প্রবাসী

৫৪শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬১

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবন—

মালদহে বন্যার একটি দৃশ্য

বন্যাবিধ্বস্ত কোচবিহার

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৬১

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শক্তির আবাহন

শারদীয়া পূজা সমাগত। দেবীপক্ষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই পূজা আনন্দ ও উৎসাহের ঢেউ লইয়া আসিত এবং আজও আসে। শুধু আজ যাহারা গৃহহারা তাহারা সে আনন্দে বঞ্চিত—তাহাদের সান্ত্বনা দিতে পারেন একমাত্র পরম জননী।

কিন্তু এই আনন্দের অধিকারী কে বা কাহারা সে কথা আমরা কয়জন ভাবিয়া থাকি। চাঁদার খাতায় লব্ধ অর্থের ব্যয়ে—বা অপব্যয়ে—বৃথা আড়ম্বরে ও প্রচণ্ড শব্দে পাড়াপ্রতিবেশীকে যাঁহারা চমকিত করেন তাঁহারা কি আনন্দময়ীর প্রসাদে যাহারা বঞ্চিত তাহাদের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন? যদি তাহা তাঁহাদের মনে স্থান পায় তবে এবারের পূজায় তাঁহারা চাঁদার টাকার অন্ততঃ এক-ভগ্নাংশ বন্যাপ্রপীড়িত দুঃস্থ আতুর জনের দুঃখমোচনে নিয়োজিত করুন। দরিদ্রনারায়ণ যদি সত্যই গৃহস্থের সেবার অধিকারী তবে পূজায় তাঁহার অংশ থাকিবে না কেন?

- অকালবোধন হইয়াছিল শক্তির আবাহন, উদ্বোধন ও আরাধনার জন্য, এই ত আমরা আজীবন শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে শক্তির প্রেরণা আজ বাঙালীর হৃদয়ে কোথায়? শক্তির আরাধনার ফলে কয়জন আজ নূতন উদ্যমে জীবন-সংগ্রামের পথে চলিতে আগুয়ান হইয়া থাকেন? এই শারদীয়া পূজার উৎসব বাঙালীর একান্তই আপন। শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ, বৎসরের পর বৎসর বাঙালী বহু প্রয়াসে বিস্তর অর্থব্যয়ে পূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ বাঙালীর দেহ-মনে, তাহার জীবনযাত্রা ও কার্য্যধারায় শক্তির উদ্দীপনা কোথায়? শক্তির আরাধনার যোগ্যতাই সে হারাইতে বসিয়াছে।

প্রয়াসহীন, উদ্যমবিহীন গ্লানিপূর্ণ তিক্ত মন ও ব্যর্থতার আচ্ছন্ন খেদকলুষিত হৃদয় লইয়া কি শক্তির আরাধনা সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে সমর্থ নহি, জানিও না কে দিতে পারেন।

সংগ্রামে ত পৌরুষ বিনা জয়লাভ সম্ভব নয়। সে সংগ্রাম সমরাঙ্গনেই হউক বা জীবনযাত্রায় আমরণ যুদ্ধই হউক, জয়লাভ তাহাদেরই হয়, "বিপ্লাবপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা"। যে যুদ্ধের পূর্ব্বেই পরাজয়ের কালিমা দেহমনে ও হৃদয়ে লেপন করিয় ক্লীবত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহার নিকট সকল প্রেরণাই বৃথা সকল পূজাই নিষ্ফল।

আজ পথে ঘাটে বাঙালী সাধারণের বাক্যালাপে, নাটক নভেল-ছায়াচিত্রে বাঙালীর সংসারের পরিচয়ে ও ব্যর্থতায় তাহা পরিত্রাণের পথের নির্দ্দেশ নাই কোথায়ও। অথচ আজ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে সে চলিয়াছে, তাহাতে তাহার নিদারুণ প্রয়োজ আলোক-ইঙ্গিতের। বাংলার আকাশ আজ নক্ষত্র-জ্যোতিঃশূন্য পথদ্রষ্টা কেহ-বা আছেন, আজ তাহা কাহারও জানা নাই।

পথ যাহা জানা আছে তাহাও এখন বহু কালের আল অবহেলায় দুর্গম হইয়া গিয়াছে। এখন পরিত্রাণ যে চাহে, জীবনযু জয়াকাঙ্ক্ষী যে জন, তাহার বালকসুলভ রোদন ছাড়িয়া, মনপ্রা হইতে ক্লেশগ্লানি বর্জ্জন করিয়া, ভয়শূন্য হৃদয়ে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইবা সঙ্কল্প করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে যে পরাজিতের মনোভাব আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বেও বাঙালীদের এমন অবস্থা ছিল না। দুর্জ সাহস, দুর্লভকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা, একনিষ্ঠ সাধনা এবং আদর্শে প্রতি অটুট শ্রদ্ধা বাঙালীর জীবনকে সবল ও কর্ম্মমুখর করিয় তুলিয়াছিল। আজ আমরা ইতিহাসের ধার ধারি না, অথচ আত্ম প্রত্যয় ফিরাইয়া আনিতে হইলে পূর্ব্বতন ইতিহাস যে জানা একা আবশ্যক, আজিকার শিক্ষাভিমানী বাঙালীকে একথাটিও কি নূত করিয়া বলিতে হইবে? অতীত বর্ত্তমানের ভিত্তিস্বরূপ। অতীতকে ভুলিয়া যাওয়ার, বা অস্বীকার করার মনোবৃত্তি অর্জ্জন করার প্রয়া হেতু আমরা যে-কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করি তাহাই যেন ব্যর্থতা পর্য্যবসিত হইয়া যাইতেছে। আজ মা আসিতেছেন। যে অমি তেজ আমাদিগকে একদা তেজস্বী করিয়া তুলিয়াছিল, আমর শক্তির আবাহনের মাধ্যমে যেন সেই শক্তিরই পুনরুন্মেষ করিয় লইতে পারি। তাহা হইলে শক্তিস্বরূপিণীর অর্চ্চনা আমাদের জীবনে সার্থক হইয়া উঠিবে। আমরা সেই শক্তিকেই শ্রদ্ধার সহিত আবাহন জানাইতেছি।

পশ্চিমবঙ্গ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন

পশ্চিমবঙ্গ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন বিলটি আইন পরিষদে তুমুল বাধার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার কারণ বিলটি অস্বাভাবিক। গোড়াতেই গলদ হইয়াছে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় স্থাপনের প্রচেষ্টায়। কংগ্রেস দল নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলিয়া প্রচার করেন, অন্ততঃ ভারতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মিশ্র কাঠামো সমাজতন্ত্র ও অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমন্বয় বিধানের জন্য বক্তৃতা করেন, ফলে সমন্বয় যাহা হয় তাহা গজকচ্ছপ জাতীয়। দোষ অবশ্য সবটাই কংগ্রেস দলের নয়; দোষ হইতেছে ভারতীয় ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারার, যাহা সমন্বয়সংশ্লিষ্ট। আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সকলই সমন্বয় সংবেশিত, সুতরাং বর্তমান রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক আদর্শ সমন্বয়-সাধনে সচেষ্ট। সাধু ভাষায় যাহাকে বলা হয় সমন্বয়, কার্যকালে তাহা পর্যবসিত হয় 'জোড়াতালি'তে এবং এই জোড়াতালি ব্যবস্থা চিরকালই অব্যবস্থায় পরিণত হয়।

প্রস্তাবিত ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য খুবই সাধু এবং মহৎ—যথা, পতিত জমি এবং জলাভূমি উদ্ধার এবং উন্নত করা যাহাতে শহর গড়া যায়, চাষের সুবিধা হয় এবং গৃহনির্মাণ পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যকরী হয়—পানীয় জল সরবরাহ, সেচ এবং জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করা, ময়লা নিষ্কাশন ও তাহা হইতে গ্যাস উৎপাদন করা, ডেয়ারী ফার্ম খোলা, লবণ তৈয়ারি করা এবং গৃহপালিত পশুপক্ষী পালন করা। এই কর্পোরেশনের মোট মূলধনের শতকরা ৪৯ ভাগ হইবে ব্যক্তিগত এবং বাকী পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিবেন। নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হইতে সাত টাকা পর্য্যন্ত মুনাফা দেওয়া হইবে বলিয়া সরকার গ্যারাণ্টি দিবেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, অডিটর-জেনারেল কর্পোরেশনের হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন না। কর্পোরেশন স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিবে, তবে ইহার বাজেট আইন পরিষদের নিকট পেশ করা হইবে।

বিলটি সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি করা হইতেছে এই বলিয়া যে, রাষ্ট্র তথা জনসাধারণের টাকায় কতিপয় ধনী ব্যক্তির মুনাফালাভের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ব্যবসা করিতে গেলে লাভ ক্ষতি দুই-ই আছে, কিন্তু কোনও ক্ষতির ঝুঁকি না লইয়া শুধু লাভের সুবিধা ভোগ করা—এ রকম ব্যবসা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। রাষ্ট্র টাকা দিতেছেন, বেসরকারী মূলধনও খাটিবে—কিন্তু বেসরকারী মূলধন তাহার পূর্বনির্দ্ধারিত মুনাফা অবশ্যই পাইবে এবং যদি ক্ষতি হয় তাহা হইবে রাষ্ট্রের। বেসরকারী ব্যক্তিগত অংশীদাররা ক্ষতির ভাগ লইবেন না, নিয়মিত ভাবে শুধু মুনাফা পাইবেন। এইরূপ প্রস্তাব তথাকথিত 'মাঙ্গলিক' রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। ব্যবসাগুলির কার্য্য-তালিকা এত ব্যাপক এবং পন্থাগুলি এত অস্পষ্ট যে, এই ব্যবসা-সমূহকে যথাযথ ভাবে কার্য্যকরী করা বহু সময়সাপেক্ষ। মাছ ধরা হইতে আরম্ভ করিয়া ডেয়ারী ফার্ম খোলা পর্য্যন্ত সকল পরিকল্পনাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ফাঁক এত বিরাট যে, লক্ষ লক্ষ টাকা তলাইয়া গেলেও তাহার কোন হদিস পাওয়া যাইবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ এমন কৃতিত্বের সহিত তাঁহাদের মৎস্যধরার পরিকল্পনাটিকে বানচাল করিয়া-দিয়াছেন যে, মৎস্যপরিকল্পনা শুনিলেই পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় আমরা চমকাইয়া উঠি।

মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, মুনাফার গ্যারাণ্টি না দিলে ব্যক্তিগত মূলধন পাওয়া যাইবে না। ইহার উত্তরে শুধু বক্তব্য এই যে, এত সমাদরে ব্যক্তিগত মূলধনকে সরকারী কার্য্যক্ষেত্রে ডাকিয়া আনার কি প্রয়োজন? গবর্ণমেণ্ট যেখানে শতকরা ৫১ ভাগ টাকা দিতেছেন সেখানে বাকী ৪৯ ভাগ মূলধনের টাকা দিতে পারেন না? আর সকল পরিকল্পনাই একসঙ্গে সুরু না করিয়া অল্প টাকায় এক একটি করিয়া আরম্ভ করিলেই ত হয়; তাহা হইলে ব্যক্তিগত মূলধনের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন হইবে না।

এই কর্পোরেশনের টাকাকড়ি ব্যয়ের ব্যাপারে অডিটর-জেনারেলের হিসাব পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না কেন? উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় আর পন্থা যদি সাধু হয় তাহা হইলে এই সৎসাহসের অভাব হইতেছে কেন? জনসাধারণের টাকার সদ্ব্যবহার হইতেছে কি অসদ্ব্যবহার হইতেছে তাহা দেখার ভার অবশ্যই অডিটর জেনারেলের উপর থাকা উচিত ছিল। যদি তাহাতে বিশেষ বাধা থাকে তবে কড়াক্রান্তি হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্যক্ রূপে হওয়া উচিত।

যে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি প্রস্তাবিত কর্পোরেশনের অধীনে দেওয়া হইবে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগসমূহের কার্য্য। যে পরিকল্পনাগুলি ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের হাতে দেওয়া হইতেছে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ সেগুলি অনায়াসেই কার্য্যকরী করিতে পারিত। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি অর্দ্ধস্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য মুনাফালাভ করা নয়—জাতীয় কল্যাণমূলক কাজ করা। কিন্তু প্রস্তাবিত ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনটি মূলতঃ মুনাফাকামী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঋণ করিতে পারিতেন। মুখ্যমন্ত্রীর কৈফিয়ত যে জাতীয় পরিকল্পনা ঋণের জন্য আর কোন ঋণ করা বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয় তাহা কতকটা অযৌক্তিক। জাতীয় পরিকল্পনা-ঋণ বর্ত্তমানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তার পরও বার্ম্মা শেল বাজারে বেশ কয়েক কোটি টাকার ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়াছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণ তুলিতে অসুবিধা হইত না, কারণ বাজারে যে এখনও যথেষ্ট টাকা আছে তাহা বার্ম্মা শেলের ডিবেঞ্চার বিক্রয় হইতে প্রতীয়মান হয়।

ভারত সরকারের আমদানী নীতি

ইদানীং ভারত সরকার আমদানীর উপর হইতে বাধা-নিষেধ ক্রমশঃ তুলিয়া লইতেছেন, তাহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি—একে-

আয়ের হ্রাস এবং ক্রমবর্দ্ধমান ষ্টার্লিং ব্যালান্স। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শুল্ক-আয় ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, কারণ আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করিয়া দেওয়াতে শুল্কও কমিয়া যাইতেছে। বাজেটের অনুমান হইতে প্রকৃত আয় অনেক কম হইতেছে। গত পাঁচ মাসে শুল্ক-আয় হইয়াছে মোট ৬০ কোটি টাকা, এই হারে বাৎসরিক আয় দাঁড়াইবে ১৪৪ কোটি টাকায়; অথচ ১৯৫৪-৫৫ সনের বাজেটের অনুমান অনুসারে ১৭৭.৫ কোটি টাকা হওয়া উচিত। অবশ্য অক্টোবর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত রপ্তানী এবং আমদানীর হার বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এবারে রপ্তানীযোগ্য অনেক দ্রব্যের উপর হইতে শুল্কহ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ফলে প্রকৃত আয় এবারও বাজেটের অনুমান হইতে অনেক কম হইবে। সুতরাং শুল্ক আয় বৃদ্ধির জন্য অর্থমন্ত্রী কয়েকটি দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, যথা—ব্লেড, কাঁচের মালা, মেকি মুক্তা এবং বিদেশী সুরা। ইহাদের উপর শুল্কবৃদ্ধির ফলে ভারত সরকারের প্রায় ৪.৫ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত আয় হইবে।

আমাদের কংগ্রেসী সরকার সব জিনিষই খুব দেরিতে বুঝেন কিংবা বুঝিয়াও বুঝেন না। এত দিনে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করিয়া দেওয়াতে কতিপয় মাধ্যমিক ব্যবসাদার জনসাধারণের টাকায় অতিরিক্ত হারে মুনাফা লাভ করিয়া আসিতেছে। সরকারী হিসাব অনুসারে, যাহারা পণ্যজাত দ্রব্য আমদানী করিত তাহারা আমদানী খরচের উপর প্রায় শতকরা ৪০।৫০ ভাগ অতিরিক্ত হারে মুনাফা করিয়া থাকে। সরকারী কৈফিয়ত এই যে, তাঁহারা এখন জানিতে পারিয়াছেন (রিপ-ভ্যান্ উইঙ্কলের মত নিদ্রাভঙ্গের পর) যে, এদেশে বহু লোক এই চড়া দামে বিদেশী পণ্যজাত দ্রব্য ক্রয় করিত এবং তাহার দরুন লাভ করিত মুষ্টিমেয় মাধ্যমিক ব্যবসাদারেরা। ইহাতে রাষ্ট্র তাহার প্রকৃত আয় হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, অধিকাংশ আমদানী দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য ইহাদের আমদানী মূল্য হইতে শতকরা ৩০।৪০ ভাগ বেশী—এ তথ্য কর্ত্তৃপক্ষের এতদিন জ্ঞাত হওয়া উচিত ছিল। আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির আর একটি প্রধান কারণ এই যে, স্বদেশজাত এই সকল দ্রব্যের প্রস্তুতকারকেরা তাঁহাদের দেশী দ্রব্যের মান আরও উন্নত ধরণের করিবার সুযোগ পাইবেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার মূলগত নীতি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন—ইহা হইতেছে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমবিভাগ এবং জাতীয় কুশল-বৈশিষ্ট্য; যেমন কাশ্মীরী শাল আমেরিকায় উৎপাদন করা কঠিন ব্যাপার, সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি তৈয়ারির কুশলতা তাহাদের একচেটিয়া জাতীয় সম্পদ, তেমনি জার্ম্মান ইস্পাতের উৎকর্ষ পৃথিবী-বিখ্যাত।

ভারতীয় শুল্ক কমিটির অভিমত এই ছিল যে, দেশী উৎপাদনকে রক্ষণের অজুহাতে যেন অকর্ম্মণ্য প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করা না হয়—ইহাতে শুধু ব্যয় বেশী পড়ে না, অধিকন্তু মুষ্টিমেয় ধনীর স্বার্থের জন্য দেশের আপামর জনসাধারণকে অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। ভারত সরকার এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাকে সমর্থন করিয়া ঘোষণাও করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহারা অন্য রকম করেন—কতিপয় ধনীর স্বার্থকে তাঁহারা দেশের জনসাধারণের স্বার্থ বলিয়া মনে করেন। দেশী দাড়ি কামানো ব্লেড শিল্পকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা কর্ত্তৃপক্ষের একটি অপচেষ্টা, ফলে বিদেশী ব্লেডের দাম প্রায় তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছে এবং জনসাধারণ তাহাই ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন, কারণ দেশী ব্লেডে আর যাহাই হউক দাড়ি কামানো যায় না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ কি দাড়ি কামান না, এবং যদি কামান ত কিসে কামান। বিদেশী উচ্চ শ্রেণীর পণ্যজাত দ্রব্যের সম্বন্ধেও এ কথাই বলা যায় যে উচ্চ শ্রেণীর সার্জ্জ কিংবা গ্যাবার্ডিন্ বস্ত্র তৈয়ার করিতে ভারতের পক্ষে এখনও বহু বৎসর লাগিবে। সুতরাং রক্ষণ-ব্যবস্থা হইলেই সকল দেশী উৎপাদন উচ্চশ্রেণীর হইতে পারে না, তাহা হইলে আর আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বলিয়া কিছু থাকিত না এবং সকল দেশই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন হইত। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা একমুখী হয় না। ভারত যেমন তাহার আমদানী হ্রাস করিয়া দিয়াছে, তেমনি অন্যান্য দেশও ভারত-জাত দ্রব্যের আমদানী কমাইয়া দিয়াছে—ফলে ভারতবর্ষ বিশেষ লাভবান হয় নাই।

ভারতে বিদেশী উপনিবেশ

ভারতবর্ষের ভূমিতে এখনও ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ আছে। বোম্বাইয়ের দুই শত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বৃহত্তম পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া। ইহার আয়তন ১,৪০০ বর্গমাইল এবং বাকী দুইটি পর্ত্তুগীজ উপনিবেশের মোট আয়তন হইতেছে ১৩৮ বর্গমাইল। ভারতের তিনটি পর্ত্তুগীজ উপনিবেশের মোট জনসমষ্টি হইতেছে সাত লক্ষ। আরব সাগরের তীরে গোয়ার উপকূল ৬২ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত এবং জুয়ারী নদীর মোহানায় গভীর সামুদ্রিক বন্দর মর্ম্মাগোয়া অবস্থিত। গোয়ার রাজধানী পাঞ্জিম কিংবা নোভা গোয়া, ইহা মাণ্ডবী নদীর মোহানায় অবস্থিত। গোয়ার অধিবাসীরা আর্য্য এবং প্রধানতঃ ভারতীয়। বর্ত্তমান অধিবাসীদের অর্দ্ধেক হিন্দু, বাকি মুসলমান এবং খ্রীষ্টান।

পুরাতন গোয়া মুসলমানদের দ্বারা ১৪৭৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ১৫১০ সনে পর্ত্তুগীজ এলফান্সো আলবুকার্ক কর্ত্তৃক ইহা অধিকৃত হয়। ভেনিসীয় এবং মিশরীয় বণিকেরা গোয়া বন্দর হইতে মশলা লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে বিক্রয় করিত। প্রায় দেড়শ' বৎসরের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধে পর্ত্তুগীজরা ওলন্দাজ এবং ব্রিটিশের নিকট তাহাদের অধিকার হারায়—গোয়া, দমন, দিউ ব্যতীত।

ইদানীং গোয়া বন্দর হইতে বিপুল পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ-প্রস্তর রপ্তানী হইতেছে, এই ধাতব দ্রব্য প্রধানতঃ ভারতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু রপ্তানীর চেয়ে সাধারণতঃ আমদানী বেশী হয়, যথা—১৯৫২ সনে আমদানীর মূল্য ছিল ৩৪.৪ কোটি এস্কুডো এবং রপ্তানীর মূল্য ছিল ১৮.২ কোটি এস্কুডো। ১৯৫৩ সনে গোয়া বন্দর হইতে জাপান, পশ্চিম জার্ম্মানী ও হল্যাণ্ডে ৮.৪৯ লক্ষ টন

লৌহ-প্রস্তর রপ্তানী হইয়াছিল এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে, কানাডা এবং হল্যাণ্ডে ২.০৭ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৫২ সনে গোয়াতে ১০ লক্ষ টন লৌহ-প্রস্তর এবং ২.৩৫ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতের পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহে লবণ উৎপাদিত হয়। ১৯৫২ সনে গোয়াতে ১৮,৪৯৯ টন, দমনে ২,১০০ টন এবং দিউতে ৩৮৩ টন লবণ উৎপন্ন করা হইয়াছিল; ইহার মধ্যে প্রায় ৮,০০০ টন রপ্তানী করা হয়। গোয়াতে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয় তাহা ইহার প্রয়োজনের দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র। ইহা ব্যতীত গোয়াতে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল, কাজুবাদাম, সুপারি, আম, মাছ জন্মে এবং সাবান ও টালি উৎপাদিত হয়। বহির্বাণিজ্যে দমনের অংশ মোট পরিমাণের শতকরা পাঁচ ভাগ এবং দিউর অংশ শতকরা তিন ভাগ—বাকি সব গোয়ার অংশ।

গোয়ার খনিজ-শিল্প প্রধানতঃ রাষ্ট্রের সম্পত্তি; খনিজ-শিল্পে প্রায় এক কোটি ডলার নিয়োজিত আছে, ইহার মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ ডলার ভারতবাসীদের। চৌগুল খনিতেই যান্ত্রিক প্রথায় উৎপাদন সবচেয়ে বেশী; এখানে প্রায় ১৪০,০০০ শ্রমিক কাজ করে এবং ইহার মধ্যে এক লক্ষ শ্রমিক ভারতীয়। গোয়ার সাঙ্কোয়েলিম, সাত্তারি, পণ্ডা এবং সাঙ্গুয়েম জেলায় প্রধানতঃ লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ খনিসমূহ অবস্থিত। প্রায় তিন কোটি টনের মত উচ্চশ্রেণীর খনিজ লোহা গোয়াতে আছে এবং সমপরিমাণ নিম্নশ্রেণীর খনিজ লোহা আছে।

ঐতিহাসিক নজির ব্যতীত পর্তুগালের নিকট গোয়ার রাজনৈতিক সার্থকতা কিছু নাই। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেখিলে গোয়া পর্তুগালের নিকট নিছক বোঝা মাত্র, কারণ পারিপার্শ্বিক ভারতীয় ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যেই গোয়ার প্রকৃত স্থান। বন্দর হিসাবে গোয়া ভারতের প্রাকৃতিক অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়, যেমন: বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা এবং কোচিন প্রভৃতির ন্যায়। ভারতের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহার খনিজ এবং কৃষিজ সম্পদের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে।

ভারতে ফরাসী উপনিবেশসমূহের মোট জনসংখ্যা হইতেছে ৩,৭০,০০০ হাজার। পর্তুগীজ এবং ফরাসী ভারতীয় উপনিবেশগুলির মোট জনসংখ্যা ভারতের একটি সাধারণ জেলার অধিবাসীর সমান। ফরাসী শহর পণ্ডিচেরী ভারতের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভারতীয় অনেক বাড়ীর পিছনের দিকের অংশ প্রায় পণ্ডিচেরীতে পড়িয়াছে, তাই এই শহরটি চোরা আমদানী-রপ্তানীর স্বর্গরাজ্য। পণ্ডিচেরী খাদ্য, তুলা, কয়লা ও পেট্রোল আমদানী করে এবং সূতা ও বস্ত্র রপ্তানী করে। ১৯৫১ সনে এখান হইতে ৭১১ টন সূতা ও ৪,৪৮০ টন বস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে গোয়া এবং পণ্ডিচেরীর ভারত হইতে বিচ্ছিন্নতা অযৌক্তিক এবং অপ্রাকৃতিক।

মার্মাগোয়া ভারতের সহিত সংযুক্ত হইলে বোম্বাই বন্দরের ভিড় অনেক কমিয়া যাইবে এবং কাজের সুবিধা হইবে। গোয়ার লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ ভারতের রপ্তানী বৃদ্ধি করিবে। তিনটি প্রদেশে—যেখানে পর্তুগীজ এবং ফরাসী উপনিবেশ অবস্থিত, অর্থাৎ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং সৌরাষ্ট্র এই তিনটি প্রদেশেই সুরাপান নিষিদ্ধ। ভারতে আমদানীর উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে এবং স্বর্ণ ও হীরার আমদানী একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু পণ্ডিচেরীতে আমদানী অবাধ এবং মুক্ত। গোয়াতে বিলিতী চকোলেট, জাপানী ফাউন্টেন পেন, আমেরিকান মোজা, সুইজারল্যাণ্ডের বস্ত্র, ফরাসী সুগন্ধি এবং সুরা অবাধে আমদানী হয়। পণ্ডিচেরীতে বেলজিয়ান ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীর আড্ডা, গোয়াতে মধ্যপ্রাচ্য হইতে আরব ব্যবসায়ীরা অবাধে সোনা লইয়া আসে। এই সকল জিনিষ সহজেই ভারতে চোরাই আমদানী হয়। ইহাতে ভারত-সরকার বৎসরে প্রায় তিন কোটি পাউণ্ড আমদানী শুল্ক হারান। অর্থাৎ আসাম এবং উড়িষ্যার যুক্ত রাজস্বের সমপরিমাণ অর্থ ফরাসী ও পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহে চোরাই আমদানীর দরুন ভারতবর্ষ হইতে বঞ্চিত হয়। এইগুলি ভারতের সহিত যুক্ত হইলে ভারতের আমদানী শুল্কের পরিমাণ প্রায় তের চৌদ্দ কোটি টাকা অতিরিক্ত হইত। এই সকল বিদেশী 'পকেটে'র অধিবাসীরা প্রধানতঃ তামিল, মালয়ালম, গুজরাটী এবং কঙ্কনী ভাষা ব্যবহার করে। এই সকল উপনিবেশের যে-সকল অধিবাসী ভারতের সহিত যুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধতা করে তাহারা ভারতের সহিত চোরা-রপ্তানীতে লিপ্ত। ভারতের সহিত ব্যবসায়ে ইহাদের আয়কর দিতে হয় না, কারণ গোয়াতে কোন আয়কর নাই।

ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতি

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু গত ২৯শে সেপ্টেম্বর লোকসভায় ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কের যে উদ্বোধন-বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এখানে দেওয়া হইল:

"২৯শে সেপ্টেম্বর—আজ লোকসভায় বৈদেশিক পরিস্থিতি এবং ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে দুই দিনব্যাপী বিতর্কের উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, বর্ত্তমানে ফ্রান্সের সহিত ভারত সরকারের যে আলোচনা চলিতেছে তাহা দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছিবে এবং আর এক মাসের মধ্যে এ সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা সম্ভব হইবে।

ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী গোয়া ও ভারত-সিংহল সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু পাকিস্থান সম্বন্ধে শুভ-কামনা প্রকাশ ছাড়া আর কিছু বলিতে অসম্মত হন। ৮০ মিনিট বক্তৃতার অধিকাংশকাল তিনি 'সীটো', 'নাটো', 'আনজাস' ও অন্যান্য আঞ্চলিক চুক্তি এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে কম্যুনিষ্ট চীনকে আসনদান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কেময়ে কামানের লড়াইয়ের জন্য তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোয়ার আন্তর্জাতিক

পর্য্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় কোন সম্ভাবনা নাই—পর্তুগীজ সরকারের 'একান্ত যুক্তিহীন' মনোভাবের ফলে সে প্রস্তাব অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, ভারতে পর্তুগীজ শাসনের অবসান হইবেই এবং ভারত শান্তিপূর্ণ উপায়েই ইহার সমাধান করিতে কৃতসঙ্কল্প। ম্যানিলা চুক্তির উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, এশিয়ার দেশগুলিকে না জানাইয়াই এশিয়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির এই ধারণাই নিন্দনীয়। জেনেভা চুক্তির ফলে যে সদ্ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ম্যানিলা চুক্তির জন্য কতক পরিমাণে দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কল্যাণ কিছুই হয় নাই, কিন্তু আশঙ্কা ও উত্তেজনা বৃদ্ধির দরুন ক্ষতি হইয়াছে অনেক। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গীটাই কেবল ভ্রান্ত নহে; এশিয়ার দেশগুলির পক্ষে বিপজ্জনকও বটে। ইহা এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং বৃহত্তর দুনিয়ার শান্তির পক্ষে ইহা বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকার এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে আসনদানই দূরপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার শান্তির সুনিশ্চিত ব্যবস্থার অন্যতম উপায়।"

বিশেষ বিবাহ বিল

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর লোকসভায় বিশেষ বিবাহ বিলটি পাস হইয়াছে। পার্লামেন্টের বিগত অধিবেশনে রাজ্য সভায় বিলটি যে আকারে পাস হয়, লোকসভাতেও দুই-একটি সংশোধনী ভিন্ন ঐ আকারেই বিলটি পাস হইয়াছে। বিবাহের নিম্নতম বয়স এবং বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজ্য সভায় যে ভাবে বিলটি পাস হইয়াছিল তাহাতে ছেলে এবং মেয়ের এই আইনের অধীনে বিবাহের নিম্নতম বয়স স্থির হইয়াছিল ২১ বৎসর। লোকসভায় গৃহীত ধারাতে ছেলেদের বিবাহের নিম্নতম বয়স ২১ বৎসর থাকিলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে তাহা কমাইয়া ১৮ করা হইয়াছে।

পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত ধারাটিরও সংশোধন করা হয়। এই ধারা অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন জেলা আদালতে করা যাইবে যদি তাহার পূর্ব্বে এক বৎসর বা ততোধিক কাল আবেদনকারিগণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিয়া থাকে এবং যদি উভয় পক্ষই বিবাহবিচ্ছেদে পরস্পর সম্মত থাকে।

এই আবেদনের অন্ততঃ এক বৎসর পর কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে উভয় পক্ষ বিবাহবিচ্ছেদ প্রার্থনা করিলে জেলা আদালত বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদন করিতে পারিবেন।

অন্যান্য ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের যে সকল বিধান রহিয়াছে তাহাতে বিবাহবিচ্ছেদের নূ্যনতম সময় বিবাহের পর পাঁচ বৎসর হইতে কমাইয়া তিন বৎসর করা হইয়াছে।

বিলটি লোকসভায় বিশেষ বিতর্কের অবতারণা করে। এই বিতর্ক দলীয় গণ্ডী ছাড়াইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহের নূ্যনতম বয়স কমাইবার জন্য যে সংশোধনী প্রস্তাব পাস হয়, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাহার বিরোধিতা করেন কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজকুমারী অমৃতকাউর উহার সমর্থন করেন। সংশোধনী প্রস্তাবটি কম্যুনিষ্ট পক্ষ কর্ত্তৃক আনীত হইলেও কয়েকজন কংগ্রেসী সদস্যের অনুরূপ সংশোধনী প্রস্তাবের সহিত তাহার যথেষ্ট মিল ছিল।

১৪ই ডিসেম্বর দীর্ঘ বিতর্কের পর বিলটির ১৫নং হইতে ২১নং পর্য্যন্ত এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা গৃহীত হয়:

"এই ধারাগুলিতে অন্যান্য রীতিতে অনুষ্ঠিত বিবাহকে এই বিশেষ বিবাহ আইনে রেজিষ্ট্রী করা এবং এই আইনে বিবাহের পরিণতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি স্থান পাইয়াছে। শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জি পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গবসহ বহু আইনবিশেষজ্ঞ এই ধারাগুলি সম্পর্কে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন কারণে এই ধারাগুলির বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সম্পর্কে তীব্র আপত্তি উত্থাপিত হয়। বিশেষভাবে পূর্ব্বে সম্পন্ন বিবাহের ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ এবং এই আইন অনুযায়ী বিবাহের ফলে একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে, সে সম্পর্কে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হয়। কেহ কেহ মুসলমানদের এই আইনের আওতা হইতে বাদ দিবার, আবার কেহ কেহ ধর্ম্মীয় বিবাহের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য না করার অনুরোধ করেন। সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহও এই বিশেষ বিবাহ আইনে রেজিষ্ট্রী করা চলিবে, এই মর্ম্মে একটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বিতর্কের মধ্যপথে উঠিয়া একটি বক্তৃতা করেন। তিনি এই আইনটি আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে বিচার না করিয়া সামাজিক লক্ষ্যের দিক হইতে এই বিলের উপর আলোকপাত করেন। প্রধানমন্ত্রী এবং আইনসচিব উভয়েই বলেন যে, সংবিধানের সামাজিক লক্ষ্য সম্পর্কে যে নির্দ্দেশ আছে তাহা পূর্ণ করার জন্য একটি সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য সামাজিক আইন প্রণয়নের ভিত্তি হিসাবেই এই বিলটি রচনা করা হইয়াছে। সামাজিক রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারাই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

বিশেষ বিবাহ বিলের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে বিতর্কের মধ্যপথে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, এই বিলটি বিভিন্ন সামাজিক রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের স্বেচ্ছামূলক প্রথম প্রচেষ্টা মাত্র। তিনি বলেন যে, সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে এইরূপ একটি বিল যদি কেহ আনেন, তিনি তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করিবেন। তবে ভারতে ঐরূপ একটি বিল প্রবর্ত্তন করার উপযুক্ত সময় এখন নয়। শ্রীনেহরু বলেন যে, এখানে তাঁহার কোন সহকর্ম্মী আঘাত পাইতে পারেন এরূপ কোন উক্তি তিনি করিতে চান না। তবে হিন্দু সামাজিক বিধি হোক অথবা মুসলমান সামাজিক বিধিই হোক কোন সামাজিক বিধির প্রতি এরূপ আত্যন্তিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন

সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজে ছোটখাটো ও অস্থায়ী ব্যাপারে এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সকল ক্ষেত্রেই ধর্মকে প্রয়োগ করিলে ধর্মের মূল ধারণাই দুর্বল হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ পরিবর্তিত হইয়াছে, যদি কেহ স্বীকার করেন তাহা হইলে কোন সময়ে বিশেষ অবস্থায় যে সামাজিক বিধি ভাল ছিল, অথচ যাহা পরবর্তীকালের উপযোগী নয় সেই সামাজিক বিধি দিয়া বর্তমান সমাজকে বাঁধিতে চাহিলে প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে না। নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রত্যেক সামাজিক বিধিকে বিকাশলাভ করিতে দেওয়া উচিত, অন্য উপায়ে ইহাকে বিকাশে বাধা করা অন্যায়।

শ্রীনেহরু বলেন যে, কঠোর আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি এই বিলটিকে দেখিতেছেন না—তিনি ইহাকে সমাজ-সংস্কার বা সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টার দিক হইতে দেখিতেছেন। এই প্রচেষ্টা খুব বড় ধরণের না হইলেও এই বিলে বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী সামাজিক জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, অতীতে হিন্দু বিধি অপরিবর্তনীয় ছিল না, ব্রিটিশদের আগমনের পর এই বিষয়ে কঠোরতার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটিশরা হিন্দু বিধি সম্পর্কে খ্যাতনামা পণ্ডিতদের এবং মুসলমান বিধি সম্পর্কে প্রখ্যাত মৌলবীদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। বহু স্থানে প্রচলিত রীতি পরিবর্তিত হইলেও মৌলবী ও পণ্ডিতগণ হাজার হাজার বৎসর পূর্বে রচিত যে পুস্তকগুলিতে বিধি নির্দিষ্ট ছিল সেই বিধির কথাই ব্রিটিশদের বলিয়াছিলেন। প্রচলিত রীতির সাহায্যে বর্তমানে এই কঠোরতা হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়—আইন প্রণয়ন করিয়া এই কঠোরতা দূর করিতে হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন যে, অতীতে হিন্দু বিধিতে পরিবর্তনের অবকাশ ছিল এবং এই পরিবর্তনের অবকাশ থাকার জন্যই হিন্দু সমাজ একটা স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি বলেন যে, কিছুদিন পূর্বে মুসলমানদের বিধি সম্পর্কে আরবী ভাষায় পণ্ডিত একজন মুসলমানের লেখা একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মুসলমানদের বিধিকে ইসলামের নিগূঢ় অংশরূপে বিবেচনা করা ভুল। এই বিধি পরিবর্তিত হইতে অথবা ন্যও হইতে পারে, কিন্তু এই বিধিকে ইসলামের মূল আদর্শের সহিত সংযুক্ত করার অর্থ সেই মূল আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা। শ্রীনেহরুর মতে, এই ব্যাখ্যাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত না হইলেও, অন্ততঃ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্তৃক ক্রমশঃ গৃহীত হইতেছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

শ্রীনেহরু বলেন যে, এই বিলটি কেবলমাত্র 'সিভিল ম্যারেজ বিলগুলি'র সম্প্রসারণ নয়—ইহাতে বিভিন্ন সামাজিক রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের একটি স্বেচ্ছামূলক প্রথম প্রচেষ্টা হইয়াছে। এ-সম্পর্কে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এই আইন অনুযায়ী যাঁহারা বিবাহ করিবেন তাঁহাদের একান্নবর্তী হিন্দু পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য করা হইয়াছে কেন? শ্রীনেহরু বলেন, কেহ কাহাকেও বাধ্য করিতেছেন না। যাঁহারা এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করিবেন তাঁহারা কতকগুলি পরিণামকে স্বীকার করিতে হইবে জানিয়াই এইরূপ বিবাহ করিবেন। তাঁহারা এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন।

বিভিন্ন সামাজিক রীতির এইরূপ সামঞ্জস্যবিধান তিনি কেন সমর্থন করেন তাহার বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, এই দেশে একটি জাতি গঠন করিতে হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক রীতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন তাঁহাদের রহিয়াছে। প্রথমতঃ, হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতিগত বিভেদ অথবা এই ধরণের যে সকল বাধা পরস্পর পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য যাঁহারা এই দেশে বাস করেন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল বাধা রহিয়াছে সেই সকল বাধা তাঁহারা যদি দূর না করিতে পারেন তাহা হইলে যে আদর্শ জাতিগঠনের কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন সেই জাতি তাঁহারা কখনই গঠন করিতে পারিবেন না। যাহাকে তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা বলেন সেই সাম্প্রদায়িকতা এই বাধাগুলি সৃষ্টি করিয়াছে। এই সাম্প্রদায়িকতার সহিত ধর্মকে মিশ্রিত করা উচিত নয়। শ্রীনেহরু বলেন যে, সিংহলে ধর্মগত বিরোধের কথা কেহ কখনও শুনেন নাই। একই পরিবারের মধ্যে হিন্দু মুসলমান এবং বৌদ্ধ থাকিতে পারে। সিংহলের অন্যান্য অসুবিধা থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ধর্মগত প্রতিবন্ধকতা নাই—যে প্রতিবন্ধকতা জাতীয়তার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ভারতে এই সকল প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। কাহারও পক্ষে এই বাধাগুলিকে হঠাৎ অথবা জোর করিয়া দূর করা সম্ভব নয়। এই প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই বর্তমান বিলটিতে প্রাথমিক প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।"

বিশেষ বিবাহ বিলটি মোটামুটিভাবে প্রগতিশীল জনমতের সমর্থন লাভ করিয়াছে, যদিও উহা সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। বিলের কয়েকটি ধারা সম্পর্কেই বিতর্কের অবকাশ থাকিয়া গিয়াছে। বিবাহ করিলে যৌথ পরিবার এবং সম্পত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে বলিয়া এই বিলে যে ধারা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তাহার সমর্থনে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে উহাকে সম্পূর্ণ প্রণিধানযোগ্য বলা চলে না।

বিলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত ধারাগুলি। বর্তমান বিলটি আইনে পরিণত হইলে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক চীন বাদ দিয়া সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্মতি-ভিত্তিতে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব হইবে।

বন্যাবিধ্বস্ত ধুলিয়ান

বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ পদ্মার ভাঙনে বিধ্বস্ত ধুলিয়ানের অবস্থা বর্ত্তমান বৎসরে বন্যার ফলে চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ধুলিয়ানের বর্ত্তমান দুর্গত অবস্থার বর্ণনাপ্রসঙ্গে "মুর্শিদাবাদ সমাচারে"র টাফ রিপোর্টার লিখিতেছেন: "এই এলাকার মর্ম্মান্তিক দৃশ্য চোখে না দেখলে অনুভব করা বাস্তবিকই কঠিন। যে ধুলিয়ানগঞ্জ রেল-ষ্টেশনের বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকা, হাওড়ার পর উহার স্থান, আজ তাহার সিকি ভাগ আরও নাই এ সংবাদও সকলেই জানেন। যে এলাকার সরকারী আবগারী শুল্ক আদায় হয় বৎসরে প্রায় আট লক্ষ টাকা—এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ রেল ষ্টেশন ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র—বন্দরের সঙ্গে আজ মাত্র একটি দিন বগীর শাটল ট্রেন যোগসাধন করছে। এখানকার ব্যাপক বিড়ি শিল্প, তাঁত শিল্প, পাট, চৈতালী, মাছ, পোনা ধরার ব্যবসা, পান, আম, পাক-ভারত বাণিজ্য, নৌকা, ষ্টীমার, যানবাহন—ব্যবসাসমূহ আজ একেবারে বিধ্বস্ত। সর্ব্বস্তরের লোক এই এলাকায় আজ সঙ্কটাপন্ন। চাকুরি, কাজ, ব্যবসা সবই আজ বন্ধ হওয়ার পথে।" সংবাদদাতা আরও লিখিতেছেন যে, বন্যার প্রকোপ এবং ভাঙনের ফলে জনসাধারণের এই দুঃস্থ অবস্থার সুযোগ লইয়া জমিদারগণ জমির উপর সর্ব্বোচ্চ মুনাফালাভের ঘৃণ্য ব্যবসা সুরু করিয়াছেন।

"রাত্রিকালে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে মানুষকে ঘরের মধ্যে মাচা খাটিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়। চারদিকে জল, অন্ধকার, ঔষধ ও পথ্যের অভাব। কিন্তু কোনরূপ সাহায্য দুই সপ্তাহের মধ্যে ঐ সকল এলাকায় পৌঁছয় নি।

"ধুলিয়ান মিউনিসিপালিটির তিনটি ওয়ার্ড—২৪০০ শত একর জমি এই ভাঙনে আজ পদ্মার গর্ভে, মাত্র একটি ওয়ার্ড টিকে আছে কোনপ্রকারে। যেখানে ট্যাক্স ছিল ১১০০০৲ টাকা তা এবার বাড়িয়ে ৩১০০০৲ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে।"

এইরূপে জনসাধারণের কষ্টের বোঝা প্রতিনিয়তই দুর্ব্বহ হইতেছে।

বন্যাবিধ্বস্ত ধুলিয়ান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শ্রীদুর্গাপদ সিংহ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় বলেন যে, উত্তরবঙ্গের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের সহিত ভাঙন-বিধ্বস্ত ধুলিয়ানের কোন সম্পর্ক নাই। তথাপি সরকার ধুলিয়ান অঞ্চলের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া তিনি আশ্বাস দেন। এই প্রসঙ্গে ২৮শে ভাদ্রের "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় "প্রসাদ" শ্রীদুর্গাপদ সিংহের বক্তব্য সমর্থন করিয়া বলেন, "মুর্শিদাবাদ জেলায় যেরূপ বন্যা হইয়াছে ধুলিয়ানের প্লাবন অনেকটা সেইরূপ। কাজেই মালদহ জেলায় অনুরূপ ব্যবস্থা এখানেও হওয়া উচিত। তবে মালদহে চীৎকার করিবার লোক অধিক থাকায় সরকারের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আর ধুলিয়ান লইয়া চীৎকার করিবার লোকাভাব; সুতরাং সবকিছু মন্ত্রী মহোদয়ের কর্ণগোচর হয় না। ধুলিয়ানের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই।"

পদ্মানদীতে নরনারীর মৃতদেহ

৭ই সেপ্টেম্বর "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, গত ৩০শে আগষ্ট পদ্মানদী দিয়া বহু নরনারীর মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়। ভগবানগোলা থানার অধীন চরবনগোলা গ্রামের জনৈক অধিবাসীর উক্তিতে জানা যায়, সে নাকি ঐ দিনে প্রাতঃকালে নিজে ছাব্বিশটি নরনারীর মৃতদেহ নদীর কূল হইতে সরাইয়া দিয়াছে।

পত্রিকাটির ভগবানগোলাস্থিত সংবাদদাতা উক্ত সংবাদ দিয়া আরও জানাইয়াছেন যে, মৃত দেহগুলি নাকি সবই বিহারের অধিবাসীদের। মৃতদেহগুলির গাত্রস্থিত গহনা দেখিয়াই ঐরূপ অনুমান করা হইয়াছে। সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ঐ তারিখের প্রায় এক পক্ষকাল পূর্ব্বেও নাকি বহু মৃতদেহ নদী দিয়া ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়। "একদিনের সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটি লোক ধান কাটিতে গিয়া প্রায় পৌনে দুই শত নরনারী ও শিশুর মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছে। রাত্রিকালেও বহু মৃতদেহ ভাসিয়া গিয়াছে, তবে সঠিক নির্ণীত হয় নাই। বহু অধিবাসী ঐ সব মৃতদেহ হইতে বহু অলঙ্কার উদ্ধার করিয়াছে।

"তন্মধ্যে তিনটি লোকের সংবাদ সঠিকভাবে পাওয়া গিয়াছে। একজন এগার ভরি সোনার, দ্বিতীয় জন (রাজসাহীর সীমান্তস্থিত গ্রামের) প্রায় আটাশ ভরি সোনার অলঙ্কার এবং অপর জন তিনটি হাতঘড়ি পাইয়াছে।"

হায়দরাবাদে ভয়াবহ ট্রেন-দুর্ঘটনা

হায়দরাবাদে দুই-তিন দিন পূর্ব্বে একটি ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। আমরা এখানে শুধু সংবাদই পরিবেশন করিলাম। এ রকম ট্রেন-দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুঃখকর। এরূপ দুর্ঘটনা ভবিষ্যতে যাহাতে না হয়, রেল-কর্তৃপক্ষের সেদিকে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন:

"হায়দরাবাদ, ২৮শে সেপ্টেম্বর—গতকল্য মধ্যরাত্রে সেকেন্দারাবাদ-কাজিপেটা লাইনে জানগাঁও ও রঘুনাথপল্লী ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী এলাকায় কাজিপেটাগামী একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন বর্ষার জলধারায় স্ফীত নদীগর্ভে পতিত হওয়ায় ১৩ জন যাত্রীর মৃত্যু হইয়াছে।

ঘটনাস্থল হইতে প্রত্যাগত হায়দরাবাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি. রামকৃষ্ণ রাও রাজ্য বিধানসভায় বলেন যে, বেলা সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত ১৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে এবং এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ রাও বলেন, দুর্ঘটনায় পতিত ট্রেনে আনুমানিক প্রায় পাঁচ শত যাত্রী ছিল। উহাদের মধ্যে প্রথম ও শেষ গাড়ীখানির যাত্রিগণ রক্ষা পায়। এই দুইখানি গাড়ী উল্টায় নাই। এই দুইটি গাড়ীর মধ্যে দিল্লীগামী থ্রু গাড়ীখানি ছিল। আরও কয়েকজন যাত্রীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। তাহারা একটি গাড়ীর

মধ্যে ঝুলিয়াছিল। পাঁচখানি গাড়ী উল্টাইয়া নদীর মধ্যে পড়িয়া যায়।

হায়দরাবাদ হইতে ৫৪ মাইল দূরের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে পরে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানিতে ৩১৯ জন যাত্রী ছিল। ট্রেনখানি একটি সেতুর উপর দিয়া যাইবার সময় সেতুটি ধ্বসিয়া যায় এবং ইহার ফলে ট্রেনখানি নদীতে পড়িয়া যায়। নদীর প্রবল স্রোতে ট্রেনের সাতখানি কামরার মধ্যে ৩ খানি কামরা এক মাইলেরও অধিক দূরে ভাসিয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় ৭৩ জন নিহত ও ৭২ জন আহত হইয়াছে। ৭৫ জন যাত্রীর এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। ইহারা ভাসিয়া গিয়াছেন বলিয়া উদ্ধারকারী দল অনুমান করিতেছেন।

ট্রেনের যাত্রীদের বহু আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সংবাদপ্রাপ্তির পর দুর্ঘটনা-স্থলে যান। যে সকল মৃতদেহ সনাক্ত করা হয়, তাহা তাহাদের আত্মীয়দের হাতে সমর্পণ করা হয় এবং হায়দরাবাদের ওসমানিয়া হাসপাতালে আরও মৃতদেহ আনয়ন করা হইয়েছে।

গাড়ীগুলি বহুলাংশে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। নদীটি ক্ষুদ্র হইলেও গতরাত্রে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ ছিল। নদীগর্ভে পতিত গাড়ীগুলি এক মাইল বা অর্দ্ধ মাইল দূর পর্য্যন্ত এবং মৃতদেহগুলি প্রায় দশ মাইল দূর পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যে এই দুর্ঘটনাকে অভূত-পূর্ব্ব বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, তিনি হতাহতদের সঠিক সংখ্যা বলিতে পারেন না। অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত ৭৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং আরও বহু মৃতদেহের সন্ধান চলে। দুর্ঘটনায় আহত প্রায় ৫০ ব্যক্তি চিকিৎসাধীনে আছে। মৃত-দেহগুলির সন্ধানের জন্য সন্ধানী দলসমূহ প্রেরণ করা হইয়াছে।"

পরবর্ত্তী সংবাদে ঘটনাটি সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য জানা গিয়াছে :

"হায়দরাবাদ, ২৯শে সেপ্টেম্বর—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রে জনগাঁও-এর নিকটে যে ট্রেন দুর্ঘটনা হয়, তাহাতে নিহতদের সংখ্যা বর্ত্তমানে ১২৬ জনে দাঁড়াইয়াছে। আজ আরও ৫০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে এবং গুরুতররূপে আহতদের মধ্যে ৩ জন হাসপাতালে মারা গিয়াছে। আজ রাত্রে এখানে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, অদ্য যে সকল শব তোলা হইয়াছে তাহা সনাক্ত করার জন্য আগামীকল্য সকালে হায়দরাবাদে নীত হইবে। আরও কিছু পরিমাণ নিখোঁজ যাত্রীর সন্ধানের নিমিত্ত নদীতে অনুসন্ধান-কার্য্য চলিতেছে। রেল-কর্ত্তৃপক্ষের মতে ট্রেনে ৩২৪ জন যাত্রী ছিল।

ইউনিয়ন-সংসদের উভয় সভায় এই দুর্ঘটনায় জন্য সদস্যেরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে বিবরণ দেন তাহাতে তিনি বলেন যে, ৭ খানা বগী এই দুর্ঘটনায় জড়াইয়া পড়ে। উহার মধ্যে তিনখানি নদীস্রোতে ভাসিয়া যায়।

আজ সকালে দুর্ঘটনার স্থান হইতে বাসন্তী নদী বরাবর ২০ মাইল বিস্তৃত এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টায় সন্ধানকার্য্য চলে। আহত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন উদ্বিগ্নভাবে খোঁজ-খবর লইবার জন্য ওসমানিয়া হাসপাতালে সমবেত হন। বেসরকারী সংবাদে প্রকাশ, বাসন্তী নদী হইতে যেসব খাল বাহির হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি শব ভাসিতে দেখা গিয়াছে।"

হায়দরাবাদ ও নিজাম

"স্পেক্টেটর" পত্রিকায় ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত এক বিশেষ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, পুলিস একশনের ফলে "নিজামের রাজ্য" এবং তাঁহার "প্রজাবৃন্দ" মুক্ত হইলেও রাজাকার নেতা মহামান্য নিজাম বাহাদুর অপূর্ব্ব কূটনৈতিক জ্ঞানের বলে নিজাম হইতে রাজ-প্রমুখ বনিয়া গেলেন।

রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিজামের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। নিজাম তাঁহাকে তেলুগু-ভাষায় সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন ; কিন্তু মিঃ এম. কে. ভেল্লোডি যখন মন্ত্রীসভার চার জন কংগ্রেসী সদস্যকে নিজামের নিকট লইয়া যান তখন নিজাম বিরক্তি প্রকাশ করেন। ঐ সময় "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" পত্রিকা এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করিয়া বলেন, নিজাম নাকি ঐ চারি জন কংগ্রেসী মন্ত্রীকে যথাযথরূপে শপথ-গ্রহণ করান নাই।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম বার হায়দরাবাদ সফরে গেলে নিজাম নাকি একটি ফার্সী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করিতে বলেন। সম্প্রতি তাঁহার অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা সি. বি. তারাপোরওয়ালা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটির নাম "শাসক হইতে রাজপ্রমুখ"।

প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত পুস্তিকখানিতে নাকি বিশেষ আপত্তিকর বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখক জোর দিয়া বলিতেছেন যে, যদিও অস্বীকার করা হইয়াছে তবুও তিনি বলিতে পারেন, পুস্তিকাটির ৪০০ কপি আমেরিকায় এবং ৫০০ কপি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে পাঠানো হয়। বাকি ১০০ কপি ভারতে বিভিন্ন রাজ্যসভা এবং পার্লামেন্টের কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

বর্ত্তমানে নিজাম নাকি "সিরাজ" নামক একটি উর্দ্দু সাপ্তাহিকে লেখেন। প্রবন্ধকারের সংবাদ অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের সকল মুসলমান রাজ্যেই ঐ পত্রিকার কপি যায়। নিজামের রচনাবলী নাকি অনেক দিক হইতেই আপত্তিজনক।

প্রবন্ধকার লিখিতেছেন যে, কাশ্মীরে সদর-ই-রিয়াসাত যদি কিছুদিন পূর্ব্বেও জনপ্রিয় আবদুল্লাকে পদচ্যুত করিতে পারিয়া থাকেন সে ক্ষেত্রে জনসমর্থনহীন নিজামকে সরাইতে ভারত সরকার গররাজী কেন তাহা বুঝা যায় না। নিজামকে মুসলমানেরা ভালবাসে একথাও খুবই ভুল।

হায়দরাবাদে দুর্নীতি অনুসন্ধান

হায়দরাবাদ রাজ্যে দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং তাহা দূরীকরণকল্পে আইন প্রণয়নে উপযুক্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য শ্রীরামচন্দ্র এস. নায়কের সভাপতিত্বে ছয় জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি দুর্নীতি দমন তদন্ত কমিশন নিয়োগ করাইয়া সম্প্রতি কমিশন তাঁহাদের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। হায়দরাবাদ হইতে নব-প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক "স্পেক্টেটরে"র ২৩শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় উক্ত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের অংশবিশেষ প্রকাশিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির প্রবলতা সম্পর্কে কাহারও মনে সন্দেহ থাকিবার কথা নহে; তবে এ রাজ্যে সরকার এই সকল ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে বিশেষ উৎসুক নহেন। সাধারণভাবে দুর্নীতির সমস্যা একটি সর্বভারতীয় সমস্যা এবং তাহার রূপও মোটামুটি একই প্রকার। সেই কারণেই দুর্নীতির কারণ সম্পর্কে হায়দরাবাদ কমিশন যে সকল সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতের প্রতিটি রাজ্যের অধিবাসীই তাহা আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করিবেন।

তদন্ত কমিশনের ৭৮টি অধিবেশন হয়। কমিশন ৭৩জন সাক্ষীর সহিত আলোচনা করেন। তদ্ব্যতীত রাজ্যের কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির সহিত তাঁহারা বেসরকারীভাবে আলোচনা করেন। কমিশন একটি প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করেন এবং তাহার ১৫৪৮টি কপি—বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সমাজসেবী দল, রাজ্য বিধানসভার এবং হায়দরাবাদ হইতে নির্বাচিত লোকসভার সদস্যদের প্রত্যেকের নিকট এক এক কপি করিয়া পাঠান। তন্মধ্যে মাত্র ১১২টি উত্তর আসে। ইহা ব্যতীত ৪০টি ব্যক্তিগত অভিযোগ আসে; কিন্তু ব্যক্তিগত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার অধিকার না থাকায় কমিশন তাহা নথীভুক্ত করিয়া রাখেন।

প্রশ্নপত্রের যে সকল উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অতীতে দুর্নীতি বিদ্যমান থাকিলেও বর্ত্তমানে তাহার অভূতপূর্ব্ব প্রসার হইয়াছে। কয়েকজন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্থলিপ্সা বৃদ্ধি এই দুর্নীতির কারণ নহে। তাঁহাদের অভিমতে সরকারী বিভাগের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিশেষতঃ কনট্রোল ব্যবস্থার ফলেই দুর্নীতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অল্পসংখ্যক ব্যক্তির অভিমতে যেরূপ প্রচার হইয়া থাকে, দুর্নীতির প্রসার আসলে তত ব্যাপক নহে।

কেবলমাত্র একজন (দায়িত্বপূর্ণ সরকারীপদে অধিষ্ঠিত) বলেন যে, পুলিস একশনের পর হইতে সাধারণভাবে হায়দরাবাদে দুর্নীতি হ্রাস পাইয়াছে বলা চলে। তবে অতীতের দুর্নীতি যে কোন ক্ষেত্রে এখনও প্রশ্রয় পায় না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

অপর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে কমিশনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হইলে তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, তদন্তের অধীন বিষয় সম্বন্ধে কোন কিছুই তিনি বলিতে অক্ষম।

বর্ত্তমানের দুর্নীতির জন্য সরকারী কর্ম্মচারী এবং জনসাধারণ—কাহার কতখানি দায়িত্ব এই সম্পর্কে অধিকাংশের অভিমত এই যে, সরকারী দপ্তরগুলিরই দোষ বেশী। তাঁহাদের মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়মত কার্য্যসিদ্ধি করিবার তাগিদে জনসাধারণ এই সকল কুপ্রথার সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হন। একজন প্রধান সাক্ষীর ভাষায় "সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে কোন বিশেষ সুবিধালাভের জন্য ঘুষ দেওয়া হয় না; যাহাতে সেই সকল অফিসার দৈনন্দিন কার্য্যে অযথা হস্তক্ষেপ করিয়া অনর্থক বাধা সৃষ্টি না করেন সেইজন্যই ঘুষ দেওয়া হয়···বর্ত্তমানে এই সকল অফিসারের সাহস এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ঘুষকে তাঁহারা নিয়মিত পারিশ্রমিকের অংশ বলিয়াই গ্রহণ করেন।"

অন্যদের অভিমতে জনসাধারণই বরং সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ঘুষ গ্রহণের জন্য প্রলুব্ধ করে।

মহাযুদ্ধের সময় হইতে সরকারী বিভাগের প্রসার ও জনসাধারণের নৈতিক মানের অধোগতি এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর নানারূপ পরিবর্ত্তন; খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির উপর যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সংরক্ষণ; যুদ্ধকালে প্রচলিত, সরকারী কর্ম্মচারী এবং তাহাদের পত্নীদের মারফত জনসাধারণের নিকট হইতে বিভিন্ন ধরণের তহবিলের জন্য অর্থ আহরণ এবং আধুনিককাল পর্য্যন্ত তাহার প্রচলন; পুলিস একশনের অব্যবহিতপূর্ব্বে এবং পরে রাজ্যের অনিশ্চিত অবস্থা; স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতিহীন বহিরাগত অফিসারদের সংখ্যাধিক্য ও তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এবং সময় থাকিতে কাজ গুছাইয়া লইবার মনোবৃত্তি; স্বেচ্ছাতন্ত্র হইতে হঠাৎ গণতান্ত্রিক কাঠামোতে শাসনব্যবস্থার রূপান্তর; জীবনযাত্রার ব্যয়াধিক্য এবং তৎসহ বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি; বহুক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ, অল্পবয়স্ক অফিসারদের দায়িত্বপূর্ণপদে সত্বর প্রমোশন; কর্ম্মসমাপনে বিলম্ব; অফিসারদের সহিত সাক্ষাতের অসুবিধা প্রভৃতিকে দুর্নীতিবৃদ্ধির কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে। তদুপরি মন্ত্রীমহোদয়দের ঘন ঘন পরিদর্শন-পর্য্যটনকেও দুর্নীতি বৃদ্ধির সহায়করূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মন্ত্রীরা ভ্রমণে বাহির হইয়া যে স্থানে অবস্থান করেন সেখানে তাঁহাদের 'খানাপিনা'র ব্যয় সাধারণতঃ স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকেই বহন করিতে হয়। উপরন্তু তাঁহাদের পরিদর্শনের সময় স্থানীয় আপিসের রুটিন-বাঁধা কাজেও ব্যাঘাত হয় বলিয়া বলা হইয়াছে। দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হইবার পরও অবস্থার উন্নতি ত হয়ই নাই, বরং কয়েক ক্ষেত্রে অবনতিই ঘটিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ, দৈনন্দিন সরকারী কার্য্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ এবং মন্ত্রীদের শাসনব্যাপারে অনভিজ্ঞতার ফলেও দুর্নীতির প্রসারে সাহায্য হইয়াছে।

প্রায় সকল সাক্ষীই সাধারণ জনজীবনে (সরকারী বিভাগসহ) নৈতিক মানের অবনতির উল্লেখ করিয়াছেন। স্বজনতোষণ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব এত প্রবল রূপ ধারণ করিয়াছে যে, জাতীয়

স্বার্থের উপর ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করিয়া দেখা আজ স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হইয়াছে।

রাজ্য সরকারের রাজস্ব-বিভাগ সম্বন্ধে সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে যে, প্যাটেল ও পাটওয়ারী প্রভৃতি গ্রাম্য কর্মচারী—যাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া শাসন-কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারা খুব কম বেতন পায়। উত্তরাধিকারসূত্রে তাহারা এই পদ পায় এবং গ্রামে তাহাদের বেশ প্রভাব থাকে। অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত প্রজাদের নিকট হইতে সকল প্রকার সুবিধা আদায় করিতে তাহারা কদাচিৎ ভুল করে।

অনুরূপভাবে রেভিনিউ ইন্‌স্পেক্টরও তাহার নিজের স্বার্থ গুছাইয়া লইতে চেষ্টা করে। অথচ এই ইনস্পেক্টরের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই তহশীলদারকে চলিতে হয়। তহশীল আপিসে পেশকার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রাজস্ব-সংক্রান্ত নানা ব্যাপারেই পেশকারের হাত থাকায় সেও স্বার্থ-সিদ্ধির কোন সুযোগকেই অবহেলা করে না।

নূতন প্রজাস্বত্ব আইন চালু হওয়ার পর রাজস্ব-কর্মচারীদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা কয়েকজন সাক্ষী বলিয়াছেন।

গরু "সংরক্ষণে"র রাজনীতি

সম্প্রতি গোহত্যা বন্ধ করিবার জন্য ভারতবর্ষব্যাপী এক আন্দোলন হইয়া গেল। পশ্চিমবঙ্গেও আমরা অনুরূপ আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখানে এই আন্দোলন নানারূপ কৌশল খাটাইয়াও জনসমর্থন সংগ্রহ করিতে না পারায় আন্দোলন সম্পর্কে সম্প্রতি বিভিন্ন মহল হইতেই নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এ সম্পর্কে নিম্নরূপ আলোচনা হইয়া গিয়াছে :

"গোহত্যা সম্পূর্ণ নিবারণের জন্য জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার চৌধুরীর বেসরকারী প্রস্তাবের উপর শুক্রবার বিধান সভায় একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এবং কংগ্রেসদলের অন্যতম হুইপ শ্রীকালী মুখার্জি যখন গোহত্যা নিবারণকারী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন সভায় যে ধরণের উদ্দীপ্ত, তীক্ষ্ণ আগ্রহ দেখা দেয়, তাহা প্রায় অভূতপূর্ব।

বিস্ময়জনকভাবে কম্যুনিষ্ট নেতা এবং কংগ্রেসের হুইপ একই ধারায় বক্তৃতা করেন। শ্রীজ্যোতি বসু কংগ্রেস পক্ষের সদস্যদের দ্বারা এমনকি একজন উপমন্ত্রীর দ্বারাই সভাকক্ষে উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসিত হন।

শ্রীকালী মুখার্জি প্রথমতঃ দেখান যে, অকেজো এবং অতিরিক্ত গরুর সংখ্যা গ্রামীণ অর্থনীতির উপর কি বিরাট ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যে দেশে গরুকে দেবতা বলিয়া পূজা করা হয়, সেই দেশেই গরুর অবস্থা পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্টতম। দ্বিতীয়তঃ, তিনি এই গোহত্যা নিবারণকারী আন্দোলনের পিছনে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় এই অভিযোগ দাঁড় করান যে, গত কিছুকাল যাবৎ যাঁহারা ভেজাল-বিরোধী আন্দোলনে হয়রান হইতেছিলেন, তাঁহারাই গোহত্যা নিবারণের আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা গরুর চামড়া বাহিরে চালান দেন, হাড়ের কারবার করেন কিংবা কসাইখানার রক্ত যাঁহারা কণ্ট্রাক্ট নেন, তাঁহারাই যে গো সত্যাগ্রহী-দের টাকা জোগাইতেছেন এমন প্রমাণ আছে।

উপসংহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত মুখার্জি তাঁহার বক্তৃতায় কেজো এবং অকেজো গরুর সংখ্যা, গরুর স্বাভাবিক মৃত্যু এবং কসাইখানায় হত্যার সংখ্যা, গরুর চামড়ার ব্যবসা ও চালানের পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য উল্লেখ করেন এবং স্বভাবতঃই তাঁহার বক্তৃতা সভার অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি দেখান যে, অত্যন্ত নগণ্যসংখ্যক গরু কসাইখানায় হত্যা করা হয়। স্বাভাবিক মৃত্যুর তুলনায় ঐ সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও কম। কিন্তু উপসংহারে যখন তিনি সহসা বক্তৃতার মোড় ফিরাইয়া বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যবসা-দার ও ভেজালের কারবারীদের সহিত বর্তমান আন্দোলনের যোগ-সূত্র দেখাইতে যান এবং এই প্রসঙ্গে ট্যাপিয়োকা দানার কেলেঙ্কারীর কথাও উল্লেখ করেন, তখন কংগ্রেসপক্ষের কয়েকজন সদস্যের মধ্যে স্পষ্ট অস্বস্তির লক্ষণ দেখা দেয়।"

গোহত্যা নিরোধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু এই সম্পর্কে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহার উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে গোজাতির কল্যাণকর কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। "পিপল" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীরমেশচন্দ্র সিংহ লিখিতেছেন যে, উত্তরপ্রদেশের মথুরাতে এক সম্প্রদায়ের লোক স্বেচ্ছায় গোহত্যা নিরোধকল্পে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও অপর এক সম্প্রদায়ের কিছু লোক গোহত্যা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের দাবি জানায় এবং সেজন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিতে উদ্যত হয়। অবশ্য পরে সত্যাগ্রহের পথ পরিত্যক্ত হয় ; কিন্তু ইতিমধ্যে যথেষ্ট 'ঘটনা' ঘটিয়া যায়।

সিংহ মহাশয় লিখিতেছেন :

"কয়েকটি শহর এবং কয়েকজন লোকের কল্পনা ছাড়া গোহত্যা ভারতবর্ষে হয় না বলিলেও চলে। ছয়টি রাজ্যে আইনবলে গোহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সাতটি রাজ্যে গরুসহ সকল প্রয়োজনীয় প্রাণিহত্যাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, আটটি রাজ্যে গোহত্যা হয়ই না, একটি রাজ্যে যদিও স্বেচ্ছায়ই গোহত্যা বন্ধ করা হইতেছে তবুও আইন প্রণয়নের আলোচনা চলিতেছে।"

এরূপ ক্ষেত্রে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া উঠিতে পারা শক্ত।

ধলভূমে বাঙ্গালীর সমস্যা

উক্ত শিরোনামা দিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ৩রা আশ্বিন, "নবজাগরণ" লিখিতেছেন, ধলভূম যে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল

তাহা নিঃসন্দেহ। বাঙালী সমাজকে বাদ দিলেও ঐ অঞ্চলের সাঁওতাল, খাড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের বাংলা ভাষায় দখল রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দী প্রচারের উদ্দেশ্যে, আদিবাসী উন্নয়নের অজুহাতে বিহার সরকার এই সকল আদিবাসীর উপর সুপরিকল্পিতরূপে হিন্দী চাপাইয়া দিতেছেন। "হিন্দী ভাষা যে এখানকার আদিবাসীদের বোধগম্য নহে তাহারও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ—সংকার ঘাটশিলা অঞ্চলে যে খাড়িয়া বসতি পরিকল্পনা লইয়া কাজ করিতেছেন তাহার জন্য এক জন খাড়িয়া অফিসারকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার মাহাত্ম্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে খাড়িয়া ভাষায় বিবৃত করাই তাঁহার কাজ। এই খাড়িয়াগণ অনায়াসেই বাংলা বুঝিতে পারে, কিন্তু সরকারের অত্যুগ্র হিন্দীপ্রীতির ফলে এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।"

বর্ত্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে যে পাঠক্রম প্রস্তুত হইতেছে তাহা সবই হিন্দী ভাষার মাধ্যমে। হিন্দী পুস্তক ক্রয় করাইবার জন্য সরকারের এক অভিনব প্রচেষ্টার কথা "নবজাগরণ" উল্লেখ করিয়াছেন: "যদি বাংলা ভাষা কোনক্রমে প্রশ্রয়লাভ করে এই আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ পাঠ্যপুস্তকগুলি সরাসরি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তাহার সঙ্গে এই নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে যেন ছাত্রেরা সেই সমস্ত পুস্তকই ক্রয় করে।"

কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রেই যে কেবল বাঙালীদের প্রতি বৈষম্যমূলক সরকারী আচরণ সীমাবদ্ধ তাহা নহে, চাকুরির ক্ষেত্রেও আজ বাঙালীদিগকে নানারূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। "নিজস্ব কৃতিত্বে এবং হিন্দীর জয়ধ্বজা উড়াইয়াও ছাত্রেরা যদি সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরি প্রার্থী হয় সে ক্ষেত্রেও তাহাদের নিকট হইতে দাবি করা হয়—ডোমিসাইল সার্টিফিকেট। যেহেতু তাহারা বাংলাভাষাভাষী, অতএব তাহাদের যত কৃতিত্বই থাকুক না কেন, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তাহাদিগকে দেখাইতেই হইবে। সর্ব্ববিষয়ে বাংলাভাষাভাষীরা এইরূপ ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্য বেশীর ভাগই দেওয়া হয় আদিবাসীদিগকে ও তথাকথিত তপশীলী শ্রেণীভুক্তদের অর্থাৎ হরিজনদের। অথচ যে সমস্ত শিল্প আজ মূলধন এবং শিক্ষার অভাবে মৃতপ্রায় তাহাদের প্রতি সরকারের কোন দৃষ্টি নাই। সরকার আজ দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া হিন্দী-প্রচারে মত্ত হইয়াছেন।"

বর্দ্ধমান হাসপাতালে অনাচার

বর্দ্ধমান শহরে অবস্থিত ফ্রেজার হাসপাতাল সম্পর্কিত নানাবিধ অভিযোগ প্রায়শঃই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সকল অভিযোগের যথাযথ তদন্ত, এবং অভিযোগ সত্য হইলে উহার কারণ দূরীকরণের কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির মন্তব্য হইতে বরং অবস্থার ক্রমাবনতিরই চিত্র ফুটিয়া উঠে।

"হাসপাতালে হাইকোর্ট" এই শিরোনামা দিয়া ৩১শে আগষ্টের 'দামোদর' হাসপাতাল পরিচালনার ক্রমাবনতির উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন: "ডাক্তারগণ নিয়মিতভাবেই অনুপস্থিত থাকেন অথবা কোন প্রকারে চাকুরী রক্ষা করিতে একবার পদধূলি দিতে আসিয়া গল্পগুজব করিয়া চলিয়া যান। নিতান্ত বিপন্ন রোগী আসিলেও হাসপাতালে স্থান হয় না। ইহার জন্য হাইকোর্ট করিতে হয় অর্থাৎ জেলাশাসক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। বর্দ্ধমান হাসপাতালের আর-এম-ও যেন সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছেন। তাঁহার নিকট মানুষের জীবনের কোন মূল্য নাই।"

এই প্রসঙ্গে পত্রিকাটি একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকাশ, সুদূর কালনা থানার অন্তর্গত বাগ্নীনাটপুরের জনৈক সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ উরুভঙ্গ অবস্থায় গত ২৪শে আগষ্ট হাসপাতালে আনীত হয়। দরিদ্র মধ্যবিত্ত বৃদ্ধের স্থানীয় চিকিৎসায় ফললাভ না হওয়াতে তাহার ভ্রাতা শ্রীমোহিত নন্দী ৬০ টাকায় একটি বাস ভাড়া করিয়া রোগীকে বর্দ্ধমানে আনয়ন করেন। 'দামোদরে'র কথায় রোগীকে প্রথমে ইমার্জেন্সী বিভাগে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে রোগী পরীক্ষা না করিয়া আউটডোরে লইয়া যাইবার হুকুম দেওয়া হয়। আউটডোরে রোগীর নাম ডাকা হইলে, মোহিতবাবু উত্থানশক্তিহীন রোগীকে গাড়ীতে গিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহাতে ডাক্তার 'রোগী দেখিব না' বলিয়া দেন। মোহিতবাবু আর-এম-ওর নিকট কাকুতিমিনতি করিলে তিনি এক্সরে করাইয়া আনিতে বলেন। অতঃপর ডাঃ শক্তি পবির নিকট এক্সরে করাইয়া বিশিষ্ট সার্জ্জন ডাঃ শচীন রায়কে দেখাইয়া বেলা একটার সময় হাসপাতালে আর-এম-ওর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, তিনি কোয়ার্টারে গিয়াছেন। সময় উত্তীর্ণ হইতেছে এবং ভাড়া বাসকে ফিরাইয়া দিতে হইবে, এমন অবস্থায় উপায়ান্তর না দেখিয়া মোহিতবাবু হাসপাতাল এলাকায় অবস্থিত আর-এম-ও-র কোয়ার্টারে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যান। আর-এম-ও তাঁহাকে বিরক্তির সহিত তীব্র ভাষায় বাহির হইয়া যাইতে বলেন। মোহিতবাবু এইরূপ রোগী লইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার পথে বিষয়টি দামোদর পত্রিকার প্রতিনিধির গোচরীভূত করেন। দামোদরের প্রতিনিধি মুমূর্ষু রোগীসহ জেলাশাসক শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট গিয়া হাসপাতাল-কর্ত্তৃপক্ষের এই হৃদয়হীনতার কথা বিবৃত করিলে তিনি দয়াপরবশ হইয়া সিবিল সার্জ্জনকে ফোন করেন। ফোন পাইয়া সিবিল সার্জ্জন হাসপাতালে আসিয়া স্বয়ং রোগীকে ভর্ত্তি করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

'দামোদর' লিখিতেছেন, "আমরা শ্রীল আর-এম-ও বাহাদুরকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি রোগীটিকে যখন হাসপাতালে স্থান পাওয়ার অযোগ্য বলিয়া তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এখানে আবার তাহার স্থান হইল কেন?···জেলাশাসক মহাশয় না থাকিলে রোগীটিকে ফিরিবার পথেই মরিতে হইত। যাঁহাদের আচরণ ও কর্ম্মের ফলে একটি জীবনদীপ চিরতরে নিবিবার উপক্রম হইয়াছিল তাঁহাদের কি বিচার সরকার করিবেন না, নরনারায়ণকেই করিতে হইবে?"

বারাসত ফুটবল খেলার মাঠে হাঙ্গামা

বারাসত ক্রীড়া-সংস্থার পরিচালনায় স্থানীয় ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় বারাসতের দুইটি জনপ্রিয় দল সমানসংখ্যক পয়েন্ট অর্জন করায় লীগবিজয়ীর সম্মান কোন্ দল পাইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য। গত ১২ই সেপ্টেম্বর পুনরায় তাহাদের মধ্যে একটি খেলা হয়—কিন্তু খেলার প্রায় শেষ দিকে একদল দর্শক উত্তেজিত হইয়া কোন একটি দলের খেলোয়াড়দিগকে আক্রমণ করায় এক কুৎসিত ঘটনার সৃষ্টি হয়।

নব-প্রকাশিত "বারাসত বার্ত্তা" ৩রা আশ্বিন তারিখে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ঐ নিন্দনীয় ঘটনায় বিশেষ ক্ষোভ ও পরিতাপ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন, ঐ ঘটনা যে কেবল বারাসত শহরবাসীর লজ্জার বিষয় তাহা নহে, উহা জাতীয় লজ্জার বিষয়। কলিকাতার মাঠের উচ্ছৃখলতাই আজ দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তাহা হইতেছে এক শ্রেণীর স্নায়ুদুর্ব্বল, উগ্র ও বদমেজাজী দর্শকের হঠাৎ উত্তেজনার বশে খেলা পণ্ড হইয়া গেল—হাজার হাজার ক্রীড়ামোদী দর্শক নির্ম্মল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং ক্রীড়া-সংস্থা ও প্রতিযোগী দলের শ্রম, অর্থব্যয় ব্যর্থ হইয়া গেল।"

খেলার সময়ে মাঠে রেফারীর সিদ্ধান্ত মানিয়া চলাই সভ্য রীতি। "সেইরূপ ক্ষেত্রে দেখা গেল বিচারকের নির্দ্দেশ ডিঙ্গাইয়া দর্শকদের ভিতর হইতে এক বা একাধিক ব্যক্তি হঠাৎ মাঠের অভ্যন্তরে অনধিকারপ্রবেশ করিয়া কোন খেলোয়াড়ের উপর বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।...

"খেলার মাঠে দেখা গিয়াছে মানুষের আদিম স্বভাবের উলঙ্গ হিংস্রতা। হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে মুষ্টিমেয় দর্শক গোঁ গোঁ করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত খেলোয়াড়দের উপর আক্রমণ করিতে ছুটিয়াছে। কি ভাষায় এই হিংস্র দর্শকদের নিন্দা করা যায়—বোধ করি, আজিকার সভ্য সমাজ সেই ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।"

ইতিপূর্ব্বেও বারাসত খেলার মাঠে অশান্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু ক্রীড়া-সংস্থার কর্তৃপক্ষ আশানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। পত্রিকাটি এই দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতে যাহাতে না হয় সেজন্য সতর্ক হইতে তাহাদিগকে আবেদন জানাইয়াছেন।

বহরমপুর সদর হাসপাতাল সম্পর্কিত অভিযোগ

বহরমপুরের সদর হাসপাতাল সম্পর্কে নানাবিধ অভিযোগের সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার জন্য বহরমপুর পৌরসভার সভ্যবৃন্দ একটি হাসপাতাল তদন্ত উপসমিতি গঠন করিয়াছেন। যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, হাসপাতালে যে সকল রোগী ও রোগিণী চিকিৎসার জন্য আসেন, হাসপাতালে নিযুক্ত চিকিৎসক অথবা অপরাপর পরিচালকবৃন্দ সেই সকল রোগী ও রোগিণীর প্রতি ভাল ব্যবহার করেন না, সময় সময় তাঁহাদের অমনোযোগিতা ও ঔদাসীনতার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ চিকিৎসা-বিভ্রাটও ঘটিয়া থাকে।

২৮শে ভাদ্রের "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হাসপাতাল তদন্ত উপসমিতির সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন সেন যাহাতে এই তদন্তকার্য্য সফল হয় সেজন্য বহরমপুর শহর তথা সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীকে সহযোগিতা করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

আসানসোলে যক্ষ্মা এসোসিয়েশন

সম্প্রতি মহকুমা শাসকের উদ্যোগে এবং রোটারী ক্লাবের সক্রিয় সহযোগিতায় আসানসোল টিউবারকিউলসিস এসোসিয়েশন গঠনের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন যে, আজ ক্ষয়রোগ ভয়াবহ রূপ লইয়া মধ্যবিত্ত-জীবনে দেখা দিয়াছে। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে দেশের কত মানুষের জীবনই না অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে! চিকিৎসার সান্ত্বনাটুকু পর্য্যন্ত অধিকাংশের ভাগ্যে জোটে না।

"বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন, "মৃত্যুপথযাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দেখবেন শুধু ধনিক সম্প্রদায় নয়, চিকিৎসকমণ্ডলীও। যাঁদের হাতে রয়েছে চিকিৎসার ভার, তাঁরা যেন শুধু ভিজিটের অঙ্কটাকেই বড় করে না দেখেন। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের জীবনের মূল্যটাও যেন তাঁরা সত্যি সত্যি অনুভব করেন।"

বার্ণপুর ইস্পাত কারখানা পরিচালনায় গোলযোগ

বার্ণপুর হইতে নবপ্রকাশিত "জি. টি. রোড" পত্রিকা ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "বার্ণপুরের ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ইংরেজ জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ম্যাক্রেকানের অকর্ম্মণ্যতা ও অযোগ্যতার ফলে ভারতের এই অন্যতম প্রধান ইস্পাত কারখানাটি বিপদগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। তিনি যেদিন হইতে কারখানা পরিচালনা করিবার দায়িত্ব লইয়াছেন সেই দিন হইতে শ্রমিক-অসন্তোষ দেখা দিয়াছে—কারখানার কোটি কোটি টাকার উৎপাদন নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার হাতে শ্রমিকের মান মর্য্যাদা বিপন্ন। তিনিই এক্শন কমিটিকে জীয়াইয়া রাখিয়া কারখানার শান্তির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন।"

মিঃ ম্যাক্রেকান বর্ত্তমানে নাকি কারখানার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পিছনে লাগিয়াছেন এবং অযোগ্য চাটুকার ব্যক্তিদের প্রশ্রয় দিতেছেন বলিয়া পত্রিকাটি অভিযোগ করিতেছেন।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "সম্প্রতি এইরূপ অবস্থা চরমে উঠিয়াছে—ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগনের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বাসুকে কিছুদিন আগে অফিসার্স ক্লাবে লিখিতভাবে ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করা হইয়াছে—তিনি নাকি ঐ সব ক্ষুদে অফিসারের অভদ্র আচরণের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। অথচ মিঃ বাসু আসিবার পর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে। শ্রমিকেরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বোনাস পাইতেছে। ঐ কারখানায় কোনরূপ শ্রমিক অসন্তোষ নাই। মিঃ বাসু বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং যোগ্যতায় বার্ণপুরের যে কোন ইংরেজ টেকনিসিয়ান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মিঃ ম্যাক্রেকান কেবল ইংরেজ বলিয়াই বার্ণপুরের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব পাইয়া-

ছেন। মজুরী যোগ্যতায় তাঁহার অপেক্ষা অনেক কুশলী কর্মী ঐ কারখানায় কাজ করিতেছেন।

"ভারতের কেন এশিয়ার প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীশুকু সেনকে মিঃ ম্যাক্রেকান তাঁহার কামরায় অত্যন্ত নিন্দনীয় ভাবে অপমান করিয়াছেন। শ্রীসেনকে তিনি এমন সব অভদ্র কটূক্তি করিয়াছেন যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শ্রী সেন নাকি এই বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়াছেন, এবং কর্তৃপক্ষ যদি ইহার প্রতিবিধান না করেন তবে তিনি বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ম্যাক্রেকানের ঔদ্ধত্যের ফলে হয়ত বাংলার শ্রেষ্ঠ কারখানা একজন বিখ্যাত শিল্পীর সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইবে। যে সময় ভারতে কুশলী শিল্পীর একান্ত অভাব—আজিকার দিনে যাঁহাদের উপর ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তাঁহারা যদি স্বাধীন ভারতের নিজেদের কারখানায় সম্মানের সহিত কাজ না করিতে পারেন, তাঁহারা যদি পদে পদে বিদেশী ম্যানেজারদের কাছে অপদস্থ হন, তবে ভারতের শিল্পীদের মনোবল ভাঙ্গিয়া যাইবে। ইহার ফলে দেশের সর্বনাশ হইবে। আমরা তাই সমগ্র ভারতবাসীর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতে চাই।"

নাগা অঞ্চলে পুলিস জুলুম

১০ই সেপ্টেম্বর "ক্রনিকল" পত্রিকায় প্রকাশিত নাগা পাহাড় জাতীয় পরিষদের প্রচারসচিব প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, গত ২২শে জুলাই মককচঙ্গে পুলিসের লাঠি চালনার ফলে পঞ্চাশ জন আহত হয় ও চব্বিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মককচঙ্গের এস. ডি. ও. কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের উপর এক আদেশ জারী করিয়া তাহাদিগকে অশ্বারোহণের পথ পরিষ্কার করিতে বলিলে গ্রামবাসীরা ঐরূপ বেগার খাটিতে অস্বীকৃত হয়। এস. ডি. ও. তখন গাঁওবুড়াদের ডাকাইয়া আনেন এবং তাহাদের উপর এই ব্যাপারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তখন সেই সকল গাঁওবুড়া এস. ডি. ওকে জানাইয়া দেয় যে, তাহারা আর ঐ পদে অধিষ্ঠিত নাই। ফলে ৬ই জুলাই এস. ডি. ও. গাঁওবুড়াদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা ডিসমিস করেন।

কিন্তু পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজের মনোমত রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করেন। উংগমা, খেংসা, মাংমেতং এবং মেকুনী গ্রামের অধিবাসীরা বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির ভিত্তিতে কাজের দাবি জানায়। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তখন জানান যে কাজ না করিলে প্রত্যেকের ১৫৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইবে এবং তাহাতেও যদি তাহারা কাজ না করে তবে তাহাদের জেলে দেওয়া হইবে। এই কথা ঘোষণা করিলে গ্রামবাসিগণ হাততালি দিয়া উঠে। তখন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লাঠি চার্জের আদেশ দেন এবং যে সকল পুলিস নৃশংসভাবে লাঠি চালাইতে পারে নাই তাহাদের ঘাড়েও লাঠির গুঁতা আসিয়া পড়ে।

তাজেন নামক এক জন স্কুলের শিক্ষক পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং গ্রামবাসীদিগের মধ্যে দোভাষীর কাজ করিতেছিলেন, কিন্তু পুলিস তাঁহাকেও মারিতে আরম্ভ করে, পরে অবশ্য পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাজেনের নিকট নিজের উত্তেজনার কথা বলিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করেন।

আহতদিগকে হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতে না দিয়া মহকুমার মেডিক্যাল অফিসারের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহাদিগকে হাজতে পাঠানো হয়।

কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের বলা হয় যে ১৫৲ টাকা করিয়া জরিমানা দিলেই তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহারা জরিমানা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, জরিমানার পরিমাণ কমাইয়া মাথাপিছু ১০৲ টাকা করা হয়; তাহারা তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলে জরিমানার পরিমাণ প্রথমে ৫৲ টাকায় এবং পরে ২৲ টাকায় নামানো হয়। কিন্তু তবুও জরিমানা দিতে কেহ স্বীকৃত না হওয়ায় বন্দীদিগকে ভয় দেখান হয় যে দুই মাস বন্দীজীবন কাটাইবার পর হয় তাহাদিগকে ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে নচেৎ দুই বৎসরের কারাদণ্ড হইবে। দুই বৎসর কারাবাসের পরও যদি তাহারা জরিমানা দিতে রাজী না থাকে তবে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইবে বলিয়া তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়।

কোহিমা হইতে প্রাপ্ত ২রা আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ, ২২শে জুলাই লাঠিচালনায় আহত উঙমা গ্রামের সেনটিসাঙ্ আওয়ের মৃত্যুর একটি নিরপেক্ষ এবং পরিপূর্ণ তদন্তের জন্য নাগা জাতীয় পরিষদ আসামের রাজ্যপালের নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছেন। যথাসময়ে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা না করাতেই মিঃ আওয়ের মৃত্যু ঘটে। জেলে দুই হাত বেড়ীতে আবদ্ধ অবস্থায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯৫২ সনে মিঃ সেনটিসাঙ্ নাগা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য আসামের রাজ্যপালের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মধ্যপ্রদেশে বিচারব্যবস্থা

২১শে সেপ্টেম্বরের "হিতবাদ" পত্রিকার সংবাদে দেখা যায় যে, মধ্যপ্রদেশ পুলিস-বিভাগে ১৯৫২ সনের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ বৎসরের শেষে ২৩,৫০০টি পুলিস কেস বিচারাধীন ছিল। পরবর্তী বৎসরের তুলনায় বিচারাধীন কেসের সংখ্যা উক্ত বৎসরে পাঁচ শতটি অধিক ছিল।

এই সকল মামলার বিচারে বিলম্বের অজুহাত হিসাবে বলা হইয়াছে যে, জজ এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যাল্পতা, ম্যাজিষ্ট্রেট ঘন ঘন বদলী এবং এক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে অপর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কেস ফাইল প্রেরণ এবং আসামী-পক্ষের দীর্ঘসূত্রী মনোভাবের দরুনই ঐ সকল মামলার বিচার সম্পন্ন হইতে পারে নাই। রিপোর্টে বলা হইয়াছে অনতিবিলম্বে এই সকল বিপুলসংখ্যক মামলার বিচার নিষ্পন্ন করিতে না পারিলে রাজ্যে বিচার-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ফলে প্রত্যক্ষ শান্তির আশঙ্কা না

থাকায় অপরাধীদের সাহস বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া রিপোর্টে সতর্কবাণী করা হইয়াছে।

২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় মন্তব্যে "হিতবাদ" লিখিতেছেন যে, এই বিপুলসংখ্যক মামলার বিচার সম্পন্ন না হওয়ার মূলে আরও একটি কারণ রহিয়াছে। তাহা হইতেছে এই যে, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অধীন ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাজকর্ম্মের উপর যথোচিত লক্ষ্য রাখেন না। অধিকতর নিয়মিত কাজ এবং উপর হইতে যথাযথ পরিচালনা এই দুইয়ের সমন্বয়ে মামলাগুলির নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করা খুবই সম্ভব বলিয়া পত্রিকাটি মনে করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সামান্য অজুহাতেই মামলা স্থগিত রাখেন। "হিতবাদ" মনে করেন যে, কেবলমাত্র অধিকসংখ্যক ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিয়াই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। বিচারাধীন মামলাগুলির যাহাতে সত্বর নিষ্পত্তি হইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিবার জন্য পত্রিকাটি সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বোম্বাইয়ে শ্রমিক আবাস নির্ম্মাণকল্পে ১০৭ লক্ষ টাকা

"ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া"র সংবাদে প্রকাশ, সাহায্য-প্রাপ্ত শ্রমিক আবাস নির্ম্মাণ পরিকল্পনায় ১০,২২৯টি এক-কামরা-আবাস নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভারত সরকার আগষ্ট মাসে ৩,১৪,৩৫,২৯৭৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকার মধ্য হইতে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা বোম্বাই সরকারকে দেওয়া হইবে—অর্দ্ধেক সাহায্য হিসাবে এবং অর্দ্ধেক ঋণ হিসাবে। এই অর্থের দ্বারা বোম্বাই সরকার ২,৩৮৮টি কামরা নির্ম্মাণ করিবেন। আমেদাবাদের চন্দ্র-প্রকাশ সমবায় গৃহনির্ম্মাণ সোসাইটি লিমিটেড এবং নিউ মহাদেবনগর সমবায় গৃহনির্ম্মাণ সোসাইটি লিমিটেডের মারফত কামরা নির্ম্মাণের জন্য বোম্বাই সরকারের হস্তে ২৩,৬৯২৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৮,৯১৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে সাহায্য হিসাবে এবং ১,৫৭,৯৫০ টাকা ঋণ হিসাবে।

পরীক্ষায় গোলযোগ নিরোধকল্পে উত্তর প্রদেশের প্রচেষ্টা

"পিপল" পত্রিকায় লক্ষ্ণৌস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, উচ্চ বিদ্যালয় এবং ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা পর্ষতের আপিসে একটি গোপন বিভাগ খুলিবার সিদ্ধান্ত উত্তর প্রদেশ সরকার পরীক্ষা-মূলক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় পর্ষতের অন্যান্য কাজ হইতে পরীক্ষার কাজকে পৃথক করা হইবে। নূতন বিভাগটিকে একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে স্থান করিয়া দেওয়া হইবে। এই বিভাগে নিযুক্ত কর্ম্মিবৃন্দ তাঁহাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত অন্যান্য আপিসের কর্ম্মী অপেক্ষা উচ্চতর মাহিনা পাইবেন। এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র কাজ আলাদা করিয়া দিলেই কর্ম্মসম্পাদন-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিবে না, যদি সঙ্গে সঙ্গে মাহিনাও বৃদ্ধি না করা হয়। বর্ত্তমানে বোর্ডের কর্ম্মচারীদিগকে যে মাহিনা দেওয়া হয় তাহাকে কোন-ক্রমেই উপযুক্ত বলা চলে না।

উক্ত সংবাদদাতার বিবরণ অনুযায়ী ঐ গোপন বিভাগ গঠিত হইবে একজন সহকারী সেক্রেটারী, ৫২ জন সিনিয়র ক্লার্ক, ৮ জন জুনিয়র ক্লার্ক, দুই জন দফতরী এবং সাত জন পিওন লইয়া।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য দুর্নীতি-বৃদ্ধির ফলেই সরকার এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমভাগে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে নির্ব্বাচনে মুস্লিম-লীগ দলের শোচনীয় পরাজয়ের পর আওয়ামী লীগ, কৃষকপ্রজা পার্টি প্রভৃতি লইয়া গঠিত যুক্তফ্রণ্ট জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত আদমজী পাটকলে বাঙালী-অবাঙালী শ্রমিকদের সংঘর্ষে পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার উস্কানি দিয়াছেন এবং তাঁহারা পাকিস্থানের নিরাপত্তা ব্যাহত করিয়েছেন এই অজুহাতে পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল মে মাসের শেষাশেষি হক মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করেন। (এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, পাক-গণপরিষদের এক সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে গবর্ণর জেনারেলের এই ক্ষমতা বিলোপ করা হইয়াছে।)

হক মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করার সময় বলা হয় যে, সাময়িক আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবেই নির্ব্বাচিত মন্ত্রীসভাকে বাতিল করা হইয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলেই পুনরায় নূতন করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

সম্প্রতি পূর্ব্ব-পাকিস্থান যুক্তফ্রণ্টের তিন জন নেতা জনাব আতাউর রহমান (আওয়ামী লীগ), জনাব আশ্রাফউদ্দিন চৌধুরী (নিজাম ইসলাম) এবং জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাস (কৃষক শ্রমিক দল) কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে পাকিস্থানের বর্ত্তমান গণপরিষদ ভাঙিয়া দেওয়ার দাবি করা হয়।

২৫শে সেপ্টেম্বর উক্ত বিবৃতিতে যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ বলিয়াছেন: "যে সমস্ত লোক গণপরিষদে আমাদের প্রতিনিধি নহেন তাঁহারা আমাদের উপর যে শাসনতন্ত্র চাপাইয়াছেন, আমরা তাহা মানিয়া লইব না।"

পূর্ব্ববঙ্গে গবর্ণরের শাসনের উল্লেখ করিয়া বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, "আদৌ কোন যুক্তি কিংবা কারণ না থাকা সত্ত্বেও প্রায় চার মাস যাবৎ প্রদেশে গবর্ণরের শাসন ও ৯২ (ক) ধারা অব্যাহত রাখিয়া জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করা হইয়াছে। ইসলাম ও গণতন্ত্রের নামে একটি উপদল কেন্দ্রে বসিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের শাসন করিতেছে।"

বিবৃতিতে তাঁহারা আরও বলেন, "গণতন্ত্র ও ইসলামের নামে তাঁহারা কেন্দ্রে বসিয়া জনসাধারণের আইনসঙ্গত অধিকার হরণে একনায়কত্ব চালাইতেছেন।"

গণপরিষদে গৃহীত মূলনীতি নির্দ্ধারণ কমিটির রিপোর্টের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন, "কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হইতেই ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছে।"

পাকিস্থানে সংবাদপত্রের "স্বাধীনতা"

সম্প্রতি প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, গত ২৮শে সেপ্টেম্বর পাকিস্থান সরকার একটি পাকিস্থানের সংবাদপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খুরশেদ জামানের সভাপতিত্বে একটি প্রেস কমিশন গঠন করিয়াছেন।

. পাকিস্থানের সরকারী আমলাতন্ত্র কি ভাবে স্বাধীন সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করিবার প্রচেষ্টা করিতেছে ২৫শে সেপ্টেম্বর "পিপল" পত্রিকার এক সংবাদে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রকাশ, পশ্চিম-পঞ্জাব সরকারের প্রধান সচিব (Chief Secretary) সরকারের নিকট এক সুপারিশে এমন একটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছেন যাহার বলে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে প্রাপ্ত সংবাদের সূত্র প্রকাশ করিতে বাধা করা যাইবে।

সংবাদে আরও বলা হইয়াছে, সরকার হইতে এই ব্যবস্থা করার মূলে রহিয়াছে লাহোরের কয়েকটি সরকার-বিরোধী নির্ভীক পত্রিকার কণ্ঠরোধ করার ইচ্ছা। লাহোর হইতে প্রকাশিত "পাকিস্থান টাইমস", "নওয়াতে ওয়াকত", "জিমিদার" প্রভৃতিতে যে সকল মন্তব্য বাহির হয়, প্রায়ই সরকারপক্ষের নিকট তাহা বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয় না। জনচিত্তে তাহার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব পঞ্জাবের নূন সরকারকে বিচলিত করিয়াছে এবং তাহারা যে-কোন উপায়ে ঐ সকল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিতে বদ্ধপরিকর।

শুভ বিবাহ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে প্রকাশ, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের গবর্ণর মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জ্জার পুত্রের সহিত পাকিস্থানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ হিলড্রেথের কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছে।

সাধারণভাবে কোন দুই ব্যক্তির বিবাহ সম্পর্কে সংবাদপত্রে আলোচনা হয় না। কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে এই পরিণয়ের সংবাদ বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্থান কর্ত্তৃক মার্কিন সামরিক সাহায্য-গ্রহণের ব্যাপারে মেজর জেনারেল মির্জ্জার ভূমিকা, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জনসমর্থিত মন্ত্রীমণ্ডলীকে অপসারণের ব্যাপারে মিঃ হিলড্রেথের ভূমিকা এবং উক্ত প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার কর্ণধাররূপে জনাব মির্জ্জার নিয়োগ প্রভৃতি ঘটনার পর এই সংবাদ স্বভাবতঃই সন্দেহবাদীদের খোরাক যোগাইতে পারে।

এশীয়-আফ্রিকা সম্মেলন

গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে কলম্বো, ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্ম এবং ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রধানমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয় তাহাতে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির একটি সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্য ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর উপর ভার দেওয়া হয়। সেই উদ্দেশ্যে এবং সাধারণভাবে ভারত ও ইন্দোনেশিয়াকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্য ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী গত ২১শে সেপ্টেম্বর ভারতে আসেন। ২২শে হইতে ২৫শে সেপ্টেম্বর ডাঃ আলি সাস্ত্রোমিদজোজো নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের অতিথি হিসাবে অবস্থান করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাঁহার যে আলোচনা হয় সেই সম্পর্কে ২৫শে সেপ্টেম্বর একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা করা হয়। এশিয়া এবং বিশ্বে শান্তি কি ভাবে রক্ষা করা যায় সে বিষয় তাহাতে বলা হয়। প্রস্তাবিত এশীয়-আফ্রিকান সম্মেলন সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা চলে সে বিষয়ে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে:

"২৫শে সেপ্টেম্বর—ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ আলি শাস্ত্রমিদজোজোর দিল্লী ত্যাগের প্রাক্কালে ওয়াকিবহাল মহল হইতে জানা গেল যে, প্রস্তাবিত আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলন ১৯৫৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে জাকর্তায় অনুষ্ঠিত হইবে—যদিও উভয় প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত বিজ্ঞপ্তিতে কেবল বলা হইয়াছে যে, উহা শীঘ্রই হইবে। শ্রীনেহরু ও ডাঃ শাস্ত্রমিদজোজোর সিদ্ধান্তগুলিকে চূড়ান্ত রূপদানের জন্য এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলম্বোতে রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনে পেশ করা হইবে—কারণ ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী ইউ নু অক্টোবর মাসে পিকিঙে থাকিবেন।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ভারত বিশেষ উৎসাহের সহিত আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলনের ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার পরিকল্পনা সমর্থন করেন নাই; কারণ এইরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে, এই ধরণের সম্মেলনে এমন কতকগুলি বিশেষ মতভেদ দেখা দিতে পারে, যেগুলি চাপা থাকাই ভাল।

টিউনিসিয়া ও মরোক্কোর প্রতিনিধিদের যে পর্য্যবেক্ষকরূপে আমন্ত্রণ করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দিল্লীর মতে এই ধরণের আমন্ত্রিতদের সংখ্যা বাড়াইয়া বিষয়টিকে জটিল করিয়া লাভ নাই। আফ্রিকা হইতে মিশরসহ পাঁচটি দেশ আমন্ত্রিত হইবে। আরব রাষ্ট্রগুলির উপস্থিতির জন্যই ইস্রায়েল বাদ পড়িবে।

একটি ঔপনিবেশিকবাদী ফ্রন্ট গঠন এবং এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য "এশীয়-কলম্বো পরিকল্পনা"-জাতীয় একটা ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা চলিতেছে। 'চীনের সম্প্রসারণ' সম্বন্ধে মনে মনে একটা ভয় থাকিলেও উক্ত ফ্রন্ট কেবল ইহাকে প্রকাশ্য সমস্যায় পরিণত করার পক্ষপাতী নহে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, যতগুলি দেশকে আমন্ত্রণ করা সম্ভব, তাহা করা হইবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তালিকা সংক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টাই হইতেছে।

চীনকে আমন্ত্রণের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কারণ, চীনকে যদি আমন্ত্রণ করা হয়, তাহা হইলে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আরও কয়েকটি দেশকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে।"

সোভিয়েটে পণ্যমূল্য নির্ণয়

'টাস' কর্তৃক-প্রচারিত এক বিশেষ প্রবন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নে পণ্যমূল্য নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, সোভিয়েটে কি উপায়ে পণ্যমূল্য নির্দ্ধারিত হয় তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সোভিয়েট দেশে অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রস্তুত হয় এবং রাষ্ট্রীয় ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মারফত বিক্রয় হয়। সেইজন্য রাষ্ট্রই পণ্যদ্রব্যাদির দর বাঁধিয়া দিয়া থাকে এবং সেই কারণেই মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির উপর বাজার কোন প্রভাব ঘটাইতে পারে না।

পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণের পিছনে দুইটি প্রধান বিষয় কাজ করে— উৎপাদনের খরচ এবং বিলি করার খরচ। সঞ্চয়ের (মুনাফা) জন্য নির্দ্দিষ্ট কিছু অংশও পণ্যমূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উহা দেশে সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে।

সোভিয়েট দেশে যাহাতে অল্পমূল্যে জিনিষপত্র উৎপাদন করা যায় সেইজন্য প্রতিনিয়তই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার চেষ্টা চলে—অর্থাৎ অল্প শ্রমে অধিক মাল উৎপাদন করিবার জন্য সেখানে অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫১-৫৫) শ্রমশক্তির শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করার ও উৎপাদন-ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মচারীরা পণ্যসমূহ ক্রয়-বিক্রয়ের খরচ যথাসম্ভব কম করিবার চেষ্টা করে। ১৯৫১-৫৫ পরিকল্পনায় পণ্যদ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ের খরচ শতকরা ২৩ ভাগ হ্রাস করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

এইরূপে উৎপাদন এবং বণ্টনমূল্য হ্রাসের প্রচেষ্টা সফল হওয়ায় ১৯৪৭ সনের পর হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নে জিনিষপত্রের দাম সাত বার কমানো হইয়াছে। ফলে জনসাধারণের প্রচুর লাভ হইয়াছে।

জিনিষপত্রের খুচরা মূল্য রীতিসম্মতভাবে কমার অর্থ দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণ এবং সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি। যেহেতু নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে, সেই হেতু সাধারণ ক্রেতার নিকট গুরুত্বপূর্ণ এমন জিনিষপত্রের উৎপাদনে কিছু ঘাটতি থাকিলেও রাষ্ট্র তাহার মূল্য কমাইয়া দিতে সক্ষম। ইহার ফলে শিল্পের উপর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং শিল্পও জনগণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়।

প্রতিবার জিনিষপত্রের মূল্য কমানোর ফলে জিনিষপত্রের বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী মূল্যবান, টেকসই এবং উন্নত ধরণের জিনিষপত্র কিনিতে থাকে।

'টাস' যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে তুলনামূলক মূল্যের কোনও নিদর্শন নাই। আমাদের দেশ হইতে যাঁহারা ওদেশে গিয়াছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এখনও সাধারণ মণিহারি দোকানের পণ্যাদি, যাহাকে ইংরেজীতে বলা হয় "কনজিউমার গুডস", আমাদের দেশের তুলনায় দুর্মূল্য। যে জিনিষ এদেশে ৫০ টাকায় পাওয়া যায় তাহার মূল্য গত বৎসরেও ওদেশে ছিল প্রায় ২৭৫ রুবল। সেইজন্যই বোধ হয় বর্ত্তমানে ঐরূপ পণ্যের মূল্যহ্রাসের চেষ্টা চলিতেছে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সম্প্রতি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। রবীন্দ্রযুগের কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ প্রকাশভঙ্গীর মৌলিকত্ব এবং বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এই উভয় দিক দিয়াই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

যতীন্দ্রনাথের পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রাম—বর্দ্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। বারো বৎসর বয়সে গ্রামের স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। ১৯০৩ সনে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১১ সনে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে বি-ই পরীক্ষা পাস করিয়া যতীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সনে নদীয়া জেলাবোর্ডে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯২৩ সনে তিনি কাশিমবাজার ষ্টেটের চাকরিতে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মেই ছিলেন।

কবিতা রচনায় যতীন্দ্রনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় ১৩১৭ সনের 'প্রবাসী'র মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার 'শীত' কবিতাটিতেই। তাঁহার প্রথম কবিতার বই 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সনে। তার পর ক্রমে ক্রমে ১৩৩৪ সনে তাঁহার 'মরুশিখা' এবং ১৩৩৭ সনে 'মরুমায়া' মুদ্রিত হয়। তাঁহার কবিতাসঙ্কলন 'অনুপূর্ব্বা'র প্রকাশকাল ১৩৫৩ সন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে তিনি কাব্যানুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। মাসিক বসুমতীতে তাঁহার "ম্যাকবেথে"র অনুবাদ এবং শনিবারের চিঠিতে "হ্যামলেটে"র অনুবাদ ছাপা হইয়াছিল। 'কাব্যপরিমিতি' তাঁহার গদ্য-রচনা।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য্য কারণবশতঃ এবারে ষাণ্মাষিক সূচী (বৈশাখ—আশ্বিন, ১৩৬১) দেওয়া গেল না। আগামী সংখ্যায় এই ষাণ্মাসিক সূচী সন্নিবেশিত করা হইবে।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ১৭ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর) হইতে ৩০শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা খুলিবার পর হইবে।

এই সূত্রে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানাপরিবর্ত্তন, প্রবাসী-অপ্রাপ্তি—এতদ্বিষয়ক চিঠিপত্র "ম্যানেজার প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

প্রাচীন ভারতের লোকায়তিক বিপ্লব

শ্রীকালিদাস দত্ত

সুদূর আদিম যুগ হইতে মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বনে বহু জাতি ও শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আছেন এবং ঐ সকল জাতি ও শ্রেণীগত বিভেদ, স্বার্থ ও সংস্কারের জন্য তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষ, নানা বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্ম্মম আচার-ব্যবহারের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় উহার নিমিত্ত কি প্রকারে প্রবল জাতি ও শ্রেণীরা দুর্ব্বল জাতি এবং শ্রেণীদের উপর উৎপীড়ন করিয়াছে, যুদ্ধবিগ্রহে পৃথিবী কিরূপে নররক্তে বার বার প্লাবিত হইয়াছে এবং কত বিচিত্র উপায়ে অসংখ্য নরনারী আত্মপীড়ন ও আত্মহত্যার দ্বারা অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

এই সকল কারণে একটি সার্ব্বজনীন মানবসমাজ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে অতীতকালেও অনেক মনস্বী ও মানবপ্রেমিক ব্যক্তি ঐ প্রকার অত্যাচার ও অনাচারের মূলকারণ, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বিলীন করিবার জন্য নানারূপ দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই সমস্ত মতবাদকে কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত সময় সময় বিপ্লবেরও উৎপত্তি হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যেও ঐরূপ একটি বিপ্লবের উল্লেখ আছে। উহা লোকায়তিক বা লোকায়তবাদ নামক দার্শনিক মতবাদের সমর্থনে উত্থিত হয়। উহাতেই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম, উল্লিখিত উদ্দেশ্যে, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরবাদকে বর্জ্জন করিয়া প্রাকৃতিক কারণদ্বারা বিশ্বতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয় এবং সমগ্র বিশ্বজগৎ প্রাকৃতিক স্বভাবেই গঠিত ও পরিচালিত ইহা ঘোষিত হয়।১

ঈশ্বরবাদের উপর যুগ যুগ সঞ্চিত বিশ্বাসের মূলে ঐরূপে আঘাত করায় উক্ত মতবাদ প্রচারক ও সমর্থকগণ প্রাচীন ভারতে খুবই নিন্দাভাজন হন এবং তাঁহাদের রচিত যাবতীয় গ্রন্থাদি নিশ্চিহ্ন হয়। পৌরাণিক সাহিত্যের স্থানে স্থানে নাস্তিক, পাষণ্ড, নগ্ন, দৈত্য ও অসুর প্রভৃতি নামে তাঁহাদের যে সমস্ত উল্লেখ আছে তাহা দেখিলে প্রাচীন সমাজ- ও ধর্ম্ম-রক্ষণশীল ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহারা কত উৎকট ঘৃণার পাত্র ছিলেন তাহাও জানিতে পারা যায়। সে কারণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাঁহাদের পরিচয়ও বিরল।

এ পর্য্যন্ত কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থে বৃহস্পতি, চার্ব্বাক, ভাগুরি ও পুরন্দর নামে চারি জন মাত্র ঐ মতবাদ প্রচারকের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে এবং ইহাও জানা গিয়াছে যে, বৃহস্পতি উহার প্রবর্ত্তক ও চার্ব্বাক একজন প্রধান প্রচারক ছিলেন।

প্রাচীনকালে উক্ত কারণে উহা বার্হস্পত্যবাদ ও চার্ব্বাকবাদ নামেও অভিহিত হইত। উহা ব্যতীত উহাকে স্বভাববাদও বলিত। প্রাকৃতিক স্বভাবে বিশ্বজগৎ গঠিত ও পরিচালিত উহার এই সিদ্ধান্ত হইতেই সম্ভবতঃ ঐ নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। উহার উক্ত লোকায়তিক বা লোকায়ত নামের তাৎপর্য্য কি তাহা এখনও সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। উহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া উক্ত মতবাদ ঐ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।২ কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় উহার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহার অর্থ এই, "লোকঃ আয়তিঃ উত্তরকালো যেষাং লোকায়তিঃকাঃ।" অর্থাৎ লোকশব্দে দৃশ্যমান (ইহলোক) ব্যতীত উত্তরকাল যাঁহারা স্বীকার করেন না।২ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিয়াছেন "ইহলোক ঐ দর্শনের সর্ব্বস্ব তজ্জন্যই উহার ঐরূপ নামকরণ হয়।"৩

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে উহার উল্লেখ আছে।৪ উহা ভিন্ন গৌতমবুদ্ধের সমকালীন দার্শনিক অজিত কেশকম্বলের মতবাদে উহার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়,৫ এবং গৌতমবুদ্ধের উপদেশের মধ্যেও তৎকালীন বহু দার্শনিক মতবাদের পরিচয়ের সহিত উহার অনুরূপ মতবাদের পরিচয় আছে।৬

এই সকল প্রমাণ হইতে ঐ মতবাদের উৎপত্তিকাল গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি

১। "স্বভাবএব জগতঃকারণম্, স্বভাবাদেব জগদ্ বৈচিত্র্যম্ উৎপদ্যতে স্বভাবতো বিলয়ং জাতি।"

"অগ্নিরুষ্ণো জলংশীতম্ সমস্পর্শস্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ ব্যবস্থিতিঃ।"
(সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)

১। বৌদ্ধধর্ম্ম (পূর্ব্বাশা সংস্করণ), পৃষ্ঠা ৩৭

২। চতুর্দ্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দর্শনশাখার সভাপতির অভিভাষণ

৩। বঙ্গদর্শন, ১২৮১ সাল শ্রাবণ সংখ্যা (চার্ব্বাক দর্শন)

৪। পাণিনি সূত্র, ৫।৩।৭

5. *Dialogues of Buddha. Rhys Davids. Samanna Phala-Sutta.* Page 75.

6. *Dialogues of Buddha. Rhys Davids. Brahamajala-Sutta,* Page 46.

কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, জনৈক বৃহস্পতি বৈদিক ধর্ম্মের মূল গায়ত্রীকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। উহা হইতে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, উক্ত বৃহস্পতিই ছিলেন ঐ মতবাদের প্রবর্ত্তক এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ রচিত হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-প্রধান কালেই উহার উৎপত্তি ঘটে।১

পুরাণসমূহে দেখা যায় বর্ণাশ্রম ও কর্ম্মকাণ্ডবহুল ব্রাহ্মণ-প্রধান কালের আরম্ভ হয় পৌরাণিক কাল ত্রেতাযুগে। বাল্মীকি রামায়ণেও এ সময়েই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকদের ঐ মতবাদ প্রচারের জন্য আন্দোলন করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাতে দেখা যায় বনবাসে যাইবার পূর্ব্বে চিত্রকূটে অবস্থানকালে রাম ভরতকে বলিতেছেন,

"কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণান্ তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে॥" (২)

অর্থাৎ, বৎস! তুমি লোকায়তিক ব্রাহ্মণদের সেবা কর না ত? ঐ সকল পণ্ডিতাভিমানী বালকেরা অনর্থ উৎপাদনে সুদক্ষ। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিতে ঐ সমস্ত কূটবোদ্ধা অনর্থক বিবাদ করে।

পূর্ব্বে অনেকে বৈদিক যাগযজ্ঞে অত্যধিক পশুবিনাশের জন্যই ঐ মতবাদ উদ্ভূত হয় বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু উহা প্রকৃত নহে। বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থাই ছিল উহার উৎপত্তির মূল কারণ। বৈদিক যুগের উপরোক্ত সময়ে উহার প্রয়োজন কত বেশী হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ব্রাহ্মণ, সূত্র ও পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে আছে।

ঐ সময়ের পূর্ব্বকাল হইতে নানারূপ শ্রেণীসংঘর্ষের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সহিত জাতি ও বর্ণভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইয়া উঠে,৩ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তখন শ্রেষ্ঠ বর্ণ হিসাবে পরশ্রমজীবী ও অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হইয়া বংশানুক্রমে বৈশ্যগণকে খাদ্য ও কৃষিমূলক দ্রব্যাদি উৎপাদনে ও শূদ্রগণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উক্ত বর্ণত্রয়ের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করেন।

তজ্জন্য শূদ্রদের ঐ সময়ে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিতে হইত। নচেৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইচ্ছামত তাঁহাদের বধ করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।৪ শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, তৎকালে ঐরূপ কার্য্য অন্যায় বলিয়াও বিবেচিত হইত না।৫

ঐ সময় হইতে এ নিয়মটি বহুদিন কার্য্যকরী ছিল বলিয়া বোধ হয়, মনুসংহিতায় এই সাবধানকারী নির্দ্দেশটি সন্নিবেশিত হয়,

"ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব সর্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতম্।
নাবমন্যেত বৈ ভূষ্ণুঃ কৃশানপি কদাচন॥
এতত্ত্রয়ং হি পুরুষং নির্দহেদবমানিতম্।
তস্মাদেতত্ত্রয়ং নিত্যং নাবমন্যেত বুদ্ধিমান॥" (৬)

অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়, সর্প ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল, অনিষ্ট করিতে অক্ষম এই বিবেচনা করিয়া কখনও ইহাদের অমান্য করিবে না। উক্ত ক্ষত্রিয়, সর্প ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অবমানিত হইলেই অবমানকারীর বিনাশ সাধন করেন। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাদের কখনও অপমান করিবে না।

তৎকালে শূদ্রদের ঐ উপায়ে অধীনে রাখিয়া সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্যের জন্য তাহাদের মনোবৃত্তি দাসভাবাপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেও নানারূপ ব্যবস্থা বলবৎ হয়। মনুসংহিতায় উহারও যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার কয়েকটি এইরূপ,

"শূদ্রের দাসশব্দযুক্ত হীনতাবাচক নাম রাখিতে হইবে ৭ শূদ্রকে লৌকিক বা ধর্ম্মবিষয়ে কোন উপদেশ দিবে না।৮ ব্রাহ্মণ-শুশ্রূষা পরায়ণ শূদ্র মাসে মাসে মস্তক মুণ্ডন করিবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে।৯ ব্রাহ্মণ আশ্রিত শূদ্রের ভক্ষার্থ উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানের নিমিত্ত জীর্ণ বস্ত্র, শয়নের নিমিত্ত জীর্ণ শয্যা ও ধান্যের পুলাক প্রদান করিবেন।১০

এই সমস্ত ব্যবস্থা মত না চলিলে শূদ্রের কি অবস্থা হইত তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও মনুসংহিতার পূর্ব্বোক্ত অংশ হইতে অনুমান করা কঠিন নহে। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত শম্বুকের কথা উহার একটি নিদর্শন।১১

ঐ সময় ধর্ম্ম ও শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের করায়ত্ত থাকায় ধর্ম্ম ও রাজতন্ত্রের সাহায্যে শূদ্রদের ঐ অবস্থায় সর্ব্বত্র শিক্ষাদীক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া বংশানুক্রমে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা হইত। গৌতম

১। বঙ্গদর্শন, ১২৮০ সাল শ্রাবণ সংখ্যা (চার্ব্বাক দর্শন)
২। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০।৩৮, ৩৯
৩। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড

৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।২৯।৪
৫। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩।৩।৪।৩
৬। মনুসংহিতা, ৪।১৩৫, ১৩৬
৭। মনুসংহিতা, ২ অধ্যায়, ৩১
৮। ঐ ৪ অধ্যায়, ৮০
৯। ঐ ৫ অধ্যায়, ১৪০
১০। ঐ ১০ অধ্যায়, ১২৫
১১। বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৭৫।৭৬ সর্গ

সংহিতা পাঠে জানা যায় যে, দাসত্বকার্য্য ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে তাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিত না।১ তজ্জন্ত মনুও বলিয়াছেন,

"শূদ্রস্তু বৃত্তিমাকাঙ্ক্ষেৎ ক্ষত্রমারাধয়েদ্ যদি।
ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ॥" (২)

অর্থাৎ, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সেবাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারে, তবে ক্ষত্রিয়ের পরিচর্য্যা দ্বারা, তদভাবে ধনশালী বৈশ্যের সেবাদ্বারা, জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

ঐ প্রকারে কেবলমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে পরিমাণ ধনসম্পত্তি রাখা প্রয়োজন তদধিক ধনসম্পত্তি উপার্জ্জনও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ঐরূপ সামান্ত ধনসম্পত্তি আবার ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছামত হরণ করিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধেও শাস্ত্রে যে নির্দ্দেশ ছিল তাহা এই,

"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥" (৩)

অর্থাৎ, শূদ্রের নিজস্ব কিছুই নাই। তাহার সমস্ত ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য। ব্রাহ্মণ বিশ্রব্ধ চিত্তে উহা গ্রহণ করিবেন।

তখন রাষ্ট্রের বাহিরে ঐরূপ শূদ্রশ্রেণীর নীচেও আরও কতকগুলি বর্ণহীন শ্রেণী ছিল। পরে তাহারাও শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া যায়। তাহাদের দ্বারাই দ্বিজাতিগণের আবশ্যক অথচ ঘৃণ্য কার্য্য যথা চিকিৎসা, চর্ম্মের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ, মৎস্য মারণ ও বিক্রয়, ঢাক প্রভৃতি বাদন, হস্তী ও অশ্বাদি পালন ইত্যাদি সম্পন্ন করান হইত। উহারা দাসবর্ণরূপে ক্রমশঃ বৈদেহক, পৌল্কস নিষাদ, শ্বপচ ও চণ্ডাল প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হয় এবং দ্বিজাতিদের জনপদগুলির বাহিরে চৈত্যবৃক্ষ মূলে, বন অথবা পর্ব্বত সান্নিধ্যে বাস করিত।

ঈশ্বরের নিকৃষ্ট স্থান পাদদ্বয় হইতে শূদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে৪ এবং তিনিই ঐ সকল দাসবর্ণকে ঐ প্রকার গূঢ় ও নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন৫, ঋগ্বেদে বিবৃত নারায়ণ ঋষি এবং ঋষি গৃৎসমদের এই দুইটি দার্শনিক সিদ্ধান্তই ঐ সময় আত্মা, জন্মান্তর ও কর্ম্মফলাদি দার্শনিক মতবাদে সুদৃঢ় হইলে এইরূপ কঠোর সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

ঐ সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তের সংস্কারে তৎকালে কেবলমাত্র শূদ্রগণেরই যে এরূপ দশা হয় তাহা নহে, পরলোকে বিশ্বাস বশতঃ, দ্বিজাতিদের মধ্যেও বানপ্রস্থাশ্রম ও মহাপ্রস্থান গমন প্রভৃতি কতকগুলি নিষ্ঠুর অনাচারের উৎপত্তি ঘটে এবং অন্ত কয়েকটি আদিম আচরণ, যাহা ঐ সময়ের পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আরও প্রবল আকার ধারণ করে। ঐ সকল আচরণের মধ্যে সহমরণ, যজ্ঞে ঋত্বিক্ ও ব্রাহ্মণদের কন্যাদান ও পশুবিনাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর সকলদেশের আদিম মহাপুরুষগণের ন্যায় বৈদিক ঋষিরাও ঐ সময়ের পূর্ব্বে পরলোকে এক অপূর্ব্ব ভোগসুখের স্থান স্বর্গরাজ্যের দর্শন পান৬ এবং দেহান্তে উহা লাভই মানবজীবনের একমাত্র কাম্য বলিয়া ঘোষণা করেন। সে কারণ উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই ক্রমশঃ সমাজে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য এই চতুরাশ্রম ও মহাপ্রস্থান বিধির প্রচলন হয় এবং দ্বিজাতিগণ তদনুসারে সর্ব্বত্র ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রম অন্তে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উক্ত বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষাশ্রমে নিযুক্ত হইতে থাকেন। তজ্জন্ত তৎকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন ও ভিক্ষাবৃত্তি তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া উঠে

বানপ্রস্থাশ্রমে কৃচ্ছ্রসাধনের বিধিসমূহ কিরূপ কঠোর ছিল সূত্র ও পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। মহাভারতে উক্ত আশ্রমের আচার ও লক্ষণ প্রসঙ্গে ভৃগুর উক্তিরূপে উল্লিখিত আছে যে, ঐ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে অনবরত শীত, উত্তাপ, বৃষ্টি ও বায়ু সহ্য করাতে এবং বিবিধ নিয়ম পালন ও আহার সঙ্কোচের জন্ত বানপ্রস্থাবলম্বীদের গাত্রের মাংস ও শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইত এবং তাঁহারা কঙ্কালমাত্র দেহ ধারণ করিয়া থাকিতেন।৭

উক্ত আশ্রম দ্বিজাতিদের অবশ্য পালনীয় থাকায় কত ব্যক্তিকে তখন ঐ প্রকার দুরবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইত তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

বৈদিক ঋষিদের নির্দ্দেশমত কেবলমাত্র দ্বিজাতিগণকে স্বর্গে ভোগসুখের মধ্যে রাখাই ছিল ঐরূপ আচরণ পালনের উদ্দেশ্য। উহার জন্ত আবার মহাপ্রস্থান গমনের যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তদনুসারেও বহু ব্যক্তি নদীতে ডুবিয়া, অগ্নিতে পুড়িয়া, পর্ব্বত হইতে পড়িয়া ও অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতেন। অত্রিসংহিতায় উল্লিখিত আছে যে, ঐ সকল উপায়ে দেহনাশে যে সমস্ত বানপ্রস্থাবলম্বী ও ভৈক্ষাশ্রমী অকৃতকার্য্য হইতেন তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া সমাজে ঘৃণ্যরূপে কালাতিপাত করিতেন।৮

১। গৌতমসংহিতা, ০ অধ্যায়
২। মনুসংহিতা, ১০ অধ্যায় ১২১
৩। ঐ ৮ অধ্যায়, ৪১৭
৪। ঋগ্বেদ, ১০।৯০।১২
৫। ঋগ্বেদ, ২।১২।৪
৬। ঋগ্বেদ, ৯।১১৩।৭-১১
৭। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়, ১৯২ অধ্যায়
৮। অত্রিসংহিতা, ২১০-২১১

স্বর্গলাভের জন্ত পুরুষদের ঐ সমস্ত অনাচার ভিন্ন নারীদের মধ্যেও সহমরণ নামে আর একটি অনাচার বলবৎ ছিল। অথর্ব্ববেদে উহার যে উল্লেখ আছে তাহা দেখিলে বৈদিক যুগে ঐ ব্যবস্থাটি একেবারে অচল ছিল না তাহা বুঝা যায়।১ পুরাণগুলিতে দ্বাপরযুগের শেষভাগেই উহার অধিকতর প্রচলনের উল্লেখ আছে।২ ঐ সময় বহু বিবাহ কার্য্যকরী থাকায় উহার জন্ত অনেক নারীকেও অকালে মৃত স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইত।

বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থার চাপে উদ্ভূত ঐ সকল কারণে তৎকালে মানুষের স্বাধীন গতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় এবং কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থাগুলি অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইয়া অসংখ্য প্রকার যজ্ঞ ও পারলৌকিক কার্য্যের সৃষ্টি হয়। ঐ সকল যজ্ঞ তখন সর্ব্বত্র বৎসরের প্রায় সর্ব্বসময় অনুষ্ঠিত হইত। তাণ্ড্যব্রাহ্মণে একদিন স্থায়ী, শতদিন স্থায়ী, সংবৎসর ও তদধিককাল স্থায়ী ঐরূপ অনুষ্ঠানসমূহের উল্লেখ আছে।

রাজারা ঐ সকল অনুষ্ঠান কিরূপ মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন তাহার পরিচয় ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে, বাল্মীকি রামায়ণে ও মহাভারতে, যোড়শ রাজিক বিবরণে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দ্বিজাতি গৃহস্থকেও ঐ সকল অনুষ্ঠান সাধ্যমত সম্পন্ন করিতে হইত।

ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে পশুহত্যা অত্যাবশ্যক থাকায় গো-মহিষাদি প্রয়োজনীয় পশুও এত অধিক সংখ্যায় বিনাশ করা হইত যে, তজ্জন্ত দেশের তৎকালীন আর্থিক বনিয়াদও নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। ঐ সকল পশু, প্রয়োজন হইলে, আবার কি উপায়ে বৈশ্য ও শূদ্রগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইত তাহা মনুসংহিতায় প্রকাশিত এই ব্যবস্থাটি হইতে জানা যায়ঃ

"যজ্ঞকারী বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ যদি উপযুক্ত দ্রব্যাভাবে একাঙ্গে অসম্পূর্ণ থাকে তবে ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে বসতি করিলে উক্ত ব্রাহ্মণ যে বৈশ্য বহু পশ্বাদি ধনশালী ও পঞ্চমহাযজ্ঞাদি ক্রিয়াবিহীন এবং অসোমযাজী তাহার নিকট হইতে যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত ঐ দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অপহরণ করিয়া উক্তাঙ্গপূর্ণ করিবেন। যদি দ্রব্যাভাবে দুইটি বা তিনটি যজ্ঞিয়াঙ্গ বৈকল্য থাকে তবে বৈশ্যের অভাবে শূদ্রের গৃহ হইতে ইচ্ছামত ঐ দ্রব্য কয়টি গ্রহণ করিবেন যেহেতু শূদ্রের কোন যজ্ঞ সম্বন্ধ নাই।৩

এই রকম অত্যাচারের প্রশ্রয়কর ব্যবস্থার ফলে বৈশ্য ও শূদ্রদের তখন সময় সময় আরও কতবেশী ক্ষতি সহ্য করিতে হইত তাহাও সহজেই অনুমেয়।

তৎকালে বৈশ্যেরা শূদ্রদের ন্যায় ইচ্ছামত বধ্য (যথা কামবধ্য) না হইলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ইচ্ছামত উচ্ছেদ্য ছিলেন।৪ সে কারণ তাঁহাদের নিকট হইতে তখন যজ্ঞে বিনাশের জন্ত প্রয়োজনমত গো মহিষ প্রভৃতি পশু ঐ প্রকারে গ্রহণ করা খুবই সহজ ছিল। যজ্ঞে ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণগণকে নারীদানের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈদিক যুগের প্রথমেও উহার প্রচলন ছিল কিন্তু তখন ঐরূপ দানে নারীর সংখ্যা কম ছিল।৫ উহা ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ প্রধান-কালে কিরূপ বর্দ্ধিত হয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা আত্রেয় অঙ্গ ও মহাভারতে ভগীরথ ও বৃহদ্রথ প্রভৃতি নৃপতিদের যজ্ঞের বিবরণ হইতে জানা যায়।৬

উপরোক্ত সামাজিক অবস্থায় প্রগতিশীল মানবগণের বিপ্লবী হইয়া উঠা স্বাভাবিক। সেকারণ ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লোকায়তিকগণকেই ঐরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে তাঁহারা যখন উক্ত মতবাদ প্রচারদ্বারা ভারতের জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিয়া উল্লিখিত রূপ শ্রেণী শাসিত সমাজ বিলোপ করিতে চেষ্টা করেন তখন পৃথিবীর অধিকাংশ ভূভাগে সভ্যতালোক প্রকাশ পায় নাই। ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, চীন প্রভৃতি তৎকালীন তথাকথিত সভ্যদেশগুলির অধিবাসীদের অন্তরে কোথাও ঐ সময় সাম্য ও মানবতামূলক সমাজ-ব্যবস্থার উচ্চ ধারণা ছিল না এবং সর্ব্বত্রেই আদিম সভ্যতার উদ্বর্ত্তন পূর্ব্বোক্ত প্রকার ও উহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর অমানুষিক আচরণসমূহ প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে ভারতে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কিরূপ মানবপ্রেমিক ও স্বাধীন চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন তাহা বুঝা যায় উক্ত লোকায়তিক মতবাদীদের পরিচয় হইতে। ঐ সময় ঐরূপ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটি গৌরবময় ঘটনা, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বভাববাদী বলিয়া উহাতে আজিও তাঁহারা অজ্ঞাত হইয়া আছেন।

তাঁহাদের বিপ্লব কি প্রকারে আরম্ভ হয় তাহা এখন সঠিক জানিবার উপায় নাই। পৌরাণিক ও বৈদিক গ্রন্থগুলির স্থানে স্থানে ধর্ম্ম আচরণ লইয়া আর্য্যগণের মধ্যে নানা রকম বিবাদ-বিসম্বাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারত,

---

১। অথর্ব্ববেদ, ১৮।৩।১,২,৩

2. *Some Aspects of the Earliest Social History of India.* Pages 192-197. By Prof. Subimal Sarkar. (Oxford Press.)

৩। মনুসংহিতা, ১১।১১-১৩

৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।২৯।৪ ৫। ঋগ্বেদ, ৮।১৯।৩৬

৬। ঐ ৮।২২ ও মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়, (২৯)

মৎস্য এবং বায়ু পুরাণে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতা ও ঋষিদের যে একটি বিবাদের উল্লেখ আছে তাহাতে দেখা যায় যে, ঋষিদের একাংশ তখনই যজ্ঞে পশু হত্যার দারুণ বিরোধী হন এবং তাহার ফলে মহাপ্রাজ্ঞ বসুধরকে উহা মীমাংসার জন্য মধ্যস্থ নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাঁহার রায় পশুবিনাশের পক্ষে হওয়াতে দেবতারা পশু বিনাশপূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং ঋষিরা ক্রুদ্ধ হইয়া বসুধরকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া যান।১

উক্ত পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে কিন্তু ঐ সকল ঋষির কোন পরিচয় নাই। তবে ঐ প্রসঙ্গে এক স্থানে মৎস্য পুরাণকার এইটুকু মাত্র বলিয়াছেন যে, তাঁহাদেরই কয়েকজন পরে বেদ-বিরোধীরূপে প্রখ্যাত হন।২ মহাভারতে গোকপিল সংবাদেও উল্লিখিত আছে যে মহর্ষি কপিলও একদা নরপতি নহুষকে মহর্ষি ত্বষ্টার মধুপর্কের জন্য গো-হত্যায় নিয়োজিত দেখিয়া দারুণ মর্ম্মাহত হইয়া হা বেদ শব্দে চীৎকার করেন।৩ উহা ভিন্ন ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডলের ৩৮ সূক্তে দেখা যায় যে, তখন আর্য্যদের ও দাসজাতির কিয়দংশ দেবরহিত হইয়া বেদানুগত আর্য্যগণের ঘোরতর শত্রুরূপে পরিগণিত হন।৪ এই সমস্ত উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ব্বোক্তরূপ বেদবিহিত আদিম ধর্ম্মের প্রতি একটা অসন্তোষ বৈদিক ভারতে বহুদিন হইতে স্ফুরিত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। ঐ প্রকার অসন্তোষই যে ক্রমশঃ উক্ত লোকায়তিক মতবাদ ও তজ্জনিত বিপ্লবের আকারে প্রকাশ পায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উহার প্রবর্ত্তক বেদবিরোধী বৃহস্পতির পরিচয় এ পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নাই। মহাভারতে মনু ও বৃহস্পতি প্রসঙ্গে জনৈক বৃহস্পতির এইরূপ উক্তি উদ্ধৃত আছে, "দুঃখ ত্যাগ করিয়া সুখলাভ করাই সকলের উচিত। সুখ কর্ম্ম-দ্বারাই লব্ধ হয়, সুতরাং কর্ম্মই লোকের কর্ত্তব্য।"৫ উহা হইতে তাঁহাকেই লোকায়তিক মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতে ঐ প্রসঙ্গে মনুশিষ্য, মহর্ষি, দেবর্ষিগণাগ্রগণ্যরূপে তাঁহার উল্লেখ আছে। লোকায়তিক-দের উক্তিসমূহের মধ্যে তাঁহার বাণীর যেরূপ প্রাধান্য আছে তাহা হইতেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বৈদিক যুগের একজন মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ ধর্ম্মাচরণ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যেই তিনি বার্হস্পত্যদর্শন ও বার্হস্পত্য নীতি প্রচার দ্বারা গায়ত্রীরূপী বৈদিক ধর্ম্মকে অপসারিত করিবার চেষ্টা করেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তাঁহার দ্বারা গায়ত্রীনাশের চেষ্টার উল্লেখ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে উদ্ধৃত তাঁহার বেদতত্ত্ববিরোধী চিন্তামূলক উক্তিগুলি ঐরূপ অনুমানকে সমর্থন করে।

উহা ব্যতীত তাঁহার মতানুবর্ত্তী চার্ব্বাক প্রভৃতি লোকায়তিকদের কার্য্যকলাপ এবং বেদশাস্ত্রকারগণ ও বেদ-ধর্ম্মেরবিরুদ্ধে ঘোষিত "বেদত্রয়ের সৃষ্টিকর্ত্তারা ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর"৬ এবং "ধর্ম্মআচরণ করিও না"৭ প্রভৃতি বাক্য-গুলিও উহার প্রতিপাদক।

সমাজে মানবতার স্থান না থাকায় এবং ধর্ম্মের নেতৃগণ পূর্ব্বোল্লিখিত আচরণসমূহ অপৌরুষেয় ও সনাতন বেদ-ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া সমর্থন করায় তৎকালে জনগণের নৈতিক অবস্থা কত শোচনীয় হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সেকারণ লোকায়তিকদের বেদ ও তন্মূলক ধর্ম্মকার্য্যাদির বিরুদ্ধে ঐ প্রকার মনোভাব সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যে দার্শনিক মতবাদ মানবগণের বাস্তব জীবনের ঐরূপ নিগ্রহ ও বিনাশের কারণ তাহা অপসারিত না হইলে উক্ত প্রকার সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কার পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব নহে। সেকারণ তাঁহারা গভীর চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা সর্ব্বশ্রেণীর মানবগণের একত্ব প্রতিপাদন, তাঁহাদের ঐহিক জীবনের সুখশান্তি বর্দ্ধন ও সমাজে মানবতা প্রসারণের জন্য নূতন দর্শন সৃষ্টি করেন এবং উহার সাহায্যে সমাজ জীবনে ঐ প্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায়—আত্মা, পরলোক ও জন্মান্তরের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অলীক, এবং বর্ণাশ্রম ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম্ম নিষ্ফল ইহা প্রতিপন্ন করতঃ বৈদিক সমাজব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য গণ-আন্দোলন আরম্ভ করেন।

ঐ আন্দোলনে তাঁহাদের ঘোষণার যে সকল নিদর্শন খণ্ডিত ভাবে প্রাচীন সাহিত্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যায় তন্মধ্যে কয়েকটি এই :

> "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।
> ন স্বর্গো নাপবর্গোবা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
> নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।
> যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়, ২০১ অধ্যায়
মৎস্যপুরাণ ১৪৩ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ, ৫৭ অধ্যায়

২। মৎস্যপুরাণ, ১৪৩ অধ্যায়, ২১

৩। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়, ২৬৮ অধ্যায়

৪। ঋগ্‌বেদ, ১০।৩৮।৩

৫। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়, ২০১ অধ্যায়

৬। "ত্রয়বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচরাঃ"।

৭। "ন ধর্ম্মাংশ্চরেৎ"।

অর্থাৎ, কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে না। যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি ঘটে। স্বর্গ, অপবর্গ (মোক্ষ), আত্মা ও পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। বর্ণাশ্রমাদির ফলদায়ক কোন কার্য্যও নাই। যতদিন বাঁচিবে ততদিন সুখে থাকিবে, মৃতের কোন গোচর নাই। দেহ ভস্মীভূত হইলে আর পুনরাগমন হয় না।

বানপ্রস্থাশ্রমে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী হইবার আশায় মহাপ্রস্থানিক বিধি মত অকালে মৃত্যু বরণ না করিয়া পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট থাকিবার জন্য তাঁহারা আরও বলেন, "বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ" অর্থাৎ, আগামী কল্য ময়ূর না হইয়া অদ্য কপোত থাকাই শ্রেয়।

তাঁহাদের মতানুসারে মানুষের কোন প্রকার জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকার থাকিতে পারে না যেহেতু আত্মা, জন্মান্তর ও পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং সমাজ-নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মও নিষ্প্রয়োজন এবং তৎপরিবর্ত্তে মানবগণের বাস্তব জীবনের হিতকারী ধর্ম্মই কাম্য।

তাঁহাদের দর্শন অনুযায়ী জীব, "শরীরেন্দ্রিয় সংঘাতএব চেতনঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ"১ অর্থাৎ, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সংঘাতে স্বচেতন ক্ষেত্রবিশেষ। তাঁহারা বলেন, জীবদেহে প্রকাশিত চৈতন্য বস্তুসত্তারই এক বিশেষ প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বস্তু স্বভাবে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি ভূতের সম্মিলনে সৃষ্ট দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সংঘাতেই কিণ্বপদার্থের সংঘাতে উৎপন্ন মাদকতা শক্তির ন্যায়, উহা জীবদেহে প্রকাশিত হয়২ এবং যতদিন উক্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্যকরী থাকে তত দিন দেখাশুনা ইত্যাদিরূপে উহারও অস্তিত্ব থাকে।৩

প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে তাঁহাদের অন্যান্য যে সমস্ত ঐরূপ বিচ্ছিন্ন উক্তি উদ্ধৃত আছে তৎসমুদয় পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, সর্ব্বশ্রেণীর মানবগণের হিতার্থে একটি সাম্য ও গণতন্ত্রমূলক লৌকিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহারা সেই সুদূর অতীত যুগে সচেষ্ট হন। দেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার তাঁহারা যে পক্ষপাতী ছিলেন তাহা তাঁহাদের এই সকল উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায়। যথা "লোক সিদ্ধো ভবেৎ রাজা", "লোকসিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরঃ", অর্থাৎ, লোকসিদ্ধো (গণানুমোদিত) ব্যক্তিই রাজা হইবেন, লোকসিদ্ধো (গণানুমোদিত) রাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (Supreme)।

তাঁহাদের রচিত কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব না থাকায় কতকগুলি প্রাচীন পুস্তকে বার্হস্পত্য, চার্ব্বাক ও লোকায়তিক মতবাদ নামে উদ্ধৃত উপরি-লিখিতরূপে কতকগুলি খণ্ডিত উক্তিই এখন আমাদের ঐ মতবাদের সহিত পরিচিত হইবার একমাত্র অবলম্বন। উহা হইতে তাঁহাদের চিন্তাধারার সুনির্দ্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া না গেলেও উহা যে গভীর চিন্তাপ্রসূত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। এবিষয়ে প্রসিদ্ধ জার্ম্মান পণ্ডিত আচার্য্য গার্ব্বেও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:

"It is natural to conjecture that the Lokayata system was based by its founders upon deeper principles and developed upon more serious philosophical lines than the information which has come down to us from their opponents."4

অর্থশাস্ত্রেও এই অনুমানের সমর্থক কৌটিল্যের একটি মন্তব্য আছে। উহা এই, "সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত ইহাই আন্বীক্ষিকী। ইহাদের হেতুসমূহের দ্বারা আনিক্ষ্যমান লোকের উপকার করে, ব্যসনে ও অভ্যুদয়ে বুদ্ধিকে অবস্থাপিত করে ও ক্রিয়ার বৈশারদ্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এই আন্বীক্ষিকী সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সকল কর্ম্মের উপায়স্বরূপ এবং সকল ধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ।"৫

কৌটিল্যের এই মন্তব্য হইতে ইহাও জানা যায় যে তাঁহার সময় (খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকেও) লোকায়ত দর্শনের গ্রন্থাদির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই এবং তখনও উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণদের অনেকে উহা যথেষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

অধুনা আমরা মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ও অন্যান্য গ্রন্থে উহার যে খণ্ডিত ও বিকৃত আকার দেখিতে পাই কৌটিল্যের উপরোক্ত মন্তব্যটি দেখিলে উহা যে ঐরূপ ছিল না তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে রিস্ ডেভিস্ও যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। উহা এই:

"Finally in the 14th century Madhava has a long chapter in which he ascribes to the Lokayatikas the most extreme forms of the let us eat and drink for tomorrow we may die view of life. . . .His able description has all the appearance of being drawn from his own imagination and is based on certain doggerel ver-

---

১। বার্হস্পত্যদর্শন, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৫১।

২। "অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ
চতুর্ভ্যঃ খলুভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।"
(সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ)

৩। "পশ্যামি শৃণোমিত্যাদি প্রতীত্যা মরণপর্য্যন্তং যাবদিন্দ্রিয়াণি তিষ্ঠন্তি তাবদেবাত্মা।"

4. Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics, (Lokayata).

৫। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২য় অধ্যায়, ১ম প্রকরণ, বিদ্যাসমুদ্দেশ

ses which cannot possibly have formed a part of the Lokayata studied by the Brahmanas of old." 1

তাঁহাদের রচিত যাবতীয় গ্রন্থ নিশ্চিহ্ন হওয়ায় বিভিন্ন পুস্তকে উদ্ধৃত তাঁহাদের খণ্ডিত উক্তিগুলির ইচ্ছামত নানারূপ অর্থ করা সহজ হইয়া আছে। তজ্জন্য অনেকে উহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে উদ্ধৃত তাঁহাদের প্রচারোক্তিগুলি দেখিলে জানা যায় যে, তাঁহারা কিরূপে হিংসা ও পরপীড়ামূলক কার্য্যাদির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন।২ নৈষধচরিতেও প্রাচীন দেবতা ও ঋষিদের অন্যায় কার্য্যাদির বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রচারিত যে সমস্ত নিন্দাবাদ উদ্ধৃত আছে তৎসমুদয় হইতেও তাঁহাদের উচ্চ নীতিজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।৩ উহা ভিন্ন তাঁহাদের মতবাদে সমাজে যে কলুষ প্রবেশ করে এরূপ কোন কথা তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদিগণের লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে কোথাও নাই।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের মতবাদ বাস্তবদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহা এরূপ মানবতামূলক উচ্চ ঐহিক নীতির দ্বারা গঠিত ছিল যাহা অবশ্যই তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। নচেৎ ঐ মতবাদ প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিস্তারলাভ করিতে পারিত না।

প্রাচীন ভারতের অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকের যে ঐ মতবাদের উপর প্রবল আকর্ষণ ছিল তাহার পরিচয় বাল্মীকি রামায়ণের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে আছে। বেদধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবও উচ্চশিক্ষা সমাপন করিয়া বেদধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রথমে ঐ মতবাদীদের সহিত মিলিত হন। মহাভারতে তাঁহাকে প্রদত্ত বেদব্যাসের যে সমস্ত উপদেশ উদ্ধৃত আছে তন্মধ্যে উহার উল্লেখ আছে।১ উহা ব্যতীত বাল্মীকি রামায়ণে, চিত্রকূটে ঋষি জাবালীর সহিত রামের যে কথোপকথন প্রকাশিত আছে তাহা হইতেও ঋষিদের উপর ঐ মতবাদের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরাও তাঁহাদের রচনায় নানাপ্রকারে ঐ মতবাদ খণ্ডনের যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলেও প্রাচীন ভারতে উহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ঐ মতবাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "উপনিষদ ও দর্শনসমূহে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্ট হয় তাহা বৃহস্পতির তর্কসম্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার প্রাগল্ভ বিলোপও যে তাঁহার হস্তে কত দূর ঘটিয়াছিল কে নির্ণয় করিবে? বোধ হয় যেন তাঁহার নাস্তিকতাই কপিল, বুদ্ধ ও জৈমিনিকে নাস্তিক করিয়াছে এবং তাঁহার প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষার্থ তর্ক করিতে গিয়া অনুমিতি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।২

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে উক্ত মতবাদজাত বিপ্লবেরও কিছু কিছু বিবরণ আছে। ঐ সমস্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ত্রেতায় উক্ত বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর, ঐ মতবাদীদের বিনাশপূর্ব্বক উহা দমনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, উহার বিস্তার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই এবং তাহার ফলে কেবলমাত্র ধর্ম্মাচরণের যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা নহে, শূদ্রেরাও নানারূপ অধিকারলাভে সক্ষম হন। পরে দ্বাপরে ভারত-যুদ্ধেই ঐ বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হয়।

1. *Dialogues of Buddha Kutadanta-Sutta.* Introduction.

২। বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ১৮ অধ্যায়

৩। নৈষধচরিত, ১৭ সর্গ

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়, ৩২২ অধ্যায়

২। বঙ্গদর্শন, ১২৮১ সাল শ্রাবণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৭৭

মহাকালের শিল্পী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মহাকাল—তব শিল্পী আমরা, উৎসাহী অনুরাগী,
করি তপস্যা বিনিদ্র নিশি জাগি।
আমাদিকে তব সেবক করিয়া লহ,
আমাদের মুখে তুমি কহ, কথা কহ,
কর কালজয়ী যাহা গড়ি, রচি,
যাহা গাহি, যাহা আঁকি।

২

সে তো দরিদ্র —প্রকাশ যাহাতে হ'ল না অপ্রকাশ,
যাহাতে হ'ল না অপার্থিবের বাস।
সেই বর মোরা চাহি যে তোমার কাছে,
গড়ি—অসীমের ইঙ্গিত যাতে আছে,
যা' তব তৃতীয়-নেত্র আলোকে
আলোকিত বারো মাস।

৩

নির্ম্মাণ করি লাবণ্যলোক—জরা ও মৃত্যু জিনি'—
স্রষ্টা মোদের সৃষ্টির কাছে ঋণী।
রচি তপোবন বিরাজে শকুন্তলা,
গাহি গীত—হয় সুরধুনী চঞ্চলা,
মোদের শক্তি শিবের লাগিয়া
সতত তপস্বিনী।

৪

তব দৃষ্টির প্রসাদ লভিয়া, আমরা সৃষ্টি করি,
তাই রেখা-ছবি রূপে রসে উঠে ভরি।
সৃজি অশ্বিনী উর্ব্বশী রূপ পায়,
বামন গড়ি—সে ত্রিপাদ ভূমি যে চায়,
তুচ্ছ কালির আঁখরে আমরা
বিশ্বরূপকে ধরি।

৫

আমরা হরির অদর্শনেতে, রচি ষড়্দর্শন—
দেখিয়া হয় তো হাসেন জনার্দ্দন।
অন্তায় তিনি করেন—দেখা না দিয়া,
'ন্তায়ে'র তর্কে দিই তাঁরে উড়াইয়া,
তাঁরে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় করি—
আমরা অকিঞ্চন।

৬

ভগবান রূপ লুকাইতে গিয়া কোথায় পড়েন ধরা—
কার্য্য মোদের তার সন্ধান করা।
বহুবল্লভ আমরা করেছি তাঁরে,
বহু রূপ তাঁরে দিয়েছি এ সংসারে,
সব রূপ তাঁরি—সত্য সে রূপ—
হোক আমাদের গড়া।

৭

বিধাতার মোরা নিন্দা রটাই—স্বভাবতঃ দুর্ম্মুখ,
আমরা তাঁহারে করেছি চতুর্ম্মুখ।
তাঁর বাহনের হরেছি শুভ্র পাখা,
তাহাতেই হয় লেখা, আলেখ্য আঁকা,
কমণ্ডলুটি কেড়ে নিতে তাঁর
মোরা সদা উৎসুক।

৮

কোথা উবে গেল ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, দ্বারাবতী?
আমরা তাদিকে রেখেছি সজীব অতি।
ভাবের ধরণী সৃজি, রূপ আসে তাতে—
বাসুকী তাহাকে ধরিতে যে ফণা পাতে,
আমাদের 'মহাভারতে' বসতি
করেন সরস্বতী।

৯

দেখি কল্পনা কল্প-পাদপে অমৃত ফল ফলে,
ভাসি বিস্ময়ে উল্লাসে আঁখিজলে।
আমরা শিল্পী অরূপের রূপকার,
বিষ খাই, করি অমৃতের কারবার,
স্নেহাদরে শিব-সীমন্তিনীর—
আমাদের দিন চলে।

১০

মহাকাল তব ডমরুর রবে উৎসব মোরা গণি—
আনন্দে নাচি গরজিলে তব ফণী।
বৃষভের পিঠে তুলে লও তব পাশে—
আমাদিকে—দেখে দেবতারা যেন হাসে,
তোমার সঙ্গে যাই, দিতে দিতে
তোমার জয়ধ্বনি।

পুণ্যের কাজ

ফোটো—পরিমল গোস্বামী

পল্লীপথে

ফোটো—পরিমল গোস্বামী

"মা"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একেবারেই যে শিশু হয়ে গেছি তা নয়, তবে বেশ অনুভব করছি আজ প্রায় পঞ্চাশটি বছর জীবন থেকে গেছে খসে। ক'দিন থেকে জ্বরে ভুগছি, গায়ে অসহ্য ব্যথা। কাঁদছি, চেঁচিয়ে নয়, আস্তে আস্তে গুমরে গুমরে; ঠিক যে অসুখের জন্যে তা নয়, বেদনার জন্যেও নয়; কাঁদছি মায়ের ওপর অভিমানে, ছোট ভাইটির ওপর হিংসায়। আজ আমি আর কেউ নয়—না, অসুখে পড়লেও নয়, গায়ের ব্যথায় ছটফট করলেও নয়, এখন যা কিছু খোকা! বেশ।

কপালে মায়ের নরম হাতটা এসে পড়ল। চোখ বুজেই পড়ে রইলাম, বোজা চোখের পাতা ঠেলে দু'কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে বালিশে। কথা কোনমতেই কইব না, তার মানে শুনিয়ে কইব না; মনে মনে অভিমান গুমরে উঠছে বৈ কি···কেন এলে? যাও না, খোকাকে নিয়ে থাকগে··· আমার অসুখ হয়েছে, এবার বেশ কেমন মরে যাব—আমার কাছে বসতেও হবে না, আমার জন্যে কাঁদতেও হবে না···

কিন্তু ভাবছি—চোখ বুজেই ভাবছি, হ'ল কেমন করে এমনটা? আমার বেশ মনে পড়ছে, আমি এত ছোট নয়; মোটেই ছোট নয়! আমি চাকরি করি, এবার রিটায়ার করব; এক্‌স্‌টেন্‌শনের জন্যে দরখাস্ত দিয়েছি, তার ধুক-পুকুনিটা এই তো এখনও বেশ অনুভব করছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, মাকে তো অনেকদিন হারিয়েছি! আবার আসবেন কি করে? অথচ একথাও ঠিক যে এসেছেন; আমি অভিমান ভুলে যদি হাতটা বাড়াই তো আমার গরম হাতটা ঠিক তাঁর নরম ঠাণ্ডা হাতের ওপর গিয়ে পড়বে, সোনার চুড়ি, শাঁখা···

তার পরেই সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। কালকেরই তো কথা। গাড়িতে আসতে সত্যবাবু বলছেন, সেই সাধুর কথা···আশ্চর্য কথা! সম্মোহন নয়, পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থায় বসে আছেন, সামনের কাগজের ওপর থেকে পেন্সিলটি কে যেন তুলে নিলে, তার পরেই পিঠে যেন আস্তে আস্তে কে সেই পেন্সিলটি বুলিয়ে দিচ্ছে।···সাধু মায়ের একেবারে সম্পূর্ণ বর্ণনাটি করে গেলেন; কখনও দেখেন নি, কোন ছবিও নয়—বললেন, আপনার মা আপনাকে আশীর্বাদ করছেন। ···সত্যবাবু শুধু নিজের চোখে দেখতে পেলেন না মাকে। নাকি, ওটা পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি না হলে হয় না।

কথাটা মনে পড়ে যেতে কেমন একটা ভয় হচ্ছে, যদি সেই লোভে চোখ খুলে বসি! চোখ দুটো বেশ ভাল করে এঁটে বন্ধ করে পড়ে রইলাম।

এখন আর ছোট ভাইয়ের ওপর ঈর্ষা নিয়ে মায়ের ওপর সেই অভিমানটা নেই। এখন তো বেশ বুঝতে পারছি ব্যাপারটা—সেই সাধুর কাজ; একটা অবস্থায় আমায় নিয়ে গিয়ে এই অতি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্যে ফেলেছেন··· কিন্তু কখন এলেন তিনি?

কিন্তু অবস্থাটা আবার এক ধরণের সম্মোহনই তো; সব কথা মনে থাকবে কি করে? সম্মোহনে যেটুকুর ওপর মনটা কেন্দ্রীভূত হবে সেইটুকুই সত্য; এই কৈশোর, এই মায়ের জন্যে আঁকুলিবিকুলি, এই মায়ের স্পর্শ। বাকি সব তো বিস্মৃত বিলুপ্ত হয়ে যাবেই।

কতক্ষণ থাকবে এ দুর্লভ অভিজ্ঞতাটুকু—অসত্য হয়েও সত্য হয়ে? চোখ চেপে পড়ে আছি। যদি পড়ে যাই লোভে—একটা ক্ষণিকের ভুল ··তার পরেই সব শেষ!

লোভ কিন্তু অন্যদিক দিয়ে উঁকি মারতে লাগল। চোখ খুললে না হয় আশঙ্কা আছে, সব মিলিয়ে যাবে; কিন্তু সাড়া নিতে দোষ কি?

হ্যাঁ, সাড়া নেওয়া যাক্। মায়ের কণ্ঠস্বর কতদিন শুনি নি। এ লোভটা সংবরণ করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। তবুও কোনরকমে খানিকক্ষণ থাকলাম দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে, তার পর বেশ বোঝা গেল, জোর করে চোখ বোজা আর কথা বন্ধ করে থাকাতে মনটা যে একটু বিকেন্দ্র হয়েছে তাইতেই আচ্ছন্ন ভাবটা হঠাৎ কেটে আসছে—ঘুম ভেঙে স্বপ্ন মিলিয়ে এলে যেমন মনে হয়; নিদ্রা-জাগরণের প্রদোষের সেই অনুভূতি। আমি হতাশায় মরীয়া হয়ে উঠে ডাক দিলাম—"মা"!

উত্তরও কানে এল, কিন্তু তখন ঘুমটা একেবারে ভেঙে গেছে।

ঘুমই। সম্মোহন নয়, সাধু নয়, মা নয়, কৈশোর নয়। অসুখও নয়, চোখের জলে বালিসও ত ভেজে নি। আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। চাপ ভিড়ের মধ্যে সমস্ত রাত ঠায় বসে কাটাতে হয়েছে গাড়িতে, চোখের পাতা বুজতে পারি নি একবারও; গায়ে অসহ্য বেদনা এখনও।

উত্তর দিয়েছে পাশের বাড়ীর ছোট্ট মেয়েটি—"মা নয় গো, আমি নিছা।"

মেয়েটি যে আমার খুব নেওটো ছিল তা নয়। ওর বড় ভাই সুবু আমার কাছে আসে, বসে, ওকে বরং ডেকেও পাই নি এর আগে, ছোট মেয়ের ভয় আর সঙ্কোচ নিয়ে দূরে দূরেই থেকে গেছে, হয়তো তার সঙ্গে বড় ভাইয়ের দুঃসাহসিকতায় একটু বিস্ময়ও। কিন্তু লোভ দেখিয়ে যা করতে পারা যায় নি, করুণা উদ্রেক করিয়ে তা আপনা হতেই হয়ে গেছে; মায়েরই জাত তো। আজ সকালে এসে যখন গাড়ির দুর্ভোগের গল্প করছি—সমস্ত রাত নিদ্রা নেই, গায়ে ব্যথা, নিশা তখন ঘরেই ছিল, আমার ট্যাক্সিটা আসার সঙ্গে সঙ্গে যে ক'টি কৌতূহলী ছেলেমেয়ে এসে জুটেছিল, তাদের মধ্যে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে। ওরা যেমন হুড়োহুড়ি করে এসে জুটেছিল, এক সময় হঠাৎ তেমনি হুড়োহুড়ি করে চলে গেল, খেলা ছেড়ে আসা তো; নিশা কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল, তার পর এক সময় আস্তে আস্তে এসে আমার বোনের পাশটিতে ঘেঁষে দাঁড়াল। চোখ দুটি বিশ্বের অনুকম্পায় ভরা।

এর পর যখন নিশার ওপর নজর পড়ল তখন সে খুব ব্যস্ত। একটু কৌতূহলীও হয়ে উঠলাম, কেননা বুঝলাম ব্যস্ততাটুকু আমাকে নিয়েই। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ওপরে শোয়ার ঘর—তিনটে ঘর এক করে বেড়াচ্ছে নিশা, নীচের ঘরটার একটা ইজি-চেয়ারে বসে জানালার ফাঁকে দোরের ফাঁকে দেখছি, কখনও ফুটফুটে মুখের একটুখানি, কখনও হলদে রঙের ফ্রকের খানিকটা, কখনও পায়ের গোড়ালির একটু; কাল বিকেলে বোধ হয় আলতা পরেছিল, সিঁড়ির ওপর একটু চিকমিক করেই ওপরে উঠে গেল। কখনও বা সমস্ত মেয়েটিকেই দেখছি, অসম্ভবরকম গম্ভীর, অন্যমনস্ক, অসম্ভব রকম ব্যস্ত; কিছুতেই সামলাতে পারছে না, কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। অবশ্য এত ব্যস্ততার মধ্যে সে কি আয়োজনে মেতে রয়েছে, তার কিছু আন্দাজ পাচ্ছি না; শুধু এইটুকুই বুঝতে পারছি দিদিদের নেপথ্যে সরিয়ে নিশা কোনও অজ্ঞাত কারণে আমার পূর্ণ চার্জ নিয়ে বসেছে আজ। এক সময় ছোট বাটিতে দু'রকম তেল রেখে গেল পায়ের কাছে, অবশ্য ডাকলাম যে তার কোন উত্তর নেই। গামছা, কাপড়, সাবান নাইবার ঘরে রেখে এল।

নীরব সেবাকে একটু বাঙ্ময় করবার ইচ্ছা হচ্ছে; একটু এসে ডাকুক, তাগাদা দিক, তার পর তেল মাখা যাবে; ঘনিষ্ঠতার এমন একটি সুবর্ণসুযোগ হাতছাড়া করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। চোখ বুজে চেয়ারে পড়ে রইলাম। টের পেলাম এসেছে, চোখের পাতা অল্প একটু আলগা করে দেখলাম চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে চঞ্চলভাবে একবার আমার দিকে চাইছে, একবার পেছনের দিকে; তার পর হন্ হন্ করে চলে গেল।

ভগ্নী এল, ওর কাকীমা, অবশ্য নিশাই ধরে এনেছে, বললে, "মেজদা, স্নানটা সেরে নাও, নিশা তেল রেখে গেছে অনেকক্ষণ।"

বললাম, "দেখেছি। ওর ওপর সবকিছুর ভার দিয়ে তোমরা শুধু তাগাদার ভারটা হাতে রেখেছিস?"

নিশ্চয় বুঝলে না; কিংবা হয়তো একেবারে উল্টোই বুঝে থাকবে; অর্থাৎ সবার ঔদাসীন্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে দাদা; বললে, "ভার দিয়েছি আমরা! একটি কাজ করতে দেবে না, না মেয়েদের না আমায়। তেল দিয়ে গেছে, ঘুমুচ্ছ, তাই ধরে নিয়ে এল আমায়।"

নিশা পাশেই রয়েছে, একটু আড়াল হয়ে; তাকেই প্রশ্নই করলাম—"তা গামছা, কাপড়, সাবান এসব রেখে এসেছ নাইবার ঘরে? তেল মাখতে আর কতক্ষণ?"

নিশা শুধু মুখ তুলে ওর কাকীমার দিকে চাইলে, সে-ই উত্তর করলে—"সে অনেকক্ষণ দিয়ে এসেছে।"

বললাম, "যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সেই বলুক না, তুই কি জানিস?...এসেছ রেখে নিশা?"

নিশা আবার আগেকার মত মুখ তুলে চাইলে।

এতক্ষণে বুঝেছে ওর কাকীমা, মাথা দুলিয়ে বললে, "হ্যাঁ, কথা কওয়াবে! সেই বান্দা কি না। আবার যখন কইতে আরম্ভ করবে তখন অস্থির করে দেবে।...নাও, নেয়ে নাও মেজদা; একটু জলটল খেয়ে না হয় একটু ঘুমিয়েও নাও, শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে—আমি রান্নাটাও যা হোক করে সেরে নিচ্ছি তাড়াতাড়ি।"

নিশাকে বললে, "তুই না হয় বোস্ না মেজমামার কাছে, গল্পসল্প কর না।"

নিশা ওর হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল, ফ্রক দোলাতে দোলাতে। তেল মাখতে মাখতে শুনছি রান্না-ঘরে হাতাখুন্তির শব্দের মাঝে মাঝে ঘোর বিতর্ক চলছে—শুক্ত রাঁধো, ঘণ্ট রাঁধো, ও মাছে হবে না, ছোট্ট...দই আনতে দাও না...পায়েছ...

ওর কাকীমা বলছে, "আমি কিছু করতে পারব না, আনাতেও পারব না কিছু—ভাতে ভাত দিয়েছি, তাই দিয়ে ভাত বেড়ে দোব...তুই-ই তো ধরে দিয়ে আসবি ঠাঁইয়ে, তোরই নিন্দে হবে, আমার কি?"

"আমি ভাত দোব মেজমামাকে!"

"তুই তো মেজমামার সব কাজ করছিস আজ।"

—এত বড় সৌভাগ্যটা আয়োজনের সংক্ষিপ্ততায় নিশ্চয় সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে; একটু চুপচাপই গেল, তারপর দেখি নিশা সামনের বারান্দা দিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তেল মাখতে মাখতেই পাশের ঘর থেকে জিজ্ঞেস করলাম—"ভড়কে দিতে গেলি কেন? বেশ তো ছিল, সঙ্গে বসে খেত একটু; এত খাটাচ্ছিস।"

ভগ্নী উঠে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল, বললে, "ভড়কাবার পাত্তোর! কি মতলবে ঠমক্ দেখিয়ে উঠে গেল, আমি বুঝেছি। তুমি তাড়াতাড়ি নেয়ে নাও। নতুন টান হয়েছে তোমার ওপর, ওর কাণ্ড এখন অনেক দেখবে।"

—একটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম। স্নান সেরে মাথা আঁচড়াবার জন্যে ওপরে যাব, দেখি বারান্দা দিয়ে ফ্রক্ দোলাতে দোলাতে হন্ হন্ করে চলে আসছে নিশা। দুটি হাত দিয়ে একটা বড় রেকাবি ধরে আছে, তার ওপর তিনটি বাটি, একটিতে গোটাকতক আলুর সঙ্গে একটা মাথারি গোছের মাছের মুড়ো, একটাতে মনে হ'ল ডুমুরের ডালনা, একটাতে শুক্ত, রেকাবিতে খানকতক আলু আর পটল ভাজা। ওদের বাড়ীতে আপিসে যাওয়ার লোক রয়েছে, রান্না এক প্রস্ত সকালেই হয়ে যায়।

সামনেই পড়ে গেছি, একবার মুখ তুলে দেখলে, তারপর গম্ভীর ভাবে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ওপর থেকে নেমে এসে বললাম, "তা হলে আর জল-খাবারের হাঙ্গাম করিস নি, একেবারেই ভাতে বসি।"

ভগ্নী জিদ করলে একটু—"জলখাবার কি আর এমন? দুটো মিষ্টি—সন্দেশটা ভালবাস, নাম করে আনানো। চায়ের জল হয়েই গেছে···ততক্ষণ আমার ডালনাটাও হয়ে যাবে।"

আর জলখাবারের হাঙ্গাম করবই না ঠিক করলাম। পেটে একটু কিছু পড়লেই ঘুম আসবে, বিছানায় একবার পড়লে আর উঠতে পারা যাবে না। নিশাকেই বললাম, "যাও, ওপর থেকে তোমার দিদিকে ডেকে নিয়ে এসো, ঠাঁইটা করে দিক।"

নিশা ওর কাকীমার দিকে এগিয়ে গেল, মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দুবার মাথাটায় ঝোঁক দিয়ে দিয়ে যেন জোর করে কি বললে ফিস ফিস করে। ওর কাকীমা বললে, "ঐ শোন বলছে—হ্যাঁ মিষ্টি খাবে, চা খাবে।···দেখ, যদি ঠেলতে পার কথা। আমাদের তো আজ কোণঠাসা করেছে।"

বললাম, "নারে, একবার বিছানায় পড়লে আর উঠতে পারব না, খেয়েই নি একেবারে।"

নিজেই ডাক দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল; মিষ্টান্নে শিশুর অদম্য লোভ, কে জানে হয়তো ঐ গুটিকতক সন্দেশ রসগোল্লাকে কেন্দ্র করেই এই সমস্ত উৎসাহটা আবর্তিত হচ্ছে। হয়তো বঞ্চিতই করতে যাচ্ছি। অন্ততঃ ঐ ক'টিকে উপলক্ষ্য করে ঘনিষ্ঠতাটুকু তো এনে ফেলা যায়।

ভগ্নীকে বললাম, "তা হলে না হয় দিয়ে যেতেই বল্। নিশাই নিয়ে আসুক না মিষ্টিটা।"

নাইবার জন্যে তেল নিয়ে আসার সঙ্গে প্লেট সাজিয়ে সন্দেশ রসগোল্লা নিয়ে আসার যে সূক্ষ্ম প্রভেদটা আছে, শিশু মন দিয়েও সেটা নিশ্চয় বোঝে নিশা। এল না; অর্থাৎ নিজে নিয়ে এল না, তবে দিদিকে ওপর থেকে ডেকে নিয়ে এল, তার সঙ্গে যাওয়া আসাও করলে—খাবার দিয়ে যেতে, জল দিতে যেতে, চা দিয়ে যেতে; তারপর ওর কাকীমা এসে দাঁড়াতে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, "এবার এসো তো।"

শুধু আরও গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আবার ডাকতে ওর সাড়িতে মুখটা ঢেকে ফেললে। কোনমতেই এল না। ওর কাকীমা বললে, "খাবার দিকে ঝোঁক নেই।"

বললাম, "তা হলে আমিও খাব না, নিয়ে যা।"

ওর কাকীমা বললে, "ঐ শোন, কি বলছেন মেজমামা। যা।"

ঢাকা মুখটাই ওর মুখের দিকে তুললে; ও মুখটা একটু নামিয়ে আনতে ফিস ফিস করে কি বললেও। ভগ্নী একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললে, "সুবু হ্যাংলা বলবে···ওর সঙ্গেই আড়াআড়ি তো।"

আমি নিশাকেই বললাম, "সে তো স্কুলে, দেখতে আসছে নাকি? আর সে তো নিজেই হ্যাংলা আমি কি জানি না? এখন স্কুলে গেছে, তাই। তুমি এসো।"

এলই না। এর বেশী টানাও গেল না কাছে, ঐ নিজে যতটুকু পর্যন্ত এগোল।

তারপর দুটো মিষ্টি মুখে দিয়ে ওপরে গিয়ে শুয়েছি, ঘুমিয়েছি স্বপ্ন দেখেছি; নিশা ভুল ভাঙিয়ে প্রথম কথা কইসে, "মা নয় গো, আমি নিছ'।"

তারপর পুরোপুরি মা-ই হয়ে উঠল।

আসল কথা, যাত্রাপথে আমার দুর্ভোগের ইতিহাস—ভিড়, অনিদ্রা, গায়ের ব্যথা, ভিড়ের জন্যেই রাত্রে যে খাওয়া পর্যন্ত হয় নি—এ সমস্তই একটি মাকে জাগিয়ে তুলছিল, বেদনায়, সেবার ব্যাকুলতায়। সুপ্তিতে শেষ আঘাত দিলে আমার 'মা' বলে ডাকাটা।

ওর কাকীমা বলে—"মেজদা, ওপর থেকে নেমে এসে সে মুখের ভাব যদি দেখতে! একে তো গম্ভীরই, তার ওপর কি যেন একটা মস্তবড় ব্যাপার হয়েছে, চোখ দুটো বড় বড় করে, গলা নীচু করে বলছে—ওগো, সেজমামা

আমায় 'মা' বললে! ··হাত বুলুচ্ছিলাম তো, সেজমামা ঘুমুচ্ছিল, বললে—মা!···বললাম ভালই তো, হয়ে যা না মা, অমন ছেলে পাচ্ছিস।···বললে—আমি কি বলে ডাকব?··· বললাম —নাম ধরে ডাকবি। বেশ তো, আর কেউ তো ডাকতে পারে না, তুই একা ডাকবি; মেজদাও দুঃখু করে, বাড়ীতে নাম ধরে ডাকবার কেউ নেই আর; তুই হলি। সব চেয়ে মজার কথা, মনে করলাম বুঝি খুশী হয়েছে, কিন্তু কি মুখের চেহারা—যেন হঠাৎ কোথা থেকে রাজ্যির ভাবনা এসে জুটে গেছে! খাবার জন্তে দিদি এসে ডেকে নিয়ে গেলেন যে, নইলে দেখতে।"

সেদিন আর পেলাম না ওর দেখা। খেয়ে-দেয়ে আর অল্প কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আমায় বেরিয়ে যেতে হ'ল কলকাতায়, যখন ফিরলাম বেশ রাত হয়ে গেছে। শুনলাম সমস্ত দিন এক রকম এই বাড়ীতেই কাটিয়েছে। শীঘ্র আসার সম্ভাবনা নেই বলে বলে সবাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাইরে, একটু খেলুক সবার সঙ্গে, নিশা কিন্তু মন বসাতে পারে নি খেলায়, ঘুরে ঘুরে এসে আমার কথাই—কখন আসব? কি খাব? বড় মাছ আনিয়েছে কাকীমা? কালও কলকাতায় যাব নাকি?

বাস্তবঃ মাতৃত্বটা স্বীকার করেছে কিনা বোঝা যায় নি—সেজমামা বলেই উল্লেখ করে গেছে, তবে প্রশ্ন মন্তব্য যা হয়েছে সমস্ত দিন, তা থেকে যে যা বোঝে '—নিশা যেমন মার কথা শোনে—মা রাস্তায় বেরুতে মানা করে, যায় না ত নিশা; কলকাতাতেও যায় না—তা হলে সেজমামা কেন যাবে?—কলকাতায় কত গাড়ি, ঘোড়া, মোটরগাড়ি, টেরাম,—নিশা গেলেই ত নিশার মা কত ভাবে···

—মা বলে জাহির করে নি নিজেকে, তবে সমস্ত দিন মায়ের অন্ধ আশঙ্কা বুকে করে কাটিয়েছে অসহায় শিশু।

সকাল থেকেই আবার আরম্ভ হয়ে গেল, আরও ভাল ভাবেই। আগের রাত্রি-জাগরণের জের ছিলই, তার ওপর কলকাতায় সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি গেছে, উঠতে দেরি হওয়ারই কথা, তবুও বেলা আটটার সময় উঠলে ত কাজ চলে না, বেড়াতে আসা নয় ত!

একটু বকাবকিই করতে হ'ল।

ভগ্নী বললে—"উপায় ছিল তোমায় তোলবার? জ্বর হয়েছে বলে দোর আগলে দাঁড়িয়ে ছিল। ভয় হয় ত? তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেখলাম। ঐ একবারটি ঢুকতে দিয়েছিল ঘরে। তার পরে আর কাউকে ঘেঁষতে দিয়েছে নাকি যে ডাকবে? যতই বলি জ্বর হয় নি, অলক্ষুণে কথা বলতে নেই, ততই—'হয়েছে জ্বর, হয়েছে'—কেউ ডেক না।'···বুঝলে না কথাটা· ছেলের জ্বর না হলে কি ভাল করে মা হওয়া যায়? তুলবে কি লোকে, আগলে রেখেছে।"

আমায় সুস্থ শরীরে উঠে হেঁটে বেড়াতে দেখে হয় ত একটু নিরাশ হয়ে থাকবে, কিন্তু অবিলম্বেই কর্মব্যস্ততার মধ্যে সে ভাবটুকু চাপা পড়ে গেল—উপরতলা, নীচের তলা, রান্নাঘর, নাইবার ঘর, শোওয়ার ঘর, এক করে বেড়াতে লাগল নিশা। 'মা নয়—আমি নিছা'র পর থেকে মুখের আগলটাও গেছে খুলে—আজ অনেক কথা—ওদিকে মায়ের নির্দেশ—মুখ ধুয়ে নাও সেজমামা, এবার চা খেয়ে নাও—এদিকে ছেলের আবদার, ফরমাস, অবাধ্যতা, জেনে শুনে গড়িমসি—এইতেই সকালটুকু একটু নীরন্ধ্রভাবে পূর্ণ হয়ে রইল যে, আর কেউ কোন কথা বলবার না পেলে একটু সুযোগ, না পেলে বসার।

গল্প হ'ল না শুধু জলযোগের পর আমি যে সময়টুকু একটু লেখাপড়া নিয়ে রইলাম। গল্প হ'ল না, তবে মায়ের সতর্কতা আমার চারিদিক দিয়ে আরও নিবিড় ভাবে ঘিরে রইল। পাশের ঘরে ওর দিদিরা গল্প করছিল, আরও দু' একটি মেয়ে বোধ হয় এসেছে নিশার মাতৃত্বের অভিনয় দেখতে, নিশা সবগুলিকে নীচে চালান করলে—শুনছি, কখন গিয়ে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গলা ভারী করে আস্তে আস্তে বলছে—'তোমরা নীচে গিয়ে গল্প কর, সেজমামা পাছের পড়া করছে।'

সবাই নীচে রান্নাঘরের বারান্দায় জড়ো হতে মুক্ত হাসি-আলাপ-আলোচনায় গোলমালটা বেড়েই গেল। খানিকক্ষণ চললও, তার পর হঠাৎ এক সময় সেটা থেমে যেতে ঘুরে দেখি নিশা নেই; এটা নেড়ে, ওটা গুছিয়ে সে ঘরের ওদিকটায় ঘোরাঘুরি করছিল, কখন নেমে গেছে।···চাপা হাসির সঙ্গে আবার গোলমালটা একটু মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, এবার ঝগড়ার আকারে—নিশার গলা শোনা যাচ্ছে না, তবে ওরা বলছে—'হ্যাঁ, করব গল্প, করব গোলমাল···তোর ছেলে ত আমাদের কি?···পাস করে তোকে রাজা করবে, আমাদের কি?'

ডেকে নিলাম—'মা কোথায় গেলে গো? জানলাটা একটু বন্ধ করে দাও, রোদ আসছে।'

—একটা বিপদও ত, এ রকম ওপর থেকে নীচে, তার পর নীচে থেকে বাড়ীর বাইরে তাড়া করে বেড়ায় যদি সবাইকে। তা ভিন্ন ঝগড়ায় পাল্লা দিতে না পারলে কান্নাকাটিও আছে ত। শুনলাম যখন নাকি আরম্ভ করে, সে এক চেহারা, থামানো যায় না। এখন আবার ছেলে নিয়ে ব্যাপার ত।

জানলা বন্ধ করে দিলে বললাম—'আমার পিঠে একটু

হাত বুলিয়ে দাও ত মা। ওরা করুক গে গোলমাল…'

চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার পিঠে হাত দিলে, বললে—'পাছের পড়া হচ্ছে যে, আমার দাদারা পড়ে। কেউ চেঁচায় না।…আমি বাবাকে কাকাকে বলে দেব, দেখ না!'

বিপদই বলা হোক, কিম্বা অসুবিধাই বলা হোক, একটু করে বেড়েই যাচ্ছে।

রাত্রে যখন ফিরলাম, ভগ্নী বললে—'ও মেজদা, এ যে মুশকিলে পড়া গেল—ও নিজের ছেলে নিয়ে একেবারে ভেন্ন হবার মতলব করেছে!'

সব শুনলাম। প্রথম টের পাওয়া গেল সাবানের খোঁজ পড়তে। দেখা গেল আমি যে সাবানটি দু'দিন ব্যবহার করেছি—শুধু সাবানই নয়, যে ডিবে থেকে মাজন নিয়েছি, যে শিশি থেকে তেল দেওয়া হয়েছে, যে আরশি সামনে করে যে চিরুনিতে মাথা আঁচড়েছি, যে পানের ডিবেটি করে পান দেওয়া হয়েছিল—সবগুলি আমার ঘরের টেবিলে এসে জড়ো হয়েছে। একটিতেও আর কেউ হাত দিতে পারলে না। ক্রমে যে সোরাইটি থেকে জল দেওয়া হয়েছে, যে গেলাসে করে—দুটিই ওপরে উঠে এসে এক পাশে জায়গা করে নিলে। যে বুরুশটি দিয়ে জুতো ঝেড়ে বাইরে যাই সেটি পর্যন্ত।

ওর এক দিদি বিছানাটা খালি পেয়ে দুপুরবেলা শুয়েছিল—ঘুমুচ্ছিলই, তাকে উঠে যেতে হয়েছে মানে মানে।

ভগ্নী ভয় পেয়ে গেছে, হেঁসেল আলাদা করাবে নাকি?

আমি কিন্তু বেশ আছি। আলাদা হতে গৃহস্থের যে ক্ষতি করেছে, তার জন্য যৎকিঞ্চিৎ খেসারত দিয়ে দিতে ওদিকটা বিবেকের দিক দিয়ে ঠিক হয়ে গেল। একটার জায়গায় এক বাক্স সাবান, আধ শিশি তেলের জায়গায় পুরো একটা নূতন শিশি, একটা নিকেলের পানের ডিবে ত—তাতেও এমন কিছু বেশী লাগল না, তার পর ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেশ আছি। কোন কিছুর অভাব নেই, একটা কিছুর জন্য ডাক দিতে হয় না। প্রত্যেকটি জিনিস যথাস্থানে। সবার ওপর, মাকে আবার নূতন করে ফিরে পাওয়াই ত—এই বয়সে। মন্দ কি? চলুক না।

পৃথগন্ন হয় নি, তবে এ বাড়ীর হেঁসেলের ওপর পূর্ণ নির্ভর নয়; একটা বাড়ীর পঞ্চ ব্যঞ্জনের জায়গায় দুটো বাড়ীর দ্বাদশ ব্যঞ্জনে ওদিকটাও বেশ চলছে।…ছেলের আবদারে মা সঙ্গে বসে খায় আজকাল। দুপুরের বিশ্রামের সময় শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ঐ সময় কিছু গল্প, কিছু উপদেশ, কিছু নালিশ, কিছু সংসারের কথা। ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে মা পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে কপাট ভেজিয়ে দেয়।

দিব্যি আছি। ওদের একটু সমস্যা, কিন্তু তা বলে ত মায়ে-ব্যাটায় আলাদা হওয়া যায় না।

কিন্তু সমস্যা সে হঠাৎ ছেলেকে ঘেঁষেও দাঁড়িয়েছে, তার কি করা যায় এখন?

এবার ফিরতে হবে দু'তিন দিন পরে। সকাল থেকে সব কাজের মধ্যেই মনটা টন টন করে। অভ্যাস ছাড়বার জন্য, ছাড়াবার জন্যও একটু গা-ঝাড়া দেবার চেষ্টা করছি; কিন্তু যতই চেষ্টা করছি, নিশা ততই যেন আরও জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে। দুপুরের বিশ্রামের সময় সুবিধা পেলেই একটু আধটু ইঙ্গিতও রেখে যাচ্ছি যে বিচ্ছেদের সময়টা এগিয়ে আসছে; অবশ্য খুব সন্তর্পণে।

আজ খাওয়ার পরই নিশা বাড়ী চলে গিয়েছিল—যা যায় না। ভালই হ'ল বলে নিদ্রার আয়োজন করছি, এসে উপস্থিত হ'ল।

বললাম—'আবার আসতে গেলে কেন মা? একটু ঘুমিয়ে নিতে। তাই ত করবে এবার থেকে, আমি চলে গেলে।'

মুখটা হঠাৎ একটু গম্ভীর আজ। শিয়রে বসে কপালে হাত বুলুতে বুলুতে বললে—'কাল ষষ্ঠী পুজো।'

ঘুরে চাইতে হ'ল, জিজ্ঞেস করলাম—'উপোস করবি নাকি রে তুই?'

নীচের ঠোঁট দিয়ে ওপরের ঠোঁটটা ঠেলে তুলে গম্ভীর ভাবে মাথা দোলালে—অর্থাৎ হাাঁ, করতে হবে; যে-মা তাকে জিজ্ঞেস করবার কথা নাকি একটা!

বললাম—'না, উপোস-টুপোস করবে না; ছি? আমি এমনিই ভাল থাকব।'

মায়েরা কি সে কথা কানে তোলে? যেন শোনেই নি এই ভাবে ও প্রসঙ্গের দিকে না গিয়ে ভারী গলাটা একটু দুলিয়ে বললে—'বাজার করতে হবে ষষ্ঠী পুজোর।'

—সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রকের ভেতর থেকে একটি খাতা-ছেঁড়া কাগজ বের করলে। তালিকা না হলে ত বড়গোছের বাজার করা সম্পূর্ণ হয় না। বাড়িয়ে ধরে চিন্তা-শিথিল কণ্ঠে বললে—'পড়ো; আজই আনতে হবে। সময় কৈ আর?'

মোটা মোটা অক্ষরে লেখা; নিশ্চয় সুবু লিখে দিয়েছে; কেননা তালিকার সব শেষে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান;

যদিও খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি দিলে এটাও বেশ বোঝা যায় যে লিখিয়েছে বহু ব্রতচারিণী কোন মাকেই, অর্থাৎ নিশাই। পড়লাম—

গরোদ শাবি	—১
সোনার পাত মোরা নতুন শাঁকা	—২
বটের ডাল	—১
পান	—২৫
সুপুরি	—৫ গনডা
কড়ি	—৫ গনডা
ভাঁর	—৫
খই	—১ সের
খুড়ি	—২১
কলা	—২১
খিরের নাড়ু	—২১
ফুটবল	—১

—এখন চক্ষু চড়ক গাছ! এ মাকে পুষি কি করে!

তেলুগু কবি ত্যাগরাজ

শ্রীস্নেহশোভনা রক্ষিত

উত্তর-ভারতের মরমী কবিদের সম্বন্ধে আজকাল আমরা অনেকটা জানতে পেরেছি। তাঁদের কারও কারও জীবন-কথা কতকটা রহস্যাবৃত থেকে গেলেও তাঁদের রচনা সম্বন্ধে অনেকখানি জানা গেছে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে আমরা এখনও বলতে গেলে প্রায় অন্ধকারেই আছি। তামিল কবি কুরাল এবং নন্দনার সম্বন্ধে তবুও কিছু গবেষণা বাংলা ভাষায় হয়েছে, কিন্তু তেলুগু কবিদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই হয় নি বলা চলে, যেটুকুও বা হয়েছে তা অতি সামান্য। ভাষার বৈষম্যই এ বিষয়ে অনেকটা প্রতিবন্ধক বলে মনে হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে বোধ হয় উৎসাহের অভাবও কিছু আছে। প্রাচীন তেলুগু সাহিত্য বহু রত্ন-সম্ভারে সমৃদ্ধ। বাংলাভাষায় সেই সাহিত্য থেকে কিছু রত্ন উদ্ধার করতে পারলে এবং কবিদের জীবন সম্বন্ধে কিছু আলোকসম্পাত করলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে।

তেলুগু কবি ত্যাগরাজ খুব প্রাচীন কবি না হলেও, সম্প্রতি তাঁর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান নানাস্থানে হয়ে গেল এবং এখনও হচ্ছে, তাই এখানে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়ত অসমীচীন হবে না। ত্যাগরাজ যে কেবল অন্ধ্রদেশেরই প্রিয় কবি তা নয়, তাঁর রচিত গানগুলি তেলুগু ভাষায় রচিত হলেও আজ পর্য্যন্ত তামিল ও কন্নাড় দেশে সর্ব্বত্র গীত হয়ে থাকে। এই গানগুলি বিশুদ্ধ কর্ণাটী সুরে গাওয়া হয়; সঙ্গীতের এই বিশেষ ধরণ শিক্ষা করার জন্য অন্ধ্র-গায়কেরা আজও তামিলনাদের তাঞ্জোর জেলা অথবা কর্ণাটী সঙ্গীতের উৎসস্থল মহীশূরে গিয়ে এই সঙ্গীত শিক্ষা করে থাকেন। তবে কবি ত্যাগরাজের অনেক গান মুখে মুখে লোকসঙ্গীতের মত জনপ্রিয় হয়ে গেছে, সেগুলি সর্ব্বত্রই সাধারণ লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। সে সব গানে বিশুদ্ধ কর্ণাটী সুর রক্ষা করা না হলেও লোকসঙ্গীতের সহজ সরল সুরে গীত সে সঙ্গীত খুবই মধুর শোনায়।

ত্যাগরাজের জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। তামিলনাদের তাঞ্জোর জেলায় এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। এই মরমী কবির তাঞ্জোর জেলায় জন্ম হওয়াটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে হয়। তাঞ্জোর জেলাতেই তামিল ও তেলুগু সংস্কৃতির মিলন হয়েছে। এই উভয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে সঙ্গীত ও কবিতার উদ্ভব হয়েছে, নানারকম ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তা সারা দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। দাক্ষিণাত্যের বিজয়-নগর রাজ্যটি যখন তেলুগু অধিনায়কদের অধিকারে আসে, সেই সময় অন্য অনেক তেলুগু-পরিবারের সঙ্গে ত্যাগরাজের পূর্ব্বপুরুষও তাঞ্জোর জেলায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। মাদুরা এবং তাঞ্জোরের অধিনায়কদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তেলুগু শিল্পকলা ও সঙ্গীত তামিলদেশেও খুব প্রভাব বিস্তার করে। পরে যখন তেলুগু-নায়কদের পতন হয় ও মরাঠা-নায়কদের হাতে ক্ষমতা আসে, তখন মরাঠা-নায়কেরা তেলুগু শিল্পকলা ইত্যাদি রক্ষা ও তার প্রচার করতে খুবই উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং কৃতকার্য্যও হয়েছেন। এইভাবে তেলুগু সংস্কৃতির বিস্তার দাক্ষিণাত্যে হয়েছে।

ত্যাগরাজের পিতামহের নাম গিরিরাজ কবি। তিনি তাঞ্জোরের মরাঠা-নায়ক দ্বিতীয় শাহজীর সময়ে তাঞ্জোরে

বাস করতেন। গিরিরাজ কবির পাঁচটি পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ রামব্রহ্মম্ হচ্ছেন ত্যাগরাজের পিতা। ত্যাগরাজের মায়ের নাম শান্তা। ত্যাগরাজ প্রথমে বিবাহ করেন কমলাম্বা নামে একটি বালিকাকে। কিন্তু ত্যাগরাজের ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় কমলাম্বার মৃত্যু হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তানাদি হয় নি। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর ত্যাগরাজ ধর্ম্মাম্বা নামে আর একটি তরুণীকে বিবাহ করেন। এই পত্নীর গর্ভে সীতালক্ষ্মী নামে তাঁদের একমাত্র কন্যার জন্ম হয়। এই সীতালক্ষ্মীরও একমাত্র পুত্র অল্পবয়সে মারা যান। ত্যাগরাজের বংশ এইখানেই শেষ হয়। তাঁর ভাইয়ের বংশধরেরা এখনও বর্ত্তমান আছেন।

বাল্যকাল থেকেই ত্যাগরাজের সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি দেখতে পাওয়া যায়। শৈশবে তাঁর মা শান্তাদেবী কবি পুরন্দরদাসের অনেক প্রাচীন গাথা গেয়ে তাঁকে শোনাতেন। তাঁর নিজের স্বাভাবিক সুস্বর ও সঙ্গীতে অনুরাগ থাকাতে তখন থেকেই তিনি সেই গানগুলি মায়ের কাছে শিখে-ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর জননীই তাঁর প্রথম ও প্রধান উৎসাহদাত্রী।

পাঠশালায় যাবার পথে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় ছিল। বেঙ্কটরমনাপ্পা নামে একজন সঙ্গীতশিক্ষক এই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করতেন। বালক ত্যাগরাজ পাঠশালায় যাবার পথে মাঝে মাঝে এই বিদ্যালয়ে গিয়ে বসতেন। সঙ্গীত-শিক্ষক তাই দেখে ত্যাগরাজের পিতার অনুমতিক্রমে তাঁকেও সঙ্গীতশিক্ষা দিতে লাগলেন। কিন্তু বেশী দিন এভাবে চলল না। অল্পবয়সেই ত্যাগরাজ পিতামাতাকে হারিয়ে অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে গিয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে অতিশয় খারাপ ব্যবহার করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর বয়স পনেরর বেশী হবে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুর্ব্ব্যবহারে এবং দারিদ্র্যের পীড়নে তিনি যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কিন্তু এই দুঃখই তাঁর জীবনে ধ্রুবতারা রূপে দেখা দিল। বিদ্যালয়ে পড়বার সময় তিনি বেদ ও বেদাঙ্গ পাঠ করেছিলেন, কিন্তু সে সবের চেয়ে রামায়ণ পড়তেই তিনি ভালবাসতেন ও রামায়ণের রাম-চরিত্রকেই তিনি ইষ্টদেবতা মনে করে পূজা করতেন। যখনই মনে কোন দুঃখ পেতেন, তখনই তিনি ইষ্টদেবতার কাছে সে দুঃখ নিবেদন করতেন। এখনও তিনি তাঁর দুঃখ দেবতাকে জানালেন। প্রথম প্রথম তিনি সাধারণ ভাষাতেই তাঁর দেবতার কাছে তাঁর বেদনা জানাতেন, কখনও-বা দেবতার উপর অভিমান করতেন, কখনও-বা অতি দীনভাবে তাঁর প্রার্থনা জানাতেন। ক্রমশঃ এই প্রার্থনা তিনি সঙ্গীতে গেয়ে শোনাতে লাগলেন। বাল্মীকি যেমন হঠাৎ এক দিন ছন্দে নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন, ত্যাগরাজও দেখলেন তাঁর দুঃখ-বেদনা ক্রমশঃ সঙ্গীতের রূপ ধারণ করেছে। দেবী সরস্বতী তাঁকে সঙ্গীত-প্রতিভা ত আগেই দিয়েছিলেন, এবার তাঁকে সৃজনীশক্তি দিলেন। এই উভয় প্রতিভার সমন্বয়ে তাঁর অন্তর থেকে অপূর্ব্ব কবিতার সৃষ্টি হ'ল। ভগবান যেন ভক্তের আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম ভক্তি এবং নির্ভরতা বুঝতে পেরে তাঁর ক্ষতস্থানে স্নিগ্ধপ্রলেপ লাগিয়ে দিলেন। ত্যাগরাজ ক্রমশঃ অনুভব করলেন আর ত কৈ তাঁর কোন দুঃখ নেই। তিনি যে ইষ্টদেবতার কাছে এতদিন ধরে কত অভিযোগ, অনুযোগ জানিয়েছেন, আর ত সে সব তাঁকে ব্যথিত করতে পারছে না। তাঁর মনে হ'ল এসব তুচ্ছ ব্যাপারে যখন আর কোনই কষ্ট হচ্ছে না, তখন কেন এ সব ব্যথা তাঁকে জানাই? তার চেয়ে তাঁকেই পেতে চেষ্টা করি না কেন? যাঁর কাছে শুধু দুঃখ নিবেদন করেই মন শান্তি পেয়েছে, তখন তাঁকেই আমি চাইব; এই সঙ্কল্প করে তিনি তখন থেকে তাঁর রচনার ধারা বদলে ফেললেন। তিনি রামকে এখন থেকে "নাদসুধারস" রূপে দেখতে সুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ শুষ্ক জীবনকে সরস করবার জন্য তাঁর জীবনদেবতাকে "গীতসুধারস" রূপে আহ্বান করেছেন, এই মরমী কবিও তাঁর দেবতাকে অমৃতবর্ষী সঙ্গীতরূপে পূজা আরম্ভ করলেন।

তাঁর রচিত প্রতিটি পদে তিনি দেবতার চরণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিয়েছেন। কখনও তাঁর উপরে অভিমান করছেন, কখনও তাঁকে আনন্দময় বলছেন, কখনও-বা তাঁকে প্রিয় সম্বোধন করছেন। এক জায়গায় দেবতাকে উদ্দেশ করে বলছেন:

"পরাধু-চেলিনা নীকু এমি ফলমু গলিগেরা
পরাৎপরা?
সুর-আবন! সুর আপ্ত! জরাগন্ধন নার এড়া
মুদান-নীহু পাদারবিন্দমুলান্নু বট্টি ব্রোবাগা লেদা?
নিদানরূপা। দারিদাপলেহ্ উদারা?
শ্রীত্যাগরাজানুতা!"

ওগো আমার চিরনবীন, মহতো মহীয়ান, দেবতা, ওগো দেবদুর্লভ, কি জন্য তুমি আমাকে দূরে রেখেছ? আমাকে অবহেলা করে তুমি কি আনন্দ পাচ্ছ? আমি যে নিত্য তোমার চরণ-কমল আকাঙ্ক্ষা করছি, তোমাকেই আমার ধ্রুবতারা করেছি। তুমি দুই হাত বাড়িয়ে আমায় তোমার কাছে টেনে নাও, তোমার সেবক ত্যাগরাজ এই বাঞ্ছা করছে।

আর একটি গানে কবি তাঁর দেবতার সেবক হয়ে থাকার প্রার্থনা করছেন:

"বান্টুরীতি কোলুব-ইয়া বৈয়া রাম!
তুন্টা বিন্টি বাণি মোদল-আই না
মদাদুলা গোট্টি নেলাগুলা-জেয়ু নিজ
রোমাঞ্চম্-অনু-ঘন কঞ্চু কমু

রামভক্ত ড়ানু মুদ্রা বিরুদু
রামনামমু-অনু বরখড়্গমু
ইরি রাজিল্লুদু আইরা ত্যাগরাজুনিকে।"

হে আমার প্রাণারাম, আমায় তোমার চরণে তোমার সেবক করে রাখ। আমি আমার সকল বাসনা ও অহঙ্কার চূর্ণ করে তোমার নামের বর্ম ও তরবারি ধারণ করে তোমারি সেবা করব, তোমার দাস ত্যাগরাজকে দূরে সরিয়ে দিও না।

কোথাও বা তিনি অভিমান করে দেবতাকে বলছেন :

"তনয়ুনি ব্রোবা জননী বৎ সাচ্চ লো
তল্লিবদ্দা বালুড় পোনো ?
ইনা কুলোত্তমা ! ঈ রহস্যমুলন এরিগিম্পুমু
মোমুনু কানিলম্পিমু,
বৎসমুবেন্টা ধেনুবু ওচ্চ নো বারিদামুনু
কানি পৈরলু ওচ্চ নো
মচ্চেকান্টিকৈ বিটুড়ু বেড়ালুনো, মাহিনি
ত্যাগরাজ বিনুত ! রাম্পু তেলপু।

প্রভু আমার, তোমার শ্রীমুখ আমার কাছ থেকে ঢেকে রেখ না। শিশু যখন কাঁদে, মা তখন তার কান্না থামাতে শিশুর কাছেই ছুটে আসেন, শিশু মার কাছে ত যায় না। বৎস মাকে ডাকলেই গাভী এসে তার অঙ্গ লেহন করে। শস্যকে পরিপুষ্ট করতে মেঘ জলধারা হয়ে উপর থেকে নেমে আসে, শস্যকে মেঘের কাছে যেতে হয় না। প্রেমিক তাঁর প্রেমিকাকে পাবার জন্য সকল বাধা লঙ্ঘন করে, প্রেমিকা ত নিজে প্রেমিকের কাছে এগিয়ে আসে না। তবে তোমার দীনভক্ত ত্যাগরাজ যে তোমায় এত ডাকছে, তার সম্মুখে কেন তুমি প্রকাশিত হচ্ছ না।

এই রকম তাঁর বহু কবিতা আছে এবং এগুলি অপূর্ব্ব সুরে মণ্ডিত, মহাকবি বাল্মীকির ভাষায় বলা চলে "গেয়েন সমলঙ্কৃতম্"। এই গানগুলির মধ্যে মানুষের মনে ভগবানের জন্য চিরন্তন ব্যাকুলতা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে যত মরমী কবি ভগবানের পায়ে তাঁদের শ্রদ্ধা অর্ঘ্য নিবেদন করে গেছেন সেই কবিদের মনের সাড়া ত্যাগরাজের কবিতার মধ্যেও পাওয়া যায়। এজন্য তাঁর ভাবধারার সঙ্গে কবীর, নানক, মীরাবাঈ প্রভৃতির ভাবধারার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

পরিণত বয়সে, পৌষমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে, অব্দ-পঞ্জিকার "পরাভব" নামক বৎসরে ত্যাগরাজ নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন। অব্দপঞ্জিকা অনুসারে ষাট বৎসরে একটি বর্ষচক্র ধরা হয় ও ষাটটি বৎসরের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। এই চক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে প্রত্যেকটি বৎসর ষাট বৎসর পর পর ঘুরে আসে। সেই রকম যে বৎসর কবি ত্যাগরাজের তিরোভাব হয় সে বৎসরটির নাম "পরাভব"। এই পুষ্যা-নক্ষত্রের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে সমস্ত দক্ষিণ-ভারত জুড়ে ত্যাগরাজের পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে সঙ্গীত সম্মেলন, তাঁর রচিত সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা-সভা ইত্যাদি হয়। এই সম্মেলনে উত্তর-ভারতের সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞরাও যোগ দেন। কিন্তু সঙ্গীত ছাড়াও সাহিত্য হিসাবেও যে এগুলি উজ্জ্বল রত্ন এবং বাংলা-ভাষায় এগুলির উপযুক্ত অনুবাদ হলে যে বাংলা-সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হবে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আকাশ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখনো বিস্ময় নিয়ে চেয়ে দেখি নক্ষত্র, আকাশ,
আশ্চর্য্য আলোর কারু, ভরে নিই মনের উত্তাপ,
শরীরে শিরায় শুনি পুনর্ব্বার রক্তের সংলাপ,
সত্তার গভীরে যেন নাড়া দেয় নতুন আশ্বাস।
এত দিন রক্তে ছিল বারুদের নিস্তেজ আঘ্রাণ—
সমস্ত ঐতিহ্যহত দেহ ছিল ক'খানি কঙ্কাল,
নির্জ্জীব পোকাকে ঘিরে থাকে যেন মাকড়সা-জাল ;
ভাবি নি ত কোনদিন শূন্য মাঠে ফলবে যে ধান।
তবুও আসবে কাছে হৃদয়ের ছিল না প্রত্যাশা।
দেখেছি আশঙ্কা থেকে দিন গেলে সন্ধ্যা আসে রোজ
কালিতে মলিন হয় দুধ-সাদা খাতার কাগজ ;—
আবার উজ্জ্বল চাঁদ, ছিঁড়ে যায় প্রান্তরে কুয়াশা।
কখনও সমস্ত ফেলে চেয়ে থাকি নিঃসীম আকাশ,
বজ্রের বিকাশ দেখি কখনও বা জ্যোতিষ্ক-আভাস।

উতাকামণ্ডে

শ্রীমাণিকলাল মুখোপাধ্যায়

যখন শুনলাম—সেণ্ট্রাল বয়লার্স বোর্ডের মিটিং হচ্ছে এবার সুদূর দক্ষিণ ভারতের উতাকামণ্ডে—তখন বড়ই আনন্দ হ'ল।

চিরসুন্দর কুন্নুর
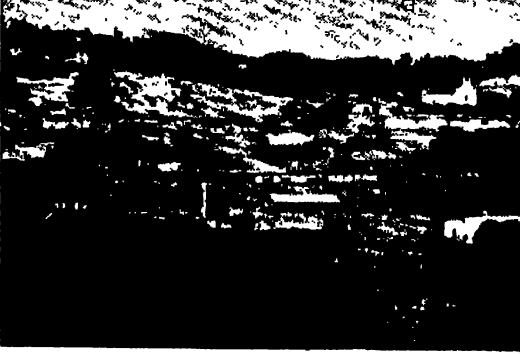
১১ই ফেব্রুয়ারী আমরা মাদ্রাজ মেলে চাপলাম। মেল ছাড়ল বিকাল ৪টা ৪০ মিনিটের সময়। গাড়ীতে যে কয়েকজন বাঙালীর মুখ দেখলাম তারা সকলেই কটকের আগেই নেমে গেলেন। আমাদের কামরায় রইলাম কয়েকজন মাত্র মাদ্রাজী, একজন এংলো-ইণ্ডিয়ান এবং একজন গুজরাটি ভদ্রলোক। গাড়ীতে আমাদের দুই রাত্রি কাটাতে হবে—কাজেই সকলের সঙ্গে আলাপ করে নিলাম।

উটী হ্রদ—এখান হইতে জল সরবরাহ করা হয়

কলকাতা থেকে সেটুপলিয়াম হ'ল ১৩৫৭ মাইল এবং থার্ড ক্লাসের মেল ট্রেন ভাড়া তেতাল্লিশ টাকার কাছাকাছি।

১২ই ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা এলাম ওয়ালটেয়ারে। এখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিটকাল ট্রেন থামে। এখানে আমরা স্নান আহার সেরে নিলাম। ষ্টেশন থেকে ওয়ালটেয়ার শহরটির কিছুই দেখা যায় না। ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘাটের পাহাড়গুলি আমাদের বাম দিকে ছিল।

বোটানিক্যাল গার্ডেন

ওয়ালটেয়ারের পর পাহাড়গুলো দৃশ্যমান হ'ল আমাদের ডান দিকে। এগুলি পশ্চিমঘাটের পাহাড় মনে হ'ল।

প্রত্যেক ষ্টেশনেই আমরা ভাল কাফি, কমলালেবু, কলা, কাজুকলাম, ডাব, নারিকেল, সরবৎ বিক্রী হতে দেখলাম। ভাল মর্ত্তমান কলা ছ'পয়সায় যা পেলাম তার দাম কলকাতায় চারি আনা হবে।

দিনের বেলায় ট্রেনে ভিখারীর বেজায় উপদ্রব। মনে

উতাকামণ্ডের একটি দৃশ্য

হ'ল যেন ব্যাণ্ডেল লোকালে হাওড়া চলেছি—এমনটা ও লাইনে হামেশাই নজরে পড়ে।

যখন আমরা গোদাবরীতে পৌছলাম, সন্ধ্যা তখন আগত প্রায়। গোদাবরী ছোট ষ্টেশন। গোদাবরীর পুলের উপর

দিয়ে যখন মেল চলছিল তখন নদীর শীকরসিক্ত হাওয়া যেন শরীর জুড়িয়ে দিলে। গোদাবরী বেশ প্রশস্ত নদী—স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ বালুচর—নদীতে নৌকা চলছে—ছোট ছোট ছেলেরা হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে পয়সা কুড়োবার জন্যে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে। বেজওয়াদায় খাওয়া-দাওয়া সেরে

ঘোড়দৌড়ের মাঠ

নিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি চারদিকে জল থৈ থৈ করছে—মাদ্রাজী ভদ্রলোক বললেন এ হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের উপচে পড়া জল আর মাদ্রাজ পৌঁছতে দেরি নেই। হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ কফি খেয়ে নিলাম। সকাল প্রায় সাড়ে সাতটার সময় মাদ্রাজ পৌঁছানো গেল। মাদ্রাজ ষ্টেশন অনেকটা আমাদের শিয়ালদহ ষ্টেশনের মত।

উটি বোট ক্লাব

ষ্টেশনে নামতেই দেখি মাদ্রাজের সুযোগ্য বয়লার পরিদর্শক শ্রী এস. এন. মহালিঙ্গম এসেছেন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ভদ্রলোকটি অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির।

হাত মুখ ধুয়ে স্নান সেরে আমরা কফি ও জলখাবার খেয়ে নিলাম। জলখাবার বলতে এখানে ইডলী, ধোসা, পুরী, পটেটো (তরকারি) এই সকল বুঝতে হবে। এখানকার হোটেলে ভাত (সাদম্), ডাল অর্থাৎ সম্বরম্ টক অর্থাৎ রসম্—আমিষ নিরামিষ দুই-ই আছে। সারাটা দিন বিশ্রাম করে আমরা সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় কোচিন এক্সপ্রেসে উত্তাকামণ্ড যাত্রা করলাম। মাদ্রাজ থেকে শ্রীমহালিঙ্গম্ ও উত্তর প্রদেশের প্রধান বয়লার পরিদর্শক শ্রী আর. পি. সিং আমাদের সহযাত্রী হলেন। দেখলাম মাদ্রাজে পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে পর্যান্ত অনেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করেন। ১৪ই ভোরবেলায় আমরা কয়ম্বটোর পৌঁছলাম। ছোট ষ্টেশন, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাওয়াদাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা মেটুপলিয়াম পৌঁছলাম। ট্রেন থেকে নেমেই দেখি নীলগিরি পর্ব্বত মাথা উঁচু করে সামনে দাঁড়িয়ে যেন আমাদের স্বাগত করছে।

এবার আমাদের পর্ব্বতের পাদদেশ থেকে উর্দ্ধে উঠতে হবে। উপরে উঠবার দুইটি রাস্তা আছে। একটি রেলে

ট্রেন হইতে উত্তাকামণ্ডের দৃশ্য

একানব্বই মাইল আর একটি হচ্ছে মোটরে বত্রিশ মাইল। ঘুরে ঘুরে যেতে হয়।

মোটর বাসের ভাড়া হ'ল তিন টাকা দুই আনা আর ট্রেনের দুই টাকা চৌদ্দ আনা। আমরা কয়েকজন একখানি স্পেশ্যাল মোটর বাস ঠিক করলাম। ধীরে ধীরে মোটরখানি নীলবর্ণ নীলগিরির গা বেয়ে উঠতে লাগল। প্রাকৃতিক দৃশ্য এতই মনোরম যে এইবার আমরা যেন স্বপ্নরাজ্যে এসে উপনীত হয়েছি। মোটরখানি আড়াই হাজার ফুট উঁচু স্থান পর্য্যন্ত চলল সুপারিগাছ ও বেউড় বাঁশের নিবিড়তার মধ্য দিয়ে—কখনো দেখছি যে পথ দিয়ে এলাম সেটা নীচে দেখা যাচ্ছে। রাস্তা একেবেঁকে সর্পিল গতিতে চলেছে—স্থানে স্থানে বড়ই সঙ্কীর্ণ। মাঝে মাঝে মনে হয় নীলগিরি যেন পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে কোথাও ছোট ছোট ক্ষেত যেন কার্পেটের উপর বোনার কাজের মত মনে হচ্ছে। ড্রাইভার গাড়ী চালাচ্ছে সুকৌশলে।

তিন হাজার ফুটের উপরে রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম। স্থানে স্থানে রাস্তা নয় ফুটের বেশী চওড়া নয়। কোথাও কোথাও অবশ্য বারো ফুট পর্য্যন্ত। একটি একটি করে বারোটি বাঁক পার হলাম। পাঁচ হাজার ফুট উঠে আসার পর কতকগুলি চা ও কফিক্ষেত দেখলাম। নীচে গভীর জঙ্গল। কোথাও ক্ষীণকায়া ঝরণা ছুটে চলেছে। সেটুপলিয়াম

পাইকারা নদী—উটী হইতে বারো মাইল

থেকে আমাদের মোটর ছেড়েছে সকাল নয়টার সময়। বেলা যখন প্রায় এগারোটা আমরা এসে পৌঁছলাম ওয়েলিংটনে। ওয়েলিংটন একটি ছোট্ট সুন্দর শহর। এখানে অনেকগুলি কাঠের বাড়ী ও দোকানপাট আছে। সেদিন ছিল রবিবার, গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি বড়ই সুমধুর লাগছিল। চারিধারে ইউক্যালিপটাসের গাছ—তার গন্ধে উপত্যকাটি ভরপুর হয়ে উঠেছে।

উতাকামণ্ডের একটি দৃশ্য—দূরে ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও ষ্টেশন

ওয়েলিংটনের মিলিটারি ব্যারাকগুলি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। এটি হচ্ছে ভারতীয় সেনাদের স্বাস্থ্যনিবাস। কোটাগিরিতেও স্বাস্থ্যনিবাস আছে। আমাদের বাসখানি এখানে অনেকক্ষণ থেমে ছুটে চলল উতাকামণ্ডের দিকে।

ক্রমশঃ উপরে উঠছি আমরা। চারিদিকে কেবল পাহাড় আর ইউক্যালিপটাস গাছের বাহার। পথে দু'চার জন যাত্রী হাত দেখালে, গাড়ী কিন্তু থামল না। গোনা-গুনতি লোক ছাড়া অধিক লোক নেবার আইন এখানে অমান্য করা হয় না দেখলাম। সকলেই বসে আছি। কাউকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়া হয় না। কুন্নুর শহরটিও দেখতে বেশ

কুটীরপার্শ্বে টোডা-পরিবার

লাগল। এখানে কুকুরের গবেষণাগার আছে এবং কুকুরের প্রদর্শনীও হয়ে থাকে প্রতি বৎসর।

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় আমাদের বাসটি থামল। একটি টাওয়ার ক্লকের কাছে। নিকটেই যাত্রীদের জন্য একটি ছাউনী রয়েছে। অদূরে রেলষ্টেশন। যদিও মধ্যাহ্ন হয়েছে তথাপি গরম কোট গায়ে রাখতে হ'ল—এত ঠাণ্ডা।

উতাকামণ্ড শহরটি প্রথম দৃষ্টিতেই ভাল লাগল। আমরা যে যার হোটেলে চলে গেলাম।

রেলষ্টেশন—পার্শ্বে "হোটেল বিজয়াবিলাস"

আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে গরম জলে স্নান সেরে নিলাম। তার পর হোটেলওয়ালাকে নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা করতে বললাম। মদ্রদেশের সনাতন 'আহম্'

'সম্বরম্', 'রসম্' ত দিলেই তা ছাড়া তরকারি, পাঁপড় ভাজা, ও সর্ব্বশেষে ঘোল (তামিল ভাষায় 'মোড়') পরিবেশিত হ'ল। তরকারি কিছুই মুখে তোলা গেল না। ভাতের সঙ্গে ডাল ঘিও দিয়েছিল। খরচ পড়ল দশ আনা মাত্র। খেয়েদেয়ে কাঠের দোতলার বারান্দায় বসলাম। সামনেই রেলষ্টেশন আর চারিধারে সেই একই দৃশ্য—পাহাড় আর ইউক্যালিপটাসের গাছ।
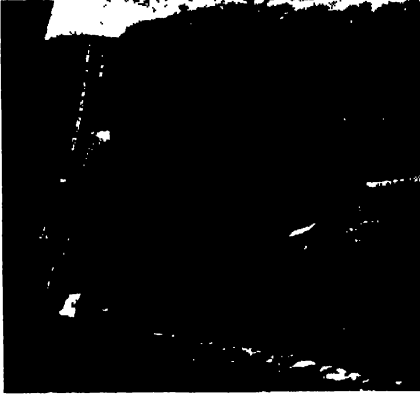
পাইকারা হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট

বেলা তিনটের সময় শৈলেন ভায়ার সঙ্গে বেড়াতে চললাম। শ্রীশটোম্‌কারও আমাদের সঙ্গী হলেন। প্রকাণ্ড পাঁচঢালা রাস্তা—তকতকে ঝকঝকে। মিউনিসিপ্যাল মার্কেট—হরেক রকম জিনিষের দোকানপাট চোখে পড়ল। ঘোড়দৌড়ের মাঠ—রাস্তার ধারেই তার একপাশে পাহাড় আর উঁচু রাস্তা। কয়েকটি সিনেমাগৃহ আছে। হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট বিস্তর। সর্ব্বত্রই ভাল কফি পাওয়া যায়। হোটেল ডি লুক্সের কফি খুব ভাল।

বোটানিক্যাল গার্ডেন

যে কয়দিন এখানে ছিলাম রোজই রাত্রে খুবই ঠাণ্ডা পড়ত—লেপ ও কম্বল ব্যবহার করতে হ'ত। রোদ্র না উঠলে বাইরে বেরুনো ছিল কষ্টকর। ভোরে ঘুম ভাঙবামাত্রই ঘরের কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যেত পাহাড়, গাছপালা আর পেঁজা তুলার মত জমাট-বাঁধা বরফ।

সকাল আটটা থেকে আমাদের সেন্ট্রাল বয়লার বোর্ডের কাজ সুরু হ'ত—বেলা একটার সময় খাওয়া-দাওয়া করার জন্যে যে যার হোটেলে চলে যেতাম। আবার বেলা দুটো থেকে বোর্ডের কাজ সুরু হ'ত। ফেরবার পথে মাইলখানেক বেড়ান হ'ত। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাড়ী—কোথায়ও উপর দিয়ে রাস্তা রয়েছে। আমরা চলেছি নীচে—সেখানে গরু, ছাগল চরে বেড়াচ্ছে—এমনি সব দৃশ্য নজরে পড়ত।

বোর্ডের কাজ চলত সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত। তার পর আমরা নিজ নিজ হোটেলে ফিরতাম। সন্ধ্যার পর উতাকামণ্ডের ঘরে ঘরে যখন বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠত তখন পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত দীপাবলী দেখে মনে হ'ত কে যেন দীপালীর আলোকসজ্জায় পাহাড়গুলিকে সাজিয়ে দিয়েছে।

সেণ্ট্রাল বয়লার বোর্ডের সাব-কমিটির সদস্যগণ ও কর্ম্মিবৃন্দ

রাত্রি দশটার মধ্যে উতাকামণ্ড নিঝুম হয়ে যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের বোর্ডের কাজ যখন শেষ হ'ল তখন বেড়াবার প্রোগ্রাম ঠিক হ'ল। ২১শে বিকালে আমরা গেলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনে। হোটেল সিসিল থেকে প্রায় দুই মাইল—উঁচুনীচু রাস্তা হেঁটে যেতে হ'ল। বাগানে নানা জাতীয় গাছপালা ও ফুল। দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল। পথগুলি বেশ সুন্দর, পার্ক আছে, বসবার বেঞ্চিও রয়েছে। একটি ছোট হ্রদের মত আছে। গাছগাছড়ায় তৈরি অশোক-স্তম্ভ ও নব ভারতের মানচিত্র দেখলাম। এখানে সৌরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কতকগুলি ফটো তুলেন।

এক দিন আমরা উতাকামণ্ড হ্রদ দেখতে গেলাম। সে দিন সরকারী মৎস্যচাষের কেন্দ্রটিও দেখা হ'ল। এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা আছে। শহরটি নেহাত

ছোট নয়—দৈর্ঘ্যে পঁয়ত্রিশ মাইল ও প্রস্থে কুড়ি মাইল হবে। উতাকামণ্ড সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭,২২৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত। চারি ধারে চারিটি সু-উচ্চ পর্ব্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলির নাম হচ্ছে ক্লাং হিল, এলুক্ হিল, স্নোডোন ও ডোডোবেটা। টোডারা এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক। টোডারা দীর্ঘকায় এবং খুব শান্ত প্রকৃতির, অনেকে চাষবাস করছে—কেউ কেউ লেখাপড়াও শিখছে।

২২শে ফেব্রুয়ারী আমরা বেলা ২টায় উতাকামণ্ড ত্যাগ করলাম। আমরা যখন সেটুপলিয়াম পৌছলাম তখন পাঁচটা বাজে। এখানে স্নানটান সেরে নিয়ে মাদ্রাজ শহর ঘুরলাম।

দুর্গাপূজা

শারদ নববর্ষোৎসব

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল

শরৎ ঋতুর যজ্ঞ দুর্গাপূজা সমাগত। কিন্তু ঋতুরাজ শরৎ দেবীর আগমনের পূর্ব্বেই ম্লান হাসিতে বিদায় লইতেছেন। প্রকৃতি যেন নিস্তব্ধ, আনন্দমুখর নহে। নির্ম্মল নীলাকাশে অভ্রের সঞ্চরণ কমিয়া গিয়াছে। নদীসৈকতে কাশপুষ্পের স্তবক এখন আর দেবীর শুভাগমনকে অবনত মস্তকে প্রণতি জানাইতেছে না, যেন ক্রমশঃ পুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া মস্তক উন্নত করিতেছে। শেফালির হাসি প্রায় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। নদীর জল নির্ম্মল, কিন্তু চন্দ্রকিরণে উর্ম্মিচঞ্চল নহে। পথের কর্দ্দম শুকাইয়া হিমসিক্ত হইতেছে। অন্তরীক্ষে অদৃশ্য চিত্রকরের শারদ শোভা প্রায় মুছিয়া যাইতেছে। শারদলক্ষ্মী যেন দেবীর আগমনের পূর্ব্বেই বিদায়ের গীতি গাহিয়া ক্লান্ত চিত্তে বিদায় লইতেছেন, ঋতুরাজ শরতের বিদায়ের প্রাক্কালে। হিমের কুয়াশার আবির্ভাবের মুখে দেবী দশভুজার আগমনে শারদোৎসবে দেশ আনন্দমুখর হইয়া উঠিতেছে। এই অকাল শারদোৎসব দেবীপূজা পূর্ব্বকালে হইত না। কারণ ঋতুসকল যথাযথ নিয়মের বন্ধনে ছিল। বর্ত্তমান সময় পূর্ব্বকাল হইতে বিষুবের মিলনস্থানে সূর্য্যের অবস্থান ২২° ২২ দিন পিছু হটিয়া ঋতুসমূহের মুখ ২২ দিন পিছনে চলিয়া গিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বাস্তব ঘটনা, প্রাণহীন অকালে শারদোৎসব—সকলেরই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কতকটা ধরা পড়িয়াছে। অথচ ঋতুসমূহের যথাযথ কালবিধান নাই।

বর্ত্তমান ভারত সরকারের পঞ্জিকা-সংস্কার-কমিটি ঋতুসমূহের যথাযথ নিয়মের বন্ধন শীঘ্রই করিয়া দিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বাঙালীর জীবনযাত্রা বার মাসে তের পার্ব্বণের মধ্যে বিমল আনন্দে এক অস্ফুট কামনায় অতিবাহিত হয়। শরৎকালীন দুর্গোৎসব বাংলার জাতীয় জীবনে শক্তিসাধনার এক বিরাট সমাবেশ। ভারতের কোথাও এই ভাবের বিরাট সমাবেশ হয় না। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীর প্রায় সর্ব্বত্রই সাধারণ গৃহস্থের ঘরে দুর্গোৎসব হইত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা মহানগরীতে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব মহাসমারোহে হইতেছে। এই সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব পূর্ব্বে ছিল না। কারণ সকলের দুর্গোৎসব করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু সমবেত শক্তিদ্বারা দুর্গোৎসবের আনন্দ সকলেই উপভোগ করিতেছে, এখন এই সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবই সমষ্টিগত জাতীয় শক্তি-সাধনায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যে শক্তিসাধনা ব্যষ্টির ভিতরে ছিল, তাহা আজ সমষ্টিগত ভাবে মিলিয়া জাতীয় শক্তিসাধনাকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাদেবীর অমিত শক্তির মধ্য হইতে জাতীয় মুক্তিসাধনার বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত রচনা করিয়া সমষ্টিগত জাতীয় শক্তি-সাধনার ইঙ্গিত দান করিয়াছেন, তাঁহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় বাস্তব দৃষ্টিতে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

দুর্গাপূজার পরিচয়—দুর্+গম্+ড=দুর্গ। দুর্গ+আপ্—দুর্গা—অর্থাৎ, যাহাকে দুঃখে কষ্টে লাভ করা যায় সেই শক্তিই দুর্গা।

পুরাণপাঠে জানা যায় যে, দুর্গ নামক দৈত্যকে বধ করায় এবং দুর্গকে নাশ করায় দুর্গা নাম হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে দেবী বলিতেছেন—আমি দুর্গ অসুরকে বধ করিব এবং দুর্গা নামে খ্যাত হইব। স্কন্দ পুরাণের কাশী খণ্ড ৭২ অধ্যায়ে দেবী বলিতেছেন—দুর্গ দৈত্যকে বধ করায় আজ হইতে আমার নাম দুর্গা হইল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ডে, ৫৭ অধ্যায়ে আছে—দুর্গ-দৈত্য ও সকল দুর্গতিনাশ হেতু দুর্গা নাম হইয়াছে। দেবী পুরাণ, ৩৭ অধ্যায়ে আছে—দুর্গম রিপু-সঙ্কটে ইন্দ্রাদিকে ত্রাণ করায় দুর্গা নাম হইয়াছে। ঋগ্বেদে খিলসূক্তের অন্তর্গত রাত্রিসূক্তে আছে—দুর্গা নাম জপে সকল

দুর্গ অর্থাৎ দুর্গতি নাশ হয়। দেব্যুপনিষদে সর্ব্ব দুর্গপ্রশমনী বলিয়া দুর্গা নাম হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ অধ্যায় হইতে ৯৩ অধ্যায়ে দেবীর যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই বর্ণনাই শ্রীশ্রীচণ্ডী নামে খ্যাত। চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে আটটি ঋক্-মন্ত্র পাঠ করিতে হয় – এই আটটি ঋক্‌মন্ত্রই দেবীসূক্ত। দেবী-সূক্তের বক্তা অম্ভৃণ ঋষির ব্রহ্মবিদুষী কন্যা বাক্। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তই দেবীসূক্ত, সর্ব্বজ্ঞানী পরমাত্মা ইহার দেবতা। প্রথম ঋকের জগতী ছন্দঃ, বাকী সাত ঋকের ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। এই দেবীসূক্তের ভাবান্তরই উপনিষদে ও বিভিন্ন পুরাণে দুর্গাপূজাতত্ত্বে স্থান পাইয়াছে। আমি রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবতাগণ রূপে সর্ব্বজীবে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণকে, ইন্দ্র ও অগ্নিকে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পোষণ করি। আমার শক্তিতেই শক্তি-মান হইয়া তাহারা জগৎ পরিচালনা করিতেছেন। এই দুর্গা-পূজার মূলতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদিতে নানা মুনির নানা মত প্রবেশপূর্ব্বক দুর্গাপূজার পদ্ধতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। তারপর বিভিন্ন দেশের আচার রীতিনীতি ইত্যাদি দুর্গাপূজায় স্থান পাইয়া দুর্গোৎসব জটিল-তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই উহার তত্ত্বানুসন্ধানও জটিল সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের পণ্ডিতগণ বৃহন্নন্দি-কেশ্বর পুরাণ, কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ এবং বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থের সারসঙ্কলন করিয়া দুর্গাপূজার পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদের প্রচলিত দুর্গোৎসব রামচন্দ্রের অকালবোধন আখ্যান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ৬২ অধ্যায়ের প্রকৃতি খণ্ডে দেখা যায় যে, সত্যযুগে গোলোকে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ দুর্গাপূজা করেন। তারপর ব্রহ্মা মধুকৈটভের অত্যাচারে দুর্গা দেবীর আরাধনা করেন। ইন্দ্রও সঙ্কটে পড়িয়া দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং দেবী ভাগবতে বর্ণিত আছে, সত্যযুগে মহারাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধস মুনির আশ্রমে নদী-সৈকতে প্রথমে দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরথ, ইন্দ্র বা কৃষ্ণ কেহই অকাল-বোধন করিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাল্মীকির রামায়ণে দেবীর অকালবোধনের প্রসঙ্গ নাই। রাম রাবণ-বধের নিমিত্ত আদিত্যহৃদয়ের স্তব পাঠ করিয়াছিলেন। দেবী ভাগবতে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের উল্লেখ আছে। ১০৮টি নীলপদ্ম দ্বারা রামচন্দ্র যে, দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন তাহা ভাগবতে বর্ণিত আছে। এই সকল পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। মনে হয় বর্ত্তমানে আমাদের দুর্গাপূজার অকালবোধন আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে রামচন্দ্রের অকালবোধন অনুযায়ী গ্রহণ করিয়াছি। মহারাজ সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের আখ্যান হইতে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তিনির্ম্মাণের বিধান পাইয়াছি। আর দেবীর মহিষাসুর বধ মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং কালিকা পুরাণের বিবরণ হইতে গ্রহণ করিয়া দুর্গাপূজা করিতেছি।

দুর্গাপূজার বিধান বা কল্পারম্ভ: কল্প অর্থে বিধান। কৃষ্ণানবমী তিথিতে দেবীর বোধন। এই তিথি হইতে শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত পূজার বিধান আছে। কালিকা পুরাণোক্ত দুর্গাপূজায় শুক্লাষষ্ঠীতে কল্পারম্ভ হইয়া থাকে। আশ্বিন শুক্লা প্রতিপদে দেবীর কেশপ্রসাধনের দ্রব্য, দ্বিতীয়ায় কেশ বাঁধিবার পট্টডোর, তৃতীয়ায় পদে অলক্তরাগ, সীমন্তে সিন্দুর, মুখদর্শনের জন্য দর্পণ, চতুর্থীতে মধুপর্ক, নেত্রের কাজল, পঞ্চমীতে অগুরু চন্দন ইত্যাদি অঙ্গপ্রসাধন, এবং অলঙ্কার আবশ্যক। আশ্বিন শুক্লাষষ্ঠীতে সায়ংকালে বিল্বমূলে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ এবং অধিবাস।

উপরের তিন ব্যবস্থায় ষষ্ঠী পর্য্যন্ত ঘটে পূজা হয়। তারপর সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত মৃন্ময়ী দশভুজার পূজা, শেষে দশমীতে জলে দেবীর প্রতিমা ও ঘটবিসর্জ্জন। এই দিন রামচন্দ্রের বিজয়-উৎসব হইয়া থাকে। বিসর্জ্জনের পর আত্মীয়-স্বজনের সহিত মধুর প্রীতিসম্ভাষণ, গুরুজনের আশিসগ্রহণ, অনুজ জনকে আশিস দান এবং স্নেহশীতল আলিঙ্গন-দানে প্রাণের এক স্নিগ্ধতর প্রীতির বন্ধন নিবিড় করিয়া লই। এইদিন আমাদের জাতীয় জীবনের উৎসবা-নন্দের নববর্ষ আরম্ভ হইত।

শারদ নববর্ষারম্ভ: আমাদের বার মাসে তের পার্ব্বণ যথানিয়মে আবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় বিজয়া দশমীতে শারদ নববর্ষারম্ভ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে আমরা এই শারদ নববর্ষের স্মৃতি ভুলিয়া গিয়াছি। পয়লা বৈশাখ সূর্য্যের অশ্বিনী নক্ষত্রে প্রবেশ হইতে নববর্ষারম্ভের উৎসব করিয়া থাকি; এই দিন আমাদের জাতীয় উৎসব এবং বার মাসে তের পার্ব্বণের নববর্ষারম্ভ প্রকৃতপক্ষে হয় না। এই দিন প্রধানতঃ মহা-জনগণের গ্রাহকদিগের কাছ হইতে বাকী অর্থ আদায়ের অর্থাৎ হালখাতার নববর্ষোৎসব হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ আমরা আচার-অনুষ্ঠানে এবং পরস্পরের সহিত প্রেম-প্রীতির বন্ধনের মধ্যে শারদ নববর্ষের উৎসব পালন করিয়া যাইতেছি; কিন্তু প্রকাশ্যে পয়লা বৈশাখকেই নববর্ষারম্ভ গণ্য করিয়া চলিতেছি।

বিজয়া দশমীর শারদ নববর্ষে, এখনও দেশীয় সামন্ত রাজগণ অগুরু চন্দন ইত্যাদি সুগন্ধি অনুলেপন দ্বারা প্রসাধন করিয়া মহাসমারোহে আনন্দ-উৎসব করিয়া থাকেন। নবমীর দিন সামন্ত রাজগণ অশ্ব গজ অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি যাবতীয়

প্রাচীন সমরোপকরণসহ গৌরব সহকারে শোভাযাত্রা বাহির করেন। সামন্ত রাজপুরোহিত অশ্ব গজ এবং সমরোপকরণের পূজা করিয়া থাকেন। রাজা গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেবীকে প্রণামান্তে রাজপ্রাসাদ হইতে শারদ নববর্ষোৎসবে বাহির হইয়া আসেন। দুর্গোৎসবের সহিত শারদ নববর্ষের শুভকামনা আমাদের দেবীপূজার অঙ্গীভূত হইয়াছে। পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং ইত্যাদি প্রার্থনা দেবীর কাছে নিবেদন করি। কাজেই দুর্গাপূজা হইতে নববর্ষারম্ভ যে প্রাচীন যুগে ছিল তাহা বুঝিতে আর কষ্ট হয় না। প্রাচীন যুগ বাদ দিলেও আধুনিক বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে,...আশ্বিনাদি মতাঃ মাসাঃ—আশ্বিন মাস হইতে নববর্ষ গণনার বিধান পাইতেছি। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রচিত হইয়াছিল। জাতীয় নববর্ষোৎসবে নূতন বস্ত্র পরিধান কেবলমাত্র দুর্গোৎসবেই হইয়া থাকে; পয়লা বৈশাখে হয় না। দুর্গোৎসব সকলের বাড়ীতে হয় না কিন্তু বিজয়া দশমীতে শারদ নববর্ষের উৎসব সকলের বাড়ীতে হইয়া থাকে। এই দিন প্রত্যেক বাড়ীতে মঙ্গলঘট ও আম্রপল্লব স্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশের তো কথাই নাই। প্রদেশভেদে সর্ব্বত্রই দুর্গোৎসবের পর বিজয়া দশমীতে জাতীয় নববর্ষের উৎসব পালিত হয়। অবশ্য সকল প্রদেশে দুর্গোৎসব হয় না, তথাপি ঐ দিনটি সকল দেশে দেশাচার অনুসারে শারদ নববর্ষোৎসব রূপে অজ্ঞাতে পালিত হয়। পঞ্জাবে এই তিন দিবস সরস্বতীর পূজা হয়। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী দেবীত্রয় একই শক্তির আধার যজ্ঞার্থস্বরূপা। কাঠিয়াবাড়, গুর্জর ইত্যাদি প্রদেশে এই দিন নবরাত্র উৎসব হয়। উৎসব অন্তে সেই দেশের পুরনারীগণ শতছিদ্র শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হাঁড়ির মধ্যে মাঙ্গলিক দীপশিখা রাখিয়া গরবা নৃত্য করিয়া জাতীয় উৎসব করেন। এই নৃত্যের মর্ম্মার্থ—হাঁড়ির ভিতরে জলন্ত দীপশিখাই নববর্ষের নবারুণোদয়। শারদ নববর্ষে নানা প্রকার নবীন আশা উদ্দীপনা লইয়া নবারুণ উদিত হইবে তাহারই আনন্দে গরবা নৃত্য। নবারুণ যেন ধরিত্রীমাতার গর্ভে ভ্রূণাবস্থায় আছে। নারীরা সেই ভাব প্রকাশের জন্যই হাঁড়ির মধ্যে জলন্ত দীপশিখা রাখিয়া আহ্লাদে গরবা নৃত্য করেন। এই সকল প্রাচীন সংস্কৃতি এবং আচার-অনুষ্ঠান হইতে সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের জাতীয় নববর্ষোৎসব শারদ বর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পয়লা বৈশাখ হইতে হয় নাই।

দুর্গাপ্রতিমা :

১। চিন্ময়ী শক্তির গুণ ও ভাব স্ফুরণের প্রতীককেই শক্তির প্রতিমা বলে। শক্তি নিরাকার, ভাব চিন্ময়ী আর তাহার গুণ-কর্ম্মের প্রতীক প্রতিমা সাকার। মানবচিত্তে নিরাকার অদৃশ্য শক্তি, সকল সময় সহজ জ্ঞানে অনুপ্রবেশ করিতে পারে না, কাজে কাজেই কোন শক্তির রূপ, গুণ ও ভাবের পূজার জন্য পূজারীর চাক্ষুষ প্রতিমা-পূজার আবশ্যক হয়। প্রতিমা জড় পদার্থ, কাজেই জড়ের পূজা হয় না—ভাবপ্রতিমার পূজা হয়। এই ভাবপ্রতিমা পূজা হইতে ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণ তাহাদের ধর্ম্মসাধনা এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া আসিতেছেন। ভারতীয় শিল্পাচার্য্যগণ প্রতিমানির্ম্মাণের মাধ্যমে, চিত্রে, দারুকাষ্ঠে মৃত্তিকায়, নিশ্চল পাষাণে, অদৃশ্য দৈবশক্তির জ্যোতির্ম্ময় ভাব, শক্তি, গুণ প্রকাশ করিয়া জড় প্রতিমার মধ্যেও দৈবশক্তির আবির্ভাব দ্বারা নিশ্চলকেও সচল প্রাণবন্ত গতির ভাব দর্শন করাইয়াছেন।

২। বর্ত্তমান সময় প্রচলিত দুর্গাপ্রতিমার স্বরূপ বর্ণনায় কিছু কিছু জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ যে জাতির যে ধর্ম্ম যত পুরাতন তাঁহার ধর্ম্মাচরণ, সামাজিক রীতিনীতি ও ইতিবৃত্ত যেন ততই অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম যত প্রাচীন, দুর্গোৎসবও প্রায় তত কালেরই পুরাতন। উপনিষদ হইতে সূচনা করিয়া পুরাণ, উপপুরাণ, দেশাচার, কুম্ভকারগণের মতবিভিন্নতা, ভক্তগণের ভাবস্বাতন্ত্র্য, আধুনিকতা ইত্যাদি মিশ্রিত হইয়া প্রচলিত দুর্গাপ্রতিমায় জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

৩। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পুরাণ এবং দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ইত্যাদি গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া দুর্গাপূজার পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন। বাংলার ভবদেব ভট্টাচার্য্য, শূলপাণি প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পুরাণ হইতে তাঁহাদের গ্রন্থে দুর্গাপ্রতিমার বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সকল বর্ণনার সহিত দেবীর ধ্যান ও রূপবর্ণনায় প্রচলিত প্রতিমার সাদৃশ্য প্রায়শঃই দেখা যায় না। তার পর কুম্ভকারগণের স্বকীয় ভাবস্বাতন্ত্র্য এবং নব্য শিল্পীদের কারুকলার নব কৌলীন্য ভাব মিশ্রিত হইয়া দুর্গার ভাবপ্রতিমার মধ্যে কতক শাস্ত্রবহির্ভূত বিষয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

৪। দশভুজা* দুর্গাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, প্রতিদ্বন্দ্বী অসুর,

* দেবী পুরাণ ১২৭ অধ্যায়—দেবী অষ্টাদশ ভুজা। কালিকা পুরাণে ৫৯ অধ্যায়—দেবী দশভুজা, ৬০ অধ্যায়—ষোড়শ ভুজা ও অষ্টাদশ ভুজা দেবীর পূজার বিধান দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী অষ্টাদশভুজা, কি, দশভুজা তাহার বর্ণনা নাই। মহিষাসুর দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে তিনি অগণিত ভুজদ্বারা সর্বদিক ব্যাপিয়া আছেন। প্রচলিত দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে দশভুজা দেবীর ধ্যান বর্ণিত আছে।

দেবীর বাহন সিংহ এবং পদতলে মহিষের ছিন্নমুণ্ড সমাবেশ করিয়া দেবীপূজা করা হয়। দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে দেবীর ধ্যান ও রূপবর্ণনা—যাহা কালিকা পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই রূপবর্ণনার সহিত প্রচলিত দুর্গাপ্রতিমার সাদৃশ্য পাওয়া যায় কি না সেই বিষয় আলোচনা আবশ্যক।

কালিকা পুরাণ: দেবীর ধ্যান: জটাজালসমন্বিতা, অর্দ্ধচন্দ্রশোভিতা মুকুটধারিণী, ত্রিনয়না, পূর্ণচন্দ্রসমমুখশ্রী, নবযৌবনা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, অতিশোভনদন্তযুক্তা, স্থূল-উন্নতস্তন-যুগল-বিশিষ্টা তিন স্থানে বক্র মহিষকে মর্দ্দন করিতেছেন, পদ্মনালের ন্যায় আয়ত ও কোমল দশ বাহুযুক্তা দেবীকে ধ্যান করিবে। দক্ষিণে ঊর্দ্ধ হস্তে ত্রিশূল ধ্যান করিবে। দক্ষিণের বাকী চারি হস্তে ক্রমে নিম্নাভিমুখে খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণ বাণ, শক্তি চিন্তা করিবে। বামে (খেটকযষ্টি) আকর্ণপূরিত ধনুপাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা বা কুঠার সন্নিবেশ করিবে। মহিষের শিরশ্ছেদ হইতে উদ্ভূত অসুরকে খড়্গপাণি, হৃদয়ে শূল দ্বারা বিদ্ধ, নাড়িভুঁড়ি বহির্গত হইয়া যাহার শরীরের ভূষণ হইয়াছে, যাহার শরীর রক্তে রক্তময়, চক্ষু হইতে রক্ত বাহির হইতেছে, নাগপাশে বেষ্টিত, ভ্রূকুটি জন্য ভীষণ মুখ, পাশযুক্ত বামহস্তে দুর্গা যাহার কেশ ধরিয়াছেন, মুখে রক্ত বমন করিতেছে—এই রকম অবস্থাপন্ন অসুরের প্রতি দেবীর বাহন সিংহ বীরপরাক্রমে ধাবিত হইয়াছে বলিয়া ভাবিবে। দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহের পৃষ্ঠে সমভাবে থাকিবে, তাহার কতক ঊর্দ্ধে মহিষের উপর বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ থাকিবে—উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি দ্বারা সতত পরিবেষ্টিতা, ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদায়িনী সকল জগতের ধাত্রীকে চিন্তা করিবে। এই বর্ণনাই হইল দেবীর চিন্ময়ীভাব। এই ভাবস্ফুরণের প্রতিমা গড়িয়া দেবীর পূজা করাই যথার্থ শক্তির সাধনা হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত দুর্গাপ্রতিমায় এই ধ্যানোক্ত রূপ বর্ণনার প্রকাশ দেখা যায় না। মহিষের হৃদয়ে শূলবিদ্ধ কোথায়? কেবলমাত্র খড়্গ দ্বারা কর্ত্তিত অবস্থা দেখানো হইতেছে। মহিষের উপর দুর্গার বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ থাকিবে, সেই মূর্ত্তি প্রায় দেখা যায় না। অসুরের অবস্থা যে ভাবে ধ্যানে বর্ণনা করা হইয়াছে, নাড়ীভুঁড়িজড়িত রক্তে রক্তময় দেহ, মুখে রক্ত বমন হইতেছে, এই চিত্র মোটেই প্রচলিত প্রতিমায় দেখানো হয় না।

দুর্গার ধ্যানে রূপবর্ণনায় 'জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃত-শেখরাম্' ইত্যাদি ভাব দেবীপ্রতিমায় দেখা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত মুকুট কোথায়? দেবীর মস্তকে নব কৌলীন্যের কারুশিল্পের মুকুট শোভা পায়, কিন্তু তাহাতে অর্দ্ধচন্দ্র থাকে না। তারপর দেবীর অষ্টশক্তি, উগ্রচণ্ডাদি ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষ-দায়িনী সকল জগতের ধাত্রীদ্বারা পরিবেষ্টিতা দেবীর ভাবময়-শক্তির প্রতিমা আদৌ দেখা যায় না। প্রচলিত দেবীপ্রতিমার পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী কন্যারূপে, আর কার্ত্তিক গণেশকে পুত্র-রূপে দেখা যায়। এই সমাবেশের কারণ কি? ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোথায়? দুর্গা কুমারী, দুর্গাপূজায় কুমারীপূজার ব্যবস্থা আছে। লক্ষ্মী ক্ষীরসমুদ্র হইতে অমৃতমন্থনকালে আবির্ভূতা হইয়াছেন। সরস্বতী বাঙ্ময়ী—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ঙ্করী, দুর্গা-শক্তির একাংশ। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা—এই তিন শক্তি একই শক্তির আধার মহাশক্তিরূপা। কার্ত্তিকের মাতা কৃত্তিকা বা ষষ্ঠীমাতা, পিতা অগ্নি, গণেশ বিঘ্ননাশক, গণদেবতা, গণদেবতার অধিপতি রুদ্র। গণেশ রুদ্রেরই প্রকাশ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে বঙ্গের স্মৃতির প্রধান নায়ক রঘুনন্দন ভট্ট দুর্গাপূজায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশকে লইয়া ব্যবস্থা করেন নাই, পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে ব্যবস্থা ছিল না, সেই ব্যবস্থা কি ভাবে কোন্ সময় প্রবেশ করিল তাহার কারণ অনুসন্ধান আবশ্যক।

আসামে নবম ও দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত দেবীর অষ্টশক্তি, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডিকা প্রভৃতি প্রতিমা ভূগর্ভমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। দশভুজা, সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী প্রতিমার পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ এই সকল মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চলে নির্ম্মিত হয় নাই। দুর্গার বামপদের অঙ্গুষ্ঠ মহিষের পিছন দিকে, নাড়ীভুঁড়ি জড়িত অসুরের দেহ এবং শূলবিদ্ধ হৃদয় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে মানভূমে পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মহিষমর্দ্দিনী দশভুজার এই রকম প্রতিমা এবং চিত্রপট পাওয়া গিয়াছে। তার পর সম্ভবতঃ লক্ষ্মী সরস্বতীসহ দুর্গাপ্রতিমার পূজা বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

দৈবশক্তি নিরাকার, সেই শক্তির পরিচয় গুণকর্ম্মের ক্রিয়ার মধ্য হইতে পাওয়া যায়। কাজেই দেবী-প্রতিমার বিভিন্নতায় তাঁহার গুণকর্ম্মের বিভিন্নতা হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান সময়ের বাংলার দুর্গোৎসব ক্রমশঃ সমষ্টিগত বাঙালী জাতির প্রাণের মিলিত শক্তি দ্বারা এক জাতীয় শক্তিসাধনার রূপ পরিগ্রহ করিতেছে; সুতরাং দুর্গাপ্রতিমায় খেয়ালখুশীমত নিরাধার কল্পনার আশ্রয় না লইয়া, ধ্যানবর্ণিত রূপকে আধার করিয়া দেবীপ্রতিমা নির্ম্মাণ করা সমীচীন।

শ্রীকুমারলাল দাসগুপ্ত

[একখানা ছোট ঘর, এক পাশে একটা টেবিল, খানদুই বেতের চেয়ার, আর এক পাশে চৌকি ও বিছানা, দেয়ালে কয়েকখানা ছবি ও ক্যালেণ্ডার। অপরিচ্ছন্ন টেবিলের উপর বইয়ের গাদা, ঘরের কোণে কোণে মাকড়সার জাল, বিছানা ছেঁড়া ও মলিন।

জানালার ধারে বেতের চেয়ারে চোখ বুঁজে বসে আছে উপল, বয়স পঞ্চাশের উপরে। মধ্যরাত্রি—খোলা জানালার ভিতর দিয়ে অন্ধকার ঘরে এসে পড়েছে জ্যোৎস্না। হঠাৎ চোখ খুলে উপল দেখে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত টেবিলের উপর বসে আছে একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি। ঘাড় উঁচু করে ভাল করে দেখে উপল, দেখে এক প্রৌঢ়া নারী, চওড়া পাড়ের সাড়ি পরা, মাথার উপর নামমাত্র আঁচল তোলা, কোলের উপর দুটি হাত রেখে বসে আছে। ভাল করে দেখেও চিনতে পারে না উপল, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এমন সময় হেসে ওঠে নারী। এইবার চমকে ওঠে উপল, এই হাসির আওয়াজ তার খুব চেনা। কিন্তু এমন হাসি যে একজন মাত্র হাসে, আর তো কেউ হাসে না। সে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। আবার হেসে ওঠে নারী, আবার চমকে ওঠে উপল।]

নারী। আমাকে চিনতে পারলে না!

উপল। (আশ্চর্য্য হয়ে) তুমি! তুমি।

নারী। কে বল তো?

উপল। তুমি।

নারী। (হেসে) হাঁ, আমি।

উপল। এতদিন পরে এলে মঞ্জরী।

মঞ্জরী। বেশী দিন তো নয়।

উপল। বিশ বছর।

মঞ্জরী। না, অত দিন হবে না।

উপল। বিশ বছর, বিশ বছর। অবশ্য আমার কাছে বিশ বছর যতটা দীর্ঘ তোমার কাছে ততটা নয়।

মঞ্জরী। কেন?

উপল। সময় দীর্ঘ হয় কখন? যখন জীবনে আনন্দ থাকে না।

মঞ্জরী। তুমি কি বলতে চাও, আমার দিন আনন্দে কেটেছে।

উপল। আমি বলছি না, তুমিই বলছ।

মঞ্জরী। তোমার জীবনটাই বা এত নিরানন্দ কিসে?

উপল। (আশ্চর্য হয়ে) তা কি জান না?

মঞ্জরী। না, কেমন করে জানব।

উপল। আজও কথায় সেই হেঁয়ালি, সেই কুয়াশা, সেই রহস্য।

মঞ্জরী। কুয়াশা কোথায়, বেশ তো পরিষ্কার।

উপল। এখানেই তোমার বিশেষত্ব, যেটা পরিষ্কার সেটা তোমার কাছে জটিল, যেটা জটিল সেটা তোমার কাছে পরিষ্কার। চারি দিকে চেয়ে দেখ, কেমন দেখছ আমার পারিপার্শ্বিক? কি দেখছ?

মঞ্জরী। টেবিল, চেয়ার, খাট-বিছানা, দেয়ালে ছবি, ক্যালেণ্ডার।

উপল। ঠিক বলেছ, কিন্তু তাদের রূপ?

মঞ্জরী। (একটু হেসে) তেমন সুন্দর নয়, তেমন পরিচ্ছন্ন নয়।

উপল। জীর্ণ টেবিল, ভাঙ্গা চেয়ার, ছেঁড়া বিছানা।

মঞ্জরী। ময়লা চাদর, আরো ময়লা বালিশ।

উপল। ধন্যবাদ! চেন ঐ বালিশটিকে?

মঞ্জরী। না, কেমন করে চিনব!

উপল। না চেনবারই কথা। অথচ বিশ বছর আগে ঐ বালিশটিতে মাথা রেখে একটি সম্পূর্ণ রাত তুমি ঘুমিয়েছিলে। সেদিন

ওটা ছিল দুধের মত ধবধবে সাদা আর তার উপর ছড়ানো ছিল চামেলির গুচ্ছ। আজও আমার মনে পড়ে সেই চামেলি ফুলের উপর তোমার কালো চুল ছড়িয়ে দিয়ে তুমি শুয়েছিলে। সেদিন ছিল ওটা ফুলের গন্ধে, চুলের গন্ধে ভরা। তার পরে একে একে বিশ বছর কেটে গেছে, কত অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখেছি ওর উপর মাথা রেখে—কত দুঃস্বপ্ন: কেটেছে কত নিদ্রাবিহীন, কত নিদ্রামগ্ন রাত, বিশ বছরের ধুলো আর ময়লা জমেছে ওর উপর।

মঞ্জরী। (কথা কয় না)

উপল। দেয়ালে ছবি—কি ছবি ওটা!

মঞ্জরী। খুব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে যেন আকাশে চাঁদ আর নীচে সবুজ পৃথিবী।

উপল। ঠিক দেখেছ, কিন্তু আরো একটা জিনিষ দেখতে পাও নি, সেটা বোধ হয় গৌণ।

মঞ্জরী। (ছবি ভাল করে দেখে) হ্যাঁ, আরো একটা জিনিষ আছে, একটা পাখী উড়ে যাচ্ছে।

উপল। এইবার ঐ গৌণ পাখীটাকে দেখেছ। মনে পড়ে ঐ ছবিটা?

মঞ্জরী। (মাথা নেড়ে) না।

উপল। তা হলে ওর কথাও শোন। ঐ যে সবুজ পৃথিবী—ও হচ্ছে চিরদিনকার সবুজ পৃথিবী, যত কল্পনার আর স্বপ্নের জন্মভূমি, পাখীটা হচ্ছে মানবাত্মা আর চাঁদ হচ্ছে তার স্বপ্ন, তার আদর্শ। মানবাত্মা ডানা ঝাপটে তার আদর্শের দিকে উড়ে যেতে চায়, কাছাকাছি আসে অথচ ধরতে পারে না—পারবেও না কোন দিন।

মঞ্জরী। বাঃ, মানেটা তো বেশ।

উপল। এইবার পরিচয়টা শোন, ঐ পাখীটা হচ্ছি আমি আর ঐ চাঁদ হচ্ছে--

মঞ্জরী। তোমার স্বপ্ন, তোমার আদর্শ অর্থাৎ কাগজের সম্পাদকত্ব!

উপল। আমার আদর্শ অত ছোট নয়। ঐ চাঁদ হচ্ছ তুমি।

মঞ্জরী। (চুপ করে থাকে)

উপল। গেরুয়া রঙের কাপড়ের উপর রঙীন সুতো দিয়ে বিশ বছর আগে বহু যত্ন করে ছবিটা কে তুলেছিল কল্পনা করতে পার?

মঞ্জরী। মোটেই না।

উপল। তুমি।

মঞ্জরী। (চুপ করে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে)

উপল। টেবিলের উপরকার বইগুলো লক্ষ্য করেছ? ছিঁড়ে গেছে, মলাট নেই, সামনে ও পিছনে এক ডজন করে পাতা নেই, বিশ বছরের বিশটা কালবৈশাখীর ঝোড়ো বাতাসে উড়ে গেছে। ও পাশের ঐ ভাজ-করা খাতাখানা তুলে দেখবে?

মঞ্জরী। (জীর্ণ খাতাখানা তুলে নিয়ে) একেবারে ছেঁড়া যে, ভয় হয় আরো ছিঁড়ে যাবে।

উপল। পড়ে দেখ কি লেখা আছে ওতে।

মঞ্জরী। (সাবধানে দু'একখানা পাতা উল্টে) এ যে কবিতার খাতা, তোমার লেখা বুঝি?

উপল। হাতের লেখাতেই সেটা প্রমাণ হচ্ছে। একটা কবিতা পড়ে শোনাবে?

মঞ্জরী। (পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) কোনটা পড়ব?

উপল। যে-কোন একটা, যেটা তোমার খুশী।

মঞ্জরী। (পড়ে)

আমার মুখে কি শবের সৌন্দর্য্য!
আমার চোখে কি দীপ্তি নাই!
তুমি কি ভয় পেয়েছ!
আমার পাণ্ডুর অধরে চুমো দেবে না!
দিও না চুমো,
তোমার চুলের ফুলটি খুলে রাখ
আমার বুকের উপর।
(পড়তে পড়তে থেমে যায়)

উপল। কি হ'ল, থামলে কেন?

মঞ্জরী। পড়তে পারছি নে, লেখাটা এইখানে মুছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

উপল। (হেসে) তাই নাকি? তা হলে আর একটা পড়।

মঞ্জরী। (আর একটা পাতা উল্টে) এটাতেও যে ঐ ব্যাপার, মাঝখানে খানিকটা মুছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

উপল। তা হলে আর একটা।

মঞ্জরী। (পাতা উল্টে) না—পড়া চলবে না, এটাতেও তাই।

উপল। তা হলে কি সবগুলোরই ঐ অবস্থা?

মঞ্জরী। (একটা একটা করে পাতা উল্টে) তাই তো, সবগুলোরই ঐ অবস্থা—প্রত্যেকটার মাঝখানেই দু'তিনটে লাইন মুছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

উপল। খুবই আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে, তাই না?

মঞ্জরী। হ্যাঁ।

উপল। ওরও একটা ইতিহাস আছে—শুনবে?

মঞ্জরী। বলো।

উপল। বিশ বছর আগে কবিতাগুলো লেখা। ঐ যে মুছে যাওয়া অস্পষ্ট দাগ—ও হচ্ছে চুমোর চিহ্ন, প্রত্যেকটি কবিতার বুকে একটি করে চুমো আঁকা আছে। কার চুমো বলতে পার?

মঞ্জরী। না।

উপল। তোমার।

মঞ্জরী। (হেসে) চায়ের পেয়ালার দাগগুলো চুমো বলে বেশ চালিয়ে দিলে।

উপল। চালাকিটা ধরে ফেলেছ তা হলে। ক্যালেণ্ডারে দেখ ত আজ কত তারিখ।

মঞ্জরী। পয়লা মাঘ, তেষট্টি চল্লিশ।

উপল। আজ থেকে বিশ বছর আগে। মনে পড়ে ঐ দিনটা তোমার?

মঞ্জরী। আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত কম।

উপল। তার প্রমাণ অনেক পাচ্ছি। তা হলে শোন আর একটা গল্প :—

ক্যালেণ্ডারে দেখতে পাবে সেদিন পূর্ণিমা। গোধূলির রক্তআভা আকাশ থেকে প্রায় মুছে গেছে এমন সময় দিগন্তে দেখা দিল পূর্ণিমার চাঁদ। ধীরে ধীরে চাঁদ উঠল গাছের মাথা ছাড়িয়ে উপরে, মাঠ ঘাট স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে গেল। মেঠো পথ দিয়ে আসে একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। পথের পাশে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা আম গাছ, তারই নীচে এসে দাঁড়ায় দু'জনে। স্বচ্ছ আকাশের দিকে, পূর্ণিমার চাঁদের দিকে, জ্যোৎস্না-ধোয়া মাঠের দিকে অনেকক্ষণ দু'জনে তাকিয়ে থাকে। তারপরে হঠাৎ ছেলেটি বলে, "ঐ পূর্ণিমার চাঁদ সাক্ষী, বল তুমি আমার।" মেয়েটি বলে, 'পূর্ণিমার-চাঁদ সাক্ষী, আমি তোমার।"

মঞ্জরী। (হাসতে হাসতে) চমৎকার গদ্য-কবিতা।

উপল। গদ্য-কবিতার শেষের দু'লাইন এখনও বাকি আছে।

মঞ্জরী। তা হলে শেষ করে ফেল।

উপল। শোন, ছেলেটির নাম উপল আর মেয়েটির নাম মঞ্জরী।

মঞ্জরী। আমার নাম যোগ করা কি নিতান্তই প্রয়োজন ছিল?

উপল। তোমার নাম যোগ না করলে যে কবিতাই হ'ত না।

মঞ্জরী। অথচ আমার মত অকবি হয়ত পৃথিবীতে আর নেই।

উপল। হয়ত তাই, হয়ত তুমি অকবি, কিন্তু তোমার স্পর্শে মানুষ কবি হয়ে উঠে। আরও শুনবে গদ্য-কবিতা?

মঞ্জরী। আরও আছে নাকি?

উপল। আছে বৈ কি। তুমি রবীন্দ্রনাথ পড়েছ?

মঞ্জরী। পড়েছি কিছু কিছু।

উপল। মনে পড়ে—

কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে কর করবী
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে
অঞ্জন আঁক নয়নে।

মঞ্জরী। বর্ষামঙ্গল।

উপল। হ্যাঁ, বর্ষামঙ্গল। গদ্য-কবিতায় শোন এবার আর এক বর্ষামঙ্গল। সেদিন আষাঢ়, আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, শালের বনে ঝর ঝর বৃষ্টি নামে, ভিজে বাতাসে ভেসে আসে কদমের গন্ধ। গভীর হয় রাত, অন্ধকার হয় গভীরতর, দমকা বাতাসে কেঁপে উঠে দীপশিখা, বিদ্যুৎ চমকায় থেকে থেকে— এমন সময় সে এসে দাঁড়ায় রুদ্ধ দরজার সামনে কম্পিত হৃদয়ে, ডাকে—"জেগে আছ প্রিয়া!" খুলে যায় দ্বার, দেখা দেয় দ্বারপ্রান্তে

কালো চুল ছড়িয়ে দিয়ে শুয়েছিলে

মালবিকা, মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়েছে তার এলো চুল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার দুটি হাত ধরে বলে, "অনুমতি দাও, কেতকী-কেশরে তোমার কালো কেশ সুরভিত করে দি।" মালবিকা বলে "দাও।" কেয়াফুলের পরাগ ছড়িয়ে দেয় কালো চুলে, অন্ধকার ভারী হয়ে উঠে গন্ধে। আবার বলে, "অনুমতি দাও, ক্ষীণ কটিতটে করবীর মালা পরিয়ে দি।" মালবিকা বলে, "দাও"। মালা পরিয়ে দেয় গলায়, মালা পরিয়ে দেয় কটিতটে, মালার কাঁকন পরিয়ে দেয় দুটি হাতে। অর্দ্ধ রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'জন দু'জনার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মঞ্জরী। থাম, তোমার কল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছি নে।

উপল। থামলাম। শেষের দুটো লাইন বাকি রইল।

মঞ্জরী। (হেসে) শুনেছি, আর বলতে হবে না।

উপল। আরও কবিতা শুনবে?

মঞ্জরী। যথেষ্ট হয়েছে, তোমার যে কবিত্ব আছে তা স্বীকার করে নিচ্ছি।

উপল। আমার শুধু কবিত্ব আছে, আর কিছু নেই?

মঞ্জরী। আর কি চেয়েছিলে?

উপল। মানুষ যা চায়! শূন্য আকাশ নয়, নীড় চেয়েছিলাম, যাকে ভালবাসি তাকে চেয়েছিলাম।

মঞ্জরী। অত বড় কল্পনায় জগৎ যার রয়েছে তার বাস্তব জগতের দরকার কোথায়!

উপল। (মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকিয়ে) কি বললে?

মঞ্জরী। বোধ হয় তুমি বাস্তবের চেয়ে কল্পনা বেশী ভালবাস।

উপল। (চিন্তিতভাবে) সত্যিই কি তাই?

মঞ্জরী। হয় ত তাই।

উপল। (একটু ভেবে) তুমি ঠিক বলেছ মঞ্জরী, স্থূল আমার কিছু নেই। আমার জগৎ কল্পনারই জগৎ, আমার সবই কল্পনা, আমার ভালবাসাও কল্পনা।

মঞ্জরী। (কোন কথা কয় না)

উপল। (চিন্তিতভাবে) মঞ্জরী, ধীরে ধীরে একটা সত্য প্রতিভাত হচ্ছে। আশ্চর্য্য, এই সত্যের উপলব্ধি এত দিন হয় নি।

মঞ্জরী। সে সত্যটা কি?

উপল। সেই সত্য হচ্ছে এই যে, আমি স্থূলকে অস্বীকার করে সূক্ষ্মের উপাসনা করেছিলাম। আমি তোমার মন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমার একটা দেহ আছে।

মঞ্জরী। (হেসে) একটা দেহ নিশ্চয়ই আছে।

উপল। সেই নিশ্চিতটাকে বেমালুম বাদ দিয়ে চলেছিলাম, এত বড় মূর্খ আমি। প্রেম শুধু গন্ধ নয় মঞ্জরী—ফুলটাও, প্রেম শুধু ধোঁয়া নয়—ধূপটাও, আলো নয়—উত্তাপটাও, মন নয়—দেহটাও।

মঞ্জরী। উপমা ত অনেকগুলো দিলে। তবু যা হোক বুঝলে এত দিনে।

উপল। (মাথা নেড়ে) বড় দেরিতে বুঝলাম মঞ্জরী, যদি বিশ বছর আগে এটা বুঝতাম তা হলে!

মঞ্জরী। তা হলে কি হ'ত?

উপল। তা হলে জীবনটা অন্য রকম হয়ে যেত কেবল আমার নয়, তোমারও।

মঞ্জরী। আমারও!

উপল। হাঁ, তোমারও, কেননা তুমি হতে আমার। বিশ বছর আগে তুমি যেদিন শঙ্খ আর উলুধ্বনির মধ্যে চিরকালের জন্যে দূরে সরে গেলে, সেদিন ভাবলাম ফুল দূরে গেল, কিন্তু গন্ধ তার রইল কাছে, দেহ দূরে গেল, কিন্তু মন বন্দী রইল মনের মন্দিরে।

মঞ্জরী। (হেসে) বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ।

উপল। (হতাশ ভাবে) ভেবেছিলাম প্রেম বিজ্ঞানের উপরে।

মঞ্জরী। খুব দুঃখ হচ্ছে?

উপল। (আশ্চর্য্য হয়ে মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে) দুঃখ হবে না!

মঞ্জরী। (হাসতে থাকে)

উপল। তোমার হাসি পাচ্ছে মঞ্জরী?

মঞ্জরী। (উপলের কাঁধের উপর হাত রেখে) আচ্ছা, যদি বিশ বছর আগে হঠাৎ ফিরে যাও তা হলে কি কর?

উপল। (উত্তেজিত ভাবে) কি করি! যে ভীষণ ভুল করে জীবনটা ব্যর্থ করে ফেলেছি সেই ভুলটা সংশোধন করি।

মঞ্জরী। (হেসে) কেমন করে সংশোধন কর?

উপল। (মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকিয়ে) কবিত্ব-কল্পনাকে বিদায় করে দিয়ে বাস্তবকে আঁকড়ে ধরি। স্বপ্নে সেবার তোমাকে ভালবেসেছিলাম, এবার জেগে তোমাকে ভালবাসব, তোমার দেহ, মাংস, ত্বক, ওজন, আয়তন, বর্ণ গন্ধ উত্তাপকে ভালবাসব।

মঞ্জরী। (হাসতে থাকে)

উপল। হাস্যকর বটে—পাগলের মত বকে চলেছি।

মঞ্জরী। সত্যি করে বল বিশ বছর আগে ফিরে যেতে চাও?

উপল। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই ফিরে যেতে চাই।

মঞ্জরী। (উপলের হাতখানা ধরে) তা হলে চোখ বুঁজে স্থির হয়ে বস।

উপল। রহস্যময়ীর এ কোন রহস্য!

মঞ্জরী। রহস্য নয়, সত্যিই বলছি চোখ বুঁজে বস।

উপল। (হাসতে হাসতে) তারপরে যখন চোখ মেলে চাইব তখন দেখব তুমি অদৃশ্য হয়েছ!

মঞ্জরী। এই যে হাত ধরা রইল।

উপল। আচ্ছা বসলাম চোখ বুঁজে—কি করবে কর।

[উপল চোখ বুঁজে বসে, ঘরটা ধীরে ধীরে অন্ধকার হতে থাকে। উপল ও মঞ্জরী ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটু পরে অন্ধকার কমে আসে, তারপরে আবার আলো ফুটে উঠে, দেখা যায় পাড়াগাঁয়ের ছোট একখানা সাধারণ ঘর, উত্তরে, পূবে জানালা, দক্ষিণে খোলা দরজা। পূবের জানালা দিয়ে দেখা যায় একটা ছোট ফুল-বাগান, দূরে আম, জাম, নারিকেল গাছ, তার পিছনে বর্ষার ঘোলাজলের স্রোত। ঘরের এক পাশে একখানা খাট, তাতে শুয়ে আছে একটি মেয়ে—বয়স পনর-ষোল, খোলা-চুল বালিশের উপর দিয়ে পড়েছে ছড়িয়ে। প্রবেশ করে একটি যুবক, বয়স আঠার-উনিশ, কিছুক্ষণ ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে ডাকে—"মঞ্জরী, মঞ্জরী।" মেয়েটি তবুও জাগে না। আবার ধাক্কা দেয় যুবক, আবার ডাকে—এবার উঠে বসে মঞ্জরী]

মঞ্জরী। (উঠে বসে মুখের উপর থেকে এলোমেলো চুল সরাতে সরাতে) আমাকে তুললে কেন?

উপল। না তুললে তোমার সঙ্গে কথা কইব কেমন করে!

মঞ্জরী। তা এত ধাক্কাধাক্কি কেন—ডাকলে কি শুনতে পেতাম না।

উপল। তুলবার যেটা সহজ উপায় সেইটাই প্রয়োগ করেছি, কিন্তু তাতেও ত পুরো দশ মিনিট লেগেছে।

মঞ্জরী। আরও আধঘন্টা লেগে যেতে পারত।

উপল। কেন?

মঞ্জরী। আমি জেগেই ছিলাম।

উপল। সত্যি নাকি! চমৎকার ঘুমের ভান করেছিলে কিন্তু।

কি বলবে বল !

উপল। তোমাকে বিশেষ প্রসন্ন দেখছি না।

মঞ্জরী। (হেসে) অপ্রসন্ন কেন হব—কি বলবে ব'ল।

উপল। ধাক্কাধাক্কি করেছি বলে রাগ করো না মঞ্জরী। তোমাকে ত আগেই বলেছি, বিশ বছর আগে ফিরে গেলে কবিত্ব-কল্পনাকে বিদায় দিয়ে পুরো বাস্তব হয়ে উঠব। তোমার ঘুম-ভাঙ্গার প্রতীক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে এসে সরাসরি ধাক্কা মারলাম। আর তুমি অবিলম্বে উঠে বসলে—কেমন সুন্দর আর সহজ! আগে কি করতাম! বোকার মত তোমার আশেপাশে ঘুরতাম, তোমার ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গত না, সাহস হ'ত না ডাকবার, সাহস হ'ত না কাছে যাবার। মনে পড়ে!

মঞ্জরী। পড়ে বৈ কি। আমি শুয়ে থাকতাম, জানতাম তুমি আসবে। তুমি নিঃশব্দে আসতে, কিন্তু আমি চোখ বুঁজেও তোমার এগিয়ে আসা টের পেতাম। এক এক দিন একরাশ ফুল তুমি আমার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে আবার নিঃশব্দে সরে যেতে, সাহস করে ডাকতে না। তুমি ভাবতে—আমি ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু আমি কি ঘুমোতে পারি! আমার মুখের উপর, বুকের উপর যে ফুলগুলো পড়ত সেগুলোকে নিবিড়ভাবে অনুভব করতাম। আমি জানতাম তুমি চলে যাও নি, আমি তোমার নীরব প্রতীক্ষাকে উপভোগ করতাম।

উপল। কিন্তু ধাক্কা দেওয়ার একটা মানে আছে। নীরব থাকাটা ত উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে কথা বলা, তাই অযথা সময় নষ্ট না করে ধাক্কা মেরে তুলে দেওয়াই সঙ্গত।

মঞ্জরী। তা হলে কি বলবে বল।

উপল। (মাথা চুলকে) বাস্তববাদীর যা বলা উচিত তাই বলব, বলব আমি তোমাকে ভালবাসি।

মঞ্জরী। (হেসে) একেবারে—ভূমিকাহীন!

উপল। এতে একটা সুবিধা আছে, যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

মঞ্জরী। কথা ত দেখছি তিনটে মাত্র।

উপল। গত বারে কিন্তু ঐ তিনটে কথা বলবার সময় ও সুযোগ হ'ত না; বলতে গিয়ে অনাবশ্যক ঘোরাফেরা করে, বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করতাম—মনে আছে?

মঞ্জরী। আছে বৈ কি। সন্ধ্যাবেলায় যখন আসতে তখন একগোছা ফুল নিয়ে আসতে, কোন দিন গোলাপ, কোন দিন রজনীগন্ধা, কোন দিন চাপা।

উপল। সে ফুল তোমার চুলে পরিয়ে দিতাম। ব্যস, তাতেই খুশী, কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতাম।

মঞ্জরী। (হেসে) কেন বলতে না?

উপল। ঐখানেই আমার অবাস্তব কবিত্ব, ঐখানেই আমার ভুল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবতাম জান?

মঞ্জরী। কি ভাবতে?

উপল। ভাবতাম তুমি যে চুলে আমার ফুল পরালে, আমার এত কাছে দাঁড়িয়ে রইলে এতেই আমি ধন্য হয়ে গেলাম। নিছক স্বপ্ন—নিছক স্বপ্ন! (হঠাৎ মঞ্জরীর পাশে বসে) মঞ্জরী!

মঞ্জরী। কি!

উপল। (মঞ্জরীর হাত ধরে) মঞ্জরী।

মঞ্জরী। কি?

উপল। এই তোমার হাত।

মঞ্জরী। (হেসে) সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপল। কল্পনা নয়—এ বাস্তব। এ হাতের স্পর্শ অনুভব করছি, এর ত্বক কত মসৃণ, এর বর্ণ কত উজ্জ্বল, এর উত্তাপ কত মধুর, এর আয়তন কত ছোট, এর ওজন কত হাল্কা (হঠাৎ হাতখানা জোরে চেপে ধরে)

মঞ্জরী। (ব্যথা পেয়ে) উঃ, ছাড়, বড্ড লাগছে।

উপল। (তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিয়ে) বড্ডই কি লেগেছে!

মঞ্জরী। তা একটু লেগেছে বৈ কি।

উপল। (লজ্জিত ভাবে) আমি ওর কাঠিন্যটাও অনুভব করতে চেয়েছিলাম।

মঞ্জরী। (আহত হাতখানা নাড়তে থাকে)

উপল। খুবই যন্ত্রণা হয়েছে মঞ্জরী! দেখি হাতখানা, আমি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

মঞ্জরী। (হাত আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে) না না, আর নয়, এবার হয়তো আস্বাদ করতে চাইবে।

উপল। কিন্তু এইটাই ত বিজ্ঞানসম্মত।

মঞ্জরী। এর চেয়ে দর্শন ভাল।

উপল। আবার আমাকে ভুল পথে নিও না মঞ্জরী! এবার শূন্য নয়, এবার মাটির উপর স্থির, নিরাপদ নিশ্চিত পথ, যে পথ সোজা নিয়ে যায় দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গৃহের দরজায়। সেখানকার সবকিছু তিন ডাইমেনশনের, সবকিছু ভারী মজবুত, নির্ভরযোগ্য; সেখানকার পিপাসা কবিতায় নয়—জলে মেটে, ক্ষুধা জ্যোৎস্নায় নয়—অন্নে মেটে।

মঞ্জরী। জ্যোৎস্না, কবিতা কি একেবারেই বাদ!

উপল। একেবারেই বাদ—যার ওজন নাই তা চলবে না।

মঞ্জরী। প্রেম?

উপল। প্রেম বাদ যাবে না—প্রেমই ত প্রধান।

মঞ্জরী। কিন্তু ওর ওজন?

উপল। ওর ওজনের কি শেষ আছে মঞ্জরী! হিসেব কর, প্রিয়ার ওজন, প্রিয়ার বসনভূষণের ওজন, হাইহিল জুতোর ওজন, প্রসাধন-সামগ্রীর ওজন—

মঞ্জরী। এই শেষ!

উপল। আরে, না না, এ ত মামুলি প্রেম! যেখানে প্রেম বৃহৎ সেখানে আরও যোগ হবে—যেমন একাধিক বাড়ীর ওজন, গাড়ীর ওজন, দাসদাসীর ওজন, বুঝলে মঞ্জরী, প্রেম যত ভারী হবে তত হবে স্থায়ী!

মঞ্জরী। তা হলে আমাকে তোমার পছন্দ হবে না।

উপল। কেন?

মঞ্জরী। আমার আয়তনও কম, ওজনও কম, সেই অনুপাতে প্রেমও কম!

উপল। তাতে ভাববার কিছু নেই, বাড়ী-গাড়ীতে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। থাক্ বাজে কথা, এখন সময় হচ্ছে সার। মঞ্জরী, বৃথা সময় নষ্ট হচ্ছে, বল তুমি আমাকে ভালবাস, বল তুমি আমার হবে।

মঞ্জরী। তুমি কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছ।

উপল। পারলে আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতাম মঞ্জরী! যে তাড়াতাড়ি করেছে সে-ই জিতেছে, যে ঢিমে তেতালায় চলেছে সে-ই হেরেছে—শেষ পর্যন্ত ব্যর্থপ্রেমিক হয়েছে। (আবার মঞ্জরীর হাত ধরে) মঞ্জরী!

মঞ্জরী। কি!

উপল। চল আমরা দুটিতে নিরুদ্দেশে চলে যাই, এক অচেনা দেশে গিয়ে ঘর বাঁধি—চল।

মঞ্জরী। কতদূর?

উপল। অনেক—অনেক দূর।

মঞ্জরী। বল, সেখানে এখানকার মত জলেভরা পুকুর আছে! তার পিছনে সবুজ ধানের ক্ষেত আছে? আম-জামের বাগান আছে? রাত্রে চাঁদ উঠে? ঘরে জোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়ে? গাছে কোকিল ডাকে?

উপল। (ব্যস্ত হয়ে) থাম, থাম, থাম, থাম। আবার চাঁদ, আবার জোৎস্না, আবার কোকিলের ডাক? আবার আমাকে কল্পনার নেশা ধরিয়ে পালিয়ে যাবে মতলব করেছ? তা হবে না মঞ্জরী! (হাতখানা জোরে চেপে ধরে)

মঞ্জরী। উঃ, বড্ড জোরে ধরেছ।

উপল। আর আবেগ নয়, উচ্ছ্বাস নয় জোর করেই ধরতে হবে, জোর করে ধরাটাই বিজ্ঞানসম্মত। চল মঞ্জরী চল। গ্রামে নয় শহরে, মস্ত বড় শহর, উঁচু উঁচু বাড়ী—আকাশ দেখা যায় না, পথে মোটরের স্রোত, ঘরে রেডিওর যান্ত্রিক গান। সেখানে পথের পাশে শীর্ণ তরুর পাতা সবুজ নয়, ধুলোয় ধুলোয় ধূসর, সেখানে ফুল ফুটলে লোকে চেয়ে দেখে না, কোকিল ডাকলে কেউ কান পেতে শোনে না; সেখানে আধখানা শহর জুড়ে প্রকাণ্ড কারখানা, রাত্রি-দিন অবিরাম কলরব। সেইখানে ঘর বাঁধব তুমি আর আমি, ভালবাসব তুমি আর আমি।

মঞ্জরী। (হেসে) আর সে ভালবাসা হবে থ্রী ডাইমেনশনাল!

উপল। (উৎসাহিত হয়ে) আর সে ভালবাসা হবে থ্রী ডাইমেনশনাল।

[উপল মঞ্জরীর হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে ঘর অন্ধকার হয়ে উঠে, তার পরে গভীরতর অন্ধকারে উপল-মঞ্জরী অদৃশ্য হয়ে যায়। একটু পরে অন্ধকার আবার হাল্কা হতে থাকে, আবার আলো ফুটে উঠে, দেখা যায় একখানা সাজানো বসবার ঘর, তার চারদিকে চারটে বড় বড় জানালা। রাত আটটা, সোফায় বসে উপল নভেল পড়ছে এমন সময় ঘরে প্রবেশ করে মঞ্জরী। মঞ্জরী সাজসজ্জায় ঝলমল করছে, হাতে দামী হাত-ঘড়ী, নাকে সোনার ফ্রেমের চশমা। মঞ্জরী এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ায়, উপল নভেল ফেলে দিয়ে সজাগ হয়ে বসে]

মঞ্জরী। (আশ্চর্য হয়ে) এ কি, তুমি আজ জনকল্যাণ সঙ্ঘে যাও নি! আমি ভেবেছিলাম, তুমি রোজকার মত সন্ধ্যাবেলা সঙ্ঘে চলে গেছ।

উপল। (ততোধিক আশ্চর্য হয়ে) আর তুমি! তুমি যে আজ শিশুশিক্ষা সমিতিতে যাও নি? আমি ভেবেছিলাম রোজকার মত তুমি আজও সাড়ে সাতটায় সমিতিতে চলে গেছ।

মঞ্জরী। না, আজ যাই নি, যেতে ইচ্ছে করল না।

উপল। তুমি নাকি সমিতির প্রাণ! একদিন একটু দেরি করে গেলে যে সমিতি অচল হয়ে যায়, সেই সমিতিতে আজ তুমি একেবারে যাও নি—আশ্চর্য ব্যাপার!

মঞ্জরী। তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য ব্যাপার আজ সঙ্ঘে তোমার অনুপস্থিতি। তুমি না গেলে জনকল্যাণ করবার প্রেরণা কে দেবে?

উপল। (হাই তুলে) কে জানে—আমার আজ যেতে ইচ্ছে করল না।

মঞ্জরী। চা খাবার সময় সেকথা তো তুমি আমাকে বললে না!

উপল। ঐ কথা আমিও ভাবছি, চা খাবার সময় তুমি কেন বললে না—আজ সমিতিতে যাবে না।

মঞ্জরী। সত্যি কথা বলব?

উপল। বলবে বৈকি।

মঞ্জরী। বলি নি এইজন্যে যে, সন্ধ্যাবেলা আজ একটু একা বসে থাকবার ইচ্ছে হয়েছিল। ভেবেছিলাম তুমি সঙ্ঘে চলে যাবে, আর আমি চুপচাপ ঘরে বসে থাকব।

উপল। ঠিক ঐ মতলবটা যে আমারও হয়েছিল মঞ্জরী! আমিও ভেবেছিলাম তুমি সমিতিতে চলে যাবে, আর আমি একলা বসে একটা সিগার টানব।

মঞ্জরী। (এগিয়ে এসে সোফার একপাশে বসে) এর মানে কি বল ত?

উপল। (চিন্তিতভাবে) একটা মানে আছে বলে মনে হয়। তুমিই বলো না।

মঞ্জরী। বোধ হয় কিছু একটা ভেবে দেখবার দরকার হয়েছিল।

উপল। ঠিক বলেছ, কোথায় যেন একটা সমস্যা লুকিয়ে আছে—অদৃশ্য দেয়ালের মত, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না অথচ এগোতে গেলে মাথা ঠেকে যাচ্ছে। কিন্তু কি সেটা?

মঞ্জরী। তেমন অদৃশ্য নয়, খানিকটা দেখতে পাওয়া যায়, খানিকটা যায় না।

উপল। কোন্‌টুকু দেখতে পাওয়া যায়?

মঞ্জরী। তুমি আমি আজকাল পরস্পরকে এড়িয়ে চলি এটা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেন এড়িয়ে চলি সেটা দেখতে পাওয়া যায় না।

উপল। হ্যাঁ, কিছুটা এড়িয়ে চলি। ঘর বাঁধবার পর মাত্র পাঁচটা বছর কেটেছে, এর মধ্যে এত বড় সমস্যা দেখা দিল?

মঞ্জরী। মাত্র পাঁচটা বছর।

উপল। অথচ আশা ছিল অনন্তকাল কেবল ভালবেসে কেটে যাবে।

মঞ্জরী। হ্যাঁ, অনন্তকাল।

(হঠাৎ মঞ্জরী উঠে গিয়ে পূবের জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে আসে)

উপল। কি হ'ল, হঠাৎ জানালাটা বন্ধ করে দিলে কেন?

মঞ্জরী। খেয়াল কর নি বুঝি, এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল ঐ জানালা দিয়ে। চাঁদের আলো পাছে তোমাকে কল্পনার নেশা ধরিয়ে দেয় তাই বন্ধ করে এলাম।

উপল। (অন্যমনস্ক ভাবে) ঠিক করেছ।

মঞ্জরী। একটা কথার উত্তর দেবে?

উপল। কেন দেব না।

মঞ্জরী। আমি যে তিন-চার দিন হ'ল কানে এক জোড়া নতুন নক্সার ঝুমকো পরেছি তা লক্ষ্য করেছ?

উপল। (মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকিয়ে) পরেছ নাকি? হ্যাঁ, তাই তো।

মঞ্জরী। (হেসে) কেমন দেখাচ্ছে তা তো বললে না?

উপল। (অপ্রতিভ ভাবে) বেশ দেখাচ্ছে—সুন্দর দেখাচ্ছে।

মঞ্জরী। কতদিন পরে আমাকে সুন্দর বললে? সত্যি কথা--বল তো, ওটা কি মন থেকে বললে, না পুরনো অভ্যাসমত বললে?

উপল। সত্যি কথা বলতে বলেই তো মুশকিলে ফেললে।

মঞ্জরী। থাক, আর বলতে হবে না।

(মঞ্জরী আবার উঠে গিয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিমের জানালা-দুটো বন্ধ করে দিয়ে আসে)

উপল। ও দুটো জানালাও বন্ধ করে দিলে?

মঞ্জরী। দক্ষিণের জানালা দিয়ে বাতাসে চাঁপাফুলের গন্ধ আসছিল টের পাও নি? আর পশ্চিমের জানালা দিয়ে ভেসে আসছিল কোকিলের ডাক। কোকিলের ডাক, চাঁপার গন্ধ যে মনকে হাল্‌কা করে।

উপল। তা করে বৈ কি! কিন্তু উত্তরের জানালাটা খোলা রাখলে কেন? ওটাও বন্ধ করে দাও।

মঞ্জরী। তা কি হয়! দেখছ না ঐ উত্তরের জানালা দিয়ে কারখানার আলোগুলো দেখা যাচ্ছে—অসংখ্য আর উজ্জ্বল, যেন পুঞ্জীভূত বড় বড় স্থির জোনাকি! আর শুনছ না আওয়াজ! কি কর্কশ, কি তীব্র, কোকিলের ডাকের মত হালকা নয়, এ হচ্ছে অত্যন্ত ভারী, এই না তোমার পছন্দ।

উপল। (অন্যমনস্ক ভাবে) সত্যিই পছন্দ।

মঞ্জরী। কি হয়েছে তোমার বলতে পার?

উপল। আমার! আমার তো কিছু হয় নাই, ভাবছিলাম কি হয়েছে তোমার।

মঞ্জরী। ঠিক বলেছ। তোমার আমার দু'জনেরই হয়েছে। কি হয়েছে বল ত?

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে

উপল। আমি বলতে পারব না, হয়তো তুমি বলতে পারবে, তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী বোঝ।

মঞ্জরী। (চাপা গলায়) কি হয়েছে বলতে পারি নে, তবে আমার মনে হয় পালিয়ে যাই—কোথাও অনেক দূরে পালিয়ে যাই।

উপল। আমাকে ফেলে!

মঞ্জরী। তোমার জন্যেই।

উপল। আবার হেঁয়ালি!

মঞ্জরী। হেঁয়ালি নয় প্রিয়, তোমার জন্যেই। আমি তোমাকে অসুস্থ করে তুলেছি। আমি দূরে গেলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

উপল। (আশ্চর্য্য হয়ে) আমি তো বেশ সুস্থ রয়েছি, তা ছাড়া তুমি কেন আমাকে অসুস্থ করে তুলবে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

মঞ্জরী। (হঠাৎ উপলের খুব কাছে সরে এসে) দেখ তো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে—কেমন দেখছ?

উপল। দেখছি খুব সুন্দর।

মঞ্জরী। রংটা! কালো নাকি?

উপল। কালো কোথায়, খুব তো ফরসা।

মঞ্জরী। ঠিক বলেছ, আগের চেয়েও ফরসা। (হেসে) বিলিতী ক্রীমের উপর ফরাসী পাউডার! দেখ তো চোখদুটো, আগের মত—না আরো সুন্দর?

উপল। আগের চেয়েও সুন্দর। এমন তুলি দিয়ে টানা ভুরু তো তোমার আগে ছিল না, আর চোখদুটি যেন স্বপ্নমাখা।

মঞ্জরী। হাঁ, ভুরু আমার সত্যিই তুলি দিয়ে টানা। আবার ভুরুর উপরে কারিগরি হয়েছে সে খবর রাখ না বুঝি! আর ভিতরের খবর হচ্ছে—চোখদুটি স্বপ্নমাখা নয়, কাজলমাখা। এইবার বলো ঠোঁট দুটি কেমন?

উপল। টুকটুকে লাল।

মঞ্জরী। স্বাভাবিক নয়—রুজ মেখেছি। এখন বুঝতে পারছ, কেন আমি তোমাকে অসুস্থ করে তুলছি?

উপল। এখনও বুঝতে পারলাম না।

মঞ্জরী। (উপলের হাতখানা ধরে নিজের মুখের উপর রেখে) জান না বুঝি আমি মরে গেছি! ছুঁয়ে বুঝতে পারছ না এটা শব?

উপল। (অবাক হয়ে বসে থাকে)।

মঞ্জরী। শব আবার পচতে সুরু করেছে, তাই সেই দুঃসহ বীভৎসতাকে ঢাকবার জন্যে সিল্কের সাড়ি, নূতন নক্সার ঝুমকো, ফরাসী সৌগন্ধ, বিলিতী ক্রীম আমেরিকান রুজ। তবু কি সে বীভৎসতা ঢাকা পড়ে!

উপল। তুমি মরলে কেমন করে?

মঞ্জরী। (উপলের বুকের উপর হাত রেখে) তুমি মেরেছ।

উপল। (আশ্চর্য্য হয়ে) আমি!

মঞ্জরী। হাঁ, তুমি। আমার আত্মার উপর একটার পর একটা পাথর চাপিয়ে—তাকে পিষে মেরেছ। আমার চারিদিকে নীরন্ধ্র দেয়াল গেঁথে দিয়ে দম বন্ধ করে মেরেছ। তা জান না কি?

উপল। (চুপ করে থাকে)

মঞ্জরী। রাত্রি-দিন কর্ম্মব্যস্ত বিরাট কারখানা, সৌন্দর্য্যহীন শহর, বাড়ী আর গাড়ী, সিল্ক আর রেয়ন, কেয়ূর আর কাঁকন এই সব প্রাণহীন বস্তুর নীচে সমাধি দিয়েছ আমার আত্মাকে। এ ছাড়া আরও একখানা পাষাণ আমার বুকে চাপিয়েছ, যা হচ্ছে সবচেয়ে ভারী, সবচেয়ে কঠিন।

উপল। কি সেটা?

মঞ্জরী। সেটা তোমার স্থূল ভালবাসা, থ্রী ডাইমেনশনাল প্রেম।

উপল। তবে শুনবে একটা কথা?

মঞ্জরী। বলো।

উপল। (চাপা গলায়) আমারও মৃত্যু হয়েছে, আমিও শব পচতে সুরু করেছি।

মঞ্জরী। (উপলের হাত চেপে ধরে) প্রিয়, প্রিয়তম।

উপল। কি বলছ মঞ্জরী!

মঞ্জরী। বাঁচতে চাও, বাঁচাতে চাও?

উপল। (আগ্রহের সঙ্গে) তুমি বাঁচাতে পারবে? তবে বাঁচাও।

[দ্রুতপদে উঠে যায় মঞ্জরী, বন্ধ করে দেয় পশ্চিমের জানালা, দক্ষিণের জানালা খুলে দেয়—ভেসে আসে কোকিলের ডাক; উত্তরের জানালা খুলে দেয়—রজনীগন্ধার গন্ধে ভরে যায় ঘর, খুলে দেয় পূবের জানালা—জ্যোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়ে। সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জরী, উপল এসে দাঁড়ায় তার পাশে, দু'জন ধরে দু'জনের হাত—তাকিয়ে থাকে দু'জনে দু' জনের দিকে। হঠাৎ ঘর অন্ধকার হয়ে আসে মঞ্জরী-উপল অদৃশ্য হয়ে যায়, তার পরে ধীরে ধীরে আবার আলো ফুটে ওঠে; দেখা যায় উপলের পুরনো সেই ঘর—সেই ভাঙা চেয়ার-টেবিল, ছিন্ন বিছানা। আগের মতই চেয়ারে বসে আছে উপল, টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে মঞ্জরী]

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে বসে থাকে।

মঞ্জরী। কি ভাবছ?

উপল। একটা মস্ত বড় ভুল ভেঙে গেল।

মঞ্জরী। আবার বিশ বছর আগে ফিরে যাবে?

উপল। ক্ষমা কর, আর নয়। ভাবতাম জীবন্ত তোমাকে, স্থূল তোমাকে ধরাছোঁয়ার পরিবেশের মধ্যে পেলে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করবে—কিন্তু তা হ'ল না।

মঞ্জরী। (হেসে) 'ধরাছোঁয়ার পরিবেশ'—কথাটা শুনতে বেশ লাগে।

উপল। শুনতে বেশ লাগে—বলতেও বেশ লাগে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই।

মঞ্জরী। অথচ দেহ না থাকলে কি প্রেম থাকতে পারে?

উপল। (চিন্তিতভাবে) তাই ত, দেহ না থাকলে কি প্রেম থাকতে পারে?

মঞ্জরী। দেহ চাই।

উপল। আবার হেঁয়ালি সৃষ্টি করো না মঞ্জরী?

মঞ্জরী। হেঁয়ালি নয়—সত্যিই বলছি দেহ না থাকলে প্রেম থাকতে পারে না। (নিজের বুকের উপর হাত রেখে) কিন্তু সে দেহ এ দেহ নয়।

উপল। সে বুঝি আর এক দেহ?

মঞ্জরী। হাঁ, সে আর এক দেহ। আর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ।

উপল। (মুখের দিকে তাকিয়ে) দেখছি।

। কি দেখছ ?

উপল। দেখছি দুটি কালো চোখ বুদ্ধির আলোতে উজ্জ্বল, নিটোল সুশ্রী কপাল, ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি।

মঞ্জরী। (হেসে) অথচ কপালে আমার পড়েছে রেখা, চোখ গেছে কোটরে, চুলে ধরেছে পাক !

উপল। আমি তা দেখতে পাচ্ছি না।

মঞ্জরী। পাবেও না দেখতে ! এতক্ষণ তুমি কবিত্ব করেছ, এইবার আমি একটু কবিত্ব করি—অপরাধ নিও না। সত্যিই এ দেহ আমার নয়। যে দেহ তুমি কল্পনায় সৃষ্টি করেছ সে-ই হচ্ছে আমার দেহ, সেই দেহ চিরসুন্দর—চিরকালের; তার পরিবর্ত্তন নেই, সে আজও নীলসাড়ি পরে, মাথায় ফুল গুঁজে তোমার কাছে আসে।

উপল। (মুগ্ধ হয়ে) ঠিক বলেছ মঞ্জরী।

মঞ্জরী। পাওয়ার পরিতৃপ্তিতে প্রেম নেই। দৈনন্দিনের পরিবেশে ধীরে ধীরে দেবী হয় মানবী, মানবী হয় মাটির পুতুল। বেদনার ইন্ধনে জ্বলে প্রেমের শিখা। তুমি বিরহী, তাই তুমি প্রেমিক।

উপল। (আশ্চর্য্য হয়ে) এ সব কথা তুমি জানলে কেমন করে মঞ্জরী ?

মঞ্জরী। (হেসে) লোকের মুখে শুনে।

উপল। হাটে-বাজারে এসব কথা শুনতে পাওয়া যায় না মঞ্জরী, এটা তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

মঞ্জরী। বই পড়ে।

উপল। বই আমি তোমার চেয়ে ঢের বেশী পড়েছি, কিন্তু আমি তো এ সব শিখি নি !

মঞ্জরী। তা হলে ভালবেসে।

উপল। কিন্তু মঞ্জরী, তোমার মনে যে ব্যথা আছে এমন তো কোন দিন টের পাই নি। সব সময় তোমার মুখে হাসিই দেখেছি।

[মঞ্জরী উপলের হাতখানা কোলের উপর টেনে নিয়েছে নিজের হাতের মধ্যে ধরে রাখে।]

দেখ তো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে

উপল। (চোখ বন্ধ করে) বুঝতে পারছি মঞ্জরী, তোমার মন বুঝতে পারছি—দেখে নয়, শুনে নয়, অনুভব করে।

[হঠাৎ উপলের হাতের উপর এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে।]

উপল। তুমি কাঁদছ মঞ্জরী !

[চমকে চোখ খুলে উপল দেখে মঞ্জরী নেই—মেঘে চাঁদ ঢেকে গেছে, বাইরে বৃষ্টি সুরু হয়েছে, হাওয়ায় তারই দু'এক ফোঁটা তার হাতে এসে পড়ছে।]

অলস হাওয়া

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অলস হাওয়া বয়ে গেল আলের ফাঁকে ফাঁকে,
অলস হাওয়ায় উঠলো ভরে' রিক্ত-বেকার দিন;
কাজের শেষে অঢেল-বিরাম যতোই যাবে ডাকে—
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে রইলো উদাসীন !

ঝিমিয়ে থাকে ঝাউয়ের পাতা, মেহগনির শির,
'পাতাবাহার' বাহার ছেড়ে রৌদ্রে নেশাতুর,
পরেশনাথের শিখরে তার আবছায়া মন্দির,
পেরিয়ে পারে নদীর ঢেউয়ে সূর্য্য হ'ল চুর।

লাল সড়কে সুরকি রঙে রাঙা তো নয় মন,
আকাশ-পথে উদাস করে টেলিগ্রাফের তার,
নীল আকাশের শুভ্র মেঘের ফুরায় প্রয়োজন,
নদীর পারে নিঃস্ব হ'ল দিগন্তেরি পার।

অলস হাওয়া বয়ে গেল আলের ফাঁকে ফাঁকে,
পাহাড় ঘেঁষে যেথায় নামে কালো জলের ঢল,
অলস স্বপন জীর্ণ করে নেশার বেদনাকে,
ধানের শিষে সিক্ত সে কি প্রাণের পরিমল !

আকবরের সময় বাংলার লোকসংখ্যা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

এখন যেমন দশ বৎসর অন্তর লোকগণনা হয়, মুঘল আমলে বা তৎপূর্ব্বে তেমন কোন লোকগণনার ব্যবস্থা ছিল না। হিন্দু আমলে মধ্যে মধ্যে রাজারা দেশে কত ঘর প্রজা আছে তাহার একটা হিসাব করিতেন। তাঁহাদের হিসাবের পদ্ধতি ছিল এইরূপ: প্রত্যেক গৃহস্থকে এক একটি কড়ি দিতে হইত; প্রত্যেক গ্রামাধিপতি এইরূপ কড়ি সংগ্রহ করিয়া ছোট্ট একটি পুঁটুলিতে গেরো দিতেন; জেলা বা চাকলা বা বিষয়ের অধিপতি এইরূপ পুঁটুলি সংগ্রহ করিয়া বড় একটি থলিয়ায় রাজধানীতে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। যে সব ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেন বা যজ্ঞ করিতেন তাঁহাদের দেওয়া কড়িতে সিন্দুরের ফোঁটা থাকিত। রাজা কড়ি গণিয়া তাঁহার দেশের মধ্যে কত ঘর গৃহস্থ আছে বা কত ঘর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছে তাহার হিসাব করিতেন। কিন্তু তৎকালে কড়ির মূল্য বেশী ছিল; এজন্য দারিদ্র্য বশতঃ হয়ত কোন কোন গৃহস্থ কড়ি দিতে অপারগ হইতেন বা এইরূপ গৃহস্থের নিকট হইতে কড়ি আদায় হইত না। ফলে গৃহস্থের সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা হিসাবে কম হইত।

কোশলের রাজা হরিশচন্দ্র, যাঁহার রাজধানী রোহিতাশ্বগড় বা রোটাসে ছিল, একদিন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার রাজ্যে কত ঘর লোক আছে। মন্ত্রী উপরোক্ত পদ্ধতিতে কড়ি সংগ্রহ করিলেন। কড়ি সংগ্রহ করিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। রাজা একদিন স্তূপাকৃতি পুঁটুলি বাঁধা কড়ি দেখিয়া বলিলেন এগুলি কিজন্য এখানে আছে। মন্ত্রী তাঁহাকে কারণ স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি এই কড়ি দিয়া একটি সুবৃহৎ পাথর-বাঁধা ইঁদারা খনন করান। এই ইঁদারা এখনও বর্ত্তমান আছে।

যদি আমরা অনুমান করি যে, হরিশচন্দ্রের সময় লৌহের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল তাহা হইলে পাথর কাটিতে (সেকালের প্রথামত), পাথর আনিতে, ইঁদারা খনন করিতে ও পাথর দিয়া বাঁধাইতে আন্দাজ দুই-তিন লক্ষ "man-day" লাগিয়াছিল, অর্থাৎ দুই-তিন লক্ষ লোককে একদিন বা দুই-তিন হাজার লোককে ১০০ দিন কার্য্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তখনকার দিনে মজুরী কত ছিল তাহা জানা যায় না। যদি এক কড়ায় এক দিনের রোজ ধরি তাহা হইলে কোশল রাজ্যে দুই-তিন লক্ষ ঘর বা "family" ছিল। প্রত্যেক ঘরে তখনকার দিনে গড়ে ১০ জন লোক ধরিলে—বিশেষ করিয়া তখনকার দিনে একান্নবর্ত্তী প্রথা চালু থাকায় ও যাহাকে 'clan-feeling' বলে তাহা প্রবল থাকায়, এইরূপ ধরিয়া লওয়া খুব অন্যায় হইবে না—কোশল রাজ্যের লোকসংখ্যা ২০।৩০ লক্ষ ছিল। আমরা হরিশচন্দ্রের কাল জানি না, বা কোশল রাজ্যের বিস্তৃতিও আমাদের জানা নাই; জানিতে পারিলে ভাল হইত।

উড়িষ্যার শেষ গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের পিতামহ গজপতি কপিলেন্দ্র বাংলার ত্রিবেণী হইতে মাদ্রাজের ত্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি এক উৎকীর্ণ শিলালিপিতে দাবি করিয়াছেন যে, তিনি নব কোটি লোকের অধীশ্বর। এই দাবির মূলে কতটা অতিশয়োক্তি, আর কতটা কড়ি গণিয়া লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণের ফল, তাহা সঠিক বলিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে কড়ি দিয়া মানুষের বা ঘরের হিসাব করিয়াছিলেন তাহার প্রবাদ উড়িষ্যার স্থানে স্থানে আছে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উড়িষ্যার ইতিহাসে (প্রথম খণ্ড; পৃষ্ঠা ৩০৪) লিখিয়াছেন যে, কপিলেন্দ্র (খ্রীষ্টীয় ১৪৩৫ খ্রীঃ অঃ সিংহাসনারোহণ ও ১৪৭০ খ্রীঃ অঃ মৃত্যু)—

"Succeeded in conquering the entire eastern coast of the Bay of Bengal from Hughli in Bengal to Trichinopoly in Madras."

সম্রাটের একটি উপাধি ছিল, "নব-কোটি-কর্ণাট কালবার্গেশ্বর" (পৃ. ৩০২) কপিলেন্দ্রের সাম্রাজ্যের একটি মানচিত্র ঐ পুস্তকের ২৯৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।

ইংরেজী ১৯৩১ সনের সেন্সাস অনুসারে এই সব স্থানের লোকসংখ্যা আন্দাজ ৫২০ লক্ষ। সুতরাং এই দাবি যে একেবারে অমূলক তাহা বলা চলে না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার লোকসংখ্যা শতকরা ৩৩ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। ইংরেজী ১৮৬৬ সনের দুর্ভিক্ষেও উড়িষ্যার লোকসংখ্যা খুবই হ্রাস পায়। অন্ধ্রদেশে দুর্ভিক্ষ ত লাগিয়াই আছে। যদি কপিলেন্দ্রের দাবি সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লই তাহা হইলে বলিতে হয় যে, পাঁচ শত বৎসরে এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ত পায়ই নাই, উপরন্তু অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ বরাবরই ঘনবসতির দেশ। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা হিরোডোটাস ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন:

"Of all the nations we know India has the largest population."

অর্থাৎ, তিনি যেসব জাতির কথা জানিতেন তাহাদের মধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাদশাহ আকবরের সময়ে ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে, যখন ভারতে মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয় তখন ভারতের লোকসংখ্যা ৬০ কোটি ছিল।

ফেরিস্তার এইরূপ বলিবার কি হেতু বা কি যুক্তি তাহা আমরা জানি না। ডব্লিউ. এইচ. মোরল্যাণ্ড হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আকবরের মৃত্যুর সময় (১৬০৫ খ্রীঃ) ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ১০ কোটি ছিল। এই হিসাব কেহ কেহ কম মনে করেন। ফেরিস্তার হিসাব বাড়তির দিকে ভুল—আর মোরল্যাণ্ডের হিসাব কমতির দিকে ভুল ধরিলেও খ্রীষ্টীয় ১১০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ১৬০০-এর

মধ্যে যে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দ্রুত কমিয়া গিয়াছিল একথা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য। মুসলমানেরা ভারত লুণ্ঠন করিয়া বহু লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, বহু লোককে হত্যা করে। এই সম্বন্ধে ভিনসেণ্ট এ. স্মিথের ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে সামান্য দুই-একটি তথ্য দিব।

সুলতান বলবন ১২,০০০ হাজার বন্দী মেওয়াটি স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে হত্যা করেন (পৃ. ২২৮)। আলাউদ্দীন খিলজীও অনুরূপ হত্যা ও অত্যাচার করেন (২৩২-৩ পৃ.)। ইং ১৩৫৩-৫৪ সালে ফিরোজ তোগলক বাংলার সুলতানের সহিত যুদ্ধে ১,৮০,০০০ লোককে হত্যা করেন (পৃ. ২৪৭)। তৈমুরলঙ্গ দিল্লীর ১,০০,০০০ লোককে হত্যা করেন, মুলতানের সমস্ত লোককে বন্দী করেন (২৫২ পৃ.)। এই বিষয়ে ইতিহাসবেত্তারা যদি নজর দেন ও তথ্যগুলি জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন ত ভাল হয়।

মোরল্যাণ্ড *India at the death of Akbar* নামক পুস্তকে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একটি মোটামুটি আন্দাজ দিয়াছেন। উত্তর-ভারতে মুঙ্গের হইতে মুলতান পর্যন্ত চাষের জমির হিসাব করিয়া এই জমি কর্ষণোপযোগী করিতে কত লোকের দরকার তাহারও একটি হিসাব দিয়াছেন। আর দক্ষিণ-ভারতে বিজয়নগরের রামরাজের সহিত বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, আহম্মদনগর, বিদার ও খান্দেসের সুলতানদের সহিত যুদ্ধে সৈন্যের সংখ্যা হইতে লোকসংখ্যার হিসাব করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমগ্র ভারতে তৎকালে ১০ কোটি লোক ছিল। তাঁহার হিসাব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া দেখা যাউক তৎকালে বাংলায় কত লোক ছিল। (আমাদের এই আলোচনায় বাংলা বলিতে ইং ১৯১২ সালে সৃষ্ট বাংলা প্রেসিডেন্সী বুঝায়।)

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার তুলনায় বাংলাদেশে ও যুক্তপ্রদেশে (অধুনা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে) বিভিন্ন আদমসুমারীর সময় লোকসংখ্যার আনুপাতিক শতকরা হিসাব নিম্নে দিলাম:

ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার শতকরা

সেন্সাসের বৎসর	বাংলায়	উত্তরপ্রদেশে
১৮৭২	১৭.০	২০.৩
১৮৮১	১৪.৮	১৭.৫
১৮৯১	১৪.২	১৬.৬
১৯০১	১৫.১	১৬.৬
১৯১১	১৫.২	১৫.৮
১৯২১	১৫.৫	১৫.২
১৯৩১	১৫.১	১৪.৩
১৯৪১	১৫.৮	১৪.২
১৮৯১-১৯৪১ পঞ্চাশ বৎসরের গড় ১৫.২		১৫.৫

আগেকার সেন্সাসে লোকসংখ্যা গণনায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি ছিল: এজন্য প্রথম দুইটি সেন্সাসের হিসাব বাদ দিলাম।

এই গড় ধরিয়া আমরা বলিতে পারি যে, বাংলায় ও উত্তর-প্রদেশে আকবরের মৃত্যু সময়ে দেড় কোটি করিয়া লোক ছিল।

১৯২১ সনে উত্তরপ্রদেশের সেন্সাস রিপোর্টে সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এডি লিখিতেছেন:

"The population at the death of Akbar is roughly estimated by Mr. Moreland to have been about 100 millions, of which the share of what is now the United Provinces would not exceed 20 millions."

এডি সাহেব উত্তরপ্রদেশের লোকসংখ্যা আকবরের মৃত্যুসময়ে দুই কোটি আন্দাজ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত রিপোর্টে তিনি কোন যুক্তি বা হিসাব দেখান নাই। যদি উত্তরপ্রদেশে সেই সময়ে লোকসংখ্যা দুই কোটি হয় তাহা হইলে বাংলায়ও লোকসংখ্যা দুই কোটি হইবে না কেন? আমাদের মনে হয় বাংলায় লোকসংখ্যা তৎকালে দুই কোটির কাছাকাছি ছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত "Famines in India" পুস্তকে(পৃ. ৫৫) লখেন:

"We read in the Ayeeni Akbari that Zamindars of Bengal were mostly Kayesto by castes, that the militia force in the Province consisted of 23,330 cavalry. 801,150 infantry,. 1170 elephants, 4260 guns and 4400 boats."

বাংলার জমিদারদের অধিকাংশ কায়স্থ। তাঁহাদের ২৩,৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮০১,১৫০ জন পদাতিক, ১১৭০টি হাতী, ৪২৬০টি কামান ও ৪৪০০ যুদ্ধ-নৌকা রাখিতে হইত।

কামানের পিছনে লোক রাখিতে হইত কামান টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য, কামানে বারুদ গাদিবার ও গোলা ভরিবার জন্য। কামান দাগিবার নিমিত্তও গোলন্দাজের দরকার হইত এবং গোলা বহিবার জন্যও লোকের দরকার হইত। প্রত্যেক কামানের জন্য অন্ততঃপক্ষে ৪ জন লোকের দরকার। হাতীর পিছনে মাহুত, সহিস ও তীরন্দাজ, বন্দুকধারী রাখিতে হইত। প্রত্যেক হাতীর জন্য ৮ জন লোক হিসাবে ধরিলাম। যুদ্ধ-নৌকার জন্য চাই দাঁড়ি, মাঝিমাল্লা ও গোলন্দাজ। গড়ে নৌকা পিছু ৮ জন ধরিলে অন্যায় হইবে না, বরং বেশী লোকের প্রয়োজন।

সুতরাং জমীদারদের রাখিতে হইত

পদাতিক —	৮০১,১৫০
অশ্বারোহী—	২৩,৩৩০
হাতী—	১১৭০ × ৮ = ৯,৩৬০
কামান—	৪২৬০ × ৪ = ১৭,০৪০
নৌকা—	৪৪০০ × ৮ = ৩৫,২০০
মোট	৮৮৬,০৮০

ইহা ছাড়া সওয়ার রসদবাহী, গোয়েন্দা প্রভৃতি রাখিতে হইতে। এক কথায় ১০ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হইত।

উপরোক্ত হিসাব সুবে বাংলার, আমাদের বাংলার নহে। সুবে বাংলার ভিতর ছিল সিংভূম, মানভূম, সাওতাল পরগণা, পুর্ণিয়া ও শ্রীহট্ট। পক্ষান্তরে মুঘল সুবে বাংলায় আকবরের সময় জলপাই-

গুড়ি, দার্জিলিং, চট্টগ্রাম প্রভৃতি ছিল না। মোটামুটি ভাবে সুবে বাংলার এই হিসাব আমাদের বাংলায় প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে লোকে ৫০ পার হইতে না হইতে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এজন্য যাহারা যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত এইরূপ ব্যক্তিদের বয়স আমরা ২০ হইতে ৪০-এর মধ্যে ধরিয়া লইতে পারি। এই বয়সের লোক সমগ্র লোকসংখ্যার ⅕ মাত্র। ইহারা সকলেই যদি সৈনিক হইত তাহা হইলে ১০ লক্ষ সৈনিক হইতে দেশের লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু সকলেই সৈনিক হইতেন না। যদি তিন জনের মধ্যে একজন সৈনিক হইতেন তবে দেশের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৮০ লক্ষ; যদি চার জনের মধ্যে এক জন সৈনিক হন তবে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৪০ লক্ষ। সৈনিকের জমি চাষ করিবার জন্য তাহার বাড়ীতে জোয়ান মরদ থাকা চাই এক জন কি দুই জন। সুতরাং সেই সময় বাংলার লোকসংখ্যা যদি আমরা ১৫০ লক্ষ অপেক্ষা ২০০ লক্ষ ধরি ত অন্যায় হইবে না।

আরও এক কারণে বাংলার তৎকালে লোকসংখ্যা ২০০ লক্ষের কাছাকাছি ছিল বলিয়া মনে হয়। "Land Revenue Commission" তাঁহাদের রিপোর্টে (২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯) ধানের খরচ মাথাপিছু ৯ মণ করিয়া ধরিয়াছেন। এই হিসাবে ২০০ লক্ষ লোক খাইবার জন্য ১৮০০ লক্ষ মণ ধান উৎপন্ন করিত। যে ধান উৎপন্ন হইত তাহার এক-তৃতীয়াংশ সরকারী খাজানা হিসাবে দিতে হইত। খাইবার ধান সরকারকে দিলে খাইবে কি? সুতরাং খাজানা দিবার জন্য আরও ৯০০ লক্ষ মণ ধান উৎপন্ন করিতে হইত। সরকার এই ধান বেচিয়া বাদশাহী রাজস্ব আদায় করিতেন। তোডরমল্লের হিসাবে বাংলার রাজস্ব ১০৬ লক্ষ টাকা। তখন ধানের দর কত ছিল? শায়েস্তা খাঁর সময় টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। ইহা ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তাঁহার আমলে চাল খুব সস্তা হইয়াছে এজন্য শায়েস্তা খাঁ গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে চাউলের বা ধানের দর কি ছিল? আচার্য্য যদুনাথ সরকার বাংলার ইতিহাসের ২য় খণ্ডে (পৃ. ৩৮৭) লিখিয়াছেন:

"As for the cheapness of grain during his viceroyalty it need not excite only surprise. About 1632 Father Sebastian Maurique during his travels in Bengal found rice selling at 5 mds. to the rupee (Luard's Maurique. 1.54) and Dacca being in the centre of the rice bowl of Bengal grain was naturally still cheaper than in Central Bengal."

টাকায় ৫ মণ চাউল বা ৭½ মণ ধান যদি উপযুক্ত দর হয় তাহা হইলে ৯০০ লক্ষ মণ ধানের দর হইতেছে ১২০ লক্ষ টাকা। এই টাকা হইতে সহজেই বাদশাহী রাজস্ব ১০৬ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর আদায় করা চলে। কিন্তু লোকসংখ্যা ১৫০ লক্ষ ধরিলে ৯০০ লক্ষ মণ ধানের পরিবর্ত্তে উৎপন্ন রাজস্ব দেয় ধান্যের পরিমাণ হয় ৬৭৫ লক্ষ মণ আর ইহার মূল্য হয় ৯০ লক্ষ টাকা।

অবশ্য আমাদের এই হিসাবের কিছু অংশ ধরিয়া লওয়া আছে। তথাপি আমরা বলিব যে, আকবরের সময়ে বাংলার লোকসংখ্যা ২০০ লক্ষ ছিল।

বাংলাদেশে যে লোকসংখ্যার প্রাচুর্য্য ছিল তাহা বাংলার তৎকালীন রাজধানী গৌড়ের লোকসংখ্যা হইতে বুঝা যায়। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত "Land System of Bengal"-এ (পৃ. ৫৬) লিখিয়াছেন যে, পাঠান যুগে গৌড়ের লোকসংখ্যা ৬ লক্ষের উপর ছিল।

মনে পড়ে

শ্রীকরুণাময় বসু

অনেক স্বপ্নের ভিড়, তোমাকে ত' তবু মনে পড়ে,
স্মৃতির তোরণ-দ্বারে জ্বলজ্বলে লেখা তব নাম;
রূপালি কাঞ্চন-নদী, বালিহাঁস সন্ধ্যেবেলা ওড়ে,
তুমি ছিলে ম্লান মুখে, আমি যবে বিদায় নিলাম।

চাঁপার পাপড়ি যেন মেলে তার প্রজাপতি পাখা,
উড়ে আসে ভিজে ঘাস, উড়ে পড়ে নীল খড়িবনে;
কাজল ভ্রমর সম ছিল তব ভুরু দুটি বাঁকা,
আঁখিতে মদির তৃষ্ণা, জীবনের রঙ ছিল মনে।

সময় ছিল না হাতে, এঁকে বেঁকে আসে রেলগাড়ী,
তোমার নরম মুঠি মোর হাতে কাঁপে থরোথর,
উতলা বনের হাওয়া, তুমি কাছে, তবু তাড়াতাড়ি
নিঃশব্দে এলাম চলে; অশ্রুচোখে ছিলে নিরুত্তর।

দ্বিধাভরে দিলে হাতে চোখ মুছে শাড়ীর আঁচলে
একটি সবুজ খাম; এক মুঠো দূরের আকাশ
নেমে এল কাছে মোর; এঁকে বেঁকে রেলগাড়ী চলে,
মন শুধু মনে মনে জুয়ো খেলে ভোজবাজি তাস।

পঁচিশ বছর গেল ক্লান্ত চোখে, পায়ে হেঁটে হেঁটে,
জীবনের ভাঙা ঘাটে জমে আছে শ্যাওলার দাগ;
এখনো খুলিনি খাম, রেখে দিছি জামার পকেটে,
কি জানি কি লেখা আছে: এতোটুকু স্নিগ্ধ অনুরাগ!

পঁচিশ বছর ধরে মেঘে মেঘে রঙধরা ভোরে
ছুঁয়েছি সবুজ খাম: তোমাকে ত' রোজ মনে পড়ে।

সভাপতি

শ্রীসুবোধ বসু

বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ নেহাত বেড়াইতে বেড়াইতে নিউ মার্কেটের সদর ফটকের কাছে উপস্থিত হইয়াছি, হঠাৎ পূর্ণদার সঙ্গে দেখা।

বহু বৎসর পরে কলিকাতা আসিয়াছি। পুরাতন স্থান ও পরিচিত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ ঝালাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় পূর্ণদার মত বহুদিনের চেনা লোকের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকার আনন্দের বিষয়। ছাত্রজীবনে তাঁহার সাগরেদী করিয়াছি, তাঁহার বকুনি খাইয়াছি, তাঁহার হুকুমে উৎসব-অনুষ্ঠানের বহু ফাই-ফরমাশ খাটিয়াছি এবং তাঁহার অনুগ্রহকে পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করিয়াছি। বয়সে আমাদের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়, কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের উপর তিনি তখন যে কর্তৃত্ব চালাইতেন, বয়সের পার্থক্য দিয়া তার ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর মধ্যে একটা সহজাত কর্তৃত্ব ক্ষমতা এবং গাম্ভীর্য্য ছিল; কর্ম্মদক্ষতাও ছিল আশ্চর্য্যজনক। মিটিং ডাকিতে, সাব্-কমিটি গঠন করিতে, থিয়েটার জলসার ব্যবস্থা করিতে, প্রতিবাদ-দিবসের শোভাযাত্রা বাহির করিতে তিনি অপরিহার্য্য ছিলেন। ছাত্রজগতে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

এইসব হাঙ্গামা পোহাইতে তাঁর পড়াশুনার কম ক্ষতি হইত না। অনেকবার তিনি পরীক্ষা দেন নাই, তবে পরীক্ষা দিয়া কখনও ফেল করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। জোর করিয়া বলিতে পারিব না, তবে বোধ হয় এম-এটাও তিনি পাস করিয়াছেন। জোর করিয়া শুধু এইটুকু বলিতে পারি, আমাদের ছাত্রজীবনে এবং তার পরবর্ত্তী বেকার-জীবনে তাঁহাকে ছাত্রজগতে অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন, এবং বহু সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব করিতেছেন, কাগজে পড়িয়াছি। এমন অবলীলাক্রমে যিনি সর্ব্বত্র কর্তৃত্ব করিতে পারেন এবং এত দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারেন যে, তিনি এতদিনে কেন একটা 'কেষ্টবিষ্টু' হইলেন না, ইহা আমার কাছে আশ্চর্য্য মনে হয়।

'আরে কে, অজিত না?' পূর্ণদার ক্ষণকালের বিভ্রান্ত দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

'হ্যাঁ, পূর্ণদা। আমিই।' আমি কাছে আগাইয়া গিয়া কহিলাম, 'বহুকাল পরে কলকাতায় ফিরেছি। অনেক চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তা ভাবতে পারি নি। কাগজে তোমার এক্টিভিটিজ-এর খবর কিছু কিছু দেখি...'

'আর বল কেন!' পূর্ণদা প্রায় প্রশ্রয়ের কণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু এই তুচ্ছ প্রসঙ্গটা আর টানিতে দিলেন না। তারপর কোথায় আছ, কি করছ, কত মাইনে পাও?...'

সংক্ষেপেই তাঁর প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব দিলাম।

'দেড় হাজার টাকা!' পূর্ণদা কহিলেন, 'তা নেহাত কম নয়। একটু দূরের পাল্লা বটে, কিন্তু সবাই কলকাতা আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলবে কেন...এসেছিলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলে। প্রফেসর গুডউইন্ এসেছেন কলকাতায়—বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট—আমাদের পরিষদে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলাম, তাঁর চিঠি পেয়েই ব্যবস্থাটা পাকা করে গেলাম। সেই সুযোগে হগ্ মার্কেট থেকে ছেলেদের জন্য কিছু ফুল আর মালাও কিনে দিয়ে গেলাম। নেপালের মহারাজা আসছেন আজ কলকাতায়, জওয়ান সঙ্ঘ থেকে হাওড়া ষ্টেশনে তাঁকে সংবর্দ্ধনা জানানো হবে। নিজে যেতে পারব কি না বলতে পারছি না, আরও কয়েকটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে, তবে ব্যবস্থায় যাতে কোনই ত্রুটি না থাকে, সেটা দেখে দিতে হয়...এই ছেলেরা, যাও, তোমরা সরাসরি সঙ্ঘে চলে যাও, মণ্টুকে বল, সে যেন যাদের যাদের নেবার সঙ্গে নিয়ে আধঘণ্টা আগেই ষ্টেশনে হাজির থাকে—কুমার শীর্ষেন্দুর গাড়িটা যেন চেয়ে নেয়, আমি টেলিফোন করে বলে রেখেছি...'

একেবারে 'টিপিক্যাল' পূর্ণদা! চাহিয়া দেখিলাম অদূরে তিন-চারি জন যুবক সাদা কাগজে জড়ানো এক গাদা ফুল ও মালা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ণদার ঠিক এই ধরণের সাগ্‌রেদী আমরাও পনের বছর আগে করিতাম। আমরা সরিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু পূর্ণদার কর্তৃত্ব আগের মতই অটুট রহিয়াছে। নূতন সাগরেদের তাঁর কোনই অভাব হয় নাই।

'দশ-পনের মিনিট নষ্ট করলে তোমার মারাত্মক কোন ক্ষতি হবে না তো, পূর্ণদা?' তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা বিদায় হইলে আমি কহিলাম। 'বহুকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা। এস কোথাও বসে চা খেতে খেতে একটু গল্প করি।'

পূর্ণদা একটু যেন দ্বিধা করিলেন। একবার রূপোর হাত-ঘড়িটায় সময় দেখিলেন, তারপর কহিলেন, 'ঠিক আছে।

চল, ক'মিনিট তোমার সঙ্গে কাটিয়ে যাই।...আমার পৌনে এগারটায় গেলেই চলবে...'

পুরাতন বন্ধু বলিয়াই অনুগ্রহ করিলেন, তাহা বুঝিতে একটুও কষ্ট হইল না। আমি তাঁহাকে সমাদর করিয়া লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের এক সম্ভ্রান্ত রেস্তোরাঁয় লইয়া গেলাম।

একটি জিনিষ আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি। পূর্ণদার সাজসজ্জা কোনও দিনই ভাল ছিল না। ছাত্রজীবনে তাঁহাকে একটা রঙীন খদ্দরের পাঞ্জাবি এমন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিতে দেখিতাম যে, কখনও কখনও সন্দেহ হইত, তাঁহার আর দ্বিতীয় জামা নাই। পায়ের জুতাও ইহার অনুরূপ শ্রেণীর ছিল—অর্থাৎ, সস্তা এবং বিবর্ণ। বস্তুতঃ তাঁহার আর্থিক অবস্থা যে সচ্ছল ছিল না, ইহা বুঝিতে কষ্ট হইত না। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানিতাম না। তিনি কোথায় থাকেন, তাঁর বাপ-খুড়া কি করেন, দেশ কোথায় এসব কাহারও যথেষ্ট জানা ছিল কিনা, জোর করিয়া বলিতে পারিব না। তাহার প্রয়োজনও ছিল না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এমন প্রখর উজ্জ্বল ছিল যে, অন্য কিছু কাহারও নজরে পড়িত না; নিজের পরিচয়েই তিনি সবিশেষ পূর্ণভাবে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর সাজসজ্জার এখনও কোনও উন্নতি বা পরিবর্ত্তন হয় নাই, লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণই উদাসীন। ইহা লইয়া যে তাঁর কোনও রকম সঙ্কোচ নাই, তাহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান বাড়িল বৈ কমিল না। দামী রেস্তোরাঁর আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে আধময়লা ধুতি, বিবর্ণ পাঞ্জাবি এবং খয়েরি রঙের ক্যাম্বিসের জুতা তাঁহার কোনই অসুবিধা ঘটাইল না। অবলীলাক্রমে তিনি হুকুম ফরমাশ করিলেন, সহজ মর্য্যাদার সঙ্গে প্রয়োজনমত চা ঢালিয়া লইলেন ও পেষ্ট্রিতে কামড় দিলেন। ফ্যাশান-দুরস্ত জায়গায় খানা খাইতে তিনি অভ্যস্ত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম।

'দাম কিন্তু আমি দেব'—খাওয়ার পাট চুকাইয়া প্রথমেই তিনি আমাকে নিম্নস্বরে কহিলেন।

'পাগল, তাও কখনও হয়।' আমি সাতঙ্কে প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম। 'আমিই আপনাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম; এ অধিকার আমার।'

পূর্ণদা পীড়াপীড়ি করিলেন না। এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা, তুমিই দাও।...চল, এবার উঠে পড়ি। এগারোটায় মিসেস ব্যানার্জ্জির কাছে যাব বলেছি—তাঁদের সমিতি থেকে কি একটা চ্যারিটি অনুষ্ঠান করছেন, তাই ডেকে পাঠিয়েছেন।...সময়টা আমি যথাসম্ভব রাখি, ভাই। আচ্ছা চলি, কেমন? অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় আনন্দ হ'ল...'

সংক্ষেপে আমার কাছে বিদায় লইয়া পূর্ণদা একটু তাড়াতাড়িই চৌরঙ্গির দিকে পা চালাইলেন।

কুড়ি বৎসর বয়সে যেমন ছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও তেমনি আছেন। জগতের সকলের কাজে মাথা ঘামাইতে-ছেন, সকলকার হইয়া খাটিতেছেন। মিটিং ডাকিতেছেন, সভাপতিত্ব করিতেছেন, নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছেন। বয়সের সঙ্গে গাম্ভীর্য্য, বাক্যালাপে ও আচরণে মর্য্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। তবে আর্থিক দিকে বিশেষ কোনও উন্নতি হই-য়াছে, এমন বোধ হইল না।

কলিকাতায় প্রধানতঃ এক মাসের ছুটি উপভোগ করিতে আসিলেও দু'একটি কাজও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম। বিখ্যাত লোহ ব্যবসায়ী হৃষীকেশ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তার একটি। সিনেমার আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া একদিন সন্ধ্যায় তাঁর পাথুরিয়াঘাটা লেনের চক্‌মিলানো পৈতৃক বাটীতে হাজির হইলাম। হৃষীকেশবাবু আমাদের বড় কন্‌ট্রাক্টর; খবর পাইয়া তিনি নীচের বৈঠকখানায় আসিলেন। আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া তিনি আর নীচে নামেন না; এটি আমার প্রতি বিশেষ খাতির। আদর-আপ্যায়নে যেন সারা বাড়ীটাই সরগরম হইয়া উঠিল।

কন্‌ট্রাক্ট, বিল পেমেণ্ট এবং ব্যবসাসম্পর্কিত বহু আলোচনার পর বৃদ্ধ হৃষীকেশ কহিলেন, 'সত্যি, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আপনার সম্মানে গ্রেট ইষ্টার্ণে একটা লাঞ্চ পার্টির ব্যবস্থা করি—চেম্বারের অনেকের সঙ্গে আপনার দেখাশোনা হতে পারবে—আপনি প্রথমেই আপত্তি তুললেন—এতে কিছু দোষ নেই। এ একটা সম্মান দেখান ছাড়া আর কিছু নয়। এতে আমার ব্যবসাগত কোনও সুবিধে হবে মনে করব, এমন আহাম্মক আমি নই। আপনার কাছ থেকে নানা রকম অনুগ্রহ পাই, সেই ঋণ পরিশোধ করতে হলে...'

তাঁহার বিনয়ের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও এই আপ্যায়নের ব্যবস্থায় রাজী হইলাম না।

'তা হলে একদিন আমাদের চেম্বারেই আসুন। লোহার ব্যাপারীদের অনেক 'গ্রিভান্স' আপনাদের কাছে জানবার আছে—যখন কলকাতায় এসেছেন, তখন স্বকর্ণে শুনে যান। দিল্লীতে ছুটোছুটি করে আমরা হয়রান হই, অথচ আমাদের বক্তব্যটা আপনাদের ঠিকমত বোঝাতে...'ওহে, কে যাচ্ছ?

হাঁ, তোমাকেই ডাকছি, শুনে যাও...' কথার মধ্যে ছেদ টানিয়া হৃষীকেশবাবু বাহিরের বারান্দার দিকে হাঁক ছাড়িলেন।

আহূত ব্যক্তি দরজার কাছে জুতা খুলিয়া বিনয়ে মুখ নীচু করিয়া সসম্ভ্রমে ঘরে ঢুকিল।

'তোমাকে মিলার কোম্পানীর হিসেবটা চেক করে রাখতে বলেছিলাম, আজ পর্য্যন্তও হ'ল না কেন?' হৃষীকেশবাবু ধমকাইয়া উঠিলেন।

'ব্যাপারটা এতটা জরুরি বুঝতে পারি নি, সর্।...' ...সরকার মশায় বললেন কি...মানে, আমি মনে করলাম...'

কয়েক মুহূর্ত্তের নৈঃশব্দ্যের পর ভীত-কম্পিত নিম্নকণ্ঠের অসমাপ্ত জবাব। এইবার চমকিয়া তাড়াতাড়ি সেই ব্যক্তির দিকে তাকাইলাম। স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। নত মস্তক, নগ্ন পদ, কৈফিয়ত-ভীত লোকটি পূর্ণদা। সভয়ে দৃষ্টি সরাইয়া অন্য দিকে চাহিলাম। প্রাণপণে পরবর্ত্তী জবাবদিহি না শুনিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত চোখো-চোখিটা আটকাইতে পারিলাম না।

'যত সব বাজে কৈফিয়ত। যাও।' হৃষীকেশ বাবুর সম্মতিসূচক ধমকটা শুনিয়াছিলাম। তবু আরও আধ মিনিট অপেক্ষার পর তবেই দরজার দিকে তাকাইতে সাহস করিলাম। পূর্ণদাকে যেন আর না দেখিতে হয়। কিন্তু তাঁকে এড়ানো গেল না। সভয়ে দেখিলাম, চোরের মত পূর্ণদা দরজার দিকে পলাইয়া যাইতেছেন। একবার ভাবিয়াছিলাম, নেকটাই-কোট পরা আমাকে হয়ত চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু সে অনুমান বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। চৌকাঠ ডিঙাইবার সময় ঘাড়টা পোয়া ইঞ্চি ঘুরাইয়া পূর্ণদা আড়চোখে একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পলকে চোখাচোখি হইয়া গেল।

'আজকাল কারুর উপরই যদি কিছুর জন্য আপনি নির্ভর করতে পারেন'—হৃষীকেশবাবু বাক্যালাপের ছেদের কৈফিয়ত এবং উপরোক্ত ঘটনার উপসংহার হিসাবে মন্তব্য করিলেন। 'দেশ থেকে দায়িত্বজ্ঞান একেবারে বিদায় নিয়েছে...'

'আপনার কর্ম্মচারী ইনি?' আমি প্রশ্ন করিলাম।

'ঠিক কর্ম্মচারী নয়।' হৃষীকেশ বাবু কহিলেন। 'ওর বাবা আমার গোমস্তা ছিল; সেই সুবাদেই এখানে আছে। কাজকর্ম্ম কিছু করে না, কেবল টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। ...আমার এখানেই দুবেলা চারটি খায়, কখনও দু'পাঁচ টাকা হাত-খরচা নেয়। কখনও-সখনও আমি ইংরেজীতে দু'চারটে চিঠি-পত্র লেখাই; খুব বেশী টাকার বিল থাকলে সময় সময় একে দিয়ে তা চেক্ করিয়ে নিই। শত হোক, এম-এ-টা পাস করেছিল।...দিন না, সর্, কোনও একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে। এত লোকের সঙ্গে জানাশোনা, কারুর কাছে যদি হতভাগা একটা চাকরি-বাকরি চাইবে...'

বেচারি পূর্ণদা! তাঁর এই শোচনীয় রূপান্তর দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চিরকাল তাঁর মর্য্যাদা-দীপ্ত, ব্যক্তিত্ব-উজ্জ্বল নেতৃসুলভ রূপ দেখিয়াছি। পরপদানত অন্নদাসের চেহারা এই প্রথম দেখিলাম। যেন মার খাইলাম। সিনেমায় না গিয়া কেন হৃষীকেশ বাবুর কাছে আসিয়াছিলাম, তাহা ভাবিয়া আন্তরিক অনুতাপ হইতে লাগিল।

নিজের যে মর্য্যাদা পূর্ণদা এতদিন এতটা অসহায়তার মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আমার মত তাঁর গুণ-গ্রাহী বন্ধুর কাছে এমন পরিপূর্ণ ভাবে ধূলিসাৎ হইতে দেখিয়া তাঁহার ভীত মুখে যে অপরিসীম লজ্জার ছাপ অঙ্কিত হইতে দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। এত অপমান-কর অবস্থার মধ্যে কি করিয়া তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে সগৌরবে বাঁচাইয়া রাখিতেন?

আমার ছোট শ্যালক সুনীল কলেজে পড়ে। ফলে তার কলা ও সংস্কৃতি চর্চ্চার উৎসাহটা কিছু বেশী। সে আসিয়া কহিল, 'অজিতদা, আপনি ত একজন কালচার্ড লোক। আমার সঙ্গে আজ আপনাকে সিনেমায় যেতে হবে। ফরাসী ভাষার ছবি বলে দিদিরা কেউ যেতে চাইছে না। যাবেন ত?...'

'না যেয়ে উপায় কি?' আমি কহিলাম, 'নিতান্ত দয়া দেখিয়ে তোমার সমশ্রেণীভুক্ত করেছ, এখন কি আর নিজেকে বর্ব্বর বলে প্রতিপন্ন করতে পারি...'

'আর তার আগে এলবার্ট হলের কফি-হাউসে আপনাকে আমি কফি খাওয়াচ্ছি।'

'তাতেও রাজী আছি।' আমি কহিলাম, 'সব কালচার্ড লোকই কফি পান করে থাকে...'

'তামাশা করবেন না। পাঁচটায় রেডি থাকবেন।' বলিয়া সুনীল অন্য কাজে প্রস্থান করিল।

পাঁচটার আগেই কিন্তু সে আমাকে জোর তাড়া দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া ছাড়িল। কফি-হাউসের কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম, লোকে লোকারণ্য। ব্যাপার কি?

'এ তল্লাটের সব লোকই দেখছি কফি-মাহাত্ম্য টের পেয়েছে!' আমি আমার হোষ্ট মহাশয়ের উদ্দেশে কহিলাম।

'সব এলবার্ট হলের মিটিঙে যাচ্ছে।' এক সেকেণ্ড পরে ব্যাপারটা বুঝিয়া সুনীল কহিল, 'ঐ যে কেমি জ থেকে কে

একজন বিখ্যাত প্রফেসর এসেছেন না—কি জানি নামটা ? —ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এক্সক্যাভেশন করে বেড়াচ্ছেন —তিনি বক্তৃতা দেবেন। কলেজের নোটিশ-বোর্ডে নোটিশ দেখেছিলাম।···চলুন না, একবার ভদ্রলোকের চেহারাটা দেখে আসি, হাতে এখনও অনেক সময় আছে···।

'তথাস্তু।'

তাহাকে অনুসরণ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। দলে দলে ছাত্রেরা চলিয়াছে। বহু সুপরিচিত অধ্যাপককেও দেখিতে পাইলাম। বক্তার প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য্য।

হলের ভিতর আর একটা বেঞ্চিও খালি নাই। আমরা বসিতে আসি নাই, বসিবার চেষ্টাও করিলাম না। পিছন হইতে আলোকিত ডায়াসের উপর উপবিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তাকে চিনিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম।

বছর ষাটেকের লম্বা পাতলা ইংরেজ ভদ্রলোক মাল্য-বিভূষিত হইয়া বসিয়া আছেন। বক্তৃতার নোট লেখা কাগজটি পাকাইতেছেন। আর তাঁহার ঠিক পাশেই সভাপতির প্রকাণ্ড চেয়ারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন আমাদেরই পূর্ণদা! হাত-ঘড়িতে সভারম্ভের ঠিক সময়টির দিকে নজর রাখিয়াছেন। আশ্চর্য্য সম্ভ্রান্ত, সুপ্রতিষ্ঠ, মর্য্যাদা-দীপ্ত গম্ভীর-সুন্দর মূর্ত্তি।

'এঁকে চেন ?' আমি সভাপতির প্রতি সুনীলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

'বাঃ রে, পূর্ণবাবুকে আর কে না চেনে!' সে কহিল, 'সেবারে এক মিটিংএ আমাদের পলিটিক্সের প্রফেসরকে যা একখানা দাবড়ি দিয়েছিলেন···'

কী বা আসে যায় ?

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যার অন্তরে করে বাস গোপাল সখী,
পুছে কে তারে—সে মন্দিরে যায় বা না যায় ?
যার ঝঙ্কারে বঁধু নাম মধু হৃদয়ে
কী বা আসে যায় তীর্থে সে ধায় বা না ধায় ?

জপে জীবনে যে নিতি হরি-মিলন আশা,
শুধু হরিদরশন যার চিরপিপাসা
যার মর্ম অতলে প্রেম অমৃত উছল
সুধা অধরে সে ধরে বা না ধরে—কে শুধায় ?
হরিপদে যে সঁপিল তার আমি ও আমার
করে বা না করে কোটিদান—কী বা আসে যায় ?

ফিরে ভবে নিতি যে প্রেমের পাগল সাজে,
লোক লাজ ভয় হারায়ে যে অটল রাজে ;
পেল দীক্ষা যে একবার প্রেমমন্ত্রে,
পড়ে বেদ বা না পড়ে সে—কী কাজ সে কথায় ?
এল যে হরির দ্বারে—রাজসিংহ তোরণ
তার তরে খুলে বা না খুলে—কী বা আসে যায় ?

মধু বৃন্দাবনের শুধু যে পুরবাসী
হরিদাসের একান্ত যে সেবিকা দাসী
ধরে সাধুর চরণধূলি যে মাথায় তার
পরে সে তিলক বা না পরে—কে দেখিতে চায় !
গায় মুখে রাধাশ্যাম নাম যে সদাসুখে
পরে নামাবলী বা না পরে—কী বা আসে যায় ?

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সমাধি-প্রাপ্ত হিন্দী ভজনের অনুবাদ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

চাষীর মেয়ে
শ্রীশৈলী মুখোপাধ্যায়
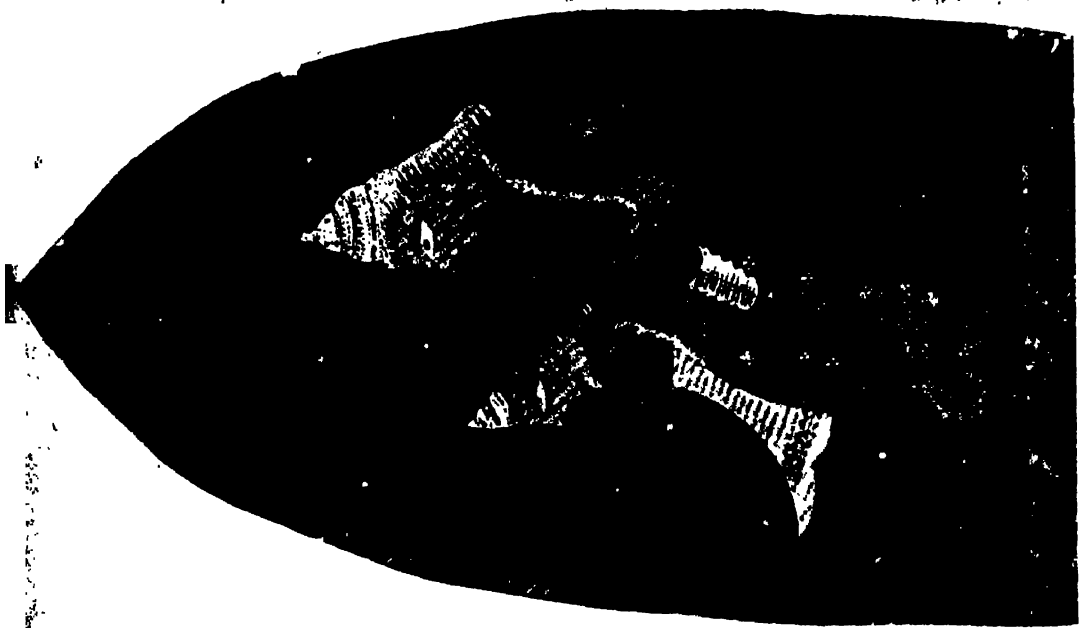
তিন বোন শিল্পী : শ্রীঅমলকুমার দত্ত

নব পরিণীতা শিল্পী : শ্রীঅমলকুমার দত্ত
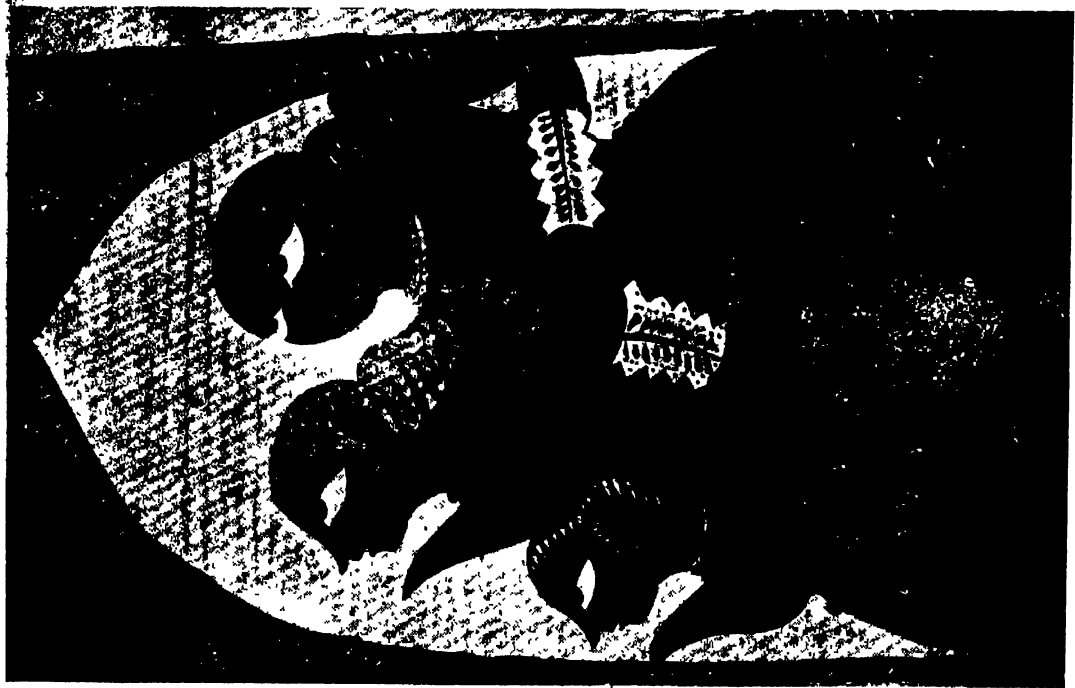
বৃহন্নলা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

কোন্ অভিশাপ-বহ্নির জ্বালা
ফিরি নিশিদিন বক্ষে ধরি'
তনুর লজ্জা ঢাকিবারে শুধু
নারীর সজ্জা নিয়েছি বরি'।
গাণ্ডীবহারা অর্জ্জুনে কে-বা চিনিবে আর ?
অ-পুরুষ করে উঠে না কো হায় সে-টঙ্কার !
শিয়রে আমার রচে মায়াজাল
শুক্লা যামিনী রূপোজ্জলা,
অতীত জীর্ণ-পত্র-শয়নে
আমি জেগে রই বৃহন্নলা !

আসে একে একে মনোমন্দিরে
প্রেয়সী-রূপিণী কত না নারী,
শিহরি' লাজে ফেলে যায় তারা
বেদনা-তপ্ত অশ্রুবারি !
ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর মিলায় দূরে,
জেগে ওঠে মরু জীবনের শেষ প্রান্ত জুড়ে,
কালবৈশাখে কালো মেঘে ঢাকে
মধুমাধবীর চন্দ্রকলা,
অতীত-জীর্ণ-পত্র-শয়নে
আমি জেগে রই বৃহন্নলা !

চির-চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণ
মন্দার-তরু-ছায়ার তলে
রূপালী রেখায় আঁকে আলিপনা
অভিসার-পথে খেলার ছলে,
কোন্ অপ্সরী গোপনে ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
হরি-চন্দন-লিপ্ত তনুর শিথিল বাস,
মণি-কঙ্কণে ওঠে নিক্কণ
বাজে শিঞ্জিনী চরণ-পাতে,
কোন্ করভোরু মদির-নয়না
দাঁড়াল আসিয়া শুক্লারাতে !

চারু কজ্জলে নীল আঁখি জলে
অধরে খলিছে মধুর হাসি,
বীণানিন্দিত কণ্ঠকাকলী
মৃদু সমীরণে উঠিল ভাসি'—
"হে সুর অতিথি, মানবী-প্রণয়ে রয়েছ ভোর,
অমরীর গলে দিবে না পরায়ে প্রেমের ডোর ?
লভিবে না স্বাদ অপ্সরী-মুখ-
চুম্বন-সুধা রভস বশে ?
অভিসার মোর সার্থক কর
তোমার মর্ত্ত্য প্রণয় রসে।

প্রণয়োচ্ছ্বাসে মোর নিশ্বাসে
মলয় বাতাস নিত্য বহে,
আমারি উতল তনুর স্বর্গে
চির বসন্ত লুকায়ে রহে,
মোর চুম্বনে পারিজাতবনে ফুটাই কলি,
কামনা-মন্দিরে-নিশাতে সাজাই রূপাঞ্জলি,
আমারি চরণে তূণহারা স্মর
লুটায় আহত আপন বাণে,
আমারি কপোল-স্বেদকণা ধরি'
শুক্তির বুকে মুক্তা আনে।

সুন্দর মম যৌবন চির-
রূপ-হিন্দোলে ত্রিকালজয়ী,
কেলি-চঞ্চলা, স্খলিতাঞ্চলা
আমি যে মোহিনী লালসাময়ী !
মোর প্রসাধনে নর্ম্ম-মুকুর-আলোকপাতে
ছায়াপথখানি হয় যে উজল তিমিররাতে,
লীলা-উত্তরী সন্ধ্যা-উষায়
ওড়ে দিগন্ত-সঞ্চারিণী,
আমারি অঙ্গ-চন্দন লভি'
সুরভি হয়েছে মন্দাকিনী !

স্নিগ্ধ-সজল মেঘের বাসরে
রূপ-পালঙ্কে এলায়ে তনু,
আমারি মুখের হাসির লহরে
সৃজি বিচিত্র ইন্দ্রধনু !
লাস্য-চপল নৃত্যমুখর চরণ হ'তে
নূপুরের মণি খসেছে উল্কা-আলোকস্রোতে,
যে গীতি গেয়েছি অমরসভায়
যৌবন-মধু-নিঃসরণী
বনমর্ম্মরে গিরি নির্ঝরে
শোন নি কি তার প্রতিধ্বনি ?

শুভ্র কুহেলি-আবরণে দেখ
উতলা হয়েছে রূপালী নিশা,
পারিজাত-বন-সৌরভ লভি'
বাড়িয়া উঠেছে তনুর তৃষা !
নূপুরের তালে সুরসভাতলে বেজেছে বীণা,
আঁখি কটাক্ষে তোমারে বরেছি লজ্জাহীনা,
উর্ব্বশী আমি চিরযৌবনা,
বিশ্বমোহিনী, নিখিলপ্রিয়া,—
অভিসার মোর সার্থক কর
তোমার অঙ্গ-পরশ দিয়া !"

উঠিনু চমকি' শুনি' সে-কণ্ঠ,
করযোড়ে কহি—"করিও ক্ষমা,
মোর বংশের পূর্ব্ব-পুরের
ছিলে একদিন মানস-রমা,
জানি যৌবন চির-অম্লান তোমার দেহে,
প্রেমে আহ্বান করিও না মোরে, করিও স্নেহে।
ক্ষণিক-অতিথি আমি সুরলোকে
এ কি পরীক্ষা আমায় দেবি ?
চিরপ্রণম্যা তুমি যে আমার
আমি যে শুদ্ধ ও-পদ সেবি' !

অতি নগণ্য গাণ্ডীবধারী
নর আমি করি মর্ত্ত্যে বাস,
তুমি স্বর্বধূ রূপে অনুপমা
কেন মোরে কর এ উপহাস ?
পূজনীয়া তুমি, বরণীয়া তুমি অর্জ্জুনের,
তোমারি আশিস কাম্য যে মম অন্তরের !
প্রেম-চঞ্চলা-রূপে কেন মোরে
অপরাধী কর বরাঙ্গনে
স্নেহবৎসলা হও তুমি দেবি,
ছলনা কোরো না এ মূঢ় জনে !

হিল্লোল তুলি' তনুবল্লরী
যেন ঝটিকায় উঠিল কাঁপি',
দৃপ্ত নয়নে রহে উর্ব্বশী
কুন্দ-দন্তে অধর চাপি' ।
বঙ্কিম গ্রীবা হেলায়ে দর্পে ফণিনী-প্রায়
অগ্নিদহকে বিষ-ফণা যেন হানিতে চায়,
ছিঁড়ি কণ্ঠের মন্দারমালা
মণি-কঙ্কণ-ঝনৎকারে
"ক্লীব হয়ে রও"—কহি উর্ব্বশী
রহিল না সে-গৃহ দ্বারে !

নিভে গেল চোখে শুক্লা যামিনী,
থেমে গেল যেন সুরভি বায়ু,
তুষার-প্রবাহ অসাড় করিল
অস্থি-মজ্জা-শোণিত-স্নায়ু,
এ কি অভিশাপ দিলে তুমি মোরে হে সুন্দরি,
এ হীন লজ্জা কোথায় রাখিব গোপন করি' ?
তুমি রূপময়ী চিরযৌবনা
কাল-তরঙ্গে অচঞ্চলা,
অতীত-জীর্ণ-পত্র-শয়নে
আমি হেথা জাগি বৃহন্নলা !

শ্রমিক সমাজের বনিয়াদ

আচার্য বিনোবা

অনুবাদক শ্রীকমলা ঘোষ

আজ আমরা এক বিশেষ স্থানে এসেছি। এটা শ্রমিক নগরী। এই রকম শ্রমিক-নগর আরও দশ-বিশটি আছে। তাদের মধ্যে এটি একটি। কিন্তু আমি ত সমস্ত জগৎকেই শ্রমিক-নগরী বলি, কারণ দুনিয়াতে যত আসল কাজ হয় শ্রমিকেরাই সে সবের বনিয়াদ। শ্রমিকদের শারীরিক শ্রম ছাড়া কোনও জিনিষ হয় না। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য বহু জিনিষ শ্রমিকদের শ্রমে উৎপন্ন হয়। অতএব মানব সমাজের বনিয়াদ শ্রমিকদের শারীরিক শ্রম। তাই আদর্শ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু-না-কিছু কায়িক শ্রম না করে অন্ন গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কারও শরীরে শক্তি বেশী, কারও কম, কিন্তু প্রত্যেকের শক্তি অনুযায়ী শ্রম করা উচিত। কিন্তু তা এক রকমের হবে তা নয়, নানা প্রকারের হবে। কিছু মানসিক কাজও করতে হবে। মানসিক শ্রম ও শারীরিক শ্রম উভয়কেই সমান ভাবতে হবে। সেরূপ আর্থিক মূল্যও তাদের সমান হবে আর আধ্যাত্মিক যোগ্যতাও সমান হওয়া উচিত। কোনও লোক দৈহিক শ্রমে দ্রব্য উৎপাদন করে। দ্বিতীয় কেউ তা অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। তৃতীয় কোনও ব্যক্তি তার গুণ বৃদ্ধি ও পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে চেষ্টা করে। এরূপ বিবিধ প্রকারের শ্রম-বিভাগ থাকবে। কিন্তু মূল্য ও যোগ্যতা তাদের সমান হবে।

মেথর ও মন্ত্রীর গুরুত্ব সমান—মেথর যদি তার কাজ ভালরূপে না করে, তা হলে সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। তার কাজ সমাজের পক্ষে খুবই দরকার। শিক্ষকের কাজ শিক্ষা দেওয়া। যদি তিনি ঠিকভাবে কাজ না করেন তবে জ্ঞান প্রচার হবে না আর সমাজের বিকাশের ধারা রুদ্ধ হয়ে যাবে। মন্ত্রীর কাজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, শ্রমিকের কাজও তদ্রূপ। যার যেমন যোগ্যতা সে তেমন কাজ করবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সব কাজেরই আধ্যাত্মিক মূল্য সমান হবে। মেথর যদি নিষ্ঠার সহিত তার কর্তব্য করে, কাজের উপকরণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে; আর নিষ্কাম-ভাবে কর্ম করে যায় তবে মোক্ষ ত তার হাতের মুঠোর মধ্যে। মন্ত্রী মেথর থেকে শ্রেষ্ঠ নন। কর্ম-শক্তিতে দু'জনেই সমান। আধ্যাত্মিক শ্রেয়ঃও উভয়েরই সমান। বুদ্ধি যার নিঃস্বার্থ নয়, নিষ্কাম নয় তাকেই যোগ্যতার দিক থেকে হীন মনে করতে হবে। নিরহঙ্কার হয়ে যে কোনও কর্তব্য করা যাক্ না কেন তাই শ্রেষ্ঠ কর্ম বিবেচিত হবে আর তা থেকেই মোক্ষলাভ হবে। ইহা গীতার কথা, আমাদের ধর্মগ্রন্থের কথা :

> স্বে স্বে কর্মণি অভিরতঃ
>
> সংসিদ্ধিম লভতে নরঃ

এর অর্থ এই : যে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম করবে সে মুক্তিলাভ করবে। এ আদর্শ ভগবান আমাদের দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক সমতা বলতে সাফ একথাই বুঝায় যে সামাজিক ও আর্থিক মূল্য সমান হওয়া চাই।

আজ ত মন্ত্রী ও মেথরের কাজের মান কম-বেশী ধরা হয়। আর বেতনও কম-বেশী দেওয়া হয়। ইহা ন্যায়সঙ্গত নয়। ন্যায়-সঙ্গত যদি হ'ত তবে মেথর অপেক্ষা মন্ত্রীর ক্ষুধা হ'ত অধিক আর তিনি পেতেনও পরিমাণে বেশী। কিন্তু যোগ্যতার দৃষ্টিতে এই যে কমবেশী আর্থিক মূল্যায়ন করা হয়, তা ঠিক নয়। কোন লোকের কর্মকে যদি আমরা গৌরবজনক মনে করি, আর সে কর্মের মূল্য যদি আমরা পয়সায় দিতে যাই তবে সেই লোকের অসম্মান করা হবে। তার কাজের জন্য তাকে বেশী পয়সা দেওয়ার অর্থ পয়সাকে ভগবানের আসন দেওয়া। যে সকল লোক তা করে, তারা ভগবানের উপাসক নহে, তারা পয়সার উপাসক। কারও মূল্য পয়সায় নিরূপণ করা—মানবতার অপমান করা। নিষ্কাম বুদ্ধিতে কৃত সেবার মূল্য পয়সায় নির্দ্ধারিত হতে পারে না—সে সেবা শারীরিক বা মানসিক যে কোন শ্রমেই করা হউক। তা যদি সেবা-ভাব থেকে করা হয় ত সেটা নৈতিক বিষয়ের পর্যায়ে উন্নীত হয়। তার মূল্য পয়সায় নিরূপণ করা যায় না। এক ঘণ্টায় কত মিনিট এ প্রশ্ন করলে লোকে বলে ষাট মিনিট। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এক মাইলে কত মিনিট, বা এক ঘণ্টায় কত গজ ত তার আপনি কি উত্তর দেবেন? একটির সঙ্গে অপরটির কোন সম্বন্ধ নাই। মিনিটকে গজে পরিবর্তিত করা সম্ভব নয়। দুটো জিনিষ যদি একই শ্রেণীর হয় তবেই পরিবর্তন সম্ভব। তদ্রূপ কাজের মূল্য পয়সায় নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

কাউকে ডুবতে দেখে কোনও লোক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটিকে উদ্ধার করলেন। এ কাজে তাঁর দশ মিনিট সময় লেগেছে। এর মূল্যায়ন আপনি কি পয়সায় করবেন? সেবার মূল্যায়ন করা যায় না। নৈতিক বিষয়ের মূল্য পয়সায় নির্দ্ধারণ করা যায় না। ধরুন এক ঘণ্টা কাজের মূল্য ছ' আনা। ঐ ব্যক্তি সেই কাজে দশ মিনিট ব্যয় করেছেন, তবে কি তাঁকে আমরা এক আনা দেব? আমাদের কোনও মন্ত্রী যদি নিষ্কাম ভাবে আমাদের সেবা করেন আর তাঁর ঐ কাজের মূল্য হিসাবে তাঁকে দু' হাজার টাকা মাসে দেওয়া হয় ত তাঁকে অপমান করা হবে। নৈতিক বিষয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ টাকা-আনা-পাইয়ের অঙ্কে করা যায় না। এ কথাও ঠিক যে তাঁকে উদরপূর্তি ও পরিবার পোষণের জন্য প্রয়োজনমত দিতে হবে। তেমনি মেথরকে তার প্রয়োজন অনু-সারে বেতন দিতে হবে। সোনা, রূপার মুদ্রা দিয়ে নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক বস্তুর মূল্য নিরূপণ করতে যাওয়া ভুল। পুঁজিবাদী মুদ্রায় সব কিছুর মূল্যায়ন পুঁজিবাদী সমাজের বেসাত। মুদ্রায় সব কিছুর মূল্য নিরূপণ চলে না।

যথার্থ মূল্যায়ন—আমি বলি, সংসার শ্রমিক-নগরী। মানুষ শ্রম করে। কিন্তু আজ শ্রমের প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রম নইলে চলে না তাই শ্রম লোকে করে, কিন্তু শ্রমের মর্য্যাদা নাই। উত্তম কার্য্য করছে এ কথা সে নিজেও মনে করে না। যে সকল বুদ্ধিজীবী মানসিক পরিশ্রম করেন তাঁরা শারীরিক পরিশ্রমকে হীন মনে করেন। গত্যন্তর নেই বলে শ্রমিকেরা কায়িক শ্রমের কাজ করে অন্য উপায় থাকলে তা তারা ছেড়ে দেবেই। যে কোনও উপায়ে এ কাজ থেকে তারা অব্যাহতি পেতে চায়। কৃষকও চেয়ারে বসাটাকে গৌরবের মনে করবে। এর মানে এই যে কায়িক শ্রমের আর্থিক মূল্যায়ন কম করা হয়। মানসিক শ্রমের মূল্যায়ন করা হয় ঢের বেশী। তাই শ্রমের মর্য্যাদা নষ্ট হয়ে গেছে। আজকাল লোকে বক্তৃতায় বলে, শ্রমের মর্য্যাদা স্বীকার করতে হবে, বুঝতে হবে। কিন্তু আর্থিক মূল্য তার তেমনিই আছে। আজ শারীরিক শ্রমকে আমরা হেয় মনে করি। তাই সম্মানও কম দিই, কিন্তু এক জনের পুষ্টির পক্ষে যাহা দরকার, আর একজনের পক্ষেও ততটাই দরকার। কমবেশী হতে পারে তবে এতটা ব্যবধান হওয়া উচিত নয়। বায়ু প্রত্যেক ব্যক্তির সমান চাই। কেউ অপর কারও থেকে বেশী বায়ু গ্রহণ করে না। কিন্তু বড়লোকেরা খুব বড় বড় বাড়িতে থাকে আর শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গ থাকে কুঁড়ে ঘরে। সে কুঁড়ে ঘরে বড় জোর থাকে একটি ছোট দরজা। ঐ কুঁড়ে ঘরেই তাদের ওঠা, বসা, শোয়া সব কিছু। বায়ুর আবশ্যকতা কি তাদের কম? যদি তাই হ'ত তো ভগবান কাকেও একটি নাক, আর কাকেও দশ-বিশটি নাক দিতেন। এরূপ করা তাঁর শক্তির অতীত ছিল না। কিন্তু তা তিনি করেন নাই। প্রত্যেককেই একটি নাক দিয়েছেন, তার মানে সকলের আবশ্যকতা সমান ধরা হয়েছে। তবে আমরা এমন ব্যবধান করি কেন? খনিতে শ্রমিকদের মাটির নীচে কাজ করতে হয়। সেখানে অন্ধকার। তাই আলো ছাড়া কাজ করা যায় না। সে জন্য বিজলী আলোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেখানে খোলা হাওয়া তারা পায় না। এত সময় দূষিত বায়ুতে থাকায় তাদের শরীরের যে ক্ষতি হয় তা পুষিয়ে নেবার জন্য মুক্ত হাওয়া চলে এমন প্রশস্ত পরিষ্কার আবাসস্থল তাদের দেওয়া চাই। কিন্তু অবস্থা তার উল্টো। ভাল স্থান ত দূরের কথা, তাদের জঘন্য স্থানে থাকতে হয়। তার কারণ এই যে মানবতার দিকে মালিকদের নজর নাই। পুঁজিবাদী সমাজে পয়সাকেই বড় মনে করা হয়। বছর কয়েক আগেকার কথা। কয়েকজন লোকে গীতা প্রচারের এক উপায় বের করেছিল। তারা জানালে যে, গোটা গীতা বা তার শ্লোক যারা মুখস্থ বলতে পারবে তাদের পারিতোষিক দেওয়া হবে। পারিতোষিক দেওয়া হচ্ছিল পয়সায় বা এমনি কোন বস্তুতে। ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে ধর্ম্মাচরণ কর, ইহাই গীতার তত্ত্ব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পারিতোষিকের ব্যাপারটা এনে গীতার মূল তত্ত্বই ক্ষুণ্ণ করে ফেলা হ'ল। তোতা গীতার অধ্যায় আওড়াচ্ছে, এও তেমনি ব্যাপার! এ তো সমাজকে উচ্ছন্নে পাঠাবার পথ। এ পথে জীবন শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। এ কাজে মানবতার মূলে ছাই পড়ছে।

নূতন মূল্যের সংস্থাপন আমাদের করতে হবে। সমাজকে বদলাতে হবে। আমরা ভূদানের কাজ সুরু করেছি। এই আন্দোলন শুধু ভূমি সংগ্রহের জন্য নয়। তা ত হবেই হয়ে গেছে। তা আর নড়চড় হওয়ার নয়। পড়তে যে জানে না, বইয়ের মালিক সে হতে পারে না। তেমনি কৃষক যে নয় ভূমির মালিক সে হতে পারে না। দুনিয়া জাগ্রত হয়েছে। ভূমির বণ্টন হওয়া আবশ্যক। আর তা হবেই। ভারতবর্ষে ভূমি বণ্টন হচ্ছেই। এ কথায় যার সংশয় আছে সে মানুষ জেগে নাই, ঘুমিয়ে আছে।

শ্রম ও হাতিয়ার--প্রাপ্য ফিরিয়ে দিচ্ছেন এ বোধ থেকে আপনারা ষষ্ঠ ভাগ দিন। পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে বলেছিলেন, ধর্ম্মতঃ রাজ্য ও ক্ষমতা আমাদের। তা হলেও আমরা ঝগড়া করতে চাই না। অর্দ্ধেক রাজ্য আমাদের দাও ও অর্দ্ধেক নিজেরা রাখ। দুর্য্যোধনের তা মনঃপূত হ'ল না। তিনি বললেন, "সে বিচার রণাঙ্গনে হবে।" ধর্ম্মরাজ ভাবলেন বৃথা কেন লড়াই করি। এত ছোট জিনিষের জন্য তিনি মানবতা বিসর্জ্জন দিতে চাইলেন না। তিনি বললেন, 'ভাল, মীমাংসা করছি। আমরা পাঁচ ভাই। আমাদের পাঁচখানি গ্রাম দিয়ে দিন।" দুর্য্যোধন বললেন, "ব্রাহ্মণের মত ভিক্ষা চাও ত পাঁচখানা কেন আরও অনেক বেশী পাবে; কিন্তু অধিকার হিসাবে সূঁচের ডগায় যতটা ভূমি ধরে ততটুকুও আমি দেব না। তদ্রূপ বাবা (বিনোবা) ভিক্ষা চায় না, 'হক' বা ন্যায্য অধিকার চায়। আর এ কাজ হাসিল হবেই হবে। ভূমির মালিক ভগবান, আর কেউ নয়। তাঁর মালিকানার উপর দাবি করা অন্যায়, নাস্তিকতাও বটে। ভূমির মালিকানার ভাব আধুনিক যুগে প্রচলিত হয়েছে। তৃষিতের যেমন জল চাওয়ার অধিকার আছে, ভূমিহীনদের তেমনি ভূমি চাওয়ার অধিকার আছে। তৃষিতের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে যেমন লজ্জিত হতে হয়, তেমনি ভূমি যাঁরা দেন না তাঁদেরও লজ্জিত হওয়া উচিত। আর ভূমিহীনেরা চায়ই-বা কি? তারা তো শুধু মাটি চায়। তাতে তারা নিজের ঘাম ফেলবে, পরিশ্রম করবে, তবে পাবে। পরিশ্রমের ফল সে চায় না, চায় পরিশ্রমের উপকরণ। তাই এটা হচ্ছে তার অধিকার। আর তাকে তার 'হক' দেওয়া উচিতও বটে।

ভূদান যজ্ঞের বিশেষত্ব— ভূদান-যজ্ঞের বিশেষত্ব ভূমির বণ্টনে নয়, এর বৈশিষ্ট্য ভূমির মালিকানা ভাব যে ভুল তা সপ্রমাণ করাতে। আর এই কাজ অহিংসার দ্বারা করতে হবে।

'ভূদান' সমাজে পরিবর্ত্তন আনতে চায় ও মূল্যমান বদলাতে চায়—এখানেই 'ভূদানে'র বিশেষত্ব। ভূদান-যজ্ঞের ক্রান্তি শুধু ভূমিতেই আবদ্ধ থাকবে না। সারা জীবনে তা ব্যাপ্ত হয়ে যাবে।

মজুররা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি তো সবকিছু ভূমিহীনদের জন্য করছেন ? আমি বলি, আমি ত আপনাদের জন্যই কাজ করছি। যে-সব ভূমিহীন মজুর কৃষকদের ক্ষেতে কাজ করে তারা সবাকার নীচের শ্রেণীর। তাদের জন্যই এই আন্দোলন। সেই বেচারারা কখনও প্রতিবাদ করে না, কথা বলতেই জানে না। 'ভূদান ভূমিহীন, বাক্যহীন মজুরদের আন্দোলন। 'ভূদানে'র ফলে তাদের মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরিয়েছে। এটা যখন পূর্ণ হবে তখন সকল প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। মজুরদের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। বিনা পরিশ্রমে যাঁরা খাবেন তাঁরা হবেন লজ্জিত।

সম্পত্তির বিসর্জ্জন—ভূদান-যজ্ঞের ক্রান্তি শুধু ভূমি-বিপ্লবেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, সম্পত্তির ক্ষেত্রেও তা প্রসারিত হচ্ছে। বুদ্ধগয়া সম্মেলনে একটা প্রস্তাব পাস করে বলা হয়েছে যে, ভূমির ভাগ যেমন ভূমিহীনদের দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি সম্পত্তির ভাগও সমাজকে দেওয়া আবশ্যক। আমি মনে করি যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের খরচের ষষ্ঠ ভাগ দেবেন। "আগে দাও, তবে খাও", এটা কর্ত্তব্যস্বরূপ মনে করা উচিত। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই শ্রমের মর্য্যাদা বাড়ানো উচিত। আর পয়সার গৌরব যাতে লাঘব হয় সে চেষ্টা করা সমীচীন। পয়সা ত লম্পট। পয়সার আবার মর্য্যাদা কি ? যখন ধীরে ধীরে ভূদান ও সম্পত্তিদান আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠবে তখন তার ধারা প্রবাহিত হবে। সম্পত্তির মালিক মালিক নয়, অছি-রক্ষক বা ট্রাস। যে কেউ হোক—মালিকই হোক, মজুরই হোক, গরীবই হোক, কম পয়সাওয়ালা হোক বা বেশী পয়সাওয়ালা সকলেই সম্পত্তির অছি। ঠিকমত উহা কাজে লাগানো তাদের দায়। ভূমির মালিকদের যেমন সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে তারা নিজেদের মালিকানা বিসর্জ্জন দিক, তেমনি সম্পত্তির মালিকদেরও সময় দেওয়া হয়েছে তারা সমাজকে এক ভাগ দিয়ে নিজ নিজ সম্পত্তি ভোগ করুক। যেমন মালিকানা স্বত্ব বিসর্জ্জন দেবার কথা মালিকদের বলি তেমনি মজুরদেরও মনোযোগ সহকারে কাজ করতে বলি। যথাযথভাবে ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করলেই তারা তাদের অধিকার পাবে। কাজের উন্নতি কি করে হবে ও তার ব্যবস্থা কেমন হবে একথা মালিকের মত তাদেরও চিন্তা করা উচিত। তা করলেই মজুরদের প্রতিষ্ঠা বাড়বে। আমি চাই যে মজুররা মালিক হোক ও মালিকরাও মজুরের কাজ করুক। মজুরদের ভাবতে হবে এটা তাদেরই কাজ, মনে করতে হবে এটা তাদেরই দায়িত্ব। ভগবানের পূজা মনে করে কাজ করা উচিত। মজুরদের পরিশ্রমের উপরই সারা পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। তারা জগতের পিতৃস্থানীয় একথা মনে করেউপাসনার ভাব থেকে—পূজার ভাবনা থেকে কাজ করতে হবে।

মজুর ও মালিক অংশীদার—প্রত্যেক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মালিক ও মজুরের অংশ থাকবে। মজুরকে যে অংশ দেওয়া হবে তা তাদের জিজ্ঞাসা করে দিতে হবে। মালিক নিজের ভাগ মজুরদের সম্মতিক্রমেই পাবে। মজুর নিজের জন্য যতটা রাখতে চায় ততটা বাদে বাকি মালিক রাখবে। এভাবে কারখানা উন্নয়ন-প্রচেষ্টাদি সবকিছুই সমাজ-সেবার অঙ্গীভূত হবে, এ কথা মনে করে তাদের চলা উচিত।

মজুরদের মানসিক উন্নতি হওয়া চাই আর মালিকদের শ্রম শেখা চাই। তা কমবেশী হতে পারে, কিন্তু পরস্পরকে পরস্পরের কাজ জানতে হবে। ভগবানের ইচ্ছা যদি এই হ'ত যে কিছু লোক মস্তিষ্ক দিয়ে কাজ করবে আর কিছু লোক শরীর দিয়ে করবে তবে কাউকে তিনি বানাতেন রাহু আর কাউকে কেতু। কিন্তু তিনি তা করেন নি। সবাইকেই মাথা দিয়েছেন, শরীর দিয়েছেন। কিন্তু লোকে এ রকম ভাগ করে। কিছু লোক হাত দিয়ে কাজ করে ও কিছু লোক মাথা দিয়ে করে।

এই রাহু-কেতু বিভাগ ভগবানের অনুমোদিত নহে। প্রত্যেকেরই ক্ষুধা পায় আর বুদ্ধিও প্রত্যেকেরই আছে। বুদ্ধিমান-দেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা পায়। কিন্তু তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা কাব্যরসে দূর হয় না, আর ক্ষুধার্ত্তের পেট ব্যাকরণে ভরে না, হলেনই বা তিনি মহা পাণিনি।

বুদ্ধি ও শারীরিক শ্রমের সমন্বয়—ভগবান আক্কেলও দিয়েছেন বুদ্ধিও দিয়েছেন। বুদ্ধির সঙ্গে শারীরিক শ্রমের সমন্বয় হওয়া চাই। লোকে জিজ্ঞাসা করে পরিশ্রম কেন করব ? এক ঘণ্টা মাথা খাটালে অনেক কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু বুদ্ধির কাজ যারা করে তাদের রীতিমত ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। ডাক্তারের কাছে তাদের দৌড়াতে হয়। ডাক্তার তাদের বলেন, "প্রত্যহ ব্যায়াম করবেন, ক্ষুধা না লেগে যায় না।" আমি বলি পরিশ্রম যদি করতেই হয় ত জমি আবাদ করব না কেন ? তাতে ব্যায়ামও হবে আর কিছু উৎপাদনও করা হবে। কিন্তু লোকে তা করে না। মনে করে তা করলে তাদের প্রতিষ্ঠার হানি হবে। ছেলেদের জন্য আজকাল ব্যায়ামশালা খোলা হচ্ছে। সেখানে ফিস দিয়ে ভর্ত্তি হতে হয়, এটা কেমন বিপরীত ব্যাপার। বালকেরা পরিশ্রম করবে আবার পয়সাও দিবে। বালকদের যদি বাগানে কাজ করতে দেওয়া হয় তবে কিছু উৎপাদনও হতে পারে আর তাদের তা থেকে দু'চার আনা দেওয়া যেতে পারে। আর তাইই ত হওয়া চাই। সকলেরই ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও করা চাই—সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা চাই। যে পরিশ্রমই করি না কেন, তা উৎপাদনমূলক হওয়া কর্ত্তব্য।

ট্রাষ্টীশিপের ব্যাপার—বুদ্ধিমানের মজুরের কাজ করা চাই আর মজুরের বুদ্ধির কাজ পাওয়া চাই। তার অর্থ মজুর ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রথম কথা হওয়া চাই অংশীদারী। তারা পরস্পরে অংশীদার হবে, একে অপরের সহযোগিতা করবে। এর নামই হচ্ছে ট্রাষ্টীশিপ। দ্বিতীয় কথা এই যে, মজুরদের শ্রমের কাজে মালিকদের ভাগ নিতে হবে। তেমনি মজুরদেরও মালিকের কাজ করতে হবে। তৃতীয় কথা হচ্ছে, আয়ের ষষ্ঠ ভাগ সমাজকে দিতে হবে। অবশিষ্ট নিজেদের কাজে ব্যবহার করবে। এর নাম সম্পত্তি দান। এর তাৎপর্য্য এই যে, সমাজের কাঠামো বদলাতে হবে, মানুষের মনোবৃত্তি বদলাতে হবে। লোকে জিজ্ঞাসা করে হৃদয়ের

পরিবর্ত্তন কি সম্ভব ? এ কথার পাল্টা জবাবে আমি জিজ্ঞাসা করি, তবে শিক্ষা-বিভাগ খোলা হয়েছে কেন ? মনোবৃত্তি বদলানোর জন্যই তা নয় কি ? ছোটদের মিষ্টি খেতে ভাল লাগে আর তারা একলাই তা খেতে চায়, কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের শেখানো হয় যে একলা খেতে নাই। এ ভাবে তার মনোভাব পরিবর্ত্তিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের ফলে মন বদলে গেল। নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলছি, তখন আমি ছ'সাত বছরের। বাড়ীতে কাঁঠাল গাছ ছিল। কাঁঠাল পাকলে আমাদের হাতে কাঁঠাল দিয়ে ঠাকুরদা বলতেন, "গাঁয়ের প্রতি ঘরে কিছু কিছু দিয়ে এস।" সকলকে দেওয়া হলে, তবে আমরা খেতে পেতাম। এ দেওয়ার কাজে আমি খুব আনন্দ পেতাম। আমার মা বলতেন, "যে দেয় সে দেবতা, আর যে রাখে সে রাক্ষস। কেউ যদি চায় আর তা তার দরকার, তবে দেওয়া উচিত।" আমি মনে করি ভূদান-যজ্ঞের এ প্রেরণা আমি মার কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি যদি আমাকে স্বার্থের শিক্ষা দিতেন তবে আমি কখনও এমন কাজ সুরু করতে পারতাম না। এই মানস-শাস্ত্রকে বদলাতে হবে—অর্থাৎ সমাজ যে স্তরে আছে সেই স্তর থেকে তাকে উঁচে উঠাতে হবে।

মনের পরিবর্ত্তন—প্রাচীনকালে চোরের হাত-পা কেটে ফেলা হ'ত। কিন্তু আজকাল এরূপ সাজা আদৌ কেউ পছন্দ করে না। চুরি করার কারণ কি ? কারণ এই যে, চোর নিজের ও সন্তান-সন্ততির অন্ন সংস্থান করতে পারে না। ঠেকে সে চুরি করে। আজকাল চোরের হাত-পা কাটা হয় না। পাঠানো হয় জেলে। কিন্তু আমি যদি বিচারক হতাম ত তাকে জেলে পাঠাতাম না। তাকে তিন একর জমি দিতাম যেন ফের তাকে চুরি করতে না হয়। আজ যে সাজা দেওয়া হয় তাতে চোরের শাস্তি হয় না, হয় তার ছেলেমেয়েদের। জেলে তার কি অভাব ? সেখানে থাকার জায়গা পায় আর খেতেও পায়। অনেকের ত জেলে যাওয়া যেন অভ্যাস হয়ে যায়। তারা বাইরে আসে। একটা কিছু করে ফের জেলে ঢোকে। এমতাবস্থায় যত কষ্ট সইতে হয় ছোট ছেলেমেয়েদের, যাদের ভরণপোষণের দায় তাদের পিতার। তাই বলছি চোরের সাজা না হয়ে, হয় পরিবারের সাজা। ভাল, এ ত হচ্ছে ভবিষ্যতের কথা। এ কথা লোকে এখনই মেনে নিচ্ছে না। কিছু সময় লাগবে। কিন্তু আজকাল কোন লোকই চোরের হাত কাটার কথা ভাবে না। আর এর থেকে বুঝা যায় যে, মনের পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি : এক সময় ছিল যখন গুরুর এক হাতে থাকত বই আর এক হাতে থাকত বেত। মনে করা হ'ত শাসন ছাড়া বিদ্যালাভ হয় না। আমি বলি তা যদি হবে তবে শিক্ষাবিভাগের প্রয়োজন কি ? পুলিস বিভাগ দিয়েই কাজ চলতে পারত। এক হাতে বই আর অন্য হাতে বেত এই না গুরুর স্বরূপ ! তবু লোকে মনে করত তাড়নায় বিদ্যালাভ হয়। কিন্তু আজকাল এ ভাব দূর হয়ে গেছে। পড়ানোর সময় শিক্ষককে যদি ছাত্রদের মারতে হয় ত বুঝতে হবে সেখানে কোন ত্রুটি আছে। প্রাচীন-কালের কথা বলি। বুদ্ধিমান রাজার ছেলে যে, বুদ্ধিমানই হ'ত তা মনে করবার কোন কারণ নেই। তবু রাজার ছেলে সে মূর্খ হলেও রাজা হ'ত। এই প্রথাই এদেশে ছিল, কিন্তু আজ এ নিয়ম কেউ মানতে রাজী নয়। এর থেকে দেখা যায় মনস্তত্ত্ব বদলাতে পারে এবং এক মনস্তত্ত্বের জায়গায় অন্য মনস্তত্ত্বের সৃষ্টি হতে পারে।

আত্মোৎসর্গ করুন—আজকের কাজ হচ্ছে নূতন মানুষ সৃষ্টি ও নূতন সমাজ রচনা করা। তার জন্য এই ভূদান, সম্পত্তিদান, শ্রমদান আন্দোলন সুরু করা হয়েছে।

এ কাজের দ্বারা জনমনে আত্মোৎসর্গের ভাব জাগাতে হবে। সর্বোদয় সম্মেলনে এ কথাটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু খবরের কাগজে এর বড় একটা উল্লেখ হয় না। সাংবাদিকেরা এর মূল্য বুঝেন না। খবরের কাগজে আত্মোৎসর্গের কথাটাকে ফলাও করা হয় না। আমি তা চাইও না। কিন্তু এ আশা আমি পোষণ করি যে এ শহরেও এমন দু'এক জন পাওয়া যাবে যারা সমাজ-বিপ্লবের জন্য, নূতন পৃথিবী সৃষ্টির জন্য আত্মোৎসর্গ করবে। তা হতে জীবনে আনন্দ মিলবে। কোন গতানুগতিকতা থেকে তা মেলে না।

আমার চিন্তাধারা পুস্তকে লেখা রয়েছে। সাময়িক কাগজেও তা বেরোয়। আপনারা তা পড়বেন। লোককে আমি গীতা-প্রবচন পড়তে বলি। আজ যে ভাবধারা উপস্থাপিত করেছি তা গীতারই কথা। যে কাগজে ভূদানের কথা, সম্পত্তিদানের কথা, সমাজ-পরিবর্তনের কথা থাকে তা আপনারা পড়বেন। শহরবাসীরা ত পড়বেনই আর অপরকেও পড়ে শোনাবেন।

কন্যাদান

শ্রীউমা দেবী

সর্বাণী আজ বড়ই প্রীত—একটিমাত্র মেয়ে শিবানীর যোগ্য পাত্রে বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। পাত্র ইঞ্জিনীয়ার, ভদ্রবংশীয়, কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা—নামটিও সুন্দর—সুবিমল।

সুবিমলের বাবা ধরাধর বাবুর একেবারেই ইচ্ছে ছিল না এ বিয়ে দেবার। কেবল স্ত্রীর অনুরোধে এবং স্ত্রীর ভ্রাতার উপরোধে এ কাজে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। এজন্যে বিরক্ত হয়ে তিনি মনে মনে স্ত্রীর ভ্রাতাকে চলিত ভাষায় অনেকবার স্মরণ করেছিলেন। সুবিমল যোগ্য ছেলে—বেশ কয়েক হাজার তিনি কন্যাপক্ষের কাছ থেকে ঠুকে নিতে পারতেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজি হতে হয়েছিল!

শিবানী দেখতে চমৎকার। সর্বাঙ্গের গৌর আভা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখে আর তার উজ্জ্বলতম শিখা কখনও জ্বলছে চোখে, কখনও ঠোঁটে—ঝিলিক দিচ্ছে হাসিতে, ঝিমিয়ে পড়ছে কান্নায়। ধরাধর বাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা মুগ্ধ। এমনি একটি বৌয়ের স্বপ্ন তিনি অনেকদিন ধরে দেখেছিলেন।

আর শিবানী? যেদিন থেকে বিয়ে ঠিক হয়েছে সেদিন থেকে কেঁদেছে। সে এক লেখাপড়া-জানা বড় চাকুরে শিক্ষিত স্বামীর স্ত্রী হবে, এ কথা ভাবতেই সে কেঁদে ফেলে। কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে কারণের কথা শিবানী কাউকে বলে না। মাঝে মাঝে যখন সই চাপার বাড়ী যায় তখন কানাইদাকে হয়ত বলে। তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন, কানাইয়ের সঙ্গে শিবানীর মন-জানাজানি আছে। আসলে কানাইদাকে সে চেনে, তাই তার সঙ্গে কথা কইতে ভারি নিশ্চিন্ত লাগে। পাত্র হিসাবে কানাই কিছুই নয়—রোগা কাল তার উপরে বেকার উদ্বাস্তু। সেই কবে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে রেখেছে, মাঝে মাঝে ডাক আসে কিন্তু চাকুরি হয় না।

সেই কানাইদা শিবানীর বিয়ের দিন সকাল থেকে কাজকর্মে লেগে গেল। বড় বড় পনের সেরি রুই মাছ দা দিয়ে কুপিয়ে দেখতে দেখতে কেটে ফেলল। ঝুড়িভর্তি কাটা মাছ কলতলায় নিয়ে গিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে জল ঝরাতে বারান্দায় সার সার বসিয়ে দিলে একা—কারুর সাহায্যের প্রয়োজন হ'ল না। তারপর কোমরে গামছা বেঁধে দই-মিষ্টি আনতে ছুটল।

সর্বাণীর এই একটিমাত্র মেয়ে শিবানী, সর্বস্ব বেচে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন তিনি। মেয়ের বিয়ে দিয়ে আবার তিনি ফিরে যাবেন দেশে—একবার শেষ খোঁজা খুঁজে দেখবেন।

শিবানীর কি বাবা নেই? আছেন—হয়তো আছেন—যদি বরিশালের দাঙ্গায় না খতম হয়ে থাকেন। শত্রুপক্ষ বলে—আছেন, সরিফুন্নেচ্ছাকে সাদী করে বরিশালেই চারবেলা নেমাজ পড়ছেন। অবশ্য সর্বাণী সে কথা বিশ্বাস করেন না। বলেন, মারাই গেছেন, দা পর্যন্ত তুলতে দেখেছেন তিনি, তার পরেই অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

শিবানী তখন ক' বছরের ছিল? সকালের আলোয় কুটকুটে কুঁড়িটি যখন ফুটি ফুটি করে—ঠিক সেই বয়সের কিশোরী, বার কি তের বছর বয়স মাত্র। সর্বাণী যখন মূর্ছা গেলেন তখন শিবানী কি করছিল? সর্বাণী বলেন তিনি শিবানীকে জলার ধারে সুপুরি গাছের আল-দেওয়া পানের বরজের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। শত্রুপক্ষ বলে, লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বটে, কিন্তু সর্বাণীকে সে কাজ করতে হয় নি। শিবানীকে যখন ফিরে পেলেন সর্বাণী তখন ভোর-বেলার সেই লজ্জাবতী কুঁড়ির কোমল আভাটি উজ্জ্বল প্রভাতের দীপ্ত পুষ্পশ্রীতে পরিণত হয়েছে।

সর্বাণী বুকে চেপে ধরেছিলেন শিবানীকে। হারান মেয়ে ফিরে পেয়ে বুকে চেপে ধরেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ভয়ে মেয়েকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নি। কোথায় ছিল সে? কেমন ভাবে ছিল? মায়ের বুকে ফিরে এল কেমন করে? না না, সর্বাণী কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না। ঐ নিষ্পাপ পবিত্র তরুণীর কৌমার্য কারুর ভোগবহ্নির ইন্ধন জুগিয়েছিল কি না—মা হয়ে কেমন করে জিজ্ঞাসা করবেন তাঁর কিশোরী মেয়েকে?

মেয়েও কেঁদেছিল মায়ের বুকে মাথা গুঁজে। অনেকক্ষণ কেঁদেছিল—প্রথমে ঝর্‌ঝর্‌ করে, পরে আস্তে আস্তে থেমে থেমে ঝির্‌ঝিরানি ঝির্‌ঝিরানি বৃষ্টির মতন। মা-মেয়ের দেহ মন কেঁদে কেঁদে শীতল হয়ে এলে দু'হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মাথা রেখে শিবানী ঘুমিয়ে পড়েছিল সর্বাণীর বুকে ছোট্ট মেয়েটির মতন।

কিন্তু আজও সর্বাণীর যখনই মনে পড়ে শিবানী কোথায় ছিল এতদিন, কেমন ভাবে ছিল তখনই দারুণ আশঙ্কায় তাঁর সর্বাঙ্গ পাথর হয়ে যায়—অজ্ঞাত ভয়ের ছায়ায় থম থম করে সারা মন।

যাক্—সে দুঃস্বপ্ন আর নেই, ভাগ্য ভাল শিবানীর। সবাই বলে—অমন বর, অমন ঘর! সর্বাণী যোগ করেন অমন কুটুম! অন্নপূর্ণা বলেন, অমন ঘর-আলো করা বউ। সুবিমল কি বলে? সেটা বাসরঘরে আড়ি পাতলেই শোনা যাবে। আর শত্রুপক্ষরা যা বলে সেটা এতদূর এসে পৌঁছবে না। সে বিষয়ে সর্বাণী নিশ্চিন্তই ছিলেন। তবু—তবু কেন সর্বাণীর বুক কাঁপে?

বিয়ে বাড়ীতে থৈ থৈ করছে লোক। বড় ঘরে এর মধ্যেই লোকজন এসে বসতে সুরু করেছে। নানা রঙের আলোর মালায় ফুলের মালায় বাড়ী জমজমাট। ফুল পাতার চাঁদোয়ায় বড় দরজার ভারি শোভা। সেই দরজা দিয়ে বর ঢুকবে রাজপুত্রের মতন—গলায় তার বেলফুলের মোটা গোড়, মাথায় শোলা-শলমার কঙ্কমলে সাদা মুকুট, রজনী গন্ধা ফুলের মতন মোলায়েম সাদা ধুতির কোঁচার সরু জরির পাড় কাঁপতে কাঁপতে হারিয়ে গেছে জ্যোৎস্নার মতন স্বচ্ছ আর সাদা পাঞ্জাবীর উড়ন্ত শোভায়—বর্ষণধৌত শুভ্র লঘু মেঘখণ্ডের মতন উত্তরীয়ে।

কোণের ঘরে শিবানীকে কনেচন্দন পরাচ্ছিল সুলেখা। চাঁপার মতন সুশ্রী কোমল মুখে শ্বেতচন্দনের চাঁপারঙের শেষ ফোঁটাটি দিয়ে শিবানীর মুখের সামনে আরশি ধরে হেসে বলল সুলেখা—দেখ ভাই, চিনতে পারিস নিজেকে?

ঘরে আরও কয়েকটি তরুণী ছিল—তারা সুখে হেসে উঠল। ঝকঝকে আয়নায় নিজের রূপকে মুখখানি দেখতে দেখতে শিবানী চোখ বুজল। সঙ্গে সঙ্গে শীতের ভোরে শিশিরভরা ফুলটিকে নাড়া দিলে যেমন করে ঝরঝরিয়ে জল ঝরে পড়ে ঠিক তেমনি করে শিবানীর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ল। এক ফোঁটা দু'ফোঁটা নয়, অঝোর বৃষ্টিধারার মত সে কান্না আর থামে না। চোখের জলে চোখের কাজল ধুয়ে গিয়ে গালের সোনালী আভা মলিন হ'ল—চাঁপার বনে মেঘের ছায়া নামল।

সবাই অবাক—শিবানী কাঁদে কেন?

—ওগো ও মেয়ের মা, মেয়ে তোমার কাঁদে কেন? জিজ্ঞাসা করেন পাড়ার বর্ষীয়সীরা।

—মেয়ের মা চোখের কাজল ধুয়ে গেল—বলে সর্বাণীর আপনজনেরা।

সর্বাণী শোনেন আর তাঁর বুক কাঁপে।

এমন সময় বাইরে রোল উঠল—বর এসেছে, বর এসেছে। মেয়েরা যে যেমন ছিল ছুটল—কেউ হাতে শাঁখ নিয়ে, কেউ বা বরণ-ডালা নিয়ে। অনেকে ছুটল স্ত্রী-আচারের সাজ-সরঞ্জাম ঠিক আছে কিনা দেখতে। একলা ঘরে শিবানী বসে রইল পাথরের প্রতিমার মতন।

সর্বাণী ঢুকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন শিবানীকে—কাঁদিস কেন? কি হ'ল? এমন সুখের দিন আজ।

শিবানী মাকে আঁকড়ে ধরল। তার মাথার পাতলা গোলাপী ওড়না কালো রেশমের হাজার ভোমরা নিয়ে মাটিতে খসে পড়ল। লাল রেশমের শাড়ীর আঁচলটি কাঁধ থেকে এলিয়ে গেল তার অজস্র সোনালী চুমকির আলো নিভিয়ে। খোঁপায় কাজললতা গোঁজা, হাতে হলুদ সুতো আর দূর্বা বাঁধা—শিবানী মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

সর্বাণীও মেয়েকে আঁকড়ে ধরলেন, তারপর থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলেন। হাজার হাজার নির্বাক প্রশ্নের বিষাক্ত-বাণে হৃদয় নির্মথিত হতে লাগল। ফিসফিস করে মা জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েকে—কেন, বল্ কাঁদছিস কেন?

—মা—এইটুকু বলেই শিবানী এলিয়ে পড়ল। বাইরে উলুধ্বনি উঠল—বর এসেছে, মেয়ের মা কইগো—মেয়ের মা?

সর্বাণী ডাকেন—শিবানী শোন, ওরা আমাকে ডাকছে—

শিবানী আঁকড়ে ধরে রইল মাকে। ধরা-ধরা গলায় বলল—তুমি যেও না মা, যেও না। আমি যে—আমি যে—মা গো—বুক আমার জ্বলে যায়। আমার বিয়ে দিও না—

সর্বাণী কাঁদেন মেয়েকে জড়িয়ে। কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করেন—তবে কি, তবে কি—

শিবানী কাঁদতে কাঁদতে বলল—আর এখন কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না মা—চল আমরা পালিয়ে যাই।

সর্বাণী বলেন—চুপ চুপ—দেওয়ালেরও কান আছে।

শিবানী বলল—বুকের মধ্যে যে দিনরাত্তির শুনছি সে কথা—

শিবানী মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদে। বলে—চল মা, আমরা পালাই পিছনের দরজা দিয়ে।

সর্বাণী কাঁদেন মেয়েকে জড়িয়ে, তারপর নিজের চোখের জল মুছে মেয়ের চোখের জল মোছান।

তখনও বিয়েবাড়ীতে শাঁখ বাজছে,উলুধ্বনি উঠছে ঘন ঘন। সর্বাণী আর শিবানী—মা আর মেয়ে—খিড়কি দরজা দিয়ে বেরুলেন। গাঢ় অন্ধকার, উপরের আকাশে হাজার তারা মেঘের আঁচলের হাওয়া দিয়ে নিভিয়ে দিল হাজার বাতি।

খানিকটা দূরে যাবার পরে পিছন দিকে কার যেন পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠেন সর্বাণী। শক্ত করে শিবানীর হাত আঁকড়ে ধরে থমকে থেমে জিজ্ঞাসা করেন সর্বাণী—কে গা?

একটি নির্ভয় শান্ত স্বর ভেসে আসে—আজ্ঞে, আমি কানাই।

জাহ্নবী যমুনার উৎস সন্ধানে

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

একটিমাত্র রাত্রের যা বিশ্রাম, পরদিন উঠে পড়ি সকাল সকাল, আর চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় আজ আর এক বিরাট অধ্যায়ের সুরু, যার তুলনা নেই···।

ধরম সিংকে সব বলাই ছিল—আমার ঘুম ভাঙার আগেই তার গোছগাছ শেষ—সেও তৈরি। আমিও তৈরি হয়ে নি'—কোথা থেকে এক বিপুল কর্মচাঞ্চল্য এসে দেখা দেয়।

সাতটা বেজে পনের মিনিট···তেরশ' বাট সালের জুলাইয়ের দশই রওনা দি' আমি আর ধরম সিং ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে অর্থাৎ সর্ব্বতীর্থসার গোমুখের পথে গঙ্গাদাস সন্দর্শনে।

কাল যে চায়ের দোকানে দণ্ডীস্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁরই গাইড আমার ভাগ্যে জোটে। গোমুখের পথ আধুনিক সভ্যতাবিবর্জ্জিত, তাই গাইডের নির্দ্দেশ অপরিহার্য্য! দণ্ডীস্বামীর সঙ্গে কালকে ফিরেছে, কালকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ, আবার আজকেই সে তৈরি। বুঝলাম গোমুখ তার কাছে কতকটা ঘর-বাড়ীর সামিল। গাইডের নাম বলবন্ত সিং—ভাটোয়ারীর লোক। ওর কাছ থেকে জানতে পারি পথিমধ্যে ভুজবাসায় একটা রাত কাটাতে হবে, সেখানে ছোট্ট একটা ঘর আছে—আগে তাও ছিল না—রাত্রিবাসের জন্যে ছিল গুহা···। টিহিরী গাড়োয়ালের রাজ-পরিবারের অর্থানুকুল্যে ঐ কাঠের ঘরখানি নাকি গড়ে উঠেছে। তের মাইল পথ—দুর্গম ও দুস্তর···। সেদিন গোমুখের পথে আমিই একক তীর্থপথযাত্রী, অন্য কোন সঙ্গী আমার জুটল না। সাধারণ তীর্থযাত্রীদের তীর্থপরিক্রমার সীমা এই গঙ্গোত্তরীর মন্দির পর্য্যন্ত···আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে গোমুখ এখনও অনেকের কাছে রহস্যাবৃত হয়ে আছে।

একটা দোকানে ফরমায়েস ছিল—তিন সের পুরি ও তরকারি। পথে খাদ্যবস্তু মিলবার সম্ভাবনা নেই—সঙ্গে করে নিতে হয় এখান থেকেই।

অনেকগুলি ঘরবাড়ী, দোকানপাট, ধর্ম্মশালা—সর্ব্বশেষে মন্দিরের পাশ কাটিয়ে তিনটি মূর্ত্তির পথ চলা সুরু হয় আর এক অজানা রাজ্যের সন্ধানে। মন্দিরের পেছন দিক দিয়ে একটি সরু পথ ঊর্দ্ধপানে উঠে গেছে, চড়াইয়ের ইতরবিশেষ এখান থেকেই সুরু। বলবন্ত সিংকে বলাই ছিল, যে পায়ে চলার পথ দিয়ে স্মরণাতীতকাল থেকে গোমুখতীর্থে সাধারণ যাত্রীদের আনাগোনা, তার উল্টো পথেই আমাকে চলতে হবে। কেননা এই উল্টো দুর পথেই গঙ্গাদাসকে পাওয়ার সম্ভাবনা। এ পথের কাণ্ডারী ধরম সিং—সে নয়—বলে দি', সে যেন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে। সে রাজী হয়, বলে বহোত আচ্ছা। কেন যে উল্টো পথকে বেছে নি' সাময়িকভাবে আর সে পথের আকর্ষণ কি, সে বিষয়ে কোন ঔৎসুক্যও তার নেই··অদ্ভুত মানুষ। বেলা এগারটার মধ্যে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির হব, সেই কথাই রইল তার সঙ্গে।

গঙ্গোত্তরীমায়ের শ্রেষ্ঠতম সাধু মহাযোগী গঙ্গাদাসকে আবিষ্কার করবার আশায় রওনা হই আমি আর উত্তরকাশীর বালক ধরম সিং।

গঙ্গোত্তরী ছাড়াবার পরই ঊর্দ্ধমুখী পাহাড়ের অনন্ত প্রসার। ক্রমশঃ তা দেওদারের নিবিড়তায় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। পথ একেবারেই নেই, পথ করে নিতে হবে: বলবন্ত সিং অদৃশ্য হয় গঙ্গার ধার বরাবর—সীমন্তিনীর সিঁথিরেখার মত পথরেখা ধরে আমরাও ঠিক উল্টোদিক মুখ করে চলতে থাকি। চোখে পড়ে একটার পর একটা জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের ভগ্নাংশের রূপ একটির সঙ্গে আর একটির মিল নেই। বড় বড় পাথরের অবিন্যস্ত সমারোহ, তার উপর সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে যেতে হয়—কখনও বসে, কখনও উঠে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে। আটটা বেজে গেছে, সূর্য্যের আলোর যেটুকু দাক্ষিণ্য তাতে শীতের কাঁপুনি থামে না।

গঙ্গোত্তরী ছাড়াবার পরই শীতের তীব্রতা বুঝতে পারি। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত—এক অচেনা জগৎ। ভাগীরথীর পাশে পাশে এতদিন চলে এসেছি, আজকের যাত্রা সেই ভাগীরথীরই উৎসের সন্ধানে। গঙ্গাদাসই এ পথের প্রধান আকর্ষণ—তাঁকে আবিষ্কার না করে গোমুখ দর্শন বৃথা ও অর্থহীন! ভগবৎপ্রসাদ বলেছিলেন—কাটাফুটা পথ, বিমলানন্দ বলেছিলেন বন্ধুরতম পথ। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গেই তাঁদের উক্তির সত্যতা বুঝতে পারি।

আমার সামনে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছে উত্তরকাশীর বালক ধরম সিং। হৃষীকেশেও সে আমার ঝোলাঝুলি পিঠের ওপর তুলে নিয়েছে, দুর্গম তীর্থপথে ধরম সিং-এর আত্মিক শক্তিকে দেখেছি ও বুঝেছি নানা ভাবে। আজ দশ-বার হাত দূর থেকে গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ তুলে চলেছে ধরম সিং—"উধার মাত জানা···ইধারসে চলিয়ে···বহোত কাটাকুটা পথ··· হুঁসিয়ার বাবুজী।" ও যেভাবে নির্দেশ দেয়, আমিও সেইভাবে লাঠির সাহায্যে পা বাড়াই আর বিরাট প্রতিবন্ধ অতিক্রম করি। এক একটি জায়গায় পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে পাথর আর মাটির টুকরো, দেওদারের পতনোন্মুখ ডাল ধরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করি।

প্রায় মাইলখানেক এই রকম পথ, কখনও চড়াই কখনও উৎরাই সামনে একটা সাদা পাহাড় চোখে পড়ে, মনে হয় এটি পার হতে পারলেই সমতলভূমির নিশানা, আর তার পরেই গঙ্গার অস্তিত্ব। কোন রকমে পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে উপরে উঠতেই ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, আচমকা আত্মপ্রকাশ করে একটি বন্য নীলগাই··· ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে—বড় বড় চোখ করে আমাদের পানে একবার তাকিয়ে হড় হড় করে পাথর ছড়াতে ছড়াতে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়···। প্রথমটায় ভয় হয় তারপরেই বুঝতে পারি···কাছা-কাছি মানুষ আছে···এ নীলগাই সম্ভবতঃ গঙ্গাদাসকে আবিষ্কারের প্রথম সূত্র। আরও খানিকটা পথ বেশ নীচের দিকে চলে গেছে··· অগ্রসরমান ধরম সিং হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় প্রস্তরমূর্তির মত···তারপরই আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে কি যেন দেখিয়ে দেয়···।

দেখতে পাই সামনেই প্রবহমানা গঙ্গা···তার তীরভূমির উপরেই ছোট্ট একটি কুটীর···গঙ্গাদাসের কুটীর···আবিষ্কারের চেষ্টা সফল হ'ল···পরিশ্রম সার্থক হ'ল···পেয়ে গেলাম গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ মার্গের পুরুষোত্তমকে যার দর্শনলাভের জন্যে উত্তরকাশী থেকে হাউইয়ের মত ছুটে এসেছি।

এর পরের মুহূর্তগুলো ভুলবার নয়, সে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা। আস্তে আস্তে এগোতে থাকি, কেমন যেন শক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসে···পায়ে পা জড়িয়ে যায়···দেহ অকারণে অবশ হয়ে আসে। ও কুটীরের ভেতর কাকে গিয়ে দেখব? গত বৎসরের বদরিকার সেই বালক-সাধু? না অন্য কেউ? গঙ্গাদাস কি তিনিই যিনি বলেছিলেন, "গঙ্গোত্তরী জানেসে সব মিল জায়গা?" যাঁর জন্যে এত দূর ছুটে আসা—যাঁর জন্যে এই আকুল আকুতি তিনিই কি ওখানে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন?

কুড়ি-বাইশ হাত দূরেই কুটীর, তবু মনে হয় পৌঁছতে কুড়ি-বাইশটা বৎসর কেটে গেল। অদ্ভুত নির্জ্জন প্রকৃতি···এপাশে, ওপাশে বড় বড় দেওদারের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ, এর মধ্যে আশ্চর্য্য সুন্দর একটি কুটীর···সাধনার উপযুক্ত স্থান বটে! খানিকটা দূরেই গঙ্গার অনন্ত প্রবাহ, তার কুলু কুলু রব···কুটীরের সামনে এসে যাই···। সম্মুখে একটি লাল কার্পেট ঝুলছে দরজার উপর, কার্পেটের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা, "রাম—।" বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত বসে পড়ি, কানে আসে ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ···বুঝতে পারি গঙ্গাদাসের পূজো চলেছে···।

আধঘণ্টারও উপর কুটীরের সামনে বসে আছি আমি আর আজকের পথের তথা যোগাযোগের কাণ্ডারী ধরম সিং···সময় যেন আর কাটে না। এই আধ ঘণ্টা ধরে ঘণ্টাধ্বনিরও বিরাম নেই, সেই টুংটাং আওয়াজ চলতে থাকে। তারপর কয়েকটা মিনিটের নীরবতা···লাল কার্পেটটা একটু দুলে উঠে, তারপরেই দেখা যায় গঙ্গাদাসের মূর্ত্তি···শাশ্বত ও জ্যোতিস্ময়···।

হঠাৎ আমাদের মত অর্ব্বাচীন দুটি মানুষের উপস্থিতিতে গঙ্গা-দাসের মুখে-চোখে যে বিস্ময়ের ভাবটি ফুটে উঠে, তার ব্যাখ্যা করাও কঠিন। বড় বড় চোখ করে তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেভাবে তাকিয়ে ছিলেন রামানন্দ—তবে সে দৃষ্টিতে ছিল ভয়াল রূপ আর এ দৃষ্টিতে শান্ত-সমাহিত রূপ। তার পরেই হো হো করে শিশুর মত হেসে উঠেন গঙ্গাদাস আর বলতে থাকেন, "আরে আপ কিধারসে আয়া? কিসিসে আয়া—হামকো পাত্তা কোন্ বোলা?" এ তিনটি কথা তিনি বার বার বলতে থাকেন আর হাসির বন্যায় ডুবে যান! কি মিষ্টি সুর, কি হাসির লহর··· সংসারে এর তুলনা মিলবে না।

আর কি! মিলে ত গেল সব···মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে পড়ে প্রণাম করি আমি আর ধরম সিং। তারপর আবার সেই জিজ্ঞাসার অনুবৃত্তি চলতে থাকে—"আপ কিধারসে আয়া, কিসিসে আয়া, হামকো পাত্তা কোন্ বোলা?" সব বলি আস্তে আস্তে···মন দিয়ে সব শোনেন, তারপর আদেশের সুরে বলেন, "পহলে গঙ্গাজী মে স্নান কর আও, ফির বাতে হোগী।" বলে আবার কার্পেটের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যান। গঙ্গার ধারে চলে আসি আর গরম কাপড়ের স্তূপ শরীর থেকে নামাতে থাকি। মনে হয়েছিল, এই অসম্ভব শীতে অবগাহন স্নান সম্ভব হবে কি না—কিন্তু এইখানেই এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। জামা কাপড় খুলে যেখানে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়ান চলে না—এতটুকু কাঁপুনী এল না, শীতবোধ হ'ল না, মনে হ'ল বাংলাদেশে গঙ্গাস্নানে নেমেছি। তিনি বলেছেন স্নানের দরকার—তাঁর এই বলাটাই চরম আদেশ, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারি যে, গঙ্গাদাস বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ।

স্নান সমাপন শেষে আবার কুটীরে আসি, দেখা দেন গঙ্গাদাস। আমাদের দু'জনকেই ঘরের ভেতর আহ্বান করেন। দেখি ফুল-লতা-পাতার স্তূপের ভেতর একটি স্বর্ণময় রামমূর্ত্তি! পাশে

গোমুখ
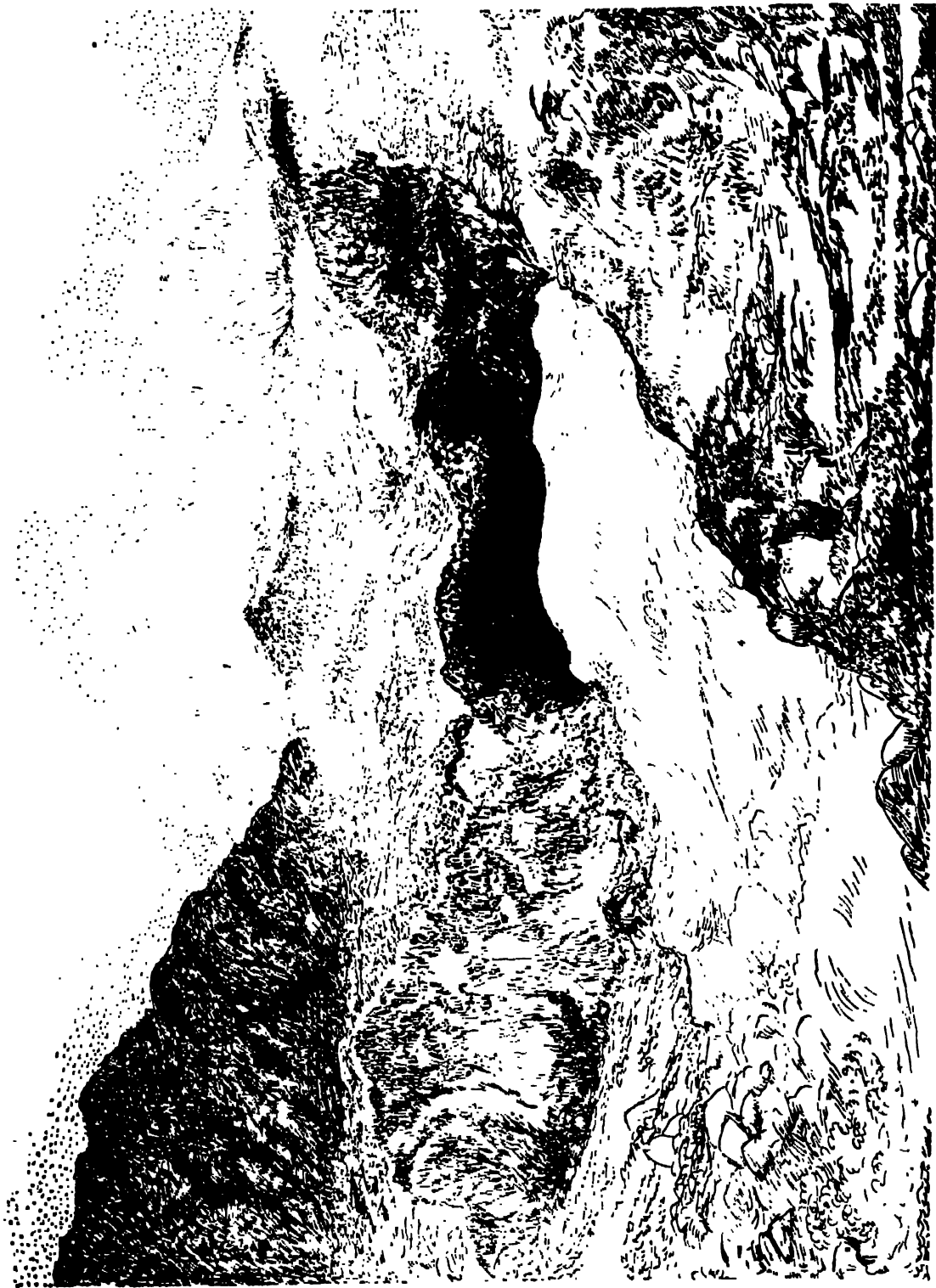
একটি ঘণ্টা, যার আওয়াজ আমরা শুনেছি কিছুক্ষণ আগে। দেয়ালে বিরাট জটাজুটসমাচ্ছন্ন এক সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি দেখিয়ে বলেন যে, ওটি ওঁর গুরুদেবের।

মুখে শুধু রাম নাম···এক একবার রাম কথাটি উচ্চারণ করেন এবং 'আনন্দে' আত্মহারা হয়ে নৃত্য শুরু করেন স্বর্ণময় রামমূর্ত্তিকে ঘিরে। চুপচাপ বসে বসে দেখি, আর মনে হয় জীবন সার্থক হ'ল। বুঝতে পারি, ভক্তিমার্গের গৌরীশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন গঙ্গাদাস—দুনিয়ার সবকিছু রামনামে রূপান্তরিত হয়েছে···ভক্তিমার্গের এমন অপরূপ প্রকাশ জীবনে আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হ'ল না। পকেট থেকে একটি খাম বার করে ওঁকে দি সন্তর্পণে—বলি, "মেরা এক রিশতেদার আনে কে পহলে মুঝে ইসে দে কর কহতা কি বদরীকান্তীকে উস সাধুসে অগর মুলাকাৎ হো গে মেরা নাম লে ইহ উনকো দেকর মেরা প্রণাম দেনা।"

বন্ধই ছিল, খুলি নি খামের মুখ। ভেবেছিলাম যদি সন্ধান পাই, যাঁর জিনিষ তাঁকেই দেব। এখানে সে সুযোগ এল তাই নিবেদন করি। "আরে এ ক্যা চীজ।" বলতে বলতে তিনি খামটি খুলে ফেলেন। বের হয় একটি বিবর্ণ শ্বেতপুষ্প। আর তাঁর আনন্দ দেখে কে—মুহূর্তে প্রেমানন্দে পাগল হয়ে ওঠেন যেন, সেই বিবর্ণ ফুলটি মাথায় রেখে শুরু করেন নৃত্য। দীর্ঘ শুভ্র দেহ, পরনে স্বল্পপরিসর কৌপিন···মাথায় কাঁচাপাকা চুল অপরূপ সুকুমার মুখচ্ছবি, সুদূর বাংলাদেশের অনামী একটি ফুল মাথায় নিয়ে গঙ্গাদাস ছোট্ট ঘরটির ভেতর উন্মাদের মত ছুটাছুটি করতে থাকেন।

এর পর আধঘণ্টা কথাবার্ত্তা হয় ওঁর সঙ্গে। অঞ্জলি ভরে ওঠে আশীর্ব্বাদে, উপদেশে, অনুপ্রেরণায়। গঙ্গোত্রী আসা সার্থক হয়—তীর্থ পরিক্রমা সফল হয় আমার। গঙ্গাদাসকে পাওয়ার আর একটি সূত্র বলে দি, সেটা হ'ল এই কুটীর, এই মানুষ আর এই গঙ্গা। তিনটি যুক্ত হয়ে নাম হয়েছে "অমৃতঘাট"।

গঙ্গাদাসের কুটীর থেকে আবার শুরু হ'ল মানুষের যাত্রা। দু'হাত তুলে গঙ্গাদাস আশীর্ব্বাদ করেন আমাদের···ধন্য হয়ে যায় জীবন। কুটীরটির সামনেই একটি গুহা যেন মুখব্যাদান করে আছে, এই হ'ল ওঁর রাত্রিবাসের স্থান। কুটীর এখানে শুধু কুটীর নয়—ওঁর কাছে তা মন্দির। ক্ষোভে বুকটা ভরে ওঠে এই ভেবে যে বলবন্ত সিং-এর ব্যাপারটা না হলে একটা রাত এখানে কাটাতাম, অনুমতিও হয়ত মিলত, কিন্তু যা হবার নয়, তা হয় না···বেদনাটাই বুকে জমে ওঠে। গঙ্গা এখানে বিপুলা নন—ক্ষীণকায়া, তবে বেগ আছে, গতি আছে। যে কাঠের তক্তাটি ফেলা আছে কোনরকমে তারই সাহায্যে পার হয়ে যাই। তক্তাটি এমনভাবে বিছানো যে, তাতে মনে হ'ল এখানে অগোচরে মানুষের যাতায়াত আছে। গঙ্গা পেরিয়ে আবার খানিকটা জটিল পথ···কোনরকমে এ পথটুকুও শেষ করি। আবার খানিকটা পথ চলা তার পর অর্দ্ধবৃত্তাকারে এ পথের পরিসমাপ্তি ঘটে গোমুখের আসল রাস্তায়। বলবন্ত সিংকে দেখি চুপ করে বসে আছে একটা পাথরের উপর।

আমাদের দেখে শুধু বলে, "মুঝে তো খ্যাল হো রহা থা কি আপ লোগ জঙ্গলমে খো গয়ে। ঔর সোচ রহা থা কি ইস রাস্তে কো ছোড় কর আপ ইতনী চক্কর কাট কর কোঁ গয়ে।"

গোমুখের পথে যার নিত্য যাতায়াত, সেই জানে না গঙ্গাদাসের অস্তিত্ব—শুনে অবাক হয়ে যাই, অথচ এঁরই জন্যে আমাকে সুদূর বাংলাদেশ থেকে ছুটে আসতে হয়েছে।

অমৃতঘাট থেকে ভুজবাসা আট মাইল কি ন' মাইল। চার মাইল প্রায় শেষ করেছি, বাকি ক' মাইল যা হাঁটতে হবে, তার পরেই ভুজবাসা এসে যাবে। এমন দেওদারের ঠাস বুনুনি অন্য কোথাও দেখি নি, এমন নয়নাভিরাম প্রকৃতির রূপও অন্য কোথাও চোখে পড়ে নি। কোন যাত্রীর পদচিহ্ন এখানে পড়ে নি। তিন জনে চলেছি চুপচাপ, এমন নির্জ্জন যে, নিজের নিশ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত কান পেতে শোনা যায়। পাথরের পর পাথর, তার ওপর দিয়ে বলবন্ত সিং-এর নির্দেশমত ভুজবাসার দিকে এগোতে থাকি। কোন্ দিকে পথ, কত দূরে ভুজবাসা তারই একমাত্র জানা, আমরা চলেছি কতকটা অন্ধের মত। শীতের প্রকোপ এত বেশী যে, কিছুক্ষণ এক জায়গায় স্থির হয়ে দাড়ান মুশকিল। কেন যে গোমুখ সাধারণের জন্যে নয়, কেন যে তিতিক্ষার ষোলআনা যাচিত হয় এখানে তার পরিচয় মেলে প্রতিটি পদক্ষেপে। চলতে চলতে মনে হয় ঠিক একটু আগে একটা বিরাট রকমের ভূমিকম্প এ অঞ্চলের উপর দিয়ে তার ধ্বংসলীলায় সবকিছু প্রকাশ করে গেছে, ভূপৃষ্ঠ যেন দুমড়ে বেঁকে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

এ পথে চলার পরম সান্ত্বনা এই যে, এখানকার যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত নৈঃশব্দ্য···এর দৈব প্রভাব ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যে কতখানি তার আর অন্ত নেই। চলতে চলতে মনে এমন একটি ধ্যানের ক্ষেত্র তৈরি হয় যে, পথশ্রমে ক্লান্তিবোধ হয় না। দেহাত্মবুদ্ধি লোপ পেতে থাকে, অসাড়ে দুটো পা যেন চলতে থাকে। প্রকৃতির দিগন্তব্যাপী নিরাভরণতার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ কতটা ব্যাপক তার অদ্ভুত পরিচয় মিলবে এই পথে।

প্রাণপণ শক্তিতে পথ অতিক্রম করে আমরা অবশেষে ভুজবাসায় পৌঁছে যাই। বেলা দুটো, ঠিক সময়েই এসে গেছি। গঙ্গা এখানে ভয়ঙ্করী, প্রথম দৃষ্টিতে শঙ্কা জাগে···জল এত ঠাণ্ডা যে ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা। বিরাট একটা দেওদারের কাণ্ড গঙ্গার স্রোতোধারার ওপর বিছানো আছে—তার উপর চড়ে বসে পার হতে হয়। পেটের কাছে পা দুটোকে টেনে এনে হাতদুটো কাণ্ডের ওপর রেখে সন্তর্পণে অতিক্রম করতে হয় গঙ্গা। দেওদারের ঠিক হাত দেড়েক নীচেই তীব্র গতিশীল গঙ্গার প্রবাহ।

ভুজবাসা···ভূর্জপত্র থেকেই এ নাম, আর এ নামের সার্থকতাও আছে। দেওদার বনের নিবিড়তার কতকটা শেষ ভুজবাসার এক মাইল আগে থেকে—তার পর থেকে ভুজগাছের সমারোহ। মূল কাণ্ডের উর্দ্ধমুখী প্রসার কতকটা দেওদারেরই সমগোত্র—কিন্তু পাতার ঘন আস্তরণের দিক দিয়ে দুইয়ের পার্থক্য অনস্বীকার্য্য। ভুজ-

গাছের শাখা-প্রশাখার আড়ালে আকাশের নীলিমা অদৃশ্যপ্রায়, তাই পথের উপর ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশটুকু বড় মধুর···। এখানে রাত্রি-বাসের আস্তানা নামমাত্র কাঠের ঘরটুকু, তাও এই ভূর্জবৃক্ষের ঘেরাটোপে যেন ঢাকা পড়ে আছে। বলবন্ত সিং-ই একমাত্র জানে এ ঘরের অস্তিত্ব···সেই এর সন্ধান দেয়···।

কাছেই গঙ্গা···জলই জীবন, তাই সেই জলের কাছেই এই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। এখানে এসেই চায়ের কথা মনে পড়ে। ধরম সিংকে জানাতেই সে চা তৈরির সাজসরঞ্জামগুলো বার করে ফেলে—আমি কিন্তু ভেবেছিলাম হয়ত এই জিনিসটিই সে ভুলেছে। কিন্তু দেখলাম কোনোদিকেই তার ত্রুটি নেই। জল নিয়ে আসে গঙ্গা থেকে—কাঠকুটো জোগাড় করে বলবন্ত সিং···চা তৈরি হয়ে যায় দশ মিনিটের মধ্যে। চা পানের পর বিশ্রাম। ভূর্জবাসার এই ঘরটি সর্বদা খোলাই পড়ে থাকে গোমুখযাত্রীদের জন্যে—ঘরটি মন্দ নয়, দেখে মনে হয় অল্পদিন হ'ল তৈরি হয়েছে। আজকের রাত্রের আশ্রয়স্থল এ ঘরটি যেন চিরপরিচিত কমলীবাবার ধর্মশালার রূপান্তর···ধূ ধূ করা শূন্যতার ভেতর এটি যেন রজনীগন্ধার মত ফুটে আছে···। দু'দশ বছর আগে এ ঘরটিও ছিল না—ছিল পাহাড়ের গুহা, আর তাই ছিল তীর্থযাত্রীর আশ্রয়স্থল। শীতের তীব্রতার জন্যে বাইরে বসে বসে প্রকৃতিকে উপভোগ করবার আশা দুরাশা—তাই সন্ধ্যা ছ'টার ভিতর তিনটি প্রাণী ঘরের মধ্যে আশ্রয় নি···পুরি ত সঙ্গে আছেই তাই এ দিকটার সম্বন্ধে চিন্তা ছিল না!

ভূর্জবাসার রাত ভোলবার নয়···স্মৃতিমঞ্জুষার সঙ্গে তা জড়িয়ে গেছে। সাড়ে সাতটার ভেতর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যায়···ধরম সিং আর বলবন্তের শয্যা নিতে যা দেরী—আটটার ভেতর বুঝলাম ওরা কেউই আর জেগে নেই। ছোট ঘরটার দরজা-জানলাগুলো বন্ধ···শুধু লণ্ঠনটা পায়ের কাছে স্তিমিতভাবে জলছে। পর পর তিনটে কম্বল চাপিয়ে শুয়ে ছিলাম, তবু শীত যাচ্ছিল না। ঘুম আসছে, আবার আসছে না···কেমন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। চিন্তার বিবর্তনের ধাক্কায় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল আমার।

কোথায় এলাম? কোথায় আমার শয্যা? কে আমি? এ পৃথিবী আমার ত? তীর্থ পরিক্রমার একত্রিশটা দিনের একত্রিশটা রাত···আশ্রয় জুটেছে, খাদ্য জুটেছে, মানুষের সঙ্গেরও অভাব ঘটে নি। পেয়েছি সামাজিকতার বন্ধন, পেয়েছি জীবনের উত্তাপ ও সভ্যতার আলো। পথ চলতে চলতে বিভিন্নরূপে মানুষের সঙ্গ পেয়েছি। ধরাসু থেকে যমুনোত্তরী—তারপর উত্তরকাশী, গঙ্গোত্তরী···দুটি মহান্ তীর্থে সবকিছু না এলেও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি নি আমি···মনুষ্যসৃষ্ট সভ্যতার সংস্পর্শ ছিল।

কিন্তু এ কি? কোথায় আমি শুয়ে? আমি ধরম সিং···বলবন্ত সিং—এই তিনটি প্রাণীর বিশেষণ কি? একটা আদিম পৃথিবী···অর্বাচীন আমরা, সৃষ্টিরহস্যের চরম জিজ্ঞাসার মত আমরা এখানে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছিঁড়ে এসেছি···। বিশ্বচরাচর অবলুপ্ত···মহামায়ার ত মহানিদ্রা চলেছে।

নিঝুম রাত···সৃষ্টির প্রথম যামের প্রথম অঙ্ক···। যাত্রীর কোলাহল নেই···জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিবৃত্ত নেই···চড়াই-উৎরাই ভাঙার গল্প নেই···ধর্মশালা নেই। কান পেতে থাকলে কেবলমাত্র গঙ্গার গর্জ্জন শোনা যায়···বিষ্ণুপাদসম্ভূতা জাহ্নবী যেন

গোমুখের পথে

বেহাগ বাজাচ্ছেন। ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজও শোনা যায় না—তার শব্দও এখানে অপাংক্তেয়। ভারতভূমির বহুতীর্থের বহু অভিজ্ঞতা, কিন্তু ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানের যে পর্ব্ব আর তার যে ভূর্জবাসার রাত—এর তুলনা কোথাও পাই নি! স্মৃতির ভাণ্ডারে আজকের এই রাত্রের সম্পদ অবিস্মরণীয় ও অমূল্য···যাত্রীবিশেষের জীবনে এই রাত্রির অবদান বোধমার্গের চরম অবদান···।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি···জপের ভেতর দিয়ে···ধ্যানের ভেতর দিয়ে···কখন ভোর হয়ে যায়!

ঘুম ভাঙে সকাল সকাল। চিন্তার ভেতর গোমুখের কথা মনে হওয়ামাত্র কম্বলের অরণ্য ছেড়ে উঠে পড়ি। আমার ওঠার আগেই ওরা উঠেছে···গরম জল, চা সবই আমার জন্যে তৈরি। সেবা-ধর্মের এরকম নিখুঁত পরাকাষ্ঠা ধরম সিং ছাড়া আর কে দেখাবে? ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি সাদা কুয়াশার একটা আস্তরণ পড়েছে, পাহাড়-পর্বত গাছপালা সব যেন ভেজা ভেজা, এদিকে-ওদিকে বিচ্ছিন্ন তুষারের আস্তরণ। এ পথে তুষারের সাক্ষাৎ এই

প্রথম। প্রচণ্ড শীতের কনকনে হাওয়া বইছে! রাজ্যের শীতবস্ত্র গায়ে জড়িয়েও শীত যায় না। সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হই গোমুখের পথে।

ভুজবাসা ছাড়িয়ে খানিকদূর যাবার পরেই গাছপালার সবুজ রং মুছে আসতে লাগল···নিঃশেষ হয়ে আসতে লাগল ভূর্জবৃক্ষের সমারোহ। সুরু হ'ল ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত খাড়া খাড়া পাহাড়··· অজস্র প্রস্তরসমাকীর্ণ এক মাঝামাঝি আমলের পথরেখা। আগে আগে চলেছে বলবন্ত···গঙ্গাকে পাশে রেখেই আজকের পথ চলা। জীবন-মৃত্যু হাতে করে গঙ্গা অতিক্রমণের পালা শেষ হয়েছে, এবার গঙ্গা নিজেই যেন হাতছানি দিয়ে তাঁর সন্তানদের রহস্যলোকের সন্ধানে নিয়ে গেছেন। চলতে চলতে ধরম সিং হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে। কান পেতে শুনে মনে হয় ওটি শিবস্তোত্রম্। কাঁচ গলায় মুক্ত প্রাণের দৈবভাবের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস···বড় ভাল লাগে। কেন ও গায় বুঝতে পারি সেটা···বুঝতে পারি বাঁধ ভেঙেছে। ভুজবাসা থেকে গোমুখ চার মাইল···বের হবার মুহূর্তে উপর দিয়ে চলেছি, এই প্রথম হাঁফ ধরে। মাইল-পোষ্টের হিসেব করার আশা সুদূরপরাহত···দেড় মাইল আন্দাজ পার হবার পর ফুলের অজস্রতা চোখে পড়ে। লাল, নীল, বেগুনি কত অজানা অনামী ফুল, পাষাণ-মৃত্তিকায় থরে বিথরে ফুটে আছে। যমুনোত্রীর আগে খরসালী ছাড়াবার পরও ঠিক এইরকম পুষ্পগুচ্ছ দেখেছিলাম। মুঠো করে কিছু তুলে নি উৎসমুখে দেব বলে। কিছুক্ষণ খণ্ড খণ্ড পাথরের উপর দিয়ে চলার পর বহুদূরে ধবধবে দুটি পাহাড়ের শৃঙ্গ চোখে পড়ল···ও দুটিই শতপথ পাহাড় কিংবা ত্রিশূল ও নন্দাদেবী। পথের দু'ধারে পাহাড়ের ভগ্নাংশের যে রূপ ছিল, তা হ'ল অদৃশ্য··· এখন বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির মাঝখান দিয়ে মা-গঙ্গা চলেছেন। এখান থেকে বৃত্তের আকারে প্রবাহ ঘুরে গেছে উত্তর দিকে ঐ শতপথকে লক্ষ্য করে। বলবন্ত সিং জানায় যে ঐ টুকু পার হলেই গোমুখের বহুশ্রুত গহ্বর দেখা যাবে! টুকু পথ যেন শেষ হয় না···মনে হয় যুগের প্রহর গোনা চলেছে। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি থেমে আসে, কাঁপুনি বেড়ে যায়, দুর্লভতমকে পাওয়ার আবেশে সবকিছু যেন অনড় ও অচল হয়ে আসে! আধমাইল মাত্র পথ··· জীবনের এ যেন অনন্ত প্রতীক্ষা।

বৃত্ত ঘুরে আসে, লাঠির উপর ভর দিয়ে চলতে থাকি। মা-গঙ্গা হারিয়ে যান—তাঁর প্রবাহ আর দেখা যায় না···চোখের সামনেই দেখতে পাই বিরাট এক পাহাড়ের একটি গুহা, নিবিড় অন্ধকারে ভেতরটা সমাচ্ছন্ন, আর তার জঠর থেকে ভীমগর্জনে বেরিয়ে আসছেন মাতৃস্বরূপিণী জাহ্নবী।

ঐ ভয়ঙ্কর গুহামুখ, ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব মানুষের পক্ষে। তাই একে অবলোকন করতে হয় দূর থেকে। এ পাথর থেকে সে পাথরের উপর পা রেখে টাল সামলে ভারসাম্য বজায় রেখে ক্রমশঃ যতটা সম্ভব গুহা-মুখের সামনে এসে দাঁড়াই। নিরেট একটি তুষারাচ্ছন্ন পাহাড় ধাপে ধাপে উর্দ্ধপানে উঠে গেছে, আর তার নাভিদেশে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখব্যাদান করে আছে একটি গুহা আর ঐ গুহার গহ্বর থেকে হু হু শব্দে, বেরিয়ে আসছে গৈরিক রঙের বিপুল জলরাশি···মনে হ'ল একটি অসীম শক্তির প্রচণ্ড তাড়নায় মা-গঙ্গা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছেন···কে যেন ঠেলে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। নিকষ কালো ঐ গুহা···মনে হ'ল গোটা পৃথিবীর মন্থন চলেছে ওর মধ্যে, বেশীক্ষণ তাকানো যায় না···বুকের ভেতর দুর দুর করে ওঠে অজানা আশঙ্কায়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে অন্তরাত্মা বিবশ হয়ে আসে, মনে হয় প্রলয় সুরু হয়েছে এখানে।

মা যেন বিশ্বসংসার গ্রাস করছেন। সৃষ্ট বস্তুর সবকিছুই মায়ের দুর্গহ্বরে প্রবেশ করছে। ঐ গুহার জঠরে কি আছে, কোন্ অনন্ত-শক্তির প্রকাশ ওর ভেতর তা'র আবিষ্কার সহজসাধ্য নয়! মা-গঙ্গা ঐ গুহামুখ থেকে উৎসারিত··· তার পর তাঁর অনন্ত প্রবাহ আর দেখা যায় না। কত জন্মের ইচ্ছা, কত আকুলিবিকুলি, আজ তার সার্থকতা···এসে গেলাম গোমুখে। যে ভাগীরথীর সঙ্গে সম্বন্ধ সারা জীবনের, যাকে নিয়ে জীবনের এক বৃহৎ অংশ কেটে গেছে, চোখের সামনে সেই গঙ্গা অদৃশ্য হয়ে গেলেন পাহাড়ের গুহায়··· এ এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। গুহামুখ থেকে জলরাশির যে উচ্ছ্বাস আর যে ভাবে তার ছুটে আসা পৃথিবীর দিকে—তার তুলনা কোন তীর্থে নেই। সুদুরপ্রসারী নিঃশব্দ আর নিরাভরণতার ভেতর এই ভীমবেগে প্রবহমান গঙ্গার উচ্ছ্বাস···মনে হয় চারিপাশে দমরুনিনাদ চলেছে, মহেশ্বরই বাজাচ্ছেন যে ডমরু। নিরবচ্ছিন্ন শব্দ গুম-গুম-গুম। কারুর কথা শোনা যায় না, আকার-ইঙ্গিতই মনোভাব প্রকাশের একমাত্র উপায়। বিরাট এক পরিবারের আকর্ষণে পৃথিবীর নাভিশ্বাস উঠছে যেন, তাই গর্জনের এত প্রচণ্ডতা। পথ থেকে সংগৃহীত অনামী ফুলের অঞ্জলি দি', আর অন্তরের সবটুকু ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে প্রণতি জানাই। অবগাহনস্নানের ইচ্ছা প্রবল হলেও তা সম্ভব নয়, কেননা জলের শীতলতা এত বেশি যে, তা কল্পনাতে আনা যায় না। দ্রবীভূত তুষারপ্রবাহ ভাগীরথীর। উত্তরকাশী থেকে আনা পাত্রে এ পুণ্য-বারি সঞ্চয় করি, কিছু মাথায় ছিটাই। মনপ্রাণদেহ এতেই যেন পবিত্র হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন হ'ল এই গহ্বরের 'গোমুখ' আখ্যা হয়েছে কেন? গো-মাতার মুখাবয়বের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলেই কি? এ বিষয়ে ঔৎসুক্য ছিল প্রচুর: মনে মনে ভেবেছিলাম যে, যাত্রাশেষে গোমুখই দর্শন হবে। পাহাড়-পর্ব্বতের যে আকৃতি তার মধ্যে পুরোপুরি একটি গরুর মুখের কল্পনা করা দুঃসাধ্য। দৃষ্টির সামনে যে উর্দ্ধমুখী পাহাড় আর সেই পাহাড়ের বুকে স্মরণাতীতকালে যে গহ্বরের সৃষ্টি, সেটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ধারণায় আসে যে, গহ্বরের গঠন পুরোপুরি গোলাকার নয়—ব্যাদিত মুখের নিম্নভাগটা বৃত্তাকারই বটে, কিন্তু উপরিভাগের ওষ্ঠের আকৃতি কতকটা গো-মুখের ন্যায়। ঐ ওষ্ঠের উপরিভাগটা বঙ্কিম আকৃতি, এইটুকুই গোমুখের সঙ্গে সাদৃশ্য।

কিন্তু অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে গোমুখের আসল রূপ ধরা পড়ে বৈ কি। এই রূপের প্রকাশ দূর থেকে, যেখান থেকে ঐ গহ্বর দৃষ্টির সামনে প্রথম শেষরাত্রে শুকতারার মত ভেসে ওঠে। অনন্ত আকাশের দূর পটভূমিকায় ধ্যানগম্ভীর ত্রিশূল ও নন্দাদেবীর যে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, দূর থেকে ও দুটিকে গোমাতার দুটি শৃঙ্গের মতই মনে হয়—তারই নিম্নে দিগন্তব্যাপী তুষারক্ষেত্র। এই তুষারক্ষেত্রের পাদদেশে যে পাহাড়ের অবস্থিতি, তারই বক্ষদেশের এই গুহার আকৃতিকে গরুর মুখের সঙ্গে তুলনা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ তুলনা চলে ধ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে, অন্য কিছুতে নয়। গোমুখের কল্পনা ভাব সমাহিত অবস্থার ভেতর এবং তাও দূর থেকে।

প্রশ্ন আরো থেকে যায়। এই গহ্বরকে গোমুখই বলা হয়েছে কেন? অন্য কোন জন্তুর মুখের সঙ্গে কেন এই মহাতীর্থের আকৃতির তুলনা করা হয় নি? এরও উত্তর মিলবে সূক্ষ্ম চিন্তার দ্বারা। গঙ্গোত্রী তীর্থভূমির তুলনা পরমশক্তি স্বয়ং মহাদেবের বক্ষদেশ, আর এই গোমুখ মহাতীর্থের তুলনা সেই শক্তিরই ত্রিভাগ। ভগীরথের মহা তপস্যার ফলেই জাহ্নবীর মর্ত্যে আগমন। তাঁর তুষারের বেগ সহ্য করেছিলেন মহাদেব, তিনি অনুকূল না হলে ভগীরথের তপস্যায় সগরবংশের উদ্ধার সম্ভবপর হ'ত না। ঐ যে ত্রিশূল পাহাড়, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই পৌরাণিক চিত্রটি মানসপটে ভেসে ওঠে: ভগীরথ কঠোর সাধনায় নিমগ্ন, তিনি বসে আছেন তপস্যায় নির্বিকল্প হয়ে, ব্রহ্মে লীন হয়ে। সাধনার বলে পতিতপাবনী মা-গঙ্গাকে তাঁর আনা চাই। শিব যেন তাঁরই পাশে দণ্ডায়মান, এক হাতে ত্রিশূল আর এক হাতে ডমরু। কণ্ঠে ফণাধর সর্পের বেষ্টনী···মস্তকের ঊর্দ্ধে একাদশীর চাঁদের মায়া। মহাদেবের দূরপ্রসারিত জটাজালের ভেতর মা অবতরণ করছেন তাঁর বিপুল জলস্রোতের বেগ নিয়ে, উচ্ছ্বাস নিয়ে। দিলীপপুত্র ভগীরথের একাগ্র সাধনার হ'ল জয়···ধরাতল মায়ের স্পর্শে হ'ল ধন্য। এখানকার সমগ্র ভূভাগেই ওতপ্রোত রয়েছে এই পৌরাণিক তত্ত্ব, এখানে সবটাই শিবক্ষেত্র, সবটাই মহেশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক আর ঐ ত্রিশূল পাহাড়টাই তার সাক্ষী। গোমুখের যে কল্পনা স্মরণাতীত কালে মহাপুরুষরা করে গেছেন, তার সঙ্গে মহেশবাহন বৃষপর্ব্বটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গরুর দেহে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান···এ স্বীকৃতি পুরাণের, এ আবিষ্কার হিন্দুধর্মের, তাই 'মাতা' শব্দের উৎপত্তি, তাই তাকে ঘিরেও আমাদের স্তবস্তুতি। অন্য কোন জন্তুর মুখের সঙ্গে এই গুহামুখের সাদৃশ্য কল্পনা করা হয় নি···তার কারণ হ'ল ওই। শিব যেখানে, সেখানেই বৃষ···আর তার মুখাবয়বও সেখানে।

এখানে এসে দাঁড়ালে আর একটি সারতত্ত্বের পৃষ্ঠা যেন আচমকা চোখের সামনে উড়ে আসে। সে তত্ত্ব মানুষের জন্মমৃত্যু। রুদ্ধ মাইলের দংষ্ট্রাকরালরেখার ভেতর দিয়ে ভাগীরথীর যে প্রবাহ

গঙ্গাদ্বারের পথ (অমৃত রাও)
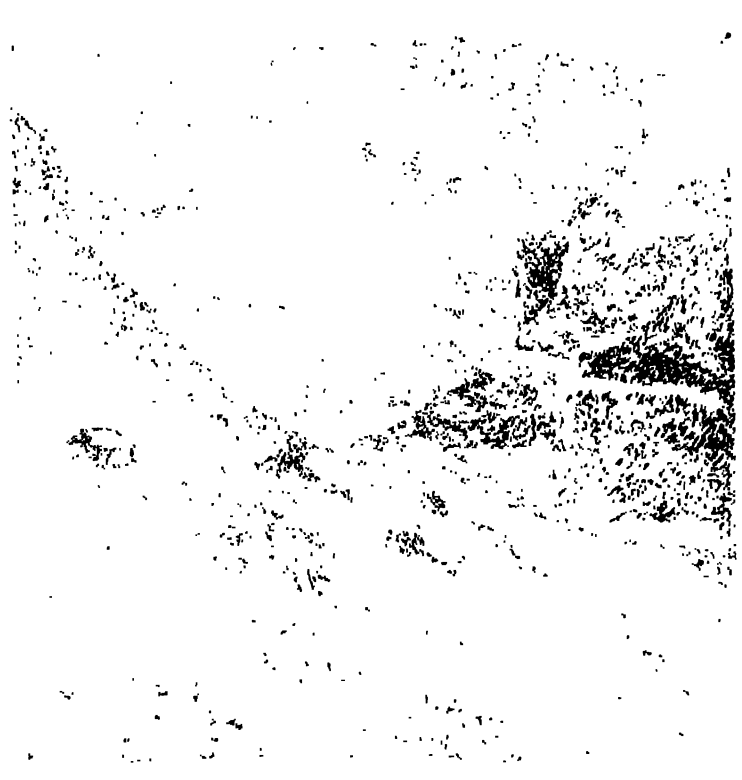
তার শেষ হয়েছে সমুদ্রে···বিশাল ভারতভূমির সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মা-ধরিত্রীর পাদদেশে সাগরে এসে মিশেছেন। নিম্নগামী যে প্রবাহ তাকে মানুষের কর্মজীবনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অল্পপরিসর স্থান, কতখানিই বা—এখান থেকেই ভাগীরথী ভীমবেগে নীচে নেমে আসছেন এবং নীচে নিম্ন-অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষীণ কায়া আর নেই—তিনি তখন বিপুলা ও উচ্ছলা। পথ চলার আবেগে তিনি নানাবিধ শক্তিকে নিজ দেহে আহরণ করেছেন···তাঁর প্রসার আপনা থেকে। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর গঙ্গার যে রূপ তার সঙ্গে এখানে দেখা গঙ্গার কোন মিল নেই; অথচ একই গঙ্গা, একই প্রবাহিণী। জীবনও তাই—জীবনের সবকিছু যেন এই একই সূত্রে গাঁথা।

আর ঐ ত্রিশূল···যেন সমগ্র মেদিনীকে ফুঁড়ে উঠে গেছে

ঊর্দ্ধাকাশে···মহাব্যোমের অনন্ত নীলিমায়। ও ত্রিশূল পিনাকপাণির, ও ত্রিশূল শ্মশানচারী ক্ষেপা ভোলানাথের। তিনিই সৃষ্টিস্থিতি-ধ্বংসের হেতু···তাঁরই হাতে মহাপ্রলয়ের ডমরু বাজে। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি ভাগীরথীকে আবাহন করে নিয়েছেন আপন জটাজালের মধ্যে আর তাঁরই সৃষ্ট মহাসমুদ্রে সেই শক্তির বিলয় হচ্ছে।

গোমুখের উদ্ভব যে পাষাণস্তূপ ভেদ করে, ইচ্ছে ছিল উর্দ্ধে উঠে গিয়ে তার এই অলৌকিক রহস্য সম্বন্ধে আরো কিছু অনুসন্ধান করব। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টার পর বোঝা গেল তা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কোথা দিয়ে উঠব? পথ কোথায়? নিরেট পাহাড় সামনে—এমন কোন অবলম্বন নেই যে তা আশ্রয় করে উপরে ওঠা যাবে। মানুষের গতিবিধির সীমা এই গুহামুখ পর্য্যন্ত···এর উপরকার স্তরের কথা রহস্যাবৃতই থেকে যাবে চিরদিন।

চার ঘণ্টারও ওপর ছিলাম গোমুখে। বলবন্ত জানায়—আজ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে যত যাত্রী এসেছে তারা দু'ঘণ্টার বেশী কেউ থাকে নি—আমার অবস্থিতিকালই নাকি সকলের চেয়ে বেশী। কেন যে এতক্ষণ থাকতে পেরেছি, কেন শীতে জমে যাই নি—তার কারণ আমার জানা নেই। ধরম সিং চুপচাপ বসে ছিল না এখানে এসে। তার আসাটাও প্রথম—উত্তেজনায় সে এ পাথর থেকে সে পাথরে ছুটাছুটি করছে। সত্তর বছরে তার গোমুখ দর্শন···কতখানি সুকৃতির ফলে এটি সম্ভব ত একমাত্র ভগবানই জানেন। পাত্রে করে সে-ই গোমুখের জল এনে দেয় আমাকে···আকণ্ঠ পুরে পান করি আমি···কি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মিষ্টি জল যে ধারণায় আসে না। এই গঙ্গাজলে আমি যেন অমৃতের স্বাদ পাই। বেলা তিনটের পরই প্রত্যাবর্ত্তনের পালা সুরু হয় আবার। সেই বৃত্ত আবার ঘুরে আসে, দৃষ্টির সামনে ঢাকা পড়ে যায় গোমুখ। এবারকার মত গঙ্গোত্তরী দর্শনের এইখানেই শেষ। রাত্রে ভুজবাসা···সেই দিব্যানুভূতি লাভ। প্রত্যুষে আবার যাত্রা···মধ্যাহ্নের আগেই গঙ্গোত্তরীতে এসে যাই।

ধরাসু থেকে যাত্রা যমুনোত্তরীর পথে। আশঙ্কা ছিল দুরারোহ দুর্গম তীর্থ পরিক্রমায় সফলকাম হব কি না। সৌভাগ্যক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছি সে পরীক্ষায়। গঙ্গোত্তরীর পথেও যাত্রা ভুলবার নয়, এ পথ স্মৃতি থেকে মুছে যাবার নয়। এ পথে অঞ্জলি গেছে ভরে, অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, জীবনে ঘটেছে সব অভাবনীয় ব্যাপার। সকলের ঊর্দ্ধে যিনি, সেই পরমাপ্রকৃতি, তাঁর অগোচর কিছু নেই। তাঁর সন্তানের কান্না যদি প্রকৃত কান্না হয়, তা হলে আঁচল দিয়ে সেই অশ্রু তিনি মুছিয়ে দেন—কেননা তিনি যে মা, তিনি যে বিশ্বপ্রসবিনী···। অর্ব্বাচীন গোত্রহীন আমি—আমার ঘরসালীতে ফেলে আসা অশ্রুর মর্ম্ম তিনি বুঝেছিলেন, তাই গঙ্গোত্তরীর তীর্থপথে অচিন্তনীয় ব্যবস্থায় আমার ভিক্ষার ঝুলিতে সঞ্চিত হয়েছে। যমুনোত্তরীতে দুঃখ দিয়েছেন, তার জন্যে হৃৎপিণ্ড যেন ছিঁড়ে গেছে মনে হয়েছে, আর সেজন্যেই গঙ্গোত্তরীমার্গে সকল পরিপূর্ণতা। জলের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তখনই যখন তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যায়—অন্ধকার যখন নিবিড়তম হয়ে আসে তখনই আলোর জন্যে আকুতি! এও তাই, যে তৃষ্ণার সূত্রপাত যমুনোত্তরীতে তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখে যেখানে অঞ্জলি ভরে জল পেয়েছি···জীবনের পাত্র তাতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে। মা-ই সব, সবই তিনি দেন, প্রাণ ভরে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়—এ চরম সত্যটি আমার তীর্থযাত্রায় বার বার প্রমাণিত হয়েছে। যোগাযোগই জীবনের আসল কথা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রত্যাবর্ত্তন

স্বর্গরাজ্যে জীবন কাটানোর অধিকার মানুষের নেই—ধূলিধূসর ধরণীর মানুষ আমি···মাটির টান বড় টান। সেখানে সংসার আছে, বন্ধন আছে···মায়া আছে, আছে নানা বিধিনিষেধের অচলায়তন। তাই ফেরার পালা, তাই প্রত্যাবর্ত্তনের অধ্যায়। যেটুকু দৈবভাবের সঞ্চার হয় তা চিরস্থায়ী করার সুযোগ নেই এখানে, কেননা মৃত্তিকার যোগমায়া বসে আছেন কলকাঠি নিয়ে···আমাকে না পেলে তাঁর লীলা যে শেষ হবে না। প্রপঞ্চ মায়ার ভেতর তাঁর অধিষ্ঠান, মাটির মানুষ আমি, তাই আমার আসল ঐশ্বর্য্য ফেলে যাওয়া, চীয়ের গনিকে পাশ কাটিয়ে আমার তাই প্রত্যাবর্ত্তনের তোড়জোড়। যেতে আমাকে হবেই···এ স্বর্গরাজ্য যে আমার নয়: পান্থশালার মত দু'দিনের আশ্রয় ভগবান দিয়েছিলেন, তাই যথেষ্ট, তাই জীবনাকাশে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হয়ে থাক্।

প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার মধ্যে বেদনা বড় কম নয়। যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফেরা, তার ভেতর না আছে বৈচিত্র্য, না আছে নূতনত্ব। আসার সময় ছিল উদ্দীপনা, উচ্ছাস···তখন মনে মনে যোগাযোগের মালা গেঁথেছি আর সে গাথা সার্থক হয়েছে। গঙ্গোত্তরীর মন্দির ও ঘরবাড়ী ছাড়িয়ে যখন আবার ভৈরবঘাটির উৎরাই পথ ধরলাম তখন মনে হ'ল আমার শক্তির ভাণ্ডারের সকল সঞ্চয় কে যেন নিঃশেষ করে নিয়েছে··· আমি দেউলে হয়ে গেছি।

সমাপ্ত

সমান অধিকার আন্দোলনে নারী

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

নারী নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম করিয়াছে তাহার কাহিনী চমকপ্রদ। নারীর এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। কোন কোন সময় নারীকে অন্যান্য অস্থাবর দ্রব্যের মতই জ্ঞান করা হইয়াছে, আবার কখনও কখনও সে পাইয়াছে সম্রাজ্ঞীর মর্য্যাদা। নানা দেশের আইন নারীকে দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য মনে করে নাই, অথচ কোন কোন দেশে মানুষ মাতার নামে পরিবার ও গোষ্ঠীর পরিচয় দিয়াছে এবং মাতৃপরিচয়ে সমাজের কাঠামো গড়িয়াছে।

নারী কখনও উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিয়াছে, আবার কখনও-বা দাসত্বের কঠিনতম নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছে। পুরুষই নারীকে উন্নতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। আবার সেই পুরুষের হাত হইতেই স্বাধিকার লাভের জন্য, নারীর প্রতি পুরুষের অশ্রদ্ধা দূর করিবার জন্য নারীজাতিকে কঠোর ও দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

বিবাহ দ্বারা পৃথিবীর বহু দেশে এক সামাজিক চুক্তি নিষ্পন্ন হয়—এই চুক্তি অনুসারে পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষ সম অধিকারী এবং সমান অংশীদার বলিয়া গণ্য হয়। অবশ্য হিন্দু বিবাহ নানা ভাবে নারীকে সমান মর্য্যাদা দিলেও ইহা ঠিক চুক্তির পর্য্যায়ে পড়ে না। বিবাহের চুক্তিতেই নর ও নারীর ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির কথা সুদূর অতীত কাল হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। যদি কখনও বিবাহ বাতিল হইয়া যায় তাহা হইলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ বা খেসারত দেওয়ার কথাও এই চুক্তিতেই থাকে।

কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারীকে দেওয়া হইত অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধরণের কাজ---যথা, বস্ত্র বয়ন বা কেনা-বেচার কাজ। পল্লী অঞ্চলে নারী ও শিশুরা পর্য্যন্ত ক্ষেত-খামারে কাজ করিত।

মিশর যখন প্রাচীন সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল তখন সেখানে নারীর অধিকার খুব স্পষ্ট ভাবেই স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য জাতির প্রাচীন সভ্যতার বিষয় আলোচনা করিলে অনুরূপ নিদর্শন সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। প্রাচীন গ্রীসের (বিশেষতঃ স্পার্টা) সভ্যতা নারীকে ভারবাহী পশুর পর্য্যায়ে নামাইয়া দিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতার আদিম বর্ব্বর যুগের যে সকল নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, ইহা তাহার অন্যতম। তখন পণ্যদ্রব্যের মত নারী ক্রয়-বিক্রয় চলিত এবং তাহাকে জোর করিয়া দখলে আনা যাইত। ইহারও বহু পরে নিজ কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতা তাহার বিবাহ দিবার অধিকারী ছিল।

কয়েকজন দার্শনিকের মতবাদ প্রচারিত হওয়ার দরুন এথেন্সের নারীর প্রতি অপেক্ষাকৃত সহৃদয় ব্যবহার করা হইত। জেনোফোন নারীর অধিকারের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্লেটো কিন্তু ভাবিতেই পারিতেন না যে, কেমন করিয়া স্ত্রী স্বামীর সমান হইবে। এরিষ্টটল ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নারী পুরুষ অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর জীব, বিশেষতঃ যুক্তিতর্কের বিষয়ে তাহার স্থান যে নীচে তাহা অবধারিত।

এরিষ্টটলের আর একটি উক্তি—"নারী নিশ্চয়ই নানা গুণের অধিকারী, কিন্তু এই গুণগুলি তাঁহার যোগ্যতা অনুযায়ীই বিকশিত হইয়াছে। তবে তাঁহার যোগ্যতা পুরুষ অপেক্ষা কম।"

এরিষ্টফেনিসের নাটক হইতে সেই যুগে নারী কতটা স্বাধীনতা এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করিয়াছিল তাহা জানা যায়। কিন্তু নারীর তৎকালীন প্রগতি আইনের আনুকূল্যে হয় নাই, সামাজিক প্রগতির জন্যই সম্ভব হইয়াছিল।

রোমেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই আইনের চোখে নারীর মর্য্যাদা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। খুব প্রাচীনকালে নারী ছিল পিতা বা স্বামীর সম্পূর্ণ অধীন। একমাত্র দেবতার পূজারিণী ব্যতীত সকল নারীকেই জ্ঞানলাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। সিসিরো, টেসিটাস এবং কেটো ইহাদের কেহই নারীর বিচারবুদ্ধি আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তবে স্বামী নির্ব্বাচনে নারীর মত জানিবার এবং বিবাহ-বিচ্ছেদে নর ও নারীর উভয়ের সম্মতির প্রয়োজন স্বীকার করা হইয়াছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রেও নারীকে অক্ষম মনে করিয়া কন্যা পিতার, স্ত্রী স্বামীর ও মাতা পুত্রের অধীনে থাকিবে এইরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সেনেকা এবং ষ্টোয়িক দার্শনিকগণ দৃঢ় ভাবে নরনারীর সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করিলেও তাঁহারা এই মত প্রকাশ করিলেন যে, দার্শনিক বিষয়ের আলোচনায় পুরুষের মত নারীর যোগ্যতা নাই। এই সময় সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সহ-শিক্ষার প্রচলন দেখা যায় অর্থাৎ তখন একজন শিক্ষক একই পরিবারে ভ্রাতা ও ভগ্নীকে একসঙ্গে শিক্ষাদান করিতে পারিতেন। শিক্ষার

ব্যাপারে এই নূতন অধিকার লাভ করায় নারীর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে অধিকতর সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু পারিবারিক এবং সাধারণ আইন মতে তখনও নারীর অধিকার বাড়ে নাই।

ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে যখন বিরাট নবজাগরণ আসিল তখন ব্যাপকভাবে নারীর উন্নতি সুরু হইল। মধ্যযুগীয় নাইটদের নিকট নারী 'দেবী'র মর্য্যাদা পাইয়াছিল। রাজকুমারী, ভদ্রমহিলা এবং মধ্যবিত্ত ঘরের নারীগণ সকলেই এই যুগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। ইটালীতে, বিশেষতঃ ইহার প্রোভেন্স এবং ল্যানগুইডক্ প্রদেশে মহিলাগণ বিশুদ্ধ লাটিন ভাষায় কথা বলিতেন, কবিতা লিখিতেন এবং শিল্প ও সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। এই সময় কোন কোন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করিতেন—দেখা যায়।

চতুর্দ্দশ শতকে নারীর আরও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। নেপলসের রাণী জোয়ানের দরবার এই সময় নারী-প্রগতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফরাসী দেশের পঞ্চম চার্লসের কন্যা ক্রীষ্টাইল ডি পীসান এ সময় নারী-প্রগতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া "The City of Ladies" নামক নারীশিক্ষা বিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা করেন। তিনি প্রচার করেন যে, প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই। ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে যদি বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হয় তবে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে নারী পুরুষের মতই ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে আরও কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল।

ফরাসী দেশে ষোড়শ শতাব্দীতে নারী-সমাজের শীর্ষস্থানীয়াদের মধ্যে মার্গারেট ডি ন্যাভেরে (প্রথম ফ্রান্সিসের কন্যা), মার্গারেট ডি ভেলয় (চতুর্থ হেনরির স্ত্রী) এবং মিস ডি গুর্লে—যিনি নর ও নারীর সমান অধিকার সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইটালীতে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এঞ্জিলিয়া ডি ব্রেসিয়া—উরসুলাইন নামক এক (ধর্ম্ম) সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। গ্রেট ব্রিটেনে নারী-প্রগতির প্রতীক ছিলেন রাণী এলিজাবেথ এবং স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী।

ষোড়শ শতাব্দীতে উদার মতাবলম্বী ডচ ইরাসমাস এবং কর্ণেলিয়াস এগ্রিপ্পা মহাপুরুষ—নারীশিক্ষা ও যে সকল কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিকার ছিল না সেই সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিকারের সপক্ষে মত প্রচার করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা রাজনীতিতে নৈপুণ্য এবং সাহিত্যেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। অবশ্য তখনও সে দেশে শিক্ষায় নারীর অধিকার কিংবা নারীর পৌর-অধিকার স্বীকৃত হয় নাই যদিও পরিবারে পিতা-মাতার আচরণ ও সামাজিক অগ্রগতি নারীকে নানা অধিকারলাভের দিকে নিশ্চিত ভাবে আগাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

প্রাচীন ইংরেজ ও ফরাসী আইনে অবিবাহিতা কিংবা বিধবা নারী পুরুষের মতই চুক্তি অথবা উইল করিতে পারিত। কিন্তু বিবাহ হওয়া মাত্রই তাঁহাদের এই সকল অধিকার লোপ পাইত।

ইংলণ্ডে মেরী এস্টেল (১৬৬৮-১৭৩১) পরিবারে এবং সামাজিক-জীবনে নারী-পুরুষনির্বিশেষে মানুষের সমান অধিকার সম্বন্ধে দুখানি বই লেখেন। পরবর্ত্তীকালে এলিজাবেথ মণ্টাগু এবং হান্না মোর এ সকল পুস্তক পড়িয়া অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা নারীর অধিকারলাভের সপক্ষে সংগ্রাম চালাইতে থাকেন। মেরী উলস্টোন ক্রাফট এই উদ্দেশ্যসাধনেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "Vindication of the Rights of Women" নামক পুস্তকে তিনি নারীর অধিক অধিকারের দাবি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ইহার উপরেই নারীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার নির্ভর করে, বিশেষতঃ নারী-শ্রমিকগণের ক্ষেত্রে ইহা খুবই সত্য। এই পুস্তকখানি টেলির‍্যাণ্ড নামক জনৈক লেখককে উৎসর্গ করা হইয়াছিল—টেলির‍্যাণ্ড নারী-পুরুষের সমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন।

নারী-প্রগতির ব্যাপারে আইনের দিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশ আর মোটেই অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু বিপ্লবের (জুলাই, ১৭৮৯) কিছু পূর্ব্ব হইতেই এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী নারী-প্রগতির পথে বেশ বড় রকমের এক ধাপ অগ্রসর হয়।

১৭৮৯ সনে ফ্রান্সের জাতীয় সম্মেলনের নিকট ফরাসী নারীসমাজ তাঁহাদের স্বাধিকারের জন্য আবেদন পেশ করেন। তাঁহারা জাতীয় সভায় সদস্যপদ দাবি করেন। নারী দরজি ও অন্যান্য শ্রমশিল্পজীবিনীগণ তাঁহাদের পেশাগুলি যাহাতে সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য আবেদন জানান। তাঁহারা বলেন —পুরুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা তাঁহাদের ইচ্ছা নয়। কিন্তু তাঁহাদের জীবিকার্জ্জনের পন্থায় যাহাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে বিষয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে তাঁহারা বলেন। নারী আন্দোলন পরিচালন করেন অলিম্পি ডি গৌজেস। তাঁহার প্রণীত "Declaration of the Rights of Women" পুস্তক এই সময় প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে এই মর্ম্মে লেখা আছে যে, পুরুষের সমান

অধিকার লইয়া নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জাতির সার্ব্বভৌমত্ব জাতির ব্যক্তিসমষ্টিকে লইয়া—নারী এই ব্যক্তিসমষ্টির একটি বিশিষ্ট অংশ। আইন উভয়ের জন্ম সমান ভাবে প্রযুক্ত হইবে। অপরাধের জন্ম নারীকে যেমন ফাঁসি দেওয়া চলিবে, তেমনি ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, 'যোগ্যতা থাকিলে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ অধিনায়কের পদে বৃত হইবারও তিনি অধিকারী। তাঁহার শেষ কথাটি সত্যই ফলিয়াছিল। বিপ্লবের সময় যখন অপরাধী-নিরপরাধ নির্ব্বিশেষে অনেকের প্রাণদণ্ড হইতেছিল তখন এই অমানুষিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ করার অপরাধে অলিম্পি ডি গৌজেসকে গিলোটিন দ্বারা হত্যা করা হয়।

ফরাসী দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে নানা বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্য দিয়া নারী-আন্দোলন প্রসারলাভ করিতে থাকে। ১৮৮০ সনে কয়েকজন সাহসিকা নারী তাঁহাদিগকে ভোটার তালিকাভুক্ত করিবার জন্ম দাবি জানান, কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় নাই। গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে নারীসমাজ স্বাধিকার লাভের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন নাই যদিও এই সময়ে আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ক্ষেত্রে নারী প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

ওদিকে, ইংলণ্ডে নারী-আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপকতালাভ করিতেছিল। জন ষ্টুয়ার্ট মিল ছিলেন এই আন্দোলনের একজন প্রধান সমর্থক। তিনি এই মর্ম্মে লিখিলেন—"বর্ত্তমান সমাজে নারীর অধীনতা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। পুরাতন বহু জিনিস ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, একমাত্র নারীর পরাধীনতা আজও টিকিয়া আছে।" ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্স সভায় ১৮৬৭ সনে যখন ভোটাধিকার সংশোধন বিল উপস্থাপিত হয় তখন 'পুরুষ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'ব্যক্তি' কথাটি ব্যবহৃত হউক—এই প্রস্তাব মিল আনিয়াছিলেন। তাঁহার এই সংশোধিত প্রস্তাবের সপক্ষে ৮৬ এবং বিপক্ষে ১৯৬ ভোট হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য হয়। নারী-আন্দোলনের সমর্থকগণ প্রচার করেন যে, পূর্ব্বে বহু শতাব্দী ধরিয়া নারী ভোটাধিকার লাভ করিয়া আসিয়াছে. কোন আইন করিয়া তাহাদের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় নাই। এইরূপ প্রচারে উৎসাহিত হইয়া অনেক নারী ভোট-তালিকায় নাম লিখাইলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বাতিল করিয়া দিলেন। কিন্তু আন্দোলনের ফলে প্রথমে স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষেত্রে নারীর ভোটাধিকার লাভ হইল।

বিংশ শতাব্দীতে প্রায় সকল দেশেই নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে সাফ্রেজেট আন্দোলন প্রবল ভাবে ক্রীষ্টাবেল প্যাঙ্কহার্ষ্ট এবং এনি কেনি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এই দুই জন নারী বেপরোয়া ভাবে প্রচারকার্য্য, সভাসমিতি ইত্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা আন্দোলন চালান। ইহা নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

১৯০৭ সনে নারী স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানে ভোটাধিকার লাভ করিলে আন্দোলনকারিণীরা আরও উৎসাহিত হন। উৎসাহের আতিশয্যে জানালার কাচ ভাঙা, চিঠির বাক্স নষ্ট করা ইত্যাদি আন্দোলনের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। একদল নারী ছদ্মবেশে পার্লামেণ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া এক দিন প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করিতেও ছাড়েন নাই। যখন এই সকল নারীকে জেলে আবদ্ধ করা হইত তখন তাঁহারা অনশন ধর্ম্মঘট প্রভৃতি দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেন।

১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে আন্দোলনকারিণীরা আন্দোলন স্থগিত রাখিয়া যুদ্ধে যোগদান করিলেন। ক্রমে আন্দোলনকারিণীদের সংখ্যা আরও বাড়িতে লাগিল। ১৯১৮ সনে যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই 'রিপ্রেজেণ্টেশন অব দি পিপলস এক্ট' নামক আইন পাস হইল এবং ত্রিশ বৎসরের অধিকবয়স্কা নারীরা ভোটাধিকারিণী হইলেন। ১৯২৮ সনে পুরুষ ও নারীর সমান ভোটাধিকার হইল।

ফরাসী দেশে ১৮৯৭ হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে বিবাহিতা নারী নিজের জাতীয়তা (Nationatit) রক্ষা, নিজের অর্জ্জিত অর্থ ব্যয়, আদালতের সাহায্যগ্রহণ এবং অভিভাবিকা হইবার অধিকার অর্জ্জন করিলেন। উচ্চ শিক্ষায়ও তাঁহার অধিকার স্বীকৃত হইল। চতুর্থ রিপাব্লিকের গঠনতন্ত্রে অন্যান্য দেশের মতই ফরাসী দেশের নারা যাবতীয় রাষ্ট্রীয় এবং পৌর-অধিকার লাভ করিলেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠনতন্ত্র সংশোধন দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) কিছু পূর্ব্বেই নারী ভোটাধিকার লাভ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই অবশ্য পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশে নারা রাষ্ট্রীয় অধিকার পান। ১৯১৪ সনের পূর্ব্বে কেবল মাত্র অষ্ট্রেলিয়া, ফিনল্যাণ্ড, নিউজীল্যাণ্ড এবং নরওয়ে দেশে নারীর ভোটাধিকার ছিল। ১৯১৮ সনে তেরটি দেশে নারী এই অধিকার পান। অবশ্য কোন কোন দেশে তখন নারীর অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯১৭ হইতে ১৯৪৫ সনের মধ্যে আরও ৩৪টি দেশ নারীকে ভোটাধিকার দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার চারি বৎসরের মধ্যেই আরও বারোটি দেশে নারী ভোটাধিকার লাভ করেন।

মোট কথা, উনষাটটি রাষ্ট্রের মধ্যে বায়ান্নটিতে ১৯৪৯ সন পর্য্যন্ত নারী পুরুষের সমান ভোটাধিকারী হইয়াছে। কোন কোন দেশে এখনও নারী ভোটাধিকার লাভ করিতে পারে

নাই। ১৯৪৬ সন হইতে রাষ্ট্রপুঞ্জ নারী-পুরুষের ভোটাধিকারের বৈষম্য দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। লেবানন ১৯৫২ সনের ৬ই নবেম্বর নারীকে ভোটাধিকার দিয়াছে। এখানে অধিকাংশ ভোটারই নারী—পুরুষ-ভোটারের সংখ্যা ৩,৮৫,০০০, কিন্তু নারী ভোটারের সংখ্যা ৩,৯৫,০০০।

গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নারীসমাজ শিল্পের ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ক্রমশঃ প্রগতির পথে চলিয়াছেন। নানা দেশে তাঁহারা মন্ত্রীপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কেহ কেহ বৈদেশিক দূতের পদও অলঙ্কৃত করিতেছেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়া ভারতের নারীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, এরূপ নারী-প্রগতির দিনেও নারীজাতি সর্ব্ববিষয়ে তুল্যাধিকার পান নাই, কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের যোগ্যতাও স্বীকৃতিলাভ করে নাই। নারীদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ সম্পর্কে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও এই পার্থক্য দেখা যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জ 'এক রকম কাজে একই পারিশ্রমিক' এই নীতি যাহাতে প্রযুক্ত হয় এবং নর ও নারীর পারিশ্রমিক যাহাতে সমান হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। নারী যাহাতে পুরুষের মতই সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষালাভের অধিকারিণী হন রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি পরিষদ—ইউনেস্কো সেই বিষয়ে সচেষ্ট।*

* রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণ হইতে তথ্যাদি সংগৃহীত। এই প্রসঙ্গে প্রবাসী মাঘ ১৩৫৯—পৃষ্ঠা ৩১-৩৬ "বিভিন্ন দেশে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

এসেছে সেদিন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সূর্য্য যখন লুপ্ত গগনে, ধরণী অন্ধকার,
ভেবো না তখন এসেছে রাত্রি, রুদ্ধ কোরো না দ্বার,
কখনো কখনো উজ্জ্বল দিন ঢাকা প'ড়ে যায় মেঘে,
আলো মুছে যায় কজ্জল-কালো বর্ষার তুলি লেগে।

স্বাধীনতা সেই সূর্য্যের মত, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়,
আসে দুর্য্যোগ, মনের আকাশ ছায়াচ্ছন্ন হয়,
ক্ষণিকের মায়া স'রে যায় ছায়া, সহসা বর্ণ-হৃত
দিগ্‌দিগন্ত হয় প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত।

স্বর্গরাজ্য হয় নি এখনো ভারতবর্ষ—জানি,
অনেক দুঃখ-দারিদ্র্য তার, অনেক বেদনা গ্লানি,
অনেক অপূর্ণতায় ক্লিষ্ট, নানা মালিন্যে ম্লান,
তবু জানি তার পথ বাধাহীন, আলোক অনির্ব্বাণ।

দেশের স্বার্থ বলি দিয়ে ধনী অনেক স্বার্থপর,
ব্যাধিতে এবং বন্যায় মরে অসংখ্য নারী-নর,
জীর্ণ কুটীরে শঙ্কিত-চিত্তে ঝঞ্ঝার হা-হা শোনে,
জন-সংখ্যার অর্দ্ধেক বুঝি কাটায় অর্দ্ধাশনে।

দেহের অন্ন জোটে না সবার, মনের অন্ন নাই,
শীর্ণ মানুষে ভ'রে আছে সারা ভারতবর্ষ তাই।
এ-সব সত্য। তবুও মুক্ত আমরা ত নহি হীন,
করুণা-ভিক্ষা করি না কখনো, দরিদ্র নহে দীন।

আমরা স্বাধীন। আপনার 'পরে আমাদের নির্ভর,
নব-প্রেরণার স্পন্দনে আজ স্পন্দিত অন্তর।
আমাদের গানে বেজে ওঠে, শোন, মানব-মর্ম্মকথা,
আমরা স্বাধীন, আনিব জাতির জীবনে সার্থকতা।

জগতে আমরা সবার বন্ধু, শত্রু কাহারো নহি,
হিংসা করি না কাহারে, সত্যে সুপ্রতিষ্ঠ রহি।
ভারত কোথায়? একদা গেয়েছ একান্ত বেদনায়,
এসেছে সে-দিন, হে দরদী কবি, খেদ নাই, খেদ নাই।

এসেছে ভারত, প্রেমে নির্ভীক, সঙ্কটে সে যে ত্রাতা,
জগৎরাষ্ট্রসভায় তাহার উচ্চে আসন পাতা,
আনে নি বিশ্ব-বিনাশী বজ্র, নহে সে শস্ত্রপাণি,
সে শুধু এনেছে প্রেমের মন্ত্র, মহামিলনের বাণী।

জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন

শ্রীকানাইলাল বসু

ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য অনেক রকম ছোট-বড় পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। এর মধ্যে "ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস" একটি। একে মোটামুটি জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে আমরা আখ্যাত করতে পারি।

এক্সটেনশন পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য দেশের লোকের জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি করা। কিন্তু সে জীবনযাত্রার মান কোন্ লোকেদের? শহরের না গ্রামের? উত্তর হবে গ্রামের। ধরুন, কোন কারণে শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে গিয়ে জমা হ'ল। মুখটা আপনার লাল টকটকে হয়ে উঠল। আমি কি সমস্ত শরীরটাকে বাদ দিয়ে শুধু মুখ দেখেই বলব যে আপনি খুব স্বাস্থ্যবান? না তা নয়। তেমনি মাত্র কয়েকটা শহরের চাকচিক্য দেখে, শহরের লোকের জীবনযাত্রার মানের স্বরূপ দেখে সারা দেশের লোকদের কি বিচার করব? যদি করি তো সে বিচার হবে মারাত্মক ভুল। আমাদের দেশে আছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ গ্রাম। আর ছোট-বড় মিলিয়ে শহর আছে মাত্র তেইশ হাজার। কাজেই সংখ্যায় যারা বেশী তাদের অবস্থাই দেশের সত্যিকারের অবস্থার মাপকাঠি। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের সত্যিকারের উন্নতি রয়েছে গ্রামের উন্নতির মধ্যে। আর এই গ্রামের উন্নতির জন্যেই করা হয়েছে "ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস" পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনার পেছনে কতকগুলো কারণ আছে। সেগুলো না জানলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঠিকমত বোঝা যাবে না।

সকলেই জানেন—আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। এদেশের শতকরা তিরাশী জন লোক চাষবাসের উপর নির্ভর করে। চাষবাস করেই তাদের খাওয়া-পরা জোটে। এযাবৎ গ্রামের উন্নতির ব্যাপারটা ছিল প্রাদেশিক শাসনের আওতায়। এই সেদিন পর্যন্তও এ বাবদ খরচ যা হ'ত সেটা নামমাত্র। কিন্তু হলে হবে কি, সমস্ত জিনিসটাই ছিল ভুলের উপর ভিত্তি করে—অভাব ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার, অভাব ছিল গ্রামজীবনের সবটুকু আবহাওয়াকে স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গীর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশ আলাদা আলাদা-ভাবে গ্রামের উন্নতির জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করেছিল। এই সব বিভিন্ন প্রদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলো বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে, যেমন ধরা যাক—প্রথমতঃ, সরকারের কোন বিভাগ থেকে লোক কৃষকের কাছে গেল। সে গেল তার নিজস্ব বিভাগের প্রতিনিধি হয়ে। এই রকম সরকারী বিভিন্ন বিভাগের তরফ থেকে বিভিন্ন লোক যখন একই কৃষকের কাছে গিয়ে বললে, এটা করো, ওটা করো, এটা করলে ভাল হবে, ওটা করলে ভাল হবে, তখন হ'ল কি? কৃষকের তো কোন লাভ হ'লই না, বরং পাঁচ জনের পাঁচ রকম কথা শুনে তার মাথা গুলিয়ে গেল, কাজের কাজ কিছুই হ'ল না। সরকারী সাহায্য বা আন্তরিকতা কৃষকের মনে কোন ছাপই রাখতে পারল না। দ্বিতীয়, জোর করে ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া কাজ কখনই ফলপ্রসূ হয় না, যতক্ষণ না কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেই কাজকে নিজেদের কাজ মনে করে এগিয়ে আসবে। তৃতীয়, সরকার না হয় কাজের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী যদি মনে প্রাণে না ভাবে যে, সেই নির্দেশমত কাজ করলে তাদের ভাল হবে, তো সত্যিকারের সুফল হওয়া সম্ভব নয়। চতুর্থ, সরকারী কাজ হ'ল সরকারী খরচে, কিন্তু গ্রামের লোক যদি মনে না করে যে, সেই কাজের মধ্যে দিয়ে তারা পরস্পরকে সাহায্য করছে, পরস্পরের উন্নতির কাজে সহায়তা করছে, তো সরকারী উদ্যম বেশী দিন স্থায়ী হবে না। কারণ যাদের জন্যে কাজ, তারাই যদি কাজের মর্ম না বুঝল ত সে কাজ নিষ্ফল, সে কাজের উদ্দেশ্য নিষ্ফল। পঞ্চম, নিছক উপদেশে বা নির্দেশে কাজ হবে না, চাই তার বাস্তব প্রকাশ, হাতে-কলমে করে দেখাতে হবে। ষষ্ঠ, কাজের মধ্যে গভীরতা থাকা দরকার, যাকে বলতে পারা যায় অধিকতর ফলপ্রসূ—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় "ইনটেন্সিভ"। সপ্তম, গ্রামবাসীকে সাহায্য করতে এগিয়ে যেতে হলে ঐ গ্রামবাসীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। আরও সহজ করে বললে দাঁড়ায়, গ্রামবাসীর কাছে যেতে হলে গ্রামবাসীর মত হয়ে যেতে হবে। বড় বড় পুঁথিগত বুলি আউড়ে কলকজার দোহাই দিলে চলবে না। কারণ এগুলো গ্রামবাসীর মাথায় ঢুকবে না কারণ সে শিক্ষা তাদের নেই। অষ্টম, গ্রামবাসীর মধ্যে জাগাতে হবে উৎসাহ, নিজেদের ভাল নিজেরা করবার ইচ্ছা না হলে সত্যিকারের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ব্রিটিশ আমলে গ্রামের উন্নতির কাজে বিভিন্ন প্রদেশের চেষ্টার ফলা-ফল থেকে এই আটটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

তারপর ব্রিটিশ রাজত্বের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত হ'ল মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী সরকার। দেশে খাদ্যবস্তুর উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য তাঁরা "গ্রো মোর ফুড কমিটি" গঠন করলেন। গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য এই কমিটিই "ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস" পরিকল্পনার কথা সুপারিশ করেন। তারপর দেশ স্বাধীন হ'ল। দেশগঠনের নানা রকম কাজও সুরু হ'ল। কিন্তু বোঝা গেল যে, দু'চারটে শিল্প গড়লেই দেশের সত্যিকার উন্নতি হবে না—সত্যিকার উন্নতি হবে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি করতে পারলে। কাজেই ১৯৫৩ সনের ২রা অক্টোবর ভারতের গ্রামাঞ্চলের সবদিক দিয়ে উন্নতি করবার জন্য "ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস" পরিকল্পনার কাজ বাস্তবে রূপায়িত করা হ'ল।

গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য বৎসর দুই হ'ল আমাদের দেশে আরও একটা পরিকল্পনামূলক কাজ চালু করা হয়েছে—তার নাম দেওয়া হয়েছে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা, ইংরেজীতে বলা হয় "কম্যুনিটি প্রোজেক্ট"। কেহ কেহ হয়ত বলবেন, এ দুটো পরি-কল্পনাই যখন গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্যে, তখন দুটোর মধ্যে তফাৎ

কি? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এ বিষয়ে বক্তব্য যে, তফাৎ অবশ্যই আছে। ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্ল্যানিং কমিশন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন—যা অনুসরণ করে এখন দেশের মধ্যে নানা রকমের কাজ চলছে। দেশের সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণের জন্য যেসব কাজ হচ্ছে, প্ল্যানিং কমিশনের মতে "কম্যুনিটি প্রোজেক্ট" হচ্ছে সেই কাজের "পন্থা" আর ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস হচ্ছে সেই কাজের মাধ্যম। এই দুটো পরিকল্পনার মধ্যেই চাষ-আবাদের কাজ প্রধান। চাষ-আবাদ ছাড়া উন্নতির জন্য আর যে সব কাজ আছে, কম্যুনিটি প্রোজেক্টের মধ্যে সেগুলোর রূপ ব্যাপক, এক্সটেনশনের কাজে সেগুলো তত ব্যাপক নয়। আজ যেসব জায়গা এক্সটেনশন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে, দরকার হলে সেগুলো সমাজ-উন্নয়ন কাজের সংস্থায় পরিবর্তিত করা চলবে। এ দুটো পরিকল্পনার মধ্যে আরও একটা পার্থক্য আছে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ কিছু দিনের জন্য—যেমন আর তিন বছর মাত্র সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলবে; কিন্তু এক্সটেনশনের কাজটা হবে স্থায়ী ভাবে। কারণ আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান—দেশের অধিকাংশ লোক থাকে গ্রামে। কাজেই গ্রামের সত্যিকারের উন্নতি করতে হলে সেটা স্থায়ীভাবে করাই বাঞ্ছনীয়। তাই ভারত সরকার ১৯৫৩ সনে দেশের গ্রামাঞ্চলের স্থায়ী উন্নতি করবার উদ্দেশ্যে এই "ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস" পরিকল্পনার কাজ চালু করেন।

আপাততঃ এক্সটেনশন পরিকল্পনামতে উন্নতিমূলক কাজ দশ বৎসর করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার গ্রামের উন্নতি হবে বলে মনে হয়। আমাদের দেশে যত লোক গ্রামে বাস করে তার চার ভাগের এক ভাগ এই সময়ের মধ্যে নিজেদের ভাল করবার, অবস্থা পরিবর্তন করবার—এক কথায় নিজেদের উন্নতি করবার সুযোগ-সুবিধা পাবে।

প্ল্যানিং কমিশন হচ্ছে "ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস" পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় কমিটি। এই কেন্দ্রীয় কমিটি ঠিক করেছেন যে, প্রথম ধাপে, ১৯৫৩-৫৪ সনে মোট দু'শ সাইত্রিশটি জায়গায় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হবে। প্রায় তেইশ হাজার সাত শত গ্রাম আর তার এক কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ বাসিন্দা এক্সটেনশনের কাজের সুযোগ-সুবিধা পাবে। এখানে আরও একটা বিষয় জেনে রাখা ভাল যে, এক্সটেনশনের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিটি প্রোজেক্টের কাজও এই নূতন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য এক্সটেনশন অনুসারে যে কাজ চালু হয়েছে, তার মধ্যে দু' রকম কাজ আছে—কোন জায়গায় কাজের মধ্যে গভীরতা বা তীব্রতা বেশী, কোন জায়গায় কম। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় "ইনটেনসিভ" আর "নন-ইনটেনসিভ"। "ইনটেনসিভ" হ'ল কম জায়গার মধ্যে বেশী ফল পাবার জন্য কাজ করা—এক কথায় বলা যায় অধিকতর ফলপ্রসূ কাজ। অন্যটির কাজ ততটা জোরালো নয়। কাজের মধ্যে এই রকম তারতম্য রাখারও একটা উদ্দেশ্য আছে—সে উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জায়গায় অধিকতর ফলপ্রসূ কাজ হবে দরকার হলে, সেই জায়গাগুলোকে কম্যুনিটি প্রোজেক্ট অঞ্চলে পরিবর্তন করা চলবে। এই যে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার গ্রাম নিয়ে এক্সটেনশন অনুসারে কাজ আরম্ভ হয়েছে, এর মধ্যে সত্তর হাজার গ্রামে কাজ হবে অধিকতর ফলপ্রসূ ভাবে, আর বাকি পঞ্চাশ হাজার গ্রামে হবে সাধারণভাবে।

ভারতের প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের মধ্যে এখন প্রায় সাতচল্লিশ হাজার তিন শত পঞ্চাশটি গ্রামে হয় কম্যুনিটি প্রোজেক্ট, নয় এক্সটেনশন পরিকল্পনা অনুসারে উন্নতিমূলক কাজ চলছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থির হয়েছে যে, এই পাঁচ বছরের মধ্যে প্রত্যেক চারিটি গ্রামের মধ্যে একটির উন্নতি করা হবে—সে জায়গায় এখন হচ্ছে প্রতি আটটি গ্রামের মধ্যে একটির। অবশ্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ এখনও দু'বছর চলবে। আশা করা যায়, এই সময়ের মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে, এর উদ্দেশ্য সফল হবে।

যে কোন কাজ করতে গেলে কিছু-না-কিছু খরচ হবেই—কাজেই "ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিসে"র কাজ হাতে-কলমে করতে গেলেও কিছু খরচ হবে—সেটা স্বাভাবিক। পাঁচসালা পরিকল্পনায় ঠিক করা হয়েছে যে, "কম্যুনিটি প্রোজেক্ট" আর "ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিসে"র কাজে এই পাঁচ বছরে মোট একশ' এক কোটি টাকা খরচ হবে। আগেই বলেছি যে, এক চাষ-আবাদ ছাড়া উন্নতিমূলক অন্যান্য এক্সটেনশন কাজের জায়গা থেকে কম্যুনিটি প্রোজেক্টের কাজের জায়গা আরও ব্যাপক। কাজেই কম্যুনিটি প্রোজেক্টের কাজে অপেক্ষাকৃত বেশী খরচ হবে সেটা স্বাভাবিক। তাই এই একশ' এক কোটি টাকার মধ্যে এক্সটেনশনের কাজে খরচ হবে ছেচল্লিশ কোটি টাকা—বাকিটা হবে কম্যুনিটি প্রোজেক্টের জন্য।

যদি মোটামুটি হিসাব করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, এক্সটেনশন মতে কাজ হচ্ছে এখন একটি জায়গায় যেখানে তিন বছরে খরচ হবে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। এর মধ্যে এক লক্ষ টাকা যাবে বিভিন্ন কর্মচারীর মাইনে বাবদ, পঞ্চাশ হাজার যাবে যানবাহন, বীজ ও ছোটখাটো যন্ত্রপাতি বাবদ, দেড় লক্ষ সামাজিক কাজ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বাবদ, পঁচিশ হাজার শিক্ষা বাবদ, পঁচিশ হাজার সরকারী সাহায্য বাবদ, এক লক্ষ সেচ ইত্যাদির জন্য ঋণ বাবদ, আর তিন লক্ষ যাবে স্বল্পমেয়াদী ঋণ বাবদ যা সে অঞ্চলের লোকদের দেওয়া হবে। এই স্বল্পমেয়াদী ঋণ কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন না—দেবেন হয় রাজ্য সরকার, নয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, নতুবা সমবায় প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য ঋণ দেবেন, তবে সেটা বিকল্পভাবে—ধারে সার সরবরাহ করবেন।

যে অঞ্চলে উপস্থিত সাধারণভাবে এক্সটেনশনের কাজ চলছে, তেমন কোন অঞ্চলে যে-কোন সময় অধিকতর ফলপ্রসূ কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। তার জন্য তিন বছরে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ছাড়া আরও তিন লক্ষ টাকা বাড়তি খরচ হবে। তা হলে দাঁড়াল এই যে, এক্সটেনশন পরিকল্পনা অনুসারে যেখানে সাধারণভাবে উন্নতিমূলক

কাজ হবে সেখানে তিন বছরে খরচ হবে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, আর যেখানে অধিকতর ফলপ্রসূ (ইনটেনসিভ) ভাবে কাজ হবে সেখানে খরচ হবে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা।

এই মোট খরচের মধ্যে যে অংশ একবার মাত্র খরচ হবে (নন-রেকারিং) তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ, আর যে খরচের বার বার পুনরাবৃত্তি হবে (রেকারিং) তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর সমবায় প্রতিষ্ঠান, এই চারে মিলে এক্সটেনশন সার্ভিস পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহন করবেন।

এইবার দেখা যাক্, এক্সটেনশন পরিকল্পনার কাজ কিভাবে পরিচালনা করা হবে। প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন যে, "ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস" আর "কম্যুনিটি প্রোজেক্টে"র কার্য্য পরিচালনা করবার দায়িত্ব ও ক্ষমতা একটি কমিটির উপরই থাকা উচিত। কাজেই প্ল্যানিং কমিশনই হচ্ছে সেই কেন্দ্রীয় কমিটি। এই কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে থাকবে রাজ্য উন্নয়ন কমিটি। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হবেন এই কমিটির সভাপতি। রাজ্য-উন্নয়ন কমিটি এক্সটেনশনের কাজের একটা মোটামুটি পন্থা নির্দেশ করবেন। এই কমিটির নীচে থাকবে জেলা-উন্নয়ন কমিটি, তার অধীনে সাব-ডিভিশনাল উন্নয়ন কমিটি। এই সকল কমিটি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এক্সটেনশন সার্ভিসের কাজ পরিচালনা করবেন।

কার্য্যপরিচালনা কিন্তু এই সব পরিচালক কমিটি করবেন না—তাঁরা কতকগুলো যোগ্য লোক নিয়োগ করবেন এই কাজের জন্ত। আর সেই যোগ্য লোকেরা বাস্তব ক্ষেত্রে গিয়ে হাতে-কলমে কাজ করে গ্রামবাসীদের দেখাবে—তখন গ্রামবাসীরা নিজেরাই সেই কাজ করবে। এখন দেখা যাক্—আমাদের দেশের গ্রামবাসী কৃষকের মধ্যে কে কি ধরণের কাজ করে। সে শুধু চাষীই নয়। আসলে সে চাষী সত্য, তবে পশুপক্ষীর পালকও বটে। কারণ হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল তার বাড়ীতে আছে—তাদের সে পালন করে। তা ছাড়া তার কিছু যন্ত্রপাতির জ্ঞানও আছে। চাষের যন্ত্রপাতি হঠাৎ ভেঙ্গে গেলে অনেক সময় সে নিজেই তা সারিয়ে নেয়। সাঁকো তৈরিও সে করতে পারে। দরকার হলে ছোটখাটো নালা যে সে কাটে না তা নয়। কাজেই শুধু চাষবাস ছাড়াও সে অনেক কাজের মানুষ। তা ছাড়া চাষীর সাধারণ জ্ঞানও বেশ আছে। কাজেই তাকে যদি একটু শেখানো যায় ত নিজের ভাল আরও উত্তমরূপে করতে নিশ্চয়ই পারবে। তাদের শেখাতে হলে প্রত্যেক চাষী-পরিবারের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে যেতে হবে। চাষীপরিবারের সংখ্যা যখন আমাদের দেশে বেশী তখন তাদের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে যেতে হলে লোকের দরকার হবে বেশী। তাই এক্সটেনশন সার্ভিস পরিকল্পনার মধ্যে যোগ্য লোক তৈরি করবার জন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব যোগ্য লোককে আমরা "গ্রামসেবক" বলতে পারি। যাঁরা গ্রামসেবক হবেন তাঁদের জনস্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান গ্রামের কুটীরশিল্প, পঞ্চায়েত প্রথা, চাষ-আবাদ, ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। শিক্ষিত গ্রামসেবক দরকার হাজারে হাজারে। শুধু গ্রামসেবক হলেই হবে না, তাদের চালাবার জন্ত আরও কিছু লোকের দরকার, তাদেরও ঐ সব সম্বন্ধে বেশ কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কাজেই বাস্তবক্ষেত্রে কম্যুনিটি প্রোজেক্ট আর ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিসের কাজ যাঁরা হাতে-কলমে করবেন ও করাবেন, তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় চুরাশী হাজারের কাছাকাছি।

"ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস"-এর কাজে গ্রামবাসীদের উপকার ত হবেই, উপরন্তু বহু লোক এই পরিকল্পনায় কাজ করে দু' মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারবে। গ্রামসেবকদের পরিচালনা করবার জন্ত যে বহু লোকের প্রয়োজন হবে, সে কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিকও এতে কাজ পাবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দেখা যাবে যে, আরও বহুগুণ বেশী লোক এই এক্সটেনশন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ পেয়েছে। শুধু কাজ পাওয়াটাই বড় কথা নয়—সবচেয়ে বড় কথা হ'ল কাজের স্থায়িত্ব। এক্সটেনশন পরিকল্পনায় যারা কাজ পাবে তাদের হবে স্থায়ী কাজ—কারণ পরিকল্পনার কাজটাও যে হবে স্থায়ী ভাবে। সরাসরি কাজ পাওয়া ছাড়াও আরও অনেক সুফল লাভ হবে এই সার্ভিসের কাজে। যেমন, অনেক পতিত জমির উদ্ধার হবে, অল্প জায়গার মধ্যে চাষ-আবাদের ফলন বহু গুণ বাড়বে, সেচব্যবস্থার উন্নতি হবে, কুটীরশিল্পের প্রসার হবে ইত্যাদি। এই সব কাজের মারফতেও বহু লোক করে খাবার মত একটা পথ পাবে। তাতে দেশের বেকারের সংখ্যাও নিঃসন্দেহে কমবে।

এক্সটেনশন সার্ভিস পরিকল্পনার সফলতা প্রধানতঃ নির্ভর করে গ্রামসেবকদের উপর, কারণ গ্রামবাসীদের তারাই হাতে-কলমে কাজ দেখিয়ে শেখাবে। কাজেই গ্রামসেবকদের যাতে ঠিকমত কাজ শেখানো যায় তারও ব্যবস্থা করা দরকার। সেজন্ত প্রায় চৌত্রিশটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এ যাবৎ প্রায় দু' হাজার ছ'শ জন এই কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষালাভ করেছেন আর এক হাজার ছ'শ জন এখনও শিক্ষা পাচ্ছেন। এই যে চৌত্রিশটি শিক্ষাকেন্দ্র চালু হয়েছে—এগুলো হয়েছে কম্যুনিটি প্রোজেক্ট পরিকল্পনার আওতায়। এক্সটেনশন সার্ভিসের জন্ত এ ছাড়া আরও চৌত্রিশটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে গ্রামসেবকদের শিক্ষা দেবার নিমিত্ত।

গ্রামের উন্নতিই হ'ল দেশের সত্যিকারের উন্নতি। এদিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি হয়েছে "ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস" পরিকল্পনা। তবে এর উদ্দেশ্য যদি আমাদের সফল করে তুলতে হয় তো তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে—যেমন প্রথমতঃ, সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে; দ্বিতীয়তঃ, এমন কিছু করতে হবে যাতে এই পরিকল্পনার কাজে গ্রামবাসীদের উৎসাহ বাড়ে, আর তৃতীয়তঃ, এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে ফললাভ তাড়াতাড়ি হয়, কারণ বাস্তব ফলাফলের উপরই নির্ভর করবে পরিকল্পনার সফলতা।

শীতকালের খাদ্যশস্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্ত্তমান সময়ে সকলেরই, বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলের প্রত্যেক গৃহস্থের—সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী খাদ্যশস্যের চাষ করা খুবই বাঞ্ছনীয়। অনেকের পক্ষে হয়তো সকলপ্রকার খাদ্যশস্যের চাষ করা সম্ভব হইবে না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই বাড়ীর সংলগ্ন বা কাছাকাছি অল্প পরিমাণ জমিতে কয়েক প্রকারের শাকসব্জীর চাষ অনায়াসেই করিতে পারেন; ইহাতে খরচ বেশী হয় না, তবে একটু পরিশ্রম করিতে হইবে। পরিবারের সকলের সমবেত পরিশ্রমের ফলে লাভ ছাড়া লোকসান হইবে না; টাটকা শাকসব্জীও পাওয়া যাইবে, সংসারের খরচও অনেকটা কম হইবে। আর একটা কথা এই যে, বাড়ীর আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে এবং ইহার ফলে বাড়ীর শ্রী ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইবে, পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিবে।

নিম্নে চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণে যাহা বলা হইল স্থানীয় মাটি, জলবায়ুর অবস্থা প্রভৃতির তারতম্যের জন্য উহাদেরও তারতম্য হইবে। বীজের হার, ফসলের পরিমাণ, আনুমানিক ভাবে বলা হইয়াছে; ইহাদেরও তারতম্য হইবে। অভিজ্ঞতাই আসল জিনিষ; অভিজ্ঞতার উপরেই সব জিনিষ নির্ভর করিবে। যাঁহারা এই বিষয়ে একেবারে নূতন, তাঁহাদের পক্ষে প্রথমে অল্প পরিমাণ জমিতে কয়েক প্রকারের শস্য বপন করা বাঞ্ছনীয়।

তৃণজাতীয় শস্য

১। বোরো ধান—আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি বীজতলা প্রস্তুত করিতে হয়। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এক ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ফসল কাটা যায়। বিঘা প্রতি চার-পাঁচ সের বীজ লাগে। বিঘা প্রতি পাঁচ-ছয় মণ ফলন পাওয়া যায়।

২। গম—এঁটেল বা দোআঁশ মাটি ইহার পক্ষে উপযুক্ত। কার্ত্তিক মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের মাঝামাঝি ফসল কাটিতে হয়; বিঘা প্রতি আট-দশ সের বীজ লাগে; বিঘা প্রতি চার-পাঁচ মণ ফলন হয়।

৩। যব—বেলে দোআঁশ মাটি এই ফসলের উপযুক্ত। ইহার চাষ ঠিক গমের চাষের মত। বিঘা প্রতি দশ-বারো সের বীজ লাগে; বিঘা প্রতি চার-পাঁচ মণ ফলন হয়।

৪। চীনা—ইহার পক্ষেও বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে মাঘের মাঝামাঝি ফসল কাটা যায়। বিঘা প্রতি এক সের দেড় সের বীজ লাগে; বিঘা প্রতি দেড় মণ দুই মণ ফলন হয়। ইহার খড় গরুকে খাওয়ানো চলে।

ডাল শস্য

৫। খেসারি—কাদা-মাটি ইহার পক্ষে উপযুক্ত। কার্ত্তিক মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; ফাল্গুন মাসে ফসল কাটিতে হয়। বিঘা প্রতি চার-পাচ সের বীজ লাগে। বিঘা প্রতি আড়াই মণ—সাড়ে তিন মণ ফলন হয়।

৬। ছোলা—ইহার চাষও ঠিক খেসারির চাষের মত। বিঘা প্রতি চার-ছয় সের বীজ লাগে; বিঘা প্রতি সাড়ে তিন মণ—পাঁচ মণ ফলন হয়।

৭। মুসুর—ইহার চাষও খেসারির মত। বীজের হার ও ফলন খেসারির মত।

৮। মটর—ইহার চাষও খেসারির মত। বিঘা প্রতি পাঁচ-সাত সের বীজ লাগে। বিঘা প্রতি আড়াই মণ—সাড়ে তিন মণ ফলন হয়।

৯। মুগ—উঁচু হাল্‌কা জমি ইহার পক্ষে উপযুক্ত। ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিনের মাঝামাঝি বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। পৌষ মাসে ফসল কাটিতে হয়। বিঘা প্রতি আড়াই সের—সাড়ে তিন সের বীজ লাগে। বিঘা প্রতি ফলন আড়াই মণ—সাড়ে তিন মণ।

১০। সয়াবীন বা গৌরী কলাই—বেলে-দোআঁশ বা দোআঁশ জমিই ইহার পক্ষে উপযুক্ত। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। চৈত্র মাসে ফসল কাটা যায়। বিঘা প্রতি সাড়ে তিন সের—চার সের বীজ লাগে। বিঘা প্রতি দেড় মণ—আড়াই মণ ফলন হয়।

১১। বরবটি—দোআঁশ মাটিতে ইহা জন্মে। কার্ত্তিক মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফসল কাটা যায়। বিঘা প্রতি পাঁচ ছয় সের বীজ লাগে। বিঘা প্রতি দুই-তিন মণ ফলন হয়।

দেশী শাকসব্জী

১২। বেগুন—দোআঁশ মাটি ইহার পক্ষে উপযুক্ত। আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি দুই হইতে আড়াই ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে দুই হইতে আড়াই ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। পাঁচ-ছয় মাস পরে ফসল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি দেড় ছটাক হইতে দুই ছটাক বীজ লাগে। ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ মণ ফসল পাওয়া যায়।

১৩। ঝিঙা (ধুঁধুল)—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। পৌষ মাস

হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত পাঁচ ফুট অন্তর মাদা করিয়া বীজ বুনিতে হয়। দুই-তিন মাসের মধ্যে ফসল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি আধ সের বীজ লাগে ; ফলন বেগুনের মত।

১৪। লাউ—দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। আশ্বিন-পৌষ মাসে ছয় ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। তিন মাস পর ফসল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি তিন-চার ছটাক বীজ লাগে। ফলন বিঘা প্রতি ত্রিশ-চল্লিশ মণ।

১৫। কুমড়া—ইহার চাষ ঠিক লাউ-এর চাষের মত। তবে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই বীজ বুনিতে হয়।

১৬। মিষ্টি আলু বা রাঙ্গালু—বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে কার্ত্তিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিন ফুট অন্তর চারা (কাটিং) লাগাইতে হয়। মাঘের মাঝামাঝি হইতে চৈত্রের মাঝামাঝি ফসল কাটিতে হয়। বিঘা প্রতি এক হাজার হইতে দুই হাজার চারা (কাটিং) লাগে। বিঘা প্রতি ৩০।৫০ মণ ফলন হয়।

(১৭) উচ্ছে—দোআঁশ মাটিতে জন্মে ; কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ৩।৪ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফসল পাওয়া যায়। বিঘাপ্রতি এক পোয়া বীজ লাগে। বিঘা প্রতি ফলন ৩০।৪০ মণ।

(১৮) মূলা—বেলে দোআঁশ জমি উপযুক্ত, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। দুই মাস পরে ফসল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ১।১। সের বীজ লাগে। বিঘাপ্রতি ফসল ৪০।৫০ মণ।

(১৯) পটল—বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত ; কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ৩।৪ হাত অন্তর কাটিং লাগাইতে হয়। মাঘ মাস হইতে ফসল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৪০।৫০ মণ ফসল হয়।

(২০) পালং ও অন্যান্য শাক- ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়।

মশলা

(২১) পিঁয়াজ—হাল্কা বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত ; কার্ত্তিক মাসে ৯।১২ ইঞ্চি অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৬।৭ ইঞ্চি অন্তর চারা বা গেঁড় লাগাইতে হয়। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের মাঝামাঝি ফসল তোলা যায়। বিঘা প্রতি ৩।৫ ছটাক বীজ বা ১।২ মণ গেঁড় লাগে। বিঘা প্রতি ফলন ৩০।৫০ মণ।

(২২) রসুন—ইহার চাষ পিঁয়াজের মত। তবে মাঘের মাঝামাঝি হইতে ফসল তোলা চলে।

(২৩)—(২৭) জোয়ান, মেথি, জিরা, মৌরি ও ধনে—এই জাতীয় সকল রকম মশলাই বেলে দোআঁশ জমিতে জন্মে ; মোটামুটি আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় ; তবে মৌরির বীজ আশ্বিন মাসের মধ্যেই বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি বীজের হার ও ফলন এইরূপ :

	বীজ	ফলন
জোয়ান	২ সের	১ মণ
মেথি	২-৩ „	১।-১ „
জিরা	১-২ „	১ „
মৌরি	১।-২ „	১।-২ „
ধনে	২-৩ „	১-২ „

তৈল শস্য

(২৮) সরিষা—দোআঁশ জমি উপযুক্ত ; আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফসল পাকে। বিঘা প্রতি ১। সের বীজ লাগে ; ফলন ১।-২ মণ। ইহার তিনটি জাতি আছে—রাই বা চৈতি, মাঘী ও শ্বেত সরিষা।

বেগুন

(২৯) চীনাবাদাম—বেলে দোআঁশ জমি ; কার্ত্তিক মাসে ২।২। ফিট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ১ ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয় ; চৈত্র মাসে ফসল পাকে ; বিঘা প্রতি ৬।৭ সের বীজ লাগে বিঘা প্রতি ৬-৭ মণ ফলন হয়।

(৩০) কৃষ্ণ তিল—বেলে দোআঁশ জমি, মাঘ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় ; জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ২-৩ সের বীজ লাগে, ফসল কম, মূল বিঘা প্রতি ২-৭ মণ।

(৩১) হইতে (৩৩) তরমুজ, ফুটি ও খরমুজা—বেলে জমি

উপযুক্ত ; আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে মাঘের মাঝামাঝি ৪ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বপন করিতে হয়। মোটামুটি ৩।৪ মাস পর ফসল পাওয়া যায়. বিঘা প্রতি ১।-২ ছটাক বীজ লাগে ; মোটামুটি ফলন বিঘা প্রতি ৩০-৪০ মণ।

(৩৪) শশা—বেলে দোআঁশ জমি ; আশ্বিন-কার্তিক মাসে ৫।৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয় ; বিঘা প্রতি ২।৩ তোলা বীজ লাগে. মাঘ—চৈত্র মাসে ফসল পাওয়া যায়।

চিনি, গুড়

(৩৫) আক—এঁটেল বা দোআঁশ জমি ; কার্ত্তিকের মাঝামাঝি হইতে মাঘের মাঝামাঝি ৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি

পেনারির ক্ষেত

লাইনে ৬ ইঞ্চি অন্তর কাটি' লাগাইতে হয়। বিঘা প্রতি ৩।-৪ হাজার কাটিং লাগে।

আলু ও বিলাতী শাকসব্জী

(ইহাদের চাষের বিবরণ একটু বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইল)

আলু

(১) মাটি—উঁচু জল, দাঁড়ায় না এইরূপ বেলে দোয়াঁশ মাটিই আলুর পক্ষে উপযুক্ত।

(২) বীজ বপনের সময়—কার্ত্তিক মাস।

(৩) বীজ বপনের প্রণালী—দুই ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৯ ইঞ্চি অন্তর ৩ ইঞ্চি গভীর মাটির নীচে বীজ আলু বসাইতে হয়।

(৪) বীজ আলুর পরিমাণ—বীজ আলুর আকার অনুসারে বিঘা প্রতি ২ হইতে ৩। মণ।

(৫) চাষের পরিচর্যা ও সার—আলুর চাষের জন্য উত্তমরূপে মাটি কর্ষণ, জলসেচন এবং প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ আবশ্যক। অন্যান্য ফসলের মধ্যে আলুর ফসলে সার প্রয়োগ অধিক লাভজনক এবং প্রতি বিঘায় অন্ততঃপক্ষে ৬০-৬৫ মণ গোবর সার এবং ৩। মণ রেড়ির খইল প্রয়োগ করা উচিত। রেড়ির খইল কেবল যে মূল্যবান সার তা নয়, ইহা প্রয়োগ করিলে উই, পিঁপড়া ইত্যাদির দ্বারা মাটিতে বসানো বীজ আলুর আক্রমণ অনেকটা নিবারিত হয়। গোবর সারের অভাব পূরণের জন্য সম্ভব হইলে পচা কচুরিপানার সার (কম্পোষ্ট) প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং এমন কি উপরোক্ত সার প্রয়োগ না করিলেও বিঘা প্রতি ৩। মণ কচুরিপানার "কম্পোষ্ট" ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। "ভাদুই" ঋতুতে সবুজ সার হিসাবে শণের চাষ করিয়া গোবর সারের অভাবও অনেকটা পূরণ করা যাইতে পারে।

জলবায়ুর অবস্থা অনুসারে তিন বার কি চারি বার জলসেচনের প্রয়োজন হইতে পারে।

গাছ যখন বড় হইতে থাকে তাহাদের শিকড় যাহাতে বাড়িতে পারে সেইজন্য গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া আবশ্যক এবং মাটিতে রস রক্ষা করিবার ও জমির জঙ্গল, আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার জন্য মাঝে মাঝে জমি নিড়াইয়া দেওয়া দরকার। ইহার দ্বারা আলুর ফলন বাড়ে।

(৮) ফসল তোলার সময়—মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আলুর লতা শুকাইয়া গেলে আলু তুলিবার উপযুক্ত হয়, কোদাল দিয়া মাটি কোপাইয়া আলু তুলিতে হয়, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন কোন আলু কোদালের দ্বারা কাটিয়া না যায়, কারণ কাটা আলু গুদামে থাকিলে রোগাক্রান্ত হইয়া ভাল আলুকে নষ্ট করে।

(৯) ফলন—ফসল ভাল হইলে বিঘা প্রতি সাধারণতঃ ১০০ মণ পর্যন্ত ফলনও হইতে পারে।

বিলাতী শাকসব্জী

(১) বীজসংগ্রহ—(১) জানাশোনা এবং বিশ্বস্ত বীজ-বিক্রেতার নিকট হইতেই বীজ ক্রয় করা উচিত।

(২) বীজ বপন করিবার পূর্বে বীজের প্যাকেট খোলা উচিত নয় ; কেননা ভিজা জলবায়ু লাগিলে ইহার জীবনীশক্তি নষ্ট হয়।

(৩) একসঙ্গে বীজ না কিনিয়া পর পর ফসলের জন্য যখন যে পরিমাণ বীজ বপনের প্রয়োজন হইবে, তখন সেই পরিমাণ বীজ কেনাই ভাল, কারণ বাড়ীতে বীজ ফেলিয়া রাখিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

বীজক্ষেত্র বা চাপোর প্রস্তুত—২। (১) বীজক্ষেত্র বা চাপোর উঁচু হওয়াই উচিত, যেন উহার উপর জল না দাঁড়াইতে পারে। বীজক্ষেত্রের উপরিভাগের মাটি ৯ ইঞ্চি হইতে ১ ফুট গভীর করিয়া খোঁড়া উচিত এবং উহার মাটি যেন খুব গুঁড়া করিয়া প্রস্তুত করা হয়। এই মাটির সহিত যেন ঘাস, জঙ্গল, গাছের শিকড়, কাঠকুটা, পোকামাকড় বা তাহাদের ডিম মিশিয়া না থাকে।

বীজক্ষেত্রের তিনটি স্তর হইলে ভাল হয়। প্রথম স্তর (২ ইঞ্চি গভীর) ভাঙ্গা ইট বা খোয়া; দ্বিতীয় স্তর (৩ ইঞ্চি গভীর) অর্দ্ধাংশ এঁটেল মাটি এবং অর্দ্ধাংশ বালি; তৃতীয় অর্থাৎ উপরিভাগের স্তর (৩ ইঞ্চি গভীর) এক-তৃতীয়াংশ এঁটেল মাটি, এক-তৃতীয়াংশ পচা পাতা সার এবং এক-তৃতীয়াংশ পচা গোবর। (২) বীজক্ষেত্রটি লম্বায় ১০ ফুট এবং চওড়ায় ৩ ফুট হইলে ভাল হয়, কেননা তাহা হইলে বীজক্ষেত্রের এক ধারে বসিয়া নিড়ানী প্রভৃতি কাজের সুবিধা হয়।

(৩ সাধারণতঃ ১০×৩ ফুট বীজক্ষেত্রের জন্য আড়াই তোলা বীজই যথেষ্ট। এই পরিমাণ বীজ হইতে যে চারা উৎপন্ন হইবে তাহার দ্বারা এক বিঘা জমি রোপণ করা চলিবে।

৩। বীজক্ষেত্রে বা চাপোরে বীজ বপন—(১) একেবারে সমস্ত বীজ না বুনিয়া প্রয়োজনমত দফায় দফায় বুনাই ভাল।

(২) শক্ত আবরণবিশিষ্ট বীজ হইলে বুনিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত।

(৩) খুব ছোট বীজ হইলে উহা বালি কিংবা ঝুরা মাটির সহিত মিশাইয়া বুনিলে ভাল হয়। কেননা তাহাতে ঠিকমত সমান ভাবে বীজ ছড়াইয়া পড়িবে।

(৪) রৌদ্রের দিনে বীজ বুনিতে হইলে বীজ বোনার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইয়া উহা ভিজাইতে হইবে। আবার যদি বীজক্ষেত্রের উপর মাটি খুব ভিজা থাকে তাহার সহিত শুকনা মাটি মিশাইয়া লইতে হইবে।

(৫) পাতলা করিয়া বীজ বপন করা উচিত। কেননা ঘন করিয়া বুনিলে চারাগাছ দুর্ব্বল হয়।

(৬) সন্ধ্যার কিছু আগে বীজ বোনা উচিত।

(৭) বীজক্ষেত্রের উপর বীজ ছিটাইয়া উহার উপর পাতলা করিয়া মিহি মাটি ছিটাইয়া হাত দিয়া আস্তে আস্তে চাপিয়া দিতে হয়।

(৮) রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বীজক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য উহা চাটাই দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়।

(৯) বীজক্ষেত্র ভিজা রাখিবার জন্য অল্প পরিমাণ জল ছিটানো প্রয়োজন।

(১০) বীজক্ষেত্রের চারিদিকে কাঠের ছাই—সামান্য কেরোসিন মাখাইয়া উহা ছড়াইয়া রাখিলে পোকা-মাকড় দূরে থাকে এবং গুঁড়া রেড়ির খইল ছিটাইলে পিঁপড়া দ্বারা বীজ সরাইয়া ফেলা বন্ধ হয়।

৪। (১) চারা গাছের যত্ন—(১) বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইলে রাত্রে যদি বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকে সন্ধ্যার সময় বীজক্ষেত্রের ঢাকনা খুলিয়া রাখা উচিত। পরের দিন সকাল ৮।৯টার সময় আবার বীজক্ষেত্রের উপর ঢাকনা দেওয়া দরকার।

(২) চারাগাছ বৃদ্ধির পক্ষে রৌদ্র ও বাতাস বিশেষ দরকার। ইহা না পাইলে গাছগুলি সতেজ হইতে পারে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রখর উত্তাপ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) খুব সাবধানে চারাগাছগুলিতে জলসেচন করিতে হইবে, যাহাতে সেগুলি নষ্ট হইয়া না যায়। অল্প বৃষ্টি চারাগাছের বাড়িবার

ফুলকপি

পক্ষে খুবই ফলপ্রদ। জমির আর্দ্রতার উপরই জলসেচন নির্ভর করে। প্রত্যেক দিন অল্প জলসেচন অপেক্ষা ২।৩ দিন অন্তর বীজক্ষেত্রকে বেশ করিয়া ভিজাইয়া দিলেই ভাল হয়। জলসেচনের পক্ষে সকাল ও বিকেল বেলাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত জলসেচন চারাগাছের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর।

৫। চারাগাছকে এক স্থান হইতে তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করা—(১) চারাগাছগুলি যখন দেড় ইঞ্চি লম্বা হইবে তখন সেগুলিকে অপর আর একটি বীজক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিতে হইবে এবং এক ইঞ্চি অন্তর পুঁতিতে হইবে। পুঁতিবার পূর্ব্বে বীজক্ষেত্রটি ভিজানো উচিত। বীজক্ষেত্র হইতে চারাগাছগুলিকে যেন কখনই টানিয়া না তোলা হয়। সকল সময়েই এমনভাবে তুলিতে হইবে যাহাতে শিকড়ের সঙ্গে খানিকটা মাটি লাগিয়া থাকে।

(২) চারাগাছ স্থানান্তরিত করিবার পক্ষে বিকালবেলাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়।

(৩) স্থানান্তরিত চারাগাছগুলিকে সূর্য্যের তাপ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

(৪) সপ্তাহে ২ ৩ বার জলসেচন করা প্রয়োজন এবং ইহা অতি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে করাই উচিত।

(৫) ১০ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে চারাগাছগুলিকে পুনরায় অপর একটি বীজক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিতে হইবে এবং স্থানান্তরিত করিবার সময় উপরোক্ত যত্ন ও সতর্কতা লইতে হইবে। এই সময় উহাদিগকে এক ইঞ্চির বেশী তফাতে পুঁতিতে হইবে, যাহাতে পাতাগুলি বাড়িবার জন্য উপযুক্ত স্থান পায়। ফুলকপির চারাগাছগুলিকে এইভাবে দুইবার স্থানান্তরিত করিতে হইবে। উত্তম ও পরিপুষ্ট শস্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দরকারী।

(৬) পূর্ব্বের ন্যায় জলসেচন করিতে হইবে। তবে এই সময়ে চারাগাছগুলির পক্ষে আরও বেশী সূর্য্যালোক ও বাতাসের প্রয়োজন।

(৭) চারাগাছগুলি যখন চার হইতে ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ হইবে তখন যে জমিতে উহারা শস্য করে জন্মাইবে সেই জমিতে নাড়িয়া পুঁতিতে হইবে। স্থানান্তরিত করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত যত্ন লইতে হইবে। চারাগাছের শিকড় ও খানিকটা কাণ্ড প্রবেশ করিতে পারে এইরূপ গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া সোজা লাইনে চারাগাছগুলিকে পোঁতা দরকার, এবং তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সহজেই জলসেচনের জন্য নালা তৈয়ারি করিতে পারা যায় এবং শস্য বাড়িবার পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। ওলকপি, স্যালাড, মটরশুঁটি, বিট ছাড়া আর সকল প্রকার শাকসব্জীর চারাগাছ সাধারণতঃ দুই হইতে আড়াই ফুট অন্তর পুঁতিলেই চলে।

(৮) স্থানান্তরিত করিবার পর শিকড়গুলিকে মাটির মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিবার জন্য জলসেচনের প্রয়োজন এবং জমির আর্দ্রতার উপরই পরবর্ত্তী জলসেচন নির্ভর করে।

(৯) চারাগাছগুলিকে সূর্য্যের তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত উহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

(১০) সর্ব্বদাই দুর্ব্বল চারাগাছ সরাইয়া সবল চারাগাছ পোঁতা দরকার।

৬। শাকসব্জীর পক্ষে উপযুক্ত জমি—(১) শাকসব্জীর পক্ষে দোআঁশ মাটিই উপযুক্ত। চারাগাছগুলি স্থানান্তরিত করিয়া পুঁতিবার পূর্ব্বে গোবর সার ও "কম্পোষ্ট" সার দিয়া জমি খুব ভাল করিয়া তৈয়ারি করা উচিত।

মূলা

(২) সব্জী-বাগান জলাশয়ের নিকটে হওয়া উচিত, যাহাতে জলসেচনের সুবিধা হয়।

(৩) বাগানের আকার অনুযায়ী সব্জীক্ষেত ছোট ছোট সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলে ভাল হয়।

(৪) সব্জীক্ষেতের মাটি নিড়ানী দিয়া আলগা করিয়া রাখা দরকার। সব্জীক্ষেতে যেন ঘাস, জঙ্গল, আগাছা না থাকে। সব্জীর বাগানে বেড়া দেওয়া ভাল।

(৫) প্রতি বৎসর একই সব্জী একই জমিতে বপন করা উচিত নহে।

(৬) উপযুক্ত পরিমাণ জলসেচন ও সারের উপরই শাকসব্জী চাষের সফলতা নির্ভর করে। বাড়ীর সংলগ্ন অল্প জমিতে যাঁহারা শাকসব্জীর চাষ করিতে চান তাঁহাদের সুবিধার জন্য নিম্নের তালিকায় কয়েকটি শাকসব্জী রোপণের সময়, বীজের পরিমাণ, রোপণ প্রণালী ইত্যাদি খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়া হইল:

নাম	রোপণের সময়	বীজের পরিমাণ ২০০ হাত লম্বা এক লাইনের জন্য	রোপণ-প্রণালী
বিলাতী শীম	ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি।	৩ পাউণ্ড	সরাসরি জমিতে এক ফুট অন্তর লাইনে ৩ ইঞ্চি গভীর নালীতে ৯ ইঞ্চি অন্তর বীজ বপন করিতে হয়; গাছ লতাইবার জন্য ঠেকনা বা ঝাকরি দিতে হয়। ইহার গাছ সাত-আট ফুট লম্বা হয়। ছয়-সাত সপ্তাহের মধ্যে ফল ধরে।
বাঁধাকপি	শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি।	১ আউন্স	বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া দুই ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে দুই ফুট অন্তর চারা লাগাইতে হয়। কয়েকদিন চারাগুলিকে রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে হয়। মাঝে মাঝে নিড়াইয়া মাটি আলগা করিয়া দেওয়া ছাড়া বিশেষ কাজ নাই। বাঁধিয়া উঠিতে তিন মাস লাগে।
ফুলকপি	আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি।	১ আউন্স	ইহার চাষ ঠিক বাঁধাকপির মত। যখন ফুল বেশ বাঁধিয়া উঠে তখন ইহার চারিদিকের কয়েকটি পাতা ভাঙিয়া উপরে ঢাকিয়া দিলে ফুল নরম থাকে ও বিবর্ণ হয় না।
গাজর	ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি।	। আউন্স	সরাসরি জমিতে বীজ বপন করিতে হয়। পরে চারা বাহির হইলে এক ফুট অন্তর পাতলা করিয়া দিতে হয়।
ওলকপি	ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি।	১ আউন্স	বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া আসল জমিতে এক ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে এক ফুট অন্তর চারা বসাইতে হয়।
লেটুস বা স্যালাড	ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি।	১॥ আউন্স	বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া আসল জমিতে এক ফুট অন্তর চারা লাগাইতে হয়।
পিঁয়াজ	আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি।	৩ আউন্স	বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া বা সরাসরি জমিতে ছয় ইঞ্চি হইতে নয় ইঞ্চি অন্তর চারা বা গেঁড় বপন করিতে হয়।
মটরশুঁটি	শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি।	[illegible] পাউণ্ড	সরাসরি জমিতে জাতি অনুযায়ী দুই ফুট হইতে চার ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ছয় হইতে নয় ইঞ্চি অন্তর বীজ বপন করিতে হয়। ঠেকনার আবশ্যক।
বিলাতী বেগুন	আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি।	। আউন্স	বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া আড়াই ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে দেড় হইতে দুই ফুট অন্তর চারা লাগাইতে হয়; প্রথম অবস্থাতেই প্রত্যেক গাছে ঠেকনা দিতে হয়। তাহা না হইলে পাশ হইতে ডালপালা বাহির হয় এবং তাহাতে ফল ধরিলে তাহার ভারে সমস্ত গাছটি মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। ডাঁটা এবং পাতার উপায় কেঁকড়ি বাহির হইলে উহা ভাঙিয়া দেওয়া আবশ্যক।
শালগম	ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি।	১॥ আউন্স	সরাসরি জমিতে বীজ বপন করিতে হয়। চারা বাহির হইলে উহা পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার। যেন একটি গাছ হইতে অপরটির নয় ইঞ্চি হইতে এক ফুট ফাঁক থাকে।
মূলা	আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে মাঘের মাঝামাঝি।	৮ আউন্স	সরাসরি জমিতে বীজ বপন করিতে হয়। পরে চারা ছয় ইঞ্চি অন্তর পাতলা করিয়া দেওয়া আবশ্যক।
বিট	শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি।	৩ আউন্স	সরাসরি জমিতে বা বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া এক ফুট অন্তর বীজ বা চারা রোপণ করিতে হয়।

তড়িৎ-লতা

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

"আশ্চর্য্য তোমার এই শ্বশুর দেবতাটি"—মন্তব্য করলেন বিদুলা।

"হাঁ, সত্যিই বড় আশ্চর্য্য! ফুলশয্যার দিন সারাদিনই আমার ঘরে লোকজন ভিড় করে আছে। দুপুরের দিকে এক সময় তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। খবর পাঠিয়েছেন আমি যেন একলাই যাই। আমার বুক ভয়ে দুরদুর করতে লাগল। কি আবার হ'ল যার জন্য তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন!

"অজানাকেই লোকে ভয় পায়। একটা জিনিষ আমার কাছে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—আমি যেন তাঁর স্নেহ-ভালবাসা ও বিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠেছিলাম। মনে হ'ল আমিই তাঁর একমাত্র নির্ভরস্থল। বুঝতে পারলাম, অত বড় দুর্দ্দান্ত ক্ষমতাশালী লোক কত অসহায়, কত বড় দুঃখী। তিনি বড়ই একা, নিঃসঙ্গ, এ সংসারে তাঁর যেন কেউ নেই। তাঁর উপর বড় মায়া জন্মাল।

তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি তিনি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসে গড়গড়া টানছেন, তাঁর ছেলে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে তাঁর কাছে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন—

'তুমি আমায় মাপ কর মা, এমনি সময় তোমায় আমি ডেকে পাঠিয়েছি। কিন্তু জান ত বুড়ো হয়েছি কখন থাকি আর কখন নেই। তোমার কাছে আমার অনেক বলার আছে। আস্তে আস্তে বলতে সুরু না করলে আর কোন দিনই বলা হবে কিনা কে জানে। দেখ মা, এ আমার একমাত্র সন্তান এর জন্যই আমার যত ভাবনা। এ যদি সত্যিকারের মানুষ হ'ত তবে আর আমার কোনই চিন্তা থাকত না। এর উপর ভরসা করে আমি একদিনের জন্যেও শান্তি পাব না, যা-কিছু বিত্ত বাপ-দাদা করে গিয়েছেন তা ওর হাতে পড়লে দিনে দিনে কর্পূরের মত উবে যাবে। মরেও আমার শান্তি হবে না। আর ও এমনি করে উড়িয়ে দেবে তা আমি জীবিত থেকে নিজের চোখে দেখতে পারব না। শুধু এর মঙ্গলের জন্যই তোমাকে এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলে দিলাম। তোমার ওপর যে কেবল এই বুড়ো ছেলের ভার পড়ল তা নয়, আমার এই একমাত্র বংশধরকেও তোমায় মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। আমার ছেলে হলে কি হয়, আমার আজ আর বলতে দ্বিধা নেই, ও তোমার যোগ্য কোন প্রকারেই নয়।' তার পর ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখ রাজু, এ আমাদের ঘরের লক্ষ্মী। একে আমি, হাঁ আমি, নিয়ে এসেছি সমাদরে। এত দিন আমার আজ্ঞায় চলত সবকিছু—আজ থেকে জেনে রেখ এর আজ্ঞাই হবে সকলের শিরোধার্য্য। এর অপমান যদি কেউ করে তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। এ তোমার বেলায়ও প্রযোজ্য। এর যেন কোন দিনই ব্যতিক্রম না হয়। বুঝতে পেরেছ ত!'

"তাঁর ছেলের মুখের দিকে সেদিন তাকাতে পারি নি। কাজেই মুখের চেহারায় কোন পরিবর্ত্তন হয়েছিল কিনা তাও বলতে পারি নে। তবে আমার শ্বশুরমশায়ের নির্দ্দেশে সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। পরে আমায় আবার শ্বশুরমশাই বলতে লাগলেন—'বুঝতে পেরেছ মা, তুমি এর কোন অন্যায়ই সহ্য করো না, নির্ম্মম ভাবে শাসন করো একে। আজ যে আমার কত আনন্দের দিন তা আর কাকে বলব! যদি বেঁচে থাকত রাজুর মা!'

"আমার কি রকম মায়া হ'ল, আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। তিনি তাঁর দু'হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে রাখলেন। আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। তিনি আমার হাত আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাও মা, বিশ্রাম কর গে। ভার যখন নিয়েছ তখন ফুরসত হয়ত কোন দিনই পাবে না। আজ যদি পেয়ে থাক তবে তার সদ্ব্যবহার করে নাও।'

"যে ভয় নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলাম, বেরবার সময় তার শতগুণ বিস্ময় নিয়ে ফিরে এলাম। এই কি সেই লোক যে আমার পিতামাতাকে অত্যাচারের নগ্নরূপ দেখিয়েছে, এমন কি গ্রাম থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছে; এই কি সেই লোক যার ভয়ে সবাই ভীত থাকে? এমনি উল্টো ধারা মানুষের মনে বইতে পারে সে পরিচয় পেয়ে যে কেবল বিস্মিত হয়েছিলাম তা নয়, নিজের ওপর যে দায়িত্ব এসে পড়ল তা বইতে পারব কিনা সে ভাবনাও মনে এল।

"শুধু সেদিন কেন, তার পর আরও অনেকদিন মনে হয়েছে যে আগেকার সমস্ত অপমান-অত্যাচারের প্রতিশোধ নি'। কিন্তু যখনই মনে হয়েছে বৃদ্ধের এই একান্ত অসহায় রূপ, তখনই পিছু হটে দাঁড়িয়েছি।"

এই কথা শেষ করেই শম্পা দেবী একটু চুপ করলেন। তিনি যেন কি ভাবছিলেন। বিদুলা মন্তব্য করলেন—"তা হলে তোমার স্বামী আর তোমার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করে নি বল!"

কথা শুনেই শম্পা দেবী হেসে ফেললেন। বললেন, "বহু দিনের অভ্যাসে মানুষের যা স্বভাবসিদ্ধ হয় তাকে এক দিনে মুছে ফেলা যায়ই না, জীবনভোর চেষ্টা করেও করা যায় কিনা তা বলতে পারি নে। আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম। কি আর তোমাদের বলব—

"প্রথম প্রথম কিছুদিন ঐ লোকটির ব্যবহারে বেশ শান্তভাব লক্ষ্য করলাম। তাই বলে মনে করো না যে, আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা তার উপর হয়েছিল! এই বোধটুকু আমার তখনও ছিল যে, একটা সাময়িক মোহ জাতসাপকে দমিয়ে রেখেছে। যে-কোন দিন ফোঁস করে উঠতে পারে।

"আমার শ্বশুর তাঁর ছেলেকে ভাল ভাবেই জানতেন। তার সম্পর্কে তাঁর কোন সংশয় ছিল না।

"যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই সে ধীরে ধীরে নিজমূর্ত্তি ধারণ করতে লাগল। দিনের বেলায় অবশ্য কোনদিনই সে বাড়ী থাকত কিনা জানি নে, তবে ক্রমে তার রাত্রিতে বাড়ী ফিরতে দেরি হতে লাগল। ওর গতিবিধি ক্রমশই পারাপের দিকে চলতে লাগল।

"অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, তার দেখা নেই। উৎকণ্ঠিত শ্বশুর বার দুই খোঁজ করে গেছেন সে ফিরেছে কি না। আমি দোরে খিল দিয়ে শুয়ে ছিলাম। গভীর রাত্রে এল তাঁর রাজু। দুমদাম্ দরজায় ঘা পড়তে লাগল। বুঝলাম আজ সহজে রেহাই নেই। মন স্থির করে ফেললাম। দরজা খুলে দিয়ে পাশে সরে দাঁড়ালাম। সে দরজা ধরে ঘরে ঢুকল। চুল এলোমেলো। পা টলছে।

"কোন কথা না বলে, আস্তে আস্তে টলতে টলতে এসে বিছানায় বসে পড়ল। বিছানাটা খুব শক্ত করে ধরে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'এই, এই, শুনতে পেলি এদিকে আয়! দেরি করিস নে।'

"রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। এবার গলার আওয়াজ আরও একটু চড়িয়ে বলল, 'বড্ড দেরি করছিস যে।' বুঝলাম আজকে ব্যাপার গড়াবে হয়ত অনেক দূর। এগিয়ে গেলাম কিন্তু একটু দৃঢ় স্বরেই বললাম, 'দেখ, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, 'তুই' 'তোকারি' করো না, ভদ্রলোকের মত কথা বলবে। ইতর ভাষায় কথা বলা ছাড়তে হবে।'

"আমার কথা শুনে মনে হ'ল ওর নেশা ছুটে গেছে। তা অবশ্য মুহূর্ত্তের জন্য। ব্যঙ্গ করে বলল, 'আচ্ছা! ছোট লোকের মেয়ের আবার তেজও আছে দেখছি। গরীব ভিখিরী বামুনের মেয়ে হয়ে এত অহঙ্কার! এ সব চলবে না, চলবে না। জেনে রাখ।'

"ওর কথা শুনে রাগও হ'ল, হাসিও পেল। আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'হাঁ চলবে। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে এমন দরিদ্রের পায়ে দুর্বৃত্ত ধনীও মাথা নোয়ায়। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি তুমি আর কোনও দিন মাতাল হয়ে বাড়ী ফের তা হলে এ ঘরে ঢুকতে পাবে না।'

"আমার কথা শুনে ওর মন নিশ্চয় খুব উত্তেজিত হয়েছিল। কিন্তু তিলমাত্র ওর গায়ে তখন শক্তিও নেই, ওঠবার চেষ্টা করে বসে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল, 'আচ্ছা, বহুত আচ্ছা! ছোটলোকের মেয়ের সাহস ত কম নয়।'

"তারপর একটু চুপ করেই, হা-হা করে হেসে উঠে বললে, হাসালি বউ, মাইরি তুই হাসালি! আমার ঘরে আমি আসব না! তোকে থাকতে দিয়েছি বলে তোর ঘর হ'ল। আমি তোকে বার করে দিতে পারি জানিস?'

"আমি ওর চোখে চোখ রেখে দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, 'যাও বলছি। যাও এখান থেকে।'

"সে মুখ বিকৃত করে বললে, 'কি? তোর কথায় যাব?'

"হঠাৎ সে চুপ করে গেল। তাকিয়ে দেখি স্বয়ং শ্বশুর হাজির। তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে, তিনি চীৎকার করে উঠলেন—মনে রেখো রাজু, এ বাড়ীঘর, বিষয়-সম্পত্তি এর এক কণার উপরও তোমার দাবি নেই। তাকে তোমার বার করে দেওয়ার অধিকার নেই। সেদিনও তোমাকে বলেছি—বৌমা সর্ব্বময় কর্ত্রী। তুমি আমার একমাত্র সন্তান হলেও তোমার কোন কর্তৃত্বই নেই। এর যেন কোন ব্যতিক্রম না হয়।

"কথাগুলি শেষ করেই তিনি হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাজু সেই যে চুপ করল আর সে রাত্রে সে একটিবারও কথা বলে নি।

"আমিও সে রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারি নি। নানা চিন্তায় মন চলতে লাগল। শ্বশুর বৃদ্ধ, তাঁর এখন যে-কোন দিন কাল হতে পারে। তাঁর বর্ত্তমানে যে ছেলে এমনি করতে সাহস পায়, তাঁর অবর্ত্তমানে কি করে নিজের মান-সম্মান বজায় রেখে বাস করব, তা ভেবে আকুল হয়ে পড়লাম। ভাবতে ভাবতে শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম—চম্পা যেন ফিরে এসেছে, মাথায় তার মুকুট, আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলছে 'তোর কোন ভয় নেই, এই দেখ আমার হাতে কি আছে।' এই কথা বলেই কোমর থেকে চক্চকে ছোরা বার করলে। বললে, 'বিপদে পড়লে এই নিয়ে আক্রমণ করবি আর না পারলে নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করবি।' আরও কত কি যে বলেছিল আজ আর মনে নেই।

"হঠাৎ একটা কিসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। আমার ঝি ঘরের আসবাবপত্র পরিষ্কার করছিল শব্দ না করে; হঠাৎ পানের ডিবেটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে শব্দ হ'ল। বেচারার মুখ কাচুমাচু হয়ে গেল। নিজের মনে মনেই হাসি পেল।

"যাক, অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হ'ল আমার স্বামীর। অর্থাৎ আবার একেবারে চুপচাপ। বাড়ী থেকে সে একরকম বেরোয় না। আমার সঙ্গে দেখা হলে, মিটি মিটি তাকায়, একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার চলে যায়। ওর তা ভিন্ন অবশ্য গত্যন্তর নেই।

"নানা ছোট-বড় ঘটনায় আমার কাছে আঘাত পেয়ে পেয়ে তার যেন আমাকে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। খুব রাগ হলেও শেষ পর্য্যন্ত কেমন মিইয়ে যেত।

"বেশ কিছুদিন শান্তভাবে কেটে গেল। আমার সারাদিন প্রায় শ্বশুরের সঙ্গেই কাটে। জমিদারীর আয়-ব্যয়, বিষয়-সম্পত্তির বিবরণ, এই সব আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি মফস্বল থেকে সমস্ত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়ে বলে দিলেন

যে, আমার আজ্ঞা পালন করতে বিন্দুমাত্র অবহেলা করবে তার দুর্গতির সীমা থাকবে না।

"বৃদ্ধ দেওয়ানজী ত ভাবে গদগদ। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের আর কোন ভাবনা নেই স্বয়' ভগবতী উপস্থিত। তাঁর আজ্ঞা অবহেলা করবে এমন মানুষ আছে না কি!' একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। এদের মধ্যে কয়েকজন কর্মচারী আমার বাবার উপর অত্যাচারের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাগ নিয়েছে। আজ আমি তাদেরই কর্ত্রী!

"কিছুদিনের মধ্যেই আমার শরীর খারাপ বোধ করতে লাগলাম। কিছুই খেতে পারি নে। কথাটা শ্বশুরমশায়ের কানে গেল। তিনি তখনিই চেঁচামেচি সুরু করে দিলেন। বাড়ীর সবাইকে ডেকে অযথা ধমকাতে লাগলেন। সবাই আবার আমার সেবায় দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে গেল। অর্থাৎ আমার অবস্থাটা অস্বস্তি-কর হ'ল ভয়ানক। কিছুতেই কিছু নয়। কবিরাজ ডাকা হ'ল। তিনি আমায় দেখে উঠে গেলেন। বাইরে আমার শ্বশুরকে ডেকে নিয়ে তাঁর পৌত্রের ভাবী আগমন-সংবাদ ঘোষণা করে দিয়ে গেলেন।

"সেকথা শুনে অবোধ বৃদ্ধ যা খুশি আরম্ভ করে দিলেন; তার স্নেহের অত্যাচার আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। বাড়ীতে ঘটার আর শেষ নেই, আজ এ পূজো, কাল সে মানত, পরশু সত্যনারায়ণ, তার পরদিন আর কিছু।

"এত হৈ চৈ মহোৎসবের মধ্যেও কিন্তু আমি নিতান্তই একা। দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, প্রজা, দাসদাসী সকলের আমি মা। কিন্তু বাৎসল্য দিয়ে, হুকুম করে মন তৃপ্তি পায় নি। দিনের মধ্যে একটা সময় আসে যখন মনে হয় বাইরের খোলসটা ছেড়ে ফেলে দিয়ে কারুর কাছে পরম নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করি। এ আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে সর্বদাই গুমরে মরতে লাগল। কিন্তু সে অদৃষ্ট আমার নেই।

"তারপর কিছুদিন আমার স্বামী খুব ভালমানুষের মত হয়ে গেল। এমন অনুগত, শান্ত, ভদ্র যে ও হতে পারে তা অনুমানও কেউ করতে পারে নি।

"একদিন ও সলজ্জ হেসে বললে—'সত্যি বউ, তুমি খুব সুন্দর। এ যেন আগুন জ্বলছে, চাইতে পারা যায় না, চোখ ঝলসে যায়।'

"আমি একটু হেসে বললাম, 'কেন তুমি এত বড় ধনীর সন্তান, প্রবল প্রতাপান্বিত, গায়ের জোরে আমার অহঙ্কার ত মাটিতে লুটিয়ে দিতে পার।'

"ও ম্লানমুখে বললে, 'আগে তা রোজই ভাবতাম, এখনও মাঝে মাঝে ভাবি তোমাকে শিক্ষা দেব, এমনকি মেরে মুখ ভেঙে দেব'—এই কথা বলেই সে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল, বললে—'তুমি কিন্তু এ কথায় রাগ করো না। যতই সঙ্কল্প করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তা আর হয় না। বাইরে থেকে কতই তোড়জোড় করে আসি, পরে আর পারি না।'

"কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, কি ভেবে ও নিজেই ভীত কণ্ঠে বললে—'ভয় হয় তুমি একদিন আমাকে খুন করে ফেলবে। তুমি কেমন করে যে চাও। দেখলে মনে হয় তুমি সব করতে পার। সত্যি? তুমি মানুষ খুন করতে পার?'

"আমি একটু হেসে বললাম—'পারি, তবে যাকে তাকে নয়, তোমার মত দুর্ব্বল অসহায়কে খুন করব? কি যে বল! তুমি তার যোগ্যই নও! তোমার কোন ভয় নেই।'

"এর পর আর কোন কথা না বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"তার পর কিছুদিন বেশ শান্তভাবেই কাটল। আমি জানতাম যে এ আবার আর এক ঝড়ের পূর্ব্বাভাস, তবে সেই ঝড় কোন পথে আসবে, কি তার গতি সেই কথাই ভাবছিলাম, আর মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিলাম। আমার অনুমান মিথ্যে হ'ল না। রাত আন্দাজ এগারটা বাজে। আমি একাই ঘরে বসে। দরজা ভেজানো ছিল। হঠাৎ তার জড়িত কণ্ঠের আওয়াজ পেলাম—ভেতরে আসতে পারি? পালঙ্ক থেকে নামতেই দেখি যে, ও ঘরে ঢুকে পড়েছে, পেছনে আরও দুটি সঙ্গী। সর্ব্বনাশ এখন উপায়? উপায় তখনই স্থির করে ফেললাম। ছুটে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালাম।

"মাতালের সবকিছু লক্ষণ ফুটে উঠেছে রাজুর সমস্ত দেহের মধ্যে। পিছনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ও সঙ্গীদের ডেকে বললে, 'এই আয়, এদিকে সরে আয়, দেখবি একখানা চিজ্।' তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঃ বড্ড দেখছি, জানিস মেয়েরা এমনিতেই সুন্দর, তুই আরও আরও। কিন্তু তোর ঐ এক দোষ, একটুতেই ফোঁস করে উঠিস—ঠিক যেন জাতসাপ। কিন্তু মেয়েমানুষের অত ভাল নয়।'

"কথা শেষ করেই রাজু এগোবার জন্য পা বাড়াল। আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'সাবধান আর এক পা এগিয়েছ কি সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।' ও থেমে গেল—বললে, 'আচ্ছা, আজ তোকে লাথি মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে তবে নিঃশ্বাস ছাড়ব।'

"বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আয় তোরা দেখে যা, আজ ওর বিষদাঁত ভেঙে দিচ্ছি।'

এক জন মাতাল বন্ধু দূর থেকেই বললে, 'যাক্ ভাই রাজু, ওকে ছেড়ে দাও। মেয়েমানুষ! মাপ কর ওকে। তার চেয়ে তুমি ভাই আর একটা বিয়ে কর। কি কাজ হাঙ্গামাহুজ্জতে।

দ্বিতীয় মাতালটি বললে, সেই ভাল। থাক আর হাঙ্গামায় দরকার নেই। ঐ পরামর্শই ভাল—আর একটা বিয়েই কর। চল ফিরে যাই। আবার কর্তা যদি এসে পড়েন, তবেই হয়েছে!

"বন্ধুরা ততক্ষণে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—আমার চোখে চোখ পড়তেই ওরা মাথা নীচু করল। মুহূর্তের জন্য প্রমাদ গনলাম। কিন্তু তখন আর ভাববার সময় নেই—গায়ের সব জোর দিয়ে ধাক্কা দিতেই ও মাটিতে পড়ে গেল। আমি চীৎকার করে বললাম—আপনারা যদি এখখুনি এ বাড়ী ত্যাগ না করেন তবে পাইক-পেয়াদা ডেকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।"

"গণ্ডগোলে আকৃষ্ট হয়ে আমার শ্বশুর শশব্যস্তে এখানে এসে

উপস্থিত হলেন—তিনি ত প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি তখখুনি ওর সঙ্গীদের বেঁধে সারারাত আটকে রাখবার হুকুম দিলেন, পর দিন সকালে ওদের বিচার হবে। তার পর ছেলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'রাজু আর একটা কথা বললে আমাকে ডেকে পাঠিও মা—আমি চাবকে ওর পিঠের চামড়া তুলে দেব।'

"সারারাত চুপ করে থাকলেও তার পর দিন থেকে ওর পাগলামি চরমে উঠল। বাড়ীর লোকজন অস্থির হয়ে উঠল - ক্রমে গাঁয়ের লোক। শ্বশুর অনেক চেষ্টা করলেন ডাক্তার ডেকে—কবিরাজ ডেকে। কিছুই হ'ল না। শেষ পর্যন্ত তিনিও হয়ে উঠলেন অস্থির। ও পাগলাগারদে চলে গেল। সেখানকার চিকিৎসায়ও কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। আজ বহুকাল যাবৎ সে সেখানেই আছে।

"কিছুদিন পরই ছেলের মা হলাম। বৃদ্ধ শ্বশুর আনন্দে আবার ফেটে পড়লেন। আবার ঘটা হৈ চৈ। আশ্চর্য্য এই ছেলের প্রতি প্রথমে আমার কোনই আকর্ষণ হ'ল না। যত আক্রোশ পড়ল গিয়ে ঐ নির্দোষ শিশুর উপর। কিন্তু বুঝতে পারলাম নাড়ীর টান যেন ছিঁড়লেও ছেঁড়া যায় না। বাস্তবিক ওর আসার জন্য ও ত দায়ী নয় কিছুতেই।

"কিছুদিন পরে মনে হ'ল এখান থেকে দূরে চলে গেলে যদি এ বাঁধন কাটাতে পারি। একদিন শ্বশুরকে বললাম, 'আপনারা যা চেয়েছিলেন তাই ত পেলেন। এবার আমায় ছুটি দিন।'

"শ্বশুর বললেন, 'ছুটি দেবার মালিক কি আমি? কর্ত্তা ত তোমার কোলেই আছে। তাকে জিজ্ঞেস কর।'

"'না বাবা, আমি আর পারি নে।'

"'সে কি হয় মা, এ ছেলেকে লালন-পালন করবে কে? এ দুধের শিশু ত তোমাকে ছাড়া মরেই যাবে। আমি তোমার অবস্থা বুঝি, কিন্তু উপায় কি! এই নিঃসহায় শিশুকে ফেলে কোথায় যাবে মা?'

"একটু থেমে আবার বললেন, 'মা তোর এই বুড়ো অক্ষম ছেলেরই বা হবে কি? ঐ শিশুও যা আমিও তাই।'

"তার পর আমি শিশুকে নিয়েই কয়েক বৎসর সবকিছু ভুলে থাকতে চেষ্টা করলাম। সন্তানবাৎসল্য সমস্ত জীবনব্যাপী ব্যথা বেদনা ভুলিয়ে দিতে পারে কিনা তার পরীক্ষা করলাম।

"সন্তান নিয়ে কিন্তু আমার দিন কাটল না। দিনগুলি আমার কাছে একান্ত অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। নিজের পথ যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে মনে হ'ল।

"সেই ডাকাতির রাতেই আমার কর্ত্তব্য আমি স্থির করে ফেললাম। মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া হ'ল। তারপর একদিন মন স্থির করে ছেলেকে শ্বশুরের হাতে তুলে দিয়ে অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। পথে আবার তোমাদের সঙ্গে এক নাটকীয় মুহূর্ত্তে দেখা হ'ল। তাদের বংশরক্ষা হয়েছে, আমিও নিষ্কৃতি পেয়েছি। তাদের ছেলে তাদের দিয়ে এসেছি।"

একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শম্পা দেবী উদাস ভাবে বললেন, "এই হ'ল আমার গল্পের শেষ। শেষের পরে আর কি থাকে! কিছুই থাকে না।"

বিনুদা বললেন, "সজীব প্রাণবন্ত গল্পের শেষ নেই, মানুষের জীবনের গল্প সমাপ্ত হয় না। বারে বারে নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়।"

শম্পা দেবী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "নূতন পরিচ্ছেদ, আমার জীবনে?"

বিনুদা—"আমার বক্তব্য দৃষ্টান্ত দিয়ে তুমিই ত বুঝিয়ে দিলে শম্পা! জীবন-নাট্যের যেখানে যবনিকাপাত মনে করেছ, তার আগেই নূতন অঙ্কের পর্দ্দা উঠতে সুরু করেছে তোমার জীবনেই। পূব আকাশে অরুণ আলোয় তার ইঙ্গিত পেয়েছ। আমরা বিশ্ব-প্রাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছি—এই অফুরন্ত প্রাণ-প্রবাহে ঢেউয়ের মত উঠছি পড়ছি, আবার উঠছি, আমাদের শেষ নেই, জীবনের গল্পেরও শেষ নেই।"

শম্পা দেবী কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ আর থাক্, বেলা পড়ে এল, সন্ধ্যার পরই কোথায় না যাবে বলেছিলে। অন্ততঃ ভাতে-ভাত কিছু তৈরি করে দিই গিয়ে।"

ক্রমশঃ

দার্জিলিং হইতে কার্সিয়াং

শ্রীআদিনাথ সেন

কার্সিয়াং শহরটি, বিশেষতঃ পাহাড়ের উপরের সেন্ট মেরী ও ডাউহিল অংশগুলি নিরিবিলি অথচ দার্জিলিঙের নিকটে।

কার্সিয়াং বাংলার সমতল ভূমির উত্তর প্রান্তে, উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালের দাক্ষিণা বাতাস তিন শত মাইলের উপর সমতল পথ অতিক্রম করিয়া হঠাৎ বাধা পাইয়া উপরে উঠিলে, এখানে ঠাণ্ডায় উহার বাষ্প জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং প্রচুর (বৎসরে মোট ১৭০") বৃষ্টিপাত হয়। সেইজন্ত পাহাড়ের কিছু ভিতরে উত্তরে অবস্থিত দার্জিলিং হইতে এখানে বৃষ্টি বেশী (দার্জিলিঙে এ বৎসরে মোট ১২৬ ইঞ্চি, অথচ কলিকাতায় মাত্র ৬২ ইঞ্চি) হয়।

তেনজিং—এভারেষ্টশৃঙ্গ আরোহণকারী

বাংলাদেশে এই গ্রীষ্মকালের দক্ষিণা বাতাস প্রকৃতির একটি দান, যাহা সমতল ভূমিতে (যেমন কলিকাতায়) বিকালের দিকে বড়ই আরামপ্রদ। স্থল হইতে জল বেশী উত্তাপের ধারক বলিয়া উহা স্থল অপেক্ষা ঠাণ্ডা হইতে গরম বা গরম হইতে ঠাণ্ডা হইতে বেশী বিলম্ব হয় এবং অধিকতর সময় ঠাণ্ডা বা গরম অবস্থায় থাকে। দিনমানে সূর্য্যতাপে ভূমি জলভাগ হইতে অধিকতর উষ্ণ হওয়াতে (হাওয়া হাল্কা হয় বলিয়া) ভূমি হইতে উপরের দিকে বাতাসের প্রবাহ বেশী হয়। উহার জায়গায় সমুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাস বৈকালের দিকে স্থলের দিকে আসে। বলা বাহুল্য, ভোররাত্রে ইহার বিপরীত পরিবেশে স্থল হইতে জলের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়া চলে।

এই অঞ্চলের ইতিহাস এবং চা-সমৃদ্ধির ইতিবৃত্ত অতিশয় বিস্ময়কর। এক শত বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র প্রদেশই জঙ্গলী পাহাড়ে পূর্ণ ছিল। দার্জিলিং অঞ্চল, খানিকটা সমভূমিসহ, সিকিম রাজ্যভুক্ত ছিল। নেপালী গুর্খারা বহুকাল পূর্ব হইতে সিকিম আক্রমণ করিতেছিল এবং পরে দখলও করিয়াছিল। ১৮১৪ সনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যুদ্ধ করিয়া সিকিমের উদ্ধার সাধন করেন; কিন্তু বিদেশ সম্পর্কে রাজনীতি নিজের হাতে রাখেন। ১৮২৮ সনে জেনারেল লয়েড নেপাল ও সিকিমের মধ্যে গোলমাল মিটাইতে গিয়া দার্জিলিঙের অবস্থিতি প্রথম আবিষ্কার করেন। লয়েড ও গ্রাণ্ট দার্জিলিঙে একটি স্বাস্থ্যনিবাস এবং একটি সামরিক ঘাঁটির জন্ত তাগিদ দিতে থাকেন। ১৮৩৪ সনে সিকিমের রাজা লেপচা-আক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য পাইয়া দার্জিলিং অঞ্চল কোম্পানীকে বাৎসরিক ৩০০০. (পরে ৬০০০.) টাকা উপঢৌকন দান করেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নেপাল প্রতিনিধি ডাঃ

কার্সিয়াং ইনডাষ্ট্রিয়াল হল

ক্যাম্বেল ১৮৩৯ সনে দার্জিলিঙের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং ঐ অঞ্চলের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। ১৮৩৯-৪২ সনে পাখা-বাড়ী হইয়া সেঞ্চল পাহাড়ের উপর দিয়া কার্সিয়াং-দার্জিলিং মিলিটারী রোড তৈয়ার হয়। ১৮৩০ সনে দার্জিলিঙের বাসিন্দা ছিল মাত্র ১০০ জন। দশ বৎসরের মধ্যেই নেপাল, সিকিম ও ভুটান হইতে ক্রীতদাস প্রথার তাড়নায় ১০,০০০ লোক দার্জিলিঙে আসে।

ডাঃ ক্যাম্বেলই প্রথম চা-বাগানের পরিকল্পনায় আসাম হইতে চীনদেশীয় বীজে এদেশে সুবিধামত চা জন্মিবে কিনা পরীক্ষা করিতে থাকেন। বিশ বৎসর পরে তাঁহারই বোনা একটি গাছ ২০ ফুট উচ্চ এবং ৫০ ফুট বেড়ে বর্দ্ধিত হয়। চা-বাগান প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৬ সন হইতে একটি শিল্প হিসাবে দ্রুত উন্নতি লাভ করে। ১৮৬১ সনে পুরাতন মিলিটারী রোড সরু ও খাড়া বিবেচিত হওয়ায় চলাচলের সুবিধার জন্ত পাহাড় কাটিয়া শিলিগুড়ি-দার্জিলিং মোটর-রাস্তা এবং ১৮৬৬ সনে শিলিগুড়ি—গঙ্গা-শিলিগুড়ি হাটা রাস্তা তৈয়ার হয়। পূর্ব্বে গরুর গাড়ী, নৌকা, পাল্কী, ঘোড়া ইত্যাদি যানের বহুল প্রচলন ছিল। ১৮৮১ সনে রেলপথ নির্ম্মিত হয়।

১৮৬৬ সনের ৩৯টি চা-বাগান ১৯০০ সনে ১৭০টিতে বৃদ্ধি পায়। প্রথমে বৃক্ষচ্ছেদনে বাধা দিয়া, চা-বাগানের প্রসার সংযত রাখিতে হইয়াছিল। কলকব্জার প্রবর্তন এবং বাষ্পের ও জ্বালানী কাঠের ব্যবহারের প্রয়োজনে বহু শ্রমিক, মিস্ত্রী ও অজানা লোক এ অঞ্চলে আসিতে থাকে। ইহাদের দুই-তৃতীয়াংশই চা বাগানের কাজে লিপ্ত হয়। এখানকার ব্যবসা ক্রমে বড় বড় কোম্পানীর হাতে চলিয়া যায়। দেশী লোকের পরিচালিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান পাহাড়ের নীচে ম্যালেরিয়াপ্রধান সমতল ভূমিতে পরে গড়িয়া উঠিতে থাকে।

সুতরাং ডাঃ ক্যাম্বেলের পরীক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। সিঙ্কোনা বাগানও ১৮৮৪ সনে সেঞ্চল পাহাড়ের পূর্বদিকে মংপুতে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপিত হয়। এদেশে কুইনাইনের বিশেষ আবশ্যক। বিদেশী কুইনাইন দুর্মূল্য হওয়ার দরুন লাভজনক না হইলেও সরকার ইহার চাষ আবাদ করাইতেছেন। কফি, কাগজ, তামাক, রবার, কর্পূর ইত্যাদির চাষও এখানে পরীক্ষামূলকভাবে আরম্ভ হয়। এখানকার জমিতে ঐসব চাষ লাভজনক হয় নাই।

সেণ্ট মেরী—পাদ্রীদের কলেজ

১৮৫০ সনে সিকিমে ক্যাম্বেলকে আটকাইয়া রাখার ফলে একটি সামরিক অভিযানের প্রয়োজন হয়। তখন কোম্পানী ইহারা বন্ধ করিয়া সিকিমের সমতল ভূমি পর্যন্ত পূর্ণ শাসনক্ষমতা হস্তে গ্রহণ করে। ১৮৬০ সনে সিকিমের সহিত কোম্পানীর বিরোধের শেষ নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু ষষ্ঠ দশকের প্রারম্ভে ভুটান হইতে আক্রমণের ফলে কালিম্পং অঞ্চল এবং সন্নিকটবর্তী পাহাড় ও নিম্নভূমি কোম্পানীর দখলে আসে। ১৮৮০ সনে শিলিগুড়ি সাব-ডিভিসন জলপাইগুড়ি জেলা হইতে দার্জিলিং জেলার সহিত সংযুক্ত এবং কার্সিয়াং সাবডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; কিন্তু ১৯০৭ সনে একটি ভিন্ন সাবডিভিসন হইয়া যায়। ১৮৮১ সনে দার্জিলিং জেলা ভাগলপুর ডিভিসন হইতে রাজসাহীর সহিত যুক্ত হয়। তখন উভয়ই বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রেলপথে যাতায়াত সহজ হওয়াতে এযাবৎ দার্জিলিং উচ্চপদস্থ কর্মচারীর, স্বাস্থ্যকামীর এবং আমোদ-প্রয়াসীর গ্রীষ্মাবাসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯০৫ সনে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ হেতু রাজসাহী পূর্ববঙ্গভুক্ত হওয়ায়, দার্জিলিং জেলা

সেণ্ট মেরী কলেজের সংশ্লিষ্ট গোলাবাড়ী

পুনরায় ভাগলপুরের সহিত সংযুক্ত হয়। ১৯১২ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরে স্বতন্ত্র বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ গঠিত হয় এবং পুনরায় দার্জিলিং জেলা রাজসাহী বিভাগে আসে। ১৯৪৭ সনের দেশ-বিভাগে রাজসাহী ডিভিসনের প্রায় সমস্তই পাকিস্থানে চলিয়া যাওয়াতে অবশিষ্ট অংশ লইয়া নূতন জলপাইগুড়ি ডিভিসন গঠিত হইয়াছে। মালদহ জেলার সহিত সংযোগ সুব্যবস্থিত হয় নাই, কারণ মাঝখানে পূর্ণিয়া বিহারের ভাগলপুর ডিভিসনেই রহিয়া যায়। রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই সব অদল-বদল বর্তমানের নানাবিধ কূট প্রশ্নের কারণ হইয়াছে।

গোলাবাড়ী—মুরগীপোষা

১৮৮৯ সনে কার্সিয়াঙে পাদ্রীদের তত্ত্বাবধানে একটি মেয়েদের স্কুল, সেণ্টমেরী কলেজ এবং শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র সুরু হয়। বহু দিন পূর্বে ১৮৪৬ সনে দার্জিলিঙে লরেটো কনভেণ্ট স্থাপিত হইয়াছিল।

ইহাই এই অঞ্চলের সর্ব্বপ্রথম পাদ্রী-প্রতিষ্ঠান। কলিকাতার সেণ্ট পলস স্কুল বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর সরকার কর্ত্তৃক ১৮৬৪ সনে দার্জ্জিলিঙে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সরকারী চাকুরীয়াদের ছেলেমেয়ের শিক্ষা। কার্সিয়াং ডাউহিল স্কুলও ১৮৭৯ সনে সরকার কর্ত্তৃক সেই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়। প্রায় শীত-প্রধান আবহাওয়ায়, ইংরেজী মতে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাতে অনেক অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেমেয়েরা আজকাল এই রকম স্থানে থাকিয়া লেখাপড়া করে। কার্সিয়াঙের আশেপাশের ডাউহিল, ভিক্টোরিয়া, সেণ্টহেলেনস ও গোথেল এই চারটি উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে ছয় শতের উপর ছাত্রছাত্রী। দার্জ্জিলিঙে এই রকম স্কুল অনেকগুলি আছে।

দার্জ্জিলিং শহর, দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা

এই অঞ্চলের পাদ্রীদের কার্য্যকলাপের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৯ সনে আরম্ভ হয়। ঐ সনে কলিকাতার আর্চবিশপ ডাঃ গোথেল কার্সিয়াঙের নিকটবর্ত্তী উডকট প্রাসাদ চা-বাগানের মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করেন এবং রুগ্ন বা কর্ম্মক্লান্ত পাদ্রীদের ব্যবহারের জন্য দেন।

১৮৮৬ সনে পোপের সম্মতিক্রমে পাটনার রোমান ক্যাথলিক ক্যাপুচিন সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কলিকাতার আর্চবিশপের তত্ত্বাবধানে জেস্তুট ফাদারেরা দার্জ্জিলিঙের সেণ্ট জোসেফ সেমিনারী গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে এই স্থান নর্থ পয়েণ্ট নামে প্রসিদ্ধ। প্রতিষ্ঠানটি ক্রমাগতই নানা রকমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। নিকটস্থ গ্রটো (গুহায়-সাজান মন্দির) নির্ম্মাণ শুরু হয় ১৮৯৭ সনে এবং ১৯২২ সনে শেষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে উডকটও প্রসারিত এবং সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছে।

কলেজটি ১৮৮৯ সনে আসানসোল শহর হইতে এখানকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলিয়া আসে। কলেজে প্রায় ১০০ জন ছাত্র ও অধ্যাপক বাস করেন। ইঁহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের, এবং বিদেশ হইতে আগত ইউরোপীয় ও আমেরিকান ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিষয়ের (যেমন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্ক, জ্যোতিষ ইত্যাদি) গ্রাজুয়েট। অন্ততঃ দশ বৎসর পূর্ব্বে সংসার ছাড়িয়া নানা রূপে শিক্ষিত হইয়া তবে এখানে আসেন এবং ডিভিনিটি ডিগ্রীর জন্য চারি বৎসর অধ্যয়নরত থাকেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর পাদ্রীর কাজে তাঁহারা অভিষিক্ত হন। দরকার মত ভারতীয় বা বিদেশীয় গ্রাজুয়েটদের বিশেষ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে পাঠান হয়। এই ভাবে পাদ্রীরা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হন। এই শিক্ষার পর কলিকাতা (যেমন সেণ্টজেভিয়ার্স) পাটনা, রাঁচি, মাদ্রাজ (লওলা কলেজ), ত্রিচিনোপল্লী ইত্যাদি বহু স্থানে শিক্ষক বা পাদ্রীরূপে ইঁহারা প্রেরিত হন।

১৯৩৯ সনের মধ্যে কলেজে ৫৮৭ জন পাদ্রী শিক্ষালাভ করেন

[illegible]

এবং বিভিন্ন স্থানে কাজে নিযুক্ত হন। ইঁহার মধ্যে বঙ্গদেশে ও রাঁচিতে নিযুক্ত হন ২১৫ জন এবং মাদ্রাজে ১৮৯ জন।

এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারটি অতুলনীয়। অধিকাংশ পুস্তক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় হইলেও বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য লেখকের সম্পূর্ণ বাংলা রচনাবলীও রহিয়াছে। বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থেরও অভাব নাই। গ্রন্থাগারে ১৯৩৯ সনে ২০,০০০-এর উপর গ্রন্থ ছিল। বর্ত্তমানে গ্রন্থসংখ্যা ৪৮,০০০। বৎসরে ১৫০০ খানা করিয়া নূতন পুস্তক ক্রয় করা হয়। কেহ কোন বিষয়ে খোঁজ করিলে গ্রন্থাধ্যক্ষ ফাদার জিবিয়েন অতি যত্নের সহিত উহা বাহির করিয়া দেন।

কলেজের সংশ্লিষ্ট একটি গোলাবাড়ী আছে। এখানে নানাধিক ৫০টি গরু, ১০০টি শূকর ও ২০০-এর উপর মুরগী প্রতিপালিত হয়। আমদানী করা কোন কোন বিদেশী গরু প্রত্যহ ২০।২৫ সের দুধ দেয়। প্রশস্ত পরিষ্কার গোয়ালে ইহারা থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটির খাদ্যের বরাদ্দ দৈনিক দেড় টাকা করিয়া। নানা জাতীয় মুরগী স্বতন্ত্র খোলা জায়গায় ও ঘরে পোষা হয়। নিকটস্থ জমিতে নানা রকম শাকসব্জীর ব্যাপক চাষ হয়। উৎপন্ন দ্রব্যসকলই কলেজের বোর্ডিঙে ব্যবহৃত হয়; অল্প কিছু যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা সাধারণের নিকট বিক্রি করা হয়।

পাদ্রীদের সমাজ-সেবা বিস্ময়কর। বৃদ্ধ ডাক্তার ভাইসকে গভীর রাত্রে পাহাড় ভাঙ্গিয়া বস্তিতে রোগী দেখিতে যাইতে দেখিয়াছি। তিনি অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বেলজিয়ম ছাড়িয়া এদেশে আসিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী তৈয়ারি, মেরামতি, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে। অবশ্য সময় সময় স্থানীয় লোকের সাহায্য লওয়া দরকার হয়।

পাদ্রীদের সরল জীবন, স্বাবলম্বন, কায়িক পরিশ্রমের মর্য্যাদা-বোধ, কোন কাজকে হীন না মনে করা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় উপকারী। কেহ কেহ সুদূর দুর্গম বস্তিতে গিয়া নানা রকম জনসেবায় লিপ্ত হন। তবে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারও যে তাঁহাদের কাজের একটি প্রধান অঙ্গ তাহা অস্বীকার করা যায় না।

আঁকাবাঁকা রেলপথ দার্জিলিং

ক্রমশঃ "পাদার" ও "ফাদার"-এর মধ্যে পার্থক্য আগে বুঝিতাম না, এখন বুঝিয়াছি; ব্রাদারেরা প্রতিষ্ঠান চালাইবার যাবতীয় বৈষয়িক কাজ এবং ফাদারেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাঠ ও প্রচার করেন।

সেণ্ট মেরীর পুরোহিত ফাদার ওয়েরী ১৯৩২ সনে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন করেন। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে সরকারী পরিদর্শনে আসিয়া কলেজের নিম্নতলে সেণ্ট আলফনসাস প্রাইমারী স্কুলের (১৯০৫ সনে স্থাপিত) একটি প্রকোষ্ঠে উহার দর্জ্জির ক্লাস দেখিয়া গিয়াছিলাম। ফাদার এক জন উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মী। তাঁহার চেষ্টায় এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারী ব্রাদার রবিনের অর্থ সাহায্যে এই শিল্প-বিদ্যালয়টি বর্ত্তমানে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কার্সিয়াঙের পুরাতন ক্লারেণ্ডন হোটেলের বিস্তৃত বাসগৃহে বর্ত্তমান সেণ্ট আলফনসাস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল এবং হাই স্কুল বিরাট প্রতিষ্ঠান, প্রতি বৎসরই ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। ফাদার ওয়েরীর সহায়তায় কলেজের পাদ্রীদের সহিত পরিচিত হই। সেণ্ট মেরীর পুরোহিতের কাজ—সংশ্লিষ্ট ক্যাথলিকদের খোঁজখবর নেওয়া এবং প্রয়োজন বোধে সাহায্য করা। তিনি এখানকার অরফ্যানেজ স্কুলও পরিচালনা করেন। সেণ্ট আলফনসাস স্কুল শহরে চলিয়া যায়। তখন সেণ্ট জন স্কুল নামে এখানকার স্কুল চলিতে থাকে।

কার্সিয়াঙের বিখ্যাত টি. বি. স্যানাটোরিয়াম (যক্ষ্মা রোগীদের হাসপাতাল) ১৯৩৭ সনে রেল ষ্টেশনের সন্নিকট পাহাড়ের গায়ে শশীভূষণ দে কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূমি ও গৃহাদির উপর স্থাপিত হয়। সরকার ১৯৪২ সনে অনেক জমি নামমাত্র ইজারায় সংগ্রহ করিয়া দেন এবং ১৯৪৫ সনে ৩,৭০,০০০৲, পরে আরও ১,৫০,০০০৲, মোট ৫,২০,০০০৲ টাকা সাহায্য করেন। ইহার জন্য মোট নয় লক্ষ টাকা খরচ হয় এবং সাধারণের চাঁদায় বাকি টাকা সংগ্রহ হয়। পূর্ব্ব বাড়ীতে ২০টি রোগীর থাকিবার বন্দোবস্ত ছিল। নূতন বাড়ীতে একশত জনের স্থান হইয়াছে। কতকগুলি কুটীরেও অনেক রোগীর থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মোট ১৭২ জন রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা আছে। তবে ইহাতেও প্রয়োজন মিটি-

কোচবিহারের বন্যা

তেছে না। কতকগুলি স্থানের বায় বাহিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বহন করেন এবং কতকগুলি স্থানের বায়নির্বাহের ব্যবস্থা স্যানাটোরিয়াম করে। রোগীদের বেশীর ভাগ দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা হইতে আসে। কলিকাতা এবং অন্যান্য জেলা হইতেও কিছু কিছু আসিয়া থাকে। আসাম, বিহার এবং অন্যান্য প্রদেশাগত রোগী এখানে আছে। সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাঃ গুহের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে বৎসরে প্রায় তিন শত রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসাকার্য্য সম্পন্ন হয়। এখানে প্রত্যেক রোগী গড়ে নয় মাস চিকিৎসাধীনে থাকে। বৎসরে অর্দ্ধেক রোগী স্যানাটোরিয়াম হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনর্থক-সন্দেহ-করা রোগীর সংখ্যা বাদ দিলে, সামান্য আক্রান্ত রোগী সকলেই। মাঝামাঝি আক্রান্ত রোগীর বেশীর ভাগ এবং গুরুতর রোগীর কতক ভাল হইয়া নূতন জীবন লাভ করে। বর্ত্তমান রোগীর মোট সংখ্যা নব্বইয়ের উপর; তবে ইহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বাস্থ্যকর স্থানে টাটকা ও পুষ্টিকর খাদ্য একান্ত আবশ্যক বলিয়া রোগীর প্রতি মাসে প্রায় ১০০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা খরচ হইয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রসারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেক সমর্থ দেশবাসীরই ইহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।

কার্সিয়াং হইতে সমতল ভূমির অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দার্জিলিঙের পশ্চিমে ছোট রঙ্গিং নদী উত্তরে বড় রঙ্গিং নদীর সহিত মিলিয়াছে এবং পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া তিস্তা নদীতে পড়িয়াছে। তিস্তা নদী কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে বাহির হইয়া তিব্বত ও সিকিমের মধ্য দিয়া শতাধিক মাইল অতিক্রম করিয়াছে। তারপর সিকিমের সীমান্ত ঘুরিয়া দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের মধ্য দিয়া

কোচবিহার বন্যা সম্পর্কে আলাপ-রত পণ্ডিত শ্রীজওহরলাল নেহরু এবং শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। এই নদী সিবকের উপরে ৩০০ ফুট চওড়া শেষ প্রপাত হইতে ৬০০ ফুট দক্ষিণে নূতন আসাম লিঙ্কের সিবক পোলের নীচে ৮০০ ফুট এবং উহার এক মাইলের মধ্যে ৪৫০০ ফুট বা প্রায় চয় গুণ চওড়া হইয়াছে। এখান হইতে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হইয়া তিস্তা দূরে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। জলপাইগুড়ি তিস্তা নদীর তীরে। তিস্তার অর্থ তৃষ্ণা অথবা ত্রিস্রোতা। মহাদেব কর্ত্তৃক ভাগীরথীর মত তিস্তার উদ্ভব বলিয়া একটি পৌরাণিক কাহিনীও আছে। পার্ব্বতীর সঙ্গে যুদ্ধে এক দানব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মহাদেবের শরণাগত হওয়ায় তিস্তার সৃষ্টি হয়। বাস্তবের দিক দিয়া ত্রিস্রোতা অর্থ অধিক সমর্থনযোগ্য। এই প্রশস্ত স্রোতস্বিনীতে বহু বাণিজ্যপোত ও বজরার চলাচল ছিল। নদীর উভয় তীরই সমৃদ্ধিশালী ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীতে উহার আভাস পাওয়া যায়। কার্সিয়াং ষ্টেশনের পাঁচ মাইল পূর্ব্ব দিকে মহানদী ষ্টেশন। উহার অনতিদূরে মহানদী নিকটে তিস্তার দিকে না গিয়া পশ্চিমে নূতন ও পুরাতন শিলিগুড়ি ষ্টেশনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কার্সিয়াং ও তাহার পশ্চিমের পাহাড়গুলির মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা বালাসোন নদী কার্সিয়াং হইতে দেখা যায়। ঐভাবে নেপাল ও বঙ্গদেশ ভাগ করা ঐ সব পাহাড় ও নেপালের পাহাড়গুলির মধ্য দিয়া মেচী নদী। শিলিগুড়ির কিছু পশ্চিম-দক্ষিণে বালাসোন মহানদীর সহিত মিলিয়াছে। মহানদী অনেক দক্ষিণে কিষণগঞ্জের উপরেই মেচির সঙ্গে মিলিয়া মহানন্দা নামে মালদহ হইয়া গোদাগাড়ীর নিকটে, পুরাতন ভাগীরথীর উৎসের প্রায় বিপরীত দিকে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই সকল নদীবিধৌত অঞ্চলে ভীষণ প্লাবন হইয়া কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নাশ হইয়াছে। বহু লক্ষ নর-নারী-শিশু গৃহহীন ও কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল নদীর নিয়ন্ত্রণ সমস্যা রাষ্ট্রের সম্মুখে প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। এরূপ সমস্যার উদ্ভব ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের অভিমত।

কার্সিয়াং যক্ষ্মা হাসপাতাল

ষ্টেশনে গিয়া মধ্যাহ্ন আহার করিয়া বৈকালের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখি সেন র‍্যালিজ উদ্যোক্তা সুপরিচিত সুধীর সেন এবং তাঁহার বিদুষী পত্নী জনৈক পাশ্চাত্য পরামর্শদাতাকে দার্জিলিং দেখাইতে চলিয়াছেন। তাঁহারাও আহারে বসিয়া গেলেন। যথাসময়ে পাহাড়ের গায়ের দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা রেলপথ দিয়া নূতন শিলিগুড়ি ষ্টেশনে সন্ধ্যার পরেই পৌঁছিলাম। প্রথম যাত্রীদের পক্ষে রেলপথের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতিশয় মনোরম মনে হয়। তবে দার্জিলিং হইতে বরফের পাহাড় দেখিয়া ফিরিবার সময় ইহার আদর বেশী কিছু থাকে না। যদিও বৃষ্টির দিনে পাহাড় ধ্বসিয়া যাওয়ায় বরাবরই মেরামত হইতেছে, তথাপি এই রাস্তাটি আশ্চর্য্যজনক ও অতুলনীয়। পথের পাশে পাগলাঝোরা জলপ্রপাত বিস্ময় উৎপাদন করে, লুপ অর্থাৎ চক্রাকারে রাস্তা ঘুরিয়া ইংরেজী "জেড্"-এর আকারের রাস্তায় আগু-পিছু গিয়া কিছু পরিমাণ নামা-উঠা এই রেলপথের একটি বিশেষ ব্যবস্থা। প্রবাদ আছে, প্রথমে রাস্তা করিবার সময় এমন একটি জায়গায় আসা গেল যে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ইঞ্জিনিয়ার হতাশ হইয়া বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীকে বলায় স্ত্রী তামাশা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবে পিছাইয়া যাও না কেন? ইহাতেই ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় এইরূপ ধারণা আসে।

বঙ্গবিভাগ হওয়ার পূর্ব্বে তিনটি সরু (২ ফুট চওড়া লাইন, দার্জিলিং, কিষণগঞ্জ ও কালিম্পং পোল হইতে) এবং একটি চওড়া (৫ ফুট ৪ ইঞ্চি) রেললাইন সোজা কলিকাতা হইতে বর্ত্তমান

পাকিস্থানের মধ্য দিয়া গিয়া শিলিগুড়িতে শেষ হইত, এবং আরোহী অদল-বদল করিত। এদিকে পূর্ব্বদিকে আসাম হইতে মাঝামাঝি (১ মিটার, প্রায় ৪০ ইঞ্চি) চওড়া লাইন (বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে ১৯০২ সনে তৈয়ারি), শিলিগুড়ি হইতে মাত্র ২২ মাইল দূরে বাগরাকোট পর্য্যন্ত আসিয়া তিস্তা নদীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উহার সহিত মিলিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ বঙ্গভঙ্গ হওয়াতে পাকিস্থান হইতে মুক্ত রেল লাইনের এবং উত্তর-বঙ্গের দুই অংশের ও আসামের সহিত সহজ যোগাযোগের প্রয়োজনে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সহিত বর্তমান আসাম লিঙ্ক (সম্পূর্ণই মিটার বা মাঝামাঝি চওড়া লাইন) দুই বৎসরের মধ্যেই তৈয়ারি হইয়া গেল। কিষণগঞ্জ শিলিগুড়ি সরু লাইন সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং আসামে সোজা যাওয়ার পথের ফাঁকা অংশগুলি পূর্ণ করিতে হইল। ১৯৪৮ সনে কাজ সুরু হয় ও ১৯৫০ সনে গাড়ী চলিতে থাকে। কালিম্পং লাইন রক্ষণাবেক্ষণে বায়বাহুল্য বলিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইল—শুধু বাস যাতায়াত করিতে থাকে। দার্জিলিং পর্যন্ত লাইন সরুই রহিয়া গেল এবং একটি নূতন মিটার লাইন ২৫ মাইল জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত ও আরও ১১ মাইল পাকিস্থানের সীমানায় পার্ব্বতীপুরের নিকট হলদিবাড়ী পর্য্যন্ত, পূর্ব্বের চওড়া লাইনের পরিবর্তে নির্ম্মিত হইল।

নূতন আসাম লিঙ্ক : জলপ্লাবিত উত্তরবঙ্গ

পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে আসামের রেলপথ পার্ব্বতীপুর হইয়া পূর্ব্বদিকে লালমণির হাটের মধ্য দিয়া ছিল এবং লালমণির হাট হইতে উত্তর দিকে শাখা লাইনে পাহাড় অঞ্চলে যাওয়া যাইত। এইরূপ একটি শাখা, মূল ষ্টেশনের পশ্চিমদিকে তিস্তা নদীর নিকট বাগরাকোট ও পূর্ব্বদিকে তোর্সা নদীর উপর মাদারীহাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আর একটি শাখা কুচবিহার ও আলিপুর দুয়ারের মধ্য দিয়া হাসিমারা ছাড়াইয়া শেষ হইয়াছিল। তোর্সা নদীটি তিব্বত হইতে ভুটান পাহাড়ের মধ্য দিয়া ১৬০ মাইল প্রবাহিত হইয়া সমতল ভূমিতে নামিয়াছে। তিস্তা ও তোর্সা নদী পাহাড়ের খাড়া পারের ভিতরে সরু হওয়ায় পোল নির্ম্মাণ দুঃসাধ্য। সমতল ভূমিতে হঠাৎ অত্যধিক চওড়া ও বহু ভাগ হওয়াতে বহু পোলেরও দরকার। কোচবিহারের প্রায় উত্তর সীমানায় এবং বঙ্গদেশ ও আসামের সীমানায় সঙ্কোষ নামে একটি তৃতীয় প্রশস্ত নদী আরও একটি বাধা ছিল। এই তিনটি ব্যতিরেকেও শতাধিক ক্ষুদ্রাকার নালা-নদীর উপর পোল বাঁধিয়া, চালু বাগরাকোট মাদারীহাট (৫২ মাইল) লাইন ও হাসীমারা-আলিপুরদুয়ার (২৮ মাইল) অংশ ব্যবহার করিয়া এবং আলিপুর দুয়ার হইতে সীমানা পর্য্যন্ত ২৪ মাইল ও তার পর ফকিরগা পর্য্যন্ত আসামে ২১ মাইল নূতন লাইন তৈয়ার করিয়া আসাম লিঙ্ক গঠিত হয়।
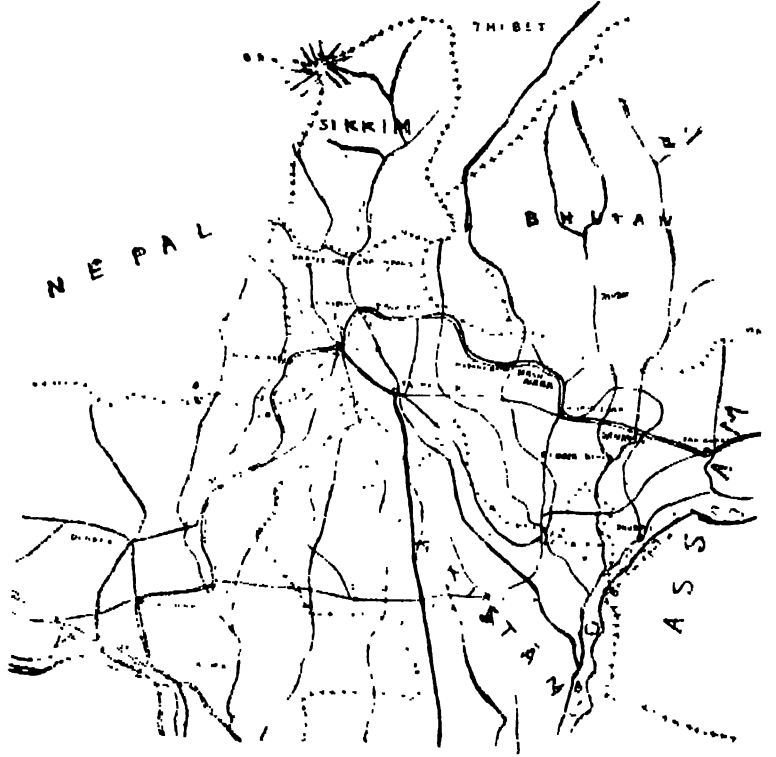
বিটপী-বন্দনা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নমো নমো মহাভাগ !
এই পৃথিবীরে শ্যামল করেছে তোমারি অনুরাগ,
নমো নমো মহাভাগ ।
অন্ধ ধরার, বন্ধ কারার
অন্তর হ'তে, সূর্য্য তারার
উদয়াস্তের সন্ধি লগনে অরুণ রক্তরাগ
তারি আহ্বানে যাত্রা করেছো
কৌতুকে চোখে কাজল প'রেছো
প্রথম প্রাণের পরমোল্লাসে উৎসুক অনুরাগ
নমো নমো মহাভাগ ।

ধূসর ভূমির রুদ্ধ জঠরে
উষ্ণ কামনা শিরায় শিহরে
সূর্য্য তোমারে পাগল করেছে, চন্দ্র বেসেছে ভালো,
তারি আহ্বানে উন্মাদ প্রাণে
নীরব বেদনা নিবেদিয়া গানে
শ্যাম কিশলয়ে রঙ ফলায়েছো সবুজে ক'রেছো আলো ।
মর্ত্ত্যের দীর্ঘ মস্তক তুলি'
মাথায় করিয়া ধরণীর ধূলি
নীহারিকা 'পরে তারকানিকরে শুনাতে প্রাণের কথা—
ঊর্দ্ধ শীর্ষে ঝরঝর ধারা
দগ্ধ চরণে বালুর সাহারা
প্রতি কুট্মলে ফুটায়ে তুলেছো অন্তর্গূঢ় ব্যথা,—
প্রতিটি অঙ্গে প্রকাশে মুকুল কি আকুল প্রবণতা ।

কথায় ফোটে না করে গুন্ গুন
জ্বলে ধিকি ধিকি গোপন আগুন
প্রাংশু-ভূষণ বজ্রদহনে মস্তক পাতি' থাকো—
বিশ্ববাউল হাতে একতারা
চকোর চাতক উচ্চারে সাড়া
কতো না পাখীর আশ্রয়-শাখা ঊর্দ্ধে মেলিয়া রাখো,
চাঁদের কিরণে ধারার শ্রাবণে সান্ত্বনা দিয়া থাকো ।

মন্ত্রের মত অমোঘ যে বাণী
অমৃতৌষধি মৃত্যুরে দানি'
নিয়ে এসে পাখী কানে মুখ রাখি'
ঢালে যবে সুধাধার ;
শাখায় পত্রে তুলি' মর্ম্মর
আঁখির শিশির ঢালি' ঝর্ঝর
হে বটবিটপী শ্যাম তরুবর—
গান শোনো তুমি তার ।

পরমাগ্রহে মাথা নাড়ি' নাড়ি'
সুর-সমুদ্রে তুমি দাও পাড়ি
পাদপ তাপস ! সেই তো তোমার
জপের মন্ত্র জানি—
অমৃতের রসে চিরনিষিক্ত,
বহুর মাঝারে রহ বিবিক্ত,
বদান্য গুরু, প্রদানরিক্ত
ভক্তারে ছায়া দানি' ।

শ্রবণ মানস নয়নাভিরাম—
অন্তরে হেরি রঘুবর রাম
শবরীর মত স্থবির হয়েছো- -
ডুবিয়াছো অভিরামে,—
ঈষদুন্মীল নিমীলিত আঁখি
বাল্মীকিসম সমাহিত থাকি'
শুধু 'রাম-রাম' জপ অবিরাম
মজিয়া আপ্তকামে ।

তুমি—
আপন অঙ্গে—
মাখিয়া লয়েছো দূর্ব্বাদলশ্যামে
নমো নমো নমো নমো মহাভাগ ! নমো দক্ষিণে বামে

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুবাদক—শ্রীচিত্রিতা দেবী

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ
দেবস্যৈষ মহিমাতু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥১

কোন কবি বলে জগৎ কারণ
আছে বস্তুর স্বভাবে।
কালের মধ্যে নিহিত কারণ
কোন মূঢ় মনে ভাবে।
সে প্রভুদেবের মহামহিমাই
জেনো আদিতম সত্য।
তাহারি প্রভাবে ব্রহ্মচক্র
ঘুরিছে নিত্য নিত্য ॥১

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ
পৃথ্ব্যপ তেজোঽনিলখানি
চিন্ত্যম্ ॥২

যাঁর দ্বারা এই বিশ্বজগৎ পূর্ণ
আবৃত রয়।
কালের কারক, সর্বজ্ঞানী,
যিনি সব গুণময়।
তাঁরি প্রেরণায়, ক্ষিতিজল তেজে,
আকাশে বাতাসে,
কর্ম ফিরিছে চিরকাল ধরে,
চিরবিবর্ত আভাসে ॥২

তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়স্তত্ত্বস্য
তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা১
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ
সূক্ষ্মৈঃ ॥৩

তাঁহারি জন্যে কর্ম করিও
তাঁহারি জন্যে পুনঃ নিবৃত্ত হয়ো
যোগবর্ণিত সকল১ পন্থা আশ্রয় করে
সাধনে।
বহু জন্মের সঞ্চিত যত সূক্ষ্ম পুণ্যগুণে।
এই জন্মেই অথবা বারান্তরে,
বিশ্বসত্যে আত্মতত্ত্ব, মিলনে করিয়া যুক্ত,
যোগী হন চিরমুক্ত ॥৩

আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি,
ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ
কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ ॥৪

তাঁরি আরাধনা মনে করে যেবা
সকল কর্ম করে,
শুদ্ধ চিত্তে সকল প্রকৃতি,
যে করে ব্রহ্মে লয়,
সব জন্মের সকল কর্ম
তার কাছে ক্ষয় হয়।
প্রারব্ধশেষে চলে যায় সে যে,
চিরবিমুক্তি পথে ॥৪

---

১ সকল যৌগিক প্রণালী। মূলে এক, দুই, তিন বা আটটি যৌগিক পন্থার কথা আছে। বাংলায় সহজে বোঝাবার জন্যে সকল পন্থা বলেছি।—একেন—একটি অর্থাৎ কেবল গুরুপসদন দ্বারা। দ্বাভ্যাং—দুইটি অর্থাৎ গুরুভক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের দ্বারা। ত্রিভিঃ—তিনটির দ্বারা। অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহায়ে। অষ্টভিঃ—আটটির দ্বারা অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির দ্বারা।

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালোদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্ ॥৫

দেহসংযোগ পাপ পুণ্যের তিনিই তো
হেতুভূত।
বিশ্বকারণ তবুও ত্রিকালাতীত।
প্রাণকলাহীন, বিশ্বশরীর
হৃদয়ে পরম দৃষ্ট
পূজনীয় দেব, চিত্তে আসীন,
স্বরূপ যাঁহার সত্য,
জেনেছি তাঁহায়ে, করিয়া নিত্য পূজা ॥৫

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ
পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং
বিশ্বধাম ॥৬

সংসার তরু কাল পরিণাম পারে,
রয়েছেন স্থির।
যাঁহার মাঝারে, চির আবর্তে,
জগৎ ঘুরিয়া চলে,
ধর্মের খনি পাপের নাশক,
অমর্ত্য ভগবান।
নিভৃত গহন বুদ্ধিতে লীন,
যিনি বিশ্বের ধাম।
জেনেছি তাঁহারে মনে ॥৬

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥৭

সব দেবতার পরমদেবতা,
তিনি মহা-ঈশ্বর,
প্রজাপতি পতি মায়ারও শ্রেষ্ঠ,
তিনি ভুবনেশ্বর।
জানি মোরা সেই পূজনীয় দেবে,
(চির মহাভাস্বর) ॥৭

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৮

দেহ ইন্দ্রিয় নাই কো তাঁহার
নাই তাঁর সম ছায়া,
শোনা যায়, তাঁর পরাশক্তিই
এই বিচিত্রা মায়া।
এই সৃষ্টি যে তাঁরি স্বাভাবিক
জ্ঞানবলময়ক্রিয়া ॥৮

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৯

এ জগতে তাঁর কোন পতি নেই,
নেই নিয়ন্তা, নেইকো কোনই চিহ্ন।
তিনিই কারণ, জীব-অধিপতি,
নেই প্রভু তাঁর, নেইকো জনক ভিন্ন ॥৯

য স্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ
প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব এক স্বমাবৃণোৎ
সনো দধাতু ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥১০

দেহনিঃসৃত তন্তুর জালে,
রাখে মাকড়সা নিজেরে আড়ালে।
আপন স্বভাবে, তেমনি সে দেব,
মায়াজাল দিয়ে নিজেরে ঢাকিছে নিত্য।
সে দেব তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপে করুন
মোদের মুক্ত ॥১০

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো
নির্গুণশ্চ ॥১১

সর্বপ্রাণীর মর্মে নিগূঢ়,
সর্বব্যাপী সর্ব অন্তরাত্মা
সবার আবাস, চির বিশ্রাম,
তিনি কর্মের প্রভু,
তবু নির্গুণ, নিত্য চেতনা,
সাক্ষী উপাধিহীন ॥১১

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং
বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং
নেতরেষাম্ ॥১২

এক মায়াবীজে যে করে অনেক,
জড়ের ভিতরে যে রয়েছে চিরস্থির,
শাশ্বত তার আনন্দ, যে বা, জেনেছে
তাঁহারে, অন্তরে সুগভীর।
জানল না যারা তাদের জন্যে,
নেই কোন সুখ, নেইকো
শান্তিনীড় ॥১২

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যোবিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥১৩

অনিত্যমাঝে সে চির নিত্য,
চিন্তমাঝারে চেতনা,
বহুর মধ্যে যে পরম এক
পুরান সকল কামনা,
জ্ঞানযোগে তিনি অনুভূত হন,
সর্বকারণ দেব সে জ্যোতির্ময়।
যে তাঁরে জেনেছে, মুক্ত সে-জন,
ঘুচেছে তাহার সব বন্ধনভয় ॥১৩

ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥১৪*

সূর্য্য সেথায় জ্বালে না আলোক,
জ্বলে না তারকা চন্দ্র,
কোথায় অগ্নি? বিজলীও সেথা
চিরতরে আছে স্তব্ধ।
তবু তো তাঁহারি প্রকাশে, আলোক
পেয়েছে বিশ্ব তাঁর।
তাঁহারি আভায় নিখিলে আলোকধার ॥১৪

* এই শ্লোকটি কঠ ও মুণ্ডকোপনিষদে আছে।

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥১৫

অবিদ্যাঘাতী পরম আত্মা,
একা বিরাজেন এ মহাভুবন মাঝে,
আগুনে ও জলে, তাঁহারি শক্তি,
নিহিত ভিন্ন সাজে,
তাঁরে জেনে লোকে, এ ভবসাগরে,
পার হয়ে যায় মৃত্যু।
তিনি ছাড়া আর কোন পথ নাই
(তরিতে অকূল সিন্ধু) ॥১৫

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি
র্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥১৬

সে বিশ্বকার, সে বিশ্বজ্ঞান,
চির চেতনার জ্যোতি।
জানিলে যাঁহারে মৃত্যুমুক্তি,
অজ্ঞানে যাঁর, মোহপাশ ক্ষয়ক্ষতি,
মূল প্রকৃতিও তারি প্রকটিত
জগতে পালেন নিত্য,
কালের কর্তা, সর্বজ্ঞানী, গুণাধীশ
চিরমুক্ত ॥১৬

স তন্ময়োহ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতু বিদ্যতে ঈশনায় ॥১৭

এ মহাভুবন যে করে শাসন,
সেই তো ভুবনময়,
মোহবন্ধেরো কারণ আবার মুক্তিরো
হেতু হয়।
চেতনাস্বরূপ সর্বতোগামী
স্থিত নিজ মহিমায়,
বিশ্বপালক তিনি ছাড়া আর
কি আছে কারণ কোথায় ? ॥১৭

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতিতস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥১৮

সবার পূর্বে যিনি সৃজেছেন,
এ বিশ্বপ্রাণতত্ত্ব,
সে প্রাণ তরিতে, যাঁর প্রেরণায়
বেদ প্রকাশিছে সত্য।
(চিত্ত মাঝারে) আত্মবুদ্ধি বিকাশে
কৃপায় যাঁর,
মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া
শরণ লইনু তাঁর ॥১৮

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং
নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং
দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥১৯
যদা চর্মবদাকাশং
বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো
ভবিষ্যতি ॥২০

দগ্ধকাষ্ঠে অনলের মত,
সর্ব উপাধিবর্জিত,
যিনি দেহহীন, পরমশান্ত
নির্লেপ ক্রিয়াহীন,
যিনি অনিন্দ্য, মুক্তির সেতু
শুভ্র জ্যোতির্ময়,
তাঁরে না জেনেও যদি কেহ পারে,
দুঃখের শেষ করিতে।
চর্মাবরণে সে যেন পারে গো আকাশ
ঢাকিয়া দিতে ॥১৯ ও ॥২০

তপঃ প্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ,
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষি সংঘজুষ্টম্ ॥২১

তপস্যাবলে দেবতাকৃপায়, পরমব্রহ্মতত্ত্ব,
জানিয়াছিলেন শ্বেতাশ্বতর,
এই পবিত্র সত্য।
(সনকাদি যত) ঋষিসংঘকে শুনায়ে,
পূর্ণভাবে,
যেমন বলিলে বুঝিবে সবাই,
তেমনি (সহজ) ভাবে।
বলিলেন পুনঃ মুক্তকণ্ঠে
সন্ন্যাসীদের কাছে ॥২১

বেদান্তে পরমং গুহ্যং
পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
না প্রশান্তায় দাতব্যং
না পুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥২২

বেদান্তে গীত গোপন তত্ত্ব,
অতীতে উদ্ভাসিত,
দিও না তাহারে, যে নয় শান্ত,
পুত্র অথবা শিষ্য ॥২২

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা
দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥২৩

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ষষ্ঠোঽধ্যায়

গুরু ও দেবের প্রতি যার মনে,
রয়েছে সমান পরমা শুদ্ধাভক্তি,
সেই মহাত্মা চিত্তে প্রকাশ
উপনিষদের মুক্তি ॥

আধুনিক বাংলার চিত্রকলা

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলার চিত্রকলার কথা বলতে গেলে সবার আগে গোড়ার কথা বলা দরকার। সেটা হ'ল—চিত্রকলা কি? বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ দেখেন শুধু ফোটোগ্রাফির দৃষ্টিতে—চিত্রে প্রকৃতির অনুকরণ কতটা ঠিক দেখায়, আবার কেউ-বা খোজেন চিত্রে গণবাণীর প্রতিধ্বনি। এ যেন সেই সাত জন অন্ধের হাতী দেখা। এ বিষয়ে তর্কেরও অন্ত নাই, যুক্তিরও শেষ নাই। বাদানুবাদের জালে মূল তথ্যের খোঁজ পাওয়াই ভার।

মূল তথ্যটা কি? শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর "জোড়াসাঁকোর ধারে" বইয়ে বলে গেছেন—

"কালি কলম মন
লিখে তিন জন"

এই হ'ল চিত্রকলার গোড়ার কথা। বলতে কি, সমস্ত চতুঃষষ্টি-কলারই মূলে ঐ এক কথাই আছে।

চিত্রকলা ও সকল ললিতকলাই শিল্পীর কল্পনারাজ্যে বিহারের ক্ষমতা এবং তাহার মানস চক্ষের দৃষ্টিশক্তির বিস্তারের পরিচয়। প্রধানতঃ চিত্রকারের ব্যক্তিত্ব তার হাতের কলানৈপুণ্য—যাকে ইংরেজীতে বলে টেকনিক—এবং তার অঙ্কিত চিত্রে একটি বিশিষ্ট রসের ধারা, এই তিনের সমষ্টিতে চিত্রকলার বিচার হয়। যে ছবিতে চিত্রকারের ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই, সেটা চিত্র হতে পারে কিন্তু তাকে চিত্রকলার পংক্তিতে বসান চলে না। আবার সেই সঙ্গে চাই একটি রসবৈশিষ্ট্য ও কলানৈপুণ্য যাতে তাকে জাতে তোলা যায়। তাতে থাকবে দেশের সনাতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট অনুলেপন যাতে বোঝা যাবে শিল্পী কোন্ দেশের জল-মাটি-হাওয়ার মানুষ। এ ছাড়াও পাওয়া যায় কারুচিত্রে সেই অপার্থিব রস যাকে প্রসিদ্ধ কলারসবিদ্ ক্লাইভ বেল বলেছেন, Significant form, যা ললিতকলার প্রাণ। চিত্রকলা যাচাই করতে হলে এই তিনটি কষ্টিপাথরে কষে দেখতে হয়। এর বাইরেও অনেককিছু আছে, কিন্তু সেগুলি মুখ্য নয় গৌণ।

অন্যদিকে আর এক কথা আছে, সেটা হ'ল গোষ্ঠী-পরিচয়। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চিত্রাঙ্কনের যে রীতি ও প্রথা চলে আসে, বা এক মতের এবং এক আদর্শের কয়েকজন শক্তিশালী শিল্পী চিত্রাঙ্কনের যে পদ্ধতি ও নীতির প্রতিষ্ঠা করেন, তার থেকেই হয় গোষ্ঠীর বিচার যাকে ইংরেজীতে বলে School।

সুতরাং আমাদের আজকের যে আলোচ্য বিষয় আধুনিক বাংলার চিত্রকলা, তার চর্চা মোটামুটি ঐ দুই নির্দেশে করতে হবে। মোটামুটি বলছি এই জন্যে, কেননা এই সময়ের মধ্যে প্রত্যেক চিত্র-

শিল্পীর পূর্ণ পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নয় এবং তাঁদের চিত্রকলার সমালোচনাও করা চলে না।

প্রথমেই বলি যে, পূর্ব্বে যে তিনটি কষ্টিপাথরের কথা বলেছি তাতে কষে দেখলে বাংলার চিত্রকলার অবস্থা খুব আশাপ্রদ নয় বলতে হয়। এ অবস্থার কারণ কি তার বিচার করার সময় এটা নয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, বাংলায় এক দিকে যেমন হয়েছে রুচিবিকার অন্যদিকে তেমনি হয়েছে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি যাতে বাস্তব জগতে বেঁচে থাকার সমস্যা এতই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে রূপরসজ্ঞানের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়েছে।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে বাংলার আধুনিক চিত্রকলায় একটা গতানুগতিক ও আড়ষ্ট ভাব এসে পড়েছে। অজানার সন্ধানে, নিত্য নূতনের খোঁজে বা সুন্দরের আকর্ষণে যে অভিযান, যে সাধনা জীবন্ত চিত্রকলার নিদর্শন তার পরিচয় খুব অল্প কয়জনের কাজে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রাচীন গোষ্ঠীর মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ যাঁদের পথপ্রদর্শক তাঁদের প্রায় সকলেই গত বা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত। সে পথের পথিক নূতন যে কয়জন এসেছেন তাঁদেরও অনেকের প্রতিভা বা কল্পনার প্রকাশ সেরকম উজ্জ্বল নয়। দুই-তিন জন মাত্র মাঝে মাঝে ক্ষণিক আলোর ঝলকে সে পথের অন্ধকার কাটিয়ে দেন। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে প্রদীপ এখনও জ্বলছে যদিও শ্রীনন্দলাল বসুর তুলি অবসর গ্রহণ করেছে মনে হয়।

অন্য আর একজন তাঁর একাগ্র সাধনায় এখনও মগ্ন হয়ে আছেন। বাংলার অতি নিগূঢ়, অতি নিজস্ব চিত্রকলার রসসম্পদের পূজারী ও ভাণ্ডারী তিনি। আজও তাঁর ঘরের প্রদীপ উজ্জ্বল আছে, তাঁর বর্ণোজ্জ্বল তুলি রূপকথার পক্ষীরাজের মত সম্পূর্ণ অজানা ও অচেনার পথে রসিকজনকে নিয়ে যেতে এখনও সক্ষম। কিন্তু তিনি একাই হোতা, উদ্গাতা এবং যজ্ঞের অধিকারী। গোষ্ঠী বলতে তাঁর সঙ্গের সাথী কাউকে দেখি না। বাংলার যামিনী রায় এখনও এককই আছেন।

আর এক গোষ্ঠী আছেন যাঁদের পরিচয় কলিকাতার নামে। এঁদের মধ্যে চারজনের চিত্রে চিত্রকলার পূর্ণ ও জীবন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের শক্তি, কল্পনা ও ব্যক্তিত্ব সবই আছে এবং শিল্পীর উদার কল্পনায় উচ্ছ্বাসের ব্যাপক পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁদের চিত্রাঙ্কনে। এঁদের শরীরে ও মনে যৌবনের উচ্ছ্বাস পরিপূর্ণ আছে এখনও।

ঐ তিনটি গোষ্ঠীর বাইরে আছেন অনেক শিল্পী। কিন্তু তাঁদের চিত্রে শুধু কারুনৈপুণ্যই দেখা যায়, সেটা যেন নিষ্প্রভ ও প্রাণহীন। কচিৎ কদাচিৎ দুই একখানা ছবি দেখা যায় যাতে মনে হয় শিল্পী রসের সন্ধান পেয়েছেন কতকটা।

তবে কি বলতে হবে যে বাংলার চিত্রকলা মরণের পথে চলেছে? তা ঠিক নয়, তবে তাতে জড়তা ও স্থাণুভাব এসেছে, যেটা ললিতকলায় ক্ষেত্রে দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থার নিদর্শন।

অজানার রাজ্যে অভিযান, অচেনাকে আপন করা, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতের সন্ধানে রূপসাগরে চৌদ্দডিঙ্গা মধুকরী ভাসিয়ে যাত্রা, এই ত কবি ও কলাশিল্পীর প্রকৃত পরিচয়। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে প্রসিদ্ধ শিল্পী পিকাসোর বক্তৃতা শুনেছিলাম। তিনি ঐ সময়ের প্রচলিত গতানুগতিক চিত্রশিল্পের সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন। বক্তৃতার পর একজন বিশিষ্ট শ্রোতা একজন খ্যাতনামা চিত্রকারের নাম করে জিজ্ঞাসা করেন, "তবে কি ওঁকে শিল্পী বলে পরিচয় দেওয়া চলে না?" তার উত্তরে পিকাসো বলেন, "আমি স্বীকার করছি যে ওঁর তুলি চালনা ও বর্ণযোজনা নিখুঁত। কিন্তু কোথায় তাঁর অজ্ঞাতের মধ্যে বিরাট অভিযান?" ইংরেজী কথায় "Where is his magnificent leap into the Unknown?"

সেই কথাই বার বার মনে হয় বাংলার চিত্রকলায় অবস্থা দেখে। আমাদের মত সাধারণের চোখের বাইরে যা আছে, তাকে মূর্ত্ত করে, প্রাণময় করে যে জন আনতে পারেন, তিনিই শিল্পী ও স্রষ্টা। এর জন্যে প্রয়োজন সাধনার ও উদ্দীপনার। সেই সাধনার ফলে যাঁদের অন্তরের চোখ খুলে গিয়েছে তাঁরাই কয়জন এখনও বাংলায় ললিতকলার ক্ষেত্র সরস করে রেখেছেন।

প্রতি বৎসর কলিকাতায় কয়েকটি প্রদর্শনী খোলা হয়। সেগুলিতে অসংখ্য চিত্রকলার নিদর্শনও দেখানো হয়। কিন্তু কৈ, অধিকাংশ ছবি দেখে মনে তৃপ্তি আসে না। সকল কিছুতেই যেন প্রেরণার অভাব, প্রাণশক্তির অপ্রতুলতা।

তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, আর্ট স্কুলের ছাত্রদের প্রদর্শনীতে গত দুই বৎসর যেন একটা নূতন জাগরণের চিহ্ন দেখেছি। মনে হয় যেন যারা তরুণ ও নবীন তাদের কয়জনের মধ্যে শিল্পচেতনা আবার জাগ্রত হয়ে উঠছে। যদি তারা ঠিকমত উদ্দীপনা পায়, পথের সন্ধান দেবার মত গুরুর সন্ধান পায় তবে হয় ত আবার সেই শিল্প-জাগৃতির সাড়া পাওয়া যাবে।

শিল্পীর সাধনার পথে অন্তরায় এদেশে অনেক। আগেও তা ছিল, এখন ত শতগুণে বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পীর পথচলা যদি আমরা সকলে কিছু সুগম করে দিতে পারি তবে সে নিশ্চয়ই এদেশে আবার পূর্ব্বেকার সম্মানের অধিকার লাভ করবে।

দুঃখের কথা, আজকের দিনে রসিকজনেরই অর্থাভাব বেশী। কিন্তু আপনি, আমি, আমরা সকলে মিলে যদি চেষ্টা করি তবে কি সমস্যাপূরণ কিছুটা হয় না? প্রতি বৎসর আমাদের প্রত্যেকেই উৎসবে-ব্যসনে, উপহার-যৌতুকে কিছু টাকা খরচ করে থাকি। তার ছোট একটা অংশও যদি চিত্রশিল্পীর উৎসাহদানে ব্যয় করি তবে নিজের আনন্দবর্দ্ধন ও শিল্পীর উদ্যমের অভিনন্দন দু-ই করা হয় না?

বাংলার চিত্রশিল্পীর গুণ ও জ্ঞানের অভাব নেই। তার নৈপুণ্য একদিন কেন আজও ভারত-বিখ্যাত। অভাব কোথায় সে ত আগেই বলেছি এবং সে অভাব দূর করাও অসম্ভব নয় মনে হয়।*

---

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও—কলিকাতা-কেন্দ্রে পঠিত ও রেডিও-কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত

ইংলণ্ডের কৃষি ও সমবায়ের কয়েকটা দিক

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

১

বিলেতের ধনৈশ্বর্যের দিকে আমরা বরাবর বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এসেছি, আর ভেবে এসেছি আমাদের দেশের সঙ্গে কত তফাৎ, আমরা কবে ওর কাছাকাছি উন্নতি করতে পারব। সেই সঙ্গে মনে মনে এ কথা ভেবে ক্রুদ্ধ হয়েছি যে, আমাদের রক্তশোষণ করে বিলেতের এই ধনসম্পদ হয়েছে। আজ ইতিহাসের চাকা ঘুরেছে। ইংলণ্ড আর সে ইংলণ্ড নেই। প্রথমত: তার সসাগরা রাজত্ব নিদারুণ সংকুচিত হয়েছে, সেই সঙ্গে তার ব্যবসা-বাণিজ্যও। এক দিকে বহু অধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং তারা নিজেরাই শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর হতে সুরু করেছে। দ্বিতীয়তঃ, অর্ধেক পৃথিবী আজ সাম্যবাদী, সেখানে তারা পরস্পর ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, ধনতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে তাদের লেনদেন কমে গিয়েছে। সে হিসেবে আগে যেসব দেশে ব্রিটেন বাণিজ্য করত সেসব দেশের অনেকগুলিই এখন হাতছাড়া। তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক জগতের মধ্যে এখন সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আমেরিকা। ধনতান্ত্রিক জগতের মধ্যেও সেইজন্ম ব্যবসার একাধিপত্য তো ইংলণ্ডের হাতে নেই-ই, তার মধ্যে বরং খুব বড় ভাগ চলে যাচ্ছে আমেরিকার হাতে। চতুর্থতঃ, যদি সে সুযোগ থাকতও, তা হলেও আজ পর পর যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের সে মূলধন বা সে ক্ষমতা নেই যাতে সে স্বদেশে ও বিদেশে আগেকার মত বাণিজ্য প্রসারিত করতে পারে। এই সব কারণে ব্রিটেনের আজ ভগ্নদশা। এ বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক প্রমাণ দেওয়া যায়, কিন্তু তা বর্তমান প্রবন্ধের উপলক্ষ্য নয়। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নেই নেই করেও আজও ইংলণ্ডের যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ-সম্বল আছে তাতে ধনতান্ত্রিক জগতে আমেরিকার পরেই এখনও তার স্থান। বিশেষতঃ আমাদের মত বহুকাল ধরে পরাধীন শোষিত দৈন্ত-জর্জর দেশের সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না—আমাদের চোখে তার ঐশ্বর্য এখনও স্বপ্নবৎ। কাজেই ইংলণ্ড খুব তাড়াতাড়ি ভাঙলেও আর আমরা খুব দ্রুতবেগে এগোলেও দুয়ের সমতা বা কাছাকাছি আসা এখনও বহু বহু দূরের কথা। সেইজন্ত এবার যখন কিছুকাল বিলেতে কাটাবার সুযোগ হয়েছিল তখন মনে হয়েছিল ওদের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের সম্বন্ধে খবরাখবর নিয়ে কোনও লাভ নেই—কারণ আমাদের সমস্যা সম্পূর্ণ অন্ত রকম। সেইজন্ত মনে হয়েছিল, বরং ইংলণ্ডের কৃষি ও সমবায়ের কিছু খবর পেলে মন্দ হয় না। ইংলণ্ডের কৃষিও কৃষকের সুনাম খুব আছে, ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্য বিখ্যাত, তার উপর ইংলণ্ড আমেরিকার মত বিরাট বিরাট কৃষিক্ষেত্রের দেশ নয়। আজকাল কলকারখানার খুব প্রসার আছে বটে—ঘোড়ার লাঙলের স্থান নিচ্ছে কলের লাঙল—কিন্তু তবু সেখানে এখনও ঘোড়ার দরকার যথেষ্ট হয়, স্কটলণ্ডে কৃষকেরা উপযুক্ত পরিমাণে জমি পায় না, সেখানে শুধু জমি হতে তার জীবিকা চলে না। সেই অনুসারে কৃষি ও সমবায় সম্বন্ধে কেতাবী খবর ছাড়াও কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হবার ইচ্ছা ও সুযোগ হয়েছিল। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পুস্তকস্থ খবর মিলিয়ে যা মনে হয়েছে সেই সম্বন্ধেই দু'চার কথা লেখা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যাঁরাই ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে গিয়েছেন তাঁরাই তার অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। প্রথমতঃ, প্রকৃতির দান। প্রকৃতি কি অকৃপণ দানে সাজিয়েছেন তার গ্রামাঞ্চল! পশ্চিম ইংলণ্ড একটু বেশী ঢেউ-খেলানো, অর্থাৎ পাহাড় বেশী আছে। পাহাড় বলে, আমাদের দেশের পাহাড় বলে কেউ যেন ভুল করবেন না। সবুজ ঘাসে ঢাকা মোলায়েম তিন-চার শো ফুট উঁচু ঢিপি। একটার পর একটা। যেন পৃথিবীর তরঙ্গ। জমি একবার উঠছে, একবার পড়ছে, আবার উঠছে, পড়ছে। এই রকম চলেছে অবিরত। ইংলণ্ডের পূর্ব দিকটা মোটের উপর বেশী সমতল, যদিচ সর্বত্র আমাদের দেশের মত দিগন্ত-বিস্তৃত নিঃসীম সমতল নয়। এই ঢেউ-খেলানো জমির শোভা অপূর্ব। তার উপর গাছগুলি যেন সাজানো, বনগুলি ত উপবনের সামিল। এর জন্ম ইংলণ্ডে জলনিকাশের সমস্যা নেই বললেই হয়, জলের অভাবও বিশেষ নেই। ১৮৮৩ সন হতে ১৯৩৫ সনের গড়পড়তা হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে, ইংলণ্ডের বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাপ হ'ল ৪০°৪ ইঞ্চি। অবশ্য বছরের সব সময়েই যে সমান বৃষ্টি হয় তা নয়, সর্বত্রই যে সমান বৃষ্টি হয় তা-ও নয়। এসেক্স এবং কেণ্টের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বর্গ মাইল জুড়ে একটা জায়গা আছে যেখানে গরমের মাসক'টিতে বৃষ্টি পড়ে দশ ইঞ্চিরও কম। কিন্তু এসব ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, ইংলণ্ড এদিক থেকে প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ। যেমন সুমিত বৃষ্টি, তেমনি নদীগুলি ছোট ছোট, একবারে ছবির মত, পাহাড় তো সাজানো পাহাড়, বন উপবন।

স্কটলণ্ড ও ওয়েলসের দুর্গম অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু আপাততঃ তা ধরছি না। বস্তুতঃ, কলকাতা হতে প্লেনে যত বারই ইউরোপ গিয়েছি তত বারই আমার একটা কথা মনে হয়েছে। একেবারে এ ধারে, অর্থাৎ পূর্ব ভারতবর্ষে (এমনকি পূর্ব এশিয়াতেই) দেখা যাবে প্রকৃতির

ভয়ঙ্কর রূপ। বিশাল অরণ্য, সমুদ্রবৎ নদী, মাঠ ঘাট জলে থৈ থৈ করছে। অল্ডাস হাক্সলি বলেছেন ওয়ার্ডসওয়র্থ প্রকৃতির মধ্যে শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু তা গ্রাসমীয়র হ্রদের চারপাশের অত্যাশ্চর্য সাজানো বাগানের মত প্রাকৃতিক দৃশ্য বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু একবার যদি ট্রপিক্যাল দেশে প্রলয়ঙ্কর প্রকৃতির মধ্যে তিনি পড়তেন তা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রকৃতির নেশা ছুটে যেত। যাই হোক্, মালয় বর্মা ইন্দোচীন হতে সুরু করে প্রকৃতির এই রূপ মোটামুটি দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর সুরু হ'ল রুক্ষ মরুভূমির পালা। পৃথিবীর পঞ্জরাস্থি যেন বেরিয়ে আছে পাহাড়-পাথরের রেখায় রেখায়, জলধারা অতি ক্ষীণ ও জীর্ণ, গাছের মধ্যে কুল বা বাবলা গাছ, ধূসর রুক্ষ মাটি বা বালি। কম-বেশি এই রূপ চলল করাচি, বেলুচিস্থান, দক্ষিণ পারস্য, আরব, মিশর হয়ে প্রায় সিসিলি পর্যন্ত: প্রকৃতির দানে কি দুঃসহ কৃপণতা। তার পর আবার দৃশ্য বদলে গেল। দেখা গেল সবুজের সুষমায় ভূষিত দৃশ্যপট, অথচ প্রাচ্যের মত জলের আধিক্য নেই—কি অপরূপ ভাবে প্রকৃতি তাঁর দান বর্ষণ করে জায়গাগুলিকে ছবির মত করে রেখেছেন! আমার মাঝে মাঝে কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়, সৃষ্টির গোড়ায় ভগবান অতি প্রসন্ন চিত্তে সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সুকুমার মাধুর্যে ও অনুপম স্নেহমমতায় তিনি পশ্চিম ইউরোপ সৃষ্টি করলেন। এমন সময় হঠাৎ কোনও কারণে তাঁর মেজাজ গেল বিগড়ে, চিত্ত জ্বলে উঠল ক্রোধের দাহে, সেই দাহের ফলে মরুভূমির সৃষ্টি। তার পর ভগবান যেন নিজের ক্রোধে নিজেই লজ্জিত হয়ে ক্ষতিপূরণ করতে চাইলেন ছোট গাছের বদলে বিরাট গাছ সৃষ্টি করে, অদৃশ্য স্রোতস্বিনীর বদলে প্রলয়ঙ্কর নদী সৃষ্টি করে, উপবনের বদলে শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য সৃষ্টি করে। বায়ুযানে যখন দ্রুত দৃশ্য বদলায় তখন যাত্রাপথে এই চিন্তা উদিত হতে দেরী হয় না, ভাবতেও ভাল লাগে।

কিন্তু ওকথা থাক। মোদ্দা কথাটা হ'ল, কৃষির ক্ষেত্রে প্রকৃতির দানে ইংলণ্ড অতি সৌভাগ্যবান্—যা আমাদের দেশ নয়। ওখানে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই, তুলনায়, অনেক কম। দ্বিতীয় কথা হ'ল চাষের পদ্ধতি ও চাষী মানুষ। মানুষগুলি খুব স্বাস্থ্যবান্, সৎ এবং পরিশ্রমী। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, ইংলণ্ডের কৃষিতে আমেরিকার মত যন্ত্র মানুষকে খর্ব করে নি। সম্প্রতি ইংলণ্ডের কৃষিদপ্তর হতে আমেরিকার কৃষি সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করা হয়েছিল। তার ফলাফল একটি পুস্তিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।[1] তাতে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার মোদ্দা কথাটা হ'ল মাটি ও আবহাওয়ার তফাৎ, ভূমিরাজস্ব-পদ্ধতির তফাৎ, পল্লী অঞ্চলে সামাজিক কাঠামোর তফাৎ—এই সব কারণে ব্রিটেন ও আমেরিকার কৃষি এক নয়। তার উপর আমেরিকার আছে অসীম স্বাভাবিক ও শিল্প সম্পদ। এই সব কারণে দুইয়ের ঠিক তুলনা চলে না। পরস্পর হতে পরস্পরের শিখবার অনেক কিছু থাকতে পারে—কিন্তু আমেরিকার পদ্ধতি হুবহু বিলেতে চালাতে গেলে চলবে না। তার প্রধানতম কারণ হ'ল, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ও ব্রিটেনের চাষবাসের আসল তফাৎ খুঁজতে হয় কেবল স্বাভাবিক সম্পদ, সামাজিক কাঠামো বা জ্ঞানবিজ্ঞানের কলাকৌশলে নয়, তা খুঁজতে হয় মানুষের মনে। ইংরেজ কৃষক মনে করে সে একজন করিৎকর্মা বায়োলজিষ্ট, তার সঙ্গে তার কৃষির উৎকর্ষ সাধনের প্রতিভা ও শারীরিক ক্ষমতা থাকা চাই। আমেরিকার কৃষক মনে করে সে হ'ল একজন করিৎকর্মা ইঞ্জিনীয়ার, আর সাফল্য বিচার হবে তার মোটর গাড়ীর সাইজ ও নূতনত্ব প্রভৃতি সম্পদের বাহ্য চিহ্নের বিচার। কথাগুলি এবারে আমি ইংরেজীতে তুলে দিচ্ছি:[2]

The British farmer tends to think as a practical biologist and to be judged by his physical skill in husbandry; the American farmer tends to think as a practical engineer and is judged more by such outward signs of wealth as the size and year of his motor-car. In other words, the most important difference between U.K. and U.S. agriculture is not a question of natural resources, social organization or technical ability, but is, it seems, an attitude of mind.

আর আমরা কিনা এ দেশে আমেরিকার বহু অনুসরণ করছি!

এর পর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি। বিলেতে থাকবার সময় অনেক গ্রামাঞ্চল এবং কয়েকটি কৃষিক্ষেত্র দেখবার সুযোগ হয়েছিল। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। একটি কৃষিক্ষেত্রের কথাই বলব। লণ্ডনের কো-অপারেটিভ হোলসেল সোসাইটির বন্ধুরা একদিন আমায় একটি কৃষিক্ষেত্র দেখাতে নিয়ে গেলেন। ফার্মটি হ'ল এসেক্সে, ওয়ালথাম অ্যাবি বলে একটি জায়গায়। এইখানে লণ্ডনের প্রান্ত সীমা গ্রামে মিশে গিয়েছে। ফার্মটির মালিক হ'ল এন্‌ফিল্ড হাইওয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটি। এইখানে একটা কথা বলা দরকার। এদেশে সমবায়ী কৃষিক্ষেত্র বলতে আমরা বুঝি চাষীরাই সমবায়ের মাধ্যমে তার মালিক, যন্ত্রপাতির মালিকরাও যৌথ, চাষবাসের ব্যবস্থাও যৌথ। ও দেশে তা প্রায় নেই। দুটি চারটি co-partnership ছাড়া আমরা যে অর্থে সমবায়ী কৃষি বুঝি তা ওখানে

1. *American Agriculture: Its Background and Its Lessons*, H.M.S.O., 1952. Price 2s 6d net.

2. *Ibid.* p. iv.

একেবারেই নেই। এই co-partnership হ'ল যৌথ মালিকানা। একজন মালিক বা একটা কোম্পানী (আজকাল চাষ থেকে লাভ প্রচুর বলে বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পানীও খুব কৃষিক্ষেত্র কিনছে) যেমন ফার্ম কিনে লোকজন মাইনে করে রেখে চাষ করায় এও ঠিক তেমনি। যে ফার্মটির কথা বলছি তার একজন ম্যানেজার আছেন (Mr. Wherry), ছয় জন লোক আছে। যেমন অন্য সর্বত্র চাষ হয় ঠিক সেই নীতি ও পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে, লাভটা শুধু জমা হচ্ছে এনফিল্ড কো-অপারেটিভের খাতায়। সমবায় বলতে যা একটা নূতন আদর্শ ও পারস্পরিক সাহায্য বোঝায় তা নয়। বাস্তবিক কৃষিক্ষেত্রে দু'চারটি কো-পার্টনারশিপ ছাড়া আর ঐ ধরণের জিনিষ পাওয়া যায় না। প্রায় সবই সাধারণ ব্যবসার মত। এ সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করব। যাই হউক, এই হলিহেড হল ফার্মটি তো আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে দেখতে গেলাম। পাকা রাস্তা, বিদ্যুতের আলো, কলের জল—তার উপরে চার পাশের তরঙ্গিত মাঠ ও বন, তারই মধ্যে ফার্মটি। অতি চমৎকার দৃশ্য। দিনটি সূর্যকরোজ্জ্বল ছিল, শেষ মাঘের মত ঠাণ্ডা, আমরা উৎসাহ করে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। শোনা গেল ফার্মটির আয়তন ৪৫০ একর। আশেপাশের ফার্মগুলির সাধারণ সাইজ এত বড় নয়—সেগুলি সাধারণতঃ ১৫০ হতে ২০০ একর। হলিহেড হল ফার্মের মালিক হ'ল কো-অপারেটিভ সোসাইটি, অর্থাৎ উর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর স্বত্বও তারা কিনে নিয়েছে—সেইজন্য জমিদারকে কোনও খাজনা দিতে হয় না। কিন্তু আশেপাশের ফার্মগুলিতে শুনলাম একর পিছু বার্ষিক খাজনা দু' পাউণ্ডের কিছু কম-বেশী। তা হলে বিঘেপ্রতি খাজনা দাঁড়াচ্ছে টাকা দশেক। আমাদের তুলনায় খুব বেশী বটে, কিন্তু ওদের দেশে উৎপাদনও তো প্রচুর। ঐ ফার্মটিতে ছ'জন মাইনে করা লোক আছে। তাদের মাইনে সপ্তাহে ৬ পাউণ্ড ৫ শিলিং। আইনেই এই রেট বেঁধে দেওয়া আছে, তার চেয়ে কম মজুরী হবার উপায় নেই। এর উপরে কো-অপারেটিভ ফার্ম বলে মজুরেরা আর একটু সুবিধে পায়—গরমের সময় তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুটি দেওয়া হয়। প্রত্যেক ফার্মেই মজুরদের থাকবার জন্য বাড়ী দিতে হয়—এর থেকেই বিলেতের বিখ্যাত tied cottage system-এর উদ্ভব। বাড়ীর ভাড়া সপ্তাহে দু'শিলিং হিসেবে কেটে নেওয়া হয়। ফার্মটির বাড়ীগুলিতে ঢুকে দেখলাম —বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দোতলা কুটীর। বাথরুম আছে।

এ ফার্মটিতে অবিমিশ্র চাষই হয় না, গোপালন ও মুরগী পালনও হয়। সেইজন্য এটি মিশ্র প্যাটার্ণ বা mixed type-এর। চাষের মধ্যে আলু বীট, পেঁয়াজ গম হতে দেখলাম। শোনা গেল, আলুতে খুব লাভ—খরচের উপর শতকরা ১০০ ভাগ লাভ। দেখলাম, আলুগুলি খুব সাইজে বড়। গমক্ষেতের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের গ্রিড লাইন চলেছে। পাইলন গাঁথবার জন্য গমক্ষেতের একটুখানি জায়গা খুঁড়ে নষ্ট করা হয়েছে—তাই নিয়ে হোয়েরি সাহেবের আপশোশের অন্ত নেই। সমস্ত ক্ষেতকে কি যত্নের সঙ্গে ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে—এক ইঞ্চি জমিও অযত্নে পড়ে নেই। ঘোড়া নেই, তার জায়গায় কলের লাঙল। দুটো ট্রাক্টর দেখলাম, সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিও আছে। তা ছাড়া একটা কম্বাইন। হোয়েরি সাহেব বললেন, আজকাল গবর্ণমেণ্ট যন্ত্রপাতির জন্য এত সাবসিডি দিচ্ছে যে সবাই একটা করে কলের লাঙল কিনছে। যারা নেহাৎ পারছে না, কয়েকজন মিলে স্থানীয় কনট্রাক্টরের কাছ থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসে। অনেক লোকও সুযোগ বুঝে ট্রাক্টর ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করছে।

ফার্ম দেখে আমরা গোয়াল দেখতে গেলাম। যাঁরা এখানে হরিণঘাটা দেখেছেন বা বোম্বাইয়ের দুগ্ধ কলোনি দেখেছেন তাঁদের চোখে নতুন ঠেকবে না। সেই গলায় লোহার হাঁসুলি দিয়ে গরু থাকে—চোনা গোবর পড়ে ঠিক ড্রেনে, সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। গরুর জল খাবার ব্যবস্থাটি নূতন দেখলাম। একটা লোহার পাত্র, পাত্রের মুখে জলের পাইপ। পাত্রটির মুখে একটা হালকা ঢাকনা আছে। গরু মুখ দিয়ে ঢাকনাটাকে ঠিক একটু ঠেললেই সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিং-এ পাইপের মুখ খুলে যায়, পাত্রটি জলে পূর্ণ হয়ে যায়। খাওয়াবার ব্যবস্থা গরুর সাইজ ও দুধের পরিমাণের সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে। কি যত্ন গরুর। আমরা থাকতে থাকতেই দুধ দুইবার সময় হ'ল। মজুরেরা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ডাক্তারদের মত জামার উপর ধোয়া সাদা apron পরে ডাক্তারদের মতই মাথায় মুখে সাদা apron বেঁধে দুধ দুইতে এল। দোওয়া মানে পাত্রগুলি সাজিয়ে ইলেক্‌ট্রিকের দুই বার যন্ত্র বাঁটে লাগিয়ে দেওয়া। দুধ দোওয়া হয়ে গেলে সে দুধ চলে গেল ডেইরীর কলকব্জায়। হরিণঘাটায় যেমন আছে, সেই রকমই—বরং একটু পুরনো। ঠাণ্ডা গরম করে বীজাণুমুক্ত করা হচ্ছে, তারপর ক্রমে ক্রমে বোতলে ভরা হচ্ছে। নব্বইটি গরু আছে। ষাঁড়টি বিপুলায়তন, চমৎকার। শুনলাম তার জন্য বছরে খরচ হয় ১৫০০ গিনি অর্থাৎ বিশ হাজার টাকার উপর।

ফার্মটির আয়ব্যয় লাভলোকসানের খবর নিয়ে জানলাম, ও অঞ্চলে সাধারণ সাইজের একটি ফার্ম থেকে বছরে নীট আয় হয় সাড়ে সাতশ' কি আটশ' পাউণ্ড। কিন্তু এ ফার্মটি আয়তনে অনেক বড়, তার উপর খাজনা লাগে না। তার

উপর অন্ত কার্য্যের তুলনায় সার ইত্যাদি বেশি ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত কারণে এটির আয় হয়েছে অনেক বেশী। গত বছরে প্রায় সাড়ে সাত হাজার পাউণ্ড নীট আয় হয়েছে। গত বছর খরচের মধ্যে মজুরদের মজুরী ছিল প্রায় ৫৬০ পাউণ্ড।

একটা ছোট্ট ঘটনা বলে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি। হরিণঘাটায় দেখেছি, গরুর চোনা গোবর সরাবার একটা চমৎকার ব্যবস্থা আছে। মাথার উপর রেল লাইন আছে, তাতে ঝুলে ঝুলে কতকগুলি টিনের ক্যান (can) চলে। গোবর প্রভৃতি জড়ো হলেই সেই ক্যানে তুলে দেয়—তারপর ঠেলা দিলে তা ঝুলতে ঝুলতে চলে যায়। হলিহেড হল ফার্মে তা নেই। দেখে মুরুব্বিয়ানার লোভ সামলাতে পারলাম না। বিশেষতঃ 'গরবী'র দেশের লোক আমরা—যদি একটা টেক্কা মারার সুযোগ আসে তো সে লোভ কি সামলান যায়? তাই ওখানকার গোয়াল দেখতে দেখতে আমি হোয়েরি সাহেবকে বললাম, ওদেশে মাথার উপর রেলে ঐ রকম সচল ক্যানের ব্যবস্থা নেই, গোবর সরাবার জন্তে? শুনে হোয়েরি চোখ কপালে তুলে বলল, আছে বটে, কিন্তু সে তো থাকে only in millionaires' places—কেবল কোটিপতিদের গোয়ালে! শুনে বাইরে একটু মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসলাম বটে, কিন্তু মনে লজ্জাই পেয়ে গেলাম। আমরা হরিণঘাটায় যা করেছি তা একেবারে আধুনিকতম, তার মধ্যে এমন কিছু কিছু সরঞ্জাম আছে যা বিলেতে সাধারণ চাষীর কল্পনার বাইরে। কিন্তু ঐ তো একটি হরিণঘাটা! তার পরে আমাদের চালভাঙা জীর্ণ গোয়ালে অস্থিসার গরু অর্দ্ধাহারে প্রাণপণে মাছি তাড়াতে তাড়াতে ধুঁকছে—তার সঙ্গে সাধারণ ইংরেজ গোয়ালের তুলনা করুন তো? একটা হরিণঘাটা দিয়ে বিচার করলে তো হবে না।

লালমোহন ঘোষ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

লালমোহন ঘোষ ও মনোমোহন ঘোষ এই দুই ভ্রাতার নাম এক সময়ে শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত ছিল। দুই ভাই-ই ছিলেন দেশপ্রেমিক, বাগ্মী ও খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী। তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন।

ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। প্রতিষ্ঠা কাল হইতেই সমগ্র ভারতের মধ্যে ঐক্যস্থাপন ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই তখন কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্য পরিচালিত হইত। বাঙালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, মদ্রদেশবাসী সকলের মধ্যে ইংরেজী ভাষাই যোগসূত্র স্থাপনের সহায়ক ছিল। তখনকার দিনের কংগ্রেসের দিকপালগণ শুধু যে ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ভাবে ব্যুৎপন্নই ছিলেন তেমন নয়, অনেকেরই ঐ ভাষায় বক্তৃতা-শক্তিও ছিল অসাধারণ। ভারত-সন্তান লালমোহন ও মনোমোহন উভয় ভ্রাতাই বাগ্মিতার জন্ত বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে হয়। সেবার সভাপতি হইয়াছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ শহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন লালমোহন ঘোষ।

লালমোহন ঘোষ মনোমোহন ঘোষের মধ্যম ভ্রাতা। পিতা রামলোচন ঘোষ সেকালে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের সময় সদরআলার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যৌবনে

লালমোহন ঘোষ

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য লালমোহন বিলাত গমন করেন এবং অল্পকাল পরেই ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে আসিবার কয়েক বৎসর পরে, ভারতবর্ষে যাহাতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয় সে বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক পুনরায় তিনি ইংলণ্ড প্রেরিত হন। সেখানে পার্লামেন্টের সদস্যগণ তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার অতি অল্পকাল পরেই ভারতবর্ষে ষ্ট্যাটুটারী সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণ প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লালমোহন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বোম্বাই ও কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। লর্ড রিপণের আদেশে তাঁহার ব্যবস্থা-সচিব ইলবার্ট 'ইলবার্ট বিল' পাস করাইবার চেষ্টা করিলে ইংরেজগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠেন। এই সময় লালমোহন বিলাতে গিয়া পার্লামেন্টের সদস্য হইবার চেষ্টা করেন। তাঁহার পক্ষে মোট ৩৫৬০ ভোট প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে আইরিশদের বিরোধিতায় লিবারেল সম্প্রদায়ের হার হওয়াতে তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইতে হয়।

বিলাতে পার্লামেন্টের নির্বাচন-দ্বন্দ্বের সময় সকন্যা লালমোহন ঘোষ ডেপ্টফোর্ডে অভিনন্দন গ্রহণ করিতেছেন। লালমোহনের সম্মানার্থে রাইট অনারেবল ডব্লু. ই. গ্ল্যাডষ্টোন নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দেন

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে লালমোহন ব্রিটিশ হাউস অব কমনসে সদস্যপদ-প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সুবক্তা, আইনজ্ঞ, নির্ভীক, স্বাধীনমতাবলম্বী যোগ্যতম প্রার্থী বিবেচনা করিয়া লিবারেল সম্প্রদায় যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন, এখানে তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। লালমোহন বিক্রমপুর বয়রাগাদী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহা লক্ষণীয় যে, এই অভিনন্দন-পত্রে তাঁহাকে বিক্রমপুর ও কৃষ্ণনগরের লালমোহন ঘোষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, বিলাতে পর্য্যন্ত তিনি বিক্রমপুর ও কৃষ্ণনগরের লোক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন।

Presented to Lalmohan Ghose Esq.,
of
Vikrampore and Krishnaghur, Bengal

By the Liberals of the Borough of Deptford as a mark of respect and esteem and in recognition of the valuable service rendered by him to the Liberal cause during the Parliamentary General Election of November 1885 and again in July 1886 which cause he so heartily and eloquently supported as the Liberal candidate for a seat in the British house of Commons. Having every confidence that he would be a most able and fearless exponent of those great principles of Liberty and Justice which alone command the love and goodwill of the People it is their earnest hope that he may soon attain the proud position of a Representative in the Imperial Parliament signed on behalf of the Committee.

Henry Abott, Chairman
Chas A. Andrews, Hony. Secretary.

মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন সাহেব লালমোহন ঘোষকে ভোট সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে নিজের গাড়ী ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। ভোট সংগ্রহের সময় গাড়ীতে তাঁহার কন্যা সুকুমারী ঘোষও ছিলেন।

সুকুমারী এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৮৩ বৎসর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার নিকট হইতে উক্ত অভিনন্দন-পত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের দুই কন্যা—সুকুমারী ও শিশিরকুমারী। সুকুমারী জ্যেষ্ঠা। তিনি চিরকুমারী। সুবিখ্যাত ডক্টর শরৎকুমার মল্লিকের সহিত শিশিরকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের মেয়েদের শরীরচর্চ্চা

অল্পকালের মধ্যেই ফিন্‌ল্যাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত শরীরচর্চ্চার প্রতি বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। ফিনিশ স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সঙ্গে উৎসাহের সহিত দেহচর্চ্চা-শিক্ষার প্রসারকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

১৯০৬ সনে ফিনল্যাণ্ডের নারীরাই ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে ভোটাধিকার লাভ করেন এবং এই বৎসরেই ফিন্‌ল্যাণ্ডের নারীদের শরীরচর্চ্চা-শিক্ষার বৃহত্তম সংস্থাটি

হেলসিঙ্কির একটি সংবাদপত্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মেয়েদের দৌড়-প্রতিযোগিতা
বাঁদিকে উপবিষ্ট মেয়েটি উল্লম্ফন-প্রতিযোগিতায় যোগদানকারিণীদের অন্যতমা

বর্ত্তমান আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'নারীসঙ্ঘ' (Association of woman) কিন্তু ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৯৬ সনে স্থাপিত হয় এবং তাহারও অনেক আগে ১৮৭৬ সনে এলিন কাল্লিও কর্ত্তৃক হেলসিঙ্কিতে প্রথম মহিলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়।

ফিন্‌ল্যাণ্ড উত্তর-ইউরোপের হ্রদ এবং অরণ্য-পর্ব্বতসমাকীর্ণ রমণীয় ভূমি। শীতকালে এখানে প্রচুর তুষারপাত হয়। ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই এখানকার অধিবাসীদের মনে স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীন জাতির প্রয়োজন সেই শ্রেণীর লোকের যাহারা যেমন দৈহিক তেমনি মানসিক শক্তিরও অধিকারী। তাই শারীর-শিক্ষার প্রতি ফিনদের এত অনুরাগ।

এক মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় রেকর্ডসৃষ্টিকারী অষ্ট্রেলিয়ার জন ল্যাণ্ডিকে শূন্যে তুলিয়া ফিনদের পুলকোচ্ছ্বাস

দীর্ঘস্থায়ী শীতকালে স্কি-ইং এখানকার খুব জনপ্রিয় ক্রীড়া, অবশ্য ইহার কারণও আছে। ক্রীড়াচ্ছলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার ইহাই সহজতম পন্থা। গ্রীষ্মকালে ফিন্‌ল্যাণ্ডের ৭০,০০০টি হ্রদের তুষার গলিয়া যাওয়াতে সাঁতার কাটা এবং নৌকা

যাওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। ঐ সময় দীর্ঘ সমুদ্রতীরেও স্নানার্থী এবং সন্তরণকারীদের ভিড় জমে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে জিমনাস্‌টিকসের বড়ই সমাদর। জিমনাসটিক্‌স এবং ক্রীড়াকৌতুক শিক্ষার ভিত্তিপত্তন হয় ছাত্রজীবনেই। ব্যায়াম-শিক্ষা অবশ্যক (compulsory) বিষয়সমূহের অন্যতম হওয়ার পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ১৬৮৬ সনে সুইডেন-ফিন্‌ল্যাণ্ডের গীর্জা আইন (Church Law) এই নির্দেশ প্রদান করে যে, প্রত্যেককেই পড়িতে শিখিতে হইবে—শারীর-শিক্ষা সম্পর্কিত কয়েকটি নিয়মও ইহার সঙ্গে যুক্ত হয়। সম্প্রতি সাত হইতে পনর পর্যন্ত এই আট বৎসর স্কুলে শিক্ষালাভ বাধ্যতামূলক। সাধারণতঃ আঠার বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত, প্রাথমিক এবং উচ্চ

বর্শানিক্ষেপরত একটি মহিলা

বিদ্যালয়সমূহে সকল ছাত্রকেই শারীর-শিক্ষা গ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অবশ্য শারীর-শিক্ষা ছাত্রদের ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সবগুলি উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা শিক্ষাদানের ভার বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হস্তে ন্যস্ত। প্রত্যেক ছাত্রকে সপ্তাহে তিন হইতে চার ঘণ্টা শারীর শিক্ষার ক্লাসে উপস্থিত থাকিতে হয়। প্রত্যেক স্কুলেরই নিজস্ব জিমনাসিয়াম বা ব্যায়ামশালা আছে এবং কৌমগত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ-সমূহও (community athletic field) দিবাভাগে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য খোলা থাকে। যাবতীয় বিদ্যালয়ের শারীর-শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের (National Board of Education) নিয়ন্ত্রণাধীনে। উক্ত পরিষদের পরিদর্শকগণ এই ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে স্কুলের ছাত্রদের ব্যায়ামাদির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা শরীরচর্চা শিক্ষাদানকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে চান তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ইঁহারাও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। ইউরোপে অন্যত্র কিন্তু ইহার রেওয়াজ নাই। বর্তমানে হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনৃষ্টিট্যুট অব ফিজিক্যাল এডুকেশন'ই হইতেছে এইরূপ শিক্ষা ও ডিগ্রী দানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষার কোর্স চার বৎসর। তন্মধ্যে শেষ বৎসরটিতে শিক্ষার্থীকে কোনো একটি নর্ম্যাল স্কুলে শিক্ষাদান অভ্যাস করিতে হয়।

উল্লম্ফনরত একটি মেয়ে

ফিন্‌ল্যাণ্ডে যে সকল শিক্ষক শরীরচর্চা শিক্ষা দিয়া থাকেন তাঁহারা কি সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, কি মাহিনায় উভয় দিক দিয়াই অন্যান্য শিক্ষকদের সমকক্ষ। প্রচলিত অর্থে জিমনাসটিক্‌স শিক্ষাদান বলিতে যা বুঝায়, জিমনাসটিক্‌স শিক্ষকদের দায়িত্ব শুধু তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। ক্রীড়াকৌতুক, লোকনৃত্য প্রভৃতিও জিমনাসটিক্‌সের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের নারীরা ছাত্রীদিগকে জিমনাসটিক্‌স শিক্ষাদানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের কর্তব্য শুধু ব্যায়াম শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ নহে, ছাত্রীদের তাঁহারা কেমন করিয়া চলিতে

হয়, কেমন করিয়া দৌড়াইতে হয়, দাঁড়াইতে হয়, বসিতে হয় এই সমস্তও শিখাইয়া থাকেন।

জিমনাসটিক্‌সে ছন্দোময় গতিও অভিব্যক্ত হয় এবং সঙ্গীতেই ছন্দ অধিকাংশের নিকট স্পষ্টতমরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। গীতি এবং গতি এ দুটি যে কিরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত লোক-নৃত্যসমূহে। ছাত্রীদের মধ্যে ছন্দবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে জিমনাসটিক্‌সের সঙ্গে পিয়ানো বাদ্যের সঙ্গত করা হইয়া থাকে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে ক্রীড়াকৌতুকের ক্ষেত্রে স্কি-ইং এবং স্কেটিং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। হাঁটিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিনিশ শিশুদের স্কি-ইং ক্রীড়ার মূলসূত্রগুলি শিখানো হইয়া থাকে। ল্যাপল্যাণ্ডের উত্তর দিক ছাড়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের আর কোথাও উচ্চ পর্ব্বত নাই, কিন্তু তাই বলিয়া স্কি-ইং ক্রীড়ার উপযোগী স্থানের জন্য যে বহুদূরে যাইতে হইবে এমন কোন কথা নয়। হেলসিঙ্কিতে পর্য্যন্ত শহরের বাহিরে স্কি-ইঙের সুবিধা আছে।

শীতকালে স্কি-ইং যেমন জনপ্রিয়, গ্রীষ্মকালে তেমনি সন্তরণের জনপ্রিয়তা অত্যধিক। যেহেতু চারিটি মাত্র শহরে সন্তরণ-শিক্ষা-কেন্দ্র (Swimming Polls) আছে, সেজন্য সন্তরণ শিক্ষাদান বিদ্যালয়ের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু এদেশে অনেকগুলি হ্রদ এবং দীর্ঘ সমুদ্রোপকূল থাকায় বালক-বালিকাদের সন্তরণ-শিক্ষার অসুবিধা হয় না।

কন্দুক (Ball) ক্রীড়াও ফিন্‌ল্যাণ্ডে বিশেষ জনপ্রিয়। মেয়েদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কন্দুকক্রীড়া হইতেছে পেসাপাল্লো—আমেরিকান বেইস বলের অনুকরণে এই ক্রীড়ার উদ্ভব। মে হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই ক্রীড়ার মরশুম।

ইহা ছাড়া মেয়েদের মধ্যে বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন ইত্যাদি ক্রীড়ারও ব্যবস্থা আছে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের জাতীয় পরিচ্ছদের রকমারির যেমন অন্ত নাই, তেমনি এখানকার লোকনৃত্যও সংখ্যাতীত। লোকনৃত্যোৎসব মুখ্যতঃ মেয়েদেরই অনুষ্ঠান, এগুলিতে অংশগ্রহণে পুরুষদের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না।

'ফিনিশ জিমনাসটিক্‌স এথলেটিক ইউনিয়ন' বয়স্কদের শরীর চর্চ্চা বিষয়েও বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। মেয়েদের পক্ষে শরীরচর্চ্চার যাবতীয় পদ্ধতির মধ্যে জিমনাসটিক্‌সই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক শহর এবং পল্লীর নিজস্ব ক্লাব আছে যেখানে সাধারণতঃ সপ্তাহে দুই দিন করিয়া সভা হইয়া থাকে।

অন্যান্য বহুদেশের ন্যায় ফিন্‌রাও প্রায়ই বিরাট জিমনাসটিক্‌স উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করে। বসন্তের শেষভাগে অথবা গ্রীষ্ম-কালের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে হাজার হাজার নর-নারী উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া থাকে।* ন. ভ.

—

বার্গাণ্ডির শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি শিশুই প্রত্যেক ষ্টেটের শিক্ষা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কোন-না-কোন স্থানীয় বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে শিক্ষালাভ করিতে পারে। অবশ্য যে সকল পিতা-মাতা নিজেদের পছন্দমত অন্য শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহে নিজেদের শিশুসন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চান, তাঁহারা সকল সময়েই তথায় তাহাদিগকে পাঠাইতে পারেন। এই সমস্ত বিদ্যালয় নানা শ্রেণীর—এগুলি লাভের আশায় স্থাপিত বেসরকারী, অথবা অর্থানুকূল্যপ্রাপ্ত বেসরকারী, কিংবা চার্চ অথবা বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয় হইতে পারে। শুধু এই দিকে লক্ষ্য রাখা হয় যেন এগুলিতে শিশুর জন্য এমন শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকে যাহা রাষ্ট্রের প্রচলিত শিক্ষামানের অনুরূপ।

আমেরিকান পিতামাতা যে সময় সময় অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার আওতার বাহিরে কোন কোন শিক্ষায়তনে ছেলেমেয়েদিগকে বিদ্যালাভের জন্য পাঠাইয়া থাকেন, ইহার নানা কারণ আছে। তাঁহারা হয়ত সেই সকল নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির কার্য্যকারিতা পরীক্ষা

বালক-বালিকাদের অঙ্কনবিদ্যা অভ্যাস

* "Finlandia Pictorial" অবলম্বনে

করিয়া দেখিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন, যাহা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত বিত্তালয়-সমূহের শিক্ষাদান-প্রণালীর বহির্ভূত। শিশু কোন বিশেষ ধর্ম্মমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিবে, ইহাই হয়ত কাহারও কাহারও মনোগত অভিপ্রায়। কেহ কেহ হয়ত ইহাও মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের শিশুর এমন কতকগুলি বিশেষ শক্তি আছে, মামুলি বিত্তালয়গুলিতে যাহার রীতিমত বিকাশসাধন হওয়া সম্ভব নয়।

শিক্ষিকা ছাত্রকে একটি জটিল বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন

শিশুশিক্ষার যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা এবং সুযোগ-সুবিধা তাঁহাদের অভিপ্রেত, যদি তাহা চালু বিদ্যালয়গুলিতে দুর্লভ হয়, তাহা হইলে পিতামাতারা বিত্তালয়-প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রায়ই সমবেত ভাবে চেষ্টা করেন। পিতামাতাদের পরিকল্পিত, অর্থানুকুল্যপ্রাপ্ত এবং তাঁহাদেরই দ্বারা পরিচালিত এমনি একটি সমবায় বিত্তালয় হইতেছে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী ভার্জিনিয়া ষ্টেটের অন্তর্গত 'বারগান্ডি ফার্ম কান্‌ট্রি ডে স্কুল'।

কয়েক বৎসর আগে যাঁহারা এই বিত্তালয় স্থাপিত করেন তাঁহারা সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক—পুরুষেরা বেশীর ভাগই সরকারী বিভাগে কোন পেশাদারী বা বৈজ্ঞানিক কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। নগরী এবং নগরোপকণ্ঠের অধিবাসী বলিয়া এই সকল পিতামাতা ইহাই চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের শিশুসন্তানের যেন প্রকৃতির সান্নিধ্যে মুক্ত আলোবাতাসের দাক্ষিণ্যে বাড়িয়া উঠিবার উৎকৃষ্টতর সুযোগ লাভ করিতে পারে। এই বিশ্বাসও তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তোতাপাখীর মত নিছক মুখস্থ দ্বারা বিত্তাশিক্ষার পরিবর্ত্তে যতদূর সম্ভব হাতে-কলমে কাজ করিয়া যদি তাহাদের শিক্ষার সূত্রপাত হয় তবে তাহাই আগেরে হইবে তাহাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রদ। শিশুরা যাহাতে অল্পবয়সেই সঙ্গীত ও কলাবিত্তার সমঝদার হইয়া উঠিতে পারে এবং এই সকল ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের পরিতৃপ্তির অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে তজ্জন্তও তাঁহারা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে তাঁহারা এমন একটি বিত্তালয় চাহিয়াছিলেন যাহা বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিভেদের গণ্ডীরেখা টানিয়া দিবে না, উপরন্তু বিশেষভাবে সেই সমস্ত ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিকের উপর জোর দিবে যাহা পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিশীলতার ভিত্তিস্বরূপ। ইহা লক্ষণীয় যে এই বিত্তালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নানা জাতি এবং বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া এগার-বারো বৎসর-বয়স্ক এক শ' ত্রিশ জন ছাত্র লইয়া এই বিত্তালয় গঠিত। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায়

বার্গান্ডি ফার্ম স্কুলের খোলা জায়গায় বালক-বালিকাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন

কাঠের কাজে বালক-বালিকাদের যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষা

করেন, শিল্পকলা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত (Trained) শিক্ষকদের নির্দ্দেশানুযায়ী ক্লাসে পাঠনারও সহায়তা করিয়া থাকেন।

স্কুলের ব্যয়নির্ব্বাহ এবং উন্নতিবিধানের জন্যও প্রত্যেক পিতা এবং মাতা কিছু সময় ও শক্তি ব্যয়িত করিয়া থাকেন। শিশুদের পিতারা বৎসরে অন্ততঃ ছুইটি সপ্তাহান্তিক দিবসে এই কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এই সময় ছেলেমেয়েরা তাহাদের বাপমায়ের সঙ্গে বনভোজন করিতে অথবা পুকুরে সাঁতার কাটিতে যায়। এই সপ্তাহান্তিক দিনগুলিতে পরিবারের সকলের চিত্তবিনোদ নব সুযোগলাভও হইয়া থাকে। পিতামাতারা এই সমস্ত ক্রীড়াকৌতুক এবং আমোদপ্রমোদে যোগদান করিয়া থাকেন বলিয়া শিশুদের মনে এই বোধ জাগ্রত হয় যে, তাহাদের শিক্ষাজীবন পারিবারিক জীবনেরই অঙ্গীভূত এবং তাহারা সকলেই কাজ এবং আমোদ-প্রমোদের সমান অংশীদার। এই উপলব্ধির দরুন পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন যোগাইয়া থাকেন পিতামাতারা। তাঁহারা যখন শিশুকে এই শিক্ষায়তনে ভর্ত্তি করান, তখন একটি বিনাসুদী 'বিয়ারার বণ্ড' (মূল্য ২৫০ ডলার) কিনিয়া থাকেন। শিশু যখন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে এবং অপরে আসিয়া

পিতামাতারা শহরের নিকটেই কুড়ি একরব্যাপী জঙ্গলাকীর্ণ এবং প্রান্তর ও নদীবেষ্টিত এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি প্রাক্তন গোয়ফা-নিকেতনকেই তাহাদের বিদ্যালয়ের আদর্শ স্থান রূপে নির্ব্বাচিত করিলেন। নিজেদের শক্তি ও বুদ্ধিকৌশল নিয়োজিত করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহারা গোশালার গৃহগুলিকে পুনর্নির্ম্মিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে নগরোপান্তে বায়ুচলাচলের উত্তম আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত ক্লাশরুম, প্রকাণ্ড ক্লাব-ঘর, গ্রন্থাগার, আপিস, বিভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে শিল্পকলার চর্চা শিক্ষা দিবার জন্য পরিকল্পিত কলা-ভবন, শিশুদের কাঠের কাজ শিখাইবার জন্য ছুতার-মিস্ত্রির কারখানা ইত্যাদি সমন্বিত এক বিরাট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল।

এই প্রতিষ্ঠানের একটি গৃহকে আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাযুক্ত পাকশালায় পরিণত করা হইয়াছে। প্রত্যহ কয়েক জন মাতা একত্রে মিলিয়া নূতন রান্নার আয়োজন করেন। যে খাদ্য-বস্তু প্রস্তুত হয় তাহা যেমন মুখরোচক তেমনি পুষ্টিকর। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেই তৃপ্তির সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করিয়া থাকেন। মায়েরা গ্রন্থাগারেও কাজ

তাহার স্থান অধিকার করে তখন এই বণ্ড ফিরাইয়া দেওয়া হয়। পিতামাতারা এই প্রকার বহু উপায়ে উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজের সহায়তা করেন বলিয়া এই অঞ্চলের অন্যান্য বেসরকারী বিদ্যালয় অপেক্ষা ইহার শিক্ষা-ব্যয় অনেক কম।

বারগার্ড ফার্ম্ম স্কুলে ছেলেমেয়েদের সহজ পদ্ধতিতে এমন ধরণের শিক্ষালাভে অভ্যস্ত করানো হয় যাহা তাহাদের কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত এবং কল্পনাকে পরিপুষ্ট করে।

'পড়া' (Reading) শেখানো হয় বিশেষ যত্নের সহিত। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার প্রথম বৎসরে শিশুদিগকে নিয়মিত ভাবে প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক পড়িতে হয় না। তৎপরিবর্ত্তে দৈনন্দিন কার্য্যক্রম (Daily Routine) এবং নূতন অভিজ্ঞতাসমূহের সহিত তাহাদের 'পড়া'র যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। ফলে অক্ষর পরিচয়ের পূর্ব্বেই তাহারা মুদ্রিত অথবা লিখিত শব্দ কিসের দ্যোতক তাহা শিখিয়া এ দুয়ের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে।

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য্যক্রম অনুসরণ করিতে গিয়া শিশুরা

যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে সেগুলিকে ভিত্তি করিয়া অঙ্ক শিক্ষাদানেরও সূচনা হয়। কাঠের টুকরো গণনা, বিস্কুটের ভাগ লওয়া, হাজিরার বিবরণী রাখায় সহায়তা, এ সকলই বালক-বালিকাদের পক্ষে সংখ্যা-পরিচয় লাভ করিবার সহায়ক হইয়া থাকে। আট বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই প্রতিষ্ঠানের একাংশে মুরগীর ব্যবসা চালাইয়া থাকে। তাহারা গণিয়া ডিম সংগ্রহ করে এবং নিয়মিত ভাবে হিসাব রাখে। দশ বৎসর-বয়স্ক বালক বালিকারা রকমারি ষ্টেশনারি জিনিষের একটি 'ছাত্রভাণ্ডার' চালায়। শিক্ষায়তনের সকল ছেলেমেয়েরই ছাত্রভাণ্ডার হইতে পেন্সিল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ষ্টেশনারি জিনিষ কিনিয়া থাকে। এমনিতর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বালক-বালিকাদের গণিতের জটিলতা বুঝার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়া থাকে।

শিশু লিপিতে শিখিলে পর নোট লওয়া, রিপোর্ট লেখা, সৃষ্টি-ধর্মী রচনা ইত্যাদি তাহার লিখন-কৌশলের উৎকর্ষ-সাধনের অনুকূল হইয়া থাকে। এগার এবং বার বৎসরের বালক-বালিকারা একটি দৈনিক সংবাদপত্র পরিচালনা করে। বিদ্যালয়ের কারিকুলামে শিল্পকলা এবং সঙ্গীতও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যেক শিশুকেই রং এবং কাদার মাধ্যমে নিজের সৃজনীশক্তির বিকাশ-সাধনের সুযোগ দেওয়া হয়, এবং সকল গ্রেপের ছেলেমেয়েরাই গান, লোকনৃত্য এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানে উৎসাহ সহকারে যোগদান করিয়া থাকে। অনেক শিশু আবার ব্যক্তিগত ভাবে যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষাও আরম্ভ করিয়া থাকে। একটি উৎকৃষ্ট সাজ-সরঞ্জামে পূর্ণ কারখানা-ঘরে একজন দক্ষ ছুতার-মিস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সকল বয়সের শিশুরা সাধারণ হাতের কাজ শিক্ষা করে এবং যন্ত্রপাতির কল-কৌশল আয়ত্ত করিবার বয়স হইলেই তাহাদিগকে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের কাজে হাতেখড়ি দেওয়া হয়।

পিতামাতাদের আত্মপ্রসাদ লাভের হেতু এই যে, তাহাদের স্পষ্ট এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবেই ছেলেমেয়েদের মানসিক প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। শিক্ষাসংক্রান্ত ষ্টেট রেকর্ডসমূহের তথ্য এবং পরি-সংখ্যানাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা থাকায় তাহারা বুঝিতে পারেন যে, বাগাণ্ডি স্কুলের ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠ মামুলি বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের অপেক্ষা ঢের বেশী। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ থাকে না যে, এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা সর্ব্বাধিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার ভিত্তি সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পিতামাতাদের এই সমবায় উদ্যোগ (Co-operative enterprise) শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

ন. ভ.

"রায়বাঘিনী"র কথা

(আশ্বিন মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংযোজনী)

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য

'ভুরসুট'রাজ্যে যখন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন রাণী বাগুড়ী গ্রামের ভবানী-মন্দিরে পূজায় ও সাধনায় প্রায়ই রত থাকিতেন। এদিকে পাঠান-সেনাপতি ওসমান পরাজয়ের বেদনা ভুলিতে পারেন নাই এবং তাঁহার মন হইতে রাণীর রূপলাবণ্যের ছবিও অপসারিত হইতেছে না। পুনরায় ওসমান-চতুর্ভুজ ষড়যন্ত্রের সূচনা হইল। ভবিষ্যতে সিংহাসনপ্রাপ্তির লোভে চতুর্ভুজ চক্রবর্ত্তী ওসমানের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, পরবর্ত্তী এক বৈশাখী অমাবস্যায় ভবানী-মন্দিরে বিশেষ আরাধনা-নিরতা রাণীকে আক্রমণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ওসমান নির্দ্ধারিত দিনের এক দিন পূর্ব্বে আট শত সৈন্যসহ খানাকুলের নিকটবর্ত্তী এক অরণ্যে লুকাইয়া রহিলেন। খানাকুলের নগর-কোতোয়াল এক শিকারী ব্যাধের মুখে বহুসংখ্যক বিদেশীর আগমন-সংবাদ পাইয়া রাজধানীতে বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্ত্তী ব্যাপারটির উপর স্বভাবতঃই গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। কিন্তু মন্ত্রী এই সংবাদ বাগুড়ীতে রাণীর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য্য বিশ্বস্ত দূত মারফত বাগুড়ীর নিকটবর্ত্তী ছাওনাপুর দুর্গের অধিপতিকে সৈন্যসমাবেশের আদেশ পাঠাইলেন। পরদিন গ্রীষ্মের শুষ্ক দামোদর সহজেই পার হইয়া ওসমান অগ্রসর হইতেই ছাওনাপুরের দুর্গস্বামী আক্রমণ সুরু করিলেন। রাণী স্বয়ং যোদ্ধবেশে সজ্জিতা হইয়া ১০০ হস্তী ও ৫০০ পদাতিক সৈন্য পরিচালনা করেন। তুমুল যুদ্ধের পর অধিকাংশ পাঠান-সৈন্য নিহত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ওসমান পুনরায় উড়িষ্যার পথে পলায়ন করিলেন। ইহার পর রাণীর রাজত্বকালে আর কেহ ভুরসুট রাজ্য আক্রমণ করিবার সাহস করে নাই। বাগুড়ী গ্রামের উত্তর দিকের যে ময়দানে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এখনও 'রায়বাঘিনীর পাড়া' নামে পরিচিত হইয়া আছে। এই স্থানটি তারকেশ্বর রেলপথের লোকনাথ ষ্টেশন হইতে চার মাইল দক্ষিণে এবং মার্টিন রেলের পিয়াসাড়া ষ্টেশন হইতে দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহারই এক মাইল পশ্চিমে ছাওনাপুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান।

পাঠান আক্রমণের বিরুদ্ধে রাণী ভবশঙ্করীর এই অভূতপূর্ব্ব ও অতুলনীয় শৌর্য্যের পরিচয় পাইয়া সম্রাট আকবর তাঁহাকে সসম্মানে 'রায়বাঘিনী' উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তিনি 'রাণী রায়-বাঘিনী' নামে রাজ্য শাসন করেন। শেষ বয়সে তিনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া কাশীধামে বাস করিতে থাকেন। সেখানেই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

মায়ামৃগ—শ্রীহীরালাল দাসগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম আড়াই টাকা।

বারোটি গল্পে এই বইখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। গল্পগুলি নিছক শিকার-কাহিনী নয়। লেখক মৃগয়ার সঙ্গে অরণ্যের মায়াজাল জড়াইয়া এক নূতন রাজ্যের পরিচয় দিয়াছেন। শহর বা শহরতলীতে যাঁহারা জীবন কাটাইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এই সকল অপরূপ কাহিনীর ক্ষেত্র, নায়ক-নায়িকা ও ঘটনা-পরিবেশ সবই স্বপ্নের মত অবাস্তব এবং সেইরূপই রোমান্টিক ঠেকিবে। যাহাদের ঐ রাজ্যের সহিত পরিচয় আছে তাঁহারাই বুঝিবেন লেখকের লেখনী কিরূপ সার্থক চিত্র দিয়াছে অরণ্যের বাস্তব ও অবাস্তব দুইয়েরই।

গল্পের মধ্যে কয়েকটি যথা "নিধন বা নিয়তি" "নৃশংস" ও "সাতপাঁওয়ার বাঘ" সত্য সত্যই রোমাঞ্চকর। আবার "অঘটন" আমাদের লইয়া যায় অবাস্তব অদৃষ্টের দিকে।

লেখা খুবই স্পষ্ট ও সরল, কোথায়ও লেখকের বিবরণ বা অভিব্যক্তি তাহার ক্ষুণ্ণ হয় নাই। হীরালালবাবুর লেখনী তাঁহার আগ্নেয়াস্ত্রেরই মত লক্ষ্যভেদে সমর্থ। বাংলায় এ জাতীয় মর্মস্পর্শী শিকারের বই খুবই কম।

ক. চ,

ঝড়ের সঙ্কেত—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

এক উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী ধনী যুবকের চিত্ত-পরিবর্তনের কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সর্বত্যাগিনী নারীর প্রেমের স্পর্শে এই পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে। প্রেমের শক্তিতে শোধন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে কলুষমুক্ত করার চিত্র বাংলা-সাহিত্যে অবশ্য নূতন নহে। শরৎচন্দ্রের একখানি অতি-খ্যাত উপন্যাসের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তথাপি সেই কাহিনীর সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসের কিছু পার্থক্যও রহিয়াছে—যদিও প্রকাশভঙ্গী এবং সংলাপ উহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভালবাসার কাহিনী; স্বল্প-প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বের মধ্যে তাহার বিকাশ ও পরিসমাপ্তি। আলোচ্য গল্পটি কিন্তু ঘর-বাঁধার রীতিকে লঙ্ঘন করিয়া মানুষের মঙ্গলকামনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। এইটুকু না থাকিলে উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকিত না।

কাহিনীর নায়ক আজন্ম-সঞ্চিত বিলাস-আরাম তুচ্ছ করিয়া বন্ধুর-পথে যাত্রার আয়োজন করিয়াছে। দুঃখ-বিপদকে তুচ্ছ করিয়া এই ভাবে মানুষের কল্যাণবোধ জাগ্রত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই ঝড়ের সঙ্কেত। গল্পের মধ্যে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

চরম চরিতার্থতা
শরতের নির্মল আকাশে
বৈরাগী মেঘ; বাতাসে
শেফালির স্নিগ্ধ নিমন্ত্রণ।
সোনায় পান্নায় বিচ্ছুরিত
দিগন্তে শরতের প্রসন্ন
মহিমা। রঙে রসে
মধুর এই যে উৎসব-
মুহূর্ত, হৃদয়ের আনন্দ-
গানেই এর চরম
চরিতার্থতা। তেমনি
রম্য রুচির চিরন্তন
বিলাস, রূপসাধনার
চরম চরিতার্থতা—
"লক্ষ্মীবিলাসে"।
লক্ষ্মীবিলাস তৈল
এম • এল • বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস : কলিকাতা-৯

গল্পটি আরম্ভ হইয়াছে নায়কের আত্ম-বিবৃতিতে। নিজ জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা এক বার নহে, বহু বার সে ব্যক্ত করিয়াছে, এবং সেই বিবরণ সুদীর্ঘও। যদি ঘটনার মধ্য দিয়া চরিত্র-বিকৃতির এই দিকটা প্রকাশ পাইত তাহা হইলে গল্পের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত সরস হইত। শুধু বিবৃতি নহে, দুটি জীবনের সংঘাত-সন্ধিক্ষণের সংলাপও দীর্ঘ, মেলোড্রামাটিক, এবং সুতীক্ষ্ণ। এই সুতীক্ষ্ণ সংলাপ দুটি বিপরীত-ধর্ম্মী। মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়া গতি-মন্থর কাহিনী পড়িবার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত রাখিয়াছে।

জীবনদোলায় (উপক্রম)— শ্রীসুধাকান্ত দে। প্রকাশক— শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ, ৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য আড়াই টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি মনস্তত্ত্বপ্রধান এবং কয়েকটি মাত্র চরিত্র ও স্বল্প ঘটনা লইয়া ডায়েরি আকারে রচিত হইয়াছে। প্রধান চরিত্র আপিসের বড়বাবু নীলকণ্ঠ—উদারপ্রকৃতি, অকৃতদার। তাঁহার ব্যর্থ প্রেমের অন্তর্নিহিত কামনা স্নেহের পাত্রী পাইয়া কি ভাবে সার্থক হইয়া উঠিল—তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কাহিনীর উপজীব্য। ভাষা সাবলীল, বর্ণনাভঙ্গীতে লালিত্য আছে। কিন্তু গল্পাংশ কম এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ সুদীর্ঘ হওয়ায় গল্প-পিপাসু পাঠককে খানিকটা নিরাশই করে।

ক্ষণকাল—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য-ভারতী প্রকাশনী। ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য তিন টাকা।

উপন্যাসখানি পড়িয়া মনে হইল লেখকের রচনার হাত মিষ্ট, গল্পও তিনি বলিতে জানেন। 'ক্ষণকালে'র মধ্যে নীড়রচনা ও নীড়ভাঙার আনন্দ এবং বেদনা তাঁহার তুলিকায় ধরা পড়িয়াছে। এটি স্বল্প-পরিমিত হইলেও সুন্দর। মনে হয় গল্পটি যদি ওই সৌন্দর্য্য-পরিমণ্ডলেই সম্পূর্ণ হইত। গল্পকে ঘটনার আবর্ত্তে টানিয়া আনিয়া লেখক অন্য পথ ধরিয়াছেন। অর্থাৎ, পল্লী-সংস্কারের রূপটিকে বিস্তৃত করিতে গিয়া সংসারের কঠিন উত্তাপে যে প্রেমের সুকুমার অঙ্কুর শুকাইয়া গিয়াছে তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। 'ক্ষণকালে'র মধ্যে এই দিকটিই ছিল প্রসারের দিক—রস-বিস্তারের দিক। শেষাংশে গল্পের গতি হইয়াছে দ্রুত—অনেকটা নাটকীয় সংঘাতে ভরা। তাহাতে দু'একটি চরিত্র হঠাৎ আসিয়াছে এবং মূল চরিত্র দুটি বাস্তবভূমি হইতে খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে। অবশ্য লেখকের পল্লী-জীবনের অভিজ্ঞতা গল্পের মধ্যে আছে এবং তাহাই বড় বড় বক্তৃতা বা নাটকীয়তা হইতে গল্পটিকে বাঁচাইয়াছে।

উপন্যাসের উপকরণ—শ্রীভোলা সেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য আড়াই টাকা।

বাংলাদেশের বহু পাঠক উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন, কিন্তু উপন্যাসের উপকরণ কি পরিমাণে তাঁহাদের চিত্ত রঞ্জন করিবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। যেমন সিনেমার ছবিটা দেখিতে চমৎকার হইলেও সে উপাদানে ও উপকরণে নির্ম্মিত হয় তাহা কোনমতেই চিত্তহারী নয়। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানি উপকরণের নামাবলী গায়ে জড়াইয়াও আসল বস্তুকে গোপন রাখিতে পারে নাই; শেষ পর্য্যন্ত এটি পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। এক বর্ষীয়ান সাহিত্যরসিক হয়তো বা সাহিত্যিকও গল্পটি বলিয়াছেন। তিনি উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে শেষ বয়সে এক মফস্বল-শহরে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন; উদ্দেশ্য একক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা। তাঁহার এই নিঃসঙ্গতা প্রথম ভঙ্গ করিল এক দল শিশু। তাহাদের অনুসরণ করিয়া শহরের কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে ঘটিল পরিচয়। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল উপকরণ-সংগ্রহের পালা। উকিল-গিন্নী, অতসী, অশ্রু, পূর্ণিমা, প্রভাত, বিভূতি, নগেন্দ্রবালা, সরি, তাহার পুত্র ও জামাতা মধুসূদন, মনোহর ও নরহরিবাবু এবং শিশু বিশ্বরূপ ও ইন্দ্রিল—কত উপকরণই না সংগৃহীত হইল! কিন্তু যতই সংগ্রহের পালা ভারী হয় এবং গল্প শেষ হইয়া আসে ততই এই চরিত্র ও তাহাদের আচার-আচরণ আর উপকরণ থাকে না—অখণ্ড একটি উপন্যাসের সূত্রে গ্রথিত হইয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাহক হইয়া দাঁড়ান কাহিনীর নায়ক।

বাংলা উপন্যাসে এই গল্প-গ্রন্থন-রীতি কতকটা অভিনব। চরিত্রগুলি উপকরণ হইয়াও এক একটি স্বতন্ত্র মণির মত দ্যুতিময়। ইহারা সকলে মিলিয়া একটি গল্প তো বলিয়াছেই—প্রত্যেকের মধ্যেও এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের সম্ভাবনাও যেন রহিয়াছে। কুশলী শিল্পী না হইলে এতগুলি মণি-মাণিক্যকে মাল্যাকারে গাঁথিয়া তোলা সম্ভব নয়। লেখায় লেখকের হাত পাকা। সরস পরিমার্জ্জিত বাগ্-বিন্যাসে রচনাটি আদ্যন্ত সমুজ্জ্বল। পড়িতে পড়িতে রসস্রষ্টা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে।... লেখার মধ্যে শিশু-মনস্তত্ত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। বিশ্বরূপ ও ইন্দ্রিলের চরিত্রবর্ণনা মনকে নির্ম্মল বাৎসল্যরসে আপ্লুত করিয়া তোলে।

পরিশেষে একটি কথা—"আজকাল আর্টের বাজারে 'ফাউ' সিষ্টেম উঠে" গেছে বলিয়া লেখক যে মন্তব্য করিয়াছেন—তাহারই জের পর পৃষ্ঠায় না টানিলেই কি ভাল হইত না?

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—ভারত-সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮০। মূল্য আট আনা।

ভারতের স্বাধীনতা লব্ধ হইবার পরবর্তী জনকল্যাণমূলক কার্যসমূহের মধ্যে সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। জাতির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষকল্পেই এই কার্যক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার সাফল্যের উপর দেশের উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে।

এই বিরাট উন্নয়ন-কার্যের মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ২০৬৯ কোটি টাকা। সম্প্রতি ব্যয়ের পরিমাণ আবার সংশোধন করিয়া বাড়ানো হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ব্যয়নির্বাহার্থে কেন্দ্রীয় সরকার ১২৪১ কোটি টাকা এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি ৮২৮ কোটি টাকা দিবেন—এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বরাদ্দ ৬৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এই অর্থের মধ্যে ৭৩৮ কোটি টাকা রাজস্ব হইতে, ৫২০ কোটি টাকা ঋণ করিয়া, ইংলণ্ডে গচ্ছিত ষ্টার্লিং হইতে ২৯০ কোটি এবং বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে ১৫৬ কোটি—মোট অর্থের পরিমাণ ১৭০৪ কোটি টাকা। আর বৈদেশিক সাহায্য না পাওয়া গেলে বাকি ৩৬৫ কোটি টাকা কর বসাইয়া কিংবা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে।

এই বিরাট পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ অর্থ ভূমির উৎপাদনবৃদ্ধি, জলবিদ্যুৎ-শক্তি-সম্প্রসারণ, বনসম্পদ, ভূনিম্ন-সম্পদবৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প, রাস্তা, রেলপথ, জাহাজ এবং বন্দর নির্মাণ ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্য এবং গৃহ, শিক্ষাবিস্তার, অনুন্নতের সাহায্য, বেকারের কর্মসংস্থান প্রভৃতি বহু কার্যে নিয়োজিত হইবে। চিত্তরঞ্জনে রেলের ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা, সিন্দ্রীর সারের কারখানা, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা এবং আরও বহু ছোট বড় জন-কল্যাণমূলক কার্যসূচী এই বিরাট পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে আর্থিক পরিকল্পনার যুগ আরম্ভ হইয়াছে বলা চলে। এ বিষয়ে অবশ্য প্রথম পথ দেখাইয়াছে সোভিয়েট রাশিয়া। জনগণের সহযোগিতা ছাড়া গণতন্ত্রী ভারতের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না, এজন্য পরিকল্পনার সাফল্যে জনগণের যে বিরাট কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা সকলের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শুধু পুস্তিকাপ্রকাশ দ্বারা ও বেতার মারফতে নহে, সাময়িক পত্রিকায়, স্কুল-কলেজে, সভাসমিতিতে গ্রামগৃহে সর্বত্র ইহার আলোচনা হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। এই বিরাট পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিলে প্রত্যেকে লাভবান হইবে—আজ না হইলেও অদূর ভবিষ্যতে হইবেই, এই ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল হওয়া উচিত। এরূপ পুস্তিকার বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন।

কংগ্রেস স্মারক-গ্রন্থ—৫৯তম অধিবেশন— কংগ্রেস-ভবন, ৫৯-বি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯২। মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকখানি কল্যাণী কংগ্রেস উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার আলোচ্য বিষয়গুলি হইতেছে : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও বাংলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও প্রাক্কালিক গণজাগরণ, ১৯২১ সালের পূর্বে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গদেশ এবং ১৯২১ সাল হইতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম, অর্থনৈতিক কাঠামো বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং ১৯৫৩-এর সালতামামি হিসাব-নিকাশ। সংক্ষেপে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের, তথা বাংলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে. উপরন্তু ইহাতে বাংলার সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক অবস্থার চিত্রও সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশিষ্ট নেতাদের চিত্র এই পুস্তকের সৌষ্ঠববৃদ্ধি করিয়াছে। বাংলাদেশের ইংরেজী সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস-সভাপতিগণের নামের তালিকা পুস্তকের শেষে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"দেখছেন, আমার তোয়ালে কত সাদা ? কেন জানেন তো—সানলাইটে কাচা হ'য়েছে ব'লে। দ্রুত-ফেনিল সানলাইটের ফেনা ময়লা নিংড়ে বার ক'রে দে'য়। সানলাইট দিয়ে কাচলে আপনার কাপড়-চোপড় ঝকঝকে সাদা হ'য়ে যায়, তার কারণ সেগুলি ঝকঝকে পরিষ্কার হয় ব'লে।"

"সাঁতারের পর শরীর যেমন ঝর-ঝরে বোধ হয় তেমন আর কিছুতে হয় না। তেমনি সানলাইট সাবানে কাচার মতন আর কিছুতেই রঙিন কাপড়-চোপড় অত ঝকঝকে হয় না। সানলাইটের সরের মতো ফেনা না আছড়ালেও ময়লা বের ক'রে দেয় আর সানলাইটে কাচা কাপড় টেঁকেও আরও বেশীদিন।"

221-X52 BG
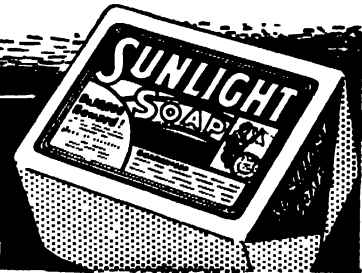
পুনর্ভব—শ্রীসুবোধ বসু। জিজ্ঞাসা, ১৩৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য আড়াই টাকা।

লেখক উপন্যাস, নাটক ও গল্প লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি উপন্যাস। একটি পুত্রহারা নারীকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনীর সূত্রপাত। রায়বাহাদুর-পত্নী রাণী দেবী তাঁহার একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া যখন শোকে পাগলিনীপ্রায় এমনি সময়ে তপন নামে একটি অজ্ঞাতকুলশীল বালক তাঁহার মৃত পুত্রের স্থান দখল করিল। তপন বস্তি হইতে ধনীর প্রাসাদে স্থান পাইলেও সেখানে তাহার মন বসিতেছিল না। কিন্তু রাণী দেবীর স্নেহ এবং তাঁর কন্যা উমার অকৃত্রিম ভালবাসা শেষ পর্য্যন্ত তপনের মনকে জিতিয়া লইল। হাসি-আনন্দে তাহাদের দিন কাটিতেছিল, কিন্তু গোল বাধিল উমার বন্ধু নীলাকে লইয়া। নীলা এবং তপন পরস্পর পরস্পরকে অনুরাগের চোখে দেখিলেও রাণী দেবী যখন নীলাকে পুত্রবধূরূপে পাইতে চাহিলেন, নীলার বাবা তখন সোজাসুজি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বসিলেন। নাম-গোত্রহীন একটি ছেলেকে তিনি জামাতৃরূপে গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইলেন। নীলা অন্তরে আঘাত পাইলেও পিতার অবাধ্য হইতে পারিল না, ওদিকে তপন রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোতে পা ভাসাইয়া দিল এবং শেষ পর্য্যন্ত পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইল। এই ঘটনায় নীলার স্নেহময় পিতা কন্যার মনের নিগূঢ় কথাটি টের পাইলেন এবং নিজের মত পরিবর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। কাহিনীটি মোটামুটি এই। খাঁটি শিল্পীর হাতে পড়িলে অতি সাধারণ জিনিষও যে কত সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে তাহার প্রমাণ লেখক এই উপন্যাসে দেখাইয়াছেন। অনাবশ্যক বিষয়ের অবতারণা করিয়া কাহিনীকে কোথাও অনাবশ্যকভাবে জটিল করিয়া তোলা হয় নাই। চরিত্রগুলি হাল্কা তুলির টানে নিপুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।
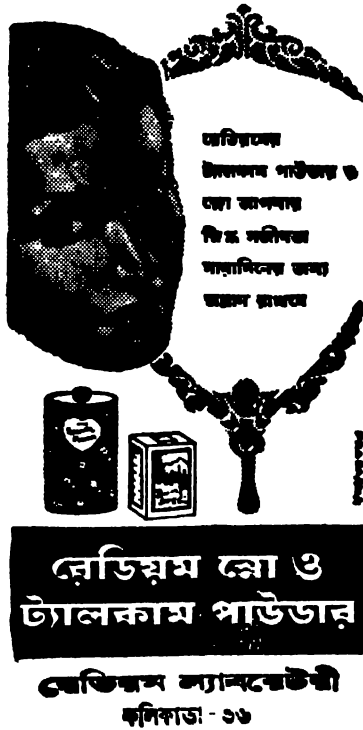
পুস্তকখানি যে পাঠকমহলে বিশেষ সমাদরলাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পারিবারিক প্রার্থনামালা—৺মন্মথনাথ নন্দী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ নন্দী। মূল্য এক টাকা।

জেমস্ মার্টিনোর *Home Prayers* নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদক শিলং ব্রাহ্মসমাজের এক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। যে মূল গ্রন্থখানির অনুবাদ তিনি করিয়াছেন সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য-মাত্র। এক সময় জেমস্ মার্টিনো ও স্কটল্যাণ্ডের দার্শনিকবৃন্দ ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত সমাজের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদের চিন্তাধারাকে ও অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসাকে নিয়মিত করিত।

অনুবাদক মূলের ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং অনুবাদের স্বচ্ছতায় তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও
লাবণ্যময়
ত্বক্
ক্যাডিলযুক্ত
রেক্সোনাকে
আপনার
জন্য এই
যাদুটি করতে
দিন
রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
★ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ্ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona
Rexona

অনটন—শ্রীকুমুদকান্ত চক্রবর্ত্তী। সৃজনিকা, কাশী ষ্টুডিও, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম দশ আনা।

দেশের বর্ত্তমান দুঃখদৈন্য অভাব অনটন অবলম্বনে রচিত নাটিকা। দারিদ্র্য, অবিচার, চোরাবাজার, বন্যা, হত্যা ইত্যাদির অতিরঞ্জিত চিত্র। কাহিনীতে সত্যের আংশিক ছায়া পড়িলেও তাহা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণিত নর-নারীর অন্তর্জীবন মোটেই ফোটে নাই। তথাপি মানুষের দুর্ভাগ্যের কাহিনীতে পাঠক কিঞ্চিৎ বেদনাবোধ করেন।

ঢেউ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। গুরুদাস ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৭২, হ্যারিসন রোড। কলিকাতা-৯। দাম দুই টাকা।

প্রথম পর্যায়ে আসামের চা-বাগানের অভিজ্ঞতা—কুলিদের পারিবারিক জীবনের ছবি—তাহাদের অসংযম, উদারতা, সারল্য সুন্দর ফুটিয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পূর্ব্ববঙ্গের—বিশেষ করিয়া বিক্রমপুর অঞ্চলের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অনুভূতি-স্পর্শে রচনা হৃদয়গ্রাহী। ভাষা ও বানানের ত্রুটি মধ্যে মধ্যে চোখে পড়িল ; যেমন, 'বেপথু হওয়ার দোষারোপ' (পৃ. ১৮), 'পুর্ণোদ্দম' (পৃ. ৩০), 'চঞ্চলময় দিন' (পৃ. ১২৭) ইত্যাদি ; তাহা সত্ত্বেও একটি অকপট সুকুমার চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া বইখানি মোটের উপর ভাল লাগে।

ঊষা-গৈরিক—শ্রীবিশ্বরূপানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দেবী প্রকাশনী, ৫৮।৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা।

সাধনা অপেক্ষা প্রকাশের আগ্রহ আজকাল বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতার বইখানিও তাহার দৃষ্টান্ত। ভাব নাই এমন নহে, কিন্তু তাহাকে উপযুক্ত ভাষায় ও ছন্দে বাঁধিবার কৌশল কবির অনায়ত্ত। গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্ব্বে উহা শিখিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হইত। পরিচ্ছন্নভাবে সভায় উপস্থিত হওয়াই সামাজিক রীতি। মনের ভাবকে পাঠক-সমাজে উপস্থিত করিতে হইলে তাহার বেশভূষার কথাও ভাবিতে হয়।

নির্ঝরসঙ্গীত—প্রোজ্জ্বলনীহার ভারতী। ৩।১এম্, ছিদাম মুদী লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য এগার আনা।

নির্ঝরধারার মতই কবিতাগুলি সহজ ও স্বচ্ছন্দ। অল্পদিনের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ইহার সমাদরলাভের প্রমাণ।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে হিন্দুমুসলমান—প্রমথ চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-৭৩। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

"যেমন সাদা—তেমন বিশুদ্ধ—

লাক্স টয়লেট সাবান—

কি সরের মতো সুগন্ধি ফেনা এর।"

বনানী চৌধুরী

বলেন।

লাক্স টয়লেট সাবান এত সাদা হবার কারণ কি ? কারণ ইহা তৈরী ক'রতে কেবল সবচেয়ে বিশুদ্ধ তেল ব্যবহার করা হয়। "এক লাক্স টয়লেট সাবানেই আমার সৌন্দর্য্য প্রসাধন সম্পূর্ণ হয়" বনানী চৌধুরী বলেন। "এর সরের মতো সক্রিয় ফেনা লোমকূপের ভেতর পর্য্যন্ত গিয়ে পরিষ্কার ক'রে আমার ত্বককে রেশমের মতো কোমল, ও নির্ম্মল করে দে'য়। রোজ লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করে আপনার মুখশ্রী সুন্দর রাখুন। এর সুগন্ধও আপনার খুব ভালো লাগবে।"

সুখবর !

নতুন

বড় সাইজ

সারা শরীরের সৌন্দর্য্যের জন্য

এখন পাওয়া যাচ্ছে

আজই কিনে দেখুন।

"...সেইজন্যই ত আমি আরও পরিষ্কার ও ঝরঝরে মুখশ্রীর জন্য লাক্স টয়লেট সাবানের ওপর নির্ভর করি!"

★ চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান ★

LTS. 427-X52 BG

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ উপলক্ষ করিয়া রচিত হইলেও ইহার স্থায়ী মূল্য আছে। পুরাতন বঙ্গসাহিত্য হইতে যাঁহারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সন্ধান করেন, বইখানি তাঁহাদের কাজে লাগিবে। আর রচনাভঙ্গীর তো কথাই নাই। সাহিত্য-রসিক পাঠক ভাষার ইন্দ্রজালে মুগ্ধ না হইয়া পারিবেন না। লেখক দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে চাহিয়াছেন, "প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রসাদে আমরা এ সত্যের পরিচয় পাই যে, বর্ত্তমানে হিন্দুমুসলমানের ধর্ম্ম-বিরোধ যদি একটা জাতীয় মহা সমস্যা হয়ে উঠে থাকে তো সে সমস্যা আমরা উত্তরাধিকার-স্বত্বে লাভ করি নি।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়—স্বামী সত্যানন্দ গিরি প্রণীত এবং সেবায়তন—ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৸৹+৫৪। মূল্য বার আনা।

অবিশ্বাস ও অনাচারের প্লাবন যখন দেশকে নিমজ্জিতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দীর্ঘকাল রাজকীয়-কর্ম্মে নিয়োজিত সদারাপত্য গৃহী লাহিড়ী মহাশয় সদ্গুরুলাভে 'ক্রিয়াযোগ সাধনায়' সিদ্ধ হইয়া ঋতসাধ্য, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি, যৌগিক বিষয়াদি অতীব সহজ প্রণালীতে কার্য্যকরী করতঃ জগন্মঙ্গল প্রতিষ্ঠার ধারা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে চিরন্তন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধ জীবনের অধিকাংশই কাশীধামে কাটিয়াছে; পূজ্যপাদ ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রমুখ মহাপুরুষগণ তাঁহাকে উচ্চ গৌরব দান করিতেন। গ্রন্থকার এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের প্রশিষ্য শ্রীমদ্ যোগানন্দ পরমহংসের অন্যতম শিষ্য। তিনি অতীব শ্রদ্ধাভরে তাঁহার গুরুদেবের প্রতিভাময় যোগৈশ্বর্য্যপূর্ণ জীবনালেখ্য সংক্ষেপে মাত্র ছয়টি অধ্যায়ে নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্ম্মপিপাসুদের নিকট গ্রন্থখানি যে আদৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	হইবে না	হইবে
১০	১	২	কোন মাকেই	কোন মায়েই
৫৭	২	১৬	কামনা মন্দিরে	কামনা-মন্দির
„	„	১৭	তৃণহারা	ভুবনহারা
৫৮	„	২০	রহিল না সে গৃহদ্বারে	রহিল না আর সে গৃহদ্বারে

দেশ-বিদেশের কথা

উত্তমাশ্রম, বাঁকুড়া

১৩২৯ সালে আচার্য্য স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজের গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ মহিমানন্দ মহারাজ বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত জাতীয় বিদ্যালয় অমর-কাননের সন্নিকটে কড়-পাহাড়ের উপর উত্তমাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৫ সালে মহিমানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর হইতে ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমের তৎকালীন আচার্য্য ঐ আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। ১৩৫১ সালে স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরির দেহত্যাগের পর বর্ত্তমান আচার্য্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ গিরি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং স্বামী পূর্ণানন্দ গিরির সহযোগিতায় উক্ত আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। আশ্রমটির উন্নতিবিধানের জন্য প্রভূত চেষ্টা হইতেছে। আশ্রমে ঠাকুরঘর, গেষ্ট হাউস প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে পাহাড়ের নিম্নদেশে একটি কূপ খনন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জলাভাব দূর না হওয়ায় সরকারী অর্থানুকূল্যে পাহাড়ের উপরিভাগে আরও একটি ইঁদারা খনন করা হইতেছে। সরকার ঐ ইঁদারা খননের জন্য দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আশ্রমের সর্ব্ববিধ উন্নতিমূলক কার্য্যে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শ্রীগোবিন্দ-প্রসাদ সিংহ মহাশয় নানা ভাবে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন।

মহিমানন্দ মহারাজের ইচ্ছা ছিল পাহাড়ের উপরিভাগে অষ্টভুজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার ব্যবস্থা করা। সম্প্রতি স্বামী
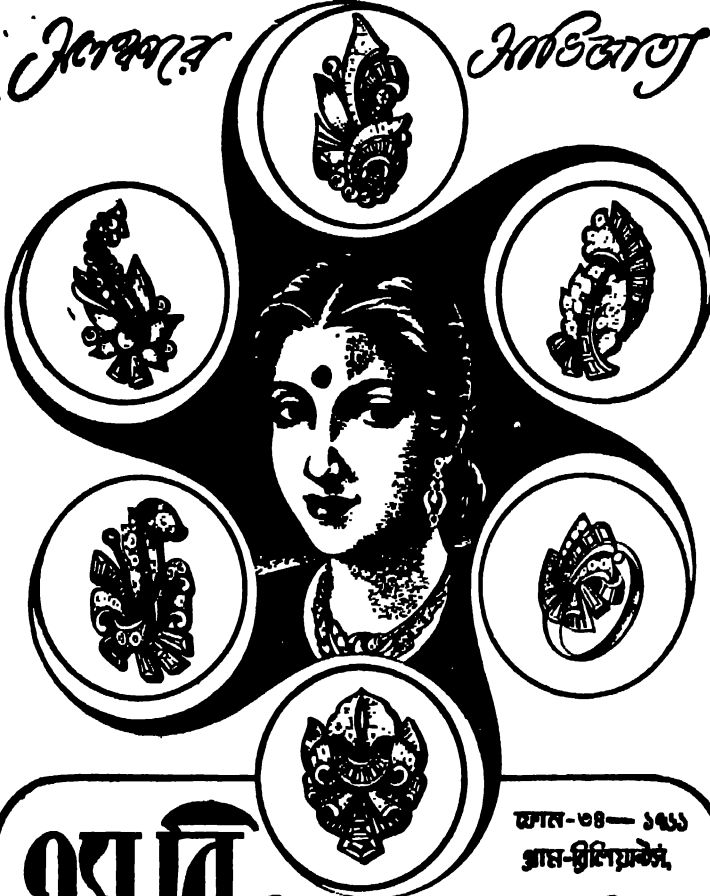
পূজা মাঙ্গলিক
সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,—শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষকে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,—আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।
দানের আনন্দ একান্ত ভাবেই আপনার, আর আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের।
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড।
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

চীনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

পিকিঙের 'সামার প্যালেসে' শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সহ পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু

পিকিঙের 'সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট ফর ন্যাশনালিটিজে'র বৌদ্ধ ছাত্রদের প্রার্থনা গৃহে পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৪শ ভাগ
২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার মধ্যবিত্তের অধোগতি

সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ কলিকাতার সংবাদপত্রে প্রায়ই স্থানীয় দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। এভাবৎ বহুসংখ্যক লোক পুলিসে ধরিয়াছে এবং এখনও ধরিতেছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের সংখ্যা বহুশত। কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চল ঐ শ্রেণীর যুবক ও মধ্যবয়স্ক লোকের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শেষে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে সচেতন করায় পুলিস এই কাজে তৎপর হয়। প্রথম গতানুগতিক ভাবে কাজ চলিয়াছিল। সম্প্রতি একজন দক্ষ ও যোগ্য উচ্চ কর্ম্মচারী ইহাতে নিযুক্ত হওয়ায় কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং উৎপাত কিছু কমিয়াছে।

নাগরিকের জীবন যাহারা এতদিন নির্ব্বিবাদে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছিল তাহাদের দমন ও শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে। প্রথমতঃ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাত বৎসর পরে কলিকাতার মত মহানগরীতে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় কিরূপে? তবে কি শান্তি-শৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত যাঁহারা, তাঁহারা মুখ্যমন্ত্রীর তাড়না ভিন্ন একাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আবশ্যকতা দেখেন নাই? দ্বিতীয়তঃ এতগুলি মহানগরীর মধ্যে কলিকাতাতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদিগের এইরূপ অধঃপতন হইল কেন?

দুইটি প্রশ্নই বিশেষ বিচারযোগ্য। কিন্তু বর্ত্তমানে দ্বিতীয়টির উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ এক দল অবিবেচক হঠকারীর মতবাদ প্রচারের ফলে ঘৃণা ও অবহেলার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ জগতের মানবসমাজের সকল উন্নতি ও সর্ব্বমুখী প্রগতির উৎস এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এমনকি এই যে অপরূপ শ্রেণীসংঘাতমূলক মধ্যবিত্ত উচ্ছেদনীতি আজ এক দল রাষ্ট্রনীতি-প্রচারকের মূলমন্ত্র তাহারও উদ্ভব ঐ ঘৃণ্য "বুর্জ্জোয়া" শ্রেণীর সন্তান হইতে। যে সকল দেশে ঐ মতবাদ প্রবলতম সেখানেও অধুনা নূতনরূপে ঐ মধ্যবিত্তই দেখা দিয়াছে—ভিন্ন নামে।

বিদেশে যাহাই হউক, পশ্চিম বাংলায় ঐ শ্রেণীর অধোগতির অর্থ বাঙালী জাতির ধ্বংস, সুতরাং রোগের নির্ণয় ও তাহার প্রতিকার এখন অত্যাবশ্যক।

আমরা দেখিতেছি, এখন কলিকাতার নৈতিক আবহাওয়া অতিশয় কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে কোনও শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ বেকার থাকিলেই তাহার মানসিক ও নৈতিক অধোগতি অনিবার্য্য। অথচ যেভাবে দেশের ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে সকল পরিকল্পনা কলিকাতাকেই কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে। বলা বাহুল্য, তাহাতে ব্যয়বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোনও উপকার সম্ভব হইবে না।

পশ্চিম বাংলার জেলা অঞ্চলের নগর ও গণ্ডগ্রাম বাসোপযোগী এবং জীবিকানির্ব্বাহের কেন্দ্র রূপে পুনর্গঠিত না হইলে বেকার-সমস্যা বা নৈতিক সমস্যা দুইয়ের একটিরও সমাধান সম্ভব নহে ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা। বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বাঙালী যুবক ও যুবতীর কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর উপর আসক্তি দূর হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। এখানকার বিলাস-ব্যসন ও উদ্দাম চালচলন তাহাদের দেহমনকে দুর্ব্বল এবং কলুষিত যেভাবে করিতেছে তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন! অথচ এই কলিকাতার বাহিরে উচ্চশিক্ষা প্রায় অসম্ভব এবং বাস ও জীবনযাত্রাও সেখানে দুর্ব্বহ!

দামোদর উপত্যকা-জাতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায় নগর ও গণ্ডগ্রামের উন্নতি আয়ত্তের ভিতর আনিতেছে। এখন ঐ সকল জেলার সদর ও মহকুমার প্রধান অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধার অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙালীর প্রত্যেক শ্রেণীরই শিকড়ের গোড়া ঐ সকল জেলায়। কলিকাতা তাহাদের উপনিবেশ মাত্র। গোড়ায় জল না দিলে শাখা-প্রশাখা বাঁচিবে না। বাঙালীকে আদি ভিটায় ফিরাইতে হইবে।

বেকার-সমস্যা

বেকার-সমস্যা সারা ভারতেই জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রতি রাজ্যে ইহা সমান নয় এবং সমস্যা পূরণের পথও একই প্রকার নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিখিল ভারতীয় সমস্যাগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম এবং সেই কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ এ বিষয়ে কি ব্যবস্থার কথা ভাবিতেছেন তাহা জানা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত সংবাদে তাহার কিছুটা আমরা বুঝিতে পারি:

"নয়াদিল্লী, ১১ই নবেম্বর—দেশের বেকার-সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ একটি ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের

সুপারিশ • করিয়াছেন। যাহাতে কার্য্যকরীভাবে বেকার-সমস্যা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা যায়, তজ্জন্য বেকার-সমস্যার প্রচলিত সংজ্ঞার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলিয়াও পরিষদ অভিমত প্রকাশ করেন।

"গতকল্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠক সমাপ্ত হইয়াছে। দেশের বেকার সমস্যা সম্পর্কে এই বৈঠকে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহাদিগকে গুরুতর অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইতেছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে বেকারের সংখ্যা কত ছিল, এখনই বা কত, তাহার সঠিক বিবরণ তাঁহাদের কাছে নাই। ইহার ফলে বেকারদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, অথবা সমস্যা আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা না থাকায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে কত নূতন লোকের কর্ম্মের সংস্থান হইয়াছে তাহাও তাঁহারা বলিতে পারেন না। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফত প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায় যে, দেশের কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি হয় নাই।

"ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৫,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই পরিকল্পনা কমিশন ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার তাঁহাদের কর্ম্মপন্থা স্থির করিবেন। এই মোট টাকার মধ্যে সরকারী কার্য্যে ৩০০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী কার্য্যে আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে।"

আড়াই হাজার কোটি টাকা বেসরকারি উদ্যোগে নিযুক্ত হইলে বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হয় যদি ঐ বিনিয়োগে সুবুদ্ধি ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে—যে দুইয়েরই অভাব আমরা এখন দেখিতেছি।

গতকল্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে শ্রীনেহরু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "বেসরকারী প্রয়াসকে আমরা উৎসাহ দিতে চাই বটে, তবে সরকারী প্রয়াসকে অধিকতর উৎসাহদানই আমাদের লক্ষ্য।"

"শ্রীনেহরু বলেন যে, ১৯৪৮ সনে শিল্প সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল বর্ত্তমানে তাহার সংশোধন আবশ্যক।

পরিষদে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কতকগুলি বিষয় উত্থাপন করেন।

পরিকল্পনা কমিশনের পত্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া শ্রী কে. সি. নিয়োগী বলেন যে, বৃহৎ শিল্পকারখানাগুলির পরিচালনার ভার রাজ্য সরকারের হাতে না আসাই বাঞ্ছনীয়। বৃহৎ শিল্প-পরিকল্পনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারেরই গ্রহণ করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি অথবা জাতীয় উন্নয়ন কর্পোরেশনের মারফত এইগুলির পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বেকার-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বলেন যে, সমস্ত 'ক' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায় যে, পল্লী ও শহর অঞ্চলে কর্ম্মসংস্থানে সমস্যার অবনতি ঘটিয়াছে। পঞ্জাব, হায়দরাবাদ ও মহীশূরে অবস্থার সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কলিকাতাস্থ ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা বেকার-সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ভার লইয়াছেন। কাজেই তিনি আশা করেন যে, তাঁহারা এ সম্পর্কে শীঘ্রই সঠিক বিবরণ পাইবেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রীদেশমুখ বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নহে, কারণ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা এ সম্পর্কে কোন রিপোর্ট পান নাই। কাজেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ঠিক কত টাকা পাওয়া যাইবে তাহা এখন কেহই বলিতে পারেন না। তবে পরিকল্পনা কমিশন এই কাজের জন্য সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।"

শ্রমিক ও মালিক

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে অহি-নকুল সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহার মূল কথা উভয় পক্ষেরই শিক্ষা ও বিবেচনার অভাব। কিন্তু পরোক্ষ হইলেও বর্ত্তমানে রাজনীতির কুটচক্রান্ত এখন ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

পণ্ডিত নেহরুর মতামত কে পড়িবে কে শুনিবে জানি না, তবে ঐ উপদেশ গ্রহণের পূর্ব্বেও উহার বিবেচনা নিতান্তই প্রয়োজন। একদল উহাকে স্তোকবাক্য বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কেননা ঐ উপদেশ গ্রহণে তাঁহাদের বিপদ।

শ্রমিক ও মালিকের বিরোধে "উলুখড়" অর্থাৎ জনসাধারণ মরে। আমরা সেই আমাদের মত সাধারণ জনের প্রণিধানের নিমিত্ত পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতি নীচে দিলাম:

"নয়াদিল্লী, ১২ই নবেম্বর—আজ এখানে শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু বলেন, যুদ্ধ যেমন কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, তেমনি লক-আউট ও ধর্ম্মঘটের দ্বারা কোন সমস্যারই মীমাংসা করা যায় না। শ্রমিক ও মালিকদিগকে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব করিলে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। আস্থার ভাব সৃষ্টি করিতে পারিলে তবেই ন্যায়সঙ্গত ভাবে সমস্যাবলীর সমাধান হইতে পারে।

শ্রীনেহরু আরও বলেন, এতদিন পর্য্যন্ত হয় শ্রমিক কিম্বা পুঁজিপতির দৃষ্টিতে সমস্যাগুলি দেখা হইয়াছে; তাই সমাধানের চেষ্টা করিতে গিয়াও সমস্যা থাকিয়া গিয়াছে। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন প্রয়োজন—এমনকি, মন্দগতিতে পরিবর্ত্তন হইলেও তাহা বাঞ্ছনীয়। ভারত একে দরিদ্র দেশ, তাহার উপরে সম্পদের অভাব। বহু বিরোধ আপনা হইতেই দেখা দেয়। তবু সম্পদ বণ্টনের দ্বন্দ্ব মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে সম্পদ সৃষ্টি করিতে হইবে। কারণ সম্পদ থাকিলে তবেই ত তাহা ভাগ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য—উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি। সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারিলে জীবনযাত্রার মান এবং সেই সঙ্গে দেশবাসীর অবস্থার উন্নতি করা যাইবে।

শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্বের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হইয়া থাকে,

এ কথা শ্রমিক ও মালিকদের ভালভাবেই মনে রাখা উচিত। আমাদের অনেক সমস্যা অমীমাংসিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সহযোগিতার মনোভাব লইয়া একযোগে কাজ করিতে না পারিলে আমরা আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব না। আমরা বিরোধ মীমাংসার জন্য অনেক আইন করিয়াছি ; কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, পারস্পরিক বুঝাপড়ার দ্বারাই বিরোধ মীমাংসা করা যায়, লক-আউট বা ধর্মঘট দ্বারা নয়।

শিল্পবিপ্লবের সময় হইতে শ্রমিক সমস্যাবলীর ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, শ্রমিকদিগকে কিরূপ অসুবিধার মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছে। এমন সময়ও ছিল যখন শ্রমিক-শোষণের অন্ত ছিল না এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ ছিল। অতি গোপনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য শ্রমিকেরা মিলিত হইত এবং ধরা পড়িলে তাহারা বহিষ্কৃত হইত। সে দিন চলিয়া গিয়াছে। সবকিছুই অতীতের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম যুগে শ্রমিকদিগকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা ইউনিয়ন গঠন ও ধর্মঘটের অস্ত্র দ্বারা তাহাদের শক্তি উপলব্ধি করিয়াছে। শত বৎসরের ইতিহাস ও শ্রমিকদের ত্যাগের কথা মনে রাখিয়া বর্ত্তমান যুগে ধর্মঘট সম্বন্ধে শ্রমিকদের সহিত আলোচনা করা উচিত।

কিন্তু যুদ্ধ যেমন কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, তেমনি অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার মীমাংসা করা যায় না। লক-আউট ও ধর্মঘট শিল্প সমস্যাবলীর সমাধানের উত্তম পন্থা, কিন্তু শ্রমিক ও মালিকদের একথা মনে রাখা উচিত বর্ত্তমান ভারতে উক্ত প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ অন্যায় ও অবাঞ্ছনীয়। সমস্যার সমাধানের জন্য নূতন অস্ত্র নির্ম্মাণ করা উচিত। তবেই দেশে প্রগতি দেখা দিবে।

বিরোধ মীমাংসার জন্য আমরা অনেক আইন করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে আমরা আরও আইন প্রণয়ন করিব। কিন্তু আইনেরও ত একটা সীমা আছে। যাহাই হউক, ভারতে দুইটি পরস্পরবিরোধী শিবির নাই। শ্রমিক, মালিক ও নেতাদের স্বার্থ এক—কারণ প্রত্যেক উৎপাদনকারীই পণ্যক্রেতা। সুতরাং প্রত্যেকের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমার এমন একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা উচিত যাহার ফলে সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে।

গত কয়েক বৎসরে ভারতে খুব কমই শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, ইহা সত্যই আনন্দের বিষয়। উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায়-সঙ্গত সম্পদ বন্টনের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সাম্প্রতিক চীন পরিদর্শনের উল্লেখ করিয়া বলেন, দশ দিনের মধ্যে এত বড় দেশ সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমি চীনে গঠনমূলক কার্য্যের একটি আবহাওয়া লক্ষ্য করিয়াছি। অথচ ভারতে তাহার পরিবর্ত্তে দেখি কথাবার্ত্তার মধ্যে পরাজিতের মনোভাব। এই মনোভাব দূর করিয়া আমাদের প্রত্যেককে কঠোর কর্ম্ম ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।"

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক সঙ্গতি

গত তিন বৎসরে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির পরিকল্পনা খাতে মোট ৮৮৫ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেন্দ্র খরচ করিয়াছে ৪৪৪.৯ কোটি টাকা এবং প্রদেশগুলি করিয়াছে ৪৩৯.৯ কোটি টাকা। এই খরচ পাঁচ বৎসরের পরিকল্পিত খরচের শতকরা মোট ৪০ ভাগ মাত্র। যে ৮৮৫ কোটি টাকা আজ পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে, তাহার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ (৫৩৫ কোটি টাকা) বাজেট উদ্বৃত্ত হইতে পাওয়া গিয়াছে। চলতি রাজস্বের উদ্বৃত্ত, সরকার-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির আয়, সরকারী ঋণ, স্বল্প জমা প্রভৃতি বাজেট উদ্বৃত্তের মধ্যে ধরা হইয়াছে। বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ খরচ করা হইয়াছে (১৩১ কোটি টাকা) এবং বাকী শতকরা ২৫ ভাগ খরচ (২১৮ কোটি টাকা) সরকারী আমানত, সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণ দ্বারা করা হইয়াছে।

পাঁচ বৎসরে মোট খরচ হইবে ২০৬৯ কোটি টাকা। পরে পরিকল্পনার মোট খরচ ১৮০ কোটি টাকার মত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, যদিও এই বাড়তি খরচ সবটাই ঘাটতি আমানত দ্বারা হইবে। মোটের উপর, রাজস্ব উদ্বৃত্ত এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির আয় যদিও পরিকল্পনা অনুযায়ী হইতেছে না, কিন্তু সরকারী ঋণ এবং স্বল্প ব্যায়বৃত্তির (small savings) পরিমাণ আশানুরূপ হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাবে পাঁচ বৎসরে ১১৫ কোটি টাকার মত সরকারী ঋণ উঠিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে ; কিন্তু সম্প্রতি যে জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ তোলা হইয়াছে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫০৷ কোটি টাকায়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্প্রতি আরও ৫০ কোটি টাকায় দ্বারা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রস্তাবিত খরচের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২,২৯০ কোটি টাকায়। পাঁচ বৎসরের শেষে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,২০০ কোটি টাকায়। ইহার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য মোট পাওয়া যাইবে ২২৮ কোটি টাকার মত এবং অবশিষ্ট ঘাটতি দাঁড়াইবে ৯৭৫ কোটি টাকায় এবং ইহার কতকাংশ জমা ষ্টার্লিং ব্যালান্স হইতে খরচ করা হইবে। তাহা হইলেও শেষ পর্য্যন্ত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে মোট নির্দ্ধারিত খরচের শতকরা ১২৷ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ৬৮৫ কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবে এবং ইহার সবটাই অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া মিটানো হইবে।

এই ত গেল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিণতি। টাকার পরিমাণই পরিকল্পনার সার্থকতার মাপকাঠি নয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খরচের পরিমাণ ধরা হইতেছে প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকার মত। এই টাকার মধ্যে সরকারী খাতে খরচ হইবে ৩,০০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে খরচ হইবে ২,৫০০

কোটি টাকা। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে বৎসরে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার মূলধন সৃষ্টি করিতে হইবে এবং কেমন করিয়া তাহাই জিজ্ঞাস্য। বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রথম দু'বৎসরে গড়ে বৎসরে ২৬ কোটি টাকার মত মূলধন সৃষ্টি হইয়াছে এবং তৃতীয় বৎসরে (১৯৫৩-৫৪ সনে) ৪৪ কোটি টাকার মূলধন উঠিয়াছে। সুতরাং বৎসরে যে ৫০০ কোটি টাকার মূলধন সৃষ্টির হিসাব ধরা হইয়াছে তাহা অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে মূলধন বৃদ্ধির হার রাতারাতি বৃদ্ধি পাইতে পারে না। বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যে যে শিল্প-উন্নয়ন ব্যাঙ্কটি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার মূলধন জোগানোর ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ থাকিবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অবশ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যাহাতে দেশের বৃহৎ এবং মৌলিক (heavy and basic) শিল্প-সমূহের উন্নতি সম্ভবপর হয়। রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মুখ্যতঃ বৃহৎ এবং মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন ব্যাপারে মনোযোগ দিয়াছে। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপারে আশান্বিত হওয়ার মত তেমন কিছু হয় নাই: সবচেয়ে বড় দুইটি সমস্যা, যথা: বেকার-সমস্যা সমাধান ও মূলধন সৃষ্টির হার বৃদ্ধিকরণ—আজও অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। নদী-পরিকল্পনার গতি কিছু পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিয়া বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে অধিকতর সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন: ইহাতে ভারতের বেকার-সমস্যার সমাধানে সাহায্য করা হইবে এবং ভারতের রপ্তানী শিল্প বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এ বিষয়ে তাঁহার মতামত অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন: নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া হইল:

"নয়াদিল্লী, ৯ই নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে পরিকল্পনাকারীদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন যে, সুনির্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনাই তাঁহার মনে রহিয়াছে।

"শ্রীনেহরু বলেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পরিকল্পনাকারীদের প্রাণবন্ত ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপটি বিবেচনা করা উচিত। আগামী ১৫ অথবা ২০ বৎসরে পরিকল্পনার যে সম্পূর্ণ রূপটি তাঁহারা প্রত্যাশা করেন, সেই দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনার প্রত্যেকটি দিক তাঁহাদের বিবেচনা করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে হইবে—কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে কারিগরি এবং অন্য যাহা কিছু করিবার প্রয়োজন, সেগুলির উন্নয়ন করিতে হইবে।

"শ্রীনেহরু বলেন, পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গী যদি গতিশীল এবং প্রাণবন্ত না হয় তাহা হইলে সেই কমিশন কোন কাজেই আসিবে না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহাদের সকলের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

"প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, তাঁহার মনে সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনাই রহিয়াছে। সেই রাষ্ট্রে জনসাধারণই সমগ্র রাষ্ট্রের কল্যাণে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক হইবে এবং তাহারাই ইহার নিয়ন্ত্রণ করিবে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণভাবেই রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে।"

ভারতবর্ষ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State) একথা পণ্ডিত নেহরু ও শাসনতন্ত্রের অধিকারীরা বার বার বলেন। সুতরাং পণ্ডিত নেহরুর মতামতের উপরোক্ত অংশে কোনও নূতন কথা নাই, শুধু পুরানো কথার উপর জোর দেওয়া হইতেছে। যদি ইহার অর্থ এইরূপ হয় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ ভাবৎ রাষ্ট্রের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অভাব মোচনে পরিকল্পনা চালকগণের মনোযোগের অভাব পণ্ডিত নেহরুর চোখে পড়িয়াছে তবে ভাল। কেননা অদ্যাবধি জনকল্যাণকে পরোক্ষ ভাবেই দেখা হইয়াছে ও হইতেছে।

আগামী ১৫ অথবা ২০ বৎসর পরে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ কল্যাণের দিকে সরকার দৃষ্টি দিবেন এই ভরসায় তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এ কথাটা আমাদের অধিকারীবর্গ কানেও তুলেন না।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন, "ভারতে বেসরকারী শিল্প অতীতে কল্যাণ করিয়াছে এবং ইহা এখনও প্রয়োজনীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে এক সময়ে বেসরকারী শিল্প যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এখন আর তাহা নাই। পরিকল্পনাকারীদের নিকট বেসরকারী শিল্পের স্থান গৌণ। আধুনিক চিন্তাধারায় 'ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজে'র কোন স্থান নাই—অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, তাঁহারা এই ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করিয়া দিতেছেন।"

"শ্রীনেহরু বলেন যে, বেসরকারী শিল্পের বিলোপসাধনে তাঁহার ইচ্ছা নাই। বেসরকারী শিল্প যথেষ্ট রহিয়াছে। যেখানে বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হইবে সেখানে সেই শিল্পের উন্নয়নের জন্য তাহাদের স্বাধীনতা, সুযোগ এবং উৎসাহ দেওয়া উচিত। তবে সমাজ হইতে ব্যক্তিগত মুনাফাকারীদের দিন একেবারে চলিয়া না গেলেও যে চলিয়া যাইতেছে তাহা তাহাদের উপলব্ধি করা উচিত।"

"প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, পৃথিবীর ছোট অথবা বড় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই আজ পরীক্ষার সম্মুখীন। তাঁহারা কি সাফল্য লাভ করিবে তাহার দ্বারাই তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। পরবর্ত্তীকালে যে যুক্তি বা অজুহাতই উপস্থিত করা হউক না, যুদ্ধের সময়ে জয়-পরাজয়ের উপরই যেমন রাষ্ট্রের সাফল্য-অসাফল্য বিচার করা হইয়া থাকে, তেমনই এক্ষেত্রেও একমাত্র কার্য্যের সাফল্যের দ্বারাই তাঁহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।

"প্রধান মন্ত্রী বলেন, ভারতে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই কাজ করিতেছেন এবং গণতান্ত্রিক ও

শান্তিপূর্ণ উপায়েই তাঁহারা পরিবর্তন আনিয়াছেন। জনগণ যদি আগ্রহশীল এবং সক্ষম হয়, তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন বিলম্বে ঘটে বলিয়া তিনি মনে করেন না। সময় এবং এমনকি পরিশক্তির দিক হইতেও গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অধিকতর কার্যাকরী বলিয়া তিনি মনে করেন। সেইজন্ত গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তাঁহাদের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীনেহরু বলেন যে, যে ধরণের উন্নয়ন তাঁহাদের লক্ষ্য তাহা দ্রুত কার্যাকরী করার জন্ত অর্থলগ্নী, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের হার আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। আবার ইহার জন্ত অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে দেশে শিল্পের প্রসার এবং উন্নতি প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, কুটীরশিল্প এবং ছোটখাট ও গ্রাম্য শিল্প এবং ভারী যন্ত্রশিল্প এই উভয়েরই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের দ্বারাই যে দেশের বেকার-সমস্তার সমাধান হইবে এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন একটিকে গৌণ স্থান দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্ত নয়—উভয়েরই উন্নয়ন প্রয়োজন একমাত্র এই উপায়েই তাঁহারা উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারেন বলিয়া তিনি মনে করেন।"

কুটীরশিল্প, গ্রাম্য শিল্প ও ছোটখাট শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই তিন ক্ষেত্রেই এ পর্য্যন্ত সরকারী মনোযোগের অভাব দারুণ। কমিটি আছে, কিন্তু তাহাদের প্রস্তাবে কর্ণপাত কেহ করে না।

প্রধান মন্ত্রী বলেন, "শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ত সকল সময়ে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনয়নের মনোভাব তাঁহাদের ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতে শিল্পের মূল উপাদান যন্ত্রপাতি উৎপাদন তাঁহাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথম দিকে তাঁহারা বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়েই বিদেশ হইতে আনিতে হইবে, এইরূপ মনোভাব তাঁহাদের ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতেই তাঁহাদের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিতে হইবে।"

শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারতে দক্ষ কারিগরের অভাবই একটি বড় সমস্তা। জাপান ছাড়া এশিয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতেই সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দক্ষ কারিগর আছে। কিন্তু যে উন্নয়ন তাঁহাদের লক্ষ্য তাহার পক্ষে দক্ষ কারিগরের সংখ্যা এখনও কম রহিয়াছে। কারিগরের দক্ষতার উচ্চ মান নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহার জন্ত তাঁহারা কাজ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। কারিগরদের দক্ষ করিয়া তুলিতে কয়েক বৎসর লাগিবে তাঁহাকে একথা বলিয়া কোন লাভ নাই। কারিগরের দক্ষতার উচ্চমান বজায় রাখিবার জন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে কল্যাণের কার্য্যের ফলভোগ হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। অন্তর্বর্ত্তীকালে যাহাতে জনগণের অন্ততঃ কিছু কল্যাণ হয়, সেজন্ত অর্দ্ধ-দক্ষ এমনকি সিকি দক্ষ কারিগরদের কাজে লাগাইতেও তিনি প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সাম্প্রতিক চীন সফরের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন কোন বিশেষ কাজে দক্ষতা অর্জন করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পরই তাহারা সেই কাজে যোগদান করে। কিন্তু ভারতে ঠিক তাহার বিপরীত—বহুসংখ্যক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, অথচ তাহাদের জন্ত কোন কর্মসংস্থান নাই। সুতরাং তাহাদের এই সমস্তার সমাধান করিতে হইবে—অন্তান্ত দেশ কি ভাবে এই সমস্তার সমাধান করিয়াছে তাহাও শিক্ষা করিতে হইবে।

প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, পরিকল্পনার মেয়াদ কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তবে ভারতে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁহারা একটি নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে তাঁহারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, এবং অন্ত স্থানের সাফল্যের সঙ্গে তাঁহাদের সাফল্যের তুলনা করা যাইতে পারে। তবে তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছেন মাত্র। পনর অথবা কুড়ি বৎসর পরে তাঁহারা কোথায় উপনীত হইতে চান সে বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তা করিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পরিকল্পনাগুলি মূলতঃ বিপ্লবাত্মক, অবশ্য যদি এইগুলির কাজ ভালভাবে হয়। যদিও এই পরিকল্পনাগুলির কাজ খুব ভাল হইতেছে একথা তিনি বলেন না, তবে এই কাজ মোটামুটি ভালই চলিতেছে এবং ইহা গ্রাম্য এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আনিয়াছে বা আনিতেছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

বিক্রয়কর ও পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সঙ্কট

শারদীয়া সংখ্যা "স্বদেশ ও শিল্প" পত্রিকায় উক্ত শিরোনামা-যুক্ত এক প্রবন্ধে "আর্থিক প্রসঙ্গ" সম্পাদক-অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটে ত্রুটিপূর্ণ বিক্রয়কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন: "এক দিকে রাজ্যসরকারের আর্থিক সঙ্কট, অন্তদিকে কর ধার্য্যের ব্যাপারে অব্যবস্থা—দুইয়ে মিলে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তার আশু সমাধান না হলে সমস্তা যে জটিল আকার ধারণ করিবে তা বলাই বাহুল্য।"

পশ্চিমবঙ্গের বিক্রয়কর ব্যবস্থায় দুর্ব্বলতাগুলির উল্লেখ করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, বাংলার বিক্রয়কর একমুখী। যে সকল দ্রব্য বাংলা দেশে বিক্রয় এবং ব্যবহার হয় কেবলমাত্র তাহারই উপর কর প্রযোজ্য হয়। বাংলা দেশ হইতে যে কোন কারণেই যদি উৎপন্ন দ্রব্য বাংলার বাহিরে যায় তবে তাহার উপর বিক্রয়কর পড়ে না। এইরূপ ব্যবস্থার পশ্চাতে অন্তান্ত রাজ্যে বাংলার উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভমূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্ত ছিল—যদিও কার্য্যতঃ তাহা হইতে পারে নাই, কারণ অধিকাংশ রাজ্যেই সর্ব্বপ্রকার ক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করায় বাংলার পণ্য সুলভ প্রতিযোগিতায় সুবিধালাভে ব্যর্থ হইয়াছে।

"শুধু বিক্রয়েই নয়, বাংলার শিল্প-ব্যবসায়ীরা যা-কিছু ক্রয় করেন অন্য প্রদেশ হইতে তাহার উপর রপ্তানীকারক প্রদেশ কর ধার্য্য করিলেও বাংলার সরকার তাহাতে কর বসান না।" ভারতের অন্যতম প্রধান বিক্রয় ও রপ্তানীকেন্দ্র কলিকাতা। কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি সমগ্র পূর্ব্ব-ভারত লইয়া গঠিত। "এই সমৃদ্ধ পশ্চাদ্‌ভূমির ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ কম নয়। তাহা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বিক্রয়কর আদায়ের পরিমাণ অন্য রাজ্যের তুলনায় নিতান্ত কম।"

কার্য্যক্ষেত্রে বিক্রয়কর আইন পরোক্ষে খানিকটা পক্ষপাতিত্ব-মূলক রূপও গ্রহণ করিয়াছে। "বাংলার বাইরের ব্যবসায়ীরা আন্তঃরাজ্যের ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যগুলি কর না দিয়ে বাংলায় আসার সুযোগ পাওয়ায় বাংলার উৎপাদনকারীদের চেয়ে তারা সুলভে তাদের জিনিষ বিক্রয় করবার সুযোগ পায়। তা ছাড়া, কলিকাতা কোর্ট (পোর্ট ?), রেলকর্তৃপক্ষ ও ষ্টীমার কোম্পানী মারফত যেসব জিনিষ বাংলার বার থেকে আসে তাদের উপর কর ধার্য্য না হওয়ায় বিক্রয়-করের ব্যাপারে খানিকটা চোরাকারবারী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।" পুনঃ রপ্তানীযোগ্য সামগ্রীর উপর কর আদায়ের ব্যবস্থা না থাকায় সেদিকেও বাংলার বিক্রয়-কর ব্যবস্থায় একটি বিরাট ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "কত যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, দ্রব্যসামগ্রীই না কলিকাতা বন্দরের মারফত আমদানী-রপ্তানী হয়। এদের উপর একটা সামান্য হারেও কর ধার্য্যের ব্যবস্থা থাকলে বহু টাকা রাজস্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদায় করতে পারতেন।"

বিক্রয়-কর আইনের সংশোধনের জন্য সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পশ্চিম-বঙ্গ খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে যে দাবি করা হয় তাহার সমর্থন করিয়া শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "বোম্বাই বা অন্যান্য রাজ্যের মত এখানেও সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে বা ক্রয়ের প্রাথমিক স্তরে কর আদায় করতে হবে। তাতে কর উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। ক্রেতার নিকট তা আদায় করলেও ক্রেতা তা জানতে পারবে না বলে তার দেবার অনিচ্ছা বা ফাঁকি দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে না।"

প্রস্তাব অনুযায়ী সরকারের দ্বিতীয় করণীয় হইবে এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে চোরাকারবারীরা জাল বা নকল লাইসেন্স বিক্রয় করিয়া সরকারকে ফাঁকি দিতে না পারে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা অসম প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

বিক্রয়-কর ইত্যাদি সম্পর্কে রাজ্যসমূহের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। অনেক নগরে বহিরাগত নূতন পণ্যের উপর শুল্ক (চুঙ্গি) ছিল। আবার বোম্বাই বন্দরে কয়েকটি রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক ছিল। ঐরূপ শুল্ক ও বিক্রয়-কর সমভাবে নির্দ্ধারিত হইলে পশ্চিমবঙ্গের ও কলিকাতা বন্দরের এবং নগরের আয়বৃদ্ধি হয়।

বাংলার রেশমশিল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেশমশিল্প বিভাগের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত শ্রীউমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত সংখ্যা "স্বদেশ ও শিল্প" পত্রিকায় বাঙালী রেশমশিল্পীদের অবস্থা সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বাংলাদেশে রেশমশিল্পের বিবর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, প্রধানতঃ জাপানী রেশমের প্রতিযোগিতার ফলেই বাংলার রেশমশিল্প সর্ব্বাপেক্ষা বড় আঘাত পাইয়াছে। রেশমশিল্প যদিও বর্ত্তমানে বিশেষ দুর্দ্দশার সম্মুখীন তবুও দুইটি কারণে শিল্পীরা তাহাদের পিতৃপুরুষের পেশা আঁকড়াইয়া রহিয়াছে: "প্রথমতঃ তাহারা এই শিল্পকে ভালবাসে, দ্বিতীয়তঃ ইহা ছাড়া তাহাদের আর কোন গত্যন্তর নাই।"

প্রবন্ধকারের বিবৃতি অনুযায়ী সমগ্র বাংলার জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১.৫ এখনও জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রেশম-শিল্পের উপর নির্ভরশীল। কুটীরশিল্পের দিক হইতে বয়নশিল্পের পরই রেশমশিল্পের স্থান। এই সকল শিল্পী বাংলার ১০০০ গ্রামে ছড়াইয়া রহিয়াছে। শিল্পীদের যে হিসাব লেখক দিয়াছেন তাহা এইরূপ:

(১)	তুঁত চাষী	৫০,০০০
(২)	রেশম কীট পোষা বসনী	৮০,০০০
(৩)	রেশম সুতা কাটুনী	৮,০০০
(৪)	রেশম তাঁতী	৬,০০০
(৫)	উৎপাদনে পরোক্ষ সাহায্যকারী	১,৬৬,০০০
(৬)	মটকা, তসর ইত্যাদি বাবদ	১০,০০০
	মোট	৩,২০,০০০

রেশমশিল্পের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ জটিল: "কিন্তু তবুও আজ যাহা সব চাইতে প্রকট তাহা হইতেছে মহাজনের নির্দ্দয় লোলুপতা, উহা অক্টোপাসের মত শিল্পীদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।"

প্রাথমিক স্তরের রেশমশিল্পী (অর্থাৎ পোষা বসনী) দিগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) যাহাদের কীট পালনের উপযোগী প্রয়োজনীয় তুঁতের জমি ও মূলধন আছে; (২) যাহাদের জমি আছে, কিন্তু মূলধন নাই; (৩) যাহাদের মূলধন ও জমি দুইয়েরই অভাব।

শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন, "প্রথমোক্ত শ্রেণী ছাড়া বাকী সকলেই একভাবে বা অন্যভাবে মহাজনের ঋণের উপর নির্ভরশীল। এই মহাজনদের কেহ কেহ সুদখোর দাদনদার এবং অন্যেরা রেশম-কুঠির মালিক। সাধারণ নিয়ম হিসাবে এই মহাজনেরা কীট পোষা বন্দের সময় বসনীদের নিকট টাকা দাদন বা অগ্রিম দেয়। বন্দ শেষ হইতেই সমস্ত গুটি তাহাদের নিজেদের আওতায় লইয়া আসে। তাহাতে বসনীর কিছুই বলিবার থাকে না, দাদনের সর্ত্তই হইল এইরূপ। তারপর আরম্ভ হয় মহাজনের বাড়ীতে বসনীর ঘন ঘন যাতায়াত আর কাকুতি-মিনতি। মহাজন তাহার খেয়াল

খুশীমত যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিল, তাহাই বসনীকে মানিয়া লইতে হয়, কারণ আবার বন্দ আরম্ভ হইলেই মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হইবে।" ইহার উপর যদি বসনী পরিবারের অসুখ-বিসুখ হয় বা নৈসর্গিক বিপর্য্যয়ে পোকাগুলি নষ্ট হইয়া যায় তখন বসনীকে ঘটিবাটি বিক্রয় করিতে হয় বা বাড়ী বন্ধক দিতে হয়। স্বভাবতঃই মহাজনরা এই অবস্থায় পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় স্তরের শিল্পী খাইওয়ালা ও রেশম সুতা কাটুনীরাও অনুরূপ ভাবে মহাজনদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। নানারূপ চাতুর্য্যজালে মহাজনেরা তাহাদের এইরূপভাবে বঞ্চিত করে যে অনেকেই বর্ত্তমানে এই ব্যবসা ত্যাগ করিতেছে।

তৃতীয় স্তরের শিল্পী তাঁতীদের অনেকেই বিপাকে পড়িয়া পৈতৃক ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছে। "দেশ বিভাগের ফলে শিবগঞ্জের তাঁতীরা অসহায় আশ্রয়প্রার্থী হইয়া এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্রেতার অভাবে বিষ্ণুপুরের জেকার্ড, মির্জ্জাপুরের পাকোয়ানের কাজ আজ প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। নিরুপায় তাঁতীরা কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছে না। কাজের অভাবে প্রায় অর্দ্ধেক তাঁতীকে বৎসরে অন্ততঃ ছয় মাস বসিয়া থাকিতে হয়। অথচ এই শিল্পই তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র পন্থা।"

লেখক একটি তাঁতী পরিবারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের গড় হিসাব দিয়া দেখাইয়াছেন যে, পাঁচ জনের একটি পরিবারের বার্ষিক মোট আয় যেখানে ৬৩০৲ টাকা, সেখানে আহার্য্যের জন্য সেই পরিবারকে বার্ষিক ৬৪০।১০ খরচ করিতে হয়। কাপড়চোপড় এবং মহাজনের সুদ ইত্যাদি পরিশোধ করিতে পরিবারকে আরও ৯৮।০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হয়—অর্থাৎ, বার্ষিক আয় হইতে ব্যয় ১১৮৲ টাকা বেশী।

"এই অভাব মিটাইতে হয় পরিবারের অনাচার অর্দ্ধাহারের ভিতর দিয়া কিংবা নিজেদের মহাজনের কবলে আবদ্ধ করিয়া। এর উপর রহিয়াছে সুচতুর ব্যবসায়ীদের ফন্দি-ফিকির। নকল রেশম দ্বারা তৈয়ারী কাপড় কম দামে বাজারে আসল রেশম বলিয়া বিক্রয় হইতেছে। সাধারণ ক্রেতারা এই দুইয়ের তফাৎ বুঝিতে পারেন না। এদিকে আসল রেশমী কাপড় সে তুলনায় দাম বেশী বলিয়া বাজারে স্থান পায় না। এই সব কারণে তাঁতীদের দুর্গতি এমন পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে যে, সরকার হইতে তাহাদিগকে নানা সহায়তা দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।"

বাংলার রেশমশিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক ১৯৪৫ সনের ভারত সরকারের সিল্ক প্যানেলের দুইটি সুপারিশ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, উৎকৃষ্টতর গুটি উৎপাদনের জন্য উত্তম বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা এবং স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন মারফতই কেবল বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। লেখক বলিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই দুইটি নীতিই কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শিল্পীদিগকে সমবায় পদ্ধতিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কার্য্যকরী পরিকল্পনা সমগ্র ভারতের মধ্যে মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই গৃহীত হইয়াছে।

রেশমশিল্প যথাযথভাবে পরিচালিত হইলে দেশের অর্থাগম ও সমৃদ্ধি কত দূর বাড়ে তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত জাপান।

আমাদের বাংলার রেশমবস্ত্র সুদূর অতীত হইতে খ্যাত। শুধু অনাদর ও সুদখোর মহাজনের এবং অর্থলোলুপ দাদনদারের উৎপাতে ইহা ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

এই শিল্প সবল হইলে বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান রেশম-জনিত নানাপ্রকার উপশিল্প ও বেচাকেনায় জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। ইহার পথ এবং অনেক চাহিদাও এদেশে বিদেশে যথেষ্ট বাড়িবার ক্ষেত্র আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইদিকে চেষ্টিত ইহা আশার কথা আমরা মনে করি।

প্রকাশম মন্ত্রিসভার পতন

অন্ধ্র রাজ্যে শ্রীপ্রকাশমের মন্ত্রীমণ্ডলীর পতনের কথা নিম্নে প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশিত হয় :

"কুর্ণুল, ৬ই নভেম্বর—আজ অন্ধ্র বিধানসভায় শ্রীপ্রকাশমের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ৬৯—৬৮টি ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। মাদক-বর্জ্জন সংক্রান্ত রামমূর্ত্তি কমিটির সুপারিশগুলি সম্পর্কে বিধানসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, মন্ত্রিসভা তাহা কার্য্যকরী করিতে ব্যর্থ হওয়ায় অন্ধ্র মন্ত্রিসভার প্রাক্তন মন্ত্রী এবং কৃষিকর লোক পার্টির সদস্য শ্রীলাচানা এই অনাস্থা প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। রামমূর্ত্তি কমিটি প্রকৃতপক্ষে মাদক-বর্জ্জন ব্যবস্থা বিলোপ সাধনের সুপারিশ করেন।

বিধানসভায় পরাজিত হইবার পর আজ প্রকাশম মন্ত্রিসভা রাজ্যপাল শ্রী সি. এম. ত্রিবেদীর নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য আগামী কল্য শ্রীপ্রকাশমের দিল্লী যাত্রার যে কথা ছিল, তিনি তাহা বাতিল করিয়াছেন।

একজন পত্রবাহকের মারফতে প্রকাশম মন্ত্রিসভার পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। সহকারী মুখ্যমন্ত্রী এবং বিধানসভার নেতা শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সময় রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে নূতন পরিস্থিতির বিষয় জানান হইয়াছে।

ভোট গ্রহণের ব্যাপারে বিস্ময়কর বিষয় এই যে, পূর্ব্বতন মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী এন. শঙ্কর রেড্ডী এবং শ্রী এন. ভেঙ্কট সুব্রাহ্মণ্যম এই অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই দুই জনই কংগ্রেসের সদস্য। প্রজা পার্টির সদস্য শ্রীরামকৃষ্ণ রেড্ডী এবং শ্রীবাপান্নাডোরা উভয়েই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।

অনাস্থা প্রস্তাবের মূল কারণ বোধ হয় প্রকাশম মন্ত্রিসভার সহিত বিধানসভার সাধারণ সভ্যদের ও রাজ্যের জনসাধারণের

সংযোগ বিচ্যুতি। যদি সংযোগ থাকিত তবে শ্রীপ্রকাশম সময় মত মাদক-বর্জন নীতির অব্যবহিত পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনায় সম্মতি দিয়া এই পতন রোধ করিতে পারিতেন।

মাত্র ভোটাধিক্যের উপর নির্ভর করিয়া মন্ত্রীসভা যদি সাধারণ সভ্যের প্রতি অবহেলা করেন তবে এইরূপ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। জনমত সদা পরিবর্তনশীল এই কথা আমাদের মন্ত্রী মহাশয়েরা ভুলিয়া যান। তাঁহাদের হুঁস হয় কেবল নির্বাচনের মুখে।

মাদক-বর্জন কংগ্রেসের একটি মূলনীতি। কিন্তু দেশের লোককে শিখাইয়া পড়াইয়া ঐ পথে লইয়া যাইতে হইবে। কঠোর শাসনের দিন চলিয়া গিয়াছে।

শর্করাশিল্প পরিস্থিতি

১৯৪৭ সন হইতে, অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতেই ভারত সরকার চিনি উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যাপারে নাজেহাল হইতেছেন। চিনির চাহিদা ভারতে নাকি হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে, দুই বৎসর পূর্বে ভারতে চিনির প্রয়োজন ছিল বৎসরে এগার-বার লক্ষ টন, বর্তমানে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় আঠার লক্ষ টনে। নিম্নে গত দুই বৎসরের চিনি উৎপাদন ও সরবরাহের হিসাব দেওয়া গেল :

	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪
	(হাজার টন হিসাবে)	
প্রাথমিক জমা (opening stock)	৫০৩	২৭৭
উৎপাদন	১,৩১৬	১,০০৮
আমদানী	৫২	৬০২
	১,৮৭১	১,৮৮৭

১৯৫২-৫৩ সনে যেমন উৎপাদন বেশী ছিল তেমনি আমদানীর পরিমাণ কম ছিল, আর ১৯৫৩-৫৪ সনে যদিও চিনির উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মোট সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ১৯ লক্ষ টনের কাছাকাছি। শর্করা শিল্প-পতিদের কথা যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, ভারতের আভ্যন্তরিক চিনির প্রয়োজন আঠার লক্ষ টনের মত, তাহা হইলেও বাজার হইতে চিনি উধাও হওয়া এবং মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কোন কারণই নাই—কারণ মোট সরবরাহের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী। বিজ্ঞদের অভিমত এই যে, ভারত হইতে পাকিস্থানে চিনির চোরাই রপ্তানী হইতেছে এবং ফড়িয়ারা (যাহাদের সহিত মিল-মালিকদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রহিয়াছে) চিনি মজুত করিয়া রাখিতেছে, ফলে বাজারে প্রয়োজনীয় চিনির সরবরাহ হইতেছে না এবং ইহাই মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই ব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থা অব্যবস্থা তথা অক্ষমতায় ভরা।

১৯৫১-৫২ সনে ভারতে ১৪'৮৬ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। তারপরে ক্রমশঃ চিনির উৎপাদন হ্রাসের কারণ কি? মিল-মালিকরা বলেন, ইক্ষু উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, যদিও আখের দাম মণ প্রতি ১৵০ হইতে ১৷৵০ আনায় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসরে ইক্ষুর উৎপাদন কি পরিমাণে হইয়াছে সে সম্বন্ধে সরকারী তথ্যও নীরব। তবে দেখা যায় ইক্ষুচাষের ভূমির পরিমাণ বাড়িয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সনে ৩৫,৯৮,০০০ একর ভূমিতে আখের চাষ হইয়াছিল এবং সে বৎসর আখের উৎপাদন ছিল ৪৬,১৪,০০০ টন। ১৯৫৩-৫৪ সনে ইক্ষু চাষভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৩৬,৩৭,০০০ একরে অর্থাৎ চাষভূমির পরিমাণ শতকরা ৫'৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং সেই পরিমাণে আখের উৎপাদন অবশ্যই বাড়িয়াছে। তাই মিল-মালিকদের যুক্তি যে আখের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে তাহা সঠিক নয়।

সম্প্রতি দিল্লীতে চিনিশিল্প কমিটির সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আখচাষীদের তরফ হইতে দাবি করা হইয়াছে যে, আখের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আখের দাম মণ প্রতি ১৷৵০ হইতে ১৸০ আনায় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে চাষীরা উৎসাহিত হইবে। মিল-মালিকরা বলিয়াছেন যে, আখের দাম হ্রাস করিয়া দেওয়া উচিত ১০ আনায়। ইহাতে চিনির দাম কমিবে। তবে সরকারী অভিমত এই যে, চিনির মূল্যের শতকরা হিসাবে আখের একটা মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। যাহাই হউক, শর্করা শিল্প-পতিরা তাঁহাদের মিলের উৎপাদন ক্ষমতার যথার্থ ব্যবহার করেন নাই।

সমবায় সমিতির প্রগতি

১৯৫১-৫২ সনের সমবায় সমিতির প্রগতি সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৫১-৫২ সনে ভারতে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১,৮৫,৬৫০ ; সভ্য সংখ্যা ১'৩৮ কোটি এবং কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩০৬'৩৪ কোটি। ১৯৫০-৫১ সনে ১৮১,১৮৯টি সমবায় সমিতি ছিল ; সভ্য সংখ্যা ছিল ১৩৭ কোটি এবং ২৭৫'৮৫ কোটি টাকার কার্য্যকরী মূলধন ছিল। কার্য্যকরী মূলধন বৃদ্ধির কারণ এই যে, ইদানীং সমবায় সমিতিগুলি গবর্ণ্মেণ্ট এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আর্থিক সাহায্য পাইতেছে।

অলগ্নী সমিতির সংখ্যা যদিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তথাপি লগ্নী সমিতির প্রাধান্য বজায় আছে। সকল প্রকার প্রাথমিক সমবায় সমিতির মধ্যে লগ্নী সমিতির সংখ্যা শতকরা ৬৮'৭ ভাগ এবং কৃষি সমিতির মধ্যে লগ্নী সমিতির সংখ্যা শতকরা ৭৬'৯ ভাগ। ভারতীয় জনসাধারণের শতকরা ১৮'৬ ভাগ সমবায় সমিতির আওতায় আসিয়াছে। ১৯৫১-৫২ সনে কৃষিঋণ সমিতিগুলির মোট সংখ্যা ছিল ১০৭,৯২৫, ইহাদের সভ্য সংখ্যা ছিল ৪৭,৭৭,০০০ এবং কার্য্যকরী মূলধন ছিল ৪,৫২২ কোটি টাকা। এই সমিতিগুলির মোট লগ্নী কারবারের শতকরা প্রায় ৬৩'৮ ভাগ বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে সীমাবদ্ধ।

বর্ত্তমানে ৭,৯৬২টি অকৃষি লগ্নী সমিতি আছে, ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ২,৩৩৬,০০০ এবং কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৫০'৯৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় অলগ্নী সমিতিগুলির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে ২,৩২১, সভ্যসংখ্যা ১,৬১৯,০০০ এবং কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৮৯'৫৯ কোটি টাকা। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যাপারে সমবায় সমিতির প্রগতি আশাপ্রদ নয়। মাত্র ছয়টি প্রদেশে জমিবন্ধকী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে এবং ১০টি প্রদেশে ২৮৯টি প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে, ইহাদের মধ্যে ১৩০টি মাদ্রাজ প্রদেশে আছে।

ভারতের সমবায় সমিতিগুলিকে তাহাদের কার্য্যকরী মূলধনের জন্ম প্রধানতঃ জনসাধারণের আমানতের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্য না পাওয়ার দরুন ইহাদের প্রগতি ব্যাহত হইতেছে। ভারতে বৎসরে ৫০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ প্রয়োজন হয়, সেই তুলনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৎসরে প্রায় ১৫ কোটি টাকার ঋণ দেয়। চাষীরা এই ঋণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে পায়।

কানুনগো কমিটির রিপোর্ট

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্ম ১৯৫২ সনের নবেম্বরে কানুনগো কমিটি নিয়োজিত হইয়াছিল। এই কমিটি সম্প্রতি ইহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কমিটির প্রধান অনুমোদন এই যে, বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন বৎসরে ৫০০ কোটি গজের অধিক যেন না হয়। কমিটির মতে ১৯৬০ সনে মাথাপিছু বস্ত্রের চাহিদা দাঁড়াইবে ১৮ গজে। এই অনুমানে ৪০ কোটি লোকের ভিত্তিতে ১৯৬০ সনে বৎসরে ৭২০ কোটি গজ বস্ত্রের প্রয়োজন হইবে। ১০০ কোটি গজ বস্ত্র প্রয়োজন হইবে রপ্তানীর জন্ম। সুতরাং মিল-বস্ত্র ও তাঁতবস্ত্রের মোট পরিমাণ হওয়া প্রয়োজন ৮২০ কোটি গজ। বর্ত্তমানে প্রায় ৬৬০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে (তাঁত-বস্ত্র ধরিয়া)। ১৯৬০ সন নাগাদ ১৬০ কোটি গজ বস্ত্র অধিক উৎপাদন করিতে হইবে।

কমিটির হিসাবে যেন গলদ আছে। ১৯৫১ সনে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৫'৬৮ কোটি। ইহাদের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার শতকরা সওয়া ভাগ। ৩৬ কোটি লোকের হিসাবে বৎসরে প্রায় ৪৫ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইতেছে। আগামী ২০ বৎসরে জনসংখ্যা প্রায় নয় কোটি বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যা হইবে ৪৫ কোটি। এই অনুমানে মাথাপিছু ১৮ গজ হিসাবে প্রায় ৮'১০ কোটি গজ বস্ত্র শুধু আভ্যন্তরিক চাহিদা মিটানোর জন্ম প্রয়োজন। সুতরাং কমিটি যে ধরিয়াছেন, ৭২০ কোটি গজ বস্ত্রের প্রয়োজন তাহা অত্যন্ত কম। ১০০ কোটি গজ বস্ত্র যদি রপ্তানী করা হয় তাহা হইলে ভারতের প্রয়োজন মোট ৯'১০ কোটি গজ বস্ত্র।

কমিটির অনুমোদন দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী যেন পিছনের দিকে। ইউরোপ, আমেরিকায় মাথাপিছু গড়ে ৭০ গজ বস্ত্র বৎসরে প্রয়োজন হয়। সুতরাং ভারতে ১৮ গজের হিসাব খুবই কম। আগামী ২০ বৎসরে চাহিদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে আর রপ্তানীও বৃদ্ধি পাইতে পারে। ভারতের বস্ত্রশিল্প একটি প্রধান শিল্প, এই শিল্পের লোক নিয়োগের ক্ষমতা বিরাট, সুতরাং বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যই প্রয়োজন। ভারতে মিল-বস্ত্র উৎপাদন অন্ততঃ ৯০০ কোটি গজ হওয়া প্রয়োজন, সেই তুলনায় ৫০০ কোটি গজে উৎপাদন নিবদ্ধ করা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। ভারতের তাঁতশিল্পগুলি বর্ত্তমানে মাত্র ১৪০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করিতেছে—ইহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। শ্রীকানুনগো মহাশয় এই রিপোর্ট দাখিলের পর কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য বিভাগে ডেপুটি মন্ত্রী পদে বহাল হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গীই ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা সূচিত করিতেছে। তাঁহার কমিটির রিপোর্ট সরকারের বস্ত্র উৎপাদন নীতিকে সমর্থন করিয়াছে।

সাম্প্রদায়িকতার পুনরভ্যুত্থান

যে সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়ায় ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয় সাত বৎসর পর তাহা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। সমগ্র ভারত-ব্যাপী তাহাদের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; তবে উত্তর প্রদেশেই তাহাদের তৎপরতা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে।

ভারত বিভাগের পর স্বদেশদ্রোহী মুস্লিম লীগের সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ বেগতিক বুঝিয়া চুপচাপ ছিলেন। বর্ত্তমানে নূতন রূপে তাঁহাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ এবং প্রচার যে কিরূপ হীন এবং অনিষ্টকারী, ৬ই নবেম্বরের "পিপল" পত্রিকায় তাহার এক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত পত্রিকার কানপুরস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, কানপুরের মুসলমান হোটেলগুলি ভারত-বিরোধী কুৎসা প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ মুসলমান জনগণকে পাকিস্থানী রেডিওর অপপ্রচার এবং পাকিস্থানী সংবাদপত্রসমূহের ভারতবিরোধী কুৎসা দ্বারা "শিক্ষিত" করিয়া তোলা হইতেছে।

সম্প্রতি কুখ্যাত মুস্লিম জমিয়তের নেতৃবৃন্দ কানপুরে আগমন করেন; তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজাও ছিলেন। কানপুরের চমনগঞ্জ মহল্লায় মহম্মদ আলী পার্কে ২০,০০০ মুসলমানের এক বিরাট জনসভায় এই সকল নেতা যে বক্তৃতা দেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নরূপ:

বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে মৌলানা মজহর সৈয়দ বলেন, নেহরু এশিয়ার নেতৃত্বের জন্ম উৎসুক, কিন্তু তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত যে এশিয়ার অধিকাংশ দেশই মুসলমান। ভারতের মুসলমানগণ যদি এশিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানগণকে নেহরুর নেতৃত্ব মানিয়া লইতে পরামর্শ না দেন তবে নেহরুকে কেহই নেতা বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

তিনি বলেন, "একজন মুসলমান মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন থাকিবেই; কাজে কাজেই আমরা ভারতে থাকিয়া

সর্ব্বদাই পাকিস্থানের পক্ষে থাকিব (We will always speak for Pakistan and remain in India)। ব্রিটিশের অবধারি পর্যন্ত আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, আর এই সাধারণ (poor) কংগ্রেসওয়ালারা আমাদের কি করিতে সক্ষম হইবে? আমরা বহু শত বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ শাসন করিয়া আসিয়াছি এবং শীঘ্রই পুনরায় তাহা করিব।

ভারতে মুসলমানগণ নির্যাতিত হইতেছেন বলিয়া সৈয়দ বদরুদ্দোজা যে বিবৃতি দেন বক্তা তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মুসলমানদিগকে হিন্দী শিখিতে বাধ্য করা হইতেছে, মুসলমানদিগকে বলা হইতেছে যেন তাহারা পাকিস্থানের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন না হন। "কেন আমরা তাহা করিব? পাকিস্থানে আমাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব রহিয়াছে। এ অবস্থায় আমরা কিরূপে পাকিস্থানের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারি?"

ভারতের মুসলমানগণের মুখপাত্র হিসাবেই তাঁহারা জমিয়তের সংগঠন করিয়াছেন বলিয়া মৌলানা মজফর সৈয়দ বলেন. কম্যুনিষ্ট, সোস্তালিষ্ট প্রভৃতি দলগুলিকে এই প্রসঙ্গে তিনি মুসলমানদের দিকে হস্ত প্রসারিত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

তিনি বলেন, যেদিন ভারতে সাড়ে চার কোটি মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইবে সেদিন হইতেই ভারতের পক্ষে সঠিক পথে চলা সম্ভব হইবে। "নেহরু পাকিস্থানের ন্যায় মুসলমান দেশগুলির সহিত বন্ধুভাবাপন্ন নহেন। অপরপক্ষে নেহরু একটি কম্যুনিষ্ট দেশ চীনকে তোষণ করিতেছেন। আমার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারাই বলুন, ইহা কি ভুল নহে? আমার মনে হয় নেহরুর অপেক্ষা ব্রিটিশ শাসন অনেক ভাল ছিল।"

পরিশেষে মৌলানা সাহেব "নেহরুশাহী" এবং "পন্থশাহী"র অবসান করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আহ্বান করেন, এবং "পাকিস্থান জিন্দাবাদ", "জমিয়ত জিন্দাবাদ" ধ্বনি করিতে করিতে সভার কার্য্য শেষ হয়।

কানপুরের একটি দৈনিক পত্রিকা হইতে উক্ত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া "পিপল" পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন, ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান যে, পাকিস্থানের প্রতি কিরূপ মনোভাব থাকা ঠিক সে সম্পর্কে জমিয়তের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে এই বিরোধের ফলে জমিয়তের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে এখন বিশেষ সতর্কতা এবং গোপনীয়তা অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

উক্ত সংবাদদাতার মতে জমিয়তের সকল শাখার উপর নাকি গোপনভাবে কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, বলা হইয়াছে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে যেন প্রকাশ্য সভাসমিতির অনুষ্ঠান না করা হয়। সংবাদ আদান-প্রদানেও কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে—বর্ত্তমানে সকল সংবাদই লোকমারফত পাঠান হয়। যথাসম্ভব লিখিত আদেশের পরিবর্ত্তে মৌখিক নির্দেশদানের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আমাদের মনে হয়, মুসলমান সাধারণের মধ্যে ইতিহাস ও পৃথিবীর আধুনিক প্রগতি সম্পর্কে প্রচার বিশেষ প্রয়োজন। ইংরেজ ভারত জয় করিয়াছিল মরাঠা, শিখ ইত্যাদি হিন্দু রাষ্ট্রপতিদিগের বিরুদ্ধে লড়িয়া। মুসলমানের বাদশাহী তাহার অনেক পূর্ব্বেই ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার ধ্বংসের কারণ ছিল অন্ধবিশ্বাস ও হিন্দু-বিদ্বেষ।

বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল কলেজ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩রা কার্ত্তিক পাক্ষিক "হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন:

"বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার রসিকতা সুরু করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের যথারীতি ইনসপেক্শন প্রভৃতির পর সিণ্ডিকেট ও সিনেট প্রথম বার্ষিক ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর অনুমোদন দিয়াছিলেন। মাত্র চ্যান্সেলারের অর্থাৎ রাজ্যপালের সম্মতির অপেক্ষায় ছিল। (বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নিয়মে সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।) চ্যান্সেলার প্রথমে মৌখিক সম্মতি দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট অনুমোদনার্থ আসিলে তিনি আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান করিবেন। কিন্তু এক্ষণে চ্যান্সেলার অনুমোদন না দেওয়ায় বিষয়টি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রহিয়াছে।

"বাঁকুড়ার প্রায় ছয় হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ এক ডেপুটেশন মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার গণ-আবেদনের মূল্য দেন ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ দ্বারা। উক্ত ডেপুটেশনের নাসিকার সম্মুখে জোড়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক ডাঃ বিধানচন্দ্র বলিয়াছেন, 'আমি বাঁকুড়ার মেডিক্যাল কলেজ হতে দেব না। খুব যে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে গেছলে।' অর্থাৎ বিধানচন্দ্র, অমূল্যধন প্রভৃতি অশ্বকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সম্মিলনী কমিটি সিনেট ও সিণ্ডিকেটে তৃণ ভক্ষণে গিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন। ক্ষমতা অবশ্য বিধানচন্দ্রের আছে তা তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকুন আর নাই থাকুন। যে বিধানচন্দ্র একদা বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন,—সরকারী সাহায্য না লইয়াও, আজ সেই বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রীর আসন হইতে ঘোষণা করিতেছেন,জনসাধারণের বিন্দু বিন্দু রক্ত ঢালিয়া গড়িয়া তোলা একটি প্রতিষ্ঠানকে চূর্ণ করিবেন।

"মুখ্যমন্ত্রীর বর্ত্তমান মনোভাবের পশ্চাতে কোন্ গূঢ়রহস্য বিদ্যমান, তাহা অজ্ঞাত। জনসাধারণ মনে করেন, কলিকাতার ডাক্তারদের 'ক্লিক' মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁহার সহকারী অমূল্যধনকে সাক্ষীগোপাল খাড়া করিয়া মফস্বলে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে বাধা দিতেছেন। কারণ মেডিক্যাল কলেজ বাহিরে হইয়া গেলে কলিকাতার মফস্বল হইতে কেস কম যাইবে, ফলে তথাকার বত্রিশ টাকা, চৌষট্টি টাকা ফি-যুক্ত ডাক্তারদের পশার কমিবে।"

মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরকারের এই বিরূপ মনোভাব বাঁকুড়ার হাসপাতালের উপরও পড়িয়াছে এইরূপ

একটি কৌতূহলোদ্দীপক অভিযোগ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "পাছে হাসপাতাল ভাল হইয়া গেলে কলেজ স্থাপনে সাহায্য হয়, তজ্জন্য সরকার গ্রাণ্টও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।"

যদি ইহা সত্য হয় তবে অতিশয় দুঃখের ও ক্ষোভের কথা। বাঁকুড়া কংগ্রেস অনুগত, সেইজন্যই বোধ হয় উহাকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়।

চোরাকারবারীদের গুপ্তচর বিভাগ

১১ই কার্ত্তিক 'ভারতী'তে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ান হইতে সুতী এলাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যে সকল চোরাকারবারী তৎপর রহিয়াছে তাহারা একটি দক্ষ গুপ্তচর বিভাগও পোষণ করিতেছে। এই সকল ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিমতিতা ও সজনীপাড়া ষ্টেশনে সজাগ প্রহরীর মত নিযুক্ত থাকে এবং সরকারী পোশাক পরিহিত কোন লোককে ষ্টেশনের নিকটে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ চোরাকারবারীদের নিকট হুঁসিয়ারীর সংবাদ পৌঁছাইয়া দেয়। ফলে চোরাকারবার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে আসিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে নিরাশ হইতে হয়।

উক্ত পত্রিকার সংবাদদাতা আরও লিখিতেছেন, পূর্ব্বে সজনী-পাড়া ষ্টেশন দিয়া বেশী মাল পাঠান হইত না; কিন্তু আজ-কাল প্রায়ই কলিকাতা হইতে সুতা, কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে। মন্তব্য প্রসঙ্গে সংবাদদাতা লিখিতে-ছেন: "যেখানে অরঙ্গাবাদ বাজার ব্যতীত অন্য কোন বাজার নাই এবং যাহার দূরত্ব সজনীপাড়া ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইলের মধ্যে এবং নিমতিতা ষ্টেশনের দূরত্ব অরঙ্গাবাদ হইতে কেবলমাত্র এক মাইলের পথ, মাল সেখানে না যাইয়া সজনীপাড়ায় আমদানী হইবার কারণ সত্যই সন্দেহের বিষয়।" সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, যদি কোন নির্ভরযোগ্য সরকারী কর্ম্মচারী এই অঞ্চলে গিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে অনুসন্ধান চালান তাহা হইলে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইতে পারে।

চোরাকারবার বন্ধের মূল অন্তরায় কংগ্রেসের দলাদলি ও দলগত স্বার্থ। তাহাই সকল দুরাচারের মূল।

ত্রিপুরার শাসন বিভাগে অফিসার নিয়োগ

'সেবক' পত্রিকা ৪ঠা কার্ত্তিক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ত্রিপুরা-রাজ্যে অফিসার নিয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন পাবলিক সার্ভিস কমিশন নাই; এতদিন অন্যান্য রাজ্য হইতে অস্থায়ীভাবে অফিসার আমদানী করিয়া রাজ্যের শাসনকার্য্য চালানো হইতেছে। অবশ্য, সম্প্রতি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ত্রিপুরার গেজেটেড পদগুলিতে অফিসার নিয়োগ করিতেছেন।

এইরূপ ব্যবস্থার ফলে পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "স্থানীয় উপযুক্ত লোক যেমন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী পায় নাই তেমন স্থায়ী চাকুরীতে নিয়োজিত অফিসারগণও প্রমোশন পাওয়ার সুযোগ পান নাই।"

অন্যান্য রাজ্য হইতে আগত অফিসারগণ ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার প্রশংসা করিয়াও 'সেবক' লিখিতেছেন, "বিগত সাত বৎসরের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায়, ত্রিপুরা ভারত সরকার হইতে যে ভাবে আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে তাহাতে অনেক অগ্রসর হইতে পারিত যদি সরকারের দায়িত্বশীল পদে অবস্থিত অফিসারগণ ত্রিপুরার ইতিহাস, সামাজিক ব্যবস্থা, কৃষ্টি ও ইহার ভূগোল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিতেন।"

পত্রিকাটি স্বীকার করিতেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে পুরাতন স্থায়ী কর্ম্মচারিগণ সকলেই দক্ষতার সহিত কার্য্য-পরিচালনার উপযুক্ত ছিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের যথোপযুক্ত শিক্ষার জন্যও কিছু করা হয় নাই। "তাঁহাদিগকে অবহেলিত দলের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া বর্দ্ধিত হারের বেতন হইতেও দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। একই কাজে নিযুক্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্ম্মচারীর বেতনের যে পার্থক্য দেখা দেয় তাহা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নহে। স্থানীয় অফিসারদের কোণঠাসা করিয়া রাখিলে ত্রিপুরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" তদুপরি ত্রিপুরার অধিবাসীদের মধ্য হইতে অফিসার নিয়োগ করিলে রাজ্যের বেকার সমস্যার আংশিক সুরাহা হইতে পারে।

মেদিনীপুরের লোধা জাতি

শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকায় পশ্চিম-বঙ্গের লোধা জাতির পরিচয় দিয়াছেন, লোধা জাতি অপরাধ-প্রবণ (criminal tribe) জাতি বলিয়া পরিগণিত। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে লোধা জাতির বাস। ইহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা প্রায় ৮০০০; কিছুদিন পূর্ব্বেও ইহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১,০০০।

লোধা জাতির অধিকাংশই বিশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটায়। "এরা প্রায় ভূমিহীন—পরের জায়গায় বাস করে থাকে... মেয়েপুরুষ সবাই সমানে ক্ষেতে কাজ এবং অনেকে গাঁয়ে দিনমজুরি করে। কেহ কেহ বনের কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রী করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে। সাপের চামড়া, কচ্ছপ, মাছ বা মধু সংগ্রহ করে বিক্রী করা এদের আর এক ব্যবসায়। এদের কেউ দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না।"

লেখকের মতে লোধা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে "লুব্ধক" শব্দ হইতে। লুব্ধক অর্থ ব্যাধ। লোধারা দেখিতে খাট এবং গায়ের রং কাল। ঢেউ খেলান চুল, এবং দাড়ি-গোঁফ অপ্রচুর। বিকৃত বাংলা ভাষায় ইহারা কথাবার্ত্তা বলে। সকলেই প্রায় অশিক্ষিত বলা চলে।

সাধারণ বাঙালীর মত ইহাদের মধ্যেও গোত্রবিচার রহিয়াছে। স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে। মৃত ব্যক্তিকে ইহারা মাটিতে কবর দেয়। সম্প্রতি বর্ণহিন্দুদের দেখাদেখি কোথাও শবদাহ করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। শীতলা ইহাদের প্রধান দেবী—বৎসরে বহু বার শীতলা পূজা করা হয়।

পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থা

৮ই কার্ত্তিক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বারাসাত বার্ত্তা" লিখিতেছেন, ঋতু পরিবর্ত্তনের বর্ত্তমান সময়ে পল্লী অঞ্চলে নানারূপ অসুখের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে এবং প্রতি বৎসরই সুচিকিৎসা ও উপযুক্ত শুশ্রূষার অভাবে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগের আরোগ্যের জন্ত সুচিকিৎসা ব্যতীত উপযুক্ত শুশ্রূষারও প্রয়োজন, কিন্তু পল্লীগ্রামে তাহাও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।

এই অবস্থায় বারাসাত মহকুমার মরিচা ইউনিয়নে একটি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন: "যদি প্রত্যেক ইউনিয়নে এইরূপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় তবে নিশ্চয়ই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার সুযোগ সমাজের দরিদ্রগণের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিত।" পত্রিকাটি আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে জনসাধারণ প্রতি ইউনিয়নে এইরূপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন।

বেতার ও সঙ্গীত

১লা নবেম্বর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "হিতবাদ" পত্রিকা অল-ইণ্ডিয়া রেডিও ভারতীয় সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্ত যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার প্রশংসা করেন। রেডিও মাস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী গৃহীত হয় এবং একটি নিখিল-ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। সেই প্রতিযোগিতার যোগদানকারীর সংখ্যা ১৮০০। অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর যে ২৩টি কেন্দ্র আছে, তাহাতে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়; এবং দিল্লী ও মাদ্রাজে যথাক্রমে হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক সঙ্গীতের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল সঙ্গীত-সম্মেলনে ভারতীয় বেতারের শ্রোতারা ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রূপের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পান এবং অল্পবয়স্কদের মধ্যে প্রতিভাবান শিল্পীরা জনসমক্ষে পরিচিতি লাভ করেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে—জনসাধারণের নিকট যে সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারা যায় যে, এই প্রতিযোগিতা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বলিয়াছেন, প্রতি বৎসরই এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইবে। ইহা সত্যই আনন্দের বিষয়।

মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সঙ্গীতের বিপুল প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, সাম্প্রতিককালে অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর অনুষ্ঠান-সূচীর উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের সহিত পরিচিত করাইবার জন্ত রেডিও যে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে সংস্কৃতির পুনর্গঠনে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভূমিকা সম্পর্কে নবচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু পত্রিকাটির মতে, রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ ছায়াছবির গানের চিত্তবিনোদনকারী গুণাবলী যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যদিও রেডিওর ন্তায় একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সর্ব্বদাই শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের উপর স্বভাবতই জোর দিবে, তবুও অনুষ্ঠানগুলির চিত্তবিনোদন-ক্ষমতার কথা চিন্তা না করিলে ভুল হইবে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অধিকাংশ লোকই রেডিও শোনেন চিত্তবিনোদনের জন্ত এবং রেডিওর জনপ্রিয়তাও নির্ভর করে এই ব্যাপারে তাহার সাফল্যের উপর। ড. রাজেন্দ্র-প্রসাদের ভাষায় "সাংস্কৃতিক প্রয়োজন এবং চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই" ইহার কর্ত্তব্য। ছায়াছবির গান বর্জ্জনের গোঁড়ামির জন্ত বহু শ্রোতাই অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর অনুষ্ঠান বাদ দিয়া পাকিস্থান এবং সিংহলের রেডিও হইতে প্রচারিত অনুষ্ঠান শোনেন। পাকিস্থান ছায়াছবির সঙ্গীত মারফত শ্রোতাদের আকৃষ্ট করিয়া ভারতবিরোধী প্রচারের সুবিধা করিয়াছে। জনচিত্তে ছায়াছবির গানের আবেদনের কথা অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর ভুলিয়া যাওয়া উচিত হইবে না।

উপসংহারে পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, জনসাধারণের মধ্যে সুষ্ঠু সঙ্গীত পরিবেশনের জন্ত রেডিওর প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়াও এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ছায়াছবির গানের মধ্যেও বহু "নির্ম্মল" (clean) গান আছে—যেগুলি শ্রোতাদের নিকট হইতে দূরে রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিবার ব্যাপারেও ছায়াছবির গান বিশেষ সাহায্য করিতে পারে।"

রেডিওতে গায়ক ও গায়িকা উপযুক্ত ও যোগ্য না হইলে সকল প্রচেষ্টাই বৃথা হইতে পারে। সেদিকে আরও জোর দেওয়া উচিত আমরা মনে করি।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বহিরাগত নেতৃত্ব

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব আসিয়াছে প্রধানতঃ মধ্য-বিত্ত শ্রেণী হইতে। ভারতে যে চারিটি প্রধান শ্রমিক সংগঠন রহিয়াছে তাহাদের নেতৃস্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই সত্য প্রমাণিত হইবে। ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল হইতে দেশ-মাতৃকার মুক্তি-সংগ্রামে শ্রমিকদিগকে অধিকসংখ্যায় আকৃষ্ট করিবার প্রচেষ্টাতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণ প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি আকর্ষিত হন এবং প্রধানতঃ এই ভাবেই ভারতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনেও সূত্রপাত হয়।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের এই দিকটি ইউরোপ বা আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ সকল দেশে আন্দোলন এবং সংগঠনের নেতৃত্ব আসে প্রধানতঃ শ্রমিকদের মধ্য হইতেই। উপরন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্য হইতে বক্তা, তথ্যবিৎ, রাজকর্ম্মচারী, রাজনৈতিক দলের নেতা এমন কি মন্ত্রীসভার সদস্য সৃষ্টি হয়। ভারতে প্রধানতঃ রাজনৈতিক দলগুলিই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্ব যোগাইয়াছে। অবশ্য, ব্রিটেনের

লেবার পার্টিতে বহু মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর লোকও বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ রহিয়াছেন।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের এই বিশেষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ২৩শে অক্টোবর "ভিজিল" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীঅজিতকুমার রায় মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন যে, এইরূপ ব্যবস্থা এতদিন চলিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকসংখ্যক মধ্যবিত্ত যুবকগণ নিঃস্বার্থ হইয়া এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলন এক নেতৃত্বহীনতায় সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে—যেহেতু শ্রমিকগণ নিজেদের সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা এখনও অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে এই অভাব এখনই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যদিও কম্যুনিষ্ট ও সোস্তালিষ্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবস্থা এখনও তত সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছায় নাই।

শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বের এই স্থবিরতা এমন এক সময়ে দেখা দিয়াছে যখন ভারতের সর্ব্বত্রই শিল্পবিস্তারের গতি বিশেষ দ্রুততর রূপ ধারণ করিয়াছে এবং শ্রমিকদের সমস্তার ব্যাপকতা এবং জটিলতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে শ্রমিক নেতাদের এত বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকিতে হয় যাহা দশ বৎসর পূর্ব্বেও প্রয়োজন হইত না। ফলে শ্রমিক-নেতৃত্ব এখন একটি নৈপুণ্যসূচক কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন ট্রাইবুনাল প্রভৃতিতে ওকালতি করিবার জন্য যে পরিমাণ আইনজ্ঞানের প্রয়োজন তাহা আয়ত্ত করা বিশেষ শ্রম, সময় ও ব্যয়সাধ্য। 'লেবার' আপীল আদালতের নির্দ্দেশগুলি না জানা থাকিলে কাহারও পক্ষে শ্রমিকদের তরফ হইতে ফলপ্রসূ আলোচনা করা সম্ভব হয় না। সংক্ষেপে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রজ্ঞার প্রয়োজন।

ঠিক এইরূপ সন্ধিক্ষণে নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত নূতন লোকের আগমন বন্ধ হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলন স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের কবলে পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই অবস্থা যাহাতে সৃষ্টি হইতে না পারে তাহা দেখা সরকার, মালিক এবং সকল রাজনৈতিক দলের সমান দায়িত্ব।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অভিমতে শ্রমিকদের মধ্য হইতে উপযুক্ত নেতা যাহাতে সৃষ্টি হইতে পারে কেবলমাত্র সেই চেষ্টাতেই ইহা করা সম্ভব। সরকারকে এই ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং আইন প্রণয়ন করিয়া মালিকদিগকে ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে হইবে। শ্রমিকগণ যাহাতে সর্ব্বক্ষণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মী হইতে পারেন সেই দিকে মালিকদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। ট্রেড ইউনিয়নে দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য্য করিবার জন্য শ্রমিকদিগকে নিজ পদের উপর "লিয়েন" (lien) রাখিয়া সর্ব্বক্ষণের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করিবার সুযোগ দিতে হইবে—যাহাতে পরে তাহারা প্রয়োজনমত নিজেদের কাজে আসিয়া যোগদান করিতে পারে।

বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষে ইংরেজীতে লিখিত আইন পড়িয়া বুঝিতে পারা দুঃসাধ্য ব্যাপার। শ্রীমুখোপাধ্যায় এই সকল আইনের প্রামাণিক অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশের পরামর্শ দিয়াছেন। অনুরূপভাবে যাহাতে মালিকরাও সকল আদেশ এবং বিজ্ঞপ্তি শ্রমিকদের মাতৃভাষায় দেন তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ট্রাইবুনালসমূহ হইতে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার তুলিয়া দিতে হইবে। এই ভাবেই শ্রমিক আন্দোলন নেতৃত্ব-সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইতে পারে বলিয়া শ্রীমুখোপাধ্যায় মনে করেন।

ভারতীয় শ্রমিকেরও যে ভারতের জনসাধারণের সম্পর্কে গুরু দায়িত্ব আছে, এই শিক্ষা কে দিবে? আগেকার ও বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ নিজেদের মতলব মত তাহাদের শুধু দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে সচেতন করিয়াছেন। শ্রমিক যদি শুধু তাই শিখিতে চায় তবে নেতৃত্ব শিক্ষার প্রয়োজন কি?

রাশিয়ায় ভারতীয় ভাষার অভিধান প্রকাশ

সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নে একটি হিন্দী-রুশ অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই একটি উর্দু-রুশ অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল। এল্ মারবার্ড লিখিত প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে ইউ. এস. এস. আর. বিজ্ঞানমন্দিরের প্রাচ্যবিদ্যাভবন রুশ-হিন্দী, বাংলা-রুশ, পাঞ্জাবী-রুশ এবং রুশ-উর্দু অভিধান প্রণয়নে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই ঐ অভিধানগুলি প্রকাশিত হইবে।

ভারতীয় ভাষা ব্যতীত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য ভাষার অভিধান প্রকাশেরও আয়োজন সোভিয়েট ইউনিয়নে করা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র সংস্করণের ইন্দোনেশীয়-রুশ অভিধান ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৃহৎ আকারে একটি ইন্দোনেশীয়-রুশ এবং রুশ-ইন্দোনেশীয় অভিধান প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। একটি ভিয়েৎনাম-রুশ অভিধান প্রস্তুতের কার্য্য ইতিমধ্যেই সুরু করা হইয়াছে। আগামী পাঁচ হইতে আট বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রকাশ-ভবন ব্রহ্ম, টাগাল, থাই এবং কতকগুলি ভারতীয় ভাষার অভিধান প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

১৯১৭ সনের নবেম্বর মাসে রুশবিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবার পর কম্যুনিষ্ট শাসনে সোভিয়েট ইউনিয়নের গত ৩৭ বৎসরে যে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি হইয়াছে 'টাস' কর্ত্তৃক সে সম্পর্কে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কয়েকটি নিয়ে দেওয়া গেল:

সোভিয়েট ইউনিয়নে ৪৯৭টি থিয়েটার রহিয়াছে। এই থিয়েটারগুলিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির ৩৯টি ভাষায় নাটকাদি অভিনীত হয়। ১৯৫৩ সনে সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চগুলির ১ লক্ষ ২৪ হাজারেরও অধিক নাটকাদি পরিবেশনে দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী সংগঠনগুলি কর্ত্তৃক শহর অঞ্চলে

পরিচালিত হয় ৫২০০টি সিনেমা থিয়েটার ; পল্লী কেন্দ্রগুলিতে পরিচালিত সিনেমার সংখ্যা ২৫০০। ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভাগীয় সংস্থা কর্ত্তৃক পরিচালিত সিনেমার সংখ্যা এই হিসাবে ধরা হয় নাই।

সোভিয়েট দেশে লেখকের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী, চিত্রকর ও ভাস্করের সংখ্যা হয় সহস্রাধিক। সোভিয়েট ইউনিয়নের সুরকার ও গায়ক-বাদক সঙ্ঘের সংখ্যা এক হাজারের বেশী।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ৩ লক্ষ ৮০ হাজারের অধিক পাঠাগার রহিয়াছে—পুস্তক সংখ্যা ১০০ কোটিরও অধিক। মোট ক্লাবের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৩ হাজার।

যৌথ ও সরকারী খামারগুলিতে ৮২ হাজার ক্লাব সংগঠন, ১ লক্ষাধিক লাইব্রেরী, ১৫ হাজার স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ ফিল্ম প্রজেক্টর রহিয়াছে। সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিতে কর্ম্মরত নরনারীর সংখ্যা ১লক্ষ ৬০ হাজার।

১৯৫৩ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে ২২ কোটি ২৮ লক্ষ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়—প্রাক্-বিপ্লব ১৯১৩ সনের সংখ্যার প্রায় ১৪ গুণ বেশী। সোভিয়েট সরকার স্থাপনের পর শিশুদের উপযোগী ৪৩,৮০০ পুস্তক প্রকাশিত হয়—উহাদের মোট খণ্ডের সংখ্যা ১২৪ কোটি ৯০ লক্ষ। ১৯৫৪ সনে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় প্রকাশ-ভবনসমূহ ৪৮৫টি শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিবে— ৭ কোটি ১০ লক্ষ খণ্ড।

রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্য্যে মার্কিন হস্তক্ষেপ

"হিতবাদ" পত্রিকার ২১শে অক্টোবর সংখ্যায় সম্মিলিত রাষ্ট্র-পুঞ্জের কার্য্যে মার্কিন হস্তক্ষেপের সমালোচনা করিয়া মন্তব্যপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, অল্প দিন পূর্ব্বে মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর হইতে রাষ্ট্র-পুঞ্জের সাধারণ সম্পাদকের উপর চাপ দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে ফরমোসার মার্কিন আক্রমণ সম্পর্কে পিকিং সরকারের অভিযোগ সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত না হয়। সম্প্রতি অপর এক সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ হেনরী ক্যাবট লজ ইউনেস্কোর অধ্যক্ষের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন—কারণ অধ্যক্ষ ডাঃ লুথার ইভান্স মার্কিন কর্ম্মচারী আনুগত্য বোর্ডের বিরূপ রিপোর্টের ভিত্তিতে ইউনেস্কোর আট জন মার্কিন কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিতে অস্বীকার করেন।

"হিতবাদ" লিখিতেছেন, ডাঃ লুথার ইভান্সের এইরূপ সমালোচনা এবং সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ ডাগ হ্যামারশোল্ডের উপর চাপের বহর দেখিয়া মনে হয় যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার সম্মিলিত রাষ্ট্র-পুঞ্জকে তাহাদের একটি সরকারী বিভাগ বলিয়া মনে করেন—যেন তাহা ওয়াশিংটনের হাতভোলা। "এইরূপ ব্যবহার কি বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানটির মর্য্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক ?"—'হিতবাদ' প্রশ্ন করিয়াছেন।

মার্কিন গণতন্ত্র ও ড. আইনষ্টাইন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে স্বাধীনভাবে গবেষণা চালাইয়া যাওয়া যে কত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকের স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশের পথে যে কিরূপ অন্তরায় রহিয়াছে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর আলবার্ট আইনষ্টাইনের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে তাহার এক বিশেষ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ড. আইনষ্টাইন ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন, যদি তাঁহার যৌবন ফিরিয়া আসে তবে তিনি বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত বা শিক্ষক হইতে চাহিবেন না ; তিনি এক জন সাধারণ শ্রমিকরূপে জীবনে যতটুকু স্বাধীনতা পাওয়া যায় তাহা ভোগ করিতে চেষ্টা করিবেন।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ড. আইনষ্টাইন নাৎসী-কবলিত জার্ম্মানী ত্যাগ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং তথায় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞানমন্দিরের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত জ্ঞানমন্দিরের ডিরেক্টর, অধ্যাপক ওপেনহিমার অতীত রাজনৈতিক যোগাযোগের জন্য বর্ত্তমানে মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছেন। অধ্যাপক ওপেনহিমারের এইরূপ লাঞ্ছনায় আইনষ্টাইন সহ সমগ্র মার্কিন বৈজ্ঞানিকমহল সরকারের কার্য্যের নিন্দা করেন। ওপেনহিমার ও অন্যান্য মার্কিন বৈজ্ঞানিক-দের উপর সরকারী বিধিনিষেধ আরোপের পরোক্ষ সমালোচনা হিসাবেই অধ্যাপক আইনষ্টাইন উক্ত বিবৃতি দিয়াছেন।

ভারত-সিংহল আলোচনা

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নয়াদিল্লীতে সিংহলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনসাধারণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক আলোচনা হয় উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে। আলোচনার ফলে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়—যাহাতে জানুয়ারী মাসে স্বাক্ষরিত নেহরু-কোটে-লাওয়ালা চুক্তি কার্য্যকরী করায় সাহায্য হইতে পারে।

নয়া দিল্লীতে আলোচনার সময় সিংহলের প্রতিনিধিদলের সরকারী কর্ম্মচারী সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে সিংহলের "ট্রিবিউন" পত্রিকায় একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

পত্রিকাটির বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন, আলোচনার প্রারম্ভে সিংহলের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ ডি. নাল্লাইয়া সিংহল-প্রতিনিধিদলের মুখপাত্ররূপে সিংহলস্থিত ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ দেশাইয়ের বিরুদ্ধে প্রবল বিষোদ্গার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, সিংহল সরকারের পক্ষ হইতে ভারতীয়দিগকে নাগরিকত্ব দান ব্যাপারে কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করা হয় নাই। ভারতীয় দলের পক্ষ হইতে উত্তরে সিংহল সরকারের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইলে তাহা অস্বীকার করা হয়।

এই আলোচনায় যখন কোন মীমাংসার সম্ভাবনার আশা দেখা গেল না তখন পণ্ডিত নেহরু নাকি বলেন যে, "রাষ্ট্রহীন" ব্যক্তি-দের ব্যাপারে উভয় পক্ষের মতবিরোধ স্বীকার করিয়াই পরদিনের জন্য আলোচনা স্থগিত রাখা হউক—অন্যান্য বিষয়ে উভয় পক্ষের মতের মিল হইতে পারে কিনা তাহা বিবেচনা করিবার জন্য।

পরদিন মন্ত্রীদের সভায় ঠিক হয় যে, বিকালে উভয় রাষ্ট্রের

বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা (officials) নেহরু-কোটেলাওয়ালা চুক্তি সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রের সম্মতির ভিত্তিতে একটি ঘোষণার খসড়া প্রণয়ন করিবেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের এই অধিবেশনে সিংহল ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসের দুই জন প্রতিনিধিকে (মিঃ থনভামন ও মিঃ আজিজ) আমন্ত্রণ জানান হয়। সিংহলের পক্ষ হইতে ইঁহাদের উপস্থিতি বোধ করা যায় নাই এই কারণে যে, সিংহল প্রতিনিধি দলের সহিত সিংহল এষ্টেটস্‌ এমপ্লয়ারস ফেডারেশনের আইন-বিষয়ক সেক্রেটারী, কর্ণেল জে. এ. টি. পেরেরাও আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

উভয় দেশের কর্ম্মচারীদের অধিবেশনে কর্ণেল পেরেরা মিঃ দেশাইয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিলে মিঃ দেশাই তৎক্ষণাৎ বলেন যে, তিনি যে-কোন আবেদনকারীকে ভারতীয় নাগরিকরূপে রেজিষ্ট্রী করিতে স্বীকৃত রহিয়াছেন এবং বিপরীত সাক্ষ্য না থাকিলে প্রত্যেক আবেদনপত্রকেই স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বলিয়া মনে করিবেন। শ্রীদেশাইয়ের এই উক্তিতে ভারতের স্কন্ধে দোষ চাপাইবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে দেখিয়া কর্ণেল পেরেরা তখন বলেন যে, প্রত্যেক এষ্টেটেই ২০।৩০টি পরিবার রহিয়াছেন যাঁহারা ভারতে ফিরিতে সবিশেষ উৎসুক এবং মালিকেরাও তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ ও গ্র্যাচুয়িটি দিতে সম্মত রহিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ থনভামন মিঃ পেরেরার এই উক্তির অসারতা দেখাইয়া তাঁহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য করেন যে, মালিকেরা গ্র্যাচুয়িটি এবং ক্ষতিপূরণ দিবেন ত্রিচিনোপল্লীতে—অর্থাৎ, ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিবার পর।

তখন ভারতীয় এবং পাকিস্থানী রেজিষ্ট্রেশনের কমিশনার মিঃ টেয়েকুন অগ্রসর হইয়া বলেন যে, সিংহল ভারতীয় কংগ্রেস ১৮ মাস যাবৎ রেজিষ্ট্রেশন আইন বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বলেন, আইনটি ন্যায়সঙ্গতভাবেই কার্য্যকরী করা হইতেছে এবং ইহার প্রয়োগ সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কিন্তু মিঃ টেয়েকুনের বাকচাতুর্য্য বেশীক্ষণ কার্য্যকরী হইবার সুযোগ পাইল না। সিংহল ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা প্রথমেই দেখাইলেন যে, আইন বর্জ্জন ১৮ মাস যাবৎ হয় নাই—মাত্র সাত মাস যাবৎ করা হইয়াছে।

অতঃপর যখন মিঃ টেয়েকুনকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সামান্য পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে তিনি অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের উপর কোন নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন কিনা, তখন তিনি তাহা অস্বীকার করেন। একটি সার্কুলার মারফত শপথপত্রে জাষ্টিস অব দি পীসের স্বাক্ষর দুর্ব্বোধ্য বলিয়া আবেদনপত্র নাকচ করিবার নির্দ্দেশদানের কথাও তিনি অস্বীকার করেন।

তখন সিংহল ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা একটি সার্কুলারের আলোকচিত্রে গৃহীত প্রতিলিপি (photostat) হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিয়া শোনান। তখনও মিঃ টেয়েকুন তাহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন শ্রীদেশাই উক্ত সার্কুলারখানি সম্পূর্ণ পড়িতে লাগিলেন তখন মিঃ টেয়েকুন নীরব হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় মিঃ গুণসেনা দ্য সুজা মিঃ টেয়েকুনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মিঃ টেয়েকুন থামিবার পাত্র নহেন; যে সার্কুলারের অস্তিত্ব কয়েক মিনিট পূর্ব্বেও তিনি সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, কমিশনার হিসাবে তাঁহার ঐরূপ সার্কুলার জারী করিবার বিধিসম্মত অধিকার রহিয়াছে।

মিঃ গুণসেনা তখন আর থাকিতে না পারিয়া বলেন যে, ঐরূপ কোন সার্কুলারের কথা তিনি জানেন না, তবে যদি ঐ ধরনের কোন সার্কুলার জারী করা হইয়া থাকে তাহা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইবে।

উক্ত সংবাদদাতার মতে ইহার পর সিংহল প্রতিনিধিদল সম্পূর্ণ রূপে নিস্তেজ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের আর বলিবার কিছু থাকে না। তিনি লিখিতেছেন যে, সিংহলদলের একমাত্র মিঃ ভি. জে. এইচ. গুণসেকরই স্থিরমস্তিষ্ক হইয়া আলোচনা চালাইয়াছেন। মিঃ গুণসেকর তখন অধিবেশনের সভাপতি মিঃ দত্তের নিকট প্রস্তাব করেন যে, অতঃপর কেবলমাত্র রাজকর্ম্মচারীরা মিলিয়াই মন্ত্রীদের নিকট পেশ করিবার জন্য কতকগুলি সুপারিশ রচনা করিবেন। সভাপতি তাহাতে সম্মত হইয়া কর্ণেল পেরেরা এবং সিংহল ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসের প্রতিনিধিদ্বয়কে সভাস্থান হইতে চলিয়া যাইতে অনুরোধ জানান।

পরদিন সকাল বেলায় মন্ত্রীদের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাহাতে রাজকর্ম্মচারীদের (officials) সুপারিশগুলি সামান্য কিছু অদলবদল করিবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। তবে 'রাষ্ট্রহীন'দের সমস্যা তখনও পর্য্যন্ত অমীমাংসিত থাকে। এই ব্যাপারেও একমত হওয়া যায় কিনা সেই সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য 'রাজকর্ম্মচারী'দের মধ্যে আর একটি সম্মেলনের জন্য বলা হয়। এই সম্মেলনে ভারতের পক্ষ হইতে পররাষ্ট্র-দপ্তরের শ্রীএন্. আর. পিল্লাই এবং শ্রীসুবিমল দত্ত উপস্থিত থাকেন; কিন্তু সিংহলের পক্ষে কোন স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডাডলি সেনানায়ক ও সিংহল পার্লামেন্টের বিরোধীদলের নেতা মিঃ বন্দরনায়ক উপস্থিত থাকেন। সংবাদদাতা লিখিতেছেন, "সিংহলের স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীরা সিংহল প্রতিনিধিদলকে এভাবে হীন প্রতিপন্ন করেন যে, সম্মেলনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত্তে প্রতিনিধিদলের দুই জন বিশিষ্ট সদস্যকে রাজকর্ম্মচারীদের স্থানে কাজ করিতে হয়।" (ট্রিবিউন, ২৩শে অক্টোবর)

ব্রিটেন ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া জোট

ব্রিটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা সম্পর্কিত সন্ধিপত্র অনুমোদন করিয়াছে। অন্যান্য দেশেও ইহার সত্বর অনুমোদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক "সিয়াটো" (SEATO) সন্ধিপত্রের অনুমোদন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে "হিতবাদ" ১৩ই নবেম্বর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, ব্রিটেনের পক্ষে এইরূপ তৎপরতা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী স্যর্ এণ্টনী ইডেন ইন্দোচীন সম্পর্কিত জেনেভা চুক্তি সম্পাদনে বিশেষ সহায়তা করেন। সেই চুক্তির একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকার করেন যে, ঐ অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁহারা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। পত্রিকাটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক কমিশনের কার্য্য যাহাতে বানচাল না হইয়া যায় সেইজন্য ঐরূপ অঙ্গীকারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অথচ ঐরূপ অঙ্গীকার সত্ত্বেও ব্রিটেন এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রোৎসাহী ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় একটি যৌথ নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হয়। যদিও দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া ম্যানিলা সম্মেলনে উপস্থিত ছিল না (তাহাদের পক্ষে তাহা সম্ভবও ছিল না) তবুও ইহা সত্য যে, ঐ তিনটি দেশ "সিয়াটো"র রক্ষণশীল পক্ষপুটের অন্তর্গত হইয়াছে।

"হিতবাদ" লিখিতেছেন, জেনেভা চুক্তির সর্ত্তাবলীর সহিত ব্রিটেন কিরূপে 'সিয়াটোর' ন্যায় একটি সন্ধিকে মানাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে তাহা বুঝা শক্ত। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, চীন-সোভিয়েট চুক্তি এবং চীন-সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভিয়েৎমিনের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার বিপক্ষে ভার-সাম্য রক্ষা করাই সিয়াটোর উদ্দেশ্য। ব্রিটেন কর্তৃক সিয়াটো চুক্তির অনুমোদনের যুক্তি হিসাবে মিঃ ইডেন ভিয়েৎমিন বাহিনীর পুনর্গঠনের ব্যাপকতা ও দ্রুতগতির কথা উল্লেখ করিয়া এক ভয়াবহ চিত্র রচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভিয়েৎমিনের স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা জেনেভা সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্ব্বের প্রায় দ্বিগুণ হইবে।

পত্রিকাটির অভিমতে সর্ এণ্টনী ইডেন যেরূপ যুক্তিই দেখান না কেন, ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কম্যুনিষ্টরা জেনেভা চুক্তি মানিয়া চলিতে পারিবে না এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং অন্যান্য রাষ্ট্র তাহাদের নীতি নির্দ্ধারণ করিতেছে। যদি ইন্দোচীনের অবস্থা কোন অবাঞ্ছিত রূপ পরিগ্রহ করে তবে এইরূপ সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টির দায়িত্ব ঐ সকল দেশকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্পষ্টতঃই মার্কিনের চাপে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স "সিয়াটো" চুক্তি সহি করিতে বাধ্য হইয়াছে। ব্রিটেনের পক্ষে এই কাজ অধিকতর অসমীচীন হইয়াছে এইজন্য যে, কমনওয়েলথের দেশগুলি এই ব্যাপারে একমত হইতে পারে নাই। কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিতে পারে মার্কিন নেতৃত্বে এইরূপ একটি চুক্তির প্রবর্ত্তন করা কি ব্রিটেনের পক্ষে উচিত হইয়াছে? আমরা মনে করি অনেক কারণে 'সিয়াটো'তে ব্রিটেনের অংশ গ্রহণ অসমীচীন হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রবীণ সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কিছুকাল রোগভোগের পর সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স তেষট্টি বৎসর হইয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্রবে আসেন। পরে শ্রীশ্রীমার নিকট তিনি দীক্ষিত হন। কৈশোর হইতেই সাহিত্যসেবার দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল। মিশনের সংস্রবে আসিয়া তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে জনসেবায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি 'নারায়ণ' মাসিকপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে যুগে এই পত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর প্রামাণিক সুবৃহৎ জীবনী-গ্রন্থ রচনায় এই সময় হইতেই তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পর "ছেলেদের বিবেকানন্দ", জবাহরলাল নেহরুর "আত্মচরিত" (অনুবাদ) ষ্টালিনের "জীবনী", "আমার দেখা রাশিয়া" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ এবং উপন্যাসও তিনি লিখিয়াছিলেন। রস-রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'নন্দীভৃঙ্গী' ছদ্মনামে তাঁহার বহু রস-রচনা বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে।

কিন্তু বাংলার সাংবাদিক হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা অন্য সকলকেই ছাপাইয়া গিয়াছিল। 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাকালেই তিনি ইহার সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত হন। তিনি দীর্ঘকাল ইহার সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র-জগতে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে তাহার জন্য সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আদৌ কম নহে। সংবাদ-সাহিত্যও যে প্রকৃত সাহিত্য-পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে তাহা সত্যেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম উক্ত পত্রিকার মাধ্যমে বিদগ্ধ সমাজের হৃদয়ঙ্গম করান। তিনি কিছুকাল 'শ্রুতি' সাপ্তাহিক প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'যুগান্তরে'র সম্পাদকীয় বিভাগেও প্রথম দিকে তিনি যুক্ত ছিলেন। 'সত্যযুগ' দৈনিকের তিনি কয়েক বৎসর সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি পুনরায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত হইয়া-ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ আদর্শবাদী ছিলেন। তাঁহার ভাষার ওজস্বিতা সকলকেই চমৎকৃত করিত। তাঁহার আলাপনে মধুরতা, সুমিষ্ট ব্যব-হার এবং স্বাভাবিক আত্মীয়তাবোধ অল্প সময়ের মধ্যে অপরিচিতকে আপন করিয়া লইত। তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতিতেও যোগ দিয়াছিলেন, এবং কারাবরণও করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁহার বিয়োগে বাংলা দেশ একজন প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্য-রসিকই শুধু হারাইল না, আমরাও একজন সহকর্ম্মী বন্ধুর মৃত্যুতে আত্মীয়বিয়োগের দুঃখ অনুভব করিতেছি। তাঁহার অভাব পূরণ হইতে দীর্ঘ সময় লাগিবে।

প্রাচীন ভারতের লোকায়তিক বিপ্লব

শ্রীকালিদাস দত্ত

২

বৈদিক যুগে যে সমস্ত কারণে লোকায়তিক মতবাদ ও তজ্জনিত বিপ্লবের উৎপত্তি হয় তাহার একটি বিবরণ উক্ত মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের সহিত আমি গত কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ বিপ্লবের মাধ্যমেই জগতে সর্ব্বপ্রথম সাম্যবাদ ঘোষিত ও প্রচারিত হয়। তজ্জন্য শুধু ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর ইতিহাসে উহা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

ঐ মতবাদীরা, স্বভাববাদীরূপে, প্রাচীন ভারতে সর্ব্বাগ্রে বেদধর্ম্মের বিরুদ্ধে যান। সে কারণ নাস্তিক, পাষণ্ড, নগ্ন ও অসুর প্রভৃতি নিন্দনীয় নামে তাঁহারা প্রথমেই বেদধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা অভিহিত হন। প্রাচীন ভারতের বেদধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যক্তিগণ সকলেই অল্পবিস্তর ঐ সকল ঘৃণ্য নামে আখ্যাত ছিলেন। উহার বহু প্রমাণ পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে আছে।

মহাভারতে নাস্তিক শব্দ প্রসঙ্গে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন, "যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে তাহারাই নাস্তিক।"১ পাষণ্ড অর্থে লিঙ্গপুরাণকার বলিয়াছেন, "বেদবিহিত নিয়মাবলী ও শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মবিবর্জ্জিত যে সকল ব্যক্তি তাহারাই পাষণ্ড।"২ নগ্ন শব্দের অর্থও বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ, "বর্ণত্রয়ের আবরণ স্বরূপ ঋক, যজুঃ ও সাম এই ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পরিত্যাগ করে সেই পাতকীর নাম নগ্ন।"৩ ছান্দোগ্য উপনিষদকার বলিয়াছেন, "যজ্ঞহীন ও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরাই অসুর।"৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উল্লিখিত আছে যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী স্বভাববাদীরা অসুরশ্রেণীভুক্ত ছিলেন।৫

উপরোক্ত কারণেই বিষ্ণুপুরাণে লোকায়তিকদের অসুর ও দৈত্য নামে এবং তাঁহাদের মতবাদ সৃষ্টিকর্ত্তার মায়ামোহ নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাতে উক্ত মায়ামোহের যে সমস্ত প্রচারোক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তৎসমুদয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থে লোকায়তিক মতবাদরূপে উল্লিখিত আছে। উহা হইতে ঐ মতবাদ সৃষ্টিকর্ত্তাকেই যে বিষ্ণুপুরাণকার ঐরূপ বিকৃত নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়।

উক্ত মায়ামোহের দ্বারা অসুরদের এবং ঐ সকল অসুরের দ্বারা জনসাধারণকে লোকায়তিক মতবাদে দীক্ষিত করিয়া বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইবার উল্লেখও বিষ্ণুপুরাণে আছে। উহা এইরূপ, "মায়ামোহ অসুরগণকে বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইলে অসুরগণও মায়ামোহ হইয়া অন্য ব্যক্তিদের নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিল। তাহারাও অন্য দৈত্যদিগকে, অন্য দৈত্যরাও অপর ব্যক্তিদের, অপর ব্যক্তিরা আর আর ব্যক্তিকে, আর আর ব্যক্তিরা অন্যান্য লোককে অল্পদিনের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইল।"৬

পৌরাণিক গ্রন্থগুলির স্থানে স্থানে লোকায়তিক মতবাদ বিস্তারের ঐ প্রকার আরও যে সমস্ত উল্লেখ আছে তৎসমুদয় হইতে প্রতিপন্ন হয় যে বৈদিক যুগে আর্য্যদের মধ্যে ধর্ম্মের বিরোধ বশতঃ উক্ত মতবাদীদের সংখ্যা উপরোক্তরূপে খুবই সত্বর বাড়িয়া গিয়াছিল। সে কারণ উহা প্রতিরোধের জন্য বহুবিধ সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়। উহার কয়েকটি নিদর্শন যাহা মনুসংহিতায় আছে তাহা এই,

"যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বেদ ও স্মৃতি, এই দুই ধর্ম্মমূলক শাস্ত্রকে অবমাননা করে সেই বেদনিন্দক নাস্তিক, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে (৭)।"

"যে স্ত্রীলোক বেদবহির্ভূত পাষণ্ড ধর্ম্ম অবলম্বন করে এরূপ স্ত্রীলোকেরও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নিষিদ্ধ (৮)।"

"বেদবিরুদ্ধ মার্গাবলম্বী, বেদশাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, বেদবিরুদ্ধ তার্কিক ইহাদের বাক্যদ্বারাও অর্চনা করিবে না (৯)।"

"পাষণ্ডদের দ্বারা আক্রান্ত দেশে বাস করিবে না (১০)।"

এ বিষয়ে মনুসংহিতায় আরও এই সমস্ত মন্তব্যও আছে।

"যে রাজ্য নাস্তিকাক্রান্ত, শূদ্রবহুল ও দ্বিজশূন্য তাহা দুর্ভিক্ষ ও নানা ব্যাধিতে শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায় ও যে সকল শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ ও অসৎতর্কমূলক সেগুলি পরলোকে ফলদায়ক হয় না। অধিকন্তু তদ্দ্বারা নরক প্রাপ্তি হয় (১১)।"

"একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিবেন তাহাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। যাহারা সাবিত্র্যাদি ব্রতরহিত, যাহারা জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ এরূপ সহস্র ব্যক্তিরও পরিষৎ নাই (১২)।"

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়, ১২ অধ্যায়
২। লিঙ্গপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৭৮ অধ্যায়
৩। বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ, ১৭ অধ্যায় ৫
৪। ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮।৮।৫
৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬ অধ্যায় ৭,৮
৬। বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ, ১৮ অধ্যায়
৭। মনুসংহিতা, ২ অধ্যায়, ১১
৮। মনুসংহিতা, ৫ অধ্যায়, ৯০
৯। মনুসংহিতা, ৪ অধ্যায়, ৩০
১০। মনুসংহিতা, ৪ অধ্যায়, ৬১
১১। মনুসংহিতা, ৮ অধ্যায়, ২২ ও ১২ অধ্যায়, ৯৫
১২। মনুসংহিতা, ১২ অধ্যায়, ১১৩, ১১৪

জনসাধারণকেও তাঁহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইত তাহার যে নিদর্শন বিষ্ণুপুরাণে আছে তাহা এই,

"পাষণ্ড পাপচারীদের সহিত আলাপ বা তাহাদের স্পর্শ করিবে না। পরান্নভোজী বেদবিরোধী ঐ সকল পাপাত্মা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে। উহাদের দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। উহার শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ নষ্ট হয়। উহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে একদিনের পুণ্য প্রনষ্ট হয়। ঐ পাপাত্মাদের নাম পাষণ্ড। পণ্ডিত ব্যক্তি উহাদের সহিত আলাপ করিবে না। দেবাতিথি পূজা ব্যতিরেকে আহারকারী, সর্ব্বপ্রকার শৌচহীন, তর্পণ কিংবা পিতৃপিণ্ডদানে পরাঙ্মুখ ঐ সকল ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলেও মনুষ্য নরকে গমন করে (১)।"

ঐরূপ বিদ্বেষবশতঃ ক্রমশঃ তাঁহাদের মতবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠও উপপাতক বলিয়া ঘোষিত হয় এবং শাস্ত্রে ঐ প্রকার পাতকীর পরিত্রাণের জন্য পরাকব্রত ও গোমেধ যজ্ঞদ্বারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হয়।২ কোন কোন শাস্ত্রকার আবার ঐরূপ বেদবিপ্লাবক পিতাকেও বর্জ্জন করিবার নির্দ্দেশ দেন।৩

এই সকল তথ্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রবল প্রতিপক্ষের দারুণ বিদ্বেষের সম্মুখীন হইয়া তৎকালে তাঁহাদের উক্ত মতবাদের সপক্ষে জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। বাল্মীকি-রামায়ণে চিত্রকূটে ঋষি জাবালীর সহিত রামের যে সমস্ত কথোপকথন উদ্ধৃত আছে তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা উহার জন্য তৎকালীন কঠোর চৌর্য্যদণ্ডে দণ্ডনীয় ছিলেন।৪ উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লিখিত আছে যে, দশরথ ও রাম-রাজ্যে তাঁহাদের স্থান ছিল না।

উপরোক্ত বিবরণগুলি ব্যতীত বিষ্ণুপুরাণে পূর্ব্বোল্লিখিত মায়ামোহের মতানুবর্ত্তীদের বিনাশের যে উল্লেখ একটি দেবাসুর যুদ্ধের কাহিনীতে আছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকালে বলপ্রয়োগ দ্বারাও তাঁহাদের ধ্বংস করা হইয়াছে। উহাও এইরূপ,

"মায়ামোহ তাঁহার মতবাদ দ্বারা দৈত্যগণকে এরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন করিয়া দিল যে তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির আর বেদে রুচি রহিল না। এইভাবে দৈত্যগণ কুপথগামী হইলে দেবগণ পরম উদ্যোগে তাঁহাদের নিকট যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন দেবতারা সন্মার্গবিশিষ্ট অসুরগণকে বিনাশ করিলেন (৫)।"

মহাভারতেও ভারতযুদ্ধের পূর্ব্বকালে বেদধর্ম্ম বিরোধী ঐরূপ অসুরদের বিনাশের আর একটি উল্লেখ আছে। উহা এই,

"পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণু ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে শত্রু নাশ করিয়া দেবতা ও মহর্ষিগণকে রক্ষা করিয়াছেন। যদি তিনি শত্রুগণকে বিনাশ না করিতেন তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রহ্মা, কি আদিধর্ম্ম কিছুই থাকিত না। যদি তিনি পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক অসুরগণকে পরাজিত না করিতেন তাহা হইলে বর্ণচতুষ্টয় ও চারি আশ্রমধর্ম্ম সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাইত। ধর্ম্মসমুদয় উচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়াছিল। শাশ্বত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই তৎসমুদয় রক্ষা করিয়াছে (৬)।"

মৎস্য পুরাণকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে চন্দ্রমস্‌ গোত্রে, ভৃগুবংশে প্রমতি নামে বিষ্ণুর অংশজাত এক নরপতি আবির্ভূত হন। তিনি কয়েক বৎসর নানা অস্ত্র, হস্তী, অশ্ব ও রথাদি রণোপকরণ সংগ্রহ করতঃ শতসহস্র ব্রাহ্মণ সৈন্যের সাহায্যে শূদ্ররাজগণকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া পাষণ্ডদিগকে নিঃশেষ করেন।

"স হত্বা সর্ব্বশশ্চৈব রাজানঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
পাষণ্ডান্‌ স তদা সর্ব্বান্‌ নিঃশেষানকরোৎ প্রভুঃ।"(৭)*

উপরোক্ত কয়েকটি গ্রন্থে প্রাচীন বেদধর্ম্মবিরোধী ঐ সকল দৈত্য, অসুর ও পাষণ্ডগণের বিনাশের ঐরূপ উল্লেখ ভিন্ন মহাভারতে চার্ব্বাক বধের আর একটি বৃত্তান্ত আছে। উহাতেও তিনি ব্রাহ্মণের নিন্দাকারক ছদ্মব্রাহ্মণরূপী রাক্ষস বলিয়া অভিহিত। উহা হইতে জানা যায় যে, দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব থাকায় ভারতযুদ্ধের পর, জয়োল্লাসের মধ্যে, যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরী প্রবেশকালে, তিনি যুধিষ্ঠিরসমক্ষে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণদের জন্য তাঁহার জ্ঞাতি ও গুরুজনদের বিনাশের নিন্দা করায় সেখানে সমবেত ব্রাহ্মণগণ হুঙ্কার পূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করেন।৮

উক্ত চার্ব্বাকই খুব সম্ভবতঃ লোকায়তিক দার্শনিক চার্ব্বাক ছিলেন। কারণ তিনি ঐ প্রকারে নিহত হইবার পর যুধিষ্ঠির শোকার্ত্ত হইলে তাঁহার শোক অপনোদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপে, মহাভারতে যে সমস্ত উপদেশ

১। বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ, ১৮ অধ্যায়

২। বিষ্ণুসংহিতা ৫৭ অধ্যায়

৩। গৌতমসংহিতা, ২০ অধ্যায়

৪। বাল্মীকি-রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০ সর্গ

৫। বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ, ১৮ অধ্যায়

৬। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়, ৬৪ অধ্যায়

৭। মৎস্যপুরাণ, ১৪৪ অধ্যায়, ৫০-৫৪

* মৎস্যপুরাণের এই শ্লোকে শূদ্ররাজগণের উল্লেখ আছে। মৈত্রায়ণী সংহিতা ও পঞ্চবিংশ সংহিতা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থেও ধনীশূদ্রের কথা দেখা যায়। সেই যুগে লোকায়তিক বিপ্লবের ফলেই শূদ্রের অবস্থার ঐরূপে পরিবর্ত্তন ঘটে। পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে উহারও প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলিয়াছেন, "গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আর্য্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের এবং শূদ্ররাজশক্তির উত্থান ঘটে।" (বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। ঐ সময় ভারতবর্ষে কিরূপ প্রবল ধর্ম্মান্দোলন হয় তাহা সুপ্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ ব্রহ্মজাল সূত্রে উদ্ধৃত গৌতমবুদ্ধের উপদেশের মধ্যে তৎকালীন ৬২ প্রকার বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের পরিচয় হইতে বুঝিতে পারা যায়।

৮। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়, ৩৮ অধ্যায়

উদ্ধৃত আছে তন্মধ্যেও তিনি ব্রাহ্মণগণের বিশেষ সন্তাপের কারণ বলিয়া উল্লিখিত আছেন।১ লোকায়তিক চার্ব্বাক ব্যতীত ব্রাহ্মণগণের সন্তাপের কারণ আর কোন চার্ব্বাকের কথা প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও নাই।

পৌরাণিক গ্রন্থগুলির স্থানে স্থানে বহু অবাস্তব বিবরণের সহিত লোকায়তিকদের উপর উৎপীড়ন ও বিনাশের পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা ঐ প্রকারে বিনাশ পাইলেও তাঁহাদের আন্দোলনের ফলে যে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম আবির্ভাবের পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিয়া প্রাচীন বৈদিক নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা রূপান্তরিত ও সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হয় তাহা নিশ্চিত। বৈদিক যুগের শেষভাগ হইতে আর্য্যদের মধ্যে অনেকের আদিম দর্শনজাত বেদধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধা ও তৎসহ উচ্চতর মানবতামূলক দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি উহার প্রমাণ।

ঐ সকল মতবাদ উৎপত্তির নিমিত্তই ক্রমশঃ জাতি ও আশ্রম-ব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে জীবহত্যা ও অন্যান্য অনাচারের সংখ্যা কমিতে থাকে। ব্রাহ্মণ-প্রধানকালের কর্ম্মকাণ্ডের ঐরূপ প্রতিক্রিয়া সর্ব্বাগ্রে, ঐ সময় রচিত, দুই-একটি আরণ্যকে লক্ষ্য করা যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে কাবাসেয়দের যজ্ঞে সন্দেহ উহার একটি নিদর্শন।২ উপনিষদসমূহে উহা যে আরও প্রবল আকারে প্রকাশ পায় তাহা ঐ সকল গ্রন্থে বিবৃত যজ্ঞের নানারূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে প্রতিপন্ন হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতরাতনয় ঋষি মহীদাসের মনুষ্যজীবনই প্রকৃত যজ্ঞ এই ঘোষণা উহার উদাহরণ।৩ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ঐ জীবনযজ্ঞ কি প্রকারে বাক্যরূপ হোতা, চক্ষুরূপ আধ্বর্য্যু, প্রাণরূপ উদ্গাতা ও মনরূপ ঋত্বিক প্রভৃতির দ্বারা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন৪ এবং স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ মানস। এই প্রকার ঘোষণার সহিত তিনি উহাতে জগতের বিভিন্ন অংশকে অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি এবং অন্যান্য যজ্ঞাঙ্গরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।৫ উহার সমর্থক আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রকাশিত এই সকল উপদেশ হইতে,

"দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে ভ্রান্ত হইও না।...যে সকল কর্ম্ম অনিন্দিত তাহাই অনুষ্ঠান কর। অপরগুলি নহে। যাহা আমাদের সদাচার তাহাই তোমার অনুষ্ঠেয়। অপরগুলি নহে (৬)।"

"অশ্মের পাষাণ সংস্পর্শে আসিয়া (লোষ্ট্রাদি) যেরূপ ধ্বংস হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রাণিবিদের প্রতি অনুচিত ব্যবহারে উদ্যত হয়, কিংবা যে তাহাকে হিংসা করে, সেও বিধ্বস্ত হয়। কেননা ঐ প্রাণিবিদ্ অশ্মের পাষাণ-স্বরূপ (৭)।"

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত কারণেই ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিটি বেদকে উহাদের সহায়ক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গের সহিত অপরা বিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করা হয়৮ এবং আরও বলা হয়—"নিত্যবস্তু (মোক্ষ) কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হয় না৯ এবং যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানরহিত কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে যজ্ঞ নির্ব্বাহক ষোড়শ ঋত্বিক, যজমান ও যজমান-পত্নী এই অষ্টাদশ জনই বিনাশী। অতএব ঐ সকল কর্ম্মকে যে মূর্খগণ শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া সমাদর করে তাহারা পুনর্ব্বার জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়।"১০

ঐ সময় হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা ও সকাম কর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপনিষদকার ঋষিদের উল্লিখিতরূপ মতবাদসমূহ প্রচারের ফলে বেদবিহিত আদিম আচরণগুলির প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। উহারও বহু প্রমাণ পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে আছে।

পূর্ব্বে প্রকাশিত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বাল্মীকি রামায়ণ ও অন্য কয়েকটি গ্রন্থে উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণযুবকদের লোকায়তিকগণের সহিত মিলিত হইবার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের মধ্যে বেদধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেদ-ব্যাসের পুত্র শুকদেবেরও নাম আছে। শুকদেব উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার পর, বেদব্যাসের নির্দ্দেশ সত্ত্বেও বেদানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার উক্তিতে উহার যে কারণ পাওয়া যায় তাহা এই,

"আমি যখন বিস্তারিত বেদ সকল অধ্যয়ন করিলাম তখন বুঝিলাম উহা কেবল কর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তক হিংসাময় শাস্ত্র (১১)।"

রাজা জনকের সহিত কথোপকথনেও বেদধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মনোভাবের আরও বিশদ পরিচয় আছে। উহাতে তিনি বলিতেছেন,

"বেদ ধর্ম্মে তো হিংসা রহিয়াছে। সুতরাং উহা কি প্রকারে মুক্তিপ্রদ হইতে পারে? হে নরাধিপ! বেদে তো সোমরস পান ও পশুহিংসারূপ

১ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়, ৩৯ অধ্যায়
২। ঐতরেয় আরণ্যক ৩।২,৩,৮
৩। ছান্দোগ্য উপনিষদ্
৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩ অধ্যায়, ১ ব্রাহ্মণ
৫ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১ অধ্যায়, ১ ব্রাহ্মণ
৬। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ১।১১।২
৭। ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ১।২।৮
৮। মুণ্ডকোপনিষদ্, ১।১।৫
৯। ঐ „ ১।২।১২
১০। মুণ্ডকোপনিষদ্, ১।২।৭
১১। দেবীভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ১৪ অধ্যায়

অনাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এমনকি উহাতে সৌত্রামণি নামক যাগপ্রকরণে প্রত্যক্ষরূপে সুরাপানের বিধিও আছে। সুতরাং বেদধর্ম্মানুসারে কিরূপে মুক্তি হইতে পারে? শুনা যায় পূর্ব্বে শশবিন্দু নামে পরম ধার্ম্মিক সত্যনিষ্ঠ, যাগশীল, ধার্ম্মিকগণের পালয়িতা ও অসৎলোকের দণ্ডদাতা এক নৃপবর ছিলেন। তিনি বেদোক্ত গোমেধাদি বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং যজ্ঞাবসানে যাজকগণকে অনেক দক্ষিণা দেন। তাঁহার যজ্ঞে নিহত গোগণের চর্ম্ম এরূপ রাশীকৃত ছিল যে দেখিলে বোধ হইত বিন্ধ্যাচলের ন্যায় অপর একটি পর্ব্বত রহিয়াছে। পরে মেঘজলপ্লাবনে ঐ স্তূপাকার চর্ম্মের ক্লেদাদি নির্গত হওয়ায় চর্ম্মণ্বতী নামে একটি নদী প্রবাহিত হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্যের বিষয় সেই নিষ্ঠুর রাজাও নাকি ভূতলে অচলা কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সে কারণ ওরূপ হিংসাপূর্ণ বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমার কোন প্রবৃত্তি নাই (১)।"

শুকদেব এই সকল কারণে বেদধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া লোকায়তিকদের সহিত মিলিত হইবার পরও, তাঁহাদের সঙ্গত্যাগ করাইবার জন্য বেদব্যাস তাঁহাকে যে সমস্ত উপদেশ দেন তাহাও মহাভারতে উদ্ধৃত আছে। উহার কিয়দংশ এইরূপ,

"তুমি ধর্ম্মপথারূঢ়, নিত্য সঙ্কল্প বেদজ্ঞ বৃদ্ধমহাত্মাদের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবলে আপনার কুপথগামী চিত্তকে শাসন কর। যাহারা কেবল বর্ত্তমান দর্শনী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পরদিনের চিন্তা পরিত্যাগ করে, সেই হতভাগ্য নাস্তিকেরা এই ভারতবর্ষকে কর্ম্মভূমি বলিয়া জানিতে পারে না। অতঃপর ধর্ম্মসোপান অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে তোমার আরোহণ করা কর্ত্তব্য। এখন তুমি জ্ঞানহীন হইয়া কোষাকার কীটের ন্যায় আপনি আপনাকে বদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছ। এখনই কুলান্তক নিয়মহীন নাস্তিকদের বেণুর ন্যায় উদ্ধত ও অশ্রদ্ধেয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য (২)।"

বেদব্যাস শুকদেবের নিকট স্বভাববাদ খণ্ডনের নিমিত্ত যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন মহাভারতে তাহারও উল্লেখ আছে।৩

মৎস্যপুরাণে দেখা যায় যে, দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঐরূপ মতবিরোধবশতঃ দেশে নানা প্রকার অশান্তি ও গোলযোগ উপস্থিত হয়। মৎস্যপুরাণের ঐ অংশ এইরূপ,

"দ্বাপরযুগে লোকসকল বিভিন্নাচারসম্পন্ন ও পৃথক মতাবলম্বী হয়। আধ্বর্য্যব কর্ম্ম এক ছিল, ক্রমশঃ উহা দ্বিবিধ হয়। অর্থের বৈপরীত্যের কারণ শাস্ত্র সকল আকুল হইয়া পড়ে। এজন্য আধ্বর্য্যব কর্ম্মসমূহও ব্যাকুলভাবে বিভিন্ন পথে গমন করে। মুনিগণের আত্মক্ষয় কারণ সন্দেহাবলম্বনের ফলে সাম ও অথর্ব্বন শ্রুতিসমূহেরও বৈকল্য ঘটে। বেদমধ্যেও সন্দেহোৎপত্তি হয় এবং বিভিন্নদর্শন মুনিগণই বিষয়সমূহ আকলিত করিয়া তোলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে সকল মেধাবী মুনি ছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনই বেদবিরোধীরূপে প্রখ্যাত হন। ঐ সময় বেদাঙ্গ সকল ও নানাবিধ শাস্ত্র সংশয়াকলিত মতভেদে পূর্ণ হইয়া পড়ে। সে কারণ সকলের সক্লেশে কালাতিপাত হইতে থাকে। বাণিজ্য, যুদ্ধ, তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞানতা, বর্ণাশ্রমসমূহের বিনাশ এবং বর্ণসঙ্করতার বৃদ্ধি হয় (৪)।"

মৎস্যপুরাণের এই বিবরণ হইতে বেদবিরোধী আন্দোলনে ঐ সময় ভারতের অবস্থা কিরূপ অশান্তিময় হইয়া পড়ে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিপ্লবের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন হইবার সময় ঐ প্রকার গোলযোগ হওয়া বিচিত্র নহে। উহাই খুব সম্ভবতঃ ঐ যুগে সংঘটিত ভারত-যুদ্ধের একটি প্রধান কারণ। মৎস্যপুরাণে বেদবিরোধী আন্দোলনে দেশের উপরোক্তরূপ অবস্থার বিবরণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে কৌরব পক্ষীয় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গ ও জনগণের বেদধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণের নানারূপ উল্লেখ ও মহাভারতে উক্তযুদ্ধে চার্ব্বাকের দুর্য্যোধনের সহিত মিত্রতা ও তাঁহার পক্ষে থাকার কথা ঐ প্রকার অনুমানের সমর্থক।

চার্ব্বাকের দুর্য্যোধন পক্ষে থাকার স্পষ্ট উল্লেখ মহাভারতে উদ্ধৃত দুর্য্যোধনের মৃত্যুকালীন বিলাপ-উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। উহা এই,

"নিদ্রিত বা প্রবৃত্ত শত্রুকে বিনাশ করিলে যে পাপ হয়, অধার্ম্মিক বৃকোদর নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাকে নিপাতিত করিয়া সেইরূপ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে। হে সঞ্জয়! এখন যদি বাগ্মিশারদ পরিব্রাজক চার্ব্বাক এই বৃত্তান্ত অবগত হন তাহা হইলে তিনি আমার উপকারার্থ অবশ্যই বৈরনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইবেন (৫)।"

ভীমের দ্বারা ভগ্নোরু হইয়া দুর্য্যোধন উক্তরূপ যে বাগ্মিশারদ চার্ব্বাকের নিকট হইতে বৈরনির্যাতনের আশা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভারতযুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুর প্রবেশকালে, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বলিয়া হত্যা করা হয়।

উপরোক্ত বিবরণগুলি ব্যতীত ভারতযুদ্ধে বেদবিরোধিগণের বিনাশের আরও যে সমস্ত প্রমাণ পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে আছে তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত জনমেজয়ের প্রশ্ন ও বেদব্যাসের উত্তরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জনমেজয়ের প্রশ্ন,

"শ্রীকৃষ্ণ—তৎকালে ভূতলে যে সকল দুষ্টবুদ্ধি আভির, ম্লেচ্ছ ও নিষাদগণ বর্ত্তমান ছিল, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসানের পর তাঁহার সমুদয় ভূসম্পত্তি ও রমণীদের হরণ করিয়া লয়—কি জন্য তাঁহাদের বিনাশ করেন নাই? যদি তাঁহাদের রাখিলেন তবে অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ আর প্রকৃতরূপে কি ভূভার হরণ করিয়াছিলেন?"

বেদব্যাসের উত্তর,

"কালস্বভাবে যে যুগে যে প্রকার আচরণশীল প্রজাবৃন্দ জন্মগ্রহণ করেন, কিছুতেই যে তাহার ব্যতিক্রম হইবার নহে যুগধর্ম্মই তদ্বিষয়ের কারণ। সুতরাং যুগধর্ম্মানুসারে যাহারা দুষ্টমতি তাহাদের সকলকে বিনাশ করিলে

১। দেবীভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ১৮ অধ্যায়

২। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়, ৩২০ অধ্যায়
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়, ২৩৭ অধ্যায়

৪। মৎস্যপুরাণ, ১৪৪ অধ্যায়

৫। মহাভারত, শল্যপর্ব্ব, গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়, ৬৫ অধ্যায়

প্রজা লোপ পায়। এজন্য তাহাদের না মারিয়া যাহারা বেদধর্ম্ম বিলোপ করিতে ক্ষত্রিয় বংশে বা দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করে তিনি তাহাদিগকেই বিনাশ করিয়াছিলেন (১)।"

এই সকল বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগের শেষভাগে ভারতযুদ্ধে বেদবিরোধিগণের বিনাশের ফলে লোকায়তিক বিপ্লবের অবসান ঘটে। তৎপরে ঐ সকল মতবাদীর সংখ্যা ও প্রভাব ভারতে খুব কমিয়া যায়।

ঐ সময়ের পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের আন্দোলনে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত ক্রমশঃ জাতি ও আশ্রম ব্যবস্থার কঠোরতা অনেক হ্রাস হইলেও মানবাত্মার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য দৈবকার্য্যে অসংখ্য পশুহনন, শ্রাদ্ধে মাংসদান, গোমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি আদিম অনুষ্ঠানগুলি একেবারে বন্ধ হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম উত্থানের পর ক্রমশঃ ঐগুলি কলিতে নিষিদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।২

আচার্য্য রিসডেভিসও উক্ত বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,

"On the question of sacrifice as on the question of caste and social previleges, the early Buddhists took up and pushed to its logical conclusions, a national view held by others. And on this question of sacrifice their party won. The vedic sacrifices of animals had practically been given up when the long struggle between Brahmanism and Buddhism reached its close. Isolated instances of such sacrifice are known even down to the Mohamedan invasion. But the battle was really won by the Buddhists and their allies."[3]

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে দেখা যায় যে, গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালেও দুই-এক জন দার্শনিক পরকালে বিশ্বাস ও যাগযজ্ঞাদির বিরুদ্ধে লোকায়তিক মতবাদের অনুরূপ মতবাদ প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সকল দার্শনিকের মধ্যে অজিত কেশকম্বলের মতবাদ মহারাজা অজাত শত্রুর নিকট যেরূপে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া সুত্তপিটকে বিবৃত আছে তাহা এই,

"যাগযজ্ঞের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পরকাল বলিয়াও কিছু নাই। কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। মানবের পক্ষে তাহা বুদ্ধিপরাহত। মৃত্যুর পর পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, কিছুই থাকে না। মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বা সৎকারাদির দ্বারা মৃতব্যক্তির উপকারের কথা বলেন, তাঁহারা হয় অজ্ঞ না হয় মিথ্যাবাদী। মৃত্যুর পর পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেরই অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহাদের কিছুই থাকে না (৪)।"

সুত্তপিটক, ব্রহ্মজাল সুত্র ও দিব্যাবদান প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে উক্ত অজিত কেশকম্বল ও অন্যান্য দার্শনিকগণের নানারূপ বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ হইতে জানা যায় গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকালেও ভারতে বৈপ্লবিক চিন্তাস্রোত কিরূপ প্রবল ছিল। উহা যে ঐ সময়ের পূর্ব্বে লোকায়তিক আন্দোলনে সৃষ্ট হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈদিক-সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের নিকট প্রচারিত লোকায়তিক মতবাদের যে সমস্ত নিদর্শন বিষ্ণুপুরাণ, নৈষধচরিত ও সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পাওয়া যায় তাহার কিয়দংশ এইরূপ,

"যে কার্য্যে কোন প্রাণীর হিংসা হয়, যাহাতে পরপীড়া হয় এরূপ কার্য্যে ধর্ম্ম হয় এই বাক্য কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ঘৃত অনলে দগ্ধ হইলে ফল প্রদান করে ইহা বালকের যোগ্য বাক্য। অনেক যজ্ঞদ্বারা দেবতা হইয়া ইন্দ্রের সহিত যদি শমীকাষ্ঠ প্রভৃতি ভোজন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপেক্ষা পশুও শ্রেষ্ঠ। কারণ পশুরা সরস পত্র ভক্ষণ করে। যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিলে যদি সেই পশু স্বর্গলাভ করে তাহা হইলে যজমান কি জন্য আপনার পিতাকে বধ করে না? শ্রাদ্ধকালে এক ব্যক্তি আহার করিলে যদি অন্য ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে প্রবাসগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গৃহে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলেই তাহার তৃপ্তি হইতে পারে, উহা যখন লোকের শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে।

তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আপ্তবাক্য কিছু আকাশ হইতে পড়ে না। উহা কোন ব্যক্তি বিশেষেরই বাক্য। সেকারণ তোমাদের, আমি বা অন্য ব্যক্তি সকলেরই যুক্তিসঙ্গত বাক্য গ্রহণ করা উচিত (৫)।"

"বেদই বলিতেছে জানি না আমরা ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ। স্ত্রীদোষে অব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণপুত্র জন্মিতে পারে। অনন্ত কুলের মধ্যে কোথায় কোন দোষ ঘটিয়াছে কে বলিবে? সুতরাং জাতির বিশুদ্ধি অসম্ভব।...অনেক প্রধান পণ্ডিত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়াও বহু ধনব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম করতঃ বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। উহাতে মনে হইতে পারে পরলোক আছে। কিন্তু বস্তুতঃ পরলোক নাই। তবে তাঁহারা ঐ সকল নিষ্ফল কর্ম্মে কেন প্রবৃত্ত হন? তাহার কারণ এই যে, কতকগুলি প্রতারক ধূর্ত্ত বেদের সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাতে স্বর্গ নরকাদি নানারূপ অলীক বিষয় প্রদর্শন করতঃ সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং নিজেরা ঐ সমস্ত বেদবিধির অনুষ্ঠান দ্বারা জনসাধারণের ঐ সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে ও রাজাদের যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিপুল অর্থলাভ করিয়া নিজ নিজ পরিজন প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া পরবর্ত্তীকালীন লোকসকল ঐ সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতে বহুকাল হইতে ঐ প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

১। দেবীভাগবত, ৬ স্কন্ধ, ১১ অধ্যায়

২। "দেবরেণ সুতোৎপত্তি মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানি গমনং গোমেধশ্চ তথামখঃ।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

3. *Dialogues of Buddha* Rhys Davids, Kutadanta-Sutta, Introduction.

4. *Ibid*, Rhys Davids, Samanna-Phala-Sutta.

৫। বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ, ১৮ অধ্যায়

বৃহস্পতি বলিয়াছেন অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যায়ন, দণ্ডধারণ ও ভস্মগুণ্ঠন এই সমস্ত বুদ্ধি ও পৌরুষবিহীন ব্যক্তিদের উপজীবিকা মাত্র। বেদে লিখিত আছে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরী যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেন যজ্ঞ করিলে শত্রুনাশ হয়। তদনুযায়ী অনেকে ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কোন ফলই পাওয়া যাইতেছে না।

ভণ্ড, ধূর্ত্ত, রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক একত্র হইয়া বেদ রচনা করিয়াছে। তাহার স্বর্গনরকাদি বিষয় সকল ধূর্ত্তের প্রণীত এবং যে সকল অংশে মদ্যমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে তাহা নিশাচরের পরিকল্পিত।

ধূর্ত্তগণ অল্পবুদ্ধি যজমানকে বলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে তোমার পুত্রলাভ হইবে। পুত্র জন্মগ্রহণ করা না করা দুইটির মধ্যে একটি অবশ্যম্ভাবী। যদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে তবে ধূর্ত্তগণ বলে আমাদের মন্ত্রবলেই তোমার পুত্র জন্মিয়াছে। যদি পুত্র জন্মগ্রহণ না করে তবে ধূর্ত্তগণ বলে, যজ্ঞে অঙ্গবৈকল্য ঘটিয়াছে তাই পুত্র জন্মগ্রহণ করে নাই। ধূর্ত্তগণের এই সকল কথা কে বিশ্বাস করিবে? (১)।"

"অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বলিঙ্গ পত্নী গ্রাহ্য হয় (২)। তাহার অভাবে অন্য কত কি দ্রব্য গ্রাহ্য হয়। ইহা ভণ্ডগণের উক্তি। পৃথিবী হইতে দান করিলে যদি স্বর্গবাসী পরিতৃপ্ত হয়, তবে অট্টালিকাবাসীর তৃপ্তির জন্য নিম্নতল হইতে দান করা হয় না কেন? যদি আত্মা এই দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পরলোকে যাইতে পারে তাহা হইলে উহা পরিত্যক্ত জগতের প্রিয়জনদের প্রতি আসক্ত হইয়া সাক্ষাৎ করিতে আসে না কেন? (৩)।"

লোকায়তিকদের এই সকল প্রচারোক্তি হইতে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম উত্থানের পূর্ব্বে মানবগণের উপর অবিচার-উৎপীড়ন নিবারণের চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্মকার্য্যে পশুহত্যা নিবারণের জন্য তাঁহারাও যথেষ্ট আন্দোলন করেন। তৎকালে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে কত পশু নিহত হইত পৌরাণিক গ্রন্থগুলি হইতে তাহার ধারণা করা যায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শুকদেবের উক্তি. উহার একটি নিদর্শন। তৎকালে গোমহিষাদি মানুষের প্রয়োজনীয় পশু ঐরূপে বিনাশ পাওয়ায় দেশের আর্থিক অবস্থারও সময় সময় নানারূপ বিপর্য্যয় ঘটিত। উহা ভিন্ন ঐ সকল পশুহত্যার পদ্ধতিও খুব নিষ্ঠুর ছিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানবগণের মধ্যে যে সময় দৈবকার্য্যে পশুহনন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয় তখন ধাতব অস্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। সে কারণ লগুড়াঘাত ও শ্বাসরোধ করিয়া ঐ সকল জীবকে বিনাশ করা হইত। সর্ব্বত্রই মানবগণ সংস্কার বশতঃ ধর্ম্মকার্য্যে পূর্ব্বজদের আচরণ সহজে পরিত্যাগ করেন না। তজ্জন্য ঐ সময় তাম্র ও লৌহের অস্ত্রাদির ব্যবহার থাকিলেও যজ্ঞাদিতে ঐ প্রকার আদিম পদ্ধতিতেই পশু বিনাশ করা হইত এবং উহা আলম্ভন নামে প্রসিদ্ধ ছিল।৪

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় ধর্ম্মকার্য্যে পশু বিনাশ রীতির প্রবর্ত্তন হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগে, মানবগণের অর্দ্ধবন্যাবস্থায়। ঐ সময় হইতে সর্ব্বত্র ঐ রীতি সুদীর্ঘকাল সমস্ত প্রাচীন জাতির মধ্যে বলবৎ ছিল এবং এখনও অনেক আদিম ও ধর্ম্মান্ধ জাতির মধ্যে অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে।

১। নৈষধচরিত, সপ্তদশ সর্গ

২। অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রধানা রাজমহিষী যজ্ঞীয় অশ্বকে বিনাশ করিতেন। এতদ্ভিন্ন স্বামিস্থানে তাঁহাকে সেই মৃত অশ্বের সহিত রাত্রিবাস করিতে হইত এবং পরদিন উহার শিশ্ন ছেদন করিয়া যজ্ঞে আহুতি দিতে হইত। লোকায়তিকগণের উপরোক্ত প্রচারোক্তিতে ঐরূপে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐপ্রকার আচরণ ব্যতীত অশ্লীল মন্ত্রাদি উচ্চারণ, নৃত্য ও বহুবিধ রঙ্গরসও ঐ যজ্ঞের অঙ্গ ছিল এবং দিগ্বিজয়ের পর অনুষ্ঠিত ঐ যজ্ঞে ঐরূপ নৃত্যাদিতে যুদ্ধে বন্দিনী নারীদের নিয়োজিত করা হইত। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের যে বর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ এইরূপ:

"সেই যজ্ঞস্থলে ধনরত্নের পরিসীমা ছিল না। তথায় সুরার সাগর, ঘৃতের হ্রদ, অন্নের পর্ব্বত ও রসসমূহের নদী প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাতে কত লোক খাণ্ডব মিষ্টান্ন নির্ম্মাণ করিয়াছিল ও কত পশু নিহত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। যুবতী কামিনী এবং মত্ত ও প্রমত্ত ব্যক্তিগণ পরম আনন্দে সেই যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছিল।" (আশ্বমেধিক পর্ব্ব)

৩। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ

৪। দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সকল বৈদিক যজ্ঞ এখনও সময় সময় অনুষ্ঠিত হয় সেগুলিতেও ঐ উপায়ে পশু বিনাশ করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় ঐরূপ নিষ্ঠুরতা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া উহা একটি গৃহমধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সম্পন্ন হয়।

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	হইবে না	হইবে
১৭	২	১১	লোকায়ত্ত	লোকায়ত
১৭	২	১৪	আয়ল	আয়ত্ত
১৭	২	১৮	লোকায়তিঃকাঃ	লোকায়তিকাঃ
২১	২	১৬	লোকায়ত্তিক	লোকায়তিক
২২	২	২৭	লোকায়ত্ত	লোকায়ত
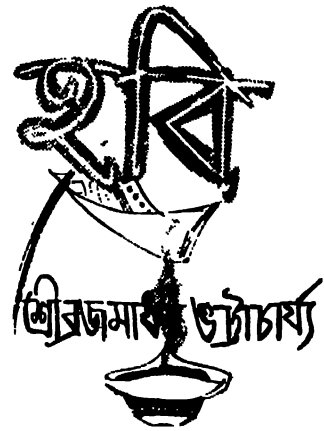
অদ্ভুত রোগের ঘটনা। কুকুরের ডাক মাঝরাতে শুনলেই মূর্চ্ছা যায়। ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় বাড়ী থেকে। দিনে তত নয়; রাত্তে হলেই আর রক্ষা নেই।

রোগিণী জনা—কলেজে পড়ত জনা দাস। বাপ ছিলেন শিক্ষক।

জনার রূপ ছিল। লম্বা চেহারার মধ্যে স্বাস্থ্যবতী। শাড়ী পরলে শাড়ীর চেয়ে বেশী চোখে পড়ত মানুষটিকে। টেনে চুল বাঁধত। টানা ভ্রুর মাঝে বড় একটি টুকটুকে টিপ। চুলে কিছু না কিছু একটা ফুল থাকতই। জনা; কোনও ছেলের সঙ্গে কখনও কেউ তাকে দেখে নি।

হঠাৎ জনার বিয়ে হয়ে গেল এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। নাম দীনবন্ধু, বয়স তার ষাট। বেঁটে মানুষ। বেশী বড় নয়, তবে চলনসই একটি ভুঁড়ি, গাল দুটো ভারি। নাকের তলা থেকে উপর ঠোঁটের রেখা পর্য্যন্ত জায়গাটা খুব চওড়া। তারই উপর আধ ইঞ্চির একটু গোঁফ খুব ছোট করে ছাঁটা। কানের ধার-গুলোয় বড় বড় লোম। সর্ব্বাঙ্গে লোম। চোখ দুটি অত্যন্ত চকিত, সন্ত্রস্ত। মোটা ভ্রূ। সাধারণতঃ গেঞ্জী পরে থাকেন ধুতির সঙ্গে; কথা বলেন অত্যন্ত কম। ব্যবসার সব কথা নাই বললাম, তবে আয় যে খুব বেশী মোটা তা বোঝা যায়।

নিজের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে সজাগ। কোনও রাত্রে হিসেবে গোলমাল দেখা গেলে বাইরে ঘরের সেক্রেটারিয়েট থেকে আর ওঠা হ'ত না। দেয়ালে ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে যেত; দীনবন্ধু উঠতেন না। শেষ অবধি হিসেব মিলতই। শুতে গিয়ে যদি দেখতেন জনা ঘুমিয়ে পড়েছে, ভাবতেন "বেশ হয়েছে—যতক্ষণ ঘুম না আসে গিলিণ্ডার্স'দের এ্যানুয়েল রিটার্ণসটা ষ্টাডি করা যাবে।"

জনা ছিল দীনুবাবুর "বিজনেস প্রপোজিশন্।"

বাড়ীতে পার্টি ইত্যাদি ডাকতে হয়। তখন কেউ বাড়ী না থাকলে চলে না। এত দিন ব্যবসায় চলত। যখন দরকার হ'ত তখন হোটেলে খানা দিলেই চলত। দীনুবাবুকে কোনদিন বিয়ে করতে হয় নি। সত্যি বলতে কি বিয়ে করতে হবে কল্পনাও করে নি কোনদিন। পাকা জেনারেলের মত হঠাৎ দীনুবাবু বুঝে ফেললেন হোমগার্ড না থাকলে ফ্রন্টের লড়াই জমে না।

অনেকে ওর নাকের উপর দিয়ে বড় বড় কাজ বাগিয়ে নিয়ে গেল। তখন বাধ্য হয়ে দীনুবাবু ঠিক করলেন "যাক্ বিপদের বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখন ঘরে একটা উদ্বৃত্ত মুখ, পেট থাকলেই বা ক্ষতি কি।"

দীনুবাবুর সব ব্যাপার বেশ ব্যবসায়ীর মত কিনা। সমস্ত ব্যাপারে হিসেব তো আছেই, তার নিকেষও একেবারে চরম। পাকাপোক্ত আঁটাসাটা ব্যবস্থায় কোথাও ফাঁক বা ফাটলের অবকাশ নেই। দীনুবাবু ছানা আর ইটের মধ্যে ইট ভালবাসেন। ক[illegible] ছানা হয়ত সাত্ত্বিক, হয়ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য, কিন্তু ওতে ফাটল আছে, আছে অনেক ফাঁক—নিরেটত্ব হিসেবে অ-খাঁটি। ইটের প্যাটার্ণটা বাঁধাছাঁদা, আঁটসাট, বুনিয়াদী, নিরেট—সলিড মাল, পোক্ত ব্যবস্থা। তা নইলে সোনার তালকে সোনার ইট বলা হয় কেন?

দীনুবাবু প্রথমেই সে ব্যবস্থা বেঁধে দিলেন।

ফুলশয্যার সন্ধ্যা থেকেই জনার একটু কাঁপুনি ধরেছিল। ওকে নানা লোকজন মিলে সাজিয়ে দিয়েছিল। সর্ব্বাঙ্গে জড়োয়া গহনার প্রাচুর্য্যের মধ্যে ওর রমণীত্বকে একেবারে সমাধি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সোনার কবরের তলায় ওর প্রথম মিলনের কাকলীর কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল। চিনত না সে অনেককে। কিন্তু চিনেছিল অনেকের চাপাহাসি, অনেকের সহানুভূতি, অনেকের খেদ। হয়ত গলায় ছিল ওর মুক্তা, মাথায় গোলাপ, বুকে চন্দ্রহার, কিন্তু হৃদয় ছিল রিক্ত বৈধব্যের শূন্যতায় সজ্জাহীন।

ষাট বছর বয়স তার স্বামীর। সাজগোজ করতেন নবীনের মত, তবে নবীন ব্যবসায়ীরই মত, নবীন প্রফেসরের মত নয়। শিক্ষক-বাপ মারা যাবার পর মার পক্ষে নিশ্চিন্ত হবার এমন সৌভাগ্যকে সে সতী-কালের সহমরণের মতই ব্রত হিসাবে কাম্য বলে গ্রহণ করেছিল। জেনেশুনেও সে শব্দ করে নি। ইতিহাসে সে বহু সার্থক-বিবাহের নজীর জানে যেখানে বয়সের সঙ্গে বয়সের বিয়ে হয় নি। বাধা কি? শেষ অবধি ত মিলে "যাওয়া" নয়, মিল "খাইয়ে নেওয়া"। সে নিজে যদি সহিষ্ণু হয়, শিক্ষা যদি তার স্বভাবকে করায়ত্ত করে থাকে, ত ষাটের একটা মাত্র বাধাকে সে কেন অতিক্রম করতে পারবে না। সে জন্য—সে এই দিকটাকে বড় করে দেখবে, এমনই স্থূল-রুচি হবে কেন জনার?

তা হলেই ত ব্যাপারটা বয়স নয়, ব্যাপারটা আদর্শের কাছে আত্মনিবেদন, যৌবনের কাছে দেহ-বিকিরণ নয়। আর দীনুবাবুর মধ্যে কি এমন কোনও আদর্শ নেই? নিশ্চয় আছে। জনা সেই গুণগুলির সঙ্গেই মিতালি করবে।

এগিয়ে যাচ্ছিল জনা। তিলে তিলে পলে পলে এগিয়ে যাচ্ছিল। পেছুবার জো ছিল না, এড়ানোর কথা ওঠে না। অবধারিত অবশ্যম্ভাবী সেই ফুলশয্যার বাসর এগিয়ে আসছিল। কে এগুচ্ছিল, জনা রাত্রির দিকে, না রাত্রি জনার দিকে? রাত্রি আসছে না বলে অসহিষ্ণুতা, না রাত্রি পেছিয়ে যাচ্ছে না বলে বিরক্তি? জনার বয়স হয়েছে; আটাশ ত হবেই। কলেজ, দুনিয়া, বাজার, মানুষ, সংসার এসব দেখাশুনার পর তার মিলনে আর জয়দেবের লালিত্য থাকে না সত্য, তবু 'প্রথমসমাগম' তো প্রথমসমাগম বটেই। চিত্রাঙ্গদাও ত এই রাত্রিটির জন্যই রমণীত্ব প্রার্থনা করেছিল।

হঠাৎ ওর তবু কাঁপুনি লেগেছিল। শুনল নিজের কানে স্বামীর প্রথম সম্ভাষণ—"দেখলে বাড়ী-ঘর-দোর? পছন্দ হ'ল গহনাপত্র? এখন আমি তোমায় আমার অজ্ঞাত এসেট সম্বন্ধে কিছু বলব। নারী সতীত্ব রাখে প্রকাশ্যে, অসতীত্ব রক্ষা করে গোপনে; পুরুষ ধনের জাঁক দেখাবে প্রকাশ্যে, ধনের সীমা রক্ষা করবে গোপনে। এই নীতি। সবটা জানাব না, যেমন আটাশ বছরের কলেজে-পড়া সুন্দরী মেয়ের সবটা আমি কোনদিন জানতে চাইব না। শেষেরটি যেমন আমার উচিত নয়, প্রথমটি তেমনি তোমার উচিত হবে না। না—না বিরক্ত হলে চলবে না। তোমার সব খবর দরকার মত আমি জেনে নিয়েছি; সে সুযোগ-সুবিধা আমার ছিল। আমার সব খবর জানার সুবিধা তোমার হয় নি। আমি খোলাখুলি পষ্টাপষ্টি কারবার ভালবাসি। আমি তোমায় দর যাচাই করে ঘরে তুলেছি। আমার বাজারদরটাও তোমার খতিয়ানে লিখে রাখা দরকার। খবরটা যদিও এনেছি, বুদ্ধিমতী তুমি, এখন খতিয়ে বুঝে নাও।

বলেই বাসরঘরের নায়ক এক গোছা চাবি কোমর থেকে খুলে হাতের তেলোর ওপর নাচাতে লাগলেন। তার পর গায়ের গেঞ্জীটা একটু টেনে জঙ্ঘা পর্যন্ত লম্বা করে দিয়ে নেমে গেলেন পালঙ্কের ওপর থেকে। ঘরে রাখা একটা ভারী সেফ খুলে ফেললেন। তার ভেতর থেকে বার করলেন কয়েক বাণ্ডিল কাগজ ও কয়েকখানা ছোট ছোট বই। খুব গর্বের সঙ্গে সেগুলি বিছানার ওপর রেখে আবার বসলেন পালঙ্কে।

জনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গলার ফুলের মালাটা খুলে এক পাশে রেখে দিয়ে বেনারসী শাড়ী গুটিয়ে নিয়ে খানিকটা জায়গা দিয়ে বসল। ব্যবসায়ীর চোখেকানে কিছু এড়াল না।

বললে, "ঠিক করেছ। মালার বয়সও নেই, প্রয়োজনও নেই আর। পরেছ পরতে হয়, লোকে দেখেছে আমি দেখেছি, ওর প্রয়োজন মিটে গেছে। কিন্তু এই কাগজগুলির প্রয়োজন মেটে না মানুষের জীবনে। এখন দেখ একে একে। এগুলি সব, যাকে বলে 'গিল্ট-এজেড' নাম নিশ্চয় শুনেছ, চোখে দেখ নি। এর এক একখানা হাজারের। গুণে দেখতে পার তেরখানা আছে। এগুলি টাটা, সারাভাই প্রভৃতি দিশি ব্যবসায়ীর শেয়ার, এগুলি চা-বাগানের। এগুলি দেখ ত, বলতে পার? সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের—এসব তুচ্ছ হয়ে যায় এই ক'খানা কাগজের কাছে, ব্যাঙ্ক অব লণ্ডনের শেয়ার, বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর শেয়ার, আর এই আমার আজীবন সাধনার ফল—আমেরিকান তেল কোম্পানীর শেয়ার। পাবে না ভারতবর্ষে বড় কারুর কাছে। তা ছাড়া এই দেখ চারখানা ব্যাঙ্কের বই—ফিগারগুলিতে চোখ বুলিয়ে নিও। এই চারখানাই ফিক্সড ডিপোজিট এ খাতাখানা শুধু তোমার; আর এই কাগজখানায় সই দিয়ে দাও, তোমার নামে কারেন্ট একাউন্টস খুলে দেব। আপাততঃ আটাশ হাজার টাকা দিয়ে খুলে দিচ্ছি তোমার আটাশ বছর বয়স বলে। খুশী হওয়া উচিত তোমার। আরও বেশী বয়স হলে আরও বেশী খুশী হতে। আমার খাতা ছাড়া একটা হিসেব আরও থাকবে গ্রিণ্ডলেজে, দু'জনের কমবাইণ্ড, যে কোনও এক জন বার করতে পারবে। মনে হয় এত টাকার দরকার হবে না তোমার। কিন্তু তবু ওয়ান মাষ্ট ফিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেই হ'ল প্রকৃত জীবন। তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য এই অঙ্কটা অপরিহার্য।"

কি যেন হ'ল জনার। ও স্বামীর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। তার পর কাগজখানা হাতে নিয়ে ফুল-বাসরে জ্বালানো রুপার দীপদানের জ্বলন্ত শিখায় ধরল। সই করার কাগজখানা পুড়ে গেল। ছাইগুলো জনা ফেললে না, বেনারসীর আঁচলে বেঁধে নিলে। আবার এসে বসল দীনবন্ধুর কাছে।

ধৈর্য্য না থাকলে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা যায় না। চোখের পর্দা থাকলে টাকা জমে না! চুপ করে দেখছিল দীনবন্ধু।

যখন জনা এসে বসল—দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি হ'ল?"

জনা বলল, "বিয়ের হোম হয় তাই। একটু ছাই আপনার মাথায় ঠেকাই, একটু আমি নিই মাথায়।"

—"কিন্তু পোড়ালে কেন কাগজখানা? হোম কি?"

—"সংসারের দামী জিনিষ হোমে দেয়, বলে ছবি। সে হ'ল ঘি। আমার জীবনের সবচেয়ে দামী জিনিষ আজ হোমে দিলাম, ছবি করে। এই প্রথম ছবি। টাকার কাগজ দিয়ে তাও আগুন জ্বাললাম।"

—"আর ছবি যা দিলে সেটা কি?"

বড় বড় চোখ চেয়ে জনা বলল, "নিতান্তই শুনবেন?—নাই-বা শুনলেন?"

"ইচ্ছে করছে জানতে। যদি ট্রেড সিক্রেট হয় জোর করব না। সেটা উচিত নয়। নইলে জানতে চাইব।"

"ট্রেড সিক্রেটই বটে। তবু শেয়ারের কারবার কিনা। জেনে রাখুন। ছবি দিলাম আমার স্বামীর জন্য যা সঞ্চয় করে রেখেছিলাম।"

"সেটা কি? জানি না তো—সেটা কি জিনিষ? টাকা তো নয় দেখতেই পাচ্ছি।"

"সব নারী সব পুরুষের জন্য যা জমিয়ে রেখে খুশীতে ভরে থাকে। চাকে মধু ভরে মৌমাছির যে খুশী, ফুলে পরাগ রেখে কুঁড়ির যে খুশী।"

"তোমরা সব একালে স্কুল-কলেজে পড়েছ। মিষ্টি মিষ্টি কথা বল। ফুল, মধু, পরাগ, খুশী—আমার কাছে সব হেঁয়ালী।"

"ভালবাসা—শুনেছেন কখনও, স্বামীর সোহাগ, স্ত্রীর আদর। শুনেছেন?"

কিন্তু আর বলতে পারে নি জনা। মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছিল। হত্যা করছিল ওর হৃৎস্পন্দন, হত্যা করছিল ওর অনিবেদিত কন্যা-কুমারীত্ব।

দীনবন্ধু বললে, "খুব 'ডিপ্রেশড' ফিল করছ তো? নিশ্চয় বড় পরিশ্রান্ত হয়েছ তুমি। তাই শুয়ে পড়লে। শোও। আমি সেফটা বন্ধ করে পাশের ঘরে শুচ্ছি। ভয় লাগে ডেক। কিন্তু 'কারেন্ট একাউন্টে'র কাগজখানা কেন যে পোড়ালে বুঝলাম না।

বাকী রাতের অনেকটা দীনবন্ধু কাটাল 'লেটেষ্ট কোরকাষ্টস' পড়ে, আর জনা শুধু দেখল—ছিল রাত হয়ে গেল ফর্সা। কখন, কি করে জানে না।

ফুলশয্যার রাতের কথা মনে ছিল না আর জনার। এমনি বাঁধা-ধরা জীবনযাত্রায় ও পড়ে গিয়েছিল। চাকর-বাকর চালানো, রান্নাঘরের তদ্বির, ঘরদোর সাজানো—এসব জনার তদারকে, জনার ভাগের বাঁটোয়ারা। পার্টি ইত্যাদিতে ব্যবস্থা, তার কার্ড বাছাই থেকে নিয়ে মেনু এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন, সব জনার। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ দিনে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া জনার ডিপার্টমেন্ট।

জনা নিপুণতার সঙ্গে এসব করত বটে। কিন্তু সবটা যেন রঙ্গমঞ্চের সামনের দিক। রঙ্গমঞ্চের পিছনের দিকে জনার একখানা নিভৃত ঘর ছিল। স্বামীর সেফ আঁটা ঘর থেকে সেটা অনেক, অনেক দূরে। সে দুটো ঘরের মধ্যে ব্যবধান ছিল পৃথিবীর
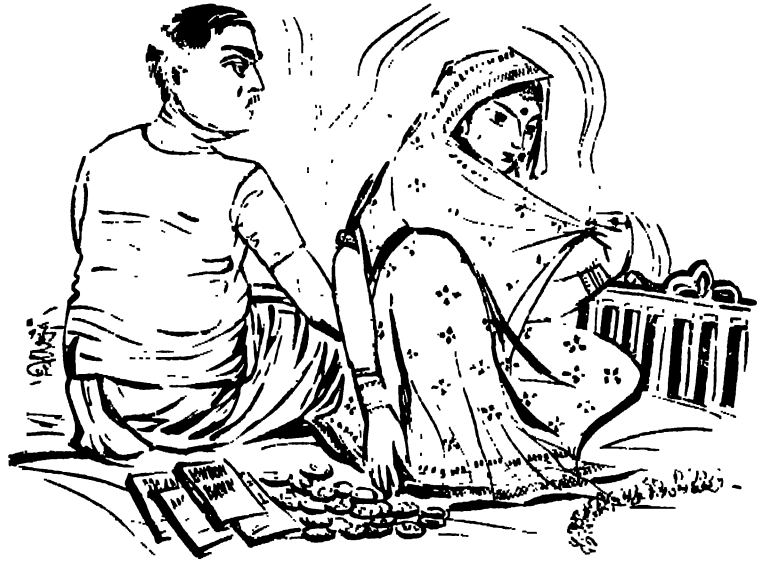
"সেটা কি? জানি না তো .... টাকা তো নয় দেখতেই পাচ্ছি"

বুক থেকে শনিগ্রহের যা ব্যবধান, নীহারিকার জননশীল-স্রোতের থেকে খসে-পড়া উল্কার যা ব্যবধান।

সে ঘরখানার একধারে একখানা ছোট তক্তপোষ পাতা। তার ওপরে একটা শতরঞ্জি। একটি পাতলা তোষক ফর্সা চাদরে ঢাকা। তার ওপরেও বর্মার পাতলা কাঠির মাদুর একখানা। শিয়রে একটি ছোট বালিশ। ঘরে একখানি মাত্র ছবি তার বাবার। একটি টেবিলে খানকয়েক বই, একটি ধূপদানী। কোণে রূপার গেলাস ঢাকা একটা সরাই। গেলাসটিতে জনার বাবা জল খেতেন। একটা বাক্স তক্তপোষের তলায়। মেঝেয় একটা মাদুর বিছানো। তার পাশে একটা জলচৌকির ওপরে লেখার সরঞ্জাম।

এটা জনার নিজস্ব ঘর। তার পাশে জনার দরবারী ঘর। সেটা একেবারে ব্যবসায়ী স্বামীর ঠাট-দুরস্ত। সেখানে এলে কেউ সন্দেহ করবে না জনা-দীনবন্ধু-জগতের ঠাসবুনুনী ঐক্যে।

জনা একদিন গিয়েছিল শ্রীরঙ্গমে শিশির ভাদুড়ীর মাইকেল দেখতে। সঙ্গে বাংলার লৌহজগতের এক জগদ্দল চাঁই এবং আরও কেউ কেউ। জনাই ওদের আপ্যায়ন করছিল। তৃতীয় অঙ্ক শেষ হতে হতেই একজন কে চেঁচিয়ে উঠল, "জনা-দি!"

ওর কেউ লক্ষ্য করে নি। বাঘ ডাকলে বাঘে না শুনতে পাক, ঝড়ের মধ্যেও হরিণীর কান চকিত হয়ে ওঠে—প্রাণে ছোটে দুরন্ত বন্যা। জনা শুনেই দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকাল। ঠিক যা ভেবেছিল তাই।

পলকে লোকটি সামনে এসে দাঁড়াল। এক গাল হাসি মুখে-চোখে উপচে পড়ছে। মাথায় ঝাঁকড়া লম্বা পাতলা চুলের রাশ ক্রমাগত এক হাত দিয়ে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। গায়ে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী—বুকে বোতাম একটাও নেই। পরণে খদ্দরেরই ঢিলে পাজামা। চোখের মধ্যে তারাটাই সব, সাদা অংশটি যাও ছিল, চোখের পাতার নিবিড়তায় তাও ঢাকা পড়ে গিয়েছে। পাতলা ছিমছাম চেহারা যেন সদ্য বেরিয়ে আসা হোমশিখা। তেমনি কাঁচা চুলের বাহার। বয়স ওর বাইশের বেশী তো নয়ই বরং আরও ছোট হবে। হাত দুখানা আর ঠোঁট দুটি চিবুকসমেত একেবারে মেয়েলী।

এসেই বললে, "ভাবি নি তোমার সঙ্গে দেখা হবে এখানে এমন ভাবে।"

জনা অন্তরের সত্য খুশী চেপে বহিরঙ্গ খুশী জানিয়ে বলল, "অংশু, তুমি কোলকাতায়? কাশী ছেড়েছ না এমনি বেড়াতে?"

এই পরিচয়।

শেষ হ'ল অভিনয়। অংশুমান বাইরে দাঁড়িয়ে। নবেম্বর মাস। তখন একটু শীত করছে। জনা অংশুমানকে দেখে বললে, "এই জামা গায়ে দিয়ে থিয়েটারে এসেছ। ঠাণ্ডা লাগবে, অসুখ করবে যে। যাবে কোথায় কদ্দূর? গাড়ী আছে পৌঁছে দিয়ে যাই।"

অংশুমান এসেছিল কলকাতায় চাকরীর খোঁজে। অংশুমানের মা আর জনার মা দু'জনে সই ছিলেন। অংশুমানের মা যক্ষ্মায় মারা যায়। তার পর অংশুমান দশের দয়ার উপর নির্ভর করে-করেই লেখাপড়া করতে লাগল। বিশেষ ভাল ফল ওর হ'ল না—কারণ ওর দুরন্ত রোগ ছিল যেখানে-সেখানে বসে চিন্তা করা, বইয়ের পর বই পড়া, আর লেখা, বিশেষ করে কবিতা লেখা। এ যুগে কবিতা লেখার মত চরম দুর্ভাগ্য নিয়ে ওর জন্ম। রোমাণ্টিক যুগের মৃত্যুর পরেও প্রেমস্বপ্ন নিয়ে ও ভাঙাহাটে পসরা আনার লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত। অথচ পুরোপুরি কবিমন। তখনকার দিনে জনাদের বাড়ীতেও কত গল্প, কত কবিতাই পড়েছে আর জনার বাবা বলতেন, "যদি জন্মাত স্বাধীন দেশে—কোনও লর্ড বংশের মেয়ের বা কোনও রথসচাইল্ডের চোখে পড়লে দেশের নাম লিখে যেত ইতিহাসের পাতায়। আগুনের পাহাড় একটা—রূপার সমুদ্র।"

জনার বিয়ে হয়ে গেল হঠাৎ। অংশুমানের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি কত বছর হ'ল আজ। তা সাত বছর তো বটেই। এর মধ্যে অংশুমান জেলে গেছে, জেল থেকে বেরিয়েছে, কাগজে লিখেছে—খিদের ছটফট করেছে—কিন্তু সেই অংশুমানই আছে, এতটুকু হুঁশিয়ার হয় নি, এতটুকু চালাক নয়। সেই ক্ষীণ দেহ, নির্বোধ ভঙ্গী, অতলস্পর্শ দৃষ্টি, আলেয়ার মত চালচলন। যেন এখানকার মানুষ নয় ও। শাদা ফ্যাকাশে রং। কলকাতায় এক বন্ধুর কাকার বাড়ী এসেছিল আজ আট-দশ দিন। কাল থেকে কাকা বদলি হয়ে খুলনায় চলে গেছেন। কাল রাতে গঙ্গার ধারে শুয়েছিল। আজ একটি সন্ন্যাসীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসেছে। "লোকটা ভাল জান জনাদি, চা দিয়েছে খেতে এবং রুটি দুখানা রাখবে বলেছে।"

"তা তো হ'ল—টাকা পেলে কোথায়? থিয়েটারের টাকা?"

হাসতে হাসতে বললে, "জুটেই যায় জনাদি জান, জুটেই যায়। একটা প্রেসে চাকুরির জন্য গিয়েছিলাম। ওদের ওখানে কোন স্কুলের টেষ্টপেপার ছাপা হচ্ছিল। বললে প্রুফ দেখে দিতে। দেখে দিলে আর দুটো টাকা দিলে। ভাবলাম শিশিরবাবুর মাইকেলটা আর দেখব না?"

জনা বললে, "কিন্তু তুই তো তিন টাকার সীটে বসেছিলি। বাকি টাকা পেলি কোথায়?"

"ওঃ তোমরা তাকাও লাইক হক্‌স্ সিউর এণ্ড মিনেসিং—বাজের মত দৃষ্টি—তেমনি নির্ঘাত তেমনি ভয়ানক। দেখ পা—দেখছ? দু' টাকা টিকিট কা'বার। জুতো জোড়া দিলাম বেচে এক বেটা উদাম মুচীকে।"

জনা প্রায় জড়িয়ে ধরল ওকে—"তেমনি পাগলাই আছ এখনও। বয়স বাড়ে নি। যাক—যাবি নে কোথাও আমার বাড়ী চল। চাকরি-বাকরি সব ঠিক করে দেব।"

প্রথম প্রথম কিছু বলে নি দীনবন্ধু। ও ধরণের বলা দীনবন্ধুর ডিপার্টমেণ্টের বাইরের জিনিষ। কিন্তু অংশুমান ছেলেটার মেয়েলিপনা দীনবন্ধুর অসহ্য। ওর বড় ঘেন্না মেয়েলীপুরুষকে, ভাববিলাসী "মলয়-সমীরণ" মার্কা ছেলেকে। জনাকে ওর ভালবাসার একটি কারণ জনার মধ্যে একটা এমন দীপ্তি, এমন স্বচ্ছ কাঠিন্য যা হীরের মধ্যে আছে। জ্বল জ্বল করছে, শোভায় ঝলমল করছে, কিন্তু বজ্রমাণিক নাম ওর, কঠিনতম বস্তু, অথচ কি দামী। এই দৃঢ়তা জনাকে ওর কাছে যথার্থ করেছে। কিন্তু তার কাছে এই অংশুমান ছেলেটা যেন মাখনের ডেলা, একটু তাতে গলে যায়।

এক দিন জনা তাই বলেছিল, "ঠিকই বলেছেন আপনি। সকালবেলায় টাটকা দুধের ভেতর থেকে তোলা মাখনের মতই অংশু। বড়ই দরিদ্র, নিঃসম্বল পরিবেশ থেকে উঠে এলেও শুভ্র অপাপবিদ্ধ, ও যেন হোমের পাত্রে ঘি। ও কারুর ক্ষতি করে না। তাই ওকে কেউ কষ্ট দেয় সহ্য হয় না।"

সমাজে মজার কথাবার্তা চলতে লাগল। দীনবন্ধুও শুনল। কিন্তু মনকে বোঝাল—"আমার ডিপার্টমেণ্ট নয়। লেজারের বইয়ে হিসাব রাখি বলে তার মলাটে ধুলো পড়বে না, পাতা ময়লা

হবে না এমন কথা নেই তো। আমার রোজকার ব্যালেন্স মিললেই হ'ল। তিসের বহুদিন মিলছে ডামাকেয়ার ধুলো, কালি।"

কিন্তু এই কথাবার্তার ধুলোবালি ওর সহ্য হ'ত, সহ্য হ'ত না অংশুমানের মেয়েলীপনা। এর মধ্যে আর একটা উৎপাত জুটিয়েছে অংশুমান। কোথা থেকে একটা কুকুর-বাচ্চা নিয়ে এসেছে। একেবারে রাস্তার কুকুর। প্রথম প্রথম জনা বিরক্ত হ'ত। অংশুমান বলত, "আমারই মত শীতে মরছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্যামবাজারের মোড় থেকে এই এলগিন রোড পর্যন্ত হেঁটে এল। গেল না কিছুতেই।"

"এতটা পথ হাঁটলি তুই? কেন?" বিস্মিত জনা জিজ্ঞাসা করল।

"বেশ লাগে নির্জ্জন পথে চাঁদের আলোয় চলতে।"

মোটের উপর কুকুরছানাটা বাড়তি হ'ল সংসারে। একটা নামকরণও হ'ল—"ঝাপো"—শাদা কুকুরটার গায়ে দু'জায়গায় বাদামী ছাপ। কান লম্বা, ঝাকড়া চুল লেজেও লম্বা চুল, ককার স্প্যানিয়েলের ছোঁয়াচ লাগা রাস্তার কুকুর। বোকার মত চেয়ে থাকত। ডাকত না একেবারে কেবল খেলা করত অংশুমানের সঙ্গে। নইলে সারাদিন বসে থাকত জনার তক্তপোষের তলায়।

তত অসহ্য হ'ল না অংশুমান, যত অসহ্য হ'ল এই আলো। বারবার দীনবন্ধু এই নিয়ে জনার কাছে নালিশ জানাল। অবশেষে এক দিন জনাকে দীনবন্ধু বললেন 'কতকগুলো জমা আছে যা আসলে খরচ লোকে জমা বলে ভুল করে, যেমন ডেড্‌ষ্টক বা ব্যাডডেটস, ব্যবসায়ে এদের সংখ্যা বাড়ালে ঘাটতি পড়বেই জান জনা?"

জনা সামনের বাগানে তখন বসেছিল। সন্ধ্যার আগের সময়। হাস্নাহেনার ঝাড় থেকে সবে গন্ধটার জানাজানি হয়েছে। পাশে আলো লেজ নিয়ে খেলা করছিল। দীনবন্ধুর গলার শব্দ শুনেই কুকুরে পালিয়ে হেনার ঝাড়ের তলায় ঢুকে পড়ে চকচকে চোখ বার করে ক্ষণে ক্ষণে চাইতে লাগল।

জনা ভাবছিল সারাদিন আজ অংশুমান আসে নি। সকালে আজ অংশুমান একটা কবিতা শুনিয়েছিল ওকে—প্রেমের কবিতা—কিছুতেই শোনাবে না, জনা জোর করে শুনেছিল—ক'টা লাইন মনে পড়ে:

> এরেই বলো ছলোছলো চোখের চাওয়া প্রাণের টান,
> এরেই বলো বুকের মণিহার?
> এরই লাগি হয় বিবাগী যুগে যুগে হাজার প্রাণ,
> ভালবাসা তবু চমৎকার?
>
> ইহার চেয়ে অনেক ভাল নাই যদি প্রেম নাই তো নাই…

তার পর কি যেন মনে নেই। তার পর…হ্যাঁ…লাইনগুলো বেশ…

> নীহারিকার স্রোতের ভীড়ে ভালবাসা রইল বা
> আলোর মালায় ঝলক সে নয় থাক
> তারায়-তারায় দূর পরিচয়, ওই তো আমার মনলোভা
> কেনই-বা এ কাছে টানার ডাক?"

বেশ লেগে। কেমন একটা উদাসীন অথচ ঝাঁঝালো মাদকতা। ওর একখানা নাটক নাকি শীগগির অভিনীত হবে। আজ তার

বক্তৃত ভঙ্গিতে দীনবন্ধু হাতের মুঠো পাকিয়ে জনার মুখের সামনে ধরল

পাকাপাকি খবর। তাই জনা অংশুমানের অপেক্ষায় বসেছিল সুখবরের প্রত্যাশায়।

আজ যদি অংশুমান ভাল খবরটা নিয়ে আসে অনেকটা স্বস্তি-বোধ করবে সে। অংশুমানের ক'দিন ধরে জ্বর চলছে। কিন্তু জনা জানে ওর নাটকখানা নির্ব্বাচিত হলেই ওর জ্বর সেরে যাবে। দীনবন্ধুর কথার উত্তরে জনা বলল, "ব্যবসার আমি কতটুকুই বা জানি বলুন।"

দীনবন্ধু বললে, "শেখা উচিত।"

"হ্যাঁ যদি ব্যবসা করি।" অবহেলাভরে উত্তর দিল জনা।

"করছই তো ব্যবসা। জীবনের বাজারে সব ব্যবহারই লেনদেন; বায়সে দেও, ওয়ায়সে লেও; নগদ কারবার। বাজিয়ে না নেও, ঠকো, দর যাচাই না কর, ঠকো; ছ-চারটে না করে নাও, ঠকো। বাঁচব অথচ ব্যবসা করব না এ অসম্ভব।"

জনা বলল, "ব্যবসায়ে কেউ জেতে, কেউ ঠকে, এও তো চন্দ'

"কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী হয়ে ঠকবে, ভাবতে পারি না আমি। তুমি অন্ততঃ লেনদেনে জিতবে এই আশাই আমি করি।" গম্ভীর গলায় জোর দিয়ে বলল দীনবন্ধু।

হঠাৎ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল জনা, হয়ে উঠল ক্রূর। সাধারণতঃ ও যা করে না তাই করে বসল। ও আঘাত করে বসল দীনবন্ধুকে। "যদি বাজারদরই যাচাই করতে জানতাম, যদি কষতে জানতাম, এ ঘরে আসতাম না। ব্যবসার গোড়াতেই যে দেউলে তার কি ব্যবসায় বৃদ্ধি হবে কখনও ?"

থমথমে হয়ে উঠল বাতাস। ষাট বছরের বুড়োর মুখ যেন উত্তপ্ত তামার পাতের মত সটান হয়ে উঠল। তার শিথিল মাংসের ভাঁজের মধ্যে যেন জলন্ত রক্ত চলাচল করতে লাগল। "তোমায় আমি বিবাহ করি নি জনা, জান। তুমি আমি সমান পাল্লায় এক বাজারে দাঁড়াই নি কখনও।"

শান্ত হবার চেষ্টা করে জনা বলল, "জানি!"

"তবে এ তুলনা করলে যে বড় ?"

"জীবন একটা বাজার। এ বাজারে দু'জনের দেখাশোনা। আমায় আপনি কিনেছেন। জিতেছেন না হেরেছেন জানি না। আমি যে আপনাকে কিনতে পারি নি এটা আমি পলে পলে বুঝি। জিনিষ না কিনে এমনি পেলে সেটা লাভ তাও জানি। কিন্তু কিনিও নি পাইও নি, অথচ ফাঁকা একটা লেনদেন—এ ত ঠকাই। ঠকেই এসেছি, তাই বলছি।"

"তোমায় আমি কিনি নি জনা; কিনলে লাভ-লোকসানের কথা উঠত। তোমায় পেয়েছি ফাউ, তাই সবটাই লাভ।"

"ফাউ ?···কি কিনলেন যে তার ফাউ ?"

"কিনেছি তোমার ইহকালকে: তোমার শরীর, মন আর পরকাল সবটাই ফাউ।···বুঝলে ? তোমার ঐ 'খোকা' নিয়ে প্রেম করার রসদ জোগায় আমার ফাউয়ের পাওনা। আমার আসল-কেনা সওগাদ যে তোমার 'ইহকাল' তা আমার হাতের মুঠোয়।" বিকৃত ভঙ্গীতে দীনবন্ধু হাতের মুঠো পাকিয়ে জনার মুখের সামনে ধরল।

জনার পায়ের তলায় সব যেন এক বার দুলে উঠল। চীৎকার করে উঠল জনা। "চলে যান, চলে যান আমার সুমুখ থেকে। আপনি আমার সুমুখে আসবেন না কখনও।"

জনার চীৎকার শুনে ঝোঁপ থেকে আলো বেরিয়ে এসে মস্ত চীৎকার জুড়ে দিল। দীনবন্ধু গোস্মাল ভালবাসেন না। গম্ভীর হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। আলো 'ঘেউ ঘেউ' করে ওর পেছনে পেছনে দৌড়াল।

হঠাৎ দীনবন্ধুর কি হ'ল। পেছন থেকে কুকুরটাকে ধরে সবলে ঘুরিয়ে পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কুকুরটা আর্তস্বরে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল।

খানিকটা পরে অংশুমান এসে জনাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেল বাগানের মধ্যে। পাশে আলো বসে আছে।

অংশুমান বললে, "জনা-দি তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে জানতাম না তো। আজ জামাইবাবুকে বলতে হবে। খুব খারাপ, খুব খারাপ। বাগানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ, ঠাট্টার কথা নয়।"

জনা নিজের ঘরে এসে বলল, "থাম তুই, ভারি তোর মুরোদ। তুই আমার স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করবি! তোর বইয়ের কি হ'ল বল।"

জনার তক্তপোষের ধারে বসে অংশুমান জনার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "বই ওরা নিয়েছে। আজ এক জন প্রপ্রাইটার এসেছিলেন, তিনিও পছন্দ করেছেন। ওরা বই ছাপছে আঠারই সেপ্টেম্বর, মানে আরও দু'মাস সময়। আঠারই সেপ্টেম্বর! তোমার জন্মদিন!! ক্যাপিটাল চমৎকার। ভাবতেও ভাল লাগছে, আমার বই হবে। আমি যেন 'জন গে', তুমি যেন 'লেডি কুইনসবারী'···"

"থাম তো তুই! কুইন্সবারীর কলঙ্ক আমার মাথায় চাপাবি তুই ?"

"বিশ্বাস কর তুমি কুইন্সবারীর মত মহিলার নামে ঐ অপবাদ? বদ সমাজের বিষ-উদ্গার। একটা অকর্মণ্য বুড়ো 'বিজি বডি' ছিল ওর স্বামী, অথচ লেডি কুইন্সবারীর নিজের টেলেন্টস—বিশেষ শিল্পরুচি, কত সূক্ষ্ম ছিল।···একে বলে সিম্ফনি, একটা আধ্যাত্মিক মিলন। শেলী যাকে বলেছেন ডিজায়ার অব দি মথ ফর দি ষ্টার, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, "মৌনী বীণা কেঁপে তোমার অঙ্গুলী পরশ'—সেই জিনিষ। কেন একে তোমরা মলিন করবে হাটের ধুলোয় ?"

অন্ধকার ঘরের কোণটা। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো মেঝের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। একটা ধূপ পুড়ছিল কোণে, নীরবে। জনার গলার স্বর ভিজে। বলছিল, "হাটে থাকবি ধুলো লাগবে না, এমন কোন্ প্রজাপতি তুই রে? শেলী কি 'ফিয়ার অব আওয়ার সরো' বলেন নি ?" এখানে থাকতে গেলে সাবধানে থাকতে হবে। বীণা যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন বীণা ছেঁড়ার দল কত ভারী। কত সাবধানে রাখতে হয় বীণা।··· বেশ তো, তোর বই হ'ল এবার তুই কোন একটা জায়গা দেখে চলে যা-না। কুটুম বাড়ীতে কি বেশীদিন থাকে রে ?"

"তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না দিদি। 'দি গে এণ্ড ইণ্ডোলেন্ট পোয়েট নেসলিং ইন দি সাইনকিউর অব এ ফ্যামিলি অব মীনস' সেই আমার আদর্শ জীবন। কিছুই তো নিই নে তোমাদের, দি'ও না। শুধু চারটি খাওয়া। জানি সে তোমাদের কিছুই নয়। কিন্তু যদি এক দিন নাম হয়, হবেই আমার নাম, সেদিন তোমার ও ···হাদল কুৎকুৎটিও বাদ যাবেন না।"

"আমার লজ্জা করে অংশু; লক্ষ্মী ভাই, এবার তোর আস্তানা তুই একটা দেখে নে।"

·· বুঝল কিছু একটা হয়েছে। ও গা-ঢাকা দিলে দু'দশ দিন . · আসে নি। এর মধ্যে ছুটো জিনিষ হয়ে গেল।

জনা সেই যে শয্যা নিল, আর উঠল না, আর দিন-রাত ঐ আলোটা কাঁউ কাঁউ করে কাঁদে।

দীনবন্ধু বিরক্ত হয়। কিন্তু ঐ তক্তপোষপাতা ঘরখানায় ও ঢুকতে পারে না।

এদিকে এক দিন বাড়ীতে একটা ভোজ লেগেছে। বিলিতি সদাগর আপিস থেকে এক কমিশন এসেছে। নিমন্ত্রণ কার্ড গিয়েছে জনার নামে।

দীনবন্ধু এসে বলল, "আজ তোমায় একটিবার উঠতে হবে।" জনা উঠেছে। সব ব্যবস্থা করেছে। হেসে হেসে সব ব্যবস্থা করেছে। আজ কিন্তু অনেকেই জনাকে একজন প্রোমিসিং ইয়ং পোয়েট সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। এমন কি একটা টেবিলে ফ্যাশন হিসাবে অষ্টাদশ শতকে কবিপোষণ যে ইংলণ্ড ও ইউরোপের একটা অনুমোদিত বিলাস ছিল সে বিষয়েও রীতিমত আলোচনা চলল।

কিন্তু দীনুবাবুর ভাল লাগে নি আজকের দিনেই সে ছোকরার অনুপস্থিতি। যদি থাকত একটা 'ষ্টার্ট' দেওয়া যেত। ষ্টার্ট হিসেবে কবি-লেখকদের একটা কদর সমাজে আছে সেটা দীনবন্ধু আজ এই প্রথম জানল।

"আশ্চর্য, তুমি তো জানতে; অথচ ওকে আজ ডাকালে না কেন?" জিজ্ঞাসা করল দীনবন্ধু পার্টি শেষ হয়ে যাবার পর নিজের ঘরে বসে।

"ডাকাব কোত্থেকে। ঠিকানা দিয়ে যায় না তো!"

বাঁকা চোখে অপাঙ্গে চেয়ে দীনবন্ধু বললে, "যেন জান না ঠিকানা!" মুখে বেজাঁর হাসি। দেখলে গা সির সির করে।

ঘৃণায় আকুঞ্চিত জনা বলল, "কি অসভ্যতা করেন, জানি না-ই তো!"

বহু অর্থ পরিপূর্ণ বক্র হাসি হেসে দীনবন্ধু বলল, "আমি জানি।...কবির ঠিকানা তোমার ভাল করেই জানা আছে।"

এরূপ ইঙ্গিত সহ্য হয় নি জনার। কি যেন একটা ছিল টেবিলের উপর। যোলায় বা কিছু। তুলেই একেবারে ডাইনে-বাঁয়ে মারতে লাগল দীনবন্ধুকে উন্মাদিনীর মত। তারপর সহসা সেটা ফেলে দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলে।

আলো জ্বেলে জনা আঁৎকে উঠল যেন।

যেন সে একটি অজগরের সঙ্গে এক খাঁচায় ঢুকেছে।

তার শয্যায় শুয়ে অংশুমান ঘুমুচ্ছে।

পরনে নোংরা জামা, ছেঁড়া পাজামা, মাথায় চুল উস্কো-খুস্কো। বেশ বোঝা যায় নেশা করেছে। ক্লান্ত অবসন্ন হাত-পা মেলে জনার তক্তপোষে ঘুমুচ্ছে।

কি করবে জনা ভাবছে।

দরজায় করাঘাত।

জনা দরজা খুলবে কি, হাত-পা তার আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে।

দরজায় তখন জোরে করাঘাত। দীনবন্ধু বলছে, "দরজা খোল!"
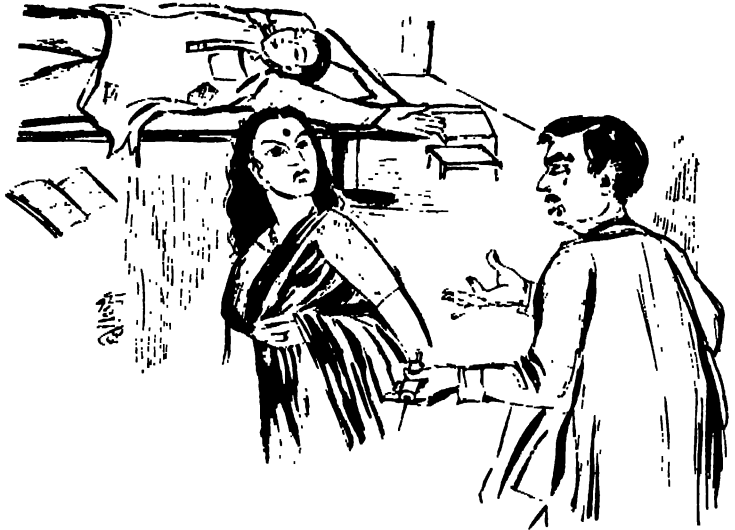
শান্ত ভাবে একটি হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ বার করলেন দীনবন্ধু

জনা দরজা খুলল।

দীনবন্ধুর গায়ে একটা শাদা কামব্রিকের শার্ট ছিল। তাতে রক্ত লেগে। চোখ-মুখ ফোলা। ঠোঁটটা কেটে গিয়েছে, জ্রর উপরটা ফাঁক হয়ে গিয়েছে। তা থেকে রক্ত পড়ছেই—সে দৃশ্য দেখে জনা যেন পিছিয়ে গেল।

দীনবন্ধুকে দেখেই আলো চীৎকার, লাফালাফি করতে লাগল। দীনবন্ধু হঠাৎ জোরে এমন লাথি মারল আলোর পেটে যে কুকুরটার নাক মুখ থেকে রক্ত পড়তে লাগল। দীনবন্ধু তার ঠ্যাং ধরে বারান্দা গলিয়ে পথে ফেলে দিল।

তখনও দীনবন্ধু শেষ করে নি তার কাজ।

রাত্রি তখন দুটোর কাছাকাছি। দীনবন্ধু বলল, "তোমাদের মত হঠাৎ রেগে কিছু করা পোষায় না আমাদের। শেয়ারের বাজার যখন পড়তে থাকে, এমনিই হয়-মার খেতে হয় আমাদের। ব্যবসা করতে গেলে মাথা গরম করলে চলে না। তুমি ভাবছ আমি জানি না। জানি। নিজে চক্ষে দেখেছিলাম তোমার ঘরে ঢুকতে। তোমার স্বীকার করা না করায় আসত যেত না কিছু।.... কিন্তু ব্যাড ডেটস আমি রাখব না। আর রাখব না বলেই রাইট-অফ করার সাজ-সরঞ্জাম সর্ব্বদাই হাতের কাছে মজুত রেখেছি।

কখন দরকার হবে ব্যাক্লেস শাঁট মেলাতে কে জানে। কি ভাবে ব্যাড-ভেটস ডিসপোজ করা হয় দেখে যাও নীরবে।"

শান্তভাবে একটি হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ বার করলে দীনবন্ধু। আমার হাতা দিয়ে জ্রুঃ রক্তটি মুছে নিলে একবার। তারপর হঠাৎ পলকে নিদ্রিত অংশুমানের ঘাড়ের উপর ফুটিয়ে দিয়েই বার করে নিলে সিরিঞ্জটা। এক নিমেষে।

যন্ত্রণায় অংশুমান বলে উঠল—

"তারায় তারায় দূর পরিচয় সেই ত আমার মনলোভা···

জান জনা-দি ওরা আমার বই করবে তোমার জন্মদিনে·

তারপর এলিয়ে পড়ল।

জনার হুঁস হ'ল যেন এতক্ষণে।

ফিসফিসিয়ে ও বললে, "পায়ে পড়ি আপনার, বলুন, কি দিলেন ওকে আপনি, কি দিলেন ?"

সিরিঞ্জটা গুছো করতে করতে দীনবন্ধু বলল, "ঘুমাবার ওষুধ। ঘুম আর ভাঙবে না। তোমার সাক্ষী রেখেই সব করা হয়েছে। নাথিং টু হাইড ফ্রম ইউ এণ্ড দি ওয়ার্ল্ড। পেটে এলকহল আছে। যদি পোষ্ট মর্টেম হয়ও রক্ত কেথাও পরভনড় হয়ে এসে ত প্রমাণ করা কঠিন হবে না। ইচ্ছা হয়, নালিশ কর, কিন্তু টিকবে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হবে কবিকে তোমার বিছানাতেই পাওয়া গেছে। বড়ই বিশ্রী অবসান হবে এমন একটা অনন্ত প্রেমের মতো কবির দেবভোগ্য একথাল মাখনের ডেলার···তার চেয়ে···"

জনা অংশুমানের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বসেছিল। সহসা সম্বিৎ পেয়ে বলে উঠল, "তার চেয়ে ?·· তার চেয়ে ?"

"ক সাজাও গোছাও। যেমন কাঁদছ, তাতে মানাবেও ল। অমনি একখানা পোজে ছবি তোলাও। কাল শোভাযাত্রা করে বার কর। একটা দারুণ ষ্টাণ্ট হবে। দেখবে ওর নাটকে কি ভীড় হয়, ওর কাব্য কি হুড় হুড় করে বিক্রী হয়ে যায়। তোমার নামের গৌরবে অভিজাত মহলের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। ঠিক যেমনটি চাইছিল কবি। সবটাই ওর কাম্য হবে। শোকও ব্যবসায়ের পণ্য—যদি বুদ্ধি করে ইউটিলাইজ করতে পারা যায়। চাই বুদ্ধি—কোল্ড ব্লাড।

"কাম্য ? তবে তাই হোক—তাই হোক কিন্তু কি হবে আমার ?"

"কি ছিল তোমার ?"

"অনেক ছিল। ওকে ঘিরে অনেক সাধ, অনেক আশা ছিল আপনি তা বুঝবেন না।" ফুঁপিয়ে কাঁদে জনা।

"প্রথম ফুলবাসরে টাকার কাগজ ছবি দিয়েছিলে, মনে আছে ? টাটকা দুধ থেকে তোলা—শুভ্রম্ অপাপবিদ্ধম্. এই মাখনের ডেলা. এই তোমার শেষ ছবি, পূর্ণ হুতি হোক, কেমন ?—সাজাও ওকে. ফুল আনাতে দিই। মর্ণিং এডিশনেই সব বেরিয়ে যাওয়া চাই।" চলে গেল ঘর ছেড়ে দীনবন্ধু।

আলোর চীৎকার ভোরের দিকে থেমে গেল।

টেলিফোন রিপোর্টার, ভীড়, মালা, ফটো, শোভাযাত্রা সব হ'ল জনার নীরব পূজার কথা—কাগজে ছেপে ফুটে বেরুল হ'ল।

আর হ'ল জনার জন্মদিনে রঙ্গমঞ্চে ভীড়—মৃত কবির নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয়ে। অমন সুন্দর নাটক নাকি বহুদিন হয় নি।

কিন্তু আলোর মরণের কথা কোন কাগজে লেখে নি। শুধু জনা কুকুরের ডাক শুনলেই এখনও মূর্চ্ছা যায়। রাত হলে আর রক্ষা নাই।

লোকে বলে, "বড়লোকের রোগ কত রকমের আদিখ্যেতাই আছে।"

অতীত দিনের ছায়া

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের মনে বিছানো আজিও অতীত দিনের ছায়া
শেফালি-খচিত কুটীর-আঙন, পল্লীপথের মায়া।
খালে আসিয়াছে বরষার জল, ডিঙিগুলি চলচলে.
বন শিরে শিরে শরতের রোদ মণির মতন জ্বলে
মণ্ডপ-ঘরে প্রতিমা-রচনা, চালচিত্তির শেষ,
অধিবাস এলো. প্রবাসীরা আজ ফিরিছে আপন দেশ.
হায়রে স্বপন! আজো সেই দিন বৃথাই খুঁজিয়া ফিরি.
আর বহিবে না জীবনের স্রোত কুলুকুলু ঝিরিঝিরি।
কোথায় নগরে ক্ষুব্ধ সাগরে তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস
কাহারে ডুবায়. কাহারে ভাসায়, কিছু নাই বিশ্বাস।
ঝড়ের বাতাসে জাগে হাহাকার অশান্ত গরজন,
দিগন্ত-তারা ঢেকে দিলো বুঝি বাষ্পের আবরণ।

প্রাচীন বিদিশা নগর

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

মহাকবি কালিদাস তাঁহার মেঘদূত কাব্যে ভারতের প্রাচীন নগর বিদিশাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। বিদিশা বা বৈশ্য নগর অথবা বেসনগরের অধিবাসীদিগকে বৈদিশ বলা হইত। রামায়ণে উক্ত আছে যে, এই নগরটি রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে দান করেন। গরুড় পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সম্পৎশালী নগরটিতে বহু জনপদ, নানা রত্ন, এবং আড়ম্বরপূর্ণ অট্টালিকা ও প্রাসাদ ছিল এই স্থানে অনেকগুলি ধর্মমত প্রচলিত ছিল।

বিদিশা বা বেদিশ (সংস্কৃত বৈদিশ, বৈদশ) হইতেছে ধ্বংসপ্রাপ্ত বেসনগরের প্রাচীন নাম। ইহা ভিলসা নগরের চারি ক্রোশের মধ্যে ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত বেত্রবতী বা বেটওয়া নদী এবং বেস বা বেদিশ নদীর মুখে অবস্থিত। পুরাণের মতে বিদিশা নদীর তীরে বৈদিশ নগর অবস্থিত। এই বিদিশা নদী পারিপাত্র পর্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। প্রাচীন বিদিশা নগর ও গোয়ালিয়রের অন্তর্গত ভিলসা নগর অভিন্ন। ইহা ভূপাল রাজ্যের উত্তর-পূর্বদিকে ছাব্বিশ মাইল দূরে ও পাটালিপুত্র হইতে পঞ্চাশ যোজন দূরে অবস্থিত ছিল। পালি টীকাকারের মতে পাটলিপুত্র হইতে উজ্জয়িনী যাইতে হইলে বিদিশা নগরের মধ্য দিয়া যাইতে হইত। বিদিশা অবন্তী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আমরা অবন্তীরাজ্যের অপরান্ত প্রতিবেশী হিসাবে বিদিশার নাম পাই। শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের রাজ্য নর্মদা নদী পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল এবং বিদিশা, পাটলিপুত্র ও অযোধ্যা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি অবন্তী শুঙ্গরাজ্যভুক্ত হইত, তবে বিদিশার পরিবর্তে উজ্জয়িনী রাজপ্রতিনিধির প্রধান কর্মস্থান হইত।

বিদিশা পূর্ব মালবের রাজধানী ছিল। ইহা শুঙ্গ বংশের রাজা পুষ্যমিত্র ও অগ্নিমিত্রের পশ্চিম রাজধানী। মেঘদূতে উক্ত হইয়াছে যে, বিদিশা দশার্ণ দেশের রাজধানী। বিন্ধ্য পাদ হইতে মেঘ দূতরূপে দশার্ণদেশের দিকে গিয়াছিল—পথিমধ্যে ছিল বেত্রবতী তীরে সুবিখ্যাত রাজধানী বিদিশা। এই বেত্রবতী নদী হিমালয় হইতে উত্থিত পাঁচ শত নদীর মধ্যে একটি। মহাভারতে লিখিত আছে, দশার্ণগণ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দশার্ণ নদী তীরবর্তী স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্তমান ধসান নদী হইতে দশার্ণের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই নদী ভূপালরাজ্যে উত্থিত হইয়া বুন্দেলখণ্ডের মধ্য দিয়া বেত্রবতী নদীর সহিত মিশিয়াছে।

দশার্ণ নামে দুইটি দেশ আছে: একটি পশ্চিম দশার্ণ—ইহা বলিতে পূর্ব মালব এবং ভূপাল রাজ্য বুঝায়, অপরটি পূর্ব দশার্ণ অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় জেলার অংশমাত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে জানা যায় যে, দশার্ণ নদীর নাম অনুসারে দেশের নামও এরূপ হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, বিদিশা ও বেত্রবতী নদী পারিপাত্র পর্বত হইতে নামিয়া আসিয়াছে। বিদিশা নগরের সহিত বিদিশা নদীর সম্পর্ক রহিয়াছে। গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত বেত্রবতী নদীতীরে ভিলসা নগরে ভৈলস্বামীর মন্দির ছিল।

পারজিটার সাহেবের মতে যাদবগণ যে সমস্ত ক্ষুদ্ররাজ্য ভাগ করিয়া লইয়াছিল, বিদিশা ইহাদের অন্যতম। বিদিশার নিকট এবং আকরাবন্তীর অন্তর্গত কার্পাসী গ্রাম তুলা ও তুলাশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদিশা অশোকের সময় বৌদ্ধধর্মের এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অশোক যখন বিদিশার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন তখন সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিদিশা খ্যাতি লাভ করে। শ্রাবস্তী এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাটলিপুত্র পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার দরুন দশার্ণের প্রধান নগর বিদিশা প্রাধান্য লাভ করে। বৈদিশা (বেদিশ নগর বা বেসস নগর) দাক্ষিণাত্যে যাইবার পথে বিশ্রামস্থান ছিল।

হস্তিদন্তের কার্যের জন্য এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করে। সাঁচির ভাস্কর্যের মধ্যে বিদিশার হস্তিদন্তশিল্পেরও একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। দশার্ণ নগর হস্তিদন্ত শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। বিদিশা তীক্ষ্ণধার অসির জন্য খ্যাতি লাভ করে।

বাবরির ১৬ জন ব্রাহ্মণ শিষ্য অন্যান্য স্থানসহ বিদিশা পরিদর্শন করে। স্কন্দপুরাণের মতে বিদিশা একটি তীর্থস্থান এবং সোমেশ্বর পরিদর্শনের পর ইহাও দর্শনীয়। ভিলসায় সুবৃহৎ বৌদ্ধ ধর্মগৃহ নির্মাণে বিদিশার ১৮ জন দাতা প্রচুর অর্থদান করেন। বারহুত স্তূপের এক নম্বর স্তম্ভে দাতাদের যে তালিকা পাওয়া যায় তাহাতে নিম্ন নামগুলি আছে—রেবতীমিত্রের স্ত্রী চাপাদেবী, বেলিমিত্রের পত্নী বাশিষ্ঠী, ফগুদেব, অনুরাধা, আর্যমা ভূতরক্ষিত—ইহারা সকলেই বিদিশার লোক। উদয়পুর প্রশস্তিতে উদয়পুরস্থ নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরের উল্লেখ আছে।

অশোকের পত্নী দেবী তাঁহার পুত্রের বসবাসের জন্ত বেদিশগিরি মহাবিহার নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ ইহা প্রথম বৌদ্ধ ধর্মগৃহ। ইহার পর ভিলসা হইতে সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সাঁচীতে অনেকগুলি স্তূপ নির্মিত হয়। অশোকের পুত্র মহিন্দ এইখানেই আপন মাতা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাতার স্বহস্তে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করেন। বেদিশ পর্বত হইতে তিনি সিংহলে যাত্রা করেন। বেদিশতে আর একটি বিহার ছিল।

বিদিশা নগরে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য স্তূপ ছিল—১। ভিলসার সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সাঁচী স্তূপ; ২। সাঁচীর ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত সোনারি স্তূপ; ৩। সোনারি হইতে তিন মাইল দূরে শৎধারা স্তূপ; ৪। ভিলসার ছয় মাইল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বস্থিত ভোজপুর স্তূপ; ৫। ভিলসার নয় মাইল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে আন্ধের স্তূপ। রেবতীমিত্র সম্ভবতঃ বিদিশার শুঙ্গমিত্র বংশসম্ভূত ছিলেন।

বেসনগরে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডে খোদিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ডিয়নের পুত্র গ্রীকদূত হেলিওডোরাস কৃষ্ণ-বাসুদেবের সম্মানার্থে একটি প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করেন। তক্ষশিলা-নিবাসী হেলিওডোরাস বিদিশার রাজা কৌৎসীপুত্র ভাগভদ্রের সভায় গ্রীক সম্রাট এন্টিয়েলসিডাস কর্তৃক প্রেরিত হন। গ্রীক হইলেও তাঁহাকে ভাগবত বলা হইত এবং তিনি দীর্ঘ বত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ বিদিশায় আগমনের পর তিনি যে নূতন ধর্ম গ্রহণ করেন, ইহার কতকগুলি উপদেশ স্তম্ভের গাত্রে খোদিত করান।

পুরাণের ভাগবত বিদিশার শুঙ্গ-যুবরাজ ভাগভদ্র নামের অপভ্রংশ। মার্শাল সাহেব বিদিশার প্রাচীন স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া একটি বৃহৎ স্তূপের নিকট দণ্ডায়মান একটি শিলাস্তম্ভ দেখেন। তিনি মনে করেন যে, গুপ্তযুগের বহু পূর্বে এই স্তম্ভটি বিদ্যমান ছিল। যুগে যুগে এই স্তম্ভটি তীর্থযাত্রী কর্তৃক পূজিত হইতেছে। রাজা ভাগভদ্র বারাণসীর কোন একটি মহিলার পুত্র (কাশীপুত্রস) ছিলেন। ফ্লীট সাহেবের মতে তিনি কাশীবাসীর কোন এক মহিলার পুত্র অথবা জনৈক কাশীরাজার দৌহিত্র ছিলেন—এই অর্থে কাশীপুত্রস ব্যবহৃত হইয়াছে।

শাক্যরাজগণ বিড়ূডভের ভয়ে বিদিশায় আশ্রয় লন। অবন্তীর মৌর্য উপরাজার (রাজপ্রতিনিধি) পদে যোগ দিবার জন্ত উজ্জয়িনী যাইবার পথে অশোক বিদিশায় বিশ্রাম করেন। এখানে তিনি বিদিশার দেব নামক শ্রেষ্ঠীর সুলক্ষণা যুবতী কন্তা দেবীকে বিবাহ করেন। পালি মহাবোধি বংশের মতে তিনি বেদিশ মহাদেবী ও শাক্য-রাজকন্তারূপে সম্মানিত হন। দেবী উজ্জয়িনী গমন করেন। তথায় তিনি মহিন্দ নামে একটি পুত্র এবং দুই বৎসর পরে সংঘমিত্রা নামে একটি কন্তা প্রসব করেন। দেবী বিদিশায় থাকিয়া যান। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও কন্তা তাহাদের পিতা অশোকের সহিত রাজধানী পাটলিপুত্রে গিয়া সিংহাসন অধিকার করে। অশোকের ভগিনীপুত্র বা ভাগিনেয় অগ্নিব্রহ্মের সহিত সংঘমিত্রার বিবাহ হয় এবং ইহাদের সুমন নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বেদিশমহাদেবী অশোকের রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত ছিলেন। রাণী দেবীর বিদিশার বাসভবন হইতে বুঝা যায় যে, সেকালে বিভিন্ন নগরে রাজাদিগের প্রত্যেক মহিষীর পৃথক বাসস্থানের বন্দোবস্ত ছিল।

বেসনগর অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, তক্ষশীলার গ্রীক রাজা ও বিদিশার রাজার মধ্যে কূট রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, শত্রুঘ্নের দুই পুত্র শত্রুঘাতিন ও সুবাহুর উপর মথুরা ও বিদিশার শাসনভার অর্পিত হয়। বৈশালীর শাসক করনধমের পুত্র অভিক্ষিতের সহিত বিদিশারাজের সংঘর্ষ বাধে এবং অভিক্ষিৎ ধৃত হন। করনধম পুত্রের উদ্ধার সাধন করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে বিদিশায় এক স্বয়ম্বর লইয়াই এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বৈশালীর রাজা করনধমের সময়ে যাদবরাজা পরাবৃৎ তাঁহার দুই কনিষ্ঠ পুত্রকে বিদিশায় প্রেরণ করেন।

সাহিত্য ও শিলালিপির দিক দিয়া শুঙ্গগণ বিদিশা রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে বিদিশার রাজসভায় ছদ্মবেশিনী বিদর্ভরাজকন্তা মালবিকার প্রতি পুষ্যমিত্রের পুত্র ও উপরাজা বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের প্রণয়ের কথা উল্লেখ আছে। বিদিশা ও বিদর্ভরাজ্যের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে বিদিশা জয়লাভ করে। যজ্ঞসেনের জ্ঞাতি-ভ্রাতা মাধবসেন অগ্নিমিত্রের দল ত্যাগ করিয়া বিদিশার পথে যজ্ঞসেনের প্রহরী কর্তৃক ধৃত ও বন্দী হন। শুঙ্গ-নরপতি অগ্নিমিত্র বীরসেনকে বিদর্ভ আক্রমণ করিতে বলেন। যজ্ঞসেন পরাজিত হন এবং বিদর্ভরাজ্য দুই জ্ঞাতিভ্রাতার মধ্যে বিভক্ত হয়। পিতার রাজপ্রতিনিধিরূপে বিদিশা-রাজ্য শাসন করিবার পর অগ্নিমিত্র আট বৎসর যাবৎ ঐ রাজ্যের অধীশ্বর হন।

বিদিশার রাজা কাশীরাজ্যের রাজকন্তার পুত্র ছিলেন। শুঙ্গগণ সর্বপ্রথমে মৌর্যগণের অধীনে বিদিশা শাসন করেন। পুষ্যমিত্র ও অগ্নিমিত্র উভয়েই বিদিশার অধিবাসী।

পুরাণের মতে শুঙ্গ-শাসনের অবসান ঘটিলে জনৈক শিশু-নন্দী বিদিশা শাসন করেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, বিদিশার শুঙ্গদিগের অবশিষ্ট ক্ষমতা কাণ্বরাজ্যের সহিত স্থায়ী

ছিল। ইহা অনুমিত হয় প্রথমে বিদিশা এবং পরে উজ্জয়িনী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রধান কর্মস্থল ছিল।

মৌর্যগণের উত্থানের কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে গুপ্ত প্রাধান্যের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত ছয় শতাব্দীর অধিককাল প্রাচীন বিদিশায় কার্ষাপণ নামে তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল। প্রাচীন বিদিশা বা বেসনগরে যে বিশিষ্ট চিহ্নযুক্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে সেগুলি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। আরও মনে হয় যে, বেসনগরে প্রাপ্ত কার্ষাপণগুলি নদীতীরে নির্মিত, কারণ ইহাদের উপরে নদীতীরসূচক আঁকাবাঁকা চিহ্নসমূহ রহিয়াছে। ভাণ্ডারকর সাহেবের মতে তাম্রমূল্যের বৃদ্ধির দরুন প্রাচীন বিদিশায় কোন সময়ে তাম্র কার্ষাপণের ওজন হ্রাস করা হইয়াছে।

বিদিশা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য :

(ক) মহাভারত (আদিপর্ব) ১১৩ ; বনপর্ব ৮৯ ; কর্ণপর্ব ২২ ; উদ্যোগপর্ব ১৯০ ; ভীষ্মপর্ব ৯,৯৫ ; দ্রোণপর্ব ২৫ ; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৭ ; মেঘদূত (পূর্বমেঘ) ; স্কন্দপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ) ; মালবিকাগ্নিমিত্র (৫ম অঙ্ক) ; গরুড় পুরাণ (৭ম অধ্যায়) ; ভাগবত পুরাণ (৪র্থ) ; রঘুবংশ (১৫শ সর্গ)।

(খ) মহাবস্তু ১ ; ললিতবিস্তর ২২ পৃঃ ; মহাবোধিবংশ ১৬৯ পৃঃ ; সমন্তপাসাদিকা ৭০ পৃঃ ; সুত্তনিপাত ১০০৬-১০১৩ শ্লোক ; জাতক (৩য়) ৩৩৮ পৃঃ ; মহাবংশ (১৩শ অধ্যায়) ; দীপবংশ (৬ষ্ঠ অধ্যায়) ; থূপবংশ ৪৩-৪৪ পৃঃ ; মহাবংসটীকা ৩২১ পৃঃ।

Cambridge History of India, Vol. I, pp. 523, 558; Pargiter, *Ancient Indian Historical Tradition*, p. 268; Bhandarkar, *Carmichael Lectures*, 1921, p. 44; Roy Chaudhuri, *Political History of Ancient India*, 4th Ed., p. 308; Barua, *Asoka and His Inscriptions*, pp. 51-52; Barua and Sinha, *Barhut Inscriptions*, pp. 3, 14, 17; Law, *Geography of Early Buddhism*, p. 35; Law, *Geographical Essays*, p. 108; Law, *Ujjaini in Ancient India*, p. 375; Law, *Indological Studies*, Pt. I, p. 50; Schoff, *The Periplus of the Erythroean Sea*, pp. 253, 473; Luders' List—*Geographical Index for References*; Cunningham, *Bhilsa Topes*, p. 7; *Archaeological Survey Report I*, 1913-1914 (Part II); Smith, *Early History of India*, 4th Ed.; *JRAS*, 1909; *JBBRAS*, Vol. XXIII; *JASB*, 1905; Thomton, *Gazetteer, Gwalior and Bhupal*.

নেপালীদের 'ভাইটিকা' উৎসব

অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, "গঙ্গার জল সাদা, যমুনার জল কালো, পদ্মা নদীর জলও সাদা, মেঘনার জল কালো, তাই গঙ্গা-যমুনা, পদ্মা-মেঘনা নদী সংগমের পরও অনেক দূর পর্যন্ত একই খাতে সাদা ও কালো এই দুইটি স্রোত পাশাপাশি চলিতে দেখা যায়।"—ভারতীয় সভ্যতার প্রবাহেও তেমনি নানা জাতীয় ভাবধারা, নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা বিভিন্ন দিক থেকে এসে মিশেছে—কিন্তু মিশে গেলেও আপন আপন বৈশিষ্ট্য তারা একেবারে হারিয়ে ফেলে নি, যদিও একটার উপর আর একটার প্রভাব পড়েছে অনেকখানি। ভারত-সীমান্তে অবস্থিত নেপালে প্রবাহিত হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার প্রবাহ। আবার সেখান থেকেও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি উত্তর ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে কতকটা অনুপ্রবেশ করেছে। বহির্ভারতীয় সীমান্তবর্তী কতকগুলো দেশ আজ ভারতীয় সভ্যতারই অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। বৌদ্ধাচার ও বৌদ্ধমতের সঙ্গে হিন্দুধর্ম মিশে গিয়ে নেপালে গড়ে উঠেছে তাদের নিজস্ব ধর্মশাস্ত্র—দেশাচার ও লোকাচার—যার ভিতর ভারতীয় ছাপ সুস্পষ্ট। সামাজিক বিধি-বিধানে, নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের ভিতরে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রাণের সঙ্গে নেপালীদের একটি নিগূঢ় যোগসূত্র সহজেই চোখে পড়ে। তাদের একটি উৎসবের কথা এখানে বলব।

নেপালের 'তেওহার' বা 'ভাইটিকা' উৎসব আমাদের 'ভাইফোঁটা' বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্বেরই নামান্তর মাত্র। ভাই বোনের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও প্রীতি-রসের যে একটা ফল্গুধারা বইছে তার বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয় এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে—ভাইকে সাদরে বরণ করে নেয় তার বোন, তার দিদি, চন্দনে মাল্যে পুষ্পে ভাইকে সাজিয়ে তার আয়ুবৃদ্ধি কামনা করে ললাটে পরিয়ে দেয় কাজল-টিপ—এই দিনটির জন্তে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে ঘরে ঘরে স্নেহশীলা ভগিনী—ভাই মনে রাখে এই দিনটির কথা—ভাই সব কাজ ফেলে রেখে দূর দেশ থেকেও এসে হাজির হয় বোনের দুয়ারে এই দিনটিতে, বোনের স্নেহ-মধুর ভালবাসা গ্রহণ করতে—দিদির সস্নেহ আশীর্বাদ মাথা পেতে নিতে। ভাই-

বোনের মধুর সম্পর্ক ও স্নেহ-সম্প্রীতির এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠান খুব কম দেশেই আছে। শ্যামাপূজার পর শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে এই ভাইফোঁটা উৎসব, এই তিথির নাম তাই ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। নেপালীদের মধ্যেও এই একই তিথিতে

নেপালীদের 'ভাইটিকা' উৎসবের একটি চিত্র। টিকার আগে বোন ভাইয়ের গলায় মালা পরাইয়া দিতেছে

'ভাইটিকা' প্রদানের রীতি। নেপালের সব উৎসবের মধ্যে 'দশাই' অর্থাৎ বিজয়াদশমী এবং 'তেওহার' বা ভাইটিকা এ দুটি উৎসবই সবচেয়ে বড়, নেপালীরা এ দুটো অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করে।

ভাইফোঁটা বাংলাদেশে কবে থেকে স্থুরু হয়েছে, তার কোন সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই। নেপালেও ভাইটিকা উৎসব আরম্ভের সন তারিখ কেউ বলতে পারে না। ভাইফোঁটার প্রচলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটা কিংবদন্তী আছে: নরকের অধীশ্বর যমরাজকে নাকি তার ভগ্নী যমুনা এই ফোঁটা প্রথম দিয়েছিলেন, তাতে নাকি যম-রাজ দীর্ঘায়ু ও পরে অমরত্ব লাভ করেন। নেপালীদের মধ্যে ভাইটিকার প্রথা-প্রচলন সম্বন্ধে নানা রকমের গল্প শোনা যায়। রাম-রাবণের যুদ্ধে বহু সৈনিক হতাহত হয়। যুদ্ধের পর যারা মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে আসে তাদের সংবর্দ্ধনা করে দেয় আত্মীয়-স্বজনেরা, বোনেরা তাদের ললাটে পরিয়ে দেয় রক্তচন্দনের ফোঁটা। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্তই নাকি নেপালীদের মধ্যে ভাইটিকা উৎসবের সমারোহ। দুর্গাপূজা নেপালীরা করে না, কিন্তু পূজার সময় তারাও বাঙালীদের মত নূতন কাপড়-চোপড় কিনতে দোকানে ভিড় করে। বিজয়াদশমী বা দশাই আসার আগেই তারা ঘর-দোর পরিষ্কার করে, ঘরে চূণকাম করে, রং দেয়, বস্তীর মাটির ঘরগুলোতে নূতন মাটির প্রলেপ পড়ে, এমন কি টেবিল, চেয়ার, চৌকি ইত্যাদিতেও তারা নূতন করে রং লাগায়, বাসনপত্র ঝকঝকে করে মেজে ঘরের দেয়ালের শেলফে সাজিয়ে রাখে। মেয়েরা রংবেরঙের নূতন সিল্কের শাড়ী পরে ঘুরে বেড়ায়। 'দশাই'-এর দিন মেয়ে ও ছেলেরা কপালে 'চালবাটা'র তিলক পরে। এই 'দশাই' উৎসব পরিণতি-লাভ করে 'ভাইটিকা'তে। 'ভাইটিকা' অনুষ্ঠানের সূত্রপাত সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, দশাই-এর পর নেপালীরা শ্যামা-পূজার দিন লক্ষ্মীপূজা করে তার পরদিন ভাইটিকা—এই উৎসব দিয়েই শারদীয়া উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। ভাইটিকার মধ্য দিয়ে ভাইয়েরা বোনেদের শুভ কামনা লাভ করে নূতন প্রেরণা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে আবার অবতীর্ণ হয়—সব উৎসব-আনন্দের অবসান ঘটে।

ভাইটিকা নেপালীদের একটি শ্রেষ্ঠ উৎসব, এই কথা আগেই বলেছি। তাদের ভাষায়:

"পানদিন দশাই পানসরথার কো
তিনদিন তিওহার ভাই কো।"

অর্থাৎ, রাজামহারাজা, বড়লোকদের 'দশাই' বা পূজা-উৎসব পাঁচ দিন ব্যাপী, কিন্তু কেবলমাত্র ভাইয়ের জন্তই তিন দিন ধরে 'তিওহার' পর্ব হয়ে থাকে। তবে অনেক আগে থেকেই চলে এর আয়োজন। আসল ভাইটিকার পাঁচ দিন আগে হয় 'কাক-তিওহার'—সেদিন এরা কাকের পূজা করে। চাল-কলা, মিষ্ট দ্রব্য ইত্যাদি একটা থালায় করে বাইরে কাকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে দেয়, কেউ কেউ ভাতও দেয়। অনেক সময় কাক কোথা থেকে যেন উড়ে এসে সে সব খেয়ে যায়। তার পরদিন হ'ল 'কুকুর-তেওহার'। সেদিন কুকুরকে স্নান করিয়ে, তার গলায় মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিয়ে পরম সমাদরে তাকে ভূরি-ভোজন করানো হয়। এই উৎসবের কয়েক দিন পর্যন্ত পথে ঘাটে মালা-চন্দন পরানো কুকুর চোখে পড়ে। যমরাজের বাহন বলে এদের সন্তুষ্ট করবার জন্তেই নাকি এই কাক-কুকুর পূজা। গরু বা বলদ তেওহার হয় এর পর দিন এবং তার পর দিন 'গাই তেওহার'। এই দিনটি ভাইটিকার আগের দিন। গরুর পা ধুয়ে, গলায় মালা দিয়ে কপালে সিঁদুরের টিকা পরিয়ে দেওয়া হয়—এর পর খাওয়াবার পালা। এই দিনই নেপালীদের লক্ষ্মীপূজা। ঘরদোর বেশ করে সাজানো

হয়েছে—প্রত্যেক দরজায় ঝুলছে ফুলের ঝালর—গাঁদা ফুলের মালা। ঘরের ভেতর ষোড়শোপচারে (?) লক্ষ্মীপূজা; চতুর্ভুজা লক্ষ্মীদেবীর পটে ফুল ও মালা দিয়ে সাজানো—ধূপ ধুনোয় ঘর অন্ধকার। পটের সামনে পেতলের ছোট বড় আধার—চর্বির তেলে তাতে জ্বলছে প্রদীপ। দু'পাশে ছোট ছোট দুটো কলাগাছ—কলাবৌয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে—আর সামনে ফলমূলের নৈবেদ্য। আয়োজন প্রায় আমাদের লক্ষ্মীপুজার মতই। এর পর দিন 'ভাইফোঁটা', অনেক সময় লক্ষ্মীপূজার দিনই 'ভাইটিকা' হয়—এদের তিথি কিন্তু দ্বিতীয়া-ই।

ফোঁটা দেবার কোন নির্দিষ্ট সময় এদের নেই, সারাদিনই শুভক্ষণ। বোন বা দিদির বাড়ীতে গিয়ে এরা ফোঁটা নিয়ে আসে। নেপালীদের মধ্যে পুরুষদের সবাইকেই ফোঁটা নিতে হয়, নিজের বোন না থাকলেও সম্পর্কীয়া বোনদের বাড়ী গিয়ে ফোঁটা নিতে যায়। বোনেরাও ভাই না থাকলে ভাই-সম্পর্ক পাতিয়ে ফোঁটা দেয়, এই সম্বন্ধ পরে প্রকৃত ভাইবোনের সম্বন্ধে স্থায়ী হয়। ফোঁটা দেবার পদ্ধতি অনেকটা আমাদেরই মত। ফোঁটা নেবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ভাই উপোস করে থাকে—তার পর নিজের জাতীয় পোশাক পরে ফোঁটা নেবার জন্য তৈরি হয়। ঘরের ভিতর সযত্নে আসন পেতে দেয় বোনটি, তার পর নিয়ে আসে থালায় সাজিয়ে ফোঁটা দেবার সরঞ্জাম—ফুল, মালা, সিঁদুর, চন্দন ও খাবার। ভাই বসে সেই আসনে, বোন তখন জল দিয়ে তার চারধারে তিন বার গণ্ডী এঁকে দিয়ে ঘরের চৌকাঠের উপরে রাখে একটি আস্ত আখরোট—সেটা এক আঘাতে ভেঙে ঘরের চালের উপর দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই আখরোটটি হ'ল 'ইয়মরাজে'র বা যমরাজের মাথা। যমরাজই মানুষের মৃত্যুর কারণ, কাজেই তার মাথা ফাটালে, ভাইয়ের আর মৃত্যুর ভয় নেই। বোন চায় ভাইয়ের পরমায়ু বাড়াতে, তাই এই ভাইফোঁটার আয়োজন। ঘরের চৌকাঠের উপর হিরণ্যকশিপু নিহত হয়েছিল, এটাই নিরাপদ জায়গা—যমরাজের তাই এটা বধ্যভূমি। এই আখরোট ভাঙার ব্যাপারের সঙ্গে যে কাহিনীই জড়িত থাক না, এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মানুষের চারিধারের অমঙ্গলকারী দৈত্যদানবদের বিনষ্ট করার জন্যই এই প্রথা। এর পর ধূপধুনোর গন্ধের ভিতর ভাইয়ের গলায় বোন পরিয়ে দেয় পুষ্পমাল্য; অনেক রকমের রং-মেশানো চন্দন, রক্তচন্দন, থালা থেকে তুলে নিয়ে তার টিপ পরিয়ে দেয় ভাইয়ের ললাটে। পিটুলীর তিলক এঁকে দেয় এর পর—সবশেষে সিঁদুরের ফোঁটা দেয় কাঠি দিয়ে। ফোঁটা দেওয়ার সময় বোন কোন মন্ত্র উচ্চারণ করে না। কিন্তু যমরাজের সেই মাথা ভাঙার ব্যাপার দেখে, তাদের ভাইটিকার সঙ্গে আমাদের ভাইফোঁটার একটা সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যায়। আমাদের বোনেরা ফোঁটা দেওয়ার সময় বলে থাকে:

"আকাশেতে দুন্দুভি বাজে
দ্বিতীয়াতে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিতে সাজে।
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
যমুনা দেন যমকে ফোঁটা
আমি দেই আমার ভাইকে ফোঁটা।
চন্দ্রসূর্য যতকাল
ভাইয়ের আয়ু ততকাল।"

চালের পিটুলীগোলা দিয়া বোন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিতেছে

যমের হাত থেকে বাঁচবার প্রয়াস বাঙালী, নেপালী উভয়েরই। ফোঁটা দেবার পর খাওয়ানো হয় ভাইকে। সন্দেশ, পেয়ারা, কমলালেবু ইত্যাদির সঙ্গে দেওয়া হয় 'শেলরুটি'। খাবারের মধ্যে এই শেলরুটি থাকতেই হবে—এটি শুভফলদায়ক। প্রকাণ্ড গোলাকার জিলিপীর মত দেখতে এই শেলরুটি। 'ওকলি' অর্থাৎ কাঠের তৈরি এক প্রকার হামানদিস্তায় আতপ চাল গুঁড়ো করে, সেই চাল জলে ভিজিয়ে তার পর তাতে কলা চটকে দেয়; গুড় বা চিনি মিশিয়ে তেল কিংবা ঘিয়ে জিলিপীর মত করে ভাজে। এই হ'ল শেলরুটি, নেপালীদের অতি প্রিয় উপাদেয় খাদ্য। ভাইয়ের পাতে ভুক্তাবশিষ্ট যা পড়ে

থাকে সে সব কেউ খায় না। খাওয়ার পর বোন ভাইকে তামার পয়সা দেয়—ভাই সেই পয়সা দিয়ে জুয়া খেলে। নেপালে এই উপলক্ষে তিন দিন জুয়াখেলায় কোন বাধা-নিষেধ থাকে না। ফোঁটা নেবার পর ভাইও বোন বা দিদিকে আশীর্বাদ অথবা প্রণাম করে। আশীর্বাদী হিসাবে ভাই টাকা ও সাড়ী দিয়ে থাকে বোনেদের।

এই 'ভাইটিকা'র একটি প্রধান অঙ্গ হ'ল 'দেওসি' অর্থাৎ গান গেয়ে ভিক্ষা করা। ভাইটিকার আগের দিন এবং ভাইটিকার দিনও 'দেওসি' হয়। এই কথাটার অর্থ হ'ল 'দেও শ্রী'—আমাকে শ্রী দাও। গান গেয়ে যায় ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে, অনেক সময় বুড়োরাও বাড়ী বাড়ী যায়—গান গেয়ে ভিক্ষা করে। এই পয়সায় এরা করে পিকনিক, রাত জেগে করে মাতামাতি। সেদিন ভিক্ষা করতে কারও লজ্জা নেই। ছড়া কেটে তারা বলে,"অন্ধকার কার্ত্তিক মাসের রজনীকে আলোয় উজ্জ্বল করে তুলতে হবে। তারা নিজের গরজে আসে নি—বলিরাজার হুকুমে তারা এসেছে উৎসবের বার্তা নিয়ে, ভিক্ষা সংগ্রহ করতে।"

"কালো কার্ত্তিক জানাউনি পরছ
হামি আফই আকো হই না
বলিরাজ কো হুকুম হোন্দা
আয় কো হামি।
সঁধাই আওনি ধোবি তেলী
আজো দেওসি ভাই।"

"অন্যান্য দিন ধোপা, তেলী আসে, আজ 'দেওসিভাই' এসেছে—তোমার দুয়ারে ভিক্ষা নেবার জন্য, বিমুখ করলে চলবে না।" বামন অবতারে বলিরাজার কাছ থেকে বামনদেব দানগ্রহণ করেছিলেন—এই দানগ্রহণে লজ্জা নেই। দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে আসে ছেলেমেয়ের দল—গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে ছড়া কেটে গান শুরু করে দেয়। একজনই প্রধান গায়ক—ছড়াগুলো সুর করে বলে যায়, আর প্রত্যেক লাইনের শেষে দলের বাকি সবাই দোহারের মত সুর করে বলে উঠে "দেওসুরে"। মুখে মুখে রচনা করে বলে যায় কবিগানের মত ছড়া—যতক্ষণ গৃহস্থ কিছু দান না করেন, অবিরাম ধ্বনিত হতে থাকে 'দেওসুরে' 'দেওসুরে':

ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি দেওসুরে
কে কো ঝিলিমিলি ”
রাম কো ঝিলিমিলি ”
রাম রাম ঝিলিমিলি ”
ভন ভন ভাই হো ”
ভন ভাই ভনিকানা ”
তিহরো বরমা বর্ষ দিন কো
চারা জন্দা।
হাস্নু ভানি, খেলনু ভানি
আয় কো হামি। দেওসুরে।

অর্থাৎ,

ঝলমল ঝলমল (আজি উৎসব রে)
কিসের ঝলমল
রামের ঝলমল
রাম রাম ঝলমল
বল বল ভাইরে
বলনারে ভাই সব।
তোমার ঘরে সবে
বছরের দিনটিতে
এসেছি সবে আজ
হাসতে খেলতে। ইত্যাদি

রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণের মৃত্যুর পর ঘরে ঘরে আনন্দ, সেই আনন্দের বার্তা বহন করে লোকেরা প্রতি গৃহস্থের ঘরে গান গাইতে গাইতে আসে। গৃহবাসীও সেই আনন্দে যোগ দিয়ে তাদের পুরস্কার বিতরণ করে—পয়সা, চাল, খাবার। 'দেওসির' বিচিত্র গানের ভিতর দিয়ে সেই সুখবর, উৎসব-আনন্দের বার্তাই নেপালীরা প্রচার করে:

"নওযুগ কো তেওহার
        মিলিজুলি খেল এ দেওসি ভাই
দেওসি কো রংমা রাগমা শুনো
হর্ষাশ্রু কো ধারা বহাই।
        মিলিজুলি···ইত্যাদি
বরষা দিন কো ইও ঠুলো চার
সঁধাই কহিলে আওনি ছই না।
আনন্দ কে বিভোর মা মস্তভই
খেলৌঁ ইয়ো দেওসিভাই।
        মিলিজুলি···
আপস কো বয়ের ভ াউ মিটাই
প্রেমকো মালা মা গাঁথিউন
আয়ো দেওসিকে সন্দেশ শুনাউনা
নওযুগ কো তেওহার।
        মিলিজুলি—

এই অপূর্ব গানের সুর ও ভাব বজায় রেখে অনুবাদ করা সম্ভব নয়। গানটির ভাবার্থ হ'ল:

নতুন যুগের এই উৎসবে
সবে মিলে এসো খেলি
দেওসির রঙে রাঙাই সবারে
চক্ষু-অশ্রু ধারে।
        সবে মিলে এসো খেলি।
বছরেতে আজ শুধু একদিন
মহা আনন্দে সবে হই লীন

উৎসব দুয়ার-ধারে
দেওসিয়া সব এস খেলা ভরে
সবে মিলে এসো খেলি।
এস তবে আজি ভুলে যাই সব
বাদ-বিসম্বাদ যত কলরব
উৎসব-গান শোনাতে এসেছি
গাঁথি লয়ে প্রেমহার
নূতন যুগের সমাচার।
সবে মিলে এসো খেলি।

দেওসির দল এক গান থেকে অন্য গানে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চলে যায়। তারা বলে:

"রাতো মাঠো চিপলো বাটো
লড়দাই পড়দাই আয়োকো হামি।
বরশ দিন কো চারবার
জানাউনো আয়োকো হামি।"

—"এই রাত্রিতে মাঠ ভেঙে—পিছল পথ অতিক্রম করে মরতে পড়তে আমি এসেছি, বছরের এই দিনটিতে আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের কথা শোনাতে—অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে তুলতে।" গৃহস্থেরা এদের মিষ্টি, পয়সা, চাল ইত্যাদি বিতরণ করে সন্তুষ্ট করে। তখন এরা যাবার আগে গৃহস্থকে আশীর্বাদ করে যায়:

"দিছু আশিস হামি সব মিলি
এসৈ ঘর কো জ্বাহান লাই।
মঙ্গল রাখুন নারায়ণ লে—
এহি হামরো মন-কামনা।
দিছু আশিস হামি সব মিলি
সুখকো সাম্রাজ্য লে পূর্ণ হোস্
ইষ্ট দেওতা খুশী রহুন
লছমী মাতা লে বাস গরুন
এহি হামরো শুভ কামনা।"

"হে গৃহস্থ, আমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ করি— এই গৃহের সকলকে নারায়ণ মঙ্গলে রাখুন, শান্তিতে রাখুন—এই আমাদের মনের কামনা। সুখে সাম্রাজ্যে তোমার ঘর ভরে উঠুক, তোমার ইষ্ট-দেবতা খুশী হউন, লক্ষ্মী তোমার ঘরে অধিষ্ঠান করুন, এই আমার শুভকামনা।"

বহু রকমের বিচিত্র সুরে এই দেওসী গীত বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরম উৎসাহে ছেলেমেয়ের দল গেয়ে থাকে। এই দেওসী উপলক্ষে অনেক ভাল কাজের জন্য তারা চাঁদা তোলে। আবার দুষ্ট লোক, বড়লোক, কৃপণ ব্যক্তিকে তারা গানের ভিতর দিয়ে গালিও দেয় অনেক সময়। মুখে মুখে তারা এই সব ছড়া তৈরি করে আর সঙ্গে সঙ্গে দোহাররা হেঁকে উঠে সুরু করে 'দেওসুরে'। ভাইফোঁটার দিন সমস্ত রাত জেগে ডম্ফু নাচ করে তামাঙরা—ঢাক, ঢোল, করতাল বাজিয়ে; এই নাচ অনেকটা বৌদ্ধরীতি-ঘেঁষা। ভাইটিকা উৎসবের সর্বপ্রধান অঙ্গ এই দেওসী গীত ও ডম্ফু-নৃত্য।

'কুকুর—তেওহার'-এ একটি কুকুরের গলায় মালা পরাইয়া তাহাকে ভূরিভোজন করাইবার জন্য বসানো হইয়াছে—চারিদিকে উৎসবরত ছেলের দল

'ভাইটিকা' উৎসবের সঙ্গে নেপালীরা জড়িয়ে ফেলে পূজার উৎসব—রাম রাবণের যুদ্ধশেষের জয়োচ্ছ্বাস। শীত ঋতুর প্রারম্ভে, উত্তর-পূর্ব প্রান্তের রৌদ্রোজ্জ্বল পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট শহর বস্তীগুলো নেপালীদের এই উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে।

ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

জনসাধারণের সঞ্চয়ের সাহায্যের জন্য সেভিংস ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। প্রথমে কিন্তু সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ ডাকঘর করিত না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে, ১৮৩৪-এ মাদ্রাজে, এবং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে যখন গবর্ণমেণ্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হয় তখন উহার কাজ চালাইত সরকারী ট্রেজারি। ১৮৬৩ এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ পড়িল ঐ তিনটি শহরের "প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে"র ঘাড়ে। এই তিনটি ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটিই ইচ্ছানুযায়ী নিয়মাদি তৈয়ারি করিল। সর্ব্বত্র এক নিয়ম গড়িয়া উঠিল না। তখন সেভিংস ব্যাঙ্কে ৩০০০৲ টাকার বেশী জমা দেওয়া চলিত না। সুদের হার ছিল শতকরা ৪৲ টাকা। প্রাদেশিক শহরে ধনীরাই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। কাজেই তিন হাজার টাকা জমা দিতে আর কয়দিন লাগে। শেষে নিয়ম হইয়াছিল যে, বৎসরে পাঁচ শত টাকার বেশী জমা দেওয়া চলিবে না।

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহর বাদে অন্যান্য জেলা-শহরেও গবর্ণমেণ্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছিল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা সত্ত্বেও সমস্ত ভারতবর্ষে সেভিংস ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯৭টির বেশী হয় নাই।

যে উদ্দেশ্যে সেভিংস ব্যাঙ্কের সৃষ্টি, অর্থাৎ জনসাধারণকে সঞ্চয়ে সাহায্য করা—ইহাতে সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইল না। হইবেই বা কি করিয়া? দেশবাসীর কয়জনই বা বাস করে জেলা কিংবা বড় শহরে? পল্লীপ্রাণ ভারতবর্ষে শতকরা ১৫ জনেরও কম বাস করে ছোট-বড় শহরে। সুতরাং পল্লীবাসী উপকৃত না হইলে সেভিংস ব্যাঙ্ক ভারতের জনগণের অতি অল্পসংখ্যক নরনারীকেই সাহায্য করিতে পারে। আমাদের দেশে শহর এবং পল্লীরও অনেক স্থলে তখন ডাকঘর ছিল। সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজটা যদি ডাকঘরে দেওয়া যায় তাহা হইলে জনগণের মধ্যে আরও বেশী লোকের সাহায্য হইতে পারে—গবর্ণমেণ্টেরও সেই ধারণা হইল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ভারতের ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ আসিয়া চাপিল। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরের ডাকঘরে ইহা খোলা হইল। প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের এবং জেলা-শহরের সেভিংস ব্যাঙ্ক যেমন ছিল তেমনি রহিল।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে জেলা শহরের সেভিংস ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব ও তহবিল ডাকঘরে হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে যে গবর্ণমেণ্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক ছিল তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ডাকঘরে যখন প্রথম সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হইল তখন চারি আনার কম জমা দেওয়া চলিত না। সুদের হার ছিল প্রতি পাঁচ টাকায় প্রতি মাসে তিন পাই।

ডাকঘরের হাতে সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ আসিবার পর হইতেই জনগণের সেবার কার্য্য প্রকৃতপক্ষে সুরু হইল। প্রথম বৎসরের শেষেই দেখা গেল, সেভিংস ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইয়াছে ৪,২৪৩টি, আমানতকারীর সংখ্যা ৩৯,১২১ জন, এবং সালকাবারে আমানত ছিল ২৭,৯৬,৭৯৬৲ টাকা। পঞ্চাশ বৎসর পরে (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে) আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ২৪,০২,০০০ জন, এবং সালকাবারে আমানতী টাকা জমা ছিল ৩৮,২০,০০,০০০ টাকা।

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে। সেই বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ৩৯,৭৩,০০০ জন; এবং সালকাবারে তহবিল মজুদ ছিল ১৪২,৩৫,০০,০০০ টাকা। ইহা ইংরেজ শাসনের ফল। স্বাধীন ভারতে এই কয় বৎসরেই (১৯৫২ পর্য্যন্ত) আমানতকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৪৪,৪৫,০০০ জন; এবং বৎসরশেষে আমানতী টাকাও বাড়িয়াছে। উহার পরিমাণ হইয়াছে ১৯৯,৮১,০০,০০০ টাকা। প্রতি আমানতকারীর হিসাবে কত টাকা ছিল তাহা কষিয়া দেখিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইংরেজ আমলের চেয়ে স্বাধীন ভারতে অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমানতকারীর মাথাপিছু ছিল গড়ে ৩৫৮'৪ টাকা। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে উহা হইয়াছে ৪৪৯'৪ টাকা। স্বাধীন ভারতের পক্ষে উহা প্রশংসনীয়।

রাষ্ট্র হিসাবে যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখা যাইবে, বর্ত্তমান সময়ে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব সবচেয়ে বেশী খোলা হইয়াছে মাদ্রাজে (৮,৬৪,৪৫৬), তাহার পরেই উত্তর প্রদেশে (৭,৬৫,৫৮১)। উত্তর প্রদেশের নীচেই বোম্বাইয়ের স্থান (৭,৫৬,৫৭৩)। পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে (৬,৯৫,৪৬৯)। পঞ্চম স্থান পঞ্জাবের (৪,৮০,৪৬৮)। তাহার পরেই বিহারের স্থান (২,৮২,৫৮১)। বিহারের নীচেই পর পর মধ্যপ্রদেশ (২,৭৪,৭০১), দিল্লী (১,৪৩,৯৭৮), আসাম (১,০৩,৬১৬), এবং উড়িষ্যা (৭৮,৪০৩)।

কিন্তু ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রতি আমানতকারীর মাথাপিছু গড়ে কত টাকা ছিল সেই হিসাব রাষ্ট্রওয়ারি করিলে দাঁড়ায় নিম্নরূপ :

পঞ্জাব	৬১৮·৭ টাকা
দিল্লী	৫৮৯·৪ „
বিহার	৫২৪·৮ „
পশ্চিমবঙ্গ	৫১০·৭ „
বোম্বাই	৪৯৮·৪ „
আসাম	৪৮৬·৮ „
উত্তর প্রদেশ	৪৫৪·০ „
মধ্যপ্রদেশ	৪১৫·৮ „
উড়িষ্যা	৩০৪·৫ „
মাদ্রাজ	২১৯·৪ „

ইহা ছাড়া যুদ্ধের সময় এক বিশেষ সেভিংস ব্যাঙ্ক খুলিতে দেওয়া হইয়াছিল। উহার নাম ডিফেন্স সেভিংস ব্যাঙ্ক। ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে উহাতেও মোট আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ১৫,০৯,৮৫৫ জন। সালকাবারে আমানতী টাকা ছিল ১·২৬ কোটি টাকা। ১৯৪৬-এর ১লা জুলাই তারিখ হইতে ডিফেন্স সেভিংস ব্যাঙ্কের নূতন হিসাব খুলিতে দেওয়া হয় না; এবং ১৯৪৭-এর ১লা এপ্রিল হইতে ডাকঘরের হাতে এইরূপ হিসাবে যে আমানতী টাকা রহিয়াছে তজ্জন্য সুদও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর আমানতকারী জুটিয়াছে যাহাদের উদ্দেশ্য সঞ্চয় নহে; তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। যে সকল ব্যাপারী পল্লী-অঞ্চলে মাল কিনিতে যায় তাহাদিগকে নগদ টাকা ট্যাকে লইয়া হোটেলে বা আড়তে দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটাইতে হয়। পল্লীতে ব্যাঙ্কের সুবিধা নাই। বাংলার গঞ্জে বা বন্দরে আছে আড়ত। টাকা গচ্ছিত রাখিতে হয় আড়তদারদের নিকট শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। আমাদের দেশে আড়তকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোন আইন হয় নাই। কাজেই নগদ টাকা সঙ্গে লইয়া পল্লী অঞ্চলে গিয়া মাল খরিদ করা ঝুঁকির কাজ। এই জন্য কেহ কেহ ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়াছে। ডাকঘরের নিয়মে আছে যে, একজন তাহার নিজের নামে একটি হিসাব এবং নাবালক পোষ্য বা আত্মীয়ের প্রত্যেকের নামে একটি করিয়া হিসাব খুলিতে পারে। কল্পিত নাবালকের নামে এক একটি হিসাব এক এক গঞ্জে বা বন্দরে অথবা বিভিন্ন পল্লীতে তাহারা খুলিয়া থাকে, এবং তথায় প্রয়োজনমত ঐ সকল হিসাব হইতে টাকা তুলিয়া ব্যবসায়ের কাজ চালায়। দূর হইতে নগদ টাকা লইয়া আর যাইতে হয় না। এইরূপ অবস্থা অন্যান্য রাষ্ট্রেও আছে। এই শ্রেণীর আমানতকারী হিসাব খুলিয়া থাকে ডজনে ডজনে।

দেখা গিয়াছে, কোনও কোনও দালাল বিভিন্ন স্থানের ডাকঘরে ৮৩টি পর্যন্ত সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব খুলিয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার কারবার চালাইয়াছে। এই শ্রেণীর আমানতকারীদিগকেও সাহায্য করিবার জন্য ইংলণ্ডে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়ম পরিবর্তিত হইয়াছে। লণ্ডন ডাকঘরে টাকা তুলিবার দরখাস্ত দিয়া যে-কোনও পল্লী অঞ্চলের ডাকঘরে টাকা পাওয়া যায়। কাজেই মিথ্যার আশ্রয় লইবার কোন প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশেও নানা কারণে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যুগোপযোগী পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে। ভারত আর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থায় পড়িয়া নাই। ব্যাবিংটন্ স্মিথ কমিটিও বহু বৎসর পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, শাসনকার্যের অসুবিধা সত্ত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্টের উচিত পরীক্ষা করিয়া দেখা—ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা জমা দেওয়া ও তুলিবার নিয়মের পরিবর্তন কতদূর সম্ভবপর; সঙ্গে সঙ্গে ডাকঘরের ব্যাঙ্কের সংখ্যাও বাড়ানো যাইতে পারে কিনা তাহাও দেখা দরকার। কিন্তু তখনকার গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কিছু করেন নাই। স্বাধীন ভারতের সরকারের এই দিকে নজর পড়িয়াছে। তাঁহারা ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের বিধিনিষেধের পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিতে গিয়া বিশেষজ্ঞগণের সম্প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের উপর। উহাকে ভিত্তি করিয়া পল্লী-ব্যাঙ্কের প্রসার সম্ভব কিনা, সেই চিন্তাও জাগিয়াছে।

প্রশ্ন এই, ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাদি কি ভাবে পরিবর্তন করিলে সর্বশ্রেণীর দেশবাসীর সুবিধা হয়, এবং পল্লীবাসীদিগকেও ব্যাঙ্কের আওতায় আনা যায়? মোটামুটি নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে :

১। ডাক বিভাগের হাতে সেভিংস ব্যাঙ্কের দরুন যে পরিমাণ টাকা থাকে তাহার কতক অংশ স্বল্পস্থায়ী ঋণদানের কাজে খাটানো যায় কিনা সেই বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত। এই অর্থ সুবিবেচনার সহিত খাটাইয়া ডাক বিভাগ যথেষ্ট সুদ পাইতে পারে। ইংলণ্ডে তাহা হয়। ইংরেজ আমলে এই অর্থ সাধারণ রাজস্ব তহবিলের অংশ বলিয়া দেখানো হইত; এবং কিছু পরিমাণ টাকা কাউন্সিল বিলের কল্যাণে ব্যয় হইত।*

* বোদী এবং ওয়াদিয়া প্রণীত *Money Market in India*, পৃঃ ৩৫৫

২। সপ্তাহে একাধিক বার টাকা তুলিবার অধিকার দেওয়া উচিত।

৩। চেকের সাহায্যে টাকা জমা বা তুলিবার ক্ষমতা আমানতকারীকে দেওয়া দরকার। ইউরোপ ও আমেরিকার ডাকঘরে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। ইংলণ্ডে চেক কোনও বিশেষ ব্যাঙ্কের উপর ক্রস্‌ড্‌ না হইলে ডাকঘরে গৃহীত হয়। "একাউণ্ট পেয়ী" চেকও ডাকঘরে গৃহীত হয় যদি উহা আমানতকারীর নিজের নামে কাটা হইয়া থাকে।

৪। ভারতের যে-কোনও ডাকঘরে অপরের নামীয় সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার অধিকার প্রদান প্রয়োজনীয়।

৫। বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে যে ডাকঘরে হিসাব খোলা আছে, শুধু সেই ডাকঘরেই টাকা তুলিতে পারা যায়। এই নিয়মও সংশোধিত হওয়া উচিত। এক প্রদেশের অভ্যন্তরে, অন্ততঃ এক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীন সকল শাখা-ব্যাঙ্কে টাকা তুলিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে একজন আমানতকারী যে-কোনও ডাকঘরে তাহার পাস বহি দেখাইয়া দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত অর্থ তুলিতে পারে। যে ডাকঘর হইতে টাকা তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তথায় যদি আমানতকারী উপস্থিত হইতে না পারে, তাহা হইলে ওয়ারেণ্ট কণ্ট্রোলারের নিকট ফেরত পাঠাইয়া অপর ডাকঘরেও টাকা তুলিবার ব্যবস্থা করা যায়। ভারতে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে ব্যবসায়ীর সুবিধা হইবে। মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বেআইনী সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলাও বন্ধ হইবে।

৬। পাস বহিতে জমা ও টাকা তুলিবার হিসাব স্থানীয় ভাষায় হওয়া উচিত। এই বিষয়ে এখনও আইন আছে; কিন্তু উহা প্রতিপালিত হয় না।

৭। "হোম সেফ" প্রচলিত হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের ডাকঘরে এই ব্যবস্থা আছে। ভারতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কোনও কোনও ব্যাঙ্কে ইহা প্রচলিত হইয়াছে।

৮। বেশী টাকার ইণ্ডিয়ান পোষ্টাল অর্ডার প্রচলিত হইলে উহা দ্বারা হুণ্ডির বা চেকের কাজ চলিবে।

লোকের সহোদর ভাইয়ের উপর যে বিশ্বাস তাহার চেয়ে অধিক বিশ্বাস ডাকঘরের উপর। সুতরাং জমিন আছে ঠিক। এখন ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মগুলির যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন করিলেই পল্লী-ব্যাঙ্কের বনিয়াদ স্থাপন করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সঙ্গে ডাকঘরের আভ্যন্তরীণ কার্য্যের প্রথারও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

অনাদি প্রিয়া

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সে মহাসাগরে যুগ যুগ ধরে মিলেছে সকল ধারা;
উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ঋষিও তার প্রেমে মাতোয়ারা।
সেথা দিন নাই, সেথা রাত্তি নাই, আলো নাই, কালো নাই;
সেথা নর নাই, সেথা নারী নাই;—একাকার সব ঠাঁই।
সেথা একাকার সারা নিখিলের সূর্য্য-চন্দ্র-তারা;
সে মহাসাগরে যুগ যুগ ধরে মিলেছে সকল ধারা।

সেথা নিরালায় নিখিল প্রেয়সী প্রেমের সাগর-তীরে
অনাদি যুগের আপনার গান গায়—শোনে ফিরে ফিরে।
'রুমী'র বীণায় তারই সুর-ছায়া, 'হাফেজে'রও তারে তাই;
সকল প্রেমের সুরু যে সেখানে, সারাও যে সেই ঠাঁই।
ঘুরি দেশে দেশে নদ-নদী এসে মেশে সে সিন্ধু-নীরে;
ভরে, খালি করে, গাগরী প্রেয়সী সে মহাসাগর-তীরে।

অনুপমা সেই প্রেয়সীর প্রেম—সাগরের কল-কথা
প্রকাশ-তিয়াসা যুগে যুগে কি যে অনুভূতি—আকুলতা।
'চণ্ডীদাসে'র পদাবলী আর কবি 'হায়েনে'র গান,
রহস্যময়ী সেই প্রেয়সীরই অনুপম অবদান।
অনুভূতি-ভরা বিপুল সাগরে আকুলতা—নীরবতা
একাকার করি, বাজায় বুঝি সে নিজেই নিজের কথা।

তার দেহ-রূপ সূর্য্য-তারায় ঠিকরিয়া বুঝি পড়ে;
তার গানে গানে নদী-ধারা ধায়; বায়ু বুঝি লীলা করে।
অধরা থেকেও সে কি বার বার ধরা দিতে ভালবাসে।
সাগর হইতে নদীর আকারে ছুটে যায়—ছুটে আসে।
সে মহাসাগরে ফেনা আর ঢেউ, নদ, নদী একাকার;—
সে চির-প্রিয়ার পরশে বাজিছে অনাদি-বীণার তার।

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীঅবনীদেব মুখোপাধ্যায়

—আমাকে আর কাজ দেখাস না বীণি, তোদের বয়সে আমি জল চিবিয়ে খেয়েছি—ষোড়শী বলল।

বীণা মৃদু হাসে, কিছু বলে না—বলতে সাহস করে না।

দাঁতের তাগিদে জলের মত তরল পদার্থকেও নাকি চিবিয়ে খেতে ইচ্ছা করে, এমন একটা বয়স মানুষের জীবনে আসে। ষোড়শীরও সে বয়স এসেছিল। তখন সে বাপের বাড়ীতে বাস করে। মা, বাবা, ভাই, বোন, ভাইদের ছেলেমেয়ে, ঝি-চাকর নিয়ে সংসার। বেশ বড়ই। সেবারের মহামারীতে সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে হঠাৎ এত বড় সংসার একেবারে ছোট হয়ে গেল।

অত্যন্ত একা পড়ে গেল ষোড়শী. কাঁদে, হা-হুতাশ করে, বাপের ভিটা আগলায়। বাবার দেওয়া সম্পত্তির আয় থেকে সংসার চলে।

বামুন-ঘরের বালবিধবা। ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল। ঠাকুরমার উপকথার মত সে একটা গল্প। পরে সে শুনেছে।

—কি লা, চুপ করে রইলি যে? ষোড়শী জিজ্ঞাসা করে।

—আজ আর অবসর হবে না পিসি, কাল থেকে আবার নিশ্চয়ই যাব—অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বীণা বলে।

ষোড়শী তবুও ছাড়ে না,—অবসর হবে না কেন? দুপুরের কাজগুলো একটু সকাল সকাল সেরে নিতে পারিস তো। কি এত কাজ তোর শুনি?

—কাল থেকে নিশ্চয়ই যাব পিসি, আজ আর থাক—তুমি কিছু মনে কর না—বীণা একই কথা বলে, বিনয় দেখায়।

—হুঁ, একটু লেখাপড়া জানলে কি তোকে এত তেল মাখাই? নিজে পড়তে জানি না তাই। একা একা দুপুরটা যেন কাটতেই চায় না।

বীণা কোন কথা বলে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

বীণা আজ আর ষোড়শী-ঠাকরুণের বাড়ী রামায়ণ পড়তে যেতে রাজী হ'ল না। অসন্তুষ্ট ষোড়শী নিজের মনেই গজগজ করে, বাড়ীর দিকে চলতে থাকে।

পথে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হ'ল।

—এদিকে কোথায় যাবি রে ক্যাবলা?

ক্যাবলা দাঁড়ায়,—ক্যানে বাউরীপাড়া!—সভয়ে উত্তর দেয়।

ষোড়শী ভেংচায়, হাসে—ক্যানে বাউরীপাড়া! আমি কি তোকে মারতে যাচ্ছি নাকি, অত ভয়ে ভয়ে বলছিস।

ক্যাবলা কোন কথা বলে না, ষোড়শীর মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল করে তাকায়।

ষোড়শী নরম করে বলল, বাউরীপাড়া কি করতে যাচ্ছিস?

—দাইমাকে ডাকতে।—ক্যাবলার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়মিশ্রিত ভয়ের আবেজ তখনও কাটে না।

—অঃ, তাই বল। মিনি দুধ্যু খাচ্ছে বুঝি?

—হুঁ।

—তবে যা শীগগির চলে যা। ছুটে যাবি, বুঝলি? দেব-গর্জ্জন, কখন কি হয় বলা যায় না।

ষোড়শীর কথার অবাধ্য হতে সাহস করে না ক্যাবলা, প্রায় ছুটেই চলতে থাকে। মাঝে মাঝে এক একবার থামে, পিছু ফিরে ষোড়শীর মুখের দিকে তাকায়।

ষোড়শী ঘাড় নাড়ে—হাঁ, যা চলে যা, শীগগির যা।—ক্যাবলা চলে গেল।

নিজের মনেই বলল ষোড়শী—নাঃ, আমাকেও ফিরতে হবে, খবরটা নিয়েই যাই।

মিনিদের বাড়ীর দিকে চলে ষোড়শী।

কিছুক্ষণ পর মিনির তল্লাস নিয়ে বাড়ী ফেরে। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল—নাঃ, এ পাড়ায় এলাম যখন, গোবরার বেটার খবরটাও একবারে নিয়ে যাই।

আকাশের দিকে তাকায়, বেলা অনেকখানি হয়ে গেছে। হোকগে, ঘরেই কি এমন কাজ?

ষোড়শী গোবর্দ্ধনের বাড়ীর পথে ফিরল। পথে একজন গ্রাম-বাসীর সঙ্গে দেখা হয়।

—তোর বাবার চোখটা কেমন আছে রে তারক? ষোড়শী জিজ্ঞাসা করে।

—একটু ভালই আছে পিসি!

—বেশ দেখতে পাচ্ছে তো?

—একটু একটু পাচ্ছে।

—একটু একটু কেন, ছানি সেরে গেলে খুব ভাল দেখতে পেতে হবে।

—খুব ভাল দেখতে পাচ্ছে না তো?

—পাবে কি করে? বললে কি তোরা কথা শুনিস? তখন বললাম সদরের হাসপাতালে গিয়ে কাটিয়ে আয়—ওসব হাতুড়ে-বদ্দির কাজ নয়। চোখের কাজ। আমার মা বদ্দিদের কাছে চোখ ছুলিয়ে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছল।

তারক একথার কোন উত্তর দেয় না, চলতে চায়।

ষোড়শী পুনরায় বলল, হাঁ রে, তা চলাফেরা করতে পারছে তো?

—তত পারে না, ভাল দেখতে পাচ্ছে না যে!

—তা হলে ও কিছুই হয় নাই। গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে। পাকা বদমাস তোর ঐ বিধবা বোন সরলাটা। বলে কিনা হাসপাতালে গেলে জাত যাবে। নইলে তোর বাবার

হাসপাতালে যাবার মত হয়েছিল। জাত কেন যাবে, একটা 'প্রাচিত্তির' করলেই চুকে যেত। পোড়ামুখীর সঙ্গে একবার দেখা হলে হয়। ষোড়শী তারকের বিধবা বোন সরলার উদ্দেশ্যে উষ্মা প্রকাশ করে।

তারক আস্তে আস্তে গন্তব্য স্থানের দিকে পা বাড়ায়—কোন কথা বলে না।

ষোড়শীও চলতে থাকে। কিছুক্ষণ পর গোবর্দ্ধনের বাড়ী এসে গেল।

—গোবরা রইছিস! গোবরা?

উঠানেই দাঁড়িয়ে ছিল গোবর্দ্ধন। ষোড়শীকে সম্ভাষণ জানায়, কে গো, পিসি! এস ঘরের ভেতরে এস।

ষোড়শী বাড়ীর ভেতরে ঢোকে, বাড়ুজ্জেদের মিনি দুধ্যু খাচ্ছে কিনা, তাই খবর নিতে এসেছিলাম। তাই বলি গোবরার বেটা কেমন আছে একবারে দেখে যাই।

—এস পিসি, বসো। তোমার পায়ের ধুলো পায় কে।

গোবর্দ্ধন স্ত্রীকে বলল, পিসিকে বসতে একটা আসন দে গো।

—না না, আসন চাই নে, থাক, অনেক বেলা হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার দেখে যাই। কোথায় আছে সে?

—ঘরের ভেতরে।

ষোড়শী দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দেয়।

—ওমা, ছেলে যেন বিছানায় মিলিয়ে গেছে! ওর গতিক ত বেশ ভাল মনে হচ্ছে না বাপু। ওষুধ খাচ্ছে কার?

—ঘোষের ওষুধ খাচ্ছে।

—না না, ও সব হাতুড়ে-বদ্যির কম্ম নয়, হাটতলার বড় ডাক্তারকে ডেকে এনে দেখাবি কাল।

—ওর মা-ও ক'দিন থেকে ঐ কথা'ই বলছে, কিন্তু হাতে টাকা-পয়সা একটিও নাই। বড় ডাক্তার ডাকব কি দিয়ে!

ষোড়শী চুপ করে থাকে, গোবর্দ্ধনও কোন কথা বলে না।

কিছুক্ষণ পর বলল ষোড়শী, আচ্ছা কিছু টাকা না হয় আমার কাছেই আনবি। ধান ঝাড়ানো হলে দিয়ে দিস। ছেলেটা বেঘোরে মরে কেন? ছেলের কেমন সুন্দর নাদুস-নুদুস চেহারা ছিল, কেমন হয়ে গেছে!

—ছেলের জর একদিনের জন্যও ছাড়ল না—অনবরত গায়ে যেন অগ্নি বর্ষাচ্ছে।

—হ্যাঁ, দেখ, আর এক কাজ কর। একটু করে বুড়োশিবের 'চানজল' এনে দে। ও বিষম জর, দৈব না হলে শুধু ওষুধে কিছু হবে না। আমার ছোটভাইটার ছেলেবেলায় ঐ জর হয়েছিল। শেষে বুড়োশিবের 'চানজল' দিতেই ভাল হয়ে গেল।

ষোড়শী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, আহা কি সব রূপ, কি সব চেহারা! ভাইরা আমার রাজা ভাই।

ষোড়শীর চোখদুটো সজল হয়ে ওঠে।

—কি করবে পিসি, সবই অদেষ্ট—গোবর্দ্ধন সমবেদনা জানায়।

উঠানে নেমে এল ষোড়শী, তা হলে ঐ করবি। একটু করে বাবার চানজল এনে দে, আর বিকালে একবার আমার বাড়ী যাস, টাকা নিয়ে আসবি।

গোবর্দ্ধন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে—'যাবো'।…

ষোড়শী বাড়ী ফেরে। বাইরে দরজার চাবি খোলে। উঠানে পেয়ারা গাছটার নীচে কতকগুলো পেয়ারাপাতা পড়ে আছে। গাছটার দিকে তাকাল।

—ওমা গো! একগাছ পাকা পেয়ারা দেখে গেলাম, এরই মধ্যে কে পেড়ে নিলে গো? চাবি-দেওয়া ঘর।

ষোড়শী চীৎকার করে, অজ্ঞাত চোরকে উচ্চৈঃস্বরে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়।

প্রতিবেশিনীদের কেউ কেউ আসে—সমবেদনা জানায়। পাড়ার প্রৌঢ়েরা বিস্মিত হয়—ষোড়শীর মত অমিতবিক্রমার ঘরে চুরি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

বেলা দুপুর পার হয়ে গেল। ষোড়শী তবুও থামে না। এক প্রতিবেশিনী তাকে সচেতন করে দিলে, আর চেঁচিও না ঠাকরুণ, শুধু শুধু চেঁচালে আর কি ফল হবে। বেলা দুপুর গড়ালো, নাওয়া-খাওয়া কর গিয়ে।

ষোড়শী থামে, তেল মেখে পুকুরঘাটে স্নানে যায়।

পেয়ারা-চুরি উপর্যুপরি কয়েক বারই হয়ে গেছে। চোর ধরতে পারে না ষোড়শী, যথা নামে গালি দেয়। ধূর্ত্ত চোর ষোড়শীর কার্য্যসূচীর সন্ধান রাখে, ফাঁকে ফাঁকে নিজের কাজ গোছায়।

স্নান সেরে ষোড়শী বাড়ী ফিরল। কাপড় ছেড়ে তুলসীগাছে জল দেয়। বিড়ালটা ষোড়শীর পায়ের কাছে মিউ মিউ শব্দ করে, নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ায়।

—দাঁড়া থাম। না রান্না করলে কি খেতে দোব তোকে? তোরই বা দোষ কি, কত বেলা হয়ে গেল আজ রাঁধতে। একটু থাম, ভাত নামলেই তোকে দুধ ভাত দিয়ে দোব।

অবাধ্য বিড়াল তবুও থামে না, একটানা মিউ মিউ শব্দ করে।

সকালে গাই দুইয়ে রেখে গিয়েছিল ষোড়শী। একটু দুধ এনে বিড়ালটাকে খেতে দিলে। বিড়াল দুধ খায়, ষোড়শী তার পাশে বসে পিঠে হাত বুলায়।

দুধ খাওয়া হলে বিড়ালটা সামনের পায়ের থাবা দিয়ে মুখ মোছে।

ষোড়শী তাকে আঁকড়ে ধরে, আদর করে—

হুঁ হুঁ হুঁ, পুষপুষি পুষপুষি?
পুষ্পমণি পুষি
দুধ পেলেই খুশি।

বিড়ালটাকে ছেড়ে দিলে ষোড়শী—নাঃ, চল, এর পর উঠি। আঁচ দি, রান্না চড়াই।

পুষি চলে গেল। একটা ইঁদুরের গর্ত্তের কাছে ওৎ পাতে। যোড়শী উনানে আঁচ দেয়।

—পিসি আছ গো?—বাইরের দরজায় কে একজন ডাকল।

—কে গো?—যোড়শী জোরগলায় জিজ্ঞাসা করে।

—আমি গো খেঁদি, মাছ নিয়ে এসেছি।

—দিয়ে যা।

খেঁদির গামছায় কয়েকটা ছোট ছোট পুঁটলি বাঁধা। একটা খুলে যোড়শীর সামনে মাটিতে ঢেলে দিলে।

যোড়শী বলল, এক পোয়া চালের মাছ ত?

—হুঁ।

—আচ্ছা, একটু পরে এসে দামটা নিয়ে যাবি।

খেঁদি চলে গেল। ছুটে আসে পুষি—মিউ, মিউ, মিউ।

যোড়শী তাকে ধমক দেয়—কাঁচা মাছ খায় নাকি? রান্না করে দেব খাবি। আমি মাছ খাই কি? তুই-ই ত খাবি।

পুষি সেকথা শোনে না। যোড়শীর মুখের দিকে তাকায়—মিউ মিউ শব্দ করে।

অগত্যা কয়েকটা কাঁচা মাছ পুষিকে দিতে হ'ল। পুষি মাছ মুখে নিয়ে চলে যায়। যোড়শী বাকী মাছগুলো কুড়িয়ে রাখে, হাত ধোয়।...

পরের দিন দুপুরে খাওয়া সারল যোড়শী। ঘরের দাওয়ায় বসল। ছোট্ট একটা তোশক সেলাই করে।

বীণা এল—পিসি আছ নাকি?

—আয়, আমি মনে করেছিলাম বীণি আজও এল না।

—বাপ রে, তাই কি না আসি! তোমাকে কথা দিয়ে কথা না রাখলে কি রক্ষা আছে!

যোড়শী হাসে—ঐ চাটাইটা বিছিয়ে বস। আমার হয়ে গেছে, রামায়ণখানা নিয়ে আসি।

—ওটা কি সেলাই করছ পিসি?

—এটা তোশক।

—এত ছোট তোশক?—বীণা বিস্মিত হয়।

—পুষির তোশক।

—পুষি মানে ঐ বিড়ালটার?

—হাঁ, তুই আঁতকে উঠলি যে! ওর তোশক আছে, বালিশ আছে, শীতের লেপ আছে। অনেক কিছু আছে ওর। মাছের রোজ আছে—দুধভাত ত খায়ই।

বীণা হাসে—আমার ইচ্ছে করছে পিসির ঘরে আবার বিড়াল হয়ে জন্মাই।

যোড়শীও ম্লান হাসে—আর আমার কি ইচ্ছে করে জানিস, তোদের মত পাঁচটার ঘরে যদি একটা কুকুর হয়ে বাস করতে পারতাম? একা একা থাকি, মনে হয় যেন জেলখানায় আটক আছি। তোদের পাঁচ জনকে নিয়ে ভুলে আছি তাই, না হলে বুকের ভেতরটা যেন অনবরত দাউ দাউ করে জলছে।

শেষের কথাগুলো ভারী হয়ে আসে।

বীণা আর কোন কথা বলে না, চাটাই বিছিয়ে রামায়ণ পড়তে বসে।

কয়েক মাস পরের কথা। ষড়ঋতুর রঙ্গমঞ্চে বসন্ত তার নিজের ভূমিকায় অভিনয় প্রায় শেষ করে এনেছে। দুপুরের দিকটায় বেশ গরম লাগে। বীণা আজ সকাল সকাল রামায়ণ পড়া শেষ করে বাড়ী গেল। কি একটা জরুরি কাজ আছে তার। যোড়শীও উঠে দাঁড়ায়, হাই তোলে—ঘুম পাচ্ছে যেন। কিন্তু ঘুমুতে যাবার আগে একবার আমগাছটা দেখে আসতে হবে। ছোট ছোট কচি আমগুলো চোরে পেড়ে নিচ্ছে। পেয়ারা ফুরিয়েছে, এর পর তালটা পড়েছে কচি কচি আমগুলোর ওপর।—চোরকে যদি একবার কোনরকমে ধরতে পারি, একবারে যমের বাড়ী দিয়ে আসব।

যোড়শীর বাড়ীর পাশেই একটা পুকুর। পুকুরের পাড়ে আমগাছ। যোড়শী আমগাছের দিকে যায়। চোর তখন আমগাছে উঠে আম পাড়ছে। যোড়শী-ঠাকরুণের কার্য্যসূচীর ব্যতিক্রমের ফলেই চোর আজ হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল।

গাছের কাছে এসে গেল যোড়শী। চোরকে চিনতে চেষ্টা করে। চেনা দিতে চায় না চোর—গাছের পাতার আড়ালে নিজেকে লুকোয়।

যোড়শী বজ্রকণ্ঠে হাঁক দেয়—কে রে, কে গাছে উঠেছিস?

কোন উত্তর নেই।

—এখনও ফুল থেকে ফল খসে নি, ঐ কচি কচি আমগুলো পেড়ে নষ্ট করছিস কে রে, কে বটিস তুই?

যোড়শী চীৎকার করে গাছের তলায় এসে দাঁড়াল।

ওপর দিকে তাকায় যোড়শী—ও মা, সুবো! তোর এই কাজ!

সুবোধ নির্ব্বোধ বনে যায়।

অত্যন্ত রেগে উঠল যোড়শী—খালভরা, পোড়াকপালে ছেলে! নেমে আয় গাছ থেকে। ভেসে-এল টোকাখানা, জুড়ে বসল ঘাটখানা! উটে-আসা লোক, পাঁচ জনের মন জুগিয়ে থাকবে, কোথায় উল্টে চুরি! আমার ঘরে চুরি!

যোড়শী চীৎকার করে, গাল দেয়।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চোর নির্ব্বাক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে গাছের ওপরে।

যোড়শী আদেশাত্মক স্বরে বলল, নেমে আয় বলছি গাছ থেকে। তোর কিনারা করছি আজ।

যোড়শী রাগে কাঁপতে থাকে।

সুবোধ আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এল। যোড়শী গিয়ে তার বাঁ হাতখানা চেপে ধরে। আঁচলের আমগুলো মাটিতে নামাল সুবোধ।

—ওমা, কত আম পেড়েছে গো ?—আধ-কান্নার স্বরে ষোড়শী বলে।

সুবোধ কোন কথা বলে না, মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—এই এক একটা আম কত বড় হ'ত, কত মিষ্টি হ'ত পাকলে ! মুখপোড়া ছেলে, তোর মুখে পোড়াই, মুখে আগুন লাগাই, এ কি করেছিস কি ! চল তোর বাবার কাছে ধরে নিয়ে যাই। তোর বাবা যদি তোকে শায়েস্তা করতে না পারে, এই আম নিয়ে পেসিটেনের কাছে নালিশ করে আসব। জেল খাটাবো তোকে।

সুবোধ কাতর স্বরে বলল, বাবার কাছে ধরে নিয়ে যেয়ো না পিসি, বাবা তা হলে মেরে খুন করে দেবে।

—তোর মত ছেলেকে খুন করাই দরকার। তোর বাবার কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে এই আমগুলো দেখিয়ে আসব। কিছুতেই আজ আর ছাড়ছি না।

ষোড়শীর পায়ে ধরে সুবোধ, তোমার পায়ে পড়ছি পিসি, বাবার কাছে ধরে নিয়ে যেও না, আর কখনও করব নাই।

—ছাড়, পা ছাড়। আমগুলো দেখে আঁত কল্‌কল্ করছে। এটুকু-টুকু আম, এখন থেকে পেড়ে নষ্ট করা ! এভাবে পাড়লে ত পাকার সময় পর্য্যন্ত গাছে একটা আমও থাকবে না—না, এ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না, তোর বাবার কাছে আমাকে যেতেই হবে।

সুবোধ একই কথা বলে—আর কখনও করব নাই পিসি, তোমার পায়ে পড়ছি, বাবার কাছে ধরে নিয়ে যেও না।

—কিন্তু কেন তুই আমার পেছনে এত লেগেছিস ! শশা চুরি, পেয়ারা চুরি, আম চুরি—এখন বুঝছি আমার এ পর্য্যন্ত যা-কিছু চুরি হয়েছে সব তোরই কাজ।

সুবোধ এ কথার কোন প্রতিবাদ করে না, চুপ করে থাকে।

—আমার একটা ছুঁচ নিতে কেউ সাহস করে না, আর তুই আমাকে এতদিন ধরে জ্বালাচ্ছিস কিসের জন্যে ? তুই আমার কে ? কি সম্বন্ধ আছে তোর সঙ্গে ? আমি কি তোদের খাই, পরি, না তোদের ধার ধারি ?

সুবোধের বাঁ হাতটায় অত্যন্ত ব্যথা লাগে।

—আর করব নাই পিসি, আজকের মত ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ছি।

সুবোধ কেঁদে ফেলে।

সুবোধের কাতরতায় ষোড়শী কিছুটা নরম হ'ল, তার হাত ছেড়ে দিলে—তবে তাই যা আজকের মত, কিন্তু কখখনও কোন দিন যদি আমার ত্রিসীমানায় পা দাও তা হলে বুঝতে পারবে।

—আর কখনও আসব নাই পিসি।

সুবোধ বাড়ীর দিকে চলতে থাকে।

—হতভাগা ছেলের সাহস দেখ দেখি, আমার জিনিষ চুরি ! গোটা গাঁখানার লোক আমাকে ভয় করে, আর ঐ একরত্তি ছেলের কত বড় বুকের পাটা !

ষোড়শী সুবোধের পরিত্যক্ত আমগুলোর দিকে তাকায়। এতগুলো কাঁচা আম নিয়েই আর কি হবে। কে খাবে আমার ঘরে ? থালভরা ছেলেকে দিয়ে দিলেই হ'ত। ওই পেড়েছে, ওই খেত। না, তাতে ওর সাহস বেড়ে যাবে, ওকে না দেওয়াই ভালো। ফেলে দোব। পাড়ার অন্য লোককে দিয়ে দোব।

সুবোধ যেতে যেতে মাঝে মাঝে পিছু পানে তাকায়। ষোড়শী-পিসির গতিবিধি লক্ষ্য করে।

ষোড়শী সুবোধের দিকে তাকাল।

—পোড়াকপালে ছেলে আবার পিছু ফিরে চাইছে। মরণ আর কি ! ষোড়শী-ঠাকরুণের এক কথা, যখন বলেছে না, তখন সে কিছুতেই তোর বাবার কাছে আজ আর যাবে না। বাবাকে কিন্তু খুব ভয় করে। অমন না হলে বাপ। বাবা খুব মানুষ ভাল। আহা, উঠে-আসা লোক ! ভাড়া-ঘরে বাস করে। নিজের জমি-জমা এক কাঠা নাই। বড় সংসার, অনেকগুলো লোক খেতে। কত কষ্ট ওদের। ছেলেমেয়েগুলো পেট ভরে খেতে পায় না হয়ত, তাই লোকের পেয়ারা চুরি, আম চুরি করে বেড়ায়। আমগুলো ওকে দিয়ে দিলেই হ'ত। যা হবার তা ত হয়েইছে। ষোড়শী-বামনীর এলাকায় আর পা দিতে ও কোনদিন সাহস করবে না। না, আমগুলো নিয়েই যাক তাই। আমার আর কে খাবে !

ষোড়শী চীৎকার করে ডাকল—ওরে ও সুবো, শুনছিস !

সুবোধ পিছন ফিরে তাকায়।

—এই ! শোন, শুনে যা ?

সুবোধ দাঁড়ায়, কিন্তু এগিয়ে আসতে সাহস করে না।

—ওরে ভয় নাই, আয়। একটা কথা বলি শুনে যা।

সুবোধ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে।

—ছেলেটা দেখতে ঠিক কানাইয়ের মত। তেমনি চেহারা, তেমনি রং, তেমনি গড়ন। আহা—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে ষোড়শী।

সুবোধ কাছে এল।

ষোড়শী বলল, আমগুলো নিয়ে যা। নষ্ট যা হবার তা ত হয়েইছে। আমার ঘরে কাঁচা আম আছে, আমি ও আম নিয়ে আর কি করব !

—না, থাক।

—থাক কেন ? আমি বলছি তুই নিয়ে যা। আমি যখন নিজে হাতে তুলে দিচ্ছি, তখন তোর ভয় কি ?

—কে কি বলবে আবার।

হেসে ফেললে ষোড়শী—ওরে ছেলে ? তুই চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলি তাতে কেউ কিছু বলত না, আর আমি নিজে হাতে দিচ্ছি তাতেই এত ভয় !

সুবোধ কোন কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

—যাও নিয়ে যাও, কচি আমগুলো কি এখন ফেলে দেবো

নষ্ট করে—তাই এত গাল দিলাম। থাকলে বরং তোকে দিয়েই পাড়াব, তুই ভাগ পাবি।

সুবোধ বলে, তবে তুমি অর্দ্ধেকগুলো নাও, আমি অর্দ্ধেকগুলো নিই।

ষোড়শী হাসে—তবে তাই নিয়ে যা। পথে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, বলবি পিসিকে আম পেড়ে দিয়ে অর্দ্ধেক ভাগ নিয়ে এলাম।

সুবোধও হেসে ফেলে, অর্দ্ধেক আম কুড়িয়ে নেয়।

সুবোধ চলে গেল। বাড়ী ফেরে ষোড়শী। ছেলেটার আচ্ছা সাহস কিন্তু! এইটুকু ছেলে, অত বড় গাছটায় উঠেছে। ছেলে ফন্দিবাজও খুব। আমি কখন কোথায় থাকি সব খবর রাখে, তাই এতদিন আমার চোখে ধুলো দিয়ে এল। চেহারাখানি ভারি সুন্দর, ঠিক কানাইয়ের মত। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কানাই বুঝি ফিরে আসছে।

ষোড়শীর চোখে জল আসে, চোখ মোছে।

ঘরে এসে গেল। রাখালটা আহুরীকে গোয়ালে বেঁধে দিয়ে গেছে। আহুরীকে এর পর খাওয়াতে হবে। একটা বালতিতে মাড়, কুঁড়ো এবং তার সঙ্গে কিছু খোল মিশিয়ে নিয়ে গেল। আহুরী খেতে থাকে। ষোড়শী আহুরীর কাছে বসে তার গলকম্বলে হাত বুলোয়—খাও, মা আমার খাও।

আহুরী খেতে খেতে মাঝে মাঝে বালতি থেকে মুখ সরিয়ে নেয়।

—নে বাপু, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। বড্ড মিরিক চিরিক খাওয়া বাপু তোর? বাছুরের মা, যা পাবি তাই চাম চাম করে খেয়ে ফেলবি, তবে ত গায়ে গোস্ত লাগবে।

আহুরী আবার খেতে শুরু করে। মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ষোড়শীর দিকে তাকায়।

ষোড়শী বলে, খাও, খেয়ে নাও, তোদিগে নিয়েই ত আছি, তোরা ছাড়া আর আমার কেই-বা আছে।

ষোড়শীর গলার আওয়াজ শুনে গোয়ালে ছুটে এল পুষি।

ষোড়শী বলল, পুসুমণির কি খবর? সাঁঝ হয়নি এখনও, তোমার ত খাবার সময় হয়নি।

পুষি মিউ মিউ শব্দ করে, ষোড়শীর গায়ে লেজ বুলায়।

বাঁ হাতে করে পুষিকে আঁকড়ে ধরল ষোড়শী—ওঃ, তার মধ্যে আজ বিকালের দুধ খাওয়াটা হয় নি তোমার, তারই নালিশ হচ্ছে বুঝি? চল, হাত ধুয়ে দুধ দিইগে। আহুরী আর পুষি দুই বোন। কেমন? একজন খায় মাড়-কুড়ো, একজন খায় দুধ-ভাত। কেমন?

আহুরীর খাওয়া শেষ হ'ল। বালতি থেকে মুখ তোলে। বিড়ালটাকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে মারতে যায়। বিড়ালটা মিউ মিউ শব্দ করে।

ষোড়শী হাসে—দুই বোনে যে খুব ভাব দেখছি। না মা, মেরো না, ও তোমার ছোট বোনটি হয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে ষোড়শী—তোরা ছাড়া আর আমার কেই-বা আছে বল। ছোটমত ছেলেপিলেও যদি একটা কেউ থাকত, তা হলেও এত একা একা থাকতে হ'ত না। এ যেন একবারে বনে বাস করা।

ষোড়শী পুকুরঘাট হতে হাত ধুয়ে এসে পুষিকে দুধ দিলে। তারপর ঘরের দাওয়ায় বসল।

বেলা পড়ে আসে। পাঁচিলের ওপাশে একটা অশ্বত্থ গাছ—বসন্তের কচি লাবণ্যে ভরপুর হয়ে আছে। বিদায়ী দিনের শেষ আলোটুকু পড়েছে কচি কচি পাতাগুলোর ওপরে। সবুজের মুখে সোনালী যেন স্নেহের চুমো দেয়।

অতীতের কথাগুলো আজ মনে পড়ে ষোড়শীর। বড়দাদার ছেলে কানাই। ঠিক সুবোর মতই অত বড় দেখতে। যেমন বুদ্ধি তেমনি দুরন্তপনা। তার দুরন্তপনায় গোটা সংসারটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। ষোড়শীর সঙ্গে মস্করা করত কত—বাবার বোন পিসি, কাদায় ফেলে আসি।

কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করত ষোড়শী, তাড়া করত তাকে। কানাইয়ের কথায় আপত্তি জানাত—ওরে ওটা ঠিক নয়, শুধু উল্টোটা ঠিক—বাবার বোন পিসি, ভাত-কাপড় দিয়ে পুষি; মায়ের বোন মাসি, কাদায় ফেলে আসি।

কানাই ষোড়শীর নাগালের অনেকখানি দূরে দাঁড়িয়ে কত হাসত, আঙুল নাড়াত—বলব না, বলব না।

কেঁদে ফেললে ষোড়শী।

এক দিন পরের কথা। দুপুরে ষোড়শী পুকুরঘাটে স্নান করতে যায়। স্নান সেরে ফিরে আসে সুবোধ, বগলে তার কতকগুলো গোটানো পদ্মপাতা, পদ্মের মৃণাল দিয়ে বাঁধা।

ষোড়শী দাঁড়ায়—অত পাতা দিয়ে কি হবে রে সুবো?

ভাত খাব—সুবোধ ছোট্ট করে বলল।

—ঘরে তোরা নিজেরা ভাত খাবি তার জন্যে এতগুলো পাতা! আমি মনে করেছিলাম, তোদের বাড়ীতে বুঝি আজ ভোজ।

সুবোধ কোন কথা বলে না।

—কি রে, কথা বলিস না কেন? তোদের বাড়ীতে আজ ভোজ নাকি?

ষোড়শী হাসে।

সুবোধ বলে—আমরা গরীব লোক, ভোজ দিতে কোথায় পাব।

—তোর বাবা গরীব সে আমি জানি, কিন্তু তুমি বাবা একটুও গরীব নও। যেমন নাদুসনুদুস চেহারা তেমনি ডাকা-বুকো সাহস, আর মাথায়ও তেমনি রকমারি ফন্দি। আমার মত ডাকিনী-মেয়ের চোখে তুমি এতদিন ধুলো দিয়ে এলে, তুমি একটি ডাকাত।

ষোড়শী হাসে।

সুবোধ বলল—ডাকাতরা বুঝি বড়লোক?

—ডাকাতরা বড়লোক নয় ? লোকের হয়ে হয়ে খায় যারা তারাই ডাকাত তাদের কি কোন অভাব থাকে ?

সুবোধ আর কিছু বলে না, পাশ দিয়ে চলতে চায়।

ষোড়শী বাধা দেয়—থাম, আচ্ছা ওসব কথা থাক্। হাঁ রে, তুই যে আজ ইস্কুলে যাস নি !

—আজ রবিবার যে।

—ও হেঁ ঠিক, আজ রবিবারই বটে। তা দেখ, তুই আজ বিকালে একবার আমার বাড়ী যাস।

সুবোধ বিস্মিত নয়নে ষোড়শীর দিকে তাকায়।

আবার বলল ষোড়শী—তোর কোন ভয় নাই, তোর সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

—কি কাজ ? সুবোধ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—চারটি আম পেড়ে দিয়ে আসবি।

সুবোধ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, কোন কথা বলে না।

ষোড়শী বলে—তোর কোন ভয় নাই। আমি যখন নিজে তোকে পাড়তে বলছি, তোর ভয়ের কি আছে। সেদিন তুই চুরি করছিলি তাই।

কতকটা ভয় ভাঙল সুবোধের—কিন্তু তুমি যে সেদিন বললে, এখন কচি আম পেড়ে নষ্ট করতে নেই।

ষোড়শী হাসে—তা ত নেই, কিন্তু কচি আমের গুড়-অম্বল খেতেও ত সাধ হয়। কখন পাকবে তাই বলে কি লোকে চুপ-চাপ বসে থাকবে, দু'চারটিও খাবে না ?

—তুমি যে পরশু এতগুলো কাঁচা আম নিয়ে গেলে গো, এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে ?

—তোকে এত কৈফেত দিতে পারি না, তোকে বলছি তুই যাস।

পুনরায় বলল ষোড়শী—কি রে, চুপ করে রইলি যে ? হাঁ, না একটা কিছু বল ?

—যাব তাই।

সুবোধ চলে গেল। ষোড়শীও পুকুরঘাটের দিকে চলতে থাকে।

বিকালে ষোড়শী সুবোধের অপেক্ষায় সদর দরজায় বসে আছে। কিছু পরে সুবোধ এল।

—আয়, আমি মনে করছিলাম সুবো বুঝি আজ আর এল না।

সুবোধ দাঁড়ায়।

—দাঁড়ালি কেন, আয় ঘরের ভেতরে আয়।

—ঘরের ভেতরে কেন, চল আমতলায় যাই।

—আমতলায় পরে যাব'খন, ঘরের ভেতরে আয় না, দুধ দিয়ে দুটি মুড়ি খা।

সুবোধ আপত্তি করে, মুড়ি খেতে চায় না।

ষোড়শী জেদ করে, দুটি খা না, এতে দোষের কি আছে! আমার ঘরে অনেক দুধ হচ্ছে এখন।

—আমি এইমাত্র ঘরে মুড়ি খেয়ে এলাম।

—আমি কি বলছি তুই ঘরে কিছু খাস নি ? তা হোক এখানেও দুটি খা।

সুবোধ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

—সেদিন এত গাল দিলাম বলে রাগ করেছিস বুঝি ?

সুবোধ হাসে—না, রাগ করি নি।

—তবে ঘরের ভেতর ঢুকতে চাইছিস না ?

সুবোধের হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে এল ষোড়শী। দুধ-মুড়ি দিলে। সুবোধ খাওয়া সেরে কিছু আম পাড়ে। ষোড়শীকে কিছু আম দিতে চাইলে। ষোড়শী নিলে না। সুবোধ সব আমই নিয়ে বাড়ী ফেরে।

এর পর থেকে সুবোধ রোজই ষোড়শীর বাড়ী যায়।

দিনকতক পরের কথা। একদিন দুপুরে বীণা ষোড়শীর বাড়ী রামায়ণ পড়তে এল—পিসি, আছ নাকি ?

—কে, বীণি ! আয়।

—তুমি আজ এত বেলা অবধি রাঁধছো ?

—এই ত রান্না চড়ালাম। দু'পোলা মুড়ি ভাজলাম আজ। ছেলেটা রোজই আসে, খায়—অল্প মুড়িতে এখন হয় না।

—তা হলে আজ আর রামায়ণ পড়া হবে না ?

—আজ আর কি করে হবে, এর পর কখন রান্না হবে ; তার পর খাবো।

শেষের কথাগুলোয় একটা অনিচ্ছাজ্ঞাপক টান।

—একদিন না এলে তুমি কত রাগ করতে, এর পর আমি যদি রাগ করি ?

বীণা হাসে।

ষোড়শীও হাসতে থাকে—তা করতে পারিস। মোটেই সময় পাচ্ছি না বীণি, ঘরের কি একটা কাজ !

—তুমি একা মানুষ, তোমার আবার কাজ কি।

—কাজ আছে বৈ কি, যে যেমন মানুষ তার তেমনি কাজ। ছেলেটা রোজই আসে, তার জন্যে আলাদা করে দুধ জাল দিতে হয়, উনি আবার সর-তোলা দুধ খান না। তারপর ঘর-দোর ঝাড়া-মোছা পরিষ্কার করা। কোথাও এতটুকু নোংরা পড়ে থাকবার উপায় নেই, বড্ড সৌখীন ছেলে।

ষোড়শী উনানের মধ্যে কয়েকটা ঘুঁটে দিয়ে ফুঁ দেয়।

বীণা হাসতে হাসতে বলে—সুবোকে নিয়ে ঘরে রাখবে নাকি ?

—তোর ঐ কথা, পরের ছেলে নেব বললেই কি আর পাওয়া যায় ? মা রয়েছে বেঁচে—নিজের ছেলেকে কি কেউ চট করে অপরকে দিতে চায়।

—তোমারও ত আর কেউ নেই। একটা ছোট ছেলে থাকলে ভালই হয়।

—তা হয়। কিন্তু নিজেদের যখন নেই তখন অপরের

ছেলের লোভ করা ভুল। আমাদের ঘরেই কি ছেলের দুঃখু ছিল? কত ছেলে! একঘর ছেলে! আজও চোখের সামনে যেন ছেলে-গুলো নাচে।

ষোড়শীর চোখদুটো সজল হয়ে আসে।

বীণা বললে—আজ আসি তা হলে—

—বোস একটু।

—পল্টুর মা মিনির কাকী সেদিন বলছিল, তোর ষোড়শী পিসিকে মোটেই আর দেখতে পাই না কেন, বল তো!

—গাঁ দিয়ে যাবার মোটেই অবসর পাচ্ছি না, ঘরেরই কাজ সামলাতে পারি না। এখন সুবোধচন্দ্রের ফরমাসমত সব কাজ করতে হয়। এখানটায় এমন কর, ওখানটায় তেমন কর। না করলেই রাগ। আমারও ছেলেটার ওপর একটা মায়া বসে গেছে। এক দিন না এলে ঘরে টিকতে পারি না।

—এখন আসি পিসি।

বীণা চলে গেল।

মিউ মিউ মিউ—ডাক দেয় পুষি, ষোড়শীর কাছে কাছে ফেরে।

ষোড়শী বিরক্ত হয়—আঃ, জ্বালাস না বাপু! রান্না হোক, তারপর দিচ্ছি খেতে। দিনরাত মিউ মিউ ভাল লাগে না। একে নিজের কাজ নিয়ে মরছি।

বিড়ালটা ষোড়শীর দিকে তাকায়, থাবা গেড়ে বসে। ষোড়শী নিজের মনেই রান্না করে। পুকুরে মাছ ধরিয়ে একদিন সুবোকে ভাল করে খাওয়াতে হবে।

জাহ্নবী গোয়াল থেকে ডাক দেয়—হাম্বা।

গোয়ালে এল ষোড়শী—ওমা, জাহ্নবীকে ত পালে দিয়ে আসা হয় নি। মুখপোড়া রাখাল 'গরু ছাড় গো' বলে হাঁক দিয়ে চলে গেছে—শুনতেই পাই নি। সারাদিন ঘরে বাঁধা থাকলে কি আর দুধ দেবে! কাল মনে করেছিলাম, সুবোকে একটু ক্ষীর করে দোব—ক'দিন থেকে খেতে চাইছে। নাঃ, পালে দিয়েই আসি। পাল কত দূরে চলে গেছে তাই বা কে জানে। রান্নাটা সেরেই যাই।

ষোড়শী তাড়াতাড়ি রান্না সারল। গরুটা পালে দেবার জন্যে নিয়ে গেল। পথে দেখা হ'ল গোবর্দ্ধনের সঙ্গে।

গোবর্দ্ধন বলে—পিসি, এত বেলায় গরু নিয়ে যাচ্ছ! গরুর পাল ত অনেক দূরে চলে গেছে।

—রাখালটা কখন হাঁক দিয়েছিল শুনি নি, আনমনে ছিলাম। যাই দিয়ে আসি। ফিরে এসে আবার স্নান করতে হবে। পথ ত খারাপ।

—খোকার মা সেদিন শুধুচ্ছিল, 'পিসি আর পায়ের ধুলো দেয় না কামনে।'

—ক'দিন একটু ঝঞ্ঝাটে আছি, গোবর্দ্ধন।

গোবর্দ্ধন ষোড়শীর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়, কোন কথা বলে না।

জাহ্নবী বিপথে যায়।

ষোড়শী ধমক দিলে—অই, অই, হেই।

গোবর্দ্ধন পুনরায় বলল—খোকাটা একটু ভাল আছে পিসি, জ্বরটা ছেড়েছে।

—তাই নাকি? অই, অই, হেই—গাইটা অন্য দিকে পালিয়ে যাচ্ছে গোবর্দ্ধন, আমি যাই, ওকে পালে দিয়ে আসি।

ষোড়শী তাড়াতাড়ি গরুটার পিছু পিছু চলে গেল।

সন্ধ্যার একটু আগেই ষোড়শীর বাড়ী এল সুবোধ।

ষোড়শী বলে—তোর আজ এত দেরি কেন রে? কখন থেকে দুধ মুড়ি নিয়ে বসে আছি।

—আজ ইস্কুলে আমাদের একটা মিটিং ছিল।

—কিসের মিটিং রে?

—আমরা অন্য একটা ইস্কুলের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে যাব কিনা।

—ভিনগাঁয়ে বল খেলতে গিয়ে কোথায় হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকবি। ওসবে না যাওয়াই ভাল।

সুবোধ আপত্তি জানায়—তা কি হয় পিসি, যেতেই হবে।

ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে ষোড়শী—হবে যা মন তাই কর গিয়ে, আমার কথা ত শুনবি নে। ঐ জল রয়েছে, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নে।

ষোড়শী একটা থালায় মুড়ি, দুধ ও গুড় এনে দিলে। সুবোধ খেতে সুরু করে। ষোড়শী তার মুখের সামনে বসল।

—হ্যাঁরে সুবো, তুই যে আমার বাড়ী আসিস, তা তোর মা কিছু বলে না?

—কি বলবে আবার।

ষোড়শী আর কিছু বলে না।

সুবোধ খেতে খেতে একটু হাসে—জান পিসি, সেদিন বাবা মাকে বলছিল, তোমার সুবোধচন্দ্র একটা নতুন পিসি জোগাড় করেছে।

—তোর মা কি বললে? ষোড়শী সুগভীর ঔৎসুক্য দেখায়।

মা বললে, আমি জানি ঠাকরুণ সুবোকে খুব ভালবাসে।

—তাই বললে বুঝি? ষোড়শী হাসে।

—হ্যাঁ, তারপর শোন, আমি মিছিমিছি বললাম আমি পিসির বাড়ী থাকব। তখন বাবা হাসতে হাসতে বললে, 'তাই থাকগে যা। আমার ত আরও তিনটে ছেলে রয়েছে। তোর পিসির কেউ নাই, একা একা খুব আদর খাবি।' তা মা বললে, 'ওসব কথা বল না বাবু, সুবোকে ছেড়ে আমি এক দণ্ড থাকতে পারি না।' বাবা হাসতে লাগল। বললে, 'তুমিও যেমন, ঠাকরুণও সুবোকে রেখেছে আর সুবোও থেকেছে!'

ষোড়শী ম্লান হাসে, তোর মা ঐ কথা বললে?

—হ্যাঁ।

ষোড়শী গম্ভীর হয়ে গেল।

সুবোধ খেতে থাকে। পিসির এই গাম্ভীর্য্যে অস্বস্তি বোধ করে।

একটু পরে সুবোধ বলল, পিসি, তোমার পুণ্যমণিকে দেখছি না।

ষোড়শী কোন উত্তর দেয় না।

পুনরায় সুবোধ বলে, পিসি, ও পিসি, তুমি কি হঠাৎ কালা বনে গেলে?

হঠাৎ যেন চমক ভাঙে ষোড়শীর—আঁ, কি বলছিস?

—তুমি কি ভাবছিলে পিসি?

—কিছু না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে ষোড়শী।

—তোর খাওয়া হ'ল? নে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। আঁধার হয়ে এল। আমাকে এর পর সাঁঝ দিতে হবে, মালা জপ করতে হবে।

—মালা জপ কি করে করতে হয় পিসি?

ষোড়শী ম্লান হাসে, আমার মত বুড়ো হবি যখন তখন বুঝবি কি করে মালা জপ করে। এখন যা করছিস তাই কর, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।

মুড়ি খেয়ে সুবোধ চলে গেল। ষোড়শী প্রদীপ জ্বালে, সাঁঝ দেয়। তুলসীতলায় প্রদীপটা নামিয়ে প্রণাম করে।

তুলসীতলায় আসন বিছায়, মালা নিয়ে জপে বসে। একটির পর একটি মালার কাঠির ওপর আঙুল চলে। মনখানা দ্বিধাবিভক্ত হয়। একটায় বকৃত হয় জপের মন্ত্র, অন্যটায় সুরু হয় সুবোধের কথার প্রতিক্রিয়া। নাঃ, পরের ছেলের ওপর এত মায়া ভাল নয়। আমার ঘরেই কি ছেলের অভাব ছিল? কত ছেলে! এক-ঘর ছেলে! সকাল থেকে সাঁঝতক গোটা ঘরে কত কলরব উঠত। ঠাকুর যখন সবই কেড়ে নিলে তখন পরের ছেলের ওপর আর এ মায়া কেন? কি ছেলেদের রূপ! কানাইকে ময়ূরে বসিয়ে দিলেই যেন দুর্গা-প্রতিমার কার্ত্তিক।

ষোড়শীর ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। জপে মন বসে না। কোনরকমে জপ সেরে উঠে গেল।

পরের দিন বিকালে স্কুলের ছুটির পর ষোড়শীর বাড়ী এল সুবোধ।

ষোড়শী গোয়ালে আদুরীকে খাড়-কুঁড়ো খাওয়াচ্ছিল। সুবোধকে দেখে নিস্পৃহভাবে বলল, আয়।

সুবোধ কিছু বলে না, গোয়ালের দরজায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ষোড়শীও আর কিছু বলে না, আদুরীর গায়ে হাত বুলোয়। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব থাকে। অস্বস্তি বোধ করে ষোড়শী।

—ঘরের ভেতরে চল, দাঁড়িয়ে রইলি যে! ষোড়শী বলল।

সুবোধ তবুও কোন কথা বলে না বা বাড়ীর ভেতরে যায় না।

ষোড়শী সুবোধের দিকে তাকায়—ও কি রে, তোর চোখ দুটো এত লাল হ'ল কেন?

সুবোধ কেঁদে ফেলে।

—ওমা, তুই কাঁদছিস কেন? কি হ'ল কি তোর?

—মাষ্টার আজ খুব মেরেছে।

—তাইতে বুঝি এত মনমরা হয়ে আছিস? চল, কোথায় মেরেছে দেখিগে চল।

ষোড়শী ঘাটে হাত ধোয়, সুবোধকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে আসে। সুবোধের পিঠ পরীক্ষা করে।

—ও মাগো, লম্বা লম্বা ছড়ির দাগ, ছেলেকে আমার মেরে খুন করে দিয়েছে? আঁটকুড়ো মাষ্টারের ঘরে কি ছেলেমেয়ে নেই! এমনি করে কখনও ছেলেকে মারে? তুই কি করেছিলি?

সুবোধ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, টিফিনের সময় হাটতলায় ভালুকনাচ দেখছিলাম। টিফিনের ঘণ্টা শুনতে পাই নাই। ফিরতে দেরি হয়েছিল তাই মারলে।

—ছোট ছেলের অমন হয়। তাই বলে এত মার! গাঁয়ের মাষ্টার হলে আমি তার বাড়ী গিয়ে কত গাল দিয়ে আসতাম। চুপ কর, কাঁদিস নে।

ষোড়শী একটু তেল এনে সুবোধের পিঠে মাখিয়ে দেয়।

সুবোধকে খেতে দিলে ষোড়শী।

—হাঁরে সুবো, তোর মাকে মারের কথা বলিস নি?

—আমি ঘরে মোটেই দাঁড়াই নি। জামাটা খুলে, বইগুলো রেখে দিয়ে এখানে চলে এসেছি।

ষোড়শী মৃদু হাসে, তা বেশ করেছিস। আমারও আজ দুপুরে মনটা খুব ছটফট করছিল। তুই দুপুরে খুব কেঁদেছিলি বোধ হয়?

—খুব কেঁদেছিলাম। কঞ্চির ছড়ি দিয়ে সপাং সপাং করে মারল, লাগে না বলছ?

—আহা, লাগে না আবার! অমনি করে কখনও ছেলে মারে? গোরু মোষ মারার মত করে ঠেঙিয়েছে। পোড়াকপালে মাষ্টারের মুখে পোড়াই। অমন মাষ্টারকে স্কুল থেকে বিদেয় করতে হয়। মাইনে দিয়ে আবার ঐরকম খুনে মাষ্টার রাখে।

সুবোধ খাওয়াতে মন দেয়, কোন কথা বলে না।

কয়েক দিন পরের কথা। সুবোধ মামার বাড়ী গেছে। দুপুরে বীণা রামায়ণ পড়তে এল।

ষোড়শী বলল, আয়, আমি অনেকক্ষণ থেকে তোর জন্যে বসে আছি।

—কেন, আমি তো ঠিক সময়েই এসেছি।

—ছেলেটা ক'দিন ঘরে নাই, বড্ড একা একা আছি কিনা।

—সুবো গেছে কোথায়?

—মামার বাড়ী। মামাতো বোনের বিয়ে। মোটে দু'তিন দিন গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে কতদিন যেন তাকে দেখি নাই। ঘর-দোর যেন খাঁ খাঁ করছে।

বীণা হাসে—পিসির অবস্থা কি শেষে ভরতরাজার মত হবে নাকি? হরিণশিশু পালন করে যেমন হয়েছিল।

শাংহাইয়ে "ইয়ং পায়োনিয়ার্স প্যালেস" নামক শিশু-সদনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের একটি কম্যুনিটি প্রোজেক্টে রাস্তার কর্মরত 'ক্যাডেট'গণ

ফ্রান্সের রোম্বাস ব্লাস্ট ফার্নেস ইহ ইউ পর ষ্ঠ ব্র র্নসগুলির অন্যতম
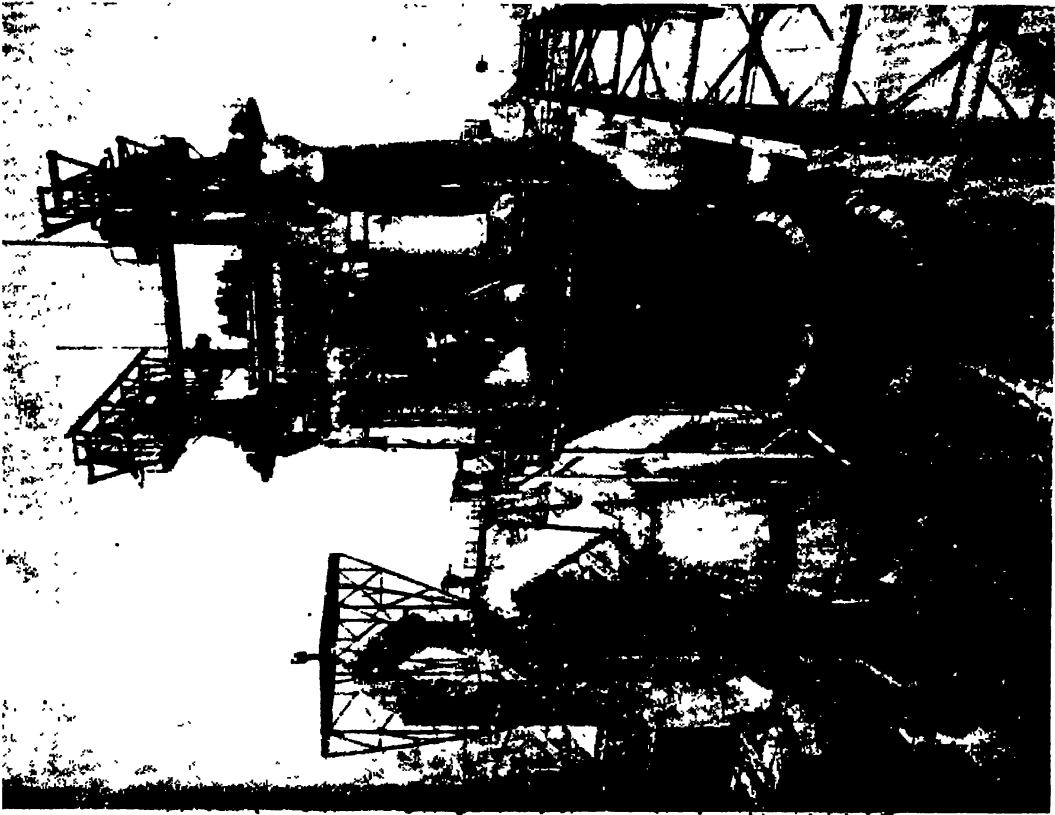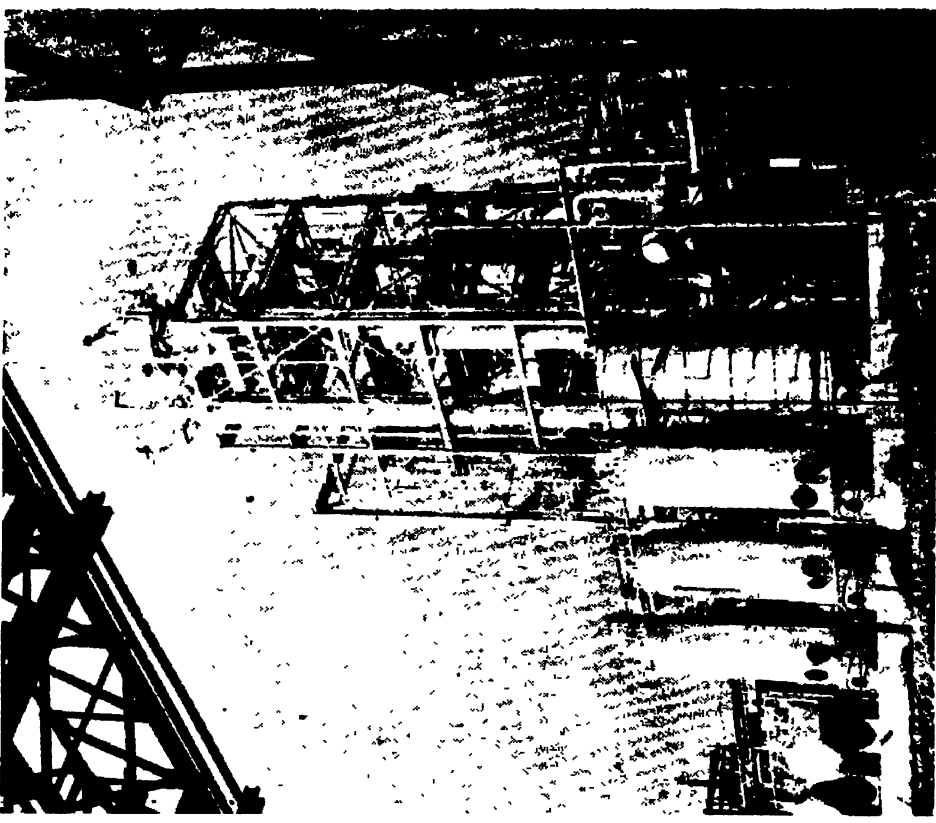
লাভেরা প্লান্ট
এসিটোন ইত্যাদি উৎপাদনের কারখানা

—তাই তো দেখছি। পরের ছেলের ওপর এত মায়া ভাল নয়, সবই বুঝছি কিন্তু পারছি না তো? নিজের পেটের না থাকলেও ভাইদের ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে ছিলাম। হঠাৎ ভগবান কেড়ে নিলেন। এক একবার মনে হয়, ওসব ঝামেলা আর না বাড়ানোই ভাল, কিন্তু মন বোঝে না।

বীণা আর কোন কথা বলে না, রামায়ণ পড়তে বসে।

খানিক পরে বীণা বলল, পিসি যেন আজ রামায়ণ শুনছ না মনে হচ্ছে।

—শুনছি, তুই পড়।

বীণা মৃদু হাসে, কৈ, এতক্ষণ কি পড়লাম বল তো?

ষোড়শী বলতে পারে না, ম্লান হাসে, তোর কাছে এই বুড়ো বয়সে পরীক্ষা দিতে হবে নাকি? আজকালকার মেয়েদিকে পেরে ওঠা দায়। তুই পড়।

—আজ আর থাক পিসি, তুমি বড্ড আনমনা হয়ে আছ।

—না না, তুই পড়। তুই আছিস, তবু ভাল আছি। তুই না থাকলে ফাঁকা ঘরটায় মোটেই মন টিকবে না। কেমন কান্না পাবে।

ষোড়শীর চোখে জল দেখা যায়, চোখ মোছে।

বীণা বলল, কিন্তু পরের ছেলের ওপর এত মায়া কেন?

—কেন তা তোকে বোঝাতে পারব না। যেদিন থেকে সে গেছে, সেই দিন থেকে ভেতরটা অনবরত যেন হু হু করছে। বিকালবেলা ঘরে মোটেই তিষ্ঠুতে পারি না।

—পিসি, যদি রাগ না কর একটা কথা বলি।

—বল্, রাগ করব কেন?

—তোমার তো নিজের পেটের ছেলেমেয়ে নেই, পরের ছেলের ওপর এত মায়া তো ভাল নয়।

ষোড়শী চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে, নিজের পেটের ছেলেমেয়ে নেই যার, তার মা হবার সাধ হয় না বলছিস?

বীণা ব্যথিত হয়, আর কিছু বলে না—রামায়ণ পড়তে সুরু করে।

দু'দিন পরের কথা। সুবোধ আজও আসে নি। বিকালের দিকটায় ষোড়শী ছটফট করে। এক বার সদর দরজার পাশে এসে বসে, আবার ঘরের ভেতরে যায়। আবার ফিরে আসে। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে এল।

—নাঃ, আজও সুবোধ এল না—সাঁঝ দেবার জন্য বাড়ীর ভেতরে এল ষোড়শী।

—পিসি আছ নাকি? বাইরের দরজায় সুবোধ ডাক দেয়।

—কে রে, সুবো এলি?

ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বের হয় ষোড়শী।

—এত দেরি করে! আমি তো ভেবে বাঁচি না, সুবোর এত দেরি হচ্ছে কেন?

—দেরি কোথায় হ'ল? এই তো মোটে ক'দিন গেছি। মামীমা, মামা—এরা কিছুতেই আসতে দেবে না, আমি জোর করে পালিয়ে এলাম। মা এখন ওখানে থেকে গেল।

—তা থাকগে, তুই তো এসেছিস। তোর মা যে ক'দিন না আসে, তুই আমার বাড়ীতেই থাক্ না। আমাকে একা একা বড্ড খারাপ লাগছে।

—দেখি, বাবাকে জিজ্ঞেস করব।

—বাবাকে আবার কি জিজ্ঞেস করবি? একই গাঁয়ে বাস, এপাড়া ওপাড়া। মা থাকলে বোধ হয় বারণ করত।

—মা বারণ করবে কেন? তোমার এখানে আসি, তার জন্যে মা কিছু বলে না ত।

ষোড়শী বিস্মিত হয়, তবে যে তুই সেদিন বললি, মা বলছিল, 'আমি এক দণ্ড সুবোধকে ছেড়ে থাকতে পারি না'।

সুবোধ হাসে, সে আমি তোমাকে রাগাবার জন্যে মিছিমিছি বানিয়ে বলেছিলাম।

হেসে ফেললে ষোড়শী, ওরে মিথ্যুক! সরি বামনীর ওপরেও তুই চাল দিতে শিখেছিস?

সুবোধ হাসতে থাকে।

—থাকগে ওসব কথা, চল্, খাবি চল্।

—আজ আর কিছু খাব না, ক'দিন মামার বাড়ী খুব খাওয়া হ'ল, খিদে নেই।

—আমি কি বলছি তুই মামার বাড়ীতে উপোস দিয়ে এসেছিস? তোর জন্যে ক্ষীর করে রেখেছি, একটুখানি খাবি চল।

ষোড়শী সুবোধকে একটা বাটিতে ক্ষীর এনে দিলে।

—তোর জন্যে যা মন কেমন করছিল—এক দণ্ড ঘরে তিষ্ঠুতে পারছিলাম না।

সুবোধ হাসে, কিছু বলে না।

কয়েক মাস পরের কথা। রিজার্ভ কেসের উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ী জমিজমা সরকার ফিরিয়ে দিলে। সুবোধরা নিজেদের গ্রামে ফিরে গেল।

আঘাতটা সহ্য করতে পারে না ষোড়শী। ওঠে না, খায় না, ঘরের মধ্যে বিছানায় পড়ে থাকে।

আদুরী ঘরের মধ্যে হাম্বা হাম্বা ডাক দেয়। পুষি বিছানার পাশে পাশে অনবরত মিউ মিউ শব্দ করে। সেদিকে কান দেয় না ষোড়শী—শুধুই কাঁদে। কানাইয়ের কথা সে ভুলেছিল সুবোধকে পেয়ে, কিন্তু সুবোধকেও সে নিজের কাছে ধরে রাখতে পারল না। এত একা একা এখানে সে কি করে থাকবে!

বাইরের দরজায় কে এক জন ডাকল, পিসি রইছ, পিসি!

ষোড়শী শোনে, কোন উত্তর দেয় না।

—পিসি ঘরে রইছ?

ষোড়শী শুয়ে শুয়েই দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়।

কেষ্টো ঘরের ভেতর ঢোকে, ঘরদোর সব খোলা, পিসি ঘরে নাই লিকিন গো ?

কেষ্টোকে একবার দেখে নেয় ষোড়শী, চোখ বোজে।

—আছি, কি বলছিস ?

—গরুচরানোর পয়সাটার জন্যে বলছেলম। আজ এখনও শুয়ে আছ, শরীল খারাপ লিকিন ?

—হাঁ, একটু খারাপই, কাল এসে নিয়ে যাবি। আজ যা।

কেষ্টো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, যায় না বা কোন কথা বলে না।

কেষ্টো বাগ্দীদের একটা ছেলে—বয়সে সুবোর মতই। পরনে একখানা ময়লা ইজের—সম্ভবতঃ ভদ্রপাড়ার কোন ছেলের পরিত্যক্ত। মাথায় তেল নেই, চুলগুলো খসখসে, চাপড়ালে ধুলো ওড়ে। শুক্‌নো রোগা চেহারা। বুকের পাঁজরাগুলো গোনা যায়। পেটটা বেশ একটুখানি উঁচু।

অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে ষোড়শীর দিকে তাকায়। দাঁড়িয়ে থাকে, যায় না।

ষোড়শী অস্বস্তি বোধ করে, তার পানে তাকায়—কি রে, দাঁড়িয়ে রইলি যে ! মন মেজাজ ভাল নাই, আজ ফিরে যা।

কেষ্টো তবুও যায় না, নীচু গলায় বলে, মা বললে, 'দোকান করতে একটা পয়সাও নাই আজ, তোর পিসিকে নরম করে বলবি নইলে আজ হাঁড়ি চাপবে নাই।

ষোড়শী কেষ্টোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, কোন কথা বলে না।

কেষ্টো পুনরায় অত্যন্ত কাতরভাবে বলল, এক বার ওঠো পিসি, পয়সা না নিয়ে গেলে মা মারবেক।

কত মিনতিমাখা চাউনি কেষ্টোর চোখে !

—ঐ তো তোর চেহারা, তোর কোনখানটায় মারবে তাই শুনি ?

—মা বড্ড মারে।

ষোড়শী ব্যথিত হয়, হাঁ রে, তোর যে এমন মোটাসোটা চেহারা ছিল, এত রোগা হলি কি করে ?

—দু'মাস শুসশুসে জ্বর আসছে পিসি।

—ওষুধ খাস না কেন ?

—মা বলছিল এখন হাতে পয়সা নাই। পয়সা হ'লে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবে।

ষোড়শী একটু ঝাঁঝালো গলায় বলল, রোগটা কি তোর মার হাত-ধরা নাকি যে তোর মায়ের হাতে পয়সা হওয়া অবধি বসে থাকবে ?

কেষ্টো একথার কোন উত্তর দেয় না।

ষোড়শী পুনরায় বলে, তোর মাকে কাল একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।

ষোড়শী উঠে দাঁড়ায়। বাক্স খুলে পয়সা বের করে এনে দিলে। পুনরায় বিছানায় বসে পড়ে। কেষ্টো পয়সা গোনে।

—দু' আনা বেশী দিলে যে !

—ভুলে দিয়ে ফেলেছি তা হলে।

—ফিরে নাও।

কেষ্টো উদ্‌বৃত্ত পয়সাটা মাটিতে নামিয়ে দেয়।

ষোড়শী বলল, আবার কে বাক্স খোলে, এখন ও আর আমি ফিরে নেবো না। তুই নিয়ে যা, পরের মাসে মাইনেতে কেটে নেবো'খন।

কেষ্টো জেদ করে, না তুমি ফিরে নাও, নইলে মা বকবেক্। বলবে, 'আগাম নিয়ে এলি ক্যানে' :

কেষ্টোর অহেতুক ভীতিতে ষোড়শীর হাসি পায়—আগাম পয়সা নিয়ে গেলে কি কোন দোষ হয় রে ক্ষেপা ? থাকগে, ও আর আমি তোর মাইনেতে কেটে নেবো না, তোকে এমনি মিছরি খেতে দিলাম।

কেষ্টো বিস্মিত দৃষ্টিতে ষোড়শীর দিকে তাকায়।

ষোড়শী মৃদু হাসে, কি রে অবাক হয়ে গেলি যে ! ও পয়সা দু'আনা আমি তোকে এমনি দিলাম।

অত্যন্ত খুশী হ'ল কেষ্টো, আপনি পিসি হও। কেষ্টোর রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানায় একগাল হাসি। বিছানা ছেড়ে উঠানে উঠে এল ষোড়শী। স্মিতহাস্যে মুখখানা একটু উদ্ভাসিত হ'ল।

—তোর পিসি আমি নিশ্চয়ই হই। কিন্তু তোর শরীর দেখে মনে হচ্ছে তোকে যেন আমি কত দিন দেখি নি। কেমন মোটাসোটা চেহারা ছিল তোর !

—শুসশুসে জ্বর হয় যে—কেষ্টো বলল।

—তোর মাকে কাল একবার নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিস।

—দোব।

কেষ্টো চলে গেল। বিড়ালটা ষোড়শীর কাছে আসে, অবিশ্রান্ত মিউমিউ ডাক দেয়, পায়ের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ায়, ষোড়শীর গায়ে লেজ বুলায়।

ষোড়শী বলে, তোদের জ্বালায় তো বাপু অস্থির। মানুষের মনমেজাজ বুঝিস না, বিছানায় একটু পড়েও থাকতে দিবি না তোরা।

বিড়ালটা ষোড়শীর মুখের দিকে তাকায়, অত্যন্ত করুণভাবে ডাক দেয়—মিঁউ, মিঁউ, মিঁউ !

ষোড়শী মৃদু হাসে, তাকে ভেংচায়—মিউ মিউ মিউ। কিন্তু কি খেতে দেব এখন তোকে ? ভাত তো আজ রাঁধি নি। গাইটাও দোহানো হয় নি আজ। আচ্ছা, চল্ দেখি, কালকের বাসি দুধ আছে, তাই তোকে একটু দিই গে।

পুসিকে খেতে দিয়ে ষোড়শী গোহালে গেল।

আদুরী 'হোঁ হোঁ' শব্দ করে, শিং নাড়ে। তার নিষ্পলক

দৃষ্টিতে যেন কত অভিযোগ। ষোড়শী আদুরীর গলাটা জড়িয়ে ধরে, আদর করে।

—খুব ক্ষিদে লেগেছে, মাড় তো আজ নাই। বালতিতে জল দিয়ে চালকাঁড়া কুঁড়ো খোল মাখিয়ে এনে দি।

আদুরীকে খেতে দিলে ষোড়শী। নিজেও দুটি মুড়ি খেলে।

কয়েক দিন পরের কথা। ষোড়শী আজ গ্রামের পথে বের হয়। মাঝে মাঝে দু'এক জন গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হয়। সকলেই ষোড়শীকে অনেক দিন না দেখতে পাওয়ার অভিযোগ জানায়।

ষোড়শী হাসে, তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করে, এগিয়ে চলে। কিছুদূর যাওয়ার পর তারকের সঙ্গে দেখা হ'ল।

—তোর বাবার চোখটা কেমন আছে রে তারক?

—ভাল নাই পিসি, বাবা একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। তারক শুকনো মুখে বলে।

—আহা-হা, কাজের লোক—খাতা লিখে দু' পয়সা আনছিল। তোদের অভাবের সংসার; তখন বললাম, বদ্যি দিয়ে চোখ ছোলাসনে। বললে কি তোরা কথা শুনিস!

তারক কোন কথা বলে না।

পুনরায় বলল ষোড়শী, চল, তোর বাবাকে এক বার দেখি গে। না হয় সদরের চোখের ডাক্তারের কাছে এক বার নিয়ে যা, খরচপত্র যা লাগে আমি এখন দিচ্ছি, পরে পরে শোধ দিয়ে দিস।

—ও চোখ কি আর হবে পিসি? তারক হতাশায়, স্বরে বলল।

—তা কি বলা যায়? সদরের উনি চোখের পক্ষে খুব ভাল। যদি কোন উপায় থাকে, নিশ্চয়ই সারিয়ে দেবেন।

তারক বাড়ীর পথে ফিরল। ষোড়শী তার পেছনে চলতে থাকে।

পথে যেতে যেতে তারক বলল, তোমাকে অনেক দিন দেখি নি কেন পিসি?

—ঘরেই ছিলাম,—ষোড়শী ছোট্ট করে বলল। চল তাড়াতাড়ি। তোদের ঘর থেকে মিনিদের ঘর হয়ে ওর ছেলেটা কত বড়টি হ'ল দেখে তার পর তিলিপাড়া যাব। গৌরীর মার নাকি খুব অসুখ।

অনুবর্ত্তন

শ্রীবীথিকা চট্টোপাধ্যায়

তোমার নিষ্প্রভ আঁখি, কি যেন বলিতে মোরে চায়
নিষ্ফল সন্ধ্যায়—
অতৃপ্ত জীবনের অপ্রচুর কামনার কথা
দিয়ে যায় ব্যথা।
পথের দু'ধারে যত রঙীন ফুলেরা ঝরে পড়ে
দুপুরের সে দুরন্ত ঝড়ে।
কারো কথা হয় নাই শোনা—
খোলা জানালার পাশে, শুধু বসে অলস প্রহর হ'ল গোনা;
ভাষাহীন আঁখি মেলি চেয়ে থাকি দূরে
ঝিকিমিকি সোনার রোদ্দুরে।
তুমি বল কি যে কথা বুঝিতে না পারি
অদ্ভুত আমি এক নারী!
এসেছিল কত জন, করে গেছে কত চাটু কথা
বুঝি নাই তাহাদের ব্যথা—
মন যায় উড়ে
দূরে কত দূরে—
কারা যেন ডাক দিয়ে যায়
মন মোর কেবলি তাদের পিছে ধায়।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গঙ্গার পার
চারধারে আহা কত ফুলের বাহার
তারপর অজানার বনপথে যাই
ভাষাহীন মিঠে মিঠে সুরের রোশনাই—
কিছুদূর গিয়ে ঘন ফুলের সুবাসে
আহা! যেন শেষ ঘুম আসে।

অনন্ত শয্যার মাঝে শুয়ে শুয়ে পড়ি বারবার,
মন্দ্রে মোর দোলা দেয় সুরের ঝঙ্কার—
দখিনের বাতাসেতে উড়ে চলে একখানি গান
থেমে যায় সুদূরের তান।
দু'ধারের ফুলগুলি ঝরে ঝরে পড়ে
আমারি ও-চরণের 'পরে।

তবু মোর ভ্রূক্ষেপ নাই
মন মোর খুঁজে ফেরে একটি কথাই—
জীবনের যাহা ছিল পুঁজি
তোমার আঁখির মাঝে অন্তহীন ভাষা ফিরে খুঁজি।

কল্যাণ-রাষ্ট্রে ছাত্রজীবন

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে কলেজে পাঠরত ছাত্রগণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি এক অনুসন্ধান হইয়াছে : অধ্যাপক কে. পি. চট্টোপাধ্যায়, ডঃ পি. কে. বোস এবং শ্রী. এ. চ্যাটার্জী মহাশয়ের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে আলোচ্য অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। অনুসন্ধানের ফলে ছাত্র-সমাজের নিদারুণ জীবনযাত্রার এক নগ্ন চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যে সকল তরুণ আগামীকাল রাষ্ট্র পরিচালনের রথ-রশ্মি ধারণ করিবে কি অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করিয়া তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আপনাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছে তাহা পড়িলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

অনুসন্ধানের রিপোর্ট হইতে আমরা জানিতে পারি, কলিকাতার মোট কলেজীয় ছাত্রসংখ্যার পরিমাণ হইতেছে কিঞ্চিদধিক ৪৩,০০০। ইহার মধ্যে ১১,৭০০ জন পূর্ব্ববঙ্গের ছিন্নমূল এবং ৬০০০ জন বাংলার বহিরাঞ্চল হইতে আগত। মোট ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ৩০,৫০০ জন ছাত্র কলিকাতা এবং শহরতলীতে তাঁহাদের পিতামাতার সহিত বসবাস করেন; ৮,১০০ জন ছাত্র তাঁহাদের নিকট অথবা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনদিগের সহিত থাকেন; অবশিষ্ট সকলে মেস অথবা ছাত্রাবাসে বসবাস করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে ইহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বহিরাগত মোট ছাত্রসংখ্যার ২,৮০০ জন তাঁহাদের পিতামাতার সহিত বাস করেন।

মোট কলেজীয় ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৬৯ জন সেই সকল পরিবারে থাকিয়া পড়াশুনা করেন যাঁহারা কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। ইহার কারণ বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী কলেজের অভাব এবং আপনার শিক্ষাব্যয় আপনি উপার্জ্জন করিবার অভিলাষ। প্রথম বার্ষিক শ্রেণী অপেক্ষা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রধানতঃ পূর্ব্বোক্ত কারণে কলিকাতায় থাকেন এবং তাঁহাদের সংখ্যাও অধিক।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি শিল্পকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যার শতকরা ৫৭ জনের কৃষিকর্ম্মই হইতেছে প্রধান উপজীবিকা। মাত্র শতকরা ২৭ জন চাকুরী এবং অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকেন; ইঁহারাই মধ্যবিত্ত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, সংখ্যালঘু হইয়াও তাঁহাদের পরিবারসম্ভূত ছাত্রগণ কলিকাতার মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৮৮ ভাগ অধিকার করিয়া আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—উচ্চশিক্ষা লাভ এবং জ্ঞানের দেউলে দীপ প্রজ্বালন মধ্যবিত্ত সমাজের মজ্জাগত অভীপ্সা।

পশ্চিমবঙ্গের ক্রমক্ষীয়মাণ মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক দৈন্যের ভয়াবহতা সকলেরই জানা আছে এবং জাতীয় জীবনের উপর তাহার প্রভাব যে কি হইবে বা হইতেছে তাহা আমরা এখনই বুঝিতে পারতেছি। কিন্তু অভাব-অনটন এখনও সম্পূর্ণরূপে পাঠ-স্পৃহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে পারে নাই তাহাও আমরা বর্ত্তমান রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি। শতকরা ৩১ জন ছাত্র সেই সকল পরিবার হইতে আগত যেখানে জনপিছু মাসিক আয়ের পরিমাণ ৩০ টাকা মাত্র। শতকরা ৩৩ জন সেই সকল পরিবার হইতে আসেন যাঁহাদের মাসিক আয় জনপ্রতি ৩০-৫০ টাকা; শতকরা ২০ জন মাথাপিছু ৫০-৭৫ টাকা আয়সম্পন্ন পরিবার-ভুক্ত; শতকরা ৯ জন হইলেন ৭৫-১০০ টাকা জনপ্রতি আয় সম্পন্ন পরিবারভুক্ত এবং মাত্র শতকরা ৭ জন জনপ্রতি ১০০ টাকার উপর আয়সম্পন্ন পরিবারভুক্ত।

অর্থসমস্যা-কণ্টকিত মধ্যবিত্ত সংসারভুক্ত ছাত্রগণের অধ্যয়ন-স্পৃহা অভিনন্দনীয় হইলেও যে প্রতিকূল অবস্থার সহিত প্রতিনিয়ত সংগ্রাম তাঁহাদের করিতে হইতেছে তাহা মানসিক স্বাস্থ্য সুদৃঢ় করিবে কিনা জানি না, তবে ছাত্রদের দৈহিক স্বাস্থ্য যে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে এ সম্পর্কে দ্বিমত থাকিতে পারে না। এই অসহনীয় আর্থিক অবস্থায় অধ্যয়ন অবসরে ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই "হোল টাইম" চাকুরি অথবা "পার্ট টাইম" চাকুরি করিয়া একাধারে সংসার প্রতিপালন এবং অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে ৬,৫০০ ছাত্র "হোল টাইম" চাকুরি করেন এবং ৪,৭০০ "পার্ট টাইম" কাজ করিয়া থাকেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর চাকুরিয়া ছাত্রের সংখ্যা শতকরা অনেকাংশে বেশী।

বাসগৃহ সমস্যা ছাত্রগণের সহজ অগ্রগতির পথে যে অন্যতম একটি বাধা তাহাও অনুসন্ধানে নিরূপিত হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যার বৃহদংশ থাকেন ইষ্টকনির্ম্মিত সাধারণ গৃহে এবং খুবই অল্পসংখ্যক বসবাস করেন অট্টালিকায়। বস্তীতে বসবাসকারী ছাত্রসংখ্যাও অল্প নহে। ছাত্রাবাস এবং মেস সমেত ইষ্টকনির্ম্মিত বাসগৃহ-বাসী ছাত্রসংখ্যা ৩৩,১০০ জন; ৫,৬০০ ছাত্র টিন অথবা টালীর ছাদবিশিষ্ট বাসগৃহে বসবাস করে এবং অবশিষ্ট ছাত্রগণ কাঁচা গৃহে বাস করে।

পাকা গৃহবাসী ছাত্রসংখ্যা বেশী হইলেও ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, তাঁহারা সুখে আছেন; চলাফেরা করার প্রয়োজনীয় স্থান লাভে তাঁহারা বঞ্চিত! ২৩,৬০০ ছাত্র এমন পাকা গৃহে বাস করেন যেখানে তাঁহারা মাত্র ২৪ বর্গফুট স্থান পান—যাহা মাত্র একটি চৌকী পাতিবার পক্ষে প্রশস্ত; মাত্র ৭,৭০০ জন ছাত্রের নিজস্ব শয়নঘর আছে এবং বাকী সকলে একাধিক ব্যক্তির সহিত থাকেন; কিঞ্চিন্নূন ৬,৪০০ জন ছাত্রের পৃথক পড়ার জায়গা আছে এবং ২৭,৫০০ জন অন্যান্য কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত এবং বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীর সহিত একই ঘরে পড়াশুনা করিয়া থাকেন।

মোট ছাত্রসংখ্যায় ১৮,৫০০ জন মাত্র পুস্তক ক্রয় করিবার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান। শতকরা ৩৪ জন ছাত্র পুস্তক চাহিয়া-চিন্তিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন এবং শতকরা ১১ জন গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হন। কিন্তু শতকরা ১২ জন এই সকল সুযোগ লাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

ছাত্রসমাজের জীবনযাত্রার যে চিত্র এতক্ষণ দেখিলাম তাহাতে ইহা শুনিলে আশ্চর্য্য ঠেকিবে না যে প্রায় ১২,৯০০ জন ছাত্র ১০০-২০০ টাকা পর্যন্ত মাহিনা পাইলে অবিলম্বে অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ জীবনের উপজীবিকা হিসাবে কি বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক সে সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা যায় বেশীর ভাগ ছাত্র এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার পক্ষপাতী; ডাক্তারী বিদ্যার প্রতি বিশেষ স্পৃহা নাই তবে সরকারী চাকুরীর প্রতি অনেকের মোহ আছে। ১৮,৯০০ জন ছাত্র ভবিষ্যৎ জীবিকা সম্পর্কে কোন সঠিক পরিকল্পনা করেন নাই। সম্ভবতঃ বেকার-সমস্যা এবং বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ইহার জন্য দায়ী।

অনুসন্ধান যে কেবল ছাত্রগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; কলেজের শিক্ষাদান-পদ্ধতি, শিক্ষার সুযোগ এবং দৈহিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

সরকারী কলেজসমূহ এবং দুইটি বেসরকারী কলেজ ব্যতীত অন্যান্য কলেজে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ১১৫ টাকা মাত্র এবং ইহার ৯৫ ভাগ ছাত্রগণ প্রদত্ত বেতন হইতে সংগৃহীত হয়। কলেজ-সমূহের আর্থিক অবস্থা প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক নিয়োগের প্রতিকূল হওয়ায় আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সম্ভবপর হইতেছে না। গবেষণাগারের আবশ্যক যন্ত্রপাতির অভাব এবং গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাব, রীডিং-রুমের অল্পপরিসর স্থান ইত্যাদি মিলিয়া কলেজীয় শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

অপরিমিত ছাত্র-গ্রহণের ফলে শিক্ষাদান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অপ্রচুর অধ্যাপক এবং স্থানাভাবহেতু অল্পসংখ্যক ছাত্র লইয়া শ্রেণী গঠন করা সম্ভব নহে। ফলে বৃহৎ ছাত্রমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া অধ্যাপক তাঁহার অধ্যাপনা সমাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

কলিকাতার ন্যায় ঘনবসতি শহরে বিরাটভাবে খেলাধূলার আয়োজনের ব্যবস্থা কলেজ-কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে দৈহিক পেশী সঞ্চালন এবং কয়েকপ্রকার ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা প্রায় সকল কলেজেই আছে; আউটডোর গেমসের জন্য প্রয়োজনীয় খোলা মাঠ মাত্র তিনটি সরকারী কলেজের আছে। অন্যান্য কয়েকটি কলেজের ময়দান অথবা অন্য কোথাও নিজস্ব অথবা সম্মিলিত মাঠ আছে।

এক দিকে সংগ্রাম অপর দিকে খাদ্যাভাব, এক দিকে ক্ষয় অপর দিকে পরিপূরণের অভাব ইহাই আমরা দেখিতে পাই রিপোর্টের প্রতি পৃষ্ঠায়। বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে, ৪৩,০০০ ছাত্রের মধ্যে ১৮,৫০০ জন ছাত্রের পুষ্টির অভাব। ১৪,৬০০ ছাত্র কোনক্রমে সাধারণ পুষ্টির সীমায় উপনীত হইয়াছে এবং মাত্র ৯,৯০০ ছাত্র প্রকৃত পুষ্টির সীমায় অবস্থানকারী। যুদ্ধোত্তর সময়ের দুর্মূল্যতা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবহেতু ছাত্র-স্বাস্থ্য এত নামিয়া গিয়াছে বলিয়া রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছে।

অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, শতকরা মাত্র ৬ জন সেই পরিমাণ খাদ্য খাইতে পারে যাহার দ্বারা সে শরীরের প্রয়োজন মিটাইয়া অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে। ইহা অর্জ্জন করিতে জনপ্রতি ২৷৵০ আনা খরচ হইয়া থাকে।

দেহধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও শরীরের প্রয়োজন মিটাইয়া অতিরিক্ত শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব নহে এইরূপ খাদ্য শতকরা ১০ জন খাইয়া থাকে। ইহার জন্য জনপ্রতি খরচ পড়ে ১৷।

মাথাপিছু ১ টাকা খরচ করিয়া শতকরা ৫৩ জন ছাত্র এমন খাদ্য লাভ করেন যাহাতে প্রোটিন জাতীয় কোনপ্রকার সামগ্রী লেশমাত্র নাই বলিলে চলে। এই খাদ্য খাইয়া কোনক্রমে জীবন-ধারণ করা চলে মাত্র; দেহগঠন এবং স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্ভব নহে।

অবশিষ্ট ছাত্রগণ ভাত বা রুটি এবং ডাল খাইয়াই জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। তাঁহারা মাথাপিছু ৸০ আনা খরচ করিয়া ইহা লাভ করিয়া থাকেন।

এই ধরণের খাদ্য খাইয়া স্বভাবতঃই ছাত্রগণ দৈহিক স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য হারাইতেছে এবং নানা প্রকার রোগজীবাণু আসিয়া পুষ্পকে কুঁড়ি অবস্থাতেই বৃন্তচ্যুত করে; ইহাও আমরা রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি।

অনুসন্ধান-ফলাফল সম্পর্কিত পুস্তকের ভূমিকাতে মাননীয় উপাচার্য্য মহাশয় গভীর দুঃখ এবং ক্ষোভের সহিত ছাত্রসমাজের বর্ত্তমান ভয়াবহ এবং আত্মঘাতী জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্ত্তনকল্পে কয়েকটি পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়াছেন।

ভূমিকার প্রারম্ভেই ছাত্রদরদী উপাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন যে, তাঁহাকে প্রায়ই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় কিসের জন্য এত অধিক সংখ্যক ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়। ইহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন আমাদের ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রসংখ্যা ২৮,৮০০ জন এবং তাহারা ১৫-১৭ বৎসর বয়স্ক; ইহা কোনক্রমেই যথার্থ সমাধান নহে যে দরিদ্র হইলেও কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সমাজ হইতে আগত এই সকল তরুণ এত অল্প বয়সে কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। প্রায়শঃই বলা হইয়া থাকে ইংলণ্ডে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন, তথায় উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় ১৮ বৎসরেরও অধিক বয়সে কিন্তু আমাদের এখানে ১৫ বৎসর বয়সে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার উপর ইংলণ্ডে দিনে চাকুরী করিয়া ছাত্রেরা সন্ধ্যায় বিনা বেতনে বাণিজ্য এবং শিল্প সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া জীবনের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারে। কিন্তু এখানে তার কণামাত্র সুবিধা আছে কি?

তিনি লিখিয়াছেন যে, আর্থিক অনটন যেখানে প্রধান সমস্যা সেখানে ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়া বিশেষ লাভ হইবে না। ইহার পরিবর্ত্তে যাহাতে ছাত্রগণ অল্প খরচে বাসস্থানের সুবিধা লাভ করিতে পারে তাহার জন্য খড়্গপুর টেকনোলজিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হলের ন্যায় 'হল' স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং তাহা রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে রাখিবার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অবিশ্বাস্য অল্পপরিসর বাসস্থানের অধিকারী হওয়ায় তিনি বলিতেছেন, অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ছাত্র ঐরূপ গৃহে তিন ঘণ্টার অধিক পড়িতে সক্ষম হয় না; কলেজেও ছাত্রেরা ৬-৯ বর্গফুট জমি পায়; ফলে সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহারা বাধ্য হয়। গৃহ এবং কলেজের এই স্থান সমস্যায় সমাধানকল্পে তিনি সুইজার-ল্যাণ্ডের ডে-ষ্টুডেন্টস হোমের ন্যায় 'হোম' স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে পারিলে স্থানাভাব সমস্যা-জর্জরিত মোট ছাত্রসংখ্যার অর্দ্ধসংখ্যক পাঠাভ্যাসের চমৎকার সুযোগ লাভ করিবে। অপুষ্টি এবং তজ্জনিত নানা রোগে শতকরা ৪৩ জন ছাত্র কষ্ট পাইতেছে। ডে-ষ্টুডেন্টস হোম সংলগ্ন স্বাস্থ্যসম্মত ক্যানটিনের ব্যবস্থার দ্বারা এ সমস্যারও আংশিক সমাধান হইতে পারে।

কলিকাতার কলেজসমূহের আর্থিক সঙ্গতি অল্পপরিসর স্থানে অসম্ভবরকম ছাত্রসংখ্যার একত্র সমাবেশ এবং ছাত্রপিছু ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনতি-বিলম্বে কলিকাতায় আটটি ছাত্র কলেজ এবং দুইটি ছাত্রী কলেজ স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কলেজ-সমূহ অপরিমিত ছাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, উপাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন, ছাত্রপিছু বাংলা সরকার যদি প্রত্যেক কলেজকে ১০০ টাকা সাহায্য করেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য ঐরূপ প্রতি কলেজকে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর করেন তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে এবং উপযুক্ত পরিবেশে ছাত্রগণ প্রকৃত শিক্ষালাভ করিবে।

ইহার পর তিনি বাণিজ্য-বিভাগের উন্নতি-সাধন সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করিয়া ছাত্রগণের সামরিক শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করিয়া তাঁহার ভূমিকা শেষ করিয়াছেন।

অনুসন্ধানের রিপোর্ট এবং উপাচার্য্য মহাশয়ের ভূমিকা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম ছাত্র-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে মুক্তি-সংগ্রামে ছাত্রগণ যে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন স্বাধীনোত্তর ভারতে ইহাই কি তাঁহাদের পুরস্কার? দেশের যুবকেরাই আপনাদিগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, দৈহিক সৌন্দর্য্যে এবং কর্ম্মকুশলতায় সমগ্র দেশকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়া থাকে কিন্তু যে দেশে যুবক-ছাত্রগণ সর্ব্বদা দারিদ্র্যের বেদীমূলে আত্মাহুতি দিতেছে সে দেশের উন্নতি কোথায়? উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, মুক্ত আলো বাতাসের অভাবে এবং অবিরাম সংগ্রামে তাহাদের জীবনের সকল মাধুর্য্য দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। নানা সমস্যার জটিলতায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে বাঙালী তরুণদিগের জয়যাত্রা। হতাশার বেদনায় তাহারা মুহ্যমান। সংবেদনশীল উপাধ্যক্ষ মহাশয় যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে কার্য্যকরী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সরকার ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে উহার বাস্তব রূপদান অসম্ভব। বাংলাদেশের আপনার নিজস্ব ঐশ্বর্য্যময় ঐতিহ্য আছে যাহা তাহাকে অন্যান্য দেশ হইতে নূতন বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে; সেই ঐতিহ্য সেই কৃষ্টি বাঙালী, বাঙালী ছাত্র-সমাজই কালে কালে গড়িয়া তুলিয়াছে। ইতিহাসের প্রাচীন পুঁথি দেখিলে সহজেই জানিতে পারা যায় জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে শিল্পকলায় বাঙালীর অগ্রগতির ইতিকথা। এমনকি এই সেদিন পর্যন্ত বাঙালী জ্ঞানের দীপবর্ত্তিকা সর্ব্বাগ্রে ধারণ করিয়া অবশিষ্ট ভারতকে অন্ধকারে পথ চিনাইয়াছে। আজ অবশ্য রাজনৈতিক কারণে বাঙালীর গতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকারী সাহায্য এবং সহানুভূতি লাভ করিলে বাঙালী যুবক আবার সর্ব্ব-ভারতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। এই অনুসন্ধান রিপোর্ট পাঠ করিয়াও যদি সরকার নিষ্ক্রিয় থাকিয়া যান তাহা হইলে উপাচার্য্য মহাশয়ের সাবধান বাণী তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিই—যদি উপযুক্ত যত্ন, সহানুভূতি এবং সহৃদয় পরিচালকের অভাবহেতু মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তরুণগণ ক্রমশঃ বিমর্ষ এবং হতাশ হইয়া পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সম্মুখে নিদারুণ ধ্বংস অপেক্ষা করিয়া আছে।

বৈদিক উপমা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

সাহিত্য রচনায় যত প্রকার অর্থালঙ্কার ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে উপমাপ্রয়োগই সর্বাপেক্ষা অধিক। দৈনন্দিনের সাধারণ কথাবার্তায়ও আমরা বহু উপমা ব্যবহার করিয়া থাকি। সমান ধর্ম-গুণ-ক্রিয়াদিবিশিষ্ট পদার্থ উপমানরূপে ব্যবহার করিতে দেশকাল ভেদে লেখকে লেখকে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একজন ভারতীয় সাধারণতঃ যে স্থলে 'দুগ্ধের ন্যায়' অথবা 'চন্দ্রের ন্যায়' শুভ্র বলেন, সে স্থলে একজন ইউরোপীয় বলেন, 'তুষারের ন্যায়' শুভ্র। ভারতীয় লেখায় যাহা 'দুগ্ধ ফেন-নিভ' কোমল, ইউরোপীয় লেখায় তাহা 'পাখীর পালকের ন্যায়' কোমল। ইহা হইতে লেখকের দেশগত বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য, তাঁহার সমাজ পারিপার্শ্বিক, পর্যবেক্ষণ শক্তি, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি অনেক কথা অনুমান করিতে পারা যায়।

ঋগ্বেদে একটি উপমা আছে 'চৌরবৎ দ্রুতগামী' (৬-১২-৫)। উপমাটি হইতে বুঝিতে পারা যায়, বৈদিককালেও চোরের উপদ্রব ছিল এবং তৎকালের চোরেরা ঠিক একালের চোরেদের মত অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিত। উক্তির অন্তর্নিহিত ভাব সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যেই উপমার প্রয়োগ হয় বলিয়া উপমান পদার্থটি সকলের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। গাভী ঋষিদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রিয় গৃহপালিত পশু ছিল। এ কারণ ঋগ্বেদের মন্ত্রমধ্যে গাভীর উপমা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কয়েকটি উপমা এইরূপ :

দোহক যেমন দুগ্ধবতী গাভীকে দোহনের জন্য আহ্বান করে (সুদুঘামিব গোদুহে), আমরাও সেইরূপ ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। ১-৪-১

গাভী যেরূপ গোষ্ঠের দিকে যায় (গাবো ন গব্যূতীরনু উচ্ছন্তীঃ) আমার চিন্তা সেইরূপ বরুণের দিকে যাইতেছে। ১-২৫-১৬

গাভী যেরূপ সুন্দর তৃণে তৃপ্ত হয়, মনুষ্য যেমন নিজের গৃহে তৃপ্ত হয় (গাবো ন যবসেষ্বা মর্য ইব স্ব ওকে) সেইরূপ তুমি (সোম) আমাদের হৃদয়ে তৃপ্ত হইয়া অবস্থান কর। ১-৯১-১৩

জলপ্রবাহের কুল-কুল ধ্বনির উপমায় আছে :

বৎসের সহিত মিলিত গো সকল যেরূপ বৎসের জন্য শব্দ করে (বৎসং সংশিশ্বরীরিব) সেইরূপ উদকসমূহ বরুণের স্তুতি করিতেছেন। ৮-৬৯-১১

একালেও আমরা গাভীর দুগ্ধ পান করি। কিন্তু গাভীর সহিত সেরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক সম্পর্ক নাই। ঋষিরা যে সকল ক্ষেত্রে গাভীর উপমা দিয়াছেন, আমরা এখন সে সকল স্থানে অন্য উপমা ব্যবহার করি। গাভী ও গো-বৎসের উপমা এখন অন্ততঃ এরূপ ক্ষেত্রে অচল।

অগ্নির নিকট প্রার্থনায় বলিতেছেন :

মা নো দেবানাং বিশঃ
প্রস্নাতী-রিবোস্রাঃ
কৃশং ন হাসুরঘ্ন্যাঃ। ৮-৭৫-৮

হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না যেমন দুগ্ধপ্রদাত্রী গাভীকে কেহ পরিত্যাগ করে না, গাভীগণ যেরূপ কৃশ বৎসকে পরিত্যাগ করে না।

সাধারণভাবে পশু প্রকৃতির উপমাও আছে :

তৃণ ভক্ষণার্থ মুক্তবন্ধন পশু যেমন সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করে, সেইরূপ তুমি (অগ্নি) বৃক্ষ সকলকে ভক্ষণ কর। ৬-২-৯

মৃগগণ কুপিত সিংহ হইতে যেরূপ দূরে অবস্থান করে সেইরূপ শত্রুগণ আমা হইতে দূরে অবস্থান করুক। ৫-১৪-৩

দ্রুতগমনে, পশুমধ্যে ঘোটক এবং পক্ষীমধ্যে শ্যেনের উপমা পাওয়া যায়।

তুমি (সোম) একটি সুচারু গতিশীল ঘোটক। ৯-৬৪-১৯

(সোম) শীঘ্রগামী অশ্বশাবকীর ন্যায় অবলীলাক্রমে ধাবিত হইতেছেন। ৯-৮৬-১

(সোম) শ্যেনপক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে আপন স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। ৯-৬২-৪

শ্যেনপক্ষীর সহিত সোমের উপমা বহু স্থানে, বহু প্রকারে দেওয়া হইয়াছে। কথিত আছে, শ্যেনপক্ষী মূজবান্ পর্বত হইতে সোমলতা আনয়ন করিয়াছিল (১০-৩৪-১)। তৎপূর্বে ঋষিরা সোমরসের ব্যবহার জানিতেন না। সম্ভবতঃ ঐ কাহিনী হইতেই পবমান সোমরস ও শ্যেনপক্ষীর মধ্যে নানা দিক দিয়া সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে।

একটি উপমায়, বিশেষ এক ভাবে উপবেশনের ভঙ্গী পাই।

মধৌ ন মক্ষ আসতে। ৭-৩২-২

মধুতে যেমন মধুমক্ষিকা উপবেশন করে।

আকর্ষণহেতু অভিমুখে গমন করিবার উপমায় আছে :

বৎসং গৌরিব ধাবতু
পথা বারিব ধাবতু। ১০-১৪৫-৬

বৎসের প্রতি গোমাতা যেরূপ ধাবিত হয়। জল যেমন নিম্ন দিকে ধাবিত হয়।

স্বামী-স্ত্রী ও নর-নারীর উপমা স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে :

পত্নী যেমন স্বামীর প্রথম আহ্বানে ত্বরান্বিত হইয়া আসেন (পত্নীব পূর্বহূতিম্) অহোরাত্র সেইরূপ আমাদিগের প্রথম আহ্বানে ত্বরান্বিত হইয়াছেন। ১-১২২-২

মনুষ্য যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে (যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ), সূর্য সেইরূপ উষার পশ্চাতে আসিতেছেন। ১-১১৫-২

যুবা-পুরুষ যেরূপ কন্যার আহ্বান সেবা করে (যোষাং জুষেথাং যুবশেব কন্যনাম্) সেইরূপ তোমরা (অশ্বিদ্বয়) এই যজ্ঞে সোম সেবা কর। ৮-৩৫-৫

স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেরূপ যুবতীর সেবা করে, সেইরূপ হে ইন্দ্র তুমি আমাদের স্তুতি সেবা কর। ৩-৫২-৩

প্রণয়বতী নারী যেরূপ রূপাভিলাষী পুরুষকে বশীভূত করে সেইরূপ ইন্দ্র মনুষ্যকে বশীভূত করেন। ৮-৭২-৯

(অগ্নি) কুমারীগণের প্রণয়ী, বিবাহিত স্ত্রীদিগের পতি (জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাম্)। ১-৬৬-৪

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া উপমা পাইতেছি :

পিতা যেরূপ অপথগামী পুত্রকে উপদেশ দান করেন (পিতেব কিতবং শশাস) সেইরূপ হে দেবগণ, তোমরা আমাকে উপদেশ দান কর। ২-২৯-৫

পুত্র যেরূপ মধুর বাক্যে পিতার বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করে (পিতুর্ন পুত্রঃ সিচমা রভে), আমি সেইরূপ মধুর স্তুতি দ্বারা তোমার (ইন্দ্রের) বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করিতেছি। ৩-৫৩-২

সন্তানের প্রতি মাতার সস্নেহ ব্যবহারের উপমা :

মাতেব যদ্ ভরসে পপ্রথানো

জনংজনং ধায়সে চক্ষসে চ। ৫-১৫-৪

(অগ্নি) তুমি জননীর ন্যায় সকলকে পালন কর।

মৃতদেহ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত* করিবার মন্ত্রে আছে :

মাতা পুত্রং যথা সিচা-

ভ্যেনং ভূম উর্ণুহি। ১০-১৮-১১

মাতা যেরূপ আপনার অঞ্চল দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন সেইরূপ (হে পৃথিবী) তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।

সাংসারিক পরিবেশের বাহিরে নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ, পক্ষী, বন্যপশু প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুর উপমায় পাওয়া যায় :

নদী যেরূপ সমুদ্রকে পূর্ণ করে সোম সেইরূপ দেবলোকে ইন্দ্রকে পূর্ণ করেন। ১-৫২-৪

নদী যেরূপ প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। ৬-১৯-৫

ধারা-নদী যেরূপ ভূ-মণ্ডলে গমন করে, সোম সেইরূপ চারিদিকে গমন করেন। ৯-৪১-৩

ইনি (সোম) পুনঃ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় সকল স্থান আচ্ছাদন করিতেছেন। ৯-৮০-১

ভারতীয়দের নিকট নদী, সমুদ্র, প্লাবন প্রভৃতি জলের উপমা এমনি স্বাভাবিক এবং মাধুর্যপূর্ণ যে, বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমরা উপমানের জীবন্তরূপ মানসপটে দেখিতে পাই।

গীতায়ও আছে :

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ

সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি। ১১-২৮

যাবানর্থ উদপানে

সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে। ২-৪৬

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। ২-৭০

একটি মন্ত্র আছে :

বায়ু যেমন জল হইতে শৈবাল অপসারিত করে বৃহস্পতি সেইরূপ আকাশ হইতে অন্ধকার অপসারিত করিলেন। ১০-৬৮-৩

উপমাটি যেমন স্বচ্ছ তেমনি কবিত্বপূর্ণ।

বিপদ বা শঙ্কটময় অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার স্তুতিতে নৌকায় নদী পার হইবার উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে :

বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ

সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি পার্ষি। ৫-৪-৯

হে জাতবেদা, নাবিক যেরূপ নৌকা দ্বারা নদী পার করে সেইরূপ তুমি আমাদিগকে দুঃখ দুরিত হইতে পার কর।

অনুরূপ মন্ত্র আরও আছে :

নৌকায় যেরূপ নদী পার করে, হে অগ্নি, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে শত্রু সমূহ হইতে পার করিয়া দাও। ১-৯৭ (৮-৭)

(ইন্দ্র) সমস্ত শত্রুগণ হইতে নৌকা দ্বারা নির্বিঘ্নে পার করুন। ৮-১৬-১১

পত্র-সমন্বিত ও পত্রহীন বৃক্ষের উপমা :

পক্ষিগণ যেরূপ সুন্দর পত্রধারী বৃক্ষকে আশ্রয় করে, সোম সেইরূপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করেন। ১০-৪৩-৪

পত্রহীন বৃক্ষের যেরূপ ছায়া থাকে না, সেইরূপ বিচরণশীল সূর্যের ছায়া থাকে না। ১০-২৭-১৪

ত্রিত ঋষি কূপ মধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার দুঃসহ কষ্টের উপমা দিতেছেন :

সং মা তপন্ত্যভিতঃ

সপত্নীরিব পার্শবঃ

মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ। ১-১০৫-৮

সপত্নীদ্বয় স্বামীর উভয় পার্শ্বে থাকিয়া যেরূপ সন্তাপ দেয়, মূষিক যেরূপ সূত্র দংশন করে দুঃখ আমাকে সেইরূপ দংশন করিতেছে।

কুরুশ্রবণ তাঁহার পিতৃবিয়োগের মানসিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন ঐ একই উপমার সাহায্যে—(সপত্নীরিব পার্শবঃ··· ইত্যাদি) ১০-৩৩ (২-৩)

বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নি, পৃথিবী, সোম প্রভৃতি পৃথিবীর দেবতা ; ইন্দ্র, বায়ু, পর্জন্য অন্তরীক্ষের এবং বরুণ, সূর্য, ঊষা, রাত্রি প্রভৃতি স্বর্গের দেবতা। পৃথিবীর দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিই প্রধান। অগ্নির উদ্দেশ্যে যে সকল স্তব রচনা করিয়াছেন, ঋষিরা তাহাতে অগ্নির ধর্ম, গুণ ও ক্রিয়া নানা উপমার সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইনি রাজার ন্যায় ব্যগ্র (১-৫৮-৪)। ধনের ন্যায় বিচিত্র, সূর্যের ন্যায় সকল বস্তুর দর্শয়িতা, প্রাণবায়ুর ন্যায় জীবনরক্ষক, পুত্রের ন্যায় হিতকারী, অশ্বের ন্যায় লোককে ধারণ করেন, দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় উপকারী (১-৬৬-১)। তস্করের পশুর ন্যায় শৃঙ্গ চালনা করিতেছেন (১-১৪০-৬)। অগ্নি তৃষিতের ন্যায় বনসমূহকে দগ্ধ করেন, জলের ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করেন, রথবাহী অশ্বের ন্যায় শব্দ করেন (২-৪-৬)।

একটি মন্ত্রে অগ্নিকে অতি বিস্তৃতভাবে বৃষের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। বলিতেছেন :

* মৃতদেহের অগ্নি-সংস্কার ও মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিবার উভয় প্রকার প্রথাই বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল।

অগ্নি অল্পবয়স্ক বৃষের ন্যায় আমোদ করিতেছেন, তাঁহার শিখাই তাঁহার ককুদ। বৎসটি দেখিতে সুশ্রী, কত খেলা করিতেছে, শব্দ করিতেছে। ১০-৮-২

অগ্নির সংহারমূর্তির একটি উপমা :

স্বর্ণকার যেমন ধাতুসমূহ দ্রবীভূত করে (দ্রবিঃ ন দ্রাবয়তি), তদ্রূপ অগ্নি কাষ্ঠ সকল ভস্মসাৎ করিয়া কুঠারবৎ নিজ জিহ্বা নিঃসৃত করিতেছেন। ৬-৩-৪

ঋষিরা কোন্ পদার্থকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর মনে করিতেন, উষার স্তুতি রচনায় তাঁহাদের ব্যবহৃত উপমা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

উষাগণ* উজ্জ্বল অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের ন্যায়। ১-৯২-১

উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন। দোহনকালে গাভী যেমন স্বীয় উধঃ প্রকাশ করে উষাও সেইরূপ স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। ১-৯২-৪

ঋষিরা সোমরস পান করিতেন। প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সোমলতা ছেঁচিয়া উহা হইতে রস বাহির করিয়া ঐ রস গো-চর্মের কলসে সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত। যে পাথরের উপর সোমলতা ছেঁচা হইত, ঋষিরা ঐ পাথরকেও দেবতাজ্ঞানে নানা উপমা সহকারে বন্দনা করিয়াছেন।

ইহারা (সোম ছেঁচিবার পাথর) শব্দ করিতেছেন, যেমন মাংসাশীরা মাংস পাক হইলে আহ্লাদসূচক রব করে, যেমন বৃষগণ নবীন বৃক্ষের শাখা ভক্ষণকালে রব করে (১০-৯৪-৩), যেমন ক্রীড়াসক্ত শিশুরা ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত করিয়া ঠেলিয়া দিয়া শব্দ করিতেছে। ১০-৯৪-১১

বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থসমূহ প্রধানতঃ তত্ত্বচিন্তার আকরগ্রন্থ রূপেই বিবেচিত। এই সকল গ্রন্থ সাধারণ ব্যক্তির নিকট সশ্রদ্ধ পূজা পাইয়া থাকে—সাহিত্য হিসাবে কেহ অধ্যয়ন করেন না। পণ্ডিতেরা নানা দিক দিয়া ঋগ্বেদের আলোচনা করিয়াছেন, যেহেতু ইহাতে প্রাচীন আর্যদিগের ইতিহাস, সমাজ, রীতি-নীতি, জীবিকা প্রভৃতি বহু তথ্য পাওয়া যায়। সাহিত্য রসিকদিগের উপভোগ্য প্রচুর সাহিত্যরসও যে এই সকল আদি ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে রহিয়াছে তাহার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

* প্রত্যহ নূতন নূতন উষা আগমন করেন এইরূপ মনে করিয়া বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে।

মৃত্যুর ছায়ায়

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবন ও মৃত্যুর মাঝে রে
ব্যবধান একচুল ;—নয় তাও।
এখনই যে জন ছিল কাছে রে—
পলক না ফেলিতেই সে উধাও !

আমরা যতই কাঁদি মায়াতে
খুঁজে খুঁজে মিলে না তো সন্ধান !
মৃত্যুর খড়্গের ছায়াতে
পাতা আছে সকলেরই গর্দান।

জীবন সরাইখানা ভাই রে !
আমরা তো রজনীর মুসাফির !
প্রভাতে কোথায় চ'লে যাই রে !
থেমে যায় কলরব যাত্রীর।

একা একা চ'লে যাই আঁধারে
প্রত্যেকে আহ্বান আসিলেই !
এ জীবন প্রকাণ্ড ধাঁধাঁ রে,—
যে ধাঁধাঁর উত্তর নেই ! নেই !

জীবন-নাগরদোলা দুলিছে ;
হাসি হ'তে নামাইছে কান্নায় ;
সুখের আকাশে পুনঃ তুলিছে ;
নামা-ওঠা—এর কোন শেষ নাই !

ওরে মূঢ়, তৃষাতুর মুঠিতে
কারে ধরো ? এর নাম সংসার !
সরে সরে যায় সব ! ধূলিতে
জেনো শেষ-পরিণতি সব্বার।

চুলোচুলি চীৎকার কোরো না !
এসো সবে, পাশাপাশি বসা যাক্ !
হাত দিয়ে হাতখানি ধরো না !
কে জানে কখন্ কার আসে ডাক্ !

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত পরিক্রমা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

১৯৫৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের এক প্রভাতে সরকার-নিযুক্ত একটি কমিটির আমরা কয়জন সন্ধ্যা প্লেনে দক্ষিণ ভারত অভিমুখে রওনা হই। এয়ারওয়েজের প্লেন ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত দেখিয়া উড়িতে উড়িতে বঙ্গোপসাগরের উপর মেঘলোকপথে লুক্কায়িত হওয়ায় পারের বিশেষ কিছু দেখা গেল না। মনে আছে, তীরের অদূরে থাকাকালে সুবর্ণরেখা নদীর সর্পিল গতিতে সাগরে আসিয়া পড়ার শোভা যেন দেখিয়াছিলাম। পুরীর বেলাভূমি কখন মিলাইয়া গিয়াছে, চিল্কা হ্রদও অদৃশ্য—বেলা দশটায় বিশাখাপত্তনে যাত্রা ভঙ্গ হইল, অল্পক্ষণের জন্য ডাকোটার হাত হইতে রেহাই পাওয়া গেল। মাটিতে নামিবার আগে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়ালটেয়ারের পার্ব্বত্য তীর ও বেলাভূমি ভালরূপে দৃষ্টিগোচর হইল। বেলা একটা নাগাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলাম। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর প্রোগ্রাম অনুযায়ী মিটিং সারিয়া শহরে বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল। যানের অভাব হয় নাই এবং মালিক-চালক বন্ধুগণ গাইডেরও কাজ করিলেন। পূর্ব্বে এদিকে কাকিনাড়া (কোকনদা) পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম, তখন মাদ্রাজ শহরটি দেখার সুযোগ হয় নাই। ময়লাপুর, এগমোর, আড্যেয়ার, চেটপুট প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরিয়া সন্ধ্যার সাগরতটে মেরিনাতে আসিয়া বসিলাম। আড্যেয়ারে এনি বেসান্টের থিওসফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্রটি এবং রামকৃষ্ণ মিশন দেখিলাম। মিশনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজার জন্য শাখা-সিন্দুর লইয়া গিয়াছিলাম, কারণ এই দুইটি বস্তু নাকি মাদ্রাজে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারত হইতে শঙ্খ আমদানী করিয়া আমাদের শাঁখারীরা শাঁখা প্রস্তুত করে, কিন্তু মাদ্রাজে তৈরি হয় না। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ হইতে সম্থোম পর্য্যন্ত সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। সত্যই মাদ্রাজের উপকূল পরম রমণীয় স্থান। সমগ্র পৃথিবীর সমুদ্রোপকূলসমূহের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

রাত্রি দশটায় এগমোর ষ্টেশন হইতে মিটার গেজ লাইনে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করা গেল। পরদিন ভোর পাঁচটায় মায়াবরম ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া আদিরাম পত্তনমের গাড়ী ধরা গেল। বেলা এগারটায় যথাস্থানে পৌঁছিয়া ষ্টেশনের পার্শ্বস্থ মেটুর কেমিক্যালের লবণের কারখানা দেখিলাম। সরকারী নিমক পান্থনিবাসে বিশ্রাম, স্নান ও ভূরিভোজনে যাত্রার ক্লেশ ঘুচিল। আদিরাম-পত্তনমের অধিবাসীদের সাদর অভ্যর্থনা ও মধুর আপ্যায়ন বড় ভাল লাগিল। অপরাহ্ণে মেটুর কেমিক্যাল করপোরেশনের ছোট ল্যাবরেটরী দেখিলাম।

সন্ধ্যায় ট্রেন ধরিয়া টিউটিকোরিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। রাত্রি এগারটায় প্যাসেঞ্জার ট্রেণে তিরুত্তরাইপুণ্ডি হইতে সদ্য স্থাপিত রেললাইন দিয়া সংক্ষেপিত পথে করাইকুডি পৌঁছানো গেল। এখানে ভারত-সরকারের ইলেকট্রো কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে রাত্রে ষ্টেশনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল, সোজা পথে মাদুরা যাইবার কোন বাস বা ট্যাক্সি মিলিল না। ওয়েটিং রুমে সহযাত্রী অন্যান্য সদস্যদের সহিত গল্পগুজব, পায়চারি ও কফি পান করিয়া সময় কাটাইতে ভালই লাগিয়াছিল। রাত্রি ত্রিপ্রহরে করাইকুডি হইতে ট্রেনে মনমাদুরাই আসিলাম। এখানেও মাদুরাই যাইবার কোন যান মিলিল না, অগত্যা সকলকেই ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

পরদিন সকাল আটটায় ট্রেন ধরিয়া মাদুরা আসিলাম। মাত্র এক ঘণ্টার পথ, এখানে টিউটিকোরিন এক্সপ্রেস ধরিতে হইবে। হাতে কিছু সময় থাকায় একটি ট্যাক্সি করিয়া মীনাক্ষী মন্দির দেখিয়া আসিলাম। বিখ্যাত মন্দিরটির চত্বর দৈর্ঘ্যে ৮৪৭ ফুট এবং প্রস্থে ৭২৯ ফুট, গোপুরম নয়টি—বৃহত্তমটি ১৫২ ফুট উচ্চ। প্রস্তর-ক্ষোদিত সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট দেবায়তন এবং দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিতে দ্রাবিড় কারুশিল্প ও স্থাপত্যকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন চোখে পড়িল। মাদুরাই অতি প্রাচীন নগর, কিন্তু বিরাট মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন রাজা তিরুমালানায়েক ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে।

টিউটিকোরিন—বেলা এগারটায় মাদুরা ছাড়িলাম, সারাদিন ট্রেনে পশ্চিম ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের শোভা দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ সীমান্তের টিউটিকোরিন বন্দরে পৌঁছিলাম বেলা চারটায়। থাকিবার ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিল, সমুদ্রের ধারে দ্বিতল নিমক বাংলোতে আশ্রয় পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল, প্রাণ ভরিয়া মুক্ত সমুদ্রবায়ু উপভোগ করিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই বন্দর এবং লবণ প্রস্তুতির কয়েকটি কারখানা দেখিলাম। কফি হাউসে কফি পাইয়া মাদুরা স্পিনিং মিলের কারখানার পাশে একটি পুরাতন রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। পরদিন সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কমিটির সভ্যবৃন্দ অনেকগুলি কারখানা দেখিলেন, বর্ত্তমানে এইগুলি হইতে প্রচুর লবণ কলিকাতার বাজারে আসিতেছে।

অপরাহ্ণে মোটরে টিনেভেলি আসা গেল। পার্ব্বত্য পথ, রুক্ষ এবং বন্ধুর—দু'পাশের ভূমি অতি অনুর্ব্বর। সূর্য্যাস্তের রঙীন আভায় প্রদীপ্ত একটি সু-উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে বড় ভাল লাগিল। টিনেভেলী হইতে কন্যাকুমারী চুয়ান্ন মাইল, সেই রাত্রেই একটি ট্যাক্সি করিয়া আমরা কন্যাকুমারীর পথে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু রেল-সংযোগ নাই, নিয়মিত বাস সার্ভিস আছে, তবে বাস সকালে ছাড়ে। রাত্রি এগারটায় কন্যাকুমারী পৌঁছিয়া ব্যবস্থামত কেপ হোটেলে উঠিয়া নৈশভোজন সমাপন করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলাম।

টিনেভেলী হইতে আসার পথে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে

প্রবেশ করিয়াছিলাম—রাস্তা ভারি সুন্দর। প্রত্যুষে উঠিয়া হোটেলের ব্যালকনি হইতে সূর্যোদয় দেখিলাম, শ্রদ্ধেয় শ্রীজিতেন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার ছোট বিলাতী ক্যামেরায় ছবি তুলিলেন। এখানেও অনেকগুলি লবণ-ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করা হইল। কার্য্যশেষে কন্যা-কুমারীর মন্দির-দর্শনে গেলাম।

কন্যাকুমারী—ত্রিসমুদ্রের সঙ্গমস্থল। পশ্চিমে আরবসাগরে সূর্য্য অস্তমিত হইল। দক্ষিণে ভারতমহাসাগর হইতে স্নিগ্ধ বাতাস বহিয়া আসিতেছে। উভয় সমুদ্রই প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত, বেলাভূমিতে তরঙ্গগুলি ফেনিল উচ্ছ্বাসে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের ঘননীল বারিরাশি স্থির, অচঞ্চল। বাঙ্গালীর নিকট এই তীর্থস্থানের বিশেষ গুরুত্ব আছে। একদা এখানেই—ভারতের পাদমূলে, একটি শিলাখণ্ডে বসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

কন্যাকুমারীর পথ
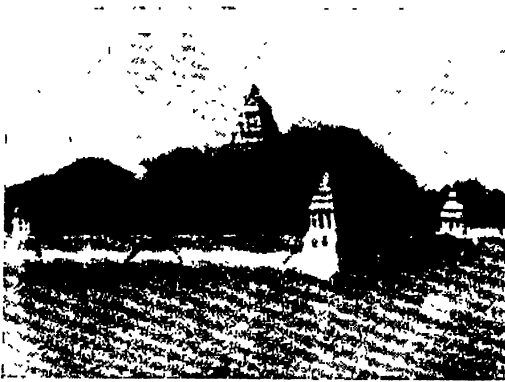
দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণে মহাসাগরের তীরভূমি এবং দেবী কন্যা-কুমারীর মূর্ত্তি দেখিয়া এত ভাল লাগিল যে, মনে হইল এত দূরে ভারতের দক্ষিণে একেবারে শেষপ্রান্তে আসা সার্থক হইয়াছে। ত্রিসাগরের সঙ্গমস্থলে বড় বড় শিলাখণ্ডের মধ্যে যাত্রীদের তীর্থ-স্নানের ঘেরা স্থানটি দেখিলাম, সরকারী কাজে সারা সকাল অতিবাহিত হওয়ায় অবগাহনের পুণ্যসঞ্চয় ভাগ্যে ঘটে নাই। উঠিয়া মন্দির-চত্বরে আসিলাম। প্রাচীরবেষ্টিত দেউলের চত্বরে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কোন দ্বার নাই, উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে দ্বার, পূর্ব্ব দিকের দ্বার বন্ধ, উত্তর দিকের সিংহদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইল। গায়ের পিরানটি খুলিয়া, কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়া দেবীদর্শনে গেলাম, কেননা উন্মুক্ত গাত্রে মন্দির-প্রবেশ করাই রীতি। শ্বেতপাথরে গড়া দেবী মহামায়ার কুমারীমূর্ত্তিটিকে যেন জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়, ওষ্ঠ স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত, চক্ষু দুইটি ভাসা ভাসা, গলায় ও হাত দুটিতে ফুলের মালা ধারণ করিয়া আছেন, যেন করধৃত পুষ্পমাল্য দেবাদিদেবের গলায় পরাইয়া দিতে উদ্যত। দেবীমূর্ত্তিতে ফুটিয়া-উঠা এই সুন্দর ভাবটি মুগ্ধ হইয়া দেখিলাম। কিংবদন্তী আছে, পৌরাণিক যুগে ভব ও সুখ নামে দুই অসুরের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে দেবী মহাশক্তি কুমারীরূপে এই স্থানে অসুরদ্বয়কে নিহত করেন। তাহার পর হইতে দেবী এই স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন এবং নিয়মিত ভাবে তাঁহার পূজার প্রচলন হয়।

দশ মাইল দূরে সুচিন্দ্রমে আছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি ভৈরব। তিনি কন্যাকুমারীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু দেবতারা ভাবিলেন যে, মহাশক্তির আধার অসুরমর্দ্দিনী কুমারী-রূপিণী দেবী, বিবাহিতা হইলে শক্তি হারাইবেন এবং পুনরায় অসুরদের অত্যাচার আরম্ভ হইবে। তাঁহারা তখন কৌশল অবলম্বনে বিবাহলগ্ন পার করিয়া ভৈরবকে আটকাইলেন, তাই বিবাহ হইল না। লগ্ন বহিয়া যাওয়ায় কন্যার নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভাবটি দেবীর মূর্ত্তিতে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বরণের মালা হাতেই রহিয়া গিয়াছে, নটরাজের গলায় আর দেওয়া হয় নাই।

বিবেকানন্দ রক, কন্যাকুমারী

সুচীন্দ্রম মন্দির দ্রাবিড় স্থাপত্যকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন। নাট্য-মন্দিরে সহস্র স্তম্ভের প্রতিটির niche-এ একটি করিয়া সুন্দর নটীমূর্ত্তি ক্ষোদিত এবং প্রত্যেকটির হস্তযুগলে একটি করিয়া অনন্ত প্রদীপ—কি মহিমময় দৃশ্য তা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যায় না। রাত্রি তখন বোধ করি আটটা, মূল মন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তরের মহালিঙ্গের আরতি দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গেলাম।

রাত্রি বারোটায় ত্রিবেন্দ্রম পৌঁছিলাম। সকলেই ট্র্যাভেলার্স বাংলোতে উঠিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের পরেই ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য—এখানে শিক্ষার প্রসার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দেশটি যে উন্নতিশীল তাহা কেপ হইতে পঞ্চাশ মাইল পথ আসিতে বুঝা গেল। পরিষ্কার পিচ-বাঁধানো রাস্তা, আগাগোড়া ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোষ্ট এবং প্রতি দুই-তিন মাইল অন্তর গ্রাম বা শহর, তিন ভাগের এক ভাগ লোক খ্রীষ্টান। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি হইতে প্রায় এক শত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এখানে পুরুষ-দিগের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জন ও স্ত্রীলোকদিগের শতকরা চল্লিশ জন শিক্ষিত।

পরদিন সকালে শহর ঘুরিতে বাহির হইলাম। প্রথমে টাটা এয়ার ইণ্ডিয়া আপিসে বাঙ্গালোরের টিকিট কিনিয়া শ্রীপদ্মনাভ মন্দির দর্শন করিতে যাওয়া গেল। মন্দিরটি ক্ষুদ্রায়তন, ইহার কারুকার্যও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরের মত নহে। মন্দিরের গর্ভগৃহমধ্যে নারায়ণের শয্যাশায়ী বিরাট শিলামূর্তি বিশেষভাবে দর্শনীয়। গর্ভগৃহের কক্ষদ্বার সঙ্কীর্ণ হইলেও মূর্তিটি বিশাল, সম্ভবতঃ দেবতা প্রতিষ্ঠার পর দ্বার নির্মিত হইয়াছিল।
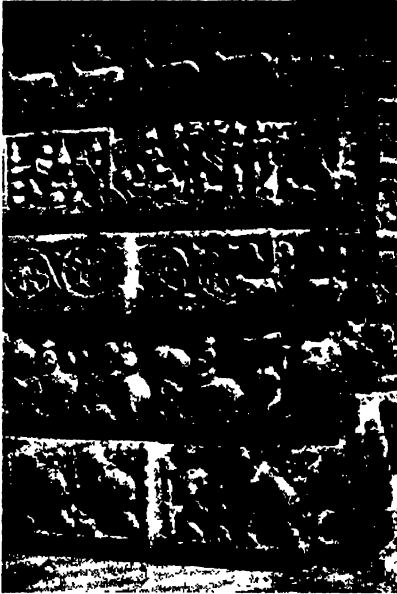
দ্রাবিড় স্থাপত্যের কারুকার্য

ইহার পর দেখিলাম—বিশ্ববিদ্যালয়; বাড়ীগুলি বেশ সুন্দর, একোয়েরিয়াম, চিত্রশালা, রঙ্গবিলাস প্রাসাদ প্রভৃতি। চিত্রশালায় ভারতবর্ষের খ্যাতনামা শিল্পীদের ছবি রহিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, নন্দলাল, সারদা উকিল, রণদা ও বরদা উকিল, অসিত হালদার, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

টাটার প্লেন ছাড়িল প্রায় সাড়ে বারোটায়। প্লেন ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত ও আরব সাগরের উপর দিয়া উড়িয়া কোচিনে আসিয়া পৌঁছিল। আকাশ হইতে দ্বাদশ দ্বীপের দেশ এবং অন্যতম বৃহৎ বন্দর কোচিনকে বেশ ভালরূপেই দেখা গেল। চমৎকার দৃশ্য—এদিকে সাগর, উপকূলে দাঁড়াইয়া আছে বৃক্ষের সারি এবং সু-উচ্চ ইমারতগুলি, ওদিকে সুদূরের অস্পষ্ট গিরিমালা হইতে নামিয়া-আসা নদীগুলি কোচিনের জলভাগে মিশিয়াছে। সম্ভবতঃ বৃষ্টি হইয়াছে খুব, দূরের আকাশ তখনও ঘোলাটে।

বাঙ্গালোর—কোচিনের পর কয়ম্বাটোরে অল্পক্ষণ 'হল্ট' করিয়া ডাকোটা নীলগিরি পর্বতমালার উপর দিয়া উড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে মেঘপুঞ্জের মধ্যে পড়িয়া রীতিমত দোল খাইতে লাগিল এবং উত্তকামণ্ড পার হইয়া বেলা প্রায় চারটায় বাঙ্গালোরে পৌঁছাইয়া দিল। বাঙ্গালোরের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মাত্র তিন হাজার ফুট উচ্চ, কিন্তু সারা বৎসর অল্প অল্প ঠাণ্ডা থাকে। এখানে হোটেলের পরিবর্তে এক বন্ধুর আবাসে আশ্রয় জুটিয়া গেল—তাঁহার মোটরে সব ঘুরিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মালভূমির উপর নগরীটির দৃশ্য নয়নাভিরাম। এখানকার দ্রষ্টব্য ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়ান্স, মিউজিয়ম, আর্টগ্যালারী, লালবাগ, কুবোন্‌স পার্ক ইত্যাদি। উচ্চাবচ, প্রশস্ত রাজপথসমূহের দুই পাশে বাগিচাসমেত বাড়ীগুলি শহরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। মিলিটারী ক্যাণ্টনমেণ্ট ছাড়া এখানকার দ্রষ্টব্য হইতেছে—হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট ফ্যাক্টরী, মেশিন টুলস্‌ ফ্যাক্টরী, রেশম, রেশমী বস্ত্র, চীনামাটি, চন্দন তৈল ও সাবানের কারখানাগুলি। বাঙ্গালোর মহীশূর রাজ্যের হেডকোয়ার্টার।

মহীশূর—মহীশূর শহর বাঙ্গালোর হইতে মাত্র ছিয়াশী মাইল দূরে—মিটার গেজ লাইনে রাতের মেলে রওনা হইয়া সকালে এখানে পৌঁছিলাম। সকলে মিলিয়া রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। একটি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া সকাল সকাল বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমেই গেলাম চামুণ্ডী পাহাড়ে—দেবী দুর্গার মন্দির দর্শনের অভিপ্রায়ে। চামুণ্ডীর মহাদেবের বৃষটি দর্শনীয়। ষোল ফুট উচ্চ একটি প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া এটি নির্মিত। গাড়ীতে করিয়াই আমরা চূড়ায় দশভুজার মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌঁছিলাম।

মহীশূররাজ-প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীমূর্তির সহিত বাংলা দেশের শাক্ত দেবীমূর্তির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। পাহাড় হইতে নামিয়া জগনমোহন প্যালেস, ললিতামহল, মিউজিয়ম প্রভৃতি দেখিলাম। জগনমোহন প্যালেসের আর্ট গ্যালারী দেখিবার মত বটে। কয়েকটি ছবি অতি সুন্দর লাগিয়াছিল—কয়েকটি পুরাতন ফ্রেস্কো, রবিবর্মার আঁকা মূল ছবি এবং অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের ছবিও দেখিলাম। মহীশূর শহরটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—রাজপ্রাসাদ দেখা হয় নাই, তবে রাতে ইহার আলোকমালার শোভা দেখিয়াছিলাম।

বেলাশেষে শহর ছাড়াইয়া আসিলাম সেরিংগাপটম দেখিতে। সেরিংগাপটমে টিপু সুলতানের সমাধি, কেয়ারী করা উদ্যান এবং ভগ্ন প্রাচীর-গাত্রে আগাগোড়া টিপু, হায়দর, ফরাসী-ইংরেজ যুদ্ধের বিরাট ফ্রেস্কোগুলি দেখিতে দেখিতে বহুক্ষণ কাটিল। অপরাহ্নে আরও কিছুদূর গিয়া মহীশূর শহরের দশ মাইল ব্যবধানে বৃন্দাবন গার্ডেন্‌সে আসিলাম। সেখানে কাবেরী নদীর কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ একটি দেখিবার মত জিনিষ। উদ্যানের বিরাট ব্রিস্টল হোটেলে চা খাইতে খাইতে মনোরম শোভা উপভোগ করিতে লাগিলাম। বৈদ্যুতিক আলোকমালা ও ফোয়ারাগুলি জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শোভা বর্দ্ধিত হইল। মহীশূর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে যথ-

ব্যয়ে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি বা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করায়। নদীর জলস্রোত বা প্রপাতগুলিতে বাঁধ বাঁধিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করায় এই রাজ্যে বহু শিল্পের উৎকর্ষ এবং প্রসারসাধন হইয়াছে।
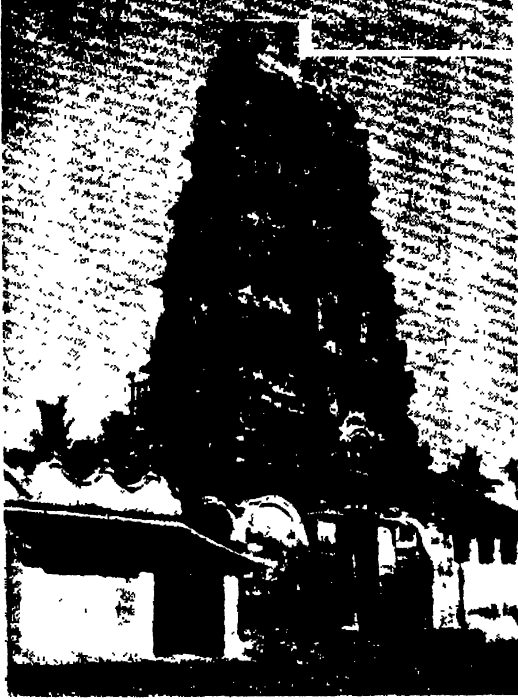
দক্ষিণ ভারতের একটি গোপুরম

সেদিন মহীশূররাজ্যে দশহরা উৎসবের দ্বিতীয় দিবস, সেইজন্য শুধু বৃন্দাবন গার্ডেন্‌স নয়, শহরের সকল প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি বৈদ্যুতিক আলোকমালায় শোভমান দেখিলাম। কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধ ১২৪ ফুট উচ্চ এবং দুই মাইল দীর্ঘ। কাবেরী নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া পঞ্চাশ বর্গমাইল এক জলাধারে জল সঞ্চয় করা থাকে, সেই জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া ছাড়িয়া ১২০ হাজার বর্গএকর ভূমিতে সেচন করা হয়। বৃন্দাবন গার্ডেন্‌সের কিছুদূরে নিম্নের দিকে শিবসমুদ্রম্‌ পাওয়ার হাউসে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হয়। এই উদ্যানের রংবেরঙের আলোকে উদ্ভাসিত হ্রদ, ফোয়ারা এবং সোপানোপরি জলস্রোতের শোভা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম কেন মহীশূরের উপর টুরিষ্টদের এত আকর্ষণ—কাশ্মীরের মত এখানে টুরিষ্ট-ট্রেড অনেকটা উন্নতিলাভ করিয়াছে। উদ্যানটি কাশ্মীরের উদ্যানের মডেলে তৈরি।

বোম্বাই—মহীশূর হইতে বাঙ্গালোরে ফিরিয়া বোম্বাইয়ে আসি। বোম্বাই আসার মুখ্য উদ্দেশ্য কাথিয়াবাড় ও কচ্ছ যাওয়া। শহরে উপস্থিত হইবার পরই কমিটির কাজ আরম্ভ হইল। পরদিন সকালে ভবনগর এয়ার ট্যাক্সিতে স্থান-সংগ্রহের জন্য বুকিং করিতে হইল।

বর্ষা তখনও চলিতেছে, লবণের কারখানাগুলি বন্ধ—চীফ ইঞ্জিনীয়ার গাঙ্গুলী মহাশয়ের পাল্লায় পড়িয়া মারেজ গ্যাস প্লাণ্ট দেখিতে গেলাম। উনি উঠিয়াছিলেন শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাঙ্গালোর লেক

বাড়ীতে, আর আমরা মেরিন ড্রাইভে, গ্রীন হোটেলে। অপরাহ্ণে মালাবার হিলস এবং ষ্ট্র্যাণ্ড চৌপাটি ইত্যাদি স্থানে বেড়াইয়া আসা গেল। ষ্ট্র্যাণ্ডে গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া এবং তাজমহল হোটেলের দিক অপেক্ষা মেরিন ড্রাইভের হাওয়া আরও প্রীতিকর, তবে মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলের মত নহে। মাদ্রাজের মত এখানেও সমুদ্রতীরে একটি একোয়ারিয়াম করা হইয়াছে—ত্রিবেন্দ্রামের মত সুন্দর সুন্দর মাছ ও সামুদ্রিক জীব রহিয়াছে দেখিলাম। এখানে বীচের ধার দিয়া ঘন ঘন যাতায়াতকারী ব্রডগেজ ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের শোভা মন্দ লাগে না।

ভবনগর, জামনগর—জুহু বীচ হইতে সৌরাষ্ট্রের প্লেন ছাড়িল সকাল সাড়ে আটটায়, দুই ঘণ্টার মধ্যে ভবনগর পৌঁছানো গেল—আকাশপথে দূরত্ব মাত্র দুই শত মাইল। পূর্ব্বে একবার এই সার্ভিসে রাজকোট আসিয়াছিলাম। সারাটা পথই আরব সাগর ও দামান উপসাগরের ধার ঘেঁষিয়া প্লেন উড়িতে লাগিল। ভবনগরে বন্ধুবর সুমতি কামদার সদলে মোটর লইয়া এরোড্রোমে আমাদিগকে স্বাগত করিলেন। ভবনগরে দ্রষ্টব্য সবকিছুই দেখিলাম, এখানকার বড় লবণের কারখানাটি দেখা হইল। ভবনগর ষ্টেট অন্যতম উন্নতিশীল দেশীয় রাজ্য ছিল, বর্ত্তমানে ইহা সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত। রাজাসাহেব পেন্‌সন ভোগ করিতেছেন এবং নিজস্ব জমিদারী দেখিতেছেন। স্বল্পবৃষ্টির দেশ কাথিয়াবাড়—এখানে পানীয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার্য্য জল ধরিয়া রাখিবার সুব্যবস্থা আছে। ভবনগর বন্দরটির বিশেষত্ব আছে এখানে জাহাজ একেবারে শহরতলীর সিঁড়িতে আসিয়া লাগে এবং

বোম্বাই হইতে পারে—বার্জে করিয়া মাল দূরে লইয়া যাইতে হয় না।

ভবনগর হইতে রাত্রের ট্রেনে জামনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। রাজকোট বড় রেল ষ্টেশন, গাড়ী এখানে দিক্ পরিবর্ত্তন করিল। আগের বারে রাজকোট দেখিয়াছিলাম, ইহা
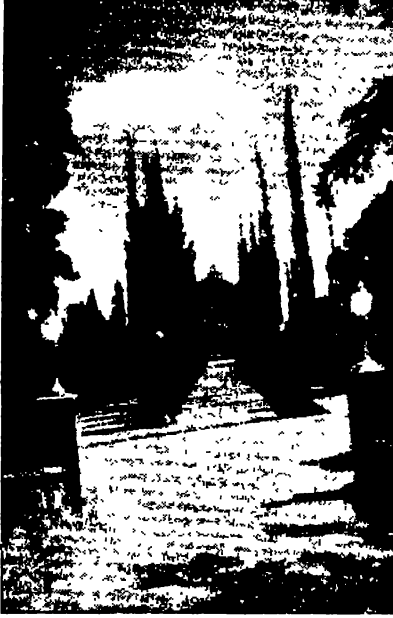
টিপুর সমাধি, সেরিঙ্গাপটাম, মহীশূর

সৌরাষ্ট্রের রাজধানী। বহু বাড়ীঘর, প্রাসাদ ইত্যাদি আছে, গান্ধীজীর পাঠ্যজীবন এই স্থানে কাটিয়াছিল, তাঁহার পিতা ছিলেন এখানকার দেওয়ান। জামনগর পৌঁছিয়া শহরটিকে আরও একটু উন্নত মনে হইল। ইহা নবনগর ষ্টেটের রাজধানী ছিল—জামসাহেব শ্রীদিগ্বিজয় সিংজী বর্ত্তমানে সৌরাষ্ট্রের রাজপ্রমুখ, রাজকোটে যাতায়াত করেন। এখানকার রাজপ্রাসাদটি বিরাট, স্থানীয় জৈনমন্দিরটি বিখ্যাত। জামসাহেব রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে বিশেষ উৎসাহী, তাঁহার চেষ্টায় কতকগুলি বড় বড় লবণের কারখানা, চীনামাটির কারখানা, কাপড়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। জামনগরে সোলারিয়াম—রৌদ্রের সাহায্য লইয়া চিকিৎসার জন্য ঘূর্ণায়মান ক্লিনিক—দেখিলাম। এখানে চর্ম্মরোগের বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। রৌদ্র ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে এলুমিনিয়ম মোড়া সারা ষ্ট্রাক্চারটি ঘুরানো হয়।

দ্বারকা, মিথাপুর, ওখা—প্রাক্তন গণ্ডাল রেলওয়ের জামনগর হইতে ওখা পোর্ট পর্য্যন্ত সৌরাষ্ট্র রেলের শেষ অংশ ওখা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে। ওখার আগে মিথাপুর, তার আগে দ্বারকাতীর্থ। আমরা মিথাপুরে টাটা কেমিক্যালস কোম্পানীর অতিথি হইয়া কয়দিন থাকি এবং সেই স্থান হইতে মোটরযোগে দ্বারকা এবং ওখা বেড়াইতে যাই। রেলপথ হইতে রাত্রে দ্বারকার সিমেন্ট কারখানার আলোগুলি বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল—সমুদ্রোপকূলস্থিত শ্রীরণছোড়জীর মন্দিরের দিকটা তখন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। মিথাপুরে আর একবার ভাল করিয়া লবণ, কষ্টিক সোডা, সোডা এশ এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানাগুলি দেখার সুবিধা হইল।

কাবেরী নদীর একটি দৃশ্য, মহীশূর

কোম্পানীর ম্যানেজার, মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু শ্রীমাধবভূষণ ভাগবত সমস্ত ভাল করিয়া দেখাইলেন। কারখানায় জনকয়েক বাঙ্গালী কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলাম। সোডা-প্রস্তুতিতে এই কারখানা সমগ্র ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দেখিয়া ধন্য হইলাম, প্রাচীন মন্দিরটি মীরাবাঈয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মন্দিরের জগমোহনে উঠিবার রাস্তায় যাইতে আমলাতদার অনুমতি দিলেন। উপরে উঠিয়া তরঙ্গসঙ্কুল আরব সাগরের কোলে দ্বারকাতীর্থের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বড় রুক্ষ ও শুষ্ক দেশ, গাছপালার নিতান্ত অভাব, ভূমি কাঁকর ও বালুতে পূর্ণ। মূল মন্দিরের পাশে রাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতির দশটি মূর্ত্তি দেখিলাম। পরদিন ওখা বন্দরে বেড়াইয়া আসিলাম—ইহা বর্মাশেল পেট্রোলের ঘাটি—নিকটে বেটদ্বারকা দ্বীপ—যাঁহারা তীর্থ করিতে আসেন তাঁহারা ইহা দেখিয়া যান, কারণ ইহাই নাকি মূল দ্বারকা।

পোরবন্দর—রেলযোগে ঘুরপথে না গিয়া আমরা জামনগর হইয়া মোটরে পোরবন্দর আসি। আরব সাগরের উপর পোরবন্দর পরম রমণীয় স্থান, আর আমরা ছিলাম দুই দিন একেবারে বীচের

উপর ষ্টেট গেষ্ট হাউসে—পাশেই প্রাচীরঘেরা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। অপরাহ্নে সূর্য্যাস্ত দেখিলাম ঠিক সম্মুখে—কক্সবাজারের মত। কয়দিন ওখানে দুইটি বাঙ্গালী পরিবারের আতিথেয়তা লাভ করিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীসুধীর গঙ্গোপাধ্যায় এবং ডাক্তার জ্যোতি ঊভয়েই আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরিভোজন করাইলেন। ডাঃ জ্যোতি সুদূর প্রবাসে বেশ প্রাক্‌টিস জমাইয়াছেন। তিনি ছোটখাটো একটি হাসপাতাল ও নার্সিং হোম করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। পরদিন গান্ধীজীর জন্মগৃহ এবং তৎসংলগ্ন "কীর্ত্তিমন্দির"—গান্ধীজীর স্মৃতিমন্দির দেখিলাম। শ্বেতপাথরের ত্রিতল চূড়াবিশিষ্ট বাড়ী—প্রাচীরগাত্রে মহাত্মাজীর কীর্ত্তিকথা উৎকীর্ণ, মন্দিরমণ্ডপের তলে বড় বড় দুইটি তৈলচিত্র—একটি গান্ধীজী এবং অপরটি তাঁহার পত্নী কস্তুরবার।

পরদিন সকালে পোরবন্দরের ছোট রানওয়েতে বোম্বাই-জামনগর-করাচী প্লেন ধরিয়া কচ্ছরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। কচ্ছ উপসাগর অতিক্রম করিয়া বিমানখানি অতি অল্প সময়ে কচ্ছের চীফ কমিশনারের হেডকোয়ার্টার্স ভুজে নামাইয়া দিল।

ভুজ, কাণ্ডলা, পালানপুর ভুজে নামিয়া মনে হইল যেন মধ্য-এশিয়ায় আসিয়াছি। পশ্চিম পাকিস্থানের সীমানার কাছাকাছি কচ্ছে মুসলমান বেশী, তবে বিত্তশালী কচ্ছবাসীরা অধিকাংশই হিন্দু। আমাদের গন্তব্যস্থল কাণ্ডলা পোর্ট, ভুজ হইতে চল্লিশ মাইল পূর্ব্বদিকে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাণ্ডলায় পৌঁছিলাম। কাণ্ডলায় নূতন বন্দর নির্ম্মিত হইতেছে দেখিলাম—পাশেই সুবিস্তৃত লবণের কারখানা পরিদর্শনের জন্য কোম্পানীর রেষ্ট হাউসে এক রাত্রির জন্য আশ্রয় লওয়া গেল। ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিজের সচিব বন্ধুবর কান্তিলাল ঠাকুরের সৌজন্যে কাণ্ডলায় থাকা, খাওয়া, বেড়ানো এবং পরিদর্শনাদি খুব উত্তমরূপেই হইয়াছিল। ক্যাণ্টিনটি খুব বড়, ইহা এডেন কারখানার "মডেলে" নির্ম্মিত। নিকটে দুইটি উদ্বাস্তু-উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে—গান্ধীধাম এবং গান্ধীগ্রাম। সরকার-কর্ত্তৃক বহু অর্থব্যয়ে বড় বড় পাকাবাড়ী এবং রাজপথ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। গান্ধীধামে নূতন রেলষ্টেশন খোলা হইয়াছে। পরদিন এখান হইতেই নূতন মিটারগেজ লাইনে রান অব কচ্ছ হইয়া আমেদাবাদ দিল্লী মেন লাইনের দিকে যাত্রা করি। ভুজ-কাণ্ডলা পুরাতন ষ্টেট রেলপথ ইহার সহিত সংযুক্ত। গান্ধীগ্রাম দেখিয়াছিলাম অন্জারে বেড়াইতে যাইবার পথে, জঙ্গলটি ভারি সুন্দর—পাহাড় জঙ্গলের মাঝে জলাধারের দৃশ্যটি বড়ই মনোরম লাগিয়াছিল। আন্জারের ছুরি, জাঁতি, কাঁচি ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ধরণের—কিছু কিছু সংগ্রহ করা গেল।

কাণ্ডলা হইতে অপর সভ্য কয়জন ভুজ বোম্বাই হইয়া প্লেনে কলিকাতা ফিরিলেন। দিল্লীতে আমার কিছু ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল, আমি পৌঁছিলাম পালানপুরে। পালানপুর অতি নোংরা জায়গা। সিন্ধ-দিল্লী মেল (মিটারগেজ লাইনের) বেলা এগারটায় পালানপুর ছাড়িল এবং রাজস্থানের অন্তর্গত আরাবল্লী গিরিমালার উপর দিয়া সর্পিল গতিতে মাউণ্ট আবু, মাড়োয়ার, আজমীর, জয়পুর, রেওয়াড়ী প্রভৃতি পার হইয়া পরদিন ভোরে দিল্লী পৌঁছাইয়া দিল। দিল্লীতে আমার যে কাজ ছিল তাহা সম্পন্ন হইল। সেই রাত্রেই প্লেন ধরিয়া ফিরিয়া আসি।

তমসা

তাংসুজো ঈশিকাওয়া

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

"যদি সত্যি অন্ধ হয়ে যাও, আমি সইতে পারব না। অসহায়ের মত হাতড়ে বেড়াবে···সেদিন কল্পনা করতেও ভয় হয়। তার আগে আমাদের যেন মৃত্যু হয়"—তার স্ত্রী মাঝে মাঝে বলে। স্বামী ঠিক বুঝতে পারে না, সে উপহাস করছে কি না। না এ তার অন্তরের কথা।

"সত্যি বলছি"—স্ত্রী হয়ত আবার বললে, "বল, বরং আমরা আত্মহত্যা করি। এভাবে বেঁচে থাকা—তিল তিল করে রোজ ক্ষয় হওয়া—সে পারা যাবে না।"

সময় সময় স্বামীও স্বীকার করে তার কথা—হয়ত-বা অনিচ্ছাতেই। কিন্তু অন্য সময় সে এমনি ধরণের কিছু বলে:—

"কাল শুয়ে শুয়ে আমার মাথায় একটা খেয়াল এসেছে। ভাবছিলাম, অন্ধ যদি হয়েই যাই, তখন কি কাজ করা সম্ভব হবে। করবার তেমন কিছুই নেই, গান তো প্রশ্নের বাইরে 'কোটো' বাজানো শেখারই অবসর নেই, তা শেখাব কাকে? কিন্তু ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখলে কেমন হয়? আমি ভেবে-চিন্তে একটা গল্প ঠিক করে রাখব। তুমি লিখে নিও। ডিটেক্‌টিভ গল্প অন্তত: আমার পারা উচিত।"

সে স্ত্রীর দিকে মুখ করে বসে রইল। চোখের উপর সাদা ব্যাণ্ডেজ। পিঠ খুঁটিতে হেলানো। জানলা দিয়ে বসন্তের রোদ এসে কাঁধে পড়েছে। করুণ দৃশ্য। স্ত্রী একবার তাকে অন্ধ রোমাঞ্চ-লেখক বলে কল্পনা করবার চেষ্টা করলে।

ব্যায়ামের অভাবে মেদময়, সূর্য্যের আলোর অভাবে পাণ্ডুর তার দেহ। আর ঐ বন্ধ চোখ দুটি চেয়ে আছে আঁধারের দিকে, সে তমসা যেন অনন্তকালের। সেই আঁধারেই সে তার রহস্যলোকের নানা দৃশ্য দেখবে। হত্যা, রক্তপাত, চুরি, ডিটেকটিভের সঙ্গে আততায়ীর মল্লযুদ্ধ। এই সে দেখবে, ভয়াল ভয়ঙ্কর দৃশ্য সব। নিজের মনের আঁধারে বসে আরও অন্ধকারময় এক জগতের সৃষ্টি করবে। ভয়ে যেন তার গায়ে কাঁটা দিল। মাথা নেড়ে বললে, "না না, তাতে কাজ নেই, আমার ভাল লাগে না। মৃত্যুই ভাল।"

ব্যাণ্ডেজের অন্তরালে স্বামী মৃদু হাসলে।

সে যে অন্ধ হবেই, এখনও তার কিছু স্থিরতা নেই। সহসা তার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেছে। তারার উপর কিছু ঘা-ও হয়েছে। চোখের মণিও আক্রান্ত, সেটাই ভয়ের। ঘা যদি সেরেও যায়, ক্ষতচিহ্ন থাকবে। সেগুলো না সারলে, আর হয়ত দেখতেই পাবে না।

লোকটি সারাদিন বসে বসে রেডিও শোনে। সকাল-সন্ধ্যে স্ত্রী খবর পড়ে শোনায়। তারপর রেডিওতে যখন আর কিছু থাকে না, ভাবনা জাগে, অন্ধ হয়ে গেলে কি করবে।

স্ত্রীর কথা শুনে দু'একবার সত্যি সে আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করেছিল। অল্প সময়ের জন্ত গল্পের কথাও তার ভাল লাগে নি। গোড়ার দিকে কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারই ফলে মাথায় আসে জীবিকার এই সব অবাস্তব কল্পনা। তার পর যেমন যেমন দিন পার হতে লাগল, তার খেয়ালগুলোও ক্রমে সহজ রাস্তা নিলে।

আর তার মূলে দেখা দিল এক উদ্বেগহীন শ্রান্তি। আজকাল ভবিষ্যতের চিন্তা এক রকম সে ছেড়েই দিয়েছে। কবে অন্ধ হবে, সঠিক কেউ জানে না, আর যদি হয়ই একটা-না-একটা কিছু উপায় তখন হবেই, এমনি ভাবখানা। দিনরাত আর ভাবা যায় না। আগে থেকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কল্পনা করতে গেলেই মনের বিকার আসে।

সে শিশুর মত খাচ্ছে। স্ত্রী দেখলে, ভাতের দানাগুলো বাটি ছাপিয়ে বাইরে পড়ে গেল। হেঁট হয়ে সেগুলো জড়ো করে সে উমুনে ফেলে দিল। কেমন রাগ হ'ল তার।

"তুমি কি এখনও খেতেও শেখ নি?"

স্বামী কোন উত্তর দিলে না। অন্ধত্বে যে এখনও অনভ্যস্ত, খাওয়াও তার এক সমস্যা। তার কেবলই মনে হতে লাগল, তার স্ত্রী যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। সে বড়ই একাকী বোধ করলে। জীবনের অসহ তার যেন তাকে স্ত্রীর সান্নিধ্যেই টেনে নিয়ে যায়, আর সেজন্তেই বুঝি তার ক্ষুব্ধ দূরত্ব এত প্রাণে বাজে। পরস্পরের মাঝে কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। যখন সুস্থ ছিল, সবকিছু নিজের ইচ্ছামত করতে পারত, তখন কিন্তু একবারও সে-কথা মনে হয় নি। স্বাস্থ্য বুঝি মানুষকে এমনি নিঃসাড় করে রাখে।

স্ত্রী মাছের কাঁটা বেছে তার প্লেটে তুলে দিলে। শক্ত কাজ, যেন চার বছরের শিশুকে মানুষ করা। সে মাছ খাচ্ছে। মুখে আনন্দের আভাস নেই, যন্ত্রের মতই তা ব্যঞ্জনাহীন। কেবল চোয়াল দুটো দ্রুত নড়ে চলেছে। মাছ শেষ হয়ে গেছে, তবু সে চপ ষ্টিক দিয়ে প্লেটের উপর হাতড়াচ্ছে, প্লেটের সাদা দাগগুলো ধরবার চেষ্টায়। সাদা জিনিষগুলো তবু আবছা দেখে, কিন্তু আর কিছুই দেখতে পায় না।

স্ত্রী নিজের চপ-ষ্টিক ছেড়ে তার নিষ্ফল প্রয়াস দেখতে দেখতে চোখের জলে ফেটে পড়ল, "ওগুলো প্লেটের নক্শা।"

"আর নেই?"

"তুমি ত সবগুলোই খেলে।"

কোন জবাব দিলে না। বাটির ভাতগুলো তাড়াতাড়ি গলা দিয়ে নামিয়ে চপ-ষ্টিক জোড়া ট্রের উপর ছুঁড়ে ফেললে, অসহ্য রাগ হ'ল।

প্রতিদিন স্ত্রী তার হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসে। তারপর গাড়ী ডেকে নিয়ে যায় ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার রোজই নিরাশ হয়ে পড়ছেন।

"সার্জারিতে সময়বিশেষে ফল হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে করলেও পরিণাম কি হবে বলা শক্ত। সুতরাং—"

স্ত্রী বড়ই অসহায় বোধ করে। আশা দেবার তার আর কেউ নেই।

ডাক্তারের কাছে যাবার আগে প্রত্যহ স্ত্রী ভাবে মুখের কিছু কৃত্রিম সজ্জা করবে কিনা। স্বামী যখন দেখতেই পায় না, 'মেক্আপে'র কোন মানে হয় না, বিসদৃশও লাগে। তবু সে 'মেক্আপ' করলে। তা কি আর কারও জন্তে? বেশ জানে, এ তার অন্যায়—তবু নিজের করুণ, অসহায় অবস্থার উপর তার রাগ হয়।

স্ত্রী মুখোমুখি বসে—পরস্পরের হাঁটু ছুঁয়ে আছে; সহসা স্ত্রী তার ডান হাতখানা স্বামীর মুখ থেকে ফুট তিনেক দূরে মেলে ধরল, "দেখতে পাচ্ছ?"

"বুঝতে পারছি একটা কিছু আছে।"

"ক'টা আঙুল?" সে তিনটে আঙুল দেখালে। স্বামী

নীরব। কালকের চেয়েও আজ খারাপ হয়েছে—স্ত্রী বিরক্ত হয়ে ভাবলে।

"বলতে পারব না।"

"এবার"—স্ত্রীর কণ্ঠস্বর আরও রুক্ষ। হাতখানা তার মুখের দু' ফুট কাছে আনল, তাও সে দেখতে পেল না।

"দুটো আঙুল কি ?"

সেদিন আঙুলগুলো একেবারে নাকের কাছে না আসা পর্য্যন্ত সে গুনতে পারলে না। স্বামীর মনে পরাভবের গ্লানি। সে যেন আর স্ত্রীর নিষ্ঠুর রূঢ়তা ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। সে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল।

"বিছানা পেড়ে দাও।"

"তোমার কি ঘুম পাচ্ছে ?"

"জেগে থেকে কি হবে ?"

স্ত্রী কাছে এসে তার ক্ষত গাল ও চিবুক নিরীক্ষণ করতে লাগল। বিশ্রী দাড়ি গজিয়েছে। সে এবার গরম জল করে আনল এবং পেছনে দাঁড়িয়ে তার শক্ত দাড়িগুলো কামিয়ে দিল। ভাল সাফ হ'ল না তাও।

"একবার কাছে এস।" স্বামীর ডাকে স্ত্রী এসে সামনে দাঁড়াল। স্বামী দু' হাত দিয়ে তার পা দুখানার উপর হাত বুলোতে লাগল।

"কি করছ ?"

স্বামী হেসে বললে, "তোমার হাঁটার শব্দ শুনছিলাম।... বড় অদ্ভুত সে শব্দ। নানা রকমের আওয়াজ! আমার মনে হয়েছিল তোমার পায়ের পাতা নিশ্চয় চ্যাপটা হবে—তাই ত দেখছি।"

দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যাবার পর এই প্রথম সে স্ত্রীর পায়ের গঠন লক্ষ্য করলে।

সে একরাশ চীনেমাটির বাটি আর গ্লাস পাশাপাশি সাজিয়ে, তার উপর শব্দ করে বললে, "তুমি যদি এভাবে পুরো স্কেলগ্রামটা সাজিয়ে নিতে পার, তা হলে একটা পিয়ানোই হয়ে যায়।"

ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, এই নিদারুণ অবস্থায় আজও তার স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো বেঁচে আছে। স্বামীর প্রণয় আকর্ষণে দেহ সমর্পণ করে স্ত্রীর কেবলই মনে হতে লাগল, সে যেন আর এক নূতন মানুষের স্পর্শ অনুভব করছে। স্বামীর ব্যবহারে বিস্ময়, উন্মত্ততার আবেগ। তার নিজের সত্তা এবার থেকে হয়ত স্বামীর আঁধারে একখানি মায়াস্বপ্নের মতই ভেসে বেড়াবে, কিন্তু সহসা সে নিরাশ হবার কোনও কারণ খুঁজে পেল না। বরং সেও যদি অন্ধ হয়ে যেতে পারত, তারও আবার নূতন করে জীবন সুরু হ'ত—সে জীবন বিশুদ্ধ শান্তিতে পরিপূর্ণ... নূতন তার আস্বাদ। সে জগতে রং নেই, আকার নেই—কেবল শব্দ, স্পর্শ আর [illegible]। সে একবার চোখ বন্ধ করে তাকালে।

[illegible] অস্পষ্ট ছায়া তার চোখের সামনে [illegible] কেটেছে, কিন্তু এমনটি সে আর কোন দিন দেখেনি।

এক দিন [illegible] স্বামী তাকে বললে, "আমি [illegible]।"

মুহূর্ত্তের জন্য [illegible] স্বামীর মুখের দিকে চাইলে:

"আলোয় আমার [illegible]।"

"একটু চোখ খোল ত।"

দুটো চোখই [illegible] তাকে উঠল। [illegible] আরও দৃঢ় করে [illegible] একটা কোন ভাল কাজের [illegible]। আমার এমন কিছু খারাপ নেই—[illegible] সুখ আছে।"

তার কাঁধে মুখ [illegible]। মুহূর্ত্তের [illegible] ছিল, অন্ধত্ব [illegible] স্বামীর গলা জড়িয়ে তাকে [illegible] লাগল—সুখের দিনে সে এমনি করে [illegible]।*

* *New World Writing* (4th Mentor Selection) হইতে গৃহীত।

তন্ত্রের শাখা ও তন্ত্রসাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

উপাস্য দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতির বিভেদ অনুসারে তান্ত্রিক উপাসকগণ বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকেন। শিব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য ও গণেশের উপাসকগণ যথাক্রমে শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণেশ বা গাণপত্য সম্প্রদায় নামে পরিচিত। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে (৫।৯২-৯৩) বৈষ্ণব, গাণপত্য, শৈব, স্বায়ম্ভুব, চান্দ্র, পাশুপত, চীন, জৈন, কালমুখ বৈদিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়া শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবগণই প্রধান। কোন কোন সম্প্রদায় ত একেবারে অপরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে এক এক সম্প্রদায় বহু উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদের বিস্তৃত পরিচয় প্রায়শঃ দুর্লভ। অথচ একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে নানা-বিষয়ে খুঁটিনাটি পার্থক্য প্রচুর। ফলে কোন গ্রন্থ বা কোন মতের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করিতে হইলে তাহা কোন্ শাখার কোন্ অংশের এবং ঐ অংশের বৈশিষ্ট্য কি তাহা বিশেষভাবে জানা দরকার। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে এখনও যথোপযুক্ত আলোচনা হয় নাই—দীর্ঘকাল পূর্বে উইলসন, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা মূল্যবান হইলেও পর্যাপ্ত নহে।

শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান চারি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে। বেদান্তসূত্রের (২।২।৩৭) ভামতী টীকার মতে মাহেশ্বরদিগের চারি শাখা শৈব, পাশুপাত, কারুণিকসিদ্ধান্তী ও কাপালিক। বেদান্ত-ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য কারুণিকসিদ্ধান্তীর স্থলে কাঠকসিদ্ধান্তী এই নামের উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীনিবাস তাঁহার বেদান্তকৌস্তুভ গ্রন্থে এবং বেদোত্তম তাঁহার পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্যে ইহার স্থানে কালমুখ শাখার নাম করিয়াছেন। শবভস্মস্নান, কপালপাত্রভোজন, লগুড়ধারণ, সুরা-কুম্ভস্থাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সাহায্যে পুরুষার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে—ইহাই এই শাখার অনুবর্তীদের ধারণা।

বীরাগম নামক গ্রন্থে সামান্য শৈব, পূর্বশৈব, মিশ্রশৈব এবং শুদ্ধশৈব এই চারিটি শৈব শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন পুরাণে বাম, পাশুপত, লাগুড়, কাপাল, ভৈরব, সোম প্রভৃতি শাখার উল্লেখ আছে। এগুলি বেদবাহ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের দুইটির নাম পূর্বোল্লিখিত প্রধান চারি শাখার মধ্যে আছে—অপরগুলির সহিত পূর্বোক্ত শাখা-গুলির কোনও সম্পর্ক আছে কিনা বলা দুষ্কর। লাগুড়, নাকুল, লাকুল বা লাঙ্গল সম্প্রদায় ও নকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায় অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। পাশুপতসূত্র, গণকারিকা ও মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে নকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সোমসম্প্রদায় কামাম্নবাদী ও দ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। নামসাদৃশ্যে অনুমান হয়, এই সম্প্রদায়ের সহিত তন্ত্রোক্ত চন্দ্রজ্ঞান-বিদ্যা ও কলাবাদের সম্পর্ক ছিল। কাপাল সম্প্রদায়ের সহিত এই সম্পর্কের কথা লক্ষ্মীধর তাঁহার সৌন্দর্যলহরী টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন ও দাক্ষিণাত্যের সিদ্ধান্তাগমের অনুবর্তী সম্প্রদায় এবং বীর শৈব বা লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় বিশেষ প্রভাবশালী। কণ্ঠে শিবলিঙ্গ ধারণ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বীরশৈবদিগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শৈবসিদ্ধান্ত-মতাবলম্বীরা সাত, ছয়, পাঁচ, চার বা তিন তত্ত্ব মানিয়া থাকেন। ইহাদের নাম শিব, পতি, পশু, শুদ্ধমায়া, অশুদ্ধমায়া, কর্ম এবং আণব। শিব ও পতি, শুদ্ধমায়া ও অশুদ্ধমায়া এবং মায়া, কর্ম ও আণবের ভেদ স্বীকার করা বা না করার উপর তত্ত্বসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। কেহ এই সমস্ত ভেদ স্বীকার করেন কেহ কেহ আদৌ স্বীকার করেন না বা কোন কোনটি স্বীকার করেন। দার্শনিক তত্ত্ববিচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে ভক্তিভাবের প্রাবল্যও অতি প্রাচীনকাল হইতে দেখা যায়।

শাক্তদের মধ্যে বহুবিধ আচার বা উপাসনাপদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। দিব্য, বীর, পশু, বাম, চীন, দক্ষিণ, সময়, কুল প্রভৃতি বিভিন্ন আচারের প্রসঙ্গ তন্ত্রসাহিত্যের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক সম্প্রদায় বা দেবতার পক্ষে এক এক রকমের আচার বিহিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে পশুভাব ব্যতীত অন্যভাব অবলম্বন নিন্দনীয় (পুরশ্চর্যার্ণব—৮৫৫)। তন্ত্রসারের মতে ব্রাহ্মণ বামাচারী হইলেও মদ্য মাংস ব্যবহার করিবেন না—পঞ্চ মকারের অবাধ ব্যবহার চতুর্থাশ্রমী বা সন্ন্যাসীর পক্ষেই বিহিত। তারারহস্যে বলা হইয়াছে—তারার উপাসনায় বামাচার অবশ্য অবলম্বনীয়—স্বগাত্ররুধির দান কালীপূজায় বিহিত, তারাপূজায় নিষিদ্ধ। এই স্বগাত্ররুধির দানও ব্রাহ্মণাতিরিক্ত বর্ণের পক্ষেই বিহিত—সকলের পক্ষে নহে।

বাম, বীর, চীন ও কুলাচারে মদ্য মাংসাদি ব্যবহার এবং শবসাধনাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। দিব্য, দক্ষিণ ও পশ্বাচারে পূজাদি সাধারণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সময়াচারীরা পূজার কোন বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করেন না। অল্প পরিচিত পারানন্দ বা পরমানন্দ মতাবলম্বীদের মতে স্নাস ও বলিব্যতীত শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত কোনও অনুষ্ঠানই নিষিদ্ধ নহে। তন্ত্রে যেখানে ছাগবলি বিহিত হইয়াছে এই মতে সেখানে পিষ্টক নির্মিত ছাগের বলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হিংসা এই মতে নিষিদ্ধ হইলেও রাজার পক্ষে বিহিত। রাজা পরমানন্দ মত অবলম্বন করিলেও যুদ্ধ করিতে পারেন—মুনি-ঋষিদের তপোবিঘ্নকারী হিংস্র ব্যাঘ্রাদিকে বধ করিতে পারেন—এমনকি কালীর সম্মুখে বলিও দিতে পারেন।

অন্যান্য শাখার মধ্যে গৌড়শাখা, কেরলশাখা, দিগম্বরশাখা ও ক্ষপণক শাখার নাম উল্লেখযোগ্য। গৌড়শাখার বৈশিষ্ট্য বামহস্তে পূজন ও দক্ষিণ হস্তে তর্পণ—আর কেরলশাখার দক্ষিণ হস্তে পূজন বামহস্তে তর্পণ (পুরশ্চর্যার্ণব, পৃ. ৮৬৭)। সাধারণতঃ জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাই দিগম্বর ও ক্ষপণক নামে প্রসিদ্ধ। সৌন্দর্যলহরীর টীকাকার লক্ষ্মীধরের মতে কোন কোন শাক্ত সম্প্রদায়েরও এইরূপ নাম ছিল। তাঁহার মতে বামাচারী, দক্ষিণাচারী, দিগম্বর, ক্ষপণক—ইঁহারা সকলেই কুলাচারীর উপশাখা।

বিভিন্ন শাখা ও তাহাদের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীধর এবং ভাস্কর রায় সময় ও কুলশব্দের বিভিন্নরূপ ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য নির্দেশ করিয়াছেন। লক্ষ্মীধরের মতে সময়াচারীরা কোন বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করেন না—তাঁহাদের জপ নাই, হোম নাই, বাহ্যপূজা নাই। ভাস্কর রায় কিন্তু এক শ্রেণীর সময়াচারীদের মদ্য ব্যবহারের কথাও বলিয়াছেন (ত্রিপুরা-মহোপনিষদ্ ভাষ্য—১৫)। লক্ষ্মীধর সময়াচারীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন—পক্ষান্তরে শৈবসিদ্ধান্তপরিভাষায় (পৃ. ৫) সময়াচারীদের সিদ্ধান্ত শ্রবণের অধিকারও স্বীকার করা হয় নাই যেহেতু তাহাদের পশুভাব তিরোহিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন স্বকল্পোক্ত আচারই কুলাচার। যে দেবতার পক্ষে যেরূপ আচার নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই দেবতার উপাসনায় সেই আচার যিনি পালন করেন তিনিই কৌলিক। পঞ্চতত্ত্ব বলিতে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব এবং ধ্যানতত্ত্ব বুঝায়—পঞ্চমকারই পঞ্চতত্ত্ব নয় (নির্বাণতন্ত্র—১২শ পটল)। সুতরাং বৈষ্ণবদের মধ্যেও কুলাচার বামাচার আছে। সময়াচারও শুধু শাক্তদের নয়, শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যেও এই নামের আচার বর্তমান ছিল।

বৈষ্ণবদের প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়, মাধ্ব সম্প্রদায় ও তদনুবর্তী বলিয়া পরিচিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী।

ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীদের বা শুধু ভারতবাসীদের মধ্যেই তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে এবং দ্বীপময় ভারতেও বিভিন্ন তান্ত্রিক শাখার ব্যাপক প্রচলন ছিল। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীমোহনলাল ভগবানদাস ঝাভেরির 'ইন্‌ট্রোডাক্‌শান টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজ্‌ম্' ও 'কম্পারেটিভ এণ্ড ক্রিটিক্যাল স্টাডি অফ মন্ত্রশাস্ত্র (উইথ স্পেশাল ট্রিটমেণ্ট অফ জৈন মন্ত্রশাস্ত্র)' নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন শাখার বিস্তৃত আলোচনা আছে। দ্বীপময় ভারতের তন্ত্রধর্ম সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন ব্যাপক আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কাম্বুজ দেশ, চম্পা ও সুবর্ণ দ্বীপ বিষয়ক গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে এ সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

উপরে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির দার্শনিক তত্ত্ব ও আচার-অনুষ্ঠানের বিচার বিশ্লেষণকে ভিত্তি করিয়া এক বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে আছে সূত্র, মূলতন্ত্র, উপনিষদ, টীকাটিপ্পনী, নিবন্ধ ও পদ্ধতি গ্রন্থ। মূলতন্ত্রগুলি দেবমুখনিঃসৃত বলিয়া পরিগণিত। কতকগুলি তন্ত্রের বক্তা শিব শ্রোত্রী পার্বতী—কতকগুলির বক্ত্রী পার্বতী শ্রোতা শিব। ইহারা যথাক্রমে আগম ও নিগম নামে পরিচিত। যাহা শিবের মুখ হইতে আগত গিরিজার মুখে গত এবং বাসুদেবের অভিমত তাহাই আগম। আর যাহা গিরিজার মুখ হইতে নির্গত গিরীশের কর্ণে প্রবিষ্ট এবং বাসুদেবের অভিমত তাহা নিগম। শিবের বিভিন্ন মুখ হইতে নির্গত বিভিন্ন তন্ত্র পূর্বাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, উত্তরাম্নায়, দক্ষিণাম্নায় ও ঊর্ধ্বাম্নায় নামে প্রসিদ্ধ। কতকগুলি তন্ত্র যামল, ডামর ও উড্ডীশ নামে অভিহিত। ইহারা সাধারণতঃ মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি অভিচারিক অনুষ্ঠানের বিবরণে পূর্ণ।

দেবতাকথিত বলিয়া সমস্ত মূলতন্ত্রই যে প্রাচীন এমন কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ অনেক গ্রন্থের মধ্যে আপেক্ষিক আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। আশঙ্কা হয়, 'বৃহৎ' এই বিশেষণে বিশেষিত গ্রন্থগুলি অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থের নবীন রূপ—কোন নূতন গ্রন্থকে প্রাচীন গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টাই 'বৃহৎ' বিশেষণ সংযোগের হেতু হওয়া বিচিত্র নয়। বৃহদ্রুদ্রযামলের প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে এই আশঙ্কা দৃঢ় হয়। বৃহদ্রুদ্রযামলের কোন উল্লেখ কোন প্রাচীন নিবন্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না। তন্ত্রের যে সমস্ত প্রাচীন তালিকা আছে তাহাদের কোনটির মধ্যেও এই গ্রন্থের নাম আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ

লিখিত ইহার তিনখানি পুথি এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি-শালায় আছে। এই গ্রন্থে বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধরনে পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রীসমাজে প্রসিদ্ধ পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতা-দের মত ইনিও সন্তুষ্ট হইলে ভক্তদের ইষ্টসাধন করেন এবং অসন্তুষ্ট হইলে অবজ্ঞাকারীর অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া থাকেন। লৌকিক দেবতার বিবরণ সংস্কৃত গ্রন্থে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না—সেই দিক্ দিয়া গ্রন্থখানির কিছু মূল্য আছে। পঞ্চানন্দের পূজা তন্ত্রবিহিত ও প্রশস্ত ইহা প্রতিপাদন ও তদ্দ্বারা ইহার গৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলা দেশে অর্বাচীন কালে এই গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিতে পারে। রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থখানিকেও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহার ভাব ও ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাংলা দেশেই বোধ হয় ইহার উৎপত্তি—অন্ততঃ বাংলা দেশেই ইহার প্রচলন। ইহার হস্তলিখিত পুথি অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। এই গ্রন্থে শক্তির উপাসকরূপে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী চিত্রিত হইয়াছে। রাধার সহিত মিলনে ও সমবেত সাধনায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সিদ্ধিলাভ হয়—ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। কয়েকখানি মূলতন্ত্র গ্রন্থে বা তাহাদের অংশবিশেষে চৈতন্যদেবের উল্লেখ দেখা যায়। মূলগ্রন্থগুলি প্রাচীন হইলেও এই অংশগুলির অর্বাচীনতা সন্দেহাতীত। কুলার্ণবের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত ঈশান সংহিতায় নানা যুক্তিসহকারে চৈতন্যদেবের দেবত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বিশ্বসার বা বিশ্বসারোদ্ধারতন্ত্রের অংশরূপে নির্দিষ্ট গূঢ়াবতার নামক খণ্ডে ৪৫৮৬ কল্যব্দে চৈতন্যরূপে বিষ্ণুর অবতরণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঊর্ধ্বাম্নায় সংহিতায় বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধের স্থলে চৈতন্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মযামল ও কৃষ্ণযামলের চৈতন্য-কল্পনামক অংশের পুথি পাওয়া যায়।

মূলতন্ত্র সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল উপনিষদ্ ও সূত্র সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তান্ত্রিক উপনিষদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। মাদ্রাজের আডায়ার লাইব্রেরি হইতে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তদের প্রায় চল্লিশখানি উপনিষদ উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগীর টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত যোগোপনিষদের সংখ্যা কুড়িখানি। আর্থার অ্যাভেলন তাঁহার তন্ত্রগ্রন্থ-মালায় ভাস্কর রায়, লক্ষ্মীধর ও অপ্যয় দীক্ষিতের ব্যাখ্যাসহ কৌলোপনিষদ্, ত্রিপুরোপনিষদ্ প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষদ্ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ইহাদের মধ্যে কয়খানি খাঁটি বৈদিক ও প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

তন্ত্রসাহিত্যে উপলভ্যমান সূত্রগ্রন্থের সংখ্যা খুব কম। শাক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীবিদ্যারত্ন সূত্রে ও পারানন্দসূত্রে এবং শৈব সম্প্রদায়ের শিবসূত্র ও পাশুপত সূত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে সূত্র বলিয়াই যে এগুলি প্রাচীন এমন কথা বলা চলে না। শ্রীবিদ্যারত্ন সূত্রের রচয়িতা হিসাবে গৌড়পাদাচার্যের নাম উল্লিখিত হয়। কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায়ের মুখ্যগ্রন্থ শিবসূত্র স্বয়ং শিবকর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিলেও ইহা খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে বসুগুপ্ত কর্তৃক প্রাপ্ত ও প্রচারিত হয় এরূপ প্রমাণ আছে।

মূলতন্ত্রের সঠিক সংখ্যা বা স্বরূপ নির্ধারণ করা দুরূহ। ইহাদের নামের একাধিক তালিকা পাওয়া যায় সত্য, তবে এই তালিকাগুলির কোনটিকে স্বসম্পূর্ণ বলা চলে না। ঐ সব তালিকায় অনুল্লিখিত কোন কোন গ্রন্থ নিবন্ধ গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে—এই জাতীয় গ্রন্থের পুথিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে তালিকার অন্তর্ভুক্ত অনেক গ্রন্থের কোন উল্লেখ নিবন্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না— তাহাদের কোন পুথিরও সন্ধান মিলে না। কোন গ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণ বা প্রাপ্ত পুথিও সকল স্থলে নির্ভরযোগ্য নহে। একই নামের গ্রন্থের বিভিন্ন রূপ অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একখানি কুলার্ণবের পুথি পাওয়া গিয়াছে। হইতে পারে, ইহা বিশাল কুলার্ণব গ্রন্থের একটি অংশের পুথি—প্রকাশিত সংস্করণ আর এক অংশের। বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অংশ বলিয়া উল্লিখিত অসংখ্য স্তবকবচাদির সন্ধান বহু স্থলেই মূলগ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণ বা উপলভ্যমান পুথিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় অনেক গ্রন্থেরই স্বরূপ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

অবশ্য তালিকাগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। এইগুলি হইতে তন্ত্রসাহিত্যের বিশালতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে। একটি তালিকায় স্থান অনুসারে গ্রন্থগুলি তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। অশ্বক্রান্তা, রথ-ক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা নামক তিন স্থানের প্রত্যেক স্থানের গ্রন্থ-সংখ্যা চৌষট্টি। বারাহীতন্ত্রের তালিকায় কতকগুলি তন্ত্র-গ্রন্থের পরিমাণ নির্দেশ প্রসঙ্গে তাহাদের বিপুল বিস্তারের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কিছু কিছু স্বতন্ত্র তালিকাও পাওয়া যায়। বামকেশ্বর তন্ত্রের (নিত্যাষোড়-শিকার্ণব—১।১৪-২২) তালিকা কৌলসম্প্রদায়ের বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে চৌষট্টিখানি তন্ত্রের নাম আছে। ইহার অনেক নামই অপরিচিত। পরিচিত নামের মধ্যে রুদ্রযামল, কুলচূড়ামণি প্রভৃতি কয়েকটি নাম উল্লেখযোগ্য। আশ্চর্যের বিষয়, এই তালিকায় অতিপ্রসিদ্ধ কুলার্ণবের

নাম নাই। তবে চন্দ্রকলাবিদ্যাপ্রতিপাদক যে, আটখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ইহার নাম আছে। সময়াচার সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি শুভাগমপঞ্চক নামে পরিচিত। বশিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দ ও সনৎকুমার প্রণীত পাঁচখানি সংহিতাই এই শুভাগমপঞ্চক।

বৈষ্ণবদের মধ্যে পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের আগমের সংখ্যা সাধারণতঃ অষ্টোত্তর শত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন তালিকার বিভিন্ন নাম একসঙ্গে মিলাইলে এই সংখ্যা দুই শতের উপর দাঁড়ায়। ডক্টর অটো শ্রাদের নামগুলি একত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। তালিকায় অনুল্লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধানও তিনি দিয়াছেন। দেবামৃত পঞ্চামৃতের নাম তিনি করেন নাই। ইহার একখানি পুথি নেপালের দরবার লাইব্রেরিতে আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উহার বিবরণ দিয়াছেন। একাদশ পটলে সমাপ্ত এই গ্রন্থে বিষ্ণু প্রতিমা ও বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা আছে। ইহা সনৎকুমার ও লোকপিতামহের উক্তি-প্রত্যুক্তির আকারে লিখিত। আর একখানি বিচিত্র গ্রন্থের পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। ইহার নাম মহাকাল পঞ্চরাত্র। ইহা একখানি শাক্ত গ্রন্থ। পঞ্চরাত্র শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ধারণ করা কঠিন। তবে অবৈষ্ণবদের সম্প্রদায়েও ইহার ব্যবহার একেবারে অজ্ঞাত নয়। শিবরাত্রিব্রতের অনুষ্ঠান পঞ্চরাত্র বিধানে করিবার ব্যবস্থা শিবরাত্রি ব্রতকথায় দেখিতে পাওয়া যায়। শিব-রহস্যোক্ত নারদ পঞ্চরাত্রে (১।১।৫৬ ৫৭) ব্রাহ্ম, শৈব প্রভৃতি সপ্তবিধ পাঞ্চরাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে (৩৯।১) পঞ্চরাত্র প্রসঙ্গে সপ্তরাত্রের কথাও আছে।

পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যেও নানা তন্ত্র-গ্রন্থের প্রচলন ও সমাদর আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বাংলার বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ গৌতমীয় তন্ত্রের নাম করা যাইতে পারে।

শৈবদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্তীদের আগম-সংখ্যা অষ্টাবিংশতি। মাদ্রাজ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরির আগম-পুরাণানুক্রমণিকা ও আগমগ্রন্থসংখ্যা নামক গ্রন্থে ইহাদের নাম ও পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার শিবার্চনচন্দ্রিকা গ্রন্থে যে তালিকা দিয়াছেন পূর্বোল্লিখিত তালিকার সহিত তাহার সর্বাংশে মিল নাই। তাঁহার মতে এই অষ্টাবিংশতি আগম দিব্যাগম—ইহার উপভেদ ২০৮। ভাস্কর রায়ও তাঁহার ললিতাসহস্রনামভাষ্যে (শ্লোক ৬৭) ইহাদিগকে বেদানুযায়ী পরমেশ্বর মুখোদ্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শিবার্কমণিদীপিকা নামক বেদান্তভাষ্যে (২।২।৩৮) বায়ুসংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে এই অষ্টাবিংশতি আগম বেদবিরোধী। সংস্কৃতে ও তামিল ভাষায় ইহাদের প্রচুর গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এক দিকে আছে দার্শনিকতত্ত্বের বিশ্লেষণ—অপর দিকে আছে ভক্তিভাবের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি।

ইহা ছাড়া কাশ্মীরীয় শৈবদের সমৃদ্ধ সাহিত্য তন্ত্র-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। স্বতন্ত্র গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত আলোচনাও আছে।

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র গ্রন্থ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। গাণপত্য সম্প্রদায়ের দুই-চারিখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির কুমারসংহিতা ও বিনায়কসংহিতা এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির গণেশকল্পের নাম করা যাইতে পারে। তন্ত্রসার ও প্রাণতোষিণী, শাক্তানন্দতরঙ্গিণীগ্রন্থে গণেশ-বিমর্শিনী নামক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার কোনও পুথি কোথাও আছে বলিয়া জানা যায় না—তাই ইহার পরিচয় অজ্ঞাত। তবে নাম দেখিয়া ইহাকে গণেশের উপাসনাবিষয়ক নিবন্ধ গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। গণেশ সম্পর্কে আর একখানি নিবন্ধ-গ্রন্থের পুথি এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে আছে। উহার নাম মহাগণপতিক্রম—রচয়িতা অনন্তদেব।

নিবন্ধ গ্রন্থ তন্ত্রসাহিত্যের এক বিরাট ও মূল্যবান্ অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। নানা সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের তান্ত্রিক সাধক ও পণ্ডিতগণ তন্ত্র বিষয়ে অগণিত নিবন্ধ টীকা টিপ্পনী ও পদ্ধতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্ত্রের প্রকৃত রহস্য ও তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বুঝিবার ও জানিবার পক্ষে এগুলি অপরিহার্য। ইহাদের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থে ব্যাপকভাবে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—কোথাও কোথাও বা বিশেষ বিশেষ দেবতা ও তৎসম্পর্কিত অনুষ্ঠানের বর্ণনা ও আলোচনা আছে। অতি অল্প পরিমাণ গ্রন্থে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে দেখা যায়। গ্রন্থকারদের নিজস্ব চিন্তা বা বিচারধারার পরিচয় ইহাদের মধ্যে বিশেষ নাই। ইহাদের মধ্যে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলির তালিকা আলোচনা করিলে বুঝা যায় বিস্তীর্ণ তন্ত্র-সাহিত্যের কোন্ গ্রন্থের কিরূপ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ নিবন্ধ গ্রন্থে নাই বা সামান্যভাবে আছে তান্ত্রিক-সমাজে তাহাদের প্রতিষ্ঠা ছিল না বা খুব কম ছিল সন্দেহ নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে অধুনা সুপ্রসিদ্ধ মহানির্বাণতন্ত্রের প্রাচীন নিবন্ধ-গ্রন্থে অনুল্লেখ বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। মূলতন্ত্রের পুথি বা প্রকাশিত সংস্করণের প্রামাণ্য নিরূপণেও নিবন্ধ গ্রন্থ হইতে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কোন গ্রন্থ হইতে নিবন্ধে

উদ্ধৃত অংশ যদি সেই গ্রন্থের কোন পুথি বা সংস্করণে পাওয়া যায় তবেই উহার প্রামাণিকতা সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। অন্যথা সংশয় স্বাভাবিক। অবশ্য নিবন্ধ-গ্রন্থের আকর-নির্দেশও যে সকল ক্ষেত্রে অভ্রান্ত এমন কথা বলা চলে না। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য চাই নিবন্ধ ও মূল গ্রন্থের পুথির পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনামূলক আলোচনা। স্মৃতি-শাস্ত্রে এইরূপ আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে—তন্ত্র ও পুরাণ সম্পর্কে এখনও বিশেষ কিছু হয় নাই।

তান্ত্রিক নিবন্ধকারগণ পণ্ডিত সমাজে গ্রন্থরচয়িতা হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও সাধনার ক্ষেত্রেও ইঁহাদের অনেকে বিশেষ প্রবীণ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অনেকের নামের শেষে যে 'আনন্দনাথ' এই অংশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহাদের সাধনার উৎকর্ষের ইঙ্গিত বহন করে।

তান্ত্রিক গ্রন্থরচয়িতাদের মধ্যে শঙ্করাচার্য, ভাস্কর রায় বা ভাসুরানন্দনাথ, লক্ষ্মণদেশিকেন্দ্র, রাঘব ভট্ট সর্বভারতে প্রসিদ্ধ। বাংলার যে সমস্ত সাধক পণ্ডিত তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ বিবৃত করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ সমধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশে বিভিন্ন সময়ে যতগুলি তন্ত্রনিবন্ধ রচিত হইয়াছে তাহাদের সকল-গুলির মধ্যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত। বাংলার তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রধানত এই গ্রন্থ অবলম্বনেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দের শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও তারারহস্য এবং তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পূর্ণানন্দের শ্যামারহস্য ও শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিও তান্ত্রিক সমাজে সুপরিচিত।

এই জাতীয় গ্রন্থরচনার ধারা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের আদেশে রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার-রচিত প্রাণতোষণী মুদ্রিত হইয়া সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছে, এই সময়েই বাংলার পূর্ব-প্রান্তে হরগোবিন্দ রায় ছয় খণ্ডে পঞ্চমসারনির্ণয় নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। তবে ইহা এখন পর্যন্ত মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

অন্যান্য প্রদেশের সাধক পণ্ডিতদের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ছাড়া মহারাষ্ট্রের শৈব নীলকণ্ঠ। দাক্ষিণাত্যের শ্রীনিবাস ভট্টগোস্বামী ও তাঁহার বংশধরগণ, কাশীর কাশীনাথ ভট্ট, মিথিলার ঈশান শিবগুরুদেব ও নরসিংহ ঠক্কুর, কাশ্মীরের অভিনবগুপ্ত ও সাহিবকৌল এবং নেপালের নরসিংহের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহারা সকলেই বিশিষ্ট বিশিষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা।

কোজাগরী অভিসারে

শ্রীমহাদেব রায়

শতছিন্ন পালে গতি হত
ব্যোম-তরী রহে অচঞ্চল
কাণ্ডারী কোথায় তন্দ্রাগত
সরসীতে ঘুমাল কমল।

অস্ফুট কুমুদ স্ফুটোন্মুখ
ডাকে প্রেমাধার কর্ণধারে,
প্রাচীর গগনে হাস্যমুখ
জাগিছে সে অমৃত-আধারে।

জাগে উৎস শৃঙ্গে গোমুখীর
বহে লাবণ্যের স্রোতোধারা–
তরী 'পরে মুগ্ধ কাণ্ডারীর
ফুটিয়াছে হাস্যের ফোয়ারা।

স্রোতে ভাসে আঙিনা ধরার
তরঙ্গে তরঙ্গে পড়ে লুটি',
মর্ত্যে নৃত্য-রতা অমরার
রাশি-রাশি সৌন্দর্যের মুঠি।

বীতনিদ্রা অভিসারিকার
অভিসারে কোজাগরী জাগে,
বিনিদ্র শারদ শশী তার
অঞ্জলি রচিছে অঙ্গরাগে।

আমাদের আত্মীয়কুটুম্ব

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের সমাজে বহুকাল হইতে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা প্রচলিত আছে। আজকাল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং পাশ্চাত্ত্য অনুকরণে এই প্রথা লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে। এই প্রথা ভাল কি মন্দ—সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। কোনও সংসারে উপার্জ্জনশীল পুরুষের মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির পোষ্যবর্গকে অকূল পাথারে পড়িতে হয়, অন্নবস্ত্রের জন্য নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু একান্নভুক্ত পরিবারের কোনও পুরুষের মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির পোষ্যবর্গকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্নবস্ত্রের জন্য ভাবিতে হয় না। ঐ পরিবারের যিনি কর্ত্তা, সে ভাবনা তাঁহারই এবং তিনি অপক্ষপাত বিচারে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি—এক ব্যক্তির চার-পাঁচটি উপযুক্ত পুত্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন; কাহারও উপার্জ্জন অধিক, কাহারও-বা অল্প—কিন্তু উপার্জ্জনের তারতম্যের জন্য ইহাদের পুত্রকন্যাদের মধ্যে আহারে বা পরিচ্ছদে কোনরূপ ইতরবিশেষ হইত না। যাহার উপার্জ্জন যেরূপই হউক না কেন, সকলকার আহার্য্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদ একই প্রকার হইত। সুতরাং কোন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পোষ্যবর্গের ভার গৃহস্বামী অর্থাৎ সংসারের কর্ত্তা গ্রহণ করিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের এই সুবিধা বড় সামান্য সুবিধা নহে।

কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারে একদিকে যেমন এই সব গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যদিকে আবার ইহার দোষও আছে। কোন ব্যক্তির যদি পাঁচটি উপার্জ্জনশীল পুত্র থাকে, তবে তাহাদের সকলেরই উপার্জ্জন যে সমান হইবে, তাহা নহে; কাহারও উপার্জ্জন অধিক, কাহারও উপার্জ্জন অল্প হইয়া থাকে। কেননা ঐ পাঁচটি পুত্রেরই বিদ্যাবুদ্ধি ঠিক একই স্তরের হইতে পারে না। সাধারণতঃ ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার উপার্জ্জন অল্প সে স্বভাবতঃই উপার্জ্জনবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয় না। কারণ সে জানে যে, তাহার উপার্জ্জন অধিক হইলে তাহার পুত্রকন্যারা পরিবারের অন্যান্য বালকবালিকাদিগের অপেক্ষা বিশেষ সুবিধা কিছুই পাইবে না। এই মনোভাববশতঃ সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া নিজের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করে না।

একান্নবর্ত্তী পরিবার উপযুক্ত কর্ত্তৃত্বাধীনে কিরূপ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। ভূদেববাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দদেব বাবু মুন্সেফ ছিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দদেব প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। মুকুন্দবাবুর আয় গোবিন্দবাবু অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু তাঁহারা দুই ভ্রাতাই নিজ নিজ উপার্জ্জিত অর্থ ভূদেববাবুর নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যাহা ব্যয় করিতেন, তাহার হিসাবও পাঠাইয়া দিতেন। ভূদেববাবু সেই হিসাব দেখিয়া পুত্রদিগকে লিখিতেন—কোন্ বিষয়ে আরও কিছু ব্যয় করা উচিত ছিল, অথবা কোন্ বিষয়ে ব্যয় কিছু কমাইতে পারিলে ভাল হইত।

কিন্তু এ ত গেল চাকরির কথা। এদেশে ইংরেজের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা মুখ্যতঃ চাকরিজীবী ছিলেন না। তাঁহারা প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের দ্বারাই সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার উপর দোল-দুর্গোৎসব, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা নির্ম্মাণ ও নানাপ্রকার দানে তাঁহারা খ্যাতিলাভ করিতেন। ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার এই তিন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। উকিল-ব্যারিষ্টারের কাজ করিতেন মোক্তারেরা এবং চিকিৎসার ভার ছিল কবিরাজদের উপর। ইঁহাদের বৃত্তিগত আয়ও খুব বেশী ছিল না। অল্প আয়েই ইঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। তখন ব্যবসায়ে প্রচুর ধনাগম হইত।

সমাজের যখন এইরূপ অবস্থা ছিল তখন লোকে আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। অতি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণকেও তাহারা স্বীয় পরিবারভুক্ত করিয়া লইত। পাশ্চাত্ত্য সমাজে এইরূপ আত্মীয়-পোষণপ্রথা আগেও ছিল না, এখনও নাই। ইহার একটি প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই, আত্মীয়গণের সহিত আত্মীয়তাজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহারে। ইংরেজী ভাষায় 'আঙ্কল' শব্দে পিতা বা মাতার ভ্রাতাকে বুঝায়। কিন্তু পিতা বা মাতার কিরূপ ভ্রাতা তাহা বুঝাইবার কোন শব্দ নাই। পিতার ভ্রাতা—আঙ্কল, কিন্তু আঙ্কল শব্দে পিতার মামাতো, পিসতুতো, জ্যাঠতুতো কি খুড়তুতো কিরূপ ভ্রাতা বুঝিতে পারা যায় না। 'নেফিউ' শব্দের দ্বারা ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভগিনীপুত্রকে বুঝাইয়া থাকে। 'আঙ্কল' এবং 'নেফিউ' এই দুইটি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'আণ্ট' এবং 'নীস' হইয়া থাকে। 'ব্রাদার্স-ইন্-ল' বলিলে ভগিনীপতি ও শ্যালক দুই-ই বুঝায়। কিন্তু 'হি ইজ মাই ব্রাদার-ইন্-ল' একথা বলিলে অপরে কিরূপে বুঝিবে—সেই ব্যক্তি আমার ভগ্নীপতি, কি শ্যালক? কিন্তু আমাদের সমাজে আত্মীয়কুটুম্বগণ একত্র বাস করে বলিয়া প্রত্যেকের সহিত কি সম্পর্ক তাহা ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। এক সংসারে অনেকে একত্রে বাস করিলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার অনিবার্য্য।

বঙ্গের হিন্দু সমাজে পুত্র বা কন্যার শ্বশুরকে 'বৈবাহিক' বলে, অর্থাৎ—এই আত্মীয়তাসূচক শব্দটির দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, বিবাহ-সূত্রে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই বৈবাহিক শব্দের অপ-

অংশে হইয়াছে 'বেয়াই' এবং উহার স্ত্রীলিঙ্গে হইয়াছে 'বেয়ান'। ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুরকে বলে 'তালুই' এবং তাঁহার স্ত্রীকে বলে 'আবুই মা' বা 'মাউই মা'; শাশুড়ীর ভগিনী 'মাসশাশুড়ী' এবং শ্বশুরের ভগিনী 'পিসশাশুড়ী'। ঐ দুইটি শব্দের প্রচলিত রূপ 'মাসাস' ও 'পিসেস'। ভগিনীপতি শব্দের প্রচলিত রূপ 'বোনাই' এবং শ্যালকের প্রচলিত রূপ শালা'। সম্বন্ধী শব্দটি অতি প্রাচীন-কালে 'বৈবাহিক' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও কোন কোন অঞ্চলে ইহার এইরূপ ব্যবহার আছে। গীতায় এই 'সম্বন্ধী' শব্দ বৈবাহিকের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে আছে :

'মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা :"

এখানে শ্যালা ও সম্বন্ধী এক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বিভিন্ন লোককে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

আমরা পুত্রের পুত্রকে বলি 'পৌত্র'; কন্যার পুত্রকে বলি 'দৌহিত্র।' পিতার পিতাকে বলি 'পিতামহ' এবং মাতার পিতাকে বলি 'মাতামহ'। কিন্তু ইংরেজদের সমাজে এক গ্রাণ্ড-ফাদার বলিলে পিতামহ ও মাতামহ উভয়কেই বুঝায় এবং পৌত্র ও দৌহিত্র উভয়েই 'গ্রাণ্ডসন'। পৌত্রের পুত্র 'প্রপৌত্র' এবং কন্যার পৌত্র, 'প্র দৌহিত্র'। প্রপৌত্র ও প্র-দৌহিত্রের পুত্রেরা 'বৃদ্ধ প্রপৌত্র' ও 'বৃদ্ধ প্র-দৌহিত্র'। কিন্তু এ স্থলে একটি অসামঞ্জস্য আছে। যে পৌত্র অপেক্ষাও ছোট, তাহার সম্বন্ধে 'বৃদ্ধ' শব্দটা ব্যবহার করা কি সঙ্গত? ফরাসী ভাষায় এ অসঙ্গতি নাই। ঐ ভাষায় পৌত্রকে petit (পেতি) অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র' শব্দটি দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ, ফরাসীরা পৌত্র শব্দে 'Grand'-এর পরিবর্তে petit শব্দ ব্যবহার করে, উহার অর্থ 'ক্ষুদ্র'। পৌত্রকে 'বৃহৎ পুত্র' না বলিয়া 'ক্ষুদ্র পুত্র' বলাই কি সঙ্গত নহে?

আমাদের এই যে আত্মীয়কুটুম্বগণের সম্পর্ক-নির্দ্ধারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার ইহা একান্নবর্ত্তী পরিবারের একটি নিদর্শন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেকালে একান্নভুক্ত পরিবারের উপার্জ্জনশীল পুরুষেরা যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত না। তাহাদের সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন গৃহের কর্ত্তা এবং কর্ত্তার মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তিতে তাঁহার পুত্রদের সমান অধিকার জন্মাইত। যে ভ্রাতার রোজগার অধিক সে কখনও স্বল্প উপার্জ্জনশীল ভ্রাতাকে স্বীয় সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত করিত না। যাহার উপার্জ্জন ছিল বৎসরে দশ হাজার টাকা, তাহার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হইত না যে, আমার ভ্রাতা দুই হাজার টাকার অধিক উপার্জ্জন করে না, সুতরাং আমার সম্পত্তির অংশ পাইবার অধিকার তাহার নাই। একালের অনেকের পক্ষে এ উদারতার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সেকালের কোন বিখ্যাত একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা বলিতেছি। উক্ত পরিবারে ঊনত্রিশ জন পুরুষ— ইহাদের মধ্যে সহোদর এবং জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো ভ্রাতারাও ছিল, সকলে একসঙ্গে এবং এক স্থানে আহার করিতে বসিত। সেকালে ধনবানদের বাটীতেও সাধারণতঃ বেতনভোগী পাচক বা পাচিকা থাকিত না। বাটীর স্ত্রীলোকেরাই পালা করিয়া রান্না করিতেন। পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাই স্বহস্তে পরিবেশন করিতেন, অথবা অন্য মহিলাদিগের দ্বারা পরিবেশন করাইতেন।

আমি সেকালের আর একটি পরিবারের কথা উল্লেখ করিতেছি। ঐ পরিবারের একজন ভদ্রলোক তখনকার দিনের একজন খ্যাতনামা লেখক এবং আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের পরিবারে বহুপুরুষ পূর্ব্ব হইতে এরূপ একটা প্রথা প্রচলিত ছিল যে পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তিকে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গমন করিতে হইলে পত্নীকে দেশের বাটীতে রাখিয়া একলা কর্ম্মস্থলে যাইতে হইত। যদি কেহ এই প্রথা লঙ্ঘন করিতেন, তবে তিনি পৃথগন্ন বলিয়া গণ্য হইতেন: তিনি পৈতৃক সম্পত্তির কোন অংশ পাইতেন না। অবশ্য এ প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা বিচারসাপেক্ষ। তবে একটা কথা বিবেচ্য। তাহা এই যে, আজকাল শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই অর্থ উপার্জ্জনের লোভে পৈতৃক নিবাস পরিত্যাগ করিয়া নগরে গিয়া সপরিবারে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন। ফলে গ্রামগুলি লোকবিরল ও হতশ্রী হইয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইউরোপে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা না থাকাতে সেখানে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বা আত্মীয়াদের সম্বন্ধ-নির্দ্দেশক কোন শব্দের প্রচলন নাই। তাহাদের সমাজে পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষদের সম্বন্ধজ্ঞাপক যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তাহা চার-পুরুষের পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। ফাদার, গ্রাণ্ড ফাদার, গ্রেট গ্রাণ্ড ফাদার, এই তিনটি সম্বন্ধ নির্দ্দেশক শব্দই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের সমাজে অধিকাংশ স্মৃ-কার্য্যে পূর্ব্বপুরুষগণের উল্লেখ করিতে হয় বলিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, বৃদ্ধাতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি শব্দ পিতৃপক্ষে এবং মাতৃপক্ষে বৃদ্ধাতি-বৃদ্ধ প্রমাতামহ শব্দ প্রচলিত আছে।

আমি এতদূর পর্য্যন্ত কেবল আত্মীয়গণের সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম; কিন্তু যাহারা রক্তের সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় নহেন, আমাদের পর্য্যন্ত স্বশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের সহিতও একটা সম্পর্ক পাতাইয়া আমরা তাঁহাদিগকে আত্মীয়, এমনকি পরমাত্মীয় করিয়া লই। এই প্রকার সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীরাই অধিকতর আগ্রহশীলা। 'মহাপ্রসাদ', 'গঙ্গাজল', 'সাগর' 'সৈ' (সখি), 'মনের কথা', 'দেখনহাসি' প্রভৃতি শব্দ আমাদের দেশের নারী-সমাজে বহুলপ্রচলিত। এই সকল সম্বন্ধ পাতাইবার সময় বর্ণভেদ বা জাতিভেদের প্রতি দৃক্‌পাত করা হয় না। আমাদের বাংলা দেশে এইরূপ পাতানো সম্পর্ক নারী-সমাজেই সীমাবদ্ধ। পুরুষ-সমাজে ইহার প্রচলন নাই। উড়িষ্যাতে কিন্তু পুরুষদিগের মধ্যেও যে সেকালে পাতানো সম্পর্কের রেওয়াজ ছিল সে বিষয়ে

লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সেই প্রথা হয়ত এখনও সেখানে প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ উহা আর নাই। সে সম্পর্কটির নাম 'সাঙ্গাৎ'। এখন বাংলার পল্লীগ্রামে সাঙ্গাতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা জানি না, কিন্তু শহর হইতে তো উহা সম্পূর্ণরূপেই নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আমার শৈশবকাল কটকে অতিবাহিত হইয়াছিল। আমার মনে আছে, এক এক দিন আমাদের কুটীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে এক একটা শোভাযাত্রা যাইত। শোভাযাত্রার মধ্যে একটি বালক চন্দনচর্চ্চিত ও পুষ্পমাল্যশোভিত হইয়া পদব্রজে অথবা পাল্কীতে গমন করিত। শোভাযাত্রার কারণ সম্বন্ধে আমার জননী কৌতূহলী হইলে আমাদের উড়িয়া দাসী বলিয়াছিল "সঙ্গাত বসাইবপু যাউছি", অর্থাৎ, সাঙ্গাৎ পাতাইবার জন্য যাইতেছে। সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশের মহিলাগণের মধ্যে যে সকল সম্পর্ক পাতানো হয়, তন্মধ্যে দুই-একটা ইংরেজী শব্দও প্রবেশলাভ করিয়াছে। 'ল্যাভেণ্ডার', 'ও ডি-কলোন', 'পাউডার' প্রভৃতি শব্দ কিশোরী ও তরুণীদের মধ্যে শহর অঞ্চলে প্রচলিত হইতেছে।

আগেকার দিনে আমাদের সমাজে সময়ে সময়ে এরূপ অদ্ভুত সম্পর্ক পাতানো হইত যে, শুনিলে কৌতুক বোধ হয়। আমাদের পাড়ার এক ব্রাহ্মণ মহিলা তাঁহার সমবয়স্কা এক সদ্গোপ মহিলার সহিত 'মুখে আগুন' পাতাইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পরকে এই অদ্ভুত সম্বোধনে সম্বোধিত করিতেন। আমাদেরই পাড়াতে এক তিলি জাতীয়া স্ত্রীলোক এক ব্রাহ্মণ মহিলার সহিত "না দেখলে মরি" পাতাইয়াছিলেন। তাঁহারাও পরস্পরকে এই অদ্ভুত সম্বোধনে সম্ভাষিত করিতেন। কিশোরী ও যুবতীগণের মধ্যে "বন্ধু" সম্পর্কও পাতানো হইত—ইহা বাল্যকালে আমরা দেখিয়াছি। এই সকল পাতানো সম্পর্কের জের তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের মধ্যেও চলিত এবং 'দাদা' ও 'দিদি'তে পরিণত হইত। এই সকল পাতানো সম্পর্ক কেবল শব্দমাত্রেই পর্য্যবসিত হইত না, সম্বন্ধ পাতাইয়া সকলেই পরকে একান্ত আপনার করিয়া লইত। তাঁহারা পরস্পরের আপদে-বিপদে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিত। ইঁহাদের মধ্যে এক জনের বাড়ীতে কেহ পীড়িত হইলে 'সৈ' বা 'গঙ্গাজল' আসিয়া পীড়িতের সেবাশুশ্রূষা করিত। অনেক ক্ষেত্রে দুর্গোৎসব, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে যে নূতন বস্ত্র ও মিষ্টান্নের আদান প্রদান হইত তাহাও আমরা দেখিয়াছি। এই যে পরকে আপন করিয়া লওয়া, নিঃসম্পর্কীয়দের মধ্যে অন্তরঙ্গতা এসকল আজকাল বিরল হইয়া উঠিতেছে। আজকালকার মানুষ ক্রমে ক্রমে আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়।

মৌমাছি পালনের প্রয়োজনীয়তা

ব্রহ্মচারী প্রাণগোপাল

কৃষিকার্য্য, চিনিসমস্যা ও বেকারসমস্যার সমাধান, দেহের পুষ্টিসাধন ও রোগপ্রতিষেধ, প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত ইত্যাদি নানা দিক দিয়াই মৌমাছি আমাদের সহায়ক হইতে পারে :

মৌমাছি কৃষিকার্য্যে কিরূপ সহায়ক প্রথমে তাহাই বলিতেছি :

'মৌমাছি' শব্দটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি শব্দ স্বতঃই মনে পড়িয়া যায়, সেইটি হইতেছে প্রকৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান এবং প্রাকৃতিক সম্পদ 'মধু'। ইহা শাস্ত্রমতে পঞ্চামৃতের অন্যতম।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৌমাছি পালন একটি বিশেষ লাভজনক কুটীর শিল্প। মৌমাছির কল্যাণে বিশুদ্ধ মধু তো পাওয়া যায়ই, তা ছাড়া আমাদের জাতীয় উন্নতিমূলক বিবিধ প্রচেষ্টায়ও মৌমাছিকে নানাভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে।

কৃষিপ্রধান ভারতে বর্ত্তমানকালে শস্যহানি, ও তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। ইহার প্রতিকারের জন্য আজকাল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন, ফলে চারিদিকে একটা জাগরণের লক্ষণও দেখা যাইতেছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য সার প্রস্তুতের বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কলের লাঙ্গলের সহায়তায় জমি চাষ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাও চলিতেছে। তাহাতে কত অর্থব্যয়ে কি পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার হিসাব করা সাধারণ কৃষকের পক্ষে অসম্ভব। একটা কথা মনে রাখা উচিত যে জমির উর্ব্বরতা ছাড়া অন্য কারণেও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহা হইতেছে : Cross-Pollination (পুংকেশর ও গর্ভকেশরের সম্মিলন)। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করা কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

ভারতে কৃষিক্ষেত্রে এই পুংকেশর ও গর্ভকেশরের সম্মিলনের জন্য একমাত্র বায়ুর উপর নির্ভর করিয়া থাকা হয়। কখন বায়ু প্রবাহিত হইবে ও এক ফুলের গর্ভকেশরের সহিত অন্য ফুলের পুংকেশরের মিলনের ফলে শস্য ও ফলমূলাদি উৎপন্ন হইবে সেই আশায় আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হয়। মাত্র বায়ুর উপর এই নির্ভরতার জন্য দেশের শস্য, ফলমূলাদির উৎপাদন দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে সকল দেশে কৃষিকার্য্যে উন্নত ধরণের কৃষিবিজ্ঞানের প্রয়োগ হইতেছে সেগুলির দিকে তাকাইলে আমরা দেখি উক্ত দেশসমূহ শুধু এই বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর না করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৌমাছি পালনপূর্ব্বক cross-pollination বা পুংকেশর ও গর্ভকেশরের সম্মিলনের

ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই মৌমাছির সহায়তায় ঐ দেশগুলিতে শস্য ও ফলের উৎপাদন যথাক্রমে শতকরা দশ ভাগ এবং শতকরা দুই শত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ ত গেল কৃষিকার্য্যে লাভ, তদুপরি যে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ মধু পাওয়া যাইতেছে, তাহাকে

পূর্ণাঙ্গ গর্ভমিলন দ্বারা খাদ্যশস্য বৃদ্ধিতে সহায়তায় রত মৌমাছি

বলা চলে বাড়তি লাভ। এই বিষয়ে আরও একটি সুবিধা এই যে, ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার অবকাশ নাই। প্রাকৃতিক বিধানে মৌমাছিরা সহজাত সংস্কার (instinct) বশতঃ নিজ নিজ উদরপূর্ত্তির জন্য মধুর সন্ধানে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বিচরণ করিয়া থাকে। এই বিচরণের সময় ফুলের রেণু বা কেশর মৌমাছির পায়ে লাগিয়া থাকে এবং অন্য ফুলে বসিবামাত্র ঐ রেণুগুলি গর্ভকোষের সঙ্গে মিলিত হইয়া ফলফুলের সৃষ্টি করে। কৃষিবিজ্ঞান মতে ইহাই "পূর্ণাঙ্গ গর্ভমিলন" এবং মৌমাছির দ্বারা তাহা এইরূপে সাধিত হইয়া শস্য ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, যখন কোন গাছে ফল ধরে, তখন গাছ বেশ পূর্ণ থাকে; কিন্তু কিছুদিন পরে বহুসংখ্যক গুটি ফল গাছের তলায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার অন্যতম কারণ পূর্ণাঙ্গ গর্ভমিলনের অভাব। মৌমাছি পালন দ্বারা এই ফলফুলের অকালে ঝরিয়া পড়া বন্ধ করা যায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৌমাছি পালনে আসল উদ্দেশ্য ইহাই, ইহা দ্বারা বিশুদ্ধ মধু অতিরিক্ত পাওনা। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফল, শস্য, বীজ উৎপাদক দেশ হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতি আছে। সমগ্র পৃথিবীতে উক্ত দেশেই মৌমাছি পালনের রেওয়াজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সে দেশে গাছে যত ফুল হয়, এই মৌমাছির দৌলতে প্রায় ততটিই ফলে পরিণতি লাভ করে। সেই সমস্ত ফল গাছে থাকিলে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেই জন্য তাহারা অপক্ব অবস্থায়ই বহু ফল পাড়িয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট ফলগুলি হইতে জ্যাম, জেলী প্রস্তুত হয়, বাকী অংশ গরুকে খাওয়ান হয়। অষ্ট্রেলিয়ার মধু, জ্যাম, জেলী ভারতের বাজারেও প্রচুর বিক্রয় হইতেছে। এই ভাবে অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা তাহাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া প্রভূত লাভবান হইতেছে।

ভারতে ভাল বীজের খুব অভাব। ভাল বীজের জন্য আমাদিগকে বিদেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হয়। ইহাতেও কম টাকা বিদেশে যায় না। ভাল বীজের জন্য চাই উত্তম পূর্ণাঙ্গ গর্ভমিলন। কৃষিবিজ্ঞান মতে মৌমাছি দ্বারাই উহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। ভারতে উত্তম বীজের জন্য মৌমাছির সহায়তা মোটেই লওয়া হয় না। তাই ভাল বীজের আশাও আমরা করিতে পারি না। ইহা নিশ্চিত যে, যদি আমরা উত্তম বীজের জন্য মৌমাছির সহায়তা গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরাও ভাল বীজ পাইতে পারি—তাহা হইলে দেশের টাকা দেশেই থাকিতে পারে। এই সব কারণে মৌমাছিকে কৃষকের পরম বন্ধু বলা হয়। কৃষক অবসরসময়ে অল্প পরিশ্রমে শুধু মৌমাছি পালন করিয়া মৌমাছির মাধ্যমে জমি ও উদ্যানজাত শস্য এবং

ফল ও ফুলের পূর্ণাঙ্গ গর্ভমিলনের ব্যবস্থা করিয়া লাভবান হইতে পারেন। উপরন্তু প্রাকৃতিক অপচয়িত সম্পদ বিশুদ্ধ মধু বিক্রয় করিয়া অর্থলাভও করিতে পারেন।

"The Indian Bee Journal" লিখিতেছেন :

"America produces more than 35 crores of rupees worth honey every year, in addition to this the bees confer at least 400 crores rupees worth of benefit every year to American Agriculture and Horticulture."

অর্থাৎ, 'মৌমাছির দৌলতে আমেরিকায় প্রতি বৎসর ৩৫ কোটি টাকার মধু উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহা বাড়তি পাওনা মাত্র, আসল লাভ হয় কৃষিজাত ও উদ্যানজাত দ্রব্যের বেলায়—মৌমাছিদের মাধ্যমে সে দেশে প্রতি বৎসর আয় হয় ৪০০ কোটি টাকা।' যদি আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালন করি তাহা হইলে আমরাও বর্ত্তমান শস্যের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ ও ফলের উৎপাদন শতকরা দুই শত ভাগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইব। ইহাতে খরচ ও পরিশ্রম উভয়ই কম, অথচ ইহা আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা সাধনের সহায়ক। জাতীয় উন্নতিমূলক অন্যান্য প্রচেষ্টার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই মৌমাছি-পালনকেও একটি বিশেষ স্থান দেওয়া উচিত। বর্ত্তমানে সংগ্রহের অভাবে ভারতের সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রাকৃতিক সম্পদ মধু রৌদ্রে শুকাইয়া, বৃষ্টিতে ধুইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই মধুর জন্য এখন আমাদের বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। যে অর্থের বিনিময়ে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে মধু সংগ্রহ করিতে হয় তাহার পরিমাণও কম নহে। আমরা সহজেই মৌমাছি পালন দ্বারা দেশের অর্থের এই অপচয় নিবারণ করিতে পারি।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৌমাছি পালন নিরীক্ষণরত প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু ও শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত,
× চিহ্নিত স্বামী পরমানন্দজী ব্যাখ্যায় রত

ভারত সরকার নাকি এই মৌমাছি পালনকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থান দিয়াছেন। কোথাও ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়াছে কিনা তাহা জানিতে পারি নাই। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের যে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ

সুফী মোতাহার হোসেন

যে সুরে বাজাতে বীণা, হে ভারতী, আদিকালে তব
যমুনা জাহ্নবী সিন্ধু সে সুরে কি বহিত উজান?
উচ্চারি' অমর শ্লোক সে সুরে কি ধরিয়াছে তান—
মুনি-ঋষি দেবগণ? চারিদিকে তুলি জয়-রব
অমৃত ভকত প্রাণ গাহিয়াছে তোমার গৌরব
আসমুদ্র হিমাচলে? শুনিয়া তা বিগলিত প্রাণ
আনন্দ-অশ্রুতে ভিতি কাঁদিতেন নিজে ভগবান
থমকি' রহিত কাল, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা সব?

সে সুর আজিও যেন সেকালের বেদমন্ত্রে গীতে
গীতার গাথায় শ্লোকে কাহিনীতে পুণ্য ধ্বনি তুলি'
অন্তর পরশ করে, স্মরণে জাগায় চিরদিন
অমৃত যুগের কোন্ দেবধর্ম্ম, লীলা অন্তহীন।
মহাভারতের যুগে রাম-যুগে হেরে তারে ভুলি
নমি সে ভারতবর্ষে, নমি তার অনাদি অতীতে।

ভিক্টোরিয়া-যুগের ইংরেজী সাহিত্য

রেজাউল করীম

ইংরেজী সাহিত্যের ভিক্টোরিয়া-যুগ এলিজাবেথের যুগের মত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে তত্টা সমৃদ্ধ না হইলেও, এ যুগেও কয়েকজন কবি ও শিল্পী সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রাণী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সাহিত্যে ভিক্টোরিয়া-যুগ বলিতে তাঁহার রাজত্বকালের সীমানাটুকুই বুঝায় না। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের কিছু পূর্ব্ব ও পরের কয়েকটি বৎসর কই ভিক্টোরিয়া যুগ বলা হয়, যখন ইংরেজ জাতির দৃষ্টিভঙ্গী একটা বিশেষ ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। যে-কোন দেশের সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, যুগে যুগে মানুষের মনের ও চিন্তার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মধ্যেও আসিয়াছে পরিবর্তন, বিবর্তন ও বিপ্লব। সাহিত্য মানুষের মনের গতি অনুসরণ করিয়া চলে। রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই সাহিত্যের আদর্শ, গঠন-প্রণালী ও পদ্ধতির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ব্যতীত পূর্ব্বযুগের আর কোন কবি বা শিল্পী জীবিত নাই, নূতন কাব্যসৃষ্টিও নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবি-প্রতিভা কতকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। কীটস, শেলী, বায়রন কিছুদিন পূর্ব্বে গত হইয়াছেন। ইঁহাদের স্থান পূর্ণ করিবার মত কবি আর জীবিত নাই। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্র একেবারে শূন্য থাকে না। রোমান্টিক যুগের কবিগণ সাহিত্যের যে ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাকে আরও শক্তিশালী করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। পরিবর্তন আসিতে লাগিল। রোমান্টিক যুগের কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সেই পূর্ব্বেকার সৃজনীশক্তি নাই। তিনি এ সময় কবি অপেক্ষা প্রচারক ও শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যুবককে নৈতিক আদর্শ দিবার জন্য কবিতা লিখিতেছেন।

শেলী, কীটস, বায়রন প্রভৃতি কবিদের জীবদ্দশায় আরও কয়েকজন কবি ও শিল্পী ধীরে ধীরে সসঙ্কোচে কাব্যজগতে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহাদের সংবাদ রোমান্টিক যুগের কবিগণ বড় একটা রাখিতেন না। তবুও এই নবাগতগণ তাঁহাদেরই অনুগামী এবং মন্ত্রশিষ্য। শেলী ও কীটসের তিন জন মন্ত্রশিষ্য ইতিমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের গুরু অপেক্ষা অনেক অধিক পাঠকসমাজ পাইলেন। লোকে ইঁহাদের পুস্তকই বেশী পড়িতে লাগিল। কবি টেনিসন ১৮২৭ সন হইতে কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। ১৮৪২ সনে যখন তাঁহার কবিতা-সঙ্কলন প্রথম সংস্করণ বাহির হইল, তখন পাঠকসমাজ স্পষ্ট বুঝিল যে, দেশে সত্যই একজন সাহিত্যরথীর আবির্ভাব হইল। রবার্ট ব্রাউনিঙের 'পলিন' ১৮৩৩ সনে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তখনও তিনি বিশেষ সুপরিচিত হন নাই। কিন্তু ১৮৪৬ সনে যখন তাঁহার 'Bills and Pcmgranates' প্রকাশিত হইল, তখন তিনি আর গোপন রহিলেন না। তাঁহার শক্তি ও মৌলিকতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। মহিলা-লেখকের মধ্যে এলিজাবেথ ব্যারেট ১৮২০ সন হইতে কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহার প্রথম কাব্যসংগ্রহ পাঠকসমাজের নিকট সমাদর পায়। এক দিক দিয়া ইঁহারা সকলেই রোমান্টিক যুগের কবিদেরই শিষ্য। কিন্তু যুগের প্রভাবে ইঁহারা এমনভাবে প্রভাবিত হইলেন যে, প্রাচীন ধারাকেই ধরিয়া রাখিলেন না, অনেক নূতনত্ব আমদানী করিলেন। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যসাহিত্যও নূতন পথ ধরিল। নূতন নূতন গদ্যলেখক আবির্ভূত হইলেন। রোমান্টিক যুগকে যদি পদ্যের যুগ বলা যায়, তবে ভিক্টোরিয়ার যুগকে গদ্যের যুগ বলাই সঙ্গত হইবে। ডিকেন্স, থ্যাকারে, কার্লাইল রাস্কিন—ইঁহারা এই যুগের গদ্যসাহিত্যের মহারথী। এই যুগের রাজনৈতিক অবস্থাটাও সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে, যেমন করিয়াছিল এলিজাবেথের যুগের রাজনীতি সেই যুগের সাহিত্যকে প্রভাবিত। এলিজাবেথের যুগের চাঞ্চল্য, আবিষ্কারের নেশা, উদ্দীপনা, ধর্ম্মবিপ্লব, কর্ম্মোন্মাদনা সেই যুগের সমস্ত কবি ও শিল্পীকেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছিল। ভিক্টোরিয়া যুগের রাজনীতি ও সমাজনীতি, সংস্কার আন্দোলন প্রভৃতি সাহিত্যের ভিতর প্রতিফলিত হইয়াছে। সাহিত্যও এই সবের প্রভাব পরিহার করিতে পারে নাই। সেই সময়ে গণতন্ত্র আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতেছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন নূতন গবেষণা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। দেশের এই অবস্থার প্রভাব সাহিত্যের উপরও পতিত হইল।

ভিক্টোরিয়া-যুগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করা দরকার, নতুবা এযুগের সাহিত্যের মূল প্রেরণা বুঝা যাইবে না। ১৮১৫ সনে ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর নেপোলীয়ন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইল। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড জয়ী হইল। সেই সময় ইংলণ্ডের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যবিত্তগণ করভারে প্রপীড়িত। তখন ধীরে ধীরে শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক নিদর্শনগুলি পরিস্ফুট হইতে থাকে। এই শিল্পবিপ্লবের আশু ফলগুলিও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই পাইয়াছিল। শিল্পের উন্নতির জন্য তাহারা প্রচুর অর্থলাভ করিতে থাকে। শ্রমিকগণ নামমাত্র পারিশ্রমিক ব্যতীত আর কিছুই পাইত না। মোটের উপর নেপোলীয়ন যুদ্ধের শেষে মধ্যবিত্তগণই লাভবান হইয়াছিল। শিল্প যতই উন্নতি হইতে লাগিল, ততই তাহাদের ধনভাণ্ডার স্ফীত হইয়া উঠিল। কিন্তু সাধারণ লোক, বিশেষতঃ শ্রমিক ও মজুরদের অবস্থা আরও কঠিন হইল। তাহাদের অভা ২

বাড়িতে লাগিল। তাহাদের জীবনের মান একটুও বাড়িল না। কিন্তু কোন দেশেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা চিরকাল একই অবস্থায় থাকে না। নানাপ্রকার আন্দোলন ও উত্তেজনার তরঙ্গে সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এই সময় পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার জন্য কতকগুলি সংস্কার আইন গৃহীত হইল। তাহার ফলে ভোটাধিকার আরও সম্প্রসারিত হইল। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কয়েকটি সংস্কার আইন পার্লামেণ্টে পাস হইয়া গেল। জনসাধারণ আরও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। বেনথামের হিতবাদ দর্শন দেশের মধ্যে সামাজিক কল্যাণবোধ জাগাইয়া দিল। সত্য বটে বেনথামের দর্শননীতি লোকপ্রিয়তা অর্জন করে নাই। কিন্তু তাঁহার 'বৃহত্তম সংখ্যক লোকের বৃহত্তম কল্যাণ' নীতির প্রভাব কেহই পরিহার করিতে পারিল না। শাসন কর, আইন কর, কাব্য লিখ—যাহাই কর না কেন, সর্ব্বক্ষেত্রেই বৃহত্তম লোকের স্বার্থ দেখিতে হইবে—এই বোধ ক্রমেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার ফল গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারলাভ করিল।

ইতিমধ্যে কত সভার প্রভাব মর্ম্মীভূত হইয়া আসিয়াছে। শুধু গণতন্ত্র নহে, স্বাধীন চিন্তা অবাধ গতি পাওয়ার ফলে বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইতে লাগিল। গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান এই দুইটিই সাহিত্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিল। পার্লামেণ্টের সংস্কার আইন ও ফ্যাক্টরী আইনের সংশোধনের ফলে সংবাদপত্র প্রসারলাভ করিল। সাংবাদিকগণ সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। নানাস্থানে বহু সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করিল। যে বৎসর পার্লামেণ্টের সংস্কার আইন পাস হইল, সেই বৎসরই চার্লস নাইট 'পেনি ম্যাগাজিন' অর্থাৎ, এক পেনি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকাখানি কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ গ্রাহক সংগ্রহ করিল। শিক্ষার ব্যাপারটিও উপেক্ষিত হইল না। ব্যাপকভাবে দেশে শিক্ষাবিস্তার আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে সাহিত্য ও কবিতাপুস্তক অল্প লোকেই পড়িত। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পাঠকদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। সাহিত্য এখন হইতে একটি সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হইল। পূর্ব্বে অবসর বিনোদনের জন্য কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই সাহিত্য পড়িত। এখন পাঠকের পরিবর্তন হইল। জনসাধারণ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুতরাং জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল। সাহিত্য এমনি বস্তু যে, উহার স্বাদ যে এক বার পাইয়াছে সে শত কষ্টের মধ্যেও তাহা ভুলিতে পারে না। গণতান্ত্রিক আদর্শ সাহিত্যকেও কতকটা গণতান্ত্রিক করিয়া তুলিল।

বৈজ্ঞানিক মনোভাব এই যুগের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করিয়াছে। জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের ধারণাকেও বদলাইয়া দিয়াছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিতে লাগিল। বিজ্ঞান জাগ্রত করিল মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য—বিজ্ঞান আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়াছে। জাতির জীবনধারাকে করিয়া তুলিল একেবারেই বাণিজ্যিক। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের যে ধারণা ছিল, বিজ্ঞান তাহা দূর করিয়া দিল। জীবতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ও ভৌগোলিক আবিষ্কার পূর্ব্বকার মধ্যযুগীয় বিশ্বাসকে টলাইয়া দিল। ইহার ফলে বহু লোকের মনে জাগিল সন্দেহ। আশার কথা এই যে, বিজ্ঞান কবিতাকে ধ্বংস করিতে পারে নাই। রোমান্টিক যুগের একটা ধারণা ছিল যে, বিজ্ঞানের সহিত কবিতার অহিনকুল সম্পর্ক। কিন্তু ভিক্টোরিয়া-যুগ প্রমাণ করিল যে, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার কিছুদিনের জন্য কবিতার লিরিক আবেগকে (Lyric impulse) মর্ম্মীভূত করিয়াছিল এবং এ যুগের অধিকাংশ কবিকে চিন্তাধর্ম্মী (Speculative) করিয়া তুলিয়াছে। টেনিসন, ব্রাউনিঙের মত এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বিজ্ঞানের প্রভাব পরিহার করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ বিজ্ঞান হইতেছে আর্টের শত্রু। কিন্তু টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি কবির কবিতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাব এমন ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, তাহাতে আর্টের কোন ক্ষতি হয় নাই। টেনিসনের "In Memoriam" এবং ব্রাউনিঙের "Christmas Eve and Easter Day" প্রায় একই সময়ের রচনা। এই দুই জন কবির কবিতা দুইটিতে সে যুগের চাঞ্চল্যপূর্ণ চিন্তা, সন্দেহ দুঃখ উদ্‌ভ্রান্ত ভাব—এই সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। তাহা ব্যতীত এ দুটির মধ্যে আছে চিরন্তন কল্যাণ ও চির-সবুজের বাণী। টেনিসনের কবিতায় আছে সূক্ষ্ম কলাবোধ ও অপূর্ব্ব রচনাকৌশল। আর ব্রাউনিঙের কবিতায় আছে নাটকীয় তেজ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মন কতকটা বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে রচনা-পদ্ধতির মধ্যেও আসিল একটা বৈজ্ঞানিক রীতি। বহু কবি এই যুগে বৈজ্ঞানিক রীতিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ণনার সময় প্রত্যেকটি বিষয়ের খুঁটিনাটি দিক তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন এবং বিস্তারিত ভাবে সবকিছুকে বর্ণনা করিবার রীতি অবলম্বন করিলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন বলিয়া বর্ণনায় কোথাও ত্রুটির অথবা ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ রাখেন নাই। মহাকবি মিল্টন প্রকৃতির গাছপালার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক সময় ভুল করিয়া বসিয়াছেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন: "Twisted eglantine" অর্থাৎ, পাকলাগানো ইগল্যানটাইন। কিন্তু ইগল্যানটাইন পাকলাগানো গাছ নয়। প্রকৃতিকে তিনি সঠিক ভাবে লক্ষ্য করেন নাই বলিয়া এই প্রকার ভুল করিয়াছেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া-যুগের কবিগণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহারা এই ধরণের ভুল করেন নাই। কবি টেনিসন এমন নিখুঁত ভাবে প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যেন মনে হয় তিনি সদ্য সদ্য কোন পরীক্ষাগার হইতে আসিয়াই প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। শুধু কবিতা নহে, সেই সঙ্গে ইতিহাস এবং উপন্যাস লিখিবার ধারাও পরিবর্তিত হইল। ইতিহাসকে লেখকের নিজস্ব মত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়ো-

অধীরতা অনুভূত হইল। উপন্যাসে ঘটনাবর্ণনা অপেক্ষা 'সাইকোলজির দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। কারলাইল সে যুগের সাহিত্যের একজন মহারথী ছিলেন। তিনি কতকটা রক্ষণশীল। তিনি সাহিত্যে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ মোটেই ভালবাসিতেন না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরও তিনি ছিলেন বিরোধী। কিন্তু তিনিও বিজ্ঞানের প্রভাব পরিহার করিতে পারেন নাই। তাঁহার বহু রচনার মধ্যে "Principle of Induction" অজ্ঞাতসারে অনুসৃত হইয়াছে। ধীরভাবে নানাপ্রকার তথ্য অনুসন্ধান করিয়া অপক্ষপাত দৃষ্টিতে কোন বিষয় সম্বন্ধে মতপ্রকাশের নামই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস লেখা। কারলাইল অনেকটা সেই পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানের বিরোধী লেখকগণও বিজ্ঞানদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। অপরাপর ঐতিহাসিকগণ বৈজ্ঞানিক পন্থায় ইতিহাস লিখিতে লাগিলেন। তাঁহারা কেবল ঘটনা সংগ্রহ করেন নাই, ঘটনার মূল কারণ কি, কি ভাবে ও কি কি অবস্থার মধ্যে ক্রমবিকাশের পথে একটি ঘটনার রূপান্তর হইয়াছে, কেমন করিয়াই বা সেই ঘটনা বর্তমান অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে —এই সমস্ত বিষয় আলোচনা আরম্ভ হইল। যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইল তাহা হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। অনেক সময় ঐতিহাসিকগণ নিজের রুচি, সংস্কার ও ব্যক্তিগত মতকে ইহার সঙ্গে বেমালুম যোগ করিয়া দেন। কিন্তু ইহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নহে। ভিক্টোরিয়া-যুগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া ইতিহাস লেখা আরম্ভ হইল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেনরী বাক্‌লে তাঁহার 'সভ্যতার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি একটি দেশের ভূতত্ত্ব, বাণিজ্য, ধর্ম, আবহাওয়া সবকিছুর তথ্য সংগ্রহ করিয়া তবেই সেই দেশের সভ্যতার বিষয় লিখিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সভ্যতা হঠাৎ গজাইয়া-উঠা ভুঁইফোড় বস্তু নহে। সভ্যতার সহিত নানা বিষয় জড়িত আছে। আর এই সব বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা ঐক্যধারা সর্ব্বদাই সক্রিয় হইয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছে। এই যুগে আরও অনেকে বাক্‌লের পন্থা অনুসরণ করিয়া ইতিহাস-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

উপন্যাসের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক 'স্পিরিট' বা ভাবধারা প্রবেশ লাভ করিল। ঔপন্যাসিকগণ কৌলিক গুণাধিকার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়া মানবচরিত্র অঙ্কন করিতে লাগিলেন। শার্লট ব্রন্টি, কিংস্‌লি, রীড প্রমুখ উপন্যাসকারগণ জীবতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও চিকিৎসাতত্ত্ব প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সাহায্যে গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের বিশ্লেষণ আরম্ভ করিলেন। জর্জ ইলিয়টের উপন্যাসে হার্বার্ট স্পেনসার ও কঁতের যথেষ্ট প্রভাব আছে। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি হামফ্রি ওয়ার্ড, ইলিয়ট প্রভৃতি উপন্যাসকারদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। টমাস হার্ডির উপন্যাসও বিজ্ঞানের প্রভাব পরিহার করিতে পারে নাই। ভিক্টোরিয়া-যুগে শিল্পসংক্রান্ত আর একটা নূতন আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তাহার নাম pre-Raphaelite movement। ইহা মধ্যযুগে প্রত্যাবর্ত্তনের দিকে ঝোঁক দিয়াছিল। আর্ট বা শিল্পকলা সম্বন্ধে ইহা একটা নূতন আন্দোলন। চিত্রকলা হইতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি। কিন্তু পরে ইহা ক্রমে ক্রমে কাব্য-জগতেও প্রবেশ করিল। মধ্যযুগের বিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেলের পূর্ব্বযুগের শিল্প এই আন্দোলনের প্রধান আদর্শ। কতকটা 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই নীতির ইহা সমর্থক। প্রথম প্রথম মনে হইয়াছিল যে, ইহা ভিক্টোরিয়া-যুগের ধারা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন একটা অভিনব ধারা। কারণ এই যুগের গণতন্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত এ আন্দোলনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রাফিক আর্ট প্রভৃতি লইয়া এই আন্দোলনের নেতারা সন্তুষ্ট ছিলেন। ইহা রোমান্টিক যুগের লিরিক ধারাকেই নূতন পরিবেশে বিকশিত করিতে চাহিয়াছিল।

এ কথাটা মনে রাখা দরকার যে, সমগ্র রোমান্টিক আদর্শটাই একদিকে মধ্যযুগ ও অপরদিকে গ্রীক যুগের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। মধ্যযুগের শিল্পের বীরত্বের দিকও কবি স্কটকে মুগ্ধ করে। তিনি উপন্যাসের মাধ্যমে সেই যুগের বীরত্বের ও 'শিভালরী'র আদর্শটাকে রূপ দিয়াছেন। কার্ডিনাল নিউম্যানের মনকে নাড়া দেয় মধ্যযুগের ধর্ম্মীয় ভাব। তিনি ইহার প্রভাবে নিজে প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মধ্যযুগীয় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আর ডি. জি. রসেটি, মোরিস প্রমুখ লেখকগণ মধ্যযুগের লোকগাথার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা মধ্যযুগের যাদুবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। উইলিয়াম মোরিস মধ্যযুগের পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা ও কিংবদন্তীর রহস্যময় রাজ্যে কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কবিতার দিক দিয়া প্রি-র‍্যাফেলাইটগণ কবি কীটসের নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করেন। সুইনবার্ণ অনুপ্রেরণা পান প্রধানতঃ শেলী ও গ্রীক ইতিহাস হইতে। তাঁহার শিল্প যতটা সঙ্গীতময় ততটা চিত্রময় নহে। ভিক্টোরিয়া-যুগের বহু কবি দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্যালোচনা করেন। আর প্রি-র‍্যাফেলাইটগণ বিজ্ঞান ও দর্শন হইতে একেবারে দূরে সরিয়া আসিতে চাহিয়াছিলেন। এই যুগের যেসব রক্ষণশীল কবি ধর্ম্ম ও নীতি সংক্রান্ত আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আর্ট সৃষ্টি অপেক্ষা তর্কবিতর্ক দ্বারা কাব্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। অন্য পরে কা কথা, এমনকি, টেনিসন ও ব্রাউনিং পর্য্যন্ত শেষের দিকে এই ধরণের বিতর্কমূলক বিষয় লইয়া কবিতা লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা কাব্যকে রোগগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মোরিস এবং রসেটির মত কবি, যাঁহারা কীটসের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং নিজেরাও সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ পূজারী ছিলেন, তাঁহারা টেনিসন ও ব্রাউনিংয়ের নীতিমূলক এবং বিশ্লেষণপূর্ণ কবিতা মোটেই পছন্দ করেন নাই। বরং তাঁহারা তাহার বিরোধিতা করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদের মতে কবিতায় বিচার-বিশ্লেষণ ও ডায়ালেকটিকসের স্থান নাই। কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য লইয়া তাহার কারবার। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের জন্য সৌন্দর্য্যকেই ভালবাসিতেন; কিন্তু তবুও একথা বলা যাইতে পারে যে, এই

সব প্রি-র‍্যাফেলাইট কবি যতই প্রিয় হউন না কেন, তাঁহারা কেহই টেনিসন ও ব্রাউনিঙের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। টেনিসন ও ব্রাউনিং যে শিল্প-রচনা করিয়াছেন তাহা চিরকালের সামগ্রী। বিভিন্ন শ্রেণীর কবিগণ সমবেতভাবে নানা দিক দিয়া ভিক্টোরিয়া যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। প্রাণবন্ত মানবপ্রেম এই যুগের সাহিত্যের যে একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহা যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা হইতে বুঝা যাইবে।

ইহাই হইল ভিক্টোরিয়া-যুগের শিল্প সৃষ্টি ও কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি দুই জন—টেনিসন ও ব্রাউনিং। ইহাদের পরেই উল্লেখযোগ্য কবি ও শিল্পী হইতেছেন: ব্রাউনিঙের স্ত্রী ব্যারেট ব্রাউনিং, রসেটি, মোরিস, সুইনবার্ণ, মেরেডিথ প্রভৃতি। এই যুগে গদ্য-সাহিত্যও বিশেষ উন্নতিলাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মত এই যুগটিও মূলতঃ গদ্যের যুগ। এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হইতেছেন, ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ্জ ইলিয়ট, মেরেডিথ, শারলটি, ব্রন্টি। যাঁহারা রচনা ও সমালোচনা লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কারলাইল, রাসকিন, মেকলে, আরনল্ড, নিউম্যান, মিল উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এযুগে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকে। বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ডারউন, হাক্সলি, স্পেনসার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ নূতন নূতন গবেষণা করিয়া মানুষের জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত করেন।

ভিক্টোরিয়া-যুগের লেখকগণ সত্যানুসন্ধানকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কি কবি, কি সাহিত্যিক, কি বৈজ্ঞানিক অকুণ্ঠভাবে সত্যের সন্ধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নানা পথে ও নানা ভাবে জীবনে সত্যানুসন্ধানে রত ছিলেন। ডারউইন আর নিউম্যান সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। এক জন লেখক ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল-বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকেই অস্বীকার করিয়া বসিলেন। আর অপর জন বাইবেলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য এ যুগের মানুষকে আকুল আহ্বান জানাইলেন। তবুও বলিব তাঁহারা নিজের নিজের পন্থায় সত্যানুসন্ধানী ছিলেন। একজন সত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন প্রকৃতির মধ্যে; অপর জন মধ্যযুগের ধর্ম্মের আদর্শের মধ্যে। সত্যসন্ধানী কারলাইল এ যুগের রাজনীতি ও অর্থনীতির বিরোধিতা করিলেন। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি অস্বীকার করিলেন। ভোটাধিকার সম্প্রসারণকেও তিনি নিন্দা করেন। আবার জন ষ্টুয়ার্ট মিল রাজনীতি ও অর্থনীতি লইয়াই গবেষণা আরম্ভ করিলেন। তিনি কারলাইলের প্রত্যেকটি মত খণ্ডন করেন। অথচ তাঁহারা উভয়েই সত্যসন্ধানী। এই যে সত্যের সন্ধান ইহার প্রধান বাহন ছিল সাহিত্য। কবি, শিল্পী, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক—ইহারা সাহিত্যের মধ্যেই নিজেদের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। আদর্শপ্রচারের উদ্দেশ্যে সাহিত্যচর্চ্চার ফলে সাহিত্য হইয়া পড়িয়াছে কতকটা Analytical বা বিশ্লেষণাত্মক ও প্রচারধর্ম্মী। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া অধিকাংশ লেখক সাহিত্যের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চ্চা করিয়াছেন। শিল্পীরা একটি বিশেষ শিল্প-নিদর্শন সৃষ্টি করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না। এই শিল্পকার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষকে শিক্ষা দেওয়া।

রোমান্টিক যুগের কবিগণ ছিলেন কেবল গায়ক—গান গাহিয়াই তাঁহাদের আনন্দ। তাই তাঁহারা শুধু গান গাহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ যুগের কবিগণ শুধু গায়ক নহেন—তাঁহারা চিন্তা ও আদর্শের নেতৃত্ব করিতে চাহিলেন। তাঁহারা মানুষের সম্মুখে একটা আদর্শ তুলিয়া ধরেন, আর দাবি করেন যে, মানুষ যদি বাঁচিতে চায়, তবে তাহাকে এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। উপন্যাসকারগণও তদ্রূপ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া একটা গল্প রচনা করিলেন। তাহা মানুষের জীবনেরই ছবি। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে রহিল সমাজ-সংস্কারের জন্য আহ্বান অথবা একটা নৈতিক শিক্ষা দিবার প্রয়াস। লেখকগণ এমন ভাবে রচনা আরম্ভ করিলেন যেন তাঁহারা সকলেই ভাববাদী প্রফেট অথবা শিক্ষক। তাঁহারা সাহিত্যকে জনসাধারণের উন্নতি ও শিক্ষার বাহন করিয়া তুলিলেন।

এলিজাবেথের যুগের অথবা রোমান্টিক যুগের কবিগণ কাব্যালোচনা করিয়াছেন আনন্দ দিবার জন্য। আর ভিক্টোরিয়া যুগের কবি ও লেখকগণ শিক্ষাদানকেই প্রধান উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত্ত মন ও পিপাসার্ত্ত আত্মাকে তাঁহারা শান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শিল্পের দিক দিয়া তাঁহারা এলিজাবেথ অথবা রোমান্টিক যুগের অনন্ত কল্পনা, শিশুর সারল্য ও অফুরন্ত আনন্দের মধুচক্র রচনা করিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ভিক্টোরিয়া-যুগের সাহিত্য পরবর্ত্তী যুগকে বহু দিক দিয়া উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাই ভিক্টোরিয়া-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

পল্লীশিক্ষা সংস্কার

শ্রীশরদিন্দু চৌধুরী

ভারতে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও বেকার-সমস্যার মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' ও অন্যান্য কর্মনিয়োগ-সংস্থায় যে সমস্ত লোক চাকুরিপ্রার্থী হন তাঁদের বেশীর ভাগ লোকই শিক্ষিত—কেউ অল্পশিক্ষিত, কেউ অধিক শিক্ষিত। তার উপর বছর বছর বিশ্ববিদ্যালয় হতে ছেলেমেয়েরা পাস করে এই বেকার-সমস্যা বাড়িয়ে তুলছেন। লেখাপড়া শিখে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বেশীর ভাগই কায়িক শ্রমের চেয়ে মানসিক শ্রমের প্রতি বেশী আগ্রহশীল হন। তাই তাঁরা আপিসের চাকুরির দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েন। তবে আজকাল অর্থনৈতিক চাপে অনেকে অবশ্য অন্য কাজও করছেন।

এখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা শতকরা কুড়ির কম। তাতেই এই বেকার-সমস্যা। সুতরাং যখন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবে তখন বেকার-সমস্যা আরও বেড়ে যাবে—যদি ইতিমধ্যে শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন না হয়। সমস্যাটি আরও জটিল আকার ধারণ করবে যখন চাষীদের মধ্যে আবশ্যিক শিক্ষা প্রচলিত হবে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, চাষীর ছেলে লেখাপড়া শিখে খুব কমই আবার হাল ধরেছে! অল্প-শিক্ষিত ছেলেদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা আরও বিষময় হয়েছে। শিক্ষার ফলে তারা সহকর্মী চাষীদের ঘৃণা করতে শিখেছে। তারা হয়ে উঠেছে সমাজের অকেজো মানুষ। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন না হলে এই কুফল বেশী দেখা দেবে, ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটবে।

কোন জাতির শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য এরূপ হওয়া উচিত, যাতে করে মানুষ মানসিক ও কায়িক উভয় প্রকার কর্মের মর্যাদা দিতে শেখে। চাষীকে লেখাপড়া শেখাতে হবে—চাষ-আবাদকে ঘৃণা করবার উদ্দেশ্যে নয়। তারা যাতে উন্নত ধরণের চাষ-আবাদ করে দেশে অধিকপরিমাণে শস্য উৎপন্ন করতে পারে, এরূপ শিক্ষাই তাদের দিতে হবে। সেরূপ ধোপা, নাপিত, কুমার, কামার কেউ যেন তার স্ব স্ব কাজকে ঘৃণা না করে এরূপ ভাবেই তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

শিক্ষার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্তন না হয়। বর্তমানে গ্রাম ও শহরের সব ছেলের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা ও শিক্ষাপদ্ধতি একই রূপ। তাদের ইংরেজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক থেকে কতক অংশ পড়ানো হয়। তারা স্বাস্থ্য নষ্ট করে কতকগুলি বই মুখস্থ করে। তারপর তাদের এই মুখস্থ বিদ্যা পরীক্ষা করা হয়। যে ঠিক ঠিক মুখস্থ লিখতে পারল সে-ই পাস, যে পারলে না সে-ই ফেল হ'ল—তার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সেখানেই সমাধি হয়। কোন কোন ছেলে ফেল করেও আবার বিদ্যাশিক্ষার অভিমানে পিতৃপুরুষের কাজে হাত দিতে লজ্জা পায়। পাড়াগাঁয়ে এরূপ শিক্ষিত অকেজো লোকের অভাব নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবার জন্য ৮৫০০ জন শিক্ষক নিয়োগ করছেন। তাঁদের বেতন ইত্যাদির কথা এখানে আলোচনা করব না। তবে এই ৮৫০০ জন শিক্ষক গ্রামে গিয়ে সত্যিই গ্রামের উপকারে আসবেন কিনা, সত্যিই কি এতে দেশে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হবে—তাই বিবেচ্য বিষয়। নূতন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবার আগে কতকগুলো বিষয় চিন্তা করা দরকার।

প্রথমতঃ, কোন্ বয়সের ছেলেদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক হওয়া উচিত তাই বিবেচ্য। আমার মনে হয়, একটু অধিক বয়সে গ্রামের ছেলেদের মস্তিষ্ক লেখাপড়া শিক্ষার উপযোগী হয়। তাই সাত বছর হতে সতের বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। এই শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, যাতে করে আঠার বছর বয়সের ছেলে জীবন-সংগ্রামে নেমে জয়ী হতে পারে। এই দীর্ঘ দশ বৎসরে ছেলেদের কি কি শিক্ষা দেওয়া হবে তার বিষয়বস্তু ও পাঠ্য তালিকার একটি মোটামুটি আভাস নিম্নে দিচ্ছি। মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রণালী হবে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সুতরাং সে বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করব না।

মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। দেখা গেছে, ইংরেজী ভাষা শিখতে আমাদের দেশের ছেলেদের যে শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়, সে শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা এবং সেই সময়ে আমরা ছেলেদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারি। অবশ্য অনেকে বলবেন উচ্চশিক্ষা লাভ করতে হলে ইংরেজী ছাড়া চলে না। সেকথা সত্য। কিন্তু কথা হচ্ছে, গ্রামের চাষী ও অন্যান্য শ্রমিক ছেলেদের সকলেরই উচ্চশিক্ষা দেবার কি প্রয়োজন? যদি কোন ছেলে অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তবেই তাকে উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ দেওয়া হবে—এই সর্তে যে, শিক্ষা-লাভান্তে আবার গ্রামেই তাকে ফিরে আসতে হবে অন্য ছেলেদের শিক্ষার জন্যে। ঐরূপ ছেলেদের শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সরকার বহন করবেন। এরূপ ছেলের সংখ্যা বেশী নয়, এবং সেরূপ মেধাবী ছেলের পক্ষে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংরেজী শিখতেও বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার এখনও একটি প্রধান অন্তরায় হচ্ছে—মাতৃভাষায় উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব, বিশেষতঃ বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের। আজকাল অনেকে এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বাংলা ভাষায় কিছু কিছু বইও রচনা হচ্ছে। কিন্তু তার ভাষা অনেক স্থানে এত দুর্বোধ্য যে, ঐসব বিষয় ছাত্রদের বোধগম্য হওয়া

কঠিন। এর কারণ আর কিছু নয়, ভাষার শব্দপ্রয়োগে আমাদের অপটুতা। আমাদের দেশে সাহিত্যিকেরা নাটক, উপন্যাস ও কবিতায় যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তক লেখেন, তাঁরা এতকাল ইংরেজীতেই বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করায়, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের বই লেখবার সময় তাঁদের অনেকেরই ভাষার জড়তা কাটে না। সেজন্য মনে হয়, বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক-লেখক এবং সাহিত্যিকদের মিলিত চেষ্টায় বিজ্ঞানের বই লিখতে হলে ভাষার জড়তা অনেক দূরীভূত হবে। অনেকে পরিভাষার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। আমার মনে হয়, বিজ্ঞানের যেসব নামকরণ বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত তাহার অন্য নামকরণের প্রয়োজন নাই। অক্সিজেনকে 'অম্লজান', হাইড্রোজেনকে 'উদযান' বলবার কি দরকার? সুতরাং প্রথমেই আমাদের স্ব-স্ব মাতৃভাষায় সহজ সরল পাঠ্য পুস্তক রচনার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

দ্বিতীয় সমস্যা—ছেলেদের কি কি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। বয়ঃক্রম অনুসারে পাঠ্যের বিষয়বস্তু বিভিন্ন রকমের হবে। সপ্তম ও অষ্টম বর্ষ বয়স্ক ছেলেদের বর্ণমালা, সংখ্যা পঠন শিখতে হবে। আর মুখে মুখে তাদের হিতোপদেশের গল্প, রামায়ণ-মহাভারত, কোরান ও বাইবেলের গল্প প্রাঞ্জল ভাষায় বলে শোনাতে হবে। সেই গল্পগুলি এমনভাবে বলতে হবে যাতে ছেলে নিজের থেকেই নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, শিক্ষকেরা তাদেরও নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। গল্পের উপদেশগুলো যাতে ছেলেদের মনে রেখাপাত ও তাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করে এই সব গল্প বলার উদ্দেশ্যই হবে তাই।

নবম ও দশম বর্ষ বয়সের ছেলেদের মাতৃভাষায় লেখা পুস্তক পড়তে দিতে হবে। তাতে দ্বিতীয় ভাগের সংযুক্ত বানান থাকবে। ছোট ছোট গল্প, ছোট ছোট প্রবন্ধ, ছোট ছোট কবিতা নিয়ে এই পুস্তক রচিত হবে। এই সঙ্গে শুদ্ধভাবে ভাষা লেখবার উপযোগী সহজ ব্যাকরণও তাদের শিক্ষা দিতে হবে। এই ব্যাকরণে কঠিন সন্ধি, সমাস ও অন্যান্য জটিলতা থাকবে না। সহজ নিয়মগুলো ভাল উদাহরণসহ প্রাঞ্জল ভাষায় শেখাতে হবে। এই পর্যায়ে তাদের পাটীগণিত শেখাতে হবে। পাটীগণিতে থাকবে—কেবল সংখ্যায় যোগ, বিয়োগ, স্থানীয় মান ও প্রকৃত মান, তৎসংক্রান্ত ছোট ছোট বুদ্ধির অঙ্ক এবং এই বয়সে ধারাপাতও শিক্ষা দিতে হবে। পাটীগণিত যে একটা ভয়াবহ জিনিষ নয়, এর যে কি প্রয়োজনীয়তা তা এই বয়সেই ছেলেদের বুঝাবার চেষ্টা করা দরকার। তার উপর এদের থাকবে আর দুখানি বই—একখানি ইতিহাসের গল্প ও একখানি ভূগোলের গল্প। সমগ্র ভারতের ইতিহাস নিয়ে এই বই রচনা করলে চলবে না। তাতে প্রাচীন ভারতে অনার্যদের বাস, দ্রাবিড় জাতি, আর্য্য জাতির আগমন ও বসতিস্থাপন এবং রামায়ণ ও মহাভারতের সময় পর্যন্ত ইতিহাস থাকবে। কেবল সন-তারিখ মুখস্থ করাবার দিকে চেষ্টা করা হবে না। এতে গল্পের আকারে প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য ভাষায় উপরোক্ত বিষয়বস্তুগুলো থাকবে। তারপর হচ্ছে ভূগোলের কথা। ভূগোলের বিষয়বস্তু—সাধারণ সংজ্ঞা, মহাদেশ, মহাসাগর ও কয়েকটি দেশ আবিষ্কারের গল্প এতে থাকবে। এ ছাড়া আর কোন বিষয় শিখতে এ শ্রেণীর ছেলেদের চাপ দেওয়া হবে না। এ পর্য্যায়ের ছেলেদের পরীক্ষা নিতে হবে আংশিক মৌখিক ও আংশিক লিখিতভাবে। প্রত্যেক বিষয়ে দশটি প্রশ্নের মুখে এবং পাঁচটির লিখে উত্তর দিতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রশ্নগুলো হবে ছোট ছোট এবং এমন ভাবে তা জিজ্ঞাসা করতে হবে যাতে পাঠ্য বিষয়গুলো পড়ে ছেলেরা নিজের ভাষায় তার উত্তর দিতে পারে। আর তা ছাড়া তাদের হস্তাক্ষরের জন্য একটি পৃথক পরীক্ষা নিতে হবে। হস্তাক্ষরের দিকে জোর দিতে ছেলেদের উৎসাহ দিতে হবে।

একাদশ ও দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক ছেলেদের পাঠ্য তালিকা অবশ্যই একটু কঠিনতর হবে। এ ক্ষেত্রেও মাতৃভাষার মাধ্যমেই তাদের সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা দিতে হবে। তবে সাহিত্যে দুখানি পুস্তক পঠিতব্য। এর একখানিতে থাকবে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি, আর একখানি হবে মাটি ও মাটির দান সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তক। ব্যাকরণে অধিকতর জটিল বিষয়সমূহ থাকবে, আর থাকবে দেশীয় প্রবাদসমূহ, পদপ্রকরণ, বিশেষ্য হতে বিশেষণ, বিশেষণ হতে বিশেষ্য, অব্যয় ইত্যাদি। ইতিহাসে হিন্দুযুগের রাজত্বের অংশ থাকবে। ভূগোলে শিক্ষা দেওয়া হবে—বৃষ্টিপাত ও তার কারণ, মেঘের উৎপত্তি, বৃষ্টির সঙ্গে চাষের সম্পর্ক, মৌশুমী বায়ু, বায়ুর চাপ এবং দেশের জলবায়ু আর কৃষিজ ও বনজ সম্পদ। তা ছাড়া এই শ্রেণীতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পড়ানো হবে। স্বাস্থ্যের দৈনন্দিন পালনীয় নিয়মগুলো, ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ কিরূপে সংক্রামিত হয় এবং কি ভাবে তাদের হাত হতে বাঁচা যায়, গ্রামকে কি ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় ইত্যাদি শেখাতে হবে। এই শ্রেণীতেই ছেলেদের দিয়ে গ্রামের কচুরিপানা ও আবর্জনা অপসারণ, জল বিশোধন, মশার ডিম নষ্ট করবার জন্য খানা-ডোবাতে বিশোধক দ্রব্য নিক্ষেপ ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। টিকা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও এদের বোঝাতে হবে।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বৎসর-বয়স্ক ছেলেদের সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যনীতি, বিজ্ঞান, ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস—এই কয়টি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্য আর একটু উচ্চস্তরের হবে, তাতে বড় বড় লেখকদের লেখা গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা থাকবে। রচনা ও চিঠি-পত্র লিখন শেখাতে হবে। ব্যাকরণও শিক্ষা দিতে হবে। গণিতে—পাটীগণিত, জ্যামিতি ও বীজগণিত থাকবে। পাটীগণিতের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে থাকবে—লঘুকরণ, মিশ্রযোগ, মিশ্রবিয়োগ, মিশ্রগুণ, মিশ্রভাগ, ভগ্নাংশ, গড় নির্ণয় ও ঐকিক নিয়ম এবং ল.সা.গু. ও গ.সা.গু.। জ্যামিতিতে থাকবে—জ্যামিতির আবিষ্কার সম্বন্ধে গল্প, সংজ্ঞা, দৈনন্দিন জীবনে জ্যামিতির প্রয়োজনীয়তা, প্রথম হতে দ্বাদশ উপপাদ্য ও সহজ অঙ্কন-প্রণালী। বীজগণিতে থাকবে—বীজগণিত আবিষ্কারের ইতিহাস,

ইহার প্রয়োজনীয়তা, বীজগণিতের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও ছোট ছোট সরল অঙ্ক। ইতিহাসে—ভারতে মুসলমান রাজত্বের উত্থান ও পতন এবং ব্রিটিশ রাজত্বের অভ্যুদয় ও পতন সম্বন্ধ পড়ানো হবে। ভূগোলে ছেলেদের পড়ানো হবে—দিন ও রাত্রি, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও তার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক, ভারতের জলবায়ু কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ, বাণিজ্যের অবস্থা, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি। স্বাস্থ্যবিষয়ে—সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিয়মকানুন ছাড়া শারীর স্থান ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে পড়ানো হবে। বিজ্ঞান পুস্তকে এই শ্রেণীতে কেবল সরল রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা পড়ানো হবে। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে থাকবে—১৯৪৭ সন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস। এই বয়সে ছেলেদের মন থাকে উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর। এদের দিয়ে হাতেকলমে চাষ-আবাদ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য এই বয়স হতেই। কুটীরশিল্পেও ছেলেদের উৎসাহ দিতে হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয় সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমি থাকা চাই। সেই জমি ছেলেরা চাষ করবে। তাতে ফল-মূলের বীজ বপন করবে ও তরিতরকারি জন্মাবে। সেই সব তরিতরকারি বিক্রয়লব্ধ অর্থ স্কুল ফাণ্ডে জমা দেওয়া হবে। যেসব ছেলের উৎপাদিত দ্রব্য ভাল হবে—তাদের বৃত্তি ও পুরস্কার দিয়ে উৎসাহবর্দ্ধন করা হবে। তা ছাড়া মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, উন্নত ধরণের বস্ত্রধৌতির-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দিতে হবে। এই শ্রেণীতে ছেলেদের সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস—এই কয়টি বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিতে হবে। আর চাষবাস ও কুটীরশিল্প বিষয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা নিতে হবে।

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ বৎসর-বয়স্ক ছেলেদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্ব্বশেষ শ্রেণীর ছাত্র বলে গণ্য করা হবে। এই শ্রেণীর অধ্যয়নকাল তিন বৎসর। এখানে ছেলেদের পাঠ্য বিষয় অন্য ধরণের হবে এবং উদ্দেশ্য হবে এই ছেলেদের জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত তৈরি করে দেওয়া। এ শ্রেণীতে সাহিত্য শেখাবার আর ততটা প্রয়োজন নেই। এ শ্রেণীতে ছেলেদের গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান, ভারতীয় সংবিধান, আদর্শ নাগরিকের কর্তব্য, এই কয়টি বিষয় আবশ্যিকপাঠ্য হওয়া উচিত। আর দেশ-বিদেশের কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভারতের বস্ত্রশিল্প, আধুনিক উপায়ে রঞ্জন ও ধোলাই প্রণালী, সূচীশিল্প ও দর্জ্জিবিজ্ঞান, উন্নত ধরণের মৃৎশিল্প, লৌহের উৎপত্তি ও প্রয়োজনীয়তা—এই কয়টি বিষয়ের যে-কোন একটি বাধ্যতামূলক ভাবে পাঠ্য হিসাবে গণ্য হবে। গণিতে এই শ্রেণীতে—পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, সহজ ত্রিকোণমিতি এবং সহজ জরীপ-প্রণালী শিক্ষা দিতে হবে। পাটীগণিতে পূর্ব্বশ্রেণীর অঙ্ক ত থাকবেই তদুপরি শতকরা হিসাব, সুদকষা, লাভক্ষতি, দশমিক ভগ্নাংশ, সময় ও কার্য্য সমানুপাত বিষয়ক অঙ্ক শেখানো হবে। জ্যামিতিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের উপপাদ্য ও সম্পাদ্য পড়ানো হবে। বীজগণিতে—সরল সমীকরণ, সাইমালটেনিয়াস সমীকরণ, ভগ্নাংশের সরল, সমীকরণের সাহায্যে সহজ প্রশ্নের সমাধান এবং লৈখিক চিত্রাঙ্কন শেখানো হবে। ত্রিকোণমিতির খুব অল্প অংশই শেখানো হবে যা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন হয়, যেমন ডিগ্রী, রেডিয়ান, সাইন, কোসাইন, ট্যানজেণ্ট, কোট্যানজেণ্ট, সেকাণ্ট, কোসেকাণ্টের সংজ্ঞা, তার ব্যবহার এবং সহজ সরল। আর Sin (A+B), Sin (A−B), Cos (A+B), Cos (A−B), tan (A+B), tan (A−B) ইত্যাদি কয়েকটি সহজ ফরমুলা ও তৎসংক্রান্ত সহজ সরল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়। জরীপ-প্রণালী—সহজ উপায়ে জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় শেখানো হবে।

ভূগোলে নিজের প্রদেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে পড়ানো হবে। ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যাতে ধারণা জন্মে তারও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের মধ্যে—রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা হবে প্রধান পঠনীয় বিষয়। রসায়নশাস্ত্রে—এলেমেণ্ট, কম্পাউণ্ড, এটম, মলেকিউলের সংজ্ঞা, কেমিক্যাল ইকুয়েশন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্লোরিন, কার্বন এবং তাদের প্রয়োজনীয় ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য সল্ট, সোডিয়াম ক্যালসিয়াম, লৌহ ও তাদের সল্টের প্রস্তুত প্রণালী। পদার্থবিদ্যায় সিলেবাস হবে—"Velocity, Acceleration, Newton's Laws, force, Archimedi's principle, Specific gravity, Density, Work, Energy, Power, Temperature, Thermometer, Humidity, Electric cells, Electrimotive force, Resistance."

উদ্ভিদবিদ্যায় সিলেবাস হবে Morphology, Natural order এবং Physiology, প্রাণীবিদ্যায় প্রধানতঃ গো-মহিষের পালন-পদ্ধতি শেখানো হবে। ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর পাঠ্য পুস্তক সেই সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সহজ সরল ভাষায় রচিত হবে—যাতে ছেলেরা বিষয়গুলো সহজে বুঝতে পারে।

তা ছাড়া এদের কতকগুলো বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা দিতে হবে। যেমন কৃষি—প্রত্যেক বিদ্যালয়-সংলগ্ন জমিতে তারা চাষ করবে। প্রত্যেক দশ জন ছেলে-পিছু দুই কাঠা জমি দেওয়া হবে। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছেলেরা সেই জমি কর্ষণ করবে, বীজ বপন করবে, জল সেচন করবে, শস্য উৎপন্ন হলে তা সংগ্রহ, ঝাড়াই বাছাই ও ওজন করবে। যে দলের ছেলেদের সবচেয়ে ভাল শস্য উৎপন্ন হবে তাদের বৃত্তি, মেডেল ইত্যাদি দিয়ে উৎসাহ বাড়াতে হবে। এ ছাড়া তাঁত, মৃৎশিল্প, রঙ ধোলাই, মিস্ত্রীর কাজ, লোহার কাজ ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ের ছেলেদের এইরূপ হাতের কাজের উপর বৃত্তি ও পদক দিতে হবে। কৃষিবিদ্যায় ছেলেদের মৃত্তিকা পরীক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হবে। কোন্ জমিতে কোন্ সার প্রয়োজন, কোন্ শস্য কোন্ জমিতে ভাল হবে ইত্যাদিতেও তাদের জ্ঞান থাকা দরকার। তবে প্রত্যেক স্কুলে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কতকগুলো গ্রাম নিয়ে একটি মৃত্তিকা-পরীক্ষাগার থাকবে। ছেলেরা পালাক্রমে সেখানে গিয়ে ছ'মাস করে থেকে

এই বিদ্যা শিখে আসবে। অনেকেরই ধারণা—জমিতে সার দিতে হলে যে-কোন সার দিলেই হ'ল। কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্ত। যে জমিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সারের অভাব সেখানে ফসফেট জাতীয় সারের সার দিলে নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ হবে না। এ সব ব্যাপারে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হবে।

সর্ব্বশেষ পরীক্ষা কেন্দ্রীয় প্রাইমারী এডুকেশন বোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত হবে। তাতে লিখিত ও হাতেকলমে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই পরীক্ষার ফলাফল কেন্দ্রীয় প্রাইমারী এডুকেশন বোর্ড কর্ত্তৃক ঘোষিত হবে। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তি দেওয়া হবে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছেলেদের মেধা অনুযায়ী প্রথম পঁচিশ জন ছেলেকে সরকার শহরে শিক্ষার জন্য পাঠাবেন। তাদের এক বৎসর ইংরেজীতে বিশেষ শিক্ষা দেবার পর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তাদের কিরূপ উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে, তাদের রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার সে ব্যবস্থা করবেন। এই প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হলে প্রথমেই আসে অর্থসংস্থার কথা। কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

মুমুক্ষু ভিক্ষুক

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এই মর্ত্ত্যলোকে,
কোথা পাবে সুখ
মুমুক্ষু ভিক্ষুক ?
বিশ্বে জন্ম আকস্মিক ? জন্মান্তর দেখেছ কি চোখে ?
নহ তুমি কৃষ্ণ বুদ্ধ খ্রীষ্ট গান্ধী নিমাই শঙ্কর,
নহ তুমি মহম্মদ, নহ শিব ভীষ্ম ভগীরথ,
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে রামকৃষ্ণসম নিরন্তর
আকুল অন্তর নহে। অন্বেষণ করেছ কি পথ ?

সাধনামন্দির তব আনন্দ মন্থনে
বৈরাগ্যবন্ধনে !
তোমারে রচিল যারা তিলে তিলে করি রক্তদান,
তাদের ভুলেছ বন্ধু। হে সন্ন্যাসী, কঠিন পাষাণ !
বিস্মৃত যুগের কোন্ ঐতিহ্যের ইতিহাস ধরে
ভস্ম মাগি' পথে আছ পড়ে ?

ধ্যানমগ্ন রাত্রির আকাশে
অজস্র তারকা যারা উঠে আর মেঘে ডুবে যায়,
ওদের কথাটি কভু শুনেছ কি উষার বাতাসে ?
সন্ধ্যার পূরবী সুরে পত্র দোলে গহন ছায়ায় :
জীবনের সমগ্রতা বৈচিত্র্যের মাঝে—
কোথা যাচ্ছে, কহ হে আমারে ?
পিছনে যে ফেলে-আসা দিন আর নাহি এলো কাছে
কত জরা, কত মৃত্যু দিল দেখা অশ্রু হাহাকারে ?

অক্ষর-ব্রহ্মের কোথা অনুভূতি ? শব্দ-স্রোতোধারা
অপূর্ণের প্রান্তে কোথা নেমে আসে ? অব্যক্তের কূলে-
চিরন্তন্যের লাগি অন্তরাত্মা কোথা হলো হারা ?
প্রদোষের অন্তরালে সমাধির তরঙ্গেরে তুলে !
কারে নিত্য পূজা করো জ্বালাইয়া জীবনের ধূপ,
অসীমের আনন্দের আস্বাদের পেয়েছ কি রূপ ?

অনন্ত কালের স্রোতে বুদ্বুদের মত জৈব প্রাণ,
মায়ারে ত্যজিতে গিয়া মহামায়া মন্ত্র করো জপ ;
কোথা তুমি খুঁজিতেছ ভূমাচ্ছন্ন আত্মার নির্ব্বাণ ?
কেমনে সম্ভব—
এ ঘাটের বারিবিন্দু ও ঘাটে যে হবে আবির্ভাব,
ও ঘাটে আনন্দ আর এ ঘাটে বিলাপ ?

তড়িৎ-লতা

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৪

আমাদের তিনটি প্রাণীর নিঃশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। চোখ বুজে শুয়ে আছি। শম্পা দেবীর বেদনা-বিধুর কাহিনী যেন মূর্ত্ত হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মহীয়সী সুন্দরী নারীর ব্যথার মধ্যেও একটা মহত্ব এবং সৌন্দর্য্য আছে। কিসের একটা পুলক-রোমাঞ্চে দেহ মন আবিষ্ট। যেন মনে হচ্ছিল চোখ খুললে স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে।

দিদিমা'র গলার আওয়াজে চোখ খুলতেই হ'ল। বুড়ী দরজায় দাঁড়িয়ে। সারা দুপুরের ঘুম জমে জমে চোখের পাতা দুটো ফুলে উঠেছে। আলুথালু পাকা চুল রেশমী আভায় চক্‌চকে। ঠোঁট দুটি কৌতুকে কাঁপছে—"কি গো, কুম্ভকর্ণের দল, ঘুম ভাঙ্গবে না!"

শুনতে পেলাম শম্পা দেবীর ঘন দীর্ঘনিশ্বাসের আওয়াজ—গুমোটবাঁধা ব্যথা আজ যেন বন্যার হাওয়ায় পাতলা হ'ল। তিনি তখনও নীরব। কথার জবাব দিলেন বিমুদাই—"কুম্ভকর্ণ ছ'মাস ঘুমোয়। কাজেই দুনিয়াসুদ্ধ লোকও তাই করে বুঝি।"

বয়স হলেও বুড়ীর বোধশক্তি দেখলাম প্রখর। বিমুদার কথার খোঁচা তাকে এড়াতে পারল না—"আরে ভাই, দু'দিন ধরে বড্ড ঝামেলা যাচ্ছে, তাই আজ পোড়া দু'চোখ যেন বুজে এল। রাগ করিস নে বুড়ীর কথায়। তোরাও ভাই রাতের পাখী, কোথায় কখন উড়ে বেড়াস তার ঠিক নেই, রাত-বিরেতে তোদের দেখা নদীর বুকেও পাওয়া যায়।"

শম্পা দেবী ততক্ষণে উঠে বসেছেন, তাঁর আশঙ্কা দিদিমা আবার কি কথায় কি কথা বলে বসেন। চুল গোছাতে গোছাতে মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করে বললেন, "জান দিদিমা, একটু পরেই ওঁরা চলে যাবেন।"

কথায় মারপ্যাঁচ কিছু নেই, কিন্তু সুরে বেদনার আভাস স্পষ্ট! দিদিমা যেন চমকে উঠলেন, "বলিস কি, আজই চলে যাবে। একটা রাতও ত এঁরা রইল না। না, না, না, তা কি হয়। এমন সোনার টুকরো ছেলেরা; যত্ন-আত্তি ত দূরের কথা, ওদের একটু ভাল করে দেখতেও পেলাম না। নিজের হাতে বেঁধে একটু ভাল-মন্দ না খাইয়ে ছেড়ে দিলে যে প্রাণে সইবে না!

বুড়ীর কথা গেল থেমে, ঝুলে পড়া শিথিল চামড়ার নীচে যেন এক ঝলক রক্ত ছুটে এসেছে। শুকনো চোখ বুঝি জলে চক্‌চক্ করছে, শেষের কথাগুলি বলতে গিয়ে বুঝি আওয়াজ কাঁপছিল!

একটু থেমে বুড়ী আবার নিজের কথার রেশ টেনে বলতে লাগল, "শেষকালে ছিল একটা নাতি অন্ধের নড়ি, সেটাও চলে গেল বুড়ীকে ছেড়ে। জীবন-ভোর অনেকেই দাগা দিয়ে গেছে, তার অনেকগুলোর ঘা কালের প্রলেপে আজ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ঐ হতভাগা বোধ করি ছিল আমার সবচেয়ে বড় শত্রুর—আমার বুকে কি আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল! আজও নিভল না।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। কিছুই থাকে না—তবুও আশা—এ করব, ও করব। সবই ভেল্কিবাজির মত মিলিয়ে যায়।"

হাত দুটো উল্টে দিয়ে, ব্যর্থতার ইঙ্গিত জানিয়ে বুড়ী দোর-গোড়ায় বসে পড়ল। হাল্কা হাওয়া নিয়ে বুড়ী এসেছিল, কিন্তু এখানকার গুমটের পরশে তাও যেন জমে গেল।

বিমুদার এক ঝলক হাসির আভায় চমকে উঠলাম। "তোমার কোন ভাবনা নেই দিদি, আমরা এখনও বেঁচে আছি; তোমার ঠাঁই যখন একবার মিলেছে, তখন দেখে নিও কেমন মাঝে মাঝে এসে তোমায় অতিষ্ঠ করে তুলি।"

"সে ভাগ্যি কি আমার হবে বাছা! আমার কপাল বড্ড মন্দ কিনা, তাই তোদের আমার ভাল লাগলেও কাছে টানতে ভয় পাই। ভগবান তোদের বাঁচিয়ে রাখুন। নিজের জীবন তুচ্ছ করে আঁধার রাতে নদীর বুকে যারা পরের প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের দূরে ঠেলে রাখব এমন শিক্ষা ত ভাই পাই নি।..."

"আর মনে রাখিস, এদেশের মানুষগুলোর মন বড় স্নেহকোমল, আমি যে এদেশেরই মেয়ে!"

দিদিমা বোধ হয় আরও কিছু বলতেন, কিন্তু তাঁকে একরকম মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে শম্পা দেবী বললেন, "ভবিষ্যতের কথা পরে ভাবলেও চলবে, কিন্তু আর দেরি করলে আজও যে ওদের কিছু করে খাওয়াতে পারবে তা মনে হয় না।"

তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা ধরে উঠতে উঠতে বৃদ্ধা বললেন, "তা যা বলেছিস। আমার আর এ বেলা স্নান করবার ইচ্ছে নেই, তুই বরং ওবেলার মাছ থেকে কিছু ঝোল আর ভাজা করে দে, আর আমি ততক্ষণে কিছু কুচনো কেটে দিচ্ছি, তাই দিয়ে যা হোক করে বাছাদের মুখে তুলে দেবার জোগাড় কর।"

আর কোন কথা না বাড়িয়ে ওঁরা দু'জনে চলে গেলেন। সুরু হ'ল আমাদের রওনা হওয়ার তোড়জোড়। দরজা বন্ধ করে দিলাম। একবার এসে শম্পা দেবী কৌটো দুটো দিয়ে গেলেন, যাবার সময় বলে গেলেন—কোন ভয় নেই, চারিদিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন।

বোমা আর 'ক্যাপ' ভাল করে পরীক্ষা করলাম—ঠিকই আছে। একেবারেই তৈয়ারি জিনিষ, পিক্‌রিক এসিডে ভরা গোলাটা সিগারেটের টিন, লোহার 'ক্ল্যাম্প' আর 'স্ক্রু' দিয়ে মোড়া। ক্যাপটা একটা কাগজের টুপির মতই দেখতে। এটিকে সযত্নে আলগা করে আবার রেখে দিলাম। কেননা সামান্য চাপ পড়লেই এর মধ্যে আগুন লাগতে পারে আর তারই ছোঁয়া বোমা ফেটে অঘটন ঘটাতে পারে।

আর একটা ছোট শিশিতে একটা তরল পদার্থও থাকে। বোমা নিক্ষেপের আগে ক্যাপের উপর ঢেলে দেওয়া হ'ত বোমার বিস্ফোরণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্ত।

বিজলতার কার্টি্জ আবার পরীক্ষা হ'ল। এক ফাঁকে গিয়ে কার্টিজগুলো ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে আসা হ'ল, শম্পা দেবী সাহায্য করলেন। জিনিষপত্র গুছাতে গুছাতে, মাথাটা একটু হেলিয়ে বোমার দিকে তাকাতে তাকাতে বিমুদা বললেন, "দেখ, অন্তান্ত দেশে যখন লড়াই হয় তখন কত উঁচু ধরণের বোমা তারা ব্যবহার করে। একমাত্র আমাদের দেশ ছাড়া আর সব দেশের বিপ্লবীরা বোধ হয়, আমাদের মত হাতুড়ে জিনিষ ব্যবহার করে না। তারা যে শুধু দেশের লোকের মুখদেখানো সহানুভূতি পায় তা নয়, টাকা-পয়সার সহায়তাও পায় প্রচুর। আমাদের একটা রিভলভার যোগাড় করতেই যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ঝুঁকি নিতে হয় তাতেই একটা লোকের কর্ম্মজীবন প্রায় শেষ হতে পারে।

"আর আমরা সহায়-সম্বলহীন, জনকয়েক নিঃস্ব ছেলে নিজেদের মনের আগুনে পথ দেখে ছুটে চলেছি। যারা তথাকথিত উঁচু শ্রেণীর রাজনৈতিক তাঁদের সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁরা বরং 'ভ্রান্তমতি বালক' বলে আমাদের গালাগাল দেন। আর যাঁরা সহানুভূতিশীল তাঁরাও প্রায় আমাদেরই মত বিত্তহীন।

"ইংরেজরা আমাদেরকে আখ্যা দেয় অরাজকতা সৃষ্টিকামী, এনার্কিষ্ট বলে, আর তা-ই আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ বিশ্বাস করে নেয়। আমরা যে শুধু আশ্রয়হারা তাই নয়, যেদিন আমাদের মনের সাহস, শক্তি আর বিশ্বাসের উৎস ফুরিয়ে যাবে সেদিন আমরা বসে পড়ব রাস্তায়, দেখব হাত ধরে তুলে নেবার লোক নেই।

"নিজের চোখে অবশ্য দেখি নি, কিন্তু শুনতে পাই রুশ ও আইরিশ বিপ্লবীদের সাজসরঞ্জামের কথা; ওদের দেশের লোকের পায়ে মাথা ঠেকাতে ইচ্ছে করে। মানুষ হিসেবে ত আমরা ওদের চেয়ে ছোট নই—কিন্তু ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার বনে আছি!

"মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের দেশী লোকেরা উপেক্ষা করলেও ইংরেজরা আমাদের চেনে। শত্রু হলেও শ্রদ্ধা যেটুকু ওদের কাছ থেকে পাই তাতে আমাদের মনের বল কম বেড়ে যায় না। কিছুই ত আমাদের নেই, তবুও আমরা বিপ্লবী দল গড়ে তুলি, বোমা, পিস্তল ছুঁড়ি—এটা ওদের কাছে কম বিস্ময়ের নয়! ইংরেজরা আশ্চর্য্য হয় যে, কত সামান্ত সরঞ্জাম দিয়ে বিপ্লবীরা এমন মারাত্মক বোমা তৈয়ারি করেছে!

"ওরা যখন আমাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ায় তখন বুঝি ওরা আমাদের ছেলেমানুষ বলে তুচ্ছ করে না। আমাদের শক্তি এবং সম্ভাবনার উপর ওদের বিশ্বাস আছে আর সে কারণে ভয়ও করে। ইংরেজরা জানে যে প্রত্যেকটা বড় কাজের আরম্ভ এমনিই হয়, ছোট থেকেই বড় হয়।

"আর দেখেছিস ত এই হাত-বোমাগুলোতে যে কত বিপদ অজান্তে একটু সামান্ত ভুলের দরুন ঘটে যায় তার ঠিক নেই। অনেক অমূল্য প্রাণ, উদীয়মান কর্মী যে আমাদের এমনি করে খোয়াতে হয়েছে! আর আমাদের সম্বলহীনতার জন্ত এই ক্রটি দূর করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

একটু পরেই মাথা তুলে বললেন, "নাঃ, এ দুর্ব্বলতা আমাদের শোভা পায় না—নিজেদের ব্যর্থতার জন্ত অপরকে দোষী করা, দেশের লোককে অপরাধী করার মত হীনতা, ক্ষুদ্রতা আমাদের থাকতে পারে না। লোকের অজ্ঞতা ও অশিক্ষার জন্ত আমরাই ত দায়ী। মানুষ তৈরি হ'ল না, জনকয়েক এসে হঠাৎ বললেন—তাও গোপনে—দেশ উদ্ধার করব, দেশ উদ্ধার তাতে হয় না। ঘটনাচক্রে বিদেশী সরকার যেতে বাধ্য হলেও তাতে দেশের জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা আসে না, তাতে হয় শুধু যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠা।

"পেরেছি কি আমরা আকর্ষণ করতে দেশের লোকের চিত্ত? তা আমরা পারি নি। অথচ নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্ত দোষ চাপাচ্ছি দেশের লোকের উপর। এ বিপ্লবীর শোভা পায় না।"

সন্ধ্যার একটু পরেই আমরা এক্শনে বেরোবার জন্ত তৈরি হয়ে নিলাম। মিটিমিটি প্রদীপের আলোয় ঘরটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। কারুর মুখের পরিবর্ত্তন বোঝা যায় না। নিজের উত্তেজিত মন দিয়ে অপরের মুখের ভাব বোঝা মুশকিল।

শম্পা দেবী বিমুদার হাত ধরে যেন মিনতি করে বললেন, "একটা কথা রাখবে···"

"কি কথা···"

"কথা দাও যে নিজেকে রক্ষা করবে। বেপরোয়া হয়ে নিজের সর্ব্বনাশ করবে না। পরের জন্তও ত লোকে নিজের জীবন রক্ষা করে! আর কিছু না হলেও, আমরা যারা তোমায় ভালবাসি তাদের কথা মনে করেও কি আত্মরক্ষা করবে না!" শম্পা দেবীর চোখে জল চক চক করে উঠল।

বিমুদা হাসিমুখে বললেন, "আমরাও মানুষ, মরতে আমরাও চাই নে। কোটি কোটি নরনারীর অসহায় মুখ যখন চোখের সামনে ভেসে উঠে, মনে তখন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা আরও প্রবল হয়ে উঠে। তবুও কোন রকমে বেঁচে থাকাই আমাদের লক্ষ্য নয়—আর সে উপদেশ তুমি আর তোমার মত যারা আমাদের ভালবাসে তারা কোন দিনই আমাদের দেবে না।"

নিজের কথার মধ্য দিয়ে যে দুর্ব্বলতাটুকু প্রকাশ পেয়েছিল তাতে মনে হ'ল যেন শম্পা দেবী লজ্জিত হলেন। নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্তই যেন বললেন, "তোমার কথা অস্বীকার করি নে। এই ত আদর্শ। কিন্তু আদর্শের পথে এগিয়ে যাওয়া যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্ত আত্মরক্ষারও প্রয়োজন আছে—তার অর্থ ভীরুতা নয়।"

"নিশ্চিন্ত থেকো হঠাৎ কোন উত্তেজনার বশে আমরা এ পথে বেরুই নি।"

এবার শম্পা দেবী বিনুদাকে প্রণাম করে আমার মাথার জেকের পরশ বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "যত তাড়াতাড়ি হোক ফিরে এস কিন্তু। আজ রাতের ঘুম তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই দেশছাড়া হবে। বাড়ীতে পা দিলেই দরজা খুলে দেব।"

"তেমন কাজ কিছুতেই করো না, ফিরতে আমাদের প্রায় ভোর হবে বলেই মনে হচ্ছে।"

গাঁয়ের পথ নাকি রমণীয়! কিন্তু কবি কি দেখেছেন আঁধার রাতে জলকাদা-ভরা পথহীন প্রান্তর!

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। মাঠঘাটের জল আস্তে আস্তে নামতে সুরু করে দিয়েছে। ভরা বর্ষায় এ-বাড়ী ও-বাড়ী নৌকা-চলাচল এখন আর হয় না, কিন্তু সড়ক ছাড়া মেঠো পথ জলে ডোবা—পায়ে হাঁটা ছাড়া আর গতি নেই।

যার জন্য আমাদের এই দুর্জয় অভিযান তিনি বোধ হয়, তৎক্ষণে শুভযন্ত্র পরে কন্যা-সম্প্রদান করতে বসে গেছেন। সম্ভবতঃ কালই তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করবেন। মনে হতে লাগল তাঁর অত্যাচারের কাহিনী। কয়েকটি জেলার লোক ক্ষেত্রবাবুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারণে অকারণে তাঁর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। আর কারুর গায়ে যদি বিপ্লবীর সামান্যতম ছোঁয়াচটুকুও থাকে তবে ত আর কথাই নেই। এমন কোন শারীরিক যন্ত্রণা ছিল না যা তিনি প্রয়োগ করতেন না ওদের মুখ থেকে স্বীকারোক্তি বের করবার জন্য। একটা বোমার মামলাকে দাঁড় করাবার জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস সরকারী মহলে বিশেষ প্রশংসার গুঞ্জন তুলেছে। আমরা তাই পূর্ব্ববাংলায় তাঁর বাড়ী লক্ষ্য করে চলেছি।

উত্তেজনার বশে এই আঁধার রাত, বিপদসঙ্কুল পথ কিছুই মনকে দোলা দিতে পারে নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পৌঁছলাম নবগ্রামে শম্ভুদের বাড়ীতে। শম্ভু ত আমাদের দেখে একগাল হেসে ফেলল। মনে হ'ল যেন ওর বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বয়ে গেল।

ওকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের গন্তব্য গ্রাম তালদহ গ্রাম—নবগ্রামের কাছাকাছিই বটে।

বিয়ের আয়োজনে চারিদিক আনন্দমুখরিত, তার মধ্যে ক্ষেত্রবাবুর দেহ যখন টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে ধুলায় লুটিয়ে, তখন বিয়ের বাসরের কেমন অবস্থা হবে, আর ওর স্ত্রীই বা কি ভাববেন তারই একটা কল্পিত দৃশ্য মনে মনে ভেসে উঠতে লাগল নানা ভাবে নানান আকারে। পরে ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রীর সম্পর্কে শম্ভুর কাছে অনেক কথা শুনেছি, স্বামীর অপকর্ম স্ত্রী নাকি এক দিনের জন্যও সমর্থন করতে পারেন নি। শুধু কি তাই, তাঁর মঙ্গলের জন্য তিনি দিবারাত্র দেবার্চ্চনা করতেন আর স্বামীকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন—যেন তিনি এপথ ছেড়ে দেন। ক্ষেত্রবাবু নাকি স্ত্রীকে ঠাট্টা করে বলতেন, "তবেই হয়েছে আর কি, এই সব হতভাগা ওদের ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকব! হ্যাঃ হ্যাঃ।"

ক্ষেত্রবাবুর লাঞ্ছনার হাত থেকে তার স্ত্রীও নাকি রেহাই পান নি। একবার নাকি তিনি একেবারে গোয়েন্দা আপিসের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন একটি ছেলেকে তাঁর স্বামীর কোপ থেকে রক্ষা করবার জন্য। এর ফল হ'ল উল্টো—ক্ষেত্রবাবুর ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়ল আর তার সবটুকু গিয়ে পড়ল সেই ছেলেটির উপর।

ক্রমে ক্ষেত্রবাবুর ছোট মেয়ে তাঁর মায়ের দলে ভিড়ল। ওরা মায়ে ঝিয়ে সারাদিন উপবাসী থাকত যতক্ষণ না ক্ষেত্রবাবু ফিরে আসতেন নিরাপদে কর্ম্মস্থল থেকে। পার্থিব অনেক সুখ-সুবিধার মধ্যে থেকেও ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী একদিনের তরেও মনে শান্তি পান নি—এই কথাটা মনকে আজও খোঁচা দেয়।

আমাদের সঙ্গী হয়ে যাওয়ার আগেই শম্ভু একবার বিয়েবাড়ী গিয়ে ভাল করে সব দেখে শুনে এসেছিল। ক্ষেত্রবাবু বহুদিন পরে বাড়ী এসেছেন, তাঁকেও একবার ভাল করে চিনে আসা দরকার, ভুল করে অন্য কারুর জীবন নষ্ট না করতে হয়। শম্ভু একটা মজার খবর নিয়ে এসেছে যে, এই বিয়েতে বাজী পোড়ানো ও বোমা ফাটানো নিষেধ! সতর্কতার জন্যই এই ব্যবস্থা।

ক্ষেত্রবাবু চার জন সশস্ত্র গোয়েন্দা পুলিস নিয়ে এসেছেন—তা ছাড়াও আরও দু'তিনটি লোক, মনে হয়েছিল ছদ্মবেশী গোয়েন্দা। ক্ষেত্রবাবু একেবারে সুরক্ষিত। বিয়ের লগ্ন একটু বেশী রাত্তিরে। সম্প্রদানের সময় ছাড়া ক্ষেত্রবাবু বেশী সময় বাইরে থাকবেন তাও আশা করতে পারি নি। তা ছাড়া আমাদের বেশীক্ষণ থাকাও নিরাপদ নয়।

ক্ষেত্রবাবুর বাড়ীর পাশেই আর এক বাড়ীতে বরযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা। আমরা রাত প্রায় এগারটা নাগাদ ওখানে গিয়েই উঠলাম, ওখানে তখন বিরাট হট্টগোল। বিয়ের লগ্নের সময় প্রায় উপস্থিত। কেউ কেউ বরকে সাজাতে ব্যস্ত, অধিকাংশই নিজ নিজ পোশাক-আসাকের দিকে নজর দিচ্ছে। ফরাসের উপর চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নানা রকমের সুগন্ধিতে বাড়ীর হাওয়া ভরপুর।

আমাদের দিকে সবাই একবার করে তাকাতে লাগল। কিন্তু আমাদের জন্য কারুর তেমন মাথাব্যথা দেখলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, বরযাত্রীরা বিভিন্ন দলে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। পুলিস সুপারের মেয়ের বিয়ে, কাজেই বরপক্ষ একেবারে লতায় পাতায় যেখানে যে আছে সবাইকে করেছে বরানুগমনের নিমন্ত্রণ। কেননা বরপক্ষের এক পয়সাও খরচ নেই।

বরযাত্রীরা সেজে গুজে ক্ষেত্রবাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। ওদের দল ভারী করে আমরাও ওদের পেছনে পেছনে এগোতে লাগলাম। বিয়েবাড়ীতে পৌঁছে দেখি—বিশৃঙ্খলার একেবারে চূড়ান্ত।

প্রকাণ্ড বড় আঙিনায় আসর সাজানো। একটা দিক বাসন-কোসন, শাড়ী, খাট আরও কত কি সৌখীন জিনিষে ঝলমল করছে। তিনদিকে লম্বা ফরাস বিছানো। অনবরত লোক উঠছে আর বসছে। মাঝে মাঝে তাড়াহুড়োর আওয়াজ—আর কত দেরি! মাঝখানে একদিকে বর্ণিত পিড়ে, উল্টোদিকে কনে'র জন্ত তেমনি পিড়ে, বরের ডান দিকে পুরোহিত আর যিনি সম্প্রদান করবেন তাঁর বসবার ব্যবস্থা। সবগুলি আসনই আপাতত খালি।

হঠাৎ এক সময় ক্ষেত্রবাবু বেরিয়ে এলেন, গরদের জোড়-পরা। রাজ্যের ছেলেমেয়ে তাঁকে ঘিরে, প্রতিবেশীসমেত। আমার বুক দুরু দুরু করে উঠল—যতই তিনি এগিয়ে আসতে লাগলেন ততই যেন আর সব গণ্ডগোল, হৈ চৈ মিতে যেতে লাগল। কিন্তু সুযোগ পাই কি করে! বিনুদা রাস্তাতেই বলে রেখেছিলেন যেন অনর্থক অন্ত কারুর প্রাণহানি না হয়—বিয়ের দিনে ছোট ছেলেমেয়ে, নিরীহ লোক থাকবে তাঁকে ঘিরে, তাদের একটিরও প্রাণ যাতে নষ্ট না হয়! কিন্তু সুযোগ পেয়েও কি আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব! একবার শম্ভু বলেছে এবং আমিও সমর্থন করে বলেছি—"দিই না ছুড়ে।"

বিনুদা অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, "না, তা হয় না। এতগুলো হাস্যোজ্জ্বল, আনন্দমুখর শিশু, নারী ও পুরুষ! তা হয় না।"

শম্ভু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, "তা বলে যখন পাওয়া গেছে তখন ছেড়ে দেব?" বিনুদা করুণাস্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "ঐ মুখগুলির দিকে চেয়ে কি সে ইচ্ছে হয়! আর একটু অপেক্ষা করে দেখি, সুযোগ পাবই। বিনুদা বলেছিলেন, "দেখ ঐ যে হাসিভরা মুখগুলো ওরাই আমাদের আশা, ওরাই আমাদের ভরসা—ওদের মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে যে হবে দেশের সবচেয়ে বড় সেবক। আর স্ত্রীলোক, ওরা হচ্ছে আমাদের দেশের মাতৃমূর্ত্তি, তাদের উপর হামলার মত অপরাধ আর নেই!

তবে কি আজকের অভিযান ব্যর্থ হবে? কিছুতেই নয়। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ 'বর আসছে', 'বর আসছে' বলে চারদিকে একটা সোরগোল পড়ে গেল। শাঁখ বেজে উঠল, তার সঙ্গে ঢোলক আর সানাইয়ের আওয়াজ মিলে যেন বাড়ীটাকে একেবারে মাথায় করে তুলল।

বিনুদা খুব আস্তে সরে সরে বরযাত্রীদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। এমন সময় গোয়েন্দাদের এক জন এসে বিনুদাকে জিজ্ঞাসা করলে—"তোম কোন্ হ্যায়? ইধার ক্যায়া করতে হো?"

বিনুদা মাথা নুইয়ে সেলাম করে বরযাত্রীদের দেখিয়ে বললেন, "আমি এই বাবুদের নোকর, সঙ্গে এসেছি।" গোয়েন্দা সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, বিনুদার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমন সময় বিনুদার সৌভাগ্যবশতঃ একজন প্রৌঢ় বরযাত্রী হাঁক দিয়ে বললেন—"কৈ রে, কলকেটা পালটে দিয়ে যা। এক কলকে তামাকেই এই বিয়ের নিমন্ত্রণ সারবে দেখছি! ভদ্রতাজ্ঞানও নেই।"

এই লোকটি বিবাহ-আসরে বসেই কন্যাপক্ষের দোষত্রুটি ধরছিলেন—দান-সামগ্রীর বাসনকোসন, বিছানা, বালিশ, তোষক, খাটপালঙ্ক কোনটাই ভাল নয়, সবই বাজে জিনিষ, কোথা থেকে সস্তায় সংগ্রহ করেছে ইত্যাদি।

তিনি বরযাত্রীদের প্রধান দলের সঙ্গে বরসহ আসেন নি। পরে প্রায় সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছেছেন, কাজেই কে চাকর, কে বাবু, কে কি, তা ঠিক করে জানেন না।

এই বাবুটির হাঁকডাক শুনে বিনুদা তৎক্ষণাৎ ভৃত্যের মত অতি বিনীতভাবে মাথা নুইয়ে, শরীর বেঁকিয়ে অগ্রসর হলেন, হুঁকোর মাথা থেকে কলকেটা নিয়ে দূরে সরে গেলেন।

গোয়েন্দাটি টিপ্পনী কেটে বললে, "ইয়ে নৌকর! পায়ের মে জুতি! সাফ কপড়া পিনকা!"

কথাটা সেই বরযাত্রী বাবুটির কানে গেল। তিনি ভাবলেন বরযাত্রীদের ঠেস দিয়ে কথাটা বলা হ'ল। তিনি মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন—"নাঃ, তা হবে কেন? বিয়েবাড়ীতে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে আসবে ভিক্ষে করতে! তুমি আবার কে হে গোঁট্টা ব্যাটা? আবার হিন্দি বাড়ছ! তোমার চেয়ে ও ছোট কিসে?"

গোয়েন্দা দেখলে এর সঙ্গে তর্ক করা ঠিক নয়, অনর্থক গোলমাল বেধে যাবে। বিনুদা যে আসলে চাকর সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না, সে সরে গেল।

এদিকে কুরুক্ষেত্র বাধে আর কি! উভয় পক্ষের বচসা ক্রমেই বাড়তে লাগল। চারদিকে ভিড় জমতে লাগল, হঠাৎ একটি মাঝ-বয়সী লোক এসে ওদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কন্যাপক্ষের লোকটিকে ধমকের সুরে সরিয়ে দিয়ে বরযাত্রী বুড়োকে হাত জোড় করে বললে, "মাপ করুন, সত্যিই ত আপনাদের মর্য্যাদা দেওয়ার সাধ্য কি আমাদের আছে। আপনারা নিজগুণে সব মানিয়ে নিচ্ছেন, তাই। নইলে যে কি উপায় হ'ত।

ততক্ষণে কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে বিনুদা ফিরে এসেছে। হুঁকোর মাথায় কলকেটা বসিয়ে বুড়োর হাতে দিতেই সাপের মাথায় যেন কেউ মন্ত্রপড়া ধুলো ছড়িয়ে দিল। সশব্দে হুঁকো টানতে মন দিল।

কিন্তু এ কি মুশকিল হ'ল। আমাদের টোপটিকে আর কিছুতেই সুবিধাজনক অবস্থায় পাচ্ছি নে। তিনি ক্রমেই আসরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। একেবারে আসরের মধ্যে এসে গেলে তখন আর বোমা ছোড়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। সম্প্রদান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু একান্ত অপরিচিত লোকের বেশীক্ষণ থাকার বিপদ পদে পদে। এক সময় মনে হ'ল যেন তাঁর চারদিকের লোক পাতলা হয়ে আসছে। আমার হাত পকেটের মধ্যে ঢুকে গেল। বিনুদা আমার কাঁধে চাপ দিয়ে শুধু বললেন 'উহুঃ'।

ওটাও সাময়িক মাত্র। হঠাৎ ঢাকঢোল শাঁখ আর কাঁসি বাজিয়ে ঝলমলে বর বিয়ের-আসরে এলে হাজির, অপর দিকে

চতুষ্পার্শ্ব থেকে বন্যার স্রোতের মত নানা বয়সের মেয়ে বউ আর গিন্নীরা উঠোন ভর্তি করে ফেলল।

ক্ষেত্রবাবু ওরই মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন। এমনি সুযোগ কি আর জীবনে আসবে! কিন্তু বিনুদার নিষেধ—এক দঙ্গল লোকের মধ্যে কি করে মারি! এত পরিশ্রম, এত বিপদের ঝুঁকি, তবে কি সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কৈ লড়াই করতে গিয়ে ত কোন মানুষের জীবনের মায়া শত্রুপক্ষ করে না। বোমা ত আর কেবল সৈন্য-ব্যারাক লক্ষ্য করে মারে না—তাতে কত নির্দোষ লোকের প্রাণ যায়! কিন্তু এ ব্যাপারে বিনুদা ভিন্ন-মত পোষণ করেন, তিনি বলেন, "দেশের মানুষের সঙ্গে আমাদের লড়াই হচ্ছে না। তাদের দেশাত্মবোধে জাগিয়ে তুলে শত্রু-নিপাতই আমাদের লক্ষ্য। এই পথে যে বা যারা বাধা দেবে, শুধু তাদেরই আমরা নিশ্চিহ্ন করব। অন্য লোকের উপর হামলা করলে তাদের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলতে হবে!

হঠাৎ দেখলাম একটি আধাবয়সী লোক এসে ক্ষেত্রবাবুর কানে কানে কি বলে গেল। ক্ষেত্রবাবু এক মুহূর্তের জন্য যেন কি ভাবলেন—পরক্ষণেই উঠে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার গতিপথ লক্ষ্য করে দেখলাম অদূরে দোলমঞ্চের সামনে একজন গিন্নীবান্নী-গোছের স্ত্রীলোক—গলায় শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মঞ্চের উপর তুলসীগাছ। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, উনিই ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী। একাই দাঁড়িয়ে আছেন।

বিনুদা আমায় পিঠে টোকা দিলেন। আমরাও একটু একটু করে এগোতে লাগলাম। বোধ হয়, তা হলে সত্যিই সুযোগ এল! শক্তচলাচল যেন আবার দ্রুততর হ'ল। ক্ষেত্রবাবু দোলমঞ্চের নিকটে গেছেন, জায়গাটা একরকম খালি বললেই চলে, শুধু তার স্ত্রী আছেন কাছাকাছি। এবার কিন্তু আমার আর তর সইল না। আমি বোমার উপর ক্যাপ পরালাম। যদিও ঐ গিন্নীকে তখন ঠিক চিনতে পারিনি, তবুও কেন জানি নে অনুমান করেছিলাম ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী বলেই। মরে ত স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গেই মরবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কয়েকটি ছেলেমেয়ে হঠাৎ দৌড়ে দোলমঞ্চের কাছে গিয়ে 'দাদু', 'দাদু' বলতে বলতে ক্ষেত্রবাবুর গা ঘেষে দাঁড়াল। আমার হাতে একটা চাপ পড়ল—বিনুদা আমার হাত থেকে বোমা কেড়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে ক্যাপে চাপ লেগে আগুন ধরেছে, অতি ক্ষীণভাবে জ্বলতে সুরু করেছে, আর উপায় নেই, এখখুনি এটা ফেটে যাবে, শুধু যে আমরাই মরব তা নয়, এতক্ষণ যাদের বাঁচাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম তাদেরও রক্ষা করতে পারব না! মুহূর্তের জন্য যেন সব অন্ধকার মনে হ'ল।

দোলমঞ্চের নীচেই পুকুরের ধার। ওখানটা খুবই ফাঁকা। বিনুদা দেখলাম, মাথার উপর হাত তুলে নীচের দিকে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। জলের উপর না পড়ে ওটা বাঁধানো ঘাটের উপর বিরাট আওয়াজ করে ফেটে গেল। টুকরো ছুটে এসে দুই-একটি লোক বোধ হয় আহতও হয়েছিল! কিন্তু তখন যে হট্টগোল আর চারদিকে ছুটাছুটি পড়ে গেল তাতে কোন কিছুই লক্ষ্য করা অসাধ্য। আমাদের পালাবার সুযোগ দেখছি। বেরিয়ে যেতে পারব কিনা, তারও ঠিক নেই। বরযাত্রীদের বাড়ীর দিকেই জন-স্রোত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। আমরাও সেই স্রোতে গা ঢেলে দিলাম। এখখুনি হয়ত লোকেরা পথ আটকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দেবে। আমরা ততক্ষণে তিন জনে আলাদা হয়ে গিয়েছি, যদি একজন ধরা পড়ি বাকি লোক যেন রক্ষা পায়। এক দিকে যেমন পালাবার তিড়িক, অন্য দিকে তেমনি শুনতে পাচ্ছি ভিতর-বাড়ীতে মেয়েমহলে কান্নার রোল উঠেছে—ভীতিবিহ্বলতার কান্না। যে লোক পিছন থেকে হুড়মুড় করে ঘাড়ে চাপ দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে তাকেই মনে হচ্ছে যেন আমাদের ধরতে এসেছে।

বিনুদা শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁরে শম্ভু, এই সড়ক ছাড়া আর দূর পথ নেই; এই খোলা পথে আমাদের এখন এগোনো ঠিক হবে না।"

"নেই যে তা নয়, তবে সেটা এত খারাপ যে তা আর কি বলব। ঝোপ-জঙ্গল, জল-কাদা—কি যে নেই তাই ভেবে পাচ্ছি নে।"

"তাতে আর কি হয়েছে, আমরা ত আর সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরুই নি যে, ময়দানের হাওয়া না খেলে চলবে না।"

এতক্ষণ আমি চুপ করেই ছিলাম, কিন্তু কথা না বলে পারলাম না—"কিন্তু তাই বলে প্রয়োজন না থাকলেও, বিশেষ করে এত রাতে, অপথে যেতে হবে তার কি মানে আছে?"

বিনুদা আমার কাঁধে বাঁ হাত দিয়ে চাপ দিয়ে হেসে বললেন, "নীতীশ ভীষণ চটেছে। আরে ভাই, আমাদের কি আর পথ-বিপথ আছে। আমাদের কাছে একমাত্র বিবেচ্য, আমরা লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব কি—সেই আমাদের পথ।"

"কিন্তু আজকের আচরণে ত মনে হ'ল সবকিছুকেই তুমি নির্বিচারে পথ বলে বেছে নিতে রাজী নও। নইলে এমন সুযোগ এল আর তুমি অনায়াসে ছেড়ে দিলে সেই সুযোগ। এই প্রশ্নই আজ আমার বারে বারে মনে উঠছে—এ প্রশ্ন তোমার কাছে জমা থাকতে পারবে কি?"

"নিশ্চয়ই পারবে, কিন্তু এ আলোচনা এখন নয়। রাত্রির কথা অনেক দূর থেকেও শুনতে পাওয়া যায়। পরে একদিন এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে'খন। শুধু একটা কথা বলে রাখি—আমরা এসেছি বিদেশী অত্যাচারী শাসকদের সাহায্যকারী, তাঁবেদার এদেশেরই এক অত্যাচারীকে শাসন করতে, নির্দোষ নরনারী ও শিশুকে হত্যা করতে নয়। আমরা খুনী নই যে নরহত্যায় আনন্দ পাব। যাক, এসব কথা এখন থাক। এখন আর কোন কথা নয় চল।"

আমরা নীরবে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা

শম্ভুদের বাড়ী এসে পৌঁছলাম। বাড়ীতে পা দিয়ে বিদুদা বললেন, "চট করে মলমের কৌটোটা বার কর্ ত, হাতটা বেশ পুড়ে গিয়েছে।"

"হাত পুড়ে গিয়েছে, কৈ এতক্ষণ ত কিছু বল নি! যন্ত্রণা হয় নি!"

"পুড়লে যন্ত্রণা হয়ই, কিন্তু রাস্তায় বলে কি লাভ হ'ত। মিছি মিছি তোদের মনে কষ্ট হ'ত।"

দেখলাম হাতের খানিকটা বেশ পুড়েছে। ব্যথা-বেদনা সম্পর্কে যার এই মনোভাব তাকে আর কি বলব! অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করা উচিত মনে হয়। মলম লাগানোর পরই শম্ভুকে অন্য এক গাঁয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, আর আমরা ফিরে চললাম শম্পা দেবীদের বাড়ীর দিকে। ওটাই মনে হ'ল নিরাপদ। শম্ভুর কাছ থেকে বিদুদা রিভলবারটা নিয়ে নিলেন।

১৫

ঝোপ জঙ্গল, উন্মুক্ত প্রান্তর। পাশেই একটা জঙ্গলের মধ্যে একদল শেয়ালের হুক্কা-হুয়া ডাকে চারিদিক মুখরিত করে তুলেছে। কোথায় ঘুমন্ত পাখীর ডানার ঝাপটায় গাছের ডাল নড়ে উঠেছে। জলভরা মাঠে চলতে গিয়ে সপসপ জলের শব্দ। লোকে বলে ঘুমন্ত পৃথিবী--সত্যিই কি তাই! এই ত চারদিকে প্রাণের স্পন্দন।

যারা কেবল দিনের আলোয় পৃথিবীকে দেখতে অভ্যস্ত, তারা ত দেখে নি আঁধার রাতের পৃথিবীর রূপ। তারা জানতেও পারে না এমনি করে রাতের আঁধারের অন্তরালে নিজেকে পৃথিবী জীবন্ত করে তুলতে পারে। সারাদিনের কর্মক্লান্ত মানুষ পশুপক্ষী এলিয়ে পড়ে সুষুপ্তির ক্রোড়ে -আঁধারের পর্দা টেনে দিয়ে স্নেহময়ী জননী পৃথিবী জেগে থাকেন সন্তানকে আগলে রেখে চুপটি করে। সদা-জাগ্রত মাতৃমূর্ত্তি আজ যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম—আজকের অভিযানের ব্যর্থতার গ্লানি মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে গেলাম—কিছুই বুঝি ব্যর্থ নয়।

আমরা যখন নবগ্রামে শম্পা দেবীদের বাড়ী পৌঁছলাম তখন রাত যে কত হয়েছে তা অনুমান করতে না পারলেও, আঁধার যে পালাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে তা যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। উঠোনে পা দিতেই শম্পা দেবী হ্যারিকেন হাতে নেমে এসে আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। বিদুদা মন্তব্য করলেন—"সারাপথ আঁধারে কাটিয়ে, বাড়ীর উঠোনে এসে অচল হয়ে গেলাম—এমনি ধারণা তোমার হ'ল কি করে!"

শম্পা দেবী উত্তরে বললেন--"বাইরে তোমাদের সঙ্গী হয়ে সাহায্য করতে না পারি, কিন্তু নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে যেটুকু আছে তা করবই, তাতে তোমরা যত ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর না কেন?"

বিদুদা—"যাক্, এত রাতে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চটপট বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়িগে!"

"উঁহুঃ, আগে কিছু খাও, তারপর। তারও আগে ভাল করে হাত পা ধুয়ে নাও, বারান্দায় জল আছে।"

এতক্ষণ বোধ হয় শম্পা দেবী বিদুদার ডান হাত লক্ষ্য করেন নি। পা ধোবার সময় শম্পা দেবীর হাত থেকে ঘটি নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই ব্যাণ্ডেজটা চোখে পড়ল—"ওকি, হাত বাঁধা কেন?"

"ব্যর্থতার প্রতিশোধ—সামান্য পুড়ে গেছে।"

"তা হলে কি হবে! আমার এখানে যে কোন ঔষধপত্রের ব্যবস্থাই নেই।"

"ঔষধ লাগিয়েছি—সেরে যাবে।"

"জ্বালা করছে না?"

বিদুদা অধীর হয়ে বললেন—"ঔষধ লাগিয়েছি, তুমি যাও, দেরী কর না। এত রাতে অনাত্মীয় পুরুষ আর মেয়ে একত্র দেখলে গ্রামের লোকে নানা কথা রটাবে যে!"

শম্পা দেবী—"আমরা তাই বলে মিথ্যা দুর্নামকে ভয় করে চলব?"

বিদুদা—"ভয়ের কথা নয় শম্পা। আমরা এতে গ্রামের লোকের কৌতূহল জাগাব, সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ব। তাতে যে খুব ক্ষতি হবে!"

শম্পা—"তোমার দেখি সব দিকেই নজর। এমন না হলে কি আর এত বড় দায়িত্ব চেপেছে মাথায়।"

আমাদের ঘরে হ্যারিকেন রেখে শম্পা দেবী পাশের ঘরে গিয়ে দরজা দিলেন। দিদিমার গলার আওয়াজ পেলাম—

"কে লা শমী, মানষের আওয়াজ যেন পেলাম।"

"কেউ নয়, তুমি এখন ঘুমোও দেখি? কাল বলব।"

"কাল বলবি কি লা?" দিদিমা উঠিয়া বসিলেন, "এখখুনি বল। এই দুপুর রাতে কে এল, কার সঙ্গে তুই কথা বললি, আমি তা জানব না?"

শম্পা দেবী বিপদ গ'নে বললেন—"দিদিমা, চেঁচিও না, ওরা এসেছে, সেই নৌকোর।"

দিদিমা শান্ত স্বরে বললেন—"ও তাই বল। সেই হতচ্ছাড়ারা এসেছে। তা আসুক। ছোড়া দুটো ভাল। আমি লক্ষ্য করেছি ত? ওদের কি লাগবে-টাগবে জিজ্ঞেস করে আয়। খাবার জল চায় কিনা জিজ্ঞেস কর।"

শম্পা দেবী বললেন—"আর কিছু দরকার নেই। আমি জিজ্ঞেস করে এসেছি।"

দিদিমা কিছুক্ষণ পর আবার শম্পা দেবীকে ডেকে বললেন—"ঘুমুলি নাকি শমী? কাল ছোড়া দুটোকে ভাল করে খাইয়ে দিস।"

শম্পা—"সব করব দিদিমা, তুমি এখন ঘুমোও।"

আমরা পাশের ঘর থেকে ওদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। আমাদের সম্বন্ধে দিদিমার ধারণা শুনে ভালই লাগল।

ঘুম ভাঙল দিদিমার গলার আওয়াজে—"শমী, শুনতে পাচ্ছিস—কাল থেকে সেই মাথাটা ধরে আছে, তা আমার জন্য অত ভাবনা নেই, কিন্তু ঐ দুটো হতভাগা, ওদের ত না হলেই চলবে না—একটু গরম জলের ব্যবস্থা কর না?"

গরম জলের প্রয়োজন কিসের জন্ত হবে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে নিষেধ না করলে এখখুনি হয় ত আবার গরম জলের জন্ত হাঙ্গামা সুরু হবে তাই বললাম—"না না, সকালবেলা আমাদের মুখ-টুক ধুতে গরম জল দরকার হয় না—ওর জন্যে আপনারা কোন ব্যস্ত হবেন না।"

কথা শেষ হতেই শম্পা দেবী খিল খিল করে হেসে উঠলেন। হাসি থামতে তার বেশ খানিকটা সময় লাগল। আমার কথার পরই এমনি হাসি দেখে মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হলাম, ব্যাপার কি!"

"আরে ভাই, গরম জল মানে মুখ ধোওয়ার জন্ত গরম জল নয়—ওটার মানে হচ্ছে চা।"

বিনুদা মন্তব্য করলেন—"গাঁজার দোকানে যেমন বলে—'চার আনার কড়া তামাক দিন ত?"

সবাই আমরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম। হাসি থামলে কৌতুক করার ইচ্ছেটা দমন করতে পারলাম না—"বুড়ো হয়েও দেখছি দিদিমা চায়ের আরামটি ছাড়তে পারেন নি।"

শম্পা দেবী হেসে বললেন—"তা আর জান না তুমি ভাই, কে একজন দিদিমাকে বলেছিল—বুড়োবয়সে একটু করে চা খেলে নাকি রোগ ব্যাধি সহজে ধরে না! শরীরে নাকি বেশ জোর পাওয়া যায়। দিদিমা সেই যে ধরেছেন আর ছাড়েন নি। তবে চা খাবে কিন্তু পাথরের বাটিতে। পেয়ালা নাকি অশুদ্ধ।"

শম্পা দেবী—"তোমাদেরও চলবে নাকি।"

বিনুদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"তা তুই কি বলিস, হলে বোধ হয় একটু মন্দ হয় না।" তার পর শম্পা দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"ধন্যবাদ, তোমার করুণা অসীম।"

"যাক্, নেশার খোঁজ এত দিনে পেলাম। এই মন্ত্রেই দেখছি তোমাদের ধরে রাখতে পারব।"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, না দিয়েই পরীক্ষা করে দেখুন—কিন্তু বলা আর হ'ল না। বিনুদা হাসি সুরু করলেন যেন কি মজার কথাই হয়েছে। হাসি থামলে শম্পা দেবী বললেন, "তা মানলাম। কিন্তু কোন নেশা করা নাকি সমিতির নিয়মের বিরোধী, তাই বলছিলাম আর কি।"

বিনুদা—"চা পানে নিষেধ নেই। তেমন মাথার কিরে অনেক কিছুর উপরই নেই। তবে নেশার বশীভূত হওয়া নিষেধ। সোজা কথা হচ্ছে গ্রহণ করতে হবে একান্ত নির্লিপ্ত হয়ে। অর্থাৎ, তুমি যদি চায়ের যোগাড় করতে না পার তবে তোমার বদনামও করব না—আবার চা না খাওয়ার জন্য আপশোষও থাকবে না। মাথাও ধরবে না, গা-ব্যথাও করবে না!"

আমাদের তাড়া দিয়ে শম্পা দেবী চায়ের যোগাড়ে চলে গেলেন। ফিরে এসে দেখি মাঝের ঘরটায় দিদিমা পাথরের বাটি সামনে নিয়ে বসে আছেন—আর শম্পা দেবী এলুমিনিয়মের ডেকচিতে চা ভিজিয়েছেন আর একটা পেতলের হাতা দিয়ে তাই নাড়ছেন।

কালবিলম্ব না করে আমরাও মেঝেয়েই বসে পড়লাম।

একটু সময় চুপ করে থেকে শম্পা দেবীই বলতে লাগলেন—"কাল রাত যত গভীর হচ্ছিল, ততই যেন মন নানা দুশ্চিন্তায় ভরে উঠছিল। তোমাদের কোন অনিষ্ট না হয়; এ পথেই যে ফিরতে পারবে তাও মনে হচ্ছিল না। কাজেই তোমার ও সামান্ত হাত পুড়ে যাওয়াটা আমি একেবারে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছি না। কালকের সারা রাতের দুশ্চিন্তা আজকের এই সকালের পরিবেশে যেন ডুবে তলিয়ে গেছে। বড্ড হাল্কা মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এটা ত ঠিক—কখন কোন্ দিকে যেতে হতে পারে নিজেরাও বোধ হয় জান না।"

বিনুদা—"তা প্রায় ঠিকই বলেছ।"

আমি বললাম—"জানেন দিদি, এমনিধারা জীবনে একটা উত্তেজনা আছে।"

"ওটাকেই আমি ভয় পাই সবচেয়ে বেশী। এর পেছনে যে নেশা আছে তা যেদিন ছুটবে সেদিনই হবে সব শেষ। আর নেশার ঘোর কারুরই চিরকাল থাকে না, থাকতে পারে না—কাজেই ও একদিন কাটবেই"—মন্তব্য করলেন বিনুদা।

বিশেষ না ভেবে চিন্তেই অবশ্য মন্তব্যটা করেছিলাম; কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া এত দূর গড়াতে পারে ভাবতেও পারি নি। একটু লজ্জিত হলাম।

"নেশা ছুটে যাওয়ার পর বোধ হয় অনুশোচনা হয়"—কৌতূহল প্রকাশ করলেন শম্পা দেবী।

"ক্ষেত্রভেদে নানা অবস্থা হয়। যারা সামনের পথ অন্ধকার দেখে, তারা ভাবে—হায়, হায়, কেন এপথে এসে জীবনটাকে মাটি করলাম। কেউ কেউ ভাল ছেলের মত বিয়ে-থা করে একেবারে সুদে আসলে পুষিয়ে নেওয়ার জন্ত সংসারে ডুব দেয়। কেউ-বা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে। এরাই হ'ল সমিতির দিক থেকে ঘৃণ্যতম জীব।"

"সমিতির আইনে এদের দণ্ডবিধান কি? মৃত্যুদণ্ড?"

"না, তা নয়, সকলের পক্ষে তা নয়? শুধু ঐ বিশ্বাসঘাতক-দের বেঁচে থাকাটা পছন্দ করি না। অন্ত যারা দল ছেড়ে যায় তাদের কাজও অবশ্য সমর্থন করি নে, তবুও অনিষ্ট করার চেয়ে ছেড়ে যাওয়া ভাল।

শম্পা দেবী যেন একটু অন্যমনস্ক হলেন, ক্ষণকাল চুপ করে থেকে প্রসঙ্গ বদলে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, তুমি ত কখনও বিয়ে-থা করবে না, সংসারী হবে না—এ ত একেবারে ধনুকভাঙ্গা পণ।"

বিনুদা একটু হেসে বললেন—"একেবারে ঠিক করে কি ভবিষ্যৎ বলা যায়। নিজের মনের কথাও কি কেউ ঠিকমত জানে, না নিশ্চিতরূপে নিজের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে পারে। ধনুকভাঙ্গা পণেরও শেষটা জানা আছে ত। হরধনু কেউ না ভাঙতে পারলে সীতার বিবাহ হবে না। কিন্তু সেই ধনুও একদিন ভাঙল। সীতার বিয়ে হ'ল।"

শম্পা দেবী—"তোমাদের মনে মনে যে একটা ভয় আছে তা বোধ হয় অস্বীকার করতে পারবে না।"

বিনুদা—"ভয়ডরের প্রশ্ন নয়। বিয়ে করলে নতুন কর্তব্যের আহ্বান আসে—যাকে বিয়ে করবে তার প্রতি ও যাদের পৃথিবীতে টেনে আনবে তাদের প্রতি বিচার-অবিচারের প্রশ্ন জাগে। কাজেই সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার প্রশ্ন আছে। বিয়ে করেও আত্মসর্বস্ব সংসারী হয়ে পড়ে না, সমিতির কাজে আত্মবিসর্জনে পরাঙ্মুখ হয় না—এমন লোকও সমিতিতে বিরল নয়।

সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ। নীরবে চা খাওয়া চলতে লাগল। শম্পা দেবী কি চিন্তায় যেন ডুবে গেলেন। আমার কেন জানি মনে হ'ল—বিনুদার সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ এবং সমিতিতে তাদের দু'জনের ঠিক স্থানটা কোথায় তাই হয়ত ভাবছেন।

আমার নিজের সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে উঠলাম। কেন জানি না একটা অনিশ্চয়তা এসে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমি যে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার স্থান ঠিক কোথায় ভেবে পেলাম না। নীলার কথাগুলি মনে পড়ল, বারে বারে মনকে বিদ্ধ করতে লাগল। সত্যিই কি তবে এক দিন আমার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে—আর আমি হয়ে দাঁড়াব সমিতির অনিষ্টের কারণ। নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখলাম, সেখানে যেন কামনা-বাসনা দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হ'ল আমি বড় ক্লান্ত। ফিরে যেতে পারলে যেন বেঁচে যাই। মনে পড়ল বিনুদার কথা—"মনে যার দুর্বলতা ঢোকে তাকে লজ্জা-ভয় কিছুতেই আটকাতে পারে না। সোজা পথ ছেড়ে সে তখন বাঁকা পথ ধরে। সে সোজা পথে দরজা দিয়ে সমিতি থেকে বেরুতে না পারলে গোপনে কোণ কেটে যায় হয়, সমিতির বিপদ ঘটায়। তাকে বেরুতে দেওয়াই উচিত।"

শম্পা দেবী সবাইকে চুপচাপ দেখে বোধ হয় আবহাওয়া লঘু করবার জন্যে বললেন, "তারপর বল তোমাদের নৈশ অভিযানের কাহিনী। আমি আর এক পেয়ালা করে চা দিচ্ছি সবাইকে। ভাল হয়ে বসে গল্প কর।" তখনই তিনি বললেন, "না থাক, তাও ত চলবে না। হয়ত বাধানিষেধ আছে। আমি কিন্তু সারা রাত জেগে থেকে ভেবেছি—এ সময় যদি তোমার সঙ্গে থাকতাম, গভীর জঙ্গলের পার হয়ে বা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা, মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ, কোন দিকে কিছু দেখা যায় না, কোনদিকে যেন শেষ নেই, পথও যেন অফুরন্ত—তোমার হাত ধরে চলেছি, কেবলই চলেছি, চলার যেন আর বিরাম নেই। ভাবতে ভাবতে যেন স্বপ্ন দেখলাম স্বপ্নেও জাগ্রত অবস্থার ভাবনাই চলতে লাগল। স্বপ্ন ও জাগরণ যেন এক হয়ে গেছে।"

"আশ্চর্য্য করলে তুমি আমায় শম্পা!"

বিনুদা অত্যন্ত বিস্মিত ও পুলকিত হলেন এবং উচ্ছ্বসিত আবেগের সহিত—যা তাঁর পক্ষে একেবারেই স্বাভাবিক নয়, বললেন "এমনি করে একই ভাবনা দু'জনের মনে জাগতে পারে এটা ভাবতেও যেন কেমন অদ্ভুত মনে হয়। ঐ রকম নিঃসীম প্রান্তরে, গভীর নিস্তব্ধ রাত্রিতে চলতে গেলে মন উদার হয়, চিত্ত প্রসারিত হয়, মনটা সমস্ত ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে চলে যায়। আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমারোহের মধ্যে যেন আমিও মিশে গিয়েছি। মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ গ্রহ তারকার সঙ্গে আমিও যেন চলেছি মনে হয়। এক সময়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ঐ দূরের অন্ধকারের মাঝখান থেকে তুমি ভেসে উঠলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে।"

শম্পা দেবী আবেগের সহিত বললেন, "তবে নাও না কেন সাথী করে। আমি চাই নে ছোটখাটো আবেষ্টনী—আর তারও চেয়ে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে জীবন কাটাতে। তুমি কেন হাত ধরে নিয়ে চল না আমার বিশাল প্রান্তরে। তুমি ভালবাস বলেই তোমাকে একথা বলতে পারছি।"

ক্রমশঃ

হেমন্ত-সন্ধ্যায়

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বিষণ্ণ হেমন্ত-সন্ধ্যা। বন্ধ্যা অন্ধকার
মাথা কুটে মরে হোথা করি' হাহাকার
আলোকশিশুর লাগি'! কোথা নাহি কেউ,—
সাথীহীন সারমেয় করে ঘেউ ঘেউ
ঝিল্লী-ডাকা পল্লীবাটে। অকূল তিমির
হিল্লোলিছে অবিরল,—আবরি' পৃথ্বীর
বৃক্ষবল্লী, জল-স্থল, কেদার-কান্তার।
কি কাজ আলোকে আর! এই অন্ধকার

জীবনের চিরসঙ্গী! জনম-মরণ
দুই প্রান্ত চিরদিন এমনি মগন
অনন্ত তিমিরপুঞ্জে! আঁধারের স্রোতে
নাহি জানি একদিন এনু কোথা হতে
ধরণীর শ্যামতটে। আর একদিন
মহামৌন তমিস্রায় হয়ে যাব লীন।

জীবন-জিজ্ঞাসার কবি জীবনানন্দ

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

অকালমৃত্যু সকলের ক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক, কবি ও মনীষীর অকাল-তিরোধান আরও বেশী শোকাবহ। কারণ সাধারণের মৃত্যু শুধু তার আত্মীয়-সুহৃদের হৃদয়েই শূন্যতার সৃষ্টি করে, কিন্তু এই অসাধারণ ব্যক্তিদের মৃত্যু স্বজন হৃদয়ে তো ঘটেই, সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও শুধু শূন্যতা নয় আশা-অপূরণের এক দুঃসহ বাধা ঘনিয়ে তোলে। যদি স্বাভাবিক পথে না হয়ে দুর্দৈবের বাঁকা পথে সেই মৃত্যুর পদসঞ্চার হয়, তা হলে সে বেদনার দুঃসহতা কালের প্রলেপেও মুছে যেতে চায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১৮২২) ইংলণ্ডের এক মহান্ তরুণ কবির প্রাণ এমনি বাঁকা পথে তিরোহিত হয়েছিল। আমরা পার্সি বিশি শেলীর কথা বলছি। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে এই কবিপ্রাণের অকাল অবসান আজও বিশ্বকবি চিত্তে, শুধু কবি চিত্তে কেন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই মনে এক পরম বেদনার স্মৃতি হয়ে জেগে রয়েছে। বাংলা দেশে কবি জীবনানন্দের সাম্প্রতিক জীবনাবসান (২২শে অক্টোবর) কাব্যপ্রিয় চিত্তে তেমনি এক অকুন্তদ বেদনার সৃষ্টি করেছে।

জীবনানন্দ জনপ্রিয় কবি ছিলেন একথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হবে। কারণ কবিতার নূতন বাণী যে পথ ও কাল অতিক্রম করে জনচিত্তের দুয়ারে গিয়ে পৌঁছয়, যে সকল স্তরের মধ্য দিয়ে গেলে কাব্যের নূতন ব্যঞ্জনা সর্বজন-আস্বাদ্য হয়ে উঠে, সে স্তর ও কাল জীবনানন্দের কবিতা এখনও পার হয়ে আসে নি। কিন্তু জীবনানন্দকে যদি কাব্যপ্রিয়ের কবি, এমনকি নূতন কালের কবিদের কবি বলা হয়, তা হলে যে মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না, একথা অকুণ্ঠ ভাবেই বলা চলে। কারণ আধুনিকতম কাব্যের তত্ত্বতালাস যাঁরা রাখেন তাঁরা একথা বিশেষ ভাবেই জানেন যে, অধুনাতন কাব্য জীবনানন্দের কাব্যরীতি, বর্ণনভঙ্গী, রূপকল্প প্রয়োগ, এমনকি ভাবনার প্রভাবে কত বেশী প্রভাবিত। কবিচিত্ত তো বটেই, যে মন কাব্যের মধ্যে এ কালের মর্মবাণী সন্ধানে তৎপর অর্থাৎ যাঁরা আধুনিক কাব্যের নিষ্ঠাবান সহৃদয় পাঠক তাঁদের কাছেও জীবনানন্দের কাব্য কালবাণীবাহী বলেই সংবেদ্য ও আদরণীয়।

সম্প্রতি প্রকাশিত "জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা"র ভূমিকায় কবি স্বয়ং লিখেছেন :

"আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে ; কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজচেতনার, বা অন্যমতে নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়ালিস্ট। আরও নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।"

উপরের এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে যে, কবি জীবনানন্দ কাব্যপ্রিয় মহলে যে শুধু বহু আলোচিত হয়েছেন তা নয়, তাঁর কাব্যের প্রকৃতি নিয়ে মতান্তরও ঘটেছে বিস্তর। আর এ ঘটা নিতন্তই স্বাভাবিক, কারণ কাব্যপাঠ 'শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনেরই ব্যাপার', কাজেই মানস মুকুরের পার্থক্যে ও প্রকৃতিভেদে কাব্য যে নানা মনে বিচিত্রভাবে প্রতিবিম্বিত হবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

কিন্তু ব্যক্তিমানসের এই দেখা খণ্ডিত হলেও অখণ্ড সত্যেরই বিভিন্ন দিক দেখার মত সার্থক, এবং কাম্যও বটে, কারণ এই আংশিক আস্বাদের সমন্বিত রসই অথবা এই খণ্ডরসের রসায়নই পরিণামে কাব্যরসকে সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করার সহায়ক হয়ে উঠে। সেদিক থেকে বিচার করলে কবির কাব্য যত আলোচিত হয় ততই ত তার অনাবিষ্কৃত বিচিত্র ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠে, এবং এই আলোচনায় মতভেদের সৃষ্টি হলেও তাতে কাব্যবিচারের নিষ্ঠায় আশান্বিত হওয়ারই কারণ আছে।

যাঁরা জীবনানন্দ দাশের কাব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদেরই দৃষ্টি তাঁর কাব্যের বহিরঙ্গের বর্ণাঢ্যতায়, রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শের ঐশ্বর্যময় অভিব্যক্তিতে, ভাব প্রকাশের সুসূক্ষ্ম প্রতীক-প্রীতিতে, তাঁর রূপকল্পের অভিনবত্বে, শুধু অভিনবত্ব নয়, কখনও কখনও তার অদ্ভুতত্বে, সর্বোপরি তার তাৎপর্যময় অভিব্যঞ্জনায় আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি। কবির লেখনী যেন তুলিকা হয়ে ধরণীর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট রূপের সমস্ত মহিমাকে শুধু অনুভবগম্য নয়, যেন দৃষ্টিগোচর ও স্পর্শলভ্য করে তুলেছে। বসুন্ধরার রূপৈশ্বর্যের চিত্রণেই কেবল নয়, কবির স্পর্শালু মনে ধরিত্রীলালিত কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী, মানুষ-সরীসৃপ, তরুলতা; পত্র পল্লব, মাঠ-ঘাট, গ্রাম-শহরের অন্তর-কথা আর আন্তর ব্যথা যে সংবেদনার সৃষ্টি করেছে তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে তা হয়ে উঠেছে রসান্বিত, শব্দচিত্রে রূপায়িত—তাঁর পল্লীগ্রামের 'গায়ে লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ', তাঁর 'ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্বাদে তার ভ'রে যাবে আমাদের সকলের দেহ', 'বসন্তের রাতে' তায় 'মৃগীর মুখের রূপে'

'লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুটহয়ে' ওঠে, কবিপ্রিয়ার ঘনকৃষ্ণ চুলে বিদিশার নিশার অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, তাঁর মুখের ছাঁদে শ্রাবস্তির কারুকার্যের মহিমা অভিব্যক্ত হয়। তাঁর মেঠো ইঁদুরেরা 'চিলের কান্নার মত শব্দ ক'রে 'ফসলের ঘুম গাঢ় ক'রে দিয়ে যায়', তাঁর নদীর জল কান্তারের একপাশে 'বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে-শুয়ে' কেবল 'বিকেলের লাল মেঘ' দেখে, তাঁর শালিকের অবিচল মন 'হলুদপাতার গন্ধে ভরে' ওঠে', তাঁর 'সোনালি চিলের বুক' মেঘের দুপুরে উন্মন হয়ে যায় তাঁর বেড়াল হেমন্ত-সন্ধ্যার 'জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে সাদা সাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা' করে, আর 'অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মত থাবা দিয়ে লুফে আনে।' কবির কাব্যের অনুপম রূপকল্প, তাঁর রূপ-রস-গন্ধসিক্ত অভি-ব্যঞ্জনা মণিমুক্তার মত তাঁর কাব্যের প্রতি ছত্রে সুবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে, রসগ্রাহী চিত্ত তার অভিনবত্বে শুধু চমৎকৃতই হয় না, তার মাধুর্যে মুগ্ধ, ঐশ্বর্যে বিস্মিত ও কাব্যময়তায় পরম পরিতৃপ্তিও লাভ করে।

জীবনানন্দ দাশ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে চিত্ররূপময় বলে আখ্যাত করেছিলেন। তাঁর কাব্যপাঠে সে চিত্র শুধু আমাদের চোখের সম্মুখেই রূপময় হয়ে ওঠে না, মনের পটেও তার বর্ণোজ্জ্বল রেখাপাত হয়। দু'একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক:

"'হিমের রাতে শরীর 'উম' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে
আগুন জ্বেলেছে—
মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের;
সূর্যের আলোয় তার রং কুঙ্কুমের মতো নেই আর;
হয়ে গেছে রোগা শালিকের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।'"

অথবা,

"মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে পৃথিবীর অন্ধকার গান.
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস: আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ প্রাণের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে: আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।"

অথবা,

"মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।"

অপরূপ রূপচিত্রণের এমনি অসংখ্য উদাহরণ জীবনানন্দের কাব্য থেকে আহরণ করা যেতে পারে;

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে সাহিত্যের উপকরণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

"যে-মন বরণীয়কে বরণ করে নেয় তার রুচিপালুর পরিচয় দিই। সজনে ফুলের সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্বতা কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারাল। বকফুল, বেগুনে

কুল, কুমড়ো ফুল এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে, রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে।"

কবি জীবনানন্দ যে এই 'শুচিবায়ু' দ্বারা মোটেই প্রভু হন নি, তাঁর যে কোন কাব্যগ্রন্থের উপর চোখ বুলালেই সে কথার প্রমাণ মিলবে। সমাধিকারের যুগের এই কবি কাব্যের ক্ষেত্রে এই কৌলীন্য ও আভিজাত্যের দাবিকে সযত্নে পরিহার করে চলেছেন। তাই তাঁর কাব্য শুধু অভিজাতের নয় সকলের স্পর্শেই পবিত্র হয়ে আধুনিক কাব্যাবগাহীর তীর্থ-নীরে পরিণত হয়েছে। তাঁর কাব্যে কাশ, ঘাস, বাঁশের সঙ্গে ফণি-মনসাও জায়গা করে নিয়েছে; আম, জাম, দাড়িম্বের থেকে টোমাটোও কম সমাদর পায় নি। রাজহাঁস, নীলকণ্ঠ আর সারস পাখীর সঙ্গে পেঁচা, শকুন আর মাছিরাও এসে ভিড় জমিয়েছে। সজনে ফুল কেন শশাফুলও তাঁর কাব্যের রাজ্যে অনাদৃত হয় নি; শুধু কুরঙ্গ, দাদুরী নয়, ধাই-হরিণ ও ব্যাঙও সেখানে নির্বিঘ্ন স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করেছে। আধুনিক বাংলার কবিমনে উপকরণ নির্বাচনে যে বিস্তৃতি ও ঔদার্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তার পিছনে জীবনানন্দের কাব্যাদর্শ যে অপরিমিত প্রেরণার সঞ্চার করেছে, সে কথা সশ্রদ্ধ ভাবে স্মরণ না করলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে।

জীবনানন্দের কাব্যের বহিরঙ্গে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব এত স্পষ্ট ও বিশিষ্ট যে তা নিয়েই স্বচ্ছন্দে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে, কিন্তু সে প্রয়াস এখানে আমরা করব না। আমরা কাব্যপ্রিয় পাঠকের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হলাম।

কিন্তু মহৎ কাব্য-সৃষ্টিতে বহিরঙ্গের উৎকর্ষ ও রস-ভূয়িষ্ঠতাই পর্যাপ্ত নয়, কবির কাব্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যদি একটা সামগ্রিক জীবন-দর্শন বা জীবন-জিজ্ঞাসা অনুস্যূত না থাকে, তা হলে কোন দেশে কোন কালেই সে কাব্যের মহত্ত্বের দাবি গ্রাহ্য বলে পরিগণিত হয় না। কাজেই কবির কাব্যের বহিরঙ্গ আর রসসত্য বিচারের সঙ্গে এই ভাবনা-অনুভূতির প্রয়োজনও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সকলের সঙ্গে মতৈক্যের প্রত্যাশা না করেও একথা আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলব যে, সমসাময়িক কবিদের মধ্যে একমাত্র জীবনানন্দের মধ্যে তাঁর কাব্য-সাধনার প্রথম কাল থেকে একটা অখণ্ড জীবন-দর্শনের পরিচয় লাভের আকুতি, একটা অকপট জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছিল। জীবনব্যাপী কাব্যারাধনার নিষ্ঠায় সে জিজ্ঞাসার চরম উত্তর তিনি যদি না পেয়েও থাকেন, তথাপি পরম সত্যের অস্পষ্ট আভাস, তার নিগূঢ় ইঙ্গিত যে তাঁর মনের চোখে ক্ষণে ক্ষণে ধরা দিয়েছিল, তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্য নিয়ে আলোচনা করলে সে তত্ত্বের আস্বাদন বিরল হলেও দুর্লভ হয় না। কাব্য-সাধনার পথেই কবিচিত্তে মানবাত্মার অন্তহীন অমর অভিযাত্রার তত্ত্ব উপলব্ধ হয়েছিল, তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পেরেছিলেন—

> মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
> থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
> আরো ভালো—আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
> পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
> কত দূর অগ্রসর হ'য়ে গেল জেনে নিতে আসে।

মানব-চৈতন্যের এই যে ক্লান্তিহীন অভিযান তা অন্ধকার থেকে অধিকতর অন্ধকারের দিকে নয়, সে যাত্রা আলোক থেকে উজ্জ্বলতর আলোকের দিকে, সত্যাভাস থেকে পরম সত্যের অভিমুখেই তাকে নিয়ে যায়। সত্যের নব নব রূপ যতই উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে মানবাত্মার গতির আবেগ ততই বেড়ে যায়। দিগ্বলয়ের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় তা যেমন ততই দূর থেকে দূরান্তরে অপসৃত হয়, মানব-চৈতন্য যখন মনে করে সত্যের কাছাকাছি বোধ হয় সে এসে পৌঁছে গেছে, তখন অসীমের নবতর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে তাকে অকূলের দিকে আহ্বান করে। এই অবিরাম অক্লান্ত চলার কথাই কবির ভাষায় এই ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে—

> হৃদয়ে চলার গতি গান আলো রয়েছে; অকূলে
> মানুষের পটভূমি হয় তো বা শাশ্বত যাত্রীর।

মৃত্যু মানুষের জীবন-চৈতন্যকে বার বার আচ্ছন্ন করার জন্য প্রয়াসী হয়, কিন্তু মানবাত্মার বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে "বার বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে বলে।" এই অভিজ্ঞতার কূলে কবি এক দিনে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি, তাঁকে হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হাঁটতে হয়েছে, 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে', 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে,' এমনকি ইতিহাসের আলো যেখানে আরও পরিক্ষীণ হয়ে গেছে সেই বিদর্ভনগরের অন্ধকারেও তাঁকে পরিভ্রমণ করে আসতে হয়েছে, সন্দেহ-সংশয়, ভ্রান্তি, অবিশ্বাসের বহু বিঘ্ন পার হয়ে তবে এই প্রত্যয়ের কূলে উত্তরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে প্রায়ই একটা দুর্বোধ্যতার অভিযোগ শোনা যায়। এ অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয়, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা অনেকবার তাঁর পরিচয় পেয়েছি। এই দুর্বোধ্যতার দোহাই দিয়ে তাঁর কাব্যের প্রতি বিরূপতা প্রদর্শনের দৃষ্টান্তও খুব বিরল নয়। এ অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলে, এর কারণগুলো যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তা হলে দেখা যাবে, কিছু পরিমাণে মানসিক অলসতা এবং চিন্তার জড়তাও মানা

কারণের সঙ্গে এই মনোভাবের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। কাব্য নামের যোগ্য কোন সৃষ্টিতেই পুরাতনের ঠিক পুনরাবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই গতানুগতিকতায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের কাছে অকথিত বাণীর অভিব্যক্তিকে নিতান্তই অপরিচিত বলে মনে হওয়া সঙ্গত না হলেও অস্বাভাবিক নয়। যে কোন নূতন বাণী, বা নূতন ভাবকে গ্রহণ করতে হলে মনের যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, যেখানে তার অভাব থাকে যে কোন মহৎ সৃষ্টিই সে মনের কাছে দুর্বোধ্য বলে প্রতিপন্ন হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জল স্বভাবধর্মেই সমোচ্চশীল, মনও সে দিক দিয়ে অনেক পরিমাণে জলধর্মী। সমধর্মী বা সমস্তরের যা নয় তাকেই অগ্রাহ্য করার একটা প্রবণতা মনের মধ্যে প্রবল হয়েই দেখা দেয়। যে মত আমাদের মতের সঙ্গে না মেলে, যে কথা আমাদের মত করে বলা হয় না, তাকে সমাদর করার মত সহজ প্রবণতা মনে থাকে না। আর থাকে না বলে যাকিছু বৃহৎ, যাকিছু মহৎ, যাকিছু গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম তাকেই দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্ম মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। সে জন্যেই নূতনকে বুঝবার, মহৎকে উপলব্ধি করবার জন্ম মনকে প্রস্তুত করতে হয়, তাকে উপযোগী করে তুলতে হয়। জীবনানন্দের কাব্য যে আধুনিক কালে নূতন কথা বলবার, জগৎ ও জীবনকে সম্পূর্ণ অভিনব ভাবে দেখবার একটা অভ্রান্ত প্রয়াস তা তাঁর কাব্যের দরদী পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীই জীবনানন্দের কাব্যকে আমাদের অনেকের কাছে দুর্বোধ বলে প্রতীয়মান করেছে। কবিকে আমাদের সমপর্যায়ে নামাবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে আমরা যদি তাঁর স্তরে পৌঁছবার প্রয়াস করি, তা হলে তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন হাস্ত যে আমাদের সর্বক্লান্তি অপনোদন করে নবাস্বাদে আমাদের জীবনকে পরিতৃপ্ত করবে সে কথা আমরা অকুণ্ঠভাবেই বলতে পারি। অবশ্য, এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, এই দোহাই দিয়ে মেকিও যাতে আসলের সমমর্যাদা লাভ না করে আমাদের সাহিত্যবোধকে সে সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন রাখতে হবে।

বাংলা কবিতার পাঠক মাত্রেরই বোধ হয় একথা অজানা নয় যে, বরিশালের বিচিত্ররূপা প্রকৃতির কোলেই কবি জীবনানন্দ দাশের দেহ ও মন পরিপুষ্ট হয়েছিল। তাঁর কাব্যে আমরা প্রকৃতির মনোরাজ্যের যে রহস্যময় বার্তা, তার সৌন্দর্যের যে ঐশ্বর্যময় সমারোহ, যে স্বাদ, যে স্পর্শ ও গন্ধ পাই, বরিশালের গাছপালা, নদীপ্রান্তরই প্রধানতঃ তার প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর কবি-মাতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতা তাঁর কাব্য ও জীবনদর্শনের প্রেরণাদাত্রী ও প্রেরণাদাতা রূপে যে তাঁর অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সে কথাও বিস্মৃত হওয়া সঙ্গত হবে না। এই প্রভাব তাঁর কাব্যপ্রকৃতিকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা বিশেষভাবেই অনুসন্ধের বলে আমরা মনে করি।

জীবনানন্দের কাব্যসাধনা যখন পত্রপুষ্পের মনোহারিত্বের স্তর অতিক্রম করে স্বাদিষ্ট ফলের পরিণতি লাভ করতে চলেছিল সেই পরম শুভক্ষণটিতেই নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁকে আমাদের মধ্য হতে অপসৃত করে ফেলেছে। সে ফল পূর্ণ পরিণত না হলেও যে প্রায় পরিণত সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর কল্পবৃক্ষজাত অমৃত ফল যে কাঁচায়-পাকায় সমান স্বাদু সে ত সকলেরই জানা কথা। কাজেই তাঁর কাব্যামৃতরসাস্বাদ বাঙালী পাঠকের চিত্তকে সুদীর্ঘ-কাল সরস ও সমৃদ্ধ করবে এ আশা আমরা নিশ্চয়ই করব।

কবি কীট্‌সের মৃত্যুর পর শেলী তাঁর স্মরণে যে শোক-কাব্য (Adonais) রচনা করেছিলেন, তার পরিসমাপ্তিতে তিনি বলেছিলেন—

"The soul of Adonais, like a star,
Beacons from the abode where the eternals are."

তাঁর মত আমরাও কামনা করব যে, অকালমৃত কবির আত্মা দিব্য কাব্যলোকে চির-ভাস্বর হয়ে বিরাজ করুক।
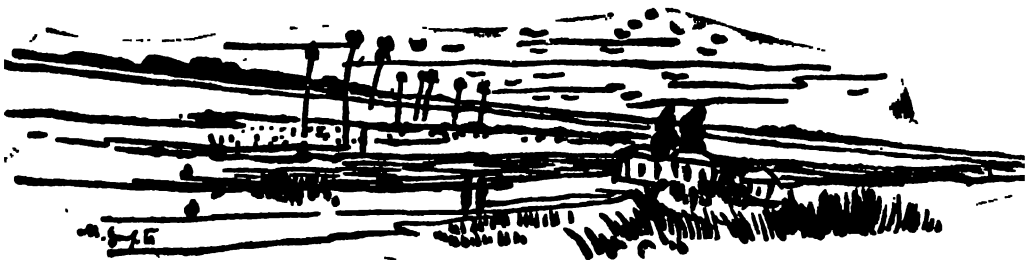
বাগাণ্ডা কোন্ পথে ?

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল একদা সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইবার জন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ঘোষণার পর ব্রহ্মদেশ, সিংহল এবং ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছে। চার্চিলের একমাত্র সান্ত্বনা যে, এই সমস্ত দেশের স্বাধীনতালাভের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। কিন্তু আজ তাঁহারই মন্ত্রিত্বকালে মালয় এবং পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইংরেজ কর্তৃত্বের অবসানের দিন হয়ত ঘনাইয়া আসিয়াছে। মালয় এবং কেনিয়ার শোষণ-জর্জ্জর নিপীড়িত জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত অ-সম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কেনিয়া, উগাণ্ডা এবং টাঙ্গানিকা লইয়া ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা গঠিত। কেনিয়ার মাউ মাউ বিপ্লবের ফলে ইংরেজ এক ঘোরতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। সম্প্রতি টাঙ্গানিকা হইতেও মাউ মাউ বিপ্লবীদের কর্ম্মতৎপরতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উগাণ্ডার অন্তর্গত বাগাণ্ডার আফ্রিকাদেশীয় নৃপতি ২য় মুতেসা বিগত ১লা ডিসেম্বর বিলাতের উপনিবেশ দপ্তরের আদেশে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। ইহার ফলে হয়ত উগাণ্ডাতেও অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

১৮৬২ সালে ইংরেজ পর্য্যটক জে. এইচ. স্পিক বাগাণ্ডা রাজ আবিষ্কার করেন। তিন বৎসর পর ১৮৭৫ সনে পর্য্যটক ষ্ট্যানলি বাগাণ্ডারাজ ১ম মুতেসার দরবারে উপস্থিত হন। ষ্ট্যানলির আগ্রহে অথবা প্ররোচনায় মুতেসা এংলিকান ধর্ম্ম-যাজকদিগকে স্বীয় রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে ইংলণ্ডের চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটি রেভাঃ সি, টি, উইলসনকে প্রেরণ করেন। তিনি ১৮৭৭ সনে বাগাণ্ডা রাজ্যে উপস্থিত হন। এই বৎসরই ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ফরাসী ধর্ম্ম প্রচারকগণ (White Fathers of Algeria) বাগাণ্ডা রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এদিকে ১৮৫৭ সন হইতে জাঞ্জিবারের মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকগণও বাগাণ্ডায় ইসলামের বাণীপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শীঘ্রই ইংরেজ প্রোটেষ্টাণ্ট, ফরাসী ক্যাথলিক এবং জাঞ্জিবারী মুসলমান প্রচারকদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমে শত্রুতায় পরিণত হইল।

১৮৮২ সনে মুসলমান প্রচারকগণ বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠিলে ক্যাথলিকগণ কিছু দিনের জন্ত বাগাণ্ডা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রাজা মুতেসা এই সময় বাগাণ্ডার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালকে প্রাগাধুনিক এবং আধুনিক বাগাণ্ডা ইতিহাসের যুগ-সন্ধি রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। এই সময়ই বাগাণ্ডাজাতি বল্কলবাসের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিতে এবং বর্শার বদলে আগ্নেয়াস্ত্র ও তরবারি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। বাগাণ্ডার কারুশিল্পীগণও এই সময় হইতেই আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও মেরামতের কার্য্যে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৮৮৪ সনে ১ম মুতেসার মৃত্যুর পর মোয়াঙ্গা বাগাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৯৪ সনে তাঁহারই রাজত্বকালে বহু দ্বন্দ্ব কলহ, রক্তপাত ও বিরোধের পর বাগাণ্ডা ইংলণ্ডের আশ্রিত রাজ্যে (protectorate) পরিণত হয়। তিন বৎসর পর ১৮৯৭ সনে মোয়াঙ্গা বিদ্রোহী হইলেন। অবশেষে ১৯০০ সনে এই বিদ্রোহ দমনের পর মেঙ্গোতে ইংলণ্ড এবং বাগাণ্ডার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। পরাজিত মোয়াঙ্গা শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া স্বীয় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহার চার বৎসর-বয়স্ক শিশুপুত্র দাউদি চোয়াকে বাগাণ্ডা সিংহাসন এবং কাবাকা (His Highness the Kabaka) উপাধি প্রদান করা হইল। কাবাকার পক্ষ হইতে সর্ব্ব বিষয়ে উগাণ্ডার ইংরেজ গবর্ণরের সহায়তা এবং তাঁহার সহিত সর্ব্ববিষয়ে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

উপরে বাগাণ্ডারাজ ২য় মুতেসার রাজ্যচ্যুতির উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীনতাভ্রষ্ট জাতির ন্যায় বাগাণ্ডা জাতিও আজ স্বীয় জাতীয় স্বার্থ, মর্য্যাদা এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। কাবাকা ২য় মুতেসা জনমতের কণ্ঠরোধ করিবার প্রয়াস পান নাই, এই তাঁহার অপরাধ। তাঁহার আর কোন দোষ আছে কিনা তাহা একমাত্র বিলাতের উপনিবেশ দপ্তর এবং উগাণ্ডার ইংরেজ গবর্ণর সর্ এনড্রু কোহেনই বলিতে পারেন।

কিছু দিন হইতে সমগ্র উগাণ্ডাতে ইউরোপীয় আগন্তুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। উগাণ্ডা প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যাও ন্যূনাধিক ৪০,০০০। এই সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে উগাণ্ডায় নূতন শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সংস্কৃত উগাণ্ডা ব্যবস্থা-পরিষদে সরকারী সদস্যগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবেন। পরিষদের গঠনে ২ : ১ : ১ এই নীতি অনুসৃত হইবে, অর্থাৎ—পরিষদে আফ্রিকাবাসীর ২ জন প্রতিনিধি থাকিলে প্রবাসী ভারতীয়

ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের ১ জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। এই ব্যবস্থায় আফ্রিকাবাসীকে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।১ পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্যান্য আদিবাসীর তুলনায় বাগাণ্ডা জাতি প্রগতিশীল এবং রাজনীতিতে সচেতন। সুতরাং নূতন শাসন সংস্কার যে উগাণ্ডাবাসীদিগকে স্বদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে পঙ্গু করিয়া রাখিবার অপকৌশল ব্যতীত আর কিছুই নহে বাগাণ্ডার নেতৃস্থানীয়গণ তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা আরও মনে করেন যে নূতন শাসন-ব্যবস্থায় বাগাণ্ডা রাজ্য বহু জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্রের অন্তর্গত নগণ্য একটি অঞ্চলে পরিণত হইবে। তাঁহারা উগাণ্ডার রাজ্যগুলির—বাগাণ্ডা, টোরো, এ্যাঙ্কোলে বুনিয়োরো সমবায়ে একটি 'আমেল' (federation) গঠনে আগ্রহশীল। তাঁহাদের স্বপ্ন সফল হইলে উগাণ্ডাবাসিগণই যে উগাণ্ডার ভাগ্যবিধাতা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ইংরেজ সরকার কিন্তু এই আমেল গঠনের বিরোধী।

অন্যান্য কতগুলি কারণেও বাগাণ্ডা বিক্ষুব্ধ এবং বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ, দক্ষিণ আফ্রিকায় মালান সরকারের অনুসৃত নীতি এবং কার্য্যকলাপে বাগাণ্ডাবাসী শ্বেতাঙ্গ জাতির উপর আস্থা হারাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজেরই অধীন গোল্ডকোষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ ডাঃ নক্রুমার নেতৃত্বে স্বায়ত্ত শাসনের পথে অগ্রসর হওয়ায় বাগাণ্ডা যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ দিকে আবার উত্তরে উগাণ্ডার ঘরের কোণে অনগ্রসর সুদানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে।

একটি উপদেষ্টা পরিষদের সহায়তায় কাবাকা স্বীয় রাজ্য পরিচালনা করেন। আসল ক্ষমতা যে উগাণ্ডার ইংরেজ গবর্ণরের হাতে, তাহা না বলিলেও চলে। এই উপদেষ্টা পরিষদকে লুকিকো বা 'দি গ্রেট লুকিকো' বলা হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এই পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৫৪ সনে লুকিকোর নির্ব্বাচন হওয়ার কথা। উগাণ্ডা ব্যবস্থা-পরিষদকে সম্প্রতি বর্দ্ধিত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। ফলে বাগাণ্ডার আভ্যন্তরীণ বিধি-ব্যবস্থার উপর ইহার কর্তৃত্ব ব্যাপকতর হইয়াছে। বাগাণ্ডার বিক্ষুব্ধ হইবার ইহাও একটি কারণ।

বিগত জুন মাসে ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিব মিঃ অলিভার লিটলটন লণ্ডনের একটি ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মধ্য আফ্রিকা 'আমেলে'র (Central African Federation) উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ব আফ্রিকাতেও অনুরূপ একটি আমেল গঠনের সম্ভাবনার আভাস প্রদান করেন।১ এই ত সেদিন মধ্য আফ্রিকার উত্তর-রোডেসিয়া, দক্ষিণ-রোডেসিয়া এবং নিয়াসাল্যাণ্ডের জনমত উপেক্ষা করিয়া মধ্য-আফ্রিকা আমেল গঠন করা হইয়াছে। ফলে এই সমস্ত দেশের অধিবাসীদিগের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

কেনিয়ার ইংরেজী কাগজগুলি লিটলটন সাহেবের বক্তৃতা ফলাও করিয়া প্রকাশ করে। ফলে বাগাণ্ডা-জাতি চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাদের আশঙ্কা হইল যে, বাগাণ্ডা যে নাম-মাত্র স্বাধীনতা ভোগ করে, কেনিয়া এবং টাঙ্গানিকার সহিত সম্মিলিত হইলে তাহাও লোপ পাইবে। স্যর্ এণ্ড্রু কোহেনের পরামর্শে বিলাতের উপনিবেশ দফ্তর ঘোষণা করিল যে, পূর্ব্ব-আফ্রিকার জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমেল গঠন করা হইবে না। কিন্তু বিক্ষুব্ধ বাগাণ্ডার জনগণ ইহাতে আশ্বস্ত হইল না।

ইহার পর লুকিকো পরিষদের পক্ষ হইতে গবর্ণরের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। এই স্মারক-লিপিতে উগাণ্ডাকে কোন আমেলের অন্তর্ভূত না করিবার, বাগাণ্ডার শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রণের ভার উপনিবেশ দফ্তরের নিকট হইতে হস্তান্তরিত করিয়া পররাষ্ট্র দফতরের উপর অর্পণের এবং বাগাণ্ডাকে স্বাধীনতা প্রদানের নির্দ্দিষ্ট সময় ঘোষণা করিবার দাবি জানানো হয়।২ গবর্ণর এই সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করিলেন। কাবাকা গবর্ণরের সিদ্ধান্তের কথা লুকিকোকে জানাইতে আদিষ্ট হইলেন। গবর্ণর আরও গোঁ ধরিলেন যে, লুকিকোর অধিবেশনে কাবাকাকে সরকারী সিদ্ধান্তের সপক্ষে ওকালতি করিতে হইবে। কাবাকা দ্বিতীয় মুতেসা উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, গবর্ণরের হুকুম তামিল করিলে জনগণের আস্থা হারাইয়া তিনি হয় ত সিংহাসনচ্যুত হইবেন, আর যদি হুকুম তামিল না করেন তাহা হইলে তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইবেন।

দ্বিতীয় মুতেসা ইহার পর বহুবার গবর্ণর স্যর্ এণ্ড্রু কোহেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গবর্ণর তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, উগাণ্ডা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাগাণ্ডার

---

১ উগাণ্ডার ন্যূনাধিক ৪০,০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে প্রবাসী ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণের সংখ্যা ৫০,০০০-এরও কম।

(1) "Nor should we exclude from our minds the evolution as time goes on of still larger measures of unification and possibly still larger measures of federation of the whole East African territories."

(2) "We strongly oppose any form of political union affecting Uganda with the neighbouring territories, and most earnestly urge that the affairs of our country revert to the Foreign office and a time-limit be set for our independence within the Commonwealth."

লাভ অপেক্ষা লোকসানই বেশী হইবে। কিন্তু 'দুষ্ট বালক' মুতেসা এই যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিলেন না।

বিগত ১লা ডিসেম্বর উপনিবেশ দফতরের আদেশে মুতেসা সিংহাসনচ্যুত হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছেন। জনমতের বিরোধিতা করিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইল।

ইংরেজ পক্ষের অভিযোগ এই যে, গবর্ণরের আদেশের বিরোধিতা করিয়া মুতেসা ১৯০০ সনে সম্পাদিত মেঙ্গো-মন্দির সর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়াছেন। এই অভিযোগ কিন্তু অমূলক। যদি তিনি গবর্ণর কর্ত্তৃক লুকিকোর দাবি অগ্রাহ্য হইবার কথা লুকিকোকে জানাইতে অথবা লুকিকোর অধিবেশনে গবর্ণরের নীতি সমর্থন করিতে অসম্মত হইতেন তবেই সন্ধির সর্ত্ত লঙ্ঘনের কথা উঠিতে পারে। কিন্তু তিনি ইহার কোনটিই করেন নাই। করিতে পারেন এই আশঙ্কা দেখা দিতেই তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মুতেসার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি বাগাণ্ডাকে উগাণ্ডা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উগাণ্ডার অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। তিনি বরং উগাণ্ডার অখণ্ডতা এবং উগাণ্ডার বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করিতেই সচেষ্ট ছিলেন। বিগত অক্টোবর মাসেও তিনি উগাণ্ডার টোরো, এঙ্কোলে এবং বুনিয়োরো রাজ্যের দেশীয় নৃপতিগণের সহিত একযোগে সর্ এণ্ড্রু কোহেনের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। মুতেসার নির্ব্বাসনের পর ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে এই চিঠির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। সত্যের অপলাপ এবং সত্য গোপন একই পর্য্যায়ভুক্ত। মুতেসা যদি উগাণ্ডার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতেই চাহিয়াছিলেন, তবে উগাণ্ডার অন্যান্য রাজাদের সহিত একযোগে পত্র লিখিলেন কেন? এই পত্রের মর্ম্ম কি? এই পত্রের কথা চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে কেন?

উগাণ্ডার ইতিহাসে যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে, তাহা পরিণামে কি রূপ পরিগ্রহ করিবে জোর করিয়া বলা না গেলেও কেনিয়া এবং মালয়ের কথা মনে করিয়া আশঙ্কা হওয়ার কারণ বিদ্যমান।

ব্যাঙ্ক ডিপোজিট সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীশিবশঙ্কর দত্ত

আমাদের দেশে ব্যাঙ্কে ডিপজিটের পরিমাণ বাড়িয়া চলিতেছে। দেশের লোকের ধন বৃদ্ধি হইলে ব্যাঙ্ক ডিপজিট বাড়িতে পারে; লোকের ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইলেও ব্যাঙ্ক-ডিপজিট বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে; আবার দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইলেও ব্যাঙ্ক-ডিপজিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার সুযোগ বৃদ্ধি পাইলে ব্যাঙ্ক-ডিপজিট বাড়িতে পারে—যেমন মফঃস্বলে যদি ব্যাঙ্কের শাখাসমূহ স্থাপিত হয় তাহা হইলে কিছু লোক ঐ ঐ শাখা-ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখে। সুতরাং ব্যাঙ্কের ডিপজিট বৃদ্ধি দেখিয়া সহসা কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না বা করা সমীচীন নহে। এ সম্বন্ধে সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য ব্যাঙ্ক-ডিপজিট সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার।

প্রথমে দেখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের ডিপজিট কি ভাবে বাড়িতেছে এবং ইহার সঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতির কোনও সম্পর্ক আছে কি না। আমাদের এই আলোচনা অবশ্য প্রাথমিক আলোচনা—সেজন্য মোটামুটি তথ্য ও পরিসংখ্যানাদির সাহায্যে এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ভারত-বিভাগের ফলে পাকিস্থান ও ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি বিভিন্ন রকমের হইয়াছে, বিশেষতঃ ডি-ভ্যালুয়েশনের ফলে উভয় দেশের মুদ্রামূল্যের হার সমান নহে। কাজেই এমতাবস্থায় আমরা এই আলোচনা ১৮৭০ হইতে ১৯৪৭ সনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলাম। নিম্নে আমরা প্রতি দশ বৎসর অন্তর ব্যাঙ্কের মোট ডিপজিট কি পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহার হিসাব দিলাম:

	ডিপোজিট
১৮৭০	৭০৬ লক্ষ
১৮৮০	১,২৫৩ ,,
১৮৯০	২,৫০০ ,,
১৯০০	৩,১৪৬ ,,
১৯১০	৮,২৭৯ ,,
১৯২০	২২,৩৯৭ ,,
১৯৩০	২০,৭৯
১৯৪০	২৯,৫৩৫ ,,
১৯৪৭	১১৪,২১৭ ,,
১৯৫৩	৮৩,৪৭৬ ,,

এই পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, ১৮৭০ সনের তুলনায় ব্যাঙ্কের ডিপোজিট বহু গুণ (১৪২ গুণ) বাড়িয়াছে। ১৯৩০

সনে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের ফলে ডিপোজিটের পরিমাণ যে বাড়িয়া গিয়াছিল, আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ৭ বৎসরে প্রায় ৩৮ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে ইহাই উপরের পরিসংখ্যান হইতে বুঝিতে পারা যায়।

মানুষই ধন উৎপাদন করে। মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ধন বৃদ্ধির তথা ব্যাঙ্কের ডিপোজিট বৃদ্ধির সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং মাথাপিছু কেমন ভাবে ডিপোজিট বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা হিসাব করিয়া দেখা প্রয়োজন। আদমসুমারির হিসাবে ১৮৭২ সন হইতে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হইল :

	লোকসংখ্যা
১৮৭২	২,০৪৪ লক্ষ
১৮৮১	২,৫০১ ,,
১৮৯১	২,৭৯৬ ,,
১৯০১	২,৮৩৯ ,,
১৯১১	৩,০৩৪ ,,
১৯২১	৩,০৫৭ ,,
১৯৩১	৩,৩৮১ ,,
১৯৪১	৩,৮৮৮ ,,
১৯৪৭	৩,৪৮০ ,,
১৯৫৩	৩,৬১২ ,,

১৮৭২ সনের আদমসুমারি ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের প্রথম আদমসুমারি। কিছু মানুষ যে এই গণনায় বাদ পড়িয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্য ১৮৭০ সনের লোকসংখ্যা ১৮৭২ সনের গুণতির সংখ্যার সহিত সমান ধরিয়া লওয়া গেল। ১৯৪১ সনের লোক সংখ্যা হইতে পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বাদ দিয়াও ১৯৪১-১৯৫১ সনের মধ্যে লোক বৃদ্ধির ৭/১০ অংশ হিসাবে ধরিয়া ১৯৪৭ সনের লোকগণনা করা হইয়াছে। আর ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে লোকগণনা হয় বলিয়া ১৮৮০ প্রভৃতি সনের লোকসংখ্যা ১৮৮১ প্রভৃতি সনের আদমসুমারির লোকসংখ্যার সমান ধরা হইয়াছে। এখন দেখা যাক, মাথাপিছু ব্যাঙ্কের ডিপোজিট কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথা :

মাথাপিছু ব্যাঙ্কের ডিপোজিট

	টাকা	আনা
১৮৭০	—	৫.৫
১৮৮০	—	৮.০
১৮৯০	—	১৪.৩
১৯০০	১	১.৬
১৯১০	২	১১.৭
১৯২০	৭	৫.২
১৯৩০	৬	২.৪
১৯৪০	২৯	৬.১
১৯৪৭	৩২	১৩.১
১৯৫৩	২৩	০০

এখানেও দেখা গেল, ১৯৩০ সনে পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কটের ফলে মাথাপিছু ডিপোজিট কমিয়াছে। আর ১৮৭০-এর তুলনায় ১৯৪৭ সনে মাথাপিছু ডিপোজিট বাড়িয়াছে ৮৫ গুণ, টাকা হিসাবে ১৬৩ গুণের প্রায় অর্দ্ধেক। পূর্ব্বে যে হিসাব দেওয়া হইল তাহা টাকার মাপে, কিন্তু টাকার মূল্য সব সময়ে সমান থাকে না এবং থাকেও নাই। সেজন্য ব্যাঙ্কের ডিপোজিট প্রকৃতই ধনের মাপে বাড়িয়াছে, না কেবল টাকার মাপেই বাড়িয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তবে দ্রব্যমূল্যের তারতম্য হেতু এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দ্রব্যমূল্য কিরূপ বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে তাহার হিসাব জানিতে পারিলে এই বিষয়ে একটু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। দ্রব্যমূল্য কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা ধানের মূল্য হইতে মোটামুটি জানিতে পারা যায়। বিগত আশী বৎসরের মধ্যে ধানের দর ২৪ পরগণা জেলায় বিশেষ করিয়া চেংলার হাটে ক্রমে ক্রমে কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার একটা হিসাব নিম্নে দিলাম :

টাকায় কত ধান পাওয়া যায়

	পৌষ মাসে		ভাদ্র মাসে		গড়	
	সের	ছটাক	সের	ছটাক	সের	ছটাক
১৮৭০	২২	১০	২১	৪	২১	১৫
১৮৮০	১২	৪	১৬	০	১৪	২
১৮৯০	১৬	৮	১৫	০	১৫	১২
১৯০০	১৫	১০	১০	০	১২	১৩
১৯১০	৯	৮	১০	০	৯	১২
১৯২০	৫	৫	৪	৯	৪	১৫
১৯৩০	৭	০	৮	০	৭	৮
১৯৪০	৯	০	৮	০	৮	৮
১৯৫০	২	৭	১	৬	১	১৪½

ধানের মূল্য ঋতুভেদে কমে ও বাড়ে। অজন্মার ফলেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৮৮০ সনে বাড়িয়াছিল, পরে কমিয়াছে। সহজে বুঝিবার জন্য মণকরা ধানের মূল্যের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১৮৭০	১৵/২ পাই
১৮৮০	২৸/৭ ,,
১৮৯০	২। ৭ ,,
১৯০০	৩৵০ ,,
১৯১০	৪/ ৭ ,,
১৯২০	৮/ ১১ ,,
১৯৩০	৫।/ ৫ ,,
১৯৪০	৪/১১ ,,
১৯৫০	২০৸৶/১১ ,,

ধান ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের প্রধান শস্য হইলেও সমগ্র ভারতে প্রধান শস্য নহে। ইহা ছাড়া এদেশের অন্যান্য পণ্যদ্রব্যও আছে যেমন পাট, চা, কয়লা প্রভৃতি।

সুতরাং ধানের মূল্যের কিংবা অন্যান্য খাদ্যশস্যের মূল্যের তার

তথ্যের উপর ষোল আনা নির্ভর করা সমীচীন হইবে না। এজন্য আমরা ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত দ্রব্যমূল্যের সূচকসংখ্যার উপর নির্ভর করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমরা Weighted index number (100 articles) equated to 100 for 1873 ব্যবহার করিতেছি। প্রথমে ১৮৭০ হইতে ১৯৩৮ অবধি সূচকসংখ্যা, পরে ১৯৩৯=১০০ যে সূচকসংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল। এই শেষোক্ত সূচকের তুলনায় পূর্ব্বের তালিকায় ১৯৪০ ও ১৯৪১ সনের সূচক হিসাব করিয়া দেখানো যাইতেছে :

১৮৭০	১০৭	১৯৩৭	১৪৭
১৮৮০	১০৯	১৯৩৮	৯৫·৭
১৮৯০	১১৭	১৯৩৯	১০৫·৯
১৯০০	১৪৩	১৯৪০	১১৮·১
১৯১০	১৫০	১৯৪১	২৯৬·৫
১৯২০	৩০২	১৯৫০	৪০০·৭
১৯৩০	২১৩	১৯৫৩	৩৯৯·৯

আমাদের কষা সূচক—

১৯৪০	১৮২
১৯৪১	৪৫৫
১৯৫৩	৬১৪

১৮৭০ সনের মাথাপিছু ব্যাঙ্ক-ডিপোজিটের পরিমাণকে যদি আমরা ১০০ ধরি তবে মাথাপিছু ব্যাঙ্ক-ডিপোজিটের সূচকসংখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়। যথা :

১৮৭০	·৯৪
১৮৮০	১·৩৪
১৮৯০	২·২২
১৯০০	২·২৪
১৯১০	৫·৩০
১৯২০	৭·০৬
১৯৩০	৮·৩৫
১৯৪০	৪৬·৯৬
১৯৪১	২০·৯৮
১৯৫৩	১৩·৫৯

দেখা যায় যে, টাকার বা মাথাপিছু হিসাবে ব্যাঙ্ক-ডিপোজিটের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলেও ইহা প্রকৃত ধন বৃদ্ধির পরিচায়ক নহে, কেননা ১৯৪১ সনের ব্যাঙ্ক ডিপোজিট ১৯৪০ সনের ব্যাঙ্ক-ডিপোজিট অপেক্ষা অর্দ্ধেকেরও অনেক কম, ১৯৪৩ সনে তিন ভাগের এক ভাগেরও কম। সবটাই ধন বৃদ্ধি বা ধন হ্রাসের পরিচায়ক নহে। ইহার আনুষঙ্গিক কারণগুলি হইতেছে : (ক) ব্যাঙ্ক ফেল করায় ব্যাঙ্ক হইতে টাকা গুটাইয়া লইবার প্রবৃত্তি ও তাহার প্রত্যক্ষ ফল ; (খ) বহু ব্যাঙ্কের শাখা তুলিয়া দেওয়া ; (গ) বাণিজ্যের, বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের সংকোচন ইত্যাদি। এই সকল কারণ বিদ্যমান না থাকিলে বা তাহার ফলাফল যাচাই করিতে পারিলে ভারতের লোকের মধ্যে Banking habit অর্থাৎ ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখার অভ্যাস বাড়িতেছে কি কমিতেছে তাহা ভাল বুঝা যাইত। তবে চেকের ব্যবহার যে বাড়িতেছে একথা বলা চলে। নিম্নে আমরা চেকের সংখ্যা, চেকের মোট টাকা ও গড়ে কত টাকার চেক হয় তাহার একটা হিসাব দিলাম :

	চেকের সংখ্যা	চেকের মোট টাকা	গড়ে কত টাকার
	হাজার	লক্ষ	চেক
১৯৫১	২,৮০·৪১	৭,৮৭৭·৯৯	২৮০৯ টাকা
১৯৫২	২,৯০·৩৪	৬,৮৫৩·৪০	২৩৬০ ,,
১৯৫৩	৩,১১·৯৯	৬,৬০৩·২৫	২১১৭ ,,

উপরের হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, চেকের সংখ্যা বাড়িতেছে ও গড় টাকার পরিমাণ কমিতেছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, লোকে লেনদেনের ব্যাপারে চেকের ব্যবহার করিতেছে। ইহার আরও প্রসার হওয়া আবশ্যক।

ফ্রান্সে আর্থিক উন্নয়ন

গত ছয় বৎসরের অধিককাল যাবৎ ফরাসী ইউনিয়নের আর্থিক উন্নয়ন অপেক্ষা ফ্রান্সের রাজনৈতিক সমস্তার উপর সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ প্রায়শঃই অধিকতর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

তাহা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যুদ্ধ-সমাপ্তির পর সমগ্র ইউরোপে যে সকল দেশে অত্যন্ত দ্রুততার সহিত আর্থিক পুনরুজ্জীবন হইয়াছে, ফ্রান্স তাহাদের অন্যতম। ১৯৫৩ সনের শেষভাগে ফ্রান্সে যে ভাবে শিল্পোৎপাদনের উন্নতিবিধান হইয়াছে, কেবলমাত্র পশ্চিম জার্ম্মানী এবং হল্যাণ্ড ছাড়া আর কোন দেশই তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই ব্যাপারে ফ্রান্সের কৃতিত্ব আরও বেশী এই কারণে যে, ফ্রান্সকে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহুলাংশে গুরুতর প্রতিবন্ধসমূহ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। ফ্রান্সের বেলায় ১৯২৯ সনের প্রাগযুদ্ধকালীন উৎপাদনের স্তর ফিরাইয়া আনার মানে শুধু যুদ্ধজনিত অপচয়ের প্রতিকারই নয়; এই শতকের তৃতীয় দশকে দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবসায়ের মন্দা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও টাকা খাটানো এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সংরক্ষণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বকেয়া পড়িয়াছিল, সেই ঘাটতি পূরণ করিয়া লওয়াও এই দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, এই সকল প্রচেষ্টায় হাত দেওয়া হয় সেই সময়ে যখন ইন্দোচীনে চলিতেছিল এক রক্তক্ষয়ী এবং বিপুল ব্যয়সাধ্য যুদ্ধ। কেবলমাত্র টাকার কথা বলিতে গেলে—প্রতি বৎসর এই যুদ্ধের জন্য খরচ হইত আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক অর্থসাহায্যের

'পা-দ্য-ক্যালে খনি অঞ্চল
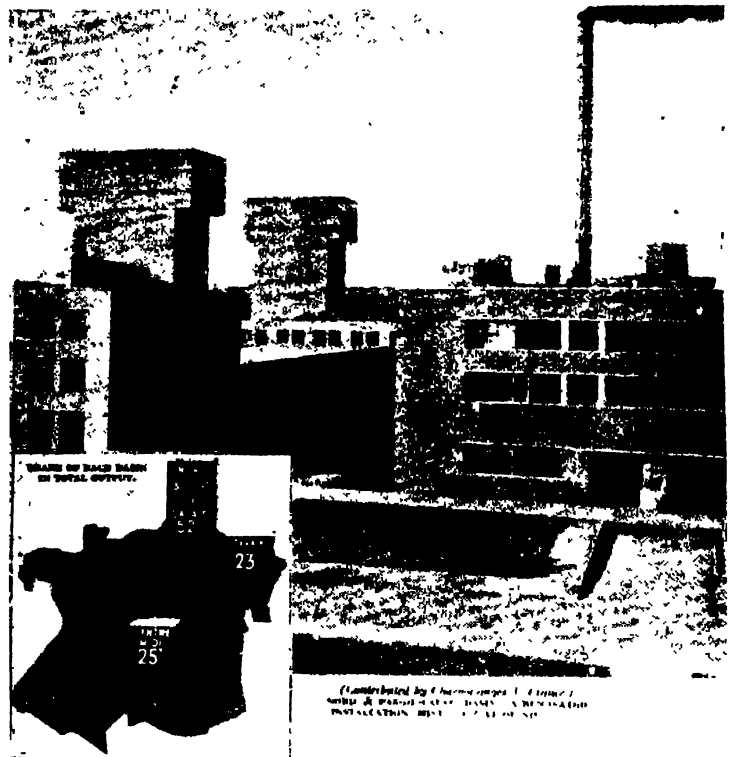
হওল; দুঃখের বিষয়, অনেকেই এই কথাটা প্রায়ই ভুলিয়া যান। ফ্রান্স যে যুগপৎ এই গুরুভার বহন এবং আর্থিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এরূপ সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময় অপেক্ষা আধুনিক কালে এই দেশের জাতীয় সম্পদকে উৎকৃষ্টতর ভাবে কাজে লাগানো হইয়াছে।

ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিদের এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। অনেকগুলি সব কমিশনসহ আঠারটি 'মডার্নাইজেশন কমিশন' গঠিত হইয়াছে। প্রায় সহস্রাধিক কর্মী—তন্মধ্যে ব্যবসায়ী, পণ্যোৎপাদক, কৃষিকর্মকারী, সাধারণ কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, টেক্‌নিশিয়ান, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই আছে—এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য একযোগে কাজ করিয়াছেন।

২৮০ ফুট উচ্চ চাস্ত বাঁধ

বস্তুতঃ, প্রথম পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত যে সুফল লব্ধ হইয়াছে তাহা আশানুরূপ। নূতন অর্থনীতির ফলে ফরাসী দেশের পণ্যোৎপাদন-শক্তি যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত অতীতে কোন কালে নাই। কিছুকাল পূর্ব্বেও যে দেশের লোকের প্রবণতা ছিল ব্যক্তিগত সঞ্চয় অথবা অপচয়ের দিকে, সেই দেশে আজ জনকল্যাণমূলক কর্ম্মে বিনিয়োগার্থে প্রকৃত মূলধনের সৃষ্টি হইয়াছে। টাকার ঘাটতি অথবা উপকরণের অভাবে আজ সেখানে উৎপাদন-প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় না। একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, ফরাসীদেশে মার্কিন অর্থসাহায্যের সদ্ব্যবহারই হইয়াছে এবং হইতেছে; ইহার ফল হইবে স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। কিন্তু তাই বলিয়া যদি একথা বলা যায় যে, বর্ত্তমান ফরাসী অর্থনীতি ত্রুটিশূন্য এবং সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা হইয়াছে, তবে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কোন কোন বিষয়ে ত্রুটি যে রহিয়াছে তাহা সুপরিস্ফুট। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জীবনযাত্রার মানের আশু উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। তা ছাড়া ফরাসীদেশের উৎপাদন এবং উৎপাদিকা-শক্তি দুই-ই আরও বাড়ানো দরকার। ফ্রান্সের দ্বিতীয় পরিকল্পনা শুধু অর্থবিনিয়োগমূলক কর্মতালিকাই হইবে না, অর্থের পরিমাণ বাড়াতে ক্রমবর্দ্ধমান হয় সেই জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম্মপন্থাও তাহাতে অনুসৃত হইবে। ১৯৫৪-১৯৫৭ এই চার বৎসরব্যাপী পরিকল্পনাটির লক্ষ্য হইবে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা। তন্মধ্যে কৃষি-উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ এবং শিল্পোৎপাদনের শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগ বাড়ানোর চেষ্টা করা হইবে। ১৯৫৭ সনের মধ্যে ২,৪০,০০০টি নূতন অট্টালিকার নির্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইবে, বর্ত্তমানে অট্টালিকার সংখ্যা ৮০,০০০।

এই উৎকর্ষবিধানের পক্ষে মার্কিন অর্থসাহায্য ছাড়া যে জিনিষটি সর্বাপেক্ষা কার্য্যকর হইয়াছে তাহা আর্থিক পুনর্গঠন এবং আর্থিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত 'মনেত প্ল্যান'। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জাঁ মনেতের উপর এই পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার অর্পণ করা হয় এবং তাঁহার নামানুসারেই এই পরিকল্পনার নামকরণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে সাফল্যের সহিত অনুসৃত হইয়াছে।

'মনেত পরিকল্পনা সংস্থা'কে তথাকথিত বিশেষজ্ঞ এবং শিল্পবিদ্‌গণকর্ত্তৃক (technicians) ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা হয় নাই। ইহার প্রস্তুতি এবং কার্য্যকরীকরণের ভারপ্রাপ্ত 'কমিসারিয়াট জেনারেল' কখনো একসঙ্গে কুড়ি জনের অধিক সর্বক্ষণের (full time) কর্মীকে কাজে লাগান নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে বিভিন্ন

এই সকল বর্দ্ধিত উৎপাদনের সমস্তটাকেই কিন্তু জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন-কার্য্যে লাগানো যাইবে না। বর্ত্তমান বাহ্যিক ঘাটতি (External Deficit) এড়াইবার জন্য ফ্রান্সকে তাহার

কৃষিপদ্ধতির অধিকতর আধুনিকীকরণ (modernization) দ্বারা কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণীকৃত করিতে হইবে এবং বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাড়াইতে হইবে। ইহার মানেই এই যে, চিরাচরিত রপ্তানি-ধারার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ নূতন নূতন প্রণালীরও উদ্ভাবন করিতে হইবে।

এই সকল বিষয়ে সাফল্যলাভ যে সহজসাধ্য নয়, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কেবল যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ গৃহনির্মাণের বেলায়) বিপুল অর্থবিনিয়োগের আবশ্যকতাই হইবে তাহা নয়; আর্থিক উন্নয়নের পথে যে সকল বাধা বিদ্যমান সেগুলি দূরীকরণার্থে এবং সেই সঙ্গে অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং দ্রব্য-মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষণের নিমিত্ত সকল রকমের সুদূরপ্রসারী এবং সংস্কারমূলক কর্ম্মপন্থাও গুরুত্বপূর্ণ হইবে। ফরাসীদেশে বর্তমান-কালের অর্থনৈতিক ইতিহাসে অনুরূপ ব্যাপার কদাচিৎ সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ছয় বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাফল্যের সঙ্গে বহু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য, একথা সত্য যে এখনো অনেককিছুই করিবার আছে। কিন্তু ইহা অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উচ্চ হারে উৎপাদন, কর্ম্মসংস্থান এবং আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স আর্থিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ। ফরাসীদেশের এই কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিলে সকল দেশের পক্ষেই লাভবান হইবার সম্ভাবনা আছে। ফ্রান্সের কর্ম্মপন্থা পুরাপুরিভাবে আন্তর্জ্জাতিক সমর্থনলাভের যোগ্য। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ কেবল যে ফরাসীদেশেরই সকল সমস্যার সমাধানের মূলসূত্রস্বরূপ তা নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের স্বার্থের পক্ষেও ইহার গুরুত্ব এবং উপযোগিতা বড় কম নহে। ন. ভ.

জালিক-প্রসঙ্গ

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইশ বৎসর হইল ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" দ্বারা ভারতবর্ষে "তপশীলী" কথাটির জন্ম হইয়াছে।

১৯৩৫ সনের ভারতশাসন আইনে আইনসভাগুলিতে কোন্ সম্প্রদায়ের কত জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে সেই বিষয়ে ৮ই মে, ১৯৩২ সনে তিনি যে বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে Caste Hindus (বর্ণ হিন্দু) ও Scheduled Caste (অনুন্নত বা তপশীলভুক্ত জাতি) রূপে এক কৃত্রিম বিভেদের সূচনা দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতারা ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সনে পুণায় 'পুণা প্যাক্ট' নামে একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তির ফলে তপশীলভুক্ত জাতির জন্য পৃথক নির্ব্বাচনমণ্ডলী না করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তপশীলীরা হিন্দুসমাজেই থাকিয়া যান।

১৯৩৬ সনে ঐ তপশীলীর তালিকা পাকাপাকি তৈরি হয়। এই তালিকায় ছিয়াত্তরটি অনুন্নত জাতির মধ্যে 'জালিক কৈবর্ত্ত' একটি।

'জালিকে'র অর্থ—জলের চাষী; অর্থাৎ যাহারা জাল ফেলিয়া মাছ ধরে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের জালিকদের সহিত পশ্চিমবঙ্গের জালিকদের সমাজগত মিল নাই।

পশ্চিমবঙ্গের (বিশেষতঃ কলিকাতার) জালিক-কৈবর্ত্তগণ সামাজিক জীবনে বহু বিষয়ে অগ্রসর। রাজনীতির আবর্ত্তে তপশীলী রূপে ১৯৩২ সনে জড়াইয়া যাইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজ সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

'কলিকাতা কৈবর্ত্ত সমিতি' ১৯১৮ সনে স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতারা সমাজ-সংস্কারকের মনোবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। আজ দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর যাবৎ সমিতির উন্নতি অব্যাহত রহিয়াছে। নিজস্ব পাকা ত্রিতল বাড়ী (রমানাথ কবিরাজ লেন), দুইটি কোচিং স্কুল এবং শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য আয়োজন ইহার কর্ম্মবীরগণের অদম্য উৎসাহ, একতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। মধ্য-কলিকাতা ও বেলিয়াঘাটায় তাহাদের প্রতিষ্ঠান—সংস্কৃতি-মূলক প্রচেষ্টা ও সমাজসেবার জন্য পরিচিত। যে "জেলে-পাড়ার সং" অনেকদিন ভালমন্দ সমালোচনার জন্য কলিকাতাবাসীর স্ফূর্ত্তি ও নিন্দার খোরাক জোগাইতেছিল, তাহা কয়েক বৎসর 'কৈবর্ত্ত সমিতি'র নির্দ্দেশে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

জালিক কৈবর্ত্তের সন্তান মহামতি ব্যাসকে বর্ণাশ্রমী হিন্দু বর্ণকিরীট পরাইয়া রাখিয়াছে। যীশুখ্রীষ্টের কয়েকজন

প্রধান শিষ্য এই 'জলের চাষী'র সন্তান। তন্মধ্যে একজনকে তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—"Thou shalt be a fisher of men."

জালিক না থাকিলে মহাকবি কালিদাস কি শকুন্তলা সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন? জালিকের রূপক প্রয়োগ করিয়া পরম ভাগবত বাউল কবি গাহিয়াছেন—

> সংসার-সাগরতীরে ধীবর বন্ধ করে জালে মীন,
> যে থাকে তাঁর চরণ ধ'রে তারে ধরা সুকঠিন।
> জাল পড়ে না পায়ের কাছে
> পায়ে ধরা মাছ এড়িয়ে বাঁচে
> মন্ কেন তুই ভুলিস তবে এ সব কথা?

বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক জোয়ান বোয়ার 'Great Hunger' নামক উপন্যাসে নরওয়ের জালিক-জীবনের চিত্র আঁকিয়াছেন—ভাবে, ভাষায়, পরিকল্পনায় দুই জালিক-ভ্রাতার কাহিনী সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। Coral Island (প্রবাল দ্বীপ) জালিকগণের স্বর্ণখনি। কত উপন্যাস, উপাখ্যান, উপকথা এইসব দ্বীপ ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মুক্তাবিজ্ঞানে, শঙ্খ-ব্যবসায়ে, মণিশিল্পে জালিক ডুবুরিগণ কত না উপাদান যোগাইতেছে! স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি শুলিয়াদের কৌশল ও সাহস প্রশংসনীয়। মহাসমুদ্রের ফেনোচ্ছল তরঙ্গভঙ্গ তুচ্ছ করিয়া মৃত্যুভয়হীন জালিক নিজ মনে যখন 'কাটামারান' বাহিয়া দিগন্তের কাছে যায়, কে না তখন বিস্ময়বিমুগ্ধ শঙ্কাকুলচিত্তে তাহার নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করে?

রুশিয়ার ছোট গল্পে জালিককে বহু স্থানে নায়কের রূপ দেওয়া হইয়াছে—পর্য্যবেক্ষণশক্তি, শ্রমশীলতা, বিপদে ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের দ্বারা তাহার কর্ম্মকুশলতা-বৃদ্ধির কথা নিপুণভাবে ঐ গল্পসাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। ইংরেজী গল্পে Trawler (মাছের নৌকার)-এর কাহিনী ও তাহার চালকদের গুপ্ত সংবাদ-সংগ্রহের ক্ষমতার কথা সুবিদিত। হাইড্রোজেন বোমার দুর্গত নিরীহ জালিকদের সাম্প্রতিক চিত্র অত্যন্ত বেদনাময়। জালিককে তুচ্ছ করার কিছুই নাই। জাতি হিসাবে সে এ দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে "শূদ্র", সে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর নিকট মর্য্যাদা পায় নাই; ধর্ম্মান্তরিত হওয়ার প্রধান কারণও তাহাই। যদিও হিন্দুশাস্ত্র তাহাকে অনেক সুযোগ দিয়াছে; পূজাপার্ব্বণে, শ্রাদ্ধে, উপনয়নে সম্মান দিয়াছে—কেশবকে মীনশরীরধারীরূপে কল্পনা সাম্যের ইঙ্গিত।

ব্রাহ্মণ কে, ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, জাতিভেদ গুণানুগত না বংশানুগত ইত্যাদি প্রশ্ন যুধিষ্ঠিরের নিকট উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

> "আমার বোধ হয় সর্ব্ববর্ণের সঙ্কর হেতু মনুষ্যমাত্রেরই জাতিনিশ্চয় দুঃসাধ্য। বর্ণসঙ্করের সংস্কারাদি কৃত হইলেও যদি সচ্চরিত্রতা বিদ্যমান না থাকে, তবে সে স্থলে সঙ্করকে বলবান মনে করিতে হইবে। যে শূদ্রে শমদমাদি লক্ষণ থাকে, সে শূদ্র শূদ্র নয়, ব্রাহ্মণই; আর যে ব্রাহ্মণে উহা না থাকে, সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়—শূদ্রই।" (বনপর্ব্ব ১৮০ এবং ২১২।১৩৮)

পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল (ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্ট ছিল বলিয়া); পরে স্ব-স্ব কর্ম্মদ্বারা পৃথককৃত ব্রাহ্মণেরাই অন্য বর্ণে গমন করিয়াছেন। তৎপরে কোন্ কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, কোন্ কর্ম্মদ্বারা ক্ষত্রিয় হয় ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—গুণ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হয়, জাতি অনুসারে নয়। (শান্তিপর্ব্ব ১৮৯।), শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় শূদ্র, দ্বিজবৎ সেব্য।

মৎস্য ব্যবসায়ে ধনবান, প্রতিষ্ঠাপন্ন রাজনৈতিক তপস্বী নেতৃবৃন্দ জালিক-সমাজের আভ্যন্তরিক সংস্কার ও সর্ব্ববিধ উৎকর্ষসাধন দ্বারা 'দ্বিজবৎ সেব্য' হইবেন নিশ্চয়!

বিনোবা

(বাল্যজীবন)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

"আমায় তোমার দাস বানাও, অহত্ব আমার মিটিয়ে দাও, নাম আমার পুছে ফেল···। মনে রাগদ্বেষ যা আছে তা থেকে এ দাসানুদাসকে মুক্ত কর। তোমার নামে বলছি, এ ছাড়া আমার অন্তরে অন্য কামনা নেই।"

স্রষ্টার নিকট ইহাই বিনোবার* নিবেদন। গান্ধীও এমন কথাই বলিতেন—"I want to be His willing slave—তোমার গোলাম আমি হতে চাই, তাতেই আমার আনন্দ।" যথা গুরু তথা শিষ্য—বিরক্ত, শুদ্ধ, জীবনমুক্ত।

মরাঠি ব্রাহ্মণ, বয়স উনষাট, শীর্ণ দেহ, দেহের ওজন কখনও ৮৮ পাউণ্ড, কখন-বা ৯৪ পাউণ্ড। অতএব গান্ধীর কথায় বলিব কি যে বিনোবা শক্তিমান আত্মার অধিকারী? 'নবজীবন' পত্রিকায় ১৯২৪ সনের ৫ই জুন গান্ধী লিখিয়াছিলেন:

"A powerful soul lives only in a weak body. As the soul advances in strength, the body languishes."—শীর্ণদেহে শক্তিশালী আত্মার অধিষ্ঠান। আত্মার শক্তি যেমন-যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে শরীর তেমন-তেমন শীর্ণ হইতে থাকে।" দেহ শীর্ণ হইলে কি হয়, অনন্ত কর্ম তিনি করেন। ক্রিয়া তাঁহার লোপ পাইয়াছে, তাই সহজভাবে অনন্ত কার্য আপনা হইতেই হইয়া যাইতেছে।

প্রথম দর্শনে মনে হইয়াছিল গান্ধী না আসিলে, লোকসেবাই ভগবানের সেবা এই মহা সত্য নিজ আচরণে লোকের কাছে না ধরিলে, বিনোবা হইতেন আমাদের দেশে যেসব জীবন-মুক্ত মহর্ষির পরম্পরা চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে তাঁহাদেরই একজন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, বুঝি ভুল হইয়াছে। যে সকল মহাপুরুষ যুগে যুগে ভারতকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন তাঁহাদের মত বিনোবারও ত গীতাভাষ্য রহিয়াছে। আর তার মূল কথা হইতেছে, আত্মোপলব্ধি করিতে চাও, ভগবানে বিলীন হইতে চাও ত ঈশ্বরার্পিত কর্ম কর। স্বধর্মাচরণ কর, কিন্তু তার ফল ত্যাগ কর।

বিনোবার জীবনাদর্শ স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ। স্বতন্ত্র হইলেও তাহা গান্ধীর জীবনাদর্শের সদৃশ। বিচ্ছেদেও তাহা এক, আর তাহা বিচিত্রও নহে। ছোট্ট একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতেছে। বিনোবা বলিতেছেন:

"বাপু একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন, 'তোমার ত অনেক কাজ, তা হউক, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য তুমি প্রস্তুত হতে পারবে কি?' আমি বললাম, 'যমরাজের আজ্ঞা আর আপনার আজ্ঞা সমান, এর বেশী আর কি বলব, বলেন ত পওনারে যাই। নয় ত এখনই 'তৈরি'।"

আর এক জায়গায় মীরাবাঈয়ের দোহা উদ্ধৃত করিয়া গান্ধী সম্পর্কে বিনোবা বলিয়াছেন:

"মারগ মেঁ তারণ মিলে, সন্তরাম দোউ
সন্ত সদা সীস উপর, রাম হৃদয় হোই।"

—জগতে দুই পরিত্রাতা আমি লাভ করিয়াছি, একজন হইতেছেন, সন্ত-মহাপুরুষ আর দ্বিতীয় হইতেছেন রাম। সন্ত আমার মাথায় বিরাজিত আর রাম আমার হৃদয়ে।

ঐ প্রসঙ্গে বিনোবা একথাও বলিয়াছেন, "আজ আমি বাপুর সান্নিধ্য অনুভব করছি, যেমন করছি ভগবানের।···বাপুর প্রেরণায় বাপুর কাজ আমি করছি।"

এখন কে বলিবে বিনোবা একান্তবাসী ঋষি হইতেন বা যে রূপে আজ তাঁহাকে দেখিতেছি তিনি তাহাই হইতেন।

ইঁহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর কথা হইতে কম হইবে। মূক জনগণ ছিল গান্ধীর দেবতা, বিনোবারও তাহারাই আরাধ্য দেবতা। ভগবানের সাক্ষাৎলাভের জন্য গান্ধী হিমালয়ে যান নাই, তদ্রূপ বিনোবার ভগবান মন্দিরে নহেন। "···যেখানে আপনাদের বাস সে স্থানই আমার তীর্থক্ষেত্র, আপনারাই আমার ভগবান, শরীর আমার দুর্বল। দীর্ঘ পথ চলার পরে ক্লান্ত হয়ে যাই, কিন্তু আপনাদের সেবার সুযোগ মিলতেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।"

তাহা হইলেও বিনোবা কাহারও ছায়া* নহেন। আর তাহা

অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অপার ভক্তি সত্ত্বেও বিনোবা গান্ধীকে সর্বকালের অলঙ্ঘনীয় পথপ্রদর্শক মনে করেন না। গান্ধী তাঁহার কাছে কালোপযোগী অভ্রান্ত পথনির্দেশক, মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য ও সন্তকবি জ্ঞানেশ্বরকেও তিনি এই দৃষ্টিতেই দেখেন।

* "বিনোবা বিনায়কের সংক্ষিপ্তরূপ। মারাঠীতে বিনায়ককে 'বিন্নু' বা 'বিনো' বলা হয়। ইহা আদরসূচক সম্ভাষণ, 'বা' বাবার সংক্ষেপ, 'বা' যেমন আদরসূচক তেমনি সম্মানেরও দ্যোতক, ইহাতে এক দিকে পরম আত্মীয়তার ভাব আর অপর দিকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি মিশ্রিত রহিয়াছে। মরাঠী আমরা বরেণ্য শিবাজীকে 'শিবোবা' আর পূজ্য তুকারামকে 'তুকোবা' বলিয়া থাকি"—

দাদা ধর্মাধিকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

* "অনেকে খ্রীষ্টের সহিত মহাত্মাজীর তুলনা করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি বুদ্ধের তুল্য। আমার কাছে মহাত্মাজী প্রতি নহেন। তিনি আমার স্মৃতি।"—বিনোবা

আমাদের ভাগ্যের কথা, কারণ ছায়া জানে অনুসরণ করিতে। সৃষ্টির প্রেরণা তার নাই, আর বিনোবার নিকট হইতে ভারত চায় নব-সৃষ্টি, নব-যুগের প্রবর্ত্তন। বিনোবা নূতন পথের যাত্রী, বিনোবা বিপ্লবী। গান্ধীর পরে এমন লোকেরই দরকার ছিল। ভারত 'আধা-খেঁচড়ে' স্বরাজ পাইয়াছে। গান্ধীর অভীপ্সিত স্বরাজ, যে স্বরাজে লোকের বন্ধন ঘুচিবে সে স্বরাজ আসে নাই; সে স্বরাজ আনিতে হইবে। বিপ্লবী ছাড়া, নূতন পথের যাত্রী ছাড়া কে সে স্বরাজ আনিবে? বিনোবা সেই নূতন পথের যাত্রী। আর ভূ-দান সেই আর্থিক সমতার, সর্ব্বোদয় সাধনার প্রথম ধাপ।

মানুষের পরিচয় তার কর্ম্মে। মানুষের জীবন প্রতিফলিত হয় কর্ম্মের দর্পণে। বিনোবার কর্ম্ম ত জগতের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত। আর সে কর্ম্ম যেমন-তেমন কর্ম্ম নয়, পৃথিবী তেমনটি কোন দিন দেখে নাই। কিন্তু কেবল কর্ম্মের পরিচয়ে মানুষের মন তৃপ্ত হয় না। অতীতের দিকে তার দৃষ্টি যায়, ভবিষ্যতের ছক সে কাটে। তবে না তার মনে পূর্ণ ছবি ভাসে, তাহা স্বাভাবিকও বটে। ভোর বেলা যে ফুল ফোটে, লোকনয়নের তৃপ্তি সাধন করে, তাহা মুহূর্ত্তের সাধনার ফল নয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে ফুলগাছকে তার জন্য সাধনা করিতে হয়, যাতনা ভুগিতে হয়। তবে না ফোটে দিব্য ফুল।

২

১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ সনে বিনোবার জন্ম। ভাবেরা চিৎ-পাবন বা কোঙ্কনী ব্রাহ্মণ। অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। বিনায়ক নরহর ভাবে জ্যেষ্ঠ সন্তান, দ্বিতীয় বালকৃষ্ণ নরহর ভাবে উরুলি-কাঞ্চন নিসর্গোপচারের কার্য্যাধ্যক্ষ। তাঁহাকে লোকে বালকোবা বলে। বালকোবা সুকণ্ঠ, তাঁহার ভজনগানে লোকের মন ভাব-রসে সিক্ত হয়, ঈশ্বরাভিমুখী হয়. যন্ত্র-সঙ্গীতেও তিনি দক্ষ। তৃতীয় ভ্রাতা শিবাজী নরহর ভাবে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ব্যাকরণে তিনি পারদর্শী, গীতায় পারঙ্গম, ধুলিয়া নগরীতে গো-সেবায় রত আছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনোবার নির্দ্দেশে নাগরী লিপির সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহার চেষ্টায় লোক-নাগরী লিপিরূপ পাইয়াছে। লক্ষ্য—সংযুক্ত অক্ষর বর্জ্জন করিয়া হিন্দীতে সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য করা। তিন ভ্রাতাই এক সময় সবরমতি আশ্রমে ছিলেন, একমাত্র ভগ্নী, নাম শান্তা।

পূর্ব্বপুরুষের নিবাস ছিল রত্নগিরিতে, তাঁহাদের কেহ সাতারা জেলার সিৰ গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। পরে সিৰ হইতে ভাবে-পরিবার কোলাবা জেলার ওয়াই নামক গ্রামে চলিয়া আসেন। ভাবে পরিবারের গৃহ-দেবতার নাম কোটেশ্বর। ওয়াইতে কোটেশ্বরের মন্দির আছে। কোলাবা জেলার গাগোদেঁ গ্রামের আশেপাশে কিছু জমি ভাবে-পরিবার ব্রিটিশরাজ হইতে ইনাম স্বরূপ পান। সেই সূত্রে গাগোদেঁ গ্রামেও আর একটি বাটী নির্ম্মিত হয়। গাগোদেঁ বনের প্রান্তে অবস্থিত, তিন দিকে পাহাড় পরিবেষ্টিত। অদূরে গিরিপথ। ঐ গিরিপথের সহিত অনেক রাজা-রাজড়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী বিজড়িত। বিনোবার বাল্যকালে সন্ত্রাসবাদীরা নিকটবর্ত্তী বনে লক্ষ্য ঠিক করিতে আসিতেন। ভাবে-গৃহে রাজনীতির চর্চ্চা চলিত। এখানে 'কেশরী,' 'কাল' ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র রাখা হইত।

শম্ভুরাও বিষয়-বিরাগী লোক ছিলেন। তাঁহার অধিক সময় যাইত গৃহ-দেবতা কোটেশ্বরের পূজা-অর্চ্চনায়, অধিক রাত্রে লোকে শুনিতে পাইত শম্ভুরাও হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, আর কখনও-বা কোটেশ্বরকে গালাগালি করিতেছেন। সেই দিনেও ছুঁয়াছুঁয়ির ধার তিনি প্রায় ধারিতেন না। তাঁহার মন্দির বৎসরে একদিন হরিজনদের জন্য মুক্ত হইত। কোটেশ্বরের মন্দিরে দেবতাকে গান শুনাইবার জন্য এক সময়ে কোন বিখ্যাত মুসলমান গায়ককে তিনি নিযুক্ত করেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা বলিল—"শম্ভুরাও, এ-কি তোমার কাণ্ড? মুসলমান গায়ককে মন্দিরে আনলে?" শম্ভুরাও তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"ভগবান কি মানুষের অঙ্গে এ-ধর্ম্ম সে-ধর্ম্মের ছাপ মেরে দেন? তাঁর কাছে সবাই সমান।"

শম্ভুরাও চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতেন। আরতির সময়ে নাতি-নাতনীদের পূজাস্থানে আনাইতেন। তিথি অনুসারে আরতি কখনও মধ্যরাত্রে, কখনও শেষরাত্রে হইত। শম্ভুরাওয়ের আরতি-অনুষ্ঠান বালক বিনোবার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সে সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"ঘুম থেকে উঠতাম, ঠাণ্ডা লাগত, চক্ষু রগড়াতাম, আরতি দেখতাম, চন্দ্র দেখতাম। দেবতার চরণে আমাদের মস্তক স্পর্শ করাতেন। নির্ম্মাল্য দিতেন। পুনরায় আমাদের শুতে পাঠিয়ে দিতেন। আমাতে যদি কোন শুচি-শুদ্ধতা বর্ত্তে থাকে ত তা আমি পেয়েছি আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে। তা তাঁর সুকৃতি ও পুণ্যের ফল।" একথা যখন বিনোবা স্মরণে করেন, আজও তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়।

ঠাকুরমা গঙ্গাবাঈ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে প্রথম লেখাপড়া শিখেন। তৃতীয় পুত্র গোবিন্দকে এক দিন তিনি বলিলেন—"রান্নাঘরের দেয়ালে অ-আ, ক-খ লিখে দাও। আমি লিখতে, পড়তে শিখব।" রান্নাবান্না করিতে করিতে গঙ্গাবাঈ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন। বই পড়িতে পারিতেন। আজও রান্নাঘরের দেয়ালে সেই অ-আ, ক-খ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। গঙ্গাবাঈ দৃঢ়চেতা ছিলেন, কর্ত্তৃত্বাভিমানী ছিলেন, আমুদে ছিলেন। শাশুড়ী পুত্রবধূ কুয়া হইতে জল তুলিতেছেন, বালতির দড়িটা পুত্রবধূর হাতে ছাড়িয়া দিয়া অকস্মাৎ বলিতেন—"এস নাচ শিখবে। এই নাও" বলিয়া এক পাক নাচিয়া লইতেন। তার পর শাশুড়ী-পুত্রবধূ হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেন।

শম্ভুরাও ও গঙ্গাবাঈয়ের তিন পুত্র ছিল—নরহর, গোপাল, গোবিন্দ।

নরহরপন্থ দীর্ঘাকৃতি ও সুদর্শন ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি কিন্তু কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। বৃহৎ শিল্পের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। পিতার সম্বন্ধে বিনোবা লিখিয়াছেন:

"বাবা বেঁচে আছেন*। তাঁর কর্মনিষ্ঠা, তাঁর অধ্যবসায়, তাঁর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবহার-মাধুর্য্য অনুসরণযোগ্য, অনুকরণীয়।"

রুক্মিণী (পত্তিগৃহে রখুমাঈ বলিয়া অভিহিত হইতেন) ছিলেন সাঙ্গলীর গোতবোল পরিবারের একমাত্র কন্যা। তাঁহার পিতা সুগায়ক ও বাদ্যযন্ত্রে নিপুণ ছিলেন। রুক্মিণী গৌরবর্ণা, বিশালাক্ষী ও সুন্দরী ছিলেন। পতিগৃহে আসার পরেও কিছু দিন তিনি কানাড়া ভাষায় কথা বলিতেন। রুক্মিণী ছিলেন মিশুক প্রকৃতির। নরহরপন্থ ছিলেন নির্জ্জনতাপ্রিয়। রুক্মিণীর রুচি ছিল আমোদ-আহ্লাদে। নরহর ছিলেন গম্ভীর। প্রকৃতিতে একে-অন্যে ছিলেন বিপরীত। তাই রুক্মিণী কতকটা মনমরা হইয়া থাকিতেন।

রুক্মিণী বুদ্ধিমতী ও বিবেচক ছিলেন। বিনোবার লেখায় ও বক্তৃতায় বার বার মায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বলা যাইতে পারে বিনোবার চরিত্রগঠনে মায়ের দান সামান্য নহে। রমণ মহর্ষির মৃত্যু সম্পর্কে 'সর্ব্বোদয়ে'† বিনোবা যাহা লিখেন তাহাতে এই কথা কয়টি আছে:

"ভক্তিবিজয় পড়তে পড়তে এক দিন আমি মাকে বলি, এমন সাধুপুরুষ কেবল প্রাচীনকালেই হ'ত। তাই না? মা বললেন, 'তা নয়। ঐরূপ সাধুপুরুষ আজও আছেন। তাঁদের আমরা চিনি না এই মাত্র। তাঁদের ছাড়া কি দুনিয়া কখনও ঠিক চলতে পারে?'

গীতা প্রবচনের নবম অধ্যায়ে এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটি আছে:

"বাল্যকালে অজ্ঞের মত আমি মাকে বলেছিলাম—দেখছ, এ ভিখারী কেমন মোটাসোটা। একে ভিক্ষা দেওয়া মানে আলস্য ও ব্যসনের প্রশ্রয় দেওয়া। কথার সমর্থনে 'দেশে কালে চ পাত্রে চ' গীতার এ শ্লোকটাও মাকে শুনিয়েছিলাম। মা বলেছিলেন, ভিখারী ত আসেন নি, এসেছিলেন পরমেশ্বর। এবার কর পাত্রাপাত্রের বিচার। ভগবানকে অপাত্র বলবে? পাত্রাপাত্র বিচার করার অধিকার তোর আর আমার আছে কি? আর অনেক বিচারের প্রয়োজনই বা কি! আমার কাছে সে ভগবানই।"

একথা বলার পরে বিনোবা বলিয়াছেন—"আমার কথার অসারতা সপ্রমাণ করতে মা যা বলেছিলেন তা খণ্ডন করার মত যুক্তি আজও আমি খুঁজে পাই নি।"

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন প্রার্থনাসভায় বিনোবা বলিয়াছেন:

"প্রতিবেশীরা বিপদে পড়লে মা তাদের রান্না করে দিয়ে আসতেন। তাদের জন্য রান্না করতে যাওয়ার আগে আমাদের রান্না করে রেখে যেতেন। মাকে এক দিন বলেছিলাম—মা, এ স্বার্থপরতা নয় কি? মা বললেন—না, এ পরার্থপরতা। তাদের রান্না যদি আগে করে দিয়ে আসি ত তাদের ঠাণ্ডা খেতে হবে। আর তোমরা খেতে পাবে গরম।"

ও-দেশে কাঁঠাল গাছ বড় নাই। বিনোবাদের বাড়ী একটি ছিল। কাঁঠাল পাকিলে রুক্মিণী বিনোবার হাতে পাড়ার সকল বাড়ীতে কাঁঠালের কোয়া পাঠাইতেন। বিতরণের পরে যাহা বাঁচিত তাঁহার সন্তানেরা ও বাড়ীর লোকেরা খাইত। শস্তুরাও বাড়ীর যখনকার যে ফল এরূপ ভাবে বিলাইতেন।

কোন এক প্রসঙ্গে বিনোবা লিখিয়াছেন:

"মাতাপিতার যেমন শিক্ষা, সন্তানের তেমন দীক্ষা। ছোটবেলা ভোরের খাওয়া খেতে বসতাম ত মা জিজ্ঞাসা করতেন, 'অরে বিন্যা, তুলসীলা পানী ঘাতলা কায়রে?'—তুলসীতে জল দিয়েছিস, বিন্যা? না দিয়ে থাকলে উঠে যেতে হ'ত। মা বলতেন, 'জা পানী ঘালুন য়ে, মগ নাস্তা দেতী।'—যা, জল দিয়ে আয় তবে খেতে পাবি'।"

এইরূপ ছিলেন ভাবে পরিবার, আর এই ছিল বিনোবার কিশোরকালের পরিবেশ। এইরূপ ছিল মাতা-পিতা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা।

৩

ছেলেবেলা বিনোবা বড় দুরন্ত ছিলেন। প্রাণচাঞ্চল্যের আধিক্য বশতঃ নানা দুষ্টুমি বিনোবা করিতেন। উত্ত্যক্ত হইয়া পিতা নরহর পুত্রকে যখন-তখন প্রহার করিতেন। কিন্তু বিনোবার দুরন্তপনা কমিত না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জেদী, নিতান্ত একরোখা। 'না' বলিতেন ত তাহা কখনও 'হাঁ' হইত না। দুষ্টুমি তিনি করিতেন, অশেষ দুষ্টুমি। কিন্তু তাহা ছিল কালিমা-স্পর্শবিহীন। তাঁহার চরিত্র ছিল পবিত্র, উন্নত। তাঁহার সেই জিদ আজও তাঁহাতে আছে। রূপ ব[illegible]ছে। যাহা ছিল রাজসিক তাহা হইয়াছে সাত্ত্বিক, সুতরাং অশেষ লোককল্যাণকারী।

কিন্তু অশান্ত বিনোবা মায়ের কাছে ছিলেন শান্ত। প্রত্যহ তিনি রুক্মিণীকে 'কেশরী' পড়িয়া শুনাইতেন। মা আটা ভাঙিতে বসিতেন ত পুত্র বিনোবা আসিয়া মাকে সাহায্য করিতেন। কখনও কখনও সবটা গম নিজে ভাঙিয়া দিতেন। এক দিন মাতা-পুত্রে জাঁতা ঘুরাইতেছেন। মা বলিলেন—"বিন্যা, তুই গীতার কথা প্রায় বলিস। শুনে শুনে আমার পড়তে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সংস্কৃত আমি জানিনে।" বিনোবা বামন পণ্ডিতের গীতার সমশ্লোকী অনুবাদ মাকে আনিয়া দিলেন। সুবিধা হইল না। স্থির করিলেন সহজপাঠ্য, সহজবোধ্য সমশ্লোকী রচনা করিবেন। সমশ্লোকী যখন রচনা করিলেন মা তখন চলিয়া গিয়াছেন। বিনোবা গীতার অনুবাদের নামের সহিত তাঁহার 'আঈ'কে জুড়িয়া দিলেন। সম-

* ১৯৪৭ সালে ধুলিয়ায় মারা যান। তিনি বরোদায় থাকিতেন।

† মে, ১৯৫০, পৃ. ২৫৪

শ্লোকীর নাম দিলেন 'গীতাঈ' (গীতা + আঈ = গীতাঈ)। মরাঠী 'আঈ' মানে মা। অন্ত অর্থেও এই নামকরণকে দেখা যাইতে পারে। 'বিনোবাকে বিচার' পুস্তকে বিনোবা বলিতেছেন :

"গীতার অর্থ অল্পাধিক বুঝতে আরম্ভ করেছি ত মা চলে গেলেন। বলব কি আমাকে গীতার কোলে সঁপে গেলেন। মাতা গীতা! তোমার স্তন্যধারায় এযাবং বর্দ্ধিত হয়েছি আর এর পরেও তুমিই আমার অবলম্বন।"

ঐ পুস্তকের অন্য এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন :

"আমার ত্রয়ী—আঈ, গীতা, তকলী···"

আহারের বিষয়ে বিনোবা উদাসীন ছিলেন, যাহা জুটিত বা পরিবেশন করা হইত, খাইয়া উঠিতেন. কিছু চাহিতেন না। তাঁহার মন ছিল অন্যত্র নিবদ্ধ—পড়া-শুনায়, তর্ক-বিতর্কে, আর দীর্ঘ ভ্রমণে। তাহা ছিল একপ্রকারের নেশা—চরিত্রোন্নয়নকারী পবিত্র নেশা।

তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তায় জনকয়েক সহপাঠী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে এই সব ব্যাপারে অনুসরণ করিতেন। বরোদা শহরে তখন দুইটি ভাল পাঠাগার ছিল—বরোদা ষ্টেট লাইব্রেরী ও সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী. সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী তখন সদ্য খোলা হইয়াছিল। কিন্তু উহার তুল্য সমৃদ্ধ পাঠাগার তখন ভারতে দ্বিতীয় আর একটি ছিল কিনা সন্দেহ। বিনোবা ও তাঁহার সহপাঠীরা ঐ দুই লাইব্রেরীতে যাইতেন, পড়াশুনা করিতেন।

বিনোবা প্রত্যহ অনেকটা পথ পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতেন—শহরের বাহিরে, গ্রামের মুক্ত প্রকৃতিতে। দশ হইতে পনর মাইল ছিল প্রতি দিনের ব্যাপার, বন্ধুরা সঙ্গে যাইতেন। বিনোবা কখনও কখনও দুপুর বেলায়ও বেড়াইতে বাহির হইতেন। গ্রীষ্মের দুপুর হইলে সহপাঠীরা প্রমাদ গণিতেন। কিন্তু নিস্তার ছিল কি? খালি গায়ে, খালি পায়ে তাঁহারা চলিতেন। শার্ট একটা অবশ্য থাকিত, গায়ে নয় কাঁধে। বরোদা সেই সময়েও ময়দানগর্বী ছিল। বিনোবা বলেন, মুক্ত প্রকৃতিতে বেড়াইলে বুদ্ধি খোলে, বিচার একাগ্র হয়।

বেড়াইতে বেড়াইতে পাঠাগারে অধীত বিষয়ের চর্চা চলিত। শহরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখনও তর্কের শেষ নাই। সময় সময় তাঁহাদের বাড়ীর সন্নিকটের চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া যাইতেন। স্নান-আহারের কথা ভুল হইয়া যাইত। ঘণ্টা—দুই ঘণ্টা আরও আলোচনা চলিত। যুক্তির শাখা-প্রশাখায় অনন্তের ফুল ফুটিত। বিনোবা সে ফুল ফুটাইতেন :

তর্কে অপরিসীম আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার অনুরক্ত সহপাঠীরা আদরে তাঁহাকে 'ন্যায়চঞ্চু' বলিতেন।*

বিনোবা ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স দশ। শঙ্করাচার্য, জ্ঞানদেব ও সমর্থ রামদাসের আদর্শ তাঁহার চক্ষে ভাসিত। তাঁহাদের মত তিনিও সমগ্র শক্তি দেশের কার্যে নিয়োগ করিবেন এই ছিল আকাঙ্ক্ষা। ব্রহ্মচর্যের কথায় তিনি বলিয়াছেন :

"রান্না করতেন, সঙ্গে ভজনও মা গাইতেন। তন্ময় অবস্থায় সময় সময় ডালে-তরকারিতে দু'বার নুন পড়ে যেত। ডাল বা তরকারি নুন-কাটা হয়েছে, তা আমি টের পেতাম না। এমনি তন্ময় অবস্থা আমার চলছিল। বেদাভ্যাসকালে আমার মনে হ'ত আমার শরীর যেন নাই। ওটা যেন একটা সব। তাই ত বেদ বলেছেন—'ছেলেবেলা থেকে বেদ অভ্যাস করবে'।"

মাতা রুক্মিণী জ্ঞাতসারে বা নিজের অজ্ঞাতে এ বিষয়ে পুত্রকে যেন সহায়তা করিতেন :

"বিন্যা, সং গৃহস্থের জীবনযাপন করলে এক পুরুষ উদ্ধার লাভ করে। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনে সাত পুরুষ মোক্ষ লাভ করে।"

ঘর ঝাঁট-পাট দিতে গিয়া রুক্মিণী একদিন দেখিলেন যে বিনোবা তোশকটা একদিকে গুটাইয়া রাখিয়া বিছানায় কম্বল পাতিয়া বসিয়াছে। মাতা পুত্রকে বলিলেন :

"বিন্যু, তোশক গুটিয়ে রেখেছ, আর কম্বল পেতেছ?"

"হাঁ, মা। ব্রহ্মচর্যের অবস্থায় কোমল বিছানায় শুতে নেই।"

মাতা পীড়াপীড়ি করিলেন না। কেবল বলিলেন :

"আমি নারী হয়ে জন্মেছি। স্বাধীনতা নেই, নইলে আমিও পারতাম। হয়ত একটু এগিয়েই যেতাম।"

ষষ্ঠ শ্রেণী তক বিনোবা বরাবর ক্লাসে প্রথম হইতেন। তারপরে ক্লাসের পড়ায় তাঁহার মন বড় একটা ছিল না। কোন রকমে পরীক্ষা পাস করিতেন, কিন্তু দিন দিন তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার প্রসারিত হইতেছিল, কিন্তু নির্ব্বিচারে যাহা কিছু তিনি পড়িতেন না। ক্ষণিক

---

* ১৯১৬ সনের কথা। বিনোবা তখন কাশীতে। কৌতূহলবশে একদিন তিনি পণ্ডিতদের এক সভায় গিয়াছিলেন। তর্কের বিষয় ছিল অদ্বৈতবাদ শ্রেষ্ঠ কি দ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের জয় ঘোষিত হইল। সভাপতি সভাভঙ্গ হইল বলিতে যাইবেন এমন সময় বিনোবা বলিলেন—"মিনিট দুই বলার সুযোগ যদি আমায় দেন।" সকৌতুকে পণ্ডিতগণ ভাবিতেছিলেন—"এ বালক কি বলবে!"

মঞ্চে গিয়া বিনোবা বলিলেন—"সুধীবৃন্দ, অদ্বৈতবাদের পরাজয়ের পরাকাষ্ঠা এইমাত্র আপনারা দেখেছেন।" অনুচ্চস্বরে পণ্ডিতগণ একে অন্যকে বলিলেন—"এ বালক কি বলতে যাচ্ছে!" ঔৎসুক্য ও বিস্ময় সকলের মুখে-চোখে। স্বয়ং সভাপতিকেও অপ্রস্তুত মনে হইতেছিল, মিনিটখানেক পরে বিনোবা বলিলেন—"অদ্বৈত মানে যার দ্বিতীয় নাই। দ্বৈতের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলে অদ্বৈত আর অদ্বৈত থাকে কি? অদ্বৈতের উদরে সব। আর সব সেই উদরে জীর্ণ হয়, এরূপ যে অদ্বৈত তার কিছুর সহিত ঝগড়া থাকতে পারে কি?" পণ্ডিতদের অভিমান চূর্ণ হইল। সাদরে তাঁহারা তাঁহার সহিত কথা বলিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

ছাড়িয়া তিনি মাণিক খুঁজিতেন। সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত, অথচ শকুন্তলার মত গ্রন্থ পর্য্যন্ত পড়েন নাই, গণিত আর দর্শন ছিল তাঁহার প্রিয় বিষয়, ১৯৫২ সনের মার্চ মাসের সর্ব্বোদয়ে গণিত সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "ভগবানের পরে আমার আরাধ্য যদি কিছু থাকে ত সে গণিতশাস্ত্র।" আর তাঁহার সকল কর্ম্ম গণিতের মতই নিখুঁত। অনাসক্ত কর্ম্মের ধর্ম্মই তাহা। দুর্লভ ছিল তাঁহার স্মরণ-শক্তি, আর অনিন্দ্য ছিল তাঁহার পাঠ্যবস্তুর নির্ব্বাচন। এই দুইয়ে মিলিয়া তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ভিত্তি রচিত হইয়াছে।

পঞ্চম শ্রেণীতে যখন পড়িতেন তখন ম্যাট্রিক শ্রেণীর ছাত্রের আঁক কষিয়া দিতেন, কোন শিক্ষক এক দিন নোট দিতেছিলেন, বিনোবা দেখিলেন বিষয়টি তাঁহার জানা, নোট না লইয়া তিনি আঁক কষিতে লাগিলেন, শিক্ষক তাহা লক্ষ্য করিলেন, নোট লেখানো শেষ হইলে বিনোবাকে অপ্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "ভাল, ভাবে পড় ত কি লিখেছ।" একটা খাতা মুখের সামনে ধরিয়া বিনোবা বলিয়া গেলেন, শিক্ষক বিস্মিত হইলেন। খাতা তিনি দেখিতে চাহিলেন, বিনোবা বলিলেন, "আপনি পড়তে পারবেন না?" শিক্ষক দেখিলেন খাতায় কিছু লেখা নাই। সাদা কাগজ।

বিনোবা যাহা পড়িতেন তাহার গভীরে প্রবেশ করিতেন, অধীত বিষয়ে কখনও তাঁহাকে উদ্ভ্রান্ত করিতে হইত না, একদিন শিক্ষকের কাছে এক কঠিন আঁক আসিয়াছিল। তিনি তাহা কষিলেন, বহিতে ফল দেখিলেন, তাহা আর এক। শিক্ষক পুনরায় আঁকটি কষিলেন, এবারও সেই উত্তর. তখন তিনি ভাবেকে সেই আঁক কষিয়া দেখতে বলিলেন। বিনোবা দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'স্যর, আপনার পদ্ধতি ও উত্তর উভয়ই ঠিক, বহিতে ছাপার ভুল হয়েছে।" শিক্ষকের সংশয় দূর হইতেছিল না। বিনোবা ভুল কোথায় তাহা দেখাইয়া দিলেন।

মাতৃভাষা মরাঠীর জ্ঞান তাঁহার অসাধারণ ছিল। ক্লাসের শিক্ষক বলিতেন, "বিষ্ণু এক শতে এক শতই পেতে পারে। তবে তা রীতি নয়, তাই নিরেনব্বই দিই।" সে সময়েও বিনোবা কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন। কিন্তু তখন আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছিল না। রাজনীতি তাঁহাকে চুম্বকের আকর্ষণে টানিত, ইংরেজ বিতাড়নের স্বপ্ন মনে রঙীন ছবি আঁকিত। আর সময়টা ছিল বঙ্গ-ভঙ্গের দিন, তিলক চিপলঙ্কার ছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ। কিশোর বিনোবা বন্ধুদের সহিত মিলিয়া 'বিদ্যার্থীমণ্ডলে'র স্থাপনা করিয়াছিলেন। 'বিদ্যার্থী মণ্ডল' যে কোন দিন 'বিস্ফোরক মণ্ডল' হইতে পারিত।

বিনোবা বন্ধুবৎসল ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে কটু কথা বলিতে তাঁহার আটকাইত না। "তোমার চুল বড় হয়েছে, নখ বেড়েছে"—কেহ বলিত ত রক্ষা থাকিত না, অমনি বিনোবা বলিতেন, "বুঝেছি, আপনি বুঝি নাপিত।" কেহ ইংরেজীর বিদ্যা ফলাইত ত তাহাকে বিনোবার তীক্ষ্ণ শব্দের লক্ষ্য হইতে হইত—"তোর মা মেম ছিলেন। তাই না।"

বিনোবা তেজস্বী ছিলেন। সাহসিকতার কার্য্য দেখিলে তিনি উৎফুল্ল হইতেন। "কেবল তাঁবুটা ফেলে দিলে, আর তাঁবুর মালিক সাহেবটা বাদ গেল!"—একথা বলিয়া তিনি কোন বন্ধুকে স্বাগত করিলেন। বন্ধু বলিতে আসিয়াছিলেন এক সাহেব বিনা অনুমতিতে তাহাদের জমিতে তাঁবু খাটাইয়া ছিল। বলা সত্ত্বেও সরায় নাই, তিনি তাহা ফেলিয়া দিয়াছেন।

ছ্যা, গোলামখানায় শিবাজী-জয়ন্তী! বন্ধুদের বিনোবা বলিলেন,

"কাল শিবাজী জয়ন্তী, তা ত পালন করতে হয়।"

"করব ত, কিন্তু কোথায় আর কি ভাবে?" কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কেন! ওখানে পাহাড়ের পাদদেশে, মুক্ত আকাশের নীচে, বন্ধনের ধার ধারে না ঐ বনে। শিবাজী আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন। তাঁর জন্মতিথি স্মরণের উপযুক্ত স্থান দেয়াল-ঘেরা গৃহ নহে।"

বন্ধুরা স্কুল পালাইলেন। মুক্তাকাশতলে, পাহাড়ের পাদদেশে, শান্ত পরিবেশে স্বাধীনতার মূর্ত্তবিগ্রহ শিবাজীর স্মৃতিপূজা করিলেন।

উৎসব অন্তে এক বন্ধু বিনোবাকে বলিলেন, "কাল কপালে শাস্তি আছে।"

বিনোবা; "প্রত্যেকে একটা করে চার-আনি সঙ্গে নিও, ফাইন করেন ত শিক্ষককে ছুঁড়ে দেওয়া যাবে।"

পরের দিন ক্লাসে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল তোমরা কোথায় ছিলে?"

বিনোবা বলিলেন, "শিবাজী-জয়ন্তী পালন করতে গিয়েছিলাম।"

"স্কুলে ত পালন করতে পারতে।"

"ছ্যা, গোলামখানায় শিবাজী-জয়ন্তী."

"ডেঁপো কোথাকার! ফাইন দিতে হবে।"

একসঙ্গে চার-আনিগুলি মাষ্টারের দিকে ছুটে গেল, মাষ্টার মহাশয় হতবাক্।

বিনোবা প্রবেশিকা পাস করিলেন—নবেম্বর ১৯১৩ সনে। তখন হইতেই তাঁহার ঘর ছাড়ি, ঘর ছাড়ি ভাব। স্বাদেশিকতার পক্ষে কোন বিঘ্ন গৃহে ছিল না। বাবার দৃষ্টি আর ছেলের দৃষ্টিতে বিশেষ ব্যবধান ছিল না। তবুও তিনি গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিজ কথায় তার কারণ বলা যাইতেছে:

"...জীবনে এমন কতকগুলি জিনিষ থাকে যাহা হঠাৎ শেষ করে দিতে হয়। সেখানে 'রয়ে-সয়ে' 'আস্তে-ধীরে' বললে চলে না। আমার পথ এই পথ। মার কথা মনে হয় না, এমন দিন নাই। এমনিই ছিলেন আমার মা। গৃহত্যাগ যখন করি, তখন আই-এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তাম, পরীক্ষার বছর ছিল, বন্ধুরা কত বললেন, কত বুঝালেন—'বি-এ পাস দিতে মাত্র দুটো বছর বাকী। তার পর যেতে হয় যাবে।' আমি তাদের বললাম—

"আমার বুদ্ধি তা নয়।" সূর্য্যাজীর কথা বন্ধুদের বলিয়া তিনি বলিলেন :

"আমার পথ সূর্য্যাজীর* পথ—তখন যেমন আজও তেমন। সেই কথা—"পিছু টান রাখতে নেই।"

সাতষট্টিতম জন্মতিথিতে বিনোবা প্রতিজ্ঞা করেন, পাঁচ কোটি একর ভূমি সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত পরমধাম পওনারে (তাঁহার আশ্রম) তিনি ফিরিবেন না।

৪

১৯১৬ সনে বিনোবা গৃহত্যাগ করেন। তাঁহার নিজ কথায় তাহা বলি :

"১৯১৬ সনে ঘর ছাড়ি, ব্রহ্মের খোঁজে বের হয়ে পড়ি। কাশী যাই। তথা হতে হিমালয়ে যাব এই ছিল মুখ্য আকাঙ্ক্ষা।† বাংলা ঘুরে আসার কথাও মনের অন্তস্তলে ছিল।‡ কিন্তু দৈবগতিকে দুইটির একটিও ঘটে নাই। গেলাম গান্ধীজীর কাছে। সেখানে দেখলাম হিমালয়ের শান্তি আর বঙ্গদেশ থেকে উৎসারিত ক্রান্তির সঙ্গম। আর মনে মনে বললাম দুই বাসনাই আমার পূর্ণ হয়েছে। ব্রহ্মের খোঁজ ত আজও চলছে।"

(গীতা-প্রবচন—বাংলা সংস্করণ)

ঘর ছাড়িয়া বিনোবা কাশী গেলেন। গেলেন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র, সংস্কৃত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র কাশীধামে যেখানে যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতের সব দিক হইতে জ্ঞানপিপাসু, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু লোকের সমাগম চিরকাল হইয়া আসিয়াছে।

বাড়ীতে রুক্মিণীকে নরহর বলিলেন :

"ক'দিন! দুনিয়ার সোয়াদ পাবে। ঘরে ফিরে আসবে।"

রুক্মিণীর ভাব উল্টা, মনে মনে তিনি বলিলেন :

"বিনু থিয়েটারে গেছে! তামাশা দেখতে গেছে না, তা নয়, মহৎ উদ্দেশ্যে বিনু ঘর ছেড়েছে—দেশের কাজ করবে, দেশ-সেবা করবে। বিনুকে পেটে ধরে আমি ধন্য।"

কাশীতে আছেন। অন্নসত্রের অন্নে জীবন চলে। আর বেদ-বেদাঙ্গ পাঠ করেন। ঐ সময়ে (১৯১৬) হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্ত্তন উৎসব। গান্ধী উৎসবে নিমন্ত্রিত অতিথি। ভারতের রাজা মহারাজারা উপস্থিত। সভানেত্রী এনি বেসাণ্ট। ভারতের বড়লাটও আছেন। যাহা ইতিপূর্ব্বে এমন স্থানে, এমন পরিবেশে ঘটে নাই তাহা ঘটিল। গান্ধী হিন্দীতে ভাষণ দিলেন আর পরাধীনতার সকল জ্বালা সে ভাষণ হইতে উপচাইয়া পড়িল। রাজা মহারাজারা সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। এনি বেসাণ্ট অস্বস্তি বোধ করিলেন, আর শেষটায় গান্ধীকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। সভাগৃহে ভীতি, কিন্তু বাহিরে উল্লাস। পরাধীন ভারতের বুকে স্বাধীনতার চমক খেলিয়া গেল। কাশীতে বিনোবা গান্ধীকে প্রথম দর্শন করিলেন—দূর হইতে। ঐ দূর হইতে দর্শনে জীবনব্যাপী নিবিড় যোগ-সূত্রের সৃষ্টি হইল। গান্ধীকে তিনি পত্র লিখিলেন। গান্ধী উত্তর দিলেন। একখানি পত্রে গান্ধী বিনোবাকে লিখিলেন :

"যে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন আশ্রমে এলে তা দূর হতে পারে। যে সব ব্রত আমরা গ্রহণ করেছি তা দৈনন্দিন জীবনে আশ্রমে আমরা পালন করতে চেষ্টা করছি।"

ঐ পত্রে বিনোবার জীবনের মোড় ঘুরিয়া গেল। কোথায় যাইবেন হিমালয়ে, আর কোথায় চলিলেন সবরমতী আশ্রমে। এক দিন প্রভাতে যত পাণ্ডুলিপি ছিল (আর ছিলও অনেক) সব লইয়া তিনি গঙ্গাতীরে গেলেন। একটা ছিঁড়েন আর গঙ্গার সমুদ্রাভিমুখা স্রোতে তাহা বিসর্জ্জন দেন। একে একে সব তিনি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া রিক্ত হইলেন। পুরাতন বন্ধনের শেষ হইল। নব জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

* দড়ির মইয়ের মত এক বস্তু সহায়ে এক মরাঠাবাহিনী তানাজীর সৈনাপত্যে সিংহগড় দুর্গে আরোহণ করে। তানাজী অস্ত্রাঘাতে মারা গেলেন। সৈন্যবাহিনীতে রণে ভঙ্গ দেওয়ার ভাব দেখা গেল। তানাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী দড়ির মইটা কাটিয়া দিলেন। সৈনিকেরা দেখিল যুদ্ধ করিলেও মৃত্যু, আর না করিলেও মৃত্যু। তাহারা যুদ্ধ করিল। সিংহগড় বিজয় করিল।

† সুরাট হইতে মা-বাপকে চিঠি দিলেন :

"পরীক্ষার নিমিত্ত বোম্বাই যাচ্ছি না। যেখানেই থাকি আর যাহাই করি, নিশ্চিত জেনো, তোমাদের পুত্র অন্যায় কিছু করবে না।"

‡ এ কথা সানে গুরুজী বলিয়াছেন, কিন্তু বিনোবা সর্ব্বোদয় সমাজের ষষ্ঠ সম্মেলনে বুদ্ধগয়াতে বলিয়াছেন, বাংলায় আসার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল। কিন্তু পরে সে সঙ্কল্প তিনি ত্যাগ করেন।

"মধু-স্মৃতি"

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (ভাদ্র ১২৮০) যে নিবন্ধটি লেখেন তাহার শেষ দিকে এই ভাবগম্ভীর আশার বাণী উচ্চারিত হয়:

"ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।"

মধুসূদনের মহাপ্রয়াণের (২৯ জুন ১৮৭৩) পর কিঞ্চিদধিক আশী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম-বর্ণিত সোপানে আরোহণ করিয়া আবর্তন-বিবর্তনের ভিতরেও আমরা যে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি তাহা আজ কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু এই উন্নতির পথের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীমধুসূদনকেও আমরা ভুলিয়া যাই নাই। তবে ইহার অন্য কারণও আছে, এবং তাহা কম বলবত্তর নহে। মধুসূদন বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটি ব্যতিক্রম, আর সেই কারণেই ইহা যুগে যুগে বাঙালী মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সে যুগেই বলিয়াছিলেন: "I am sure anything said of Michael will prove interesting"—মাইকেল সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, আমাদের কৌতূহল উদ্রেক না করিয়া পারে না। এই কৌতূহলবশেই তাঁহার জীবনকাহিনী এখনও আলোচিত হইতেছে, জীবন লইয়া নাটক রচিত ও অভিনীত হয়; তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন শোভন সংস্করণও প্রকাশিত হইয়া গৌড়জনের মনোরঞ্জন করে।

মধুসূদনের দুইখানি বড় জীবন-চরিত: যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-স্মৃতি'। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" ভুক্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত "মধুসূদন দত্ত" শীর্ষক সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল জীবনীও উল্লেখযোগ্য। মোহিতলাল মজুমদার বিশেষ কৃতিত্বের সহিত মধুসূদনের কবিপ্রতিভার আলোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে মধুসূদন-জীবনীর উপর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে নূতন আলোকপাতে-রত রহিয়াছেন। মধুসূদনের কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে গত শতাব্দীতে যেমন বহু মনীষী আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তেমনই বর্তমান শতকেও এই আলোচনা অব্যাহত আছে। মধুসূদন জাতীয় চিত্তে যে সদাজাগ্রত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এইরূপ অবস্থায় মধুসূদন-জীবনের তথ্য-সমৃদ্ধ কোন পুস্তক চালু না থাকিলে তাহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-স্মৃতি' প্রকাশিত হয় ১৯২১ সনে। প্রকাশের কিছুকাল পরেই পুস্তকখানি নিঃশেষিত হইয়া দীর্ঘকাল অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি এই পুস্তকখানি 'পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত' আকারে পুনঃপ্রকাশিত হওয়ায় শুধু বহুদিনের একটি অভাবই নিরাকৃত হয় নাই, জাতীয় সাহিত্যের একটি অপূর্ব অঙ্গ ইহার প্রকাশে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। এজন্য "মধু-স্মৃতি" প্রকাশকগণ বাঙালী পাঠক-সমাজের, বিশেষতঃ মধুসূদনের কাব্য-সাহিত্যামোদীদের আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হইলেন। আজকাল একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়, বাংলা মনন-সাহিত্যের পাঠকের এবং সমঝদারের নাকি অপ্রতুল ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের একথায় বিশ্বাস হয় না। বাংলা ক্লাসিক্স এবং মনন-সাহিত্যমূলক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের আদর করিতে বাঙালী—যতই দুঃস্থ এবং দুর্দৈবগ্রস্ত হউক না—ভুলে নাই, কখনও ভুলিবে না। তবে বর্তমানের উন্নত রুচি অনুযায়ী সুষ্ঠুরূপে এসমুদয় পরিবেশন করা চাই। এদিক দিয়া "মধু-স্মৃতি"র বর্তমান সংস্করণ* বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। মধুসূদনের সমসাময়িকদের চিত্রাদিও পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

দীর্ঘকাল অমুদ্রিত থাকায়, আজিকার দিনের পাঠক-পাঠিকার নিকট হয়ত "মধু-স্মৃতি" কতকটা অপরিচিত। কি কঠোর পরিশ্রম, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত তথ্য-সমাবেশের ফল এই পুস্তকখানি! যোগীন্দ্রনাথ বসুর মধুসূদন-জীবনীর জন্য গ্রন্থকার নগেন্দ্রনাথ মালমসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে। ইহার পরে তিনি নিজে মধুসূদন সম্পর্কিত জীবন-কাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে যাবতীয় তথ্য "মধু-স্মৃতি"তে পরিবেশন করিয়াছেন। পুস্তকের একুশটি অধ্যায় এবং উপসংহারে ধারাক্রমে জীবন-কথা এমন সাহিত্যরসপ্লুত করিয়া বিবৃত হইয়াছে যে, পাঠকের চোখের সম্মুখে মধুসূদন এক বিরাট পুরুষরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠেন। মধুসূদন-সংক্রান্ত যেখানে যাহা কিছু গ্রন্থকার পাইয়াছেন তাহাই ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে কখন কখন পুস্তকের অংশবিশেষ অযথা ভারাক্রান্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু তথাপি লেখকের তথ্য পরিবেশনে ঐকান্তিক নিষ্ঠার বিষয় যখন আমরা উপলব্ধি করি তখন তাহা অতীব তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। পাঠকের নিকট "মধু-স্মৃতি" একাধারে মধু-জীবনী এবং "মধু-সত্র"।

এখন, পুস্তকখানির পরিবর্তন ও সংযোজন বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। প্রথম সংস্করণে (১৯২১) এখানি বঙ্গগৌরব স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে গ্রন্থকার উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আশুতোষ মধু-সাহিত্যের কতখানি গুণগ্রাহী ছিলেন, 'নারায়ণে' প্রকাশিত তদীয় দীর্ঘ প্রবন্ধ, যাহা ইদানীং 'জাতীয় সাহিত্য' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত

---

* মধু-স্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দশ টাকা।

হইয়াছে এবং বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টেও যাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—পাঠে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। এই উৎসর্গ পত্রখানি কেন তুলিয়া দেওয়া হইল বুঝা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ পনর বৎসর বয়সে মেঘনাদবধের যে বিরাট, বিরুদ্ধ সমালোচনা 'ভারতী'তে প্রকাশিত করেন তাহা তিনি পরিণত বয়সে বর্জন করিয়াছিলেন। পুস্তকখানির বর্তমান সংস্করণে সেই দীর্ঘ সমালোচনাটি বাদ দিয়া ভালই করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র appreciation বা রসোপলব্ধিমূলক পরিণত বয়সের উক্তিগুলিও ('বঙ্গদর্শন', আষাঢ় ১৩১৪) কেন বাদ দেওয়া হইল বুঝা গেল না। ইহা বর্জন করা যে আদৌ সমীচীন হয় নাই তাহা যে কেহ ঐ অংশ পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের উক্ত রচনা হইতে কয়েকটি পংক্তি মাত্র এখানে দিলাম :

"মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ী ভাঙ্গিয়াছেন এবং রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধা-বাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহারও শাসন ভাঙ্গিয়াছেন।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

গ্রন্থকার নগেন্দ্রনাথ সোম জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধ মঞ্জরী' হইতে তৎকৃত মেঘনাদবধ কাব্যের 'অম্লমধুর' সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন (১ম সং, পৃ. ২৫৩-৬১)। কাব্যখানি সম্বন্ধে এটি—যাহাকে ইংরেজীতে বলে "critical estimate". এই নিবন্ধটি 'এপিক'-কাব্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর আলোচনাও বটে। এটি দেখিতেছি বর্জিত হইয়াছে। যদি দীর্ঘ বলিয়াই ইহা বাদ দেওয়া হইয়া থাকে তবে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আলোচনাটিও ত দীর্ঘতর (১ম সং, ২৬১-৭১) বলিয়া বাদ দেওয়া উচিত ছিল। অথচ নগেন্দ্রনাথের "অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইল" কথাগুলি ঠিকই রাখা হইয়াছে।

অতঃপর নূতন সংযোজন সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের পর বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ মধুসূদনকে বাংলায় একখানি মানপত্র প্রদান করেন। মধুসূদনও বাংলা ভাষায় ইহার উত্তর দেন। 'মধু-স্মৃতি'র রচনাকালে এ সকল তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে এগুলি নকল করাইয়া আনান। "প্রবাসী" জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যাদ্বয়ে দুইটি প্রবন্ধে মানপত্র ও উত্তর তৎকর্তৃক সর্বপ্রথম সন্নিবেশিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার 'মধুসূদন দত্ত' পুস্তকে যথারীতি এ দুইটি প্রদত্ত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ-সংগৃহীত সমুদয় উপাদান 'যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোথাও, বিশেষতঃ ঐ দুইটি বিষয় যেখানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে সেখানে কোনও স্বীকৃতি নাই। অথচ "মধু-স্মৃতি"র মত প্রামাণিক গ্রন্থে এরূপ অনুল্লেখ সমীচীন নয়। লক্ষণীয় এই যে, 'সোমপ্রকাশ, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬১'—পাদটীকায় এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিয়া বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাইকেলের সম্বর্দ্ধনাবিষয়ক তথ্যাবিষ্কা'র সম্পর্কে মৌলিকতা প্রদর্শনের চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। আবার, ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক নূতন সংগৃহীত বা প্রদত্ত 'সকল উপাদান' যে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, অন্ততঃ দুইটি দৃষ্টান্তে তাহা বুঝা যাইবে : (১) ব্রজেন্দ্রনাথ মধুসূদনের হিন্দুকলেজে প্রবেশকাল '১৮৩৩' ধরিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকে '১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ' রহিয়াছে। অবশ্য এ বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের মত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত সে প্রশ্ন এখানে তোলা অপ্রাসঙ্গিক। (২) ১৮৭২ সনে ঢাকায় গেলে সেখানকার বিশিষ্ট অধিবাসীবর্গ মধুসূদনকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। মধুসূদন ইহার একটি মনোজ্ঞ উত্তর দিয়াছিলেন। ইহা ১৮৭২, ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ 'মধুসূদন দত্ত' পুস্তকে (পৃ. ৮১) ইহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই উপাদেয় অংশটি "মধু-স্মৃতি"তে প্রদত্ত হইলে ভাল হইত।

পুস্তকখানির "মেঘনাদবধ কাব্য" অধ্যায়ে 'বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে' কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখিত মধুসূদন প্রশস্তির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ("ইউরোপ প্রবাস—" প্রভৃতি) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক আবিষ্কৃত মহাকবি দান্তের ষষ্ঠশত বার্ষিক জন্মোৎসবে মধুসূদনের প্রেরিত কবিতা সম্পর্কে মধুসূদন ও ইটালীরাজ ভিক্টর ইমানুয়েলের পক্ষে উভয়ের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল তাহা অবশ্য স্বীকৃতি সহকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'কবি দান্তে' শীর্ষক চতুর্দ্দশপদী কবিতাটির প্রতিলিপিও এই সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। বিষয়গুলি নূতন এবং ইহা দ্বারা গ্রন্থের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যোৎসাহিনী সভার পূর্ব্বোক্ত মানপত্র ও উত্তর সমেত এই সকল তথ্য নগেন্দ্রনাথ-কৃত রচনার অঙ্গীভূত করিতে গিয়া মূলের বহু অংশের উপরও হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। ইহাতে সম্পাদনার মূল নীতি আদৌ অনুসৃত হয় নাই। নূতন সংযোজিত বিষয় হয় পাদটীকায়, নচেৎ পরিশিষ্টে দেওয়া উচিত ছিল। ১৯২১ সনে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথের 'মধু-স্মৃতি'তে 'বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে' কবি মোহিতলাল-কৃত সমালোচনা অনুপ্রবিষ্ট করানো কিরূপ বিসদৃশ ব্যাপার সহজেই অনুমেয়। পরিশিষ্টে "Captive Ladie" সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'উৎসাহ' (১৩০৭-৮) হইতে একখানি পত্র এবং মনোমোহন ঘোষের একটি ইংরেজী বক্তৃতাও নূতন প্রদত্ত হইয়াছে। সন তারিখ এবং তথ্যগত আপাত-ভ্রম সংশোধিত করা হইয়াছে। পরিবর্জ্জন ও সংযোজনে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও পুস্তকখানির শোভন ও সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

পুস্তক-পরিচয়

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম আট আনা।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সূচনা বাংলাদেশ থেকেই হয়েছিল এই কথা শুধু বাঙালীর স্বপ্রদেশপ্রীতির কথা নয়, এ ইতিহাসসম্মত কথা। যাঁরা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁরা সকলেই জানেন কেমন করে কালক্রমে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ন্যাশনাল কনফারেন্স হতে ধীরে ধীরে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয়। তার মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের দান যথেষ্টই ছিল। তবু অস্বীকার করা যায় না যে, তার মধ্যে বাংলার নেতৃবৃন্দই সকলের পুরোভাগে ছিলেন। একথা ইতিহাসের কথা। এই ইতিহাস নানা গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রিকার পাতায় ছড়ানো আছে। কিন্তু এই আন্দোলনে বাংলার নারীরাও যে গোড়া থেকেই অংশ গ্রহণ করতে সুরু করেছিলেন তার ইতিহাস আমাদের সবিশেষ জানা ছিল না। বস্তুতঃ, শুধু গোড়ার যুগেই নয়, বাংলার নারীরা জাতীয় আন্দোলনে বরাবরই অংশ গ্রহণ করে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে নেত্রীদের নাম সকলেই জানেন। কিন্তু শুধু নেত্রীদের কথা জানাই যথেষ্ট নয়, বাংলার বিস্তৃত নারীসমাজের সর্বত্রই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, যা আজও বহুলাংশে লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গিয়েছে। সিউড়ির দুকড়িবালা ওরফে 'সিন্ধুবালা' সানন্দে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড নিলেন, স্বামীর কাছে ছোট ছোট ছেলেদের রেখে জেল খাটতে গেলেন; বরিশালের সরোজিনী বসু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত ডান হাতে বালা পরবেন না প্রতিজ্ঞা করে হাতের বালা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন; কলসকাঠি গ্রামে মহিলারা প্রতিজ্ঞা করেন, বঙ্গবিভাগ রহিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা গৈরিক বসন পরবেন। এই সব ঘটনা আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে নিহিত রয়েছে।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল সিদ্ধহস্ত। এ বিষয়ে তাঁর পাকা হাত। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে তিনি 'জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী' নামে যে বইখানি লিখেছেন তা আয়তনে বৃহৎ না হলেও তথ্যের দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় হতে আরম্ভ করে এই আন্দোলনের ইতিহাস যোগেশবাবুর পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। কংগ্রেসের সেই প্রথম যুগে ১৮৮৯ সনের বোম্বাই কংগ্রেসে দু'জন বঙ্গনারী সর্বপ্রথম যোগদান করেন—স্বর্ণকুমারী দেবী এবং প্রথম ভারতীয় মহিলা গ্রাজুয়েট চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। পরে কাদম্বিনী কবি কামিনী রায়ের সঙ্গে খনিমজুরদের বিষয় অনুসন্ধানের জন্য অনেক চেষ্টাই করেছিলেন। স্বদেশী যুগে স্বর্ণকুমারীর গান "শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম" ও পরে তদীয়া কন্যা সরলা দেবীর গান "অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী" জনসাধারণকে মাতিয়ে তুলেছিল। স্বদেশী আন্দোলনে সরলা দেবীর দান অসামান্য। তাঁর প্রবর্তিত প্রতাপাদিত্য-উৎসব, বীরাষ্টমী-উৎসব, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আজও লোকে বিস্মৃত হয় নি। স্বদেশী আমলের কল্যাণী বন্যা যখন বাংলাদেশে এল তখন স্বদেশী ভাব ও দেশানুরাগ বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীযুক্ত বাগল তার বহু উদাহরণ একত্রিত করেছেন তাঁর বইখানিতে। নারীরা বিপ্লবীদের কি রকম সাহায্য করতেন, নিজেরাও বৈপ্লবিক কার্যকলাপে কি রকম অংশ গ্রহণ করতেন তারও মনোরম বর্ণনা আছে। ভগিনী নিবেদিতা, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী, কুমুদিনী বসু, মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, সন্তোষকুমারী গুপ্তা, লীলা নাগ (পরে রায়), শান্তি দাস (পরে কবির), লতিকা ঘোষ, বিমলপ্রতিভা দেবী, সরলাবালা সরকার, শান্তি ঘোষ (পরে দাস), সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস (পরে ভৌমিক), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, নেলী সেনগুপ্তা, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, মাতঙ্গিনী হাজরা, অরুণা আসফ আলি প্রভৃতি বহু মহীয়সী বঙ্গনারীর কাহিনী বইখানিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইভাবে কংগ্রেসের একেবারে গোড়ার যুগ হতে স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক কাহিনী এতে পাওয়া যায়। এরূপ স্বল্পপরিসরে এত তথ্য এবং এমন একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে পারায় লেখক পাঠকসমাজের প্রভূত ধন্যবাদ অর্জন করবেন। বইখানির বহুল প্রচার হওয়া উচিত।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
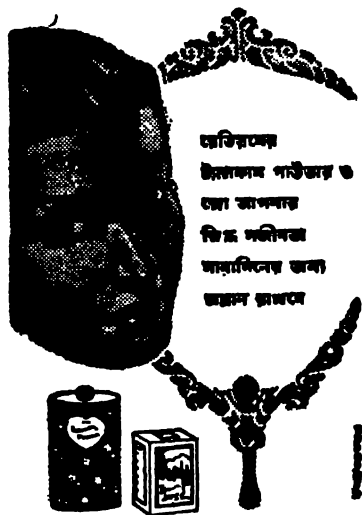
মঙ্গলচণ্ডীর গীত—শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য, এম-এ, সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য আট টাকা।

প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের নিখুঁত বিজ্ঞানসম্মত সংস্করণ দুর্লভ। বস্তুতঃ এইরূপ সংস্করণ প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কারণ, বাংলা গ্রন্থের পুঁথির পাঠ অনেক স্থলেই অত্যন্ত বিকৃত। কেবল পুঁথির সাহায্যে এই বিকৃতির সংশোধন সম্ভবপর নয়। সুখের কথা, অন্যতম প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা

দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নূতন সংস্করণ সম্পাদন করিতে গিয়া শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। ছয়খানি পুথি ও একখানি মুদ্রিত সংস্করণ অবলম্বনে এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। আদর্শ হিসাবে গৃহীত প্রাচীনতম পুথির তারিখ ১৭৫৯ সন। সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন পুথির তারিখ মনে হয় ৮৬৩ সন। ধ-পুথির পরিচয় অস্পষ্ট—সময় সন্দিগ্ধ। দুই স্থানে এ সম্বন্ধে দুই রকম উল্লেখ আছে। বিভিন্ন পুথির পাঠান্তর পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। তবে সাধারণত প্রচলিত বাংলা পুস্তকের বিভিন্ন পুথির মধ্যে যেরূপ গুরুতর গরমিল দেখিতে পাওয়া যায় বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ দেখা যায় না। অবশ্য পাঠের বিকৃতি আছে এবং সম্পাদক মহাশয় তাহাদের অনেকগুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের বিকৃত উচ্চারণজাত অর্দ্ধতৎসমজাতীয় শব্দ। ইহাদের সংশোধন তেমন প্রয়োজনীয় নহে, যেমন প্রয়োজনীয় মৌলিক বিকৃতি সংশোধনের। শেষোক্ত সংশোধনের মধ্যে ১৪শ পৃষ্ঠায় পুথিতে প্রাপ্ত 'রক্তবস্ত্র' স্থানে 'পীতবস্ত্র' এবং 'পীতবস্ত্র' স্থানে 'রক্তবস্ত্র' উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিনির্ম্মাণশাস্ত্রের অনুরোধে এই সংশোধন করা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন—তান্ত্রিক পূজাবিধি অনুসরণ করিয়া অন্যত্র এইরূপ আরও কিছু কিছু সংশোধন করা হইয়াছে। কিন্তু সেগুলির ঠিক সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ অনুসন্ধান এবং একই বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করিলে প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীভূত হইতে পারে—বহু দুর্ব্বোধ্য অংশের অর্থ সুগম হইতে পারে সন্দেহ নাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সম্যক্ আলোচনার জন্য এ জাতীয় প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে এই প্রচেষ্টার আভাস পাইয়া আশান্বিত হইলাম। সম্পাদক মহাশয় বহু পরিশ্রম ও প্রচুর যত্ন করিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী ও তাঁহার কাহিনীর উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ, আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, ইহার ভাষা ও কবির ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিষয় লইয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সকল মন্তব্যের সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। বিশেষ করিয়া, গ্রন্থকারের প্রদত্ত নাম বর্জ্জন করিয়া গ্রন্থের নূতন নামকরণ সম্পর্কে তাঁহার যুক্তি আমাদের কাছে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। গ্রন্থশেষে 'শব্দটীকা' সংযোজনের কল্পনা পরিত্যাগ করাকেও আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। দুরূহ শব্দের সূচী ও তাহার অর্থনির্দ্দেশ প্রাচীন গ্রন্থ-সংস্করণের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে হয়।

সোনারায়ের গান—শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। অনুসন্ধান গ্রন্থমালা-২। ধুবড়ী অনুসন্ধান সমিতি। মূল্য এক টাকা চার আনা।

উত্তরবঙ্গ ও আসামে ব্যাঘ্রের দেবতা সোনারায়ের পূজা ও গান প্রচলিত আছে। আসাম হইতে সংগৃহীত একটি গানের পালা এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে—পরিশিষ্টে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত গানের কিছু নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্পাদিত 'মাণিক্য মিত্রের কথা'র সমালোচনা ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

নার্সারি স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী—শ্রীযূথিকা চট্টোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৩৮। মূল্য দুই টাকা।

শিশুর দল মানবসমাজকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে ; তারা জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি রাষ্ট্রব্যবস্থা—এক কথায় আমাদের অতীতের এবং বর্ত্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক এবং বাহক ; তাদের ভিতর দিয়ে অনাগত ভবিষ্যৎ রূপায়িত হয়ে উঠবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিশুর জীবন-গঠনের আয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সমস্যা কোন আলোর সন্ধান পাই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু অনাদরে, অবহেলায়, অব্যবস্থার ভিতর দিয়ে শৈশব ও বাল্যের কিছু সময় অতিক্রম করে। অনেক সম্পন্ন গৃহেও দেখা যায়, ঘড়ি, ফাউণ্টেনপেন বা অন্য কোন ব্যবহার্য্য জিনিস সামান্য মাত্রায় অকেজো হলে মালিক যেমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন, শিশুর শিক্ষার ত্রুটি সংশোধনের দিকে তাঁর তেমন তৎপরতা দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে অজ্ঞতা অবশ্য অন্যতম কারণ। এর ফলে অগঠিত মন নিয়ে এবং উপযুক্ত আচরণে অভ্যস্ত না হয়ে কিশোররা যখন উচ্চ বিদ্যালয়ে ও কলেজে এসে উপনীত হয় তখন তারা প্রায়ই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখিকা মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুদের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। শিশু-শিক্ষা-ভবন—নার্সারি স্কুল পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা বলে সমগ্র বিষয়টি সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সদাচরণ, সদভ্যাস গঠন, স্বাস্থ্য ও সুরুচিসম্পন্ন জীবনবিকাশের জন্য যে আয়োজন করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়ও লেখিকার দৃষ্টি এড়ায় নি, এমনকি নার্সারি স্কুলের জলের চৌবাচ্চা যে ঢেকে রাখা দরকার, নইলে কৌতূহলী শিশুর পক্ষে তা মারাত্মক হতে পারে—এ কথাটি পর্য্যন্ত তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

বহুদিনের অনুভূত একটি অভাব দূর করেছেন বলে শ্রীযুক্তা চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ। শিশুর কল্যাণকামী প্রত্যেকের—বিশেষ করে মায়েদের, বইখানি যত্নের সঙ্গে পাঠ করা উচিত। লেখা সরস ও সুখপাঠ্য, ছাপা
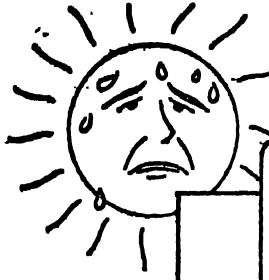
আবার গরম পড়লো—

গা বড্ডবেশী চটচটে আর নোংরা বোধ হচ্ছে কি?

লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতি-দিন নিজেকে রক্ষা করুন
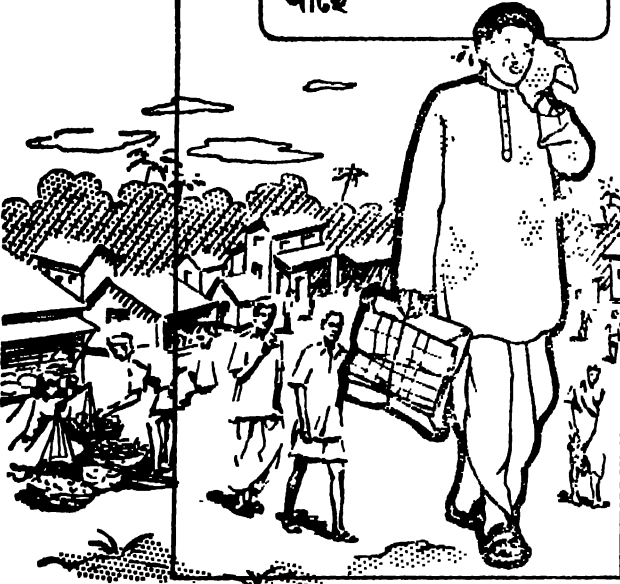
লাইফবয়ের "রক্ষা-কারী ফেনা" আপ-নার স্বাস্থ্যকে নিরা-পদে রাখে

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে
আপনাকে রক্ষা করে

L. 247-X 52 BG
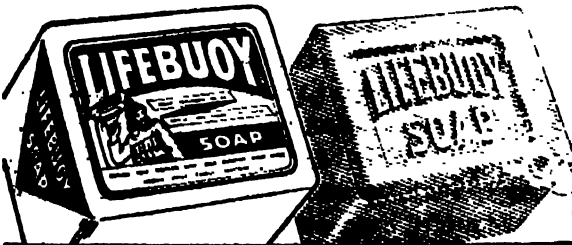
পরিপাটি। নার্সারি স্কুলের ছাত্রছাত্রী, খেলনা প্রভৃতির কতকগুলি সুন্দর আলোকচিত্র পুস্তকখানার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

গৃহ-কপোতী—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। সাহিত্য-ভারতী প্রকাশনী, ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

সরোজকুমারের ময়ূরাক্ষী, গৃহ-কপোতী ও সোমলতা এই তিনখানি বই

একটি দীর্ঘায়ত উপন্যাসের স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড। ময়ূরাক্ষীতে পাওয়া যায় নায়িকা বিনোদিনীর গার্হস্থ্য জীবন, গৃহ-কপোতীতে আছে রসময় বাউলের আখড়ায় তার বন্ধনমুক্তির সাধনা। একদা শ্রীগৌরাঙ্গদেব বাংলার ধর্মমণ্ডলে যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া ছুতমার্গের বেড়া ভাঙিয়াছিলেন—সাড়ে চারি শত বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব ও বাউল সম্প্রদায় তাহারই জের টানিয়া চলিয়াছে। মানুষকে ভালবাসিবার ও সেবা করিবার প্রেরণাই এই ধর্মের মূলকথা। পার্থিব লালসা কামনা স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি পরিহার করতঃ ঈশপ্রেমের উচ্চ লক্ষ্যে সাধনাকে স্থিত করার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এই সব সাধুসন্ত মহাজন। 'গৃহ-কপোতী'তে রসময়ের আখড়ায় বিনোদিনী সেই সাধনায় মন দিয়াছে; কিন্তু এত ঊর্দ্ধে উঠিবার সাধ্য তাহার হয় নাই। মুক্তির আকাশে উঠিয়াও সে আপন গৃহস্থালি গুছাইয়া লইয়াছে। এই চরিত্রটির মধ্যে লেখক একটি বাঙালী মেয়ের প্রতিদিনকার নীড়রচনার প্রয়াসকে নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গল্পে কোথাও চমক লাগাইবার প্রয়াস নাই, মনস্তত্ত্বের অযথা কচকচি নাই, দেশের মাটিকে অস্বীকার করিয়া পরদেশীয় ভাবধারার তুফান তোলার চেষ্টা নাই। একটি অনাড়ম্বর বাউলের আখড়া, সহজ গ্রাম্য পরিবেশ, তেমনি সহজ ও সরল কয়েকটি চরিত্র ও তাহাদের অকুটিল আলাপ ও আচরণ। আজিকার বাংলা-সাহিত্যে এই ধরণের কাহিনী রচনার প্রয়াস বিরল। সরোজকুমারের লেখার বৈশিষ্ট্য হইল প্রকাশভঙ্গীর সংযম। 'গৃহ-কপোতী'র গল্পটি আগাগোড়া এই সংযত বিন্যাসের দৃঢ়বন্ধ। বাংলা-সাহিত্যে ইহার মর্য্যাদা যথেষ্ট।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শালপিয়ালের বন—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৭৮। মূল্য তিন টাকা।

এখানি অশোক, পলাশ, শাল, মহুয়া বনের অধিবাসী আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী সাঁওতাল, ওঁরাওদের জীবন লইয়া রচিত একখানি মনোরম উপন্যাস। সাঁওতাল পরগণার আরণ্য সৌন্দর্য্যের পটভূমিতে এইসব আদিবাসীর সরল অনাড়ম্বর জীবন, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা—ভালবাসা, ঘৃণা, ভয় ভক্তি প্রতিহিংসার যে আলেখ্য লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন বাংলা-সাহিত্যে তাহার একটি বিশেষ মূল্য আছে। বস্তুতঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং কালীপদ ঘটক ছাড়া সাঁওতাল মাঝি মেঝেনদের লইয়া গল্প উপন্যাস আর কেহ বড় একটা রচনা করেন নাই, সুতরাং সেদিক দিয়া শক্তিপদবাবুকে তৃতীয় বিশিষ্ট লেখক বলা যায়। মাঝি-মেঝেনদের সংলাপ পাঠে জানা যায়—সাঁওতালী ভাষার উপর শক্তিপদবাবুর বিশেষ দখল আছে, তাই উপন্যাসখানি পড়িতে বসিলে মনে হয়—পাঠক যেন তখনকার মত সাঁওতাল-সমাজেই বাস করিতেছেন। আরণ্য-প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক কবিধর্মী।

লেডীরম—শ্রীপুলকেশ দে সরকার। প্রতিভা প্রকাশিকা, ৩১, ট্রক লেন, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে সম্প্রতি এক নূতন ধরণের রচনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—ইহার নাম রম্যরচনা। ইহা ঠিক গল্পও নয়, প্রবন্ধও নয়, অথচ কতকটা গল্পের মত, কতকটা প্রবন্ধধর্মী, কিন্তু মূলতঃ হৃদয়গ্রাহী। কয়েকজন শক্তিধর লেখক এরূপ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে পুলকেশবাবু অন্যতম।

লেডীরম—লেডীরম, শ্রীমতী চারু, তিলোত্তমাসম্ভবম্, হারামজাদা প্রভৃতি তেরোটি রম্য রচনার সঙ্কলন। ইহার প্রত্যেকটি রচনা শ্লেষাত্মক অথচ রসোত্তীর্ণ, সুতরাং কাব্যগুণসম্পন্ন। পড়িতে গেলে মনে হয় লেখক কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শ্লেষের সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নানাদিক যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। সেকালের অস্ত্রগুলির নাকি উজ্জ্বল, বর্ণচ্ছটা ছিল, পুলকেশবাবুর বাক্যবাণগুলিও সে গুণ হইতে বঞ্চিত নয়। তিনি সমাজের উচ্চতম

হইতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত যেখানে যাহা ব্যঙ্গযোগ্য দেখিয়াছেন—তাহার কোনো কিছুকেই রেহাই দেন নাই।

পুলকেশবাবুর লক্ষ্যভেদ-প্রয়াস প্রশংসনীয়, কিন্তু লক্ষ্য যেখানে ব্যক্তি-বিশেষ সেখানে তিনি আরও কিছু সংযমের পরিচয় দিতে পারিতেন।

শ্রীতারাপদ রাহা

নীল আলো—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ২।০।

এখানি রহস্য-উপন্যাস। কিন্তু রহস্য-উপন্যাস বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় পুস্তকখানি ঠিক সেই শ্রেণীর নহে।

একটি মেয়ের তিনটি পুরুষ বন্ধু। মেয়েটি তিন জনকেই সমভাবে দেখে, কিন্তু ইহারা তিন জনেই মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া রঙীন স্বপ্নের জাল বোনে, গোপনে আলাদা ভাবে প্রেম-নিবেদনও করে। মেয়েটি ইহাদিগকে তিরস্কার করে, কিন্তু একের কথা অপরের কাছে প্রকাশ করে না। ইতিমধ্যে মেয়েটির বাড়ীতেই এই তিন জনের মধ্যে একটি খুন হইল। এইখান হইতেই কাহিনীটি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা কিরীটী এই রহস্যময় হত্যার কিনারা করিল। পুস্তকখানিতে হত্যা-রহস্য যেমন কৌতূহল উদ্রিক্ত করে তেমনি মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সরল ন্যায়—শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তিকায় সহজ ভাষায় বৈশেষিক দর্শনোক্ত মৌলিক পদার্থ-সমূহের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন পরস্পরের পরিপূরক। বিশেষতঃ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পরবর্তীকালে নৈয়ায়িক সমাজে ন্যায় বলিতে বৈশেষিক দর্শনের প্রমেয় এবং ন্যায় দর্শনের প্রমাণ একত্রিত ভাবে বুঝায়। সেই অনুসারে বৈশেষিক পদার্থ-প্রবেশক গ্রন্থ হইলেও ইহার নাম সরল ন্যায় রাখা হইয়াছে। ক্ষুদ্র পরিসরে গ্রন্থকার বহু বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য তাঁহার বৃহত্তর গ্রন্থ ন্যায়প্রবেশ দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

সঙ্কেত—শ্রীমন্মথ সর্ব্বাধিকারী। মহাভারতী প্রকাশিকা। মূল্য বার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মথ সর্ব্বাধিকারী হিন্দু-ভাবধারার বাহক মাত্র নন, তিনি গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া বাঙালী পাঠকের প্রিয় হইয়াছেন। 'সঙ্কেত' তাঁহার কাব্য-গ্রন্থ।

ইহার ভূমিকায় শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—মন্মথচন্দ্র "বর্ত্তমান বাংলার একমাত্র চারণ কবি।" চারণ-সঙ্গীতের মূল সুরটি তাঁহার গানের মধ্যে অনুস্যূত।

সঙ্কেতের অনেকগুলি কবিতাই পাঠকের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

আত্ম-বন্ধু-গণ
ভয়ে দূরে সরে গেছে কতজনে
করিয়াছে ঘৃণা
তবুও তোমার হাতে ঝন্ ঝন্ রবে
বাজিয়াছে মহারুদ্র বীণা।"

১৯৫২ সনে জুন মাসে যখন "সঙ্কেত" লেখা হয় তখন বিভক্ত স্বাধীন ভারত সৃষ্টি হওয়ার পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের নানা অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছে, কখনও আমরা আশায় উৎফুল্ল হইতেছি, কখনও-বা ব্যর্থতার বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছি। মন্মথচন্দ্র কিন্তু প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর আশা ভরসা অটুট রাখিয়াছেন। তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ গান ও কবিতা-রচনার বিরাম নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

রহস্যত্রয়ী—শ্রীকৈলাসনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ। বহরমপুর, গোরাবাজার হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ৭৮। মূল্য বার আনা।

এই গ্রন্থে স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহাশয় বত্রিশ পৃষ্ঠায় 'সনাতন ধর্মরহস্য'—বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টিময় ব্যক্তি ও বিশ্বের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিরূপে; আটাশ পৃষ্ঠায় 'বিবাহে ব্যবহাররহস্য'—নীতি, যুক্তি, সংযম ও উদারতাময় দেশ ও কালের গতির সহিত সামঞ্জস্যসাধনরূপে; এবং শেষ চৌদ্দ পৃষ্ঠায় 'অস্পৃশ্যতা রহস্য'—ঘৃণিত ছুঁতমার্গব্যাধিমুক্ত আত্মশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার অপরিহার্য্য উপায়রূপে; বেশ স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দেশ ও জাতির যথার্থ কল্যাণের সন্ধান পাইতে হইলে ত্রিকালদর্শী ঋষিদের উপদেশাবলীপূর্ণ শাস্ত্রের মর্মকথা অনুধাবন এহেন গ্রন্থাদির সাহায্যে নরনারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"সানলাইট দিয়ে কাচলে কেমন সহজে কাপড়ের ভেতর থেকে ময়লা বেরিয়ে আসে দেখুন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার রুমাল থেকে আরম্ভ ক'রে বিছানার ছাদর পর্য্যন্ত সব সাদা কাপড়ই নতুনের চেয়ে আরও সাদা হ'য়ে যায়। আর সানলাইটে কাচা কাপড় আরও বেশীদিন পরা চলে।"

"এ কথা মনে গেঁথে রাখবেন যে আর কিছুতেই না, না সত্যিই আর কিছুতেই রঙিন জিনিষ অত সুন্দর ঝকঝকে তক-তকে হয় না যেমন সানলাইট সাবানে হয়। এর দ্রুত উৎপাদিত ফেনা সব ময়লা উড়িয়ে দিয়ে কাপড়ের রঙকে জীবন্ত ক'রে তোলে, আর না আছড়াতেই তাই হয়।"

ভারতে প্রস্তুত

১। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,

২। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ,

৩। বিশ্বভারতী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪। ব্রহ্মবিদ্যালয়—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য যথাক্রমে ।৵০, ১৲, ২৲ এবং ১৷৵০।

এই পুস্তিকা চারখানি রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ বর্ষ-পূর্ত্তি উপলক্ষে নূতন করিয়া প্রকাশিত হয়। প্রথম পুস্তিকায় আছে—প্রতিষ্ঠাদিবসের উপাসনা ও প্রথম কার্য্য-প্রণালী। এখানি শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক চিত্রালঙ্কৃত। প্রথম কার্য্যপ্রণালী একখানি পত্রাকারে গ্রথিত। ইহার মধ্যেই যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথম 'কনষ্টিটিউশন' লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সঙ্কলয়িতা এইরূপ মনে করেন।

দ্বিতীয় পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধ পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় প্রবন্ধটি এই প্রথম বারে পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি শ্রীযুত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক চিত্রালঙ্কৃত।

তৃতীয়খানিকে পুস্তিকা বলিলে ভুল হইবে। ইহা আকারে ছোট হইলেও রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই ১৮২ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৩৪৭ সাল পর্য্যন্ত কুড়ি বৎসরের অধিককাল শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সকল বক্তৃতা দেন, বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে তাহার অধিকাংশই সঙ্কলিত হইয়াছে। এগুলি ইতিপূর্ব্বে পুস্তকে একত্র প্রকাশিত হয় নাই। পরিশিষ্টে ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালীন ভাষণ, গ্রন্থপরিচয় এবং একটি বিজ্ঞপ্তি আছে। শেষের দুইটি গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহের পরিচয় ও নির্দ্দেশ সম্বলিত। তিনখানি চিত্রও রহিয়াছে।

'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে' অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথম দিককার (১৩০৮-১৩১৮) ভাবকল্পনা এবং কার্য্যক্রমের একটি আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে এগারখানি চিত্র এবং ইহার পরিশিষ্টে আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যাপকগণ ও ছাত্রবৃন্দের তালিকা, শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাষ্ট ডীড ও শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যাঁহারা একটি পরিপূর্ণ ধারণা করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক চতুষ্টয় অবশ্য-পঠনীয়। এই বইগুলি হইতে দুইটি বিষয়ে পরিষ্কার প্রতীতি হয়। প্রথম, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা আজিকার দিনে অনেকেরই জানা নাই। নিজের যাবতীয় উপার্জ্জন, মায় সহধর্ম্মিণীর অলঙ্কার, বিদ্যালয়টির লালন নিমিত্ত ব্যয় করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। ক্রমে বিদ্যালয়টি রূপ বদলাইয়া বিশ্বভারতীতে পরিণত হইয়াছে। এই বিশ্বভারতীর ভাবকল্পনা তাঁহার মনে প্রথম হইতেই আশ্রয় লাভ করে, পরে যথাসময়ে ইহা একটি সম্পূর্ণ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয়, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও রচনা সঙ্কলনে এবং পুস্তক সম্পাদনে যে অনুসন্ধিৎসা, নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অন্যত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এ পুস্তকগুলির বহুজনপাঠ্য হওয়া উচিত।

সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। পৃ. ২৯৮। মূল্য তিন টাকা চারি আনা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী 'সাহিত্য' পুস্তকে প্রথম গ্রথিত হয় ১৩১৪ সনে। ইহার পর কয়েক বার ইহার পুনর্মুদ্রণ হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থ 'সাহিত্যে'র তৃতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে একুনে পঁচিশটি প্রবন্ধ আছে। ইহার মধ্যে ১৯ হইতে ২২ সংখ্যক প্রবন্ধ নূতন সংযোজন। সংযোজনের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি সমুদয়ই গত শতকের শেষপাদে রচিত এবং 'ভারতী ও বালক' এবং 'সাধনা'য় প্রকাশিত। 'সাহিত্য' পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণে সুতরাং ১২৯৩ হইতে ১৩১৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ বাইশ বৎসরের ভিতরকার সাহিত্য-বিষয়ক নানা চিন্তা, সমস্যা এবং বঙ্গসাহিত্যের ক্রমিক বিকাশের চিত্র ধৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' বহু সুধীজন ইতিপূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংস্করণের

সংযোজন এমন অনেক নূতন বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে যাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে পড়া ও জানা সম্ভব ছিল না। আমরা সমুদয় গ্রন্থখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিলাম। যে কঠোর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সংযোজনের অন্তর্গত প্রবন্ধসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের প্রকাশকাল ও প্রকাশক্ষেত্র নির্দ্দেশিত এবং বহু প্রবন্ধের পরিচয় ও বর্জ্জিতাংশও গ্রন্থপরিচয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্বগৃহ-প্রবেশ-উৎসবে (২১ অগ্রহায়ণ, ১৩১৫) রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাও গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইয়াছে। 'সাহিত্য' পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণ সকল দিক হইতেই বিশেষ উপভোগ্য।

বঙ্গের মহিলা কবি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। পৃ. ৪৮৪। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ বাহির হয় ১৩৩৭ সালে। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর পরে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সময়ের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা-গবেষণায় একটি যুগান্তর ঘটিয়াছে। নানা বিষয়ে পূর্ব্বকার ধারণা বহুলাংশে বর্জ্জিত হইয়াছে এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে বহু নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে তাহা পরিবেশিতও হইয়াছে। ইহার মধ্যে মহিলা কবিদের জীবন এবং রচনার কথাও আমরা অনেক জ্ঞাত হইয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ বর্ষীয়ান্ লেখক খুবই ভাগ্যবান্। কেননা এই সকল গবেষণার ফল এবং নিজের দীর্ঘকালের অনুসন্ধিত বিষয়াদির সমাহার পুস্তকখানির বর্ত্তমান সংস্করণে সন্নিবদ্ধ করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন। গ্রন্থকার পুস্তকে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সাত জন, ঊনবিংশ শতাব্দীর পঁয়তাল্লিশ জন ও বর্ত্তমান শতাব্দীর দুইজন মাত্র মহিলা কবির বিবরণ দিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেকে বিংশ শতাব্দীতেও জীবিত ছিলেন, কেহ কেহ বর্ত্তমানেও বাঁচিয়া আছেন। এ সমুদয়ই ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তরু দত্ত ও সরোজিনী নাইডু ইংরেজী কবিতা লিখিলেও 'বঙ্গের মহিলা কবি'দের মধ্যেই লেখক তাঁহাদিগকে স্থান দিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর মহিলা কবিদের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছুই লেখা হয় নাই। গ্রন্থকার আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহাদের সম্বন্ধেও তিনি কিছু লিখিবেন। পুস্তকখানিতে চিত্রও দেওয়া হইয়াছে সাঁইত্রিশ জন মহিলা কবির। গ্রন্থকার প্রত্যেক মহিলা কবির সংক্ষিপ্ত জীবন-কথার সঙ্গে তাঁহার কবিতা ও কাব্যগ্রন্থাদির মূল ভাব পাঠকের সম্মুখে স্বল্পপরিসরে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াস যে বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে তাহাও পাঠকমাত্রে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। মানকুমারী বসু ও শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারের স্বরচিত জীবন-কথা বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। এ পুস্তকখানির যে বহুল প্রচার হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রচ্ছদপটটিও সুন্দর।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আলোচনা

"মহাত্মাজীর আহ্বানে"

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গত ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী রায়ের "মহাত্মাজীর আহ্বানে" নামক প্রবন্ধটি পড়িলাম। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা বিবৃত করিতে গিয়া স্মৃতির ক্ষীণতাবশতঃ ঐ প্রবন্ধে শ্রীমতী রায় কয়েকটি ভুল করিয়া বসিয়াছেন। ১৯৩০ সনের লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া উহার সম্পর্কে কোনও বিবরণে কোনও ভুল থাকা সঙ্গত নহে, সেজন্ম সেগুলির সংশোধনার্থ ইহা লিখিতেছি।

ঐ লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার কংগ্রেসের আহ্বানে যোগদান করেন নাই; বাংলার বহু কর্ম্মীর সহিত তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে গঠিত কাউন্সিল অব সিবিল ডিসওবিডিয়েন্সের তরফ হইতেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী, শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার* প্রভৃতির সহিত একযোগে নারী সত্যাগ্রহ সমিতি স্থাপন করিয়া বাংলার মহিলাবৃন্দকে আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি হইতে তিনি মেদিনীপুর পরিক্রমা করিতে অনুরুদ্ধ হন নাই, কেননা তিনি বাংলা কংগ্রেসের হইয়া কোনও আন্দোলন করিতে সে সময়ে নানা কারণে ইচ্ছুক ছিলেন না; কাউন্সিল অব সিবিল ডিসওবিডিয়েন্সের পক্ষ হইতেই তিনি ঐ পরিক্রমায় বাহির হন। উক্ত কাউন্সিল পূর্ণ রূপ পাইবার পূর্ব্বেই উহার প্রধান উদ্যোক্তা যতীন্দ্রমোহন ছাত্রদলের ডাকে সাড়া দিয়া, নিষিদ্ধ পুস্তক প্রকাশ্য সভায় পাঠ করিয়া আইন ভঙ্গ করার অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারারুদ্ধ হন। তাঁহার স্থলে শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত উক্ত কাউন্সিলের প্রথম সক্রিয় সভাপতি হন এবং উক্ত কাউন্সিলের তরফ হইতে বাংলা দেশে লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার জন্য মহিষবাথানকে উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন ও নিজেই ঐ স্থানে সর্ব্বপ্রথমে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন।

সে সময়ে কোনও কোনও নেতাকে মালাচন্দন ও কুঙ্কুমভূষিত করিয়া রণক্ষেত্রে সংগ্রাম করিবার জন্ম প্রেরণ করা হইলেও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসুর ভাগ্যে ঐরূপ সংবর্দ্ধিত হইবার অবকাশ ঘটে নাই। পর পর ধৃত সম্পাদকের স্থানে সম্পাদক রূপে কার্য্য করিবার যে ক্রমনির্দ্দেশক তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার প্রথম নয় জনের নাম একটি ইস্তাহারে কোনও কর্ম্মীর ভুলে ছাপা হইয়া বাহির হওয়াতে সরকার পক্ষ উক্ত নয় জনকে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করেন—হেমন্তবাবু, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনয় বসু, শ্রীপুরুষোত্তম রায় প্রভৃতির নাম ঐ নয় জনের মধ্যে থাকায় তাঁহারা সকলেই সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ধৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কাড়েবর মাঝির গোলার পোড়া ধান মহাত্মাজীকে দেখাইবার কোনও অবকাশ ঘটে নাই, কেননা ধান পোড়ার ব্যাপার ঘটিবার বহু পূর্ব্বেই মহাত্মাজী দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জেলের অভ্যন্তরে বাস করিতেছিলেন। আমি কাউন্সিল অব সিবিল ডিসওবিডিয়েন্সের প্রথম সক্রিয় সম্পাদক রূপে, এলাহাবাদে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির এক গোপন বৈঠকে বাংলার রিপোর্ট পেশ করিতে গমন করি। বাংলায় সরকারী অত্যাচারের মাত্রা কত বেশী তাহা বুঝাইবার জন্ম আমি যে সমস্ত নিদর্শন সঙ্গে লইয়াছিলাম তাহার মধ্যে পোড়া ধানের একটি বৃহৎ চাপ ছিল। কংগ্রেস-ভবনে স্মারক চিহ্ন হিসাবে উহা রক্ষা করা প্রয়োজন বোধে স্বর্গতা সরোজিনী নাইডু উহা আমার নিকট হইতে চাহিয়া লন। এই এলাহাবাদ অভিযানে মেদিনীপুরের অত্যাচারে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরূপে সাক্ষ্য দিবার জন্ম আমার ভগিনীকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট অত্যাচারের বিশদ বিবরণ শুনিয়া উপস্থিত নেতৃবর্গ স্তম্ভিত হন ও মেদিনীপুর জেলাবাসীর ধৈর্য্য ও সাহসের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন না, সম্পাদক ছিলেন উকীল মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি তমলুকের বর্ত্তমান নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের শ্বশুর... পিতা এবং কাউন্সিল অব সিবিল ডিস-ওবিডিয়েন্সের তমলুক জেলার অন্যতম সংগঠক।) সতীশচন্দ্র একজন উৎসাহী কর্ম্মী ও ত্যাগশীল মানুষ ছিলেন; মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি প্রায় বসতবাটি জনহিতকর কার্য্যের জন্ম দিয়া গিয়াছেন। তিনি স্থানীয় একজন নেতা নিশ্চয়ই ছিলেন কিন্তু সম্পাদক বলিলে ভুল হয়। তমলুকে সে সময় মহেন্দ্রনাথ মাইতি, অজয় মুখোপাধ্যায়, তমলুকের পুরাতন রাজবংশের বংশধরগণ, হংসধ্বজ ধাড়া, সতীশচন্দ্র সামন্ত প্রভৃতি অনেক কর্ম্মীর সহিত সতীশচন্দ্রও নির্ভীক ভাবে সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। শ্রীরতন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার চাষের পল্লীর এক জন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন বটে, কিন্তু কোনও দিন ঐ পল্লীর কংগ্রেস-সম্পাদক হন নাই; সে সময়ে কংগ্রেস-সম্পাদক ছিলেন রজনীকান্ত বসু। রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রোদয় মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সাইক্লোস্টাইল বুলেটিন বাহির করা ও চিত্র-সম্বলিত বেআইনী প্রাচীরপত্র লটকাইবার ভার ছিল এবং সে কার্য্য ইহারা খুব যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

* এখানে শ্রীমতী 'হেমপ্রভা দাসগুপ্তা' হইবে।—প্রবাসীর সম্পাদক

দেশ-বিদেশের কথা

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে 'কম্যুনিটি প্রোজেক্টে'র কার্য্যাবলী

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে দুইটি 'কম্যুনিটি প্রোজেক্ট' অঞ্চল আছে। কোচিনের কম্যুনিটি প্রোজেক্টের প্রধান কেন্দ্র চালাকুড়ি। এই অঞ্চলের আয়তন ৪৫০ বর্গমাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ। অপরটি ত্রিবাঙ্কুরের নেয়াত্তিঙ্কারা-ভিলাভাঙ্কোড তালুক। ইহার আয়তন ৪০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষ।

১৯৫২ সনের ২রা অক্টোবর একটি রাস্তা নির্ম্মাণ দ্বারা নেয়াত্তিঙ্কারা ভিলাভাঙ্কোড তালুকের কম্যুনিটি প্রোজেক্টের কাজের সূচনা হয়। অনেক বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া এই রাস্তা নির্ম্মাণকার্য্য অগ্রসর হইতে থাকে। সম্প্রতি এই রাস্তা আরও দুই মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। এখন কম্যুনিটি প্রোজেক্টের বিরোধীদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং যাবতীয় অঞ্চলে সকলেই সক্রিয় ভাবে এই কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের 'কম্যুনিটি প্রোজেক্ট' কার্য্যের পার্থক্য আছে ; কেননা সমগ্র ভারত-

বর্ষের মধ্যে এই রাজ্যে লেখাপড়া জানা লোকের আনুপাতিক সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। এই রাজ্যে জনকল্যাণমূলক কার্য্যের প্রধান অঙ্গ—নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ এবং পুরাতন রাস্তা মেরামত। সেজন্য এখানে কম্যুনিটি প্রোজেক্ট কর্ম্ম-প্রচেষ্টার রাস্তার উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। নেয়াত্তিঙ্কারা ভেলাভাঙ্কোড অঞ্চলে ৩৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, কিন্তু এগুলিতে হাতের কাজ শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সেইজন্য এখানকার কম্যুনিটি প্রোজেক্ট কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষাদানের এবং কুটীর-শিল্পের উন্নয়নের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও উন্নয়নমূলক কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে :

(১) নেয়াত্তিঙ্কারা ভিলাভাঙ্কোড অঞ্চলে জেলেদের জন্য উত্তম বাসগৃহের ব্যবস্থা—ইহার জন্য বিনামূল্যে কিছু জমি পাওয়া গিয়াছে, (২) মৎস্যশিকার, হস্তচালিত তাঁত, মৌমাছি-পালন প্রভৃতি কুটীর-শিল্পের উন্নয়ন, (৩) নলকূপ এবং কূপসমূহ হইতে অনায়াসে জল তোলার জন্য হ্যাণ্ড-পাম্প নির্ম্মাণ এবং একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক এই শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ।

এই অঞ্চলের 'কম্যুনিটি প্রোজেক্টে'র কর্ত্তৃপক্ষ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, খেলনা, ছোট এঞ্জিনের মডেল, ইলেকট্রিক মোটর ইত্যাদি নির্ম্মাণের পরিকল্পনাও করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একটি বাণিজ্য-বিদ্যালয় ('trade school') ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুতগতিতে সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হাতেকলমে বিভিন্ন ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া। এই স্কুলে শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হইবে না। পক্ষান্তরে প্রায় অর্দ্ধেকসংখ্যক শিক্ষার্থীকে মাসিক কুড়ি টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই বিদ্যালয়ের জন্য স্থানীয় কৃষিকর্ম্মকারিগণ প্রায় ৩০,০০০ টাকা মূল্যের ১০ একর জমি দান করিয়াছেন—এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে সাকুল্যে খরচ লাগিবে ৩,১৫,০০০ টাকা।

জমির ক্ষয়-নিবারণের পদ্ধতি শিখাইবার উদ্দেশ্যে প্রোজেক্টের কর্ত্তৃপক্ষ সাতটি প্রদর্শন-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা গ্রামবাসীরা বিশেষ উপকৃত হইতেছে।

নেয়াত্তিঙ্কারা ভিলাভাঙ্কোড কম্যুনিটি প্রোজেক্টের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় পঁয়ত্রিশটি গ্রাম্যপঞ্চায়েত সহযোগিতা করিতেছে—প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত পনর হইতে কুড়ি হাজার লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন। পঞ্চায়েতের সভ্যগণ ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয়ভাবেই নিজ নিজ এলাকায় কম্যুনিটি প্রোজেক্টের কার্য্যের প্রসারকল্পে কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উন্নয়ন-পরিকল্পনায় একদিকে বয়স্ক ব্যক্তিরা যেমন কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, অন্য দিকে তেমনি তরুণ-তরুণী এবং বালক-বালিকাদের শরীরচর্চ্চা ও খেলাধূলার ব্যবস্থাও ইহাতে আছে। এই কম্যুনিটি প্রোজেক্ট এলাকায় গত এক বৎসরের মধ্যে আটটি মহিলা ক্লাব, তরুণ ও বালকদের এগারটি সঙ্ঘ এবং দশটি ভলিবল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীঅবনীকুমার দাশ

হায়দরাবাদ সরকারের মৎস্য-বিভাগের অফিসার শ্রীঅবনীকুমার দাশ ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত 'ক্লিনিক্যাল কেমিষ্ট্রি'র প্রথম ইউরোপীয় কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য আমষ্টারডাম বিজ্ঞান কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি স্থান হইতেও বিশিষ্ট-বৈজ্ঞানিকগণ যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত দাশ রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য যে অভিনব প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞান কংগ্রেসের কৃতী বৈজ্ঞানিকদের সম্মুখে প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত দাশের উদ্ভাবিত দুইটি যন্ত্রের সাহায্যে ইহা প্রদর্শিত হয় : ১। Scholander Roughton Syringe ২। Das Bubbletrap। ১৯৫২ সনে যখন অবনীবাবু কেম্ব্রিজের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক রাফটন, এফ-আর-এস'এর পরীক্ষাগারে গবেষণাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন তখন অক্লান্ত চেষ্টায় শেষোক্ত যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। প্রথমে মৎস্যের শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত দাশের গভীর গবেষণায় যন্ত্রটির উপযোগিতা আরও বাড়িয়াছে। বর্ত্তমানে কেবল যে মৎস্যের বেলায়ই ইহা কাজে লাগে তেমন নয়,

বহুমূত্র রোগে রক্তের যে ক্ষারাংশ (alkali reserve) কম হয় তাহাও এই যন্ত্রসাহায্যে দশ মিনিটে ধরা পড়ে।

শ্রীঅবনীকুমার দাশ

১৯৫০ সনে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক শারীরতত্ত্ববিদ মহাসম্মেলনে শ্রীযুক্ত দাশ ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন এবং মৎস্যের উপর Heatstroke-এর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন। প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বায়োকেমিষ্ট্রি কংগ্রেসে Bas Bubbletrap দ্বারা মৎস্যের শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধীয় পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়া পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক মহলে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ইউনেস্কোর সদস্যরূপে ইউরোপে গবেষণায় রত থাকাকালীন সেখানকার অনেকগুলি মৎস্যকেন্দ্র ও বিখ্যাত গবেষণাগার পরিদর্শনের সুযোগ পাইয়া শ্রীযুক্ত দাশ মৎস্য সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। সম্প্রতি লণ্ডন ইউনিভার্সিটির নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এ. ভি. হিল, কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটির নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক হেনরি ড্যাম, ইনসুলিনের আবিষ্কর্তা টরাণ্টো প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকগণ শ্রীযুক্ত দাশকে শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের জন্মতিথি অনুষ্ঠান

গত ২রা আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বিক্রমপুর শাখার উদ্যোগে "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র আবিষ্কর্তা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক, পরলোকগত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের জন্মতিথি উৎসব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান

উপলক্ষে বিষয়রত্ন মহাশয়ের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন উক্ত সভার সভাপতি, বিষ্ণুপুরের মহকুমা-শাসক শ্রী এস. সি. সরকার মহাশয়। বসন্তরঞ্জনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার কথা উল্লেখ করিয়া আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় যে লিপি প্রেরণ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সম্পাদক তাহা সভায় পাঠ করেন। শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি), বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা, শ্রীশশাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরিত লিপিও পঠিত হয়। শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায়, শ্রীমাণিকলাল সিংহ, শ্রীক্ষিতীশ ঘোষাল, শ্রীসুখময় সরকার, শ্রীচিত্ত দাশগুপ্ত, শ্রীরামনলিনী চক্রবর্তী, শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূদেব মণ্ডল, শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতুলসী মণ্ডল, শ্রীবারীন বিশ্বাস ও শ্রীশরদিন্দু বিশ্বাস প্রভৃতি বসন্তরঞ্জনের জীবন এবং সাহিত্যসাধনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীগুরুদাস সরকারের প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি-সঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

শ্রীনবকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের কর্ম্মী শ্রীনবকুমার মুখোপাধ্যায় কৃষি, গোপালনাদি শিক্ষা করিবার জন্য ১৬ই অক্টোবর ডেনমার্ক

শ্রীনবকুমার মুখোপাধ্যায়

রওনা হইয়াছেন। ডেনমার্কের 'ডেনিশ স্মল হোল্ডার্স ইউনিয়ন' তাঁহার শিক্ষাকালীন যাবতীয় খরচ বহন করিবেন। শিক্ষার্থীকে কলেজে ভর্ত্তি হইয়া এক বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। পরে ছয় মাস কৃষিক্ষেত্রে ও গোশালায় হাতেকলমে কাজ করিতে হইবে।

নবকুমারবাবু বাঁকুড়ার অধিবাসী এবং প্রবাসীর লেখক, বিশ্বভারতী চীনা ভবনের শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

দিল্লী নিখিল-ভারত রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন

গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে, দিল্লী সপ্রু হাউসে নিখিল-ভারত রেডিও সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশনে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ আমন্ত্রিত হন। পাঁচ দিন ধরিয়া সম্মেলনের অধিবেশনে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ ও লঘু উভয়বিধ যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ভারত সরকারের উদ্যোগে এরূপ সঙ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান এই প্রথম। তথ্য ও বেতার বিভাগের মন্ত্রী ডঃ বি. ভি. কেশকার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং রাষ্ট্রপতি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন। এই সম্মেলনের গুরুতম আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। ২৮শে অক্টোবর সকালের আসরে ভারত-বিখ্যাত গীতশিল্পী শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিগুরুর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গান গাহিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের রচিত উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীত তিনি এরূপ দরদ দিয়া গান যে, সকলেই বাংলার এই সঙ্গীতকে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন। শৈলজারঞ্জন মজুমদারের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের একটি দল কয়েকটি সমবেত ও একক সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া রবীন্দ্রসৃষ্ট সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার পরিচয় দেন।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৫৩ সনের কার্য্যবিবরণী

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও মঠে নিত্যনৈমিত্তিক পূজা নিয়মিতভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠে ১৫৩টি ধর্ম্মালোচনা বৈঠক হইয়াছিল। কালীতলা নামক স্থানে গত ঝুলন পূর্ণিমা হইতে সাধারণের জন্য একটি ধর্ম্মালোচনার ক্লাস প্রতি সপ্তাহে রবিবার সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বৎসরে পুস্তকাগার ও পাঠাগারের কার্য্য যথাবিহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মোট পুস্তক-সংখ্যা ১৮৮৮; ২৮ খানি মাসিক পত্রিকা এবং দুখানি দৈনিক কাগজ নিয়মিত ভাবে পাঠাগারে পাঠের জন্য রাখা হয়।

রামহরিপুর শাখা-কেন্দ্রে নূতন পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে। মিশন বিভাগের তত্ত্বাবধানে তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। এই বৎসরে নূতন ও পুরাতন মিলাইয়া মোট ১৬,৬৩৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, তা ছাড়া রোগীদের মধ্যে কুইনাইন ও প্যালোড্রিন বিতরিত হইয়াছে। রামহরিপুর অবৈতনিক বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ হোমিও বিদ্যালয়, সারদানন্দ ছাত্রাবাস, রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজও নিয়মিত ভাবে চলিতেছে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পাহাড়ী রমণী

শ্রী পূর্ণেন্দুশেখর মজুমদার

বাস্তুভিটা

পল্লী-কুটীর

পল্লী-প্রাসাদের একাংশ

ফোটো—শ্রীবিনয়ভূষণ দাস

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৬১

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশের অবস্থা

পুলিসের ধর্ম্মঘট ব্যাপারটি রাষ্ট্রধ্বংস-নীতির অঙ্গবিশেষ এবং উহার আয়োজনকারীবর্গের কার্য্যক্রমের একটি পর্ব্ব। লিখিবার সময় শেষ খবর যাহা আসিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, অনেক স্থলে উহা সরকারের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে, আবার এখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়ারও সম্ভাবনা বাড়িয়াছে। যাহাই হউক, এখনও এই পর্ব্বের শেষ দেখা যায় নাই ও উহার বিষয়ে পূর্ণ তথ্যও প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং উহার সম্যক্ আলোচনা এখনও সম্ভব নহে।

কিন্তু এযাবৎ যে সংবাদসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অনশন ধর্ম্মঘটের প্রাক্কালেও সরকারী খাসমহলে সে বিষয়ে কিছু কাণাঘুষা-উড়ো খবরও পৌঁছায় নাই এবং ব্যাপারটি ঘটিয়াছে অতর্কিতে—অন্ততঃপক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলের ও উচ্চতম অধিকারীবর্গের অজ্ঞাতসারে। যদিও কেহ এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন তথাপি তিনি উহার নিরোধ বা প্রতিকারের কোনও চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই।

শাসনতন্ত্রের প্রধান যন্ত্র ও অস্ত্র পুলিস। তাহার অবস্থা এখন কোথায় দাঁড়াইয়াছে তাহা দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও অজানা নহে। অজানা শুধু মুখ্যমন্ত্রীর ও তাঁহার পারিষদবর্গের।

"সরিষার ভূত" আবেশ হইলে উপায় কি তাহা দৈবজ্ঞরাই বলিতে পারেন, আমাদের মত সাধারণের সেখানে অধিকার নাই। কিন্তু এই ব্যাপারের একটা সংজ্ঞা খুবই স্পষ্ট দেখা যায়। সেটা এই যে, দেশের মহাকরণের অধিকারীবর্গের—বিশেষতঃ প্রধান মহাশয়ের—গণ্ডীর বাহিরের সংবাদ গ্রহণের কোনও সূত্র নাই।

দেশের উন্নতির ব্যবস্থা ত কঙ্কাবতীর উপাখ্যানের কাঁকড়া-দরজীর জামা তৈয়ারির প্রথায় চলিতেছে। দেশের লোকের দৈহিক ও মানসিক অবনতি যে কিরূপে ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে সে খবর রাখে কে? বেকার-সমস্যা পূরণের সময় দশ বৎসর লাগিবে সেই কথা আমরা উচ্চতম অধিকারীদ্বয়ের মুখে বারবার শুনিলাম। কিন্তু এই দশ বৎসরে দেশের লোক অধঃপতনের কোন্ অতলে নামিবে তাহার ঠিকানাও একটা পাওয়া দরকার। রাষ্ট্রধ্বংসকারীরা এ সুযোগ ছাড়িবে না।

এত বড় বিপদের সঙ্কেতেও যদি অধিকারীবর্গ সচেতন হইয়া নূতন ব্যবস্থা না করেন তবে পশ্চিমবঙ্গের সন্তানগণের কপালে "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি"?

পুলিস বাহিনীর অনশন ধর্ম্মঘট

বিগত বুধবার ১৫ই ডিসেম্বর এই খবরটি প্রকাশিত হয়:

"হাওড়ার পুলিস বাহিনীর কনষ্টেবলগণের অনশন ধর্ম্মঘট মঙ্গলবারও অব্যাহত থাকে এবং ঐদিন অবস্থার আরও অবনতি ঘটে।

"ঐদিন হাওড়ায় ধর্ম্মঘটীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এই ধর্ম্মঘট হুগলী, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার কনষ্টেবলদের মধ্যে আংশিকভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

"অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐদিন হাওড়ায় সকাল হইতে সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেন। হাওড়ায় সশস্ত্র কনষ্টেবলদিগকে ঐদিন নিরস্ত্র করা হয় এবং যে সকল স্থানে সশস্ত্র পুলিসের পাহারা দিবার কথা, সেই সকল স্থানে মঙ্গলবার সৈন্যদলকে মোতায়েন রাখা হয়। হাওড়া ট্রেজারী, জেলা পুলিসের অস্ত্রাগার প্রভৃতির ভারও সৈন্যদল গ্রহণ করে।

"অন্যান্য দিনের মত মঙ্গলবারেও পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ইন্সপেক্টর-জেনারেল শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার কয়েকজন পদস্থ অফিসার সহ হাওড়ায় ধর্ম্মঘটী কনষ্টেবলদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল তাহাদের সহিত আলোচনা করেন। প্রকাশ, শ্রীসরকার অনশনরত কনষ্টেবলদিগকে অনশন হইতে বিরত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু কনষ্টেবলগণ তাহাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত অনশন ভঙ্গ করিবে না বলিয়া শ্রীসরকারকে জানায়।"

ঐ দিনই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সাংবাদিকদিগের নিকট নিম্ন মর্ম্মে বিবৃতি দিয়াছেন:

"রাজ্য-সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আশ্বাস সত্ত্বেও কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন এলাকায় পুলিস বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কিছুসংখ্যক কনষ্টেবল অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত মঙ্গলবার সরকারী দপ্তর ভবনে সাংবাদিকদের নিকট এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে কতকগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য গবর্ণমেণ্টকে প্রচুর টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে।

ইহার ফলে তাঁহার (মুখ্যমন্ত্রীর) আশঙ্কা হয় যে, সরকারী ব্যয় এবং রাজস্বের মধ্যে প্রায় দশ কোটি টাকার মত ব্যবধানের সৃষ্টি হইতে পারে।

"দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গবর্ণমেন্ট ঐ পরিকল্পনা পরিহার করিয়াছেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

"ডাঃ রায় বলেন যে, তিনি কলিকাতায় ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী সি. ডি. দেশমুখের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যের আর্থিক অবস্থা তাঁহার গোচরে আনিয়াছেন। গত ৩ বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে 'রাজস্ব আদায়' প্রায় স্থিতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং অপরপক্ষে এই রাজ্যের ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে—এতদ্বিষয়ে তিনি (মুখ্যমন্ত্রী) শ্রীদেশমুখের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

"রাজ্যের ব্যয়বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডাঃ রায় বলেন, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতৎ রাজ্যের উন্নয়নের জন্য বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গবর্ণমেন্ট যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন সেগুলির মধ্যে সেচ-পরিকল্পনাসমূহ, অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান, ম্যালেরিয়া-নিরোধ ব্যবস্থা, বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধানের নিমিত্ত ৩০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ, সুন্দরবন অঞ্চলের জল-সরবরাহ ব্যবস্থা, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলির উন্নতি বিধান, জাতীয় উন্নয়ন সম্প্রসারণ ব্লক, স্থানীয় উন্নয়ন এবং সমাজ-কল্যাণ পরিকল্পনাসমূহ আছে। কার্য্যতঃ এই সকল পরিকল্পনার প্রত্যেকটির জন্যই রাজ্য-সরকারকে আংশিক ব্যয় বহন করিতে হইয়াছে; ভারত সরকার, টি সি এ, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন প্রভৃতি সংস্থা অবশিষ্ট ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাজ্যসরকারের ব্যয় প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে প্রথম বৎসর রাজ্য-সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ, দ্বিতীয় বৎসর আধা-আধি, তৃতীয় বৎসরে শতকরা ৭৫ ভাগ এবং চতুর্থ বৎসরে রাজ্য-সরকারকে সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিতে হইবে।

"পুলিসের অনশন ধর্ম্মঘট সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনসাধারণ কলিকাতা পুলিসের ব্যাপার অবগত আছেন। গবর্ণমেন্ট পুলিসের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত দাবি-দাওয়ার বিষয় বিবেচনা করার সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এক শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী যাহাদের দুরূহ অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে হয় এবং কখনও কখনও কঠোর শ্রম করিতে হয় তাহাদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ সচেতন আছেন। এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের অবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করিতে গবর্ণমেন্ট অনিচ্ছুক নহেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী অনুসরণ করিয়া যাইতে হইবে এবং এইজন্য মূলধন ও পৌনঃ-পুনিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন। তৎসত্ত্বেও যে সকল কর্ম্মচারী জনসেবায় নিযুক্ত আছে তাহাদের কি ভাবে সাহায্য করা যায়, তাহাও তাঁহাদের চিন্তা করিতে হইবে।"

"মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুঃখের বিষয় যে, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশ্যে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন এলাকার পুলিস বাহিনীর কিছুসংখ্যক কনষ্টেবল নানা ধরণের অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছে। তাহারা যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঐরূপ করিতেছে গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

"মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এরূপ প্রমাণ আছে যে, কনষ্টেবলগণ রাজ-নৈতিক দলসমূহের ন্যায় প্রচার-পুস্তিকা এবং প্রাচীরপত্রের সাহায্যে স্বীয় দাবি-দাওয়া সম্পর্কে প্রচার করিতেছে। গবর্ণমেন্ট ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে, পুলিস বাহিনীর একটি কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রের পুলিসকে যোগদানে আহ্বান জানাইয়া সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে। তত্ত্বের দিক দিয়া এই ধরণের কার্য্যকলাপ যে কোন শ্রেণীর লোকের পক্ষে নিরীহ বলিয়া গণ্য করা হইলেও পুলিস বাহিনীর ক্ষেত্রে ঐ প্রকার কার্য্যকলাপ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন। স্বীয় অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কনষ্টেবলদের পক্ষে কারণ ব্যতিরেকে এই প্রকার পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কোন হেতু থাকিতে পারে না। তিনি আশা করেন যে, পুলিস বাহিনী তাহাদের কর্ত্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিবে না এবং কোন আদেশ দেওয়া হইলে তাহা অমান্য করিবে না। কারণ পুলিস বাহিনীর ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্ত্তিতাই প্রধান কথা।

"ডাঃ রায় আরও বলেন, বলা বাহুল্য যে পুলিস বাহিনীর বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির যে-কোন প্রস্তাবই বিধানসভার দ্বারা পাস করাইয়া লইতে হইবে। বিধানসভা যাহাতে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন তজ্জন্য তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণতঃ বিধান-সভাতে যখনই পুলিসের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠে তখনই বেশ কিছু আপত্তি উত্থাপন করা হইয়া থাকে। ডাঃ রায় বলেন, আমি আশা করি, পুলিস বাহিনী এমন কোন কাজ করিবে না যাহাতে বিধানসভা কর্তৃক সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করাইয়া লওয়ার পক্ষে অধিকতর বিঘ্ন ঘটে।"

হিন্দু বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ বিল

কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় হিন্দু বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ বিলের অনেকরূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত সংবাদে প্রকাশিত পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"১৪ই ডিসেম্বর—মঙ্গলবার রাজ্যসভায় আইন মন্ত্রীর বহু আলোচিত হিন্দু বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ বিলের আরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই দিন রাজ্যসভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, প্রথমাবধি অসিদ্ধ বিবাহসংক্রান্ত ধারাটি—আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে সম্পাদিত বহু বিবাহ এবং নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। তবে আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে যে সকল হিন্দু দুই বা ততোধিক বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের পত্নী-দেরও বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার থাকিবে। এই জাতীয় বিবাহের পত্নীদিগকে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

বাতিলযোগ্য বিবাহের কারণ সংক্রান্ত ধারার পরিবর্তে নূতন একটি ধারা সংযোজন করিয়া এই দিন বিলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। কংগ্রেস-সদস্য দেওয়ান চমনলালের প্রস্তাবক্রমে এই পরিবর্তন করা হয়। অন্যান্য সংশোধন প্রস্তাবগুলিও তিনিই উত্থাপন করেন।

বাতিলযোগ্য বিবাহ সম্পর্কিত মূল ধারায় আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে ও পরবর্তী সময়ে সম্পাদিত বিবাহ অসিদ্ধকরণের হেতুগুলি স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি উপধারায় বর্ণিত হইয়াছিল। রাজ্যসভায় নূতন যে ধারাটি গৃহীত হইয়াছে, উহাতে বিবাহ অসিদ্ধকরণের কারণগুলি একসঙ্গে সঙ্কলন করিয়া এই পার্থক্য দূর করা হইয়াছে। নূতন ধারায় বিবাহ অসিদ্ধ করার আরও একটি কারণ সংযোজিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বিবাহের সময় আবেদনকারী ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা প্রতিবাদিনীর গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকিলে সেই বিবাহ বাতিলযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহাকে অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে। রাজ্যসভার বহু সদস্য, বিশেষতঃ মহিলা সদস্যগণ এই সংযোজনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এই সম্পর্কে ভোট গ্রহণের দাবি জানান। কিন্তু নূতন ধারাটি ২১—৪ ভোটে গৃহীত হয়।

নূতন ধারা অনুসারে আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে অনুষ্ঠিত যে কোন বিবাহ পুরুষত্বহানির ক্ষেত্রে, বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা জড়বুদ্ধি হইলে এবং বলপূর্ব্বক বা প্রতারণা দ্বারা বিবাহে সম্মতি লওয়া হইয়া থাকিলে বাতিলযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আন্দোলন ও জাতির প্রগতি

সম্বলপুরে পণ্ডিত নেহরু যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমানে এদেশে যাঁহারা বিদেশীর অনুকরণে বা অনুপ্রেরণায় রাষ্ট্র বিপ্লবের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের মনোবৃত্তিকে তিনি কি চোখে দেখেন :

"সম্বলপুর, ১১ই ডিসেম্বর—আগামী পাঁচ বৎসরে দেশকে আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্য জনগণকে প্রাণপণ পরিশ্রম করিবার আহ্বান জানাইয়া শ্রীনেহরু আজ এখানে বলেন, দীর্ঘদিন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পর যে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা রক্ষার যোগ্যতা যে আমাদের আছে সেই প্রমাণই আমাদের দিতে হইবে। দেশের সাফল্য কোন দিক দিয়াই কম নহে। কিন্তু যাহারা অন্য দেশের বাণী আঁকড়াইয়া রহিয়াছে তাহাদের মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট হয় না। কেননা, শান্তিপূর্ণ পন্থায় এই সাফল্য অর্জ্জিত হইয়াছে। জনগণের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার ফলে যখন ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে তখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও শান্তিপূর্ণ পন্থায় সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। একমাত্র উহাদ্বারাই স্থায়ী সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব।

স্বরাজকে শুধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, স্বল্পসবল দেহমন আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্বরাজ অর্জ্জিত হওয়াতেই সমৃদ্ধির রাজপথ আমাদের সমক্ষে উন্মুক্ত হইয়াছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিপোষক না হইলে স্বরাজের কোন মূল্যই থাকিবে না।

লক্ষাধিক লোকের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া আরও বলেন, নবভারত গঠনের জন্য কাজ ও জাতীয় ঐক্যই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বিক্ষোভ বা অনুকরণের সাহায্যে নবভারত গঠনের দায়িত্ব কোনমতেই নির্ব্বাহ করা যাইবে না।

রাশিয়া বা অন্য কোন দেশের ন্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশের সমৃদ্ধি আসিবে বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা 'গুরুতর ভুল' করিতেছে, কেননা, এই দেশের মাটি অত্যন্ত অদ্ভুত ধরণের। শান্তিপূর্ণ পন্থায় না বপন করিলে কোন বীজই এই মাটিতে অঙ্কুরিত হয় না।

আন্দোলন করিয়া আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ঐরূপ পদ্ধতিতে জাতীয় সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে পারিব না। আন্দোলনের স্থলে আমাদের গভীর চিন্তা ও কঠোর শ্রম করা প্রয়োজন।

জমিদারী বিলোপের ন্যায় দূরপ্রসারী যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে শুধু আন্দোলনের জন্যই যে তাহা করা হইয়াছে সেইরূপ মনে করা ভুল। জমিদারীর প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জমিদারী ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ত ছিল, কিন্তু আজ আর নাই। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে ছয় শত দেশীয় রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে।

সরকার বহু সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট শাসনতন্ত্রের রূপ নির্দ্ধারণ করিতেছেন ; ফলে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেছি।

সুপ্রীম কোর্ট যে সকল অসুবিধার কথা বলিয়াছেন তাহা দূরীকরণের জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

শ্রীনেহরু সকলকে আইনের মর্য্যাদা দেওয়ার অনুরোধ জানান।"

জাতীয় আয় ও বেকার-সমস্যা

গত ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতাস্থ ভারতীয় ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ সভাপতির ভাষণে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে যাহা করা হইবে তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে পাঁচসালা পরিকল্পনার বিষয় উত্থাপন করেন।

সরকারী পরিকল্পনার উল্লেখ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন যে, পরিকল্পনা রচনার পশ্চাতে কতকগুলি ব্যাপক উদ্দেশ্য রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আগামী ১৯৭১ সালের মধ্যে তাঁহারা জাতীয় আয় দ্বিগুণ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, বেকার-সমস্যার সমাধান এবং জাতীয় আয় দ্বিগুণ করিবার ব্যাপার প্রায় একই সময় সমাধা হইবে।

ইনষ্টিটিউটের শিক্ষাপ্রণালীর উল্লেখ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন যে, তিনি বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত ইনষ্টিটিউটের শিক্ষাপদ্ধতি

লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নির্দ্ধারিত কতকগুলি কার্য্যকরী নীতির ভিত্তিতে সরকার শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং সরকারী সামর্থ্যের সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাঁহাদের নীতি নির্দ্ধারিত করিবেন।

পাঁচসালা পরিকল্পনার উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীদেশমুখ আরও বলেন যে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাকে তাঁহারা প্রস্তুতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। এক্ষণে আর তাঁহাদের সেভাবে অগ্রসর হইলে চলিবে না। তাঁহারা যে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছেন উহারই সীমানার মধ্যে ব্যাপকতর ভিত্তিতে এক্ষণে তাঁহারা পরিকল্পনা রচনায় হাত দিয়াছেন। পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে গভীর চিন্তা ও কঠোর সাধনা দরকার।"

ঐ দিনই লক্ষ্ণৌয়ে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার ভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সংবাদ পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল :

"লক্ষ্ণৌ, ১২ই ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য এখানে ঘোষণা করেন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেশে বেকার-সমস্যা দূর করার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতায় ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদ অধ্যাপক মহলানবীশের পরিচালনায় এই পরিকল্পনার জন্য পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

রাজ্য কংগ্রেস পরিষদ দল ও কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের যুক্ত সভায় বক্তৃতাকালে শ্রীনেহরু ঐ তথ্য প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন যে, পরিসংখ্যানগত কার্য্যের প্রথম বিবরণী আগামী তিন-চার মাসের মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করা হইবে।

বেকার-সমস্যা দূরীকরণের পরিকল্পনায় যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ও লগ্নীর পরিমাণ স্থির করিবার জন্য আমেরিকান, নরওয়েজিয়ান, জাপানী ও রাশিয়ান প্রভৃতি বিদেশী পরিসংখ্যানবিদরাও ভারতীয় পরিসংখ্যানবিদগণের সহিত একযোগে কাজ করিতেছেন বলিয়াও শ্রীনেহরু জানান।

শ্রীনেহরু মন্তব্য করেন যে, এত বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের একত্র কাজ করা একমাত্র ভারতেই সম্ভব।

আজ জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, ভারতে একটি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের সহিত যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা এখনও চলিতেছে। তিনি আরও বলেন, বর্ত্তমানে দেশে যে পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদন হয়, তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে এবং উৎপাদনের পরিমাণ পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও জানান যে, ভারতে ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি বৈদেশিক কোম্পানীর সহিত আলোচনা শেষ হইয়াছে, দ্বিতীয় একটির সহিত আলোচনা চলিতেছে এবং তৃতীয় একটি কোম্পানীর প্রস্তাব এখন সরকারের বিবেচনাধীন। প্রধানমন্ত্রী যদিও কোম্পানী অথবা দেশের নাম করেন নাই, তবু মনে হয় যে, প্রথম কোম্পানীটি হইল জার্মান, দ্বিতীয়টি রুশ এবং তৃতীয়টি ব্রিটিশ।

ঐদিনই তিনি অন্য কথা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, জাতীয় উন্নতির পথে যাবতীয় সমস্যা পূরণের জন্য তিনি কোনও বিদেশী পন্থার অনুকরণের সপক্ষে নহেন। ইহা সম্বলপুরের বক্তৃতা অপেক্ষা সুস্পষ্ট।

তিনি বলেন, লোকে যতক্ষণ নূতন সমাজগঠনের জন্য পুরাতন বুনিয়াদ ভাঙ্গিয়া ফেলার কল্পনা না করিবে, ততক্ষণ তাহারা বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে, ইহাতে তাঁহার আপত্তি নাই।

শ্রীনেহরু বলেন, এই আণবিক যুগে শুধু ভাববিলাসের কোন সার্থকতা নাই। ইহা কাজ করিবার যুগ। দেশকে একাধারে শক্তিশালী ও সুসমৃদ্ধ করিয়া তোলার জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন যে, তিনি চীনে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র দেখিয়া আসিয়াছেন। চীনের নিজস্ব জাতীয় প্রতিভা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চীনে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চীন কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নকল করে নাই।

শ্রীনেহরু আরও বলেন, ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা আমেরিকার অনুরাগী এবং আমেরিকার ভাবাদর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। আবার, আর এক শ্রেণীর লোক, বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট রাশিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাহেন।

শ্রীনেহরু বলেন, যতক্ষণ না দেশের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, ততক্ষণ ভারতবাসীরা এই দুই দেশের অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাইয়া উপকৃত হইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই।

শ্রীনেহরুর মতে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমকে স্বীকার করার একটা বিপদ আছে। ইহাতে ভিন্ন দেশে দলগত সজ্ঘাত বিস্তারের আশঙ্কা আছে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম আজ যে রূপে প্রকটিত আছে, তাহা যদি ভিন্ন রকমের হইত তবে পৃথিবীতে আজ ভয় ও সন্দেহের মাত্রাও কম হইত। এজন্যই ভারত কি জাতীয় বিষয়ে, কি আন্তর্জাতিক বিষয়ে, স্বকীয় নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে।

চীন ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের সম্পাদিত পঞ্চশীলের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ইহাতে উভয় দেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইতেছে, উভয় দেশ প্রকাশ্যে বা গোপনে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি পৃথিবীর সমস্ত দেশ এই নীতিগুলি স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কাজ করিত তবে কম্যুনিষ্ট ভীতি দূর হইত এবং উত্তেজনাও প্রশমিত হইত।"

শিল্পনীতি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বিড়লারা যে ষ্টীল কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যাপারে

নাকি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে মতবিরোধ হইয়াছে, কোন কোন মন্ত্রী বিড়লাদের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে বেসরকারী শিল্পকে সাহায্য এবং উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন, সুতরাং এই নূতন ষ্টীল কারখানা স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য, উঁহাদের নীতির কোন বালাই নাই। পণ্ডিত নেহরু বিড়লা ষ্টীল কারখানার বিপক্ষে মত দিয়াছেন, কারণ এই প্রস্তাব সরকারী শিল্পনীতির বিরোধী।

১৯৪৮ সনের সরকারী শিল্পনীতি অনুসারে সামরিক ও মৌলিক শিল্পগুলি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইবে; যথা, অস্ত্র উৎপাদন, আণবিক শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ, এবং রেলপথ। অন্যান্য কতকগুলি শিল্প, যথা—কয়লা, লৌহ ও ষ্টীল, বিমানযান উৎপাদন, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন নির্মাণ, খনিজ তৈল এবং বেতারবার্তার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, তবে যে সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী সাহায্যের প্রয়োজন অনুভূত হইবে, কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী সাহায্য লওয়া হইবে। বাকী অন্য শিল্প বেসরকারী পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে; অর্থাৎ, উপরিলিখিত শিল্পগুলি ব্যতীত অন্যান্য সকল শিল্প বেসরকারী প্রচেষ্টা দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিবে। তবে যদি ব্যক্তিগত শিল্প কোন সময় ব্যাহত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্র সে ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

সরকারী ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের বিভাগ আদর্শগত নয়। ব্যক্তিগত শিল্প মুনাফালাভের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিন্তু সরকারী শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট, তাহাতে মুনাফা-লাভের প্রবৃত্তি নাই। তথাপি সরকারী শিল্পনীতি স্বীকার করিয়াছে যে, ব্যক্তিগত শিল্পও বহুলাংশে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতে পারে। এ দেশের শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়ন প্রয়োজন এবং তাহার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও সাহায্য প্রয়োজন। তবে রাষ্ট্র মনে করেন যে, বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়নে ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও সম্পদ উপযুক্ত নয়, তাই রাষ্ট্র নিজেই বৃহদায়তন শিল্প পরিচালনা করিবেন। বর্ত্তমান ব্যক্তিগত বৃহদায়তন শিল্পসমূহ আগামী দশ বৎসরের মধ্যে জাতীয়করণ করা হইবে না। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক প্রচেষ্টাকে বাদ দেওয়া হয় নাই, তবে তাহাকে রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে দেখা হইবে, সুতরাং তাহার নিজস্ব স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত।

১৯৫১ সনের শিল্পোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা রাষ্ট্র তাহার প্রভাব ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে আরও ব্যাপক করিয়াছেন। যদি কোন বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারী শিল্পনীতির বিরোধিতা করে তাহা হইলে রাষ্ট্র সেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করিতে পারেন। বিড়লা-প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের শিল্প-নীতিকে বজায় রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যথার্থ হইয়াছে। বিড়লা-প্রস্তাবিত ষ্টীল কারখানাকে মানিয়া লইলে শিল্পনীতির ব্যতিক্রম করা হইত। ভারত আজ যদিও মিশ্রনীতিতে আস্থাবান, তথাপি তাহার ভবিষ্যতের আদর্শ হইতেছে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক কাঠামো। সেই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ইস্পাতশিল্প একটি মৌলিক তথা সামরিক শিল্প, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক পথই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার নাকি বিড়লা-প্রস্তাবকে সরাসরি অগ্রাহ্য না করিয়া শতকরা ৫১ ভাগ অংশ দাবি করিয়া-ছিলেন, তাহাতে বিড়লারা রাজী হন নাই।

সন্ত প্রতিষ্ঠিত তৈল পরিশোধন শিল্পের নজির দেখাইয়া বিড়লা-সমর্থকরা বলিতেছেন—এ রকম বৈষম্যের কারণ কি? তৈলশিল্পও সরকারী রক্ষিত শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ভারতের আভ্যন্তরিক তৈল উৎপাদন ভারতের মোট প্রয়োজনের শতকরা এক ভাগ, বাকী সবটাই আমদানী করিতে হয়, সুতরাং কাঁচামাল আমদানী করিয়া বৃহদায়তন শিল্প-প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের পক্ষে অযথা ভারস্বরূপ বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয়, তৈলশিল্পের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের নাই বলিলেই চলে। সুতরাং এইরূপ একটি অজানা শিল্পে রাষ্ট্র যে হাত দেন নাই তাহা তাঁহাদের সুচিন্তার পরিচায়ক। ইরাণের তৈলশিল্প বিরোধের ইতিহাস স্মরণে রাখিয়া এই শিল্পকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর ছাড়িয়া দিয়া সরকার সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। লৌহ ও ইস্পাতশিল্প দেশে কয়েকটি আছে, রাষ্ট্র আর একটি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। সে ক্ষেত্রে সরকারী শিল্পনীতির অযথা ব্যতিক্রম অবাঞ্ছনীয়। আর তৈলশিল্প যে-কোন অবস্থাতেই জাতীয়করণ করিয়া লইতে পারা যায়, সুতরাং এইরূপ একটি প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নয়ন যদি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা সার্থক হয়, তাহাতে আপত্তি করার মত কিছু নাই।

শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পনীতি সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট মতামত এত দিন প্রকাশ করেন নাই। ইহা অবশ্য সর্ব্বজনবিদিত যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা বেসরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে একমত নহেন। তবে অর্থনীতি ও আর্থিক উন্নতির সকল সমস্যাই মূলতঃ অর্থমন্ত্রীর দপ্তরের অন্তর্গত। সেই হিসাবে গত ১৩ই ডিসেম্বর শ্রীদেশমুখ যে সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটি কথা প্রণিধানযোগ্য।

এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সোমবার কলিকাতায় ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ বলেন ভারতবর্ষে যেভাবে গণতান্ত্রিক পন্থায় উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে এইরূপ আয়তনের অন্য কোন দেশে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির উপযুক্ত সমাধান করিতে হইলে নূতনভাবে ভাবিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামি ও বাঁধাবুলি বর্জ্জন করিয়া আমাদের পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপযোগী পথে চিন্তা করিতে হইবে।

অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা

অর্থমন্ত্রী শ্রীসি. ডি. দেশমুখ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "আমাদের

আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছি। কেহ কেহ মনে করেন—পুনর্গঠনের কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে চলিয়াছে, তাঁহাদের এরূপ ধারণা একেবারে অমূলক নয়। কেহ কেহ আবার এরূপ আশঙ্কা করেন যে, দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিলে উন্নয়নের স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়ত সম্ভব না-ও হইতে পারে। একটা চমৎকার মধ্যবর্তী পন্থা উদ্ভাবন করাই এখন সমস্যা এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করায় তৎপরতা দরকার।"

তিনি বলেন, "আমাদের বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থা হইতে দেখা যায় যে, তাহাতে শক্তি ও স্থায়িত্বের পরিচয় আছে। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আমরা যে ঠিক পথে চলিয়াছি তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই বলিয়াই মনে হয়। পরিকল্পনাটি প্রথম প্রবর্তনের সময় যে আর্থিক পরিস্থিতি ছিল তাহার সহিত বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি তুলনা করিলে যে কেহই গত তিন বৎসরের লাভ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। খাদ্যোৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে, শিল্পোৎপাদনও অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধির দিকে, পণ্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি আর নাই এবং পাওনা টাকার পরিস্থিতিও উন্নত হইয়াছে। ঐ সঙ্গে সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মূল শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নের দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিও নিরবচ্ছিন্নভাবে গঠিত হইয়া যাইতেছে। আমার নিজের বিচার-বুদ্ধিতে দেখিতেছি যে, কাজের মধ্যে যেমন কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি আছে, তেমনি ভাল কাজ যেটুকু হইয়াছে সেটুকু বিচার করিলে লোকের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিবার সুযোগও আছে। বর্তমান অবস্থায় শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে উদ্বেগ অনুভূত হয় তাহার কথা আপনি (সভাপতি) উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রশংসনীয়ভাবে ও অসঙ্কোচে সরকারী নীতির কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যথাযোগ্য মহলে ঠিকভাবে পৌঁছান হইবে এবং আপনারা এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে, এই সব বিষয়ে যেরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই করুন না কেন, আপনাদের অভিমত ঠিক ভাবে বিচার করা হইবে। মোটের উপর, আমার মনে হয়, আমাদের আর্থিক নীতির চরম লক্ষ্যের মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাতে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজের মধ্যে বিষম মতভেদ ঘটিতে পারে। সেই কথা স্মরণ রাখিয়া, আমি এই দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে কতখানি উত্তমরূপে এই সব উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করি।"

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

আমাদের পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা কি কি পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে চাই তাহা এই সুযোগে পুনরায় এখানে বিবৃত করিতেছি। যেমন দশ বৎসরের মধ্যে আমি বেকার সমস্যা দূর করিতে চাই এবং আমরা আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ অবশ্যই করিব। সেই সঙ্গে আয়, সম্পদ ও আর্থিক ক্ষমতার সুসমঞ্জস বণ্টনের দিকেও আমাদের প্রচেষ্টা চলিতে থাকিবে। এইগুলি আমাদের মূল লক্ষ্য। আমার বিশ্বাস, এইসব লক্ষ্য সকলেই অনুমোদন করিবেন। আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে এই সব লক্ষ্য সাধন করিতে চাই। আমাদের মত কোন বিরাট দেশ আর নাই যেখানে আমাদের অবলম্বিত উপায়ে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্রুত উন্নয়নের চেষ্টা চলিয়াছে। যদি আমাদিগকে আমাদের বিশেষ বিশেষ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অন্বেষণ করিতে হয় তবে আমাদিগকে আমাদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপযোগী নূতন রূপে চিন্তা করিতে হইবে এবং আমাদের বাঁধা মতবাদ পরিহার করিতে হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গিয়া যে সকল সমস্যা দেখা দিতেছে সেগুলির উল্লেখ করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন যে, বেকার সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা, প্রথম পরিকল্পনার ফলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বাড়িয়াছে। কিন্তু আমরা এখনও এমন পরিস্থিতির মধ্যে রহিয়াছি যেখানে কর্ম সংস্থান বাড়িতেছে— সেই সঙ্গে বেকার সমস্যাও বাড়িতেছে। অর্থাৎ, বার্ষিক যে হারে শ্রমিক সংখ্যা বাড়িতেছে সেই হারে নূতন নূতন কাজ সৃষ্টি হইতেছে না। এই সমস্যার সমাধান হইতেছে অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ এবং তাহার বিচারবুদ্ধি সহকারে বিনিয়োগ। বৃহত্তর ত্যাগ ও কঠোর শ্রমের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। মূল সমস্যা হইতেছে নূতন নূতন আয়ের হার বৃদ্ধি অথবা বিনিয়োগের জন্য অর্থাগম বৃদ্ধি।

সমস্যার এই সব দিক এখন বিবেচনাধীন রহিয়াছে। কলিকাতাস্থিত ভারতীয় পরিসংখ্যান গবেষণা মন্দিরে আর্থিক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ পরিকল্পনার তাৎপর্য্য এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক—এই কয়টি বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনাকালে এই গবেষণার ফলাফল বিবেচনা করা হইবে। বর্তমান হিসাব অনুসারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে, বৎসরে জাতীয় আয়ের শতকরা দশ-বার ভাগ পর্য্যন্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন ঘটিতে পারে। সরকারী ও বেসরকারীভাবে অধিকতর পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করা গেলেই এইরূপ অর্থ বিনিয়োগ সম্ভব করা যাইতে পারে।

শ্রীদেশমুখ বলেন, "এইরূপ প্রচেষ্টায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা আবশ্যক। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার উল্লেখ আছে এবং এখনও ভারত গবর্ণমেণ্ট এই নীতি অনুসরণ করিতেছেন। আমি উহাদের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। গত ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে উহাদের পার্থক্য বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন;

কারণ দেশের উন্নয়ন ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টার স্থান কোথায় থাকিবে তাহা উহাতে সঠিকভাবে নির্ণীত হইয়াছে। আমার মনে হয় যে, এই মূল নীতির পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ ঘটে নাই। তথাপি আমার বিশ্বাস এবং আপনারাও স্বীকার করিবেন যে, এই গতিশীল জগতে কোন নীতিই একেবারে স্থির থাকিতে পারে না, দেশের আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে উহারও কিছু পরিবর্তন অবশ্যই ঘটিবে। নীতির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। পরিস্থিতি কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহা মধ্যে মধ্যে হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে। এ কথা সত্য যে, আমাদের মত অনুন্নত দেশে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালনার উপযোগী মোটা টাকা বেসরকারী উদ্যোগে দ্রুত সংগ্রহ করা বা একটা অবাঞ্ছনীয় সামাজিক পরিস্থিতি না ঘটাইয়া সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। যত দিন না বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বৃহৎ দায়িত্ব পালনের অবস্থায় আসে তত দিন উন্নয়ন-প্রচেষ্টা বন্ধ রাখা চলে না। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কোন শিল্পের উন্নয়নে রাষ্ট্র উদ্যোগী হইলে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্বেগ সৃষ্টি হইবে কেন তাহা আমি বুঝি না। এই অবস্থা চলিতে দেওয়া এবং এইভাবে উন্নয়ন ব্যাহত করা যায় না। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাহাদের সম্পদ কাজে লাগাইবার ও তাহাদের প্রচেষ্টা চালাইবার সুযোগ পাইবে না। আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সরকারী প্রতিষ্ঠানের যে কোন প্রকার সম্প্রসারণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাধা সৃষ্টি করিবে, এ কথা মনে করা ঠিক নয়। যেসব শিল্প সরকারের সংরক্ষিত সে-সব শিল্পেও কেন বিদেশ হইতে বেসরকারী মূলধন বা সাহায্য থাকিবে না ইহার কোন যুক্তি নাই। যদি কেহ সংস্কারমুক্ত মন লইয়া এই সমস্যার আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস তিনি স্বীকার করিবেন যে, এদেশে এখনও বেসরকারী প্রচেষ্টার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।"

কর তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের উল্লেখ করিয়া শ্রীদেশমুখ বলেন, "কমিশন যে কর নির্দ্ধারণ সমস্যা এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকের প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কেন নৈরাশ্য পোষণ করিবেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

কোম্পানী বিল

সংসদের উভয় সভার জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে যে কোম্পানী বিল রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, "আমরা বর্তমান কোম্পানী আইনের সুদূর প্রসারী পরিবর্তন সাধনে ব্যস্ত হইয়া পড়ি নাই। যদি কমিটির কোন কোন সুপারিশ অগ্রাহ্য করা সরকার প্রয়োজন মনে করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থেই তাহা করিবেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মূল প্রয়োজন হইতেছে বেসরকারী প্রচেষ্টা চালান—গতানুগতিক পদ্ধতি আঁকড়াইয়া চুপ করিয়া থাকা নয়—আমার এই কথা আপনিও স্বীকার করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানে উদ্যোগের অভাব থাকায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ-বিরোধী শক্তি আশ্রয় লাভ করায় সরকার বাধ্য হইয়া ১৯৫১ সনে কোম্পানী আইন সংশোধন করেন এবং ডিরেক্টর বোর্ড গঠন, ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং এজেন্টদের নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কোম্পানী আইন কমিটির অনুমোদনক্রমে এবং আমার যতদূর জানা আছে এই এসোসিয়েশনের সদস্য বণিক-সভাগুলির সম্মতিক্রমে সরকার ঐ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। উপদেষ্টা কমিশনের সম্মতিক্রমে সরকার আজ তিন বৎসর শত শত ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন। এই ক্ষমতা প্রয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলির কাজকর্মে বস্তুতঃ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে সরকার কোম্পানী আইনানুসারে তাহাদের দায়িত্বের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যতটা সম্ভব, সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলির সহিত মিলিত হইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছেন।" শ্রীদেশমুখ আরও বলেন, "ম্যানেজিং এজেন্টদের সম্পর্কিত নূতন প্রস্তাবের দ্বারা ১৯৫১ সনের আইনে বিহিত সরকারের ক্ষমতা দুই-এক দিকে বাড়ে এবং এই আইনের দ্বারা সরকারের উপর ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়। যদি এই সব প্রস্তাব বর্ত্তমান রূপেই চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়, তাহা হইলেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভীষণ বিপদ ঘটিতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

তিনি আশ্বাস দেন যে, কেবলমাত্র যখন ক্ষমতা প্রয়োগের একান্ত দরকার হইবে তখন এবং দেশের শিল্প-বাণিজ্যের দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে সরকার তাঁহাদিগকে প্রদত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিবেন। যথাসময়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এবং বেসরকারী কোম্পানীর কাজের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাঁহাদের প্রতিনিধিগণকে কোম্পানী আইনের পরিচালনায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

সংবিধানের ৩১ নং অনুচ্ছেদটির পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সামগ্রিক বিষয়টি দেখা উচিত; একটি সংশোধনের প্রস্তাব হওয়ার জন্যই কোনরূপে আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। যেরূপেই হউক না কেন, কোন সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট দখল করিলে উহার মালিক ক্ষতিপূরণ পাইবে না এইরূপ ভীতির কোনই কারণ নাই। দেশের স্বার্থে কোনও বেসরকারী সম্পত্তি দখল করিলে ভারত গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের ফলে আইন অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকার হ্রাসের সহিত সরকার কর্ত্তৃক ন্যায্য ক্ষতিপূরণ সহকারে উহা দখলের বিধান করা হইয়াছে। আমার মনে হয়, ৩১ নং অনুচ্ছেদটি রচনাকালে বেসরকারী সম্পত্তি দখলের উপর সংবিধান রচয়িতারা এইরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। যাহা হউক, সংবিধানের উক্ত অভিমতের ফলে সরকার কর্ত্তৃক বেসরকারী সম্পত্তি দখল অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ বীমাকারীদের অর্থ লইয়া ছিনিমিনিকারী বীমা প্রতিষ্ঠান অথবা অত্যাবশ্যক শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত ক্ষীয়মাণ প্রতিষ্ঠানের কথা বলা চলে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন, বিকল্প ব্যবস্থা হইতেছে সরকার কর্তৃক ঐগুলির পরিচালনাভার গ্রহণ। ভূমিস্বত্ব সংশোধন কার্য্যকেও ৩১ নং অনুচ্ছেদের সাধারণ নিয়মাবলীর বহির্ভূত রাখা আবশ্যক। এই অনুচ্ছেদ সংশোধনের দ্বারা ব্যক্তিগত শিল্প-সংস্থার কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী মনে করেন যে, অনিবার্য্য প্রয়োজনে ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে গবর্ণমেণ্ট ও শিল্প-মালিকগণ দ্বিমত হইবেন না। একমাত্র যে পার্থক্যটি রহিয়াছে তাহা হইতেছে প্রস্তাবনা ও গুরুত্বের। মালিক ও শ্রমিকদের স্বার্থের খাতিরে সরকার আশা করেন যে, শিল্পকর্তৃপক্ষকে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেই আধুনিকীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; শ্রমিকদের কর্মচ্যুতির উদ্দেশ্য লইয়া নয় এবং ঐ বিষয়ে মালিক ও শ্রমিকগণ পারস্পরিক সহযোগিতার পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন।

সভাপতির বক্তৃতা

চেম্বারের সভাপতি মিঃ জি. এম. ম্যাকিনাল তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, যদিও দেশের অর্থনীতিতে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে তথাপি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে আশানুরূপ অগ্রগতি হইতেছে না, বেসরকারী শিল্পে যে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে, তাহার জন্য যেমন সাধারণ কতকগুলি কারণ আছে, তেমনি কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। সাধারণ কারণগুলির মধ্যে যে কারণটি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইল সরকারী নীতিতে অতি দ্রুত সমাজতন্ত্রীকরণের একটি ঝোঁক।

তিনি বলেন, "মিশ্র অর্থনীতি আমরা মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যেও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ও উহার বিকাশে উৎসাহ দিবার সুযোগ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 'হিতব্রতী রাষ্ট্রে'-র পরিপোষণের ক্ষমতা নাই, উহার উপর এইরূপ ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া যায় না। হিতব্রতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলে অশেষ ক্ষতিই হইতে পারে।"

তিনি আরও বলেন যে, একটির পর একটি আইনের ও নীতির এমন কতকগুলি পরিবর্তন করা হইতেছে যেগুলি বেসরকারী মালিকানার ভবিষ্যৎ, এমনকি উহার অস্তিত্বের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বেসরকারী ব্যবসায়ী ও শিল্প-মালিকগণ দ্বিধাগ্রস্ত, এমনকি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে যেটি বেসরকারী মালিকদের মন সর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া অধিকার করিয়া আছে তাহা হইল কোম্পানী আইনের সংশোধনের প্রস্তাব। কোম্পানী আইন কমিটির সুপারিশে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অপব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যে সকল নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছিল এসোসিয়েটেড চেম্বার্স সেগুলি সানন্দে সমর্থন করিয়াছিল। কমিটি দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় ম্যানেজিং এজেন্সী পদ্ধতির উপযোগিতা মানিয়া লওয়ায় এবং ভারত সরকার তাঁহাদের অভিমত সমর্থন করায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কমিটির সুপারিশগুলি সংশোধনী বিলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটিতে বিলের বিবেচনা শেষ হইবার পূর্বে চেম্বার্সের পক্ষ হইতে তাঁহারা এই আবেদন জানাইতে চাহেন যে, কমিটির সুপারিশের কোন প্রধান অংশ বাদ দিলে সমগ্রভাবে বিলটির উপযোগিতাই নষ্ট হইয়া যাইবে। ভারতের শিল্পশক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে এবং দেশের সাধারণ স্বার্থে এখনও ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। মোটামুটি বর্তমান আকারেই কোম্পানী বিলটি পাস না হইয়া যাওয়া পর্যন্ত সরকারী মালিকানার উদ্বেগ ও দ্বিধা থাকিবে।

সংবিধানের ৩১ নম্বর ধারা যেভাবে সংশোধন করা হইতেছে তাহাতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া মিঃ ম্যাকিনাল বলেন যে, সংবাদ হইতে যতদূর বুঝা যাইতেছে, ক্ষতিপূরণ লইবার সংবিধানের যে অধিকার আছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইতেছে বলিয়াই সরকার কর্তৃক কোন সম্পত্তি দখল বেআইনী হইয়া যাইবে না, ঐ উদ্দেশ্যেই উক্ত ধারার সংশোধন করা হইতেছে। সরকার যে জনসাধারণের স্বার্থ-রক্ষার আগ্রহেই এইরূপ করিতেছেন, একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাঁহারা মনে করেন যে, ইহার দ্বারা সরকারকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, যাহাতে তাঁহারা কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়াই তাঁহাদের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করার অধিকার লাভ করিবেন। ইহাতে বেসরকারী মালিকগণ যে বিচলিত হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

করভার শাসনের প্রশ্ন

করভারের ফলে সঞ্চয় প্রবৃত্তিতে ও বেতনভোগী লগ্নীকারীদের স্বল্পসঞ্চয় উৎপাদনে নিয়োগের পথে যে বাধা হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া মিঃ ম্যাকিনাল এই আশা প্রকাশ করেন যে, কর তদন্ত কমিশন এই ভার লাঘবের ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিবেন। ভারতবর্ষের যখন দেশীয় ও বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজন রহিয়াছে তখন 'মুনাফা-প্রবৃত্তি'-কে সহজে বাদ দেওয়া যায় না।

সভাপতি বলেন যে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা বিরোধ মীমাংসার বৃহত্তর অবকাশ রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বোনাস ও কল-কারখানার আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রশ্ন দুইটি কিছুতেই সমাধান করা যাইতেছে না। এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

সরকারী তথা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাবের গলদ যেন স্বাভাবিক নিয়মে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারতীয় শিল্প ঋণ সংস্থাটি কিছু দিন যাবৎ আলোচনার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, কারণ ইহার কার্য্যাবলীতে বহু গলদ আছে। কর্পোরেশনের ঋণদান-নীতি

সম্বন্ধে দোষারোপ হওয়াতে ভারত সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন এবং কমিটির অনুসন্ধান যদিও কর্পোরেশনের কার্য্যাবলীর তেমন কিছু গলদ বাহির করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি কর্পোরেশনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে ভাল ধারণার যথেষ্ট অভাব আছে। তবে অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ভূতপূর্ব্ব বেসরকারী চেয়ারম্যান পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন, কারণ তাঁহার কুকীর্ত্তি সর্ব্বজনবিদিত। ইহার জন্য ভারত সরকারের শিল্পপতিঘেঁষা মনোবৃত্তি অনেকাংশে দায়ী। সরকারী প্রতিষ্ঠানে শিল্পপতিদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা কিংবা ডিরেক্টর নিয়োগ করা (যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে) অব্যবস্থার পরিচায়ক।

শিল্পঋণ-সংস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কমিটি যে সকল গলদ বাহির করিতে সক্ষম হন নাই, নিয়ন্ত্রক মহালেখাপরীক্ষক তাঁহার অডিট রিপোর্টে কর্পোরেশনের বহু গলদ বাহির করিয়াছেন। ঋণদানের সর্ত্তাবলী এবং সুদের হার ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁহার খুশীমত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, যদিও এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অযথা ঋণ দেওয়া হইয়াছে, কারণ এই সকল প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত শেয়ার কিংবা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় মূলধন তুলিতে পারিত। এমন কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে যাহারা ঋণদানের উপযুক্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রে সরকারী নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

অডিট রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যখন কর্পোরেশনটি ক্ষতির উপর চলিতেছে এবং বাৎসরিক ডিভিডেণ্ড সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইতেছে, সে ক্ষেত্রে ৬৪ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কর্পোরেশনের নিজ ভবন তৈয়ার করা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। ইহার দরুন কর্পোরেশনের প্রায় ছয় লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হইবে। কর্পোরেশনের আপিস সংক্রান্ত খরচ তাহার আয়ের অনুপাতে অত্যাধিক। ১৯৫৪ সনের অক্টোবর মাসে কর্পোরেশনের যে মিটিং হয় তাহাতে এই সকল গলদ তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজ ধরা পড়ে।

কর্পোরেশনের কার্য্যপদ্ধতির জন্য বিশদ নিয়মাবলীর প্রয়োজন এবং এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করিতেছেন। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্বে কাজ না করিয়া কর্পোরেশনের সরকারী নির্দ্দেশ অনুসারে চলা উচিত ছিল। অডিট রিপোর্ট হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে কার্য্যকরী কমিটিকে না জানাইয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁহার ইচ্ছামত ঋণের সর্ত্তাবলী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠানটিকে যখন অতিরিক্ত সাত লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয় তখন কার্য্যকরী কমিটিকে না জানাইয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর কতকগুলি সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পঋণ-সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ লোপ করিয়া দেওয়ার জন্য ভারত সরকার চিন্তা করিতেছেন। অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের পর কেন্দ্রীয় সরকার ঋণদান সম্বন্ধে কর্পোরেশনকে কতকগুলি নির্দ্দেশ দিয়াছেন, যথা :

১। দিল্লী ছাড়াও ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে কর্পোরেশনের ডিরেক্টর বোর্ডের অধিবেশন হইবে।

২। ঋণ গ্রহণের আবেদন-পত্র সম্বন্ধে আলোচনাকালে ডিরেক্টরগণ জানাইবেন যে বিশেষ বিশেষ সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহা হইলে ঐ আবেদন-পত্রের আলোচনাকালে তাঁহারা মিটিং হইতে অবসর লইবেন।

৩। শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ মার্জিনে যেন ঋণ দেওয়া হয় এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানটির ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

৪। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ দিলে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো প্রয়োজন।

৫। কর্পোরেশনের কোন ডিরেক্টর যদি ঋণ-গ্রহীতা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন তাহা হইলে সে তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ভারতীয় রাজস্বে রেলপথের দান

১৯৪৯ সনের চুক্তি অনুসারে ভারতীয় রেলপথ তাহাদের নিয়োজিত মূলধনের জন্য ভারতীয় রাজস্বে শতকরা চার টাকা করিয়া দিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা পাঁচ বৎসরের জন্য কার্য্যকরী ছিল, অর্থাৎ ১৯৫৫ সনে ইহা বাতিল হইয়া যাইবে। সেইজন্য সদ্য নূতন একটি চুক্তি করা হইয়াছে। ভারতীয় পার্লামেন্টের কতিপয় সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী আরও আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য রেলপথ ভারতীয় রাজস্বে শতকরা চার টাকা হিসাবে নিয়োজিত মূলধনের উপর সুদ দিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলপথে ৮৬৫ কোটি টাকা খাটিতেছে এবং ইহার সমস্তই কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা। সেইজন্য ভারত সরকার এই মূলধনের উপর শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ পাইবেন। তবে নূতন সিদ্ধান্ত ১৯৪৯ সনের ব্যবস্থার দুইটি প্রধান পরিবর্ত্তন করিয়াছে। প্রথমতঃ, নূতন লাইনের জন্য নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা চার টাকার নিম্নহারে সুদ দেওয়া হইবে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে যে সুদের হারে ঋণ দেওয়া হয়, তাহারই গড়পড়তা সুদের হার নূতন লাইনগুলির মূলধনের জন্য দাবি করা হইবে। নূতন লাইন স্থাপন কালে এবং কার্য্যকরী হওয়ার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাতে নিয়োজিত মূলধনের উপর কোন সুদ দেওয়া হইবে না। নূতন লাইনে গাড়ী চলিবার ছয় বৎসর পর দেয় বকী সুদ ও চলতি সুদ দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, নূতন সিদ্ধান্ত অনুসারে নিয়োজিত মূলধনের মূল্য হ্রাস করা হইবে। কতকগুলি ক্ষেত্রে রেলপথের মূলধনের মূল্য

অতিরিক্ত হারে ধরা হইয়াছে, সেগুলি যথার্থ হারে হিসাব করা হইবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিবর্তন দ্বারা রেলপথগুলি প্রায় তিন কোটি টাকার মত লাভ করিবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে রেলপথ বিভাগ ১,৫০০ মাইল নূতন লাইন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার উপর যদি শতকরা চার টাকা হারে সুদ দিতে হয় তাহা হইলে সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় দশ কোটি টাকার মত। এই নূতন লাইন স্থাপন করিতে প্রায় আশী কোটি টাকার মত খরচ হইবে।

বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে ক্ষয়-রক্ষিত ভাণ্ডারে বৎসরে ত্রিশ কোটি টাকার মত জমা রাখা হইত। নূতন সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫৫ সনের মার্চ হইতে এই ভাণ্ডারে পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা করিয়া জমা রাখা হইবে রেলপথের সম্পদের চালু অবস্থা পর্যন্ত ক্ষয়-রক্ষণ সঞ্চয় করা হইবে।

রেলপথ উন্নয়ন ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ব্যাপক করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। এই সুপারিশ অনুসারে যাহারাই রেলযান ব্যবহার করে তাহাদের সকলের সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্যাসেঞ্জার যাহাতে অধিকতর সুবিধা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করা উচিত, সেই সঙ্গে মাল চলাচলের ব্যবস্থারও উন্নয়ন প্রয়োজন। উন্নয়ন খাতে বৎসরে তিন কোটি টাকা জমা রাখিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। রেলপথে যাত্রার নিরাপত্তা বন্দোবস্তের জন্য উন্নয়ন ভাণ্ডার হইতে ব্যয় করা হইবে। রেলপথের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য যে সকল বাড়ী দেওয়া হয় সেইগুলি হইতে যাহাতে আনুপাতিক ভাড়া পাওয়া যায় তাহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের জন্য উন্নয়ন ভাণ্ডারের অর্থ যথেষ্ট নহে। এইজন্য প্রয়োজন হইলে সাধারণ রাজস্ব হইতে ধার লওয়ার প্রস্তাব কমিটি করিয়াছেন।

বিশ্ব বন-কংগ্রেস

গত ১১ই ডিসেম্বর হইতে দেরাদুনে চতুর্থ বিশ্ব বন-কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশন বার দিন যাবৎ চলিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ৫২টি রাষ্ট্র এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। তৃতীয় বিশ্ব বন-কংগ্রেসে যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬। এই বারকার চতুর্থ কংগ্রেসে বিদেশ হইতে দুই শত পাঁচ জন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছেন—ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে যোগদানকারী প্রতিনিধি (ইঁহাদের মধ্যে রাজ্য-সরকারের মন্ত্রীরাও রহিয়াছেন) সংখ্যা ২২১। বিদেশাগত প্রতিনিধিদের সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক আসিয়াছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে—তাঁহাদের সংখ্যা ২৭। সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে আগত প্রতিনিধির সংখ্যা ১৫ এবং চীন হইতে ১০।

ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিতেছেন ভারতের বনসমূহের ইনসপেক্টর-জেনারেল শ্রী সি. আর. রঙ্গনাথম—ইনি চতুর্থ বিশ্ব বন-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৯২৬ সনে রোমের আন্তর্জাতিক কৃষি-ভবনের (Institute) চেষ্টায় প্রথম বিশ্ব বন-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৯৩৬ সনে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেষ্ট নগরীতে। তাহার প্রায় অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ব বন-কংগ্রেসের আর কোন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। মহাযুদ্ধের পর ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে বিশ্ব বন-কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন বসে ১৯৪৯ সনে। ১৯৫১ সনের নবেম্বর মাসে রোমে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার ষষ্ঠ সম্মেলনের অধিবেশনের সময় ভারতের পক্ষ হইতে চতুর্থ বিশ্ব বন-কংগ্রেসের অধিবেশন ভারতে অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইলে তাহা গৃহীত হয় এবং সেই অনুযায়ী বর্তমানে দেরাদুনে কংগ্রেসের অধিবেশন বসিয়াছে।

বর্তমান বন-কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয়গুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় যথা: (১) বনসমূহের সংরক্ষণশীল ভূমিকা: (২) বনসমূহের উৎপাদিকা ভূমিকা; (৩) বনজসম্পদের ব্যবহার এবং (৪) গ্রীষ্মমণ্ডলের বনরাজি।

ভারতে বনসংরক্ষণ

ভারত সরকারের বনসমূহের ইনসপেক্টর-জেনারেল শ্রী সি. আর রঙ্গনাথম চতুর্থ বিশ্ব বনকংগ্রেস উপলক্ষে রচিত এক প্রবন্ধে ভারতে বন-সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, মুসলমান বিজেতাদের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিশাল বনভূমির যথেচ্ছ ধ্বংস সাধন আরম্ভ হয়। মুসলমান আক্রমণের পর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক কারণে বহুলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উপরন্তু বনসম্পদে মুসলমানদের মানসিক বা ধর্মগত কোন আকর্ষণ না থাকায় বনভূমির যথেচ্ছ ধ্বংস সাধন ঘটিতে থাকে। তবে যুগপৎ পরিত্যক্ত গ্রামগুলিও অনেক সময় বনভূমিতে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ শাসন আরম্ভ হইবার পরও কিছুকাল বনভূমির এইরূপ অবাধ ধ্বংস-সাধন চলিতে থাকে—কারণ মুসলমানদের ন্যায় ব্রিটিশদেরও বনসংরক্ষণের কোন ঐতিহ্য ছিল না। বনসংরক্ষণ যে অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই জ্ঞানও তাহাদের ছিল না। ফলে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত সরকারী নীতিতে বনভূমিকে কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারণের ক্ষেত্র ব্যতীত অতিরিক্ত কোন মূল্য দেওয়া হইত না।

শ্রীরঙ্গনাথম লিখিতেছেন, তবে অবশ্য ইহাও সত্য যে, অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত বনসংরক্ষণ ব্যাপারেও আমরা ব্রিটিশ শাসকদের নিকট অনেকাংশে ঋণী। তাহাদের বনসংরক্ষণ প্রশাসনের একটি প্রধান ঘটনা হইতেছে ১৮৯৪ সনে ভারতের বনভূমি সম্পর্কিত নীতি ঘোষণা। ঐ সময়ে বনভূমি সম্পর্কিত ঐরূপ নীতি আর কোথাও ছিল না। আমাদের দেশে বনসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে ঐ ঘোষণা আদর্শ হিসাবে কাজ করিয়াছে। কিন্তু ঐ দূরদর্শী ঘোষণাতেও ভূমিব্যবহারের ফলপ্রসূ রূপ হিসাবে দেশের ভৌগোলিক

আয়তনের একটি বিশিষ্ট অংশের উপর বনভূমির দাবি স্বীকৃত হয় নাই। চাষের অযোগ্য জমি অথবা যে সকল জমি তখনও পর্যন্ত কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজন হয় নাই কেবলমাত্র সেইরূপ জমিই বনভূমির জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল।

দুই মহাযুদ্ধের পর বনসংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই সচেতন হইয়াছে। পৃথিবীর বনসম্পদ যে অফুরন্ত নহে দায়িত্বশীল লোকেরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। যুদ্ধের একটি অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কাঠ। যুদ্ধের সময় বাহির হইতে কাঠের আমদানী বন্ধ হওয়ায়, ভারতের কাষ্ঠোৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় যে কত অপ্রতুল, তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, আমাদের দেশে খুব অল্প পরিমাণ কাষ্ঠই ব্যবহৃত হয়। জ্বালানী সমেত সকল প্রকার কাষ্ঠ ভারতে মাথাপিছু প্রতি বৎসর ব্যবহৃত হয় মাত্র ০·৩ ঘনফুট। তাহার তুলনায় ইউরোপে কেবলমাত্র কাষ্ঠ (টিম্বার) ব্যবহারের পরিমাণ বার্ষিক জনপ্রতি ৮ ঘনফুট এবং উত্তর আমেরিকাতে ২৪ ঘনফুট।

বর্তমানে ক্রমশঃই উপলব্ধি হইতেছে যে, কেবলমাত্র কাষ্ঠ এবং জ্বালানীর জন্যই যে বনভূমির প্রয়োজন তাহা নহে, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয়নিরোধ, স্রোতের গতি নির্দ্ধারণ এবং আবহাওয়ার উন্নতির জন্যও বনভূমির সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কাষ্ঠব্যবহারের একটি সুবিধা এই যে, উহা নিকটবর্তী স্থান হইতেই সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সেজন্য দেখা প্রয়োজন যাহাতে দেশের সর্বত্র বনভূমি সমভাবে বিস্তৃত থাকে। বনভূমির সংরক্ষণশীল গুণাবলীর সুবিধা-গুলি পাইতে হইলেও দেখিতে হইবে যাহাতে দেশের সকল অংশেই বনভূমির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রসার ঘটে।

শ্রীরঙ্গনাথম লিখিতেছেন, বনভূমি নানারূপ হইতে পারে। কিন্তু আইনের বিচারে যে অঞ্চলকে বনভূমি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাই বনভূমি—সেখানে যদি মরুভূমি বা তৃণভূমি হয় তথাপি উহাকে বনভূমিই বলা হয়।

সকল দেশেই বনভূমি সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থায় টেকনিক্যাল, শাসনতান্ত্রিক এবং সামাজিক কতকগুলি সমস্যা দেখা দেয়। যাহাতে বনভূমি সম্পূর্ণরূপে উৎখাত না হয় সেজন্য দেখা প্রয়োজন যে, বৎসরে যে পরিমাণ বৃক্ষ জন্মায় তদপেক্ষা বেশীসংখ্যক না কাটা পড়ে। একটি সেগুন বন কাটিবার উপযুক্ত হইতে সময় লাগে ৭১ হইতে ১০০ বৎসর পর্যন্ত। মূল্যবান কাষ্ঠ যে সকল বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত হয় তাহাদের বৃদ্ধির পরিমাণ ধ্বংসের সহিত স্বাভাবিক অবস্থায় তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। যাহাতে তাহাদের বৃদ্ধি দ্রুততর করা যায় সেজন্য নানারূপ টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধান করিতে হয়। এই ব্যাপারে বন-গবেষণা মন্দিরগুলির যথেষ্ট কর্তব্য রহিয়াছে। যাহাতে অতিরিক্ত কাঠ কাটিয়া বনভূমির ক্ষতি করা না হয় তাহা দেখা এবং সাধারণভাবে সংরক্ষিত বনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি প্রশাসনিক সমস্যার অন্তর্গত।

শ্রীরঙ্গনাথম বলিতেছেন যে, সরকার পক্ষ হইতে সকল প্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হইলেও জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত কোন সরকারী বনসংরক্ষণ-নীতিই সফল হইতে পারে না। ১৯৫২ সনে ভারত সরকার যে বননীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতেও এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

নূতন মধ্যস্বত্ব

জমিদারী উচ্ছেদ আইন এড়াইবার কোনরূপ কৌশল কার্য্যকরী হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। এরূপ কয়েকটি ফাঁকির পথ আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে। গত মে মাসে অর্ডিনান্স জারী হয় যে তার পূর্ব্ব পর্যন্ত যেসব স্বত্ব হাত বদল হইয়াছে কেবলমাত্র সেইগুলিই বজায় থাকিবে। কোনও কোনও জমিদার ইহার পরেও নিম্নস্বত্ব হস্তান্তরের কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক bona fide মনে হয় না। গত সেপ্টেম্বরের শেষভাগেও এই মর্ম্মে হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত হইয়াছে যে, ১৩৬১ সালের ১লা বৈশাখ ইংরেজী ১৪ই এপ্রিল ১৯৫৪ এমনকি ১৩৬০ সালের ১লা বৈশাখ অর্থাৎ ১৪ই এপ্রিল ১৯৫৩ হইতে নিম্নস্বত্ব হস্তান্তর সম্পাদিত হইল এবং ঐ মৌজার নিম্নস্বত্ব ও খনিজ অধিকার ক্রেতার উপর বর্তাইল। চুক্তি হইল অর্ডিনান্সের অনেক পরে কিন্তু চুক্তি বলবৎ হইল ৫ হইতে ১৭ মাস পর্যন্ত আগে। ইহা আইন এড়াইবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নহে। এইরূপ কয়েকটি কয়লা-খনির স্বত্বের ক্রেতা হস্তান্তরকারী জমিদারের সঙ্গে চুক্তি করিয়াছেন এবং পুরাতন মধ্যস্বত্বের লীজ গ্রহীতাকে জানাইয়াছেন যে, ৩১শে মার্চ্চ ১৯৫৪ পর্যন্ত জমিদারকে দেওয়া যাবতীয় টাকা তাঁহারা পাইয়াছেন যে ক্ষেত্রে তাঁহার স্বত্ব ১৪ই এপ্রিল ১৯৫৪ সনে মাত্র বর্তিয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বের সমগ্র চুক্তি জানুয়ারী-ডিসেম্বর বর্ষগণনা ও জানুয়ারী-মার্চ্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টার যাহা বহু বর্ষ যাবৎ বলবৎ ছিল তাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইল ও তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইল না।

আইনে আছে, সম্পত্তিতে আর কিছু স্বত্ব যদি না থাকে এবং কেবল নিম্নস্বত্ব থাকে তাহা হইলে নীট আয়ের আট গুণ ক্ষতিপূরণ পাইবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এক কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। নীট আয় হইতে আদায় খরচ বাদ দিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাব হইবে, সুতরাং আদায়ের খরচ যত কম বাদ যায় নীট আয় এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ততই বেশী হইবে। আইনে আদায় খরচের ধাপ ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ২৫ হাজার পর্য্যন্ত শতকরা ৪ টাকা, ৫০ হাজার পর্য্যন্ত ৮ টাকা এবং ৫০ হাজারের বেশী হইলে শতকরা ১০ টাকা। সুতরাং বিভিন্ন খনির স্বত্ব টুকরা করিয়া বিভিন্ন নামে হস্তান্তরিত হইলে আদায় খরচ কম বাদ যাইবে। হইয়াছেও তাহাই। একই আপিস হইতে একই পামে একই ঠিকানাস্থিত বিভিন্ন কোম্পানীর কাগজে হস্তান্তরের চিঠি আসিতেছে। খোঁজ লইয়া দেখা গেল, ম্যানেজিং এজেন্ট হয়ত একই ব্যক্তি। জমিদারীর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হইয়াছে জমিদারের জন্য। ঐ অধিকার কেনা-বেচার ব্যবসাদারী গড়িয়া উঠিতে দেওয়ার

একমাত্র অর্থ অনাবশ্যক বেশী আর একটি মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি। বাঙালী জমিদারের মধ্যস্বত্ব অবসান করিতে গিয়া একটি নূতন অতিরিক্ত অবাঙালী মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি কোনমতেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

আসানসোলে বিজলী সরবরাহের অব্যবস্থা

মফস্বলের শহরগুলিতে বিজলী সরবরাহের অব্যবস্থা যেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরিণত হইয়াছে। মফস্বল হইতে যে সকল খবরাখবর আমাদের নিকট পৌঁছায় প্রায়ই তাহাতে কোন-না-কোন স্থানে বিজলী কোম্পানীর অযোগ্যতা এবং অব্যবস্থার উল্লেখ থাকে। সম্প্রতি সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" আসানসোল শহরে বিজলী সরবরাহের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন: "বাস্তবিক স্থানীয় ইলেকট্রিক কোম্পানীর এই জীর্ণতা, এই অকালবার্দ্ধক্য অবস্থা কেন? আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ হইতেই এ প্রশ্নের প্রকৃত জবাব চাই।"

দামোদর পরিকল্পনা অনুযায়ী যে ব্যবস্থা হইবার কথা আমরা আজ দুই বৎসর যাবৎ শুনিতেছি তাহাতে "বঙ্গবাণী"র উপরোক্ত প্রশ্ন আরও আশ্চর্য ঠেকিতেছে। পরিকল্পনা কবে জনসাধারণের বিশেষতঃ কলিকাতার বাহিরের জনসাধারণের কাজে লাগিবে এ প্রশ্নের উত্তরও ঐ সঙ্গেই পাওয়া প্রয়োজন।

পল্লী-অঞ্চলে চিকিৎসা-ব্যবস্থা

পল্লী স্বাস্থ্যোন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ডাক্তারদের মূল বেতনের সঙ্গে সেই পরিমাণ টাকা পল্লীভাতা দিবেন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "ভারতী" লিখিতেছেন, "পূর্ব্বে চিকিৎসকদিগকে গ্রামমুখীন করিবার জন্য যে সকল সরকারী পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহার ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল নিছক আদর্শবাদিতার উপর অত্যধিক জোর। বর্ত্তমানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে অধিকতর আর্থিক সুযোগ দিয়া ডাক্তারদিগকে গ্রামে পাঠাইবার চেষ্টা সেইজন্যই শুভ সূচনা বলিয়া পত্রিকাটি মনে করেন।"

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীঅঞ্চলে ১৮২টি সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র রহিয়াছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার বীরভূম-মুর্শিদাবাদ সীমান্তে হিলোড়া-ভাক্তিগ্রামের নিকটে একটিমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়া আর কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাই। এই অঞ্চলের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্যে ক্ষুব্ধ হইয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "চার লক্ষাধিক নরনারী অধ্যুষিত এই অঞ্চলের প্রতি সরকারী দৃষ্টিকার্পণ্য দুর্জ্ঞেয় বলিয়া মনে হয়।"

যতদিন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়িয়া না উঠে ততদিন অন্তবর্ত্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে স্থানীয় চিকিৎসকদিগকে পল্লী-অঞ্চলের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবার ও উপযুক্ত ভাতা দেওয়ার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে পত্রিকাটি সরকারকে তাহা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাহা এই

"কারণ পল্লীঅঞ্চলে যেভাবে হাতুড়ে চিকিৎসার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই। অথচ কোন সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা ব্যতিরেকে হাতুড়ে চিকিৎসার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াও লাভ নাই। পল্লীর যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও অজ্ঞতাই ইহার মূল কারণ। শহর হইতে মোটা ফি-এর ডাক্তার দেখান হয়ত মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষেই সম্ভব; বাকী সাধারণ গৃহস্থ, মজুর, চাষীকে প্রাণের দায়ে হাতুড়ে চিকিৎসার উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। শহরের ডাক্তারদেরও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হাতুড়ে চিকিৎসকদিগের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদেরও টুঁ শব্দ করিবার উপায় থাকে না, বরঞ্চ পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে হাতে রাখিয়া প্র্যাকটিস বজায় রাখিতে হয়।"

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থায় অধিকাংশ গ্রামবাসীদের যেরূপ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয় তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা প্রায় একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে। সে অবস্থায় কেবলমাত্র কয়েকজন ডাক্তারকে ঠেলিয়া পল্লীঅঞ্চলে পাঠাইলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে না।

উপসংহারে "ভারতী" লিখিতেছেন, "যাহাই হউক পল্লীর চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে শুধু 'গাঁয়ে চল' বলিলেই হইবে না—গ্রামের রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ যাহাতে প্রস্তুত হয় সেদিকে সরকারের বিশেষ দায়িত্ব আছে। যাঁহারা গ্রামে যাইবেন তাঁহাদেরও মনোভাবের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা যেন নিজেদের পল্লীভাতাপ্রাপ্ত সরকার-আশ্রিত পোষ্যপুত্র ভাবিয়া না বসেন—গ্রামের দুস্থ জনসমাজের প্রতি তাঁহাদের নৈতিক দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিলে তবেই সরকারের শুভ প্রচেষ্টা সার্থক।"

জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতাল

জঙ্গীপুর মহকুমায় একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার আশু প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ২৩শে অগ্রহায়ণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ভারতী" লিখিতেছেন, "কয়েক মাস পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ শহরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত মহকুমা হাসপাতাল শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া শোনা গিয়াছিল। "এই শহরের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটিও গঠিত হইল, নিয়মমাফিক কমিটির দুই বার বৈঠকও হইয়াছিল, চাঁদার খাতা হাতে হাতে বিলি করা হইল, স্কীম, প্ল্যান ও কাগজপত্র ঝটপট প্রস্তুত হইল। জেলার সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে ও দৈনিক পত্রিকায় যথারীতি সংবাদটি প্রচারিত হইল। দেশের জনসাধারণ ভাবিল এতদিনে তাহাদের বহুদিনের একটি বড় অভাব পূর্ণ হইল।" কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইল না। পত্রিকাটির সংবাদ অনুযায়ী, উপরন্তু 'স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ঢিলেমির জন্য এই বৎসরের স্কীমে (১৯৫৫-৫৬) উক্ত পরিকল্পনাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই তবে

সরকার জঙ্গীপুরে ৫৮ বেডযুক্ত পূর্ণাঙ্গ মহকুমা হাসপাতাল ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন; ইহা ১৯৫৬-১৯৫৭-এর স্কীমে অন্তর্ভুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।"

প্রস্তাবিত হাসপাতালটির জন্ত ত্রিশ বিঘা জমির প্রয়োজন হইবে। যাহাতে যথাসময়ে এই জমি সংগৃহীত হইতে পারে তাহার জন্ত আবেদন জানাইয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "যাঁহারা জমি দান করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের দেয় জমির পরিমাণ কত হইবে, বাকী জমি কিনিতে কত টাকার প্রয়োজন, কত টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইবে ইত্যাদি বিবরণাদি যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া পরিকল্পনাটি আগামী বৎসরের স্কীমেই যাহাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেজন্ত আমরা স্থানীয় প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের উদ্যোগী ও তৎপর হইতে অনুরোধ করিতেছি।"

সরকারী লালফিতার দৌরাত্ম্য

সরকারী দপ্তরখানাগুলির বিলম্বিত কর্ম্মপদ্ধতির সমালোচনা করিয়া "ঔদাসীন্ত না কর্ম্মে অপটুতা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন, ইংরেজশাসনের অবসানের সহিত তাহার অনুষঙ্গ লালফিতার দৌরাত্ম্যও দূর হইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হয় নাই। "ইংরেজ আমলের Red Tapism ত কমে নাই-ই বরং অনেক ক্ষেত্রেই বহু গুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। আজ সরকারী বিভাগে চিঠি লিখিয়া তাড়াতাড়ি জবাব পাওয়া নিতান্তই সৌভাগ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ইংরেজশাসনে জনমতের কোন সম্মানই সরকারী আমলারা দিত না। জনসাধারণের দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত অভিযোগ এবং চিঠিপত্র সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন অনুভূত হইত না—সেগুলির কোন গুরুত্ব দেওয়া হইত না—যেন উঁহাদের উত্তর দিলেও হয়, না দিলেও হয়। "আজ স্বাধীন ভারতের জনসাধারণও কি সরকারী আপিস হইতে এই ব্যবহারই পাইবে?"—"বঙ্গবাণী" প্রশ্ন করিয়াছেন।

এইরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থার সত্বর অবসানের জন্ত পত্রিকাটি দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ:

(১) যে কোন চিঠিই আসুক না কেন, অন্ততঃ পনর দিনের মধ্যেই তাহার একটা উত্তর দিতে হইবে।

(২) বিশেষ কারণ ব্যতীত তিন মাসের মধ্যেই সম্পর্কিত বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে। "যে আপিসে এই নিয়মের অধিক ব্যতিক্রম দেখা দিবে তাহার ভারপ্রাপ্ত অফিসার inefficient বা অকর্ম্মণ্যরূপে গণ্য হইবেন এবং কার্য্যে উন্নতি না দেখান পর্য্যন্ত তাঁহার উন্নতি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিবে।"

আসামে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের অব্যবস্থা

আসামে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকার যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" পর পর কয়েকটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আসামে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

কাছাড় জেলায় উদ্বাস্তুদের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া "যুগশক্তি" লিখিতেছেন যে, কাছাড় জেলায় উদ্বাস্তু পুনর্বসতিতে আই-টি-এ স্কীম অনুসারে" ২২ লক্ষ টাকা সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় করা হইয়াছে, "কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে এই অর্থ অপব্যয়িত হইয়াছে। পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীমুখার্জ্জিও স্বীকার করিয়াছেন যে, আই-টি-এ স্কীম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের কারিগরী শিক্ষার জন্ত ঘুঙ্গুর, পাঁচগ্রাম, রামকৃষ্ণনগর প্রভৃতি কলোনীতে যে ব্যবস্থা কর্ত্তারা করিয়াছিলেন তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অসহায় অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু নারী ও শিশুদের শিবিরগুলির অবস্থা বর্ণনারও অতীত। সরকার তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা বা স্বাবলম্বনের কোন ব্যবস্থা না করিয়া প্রায় পাঁচ সহস্র নারী ও শিশুকে অসহায় করিয়া রাখিয়াছেন। উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের শোচনীয় ঔদাসীনতা বহু পরিবারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর ঋণদান ব্যবস্থাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। ঋণদান ব্যাপারে যে সমস্ত সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে তাহা পালন করা অধিকাংশ উদ্বাস্তুর পক্ষে অসম্ভব। ইহারই ফলে সাত বৎসর পরও অধিকসংখ্যক উদ্বাস্তু ঋণ গ্রহণ বা বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইল না।"

আসামে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া আসামের বর্ত্তমান অর্থ (প্রাক্তন পুনর্ব্বসতি) মন্ত্রী শ্রীমতিরাম বরার যে বিবৃতি ২৪শে নবেম্বরের আসাম গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবরা আরও বলেন যে সাধারণতঃ আসামে প্রত্যেক কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারকে দশ বিঘা করিয়া জমি দেওয়া হইয়াছে। "আসামের কোথায় কোন কোন উদ্বাস্তু পরিবারকে দশ বিঘা করিয়া কিরূপ জমি দেওয়া হইয়াছে—তাহার একটি তালিকা বিধান সভার আগামী অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন কি?"—"যুগশক্তি" প্রশ্ন করিয়াছেন।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "বিধান সভায় শ্রীবরা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের আন্দোলন সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছেন যে, আসামে উদ্বাস্তুরা কোন বিক্ষোভ প্রদর্শন না করায়ই বুঝিতে হইবে যে সরকারের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের কোনই অভিযোগ নাই এবং তাহাদের পুনর্ব্বাসন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে। শ্রীবরার এই উক্তিতে কি আমরা ধরিয়া লইব যে আসামেরও উদ্বাস্তুদিগকে তাহাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্ত ধর্ম্মঘট, মিছিল প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হইবে?

"শ্রীবরার পর শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী পুনর্ব্বসতি দপ্তরের ভার লইয়াই বলিতেছেন যে আট কোটি টাকা না পাইলে তাঁহার পক্ষে পুনর্ব্বসতি কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। অথচ গত বাজেট অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পুনর্ব্বাসন-

খাতে অধিক অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য বিরোধীদলের সদস্য শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস অনুরোধ জানাইলে পর অর্থমন্ত্রী শ্রীবর্মা জবাব দেন যে, আগামী বৎসরের জন্য এ বাবদ মোট ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে; উহা অপ্রচুর নহে। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যাপারে রাজ্য-কর্তৃপক্ষ কতটুকু মনোযোগ দিয়াছিলেন।"

"বর্ত্তমান ব্যবস্থায় রাজ্যসরকার উদ্বাস্তুদের জন্য স্কীম প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাহা লইয়া বিচার-বিবেচনা করিতে করিতেই বহুদিন কাটিয়া যায়, এদিকে উদ্বাস্তুরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার পর দেখা যায় রাজ্য-সরকারের বহু স্কীম কেন্দ্রীয় সরকারের লালফিতার বন্ধনে ফাইল-অরণ্যে আটক পড়িয়া আছে;—ফলে রাজ্য-সরকারের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ বাতিল হইয়া যায়। সরকার কলিকাতায় একজন উপদেষ্টা প্রেরণ করায় অবস্থায় কতদূর উন্নতি হয় তাহা না দেখা পর্য্যন্ত আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে পারিতেছি না। কিন্তু একজন উপদেষ্টা পাঠাইলেই উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতি সুসম্পন্ন হইবে না।"

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী সম্মেলনে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, ঐ কমিটি গঠনের সময় যেন সরকারী সদস্যের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত সংখ্যক বেসরকারী প্রতিনিধিও গ্রহণ করা হয়। "নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য জনপ্রতিনিধি সহযোগে স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইলে ঋণদান ও অন্যান্য ব্যাপারে যে সমস্ত কেলেঙ্কারী ও দুর্নীতির অভিযোগ শুনা যায় তাহার প্রতিরোধ হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।"

উত্তর-প্রদেশে বাঙালীর শিক্ষাসমস্যা

নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র "সম্মেলনী"র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উক্ত শিরোনামাযুক্ত এক প্রবন্ধে শ্রীঅম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রবাসী বাঙালীরা যাহাতে নিজের মাতৃভাষা ভুলিয়া না যায় অথবা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা না করে সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

প্রবাসী বাঙালীরা বিশেষতঃ তাহাদের ছেলেমেয়েরা বর্ত্তমানে কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছে উত্তর-প্রদেশের বাঙালী সমাজের উদাহরণ দিয়া লেখক তাহার এক সাধারণ বর্ণনা দিয়া লিখিতেছেন, "বর্ত্তমানে আমাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা শিক্ষা দেওয়া একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে। আজকালকার শিশুরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নীতি-মূলক প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ইত্যাদি পাঠমালা পড়ে না। কেহই বাংলায় সংখ্যা গণনা অথবা নামতা শিক্ষা করে না। আমাদের শিশুরা বাংলায় ছড়া এবং কবিতা বলা ভুলিতে বসিয়াছে। যেখানে একদিন বাংলার মনীষী সাহিত্যিক এবং কবিদের নীতিকথা, উপদেশ, গান এবং গল্প ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ছিল সেখানে এখন সস্তা হিন্দী সিনেমা প্রসঙ্গ এবং গান স্থান করিয়া লইয়াছে। বেশীর ভাগ স্থলে এগুলি অশ্লীল, অশ্রাব্য এবং সংস্কৃতিবিরোধী।" এই-রূপে প্রবাসী বাঙালী নিজ সংস্কৃতি হইতে ক্রমশঃই দূরে সরিয়া যাইতেছে।

ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধকার লিখিতেছেন যে, সেকালে যে পাঠশালায় ছেলেমেয়েদের প্রথম শিক্ষা হইত বর্ত্তমানে তাহা লুপ্তপ্রায়। ব্যয়বহুল শিক্ষার চাপে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে। উত্তর-প্রদেশের শহরে শহরে এবং প্রতিটি গ্রামে মিউনিসিপাল এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাভাবে উপায়ান্তর না থাকায় বাঙালীর ছেলেরা ঐ সকল বিদ্যালয়েই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে বাঙালীর ছেলেরা বাংলা ভাষা ভুলিতে বসিয়াছে।

এই বিপজ্জনক গতি রোধ করিতে না পারিলে বাঙালী আত্ম-বিস্মৃতির অবলুপ্তিতে আচ্ছন্ন হইবে। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত প্রবাসী বাঙালী শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করা যাইবে তত দিন এই অবস্থার উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। ভারতীয় সংবিধানে প্রাদেশিক ভাষা এবং প্রত্যেক জাতির স্ব-স্ব সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশের অধিকারের স্বীকৃতির উল্লেখ করিয়া লেখক বলিতেছেন, "বাংলার বাহিরে বাঙালী যদি তাহার মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দাবি করে তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাহা কোনক্রমেই অনুচিত হইবে না।"

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধকার শ্রীভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন যে, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সংবিধান-বর্ণিত সকল সংস্কৃতির সমান সুযোগের অধিকার অব্যাহত থাকে সে ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। সেজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, মাতৃভাষা ভিন্ন অপর একটি ভারতীয় ভাষা যাহাতে তাহারা শিক্ষা করে তাহার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে প্রত্যেক ভারতীয়কে নিজ মাতৃভাষা ব্যতীত অপর একটি ভারতীয় ভাষায় বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা।

নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

প্রায় পঁচিশ বৎসর পর নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ত্রিংশতিতম অধিবেশন লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুয়ারী সম্মেলনের অধিবেশন বসিবে। ঐ সম্মেলনে মূল শাখা ব্যতীত আরও দশটি শাখায় আলোচনা হইবে।

সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পক্ষ হইতে এক বিবৃতিতে সভাপতি ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বিভক্ত বাংলার এবং বহির্বঙ্গে বাঙালীর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সঙ্কটের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে স্বদেশ ও বহির্বঙ্গের কৃষ্টি ও জীবন-সমস্যাগুলির সম্মিলিত ভাবে

নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, "অতীত যুগে বাঙালী বহির্বঙ্গে উচ্চ আসন ও সমাদর লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহার ব্যক্তিগত প্রতিভা ও উদ্যমের ফলে। বর্তমান যুগে সমবেত উদ্যম ব্যতীত বাঙালীর প্রতিষ্ঠা ও প্রগতি অসম্ভব। কিন্তু বাঙালীর সমবেত উদ্যোগকে বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতি ও কার্য্যধারার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের সহিত সখ্য, মৈত্রী ও সহানুভূতির সুনিবিড় যোগাযোগ স্থাপন একদিকে যেমন বাঙালীর সংস্কৃতির উৎকর্ষসাধন করিবে নূতন মানবিকতার সন্ধান দিয়া, অপরদিকে ভারতের প্রাঙ্গণে বাঙালীর জীবিকার্জ্জন সমস্যার সমাধানও সহজ হইবে।"

নানা কারণে স্কুল, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার ব্যবহার সঙ্কোচনের ফলে বাঙালীর কৃষ্টির প্রসারে যে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া ডঃ মুখোপাধ্যায় বলিতেছেন, "স্কুলে স্কুলে বাঙালীদের জন্য মাতৃভাষা প্রয়োগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা ও তাহার জন্য নিয়মিত অধ্যাপক নিয়োগ আগামী লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের প্রধান দায়িত্ব বলিয়া আমরা স্বীকার করি।"

মণিপুরে সত্যাগ্রহ

ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে অবস্থিত মণিপুর সংবিধান-বর্ণিত "গ" শ্রেণীর রাজ্য। সম্প্রতি সেখানে গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এক সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছে। মণিপুর রাজ্যে ১৯৪৮ সনে একটি আইন সভা ছিল, কিন্তু ১৯৪৯ সনের অক্টোবর মাসে তাহা তুলিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে মণিপুরের শাসনকার্য্য এক জন চীফ কমিশনারের মারফত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ১৯৫৩ সনে মনোনীত সদস্যবৃন্দ লইয়া সেখানে একটি পরামর্শদাতা পরিষদ গঠিত হয়।

বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করিতেছে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল। ৪ঠা ডিসেম্বর "ভিজিল" পত্রিকায় ঐ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ১৫ই নবেম্বর হইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কয়েকটি প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লীতে গিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা করেন যাহাতে মণিপুরে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার মানিয়া লন। তাহা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্য সম্পর্কীয় মন্ত্রণাদপ্তরের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়াও জানান হয় যে, ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত যদি কর্তৃপক্ষ কোন সিদ্ধান্ত না জানান তাহা হইলে ১৫ই নবেম্বর হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইবে। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

১৪ই নবেম্বর দশ হাজার লোকের এক সভায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। ১৫ই নবেম্বর এক দল সত্যাগ্রহী নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করেন—তাহাতে পুলিস কোন বাধা দেয় না। ১৬ই নবেম্বর শ্রীনবকিশোর সিং-এর নেতৃত্বে এক দল সত্যাগ্রহী সেক্রেটারিয়েট ভবনের দিকে অগ্রসর হইলে পুলিস তাহাদের বাধা দেয় এবং পুলিসের আঘাতে দুই জন সত্যাগ্রহী আহত হন। ১৭ই নবেম্বর পঞ্চাশ জন সত্যাগ্রহী সেক্রেটারিয়েট ভবনে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন ধ্বনি দিতে থাকিলে পুলিস লাঠি চালায়, ফলে সত্যাগ্রহীদের নেতা শ্রীথৌচম আংগৌ সিং (Thouchom Angou Singh) আহত হন। উভয় দল হইতে মোট ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দূরবর্তী স্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১৯শে নবেম্বর পুলিসী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ হরতাল পালন করা হয় এবং প্রায় দশ হাজার লোকের এক শোভাযাত্রা সেক্রেটারিয়েট ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ডের ভূমিকা

মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড ১৯৪৮ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় যুক্তরাজ্যের কমিশনার-জেনারেল রূপে কাজ করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্য্যকাল ১৯৫৫ সনের শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ব্রিটেনের প্রথম সোস্যালিষ্ট প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের পুত্র। ১৯৪৮ সনে কমিশনার-জেনারেল নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড দুই বৎসর মালয়ের গবর্ণর-জেনারেল রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কমিশনার-জেনারেলের পদটি সম্পূর্ণ নূতন, কিন্তু উহার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। "যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট উপলব্ধি করেন, বিশ্বের বিভিন্ন উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে উচ্চপদে এমন কতকগুলি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী অধিষ্ঠিত রাখা প্রয়োজন যাঁহারা অঞ্চল-বিশেষে উপস্থিত থাকিয়া সমগ্র পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনমত স্বদেশের গবর্মেণ্টকে ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ দিতে পারিবেন। এই সকল অঞ্চলের ব্রিটিশ সিবিল সার্ভেণ্ট ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনও তাঁহার অন্যতম কার্য্য হইবে।"

মিঃ উইণ্ট লিখিতেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কমিশনার-জেনারেল মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ঐ কার্য্য বিশেষ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। "দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্পর্কে তাঁহার দপ্তরে বিভিন্ন বিষয়ে যে পরিমাণ তথ্য আজ জমা হইয়াছে তাহা বিশ্বের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।" তাঁহার চেষ্টার ফলেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার উচ্চতর ব্রিটিশ কর্ম্মচারী এবং সেনাবাহিনীর লোকদের লইয়া মাঝে মাঝে সম্মেলনের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

এই সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা একটি ইংরেজী পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম, মালয়ের ব্রিটিশ প্রধান সেনাপতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, শুধু সামরিক অভিযানে লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও এরোপ্লেন ব্যবহার করিলেও মালয়ের সমস্যা মিটান সম্ভব নয়। যত দিন মালয়ের প্রত্যেক গ্রামের লোক তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হইবে তত দিন সামরিক দমননীতি বৃথা। মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ডের কৃতিত্বের পরীক্ষা সেইখানে।

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত বিপ্লবী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ১২ই ডিসেম্বর চুয়াত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার আদি-নিবাস ছিল যশোহর জেলার অন্তর্গত ভুগিলহাট গ্রামে। প্রথম যৌবনেই তিনি বিদেশী শাসনের নাগপাশ হইতে মাতৃভূমির মুক্তি সাধন নিমিত্ত বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং বিপ্লবের প্রথম যুগে স্বামী নিরালম্ব (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু) প্রমুখ বিপ্লব-সাধকদের সংস্পর্শে আসেন।

স্বদেশী আন্দোলনকালে বিপ্লবকর্ম বঙ্গদেশে ব্যাপ্তিলাভ করে। কিরণচন্দ্র এ সময়ে একান্তভাবে ইহাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তৎকালীন 'বন্দেমাতরম্‌', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' এবং 'নবশক্তি' এই চারিখানি জাতীয় অগ্রসরপন্থী পত্রিকার সঙ্গেই কিরণচন্দ্র সংশ্লিষ্ট হইলেন। প্রথম যুগের অন্যতম বিপ্লবকর্ম্মী ও বিপ্লবসহায়ক বর্ত্তমানে অশীতিপর শ্রীযুত অতীন্দ্রনাথ বসুর আশ্রয়ে থাকিয়া, তিনি এই সকল পত্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে 'সন্ধ্যা' এবং ইহার সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন। কিরণচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম 'যুগান্তর' দৈনিকে বোমা তৈরির কৌশল প্রকাশ করেন। 'কঃ পন্থাঃ' পুস্তক প্রকাশের জন্য তিনি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাবাসের পর তিনি আত্মগোপন করেন। ১৯০৯ সনে আত্মগোপনকালে তিনি বাদুরবাগানে ধৃত হন বটে, কিন্তু বিচারে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর কিরণচন্দ্র 'বাঘা যতীনে'র সহকর্ম্মীরূপে বিপ্লবকার্য্যে অগ্রণী হন। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ১৯১৫ সনে ভারতরক্ষা আইনে তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৯২০ সনে মুক্তিলাভ করিয়া কিরণচন্দ্র পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে 'সার্ভেণ্ট' দৈনিক প্রকাশে সবিশেষ সহায়তা করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অহিংস কর্ম্মীরূপে তিনি মহাত্মা গান্ধীর পাশে আসিয়া দাঁড়ান। খুলনা জেলার দৌলতপুরে তিনি জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, চারুচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী দেশকর্ম্মীদের সহযোগে 'সত্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন যতদূর মনে পড়ে ১৯২২ সনের শেষদিকে দৌলতপুরে সত্যাশ্রমের আনুকূল্যে একটি জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন হয় এবং বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী কামাখ্যাচরণ নাগ ইহাতে সভাপতিত্ব করেন।

কিরণচন্দ্র ১৯২৪ সনে পুনরায় বিপ্লবকর্ম্মে যোগাযোগ সন্দেহে ধৃত হন এবং বঙ্গ ও বঙ্গের বাহিরে চার বৎসরকাল বন্দীজীবন যাপন করেন। ১৯২৮ সনে তিনি মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুনরায় ১৯৩০ সনে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে'র পর সরকার তাঁহাকে আটক করেন। ইহার পর দীর্ঘ আট বৎসরকাল তাঁহাকে বন্দীজীবন কাটাইতে হয়। এই সময়ে বেশীর ভাগ তিনি দেউলি বন্দীনিবাসে অবরুদ্ধ ছিলেন। কিরণচন্দ্র ১৯৩৮ সনে মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন এবং সরস্বতী লাইব্রেরী পুনর্গঠনে মন দেন। ১৯৪২-এ আগষ্ট বিপ্লবে ধৃত হইয়া তিনি তিন বৎসর বন্দী থাকেন। ইহার পর মুক্তিলাভান্তে তিনি কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারে "প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার" প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি আজীবন যুবকদের নৈতিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশে সচেষ্ট ছিলেন। "প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার"ও এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। এই পাঠাগারটি কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যুবকদের মধ্যে সত্যকার জ্ঞান প্রচারকেই কিরণচন্দ্র শেষ জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। যুবক-বৃদ্ধ প্রত্যেকের নিকটেই তিনি 'কিরণ-দা' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আমরাও তাঁহার প্রচুর স্নেহ লাভ করিয়াছি।

সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল অপরিসীম। তাঁহার বিপ্লবী জীবনেও সাহিত্যসেবার সময় করিয়া লইতেন। "শিবাজী-গুরু রামদাস" এবং "চাণক্য" এই দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। সকলেরই তিনি প্রীতি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিনয়ের পরিসীমা ছিল না। তাঁহার প্রমুখাৎ তাঁহার বিপ্লব কর্ম্মের কথা বহুবার জানিতে চাহিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছি, পাছে নিজের কৃতিত্বের কথা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত-মাতার একজন অকৃত্রিম একনিষ্ঠ সেবক আমরা হারাইলাম।

সুরেশচন্দ্র দেব

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সুরেশচন্দ্র দেব গত ১৫ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বাহাত্তর বৎসর বয়স হইয়াছিল।

সুরেশচন্দ্রের আদি-নিবাস শ্রীহট্টে। তিনি ১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে কলিকাতায় আসিয়া মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে বিপিনচন্দ্রের 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও পরে 'বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকার সূচনা হইতে তিনি ইহার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিখ্যাত নেতা ও মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন এবং ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে শ্রীহট্টের জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে ব্রতী হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত 'খাদি-প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করিলে সুরেশচন্দ্র ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাংবাদিক জীবন কিন্তু অব্যাহত ছিল। 'হিন্দু রিভিয়ু'র সম্পাদকীয় বিভাগে পূর্ব্বে তিনি কার্য্য করেন। পরে 'সার্ভেণ্ট' এবং 'ফোরাম' কাগজের সঙ্গেও যুক্ত হন। পরবর্ত্তী কালে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড', 'ন্যাশানালিষ্ট' প্রভৃতি দৈনিকে সহযোগী সম্পাদকের পদে ব্রতী ছিলেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু সাময়িক পত্রিকাদিতেও তিনি নিয়মিত লিখিতেন। সুরেশচন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ 'ইণ্ডিয়ান এম্পয়েল রেজিষ্টার' নামক সাময়িক পত্রীর রাজনীতিবিষয়ক অংশ লিখিয়া দিতেন।

বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে তিনি একবার দক্ষিণ ভারতেও গিয়াছিলেন। দক্ষিণীদের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ বজায় ছিল। তামিল-কবি ভারতী সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধাদি বাহির হয়। সুরেশচন্দ্র বিপিনচন্দ্রের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রয়াণে আমরা আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখ অনুভব করিতেছি।

ইন্দ-পরব

শ্রীসুখময় সরকার

"পাড়ার ওরা সবাই ইন্দ-পরব দেখতে খাতড়া যাচ্ছে। আমিও যাব, মা।"

"যাস্‌নে, বাবা, বৃষ্টি হবে।"

"বৃষ্টি হবে! তুমি কেমন করে জানলে?"

"ইন্দ-পরবে বৃষ্টির যোগ আছে যে।"

আমার বয়স তখন এগার। জানিতাম, আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। ভাদ্রমাসের শেষ দিকে ইন্দ-পরব তখন কেন বৃষ্টির যোগ থাকিবে? ভাবিতে লাগিলাম। মা মনে করিলেন, তাঁহার অনুমতি না পাইয়া আমি বিমর্ষ হইয়াছি। তখন আট আনা পয়সা দিয়া বলিলেন—

"আচ্ছা যা। কিন্তু সাবধানে যাবি, আর যা-তা কিনে খাসনে।"

সাত-আট জন দল বাঁধিয়া ইন্দ-পরব দেখিতে চলিয়াছি। দলের মধ্যে আমিই কনিষ্ঠ। তখন আমাদের গ্রাম হইতে খাতড়া যাইবার মোটর-বাস ছিল না। বন-পথে প্রায় চারি ক্রোশ হাঁটিয়া খাতড়ায় পৌঁছিলাম। বাঁকুড়া শহর হইতে খাতড়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় বার ক্রোশ। তখন রবি ডুবিতে আর দুই-তিন দণ্ড বিলম্ব আছে। ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কিন্তু সে বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া দলে দলে লোক গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে খাতড়ায় ইন্দ-পরব দেখিতে আসিতেছে। যে প্রান্তরে ইন্দ-পরব হয়, তাহার নাম ইন্দ-কুড়ি (ইন্দ্রকূট)। ইন্দকুড়িতে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। দূর হইতে ইন্দ-গাছ দেখা যাইতেছে। একটি অনতিস্থূল, প্রায় ত্রিশ হাত উচ্চ, সুসজ্জিত, শাখা-প্রশাখাহীন শালকাণ্ডের শীর্ষদেশে একটি পীতবর্ণ ছত্র; ছত্রের চতুর্দিকে ঝালর ঝুলিতেছে। ছত্রের কিঞ্চিৎ নিম্নে ইন্দ গাছের সহিত সংলগ্ন একটি পতাকা উড়িতেছে। এই পতাকার নাম ইন্দ্রধ্বজ।

জনতা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে ইন্দ-গাছের নিকটবর্তী হইতে চেষ্টা করিলাম। এমন সময় বাদ্য-ভাণ্ড-সহকারে খাতড়ার রাজা ও রাজ-পুরোহিত পদব্রজে তথায় উপস্থিত হইলেন। জনতা বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের পথ করিয়া দিল। রাজা, রাজ-পুরোহিত, কয়েকজন রাজ-পুরুষ এবং বাদ্যকরগণ ইন্দ-গাছের সমীপস্থ হইলে আমরাও কোনরূপে ভিড় ঠেলিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। পুরোহিত ইন্দ-গাছে হরিদ্রা-রঞ্জিত এক খণ্ড বস্ত্র ও নানা পুষ্প রচিত একটি মাল্য বেষ্টন করিয়া দিলেন; পরে যথাবিধি পূজা করিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টা, ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া বাজিল। পূজান্তে রাজা ও রাজ-পুরোহিত প্রস্থান করিলে ইন্দ-গাছের তলায় সাঁওতালদের নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। তাহাদের সেই স্বচ্ছন্দ নৃত্য এবং সহজ সুরের গান এখনও স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। সে নৃত্য-গীতে বৈচিত্র্য না থাকিলেও অতিশয় চিত্তাকর্ষক। তাহারা যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রেরণায় এই নৃত্য, এই গীত আপনা হইতে শিখিয়াছে। শুনিলাম, সেদিন রাজবাটীতে ঝুমুর খেলা, এক বিখ্যাত দলের যাত্রাগান হইবে। কিন্তু সাঁওতাল-নাচ ছাড়িয়া যাত্রা শুনিতে যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। ইন্দ-গাছের তলায় আশপাশে অগণিত দোকান বসিয়াছে—মিঠাইয়ের দোকান, পানের দোকান, মণিহারী দোকান, জামা কাপড়ের দোকান, মাটির ও কাঠের খেলনা এবং চুড়ি-মালার দোকান। ফেরিওয়ালা ফিরাফিরি, কুমকুম, ডুগডুগি ও ঘড়ঘড়ি ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। যাহারা ইন্দ-পরব দেখিতে আসিয়াছে, তাহারা ইন্দ-গাছের তলায় প্রণাম করিয়া, সাঁওতাল-নাচ দেখিয়া, দোকানে দোকানে এটা-সেটা কিনিয়া বেড়াইতেছে। প্রান্তরে এক দিকে নাগরদোলা বসিয়াছে, অন্য দিকে মোরগের লড়াই চলিতেছে। বালক ও যুবকেরা কেহ কেহ বলিতেছে, "চল, রাজবাড়ীতে যাত্রা শুনি গে।"

প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা কেহ কেহ বলিতেছে, "বাড়ী যাই চল—বৃষ্টি আসতে পারে। ইন্দের মা[illegible]সি কাঁদে।"

ইহার পূর্বদিন 'আখাগাড়ি' হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, ইন্দ-গাছ অর্ধোন্নত উঠাইয়া রাখা হইয়াছিল। আখাগাড়ির দিন হইতেই উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, আরও দুই দিন চলিবে। রাজা দুই দিন সন্ধ্যায় সমারোহের সহিত ইন্দকুড়িতে আসিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন; রাজবাড়ীতেও এই উপলক্ষে আনন্দোৎসব চলিতে থাকে

রাত্রি বারটা পর্যন্ত পরব দেখিয়া, চারি আনার খাবার খাইয়া এবং চারি আনার কাগজের মালা ও কাঠের খেলনা কিনিয়া সকলে মিলিয়া মুন্‌সেফী আদালতের বারান্দায় শুইয়া রহিলাম। রাত্রি অর্দ্ধ প্রহর থাকিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল; পুনরায় চারি ক্রোশ হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

এ বৎসরও (১৩৬১) খাতড়ায় ইন্দ-পরব দেখিয়া আসিয়াছি। প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানগুলি পূর্বের মতই আছে; কিন্তু মনে হইল, আগেকার সে আড়ম্বর নাই। অথবা পল্লী-বালকের দৃষ্টিতে যাহা আড়ম্বরপূর্ণ মনে হইয়াছিল, শহরবাসী

যুবকের দৃষ্টিতে তাহাই অনাড়ম্বর বোধ হইয়াছে। শুনিয়াছি, বিষ্ণুপুরেও সমারোহের সহিত ইন্দ-পরব হইত, এখন নামমাত্র অনুষ্ঠান হয়। খাতড়া ক্ষত্রভূমি। সেখানকার ধবলবংশীয় ক্ষত্রগণ যে কত পুরুষ ধরিয়া ইন্দ-পরব করিয়া আসিতেছেন, জানা নাই।

ইন্দ-পরব কেবল ইন্দকুড়িতে হয় না, রাজ-অন্তঃপুরেও হয়। সেদিন রাজা-রাণী উপবাস করিয়া শুদ্ধাচারে থাকেন এবং যথাবিহিত সময়ে স্বহস্তে পঞ্চহস্ত উচ্চতা-বিশিষ্ট সুসজ্জিত ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলন করেন। এই ধ্বজের শীর্ষে স্বর্ণখচিত ছত্রে শোভিত হয়। ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলনের পর ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই যজ্ঞে রাজা-রাণী পূর্ণাহুতি দান করেন।

কিন্তু এ অঞ্চলে সাঁওতালের সংখ্যাধিক্য বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, ইন্দ-পরবে তাহারা যেরূপ আমোদ-আহ্লাদ করে, অন্যে তেমন করে না। পরবে দেখিয়াছি, তাহারা নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছে, পুরুষেরা মধুক-সুরা পান করিয়া গীত গাহিতেছে, নারীরা কবরীতে বনফুল গুঁজিয়া অপূর্ব ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছে। সাধারণ লোকের ধারণা, এ সব সাঁওতালী পরব, অনার্য-উৎসব। কিন্তু এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, ইন্দ-পরবের রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে তাহা প্রতিপন্ন হইবে। দেখা যাইবে, ইহা সম্পূর্ণরূপে আর্যোৎসব এবং ধীরে ধীরে অনার্যেরা উহা আত্মসাৎ করিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল ইন্দ পরব কেন, ভারত-ভূমিতে আর্য ও অনার্য বহু সহস্র বৎসর একত্র বাস করার ফলে একে অপরের বহু আচার-অনুষ্ঠান, বহু পূজা-পার্বণ এমনভাবে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে যে, কে কাহার নিকট হইতে কোন্‌টি পাইয়াছে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ইন্দ-পরব, ইন্দ্র-পর্ব। পঞ্জিকায় ইহার নাম শক্র-ধ্বজোত্থান, সংক্ষেপে শক্রোত্থান। শক্র—ইন্দ্র। শক্রোত্থান —ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলনের উৎসব। ভাদ্র শুক্ল-একাদশীতে শক্রোত্থান বিহিত হইয়াছে। খাতড়ায় একাদশীর দিন 'আধাগাছি' করিয়া রাখা হয়, ইন্দ্রধ্বজের 'অর্ধোত্থান' হয়। পরদিন দ্বাদশীতে পূর্ণোত্থান। এই দিনের উৎসবেই আড়ম্বর হয়। এ অঞ্চলে 'ইন্দ-একাদশী' প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পঞ্জিকায় ইহাই শ্রীহরির 'পার্শ্বৈকাদশী'। সেদিন নিদ্রিত বিষ্ণু পার্শ্ব-পরিবর্তন করেন। ইহার পরদিন বামন-দ্বাদশী, দধিবামনের 'জলযাত্রা'।

ভাদ্র শুক্ল-একাদশীতে কেন শক্রোত্থান হয়, ইন্দ্র-যষ্টির শীর্ষে পতাকা কেন, এ সকল প্রশ্ন প্রায়ই মনে উদিত হইত, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর মিলিত না। ইন্দ-পরবে বৃষ্টি হয়, ইহা সকলেরই বিশ্বাস। কিন্তু কেন হয়? প্রাকৃত জনে বলে, 'ইন্দের মাসী-পিসী কাঁদে', সেই অশ্রুধারা বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। মাসী-পিসীর ক্রন্দনই বা কেন? ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন। ঋগ্বেদে আছে, বৃত্র প্রতি বৎসর ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়; পর বৎসর পুনর্জীবিত হইয়া অবগ্রহ সৃষ্টি করে। ইন্দ্র যদিও অমর, তথাপি যুদ্ধ ব্যাপারটা কদাপি সুখের নহে। বিশেষতঃ অসুরদের পরাক্রমও অগ্রাহ্য করিবার নহে। মাসী-পিসী বোধ হয় এই দুশ্চিন্তায় ক্রন্দন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের জয় হয়; তাঁহার বজ্রের আঘাতে কোনও অসুর রক্ষা পায় না। অসুরেরা নিহত হইলে বৃষ্টি নামিয়া আসে; তাহাতে পৃথিবীর মানুষের আনন্দ। ইন্দ্রের বিজয়ে মানুষের কল্যাণ। তাই ইন্দ্রের বিজয়ে বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া ও উৎসব করিয়া মানুষ আহ্লাদ প্রকাশ করে। দুই বৎসর পূর্বেও ইহার অধিক কিছুই জানা ছিল না।

কিন্তু মনে হইত, এই উৎসব কতদিন ধরিয়া চলিতেছে? মহাভারতে আছে, চেদী দেশে উপরিচর-বসু নামে এক পরম ধার্মিক নরপতি ছিলেন; তিনিই শক্রোত্থান-উৎসবের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। সে কোন্ কালের কথা, কে বলিবে? বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে [illegible] গোপ-গণের ইন্দ্রযষ্টি রোপণ করিয়া ইন্দ্রোৎসবের [illegible] আছে। উপরিচর-বসু নিশ্চয় ইঁহার পূর্বে ছিলেন। সে ত অল্প-কালের কথা নহে!

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের "পূজাপার্বণ" গ্রন্থে 'ইন্দ্রপূজা'-অনুচ্ছেদে একটি কুঞ্চিকা আছে; সেই কুঞ্চিকা লইয়া আমি শক্রোত্থানের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে যাইতেছি। প্রকৃতপক্ষে আচার্য যোগেশচন্দ্রই শক্রোত্থান-তত্ত্বের সূত্রকার, আমি ইহার ভাষ্যকার মাত্র।

'জিতাষ্টমী' প্রবন্ধে (প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩৬১) আমরা ইন্দ্রদেবের পরিচয় পাইয়াছি। দক্ষিণায়ন দিনে সূর্যের বর্ষণকারী শক্তিই ইন্দ্র। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন ধরিলে ইন্দ্র দক্ষিণায়ন দিনের সূর্য। অবশ্য সে দিনের প্রত্যক্ষ সূর্যের নাম বিবস্বান ছিল। ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ আছে। তবে ঋগ্বেদের স্থানবিশেষে বিবস্বান ও ইন্দ্র, বিষ্ণু ও ইন্দ্র, অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। বিষ্ণু ত্রিবিক্রমদ্বারা বর্ষচক্র নির্মাণ করিতেছেন। ইন্দ্র বিষ্ণুকে বলিতেছেন, "সখে, তুমি শীঘ্র শীঘ্র পদক্ষেপ কর।" অর্থাৎ ইন্দ্র বিষ্ণুরূপ সূর্যকে দ্রুত দক্ষিণায়ন স্থানে আসিতে বলিতেছেন। রূপক ভেদ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে, ইন্দ্র দক্ষিণায়ন-দিনের সূর্য; আর, বিষ্ণু চলমান সূর্য, যিনি বর্ষচক্র নির্মাণ করেন। একই বস্তু, কর্মভেদে নামভেদ হইয়াছে মাত্র। আমরা যে বর্তুলাকার শালগ্রাম-শিলায় বিষ্ণুর পূজা করি, সে শিলা সূর্যেরই প্রতীক। উপরে

লিখিয়াছি, শক্রোত্থানের দিন বিষ্ণুর 'পার্শ্ব-একাদশী'। প্রকৃত ব্যাপার, বিষ্ণুরূপ সূর্য সেদিন পার্শ্ব পরিবর্তন করেন, উত্তরায়ণ শেষ করিয়া দক্ষিণায়ন আরম্ভ করেন। আরও লিখিয়াছি, পরদিন দ্বাদশীতে দধিবামন ঠাকুরের 'জলযাত্রা'। দধিবামন বিষ্ণুর রূপ-বিশেষ। বর্ষণারম্ভ না হইলে 'জলযাত্রা' হইতে পারে না। এই সকল বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতেছি, যে সময়ে শক্রে থান, শ্রীহরির পার্শ্ব-একাদশী এবং দধিবামনের জলযাত্রা হয়, সে সময়ে এক কালে রবির দক্ষিণায়ণ হইত।

কতকাল পূর্বে ভাদ্র শুক্ল একাদশীতে রবির দক্ষিণায়ন হইত? জ্যোতির্গণিতের সাহায্য লইয়া সেই কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্গণিতে যাহাকে Precession of the Equinoxes বলে, প্রাচ্য জ্যোতির্গণিতে তাহার নাম অয়ন-চলন। বিষুব-চলন বলিলেও দোষ হইত না, কিন্তু অয়ন-চলন নামটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্য জ্যোতির্গণিতে অয়ন ও বিষুব-দিন বাঁধা আছে, চিরকাল ২১শে জুন দক্ষিণায়ন হইতেছে ও হইবে। কিন্তু প্রাচ্য গণনায় এরূপ নহে। মাস নক্ষত্রের সহিত বাঁধা আছে, সুতরাং স্থির আছে এবং অয়ন-দিন ও বিষুব-দিন শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদ্গত হইতেছে। একটা উদাহরণ দিই। অশ্বিনী নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে আশ্বিন-পূর্ণিমা; যে মাসে আশ্বিন-পূর্ণিমা হয়, সে মাসের নাম আশ্বিন। ইহা চিরকাল স্থির আছে। এক্ষণে আশ্বিন মাসে জলবিষুব হইতেছে; কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না, থাকিবে না। প্রায় দুই সহস্র বৎসরে অয়ন-দিন বা বিষুব-দিন এক মাস পশ্চাদ্গত হয়। এখন ৭৮ই আষাঢ় রবির দক্ষিণায়ন হইতেছে; কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ৭৮ই শ্রাবণ এবং চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ৭৮ই ভাদ্র রবির দক্ষিণায়ন হইত। যদি ভাদ্র শুক্ল-একাদশী ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহের অন্তে কিংবা চতুর্থ সপ্তাহের আরম্ভে পড়ে (যেমন, বাংলা ১৩৬১ সালে পড়িয়াছে) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তদবধি দক্ষিণায়ন দিন।

ভাদ্রের ২১৷২২ দিন = ¾ মাস
শ্রাবণ = ১ মাস,
আষাঢ়ের ২১৷২২ দিন = ¾ মাস,
২½ মাস

একুনে ২½ মাস পশ্চাদ্গত হইয়াছে। অতএব অদ্যাবধি প্রায় ২০০০ × ২½ = ৫০০০ বৎসর পূর্বে ভাদ্র শুক্ল-একাদশীতে রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কথা।

ইহা অবশ্য স্থূল গণনা। সূক্ষ্ম গণনায় আরও প্রাচীনতর কাল পাওয়া যাইবে। কারণ ভাদ্র শুক্ল-একাদশী সর্বদা ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহের অন্তে পড়ে না এবং শ্রাবণ মাসের দৈর্ঘ্য ৩০ দিন নহে, ৩১৷৩২ দিন। তাহা ছাড়া অয়ন দিন এক মাস পশ্চাদ্গত হইতে দুই সহস্র বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক সময় লাগে। সূক্ষ্ম গণনাটি 'জিতাষ্টমী' প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। তথাপি বিষয়টির জটিলতা হেতু এখানে সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি রোহিণীর যে উপাখ্যান আছে, তাহার ফলিতার্থ এই যে, মহাবিষুব দিন মৃগ-নক্ষত্র হইতে রোহিণী-নক্ষত্রে সংসপিত হইয়াছিল; ঋষিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র এই ঘটনার কাল সূক্ষ্মরূপে গণিয়া দিয়াছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ অব্দ, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-দশমী। পুরাতন স্মৃতি ধরিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন:

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লা দশমী সম্বৎসর-মুখী স্মৃতা।
তস্যাং স্নানং প্রকুর্বীত দানঞ্চৈব বিশেষতঃ॥

অর্থাৎ, খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ অব্দে এবং পরবর্তী কালে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমীতে মহাবিষুব দিনে এক সম্বৎসরের মুখ ধরা হইত। আমরা সেই স্মৃতি ধরিয়া উক্ত দিনে অদ্যাপি দশহরা পালন করিতেছি, স্নান-দান করিতেছি। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-দশমী হইতে গণিয়া গেলে সে বৎসর তিন চান্দ্রমাস ও তিন তিথি পরে নিশ্চয় রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, সে তিথি ভাদ্র শুক্লা-ত্রয়োদশী। ইহার দুই দিন পূর্বে, একাদশীতে শক্রোত্থান বিহিত হইয়াছে। যে কালের কথা হইতেছে সেকালে পঞ্জিকা ছিল না। অতএব অয়ন-দিন-নির্ণয়ে ২৷৩ দিনের ইতর বিশেষ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ৭৮ দিন, এমনকি ১০৷১২ দিনের ভুল হইলেও প্রাচীনদিগের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হইত।

যে প্রাচীন কালের কথা বলিতেছি, তখন পঞ্জিকা ছিল না; অতএব অয়ন-দিন-নির্ণয় সহজ কর্ম ছিল না। এখন আমরা পঞ্জিকা খুলিয়া অনায়াসে বলিয়া দিতে পারি, অমুক দিন রবির উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন হইবে, অমুক দিন মহাবিষুব কি জল-বিষুব হইবে। কিন্তু পাঁচ-ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে জ্যোতির্গণিতের এত উন্নতি হয় নাই। তখন নৈসর্গিক লক্ষণ দেখিয়া অয়ন-দিন ও বিষুব-দিন নির্ণয় করিতে হইত। রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভে বর্ষণারম্ভ হয়; আর কৃষি-কর্মের জন্য দক্ষিণায়ন দিন না জানিলেই নয়। কৃষি-কর্মের আয়োজন করিতেও সময় লাগে, অতএব পূর্ব হইতেই দক্ষিণায়ন দিন জানা প্রয়োজন। বর্ষাকাল পড়িয়া গেলে পর দক্ষিণায়ন দিন জানিয়া লাভ কি? চেদীশ্বর উপরিচর শক্রোত্থান উৎসবের প্রবর্তন করিয়া দক্ষিণায়ন দিন-নির্ণয়ের এক অপূর্ব কৌশল দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

চেদীদেশ বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড (বিন্ধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ)। ইহার অক্ষাংশ প্রায় ২৪° উত্তর। দক্ষিণায়ন দিনে সূর্য্যগতির পরম সীমা ২৩°৩০ কলা। বাঁকুড়ার অক্ষাংশ প্রায় ২৩° উত্তর, অতএব এ অঞ্চলে দক্ষিণায়ন দিনে দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের খ-মধ্যস্থিতি (Right Ascension) মাথার উপর হইতে প্রায় ৩০ কলা উত্তরে। এখানে একটা যষ্টি প্রোথিত করিলে ঐ দিন দ্বিপ্রহরে তাহার ছায়া সামান্য দক্ষিণে হেলিয়া পড়িবে। কিন্তু দক্ষিণায়ন দিনের মধ্য-দিবায় চেদীদেশের খ-মধ্য হইতে সূর্য প্রায় ৩০ কলা দক্ষিণে থাকেন। যদি সেখানে একটা যষ্টি প্রোথিত করা হয়, তবে দক্ষিণায়ন দিনে উহার ছায়া সামান্য উত্তরে হেলিয়া পড়িবে; বিশেষ লক্ষ্য না করিলে ছায়া প্রায় অদৃশ্য হইবে। অতএব যখন দেখা যাইবে, যষ্টির ছায়া ক্রমশঃ হ্রস্বতর হইতে হইতে যষ্টির প্রায় পাদমূল আসিয়া পড়িয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে দক্ষিণায়ন দিনের আর বিলম্ব নাই। আবার যদি ঐ যষ্টির শীর্ষে একটা পতাকা থাকে, তবে উহা দক্ষিণ সমুদ্র হইতে বহমান আয়ন (মৌসুমী) বায়ু প্রভাবে উত্তরদিকে উড়িতে থাকিবে। অবশ্য, চেদীদেশ ভারতের ঠিক মধ্যস্থলে, সমুদ্র হইতে বহুদূরে। সুতরাং আয়ন বায়ু প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষারম্ভ হয় না; ৭৮ দিন, এমনকি দশ-বার দিন পরে হয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রধ্বজরোপণ-উৎসবের সাহায্যে রবির দক্ষিণায়ন দিন নিরূপিত এবং বর্ষাগম অনুমিত হইত। অতকাল পূর্ব্বেও আমাদের দেশের লোকে কি অসামান্য বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন, ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অয়ন-দিন চিরকাল একই সময়ে হয় না, পিছাইয়া আসে। প্রাচীনেরা তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন; পুরাণে ইহার বহু প্রমাণ আছে। এখানে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কাহিনীটি সংক্ষেপে বলিতেছি। নন্দাদি গোপগণ শাস্ত্র-বিহিত দিনে এক পবিত্র স্থানে ইন্দ্র-যষ্টি রোপণ করিয়া মহ সমারোহে ইন্দ্রপূজা করিতেছিলেন; কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তাত! এখন আর ইন্দ্রপূজা করিবার প্রয়োজন নাই।" কৃষ্ণ ইন্দ্রপূজা বর্জ্জিত করিলে মহেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া গোকুলের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঝঞ্ঝাবাত, অশনিপাত ও প্রবল বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া গোকুলকে রক্ষা করিলেন। ইন্দ্রের ক্রোধ হইলে কি হইবে, কৃষ্ণ ত মিথ্যা বলেন নাই। উপরিচর বসুর কালে, খ্রীঃ পূঃ ৩২৫৬ অব্দে ভাদ্র শুক্ল-একাদশীতে রবির দক্ষিণায়ন হইত, কিন্তু কৃষ্ণের সময়ে সেদিন হইত না। বস্তুতঃ, কৃষ্ণের জন্মদিনে, গৌণচান্দ্র ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে, দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল। সে খ্রীঃ পূঃ ১৬শ শতাব্দের কথা। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়াছেন, খ্রীঃপূঃ ১৪৪২ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন; অতএব কৃষ্ণের জন্ম তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে হইয়াছিল। কৃষ্ণ জানিতেন, অয়ন-দিন পশ্চাদ্গত হইয়াছিল, এইজন্য তিনি পূর্ব্বকালের ইন্দ্রোৎসব রহিত করিয়া দিলেন। মনে হয়, তখন হইতে আর্য্য-সমাজে ইন্দ্রধ্বজ রোপণের তেমন প্রাধান্য থাকে নাই। কচিৎ কোথাও কোন কোন রাজবংশ প্রাচীন স্মৃতি বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু অনার্য্যদের মধ্যে ইহা এখনও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিহারের শক্রোত্থানের দিন 'করম-পরব' হয়। ইন্দ-পরবের সহিত অনেক বিষয়ে ইহার সাদৃশ্য আছে।

ইন্দ-পরব হইতে আর্য্য কৃষ্টির এই যে কাল নিরূপিত হইল, ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র কালের সাক্ষী; ইহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দে ভারতে প্রথম আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং আর্য্য-কৃষ্টির বয়স ৩৫০০ বৎসরের অধিক নহে—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই সিদ্ধান্ত টিকিতেছে না। ইন্দ-পরবে কিঞ্চিদধিক পাঁচ সহস্র এবং জিতাষ্টমীতে কিঞ্চিদূন ছয় সহস্র বৎসরের পুরাতন স্মৃতি রক্ষিত আছে। অন্যান্য পূজা পার্ব্বণে হয় ত আরও প্রাচীনকালের স্মৃতি আত্মগোপন করিয়া আছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, এক-একটা ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে খ্রীষ্টজন্মের ছয়-সাত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যাইতে যাইতে আপনার অবশেষটুকু রাখিয়া গিয়াছে।

রায়বাঘিনী ও কালাপাহাড়

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে রমণীর বাস্তবমূলক একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, "মেয়ে যেন রায়বাঘিনী"। এই আদর্শ রমণী "রায়বাঘিনী" কে ছিলেন—কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, না রূপকথার নায়িকা—তৎসম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বিন্দুমাত্র কাহারও জানা ছিল না। হুগলী জেলার একজন প্রবীণ সাহিত্যিক ভাঙ্গামোড় নিবাসী অম্বিকাচরণ গুপ্ত শেষ বয়সে "হুগলী বা দক্ষিণরাঢ়" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া নানা ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রবাদকাহিনী প্রকাশ করেন (১৩২১ বঙ্গাব্দে)। ঐ গ্রন্থে ভুরসুট পরগণার যে বিবরণ আছে (পৃ. ৭১-৭৩) তন্মধ্যে রায়বাঘিনীর বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নাই। অর্থাৎ ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত রায়বাঘিনী নামে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির পরিচয় অভিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসুর নিকটও অজ্ঞাত ছিল। ঐ সময় হঠাৎ "রায়বাঘিনী" নামক পৃথক্ এক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—তন্মধ্যে ভূরিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-রাজবংশের যাবতীয় বিবরণ ও বিস্তীর্ণ বংশলতা সর্ব্বপ্রথম লোকলোচনের গোচরীভূত হয়। রাজা রুদ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পত্নী রাণী ভবশঙ্করী পাঠান সেনাপতি ওসমানকে পরাজিত করিয়া মোগল সম্রাট আকবরের নিকট "রায়-বাঘিনী" উপাধি অর্জ্জন করেন—এই অপূর্ব্ব কাহিনী অদ্য প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ অনেকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, বিশেষ করিয়া ভুরসুটের অধি-বাসিগণ। কেহ কেহ সম্প্রতিও রায়বাঘিনীর গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী পুনঃস্থাপন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (রবিবারের যুগান্তর, ৫ ভাদ্র ১৩৬১; প্রবাসী আশ্বিন ১৩৬১—সচিত্র)। এই সকল (...) একমাত্র উপজীব্য হইল ঐ "রায়-বাঘিনী" গ্রন্থ। ... প্রামাণ্য বিচারের পূর্ব্বে আমরা গ্রন্থকার বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করি।

ভুরসুটের ব্রাহ্মণরাজাদের গুরুবংশ সমগ্র পরগণায় অতীব সম্মানিত ছিল। ইঁহারা শাণ্ডিল্যগোত্র "শাণ্ডিল্যবংশ-বিশ্রুত" সুবুদ্ধি মিশ্রের সন্তান—অর্থাৎ, মূলতঃ রাঢ়ীয় শ্রেণী হইতে বিভিন্ন "সপ্তশতী" শ্রেণীর অন্তর্গত এবং অন্যান্য বহুতর সপ্তশতী বংশের ন্যায় রাঢ়ীয় সমাজের সহিত বহু শতাব্দী ধরিয়া সামাজিক আদান-প্রদানে আবদ্ধ। এই বংশে মহাদেব বিদ্যাবাগীশ নামে একজন বিখ্যাত সাধক ও পণ্ডিত ১৫২৭ শকাব্দে (১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে) আনন্দলহরীর এক উৎকৃষ্ট টীকা ("তত্ত্ববোধনী") রচনা করেন—তাঁহার নিবাস ছিল "মন্দারণে বিষ্ণুপুরগ্রামে শ্রীরামসন্নিধৌ"। ইহা অতিমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই "শুদ্ধশ্রোত্রিয়" বংশের বর্ত্তমান পুরুষ-গণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কুপ্রভাবে শত শত বৎসরের ঐতিহ্য অম্লানবদনে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় শাণ্ডিল্যের পরিবর্ত্তে এখন "বন্দ্যোপাধ্যায়" বলিয়া পরিচয় দিতেছেন—ঐতিহ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও কুল সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকিলে কেহ উৎকৃষ্টতর শ্রোত্রিয় শ্রেণী হইতে অপকৃষ্ট "বংশজ" শ্রেণীতে নামিয়া আসিয়া গৌরববোধ করিতে পারে, ইহা আমাদের ধারণার অতীত। এই বংশের যে শাখা ভুরসুট রাজবংশের কুলগুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিল তাহার আদিপুরুষ হরিদেব ভট্টাচার্য্য ঐ পরগণায় দেবীপুর গ্রাম বসস্থাপন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুবরাম সাধু ... গ্রামের অধিবাসী। কনিষ্ঠ পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রামদেব ভট্টাচার্য্য কুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন বিষ্ণুঠাকুরের পৌত্র সীতারামের হস্তে কন্যা-দান করিয়া রাঢ়ীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন ("সিতারামঠাকুরো ভুরসুটনিবাসী সাণ্ডিল্য রামদেব ভট্টাচার্য্যস্য কন্যাবিবাহ"—বড়কলেকেশীয় কুলপঞ্জী, কুলপঞ্জী প্রকরণ, ১৪১ পত্র)। রাজা নরনারায়ণ তাঁহাকে ভূমিদান করেন। দানপত্রের তারিখ ১ বৈশাখ ১১০৫ সাল (১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ)—দেবীপুরে ৪১/০ বিঘা এবং রায়চকে ১০/০ বিঘা (হুগলীর ৫০৫৮ নং তায়দাদ)। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামদেবের অধস্তন সপ্তম পুরুষ:—রামদেব—রামকিশোর (আঁটপুর-লোহাগাছি নিবাসী)—কালীপ্রসাদ তর্কশিরোমণি (রাজা তিলকচাঁদের সভাপণ্ডিত)—রামচাঁদ—রাধানাথ—কেদার-নাথ তর্কালঙ্কার—বিধুভূষণ। ইঁহারা দশ বৎসর পূর্ব্বেও সাণ্ডিল্য বংশ বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না—এখন দেখা যায় গড্ডলিকাপ্রবাহে পড়িয়া "বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ" বলেন (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৬১, পৃ. ৭০৫)। "রায়বাঘিনী" গ্রন্থ প্রকাশ করার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভূত পরিশ্রমে দুই খণ্ডে "হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস" মুদ্রিত করেন (১৩৩০, ১৩৩৫ সাল—তন্মধ্যে রায়বাঘিনী গ্রন্থের বহু প্রতিপাদ্য পুনঃস্থাপিত হইয়াছে (২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯, ৭৯ ৮১, ১৪৫-৪৯ দ্রষ্টব্য)।

সম্ভ্রান্ত রাজগুরুবংশীয় মনীষী দ্বারা রচিত গ্রন্থদ্বয়ে ভুর-সুটের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতি অনেকের এবং বিশেষ করিয়া নিজ ভুরসুটবাসিগণের প্রামাণ্যবোধ ও আস্থাস্থাপন স্বভাবসিদ্ধ। পরন্তু রায়বাঘিনী গ্রন্থটি প্রায় সর্ব্বাংশে জনশ্রুতিমূলক এবং "নষ্টমূলা জনশ্রুতিঃ" প্রবচনানু-

সারে পল্লী অঞ্চলের জনশ্রুতিও সাবধানে সংগৃহীত ও আলোচিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জনশ্রুতিকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিতে হইলে ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা তাহার সমর্থন আবশ্যক হইয়া পড়ে। উক্ত গ্রন্থ ঐতিহাসিক প্রমাণ-পত্র অত্যন্ত বিরল, মাত্র তিনটি বলা চলে—রাজবংশের নাম-মালা, গড়-ভবানীপুরের মণিনাথ শিবমন্দিরের ১৩০৬ শকাব্দের শিলালিপি ও রাজা নরনারায়ণের নামাঙ্কিত ১০৯২ বঙ্গাব্দের দলিল। ভূরসুটের এই ব্রাহ্মণ-রাজবংশের কীর্ত্তি-কলাপ বাংলার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমরা পনর বৎসর ধরিয়া এই বংশের এবং ইহার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বংশের পারিবারিক ইতিহাস গবেষণা করিয়া নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই এবং তাহাদের আলোচনার ফলে "রায় বাঘিনী" গ্রন্থোক্ত প্রায় সমস্ত কাহিনী নিষ্প্রমাণ প্রতিপন্ন হয়। "রায় বাঘিনী" গ্রন্থের ঘটনাপরম্পরার কালনির্ণয় একটি মাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত—১৩০৬ শকাব্দের শিলালিপি। ঐ সময়ে পাঠান সুলতান সিকান্দর সাহ বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত—তাঁহার আমলের একটি শিবমন্দির ৫০০-৬০০ বৎসর যাবৎ এখনও অক্ষতাবস্থায় বিদ্যমান, অথচ কোন প্রামাণিক গ্রন্থে তাহার উল্লেখমাত্র নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। আমরা ১৩৪৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে গড়-ভবানীপুর যাইয়া ঐ মন্দির ও শিলালিপি পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র মন্দিরটি বড় জোর ২০০-৩০০ বৎসর প্রাচীন এবং দ্বারোপরি শিলিপুর হস্তে খোদিত আছে:

শ্রীভগবত: রাম	শুভমস্তু শকাব্দ
দেবনারায়ণ	১৩০৬ ॥২১ শ্রাবণ

কৃত্রিম উপায়ে একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দিরকে সুপ্রাচীন প্রতিপন্ন করার জন্য এই শকাঙ্ক কল্পিত হইয়া থাকিবে। যে কোন ঐতিহাসিক এই মন্দির ও শিলালিপি পরীক্ষা করিয়া তাহার আনুমানিক কালনির্ণয় সহজেই করিতে পারিবেন। প্রবাসীতে (পৃ. ৭০৭) মন্দিরের যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহা দেখিলেও অনায়াসে বুঝা যায়, এই মন্দির ৫৭০ বৎসরের প্রাচীন নহে। অথচ বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় ও তাঁহার অনুযায়ী সকল লেখকই ১৩০৬ শকাঙ্ক অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও অনুমান করা যায় যে, মন্দিরের প্রকৃত নির্ম্মাণকাল ১৬০৬ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ)—শিল্পী ভুল করিয়া ১৩০৬ শকাব্দ উৎকীর্ণ করিয়াছে। কারণ, মন্দিরস্থিত দেবতার দেবোত্তর সম্পত্তির প্রাচীনতম সনদের তারিখ ১০৯২ সাল (অর্থাৎ ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) বটে। এই মূল্যবান সনদের প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল:

"৭ শ্রীশ্রীরাম

(নাগরীতে) শ্রীশ্রীরাম সহী (?)

এক সও এক বিঘা জমীন

স্বস্তি শ্রীযুত মণিরাম গিরি গোস্বামী সতচরিত্রেষু

দেবোত্তর পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে ভুরশিট্ট পরগণায় মৌজে হায় পতিত জমী ১০১ এক সও এক বিঘা তোমাকে শ্রীশ্রী৺মণিনাথ জীর সেবা সদাব্রতের খরচ কারণ তোমাকে দিলাম মৌজে হায় জায় মাফিক জমী চিহ্নিত করিয়া আবাদ তরদুদ করিয়া শ্রীশ্রী৺ সেবা সদাব্রতের খরচ ভোগ দখল করিবেন এহার রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি ইতি সন ১০৯২ সাল তারিখ ৫ বৈশাখ।"

সনদের অপর পৃষ্ঠে "জায় জমী" মোট ১৩ গ্রামে লিখিত আছে—সর্ব্বপ্রথম "গড় ভবানীপুর মন্দির সহ ৩ বাটী ১০" (বিঘা)। যে নকল হইতে প্রতিলিপি করা হইল তাহার তারিখ "৬ জুলুস ১১৮৫ হিজরী।" নকলে ভূমিদাতার নাম নাই—মূল সনদের শীলমোহরে হয়ত ছিল। এই দেবোত্তর-পত্রদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে ১০৯২ বঙ্গাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ১৬০৬ শকাব্দেই শিবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল—নির্ম্মাণের ৩০০ বৎসর পরে "মন্দিরসহ" দেবোত্তর দেওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। দানপত্রের ভাষা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, ইহা বাঙালী সনদ নহে—আদিম সনদ।

শিলালিপির অক্ষরার্থ কি আমরা জানি না—প্রকৃত বা কল্পিত প্রতিষ্ঠাতার কোন নামোল্লেখ তন্মধ্যে আমরা পাইতেছি না। তথাপি আমরা অবস্থাক্রমে ধরিতেছি যে আধুনিক বলিয়া দৃশ্যমান এই মন্দির বস্তুতই ১৩০৬ শকে নির্ম্মিত এবং তাহার প্রতিষ্ঠাতার নামও "দেবনারায়ণ রায়"ই, কেবল স্বাধীনতার যুগেও অদ্যাপি ঐতিহাসিক গোষ্ঠী ভূরশুটের এই প্রাচীনতম প্রস্তরলিপি ও তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। প্রশ্ন হইল, ১৩০৬ শকাব্দে (১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) বিদ্যমান এই দেবনারায়ণ রায় কে ছিলেন? রায় বাঘিনী গ্রন্থানুসারে (পৃ. ৩) তিনি ছিলেন রাজা কৃষ্ণ রায়ের পুত্র এবং দর্পনারায়ণের পিতা। এই গ্রন্থে মুদ্রিত বিস্তৃত বংশলতাটি একটি মূল্যবান উপাদান—ইহা যেভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা বলা আবশ্যক। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের বংশলতা সেকালে সমাজের একটি পৃথক সম্প্রদায় কুলশাস্ত্র নামে পৃথক এক বিদ্যাপ্রস্থান পরিপোষণ করিয়া রক্ষা করিতেন—অন্ত্য ১০০ বৎসর যাবৎ ঘটক সম্প্রদায়ের সহিত এই বিরাট গ্রন্থরাশি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থান অধিকার করিতেছে কৃত্রিম রচনাবলী। ভূরশুট রাজ-বংশের অধস্তন কৃতী পুরুষ পাটনার উকীল অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বগ্রাম বসন্তপুরের ঘটক কেদার

চট্টোপাধ্যায়ের পুথি হইতে বংশলতা প্রথম সংগ্রহ করেন—উক্ত পুঁথির ১৬২ পত্রে লিখিত বংশলতার প্রতিলিপি তাঁহার নিকট এবং অপর একজন অভিজ্ঞ গবেষকের কৃপায় আমরা পাইয়াছি। পুথির মালিক কেদার চট্ট ও তাঁহার পুত্র অসম্ভব মূল্য হাঁকিয়া কাহাকেও তাহা স্পর্শ করিতে দিতেন না। এই পুথিটি অতীব মূল্যবান্—ভুরশুট রাজবংশের সমস্ত শাখা-প্রশাখা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। অতুলবাবুই বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যকে এই বংশলতা পাঠাইয়াছিলেন। মূল রাজশাখাটি এই:—মুরারি ওঝা—গৌরি—গোপাল—মদন—সদানন্দ—"রাজা" কৃষ্ণ রায়—দর্পনারায়ণ—উদয়নারায়ণ—প্রতাপনারায়ণ প্রভৃতি। কিন্তু এই প্রামাণিক বংশলতার মধ্যে চারিটি কৃত্রিম নাম যথেচ্ছ যোজনা করিয়া রায় বাঘিনীতে মুদ্রিত হইয়াছে—দেবনারায়ণ, সত্যনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও স্বয়ং রায় বাঘিনীর স্বামী রুদ্রনারায়ণ। তন্মধ্যে শিবনারায়ণ ছিলেন প্রতাপনারায়ণের পুত্র, পিতামহ নহেন। বাকী তিনটি নাম বসন্তপুরের পুথিতে কিম্বা অন্যান্য দেশের কোন ঘটকপুঁথিতে অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল বিভিন্ন পুঁথির নামমালা আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃ. ১৯২-২০০; প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৯, পৃ. ৫৩৫-৩৯)। সুতরাং রুদ্রনারায়ণ কিম্বা তাঁহার রাণী রায় বাঘিনী এই রাজবংশের কেহ ছিলেন বলিয়া কোনই প্রমাণ নাই। রাজা কৃষ্ণ রায়ের ৯৯০ বঙ্গাব্দের দলীল আবিষ্কৃত হওয়ায় এই সত্য দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বংশলতায় কেন চারি পুরুষের কৃত্রিম নাম যোজনা করেন তাহা সহজেই অনুমেয়—১৩০৬ শকাব্দ হইতে প্রতাপনারায়ণের কালব্যবধান প্রায় ৩০০ বৎসর, তাহাতে মাত্র তিন চারি পুরুষ হইতে পারে না। শকাব্দটি অভ্রান্ত ধরিলে অন্ততঃ চারি পুরুষের নাম যোজনা করা আবশ্যক।

ধরিয়া লওয়া যাক যে, রাজবৃত্তিভোগী বসন্তপুরের ঘটক ও অন্যান্য স্থানের ঘটকগণ চক্রান্ত করিয়া রায় বাঘিনীর স্বামী ও অন্য দুইটি নাম বাদ দিয়াছিলেন। বিধুবাবু দৈবাৎ কোন অজ্ঞাত ও অনুল্লিখিত প্রমাণ পাইয়া নামগুলি উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। ৯৯০ বঙ্গাব্দের কৃষ্ণ রায়ের দানপত্রাদি সব জাল; তাহা হইলে দেখা যায় মুরারি ওঝার অধস্তন সপ্তম পুরুষ, অর্থাৎ বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাসের বৃদ্ধপ্রপৌত্র পর্য্যায়ের লোক দেবনারায়ণ ১৩০৬ শকাব্দে (১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) বিদ্যমান ছিলেন। ইহা যে একেবারেই অসম্ভব তাহা না লিখিলেও চলে। কারণ কৃত্তিবাসের জন্ম আমাদের মতে ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে, অনেকের মতে আরও পরে। অর্থাৎ, দেখা যায় দেবনারায়ণের বৃদ্ধপ্রপিতামহ দেবনারায়ণের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন!! অপর দিকে রাজা প্রতাপনারায়ণ ছিলেন বিধুবাবুর বংশলতানুসারে দেবনারায়ণের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। প্রতাপনারায়ণের জন্মাব্দ হইবে প্রায় ১৬২০ খ্রীঃ—সে স্থলে টানিয়া ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিলেও এক পুরুষে ৪২ বৎসর পাওয়া যায়, রাজবংশের পক্ষে যাহা প্রায় অসম্ভব। আরও দু'এক পুরুষের নাম যোজিত হইলে ঠিক হইত!! অন্য দিকে বিধুবাবুর পূর্ব্বপুরুষ হরিদেব ভট্টাচার্য্য আকবরের সমসাময়িক হইলে তাঁহার পুত্র রামদেব শতাধিক বৎসর পরবর্ত্তী নরনারায়ণের দানভাজন হইতে পারেন না—পিতা-পুত্রের অভ্যুদয়কালের ব্যবধান এক শতাব্দী হওয়া প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ রামদেবের এক পুত্র বিদ্যাধর ১২০৯ বঙ্গাব্দে (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ আছে। বিদ্যাধরের পিতামহ হরিদেব কোন প্রকারেই ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না।

রায় বাঘিনী গ্রন্থে আর একটি অদ্ভুত কথা লিখিত হইয়াছে যে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "কালাপাহাড়" ভুরশুটের আলোচ্য রাজবংশীয় ছিলেন। অনেকে ইহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে বারেন্দ্র শ্রেণী ভাদুড়ী বংশীয় এক কালাপাহাড়ের অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল—কিন্তু তিনি আকবরের এক শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড় সুলতান বারবক সাহার কন্যার প্রেমপাত্র ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই বহুলপ্রচারিত কাহিনী বিশ্বকোষ প্রভৃতিতে পর্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে—অথচ ইহা একটি নিরবচ্ছিন্ন আকাশকুসুম। উক্ত সামাজিক ইতিহাসটি এ জাতীয় আকাশকুসুমে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ—অথচ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রন্থটিকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে যুক্তি-প্রমাণের এই বর্জ্জননীতি অতি শোচনীয় ও ভয়াবহ।

"আগড়ডাঙ্গা চৌধুরীবংশ" (১৩২৯) গ্রন্থানুসারে (পৃ. ১২-১৩) বর্দ্ধমান পাটুলী গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বংশে কালাপাহাড়ের জন্ম—পূর্ব্ব নাম নিরঞ্জন রায় (বা রাজু)। তিনি "বাসুদেব সার্ব্বভৌমের দৌহিত্র হরদেব ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায় ও জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। "বঙ্গাধিপতি সুলেমান কররাণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাজখাঁর কন্যা নজিরণের প্রণয়ে পড়িয়া সন ৯৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন" ইত্যাদি। এই গ্রন্থকার গ্রাম্য-বিবরণে ও বংশবৃত্তান্তে যথেষ্ট সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন—কোথাও অতিরঞ্জন নাই। দুঃখের বিষয়, কালাপাহাড়ের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী তিনি কোথা হইতে সঙ্কলন করিলেন, আমরা অবগত নহি।

৺বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থানুসারে কালা-

নবজাতক

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

ঝম্ ঝম্ ঝম্—

একটি একটানা শব্দ। যেন দুটি পায়ে মল পরে সারা উঠান ছুটে বেড়াচ্ছে একটি দুষ্টু মেয়ে। শব্দের আঘাতে ঘুম ভেঙে গেল রঘুনাথের। বিছানা থেকে উঠে এসে দরজা খুলে দাঁড়াতেই বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে লাগল তার। বড় ঠাণ্ডা! গুমোট গরমের পর এই ঠাণ্ডাটুকু পড়তেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল রঘুনাথের ভেতর থেকে। হাত পেতে বৃষ্টির জল নিয়ে চোখে মুখে দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল। অন্ধকার—নিবিড় নিশ্ছিদ্র আঁধার। কিছু দেখা যায় না। কাল মেঘের আবরণে তারাগুলি ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ঘনঘটা করে এসেছে বর্ষা। রাত্রি কত তা ঠিক ঠাহর করা যায় না। তবে রঘুনাথের মনে হয়—আর বেশী রাত নেই।

ঝম্ ঝম্ ঝম্—

ভৈরব রবে গর্জাচ্ছে বর্ষা। সাড়ম্বরে নেমে এসেছে অনেক দিন পর। কিন্তু হলে কি হয়, রৌদ্রের তাপে মাটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। আষাঢ় মাস শেষ হয়ে শ্রাবণ পড়েছে, এর মধ্যে বড় জল একটাও হয় নি। শুকিয়ে আছে পথ-প্রান্তর, নদী-নালা, পুষ্করিণী! আকরের ক্ষেতে আকরের সবুজ লিকলিকে ডগাগুলি একেবারে সাদা হয়ে উঠেছে। এই জলটায় তারা আবার রং ফিরে পাবে। আবার প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভাবীকালের সমৃদ্ধিময় সম্ভাবনায় হাওয়ার তালে তালে তুলবে ঢেউ। মাছরাঙা, শালিক, সাদা সাদা বকের পাল এসে নামবে ক্ষেতের আলে। রঘুনাথের কাজ যাবে বেড়ে। তারপর কয়েকটা মাস পরেই আবার সোনায় সোনায় ভরে উঠবে মাঠ। গর্বে নুয়ে নুয়ে পড়বে ধানগাছের মাথাগুলি, বার বার মাথা ঠুকবে চাষীর বাড়ীতে নিয়ে যাবার তাগিদে।

এই সব ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল, ক্ষেতের আলগুলি ভাল ভাবে মেরামত করে রাখতে পারে নি রঘুনাথ। মেঘের এই অকৃপণ দান সব অপচয় হয়ে যাবে, এ সময় জলকে বেঁধে রাখতে পারলেই লাভ! রঘুনাথ অনেক দিন পর আজ চাষ করতে পেয়েছে।

বাঁশের ছাতাটার খোঁজে একবার গোয়ালঘরের দিকে গেল রঘুনাথ। গরুগুলো তখন মাথা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। কোনটা আবার সামনে পড়ে-থাকা ঘাসের টুকরো মুখে নিয়ে ঘুম-জড়ানো চোখেই চিবুচ্ছিল, হঠাৎ রঘুনাথের পদশব্দে উঠল ধড় মড় করে। রঘুনাথ তাদের উদ্দেশ করে বলল, থাক্ থাক্ তুদের লিতে আসি নাই, ঘুমা।

ছাতাটা গোয়ালের আড়াচে রাখা ছিল, তাই হাতড়াতে লাগল, কিন্তু কোথাও পেল না। গত সনে রথের মেলায় ছাতাটা কিনেছিল রঘুনাথ। বেশ মজবুত ছিল জিনিষটা, বাঁশের ছিলা দিয়ে পুরু করে বুনেছে ডোমনা ডোম, একটুও জল গলে না। ভাবল—হয়ত অন্য কোথাও তুলে রেখেছে উষা, তাই ধীরে ধীরে তার বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে উষা। জলধারার শব্দ-সঙ্গীতে ঘুম যেন আরও পেয়ে বসেছে উষাকে। রঘুনাথ বিছানার এক পাশে আস্তে আস্তে বসল, তারপর তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকল রঘুনাথ এই বৌ! এই—

উষা কোনও জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুল। রঘুনাথ আর জাগাবার চেষ্টাও করল না। দরজাটা খোলাই ছিল —একটা বেশ ঠাণ্ডা আমেজ আসছিল বাতাসের সঙ্গে। এমনই জল যদি আরও গোটাকয়েক দেন দেবতা তবে কত ধান পাবে, মনে মনে তারই একটা হিসাব করতে লাগল। বছরের খরচ, দায়-ধাক্কা, পূজা-পার্বণ। এ ছাড়াও অসুখ-বিসুখ আছে, তার মধ্যে সামনেই একটা মোটা খরচও আছে। কয়েক মাস পরেই উষার ছেলে হবে। ছাড়বে না কুটুমরা—একটা ভোজ দিতেই হবে তাকে। বেশ খরচ হবে, তা হোক—ভগবান মুখ তুলে চাইলে খরচকে সে পরোয়া করে না। সেই সঙ্গে আরও একটা খরচ ধরা হয় নি—সেটা উষারই জন্য। কতবার সে চেয়েছে বাসন্তী রঙের মিহি সুতোর একটি সাড়ী। তখন দেবার অবস্থা ছিল না রঘুনাথের, আজ যখন ভাল দিনের মুখ দেখবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তখন···ভাবতে ভাবতে কোন্ সময় নিদ্রিতা উষার চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে আনমনেই তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল রঘুনাথ। বেশ একটা মিষ্টি গন্ধ বেরিয়ে এসে রঘুনাথের নিঃশ্বাসের সঙ্গে গেল মিশে। জোরে জোরে বার দুই শ্বাস নিল রঘুনাথ। হঠাৎ ভাল লাগার নেশায় কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল ওর মন।

ঘণ্টা দেড় দুই পরে বৃষ্টির তীব্রতা কমে গেল। অনেকটা কেটে গেছে মেঘটা, মেঘের ফাঁক দিয়ে শেষরাত্রির চাঁদ উঁকি মেরে যেন জানিয়ে দিল রজনীর বিদায়ক্ষণ, উঠে এল

বিছানা থেকে রঘুনাথ—মাথার উপর শুকতারাটি উঠল জল্ জল্ করে।

রঘুনাথ আবার একবার ঊষাকে জাগাবার তাগিদ অনুভব করে বললে, অ বৌ উঠ, ভোর হুঁয়্যা আইল যে রে! —শেষরাত্রির ঘুম কি আর অত সহজে ভাঙে, তাই নিরুত্তরই রইল ঊষা। কিন্তু বারকয়েক ডাকতেই ঊষা বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, বাবারে বাবা, এখনই সকাল হেল নাকি!

—না হয় নাই, তবে হবার দেরিও নাই, হাঁই ভাল্ শুকা তারা উঠেছে।

চোখ দুটি বন্ধ রেখেই ঊষা বলল, উঠুক, এখন রাত আছে। লাও ঘুমাও···হাঁ রাত আছে, কিন্তু শোয়া আর চলবে না রঘুনাথের। ভোরের আলো ফুটবার আগেই তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ক্ষেতের মাথায়। যতটা পারে জল ঢুকিয়ে রাখবে ক্ষেতগুলোয়।

আট-দশ বছর ক্ষেতের মাথায় আসে নি রঘুনাথ—আসতে পায় নি, এই আট-দশ বছরেই কি করে দিয়ে গেছে ধেনো জমিগুলোকে। হাজার বিঘার এলাকার মধ্যে একটা জমিও ভাল নাই। মাটিগুলো সব পাথর হয়ে গেছে। অমন যে সোনাফলানো মাটি, তাকে একেবারে ঢেকে ফেলে সিমেণ্ট আর পাথরকুচি দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে মিলিটারীরা। 'উড়া-কলে'র আস্তানা করবার আর জায়গা পায় নি তাদের জমি-গুলো ছাড়া! শুধু কি জমি, গাঁ কে-গাঁ তুলে দিয়ে—ঘর-দোর ভেঙে-চুরে সেই জায়গায় তুলেছিল মিলিটারী ব্যারাক। আজও ভাঙা ইটের চালাগুলো পড়ে আছে। নেই মাটির সেই নয়ন-ভোলানো রূপ! যেন রোগা ভোগা শীর্ণা মেয়ে, যেন উৎপীড়নের কঠোরতায় ম্রিয়মাণা।

তা হোক, আজ যখন জমি ফিরে পেয়েছে, তখন আবার মাটির সেই রূপটিকেই ফিরিয়ে আনবার সাধনায় নেমেছে রঘুনাথ। সেদিনের কথা মনে পড়ে, যখন অনেক সাধ্য-সাধনার পর হুকুম পেল গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষ আবাদ করবার, তখন থেকেই সারা দিন পরিশ্রম করে মাটির উপরের শক্ত ছালটাকে গাঁইতির আঘাতে ভাঙতে কিন্তু করে নি। এতটুকু ক্লান্তিবোধ করত না মানুষগুলি, গাঁইতির ফলার সঙ্গে পাথরের সংঘাতে জলে উঠত আগুন—তবু পরাজয় স্বীকার করতে পারে নি, স্বীকার করে নি। সেই মাটিকে আরও সরস, আরও নরম করতে না পারলে ধানের গাছ কোঁড় মেলে আকাশের দিকে তাকাবে না, ফলন হবে না। তাই মাটিকে ভিজিয়ে রাখতে চায় রঘুনাথ। সার দিয়ে রেখেছে—আর দু'বার চাষ দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। এই ক্ষেতগুলো হতে আগে যে ফসল পেয়েছে সে তুলনায় বর্তমানে কত পেতে পারে, মনে মনে তারই একটা তুলনা-মূলক হিসাব করে দেখল রঘুনাথ। ভাবতে ভাবতে চোখ দুটোর দৃষ্টি চিক্ চিক্ করে উঠল।

ঘুমন্ত ঊষাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, শুন বৌ-ইবারে তুকে একটা সাড়ী কিনে দিব।

—হুঁ, তুমি আবার দিবে নাই।

ঊষার বিশ্বাস হ'ল না স্বামীর কথা।

—পত্যালি নাই বুঝি?

বিশ্বাস না করবারই কথা। অনটনের সংসার রঘুনাথের। প্রয়োজনীয় সমস্ত দায়ই মেটানো যায় না, তার আবার সখের দাবি! সে যাই হোক এখন ত আগের মত অবস্থা থাকবে না তার। উঃ, কি কষ্টেই আট-দশটা বছর কেটেছে রাস্তায় রাস্তায় চানাচুর ফিরি করে বেড়িয়েছে রঘুনাথ। এখন ত আর সেদিন নেই, চাষের ক্ষেত যখন ফিরে পেয়েছে তখন সব ফিরে পাবে।

—দেখিস্ যদি না দিই, তবে আমি—

—যাক্ যাক্। মুখ চেপে ধরল ঊষা। তারপর বলল, তুমার কি ঘুম লাগে না নাকি? এখনও ঢের রাত আছে, শুয়ো।

আপনার বিলম্বিত দেহটাকে খানিক সরিয়ে নিয়ে রঘু-নাথের জন্য জায়গা করে দিল ঊষা।

রঘুনাথ চুপ আবার। এই পরিবেশে ঊষাকে আজ তার বড় ভাল লাগছে। নিজের মধ্যে একটা দারুণ আকর্ষণ অনুভব করল রঘুনাথ—যেন সমস্ত বৈভব নিয়ে পাশে শুয়ে আছে ঊষা।

— না, এখন শুলে আর উঠতে লারব, বৌ; তুই ঘুমা।

বলেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রঘুনাথ। তারপর এক সময় হাতে কোদালটা নিয়ে পড়ল বেরিয়ে। তখনও রাত্রির ঘোর কাটে নি ধরণীর বুক থেকে।···

—কে যায় হে?

চলতে চলতে পিছন দিক থেকে একটা প্রশ্ন আসতেই থমকে দাঁড়াল রঘুনাথ। পিছনপানে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু স্পষ্ট চেনা গেল না লোকটাকে। একটা অতি-প্রাকৃত চিন্তা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল! জায়গাটা ভাল নয়—তার উপর মিলিটারীরা ছিল, তাদের আমলে কত অপমৃত্যু হয়েছে কে জানে। ঐ ত হরি সামন্তের জোয়ান মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। হাতের কোদালটা আঁকড়ে ধরে বলল, কে হে?

—আমি রামদাস, রঘুদাদা নাকি?

—হঁ, ভালই হ'ল এক-টা সঙ্গী মিলল, আয়।

রামদাস কাছে আসতেই রঘুনাথ বলল, খেতারো কৈবর্তে যাবি ত?

—ই একবার যাই।

দু' জনেই নীরবে এগিয়ে চলল। খানিকটা গিয়ে রঘুনাথ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বল ত রামদাস, ই-সালে কেমন ফসল ঘরে আসবেক! ভালই, কি বল।

—ই সনে তেমন হবেক নাই দাদা, ইবারে ত মাটি ঠিক কৈরতেই গেল। মাটি কি রাখ্যাছে উয়ারা। আবার তাথেই সাধ মিটে নাই, শালারা যাবার সময় বোমা ভুপে দিয়ে গেইছে মাটির তলে।

কথাটা সত্যিই বটে। এই বৈশাখেই, মাটির উপর গাঁইতির কোপ চালাতে চালাতে বিরাট একটা বোম্ ফাটার শব্দ হয়ে গেল। উঃ, শালা তিলির হাতটা নিয়ে গেল। প্রাণে বাঁচল মানুষটা—এই যা।

—তা ঠিক কয়্যাছিস, তাও তুর অনুমান কেমন লাগে? বলল রঘুনাথ।

—দাবতা যদি মু ঘুরাএ না বসে দাদা, তবে আর থার-দুর কৈরতে হবেক নাই।

—আমারও তাই মনে হয় রামদাস।

মাঠের কাজ সেরে বাড়ীতে ফিরতে একটু বেলাই হ'ল রঘুনাথের। উষা তখন বাড়ীর বাসিপাট সেরে উনুনে আঁচ দিয়েছে।

—বৌ, অ বৌ—বাড়ীতে ঢুকেই ডাকল রঘুনাথ।

—কি গো?

—দে, তাড়াতাড়ি টুকচা চা কৈরে দে।

—আবার দিগ্‌বিজয়ে যিবাবে নাকি?

—হুঁ! মৈ আনতে যাব—আসনসোল।

কালকের মধ্যেই ক্ষেতে মই দিয়ে সমান করে নেবে রঘুনাথ, তারপর আফরগুলিকে এনে এই জল থাকতে থাকতেই পুঁতে ফেলবে।

—তবে দুটি ভাত-ই কৈরে দি গো।

—না না, তুই চা-ই দে।

তর আর সইল না রঘুনাথের। উষা একটা থালে কিছু মুড়ি আর এক কাপ চা এগিয়ে দিল স্বামীকে। তাই খেয়ে বেরিয়ে পড়ল রঘুনাথ।

বৈকালের দিকে আসানসোল ছাড়ল রঘুনাথ। কাঁধের উপর মইখানা, এক হাতে একটা ছোট্ট পুঁটুলি, সোজা রাস্তায় গেলে রাস্তাটা বেশী পড়ে যাবে বলে মাঠের পথ দিয়ে গাঁয়ে ঢুকল রঘুনাথ। নূতন বাঁধের পাড়ের নীচ দিয়েই রাস্তা। কিন্তু সে রাস্তার গা দিয়ে পাড়ে উঠল। ঠিক বাঁধের ঘাটেই রাস্তার ধারে উষাকে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপনে রত দেখে থমকে দাঁড়াল রঘুনাথ।

—ই খ্যানে দাঁড়াএ কি সলা হৈছে গো!

উষা কথা বলছিল অবিনাশ মণ্ডলের মেয়ে মেনকার সঙ্গে।

—যা বৌ, পরোয়ানা হাজির, ঘরে যা! যাও দাদা লিয়ে যাও বৌকে সাথে কৈরে।

রঘুনাথ তার কোন জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কখন আলি মেনি!

—আজ সকালে। ভাবলাম, নাইবা থাকল মা-বাপ, গাঁয়ে ফিরে আস্যাছে সবাই যখন, তখন একবার দেখে আসি মানুষগুলাকে।

—ভালই কৈরেছিস। উঠেছিস্ কুথা।

—গুপী কাকার ঘরে।

—থাকবি ত?

—দুটা দিনের ছুটি যে! কঠিন ভগ্নিপতি কৈরেছিলে দাদা।

কথাটা শুনে হাসি এল উষার মুখে!

—সবাই সমান ঠাকুরঝি!—কথাটি বলেই আড়চোখে একবার তাকাল উষা রঘুনাথের মুখের দিকে। রঘুনাথও তাকিয়েছিল উষার মুখের পানে।

হঠাৎ চোখাচোখি হতেই মাথাটা নামিয়ে নিল উষা।

—অনেক দিন পর আসছি নিমন্তন্ন কৈরে খাওয়াবে নাই দাদা?

খাওয়ানোই উচিত, কিন্তু এখন যে ঘরে বাড়তি খাবার একেবারেই নেই! কথাটা এড়িয়ে গিয়ে তাই বলল, পুষ্ (পৌষ) মাসে আসিস, মেনি!

—ক্যানে গো?

—এক-ট ভোজ দিব সেই সময়। বলল রঘুনাথ।

—সুখ সমাদে ভোজ ক্যানে গো দাদা?

—শুধা তুর ভাজকে। বলেই অপাঙ্গে উষার পানে তাকিয়ে মুচকি হাসল রঘুনাথ। উষা মাথার কাপড় একটু-খানি টেনে দিয়ে বলল, আঃ! লজ্জাও নাই।

—কি টে—কি এমন সুখবর আছে লো? গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল মেনকা।

—উয়ার কথা কি শুনছ ভাই ঠাকুরঝি।—বলল উষা।

—হুঁ, আমি মিছা কথা বলি বুঝি, হেই ভাল, মেনি, তুর ভাজের তরে আসনসোল থাইকে লিয়ে আস্যাছি আচার। বলে আবার তাকাল রঘুনাথ উষার পানে।

—তাই নাকি টে? সন্ধ্যা বেলায় যাব ভাজ, খাওয়াস কিন্তুক।

—হাঁ যাস। বলল রঘুনাথ।

চলে গেল রঘুনাথ। তারপর আরও খানিকটা সময় মেনকার সঙ্গে আলাপ করে, উষাও বাড়ীর পথ ধরল।

দেখতে দেখতে সালের মাস কয়টা গেল কেটে। কোঁড় মেলে বেশ জেগে উঠেছে ধানগাছগুলি—মাঠের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। একেই বলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বেশ হয়েছে ফলন—লম্বা লম্বা শিষের গায়ে ছোট্ট ছোট্ট সোনার বরণ ধানগুলি—পৃথিবীর বুক থেকে দুধ টেনে নিয়ে সুপুষ্ট হয়ে উঠেছে তারা!

রঘুনাথের আজকাল বেশীর ভাগ সময় কাটে মোড়ের মাথায়ই। এ সময়টায় নানা উৎপাত এসে জমা হয়, গরু-বাছুর আছে, চোর-বদমায়েসের অভাব নেই, তাদের সকলের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে যতক্ষণ খামারে নিয়ে না তুলছে ততক্ষণ বিশ্রাম নেই তার।

মাঝে মাঝে উষা অভিমানভরা কণ্ঠে বলে, বলি দিনে দিনে হঁয়্যা যাইছ কি, নিজের শরীলটা একবার ভালো দেখেছ?—কিন্তু সে দেখবার সময় এখন নেই রঘুনাথের। সে উত্তর দেয়—আর দশটা দিন বৌ, তার পরেই তুর আঁচলেই বাঁধা থাকব, তখুন ছিলার ওক্কুহাতে কিস্তুক ছড়ায় দিতে পাবি নাই।

—উ সোব কথা ছাড়, আর তুমি রাত্যা উঠানে থাকতে পাবে নাই, আমার ডর লাগে না, ঘরে এক-ট মানুষজন নাই, যদি—

সেদিন বলল উষা। সব খোলসা করে বলতে কেমন যেন লজ্জা হ'ল তার, তাই গোটা বক্তব্যটা প্রকাশ করতে পারল না।...এই নয় মাস চলছে উষার। চলতে ফিরতেও কষ্ট হয়। কোন কাজকর্ম্ম করতে পারে না!

—তা ঠিক কয়্যাছিস্ বৌ, নিমার মাকে আজ কয়্যা দিব, আস্তা থাকবেক তুর কাছে।

গাঁয়ে ভাল ধাই বলে সুনাম আছে নিমার মায়ের। এ বিদ্যাটি শিক্ষা পেয়েছে নিমার মা তার শাশুড়ীর কাছ থেকে। সেও ভালই ছিল। নিমার মা আরও নিপুণ, আরও চটপটে।

—আর বুদি কিছুর দরকার নাই? আগুন-পাত্তির ব্যবস্থা ত করা চাই!

—হঁ্যা, তা আমি কৈরে রাখ্যাছি বৌ!

দেখতে দেখতে দিন কেটে গেল। গ্রামে যেন পরব পড়ে গেছে। আট বছর আগের উদ্যম নিয়ে আবার জেগে উঠেছে গ্রামের মানুষগুলি, লক্ষ্মীকে বরণ করে নেবার আয়োজনে ব্যস্ত গ্রামের মেয়েরা। খামার পরিষ্কার করে, গোবর-মাটি দিয়ে নিকিয়ে একেবারে পূজামণ্ডপের পবিত্রতা আনবার চেষ্টায় তারা ব্রতী। ধানের পালৈ হবে—পাড়ার ছেলেমেয়েরা এসে সেই পালৈয়ের চারপাশে লুকোচুরি খেলবে। রঘুনাথ ভাবে, নূতন ধানের সঙ্গে সঙ্গে তারও ঘরে আসছে নূতন অতিথি—অন্যান্য চাষীদের মত সেও তার বাচ্চা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে এসে বসবে খামারে, বড় হলে তার ছেলেও ওদের মতই খেলা করবে। আর তারই সঙ্গে—ধানের হিসাবও শিখবে সে—সন শালি রাশি—

পিছন-বাড়ীটি নিকিয়ে নিচ্ছিল রঘুনাথ, এমনি সময় রামদাস এসে বলল, মিছাই ই সোব কৈরছ দাদা!

—ক্যানে রে? চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাল রঘুনাথ।

—শুন নাই কিছু?

—কৈ না ত!

—জমীদার হুকুম কৈরেছে। আট সনের খাজনা এক সাথ চাই, ত্যাবে ক্ষেতে লামতে পাবে কাস্তা লিয়ে।

—হুকুম?

—হঁ।

—কিস্তুক আট সাল ত আমরা জমিই চষি নাই রামদাস, যারা টাকা দেবার তারা টাকা না দিলে আমরা কি কৈরব?

গ্রাম ছাড়বার সময় কিছু কিছু করে টাকা পেয়েছিল ওরা। কিন্তু তা অতি সামান্য। কথা ছিল চাষ করে ঋণ শোধ করবে; কিন্তু চাষ করা হয় নি, কাজেই খাজনাও দিতে পারে নি।

—তা তুরা কি করবি ভাবছিস? মানবি এই হুকুম?—অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করল রঘুনাথ। একটা ব্যাকুল কণ্ঠস্বর এল বেরিয়ে। তার সঙ্গে যেন মিশে আছে বিক্ষোভের ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি!

—আমি বলি, চল দাদা, আমরা জোর কৈরে কাট্যা লিয়ে আসি। তারপর খাজনা। ফসল আনার আগে কে কুথায় খাজনা দিয়েছে দাদা?

—তার চায়্যা এক-ট বাইশী ডাক রামদাস, ধান না পালে আমরা যে মৈরে যাব রে! বলল রঘুনাথ।

—না না—আর আমরা মৈরব নাই দাদা। চল!

রঘুনাথ উঠতে যাবে এমনি সময় নিমার মা এসে উপস্থিত হ'ল খামারে, নিমার মায়ের মুখে হাসি ভাব। সে একেবারে রঘুনাথের আঁচল ধরে বলল, তীর্থ করাঞ দিও গো; আর মিষ্টি খাওয়াই দিও।

রঘুনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নিমার মায়ের মুখের দিকে।

—চাইছ কি—ঐ শুন কে কাঁদছে। ব্যাটার কান্না শুনছ। মুখে হাসি ফুটে উঠল রঘুনাথের। নবজাতককে মনে মনে আশীর্ব্বাদ জানাল।

সেভিংস ব্যাঙ্কের গোড়ার কথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবর্ষে ডাকটিকেট প্রবর্ত্তনের শতবার্ষিকী সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে সাধারণ ভাবে ডাকঘর ও বিশেষ ভাবে ইহার কোন কোন জনকল্যাণ বিভাগ—যেমন সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রভৃতির বিষয়ও কিছু কিছু আমরা জানিতে পারিয়াছি। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ রায় গত সংখ্যা প্রবাসীতে "ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক" শীর্ষক একটি তথ্যবহুল, উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সরকার পক্ষে ১৮৩৩ সনে কলিকাতায় সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঐ সময়কার সংবাদপত্রে নানা সংবাদ বাহির হয়। এই সকল হইতে আমরা সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা জানিতে পারি।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন কর্ত্তৃপক্ষ জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইয়া বেসরকারী ভাবে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ একটি "সেভিংস ব্যাঙ্ক" বা 'সঞ্চয়ার্থ ভাণ্ডার' স্থাপন করেন। এই ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী-সম্বলিত একটি অনুষ্ঠানপত্রও প্রচারিত হইয়াছিল। ব্যাঙ্কে এককালীন অন্যূন কত জমা দিতে হইবে, বৎসরে শতকরা কত সুদ আমানতকারী পাইবে, ইহাতে সে সব বিষয়ের উল্লেখ থাকে। ব্যাঙ্কের কলিকাতা এজেন্ট স্থির করা হয় ঐ সময়ের অন্যতম বিখ্যাত এজেন্সী হাউস আলেকজাণ্ডার কোম্পানীকে। সেভিংস ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হইলেন উইলিয়ম কেরী, জসুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যান।*

শ্রীরামপুরস্থ এই ব্যাঙ্কটি সম্বন্ধে শেষোক্ত অধ্যক্ষ জন ক্লার্ক মার্শম্যান পরবর্ত্তীকালে কতকটা বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। বিলাতের সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য্যকারিতায় উৎসাহিত হইয়া কেরী প্রমুখ মিশনরীগণ শ্রীরামপুরে ঐরূপ একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এটি মুখ্যতঃ দেশীয় খ্রীষ্টানদের জন্য স্থাপিত হয়। কিন্তু মিশনরীগণ সাধারণেরও এতখানি আস্থাভাজন হইয়াছিলেন যে, এই ব্যাঙ্কে এক বৎসরের মধ্যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড—তখনকার হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা—জমা পড়িয়াছিল। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ এবং অংশীদার ছিলেন সর্ব্বসাকুল্যে উক্ত চারি জন মাত্র। পক্ষান্তরে বিলাতে এইরূপ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ এবং অংশীদার থাকেন অনেক, আর একারণ তাঁহাদের পক্ষে ঝুঁকি লওয়া ও ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম তদারক করা সহজসাধ্য। শ্রীরামপুর তখন অন্য রাষ্ট্রের অধীন থাকায় ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষদের ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইত অনেক বেশী। তথাপি এখানকার সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। মিশন-কর্ম্মীদের পক্ষে অন্য কাজে ব্যাঘাত না করিয়া তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করা কঠিন হইয়া উঠিল। চারি বৎসরেরও

শ্রীরামপুর সেভিংস ব্যাঙ্কের তিন জন অধ্যক্ষ
উপবিষ্ট: উইলিয়ম কেরী: দণ্ডায়মান বাম হইতে: উইলিয়াম ওয়ার্ড, জসুয়া মার্শম্যান

অধিককাল যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিয়া অধ্যক্ষগণ ইহা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কারণ তাঁহাদের আসল কাজ ইহার দরুন বিশেষ ব্যাহত হইতে থাকে। আমানতকারীদের প্রত্যেককেই পাই-পয়সা পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। জন ক্লার্ক মার্শমান বলেন যে, ইহার কয়েক বৎসর পর তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক জনসাধারণের নিমিত্ত একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন।*

---

* সমাচার দর্পণ, ৩ এপ্রিল ও ২৬ জুন ১৮১৯। "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ১৬৪-৬ এ উদ্ধৃত।

* জন ক্লার্ক মার্শমানের কথাগুলি মূলে দিতেছি:

"The benefit which had resulted from Saving Banks in England induced Dr. Carey and his col

১৮২৪ সনে কলিকাতায় 'সঞ্চয় ভাণ্ডার' নামে চারি ব্যক্তির অধ্যক্ষতায় চৌষট্টি জন অংশীদার মিলিয়া একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঠিক সেভিংস ব্যাঙ্ক-জাতীয় ছিল না বলিয়া এখানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম না।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলেই শ্রীরামপুরস্থ সেভিংস ব্যাঙ্কের অনুরূপ একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপনের আয়োজন সর্ব্বপ্রথম সরকারী ভাবে আরব্ধ হয়। সরকার ১৮৩৩, ১৩ই এপ্রিল সংখ্যক 'কলিকাতা গেজেটে' স্বীয় কর্তৃত্ব ও ঝুঁকিতে একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ের কথা ঘোষণা করেন। দেশের সাধারণ জনগণের হিত-সাধনই ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচারিত হইল।† সরকার এই উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিলেন: সি. এম. ওয়াইল্ড—সভাপতি, জে. এ. ডোরিন, সি. ই. ট্রেভেলিয়ান, লে. কর্ণেল কেনেডি, ক্যাপ্টেন এইচ. বি. হেণ্ডারসন, থিওডোর ডিকেন্স এবং রামকমল সেন।‡

leagues, at this time, to attempt the establishment of a similar institution in India on a limited scale. It was intended to promote habits of frugality and industry, more especially in the rising community of native Christians. The circumstances under which it was commenced were not favourable to success. The names of only four individuals were offered as the guarantee of an institution which, in England, was found to require the guarantee of a large body of directors of social eminence. They were, moreover, residing under a foreign flag, beyond the jurisdiction of the British courts, and in a settlement which lay under the stigma of being the Alsatia of Calcutta. But the institution took with the public, and so great was the general confidence in them that, deposits to the extent of 5000*l*. were forced upon them within the first twelve months. The bank continued the operation for more than four years; but though it was felt to be a very useful institution, the deposits increased to a very inconvenient amount, and the labour of managing it was found to interfere with higher duties; it was, therefore, brought to a close by the return of every sum which had been deposited. Some years after, the plan was taken up by Lord William Bentinck, upon the same philanthropic principle, and the Government Savings Bank still continues to encourage the principle of economy in the Bengal Presidency."—*The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*. Vol. II. By John Clark Marshman, 1859. P. 223.

† *The Asiatic Journal*, Vol. XII, 1833, New Series: "Asiatic Intelligence—Calcutta," October, p. 82.

‡ *The Calcutta Courier*, May 8, 1833

কমিটি নিয়মাবলী প্রণয়নান্তর যথাসময়ে উহা সরকারে পেশ করিলেন। সকৌন্সিল বড়লাটের অনুমোদন লাভ

রামকমল সেন

করিবার পর ১২ই অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখের কলিকাতা গেজেটে নিয়মাবলী প্রচারিত হইল। মূল নিয়মাবলীর প্রধান প্রধান নিয়মের সংক্ষিপ্তসার এইরূপ: ১ সেভিংস ব্যাঙ্কের সমুদয় ঝুঁকি গবর্ণমেণ্ট লইবেন; ২ ব্যাঙ্কে টাকা গ্রহণে আমানতকারীদের মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ করা হইবে না; ৩ এককালীন গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ন্যূনপক্ষে এক টাকা; ৪ বৎসরে সুদ শতকরা চারি টাকা; ৫ সুদের হার বাড়াইতে বা কমাইতে হইলে, সরকারকে ছয় মাস পূর্ব্বে সে বিষয় কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে; ৬ কোন আমানতকারীর গচ্ছিত টাকা পাঁচ শত টাকায় পৌঁছিলে তাহা শতকরা চারি টাকা হারে 'লোন' বা কর্জ্জ রূপে গৃহীত হইবে।

সরকার এই সমস্ত ব্যক্তিকে লইয়া সেভিংস ব্যাঙ্ক পরিচালনার নিমিত্ত একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করিলেন: চার্লস মর্লে এবং জে. এ. ডোরিন (গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট), সেনা-বিভাগের এড্জুটাণ্ট-জেনারেল, রাজকীয় বাহিনীর এড্জুটাণ্ট জেনারেল, ফোর্ট উইলিয়মস্থিত রাজকীয় সেনাদলের সিনিয়র অফিসার, টাউন মেজর, থিওডোর ডিকেন্স, সি. ই. ট্রেভেলিয়ান, ক্যাপ্টেন জেমস কিড, দ্বারকানাথ ঠাকুর,

আশুতোষ দে (দেব), রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ।*

পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী ১৮৩৩, ১লা নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হইল। এই দিনকার আমানতকারীদের বিষয়ে সংবাদপত্রে এইরূপ বাহির হয়:

"The Savings Bank was opened to the public on the 1st November. On that day there were 62 deposits, varying from Re. 1 up to Rs. 400, and amounting in the whole to Rs. 3,828. The deposits were mostly in the pilot service, and assistants of every class in the public offices. At the head of the first day's list appear the names of Baboo Dwarkanath Tagore and his son for Rs. 400 each, as an example to the Hindu community. Many deposits of Rs. 5 and 10 were received from the native writers in the Bank of Bengal, Baboo Ramcomul Sein, the Khazanchee of that establishment, having exerted himself to explain to the assistants the nature of the benefits which the Savings Bank afforded."†

খোলার দিনেই চারি শত ব্যক্তি সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলেন। আমানতকারীদের টাকার পরিমাণ ছিল এক হইতে চারি শত টাকা পর্য্যন্ত। আমানতী টাকার পরিমাণ ৩,৮২৮৲ টাকা। আবার আমানতকারীদের অধিকাংশই ছিলেন পাইলট সার্ভিস এবং সরকারী আপিসের কর্ম্মী। প্রথম দিনের আমানতকারীদের পুরোভাগে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তদীয় পুত্র। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে চারি শত টাকা জমা পড়িল। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র বলিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে, মহর্ষি) না হইয়া যান না। উপরের উদ্ধৃতি হইতে আরও জানা যায়, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কর্ম্মীরা অনেকে পাঁচ টাকা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত জমা দিয়াছিলেন; আর উক্ত ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি বা দেওয়ান রামকমল সেনের চেষ্টাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বেই ব্যাঙ্ক-কর্ম্মীদের নিকট সেভিংস ব্যাঙ্কের উপকারিতার বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ক্রমে অনুভূত হইতে লাগিল। সংবাদপত্রসমূহেও ইহার উন্নতির বিষয় মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতে থাকে। সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রথম ছয় মাসের কাজ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে লোকে ১,৬৯,৬৭২ ৶৩ পাই ব্যাঙ্কে জমা দেয়, এবং তোলে ১৮,০৬১৷৶৭ পাই। সুতরাং ব্যাঙ্কে আমানত ছিল বাদবাকী ১,৫১,৬১০৷৶৮ পাই। এই আমানতী টাকার মধ্যে কতক অংশ ব্যাঙ্কে জমা থাকে, এবং অবশিষ্টাংশ শতকরা চার টাকা সুদের 'লোনে' পরিণত করা হয়। ১৮৩৪ সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত আমানতী টাকার পরিমাণ দুই লক্ষের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়ায়। এ বৎসর এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ

দ্বারকানাথ ঠাকুর

প্রতিদিন গড়ে জমা পড়িয়াছিল ১২৫৬৲ টাকা। মাত্র মার্চ্চ মাসের প্রাত্যহিক গড় ছিল ১৫০৬৲ টাকা। এপ্রিল মাসের গড় ছিল কিছু কম, অর্থাৎ, ১৪৩৫৲ টাকা। প্রতিদিন গড়ে আমানতকারীরা তোলেন ১৩৩৲ টাকা করিয়া। এপ্রিল মাসের গড় ছিল অন্যান্য মাসের চেয়ে বেশী—২৩৮৲ টাকা।*

সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপনের নয় মাস পরে আবার ইহার কার্য্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইল। 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র' ১৮৩৪, ১৩ আগষ্ট সংখ্যায় এইরূপ লেখেন:

"We publish today an abstract of the operations of the Savings Bank from its commencement to the 31st ultimo, a period of nine months only. In that short space the deposits have amounted to Rs. 2,75,635 of which less than one-sixth, namely the sum of Rs. 45,044 only has been withdrawn—the

---

* *The Asiatic Journal*, Vol. XIII, 1834. N.S "Asiatic Intelligence, Calcutta." April. Pp. 244-5.

† *Ibid, ibid*, p. 244.

* *The Calcutta Courier* (Supplement), May 31, 1834.

amount remaining in the Bank being Rs. 1,26,590 after transferring Rs. 1,04,000 to the 4 per cent loan. The deposits since the first of May, average about 1,400 Rupees a day, and withdrawal was 360 Rupees. The last three months have added Rs. 78,980 net to the stock and 4 per cent loan subscriptions."

এখানে ১লা নবেম্বর ১৮৩৩ হইতে ৩১শে জুলাই ১৮৩৪ এই নয় মাসের হিসাব পাওয়া যাইতেছে। এই সময়ের মধ্যে আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ২,৭৫,৬৩৫৲ টাকা। ইহার ষষ্ঠাংশেরও কম—৪৫,০৪৪৲ টাকা মাত্র এই নয় মাসে ব্যাঙ্ক হইতে আমানতকারীরা তুলিয়া লইয়াছিলেন। তখন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে ১,২৬,৫৯০৲ টাকা, এবং শতকরা চারি টাকা সুদের 'লোনে' পরিণত করা হয় ১,০৪,০০০৲ টাকা। ১লা মে ১৮৩৪ হইতে প্রতিদিন গড়ে ১,৪০০৲ টাকা জমা পড়িয়াছে এবং তোলা হইয়াছে প্রতিদিন গড়ে ৩৬০৲ টাকা। শেষ তিন মাসে, অর্থাৎ মে-জুন-জুলাইয়ে ব্যাঙ্কে জমা পড়িয়াছিল ৭৮,৯৮০ টাকা।

কলিকাতায় ১৮৩৩, নবেম্বর হইতে সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ যে বেশ উৎসাহের সহিত আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিলাম। ১৮৩৪ ও ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই শহরেও সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হইল। শহর ছাড়িয়া পল্লীতে পৌছিতে ব্যাঙ্কের দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল।

আমি শুধু চেয়ে থাকি

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

কোথা হ'তে এলো এতখানি আলো শ্যামল বনানী-বুকে,
আলো-ঝলমল শাওন-প্রভাত, ম্লানিমা গিয়াছে চুকে!
সোনালী তপন বনানীর ফাঁকে
ধরণীর বুকে আলিপনা আঁকে
ছন্দ-মুখর প্রভাতী সমীর দিকে দিকে বয়ে যায়,
বেগে-বৌ পাখী দূর তরুশাখে আনমনে কি যে গায়!

কনক-আলোকে স্বর্ণমুকুটে ঝলিতেছে তরুশির
মৃদুল লহরী শান্ত সমীরে কাঁপায় তটিনী-নীর।
নীলিমার বুকে এলোমেলো মেঘ,
মন্থর আজি তারও গতিবেগ,
আলোকের গান তাহার বুকেতে বুঝি বা বেজেছে আজ,
শাওন-প্রভাতে সোনালী আলোক ভুলালো সকলি কাজ।

শেফালি-তলায় ফুটিয়াছে আজ কোমল রজনীগন্ধা,
বর্ষার বুকে ফুটিল কি আজ করুণ মাধবীচন্দা!
মালতী কুসুম পুষ্পবিতানে,
চুলে চুলে পড়ে পেলব শিথানে,
দূর পরপারে সোনালী আলোয় আমি শুধু চেয়ে থাকি,
বর্ষার মাঝে নব শরতের শুভ আগমন নাকি?

তাই বুঝি এই আলোকলেখায় পৃথিবীর বুকে লেখি'
পাঠায়েছ তব আগমন-লিপি আজি এ প্রভাতে দেখি।
প্রভাতের আলো তাই লাগে ভালো
চারিদিকে শুধু আলো আর আলো
আকাশে বাতাসে পৃথিবীর বুকে নেই কোথা কিছু বাকী,
দূর সুদূরের সোনালী আলোয় আমি শুধু চেয়ে থাকি।

পিছোলা হ্রদ : উদয়পুর

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিশাল রাজপুরী, পড়েছে ছায়া তার
পিছোলা-সায়রের জলে
অতীত মহিমার স্বপন-ছবিখানি
কাঁপিছে মরমের তলে।
চূড়ার পরে চূড়া উঠেছে মেঘলোকে
মুকুটমালা চিতোরের,
নীরবে বীরগাথা গাহিছে তা'রা বুঝি
হারানো কোন্ সে যুগের।

অন্তঃপুর হতে সোপান নেমে আসে,
প্রমোদ-তরী টলমল,
শতেক উৎসব-স্মৃতি মনে ভাসে,
ঊর্মি কাঁদে ছলছল।
সলিল-মাঝে জাগে 'জগনিবাস' আর;
সুচারু 'জগমন্দির'
শোভন দ্বীপপুরী, সোপানমালা নামে,
স্বচ্ছ কম্পিত নীর।

ওপারে গিরিশিরে চিত্রসম স্থির
প্রাসাদ 'সজ্জনগড়'
মৃগয়া-অনুরাগী প্রাচীন নৃপতির
পাষাণে লেখা স্বাক্ষর।
তরণী বহি' চলে, রৌদ্রমণি জলে
হ্রদের ঢেউ ভাঙি' ভাঙি',
কালের স্রোতে মোর ভাবনা ভেসে যায়
স্বপ্ন ওঠে বাজি' বাজি'।

অগ্রদ্বীপের ৺গোপীনাথ

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী

অগ্রদ্বীপ একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামখানি আগে পাটুলীর জমিদারদের ছিল, পরে কোন এক কারণে ইহা নদীয়ার মহারাজার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। গঙ্গার বুকে প্রথম যে চড়া পড়ে, সেই চড়ার উপরে গড়ে-ওঠা গ্রামই অগ্রদ্বীপ নামে খ্যাত।

সেকালে বাসুদেব ঘোষ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আদি বাসভূমি ছিল কাশীপুর গ্রামে। এই গ্রামখানি আবার অগ্রদ্বীপেরই নিকটে। ঘোষঠাকুর পরম বৈষ্ণব। দিন-রাত কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা। কিন্তু তাঁর সন্তানসন্ততি ছিল না। তাই তাঁর বাসনা ছিল একটি ছেলের, যে তাঁর মৃত্যুর পর মুখে একটু জল আর পিণ্ডদান করতে পারবে।

এক রাতে সেবার পর তিনি কৃষ্ণনাম জপতে জপতে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তন্দ্রা নেমে এল চোখে। ঘোষঠাকুর স্বপ্ন দেখলেন তাঁর ঠাকুর যেন তাঁকে বলছেন—

"কাল গঙ্গায় চান্ করতে গিয়ে দেখবি—একটা কালো পাথর ভেসে আসছে। তুই পাথরখানা ধরে বাড়ী এনে, তা থেকে একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি তৈরি করিয়ে স্থাপনা করবি। সেই হবে তোর ছেলে!"

ঘুম ভেঙ্গে যায়। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর ঘুম আসে না চোখে। ঘোষঠাকুরের চোখে-মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটে ওঠে। বাকী রাতটুকু নিদ্রাহীন অবস্থায় কেটে গেল।

ভোরের আলো দেখা দেয়। পাখীরা জাগে। সুর জাগে তাদের মনে। নানা সুরে গান ভেসে আসে। সূর্য্য তার রক্ত-কিরণ ছড়িয়ে দেয় ধরণীর বুকে। ঘোষঠাকুরের মুখেও আনন্দ উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে।

স্নানের সময় হয়। বাসুদেব তেল মেখে যান গঙ্গাস্নানে। বড় আনমনা। কয়েকবার পথের ঢেলায় বাধাও পান তিনি। তবু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি যথারীতি গঙ্গায় নামেন। স্নান সারা হয়। হঠাৎ চোখে পড়ে দূরে কি যেন আসছে ভেসে। মনে পুলক জাগে। সেই দিকে অপলকে চেয়ে থাকেন।

হাঁ, কালো যেন একটা কি! নিকটে আসে সেটা। পাথরই ত বটে। সাঁতরে গিয়ে বাসুদেব ধরেন পাথরখানাকে। মাথায় করে বাড়ী নিয়ে যান। নদীর বুকে স্নানার্থীরা তাঁর দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

এই পাথর থেকে তৈরি হয় এক কৃষ্ণমূর্ত্তি। তিনিই ৺গোপীনাথ। ঘোষঠাকুর ৺গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। নিজেই তিনি অন্তরের ভক্তিকুসুমে পূজা করেন।

চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে এ অলৌকিক কথা! দেশ-বিদেশ থেকে ভক্তের ভিড় অগ্রদ্বীপের বুকে জমে ওঠে। তার পর কত বছর কেটে যায়। ঘোষঠাকুর দেহ রাখেন ফাল্গুনের কৃষ্ণা একাদশীর আগে। ৺গোপীনাথ পিণ্ড দেন তাঁর।
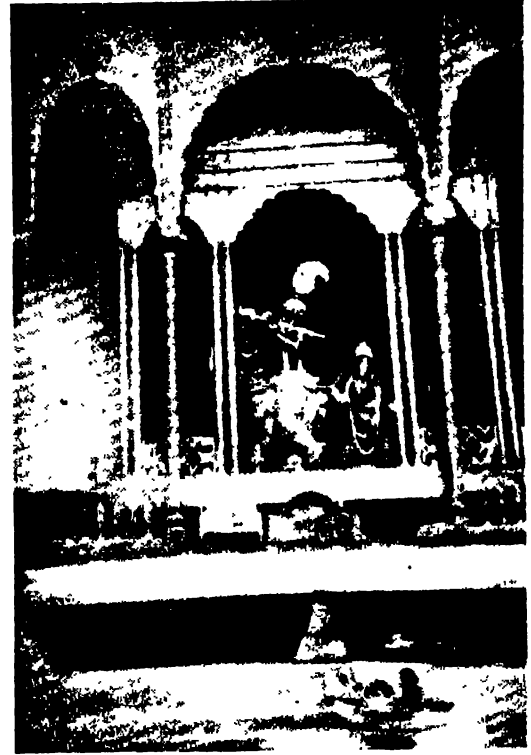
মন্দিরের মধ্যে ৺শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ—মন্দিরটি ১২৩০ সালে স্থাপিত

প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায়। ঘোষঠাকুরের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের দিন পিণ্ডদানের জন্য ৺গোপীনাথের হাতে পিণ্ড দিয়ে নীচে কুশ বিছিয়ে রাখা হয় এবং দরজা বন্ধ করা হয়। অল্পকাল পরে দরজা খুলে দেখা যায় পিণ্ডটি কুশের উপর পড়ে আছে। এই ত গেল ৺গোপীনাথের আবির্ভাবের কাহিনী।

আরও একটি কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের এক শিষ্য ছিলেন। তাঁকে প্রভু খুবই ভালবাসতেন এবং শিষ্যও তাঁকে নিজের ছেলের মত বিবেচনা করতেন। এক দিন প্রভু সেবার পর প্রিয় শিষ্যের কাছে মুখশুদ্ধি চাইলেন। কায়স্থ ঘোষ-ঠাকুর একটা হরিতকী ভিক্ষে করে এনে প্রভুকে দিলেন আধখানা, আর আধখানা রাখলেন পরের দিনের জন্যে। প্রভু বুঝতে পারলেন—ঘোষঠাকুরের আজও বিষয়াসক্তি দূর হয় নি। তিনি প্রিয় শিষ্যকে জানালেন—তুমি বাড়ী গিয়ে কৃষ্ণনাম কর।

ঠাকুরের কথায় শিষ্য জানালেন—"তোমাকে আমি ছেলের মত দেখি। তোমাকে না দেখে ত ঠাকুর আমি থাকতে পারব না।"

"বাড়ী গিয়ে কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ভজনা কর, তবেই তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে।"

প্রিয় শিষ্য বাড়ী ফিরে এসে কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সেই মূর্তিই অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ।

এর পরে অনেক বছর কেটে যায়। তখন কৃষ্ণনগরের মহারাজার মোক্তার ৺গোপীনাথকে আপন করে নিলেন। সেও এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

ফিরিয়ে দেবার জন্যে। রাজা নবকৃষ্ণ জানালেন—কলকাতায় এসে তোমার দেবতাকে তুমি নিয়ে যাও।

মহারাজা গেলেন। সঙ্গে গেল বহু লোক।

কিন্তু একি! মহারাজা নিজের বিগ্রহ চিনতে পারলেন না। মহা ভাবনায় পড়লেন তিনি। দুঃখে দু'নয়নে অশ্রু দেখা দিল।

রাত্রে মহারাজা স্বপ্ন দেখলেন, গোপীনাথ বলছেন, "চিন্তা কি তোর। কাল আসবি মন্দিরে। দেখবি যার মুখে ঘাম, সেই তোর দেবতা।"

পরদিন হ'লও তাই। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজের বিগ্রহ নিয়ে আবার ফিরে এলেন অগ্রদ্বীপে।

৺শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেবের মন্দিরের সম্মুখে দর্শনার্থী নরনারী

২

শ্রীশ্রীগোপীনাথের মূর্তি উঁচে প্রায় দেড় হাত। তাঁর গঠনপারিপাট্য এবং অঙ্গসৌষ্ঠবও চমৎকার।

অগ্রদ্বীপ ষ্টেশনে নেমে বেশ খানিকটা হেঁটে, গঙ্গা পার হয়ে মন্দিরে যাবার পথে বাঁ-দিকে পড়ে ঘোষঠাকুরের সমাধি, ইহাও বর্তমানে ধ্বংসোন্মুখ। এর পাশেই গোপীনাথের পুরানো দালান। আজ তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। নানারূপ আগাছা ভিটেকে সবুজ করে রেখেছে।

এর পাশেই বর্তমান মন্দির। মন্দির ঠিক নয়, গোপীনাথের বাসগৃহ। ঘরের মধ্যে সিংহাসনের উপর তিনি থাকেন; তার পাশেই তাঁর শয়নের বিছানা। এ মন্দিরটি তৈরি হয়েছে ১৭৪৫ শকাব্দে বা বাংলা ১২৩০ সালে।

অগ্রদ্বীপে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীগোপীনাথের মেলা বসে। এই মেলাও বহু দিনের। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন মেলার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। গোপীনাথের সেবার জন্য বহু জমি দেবোত্তর দেন মহারাজা।

তখন নবাবী আমল। ৺গোপীনাথের মেলাতে ভিড় বেড়ায়। কিছু লোক হঠাৎ মারা যায়। নবাবের রক্তচক্ষুর আদেশ আসে কৈফিয়ত দাখিলের। অগ্রদ্বীপের জমিদার মোক্তারের মারফত জানান :—"অগ্রদ্বীপ আমাদের জমিদারী নয়।" কৃষ্ণনগরের মহারাজার ধূর্ত মোক্তার জানালেন, "হুজুর, অগ্রদ্বীপ আমার জমিদারবাবুদের। কিন্তু মেলায় যে রকম ভিড় হয় তাতে আরও বেশী অনিষ্ট ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমার প্রভুর সাবধানতার জন্যে সে পরিমাণ অনিষ্ট ঘটতে পারে না।" নবাব একথার সারবত্তা বুঝে কাউকে শাস্তি দিলেন না। অগ্রদ্বীপ এল কৃষ্ণনগরের মহারাজাদের অধীনে।

তখন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল। কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণ ৺গোপীনাথকে নিয়ে যান। তাঁরই মত আর একটি মূর্তি তৈরি করিয়ে রাজা নবকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয়ের পূজা চালাতে থাকেন। এদিকে ভক্তবৎসল কৃষ্ণচন্দ্র দেবতার অদর্শনে অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন এবং কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণকে অনুনয়-বিনয় করেন গোপীনাথকে

আমবারুণীর দিন অগ্রদ্বীপে মেলার আরম্ভ। তিন দিন ধরে মেলা জোর চলে। মেলায় যেসব যাত্রী আগমন করে, তাদের প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ের লোক। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক যে মেলা দেখতে বা ঠাকুর দর্শন করতে না যান তাও নয়।

যেসব ভক্ত যাত্রীর এখানে সমাগম হয়, তাঁরা চাল, ডাল, চিঁড়ে, গুড়, মুড়কী, কলকুলারী সব নিয়ে আসেন। তিন দিন ধরে মহোৎসব ও নামসংকীর্তন হয়। প্রথম দিন চিঁড়া মহোৎসব, দ্বিতীয় দিনে অন্ন মহোৎসব আর তৃতীয় দিনে খই-দইয়ের মহোৎসব এবং চতুর্থ দিনে গোপীনাথের দোল-উৎসব। হাজার হাজার ভক্ত এই উৎসবে যোগ দিয়ে নীরব শ্যামল গ্রামখানিকে কোলাহলমুখর

করে রাখে। চতুর্দিক হতে যখন কীর্ত্তনের সুর—'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম হরে হরে' ধ্বনি অনবরত প্রতিধ্বনিত হয়, তখন স্বভাবতঃই মন এক অতি পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়। লালাবাবু এক "বেলা যায়" কথায় পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আর এই 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'—নামামৃতে এরূপ কত লালাবাবুর যে সৃষ্টি হয়, তার আমরা কোন খোঁজই রাখি না।

বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে নানা জিনিষের দোকান আসে এ মেলায়। মেলার স্থায়িত্বও প্রায় মাসাবধিকাল। আশেপাশের গ্রামগুলি হতেও এখানে বহু জনসমাগম হয় এবং তাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করে বৎসরখানেকের জন্যে নিশ্চিন্ত মনে তারা দিন কাটায়।

দূরের যাত্রীরা আসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে একেবারে যেন চলমান ঘর-সংসার বেঁধে। তারা এসে ঠাঁই সংগ্রহ করে মেলার সংলগ্ন বাগানের মধ্যে। এগুলো সব আম-কাঁঠালের বন।

দোকানীরা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, মিষ্টি, লাঙ্গলের ইস, ঘরের দরজা-জানালা, কাপড়-চোপড়, পোশাক, হাতা খুন্তি বেড়ি, চাকী বেলুন, গরুর গাড়ীর চাকা ইত্যাদি ক্রেতাসাধারণের কাছে লাভ-লোকসানে বিক্রী করে তাদের সংসারযাত্রার পথ সুগম করে। সিনেমার সুধাও যে তাদের না মেটে তা নয়। এক-আধটা সিনেমাও আসে। গ্রামের লোক ছবির মুখে কথা শুনে তাজ্জব বনে যায়। যাত্রীরা সব বাগানের মধ্যে উনুন জেলে রান্নার কাজে লেগে যায়। সকালে বিকেলে ঘোরাঘুরির পর তাদের সেই বনভোজন হয় অতিশয় আনন্দের।

মেলার নীচেই ভাগীরথী। যাত্রীরা গঙ্গায় স্নান করে, গঙ্গার জল পান করে, দেবদর্শন করে—তাদের মন হয় পবিত্র, দেহ হয় শীতল, পানীয় হিসাবে ডাবের জল ব্যবহার করে অনেকে। মেলায় ডাবের আমদানী হয় প্রচুর।

গঙ্গার ধার দিয়ে যে পথ মন্দিরের দিকে চলে গেছে, তারই দু'পাশে বসে মেলার দোকানপাট। মেলার মাঝামাঝি জায়গায় একটা খোলা মাঠে সার্কাস বা সিনেমাও বসে। পাড়াগাঁয়ের

মহোৎসবে বহু ভক্ত সমাগম—অনেকে ভোজনে রত

লোকেরা এই সব আমোদ-প্রমোদ বৎসরান্তে একবার উপভোগ করে সারা বৎসরের আনন্দের খোরাক সঞ্চয় করে। এতে তাদের মনের গ্লানিও অনেকটা দূর হয়।

মন্দিরের পথে দেখা যায়, এক শ্রেণীর ভিখারী সাবিত্রী-সত্যবানের মূর্ত্তি, কতকগুলো কড়ি-শাঁখা, আর কিছু ফুল নিয়ে বসে থাকে। বিগ্রহ দর্শন-অভিলাষিণীরা যাবার সময় সাবিত্রী-সত্যবানকে দেখেন, আর তাঁদের হৃদয়ে পতিভক্তি জেগে উঠে। তাই তাঁরা

ঠাকুর বাসুদেব ঘোষের সমাধি

এক এক জোড়া শাঁখা খরিদ করে ফুল নিয়ে সাবিত্রীর হাতে পরিয়ে দিয়ে, পায়ের কাছে কিছু দক্ষিণা রেখে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করেন। ব্যবসায়ী আবার সেই শাঁখাই খুলে রাখে পাশে। চক্রবৃদ্ধি হারে দাম পেয়ে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের পুঁজির অঙ্ক সত্যই অসম্ভব রকম বেড়ে উঠে।

আবার পথের দু'পাশে ছেড়া নেকড়া, কাপড়, বা গামছা বিছিয়ে বসে গেছে, কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর। এদের করুণ চিৎকারে যাত্রীদের হৃদয়ে সহানুভূতি জেগে উঠে, তাঁরা ফুটো পয়সা, চাল, ডাল ইত্যাদি কিছু কিছু সকলকেই দিতে দিতে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যান। এ ভাবে তারা যা পেয়ে থাকে তাতেই তাদের উদরান্নের কতকটা সংস্থান হয়।

আর একটু এগিয়ে গেলেই বাঁ-দিকে চোখে পড়বে, ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি। বাসুদেব ঘোষ দেহরক্ষা করলে, এখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। স্মৃতি-সমাধির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দু'চার বৎসরের মধ্যে মেরামত না করলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সমাধির পূব গায়ে দেখা যাবে গোপীনাথের পুরানো মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ।

মেলার অপর প্রান্তে এক বাগানে জনৈক বাবাজীর আখড়া। এখানেই নামকীর্ত্তন এবং মহোৎসব হয়। ভক্তেরা প্রসাদ পায়। আখড়াটি দেখলে সত্যই মনে বেশ একটা পবিত্র ভাব জেগে উঠে, তাই সেদিন কীর্ত্তনগান শুনতে গাছের নীচে বসে পড়ি আপন মনে। কানে আসে হরিনাম, আর চোখে ভেসে উঠে ভক্তসেবার দৃশ্য। সত্যই চমৎকার।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় রাজবাড়ী থেকে মহোৎসবে প্রতি বৎসর চাল, ডাল, দই, মিষ্টি ভারে ভারে পাঠানো হ'ত এই অগ্র-দ্বীপে। আজ আর সেদিন নেই।

দেখতে দেখতে দিনগুলো যায় কেটে। যাত্রীরা দিনের পর দিন আপন আপন বাড়ী চলে যায়। গ্রামখানি আবার নীরব নিস্তব্ধ হয়ে উঠে। সকাল দুপুর সন্ধ্যায় শিয়াল ডাকে সেখানে। জেগে থাকে স্মৃতি যাত্রীদের মনে, আর দোকানীরা আশায় থাকে কবে আবার ফিরে আসবে সেই নীরব পল্লীর বুকে কোলাহলমুখর মেলা-উৎসব, যা আবার এনে দেবে তাদের প্রাণে সঞ্জীবনী সুধা।

অলঙ্করণ শিল্পী—শ্রীঅমলকুমার দত্ত

বিচিত্র-চরিতকথা

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়

পিছিয়ে যেতে হবে অনেকখানি।

স্মৃতির জীর্ণ পাতায় বিবর্ণ লিপির এখনও কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করা যায়।

নটবর চক্রবর্তী। ষাটের ওপর বয়স। মাথার চুল সব দুধের মত সাদা। হাতে সব সময়ে থাকত একটা চলন-সই কড়োর লাঠি, মাথাটা রূপো দিয়ে বাঁধানো। পরনে একখানা চারহাতি রঙা গামছা, মাথায় একখানা হাত আড়াই। শীতকালে শীত, গ্রীষ্মকালে আতপ নিবারণে ঐটিই প্রযুক্ত হ'ত সর্বক্ষেত্রে। লাঠি-হাতে এই বয়সেও যেতেন খাজনা আদায়ে। আমরা সবাই ডাকতাম দাদামশাই বলে।

দাদামশাই বেঁচে থাকতেই বড় ছেলে মারা যায়। ছোট ছেলেকে কি কারণে অনেক দিন আগেই ত্যাজ্যপুত্র করে দেন। সংসারে ছিলেন নিজে, দুই নাতি আর এক নাতনী—সবাই বড় ছেলের সন্তান। দাদামশায়ের ছিল সুদী কারবার আর বন্ধকী ব্যবসা। জমিজমা যা ছিল তাতে ভাত-কাপড় হয়ে যেত স্বচ্ছন্দে। কারবার ছিল বাড়তি আয়। টাকা-পয়সার ব্যাপারে দাদামশাই ছিলেন চোখের চামড়া-ওঠা। জিনিষ বন্ধক দিয়ে মেয়াদের এক দিন বেশী হলে আর উদ্ধার হ'ত না।

একদিন কি কাজে দাদামশায়ের বাড়ী গেছি। দেখি একটি মেয়েছেলে আধ হাত ঘোমটা টেনে উঠানে এসে দাঁড়াল, এক নজরেই চিনতে পারলাম। মীরডাঙ্গার তিনকড়ি মোড়লের বউ। মাস আষ্টেক আগে কানের দুটো টাব নিয়ে দাদামশাইয়ের কাছে এসেছিলেন গোটাকুড়ি টাকা পাবার প্রত্যাশায়। মোড়লের ক'দিন থেকে সান্নিপাতিক জ্বর, ডাক্তার বলছে বাঁকা পথ নিয়েছে, ফুঁড়তে হবে, টাকার দরকার। গোটা কুড়ি টাকা না দিলেই নয়।

দাদামশাই জিনিষ দুটো হাতে নিয়ে একটু হেসে বললেন, দেখ মা, আমার ত আর ঘরে টাঁকশাল বসানো নেই যে, চাই বললেই পেয়ে যাবে। দুটো মিলিয়ে খানাতিনেকের ওপর উঠবে কিনা সন্দেহ ; বাজারে বেচতে গেলেও দশটা টাকার বেশী কেউ দেবে না। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর, জিনিষ দুটো এনেছ যখন, রেখে যাও, গোটা পাঁচেক টাকা দিচ্ছি, যাবার পথে অনন্ত কবরেজকে ডেকে নিয়ে যাও। তা ছাড়া বাঁচা-মরা ভগবানের হাত, চিত্রগুপ্তের খাতায় যদি নাম না উঠে থাকে ত ঐ অনন্ত কবরেজই মোড়লকে বাঁচিয়ে তুলবে।

মোড়লবউ কিছু না বলে জিনিষ দুটো ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল। খানিক বাদেই আবার ফিরে এল একটা কাগজের মোড়ক হাতে নিয়ে। কাগজের মোড়কটা দাদামশায়ের পায়ের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে, জিনিষটা তুলে রাখুন বাবাঠাকুর, এবারে আর ওজন দেখতে হবে না। ভেবেছিলাম নিজের যা আছে তাই যাক্, আর বউয়ের জিনিষে হাত দেব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও করতে হ'ল।

দাদামশাই মোড়কটা হাতে নিয়ে বললেন, এ কি মা এ তো অনেক ওজন হবে। তা রাখতে এনেছ বেশ, রেখে যাও ; যা দরকার নিয়ে যাও। সত্যিই ত মানুষের প্রাণের আগে ত আর টাকাটা নয়। বাঁচা-মরার ওপর মানুষের কোন হাত নেই তা ঠিকই, কিন্তু তা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কি হবে ? তিনি কি আর নিজে কিছু করবেন, মানুষকে দিয়েই সব করাবেন। ডাক্তার যদি বলে থাকে ফুঁড়তে, ত নিশ্চয়ই দরকার আছে বলেই বলেছে। টাকা-পয়সার জন্মে তুমি কিছুই ভেব না মা—তোমার যা দরকার তুমি নিয়ে যাও।

প্রায় মাস আষ্টেক আগের কথা, কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

দাদামশাই বৈঠকখানায় বসে হিসাবপত্র দেখছিলেন। পায়ের শব্দে মাথা তুলে বললেন, কি চাই মা ?

ঘোমটার ভেতর থেকে উত্তর হ'ল, জিনিষটা ছাড়িয়ে নিতে এলাম, তা বাবার কি এখন সময় হবে ?

দাদামশাই ব্যস্ত হয়ে কাগজপত্র সরিয়ে রেখে বললেন, নিশ্চয় হবে মা, নিশ্চয় হবে। আমার কাজই ত এই মা, লোকের প্রয়োজনে তার জিনিষ রেখে তাকে সাহায্য করব, তার পর তার সামর্থ্য হলে তৎক্ষণাৎ জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দেব। নতুবা তোমরা কি ভাব এতে আমার দু'পয়সা ঘরে আসে. তা নয় মা, বরং রোজগার চুকিয়ে নিয়ে এখন নিজের পুকুরের মাছ পর্যন্ত তার সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যা, তা নাম কি মা ?

—আজ্ঞে গঙ্গামণি দাসী।

খাতার পাতার উপর চোখ বুলুতে বুলুতে জিজ্ঞেস করেন, কি মাস মনে আছে কি মা ? আর বোঝই ত বয়সও হচ্ছে, ভুলও হচ্ছে। আর মা, এবার গেলেই হয় ; কেবল নাতি-নাতনীগুলোর একটা বিলি-ব্যবস্থা করতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্দি হয়ে চোখ বুজতে পারি।

ঘোমটার ভেতর থেকে উত্তর এল, আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি, দু'এক দিন এদিক-ওদিক হতে পারে।

খাতায় চোখ বুলুতে বুলুতে দাদামশাই বলে উঠলেন, হাঁ, হাঁ এবার মনে পড়েছে বটে। আর মা সবই অদৃষ্ট, নতুবা মোড়লের কি আর যাবার সময় হয়েছিল ! বলে না বিধাতার মার দুনিয়ার বার। হাঁ, এই যে—এখানেই আষাঢ়, গঙ্গামণি দাসী, স্বামী তিনকড়ি মণ্ডল, নিবাস মীরডাঙ্গা, জমা অনন্ত একগাছি—ওজন তিন,

ভরি ও কুচো সোনা চার আনা এক পাই—মোট তিন ভরি চার আনা এক পাই—আটচল্লিশ টাকায় বাঁধা দেওয়া হইল। সুদ টাকা-প্রতি প্রতি মাসে এক পাই হারে প্রদত্ত হইবে, মেয়াদ আট মাস। তা আজ হ'ল গিয়ে—পাঁজীটা দেখি—পনরই ফাল্গুন। হিসাব করে বিষণ্ণ মুখে বললেন, তা হলে ত হ'ল না মা, মেয়াদ যে শেষ হয়ে গেছে।

দূর থেকেও বুঝতে পারলাম ঘোমটার আড়ালে মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। ধরাগলায় প্রশ্ন হ'ল তা হলে কি কোন উপায়ই নেই বাবা?

দাদামশাই বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বললেন, কি বলি বল মা, কিছু করারও ত উপায় দেখি না। আজ যদি তোমাকে দিই কাল রাধু এসে চাইবে, পরশু কেষ্ট এসে চাইবে, তখন আমি কি করব? বাঁধা দিন ত আমায় একটা রাখতেই হবে, নতুবা কাজকারবার যে অচল হয়ে যাবে মা।

মোড়লবউ দাদামশায়ের পা জড়িয়ে ধরে বললে, উপায় আপনাকে একটা করতেই হবে বাবাঠাকুর; আমার নিজের জিনিষ হলে কথা ছিল না, কিন্তু নিজের বুদ্ধির দোষে বৌয়ের সাধের জিনিষ যদি এমন করে ঘুচিয়ে দিই ত তার কাছে আবার কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব বাবাঠাকুর।

দাদামশাই শশব্যস্ত হয়ে বললেন, আহা-হা কর কি মা, আমার দিকটা একবার ভেবে দেখ। আমার যে হয়েছে হাত-পা বাঁধা অবস্থা। আচ্ছা, দাঁড়াও তারিখটা আর একবার মিলিয়ে দেখি।

মোড়লবউ পা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হিসাবের খাতাটায় খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে দাদামশাই বললেন, যাক মা, ভগবান রক্ষে করেছেন। জমা এগারই আষাঢ় নয় উনিশে আষাঢ়। তা হলে ও দিকে তিন দিন কম হচ্ছিল, এদিকে আট দিন বেশী হ'ল। আমারই পড়তে ভুল হয়েছিল মা। তারপর একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, আর মা চোখে ঠাওর হয় না, চোখেরই বা কি দোষ দিই বল। কৈ দাও দিকি ৪৯।৵১৫। শুনতে গিয়ে যেন আঁতকে উঠেন, একি—না না, ও পয়সা তিনটে কম করতে পারব না সতীশের মা, যা বাজার পড়েছে দেখছই ত, নতুবা আমারই কি সাধ যায় তিনটে পয়সা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে ছোটলোকোমি করি।

টাকাকড়ি ভাল করে বাজিয়ে তারপর বাক্সে তোলেন।

—ভাল করে ওজন দেখে নাও সতীশের মা, শেষে না বল বুড়ো ঠকাল। আর এই দেখ তোমার সামনেই চিরকুট ছিঁড়ে ফেলছি।...

এই রকম লোক ছিলেন নটবর চক্কোত্তি. কিন্তু অতিবড় নিন্দুকের মুখেও শুনি নি কারও একটা পয়সা গরমিল করেছেন।

আজও চোখ বুঁজলে চোখের সামনে দেখতে পাই, দাদামশাই বলছেন, না না, সতীশের মা ও তিনটে পয়সা ছেড়ে দিলে আমার চলবে না। তোমরা ভাবছ বুড়ো বসে বসে সুদ খাচ্ছে, কিন্তু এ কি কম হাঙ্গামা, কম কৈফৎ। আজ যদি তোমার জিনিষ হারিয়ে গেল কি চুরি গেল, ত কাল এ বুড়োকে ভিটেমাটি বেচেও তোমার জিনিষ ফিরিয়ে দিতে হবে।

সেই নটবর চক্কোত্তি। লোকে বলত সকালবেলা ওর নাম করলে হাঁড়ি না হোক কলসীও ফাটবে। এমনি কৃপণ। বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব, কালীপুজো, মনসাপুজো থেকে আরম্ভ করে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পুজো হ'ত। অথচ এত কম খরচে হ'ত যে শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। পুজো করতেন নিজে; পুজোর সাড়ী গামছা ছাড়া বাড়ীতে কখনও সাড়ী গামছা ঢুকতে দেখি নি। বললে বলতেন, বাপ-ঠাকুদ্দার আমলের পুজো-আচ্চা ত আর উঠিয়ে দিতে পারি নে। তার উপর ভগবান যখন দয়া করে বামুনের ঘরে জন্মই দিলেন, তখন নিজে হাতে একটু দেবসেবাই যদি না করে যেতে পারলাম ত পোড়া বামুনের ঘরে জন্ম নিয়েই বা লাভ কি? মিথ্যেমিথ্যে একটা পুরুত লাগিয়ে সাড়ী গামছাগুলো তাকে গছিয়ে দিয়েই বা লাভ কি, আর তাতে পুজোও ঠিকমত হয় না।

তারপর হয়ত সমর্থনের আশায় পার্শ্ববর্তী ঋণ-প্রত্যাশী ঘোষের পো'র উদ্দেশ্যে বললেন, ঠিক কি না ঘোষের পো?—ঘোষের পো গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিলে, আজ্ঞে সে ত ঠিক কথাই ঠাকুরমশায়।

আবার ট্যাঁকে টাকা গুঁজে বাইরে বেরিয়ে ঐ ঘোষের পো-ই বলবে, আরে রামোচন্দর, বুড়ো হাড়কেপ্পন, নতুবা দুখানা গামছা একখানা সাড়ী আর পাঁচপো আলো চালের মায়া ছাড়তে পারে না। তার উপর দক্ষিণেটা তো বেঁচেই যাচ্ছে, সেও কি কম লাভ?

অদ্ভুত সঞ্চয়ী ছিলেন দাদামশাই। আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাতেন পৈতের রাজবেশের ছাতা, চাদর, মায়ের গীতা, বাবার খড়ম। ছাতার শিকগুলো এখনও টিঁকে আছে, বাঁটটা ঝুলছে বাঁশের আলনা থেকে। পাটের দাগে দাগে চাদর কেটে যায় কাগজের মত, গীতার পাতা ছুঁলে গুঁড়িয়ে যায়। যে চৌকিখানায় দাদামশাই শুতেন, সেটা পেয়েছিলেন তাঁর ঠাকুদ্দা বিয়ের দানে। সেটির অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে এসেছে যে, তার উপরে শুয়ে কেউ নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুমোতে পারে এ কথা ভাবতেও যেন বিস্ময় বোধ হয়।

এক দিন দাদামশায়ের ছোট নাতি শিবুর মুখে শুনলাম তার দিদি উমাদির বিয়ে। শিবু বললে, দাদু কাউকে বলতে মানা করে দিয়েছে।

ও ছিল একে আমারি সমজোটী, তায় অনুরক্ত বন্ধু। আমাকে কিছু লুকানো ওর পক্ষে অসম্ভব।

বললাম, কার সঙ্গে রে? কোথায় হচ্ছে?

শিবু একবার এদিক-ওদিক চেয়ে বললে, শিমুলবেড়ের জগন্নাথ ভাণ্ডেলকে চিনিস? সেই যে রে প্রায়ই দাদুর কাছে টাকা ধার নিতে আসত—

আর বলতে হবে না। জগন্নাথ ভাণ্ডেলকে চেনে না এমন লোক এ তল্লাটে নেই। লম্বা পাকানো চেহারা। পরনে একটা

গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, গলায় হাতে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে বাহুতে রক্তচন্দনের গাঢ় প্রলেপ। একমুখ ঘন শ্মশ্রুগুম্ফের অরণ্য ভেদ করে শিকারী কুকুরের মত জ্বলছে রক্তিমাভ দুটো চোখের পানে চাইলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়।

আহারে-বিহারে ঘোর তান্ত্রিক।

বাড়ীর বুড়ো কিষেণ গল্প করে, স্যাণ্ডেলদের যে কি অবস্থা ছিল তা ঐ বাড়ীখানার দিকে চাইলেই অনুমান করতে পারবেন ছোট দাদাবাবু। ঐ জগুঠাকুরের বাবা নিশিকান্ত স্যাণ্ডেলের আমলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে। সেই কর্তা মারা গেছেন আজ প্রায় বৎসর ত্রিশ হবে, তখন এই জগুঠাকুরের বয়েস বড় জোর কুড়ি-বাইশ। সেই থেকে সুরু করলেন কালীসাধনা তান্ত্রিকমতে। এখনও প্রতি অমাবস্যায় আঁতিরির ছেড়া খাল বেয়ে চলে যান মনসাপোঁতার বাঁকে। বাঁকের মুখেই সাঁ-হাতি পাড়ের ওপর রয়েছে এক বুড়ো বট। সেই গাছের গোড়ায় মাটির তলায় পোঁতা আছে পঞ্চমুণ্ডীর আসন। প্রতি অমাবস্যায় সেই আসনে বসে শবসাধনা করেন জগুঠাকুর।

জগুঠাকুরের মা নিস্তারিণী দেবী এখনও বেঁচে।

শিবু বললে, কাল এসেছিল আবার অনেক দিন বাদে, শুনলাম দাদুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে কথা বলছে। আড়াল থেকে শুনলাম, —বড় বিপদে পড়ে গেছি চক্কোত্তি-কাকা, কাল মা মারা গেলেন। ভেবেছিলাম আপনার টাকাটা এবার শোধ করব, কিন্তু সামনে আবার শ্রাদ্ধ-শান্তির খরচা আছে। আর এ ত যে-সে বাড়ীর কাজ নয়—খোদ স্যাণ্ডেল বাড়ীর কাজ। কিছু না থাক নামটা ত এখনও আছে। আমি বললেই কি আর লোকে বিশ্বাস করবে; বাধ্য হয়ে যেমন করেই হোক নামটা বজায় রাখতে হবে। তাই ভাবছি আপনার টাকাটা বোধ হয় এবার আর হয়ে উঠবে না। আর শুধু এবারই বা বলি কেন কোনকালেই হয় ত আর হবে না, সবই মায়ের ইচ্ছে।

দাদু চোখ কপালে তুলে বললে, হবে না মানে? পাগলের মত কি যা তা বকছ? হবে না বললেই হ'ল? নটবর চক্কোত্তি কচি ছেলে নয় যে অত সহজে ভুলবে; বলে এই করে চুল পাকিয়ে ফেললাম। তার চেয়ে যা বলি শোন, ও সব ছেড়ে দাও, নাবালকের টাকা ফাঁকি দিয়ে কি শেষে নরকে ডুববে?

জগুঠাকুর জিব কেটে বললে, আরে ছি ছি, ও হিসেবে কথাটা আমি বলি নি; চেষ্টা আমি করব, তার পর দিতে পারা না পারা সে মায়ের ইচ্ছে।

দাদু গম্ভীর মুখে বললে, হুঁ মায়ের ইচ্ছে ত বটেই, কিন্তু বাবাজী নেবার বেলায় ত স্ব-ইচ্ছেয়ই নিয়েছিলে, এখন দেবার বেলাতেই বা মায়ের ইচ্ছে কেন? তখন ত খুব বলেছিলে, চক্কোত্তি কাকা, নেই নেই করেও এখনও স্যাণ্ডেলবাড়ীর যা আছে তাতে অমন অনেক পাঁচশ' টাকা শোধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে যা বলি শোন বাবাজী, ওসব আশা ছেড়ে দাও। পাঁচ জনের দেওয়া এক-আধ পয়সা নেড়ে-চেড়ে কোনগতিকে সংসার চালাই, তবে নেহাত আজ যদি চোখ বুঁজি ত, কাল নাতি-নাতনীগুলো না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, তাই খেয়ে-না-খেয়েও ওদের জন্যে দু'এক পয়সা জমাতে হয়। কিন্তু এও বলে রাখছি—নাবালকের টাকা ফাঁকি দিলে নরকেও ঠাঁই হবে না বাবাজী।

তার পর জগুঠাকুরের মুখের পানে খানিক চেয়ে কি ভাবলে, বোধ হয় বুঝলে, নরকে ঠাঁই হবে কি না হবে সে নিয়ে এ ব্যক্তির বিশেষ মাথাব্যথা নেই। একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—তুমি বলছ টাকা তুমি দিতে পারবে না, এদিকে এতগুলো টাকা ছেড়ে দেওয়ার মত অবস্থা আমারও নয়। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর না, তোমার টাকাও দিতে হবে না, আমার পাওনাও শোধ হয়ে যাবে।

বিস্মিত হয়ে জগুঠাকুর বললে, কি রকম?

একটু থেমে দাদু বললে, দেখ ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম কথাটা বলব। নিজে ত এদিকে বিয়ে-থাওয়া না করে বেশ কাটিয়ে দিলে; কিন্তু তোমা থেকে যে প্রাতঃস্মরণীয় নিশিকান্ত স্যাণ্ডেলের বংশটা লোপ হয়ে গেল এ বড় দুঃখের কথা। অথচ এদিকে ত শুনি তোমাদের তন্ত্রে নাকি বলে গৃহস্থ হতে বাধা নেই। তাই বলছিলাম উমাও ত আমার কাজে-কর্মে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, আর তোমারই বা এমন কি বয়েস হয়েছে, বেমানান বিশেষ হবে না। এক বার ভেবেচিন্তে দেখ।

জগুঠাকুর একটু ভেবে বললে, না অমতের আর কি আছে? তা শ্রাদ্ধ-শান্তিটা মিটে যাক, তার পর একটা ভাল দিনক্ষণ দেখে নিলেই হবে।

দাদু একগাল হেসে বললে, বাপু হে বুড়োর বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু মাথাটা এখনও নিরেটই আছে।

শিবু একবার এদিক-ওদিক চেয়ে বললে, যাই ভাই দাদু দেখলে আবার বকাবকি করবে, আমায় অবিশ্যি বিশেষ কিছু বলবে না।

বিয়ের কথা চাপা থাকে না; আমাদের মুখ থেকেই খবরটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল। ছেলে-ছোকরারা কেউ কেউ নাকি বলেছিল, পয়সার জন্যে শেষে কিনা মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেন, তবু ত আপনার ভাতজলটাও করত।

দাদামশাই হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, বাপু হে, মেয়েমানুষের বিয়ে ত দিতেই হবে, আজ না হয় কাল, তা বলে আমার ভাতজল করবে বলে ত আর চিরটা কাল আইবুড়ো রেখে দিতে পারি নে। আর পাত্তর হিসেবে আমাদের জগন্নাথ স্যাণ্ডেল তোমাদের চেয়ে কোন অংশে কম একবার দেখিয়ে দাও দিকি। তোমরা বলবে নেশাখোর; আরে বাপু, মেয়েরা পুণ্যিপুকুর ব্রত করে, বলে যেন শিবের মত স্বামী পাই, আর সেই শিবের মত নেশাখোর ত্রিভুবনে আর দুটি নেই। আর বয়েসের কথা যে বলছ, আয়ুর কথা কি

কেউ বলতে পারে ? এই আমারই ত বয়স হ'ল গিয়ে সাতাশি অথচ আমারই সমবয়সীরা কেউ মারা গেছে দশে, কেউ বিশে আবার কেউ-বা পঞ্চাশে। কপালে থাকলে ওই জগুই এখনও পঞ্চাশ বছর বাঁচবে। আর ওদের বংশটা একবার দেখছ ? খাটি গ্রাস্ত-সাপের বংশ। ওসব বংশে আজ না হয় চলন নেই, নতুবা—

ছেলেরা অধৈর্য হয়ে বলেছিল, থাক্, থাক্ ঢের হয়েছে, আর শুনতে চাই না—

দাদামশাই হেসে বলেছিলেন, ওই ত ভায়া টপ করেই তোমাদের মাথা গরম হয়ে যায়—সব দিক বিবেচনা করে ত দেখতে হয়।

আড়ালে সবাই বলত, বক্কি, পিচাশ নতুবা অমন মেয়েটাকে হত্যে করে।···

বিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। শুভদৃষ্টির সময় অত দূর থেকেও বেশ বুঝতে পেরেছিলাম উমাদির মুখখানা মৃতের মত ক্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। দু'এক ফোঁটা জলও হয়ত গাল বেয়ে গড়িয়ে থাকবে। দাদামশাই পিঁচিয়ে উঠেছিলেন, শুভকাজের সময় যত সব অকল্যাণ।

বিয়ের পুরুতের কাজ করেছিলেন নিজে, খাইয়ে ছিলেন দশটি ব্রাহ্মণ। এর বেশী অবশ্য কেউ আশা করে নি।

বিয়ের পর থেকে দাদামশাইকে কেমন যেন একটু বেশী রকম খুশী খুশী দেখতাম। আবার মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যেতেন। নিজেই রান্নাবান্না করতেন, বলতেন, ভার ত রান্না—নিজের আর নাতি দুটোর জন্যে দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে নেওয়া—এক ঘণ্টাও লাগে না।

আবার মাঝে মাঝে বলতেন, এমন করে আর রোজ রোজ হাত পুড়িয়ে রাঁধা পোষায় না। উমা থাকতে আমার গায়ে আঁচড়টি লাগতে দিত না। এখন এমন কেউ নেই যে, দুপুরবেলা গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেয় কি দুটো পাকা চুল তুলে দেয়। উমা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দুপুরবেলার ঘুম গেছে। তাই হুঁকো হাতে দুপুরবেলা গাছতলায় গাছতলায় ঘুরি।

বছরখানেক বাদে। সদরের সামনে এক দিন একখানা ছই-দেওয়া গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে উমাদি নেমে এল। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এই প্রথম সদরে আবার পা পড়ল। পরনে রাঙা চেলির বদলে ধবধবে সাদা থান, অঙ্গে আভরণের চিহ্ন নেই, সিঁথি শূন্য।

দাদামশাই ঠিক সে সময় হুঁকো হাতে পাড়ায় বেরোচ্ছেন। সদর দিয়ে বেরোতেই সামনে উমাদিকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বুদ্ধিভ্রংশের মত অর্থশূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ মুখের পানে চেয়ে রইলেন ; তার পর আপনা হতেই মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্তস্বর বেরিয়ে এল। হাতের মুঠি শিথিল হয়ে হুঁকোটা পড়ে গেল মাটিতে, জলন্ত টিকে পায়ের ওপর ছড়িয়ে পড়তে উমাদি হাঁ হাঁ করে উঠল, দাদামশায়ের সেদিকে খেয়াল নেই। উমাদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন, বললেন, নিজেকে নিজে এমন করে ঠকালাম দিদি।

নিজের অজান্তে নিজেকে ঠকিয়েছিলেন দাদামশাই।

পরে শুনলাম জগুঠাকুর হঠাৎ মারা গেছেন। যৌবনের অপচয়ের মূল্য দিতে হয়েছে জীবন দিয়ে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন ছ'মাসের ওপর। পাশ ফিরে শোবার মত ক্ষমতাও লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

দাদামশাই সে খবর জানতেন না।

তারপর মাসখানেক দাদামশাইকে বাড়ী থেকে বেরোতে দেখি নি। শুনলাম শোবার ঘরে চুপ করে পড়ে থাকেন, নাওয়া-খাওয়ার সময় উমাদির ডাকাডাকিতে নেমে আসেন। একাদশীর দিন ভাতের থালা সামনে নিয়ে অপরাধীর মত বসে থাকতেন হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে, গাল বেয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ত। বলতেন, তোর দিকে তাকালে দিদি—আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে।

উমাদি হেসে বলত, তোমার যেমন কাণ্ড, দেখে আর বাঁচি নে —ভাতক'টা খেয়ে নাও দিকি নি।

পরে এক দিন শিবুর মুখে শুনেছিলাম, একাদশীর দিন দাদামশাই নিরম্বু উপবাস করে থাকেন। উমাদি কিছু বলতে এলে বলতেন, ভাতের কথা আর আমায় শোনাস নি দিদি, গলায় আমার কাঁটার মত বিধবে।

মাসখানেক পর দাদামশাই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন। ক'দিনে বয়স যেন দশ বছর এগিয়ে গেছে। চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে, কুঁজো হয়ে গেছেন ; প্রচণ্ড আঘাতে শিরদাঁড়াটা কে যেন ভেঙে দিয়েছে। লাঠিতে ভর দিয়ে কোনমতে দেহটাকে খাড়া রেখেছেন। চলন দেখে মনে হ'ত এই বুঝি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবেন।

এর পর আর দাদামশায়ের মুখে কোনদিন হাসি দেখি নি। সুদ আর বন্ধকী ব্যবসা তুলে দিয়েছিলেন। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসলে সেখান থেকে সহজে আর উঠতে পারতেন না। কখনো কখনো দেখতাম হুঁকোর নলে মুখ লাগিয়ে বসে রয়েছেন কোন গাছতলায়, নিষ্পলক দৃষ্টিতে আকাশপানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে রয়েছেন, কখন তামাক পুড়ে গেছে খেয়াল নেই। কথাবার্তা কইতেন খুব কম।

লোকে ধার চাইলে দিতেন, নিতে মনে থাকত না। বিশ জনের মধ্যে এক জনের কথা মনে পড়লে সব শোধ তুলতেন তার উপর। চাঁদা চাইতে গেলে বড় একটা ফেরাতেন না, আবার সময় সময় তেড়ে মারতে আসতেন।

সেবার বর্ষার খুব জোর। নদীতে ঢল নেমেছে, আশঙ্কা হচ্ছে বান আসবে। আমাদের সোনাডাঙ্গার সামনেই আত্রাই নদী মোড় ফিরেছে, তাই জলের চাপটা পড়ে এপারেই বেশী। গাঁয়ের সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, আজ পঞ্চাশ বছর নদীর এমন মূর্তি কেউ দেখে নি। জীর্ণ বাঁধের মাটি ক্ষয় হচ্ছে, স্রোতের আঘাতে

বড় বড় চাঙড় ধ্বসে পড়ছে ; নদীতে বান এলে স্রোতের মুখে বাঁধ কুটোর মত ভেসে যাবে।

বিকেলে পাড়ার সবাই শুকনো মুখে হাজির হ'ল দাদামশায়ের বৈঠকখানায়। নদীতে বান এসেছে, বাঁধে ফাটল ধরেছে, জল ঢুকছে। গাঁয়ের সক্ষম মেয়ে-পুরুষ সবাই গেছে ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে, তবু মাটি থাকছে না ; স্রোতের মুখে গলে গলে বেরিয়ে আসছে। আশপাশের গাঁ থেকে কিছু লোক এসেছে, তবু তাতেও কুলোচ্ছে না, আরো লোক চাই। এরা গিয়েছিল বারুইপুরে তাঁতীদের পাড়ায়, তারা বলেছে তাদের ভাবনা নেই, তাদের গাঁ সবচেয়ে উঁচুতে, জল সেখানে পৌঁছুবে না। তারা বেগার দিতে আসতে পারবে না ; তবে জনমজুরি পেলে আসতে পারে। কিন্তু টাকা দেবে কে ? অথচ টাকা না পেলে বানের হাত থেকে মানুষ, গরু-বাছুর কেউই রেহাই পাবে না।

সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাদামশায়ের মুখের পানে চেয়ে থাকে। আষাঢ়ে মেঘের মত সবারই মুখ থমথমে।

হঠাৎ দাদামশাই পাগলের মত চেঁচিয়ে ওঠেন, যাক্, যাক্ সব জাহান্নমে যাক্, যেখানে ইচ্ছে যাক্। টাকা চাই তার আমি করব কি ? আমার কাছে কি সবাই গচ্ছিত রেখেছ, যে চাই বললেই তখখুনি বের করে দোব ? হবে না, একটা পয়সা হবে না আমার কাছে ; মরুক, চুলোয় যাক সব।

ম্লান মুখে প্রণাম করে সবাই উঠে আসে। দাদামশাই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকেন।···

একটা কথা বলা হয় নি। দাদামশায়ের দুই নাতি হারাধন আর শিবনাথ। ছোট শিবুকেই দাদামশাই ভালবাসতেন সবচেয়ে বেশী। তাকে ভাল খাওয়াতেন-পরাতেন, কখনও একটা রূঢ় কথা পর্যন্ত বলেন নি। এদিকে বড় হারুকে একেবারে দেখতে পারতেন না। স্নেহ-আদর ত দূরের কথা তার বেশী ভাত খাওয়া নিয়ে তাকে এমন গঞ্জনা দিতেন যা লোকে বাড়ীর চাকরকেও দেয় না। একখানা কালচিটে ইজের আর একটা ছেঁড়া হাতকাটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে হারু ঘুরে বেড়াত। দাদামশাই বলতেন, আমার বংশে কোন বড়ছেলে বেশী দিন বাঁচে নি। আমার নিজের বড়ছেলে বাঁচে নি, আমার দাদা বাঁচেন নি, আবার শুনি নাকি আমার জ্যাঠামশাইও মারা গিয়েছিলেন অসময়েই। তাই বড়টার উপর আর মায়া-মমতা বাড়াই নে।

হারু শুনে বোকার মত হাসত। যাক্ সে কথা—

তখনও সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। অদম্য কৌতূহল হ'ল—বাঁধ দেখতে যাব। শিবু ওর দাদুকে লুকিয়ে আমার সঙ্গ নিলে। কাদা ভেঙে যখন পৌঁছলাম তখন লোকের ভিড় জমে গেছে। এক দল কোদাল দিয়ে ঝপাঝপ মাটি কাটছে, আর এক দল ঝুড়ি করে বয়ে এনে ফেলছে ফাটলের মুখে। জল বেরোচ্ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নূতন মাটির আস্তরণ ভেদ করে।

এক দল লোক বাঁধের মাথায় ছুটোছুটি করছে, নজর রাখছে কতটা উঠছে। ভাতের হাঁড়ির মত আস্তে আস্তে ফুলে উঠ ফালচে ঘোলা জল। কোথাও কোথাও ঘূর্ণির মত পাক খেতে খে ছুটে চলেছে, সঙ্গে নিয়ে চলেছে কচুরিপানার দল, ঘর-ভাঙা বাঁ টুকরো, খড়ের চাল। ভেসে-যাওয়া বুনো-বাবলার ডালে জ জড়িয়ে রয়েছে নানা জাতের সাপ। জলের ভিতর থেকে উঠ চাপা গোঙানি—যেন সপ্তবিজিত কালনাগিনী বেদের ঝাঁ ভিতর আক্রোশে ফুঁসছে।

ঝপ করে একটা শব্দ হ'ল। এক দল লোক এঁটেল মাটির উ দিয়ে বাঁধের এধার থেকে ওধারে ছুটে গেল সন্তর্পণে, বোধ মাটির চাঙড় ধ্বসে পড়ল।

বর্ষার জলভরা মেঘ আকাশে ঘুরছে। বটগাছের পাতা থে পাতায় টুপ টুপ করে জল ঝরে পড়ছে। লোকজনের ছুটোছুটি ক ব্যস্ততার মধ্যে কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম তার খেয় ছিল না। হঠাৎ মনে হ'ল—শিবু ত পাশে নেই, চকিতে এব অশুভ ইঙ্গিত মাথার মধ্যে খেলে গেল। বুকের ভিতরটা ফাঁ হয়ে গিয়ে হৃৎপিণ্ডটা যেন সজোরে উপর দিকে লাফিয়ে উঠল, য হ। এখখুনি বুঝি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে। কাঠের পুতু মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম নির্বাক হয়ে।

আমার দিকে বিপিন ঘোষের নজর পড়তে বললে, কি হ ঠাকুর অমন করে দাঁড়িয়ে কেন ?

অতি কষ্টে তাকে সব খুলে বললাম। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ম লাফিয়ে উঠে বিপিন বললে, সে কি কতক্ষণ হ'ল দেখেন নি ?

বললাম, নজর হ'ল ত এখখুনি, কতক্ষণ পাশে ছিল না খেয়া করি নি।

দাবানলের মত খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে গেল। একজন ছু গেল দাদামশায়ের বাড়ী, জনকয়েক আশপাশে খোঁজ কর লাগল। জনকয়েক বাঁধের মাথায় উঠে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘোলা জ ভেদ করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। ভূধর পাটনী ঝাঁপ দি অতল জলে—সাঁতারু সে, কারো মানা শুনলে না। পুরো এ ঘণ্টা হাঙরের মত জল ঠেলে ঠেলে সন্ধান করলে, শেষে হাঁপা হাঁপাতে উঠে এল, বললে, সব্বত্তর চুঁড়ে ফেলাইচি, কুথাও পা মিলল না।

এক দল গেল দাদামশায়ের বাড়ী। দাদামশাই আগে থেকে খবর পেয়েছিলেন ; বৈঠকখানায় বসেছিলেন দু'হাতে কপাল টি ধরে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন—ভাবলেশহীন দৃ সবাই দাঁড়িয়ে রইলে বললেন, বসো।

কণ্ঠে এতটুকু চাঞ্চল্যের আভাস নেই।

নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, পাওয়া গেল না ?—কণ্ঠ আগের মতই শান্ত, নিরুত্তাপ।

সবাই মাথা নীচু করে রইল, কারও মুখে উত্তর যোগাল না —যাবে না জানতাম, একটা উদ্গত নিঃশ্বাস দমন করে এ

থেকে দাদামশাই আবার বললেন, এই সবপ্রথম আমাদের বংশে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল।

সবাই চুপ। ঘরে ছুঁচ পড়লে শুনতে পাওয়া যায়।

হঠাৎ দাদামশাই মুখ তুলে বললেন, বাঁধের অবস্থা কি রকম?

সবাই বিস্মিত হয়ে ওঁর মুখের পানে তাকাল, আমারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সদ্য দুর্ঘটনার এতটুকু আভাসও দাদামশায়ের চোখে, মুখে, কণ্ঠস্বরে কোথাও নেই; কপালে রেখার কুঞ্চনে এতটুকু পরিবর্তন ঘটে নি। অবাক হয়ে ভাবলাম, উমাদিকে জড়িয়ে ধরে যে দাদামশাইকে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে দেখেছি, চোখের সামনে তাঁকেই কি দেখছি?

অন্য সবাইও আমার মতই অবাক হয়ে গিয়েছিল, যাই হোক, একজন বললে, ভাল না ঠাকুরমশায় অবস্থাগতিকে অনুমান হচ্ছে আজ শেষরাত নাগাদ ধুয়ে যাবে। মরদরা ত সবাই কোদাল ধরেছে, মেয়েরাও বাদ যায় নি, তবু আর বড় বেশী আটকাতে নারবে। লোকবল নেই আমাদের, দুখানা গাঁয়ের সাধ্যিতে কুলোচ্ছে না। যাক্, কপালে যা আছে তাই হবে, সবই ভগমানের ইচ্ছে।

দাদামশাই হঠাৎ মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত থর থর করে কাঁপছে উত্তেজনায়। দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কোটরগত চোখ দুটো ছুরির ফলার মত ঝক্ ঝক্ করে উঠছে। ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে উঠলেন, নিয়ে এস বারুইপুর থেকে তাঁতীদের, যত টাকা লাগে আমি দেব, কিন্তু এক ফোঁটা জল যেন বাঁধের ফাটল দিয়ে না বেরোয়। যত মেয়ে-পুরুষ আছে সবাইকে নিয়ে আসবে, বলো টাকার ভাবনা তাদের নেই, যত টাকা লাগে পাই-পয়সা পর্যন্ত আমি তাদের গুনে দেব।

একদমে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে থাকেন। হাত-পা থর থর করে কাঁপছে, সবাই মিলে ধরাধরি করে বসিয়ে দেয়।

বসে বসেই বলেন, যাও যাও, এখুনি বেরিয়ে পড় দেরি করো না।

সবাই প্রণাম করে বেরিয়ে আসে, বলে—ঠাকুরমশায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বর্ষা কেটে গেছে, বাঁধের মাটি শুকিয়ে গেছে; জল নেমে গেছে অনেক নীচে; তার ঘোলাটে রং কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে স্বচ্ছতা, যেন রাত্রি জাগরণে রক্তিম আঁখিতে ঘুমের পর নেমে এসেছে নির্মল শুভ্রতা।

দাদামশাইকে দেখেছিলাম—বর্ষা শেষ হয়ে যাবার পর। শুনলাম এক দিন নাকি বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। চলতে গেলে সারা দেহ থর থর করে কাঁপে। কপালে আর রগের নীল নীল শিরাগুলো দড়ির মত ফুলে উঠেছে। মুখের চামড়াখানা বায়ুহীন আধারে যেন শুষে নিয়েছে।

বাইরে কোন লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বড় একটা বলতেন না। আকস্মিক বজ্রাঘাতে মানুষের সমস্ত অনুভূতি যেমন নিমেষে লোপ পেয়ে যায়, তেমনি অপ্রত্যাশিত আঘাত এসে বাইরের জগৎ থেকে দাদামশাইকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

রোজ সকাল হতেই কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে পড়তেন বাঁধের দিকে। ওইটুকু রাস্তা যেতে পথের মাঝে বসতেন অন্ততঃ বার-ছয়েক।

কোন কোন দিন রাত থাকতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন, বিনিদ্র নয়নে অপেক্ষা করে থাকতেন—কখন ভোরের আলো দেখা দেবে তারই প্রতীক্ষায়। কোথায় যেন যেতে হবে, কে যেন তাঁকে ডাকছে, তার অশ্রুত অথচ বহুশ্রুত সুস্পষ্ট আহ্বানে অধীর হয়ে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসতেন বাইরের ছাতে। বাইরে বেরিয়ে হয়ত দেখতেন—চাঁদ জল্ জল্ করছে আকাশে, এক ফালি জ্যোৎস্না জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে গলে এসে লুটিয়ে পড়েছে মশারির গায়ে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়তেন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের পানে।

পূব আকাশ রাঙা হয়ে উঠতেই বেরিয়ে পড়তেন। বাঁধের ধারে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন একটা কলকে ফুলগাছের গোড়ায়। নদীর জল নেমে গেছে; বুকে চড়া দেখা দিয়েছে জেগেছে কচি ঘাসের সমারোহ। অসংখ্য কাশফুলে সাদা হয়ে গেছে চড়ার বুক; কোন এক আদিকালের বদ্যিবুড়ী বসে আছে চড়ার মাটিতে, তার মাথার পাকা চুল উড়ছে মৃদু দক্ষিণা বাতাসে।

স্থির হয়ে বসে থাকেন দাদামশাই, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন জলের পানে। হুঁকোর নলে মুখ লাগানো রয়েছে, টানতে ভুলে গেছেন; কখন টিকে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে খেয়াল নেই। চকচকে ঢেউয়ের মাথায় চোখ-ধাঁধানো সূর্য্যরশ্মি ভেদ করে কোটরগত দুটো চোখের সন্ধানী দৃষ্টি কিসের যেন খোঁজ করে।

আস্তে আস্তে সূর্য্য ওঠে মাথার ওপর, খররৌদ্র দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে তোলে। গাছ থেকে সোনার মত কলকে ফুল ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে। স্নান করার সময় হয়ে যায়, হারাধন এসে ডাক দেয়, আজ কি আর নাওয়া-খাওয়া করবে না দাদু, ওদিকে সূয্যি যে মাথার ওপর উঠে গেল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে হয় দাদামশাইকে। পথ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করেন জলে কিছু দেখতে পেলি হারু?

—কি দেখব? বিস্মিত হয়ে হারু প্রশ্ন করে।

—ওঃ, না কিছু না, চল্—একটা উদ্যত দীর্ঘশ্বাস চেপে যাপেন দাদামশাই।

স্নান করে খেতে বসায় সময় উমাদি হয়ত বলে, আজও তেল মাখতে ভুলে গিয়েছ তো দাদু? তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না।

দাদামশাই অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলেন, ইস! বড্ড ভুল হয়ে গেছে ত দিদি!—এমন কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে উমাদির মুখের পানে চান

যে, উমাদি তখন নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজের উপরেই বার বার দোষারোপ করতে থাকে।

খেয়ে দেয়েই আবার বেরোন। উমাদি যদি বলে, এই দুপুর রোদে আবার কোথায় বেরুচ্ছ দাদু, দাদামশাই সলজ্জ হাসি হেসে কৈফিয়তের সুরে বলেন, যাই দিদি, পাড়াটা একটু বেরিয়ে আসি, এখখুনি ফিরব; আর এ বয়েসে বসে থাকলে ক'দিন আর বাঁচব দিদি?

কাঁপতে কাঁপতে লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। উমাদি জানে পাড়াবেড়ানো বাজে অজুহাত। এখুনি গিয়ে বসবেন বাঁধের ধারে কলকে ফুলগাছের নীচে। তবু দাদামশায়ের চোখের সামনে তাঁর ছলনাটুকু ধরে ফেলে, আঘাত করে আহত স্থানের অস্তিত্বটুকু নতুন করে জানিয়ে দিতে উমাদি পারে না।

বিকেল গড়িয়ে যায়। বটফলের ভাগ নিয়ে পাখীদের ঝগড়ার আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। নদীর বুক থেকে বয়ে আসা এক ঝলক হাওয় জীর্ণ অশ্বত্থপাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়। অস্তোন্মুখ, স্তিমিত সূর্যের ক্ষীণ রশ্মির শেষরেখা নদীর জলে আবীর গুলে দেয়। ক্রমে সেটুকুও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে কখন একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাঁঝের আঁধার আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে। ঘরফেরা গরুর গলার টুং টুং শব্দ বাতাসে সুরের রেশ জাগিয়ে তোলে। একটা দুটো করে শাঁখ বেজে উঠে। পাশেই একটা শেয়াল একবার ডেকে উঠেই চুপ করে যায়—বোধ হয় একটু আগে থেকে ডেকে ফেলে অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল। জোনাকির মত দু'একটা পিদীমের আলো দূর থেকে বাঁশ-বাগানের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে।

অন্ধকার জমাট বেঁধে আসে, দৃষ্টি চলে না। হারাধন এসে ডাক দেয়, দাদু ওঠ, অন্ধকার হয়ে গেল যে। দাদামশাই ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অন্ধকার ভেদ করে নদীর বুকে কি খুঁজতে থাকেন, কোন কথা তাঁর কানে পৌঁছায় না।

—দাদু ওঠ, আর একবার ডাক দেয় হারাধন। এবারেও বোধ হয় ঠিকমত শুনতে পান না। অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেন, হুঁ।

অধৈর্য্য হয়ে হারাধন বলে, ও দাদু শুনছ, এদিকে যে রাত হয়ে গেল।

—এ্যা, সুপ্তোত্থিতের মত দাদামশাই বলে উঠেন, এই যে ভাই উঠি।

আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জলের পানে চেয়ে থেকে বলেন, একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছিস দাদা?

—কি? হারাধনের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

—আঃ চেঁচাস নি, সবাই শুনতে পাবে যে।—তার পর হারাধনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বলেন, এদিকে আয়, আমার সঙ্গে এগিয়ে আয়, ভাল করে তাকিয়ে দেখ, ঐ যে—হ্যাঁ হ্যাঁ কালোমত—বেশ করে দেখ, মানুষের মাথার মত বোধ হচ্ছে না?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হারাধন বলে, কৈ দাদু, কিছু না ত।

আশাভঙ্গের হতাশায় ভেঙে পড়েন দাদামশাই; বলেন, ঠিক দেখেছিস, কিছু নয়?

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, ওঃ। চল্ তবে ভাই, একটু আস্তে আস্তে যাস দাদা।

দাদামশায়ের সত্যি সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

এক দিন দাদামশাইকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। খোঁজা-খুঁজি করে জানা গেল—তার আগের দিন শেষরাত্রে প্রাণকেষ্ট মাঝি নৌকোর উপর থেকে দাদামশাইকে দেখেছিল নদীতে নামতে। ভেবেছিল হয় ত কোন পুজো-আচ্চা আছে তাই এত রাত থাকতে নাইতে নেমেছেন। তার পর আর কেউ তাঁকে দেখে নি।

১,০০০ থাকে তাহা হইলে মন্বন্তরের ফলে ইহার অব্যবহিত পরে শতকরা ৩৫ জন করিয়া মারা যাওয়ায় ৬৫০-এ দাঁড়াইল। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে যদি কর্ষিত জমির পরিমাণ ১০০০ বিঘা থাকে ১৭৭১ সনে উহা ৬৬৭ বিঘায় দাঁড়াইয়াছিল; এবং ৫ বৎসর পরে ১৭৭৬ সনে উহা ৫০০ বিঘায় দাঁড়াইয়াছিল। ৫ বৎসরে (১৭৭১-১৭৭৬) চাষের জমি ১৬৭ বিঘা কমিয়া গিয়াছিল। এই কমতির একমাত্র কারণ লোকসংখ্যার হ্রাস। লোকসংখ্যার কমতি যদি আমরা চাষের জমির কমতির সমান সমান ধরি তাহা হইলে অসঙ্গত হইবে না। ৫ বৎসরে লোকসংখ্যা শতকরা $\frac{১৬৭}{৬৬৭}$ × ১০০ = ২৫ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। এই হিসাবে মন্বন্তরের পরে যে ৬৬৭ জন লোক ছিল তাহা কমিয়া ৬৬৭—২৫/১০০ × ৬৬৭ = ৫০০তে দাঁড়াইল।

ইহার দশ বৎসর পর পর্যান্ত লোকসংখ্যা কমিয়াছিল। প্রশ্ন হইতেছে—কত কমিয়াছিল? আমরা ধরিয়া লইলাম যে দশ বৎসরের শেষে লোকসংখ্যা কম হওয়া বন্ধ হইয়াছিল। ১৭৭১ হইতে ১৭৭৬ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসর শতকরা ৫ জন করিয়া কমিয়াছিল। এই ৫ ভাগ কমা ১০ বৎসরে ০তে দাঁড়াইল—গড়ে শতকরা ২.৫ জন করিয়া প্রতি বৎসর কমিয়াছিল। ১০ বৎসরে মোট কমতির পরিমাণ শতকরা ২৫-এ দাঁড়ায়। অর্থাৎ, ৫০০ জন কমিয়া ৩৭৫-এ দাঁড়াইল। ১৭৮৬ সনের এই অবস্থা।

তাহার পরও দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি হইয়াছিল। কাজেই আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, লোকসংখ্যা ১৭৯১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় নাই। ১৭৮৬ সনে যাহা ছিল ১৭৯১ সনেও তাহাই ছিল। আমাদের যুক্তি এইরূপ—১৭৭১ হইতে ১৭৭৬ সন পর্য্যন্ত কোন দুর্ভিক্ষ হয় নাই, অথচ লোকসংখ্যা কমিয়াছে দ্রুত—বৎসরে শতকরা পাঁচ জন করিয়া। ১৭৭৭ হইতে ১৭৮৬ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে দুই বার; বন্যাও হইয়াছে; অজন্মাও হইয়াছে—অথচ আমরা লোকসংখ্যা কম হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। ১৭৮৭ হইতে ১৭৯১ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে বন্যা হইয়াছে দুই বার ও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এক বার এমতাবস্থায় লোকসংখ্যা কমাই সম্ভব। কিন্তু হাণ্টার সাহেব যখন লোকসংখ্যা কম হইবার কথা স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই তখন আমরাও লোকসংখ্যা কম হয় নাই বলিয়া ধরিয়া লইলাম। তাদৃশ লোকবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া আমরা লোকসংখ্যা সমান ছিল মনে করি। এ বিষয়ে আরও তথ্য জানিতে পারিলে আমাদের মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ ঘটিতে পারে।

সুতরাং যেখানে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ব্বে ১০০০ লোক ছিল সেখানে ১৭৯১ সনে ৩৭৫ জন লোক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তথাপি যাহাতে ভুল না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবার জন্য ১৭৮৬ সন হইতে লোকবৃদ্ধি হইতেছে ইহাই ধরিয়া লইলাম।

১৮৭১-৭২ সনের শীতকালে প্রথম লোকগণনা হয়। এই লোকগণনার হিসাবে বর্দ্ধমান বিভাগের লোকসংখ্যা হয় ৭৬,০৫ হাজার। এখন ১৭৮৬ বা ১৭৯১ সন হইতে ১৮৭১-৭২ সন পর্য্যন্ত কিভাবে, কি হারে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে জানিতে পারিলে আমরা ১৭৮৬ বা ১৭৯১ সনের লোকসংখ্যা, তথা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ব্বের লোকসংখ্যার একটা হিসাব পাইতে পারি।

১৮৭২ সনের পর ১৮৮১ সনে লোকগণনা হয়। তাহার পর প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর লোকগণনা হইয়াছে। আদমশুমারির হিসাবে বর্দ্ধমান বিভাগের লোকসংখ্যা ও প্রত্যেক দশকে লোকসংখ্যা কি হারে বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে নিম্নে তাহা দেখানো হইল:

বৎসর	বর্দ্ধমান বিভাগের লোকসংখ্যা (হাজারে)	শতকরা হ্রাস বা বৃদ্ধি
১৮৭২	৭৬,০৫	...
১৮৮১	৭৩,৯৪	—২.৮
১৮৯১	৭৬,৮৯	+৪.০
১৯০১	৮২,৪০	+৭.২
১৯১১	৮৪,৬৮	+২.৮
১৯২১	৮০,৫১	—৪.৯
১৯৩১	৮৬,৪৭	+৭.৪
১৯৪১	১০২,৮৭	+১৯.০
১৯৫১	১১১,০২	+৭.৯

দেখা যায়, ৮ দশকের মধ্যে ২ দশকে বর্দ্ধমান বিভাগের লোকসংখ্যা কমিয়াছিল। ১৮৭২-১৮৮১ সনের মধ্যে বর্দ্ধমান জ্বিলার বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; আর ১৯১১-১৯২১ সনের মধ্যে কমিয়াছিল ১৯১৮ ও ১৯১৯ সনের ইনফ্লুয়েঞ্জায়। আর বৃদ্ধির সবটা স্বাভাবিক কারণে নহে। এই সময়ের মধ্যে হাওড়া ও হুগলী জেলায় বহু নূতন নূতন কল-কারখানা স্থাপিত হয়, মেদিনীপুরে, খড়্গপুরে রেলের কারখানা ও বর্দ্ধমান জেলায় কয়লার খনির কাজ আরম্ভ হয়। ফলে বর্দ্ধমান বিভাগের বাহির হইতে শ্রমিকের আমদানী হইয়াছে। সাঁওতালরা বিহার হইতে বিতাড়িত হইয়া এই অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় বসবাস করিতে থাকে, এবং যে যে কারণে লোকসংখ্যার কমতি হইয়াছে তাহা কিছু পরিমাণে অল্প প্রতীয়মান হইয়াছে; আবার যে যে স্বাভাবিক কারণে লোকসংখ্যায় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বড় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তাহার প্রথম দিকে বাহির হইতে লোকের আগমন বা এই অঞ্চল হইতে বহির্গমন ছিল না বলিলেই হয়। শেষের দিকে এইরূপ আগমন বা বহির্গমন থাকিলেও সংখ্যায় খুব কম ছিল। আমরা আরও জানিতে পারি যে, ১৮১৩-১৪ হইতে ১৮৭২ সন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান বিভাগের লোকসংখ্যা বাড়ে নাই। ১৮১৩-১৪ সনে বর্দ্ধমানের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট বেলী সাহেব এই বিভাগের লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ এশিয়াটিক রিসার্চেসের ১২শ খণ্ডে আছে। তিনি জমিদার ও স্থানীয় ইংরেজদের সাহায্যে ৯৮টি শহর ও গ্রামের লোকসংখ্যা গণিয়া দেখেন। এই সমস্ত গ্রাম বর্দ্ধমান, হুগলী (সহ হাওড়া), মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহল (বাঁকুড়া প্রভৃতি) জেলায় ছড়ান ছিল। এই পরিসংখ্যান হইতে তিনি দেখিতে পান যে, প্রত্যেক বাড়ীতে

৫'৭ জন করিয়া লোক আছে। তাহার পর সমস্ত দেশের বাড়ীর সংখ্যা নিরূপণ করিয়া দেশের লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার হিসাবে বর্দ্ধমান বিভাগে প্রতি বর্গমাইলে ৬০০ জন করিয়া লোক। আর ১৮৭২ সনের গণনায় প্রতি বর্গমাইলে ৬১০ জন করিয়া লোক। অর্থাৎ, প্রায় ৬০ বৎসরে মোট লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ১'৬ জন করিয়া। পরবর্ত্তী ৬০ বৎসরে (১৮৭২-১৯২১) দুই দশকে লোকসংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তি সত্ত্বেও বাড়িয়াছে শতকরা ৬ জন করিয়া।

বেলী সাহেবের নির্দ্ধারণ কতদূর সত্য তাহা ১৮৭২ সনের সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যাচাই করেন। ১৮১৪ সনে ৫৪টি গ্রামে বেলী সাহেব যেখানে দেখিয়াছিলেন ১৬,২০০ লোক, ১৮৭২ সনের গণনায় সেখানে ১৬,১২১ জন লোক দেখা গিয়াছিল।

১৮৩৮ সনে এডাম সাহেব বর্দ্ধমানের কালনা থানা'র লোকসংখ্যা প্রভৃতির কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করেন। উক্ত হিসাব ও ১৮৭২ সনের সেন্সাসের হিসাব নিম্নে পাশাপাশি দেওয়া হইল। যথা :—

কালনা থানা	এডাম সাহেবের হিসাব ১৮৩৮	১৮৭২ সনের সেন্সাসের হিসাব
গ্রামের সংখ্যা	২৮৮	২৯৬
বাড়ীর ,,	২৩,৩৪৬	৩২,৪৫২
পুরুষের ,,	৫৯,৮৪৪	৫৮,৪১৫
স্ত্রীলোকের ,,	৫৬,৮৫১	৬৩,০৬৫
মোট লোকসংখ্যা	১,১৬,৪২৫	১,২১,৪৮৯
বাড়ীপিছু লোকসংখ্যা	৫'০	৩'৭

১৮৭২ সনের সেন্সাসের গণনায় কালনায় ৩২৫ খানি নৌকার লোকজন এই গণনার মধ্যে ধরা হইয়াছে। কালনায় বন্দরের বড় বড় চালানি নৌকার মাঝি-মাল্লার সংখ্যা যদি গড়ে ১০ জন করিয়া ধরা হয় ত অসঙ্গত হয় না। এই সংখ্যা বাদ দিলে দেখা যায় যে, ১৮৩৮ হইতে ১৮৭২ সনের মধ্যে এই ৩৪ বৎসরে লোকসংখ্যা প্রায় সমান সমান। সূক্ষ্ম হিসাব করিলে বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১'৩।

মোটামুটি ভাবে বলা চলে যে, ১৮১৩-১৪ সন হইতে ১৮৩৮ সন পর্য্যন্তও লোকসংখ্যা বাড়ে নাই এবং ১৮৩৮ সন হইতে ১৮৭২ সন পর্য্যন্ত লোকসংখ্যা বাড়ে নাই বা অতি সামান্য মাত্র বাড়িয়াছিল। এই সময়ে যে বর্দ্ধমান বিভাগের লোকসংখ্যা স্থিতিশীল ছিল তাহার একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণটি এই—

১৮৯৯ সনে সুইডেনের বিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ সুণ্ডবার্গ আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান কংগ্রেসে দেখান যে, সব দেশেই, বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় যদি কোন দেশের লোকসমষ্টিকে বয়সের হিসাবে সাজানো হয় তাহা হইলে ১৫ হইতে ৫০ বৎসরের লোকসংখ্যা লোকসমষ্টির অর্দ্ধেক। আর যে যে দেশে ০—১৫ বৎসরের লোকসংখ্যা বেশী সেই সেই দেশ বৃদ্ধিশীল। তিনি লোকসমষ্টিকে বয়সের তারতম্য অনুযায়ী এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে বর্দ্ধনশীল, স্থিতিশীল ও কমতির পথে আখ্যা দেন ও তাহারা যে এইরূপ তাহা দেখান। তাঁহার বয়স-বিভাগ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ নিম্নে দেওয়া হইল :

	প্রতি হাজার লোকের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের লোকের অনুপাত		
	০-১৫	১৫-৫০	৫০-এর উর্দ্ধে
Progressive (বর্দ্ধনশীল)	৪০০	৫০০	১০০
Stationary (স্থিতিশীল)	৩৩০	৫০০	১৭০
Regressive (কমতির পথে)	২০০	৫০০	৩০০

তাঁহার এই শ্রেণীবিভাগ পণ্ডিতেরা নির্ভুল বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাক বর্দ্ধমান বিভাগের লোকসমষ্টি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত। আদমশুমারির রিপোর্ট হইতে ০-১৫ বৎসর বয়সের লোকের অনুপাত এইরূপ :

	হাজার করা			লোক-বৃদ্ধির হার
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	শতকরা
১৮৯১	৩,৮৫৮	৩৫০৩	৩৬৮১	+৪'০ (১৮৮১-৯১)
১৯০১	৩,৮১৪	৩৫৭৩	৩৬৯৩	+৭'২ (১৮৯১-০১)
১৯১১	৩,৭৪৬	৩৫৪৫	৩৬৪৫	+২'৮ (১৯০১-১১)
১৯২১	৩,৬০০	৩৪৩৭	৩৫৪৫	—৪'৮ (১৯১১-২১)
১৯৩১	৩,৬২৫	৩৫৬৬	৩৫৯৬	+৭'৪ (১৯২১-৩১)

বর্ত্তমান যুগে এই বিভাগের লোকসংখ্যা বর্দ্ধনশীল।

এডাম ১৮৩৮ সনে বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার কতিপয় স্থানের কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করেন। ইহা তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহার সংগৃহীত তথ্য এইরূপ :

মোট লোকসংখ্যা	১,৬২,৮৪১	১০০০
০-১৪ বৎসরের বালক-বালিকা	৫১,৩৮৬	৩১৫

এই তথ্য হইতে বুঝা যায় ১৮৩৮ সনে এই বিভাগের লোক "স্থিতিশীল" পর্য্যায়ে পড়ে।

১৮৭২ সনে বর্দ্ধমান বিভাগের লোকসংখ্যা ছিল ৭৬ লক্ষ ৫ হাজার। ১৮১৩-১৪ সনে বেলী সাহেবের হিসাব অনুযায়ী ইহা প্রায় সমান বা কিছু কম। ১৮১৩-১৪ সনে যত লোক ছিল তাহার তুলনায় ১৭৯১ সনে কত লোক ছিল ইহার হিসাব বাহির করিতে হইবে। এই ২২ বৎসরে সম্ভবতঃ লোকসংখ্যা বাড়িয়াছিল ; কিন্তু কি হারে বাড়িয়াছিল ? পণ্ডিতেরা বলেন যে, ১৯২১ সন হইতে বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে একটি দ্রুত লোক-বৃদ্ধির যুগ আসিয়াছে। এজন্য ১৯২১ সনের পরের বৃদ্ধির হিসাব ছাড়িয়া দিয়া ১৮৭২ হইতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত ৩৯ বৎসরে যে বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাই যদি বর্দ্ধমান বিভাগের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ধরিয়া লই ত খুব অন্যায় হইবে না। যেমন এই বৃদ্ধি ম্যালেরিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে কম হইয়াছে, তেমনি কলকারখানা ও কয়লার খাদে বহিরাগত লোকের জন্য বেশী হইয়াছে। এই

৩১ বৎসরে বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৫·৮৬ জন করিয়া। পূর্ব্বযুগে ইনফ্লুয়েঞ্জার ন্যায় ব্যাপক মহামারীর কথা শুনা যায় না ; আর মড়ক থাকিলেও, জ্বর, ওলাউঠা প্রভৃতি থাকা সত্বেও "বর্দ্ধমান ফিভারে"র ন্যায় মহামারী ছিল বলিয়া মনে না। এজন্য আমরা ১৮৮১ হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত যে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাকেই এই বিভাগের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ধরিয়া লইলাম। এই ৩০ বৎসরে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ১৪·৫ করিয়া।

এই হারে যদি ১৭৮৬ হইতে ১৮১৩-১৪ সন পর্য্যন্ত ২৭ বৎসর লোকসংখ্যা বাড়িয়াছিল ধরি, তাহা হইলে ১৭৮৬ সনের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫ লক্ষ ১৮ হাজার। আর আমাদের পূর্ব্বের বৃদ্ধি অনুসারে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ব্বের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৫ লক্ষ ৬০ হাজার বা ১৭৪ লক্ষ। বর্ত্তমানে ১৯৫১ সনে বর্দ্ধমান বিভাগের লোকসংখ্যা ১১১ লক্ষ। আমাদের হিসাবে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে। ভুল-ভ্রান্তির জন্য শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিলেও লোকসংখ্যা ছিল ১৫৭ লক্ষ—বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা যে ঢের বেশী এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

সারনাথ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সারনাথ, সারনাথ, নাই তব তুলনা।
ফিরে যদি যাই কোলে ঠাঁই দিতে ভুলো না!
সূর্য্যকরোজ্জ্বল সেই তব নীলাকাশ!
সারাবেলা পাখীদের সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস!
রক্তকরবী দোলে বায়ুভরে সুন্দর!
আকাশের নীলিমায় উড়ে চলে কবুতর।
সবুজ-বনানী-ঘেরা প্রান্তরে মন্দির ;
মাঝে মাঝে ঘণ্টার ধ্বনিটি কি গম্ভীর!
অগণ্য তারা জ্বলে ছায়াপথে সুদূরে ;
শ্রমণের স্তবগান কানে ঢালে মধু রে!
সে গানের সাথে মেশে মাধবীর সুরভি!
ভুলিব না, ভুলিব না, ভুলিব না সে ছবি!

পড়িতেছি নিম্বের সুশীতল ছায়াতে
'এড্উইন্ আরনল্ড্', পতি আর জায়াতে!
দূরে কাছে চরে ধেনু, মাঠে মাঠে রোদ্দুর।
দিগন্তপ্রসারিত সবুজ-সমুদ্দুর!
জীবন্ত হ'য়ে ওঠে কবেকার ঘটনা!
চলে যায় প্রিয়তম—যশোধরা, ওঠো না!
অন্নের পাত্রটি করপুটে সুজাতার ;
দ্রুমমূলে গৌতম—দেহ কঙ্কালসার!
আপনার সাথে চলে আপনার সংগ্রাম ;
সে লড়াই নিষ্ঠুর, সে লড়াই অবিরাম!
ইতিহাস প্রোজ্জ্বল মার-জয়-কাহিনীর
অনুপম মহিমায়! মৃত্যুর বাহিনীর
চরম সে পরাজয়ে আলো এল প্রজ্ঞার।
আঁধারের কেল্লা,—সে ভেঙে হ'ল চুরমার।

স্নান ক'রে সে-আলোর পবিত্র গঙ্গায়
প্রবুদ্ধ এসিয়ার জনগণ গান গায়।
বুদ্ধের জয়গান, জয়গান ধর্ম্মের,
জয়গান সঙ্ঘের। ভারতের মর্ম্মের
শতদল ফুটে ওঠে দলে দলে। সৌরভ
ছড়ায় সমুদ্রপারে। প্রাণের সে গৌরব
পাষাণের মূর্ত্তিতে অপরূপ সুষমায়
শাশ্বত হ'য়ে ওঠে। অপূর্ব্ব গরিমায়
স্তূপে আর স্তম্ভেতে জীবনের অভিযান!
ধর্ম্মের শিল্পের মিলন—সে কি মহান্!
কত দূর হ'তে আসে অমৃতের পিপাসায়
সঙ্ঘারামের বুকে ছাত্রেরা! এসিয়ায়
সারনাথ তুমি ছিলে আলোকের নির্ঝর!
তোমার মাটিতে তার স্মৃতি আজও ভাস্বর।
সারনাথ! এক দিন জানি তুমি মৃত্যুর
ছায়া হ'তে বাহিরিয়া দিবে এই তৃষাতুর
ধরণীর করপুটে পাত্রটি অমৃতের।
ভারত সেদিন হবে সেরা সব তীর্থের।

আণবিক বোমা হাতে উদ্ধত পশ্চিম
ধূলাতে লুটাবে ফণা। নয়, নয় নিঃসীম
অন্ধকারের শক্তি। ঐ ধ্বজা উড্ডীন!
চৌ-এন্ লাই, মাও, নেহেরু ও হো-চী-মীন!
ইতিহাসে সুরু হ'ল এসিয়ার অভিযান!
দিকে দিকে উঠিতেছে মৈত্রীর জয়গান।
আমেরিকা হতমান ; ইউরোপ নতশির।
জয় নয় হিংসার—জয় হবে মৈত্রীর।
জয় হবে আলোকের। সে আলোর 'অরোরা'র
প্রথম প্রকাশ হেথা—তোমারে নমস্কার!

আমাদের খাদ্য ও স্বাস্থ্য

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনেকের ধারণা যে, বাঙালীরা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, ভীরু এবং অতি নির্ব্বিরোধ। এই দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ আমরা অন্নভোজী। যাহারা অন্নকেই প্রধান খাদ্য রূপে ব্যবহার করে, তাহারা বলবান হয় না। উত্তর ভারতের লোকেরা প্রধানতঃ গোধূমকেই তাঁহাদের খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করেন। সেইজন্যই পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী এবং ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্তবাসীরা বলশালী, দীর্ঘকায় এবং সাহসী হইয়া থাকেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। বাংলা দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব দিকে উড়িয়া, মাদ্রাজী, ব্রহ্মবাসী, শ্যাম এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপবাসী, সমগ্র চীন সাম্রাজ্যবাসী, জাপানী প্রভৃতি সকলেই অন্নভোজী অর্থাৎ এক কথায় এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দেশসমূহের সমস্ত অধিবাসীরই প্রধান খাদ্য তণ্ডুল। এই তণ্ডুল সিদ্ধকে সাধু বাংলায় বা সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় "অন্ন" এবং প্রচলিত বাংলায় ইহারই নাম "ভাত"। এই অন্নভোজী বঙ্গবাসী বা "ভেতো বাঙালী" এক সময়ে বাহুবলে সিংহল হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। এখনকার দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের ইংলণ্ডের কার্য্যালয়ে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রেরণ করিতেন, তাহাতেও বঙ্গবাসীদিগকে শারীরিক এবং মানসিক শক্তির জন্য যথোচিত প্রশংসা করিতেন। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে "ভেতো বাঙালী" পূর্ব্বে এরূপ দুর্ব্বল, ভীরু এবং কঙ্কালসার ছিল না।

তবে বাঙালীর এখন এ দুরবস্থা হইল কেন? আমাদের এই দুর্ব্বলতার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এ দায় অন্যের উপর চাপাইলে আমাদের কলঙ্ক মোচন হইবে না। আমরা কেন দায়ী, আমি আজ তাহাই আলোচনা করিব। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন 'হিতবাদী'র সেবায় প্রবৃত্ত হই, তখন এক খর্ব্বকায় বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের আপিসে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ইন্দ্রনারায়ণ অধিকারী। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রামে। তিনি শারীরিক শক্তির কিছু পরিচয় দিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। তখন আমরা কৌতূহলী হইয়া তাঁহার শক্তির নিদর্শন দেখিতে চাহিলে তিনি ঘরের মেজেতে চিৎ হইয়া শয়ন করিলেন এবং তাঁহার হস্তস্থিত তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি নিজের গলদেশে স্থাপন করিয়া বলিলেন, আপনারা ৫.৬ জন লোক এই লাঠির উপর আসিয়া দাঁড়ান। কিন্তু ব্রাহ্মণের কণ্ঠলগ্ন যষ্টিতে কেহই দাঁড়াইতে সম্মত না হওয়াতে তিনি বলিলেন, আপনারা আপনাদের অপিসের দরোয়ান ও বেহারাদিগকে ডাকুন। চার পাঁচ জন দরোয়ান ও বেহারা আসিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এই লাঠিটা আমার গলায় চাপিয়া ধর, আমি যেন উঠিতে না পারি। তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে লাঠি চাপিয়া ধরিলে তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং দরোয়ান, বেহারারা চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের মাথায় সুদীর্ঘ কেশ ছিল। কেশের ডগায় একটি গ্রন্থি বাঁধা। তিনি নিজে এই লাঠিগাছটা নিজের দীর্ঘ চুলের ভিতর দিয়া চালাইয়া দরোয়ানদিগকে বলিলেন, আমি উবু হইয়া বসি, তোমরা আমার দুই পাশে বসিয়া এই লাঠি নীচের দিকে টানিয়া রাখ, আমায় উঠিতে দিও না। তাহারা সেইরূপ করিলে তিনি সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। দরোয়ান, বেহারারা পড়িয়া গেল। তাঁহার তৃতীয় প্রক্রিয়া দেখিলাম, দুই রগের দুই গোছা চুল লইয়া টানিয়া আমাকে মাটিতে বসাইয়া দাও—ইহা দরোয়ানদিগকে বলিলেন। তাহারা কিছুতেই বসাইতে পারিল না। তিনি প্রথম দুই প্রক্রিয়ায় হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করেন নাই। এই তিনটি প্রক্রিয়া দেখাইলে সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি প্রত্যহ কি খাইয়া থাকেন। তিনি উত্তর করিলেন, আপনারা যা খান, আমিও তাই খাই, তবে দুধ কিছু বেশী খাই। দুই বেলায় বাড়ীর খাটি দুধ খাই। সে দুধ আপনারা কলিকাতায় চোখেও দেখিতে পান না—খাওয়া ত দূরের কথা। কি পরিমাণে দুধ খান জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, বেশী আর কি, ওই দুই সের থেকে আড়াই সের পর্য্যন্ত। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, দেখিতে পাই, লোকে কাটারি লইয়া কলাগাছ কাটিতে যায়। আমার বাপ কখনও কলাগাছ কাটারি দিয়া কাটিতেন না, আমিও কাটি না। কলাগাছের শিকড় কোথায়? আমরা ত কাঁদিসুদ্ধ গাছ মূলার মত টানিয়া উপড়াইয়া ফেলি। তিনি আরও গল্প করিলেন, তাঁহার পিতার সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, শুনিয়াছি আপনি শক্তিশালী পুরুষ। আমাকে কিছু নিদর্শন দেখান। তাহাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কি দেখাইব আদেশ করুন।" মহারাজ বলিলেন, "আপনি ঘাড় না তুলিয়া দীর্ঘ কতটা জমি খুঁড়িয়া যাইতে পারেন?" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বিরুক্তি না করিয়া কোদালী দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজা বলিলেন, আর খুঁড়িতে হইবে না। রাজার একজন কর্ম্মচারী মাপিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ প্রায় ৯০ হাত দীর্ঘ জমি খুঁড়িয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর সেই ব্রাহ্মণকে ৯০ হাত দীর্ঘ ও ৯০ হাত প্রস্থ জমি দান করিয়াছিলেন।

আমি যে ব্রাহ্মণের কথা বলিলাম তিনি হয়ত সাধারণের মধ্যে ব্যতিক্রম। কিন্তু তাহা হইলেও সেকালের লোকে যে এখনকার অপেক্ষা অনেক বলশালী এবং সাহসী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটে ডুমুরদহ গ্রামে আশানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি নাকি লাঠি ঘুরাইবার মত একটা

ঢেঁকি ঘুরাইয়া একবার একদল ডাকাতকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেকালের লোকের শারীরিক শক্তিও যেরূপ ছিল, মানসিক শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি তদনুরূপ ছিল। সে শক্তি বাঙালী হারাইল কেন? একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, ইংরেজ এদেশে ব্যবসা করিতে আসিলেও তাহারা বীরের জাতি। সেকালের ইংরেজ রাজপুরুষগণ বাঙালীকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহারা উপেক্ষণীয় নহে। ছলে, বলে, কৌশলে ইহাদিগকে শক্তিহীন করিতে না পারিলে নিশ্চিন্তভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিতে পারা যাইবে না। তাই তাঁহারা এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, হিন্দু আমলে এবং মুসলমান আমলে রাজারা কখনও লোকশিক্ষায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। সে ভার ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক এবং মুসলমান মৌলবীদিগের উপর ছিল। সেকালের রাজপুরুষগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সাহায্যে বাঙালীকে দুর্ব্বল করিতে হইবে।

ইংরেজ রাজপুরুষেরা এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিজের হাতে ধীরে ধীরে তুলিয়া লইলেন। ইহার জন্য তাঁহারা প্রচুর অর্থব্যয়ে অগ্রসর হইলেন। লর্ড ক্লাইব উমীচাদকে বিশ লক্ষ টাকা উৎকোচের প্রলোভন দেখাইয়া এবং মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসন উৎকোচ দিয়া বাংলা দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। বাংলার অধীশ্বর হইয়া তাহারা সেই উৎকোচের স্রোত অব্যাহত রাখিলেন। কোন বাঙালী কুড়ি-পঁচিশটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলে তাহাকে উচ্চহারে কমিশনের লোভ দেখাইয়া, বা উচ্চহারে বেতন দিয়া আপনাদের কার্য্যের সহকারী করিয়া লইতে লাগিলেন। তখন সকলেই ইংরেজী শিখিয়া বড় মানুষ হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইল। বাংলার শিক্ষার স্রোত ফিরিয়া গেল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীকে উচ্চ বেতনে বাংলার বাহিরেও অধ্যাপক, শিক্ষক বা বিচারকের পদে নিযুক্ত করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইতে লাগিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংরেজ সৈনিকদিগের সাহায্যে ভারত জয় করেন নাই। জয় করিয়াছেন ভারতীয় সৈনিকের এবং ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীর সাহায্যে। তখনকার ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা বুঝিতে পারেন নাই যে ইংরেজের কুট-কৌশল প্রত্যেক ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীকে মীরজাফর ও উমিচাঁদের দলভুক্ত করিয়া লইতেছে। এই ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজপুরুষগণ বাঙালী যুবকদিগকে শিখাইতে লাগিলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী বাঙালী—শিখ পাঞ্জাবী, মারাঠা বা গুর্খাদের ন্যায় সামরিক জাতি নহে: বাঙালী জাতি অসামরিক। সাধারণ সৈনিকদিগের মত তাহারা মারামারি কাটাকাটিতে দক্ষ নহে। তাহারা বুদ্ধিমান। সেইজন্য তাহারা উচ্চতর রাজকার্য্যের যোগ্য।

দশচক্রে ভগবান ভূত হইল। ইংরেজ রাজপুরুষগণের দুর্নীতির চক্রান্তের ফল ফলিল। বাঙালীদের মনে ধারণা হইল যে, তাহারা সামরিক জাতি নহে। তাহাদের বাহুবল নাই, সাহস নাই, তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে জানে না। তাহারা বুদ্ধিমান হইলেও সে বুদ্ধি কেরাণীগিরি ভিন্ন অন্য কোন খাতে প্রবাহিত হয় না। বাঙালীর এই শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ—তাহারা অন্নভোজী 'ভেতো বাঙালী'। এই ধারণা বাঙালীর মনে বদ্ধমূল হওয়াতে তাহারা শরীরচর্চ্চায় প্রতি বিমুখ হইল। শিক্ষিত বাঙালীরা অর্থোপার্জ্জনের জন্য পল্লীগ্রামে নিজ নিজ পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া রাজধানী কলিকাতা এবং একস্থলের শহরগুলির দিকে ধাবিত হইল। ফলে পল্লীগ্রামগুলি ধ্বংস হইতে লাগিল এবং নগরগুলি ক্রমশঃ স্ফীতকলেবর হইতে লাগিল। রাজধানীর আয়তন বর্দ্ধিত হওয়াতে সন্নিহিত বহু গ্রাম রাজধানীর সহিত মিলিত হইতে লাগিল।

পল্লীগ্রাম হইতে আগত লোকেরা রাজধানীতে আসিয়া দেখিল যে, কলিকাতায় থাকিলে তাহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হবে না। দশটা-পাঁচটা আপিসে চাকরি করিলে তাহারা স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। ইহা তাহাদের পক্ষে বড় অল্প প্রলোভন নহে। বাঙালী ধনবানদিগের অট্টালিকা দেখিয়া গ্রাম হইতে আগত ব্যক্তিরা ঈর্ষান্বিত হইল। তাহারা রাজধানীবাসী ধনবানদিগের আচার-ব্যবহার এবং বিলাসিতা দেখিয়া তাহাই কাম্য বলিয়া স্থির করিল। ফলে ধনবানের বিলাসিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাটীতেও ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিল। বহুমূল্য গৃহশয্যা, জুড়িগাড়ী প্রভৃতি বহু ব্যয়সাধ্য, কিন্তু উহা অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে ধনবানের আহার্য্য জনসাধারণও পাইতে পারে। আমি পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে ('আমাদের পরিচ্ছদ') স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা অভিমতের উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, বাঙালীর সংসারে যতপ্রকার পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তন্মধ্যে ভোজন-বিলাসিতাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট পাপ। তাঁহার এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমরা আজকাল স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া রসনার তৃপ্তির জন্যই বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছি। এখনকার ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ভোজের নিমন্ত্রণে যে সকল ভোজ্য পদার্থ খাইয়াছি, তাহা বর্ত্তমানকালে সম্পূর্ণ অচল। সেকালে ভোজের বাড়ী ব্যতীত লুচি-সন্দেশের দর্শনলাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটিত না। আর আজকাল দেখিতে পাই, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতেই জলযোগের জন্য প্রত্যহ লুচি, পরোটা ও মোহনভোগ প্রস্তুত হয়। সেকালের ভোজে লুচির সহিত একটা তরকারি, পটল বা বেগুন ভাজা এবং শেষে দধি ও সন্দেশ হইলেই লোকে কর্ম্মকর্ত্তার যথেষ্ট প্রশংসা করিত। যে সকল দ্রব্য আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারী নহে, লোকে তাহা আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিত না। মাছের সহিত দুগ্ধ পাইলে শরীরে বিষক্রিয়া হয়। কবিরাজী শাস্ত্রমতে উহা বিরুদ্ধভোজন। আর আজকাল 'দই-মাছ' বিলাসীদের একটা উপাদেয় খাদ্য।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের শহর অঞ্চলে সাধারণতঃ সিদ্ধ চাউলের ভাত খাই। কিন্তু সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউলের ভাত সমধিক পুষ্টিকর ও শক্তিপ্রদ। আমাদের এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য

ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতীয়া বিধবারা সিদ্ধ চাউলের অন্ন গ্রহণ করেন না। তাঁহারা প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে একবার মাত্র আলোচালের অন্ন ভক্ষণ করেন। রাত্রিতে অনেকেই সামান্য পরিমাণ ফলমূল ও দুগ্ধ খাইয়া থাকেন। সকলেই জানেন যে ঐ সকল বিধবার স্বাস্থ্য সধবাদিগের স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। এই স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান কারণ ব্রহ্মচর্য্য এবং অল্প ভোজন। আমরা সাধারণতঃ ভাতের ফেন অর্থাৎ মাড় ফেলিয়া দিই। যাঁহাদের বাড়ীতে গরু আছে, তাঁহারা ভাতের ফেন গরুকে দিয়া থাকেন; কারণ আমরা জানি না যে, ভাত অপেক্ষা ফেন অধিকতর পুষ্টিকর। ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন যে, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে টিপুসুলতানের সহিত ইংরেজের যুদ্ধকালে এক সময়ে ইংরেজের শিবিরে অন্নাভাব হইয়াছিল। ইংরেজ সেনাপতি মহাশয় মহা বিপদে পড়িলেন। ইংরেজের ভারতীয় সেনারা না খাইয়া কিরূপে যুদ্ধ করিবে? তাঁহার অধীন ভারতীয় সৈনিকেরা এ সঙ্কটের প্রতিকার দেখাইয়া দিল। তাহারা বলিল, "আমরা ভাত খাইব না, আমরা ভাতের ফেন খাইয়া থাকিব। শ্বেতাঙ্গ সৈনিকেরা ভাত খাইয়া যুদ্ধ করুক।" এই ব্যবস্থার ফলে ইংরেজ সৈন্যের অন্নাভাব ঘুচিল। এই যুদ্ধে দেশী সিপাহীরা শ্বেতাঙ্গগণের অপেক্ষা কণামাত্রও নূ্যন বিক্রম প্রকাশ করে নাই। শ্বেতাঙ্গ ঐতিহাসিকগণ এবং ইংরেজ সেনাপতিরা দেশীয় সৈনিকদের এই স্বার্থত্যাগের জন্য অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন না যে, ভারতীয় সিপাহীরা অন্নের সার অংশ অর্থাৎ ফেন নিজেরা খাইয়া অবশিষ্ট অপেক্ষাকৃত অসার ভাগ, অর্থাৎ ভাত শ্বেতাঙ্গদিগকে খাইতে দিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার এক নিকট আত্মীয় খুলনায় বাস করিতেন। পাকিস্থান হইবার পর তাঁহারা খুলনা ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা আমার অবস্থা অপেক্ষা অনেক উন্নত। আমি তাঁহাদের বাড়ীতে দেখিয়াছি, প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক হাঁড়ি আলোচালের ভাত সিদ্ধ করা হইত। বাড়ীর প্রত্যেকে বালক-বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যহ সকালে সেই ফেন শুদ্ধ ভাত বা "ফেন-ভাত" ঘৃত ও একটু লবণ-সহযোগে ভোজন করিত। উহাই ছিল তাঁহাদের প্রাতঃরাশ অর্থাৎ জলখাবার। এ দেশের কারাগারে ঐরূপ "ফেন-ভাত" খাওয়াইয়া জলযোগের কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। কারাগারের ভাষায় ঐ ভাতে নাম "লপসি"।

বৎসর আষ্টেক পূর্ব্বে আমি একবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি তখন চন্দননগরের বাটীতে থাকিতাম। জ্বর ছাড়িয়া জ্বর আসিত। চিকিৎসক আমায় কুইনাইন ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু জ্বর বন্ধ হইল না অধিকন্তু উদরাময় দেখা দিল। কোন পথ্যই হজম হইত না। দুইটা পায়ে শোথ দেখা দিল। আমার পুত্র চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার অবস্থা কি রকম মনে করেন।" উত্তরে ডাক্তার বলিলেন, "আগামী পূর্ণিমা পার না হইলে কিছু বলিতে পারি না।" আমার এক নিকট আত্মীয় কলিকাতায় চিকিৎসা করিতেন। তিনি আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আমাকে তাঁহার কলিকাতার বাসায় লইয়া আসিলেন। তিনি আমার রোগের ইতিহাস শুনিয়া আমার সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে প্রথমেই আপনার শরীরে যাহাতে শক্তিসঞ্চার হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" তিনি ব্যবস্থা দিলেন, আমাকে প্রত্যহ দুই কাপ বা তিন কাপ করিয়া ফেন খাইতে হইবে। লেবুর রস বা লবণ মিশ্রিত ফেন তিন-চার দিন খাইবার পর তিনি ফেনের সহিত অল্প পরিমাণ দুগ্ধ সেবনের ব্যবস্থা করিলেন। এই দুধ ফেনের সহিত লবণ বা লেবুর রস না দিয়া চিনি সহযোগে খাইতে বলিলেন। তাঁহার ব্যবস্থায় আমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম। তদবধি আজ পর্য্যন্ত আমি প্রত্যহ ভাত খাইবার সময় একবাটি করিয়া ফেন খাই। আমার এই আত্মীয় চিকিৎসকের বাটীতে কোনদিন ফেন ফেলিয়া দেওয়া হয় না। পরিবারস্থ সকলেই অন্নাহারের পূর্ব্বে এক বাটি বা দুই বাটি করিয়া ফেন খাইয়া থাকেন।

আমরা সাধারণতঃ ভদ্রসমাজে সরু চাউলের ব্যবহারই দেখিতে পাই। কিন্তু বাংলার মফস্বলে কৃষক এবং শ্রমজীবীরা সরু চালের ভাত পায় না। তাহারা মোটা মোটা লাল রঙের চালই খাইয়া থাকে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রেশন ব্যবস্থার কল্যাণে আমরাও মাঝে মাঝে ওরূপ মোটা ও লাল চালের আস্বাদ পাইয়াছি। অধিকন্তু তাহার সহিত কিছু কিছু ধান-কাঁকরও উদরস্থ করিয়াছি।

পশ্চিমবঙ্গের শহর অঞ্চলে আজকাল যেরূপ মিষ্টান্ন বাহুল্য দেখিতে পাই, এখন হইতে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে অবাঙালী মিষ্টান্ন বিক্রেতারা নানাপ্রকার ক্ষীরের খাবার এবং নানাপ্রকার লাড্ডু ও বরফি বিক্রয় করিত। বাঙালী ধনবানেরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য বড়বাজার হইতে ঐ সকল খাবার আনাইতেন। আজকাল আর কাহাকেও বড়বাজারে ছুটিতে হয় না। কলিকাতার যে কোন পল্লীতে বাঙালীর মিষ্টান্নের দোকানে বড়বাজারের মত নানা প্রকার মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বিজয়া দশমী, দেওয়ালী এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে মিষ্টান্নের দোকানগুলি যেরূপ সাজান হয়, তাহা দেখিয়া ক্রেতাকে নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে হয়, কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা কিনি। আমরা যে অর্থব্যয় করিয়া একরূপ বিষ কিনিয়া খাই, তাহা একবারও ভাবি না। আমার নিজের অভিজ্ঞতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমি কলিকাতার একটি মেসে কয়েক বৎসর বাস করিতেছিলাম। সেই সময়ে এক দিন অপরাহ্নে বাসার দাসীকে দোকান হইতে কিছু টাটকা খাবার আনিতে বলিলাম। সে আমার কথামত দুইটি গরম সিঙ্গাড়া এবং একটি মিষ্টি আনিয়া আমাকে দিল। সিঙ্গাড়াগুলো অত্যন্ত গরম দেখিয়া একেবারে মুখে না পুরিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। সেই ভাঙ্গা সিঙ্গাড়ার ভিতরে দেখিলাম, ভিতরের আলুগুলো ছাতায় পরিপূর্ণ। দোকানদার

বুঝিতে পারিলাম যে সেগুলো অন্ততঃ চার-পাঁচ দিনের পুরাতন। দোকানদার সেই সব বাসি, পচা মাল ফেলিয়া না দিয়া রোজ এক বার করিয়া গরম ঘৃতে ভাজিয়া টাটকা বলিয়া খরিদ্দারকে বিক্রী করে। খরিদ্দারও গরম খাদ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয়। অতিশয় গরম বলিয়া সিঙ্গাড়াগুলি যদি না ভাঙ্গিতাম ত আমিও খাইয়া ফেলিতাম। এইরূপ পচা খাবার উদরস্থ করিলে উহাতে আমাদের পাকস্থলীতে বিষের কার্য্য করে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

আমার এই পচা খাবার সম্বন্ধে জ্ঞান পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বকার অভিজ্ঞতালব্ধ। তাহার পর এই সুদীর্ঘকালে বাণিজ্য-কেন্দ্র কলিকাতায় ভেজাল খাদ্যের ধীরে ধীরে কিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ়গণের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় একটা জনরব প্রচারিত হইয়াছিল যে, কোন কোন অসাধু ঘৃত ব্যবসায়ী অতিরিক্ত লাভের আশায় ঘৃতের সহিত চর্ব্বি ভেজাল মিশাইতেছে। এই জনরব প্রচারিত হইবামাত্র কলিকাতার শত শত অবাঙালী ব্যবসায়ী চর্ব্বি ভেজাল রূপ পাপ হইতে মুক্তিলাভের আশায় নিজ নিজ মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। বিস্ময়ের বিষয়, এই ঘটনার পর হইতে কলিকাতার বাজারে বিশুদ্ধ গব্য বা ভঁয়সা ঘৃত অদৃশ্য হইতে লাগিল। আমি ইহার পূর্ব্বে প্রতি মাসে সংসারে ব্যবহারের জন্য কলিকাতা হইতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা মণ হিসাবে ভঁয়সা ঘৃত কিনিয়া লইয়া যাইতাম। সেই ঘৃতের মূল্য দেখিতে দেখিতে বৎসরখানেকের মধ্যে এক শত টাকায় উঠিল আর ঘৃতে ভেজালও তত বাড়িতে লাগিল। আমাদের বাড়ীতে চিরকালই গরু থাকিত আমার জননী গৃহজাত দুগ্ধ হইতে বাটী ভরা গব্যঘৃত প্রস্তুত করিতেন। উহা আমরা ভাতের সঙ্গে খাইতাম। আমরা কখনও গব্যঘৃত কিনিয়া খাই নাই। যে সময়ে ঘৃতে চর্ব্বি মিশান সংবাদ প্রচারিত হইল, আমি তখন 'হিতবাদী'র সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। এই ঘৃতে ভেজালের মূল ব্যাপারটা কি, অনুসন্ধান করিবার জন্য বড়বাজারে গিয়াছিলাম। অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিলাম, যে সকল অবাঙালী ঘৃত-ব্যবসায়ী ঘৃতে ভেজাল দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এখন সাধু সাজিয়া অবাধে ঘৃতে ভেজাল মিশাইতেছে এবং নিজেরা বিশুদ্ধ ঘৃত বিক্রয় করে বলিয়া ঘৃতের মূল্য বাড়াইয়া দিতেছে। অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত অসাধু ব্যবসায়ীরা, যাহারা 'লোটা-কম্বল' সম্বল করিয়া কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক 'বুদ্ধিমান' বাঙালীকে ঠকাইয়া তিন-চার বৎসরের মধ্যেই কলিকাতায় চার পাঁচ তলা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে। আর আমরা 'শিক্ষিত' বাঙালী বি-এ, এম-এ পাস করিয়া চাকরীর জন্য তাহাদের দয়া ভিক্ষা করিতেছি।

যখন ঘৃতে ভেজাল অবাধে চলিতে লাগিল, তখন নারিকেল তৈল, সর্ষপ তৈল, আটা, ময়দা, গুড় এবং চিনিই বা বিশুদ্ধ থাকিবে কেন? এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে শাক-সব্জী, ফল-মূল ও চাউল ডাইল ব্যতীত কোন খাদ্যদ্রব্যই বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না। আমার একজন বন্ধু এক দিন আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার কিছু ভেজাল সরিষার তৈলের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি শ্যামবাজার হইতে বালীগঞ্জ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ভেজাল তৈল কোথায়ও কিনিতে পারেন নাই। তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তুমি ভুল করিয়াছ। যে দোকানে লেখা আছে 'খাঁটী সরিষার তৈল' সেই দোকানে তৈল কিনিলেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইত।" আমি একবার আমাদের বাসাতেই দেখিয়াছিলাম, স্নানের পূর্ব্বে তেল মাখিবার জন্য একটা বাটিতে নারিকেল তৈল, আর একটা বাটিতে সরিষার তৈল লইয়াছি, কিন্তু উহার ঘ্রাণ লইয়া বুঝিতে পারিলাম না যে কোন্‌টা নারিকেল তৈল, আর কোন্‌টা সরিষার তৈল; তবে ঈষৎ পীতাভ বর্ণ দেখিয়া সেইটাই সরিষার তৈল বলিয়া অনুমান করিলাম। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিবেন, আমরা অর্থাৎ শহরবাসী বাঙালীরা কেন ক্রমে ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছি।

দৈনিক পত্রের পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আজকাল কলিকাতার মিউনিসিপাল করপোরেশন পুলিসের সহযোগিতায় শহরে ভেজাল খাদ্য এবং ভেজাল ঔষধ বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। করপোরেশনের কর্ম্মচারীরা প্রত্যহ ত্রিশ চল্লিশ জন ভেজাল বিক্রেতার দোকান অনুসন্ধান করিয়া দোকানদারকে গ্রেপ্তার করিতেছে ও তাহাদিগকে হাজতে চালান দিতেছে। যাহারা শহরের শান্তি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দায়ী, তাহাদের কর্ত্তব্য এইখানেই শেষ হইতেছে। কিন্তু তাহার পর ঐ অপরাধীদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইয়াছে বা হইতেছে? কদাচিৎ দুই-এক দিন কাগজে দেখিতে পাই যে, দুই-একজন ক্ষুদ্র মুদীর দোকানে দুই বা আড়াই সের সরিষার তেল বা নারিকেলের তেল রাসায়নিক পরীক্ষায় ভেজাল প্রমাণিত হওয়াতে অপরাধীদিগের পাঁচ, দশ বা কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। কিন্তু যে সকল আড়তদার বা তেল-কলওয়ালাদের দোকানে শত শত মণ ভেজাল তৈল, ভেজাল আটা-ময়দা বা ভেজাল চিনি গুদামজাত হইয়া আছে, তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইয়াছে বা হইতেছে? আমি যখন 'হিতবাদী'তে কার্য্য করিতাম তখন আমার সুপরিচিত এক ভদ্রলোক আমাদের আপিসে আসিয়া আমাকে একটা কাগজের মোড়ক দিলেন এবং বলিলেন, "এ জিনিসটা কি বলুন দেখি?" আমি মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে দুই তোলা বা আড়াই তোলা চিনি রহিয়াছে। 'উহা চিনি' আমি এই কথা বলাতে তিনি বলিলেন, "একটু জিভে দিয়ে দেখুন না?" আমি সেই চিনি অত্যল্প পরিমাণে লইয়া জিহ্বাতে দিলাম, কিন্তু কোন স্বাদ পাইলাম না এবং উহা জিহ্বার লালাস্পর্শে গলিয়াও গেল না। তখন তিনি বলিলেন—উহা চিনি নহে, খুব সূক্ষ্ম বালির কণা। তাঁহার বাড়ীতে খাবার প্রস্তুতের জন্য চিনির রস প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সেই রসের পাত্রের তলদেশে ঐগুলি জমিয়াছিল। উহা ছাঁকিয়া লইয়া এক বাটি জলে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু

উহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা আপিস হইতে সেই 'চিনি' এবং তৎসহ একখানি পত্র করপোরেশনের তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। করপোরেশন আপিসের কর্ম্মচারীরা আমাদের আপিসের পিওনবুকে স্বাক্ষর করিয়া সেই পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিন চার সপ্তাহের মধ্যে আমরা কিছুই জানিতে না পারায় পুনরায় করপোরেশন আপিসে পত্র লিখিলাম। তাহার উত্তর পাইলাম—অনুসন্ধান চলিতেছে। এটা ১৯১০ কি ১৯১১ সনের কথা। সে অনুসন্ধান বোধ হয় এখনও শেষ হয় নাই।

যদি কোন দুর্বৃত্ত অর্থের লোভে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি করে এবং গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, গৃহবাসিগণকে আঘাত করে, এমনকি হত্যাও করে, তাহার পর সেই দুর্বৃত্ত ধরা পড়িলে বিচারে তাহার দীর্ঘকাল কারাদণ্ড, দ্বীপান্তরবাস, এমনকি প্রাণদণ্ডেরও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল স্বার্থপর ব্যক্তি অর্থের লোভে দেশের লোককে ভেজাল খাদ্য ও ভেজাল ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে ও তাহাদিগকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতেছে, তাহারা কি দস্যুদলের অপরাধ অপেক্ষা কম অপরাধে অপরাধী? এ প্রশ্ন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কে ইহার সদুত্তর দিবে?

আমরা স্বাধীন হইয়াছি। বিদেশী অর্থলোভী বণিকেরা এখন আর আমাদের ভাগ্যবিধাতা নহে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর কোন্ স্বাধীন সুসভ্য দেশে অর্থলোভে এইরূপ দুষ্কার্য্য চলিতেছে? ইহা কি আমাদের ভাগ্যলিপি?

তড়িৎ-লতা

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কথার স্রোতে বাধা পড়ল। দিদিমা এতক্ষণ একমনে চা খাচ্ছিলেন। বাটিতে শেষ চুমুক দিয়ে যেন পরম তৃপ্তির সঙ্গে বাটিটা মাটিতে রেখে বললেন, "বাবারে বাবা, তোরা এত কথা বলতেও পারিস—এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে তা খেয়াল করেছিস?"

"শমী আজ দেখত একটু কিছু যোগাড় করতে পারিস কিনা? আর শমীকেই বা বলি কি! আমরা দুটি মেয়েমানুষ এই শূন্যপুরীতে। কাল রাত্তিরে তোমরা ত চলে গেলে, এই নির্জ্জনে মনটা কেমন করতে লাগল। ঠিক ভয় পাই নি, তবে মনটা যেন দমে গেল। তবু নাতনীকে ভরসা দিয়ে বলি, আমরা বাংলা দেশের মেয়েরা হলাম বাঘিনী। আমরা কি ডরাই চোর-ডাকাত বদমাসকে? গল্প শুনবে?

"একবার আমরা গিয়ে বাস করি অন্য এক জায়গায়। সেই গ্রামে এক বাড়ীতে ডাকাত পড়ে রাত দুপুরে। হৈ হৈ রৈ রৈ করে ত ডাকাতরা হাঁক দিয়ে এসে পড়ল। কান্নাকাটি, চেঁচামিচি, সোরগোল পড়ে গেল। অনেকে বাড়ীঘর ছেড়ে বৌ-ঝি শিশু নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকোতে লাগল। তোমার দাদু তাড়াতাড়ি মালকোঁচা মেরে একটা শক্ত বড় লাঠি নিয়ে বললে, এখন কি করা যায়? একবার গিয়ে দাঁড়ানো উচিত; কিন্তু তোমাদের একলা রেখে যাব কি করে?"

আমি বললাম, "না, তা যাবে কেন? আমাদের সঙ্গে ঘোমটা টেনে বসে কাঁদ। পুরুষমানুষ যাবে না ত কি? লোকের বিপদে গিয়ে দাঁড়াবে না? ডাকাতদের বাধা দেবে না! যাও, আমাদের জন্য ভেব না। আমরা এই দা, বঁটি, এই সব নিয়ে বসে রইলাম।"

"তোমার দাদুকে এগুতে দেখে আরও কয়েক জন গ্রামের লোক এগোল। তোমার দাদু ফিরে এল গায়ে মাথায় রক্ত মেখে। ওঁর মাথা ফেটে গেছে।"

"তুমি খুব কাঁদলে না দিদিমা?"

"কেঁদেছি সত্যি, কিন্তু হাত-পা ছড়িয়ে বসে কাঁদি নি।"

শম্পা তার দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "বল না দিদিমা দাদুর সঙ্গে তোমার কেমন ভাব ছিল। ভালবাসতে, না শুধু ভয়ই করতে। তখনকার দিনে স্বামীদের ছিল বউদের উপর প্রবল প্রতাপ··· !"

দিদিমা বললেন, "একালের মেয়েদের মত ভালবাসাবাসি জানি নে বাপু। তোদের মত কেঁদে সোহাগ করতে জানতাম না। তবে মনে মনে যাকে সোয়ামী বলে একবার ঠিক করলাম, তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করা অধর্ম্ম বলেই জানি। তবে শোন বলি গল্প—

"তোর দাদু আর আমি ছিলাম এই গ্রামেরই এপাড়ায় ওপাড়ায়। দু'বাড়ীর লোকেই বলাবলি করত আমাদের বিয়ে হবে। আমারও বিশ্বাস হ'ল। ওর চেহারাটাও দেখতে ভাল ছিল। তখন আমার বয়স ছিল আট আর ওর হবে দশ। দিনকয়েক পর ওকে দেখলাম আর একটা মেয়ের সঙ্গে পালের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। খুব রাগ হ'ল—দৌড়ে গিয়ে মেয়েটাকে মেরে তাড়িয়ে দিলাম আর তোর দাদুকে খুব তম্বি করলাম।"

আমরা কেউ হাসি চাপতে পারি নি। হাসি থামলে শম্পা দেবী বললেন, "বিয়ে না হতেই এই, বিয়ের পর তা হলে দাদুর যে কি অবস্থা হয়েছিল তা ত বুঝতেই পারছি।"

"ও মানুষের সঙ্গে পেরে উঠবার উপায় ছিল না। রাগ

করলে কোনদিন গায়ে মাখতে দেখি নি, এমন মানুষের উপর কি রাগ করা যায়।"

"তা হলে দেখছি একেবারে উল্টো গঙ্গা বইয়ে ছেড়েছ। ওকালে ত ছিল কর্তাদের রাজত্বি, তার বদলে তুমিই দেখিয়েছ তার উপর দাপট।"

"আরে ভাই, তখনকার দিনে কুলীনের মেয়েদের হ'ত বেশী বয়সে বিয়ে. সবাইকে কি আর অমনি করতে পারত?"

"তোমার ত ছোটবয়সে বিয়ে হয়েছিল।"

"তা হলে কি হয়, তোর দাদুর মত মানুষ···" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "অমনি মানুষ কারুর উপর জুলুম করতে পারে—এ আমি কিছুতেই ভাবতে পারি নি, দেখিও নি কোনদিন।"

শম্পা দেবী ক্ষণেকের তরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, হঠাৎ যেন চমকে উঠে বললেন, "জান দিদিভাই, আমি একদিন বাড়ী ছেড়ে চলে যাব!"

"কোথায় যাবি?"

"যেদিকে দু'চোখ যায়।"

"মেয়েমানুষ আবার বেরিয়ে যাবে কি? ওসব পাপকথা মুখেও আনতে নেই, তামাশা করেও বলতে নেই। মেয়েমানুষের তাতে কলঙ্ক হয়।"

"কণ্ঠিবদল করে গেলেই ত পাপের হাত থেকে রক্ষে পাওয়া যাবে।"

"ছিঃ, তোর বিয়ে হয়েছে, তোর আবার কণ্ঠিবদল কি? ওসব কথা মুখেও আনবি নে। অদেষ্টর দোষে যা হয়েছে, এ জন্মে তাই মেনে নিতে হবে। দুঃখ পেলেও মান সম্মান নিয়ে আছিস। আর অন্য কিছু হলে দুঃখ ত ঘুচবেই না, মান-মর্য্যাদাও খোয়াবি।"

"সবাই সুযোগ পেলে উপদেশ দেয়। শুনেছি তুমিও না কি একবার বেরিয়ে গিয়েছিলে?"

দিদিমা—"কিসে আর কিসে? কার সঙ্গে কার তুলনা। আমি গিয়েছিলাম বেরিয়ে তোর দাদুর সঙ্গে। ঘটনাটা বলছি—

"তোর দাদু ছিল ঘরজামাই। শ্বশুরবাড়ীতে দিন দিন তার অযত্ন, অচ্ছেদ্দা বাড়তে লাগল। আমার কেমন যেন লাগত। আমি প্রথম প্রথম বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু তাতে ফল হ'ল না, শেষে এক দিন রাতে তোর দাদুকে চুপি চুপি বাড়ীর বার করে দিলাম, ঠিক হ'ল তিনি একটা কিছু আস্তানা ঠিক করে তিন দিন পর মাঝরাত্তিরে আমাদের গাঁয়ের কোণে বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকবেন আমি ওখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

"পরদিন সকালে জামাই পালিয়েছে বলে জানতে পেরে নানা লোকে নানা মন্তব্য করলে—তারপর ঠিক হ'ল বাছাধন যাবে আর কোথায়, চিট হয়ে আপনিই ফিরে আসবে। আমি মনে মনে হাসলাম। চুপচাপ রইলাম। সবাই মনে করল—আমার মন খারাপ!"

"কথামত সেই রাত্তিরে বেরিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে নৌকোয় চাপলাম। কোথায় যাব জানিনে। এই তিন দিন ঘুরে কিছুই ঠিক করতে পারে নি। তারপর দু'পাঁচ দিন করে এর বাড়ীতে তার বাড়ীতে থাকতে লাগলাম।

প্রথম প্রথম যত্নআত্তি করত, কিন্তু বেশীদিন আস্তানা দিতে কেউ রাজী হ'ত না—তারপর এক অজায়-পাড়ায় আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে জায়গা পেলাম।

কোনগতিকে একটা ডেরা বাঁধলাম। আমার বাপের বাড়ীর লোক টের পেয়ে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত অনেক সাধ্যসাধনা করেছে, টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করতে চেয়েছে। আমি অস্বীকার করলাম।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—দাদু বুঝি কিছু উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করে ফেললেন।

দিদিমা—"কিছু না। নিষ্কর্ম্মা লোক। তাঁর কখনও কোন চিন্তা-ভাবনা ছিল না; সদাই হাসিখুশী, গল্প-তামাশা নিয়েই থাকতো, একেবারে সদাশিব লোক। পেলে খেলেন, না পেতে পেলেও মুখ থেকে হাসিটুকু মুছে যেত না। পরের কাজ করেই তার দিন কাটত। কিন্তু এদিকে যে নিজের বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে না তার জন্ত তার এক দিনের তরেও ক্ষোভ দেখি নি। পাড়া-পড়শীর ভরসাস্থল ছিল, গ্রামের সকলেই 'ঠাকুর মশায়' বলে পায়ের ধুলো নিয়ে যে যার নিজের কাজ করিয়ে নিত। খাওয়ার সময়ও ছিল না, ঘুমের সময়ও ছিল না। আর ছিল টৈ টৈ করে পাশা-খেলা। আমি কত বকাবকি করতাম। হেসেই উড়িয়ে দিতেন, তবুও একরকমে দিন কাটছিল।

একটা কথা বলব—এখনকার কোন কোন মেয়ের মত ছেলে-পুলে চাই নে এমন কথা আমরা বলতাম না। ছেলে হ'ল মেয়েদের শোভা, সম্পদ, সম্মান সব। ছেলে হলেই মা হয় ভাগ্যবতী, ভগবতী। সত্যি বলব আমি—শমীর আচরণ আমি পছন্দ করি নে। ছেলে ফেলে কোন্ মা আসতে পারে? না হয় ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতিস। ছেলে কোলে থাকলেই মা-দুর্গার মত চেহারা হয়, নইলে হয় দুষ্ট সরস্বতী।"

ধীরে ধীরে শম্পা দেবীর হাত ছাড়িয়ে দিদিমা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা সবাই চুপ করে আছি। বিদুদার দৃষ্টি যেন হয় অনেক—অনেক দূরে। শম্পা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—"কি ভাবছ।"

"দিদিমাদের।"

"তার মানে?"

"বইয়ে পড়েছি পুরনো সমাজের বহু কাহিনী। আজ তার একটা পাতা যেন একেবারে জীবন্ত হয়ে এতক্ষণ আমাদের চোখের সম্মুখে কথা বলে গেল।"

শম্পা দেবী—"তুমি আশ্চর্য্য লোক! এর মধ্যেও তুমি—"

বিদুদা বাধা দিয়ে বললেন, "আগে শোন। আমি ভাবছি কি

জান। দিদিমা শুধু তোমার দিদিমা নন্। এ দেশের সমস্ত দাদু ও দিদিমারা হলেন জাতির দাদু ও দিদিমা। এ জাতির ঐতিহ্যকে তাঁরা বাঁচিয়ে রেখে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এঁরা না থাকলে আজ আমরা থাকতাম না। এরা জাতির প্রবাহ অব্যাহত রেখেছেন। এঁরা আমাদের নমস্য। সমস্ত জাতির কর্তব্য এঁদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। এমন সমাজই ত আমরা গড়ে তুলতে চাই যেখানে সকলে সমাজের সেবা করবে আর সমাজ সকলকে রক্ষা করবে।"

কিছুক্ষণ যাবৎই একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। এবার দেখি, একটি চাষীর ছেলে কাঁধে, হাতে কাস্তে নিয়ে এ-দিক দিয়ে যাচ্ছে। চাষী তার মোটা কর্কশ গলায় ছেলেকে যেন একবার বোঝাচ্ছে আবার ধমকাচ্ছে। ছেলেটা কেবল মা, মা করছে। আমাদের কাছাকাছি আসতেই শম্পা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেটি কাঁদছে কেন? কি হয়েছে? কোন অসুখ করেছে কি?"

"আজ্ঞে না। আমি ক্ষেতে কাজ করে খাই, নিজের ক্ষেত ত নাই, পরের জমিতে চাষ করি। যেদিন না যাব সেদিনের রোজগারই মারা গেল। আমি কি পারি ছেলে আগলে ঘরে বসে থাকতে? বলুন ত মা ঠাকরুণ?"

"ওর মা কোথায়?"

"আজ্ঞে সেই ত হয়েছে জ্বালা। ক'দিন ধরে পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া চলছিল। আমাদের অভাবের সংসারে—যেখানে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বাইরে থেকে কিছু না আনতে পারলে একেবারে উপোস দিতে হয়, সেখানে ঘরে ঝগড়া হয়ই। বাইরে কিছু করতে না পেরে ঘরে এসে আমি পরিবারকে বকে মেরে ধরে গায়ের জ্বালা মেটাই; ওদিকে ক্ষুধার জ্বালায় ছেলে কাঁদছে, তার মুখে কিছু দিতে না পেরে বৌ বকে আমাকে। এ ত আমাদের অভাবের সংসারে নিত্যকার ঘটনা। সেই যে ছেলেটাকে ফেলে বাড়ী থেকে চলে গেল আর ফেরবার নামটি নেই।"

"তুমিই তাকে নিয়ে আস না কেন?"

"তাই যাব মা'ঠান; দু'চারটা দিন দেখে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসব না?"

"আজ তোমাদের খাওয়া হয়েছে?"

"ওকথা জিজ্ঞেস করবেন না—এ রকম আমাদের হয়, অভ্যেস আছে।"

শম্পা দেবী তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন—চাষীর আপত্তি সত্ত্বেও ছেলেটাকে নিয়ে এসে চায়ের পর যেটুকু দুধ পড়েছিল তা ওকে খাওয়ালেন—মুড়িটুড়িও দিলেন, সেগুলি একটা বাটিতে করে আর কিছু চিনি মিশিয়ে চাষীর হাতে দিলেন খেতে। খাওয়া শেষ করে বাটি পরিষ্কার করার জন্য উঠে দাঁড়াল; শম্পা দেবী বাধা দিলেন। চাষী বলল, "আমার খাওয়া বাটি আপনি কি করে···" কথা শেষ করতে পারল না—শম্পা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তার পর আস্তে আস্তে বাটিটা নামিয়ে রেখে ছেলেকে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল।

"তুমি ত ভাই সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ করবে, তা ছেলেটা থাকবেই বা কোথায়, খাবেই বা কি?"

চাষীর মুখে কোন উত্তর যোগাল না, সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শম্পা দেবীর মুখের দিকে।

"না ভাই, ওকে মাঠে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই, এখানেই থাকবে, ফেরবার পথে তুমি ওকে নিয়ে যেও—মাঠে গিয়ে আলের ওপর একা থাকতে পারবে না।"

"খুব পারবে, মা'ঠান, খুব পারবে। একটু কান্নাকাটি করবে, তার পর আপনিই ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি বড়লোক, তোমার এখানে ও সারাদিন হাঙ্গামা করবে, তুমি তা সইতে পারবে না। তোমার দয়ার শরীর, তাই তোমার কাছে নিজের ছেলে আর পরের ছেলে এক—কিন্তু আমার বরাত বড় মন্দ, বেঁচে বর্তে থাক তোমার ছেলে-পান—তাদের ভাগ্য ভাল, তোমার মত মা পেয়েছে।"

কথা বলতে বলতে চাষী সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ছেলেকে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে চলে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় শম্পা দেবী ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন—মুখখানি বেদনায় করুণ। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তিনি হঠাৎ পিছন ফিরে পাশের ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজা বন্ধের শব্দটা যেন কানে ও মনে আঘাত করল।

১৬

সকালবেলা চাষী চলে যাওয়ার পর থেকেই শম্পা দেবীর ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। তিনি যেন আমাদের এড়িয়ে চলতে চাইছেন। আমরাও তাঁকে আর বিশেষ ব্যস্ত না করে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বার পরামর্শ করতে বসলাম।

হঠাৎ শম্পা দেবীর 'মাগো' চীৎকার শুনে দৌড়ে ভিতরে গিয়ে দেখি ওঁর সাড়ীতে আগুন ধরেছে, আর শম্পা দেবী দিশেহারা হয়ে উবু হয়ে সাড়ীর এদিক-ওদিক হাত দিয়ে চেপে ধরে আগুন নেবাবার চেষ্টা করছেন। ব্যাপার দেখে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল—হাতের কাছে একটা জলের বালতি ছিল তাই দিয়েই ভাবলাম আগুন নিবিয়ে দেব। কিন্তু বিনুদা আর আমাকে সে সুযোগ দেন নি। তিনি এক সেকেণ্ডের মধ্যে আশ্চর্য কৌশলে সাড়ীটাকে দুমড়ে আগুন নিভিয়ে ফেললেন। সাড়ীটা অনেক জায়গায় পুড়েছে; বিনুদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "বালতির জলে আগুন নেবালে শরীরের জ্বালা যে বেড়ে যেত অনেক!" প্রতিবাদ করবার উপায় নেই, তবু লজ্জিত হাসি হেসে মেনে নিতে হ'ল স্নেহের তিরস্কার!

শম্পা দেবীর শরীরের কোথাও পুড়েছে কিনা সে প্রশ্ন করবার আগেই তিনি বললেন, "ভয় নেই, শুধু পায়ের একটু জায়গা পুড়ে গেছে, তাতে বেশ জ্বালা করছে, কিন্তু তাই বলে এখন তোমাদের

ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারখানায় ছুটতে হবে না, খানিক বাদে এমনিতেই সেরে যাবে! আগুনের জ্বালা···ও কিছু নয়···"

বলতে বলতে শম্পা দেবী হঠাৎ থেমে গেলেন। চোখের কোলে জল জমে টল্‌ টল করছে—তিনি ঘর থেকে আচমকা বেরিয়ে গেলেন।

"শম্পা দেবী নিজেই বললেন তেমন কিছু পোড়ে নি, জ্বালা একটু বাদেই সেরে যাবে; কিন্তু তবু তার চোখে জল—কেমন যেন লাগছে বিনুদা—তবে কি ভয় পেয়েছেন নাকি!"

"নারে ভাই না, ভয় পাওয়ার মেয়ে ও নয়—আগুনের জ্বালায় আসে নি ওর চোখের জল, আজ ওর মনে বয়ে যাচ্ছে মাতৃস্নেহের শান্ত শীতল হাওয়া।

মনে হচ্ছিল বিনুদা যেন আরও কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু শম্পা দেবীকে আবার ঘরে ঢুকতে দেখে থেমে গেলেন। শম্পা দেবী হাসিমুখ দেখাবার চেষ্টা করে বললেন, "আজ তোমাদের খাওয়া যা হবে তা ত বুঝতেই পারছি! ডাল তরকারী যা রেঁধেছি তাতে নুন মসলা দিয়েছি কিনা তার কিছুই ঠিক নেই; তার পর, সাড়ীর আঁচল দিয়ে কড়া নামাতে গিয়ে যা হ'ল তাত দেখতেই পেলে।"

"কিন্তু হ'ল কি করে" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কি জানি ভাই, বোধ হয় সাড়ীর একটা ধার কোথাও ঝুলেছিল, তোমাদের যে খাওয়া হবে না তাই ভাবছি।"

শম্পা দেবীকে আশ্বাস দিয়ে বিনুদা বললেন, "আমাদের খাওয়ার জন্ম তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না! আজকে আর তোমার রেঁধেও কাজ নেই। দেখছি ত একটা ডাল আর একটা তরকারী রেঁধে রেখেছ ওতেই চলে যাবে! আর তেল নুন মসলার কথা বলছ—ওর জন্ম কিছু ভাবনা নেই।"

শম্পা দেবীও আর কোন বাধা দিলেন না; শুধু বললেন, "বেশ, তাই হোক; চেষ্টা করে বুঝি বিড়ম্বনাই বাড়াব!"

দুপুরবেলা খেতে গিয়ে দেখি শুধু আমাদের দু'জনের জন্ম খাওয়ার জায়গা করা।

খাওয়ার পর বিনুদা বললেন, "চল আজ একটু গড়িয়ে নিই।"

বিছানায় গা ঢেলে দিতেই চোখ বুজে এল—তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। শম্পা দেবীর গলার আওয়াজে চমকে উঠলাম—"বিনুদা, ও বিনুদা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি! আজ তুমি ঘুমোতে চাইলেও ঘুমোতে দেব না।"

"বিদায়ের বেলা আসছে ঘনিয়ে, আবার তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে, দেখা হবে কিনা তাও জানি নে; মনের কথা আজ না বললে আর কবে বলব বল ত! আজ তোমাকে শুনতে হবেই। আজ তোমাদের খাওয়া হয় নি, সে দুঃখই রাখবার জায়গা নেই, তার ওপর ছাড়াছাড়ির কথা মনে হলেই মনটাতে কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে!"

বিনুদা বিছানার উপর উঠে বসে বালিশটাকে কোলের উপর রেখে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—"মানুষ হয়ে জন্মে একেবারে ভাবলেশহীন হয়ে একটা চামড়ার আবরণে কলের মত কাজ করবে, এ আশা আমি ত কোন দিনই করি নি।

"চেয়ে দেখ আকাশে আজ মেঘের আমন্ত্রণ কবি বলেছেন, এমনি অবস্থায় সুখী মানুষও নাকি আনমনা হয়ে পড়ে প্রেমাস্পদের জন্ম, ভালবাসার জনকে কাছে পাওয়ার জন্ম।"

শম্পা দেবী হেসে ফেললেন—"এতও পার তুমি! যে বস্তুর অস্তিত্বই নেই তোমার কাছে, তা নিয়েও বক্তৃতা দিতে পার! মাথা নেই তার মাথাব্যথা! ভালবাসার পাত্র, প্রেমাস্পদ! যত রাজ্যের বাজে কথা! অন্ততঃ তোমার মুখে এগুলো বাজেই শোনায়। রাজনীতি করতে এলে, তাও হলো গুপ্ত সমিতির সভা, সেখানে মুখটাই আগে বন্ধ করতে হয়। এ না হয়ে কথার ব্যাপারী, রাজনৈতিক বক্তা হলেই পারতে। যা ইচ্ছে সভায় দাঁড়িয়ে বলে যেতে আর হাততালি পেতে।"

"তোমার মত কথায় ছুরি উদ্যত করে যদি শ্রোতাদের মধ্যে দু-চার জন থাকে, তা হলে বক্তার হাততালির বদলে কি জুটবে বুঝতেই পার। ঠাট্টার কথা নয়, বাস্তবিকই এমনি মেঘলা দিনে প্রিয়জনকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে; এ শুধু কবির কথা নয়—বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত কিছুর ব্যঞ্জনার মধ্যেই এর রূপটি প্রকট হয়ে আছে।"

বিনুদা'র কথা শম্পা দেবীর মনে কোন দাগ কাটল কিনা জানি নে, তিনি চুপ করে রইলেন—মনে হ'ল তিনি নিজের মনের ভিতরটা যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আজ আমার মন আবার কেন জানি নে উতলা হয়ে উঠল। প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তার জীবন যেন মুহূর্ত্তে বোঝা হয়ে উঠল—মনে ভেসে উঠল একান্ত নির্ভরশীল একখানা ছোট সংসার, নিয়মবাঁধা একান্ত পরিচিত পরিবেশ!

শম্পা দেবী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—"চাষী তার ছেলেকে নিয়ে চলে গেল চোখের আড়ালে, কিন্তু মনের আড়াল কিছুতেই করতে পারলাম না তাকে। চারদিকে শুনতে পাচ্ছি কেবল মা, মা, কান্না। একটুকু শব্দ হলে চমকে উঠি, কে বুঝি এল—চোখ ফিরিয়ে দেখে নিরাশ হয়ে যাই! ঐ দুটি অসহায় চোখ যেন আমার একান্ত চেনা—সবকিছু আজ দুঃসহ হয়ে উঠেছে!"

আমি স্বভাবতঃ লাজুক। নিজের কথা সহসা কাউকে বলতে পারি নে, কিন্তু মনের বাঁধ আজ আমার একান্ত অজ্ঞাতেই খুলে গিয়েছিল, তাই বোধ হয় শম্পা দেবী থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ থেকেও বেরিয়ে এল—"আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার মনও কেন জানি নে আজ বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে সর্বক্ষণ অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আজ সবকিছুকেই অনিশ্চিত বলে বোধ হয়!"

হঠাৎ মনে হ'ল বিপ্লবীর জীবনে এমনি ভাবালু কথা অদ্ভুত। সেজন্ম বললাম—"নিজের লক্ষ্য-পথে আমরা নিশ্চয়ই চলব—তবে

ফরাসী-ভারতের ভারত-রাষ্ট্রভুক্তি উপলক্ষে পণ্ডিচেরিতে উৎসব

গান্ধীগ্রামে একটি শিক্ষার্থিনী কর্তৃক বাতি জ্বালানো

বি বি সি-তে রাশিয়ান নৃত্যশিল্পী ভায়োলেট এলভিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জব্বলপুরের অন্ধ বালক ডেনজিল মেয়ার্স
("দেশ-বিদেশের কথা" দ্রষ্টব্য)

মাঝে মাঝে মানুষ হিসেবে যে কথা মনে জাগে এ তারই শুধু স্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র।'

'নীতীশ ঠিকই বলেছে শম্পা, আমাদের লক্ষ্য এবং তার প্রাপ্তি সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, দেখছ না কালো পর্দা নড়ে নড়ে উঠছে। অচিরে এ সরে যাবে, আসবে আলোর পসরা নিয়ে নতুন মানুষ, নতুন সমাজ—দুঃখ মানুষের ঘুচবেই।'

শম্পা দেবী বিস্মিত হয়ে বললেন—'তোমার হয়ত কোথাও ভুল হচ্ছে—নীতীশদাও তোমার মত মেতে আছেন বিপ্লবের মহোৎসবে, এরই রসে তিনিও আপ্লুত, এরই মাঝে খুঁজে পেয়েছেন আনন্দের সূত্র!'

শম্পা দেবীর দিকে স্থির দৃষ্টিপাত করে বিনুদা বললেন, 'এমনি হয়। বাইরের সঙ্গে অন্তরের পরিচয়ে অনেক সময়ই তফাৎ থাকে। 'আমি নীতীশের নিন্দে করছি নে। ওর মত শক্তিমান একনিষ্ঠ কর্মী খুব বেশী নেই। ও সমিতির একটা বলভরসা; কিন্তু তবু ওর প্রাণ চায় একটি শান্ত শীতল গৃহ, এর জন্য ওর বিন্দুমাত্রও অপরাধ নেই। ও একদিন সেখানে ফিরে যাবে এও ঠিক, তাই বলে কি ও সমিতির কোন ক্ষতি করবে, মোটেই নয়।'

বিনুদা বলতে লাগলেন—'আমাদের কথা ছেড়ে দাও। তোমার সব কথা কিন্তু হয় নি শম্পা। এ ত গেল একটা দিক। তোমার মনে আজ ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দ্বিধা দ্বন্দ্বে, হৃদয় প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। মনের সমস্যা, দ্বন্দ্ব, অশান্তির ঝড় কেটে যায় তা প্রকাশিত হলেই। মনের ভিতর তা বদ্ধ থাকলে ঠিক তেমনি-ধারাই হয় যেমনটি হয় শক্ত আবরণের মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য বদ্ধ থাকলে—বিস্ফোরণ হয়, অগ্নি উদ্গীরণ হয়।'

'সবই আজ আলোচনা করব' বলে শম্পা দেবী ভাল করে বসলেন।

জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলাম, কে যেন ও-বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটা ঝোপের আড়াল হ'ল। বিনুদা বললেন—'শম্ভু আসছে, তুই গিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে ইসারা করে নিয়ে আয় একেবারে ঘরের ভিতর; কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই।'

শম্ভু ঘরে এসে যা বললে তার মর্ম এই যে, আমরা যে এখনও এই অঞ্চলেই আছি এ সন্ধান পুলিশ পেয়েছে, তারা চারদিকে খুব তল্লাসী চালাচ্ছে—এখানে থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়। মীরগঞ্জেও নৌকোর ব্যবস্থা ঠিক রেখে এসেছে, ওখান থেকে রাতারাতিই গোবিন্দপুর পৌছানো যাবে। কথা শেষ করেই শম্ভু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে এখখুনি যেতে হবে!"

"এখখুনি!" বললেন শম্পা দেবী, "খাওয়া নিশ্চয়ই সারাদিন হয় নি; জল দিচ্ছি, চট করে হাত-পা ধুয়ে নিন; খাবার তৈরি আছে।"

"অর্থাৎ, চিরাচরিত প্রথা অনুসারে আপনার অংশই আমাকে দেবেন এই ত!"

একথার কোন জবাব না দিয়ে শম্পা দেবী বললেন, "না খেয়ে গেলে সারাদিন আর জুটবে কি না কে জানে!"

"খিদে অবশ্য খুবই পেয়েছে, কিছু খেতে পারলে বেশ হ'ত। তবে তত ভাবনা নেই, কিছু জুটবে, কিছু কি আর মিলবে না; আর নাই যদি মেলে তাতেই বা ক্ষতি কি!"

"এদেশে যা জুটবে সে আমার জানা আছে! কথায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই, চট করে বসে পড় ভাই!"

খাওয়া শেষ করে শম্ভু যাওয়ার জন্য তৈরি হ'ল। বিনুদা ওকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি বললেন। ফিরে এসে শম্ভু শম্পা দেবীকে প্রণাম করে বলল, "চললাম শম্পাদি; পরিচয় মুহূর্তের, কিন্তু তবু ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না! কি যে তোমাদের মধ্যে আছে জানিনে। সবগুলো মানুষই দেখলাম এমনি ভালবেসে আপন করে নেয়। আমাদের সাক্ষাৎ যেমন আচমকা, বিদায়ও তেমনি; কিন্তু ছাড়াছাড়ির বেলায় মনে কেন জানি একটা মোচড় দেয়! মনে হয় কি যেন হারিয়ে ফেললাম!"

কথা শেষ করেই শম্ভু সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে চলে গেল। একেবারে চোখের আড়াল না হওয়া পর্য্যন্ত আর আমরা কেউই নড়তে পারলাম না।

আমরা নীরবে চলে গেলাম আমাদের বসবার ঘরে, শম্পা দেবী গেলেন ভিতরের দিকে। খানিকক্ষণ বাদে তিনি ফিরে এলেন। মুখে ফুটে উঠেছে এক তৃপ্তির আভা—মনে হ'ল যেন কোন হারানো বস্তুর সন্ধান মিলেছে।

"খাওয়া শেষ করে এলাম। খেতে খেতে বারে বারেই মনে হচ্ছিল শম্ভুর কথা। এমন একটা পাগলা ছেলে কমই দেখতে পাওয়া যায়। ওর মত একটা ভাই পেলে হয়ত আমার অনেক অভাব মিটে যেত।

"তোমার উপর দেখছি এদের অগাধ বিশ্বাস। আর একটা কথা যা বললে, তা শুনলে রাগ করবে কিনা জানিনে—সে বললে, "আপনি সত্যিই আর দশ জনের চাইতে আলাদা, নইলে বিনুদার ভালবাসা পেতেন না কিছুতেই।" আমি বললাম, "তার মনের কথা কি করে জানব ভাই।" জবাবে বললে, "জানা যায়, জানা যায়। বিশ্বাস আর ভালবাসা না থাকলে তোমার মত যুবতী মেয়ের বাড়ীতে তিনি নিজেও আশ্রয় নিতেন না, আমাদেরও উঠতে দিতেন না। তিনি কিন্তু বিশ্বাস না করলে ভালবাসেন না, আবার ভাল না বাসলে বিশ্বাস করেন না।"

বলতে বলতে শম্পা দেবী থেমে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। নিজেই আবার কথা সুরু করলেন বিনুদাকে উদ্দেশ করে, "আচ্ছা শম্ভু যা বললে তা কি ঠিক? বিশ্বাস তুমি কর সে ভরসা আমার আছে, কিন্তু ভালবাস কিনা তা ত কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছিনে। তোমাদের রীতি-নীতি আলাদা। ভালবাসার সূত্র ধরেই বিশ্বাস জাগে মনে, না এর ঠিক উল্টো পথে চলে তোমাদের মন, এ কৌতূহল তোমাকেই মেটাতে হবে আজ।"

"কি জানি অতশত ভেবে দেখি নি। ভালবাসার শাস্ত্র ঘাটি নি, তাই তার হিসেব-নিকেশ, জমা-খরচ কিছুই আমার জানা নেই। ভালবাসা নাকি অন্ধ, কাজেই ওতে বিচারবুদ্ধি লোকে তেমন করে না। তাই ভালবাসা অন্ধ হলেও বিশ্বাসটা চোখ-কান খাড়া রেখেই করতে হয় আমাদের।"

"যাক্, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। অবিশ্বাসের কাজ এখন পর্য্যন্ত যখন কিছু করিনি, তখন বিশ্বাস হয়ত কর, কিন্তু আর একটা প্রশ্নের জবাব ঠিক পেলাম না, পাওয়ার আশাও করিনে অবশ্য।"

দিদিমার গলার আওয়াজ পেয়ে শম্পা দেবী কিছুক্ষণের জন্ম ভিতরে চলে গেলেন। হঠাৎ সব চুপচাপ! বিনুদার গলায় গানের গুন গুন গুঞ্জন—বিনুদা ভাবসাগরে ডুব দিয়েছেন, কথা বলে তাকে সজাগ করতে ইচ্ছে হ'ল না। কিই বা বলি!

শম্পা দেবী যেমন চট করে ঘর থেকে গিয়েছিলেন, তেমনি আচমকা ফিরে বললেন, "তোমার গলায় গানও আছে দেখছি।"

"কেন আমার গলাটা কি এমনি একটা বন্ধ দ্বার যেখান থেকে শুধু কথা ছাড়া আর কিছু বেরুতে নেই!"

"কথায় তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই। তবে তোমরা আবার সব জিনিষই কতকগুলো মতবাদের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে ব্যবহার কর কিনা—তাই কৌতূহল হয় হঠাৎ আজ কেন তোমার কণ্ঠে উঠেছে গানের সুর।"

একটু চুপ করে থেকে বিনুদা বলতে লাগলেন—"দেখ, প্রকৃতির সঙ্গে বা কোন দৃশ্য বা ঘটনার সঙ্গে যখন মনের সুরটি মিলে যায় তখন গলায় গান আসে। গলার সুর তেমন ভাল না থাকলেও যদি সুরে দরদ থাকে তবে তাই শ্রোতার মনকে টানে।"

শম্পা দেবী মৃদু হেসে বললেন, "যেমন ঝিল্লীরবে বিরহীর ব্যথা জাগে, মত্ত দাদুরীর ডাকে ছাতি ফেটে যায়! তোমাদের ত তা হয় না, হওয়াটাই নিষিদ্ধ!"

কথার শেষটায় একটু শ্লেষ ছিল মনে হ'ল। বিনুদা জবাবে কিছু বলবার আগেই শম্পা দেবী বললেন—"থাক, আর উত্তর দিতে হবে না। কি গাইছিলে বল।"

"শুনে তুমি আশ্চর্য্য হবে। একটা প্রেমের গান গুন গুন করছিলাম।"

"তাই বল স্বদেশপ্রেমের গান। নারীপুরুষের প্রেমের গান গাইতে পার তেমন কথা ভাবাই যায় না।"

"যদি বলি ও রকম গানই গাইছিলাম!"

"বিশ্বাস করব না।"

"কেন?"

"যে লোক হয়ত আজ পর্য্যন্ত কোন সুন্দরী নারীর দিকে ভাল করে তাকিয়েই দেখে নি—পাছে ব্রত ভঙ্গ হয় বলে, তার পক্ষে ওটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে মন চায় না।"

বিনুদা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। এমনি প্রাণখোলা হাসি তাঁর অনেক দিন শুনতে পাই নি। হাসি থামলে খানিক-ক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "চোখ মেলেই দেখেছি আমার মাকে, তাঁর মত সুন্দরী নারী আজও আমার চোখে পড়ে নি শম্পা।

মানুষের দেহটা এমন কিছু অপবিত্র ঘৃণ্য বস্তু নয়। দেহ ত সবই—সুন্দর পাখী, সুন্দর ফুল, সুন্দর পৃথিবীর শ্যামল রূপ, সুন্দর আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা; এমন যে প্রচণ্ড সূর্য্য তাও উদয় অস্তকালে কি অপরূপ! যেদিকেই তাকাও না কেন সৌন্দর্য্যের লহরী দুলছে। এসবের দিকে চোখ মেলে তাকালে অপরাধ হয় না, কিন্তু মেয়েরা সুন্দরী হলে চোখ মেলে তাদের দেখলে অপরাধ হবে এমন আইন আমার জানা নেই!

"জন্মে মাকে দেখেছি—মা আর বোন ছাড়া আর কোন মেয়ের মুখের পানে বোধ হয় তাকিয়ে দেখি নি। তার পর এই হয়ত প্রথম রমণী-মুখ দর্শন করলাম। এতদিন দেখেছি না-দেখা চোখ নিয়ে।"

বিনুদা হয়ত আরও কিছু বলতেন, কিন্তু শম্পা দেবীর কপোল বেয়ে নেমে আসছে দু' ফোঁটা জল, মুখে প্রশান্তি! তবে চোখের জল কেন? শম্পা দেবী গলায় আঁচল দিয়ে বিনুদার পায়ে প্রণাম করে উঠে, কোন কথা না বলেই চলে গেলেন শোবার ঘরে।

আমরাও চুপ করে রইলাম। আজ কেন জানি নে ঘরে বাইরে ঘুরে ফিরে আসছে একটা ঘোলাটে ভাব। শম্ভু এসে ঘরের মধ্যে এনেছিল একটা মুক্ত হাওয়ার স্পর্শ; কিন্তু ওর সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুও বিদায় নিল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই শম্পা দেবী আবার ফিরে এসে ঘরের মেঝেয় বসে পড়লেন। তার স্থির দৃষ্টি বিনুদার উপর নিবদ্ধ। বিনুদা চোখ ফেরালেন না, মনে হ'ল ওর অন্তর বুঝতে চাইছেন।

"মনে হচ্ছে, তুমি আমায় কিছু বলতে চাইছ"—জিজ্ঞেস করলেন বিনুদা।

"আজ এ ক'দিনের মধ্যে তোমার সঙ্গে কথা বলেছি অনেক। আজ যখন নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম—দেবতা মুখ তুলে তাকিয়েছেন, আকাশে আর দীঘির বুকে চাঁদ ও কুমুদিনী দৃষ্টিবিনিময় করল, ঠিক সেই মুহূর্তে সব ভাষা ফেললাম হারিয়ে।"

বলতে বলতে শম্পা দেবীর গলা ভারী হয়ে এল, চোখমুখ লাল, চোখ ফেটে দু' ফোঁটা জল টস টস করে ক্রমে নীচে নেমে আসতে লাগল।

বিনুদা হেসে বললেন—"কথার দরকার কি শম্পা?"

শম্পা—"না আজ কথার প্রয়োজন আছে। শুধু ভাব নিয়ে আমি থাকতে পারব না। আজ বড়ই অস্থির হয়ে আছে আমার মনটা। কয়েক ঘণ্টা পরই ত তোমরা চলে যাবে। তখন আমার কি দশা হবে! এখন শোন—আজ আমার প্রশ্নের মীমাংসা চাই। কোন পথই যদি না থাকে আমার, সব পথই যদি বন্ধ হয়ে যেতে থাকে তবে বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ে মরব। আমি অকপটে বলব, আজ আর লজ্জা সঙ্কোচের সময় নেই।"

বিনুদা বললেন, "ছেলেটার জন্ম মনটা কেমন করছে, নয় কি? তোমার ত এখন সমিতির প্রতি নূতন আকর্ষণ। নবান্নগণের

আবেগের শক্তি অনেকখানি বেশী, তার প্রচণ্ডতাও বেশী। এই ত হ'ল তোমার সমস্যা। কি যে করবে ঠিক পাচ্ছ না।"

শম্পা—না, এই সব নয়। তোমার সব দিকে চোখ থেকেও এই দিকটা অন্ধ। সব পুরুষ মানুষেরই বোধ হয় তাই। আমার দিকটা কি তোমার একেবারেই চোখে পড়ে না? মেয়েছেলে হয়ে এও কি আমায় বলে দিতে হবে? শুনলে হয়ত কানে আঙুল দিয়ে পালিয়ে যাবে চিরকালের মত আমাকে ছেড়ে, আর মুখদর্শন করবে না। আমার যে কিছুই নেই! আমার চেয়ে রিক্ত বোধ হয় কেউই নয়।"

বোধ করি উচ্ছ্বসিত আবেগ রোধ করবার জন্য কিছুক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন। মুখ তুলে অশ্রুপূর্ণ চোখে তিনি বিনুদার হাত ধরে বললেন—তুমি অন্ধত্বের ভান করছ? একেবারে রিক্ত অবস্থায় আমায় ফেলে যাবে? তা হবে না। আজ আমার দাবি স্পষ্ট ভাষায়, মুক্ত কণ্ঠে জানাব। আমি তোমায় ভালবাসি, এই ভালবাসার দাবি অগ্রাহ্য করার শক্তি তোমার নেই। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি ঘর ছেড়েছি, তুমি ত গৃহত্যাগ করেই করে এসেছ—আমরা দু'জনে একসঙ্গে থেকে সমিতির সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী হয়ে কাজ করব।"

বিনুদা প্রশান্ত মুখে বললেন, "আমিও আজ এই বিদায়ের ক্ষণে কিছু রেখে ঢেকে বলব না। আমিও তোমায় ভালবাসি। এই কথাটা আমি নানা সময়ে নানা ভাবে প্রকাশ করেছি। তোমার নারীত্বের উপর আমার শ্রদ্ধা আছে, তোমার মহিমময়ী নারী-সত্তাকে আমি হৃদয়ে স্বীকার করে নিয়েছি?"

শম্পা দেবী মুখ তুলে চেয়ে "সত্যি, সত্যি বলছ?" বলে বিনুদার দুই হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে ধরে অভিভূতের মত চেয়ে রইলেন।

বিনুদা বললেন—"তুমি সুন্দর! তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ আছে। কিন্তু সংসারে সুন্দর আকর্ষণের বস্তু আরও আছে। আমরা সংসারে সকল মানুষের সঙ্গে সহস্র পাকে জড়িত।"

শম্পা দেবী—"আমার ছেলে, আমার সমিতির আদর্শ, আমার তুমি—এখন আমি কি করি বলে দাও।"—

বিনুদার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কপাল কুঞ্চিত করে বললেন—"ঝোপের আড়াল দিয়ে যেন লাল পাগড়ী দেখতে দেখতে পেলাম। হুসিয়ার হওয়াই ভাল। শম্পা, তুমি বাইরে বেরিয়ে যাও। যদি ওরা একান্ত এ বাড়ীতে আমাদের খোঁজে এসে থাকে তবে তুমিই ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাও। ঘরে ঢুকে তল্লাসী করতে চাইলে একটু চেঁচামেচি করে কথা বলতে চেষ্টা করো, সেইটেই হবে ইঙ্গিত। আমরা তখন পালাবার চেষ্টায় থাকব। আর একটুও দেরি করো না শম্পা।"

শম্পা দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে কোন কথা না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ক্রমশঃ

সৃষ্টি-ধ্বংস

শ্রীকালিদাস রায়

সূর্য্য কহে—"নিত্য তাপ বিশ্ব ভরি' করি বিকিরণ
অথচ করি না নব তাপ আহরণ;
নিত্য যেই ভাবে হয় মোর তাপক্ষয়
শৈত্যাগমে, জীবলোক, জেনো তব মরণ নিশ্চয়।"

আকাশ কহিল—"শোন, সারা বিশ্ব হইবে শীতল,
সীমাবদ্ধ তাপের সম্বল,
সে তাপ ছড়ায় বিশ্বে, সমদশা গ্রহতারকার
এক দিন হবে জেন', রহিবে না চিহ্নও তোমার।"

জ্যোতিষ্কেরা বলে হেসে—"প্রতীক্ষার নাহি প্রয়োজন
বেশী দিন। আসিবেই আমাদের সংঘর্ষ এমন,
তাহাতেই চূর্ণ হয়ে ধ্বংস পাবে এ বিশ্বজগৎ,
জীবলোক, বাঁচিবার নাই কোন পথ।"

মানুষ বলিল হাসি'—"প্রতীক্ষা করি বা কত দিন,
আমরা রহিতে নারি হ'য়ে উদাসীন,
সয় না মোদের দেরি, কত দিনে লভিব নির্ব্বাণ!
অণু দিয়া সর্ব্বধ্বংসী বজ্র মোরা করেছি নির্ম্মাণ,
বিমানে আরোহি' একদিন
বিধ্বংস করিতে পারি সারা পৃথ্বী করি প্রদক্ষিণ।"

কাশ্মীরে কাঠকল

কাশ্মীর সরকার একটি কাঠকল স্থাপন করিয়া জঙ্গল হইতে সংগৃহীত কাঠ ও ভাঙ্গা জাহাজ হইতে সংগৃহীত ষ্টীম ইঞ্জিনের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতে এই ধরণের কল এই প্রথম স্থাপন করা হইয়াছে।

এই কলটি "গবর্ণমেণ্ট জয়নারি মিল" নামে পরিচিত। এই কলে ও পালিশ-করা কাঠ হইতে দরজা, জানালা প্রভৃতির যে কাঠামো তৈয়ার করা হয় তাহা সেইখানে জুড়িয়া ফেলা হয়। বৎসরের সব সময় পরিবহনের সুবিধার জন্য এই কলটি জম্মুগামী রাস্তায় পামপুর নামক স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। উহা শ্রীনগর হইতে মাত্র সাত মাইল। নিকটেই ঝিলাম নদী বহিয়া যাইতেছে। এই নদীপথে কাঠ ঐ কলে আনয়নের সুবিধা হয়।

১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে এই কাঠকলটি স্থাপিত হয়। এ বিষয়ে একটি সুইডিস প্রতিষ্ঠান সহায়তা করেন। ঐ কলে এ পর্য্যন্ত দুই লক্ষাধিক টাকা আয় হইয়াছে। উহা আসল টাকার (অর্থাৎ এককালীন ব্যয়িত মোট টাকার) এক-দশমাংশ।

গড়পড়তা উৎপাদন—এই কলে বৎসরে সাধারণ আয়তনের ৩৬ হাজার দরজা ও সমসংখ্যক জানালা নির্ম্মিত হয়। তাহাতে বৎসরে প্রায় ১৪ লক্ষ বর্গফুট পাকা সেগুন কাঠ খরচ করিতে হয়। ইএ কলে চায়ের বাক্স, গোলাবারুদ রাখিবার বাক্স প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য তৈয়ারি করা যাইতে পারে।

সরকারী জয়নারী মিলে কর্ম্মরত একজন কর্ম্মী
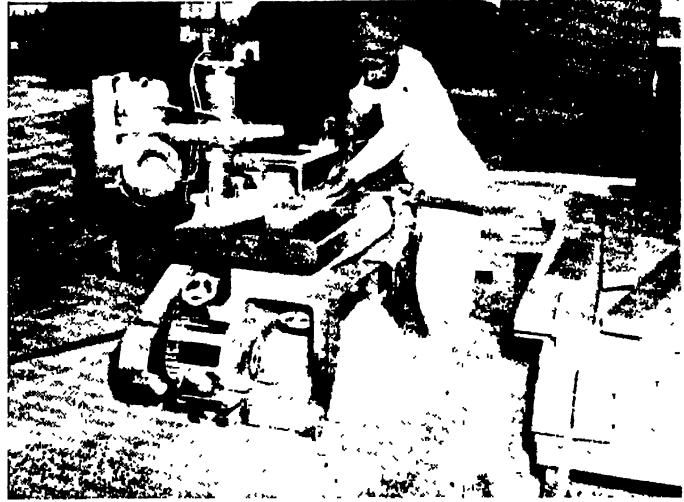
ঐ কলে বেশীর ভাগই দেওদার কাঠ ব্যবহার করা হয়। বিশেষ বিশেষ কাজে পাইন ও ফার কাঠও ব্যবহৃত করা হয়। বনবিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারিগণ কাশ্মীর উপত্যকার পশ্চিম ভাগ হইতে কাঠ নির্ব্বাচন করেন। ঐ নির্ব্বাচিত কাঠ ঝিলাম নদী দিয়া মিলে পৌঁছানো হয়। কাঠগুলি চেরানো না হওয়া পর্য্যন্ত নদীর এক পাশে রাখা হয়।

কাঠের গুদাম—কাঠ চেরাই করার পর সেগুলি কাঠ-গুদামে জমা করিয়া রাখা হয়। তক্তাগুলির মাপ ও গুণ অনুসারে সাজাইয়া রাখা হয়। তাহাতে বাতাসে কাঠ শুকাইবার সুবিধা হয়। এই গুদামে কাঠ পাঁচ মাস থাকে। তার পর সেগুলি কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য পুনরায় চেরাই করিতে পাঠানো হয়।

ঝিলাম নদীর উপর দিয়া কারখানায় চালান-দেওয়া কাঠ

এইবার কাঠ পাকা করিবার কলে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ কলে কাঠ শুকাইবার কয়েকটি কক্ষ আছে। ঐ সকল কক্ষের মধ্য দিয়া তক্তাবাহী ট্রলি নিয়মিত ভাবে আসা-যাওয়া করে। সেগুলির মধ্যে গরম বাতাস ছাড়া হয়। এ বিষয়ে পাখার সাহায্য লইতে হয়। হিটিং পাইপের সাহায্যে সর্ব্বদা তাপ ঠিক রাখার ব্যবস্থা আছে। ঐ পাইপগুলি কক্ষগুলির সমান লম্বা।

কাঠে যাহাতে রস প্রবেশ না করে, উইপোকা না ধরে, ছাতা না পড়ে, কাঠ যাহাতে পচিয়া নষ্ট না হয় সেজন্য আধুনিক প্রণালীতে নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য কাঠে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহাতে ঐ কাঠ হইতে নির্ম্মিত দ্রব্যাদি টেকসই হয় এবং সেগুলি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের এত গরমে নষ্ট হয় না।

শেষ পর্য্যন্ত কারখানায় কাঠ পৌঁছিলে, সেখানে কাঠ মসৃণ করা, শিরিষ মাখানো এবং পরে পালিশ করিয়া রঙ লাগানো হয়। তার পর সেগুলিতে প্রয়োজনমত ছিদ্রাদি করিয়া কাজের উপযোগী করা হয়। কাঠ চেরাই করার সময় যাহাতে কাঠের গুঁড়া বাতাসে না মিশিতে পারে সেজন্য পাইপের বন্দোবস্ত আছে। গুঁড়াগুলি ঐ পাইপের মধ্য দিয়া বয়লারে গিয়া পড়ে। উহাই একমাত্র জ্বালানি।

মনি-অর্ডার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

ডাকঘরের মনি-অর্ডার সকলের নিকটই সুপরিচিত। মনি-অর্ডারে অনেককেই টাকা পাঠাইতে হয়। গরীবের গরজই বেশী ; কারণ অল্প টাকা পাঠাইবার নির্ভরযোগ্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা আর নাই।

মনি-অর্ডারের কাজ ডাকঘরের মুখ্য কর্তব্য নহে। সর্ব্বপ্রথমে ডাকঘরকে এই কাজ করিতেও হইত না। ভারতে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে লোকে টাকা পাঠাইত হয় কোনও লোকের মারফৎ, নয় ত হুণ্ডির সাহায্যে। ইংরেজ আমলে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও মনি-অর্ডারের কাজ চালাইত গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারি। এক ট্রেজারি অপর এক ট্রেজারির উপর বারমাসের মেয়াদী হুণ্ডি কাটিত। এই ট্রেজারি-হুণ্ডির সাহায্যেই লোকের টাকা পাঠাইবার কাজ চালাইতে হইত। সমগ্র ভারতে ট্রেজারির সংখ্যা ছিল নগণ্য। হুণ্ডি কাটিবার ও ভাঙ্গাইবার আপিস ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে ছিল মাত্র ২৮৩টি। ইহাতে দেশবাসী বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিত। তজ্জন্য অনেকে চিঠির মধ্যে নোট পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

দেশবাসীর এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মনি-অর্ডারের কাজ গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারি হইতে তুলিয়া আনিয়া ডাকঘরকে দেওয়া হইয়াছিল। তখন সারা দেশে প্রায় ৫৫০০ ডাকঘর ছিল। ডাকঘর এই কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিবার পরে দেশের অনেক বেশী লোক মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। প্রথম বৎসরেই (১৮৮০-৮১ খ্রীঃ) ষোল লক্ষের বেশী মনি-অর্ডার হইয়াছিল।

এখন আমরা যে প্রণালীতে ডাকঘরে মনি-অর্ডার করিতে ও মনি-অর্ডারের টাকা পাইতে পারি, প্রথমে এইরূপ সহজ ব্যবস্থা ছিল না। তখন মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইতে হইলে ডাকঘরে একখানা দরখাস্ত দিতে হইত। টাকা পাঠাইবার কমিশন ডাকটিকেটে দিতে হইত। ঐ টিকেট দরখাস্তের অপর পৃষ্ঠায় আঁটিয়া দিবার রীতি ছিল। দরখাস্ত ও টাকা ডাকঘরে দিলে ডাকঘর প্রেরককে রসিদ দিত। প্রেরককে দরখাস্তে লিখিয়া দিতে হইত কোন ডাকঘর হইতে প্রাপক টাকা লইবে। ডাকঘর এই দরখাস্তখানা প্রাপক যেখানে থাকেন তথাকার হেড পোষ্টাপিসে (প্রধান ডাকঘরে) পাঠাইয়া দিত। এই প্রধান ডাকঘরকে বলা হইত "মনি-অর্ডার তৈয়ারির আপিস"—কারণ, এই বড় ডাকঘরই মনি-অর্ডার তৈয়ারি করিয়া প্রাপক যে ডাকঘরের এলাকায় থাকেন তথায় মনি-অর্ডারখানা বিলির জন্য পাঠাইয়া দিত। মনি-অর্ডার পাইয়া প্রাপককে প্রাপ্তিস্বীকার-পত্রীতে সহি করিয়া দিতে হইত। ঐ প্রাপ্তিস্বীকার-পত্রী প্রেরকের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত। প্রাপক মনি-অর্ডার বিলি লইয়া, যে ডাকঘর টাকা দিবে তথা হইতে মনি-অর্ডার ভাঙ্গাইয়া টাকা গ্রহণ করিত। মনি-অর্ডার ভাঙাইয়া টাকা লইয়া আসিবার দায়িত্ব ছিল প্রাপকের নিজের।

তখন ১৫০৲ টাকার বেশী এক মনি-অর্ডারে পাঠানো যাইত না। একজন প্রেরক একই প্রাপকের নিকট একদিনে চারিখানার অধিক মনি-অর্ডার পাঠাইতে পারিত না।

ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা তখন হইতেই হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে (১৯৫১-৫২ খ্রীঃ) বিদেশী মনি-অর্ডার ভারত হইতে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হইয়াছে ১১,৯৬২ খানা, এবং বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়া বিলি হইয়াছে ২২,৭৪,৮৩৫ খানা বিদেশী মনি-অর্ডার।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হইয়াছিল—ডায়মণ্ড হারবার কলিকাতার মধ্যে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে ২১ মাইল পথে টেলিগ্রাফের তার খাটাইয়া ইলেকট্রিক্ টেলিগ্রাফের প্রথম পরীক্ষা ভারতে করেন, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ডাক্তার উইলিয়ম ব্রুক ও'সাগনসি। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবারের মধ্যে টেলিগ্রাফের লাইন স্থায়ী ভাবে নির্ম্মাণ

করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উহা শেষ হয়। ডায়মণ্ড হারবার হইতে প্রথম এই লাইনে টেলিগ্রাফের সঙ্কেত প্রেরণ করেন একজন বাঙালী, রায় বাহাদুর শিবচন্দ্র নন্দী। ঐ বৎসর হইতেই ভারতে প্রথম টেলিগ্রাম প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। তখন গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফই বেশী হইত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে আগ্রার টেলিগ্রাফ লাইন তৈয়ারি সুরু হয় এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ আগ্রা হইতে কলিকাতায় প্রথম টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা হইতে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের মধ্যেও টেলিগ্রাফ লাইন তৈয়ারি হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে পেশোয়ারে টেলিগ্রাফ পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন পাস হয়।

সমগ্র ভারত, কাশ্মীর ও ব্রহ্মদেশকে যুক্ত করিয়া টেলিগ্রাফ লাইন তৈয়ার করিতে এবং টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতির উন্নতি করিতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় কাটিয়া গেল। অবশ্য আমাদের দেশে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডার ('তার' মনি-অর্ডার) প্রচলিত হয়। মনি-অর্ডার কমিশন বাদে টেলিগ্রামের জন্য অতিরিক্ত দুই টাকা আদায় হইত। 'তার' মনি-অর্ডারে ছয় শত টাকা পর্যন্ত পাঠানো চলিত। প্রথম ছয় মাসেই ৫৭৮৮ খানা টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডার হইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছে ১২,১১,৯২৯ খানা।

১৮৮৯ সনে মনি-অর্ডারের সংখ্যা ও ঊর্দ্ধতম টাকার পরিমাণের বিধিনিষেধের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সাধারণ ও তার মনি-অর্ডার দুই-ই ছয় শত টাকা পর্যন্ত পাঠাইবার আদেশ হইয়াছিল। এক প্রেরক যে একই প্রাপকের নিকট দিনে চারিখানা মনি-অর্ডারের বেশী পাঠাইতে পারিত না—সেই নিষেধ-আজ্ঞাও উঠিয়া গেল।

তখন মনি-অর্ডারের কমিশন ছিল দশ টাকা পর্যন্ত দুই আনা এবং পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত চারি আনা হারে। আমাদের দেশে দশ টাকার অনধিক মূল্যের মনি-অর্ডারের সংখ্যাই বেশী। সে-কালেও অবস্থা এইরূপই ছিল। কমিশন হ্রাসের জন্য দেশবাসী দাবি জানাইল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে দশ টাকা পর্যন্ত মনি-অর্ডারের কমিশন দুই আনার পরিবর্ত্তে এক আনা হইয়াছিল।

আমাদের দেশে সত্তর বৎসরে মনি-অর্ডারের অগ্রগতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, ডাকঘর মনি-অর্ডারের কাজ গ্রহণ করিয়া দেশ-সেবার কত বড় দায়িত্বে হাত দিয়াছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল প্রায় ষোল লক্ষ মনি-অর্ডার; ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছে ৫৩ কোটি ৮ লক্ষের বেশী।

সদর খাজনা দিবার জন্য সুদূর পল্লী হইতে সদরে আসা যে কি ঝকমারি তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যও ডাকবিভাগ সচেষ্ট হইয়াছিল, রাজস্ব মনি-অর্ডারের প্রচলনও হইয়াছিল। এই মনি-অর্ডারের জন্য পৃথক ফরম ব্যবহৃত হইত। এখনও উহাই চলিতেছে। এই মনি-অর্ডারের প্রথম পরীক্ষা হয় বারাণসীতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম এগার মাসেই ১৩,১১৪ খানা রাজস্ব মনি-অর্ডার হইয়াছিল। বারাণসীতে পরীক্ষায় সাফল্য দেখিয়া উহা ক্রমশঃ কুমায়ুনবাদে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সর্ব্বত্র, বঙ্গদেশের দশটি জেলায়, পঞ্জাবে, মধ্যপ্রদেশে এবং মাদ্রাজেও চালু হইয়াছিল। মাদ্রাজে উহা প্রথমে জনপ্রিয় হয় নাই। তজ্জন্য ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উহা পুনরায় তথায় প্রচলিত হইয়াছে। পরীক্ষায় সাফল্য দেখিয়াই সমগ্র ভারতে রাজস্ব-মনি-অর্ডার এখন চলিতেছে।

রেণ্ট মনি-অর্ডারও পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম প্রচলিত হয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও বঙ্গদেশে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে; এবং মধ্যপ্রদেশে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। এখন এই ব্যবস্থা স্থায়ী হইয়াছে।

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে রেভিনিউ ও রেণ্ট মনি-অর্ডার ক্রমশঃ কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে:

	রাজস্ব বা রেভিনিউ মনি-অর্ডার	রেণ্ট মনিঅর্ডার
১৮৮৬-৮৭	৬৬,২০৪	১,২১৩
১৯৫১-৫২	৫৩৩,২৯০	১৩৮,৭৩০

আমাদের দেশে মনি-অর্ডার এখন প্রাপকের বাড়ীতে বিলি হয়। ইউরোপ আমেরিকার সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা নাই। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, আমাদের দেশেও সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যবস্থা ছিল না। প্রাপককে তখন ডাকঘরে যাইয়া মনি-অর্ডারের টাকা লইয়া আসিতে হইত। ইহাতে পল্লীবাসীর অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছিল। সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মনি-অর্ডারের টাকা বাড়ীতে বিলির ব্যবস্থা হইল। ইহাতে জনসাধারণের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ডাকঘরের ঝুঁকি বাড়িয়াছে।

মনি-অর্ডার না করিয়া অল্প পরিমাণ টাকা পাঠাইবার অপর ব্যবস্থাও ডাকবিভাগ করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান্ পোষ্টাল অর্ডার ক্রয় করিয়াও টাকা পাঠানো যায়। ইহাকে ডাকঘরের চেক বা হুণ্ডি বলা যাইতে পারে। চিঠির সহিত খামে ইহা প্রাপকের নিকট পাঠানো যাইতে পারে। প্রাপক নির্দিষ্ট ডাকঘর হইতে ইহার বিনিময়ে টাকা পাইতে পারেন। ইচ্ছা করিলে ব্যাঙ্কের সাহায্যেও ইহার টাকা পাওয়া যাইতে পারে। চেকের মত ইহা 'ক্রস' করিয়া দেওয়া চলে।

১৯৫১-৫২ সনে ২৯,৩৫,৯৩০ খানা ইণ্ডিয়ান পোষ্টাল অর্ডার বিক্রয় হইয়াছে। দেখা যায়, ইহাও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যবসায়ীদিগের মত যাঁহারা বেশী পরিমাণ টাকা ডাকঘরের সাহায্যে পাঠাইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে মনি-অর্ডার অথবা ইণ্ডিয়ান্ পোষ্টাল অর্ডার কোনটাই সুবিধাজনক হয় না। তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা আছে ইন্সিওর চিঠি বা পার্শেলের। ইন্সিওর করিয়া হাজার হাজার টাকার নোট ডাকে পাঠানো যাইতে পারে। অবশ্য ইন্সিওর-ডাকে যে কেবল টাকাই পাঠানো হয় তাহা নহে, অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি বা দলিল ইত্যাদিও প্রেরিত হইয়া থাকে।

এইরূপ নানাভাবে টাকা পাঠাইবার সুব্যবস্থা করিয়া ডাকঘর এই গৌণ কর্ত্তব্যের সাহায্যেও দেশবাসীর যথেষ্ট সেবা করিতেছে।

উপসাগরে — শিল্পী—উইন্‌স্‌লো হোমার

আমেরিকার চিত্রশিল্প

ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা ভাষাভাষী এক দিন আমেরিকায় এসে বাসা বেঁধেছিলেন। অন্ন ও বস্ত্রের সমস্যাই সেদিন ছিল নূতন অভিযাত্রীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। দুশ্চর সাধনা ও কঠোর সংগ্রাম করে তাঁরা সেই কঠিন সমস্যার অনেকটা সমাধান করে আনলেন। জীবনধারণের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা হ'ল, কিন্তু অন্তরের পিপাসা মেটাবার কোন সম্পদ সেই নূতন দেশে ছিল না। সেই সময় আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ান নামে যে জাতি বাস করত, তাদের মধ্যে আধুনিক সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তার উন্মেষ হয় নি। তাদের না ছিল কোন লিপি, না ছিল ঘরবাড়ী—তারা ছিল যাযাবর। তাই সাংস্কৃতিক সম্পদের জন্য আমেরিকানরা এলেন ইউরোপ তথা ইংলণ্ডের দ্বারে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার সাংস্কৃতিক আদর্শ ছিল ইউরোপেরই আদর্শ। আমেরিকার শিল্পীরা এসে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করেছেন, ইউরোপের নূতন নূতন ভাবধারার সংঘাতে আমেরিকার ইতিহাসও গড়ে উঠেছে। সেদিনকার আমেরিকাকে ইউরোপের রূপকল্প বললে হয়ত অত্যুক্তি হয় না।

সেই দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল এক দিন দূরদিগন্তে পাড়ি জমিয়েছিল, তাদের কল্পনাবিহারী মন উধাও হয়েছিল নিরুদ্দেশের পানে। এই রোমান্টিক মনই উইন্‌স্‌লো হোমার ও টমাস ইকিন্সের চিত্রে প্রতিবিম্বিত। সেই রোমান্টিক শিল্পের ধারাই এসে মিশেছে নূতনকালে, বস্তুনিষ্ঠতায়। বিগত যুগের এই নূতন শিল্পধারার ধারক ও বাহক হলেন এডোয়ার্ড হপার, চার্লস শীলার, মরিস গ্রেভস, মার্কটোবী প্রভৃতি।

শিল্পের ধারা নদীর মত পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যায়। অঙ্কনশৈলী, পদ্ধতি, আঙ্গিক ও বিষয়ের বন্ধন ভেঙে নূতনের সন্ধানে সেই ধারা চিরপ্রবহমাণ। সেদিনকার সেই বাস্তব দৃষ্টি ও বলিষ্ঠ কল্পনার সমন্বয়ে যে চিত্ররূপ গড়ে উঠেছিল, আজ বিংশ শতাব্দীর মননশীলতার যুগে দু'একজন শিল্পীর রচনা ব্যতীত তন্মধ্যে প্রায় সকলেরই চিত্র অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সকল কালজয়ী শিল্পীর অন্যতম হলেন হপার।

এডোয়ার্ড হপার

এডোয়ার্ড হপারের জন্ম ১৮৮২ সনে। ফিলাডেলফিয়ার একটি বিদ্যালয়ে তিনি ছবি আঁকা শেখেন। তারপর কয়েকবার প্যারিস ঘুরে আসেন। হপারের অঙ্কনশৈলী একেবারে তাঁর নিজস্ব, অভিনব, একান্ত সংবেদনশীল। ইউরোপীয় কোন বিশেষ অঙ্কন-পদ্ধতি বা অঙ্কনশৈলী অথবা আমেরিকায়

তাঁর পূর্বগামী কোন শিল্পীকেই তিনি কোন দিনই অনুকরণ করেন নি।

হপার তাঁর ছবি সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভূতিকেই রং ও রেখায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি, সৌন্দর্যানুভূতির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি রচনার প্রয়াস পেয়েছি। এই বক্তব্যের মধ্যেই রয়েছে হপারের স্বকীয়তা। অনন্ত প্রকৃতির যে দৃশ্যটি শিল্পীর মনে ছাপ রেখে যায়, চোখে অপরূপ বলে প্রতিভাত হয়, সেই দৃশ্যটিকে "মনের মাধুরী মিশায়ে" ফুটিয়ে তোলাই তাঁর শিল্পরচনার লক্ষ্য।

হপার নিউ ইয়র্ক শহরেরই বেশীর ভাগ চিত্র রচনা করেছেন। নিউ ইয়র্কের নাম করলেই অনেকেরই মনে হবে সেই শহরের কোলাহল, বিরাট ভবন আর অসংখ্য যানবাহনের কথা। হপারের চিত্রব্যঞ্জনার প্রধান উপজীব্য শান্ত ভোরবেলা বা ক্লান্ত গোধূলির করুণ রাগ। প্রকৃতির পরম সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তসমূহ ধরা পড়েছে তাঁর তুলিকা-

চন্দ্রালোকে গানে মুখর পাখী শিল্পী—গ্রেভস

সম্পাতে। এই প্রসঙ্গে 'রবিবারের প্রত্যূষে' নামক ছবিখানির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শহরের ঘুম তখনও ভাঙে নি, পূর্বদিগন্তে সবিতাও জাগে নি—চারিদিকে গভীর নীরবতা এবং পথ জনহীন। তারপর আসে প্রত্যূষের আলো-আঁধারের খেলা। আলো-আঁধারের অপূর্ব সঙ্গমতীর্থ রচিত হয়েছে এই চিত্রে—অচেতন, সাধারণ জিনিষ, অপরূপ রূপপরিগ্রহ করেছে, অর্থাৎ তাদের যথার্থ রূপটিই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পী মানস বা ঋতুপর্যায়ের বিভিন্ন পদক্ষেপের পরিচয়ই যে মেলে তাঁর চিত্রে তা নয়, সেই ঋতুর নির্দিষ্ট সময়, সকাল, বিকাল, অপরাহ্ণ কি রাত্রি, তাও নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে তাঁর শিল্পে। ১৯৩০ সনে এই ছবিটি অঙ্কিত হয়। চিরন্তনের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর শিল্পে, তাই তারা আজও পুরনো হয় নি, বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায় নি।

স্টুয়ার্ট ডেভিস

এই প্রসঙ্গে আর একজন প্রখ্যাত শিল্পীর কথা বলা যেতে পারে। তাঁর নাম স্টুয়ার্ট ডেভিস। ইনি হপারেরই সমসাময়িক। হপারের ন্যায় রাস্তার দৃশ্য তিনিও এঁকেছেন—এই পর্যন্তই এঁদের মধ্যে সাদৃশ্য। শিক্ষা, দীক্ষা, পরিবেশ উভয়েরই এক হলেও, এই দু'জনের ব্যক্তিত্ব, রচনাশৈলী ও অঙ্কন-পদ্ধতির মধ্যে বিরাট ব্যবধান, একের সঙ্গে অন্যের কোন প্রকার মিল নেই। হপার বাস করেন ভাবরাজ্যে, সংসারের উপকণ্ঠে, একান্ত শান্ত পরিবেশে। আর ডেভিস ভালবাসেন নিউ ইয়র্কের নাগরিক জীবনের কোলাহল আর তার শক্তির প্রকাশকে।

রবার্ট হেনরি তাঁকে শিল্প-শিক্ষায় হাতেখড়ি দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নূতন শিল্প-আন্দোলনের অন্যতম নেতা। চলমান জীবনের ছন্দ উপলব্ধি, তার রসগ্রহণ ও প্রতিচ্ছবি রচনা ত তিনিই তাঁকে শিখিয়েছিলেন। নানা অলিগলি, রাস্তা, সঙ্গীত-ভবন অথবা হাস্যরস পরিবেশনের জন্য যে সকল ছোট ছোট নাট্যনিকেতন রয়েছে, তাদের দৃশ্যাঙ্কনে হেনরিই তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিলেন। ডেভিসের চিত্রে আজ আর এই সকল বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না, অদৃশ্য লোকে তারা অন্তর্হিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর চিত্রের রং এবং রুক্ষ ব্যঞ্জনার অন্তরালে দেখা যায়—বলিষ্ঠ রূপের প্রকাশ। গতি ও প্রাণছন্দই তাকে চিত্র-রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। এই গতি ছন্দকে রূপায়িত করবার জন্য অনেক সময়েই তিনি প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন ইলেকট্রিক পাখা ইত্যাদি। এই অবচ্ছিন্ন বা এবস্ট্রাক্ট শিল্প-প্রয়াসে তাঁর বহুকাল কেটেছে।

ডেভিসের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই 'জাজ' সঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞ। এই ধরণের সঙ্গীতের মূল পদ্ধতি অনুসরণ করেই যে তিনি চিত্র-রচনা করেছেন তা প্রায়ই বলে থাকেন। "হাউস এণ্ড ষ্ট্রীট" নামে তাঁর যে ছবিখানি আছে তাতে দুটো দিক দেখানো হয়েছে, এক দিকে রয়েছে মূল বিষয়বস্তু আর এক দিকে তার অলঙ্করণ। যেমন জাজ সঙ্গীতে ভেরী-বাদকের বাজনায় মূল সুর ও সেই সুরের বিহার। প্রাকৃতিক বস্তুর যথাযথ রংটি ব্যবহার করে তারই প্রতিচ্ছবি রচনা অথবা অন্য বস্তুর সঙ্গে তার দূরত্ব নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে তিনি রঙের ব্যবহার করেন নি। সঙ্গীতজ্ঞেরা যেমন স্বরগ্রামের উচ্চ থেকে নীচের পর্দায় ধাপে ধাপে নেমে আসেন, কোন বস্তুর রূপায়ণে শিল্পী ডেভিস রঙের প্রয়োগ এই রীতি অনুসারে

করেছেন। লালের বিষম রং হ'ল সবুজ, লাল ও সবুজের মধ্যে আরও চারটি বা ছয়টি রং আছে। সার্থক শিল্পীর কালো-সাদায় আঁকা ছবিতে যে বলিষ্ঠতা ফুটে উঠে, বিপরীত রং ব্যবহার করে ডেভিস তাঁর চিত্রে সেই বলিষ্ঠতা আনয়ন করেছেন এবং উজ্জ্বল প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

ডেভিসকে আধুনিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে গণ্য করা হয় এবং আমেরিকার কোন চিত্র-প্রদর্শনী যত বড় হোক না কেন, ডেভিসের ছবি না থাকলে সেই প্রদর্শনী অসম্পূর্ণ রইল বলে সকলেই মনে করেন। আমেরিকার আধুনিক চিত্রকরদের বেশীর ভাগ ছবিতেই তাঁর শক্তিশালী, সুস্পষ্ট ও সংহত অঙ্কনশৈলীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। রিয়ালিষ্টিক বা বাস্তবশিল্প ও অবচ্ছিন্ন শিল্পের মধ্যে সেতু-রচনা করেছেন মিঃ ডেভিসই।

গৃহ এবং রাস্তা শিল্পী—ষ্টুয়ার্ট ডেভিস

অন্যান্য দেশের তুলনায় "এবষ্ট্রাক্ট আর্ট" বা অবচ্ছিন্ন শিল্পের সাধনা আমেরিকায় দীর্ঘদিন হয়েছে। নিউ ইয়র্কে 'মিউজিয়ম অব নন অবজেকটিভ পেন্টিং' নামে অবচ্ছিন্ন শিল্পের একটি মিউজিয়ম আছে। কিন্তু এই মিউজিয়মে রক্ষিত চিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির কোন সম্পর্ক খুঁজে না পাওয়ায় দর্শকবৃন্দের পক্ষে এই সকল চিত্রের রসাস্বাদন করা খুবই শক্ত হয়।

পেচক শিল্পী—গ্রেভস

আইরীন রাইস পেরের।

এবষ্ট্রাক্ট বা অবচ্ছিন্ন শিল্পানুধ্যায়ীদের মধ্যে আজ আইরিন রাইস পেরেরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে পরিগণিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়তন এবং তল বা প্লেনসকে এই প্রখ্যাত শিল্পী এমন সুচারু ও সুস্পষ্টভাবে সাজিয়েছেন যে তাঁর এই জ্যামিতিক শিল্প চোখকে পীড়িত করে না। রং-রেখার অপূর্ব সমাবেশে এই সব চিত্র একঘেয়ে মনে হয় না।
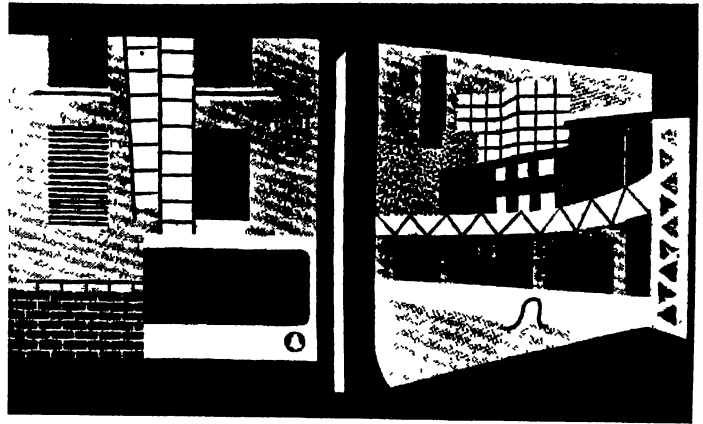
'সাবজেকটিভ' শিল্পীদের মধ্যে মার্ক টোবী এবং মরিস গ্রেভস-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের দু'জনই আমেরিকার পশ্চিমোপকূলে অবস্থিত সিয়াটেলে বাস করেন। প্রাচ্যের শিল্পরীতি টোবী ও গ্রেভসের শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

মার্কিন শিল্পে এশিয়ার প্রভাব

আমেরিকার চিত্রশিল্পের উপর এশিয়ার প্রভাব সম্পর্কে এখনই কোন অভিমত প্রকাশ বা আলোচনা করা হয়ত সময়োচিত হবে না। তবে আমেরিকায় প্রাচ্যশিল্প সম্পর্কে আগ্রহ যে দিন দিনই বেড়ে চলেছে তার প্রমাণ—প্রাচ্যশিল্প-নিদর্শন-সংগ্রহ আমেরিকায় বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। তা ছাড়া আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যে নানা বিষয় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছে। আমেরিকাবাসীর প্রাচ্য সম্পর্কে এই আগ্রহবৃদ্ধির মধ্যেই মার্কিন চিত্রশিল্পের উপর প্রাচ্য প্রভাবের পরিচয় কতকটা পাওয়া যায়।

মার্ক টোবী ১৮৯০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের শিল্পীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। চিত্রবিদ্যা তিনি নিজের চেষ্টায়ই আয়ত্ত করেছেন এবং বহু দেশ ঘুরে এসেছেন। ইউরোপ, নিকট-প্রাচ্য, চীন এবং

মেক্সিকো পরিদর্শন করে এসেছেন। চীন পরিদর্শনকালে তিনি চৈনিক হস্তলিপি দেখে মুগ্ধ হন এবং বিশিষ্ট চীনা পণ্ডিতের সাহায্যে এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করেন। বর্তমানে যে অঙ্কনশৈলী অনুসরণ করে চিত্ররচনা করেছেন তাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'হোয়াইট রাইটিং'। ১৯৩৬ সনে রচিত 'ব্রডওয়ে' নামক চিত্রখানি এই অঙ্কনশৈলীতেই আঁকা।

নোঙর শিল্পী—আইরীন আইস পেরেরা

তমসা-রজনীর পটভূমিকায় নিউ ইয়র্কের প্রসিদ্ধ রাস্তা "দি গ্রেট হোয়াইটওয়ে'র চোখ-ঝলসানো, আলোকদীপ্ত গতি-ছন্দকেই এই চিত্রে চৈনিক হস্তলিপি বং এপ্রতীকের সাহায্যে সাদা ও সামান্য কয়েকটি রঙে রূপায়িত করা হয়েছে।

সম্প্রতি শিল্পী টোবী যে সকল চিত্ররচনা করেছেন তাতে তিনি বস্তুনিরপেক্ষ শিল্প সৃষ্টিরই প্রয়াস পেয়েছেন, ফলে ঐ সকল চিত্র হয়ে উঠেছে আরও মিষ্টিক। তাঁর সর্বশেষ চিত্রখানির নাম 'এজ অব আগষ্ট'। এই ছবিখানি ধুলো ও শুকনো পাতার রঙে আঁকা।

"বেদান্তবাদী" গ্রেভস

মরিস গ্রেভস এঁদের তুলনায় আরও বেশী দার্শনিক মনোভাবাপন্ন, কিন্তু তাঁর অঙ্কনশৈলী এঁদের মত দুর্বোধ্য বা এবষ্ট্রাক্ট নয়। নিঃসঙ্গ গ্রেভস্ সিয়াটেল শহরের বাইরে এক আরণ্য অঞ্চলে প্রায় সন্ন্যাসীর মতই জীবন যাপন করেন। তিনি মনে-প্রাণে একজন ধার্মিক ব্যক্তি, বেদান্তের মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শনের সন্ধান পেয়েছেন।

গ্রেভসের চিত্ররচনার পেছনে রয়েছে তাঁর দীর্ঘকালের ধ্যানধারণা। তিনি বহু পাখীর ছবি এঁকেছেন। এই সকল চিত্রের মাধ্যমে তিনি মানবজাতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেছেন। মধ্যযুগীয় জাপানের পশুচিত্রাবলীই হয়ত তাঁকে এই সকল চিত্ররচনায় প্রেরণা দিয়েছে।

বহু শিল্পীর শিল্পরচনা আত্মকেন্দ্রী বলে তাঁরা মহাকালের বুকে অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি। সার্থক শিল্পনিদর্শন নিজগুণেই অবিস্মরণীয় হয়—এই ভাবনার ফলেই শিল্পরচনায় গ্রেভস আজ অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছেন। আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক বড় বড় শিল্পশালায় ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর চিত্র রয়েছে এবং যে কোন উল্লেখ-যোগ্য চিত্র-প্রদর্শনীতে গ্রেভসের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

'ক্যাপ এন গ্র্যানাইট' অন্তরীপ শিল্পী—এডোয়ার্ড হপার

কোচবিহারে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও বিংশ শতকের প্রথম পাদে যাঁহাদের মনীষা ও প্রতিভায় বাংলা গৌরবোজ্জ্বল এবং বাঙালীর খ্যাতি ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বসভায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদেরই এক জন। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এক এক জন দিক্‌পাল। ইঁহারা বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। 'আমরা নেহাৎ গরীব, নেহাৎ ছোট'—মনের এই দীনভাব দূর করিয়া বাঙালীর মনে তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আত্মপ্রত্যয়। পাশ্চাত্যদেশ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের একমাত্র আবাস-ভূমি, এই ভ্রান্ত ধারণা তাঁহারা দূর করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি সেযুগের বাঙালীর গৌরবের বিষয় ছিল। কাব্য ও সাহিত্যে তাঁহার বিরাট অবদান রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি চিরভাস্বর করিয়া রাখিবে। জীব ও জড়ের মধ্যে সীমারেখার সন্ধানে যাহারা ব্যাপৃত আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা তাঁহারা ভুলিতে পারিবেন না। বেতারের ইতিহাসের কথা উঠিবামাত্র জগদীশচন্দ্রের নাম স্মৃতিপথে উদিত হয়। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র অপেক্ষা সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্রের সহিতই বাঙালীর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর। তিনি তাঁহার ছাত্রদের হৃদয়ে কর্ম্মের মধ্য দিয়া দেশ-সেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলায় যে সঙ্কট সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহা ত্রাণের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইত বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত তরুণ বিদ্যার্থী। শিক্ষিত বাঙালী তরুণদের সমাজসেবায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন তিনি। তাঁহার সাদাসিধা জীবনযাত্রা এখনও বহুজনের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। বাঙালীর অন্নসমস্যা তাঁহাকে অনুক্ষণ ব্যথিত করিত। শিল্পপ্রতিষ্ঠা দ্বারা অন্নসমস্যা সমাধানের পথ তিনিই প্রদর্শন করিয়াছেন। হিন্দু রসায়নের ইতিহাস তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথকে কিন্তু আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। এযুগের শিক্ষিত সমাজে তিনি প্রায় অপরিচিত। তরুণ বিবেকানন্দ যখন জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ তখন তাঁহার সম্মুখে হিন্দুর জীবন-বেদের গূঢ় তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। বহুকাল পরে এই প্রসঙ্গে একবার তিনি বলিয়াছিলেন, 'There are many *anands*, but there was only one Vivekanand' ('আনন্দে'র অভাব নাই, কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন মাত্র এক জন)। স্বামীজীর অধ্যাত্ম-জীবন বিকাশের পরিচয় প্রদানকালে তাঁহার জীবনীতে আচার্য্য শীলের নামোল্লেখ করা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই নামের পশ্চাতে যে বিরাট পুরুষটি ছিলেন তাঁহার পরিচয় সেখানে মিলে না।

আচার্য্য শীল ছিলেন প্রকৃত দার্শনিক। বিভিন্ন বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরিদৃশ্যমান জগতের ভিন্ন ভিন্ন দিক ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞানলব্ধ খণ্ড খণ্ড সত্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান দার্শনিকের কাজ। প্রাচীনকালের দার্শনিক মতবাদ ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য এখন দর্শনের ভিত্তি। যিনি যথার্থ দার্শনিক, জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞান যেরূপ গভীর তেমনই ব্যাপক ছিল। সে যুগে তাঁহাকে 'living and

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

moving Encyclopaedia বা সজীব ও চলমান বিশ্বকোষ বলা হইত। তিনি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন। এক বিদায়-অভিনন্দন সভায় তাঁহাকে চলন্ত বিশ্বকোষ বলায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন পরদিন তিনি বলিলেন, 'আমাকে বিশ্বকোষ আখ্যায় অভিহিত করিয়া আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইল বলিয়া তাহারা মনে করে, কিন্তু আমি উহাতে অপমানিত বোধ করি। কারণ অভিধানের বিষয় আমি অভিধানের জন্যই রাখিয়া দিয়া থাকি।' জ্ঞানের ব্যাপকতার দিক হইতে তাঁহার বিশ্বকোষ আখ্যা যে সার্থক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'If you

follow the geometrical method, the Euclidean method, there is no subject under the sun which cannot be mastered' (যদি তুমি জ্যামিতির, ইউক্লিডের, পদ্ধতি অনুসরণ কর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন বিদ্যা নাই যাহা আয়ত্ত করা যায় না)। ইউক্লিডের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে তিনি বিশ্বের সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাঁহার কার্য্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার কোনারকের সূর্য্যমন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। সহযাত্রীটি প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি নাকি সকল বিষয়ে এম-এ পড়াতে পারেন?' 'এম-এ পরীক্ষার জন্তে তো elementary (প্রাথমিক) জিনিস পড়ানো হইয়া থাকে,' উত্তর হইল। বিদ্যার ব্যাপকতা সাধারণতঃ গভীরতার পরিপন্থী। কিন্তু আচার্য্য শীল যাহা কিছু অধ্যয়ন করিতেন তাহাতেই তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান জন্মিত। অধ্যয়নের সময় তিনি বিষয়ের গুরুত্বের তারতম্য করিতেন না। এক দিন কাণ্টের দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের কথা আসিয়া পড়িল। তিনি ভূগোলের অধ্যাপনা করিতেন। অথচ কয়েনস্‌বার্গ শহরের বাহিরে কোন দিন যান নাই। বলিলেন, 'তাহা সম্ভব, বাহিরে কোথাও না গিয়া ভূগোল পড়ানো চলে।' বলেন আর মৃদু মৃদু হাসেন। আত্মশ্লাঘা বুঝায় এরূপ কোন কথা বলিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইতেন। অবশেষে বলিলেন: "প্রথম যে বার লণ্ডনে যাই—শহর দেখাবার জন্য জন গ্রীচার নামক পাণ্ডাকে নিযুক্ত করি। ঘোড়ার গাড়ী রাস্তা ধরে চলেছে। পাণ্ডা প্রথম স্থানটি দেখাবার পর আমি বললাম, 'ও এটি তা হলে অমুক জায়গা, ওটা অমুক বাড়ী।' এরূপ কিছুক্ষণ বলার পর পাণ্ডা বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি বলছিলে এখানে নতুন এসেছ, এখন দেখছি তুমি আমার চেয়ে লণ্ডনের খবর বেশী রাখ।' আমি চুপ করি, তুমিই আমাকে লণ্ডন দেখিয়ে চল।' তাই হ'ল। গ্রীচার বসে রইল, আমি শহরের রাস্তা, পার্ক ও প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ দিয়ে লণ্ডন ঘুরে এলাম। এর পর যখন প্রতাপ মজুমদার গেলেন তাঁরও সেই গাইড। প্রতাপবাবু ফিরে এসে বলেছিলেন,'ভাই, আমাদের ইজ্জত বাড়িয়ে এসেছ; লোকটা বলে কি, 'তোমাদের দেশের এক giant (বিদ্যার জাহাজ) এসেছিল। আমি পঁচিশ বছর গাইডের কাজ করে লণ্ডনের কথা যা জানি সে তার চাইতে ঢের বেশী জানে। অদ্ভুত লোক বটে।' হেসে হেসে আবার বললেন, 'কলকাতায় আমার জন্ম, সেখানে আমার বাড়ি কিন্তু শিয়ালদহ থেকে পথ চিনে বাড়ি যেতে পারব না। পথটির নাম বলে যদি নিউ ইয়র্কের কোন রাস্তায় আমাকে ছেড়ে দাও, একা একা সারাটি শহর ঘুরে আসতে পারব।" অধীত প্রতিটি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভের চেষ্টা তিনি করিতেন এবং উহাতে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন তাহা হইতেই তাঁহার জ্ঞানের পরিধির পরিসরের ধারণা করা যায়। তাঁহার ছাত্রাবস্থায় 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সাময়িক পত্রে তাঁহার 'সমালোচনা সাহিত্যের নূতন নিবন্ধসমূহ' প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা-সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের আবির্ভাব, তাহার ক্রমবিকাশ ও ভবিষ্যৎ উহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এক প্রবন্ধে তরুণ ব্রজেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, 'Rabindranath is the greatest living lyric poet in the world.' পরবর্ত্তী কালে বন্ধু-সমাজে বিতরণের উদ্দেশ্যে এই সকল প্রবন্ধ "New Essays in Criticism" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আচার্য্য শীলের অভিমত পাঠ করিয়া কাব্যবিশারদ হিতবাদীতে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'অধ্যক্ষ শীল কি পৃথিবীর সকল সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জীবিত গীতিকবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন?' কাব্যবিশারদের প্রশ্ন তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সেযুগের লোকের ধারণার পরিচায়ক। বাংলা-সাহিত্যের অলিগলি তাঁহার নখদর্পণে ছিল। ডি. এল. রায়ের, 'সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।'—এই পংক্তি আওড়াইতে আওড়াইতে হাসিয়া কুটপাট হইতেন। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনবিদিত। ইংরেজী সাহিত্যের উপর তাঁহার অধিকার দেখিয়া বিস্ময়ের সঞ্চার হইত। বাকের 'ফরাসী বিপ্লব' ও জনসনের 'কবি-জীবনীর মত পূর্ব্ব-সূত্র' (allusion)-সকুল গ্রন্থাদি বিনা প্রস্তুতিতে অক্লেশে পড়াইয়া যাইতেন। মনে হইত উহা যেন তাঁহার সদ্য অধীত বিষয়। পোপ, সুইফ্‌ট, ড্রাইডেন প্রভৃতির জীবনের কত খুঁটিনাটি বিষয় যে তাঁহার জানা ছিল তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। মনে হইত তিনি জনসনের অসম্পূর্ণতা পূরণ করিতেছেন। আচার্য্য শীলের আহ্বানে যেন সব রুসো রেনল্‌ডস, বার্ক, গোল্ডস্মিথ, গিবন, গ্যারিক, শেরিডন, সার উইলিয়ম জোন্স, বসওয়েল প্রভৃতি সভাসদ জনসনের সাহিত্য-সভার (Literary club) নূতন অধিবেশন বসিত কোচবিহার কলেজে। জনসন বিচারক হইয়া বসিয়াছেন; সাহিত্য, রাজনীতি, রঙ্গরস কোনটাই বাদ পড়িত না। বিদেশী সাহিত্যের সহিত এমন নিবিড় পরিচয় সত্যই বিস্ময়কর। দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া'র অংশবিশেষ তিনি ইটালিয়ান হইতে ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। কোন কোন সময় তাহা আবৃত্তি করিতেন। কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি জার্ম্মান দার্শনিকের মতবাদ তাঁহাদের রচিত মূল গ্রন্থে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জার্ম্মান শিখিতে হইয়াছিল। ফরাসী ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন কিন্তু বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। গ্রীক ভাষায় লিখিত এরিষ্টটলের 'Poetics' নামক গ্রন্থ হইতে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করিয়া তিনি সময় সময় শুনাইতেন।

রোমের আন্তর্জাতিক ধর্ম্ম-সভায় আমন্ত্রিত হইয়া আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। খ্রীষ্টধর্ম্ম বৈষ্ণব ভাবাদর্শে পরিপুষ্ট হইয়াছে ইহা ছিল তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যীশুর আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে ও ইউরোপে

ভারতীয় ধর্ম্মপ্রভাবের কথা সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন।

১৯১১ সনে বিশ্বের সর্ব্বজাতি সম্মেলন (Universal Races Congress) অনুষ্ঠিত হয় লণ্ডনে। তিনি ছিলেন এই বিশ্বসভার উদ্বোধক। দার্শনিক শীল এই সভায় দর্শনের তত্ত্ব আলোচনা করেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল গোষ্ঠী, গণজাতি ও জাতি। অধিবেশনের অবসানে ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে আচার্য্য শীল এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্বে এই সভায় তিনি প্রস্তাব করেন যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ মীমাংসার যে উপায় সভাসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বিভিন্ন জাতির বিরোধও সেই উপায়েই মীমাংসিত হওয়া উচিত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে হিন্দুদের পরমাণু তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনাথ। ইউরোপীয় মনীষীদের মতে উহা "হিন্দুদের অতুলনীয় পরমাণু তত্ত্বের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা।" তাঁহার "Exact Sciences of the Hindus" বিদেশী পণ্ডিতগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। ধনবিজ্ঞানে তাঁহার অভিমত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত।

আচার্য্য শীলকে আমরা ভুলিয়াছি কেন? ইহার সোজা উত্তর এই যে, পাণ্ডিত্যের তুলনায় জ্ঞানের ভাণ্ডারে তাঁহার স্থায়ী অবদানের পরিমাণ নিতান্তই অল্প। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল এখনও অপ্রকাশিতই রহিয়া গিয়াছে। সক্রেটিস কিছু লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁহার ছিল প্লেটো আর এরিষ্টটল। তাঁহাদের হাতে সক্রেটিস অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। শিষ্যরূপে কোন প্লেটো লাভের সৌভাগ্য আচার্য্য শীলের ঘটে নাই। তিনি নিজে ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ। জন্ম ও শিক্ষা কলিকাতায়, কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রধান অংশ অতিবাহিত হইয়াছে কলিকাতার বাহিরে। বহরমপুর ও কোচবিহার আর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষরূপে দাক্ষিণাত্য ছিল তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। কোচবিহার ত্যাগের পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন বটে, কিন্তু সেখানে তাঁহার পাণ্ডিত্য উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। এম-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্র ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রশ্নকর্ত্তা তিনি থাকিতেন। এই কার্য্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'butcher' বা কসাই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার ছাত্রমণ্ডল তাঁহাকে কসাইরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার সান্নিধ্যে উপকৃত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণ তাঁহার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহ বোধ করিতেন না। তাঁহারা আচার্য্য শীলকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেন।

জ্ঞান ও কর্ম্মের কেন্দ্র কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া জীবনপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র শহর কোচবিহার তিনি কেন কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন তাহার কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি মাত্র। আনন্দমোহন বসু তাঁহাকে সিটি কলেজের অধ্যাপকের পদ স্থায়ী ভাবে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ তিনি রক্ষা করেন নাই। তাঁহার শিক্ষার আদর্শকে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষের পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। কলিকাতায় সেই পদ শীঘ্র লাভের সম্ভাবনা ছিল না। অর্থের প্রয়োজনও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে। কোচবিহারে তিনি সাড়ে সাত শত টাকা বেতন পাইতেন। সে সময়ে কলিকাতায় এই পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইত না। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁহাকে স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য করিয়াছিল। তাঁহার মনীষা ও অতুলনীয় জ্ঞান ফলপ্রসূ না হইবার ইহাই মনে হয় প্রধান কারণ।

কোচবিহারে তিনি ছিলেন একান্ত নিঃসঙ্গ। তাঁহার চিন্তাধারা জনসাধারণের নাগালের বাহিরে থাকিত বলিয়া তিনি কোচবিহারে কাহারও সহিত মিশিতে পারিতেন না। অধ্যাপকদের মধ্যে জ্ঞানপিপাসার অভাব পরিলক্ষিত হইত। ইংরেজীর অধ্যাপককে সময় সময় স্বরচিত "Songs of the Sea" অথবা অন্যকিছু পাঠ করিয়া শুনাইতেন; কিন্তু তাঁহার সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবার মত লোক তখন কোচবিহারে ছিল না। গিরিকন্দরবাসী ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর ন্যায় এই জ্ঞানতপস্বী কোচবিহারের নিঃসঙ্গতায় আত্মসমাহিত চিত্তে কালযাপন করিতেন।

১৯০৭ সন পর্য্যন্ত ভিক্টোরিয়া কলেজ অবৈতনিক বিদ্যাপীঠ ছিল। মাসিক সাত টাকার বিনিময়ে ছাত্রাবাসে আহার, বাসস্থান, প্রদীপ জ্বালিবার ও গায়ে মাখিবার সরিষার তেল পাওয়া যাইত। সরকারী ডাক্তার প্রতিদিন ছাত্রাবাসে আসিয়া রোগীর ঔষধাদি ব্যবস্থা করিতেন। প্রতি ব্যবস্থাপত্রে লিখিত ঔষধের মূল্য মাত্র এক আনা দিতে হইত। ব্যয়ের স্বল্পতা পূর্ব্ববঙ্গের নিঃসম্বল বিদ্যার্থীদিগকে কোচবিহারে আকৃষ্ট করিত। কিন্তু বহুবিধ সুবিধা সত্ত্বেও কলেজের ছাত্রসংখ্যা কখনও তিন শত অতিক্রম করে নাই। তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ষাটের মধ্যে থাকিত। এই দুই শ্রেণীতে তিনি ইংরেজী গদ্য-সাহিত্য অধ্যাপনা করিতেন। দর্শনের অনার্স পড়িত এক জন কি দুই জন। অনার্সের পাঠ্য বিষয় তিনি পড়াইতেন। অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বজ্ঞ মহাপণ্ডিতকে বৎসরের পর বৎসর দশ-বিশ জন অনধিকারীকে বিদ্যাদান করিতে হইত। তিনিও হয় ত সময় সময় 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ'—এই শ্লোকার্দ্ধ স্মরণ করিতেন।

কোচবিহারের পরিবেশ শিক্ষার অনুকূল হইলেও সেখানে মেধাবী ছাত্রের সমাগম অতি অল্পই হইত। কলিকাতা, ঢাকা ও বরিশাল ছিল সেযুগের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে তাঁহাদের শত শত ছাত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই সৌভাগ্যে প্রায় বঞ্চিত।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা ব্যতীত কলিকাতার কোন সভায় তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহাকে দেখিবার বা তাঁহার চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ শিক্ষিত সমাজের ছিল না। বাংলার শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি কাজ করিয়াছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার দান ছিল প্রচুর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হইতে উচ্চাঙ্গের বিদ্যাপীঠে রূপান্তরিত করিবার কাজে তিনি ছিলেন আশুতোষের প্রধান সহায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস আশুতোষের বিপক্ষদলের নেতা ছিলেন। সেনেটের কোন সভায় প্রবল বাধা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলেই ব্রজেন্দ্রনাথ কোচবিহার হইতে ছুটিয়া আসিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচীর অধিকাংশই আচার্য শীলের রচিত। আদর্শবাদী ব্রজেন্দ্রনাথের পাঠ্য-সূচী কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙালী ছাত্রের উপযোগী করিয়া আশুতোষকে সংশোধন করিতে হইয়াছে। আচার্য শীল বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী হইতে এম-এ ক্লাস পর্যন্ত গণিতের পাঠ্যসূচী রচনা করেন। উহা দেখিয়া আশুতোষ প্রশ্ন করিলেন, "আমাদের ছাত্ররা কি উহা অনুসরণ করতে সক্ষম?" "এ না হলে তারা গণিতে সুসম্পন্ন হতে পারবে না", উত্তর করলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। আশুতোষ উহা পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন।

দেশ ও সমাজের তৎকালীন অবস্থায় এই মহামনীষীর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাধারার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার লিখিয়াছেন, "এই মহাপণ্ডিত নিজে কিছু লিখেন না কিন্তু বাঙালী পণ্ডিতদের লেখার প্রেরণা যোগান তিনি"। অধ্যাপক সরকার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ধনীর দানে তহবিল সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে অন্নচিন্তামুক্ত করিবার পর গবেষণাকার্যে নিয়োগ করা উচিত। এই প্রস্তাব কার্যকর হয় নাই। বাঙালীর গৌরব, বাংলার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আজ নিজ বাংলা দেশেই অপরিচিত।

দেহের গঠনে আচার্য শীল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও আশুতোষের সমপর্যায়ভুক্ত। স্থূল ও উন্নতকায়। ব্রজেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত। তাঁহার বক্ষবিলম্বিত শ্বেতকৃষ্ণ সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি ইহুদি রেব্বাই ও ভারতের ঋষিদিগকে স্মরণ করাইয়া দিত। দেহের তুলনায় তাঁহার মস্তকের আকার ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ অনুন্নত এবং গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগের সহিত প্রায় এক সমতল গঠন করিয়াছিল। মাথার তিন দিক ঘিরিয়া সরল কাল কেশ আর উপরিভাগ কেশহীন। ভাসা চক্ষু দুইটিতে সদাজাগ্রত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি, আর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে ছিল বুদ্ধির দীপ্তি। দার্শনিকের অচঞ্চল ভাবগম্ভীর মূর্তি তাঁহার ছিল না। সুনিপুণ অভিনেতার মত প্রতিটি চিন্তা ও ভাবের অভিব্যক্তি তাঁহার চোখেমুখে প্রকাশ পাইত। অমন অনাবিল উচ্চহাসি অপর কাহাকেও হাসিতে দেখি নাই। হাঁটিতে অনভ্যস্ত লোকের মত মাটিতে জুতা ঘষিতে ঘষিতে সম্মুখে ঝুঁকিয়া চলিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল। একঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়ী ছাড়া তিনি কখনও পথ চলিতেন না।

কলেজের অনতিদূরে অধ্যক্ষের ছোট দ্বিতল বাসভবনে বিপত্নীক আচার্য শীল তাঁহার এক কন্যা, তিন পুত্র, জনৈক প্রৌঢ়া আত্মীয়া ও পরিচারক সহ বাস করিতেন। বসিবার ঘরের গৃহসজ্জা ছিল আড়ম্বরহীন। ফরাসে আচ্ছাদিত তক্তপোশের উপর একটি ছোট তাকিয়া, দুইখানা কাঠের সাধারণ চেয়ার, গৃহকোণে একটি অব্যবহৃত টেবিল আর দেয়ালের গায়ে একটি মধ্যাধার (rack)। মধ্যাধারে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এক খণ্ড বিদ্যাসাগর-চরিত, বিরাজ সেনগুপ্তের বর্ণবোধ দর্পণ ও আর দুই-চারটি ছোটখাট বই। তিনি বসিতেন ফরাসের উপর, আগন্তুকদের জন্য ছিল চেয়ার। কলিকাতায় রামমোহন সাহা লেনের বাড়ীতে বসিবার ঘরে অনুরূপ ব্যবস্থাই ছিল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সার্কুলার রোডের বাসস্থানে প্রথম কক্ষে একখানা খাটিয়া ও একটি অনুচ্চ মোড়া থাকিত। পরবর্তী কক্ষের চারিদিকের দেয়ালের গায়ে বইয়ের আলমারি, মধ্যস্থলে টেবিল ও একখানা চেয়ার। ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায় সেখানে বসিয়া তিনি লিখিতেন বা অধ্যয়ন করিতেন। সকালের দিকে কাহারও সহিত দেখাসাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল। সকাল বেলাটা তিনি নিজের জন্য রাখিয়া দিতেন। আচার্য শীলের এরূপ কোন বিধিনিষেধ ছিল না। সারাদিন ও রাত্রি এগারটা অবধি সকলের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত থাকিত। একক যখন থাকিতেন তাকিয়ার উপর বুক রাখিয়া শায়িত অবস্থায় কিছু পাঠ করিতেন। আলাপের সময় উঠিয়া বসিতেন। তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিবার অভ্যাস ছিল না। সিদ্ধপুরুষের মত এই জ্ঞানযোগীর যেন আর অধ্যয়নের প্রয়োজন ছিল না। মনে হইত জ্ঞানাম্বুধি অতিক্রম করিয়া তীরে উপনীত হইয়াছেন। কলেজ লাইব্রেরী ও ল্যান্সডাউন হলের গ্রন্থাগার বেশ সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে সেখান হইতে বই ধার করিতে দেখা যায় নাই। ব্রজ সাহেবের জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রকাশের পর সংস্কৃত কলেজ হইতে অনেক পুঁথি-পুস্তক ডাকযোগে তাঁহার নিকট আসিত। এসকল যে সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কয়েক দিন উহাদের অধ্যয়নে মগ্ন ছিলেন। আচার্য্য রায়ের 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' প্রকাশের পর কিছুদিন উহার অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকিতে দেখা গিয়াছে। কলেজের পথে গাড়িতে বসিয়াও রসায়নের ইতিহাসই পড়িতেন। তাঁহার লিখিত হিন্দুর পরমাণুতত্ত্ব নামক অধ্যায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ক্লাসে অধ্যাপনার জন্য তাঁহার কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল না। জনসন বা বার্ক, হেগেল বা কাণ্ট যাহাই হউক না কেন অনায়াসে পড়াইয়া যাইতেন। মনে হইত এদের গ্রন্থ যেন তাঁহার নিত্যসহচর।

মনঃসংযোগের ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ। কোন কাজে

মনোনিবেশ করিলে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া যাইত। লেখা, চিন্তা ও অধ্যয়নে নিবিষ্ট হইলে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। কোন কোন প্রভাতে ভৃত্য আসিয়া স্মরণ করাইয়া দিত যে, তিনি সারা-রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছেন। এক দিন সন্ধ্যার পর দর্শনের তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। হিন্দুস্থানী ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'আপনি আগে খেয়ে নিন্।' সুবোধ বালকের মত সম্মত হইলেন। চাকর মুখে লুচি পুরিয়া দিতে লাগিল। খানিক পর মুখ ফিরাইলেন। পরিচারক বলিল, 'না, আপনার পেট ভরে নাই, আরও খান্।' আবার খাইলেন। তিনি ছিলেন মনসর্ব্বস্ব মানুষ। তাঁহার শরীর রক্ষার ভার অপরের উপর ন্যস্ত থাকিত। কলেজের সময় হইলে ভৃত্য আসিয়া বলিত, 'এখন কলেজে যান্।' চোগা-চাপকান, মোজা, মোগলাই পাগড়ি পরাইয়া ভৃত্যই তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিত।

আচার্য্য শীল শাস্ত্রবেত্তা ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র ছিলেন না; দর্শনের তত্ত্ব অনুযায়ী আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিতেন। প্রতি জীবে ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিতেন। তিনি শুধু বিদ্বান্ নহেন, ক্রিয়াবানও ছিলেন। জনৈক ছাত্র পরীক্ষার পর তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বশেষ উপদেশ, 'মানুষকে ঘৃণা করিও না।' তিনি নিজে ছিলেন ঘৃণা-বিদ্বেষের ঊর্দ্ধে। পরীক্ষার খাতার জন্য এক দিন কয়েকজন ছাত্র তাঁহার বাসায় উপস্থিত। সকলের বসিবার আসন তথায় ছিল না। 'চৌকি লে আও, চৌকি লে আও,' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যকে আদেশ দিলেন। যে পর্য্যন্ত না প্রত্যেকের বসিবার ব্যবস্থা হইল তৎক্ষণ তাহাদের সহিত আলাপ করেন নাই। আর্থিক সাহায্যের আশায় বিপন্ন লোক আসিয়াছে। দুইটি টাকা দিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, 'আমি গরীব, আর দেবার শক্তি নাই।' কলেজে সংবাদ আসিল, তাঁহার হিন্দুস্থানী ভৃত্য কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। কি উৎকণ্ঠা! বলা হইল যে তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। তথাপি কালবিলম্ব না করিয়া হাসপাতালে ছুটিয়া গেলেন। আরোগ্যান্তে সে তাহার দেশে যাইবে। মনিব ভৃত্যকে গাড়ি করিয়া ষ্টেশনে লইয়া গেলেন। যতক্ষণ না গাড়ি ছাড়িল, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ ভৃত্যের দিকে চাহিয়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বলা বাহুল্য যে, আচার্য্য শীলের অধ্যাপনা ছিল অনন্যসাধারণ। দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবারের অল্পবুদ্ধি যুবকেরা তাঁহার ছাত্র। কিন্তু তাঁহার বাক্য বা আচরণে কখনও অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। কাহারও ইংরেজী ভুল হইলে ইংরেজীর অধ্যাপক রুক্ষস্বরে বলিতেন, 'Go back to your school, learn English and come here afterwords' (আবার স্কুলে ফিরে যাও; ইংরেজী শেখ, তার পর এখানে এস)। আচার্য্য শীলের খাতায় অশুদ্ধ ইংরেজী লিখিলে তিনি বলিতেন, 'সাহেবরা এরূপ লেখে না। আঃ! আমাদের কি দুঃখ। নিজের মনের ভাব পরের ভাষায় প্রকাশ করতে হবে!' আপনভোলা মানুষ, যখন পড়াইতেন পড়ার মধ্যে সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দিতেন। উলুবনে মুক্তা ছড়াইতেছেন কিনা এই বোধ তাঁহার থাকিত না। ইংরেজী কবিতা পাঠ করিয়া প্রশ্ন করিতেন, 'বুঝলে কি? পড়াতেই যদি কাব্যের অর্থ-বোধ না হয় তবে সে পড়া পড়াই নয়।' সাহিত্য অধ্যাপনাকালে দেশীয় অবস্থার সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যেকটি অবস্থার সহিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অবস্থার তুলনা করিতেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দূরের অপ্রত্যক্ষ বিষয় বুঝিতে সাহায্য করিত। ইংরেজী সাহিত্যে ডঃ জনসনের স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিতেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাদ্ধে বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিমের যে স্থান ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জনসনের স্থানও তাহাই ছিল। উভয়েই ছিলেন সাহিত্যের ডিক্টেটর। উভয়েই সাহিত্যের আদর্শ নির্দ্ধারণ করিতেন, নূতন ও পুরাতন সাহিত্য যাচাই করিতেন। তাহাদের অভিমত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত।' বহু উদাহরণের সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া দিতেন। তুলনামূলক আলোচনা তাঁহার অধ্যাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। কবি পোপের জীবনীতে কাব্য সম্বন্ধে জনসনের মতবাদ লিখিত আছে। উহার আলোচনা-প্রসঙ্গে এরিষ্টটলের মূল 'Poetics' (কাব্যবিচার) গ্রন্থ আনা হইল। গ্রীক হইতে অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন। অবশেষে বলিলেন, 'এখন 'সাহিত্য দর্পণ' পড়িয়া শুনাইতে পারিলে ঠিক হইত।' কলেজ লাইব্রেরীতে 'সাহিত্য-দর্পণ' ছিল না। তিনি পাঠ্য-পুস্তকের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া উহার আলোচ্য বিষয়ের উপর জোর দিতেন। সেই বিষয়টি সকল দৃষ্টিকোণ হইতে দেখাইবার চেষ্টা করা হইত। তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞানের সাহায্যে কাব্য ও সাহিত্যের ভিত্তিপত্তন রচনা করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। তাঁহার তন্ময়তা ও রসবোধ ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত না হইয়া পারিত না। কিন্তু ছাত্রদের অযোগ্যতার জন্য সেই ভাব দীর্ঘস্থায়ী হইত না। তাঁহার অধ্যাপনা উদ্দেশ্যক টনিকের মত কাজ করিত।

দর্শনের অধ্যাপনার রীতিও ছিল সাহিত্যের অনুরূপ। পাঠ্য-পুস্তকে হেগেল বা অন্য দার্শনিক সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন না। অন্য যে বইয়ের যে স্থানে উহাদের বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সর্ব্বশেষে নিজের অভিমত প্রকাশ করিতেন।

কোচবিহার কলেজে 'নোট' দেওয়া হইত না। ছাত্রদের চিন্তাশক্তির উন্মেষ, অধীত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ, অধ্যয়নের পদ্ধতি শিক্ষাদান ছিল প্রধান লক্ষ্য। পরীক্ষার চিন্তা গৌণ। পরীক্ষা পাসের জন্য প্রশ্ন বাছিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজে অধ্যাপকগণ সাহায্য করিতেন না। কলেজের ফল অন্য মফস্বল কলেজ হইতে ভাল হইত না। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আচার্য্য শীল হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'আমার ছেলেরা মনের আনন্দে থাকে।' তাঁহার এই দাবি অমূলক নহে।

একদিন তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছি। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পড়িতেছিলেন। কাগজ রাখিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন, 'দেখেছ, অক্সফোর্ডে বি-এ পাস করেছে শতকরা আশীর ওপর, আর আমাদের এখানে ২৮ কি ৩০।' কেন, আমাদের ছেলেদের কি বুদ্ধি কম? না না, আমাদের ছেলেরা ঢের বেশী মেধাবী। It is due to the method of teaching and the system of examination (শিক্ষার পদ্ধতি ও পরীক্ষার ধরণের দোষে এত ফেল হয়।)'

ধর্ম্মে আচার্য্য শীল ছিলেন খাঁটি হিন্দু। তিনি বলিতেন, 'ব্রাহ্মগণ রিফর্মড (সংস্কারমুক্ত) হিন্দু। হিন্দুর মধ্যে বহু সম্প্রদায় রয়েছে, ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্ম্মের এক সম্প্রদায়।' সরস্বতী পূজার চাঁদা দিতেন কিন্তু হাসিতে হাসিতে বলতেন, 'আমার টাকা পূজায় ব্যয় করো না, দরিদ্রদের সাহায্যে খরচ করো।' সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের রীতি ছিল। কিন্তু নাটকের বইখানা কলেজের অধ্যক্ষের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। বই লইয়া ছেলেরা বাসায় আসিয়াছে। সেখানে এক জন স্কুলের শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বইখানা তাঁহাকে দিয়া বলিয়া দিলেন, 'আপনি বই দেখে দেবেন। হিন্দুর নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধ কোন কথা বইতে থাকলে উহা অভিনয় করতে দেবেন না।'

অবিশ্বাস্য হইলেও একথা সত্য যে, রাজনীতিতে তিনি ছিলেন চরমপন্থী। বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথও ব্রজেন্দ্রনাথের মুখপাত্র ছিলেন। নবজাগরণের সূত্রপাতেই পূর্ব্ববঙ্গে রাজদণ্ড উদ্যত হইয়াছিল। অসংবদ্ধ জনগণ ভীত হইয়া যেন পশ্চাদপসরণ না করে তজ্জন্য বিপিনচন্দ্র পাল প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার প্রথম ঢাকায় আগমন। ১৯০৫ সনের অক্টোবর মাস। বিপিনবাবু সভায় বলিলেন, 'আমার বন্ধু রবিবাবু আমি আসার সময় একটি গান রচনা করিয়া দিয়াছেন তাহা এখন পাঠ করিব।' দৃপ্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিলেন—

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন ততই টুটবে···'
···   ···   ···
ও ভাই ভরসা না ছাড়িস কভু···'

বিপিনচন্দ্র ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। 'বন্দেমাতরমের, মোকদ্দমায় বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া কারাবরণ করেন। কোচবিহারে সংবাদ পৌঁছিবার তিন ঘণ্টার মধ্যেই প্রথম ট্রেনে তিনি বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের জন্য কলিকাতা রওনা হন। উভয়ের মধ্যে সময় সময় কোচবিহারেও সাক্ষাৎ ঘটিত।

সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড হইবার সংবাদ শুনিয়া খেদের সহিত বলিলেন, "Thus ends the Indian National Congress (ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই শেষ হ'ল)।" তার পর স্বগতোক্তির মত বলিতে লাগিলেন, "না না, এ অসম্ভব। তিলক কংগ্রেস ভাঙতে পারেন না। তিলক আর অশ্বিনী দত্ত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক। বুঝেছি, তিলক মনে করেছেন সকলের একত্র আবেদন-নিবেদনে ইংরেজ কর্ণপাত করছে না। কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হবার পর মডারেটদের হাত করবার জন্য কিছু কিছু প্রার্থনা মঞ্জুর করবে। নিজের উপর কলঙ্ক এনে দেশের সেবা করছেন। এই তো তিলক। দেশকে কত ভালবাসেন। নাগপুরে জুতা সুরেন্দ্রনাথের কান ছুঁয়ে চলে গেছে। এ হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ। কৃষ্ণদাস পালকে লক্ষ্য করে জুতা ছোঁড়ার ফল।"

আলিপুর জেলে কানাইলালের ফাঁসী হইল। আচার্য্য শীলের কি মনোবেদনা! 'দেশের সেবায় প্রাণদান! এসব ত্যাগী বীরেরা বেঁচে থাকলে দেশের কত কাজ করতে পারত।'

ময়মনসিংহের এক ছোট জমিদার এসেছেন। উদ্দেশ্য অসবর্ণ বিবাহ আর পণ নিবারণের সমর্থকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ। আচার্য্য শীল বলিলেন, 'অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমার স্বাক্ষর নিয়ে আপনার কোন লাভ হবে না। হিন্দু সমাজে আমার কথার কোন মূল্য নাই। আমার মেয়ের অসবর্ণে বিবাহ দিয়েছি। স্বাক্ষর ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে কি পণ নিবারণ করতে পারবেন? বিবাহের বয়স বাড়িয়ে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা উচিত। তখন অর্থের চাইতে গুণের আকর্ষণ বেশী হবে। পণ প্রথার একটা উপকারিতা আছে। পণের জন্য কুরূপাদেরও বিবাহ হয়ে থাকে।'

বিদ্যোৎসাহী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অনুরোধে তিনি কোচবিহারে যান। মহারাজা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্র একবার কলেজের পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকিয়া রাজকুমারের বন্ধুরূপে তাঁহার মোটরে চড়িয়া শহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। তিনি এই ঘটনার সংবাদ শুনিয়া সন্ধ্যায় বালকের মেসে গেলেন। আদেশ দিলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে কোচবিহার কলেজ ও মেস ত্যাগ করিতে হইবে। পরদিন রাজকুমার মহারাজার নিকট এই আদেশের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। মহানুভব মহারাজা উত্তর করিলেন, 'আমি তাঁকে কলেজের ভার দিয়েছি। কলেজের হিতের জন্য যা ভাল মনে করেন তাই তিনি করবেন। আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারব না।' মহারাজার মৃত্যুর পর আচার্য্য শীল কোচবিহার পরিত্যাগ করেন।

গ্রীক ও সংস্কৃত নাটক

শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, এম-এ

সৃষ্টির কোন আদিম প্রভাতে মানব প্রথম বাক্য উচ্চারণ করেছিল এবং সেই বাক্যোচ্চারণের পর সে আনন্দাতিশয্যে আপন অন্তরের ভাষা ব্যক্ত করবার জন্য বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে যারা নৃত্য করতে শিখেছিল। আর সেই নৃত্যের তালে তালে ছন্দ, ছন্দ হতে সুর এবং সুর হতে গীতের সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে নৃত্য-গীত সম্বলিত নাটকের উদ্ভব হয়েছিল, তা কে বলতে পারে? তবে মহামুনি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' সম্বন্ধে চিন্তা করলে একথা সুস্পষ্ট বলে মনে হয় যে, স্মরণাতীত কালেও এই ভারতভূমিতে নাটকাভিনয়ের প্রচলন ছিল এবং উচ্চশ্রেণীর নাট্যশালাও বিদ্যমান ছিল। মূল রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একসপ্ততিতম সর্গের চতুর্থ শ্লোকে উক্ত হয়েছে:

অবাদয়ঞ্ জগুশ্চান্যে ননৃতুশ্চাপরে তথা।
নাটকান্যপরে চক্রুর্হাস্যানি বিবিধানি চ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের পর দশরথের মৃত্যু-সংবাদ বহন করে অযোধ্যার দূত যে রাত্রে ভরতের মাতুলালয়ে গমন করে, সেই রাত্রে নানা বিভীষিকাময় স্বপ্ন দর্শন করে ভরত অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তখন ক্ষুন্নায়মান ভরতের চিত্তশান্তির জন্য কেহ মনোহর বাক্য, কেহ নৃত্য, কেহ বা নাটকের অভিনয় করেছিল। মহাভারত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতেও নাটকাভিনয়ের উল্লেখ আছে। তবে তাৎকালিক অভিনীত নাটকগুলির নাম কি এবং সেগুলির আজিও অস্তিত্ব আছে কিনা তা বলা যায় না। সেই হেতু হিন্দুদের প্রাচীন নাটকগুলি সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমাদের প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-উপপুরাণ বা জগতের বিভিন্ন দেশের পৌরাণিক যুগের সৃষ্ট সাহিত্যের কথা চিন্তা না করে আমরা যদি লৌকিক সাহিত্যের কথা চিন্তা করি—যে সাহিত্যে সাধারণ নর-নারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্নেহ-ভালবাসার কাহিনীই মুখ্য ভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা হলে আমরা দেখতে পাব যে, সমগ্র জগতে আজ পর্যন্ত পাঁচ বার এমন কয়েকজন নাট্যকার, কবি ও ঔপন্যাসিককে আমরা লাভ করেছি, যাঁরা প্রাচীন রচনাপদ্ধতি এবং যুগজীর্ণ বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনপূর্বক যুগান্তকারী সাহিত্য সৃষ্টি করে আমাদের নূতন জীবনের জয়গান শুনিয়ে চলে গেছেন এবং আমরা সেই গান শুনে নিজেদের ধন্য মনে করেছি। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে সম্রাট পেরিক্লিসের (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫-৪২৯) রাজত্বকালের কিছু আগে গ্রীসদেশে নাট্যকার এস্কাইলাসকে (খ্রীঃ পূঃ ৫২৫-৪৫৬) কেন্দ্র করে সেই সাহিত্যের প্রথম অভ্যুত্থান হয় এবং নাট্যকার ইউরিপিডিসে (খ্রীঃ পূঃ ৪৮০-৪০৭) তার পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় অভ্যুত্থান হয় প্রায় সেই সময়ে বা তার কিছু পরেই এই ভারতবর্ষে এবং মহাকবি কালিদাস হন সেই সাহিত্যের প্রধান নায়ক। তার পর বহু শত বর্ষ পরে ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে মহাকবি সেক্সপীয়র সাধারণ নর-নারীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি, বাহির ও ভিতরকার দ্বন্দ্ব প্রভৃতিকে তাঁর নাটকের মধ্যে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেন। তার পর প্রায় আড়াই শ বৎসর পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে রাশিয়ায় এবং বাংলা দেশে আর এক নূতন সাহিত্যের উদ্ভব হয়। এই নূতন সাহিত্যের পিছনে ছিল দুটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা—একটি ফরাসী-বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী এবং অপরটি নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। রাশিয়ায় টুর্গেনিভকে কেন্দ্র করে ডষ্টয়েভস্কি ও টলষ্টয়ের মধ্য দিয়ে সেই সাহিত্যধারা প্রবাহিত হয়ে গোর্কিতে একটা বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করে এবং বাংলা দেশেও মধুসূদনের হাতে সেই সাহিত্য জন্মলাভ করে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে জাতির মনোবেদনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথে সেই যুগটি অমরত্ব লাভ করে। প্রথম তিনটি সাহিত্যিক অভ্যুত্থান রাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে হয়েছিল এবং রাজতন্ত্রের দোষ-গুণ ত্রুটি-বিচ্যুতির অসংখ্য চিত্র সেখানে অঙ্কিত হয়েছে। শেষের দুটি সাহিত্যিক অভ্যুত্থানে শোষণদক্ষ রাজশাসন থেকে শোষিত পদদলিত জনগণের পরিত্রাণের বাণী বিঘোষিত হয়েছে।

গ্রীস দেশের নাট্য-সাহিত্য বুঝতে হলে আমাদের মুখ্যতঃ দুটি কথা মনে রাখতে হবে। একটি হচ্ছে এই যে, মহাকবি হোমারের (ঐতিহাসিকেরা খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে হোমারের আবির্ভাব-কাল বলে অনুমান করেন) মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পর হতেই এই নাট্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, সক্রেটিস (জন্ম আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯), প্লেটো (জন্ম খ্রীঃ পূঃ ৪২৭) এবং এরিষ্টটল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) প্রভৃতি বিশ্ববন্দিত দার্শনিক পণ্ডিতদের আবির্ভাবের পূর্বে এই নাট্য-সাহিত্য প্রায় শেষ হয়ে যায়। একথা বলার তাৎপর্য এই যে, ঐ সকল যুগান্তকারী দার্শনিক পণ্ডিতের চিন্তাধারার সঙ্গে এস্কাইলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস বিশেষ পরিচিত হতে পারেন নি। যদি পরিচিত হবার সুযোগ তাঁদের হ'ত, তা হলে আমরা গ্রীক দেশের অন্যরূপ নাট্য-সাহিত্য পেতাম। যা হোক, নাট্যকারদের উপর ঐ সকল দার্শনিকের বিশেষ কোন প্রভাব পড়তে না পারায় একটা সুফল হয়েছে। হোমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে উপরি-উক্ত নাট্যকারগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে আমরা তাঁদের নাটকে তাৎকালিক গ্রীসের কতকগুলি নিখুঁত জীবন্ত ছবি দেখতে পাই। তখন গ্রীস দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, গ্রীকদের উপর

দেশের বিবিধ কুসংস্কার কিরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার অসংখ্য বাস্তব চিত্র এস্কাইলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিডিসের নাটকাবলীর মধ্যে বিধৃত রয়েছে। সেই সকল চিত্রের কতগুকলি এই প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করব। এখন গ্রীস দেশে নাটকের জন্ম কি করে সম্ভব হ'ল সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের গোড়ার কথা আলোচনা করলে বুঝা যায়, বিগ্রহ-পূজা বা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। গ্রীকরা অনেক দেব-দেবীর পূজা করত। কিন্তু তাদের গ্রাম্য দেবতা ডিওনিসাসকে তারা সবচেয়ে বেশী ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। তাঁর পূজোর সময়ে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত। এই ডিওনিসাসই ছিলেন গ্রীকদের প্রধান উপাস্য দেবতা। তারা এই দেবতাকে শস্য, ফল, পুষ্প, মদ্য এবং বৃক্ষলতাদির প্রদাতা মনে করত। প্রধানতঃ বছরে দু'বার করে গ্রীকরা ডিওনিসাসকে আরাধনা করত—একবার শীতকালে এবং আর একবার বসন্তকালে। শীতকালে যে উৎসব হ'ত সেটি হাল্কা ধরণের এবং তার থেকে কমেডি বা মিলনান্ত নাটকের উৎপত্তি হয় আর বসন্তকালে যে উৎসব হ'ত সেটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং তার থেকেই ট্রাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটকের উৎপত্তি। বসন্তকালের উৎসবে ডিওনিসাসের জীবনের কল্পিত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রভৃতিকে 'কোরাসে'র মাধ্যমে সকলে নেচে-নেচে তাঁর বেদীর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গান করত এবং এই কোরাসের মধ্যেই ট্রাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটকের বীজ উপ্ত ছিল। কোরাসের মধ্যে প্রাণমাতানো গানগুলিকে ডিথাইরাম (Dithyramb) বলত। প্রথমে এই ডিথাইরাম কেবলমাত্র গ্রাম্যসঙ্গীত বলে গণ্য হ'ত। এরিয়ন একে উন্নত করলেন এবং তিনিই দেখালেন যে, এই ডিথাইরাম-এর মধ্যেই ট্রাজেডির মূলসূত্রগুলি নিহিত রয়েছে। তার পর এলেন থেসপিস। তিনি কোরাসের মধ্যে একটি নটের প্রবর্ত্তন করে নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ, তিনি কোরাসকে দু'ভাগে ভাগ করে দিলেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত নট কোরাসের মূল গায়কের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগল এবং তার থেকে নাটকীয় ডায়লগ বা সংলাপের সূত্রপাত হ'ল। অর্থাৎ, থেসপিসই কোরাসের মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গী নিয়ে এলেন। তার পর এলেন এস্কাইলাস তাঁর অসমান্য নাট্যপ্রতিভা নিয়ে। তিনি আর একটি নটের প্রবর্ত্তন করলেন—অর্থাৎ, তিনি কোরাসকে তিন ভাগে ভাগ করে দিলেন। কোরাসের মূল গায়ক এবং দু'জন নটের মধ্যে এবার সংলাপ সুরু হ'ল। তার পর আমরা গ্রীস দেশের অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার সফোক্লিসকে পেলাম।

তিনি আরও একটি নটের সৃষ্টি করলেন এবং গ্রীক নাটকের গঠনপ্রণালীর ব্যাপারে সম্পূর্ণতা-বিধান করলেন। অর্থাৎ, সফোক্লিসই গ্রীক নাট্যসাহিত্যকে যথার্থ উন্নত স্তরে নিয়ে গেলেন, তাকে গৌরব দান করে মর্য্যাদার আসনে বসালেন। তিনি সৃত্তিকারের নাটকীয় চরিত্র ও সংলাপ সৃষ্টি করলেন। নট-নটীর পোশাক-পরিচ্ছদেরও অনেক প্রশংসনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করলেন। এক কথায় সফোক্লিসই হচ্ছেন গ্রীক নাট্যসাহিত্যের গুরু। তার পর এলেন গ্রীসের নাট্য-জগতের শেষ উজ্জ্বলতম রত্ন ইউরিপিডিস। এঁর সময়ে কোরাসের প্রাধান্য একেবারে কমে গেছে। সেইজন্য তিনি নাটকের আঙ্গিকের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে তাঁর অন্তর্লোকটিকে আরও উন্নত করতে চেষ্টা করলেন এবং প্রকৃত শিল্পীর মন নিয়ে তিনি নর-নারীর চরিত্র আঁকতে লাগলেন।

তা হলে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, গ্রীকদের গ্রাম্য দেবতা ডিওনিসাসের আরাধনাকে কেন্দ্র করে যে কোরাসের সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকেই 'কমেডি' এবং 'ট্রাজেডি'র উৎপত্তি। মহাকবি হোমারের মৃত্যুর পর গ্রীস দেশে এক কবিয়ালের দল গড়ে উঠেছিল। তারা গ্রীসের বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে সমবেত কণ্ঠে প্রাচীন গ্রীসের পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী গান করে যেত। এদের 'Cyclic Poets' বলত। থেসপিসই সর্ব্বপ্রথম এদের গান থেকে নাটকীয় ধারার প্রবর্ত্তন করেন। কোরাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করে স্বয়ং এরিষ্টটল বলেছেন:

"The Chorus too should be regarded as one of the actors: it should be an integral part of the whole, and take a share in the action."

আর একজন বিখ্যাত সমালোচক বলেছেন:

Chorus is the spectator idealised, *i.e.*, is the universal voice of moral sympathy, instruction and warning."

এস্কাইলাস (খ্রীঃ পূঃ ৫২৫-৪৫৬)

থেসপিসের হাতে গ্রীক নাটকের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত হলেও, তা সত্যিকারের নাটকের পর্য্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। এস্কাইলাসই প্রথমে প্রকৃত নাটক রচনা করলেন। তিনি দুটি নটের সৃষ্টি করে কোরাসের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিলেন এবং নাটকীয় সংলাপের সৃষ্টি করলেন—একথা আগেই বলেছি। হোমারের দুখানি মহাকাব্য এবং প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী হতেই তিনি তাঁর নাটকীয় বিষয়বস্তু বেছে নিলেন। তাঁর নাটকগুলি মূলতঃ মহাকাব্যমূলক এবং গীতিকাব্য-ধর্ম্মী। তা হলেও তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভাবলে সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে নূতন প্রাণসঞ্চার করে তাদের যথাসাধ্য মানবধর্ম্মী করে তুললেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে খুব জটিল 'প্লট' দেখতে পাওয়া যায় না। অত্যন্ত সহজ সরলভাবেই প্রাচীন গ্রীসের পুরাণ এবং ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি তাঁর নাটকীয় চরিত্রগুলিকে রূপ দিয়েছেন। খুব বেশী মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না! তাঁকে তাৎকালিক গ্রীস দেশের ধর্ম্ম, সমাজ এবং রাজনীতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে নাটক রচনা করতে হয়েছিল এবং সেজন্য বহু স্থানে তাঁর স্বাধীন মত ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মানুষের অদৃষ্ট, মানুষের ভবিষ্যৎ-দর্শনে অক্ষমতা, তার সর্ব্ববিষয়ে অসহায় ভাব প্রভৃতিকে এস্কাইলাস সুন্দরভাবে এঁকেছেন। গ্রীকেরা মনে করত

যে, মাতাপিতার পাপ তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। তাদের এই ধারণা ছিল যে, মাতা-পিতার পাপ পুরুষানুক্রমে তাদের সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের উপর গিয়ে বর্তায়। এটি এস্কাইলাস তাঁর নাটকে বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয় এবং আরও বহু জটিল বিষয়ের আলোচনা তিনি তাঁর নাটকগুলিতে করেছেন। আধুনিক সমালোচকদের মতে তিনি হয়ত প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার নন্। তা হলেও একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এস্কাইলাস কেবল গ্রীকদেশের কেন—বিশ্বের নাট্য-সাহিত্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়ে গেছেন। তিনি অসংখ্য নাটক রচনা করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এস্কাইলাসের সময়ে কোন সাধারণ নাট্যশালার অস্তিত্ব ছিল না। দর্শকেরা উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে অভিনয় দর্শন করে যেত। এক সঙ্গে দু'তিনখানা নাটকও অভিনীত হ'ত এবং দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা দেখত।

এস্কাইলাসের মাত্র প্রধান প্রধান নাটক সম্বন্ধে এখানে কিছু বলব। তিনি আগামেমনন (Agamemnon), চোফোরি (Choephorae) এবং ইউমিনাইডিস (Eumenides) নামক তিনখানি নাটক রচনা করে বিশ্বের নাট্য-সাহিত্যে গৌরবময় স্থান লাভ করেছেন। এই তিনখানি নাটক "Oreastean Trilogy" বলে সাহিত্যসমাজে পরিচিত। সমালোচকদের মতে 'আগামেমনন'ই এস্কাইলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। নাটক তিনখানির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই :

আগামেমনন ট্রয় জয় করে গৃহে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে করে এনেছেন অসামান্যা সুন্দরী যুবতী বন্দিনী প্রায়াম-কন্যা ক্যাসাণ্ড্রাকে। বিজয়লাভ করলেও পবনদেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ভবিষ্যদ্বক্তাদের উপদেশমত আগামেমনন তাঁর কুমারী কন্যা ইফিজেনিয়াকে বলি দিয়েছেন। তা না দিলে রণতরীগুলি অগ্রসর হতে পারত না। পত্নী ক্লাইটেমনেষ্ট্রা স্বামীকে উদ্দেশ করে বলছেন :

". . .and sacrificed my child,
My best-beloved, fruit of my throes, to lull
The Thracian blasts asleep."

এটি ইউরিপিডিসের "Iphegenia at Aulis" নামক নাটকে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে :

"The prophet Calchas midst the gloom
That darkened on our minds, at length pronounced
That Iphegenia, my virgin daughter,
I to Diana, goddess of this land,
Must sacrifice, this victim given, the winds
Shall swell our sails, and Troy beneath our arms
Be humble in the dust."

এই ইফিজেনিয়াকে বলি দেওয়ার পর হতেই নাটকের সূত্রপাত। ক্লাইটেমনেষ্ট্রা আগামেমননকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু কন্যাবলির কোন সদুত্তর না পেয়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নারীর সে কি ভয়ঙ্কর রূপ! ভাবাবেগ এবং আক্রোশবশে নারীধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রণয়ী এগিসথিউসের সহায়তায় তিনি স্বামী এবং ক্যাসাণ্ড্রাকে হত্যা করলেন। নাটকের জটিলতা বেড়ে গেল। পুত্র অরেসটেস এই সংবাদ পেলেন। তিনিও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলেন। মাতা এবং মাতার প্রণয়ীকে তিনি যমালয়ে পাঠালেন। অরেসটেস মাতাকে যখন হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন ক্লাইটেমনেষ্ট্রা বলছেন :

'Hold thee my son!
Look on this breast, to which with
Slumbrous eyes
Thou oft has clung, the while thy baby gum
Sucked the nutritious milk."

আরও বললেন :

"Beware thy mother's anger-whetted hounds"

তখন অরেসটেস বললেন :

"My father's hounds have hunted me to thee."

মাতৃহত্যার ঠিক অব্যবহিত পর হতেই অরেসটেস নানা বিভীষিকা দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হ'ল যেন ক্লাইটেমনেষ্ট্রার প্রেতমূর্তি এবং আরও অসংখ্য ভয়ঙ্কর মূর্তি তাঁর পিছু পিছু ছুটে আসছে। অরেসটেস প্রাণভয়ে ছুটে চললেন। শেষে পালাস এথেনার মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি অরেসটেসকে ক্ষমার আশ্বাস দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর মূর্তিগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। এরিওপেগাসের আদালতে অরেসটেসের বিচার আরম্ভ হ'ল। এখানে নাট্যকার গ্রীসের তাৎকালিক রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। ক্ষমাশীলা এথেনা, অনুতপ্ত বিভ্রান্ত অরেসটেস এবং প্রতিহিংসাপরায়ণা মূর্তিগুলিকে যে দৃশ্যে আমরা একসঙ্গে দেখিতে পাই সে দৃশ্যটি এস্কাইলাসের অসামান্য নাট্যপ্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দৃশ্যটি গ্রীক নাট্যসাহিত্যে সত্যই অপূর্ব। বিচারে অরেসটেসের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক ভোট দেওয়া হ'ল এবং গণনাশেষে দেখা গেল যে ভোটের সংখ্যা সমান-সমান হয়েছে। তখন এথেনা তাঁর বাড়তি ভোট দিয়ে অরেসটেসের জীবনরক্ষা করলেন। পালাস এথেনা বলছেন :

"My part remains and I this crowing pebble
Drop to Orestes
Though the votes fall equal from the urn
My voice shall save him." (*Eumenides*).

এই হ'ল গ্রীকদেশের তিনটি বিখ্যাত নাটকের সারমর্ম।

সফোক্লিস (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৭-৪০৬)

এস্কাইলাসের পর আমরা গ্রীক নাট্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা সফোক্লিসকে পেলাম। এরিষ্টটলের মতে সফোক্লিসই গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সফোক্লিস যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন গ্রীক-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ—সম্রাট পেরিক্লিসের রাজত্ব। তিনি যেমন এথেন্সের চরম উন্নতি দেখেছিলেন তেমনি আবার তার পতনও দেখেছিলেন। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। বহুবার সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বহুবার গমন করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং বহু শ্রেষ্ঠ

নাটকের রচয়িতা হিসাবে পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। সফোক্লিস গ্রীক নাট্যসাহিত্যে কি দিয়ে গেলেন? তিনি গ্রীক নাটকের মধ্যে প্রকৃত প্রাণসঞ্চার করলেন, গ্রীক নাটককে অধিকতর সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেলেন। তিনি আর একটি নট সৃষ্টি করে প্লট এবং সংলাপের প্রাধান্য আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি সত্যিকারের নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টি করেন। কাজেই কোরাসের স্থান অনেক নীচে নেমে গেল। মানবমনের দ্বন্দ্ব এবং তার সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আরও সুন্দরভাবে তিনি এঁকে দেখালেন। এস্কাইলাস অলৌকিক চরিত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। সফোক্লিস সেদিকে ততদূর দৃষ্টি দেন নি। তাঁর অধিকাংশ সৃষ্ট নর-নারী গ্রীসের পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস এবং হোমারের দুটি মহাকাব্য থেকে গৃহীত হলেও তিনি যতদূর সম্ভব তাদের এস্কাইলাসের চেয়ে অধিকতর মানবীয় গুণ ও ধর্মে বিভূষিত করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তা হলেও তিনি আদর্শবাদী ছিলেন। সেইজন্য সমালোচকেরা তাঁর সম্বন্ধে বলে থাকেন

"Sophocles drew men as they ought to be Euripedes drew men as they are."

সমালোচকদের মতে সফোক্লিসের "Oedipus Tyrannus" নামক নাটকটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এরিষ্টটলও এই নাটকখানির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গল্পটি হ'ল এই:

ডেলফিক ওরাকল থিবসের রাজা লেয়াসকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি অপুত্রক হয়ে মারা যান, তা হলে থিবস নগরী সর্ব্ব আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। রাজা কিন্তু এই সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করেছিলেন। তিনি ইডিপাস নামে এক পুত্রোৎপাদন করে দেবরোষে পতিত হন। বাল্যকালেই ইডিপাস কোন কারণে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে তিনি যৌবনে যোদ্ধার বেশে পিতৃরাজ্যে এসে পিতাকে ভুলক্রমে হত্যা করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেন এবং নিজমাতা জোকাষ্টাকে বিবাহ করেন। এ সমস্তই ভ্রান্তিবশতঃ হয়েছিল। বিবাহের ফলে ইডিপাসের Antigone ও Ismene নামে দুটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এর কিছু কিছু জোকাষ্টা জানলেও ভয়ে তিনি কিছুই প্রকাশ করতে পারেন নি। 'Soothsayer' টাইরেসিয়াস এসে প্রকৃত ঘটনা ইডিপাসকে বলে দিলেন। ইডিপাস যখন জানতে পারলেন যে, তিনিই তাঁর পিতাকে হত্যা করে নিজ মাতাকে অজ্ঞাতসারে বিবাহ করেছেন, তখন তিনি পাগল হয়ে গেলেন। চীৎকার করে বলে উঠলেন:

"O Light,
This be the last time I shall gaze on thee,
Who am revealed to have been born of those
Of whom I ought not—to have wedded whom
I ought not—and slain whom I might not slay."

তিনি নিজের চক্ষুদুটিকে উৎপাটিত করে ফেললেন। তখন অন্ধ ইডিপাস তাঁর মেয়েদুটিকে ডেকে বললেন:

"Come, come hither to my arms—
To these brotherly arms . . . .
Author of you unseeing—unknowing—in
Her bed, whence I derived my being!"

তখন তিনি ক্রিওনকে আহ্বান করে বললেন:

"Banish me from this Country."

ইডিপাস কন্যাদ্বয়কে শেষজীবনের সুখদুঃখের অংশভাগিনী করে নির্ব্বাসিতের জীবনযাপন করতে লাগলেন। জোকাষ্টা এর আগেই আত্মহত্যা করেছেন। এই হ'ল নাটকটির মূল গল্পাংশ।

সফোক্লিস কত নিপুণভাবেই না নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ঘটনাগুলিকে রূপ দিয়েছেন। পার্থিব সংস্কার থেকে মুক্ত হলে নর-নারীর চিরন্তন আদিম বৃত্তি যে কিভাবে নগ্ন হয়ে প্রকাশ পেতে পারে তা আমরা যেমন এই নাটকটিতে দেখি, তেমনি আবার সেই নর-নারী যখন সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখনই বা তাদের মনোজগতে কি ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তাও আমাদের নিকট পরিস্ফুট হয়। সফোক্লিস, মানব-মনের সেই দুটি দিকই অতি সুন্দরভাবে এঁকে আমাদের দেখিয়েছেন। সেখানেই তিনি কালজয়ী হয়ে অমর হয়ে আছেন।

ইউরিপিডিস: খ্রীঃ পূঃ ৪৮০-৪০)

ইউরিপিডিস গ্রীক ইতিহাসের যুগ সংক্রমণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে সময় গ্রীসবাসীরা তাদের প্রাচীন ইতিহাস এবং পুরাতনের উপর আস্থা হারায় এবং এক নূতন যুগের নবালোককে অভিনন্দন করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অতিপ্রাকৃত ঘটনার উপর তারা বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিল। গ্রীকদের মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন ইউরিপিডিস তাঁর অসামান্য নাট্যপ্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরিপিডিস দেখলেন যে, নাটকের বাইরের দিকটি সফোক্লিসের হাতে পূর্ণতা লাভ করেছে—সেদিকে তাঁর আর বিশেষ কিছু করবার নেই। সেইজন্য তিনি তাঁর অঙ্কিত নর-নারীদের এস্কাইলাস-সফোক্লিসের চেয়ে অধিকতর মানবীয় দোষে গুণে বিভূষিত করে দেখাতে চেষ্টা করলেন। তিনি নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকে বেশী মন দিলেন। ফলে সংলাপের প্রাধান্য আরও বেড়ে গেল। কোরাসের স্থান তো তাঁর আগেই অনেক ধাপ নীচে নেমে গিয়েছিল। সেইজন্য তাঁর সমালোচকেরা বলে থাকেন যে, ইউরিপিডিসের সৃষ্ট নর-নারীরা যেন বিতর্কসভায় তর্কে লিপ্ত। অর্থাৎ, ইউরিপিডিস তাঁর পূর্ব্বাচার্য্যদের চেয়ে অনেক আধুনিক এবং সেইজন্য তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এস্কাইলাস ও সফোক্লিসের মত সম্মানলাভ না করলেও তাঁর নাট্য-প্রতিভার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে ইউরোপের বহু নাট্যকারকে প্রভাবান্বিত করেছিল—এমনকি সেক্সপীয়র, ইবসেন এবং বার্ণার্ড শ পর্য্যন্ত বাদ পড়েন নি। প্রাচীন যুগ এবং আধুনিক যুগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইউরিপিডিস পুরাতন আর নূতনকে একটা স্বর্ণসূত্রে গেঁথে দিয়ে গেছেন। সেইজন্য একদল সমালোচক আছেন যাঁরা ইউরিপিডিসকে গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে অভিহিত

করে থাকেন। তিনি রোমান্টিক নাটকের স্রষ্টা। কিন্তু তিনি সর্ব্বদিক থেকে নবীন হলেও প্রাচীনদের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি—করবার উপায়ও ছিল না। ইউরিপিডিসের মৃত্যুর পর গ্রীস থেকে নাট্যকলা ধীরে ধীরে লোপ পায়। তাঁর পরে আর কোন প্রতিভাবান নাট্যকার এসে তাঁর শূন্য সিংহাসন অধিকার করতে পারেন নি।

ইউরিপিডিস-রচিত নাটকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। সমালোচকেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর "মিডিয়া" নামক নাটকটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তার গল্পাংশ এইরূপ :

জেসন ও মিডিয়া উভয়ে স্বামী-স্ত্রী। তাদের মধ্যে গভীর ভালবাসা; তাদের সন্তান-সন্ততিও আছে; হঠাৎ দেখা গেল যে, জেসন তাঁর স্ত্রীর উপর বীতরাগ হয়ে পড়লেন এবং রাজা ক্রিয়নের কন্যাকে বিবাহ করলেন। স্বামীর এই ব্যবহারে সতীসাধ্বী মিডিয়া হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তিনি মানসিক স্থৈর্য্য হারিয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। মিডিয়ার কাছে বিবাহ ছিল এক পবিত্র অবিচ্ছেদ্য সামাজিক বন্ধন—যখন-তখন যে কেউ বললে তাকে ছিঁড়ে ফেলা যায় না। ইউরিপিডিস মিডিয়ার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে বলছেন :

"She even hates her children, nor with joy
Beholds them—"

তার পর তাঁর ক্ষিপ্ত ভাব আর এক ধাপ উপরে উঠল। তিনি তাঁর সন্তানদের সম্বোধন করে বললেন :

"Ye execrable sons
Of a devoted mother! Perish ye
With your false sire, and perish his whole house"

ক্রিয়ন এলেন। পাছে মিডিয়া তাঁর কন্যার কোন অনিষ্ট করে সেই ভয়ে তিনি মিডিয়াকে বললেন :

"I command you to leave these realms
An exile"

নারীত্বের চরম অবমাননা হ'ল। নাট্যকার সেটা দেখালেন। মিডিয়ার বিলাপ কত করুণ! তিনি বলছেন :

"Can life be any gain
To me who have no country left, no house
No place of refuge?"

এর পর মিডিয়ার ক্ষিপ্ত ভাব আরও কয়েক ধাপ উপরে উঠে গিয়ে চরম মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ইউরিপিডিস প্রতিহিংসাপরায়ণা মিডিয়ার সেই ছবিটা আঁকলেন। সে কি ভীষণ মূর্ত্তি! নারীত্ব এবং মাতৃত্বকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে মিডিয়া এক ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর সাজে সজ্জিত হয়ে বিশ্বাসঘাতক স্বামী জেসনের বুকে নিষ্ঠুরতম আঘাত হানবার জন্য উন্মাদিনী হয়েছেন। কি বীভৎস নাটকীয় পরিণতি! কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব হতে পারে? তখন কোরাস বলছেন :

"Thy guiltless children wilt thou slay"
Medea :—"My husband hence more deeply shall I wound"

মিডিয়া তাঁর সন্তানগুলিকে হত্যা করে ফেললেন। এই হ'ল গল্পের সারাংশ। শেষের দিকে অবশ্য নাট্যকার অলৌকিকত্বের আশ্রয় নিয়েছেন।

গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিন জন নাট্যকার এবং তাঁদের প্রধান প্রধান নাটকগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল। যে কয়খানি নাটকের কথা উল্লেখ করা হ'ল তা ছাড়াও তাঁদের রচিত আরও অনেক বিখ্যাত নাটক আছে। এখন সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

গ্রীক নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে গিয়ে এক জন ইংরেজ সমালোচক বলেছেন :

"The Hindu dramas on the other hand, **while** superior to the Chinese in literary merit, have **far less** claim to rank as indigenous creations. **None of them** belong to an earlier date than the first century **before** Christ. But long before that period the Hindus **had** been brought into contact with the influences **of Greek** civilisation by means of Hellenic dynasties established in the North-Western districts of India . In confirmation of this view it has been pointed out by **recent** scholars that the most ancient of the Indian **plays** contain various features which are not strictly **oriental,** but recall the characteristics of the Greek theatre."

ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দী হ'ল হোমারের আবির্ভাবকাল এবং এরপর তিন শতাব্দীর মধ্যে প্রায় তিন-চার শ' বছর পরে গ্রীসে নাটকের উৎপত্তি। তা হলে আজ হতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসে নাটকের উদ্ভব হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আড়াই হাজার বছর আগে হিন্দুদের নাটক ছিল কিনা। উক্ত সমালোচক বলেছেন, প্রাচীনতম ভারতীয় নাটকও গ্রীক নাটকের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু সেই নাটকখানির নাম তিনি করেন নি। ভারতের ইতিহাসে গ্রীক-সভ্যতার প্রভাব কোন্ সময়ে বিশেষ ভাবে পড়েছিল? এটা জানা কথা যে, আলেকজাণ্ডার খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে হিন্দুকুশ অতিক্রম করে সসৈন্যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেই সময়েই গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাময়িক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারটি তো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। এর সঙ্গে সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? কোন জাতির পক্ষে অপর এক জাতির মনোজগৎ জয় করে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করা ত দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রীক নাটকের গঠনকৌশল এবং ভাব-ধর্ম্মের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের কোন সাদৃশ্য নেই। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব-কাল আমরা যদি দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে ধরি তা হলেও তাঁর আগে আমরা মহাকবি ভাসের নাটক পাই। স্বয়ং কালিদাস তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে বলেছেন :

"প্রথিতযশসাং ধাবক সৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমান-কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কথং বহুমানঃ?"

তা হলে একথা সুনিশ্চিত যে, কালিদাসের পূর্বে নাট্যকার ছিলেন এবং তাঁরা বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হতেন। গ্রীক নাট্যসাহিত্য বিয়োগান্ত নাটক এবং দেশ, স্থান ও ক্রিয়ার ঐক্যের জন্য বিখ্যাত। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে কোন বিয়োগান্ত নাটক আছে কি? রঙ্গমঞ্চের উপর বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা করা আর্য-শিল্পীরা নিম্ন শ্রেণীর আর্ট বলে মনে করতেন। স্থান কালের ঐক্যও তাঁরা স্বীকার করেন নি। ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গ্রীক নাটকে অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক, দৃশ্য বা পট-পরিবর্তনের কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায়, কোরাসই দর্শকদের ঐগুলি ইঙ্গিতে বলে দিত। কিন্তু সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে—যেমন ধরা যাক ভাসের স্বপ্ন-বাসবদত্তা বা কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ প্রভৃতি নাটকে অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক প্রভৃতির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সাহিত্য-দর্পণে দেখতে পাওয়া যায়, কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য কাকে বলে? উত্তরে বলা হ'ল—দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম অর্থাৎ যা অভিনীত হয়। যে সকল কাব্যকে অভিনয় করা হয় তার একটা সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হ'ল রূপক। এই রূপক আবার দশ রকমের, যথা—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন ইত্যাদি। নাটিকাও অনেক প্রকারের। তাদের নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তা ছাড়া প্রস্তাবনা, পূর্ব-রঙ্গ, নান্দী, বীজ, বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার, বিন্দু, পতাকা, ভরতবাক্য প্রভৃতি যে সকল নাট্যকীয় সংজ্ঞার সহিত আমরা পরিচিত সেগুলি গ্রীসদেশ হতে ভারতে এল কি করে? সেগুলি তো ভারতের নিজস্ব সম্পদ। যে দেশে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির মত গ্রন্থ রচিত হতে পারে, সে দেশের লেখকেরা গ্রীস দেশ হতে নাট্যরচনা-প্রণালী শিখে আসবেন একথা কি করে মেনে নেওয়া যায়?

ভাবধর্মের দিক থেকে বিচার করলেও দুই দেশের নাটকের মধ্যে কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রীক নাট্যকারেরা যেমন হোমারের মহাকাব্য এবং প্রাচীন গ্রীসের পুরাণ ও ইতিহাস হতে নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি সংস্কৃত নাট্যকারেরাও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ উপপুরাণ হতে নাটকীয় চরিত্র আহরণ করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত নাটকে যেমন নর-নারীর পরস্পরের প্রতি চিরন্তন আকর্ষণ, তাদের মধুর প্রেম, মান, অভিমান এবং অসংখ্য স্নেহ-প্রীতির সুমধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেরকম একটা চিত্র গ্রীক নাটকগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। একটা নীরস, কর্কশ, ভীতিপূর্ণ ভাব যেন সমগ্র গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের মজ্জায় মজ্জায় বিজড়িত রয়েছে। গ্রীকরা জীবনকে অত্যন্ত দুঃখময় বলে মনে করত এবং মানুষ যে কত দুর্বল এবং সে যে এক অদৃশ্য, অলঙ্ঘনীয় নিয়তির দ্বারা সর্বদা পরিচালিত হচ্ছে একথা তারা বর্ণে বর্ণে সত্য বলে মনে করত। ফলে তারা আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে অত্যন্ত দুঃখবাদী হয়ে পড়েছিল। 'ওরাকল,' 'সুথ-সেয়ার' প্রভৃতিকে তারা অত্যন্ত বিশ্বাস করত এবং আমরা দেখেছি যে বহু গ্রীক নাটকের চরম মুহূর্ত ওরাকল প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। জীবন সম্বন্ধে গ্রীকদের কিরূপ ধারণা ছিল তা দেখা যাক। সফোক্লিসের মত মনীষী বলছেন :

"It is best not to be born and that after birth the next best by far is that a man with all speed should go to the place from where he came."

ইউরিপিডিস ওরাকল ও 'সুথ-সেয়ারে'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলছেন :

"False and worthless are the utterances of sooth-sayers, nor is wisdom to be found in places of fire or in the voices of the feathered tribe, . . . and let us pay no heed to oracles. Wisdom and prudence are the wisest sooth-sayers."

মানব-জীবন সম্বন্ধে ইউরিপিডিসেরই বা কিরূপ ধারণা তাও দেখা যাক। তাঁর কথায় :

"Life is but a calamity, it is better for a man never to have been born."

তিনি আরও বলছেন :

"We should weep when a man is born into the world because of the sorrows that await him, but when he dies and rests from his labours, we should bear him forth to burial with joy and gladness."

সংস্কৃত কোন নাটকে এ রকম উক্তি দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল উক্তি হতে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, গ্রীকেরা জীবনের মধ্যে দুঃখ ছাড়া আনন্দের সন্ধান একরকম পায়ই নি। পাপ আর মৃত্যুভয় তাদের অত্যন্ত বিচলিত করে রেখেছিল। তাই সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে বলতে হয় যে, দুই দেশের সংস্কার, মনোবৃত্তি, চিন্তাধারা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এবং কোন দিক থেকেই গ্রীক নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের তুলনা হতে পারে না।

পবনদেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কন্যাকে বলি দেওয়ার ফলে প্রতিহিংসাপরায়ণা স্ত্রীর প্রণয়ীর সাহায্যে স্বামীকে হত্যা; পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মাতৃহত্যা; বাল্যকালে পিতৃরাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, পরে পিতৃরাজ্য আক্রমণান্তে অজ্ঞাতসারে পিতাকে হত্যা ও নিজ মাতাকে বিবাহ করে তারই গর্ভে সন্তানোৎপাদন করা অথবা স্বামীকে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত দেখে নিজ সন্তানদের হত্যা করে স্বামীর অন্তরে নির্মম আঘাত হানার যে সকল চিত্তবিক্ষেপ-কারী চিত্র গ্রীক নাটকে আমরা পাই, তা ভাস-কালিদাস-ভবভূতি তো দূরের কথা, সংস্কৃত কোন নাটকেই দেখা যায় কিনা সন্দেহ। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ঐ চিত্রগুলি যত মূল্যবানই হোক না কেন, মানবতার দিক থেকে বিচার করলে এগুলি অতি বীভৎস এবং ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কালিদাস বা ভবভূতি স্বপ্নেও হয়ত ওদের কল্পনা করতে পারতেন না।

হিন্দুদের নাট্য-সাহিত্য অপর কোন দেশ হতে ধার-করা সামগ্রী নয়—এটি তাদের একেবারে নিজস্ব, সুদীর্ঘকালের সাধনার ফল। এ কথা সত্য যে, গ্রীক নাট্যকারেরাই জগতে বিয়োগান্ত নাটক রচনার পথ দেখিয়ে গেছেন, কিন্তু তাই বলে সংস্কৃত নাট্যকারেরাও যে তাঁদের অনুসরণ করে নাটক লিখেছেন বা নাটক-রচনা ব্যাপারে তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন তা কিরূপে বলা যায়? আমাদের সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ভারতের বাইরে পড়ে নি। তার প্রধান কারণ এই যে, ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। উপরন্তু প্রাচীন ভারতীয় নাটক যে গ্রীক নাটক দ্বারা প্রভাবিত সেকথা মনে করবার কোন কারণ নেই।

মুহূর্ত

শ্রীতরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

ওরা এসে বসল, সত্য ও শিপা। শহর ছেড়ে এগিয়ে এসে, নদীর তটভূমির ওপর ওরা এসে বসল—কাছাকাছি, মুখোমুখি। দিগন্তে সূর্যাস্তের রাঙা রশ্মির প্রতিফলন ওদের মুখে চোখে। নদীর জলেও বিক্ষিপ্ত সোনালী আভা। ওগুলো ভেঙে ভেঙে দিল জলের ঢেউ। ওরা ঢেউগুলো গুনল—কথা না বলে, মৌন মূক ভাবে। নীরবে বহুক্ষণ বসে রইল ওরা দু'জনে।

'সত্যদা, কতদিন পরে দেখা আমাদের?'

শিপা প্রথমে কথা বলল। পরস্পরের সান্নিধ্যের অনুভূতি হারিয়ে যেতে বসেছিল যেন, কথা কয়ে নাড়া দিল শিপা। চোখ দুটো ওর আবেগে ম্লান। অতীত থেকে বর্তমানে এক এক ধাপ করে এগিয়ে এল শিপা ভাবল অনেক কথা। অতীত স্মৃতির প্রতিবিম্ব খুঁজল সত্যর মুখে। মুখখানি আর অপরিণত নয়, জ্র দুটো চঞ্চল নয়, তার পরিবর্তে নেমে এসেছে মুখে গম্ভীর সৌম্যভাব, সেই দীর্ঘ ঋজু দেহ। পরস্পরের পলকহীন দৃষ্টি মিশে রইল। সত্য ধীরে ধীরে উত্তর দিল,

'বছর সাতেক। কিন্তু তুমি কি করে চিনলে আমায়?'

সত্য হাসল, শিপাও যোগ দিল। সেই শিপা, তার অতীতের উদ্দীপ্ত যৌবনের শিপা। বয়সের ছাপ এখন শরীরে। বেশী নয়, বছর সাতেক এগিয়ে গেছে, পিছিয়ে পড়েছে যৌবনের সন্ধিক্ষণ থেকে ঐ ক'টা বছর। কিন্তু চোখ দুটো তেমনই দীঘল কালো, নিটোল মুখ, পাতলা ঠোঁটে সেই হাসি, যে হাসি সে হাসত সাত বছর আগে। সত্যর প্রশ্নে চাপা হাসি খেলে গেল শিপার মুখে, ধীরে ধীরে সে বলল, "তোমার হাঁটা দেখে চিনলাম। অত বড় লম্বা শরীর নিয়ে ক্যাঙ্গারুর মত লাফাতে লাফাতে হাঁটবে কে, তুমি ছাড়া?"

ঠিক আগের মত কৌতুকোজ্জ্বল চোখদুটো নেচে উঠল। অতিপরিচিত বিশেষণটা অতীতের অনেক অস্পষ্ট আবরণ সরিয়ে দিল। আর এক বিস্মৃতপ্রায় মধুর শিহরণের দোলা লাগল যুগপৎ ওদের দেহে মনে। সাত বছর আগের অবিস্মরণীয় স্মৃতিকে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে শিপা ফুটপাথে কিছুক্ষণ আগে।

'সত্যদা',—পথ চলতে চলতে আন্দাজে হঠাৎ ডাক দিয়েছিল। আশ্চর্য, দীর্ঘকায় লোকটা ফিরে দাঁড়িয়েছিল এক ডাকেই। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারার বিস্ময় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সত্য। তার পর অতীতের নিবিড় দিনগুলোর স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে ওরা এসে বসল নদীর ধারে তটভূমির উপর। কথা কইল কম, ভাবল বেশী।

ওদের মৌন চিন্তা পরিব্যাপ্ত হল জল-স্থল অতিক্রম করে দিগন্তের বিলীয়মান দিনের আলোর শেষে। অন্ধকার নেমে এল কৃষ্ণপক্ষের তারাগুলো চিক্ চিক্ করে উঠল জলে। আশ্চর্য ঐ তারাগুলো প্রসন্ন হাসিতে যোগ দিল আজ ওদের যুগ্ম মিলনে। কিন্তু এগুলোই এক দিন দীঘির গভীর কালো জলের মধ্যে ভেসে উঠে তিরস্কার করেছিল দুটি হৃদয়কে, সেদিন ওরা সঙ্কল্প করে এসেছিল দু'জনে ডুববে বলে, ডুবে মরবে বলে। ওরা পাবে পরস্পরকে মৃত্যুর ওপারে, যেখানে সমাজ-সংসারের বিধিনিষেধ নেই—স্বাধীন মুক্ত সবাই।

জীবনে যখন নূতনের স্পন্দন আসে, বসন্তের হিল্লোল যখন দেহের শিরা-উপশিরায় রোমাঞ্চ আনে, তখন মানুষ খোঁজে নিজেকে অন্যের চোখে। ঠিক নিজেকে নয়, নিজের রূপকে। আপনাকে সাজায় রূপে, রসে, মুখটা টস টস করে সলজ্জ আরক্তিম আভায়, নিজেকে তখন সুন্দর লাগে অন্যের দৃষ্টিতে। কলেজ-জীবনের এই উচ্ছল সন্ধিক্ষণে হয় তাদের পরিচয়। নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে ওঠে ওরা, দু'জনে এগিয়ে যায় বাস্তব থেকে কল্পনার রঙীন রাজ্যে, যেখানে তৃপ্তির শেষ নেই, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নেই।

বছর দুয়েক কাটল বেশ। বছর দুয়েক ত নয়, যেন জীবনের দুটি প্রচ্ছদপটের দুখানি অপূর্ব অমূল্য চিত্রপট। শিপাদের স্থানান্তরে যাবার তাগিদ এল হঠাৎ। ছাড়াছাড়ি হবার আগে, ব্যক্ত করে ফেলেছিল ওরা মনের ভাব ওদের বাপ মায়ের কাছে। সমর্থন পেল না ওরা অসবর্ণ বলে। তার পর ওদের দু'টি বিক্ষুব্ধ হৃদয় মিলতে গিয়েছিল ও জগতে—হাত-ধরাধরি করে এসে দাঁড়িয়েছিল দীঘির ধারে সে রাত্রেই। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি এসে ওরা চিনল মৃত্যুকে,

মৃত্যুর বিভীষিকাকে। দীঘির কালো জলে সহস্র সরীসৃপের মত কি সব কিল্‌বিল্‌ করছিল। ওরা পিছিয়ে এসেছিল আতঙ্কে, পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরেছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পরস্পরকে— ওদের মিলন হবে অবিচ্ছেদ্য, ওরা স্বাবলম্বী হবে, প্রতীক্ষা করবে পরস্পরের।··· খিদিরপুর চলে গেল তার পর।

দীর্ঘ সাত বছর পর আজ আবার ওরা নিভৃতে নির্জনে এসে বসল ওদের জীবন-নদীর তটভূমিতে। খুঁজল অতীতের প্রতিটি দিনের, প্রতিটি পলের ইতিহাস। দুটি সমান্তরাল পথরেখা দুর্নিবার বেগে ছুটে চলেছিল প্রকৃতির শস্যশ্যামল উজ্জ্বল দৃশ্যকে পাশে রেখে। হঠাৎ দিগভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত হ'ল তারা, নিক্ষিপ্ত হ'ল রূঢ় কঠিন বাস্তবের মরুভূমির উপর। অতীতের মধুর স্মৃতি হয়ে এল ম্লান, মুছে যেতে বসল। জীবনের দীর্ঘ ব্যবধানের পর হঠাৎ পথ-দুটো এগিয়ে এসে দাঁড়াল মুখোমুখি, দাঁড়াল সত্য ও শিপ্রা— আকস্মিক দুর্ঘটনার মত। অবাক হ'ল, চিনল পরস্পরকে।

দিনের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—দুটি ছায়ামূর্তি যেন আবছা দেখা যায় নদীর ধারে।

'কি ভাবছ ?'

সত্যর প্রশ্নে শিপ্রার চমক ভাঙল। চতুর্দিক ঘন অন্ধকার, পাশে অস্পষ্ট দেখল সত্যকে শিপ্রা, ওর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত মনে হ'ল, রোমাঞ্চিত হ'ল সর্বশরীর।

"দীঘির ধারে আর একটি রাত্রের কথা মনে পড়ছে, তোমার ?"

উৎসুক হয়ে মুখটা উঁচু করে ধরল শিপ্রা।

"ঠিক তাই। আরও মনে পড়ছে সেই প্রতিশ্রুতি।"

সত্য সমর্থন জানাল। নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। শেষের কথাগুলো প্রতিধ্বনির মত কানে লেগে রইল দু'জনেরই। ওরা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ভাবতে ভয় হ'ল, জানতে সাহস হ'ল না, ওদের দীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যেকার ইতিহাস। ওর মধ্যে হয়ত বিলীন হয়ে গেছে সেই প্রতিশ্রুতি। এই মুহূর্তে হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে, নিষ্পিষ্ট হয়ে যাবে এখনই সাত বছরের অজানা ইতিহাসের উদ্ঘাটনে। সত্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে শিপ্রার জীবনের কোন পরিবর্তন। কিন্তু ওর পক্ষ অবিকম্প চোলের দিক দিয়ে অন্তের হয়ে-যাওয়ার কোন সঙ্কেত বোঝা যায় নি। হয়ত প্রতিশ্রুতি রেখেছে শিপ্রা। প্রতিশ্রুত দীর্ঘ প্রতীক্ষার জীবনের এক এক বিন্দু পীযূষ নিঃশেষ করেছে সাতটি বছর ধরে। তবু অন্যের হয়ে যায় নি বা হতে পারে নি।

বহুক্ষণের মৌন ভঙ্গ করে হঠাৎ বলল সত্য···বলার জন্য নয়, একটু একটু করে সাত বছরের রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য। খুব সন্তর্পণে, সসঙ্কোচে কথাগুলি বলল, "এখন কি করছ ?"

"মাষ্টারি—," সংক্ষিপ্ত হাসল শিপ্রা। "তুমি ?"

"কেরানীগিরি।"

সত্য থেমে গেল, আর কি বলবে ভেবে। একটু পরে যেন অন্ধকারে হাত বাড়াল সে, খুব সাবধানে বলে গেল।

"আর কি খবর ? বাড়ীর ?"

"বাড়ী ?"

অদ্ভুতভাবে হাসল শিখা। হাসিটা শোনাল কাকে যেন ভর্ৎসনা করার মত।

"কেউ নেই। একান্ত নিজের বলে কেউ কি কোনদিন ছিল ? আমি চিরদিন একা, একেবারে নিঃসঙ্গ।"

গলার স্বরটা যেন বেধে যাবার উপক্রম হ'ল শিখার।

"বিয়ে কর নি ?"

সত্য যেন এক দৌড়ে অন্ধকার ভেদ করতে চাইল।

"একা মানুষের আবার বিয়ে—।"

শ্লেষোক্তি করল শিপ্রা। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। অধীর, উদ্‌গ্রীব কয়েকটা মুহূর্ত সত্যর কেটে গেল। হঠাৎ অনর্গল বলতে সুরু করে দিল শিপ্রা।

"বিয়ে করার সার্থকতা কি ? শুধু বিশ্বজোড়া রোগ-ভোগ, দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় পেতে নেওয়া, তারই তলায় জীবনের অমূল্য মুহূর্তগুলো তিলে তিলে পিষে মারা। হয়ত অক্ষম পঙ্গু স্বামীর হাতে সঁপে দিতে হবে নিজেকে। রুদ্ধ কক্ষে বসে স্বামীর পরিচর্যা করে কাটিয়ে দিতে হবে জীবনের অপূর্ব দিনগুলো। এরই পুনরাবৃত্তি ঘরে ঘরে। কেউ রোগে, কেউ অনাহারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে—সংগ্রাম করে চলেছে অবিরত নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।"

হঠাৎ থেমে গেল শিপ্রা। ওর কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত শোনাল। সত্য অন্ধকারে ওর হাওয়ায়-ওড়া অস্পষ্ট চুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হ'ল ওকে, যেন হঠাৎ ঘা-লাগা দিগভ্রষ্ট পাল-ছেঁড়া নৌকো। আর কোন প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হ'ল, কেমন বাধ-বাধ ঠেকল ওর সান্নিধ্য। হয়ত ও প্রতিশ্রুতি রেখেছে, একাই আছে

কিন্তু সত্যর বিষয় কি ভাবল শিপ্রা ?

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল শিপ্রার। হৃদয়ের অবরুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়া পেয়ে মিশে গেল রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে। শিপ্রা কয়েকটা কথা প্রায় ফিস ফিস করে বলল :

"তোমার কথা কিছু বলবে না ?"

শিপ্রা আরও একটু কাছে এগিয়ে এল, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। ওর যেন কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই সত্যর বিষয়ে। ওরা পুরুষ— পরাধীন নয়

"আমার কথা শুধু হবে তোমার কথারই প্রতিধ্বনি, তাই বলার বিশেষ কিছু নেই।"

একটু হেসে আরও বলতে আরম্ভ করে সত্য।

"আমিও যদি বলি বিয়ে করার সফলতা কোথায়, যদি মনের মত জীবন-সঙ্গিনী না পাওয়া যায় ? আর সত্যিই, ক'জনই বা পায় ? হয়ত ভাগ্যে উঠে আসবে এক অতি কলহপরায়ণা স্বার্থপর স্ত্রী। স্বামীর অবস্থা সে কোনদিন বুঝবে না। জীবন-সংগ্রামে

সে ডুবিয়ে দেবে আরও তার স্বামীকে, সন্তানসন্ততিকে। রোগে ভুগবে শিশুরা। চিকিৎসা করার বা পথ্য দেবার সামর্থ্য থাকবে না—শুধু সামর্থ্য থাকবে একটার পর একটাকে মৃত্যুর দ্বারে অসীম ধৈর্য্য সহকারে এগিয়ে দেবার—"

"চুপ কর, চুপ কর—।"

আর্ত্তনাদ করে সত্যর মুখটা চেপে ধরল শিখা। অসহ্য লাগল কথাগুলো।

এবার তারা আরও নিবিড় হয়ে বসল। দুটি বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের মিল আছে যেন কোথায়—জীবন সম্বন্ধে একই ধারণার হয় ত মিল আছে ওদের। একটা হাল্কা স্বস্তির ভাব নিয়ে চুপ করে বসে রইল ওরা দুজনে। নদীর জলে ওদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ হঠাৎ উঁকি দিয়ে উঠল, উদ্ভাসিত করে দিল বিশ্ব-প্রকৃতি। নদীর জলে, চাঁদের আলোয় ওরা ছায়া দেখল নিজেদের। জলের ঢেউ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে এক করে দিল দুটি ছায়া-মূর্ত্তিকে—দুটি হৃদয়কেও, সত্য ও শিখার।

এক সময় ওরা উঠে দাঁড়াল, তখন নিশীথ রাত্রি। নদী ছেড়ে এগিয়ে এল নিঃশব্দে, হাতে হাত রেখে। শহর তখন জনহীন, নিস্তব্ধ নিঝুম। ওরা একবার তাকাল পরস্পরের দিকে। ওদের চোখ দুটো মুখর হয়ে উঠতে চাইল—কণ্ঠের ভাষা অবরুদ্ধ বলে। তারপর দুটো বিপরীত পথ ধরে হন্‌হন্ করে হেঁটে চলে গেল ওরা।

ক্রমশঃ দ্রুততর হয়ে উঠল গতি ওদের দু'জনের একই সঙ্গে, বিভিন্ন পথে।

শিখা জোরে পা চালিয়ে দিল—পঙ্গু স্বামী ওর অভুক্ত পড়ে আছে এখনো অধীরভাবে, শিখার আগমন-প্রতীক্ষায়।

সত্যও জোরে জোরে পা চালিয়ে দিল—রুগ্ন খোকার বার্লির প্যাকেটটা পকেট ছুঁয়ে দেখে নিল। পরক্ষণেই শিউরে উঠল ওর সর্ব্বশরীর, স্ত্রীর রুদ্রমূর্ত্তি স্মরণ করে।

বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে দু'জনেরই।

শুধু পিছনে পড়ে রইল ওদের নদীর ধারের কয়েকটা মুহূর্ত্ত, যখন ওরা এক হয়েছিল।

সুদূর বান্ধবী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তুমি যে আমার প্রপিতামহের
বৃদ্ধ-প্রপিতামহী,
দাও বর দেবি,—আমি তোমাদের,
প্রণয়কাহিনী কহি।
অনেক দিনের কথা,
ক্ষমিয়ো প্রগল্‌ভতা,
আমি দেখিয়াছি তোমাদের প্রেম
ফুলছবি হয়ে রহি'।

যে 'বাটা'য় তুমি সাজিয়াছ পান
গৃহেতে রয়েছে আজও,
সে 'বাটারি' পান আমি যে চিবাই
তুমি কি দাঁড়ায়ে আছ ?
অধরে মধুর হাসি,'
সরে এস ভালবাসি,'
আমার প্রিয়ার হাতে হাত দিয়া
মোর লাগি পান সাজো।

৩

রয়েছে তোমার আতর-দানীটি
তোমারে কেমনে ভুলি' ?
সোহাগ-পরশ দিল তারে তব,
চম্পক অঙ্গুলি।
তোমার নীলাম্বরী—
কুসুমে ফুলে ছিল ভরি',
সৌরভে তার আসিত নিকটে
ভোমরা ও বুলবুলি।

নাসায় 'বেশর', সীমন্তে সিঁথি,
মুক্তাবলির তাহে,
মিহি কাশ্মীরী শাল যে শোভিত
গরবিনী তব গায়ে।
কটিতে চন্দ্রহার—
কি বাহার ছিল তার,
অশোক ফুটায়ে চলে যেতে তুমি
পাঁইজোর মল্ পায়ে।

৫

চারু কর্ণেতে শিরীষ শোভিত
অলকেতে কুরুবক,
লোধ্ররেণুতে যক্ষবধূ কি
সাজিতে হইত সখ ?
নয়নে কাজল দিতে,
হাসে মেঘে বিজলিতে,
ময়ূরকণ্ঠী কাঁচুলি করিত
আলোকেতে ঝকমক্ !

৬

আলতা-রাঙানো পদে কাদাপথে—
যেতে যবে সরসীতে,
প্রিয় ননদীকে হয় ত বলিতে
হাসি' কোলে তুলে নিতে।
সে রসিকতার ধারা,
এখনো হয় নি হারা,
অমর হয়েছে, বাদল বাতাসে,
গ্রামের রীতে ও গীতে।

৭

চঞ্চল তব চাহনির দাম—
ছিল নাকো বড় কম,
ঘুরি' বার বার নিকটে আসিত,
স্বামী তব প্রিয়তম।
লভিতে মনের মত,
উপঢৌকন কত—
আজিও জড়োয়া ফুল-ঝুমকা যে
হয়ে আছে অনুপম।

৮

কলসী কক্ষে সলিল আনিতে
সন্দেহ নাই তিল,
কুম্ভে করিত স্বর্ণকুম্ভ,
নভের সোনালী নীল।
পড়া মেহগনি কাঠে।
তোমার সখের ঘাটে—
আমরাও বসি, তোমার সঙ্গে
সখীর রয়েছে মিল।

৯

সে জাঁতি রয়েছে, বিবাহে যা ছিল
তোমার বরের করে,
তোমার হাতের কাজল-লতা ত
দেখিতে পাই না ঘরে ?
তোমার বরণ-থালা—
ভাণ্ডার করে আলা,
তব হেমহারে কস্ লেগে আছে
সোনা রঙ ঝরে পড়ে।

১০

কপোত হইয়া কোলে উঠিয়াছি,
স্বর্গ-শিশু হয়ে মনে,
শিখী হয়ে তব সুমুখে নেচেছি
কঙ্কণ নিক্বণে।
ছিনু আমি দিবানিশি
তব লাবণ্যে মিশি,
এসেছি তোমার সোনার স্বপনে—
শুভ শঙ্খস্বনে।

১১

মুগ্ধা চকোরী, সুদূর সুধার—
লভিয়াছ আস্বাদ,
কিরণ ধরিয়া চন্দ্রলোকেতে
চাওয়াই তোমার সাধ।
হৃদি-দর্পণ 'পরে
হেরিতে বংশধরে।
তোমার মনের কামনা যে আমি—
অনাগত আহ্লাদ।

১২

হয় নাই দেখা তোমার লাগিয়া
উড়ু উড়ু করে মন,
সুরলোক হতে লহগো আমার
বেতার নিমন্ত্রণ।
তোমার চিবুকখানি,
প্রেয়সীকে দাও আনি,
দাও বুকভরা আশীর্ব্বাদ আর
মুখভরা চুম্বন।

গাথার দেশ উড়িষ্যা

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

বাংলার মত উড়িষ্যাও কৃষিপ্রধান দেশ। সেখানকার অধিবাসীরা চাষবাস করে, গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে এবং অবসর সময়ে তারা গায় অসীম আগ্রহে নিজেদেরই রচিত গান। অপূর্ব্ব পুলকের সঙ্গে উপভোগ করতে থাকে উড়িষ্যার লোককবির অন্তর-নিষিক্ত সুধা দিয়ে রচিত লোকগাথা ও গান।

উড়িষ্যার লোক-সঙ্গীতে ধর্ম্মভাবই বেশী। তাই এর ধর্ম্ম-ঘেঁষা গানগুলি যতটা পরিস্ফুট হবার অবকাশ পেয়েছে, এ বিষয়ে লোক-কবিরা যতটা সত্যিকারের কবি-আখ্যা পেয়েছে সাধারণ গানে তা পায় নি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ কর উচিত উড়িষ্যার বিখ্যাত সাইযাত্রার কথা।

সাইযাত্রা মূলতঃ শিববিষয়ক। শিববন্দনা, তাঁর মাহাত্ম্য, লীলাপ্রসঙ্গই প্রধানতঃ এর মূল উপজীব্য। তবে এর ভিতর সময় সময় অন্য ধরণের কিছু কিছু গান যে একেবারে থাকে না একথা ঠিক নয়।

মনে করুন সাইযাত্রার আসর বসেছে। অধিকারী মশাই ঐকতান বাদনের পর (সম্প্রতি এ কাজে ঢোল, কাঁসি, বাঁশীর পরিবর্ত্তে কনসার্ট পার্টির কিছু কিছু আমদানী দেখা যায়) সুরু করলেন শিববন্দনা গাইতে :

"দিব্য কুণ্ডল, হারন উজ্জ্বল, মস্তক কজ্জল লোলিতম,
গাঢ় কুণ্ডল, নেত্র উজ্জ্বল, চন্দ্র শীতল হাসিত।
হস্ত নির্ম্মল, দণ্ড ত্রিশূল, ভালে কমল ধারিতম্।
হে শিবাপতে, পার্ব্বতীপতে, ত্রাহিমা ভবসাগর॥
চন্দ্ররূপিণী, বিশ্বমোহিনী
সর্ব্বক্ষেত্রেণী শোভিতম্।
হে দেহধারিণী, বিশ্ববাসিনী
রূপ কামিনী শোভিত।
দেহ কামিনী, নাগ পদ্মিনী
সব্ব সুর মুনি শোভিতম্॥
চন্দ্রকর্পূর, রূপ ভাস্বর
পাদে নূপুর গঞ্জিতম্।
চন্দ্র ভাস্কর, কান্তি প্রভাকর—
কর্ম্মকেশর সূচিতম্।
ভূত খেচর, সিংহ শার্দ্দূল
প্রেতভূষণ, ভূষিতম্॥
পদ্মলোচন, নন্দিবাহন
শেষভূষণ ভূষিতম্।
ভস্মলেপন, চর্ম্মধারণ
শক্তিধারণ, প্রাচীতম্!
পঞ্চ আনন, কাম মর্দ্দন
যোগসাধন সাধিতম্॥
দেব কিন্নর, দেব গোচর
ভূধরাধর ভূষিতম্।
আদি গোচর অনকাধর
মন্ত্র সাধনে সাধিতম্।
ত্রাহিমা শিব, ত্রাহিমা শিব
ত্রাহিমা হর ত্রাণিতম্॥
হে শিবাপতে, পার্ব্বতীপতে
ত্রাহিমা ভবসাগর।"

পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সাইযাত্রার পদগুলি অনেকটা পুথিঘেঁষা, ব্যাকরণ বোধ, অলঙ্কার শাস্ত্রেও এদের যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় মেলে। কারণ স্বরূপ বলা চলে, সাইযাত্রার অধিকারিগণ সাধারণতঃ স্বল্পশিক্ষিত বিধায় তাদের গান খাঁটি পল্লীগীতির মত একটা ঘরোয়া অসংস্কৃত নয়। এদিক থেকে উড়িষ্যার পটুয়া যাত্রাকে কিন্তু ধরা যায় খাঁটি লোকসঙ্গীত বলে।

পটুয়াযাত্রা বাংলার পটুয়াদের পটখেলা দেখাবার মতনই অনেকটা। পার্থক্যের মধ্যে বাংলার পটুয়াদের একাকী বা দ্বৈত ভাবে পট দেখিয়ে গান গাইতে শোনা যায়, কিন্তু উড়িষ্যার পটের কোন বালাই নেই, পরিবর্ত্তে তারা গুটিকতক ছোকরাকে রাধা-কৃষ্ণ, বৃন্দাদূতী, সুবলসখা সাজিয়ে নিয়ে আসে, তাদের দিয়েই গান গাওয়ায়, কথা বলায়, হাতমুখ নেড়ে বিচিত্র ভঙ্গীমায় রামায়ণ, মহাভারত থেকে আধুনিকতম গান গাইয়ে পল্লীবাসীদের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করে। কাজেই মনে করা চলে উড়িষ্যার শান্ত পল্লীর মাঝে হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয় এই পটুয়াযাত্রার দল। স্থানীয় অধিবাসীদের অনুরোধে তারা নৃত্য-গীত ও সামান্য অভিনয় মারফত দেখাতে সুরু করে রাধাকৃষ্ণের মিলনের প্রসঙ্গে কি ভাবে ললিতাসখী আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধিকাসুন্দরীকে নন্দের নন্দন কৃষ্ণতপোধনের প্রতি অনুরক্ত করবার চেষ্টা পাচ্ছে।

সুরু হয় ললিতা ও রাধার কথোপকথন। এর মূল কথা হ'ল রাধিকা প্রশ্ন করছে, জগতে এত নারী থাকতে সে কেন আমার প্রতি এতটা অনুরক্ত?

ললিতা বুঝিয়ে বলছে, 'ঘট বুকেই ফুল পরে', অর্থাৎ সুন্দর ফুল, গাছপালা, সুমিষ্ট ফলের প্রতিই ত সকলের লোভ, এই ত দুনিয়ার রীতি। এতে আশ্চর্য্যের কি আছে?

"রাধা। কি নাম বইলু তুইগো ললিতে
কি নাম বইলু তুই?
ললিতা। পুনি শুনিবারু চিত্তবইল্যাকি
কৃষ্ণ বিনিখিনি কহি।
রাধা। বয়সে কেতে ঠাকুরগো ললিতে
বয়স কেতে ঠাকুর।
ললিতা। নবতরনীয়া অবস্থা
বয়স হইথিবা বার-তের।
রাধা। এহি গোপরে কি বাসগো ললিতে
এহি গোপরে কি বাস?

ললিতা। অঙ্ক অট্টালিকা আড়হিলে দিশুচি
তাহু সৌধ কলস।
রাধা। কেরে ভরি উচ্চ হেবেগো ললিতে
কেরে ভরি উচ্চ হেবে ?
ললিতা। তু তাহু প্রকৃতিটকুমারী
হেবু অনুমানুচি মু এবে।
রাধা। বিবাহ হইলেনি কিগো ললিতে
বিবাহ হইলেনি কি ?
ললিতা। বধূ ছন্দে হাতছন্দি হেউছুঞ্জি
যশোদা তোতে বিলোপী।
রাধা। মো আড়িকি কেতে চাড় গো ললিতে
মো আড় কেতে চাড় ?
ললিতা। যথাযোগ্য বলি মনোলোভাইল
কথাকু কাহিঁকি চড়।
রাধা। শুভুচি একি নিস্বন গো ললিতে
শুভুচি একি নিস্বন ?
ললিতা। বেণু বজাই, বনরু আসুছন্তি
সোহি ব্রোজেন্দ্রনন্দন।
রাধা। দেখিবা রহি কোঁঠারে গো ললিতে
দেখিবা রহি কোঁঠারে ?
ললিতা। হর্ম্মে আরোহ, করছেই গোপাল
ক্রুস্কু কর পৈঠারে।"

এই ত গেল সাধারণ কথা। ঋতুরাজ বসন্তের বন্দনাগীতি গাইতেও উড়িষ্যার লোককবি নেহাৎ অপটু নন্। বসন্তসমাগমে প্রকৃতিরাণী নব পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হয়ে উঠলেন। বনপ্রান্তর মুখর হয়ে উঠল কোকিলের কুহুতানে, বিরহিণীদের বুকের মাঝে হঠাৎ এত দিনে আবার দেখা দিল জ্বালা। মধুলোভে মৌমাছি উড়তে লাগল ফুলের আনাচ-কানাচ দিয়ে। সেই সুমধুর পরিবেশের মধ্যে থেকে চিরবসন্তের রাজ্য পুরীর লোককবি গেয়ে উঠলেন বসন্ত বন্দনা :

"এহা সুষমা দেখগো
দেখ পরাণ-মিত্র।
সরস্বরে পিকরা বুজে
এ ঋতুরাজ বসন্ত।
কহু কুহু পিক গাউচি
উহু হুয়ে বিরহী
পঞ্চ প্রাণরে
সে খানে হেউথিবে গো দহি।
চারি আড়ে নব সুষমা
ধরি অছি এ বন
ধরণীরাণী কি পাইচি
আজি নব যৌবন।
যৌবন কাল সুষমা
কাহিঁ নাহি উপমা
বোলে জগবন্ধু
এ শোভা দিশে কি মনোরমা।"

একথা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এ হেন পরিবেশের মধ্যে পড়ে পথ হারিয়ে ফেললেন উড়িষ্যার করদ-রাজ্যের রাজকুমারী। বনমধ্যে দেখা হয় রাজপুত্রের সঙ্গে।

পাঠকগণ একটু পশ্চাতের দিকে নজর দিয়ে কল্পনা করে নিন রাজকুমার প্রশ্ন করছে হে সুন্দরী, কেন ঘুরছ একা এ বনের ভিতর। বল সুন্দরী, কোথা থেকে এসেছ, কোথায় তোমার ঘর, চল তোমাকে দিয়ে আসি তোমার ঘরে। আমাকে বিশ্বাস কর। আমার দ্বারা আশঙ্কার কিছু নেই :

"কে তুম্ভে বরাননী গো
অটেকাহা কুমারী—
একাকিনী বনে ভ্রমিছ, কিম্পাগো সুকুমারী।
কহ কেউঁ ঠারু আসিল
কেউঁ ঠারু পু যিব
সঙ্গে নেই ছাড়ি দেবী গো
মনে না ভাব।
হে রাজকুমারী, কিম্পা ভাবিলে এপরি
ক্ষত্রিয় নন্দিনী হোই,
হেল অবিচারী!
প্রভুর কৃপার কিছে,
ওনা নাহি মোর,
গ্রহণ না করে,
কাহা ঠারু পুরস্কার।"

রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন-কথা নিয়েই রচিত হয়েছে গোটা পদাবলী সাহিত্য। প্রেমিক-প্রেমিকার মান-অভিমানের কথা নিয়েই ত রচিত হয়েছে দুনিয়ার যত কাব্য-কাহিনী, বিচ্ছেদ ও মিলন, মিলন আর বিচ্ছেদ এই নিয়েই ত জীবন। প্রতীক্ষায় বসে থেকে থেকে শ্রীরাধিকা যখন গোসাঘরে গিয়ে (পুরাকালে ধনী-গৃহিণী বা ঐ জাতীয়া নারীদের রাগ বা অভিমান হলে তাঁরা গোসাঘরে গিয়ে আশ্রয় নিতেন, একরূপে পৃথক ঘরের ব্যবস্থাও ছিল এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় পুরনো বইতে) আশ্রয় নিলেন, তখন কালাচাঁদ এসে সুরু করল সাধ্যসাধনা।

শ্রীরাধিকা ত প্রথমে আমলই দিতে চান না, নানা অজুহাত। প্রথমতঃ পতি বিদেশে, বাইরের কোন পুরুষকে ঘরে আশ্রয় দিতে পারেন না। তা ছাড়া জ্বরে তাঁর বড়ই কষ্ট হচ্ছে, পিত্ত, শ্লেষ্মা এই সব উপসর্গ দেখা দিয়েছে এই সঙ্গে। সুতরাং কি করে আর দরজা খুলে দেবেন ?

কিন্তু হলে হবে কি ? কোন যুক্তি খাটবে না ঘরপোড়ার কাছে। শ্রীরাধিকাকে সত্যই দরজা খুলে দিতে হয়েছিল, উড়িষ্যার লোককবিও অতি সংক্ষেপে এই অসহনীয় পরিবেশের সমাপ্তি ঘটাতে পেরেছিলেন—যে কথা, যে ঘটনাকে বোঝাতে বাঙালী লোককবির গানের পর গান, কথার পর কথার জাল বুনতে হয়েছে :

"কে অছি এই ঘরে, দুয়ারে হাতমারি ডাকেমু ভিতিরে,
মারি আসি ঠারু এঘর বরষা রহিবা পাইমু ভলাশকি বাসা,
নাহি মন্দবাত, কম্পে মোর গাত্র
তিন্তি তিন্তি জড় সর্ব্ব মো অঙ্গরে।

সে ভিতরে থাই বলই নাগরী
কে ডাকুছ কবাট হাতমারি
মু নব-যুবতী, দূর দেশে পতি
কলাস বসা গাই অস্ত আত্মারে ॥
বিদেশী পুরুষ বলই আয়ত্তে
এড়ে অভদ্রতা লোক নতু আছে
জিবা আসিবার সংসার বেভার
লাগি আছি এহি সভ্য অসভ্যোরে ॥
সে ভিতরে থাই বলই বিরহি
কালী চারি ধর ন পারই উঠি
দেহ মো তরতি উঠ আছি তাতি
ভ্রম আছি মাথা পিতি শেষ মারে ॥
বিদেশী পুরুষ বলই আয়ত্তে
অল্প কিছে বড় শাস্ত্র জানে আমি,
যে ঔষধি দেলে রসনিধি
পিপ্পলী ত্রিফলা মধু পরস্পরে ॥
তাহা শুনেনা কামিনী
হেলা ছিড়া ছিটাই দেলে সেই কবাট পুরা।
মাগো গলি পুন ভিতরে প্রবেশে
মূর্খ দাশরথী ভনয়ে এগীতি।"

উড়িষ্যা যে কৃষিপ্রধান দেশ একথা আগেই উল্লেখ করেছি। শুধু উড়িষ্যাই-বা কেন, যে দেশের শতকরা নব্বই জনই হ'ল পল্লীগ্রামের বাসিন্দা সেখানে তাদের গানে তাদের ঘরের কাহিনী কিছু থাকবে না এ কথা কেউই বলবেন না তা জানি। সুতরাং উড়িষ্যার লোককবির মুখ থেকে এখন শোনা যাক উড়িষ্যার কোন এক পল্লীগ্রামের এক কৃষাণ-দম্পতির মধ্যে কি ভাবে মান-অভিমানের পালা চলেছে :

"কৃষাণ। আছে বেটি থাটি আনি দেলোটিগো
তুহে ত পুরাও পেটে,
মুণ্ড খাড়, তুণ্ড মারি পর ভাণ্ডে
তুহে পাও পটে ॥
কৃষাণী। আহুকু ঘর কোনে রাখি
তুহে সাজি যেনি রঙে মাতি
নানা রঙে বুলু পাই হই সখা।
কৃষাণ। সম্পত্তিরে পতি সোহাগ বোলই
কি রঙ্গরে আন ভুলি
তুহ দরব কিনারে সরবস দেই
তুহ বসি যাও ভুলি ॥
কৃষাণী। আদরেরে কেতে রনছেনা যাচি দেই
প্রাণনাথ বলি ডাকি
ফটা কপালকু দীনস্বরে রিনা
পটা চাষী চাষী ॥
কৃষাণ। জড়িয়ে টঙ্কার খড়ি হেলা পুগা
কেনি আণ দোকানর
কড়িরে ভরি সোনা
নাহি বদন মারি দিও যাহা দূর ॥
কৃষাণী। জাছে ধুয়ারে মরিলু
ভাত রান্ধি রান্ধি
কোয়া পিল কাখে থাকি
তুহে পকাড়রে চকা পকাই
দো পখা পবন পিয় কাহিকে ॥
কৃষাণ। বড় তেণ্টা লাগে কিয়া কণ্টা করি
নিতি বড়ি আস্থ দাড়ী
অণ্টারে হাত দেই
কেতে হসগো পিন্দি বেনারসী শাড়ী ॥
কৃষাণী। আদরেরে কেতে কোড়রে বসাও
প্রীতি মধুর সখী কি
দশমাস, দশদিন দুঃখ বাড়ে
চাহি না চাহ কাহিকে ॥
কৃষাণ। সবু বিপত্তি ছিতিকি ছাতিরে পুরাই
হাতি পরি নিতি সচ
গঞ্জনাধারী, সহনে নিজে কর
টিকিয়ে না চাহ আউ ॥
কৃষাণী। রাত জাক হাত পরি বুলু পাখ
পীরিতি পতাকা টেকি,
ছাতিকি ফুলাই, হাতী গাও যেবে
টিকেও অনাও লুচি ॥
কৃষাণ। আস্থ হাড়ুবিত শরীগলে নখ
হলাই পথর পরাই হর,
কুহ মোরে বাসি মোহকু হলাই
লয়ন বুহাও মোও ॥
কৃষাণী। ভ্রমরে পরিলে পুরুষ ভ্রমরা
কি করি পারে এড়িকি।
এ মোহন চিত্ত জড়িয়ে প্রকৃতি
জড়িয়ে জীবন পাশে ॥
কৃষাণ। ধন্যগো প্রকৃতি সখ্যারাণি জাতি
যে তুহকু না চিনিছি
এ মোহন ভাড়ে তাহারি কপালে
অনুভব ন ফলিছ ॥"

সুতরাং এর পর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? এরকম অবস্থায় পড়লে বেচারীর যদি ঘর-গৃহস্থালি সামলাতে হয়, স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করতে হয় তা হলে তার পক্ষে মনের আক্ষেপে বলা সম্ভব কিনা, 'এখন দেখছি চুরি না করলে আর চলবে না' :

"চুরি ন করিলে ভাই চড়িব নাই
মুহু পিটি দেলে ধার ন মেলে কাহি।
খোজি খোজি থাকি গলি খণ্ডে চাকরী পাই,
কিলটর আদালত, প্রবেশ নারি পাই
ধর্ম্মবাপ কলিকেতে অণ্টাগুণ্ডা দেই ॥
গলি টাটা নগর, খড়গপুর
প্রিয়া উপভার মুদিবন্ধা পকাই,
ব্যবসায় চিন্ত এবে রচ মোর মুণ্ডরে,
পড়িলি পঞ্চীক পাদে
থাই চুলি মুণ্ডরে ॥
কড়ি সবু গহনা, সেদিন দেওনা

দেবাকু কেহি বিশ্বাস করন্তি নাহি ।
সবু সাবিহ সম্মান পিন্ন মারচ্ছন্তি মুণ্ডে জোতা ।
কাঁহিকি জড়ারু মোতে
ঘারে খণ্ডাইয়া যাবা
আজি তো হাতে ধরি এ সুকুমারী
পিন্ধে লুগা সাত জাগা সিলাই ।
তার পরে চাষ নিশামুক্তে এবে লাগিলা
কোঁঠিয়া পাই মুল. মোর সাহস নহিলা ।
মুকি পাপ করিলি পঙ্গু হইলি
হল করিবাকু লাজ মাডিচি খাই ।

জমিবাড়ী যাউ আছি, মোর পাঠ পড়াওরে
ফেশন পাইকেতে এ চশমা মাড়রে ।
পান বিড়ি খরচ উঠে
রিষ্টওয়াচ খণ্ডিক যে রেজী বিকাই ।
সবু বাট ছাড়ি, এবে ভিক্ষা ঝুলি ধরিবি
ভিক্ষাদাতা গোরহ পাপ সব মুণ্ডে বহিলি ।
ধরম ছাড়া মু রুডুম দুড়া
অৰ্দ্ধচন্দ্রকার দ্বার কেতে খাইবি ।"

অভাব-অভিযোগ, রোগ-ব্যাধি, হাসিকান্না এ সবই ত আমাদের সাথী। বাস্তুদেবতা দেববিগ্রহও আমাদের পরিবারবর্গের একজন। এ সবই সত্য। কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতা লাভের উদগ্র বাসনাও যে উড়িষ্যাবাসীদের ভারতের অন্য প্রদেশের কারও চেয়ে কম ছিল এ কথা মনে করাও ভুল। মহাত্মাজীর ডাকে, নেতাজীর উদাত্ত আহ্বানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত উড়িষ্যাও সমান তালে পা মিলিয়েছিল। উড়িষ্যার লোককবিও তখন তার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন :

"উঠরে উঠরে স্বোরাজ সৈনিক
আস নব রঙ্গে মাতি,
ই রাজ রাজত্ব করিবা কি লুপ্ত
আহে গজপতি জাতি ।
রাক্ষস সরকার, ক্রোধরে পাগল
পাড়িলানি আনি, তার শেষ কাল ।
দিশু নাহি কিছে, বুঝি বাই কিছে
ধরিলা মারিবা নীতি ।
কুটিপতি ঠাক, কুটির কুরষক
সভিংকে শিখাই দেইছি বিবেক
রাজা নাহি আউ দেশ অরাজক
বেপরীকি কিয়া ভিতি ।

দেড়শ বরষ কাল
জলদে মু ভাবিনা আঙ্কাকু
দুইপর পন্ড, দড় বান্ধি এঠি
কর মেলিচ্ছন্তি, কুচ্ছান্ত দিবারাতি ।
যুগকু আসিলা, যুগ অবতার
অন্নবিনা থিল দেশ হাহাকার
শুমরে যেতেক ফিট পার লাগি
জানিছু গৌরাঙ্গ প্রীতি ।
দেখাইলে গান্ধী, যেউ সকাবাট
চালন্তি সেথিরে, লক্ষ লক্ষ থাট
জেলখানা থাক পুরি উঠি থিলা
শুড়িকি দেখান্তি ছাতি ।
নারীকুড় হীরা, দেবী সরোজিনী
নাগপাশে এবে হেলেনী বন্দিনী
কমলাদি কেতে ভারতর কন্যা
কারাবাস ভুঞ্জুচ্ছন্তি ।
সেতাকু হরিলা রাবণ মরিলা
দ্রুপোদিকা শাপ কুরু কুড় গেলা
সরকার আয়ুশ দুই-চারি মাস
ঘড় হুয়া যদি অছি ।
অহিংসা নীতিকি ধরিথিবা যেবে
মনুষ্যর ছাড় কিসে সরগর দেবে
শুলাই আসিবে আঙ্ক নিকটকু
থিবা হিনি পুণ্যথিতি ।"

শুধু কি তাই? উড়িষ্যার লোককবি আশাবাদী। তিনি স্বপ্ন দেখলেন ভারতের বরেণ্য নেতাদের প্রচেষ্টায় দেশ আবার পরাধীনতার গ্লানি হতে মুক্তি লাভ করবে। তাই ত শোনা গেল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠস্বর :

"জাগিলরে দেশ জাগিল
লাগিলরে যুদ্ধ লাগিল
দেখ স্বাধীনতা যুদ্ধ লাগিল ।
যেউ পঞ্জাবে অত্যাচার
কলাও অসহযোগ কু প্রচার,
সেই পঞ্জাবরে স্বাধীনতা বাণী
গম্ভীর ভাবে আরম্ভিলা ।
মাহাত্ম মোহন মতিলাল
মিশি প্রবাস, যতীন জহরলাল
বজাইলে তুরী, স্বাধীনতা ভেড়ী
গগনে পবনে বাজিলা,
হিমাল ঠারু, সিংহল পরশলে চমক চহর
বিলাতী জাপানী ইটালীরে
প্রতিনিধি সভা বাজি উঠিলা ।
সতেক নালকি না পরি
সরকার কু হেলা বৈরী
আইন কাম নকড়ি
দেলা যাই নমানি পতাকা উড়িলা ।
উড়িলারে ভাই উড়িলা
আম্ভ জাতীয় পতাকা উড়িলা
শহরে শহরে উড়িলা
গ্রামে গ্রামে উড়িলা
জাগিলরে দেশ জাগিল ।"

যুগ পাল্টে যাবে, বদলে যাবে রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে লোককবির গাথাগুলো চিরকালের মত বাসা বেঁধে থাকবে এদেশবাসীদের মনের মণি-কোঠায়। সেই ত হবে তার আসল জায়গা। শহরের শত কোলাহলেও তার অস্তিত্ব কোন দিনই বিলুপ্ত হবে না।

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীভগবতীচরণ বর্ম্মা

অনুবাদক—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

বেড়ালটা যদি সে বাড়ীর কাউকে ভালবাসত ত একমাত্র রামুর বউকে, আর রামুর বউ যদি সে বাড়ীর কাউকে ঘৃণা করত ত সেই ভূষো রঙের বেড়ালটাকে। আজ দু'মাস হ'ল রামুর বউ বাপের বাড়ী থেকে প্রথম শ্বশুরবাড়ী এসেছে—পতির প্রিয়পাত্রী আর শাশুড়ীর আদুরে চৌদ্দ বছরের মেয়ে। ভাঁড়ারঘরের চাবি তার কোমরে ঝুলছে, ঝি-চাকরদের উপর তার হুকুম চলছে—বাড়ীতে সে-ই সব। শাশুড়ী মালা হাতে নিয়ে পূজো-পাঠে মন দিয়েছে।

কিন্তু মাত্র চৌদ্দ বছরের মেয়ে, কখনও ভাঁড়ারঘর খোলা পড়ে থাকে, কখনও ভাঁড়ারঘরেই বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ে আর বেড়াল ঘি-দুধের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যায়। এদিকে রামুর বউয়ের জান নিয়ে টানাটানি, কিন্তু ওদিকে বেড়ালের পোয়াবারো। হাঁড়িতে ঘি রাখতে রাখতে হয় ত সে ঘুমিয়ে পড়ে আর বাকি ঘিটুকু চলে যায় বেড়ালের পেটে। হয় ত সে ঝিকে জিনিষপত্র দিতে গেছে, ওদিকে দুধ লোপাট। ব্যাপারটা যদি এখানেই শেষ হ'ত তা হলেও বিশেষ কিছু খারাপ হ'ত না, কিন্তু তার সঙ্গে বেড়ালটা এমনই কাণ্ড আরম্ভ করে দিল যে, বেচারার খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। হয় ত তার ঘরে রাবড়িভর্ত্তি বাটি এসে পৌঁছেছে, কিন্তু রামু যখন বাড়ী এল তখন বাটি একেবারে চাঁচাপোঁছা। বাজার থেকে মালাই আসে আর রামুর বউ পান তৈরি করতে করতে মালাই অদৃশ্য। অবশেষে সহ্য করতে না পেরে সে সঙ্কল্প করল, এ বাড়ীতে হয় সে অথবা বেড়াল এ দুয়ের এক থাকবে। আক্রমণের প্রস্তুতি হয়ে গেল আর দু'জনেই সতর্ক হয়ে পড়ল। বেড়াল ফাঁসাবার খাঁচা এল, তার ভিতরে দুধ, মালাই, ইঁদুর এবং বেড়ালের প্রিয় আরও নানা রকম সুস্বাদু খাবার রাখা হ'ল, কিন্তু বেড়াল সেদিকে তাকিয়েও দেখল না, উল্টে তার সাহস আরো বেড়ে গেল। এতদিন সে রামুর বউকে ভয় করে চলত, এখন সামনাসামনি কাজ সুরু করে দিল—অবশ্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই।

বেড়ালের সাহস বেড়ে যাওয়াতে বাড়ীতে টেকাই মুশকিল হয়ে উঠল রামুর বউয়ের। শাশুড়ীর কাছ থেকে সে পেত মিঠে বকুনি আর তার পতিদেবতা পেত অতি সাধারণ খাবার।

একদিন রামুর বউ স্বামীর জন্য ক্ষীর তৈরি করল। পেস্তা, বাদাম, আর নানা রকম মেওয়া দুধে মেশানো হ'ল। সোনালী রাংতা লাগানো হ'ল তাতে, আর ক্ষীরভর্ত্তি বাটি বেড়ালের নাগালের বাইরে একটা উঁচু তাকে রাখা হ'ল। তার পর সে পান তৈরি করতে বসল।

এদিকে বেড়াল ঘরে এল। তাকের নীচে দাঁড়িয়ে রামুর বউয়ের দিকে চেয়ে দেখল, শুঁকল। বুঝল তাকের উপরের মালটা ভালই। তার পর তাকের উচ্চতা আন্দাজ করল। ওদিকে রামুর বউ পান সেজে চলেছে। পান সেজে সে শাশুড়ীকে পান দিতে গিয়েছে, এমন সময় বেড়াল এক লাফ মারল। থাবাটা লাগল বাটিতে আর ঝন্ ঝন্ শব্দে সেটা নীচে পড়ে গেল।

রামুর বউয়ের কানে সে শব্দ পৌঁছল। শাশুড়ীর সামনে পান ফেলে দিয়ে দৌড়ে চলে এল সেখানে। দেখল সুন্দর বাটিখানা টুকরো টুকরো, মেঝের উপর ক্ষীর পড়ে আর বেড়াল আরাম করে ক্ষীর ওড়াচ্ছে। তাকে দেখেই বেড়ালটা চম্পট দিলে।

রামুর বউয়ের মাথায় খুন চেপে গেল, তার মনের সকল শান্তি দূর হয়ে গেল, স্থির করল বেড়ালটাকে মারতেই হবে। সমস্ত রাত্রি তার ঘুম এল না। কি করে ওটাকে একেবারে শেষ করা যায় তাই সে ভাবতে লাগল শুয়ে শুয়ে। ভোরবেলা উঠে দেখল চৌকাঠে বসে বেড়ালটা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে।

রামুর বউ একটু ভাবল, তার পর মুচকি হেসে উঠে পড়ল। তাকে উঠতে দেখেই বেড়ালটা সটকাল। রামুর বউ এক বাটি দুধ এনে চৌকাঠের উপর রেখে চলে গেল। তার পর হাতে একটা পাটা নিয়ে ফিরে এসে দেখল, বেড়ালটা দুধ সাবাড় করতে লেগে গেছে। এই ত সুবর্ণসুযোগ। সমস্ত শক্তি সংহত করে সে পাটাটা ছুঁড়ে মারল বেড়ালটার গায়ে। বেড়াল একটুও নড়াচড়া করল না, একটুও চেঁচাল না, একেবারে উল্টে পড়ে গেল।

আওয়াজ হওয়ামাত্র ঝি ঝাঁটা ছেড়ে, রাঁধুনী রান্না ছেড়ে আর শাশুড়ী পূজো ছেড়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'ল। রামুর বউ অপরাধীর মত মাথা ঝুঁকিয়ে সবার কথা শুনতে লাগল।

"আরে রাম রাম, বেড়ালটা যে মরে গেছে! বউমা বেড়ালটাকে মেরে ফেলেছে—এ যে বড় খারাপ হ'ল মা," ঝি বলল।

রাঁধুনী বলল, "মানুষ মারা আর বেড়াল মারা একই কথা। যতক্ষণ বউয়ের উপর হত্যার দোষ থাকবে ততক্ষণ আমি রাঁধব না।"

শাশুড়ী বলল, "হাঁ ঠিকই বলেছ, বউমার ওপর থেকে হত্যার দোষ যতক্ষণ না নামবে ততক্ষণ কেউ জলও খেতে পারবে না, আর কিছুও খেতে পারবে না। এ কি করলে বউমা?"

ঝি বলল, "এখন তা হলে কি করব? পণ্ডিত মশাইকে ডেকে আনব?"

শাশুড়ীর ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। "সত্যিই ত, শীগগির যা, দৌড়ে পণ্ডিতমশাইকে ডেকে আন্," বলল সে।

বেড়াল মারার খবর বিদ্যুদ্বেগে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। পাড়াসুদ্ধ মেয়ের ভিড় জমে গেল সে বাড়ীতে। চারদিক থেকে প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল আর রামুর বউ মাথা নীচু করে বসে রইল।

পণ্ডিত পরমসুখের কাছে যখন এ খবর পৌঁছল তখন তিনি *পুজো করছিলেন। খবর পেতেই উঠে দাঁড়ালেন।* মৃদু হেসে *গৃহিণীকে বললেন, "আজ আর রান্না করো না। লালা ঘাসীরামের* ছেলের বউ বেড়াল মেরে ফেলেছে। প্রায়শ্চিত্ত হবে, খুব একচোট খাওয়াদাওয়া হবে'খন।

পণ্ডিত পরমসুখ চৌবে ছোটখাটো মোটাসোটা মানুষ। লম্বায় চার ফুট দশ ইঞ্চি আর ভুঁড়ির পরিধি আটান্ন ইঞ্চি। চেহারা গোলগাল, গোঁফজোড়া বিরাট, ফর্সা রং, টিকি কোমর পর্য্যন্ত।

শোনা যায় মথুরায় যখন পাঁচসেরী খোরাকওয়ালা পণ্ডিতদের খোঁজ করা হ'ত তখন নাকি পণ্ডিত পরমসুখকে সেই তালিকায় প্রথম স্থান দেওয়া হ'ত।

পণ্ডিত পরমসুখ পৌঁছলেন আর আসর পুরো হ'ল। পঞ্চায়েত বসল—শাশুড়ী, রাঁধুনী, কিসনুর মা, ছন্নুর ঠাকুরমা আর পণ্ডিত পরমসুখ। বাকী মেয়েরা বউয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগল।

কিসনুর মা বলল, "পণ্ডিতমশাই, বেড়ালহত্যায় কোন্ নরক ভোগ হয়?"

পণ্ডিত পরমসুখ পঞ্জিকা দেখতে দেখতে বললেন, "শুধু বেড়াল-হত্যা বললেই ত নরকের নাম বলা যায় না, কখন হয়েছে তা জানা গেলে নরকের কথা ঠিকমত বলা যেতে পারে।"

"এই ধরুন সকাল সাতটায়," রাঁধুনী বলল।

পণ্ডিত পরমসুখ পঞ্জিকার পাতা উল্টালেন, অক্ষরের উপর আঙুল চালালেন, এবং মাথায় হাত দিয়ে কিছু ভাবলেন। মুখে অন্ধকার নেমে এল, কপালে চিন্তারেখা ফুটে উঠল, নাকটা একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল আর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে গেল—"হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! বড় খারাপ হয়েছে। প্রাতঃকাল, ব্রাহ্মমুহূর্তে বেড়াল-হত্যা! ঘোর কুম্ভীপাক নরকের বিধান রয়েছে দেখছি। এ যে বড় খারাপ হ'ল রামুর মা।"

রামুর মার চোখে জল এসে গেল—"এখন তা হলে কি করি আপনিই বলে দিন পণ্ডিতমশাই।"

পণ্ডিত পরমসুখ মৃদু হেসে বললেন, "ওতে চিন্তার কি হয়েছে রামুর মা! পুরুত তা হলে রয়েছে কোন্ দিনের জন্যে? শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান রয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রামুর মা বলল, "সেই জন্যেই ত আপনাকে ডাকিয়েছি পণ্ডিত-মশাই। এখন বলুন কি করা যায়।"

"কি করা যায়? এই শুধু একটা সোনার বেড়াল তৈরি করে বউমাকে দিয়ে দান করিয়ে দাও।" যতক্ষণ না বেড়াল দান হবে ততক্ষণ বাড়ী অপবিত্র থাকবে। দানের পরে একুশ দিন পাঠ দিতে হবে।

ছন্নুর ঠাকুরমা—"তা হলে আর কি, পণ্ডিতমশাই ত সবই বলে দিয়েছেন। এখখুনি বেড়ালদান হয়ে যাক, পরে একুশ দিন পাঠ হবে'খন।"

রামুর মা বলল, "তা হলে পণ্ডিতমশাই ক'তোলার বেড়াল বানাতে হবে?"

পণ্ডিত পরমসুখ হাসলেন। ভুঁড়ির উপর হাত বুলিয়ে বললেন, "ক'তোলার বেড়াল বানাতে হবে? আরে রামুর মা, শাস্ত্রে ত লেখা রয়েছে যে বেড়ালের ওজনের সমান সোনা দিয়ে বেড়াল বানাতে হবে। কিন্তু এটা কলিযুগ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব নষ্ট হয়ে গেছে, সে শ্রদ্ধাভক্তিও আর নেই। তা রামুর মা, বেড়ালের ওজনের সমান সোনার বেড়াল আর কি করে দেবে—বেড়ালটা ত কুড়ি-একুশ সেরের কম হবে না। তবে কমসে কম একুশ তোলার বেড়াল বানিয়ে দান করাও, তারপর নিজের শ্রদ্ধাভক্তি।"

রামুর মা হাঁ করে পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, "ওরে বাপ রে! একুশ তোলা সোনা! এ যে বড্ড বেশী পণ্ডিত-মশাই। তোলাখানেকের বেড়ালে কাজ চলবে?"

পণ্ডিত পরমসুখ হেসে ফেললেন—"এক তোলা সোনার বেড়াল রামুর মা! টাকার লোভটাই কি বউয়ের চাইতে বড় হ'ল? বউমার ঘাড়ে মস্ত বড় পাপ ঝুলছে—এতটা লোভ ঠিক নয়।"

দরাদরি সুরু হ'ল অবশেষে এগারো তোলায় বেড়ালে রফা হ'ল।

তারপর পূজো-পাঠের কথা উঠল। পণ্ডিত পরমসুখ বললেন, "ওতে আর ভাবনার কি আছে—আমরা রয়েছি কিসের জন্য? আমি পাঠ করে দেব'খন রামুর মা, পূজোর জিনিসপত্র আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও।"

"কি কি দরকার হবে পূজোয়?"

"আরে সব চাইতে কম জিনিসে আমি পূজো করে দেব। দানের জন্য মণদশেক গম, এক মণ ডাল, মণখানেক তিল, পাঁচ মণ যব, পাঁচ মণ ছোলা, বিশ সের ঘি আর নুনও মণখানেক। ব্যস, এতেই কাজ চলে যাবে।"

"ওরে বাপ রে! এত জিনিষ! ও যে একশ' দেড়শ' টাকার ধাক্কা!" রামুর মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল।

"এর কমে ত চলবে না। বেড়ালহত্যা একটা কত বড় পাপ রামুর মা! খরচের দিকে দেখার আগে বউমার পাপের কথাটা ভেবে দেখ। এটা প্রায়শ্চিত্ত—ছেলেখেলা নয়। আর যার যে রকম অবস্থা তাকে সে রকমই খরচ করতে হয়। আপনারা ত আর যা-তা লোক নন, একশ'-দেড়শ' টাকা ত আপনাদের হাতের ময়লা।"

পণ্ডিত পরমসুখের কথায় পঞ্চায়েত প্রভাবিত হ'ল। কিসনুর মা বলল, "পণ্ডিতমশাই ঠিকই বলেছেন, বেড়ালহত্যা যা-তা পাপ নয়। বড় পাপের জন্য খরচও বড় করতে হয়।"

ছন্নুর ঠাকুরমা বলল, "তা ছাড়া দান-ধ্যানেই ত পাপ কাটে। এতে খরচ কমানো ঠিক নয়।"

রাঁধুনী বলল, "আপনারা ত বড়লোক মা, এটুকু খরচ করতে আপনাদের একটুও গায়ে লাগবে না।"

রামুর মা চারদিকে চেয়ে দেখল। সবাই পণ্ডিতমশাইয়ের পক্ষে। পণ্ডিত পরমসুখ মৃদু মৃদু হাসছেন। বললেন—"রামুর মা, একদিকে বউমার কুম্ভীপাক নরক, অন্যদিকে তোমার সামান্য একটু খরচ। এতে পিছিয়ে যেয়ো না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রামুর মা বলল, "এখন ত যে নাচ নাচাবে সেই নাচই আমাকে নাচতে হবে।"

পণ্ডিত পরমসুখের মেজাজ একটু বিগড়ে গেল, বললেন, "রামুর মা! এ সব ত বার বার নিজের ইচ্ছে। তোমার যদি ইচ্ছে না হয় নাই করলে, আমি চললাম।" এই বলে পণ্ডিতমশাই পুথিপত্র বাঁধতে লাগলেন।

"না না, পণ্ডিতমশাই। রামুর মার একটুও অনিচ্ছা নেই—বেচারার কত দুঃখু একবার ভেবে দেখুন। আপনি কিছু মনে করবেন না।" রাঁধুনী, ছমুর ঠাকুমা আর কিসমুর মা একসঙ্গে বলে উঠল।

রামুর মা পণ্ডিত মশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরল, পণ্ডিতমশাই তখন গ্যাঁট হয়ে আসনে বসলেন।

"আর কি ?"

"একুশ' দিন পাঠের একুশ টাকা আর একুশ দিন পর্যন্ত রোজ দু'বেলা পাঁচ জন করে ব্রাহ্মণভোজন।"

একটু থেমে বললেন, "তা এজন্যে চিন্তা করো না। আমি একলাই দু'বেলা খেয়ে নেব আর আমার একলার খাওয়াতেই পাঁচ জন বামুনের খাওয়ার ফল হবে।"

"হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই ঠিকই বলছেন, ওঁর ভুঁড়িখানা দেখেছ ত!" মুচকি হেসে রাঁধুনী পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করল।

"আচ্ছা, তা হলে প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত করাও রামুর মা আর এগারো তোলা সোনা বের করো, আমি দু'ঘণ্টার মধ্যেই বেড়াল বানিয়ে আনছি। ততক্ষণে পূজোর ব্যবস্থা করে রেখো। আর দেখো পাঠের জন্যে..."

পণ্ডিতমশাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সবাই। রামুর মা ভয় পেয়ে বলল, "কি হয়েছে রে ?"

ঝি আমতা আমতা করে বলতে লাগল, "বেড়ালটা যে উঠে পালিয়ে গেছে মা!"

লছমনঝোলা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

দু'ধারে উচ্চ শৈলের শ্রেণী, মাঝেতে লৌহসেতু।
লছমনজীর মন্দিরে আজো উড়িছে বিজয়কেতু।
মহাপ্রস্থান পথ চলে পাশে
বনফুল-বাস ভাসিছে বাতাসে
সুরধুনী চলে মর্ত্ত্যের পানে কলুষ নাশের তরে।
শিবের পাংশু জটাজাল যেন ছড়ায়েছে অম্বরে।

উপলে উপলে নাচে বারি দিয়ে ছন্দের করতালি,
কভু খরস্রোতে, কভু আবর্ত্তে, গলিত তুষার ঢালি।
কভু পড়ে নিচে গুরু গর্জ্জনে
কভু বহে যায় আপনার মনে
করুণারূপিণী, ত্রিতাপ-হারিণী ভোগবতী ভাগীরথী।
আর্ত্তজনের দুঃখহারিণী, কত অগতির গতি।

স্নান করি' এই পুণ্য সলিলে যাত্রীরা করে স্তব।
পবিত্র বারি শিরে নিয়ে হ'ল ধন্য অকৈতব;
পারমার্থিক রস পান করি'
চলে সকলে কেদার-বদরী
লছমন ঝোলা সিংহদ্বার হিমালয় যাত্রার।
বালক এসেছে তপঃক্ষেত্র ফিরে দেখি বার বার।

ধরা অমরার মিলনের সেতু, এ যে গো শান্তিধাম।
বাক্যমনের অগোচর যিনি তাঁহারে করি প্রণাম।
হেরিয়া নয়নাভিরাম অচলে
ডুবে গেল মন প্রশান্তিতলে
সত্যের জ্যোতি যেন উঠে জ্বলে সমুখেতে বার বার,
ওঙ্কারনাদ তরঙ্গে হ'ল উন্মেষ আত্মার।

গান

তানসেন বিরচিত

(গুর্জ্জরীতোড়ী—চৌতাল)

নাদ নগর বসাওয়ে সুর পটমহল ছায়ো,
উনঞ্চাশ কোটি তান অচ্ছর বিশ্রাম পাওয়ে।
গীত ছন্দ তত বিতত ডমরু কা গুন আলাপ,
তান তার কো কিওয়াড় খরজ সুর পট জিঞ্জর।
ত্রিবট খুঙ্গী তামেঁ ধুরপদ মধ ছিপাওয়ে।
ওড়ব খাড়ব সম্পূরণ তিনকে ভেদ বতাওয়ে,
একইশ মুরছন কণ্ঠমেঁ দেখাওয়ে।
কহে মিয়া তানসেন শুনহো গোপাললাল,*
অর্দ্ধ খর্দ্ধ কর দেখাওয়ে সুর মিলওয়ে কণ্ঠ মিলওয়ে।
অকবর পরখ পাওয়ে।

খাড়ব সম্পূর্ণ জাতি, আরোহীতে রী বর্জ্জিত, রী, গ, ধ কোমল দুই নি।
গ—বাদী, ধ—সংবাদী. স্বরবিন্যাস—সা জ্ঞা মা পা দা না র্সা, র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা।

গাইবার সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

স্বরশিক্ষক—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়   স্বরলিপি—শ্রীনেপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১´		0		২		0		৩		৪		১´			
জ্ঞাঃ	জ্ঞঃ	ঋা	ঋা	সা	সা	সা	ঋন্া	সা	সা	-া	-া	সন্া	সন্া	সা	জ্ঞা
না	০	দ	ন	গ	র	ব	সা০	০	ওয়ে	০	০	সু	র	প	ট

* "কহে মিয়াঁ তানসেন শুনহো গোপাললাল" শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন নায়ক গোপাল বল্‌গরামী (বল্‌গরামী দেশনিবাসী) তানসেনের সমসাময়িক, কিন্তু তাহা নহে। গোপাললাল সম্রাট আলাউদ্দীন খিল্‌জীর সভাগায়ক ছিলেন এবং সম্রাট গিয়াসুদ্দীন তোগলকের সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩
মা জ্ঞা | ঋা ঋা | সা সা | সা সা | সদা সা | -া সা | জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা ঋা |
য তা ০ ০ ০ ওয়ে এ ক ০০ ই — শ মু র ০ ছ

৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা সা | সা দা | দা দা | পা পা | মা জ্ঞা | ঋা ঋা | সা সা II
০ ন ক ০ ০ ঠ ০ মেঁ দে খা ০ ০ ০ ওয়ে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
মা ণদা | -া র্সা | -া র্সা | র্সা -া | র্সা র্সনা | র্সা র্সা | র্সা ণদা | া র্সা | না ঋা |
ক হে — মি — য়াঁ তা — ন সে০ ০ ন শু ন — হো ০ গো

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ঋা র্সা | সনা র্সা | দা পা | মা জ্ঞা | মা পা | -া পা | ণদা দা | দা পা | -া জ্ঞপা |
পা ০ ল০ লা ল ০ অ ০ র্ব্ব খ — র্ব্ব ক র দে খা — ওয়ে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
না সা | সা সা | দা দা | ণা দা | দা পমা | পা পা | মা পা | দা পা |
সু র মি লা ০ ওয়ে ক ণ্ঠ মি লা ০ ওয়ে অ ক ব র

২ ০ ৩ ৪
পা মা | পা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞপা | মদা -া II
প র খ পা ০ ওয়ে০ ০০ —

ভারতে ন্যায়চিন্তা

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

ভারতে ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস এরূপ গৌরবময় যে, ইহা একমাত্র দর্শন-প্লাটো-বেদান্তের ইতিহাসের সহিত তুলিত হইতে পারে। বেদান্তদর্শন অপেক্ষাও যাহা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাহা এই যে, পূর্ব্ব-মীমাংসা ত বটেই উত্তর-মীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা কিংবা বেদান্ত-দর্শনের বিভিন্ন পন্থীরাও স্বীয় অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত (মাধ্ব) মতকে ন্যায় প্রকরণের মত রচনা করিয়া আন্বিক্ষিকীর মর্য্যাদা বাড়াইয়া গিয়াছেন। বাঙালী নব্যন্যায়ের গৌরবের বিশিষ্ট অংশীদার বলিয়া এই ইতিহাস আলোচনা তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

ভারতে ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস যে সুপ্রাচীন তাহা সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেন। যদিও সে ইতিহাস এখনও বিস্মৃতির গর্ভে তথাপি এই অন্ধকারে কিছু কিছু আলোকসম্পাত করিয়া যতটা সম্ভব জানিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। ভারতে এই শাস্ত্রের আদি গ্রন্থ 'আন্বিক্ষিকী সূত্র', বোধ হয় দর্শনশাস্ত্রে আদিতম গ্রন্থ সাংখ্যের পরে ইহার জন্ম। রামায়ণের কাহিনী যদি ঐতিহাসিক হয় আর অহল্যা-স্বামী গৌতম যদি এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রণেতা হন তবে ডঃ সীতানাথ প্রধানের (Ancient Indian Chronology) মতানুবর্ত্তী হইয়া, ঋগ্বেদ উল্লিখিত সুদাসের সহিত দশরাজার যুদ্ধে রামচন্দ্রের পিতা দশরথের উপস্থিতি ধরিয়া, গৌতমকে আমরা এই যুদ্ধের প্রায় অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালের ব্যক্তি বলিয়া ধরিতে পারি। এই শাস্ত্রের আখ্যা আন্বিক্ষিকী হইলেও মহাভারতে শান্তিপর্ব্ব ১০৪৫ হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে ইহা দর্শন আখ্যা পাইতে থাকে (Radhakrisnan's 'Indian philosophy', vol. II, page 18)। এই দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই বটে, তবে তিনি কামসূত্রেরও গ্রন্থকার হইলে ভারতের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাকে বলা চলে।

ইহার পরই বৌদ্ধ ন্যায়চিন্তার গৌরবময় যুগ, যাহার ফলে দিঙ্-নাগ, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি চিন্তাবীর সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারতে ন্যায়চিন্তার প্রথম সূত্রপাত করেন। বৌদ্ধচিন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা বহুকারণবাদী, প্রমাণ সম্বন্ধেও ইহাদের চিন্তা স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। বৌদ্ধ যুগের বিরাট প্লাবন-মধ্যে প্রাচীন ন্যায়চিন্তা বন্ধ হয় নাই। ফলে উদ্দ্যোতকর প্রমুখ পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্র পরমাণু কারণবাদ খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধ-বিরুদ্ধ দার্শনিক চিন্তার সমাবেশ-যুক্ত "ন্যায় বার্ত্তিক" রচনা করেন। কিন্তু কালপ্রভাবে পরে উদ্দ্যোতকরের সম্প্রদায়ও বিলুপ্ত হয়। এত দূর পর্য্যন্ত ভারতে ন্যায়চিন্তার ইতিহাস প্রকৃত-কাল নির্ণয়ের অভাবে কাহিনীমাত্র হইয়া আছে। ইহার পরে নবম শতাব্দীতে সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গুরু ত্রিলোচনের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া উদ্দ্যোতকরের "ন্যায় বার্ত্তিকে"র তাৎপর্য্য টীকা-রচনার দ্বারা উদ্ধার করেন।

বৌদ্ধযুগের প্রবল প্লাবনে বৈদিক ন্যায়শাস্ত্রকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, দশম শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ মহা-নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রে বস্তুতান্ত্রিকতার প্রয়োজন বুঝিয়া বৈশেষিক দর্শনের সাহায্য-গ্রহণান্তর "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা"র "তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি" ও "কুসুমাঞ্জলি" রচনা করিলেন। ইহা ছাড়া বৈশেষিক দর্শনের "কিরণাবলী" টীকা ও "লক্ষণাবলী" নামক স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনায় শুধু বৈশেষিকের গুরুত্ব যে নৈয়ায়িকের উপজীব্য হইল তাহা নহে, ন্যায়শাস্ত্রে "প্রমা" প্রসঙ্গের সূত্রপাত করিয়া তিনি ন্যায়-শাস্ত্রকে প্রকৃত দর্শনের মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। ন্যায়ের গৌরবরবি পূর্ব্ব-ভারত আশ্রয় করিল। কঠোপনিষদের ৩য় বল্লী ২য় মন্ত্র ও শঙ্করের মায়াবাদ মতে সিদ্ধ হইলেও, বৌদ্ধগণের যে ক্ষণিকবাদ পরমাচার্য্য অস্বীকার করিয়া তৎস্থলে বেদান্তের অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিলেন তাহা বৈশেষিকের পরমাণুবাদবিরোধী হওয়ায় বৈশেষিক দর্শনের পারিমাণ্ডল্যের কারণত্বও অস্বীকার করিল।

মিথিলায় এই নব সূর্য্যোদয় ফলে নব্য ন্যায়ের স্রষ্টা তত্ত্ব-চিন্তামণির গ্রন্থকার ভারতগগনে অপূর্ব্ব দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া প্রকাশিত হইলেন। গঙ্গেশের পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ কেবল "ব্যাপ্তিবাদ" ও অনুমানখণ্ড লইয়াই বিশেষ বিব্রত রহিলেন। তত্ত্বচিন্তামণি পড়িবার জন্য সকল দেশ হইতেই বিদ্যার্থীরা মিথিলায় যাইতেন। বঙ্গদেশে খুব সম্ভব "ন্যায় কন্দলী" গ্রন্থকার আচার্য্য শ্রীধরের সময় হইতেই নব্যন্যায়ের চিন্তা দানা বাঁধিতে থাকে এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সময়ে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সার্ব্বভৌমের ছাত্র, বাংলার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান শূলপাণি-দৌহিত্র সাহড়িয়াল রঘুনাথ মিথিলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের দ্বারা আহূত, ভারতের সর্ব্বস্থানের নৈয়ায়িকমণ্ডলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মিশ্র কর্ত্তৃক উত্থাপিত "সামান্য লক্ষণা"-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিয়া শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বলিয়া পরিগণিত হন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বঙ্গদেশের এই বিমল প্রভা সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত হইল। পক্ষধর মিশ্র হইতে "তার্কিক শিরোমণি" উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গগৌরব রঘুনাথ নবদ্বীপে আসিয়া নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং নবদ্বীপই ন্যায়ালোচনার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। মিথিলার জ্যোতি ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকিলে ভারতের সর্ব্বদেশের ছাত্র ক্রমে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে থাকেন।

বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া ন্যায়ের এই নবীন গৌরবে শুধু যে নৈয়ায়িকেরা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা নহে, ভারতের অন্যান্য দর্শনকেও ন্যায়াদর্শে রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। দাক্ষিণাত্যে (দুই জন) নারায়ণ পণ্ডিত মিলিয়া মীমাংসা দর্শনকে প্রসিদ্ধ "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে, বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনকে "ন্যায়পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে,

বৃন্দাবনবাসী আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্য অদ্বৈত বেদান্তদর্শনকে "প্রমাণমালা" ও "ন্যায় দীপাবলী" গ্রন্থে, এবং বিশেষ মূল্যবান না হইলেও ব্যাসতীর্থ মাধ্ব বেদান্ত মতকে তর্কতাণ্ডব গ্রন্থে রূপান্তরিত করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন। নিবন্ধ আকারে হইলেও সমকালে রচিত, কাশীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণাচার্য্য কৌণ্ডভট্টের "পদার্থদীপিকা" গ্রন্থখানিকেও শিরোমণির "পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ" গ্রন্থের পর্য্যায়ভুক্ত ধরিয়া একখানি মূল্যবান গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "প্রমা"-বিষয়ক প্রসঙ্গ ন্যায়শাস্ত্রে আচার্য্য উদয়ন কর্তৃক প্রথম সঞ্চারিত হয়। আদি আলোচনা গ্রন্থগুলিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বিবিধ বিভাগরূপে "সবিকল্পক" ও "নির্বিকল্পক" এই দ্বিবিধ বিভাগমাত্র স্বীকৃত হইত। উপাধ্যায় গঙ্গেশ তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণিতে প্রমা-বিষয় উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"যথার্থানুভবো-মানমন পেক্ষাযত" ইতি কুসুমাঞ্জলাবুদয় নোক্তেশ্চ। বাস্তবিক আচার্য্য গঙ্গেশের গ্রন্থেও ন্যায়শাস্ত্রের সহিত প্রমা-গুণের কি সম্বন্ধ তাহা এবং "সমবায়"-বিষয়ক আলোচনা বিশদীকৃত হয় নাই। এই "সমবায়"-বিষয়ক আলোচনা যদিও প্রসিদ্ধ মীমাংসক গুরু প্রভাকরের দ্বারা এবং আচার্য্য উদয়নের "কিরণাবলী" ও শঙ্কর মিশ্রের "প্রশস্তপাদ ভাষ্যোপস্কার" নামক বৈশেষিক গ্রন্থদ্বারা কিঞ্চিৎ বিশদীকৃত হইয়াছিল, তথাপি বঙ্গগৌরব রঘুনাথের "পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ" গ্রন্থে ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র সুব্যাখ্যাত হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন পণ্ডিত, "প্রমা" বলিতে যথার্থ জ্ঞান বুঝায়—এই সূত্র ধরিয়া এই বিষয়কে পাশ্চাত্ত্য epistomology or theory of knowledge-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক প্রমা বলিতে যথার্থ জ্ঞান বুঝায় না, কারণ "প্রমাচ যথার্থ অনুভবঃ"—ইহাই পদার্থ-দীপিকার সূত্র এবং ইহা এইভাবে ভাষা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি অন্যান্য ন্যায় মীমাংসা গ্রন্থেও স্বীকৃত। পদার্থ দীপিকাকার উল্লিখিত রূপে "প্রমা" সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া জ্ঞানের বিভাগ এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ রূপে বলিয়াছেন যে—সাক্ষাৎ করোমি ইতি প্রতীতি সাক্ষিক জাতি বিশেষ বজ্ঞানং প্রত্যক্ষন্তং দ্বিধা নিত্য মানিত্যং চ নিত্যং ভগবতঃ তৎসববিষয়ং প্রমাচ। অনিত্যং চ জীবনাম্। তৎদ্বিধা সবিকল্পকং নির্বিকল্পকং চ"—এই সূত্র কয়েকটি দ্বারা "প্রমা" যে 'Epistomology'র আলোচ্য বিষয় নহে শুধু তাহা বলা হয় নাই, ন্যায়শাস্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই শাস্ত্রের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-বিষয়ক আলোচনা "মানমেয়োদয়" গ্রন্থের উপোদঘাতেও দেখা যায়। ব্যাপ্তিবাদের সহিত সমবায়ের পার্থক্য প্রদর্শন এবং প্রজ্ঞা ও প্রমার পার্থক্য দেখাইয়া ভট্ট-গুরু মিশ্র মতানুসারে প্রজ্ঞা অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞানের সবিশেষ আলোচনাও এই ন্যায়দর্শন গ্রন্থের বিশেষত্ব। ন্যায় পরিশুদ্ধিকার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেঙ্কটনাথ—নচ সমবায়স্ত সবিকল্পকৈক বিষয়ত্বেতি বাচ্যম্ (পৃ. ১৯)—সূত্রদ্বারা সমবায় পদার্থের সহিত জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং কৌণ্ডভট্ট—সবিকল্পকং তু ন প্রমা (পদার্থ-দীপিকা—১৮) বলায় পরিশুদ্ধ মতের ইঙ্গিতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানবিভাগ দ্বারা প্রমা ও সমবায়ের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমস্ত পরিষ্কার করিয়া বলিলে এই বুঝায় যে, প্রমা বলিতে নিত্য ও অনিত্য নির্বিকল্পক জ্ঞান এবং সমবায় বলিতে নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক উভয় অনিত্য জ্ঞান বুঝায়। কৌণ্ডের গ্রন্থ হইতে আমরা শুধু যে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাই তাহা নহে, সমবায়ের সহিত ন্যায় বিভাগের "শব্দ" ও "উপমান"দ্বয়ের সম্বন্ধ নির্দ্দেশও সুন্দররূপে পাইয়া থাকি। উদয়নের পরবর্ত্তী এবং ভট্টবাদীন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে আবির্ভূত শিবাদিত্য মিশ্রের "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থেও অনুমানের সহিত শব্দের সম্বন্ধ আলোচনা দেখা যায়। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে এই গ্রন্থখানিকে যেমন প্রাচীন এবং নব্য-ন্যায়ের সন্ধিস্থলজ্ঞাপক সূত্র হিসাবে ধরা হয়, তেমনই ভারতীয় ন্যায়-চিন্তাকে পাশ্চাত্ত্য Inductive ও Deductive এই দুই বিভাগে আনিবার সূত্র বলিয়াও পরিগণিত করা যায়। বস্তুতঃ এই গ্রন্থখানিকে আধুনিক ন্যায়ের আকর হিসাবে ধরিবার সমূহ কারণ থাকায় অন্যতম মূল্যবান গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ন্যায়চিন্তার অন্তিম যুগে রচিত হইলেও মীমাংসা ও বৈদান্তিক প্রভৃতি অর্ব্বাচীন এই ন্যায় নিবন্ধগুলির মূল্য প্রমাবাদ (concept or idea) হইতে প্রজ্ঞাবাদের (theory of knowledge or epistomology) পার্থক্য বুঝিবার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। শুধু তাহাই নহে, পাশ্চাত্ত্য ন্যায়শাস্ত্র-উপযোগী ভারতীয় ন্যায়চিন্তাকে দাঁড় করাইবার যে সুবিশাল উপাদান এই সব বিভিন্ন ন্যায়চিন্তার মধ্যে ছড়াইয়া আছে তাহা পাইবার জন্য এই গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা অনিবার্য্য। ফলে প্রকৃতির একরূপতা নিয়ম (Law of the uniformity of nature) বেদান্তের—সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্মঃ—এই সুমহান্ সূত্র হইতে উৎসারিত হইয়া ন্যায়শাস্ত্রে আশ্রয় পাইবে। বৈভাষিক বৌদ্ধ ন্যায় অস্বীকার করিয়াও আমরা প্রস্থানত্রয়ের অদ্বৈত ব্যাখ্যা দ্বারা আধুনিক যুগসম্মত পরমাণু ক্ষণিক কারণবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ন্যায়শাস্ত্রের নবভিত্তি গঠিত করিতে পারি।

আরম্ভবাদের যে প্রাচীন রূপ বৈশেষিক দর্শনের বাস্তবতা আশ্রয়ে পরামাণু-কারণবাদ রূপে স্বীকৃত হইয়াছিল, মধ্যযুগে বেদান্তের প্রভাবে সেই আরম্ভবাদ কাল্পনিক ব্রহ্ম আশ্রয়ে অর্ব্বাচীন অসৎকার্য্যবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে; ফলে বৈজ্ঞানিক তথ্যসিদ্ধ বৈশেষিক ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে একেবারে পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে। যদি ন্যায়শাস্ত্রকে পুনরায় স্বীয় ভিত্তির এবং ভারতের দার্শনিক চিন্তা, বেদের নব আলোকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তবে বৈশেষিক প্রভৃতি সমূহ দর্শন আবার নিজস্ব সত্তা ফিরিয়া পাইতে পারে। ইহা হওয়া উচিত কিনা তাহা ভারতের ঋষিতুল্য মনীষিগণের বিবেচ্য।

তিন বিঘা জমি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কৃষি-বিভাগ মধ্যে মধ্যে কৃষিকার্য্যের এবং এই সংক্রান্ত প্রচেষ্টা ও উদ্যমের খুবই আশাপ্রদ, এমনকি চমকপ্রদ বিবরণ দিয়া থাকেন; সেই সকল বিবরণ পড়িয়া কৃষিকার্য্যের প্রতি এমন আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ে যে, মনে হয় এই বৃদ্ধবয়সেও লাঙ্গল ধরি; শস্য-প্রতিযোগিতা সম্পর্কে—ধান, গম, আলু প্রভৃতির যে ফলন ঘোষণা করা হয় তাহা পড়িয়া মনে হয় দুই-তিন বিঘা জমিতে এই সকল শস্যের চাষ করিলেই ধনবান হওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-বিভাগের এইরূপ চমকপ্রদ বিবরণের দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, ১৩৫৬ সালের ফাল্গুন-চৈত্র মাসের "বসুন্ধরা"য় 'বেকার সমস্যা ও খাদ্যাভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে একটি নূতন প্রতিষ্ঠিত ৫০ বিঘা আয়তনের কৃষি-ক্ষেত্রের চাষের বিবরণ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার অন্তর্গত একটি স্থানের (স্থানের নাম দেওয়া ছিল না) সাত জন যুবক কর্ত্তৃক এই কৃষিক্ষেত্রটি স্থাপিত হইয়াছিল; তাঁহারা দশ হাজার টাকা মূলধন লইয়া কাজ সুরু করিয়াছিলেন এবং প্রথম বৎসরই একই জমিতে চারি প্রকার ফসল উৎপন্ন করিয়া ৫১ হাজার টাকা নীট আয় করিয়াছিলেন; ইহা ছাড়া দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের আরও কিছু অধিক আয় হইয়াছিল। এই বিবরণটি পড়িয়া লেখক কৃষি-বিভাগের সহিত বহু পত্র বিনিময় করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে জানান হইয়াছিল এইরূপ কৃষিক্ষেত্রের কোন অস্তিত্বই নাই। ১৩৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছয় পৃষ্ঠা-সম্বলিত একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল—A plan for mixed farming for 2 bighas—অর্থাৎ, দুই বিঘা জমিতে মিশ্রিত চাষবাসের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাটিতে রচয়িতার নাম ছিল না এবং সরকারী কোন্ বিভাগ হইতে প্রকাশিত, তাহারও উল্লেখ ছিল না; পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণে মুদ্রিত ইহাই উল্লিখিত ছিল। এই পরিকল্পনায় দেখান হইয়াছিল যে, মুরগী পালন করিবার এবং ঢেঁড়স, কুমড়ো, ঝিঙ্গা, লঙ্কা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, আলু, পিঁয়াজ এবং পেঁপে গাছ লাগাইয়া প্রতি বৎসরে ২,৭৭০ টাকা নীট লাভ হইতে পারে। এই সম্বন্ধে "প্রবাসী" ও "খাদ্য উৎপাদন" পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছিলাম; কিন্তু কৃষি-বিভাগ হইতে কোন সাড়াশব্দ পাই নাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারপত্রে "দৃষ্টান্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে তিন বিঘা জমি চাষের একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমা, থানা শালবনী, পোঃ ও গ্রাম শালবনী নিবাসী শ্রীফণিভূষণ ঘোষ মহাশয় মাত্র তিন বিঘা জমিতে পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে নিজ হাতে চাষ-আবাদ করে সচ্ছলতার সঙ্গে জীবিকানির্বাহ করছেন। শ্রীযুত ঘোষের বর্তমান বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। পরিবারের লোকসংখ্যা ১০ জন। এর মধ্যে দুই ভাই স্কুলে পড়াশুনা করে। তাদের মাসিক মাহিনা ৭৸০ টাকা। একমাত্র উক্ত তিন বিঘা জমি-চাষের ওপরেই পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্ভর করে। পিতার মৃত্যুর পর শ্রীযুত ঘোষ ১৯৪৯ সাল থেকে চাষের কাজে নামেন। ঐকান্তিক আগ্রহ ও পরিশ্রমের সাহায্যে তিনি চাষ আবাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই তিন বিঘা জমিতে তিনি পর্যায়ক্রমে প্রতি বছরে একই ভাবে চারটি ফসলের চাষ করে আসছেন। এই চারটি ফসল হ'ল: (১) আউশ ধান—পর্যায়ক্রমে ভূতমুড়ি ও সাজননা, (২) বিড়ি কলাই, (৩) নৈনিতাল আলু ও (৪) চৈতালি কুমড়া। শ্রীযুত ঘোষ কিভাবে উপরি-উক্ত এই ফসলের চাষ করেছেন তা নীচে দেওয়া গেল,—

জমির প্রকৃতি: উঁচু জমি, বেলে দোআঁশ মাটি। পাশের খাল থেকে লাটা দিয়ে সেচের সুবিধা আছে। এ ছাড়াও বর্ষাকালে আশেপাশে পথঘাট, জমি ও নালা-ধোয়ানি জল শ্রীযুত ঘোষের জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে কুমড়ো তুলে নিয়ে আবার বোয়া আউশ ধানের আবাদের জন্য জমিতে চাষ দিয়ে কতক দিন ফেলে রাখা হয়। বর্ষা নামার সঙ্গে আষাঢ়ের শেষাশেষি বা শ্রাবণের প্রথমাংশে জমিকে আবার চাষ করা হয়। ধান-চাষের জন্য কোন রকমের সার ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় না। আলু ও কুমড়ো চাষের সময় যে প্রচুর সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার ফলে অতিরিক্ত সার না দিয়েও ঐ জমিতে পরে ধান বেশ ভালই হয়। এই উঁচু জমি রবিশস্য চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই কারণে আউশের পর আমন ধান চাষ করা সুবিধা হয় না। অতি কষ্টে আমন ধানের চাষ করা সম্ভব হলেও পরে ঐ জমিতে কলাই, আলু, কুমড়ো ইত্যাদি চাষ করার আর সময় থাকে না। লাঙ্গল ও মই-এর সাহায্যে জমি তৈরির পর প্রায় ১৪ ইঞ্চি তফাতে একসঙ্গে ২-৩টি করে ধানের চারা রোপণের পর ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে প্রথম নিড়ানি দেওয়া হয়। কোদালি ও অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে মাটি গভীর করে ওলটান হয় না, কারণ এইভাবে ওলটানর ফলে মাটিতে যে গর্ত হয় তার মধ্যে বর্ষার জল জমে থাকার দরুন ঐ জায়গায় বিড়ি

কলাই-এর চাষ ভাল হয় না। ঐ জল-জমা জায়গায় যে বীজ পড়ে সেগুলি পচে নষ্ট হয়ে যায়। প্রথমবারের নিড়ানির এক মাস পরে অর্থাৎ ধান গাছে দানা ধরার কিছুদিন আগে দ্বিতীয়বার নিড়ানি দেওয়া হয়। এর সপ্তাহখানেক পরে অর্থাৎ ধানের দানায় সবে যখন দুধ দেখা দেয় তখন ঐ জমিতে ধানের মধ্যে বিড়ি কলাই বিঘাপ্রতি তিন সের হিসাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। প্রয়োজনবোধে কলাই বোনার আগে ২-৩ বার জমিতে জলসেচ করা দরকার হতে পারে। কিন্তু বিড়ি কলাই বোনার পরে কোন সেচ দেওয়া হয় না। কারণ ঐ সময় সেচ দেওয়া হলে ধানগাছগুলি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বিড়ি কলাই-এর জন্ম জমি বেশি ভিজে বা বেশি শুকনো থাকা উচিত নয়। মাটিতে প্রয়োজনমত জো থাকা বাঞ্ছনীয়। আশ্বিনের প্রথমাংশে কিংবা শেষাশেষি ধান কাটা হয়। যে জমিতে ধানের সঙ্গে বিড়ি কলাই বোনা হয় সেখানে কলাই গাছের মাথার উপর থেকে ধান কাটতে হয়। তখন কলাই গাছ ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি মত উঁচু থাকে। সুতরাং ১০-১২ ইঞ্চি ধানের গোড়া বাদ দিয়ে ধান কাটা হয়। ধান কাটার পর কলাই গাছগুলি পুষ্ট ও সতেজ হয়ে ওঠে। কলাই-এর জমিতে প্রায় কোন বছরই জলসেচ দিতে হয় না। তবে যদি অনাবৃষ্টির জন্ম জমি একেবারে শুকিয়ে ফাটল ধরতে সুরু করে তবে ২-১ বার সেচের দরকার হয়। কলাই-এর চাষে কোন সার দেবার দরকার হয় না। প্রতি বছর কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে কলাই তুলে নেওয়া হয়। কলাই তুলে নিয়ে ঐ জমি আলু-চাষের জন্ম তৈরি করা হয়। ১০-১২টি চাষ দিয়ে মাটি কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর করে ধূলার মত করা হয়। আলুর জমিতে কেবলমাত্র সরষের খইল বিঘাপ্রতি ৮ মণ হিসাবে দেওয়া হয়। নৈনিতাল আলু চাষ করতে বিঘাপ্রতি ২॥ থেকে ৩ মণ বীজ-আলু লাগে। প্রতি দেড় ফুট অন্তর লাইন করে প্রতি লাইনে দেড় ফুটের মধ্যে তিন টুকরো আলু-বীজ বসান হয়। আলু বসানোর আগে জমিকে সোজা মাপ করে লাইন টেনে ৩০ হাত দৈর্ঘ্য এক একটি লাইনে চার সের গুঁড়ো খইল দেওয়া হয়। এইভাবে খইল ব্যবহার করলে বিঘাপ্রতি ৮ মণ সরষের খইল দরকার হয়। শ্রীযুত ঘোষের বিশেষ অভিজ্ঞতা এই যে, আলু-বীজ রোপণের পর কেবলমাত্র খইল প্রয়োগ না করে তার সঙ্গে যদি বিঘাপ্রতি ৩ মণ হিসাবে শুকনো ছাগলের নাদি গুঁড়ো করে এবং বিঘাপ্রতি দুই মণ হিসাবে ধানের আকড়া-পোড়ান ছাই দেওয়া যায় তা হলে ফসল খুব ভাল হয় এবং গুদামজাত আলুতে পচনও খুব কম হয়। আলু বসানোর ২-৩ দিনের মধ্যে প্রথমে মাটি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ আলু গাছের দৈর্ঘ্য যখন ৫-৬ ইঞ্চি তখন প্রথমবার মাটি চাপান হয়ে থাকে। কিন্তু শ্রীযুত ঘোষ বলেন যে, সব আলু-বীজ একসঙ্গে অঙ্কুরিত হয় না বা সব গাছ সমান ভাবে বাড়ে না। সেইজন্ম আলুর কল সামান্ত গজাবার সঙ্গে সঙ্গে গাছে মাটি দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। গাছগুলি ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা হলে পর বিঘাপ্রতি ৪ মণ হিসাবে খইল গুঁড়ো (অর্থাৎ ৩০ হাত লম্বা লাইনে প্রত্যেকটিতে দুই সের হিসাবে খইল গুঁড়ো) দিয়ে দ্বিতীয়বার গোড়ায় মাটি পুঁড়ে দেওয়া হয়।

আলু তোলার প্রায় ১॥ মাস আগেই ঐ জমিতে সেচ দিয়ে নালার মধ্যে বা পাশে ৬ হাত অন্তর (৬ × ৬) কুমড়ো বীজ লাগান হয়। বীজ লাগানর ২ মাস পরে বিঘাপ্রতি ১ মণ খইল ও ৫ সের অ্যামোনিয়ম সালফেট দেওয়া হয়। প্রতি মাদায় ২-৩টি করে গাছ রেখে বাকিগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়। প্রায় তিন-চার দিন পর পর এই জমিতে জল দিতে হয়। এইভাবে জল দিয়ে জৈষ্ঠ্যের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে কুমড়ো তুলে নেওয়া হয়। এর পর আবার পর্যায়ক্রমে ঐসব ফসলের চাষ চলতে থাকে। শ্রীযুত ঘোষ ঐ চারটি ফসলের যে ফলন পান তা বেশ সন্তোষজনক, বিশেষ করে তাঁর কুমড়োর ফলন সত্যিই খুব ভাল।

১৯৪৯-৫০ সন থেকে ১৯৫৩-৫৪ সন পর্যন্ত শ্রীযুত ঘোষের উপরি-উক্ত তিন বিঘা জমিতে যে হারে ফসলের ফলন হয়েছে তার তালিকা মূল্যসহ নীচে দেওয়া গেল :

সন	আউশ ধান		বিড়ি কলাই		আলু		কুমড়ো		
	মণ	মূল্য টাকা	মণ	মূল্য টাকা	মণ	মূল্য টাকা	মণ	মূল্য টাকা	মোট মূল্য টাকা
১৯৪৯-৫০	৩০	১৮০	৫	৮০	১২০	১,৪৫০	২০০	৮০০	২,৫১০
১৯৫০-৫১	৩২	১৯২	৫।	৮৪	১২৫	১,৫০০	২১৪	৮৫৬	২,৬৩২
১৯৫১ ৫২	৩৫	১৭৫	৫	৭০	১২৭	১,২৭০	২১৪	৭৮৪	২,২৯৯
১৯৫২-৫৩	৪০	২২০	৫॥	৮২॥০	১৩৫	১,৩৫০	২৫০	১,২৫০	২ ৯০২॥০
১৯৫৩-৫৪	৫৬	৩৯২	৬॥	৯১	১৬০	২,২৪০	৩০০	১৫.০০	৪.২৩"

এই বিবরণটিও খুবই আশাপ্রদ ও চমকপ্রদ ; লেখক শ্রীযুত ফণীভূষণ ঘোষ মহাশয়কে এই সম্পর্কে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন উত্তরপান নাই। আশা করি, এই বিবরণ পূর্ব্বেকার বিবরণের স্থায় কাগজে ফসল না ফলাইয়া জমিতে ফলাইবে।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ্

(Central Social Welfare Board)

দেশ স্বাধীন হইবার পর চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশের অনগ্রসর নারীজাতি ও শিশুকল্যাণের কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং ১৯৫৩ সালের আগষ্ট মাসে (কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ্ সেণ্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড) নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখ এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। নারীর সামাজিক উন্নয়ন ও শিশুকল্যাণমূলক কাজ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে চার কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

দেশের অধিবাসীদিগের সহিত ব্যাপক সহযোগিতা-লাভের উদ্দেশ্যে, ১৯৫৪ সনে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেও অনুরূপ বোর্ড স্থাপন করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও একজন চেয়ারম্যান ও আট জন সদস্য লইয়া একটি পর্ষদ (Board) গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা রমলা সিংহ এই পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং ডাঃ ফুলরেণু গুহ ইহার সেক্রেটারী বা কর্ম্মসচিব। অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে আছেন—শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাক্সার, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, মিসেস আয়েষা আমেদ, শ্রীযুক্তা লাবণ্য-প্রভা দত্ত, মিসেস কাজ্জী, শ্রীযুক্ত ডি. এম. সেন ও শ্রীযুক্তা অণিমা বসাক। এই বোর্ডের কাজ দ্বিবিধ :

১। যে সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন করিবেন, তাহাদের কার্য্যকলাপ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের আবেদনপত্র অনুমোদন করা।

২। বাংলা দেশের প্রতি জেলায় সতর-আঠার হাজার অধিবাসী লইয়া এক একটি ব্লকে শিশু এবং নারীর স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কার্য্য পরিচালনা করা।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলায় একটি ও কলিকাতার উপকণ্ঠে তিনটি, মোট সতরটি ব্লক পশ্চিমবঙ্গে গঠন করা হইবে। প্রতিটি ব্লকে ৬।৭টি কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া কাজ করা হইবে। প্রতি কর্ম্মকেন্দ্রে দুই জন কর্ম্মী থাকিবেন। বিভিন্ন সমাজ-সেবা-সমিতির আট জন প্রতিনিধি ও একজন সরকারী কর্ম্মচারী, মোট নয় জন লইয়া একটি পরিচালনা সমিতি গঠন করিয়া প্রতিটি জেলায় কাজ করা হইবে।

এই সব কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে শহর হইতে দূর দূরান্তরে অবস্থিত গ্রামের ভিতরে এবং এই সব কেন্দ্রে শিশুদের জন্য চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ, ব্যায়ামকেন্দ্র, ব্রতচারী শিক্ষা, গার্লস গাইড ও বয়েজ স্কাউট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইবে।

নারীদের জন্য সন্তান-প্রসবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালীন স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, সমাজ-উন্নয়ন ও বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র, মহিলা সমিতি সংগঠন, হস্তশিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে।

গত ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিবসের পুণ্যতিথি উপলক্ষে নিম্নলিখিত চারিটি স্থানে এবং ২২শে অক্টোবর নদীয়া জেলায় এই কর্ম্মকেন্দ্রের উদ্বোধন হইয়াছে।

১। জোকা বিষ্ণুপুর—২৪ পরগণা।

হাঁসপুকুর, হরিদেবপুর, মোয়াবাদ, মগরখালি, খড়বেড়িয়া, ভাসা ও ইহাদের আশপাশের গ্রামের ১৬,৬২৩ জন অধিবাসী লইয়া এই ব্লক গঠিত হইয়াছে। এই ব্লকের নিম্নলিখিত গ্রামগুলিতে ছয়টি কেন্দ্র খোলা হইবে।

খড়বেড়িয়া, উত্তর কাজির হাট, চক্-ঠাকুরাণী, দুলালপুর, ও ব্রতচারীগ্রাম।

২। কালিকাপুর প্রতাপনগর ব্লক।

কালিকাপুর, মুড়াগাছা, চক্‌বেড়িয়া, প্রতাপনগর, নাজির হাট, দক্ষিণ ও উত্তর সাগুর ও তৎসংলগ্ন গ্রামের ১৫,৪০৮ জন অধিবাসী লইয়া এই ব্লক গঠিত।

৩। মধ্যমগ্রাম ব্লক।

মধ্যমগ্রাম, চক্রঘাটা, উদয়রাজপুর, কোরা, গঙ্গানগর ও তৎসংলগ্ন গ্রামের ১৬,৬৬৫ জন অধিবাসী লইয়া গঠিত।

নিম্নলিখিত স্থানে সাতটি কেন্দ্র খোলা হইবে।

তাঙ্গধরিয়া, চক্রঘাটা, উদয়রাজপুর কোরা, গঙ্গানগর, আবদুলপুর ও মোল্লাপাড়া।

৪। হুগলী ব্লক।

সাতবেরিয়া, রাঙ্গামাটি, কামারপুকুর, শ্রীপুর, মদনমোহন-ও তৎসংলগ্ন গ্রামের ১২০০০ অধিবাসী লইয়া গঠিত।

৫। নদীয়া ব্লক।

দেপাড়া, আসননগর, কৃষ্ণগঞ্জ, চাপড়া, ভীমপুর, গোড়াগাছা, ভাণ্ডারখোলা, মাবদিয়া ইত্যাদি ইউনিয়নের অন্তর্গত ১৮,২০৫ জন অধিবাসী লইয়া গঠিত।

এই ব্লকে ছয়টি কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

আগামীকালের নির্ম্মাতা

শ্রীরত্নপ্রভা রায়

"আমাদের শিশুরা কেবল আমাদের প্রিয়ই নহে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই জাতির সম্পদ। আমাদিগকে এই সম্পদ রক্ষা করিতে হইবে।"
—শ্রীজবাহরলাল নেহরু

একটি চমৎকার কারুকার্য্যখচিত মন্দির-স্তম্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান দুইটি শিশুর মধ্যে আলোক-চিত্র-শিল্পী মদনজিৎ সিং ভাবীকালের নির্ম্মাতাযুগলকে প্রত্যক্ষ করিলেন। হাঁ, ছয় ইঞ্চিরও কম কাপড় কোমরে জড়ানো এই যে দুইটি শিশু, ইহারা বাস্তবিকই আগামীকালের নির্ম্মাতা—এই উক্তির মধ্যে ব্যঙ্গের লেশমাত্রও নাই।

ভবিষ্যৎ

সমস্ত মানব-সমাজের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, সামনের সুদূরপ্রসারিত বিরাট শূন্যতার দিকে তাকাইয়া তাহারা অস্ফুটস্বরে কি বলিতে থাকে, তাহা যদি কেহ আমাকে বলিতে পারিত! তাহারা কি এই পৃথিবীতে জানা-অজানা সকল দেবদেবীর নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে—নিজেদের ক্ষুধার জ্বালা মিটাইবার জন্য, এক মুষ্টি খাদ্যের জন্য অথবা দেহ আচ্ছাদিত করিবার উপযোগী একটি মাত্র বস্ত্রখণ্ডের নিমিত্ত। কি তাহাদের কামা—অজ্ঞানতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানের কণা; আশ্রয়ের জন্য একটি ক্ষুদ্র ছাদ, অথবা এমন কোনও ব্যক্তি যিনি ভাবীকালের নির্ম্মাতারূপে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে পারেন।

তাহারা কি চিন্তা করিতেছে তাহা বলিব। তাহারা তাহাদের দেশকে এমন এক বীরত্বময় সংগ্রামের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়াছে, যাহা পরিণতি হইয়াছে স্বাধীনতা অর্জনে। তাহারা পাঁচ বৎসরের—পরবর্ত্তী আরও পাঁচ বৎসরের এবং তাহারও পরে আরও পাঁচ বৎসরের এক পরিকল্পনার কথা শুনিয়াছে, যাহা ভারতকে এক সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করিবে। সেই দেশ তাহাদের প্রাণস্পন্দনে তাহাদের পৌর শক্তিতে সঞ্জীবিত হইবে, তাহাদের মনের সৃষ্টি এবং ন্যূনতম কর্ম্মের দ্বারা বাঁচিয়া থাকিবে। সেই দেশ তাহার উন্নয়নকার্য্য এবং সমৃদ্ধির অংশ হইবার জন্য এই শিশুদ্বয়কে সমান সুযোগ প্রদান করিবে। তাহারা আপনাদেরই দায়স্বরূপ অবশ্য, সরকারী পরিকল্পনাকারিগণ, অথবা কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ তাহাদিগকে প্রচুর খাদ্য, বস্ত্র, আক্ষরিক এবং জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী বৃত্তিমূলক এই উভয়বিধ শিক্ষাদানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা আপনাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। আমরা সকলে যদি তাহাদিগকে সুযোগ দিই তাহা হইলে তাহারা কড়ি-বরগা জড়ো করিবে, ইটের পর ইট বিন্যাস করিবে আগামী-কালের সৌধ গড়িয়া তুলিবার জন্য। তাহারা এক মহান্ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, তাহারা আমাদের ভবিষ্যতের সমান অংশীদার, আমাদের সকল শুভসঙ্কল্পের পরশপাথর।

আমাদের অজানা সৈনিক

শ্রীফ্রেডা এম্. বেদি

"আপনি কি আত্তর সিংহের বুটজুতো দেখেছেন?" মহম্মদ আফজল এক দিন জিজ্ঞেস করলেন। আমরা বাস্তুহারাদের মধ্যে পুরনো মজবুত 'আর্মি' বুটজুতো বিতরণ করছিলাম—বিনামাহীন বাস্তুহারাদের নিকট বাস্তবিকই এগুলো অমূল্য সম্পদ। তখন কাশ্মীরের ১৯৪৭-৪৮-এর শীতের নির্মম আক্রমণের মাঝামাঝি সময়। মাটির উপরে মাসেক কাল ধরে তুষারপাত হয়েছে, জমে উঠেছে প্রায় দুই ফুট উঁচু তুষারস্তূপ এবং আরও দু'মাস তা বিদ্যমান থাকবে অটুট অবস্থায়।

সত্য বলতে কি, আত্তর সিংহের বুট জুতোর দিকে আমি তাকাই নি। সে সীমান্ত অঞ্চলের মুজফ্‌ফরাবাদ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অন্যতম ছিল বটে, কিন্তু আগেই সে আমার কাজে যোগ দিতে আমার কাছে এসেছিল এবং আমার একজন স্বেচ্ছাসেবক হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। যে অঞ্চল সে পিছনে ফেলে এসেছে, সেদিক পানে ইঙ্গিত করে সে বললে, "ওই ওখানে একটি গ্রাম্য স্কুলে আমি ছিলাম এক জন শিক্ষক।" আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তার প্রস্তাবে রাজী হলাম, কেনন, কতকগুলো কঠিন কাজের যথোচিত ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপিসে যে কয়জন সমবেত হয়েছিল তাদের আমি জিজ্ঞেস করলাম, "চট্টি বাদশাহীর শিশুদের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ করবে কে?" যাবতীয় কর্তব্যের মধ্যে এইটিই ছিল দুরূহতম। এর মানে হচ্ছে অতি প্রত্যুষে তুষারের উপর দিয়ে ছয় মাইল হাঁটা আর রাত্রে ঐ পথেই ছয় মাইল ফিরে আসা।

সেই অতিপরিচিত শান্ত হাসি হেসে আত্তর সিং বললে, "আমি পারব।"

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে কাজটি সম্পন্ন করেছিল—সমস্ত পীড়িত শিশুর সম্বন্ধে সে রিপোর্ট দাখিল করত, তাদের জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করত। তার ঘন লাল রঙের একমাত্র পাগড়িটি এবং তার হাসি আমাদের সবাইকে পুলকিত করে তুলত। এত চোখের জল আমাদের দেখতে হ'ত যে, তাঁর প্রফুল্ল আননের দিকে তাকিয়ে বাস্তবিকই আমরা স্বস্তিবোধ করতাম।

"তাকে অনেকখানি রাস্তা হাঁটতে হয়," বললেন মহম্মদ আফজল। আমি বুটজুতাজোড়ার দিকে তাকালাম। সেগুলোর 'সোল' প্রায় ছিল না বললেই চলে। সামনের দিকের সোলের নীচে ছিল একটা বড় ছেঁদা এবং একটা ছেঁড়া খাটো মোজার ভেতর দিয়ে একটি লাল, ফুলে-উঠা পা দেখা যেত।

সে যে তার বুটজোড়া পেয়েছিল সেকথা অবশ্য আমাকে নির্বিচারে বিশ্বাস করতে হ'ল এবং তখনই আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হ'ল যে, আমার অধিকাংশ উদ্বাস্তু-কর্মীই সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের শোচনীয় কাহিনী আমাকে বলেছিল বটে, কিন্তু আত্তর সিংহের বক্তব্য কখনও শুনেছি বলে আমার মনে পড়ল না। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় আমি বলে

শিশুকেন্দ্র

বললাম, "তোমার কাহিনী আমাকে বল, আত্তর সিং!" যে সকল টাটকা ক্ষতস্থান থেকে শোণিতক্ষরণের ফলে দুঃসহ যন্ত্রণাভোগের সম্ভাবনা সেগুলোর উদ্ঘাটনে সাধারণতঃ আমি বিরত থাকতাম, কিন্তু আত্তর সিং সকল সময়েই এরূপ প্রশান্ত ভাব ধারণ করে থাকত যে, আমার মনে পুরোপুরি না হলেও এই ধরণের আশার সৃষ্টি হ'ল—তার কাহিনী হয় ত খুব নিদারুণ কাহিনী না-ও হতে পারে।

"আমি একা"; সে বললে "আক্রমণকারীরা আমার সামনে আমার দুই পুত্রকে গুলি করে মেরেছিল। আমার স্ত্রী হয়েছিল ধর্ষিতা, আমার আর দুটি ছেলে, আমার তিন বছরের শিশুকন্যা, সবাই তারা হারিয়ে গেছে। আমার স্ত্রীর জন্তে আমার দুশ্চিন্তার সীমা নেই, সে ছিল অন্তঃসত্ত্বা···আর আমার ছোট্ট মেয়ে···তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

"কিন্তু সব সময় তোমাকে এত হাসিখুশী দেখাত আর তুমি এরূপ কঠোর পরিশ্রম করতে···" এর বেশী আর কিছু আমি বলতে পারলাম না। সহজ এবং স্বাভাবিক কণ্ঠেই সে বললে, "যদি কাজ না করি তা হলে কেমন করে আমি বাঁচব?"

এর পর আমরা আর কখনও এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নি। এমনি ভাবে শীতকাল অতিবাহিত হ'ল, দুগ্ধ বিতরণ কিন্তু চলল যথারীতি। গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকে এক দিন আত্তর সিং একখানা চিঠি নিয়ে এসে হাজির—খুশীতে ঝলমল করছে তার মুখ। "আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে," সে বললে, "এবং তাকে নিয়ে আসবার জন্তে আমি যাচ্ছি অমৃতসরে।"

ভ্রমণের পক্ষে যথেষ্ট টাকা-পয়সা তার ছিল না বললেই চলে, তদুপরি পঞ্জাবে তার কোনো কাজকর্ম্মও ছিল না। কিন্তু আমি দিল্লী থেকে একখানি পোষ্টকার্ডে সুসংবাদ জানতে পারলাম—তাতে সে লিখেছে, "আমার স্ত্রী অমৃতসরে একটি ছেলের জন্মদান করেছে, এবং আমি দিল্লীতে কাজ সুরু করেছি।"

এ হ'ল বছর পাঁচেক আগেকার কথা। মার্চ্চ মাসে সম্পাদকমণ্ডলী স্থির করলেন যে, পত্রিকায় "আমাদের অজানা সৈনিক"—এই নামে একটি নিয়মিত নূতন বিভাগ খুলবেন। চকিতে আমার মনে পড়ে গেল আত্তর সিংহের কথা। তার সম্বন্ধে যখন আমরা আলাপ করছিলাম, তখন আমার মনের ভাবনা আমার মুখে উচ্চারিত হয়ে উঠল, "আমি অবাক্ হচ্ছি এই ভেবে যে, তার কি হ'ল?"

এক দিন বিকেলে আত্তর সিং এসে হাজির হ'ল আপিসে, সেই হাসিটি লেগেই আছে তার মুখে। মাথায় তার সাদা পাগড়ি, দাড়ি কম ছাঁটা, কিন্তু অধিকতর পাকা। "আমি শুনলাম যে, আপনি দিল্লীতে গিয়েছিলেন, আর আমি সেখানে ঘরে ঘরে আপনার খোঁজ করেছি।"—সে বললে। "তোমার পরিবার···?" এই একটি মাত্র প্রশ্ন বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে। "ওঃ, সে কথা," সে জবাব দিলে, "আমার দুটি ছেলেকে উদ্ধার করা হয় চার বছর পরে, এমন কি আমার ছোট মেয়েটিকে পর্য্যন্ত ফিরিয়ে আনা হয়েছে।" তার কণ্ঠস্বরে অপরিসীম পরিতৃপ্তি—"খুকু এখন স্কুলে যাচ্ছে। আমি একটি 'ড্রাই ক্লিনার' (জল না দিয়া ময়লা কাপড় পরিষ্কার করার দোকান) খুলেছি। নিজের কারবার থাকা সকল সময়েই ভাল।"

নারীজাতি ও শ্রমিক-কল্যাণ

শ্রীপদ্মিনী সেনগুপ্তা

মানুষ যখন হাতের কাজ সুরু করে এবং নিজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করিয়া জীবন-যাত্রার অবস্থার উন্নয়নের জন্ত কার্য্যে ব্রতী হয়, শ্রমিক-কল্যাণের প্রশ্ন তখনও উত্থাপিত হয় নাই। ইহার একমাত্র হেতু এই যে, তখন কোনও শ্রমিক দল ছিল না, এবং মালিক ছিলেন একাধারে মনিব ও ভৃত্য দুই-ই। যদিও কালক্রমে ক্ষুদ্র আকারের এবং অপরিণত শিল্পসমূহের উদ্ভব হইতে লাগিল তথাপি প্রকৃতপক্ষে বাষ্পীয় শক্তির প্রবর্ত্তনের দরুন কারখানায় শ্রম-শিল্পের নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি হওয়ার পরেই একক কর্ম্মীরা আড়ালে চাপা পড়িয়া গেল এবং বৃহৎ শ্রমিক দলের কর্ম্মে নিয়োগের ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক-কল্যাণ-সমস্যার সৃষ্টি হইল। শিল্পসমূহের যতই বিকাশসাধন হইতে লাগিল ততই স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন, কর্ম্মের অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি বিষয়ের উপর ক্রমে ক্রমে অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইতে লাগিল এবং ইহাও প্রতীয়মান হইল যে, শ্রমিক শুধু যান্ত্রিক উৎপাদনের প্রকাণ্ড আবর্ত্তনশীল চক্রের অংশ মাত্র নহে, সেও রক্তমাংসের দেহধারী মনুষ্য। শ্রমিক হইল মজুরি-উপার্জ্জক, আর তার মনিব হইলেন উৎপাদনের উপকরণসমূহ এবং উৎপাদিত দ্রব্যনিচয়ের মালিক। কাজেই শ্রমিক এবং মনিবের

মধ্যে স্বার্থ-সংঘাতের সূচনা দেখা দিল এবং অবশেষে 'এতাদৃশ স্বার্থ-সংঘাতের মীমাংসার জন্য উপায় উদ্ভাবন' আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। শ্রমিক কল্যাণের প্রশ্নটি আজ এরূপ সুদূর-প্রসারী হইয়াছে যে, প্রত্যেক জাতিই আজ অনুভব করিতেছে—শ্রমশিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মীদের সন্তুষ্টির উপর দেশের সুখ-শান্তি বহুলপরিমাণে নির্ভর করে। স্বাধীন ভারতবর্ষও এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উপর জোর দিতেছে।

শ্রমিক কল্যাণ জিনিষটা কি? ইহা হইতেছে—রাষ্ট্র, মনিব, ট্রেড ইউনিয়ন এবং স্বেচ্ছাকর্ম্মী এই চতুর্বিধ মাধ্যমের সাহায্যে শ্রমিকের জীবনকে এমন-ভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে বাঁচিয়া থাকার আনন্দকে সে উপভোগ করিতে পারে। আজ যখন এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এক বিশেষ ধরণের কর্ম্ম-পদ্ধতি অবলম্বন অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন আর একটি বিষয়ের গুরুত্বও সমধিক বৰ্দ্ধিত হইয়াছে—তাহা এই কার্য্যের জন্য কেবার অফিসার নিয়োগ। তিনি হইতেছেন মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে যোগ-স্থাপনকারী অফিসার। বেতনভোগী কর্ম্মচারী অপেক্ষা একজন অকপট মিশনরীর দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁহার হওয়া উচিত, নির্ভর হাজার হাজার শ্রমিকের সুখসৌভাগ্য নির্ভর করে তাঁহার সুষ্ঠু ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপর।

অলঙ্কার-পরিহিতা শ্রমিক নারী

আমাদের সরকারের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের বিষয় যে, স্বল্প-কালের—মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে শ্রমিক-কল্যাণমূলক বেশ কতকগুলি আইন যথারীতি প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং এই কাজকে অধিকতর ফলপ্রসূ করিবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই এগুলি বলবৎ হইবে। তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে—'নিউ ফ্যাক্টরিজ এক্ট' বা নূতন কারখানা আইন। বিভিন্ন ধরণের ও প্রয়োজনীয় সমস্যাসমূহ ইহার অঙ্গীভূত এবং উৎকৃষ্টতর কর্ম্ম পরিবেশ সৃষ্টি, ক্যান্টিন, উত্তম পায়খানা, কল্যাণকেন্দ্র, শ্রমিক স্ত্রীলোকদের কার্য্যে রত থাকাকালীন শিশু রক্ষণাগার, এম্বুলেন্সের সুযোগ-সুবিধা, চিকিৎসালয়, কয়লা এবং পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহ, বিশ্রান্তিকক্ষ, চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদের কারখানায় কর্ম্মে নিয়োগ সম্বন্ধে কড়াকড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন বাবস্থা অবলম্বন এই আইনের লক্ষ্য। তা ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষের সহ-যোগিতায় উপরোক্ত বিষয়গুলির তত্ত্বাবধানের জন্ম উন্নয়ন কর্ম্মচারী নিয়োগের দিকেও এই আইনের দৃষ্টি থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত এমন আরও কতকগুলি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে যাহাতে শ্রমশিল্পে নিয়োজিত কর্ম্মীর জন্ম রাষ্ট্র, উৎকৃষ্টতর কর্ম্ম এবং উত্তম জীবন-যাপন-ব্যবস্থার উপর জোর দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'এম্প্লয়িজ ষ্টেট ইনস্যুরেন্স এক্টে'র কথা—যাহা ইতিমধ্যেই দিল্লী এবং কানপুরে বলবৎ হইয়াছে এবং যাহা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হইবে। এই আইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কার্য্যকরী হইলে ইদানীং নিদারুণ ভাবে উপেক্ষিত শ্রমিকের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী।

ভারতের বিভিন্ন শ্রমশিল্পে নিয়োজিত নারী-শ্রমিকের মোট সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ। গ্রেট ব্রিটেনের তুলনায় এই সংখ্যা অপেক্ষাকৃত ঢের কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সেখানে সাত লক্ষ নারী—শ্রমিকদের দলের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাজ্যের কারখানার শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশই নারী। ভারতবর্ষে সংখ্যার এই স্বল্পতাসত্ত্বেও কিন্তু রাষ্ট্র কতিপয় নারী 'লেবার অফিসার' নিয়োগ করিয়া তাহাদের কল্যাণের দিকে সযত্ন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। মাতৃমঙ্গল সহায়ক আইন, যে সকল কারখানায় পঞ্চাশ জনের অধিক স্ত্রীলোক কর্ম্মে নিযুক্ত আছে সেগুলিতে শিশু-রক্ষণাগারের ব্যবস্থা, কাজের সময় বাঁধিয়া দেওয়া (কোনো স্ত্রীলোককে সকাল ছয়টার আগে এবং রাত সাতটার পরে কাজ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না), ভারী দ্রব্য উত্তোলন এবং প্রসাধন ও বিশ্রামের পৃথক বন্দোবস্ত—এই সকল গুরুত্বপূর্ণ, আইন-অনুমোদিত বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিতেছেন। 'সমান কাজের জন্ম সমান মাহিনা'—এই নীতির উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা আমাদের দেশের নারী শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। যুদ্ধকালে পাটকলসমূহের সেই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের কথা আমার মনে পড়ে যখন নারী শ্রমিককে মাঝরাতে টর্চ্চ হাতে লইয়া শ্রান্ত পদক্ষেপে কাজ করিতে যাইতে হইত। কোনো গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে স্ত্রীলোকদিগকে কয়লাখনির তলদেশে পর্য্যন্ত যাইতে হইত, কিন্তু ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে, সেই ব্যবস্থা এখন লোপ পাইয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে যে, শ্রমশিল্পে নিয়োজিত কর্ম্মীর এবং বিশেষভাবে নারীদের কল্যাণ-প্রচেষ্টা সন্তোষজনক মানে (Standard) পৌঁছিয়াছে। আরও অনেক কিছুই করিবার রহিয়া গিয়াছে। শুধু রাষ্ট্রেরই নয়, নারী-কল্যাণকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকতরসংখ্যক নারী 'লেবার অফিসার' নিয়োগ করিবার বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ইদানীং অনেক শ্রমশিল্পের ক্ষেত্র হইতে নারী-শ্রমিকদিগকে ছাঁটাই করিবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছে। এই ক্রমিক ছাঁটাইয়ের দরুন কতকগুলি শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে নারী-শ্রমিকদের উন্নয়ন-কার্য্য উপেক্ষিত হইতেছে। ইহা কিন্তু দুঃখের বিষয়।

ভারতীয় শ্রমিকদের উন্নয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কেননা তাহারা চিরাচরিত প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধনে আবদ্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং তাহাদের পুরুষ-ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞ। নারী শ্রমিকেরা একবার জনৈক উৎসাহী নারী 'ওয়েলফেয়ার অফিসার' কর্ত্তৃক উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে কাঁচা টম্যাটো খাইতে উপদিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা কিন্তু টম্যাটোগুলি সাড়িতে জড়াইয়া রান্না করিবার জন্ম বাড়ীতে লইয়া যায়। যদি না স্ত্রীলোকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানান্তে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, রান্না-করা টম্যাটো অপেক্ষা কাঁচা টম্যাটো অধিকতর পুষ্টিকর, তাহা হইলে আমাদের অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা কি ভাবে তাহাদের পূর্ব্ব-সংস্কারসমূহ কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইবে?

প্রশ্ন হইতে পারে, নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে উপযোগী, শ্রমিক-উন্নয়নের প্রধান প্রধান অঙ্গ কি কি? কিন্তু নারীরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদের কথা গভীর ভাবে চিন্তনীয় এবং তাহাদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন: কারখানাগুলিতে কাজের একঘেয়েমি, বহুক্ষণ ঠায় দাঁড়াইয়া থাকা প্রভৃতি গুরুতর সমস্যা বিদ্যমান এবং ভারতের অধিকাংশ শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানে ধূলির বহর, হট্টগোল, বিশ্রামস্থলের অভাব প্রভৃতি সমস্যাও আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে। এই সমুদয়েরই প্রতিকার হইতে পারে এবং ধীরে ধীরে হইতেছেও, কিন্তু আমাদের দেশে এগুলি নির্ম্মূল হইতে বহু সময় লাগিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কাজের সময়

একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য বাদ্যযন্ত্র বাদনের কথা আমাদের দেশে কদাচিৎ কেহ চিন্তা করিয়া থাকেন। অন্যান্য অধিকাংশ দেশেই এই কল্যাণমূলক ব্যবস্থাটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তারপর আবার কারখানার দৃশ্য যাহাতে অধিকতর প্রীতিকর হয়, সে ব্যবস্থা করারও প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। আমি অবগত আছি যে, জাপানে নারীরা যেখানে কাজ করে তাহার প্রত্যেক সারির প্রান্তে এই উদ্দেশ্যে এক একটি জলাধার স্থাপিত হইয়াছে যে, নারীরা সেখানে যেন এমন কিছু দেখিতে পায় যাহা মনোরম। আমাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধূলি এবং স্বাস্থ্যহানিকর দূষিত পরিবেশ ছাড়া আর কিছুই নাই। এমনকি কারখানাগুলি পরিষ্কার করা সম্বন্ধেও যথোচিত যত্ন লওয়া হয় না। কাচের জানালাগুলি ধূলিতে ঢাকা, দেয়াল পানের পিকে রঞ্জিত, মেঝের উপর নানা জিনিসের টুকরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। হট্টগোলও এরূপ প্রকট যে, পরস্পরের কথাবার্ত্তা শোনা প্রায়ই হইয়া দাঁড়ায় অসম্ভব। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টাব্যাপী কাজের সময় বসিয়া বিশ্রাম করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না বলিয়া অনেক স্ত্রীলোককে দেহযন্ত্রের আভ্যন্তরিক অসুখে এবং স্থায়ী আকারের পিঠের বেদনায় ভুগিতে হয়।

শ্রমিক নারী

আমি ইহাও দেখিয়াছিলাম যে, অনেক শ্রমিক স্ত্রীলোক তালপাতা এবং তামাকপাতার মিশ্রণে তৈরি খৈনীর গুঁড়া তাহাদের কাপড়ে বাঁধিয়া রাখে। মাঝে মাঝে তাহারা কিছু কিছু করিয়া ইহা খায়। ইহা সাময়িক ভাবে তাহাদিগকে চাঙ্গা করিয়া তুলে বটে, কিন্তু ইহার দরুন পরিণামে অকালে তাহাদের দাঁত পড়িয়া যায় এবং পাইয়োরিয়ার সৃষ্টি হয়। এখানে বৃত্তিসঞ্জাত যাবতীয় ব্যাধির (Occupational disease) কথা উল্লেখ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, মাত্র দু'একটির কথা বলিতেছি। অনেক ফ্যাক্টরিতে সর্ব্বক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ধূলিকণা গ্রহণের দরুন প্রায়ই ফুসফুস ও কণ্ঠনালীর নানা অসুখের এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শ-হেতু নানাপ্রকার চর্ম্মরোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বহু বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণে একটি কাঁচের কারখানা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা আমার মনে পড়ে। আমি দেখিলাম, সেখানে প্রায় চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক বালকেরা গরম চুল্লিতে ফুঁ দিয়া কাঁচের গোলক এবং বাতির চিমনী তৈরি করিতেছে। প্রত্যহ ঘণ্টাকয়েক তাহারা এই কাজ করিত। ইহার দরুন নিশ্চয়ই তাহাদের ঠোঁটে স্থায়ী ঘায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। তারপর অন্য একটি ঘরে কতকগুলি স্ত্রীলোককে কর্ম্মরত অবস্থায় দেখিলাম, তাহা হইতে এক উৎকট রকমের গ্যাস এমন প্রচণ্ডভাবে নিঃসৃত হইতেছিল যে, আমার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, আমি ভিতরে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিলাম না। কেমন করিয়া সেখানে স্ত্রীলোকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করিতেছিল তাহা ভাবিয়া আমি অবাক হইলাম। এক্ষেত্রে বাস্তবিকই গুরুতর সমস্যাসমূহ বিদ্যমান যেগুলির সমাধানের জন্য রাষ্ট্র, কারখানার মালিক, ট্রেড-ইউনিয়ন, স্বেচ্ছাকর্ম্মী, লেবার অফিসার প্রভৃতি সকলেই দায়ী। এ বিষয়ে শ্রমশিল্প সংস্থা বা সরকারী বিভাগসমূহের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র।

অধিকতর কল্যাণমূলক কর্ম্মপদ্ধতি সযত্নে অনুসৃত হইলে এবং আরও বেশী বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগে শ্রমিকগণকে

দিয়া কাজ করাইলে দুর্ঘটনা নিবারণের ব্যবস্থাও হইতে পারিত। এখানে আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। হাতে এবং কোমরে ভারী গয়নাগাঁটি পরা হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদের অভ্যাস। একটি স্ত্রীলোক 'সফেনারে' পাটের যোগান দিতেছিল, হঠাৎ যন্ত্রের আকর্ষণে তাহার হাত ভিতরে ঢুকিয়া গেল, কিন্তু তাহার বালাগুলি অভ্যন্তরভাগে আটকাইয়া রহিল বলিয়া সে হাত বাহিরে টানিয়া আনিতে পারিল না। এ ধরণের দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে হইলে শুধু যে মেসিনের গার্ডদেরই সকল সময় সজাগ ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন তাহা নয়, স্ত্রীলোকদিগকে এরূপ ভারী গহনা পরিতে বারণ করাও আবশ্যক। শেষোক্ত বিষয়টির বেলায় কিন্তু তাহাদের পরম্পরাগত সংস্কারের কথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগকে ধীর, শান্তভাবে যুক্তি-বিচারের দ্বারা, বালা পরিয়া কারখানায় কাজ করিবার অভ্যাস বর্জ্জনের শিক্ষা দিতে হইবে। এক্ষেত্রেই ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং মনিবের বুদ্ধিকৌশলের প্রয়োজন।

শ্রমিকদের বাসস্থান সম্বন্ধেও নিরন্তর তত্ত্বাবধান এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সেবার অফিসারেরা শ্রমিকদের সাহচর্য্য পরিহার না করিলে তবেই এই তত্ত্বাবধান এবং সতর্কতা বাস্তবক্ষেত্রে সুফলপ্রদ হইতে পারে। উচ্চস্তর হইতে পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব দ্বারা শ্রমিকের বিশ্বাস উৎপাদন করা যাইবে না। কুলি-লাইন অথবা পাটকলে বসিয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে নারীদের সঙ্গে গল্প গাছা করিয়া আমি যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম তাহার মত আর কিছুই নহে। নারী-শ্রমিকের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যথেষ্ট সময় ও শক্তি নিয়োজিত করা আবশ্যক এবং আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি যে, তাহারা ইহার যোগ্য।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও শ্রমিক-কল্যাণ-কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত :

'মেটারনিটি বেনিফিট'সমূহের নির্ভুল বিতরণের হিসাব মেলানো, শিশু-রক্ষণাগার এবং ক্লিনিকগুলির তত্ত্বাবধান, প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং মহামারীর বিরুদ্ধে গ্রহণীয় প্রতিষেধক পন্থা নির্ণয়, সস্তা খাবারের দোকানে উত্তম খাদ্য সরবরাহ, শ্রমজীবী সংস্থা যাহাতে মহাজনদের পৃষ্ঠপোষকতা না করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি এবং ক্রেডিট ব্যাঙ্ক সংগঠন—ইহা ছাড়া অন্যান্য অসংখ্য কৃত্য শ্রমিক-উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ইহাও মনে করা ভুল যে, নারীরা কল্যাণকেন্দ্র এবং ক্লাবসমূহ দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না। জেনানা ক্লাবে অথবা নারীদের জন্য পৃথকীকৃত কক্ষগুলিতে আসিয়া তাহারা আনন্দ উপভোগ করে। সেখানে তাহারা রেডিও শোনে, খেলাধুলা করে এবং রান্না ও সেলাই করিতে শেখে এবং অক্ষরজ্ঞান লাভ করে। প্রাথমিক লজ্জাশীলতা একবার দূর হইলে, বহু নারী ক্রীড়া-কৌতুকে পর্য্যাপ্ত অংশ গ্রহণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন শ্রমিককে ভালবাসা। এই আসল চাহিদাটি মিটিলে আর সবকিছু ঠিক হইয়া যায়। শ্রমিকদের সম্পর্কে মানবতাবোধ না জন্মিলে, যে পরিমাণ ব্যবহারিক বিদ্যাই (technical knowledge) আয়ত্ত হোক না কেন তাহাতে কোনও কাজ হইবে না।

ঊনষাটটি পরিকল্পনার উদ্বোধন

২রা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী দিবসে ঊনষাটটি নূতন কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনার (Welfare Extension Project) উদ্বোধন হয়। এই বৎসরের ১৫ই আগষ্ট হইতে যে অপর আটাত্তরটি পরিকল্পনা চালু হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে এই ঊনষাটটি যুক্ত হওয়াতে পরিকল্পনাসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল ১৩৭টিতে।

এই ১৩৭টি প্রোজেক্টের কার্য্য পরিচালিত হয় 'ভলান্টারী ওয়েলফেয়ার অর্গেনাইজেশন' বা স্বেচ্ছাক্রিয় কল্যাণ-সংস্থাসমূহ কর্তৃক এবং তাহাদের মুখ্য কৃত্য হইতেছে—শিশু-মঙ্গল, নারীকল্যাণ, অপরাধপ্রবণ শিশু, অক্ষম এবং জড়বুদ্ধি শ্রমিক স্ত্রী-পুরুষের তত্ত্বাবধান। কেন্দ্রীয়-সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের এই কর্ম্মতালিকাকে এক দিক দিয়া সমাজ-উন্নয়নের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে, কেননা গ্রামাঞ্চলসমূহে এবংবিধ কল্যাণকর্ম্ম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা প্রথম এই প্রোগ্রামে করা হইয়াছে, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টার অংশ কতখানি, এই তালিকা তাহারও একটা দৃষ্টান্তস্থল।

পরিকল্পনার প্রথম গ্রুপ নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল :

অন্ধ্র ১২, আসাম ৪, বোম্বাই ৪, মধ্যপ্রদেশ ৮, মাদ্রাজ ৭, উড়িষ্যা ১০, হায়দরাবাদ ১০, পেপসু ১০, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ৪, ভূপাল ৫, দিল্লী ২, এবং বিন্ধ্যপ্রদেশ ২।

২রা অক্টোবর তারিখে যে অতিরিক্ত ৫৯টি প্রোজেক্টের উদ্বোধন হয় সেগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বিতরিত :

আসাম ২, বোম্বাই ৩, মধ্যপ্রদেশ ৭, মাদ্রাজ ৪, উড়িষ্যা ৭, পঞ্জাব ২, উত্তরপ্রদেশ ১৩, পশ্চিমবঙ্গ ৫, মহীশূর ১, সৌরাষ্ট্র ১০, হিমাচলপ্রদেশ ১, কচ্ছ ১, বিন্ধ্যপ্রদেশ ২।

ইহার দরুন ২,৭৯০টি গ্রাম এবং ২,৭৬ লক্ষ লোকের পক্ষে উন্নয়ন-প্রচেষ্টার দ্বারা উপকৃত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সমস্ত পরিকল্পনায় গ্রাম্য নারী-শ্রমিকদেরও কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং ইহা খুবই সম্ভব যে, এই ১৩৭টি প্রোজেক্টে ৪০০০ হাজার নারী-শ্রমিককে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবে।

মেলানেশিয়ার আদিবাসী

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মেলানেশিয়ানরা পৃথিবীর আদিমতম মানবগোষ্ঠীর ধারাবাহী। দক্ষিণ সমুদ্রের অন্যান্য অধিবাসীদের মত ছোট ছোট প্রবাল-দ্বীপে ইহাদের বাস। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সভ্য-জগতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শ এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে।

লম্বা ঘাসের শিরোভূষণ-পরিহিতা মালেকুলার কাংদং আদিবাসী স্ত্রীলোক

গীতি এবং গল্পের মাধ্যমে পরিচিত পোলিনেশিয়ানদের তুলনায় মেলানেশিয়ানদের সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ধরনের। রাজনৈতিক বোধ না থাকায় ইহারা কখনও রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয় নাই, গোষ্ঠী-প্রথাও ইহাদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় নাই—ইহাদের সমাজে অসংখ্য লোক একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—সুপরিণত ইতিহাসবোধও ইহাদের নাই। পোলিনেশিয়ান এবং মাইক্রোনেশিয়ান প্রভৃতি অন্যান্য দ্বীপবাসীদের অপেক্ষা ইহারা অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ, মাথার চুল ইহাদের শক্ত এবং কোঁকড়ানো। এইজন্য কেহ কেহ ইহাদিগকে আফ্রিকার আদিবাসী-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন।

গুডালক্যানালের দুইটি স্ত্রীলোক—মাথায় খাদ্যদ্রব্যে ভর্তি কাষ্ঠাধার

ভাষাগত বৈচিত্র্য ইহাদের সমাজের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রায়শঃ, এক হাজারেরও কম লোক এক ভাষায় কথা বলিয়া থাকে এবং ভাষাগত এই বিভিন্নতাই ইহাদের এক গোষ্ঠীর সহিত অন্য গোষ্ঠীর পার্থক্যের পরিচায়ক।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কোন কোন আদিম জাতির ন্যায় একদা ইহাদের সমাজেও নরমুণ্ড-শিকারের (Head-hunting) বহুল প্রচলন ছিল। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে ইহা কমিয়া আসিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। পাপুয়ান উপসাগর ও নিউগিনির বাসিন্দারা আত্মীয়স্বজন এবং শত্রু উভয়েরই মাথার
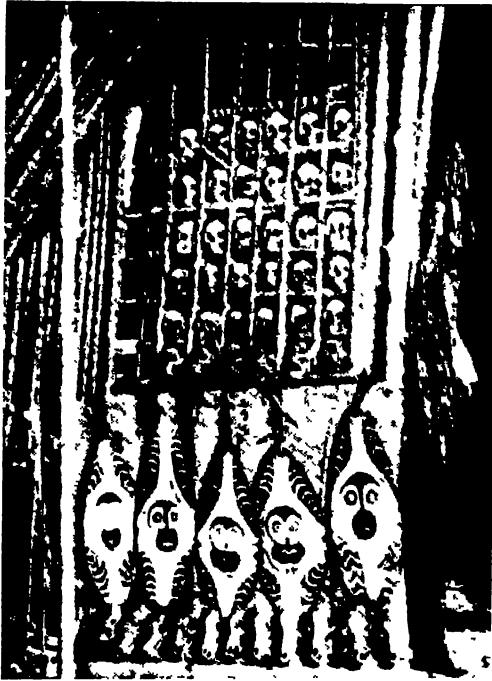
মেলানেশিয়ানদের পূজা-ঘরে রক্ষিত মড়ার মাথার খুলি—নীচেকার অংশের কাষ্ঠফলকে মনুষ্যমুখ উৎকীর্ণ

খুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে। পাপুয়ান-বিধবারা মৃত স্বামীর করোটি গলায় ঝুলাইয়া পরে। উৎসব-গৃহে তাকের মধ্যে মড়ার মাথার খুলি সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইয়া রাখা হয়। ইহার নীচেকার অংশের কাঠের ফলকে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিকট আকারের কতকগুলি মনুষ্যমুখ খোদিত থাকে। এই কাষ্ঠফলকগুলি অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয় এবং মৃতের শক্তিশালী আত্মার সহিত এগুলির সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা হয়। মৃত শত্রুর আত্মার কোপ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে, নরমুণ্ড-শিকার-অভিযানে নিহত শত্রুদের করোটির পাশেও এই সমস্ত কাষ্ঠফলক রক্ষিত হয়। উৎসবাদি উপলক্ষে বলি-দেওয়া শূকরের মাথার খুলিগুলি রাখা হয় এই কাষ্ঠফলকের নীচে।

মেলানেশিয়ার কোন কোন দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে এখনও নরমাংস-ভোজনের রেওয়াজ কিছু কিছু আছে। আগেকার দিনে ঘন ঘন মুখোমুখি লড়াইয়ের দরুন নরখাদকদের ভাগ্যে প্রচুর শিকার জুটিত। আজকাল তাহা বিরল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালে, প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিয়া, মৃতের গুণাবলীর অধিকারী হওয়া যাইবে এই বদ্ধমূল ধারণাবশতঃ বিজয়ীরা তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা তৈরি করিবার হাতিয়ার দ্বারাই নরখাদকেরা তাহাদের কাজ হাসিল করিত।

মেলানেশিয়ানদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি খুবই চিত্তাকর্ষক। সোলোমন দ্বীপের লংগু এবং গুয়াদালক্যানালের মেয়েরা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ অথবা অন্য কোন উপলক্ষে পায়ে হাঁটিয়া কোনও দূরবর্তী স্থানে যাইবার কালে, খাদ্যদ্রব্যে ভর্ত্তি একটি কাষ্ঠাধার মাথায় করিয়া বহিয়া লইয়া যায়। মা তাহার শিশু সন্তানকে কাকালের উপর একটি বস্ত্রবন্ধনীতে (sling) বসায় এবং একটি মাদুরের সাহায্যে রোদের তাপ হইতে তাহাকে বাঁচায়।

দ্বীপবাসীরা নিপুণ মৎস্যশিকারী। টোপ ফেলিয়া বড়শির দ্বারা এবং হরেকরকমের জালের সাহায্যে মাছ ধরা, বিষ-প্রয়োগে মাছ মারিয়া ফেলা, তীরধনু এবং বর্শা দ্বারা মাছকে ঘায়েল করা ইত্যাদি মৎস্যশিকারের যাবতীয় পদ্ধতি ইহারা অবলম্বন করিয়া থাকে। প্রায়ই ইহারা ডোঙ্গানৌকা হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাল ফেলিয়া মাছগুলিকে ঘেরাও করিয়া ফেলে এবং মাছ জালে আটকা পড়িলে বর্শার খোঁচায় ঘায়েল করে। মৎস্যশিকারে বর্শা এবং তীর চালনায় ইহাদের হাতের ক্ষিপ্রকারিতা, লক্ষ্যভেদের অব্যর্থতা এবং সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বিস্ময়কর। সূর্য্যাস্তকালে মৎস্যশিকারীরা গভীর জলের ধারে প্রবালশৈলের উপর দাঁড়াইয়া সতর্ক ভাবে যখন শিকারের প্রতীক্ষা করে তখন অনন্তপ্রসারিত সমুদ্রের পটভূমিকায় দৃশ্যমান তাহাদের ছায়ামূর্ত্তিগুলিকে যেন অবাস্তব ও রহস্যময় বলিয়া মনে হয়।

পান-সুপারির প্রতি এই সকল দ্বীপবাসীর অত্যাসক্তি আছে। ইহারা পান-সুপারি একত্রে ছেঁচিয়া চূনের সঙ্গে মিশাইয়া মনের সুখে চর্ব্বণ করিয়া থাকে। নিউগিনির বাসিন্দারা একটা লাউয়ের খোলের মধ্যে চূণ ভর্ত্তি করিয়া রাখে এবং চূণ খাইবার জন্য একটি শান-দেওয়া হাড়ের টুকরা চামচের মত ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা ঘরে-বাহিরে যেখানেই থাকুক না কেন পান-সুপারি ও চূণ সঙ্গে থাকিবেই।*

---

* আসামের খাসিয়া স্ত্রীপুরুষেরা দল বাঁধিয়া যেখানেই যাক, খাসিয়ানীর থলের মধ্যে পান-সুপারি থাকিবেই। খাসিয়াদের মতে প্রাণ ভরিয়া পান-সুপারি খাওয়া মানবজীবনের অন্যতম প্রধান সুখ। মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহারা প্রায়ই নিম্নলিখিত কথাগুলি উচ্চারণ করে, "উবা বাম কোয়াই হা ইং উ ব্লেই", অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যিনি ভগবানের বাড়ীতে অবাধে পান-সুপারি খাইতেছেন।

মেলানেশিয়ার আদিবাসীদের অনেকগুলি নিজস্ব উৎসব এবং পূজাপার্ব্বণ আছে। মানেকুলায় (নিউ হিব্রাইড্‌স গোষ্ঠী) স্ত্রীলোকদের মধ্যে গ্রামীণ উৎসবাদি উপলক্ষে লম্বা ঘাসের তৈরি এক আজব ধরণের শিরোভূষণ পরিবার রেওয়াজ আছে। কোন কোন দ্বীপে স্বামী এবং স্ত্রীর আলাদা আলাদা আস্তানা থাকে এবং নৃত্যানুষ্ঠানের সময় স্ত্রী ও পুরুষ দর্শকদের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়—স্ত্রী-পুরুষের একত্রে বসিয়া উৎসবের সমারোহ অবলোকন করা নিয়মবিরুদ্ধ। এই নিয়ম অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে প্রতিপালিত হয়, কেননা নৃত্য তাহাদের মতে পুণ্যকৃত্য এবং নারীর প্রভাবে ইহার পবিত্রতা নষ্ট হয় বলিয়াই তাহাদের ধারণা। উপদেবতার অস্তিত্বেও তাহারা আস্থাবান। যেমন হাঙ্গর-উপদেবতা—ইহার কৃপায় সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ হয়, ঈগল-উপদেবতা দান করে যুদ্ধে সাফল্য, আর সর্পদেবতার প্রসাদে কৃষিকার্য্যে সফলতা-লাভ হয়।

মালেকুলাতে নিউ হিব্রাইড-গোষ্ঠীর মধ্যে মানী পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের নিমিত্ত বৃক্ষকাণ্ডে কতকগুলি মনুষ্য-প্রতিকৃতি খোদাই করিবার প্রথা আছে। উৎসবানুষ্ঠানকালে মৃতের আত্মা নাকি এই সমস্ত কাষ্ঠমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান করে।*

বিবাহ উপলক্ষে এদের সমাজে বিরাট ভোজের আয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে ইহারা জঙ্গল কাটিয়া বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার

লাউয়ের খোল-ভর্ত্তি চূণ এবং হাড়ের চামচে সহ নিউগিনির একটি আদিবাসী

মালেকুলাতে বৃক্ষকাণ্ডে খোদিত মনুষ্য-প্রতিকৃতি

করে। সেই পরিষ্কৃত স্থানের একদিকে কতকগুলি গাছের ডালপালা ছাঁটিয়া প্রত্যেকটির কাণ্ডে একটি করিয়া ধুনোআলু বাঁধিয়া রাখা হয়। যে সকল সর্দ্দার ভোজের আসরে উপস্থিত হইবে, এগুলিকে তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ গণ্য করা হয়।

ইহাদের পূজা-ঘরের (sacrificial hut) অভ্যন্তরভাগে মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ, কিন্তু এমব্রাইন দ্বীপের নিউ হিব্রাইড গোষ্ঠীর পূজাগৃহের দ্বার সকলেরই নিকট অবারিত। ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে, পূজা-ঘরের বেড়ায় ঝুলানো লাঠির ঘায়ে শূকরগুলিকে মারা হয়। তারপর রান্না করিয়া, প্রকাণ্ড কাঠের পাত্রে মাংস রাখিয়া সকলে মিলিয়া একসঙ্গে ভোজ লাগায়। এই সমস্ত দ্বীপবাসীর মধ্যে পিতৃপুরুষের পূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। তাহাদের বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তির আছে দ্বৈত আত্মা—তন্মধ্যে একটি অংশ যায় সাধারণতঃ কোন পর্ব্বতশীর্ষস্থ বা দূরবর্ত্তী দ্বীপস্থিত প্রেতলোকে, আর অপর অংশটি গ্রামের আশেপাশেই থাকে। মৃতের আত্মার তুষ্ট্যর্থে এবং পরিবারের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ঘটা করিয়া কৌমগত (communal) উৎসবানুষ্ঠান হয়। মৃতের আত্মা ছাড়া অন্যান্য

খ্রীষ্টান মিশনরীরা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত আদিবাসীর মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিতেছিল। ফলে কোন কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর লোক খ্রীষ্টধর্ম্মের আওতায় আসিয়াছিল, তাহারা গীর্জ্জায় যাইত এবং খুব ধীর গতিতে তাহার মধ্যে শিক্ষাবিস্তারও হইতেছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের অবস্থার যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, একথা বলা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে মেলা-

* আসামের গারোদের মধ্যেও মৃতের উদ্দেশ্যে এ ধরণের কাঠ-খোদাই প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণের প্রথা আছে। গারোরা সেগুলিকে বলে—কিমা।

নেশিয়ানদের লইয়া যাঁহারা মাথা ঘামাইতেন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, যে আদিম জাতির লোক এই রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত, তাহারা আধুনিক সভ্যতার সংঘাতে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। কেননা তাহাদের পুরানো ঐতিহ্যের মধ্যে নরমুণ্ড-শিকার, নরমাংস ভোজন-প্রথা, যাদুবিদ্যা, তুকতাক ইত্যাদি এমন সব উপাদান রহিয়াছে যাহা আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং এমতাবস্থায় স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে তাহাদের উদ্বর্তন (survival) হইবে না—ইহাই ছিল অনেকের বদ্ধমূল বিশ্বাস।

কিন্তু সুখের বিষয়, তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। সাম্প্রতিক কালে মেলানেশিয়ানদের মধ্যে এক নব-জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। প্রাচীন আমলের কুপ্রথা এবং কুসংস্কারসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক কালের অনেক ভাল জিনিষ গ্রহণ করিবার দিকে তাহাদের মানসিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছে। টাকাকড়ির প্রকৃত মূল্য (value), ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহারা ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিয়াছে। মেলানেশিয়ান ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করিয়া নয়া-মেলানেশিয়ান (Neo-Melanesian) নামে একটি কারবারী ভাষা (trade language) গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহার শব্দসম্ভার পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা হইতে আহৃত, যদিও মূলতঃ ইহা ইংরেজী।

মেলানেশিয়ানদের নূতন সমাজে অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে: কোন লোক যে অর্থ উপার্জ্জন করে সে অর্থের উপর যে তাহার মালিকানা আছে—এ বোধও তাহাদের মনে জন্মিতেছে। এই সমস্ত নানা দিক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাস্তবিকই পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব-গোষ্ঠীর একটি শাখার লোকদের মধ্যে নবযুগের (renaissance) সূচনা হইয়াছে। কোন বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিঃশেষে আত্মবিলোপ তাহাদের কাম্য নয়। তাহারা চায় একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে।

আমাদের দেশে যাঁহারা আদিবাসীদের প্রকৃত কল্যাণকামী, নব-জাগ্রত মেলানেশিয়ানদের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের পথনির্দ্দেশের সহায়ক হইবে। ভারতরাষ্ট্রে সম্প্রতি আদিবাসীদের কল্যাণমূলক নানা কর্মপ্রচেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে। আদিবাসীদের মধ্যে যাঁহারা কাজ করিবেন তাঁহাদিগকে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, জোর করিয়া ইহাদের উপর বিজাতীয় সংস্কৃতি চাপাইয়া দিলে হিতে বিপরীতই হইবে। ইহাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি—তা তথাকথিত সভ্য মানুষের দৃষ্টিতে যতই অনুন্নত বলিয়া মনে হউক না কেন, যাহাতে নিঃশেষে বিলুপ্ত না হইয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।*

ন. ৺.

* এই প্রবন্ধের তথ্যাদি "The Unesco Courier" (Number 8-9-1951) হইতে গৃহীত।

শাশ্বত

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ষ আসে, বর্ষ চলে যায়।
দু'দিনের পাওয়া প্রীতি, দু'দিনের পাওয়া স্মৃতি
অনাদি কালের বুকে না-পাওয়ার বেদনা ঘনায়,
তবু মোরে রাখিও স্মরণে,
আজি নব বরষের প্রথম আলোকে জাগা
ফুলবনে ভাললাগা বিহগের প্রথম কূজনে!

আলোচনা

"হালিসহর"

১

শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে হালিসহর সম্বন্ধে শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় লিখিত যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এক জায়গায় একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। উহা সংশোধনার্থে এই কয় পংক্তি লিখিলাম :

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে যে, তিনি টিকারী রাজ ষ্টেটের সহকারী ম্যানেজার ছিলেন। ইহা ঠিক নহে। তিনি ঐ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং ঐ রাজ ষ্টেট বোর্ড অব রেভিনিউ হইতে মুক্ত হইলে রাঁচিতে ওয়ার্ড ষ্টেটের জেনারেল ম্যানেজার হইয়া যান। সেখানে ডারহাম ওয়েইট নামক একজন ইংরেজ তাঁহার সহকারী ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (তখন প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত) এবং প্রকাশচন্দ্র রায় (পাটনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা) গয়ায় আশুবাবুর বাড়ীতে মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসিতেন : ইঁহারা উভয়েই তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ভোলানাথবাবু কিছুকাল হালিসহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

২

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য

গত ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় লিখিত "হালিসহর" শীর্ষক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি পড়িলাম। প্রবন্ধের আরম্ভেই তিনি লিখিয়াছেন : "কুমারহট্ট নামেরও একটু ইতিহাস আছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বজরা করিয়া গঙ্গায় ভ্রমণ করিতে করিতে হালিসহরে আসিয়া উপস্থিত হন। মাঝিরা বজরা ঘাটে বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে। ইত্যবসরে মহারাজ দেখেন যে, একটি নিম্নশ্রেণীর লোক ঘাটে স্নানান্তে স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে উঠিয়া যাইতেছে। তিনি লোকটির সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া প্রশ্ন করেন : 'কস্ত্বম্'? উত্তরে সে বলে, 'রজকোঽহম্'। মহারাজা আশ্চর্য্য হইয়া আবার প্রশ্ন করেন, 'বাপু হে, তুমি কি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছ?' তখন লোকটি বলে, 'হালিসহর গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বাস এবং বহু টোল আছে যেখানে ব্রাহ্মণকুমারেরা প্রত্যহ সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদের স্তোত্রাদি পাঠ শুনিয়া আমি সংস্কৃত উচ্চারণ এবং সংস্কৃত ভাষাও কিছু কিছু শিখিয়াছি এইমাত্র।' অতঃপর মহারাজা বজরা হইতে নামিয়া গ্রামমধ্যে গমন করেন এবং রজকের কথা যে সত্য তাহা অবগত হন। এখানে সংস্কৃতের ও শাস্ত্রের এত চর্চ্চা হয় এবং এত ব্রাহ্মণকুমার অধ্যয়ন করেন দেখিয়া মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া এই হাবেলীসহর পরগণার কেন্দ্রস্থলের নাম দেন কুমারহট্ট।"

প্রবন্ধকার এই 'ইতিহাস' কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলিতে পারি না, তবে তিনি যখন হালিসহরের অধিবাসী তখন তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাবলী নির্ভুল হইবে, ইহা বাঞ্ছনীয়। কাঁচরাপাড়ার কৃতী সন্তান শ্রীসতীশচন্দ্র দে মহাশয় কিন্তু "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" গ্রন্থে অন্যরূপ লিখিয়াছেন : "চৈতন্যদেবের সময়ে 'কুমারহট্ট' বলিলে আধুনিক হালিসহর, গোলাবাড়ী ও মল্লিকের বাগ এবং কাঁচরাপাড়া বুঝাইত। আমরা জানি যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও মল্লিকের বাগে অনেক কুম্ভকারের বসতি ছিল। এক্ষণেও এই গ্রামে সাত-আট ঘর কুম্ভকার আছেন। কাঁচরাপাড়ার হাঁড়ি, কলসী, গামলা, জালা, কূপের পাট প্রভৃতি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্য স্থায়িত্ব ও চিক্কণতার নিমিত্ত এক্ষণেও প্রসিদ্ধ।"

ঐ গ্রন্থেই অন্যত্র লিখিত আছে : "প্রাচীনকালে কুমারহট্ট বলিতে সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মল্লিকের বাগের কুম্ভকারদিগের বসতিস্থানকে বুঝাইত। কুম্ভকারদিগের বসতিস্থানের নিকট একটি বৃহৎ হট্ট বা হাঁড়ি-কলসীর বড় হাট বসিত। পরে এই হাটের উত্তরাংশ, (অর্থাৎ বর্ত্তমান কাঁচরাপাড়া) এবং দক্ষিণাংশকেও (বর্ত্তমান হালিসহর) কুমারহট্ট বলিত। ধান্যের অনেক গোলা রাসমণির ঘাটের সন্নিধানে থাকায় জন সম্ভবতঃ বাগের পশ্চিমাংশকে গোলাবাড়ী বলিত। তাহার পর এই পল্লীটি (কুমারহট্টের উত্তরাংশ) অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তির বাসস্থান বলিয়া এবং সম্ভবতঃ কুমারহট্টের অন্যান্য পল্লীকে পরাস্ত করিবার মানসে পণ্ডিত অধিবাসীরা কুমারহট্টের এই পল্লীকে 'কাঞ্চনপল্লী' নাম দিয়াছিলেন।"

যেহেতু মুসলমান নৃপতিদিগের সময়ের বহু দলিলপত্রে 'কাঁচরাপাড়া, পরগণে হাবেলিসহর' লিখিত আছে দেখা যায়, সুতরাং 'হাবেলীসহর পরগণার কেন্দ্রস্থল' বলিতে প্রবন্ধকার নিশ্চয়ই হালিসহর ও কাঁচরাপাড়ার মধ্যবর্ত্তী মল্লিকের বাগকে বুঝাইয়াছেন।

উপরের উদ্ধৃতি হইতে কিন্তু মনে হয় যে, কুম্ভকারদিগের হট্ট হইতে অপভ্রংশ কুমারহট্ট হইয়াছে। প্রবন্ধকার যে শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকুমারদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা সম্ভবতঃ কাঞ্চনপল্লীর অধিবাসী ছিলেন। কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়া তৎকালীন

বৃহত্তর কুমারহট্টের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মূল কুমারহট্টের (মল্লিকের বাগের) উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। সুতরাং কাঞ্চনপল্লীর ব্রাহ্মণ-কুমারদের নাম অনুসারে উহার দক্ষিণাংশ মল্লিকের বাগের নাম কুমারহট্ট হইতে পারে, ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

"আমাদের জাতিভেদ রহস্য"

শ্রীমঞ্জুলা সানা

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত "আমাদের জাতিভেদ রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িলাম। লেখকের সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। এখানে কেবল একটি বিষয়েরই আলোচনা করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধযুগে যখন সকলেই এক জাতি হইল, দ্বিজে ও অদ্বিজে কোনও প্রভেদ রহিল না, তখন পরস্পরের বিবাহে উৎপন্ন সন্তান সকলেই এক জাতি হইয়া গেল।"

ইহা আংশিক সত্য। বৌদ্ধগ্রন্থ 'সংযুক্তনিকায়ে' আছে—

খত্তিয়ো সেট্‌ঠো জনে তস্মিন্ যে গোত্তপটিসারিণে

বিজ্জাচরণসম্পন্নো সো সেট্‌ঠো দেব মানুসে। ('অগগঞ্ঞ সুত্ত')

অর্থাৎ, জনসমাজে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন তিনি দেব ও মনুষ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। 'দীঘনিকায়ে' ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের একাধিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 'মহাবগগ সুত্তে' বুদ্ধদেবের একটি উপদেশ আছে—'শূদ্রদিগকে কোন উচ্চাধিকার দিবে না।' জিন সংহিতায়ও শূদ্রগণ 'অভূম' অর্থাৎ অনধিকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধপুঁথিতে শূদ্রের নিম্নেও 'হীন জাতিয়ো' ও 'হীন সিপ্পানি'র (শিল্পীর) উল্লেখ আছে। বাহুল্যভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম।

"আমাদের দেশের আচার-বিচার"

শ্রীঅতুলেন্দু গুপ্ত

গত আশ্বিনের প্রবাসীতে শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত "আমাদের দেশের আচার-বিচার" পড়িলাম। লেখক বলিতেছেন, "খ্রীষ্টান সমাজে জ্ঞাতিকন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু মৃত পত্নীর ভগ্নীকে বিবাহ একান্ত নিষিদ্ধ। এই নিষেধের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে আন্দোলনে কোনও ফল হয় নাই।"

এই উক্তি ঠিক নহে। খ্রীষ্টানসমাজে "third degree" পর্যন্ত সম্পর্ককে (রক্তের বা বিবাহের) নিকট-সম্পর্ক বলিয়া গণ্য করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিবাহ আইনবিরুদ্ধ। খুড়তুতো-জেঠতুতো বা মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের সম্পর্ক "fourth degree"-র, এজন্য উহাদের মধ্যে বিবাহ চলিতে পারে। কিন্তু দেবর বা শালীর সঙ্গে সম্পর্ক "third degree"র মধ্যে, তাই বিবাহ নিষিদ্ধ।

১৯০৭ সন পর্যন্ত ইংলণ্ডে শালীকে বিবাহ করা বেআইনী ছিল। কিন্তু ঐ বৎসর "Deceased Wife's Sister's Marriage Act" পাস হওয়ায় আইনগত বাধা অপসারিত হইয়াছে। কাজেই এখন আর মৃতা পত্নীর ভগ্নীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ নহে।

মানুষ

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

বিস্মিত মানুষ আমি—অকস্মাৎ দেখেছি প্রথম
আদিম প্রভাতে সে কি সাগরের বিপুল উদ্যম,
উদ্বেলিত ফেনপুঞ্জ। নীলে নীলে তরঙ্গ-সীমায়
আদিগন্ত আলোড়ন। প্রসারিত বালুকা-বেলায়
অফুরন্ত জীবনের উচ্ছ্বসিত আবেগ অসীম—
প্রশান্তি গভীর রাত্রে। নক্ষত্রের বেদনা অন্তিম
নির্বাপিত বুকে তার। কামনার প্রদীপ্ত শিখায়
অসহ্য দহন-জ্বালা—তৃপ্তিহীন নিষ্ফল ক্ষুধায়
হৃদয়ের রক্তরাগ। পৃথিবী ও অশান্ত সাগর
বর্বর উদ্দাম সে কি নির্মমতা মরু ঝঞ্ঝা ঝড়
অবিরাম। তবু দেখি দিনশেষে রিক্ত পৃথিবীর
অন্ধকারে অভিসার—যাত্রা কোন নিঃশব্দ গভীর—
সুন্দরের আকর্ষণ। ধূমকেতু ছুটেছে উন্মাদ
দিক থেকে দিগন্তরে—নিত্য দূর নীলের প্রাসাদ
পরিক্রমা। এই তার পটভূমি দুর্জয় মানুষ—
অসীম অদম্য আশা—জীবনের গতি নিরঙ্কুশ
অফুরন্ত প্রাণশক্তি—প্রীতিমায়া মমতা অক্ষয়,
ভ্রূক্ষেপবিহীন আত্ম-প্রতিষ্ঠার বাসনা দুর্জয়।
অসত্যায় তবু সেই মানুষের নিঃশঙ্ক যাত্রায়
নক্ষত্রের গতিবেগ। অচঞ্চল প্রাণ-সাধনায়
অনন্তের স্পর্শকামী। ধরণীর ধূলিমাখা তার
মানুষ-মরাল নীলে শুভ্রপক্ষ প্রাণের বিস্তার।

এক সুখী পরিবারের ছবি!

সব হাসিরই একটা ইতিহাস আছে। আমার পরিবারের সকলের মুখের হাসিরও একটা বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু এখনকার মতো চিরদিনই এদের স্বাস্থ্য এত ভালো ছিল না।

কয়েক মাস আগেও আমার স্বামী প্রায়ই অসুখে ভুগতেন, যার জন্য তাঁর আয় কমে যেতে লাগলো। তার উপর আমার তিন ছেলে-মেয়ের শরীর ভাল যাচ্ছিল না, তাদের ওজন কমতে আরম্ভ ক'রেছিল। ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হওয়াতে কথা-বার্তায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি জিজ্ঞাস ক'রলেন, 'মাপ ক'রবেন, কিন্তু আপনারা রান্নার জন্য স্নেহপদার্থ কি করে কেনেন বলুন ত? হয়ত তার থেকেই আপনার পরিবারে অসুস্থতা আসছে।'

তিনি শুনে সন্তুষ্ট হবেন ভেবে আমি বললাম যে আমি সর্বদাই রান্নার জন্য সবচেয়ে ভালো স্নেহপদার্থ খোলা অবস্থায় কিনি। 'যত ভালো স্নেহপদার্থই হোক', শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'খোলা অবস্থায় থাকলে তাতে সর্বদাই ময়লা হাত লাগতে পারে ও তাতে মশা-মাছি পড়তে পারে আর তা খেয়ে অসুখ ক'রতে পারে।'

তিনি তক্ষুনি আমাকে ডালডা বনস্পতি কিনতে বললেন। তার প্রথম কারণ ডালডা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল আর শীলকরা টিনে সর্বদা বিক্রী হয় বলে তাতে রোগের বীজাণু ঢুকতে পারে না। আর ডালডা বনস্পতির প্রস্তুতকারীরা অতি উৎকৃষ্ট জিনিস ছাড়া অন্য কিছু বাজারে বের করেন না। আমি শুনেই বুঝলাম যে শিক্ষয়িত্রী ঠিক কথাই বলছেন। আর আমার পরিবারের সকলেই ডালডায় রান্না খাবার খেয়ে কি খুসী! কারণ ডালডা বনস্পতি সব খাবারের নিজস্ব স্বাদগন্ধ ফুটিয়ে তোলে। শীলকরা টিনে ডালডা বনস্পতি কিনলে আপনি যে তাজা, বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর জিনিস পাচ্ছেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ডালডা বনস্পতিতে রান্না খেয়ে কেমন ক'রে আমার পরিবারের সকলে দিনভোর স্বাস্থ্যের হাসিখুসীতে কাটায় তার প্রমাণস্বরূপ এই ছবিটি আমি কাছে রাখবো। আপনার পরিবারেরও এমন ছবি যদি চান তো ডালডা বনস্পতি দিয়ে সব রান্না করুন। আজই এক টিন কিনুন।

১০, ৫, ২ ১ ও ১/২ পাউণ্ড টিনে পাবেন।

ডালডায় এখন ভিটামিন এ ও ডি দেওয়া হয়।

বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখুন:
দি ডালডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোঃ, আঃ, বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

রাঁধতে ভালো—খরচ কম

গাছ মার্কা টিন দেখে নেবেন

HVM. 220-X52 BG

"আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য"—শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। "নব-ভারতী", ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট; কলিকাতা। ডিমাই ২৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় টাকা।

ভারতীয় ভাষাসমষ্টির মধ্যে বাংলার স্থান পুরোভাগে বলে যখন আমরা গর্ব্ব করি তখন এর দৈন্যের কথাটা ভেবে দেখি না। আমরা এগিয়ে আছি কাব্যে ও গল্প উপন্যাসে, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কিন্তু সাহিত্য এইখানেই শেষ হয়ে যায় না। অনুবাদ-সাহিত্যে বোধ হয় আমরা হিন্দীর পেছনে; নাটকে মহারাষ্ট্র সম্ভবত এগিয়ে আছে; ইতিহাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্য আমাদের এখনও গর্ব্ব করার মত নয়, দাক্ষিণাত্যের দু'একটি ভাষা এগিয়ে থাকা বিচিত্র নয়।

একটা খুব সুলক্ষণ, বর্তমান যুগে কোন কোন শক্তিশালী লেখকের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে এবং তাঁরা এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানা বিষয়ে ভাষাকে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়েছেন। কথা-সাহিত্যের আওতায় যা কিছু পড়ে তা দিন দিনই বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। অনুবাদ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যিকদের যে একটা উন্নাসিকতা ছিল সেটা দিন দিনই অপসারিত হচ্ছে; ইউরোপীয় (মার্কিনীও) সাহিত্যের অনুবাদ তো বটেই, ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধেও বাঙালী পাঠক, লেখক উভয়েরই অনুসন্ধিৎসা বেড়েছে এবং আরও যা সুখের বিষয়, দিন দিনই শক্তি বাড়ছে।

শ্রীযুক্ত শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য বইখানি এই অনুসন্ধিৎসা ও শ্রদ্ধার দ্যোতক। তাঁর প্রয়াস আরও প্রশংসনীয় এইজন্য যে তা একেবারেই একটি নতুন পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। তিনি হিন্দী প্রভৃতি চৌদ্দটি প্রধান প্রধান ভারতীয় সাহিত্যের একটি দিগ্‌দর্শন দিয়ে এ বিষয়ে বাঙালী পাঠকের জ্ঞান-বিস্তার ও তারই সহজ পরিণাম, তার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করবার চেষ্টা করেছেন। অস্বীকার করবার উপায় নেই, আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের একটা অবজ্ঞার ঔদাসীন্যই থেকে গেছে। বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথকে জানবার জন্য যারা উৎসুক, তাদের মধ্যে আমাদের জানবার আর কি থাকতে পারে? এই হচ্ছে আমাদের মনোভাব। ইতিমধ্যে ওদের উদার মনোভাব নিয়ে ওরা চলেছে এগিয়ে, আমরা দিনদিনই আমাদের গণ্ডি সঙ্কীর্ণতর করে এনে পেছনে পড়ে যাচ্ছি; সব ক্ষেত্রেই, কেননা একটা জাতির জীবনের সব দিকের প্রেরণা যোগায় তার সাহিত্য।

যতদূর আমাদের জানা আছে, সর্ব্বভারতীয় সাহিত্যের ব্যাপক পরিচয় নিয়ে এ ধরণের বই বাংলা ভাষায় এই প্রথম। কিন্তু তার চেয়েও যা বড় কথা, প্রথম হলেও পরিকল্পনা ও তার Treatment অর্থাৎ রূপায়ণের গুণে এ বই বহুদিনই অনতিক্রান্ত থেকে যাবে বলে মনে হয়। গোড়াতেই বলতে হয় নামে আধুনিক সাহিত্য হলেও লেখক সাহিত্যের শুধু আধুনিক অংশটুকুতেই নিজেকে আবদ্ধ করেন নি, প্রত্যেক সাহিত্যেরই একটা আদ্যন্ত ইতিহাস দিয়ে গেছেন। অবশ্য, এই অল্প পরিসরের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, তবু যেভাবে যেটুকু সংগ্রহ করেছেন তাতেই তাঁর ধৈর্য্য ও সাধনার যা পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে আমি মৈথিলী ভাষা সম্বন্ধে বলতে পারি, আদি যুগ থেকে একেবারে আধুনিক সময়ের পর্য্যন্ত সমস্ত তথ্য লেখক নিখুঁতভাবেই দিয়েছেন বলে মনে হ'ল। এটাকেও যদি বিচারের মান বলে ধরি তো প্রামাণিকতার দিক দিয়ে বইখানিকে স্বচ্ছন্দেই পাঠকের হাতে ধরে দেওয়া যায়।

শ্রদ্ধার কথা পূর্ব্বেই বলেছি। বাংলা সাহিত্যের কাছে ভারতীয় সব আধুনিক সাহিত্যের ঋণের কথা কয়েকবারই উল্লেখ করেছেন লেখক; স্বভাবতই তিনি এর গৌরবের অংশীদার, কিন্তু তা কোনখানেই তাঁর শ্রদ্ধা ও দৃষ্টির প্রসারতাকে সামান্যিত করতে পারে নি। এইখানে লেখক তাঁর মিশনে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। তাঁর যা মহৎ উদ্দেশ্য, বইখানিতে তার যা ভূমিকা, তাতে অন্য ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালীর মনোবৃত্তি কণিকামাত্র থাকলে লেখক বহু শ্রমের জন্য গৌরবান্বিত হবেন।

বইখানির পরিকল্পনার মধ্যে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়; শেষের দিকে লেখক ভারতীয় সাহিত্যের অতিরিক্ত আরও দুটি অধ্যায় সংযুক্ত করে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন—'ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের ভূমিকা' ও 'পূর্ব্বপাকিস্থানের নতুন সাহিত্য'। সাহিত্যিক নিয়েই সাহিত্য; সেদিন পর্য্যন্ত ইংরেজীর মাধ্যমে অনেক ভারতীয় মনীষী তাঁদের চিন্তাবলি প্রকাশ করে ভারতীয় ইংরেজী সাহিত্যের একটা ধারা সৃষ্টি করে গেছেন—শুধু ইতিহাস-বিজ্ঞানে নয়, কাব্যে-উপন্যাসেও; এখনও করছেন কিছু কিছু। সুতরাং এদিকে আলোকসম্পাত করে লেখক যেমন সেই সাহিত্যিকদের প্রতি সুবিচার করেছেন, তেমনি কৌতূহলী পাঠকদেরও করেছেন উপকার।

পূর্ব্ববাংলার আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের একটা বেদনাতুর কৌতূহল বর্তমান। পদ্মা-মেঘনা যেমন আজ ভারতীয় হয়েও অভারতীয় অথবা অভারতীয় হয়েও ভারতীয়, পূর্ব্ববাংলার সাহিত্য সম্বন্ধেও অবিকল সেই ধরণের কথা বলা যায়। দুটির অন্তরাল থাক, কিন্তু ওই সাহিত্যই বাংলা সাহিত্য, অথচ দুটির অন্তরালের জন্যই এদিককার সাধারণ পাঠকের ওদিককার খবর পাওয়া দুষ্কর। লেখক একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এ

শান্তিরঞ্জন বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। তাঁর ভাষা খুব প্রাঞ্জল, তাইতে আলোচ্য বিষয় দুরূহ হয়েও বরাবর সুবোধ্য এবং সুখপাঠ্য থেকে গেছে।

ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য দুইটি বিষয় বলে রাখি: উর্দ্দু সাহিত্যপ্রসঙ্গে গোড়াতেই একটা উদ্ধৃতিতে দেখানো হয়েছে যে, ঐ সাহিত্যের সৃষ্টিতে **"European and Indo-European"**-দেরও হাত আছে। এর দৃষ্টান্ত

কিন্তু বইয়ে পেলাম না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ভাষার ব্যবহৃতি-সীমা যদি একটু ভাল করে নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয় ত আরও সুবিধা হয়; বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলির, কেননা আর্য্যাবর্ত্তের ওদিককার জ্ঞান আমাদের অনেকখানিই ত্রুটিপূর্ণ। আমরা মোটামুটি চিনি মহারাষ্ট্রী আর মাদ্রাজী। একখানি ভাষা-মানচিত্র দিলে আরও সুবিধা হয়।

বইয়ের ছাপা পরিচ্ছন্ন; অঙ্গসৌষ্ঠবও সুরুচিসম্পন্ন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিচিত্র কাহিনী—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

বইখানি পনেরটি কাহিনীর সমষ্টি। "যুগান্তর" অথবা অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় যখন এগুলি বাহির হইত তখন আমরা আগ্রহ সহকারে কাহিনীগুলি পড়িতাম। লেখক সাংবাদিক এবং সম্পাদক রূপে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকাররূপে ইহাই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলায় সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইলেন। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, "কয়েকটি ছোট ছোট সত্য ঘটনা লইয়া এই 'বিচিত্র কাহিনী' লিখিত।" অনেকগুলি রচনাই শিকার-কাহিনী। 'শিকারে বিপত্তি' গল্পটির গোড়ায় আছে, "প্রথমেই ব'লে রাখি আমি শিকারী নই। আমার শিকার হচ্ছে একটু সময় কাটানো, একটু আনন্দ করা, কিম্বা বনভোজনের একটা অঙ্গ। মোটরে যেতে যেতে হয়ত একটা পাখী, খরগোস কিম্বা হরিণ দেখলুম। সুবিধা হ'ল ত গাড়ীর ভিতর থেকেই মারলুম, নয় ত নেমে কিছুদূর গিয়ে গুলি ছুঁড়লুম।...এ রকম অনেক মজাদার শিকার করেছি।" লেখক বড় বড় বাঘ, বাইসন অথবা বন্য-হস্তী শিকারের কথা বর্ণনা করেন নাই। কাহিনীগুলি হয়ত লোমহর্ষক নয়, কিন্তু সত্যই চিত্তাকর্ষক। এ আকর্ষণ লেখার গুণে। সত্য ঘটনা গল্পের মত করিয়া বর্ণনা করা একটা আর্ট। লেখক সে আর্ট আয়ত্ত করিয়াছেন। অনেকগুলি হইলেও সবগুলি শিকার-কাহিনী নয়। 'মাষ্টারমশায়,' 'মামাবাবুর মাছ-ধরা,' 'টেলিফোন বিভ্রাট,' 'সভাপতির বিপদ,' 'মৃতের সহিত সাক্ষাৎ,' 'ছোট পাখীর ভালবাসা,' 'ছোটদের গল্প' প্রভৃতি রচনায় গ্রন্থকার অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এর অনেকগুলির মধ্যেই একটা সহজ কৌতুকরস আছে। স্বচ্ছ হাস্য-কৌতুকে উদ্ভাসিত হইয়া সেগুলি আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে। 'ছলনার রূপকথা' গ্রন্থের মুখবন্ধ বলা যাইতে পারে। এটি পড়িয়া মনে হইতে পারে লেখক ছোটদের জন্যই বইটি লিখিয়াছেন। যে বইগুলি ছেলেদের অত্যন্ত প্রিয় তার অনেকগুলিই বড়দের জন্য লেখা; আবার ছেলেদের জন্য লেখা বই বড়দের প্রিয় হইয়াছে—ইহাও দেখা যায়; "বিচিত্র কাহিনী" ছোট বড় সকল পাঠককে আনন্দ দান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কাঠগোলাপ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩৷৹ টাকা।

বাঙালী-জীবনে প্রসার ও বৈচিত্র্য কম এমনই একটা ধারণা অনেকের মনে রহিয়াছে; কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের আসরে যে রস পরিবেশিত হইতেছে তাহা স্বাদহীন ত নহেই, উপরন্তু বিশ্বসাহিত্যে তাহার একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে। আজিকার ছোটগল্প শুধু ঘটনাপ্রধান নহে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবিকলনের ধারায় প্রবাহিত। যে সূক্ষ্ম কারণের প্রচ্ছন্ন বেগধারায় বাহিরের মূল-ঘটনাগুলি নিয়ত প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে—তাহারই সূত্রটি ধরিয়া অত্যন্ত সরল জীবনের মধ্যেও বৈচিত্র্যের সন্ধান করিতেছেন গল্পকার, এবং ঘটনাহীন বৃত্তান্তও গল্পলোভী পাঠকের রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিতেছে।

আলোচ্য গল্প-সংগ্রহটিতে লেখকের এমনই কয়েকটি গল্প আছে। মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত সংসার এবং সাধারণ মানুষেরা এই গল্পের বিষয়বস্তু। কেরাণী, গ্রাম্য চিকিৎসক, বাস্তুহারা, শিক্ষক প্রভৃতি অভাবগ্রস্ত মানুষদের ছবিই তিনি আঁকিয়াছেন। তার গল্পের পরিসর সঙ্কীর্ণ, দুঃখ-বেদনা, ভালবাসা, স্বার্থ, লালসা প্রভৃতির পাকে পাকে জড়ানো আছে পাত্র-পাত্রীদের মন। তাহাদের প্রাত্যহিক তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে জড়াইয়া সহজ ভঙ্গীতে গল্প বলিয়াছেন লেখক। তিনি ঘটনা এবং মনস্তত্ত্বকে একই সূতার দুটি প্রান্তে বাঁধিয়া পাঠকের কৌতূহল ও রসপিপাসা মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহারই মধ্যে বৈচিত্র্যও কিছুটা পাওয়া যায়। দুঃখ-অভাবের স্পর্শ প্রায় সবগুলি গল্পেই আছে, বাংলা দেশের বর্ষাপ্রকৃতির মতই তার রূপটি। কিন্তু বর্ষণের একঘেয়েমি যতই থাকুক, মেঘসজ্জার রূপ ও বৃষ্টিপতনের সুর নিতান্ত অকবি-মনকেও মুগ্ধ করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা লাভের যোগ্য করিয়া তুলে। এই সংগ্রহের কয়েকটি গল্পের মধ্যে এই ধরণের কল্পনা নিহিত। সবকয়টি গল্প পড়িয়া হয়ত মনে হইবে—গল্পের পটভূমি দুরন্ত জীবনের বিস্ময়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কিন্তু নিজ নিজ গণ্ডী সেগুলি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এমনি অভিযোগের অবকাশ প্রকাশভঙ্গী সম্বন্ধেও আসিতে পারে অর্থাৎ চমক লাগানোর চেষ্টা তাঁহার মধ্যে নাই। কিন্তু [illegible] তাহা লেখক ভাল করিয়া বলিয়াছেন। গল্প বলার [illegible] পড়িবার আগ্রহকে জাগাইয়া রাখে এবং গল্প শেষ হইলে প্রত্যাশাকে ক্ষুণ্ণ করে না। লেখক পাঠকের প্রত্যাশাকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই, ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব।

দুই নারী—শ্রীকানাই মুখোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে দুই নারী ও এক নারী এই দুটি গল্প আছে। দুই

লাইফবয়ের "রক্ষা-কারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 248-X52 BG
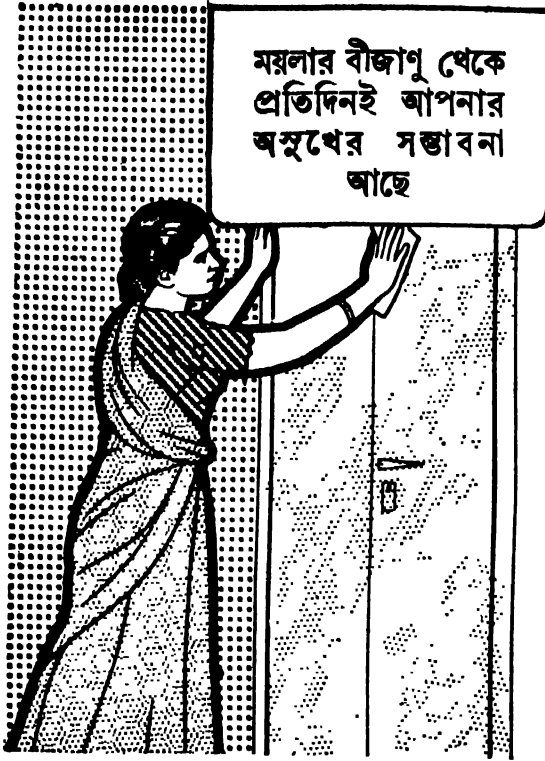
নারীকে ঠিক ছোটগল্প বলা যায় না, আবার উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও এটি উপন্যাস নহে। কাহিনীর প্রারম্ভে ট্রেনের কামরায় অপরিচিত তরুণ-তরুণীর প্রগলভ আলাপের মাধ্যমে রোমান্স সৃষ্টির প্রয়াস আছে। কিন্তু মধ্যভাগে বৌদির স্নেহ-করুণ কাহিনী ও যুদ্ধশিবিরের টুকরা ছবি কাহিনীকে ভিন্নমুখী করিয়াছে। শেষ দৃশ্যে নায়িকার আবির্ভাব ও আত্মনিবেদন তাই মনে রেখাপাত করে না। এক নারীতে ছোট গল্পের আমেজ আছে। স্বামীঘাতিনী এক মুসলমান-কন্যার মনোবিশ্লেষণে লেখকের নৈপুণ্য দেখা যায়। বর্ণনা আরও কিছু সংক্ষিপ্ত হইলে গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ বলা যাইত।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের গল্প—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। মূল্য ৸০ আনা।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাংলা-রচনার সঙ্গে যাঁহাদের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে ভারতচন্দ্রের রচনা-বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করিবেন। সেকালের কবিগণের মধ্যে এমন বাস্তবানুরাগ ও উপমা-প্রয়োগ বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্নদামঙ্গলের ছত্রে ছত্রে ইহার পরিচয় আছে। অন্নপূর্ণাপূজার মাহাত্ম্যপ্রচার এবং কৃষ্ণনগর রাজবংশ-প্রতিষ্ঠার কাহিনীটি বেশ চিত্তাকর্ষক। এই সুন্দর কাহিনী কিশোরদের উপযোগী করিয়া লেখক সংক্ষেপে পরিবেশন করিয়াছেন। গল্পের সঙ্গে ছবি এবং ভারতচন্দ্রের রচনাংশের কিছু উদ্ধৃতি আছে। ভারতচন্দ্রের গল্প এবং রচনারীতির নমুনা কিশোর-চিত্তকে কৌতূহলাবিষ্ট করিবে এবং উত্তরকালে মূল কাব্যখানি পড়িবার উৎসাহকে জাগাইয়া রাখিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার—শ্রীবিমলকুমার দত্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৫৬। মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার ১০৬ সংখ্যক পুস্তক। ভারতবর্ষের মত গণতান্ত্রিক দেশে অবিলম্বে নিরক্ষরতার বিলোপসাধন ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যায় গ্রন্থাগার স্থাপন প্রয়োজন। এজন্য ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বয়স্ক ও সমাজ-শিক্ষা বিষয়ে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন রাজ্য-সরকার তদনুযায়ী গঠনমূলক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থাগার-পরিচালন সম্পর্কে যতই গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল।

এই পুস্তকের ১৬টি অধ্যায়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক; পুস্তক নির্ব্বাচন, পুস্তকের অর্ডার প্রেরণ, মিলানো ও পরীক্ষা, পুস্তককে গ্রন্থাগারের উপযোগী করিয়া লইবার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারে আবশ্যকীয় খাতাপত্র ও কার্ড, বর্গীকরণ, মেলভিল ডিউই বা দশমিক বর্গীকরণ ব্যবস্থা, গ্রন্থকারের নামের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা, গ্রন্থাগার সূচী, পুস্তক আদান-প্রদান, হিসাব-নিকাশ, গ্রন্থাগার প্রচার, গ্রন্থাগার-সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। পুস্তকের 'মুখবন্ধে' লেখক বলিয়াছেন যে, "গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।" বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীতপেন চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু যে বাংলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা লেখকের জানা থাকিলে তিনি হয়ত এরূপ উক্তি করিতেন না।

বর্ত্তমান গ্রন্থের কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। আশা করি, সুযোগ্য লেখক ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। পুস্তক নির্ব্বাচন অধ্যায়ে Saturday Review of Literature, New York Times, Book Review এবং Times Literary Supplement-এর নাম থাকা উচিত ছিল। জলন্ধর হইতে প্রকাশিত 'Librarian' স্থলে 'Indian Librarian' হইবে। কলিকাতার 'Modern Review—যাহাতে ইংরেজী ও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের সমালোচনা নিয়মিত বাহির হয়, বাদ পড়িয়াছে। ইহা ব্যতীত Organ of the Indian Book Sellers and Publisher's Association, Bombay এবং Quarterly Catalogue of books published by the State Government-এর উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত। পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় "(১৪) বাঁধাই কিনা" বাক্যটি অস্পষ্ট, কারণ গ্রন্থাগারে যে সকল পুস্তক আসিবে তাহার প্রত্যেকখানিই বাঁধাই: সুতরাং এস্থলে 'কি ধরণের বাঁধাই' (অর্থাৎ কাগজের, রেক্সিনের, চামড়ার ইত্যাদি) এরূপ হইলেই বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। 'দশমিক বর্গীকরণ ব্যবস্থা' (১২ এবং ১৩ পৃষ্ঠা) অধ্যায়ে লেখক মেলভিল ডিউই ১৪শ সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন অথচ ১৯৫১ সনে ইহার ১৫শ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই সংস্করণে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে ১৪শ সংস্করণ অপ্রাপ্য, সুতরাং লেখকের নির্দ্দেশ মানা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব নহে। ১৯৫১ সনের সংস্করণে Natural Science, Useful Arts এবং Fine Arts-এর বিভাগগুলির নাম যথাক্রমে Pure Science, Applied Science এবং Arts and Recreation-এ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ডিউই-র সর্ব্বশেষ সংস্করণের ভিত্তিতে শিক্ষার্থিগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া লেখকের পক্ষে সমীচীন ছিল।

এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও স্বল্প পরিসরের মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি বাংলাভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য আমরা লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি। ভবিষ্যৎ সংস্করণে তিনি একটু যত্ন করিলেই পুস্তকখানিকে শিক্ষার্থী ও গ্রন্থাগারকর্মীর অধিকতর নির্ভরযোগ্য করিতে পারিবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"সানলাইট দিয়ে কাচলে কেমন সহজে কাপড়ের ভেতর থেকে ময়লা বেরিয়ে আসে দেখুন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার রুমাল থেকে আরম্ভ ক'রে বিছানার ছাদর পর্য্যন্ত সব সাদা কাপড়ই নতুনের চেয়ে আরও সাদা হ'য়ে যায়। আর সানলাইটে কাচা কাপড় আরও বেশীদিন পরা চলে।"

"এ কথা মনে গেঁথে রাখবেন যে আর কিছুতেই না, না সত্যিই আর কিছুতেই রঙিন জিনিষ অত সুন্দর ঝকঝকে তক-তকে হয় না যেমন সানলাইট সাবানে হয়। এর দ্রুত উৎপাদিত ফেনা সব ময়লা উড়িয়ে দিয়ে কাপড়ের রঙকে জীবন্ত ক'রে তোলে, আর না আছড়াতেই তাই হয়।"

বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

—শ্রীসুধাংশু ভট্টাচার্য। ৩৭ই, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৪। পৃষ্ঠা ৬৪। মূল্য বার আনা।

পত্রগুলি নবেম্বর, ১৯৪৯ হইতে জুন, ১৯৫০-এর মধ্যে লেখা। পত্রের মোট সংখ্যা তের। যাঁহারা সহিংস উপায়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, এই পত্রগুলির লেখক তাঁহাদের নেতা। কিরূপে বর্তমান ভারতীয় গণতন্ত্র ধ্বংস করিয়া কৃষক-শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহার নিয়ম নির্দেশ এবং অমানুষিক উপায়গুলি সম্বন্ধে দলের কর্মিগণকে চিঠিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। হিংস্র ও বীভৎস উপায়ে স্বর্গরাজ্য (?) স্থাপন যাঁহাদের আদর্শ তাঁহাদের এরূপ প্রচার-গ্রন্থ সমাজের, বিশেষতঃ যুবসমাজের কোন হিতসাধন করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। এরূপ পুস্তকের প্রচার অবাঞ্ছনীয় এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর।

ভাষার ভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গ—শ্রীপুলকেশ দে সরকার। ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা হইতে শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৫। মূল্য এক টাকা।

কিরূপে নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে অর্থাৎ কি ভাবে রাজ্যসমূহ বা প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং উহার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। পুনর্গঠনের একটি অঙ্গ—[illegible] সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা। এই পুস্তকে বঙ্গভাষাভাষী জনগণকে লইয়া একটি প্রদেশগঠনের কথা ও উহার সম্পর্কে নানা যুক্তি দেখানো হইয়াছে। অবশ্য, বাংলার যে অংশ (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ) বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে পরিণত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু বলা চলে না। তবে এ বিষয়ে দ্বিমত নাই যে, বর্তমান ভারত-রাষ্ট্রের বাংলাভাষাভাষী জনগণকে একটি প্রদেশের অন্তর্গত করা পুরাপুরি সমীচীন এবং ইহা বাঙালীর বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে অত্যাবশ্যক। সমগ্র ভারতে ভাষার দিক দিয়া ঐক্যবদ্ধ [illegible] বাঙালীর বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। সমালোচ্য পুস্তকের বক্তব্য বিষয়ে কিছু কিছু ভাবালুতা থাকিলেও যুক্তির অংশ প্রবল ও অকাট্য। মানভূমের কয়েকটি থানা, বিহারের অংশবিশেষ, এবং ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হউক ইহা যুক্তির কথা ত নিশ্চয়ই, বাঙালীর অন্তরের কামনাও বটে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

গোলটেবিল—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, দেশবন্ধু-নগর, ২৪ পরগণা। মূল্য ৷৵০।

সাংবাদিকের কাজ যে কত বিঘ্নসঙ্কুল, সরকারী খবরদারি, প্রভৃতির এবং জনসেবার আদর্শের সামঞ্জস্য-সাধন যে কত কঠিন, সমালোচ্য নাটিকায় তাহাই নাট্যকার নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন।

মুস্কিল-আসান—শ্রীদিলীপ রায়। ৪৪এ, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯। শোভন সংস্করণ ২৷০, সাধারণ সংস্করণ ১৷০।

কবিতার বই। লেখক প্রথমেই বলিয়াছেন, "লিখেছি যে সব কবিতা, নয় তা কবিতা সবই তা।" অনায়াসে লিখিয়া যাইবার ক্ষমতা তাঁহার আছে, কিন্তু পড়িয়া মনে হয়, এ রচনা হালকা ধরণের মজলিস জমানোর উপযুক্ত, রস-সন্ধানীর উপভোগের বস্তু নহে। "অনেক মেয়ে পটিয়ে, খিস্তি-খেউড় করে, চায়ের নিভৃত দোকানে আর গ্র্যাণ্ডের রোমাঞ্চকর আড্ডায়, নিরবচ্ছিন্ন দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছিলাম"—ইহার বেশী উক্তি কি সমঝদার পাঠকের প্রয়োজন হইবে?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুক্তপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। প্রাঃ ভারতী, ৫৮ শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য সুলভ সংস্করণ পাঁচ টাকা, শোভন সংস্করণ ছয় টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে গল্প লেখার রীতিতে মহাপুরুষদের জীবনী লেখার রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে। এ বইখানাও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী—ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করে দেহরক্ষা পর্যন্ত, সাবলীল ভাষায় গল্পের মত লেখে যাওয়া সহজ নয়, দুরূহ কাজ, বিশেষ করে এমন ব্যাপক কর্মবহুল জীবন-ইতিহাসের আগাগোড়া ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলা বাস্তবিকই কঠিন। লেখকের ভাষার সাবলীল গতি আর ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতা কোথাও ব্যাহত হয় নি। মহাপুরুষদের জীবনী-রচনার ভিতর দিয়ে তাঁদের মহত্ত্ব সম্পূর্ণ প্রকাশিত করে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরা সহজ নয়, শুধু সেই মহত্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়াই চলে মাত্র। এদিক দিয়েও লেখকের প্রয়াস যে সার্থক হয়েছে তা নিঃসন্দেহ। বইখানিতে তথ্যবিকৃতি নেই দেখে মন খুশি হয়ে ওঠে। আগাগোড়া বইখানিকে ভাল আর সুখপাঠ্য করবার জন্য লেখকের চেষ্টার চিহ্ন বর্তমান। 'মুক্তপুরুষ বিবেকানন্দ' পড়ে পাঠকেরা খুশি হবেন।

শ্রীকুসুমময় ভট্টাচার্য্য

হে বিজয়ী বীর—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩৷০।

উপন্যাসখানিতে তিনটি চরিত্র মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। আখ্যানভাগে নূতনত্ব কিছুই নাই। মামুলি এক প্রেমের কাহিনী, কিন্তু লেখকের নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গীর ফলে তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রঞ্জন, অতসী ও সরোজ এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে রঞ্জন টাইপ চরিত্র—সরোজ নীরব প্রেমিক—অতসী চরিত্রের শেষ পরিণতি নাটকীয়।

আগুন—শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

মূলতঃ রাজনৈতিক উপন্যাস হইলেও সমাজ-সংস্কারের চিত্রগুলিই পুস্তকখানিতে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি চরিত্র বড় খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়। কাহিনী-বর্ণনায় মাঝে মাঝে কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইল। লেখকের ভাষা নিরলঙ্কৃত কিন্তু স্বচ্ছ ও সাবলীল।

রজনীগন্ধা—শ্রীস্বপনকুমার। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৷০

মাতৃপিতৃহীন স্মৃতি দাদা-বৌদির কাছে মানুষ হইয়াছে। তার মধ্যে ছিল সাহিত্য-প্রতিভা—যাহার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করিয়া দেন স্মৃতির মাতৃসমা বৌদি। বিবাহে ছিল স্মৃতির প্রবল আপত্তি, কিন্তু বৌদির ইচ্ছার কাছে হার মানিয়া তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্মৃতির বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় নাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব সুন্দর ফুটিয়াছে, কিন্তু বর্ণনার মধ্যে এমন সব দুরূহ এবং অনাবশ্যক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে যাহা কাহিনীর স্বচ্ছন্দগতিকে পদে পদে ব্যাহত করে। লেখকের শক্তি আছে, কিন্তু তিনি যদি এই ধরণের শব্দপ্রয়োগের মোহ সংবরণ করিয়া সহজ ভাষায় কাহিনীটি বর্ণনা করিতেন তাহা হইলে উপন্যাসখানি চের বেশী সুখপাঠ্য হইতে পারিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়। ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। পৃ. ৭০২। মূল্য ছয় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ। সারদামণি ১২৬০ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ (২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩) বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রামে তথাকার মুখোপাধ্যায়-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গত সম্বৎসর ধরিয়া নানা ভাবে বিভিন্ন স্থলে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙালীর চিত্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মত তদীয় সহধর্মিণী সারদামণিও কিরূপ স্থান লাভ করিয়াছেন, এই ব্যাপার হইতে তাহা সম্যক্ বুঝা গিয়াছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বাংলা-সাহিত্যে বিশেষ সমৃদ্ধ। সারদামণি দেবী (সাধারণ্যে "শ্রীশ্রীমা" বলিয়া কথিত ও পূজিত)-প্রসঙ্গও এই বিরাট সাহিত্যের এক বিশিষ্ট অংশ জুড়িয়া আছে। গ্রন্থকার স্বামী গম্ভীরানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য, তথা শ্রীশ্রীমার সম্পর্কিত রচনাদি মন্থন করিয়া এই প্রামাণ্য গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহীশূরের মাননীয়া রাজমাতা শ্রীযুক্তা প্রতাপ কুঞ্জর গ্রন্থখানি প্রকাশের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়া নিজ গুণগ্রাহিতার এবং শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁহার অচল ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন।

সারদামণি দেবী বাঙালী সাধারণের একান্তই আপনার জন। তাঁহার জীবনকথা আলোচনা করিয়া তাহারা 'অমৃতের' আস্বাদ পাইয়া থাকে। তাই তিনি তাহাদের "শ্রীশ্রীমা"। এই আদর্শ জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া বহু নর-নারী ধন্য হইয়াছেন, নিজেদের জীবনাদর্শ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। নরে 'নারায়ণ' দর্শন—পরমহংসদেবের এই ভাবনা স্বামী বিবেকানন্দ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল; সেবার পরম আদর্শ শ্রীশ্রীমা নিজ আচরণ দ্বারা জনচিত্তে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। লেডী অবলা বসুর মুখে শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীমার পদতলে বসিয়া তিনি বহু সদুপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নিকট হইতে আত্মবিলোপী সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এইরূপ বহু মহীয়সী নারী ও পুরুষপ্রধান তাঁহার নিকট হইতে যে কত প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার শোকসন্তপ্ত নর-নারী তাঁহার সংস্পর্শে শান্তি পাইতেন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনী হইতেও আমরা তাহা অবগত হই। শ্রীশ্রীমার জীবন বিভিন্ন দিক হইতে যতই আলোচিত ও কথিত হয় ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল।

'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'সারদামণি দেবী' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে (প্রবাসী—বৈশাখ ১৩৩১) শ্রীশ্রীমার জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমরা যতদূর জানি, শ্রীশ্রীমার সরল, অনাড়ম্বর অথচ মহিমময় জীবনকথা তিনিই প্রথমে এই রচনাটির মারফত জনসাধারণের গোচরীভূত করান। যিনি ইতিপূর্বে মুষ্টিমেয়ের দ্বারা মাত্র পূজিত ছিলেন, তিনি সমগ্র জাতির চিত্তে আসন লাভ করিলেন। ইহার পর তাঁহার সম্বন্ধে বহু জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আর ভক্তের দৃষ্টি হইতেই অধিকাংশ

পুস্তক লেখা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা সারদামণি সাধারণ বাঙালী ঘরের নারী হইয়াও যে আদর্শ মানবী হইয়াছিলেন তাহাও আমাদের বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। আলোচ্য গ্রন্থখানি ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত হইলেও ইহা পাঠে আমরা এই উভয় দিক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। মার সেবায় যে যে সাধু ভক্ত নিয়োজিত ছিলেন তাঁহাদের অনেকের কথাও আমরা ইহাতে পাইতেছি। গ্রন্থখানি সুলিখিত এবং বহু চিত্রে সুশোভিত।

শহীদ যুগল—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়। বি. সিংহ এণ্ড সন্স, ৩৮, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

এখানি "শহীদ যুগল" মূল পুস্তকের পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। এবারে পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তক প্রথম খণ্ড—ইহাতে মাত্র ক্ষুদিরাম বসুর জীবন-চরিত প্রদত্ত হইয়াছে। শহীদ ক্ষুদিরামের কথা আজ বাঙালী মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহার একখানি ধারাবাহিক জীবনীর বিশেষ অভাব ছিল। রাজনৈতিক কর্মী ও সাহিত্যিক নগেন্দ্রবাবু আলোচ্য পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া সে অভাব নিরাকৃত করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরই যে ইহা নিঃশেষিত হয়, পুস্তকখানির গুরুত্ব তাহা সপ্রমাণ করে। ক্ষুদিরাম-জীবন প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনাদি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা অধিকতর অনুভূত হইবে। পুস্তকে বিস্তর ছবি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ছাপা বড়ই অস্পষ্ট, কোন কোনটি প্রায় বুঝাই যায় না। সংখ্যা কমাইয়া যদি অন্ততঃ কয়েকটি ছবি দিয়াও ভাল করিয়া ছাপা হইত তাহা হইলে পুস্তকখানির সৌষ্ঠব আরও বাড়িত। যাহা হউক, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

শিক্ষার কথা—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই পুস্তকখানির রচয়িতা প্রবীণ শিক্ষাব্রতী, কাজেই 'শিক্ষা' সম্বন্ধে তাঁহার কথা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে দশটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি বিভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলির নাম যথাক্রমে : ১। বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থা ; ২। সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ; ৩। বিজ্ঞানের ভাষা ; ৪। বাংলায় গণিতশিক্ষা ; ৫। ধারাপাত সমস্যা ; ৬। বাংলাদেশে জ্যোতিষচর্চা ; ৭। গণিতের প্রতীক ; ৮। পরীক্ষায় পাসের হার ; ৯। অভিভাবকদের জন্য এবং ১০। শিক্ষায় আনন্দবাদ। প্রবন্ধগুলিতে শিক্ষা সম্বন্ধে নানা বিষয় ও সমস্যার কথা আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষাব্রতী ও অভিভাবকের পক্ষে পুস্তকখানি অবশ্যপঠনীয়। বিভ্রান্ত অভিভাবকবৃন্দ "অভিভাবকদের জন্য" প্রবন্ধটি পাঠে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাইবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও
লাবণ্যময়
ত্বক্
ক্যাডিলযুক্ত
রেক্সোনাকে
আপনার
প্রকৃত সৌন্দর্য্য
ফুটিয়ে তুলতে
দিন
রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে---আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
ত্বকপোষক ও কে
বিশেষ সংমিশ্রণের
Rexona
Rexona
RP. 123A-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী।

দেশ-বিদেশের কথা

নয়া দিল্লীতে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় যুব-উৎসব

সম্প্রতি কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হলে উপাধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং সিণ্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ, সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় যুব-উৎসবে যোগদানকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিশ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্দ্ধিত করেন।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত উক্ত উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যন্ত্রসঙ্গীত এবং ক্লাসিক্যাল কণ্ঠসঙ্গীতে পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হন। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় আট শত ছাত্র এই উৎসবে যোগদান করেন।

ছাত্রদিগকে অভিনন্দিত করিয়া উপাধ্যক্ষ বলেন যে, এই উৎসবে অংশ-গ্রহণকারীরা সকলেই ছিলেন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। তাহারা তাহাদের ধর্ম্ম ভাষা এবং সামাজিক রীতিনীতিগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের সঙ্গে স্থায়ী মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীবীরেনপাল চৌধুরী, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রদের সহিত পরিচিত হইবার এই সুযোগ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য সরকারকে অভিনন্দিত করেন।

নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় জানাইতেছেন :

"নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ত্রিংশত্তম অধিবেশন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি বহু বৎসর পর লক্ষ্ণৌ শহরে উদ্‌যাপিত হবে। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর '৫৪ হতে ২রা জানুয়ারী '৫৫ সম্মেলনের দিন স্থির হয়েছে।

আগামী সম্মেলনের সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতার জন্যে বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে আমোদ-প্রমোদের অতিরিক্ত বিশেষভাবে চিত্রকলা, পুস্তক ও পত্রপত্রিকাদির প্রদর্শনী পরিকল্পিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদির সম্মিলিত প্রদর্শনী আগামী সম্মেলনের সাংস্কৃতিক উৎসবের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হবে আশা করা যায়।"

শিক্ষার জন্য প্রবাসী বাঙালীর দান

লক্ষ্ণৌপ্রবাসী বিশিষ্ট বাঙালী দানবীর শ্রীভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত স্থানীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে আট লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। শশীভূষণ বালিকা বিদ্যালয়, বিদ্যান্ত হিন্দু ডিগ্রি কলেজ, কুইন্স এংলো-সংস্কৃত কলেজ এই তিনটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানের ফলে উপকৃত হইয়াছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে স্থানীয় সমস্ত সম্পত্তি ব্যতীত শ্রীযুত বিদ্যান্ত তাহার বারাণসীর একটি বাড়ী রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের কর্তৃপক্ষকে এবং নদীয়া জেলার শান্তিপুরস্থিত তাঁহার আর একটি ভবন সেখানে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবিদ্যান্ত কর্ত্তৃক রাঁচি, যক্ষ্মারোগী-স্বাস্থ্যনিবাস, স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম এবং লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নগদ কয়েক সহস্র টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যান্ত মহাশয় একজন আইনজীবী। শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম্মের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত।

গান্ধীগ্রাম উপনিবেশ

মাদ্রাজের মাদুরাইয়ের নিকট সমাজ-শিক্ষা-কর্ম্মীদের শিক্ষণ-কেন্দ্রে গান্ধীগ্রাম নামক কলোনিটি অবস্থিত। প্রত্যেক পাঁচ মাস অন্তর প্রায় পঞ্চাশ জন ছেলেমেয়ে এখানে শিক্ষা লাভ করিবার জন্ম আসিয়া থাকে। শিক্ষা লাভ সমাপ্ত হইলে তাহাদিগকে 'কম্যুনিটি প্রোজেক্ট' অঞ্চলে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়।

শিক্ষণকেন্দ্রে এই সকল কর্ম্মীকে কৃষিকার্য্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি-বিষয়ক বক্তৃতামালা, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কৃষি, গ্রামীণ অর্থনীতি ও শিল্প, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এই শিক্ষণের বিশিষ্ট অঙ্গ।

বিদ্যায়তনের কর্ম্মীরা যে জ্ঞান আহরণ করে, কৃষিক্ষেত্রে হাতেকলমে তার পরীক্ষা হয়। যেমন, জাপানী পদ্ধতিতে ধানের চাষ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা যে সকল কথা পড়ে বা বক্তৃতায় শোনে, শিক্ষণ-কেন্দ্রের কৃষিক্ষেত্রে সেগুলি তাহারা কার্য্যে পরিণত করার অভ্যাস করে। নিজেরা ক্ষেতে কাজ করিয়া শস্যাদি উৎপাদনের অভিনব পদ্ধতি-সমূহ আয়ত্ত করে।

স্বাস্থ্যনীতি, পায়খানা পরিষ্কার, রন্ধনবিদ্যা, স্বাস্থ্যনির্ম্মাণ, কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়েও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কুটীরশিল্প, পল্লীস্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার জন্ম শিক্ষার্থীদের ক্ষুদ্র দল রোজই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে গিয়া থাকে।

১৯৫৩ সনে এই শিক্ষণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর শতাধিক শিক্ষার্থী কমলাপুরম প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে গিয়া সেগুলিতে সুতাকাটা, মুরগীপালন এবং কাগজ তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

শিক্ষার্থীরা যাহাতে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় শিক্ষণ-কেন্দ্রের সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। শিক্ষণ-কেন্দ্রের পাঠ্যতালিকা সমাপ্ত হইলেই কিন্তু শিক্ষালাভ শেষ হয় না। শিক্ষার্থীদিগকে নিয়মিত ভাবে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত জনকল্যাণমূলক কার্য্যাবলীর রিপোর্ট পাঠাইতে হয়—তাহাদের শিক্ষাদাতারা মাঝে মাঝে ঐ সকল স্থানে গিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

অন্ধ বালকের দৃষ্টিশক্তি লাভ

জব্বলপুরের ডেনজিল মেয়ার্স নামক যোল বৎসরবয়স্ক একটি অন্ধ বালক নিউ ইয়র্কের আর্কবিশপ ফ্রান্সিস কার্ডিন্যাল স্পেলম্যান এবং 'ভয়েস অব আমেরিকা' নামক পত্রিকার আনুকূল্যে চিকিৎসার জন্ম সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করে। নিউ ইয়র্ক সিটির সেণ্ট ভিন্সেণ্টস হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর সে আংশিক ভাবে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। তাহার চোখ হইতে একটি রোগাক্রান্ত কর্নিয়া অপসারিত করিয়া সেই স্থলে হাসপাতালের 'আই ব্যাঙ্ক' হইতে একটি নূতন কর্নিয়া বসানো হইয়াছে। বালকটি এখন এক চোখে দেখিতে পারে। ছয় মাসের মধ্যে তাহার অন্য চোখে অনুরূপ আর একটি অস্ত্রোপচার করা হইবে।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠ

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅন্নদা ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট হইতে আদ্যাপীঠে মন্দির নির্মাণের আদেশ প্রাপ্ত হন। আদ্যাপীঠে এই মন্দির নির্মাণ-কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীঅন্নদা ঠাকুর এবং আদ্যাশক্তি, এবং প্রণব-মধ্যস্থিত রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যে সকল স্ত্রী-পুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনায় জীবন কাটাইতে চান তাঁহাদের জন্য এই মন্দিরের কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে দুইটি পৃথক সংস্থা থাকিবে। ইহা ছাড়া মন্দিরের আয় হইতে নিম্নলিখিত আরও চারিটি সংস্থা পরিচালিত হইবে: (১) ছেলেদের জন্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, (২) মেয়েদের জন্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, (৩) বানপ্রস্থ আশ্রম এবং (৪) সংক্রামক রোগ প্রতিষেধক সংস্থা। দেশের সকল শ্রেণীর বদান্য ব্যক্তিদের সাহায্যে মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। যে চার-পাঁচ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রথম এবং দ্বিতীয় গম্বুজের নির্ম্মাণকার্য্যে নিঃশেষিত হইয়াছে। মন্দিরটিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিয়া গড়িতে হইলে আরও প্রায় সাত লক্ষ টাকার প্রয়োজন। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ এজন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য-প্রার্থী। টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য:

রাধাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বর ভাই, যুগ্ম সম্পাদক, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠ, পোঃ আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের (৬৫ ২বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে কলিকাতার উপকণ্ঠে কাঁকুড়গাছিতে একটি প্রসূতিসদন নির্ম্মিত হইতেছে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা পত্নী সুধাংশুবালা পালের স্মৃতিরক্ষার্থে জমি দান করিয়াছেন। ভাণ্ডারের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি পরিকল্পিত পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালটির নাম "শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন" রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। একতলার যে অংশটির নির্ম্মাণকার্য্য সম্প্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহার নাম হইবে "সুধাংশুবালা প্রসূতিসদন।" ব্রহ্মচারী মহারাজ স্বয়ং এই প্রসূতি-কেন্দ্র ও হাসপাতালের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন। আগামী জানুয়ারী মাসে মহারাজের জন্ম-দিবসে ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রথম পর্য্যায়ে পঁচিশটি শয্যা লইয়া কাজ সুরু হইবে। তৎসহ প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে সতর্কতা, শিশু-পরিচর্য্যা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে বেতনভোগী চিকিৎসক দ্বারা পরামর্শদানের, ধাত্রীবিদ্যা ও শুশ্রূষাবিদ্যা শিক্ষাদানের এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী কর্ম্মী পাঠাইয়া প্রসূতি ও জননীদিগকে পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে। উত্তর কলিকাতার এই পল্লীতে নিম্নমধ্যবিত্তের ও দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী অথচ পৌরসভার একটিমাত্র কেন্দ্র ছাড়া সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধাযুক্ত কোন প্রসূতিসদন নাই। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সে অভাব অনেকাংশে পূরণ হইবে।

দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যয়সহ আনুষঙ্গিক আয়োজনাদি সম্পূর্ণ করিতে ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ প্রভৃতি ক্রয় করিতে ৭৫,০০০৲ টাকা প্রয়োজন। প্রত্যেকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য পাঠাইয়া পরিকল্পিত হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা করুন। যাঁহারা ৫০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের নাম প্রস্তরফলকে খোদিত করিয়া রাখা হইবে এবং যাঁহারা ৫০০০৲ টাকা দিবেন, তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী আত্মীয়-বন্ধুর নামে একটি "বেড"র ব্যবস্থা হইবে।

সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা:—

১। শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত, সম্পাদক, দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার, ৬৫ ২বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

২। শ্রীদুর্গাচরণ রায় চৌধুরী ১৩, হেম কর লেন, কলিকাতা-৪

পরলোকে যোগেশচন্দ্র বসু

গত ২৯শে অক্টোবর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্রের পিতা জ্ঞানদা-চরণ বসু মহাশয় পটাশপুর থানার মঙ্গলামাড়ো গ্রাম হইতে প্রথম কাঁথিতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। ১৮৮৪ সনের ৪ঠা মার্চ কাঁথিতেই যোগেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভ করেন নাই, কিন্তু একাগ্র বিদ্যানুশীলনের ফলে অল্পদিনেই বাংলা-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে সেটলমেন্ট কানুনগোর পদে নিযুক্ত করেন। ১৯০৮ সন হইতে তিনি বিভিন্ন সরকারী বিভাগে যোগ্যতার সহিত কার্য পরিচালনা করেন এবং ১৯১৩ সাল হইতে স্থায়ীভাবে সরকারী কর্মে অধিষ্ঠিত হন। এই কার্যব্যপদেশে তদানীন্তন বাংলার প্রতি জেলায় তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। ঐ সময় মেদিনীপুর জেলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে ভ্রমণের ফলে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। সরকারী নির্দেশে ও ময়ূরভঞ্জের মহারাজার অনুরোধক্রমে তিনি ময়ূরভঞ্জেও সরকারী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁর রচিত বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর, মেদিনীপুরের ইতিহাস, বঙ্কিম [illegible], বঙ্কিম-সাহিত্যে স্ব[illegible]দর্শন, বঙ্কিম-সাহিত্যে নৌকাযাত্রা প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকা তাঁহার সাহিত্যিক শক্তির নিদর্শন। সরকারী কার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার সাহিত্যানুরাগ স্তিমিত হয় নাই। তিনি বহু পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি লিখিতেন। তিনি কবিত্বশক্তিরও অধিকারী ছিলেন। কাঁথির আদি পত্র 'সুরভি' ও 'মেদিনীবান্ধব' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। স্থানীয় হিজলী হিতৈষী পত্রিকার সাময়িকভাবে সম্পাদকের কার্যও করিয়াছিলেন। ১৯৪৫ সনে তিনি সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু কখনও তিনি সাহিত্য-সাধনায় বিরত হন নাই। তিনি কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, বেঙ্গল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতির সদস্য ছিলেন

মোহিনীমোহন চক্রবর্তীর স্মৃতিবার্ষিকী

গত ৭ই নভেম্বর মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মোহিনী-মোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের ত্রয়স্ত্রিংশত্তম স্মৃতিবার্ষিকী কুষ্টিয়ায় মিল প্রাঙ্গণে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। কাজী আবদুল ওদুদ, বটু দত্ত, রেবতীরঞ্জন সিংহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিয়া মোহিনীমোহনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী ঘোষাল, শ্যামল মিত্র, অমূল্য সান্যাল প্রমুখ শিল্পিগণ কণ্ঠ-সঙ্গীত ও হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন।

রাজনারায়ণ বসু সাধারণ পাঠাগার, দেওঘর

সম্প্রতি দেওঘরস্থ রাজনারায়ণ বসু সাধারণ পাঠাগারে স্থাপিত ঋষি রাজনারায়ণ বসুর একটি প্লাস্টার-নির্মিত আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শিল্পাচার্য শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীর ছাত্র ও স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে কলাবিভাগের শিক্ষক শিল্পী শ্রী[illegible] রায়চৌধুরী স্বহস্ত-নির্মিত এই মূর্তিটি পাঠাগারে দান করিয়াছেন।

[illegible] পাঠাগার

এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯০২ সালে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র মুনীন্দ্রনাথ বসু [illegible]। পাঠাগারের ভবনটি নির্মিত হয় ১৯২২ সালে। ইহার বর্তমান পুস্তকসংখ্যা ৪০২০খানি। ইহাতে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষার পুস্তক আছে। পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী এই তিনটি ভাষার কতকগুলি সাময়িক ও দৈনিক পত্র রাখা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বার্ষিক আয় গড়ে [illegible] এবং বাৎসরিক ব্যয় গড়পড়তা ১৩৯১।/৩ পাই। [illegible] করা হয় সাধারণ অর্থভাণ্ডা

হইতে। সাম্প্রতিককালে স্থানীয় বাঙালী-সমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পাঠাগারটির অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। ইহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দেশবাসীর সাধ্যমত অর্থসাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন।

রঙ্গ-ভারতী

সম্প্রতি বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকদিগের চেষ্টায় কলিকাতা, ৪নং, বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেনে "রঙ্গ-ভারতী" নামে এক সাংস্কৃতিক নাট্য-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণসাধনই রঙ্গ-ভারতীর উদ্দেশ্য। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য হইতে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের স্রষ্টা মহাপুরুষদের জীবনাদর্শের নাট্যরূপায়ণের অভিনব পরিকল্পনা ইহারা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীতারক হালদার রচিত, সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ আচার্য নিগমানন্দ পরমহংসদেবের অলৌকিক জীবন-নাট্য "মহাপুরুষ" শ্রীজ্যোতির্ময় কুমারের পরিচালনায় অবিলম্বে কলিকাতার কোনও বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে প্রথম মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

গত ৩১শে অক্টোবর রঙ্গ-ভারতীর উদ্যোগে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের সভাপতিত্বে উপরোক্ত নাট্য-প্রতিষ্ঠানের মহলাদিসহ বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ও অন্যান্য বক্তা "মহাপুরুষ" নাট্যাভিনয়ের সাফল্য কামনা

রঙ্গ-ভারতীর বিজয়াসম্মিলন। সভাপতির বক্তৃতাপ্রদান

করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় বঙ্গসন্তানদের লোকজ্ঞান, কালজ্ঞান এবং দেশজ্ঞান এই ত্রিবিধ জ্ঞান আহরণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। ইহার পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

গত ১৩ই নবেম্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ৪৩।২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে সঙ্গীতসাধক শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানও হইয়াছিল। অনুষ্ঠানে 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সুচিন্তিত ভাষণের পর সভাপতি শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, জয়কৃষ্ণবাবুর মত বিশুদ্ধ রাগের গান যাঁহারা গাহিয়া থাকেন তাঁহারা যেন সঙ্গীতের কথার রূপ জনসাধারণকে উপলব্ধি করাইবার ব্যবস্থা করেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীজয়কৃষ্ণবাবু ইমন, নটকামোদ ও পুরিয়া রাগে চৌতাল ও ধামার গান করেন। তার পর গুণী গায়কবৃন্দ কর্ত্তৃক ধ্রুপদ সঙ্গীতাদি গীত হয়।
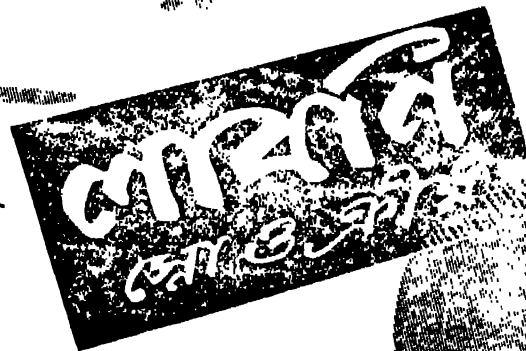
শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৪ সনের আগষ্ট মাসে সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছিয়াত্তর বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ভারতের

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যতম সঙ্গীতকেন্দ্র বিষ্ণুপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তানসেন-প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত ধারার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যৌবনে কলিকাতায় অবস্থানকালে শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র এবং গোপাল চক্রবর্ত্তীর নিকট ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা সংগ্রহ করেন। এতদ্ব্যতীত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতকেন্দ্রসমূহে তিনি পরিভ্রমণ করেন এবং সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান ও বহুবিধ পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। বারাণসীতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত সঙ্গীত মহাসম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং গৌরব অর্জ্জন করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করেন। ভারতের সর্ব্বত্রই বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি আহূত হন।

ভারতের যে কয়েকজন গুণী সঙ্গীতকে রাজদরবারের গণ্ডীর ভিতর হইতে মুক্তি দিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গোপেশ্বরবাবু অন্যতম। গোপেশ্বরবাবুর জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল সঙ্গীতকে শিক্ষিত ভদ্রসমাজে এবং শিক্ষা-বিভাগে সঙ্গীতকে যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তৎকর্তৃক প্রণীত সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থগুলি সঙ্গীতশাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ। শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতে তাঁর গ্রন্থগুলি সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। তিনি সঙ্গীতের বহু লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিয়া দেশকে দান করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতপ্রতিভা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'স্বর-সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন। অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ তিনি একনিষ্ঠভাবে সঙ্গীতের সাধনা করিয়া আসিতেছেন। বৃদ্ধ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গীতসাধনা এবং সঙ্গীতপ্রচারের জন্য বহুমুখী চেষ্টার বিরাম নাই।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নিভৃত পল্লী

শ্রীঅসিতরঞ্জন বসু

মিলন　　শিল্পী : শ্রীরথীন মৈত্র

রাধা　　শিল্পাচার্য ডঃ শ্রীনন্দলাল বসু
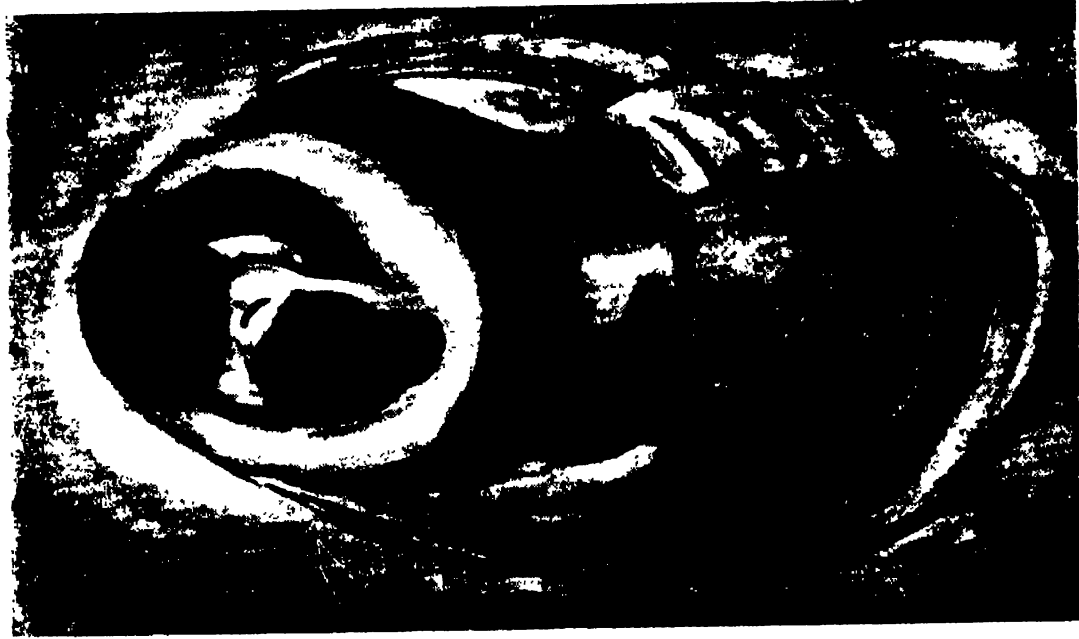
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৪শ ভাগ
২য় খণ্ড
মাঘ, ১৩৬১
৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিক্ষার মান ও শিক্ষার উদ্দেশ্য

বাংলা ও বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষাই যেন দিনের পর দিন সমস্যাপূর্ণ হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, আমরা কেবল ভৌগোলিক বাংলা বা নৃতত্ত্বের বাঙালীর কথা বলিতেছি না। সেভাবে তো দরিদ্র ও সংপ্রকৃতি সাঁওতালেরও অস্তিত্ব আছে এবং সাঁওতাল পরগণাও আছে। তবে ঐরূপ অস্তিত্বের সার্থকতা কতটা সেকথার বোধ হয় বিশদ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

অথচ এমন দিনের কথা প্রৌঢ় বাঙালী মাত্রেরই মনে আছে যখন বাঙালীর সম্মুখে যে এ রকম প্রশ্নের কোন দিন উদয় হইবে তাহাও কেহ ভাবে নাই। তখন সকল ক্ষেত্রেই বাংলার ও বাঙালীর প্রভাব এবং প্রগতি অপ্রতিহত ও প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সেদিন ও এদিনের মধ্যে এত প্রভেদ আসিয়াছে কিসে?

বাঙালীর প্রভাব ও প্রগতির মূলে ছিল শিক্ষা ও দীক্ষা। দুই দিকেই বাংলা তখন অগ্রমুখী ছিল। প্রাচীনের উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি তখনও ছিল কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মোহজাল সেদিন প্রায় ছিন্ন ও কর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। আজ আমরা শুধু পশ্চাতের দিকে তাকাইয়াই দিনগত পাপক্ষয় করিতেছি, সুতরাং প্রগতি এখন ব্যাহত এবং বাংলার সংস্কৃতির প্রভাব নষ্টপ্রায়। সত্য কি এখন আমরা ভারতের প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে প্রায় পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্থানে নামিয়াছি। আমাদের বুঝা উচিত এইরূপ হইতেছে কেন?

দেশে শিক্ষার মান নামিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুই দশটি মেধাবী ছাত্র নিজগুণে এখনও বাঙালীর মুখ রক্ষা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের জাতিগত শিক্ষার—বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহারও কারণ নির্ণয় অতি সত্বর প্রয়োজন। শিক্ষার মান নির্ণয়ে প্রথম প্রশ্ন দাঁড়ায় শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণময় যুগে বিদ্যা ও বিদ্বানের সম্মান সর্ব্বত্র ছিল। সেই সময় চাণক্য যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাতে বিদ্যা ছিল মুখ্যতঃ বিনয়ের আকর এবং সেই বিনয়ই ছিল মানুষের সকল গুণ ও সকল ভূষণের মূল। বিনয় শব্দের সংজ্ঞা এখন যাহাই হউক তখন উহার অর্থ ছিল দেহ মন প্রাণে সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা। ইংরেজী discipline শব্দের প্রকৃত অর্থও তাহাই। এই সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শুধু দৈহিক ও মানসিক নহে, ইহা প্রধানতঃ চরিত্র ও বুদ্ধিবিবেচনার ক্ষেত্রও প্রভাবিত করে।

আজ শিক্ষার বিচার চলিতেছে শুধু তাহার আর্থিক ফলাফল লইয়া। অর্থাৎ বিদ্যালাভ বা শিক্ষালাভের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন অর্থোপার্জ্জন এবং এই বিশ্বাস শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রী সকলেরই মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে আমাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ব্যর্থই হইতেছে এবং গতানুগতিক ভাবে ক্রমেই উহার মান নীচে নামিয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ও বিদ্যালাভের অতি উচ্চ, অতি উদার আদর্শ স্থাপনে চেষ্টিত হইয়া দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তীরা সে আদর্শ ম্লান করিয়া ফেলিয়াছেন। সম্প্রতি বিশ্বভারতী যে পথে চলিয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের অন্ত্যেষ্টিও প্রকৃতভাবে হয় কিনা সন্দেহ। কবিগুরুর প্রিয়কার্য্য যাহা কিছু ছিল, এমনকি তাঁহার প্রিয়জনও যাঁহারা আছেন, এখন সে সকলই বর্জ্জনীয় জ্ঞানে অবহেলিত হইতেছে। বিশ্বভারতীর পরিচালকবর্গ এখন অর্থকরী গবেষণায় ব্যস্ত।

বাঙালীর প্রধান অস্ত্র তাহার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা। বর্ত্তমান শিক্ষার পথে তাহা আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট হইতেছে। স্তোকবাক্য শিক্ষারই এখন দিন। অপরা বা কিং ভবিষ্যতি।

ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, শিক্ষা ও বিদ্যা দুইয়েরই জীবনযাত্রা পথে অর্থোপার্জ্জনের সহায়ক রূপে একটা বিশেষ ব্যবহার আছে। কিন্তু একথা কি ঠিক যে অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন ঐ দুইয়ের অন্য কোনই সার্থকতা নাই? বিলাস-ব্যসন ও উদরপূর্ত্তিতেই কি মনুষ্যত্ব লাভ হয়? জাতীয় সংস্কৃতি ও সংগতির পরিমাপ কি শুধুই টাকার ওজনে?

আগেকার দিনে আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ ছিল এবং সেই কারণেই বাঙালীর প্রতিভা শতমুখী হইয়া তাহার জীবনের মান উন্নত ও তাহার সংস্কৃতির ও মনুষ্যত্বের গৌরব উজ্জ্বল করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে তাহার দৈন্য দারিদ্র্যও দূর হইতেছিল। শিক্ষিত বাঙালী বিনয়যুক্ত ও দৃঢ়চিত্ত ছিল, তাহার মধ্যে আজিকার কূপমণ্ডূকভাব ছিল না। তাহার জীবনযাত্রার পথ কঠিন হইলেও সুপরিকল্পিত ছিল। আজিকার মত নিরুদ্দেশ-যাত্রা তখনকার শিক্ষার্থী বিদ্যার্থীর ছিল না।

বর্ত্তমানে শিক্ষা-সমস্যার বিষয়ে অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রথমেই স্থির করা প্রয়োজন শিক্ষার উদ্দেশ্য কি।

ভারতের পূর্ণ শিল্পায়ন

কোনও দেশের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে ও জাতীয় প্রগতির পথ নির্ণয়ে সে দেশের বিশেষজ্ঞদিগের মতামতের গুরুত্ব সকল ক্ষেত্রেই থাকে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ড. শিশির-কুমার মিত্র তাঁহার ভাষণে ঐরূপ একটি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাহার চুম্বক নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"বরদা, ৪ঠা জানুয়ারী—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪২তম অধিবেশনে সভাপতির প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ড. এস কে মিত্র সুপরিকল্পিত পন্থায় পর্য্যায়ক্রমে ভারতের পূর্ণ শিল্পায়নের জন্য আবেদন জানান।

পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার এবং বিভিন্ন বিভাগে যথা—বিদ্যুৎ উৎপাদন, যন্ত্রপাতি শিল্প, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন-শিল্প এবং কৃষি ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের তিনি প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে, এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে সমগ্রভাবে দেশের দ্রুত প্রগতি সম্ভব হইবে। ড. মিত্র বলেন, এই সকল উন্নয়নের জন্য ব্যাপক সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে (দেশে) শান্তি প্রয়োজন। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, নিজেদের স্বার্থের জন্য শান্তি রক্ষা প্রয়োজন, কারণ পরিকল্পনার সাফল্যে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞানের ভূমিকার উল্লেখপ্রসঙ্গে ড. মিত্র বেতার ও ইলেকট্রনিক্সসংক্রান্ত সাম্প্রতিক গবেষণা এবং কার্য্যকলাপের বিশদ বিবরণ প্রদান করেন।

ড. মিত্র বলেন যে, নূতন বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহ প্রয়োগের অব্যবহিত পরেই শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নয়ন সম্ভব হয় এবং ইহার দ্বারাই সমৃদ্ধিশালী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে শিল্পের সাহায্যে যে সম্পদের সৃষ্টি হয়, তাহার অংশবিশেষ গবেষণা সংক্রান্ত কার্য্য-কলাপ ও প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের জন্য ব্যয় হয় এবং ইহার দ্বারা নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়। আবার তাহা হইতেই শিল্পবিজ্ঞানের উন্নয়ন হয় এবং নূতন সম্পদ সৃষ্টি হয়। ড. মিত্র বলেন যে, পশ্চিমী দেশগুলিতে এই উন্নয়ন-প্রথার দৃষ্টান্ত দেখা যায়—'শিল্প ও সম্পদের চক্রবৃদ্ধি পশ্চিমীদের সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে পৌঁছাইয়া দিতেছে।'

ড. মিত্র ভারতের অধিবাসীদের দারিদ্র্যের কারণ বিশ্লেষণ সম্পর্কে বলেন যে, পরিশ্রম বাঁচাইয়া শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতে তাহার পূর্ণ প্রয়োগ করা হয় নাই বলিয়া ভারতের জনসাধারণ দরিদ্র রহিয়া গিয়াছেন। জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রত্যেকের কার্য্য করা প্রয়োজন। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ কার্য্য প্রয়োজন, তাহা মানুষ বা কোন প্রাণীর সামর্থ্যে কুলায় না। পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য শক্তিচালিত যে সকল যন্ত্রপাতির উদ্ভব হইয়াছে পশ্চিমীদেশগুলিতে তাহার নিয়োগ হইয়াছে। ভারত এইরূপ ভাবে পরিশ্রম বাঁচাইবার যন্ত্রপাতি নিয়োগ করিতেছে না। সেই জন্য পশ্চিমীদেশের অধিবাসীরা যে সুখস্বচ্ছন্দ্যে থাকেন, ভারতীয়দের পক্ষে তাহা ভোগ করা সম্ভব নয়।

ভারতে পূর্ণ শিল্পায়নের নীতি গ্রহণে যে অসুবিধা রহিয়াছে, তাহার উল্লেখপ্রসঙ্গে ড. মিত্র বলেন, কোন শিল্পপতিকে শিল্প-বিজ্ঞানের আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলিলে তিনি পাল্টা অভিযোগ করিয়া বলিবেন যে ইহার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং বেকার সংখ্যার উদ্ভব হইবে। শিল্পায়নের নীতি গ্রহণের সময় 'বিপরীত দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য এই সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। শিল্পায়নের গতি এলোমেলো না হইয়া নিয়মানুগ হওয়া উচিত। প্রথমে স্থায়ী কার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের শিল্পের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। তাহার পর অন্যান্য দ্রব্য ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের উৎপাদনের উপর জোর দিতে হইবে। কিন্তু প্রথমেই শেষোক্ত দ্রব্যের উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে বেকারসমস্যা ও অতি-উৎপাদনের সমস্যা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

তিনি আরও বলেন, দেশের পূর্ণ শিল্পায়ন খুব সহজসাধ্য নহে। ইহার জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। ইহার পর আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে দেশের শিল্পায়ন না হইলে আমরা আরও দরিদ্র হইয়া যাইব।

নূতন অর্থ কমিশন

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সময় আগাইয়া আসিতেছে। কিন্তু উহা রচনায় যে দুইটি বাধা রহিয়াছে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রীর নিম্নোক্ত ঘোষণায় পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় :

"মাদ্রাজ, ১৩ই জানুয়ারী—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি. ডি. দেশমুখ এক সাংবাদিক বৈঠকে অদ্য ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার যথাশীঘ্র পুনরায় একটি অর্থকমিশন নিয়োগ করিবেন। কারণ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই পরবর্ত্তী অর্থ কমিশনের সুপারিশসমূহ জানা প্রয়োজন।

তিনি বলেন যে, প্রথম অর্থকমিশনের সুপারিশসমূহ হস্তগত হইবার সময় তিনি একটি অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। প্রথ পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যকে সাহায্যদানের চা পূর্ব্বেই তিনি স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম অর্থকমিশন কে হইতে বিভিন্ন রাজ্যের নিকট ৮১ কোটি টাকা হস্তান্তরের সুপারি করেন। ইহা কেন্দ্রের উপর অতিরিক্ত বোঝাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়

অতঃপর তিনি বলেন, 'শীঘ্র অর্থকমিশন নিয়োগের অন্তর অন্তরায় হইল রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সম্ভাব্য রিপোর্ট। আ জানি না যে, কতগুলি রাজ্যের জন্য অর্থকমিশন নিয়োগ করি হইবে। সুতরাং রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের বিবরণ হস্তগত হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে।'

তিনি আশা করেন যে, চলতি বৎসরের মাঝামাঝিই রা পুনর্গঠন কমিশনের বিবরণ সরকারের হস্তগত হইবে। এ বি

সকল ব্যাপার ওয়াকিবহাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থকমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইবে। কমিশন বিভিন্ন রাজ্যের ছোটখাট ও বৃহৎ উন্নয়ন-পরিকল্পনাসমূহের বর্ত্তমান ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব সম্পর্কেই নহে, তাহাদের ঋণের ফয়সালা সম্পর্কেও বিবেচনা করিবেন।"

কলিকাতা শহরতলীর রেলপথ

কলিকাতা শহরতলীর বাসিন্দাগণ সুদূর ভবিষ্যতে যানবাহনের অভাবমুক্ত কতকটা হইবেন এই আশা নিম্নোক্ত সংবাদে আছে। দৈনিক যাত্রীদের মধ্যে হাওড়া-বর্দ্ধমান অঞ্চলের লোক বৎসর দুইয়ের মধ্যে কিছু উপকার অনুভব করিতে পারেন :

"৫ই জানুয়ারী—কলিকাতা শহরতলীর রেলপথ বৈদ্যুতিকীকরণের কাজের প্রথম পর্য্যায় ১৯৫৭ সনের জুন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই পরিকল্পনায় মেন লাইনে হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত এবং হাওড়া ডিভিসনের তারকেশ্বর শাখার ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার বৈদ্যুতিকীকরণ হইবে। ভারতীয় রেলপথের গত কয়েক সনের আয় ও কাজ, বিভিন্ন রেলপথের উন্নতি ও প্রসার এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যরা এক সাংবাদিক বৈঠকে কলিকাতার শহরতলীর রেলপথ বৈদ্যুতিকীকরণ সম্বন্ধে উপরোক্ত আভাস দেন।

কলিকাতার শহরতলীর রেলপথ বৈদ্যুতিকীকরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ে বর্দ্ধমান, দমদম, খিদিরপুর ডক, বজবজ, ক্যানিং এবং শিয়ালদহ শাখায় রাণাঘাট পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ-চালিত রেল-চলাচল ব্যবস্থা প্রসারিত হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, সম্ভবতঃ ১৯৫৯ সনের শেষের দিকে এই কাজে হাত দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে এই রেলপথগুলি দ্বিগুণ যাত্রী বহন করিতে পারিবে।

এছাড়া আরও জানা গিয়াছে যে, ১৯৫৫ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের সমস্ত রেলপথ হইতে প্রথম শ্রেণী তুলিয়া দেওয়া হইবে। বর্তমান দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণী, বর্তমান ইন্টার দ্বিতীয় শ্রেণীরূপে পরিগণিত হইবে এবং ইন্টার ক্লাস বলিয়া কিছু থাকিবে না। রেলের বিভিন্ন শ্রেণীর এইরূপ পরিবর্তন হইলে, ভাড়ার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না. তবে প্রথম শ্রেণীর বর্তমান ভাড়ার বিলোপসাধন করা হইবে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ আরও যে সব শুভ সংবাদ দিয়াছেন, তাহা হইতেছে :

১। এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা দুই শত ইঞ্জিন তৈরী শেষ করিবে। আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই ভারত ষ্টীম ইঞ্জিন নির্মাণের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে, কারণ তখন চিত্তরঞ্জন হইতে বৎসরে দুই শত ইঞ্জিন তৈরী হইবে।

২। পেরাম্বারের রেল-কামরা তৈরীর কারখানা ১৯৬০ সনের মধ্যে ব্রড গেজে ব্যবহৃত সাড়ে তিন শত ষ্টীলের রেল-কামরা তৈরী করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে—ইহার প্রথম রেল-কামরা এই বৎসরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নির্ম্মাণ শেষ হইবে।

৩। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেড় হাজার হইতে তিন হাজার মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং দুই-তিনটি রাজ্য ছাড়া অন্য সকল রাজ্য হইতেই এ সম্বন্ধে নানা প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে।"

ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ

১৯৫১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সর্ব্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ কমিটি নিয়োগ করেন। ভারতীয় গ্রাম্য তথা কৃষিঋণের উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কমিটিকে অনুরোধ করা হয়। এই কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৫টি গ্রামের ৬০০ জেলার মধ্যে ১,২৭,৩৪৩টি পরিবারের নিকট হইতে তথ্যসকল যোগাড় করা হইয়াছে। এই রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় ৩৬ কোটি লোকের মধ্যে ৩০ কোটি—অর্থাৎ প্রতি ছয় জনের মধ্যে পাঁচ জন গ্রামে বাস করে। মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ জন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত কিংবা কৃষির উপর জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নির্ভরশীল। ভারতীয় জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলী হইতে আসে। বাকি শতকরা ত্রিশ জনের মধ্যে প্রায় দশ জন গ্রাম্য শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আরও অধিক প্রচেষ্টা নিয়োগ করা হইবে। কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উন্নততর বীজ, অধিকতর সেচব্যবস্থা, সার, উন্নত পন্থা এবং সাজ-সরঞ্জাম। ইহার জন্য প্রয়োজন মূলধনের। বর্তমান বৎসরে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকার মত কৃষিঋণের প্রয়োজন হয় এবং ভবিষ্যতে কৃষিঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই ঋণ কোথা হইতে আসিবে? ভারতীয় চাষী তাহার বৎসরের ফসল কিছু উদ্বৃত্ত রাখিতে পারে না, এমনকি বীজ ধানও খাইয়া বসিয়া থাকে। সেইজন্য ভারতীয় কৃষিঋণের কেবলমাত্র উৎপাদনের দিকে নজর দিলে চলিবে না, তাহাকে জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজনও কতকাংশে মিটাইতে হইবে। বর্তমানে কৃষিঋণ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিম্ন হারে দেয় :

ঋণদায়ক সংস্থা	ঋণদানে শতকরা আনুপাতিক ভাগ
গবর্ন্মেণ্ট	৩.৩
সমবায় সমিতি	৩.১
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	০.৯
আত্মীয়স্বজন	১৪.২
জমিদার	১.৫
কৃষিঋণের মহাজন	২৪.৯
ব্যবসায়ী মহাজন	৪৪.৮
ব্যবসাদার	৫.৫
অন্যান্য	১.৮
	১০০.০

ইহা হইতে অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের কৃষিঋণ ব্যাপারে সমবায় সমিতির দান বৎসামান্ত। কৃষকের ঋণের শতকরা মাত্র ৩ ভাগ সমবায় সমিতিগুলির দেয়। অধিকন্তু সমবায় সমিতির ঋণ গরীব চাষী প্রায় পায় না বলিলেই চলে। সাধারণতঃ বড়লোক চাষী এবং জমির মালিক যাহারা তাহারাই সমবায় ঋণ পায়। এবং বেচাকেনায় সুবিধাজনক বন্দোবস্ত না থাকায় চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমবায় প্রথা ভারতের মোট জনসাধারণের শতকরা কেবলমাত্র ১৮ ভাগ অধিবাসীকে সাহায্য দেয় এবং ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, চাষীদের বৃহত্তর সংখ্যা সমবায় আন্দোলনের বাহিরে অবস্থিত। কৃষিঋণের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ আসে গ্রাম্য মহাজনের নিকট হইতে। সেইজন্ত কমিটি অভিমত দিয়াছেন যে, গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতাই প্রতীয়মান হয়।

গ্রাম্য তথা কৃষিঋণ উৎপাদনশীল হওয়া অবশ্যই উচিত। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণের প্রয়োজন এবং ইহার জন্ত কমিটি অভিমত দিয়াছেন যে, সমবায় প্রথাই ভারতের কৃষিঋণের জন্ত একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সমবায় প্রথার পুর্ণসংস্থানের জন্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। গ্রাম্য ঋণব্যবস্থাকে ভারতীয় বৃহত্তর জীবনের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত কৃষিঋণ সমস্তার যথার্থ সমাধান হইবে না। গ্রাম্য ঋণ সমস্তা শুধু গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়, গ্রাম্য অর্থনীতি সর্ব্বভারতীয় অর্থনীতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। সেই জন্ত গ্রাম্যঋণের সংজ্ঞা আইনগত ব্যাখ্যাতে নিবদ্ধ না করিয়া বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

সমবায় প্রথার পুর্ণসংস্থানের জন্ত রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন। এতদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্র সমবায় ব্যবস্থার উপর শুধু অতিরিক্ত কর্তৃত্ব করিয়াছে, কিন্তু অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে কার্পণ্য করিয়াছে। সেই জন্ত নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনে রাষ্ট্র ও সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে অংশীদারের মত সহযোগিতার প্রয়োজন। কৃষিঋণ ব্যবস্থার নেতৃত্ব করিবার দায়িত্ব কমিটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কৃষিঋণ দাদনের জন্ত কেন্দ্রীয় কৃষিব্যাঙ্ক আছে, কারণ কৃষিঋণ ও ব্যবসায়ী ঋণ ভিন্ন। কৃষিঋণ সাধারণতঃ দীর্ঘমেয়াদী, আর ব্যবসায়ী ঋণ স্বল্পমেয়াদী। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদিও নোট প্রচলনের দায়িত্বে লিপ্ত আছে, তথাপি ইহা একটি বৃহত্তর কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ব্যতীত কিছুই নয়। সেইজন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর কৃষিঋণের দায়িত্ব চাপানো মানে ইহার সুব্যবস্থা অপেক্ষা অব্যবস্থার সম্ভাবনাই বেশী।

কমিটি গ্রাম্যঋণ ব্যবস্থার জন্ত একটি রাষ্ট্রিয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও অন্তান্ত কয়েকটি ব্যাঙ্ক লইয়া এই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে। নূতন প্রতিষ্ঠানের মূলধন বৃদ্ধি করা হইবে এবং ইহার শতকরা ৫২ ভাগ শেয়ারের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তভাবে মালিক হইবেন। এই নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কটি গ্রামে গ্রামে শাখা বিস্তার করিবে সমবায় সমিতিকে সাহায্য প্রদানের জন্ত। আশা করা যায় যে, নূতন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কৃষিঋণের পরিমাণ বিবর্দ্ধিত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

সমাজতন্ত্রের রূপ

ভারতীয় লোকসভা ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজতান্ত্রিক হইবে বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের বা অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর কাহারও নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নাই।

ভারতীয় সমাজতন্ত্রের ধারা অবশ্যই মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শ হইতে বিভিন্ন এবং তাহা হইতে বাধ্য। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র হুবহু সোভিয়েট রাশিয়াতেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং তাহা হওয়া সম্ভবপরও নয়। দ্বন্দ্বমূলক বাস্তববাদের আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক দেশের অবস্থা ভিন্ন এবং আপেক্ষিক অবস্থায় ঘাতপ্রতিঘাতে আদর্শের রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। আর উনবিংশ শতাব্দীতে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল বিংশ শতাব্দীর আদর্শের বিবর্তনের ধারায় তাহার বাস্তবতা ক্ষীয়মাণ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সোজা কথায়, মিশ্র অর্থনীতিই ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অভিব্যক্তি এবং ইহাই ভারতীয় কংগ্রেস তথা লোকসভার আদর্শ। তাই সমাজতন্ত্রের কথা শুনিয়া ভয়ে আংকাইয়া উঠার মত কিছু নাই। এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে; তবে রাষ্ট্র কর্তৃক ইহা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইবে। অবাধ অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ এবং বাস্তবের দিক হইতে আজকের দিনে অচল।

পণ্ডিত নেহরু অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থাবান এবং ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় তিনি বেসরকারী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির তিনি নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন:

(১) ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে;

(২) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা থাকিতে পারিবে, কিন্তু তাহা রাষ্ট্র কর্তৃক বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(৩) তৃতীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে।

অর্থাৎ, ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে ত্রিধারায় ভাগ করা হইয়াছে—ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত এবং সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়। বিরুদ্ধবাদীরা অবশ্য বলিতে পারেন যে ইহাতে নূতনত্ব কি আছে?

১৯৪৮ সনে ঘোষিত মিশ্র শিল্পনীতিকে সমাজতন্ত্র বলিয়া নূতন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, ইহা যেন নূতন বোতলে পুরাতন সুরা বিতরণ। স্বপক্ষবাদীরা বলিবেন যে, ইহাতে ক্ষতি কি? রাশিয়া ত আর ভারতবর্ষ নয়। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রাশিয়ার মাটিতেই ফলবতী হইয়াছে; ভারত তাহার অবস্থা অনুসারে নূতন আদর্শ গড়িয়া লইবে, অন্ধ অনুকরণ অবাঞ্ছনীয়।

ভূদান ও ভূবণ্টন ব্যবস্থা

ভূদান আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় ভূবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে নাকি বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। আদর্শ সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু উহা যদি সুন্দর অবাস্তব আদর্শ হয় তবে তাহা বাস্তবের ক্ষেত্রে অচল।

ভারতে গড়পড়তা মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩ একর কিংবা তাহারও কিছু কম। ইহা হইতে যদি কোন মালিক চাষী আদর্শভাবাপন্ন হইয়া কিছু জমি দান করে তবে তাহার নিজের জমির মাপ অর্থ নৈতিক মাপকাঠির নীচে নামিয়া যাইবে। বাংলা দেশের কথাই ধরা যাক। এই প্রদেশে কর্ষণীয় জমির পরিমাণ মোট ১ কোটি ২৮ লক্ষ একর। মাধ্যমিক মালিকদের মাথাপিছু ২৫ একর দিবার পর মোটে ৪ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমি পাওয়া যাইবে বণ্টনের জন্য। মালিক চাষীরা মাথাপিছু ৩৩ একর জমি রাখিতে পারিবে। সুতরাং অতিরিক্ত ৪ লক্ষ একর যদি ৪ লক্ষ চাষীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে মাথাপিছু মোট এক একর করিয়া পড়ে। ইহাই ভূবণ্টনের সমস্যা।

বাংলা দেশে প্রায় দেড় কোটি কিংবা তারও অধিক চাষী, সুতরাং গড়ে মাথাপিছু এক একর চাষের জমিরও কম পড়ে। এ অবস্থায় শুধু রায়ত কিংবা মাধ্যমিক মালিকদের নিকট হইতেই জমি লওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ রায়তরা মাথাপিছু ৩৩ একর এবং মাধ্যমিক মালিকরা মাথাপিছু ২৫ একর রাখিতে পারে।

আচার্য্য বিনোবার মত

বিগত ২রা জানুয়ারী বাঁকুড়ায় আচার্য্য বিনোবা তাঁহার ভাষণে তাঁহার দৃষ্টিতে ভূবণ্টনের মূলকথা নিম্নোক্তরূপে বিবৃত করেন:

"বাঁকুড়া, ২রা জানুয়ারী—আচার্য্য বিনোবা ভাবে এখান হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী পাবরা গ্রামে আজ প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেন, 'সাম্যবাদ নহে, দারিদ্র্যই দেশের আসল শত্রু। দেশ হইতে দারিদ্র্য অবিলম্বে দূর করা না গেলে, ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা আছে।'

বিনোবাজী আরও বলেন যে, তিনি সাম্যবাদকে তাঁহার শত্রু বলিয়া মনে করেন না। কারণ তিনি জানেন যে, উহা দেশের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্গতিরই পরিণতি। অতএব দেশ হইতে সাম্যবাদকে দূর করিতে হইলে, দারিদ্র্যেরই মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। পরে প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি বলেন যে, তিনি পাবরায় কয়েকজন দরিদ্র গ্রামবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া প্রচণ্ড বেদনা পাইয়াছেন। গ্রামের হরিজনরা অপরের জমিতে চাষবাস করেন, বেগার খাটেন খাজনার পরিবর্তে। ইহা দরিদ্রদের শোষণ। ইহাতে দেশের পক্ষে মহা বিপদের সৃষ্টি হইতেছে।

তিনি দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূদান আন্দোলনের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসের কথাও উল্লেখ করেন। দেশের সমস্ত ভূদান-কর্মী সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া ভূদান আন্দোলনে ছয় মাসের জন্য কাজ করিলে, ভারতের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতেছে, দেশের সমস্ত চাষীর জন্য ভূমির ব্যবস্থা করা। ভূমি জল ও বাতাসেরই মত ভগবানের দান। ভূমির উপর কাহারও আধিপত্য থাকা উচিত নহে বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি সকলকে স্ব-স্ব ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ চাষীদের দিতে অনুরোধ করেন, কারণ ইহাতে দেশের সমস্ত ভূমিহীন চাষীর পক্ষেই জমি পাওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া তাঁহার ধারণা। তিনি আরও বলেন যে, গ্রামবাসীরা ঐ পরিমাণ জমি ভূদান আন্দোলনে দান করিলে দেশের ভূমিহীন চাষীরা আর বড় বড় শহরে জীবিকার্জনের জন্য ছুটিবে না।

ভারতের সভ্যতা মূলতঃ গ্রামীণ সভ্যতা—এই কথার উল্লেখক্রমে তিনি বলেন যে, ভারতে কলিকাতার মত মহানগরীর উদ্ভব হইয়াছে। ইহা ভারতীয় সভ্যতার পরিপন্থী। ভারতের সমৃদ্ধি ভারতের মহানগরীগুলির সমৃদ্ধির উপর নহে, গ্রামসমূহেরই সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ কলিকাতা নগরীতেই বাস করে। এই নগরীগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, গ্রামগুলিকে শোষণ করিয়া। তিনি গ্রামবাসীদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমৃদ্ধি কলিকাতা মহানগরীর আয়তন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে না। তিনি কলিকাতা মহা-নগরীর অধিবাসীদের এই বাস্তব সত্যকে অনুধাবন করিতে এবং গ্রামবাসীদের কল্যাণে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন।"

হিন্দী ও ভারতের নূতন সৃষ্টিধর্ম্ম

বিগত ৫ই জানুয়ারী শ্রীনেহেরু যে ভাষণ দিয়াছেন তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। বিশেষতঃ যে 'মহাশয়' ব্যক্তিগণ আজ "হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের" উৎসাহী প্রবর্তক তাঁহাদের ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে তাহা বোধ হয় দুরাশা মাত্র।

"আমেদাবাদ ৫ই জানুয়ারী—আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন 'ভারত এক নূতন সৃষ্টিধর্ম্ম যুগে পদার্পণ করিয়াছে। দীর্ঘকালের প্রাণহীন অন্ধ অনুকরণের পর দেশ আবার প্রগতির পথে নূতন প্রেরণা লাভ করিয়া অগ্রসর হইতেছে। কেবল স্বাধীনতা লাভের কথাই আমি উল্লেখ করিতেছি না...সাহিত্য, কলা এবং অন্যান্য বিষয়ে জনগণের মধ্যে সৃষ্টিধর্ম্মী বিপ্লবের যে বিকাশ ঘটিতেছে তাহার কথাই আমি বলিতেছি।'

১৯২০ সনে মহাত্মা গান্ধী গুজরাট বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। আজ শ্রীনেহরু এই সংস্থার পুস্তকাগার গান্ধী-ভবনের উদ্বোধন করিয়া উপরোক্ত মর্ম্মে ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, 'হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে। ইহার অর্থ

এই নয় যে, অন্যান্ত ভাষার প্রগতি রুদ্ধ হইবে। জনগণের মধ্য হইতে যে ভাষা পুষ্টিলাভ করে সেই ভাষাকে দাবান যায় না। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় পণ্ডিত এই সমৃদ্ধির অধিকারী নহে। পল্লীবাসীরাও তাঁহার প্রাণবন্ত গান গাহিয়া থাকে এবং তাঁহার গান ও গ্রন্থগুলি সমাদরে পঠিত হয়। ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য যে বাংলা ভাষাভাষীদের অন্ত কোন ভাষার দাপটে রবীন্দ্রনাথের অবদানে সমৃদ্ধ এই বাংলাভাষার দমন সম্ভব।'

শ্রীনেহরু বলেন যে, ভাষার অবস্থা দেখিয়াই কোন্ জাতি কত দূর উন্নত হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। একদা সংস্কৃত ভাষায় আমাদের দেশবাসীর জ্ঞানগরিমার প্রকৃষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু দীর্ঘকাল পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা সেই শক্তি হারাইয়াছে। সংস্কৃতে দশ লাইনে ভাষাচাতুর্য্য প্রধান কবিতা লেখা সম্ভব; কিন্তু সেই ভাষার আজ প্রাণসম্পদ নাই—জনগণই সৃষ্টির প্রেরণা হারাইয়াছে। নিরর্থক ভাষাগত বিরোধ সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন যে, এই বিতর্কের কারণ বুঝিতে পারি না। যদি কোন ভাষা জনগণের চিন্তার অভিব্যক্তিতে প্রাণরসে পুষ্ট না হয় তাহা হইলে সেই ভাষার আত্মবিলুপ্তি অপরিহার্য্য।

শ্রীনেহরু বলেন যে, হিন্দী প্রচার দূষণীয় নহে তবে যে কোন ভাষার অস্তিত্বই জনপ্রিয়তার উপর নির্ভরশীল। উর্দ্দু আমাদেরই ভাষা। অন্য কোন দেশবাসী উর্দ্দু ভাষা গ্রহণ করিলেই উর্দ্দু আর আমাদের ভাষা বলিয়া গণ্য হইবে না, তাহা হইতে পারে না। হিন্দুদের দ্বারা প্রকাশিত দিল্লীর বহু সংবাদপত্রই উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশিত। উর্দ্দু বিরোধী হিন্দু মহাসভার লোকেরা তাহার সম্পাদনা করিয়া থাকে।

ইংরেজী ভাষার অবহেলা সম্পর্কে শ্রীনেহরু সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, যদিও ইংরেজী জাতীয় ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না তথাপি কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই নহে পরন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও আমরা ইংরেজীর অপরিহার্য্যতা উপলব্ধি করি। আমরা বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলে প্রগতির পথ হইতে আমরা পিছাইয়া পড়িব। ফরাসী, জার্ম্মান, রুশ এবং চীন ভাষাও আমাদের শিক্ষা করা প্রয়োজন, কারণ ইহাদের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বের সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইতে পারিব।

শ্রীনেহরু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে পুস্তকাগারের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আমরা দীর্ঘ বিতর্কের মধ্যে ডুবিয়া যাই কিন্তু আমরা পড়ার ব্যবস্থা করি না। প্রত্যেকটি পল্লীতে একটি করিয়া অন্ততঃ পুস্তকাগার স্থাপন করিতে হইবে।

বিহারী হিংসানীতি

বিহার সরকার ও তাহার অধিকারীবর্গ এখনও কি ভাবে বাঙালীর উপর অত্যাচার চালাইয়া যাইতেছে তাহার পরিচয় নিম্নোক্ত সংবাদে পাওয়া যায়। উহা আনন্দবাজারের বিশেষ সংবাদ।

"জামসেদপুর, ১২ই জানুয়ারী—সিংভূমের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করিয়া ধলভূম অঞ্চলে কিছু সংখ্যক বিহারী বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেছে বলিয়া প্রায়ই এখানে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সব বিহারী গ্রামবাসীদের নিকট অপরিচিত। তাহারা নিরীহ গ্রামবাসীদের নিকট বাঙালীদের বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচার কার্য্য চালাইতেছে এবং গ্রামবাসীদের এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে যে, তাহারা যদি ধলভূম, সিংভূম প্রভৃতির পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাহা হইলে তাহাদের উপর আক্রমণ চালান হইবে।

এই সব ভীতি প্রদর্শনের ফলে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নিজেদিগকে অসহায় মনে করিতেছে।

জামসেদপুর শহরেও এই সব কদর্য্য প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে। গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে কতকগুলি বিহারীকে ট্রাকে করিয়া প্রচারপত্র লইয়া যাইতে দেখা যায়। তাহারা 'জয় বিহার', 'সিংভূম জিলা বিহারমে রহেগা' প্রভৃতি ধ্বনি করিতেছিল। একদল বাঙালী মহিলা পিকনিক করিয়া ষ্ট্রেট মাইল রোড দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত উক্ত বিহারীদের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা 'জয় বাংলা' ধ্বনি করেন। আনন্দের বিষয় এই যে, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সঙ্ঘর্ষ হয় নাই।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্যগণ বর্তমান মাসের শেষ দিকে অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে এই অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। জানা গিয়াছে যে, কমিশন তাঁহাদের সম্মুখে স্মারকলিপি পেশ করার জন্য জনগণকে অনুরোধ জানাইবেন এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

কমিশনের সদস্যদের এই সব জেলার অভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত।

রাজ্যপুনর্গঠন ও বিহার

অন্যায়ের প্রতিকার চাহিলে অনেক সময় যে দোষী সে নিজের দোষ অত্যাচরিত বা বঞ্চিতের দোষ বলিয়া ঘোষণা করিবার চেষ্টা করে। ইহা শঠ লোকমাত্রেরই একটা প্রধান অস্ত্র। সম্প্রতি রাজ্যপুনর্গঠন সম্পর্কে বিহার ও বাংলার মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছে তাহাতে বিহারের প্রধানমন্ত্রীও যে এই ছলনার পথ অবলম্বন করিয়াছেন ইহা নিতান্ত লজ্জার কথা। ইঁহারা কংগ্রেসকে কোন্ নরকে লইয়া চলিয়াছেন?

শ্রীঅতুল্য ঘোষের এত দিনে কিছু চৈতন্যের আভাষ দেখা গিয়াছে। তাহার পরিচয় নিম্নোক্ত বিবৃতিতে আছে:

"বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ড. শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হুমকায় তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় রাজ্যপুনর্গঠন সম্পর্কে বলিয়াছেন। ড. সিংহের ন্যায় একজন খ্যাতি ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির বিবৃতি জনসাধারণকে নির্ভুল নেতৃত্ব দেয় বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার বিবৃতিতে কিছু সত্যের অপলাপ ঘটিয়াছে, এমনকি, ভ্রান্তিপূর্ণ তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। আমি দুঃখিত যে, তাঁহার এই সব উক্তির স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখিতেছি না।

"সর্ব্বপ্রথম তিনি বলিয়াছেন যে, ছোটনাগপুর সব সময়ই বিহারের অংশ ছিল এবং ছোটনাগপুরের অধিবাসীরা বিহার রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সুখদুঃখের ভাগী হইয়া বসবাস করিতেছে। আমি বলিব যে, ইহা অপেক্ষা অসত্য কিছু হইতে পারে না। ছোটনাগপুরের বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়ার স্থান ইহা নহে। তবে সংক্ষেপে আমি বলিতে পারি যে, জোর করিয়া কিছু বলিলেই ইতিহাসজ্ঞদের নিকট সুপরিচিত ঐতিহাসিক তথ্য বদলাইয়া যাইতে পারে না। বস্তুতঃ, ইতিহাসের যাবতীয় তথ্য ইহাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, অধুনা পশ্চিমবঙ্গ বিহারের যে সব অংশ দাবি করিতেছে, কোন কালেই তাহা বিহারের অংশ ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে ঐ সব অঞ্চল বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এমনকি, হিন্দুযুগেও বর্ত্তমান আকারে বিহারের যখন কোন অস্তিত্ব ছিল না, তখন বাংলাদেশ একটি সর্ব্ববিষয়ে উন্নত অঞ্চল ছিল, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট ইতিহাস ছিল, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল এবং বিহারের অন্তর্গত বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি সেই প্রাচীন যুগেই নিঃসন্দেহে বাংলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোটা মুসলমান রাজত্বকালে ঐ অঞ্চলগুলি বাংলার সহিত যুক্ত ছিল। এমন কি ব্রিটিশ যুগেও ১৯১২ সন পর্য্যন্ত এই সব অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ১৯১২ সনে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শাসনের ক্ষেত্রে এই সব অঞ্চলকে পৃথক করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু শাসনের ক্ষেত্রে ৪৩ বৎসরকাল এই অঞ্চল বাংলা হইতে পৃথক হইয়া থাকিলেও, উহা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের সহিত ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতির একাত্মতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই ভাষা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতির অভিন্নতা কয়েক শতাব্দীর মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, আজও প্রত্যেকটি মূলনীতির বিচারে ঐ সব অঞ্চল বাংলারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিমবঙ্গের এই সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত দাবি মানিয়া লইতে এত বিরোধের সৃষ্টি কেন হয়, আমি তাহা বুঝিতে অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ, ড. সিংহ অভিযোগ করিয়াছেন যে, সীমান্ত জেলাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের শত শত স্বেচ্ছাসেবক বিহারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতেছে; অপর পক্ষে ড. সিংহ দার্জ্জিলিঙ ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়াও ঐ সব অঞ্চলে সফর করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বিহারের সীমান্ত অঞ্চলগুলি হইতে আমিও তথায় যাওয়ার আমন্ত্রণ পাইয়াছি; কিন্তু আমিও তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হই নাই। ইহা শুধু পারস্পরিক সৌজন্যের কথা নহে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে, জনসাধারণই নিজেদের ইচ্ছানুসারে অবাধে নিজদিগকে সংগঠিত করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি পশ্চিমবঙ্গের নেতারা মানভূম, ধলভূম প্রভৃতি অঞ্চলে যাইয়া প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন, ড. সিংহ তাহাতে কিরূপ বোধ করিতেন? যে সব অঞ্চলের অধিবাসীরা বাংলার সহিত নিজ নিজ এলাকা যুক্ত করিতে উৎসুক, ড. সিংহের শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের নেতাদিগকে কি তিনি সেই সমস্ত অঞ্চলে যাইয়া প্রচারকার্য্য চালাইতে দিবেন?

ড. সিংহ আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে, বিহারের সীমান্ত জেলাসমূহে বাংলাদেশ হইতে স্বেচ্ছাসেবকেরা যাইয়া প্রচারকার্য্য সংগঠন করিতেছে। আমি সবিনয়ে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিব যে, ইহা মোটেই সত্য নয়। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, একজন স্বেচ্ছাসেবকও এখান হইতে বিহারে যান নাই। বিহারে বঙ্গভাষাভাষীদের বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এবং স্থানীয় লোকেরাই ইহা গড়িয়া তুলিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমার হাতে এমন নিশ্চিত খবর আছে যে, বিহারের অধিবাসীদের কেহ কেহ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় অবাধে যাতায়াত করিয়া উপদ্রব সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ড. সিংহ রাজী থাকিলে, এই বিষয়ে তদন্তের ভার আমি পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের ন্যায় কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় কোন নেতার হাতে পেশ করিতে একান্তভাবে ইচ্ছুক।

অবশেষে ড. সিংহ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, বিহারে বাংলাভাষা দলন মোটেই হয় নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার মতে বিহার সরকার ভাষায় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের যে শিক্ষানীতি তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। আমি চাহি যে, ইহা সত্য হউক; কিন্তু আমার হাতে যেসব তথ্য আছে এবং জনসাধারণ যে-সব তথ্যের সহিত সুপরিচিত, তাহা অন্য কথা বলে। বিহার রাজ্যে হিন্দী ভাষা বলপূর্ব্বক চাপাইবার নীতি এবং বিহারের ভাষায় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঢেউ সকল প্রকার শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। এই দমননীতির লাঠি চালাইয়া যাইতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ সেখানে দেখা যায় না। আমি এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

ভাষায় সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ডের সভায় (১৯৪৯ সনের এলাহাবাদ অধিবেশনে) এবং শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে (১৯৪৯ সনের আগষ্ট মাসে), কয়েকটি নীতি গ্রহণ করেন। সংক্ষেপতঃ নীতিগুলির আসল কথা ছিল, শিক্ষারম্ভের প্রথমাবস্থায় শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা করিতে হইবে। মাধ্যমিক স্তরে, "রাজ্য বা অঞ্চলের ভাষা নয়, এমন ছাত্রদের সংখ্যা যদি এত অধিক হয় যে, ঐ অঞ্চলে তাহাদের জন্য একটি পৃথক স্কুল স্থাপনের যৌক্তিকতা আছে, এইরূপ স্কুলে ছাত্রদের শিক্ষার বাহন তাহাদের মাতৃভাষা হইতে পারে। এইরূপ স্কুল যদি বেসরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা সংগঠিত বা স্থাপিত হয়, তবে সরকারের নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী উহাদের সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্তির এবং সরকার হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকার আছে। কোন স্কুলের এক-তৃতীয়াংশ ছাত্র দাবি করিলে সেই দাবি অনুযায়ী সরকারকে ছাত্রদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে করিতে হইবে।" ১৯৪৮ সনেই প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু

বিচারের অবস্থা কি? ১৯৫৩ সনে বিহার সরকার তাঁহাদের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে (৬৪৫ ই নং, রাঁচী, ১০ই আগষ্ট, ১৯৫৩) মাতৃভাষায় সমস্ত মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে নহে, শুধু সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত, শিক্ষা দিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু ইহাও সরকারী নীতি মাত্র।

কার্য্যতঃ আমরা কি দেখি? বস্তুতঃ যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ করিয়া এই নীতি লঙ্ঘন করা হইতেছে, ইহাই কি সত্য নহে, বাঙালী শিক্ষকদিগকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইতেছে; বাংলাভাষা দমন করা হইতেছে; বাঙালীর সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকে লাঞ্ছিত করা হইতেছে; সাধারণ সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও অসম্ভব সব সর্ত্ত আরোপ করা হইতেছে। ইহাই কি ভারত সরকারের শিক্ষানীতি অনুসরণ? সমস্ত প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে ভাষার সংখ্যালঘুদের উপর এই যে পরিকল্পনাপ্রসূত নির্যাতন ইহার সহিত সত্যকার গণতান্ত্রিক সরকারের নীতির সামঞ্জস্য কোথায়?

আমি শুধু ন্যায় আচরণ চাহি। বিশেষতঃ, বিষয়টি এখন বিচারাধীন রহিয়াছে।

বিহারে বাঙালী বিতাড়ন

"নবজাগরণ" পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, বিহারে রাজ্য-সরকারের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারও প্রাদেশিকতার তালে তাল মিলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, জামসেদপুর হেড পোষ্টাপিস হইতে বাঙালী কর্ম্মচারীদিগকে নাকি বদলী করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। "জামসেদপুর হেড পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টার, একাউনটেণ্ট, দুই জন সুপারভাইজার ও সিংভূম পোষ্টাল সাবডিভিসনের জামসেদপুরস্থিত সদর দপ্তরের ইনস্পেক্টরকে অন্যত্র বদলী করিয়া তাঁহাদের স্থানে বিহারী কর্ম্মচারী বহাল হইবে এইরূপ নাকি আদেশ পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নিকট হইতে আসিয়াছে।" উক্ত আদেশের ফলে জামসেদপুরের ডাক-বিভাগের বাঙালী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিশেষ আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এরূপ ব্যাপার ত চলিতেছেই। আমাদের যদি প্রতিকারের শক্তি ও সামর্থ্য না থাকে তবে উপায় কি? ভাবাবেগে উন্মত্ত হইয়া আমরা ত বাস্তবকে ছাড়িয়াই চলিয়াছি। জাতির কল্যাণ সম্পর্কে কোন কথা আমরা কেহই শুনিতে চাহি না।

উদ্বাস্তু সমস্যা

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না গত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্বাচিত লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যগণের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারা পুনর্বাসনের নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই বৈঠকে শ্রীখান্না জানান যে, পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের জন্য একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ইতিমধ্যে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। আগামী দুই বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৬-৫৭ সনে আনুমানিক আরও ২১ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হইবে।

শ্রীখান্না বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমস্যাকে ভারত সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেছেন। পুনর্বাসন বিভাগের সদর দপ্তর কলিকাতায় স্থানান্তরিত করায়, কলিকাতাস্থিত দপ্তরের কর্ম্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি করায় এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনাসমূহ দ্রুত পরীক্ষা করায় জন্য অর্থদপ্তরের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগ করায় এই বিষয়ে সরকারের উদ্বেগ ও আগ্রহের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত যে কাজ হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া শ্রীখান্না বলেন যে, সরকারী হিসাবে দেখা যায়, সরকার সওয়া তিন লক্ষ বাস্তুহারা পরিবারকে পুনর্বাসন সাহায্য দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ২,৭৬ ৪৬৪জন গ্রামাঞ্চলের ও ৫৬,৬৩০জন শহর অঞ্চলের অধিবাসী। ইহা ছাড়া ১,১১,৮৭১ জনকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মারফত চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। ১৮,৫৪২ জনকে কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে ৯৬০ জন এপ্রেণ্টিস সহ আরও ৩,৪৫০ জন বাস্তুহারা এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীখান্না বলেন যে, গত দুই মাসে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ের ত্রিশটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যগণকে নিজের নিজের প্রস্তাব জানাইতে বলিয়া শ্রীখান্না বলেন যে, স্থানীয় অবস্থার সহিত পরিচিত বলিয়া বাস্তুহারা সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান আছে, একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি বলেন, পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলে পুনর্বাসনের সমস্যা কঠিনতর। পশ্চিমাঞ্চলে বাস্তুহারারা একবারে এবং চিরকালের মত চলিয়া আসিয়াছেন এবং সমসংখ্যক লোক ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে পশ্চিম পাকিস্থান হইতে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য ৭৫ লক্ষ একর চাষের জমি, পল্লী অঞ্চলে সাড়ে চার লক্ষ গৃহ ও শহর অঞ্চলে তিন লক্ষ গৃহ, ছয় হাজার দোকান, ১৬০০ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৩,১৪,০০০ প্লট পাওয়া গিয়াছিল। অথচ পশ্চিমবঙ্গত্যাগী বাস্তুহারাদের নিকট হইতে দুই লক্ষ ৪৮ হাজার একর কৃষিজমি, গ্রামাঞ্চলে ৫১,০৭৭টি ও শহরাঞ্চলে ১৬০০ গৃহ, ৫৬৯টি দোকান ও তিনটি প্লট পাওয়া গিয়াছে। এখানে বাস্তুহারারা কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান রাখিয়া যান নাই। পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। সেইজন্য এখানে জমি পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। এতদ্ব্যতীত এখনও প্রতি মাসে দশ হাজার বাস্তুহারা আসিতেছেন। এই সকল কারণে এই অঞ্চলে পুনর্বাসনের সমস্যাটি অতিশয় জটিল।

পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারা পুনর্বাসনের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অন্তরায় শ্রমবিমুখতা। যে সকল লোক প্রথমে পূর্ণ উদ্যমে নূতন জীবন গঠনের চেষ্টা করিতেছিল তাহারাও দীর্ঘদিন দেখিয়া আসিতেছে যে, তাহারা কঠোর পরিশ্রমে যাহা পায়, চতুর ব্যক্তিরা বিনাশ্রমে তুলনায় পথে তাহা অপেক্ষা অধিক অর্জ্জন করে। ফলে তাহাদেরও উৎসাহ গত হইয়াছে। "জবর দখল" বাস্তুঘুঘুর একটি প্রধান অস্ত্র। শ্রীখান্নার এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

উদ্বাস্তু শিবিরে বালিকা বিক্রয়ের ষড়যন্ত্র

১লা পৌষ "যুগশক্তি" পত্রিকায় শিলচরস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ১১টায় সময় শিলচর তারাপুর অনাথ উদ্বাস্তু শিবিরের বীণা নাম্নী মাতৃপিতৃহীনা দশ বৎসর বয়স্কা একটি কায়স্থ বালিকাকে ক্যাম্প সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও অন্যান্য কয়েকজন কর্ম্মচারীর যোগসাজসে শিবির হইতে সরাইয়া লইয়া শিলচর শ্মশান ঘাট রোডের জনৈক ব্যক্তির সহিত শেষরাত্রে বিবাহ দিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু স্থানীয় যুবকদের প্রতিকূলতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, "পরদিন ১৫ই ডিসেম্বর দ্বিপ্রহরে কাছাড় জেলা উদ্বাস্তু সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য ঘটনার কথা জানিতে পারেন এবং এডিশনাল রিলিফ কমিশনার শ্রী জে. কে. দত্তকে জ্ঞাপন করেন। অতঃপর ঘটনার তদন্ত আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ পায় যে, সূর্য্য বিশ্বাস নামক জনৈক ব্যক্তি সূর্য্য দেব নামক অপর এক ব্যক্তির সহিত মিলিয়া ক্যাম্পের কর্ত্তৃপক্ষ ও কয়েকজন বাসিন্দার যোগসাজসে প্রচুর টাকার বিনিময়ে উক্ত শিশু বালিকাকে লইয়া গিয়া বিবাহ করার ষড়যন্ত্র করে।"

তদন্তের ফলে আরও একটি মেয়ের তিন দিন পূর্ব্ব হইতে নিখোঁজ হইবার সংবাদ প্রকাশ পায়।

ক্যাম্প সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীশীতল চক্রবর্ত্তী এবং পিয়ন শ্রীযোগেন্দ্র দেবকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে, সংবাদে এরূপ বলা হইয়াছে।

আমরা আশা করি, তদন্তে যাহা জানা যাইবে তাহা সরকারী তরফ হইতে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ ঘটনা যদি প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়া থাকে তবে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বাঁকুড়ায় মহিলা কলেজ

বাঁকুড়ায় মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে কলেজ ভবন ও আসবাবপত্রাদির জন্য তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে। অবশ্য, তাহার পূর্ব্বে বাঁকুড়ার জনসাধারণকে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

শহরে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে অভিনন্দিত করিয়া শ্রীমুখ 'হিন্দুবাণী'তে লিখিতেছেন যে, নিম্নলিখিত কারণে অবিলম্বে বাঁকুড়ায় একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে:

"(১) বর্ত্তমানে কলেজ-ছাত্রীসংখ্যা বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংখ্যা প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। ছাত্রীদের পৃথক কলেজ অল্পকালের মধ্যে স্বয়ংসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

"(২) বহু রক্ষণশীল পরিবার আছেন, যাঁরা মেয়েদের পৃথক কলেজ বাঞ্ছনীয় মনে করেন। মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট স্তরে সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় নয়, রাধাকৃষ্ণণ কমিশন এই মত ব্যক্ত করেছেন।

"(৩) আসন বাড়াবেন না বলে স্থানীয় বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছেন। কাজেই ছাত্রীরা সরে এলে ছেলেরা অধিক সংখ্যায় ভর্ত্তি হবার সুযোগ পাবে।

"(৪) শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স প্রভৃতির কার্য্যে উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের দরকার খুব বেশী।"

বর্দ্ধমান কেতুগ্রামে পুলিসের বর্ব্বর আচরণ

১৭ই ডিসেম্বর "দামোদর" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, গত ৪ঠা ডিসেম্বর বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার রতনপুরে ধানকাটা লইয়া সংঘর্ষের ফলে পুলিস গুলী চালনা করে। ফলে জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া নাকি দুই জন পুলিসকে ধরিয়া রাখে। মহকুমা পুলিস আসিয়া পরে ঐ দুই জন পুলিসকে উদ্ধার করে। কিন্তু একুশটি কার্ত্তুজ নাকি কম পাওয়া যায়। পুলিস এ সম্পর্কে রতনপুর, খাসপুর, কাঁটারী ও রাইগাঁ গ্রামে হাঙ্গামাকারীদের ধরিবার জন্য বেপরোয়া মারপিট করিয়াছে। বহু লোককে গ্রেপ্তারও করা হয়।

কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ পুলিস অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং সকলেই পুলিসের নিতান্ত অশিষ্ট আচরণের উল্লেখ করেন। বর্দ্ধমান কংগ্রেসের সভাপতি জনাব আবদুস সাত্তার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিবার সময় কয়েকটি বাড়ীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র, ভাঙ্গা বাক্স প্যাঁটরা প্রভৃতি দেখিতে পান। পুলিস সোনার গহনাদি এবং নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ তাঁহার নিকট অভিযোগ করে বলিয়া প্রকাশ। ১৭ই ডিসেম্বর "বর্দ্ধমান বাণী"তে কংগ্রেস-সভাপতির সফরের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে: "খাসপুর গ্রামে একজন অন্ধ বৃদ্ধার শরীরে আঘাতের চিহ্নও জনাব সাত্তারকে দেখান হয়। অন্ধের সাহায্যকারী একটি ১০।১১ বৎসরের বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলে পুলিস তাহাকে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া মারিয়াছে। একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোক তাহার শরীরের আঘাতের চিহ্ন দেখাইয়া বলে পুলিস তাহাকে মারিয়াছে। খাসপুরের জনৈক কলেজের ছাত্রও পুলিসের হাতে লাঞ্ছনার কথা বিবৃত করেন। রতনপুর, খাসপুর ও কাটারির বৃত্তান্ত একরূপই। রাইগাঁর লোক পুলিসকে টাকা দিয়া রেহাই পাইয়াছে বলিয়া উক্তি করে।"

"বর্দ্ধমানের ডাক" (২৪শে ডিসেম্বর) পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধাগোবিন্দ দত্ত উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া উক্ত পত্রিকায় লিখিতেছেন:

"পাশবিক-উন্মাদনায় কাটোয়ার সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর লোকেরা কাঁটারী, খাসপুর ও রতনপুর গ্রামে যে সকল মর্ম্মন্তুদ অসভ্য অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাতে ইতিহাস-বর্ণিত বর্গীর জুলুমও ম্লান হইয়াছে। দেখিলাম দুর্ব্বৃত্তরা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে জাতীর সভ্য শাসনের কলঙ্কের ছাপ। সে দাগ সহজে মিলাইবার নহে। অবাধ গ্রেপ্তার ও নির্ব্বিচারে মারপিটের ফলে গ্রামগুলি যখন প্রায় পুরুষশূন্য হইয়াছে দুর্ব্বৃত্তরা তখন পাশবিক লালসায় উন্মাদ হইয়া বালক-বালিকা ও ঘরের মেয়েদের

উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে রক্ষকবিহীন মেষপালে নেকড়ের মতন। গৃহে গৃহে দরজার কপাট ও বাক্সপেঁটরা ভাঙিয়া অবাধ লুণ্ঠন, বালক-বালিকা ও মেয়েদের বেপরোয়া মারপিট ও উলঙ্গ করিয়া এবং দুইটি ক্ষেত্রে কুলবধূর উপর পাশবিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে। গ্রামবাসীদের হাঁস, মুরগী, খাসী, মাছ ও ডিম এবং মিষ্টির দোকানের মিষ্টি অবাধ ভক্ষণ করিয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসীদের বিবরণে প্রকাশ, কাটোয়ার মহকুমাশাসক শ্রীসুধীরকুমার মুখার্জি স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া এই অবাধ বেআইনী দমনের নির্দেশ দেন। এই ঘটনা গভীর পরিতাপের। এ বিষয়ে বেসরকারী তদন্তের আশু প্রয়োজন।"

৮ই পৌষ "বর্দ্ধমানবাণী" পত্রিকায় স্বাক্ষরিত এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে জনাব আবদুস সাত্তার এই পুলিসী অত্যাচারের আশু তদন্তের দাবী করিয়াছেন।

দুই জন পুলিসকে আটকাইয়া রাখার নিন্দা করিয়া উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে জনসাধারণকে স্বহস্তে আইন তুলিয়া লওয়ার ঝোঁক পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের নিষ্ঠুরতারও নিন্দা করা হইয়াছে।

ঘটনার কারণ বিবৃত করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, জমির দখল ও স্বত্ব লইয়া রতনপুর গ্রামের দুই ব্যক্তির মধ্যে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিবাদ চলিতেছিল। এতদিন পর্য্যন্ত শক্তিশালী পক্ষ জোর করিয়া ধান তুলিয়া লইত। "এ বৎসরেও তাহারই আয়োজন চলিতেছিল কিন্তু এ বৎসর দুই জন সশস্ত্র পুলিস দেখা গেল। বিরোধের ক্ষেত্রে ১৪৪ ধারা জারীর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সাধারণভাবে শান্তি রক্ষার জন্য পুলিস গিয়াছিল, না এক পক্ষকে সাহায্য করিবার জন্য গিয়াছিল তাহারও কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুসারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমি কোন্ পক্ষের দখলে আছে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল কি না তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক, যে কোন সূত্রে পুলিস আসিয়া হাজির হয়। পুলিস যে ভাবে ডেরা গাড়িয়াছিল তাহাতে তাহাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়া গিয়াছে।"

৪ঠা ডিসেম্বর এক পক্ষ জোর করিয়া ধান তুলিতে আসিলে পুলিসের গুলি চালনায় এক জন নিহত হয়। তার পরই পুলিস দুই জনকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখা হয়।

পুলিসের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব সাত্তার লিখিতেছেন :

"ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ৫ই ৬ই ডিসেম্বর। এক সপ্তাহ পরে ১৩ তারিখে গ্রাম তিনখানিতে গিয়া দেখা গেল, লোকের মন হইতে পুলিস-আতঙ্ক যায় নাই, তখনও সকলে গ্রামে ফেরে নাই। একটি-দুইটি বাড়ীতে নহে, অনেকগুলি বাড়ীর জিনিষপত্র তচনচ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গেল। দুঃখ ও লজ্জার কথা বাড়ীর মেয়েদের দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল। কাহারও দেহে বেটন অথবা বন্দুকের কুন্দার আঘাতের চিহ্ন, কাহারও দেহে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইবার চিহ্ন। ইহাদের মধ্যে অল্পবয়স্কা বালিকা আছে, অন্ধ বৃদ্ধা আছে, গর্ভবতী রমণী আছে। পুলিসের হাতে লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ আছে, কলেজের তরুণ ছাত্রও আছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, পুলিসের মনে এক হাত দেখিয়া লইবার মনোভাব জাগিয়াছিল। আসামী-গণ যদি ফেরার হইয়াছিল তাহা হইলে এই শ্রেণীর আসামীগণকে গ্রেপ্তার করিবার যে বিধান আছে তাহাই অবলম্বন করা আবশ্যক ছিল। একুশটি খুঁজিয়া না পাওয়া কার্ত্তুজের সন্ধান হইয়াছিল—ধরিয়া লইলাম। খানাতল্লাসীর নিয়ম আছে, সে নিয়মমত কি খানাতল্লাসী হইয়াছিল? ডাঃ মুকুল আবসার, এম-বি, বি-এস, কাটাড়ী গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি কর্তৃপক্ষের সহিত সকল বিষয়ে সহযোগিতাই করিয়া থাকেন। তাঁহার বন্দুক ও রিভলভার দুই-ই আছে। তিনি গ্রামে উপস্থিত থাকিতেও বাড়ীর মেয়েদের সরিয়া যাইবার সুযোগ না দিয়া তাঁহার অসাক্ষাতে বাড়ী খানা-তল্লাস হইয়া গেল। পুলিসবাহিনী তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি যদি এইরূপ অশোভনীয় ও অসঙ্গত আচরণ করিয়া থাকে তাহা হইলে সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহা ইহা হইতে অনুমান করা কঠিন হইবে না। রাইপা গ্রামে কোন ঘটনা ঘটে নাই। গ্রামবাসিগণ বলে তাহারা পুলিসকে টাকা দিয়া রেহাই পাইয়াছে।"

পুলিসকে আটক রাখার নিন্দা করিয়া জনাব সাত্তার লিখিতেছেন, "কিন্তু পুলিস কি দুর্ব্যবহারের উত্তরে দুর্ব্যবহার ও বেআইনী আচরণ করিবে?"

অসুস্থ চিকিৎসাধীন কয়েদীর হাতে কড়ি

বালুরঘাট হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "আত্রেয়ী" পত্রিকায় ৪ঠা পৌষ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে আনীত অসুস্থ কয়েদীদিগকে হাতকড়িবদ্ধ অবস্থায় রাখার সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ যুগেও কখনও অসুস্থ চিকিৎসাধীন কয়েদীকে হাতকড়ি পরাইয়া হাসপাতালে রাখার নজীর পাওয়া যায় না। স্বাধীন ভারতে পুলিসের ঐরূপ ব্যবহার সত্যই বিশেষ নিন্দার্হ। "কোন চিকিৎসাধীন আসামীর বিরুদ্ধে যদি বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হয়, তবে তাহাকে হাতকড়ি লাগাইয়া রাখিতে হইবে এইরূপ মানবতাবিরোধী কার্য্য কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। বিষয়টির প্রতি আমরা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

বর্দ্ধমান-দামোদর সদরঘাটে টোল ট্যাক্স

বর্দ্ধমানের দামোদর সদরঘাট বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার জনসাধারণের কলিকাতার সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার প্রধান পথ। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সদরঘাটের ফেরী-ঘাট জেলাবোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হইত। যুদ্ধের পূর্ব্বে বর্ষাকালে

দুই পয়সা এবং অন্য ঋতুতে এক পয়সা করিয়া ফেরীঘাটের মাশুল ছিল। যুদ্ধের সময় বর্ষাকালে এক আনা এবং অন্য ঋতুতে দুই পয়সা করিয়া লওয়া হইত। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সরকার ফেরীঘাটের পরিচালনভার গ্রহণ করার পর হইতে বর্ষা ও অন্যান্য ঋতুতে জনপ্রতি এক আনা করিয়া মাশুল ধার্য্য করা হইয়াছে এবং মোটর ভাড়াও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

জনসাধারণের পুনঃপুনঃ দাবীর ফলে এবং ১৯৪৯ সনে তৎকালীন পূর্ত্তমন্ত্রীর আশ্বাসের ভিত্তিতে ১৯৫২ সনে সাময়িক ভাবে নির্ম্মিত রাস্তার উপর দিয়া এবং ১৯৫৩ সনে গ্রীষ্মকালে নির্ম্মিত সাময়িক সেতু ও রাস্তার উপর দিয়া জনসাধারণকে বিনা মাশুলে যাতায়াতের সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু গত বৎসর হইতে ঐরূপ সাময়িকভাবে নির্ম্মিত সেতু ও রাস্তার উপর দিয়া নদী পার হইবার জন্য প্রতি বার জনপ্রতি এক আনা হিসাবে মাশুল ফেরীঘাটের ইজারাদার মারফত আদায় করা হইয়াছে।

১৫ই পৌষ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে উক্ত তথ্য পরিবেশন করিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন যে, ঐ ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণকে বিশেষ দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হইতেছে এবং ফেরীঘাট ও গ্রীষ্মে নির্ম্মিত পুল ও রাস্তাকে এক করিয়া ইজারাদারের অধীনে দিয়া অবাধে জনসাধারণকে শোষণ করা হইতেছে। "ইজারাদারকে বার্ষিক মাত্র দুই হাজার সাত শত টাকা খাজনায় উক্ত ঘাট বিলি করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে শুধু ফেরীঘাটের জন্যই ইহা অপেক্ষা বহু বেশী খাজনায় বিলি হইত।"

ইজারাদারের যথেচ্ছাচারের উল্লেখ করিয়া দামোদর লিখিতেছেন: "ইজারাদার এগ্রিমেণ্ট অমান্য করিয়া বেআইনীভাবে বেশী পয়সা আদায় করিতেছেন বলিয়া আমরা প্রমাণ পাইয়াছি। গ্রীষ্মকালে সাইকেল প্রতি ছয় পয়সা লইবার কথা, সে ক্ষেত্রে তাঁহারা জুলুম ও প্রতারণা করিয়া দশ পয়সা হিসাবে আদায় করেন। দামোদরবক্ষে বর্দ্ধমান হইতে যে বাস যায়, একবার বাস মারফত ও আর একবার বাস হইতে নামিয়া দক্ষিণ তীরে উঠিবার সময় জন প্রতি এক আনা হিসাবে আদায় করা হয়।"

মেদিনীপুরে জলদস্যুর উৎপাত

১লা পৌষ "মেদিনীপুর পত্রিকা" সংবাদ দিতেছেন যে, কাঁথি বা তমলুক অঞ্চল হইতে সুন্দরবন অঞ্চলে যাতায়াতকারী নৌকাগুলি নাকি প্রায়ই জলদস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং যাত্রীসাধারণের অর্থাদি লুণ্ঠিত হয়। অনেক স্থলে প্রকাশ্য দিবালোকেও দুর্বৃত্তেরা নৌকাতে চড়াও হইয়া ডাকাতি করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী ১লা পৌষের পূর্ব্বে দুই সপ্তাহের মধ্যে ছোটবড় ঐরূপ আটটি ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছিল।

মেদিনীপুরের দুরবস্থা

১লা পৌষ প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মেদিনীপুর পত্রিকা" মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন যে, জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই অনাবৃষ্টির ফলে এবং কোন কোন স্থানে পূর্ব্ব-বৎসরের বন্যার জন্য ধানের ফলন একেবারেই হয় নাই। যেখানে ফলন সামান্য হইয়াছে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ফলে জেলার সর্ব্বত্রই হাহাকার পড়িয়াছে। স্থানবিশেষে টেষ্ট রিলিফের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নগণ্য।

চাষীদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার দরুন সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধে তাহাদের অক্ষমতার ফলে মেদিনীপুর জেলার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিও সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে যে, গরীব চাষীকুলকে "বিপথে লইয়া যাইবার জন্য এবং বিপাকে ফেলিবার জন্য রাজনৈতিক উস্কানিরও অভাব নেই। ভূমি-সংস্কারের নূতন ও অনিশ্চিত ব্যবস্থার সুযোগে স্বার্থপর ব্যক্তিদের অপপ্রচেষ্টার অন্ত নেই।"

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অপর একটি প্রধান সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে—তাহা হইতেছে পানীয় জলের সমস্যা। জেলার বহুস্থলেই ২।৩ মাইল দূর হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয় এবং যেখান হইতে জল লওয়া হয় ক্রমান্বয়ে চাপ বৃদ্ধির ফলে সেই উৎসগুলিও শুকাইয়া যাইতেছে।

এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় হিসাবে জেলার প্রতি বর্গ মাইল স্থানে সাধারণের জন্য নলকূপ বা ইন্দারা স্থাপনের জন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, সরকারের পক্ষে যদি সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব না হয়, তবে সেই সকল এলাকার জনসাধারণের উচিত অবিলম্বে স্থানীয় ভিত্তিতে দলমতনির্বিশেষে একটি কমিটি গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

অন্যান্য কার্য্যের জন্য "মেদিনীপুর পত্রিকা" জনসাধারণকে জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পত্রিকাসমূহ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ দিবার জন্য পরামর্শ দিয়া লিখিতেছেন যে, "মেদিনীপুর জেলার ৩৪ লক্ষ অধিবাসী এবং তাহার উপর নির্ভরশীল আরও কয়েক লক্ষ অধিবাসীকে রক্ষা করিতে হইলে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে এবং একটি সুপরিকল্পিত উপায়ে সকলের পক্ষে আগ্রহ সৃষ্টিকারী পদ্ধতিতে ও পরিবেশে কার্য্যাদি অবিলম্বে আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।"

বারাসাতে বিজলী সরবরাহের অব্যবস্থা

২৫শে পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বারাসাত বার্ত্তা" বারাসাত শহরে বিজলী সরবরাহ ব্যাপারে বিশেষ অব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারাসাতে বিজলী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু গত চারি বৎসরের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীদিগের বিজলী সরবরাহের প্রতি আস্থা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।"

বিজলী সরবরাহের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া উদাহরণ হিসাবে পত্রিকাটি স্থানীয় একটি প্রেক্ষাগৃহের বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন—যাহাতে বলা হইয়াছে যে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত

হইবার সময় বিজলী সরবরাহ বন্ধ হইয়া প্রদর্শনী এক ঘণ্টার অধিক কাল বন্ধ থাকিলে টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "এই এক ঘণ্টা সময়টুকুই তাহাদের লোকসান সময়ের সান্ত্বনা। আমরা বহুদূর জানি এইরূপ সান্ত্বনা অনেক দিন ব্যর্থ হইয়াছে এবং তাহাদের বিক্রীত প্রবেশ মূল্য ফেরত দিতে হইয়াছে।"

কিন্তু সরবরাহ ব্যবস্থা এইরূপ অনিশ্চিত হইলেও বিদ্যুতের মূল্য ইউনিট প্রতি সাড়ে ছয় আনা হইতে কম নহে। বিদ্যুতের এইরূপ অতিরিক্ত চড়া হারের জন্য বারাসাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা পূর্ব্ব হইতে বহুল বৃদ্ধি পাইলেও অধিকাংশ গ্রাহকই প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। পত্রিকাটি দুঃখ করিয়া লিখিতেছেন, "বাজারের সমস্ত দ্রব্যের মূল্য নামিতেছে —সরকারের হাতের বিষয় বলিয়া বিজলীর মূল্য কমিতে পারিতেছে না।" বিজলী ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এই অবস্থায় পত্রিকাটি সরকারকে বিদ্যুতের মূল্যের হার সাড়ে ছয় আনা হইতে কমাইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

পাঠ্যতালিকা প্রণয়নে বিলম্ব

"ভারতী" লিখিতেছেন: "এবারে অনুমোদিত পাঠ্যতালিকা প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটিয়াছে। ফলে এখন পর্য্যন্ত অনেক স্কুলে পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় নাই। অন্যান্য বৎসর ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটির আগেই স্কুল হইতে পাঠ্যতালিকা দেওয়া হয় এবং জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকেই ছাত্রেরা পুস্তকাদি কিনিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করে। এবার যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে সরস্বতী পূজার পূর্ব্বে পড়াশুনা আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ছাত্রদের এই ক্ষতির জন্য বোর্ড-কর্তৃপক্ষই প্রধানতঃ দায়ী। সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিলে অবস্থার উন্নতিরই আশা করা যায় কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিপরীত ঘটিতেছে, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। যাহা হউক, পুস্তক অভাবে ছাত্রগণকে বসাইয়া না রাখিয়া স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের সাধারণভাবে পড়াশুনা সুরু করাই সমীচীন।"

বারাসাতে বাসযাত্রীদের অসুবিধা

বারাসাত মহকুমার যানবাহনের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া ৪ঠা পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বারাসাত বার্ত্তা" লিখিতেছেন যে, বঙ্গব্যবচ্ছেদের পর বারাসাত মহকুমার বিভিন্ন রাস্তাগুলিতে যাত্রীর চাপ যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ফলে অধিকাংশ যাত্রীকে যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই। যশোহর রোডে একাধিক রুটের বাস চলিলেও এখনও ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ যাত্রীকেই দীর্ঘ পথ বাসে দণ্ডায়মান অবস্থায় অতিক্রম করিতে হয়। "বিশেষ করিয়া যাঁহারা ৭৯ নং বাসে যাতায়াত করেন তাঁহাদের দুর্দ্দশা ও ক্লেশের অন্ত নাই। কি নারী কি বালক-বালিকা সকল শ্রেণীর যাত্রীকেই কোনক্রমে গাড়ীর ভিতরে শরীর প্রবেশ করাইয়া দিয়া দারুণ ভিড়ে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ইদানীং মধ্যস্বত্ব-জমিদারী উচ্ছেদ, জমি ফেরত, উদ্বাস্তু ঋণ সংগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্যে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে—তাহাদের ক্লেশও সেই সহিত বাড়িয়া গিয়াছে।" এই লাইনের ভিড় বেড়াচাপা হইতে ঝাঁকিয়া উঠে। হাবড়া-সন্দেশখালি অঞ্চলের বহু যাত্রী এই স্থান হইতে কলিকাতাগামী বাসে আরোহণ করেন, ইহা ব্যতীত বারাসাতের কোর্ট কাছারির যাত্রী রহিয়াছেন—তাঁহাদের পথযাত্রা বংপরোনাস্তি ক্লেশপূর্ণ।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, যদি শ্যামবাজার হইতে বারাসাতের বাস বেড়াচাপা পর্য্যন্ত এবং মাজেরহাটের বাসের বারাসাত পর্য্যন্ত চলাচল ব্যবস্থা করা যায় তবে ঐ অঞ্চলের বাসযাত্রীদের এইরূপ ক্লেশ লাঘব হইতে পারে।

জঙ্গীপুর শহরে বাজারের অসুবিধা

৩০শে অগ্রহায়ণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক "ভারতী" জঙ্গীপুর শহরে বাজারের অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। শহরে দুইটি বাজার আছে—বাজার দুইটি দুই জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অতীতে এই দুইটি বাজার জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইলেও বর্ত্তমানে শহরের বর্দ্ধিত লোকসংখ্যা এবং পরিবর্ত্তিত রুচির চাহিদা মিটাইবার পক্ষে বাজার দুইটি নিতান্তই অনুপযোগী। বাজারের স্থানটির উপর কোনও আচ্ছাদন নাই। "বাজারের মধ্যে যে কয়েকটা ভাঙাচোরা চালা আছে তাহাও মুষ্টিমেয় ফড়িয়ারাই দখল করিয়া থাকে। সুতরাং যাহারা পল্লী অঞ্চল হইতে তরিতরকারী লইয়া বেচিতে আসে তাহাদের হয় বাজারের মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলে আর না হয় আশেপাশের রাস্তার উপর লোক চলাচলের বাধা সৃষ্টি করিয়া কোনরূপে একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় এবং ক্রেতাসাধারণও গুঁতাগুঁতি করিয়া কোনরূপে কেনাকাটি সারিয়া বাজার হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচে।"

বর্ষাকালে জল, বৃষ্টি ও কাদায় বাজারের দুরবস্থা চরমে উঠে। অনেকদিনই বাজার ঠিকমত বসে না। "বাজারের এই কদর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও তদুপরি আশেপাশের দোকানগুলির অনাবৃত ধূলিকীর্ণ খাবারের উপর মাছির ভনভনানি ইত্যাদি মিলিয়া যে নারকীয় অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা প্রত্যেকটি মানুষই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া ক্ষুব্ধ হইলেও যেন একান্ত নিঃসহায় ও নিরুপায় ভাবিয়া দিনের পর দিন মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যায়। বর্ত্তমান যুগে একটি মিউনিসিপাল শহরে কি করিয়া এই অবস্থা চালু থাকিতে পারে তাহাই ভাবিয়া আমরা বিস্ময় বোধ করিতেছি।"

বাজারগুলির এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারে মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া "ভারতী" লিখিতেছেন যে, পৌরকর্ত্তৃপক্ষের উচিত শহরের প্রয়োজনমাফিক নিজ ব্যয়ে অধিকতর পরিসরযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন বাজার গড়িয়া তোলা আর না হয় চলতি বাজার দুইটির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য উক্ত বাজারের মালিকদের উপর চাপ দেওয়া এবং

শহরের মধ্যে অনুরূপ আরও দুই-একটি বাজার বসাইবার জন্য শহরের বিত্তশালী ব্যক্তিবিশেষকে উৎসাহিত করা।

মফস্বলের প্রায় অধিকাংশ শহর ও গণ্ডগ্রামের একই অবস্থা। মিউনিসিপ্যালিটি টাকা আদায়ে অসমর্থ এবং যাহা আদায় হয় তাহারও সদ্ব্যয়ের ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় না। আমাদের অবস্থার উন্নতি তখনই সম্ভব হইবে যখন মফস্বলের পত্রিকা পৌর-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নাগরিকদিগকেও তাঁহাদের কর্ত্তব্যের কথা বুঝাইতে আরম্ভ করিবেন। সরকারী ভিক্ষাদানের উপর যাহার নির্ভর তাহার কি কোনদিনও উন্নতি হওয়া সম্ভব? 'ভারতী' ঠিকই লিখিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে আরও লেখা উচিত।

বাঙালী যুবকদের সামরিক শিক্ষা

"বঙ্গবাণী" পত্রিকার ৬ই পৌষ সংখ্যায় বাঙালী যুবকদের সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, অতীতে বাঙালী যুবকদিগকে সামরিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইতেছে না বলিয়া ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে ঐরূপ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও যথেষ্টসংখ্যক বাঙালী যুবক সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিতেছে না।

১৮ই ডিসেম্বর আসানসোলে নৌ-দিবস পালনের জন্য যে অনুষ্ঠান হয় তাহাতে বাঙালী যুবকদের অনুপস্থিতির উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি বলিতেছেন, এ কথা খুবই সত্য যে, ইংরেজ আমলের চণ্ড বনমহোৎসব, নৌ-দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠান জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার ভ্রান্ত পদ্ধতি ত্যাগ করা প্রয়োজন। কিন্তু সামরিক কার্যে বাঙালী যুবকদের উদাসীনতা কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টার ত্রুটির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফলে বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মের উদ্যমে ভাঁটা পড়িয়াছে। সেই উদ্যমকে জাগাইবার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন।

বাঙালী যুবকদিগকে সামরিক শিক্ষার দিকে যথেষ্ট সংখ্যায় আকৃষ্ট করিবার জন্য বঙ্গবাণী নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করেন:

"(১) পশ্চিমবঙ্গে একটি বা দুইটি মিলিটারী কলেজ স্থাপন করিতে হইবে।

"(২) বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ও কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল তাহাদিগকে অন্যান্য শিক্ষার সহিত আবশ্যিক সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে।

"(৩) স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে ব্যায়াম বা শরীরচর্চা আবশ্যিক বা compulsory ভাবে রাখিতে হইবে।

"(৪) বাঙালীর জীবনযাত্রার মান (standard of liveing) সাধারণতঃ একটু উচ্চ। সামরিক বিভাগে বাঙালী প্রার্থীদের বেতনের হার অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিলে এই দিকে অধিকতর সংখ্যায় বাঙালী যুবককে আকর্ষণ করা যাইবে। সামরিক বিষয়ে অনগ্রসর হিসাবে সামরিকভাবে আগামী ১০ বৎসরের জন্য সরকার ইহা করিতে পারেন। তত দিনে ধীরে ধীরে বাঙালীদিগের মধ্যেও সামরিক বিভাগে প্রবেশ করার একটা রীতি ও প্রবণতা গড়িয়া উঠিবে।"

পত্রিকাটি সরকারকে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা মিলিটারী কলেজ স্থাপন সম্ভব মনে করি না। বাঙালীর জন্য বেতনের হার উচ্চ করাও কতটা সম্ভব হইবে জানি না। অন্য বিষয়ে আমরা একমত। তবে আসল কথা, সাধারণ সৈন্য হিসাবে বাঙালীর ছেলে ভর্ত্তি না হইলে শুধু উচ্চ পদে বাঙালীর স্থান বেশী হইবে না। অন্য প্রদেশে সৈন্যদলে সাধারণ ভাবে লোকে ভর্ত্তি হয় এবং উচ্চ পদেও তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

ভারতে টেলিফোনের তার উৎপাদন

গত ২৬শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতার ১৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রূপনারায়ণপুরে ভারত সরকারের নবনির্মিত হিন্দুস্থান কেবল্ ফ্যাক্টরীর উদ্বোধন করেন। অসুস্থতার দরুন ডাঃ রায় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবন হইতে বেতার মারফত উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত যখন সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে তখন টেলিফোন-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাক ও তার বিভাগের কারখানাগুলিতে কয়েক শ্রেণীর সাজসরঞ্জাম তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু টেলিফোন-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় ভূগর্ভস্থ তারের ব্যাপারে ভারতকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ১৯৪৯-৫০ সনে ভারতে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের উক্ত তারের চাহিদা ছিল। বর্ত্তমানকালে যে সকল পরিকল্পনা রূপায়িত হইতেছে সেগুলি সম্পূর্ণ হইলে ভারতে মোট দেড় কোটি টাকা মূল্যের ভূগর্ভস্থ তারের প্রয়োজন হইবে বলিয়া প্রকাশ।

এই অবস্থায় ভূগর্ভস্থ তারের ব্যাপারে ভারত স্বাবলম্বী হইতে পারে কিনা সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান হয়। অনুসন্ধানের ফলে বৎসরে ৭৫ লক্ষ টাকার তার লাগিলেই ভারতে ভূগর্ভস্থ তার উৎপাদনের একটি কারখানা স্থাপন যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন স্পেশাল অফিসারের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার বিদেশী উৎপাদকদিগের কারিগরি সাহায্য লইয়া একটি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। তদনুসারে ব্রিটেনের মেসার্স ষ্ট্যাণ্ডার্ড টেলিফোন্স এণ্ড কেবল্স লিমিটেডের সঙ্গে এক চুক্তি হয় এবং ১৯৪৯ সনে কারখানার বিশদ পরিকল্পনা আরম্ভ হয়।

১৯৫২ সনের আগষ্ট মাসে হিন্দুস্থান কেবল্স লিমিটেড নামক একটি কোম্পানী স্থাপিত হয়। ভারত সরকার উহার মালিক এবং ভারত সরকারের উৎপাদন মন্ত্রণালয় উহার সর্বময় পরিচালনার কর্ত্তা। পরিচালক বোর্ডের আট জন সদস্যের সকলেই ভারত

সরকার কর্তৃক মনোনীত। শ্রী এস. কে. কাঞ্জিলাল কোম্পানীর বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রী কাঞ্জিলালের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, কারখানাটি আধুনিকতম রুচি অনুযায়ী পরিকল্পিত হইয়াছে। কারখানাটিতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষার যন্ত্র বসান হইয়াছে। "বর্ত্তমানে এই কারখানাতে স্থানীয় ও এক্সচেঞ্জ অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ তার, দূরপাল্লার ট্রাঙ্ক টেলিফোনের ভূগর্ভস্থ তার প্রভৃতি তিন শ্রেণীর তার উৎপাদন করা যায়। এখন এখানে যে সকল যন্ত্রপাতি বসানো হইয়াছে তাহাতে প্রতি বৎসর বিভিন্ন ধরণের ৫০০ মাইল টেলিফোনের তার সহজেই উৎপাদন করা যাইবে। এইগুলির মূল্য হইবে প্রায় এক কোটি টাকা।"

ভারতীয় আইন-পরিষদ

বোম্বাই বিধানসভার স্পীকার শ্রী ডি. কে. কুন্তে আমেদাবাদের হ্যাণ্ড লাল্বী ভবনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "ভারতীয় আইনসভাগুলি রবার ষ্ট্যাম্পের ন্যায়; শাসনকর্তৃপক্ষ তাহাদের সম্মুখে যাহা উপস্থাপিত করেন তাহারা তাহাই অনুমোদন করে।"

আইন-সভাতে বেসরকারী সদস্যদের বিলের ভাগ্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া শ্রী কুন্তে বলেন, সরকার স্পীকারের সহিত পরামর্শ না করিয়াই গেজেটে বিল (খসড়া আইন) প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু সভ্যদিগকে বেসরকারী বিল উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে স্পীকারের অনুমতি লাভ করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে যদি বিলটি উপস্থিত করিবার সুযোগ হয় তবে তাহা পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য মুলতুবী রাখা হয়। অনুরূপভাবে পূর্ব্বে সরকারের সম্মতি লাভ না করিয়া কোন সভ্য নূতন কর প্রবর্ত্তনের জন্য কোন বিল আনয়ন করিতে পারেন না।

লোকসভা এবং রাজ্যবিধান সভাগুলিতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে প্রত্যাহ্বানের অধিকার জনসাধারণের থাকা উচিত কিনা সেই বিষয়ে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে লোকসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রী এম. অনন্তশয়নম্ আয়াঙ্গার বলেন যে, প্রতিনিধিরা যদি উপযুক্তরূপে কর্ত্তব্য পালনে অপারগ হন, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবেই জনসাধারণ তাঁহাদিগের প্রত্যাহ্বান দাবি করিতে পারেন। প্রথম অবস্থায় রাজ্যবিধান সভাগুলিতে ঐ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া শ্রী আয়াঙ্গার অভিমত প্রকাশ করেন।

হ্যাণ্ড লাল্বী ভবনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রী আয়াঙ্গার লোকসভায় প্রায়শঃই বহু সভ্যের অনুপস্থিতির উল্লেখ করিয়া বলেন, "কোরামের জন্য প্রায়ই আমাদিগকে ঘণ্টা বাজাইতে হয়। সভ্যদের মাহিনা নির্দ্ধারিত হইবার পর হইতে সভ্যদের অনুপস্থিত থাকিবার ঝোঁক বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

সরকারী বিজ্ঞাপন-নীতি

ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন-নীতি আলোচনা করিয়া "যুগশক্তি" ১লা পৌষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, ভারত সরকারের তথ্য বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. কেশকার ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন-নীতি বলিয়া যাহা ঘোষণা করিয়াছেন কার্য্যক্ষেত্রে তাহা যে সম্যক্ প্রতিপালিত হইতেছে তাহা বলিতে পারা যায় না।

সম্প্রতি ড. কেশকার বলিয়াছিলেন যে, বিরোধীপক্ষীয় পত্রিকাগুলিতে অধিকতর বিজ্ঞাপন দেওয়াই ভারত সরকারের নীতি। ১৯৫৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বলিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন বণ্টন ব্যাপারে অতঃপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

"কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি সরকারের অনুস্তাবক সংবাদপত্রসমূহই বেশী পরিমাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহের বিজ্ঞাপন পাইয়া থাকে।"

যুগশক্তি লিখিতেছেন, "আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, দলনিরপেক্ষ, স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক সংবাদপত্রসমূহই গণতান্ত্রিক দেশের জনগণের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিয়া থাকে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের নিকট এই শ্রেণীর সংবাদপত্রই বিজ্ঞাপনাদি ব্যাপারে অগ্রাধিকার দাবি করিতে পারে।"

কংগ্রেস সভাপতিত্ব

আবাদী কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সৌরাষ্ট্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীউচ্ছরঙ্গ রায় নওলশঙ্কর ধেবর মহাশয়ের নির্ব্বাচনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া শ্রীমগনভাই প্রভুদাস দেশাই ১৮ই ডিসেম্বর "হরিজন পত্রিকা"য় লিখিতেছেন যে, দেশের স্বাধীনতা লাভের পর পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেস সভাপতির পদের গুরুত্ব ও অর্থও স্বভাবতঃই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কংগ্রেস সভাপতিকেই রাষ্ট্রপতি বলা হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ পদবী রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় প্রেসিডেণ্ট বা অধ্যক্ষের উপর অর্পিত হইয়াছে। শ্রীদেশাইয়ের ভাষায় "উপাধির এই পরিবর্ত্তন দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর কংগ্রেসের প্রকৃতি ও কার্য্যে যে বাস্তব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহারই প্রতীক বা নিদর্শনস্বরূপ। কংগ্রেস দ্রুতবেগে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের কার্য্যকলাপের কর্ণধার হইল। প্রধান কার্য্যসূচীতে এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার আনুষঙ্গিক কতকগুলি পুনর্গঠনও আবশ্যক হইল। এই পরিবর্ত্তন কেবল সংগঠনের ব্যাপারেই নহে, মৌলিক কতক বিষয়েও সূচিত হইল। এই পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠন এখনও চলিতেছে। কংগ্রেস সচেতনভাবে ইহা বিচার-বিবেচনা করিতেছেন এবং এই পরিবর্ত্তন যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় ও জাতীয় কল্যাণ ও সেবাকার্য্য করিবার যে মহান্ সম্ভাবনা কংগ্রেসের রহিয়াছে তাহার কোনরূপ অপচয় না হইয়া যাহাতে উহা জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছেন।"

এইরূপ বৃহৎ পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্তে কংগ্রেসের কর্ণধাররূপে শ্রীধেবরের নির্ব্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের সভাপতিত্ব এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিবার যে ব্যবস্থা এই কয় বৎসর চলিয়া আসিতেছিল শ্রীধেবরের নির্ব্বাচনের ফলে

স্বভাবতই তাহার অবসান ঘটিল। শ্রীদেশাই ইহাকে শুভলক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন, "এই দুই পদ ভিন্ন ব্যক্তিতে ন্যস্ত থাকিবে এইরূপ ধারা সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিলে আমাদের গণতন্ত্রের সুস্থ অগ্রগতি হইবে। প্রধান কথা হইল এই যে, কংগ্রেস যেন অবাধে ও মুক্তভাবে নিজ কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারে। উহার নিজ আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতে পারা চাই। সর্ব্বোদয়ের পথে জয়যাত্রার জনগণের প্রধান অবলম্বন ও স্তম্ভস্বরূপে কংগ্রেস সক্রিয় থাকা চাই। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কংগ্রেসকে আরও নানা গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্ত্তনের পথিকৃৎ হইতে হইবে। ঐ সকল ধারার নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং কেন্দ্ররাজ ও প্রদেশরাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কংগ্রেস দেশকে সর্ব্বোদয়ের তীর্থে লইয়া যাইতে পারিবে।"

ভূমধ্যসাগরীয় কম্যাণ্ড

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠন পরিষদ হইতে মিত্রপক্ষীয় সর্ব্বোচ্চ কম্যাণ্ডারের অধীনে এক মিত্রপক্ষীয় ভূমধ্যসাগর কম্যাণ্ড গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন উক্ত কম্যাণ্ডের সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং ফ্রান্স, গ্রীস, ইটালী, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর এবং নৌবহরের বিমানবাহিনীগুলিকে তাঁহার কম্যাণ্ডে রাখা হয়। উক্ত ছয়টি দেশের বাহিনীগুলি একটি "আন্তর্জাতিক" বাহিনী হিসাবে ভূমধ্যসাগরীয় পথের সামুদ্রিক যোগাযোগ-ব্যবস্থার নিরাপত্তার জন্য, প্রয়োজনমত সম্মিলিত সমুদ্র এবং বিমান অভিযান পরিচালনার জন্য এবং প্রয়োজনমত সন্নিকটবর্ত্তী কম্যাণ্ডগুলির সাহায্য আদায়ের নিমিত্ত দায়ী থাকে।

লেঃ কম্যাণ্ডার নোয়েল হল লিখিতেছেন, "ভূমধ্যসাগরের জন্য এই ধরণের একটা প্রতিরক্ষা কাঠামো গড়িয়া তুলিবার কাজ ন্যাটোর পরিকল্পকদের কাছে বড় বেশী সহজ হয় নাই। ইহার জন্য তাঁহাদের অনেক দিকে অনেক বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে হইয়াছে। এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটির নিজের কতগুলি সমস্যা আছে। এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এলাকাটিতে জাতীয় স্বার্থ এমন পরস্পরবিরোধী যে তাহার জন্য অনেকেই মনে করিয়াছিলেন আপোষে হয়ত উহা সম্ভব হইবে না।" অবশ্য পরে একটি সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয়।

১৯৫২ সনের ডিসেম্বর এবং ১৯৫৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে উক্ত জটিলতার সমাধান সম্ভব হয়। ভূমধ্যসাগরকে ছয়টি ভৌগোলিক এলাকায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন দেশের নৌ-অফিসারের অধীনে রাখিবার সিদ্ধান্ত হয়। "এই ভাবে মিত্রপক্ষীয় আঞ্চলিক কম্যাণ্ডার হিসাবে মিত্রপক্ষীয় ভূমধ্যসাগর বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কের নিকট হইতে কর্ত্তৃত্বের অধিকারী হইয়া ও জাতীয় সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে নিজ নিজ দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদপ্তরের কাছ হইতে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া এই সকল অফিসার নিজেদের এলাকায় সাফল্যের সহিত কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন।"

আঞ্চলিক অফিসারগণ সর্ব্বাধিনায়কের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন। তাঁহারা নিয়মিতভাবে তিন বা চার মাস অন্তর মিত্রপক্ষীয় নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স মাল্টায় মিলিত হন। সেখানে তাঁহাদের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে থাকেন স্বজাতীয় ফ্ল্যাগ অফিসারগণ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দ। মাল্টার ঐ সম্মিলিত ষ্টাফে বর্ত্তমানে মোট ২৪৪ জন অফিসার ও কর্ম্মচারী রহিয়াছেন।

শান্তিকালে মিত্রপক্ষীয় কম্যাণ্ডের অন্যতম কাজ হইল মিত্রপক্ষীয় বাহিনীগুলিকে সম্মিলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষিত করিবার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রচনা এবং তাহা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা করা।

মাল্টা হইতে এ পর্য্যন্ত পাঁচটি মহড়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহিলা চাকুরীজীবী

মার্কিন শ্রমদপ্তরের অন্তর্গত মহিলাদের ব্যুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা চাকুরীজীবীদের সম্পর্কে সম্প্রতি যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দুই কোটি মহিলা বিভিন্ন চাকুরীতে নিয়োজিত রহিয়াছেন। আর একটি হিসাবে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই মহিলা।

মহিলা কর্ম্মচারীদের মধ্যে শিক্ষিকার সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। মোট মহিলা কর্ম্মীদের এক-চতুর্থাংশ কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এক-দশমাংশেরও অধিকসংখ্যক মহিলা কোন বিশেষ বৃত্তিতে অথবা কারিগরি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। মহিলা কর্ম্মচারীদের গড়পড়তা বয়স ৩৮। ইঁহারা অধিকাংশই বিবাহিতা। প্রায় ৫০ লক্ষ মহিলা চাকুরীজীবীর ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক সন্তান রহিয়াছে।

সোভিয়েট বিদ্যালয়সমূহে বিদেশী ভাষা

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিদ্যালয়সমূহে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে ও. কোসোভা লিখিতেছেন যে, বর্ত্তমানে তথায় সমস্ত স্কুলেই ইংরেজী, জার্ম্মান, ফরাসী অথবা স্পেনীয় ভাষার যে-কোন একটি পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সোভিয়েট বিদ্যালয়গুলিতে পঞ্চম শ্রেণী হইতে বিদেশী ভাষার শিক্ষাদান সুরু হয়। বিদ্যালয়ে ছয় বৎসর বিদেশীয় ভাষাসমূহে যে শিক্ষা ছাত্রছাত্রীরা লাভ করে তাহাতে শিক্ষান্তে তাহারা বিদেশী লেখকদের রচিত গ্রন্থগুলি পড়িতে পারে, কথ্য বিদেশী ভাষা বুঝিতে পারে এবং নিজেরাও বিদেশী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে।

ছাত্ররা যাহাতে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে পারে সেজন্য বহু লক্ষ কপি পাঠ্যপুস্তক, অভিধান, ব্যাকরণ, শ্রুতিলিখন ও পাঠগ্রহণ পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাহাতে নির্ভুল উচ্চারণ শিক্ষা করিতে পারে সেজন্য স্পেশাল গ্রামোফোন রেকর্ড তৈয়ারী করা হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের বাক্‌পটুতার অভ্যাস গড়িয়া তুলিবার জন্য সুন্দর চিত্রমালা প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষার্থীদিগকে সবিস্তারে ঐ সকল ছবির বিষয়বস্তু বর্ণনা করিতে বলা হয়।

প্রতি তিন বৎসর অন্তর শিক্ষক-শিক্ষিকারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষায়তনে স্পেশাল কোর্সে যোগদান করেন। "শিক্ষার ব্যয় বহন করেন গবর্ণমেন্ট এবং কোর্স বা পাঠশালায় যোগদানকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁহাদের বেতন ছাড়াও একটা ভাতা বা জলপানি পাইয়া থাকেন।"

"সোভিয়েট দেশের স্কুলগুলিতে বিদেশী ভাষায় পরিচালিত প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন আসর অনুষ্ঠিত হয়। এই সব অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা নাটক মঞ্চস্থ করে, কবিতা আবৃত্তি করে, সেরা সাহিত্য হইতে অংশবিশেষ পাঠ করে এবং গান করে ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ও স্পেনীয় গীত। বিদেশের ক্লাসিক বা কালজয়ী সাহিত্য ও সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কেও সান্ধ্য আসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।"

ব্যাঙ্কক ও বান্দুঙ

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (সিয়াটো)-র ৮টি সদস্যরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীরা আলোচনার জন্য মিলিত হইবেন ব্যাঙ্কক নগরীতে। বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর উহাই সিয়াটো কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন। যে সকল দেশ চুক্তি-সংস্থার সভ্য তাহারা হইতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস, থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্থান।

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার বোগরে অনুষ্ঠিত কলম্বো পঞ্চশক্তির প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে স্থির হয় আগামী এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুঙ শহরে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সম্মেলনে চীন, ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল প্রভৃতি পঁচিশটি দেশকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইবে বলিয়া প্রকাশ। সর্ব্বশেষ সংবাদে সম্মেলনের অধিবেশন ১৮ই এপ্রিল হইতে পারে বলা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ককে সিয়াটো পরিষদের অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে চুক্তিসংস্থার হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সামরিক সহযোগিতা, বর্দ্ধিত পশ্চিমী অর্থনৈতিক সাহায্য এবং ইন্দোচীনের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে।

দুই সম্মেলনের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া "হিতবাদ" ৯ই জানুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "হিতবাদ" লিখিতেছেন, সিয়াটো চুক্তি-সংস্থার হেড কোয়ার্টার্স ওয়াশিংটনে স্থাপন করিবার যে পরিকল্পনা ছিল তাহা বস্তুতঃ পরিত্যাগ করা হইয়াছে, কারণ তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট প্রচারের ইন্ধন জোগান হইত। বর্ত্তমানে ম্যানিলা বা ব্যাঙ্ককের পরিবর্ত্তে সিঙ্গাপুরেই হেড কোয়ার্টার্স প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা বেশী।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, ব্যাঙ্ককে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কম্যুনিষ্ট চীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে। ভারত ও চীন যে পঞ্চনীতি ঘোষণা করিয়াছে এবং ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মদেশ যাহার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে সিয়াটো শক্তিপুঞ্জ বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছে। থাইল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইনস সিয়াটো গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হইলেও নিজেদের নিঃসঙ্গ অনুভব করিতেছে। অবশ্য আফ্রো-এশিয়া সম্মেলনে উক্ত দেশ দুইটিকেও আমন্ত্রিত রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দেশ দুইটি সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আবদ্ধ থাকায় উক্ত আমন্ত্রণ গ্রহণ বা বর্জ্জনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্ব্বে তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে নির্দ্দেশের প্রত্যাশায় রহিয়াছে। বর্ত্তমানের সূচনা হইতে মনে হয় যে দেশ দুইটি বান্দুঙ সম্মেলনে যোগদান করিবে না। পাকিস্থান কিন্তু দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছে। উহা এক দিকে সিয়াটোর সদস্য অন্য দিকে কলম্বো পঞ্চশক্তির এক জন সদস্য হিসাবে বান্দুঙ সম্মেলনের উদ্যোক্তা মার্কিন কুক্ষি হইতে পাকিস্থান সরিয়া যাইতে পারে এই সম্ভাবনায় মার্কিন মহল ইতিমধ্যেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারীভাবে বান্দুঙ সম্মেলন সম্পর্কে কোন মন্তব্য করে নাই, কিন্তু হাওয়া যেদিকে বহিতেছে তাহাতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার আশ্রিত রাজ্যগুলিকে গণতান্ত্রিক চীনের উপস্থিতিতে বান্দুঙ সম্মেলনে যোগদান না করিবার জন্য ইঙ্গিত করিবে। জাপান ইতিমধ্যেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছে এবং সেইজন্য জাপানী সরকারী মহলে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ঐক্যে"র প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চীনা মূল ভূখণ্ডের সহিত তাহার বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং এশিয়ার দেশগুলির সহিত বন্ধুত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও জাপান বিস্মৃত হয় নাই।

ব্যাঙ্কক এবং বান্দুঙ সম্মেলনে যোগদান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কয়েকটি এশীয় দেশের পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য হইবে না বলিয়া "হিতবাদ" মন্তব্য করিতেছেন। সিয়াটো এবং আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলন সম্পর্কে ভারত তাহার মতামত স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে। সিয়াটো চুক্তি কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য করা হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ সরকারীমহল ভারতকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ইডেনও তাঁহার আসন্ন ভারত সফরকালে এই সম্পর্কে ভারতকে নিশ্চয়তা দিতে পারেন। কিন্তু ইন্দোচীনকে সিয়াটোর মধ্যে লইয়া আসা এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিবার জন্য ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির পর ঐরূপ আশ্বাসের কি মূল্য থাকিতে পারে?—"হিতবাদ" প্রশ্ন করিতেছেন। ইহার ফলে ইন্দোচীন যুদ্ধবিরতি কমিশনের সভাপতি হিসাবে ভারতকে বিশেষ অসুবিধাজনক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইন্দোচীনকে সিয়াটো পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করাকে কি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়? পত্রিকাটি আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে জেনেভা চুক্তির অন্যতম রচয়িতা এবং সিয়াটো কাউন্সিলের অধীশ্বর হিসাবে মিঃ এন্টনী ইডেন উহার সম্যক্ জবাব দিবেন।

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

দেশে অধুনা-প্রচলিত রাগসঙ্গীতের মূল উৎস এবং তাহার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন রূপ সম্যক্ বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ অধিকাংশ হস্ত-লিখিত পুথিই বৈদেশিক আক্রমণে ও নানা বিপ্লবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাও উপপত্তি (theory) মাত্র; প্রত্যক্ষ সঙ্গীত স্বরলিপি ব্যতীত বুঝা সম্ভব নহে। সঙ্গীত স্বয়ম্ভূ বিদ্যা, মানবমনের ভাবাবেগের স্বাভাবিক শাব্দিক স্ফুরণ। ইহার প্রাথমিক অভিব্যক্তি বিশৃঙ্খল হইলেও সামাজিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ অগ্রগতির সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে মানবমাত্রেরই সঙ্গীত ছিল, আছে ও থাকিবে। সঙ্গীত বিহীন মানব সম্ভব নহে। শিক্ষিত সম্প্রদায় সঙ্গীতকে 'বিদ্যা' হিসাবে চর্চ্চা করিয়া থাকেন, জনসাধারণের নিকট সঙ্গীত 'কলা' মাত্র, মনোরঞ্জনের উপায়।

ভারতের ইতিহাসে 'আর্য্য ও অনার্য্য' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; আর্য্যগণ বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী, অনার্য্য-গণ বিগ্রহ, বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদির পূজক। আর্য্যগণ এ দেশে ছিলেন অথবা বাহির হইতে আসিয়া থাকিবেন; অনার্য্যগণ এই দেশেরই অধিবাসী এ বিষয়ে মতভেদ নাই। আর্য্যগণ সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং উচ্চ কৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই দেশবাসিগণও উচ্চ সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন ইহাই পণ্ডিতগণের মত। তাহা না হইলে কালক্রমে এই দেশবাসীর সংস্কৃতির অনেকটা আর্য্যগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিরূপে? এখনও বিবাহে এই দেশবাসীর (অনার্য্য?) রীতি অনুযায়ী প্রথমে স্ত্রী-আচারাদি সমাপ্ত হইবার পর পুরোহিতের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে বিবাহ সিদ্ধ হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞ অপেক্ষাও তান্ত্রিক পূজাদি (কালী, দুর্গা ইত্যাদি) অধিক জনপ্রিয় ও প্রচলিত। এই সকল পূজাদিতে "ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ" উচ্চারণের সঙ্গে একটিমাত্র সচন্দন পুষ্পদ্বারা বৈদিক দেবতা-গণের প্রতি ভক্তি নিবেদন করা হয়। ইহা আর্য্যেতর সম্প্রদায়ের উন্নত সংস্কৃতিরই পরিচায়ক নহে কি?

সঙ্গীত সম্বন্ধেও এই দুই সংস্কৃতির মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক যুগ হইতেই সঙ্গীতের দুইটি শাখা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মার্গ বা গান্ধর্ব ও দেশী সঙ্গীত। মার্গ ও দেশী সঙ্গীতালোচনা করিবার পূর্বে আমরা পুরাণ ও মহা-কাব্যে বর্ণিত সঙ্গীত পর্য্যালোচনা করিয়া লইব। রামায়ণে দেখা যায়:

> "সর্ব্ব তুর্যনিনাদৈশ্চারাবাদ্য যাদৈশ্চ নন্দিতম্।
> বেণুভির্বীণাভির্বাদ্যাদ্ভিরনন্ত মুখুণম্।
> নর্ত্তকীভিঃ পুরস্তাত্ত পুরংতঃ প্রবিবেশ সঃ।" ৭০ সর্গ। ৪০।

অর্থাৎ দূরাগত নানাবিধ তূর্য্যধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি দ্বারা এবং বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে পুরোভাগে সম্মুখে উদ্দাম ভাবে নৃত্য-কারিণী শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনাগণের দ্বারা আনন্দে পরিপূর্ণ সেই নগরে ভরত প্রবেশ করিলেন। ৪র্থ সর্গে লবকুশের রামায়ণ গান সম্বন্ধে দেখা যায়:

> "তন্ত্রীগীতৈশ্চ মধুরৈর্বাদিত্ৰ সপ্তভিঃ স্বরৈঃ।
> জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং শ্রোত্রশ্রুতি মনোহরাম।" ৪০

অর্থাৎ—সপ্তস্বর, সপ্তজাতি (ষাড়জী, আর্ষভী ইত্যাদি) এবং মধুর বীণাধ্বনি সমন্বিত এই রামায়ণ গান শ্রোতৃবর্গের শ্রবণ ও মন হরণ করিতে পারে। মহাভারতে অর্জ্জুন বিরাটের গৃহে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেছেন দেখা যায়:

> "স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয় প্রভুঃ।
> সখীশ্চ তস্যা পরিচারিকা শুভাঃ প্রিয়শ্চতাসাং স বভূব
> পাণ্ডবঃ।" ১২।

অর্থাৎ—অর্জ্জুনও বিরাট রাজার কন্যা উত্তরাকে এবং তাহার সহচরী সুলক্ষণা সখীদিগকে গীতবাদ্যাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বায়ুপুরাণে দেখা যায়:

> "সপ্তস্বরাস্ত্রয়োগ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
> তানাশ্চৈ কোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্।" ৮৬ অধ্যায়

অন্যত্র:

> "ক্রিয়মাণোঽপালঙ্কারো রাগং যশ্চৈব দর্শয়েৎ।
> যথে দিষ্টস্তু মার্গস্তু কর্ত্তব্যস্তু বিধীয়তে।" ৮৭ অঃ। ২৮।

অর্থাৎ—(নারীগণের অলঙ্কারের ন্যায় সঙ্গীতালঙ্কারেরও যথাযোগ্য বিন্যাস আবশ্যক) অতএব গায়ক সঙ্গীতের বিহিত কালে বিধানানুসারে 'রাগ' এবং 'অলঙ্কার' প্রদর্শন করিবেন। বায়ুপুরাণে আমরা 'রাগ' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাইলাম। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণে দেখা যায়:

> "গ্রহাংশ তারমন্দ্রশ্চ ন্যাসাপন্যাস এব চ।
> অল্পত্বং চ বহুত্বং চ ষাড়বোড়বিতে তথা।
> এবমেব বুধৈর্জ্ঞেয়া জাতয়ো দশ লক্ষণাঃ।"

গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব,

ষাড়ব, ওড়ব এই দশটি জাতির লক্ষণ। মার্কণ্ডেয় উবাচ, "অথ গীত লক্ষণং ভবতি, তস্য ত্রীণি স্থানানি উরঃ, কণ্ঠঃ, শিরশ্চ তেভ্যো মন্দ্র, মধ্য, তারোৎপত্তি।" মার্কণ্ডেয় মুনি ভরতের সমসাময়িক, অথবা পূর্বের নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এ পর্য্যন্ত সপ্তস্বর মাত্র, রাগশব্দ, জাতি এবং তাহার দশটি লক্ষণ উল্লিখিত দেখিতে পাইলাম। অতঃপর আমরা সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গীত কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব: ২৮শ, ২৯শ, ৩০শ অধ্যায়ে সঙ্গীত বর্ণনা পাওয়া যায়। ২৮শ অধ্যায়ে ঃ

"এবং গীতং চ বাদ্যং চ নাট্যং চ বিবিধাশ্রয়ম্ :
অলাৎ চক্র প্রতিমং কর্তব্যং নাট্য যোক্তৃভিঃ।"•

তৎকালে 'নাট্য' শব্দে নৃত্য বুঝাইত। আজকাল নাট্য বলিতে অভিনয় মাত্র সূচিত হয়, কিন্তু তৎকালে নৃত্য ব্যতীত কোন নাট্য পরিকল্পিত হইত না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। দেবমন্দিরে, যাগযজ্ঞে 'দেবদাসী' নৃত্য এবং কিন্নরী নৃত্যাদিরও ব্যাপক প্রচলন ছিল। সঙ্গীত (কণ্ঠ ও যন্ত্র) অপেক্ষা ছন্দ ও তালের প্রভাব অধিক ছিল। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সমন্বয়ে ঐকতান (orchestra) বাদ্যেরও অধিকতর প্রচলন ছিল। যেমন ঃ

"যত্ত তন্ত্রীকৃতং প্রোক্তং নানাতোদ্যসমাশ্রয়ম্
গান্ধর্বমিতি তজ্জ্ঞেয়ং স্বর তাল পদাত্মকম্।৮
অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং কথা প্রীতিকরং পুনঃ।
গন্ধর্বানাং চ যস্মাদ্ধি তস্মাদ্গান্ধর্ব মুচ্যতে।।"৯ নাট্যশাস্ত্র

টীকা—তন্ত্রী শব্দেন তন্ত্রীযুক্তবীণা। নানাতোদ্য "চতুর্বিধমাতোদ্যং ততং বীণাদি, সুষিরং বংশাদি (বাঁশী) ঘনং তালবাদ্যাদি, অবনদ্ধং মুরজাদি" নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে স্বরতাল পদযুক্ত এই সঙ্গীতকে 'গান্ধর্ব' বলা হইত। দেবতাগণের অত্যন্ত ইষ্টপ্রদ ও প্রীতিকর বলিয়া গন্ধর্বগণেরও ইহ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। জাতিগানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন, "ব্রহ্মপ্রোক্ত পদৈঃ সম্যক্ প্রযুক্তা শঙ্কর স্তুতৌ"। অর্থাৎ, ব্রহ্মার দ্বারা রচিত শঙ্করের স্তুতিগান। এ স্থানে জাতি অর্থে মার্গজাতি বা গান্ধর্ব ইহা ব্যতীত "দেশজাতি"রও প্রচলন ছিল—সেগুলিকে 'ধ্রুবা' গান বলা হইত। 'মার্গজাতি'র ত্রয়োদশ লক্ষণ,—'দেশজাতি'তে দশ লক্ষণে পরিণত হইতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে শাণ্ডিল্যমুনি লিখিয়াছেন ঃ

"সর্বগীত সমাধারো জাতিরিত্যভিধীয়তে।
ষাড়জী চৈবার্ষ নৈষাদি ধৈবতী পাঞ্চমীতথা।
মাধ্যমী চৈব গান্ধারী সপ্তমীত্যার্ষভী মতা।।"

ষাড়জী, নৈষাদি আদি শুদ্ধ সম্পূর্ণ সপ্তজাতি ব্যতীত ষাড়ব ও ঔড়ব জাতিরও ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রে মোট অষ্টাদশটি জাতির উল্লেখ আছে। ষাড়জী অর্থে তার সা হইতে মধ্য সা পর্য্যন্ত, নৈষাদি অর্থে নি হইতে মন্দ্র নি এই সব জাতির বর্ণনা দেখিলে বুঝা যায় যে, নানাবিধ মূর্চ্ছনার ব্যবহারেই জাতির উৎপত্তি। "যৎকিঞ্চিদ্গীয়তে লোকে তৎসর্বং জাতিষু স্থিতম্" অর্থাৎ, যাহাকিছু গাওয়া হয় তাহা জাতিতে বর্তমান আছে। অথবা "জাতিসম্ভূত-ত্বদ্রাগাণাম্", অর্থাৎ, জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়াই ইহারা 'রাগ'। ইহা হইতেই স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, জাতিগুলি আধুনিক 'ঠাট' বা 'ঠাটবাচক' রাগই ছিল। নাট্যশাস্ত্রে বিকৃত স্বরের উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু আধুনিককালে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়া দ্বাদশটি স্বরের সাহায্যে বহুবিধ 'জাতি' বা ঠাটের রচনা হইতে পারে। প্রাচীনকালে জাতির সৃষ্টিতে স্বরগুলি অবরোহ বর্ণে ব্যবহার করা হইত দেখা গেল।

ত্রয়োদশ শতকে শার্ঙ্গদেব তৎপূর্ববর্তী সঙ্গীতাচার্য্যগণের গ্রন্থগুলি মন্থন করিয়া 'সঙ্গীত রত্নাকর' নামক বিরাট গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। প্রাচীন সঙ্গীতের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া 'রত্নাকর' বিখ্যাত। তিনি (শার্ঙ্গদেব) মার্গ ও দেশী সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"মার্গ দেশীতি তদ্দ্বেধা তত্র মার্গ স উচ্যতে
যো মার্গিতো বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ
দেবস্য পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তাভ্যুদয়-প্রদ।"

কল্লিনাথের টীকা—'চতুর্ভিঃ বেদৈঃ অন্বিষ্য কৃতত্বাৎ মার্গিত ইতি। মার্গিত অর্থাৎ পথপ্রদর্শিত। চারি বেদ অন্বেষণ করিয়া ব্রহ্মাদি এই সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া ভরত ও অন্যান্য গন্ধর্বগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভরতাদিও আভ্যুদয়িক উদ্দেশ্যে শিবের সম্মুখে উহা গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন প্রবন্ধাধ্যায়ে মার্গকে তিনি গান্ধর্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন:

"অনাদি সম্প্রদায়ং যদ্গন্ধর্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে।
নিয়তং শ্রেয়সো হেতুস্তদ্গান্ধর্বং জগুর্বুধাঃ।২।

সিংহভূপাল টীকা—"অনাদি মতো যঃ সম্প্রদায়ঃ গুরু শিষ্যপরম্পরয়া পরিজ্ঞানম্; তস্মাদেব নিয়তং গ্রহাংশ মূর্চ্ছনাদি নিয়মযুক্তম্, শ্রেয়স্ ঐহিকসুখস্য স্বর্গাপবর্গ রূপস্য হেতুঃ।" ইহা হইতে দেখা যায় যে, গান্ধর্ব (মার্গসঙ্গীত) বেদবৎ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি—ঐহিক ও মোক্ষপ্রাপ্তি কামনায় গন্ধর্বগণই কেবলমাত্র উহা প্রয়োগ করিতেন। ইহার ভাষা সংস্কৃত, সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়মযুক্ত এবং যাগ, যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণ বা মুনিগণের দ্বারা ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে ইহা ব্যবহৃত হইত। এই সঙ্গীত ভাষাবহুল, শ্রুতি, গ্রাম মূর্চ্ছনা এবং গাহিবার সময়াদির কঠোর নিয়মাবদ্ধ ছিল। ইহাতে কিছুমাত্র নিয়ম লঙ্ঘন "প্রত্যবায়" বা পাপ বলিয়া গণ্য

হইত। বেদগানের ঠিক পরবর্তী বলিয়া ইহাও স্তোত্র গানেরই অনুরূপ ছিল। গুরুশিষ্যপরম্পরা মুখে মুখে ইহা শিক্ষা দেওয়া হইত। কালক্রমে শুদ্ধ-আদর্শ ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিষ্ঠাহীন ক্রিয়াকলাপের প্রতি যখন জনসাধারণ বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং দেশব্যাপী বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্লাবন বহিতে লাগিল তখন ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল এবং যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান লোপের সঙ্গে সঙ্গে মার্গ-সঙ্গীতও লুপ্ত হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্মের প্রচারের সঙ্গে পালি, মাগধ, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশের জনসাধারণেরও সুখ, দুঃখ, আশা, আনন্দ, বিরহ, প্রেম, অনুরাগ ইত্যাদি প্রকাশের সঙ্গীত ছিল। বৈদিক অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত দেশের লোকের নিজস্ব নানাবিধ পূজা, পার্বণ, ব্রত, উৎসবাদি অনুষ্ঠান ছিল এবং তাহাতেও আনুষঙ্গিক গীতবাদ্য ও নৃত্য প্রযুক্ত হইত। ইহাকে দেশী সঙ্গীত বলা হইত। শার্ঙ্গদেব লিখিয়াছেন :

"দেশে দেশে জনানাং যদ্রুচ্যা হৃদয়রঞ্জকম্।
গানং চ বাদনং নৃত্যং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে ॥" সঙ্গীত রত্নাকর
"অবলা বাল গোপালৈঃ ক্ষিতি পালৈর্নিজেচ্ছয়া।
গীয়তে সানুরাগেণ স্বদেশে দেশীরুচ্যতে ॥" সং রঃ
(বৃহদ্দেশী)

অন্বয়—ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্ত্রীলোক, বালক, রাখাল, রাজা আপন আপন রুচি অনুসারে জন-মনোরঞ্জনের জন্য যে গীত, বাদ্য ও নৃত্য ব্যবহার করে তাহাই দেশী সঙ্গীত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, মার্গসঙ্গীত সৃষ্ট ও প্রচলিত হইবার পূর্বেও এই দেশী সঙ্গীত দেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সঙ্গীত স্বতন্ত্র বিদ্যা, ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। তবে নিয়মাবদ্ধ রাগসঙ্গীতের উচ্চ পর্য্যায়ে দেশী সঙ্গীতকে উঠাইয়া লইবার প্রচেষ্টার জন্য (সঙ্গীত-) গুণিগণের প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। সঙ্গীত রত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল জনরুচি অনুসারে কয়েক প্রকার দেশী গানের প্রসঙ্গে পার্শ্বদেবের উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"আচার্য্যাঃ সমমিচ্ছন্তি বাদ্ধিমিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ
স্ত্রিয়ো মধুরমিচ্ছন্তি বিক্রুষ্টমিতরে জনা।
উচ্চ নীচস্বরোপেতং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্
পদতালৈঃ সমং গীতং সমমাচার্য্যবল্লভম্ ॥
ক্রিয়া কারক সংযুক্তং সন্ধিদোষ বিবর্জিতম
ব্যঞ্জস্বর সমাযুক্তং ব্যক্তং পণ্ডিত সম্মতম।
ললিতৈ রক্তবৈর্যুক্তং শৃঙ্গার রসরঞ্জিতম্।
স্বরানাম সমোপেতং মধুরং প্রমদাপ্রিয়ম
স্বরৈশ্চ তরৈর্যুক্তং প্রয়োগ বহুল কৃতম্।
বিক্রুষ্টং নাম তদ্গীতং ইতরেষাং মনোহরাম ॥"

ইহা ব্যতীত বীরত্বপূর্ণ কাহিনী বীরের প্রিয়, শৃঙ্গাররসে গীতপ্রেমোদ্দীপ্ত পদ প্রেমিক বা বিরহী প্রিয়, হাস্যরসে গীত বিকৃত অর্থযুক্ত পদ বিট-প্রিয় গূঢ়রহস্যযুক্ত আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ (পরমার্থ) পদ যোগীজনের প্রিয়, বিবাহাদি উৎসবে গীত শুভবাক্যযুক্ত মঙ্গলগান মহিলাগণের প্রিয়, ভক্তিকোৎ-পাদক, দেবতাস্তুতি ভক্তজনপ্রিয় ইত্যাদি। এই সকল গানে কাব্যিক অভিব্যক্তিই মুখ্য, স্বর ও তাল সংযোজন স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ, সরল ও গৌণ। উপরোক্ত মার্গ ও দেশী সঙ্গীতের বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, একই সময়ে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইত। ভারত-বর্ষে ঠিক কোন্ সময় হইতে দেবালয় নির্মিত হয় নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব নহে, তবুও বৌদ্ধমঠাদির ভাস্কর্য সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়া মনে হয় মুনিঋষিগণের তপোবনের সময়েও দেশের রাজন্যবর্গের গৃহদেবতার মন্দির ছিল। মার্গ সঙ্গীতের তপোবনে জন্ম, ইহা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যাগ, যজ্ঞ নানাবিধ আভ্যুদয়িক উৎসব অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইত। রাজন্যবর্গের যজ্ঞাদিতে প্রযুক্ত এই সঙ্গীতের প্রভাব জন-সাধারণের উপর বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার ভাষা সাধারণ লোকের বোধগম্য না হইলেও ইহার মধুর ধ্বনি-সম্পত্তি তাহাদের অন্তরের সঙ্গীতানুভূতিকে সচেতন করিয়া লোকসঙ্গীতে ইহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মার্গরাগের নিয়মাদি সাধারণ লোকের নিকট দুর্বোধ্য বোধ হইলেও তিন, চার অথবা পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত দেশী সঙ্গীত ধীরে ধীরে আরও অধিক স্বরের উপর বিস্তৃত হইয়া রাগরূপ গ্রহণ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষ বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দেশী সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন রাগরূপ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রকারগণের দ্বারা নিয়মবদ্ধ হইতে লাগিল। সুর যতই মধুর হউক না কেন, মাত্র স্বরসম্পত্তি গান চিরদিন আনন্দ-দায়ক হইতে পারে না। অপরিবর্তনীয়, শ্রুতিগ্রাম মূর্চ্ছনা, লয়াদির জটিল নিয়মাবদ্ধ সংস্কৃত পদযুক্ত পবিত্র গান্ধর্বসঙ্গীত আধা-সংসারী মুনিগণেরও অধিক দিন ভাল লাগে নাই। অচলাবস্থা, পরিবর্তনের অভাব, স্বল্পপ্রয়োগ মার্গসঙ্গীতের লুপ্তির কারণ। ত্রয়োদশ শতকে শার্ঙ্গদেবের সময়ে মার্গ-রাগের নামমাত্র অবশিষ্ট ছিল এবং সর্বত্র দেশী সঙ্গীতই প্রবর্তিত হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কে বা কাহারা দেশী সঙ্গীতে জাতি আদি মার্গ রাগের নিয়মাদের প্রয়োগে দেশী রাগ সৃষ্টি করেন। মতঙ্গ মুনির "বৃহদ্দেশী" এই বিষয়ে একখানি

প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী সঙ্গীতাচার্যগণের (কাশ্যপ, দত্তিল, কোহল, দুর্গাশক্তি, নন্দিকেশ্বর, নারদ, ব্রহ্মা, ভরত, মহেশ্বর, যাষ্টিক, বল্লভ, বিশ্বাবসু, শার্দূল) নানাবিধ সঙ্গীতবিষয়ক মত উল্লেখ করিয়া জাতিলক্ষণ, ভাষা-লক্ষণ এবং সর্বশেষে দেশীরাগে প্রবন্ধ গীতের উল্লেখ করিয়াছেন। মতঙ্গ মুনি পৌরাণিক যুগের শাস্ত্রকার।

রামায়ণ মহাভারতে মতঙ্গ মুনির নাম পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে দেশী রাগাদি প্রচলিত হইয়াছিল ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। মার্গ ও দেশী রাগের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনা ও দেশী রাগ সঙ্গীতকে উপযুক্ত মর্যাদা দানের প্রচেষ্টা মতঙ্গ ও নারদ উভয়ের পুস্তকেই পরিলক্ষিত হয়। জাতি হইতে গ্রাম রাগ এবং তাহা হইতে দেশী রাগে নিয়মাদি সঙ্কলন কি প্রকারে হইল তাহা দেখাইতে গিয়া জাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যস্মাজ্জায়তে রসপ্রতীতিরারভ্যতে ইতি জাতয়ঃ" অথবা "সকলস্য রাগাদের্জন্ম হেতুত্বাজ্জাতয় ইতি"—সমস্ত রাগের জন্মের কারণ বলিয়া ইহাদিগকে জাতি আখ্যা দেওয়া হয়। "রঞ্জনাজ্জায়তে রাগঃ" মনোরঞ্জন করে এই অর্থে রাগ শব্দ বৃহদ্দেশী রচনার পূর্বেও ছিল দেখা যায়। মতঙ্গ রাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"যোহসৌ ধ্বনি বিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ।" (২৮১। বৃহদ্দেশী)

ধ্বনির বিশিষ্ট রচনা, যাহা স্বর ও বর্ণ বিভূষিত এবং যাহা লোকের মনোরঞ্জন করে তাহাই রাগ। ধ্বনি অর্থ সঙ্গীতোপযোগী শব্দ বা নাদ; স্বর অর্থে সা রে গা মা ইত্যাদি, বর্ণ অর্থে:

"গান ক্রিয়োচ্যতে বর্ণ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ।
স্থায্যারোহ্যবরোহী চ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্।"

গানের প্রত্যেক ক্রিয়াকে বর্ণ বলা হইত, অর্থাৎ গান গাহিবার সময়ে যে ভাবে স্বরগুলি ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহাকে বর্ণ বলা হয়। বর্ণ চারি প্রকার—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী। একই নাদ বা স্বর বার বার উচ্চারণ করিলে স্থায়ী বর্ণ, নিম্নদেশ হইতে উচ্চাভিমুখে গাহিয়া গেলে আরোহী ও উচ্চস্থান হইতে নিম্নাভিমুখে গাহিয়া আসিলে অবরোহী বর্ণ হয়। এই তিনটির সংমিশ্রণকে সঞ্চারী বর্ণ বলা হয়। এই বর্ণগুলির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ স্বর রচনাকে অলঙ্কার বলা হয়। "বিশিষ্ট বর্ণসন্দর্ভমলঙ্কারং প্রচক্ষতে"। অন্য মতে দেখা যায়।

"চতুর্ণামপি বর্ণানাং যো রাগঃ শোভনো ভবেৎ।
স সর্বো দৃশ্যতে যেষু তেন রাগা ইতিস্মৃতা॥"

চতুর্বিধ বর্ণ দ্বারা যে রাগ শোভিত তাহাকে রাগ বলা হয়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যে অলঙ্কার প্রয়োগ দ্বারা রাগাবয়ব প্রদর্শন অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। রাগের মনোরঞ্জক হইতে গেলে জনরুচির উপর নির্ভরশীল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু "ভিন্নরুচিহিলোকাঃ"—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। ভারতবর্ষ বহুবিধ ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ, সুতরাং নানা সংস্কৃতি ও রুচির বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী। একই ভঙ্গিমায় স্বর বা ভাষা ব্যবহারের রীতি প্রত্যেকটি মনের আনন্দদায়ক হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য গীতের ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই গীতে ব্যবহৃত ভাষার এবং পরবর্তীকালে স্বরের ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতিকে 'গীতি' আখ্যা দেওয়া হইত। ভরতের মতে দেখা যায়—মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা এই চারি প্রকার গীতি প্রচলিত ছিল। যাষ্টিকের মতে ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা এই তিন প্রকার গীতি। দুর্গাশক্তির মতে:

"গীতয়ঃ পঞ্চবিজ্ঞেয়াঃ শুদ্ধ ভিন্না চ বেসরা
গৌড়ী সাধারণী চৈব"

এই পাঁচ প্রকার গীতি।

মতঙ্গের মতে শুদ্ধ, ভিন্নক, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা, বিভাষা এই সাত প্রকার গীতের প্রচলন দেখা যায়। যাহা হউক, স্বরের ব্যবহারের প্রণালী হইতে শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণী এই 'পঞ্চগীতি' আশ্রয় করিয়া পাঁচ প্রকার গ্রাম রাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। শার্ঙ্গদেব পঞ্চ গীতির এইরূপ বর্ণন দিয়াছেন:

"পঞ্চধা গ্রামরাগাস্যুঃ পঞ্চগীতি সমাশ্রয়াৎ।
গীতয়ঃ পঞ্চ শুদ্ধাদ্যা ভিন্না গৌড়ী চ বেসরা।
সাধারণীতি "শুদ্ধা" স্যাদবক্র ললিতৈঃ স্বরৈঃ।
'ভিন্না' সূক্ষ্মৈঃ স্বরৈর্বক্রৈর্মধুরৈর্গমকৈর্যুতা॥
গাঢ়ৈস্ত্রিস্থান গমকৈরুহাটী ললিতৈঃ স্বরৈঃ।
অখণ্ডিত স্থিতি স্থানত্রয়ে "গৌড়ী" মতা সতাম্॥
ওহাটী কম্পিতৈর্মন্দ্রৈর্দ্রুত দ্রুততরৈঃ স্বরৈঃ।
হকারোকার যোগেন ন্যস্তে চিবুকে ভবেৎ॥
বেগবদ্ভিঃ স্বরৈর্বর্ণ চতুষ্কেপ্যতি রক্তিতঃ।
বেগস্বরা রাগ গীতির্বেসরা চোচ্যতে বুধৈঃ॥
চতুর্গীতিগতং লক্ষ্মশ্রিতা "সাধারণী" মতা।

(১) অবক্র অর্থাৎ সরল ও মনোহর স্বর ব্যবহারে শুদ্ধা-গীতি, (২) মধুর গমকযুক্ত সূক্ষ্ম এবং দ্রুত উচ্চারিত বিষম বা বক্র বা বিকৃত স্বর ব্যবহারে ভিন্না, (৩) ওহাটী ('ও'কার ও 'হ'কার শব্দে হলপ ব্যবহার) ও সুমিষ্ট স্বরে মন্দ্র, মধ্য, তার এই তিন স্থানেই নিবিড় (গম্ভীর) গমক ব্যবহারে অবিচ্ছিন্ন অবস্থানে গৌড়ী গীতি, (৪) হৃদয়ে চিবুক স্থাপন করিয়া মন্দ্র স্থানে দ্রুত ও দ্রুততর ওহাটী ও কম্পিত গমক

ব্যবহারে 'অ'কার ও 'ও'কার যোগে সবেগে চতুর্বিধ বর্ণ সাহায্যে অতি মনোরঞ্জক বেসরা গীতি (বেগস্বরা ইতি বেসরা) এবং এই চারি গীতির সংমিশ্রণে সাধারণী গীতি গাহিবার প্রচলন ছিল। রাগসমন্বিত প্রবন্ধাদিই প্রথম দিকে গাওয়া হইত। রত্নাকরে বহুবিধ প্রবন্ধের বর্ণনা দেখা যায়। প্রবন্ধ গানের স্থানে স্থানে বক্তৃতাদিও ব্যবহৃত হইত—আজকাল ভাগবৎ পাঠ অথবা কীর্তনগানে যেরূপ মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা দ্বারা পদের ব্যাখ্যার সঙ্গে গান করা হয়। অতি প্রাচীন কালে ঐরূপ গান ও নাটকে ব্যবহৃত গানের প্রচলন অধিক ছিল। ধ্রুপদাদি উচ্চ প্রতীকের রাগ সঙ্গীত এই সকল প্রবন্ধ হইতেই ক্রমে ক্রমে রচিত হয়। এই সকল ভাষাগত বা স্বরগত গীতি অনুসারেই পরবর্তীকালে ধ্রুবপদে চারিটি 'বাণী'র সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন ঘরোয়ানায় বিভিন্ন বাণীর (খাণ্ডার, নোহার, ডাগুর, গৌরহার) ব্যবহারের কথা শোনা গেলেও আজকাল বাণীর রহস্য ও তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। কাজেই উহার আজকাল শব্দমাত্র।

এইরূপে পঞ্চগীতি আশ্রয়ে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামে ভাস, বিভাষাদি ত্রিশটি গ্রাম রাগ উৎপন্ন হইল। শার্ঙ্গদেব বলিলেন, "প্রসিদ্ধ গ্রামরাগাখ্যাঃ কেচিদ্দেশীত্যাপীরিতা"। প্রসিদ্ধ গ্রাম রাগগুলিকে কেহ কেহ দেশীও আখ্যা দেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে মার্গ ও দেশী সঙ্গীত এরূপ ওতঃপ্রোত ভাবে মিলিত হইয়াছিল যে, একই রাগ মার্গ ও দেশী দুইটি পর্যায়েরই অন্তর্ভূত হইয়াছিল। অবশ্য, স্বর স্বরূপ ভিন্ন ছিল। কারণ দেশী সঙ্গীত পরিবর্তনশীল—লোকরুচি অনুযায়ী চিরদিন তাহাকে চলিতে হয়। রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ এই চতুর্বিধ দেশী রাগ সৃষ্ট হইল। এই সকল দেশীরাগে শ্রুতি, স্বরগ্রাম, মূর্চ্ছনাদি ব্যবহারের নিয়ম ছিল না।

"যেষাং শ্রুতিস্বরগ্রাম জাত্যাদি নিয়মোনহি।
নানা দেশ গতিচ্ছায়া দেশী রাগাস্তু তে মতা॥" হনুমান

কল্লিনাথের টীকা:

"দেশীত্বাদেতেষামনিয়মো ন দোষায়েতি। দেশীত্বং চ তত্তদ্দেশ জনমনোরঞ্জনৈক ফলত্বেন কামচার প্রবর্তিত্বম্। নিয়মেতু সতি তেষাং গীতানাং মার্গত্বমেব।"

দেশীরাগ বলিয়া ইহাতে অনিয়ম দোষের হয় না। যে যে দেশে প্রচলিত তথাকার জন-মনোরঞ্জনই উদ্দেশ্য বলিয়া স্বেচ্ছাচার চলিয়া থাকে। অন্যত্র দেখা যায়:

"তদত্র মার্গরাগেষু নিয়মো যঃ পুরোদিতঃ।
স দেশী রাগ ভাষাদাবন্যথাঽপি কচিদ্ভবেৎ॥" সং রঃ

মার্গরাগের নিয়মাদির কিঞ্চিৎ অন্যথা দেশীরাগে ও ভাষায় হইতে পারে।

এখন দেখা যাক, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ রাগ বলিতে কি বুঝাইত। (১) গ্রামোক্ত রাগাদির ছায়া অবলম্বনে শাস্ত্রীয় নিয়মে শুদ্ধভাবে যে রাগ গাওয়া হইত তাহাকে রাগাঙ্গ রাগ বলা হইত। শাস্ত্রীয় নিয়ম ভঙ্গ হইলে রাগাঙ্গ রাগ হইত না। (২) ভাষাচ্ছায়া অবলম্বনে ভাষাঙ্গ রাগ বলা হইত। এই সব রাগ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রচারশৈলী দ্বারা ইহার সৃষ্টি হইত এবং রাগ যে দেশে উৎপন্ন তাহার নাম থাকিত। (৩) শোক, উৎসাহ, করুণা ইত্যাদি আশ্রয়ে ক্রিয়াঙ্গ রাগ সৃষ্ট হইত। ইহা শাস্ত্রীয় নিয়মে সৃষ্ট হইলেও (প্রায়ই অবরোহে) কোন বিবাদী স্বর প্রয়োগ করিয়া বৈচিত্র্য দ্বারা মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা হইত। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এই সব রাগ ভ্রষ্ট হইলেও রাগের রক্তিগুণ বা রঞ্জকতা বৃদ্ধিই পাইত। (৪) উপাঙ্গ রাগ রাগাঙ্গ রাগকে নিয়মভ্রষ্ট করিয়া ক্রিয়াঙ্গ রাগের মতই সৃষ্টি করা হইত। ক্রিয়াঙ্গ রাগে শুদ্ধ রাগ স্বরূপ স্থির রাখিয়া নূতন স্বর সংযোজনা করা হইত, কিন্তু উপাঙ্গ রাগে মূল রাগাঙ্গ রাগের দুই-একটি স্বর পরিবর্তন করিয়া নূতন স্বর ব্যবহার করা হইত। এরূপ রাগের সংখ্যা অল্পসংখ্যক মাত্র। জাতিগান যখন ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হইয়া গ্রাম রাগ সৃষ্ট হইতে লাগিল তখন জাতির লক্ষণগুলিই এই সকল রাগে প্রযুক্ত হইতে থাকে। গ্রাম রাগের নিয়ম কশ্যপ এইরূপ দিয়াছেন:

"কচিদংশ কচিন্ন্যাস ষাড়বৌড়বিতে কচিৎ।
অল্পত্ব চ বহুত্ব চ গ্রহাপন্যাস সংযুতম্॥
মন্দ্রতারৌ তথাজ্ঞস্থা যোজনীয়া মনীষিভিঃ।
গ্রাম রাগা প্রযোক্তব্যা বিধিবল্লক্ষ রূপকাঃ॥"

অর্থাৎ—অংশ, ন্যাস, ষাড়ব, ঔড়ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, গ্রহ, অপন্যাস, মন্দ্র, তার এই দশটি নিয়ম গ্রাম রাগে প্রয়োজন করিতে হইবে।

একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'সঙ্গীত অপৌরুষেয়' বা ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে—সঙ্গীত অন্যান্য বিদ্যার মতই মানব দ্বারা সৃষ্ট এবং মানবের মনোরঞ্জনের জন্যই মানব দ্বারা ব্যবহৃত হয়। যিনি এই সঙ্গীতস্রষ্টা তাঁহাকে শাস্ত্রে 'বাগ্‌গেয়কার' বলা হয়। 'গীত' বলিতে কি সূচিত হয় লোচন কবি সে সম্বন্ধে তাঁহার "রাগতরঙ্গিনী" গ্রন্থে বলিয়াছেন:

"ধাতু মাতু সমাযুক্তং গীতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তত্র নাদাত্মকো ধাতুর্মাতুরক্ষর সম্ভবঃ"।

মাতু পদ্য রচনা এবং ধাতু স্বর সংযোজনা। যিনি এই পদ্য রচনা ও তাহাতে স্বর সংযোজনা করিয়া গীত সৃষ্টি করেন তাঁহাকে বাগ্‌গেয়কার বলা হয়:—"বাচং গেয়ং চ কুরুতে যঃ স বাগগেয় কারকঃ"। সঃ রঃ॥ এই বাগগেয়কার (com-

poser) বহুবিধ গুণের অধিকারী হইতেন। দেশী রাগে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ এই দুই প্রকারের গান প্রচলিত ছিল :

"নিবদ্ধমনিবদ্ধং তদ্‌দ্বেধা নিগদিতং বুধৈঃ।
বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে
আলপ্তির্বন্ধহীনত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতম
সংজ্ঞাত্রয়ং নিবদ্ধস্য প্রবন্ধ বস্তু রূপকম্‌।" সঃ রঃ

শার্ঙ্গদেবের সময়ে ধ্রুবপদাদির প্রচলন হয় নাই, তখন প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক ইত্যাদি গানের প্রচলন ছিল। এইগুলি নিবদ্ধ গান অথবা স্বরতালযুক্ত পদ। প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ বা অবয়বকে ধাতু বলা হইত। প্রবন্ধ-পদের উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ এই পাঁচটি অংশ বা ধাতু থাকিত। পরবর্তীকালে ধ্রুপদে প্রবন্ধের মত স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চারিটি অংশ বা 'তুক্‌' রচনা করা হইত। বন্ধনহীন বলিয়া আলপ্তিকে অনিবদ্ধ গান বলা হইত। আলপ্তি (আধুনিককালের আলাপ) দুই প্রকারের ছিল—রাগালপ্তি ও রূপকালপ্তি। রাগালাপে গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে দেখাইতে হইত। রূপকালাপে প্রবন্ধের মতই ভিন্ন ভিন্ন অংশে থামিয়া থামিয়া সা, রে, গা, মা, অথবা তে, নে, রি, নেরি ইত্যাদি অক্ষর বা শব্দাংশ সাহায্যে তালবদ্ধ অবস্থায় রাগ প্রদর্শন করিতে হইত। "অপন্যাসেষু অবিরম্য একাকারেণ প্রবৃত্ত (রাগ) আলাপঃ স এব অপন্যাসেষু (স্বরেষু) বিরম্য বিরম্য প্রবৃত্তং রূপকম্‌।" রাগালাপে তালের ব্যবহার থাকিত না, রূপকালাপে বাণী থাকিত না—কিন্তু তাল থাকিত। ইহা ব্যতীত রাগ) আলাপে রাগের আবির্ভাব, তিরোভাব, পুনরাবির্ভাব দেখাইতে হইত। তৎকালীন সঙ্গীতে ইচ্ছামত আলাপ গাওয়ার প্রথা ছিল না, কোন্‌ আলাপে কতগুলি স্বর ব্যবহার করা যাইবে, এক-একটি আলাপে কোন্‌ স্বর হইতে আরম্ভ করিলে কোন্‌ স্বর পর্যন্ত যাওয়া চলিবে তাহার বিশেষ নিয়ম ছিল। ইহাকে 'স্বস্থান' নিয়ম বলা হইত। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম—প্রবন্ধ, বস্তু, রূপকাদি নিবদ্ধ গান পরবর্তীকালে ধ্রুবপদ, খেয়াল, ঠুংরী আদিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং আলপ্তি আধুনিক আলাপে পর্যবসিত হইল।

কোন সঙ্গীতে এক স্বর ব্যবহার করিলে আর্চিক, দুই স্বরে গাথিক, তিন স্বরে সামিক, চার স্বরে স্বরান্তর, পাঁচ স্বরে ঔড়ব, ছয় স্বরে ষাড়ব, সাত স্বরে সম্পূর্ণ বলা হইত। পাঁচটির কম স্বর ব্যবহারে কোন রাগ হইত না। বৃহদ্দেশীকার লিখিয়াছেন, "চতুস্বরাৎ প্রভৃতি ন মার্গঃ"। মার্গ অর্থাৎ রাগ—"শবরপুলিন্দকাম্বোজবঙ্গকিরাতবাহ্লীকান্ধ্রদ্রবিড়বনাদিষু প্রযুজ্যতে", অর্থাৎ চতুস্বর ব্যবহৃত শবর পুলিন্দ বঙ্গাদি দেশী সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত। এই জন্য চারি প্রকার 'ধ্রুবা' গানের মধ্যে চতুস্বরিক 'ধ্রুবা' অপকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইত। 'ধ্রুবা' দেশী সঙ্গীত ছিল, জাতি ও ধ্রুবা অর্থাৎ মার্গ ও দেশী মিলিয়া ভরতের পরবর্তীকালে রাগাদির সৃষ্টি হইয়াছিল। দেশী রাগগুলিকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদানের নিমিত্ত এই সকল রাগের মূর্তি, দেবতা, পূজা, ধ্যান, গাহিবার সময় ইত্যাদির বিবরণ দৃষ্টিগোচর হয়।

রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে রাগে ব্যবহৃত স্বর, শ্রুতি, সপ্তক, ঠাট-রাগ অথবা রাগ-রাগিণী, ধ্রুবপদ খেয়ালাদি রচনা, বাদী, সম্বাদী, গাহিবার সময়, আলাপ, বাট, তান ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা আবশ্যক। বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ এবং বিস্তৃতির সময়ে ভারতীয় সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল শুনা যায়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে তথ্যসম্বলিত পুস্তকাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্যাপ্টেন দে মহাশয় তাঁহার *Music and the Musical Instruments of Southern India* পুস্তকে লিখিয়াছেন :

"The most flourishing age of Indian music was during the period of the native princes, a little before the Mahomedan conquest. With the advent of the Mahomedans its decline commenced. Indeed, it is wonderful that it survived at all."

ক্যাপ্টেন উইলার্ড *A Treatise on the Music of Hindusthan* পুস্তকেও লিখিয়াছেন :

"The conquest of Hindusthan by the Mahomedan princes forms a most important epoch in the history of its music. From this time we may date the decline of all arts and sciences purely Hindu."

মুসলমান আক্রমণ ও আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতে যুগান্তর ঘটিয়াছে। আধুনিক কালে প্রচলিত রাগসঙ্গীতে মুসলমান সঙ্গীতের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়। কিয়ৎপরিমাণে প্রাচীন সঙ্গীতের রূপ কর্ণাটক পদ্ধতিতে এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়। উত্তর-ভারতের সঙ্গীত আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়াই পণ্ডিতগণের ধারণা
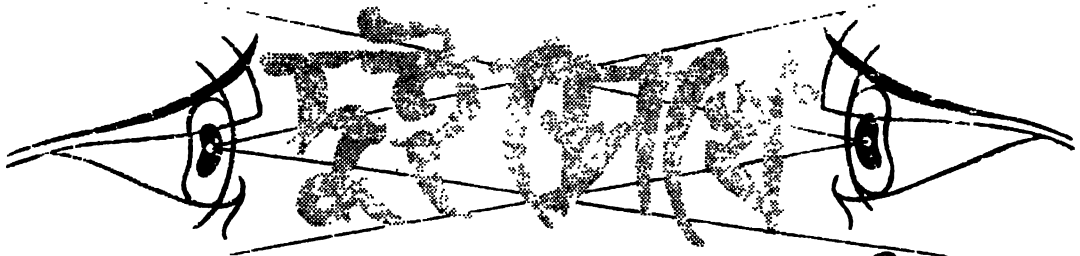
শ্রী সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

পয়সাকে কি করে টাকায় পরিণত করতে হয়, সে পথ মধুসূদনের জানা। আর পুরুষানুক্রমে চলে আসছে এ জানাজানির পালা। চক্রবৃদ্ধির মারপ্যাঁচ মধুসূদনের কাছে অত্যন্ত সহজ, অথচ এ শিখতে স্কুলে যেতে হয় নি বা অনর্থক পয়সা খরচের হাঙ্গামা পোয়াতে হয় নি তাকে। মধুসূদন নাকি ট্যাঁ ট্যাঁ না করে টাকা টাকা বলে কেঁদেছিল, অর্থাৎ অর্থের ব্যাপারে নিজেকে একান্ত অসহায় মনে হয়েছিল জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে। তাই যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এই অবস্থা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল মধুসূদন। পাঁচ বছরের ছেলে যখন ছড়াছবির বই দেখতে ভালবাসে, কিংবা ছবির বাঘ, ভালুক দেখে রোমাঞ্চিত হয়, সেই বয়সে একান্ত অভিনিবেশ সহকারে খাতাপাত নিয়ে বসত মধুসূদন। তাই বাবা মারা যাওয়ার পর দশ বছর বয়সে ঐ প্রকাণ্ড খেরো-বাঁধানো খাতার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হিজিবিজি লেখা নিয়ে এতটুকুও অসুবিধায় পড়তে হয় নি তাকে। অল্পবয়সে মধুসূদনকে দেখে যারা পাওনা-গণ্ডা ব্যাপারে একান্ত অবুঝ ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, বছর ঘুরতে না ঘুরতে তারা বুঝতে পারল—কোন এক কৌশলে তাদের পরিমাণ দ্বিগুণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মধুসূদন দাস একান্ত অমায়িক নির্বিরোধী মানুষ এবং ধার্মিকও বটে, বৈষ্ণবধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে মাছ মাংসের পাট উঠিয়ে দিয়েছে বাড়ী থেকে। কেউ অনুযোগ করলে, কপালে একবার হাত দুটো ছুঁইয়ে উত্তর দেয়—সবই মহাপ্রভুর ইচ্ছে। পাপীতাপী মানুষ, সারাজীবন তো শুধু পাপ করেই চলেছি, তবুও

"ভদ্র পাড়া এটা, সেরকম ভাবে থাকতে যদি না পার, বস্তি আছে চলে যাও।"

যেটুকু এড়ানো যায় তাঁর কৃপায়।—চোখ দুটো বোধ করি ভক্তিতে বন্ধ হয়ে আসে।

জানতঃ পাপ করে না মধুসূদন। লাল খেরো খাতার সংখ্যাগুলি যদি একটু লাফিয়ে চলে, তার জন্ত ত দায়ী মধুসূদনকে করা যায় না। ব্যবসার খাতিরে যেটুকু না করলে নয়, সেইটুকুই শুধু সে করে থাকে। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। অন্ততঃ সে স্বীকার করে না।—প্রত্যেক দিন সকালে ধূপধুনো গঙ্গাজল ছিটিয়ে তারপর খাতা নিয়ে বসে। নিকেলের ফ্রেমটা নাকের উপর প্রায় কেটে বসে, অবশ্য এর জন্ত কোন অসুবিধা হয় না। কাজ চলে, তা হলেই হ'ল।

· কি নাম?—হারাণচন্দ্র দত্ত! তোমার কাছে পাওনা হ'ল গিয়ে, তেইশ টাকা তেরো আনা চার পাই। তা পাই-টাইয়ের হিসেব ত আজকাল অচল, তুমি তেরো আনা এক পয়সাই দাও! তারপর বুঝলে না, এই হয়েছে আজকালকার অসুবিধা। বাবা কিংবা ঠাকুরদা মশায়দের সময় ঐ চার পাই নেওয়া চলত, কিন্তু আজকাল ত ওসব উঠে গিয়েছে; লাভের গুড় সব ঐ পিঁপড়ের পেটেই চলে যাচ্ছে। কি করে যে সংসার চলবে তা মহাপ্রভুই জানেন। চালের কথা ছেড়েই দাও, ও সব রথী মহারথীদের দখলে, সেখানে সাধ্য-সাধনার কোন মূল্যই নেই। কিন্তু ঐ যে মাছ তিন টাকা সের, দুধ এক টাকা, তার মধ্যে আবার কতটুকু জল তা না ধরাই ভাল।

সিঁদুরমাখানো সিন্দুকের গহ্বর আস্তে আস্তে ভরাট হতে থাকে। এতেও মধুসূদনের সন্তুষ্টি নেই, বড় সময় লাগে। কবে যে রূপোর প্লাবন আসবে সেই চিন্তা করে মধুসূদন।

কত চাই? পঞ্চাশ! এনেছ কি? মোটে দু'গাছা চুড়ি, ওতে হবে না।—দিনকাল যা পড়েছে এতে কুলিয়ে উঠতে পারছি না কোন দিক।—তা তোমার যখন বিশেষ দরকার বলছ, চল্লিশ টাকা নিয়ে যাও। ওর বেশী আর পারব না।

এ জিনিস যে পরে তারই হয়ে যাবে এ কথা মধুসূদন জানে। মাঝখান থেকে কয়েক বছরের সুদ লাভ হবে তার।

ছোট মেয়েটা ঘরে এসে ঢোকে, বলে—খেতে চল বাবা। মা যে কখন থেকে তোমায় ডাকছে।

—এই যাচ্ছি।

খেরো খাতাটা সুতো দিয়ে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে মধুসূদন ভাবে, এ ব্যবসা বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে তার মৃত্যুর পর। ছেলেটা কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে। স্কুল-কলেজে দিয়ে ভাল করেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারে না। অন্যদের যা পোষায় তাই কি তাকেও করতে হবে? এদিকে এক নম্বরের বাবু হয়ে উঠেছেন। হাঁটুর উপর কাপড় পরলে, ছেলের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বাপের পয়সা ওড়াতে আর কষ্ট কি। অথচ কত কম বয়সে মধুসূদনকে সংসারের ভার নিতে হয়েছিল। একমাত্র ছেলে, বলতে পারে না ত কিছু, সেইটাই তার সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা।

খেয়ে এসে আধশোয়া অবস্থায়, বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে মধুসূদন। জানালার সামনে দিয়ে একটা নূতন মোটর চলে যায় একরাশ ধুলো উড়িয়ে। খোলা জানালা দিয়ে ধুলোর ঝাপটা এসে ঘরে ঢোকে। বিড়বিড় করে কি যেন বলে উঠে, তারপর কেশবিরল মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মনে মনে হাসতে থাকে মধুসূদন। ভাবে, কাকপক্ষী ডাকার সঙ্গে সঙ্গে এ পাড়ার ঘুম ভাঙে না, এ পাড়ার সকাল হয় আর কিছু পরে, সূর্য্য তেরছা ভাবে আর একটু উপরে উঠলে পরে তবে। ঘুম থেকে উঠে পায় গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যের আলোর লুকোচুরি না দেখলে, এদের রাতের ঘুমের আমেজ কাটে না—শরীরের জড়তা ভাঙে না, ধূমায়িত চায়ের পেয়ালাও কি রকম যেন বিস্বাদ ঠেকে।

পাড়াটার আভিজাত্য আছে। মাঝখানে ছোট্ট এক টুকরো জায়গা পার্কের মত। রেলিঙের ধার ঘেঁষে মরশুমী ফুলের সারি। কেয়ারী করা ঝোপ। বিকালবেলায় কচিৎ কখনও দু'এক জন এখানে এসে বসে, তবে সে খুব কম। কেননা এতে আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়।

ওজন করা হাসি, আর কেতাদুরস্ত আলাপ, এর গণ্ডী ছাড়িয়ে কেউ যায় না। শব্দ করে হাসা, ওরে বাবা, সে যে ভীষণ অসভ্যতা। কিন্তু মধুসূদন এ কথা মানে না, হাসবার ক্ষমতা এদের নেই, সেইটাই আসল কারণ। তবে শব্দ হয় মোটরের। প্রতিবেশীর পুরনো গাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় নূতন গাড়ীর মালিক ইচ্ছা করেই এক্সিলেটারটায় একটু চাপ দেয়, গোঙিয়ে উঠা ইঞ্জিনটা যেন প্রতিবেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একরাশ ধোঁয়াছড়িয়ে চারিদিক কালো করে তোলে। বিশ্রী কটু গন্ধযুক্ত পোড়া পেট্রোলের ধোঁয়া—আভিজাত্যের কোঁসকোঁসানি।

কিন্তু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় না এরা, আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ায় মাত্র। শব্দ হবে—বিশ্রী ব্যাপার।

আর একটা শ্রেণীবিভাগ আছে—পাঁচশো সাতশোয় আর হাজারে। পাঁচশো আর সাতশোয় বড়জোর দুটারটে কথা চলতে পারে, কিন্তু সামাজিকতা?—অসম্ভব।

রোদ পড়ে আসছে, সামনে ঐ পার্কের মাঝখানে গাম গাছটার পাতা চিক্‌চিক্ করছে, আর কিছুক্ষণ পরে ধূসর হয়ে আসবে চার ধার।

মার্চেন্ট অফিসের চাকুরে জয়ন্ত গাঙ্গুলীর গাড়ীর মডেল এত ঘন ঘন বদলায় কি করে, রায় বাহাদুর গিন্নী তার হদিস পান না। রায় বাহাদুরের গেটে দারোয়ান মোতায়েন থাকে দেখে শরজিৎ মুখুজ্যে মুখ টিপে হাসে।—নাম ভাঙিয়ে ভাঁওতা দেওয়া আর কত দিন চলবে? উপর ঠাঁট না দেখালেই নয়? পেনসনের টাকা ক'টা ত ঐ লিকলিকে মেয়েটার রুজ আর লিপষ্টিকেই শেষ হয়ে যায়। তবুও ত দেমাকের কমতি নেই।

মধুসূদন ভাবে, এই সযত্নরক্ষিত আভিজাত্যের মাঝে নিতান্ত ছন্দহীন তার এই পাঁজরা বার করা একতলা বাড়ীটা। রায় বাহাদুরের চক্‌চকে চার-তলার পাশে আর 'সাতশো'র বাড়ীর সামনে তার এই বাড়ীটা যে শুধু বেমানান তাই নয়, দৃষ্টিকটুও বটে। চিমনীহীন বাড়ীর দু'বেলা উনানে আঁচ-দেওয়া ধোঁয়া, আশেপাশের বাড়ীতে ঢুকে তাদের বিরক্তি উৎপাদন করে। তার জন্য অনুযোগও শুনতে হয় মাঝে মাঝে।

বাড়ী মধুসূদনও করতে পারে, তবে ঐ যে, বাড়ীগাড়ীতে লোভ নেই তার। অবশ্য বাড়ী করলে ভাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু অতদিন এতগুলি টাকা শুধু শুধু আটকে রাখার কোন মানে হয় না। ঐ টাকাটা সুদে খাটালে, ভাড়ার থেকে অনেক বেশী ঘরে আসবে এর মধ্যে। এই হিসাবে এতটুকু ভুলচুক হয় না তার। তা ছাড়া আর কয়েকটা বছর অপেক্ষা করলে অমন অনেক বাড়ী আসবে তার হাতে।

বিকাল হয়ে এল, উঠে পড়ে মধুসূদন। আবার বাইরের ঘরে গিয়ে বসতে হবে। মোটা খেরো খাতাটায় কয়েকটা আচড় কাটাকাটি রয়েছে; তেল-সিন্দুর মাখানো সিন্দুকের ডালাটা আর একটু টক্‌টকে করে তুলতে হবে।

নীচে এসে দেখে রায় বাহাদুর এগিয়ে আসছেন। মধুসূদন দাঁড়িয়ে বলে, আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার।—ওরে উমা একটা আসন এনে দে বসতে।—না না, দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন, আপনার মত মানী লোক দাঁড়িয়ে থাকবে সে কি হয়?

রায় বাহাদুর বসেন না, বসতে আসেন নি তিনি। দাঁড়িয়ে থেকেই বলেন—তোমার বাড়ীর সামনেটা এমন নরক করে রেখেছ যে, লোকজন যাতায়াত করতে পারে না। আত্মীয়-

তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির আকর্ষণে কাপড় গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত উঠে যায়, কুঞ্চিত নাসিকায় ঘৃণা আর অস্বস্তি ঠিকরে পড়তে চায় যেন।

স্বজন এলে মাথা কাটা যায় লজ্জায়। ভদ্রপাড়া এটা, সে রকম ভাবে থাকতে যদি না পার, বস্তি আছে চলে যাও।

মধুসূদন বিনয়ে নুয়ে পড়ে—কিছু মনে করবেন না, বারণ করে দেব। আপনাদের দয়াতেই ত টিকে আছি কোন রকমে, বিরূপ হলে যাই কোথা বলুন?

রায় বাহাদুর চলে যেতে মধুসূদন হাসে। প্রত্যেক বারই হেসে থাকে, এদের কাঙালপনা দেখে। কাঙালপনা ছাড়া

আর কি বলবে ? দরখাস্ত পেশ না করে, ক্ষমতা থাকে কিছু করুক। কিছু করবার ক্ষমতা যে এদের নেই এ কথা সে ভাল করেই বোঝে।—বিষহীন ঢোঁড়ার জাত সব।

মধুসূদন ওস্তাদ খেলিয়ে। বিষের থলি ভেঙে দিয়ে মজা দেখে। অনেক পোড়-খাওয়া বুদ্ধি তার। সামনাসামনি একটু নত হলে, একটু তোষামোদ করলে যদি কাজ হয়, মধুসূদন সেখানে কার্পণ্য করে না।

আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে এদের অনেককেই আসতে হয় তার কাছে আর এক মূর্ত্তিতে। তখনও কৃতার্থ হবার ভঙ্গী করে, এতে কাজ হয়। চকচকে জামা-কাপড় পরে রাজা-উজির মারা, সবার হাঁড়ির খবর তার জানা।—এই যে পেনসন-পাওয়া রায় বাহাদুর, যার মেয়ে জর্জ্জেটে সরু দেহটা মুড়ে, হাই হিলের জুতায় রাস্তায় ঠোক্কর খেতে খেতে হাঁটে। পাতলা লিপস্টিকে রাঙানো ঠোঁটের বাঁকা হাসি। তার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময়, ডান হাতের তর্জ্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির আকর্ষণে, কাপড় গোড়ালী থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত উঠে যায়, কুঞ্চিত নাসিকায় ঘৃণা আর অস্বস্তি ঠিকরে পড়তে চায় যেন।

এই স্মরজিৎ মুখুজ্যে, উকিল ; পেট মোটা পোর্টফোলিও বগলে নিয়ে কোর্টে যায়। সব সময় লেগে আছে তার পেছনে, একটা কিছু অনিষ্ট করবার জন্ত। একথা কতবার যে মহাদেবকে বলে সাবধান করে দিয়েছে, কিন্তু ছেলের যদি সে কথায় কান থাকে। দেশ উদ্ধারে মেতে আছেন, মুখ্যু বাপের কথায় কান দিলে কি আর চলে ? বাবার পয়সা আছে, তার আর ভাবনা কি ?

কিংবা জয়ন্ত গাঙ্গুলী—অফিসার না কি যেন কোন্ মার্চ্চেন্ট আপিসের। গাড়ী হাঁকিয়ে ন'টার সময় বেরিয়ে যায়। রংচঙা টাইবাঁধা ঐ গলার পেষণ আর একটু বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তার আছে।—আর কার কথা ? ঐ সমর চৌধুরী ? প্রিন্স না কি বলে যেন নিজের পরিচয় দেয়। টুসিটারটা নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ায় বোটানিক্স, ডায়মণ্ড হারবার না আরও কোথায় কোথায় যেন সব ; রাতে নাইট ক্লাব। আর প্রেম করেন ঐ রায় বাহাদুরের মেয়ের সঙ্গে। তার কথা ? হাজার ষোলর হিসাব আছে আর বেশী দিন নয়।...

মধুসূদনের চিন্তায় বাধা পড়ে। ভারী পায়ে দু'জন পুলিস এসে ঘরে ঢোকে। মধুসূদন তটস্থ হয়ে উঠে, হাত জোড় করে বলে, কোন হুকুম আছে ?

—মহাদেব দাস কে হয় ?

—ছেলে।

—আইনভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে। বাড়ীতে কাগজপত্র কিছু আছে ?

—তা ত জানি না।

—সার্চ্চ হবে। পরোয়ানা আছে।

বাড়ীর ভিতর পুলিসের তাণ্ডব সুরু হয়। ভিতর থেকে স্ত্রী কাঁদছে, মেয়েটা ভয়ে চীৎকার করছে। মধুসূদনেরও বুকের ভিতরটা জ্বালা করতে থাকে। বোকা ছেলে, আগে থেকে যদি কিছু জানাত, তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারত পয়সা ছড়িয়ে।

মধুসূদন বুঝতে পারে না, তার ছেলের স্বভাব এ রকম হ'ল কি করে ? তাদের রক্তে ত চিরকাল অর্থসঞ্চয়ের বীজ লুকানো ; এ রকম ছন্নছাড়া ভাব তার এল কোথা থেকে ?

পুলিস কাজ শেষ করে চলে যায়, কি একটা কথা যেন মধুসূদনকে বলে, কিন্তু তার কান পর্য্যন্ত পৌছায় না।

কানে মধুসূদনের অনেক কথাই পৌঁছায় না বা পৌঁছায় নি এতদিন ; বাইরের পাঁচটা ফাঁকা কথায় কান দিতে কোন দিনই চায় নি। আজ তাই তার মনে হয়, সে ভুলের একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ; নিজের গড়া জগৎ ছাড়া অন্য সব-কিছু উপেক্ষা করবার মাশুল না দিয়ে সে যাবে কোথায় ? প্রথম থেকে যদি মহাদেবের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখত, তা হলে আজ এ অবস্থায় পড়তে হ'ত না। কিন্তু এমন যে হতে পারে সেকথা যে কোনদিনই ভাবতে পারে নি। মহাদেব এমন একটা কিছু করবে যাতে তাকে পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে, তা হলে ব্যবস্থা একটা কিছু করে রাখতে পারত আগে থেকেই। এটাকে একটা বিলাস নেহাত হুজুগে মাতা বলে ধরে নিয়েছিল ; ভেবেছিল, ভাবনা চিন্তা নেই, তাই যা খুশী করে বেড়াচ্ছে। বয়স হলে যখন সমস্ত বুঝতে শিখবে, তখন চাষী-মজুর ক্ষেপিয়ে বেড়াবার উৎসাহ ঝিমিয়ে আসবে আস্তে আস্তে। নিজের ভাল কে না চায় ? হাতে প্রচুর সময়, করবার কিছু নেই, তাই পার্টি-টার্টি যা করছে করুক, সময়মত সামলে নিলেই চলবে। তার নিজের রক্ত ত রয়েছে মহাদেবের গায়ে, মোহ কাটতে আর কত দিন। কিন্তু কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল, ভাবতেও পারে নি কোন দিন।

খবরের কাগজ পড়ে না মধুসূদন। বাইরের সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ও তার নেই। এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করে নি কোন দিন। পরিচিত পৃথিবীটাকে একটা বাঁধাধরা ছকে ফেলে দিন কাটায়। দশ বছর বয়স থেকে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে, সারাজীবন

ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে একই পথে ; অন্য কিছু ভাববার কোন তাগিদ সে অনুভব করে নি। সেদিন তার লক্ষ্য ছিল অর্থ, কিন্তু এরা যে কি করছে তা ভাল ভাবে বুঝতে পারে না। ধনী দরিদ্রে ভেদ রাখবে না, চাষা-মজুর ক্ষেপিয়ে দেশ উদ্ধার করবে ? অভিজাত সমাজটাকে ধ্বংস করতে এত যোগাড়যন্ত্র ?

কেন যেন হাসি পায়।

তুলসী কাঠের কণ্ঠিটা গলায় শক্ত ভাবে এঁটে বসেছে, আর একটা নতুন তৈরি করাতে হবে। অভ্যস্ত আঙ্গুল কণ্ঠিটাকে একটু স্থানচ্যুত করে, এটা মধুসূদনের একটা অভ্যাস।

জাল পেতে বসে আছে, এ পাড়ার অলি-গলিতে শুধু সুযোগের অপেক্ষায়। সময় হলে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরবে এদের কণ্ঠ, সে আলিঙ্গনের হাত থেকে কারও রেহাই নেই।

মধুসূদন ভাবে, স্বাধীন হবার আগে না হয় আইন ভাঙা নিয়ে মাতামাতি চলেছে, সে যা হোক্ তবু বুঝতে পারে ; কিন্তু এখন এ সবের দরকার কি ? নিজেদের মধ্যে শুধু শুধু মারামারি না করে, একটু বুদ্ধি খরচ করলে ত সবই করা যায়। সে নিজেও করছে তাই। তার জন্যে খবরের কাগজে লেখালিখি বা পথে ঘাটে বক্তৃতা দেবার দরকার করে না। এ সমাজটার উপর রাগও ত তারও অনেক দিনের, কিন্তু সেজন্যে কাউকে চটিয়ে বা অনর্থক পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে মধুসূদন রাজী নয়। শোধ নিতে হয় এমন ভাবে নেবে যাতে তাকে কেউ স্পর্শ করতে না পারে ; অথচ কাজ যা করবার ঠিক গুছিয়ে নেবে।— করছেও তাই।

পেটমোটা পোর্টফোলিও বগলে নিয়ে কোর্টে যায়, সব সময় লেগে আছে তার পেছনে, একটা কিছু অনিষ্ট করার জন্য।

গাড়ী বাড়ীতে লোভ নেই মধুসূদনের, ওসব দিয়ে কি হবে ? অযথা অর্থের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। রূপোর স্বপ্ন দেখে, থরে থরে সাজানো, অজস্র, অপর্য্যাপ্ত, চোখ-ধাঁধানোর ঝিকিমিকি—রূপোর প্লাবন। এ কথা ভাল করেই জানে, আর বেশী দিন লাগবে না তার স্বপ্ন সার্থক হতে, এই ঘুণধরা সমাজটাকে করায়ত্তে আনতে—অতিসাধারণ পথে, আইন শৃঙ্খলার আওতায়।

তবুও কেন যেন তার চোখের কোণ জ্বালা করে উঠে।

একটা জমাটবাঁধা ব্যথায় বুকটা টনটন করতে থাকে।

মধুসূদন বোঝে না, তার ছেলের চোখে তারও কোন অস্তিত্ব নেই।

শ্রীপাট যাজিগ্রাম

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীখণ্ড হইতে প্রায় তিন মাইল ও কাটোয়া হইতে প্রায় দুই মাইলের মধ্যে শ্রীপাট যাজিগ্রাম অবস্থিত। কেহ কেহ মনে করেন, এই স্থানে যজনশীল ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল বলিয়া ইহার নাম 'শ্রীযাজিগ্রাম' হইয়া থাকিবে। গ্রামটি বর্ধমান রাজসেরেস্তার ১ নং তৌজিভুক্ত। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে যাজিগ্রাম ওরফে 'হরিপুর' এইরূপ নাম দৃষ্ট হয়। এই যুগ্ম নাম হইতে প্রাচীন যাজিগ্রামের বর্তমান হরিপুর পর্যন্ত বিস্তৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক হরিপুরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত 'হরিসাগর' দীঘি ও যাজিগ্রামের প্রান্তস্থিত 'সিপাহী দীঘি' প্রাচীনকালের উক্ত গ্রাম দুইটির ঐক্য প্রমাণ করিতেছে।

মহারাজ বীর হাম্বীরের খনিত দীঘি

শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর প্রকটকাল ও তৎপূর্বে এই গ্রামটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়াই জানা যায়। এইরূপ জনশ্রুতি যে, এই গ্রামে প্রায় সহস্র ঘর ব্রাহ্মণের বাস ও এক শত ছত্রিশটি পুষ্করিণী ছিল। এখনও বহু পুষ্করিণী এবং দীর্ঘিকার বাঁধানো ঘাটের ভগ্নাবশেষ ও নিদর্শনসমূহ দৃষ্ট হয়। এইস্থানে শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর মাতামহ বলরাম চক্রবর্তী ও আচার্য-প্রভুর শ্বশুর গোপালদাস চক্রবর্তীর গৃহ ছিল।

কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমৎ কেশব-ভারতীর নিকট কাটোয়ায় সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া নীলাচলাভিমুখে 'বিজয়' করিবার পথে এই যাজিগ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

আচার্য-প্রভু তদীয় পিতৃদেব শ্রীচৈতন্যদাসের অপ্রকটের পর শ্রীখণ্ডবাসী গৌরপার্ষদগণের অনুক্ষণ সঙ্গলাভ করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় আবির্ভাবস্থান চাখন্দি গ্রাম হইতে যাজিগ্রামে আসিয়া স্থায়িভাবে বসতিস্থাপন করেন। এতৎসম্বন্ধে 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' এইরূপ উক্তি আছে :

> 'চাখন্দিতে বৈছে শ্রীনিবাস বিলাস।
> তাহা একমুখে কি কহিতে সাধ্য হয়?
> কতদিনে পিতার হইল পরলোক।
> পুত্রমুখ দেখি' মাতা পাসরিল শোক।
> কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস মহাশয়।
> 'যাজিগ্রামে' গেলা মাতামহের আলয়॥
> যুক্তি স্থির করিলেন মাতার সহিত।
> 'যাজিগ্রামে' বাস এবে হয় ত' উচিত॥
> গ্রামবাসী লোক-সব একথা শুনিল।
> পরম আনন্দে বাসযোগ্য স্থান কৈল॥
> 'যাজিগ্রাম'-সমীপাদি সবার উল্লাস।
> সর্ব-প্রাণাধিক হইলেন শ্রীনিবাস॥
> ভক্তিরসে মগ্ন শ্রীনিবাস অনুক্ষণ।
> দেখি' মহাতর্ক চৈতন্যের প্রিয়গণ॥
> নিরন্তর শ্রীনিবাস ভক্তগোষ্ঠী-পাশে।
> শুনয়ে চৈতন্যলীলা অশেষ-বিশেষে॥১

বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর আচার্য-প্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত হইবার পর সহধর্মিণীর সহিত শ্রীপাট যাজিগ্রামে অবস্থানপূর্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ও তাঁহার কীর্তিত উপদেশসমূহ শ্রবণ এবং শুদ্ধভক্তি প্রচারের আনুকূল্য করিতেন। কাটোয়া হইতে বর্ধমানগামী প্রধান রাজপথের পার্শ্বে বীরহাম্বীর বহু অর্থব্যয়ে এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। কালপ্রভাবে পঙ্কোদ্ধারের অভাবে তাহা শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভু যাজিগ্রামে থাকিয়াই বৃন্দাবন হইতে আনীত শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থসমূহের প্রচার করেন।

> যাজিগ্রামে বিলসয়ে লৈয়া শিষ্যগণ।
> গোস্বামীর গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন॥
> বৈছে সর্বশ্রেষ্ঠ মত গোস্বামী প্রকাশে।
> তৈছে ব্যাখ্যা করেন আচার্য শ্রীনিবাসে।
> কুমতাবলম্বী শুনি' ভক্তির ব্যাখ্যান।
> দূরে পলায়েন বৈছে সিংহভয়ে যান॥
> সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি—জানি' পণ্ডিতের গণ।
> শ্রীনিবাস-পদে আসি' মাগয়ে শরণ॥২
>
> যাজিগ্রামে আচার্য লইয়া নিজগণ।
> ভক্তিশাস্ত্র-আলাপে উল্লাস অনুক্ষণ॥৩

কথিত আছে, পরম-পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় বিবাহ করিতে আসিয়া এই যাজিগ্রামে দোলা হইতে নামিয়া

১,২। শ্রীভক্তিরত্নাকর ৩।১৭-২৪, ৭।৬৩১-৩৮ ; ৩। শ্রীনরোত্তমবিলাস ৮।১৩।

আচার্য-প্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। এই রামচন্দ্র কবিরাজের কথাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা' ও 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'য় একাধিক বার কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যাজিগ্রামে শুভবিজয় করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর সহিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-তরঙ্গ প্রবাহিত করিতেন। শ্রীখণ্ড ও কাটোয়া—শ্রীগৌরপার্ষদগণের এই দুইটি লীলাস্থানের প্রায় মধ্যবর্তী প্রদেশে শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর লীলানিকেতন যাজিগ্রামের অবস্থিতি থাকায় অনুক্ষণই তথায় শ্রীগৌরপ্রেমিক ভক্তগণের আগমন হইত। রঘুনন্দন ঠাকুর প্রমুখ শ্রীগৌরপার্ষদগণও কাটোয়ায় যাইবার পথে যাজিগ্রামে আগমন করিতেন।

যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের আলয়।
তথা গেলা নরোত্তম—অধৈর্য-হৃদয় ॥১

মধ্যে মধ্যে যাজিগ্রামে গিয়া মহাশয়।
আচার্যের সহ ঐছে সুখে বিলসয় ॥২

শ্রীরঘুনন্দন গণসহ খণ্ড হৈতে।
যাজিগ্রামে আইলেন রজনী-প্রভাতে ॥
কতক্ষণ রহিয়া শ্রীআচার্যের ঘরে।
আচার্যাদি-সহ গেলা কণ্টকনগরে ॥৩

সকল মহান্ত গেলা যাজিগ্রাম-পথে।
হইল গমন-ধ্বনি শ্রীযাজিগ্রামেতে
যাজিগ্রামবাসী লোক মহাহৃষ্ট-মনে।
আগুসরি' সবে লৈয়া গেলা বাসা-স্থানে ॥
শ্রীনিবাস আচার্যের মহানন্দ হৈল।
তাহা একমুখে কিছু কহিতে নারিল ॥
আনে কি জানিব শ্রীনিবাসের হৃদয়।
নিরীখয়ে পথপানে উৎকণ্ঠাতিশয় ॥
হেনকালে রঘুনন্দনাদি গণসনে।
কণ্টকনগর হৈতে আইলা হর্ষমনে ॥
আর যে যে গ্রামে ভাগবতগণ ছিলা।
আচার্যভবনে সবে একত্র হইলা ॥
মহামহোৎসব হৈল আচার্য-ভবনে।
সবে মহামত্ত হইলেন সংকীর্ত্তনে ॥
ঐছে চারি-পাঁচদিন শ্রীনিবাস-ঘরে।
করিলেন স্থিতি সবে উল্লাস-অন্তরে ॥৪

শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া নিজগণ সহিত যাজিগ্রামে গমন করিয়াছিলেন; ইহার বর্ণনা 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' এইরূপ দৃষ্ট হয়:

শ্রীনিবাস আচার্যে অতি অনুগ্রহ করি'।
সবা-সহ যাজিগ্রামে গেলেন ঈশ্বরী ॥
শ্রীযাজিগ্রামের লোক আনন্দ-হিয়ায়।
করিতে দর্শন সবে চতুর্দিগে ধায় ॥
শ্রীনিবাস আচার্য অতি উল্লসিত-চিতে।
শীঘ্র সমাচার পাঠাইলা শ্রীখণ্ডেতে ॥

যাজিগ্রামে বটবৃক্ষ-তলে রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর মিলনস্থান

নরোত্তম, রামচন্দ্র-আদি প্রিয়গণে।
করিলা নিযুক্ত সর্বকার্য-সমাধানে ॥
সর্ব-মহান্তের বাসা হৈল রম্যস্থানে।
ঈশ্বরীর বাসা শ্রীনিবাসের ভবনে ॥

শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর ভজনকুটির ও নিম্ববৃক্ষ

শ্রীজাহ্নবা-ঈশ্বরী ভবনে প্রবেশিতে।
আচার্যের ভার্যা আইসে আগুসরি' নিতে ॥
হেনকালে খণ্ড হৈতে শ্রীরঘুনন্দন।
আইলেন—সঙ্গে মহাভাগবতগণ ॥
ঈশ্বরী-আজ্ঞায় শ্রীনিবাস হৈয়া হৃষ্ট।
শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে কৈল সুধা-বৃষ্ট ॥১

শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্র প্রভুও সময়ে সময়ে শ্রীখণ্ডে যাইবার পথে যাজিগ্রামে উপস্থিত হইতেন। 'শ্রীনরোত্তম-বিলাসে' এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়:

দ্রৌপদী ঈশ্বরী আর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া।
আচার্যের ভার্যা দোঁহে প্রণমিলা গিয়া ॥

১। শ্রীভক্তিরত্নাকর ৮।৪৩৪। ২। শ্রীনরোত্তমবিলাস ৯।৩৫১;
৩,৪। শ্রীভক্তিরত্নাকর ৯।৩৮৮-৮৯, ৪৯৫-৫০২।

১ শ্রীভক্তিরত্নাকর ১১।৬৮৩-৮৬, ৬৮৮-৮৯, ৭০১, ৭১৯

সুশীতল জল আনি' উল্লাস-হৃদয়ে।
প্রভু বীরচন্দ্রের চরণ পাখালয়ে॥
আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি বিচক্ষণ।
শ্রীজীবগোস্বামি-দত্ত নাম—বৃন্দাবন॥
রাধাকৃষ্ণ, শ্রীগীতগোবিন্দ এই তিনে।
পড়িলেন প্রভু বীরচন্দ্রের চরণে॥
এ তিন বালকে প্রভু আশীর্বাদ কৈলা।

পঞ্চবটী, শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর ভজনস্থান

এ তিনের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিলা॥
আচার্যের কন্যা তিন ভক্তি-প্রেমরতা।
হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া, শ্রীকাঞ্চনলতা॥
তিনে প্রণমিলা প্রভু বীরচন্দ্র-পায়।
প্রভু আশীর্বাদ কৈলা বাৎসল্য-হিয়ায়॥
গ্রামবাসী স্ত্রী-পুরুষ আইলা দর্শনে।
সবে প্রণমিলা বীরচন্দ্রের চরণে॥[২]

বর্তমান যাজিগ্রাম কাটোয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিমে এক ক্রোশের মধ্যে বর্ধমান-কাটোয়া-রাজপথের পার্শ্বেই অবস্থিত। কিন্তু একমাত্র শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর স্থান ব্যতীত বর্তমানে এই স্থানে আচার্য-প্রভুর বংশীয়গণের অথবা পূর্বতন ব্রাহ্মণ-বংশধরগণের বসতি নাই। শুনা যায়, বর্গীর হাঙ্গামার সময় যাজিগ্রামবাসী তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ ও আচার্য-প্রভুর বংশীয়গণ নবগ্রাম, দক্ষিণখণ্ড, মাণিক্যহার, সোমপাড়া, মালিহাটি প্রভৃতি গ্রামে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। মালিহাটিতে শ্রীশ্রীআচার্য-প্রভুর বংশধর পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের বাসস্থান ছিল। ইনি 'পদামৃতসমুদ্র' নামক গ্রন্থের সঙ্কলনকারী। ইনিই নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে পণ্ডিত-সভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 'পরকীয়া' সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

পূর্বতন বর্ধমান রাজসরকার শ্রীনিবাস প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের সেবা ও চতুষ্পাঠীর আনুকূল্যার্থ প্রায় সত্তর বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য-প্রভুর প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীবংশীবদন'—শ্রীশালগ্রামের নামে প্রসিদ্ধ, মন্দিরের দক্ষিণস্থ দীর্ঘিকাটি বর্তমানে জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যাজিগ্রামের শ্রীপাটবাড়ীর মধ্যে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কিংবদন্তী, শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়া নীলাচলে গমনের পথে এই বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তথায় একটি তমাল-বৃক্ষও দৃষ্ট হয়। এই স্থানে বীরচন্দ্র প্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। আর একটি বকুল-বৃক্ষের তলে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আসন প্রদর্শিত হইয়া থাকে; নিকটেই একটি নিম্ববৃক্ষ বিরাজিত। ইহা আচার্য-প্রভুর দন্তধাবনের নিম্ববৃক্ষ বলিয়া কথিত হয়। এতদ্ব্যতীত আচার্য-প্রভুর নিত্য উপবেশন-স্থানে শ্রীচরণ-

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির, যাজিগ্রাম

চিহ্নিত একটি মর্মরবেদী দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-স্তম্ভের দুই-একটি ভগ্নাংশও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আচার্য-প্রভুর সময় এইস্থানে বিরাট্ মহামহোৎসব হইত। মহোৎসবের ডাল ঢালিবার জন্য একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া প্রস্তরের দ্বারা বাঁধানো হইয়াছিল, তাহা বর্তমানে তৃণগুল্মাচ্ছাদিত ও পঙ্কপূর্ণ হইয়া অতীতের স্মৃতিমাত্র বহন করিতেছে। শ্রীল আচার্য-প্রভুর কনিষ্ঠাত্মজ গতিগোবিন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল ও আচার্য-প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবংশীবাদন-শালগ্রাম এবং পরবর্তিকালে প্রকাশিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ বর্তমান মন্দিরে সেবিত হইতেছেন। উত্তরপাড়ার নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন কাটোয়ায় সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন তিনি বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দেন। পণ্ডিত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের শ্বশুর মধুসূদন দাস মহান্ত ১৩০৫ বঙ্গাব্দে এই স্থানের সেবাভার গ্রহণ করেন। শ্রীপাটবাটীর নাটমন্দিরটি অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে গোষ্ঠাষ্টমীর সময় এই স্থানে শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই পল্লী 'শ্রীনিতাই গৌরের পাড়া' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২। শ্রীনরোত্তমবিলাস ১১।২০-২৭

ক্ষণিকা

শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার

প্রিয়নাথ চৌধুরীর বাড়ীতে দুর্গাপূজার ভারি ধুম। পুরনো বন্ধু। প্রতি বছরেই নিমন্ত্রণ করেন। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারি নি। ঐ সময়টা কলকাতায় কাটে। এ বছর ছুটিতে গোয়াড়িতে রয়েছি। 'চৌধুরী-নিলয়ে'র আকর্ষণ এড়ানো সম্ভব নয়। প্রিয়বাবু হাত ধরে বার বার বলেছেন, মহাষ্টমীর দিন সকালেই আসতে হবে। সন্ধিপূজা দেখে প্রসাদ পাবেন। সন্ধ্যার পর আরতি শেষ না হলে ফেরা চলবে না। এবার যখন আপনাকে পেয়েছি, কিছুতেই ছাড়ব না।

চৌধুরীদের বিরাট চকমিলান বাড়ী। লোকে লোকারণ্য। মেয়েদের আনাগোনা, ছেলেদের হুড়োহুড়ি, সাইকেল রিক্সার ঠেলা-ঠেলি। চত্বরে চাঁদোয়া। একদিকে ঢাক ঢোল কাঁসির সমারোহ, অন্যদিকে বৈকালিক প্রমোদ-অনুষ্ঠানের জন্য সুসজ্জিত মঞ্চ। কত সাজে কত লোক আসে ঠাকুর দেখতে! বিচিত্র বাদ্যে দিগদিগন্ত মুখর। ধূপধুনো গুগগুলের শুচিগন্ধে বাতাস ভরপুর। অপ্রতিহত ভাবে বয়ে চলেছে একটা অনাবিল আনন্দের ঢেউ। মফস্বল শহরে গ্রাম্য জীবনের ধারাটি আজও বিলুপ্ত হয় নি: চৌধুরীদের পূজা কি সাধারণের পূজা বোঝা যায় না। পরিবার ও পল্লীর ভেদরেখা মুছে গিয়েছে একেবারে। কলকাতায় ঠিক এ জিনিস মেলে না। সেখানে সার্ব্বজনীন উৎসবে আন্তরিকতা চাপা পড়ে আড়ম্বরে।

বেশ ভাল লাগে শরতের স্বচ্ছ সকালটি। কাজ-ভোলানো আকাশ আর প্রাণ-মাতানো বাজনা। রাশি রাশি লোক আর হাসি হাসি মুখ। মনে পড়ে রমণীর শৈশবের কত কমনীয় স্মৃতি!

সন্ধিপূজা শেষ হয় বেলা এগারটায়। প্রিয়বাবু পট্টবস্ত্র বদলে আসেন। ঠাকুরদালানের পাশে ছোট ঘরটিতে আমাকে নিয়ে গিয়ে বসান। বলেন, কাজের বাড়ী, চারিদিক থেকে ডাক পড়ছে। আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলবার অবসর পাই নি। অঞ্জলি দেওয়া হয়েছে, এখন একটু চায়ের যোগাড় করতে বলেছি।

প্রিয়বাবু পারিবারিক ইতিহাসের অবতারণা করেন--বিপুল জমিদারী বহু শরিকে বিভক্ত। দেড়শ' বছর ধরে পূজা কিন্তু ঠিক চলে আসছে। কর্ত্তারা হুঁশিয়ার ছিলেন—সে বন্দোবস্ত তাঁরা করে গিয়েছেন।

একটি সতর-আঠারো বছরের সুশ্রী মেয়ে প্রিয়বাবুকে চাবির ছড়া দিয়ে যায়। প্রিয়বাবু বলতে থাকেন, বংশের শাখা-প্রশাখা নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। এত বড় পূজো। কত কালের অনুষ্ঠান! হলে কি হবে, কেউ আসতে চায় না। সেই ম্যালেরিয়ার ভয়। ডি-ডি-টি-র কৃপায় ম্যালেরিয়া পালিয়েছে তবু গ্রামবাসীদের আতঙ্ক যায় নি।

মেয়েটি আবার দেখা দেয়। প্রিয়বাবুর কানে কানে কি বলে। তিনি পকেট থেকে গোটাকয়েক টাকা বার করে তার হাতে দেন। তারপর কাহিনীর সূত্র ধরেন—কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগর আর নেই। অথচ এই শ্রীহীন শহরই ভাল লাগত আমার স্ত্রীর। তাঁর মৃত্যুর পর কতদিন ভেবেছি কোথাও চলে যাব। কিন্তু তাঁর স্মৃতিভরা বাড়ী ছেড়ে যেতে মন সরে না।

মেয়েটি একে একে জলের গ্লাস, মিষ্টির রেকাবি ও চায়ের কাপ নিয়ে আসে। খুব সপ্রতিভ মেয়ে, ভারি গোছানো কাজ। খেতে খেতে প্রিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করি—আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীটি কে?

প্রিয়বাবু সহাস্যে বলেন, আমার ভাগ্নী মিলি। খুব চটপটে, দিনরাত খাটে। ও না থাকলে আমার ছন্নছাড়া সংসারে বৃহৎ কাজ সম্ভবই হ'ত না। কিছু মনে করবেন না। আমাকে একবার রান্নাবাড়ীর দিকে যেতে হবে। বিকেলে কাঙালীভোজন। সেও সোজা ব্যাপার নয়। প্রাইভেট সেক্রেটারী রইল। দরকার হলে হুকুম করবেন। আপনি আমার ঘরের লোক।

খাওয়া শেষ হলে মিলি আমাকে দোতলায় নিয়ে যায়। সুসজ্জিত ঘরটি আমার সুপরিচিত। এক কোণে চৌধুরীদের কুলগুরু বসে আছেন, আর এক কোণে পাঁচ-ছয়টি ছোট ছেলেমেয়ে গ্রামো-ফোন বাজাচ্ছে। কার্পেটের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসি। মশলার ডিস আমার সামনে রেখে মিলি গিয়ে বসে তাদের দলে। ভাল ভাল রেকর্ড বার করে, মেশিনে চড়ায় আর মুগ্ধ হয়ে শোনে। আমি অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করি তার সরল সঙ্কোচহীন ভাবভঙ্গি।

কুলগুরু বিশ্রাম করতে যান অন্য ঘরে। ছোটদের খাওয়ার ডাক আসে। মিলি তাদের নীচে নিয়ে যায়। মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে আমাকে প্রণাম করে। আমি চমকে উঠে বলি, পায়ে হাত দিলে! আমি ব্রাহ্মণ নই।

—তাতে কি? আপনি প্রফেসর। শিক্ষাগুরুর জাত নেই।

—আমার পরিচয় পেলে কোথায়? প্রিয়বাবু ত কিছু বলেন নি!

—আষাঢ় মাসে এই ঘরে সাহিত্য-সভা হয়েছিল। আপনি ছিলেন সভাপতি। সভার ঘর সাজাবার ও সভাপতির মালা গাঁথবার ভার পড়েছিল আমার ওপর। সভায় আপনার কাছেই বসেছিলেন মহিলারা। আমি ছিলাম তাঁদের মধ্যে। তাই আজ দেখেই আপনাকে চিনতে পেরেছি।

—তুমি কত যত্ন করে ঘর সাজিয়েছিলে, কত কষ্ট করে মালা গেঁথেছিলে। অথচ এখন পর্য্যন্ত ছিলে একেবারে অচেনা। ভারি অন্যায় তোমার মামাবাবুর। তাঁর উচিত ছিল সেই দিনই তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া। আন্তরিকতার পুরস্কার না

হলে কর্তব্যের হানি হয়। সাহিত্য-সভার নিখুঁত ব্যবস্থায় কৃতিত্ব অনেকটা তোমার।

আরক্তিম হয়ে ওঠে মিলির মুখ। দীপ্তিভরা নয়নে নামে লজ্জার ছায়া। জিজ্ঞাসা করি—মিলি, পড়াশুনো কতদূর করেছ?

বাবা পশ্চিমে চাকরি করতেন। সেখানে মেয়েদের স্কুল ছিল না। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস করলাম। তার পরই বাবা মারা গেলেন। তিনি বেঁচে থাকলে কলেজে পড়তাম। সে আর হ'ল না।

মিলির কণ্ঠে বেদনার সুর, চোখে অশ্রুর ধারা। ব্যথিত কণ্ঠে বলি—অল্পবয়সে বাপ হারানো সত্যিই দুর্ভাগ্য। তবে ভাবনার কারণ নেই। তোমার মত মেয়ের কলেজের দরকার হবে না, নিজের চেষ্টাতেই আই-এ, বি-এ পাস করে যাবে।

আমার কথায় উৎসাহিত হয় মিলি। বলে—বাবা মারা যাবার পর আমরা মামার কাছে এসেছি। এখানে এসে মা অনেকটা শান্ত হয়েছেন। ভাবছি এইবার পড়াশুনো করব। আপনার সাহায্য নিশ্চয়ই পাব।

মিলির দৃষ্টিতে প্রত্যয়ের জ্যোতি। আমার অস্বীকৃতির অবকাশ কোথায়?

প্রিয়বাবু হাঁকেন—মিলি, অধ্যাপক মশাইকে নিয়ে আয় শীগগির, আসনে বসে আছেন সবাই।

পরম আনন্দে প্রসাদ খাওয়া হয়। বিপুল আয়োজন। পরিবেশনের কোন ত্রুটি নেই। সারাক্ষণ তদারক করেন প্রিয়বাবু। কত অনুনয়-বিনয়। অন্যের তৃপ্তিতে এমন আত্মতৃপ্তি বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। আঁচানো হতেই বলেন—ওপরের ঘরে একটু গা গড়িয়ে নিন্। কেউ বিরক্ত করবে না। কাঙালী-ভোজনের সময় অনুগ্রহ করে একবার এসে দাঁড়াবেন। মিলি খবর দেবে।

জনহীন ঘর। শয্যার আহ্বান উপেক্ষা করে জানলায় বসি। মধুর দুপুরবেলা। মৃদুমন্দ হাওয়া। অসমাপ্ত গল্পের মত অন্তহীন আকাশ। দূর নীলিমার সোহাগ-লাগা বাঁধানো ঘাটের জল। খিড়কিবাগানে নিমের ছায়াবীথি। অবাক্ লাগে অকালে কোকিলের ডাকে। পায়ের শব্দ শুনে ফিরে দেখি পানের প্লেট হাতে মিলি। জিজ্ঞাসা করি—বাগানে কি কোকিলের বাসা আছে?

হ্যাঁ, বার মাস এ পাড়ায় কোকিল ডাকে।

আচ্ছা, তোমাদের দেশ কোথায়?

বীরনগর।

উলো! সে ত ম্যালেরিয়ার ডিপো।

ম্যালেরিয়া এখন নেই।

ম্যালেরিয়া নেই, ভূত আছে।

বা রে, উলোর ভূতের গল্প শুনেছেন। বীরত্বের কাহিনী শোনেন নি? সুনামটা চাপা পড়ে গেল আর দুর্নামটা পড়ল ছড়িয়ে।

উলোর লোকেরা ডাকাত তাড়িয়ে অসামান্য সাহসের পরিচয় দিয়েছিল? সে ইতিহাস জানি।

শুধু তাই নয়, এখানে কত জ্ঞানী জন্মেছেন।

মিলির কোমল কণ্ঠে দৃপ্ত স্বর। সে পশ্চিমে মানুষ হয়েছে, কিন্তু জন্মভূমির সঙ্গে নাড়ীর যোগ তার ছিন্ন হয় নি।

বিকেল চারটে। কাঙালীভোজন আরম্ভ হয়েছে। চমৎকার লাগে পর্বটি। কত হাঁকাহাঁকি, কত ছুটোছুটি! চাওয়ার আনন্দ, পাওয়ার আনন্দ। গরীবের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যে কত বড় সৌভাগ্য তা অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। দৈন্যের মাঝে বিশ্বাসের এমন দৃশ্য আর কোথায়?

পড়ন্ত রোদে শ্রান্ত হয়ে বৈঠকখানার বারান্দায় বসি। হঠাৎ মিলি এসে হাজির এক গ্লাস জল নিয়ে। বিস্মিত হয়ে বলি—জল আনতে বললে কে?

রোদে ঘোরাঘুরিতে মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডা জল খান।

সেবাধর্ম মেয়েদের স্বভাবজাত। কৃতজ্ঞচিত্তে বলি—মিলি, তোমার যত্ন ভুলবার নয়। আমার বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, আসবে ত?

আপনার বাড়ীতে আমি নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু আপনি একবার আমাদের বীরনগরে যাবেন কিনা বলুন। বৈশাখী পূর্ণিমায় উলুই-চণ্ডীর পূজো। বড় মেলা বসে। আমরা ওখানে থাকব। আপনাকে পেলে খুব খুশী হব।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। মিলি চলে যায় প্রমোদ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হতে।

বেলাশেষে বিচিত্রানুষ্ঠান। সংক্ষিপ্ত কার্যসূচী। হাস্যকৌতুক, আবৃত্তি, গান। সমাপ্তি-সঙ্গীত গায় মিলি।

দিনান্তে ক্লান্ত মনে বিদায়-সঙ্গীতের শান্ত সুর অপূর্ব অনুভূতি আনে। মেয়েটির গুণের শেষ নেই। সব মিলিয়ে মিলি অতুলনীয়া।

আঁধারের যবনিকা। আলোর ঝিলিমিলি। আরতির লগ্ন। কাঁসর-ঘন্টার শব্দ। কানে তালা লাগে। ধূপধুনোর ধোঁয়া। চোখ কর্ কর্ করে। কিছুই শোনা যায় না, কিছুই দেখা যায় না। অচেনার হাটে হারিয়ে যায় চেনা মুখ। বাড়ী ফিরতে হবে। মিলির কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বেদনায় বুক ভরে ওঠে। রাত হয়ে যায়। আর অপেক্ষা করা চলে না। নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ি উৎসবমুখর 'চৌধুরী-নিলয়' থেকে।

তারাভরা আকাশের তলায় যে তারাটি মিলিয়ে গেল আর তার সন্ধান পাই নি।

পাণ্ডু ও মাদ্রী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[মহাভারত-বর্ণিত উপাখ্যান। কামনাবশে কোন নারীকে স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে, মহারাজ পাণ্ডুর প্রতি এই ঋষি-অভিশাপ ছিল। রাণী মাদ্রীর অনুরোধ, প্রতিরোধ ও হিতবাণী উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করায় পাণ্ডু মৃত্যুমুখে পতিত হন।]

পাণ্ডু

যৌবন কাঁদিয়া ফেরে অভিশপ্ত জীবনের দ্বারে
কে দেবে তাহারে ভিক্ষা? হৃদয়ের মৌন হাহাকারে
ডুবে যায় ধরণীর উচ্ছ্বসিত আনন্দের গান।
দূরে ফেলি' ধনুঃশর বেদনায় আঁখি দুটি ম্লান
ফিরে যায় মনসিজ, বসন্তের নব-রূপ রথে
কুসুম-কেতন ধরে দাবদগ্ধ ছায়াশূন্য পথে।
...আরো কাছে এস মাদ্রি, যৌবনের উচ্ছল সঙ্গীতে
প্রণয়-মদির স্বপ্নে তনু চাহে তনু আলিঙ্গিতে।

মাদ্রী

ক্ষম মোরে মহারাজ, জ্ঞানী তুমি, জিতেন্দ্রিয় তুমি,
তুমি রাজরাজেশ্বর, আহিমাদ্রি সসাগরা ভূমি
তোমার গৌরবগীতি-জয়োল্লাসে হয়েছে মুখরা,
অধীরতা কর ত্যাগ।

পাণ্ডু

রূপরসগন্ধগীতিভরা
এই রাত্রি, এই স্বপ্ন, যৌবনের এই আকুলতা
নিষ্ফল হইবে আজ? এ বুভুক্ষু অন্তরের কথা
নিঃশেষে হারায়ে যাবে কোন্ মরু-দিগন্তের পারে?
শোন মাদ্রি অনুনয়, প্রত্যাখ্যান কোরো না আমারে।
প্রথম অরুণ-করে এ দেহের কামনা-কমল
প্রতীক্ষার রাত্রিশেষে চাহে আজি মেলিবারে দল,
তারে কি সহিতে হবে অভিশাপ-নিষ্ঠুর পীড়ন?
উদগ্র চেতনাবুকে নিদ্রাহীন তৃষিত যৌবন
শুষ্ক ওষ্ঠে বারিপাত্র যতবার নিতে চায় তুলি,
তুমি তত দিবে বাধা? পতি-প্রতি নারীধর্ম্ম ভুলি
আগলি' রাখিবে দ্বার রাজকোষ-প্রহরীর মত,
সুচতুর চৌরভয়ে নিশিদিন শঙ্কায় জাগ্রত?

মাদ্রী

কিবা প্রয়োজন সেথা প্রহরীর সতর্ক নয়ন,
রাজা যবে আপনার রাজকোষে করেন গমন
প্রহরী কি রোধে তাঁরে? সম্ভ্রমে সে খোলে না কি দ্বার?
মহারাজ, ক্ষম মোরে, জানি আমি অযোগ্যা ক্ষমার,
তবু বল, এই দেহ, এই রূপ, এই যে যৌবন
—এ সব কাহার তরে? ললাটের সিন্দুর চন্দন
রচে কোন্ আলিম্পন? স্বর্ণসূত্র-নীলাম্বর চেলী
ধূম্র-ধূপশিখাসম সর্ব্ব অঙ্গে গাঢ় ছায়া মেলি
পূজে কোন্ দেবতায়? এ কণ্ঠের কুসুমমালিকা
কাহার কণ্ঠের লাগি' অভিসারে সেজেছে দূতিকা?
এ তপ্ত সৈকতে নাথ, কে মিটাবে চরম আগ্রহ
এই সেবিকার ব্রত? বল, বল, সে কি তুমি নহ?

পাণ্ডু

প্রস্ফুট-যৌবনমাঝে অয়ি নারি, লালসাবিহীনা
সুখে নিদ্রা যাও তুমি, অনাদরে তব তন্ত্রবীণা
সুরহারা, হায় প্রিয়ে, কোনদিন বক্ষে ধরি তারে
পারি না তুলিতে গীতি মিলনের অপূর্ব ঝঙ্কারে!
এ যে কত বড় ব্যথা, কত তীব্র অনলপ্রবাহ
কাহারে জানাব আমি? এ যে কত বড় চিত্তদাহ
কে বুঝিবে? কে জানিবে কি ঝটিকা উঠেছে অন্তরে!
তবু তুমি রূপময়ী, সদ্যঃস্নাতা যৌবন-নির্ঝরে
চির আকাঙ্ক্ষিতা মোর। কি উচ্ছল বন্যা লয়ে বুকে
প্রমত্তা তটিনীসম নাচিতেছ উন্মত্ত কৌতুকে!
আমি শুধু চেয়ে থাকি, স্পর্শিবার নাহি অধিকার,
সম্মুখে গর্জিয়া ওঠে নৈরাশ্যের মহাপারাবার!

মাদ্রী

এ যৌবন অভিশপ্ত মোর। [illegible] রাজসভাতলে
নাহি কি ভিষক্ কেহ, ভৈষজ্যের অপূর্ব্ব কৌশলে
হরি' লয় যৌবন আমার? [illegible], শুভ্র কেশ,
বিকলাঙ্গ,—সব রূপ করে দেহ নিমেষে নিঃশেষ?
আদেশ দেবে না তুমি?

পাণ্ডু

এই চাও প্রিয়ে? তব দেহে
তিলে তিলে যেই রূপ বাড়িতেছে যৌবনের স্নেহে
আমি তার হব হন্তা? সুকঠোর রাজ-অনুজ্ঞায়
সৌন্দর্য্য মুছিয়া যাবে? শোন মাদ্রি, কতদিন হায়,
বসিয়াছি একা আমি নিদ্রাহীন গভীর নিশীথে
প্রাসাদ-শিখরে মোর। ঊর্দ্ধে কাঁপে তারকা-বীথিতে
কত অভিসার-দীপ! শুভ্র লঘু মেঘাঞ্চল-তলে
কম্পমান শিখা তার ক্ষণে ক্ষণে নেভে আর জ্বলে!

স্মর-অভিসারিকারা চলে বুঝি কামদগ্ধ মনে
গুণ্ঠনে ঢাকিয়া মুখ, কৃষ্ণনীল অলক্ষ্য গহনে
কোন্ ছায়াপথপাশে প্রিয় কার আছে প্রতীক্ষায় ?
দুই করে বক্ষ চাপি জেগে থাকি ক্ষুব্ধ বেদনায় !
হা রে হতভাগ্য আমি, হীরামুক্তা স্বর্ণ-সিংহাসন,
সাগরবলয়া ভূমি, সব শূন্য ছায়ার মতন !
নিম্নে পৃথ্বী নিদ্রাহীনা সচকিতা যেন প্রহরিণী
নিঃশব্দে জাগিয়া আছে ! পার্শ্বে তার নবপল্লবিনী
বনানী প্রতীক্ষমানা, চেয়ে আছে আকুল নয়নে।
এল কি দক্ষিণবায়ু শুষ্কপত্র উড়ায়ে চরণে
যামিনীর অভিসারে ? সুরভি কি হয়েছে নিঃশ্বাস
কবরী-মালিকাগন্ধে ? মিলনের সঙ্কেত-আভাস
কে পাঠাল কুঞ্জবনে ? প্রাসাদ-শিখর হতে নামি'
উন্মাদ আগ্রহে ছুটি বনপ্রান্তে, ক্ষণতরে থামি'
দুই করে ছিঁড়ি কুঞ্জ তরুলতা হতে আচম্বিতে
নবকিশলয়দল পদতলে দলিতে দলিতে
উচ্চকণ্ঠে বলি—"ওরে অভিশপ্ত জীবনে আমার
তোদের মিলন আমি সহিব না, সহিব না আর !"

মাদ্রী

শান্ত হও মহারাজ ! জান না কি কত জ্বালা মোর ?
জান না কি কত তৃষ্ণা কাঁদে বুকে ? কত আঁখিলোর
রুদ্ধ করে দৃষ্টিপথ ? এ কি ক্ষোভ, দিতে নাহি পারি
তোমার কাতর কণ্ঠে এক বিন্দু পিপাসার বারি !
এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ মোর। এই তীব্র মনস্তাপ
কোথায় জুড়াব আমি ?

পাণ্ডু

হায় মাদ্রি, ঋষি-অভিশাপ
পশ্চাতে ছুটেছে মোর নিশিদিন কালসর্পসম
দংশন করিতে মোরে ! কোন এক অসতর্ক ক্ষণে
বরণ করিতে হবে দুর্ব্বার সে নিষ্ঠুর মরণে !

মাদ্রী

রুদ্ধ করি অভিশাপ আমি মোর নারীত্ব গৌরবে
দাঁড়াব সম্মুখে আসি'। ঋষিবাক্য সব ব্যর্থ হবে।
কোনদিন স্জিব না আমি মোহজাল, কোনদিন
শুনিবে না মোর কণ্ঠে প্রেমগীতি। বিধাতার ঋণ
রহিবে অপূর্ণ চির। অর্দ্ধরাতে মধুমাধবীর
গন্ধভারে ক্লান্ততনু আসি যবে মলয়সমীর
ব্যজন করিতে চাবে, আমি রুধি বাতায়ন দ্বার
ফিরাইয়া দিব তারে। মায়াস্বর্গ চৈত্র পূর্ণিমার
আমি দিব ব্যর্থ করি। নিশিদিন অন্তরের তলে
দিশাহারা যে কামনা অন্তহীন পিপাসায় জ্বলে
দিব না তাহারে মুক্তি, অন্ধকারে শৃঙ্খলিতা করি'
রাখিব তাহারে আমি বন্দীসম দিবসশর্ব্বরী !

পাণ্ডু

হায় নারি, এখানেও পরাজিতা তুমি। বন্দী করি'
রাখিবারে চাহ যারে, সে যে অলক্ষিত পথ ধরি'
বাহিরে দিয়েছে দেখা। রাখ নি কি কোনই সন্ধান ?
শোন নি উল্লাস তার ? রূপোজ্জ্বল সারা অঙ্গে তব
সে যে রচিয়াছে পথ মায়াজাল সৃজি অভিনব !
হিল্লোলিত নীবিবন্ধে, মণিময় মেখলা স্পন্দনে,
তব চারু চরণের সুমধুর নূপুর নিক্বণে
শুনি আমি তার গান। অগুরু-চন্দনরেণু মাখা
তব দেহে পাতে সে আসন। আমন্ত্রণলিপি আঁকা
ও-দুটি পীবর বক্ষে, স্পর্শাতুর লোলুপ অধরে।
নয়ন-অপাঙ্গে মাদ্রি, দেখিয়াছি সেই ধনুর্দ্ধরে
হানিতে সুতীক্ষ্ণ শর। সুগঠিত ও চারু-কটিতে
যৌবন-বারিধিবক্ষে তরী তার উচ্ছ্বিতে উচ্ছ্বিতে
আন্দোলিত। কি দর্পের ছন্দ বাজে গমন-নর্ত্তনে !
লুব্ধ ভুজগীর মত বাহু তব গাঢ় আবেষ্টনে
কাহারে জড়াতে চায় ! শোন মাদ্রি, বন্দী যে দুর্ব্বার,
আপনি হইয়া প্রভু, তব তরে রচে কারাগার !

মাদ্রী

মহারাজ, যদি নাহি রহি হেথা ? কোন দূর বনে
যাই চলি ? বর মাগি লই যদি দেবতা-চরণে
অন্ধ করে দিতে আঁখি ? বেশ ধরি অতি দীনহীন
রূপহীনা হয়ে রই নির্জ্জন কুটীরে চিরদিন ?
বল, বল মহারাজ, ক্রুদ্ধ ঋষি অভিশাপভারে
খুঁজিবে না চিত্ত তব কোনদিন এ রূপহীনারে ?

পাণ্ডু

শোন মাদ্রি, কতদিন অভিশাপ-শঙ্কাকুল চিতে
তোমার কক্ষের পানে ভীরু পায়ে চলিতে চলিতে
দাঁড়ায়েছি প্রেতের মতন। হাসে রাত্রি মায়াবিনী
মোরে হেরি', দুই করে ঝিল্লীরবে বাজায়ে কিঙ্কিণী
বোনে সে স্বপনজাল জ্যোছনার রূপালী সূতায়।
বসন্ত বাতাস আসি লীলাচ্ছলে আমারে শুধায়—
"কোথায় চলেছ বন্ধু ?" ভূর্জ্জ-কিশলয়-গন্ধ মাখা
রাত্রিচর বিহগের সঞ্চালন-ক্লান্ত দুটি পাখা,
রাজহর্ম্ম্য-অলিন্দের প্রান্তে খোঁজে বিশ্রাম-আগার।

দোলাইয়া দীর্ঘবেণী ওঠে হাসি নব কর্ণিকার
পাষাণ-প্রাচীর-গাত্রে। সুবর্ণ পিঞ্জরতলে সারী
সহসা চিৎকারি ওঠে—"কে ওখানে? শীঘ্র এস দ্বারী!"
আমি পশি কক্ষে তব, লঘুপায়ে তব শয্যাপাশে
নীরবে দাঁড়ায়ে রহি। শুক্লারাতে অশান্ত বাতাসে
স্খলিত-অঞ্চলা তুমি, জ্যোৎস্নায় তনু সমুজ্জ্বল!
দীর্ঘায়ত নেত্র-পক্ষ্মে অশ্রুবিন্দু করে টলমল্
কোন্ বেদনার স্বপ্নে! মণিবন্ধে হীরক-কঙ্কণ
বাজে কর-সঞ্চালনে, যেন কারে করো আলিঙ্গন
স্বপ্নঘোরে। ওষ্ঠাধর কম্পমান অস্ফুট ভাষণে,
কখনো উচ্ছ্বিত, যেন নিপীড়িত দয়িত চুম্বনে!
হায় প্রতারিতা নারি, অন্তরের গোপন অতলে
যে বন্দিনী তৃষ্ণা কাঁদে দিবানিশি যৌবন শৃঙ্খলে,
স্বপনে কি মুক্তি তার? চারু তনু কাঁপে থর থর
নিদ্রাঘোরে কি পুলকে, পদ্ম যথা তরঙ্গ-উপর!

মাদ্রী

স্বামী তুমি, রাজা তুমি, আমি দাসী চরণে তোমার,
কেন কর ব্যঙ্গচ্ছলে কঠিন আঘাত বার বার?

পাণ্ডু

রাজা আমি? এ যে কত বড় ভ্রান্তি, জান প্রিয়ে তুমি,
গৌরব কিছুই নাই। রাজ্য মোর শুষ্ক মরুভূমি,
এতটুকু নাই ছায়া, এতটুকু নাই শ্যামলিমা,
যতদূর দৃষ্টি চলে ধু ধু করে দিগন্তের সীমা।
রাজা আমি? আসে যদি সিংহাসন-বিনিময় তরে
দীনতম প্রজা মোর, যদি তার ক্ষুদ্র পর্ণঘরে
রচে মোর ভূমিশয্যা, অভিশাপমুক্ত সে-লগনে
তাহারে সাজাব আমি মহামূল্য রত্ন-আভরণে,
দিব তারে ইহকাল, পরকাল, সর্ব্বস্ব আমার,
দিব তারে ধর্ম্ম মোক্ষ, দিব তারে সব পুণ্যভার।
অভিশাপরাত্রিশেষে মিলনের অরুণ কিরণে
তোমারে বাঁধিব বুকে পুলকের চরম সে-ক্ষণে!
দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে শৃঙ্খলিত বিদ্রোহী যৌবন
লভিবে মুক্তির স্বাদ, স্বর্গ হবে এ মর্ত্ত্যভুবন।

মাদ্রী

মহারাজ, কেন এত ব্যাকুলতা? তুচ্ছ নারীদেহ,
তার লাগি এ জগতে সব কিছু দিতে পারে কেহ
ভাবি নাই কোনদিন। এই দেহে পেয়েছ কি সাড়া
অন্তহীন আনন্দের? কোথা পাবে অমৃতের ধারা
এ নশ্বর মাংসপিণ্ডে? এর লাগি এতই উচ্ছ্বাস?
এত তব আকিঞ্চন, ব্যর্থতার প্রতপ্ত নিঃশ্বাস?

পাণ্ডু

হায় নারি, জান না কি অপেয় লবণ-সিন্ধুতলে
রয়েছে প্রবালমুক্তা? মণিমরকত সেথা জ্বলে?
জান না কি দৃঢ় রুক্ষ পাষাণ-পর্ব্বত-অন্তরালে
স্নিগ্ধতোয়া নির্ঝরিণী সঞ্জীবনী ধারা তার ঢালে?
বিস্বাদকণ্টকগুল্মে দেখ নি কি ফুটে ওঠে ফুল
রূপে গন্ধে সর্বোত্তম? দেহাতীত আনন্দ অতুল
বিচার করিতে চাহ রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা নিয়া?
যে অসহ পুলকের বন্যা চলে মর্ম্ম আলোড়িয়া
সৃষ্টির রহস্য-সিন্ধুপানে, এখনো চেন নি তারে?
চন্দ্র দেখিয়াছ শুধু, দেখ নাই স্নিগ্ধ চন্দ্রিকারে?
স্পর্শসুখ, সে কি শুধু মিলনের তীব্র অনুভূতি
থাকে ঢাকে? যৌবনের সেই তৃষ্ণা সাজিয়াছে দূতী
চুম্বন-বিলাস তরে, সে কি শুধু স্পর্শ অধরের?
বাহুর বন্ধন সে কি প্রেমতপ্ত লীলা আসঙ্গের?
মনে পড়ে, শুক্লারাতে পুষ্পভরা পল্লব প্রচ্ছায়ে
আলোছায়া ইন্দ্রজালে দিতে যবে তনুটি এলায়ে
অঙ্গে মোর, চারুভুজে কণ্ঠ বেড়ি' মদির নয়না
রোমাঞ্চিত হর্ষে মোর, মুহুর্মুহু সলজ্জ ভর্ৎসনা
কৃত্রিম ক্রোধের বশে, স্বেদসিক্ত আনন কমলে
ভৃঙ্গসম ওষ্ঠাধর বার বার চুম্বনের ছলে
পুলকে করিত স্পর্শ। দ্যুতিময় হীরক-কঙ্কণে
বাজিত মধুর ছন্দ, যবে তুমি গাঢ় আলিঙ্গনে
বার বার বাঁধিতে আমারে। তব মুক্ত কবরীতে
শ্বেত কুরুবকমালা যেত নড়ি' দুলিতে দুলিতে।
কভু উগ্রা, কভু শান্ত, কভু লজ্জা-সংকুচিতা
ব্যাধজালে মৃগী যেন। উচ্ছ্বসিতা গিরি-নির্ঝরিণী
কল্লোলে হিল্লোলে বহে আবর্ত্তন-নর্ত্তন বিলাসে।
মধুক বনের গন্ধ ভেসে আসে দক্ষিণ বাতাসে
বিদূরিতে ক্লান্তি তব। লীলাভঙ্গে উঠিতে শিহরি'
লজ্জা-অবসাদভরে। রুথ তনু রাখিতে আবরি'
স্বর্ণচেলাঞ্চলে তব। তন্দ্রাতুর আঁখি দুটি মেলি
চাহিতে দিগন্তপানে, যেথা সন্তর্পণে পদ ফেলি'
পূর্বাশার খুলি' দ্বার দেখা দিত উষা রূপময়ী
যামিনী-বাসর শেষে। সে আনন্দ পক্ষপুটে বহি'
কাকলীমুখর-কণ্ঠ বিহঙ্গম উড়িত আকাশে।
লঘুমেঘ-অন্তরালে দিগঙ্গনা সাজি' স্বর্ণবাসে
বরিত প্রভাত নব। নিদ্রাভঙ্গে পারাবতগুলি
অশ্রান্তকূজনমগ্ন। সচকিত আঁখি দুটি তুলি
আমারে কহিতে লাজে—"পোহাইল মিলন-শর্বরী
এবার বিদায় দাও, এখনি আসিবে সহচরী।"

মাদ্রী

অতীতের সুপ্ত বহ্নি ভস্ম হয়ে আছে হিয়াতলে
কি কাজ ইন্ধনদানে? কিবা হবে বহ্নি সে অনলে?
আজো ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস তনু ঘিরে নিষ্ফল যৌবন,
ক্ষণিকের অবসর খুঁজে স্মর লয়ে শরাসন।
এখনো যায় নি চলি দক্ষিণের বসন্ত বাতাস,
এখনো কুসুমগন্ধ কুঞ্জ হতে করে পরিহাস
প্ররোচিকা দূতীসম। মন হতে দূর করি যারে
কেন মহারাজ বৃথা ডাক তারে স্মৃতির দুয়ারে?

পাণ্ডু

তুমি ত জান না মাদ্রি, অন্তরের রহস্য অপার,
কেন ক্ষুব্ধ চিত্ত মোর রোমন্থন করে বার বার
অতীতের জীর্ণ স্মৃতি? যবে পক্ষাঘাতপঙ্গু নর
স্বপ্নমাঝে লঙ্ঘে গিরি, উল্লম্ফনে সরায় প্রস্তর,
সে কি ভাবে অঙ্গ তার নিস্পন্দ, অসাড়, বলহীন?
সেই সুখস্বপ্নবুকে উল্লাসে সে হয় না কি লীন
বহুক্ষণ? পথ ভুলি কামনার দগ্ধ উপবনে
পূর্ব্বস্মৃতি লয়ে অলি আসে না কি নিষ্ফল গুঞ্জনে
ক্ষণতরে? হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় সে রহস্য-সাগরে
কত কল্পনার তরী ওঠে নামে লহরে লহরে।
ভুলে যাই বর্ত্তমান, ভুলে যাই সব নিষ্ফলতা,
ভুলে যাই অভিশাপ, বাণবিদ্ধা হরিণীর ব্যথা।

মাদ্রী

মহারাজ, এই ভ্রান্তি দিক আজ গৌরব-মুকুট
পরায়ে তোমার শিরে। তবু জুড়ি করপুট
ক্ষমা মাগি চরণে তোমার। তুমি মহামহীয়ান্,
আত্মদ্রষ্টা, ঋষিকল্প, সত্যাশ্রয়ী, বেদজ্ঞ, ধীমান্,
হবে তুমি মোহমুগ্ধ? মোর সম ক্ষুদ্র এক নারী
কতটুকু শক্তি ধরে? দৃষ্টি তব সুদূর-সঞ্চারী
দেখেছে কি হিয়া তার ভরে' ওঠে কোন্ বেদনায়?
উচ্চ হতে উচ্চতর হবে তুমি নিজ গরিমায়
এই তার বড় সাধ। ঋষি যারা চির-ব্রহ্মচারী
তারাও তোমারে হেরি' নতশিরে পথ দিবে ছাড়ি
মহা-জিতেন্দ্রিয় বলি'। ইতিহাস, কাব্য ও পুরাণ
গাহিবে তোমার যশ। লোকোত্তর-কীর্ত্তিতে অম্লান
রবে তুমি রবি সম গৌরবের মধ্যাহ্ন-আকাশে.
আমি হব যশস্বিনী পতিব্রতা রহি' তব পাশে।

পাণ্ডু

হায় নারি, শুধু যশ, শুধু কীর্ত্তি, আর কিছু নহে?
শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা? ফল্গুসম কোন্ ধারা বহে
অন্তরগহনতলে কোনদিন জানিবে না কেহ?
আমি জিতেন্দ্রিয়? সর্ব্বভোগলিপ্স এই দেহ
উন্নত রহিবে শুধু শিরে বহি' বৈরাগ্য-কেতন?
মায়াপ্রপঞ্চের স্তোত্র ক্ষণে ক্ষণে করি উচ্চারণ
কীর্ত্তিমান হব আমি? যাহা বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান
তাহারে ফিরায়ে দিব বরি' নিতে গৌরব সম্মান
ব্রহ্মচর্য্য তপস্যার? কণ্ঠ চাপি' চাহিব রুধিতে
মানবের আদিম পিপাসা? বারি পারিব না দিতে
একবিন্দু কোনদিন? জীব-আত্মা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে
পেয়েছিল যেই বর, জীবনের দুঃসহ যৌবনে
সেই বর ব্যর্থ হবে? আপন নিগ্রহে দিবাযামি
বঞ্চিত কামনা লয়ে প্রচারিব "ব্রহ্মচারী আমি?"
জলে স্থলে নীলাকাশে যে আদিম মিলন বাসনা
পশুপক্ষীমীনকীটপতঙ্গের প্রাণে উন্মাদনা
সৃষ্টিরক্ষাতরে, তারে দিব নির্ব্বাসন সগৌরবে?
বিধাতার আশীর্ব্বাণী মোর কাছে অভিশাপ হবে?
এ যে কত বড় ব্যথা, কত বড় তপস্যা কঠোর
কেমনে বোঝাব প্রিয়ে!

মাদ্রী

তারো চেয়ে বড় ব্যথা মোর—
তোমারে করেছি প্রত্যাখ্যান। সব কিছু দেব আমি
শুধু চেয়ো না'ক দেহ। কতদিন জানে অন্তর্যামী
দেবতার কাছে শুধু যাচিয়াছি মরণ আমার!
তব পার্শ্বে কতদিন রোধিয়াছি ক্রন্দন দুর্ব্বার
শুষ্ক চক্ষে। কতদিন একাকিনী কক্ষ রুদ্ধ করি
বক্ষে করাঘাত হানি যাপিয়াছি বসন্তশর্ব্বরী!

পাণ্ডু

জান তুমি মোর ব্যথা? বহি কি যে অসহ যন্ত্রণা
দিবানিশি বক্ষে মোর? সহি কত যৌবনলাঞ্ছনা?
...দুঃসহ নিদাঘ দিনে বসিয়াছি দীর্ঘিকার কূলে
সপ্তপর্ণ তরুচ্ছায়ে। ঢেউগুলি পড়ে ফুলে' ফুলে'
আমারি চরণপ্রান্তে। রাজোদ্যান-পালিতা মরালী
কভু ডোবে, কভু ভাসে, সন্তরণে কত চতুরালী!
অসীম আগ্রহভরে দুই হাতে ছিঁড়ি কুবলয়
তাহারে দিয়েছি ডাক, সন্তর্পণে শঙ্কিত হৃদয়
সে যে আসিয়াছে কাছে। শ্বেতপক্ষ-বিধুনন-ছলে
আমার তাপিত তনু ভিজায়েছে বিন্দু বিন্দু জলে।
বাঁধিলাম বাহুপাশে মরালীরে স্নেহভরে টানি',
মধুর শীতোষ্ণস্পর্শে গ্রীবা তার মোর কণ্ঠখানি
জড়ায়েছে কি আনন্দে! মোর দৃঢ় নিবিড় পীড়নে
আতঙ্কিত চিত্তে সে যে চেয়ে থাকে করুণ নয়নে!

সেই সুখস্পর্শে, ভাবি তুমি বুঝি জড়ায়েছ মোরে,
বেড়িয়াছ কণ্ঠ মোর তোমার মৃণাল ভুজ-ডোরে!
আবার প্রাবৃটে যবে ধূম্র মেঘে ধূসর আকাশ,
হু হু করে আসে ঝড়, ধরণীর বাসর-বিলাস
মুহূর্ত্তে থামিয়া যায়। বৃন্ত হ'তে পত্রপুষ্পগুলি
ছিন্ন করে প্রভঞ্জন। বার বার আর্ত্তনাদ তুলি'
উৎক্ষেপি' পল্লব-কর বাধা দেয় শঙ্কিত কানন।
কক্ষে মোর আসে উড়ে নীড়হারা খঞ্জনা-খঞ্জন
অলিন্দ-গবাক্ষপথে। দুটি দেহ দুটি মুঠি ভরি'
আঁধার গৃহের কোণে, মাদ্রি, যেন অনুভব করি
তোমার দেহের স্পর্শ! বসে থাকি স্মৃতি-স্রোতহত
উদ্বেল বারিধিবক্ষে ছিন্ন-পাল তরণীর মত!

মাদ্রী

সহ্য নাহি হয় আর। অরুন্তুদ অশ্রুবেদনায়
কণ্ঠ মোর রুদ্ধ আজ। তবু বলি, অতীত চিন্তায়
ক্ষান্ত হও মহারাজ।

পাণ্ডু

আসে ভাসি চিত্রের মতন
অপরাধী যৌবনের কত ভ্রান্তি, বিচিত্র স্বপন!
নবীন বসন্তে যবে পত্রপুষ্পে সজ্জিতা ধরণী,
উপবন-পথপ্রান্তে শুনি কানে লঘু পদধ্বনি,
পালিতা হরিণী আসে। শৃঙ্গে তার কামন্দকশাখা
কখন্ জড়ায়ে গেছে। সর্ব্বদেহ লোধ্ররেণুমাখা।
কৃষ্ণায়ত নেত্র মেলি মোর পানে শুধু থাকে চেয়ে
কত আকিঞ্চনভরে! আসে কাছে বিগলিত স্নেহে
প্রসারিত ওষ্ঠে তার। মোর হাতে খায় দূর্ব্বাদল।
সেই স্পর্শসুখ লভি কামতাপে অন্তর বিকল
মুহুর্মুহু। হায় প্রিয়ে, অভিনব কল্পনার জালে
বন্দী করি পশুপাখী, হেরি আমি তার অন্তরালে
তব বিলাসিনী মূর্ত্তি, লালসার মদির ভঙ্গিমা।
সদ্যোভিন্ন কমলের বক্ষপুটে যে মৃদু লালিমা
আনে ক্ষণিকের মোহ, তব অঙ্গ মনে পড়ে' যায়
আমার ধ্যানের স্বর্গে, চিত্ত কাঁদে চির-ব্যর্থতায়!
এস মাদ্রি, বক্ষে মোর—

মাদ্রী

দেবতার নামে বার বার
তোমারে মিনতি করি, এষে মৃত্যু! ঘোর হাহাকার
এখনি গ্রাসিবে পুরী। অট্টহাস্য তৃপ্ত সে ঋষির
আকাশ ছাইয়া যাবে! চন্দ্রবংশসমুন্নত শির
নত হবে অগৌরবে। পিতৃপিতামহ সর্ব্বজন
স্বর্গ হতে ম্লানমুখে করিবে যে অশ্রুবরিষণ
তব পরিণাম হেরি! যুগে যুগে তব ইতিকথা—
অতি কামাতুর বলি' তব যশে দিবে মলিনতা।
"যোগ্য পত্নী এই তাঁর—" বলি' ব্যঙ্গে নিত্য মোর প্রতি
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততি
কহিবে কঠোর কণ্ঠে—"এই সেই নারী যাদুকরী
যার পাপে ধ্বংস হ'ল চন্দ্রবংশ!" ঘৃণায় শিহরি
সভাসীমন্তিনীদল যাবে সরি'। অখ্যাতি আমার
হবে পরলোকসাথী। কালিমার গাঢ় অন্ধকার
ঘিরিবে অনন্তকাল। পতিহন্ত্রী মহাপাতকিনী
কোথাও পাবে না স্থান। তাই আজি অধর্ম্মচারিণী
মাদ্রীরে ভুলিয়া যাও। ক্ষমাহীন বিদায়ের দিনে
আর বাঁধিও না তারে প্রিয়তম, অভিশপ্ত প্রাণে!

পাণ্ডু

কোথা যাবে মাদ্রি প্রিয়ে? ভুলায়ো না আর মোরে তুমি
বৃথা বাক্যছটাজালে। জানি মাদ্রি এ ভারতভূমি
জানে অভিশাপকথা। অভিশাপ হলে ফলবান
তৃপ্ত হবে বিপ্রকুল, তৃপ্ত হবে ঋষিরা ধীমান্,
তৃপ্ত হবে দৈবজ্ঞের দল। আর যারা রহি অন্ধকারে
রাজসিংহাসনপানে লুব্ধ দৃষ্টি হানে বারে বারে
তারাও লভিবে তৃপ্তি। শুধু রবে সান্ত্বনাবিহীন
শোকাতুর সেই সব প্রজা, যাঁরা কাঁদে প্রতিদিন
আমার কল্যাণতরে। বহে যারা অর্ঘ্য-নিবেদন
দেবতার মন্দিরে মন্দিরে। শাপ করিতে মোচন
করে যারা নিত্য হোম, জ্বালে গৃহে পঞ্চদীপ-আলো
সেই সব ম্লান মুখ, যাদের বেসেছি আমি ভালো,
তারা শুধু রবে শোকাকুল। আর তুমি পতিব্রতা নারী
নির্ব্বাক্ গৌরবপুকে প্রতিদিন ঘৃণ্য কামাচারী
পতিরে স্মরিবে। যবে বিপ্রকুল প্রচণ্ড ধিক্কারে
উচ্চারিবে নাম মোর, দৃষ্টিহীনা তুমি অশ্রুভারে
লুটাইবে গূঢ় বেদনায়। মোরে ঘিরি যত মলিনতা
হবে পুঞ্জীভূত, তার স্পর্শে তব অম্লান শুভ্রতা
লভিবে কলঙ্করেখা। থাক্ তবে সেই সব কথা—
একটি প্রার্থনা শোন, প্রত্যাখ্যানে দিও না'ক ব্যথা।

মাদ্রী

কি আদেশ বল নাথ, চেয়ো না'ক দেহের মিলন
এ মিনতি শুধু মোর। যত তুমি কর আবেদন
তত যে পিপাসা বাড়ে। রাজকার্য্য, মৃগয়া, মন্ত্রণা,
কূটরাজনীতিতত্ত্ব, পণ্ডিতের দর্শন-বাঞ্জনা,
বন্দীদের রাজস্তুতি, লক্ষ্যভেদ, তরণীবিহার,
অসিযুদ্ধ, দ্যূতক্রীড়া, হস্তি-রণ,—যাহা ইচ্ছা নাথ
কর তুমি। শুধু মোরে দিও না'ক নির্ম্মম আঘাত!

পাণ্ডু

উষ্ণ রক্তস্রোতে মোর জাগিয়াছে দুরন্ত প্লাবন,
কে তারে রোধিবে আজ ? তপঃক্লান্ত অধীর যৌবন
মাগিছে তোমার কাছে করযোড়ে একমাত্র বর,
দেবে তুমি প্রিয়তমে ? জীবনের প্রতিটি প্রহর
যুগ-যুগান্তের মত ! মনে হয় আজি মিথ্যা সব,
মিথ্যা ঋষি-অভিশাপ, মিথ্যা সেই ব্রহ্মণ্য-গৌরব !
কবে করেছিল ঋষি উপহাস, ঢাকিয়া মিথ্যারে,
সমগ্র জীবন ধরি সত্য বলি মানি লব তারে ?
শোন মাদ্রি, পরীক্ষা করিতে চাই ঋষি প্রবঞ্চনা,
এস এস কাছে মোর—

মাদ্রী

মহারাজ, এ তীব্র যন্ত্রণা
সহিতে পারি না আর। মোহাচ্ছন্ন নিমেষের ভুলে
চির-কলঙ্কের বোঝা শিরে মোর দেবে তুমি তুলে
তব মৃত্যু সাথে ? বল, আর কিবা চাহ বিনিময়ে ?
নেবে কি আমার স্বর্গ ? আমি রব অনন্ত নিরয়ে
তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলি। চাহ আত্মা মোর ? তাও লহ,
শুধু বরিও না মৃত্যু, সে যে মোর একান্ত দুঃসহ !

পাণ্ডু

আমি মৃত্যু চাই মাদ্রি, আমি আজ শুধু মৃত্যু চাই,
তোমার তনুর স্বর্গে চারু বাহুবল্লরী-বিতানে
আনন্দ হিন্দোলে দুলে পরিতৃপ্ত কামনার গানে
আমি মৃত্যু চাহি মোর। স্পর্শাতুর উন্মত্ত বিলাসে
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী সুরে স্বপ্নময় মৃত্যু যদি আসে
তারে লইব না বরি ?' যে নিঃশ্বাস মিশাইবে ধীরে
চিরতরে, তারে শেষ-চুম্বনের সুধাতীর্থনীরে
করিব না অভিষেক ? হারাইব যবে স্পর্শসুখ
অসাড় স্নায়ুর দলে, বক্ষ হবে স্পন্দনবিমুখ
পুলকতন্দ্রার মাঝে, রক্তধারা উচ্ছ্বাসলীলায়
সহসা থামিয়া যাবে তালভ্রষ্টা নর্ত্তকীর প্রায়
আনন্দ-হিল্লোল-বুকে, সর্ব্বশেষ ম্লান দৃষ্টি দিয়া
আমার চরম স্বর্গে তোমারে হেরিব আমি প্রিয়া।
সে অন্তিমে চুম্বনের শেষ তাপ অধরে তোমার
দিব ঢালি', উপহাসি আততায়ী শমনে দুর্ব্বার !
বল মাদ্রি, প্রিয়তমে, এর চেয়ে সুখের মরণ
কোথা পাব ? অভিশপ্ত যৌবনের অর্ঘ্য-নিবেদন
আর ফিরায়ো না, আজি লহ তারে তনুর মন্দিরে,
হয় মিথ্যা, নয় সত্য, দেখা দেবে মরণের তীরে !

মাদ্রী

তার চেয়ে আগে কর হত্যা মোরে। আজি মুছে যাক্
যত অভিশাপ গ্লানি, ঋষিকণ্ঠ হউক নির্ব্বাক্ !

পাণ্ডু

নারীহত্যা ? হায় প্রিয়ে, কলঙ্কের যা-ও ছিল বাকী,
সেটুকুও পূর্ণ হবে ? সর্ব্ব অঙ্গে নারীরক্ত মাখি
উন্মত্ত পিশাচসম করিব চীৎকার ? করযোড়ে
যাচি, দাও মৃত্যু ভিক্ষা, আজ মাদ্রি, ফিরায়ো না মোরে !

মাদ্রী

না, না, মহারাজ, কোনদিন সে ভিক্ষা পাবে না তুমি।
কে চাহে আপন হাতে বধিতে পতিরে ? পুণ্যভূমি
এ ভারত সতীপীঠ, বার বার করি এ মিনতি,
কর ক্ষমা, ও আদেশ দিয়ো না'ক অধীনার প্রতি।

পাণ্ডু

কিছুতেই শুনিবে না প্রার্থনা আমার ? এ কাকুতি
ভেবেছ কি মনে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে নারীস্তুতি ?
শোন মাদ্রি, বলি এই শেষবার, মৃত্যুভিক্ষা দাও !

মাদ্রী

স্পর্শ করিও না নাথ, এ যে মৃত্যু, যাও সরে যাও !

পাণ্ডু

সরে যাব আমি প্রিয়ে ? বৃথা দীর্ঘ মরুপথ ধরি
ঘুরিয়াছি এতদিন ! জীবনের সায়াহ্নে সুন্দরি,
এ দেহের এ কি জাগরণ ! এ কি বুভুক্ষার জ্বালা !
সম্মুখে সাজানো মোর অনবদ্য নৈবেদ্যের ডালা
পাষাণ-দেবতা আমি, দাঁড়াইয়া রিক্ত-অধিকার !
মাদ্রি, শোন পতিবাক্য, ধর্ম্মপত্নী তুমি যে আমার,
দাও, দাও মৃত্যুভিক্ষা, চেয়ো নাক' ধর্ম্ম কলঙ্কিতে !

মাদ্রী

ক্ষমা কর মহারাজ, মৃত্যু-ভিক্ষা পারিব না দিতে।

পাণ্ডু

পারিবে না ? ব্যর্থ হবে পতির আদেশ ? অনুরোধ
শুনিবে না কানে ? অয়ি সাধ্বি, এত পতিধর্ম্মবোধ
জন্মেছে তোমার ? তাই পতিবাক্য অবহেলা করি
জগতে রাখিবে কীর্ত্তি ? সুদূর অতীতে দেখ স্মরি
করেছিলে কি প্রতিজ্ঞা পুণ্য বেদমন্ত্র উচ্চারণে ?
সুখে দুঃখে চিরদিন যাগযজ্ঞ ব্রত-আচরণে
হও নি কি সাথী মোর ? কখনো কি আমার আদেশে
দাও নাই দেহ-অর্ঘ্য মোর পায়ে বিলাসিনী বেশে ?
পতিবাক্য অবহেলি তুমি পাপ-পাংশুলা কামিনী
পাবে না নরকে স্থান ? পুণ্যশীলা যে সহধর্ম্মিণী

পতির আদেশে দেয় ইহকাল পরকাল তার,
তুমি কি তাদের নহ কেহ ? যারা শত দুঃখভার
স্বামীর আদেশে সহে, সেই সব পতিব্রতা নারী
দেখ নি কি কোনদিন ? জানি মাদ্রি, এ ধরণী ছাড়ি
একদিন যেতে হবে মোরে, তবু শেলসম এই ব্যথা
রহিল অন্তরে মোর, হও নাই তুমি পতিব্রতা।

মাদ্রী

এ কলঙ্ক দাও শিরে, ক্ষতি তাহে নাই। পরীক্ষার
কিবা প্রয়োজন আর ? আমি হীনা, আদেশ তোমার
শুনি নাই, এই ভালো। অনন্ত নরকে করি বাস
অনুতপ্ত আত্মা মোর মুক্তি লাগি ছাড়িবে নিঃশ্বাস,
সেও ভালো। যত গ্লানি, যত ঘৃণা যত অবহেলা
আমারে ঘিরিয়া থাক্‌, পুঞ্জীভূত কলঙ্কের ভেলা
আমিই ভাসায়ে যাব অশ্রু-নদী বৈতরণী-তীরে।
অভিশপ্ত আত্মা মোর ডুবে যাবে অনন্ত তিমিরে।

পাণ্ডু

শুনিব না উচ্ছ্বাসের কথা। দুর্বলতা কেন প্রিয়ে ঢাকি
কঠিন বাস্তব দিয়ে। মৃত্যুরে সম্মুখে মোর রাখি
লব আমি পরশ তোমার। সম্ভোগের তীব্র উন্মাদনা
হবে তীব্রতম, যবে মৃত্যু আসি হরিবে চেতনা
শেষ উগ্র কামনায়। কামশয্যা মৃত্যুশয্যা হবে।
সর্ব ইন্দ্রিয়ের সেই সর্বশেষ আনন্দ-গৌরবে
তুমি কি হবে না সাথী ? ফেনায়িত তপ্ত রক্তস্রোতে
আদিম মানবতৃষ্ণা চীৎকারিবে কালগর্ভ হতে
“তৃপ্ত আমি”। শোন মাদ্রি, সে আনন্দ সমারোহ বুকে
তুমি আর আমি হব কালজয়ী মৃত্যুর সম্মুখে !
এস প্রিয়ে, এস সান্নিধ্য কাছে মোর, কোরো না বঞ্চনা,
নীরবে দাঁড়ায়ে কেন ? বল, বল, কি শেষ প্রার্থনা ?

মাদ্রী

তব মৃত্যুসাথে মোরে মৃত্যু যেন আশীর্বাদ করে,
পতিহন্ত্রী মাদ্রী যেন চিরদিন সতী নাম ধরে।

সোমনাথপুর মন্দির-চূড়া, মহীশূর
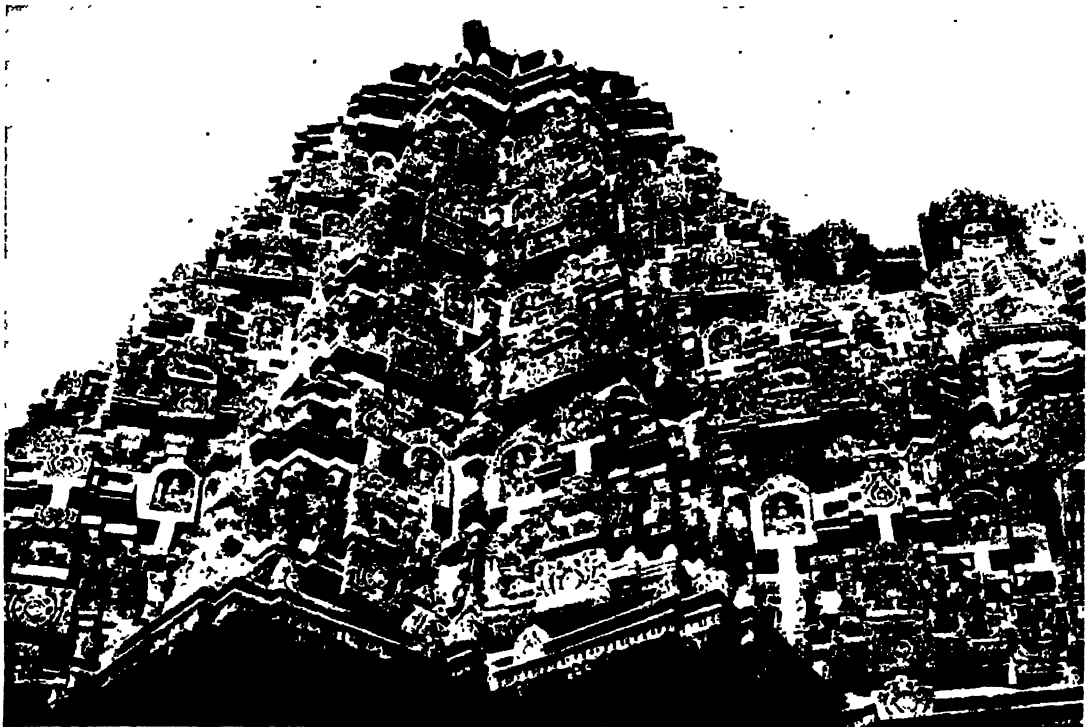
দাক্ষিণাত্যে বৈদেশিক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক

অম্বুজনাথ বন্দোপাধ্যায়

হিন্দুস্থান বা উত্তর-ভারতবর্ষের ভাগ্যান্বেষণনিরত ইউরোপীয় সৈনিকগণ সম্বন্ধে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কিন্তু উঁহাদের দাক্ষিণাত্যের সমধর্মী বা সহকর্মীবৃন্দ সম্বন্ধে কৌতূহল পরিতৃপ্তির তাদৃশ কোন উপায় নাই। প্রথম দলের তুলনায় অপর দলের ইতিহাস যে কোন অংশেই অল্প চিত্তাকর্ষক বা কৌতূহলপ্রদ নহে তাহা নয়, ঐতিহাসিক উপকরণের অভাবই এই অন্তরায়ের প্রধান কারণ। নিজামের সৈন্যাধ্যক্ষ সুবিখ্যাত জেনারেল রেমঁ ব্যতীত দক্ষিণাপথের বিভিন্ন দেশীয় দরবারে ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয়গণের মধ্যে অপর কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। বলা বাহুল্য, উঁহার সম্বন্ধেও যেটুকু জানা গিয়াছে তাহা ঐতিহাসিকের নিকট পর্যাপ্ত নহে। বিভিন্ন সূত্র হইতে পরিজ্ঞাত নামটুকু ভিন্ন অনেকেরই সম্বন্ধে আর সব কথাই অজানা। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে পুরাতন সমাধিক্ষেত্রসমূহে আজিও অনেক ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের কবর রহিয়াছে। সেগুলির অধিকাংশই আজকালের কুটিল গতিতে জীর্ণ, সংস্কারাভাবে বিনষ্টপ্রায়। অনেক ক্ষেত্রেই উপরকার স্মারকলিপিও অন্তর্হিত হইয়াছে। সামান্য যে কয়টি অপেক্ষাকৃত পাঠযোগ্য অবস্থায় রহিয়াছে তাহা হইতে অনেক ক্ষেত্রেই সমাহিত ব্যক্তির শুধু নাম এবং মৃত্যুর তারিখ ভিন্ন অপর কোন পরিচয় লাভ করা চলে না। এ ধরণের উপকরণ হইতে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করা সম্ভব না হইলেও এখানে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন দরবারে ভাগ্যান্বেষণ-নিরত কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিকের যথাসম্ভব পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

সত্য কথা বলিতে গেলে বলা প্রয়োজন যে, এখানে আমরা ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করিতেছি, সে ধরণের ব্যক্তিবৃন্দের আবির্ভাব উত্তরাপথের পরিবর্তে দক্ষিণাপথেই প্রথম সংঘটিত হয়। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। কর্ণাটক সমরকালে (১৭৪৮-৫৪ খ্রীঃ) এদেশে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য সমরপদ্ধতির উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল। ইউরোপীয় অফিসার কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত দেশীয় সিপাহীসেনার উদ্ভব ভূপ্লের দ্বারা দাক্ষিণাত্যেই প্রথম ঘটিয়াছিল। তাহার পর হইতেই দক্ষিণ ভারতবর্ষের বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৃপতি বা সর্দার ইউরোপীয় সৈনিক এবং শিক্ষিত বাহিনী লাভে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-হস্তে পণ্ডিচেরীর পতন এবং ভারতবর্ষে ফরাসীশক্তি উন্মূলিত হইবার পর পলাতক আশ্রয়বিহীন ফরাসী সৈনিকগণের জন্য কাহারও সৈন্যলাভে অপ্রাচুর্য্য ঘটে নাই। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম আলি এবং তদীয় ভ্রাতা গুন্টুর-আদোনির জায়গীরদার সলাবৎজঙ্গ, কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলি এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদসাহেব, মহীশুরের হায়দর আলি এবং টিপু, মাদুরার ফৌজদার মহম্মদ ইউসুফ খাঁ, ত্রিবাঙ্কুরের, তাঞ্জোর ও কোচিনের রাজন্যবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নায়ক, পলিগড় বা সর্দারগণ সকলেই পাশ্চাত্ত্য সমরপদ্ধতিতে শিক্ষিত সিপাহী এবং ফিরিঙ্গী সৈনিক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখানে ইউসুফ খাঁ, মহীশুর ও নিজামের সৈনিকগণ ব্যতীত অন্যান্য ভাগ্যান্বেষীদের কথাই বলা যাইবে।

কর্ণাটক :—কর্ণাটক-সমরকালে মহম্মদ আলির বাহিনীতে পোভেরিও নামক একজন ইটালিয়ান সৈনিককে "এনসাইন" পদে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। ঐ ব্যক্তি নেপলস প্রদেশের অধিবাসী ছিল এবং যুদ্ধবৃত্তির অন্তরালে ব্যবসা-বাণিজ্যও করিত। তদ্ভিন্ন তাহার আরও একটি তৃতীয় বৃত্তি ছিল ; তাহা এই, অর্থ বিনিময়ে যুযুধান উভয়পক্ষের হইয়াই গুপ্তচরের কাজ করা! ইংরেজ-করে বন্দী ফরাসী সৈনিকগণের মুক্তিসাধনের জন্য মহীশুরের প্রধানমন্ত্রী একবার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাতে বাহ্যতঃ যোগদানের ভান করিয়া গোপনে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট সকল সংবাদ পোভেরিও প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল।* এই সময়ে চাঁদ সাহেবের পক্ষেও ফ্রান্সিসকো পেরেরা নামক জনৈক পর্তুগীজ সৈনিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহম্মদ আলি ইংরেজ কোম্পানীর আশ্রিত নরপতি ছিলেন বলিয়া অনেক সময় তাহাদের কর্মচারীবৃন্দ উঁহার রাজসরকারে কর্ম্ম নিরত থাকিতেন। বলা বাহুল্য, উঁহাদের কোনমতে ভাগ্যান্বেষী পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে না। কিন্তু উঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার দরবারে ভাগ্যান্বেষণ-নিরত বিদেশীয় সৈনিক পুরুষগণের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল না।

এই সময় পালনাদ প্রদেশের টিমারকোটা অন্যতম প্রধান সামরিক কেন্দ্র ছিল। তাহার পূর্ব্বগৌরব আর নাই। এক্ষণে উহা বিধ্বস্ত স্তূপসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র একটি গ্রামে পর্যবসিত হইয়াছে। কৃষ্ণাজেলায় বিনুকোণ্ডার ৩৮ মাইল উত্তরে উহা অবস্থিত। নবাবের ফিরিঙ্গী সৈনিকবৃন্দের এবং তাহাদের পরিজনবর্গের কয়েকটি ভগ্ন জীর্ণ সমাধি আজিও এখানে দেখা যায়। অধিকাংশ সমাধিগাত্রে স্মারকলিপি নাই, পূর্ব্বে থাকিলেও বর্তমানে তাহা বিলুপ্ত। কাজেই সমাহিতের কোন পরিচয়প্রাপ্তি সম্ভব নহে। যে কয়টির সমাধিলিপি পাঠযোগ্য অবস্থায় আছে তাহা হইতে নবাবের কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের নাম পাওয়া যায়—

কাপ্তেন জেমস আৰবোল্ড : ২১।৬।১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে টিমারকোটাতে উহার দেহান্ত হইয়াছিল।

জে. বি. তার্দিভাল : এই ব্যক্তি জাতিতে ফরাসী। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে উহাকে পালনাদে অবস্থিত সৈন্যদলের অধ্যক্ষতা করিতে

* Wilks :—"History of Mysore" vol. I, p, 379

দেখা যায়। উহার পত্নীর নাম ছিল ম্যাগদালেন বুরোট। এ সব কথা জানা যায় ১১।৯।১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত ইহার শিশুপুত্র পীয়ের মাইকেলের সমাধিলিপি হইতে।

এনসাইন পীয়ের চার্লস : ১১।২।১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল।

লেফটেনাণ্ট জোয়ান প্রাসিট : পর্তুগীজজাতীয় এই সৈনিকের ৩৯ বৎসর বয়সে ১৫।১।১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহান্ত হয়।

পালনাদ প্রদেশে ভুরুজেলা নামক স্থানেও কয়েকটি পুরাতন কবর আছে। স্মারকলিপি—মাত্র দুইটির গাত্রে বর্তমানে দেখা যায়। উহা হইতে ম্যানুয়েল ডি আলমেডা এবং প্রাসিট কেরমিকেল নামা, নবাবের দুই জন পর্তুগীজ জাতীয় সৈনিকের সন্ধান পাওয়া যায়। কেরমিকেল কথাটি স্কচ—কারমাইকেল নামের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ষ্টুয়ার্ট বংশের পতনের পর উহার পূর্বপুরুষগণ আরও অনেকের মতই জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া বিদেশে আশ্রয় লইতে গিয়াছিলেন।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলি কর্ণাটক প্রদেশ আক্রমণ করিলে বিখ্যাত গিঞ্জি বা জিঞ্জিরের অধ্যক্ষ, নবাবের বুরে নামক জনৈক ইউরোপীয় সেনানী বিনা বাধায় তাঁহার করে দুর্গাধিকার সমর্পণ করিয়াছিলেন।* কুদ্দালুরের পনর ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উদায়ারপালয়ের ইউরোপীয় কিল্লাদারও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিল। এই ব্যক্তির নাম জানা নাই। বুরে নামটি ফরাসী নাম। কিন্তু হায়দর আলি এবং ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধকালে কোন ফরাসী জাতীয় সৈনিকের পক্ষে নবাব-সরকারের এতদৃশ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব ছিল বলিয়া মনে করিতে বাধা আছে। সুতরাং বুরেকে সুইস জাতীয় বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত।

পর বৎসর পেরামবকমের যুদ্ধে (১০।৯।১৭৮০) কর্ণেল বেলীর সৈন্যদের সহিত উপস্থিত যে নবাবী ফৌজ শত্রুহস্তে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্তর্ভুক্ত তিন জন ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ সৈনিক—উহাদের নাম কাপ্তেন রমলে, কাপ্তেন গাউদে এবং কাপ্তেন উইমস আহত হইয়া বিপক্ষহস্তে বন্দী হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

তাঞ্জোর সহরে সেণ্টপিটার গীর্জাসংলগ্ন সমাধিভূমে মেজর জন গালওয়ে নামক জনৈক সেনানীর কবর আছে। ৩০।১।১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উহার জন্ম এবং ৮।৬।১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল।

লেফটেনাণ্ট প্যাট্রিক বেলিউ নামে নবাবের যে একজন সামরিক কর্মচারী ছিল সেকথা জানা গিয়াছে ত্রিচিনপল্লীর ক্রাইষ্ট চার্চ সমাধিক্ষেত্রে অবস্থিত তাঁহার পত্নী রেবেকার সমাধিলগ্ন স্মারকলিপি হইতে। ৩০।৮।১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩২ বৎসর বয়সে ঐ মহিলার দেহান্ত হইয়াছিল। তখন তাঁহার স্বামী জীবিত ছিলেন।

ত্রিচিনোপল্লী জেলার অন্তর্গত উড়িয়ুড় নামক স্থানে জন গ্রান্টের কবর আছে। দীর্ঘ ১৭ বৎসরকাল কোম্পানীর এবং নবাবের বাহিনীতে কার্য করিবার পর ২৯।১১।১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩ বৎসর বয়সে ঐ ব্যক্তি পরলোকগমন করিয়াছিল।

জন ব্যাটলী নামে নবাবের একজন ইংরেজ কর্মচারী ছিল। কোম্পানীর লিখিত পত্রসমূহ ফারসীতে ভাষান্তরিত করা ছিল তাহার কার্য।

কাপ্তেন জেমস হল : এই ব্যক্তি প্রথমে নবাবের একজন সৈনিক ছিল। ইংরেজ সরকারের যথেষ্ট উপকারসাধন করার জন্য পরে তাদের কাপ্তেন পদ লাভ করিয়া ঐ ব্যক্তি কোম্পানীর সেনাবিভাগে গৃহীত হইয়াছিল। হল ই হায়দর-হস্তে নিপতিত প্রথম ইংরেজ-অফিসার। উহার আচরণে প্রীত হইয়া হায়দর তাহাকে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে দিয়াছিলেন এবং সম্মানও করিতেন বলিয়া শুনা যায়। পরবর্তীকালে শত্রুকবলে নিপতিত অন্যান্য ইংরেজের কারাযন্ত্রণা লাঘব করিতে এ ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ২২শে অক্টোবর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উহার দেহান্ত হয়। মাদ্রাজ শহরের সেণ্ট মেরী সমাধিক্ষেত্রে উহার কবর আছে।

কর্ণেল টমাস ব্যারেট : এই ব্যক্তি নবাব মহম্মদ আলির অন্যতম প্রধান সেনানী এবং সেক্রেটারী ছিল। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে উহার জন্ম হয়। ১৭৮৯ হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি দ্বাদশ বৎসরকাল ব্যারেট নবাবের 'পাসমুন্সী' অর্থাৎ আধুনিক কালের confidential secretary এবং প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষার দোভাষী ছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলির পুত্র নবীন নৃপতি উমদাৎ-উল-উমরা তাঁহাকে ৪১ খানি গ্রাম 'আলতাম' দান করেন, কিন্তু তাহাকে বেশীদিন উহা ভোগ করিতে হয় নাই। পর বৎসর লর্ড ওয়েলেসলি নবাবকে বৃত্তিভোগীতে পরিণত করিয়া তদীয় রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করেন। ব্যারেটকে প্রদত্ত জায়গীরও সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার সমস্ত আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়। ২৩শে জুন ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারেট পরলোকগমন করেন। ভেপেরীর সেণ্ট ম্যাথায়াস সমাধিক্ষেত্রে তাহার নিজের, পত্নীর এবং ভগিনীর কবর দেখা যায়।

কর্ণেল মার্টিন্স : এই ব্যক্তি জাতিতে পর্তুগীজ অথবা ইটালিয়ান ছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে উহার জন্ম এবং ৭।১০।১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে দেহান্ত হয়। মাদুরা জেলার রামনাদ নামক স্থানে উহার কবর আছে। সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল তিনি নবাবের কর্মে নিরত থাকেন, তন্মধ্যে শেষ ত্রিশ বৎসর রামনাদের ফৌজদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখনকার দিনে রামনাদের দুর্গ সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য ছিল। মাদ্রাজ সরকার উহাদের সমগ্র সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াও দীর্ঘ অবরোধের পর বাহুবলে উহা বিদ্রোহী সুবেদারের কবল হইতে অধিকার করিতে পারেন নাই। কর্ণেল ওয়েলশ লিখিত 'Military Reminiscences' নামক গ্রন্থে

---

* Ibid, p. 449

মার্টিন্ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা এখানে দেওয়া যাইতেছে—

"দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নবাবী সৈন্যদলের কর্ণেল মার্টিন্সের বাসস্থান ছিল বলিয়াই শুধু রামনাদ দুর্গ ভারতবর্ষীয়গণের নিকট স্মরণীয়। তিনি ঐ স্থানের এবং তাঁহার নিজ নামে অভিহিত এক ব্যাটালিয়ন 'রেঞ্জার' শিক্ষিত সেনার অধ্যক্ষ ছিলেন। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অতিথিবৎসল দেশের আতিথ্যপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রধানতম স্থান এই অনন্যসাধারণ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অধিকার করিতেন। একটি সুসজ্জিত বৃহৎ আবাসবাটী তাঁহার ছিল। যাহারা তথায় আসিতে ইচ্ছা করিত তাহাদের সকলকেই তিনি সমাদরের সহিত সেখানে সংবৰ্দ্ধনা করিতেন। সুনির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট মদ্যপরিপূর্ণ তাঁহার একটি কুঠরি (cellar) ছিল। এখানে তাহা 'গুদাম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্যান্য নানা দ্রব্যের সহিত বিভিন্ন যুগের 'মাদিরা' মদ্য কয়েক পিপা ছাদ হইতে রজ্জুযোগে ঝুলানো থাকিত। যখনই ঘরের দ্বার খোলা হইত তখনই প্রত্যেকবার তাঁহার আদেশমত একজন ভৃত্য কয়েক মিনিট ধরিয়া ঐগুলিকে দোল খাওয়াইত। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন 'ইউরোপ যাত্রা'। তাঁহার মদ্য কদাপি পরিস্রুত করা হইত না, কদাচিৎ বোতলে ভরা হইত। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করিবার জন্য উহা বাহির করা হইত। লোকটি কথা খুব কমই কহিতেন, তুড়ি বা শিস দিয়া পরিচারকবর্গকে তিনি আদেশ প্রদান করিতেন। কর্ণেল মার্টিন্স সাভয় অথবা পড্মোন্টদেশের অধিবাসী। তিনি মধ্যমাকার হইতেও হ্রস্বাকৃতি ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা বলা যায়। তাঁহার মুখাকৃতিতে মানব অপেক্ষা বেবুনের সহিত অধিকতর সৌসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইলেও এবং ধরণধারণ নিতান্ত জঘন্য ও কদর্য্য হইলেও তিনি স্বীয় সৈন্যদলের পিতৃস্থানীয় এবং নিজ ক্ষুদ্র দলটির সকলকার পরম দয়ালু সুহৃদরূপে সংবর্দ্ধিত ছিলেন। অল্প কথায় তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে হইলে বলা চলে, তিনি সাধারণে সুপরিচিত এবং অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার পক্ষে জনসমাজে সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন হইবার জন্য শুধু ধর্ম্মের বাহ্যিক আবরণ ব্যতীত আর কিছুরই অভাব ছিল না।"

তাঞ্জোররাজ প্রতাপসিংহ কর্ণাটকের নবাবের এক জন সামন্ত নরপতি ছিলেন। তখনকার দিনের প্রথামত তাঁহারও ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া গঠিত ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদল ছিল। ক্লামিকোর্ট এবং মার্শা নামক দুই জন ফরাসী সৈনিক উহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন। ক্লামিকোর্ট দীর্ঘকাল তাঞ্জোর দরবারে ভাগ্যান্বেষণ-নিরত ছিলেন এবং সাহস, বীরত্ব ও সামরিক জ্ঞানের জন্য বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। মার্শারও সাহসী এবং বীরত্বপূর্ণ কর্ম্মতৎপরতার অভাব ছিল না। উহার সম্বন্ধে সকল কথা ইউসুফ খাঁ প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে। কাপ্তেন জোহান উইলহেলম বার্গ নামক হাম্বুর্গ নগরের অধিবাসী জনৈক জার্ম্মান সৈনিককে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঞ্জোর বাহিনীতে কর্ম্মরত দেখা যায়। গোদাবরী জেলার অন্তর্গত মামুলকোট্টা নামক স্থানে এক পুরাতন সমাধিক্ষেত্রে মিসেস ক্রিষ্টিয়ানা বার্গ নাম্নী একজন স্ত্রীলোকের কবর আছে। স্মারকলিপি হইতে প্রকাশ যে, ২৯শে এপ্রিল ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০১ বৎসরেরও অধিক বয়সে উহার দেহান্ত হইয়াছিল। ইনি পূর্ব্বোক্ত কাপ্তেনেরই বিধবা হওয়াই সম্ভব। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক মাণ্ডেভিল নামক জনৈক ইংরেজের সহিত মিস এন বার্গেটা নাম্নী এক বালিকার বিবাহ হইয়াছিল। উহাকে কাপ্তেনের কন্যা বলিয়াই মনে হয়। লা ফুমো নামক প্রতাপসিংহের একজন ফরাসী সৈনিক ছিলেন, ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে একবার নিদারুণ ভাবে প্রতারিত করিয়াছিল এবং তজ্জন্য প্রতাপসিংহ সমগ্র ফরাসীজাতির উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীর পতনের পর যখন বহুসংখ্যক ফরাসী সৈনিক কোনমতে ইংরেজ-হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় লইতেছিল, তখন প্রতাপসিংহ উহাদের সাহায্যে নিজ সেনাবল পরিবর্দ্ধন মানসে উহাদিগকে নিজ দরবারে সমবেত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালমধ্যে এই অবিবেচনাপূর্ণ কার্য্যে তাহার নিজের চিত্তেই ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। ইংরেজদিগের বিরাগ-আশঙ্কায় তিনি যে শুধু নূতন সৈনিক-সংগ্রহ-কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, ক্লামিকোর্ট, মার্শাপ্রমুখ তাঁহার পুরাতন সৈনিকবর্গকেও বিদায় দিয়া তিনি সৈন্যদল একেবারেই ভাঙিয়া দিয়াছিলেন।

২

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ভাগ্যান্বেষণ-নিরত ইউরোপীয় সৈনিকগণ প্রসঙ্গে আধুনিক ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের স্রষ্টা মহারাজ মার্তণ্ডবর্ম্মা (১৭২৯-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) এবং তাঁহার সুবিখ্যাত ফ্লেমিশজাতীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ডি লানয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মার্তণ্ডবর্ম্মা যখন রাজা হন, তখন ত্রিবাঙ্কুর মালাবার উপকূলের একটি নগণ্য রাজ্যমাত্র ছিল। উহার আয়তন বর্ত্তমান রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ অপেক্ষাও অল্প ছিল। অবশিষ্ট জনপদ পরস্পর-বিবদমান বহুসংখ্যক রাজন্য ও নায়রের মধ্যে বিভক্ত থাকিত। ইহাদের সহিত ত্রিবাঙ্কুরাধিপতিগণের যুদ্ধবিগ্রহ সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। সামরিক শক্তি অথবা সমৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের অবস্থা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণের কাহারও অপেক্ষা কোনও বিষয়েই উন্নততর ছিল বলা চলে না। ইহার উপর আবার উপকূলভাগে বাণিজ্যব্যপদেশে সমাগত ওলন্দাজগণ বর্ত্তমান। নিজেদের বাণিজ্যগত প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক সুবিধার আশায় উহারা যুযুধান রাজন্যবর্গের আত্মকলহে হস্তক্ষেপ করিয়া এবং উহাদের সুনির্দ্দিষ্ট ভেদনীতিপ্রয়োগের বলে 'রাজশক্তিসমূহের সমতা' বা balance of power রক্ষার নামে সর্ব্বদা ঈর্ষ্যা বিবাদ অশান্তির সৃষ্টি করিত।

মহারাজ মার্তণ্ডবর্ম্মাই ত্রিবাঙ্কুরের সকল উন্নতির মূল। কোচিন হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত কেরলপ্রদেশ স্বীয় আয়ত্তে আনিয়া মালয়ালম ভাষাভাষী যাবতীয় ব্যক্তিকে এক অখণ্ড রাজছত্রতলে

সুসংবদ্ধ করার পরিকল্পনা তিনিই সর্ব্বপ্রথম করিয়াছিলেন এবং নিজ শৌর্য বীর্য ও সংগঠনশক্তি বলে তাহা বাস্তবেও পরিণত করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় হন জেনারেল ইউষ্টাস বেনেডিক্ট দি লানয়। তিনিই পাশ্চাত্য সমর-পদ্ধতিতে রাজার শিক্ষিত বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং উঁহাদের সুষ্ঠু পরিচালনা দ্বারা তাঁর প্রভুকে সমগ্র জনপদের অধি-পতিতে পরিণত করিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা যে খুব সহজসাধ্য হইবে না মার্ত্তণ্ড-বর্ম্মা তাহা বুঝিতেন। প্রতিবেশী রাজগণ ব্যতীত ওলন্দাজদিগের সহিতও যে তাঁহার সংঘর্ষ অনিবার্য্য সেকথাও তাঁহার অজানা ছিল না। ধনুর্ব্বাণ-শূল-গদা-বর্শা-তরবার সম্বল তাঁহার পাইকগণ যে ইউরোপীয় সেনার মহড়া লইতে কোনও ভাবেই অনুপযুক্ত এ কথা বুঝিতে মার্ত্তণ্ডবর্ম্মার বিলম্ব ঘটে নাই। উহাদিগের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে তাঁহার সৈনিকগণকে সর্ব্বাগ্রে অনুরূপ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করা এবং বশ্যতা, শৃঙ্খলা ও রণপদ্ধতিতে শিক্ষিত করা যে অপরিহার্য্য, তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মার্ত্তণ্ড-বর্ম্মা যখন দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত রাজ্যসমূহ জয় করিতে-ছিলেন তখন ওলন্দাজদিগের উহাতে কোন আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু সাগরোপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে তিনি প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ করিতেই নিজেদের বাণিজ্যনাশের আশঙ্কায় উহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল এবং ক্রমে তাহা হইতে উভয় পক্ষে বাহু-বলের পরীক্ষাও আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কুইলনের রাজার মৃত্যুর পর পার্শ্ববর্ত্তী কেয়েনকুলমের রাজা কুইলন রাজ্য অধিকারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ওলন্দাজদিগের মিত্র ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মার্ত্তণ্ডবর্ম্মাও তাঁহার দাবি তুলিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে ওলন্দাজ গবর্ণর আপত্তি জানাইলে তিনি তাহাকে "নিজের চরকায় তেল দিতে" উপদেশ দিয়াছিলেন। কুইলন হস্তগত করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের প্রধান মন্ত্রী বা দলবার্ম্ম আয়ান কেয়েনকুলম অধিকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত রাজ্যের মিত্র ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ ভীত ও চিন্তিত হইয়া মার্ত্তণ্ডবর্ম্মাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকটে দূত পাঠাইলেন। কিন্তু অনুনয় বিনয় অথবা ভীতিপ্রদর্শনে ইষ্টসিদ্ধি হইতে নিরস্ত হইবার পাত্র রামবর্ম্মা ছিলেন না। তিনি উহাদের সমরে আহ্বান করিলেন। ইহাতে তাহাদের গবর্ণর ভ্যান ইমহফের ক্রোধ হইবারই কথা। তিনি সিংহল হইতে মার্ত্তণ্ডবর্ম্মার বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করিলেন। ত্রিবান্দম হইতে ৪৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কোলাচেল নামক স্থানে ওলন্দাজ সেনা আসিয়া অবতরণ করিল। অনন্তর উহারা সমীপবর্ত্তী জনপদ দখল করিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী পদ্মনাভপুরম অধিকারে সচেষ্ট হইল।

মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা তখন ওলন্দাজদিগের অন্যতম মিত্র এলায়া দাপ্পু স্বরূপম নামক জনৈক পলিগড়ের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। শত্রুসেনার আগমন-সংবাদে তিনি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত কোলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার সুন্দর একটি নৌ-বহর ছিল। উহাও তাঁহার আদেশে কোলাচলে আসিয়া প্রতিপক্ষের রণতরীসমূহকে পাহারা দিতে প্রবৃত্ত হইল। দুই মাস ধরিয়া উভয় পক্ষে জলে স্থলে খণ্ডযুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রথম একটি যুদ্ধে ত্রিবাঙ্কুরীরা বিজয়লাভ করিল। এ যুদ্ধে ওলন্দাজদিগের যে সকল সৈনিক উপস্থিত ছিল তাহাদের মধ্যে একটি প্রাণীও রক্ষা পায় নাই। পরবর্ত্তী যুদ্ধ সমরের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। মার্ত্তণ্ডবর্ম্মার সৈনিকগণ শত্রুর প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রায় পরাজিত হইয়াছে, এমন সময়ে দৈবক্রমে এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে যুদ্ধের গতি এবং পরবর্ত্তী ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ত্রিবাঙ্কুরী তোপের নালী হইতে নিক্ষিপ্ত একটি জ্বলন্ত গোলা বিপক্ষের গোলাবারুদের ডিপোর মধ্যে পড়িয়া এক নিদারুণ বিস্ফোরণের সৃষ্টি করিল। অগ্নিকাণ্ডে অনেকে প্রাণ হারাইল, ততোধিক ব্যক্তি আহত ও দগ্ধ হইল, অবশিষ্ট সৈনিকগণ মহাত্রাসে রণে ভঙ্গ দিয়া বন্দরস্থ পোতসমূহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। চব্বিশ জন সৈনিক শত্রুহস্তে নিপতিত হইল। ওলন্দাজদিগের ৩০টি কামান ও বন্দুক বিজয়ী ত্রিবাঙ্কুরী সেনার হস্তগত হইয়া গেল।

কিন্তু মার্ত্তণ্ডবর্ম্মার প্রকৃত বিজয় হইল দি লানয়কে লাভ। বন্দীদের মধ্যে ডুইভেনশট এবং দি লানয় নামক দুই জন ফ্লেমিশ বা আধুনিক নামে উল্লেখ করিতে হইলে বেলজিয়ান সার্জেণ্ট ছিলেন। উভয়েই ইউরোপীয় সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুদক্ষ সৈনিক এবং মার্জ্জিতরুচি ছিলেন। দি লানয়ের দুর্গাদি রক্ষার ব্যবস্থা, কামান চালাই কার্য ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁদের অভিজ্ঞতা যথেষ্টরূপেই ছিল। ফ্লেমিশ জাতীয় বলিয়া ওলন্দাজ সৈন্য-বিভাগে আশানুরূপ পদপ্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া ক্রোধ ও বিরাগের বশে উঁহারা বিস্ফোরণজনিত গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে দল ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণের নবীন ক্ষেত্রের সন্ধানে আসিয়াছিলেন। আগন্তুকদের পাইয়া মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা যে পরম প্রীত হইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা তাঁহার অধীনে কর্ম্ম-গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন কিনা সেকথা দোভাষীর মারফত প্রশ্ন করা হইল। উহারা সেই উদ্দেশ্য লইয়াই তো তাঁর দরবারে আসিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের আপত্তি হইবে কেন? দি লানয় এবং ডুইভেনশট উভয়েই ত্রিবাঙ্কুরী বাহিনীতে কাপ্তেন পদ লাভ করিয়াছিলেন। দি লানয়ের বীরত্বব্যঞ্জক সামরিক আকৃতি এবং ভদ্র ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে স্বীয় সন্নিধানে রাখিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। সেজন্য তিনি উঁহাকে দেহরক্ষী দলের অন্তর্ভুক্ত করিবার নিমিত্ত এক কোম্পানী শিক্ষিত পদাতিক সেনা গঠনের আদেশ দেন। অবশিষ্ট বাইশ জন সৈনিকও নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে কর্ম্মলাভ করিয়াছিল।

কোলাচলের যুদ্ধের ফলে যুদ্ধ অবশ্য শেষ হয় নাই। ওলন্দাজ-দিগের বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী অভিযানে দি লানয় এবং ডুইভেনশটের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা উঁহাদের সাহায্যে নিজ সেনা-

বল পরিবর্দ্ধনে পুনঃপ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চারি ব্যাটালিয়ন পাশ্চাত্ত্য রণপদ্ধতিতে শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য এবং তদুপযোগী গোলন্দাজবাহিনী সংগঠনে লানয় আদিষ্ট হইলেন। রাজা অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করেন নাই। লানয় তাঁহাকে প্রদত্ত কার্য্যভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুররাজ্যে এ যাবৎ সম্ভ্রান্ত হিন্দুশ্রেণীর, প্রধানতঃ নায়ার এবং চোগার জাতির—মধ্য হইতেই সৈনিক সংগৃহীত হইত। গত যুদ্ধে দলবা অর্থাৎ দেওয়ান রাম আয়ান বাহিনীতে এক দল মারবজাতীয় সৈনিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওলন্দাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। দি লানয় এক্ষণে রাজ্যের প্রজাসাধারণের পক্ষে সামরিক বৃত্তি সুগম করিয়া দিলেন। নায়ার, মারব, মোপলা, পাঠান, খৃষ্টান, তোপাসি সকল জাতির মধ্য হইতেই সৈনিক লওয়া হইতে লাগিল। উহাদের শিক্ষা-দীক্ষার উৎকর্ষের জন্য তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নাই। তৎকর্তৃক সযত্নে নির্ব্বাচিত ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয় অধিনায়কবৃন্দের হস্তে উহাদের পরিচালন-ভার ন্যস্ত হইল। এক ধরণের অস্ত্রশস্ত্র, এক ধরণের ইউনিফর্ম সকলকে দেওয়া হইল। একটি "স্যাপার" এবং "মাইনার কোর" গঠিত হইল। এদেশের সামরিক ইতিহাসে ইহা এক অভিনব সৃষ্টি। সাগরতটবর্ত্তী ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার বণিকগণের নিকট হইতে প্রচুর সমরোপকরণ ক্রীত হইল, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করা চলে না বলিয়া দি লানয় স্বীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানী পদ্মনাভপুরমে একে একে প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার সমরদ্রব্য নির্ম্মাণের কারখানা, যেমন কামান ঢালাইয়ের কারখানা, গোলাবারুদ প্রস্তুতের কারখানা, তোপসমূহ যাহাতে দ্রুত সঞ্চারী হইতে পারে সেজন্য আবশ্যক শকটনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। মার্ত্তণ্ডবর্ম্মার এই সৈন্যদলকে এদেশীয় নৃপতির পাশ্চাত্ত্য সমরপদ্ধতিতে সংগঠিত প্রথম বাহিনী বলা চলে।

এই সকল কার্য্যেই প্রায় দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া যায়। সিপাহীদের শিক্ষাকার্য্য সমাধা হইলে মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা পুনরায় ওলন্দাজদিগের সহিত শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন। এবারে পূর্ব্বাবস্থার সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে যে ত্রিবাঙ্কুরী সেনা শত্রুহস্তে পর্য্যুদস্ত হইয়া প্রায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবারকার বাহিনী তাহা হইতে ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্যবলে উহারা বিপক্ষ অপেক্ষা সমধিক শক্তিশালী। নামে রাম আয়ানের অধস্তন হইলেও কার্য্যতঃ দি লানয় প্রধান সেনাপতিরূপেই সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছিলেন। অতঃপর ওলন্দাজ এবং তাহাদের মিত্ররাজগণের সহিত ত্রিবাঙ্কুরাধিপতির যে সমর বাধিল, তাহা ক্রমান্বয়ে প্রায় বার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল বলা যায়। ফলে কোচিন হইতে কেয়েনকুলম পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সুদীর্ঘকালব্যাপী সমরকে কয়েকটি বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার প্রথম অংশ প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া চলে এবং ইহা ওলন্দাজদিগের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। বহু খণ্ডযুদ্ধ এবং অভিযানের পর (ইহাদের বিশদ বিবরণ অনাবশ্যকবোধে প্রদত্ত হইল না), ত্রিবাঙ্কুরী সেনা প্রতিপক্ষকে কিল্লিমানুর নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। দীর্ঘ ৬৮ দিন অবরোধের পর ওলন্দাজরা কোনমতে কুইলনের নগরপ্রাকারের অভ্যন্তরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন লানয় এবং রাম আয়ান বাহিনীর একাংশ শত্রুসেনার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য নিযুক্ত রাখিয়া অপরাংশসহ উহাদের মিত্র স্বদেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত বুঝাপড়া করিতে গিয়াছিলেন। ইহার পরিণতিতে তাকাকুর, বড়কক্কুর এবং কোট্টয়ামের নৃপতিত্রয় পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। কেয়েনকুলমের রাজা ত্রিবাঙ্কুরের বশ্যতাস্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর দিতে অঙ্গীকার করিয়া অব্যাহতি পাইলেন। অনন্তর দি লানয় এবং রাম আয়ান আবার কুইলনে ফিরিয়া গেলেন। সম্মিলিত শত্রুসেনার যুগপৎ প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা ওলন্দাজদিগের পক্ষে বেশী দিন সম্ভবপর হইল না। মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা যে শুধু বীর ও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন তাহা নহে, পরাজিত শান্তিপ্রার্থী প্রতিপক্ষের সহিত ব্যবহারে তিনি যে ধীরতা ও সংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। মাবেলীকেরাইয়ের সন্ধিসর্ত্তানুসারে ওলন্দাজদিগকে দেশে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকারবিস্তারের প্রয়াস হইতে নিরস্ত থাকিতে, তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহে কেবলমাত্র বাণিজ্যকর্ম্ম লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে এবং দেশীয় নৃপতিবর্গের সহিত পূর্ব্বকৃত সমস্ত বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতে হইয়াছিল। অতঃপর মার্ত্তণ্ডবর্ম্মার হস্ত হইতে উক্ত রাজন্যবৃন্দের রক্ষা পাইবার আর কোন পথই উন্মুক্ত রহিল না।

মার্ত্তণ্ডবর্ম্মার দ্বিতীয় অভিযান প্রধানতঃ মধ্যমালাবার প্রদেশের রাজা ও সর্দ্দারগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। দুই বৎসরব্যাপী এই সংগ্রামের ফলে তাঁহার রাজ্যসীমা পেরিয়ার নদীর বামতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ওলন্দাজদের নিরপেক্ষতা হেতু এই কার্য্য তাঁহার পক্ষে আয়াসসাধ্য হয় নাই। বহুকালের স[illegible]ত ব্যক্তিগণের পক্ষে দি লানয়ের শিক্ষিত বাহিনীকে বাধা দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। খোট্টুপিল্লির যুদ্ধে শত্রুসেনার [illegible] দলবার সৈনিকগণের মনে যথেষ্ট ত্রাসের সঞ্চার করিলেও লানয়ের কামানের মুখে তাহারা বেশীক্ষণ টিকিতে পারে নাই। আর একবার পুরোভাগে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণকে রাখিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া উহারা হিন্দু-সৈনিকবৃন্দকে বিপদে ফেলিয়াছিল, কিন্তু খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী সৈনিকগণের পক্ষে ইহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা বাধার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অনন্তর পরাজিত নৃপতিবর্গ কোচিনরাজের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু পোরকাদের তুমুল যুদ্ধে উহাদের সমবেত সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া যায়। এই যুদ্ধে দি লানয় বিশিষ্ট সৈনাপত্যের পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর কোচিনরাজ্যও ত্রিবাঙ্কুরের করদ রাজ্যরূপে পরিণত হয়।

দি লানয়ের চতুর্থ অভিযান (১৭৫৮-৬২ খ্রীঃ) কালিকটের জামোরিণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। জামোরিণ কোচিন-রাজ্য আক্রমণ করিলে ভয়ার্ত নৃপতি মার্তণ্ডবর্ম্মার নিকট প্রতিকার-প্রার্থী হইয়াছিলেন। দি লানয় আক্রমণকারিগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কোচিনরাজ—রাজ্যের যে অংশ দি লানয় শত্রুকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা মার্তণ্ডবর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে উত্তরে আম্বা-কোট্টা এবং দাক্ষিণোর পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রায় এই সময়েই কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলির সহিত বিরোধ বাধে; এ সময়েও দি লানয় বিজয়লাভ করেন। নবাবের সৈন্যদল ও তাঁহার ভ্রাতা মহফুজ খাঁ পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত আঁকেতিল দ্যুপের দি লানয় সম্বন্ধে একটি কৌতূহলবহ কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে থাকিবার সময় দি লানয়ের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। সুতরাং কাহিনীটি সত্য হওয়াই সম্ভব। দি লানয় আঞ্জেঙ্গোর ইংরেজ কুঠীর জনৈক কর্মচারীর কন্যাকে বিবাহ করিতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু কন্যার পিতার এ বিবাহে সম্মতি না থাকায় ক্রুদ্ধ দি লানয় মার্তণ্ডবর্ম্মাকে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে প্ররোচিত করেন এবং আঞ্জেঙ্গো অধিকার করিয়া স্বীয় নির্বাচিতা বধূর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। Travancore State Manual গ্রন্থেও এ কাহিনীর উল্লেখ আছে। মাদামের পিতৃপরিচয় অবশ্য জানা যায় নাই। মাত্র সমাধিলিপিতে তাঁহার নাম মার্গারেট ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দি লানয়ের পুত্র জন ইউষ্টেসের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং ঘটনাটি তাহার পূর্ব্ব-বৎসর অর্থাৎ লানয়ের ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃত্তি গ্রহণের স্বল্পকাল পরেরই কথা।

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মার্তণ্ডবর্ম্মা পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দি লানয় নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। রাজাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। পূর্ব্বের মতই পরম বিশ্বস্ততার সহিত তিনি নবীন ভূপতি মার্তণ্ডবর্ম্মার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরাধিকারী রামবর্ম্মার সেবানিরত হইলেন। ত্রিবাঙ্কুরী ঐতি-হাসিকের ভাষায় বলিতে গেলে, রামবর্ম্মার পক্ষে আর কোন নূতনতর বিজয়লাভের অবকাশ ছিল না, কারণ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তাঁহার জন্য কিছু অবশিষ্ট না রাখিয়া সমস্ত কার্য্যই সমাধা করিয়া গিয়াছিলেন। সেজন্য লব্ধরাজ্য ব্যবস্থা-বিধান লইয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এ কার্য্যেও দি লানয় তাঁহার প্রধানতম সহায় ছিলেন। অতঃপর যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজ্যজয়ের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সামরিক তৎপরতার যুগ দেখা দেয়। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে রামবর্ম্মা দি লানয়কে "জেনারেল" পদসহ সৈন্যবিভাগের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষতা এবং নবাধিকৃত জনপদ-সমূহের রক্ষার ভার অর্পণ করেন। দেশরক্ষার উন্নতিবিধানকল্পে তিনি এই সময় সুবিখ্যাত "ত্রিবাঙ্কুর লাইনস" এবং উদয়গিরি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইতিহাসে দি লানয় "ত্রিবাঙ্কুর লাইনস"-এর নির্ম্মাতৃরূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। ভবিষ্যতে মালাবার অঞ্চল হইতে আক্রমণ নিরোধের জন্য কোচিনাধিপতি প্রদত্ত জনপদের উপর দিয়া পশ্চিমে সাগরবেলাভূমি পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত রাজ্যের সমগ্র উত্তরপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া এই সুদৃঢ় প্রাচীরনির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা ২০ ফুট চওড়া এবং উচ্চতায় ১২ ফুটেরও অধিক, উহার সম্মুখভাগ সুগভীর ও সুপ্রশস্ত খাত দ্বারা এবং মধ্যে মধ্যে দুর্গ ও অট্টালিকাযোগে সুরক্ষিত। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সুলতান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া এই প্রাচীর বিনষ্ট করিয়া ফেলেন এবং তাহা হইতে তৃতীয় মহীশূর সমরের উদ্ভব হয়। উত্তরের ঐ প্রাচীর ব্যতীত রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে দি লানয় দুর্গ, মৃচ্চা এবং প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করান। পশ্চিমের বেলাভূমেও শত্রুর অবতরণের অনুকূল স্থানসমূহে তিনি কামানের ব্যাটারি স্থাপন করিয়া উহা সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

ত্রিবান্দ্রম হইতে ৩৩ মাইল এবং পদ্মনাভপুরম্ হইতে আধ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে উদয়গিরি অবস্থিত। এখানে পূর্ব্ব হইতেই সামান্য একটি দুর্গ থাকিলেও সাধারণতঃ দুর্গ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা দি লানয়ের নির্ম্মিত। চারিদিকে গণ্ডশৈলমালা কর্তৃক স্বভাবতঃ সুরক্ষিত একটি স্থান তিনি ১৫ ফুট উচ্চ এবং ১২ ফুট প্রশস্ত একটি সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টন করেন। উহার আয়তন প্রায় ৩৫ একর ভূমি-পরিমাণ হইবে। ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি গণ্ডশৈল অবস্থিত। উহার উপরে আরোহণ করিলে চতুর্দ্দিকের সুন্দর একটি দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। উদয়গিরিতে অতঃপর দি লানয় তাঁহার হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করিলেন। এখানকার বিভিন্ন কারখানায় তাঁহার নিজের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে কামান, মর্টার, বন্দুক, বেয়নেট, তরবারি, গোলাগুলি বারুদ প্রয়োজনীয় সবকিছুই নির্ম্মিত হইত। এখনও এখানে তাঁহার কামান ঢালাইয়ের কারখানার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দীর্ঘকাল পরে পূর্ব্বোক্ত কর্ণেল ওয়েলশ উদয়গিরি দুর্গে দি লানয় নির্ম্মিত কামান এবং মর্টার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, সমসাময়িক যুগে ইউরোপে প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত তুলনায় ঐগুলিকে কোন অংশেই অপকৃষ্ট বলা চলে না।

সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসরকাল ত্রিবাঙ্কুরাধিপতিগণের সেবাকার্য্য করিয়া পরিণত বয়সে (১লা জুন ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) দি লানয় পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর ৫ মাস হইয়া-ছিল বলিয়া সমাধিলিপিতে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে, সম্ভবতঃ ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় তাঁহার মৃত্যু-সময়েই ফরাসী ভারতের তাৎকালীন গবর্ণর ল' দি লরিস্টন স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে তাঁহার উত্তরাধিকারী এদেশে নবাগত মার্কুইস দি বেলকুম্বের বুঝিবার সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের সম-সাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ লিখিয়া রাখিয়া

গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের কাহিনী-প্রসঙ্গে দি লানয় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—"মালাবার উপকূলে দি লানয় নামক একজন ফরাসী দীর্ঘকাল যাবৎ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কর্ম্মনিরত থাকিয়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার দলে বিভিন্নজাতীয় কয়েকজন ইউরোপীয় আছেন। ত্রিবাঙ্কুররাজ তাঁহাকে পূর্ণ প্রশ্রয় করিয়া থাকেন। তবে তাঁহার অনেক বয়স হইয়াছে।* লবিন্তঁ একথা যখন লেখেন হয়ত বা তাহার পূর্ব্বেই—তিনি সংবাদ পাইবার আগেই দি লানয় পরলোকগমন করিয়াছেন।

আজ প্রায় দুই শতাব্দী কাল পরেও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে তাঁহার নাম বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হয় নাই। নিজাম রাজ্যে "মুসারহিম" বা "মসিয় রেম"র মতই তথায় "ইষ্টাক সাহেব"-এর স্মৃতি আজিও লোকসমাজে জাগরূক রহিয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত আজিও রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ "বালিয়া কাপ্পিথান" অর্থাৎ বড় কাপ্তেনকে স্মরণ করিয়া থাকে।

প্রভু ত্রিবাঙ্কুরাধিপতির পরম বিশ্বস্ত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পরিচারক হইলেও দি লানয় যে তাঁহার স্বদেশীয়গণের প্রতি ঠিক কর্ত্তব্য পালন করেন নাই তাহা অস্বীকার করা যায় না। Adrian Moens প্রকৃতই বলিয়াছেন যে, দি লানয় ওলন্দাজদিগের প্রতি দুই বার বিষম অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন—প্রথমতঃ, তাঁহাদের সৈনিক অবস্থায় গোপনে পলায়ন করিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের পরম শত্রুর নিকট কর্ম্মগ্রহণ করিয়া। কিন্তু নবীন প্রভুর তিনি বরাবরই বিশ্বাসী অনুচর ছিলেন এবং তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক স্বজাতীয় ইউরোপীয়গণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণেও তাঁহার বাধে নাই।"

উদয়গিরি দুর্গাভ্যন্তরে একটি গীর্জ্জা আছে। এটিও দি লানয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক ইহার সংস্কারকার্য্য সাধিত হইয়াছে। কাজেই উহার আর সে পূর্ব্বকার ধ্বংসোন্মুখ দশা এখন দেখা যায় না। গীর্জ্জাসংলগ্ন চ্যাপেল মধ্যে লানয়ের নিজের, পত্নীর এবং পুত্রের কবর আছে। তাঁহার সমাধির উপরে প্রস্তরনির্ম্মিত স্মারক ফলকটি মনোরম তক্ষণশিল্পের সুন্দর নিদর্শন। নিম্নদেশে লাটিন এবং তামিল ভাষায় সমাধিস্থের পরিচয়াদি উৎকীর্ণ। লাটিন লিপির ইংরেজী অনুবাদ এইরূপ :

"Stand Visitor. Here lies Eustace Benedict de Lannoy who was the General in Chief of the troops of Travancore and for 37 years served the king with the utmost fidelity, who by the might of his arms and the dread which his name inspired subjugated all the kingdoms from Cainecolam to Cochin. He lived 62 years and 5 months and died on the 1st of June, 1777. May he rest in peace."

মাদাম দি লানয়ের সমাধিলিপির ইংরেজী অনুবাদ এইরূপ :

"Epitaph, here lies in this tomb lady Margaret de Lannoy, the faithful wife of the famous and invincible Benedict Eustace de Lannoy, who for the continuous large alms was fitly called by all the Mother of the Poor and is on that account and because of her other virtues worthy of everlasting remembrance. She died on the 11th September, 1782. May she rest in peace. Amen."

ইঁহাদের পুত্র জনের সমাধিফলকের লাটিন স্মারকলিপির অনুবাদও এখানে প্রদত্ত হইল :

"Through this sign do souls soar Heavenwards. Stop and listen, pious Christian and Wayfarer. Here lies an intrepid and brave soldier, General of the soldiers of the Kingdom of Travancore, John Eustace Benedict de Lannoy, born A.D. 1745 Wednesday, the 5th of the month of August, morally wounded in the expedition against Kalakkad in the Kingdom of Madura, he died of the wound in A.D. 1765, Saturday, the 11th of the month of September, comforted with all the sacraments of the Holy Roman Church. Farewell and neglect not to pray to the Almighty for his soul's salvation, as Christian charity demands. May he rest in peace. Amen."

এই সমাধিক্ষেত্রে আরও চারি জন ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের কবর আছে।* তন্মধ্যে পিটার ফ্লোরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ ব্যক্তি দীর্ঘ ৩৮ বৎসর কাল ত্রিবাঙ্কুর সেনাবিভাগে কর্ম্মনিরত ছিলেন। ১৬.৩.১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়সে তিনি মার্ত্তণ্ডবর্ম্মার কর্ম্মে প্রবেশ লাভ করেন।

ত্রিবান্দ্রম নগরে এক পুরাতন সমাধিক্ষেত্রে ক্লাদ ফ্লোরী নামক জনৈক ব্যক্তির পত্নী এলিজাবেথ ফ্লোরী নাম্নী জনৈক মহিলার কবর দেখা যায়। তেত্রিশ বৎসর বয়সে ২৬।১০.১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল। ক্লাদকে পিটার ফ্লোরীর কোন নিকটতম আত্মীয়, সম্ভবতঃ পুত্র, বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। এই সমাধিভূমে কাপ্তেন জোসে ডনকোড নামক একজন পর্ত্তুগীজ সৈনিকের কবর আছে। ঐ ব্যক্তি সুদক্ষ সামরিক ইঞ্জিনিয়র ছিল; ২৮।১০।১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪৭ বৎসর বয়সে উহার মৃত্যু হয়।

এলেপি নগরে ম্যানুয়েল বার্ণাডো ডালমেডা নামক একজন পর্ত্তুগীজ ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের কবর দেখা যায়। ঐ ব্যক্তি তথাকার গবর্ণর ছিল। তৎপূর্ব্বে বিশ্বস্ত পরিচর্য্যার জন্য পর্ত্তুগাল-অধিপতি উহাকে নৌ এবং সেনাবিভাগে কাপ্তেন পদ দিয়াছিলেন। এলেপি নগরীতে তাহার নিজের নির্ম্মিত গীর্জ্জাসংলগ্ন প্রাঙ্গণমধ্যে উহার সমাধি অবস্থিত। ৩১শে ডিসেম্বর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে উহার দেহান্ত হয়। শেষোক্ত স্মারকলিপি দুইটি পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত †

---

* L Etat Politique dous l'Inde en 1777, p. 148.

† *Travancore Archaeological Series*, Vol. II, Pt. I.

J. J. Cotton: *List of Inscriptions on Tombs and Monuments in the Madras Presidency*, Nos. 2207-13.

এইখানে মিশো দেলা কোঁবির নাম মনে পড়ে। তরুণবয়স্ক এই ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের সাহস, বীরত্ব এবং সামরিক কৃতিত্বের সকলেই উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার জীবনের আর সকল কথাই অজ্ঞাত। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে (১৭৯০-৯২ খ্রীষ্টাব্দ) ত্রিবাঙ্কুরী বাহিনীতে সৈনিকরূপে ইঁহার সন্ধান পাওয়া যায়। কৈম্বাটুরে প্রতিপক্ষের তাদৃশ সেনাবল নাই জানিয়া টিপু উক্ত নগর হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তখন ঐ স্থানে লেফটেনান্ট চামার্স নামক একজন ইংরেজ অফিসার পরিচালিত ক্ষুদ্র এক পল্টন তোপাসী এবং লা কোঁবির প্রায় দুই শত ত্রিবাঙ্কুরী সিপাহী অবস্থান করিতেছিল। শত্রুসেনার অগ্রগতির সংবাদ পাইয়া ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ মেজর কাপেজ কৈম্বাটুর দুর্গ অবরোধ প্রতিরোধে অনুপযুক্ত বলিয়া তথা হইতে যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান দ্রব্যাদি, যথা কামান, রসদ, গোলাবারুদ, পালঘাটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অথচ কৈম্বাটুর একেবারে পরিত্যাগ করা চলে না, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য অন্ততঃ কিছুকাল সেখানে থাকাও আবশ্যক এবং ভারী তোপখানাবিহীন শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া তিনি চামার্সকে তথায় রাখিয়া স্বয়ং পালঘাটে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আবশ্যক মনে করিলে পশ্চাৎপদ হইয়া তথায় যাইবার আদেশ চামার্সকে দেওয়া হইয়াছিল।

এই সময় চামার্স যথেষ্ট সাহস এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত অস্ত্রাগারে সন্ধান করিতে গিয়া তিনটি ছোট মেটো তোপ তিনি কতকটা কার্যক্ষম অবস্থায় পাইয়াছিলেন, ভগ্ন শকটসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া উহাদের জন্য তিনটি কামানবাহী শকট নির্মিত হইল। তখনকার দিনে বহুল প্রচলিত swivell অথবা jinjals কতকগুলি পাওয়া যায়। এগুলিকে তখনকার দিনের গাদা বন্দুক এবং ছোট কামানের মাঝামাঝি আগ্নেয়াস্ত্র বলা চলে। চামার্সের সৈন্যসংখ্যা মাত্র ১২০ জন ছিল। লা কোঁবির দুই শত ত্রিবাঙ্কুরীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ব্যক্তি ভয়ে পলাইয়াছিল। যাহারা রহিল তাহারাও বিষম শঙ্কিত এবং বিরক্ত চিত্তে পদে পদে দারুণ অবাধ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল।

১৩ই জুন মহীশূরী সেনা আসিয়া দুর্গ অবরোধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু দীর্ঘ দুই মাস কাল ধরিয়া চামার্স এবং লা কোঁবি মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ অসীম সাহস এবং বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিয়া উহাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অনন্তর শত্রুসেনা সম্মুখ আক্রমণে দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করিল। ১১ই আগষ্ট ঊষাকালে উহারা পাঁচটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইল, কয়েক ক্ষেত্রে উহারা প্রাকার-সমীপে আসিয়া পৌঁছিতেও সমর্থ হইয়াছিল। লা কোঁবি যে স্থানটি রক্ষা করিতেছিলেন তথায় বিষম হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কয়েকবার তিনি আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু সংখ্যায় বলীয়ান প্রতিপক্ষের তুলনায় তাঁহার সৈন্যসংখ্যা নিতান্তই নগণ্য, ক্রমেই শত্রুর আক্রমণে তাঁহারা পর্যুদস্ত হইয়া পড়িল, এমন সময় চামার্স-প্রেরিত একদল সৈনিক আসিয়া তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করে। দুর্গরক্ষিগণ বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল, উপর হইতে বড় বড় পাথর গড়াইয়া দিয়া তাহারা বিপক্ষের দুর্গপ্রাচীর গাত্রে মই লাগাইবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। সমস্ত দিন ধরিয়া এইভাবে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময়ে পালঘাট হইতে সাহায্যকারী সেনাদল লইয়া লেফটেনান্ট ন্যাস আসিয়া দেখা দিলেন। তখন হতোদ্যম মহিশুরী সেনা বাধ্য হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। সুযোগ বুঝিয়া লা কোঁবি সহসা দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া অতর্কিত আক্রমণে উহাদের কয়েকটি কামান অধিকার করিয়া লইলেন।

ভগ্নপ্রাকার-সংস্কার, রসদসংগ্রহ প্রভৃতি আবশ্যক কার্যসমূহ সমাধা হইবার অল্পকাল পরেই সুপ্রসিদ্ধ মহীশূরী সেনাপতি কমরউদ্দীন পরাক্রান্ত নূতন সৈন্যদলসহ আসিয়া নবীন উদ্যমে দুর্গ অবরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এদিকে পালঘাট হইতে মেজর কাপেজও সাহায্যের জন্য আহূত হইয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যপথে কমরউদ্দীনের হস্তে পরাজিত এবং বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। যখন কোনদিকে কোন আশাই রহিল না, তখন অবরুদ্ধ সৈনিকগণ অগত্যা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। চামার্স এবং ন্যাস উভয়ে বন্দীভাবে শ্রীরঙ্গপত্তনে নীত হইয়াছিলেন, কিন্তু লা কোঁবি সম্বন্ধে আর কোন কথাই জানা যায় না।

ত্যাগ

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

মহেশখালির সদানন্দবাবু আজ দীর্ঘ পনের বৎসর হইতে মহেশখালি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হইয়া আছেন। ভোটে প্রত্যেক বারই সসম্মানে জয়লাভ করিয়া, সদস্যদের ভোটে উনিই প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই দীর্ঘ পনর বৎসর একাদিক্রমে সুনামের সঙ্গে প্রেসিডেন্টগিরী করিয়া আসিতেছেন। ইহাতেই বোঝা যাইবে যে, তাঁহার যেমন সুনাম আছে, তেমনি আছে ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কপালখানিও ভাল। সদানন্দবাবু তাঁহার বোর্ডের সেক্রেটারী, কয়েকজন চৌকীদার, দফাদার লইয়া মহেশখালি ইউনিয়ন বোর্ডে বিশেষ প্রতাপে ও কায়েমিভাবে আধিপত্য করিতেছেন। নিজস্ব জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তি আছে, কিছু প্রজাবিলি মহালও আছে। সংসারে অভাব নাই, অনটন নাই। ধান, মুগ, কলাই, ছোলা, আলু, আখের গুড় এ সবই জমি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া নারিকেল-বাগান, আম-কাঁঠালের বাগান, বাঁশ-বাগান আছে, তাহারও আয় যথেষ্ট। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিষয়-সম্পত্তির তদারক করিয়া, গ্রাম্য ঝগড়া-বিবাদ মিটাইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ-কর্ম্ম সারিবার পর সন্ধ্যাবেলায় বন্ধু-বান্ধবসহ বহু কলিকা তামাক ও বহু কাপ চা উড়াইয়া দিয়া দিব্য আরামে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সময় কাটাইয়া দেন। লোকে খাতির করে, চৌকীদার, দফাদার সেলাম জানায়, থানার দারোগাবাবুরা মাঝে মাঝে আসিয়া সিগারেট, চা, জলখাবার খাইয়া নানা আলাপ করিয়া যান। কখনও কখনও স্বয়ং মহকুমা-শাসক আসিয়া বোর্ড পরিদর্শন করিয়া যান। সদানন্দবাবু পান, ডাব, চা, ভাল মিষ্টি খাওয়াইয়া, বহুবার সেলাম বাজাইয়া গদগদকণ্ঠে হুজুর হুজুর বলিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি পান ও প্রাণে বেশ আনন্দ অনুভব করেন।

ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে, সাদা সাহেবের পরিবর্ত্তে এখন দেশীয়েরা রাজাসনে বসিয়াছেন। ইহাতে সদানন্দবাবুর বিশেষ কিছু বলিবার নাই, তবে তাঁহার একটি বৃহৎ আশায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সদানন্দবাবু ইতিপূর্ব্বে বহু সাদা সাহেবকে বিশেষভাবে তোয়াজ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহকুমা হাকিম প্রায়ই খাটি সাহেব কিংবা ট্যাস ফিরিঙ্গী আসিতেন। সদানন্দবাবু যদিও বিশেষ কিছু ইংরেজী ভাষা জানিতেন না, তবুও 'ইয়েস-নো' বলিয়া হাত দোলাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া, বহু বার আ-ভূমি নত হইয়া সেলাম বাজাইয়া ও বন্ধুবর হলধর দে-কে দোভাষীরূপে খাড়া করিয়া মনোগত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন। সাহেব হাসিয়া সদানন্দবাবুর হাত ধরিয়া ঝাকুনি দিতেন। ইহাতে সদানন্দবাবু যেন স্বর্গীয় আনন্দ ও বিমল শান্তি অনুভব করিতেন। সুখের আবেশে দুই চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইত, পুষ্ট গোঁফজোড়াটি ফুলিয়া উঠিত—হাসি যেন দুই চোখ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিত। তার পর সাহেব চলিয়া গেলে সেই ধূলিময় বঙ্কিম মেঠো পথে—যে পথে সাহেবের মোটরগাড়ী চলিয়া গিয়াছে সেই দিকে, ধ্যানস্থের মত চাহিয়া পিঠে সাহেবের হাতের সোহাগের চাপড় যেন অনুভব করিতেন। কিছুক্ষণ পর সমবেত সদস্যদের, চৌকীদার ও গ্রামস্থ অন্যান্য লোকেদের দিকে এমনভাবে তাকাইতেন যেন ভাবখানা এই—তোমরা দেখ, আমি যে-সে কেউকেটা ব্যক্তি নই। স্বয়ং হাকিম পিঠ চাপড়াইয়া হাসিয়া হাসিয়া হাত ঝাঁকুনি দিয়া গিয়াছেন।

যে সমস্ত লোকজন এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া সভয়ে সাহেবকে দেখিতেছিল, তাহারা এতক্ষণে কাছে আসিয়া সদানন্দবাবুকে বলিত—সাধে কি সাহেব আমাদের বাবুকে ভালবাসেন—বাবুর গুণ কত—আর কত ক্ষমতা, কালিকলমের জোর কত বাবুর।—সদানন্দবাবু আত্মপ্রসাদে একটু হাসিয়া উঠেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরেই সদানন্দবাবুর একটি বড় আশা সমূলে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। রায়সাহেব খেতাবটির দিকে বহুদিন হইতে লুব্ধ নয়নে সদানন্দবাবু তাকাইয়া ছিলেন। ইহার জন্য আজ পর্য্যন্ত বহু খরচও করিয়াছেন। পূজার সময়, বড়দিনের সময়, ইংরেজী নববর্ষে ভেট লইয়া এস-ডি-ও এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় গিয়াছেন। তাঁহারা বহুবারই আশ্বাস দিয়াছেন, আগামী বার নিশ্চয়ই তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট রায়সাহেব খেতাবে ভূষিত করিবেন। এই রায়সাহেব খেতাবটি পাইবার জন্য সদানন্দবাবু লালায়িত ও উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন, কিন্তু কালের কি কুটিল চক্রান্ত! কোথা হইতে কি হইয়া গেল। দেশে যেন প্রলয়ঝড় আসিল। সমস্তই ওলট-পালট হইয়া গেল। সদানন্দবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া শেষে সামলাইয়া লইলেন। তার পর আবার সময়ের সহিত, কালের সহিত মানাইয়া লইলেন। বুঝিলেন, রায়সাহেব খেতাব না পাওয়ার দুঃখ ভুলিয়া যাইয়া বর্ত্তমানের প্রভুদের সেবা, যত্ন ও সন্তুষ্ট করিলে ভাল ছাড়া মন্দ হইবে না। চাই কি, রায়সাহেবের মতন একটা কিছু খেতাব জুটিবেই। তবে নামের হেরফের অদলবদল হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব ভালরূপ সেবা করিলে অবশ্যই উপাধি জুটিবার সম্ভাবনা। সে বিষয়েও ত্রুটি হইল না। এতদিন পর্য্যন্ত যে লোকটি স্বদেশী করিয়া, বার বার জেল খাটিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে বহু বার বহু কথা সদরে গোপনে সদানন্দবাবু কিছু কিছু বলিয়া আসিতেন। কিন্তু এখন আর সেই সময় নাই। এখন চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। তাই, এখন সেই জেলখাটা লোকটিকে ডাকিয়া চা, পান খাওয়াইয়া, দিনকতক গভীর ভাবে তাহার সহিত কি যেন পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর, কার্য্যের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। লোকে

যাত্রা — ফোটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

"ধানকাটা হ'ল সুরু..." — ফোটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

নিউদিল্লী ষ্টেশনে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো এবং ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণন

দিল্লীর ডিলাইট সিনেমায় চীনের সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনের একদল নৃত্যশিল্পী কর্তৃক নৃত্যাভিনয়

জানিল, প্রেসিডেন্ট সদানন্দবাবু মহেশখালি কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী হইয়াছেন।

রাত্রে আহারাদির পর পান চিবাইতে চিবাইতে গৃহিণী কাত্যায়নীকে কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী পদপ্রাপ্তির শুভ সংবাদ দিতেই কাত্যায়নী চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, অ্যাঃ—কংগ্রেসের কি হলে—সিকরিটরী? ও মা—ওতে জেলে নিয়ে যাবে যে—

অমায়িক ভাবে হাসিয়া সদানন্দ বলিলেন, আরে না। তুমি দেখছি কিছুই খবর রাখ না। ইংরেজ কি আছে নাকি এদেশে? তারা ত সাগর পার হয়ে গিয়েছে। এখন ত কংগ্রেসেরই রাজত্ব। আর এখন আমি তাদেরই লোক—

কাত্যায়নী মুখে গোটা দুই পান ও খানিকটা জর্দা ফেলিয়া দিয়া বলেন, বটে। এই দেখ—কোন খবরই রাখি না। তা ওরা—এমনি এমনি চলে গেল। বেশ ত ছিল বাপু—আর তোমরা যাই বল—ওদের মত তোমাদের সাধ্যি কি রাজত্ব চালাও। তোমরা ধুতি কামিজ পরে, পান চিবুতে চিবুতে কি নাটি তরোয়াল ঘুরিয়ে যুদ্ধ করতে পারবে—তা ত মনে হয় না। লালমুখো সাহেব—বাব্বাঃ যেমন ওদের চলন—তেমনি সব কাজের। আমি দোতলার জানালা দিয়ে হাকিম সাহেবদের ত দেখেছি। কি লম্বাচওড়া দেহ—আর গর গর করে ইংরিজী বলছে। চলন বলন দেখলেই ভয় লাগে।

সদানন্দবাবু এই অজ্ঞ নারীর সহিত আর বিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন না। যে লোক ভাবে, এখনও ইহা ইংরেজদের রাজত্ব—এখনও মহারাণী রাজত্ব করিতেছেন—তাহার সহিত কথা বলাও যা, আর দেওয়ালের সহিত আলাপ করা একই ব্যাপার। সদানন্দবাবু এক মনে তামাক টানিতে থাকেন। এক সময় কাত্যায়নী পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, ওরা গেল ত বুঝলাম, কিন্তু কি নিয়ে থুয়ে গেল। কাত্যায়নী বিরক্ত হইয়া বলেন, খালি গড় গড় করে তামাক টানবে ত কি করে একটা কথা শুনবে। তামাকের ধোঁয়ায় যে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। গোটাদিন ত বাইরে বাইরে থাক। এই সময় যে দু-একটা কথা বলব, তাও কান দেবে না। ধন্যি কপাল করে এসেছিলাম।

কাত্যায়নী সশব্দে পাশ ফিরিয়া শুইতেই সদানন্দ বাবু বলেন, এই দেখ বলি কে কি নিয়ে থুয়ে গেল, তাই বল না। কি বিপদ—

ঝঙ্কার দিয়া, কাত্যায়নী বলেন, তোমার আর বিপদ কি? যত পোড়া অদেষ্ট আমারই। ভূতের মতন সারাদিন খেটেই যাচ্ছি। সকাল থেকে বিশ বার চা করা, ভাত রান্না, খাবার করা আছে। তার ওপর আজ এ আসছে—দাও চা—দাও খাবার। আজ হাকিম আসছেন, দারোগা আসছেন—সে কে জানে দিন বারটা—আর রাত দুটো। হুকুম হলেই, মিনি মাগনার দাসী বাঁদী রয়েছি—ফরমাস খাটছি—

সদানন্দবাবু ব্যস্ত হইয়া বলেন, কেন হ'ল কি তোমার। আজ বুঝি ঝি বেটী কাজ করতে আসে নি। না—কালই রাখলার মাকে রাখতে হবে। আমি সাত কাজ নিয়ে ঘুরি, বাড়ীতে একটা ঝি, দুটো চাকর, তবুও কাজের ব্যবস্থা হয় না। সব ফাঁকি বাজ—যে দিকে না দেখব—অমনি সব কাজের জট পাকিয়ে ব[সে] থাকবে—

কাত্যায়নী বলিয়া ওঠেন, কেন মিথ্যে বকর বকর করছ। [কে] বলল তোমাকে যে ঝি কাজে আসে নি—চাকরেরা কাজ করে না[?] তাদের কাজ তারা ঠিকই করছে। বলি তারা ত রান্নাঘরে বসে চ[া] জলখাবার লুচি, মাছের কালিয়া আমায় রেঁধে দেবে না। না ভা[ত] ডাল রেঁধে দেবে। সংসারে না একটা ছেলে—না একটা মেয়ে[—] দুটো ত প্রাণী—কিন্তু বাইরের দশ গণ্ডা লোকের লুচি,চা জলখাবা[র] যোগাতে যোগাতে প্রাণান্ত হয়ে গেল। কাল থেকে আমি আ[র] কিছু করতে পারব না। কি সুখে সংসারে খাটব। শুধু ভূতে[র] বেগার খেটে কি লাভ? নিজের পেটের যদি একটা কুচোকাচ[া] সন্তান থাকত—তবুও বুঝতাম। তা ত হ'ল না—ভগবান যে একচোখো—সে মিনষের যে চোখ নেই—কানা—

সদানন্দবাবু হুঁকাটি একপাশে রাখিয়া বলেন—ও এই। ত[া] দেখ, ভগবান যদি আমাদের সন্তান না দেন—তা কি করতে পারি বল। এতে আর দুঃখ করে কি হবে—।

কিন্তু কাত্যায়নীর মনে হয়, ইহা কাহারও দোষ নয়। দোষ যদি থাকে, তে সে ভগবানের। কেন, তাহাদের একটি সন্তান দিলে কি ক্ষতি হয়। কত দরিদ্র—কত অনাথার ঘরে কত সন্তান তাহারা খাইতে পায় না—আশ্রয় পায় না। কোলের ছেলে একটু দুধ পায় না, কেহ এক মুঠা ভাত পায় না। আর তাহাদের ঘরে কিসের অভাব? এই বিষয়-সম্পত্তি, বাগান-বাগিচা-পুষ্করিণী, ক্ষেত-খামার—গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু—কিছুই ত অভাব নাই। কত মানসিক—কত পূজা-অর্চনা—কত সকাতরে ডাকিয়াও ভগবানের দয়া নাই।—কাত্যায়নী নীরবে অশ্রু মোচন করিতে থাকেন। রাত্রি বাড়িতে থাকে—দূরে বৃহৎ আমগাছটির কম্পমান শাখান্তরাল হইতে বৃহৎ চাঁদখানিকে দেখিতে পাওয়া যায়। বহু দূর হইতে চৌকিদারদের গম্ভীর হাঁক নিস্তব্ধ নিশীথের বাতাসে ভাসিয়া আসিতে থাকে—নিশাচর পাখীর দল পাখার শব্দ করিতে করিতে দূরে উড়িয়া যায়। সদানন্দবাবু পাশ বালিশ আঁকড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়েন। কিন্তু এই নিস্তব্ধ নিশীথে, বহুমূল্য খাটের উপর সুকোমল দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শুইয়াও, কাত্যায়নী যেন শত কণ্টক জ্বালা অনুভব করিতে থাকেন। বার বার মনে হয়, তাঁহার নারী-জন্ম বৃথা। এই সংসার—এই জীবন—সবই বৃথা—সবই মিথ্যা

সদানন্দবাবু বাহিরে বাহিরেই থাকেন। নিজের বিষয়-সম্পত্তির তদারক—জমি-বাগান-পুষ্করিণীর খোঁজ-খবর লওয়া—মহাজনের খাজনা আদায়পত্র করা—এ ছাড়া গ্রামা বিবাদ-বিসম্বাদ মিটানো ও তদুপরি ইউনিয়ন বোর্ডের বহু কাজ সারিয়া, যেটুকু সময় পান, তাহা বন্ধু-বান্ধবসহ, সন্ধ্যাবেলায় চা তামাক ও গল্পের ভিতরই কাটিয়া যায়। নিঃসন্তান হওয়ায় যে দুঃখ, বা যে বিরাট বেদনা

থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার মনেও বিশেষ হয় না, বেশ নিশ্চিন্তে হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটাইয়া দিতেছেন। কিন্তু অন্তঃপুরমধ্যে যে, একজন দিবানিশি, অন্তরে অন্তরে তুষানলে দগ্ধ হইতেছে, সে-দিকে চোখও নাই বা কানও নাই।

সেদিন রবিবার—বেলা দশটার সময় একজন ভিখারিণী আসিয়া হরেকৃষ্ণ বলিয়া দাঁড়াইয়া, খঞ্জনী বাজাইয়া গান জুড়িয়া দিল। গান শেষ হইলে, ভিখারিণী হাঁকিল—জয় রাধে, চাট্টি ভিক্ষে দিন্ মা—। কাত্যায়নী এক বাটি চাল লইয়া, তাহার ঝুলিতে ঢালিয়া দিতেই ভিখারিণী বলিল, আপনি বুঝি গিন্নীমা—

কাত্যায়নী বলিলেন—হাঁ। ভিখারিণী বলিল, ছেলেপুলে কিছু দেখছিনে মা—ক'টি ছেলেমেয়ে মা আপনার—

কাত্যায়নী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—আমার? ভগবান দেন নি মা।...

ভিখারিণী চারিদিকে তাকাইয়া, বৃহৎ দোতলা বাড়ী—বারান্দা—ঘর দেখিয়া বলিল, আহা, এই এমন বাড়ীঘর, এমন বিষয়-সম্পত্তি—একটিও ছেলে মেয়ে নেই মা। হরি, হরি—তবে? তবে যে সবই বৃথা মা? সন্তান সে যে কিশোর গোপাল, ননীচোরা গোপাল। সে গোপাল বিনা যে সবই অন্ধকার মা। ভাল করে ডাকুন মা—ডাকুন। কাঁদতে হবে—কাঁদলে তবে সে আসবে—নইলে নয়।—ভিখারিণী খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। আর কাত্যায়নী তাহারই গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন পলকহীন নেত্রে।

দুপুরে প্রতিবেশিনীরা বেড়াইতে আসে। সংসারের নানা সুখ-দুঃখের কথা বলে—কেহ গল্প করে—কেহ বা পানের বাটা লইয়া, পান সাজিতে বসে। সেদিন সকলে বেড়াইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অপরিচিতা এক সুন্দরী তরুণী—তাহার কোলে বৎসরখানেকের শিশু।

কাত্যায়নী বলিল, রাঙা খুড়িমা এই মেয়েটি কে? চিনতে পারলাম না ত—

রাঙা খুড়ীমা বলিলেন, ও আমার বোন-ঝি, তরুর মেয়ে। বিয়ে হয়েছে শান্তিপুরে—মস্ত লোক। জামাই রেলে কাজ করে। কতদিন তরুকে লিখেছি, পরে নিরুকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিস। জামাইকে লিখেছিলাম, জামাই কাল রেখে গিয়েছে।

কাত্যায়নী নিরুর দিকে তাকাইয়া থাকেন। সুন্দরী তরুণী মেয়েটি—উনিশটি বসন্তের মোহময় স্পর্শে পরিপূর্ণযৌবনা। সুন্দর খোকাটি পারিজাত ফুলের মতই যেন প্রস্ফুটিত হইয়া, মায়ের কোল আলো করিয়া রহিয়াছে। কাত্যায়নী অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকেন। অমনি সুন্দর অমনি কচি নবনীর মত কোমল স্নেহের পুত্তলি কি তাহার কোল আলো করিয়া আসিবে না! কচি কচি হাতে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, বক্ষের সঞ্চিত ক্ষীরসুধা পাপড়ির মত কোমল দুইখানি লাল ঠোঁটে চুষিয়া চুষিয়া খাইবে। দুই নয়নে কাজল দিয়া কপালে টিপ পরাইয়া স্নেহের ধনকে বক্ষে চাপিয়া ধরিবেন। কাত্যায়নীর সমস্ত দেহ যেন আনন্দরসে মূর্চ্ছিত হইয়া যায়, একটা বাৎসল্যরসের প্রবল স্রোতোচ্ছ্বাস, দেহের সমস্ত শিরা উপশিরায় দ্রুত প্রবাহিত হইয়া, সবকিছুকে এক অনাবিল স্নেহরসে ভাসাইয়া দেয়। নিজেকে শান্ত করিয়া, কাত্যায়নী দুই ব্যগ্র হাতে নিরুর কোল হইতে শিশুকে কোলে লইয়া, ক্ষুদ্র সুকোমল দেহ নিজ উদ্বেলিত বক্ষে নিবিড় ভাবে চাপিয়া ধরিয়া, গায়ে মাথায়, কপালে, দুই নরম গালে চুম্বনের সহস্র স্নেহরাগ, অফুরন্ত সুধা ঢালিয়া দেন। যে বাৎসল্যস্রোত এত দিন নিরুদ্ধ ছিল—শুকাইয়া গিয়াছিল, আজ যেন সেই শুষ্ক খাতে হঠাৎ কোথা হইতে দুরন্ত জোয়ার আসিয়া দুই কূল ভাসাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। কাত্যায়নীর মনে যে গান যে সুর বিলুপ্ত হইয়াছিল—আজ যেন কেহ সেই জীবন-তন্ত্রীর উপর অঙ্গুলি চালাইয়া, সেই বিগত দিনের হারানো সঙ্গীতকে নূতন ভাবে বাজাইয়া দিল। কাত্যায়নীর মনে সন্তান-পরিবৃত গৃহের একটা সুখময় চিত্র উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল। কিন্তু হায় সেই দিন চলিয়া গিয়াছে—আজ সবই ফুরাইয়াছে—সবই গিয়াছে। কাত্যায়নী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শূন্যপানে চাহিয়া থাকেন। আজ বহুদিন পর কাত্যায়নীর মনে হইল, সিন্দুকপোরা দামী দামী অলঙ্কার বাক্সবোঝাই কত নীলাম্বরী কত রঙীন সাড়ী এগুলির কোন মূল্য নাই। সবই মিথ্যা, সবই অকিঞ্চিৎকর। এই মিথ্যা জীবনের মাঝে ঐ সব সাজপোশাক গহনা-গাঁটি এগুলি অনর্থক বোঝাস্বরূপ।

সংসার পূর্ব্বের মতই চলিতে থাকে। বাহিরের ঘরে লোক-জনের চা জলখাবার, রান্নাবান্না, ঘরসংসার তদারক করা, ঘর একবারের জায়গায় পাঁচবার মুছিয়া, যেখানকার জিনিষ সেইখানে গুছাইয়া পরিপাটি রাখা, এ সবই কাত্যায়নী নিজের হাতে করেন। ঝি-চাকরদের বিশ্বাস নাই, চুরি করিতে পারে, ভাঙ্গিতে পারে বা যথাস্থানে ঠিক ঠিক জিনিষ না রাখিয়া আগোছাল ভাবে স্তূপাকারে রাখিয়া দিবে। কাঁচের আলমারীতে জাপানী পুতুল—কৃষ্ণনগরের মাটির খেলনা—চিনামাটির নানা বাসন, চায়ের কাপ, কাঁচের বোয়েম, পাথরের জিনিষপত্র সাজানো আছে। সন্তানহীনার ঘরে কোন বস্তুই অপচয় হয় না—ভাঙে না, নষ্ট হয় না। কবেকার সব জিনিষ আজও নূতনের মতই রহিয়াছে। কাত্যায়নীর পোষা বিড়ালটি, পায়ের কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, পায়ে পায়ে ঘোরে, মিউ মিউ করিয়া ডাকিতে থাকে। কাত্যায়নী বিড়ালটিকে আদর করেন, মাছ দুধ খাইতে দেন—রাত্রে নিজের বিছানার একাংশে স্থান দেন। একমুহূর্ত্ত না দেখিলে অস্থির হইয়া পড়েন। বিড়ালটিকে বিছানার একাংশে দেখিয়া, সদানন্দবাবু মাঝে মাঝে একটু-আধটু পরিহাস করেন। মন ভাল থাকিলে মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নী তাহার জবাব দেন। কখনও-বা চুপ করিয়া থাকেন। কিন্তু কয়দিন হইতে, কাত্যায়নীর যেন একটু ভাবান্তর দেখা গিয়াছে। অবশ্য কাজ-কর্ম্মে শৈথিল্য নাই—যথাস্থানে সব জিনিষই থাকে। সদানন্দবাবুর চ্যবনপ্রাশ, কাশির জন্য পাঁচন, ও খাওয়ার পর হজমের ঔষধ, পান

মশলা প্রভৃতি যথারীতি হাতের কাছে আগাইয়া দেওয়া, এসবই ঠিক আছে। কিন্তু তবুও যেন ইহারই মধ্যে, কাত্যায়নীর সামান্য ভাবান্তর, একটু অন্যমনস্কতা দেখা গিয়াছে। সদানন্দবাবু তেমন বুঝিতে পারেন না—তবে দেখেন কথাবার্ত্তায় ঠিক পূর্ব্বের সেই উৎসাহ, পরিহাসপ্রিয়তা, কার্য্যে ক্ষিপ্রতা, তেমন নাই—আর মুখখানিও যেন সব সময় একটু বিমর্ষ—যেন কিসের একটা ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

খাইতে বসিয়া সদানন্দবাবু বলিলেন, তোমার শরীর কি ভাল যাচ্ছে না?

হাতের পাখা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কাত্যায়নী উত্তর দেন—তবু ভাল যে শরীরের কথা জিজ্ঞেস করলে—নাঃ, ভালই আছি।

সদানন্দবাবু বুঝিলেন ইহা রাগের কথা, তাই পুনরায় বলিলেন, উঁহুঃ—ওবেলা বগলাকেই বলি। এসে পরীক্ষা করে দেখুক—

—থাক আর বগলাকে ডাকতে হবে না। বুকে কল বসিয়ে, জিভ টেনে, নাড়ী টিপে ও আর কি বুঝবে? শেষে এক শিশি তেতো ওষুধ পাঠিয়ে দেবে ত।

সদানন্দবাবু বলিলেন, বাঃ, বগলা পাসকরা ডাক্তার। ও বুঝবে না তো কি বদ্যি ডাক্তার বুঝবে নাকি? না-না বগলাকেই বলি। রোগের প্রথম থেকেই চিকিচ্ছে করা দরকার। রোগ হয়ে ভোগান্তি সয়ে ওষুধ খাওয়ার চেয়ে, রোগ হওয়ার আগেই ওষুধ খাওয়া, সাবধান থাকা দরকার। আর না হয়, কবরেজ মশাইকে বলি। ওবেলা বৈঠকখানায় ওঁরা দু'জনই ছিলেন, রাত্তেও রোজই দু'জন দু'তিন ঘণ্টা করে থাকছে। তা মুখ ফুটে ত কিছু বলবে না। মেয়েদের স্বভাবই এই—দাঁতে দাঁত দিয়ে কষ্ট সহ্য করব সেও আচ্ছা—তবুও বলব না।

কাত্যায়নী বিরক্ত হইয়া বলেন, কবরেজ, ডাক্তার আমার কি হবে। আমার কি সান্নিপাতিক বিকারে ধরেছে নাকি। যমে যখন ডাকবে, বুঝবো বাঁচলাম। ত পোড়া যমও ত ডাকে না।

অবাক হইয়া, সদানন্দবাবু বলিলেন, বাঃ—হ'ল কি—অ্যাঁঃ—

কাত্যায়নী কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেলেন। সদানন্দবাবু দুধে চুমুক দিয়া, আপন মনেই বলিলেন, নাঃ ভাল বিপদ—মেয়েছেলের মন—কি যে করে আর কি যে ভাবে, তা ওরাই জানে।

অন্য ঘর হইতে কাত্যায়নী বলিলেন, উঠ না যেন। কাল ক্ষীরের সন্দেশ করেছি, নিয়ে যাচ্ছি—

সদানন্দবাবু বলিলেন—না—না—মিষ্টি ফিষ্টি আমার ভাল লাগে না।

না—না উঠবে না। মাথা খাও বলছি, উঠবে না।—সদানন্দ বাবুর আর উঠিবার সাহস হইল না। কাত্যায়নী একখানি রেকাবিতে করিয়া, চারটি বড় বড় ক্ষীরের সন্দেশ পাতের কাছে রাখিয়া দিলেন। সদানন্দ বাবু আড়চোখে কাত্যায়নীর মুখের দিকে তাকাইয়া, নীরবে গম্ভীর হইয়া সন্দেশ চিবাইতে লাগিলেন।

সদানন্দ বাবুর সান্ধ্য-সভায় অনেকেই আসেন। এখানে আসিলে, লোকের লাভ ছাড়া লোকসানের ভয় নাই। কলিকা কলিকা ভাল আনোয়ারপুরী তামাক, দুই এক কাপ চা, তাস, দাবা খেলা ও তৎসহ নানা মুখরোচক গাল-গল্প হয়। মাঝে মাঝে সরকারী খবরাখবর—বোর্ডের নানা প্রসঙ্গ—ও অন্যান্য বৈষয়িক সমস্যার সমাধান সবই এখানে হইয়া থাকে। তাই নিয়মিত আড্ডাধারীর সহিত আবার এমনি দুই একজন আসিয়া আড্ডা জমান। বিপিনবাবুও মাঝে মাঝে আসেন। গ্রামের মধ্যেই বিপিনবাবুর একখানি গাঁজা আফিঙের দোকান আছে। বিপিনবাবু কপালে লাল চন্দনের বড় ফোঁটা কাটিয়া, হাতে বাঁশের মোটা লাঠিগাছটি লইয়া, 'জয় তারা তারা' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে আসন গ্রহণ করেন। বিপিনবাবু ধার্ম্মিক ব্যক্তি কিনা, তা বলা কঠিন। তবে যেখানেই যান, সেইখানেই ধর্ম্মালোচনা করেন। উনি ইহকাল পরকাল—বেদ-বেদান্ত—গীতা-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা এমন গুরুগম্ভীর ভাবে চালাইয়া যান যে, তখন বিপিনবাবুর সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, তিনি একজন মহাপুরুষ। ওঁর জীবিকা হিসাবে ঐ আবগারী দোকানখানি যে স্রেফ মায়ার ব্যাপার এ সম্বন্ধেও আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিপিনবাবু চা তামাক খাইয়া, আজও তেমনি পদ্মাসনে বসিয়া, মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া ধর্ম্মালোচনাই করিতেছিলেন। শ্রোতা হিসাবে অনেকেই আছেন। সদানন্দবাবু নীরবে শুধু তামাক টানিতেছেন। বিপিনবাবু সমবেত শ্রোতার মুখের দিকে চাহিয়া, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে বলিতে বলিতে, জন্মান্তর রহস্য ও মৃত্যুর পর যে মানুষের ভৌতিক দেহ থাকে ও মানুষকে যে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং মৃত্যুটা যে দৈহিক রূপান্তর অর্থাৎ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধানের মত, ইত্যাদি বহুবিধ রহস্যময় গুহ্য কথা ব্যক্ত করিয়া, নিজের দম লইতে ও অপরকে এই কঠিন গুরুপাক গুহ্য কথাগুলি পরিপাক করিবার জন্য কিছু সময় দিয়া, তামাক টানিতে লাগিলেন।

এই ফাঁকে বগলা ডাক্তার বলিলেন, আচ্ছা বিপিনবাবু, আপনি ত অনেক কিছু জানেন—এখন সদানন্দদার যে ছেলেপুলে হ'ল না—তার একটা বিহিত কি কিছু হয় না?

তামাক টানিতে টানিতে বিপিনবাবু বলিলেন—হয়। কিন্তু তোমাদের ঐ বিলিতী ডাক্তারী কেতাবে কি বলে—

বগলা ডাক্তার বলিলেন, ডাক্তারী মতে হওয়ার সম্ভাবনা নেই—তবে কিনা—

তবে কি?

মানে, সদানন্দদা যদি আর একটা বিয়ে করেন তবেই। আমি বলি বিয়ে ওঁর করাই উচিত। নইলে, এই সংসার, বিষয়-সম্পত্তি কে ভোগ করবে বলুন। আর তা ছাড়া বাপ মার নামই থাকবে না, লোপ পেয়ে যাবে।

সদানন্দবাবু এতক্ষণে কথা বলিলেন। হুঁকা হইতে কলিকাটি

মামাইরা কহিলেন, কি যে তোমরা বল। এই বয়সে আবার বিয়ে। বুড়ো বয়সে একটা কচি খুকী বিয়ে করে, জালাতন হই আর কি—

বগলা ডাক্তার বলিলেন—আহা কতই বা আপনার বয়স হ'ল? বড়জোর বছর বিয়াল্লিশ। পুরুষ মানুষের বিয়াল্লিশ বছর আবার একটা বয়েস। ঐ বয়সে সাহেবদের বলে বিয়েই হয় না। আর কচি খুকীই বা বিয়ে করবেন কেন? আজ কাল বড় বড় মেয়ে, ঘরে ঘরে। আপনি মত করুন, আমরা কনে খুঁজে দিচ্ছি।

সদানন্দবাবু বলিলেন, আরে আমার সময় কোথায়? এখন নূতন করে ওসব ঝঞ্ঝাট—কি পোষায়। তবে, ভাবি মাঝে মাঝে, আমরা চোখ বুজলে, এই সাজানো সংসার কে ভোগ করবে? কিন্তু—উপায় কি? আর—না—না—স্ত্রী জীবিত থাকতে আবার বিয়ে? ছিঃ—লোকে ভাববে কি?

আমাদের মুখ দিয়া যে কথা বাহির হয়, তাহাই যে সব সময় সত্য, এ কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই বা তাহা বিশ্বাস-যোগ্যও নয়। মোট কথা, মুখের কথাটাই চরম সত্য নয়। তা যদি হইত, তবে এই সংসারটা বড়ই একঘেয়ে হইয়া যাইত।

সদানন্দবাবুর বিবাহে অনিচ্ছাটা যে সত্যই অনিচ্ছা নয়—বরং রীতিমত ইচ্ছা, একথা একমাত্র সদানন্দবাবুই জানিতেন। অন্যের পক্ষে ধরা কঠিন। কিন্তু সোজাসুজি ইচ্ছাটা সরল ভাবে প্রকাশ হইলে বিপদ আছে। অন্যে, কে কি মনে করিবে সেটা বিশেষ কিছু নয়। অপরেরা বরযাত্রী যাইয়া ও বৌভাতে লুচি পোলাও সন্দেশ খাইয়া বেমালুম ভুলিয়া যাইবে, বরং বৎসরখানেকের মধ্যে আও অন্নপ্রাশনের আর একটা জমাটি ভোজের আশায় সকলেই মনে মনে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়াই থাকিবে। কিন্তু বিপদ হইতেছে কাত্যায়নীকে লইয়া। বিবাহের যে ইচ্ছা আছে, এ কথা সোজাসুজি কাত্যায়নীকে বলা কঠিন। সে যাহা হউক—সেই দিন হইতেই সদানন্দবাবুর মনের ভিতর হাঁ ও না এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। সংসারে কে না চায় যে, নিজের নাম চিরকাল অমর হইয়া থাকুক। কেহই চাহে না যে, তাহার মৃত্যুর পর সকলেই তাহাকে ভুলিয়া যাইবে। সদানন্দবাবু মাঝে মাঝে ভাবেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ত তাহাদের বংশ শেষ হইয়া যাইবে। লোকে তাহাকে আর স্মরণ করিবে না। তবুও সন্তান থাকিলে লোকে বলিবে, অমুকের ছেলে। সন্তান থাকিলে লোকে ভুলিবে না—সন্তানের মাঝে পিতা অক্ষয় হইয়া থাকিবেন। এমনি ভাবে এক প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপে বংশের শিখা উজ্জ্বল হইবে। তাহা নিভিবে না—তাহা ফুরাইবে না।

ইতিমধ্যে কাত্যায়নী এক দিন অসুখে পড়িলেন। অসুখটা সহজ নয়—কঠিন কলেরা। দুপুর হইতে দাস্ত ও বমি সুরু হইল। প্রথমটা সামান্য পেটের গোলমাল বলিয়া তত্তটা গ্রাহ্য করেন নাই। শেষে বৈকাল হইতেই রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর যেন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সদানন্দবাবু ভয় পাইয়া বগলা ডাক্তারও মাখন কবিরাজকে ডাকাইয়া আনিলেন। অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার দুর্গাচরণবাবুও আসিলেন। কবিরাজ মহাশয় বড়ি দিতে উদ্যত হইলেন। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, উঁহু, ওসব বড়ির কর্ম্ম নয়, এ একেবারে—এই অবস্থায় এক ডোজ আর্সেনিক টু হান্‌ড্রেড দিলেই ব্যস—আর কিছু করতে হবে না—

বগলা ডাক্তার বলিলেন, না এই ষ্টেজেই স্যালাইন দেওয়া ভাল।

সদানন্দবাবু বলিলেন, আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছে, যা ভাল বোঝ তাই কর। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্যালাইন দেওয়া হইল। কিন্তু রোগিণীর অবস্থার বিশেষ সুবিধার মনে হইল না। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, জীবনীশক্তি যে ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে! এই অবস্থার মধ্যে কাত্যায়নী ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—শোন।

সদানন্দবাবু কাত্যায়নীর মুখের নিকট মুখ আনিয়া বলিলেন, কি বলছ? বড় কষ্ট হচ্ছে। সদানন্দবাবুর গলার স্বর ভাঙিয়া গেল—চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কাত্যায়নী বলিলেন, আমি বাঁচব না এ বেশ বুঝেছি। তুমি আবার বিয়ে করবে—

ব্যস্ত হইয়া সদানন্দবাবু বলিলেন, আহা, ওসব কথা থাক্—

—না আর সময় হবে না বলি। অনেকদিন থেকেই বলব বলব ভাবছিলাম, কিন্তু বলতে পারি নি, পাছে রাগ কর। কিন্তু না বংশরক্ষার জন্যে, তোমায় বিয়ে করতেই হবে। তার রোজ সূর্য্যপ্রণাম করে মাদুলি ধুয়ে জল খাবে। নিয়ম করে ওষুধ খাবে। আমার বাক্সে যত গয়না আছে, সে আমার ছেলের বৌয়ের জন্য রইল। আর—। অতি শ্রান্তিতে কাত্যায়নী জল খাইলেন। আবার ঔষধ দেওয়া হইল, নাড়ীও দেখা হইল। সদানন্দবাবু ঘর বার করিতেছেন—শহরে বড় ডাক্তার আনিবার জন্য দুই জন লোক সাইকেল চড়িয়া গিয়াছে। মনে হয় এক ঘণ্টার মধ্যে বড় ডাক্তার আসিয়া পড়িবেন। তবে ততক্ষণ রোগিণী টিকিয়া থাকিলে হয়। সদানন্দবাবু কাত্যায়নীর নিকট বসিয়া রহিলেন। কাত্যায়নী দুই সজল চক্ষু স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া, স্বামীর একখানি হাত ধরিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় বড় ডাক্তার আসিলেন, রোগের বিবরণ শুনিয়া, রোগী দেখিয়া, নূতন ঔষধ দিয়া বলিলেন, রাতটা এমনি আচ্ছন্নভাবেই কেটে যাবে, কাল বেলা ন'টা দশটায় জ্ঞান হবে। তবে ভয় নেই, কিন্তু সজাগ থাকবেন।—বগলা ডাক্তারকে যথাবিধি উপদেশ দিয়া শহরের বড় ডাক্তার মোটা ফি লইয়া চলিয়া গেলেন। সারা রাত কাটিল, সকাল হইল, বেলা দশটার পর কাত্যায়নীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কবিরাজ মশাই নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, যাক্ ফাঁড়া কেটেছে সদানন্দ। আর ভয় নেই। সদানন্দবাবু দুই হাত যোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, নারায়ণ—নারায়ণ।

দিন চলিতে থাকে। কাত্যায়নীর অসুখ ভাল হইলেও শরীর ভাল হইতে চাহে না। শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ। গায়ের রং সাদা-ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য হইয়াছে। গালের হাড় বাহির হইয়া গিয়াছে, চোখ দুটি আরও বড় বড় ভাসা ভাসা দেখাইতেছে। কাত্যায়নী বিছানায় শুইয়া শুইয়া স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার খোঁজখবর লন। রাঁধুনিকে বকাবকি করেন, ঝিকে বার বার ডাকিয়া কড়া কড়া কথা শোনান। কাহারও সামান্য বিলম্ব হইলে চীৎকার করিতে সুরু করেন। রোগে মেজাজের যেন রূপান্তর ঘটিয়াছে।

সদানন্দবাবু বলেন, হাওয়া বদলানো দরকার। কাত্যায়নীর মত হয় না—বলেন, কেন এখানকার বাতাস কি করল। আমি বেশ আছি এই ঘরবাড়ী ছেড়ে কোথাও যাব না। যদি ভাল হই ত এখানেই হব।—সদানন্দবাবু আর কথা বলেন না।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া গুরু গুরু করিয়া মেঘ ডাকিতেছে। পথ পথিকবিহীন, সকলেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ক্রমশঃ ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার সমস্ত চরাচরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিরামবিহীন ভাবে ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আজ সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ঝি-চাকর শুইতে গিয়াছে। ঘরে ঘরে আলো নিভিয়াছে। লোকে বর্ষার অবিরাম বর্ষণের মাঝে, নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সদানন্দবাবু তখনও শুইতে আসেন নাই। বাহিরের ঘরে বসিয়া আজ একাই তামাক টানিতেছিলেন। এদিকে কাত্যায়নীর চোখেও ঘুম নাই। দিনরাত শুইয়া থাকিয়া থাকিয়া শয়নের যে আনন্দ, নিদ্রার যে তৃপ্তি তাহা ত থাকে না। তখন শুইয়া থাকাটাই রীতিমত দুঃখময় ও বিড়ম্বনা বোধ হয়।

ঘরের দরজা জানালা বন্ধ, লণ্ঠনটি স্তিমিত হইয়া জ্বলিতেছে। আলো অন্ধকারে ঘরটি অন্যরকম দেখাইতেছে। বাহিরে অঝোরে বিরামহীন বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ হইতেছে, অন্য কোথাও আর কোন শব্দ নাই। মনে হইতেছে সমগ্র পৃথিবী বুঝি দীপশূন্য অন্ধকারে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সমাজ সংসার গ্রাম বিস্তীর্ণ মাঠ বৃক্ষলতাসহ বিরাট পৃথিবী এই সূর্য্য-চন্দ্র অগণ্য তারকাপুঞ্জ, কোটি কোটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীসহ এই অনন্ত অসীম বিশ্বজগৎ বুঝি বা সেই শেষ প্রলয়ের মাঝে বিলীন হইয়া যাইতেছে। কাত্যায়নীর মনে হইল, চতুর্দ্দিক শুধু শূন্য, মহাশূন্য—ঊর্দ্ধ অধঃ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে কোথাও কোন কঠিন জড়বস্তু নাই, শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ মৃত্যুশীতল হিমানীপ্রবাহ ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আর চতুর্দ্দিকে শুধু অনন্ত মহাশূন্য বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই শূন্যতার মাঝে, তাহার জীবন শূন্য, হৃদয় শূন্য—কোন চাওয়া-পাওয়া, কামনার-বাসনারও অস্তিত্ব নাই—সবই যেন ধীরে ধীরে সেই অনাদি মহাশূন্যে বিলীয়মান হইয়া, এক আশ্চর্য্যজনক মহা প্রশান্তির মাঝে চিরতরে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। শুধু মনে হইল, এই নিদারুণ বর্ষণমুখর নিস্তব্ধ ঘনকৃষ্ণ রাত্রিতে, কে যেন সকরুণ স্বরে ডাকিতেছে ওগো আমায় পার কর, পার কর গো। যেন বুকের ভিতর হইতে, সেই ডাক শোনা যাইতেছে পার কর, আমায় পার কর। কাত্যায়নীর মনে হইল যেন মর্ত্তের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পৃথিবীর সকল দুঃখ-বেদনা-ব্যথা সব বিরহ প্রেম ভালবাসা সব স্নেহ, দয়া-মায়ার সকল গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সর্ব্বকালের সমগ্র ধারাবাহিকতা লুপ্ত করিয়া দিয়া কালের তীরে আসিয়া বার বার কে যেন ডাকিতেছে—ওগো আমায় পার কর, পার কর গো—। কিছুক্ষণ পর যেন কাত্যায়নীর চেতনা ফিরিয়া আসে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, কাত্যায়নী অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, উঃ, মা-মাগো। তাঁহার মনে হইল, তিনি ফুরাইয়া গিয়াছেন, শীঘ্র এই পৃথিবীর আলো বাতাস তাঁহার চক্ষুর উপর হইতে সরিয়া যাইবে আর এই নিস্ফলা বন্ধ্যাজীবন লইয়া, অশক্ত শরীরে সংসার জড়াইয়া ধরিয়া কি লাভ হইবে। তাহার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ও কাম্য। কিন্তু তার পূর্ব্বে তাঁহার স্বামীর—স্বামীর বংশের জন্য একটা বৃহৎ কর্ত্তব্য সারিয়া যাওয়াই উচিত।

সেই রাত্রেই কাত্যায়নী সদানন্দবাবুকে বলিলেন, শুনছ—ঘুমুলে নাকি?

—না কেন।

—বলছি যে, আমার ছেলেপুলে হ'ল না আর আশাও নেই। বংশরক্ষার জন্য তুমি বিয়ে কর। বেশী দেরি না করে এই মাসেই কর।—সদানন্দবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। যে কথা নিজের উচ্চারণ করিতে এতদিন তাঁহার বাধিতেছিল, আজ বেশ সহজ ও সরল পথেই তাহা আসিয়াছে। তবুও একবার বাধা দিয়া, অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। অবশ্য ইহাই স্বাভাবিক। একদিন যাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, আজ নূতনের মোহে, সেই বহু বর্ষের, বহু দিনের বহু সুখ, দুঃখ, মায়া, মমতা শত সহস্র ভালবাসার পাত্রীকে কি করিয়া বলিবেন যে, এখন তুমি বিদায় নাও—আর চাহি না।

কাত্যায়নী আবার বলিলেন, আমি সব ঠিক-ঠাক করছি, তুমি আর অমত করো না—

সদানন্দবাবু অমত করিলেন না।

শ্রাবণ মাসের দশই তারিখে, মিনতির সহিত সদানন্দবাবুর বিবাহ হইয়া গেল। মিনতি ছোট মেয়ে নয়—বেশ ডাগর। যেমন স্বাস্থ্য, রঙও তেমনি এবং রূপও মন্দ নয়। অষ্টাদশ বর্ষের মিনতি যেন অপূর্ব্ব হইয়া ঝলমল করিতেছে। কাত্যায়নী মিনতিকে সাজাইয়া, গহনা পরাইয়া, সাংসারিক বিষয়ে বহু উপদেশ দিয়া মনে মনে ভাবিলেন, স্বামীর বংশের জন্য একটা বৃহৎ কর্ত্তব্য করিয়া তিনি দায়মুক্ত হইয়াছেন।

ইহার মধ্যে সদানন্দবাবুর যেন কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন, যখন-তখন বাড়ীর ভিতর আসিয়া এটা-সেটা করিতেছেন, অথবা কাত্যায়নীর শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কাত্যায়নী সবই বুঝিয়া মনে মনে হাসেন। এখন রোজই পুষ্করিণী হইতে বড় বড় মাছ ধরানো হইতেছে, শহর হইতে ভাল ভাল খাবার

—অসময়ের ফলমূল আসিতেছে। গোপনে নানারূপ গন্ধদ্রব্য, বিবিধ সৌখিন জিনিষপত্র আনাইয়া মিনতিকে উপহার দিতেছেন। সদানন্দবাবুর জীবন হইতে যে যৌবন সরিয়া যাইতেছিল, আজ অকস্মাৎ হুড়মুড় করিয়া আবার তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া সদানন্দবাবুকে যেন ভাসাইয়া দিল।

এখন রোজই ফুলদানিতে, বাগানে গোলাপ ফুলের তোড়া শোভা পাইতে লাগিল। সদানন্দবাবুর শয়নঘরটি, ধূপের সুগন্ধে, এসেন্স ও পাউডার এবং দামী ক্রীমের সৌরভে আমোদিত হইতে লাগিল। সদানন্দবাবুর রেশমী রুমালে আতরের সুগন্ধ—জামা কাপড় জুতারও বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। কাত্যায়নী শুধু দুই চোখ মেলিয়া তাকাইয়া থাকেন, আর অলক্ষ্যে বুঝিবা একটা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ঝি-চাকরে কাজকর্ম্ম করে, রাঁধুনী রান্না করে। বোর্ডের চৌকিদারেরা বোডে হাজিরা দিতে আসিয়া বাড়ীর চতুর্দ্দিক পরিষ্কার করে। ফুলবাগানে আরক্ত ফুল ধরিতেছে, এখন অযত্ন নাই, অবহেলা নাই। ইহারই মধ্যে কলিকাতা হইতে দামী গ্রামোফোন ও এক বাক্স রেকর্ড আসিয়াছে। বাংলা নাটক নভেল গল্পের বই—তাহাও আসিয়াছে। নূতন বউ মিনতি, যেমন গান শুনিতে ভালবাসে, তেমনই ভালবাসে বই পড়িতে। মিনতি চা খাইয়া, নূতন ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া বই পড়ে, কখনও গ্রামোফোনে রেকর্ড দিয়া গান শোনে।

সেদিন পূর্ণিমা তিথি। রাত্রি তখন বেশ হইয়াছে, বোধ হয় এগারটা। কাত্যায়নীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া সীমাহীন আকাশ দেখা যাইতেছে। ঘরের ভিতর সুন্দর জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ণিমা রাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নায় সমস্ত বিশ্বজগৎ যেন রৌপ্যধারায় স্নান করিয়াছে। অনেকক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে বাহিরের সেই শুভ্র রূপের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, হঠাৎ এক সময় কি মনে ভাবিয়া ঘরের দরজা নিঃশব্দে খুলিয়া কাত্যায়নী বারান্দায় আসিলেন। দেখিলেন, নূতন বৌয়ের ঘরে টিপ টিপ করিয়া আলো জ্বলিতেছে, উন্মুক্ত জানালা দিয়া জ্যোৎস্নার অজস্র আলো সেই শুভ্র বিছানায় পড়িয়াছে। মিনতি বাগানের ফুল লইয়া মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়াছে, গলায় পরিয়াছে—ফুলে ভূষিত হইয়া যেন বসন্তকালের পুষ্পভার-লুণ্ঠিত লতাটির ন্যায় অম্লান জ্যোৎস্নার মাঝে শুভ্র বিছানায় বিরাজ করিতেছে আর স্বামী মিনতির মুখের কাছে মুখ লইয়া…

কাত্যায়নী আর তাকাইলেন না—চোখ মুদিয়া ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন—অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার মনে হইল, এই ঘরবাড়ী, খাট-বিছানা এই সব অলঙ্কার তাঁহার নয়—স্বামীও তাঁহার নয়। একদিন সব ছিল—আজ সর্ব্বস্ব দান করিয়া তিনি পথের ভিখারিণী। কাত্যায়নীর মনে হইল আর কেন? এই সংসারের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ ত ফুরাইয়াছে—যাহাকে তিনি ডাকিয়া আনিয়াছেন সেই আজ রাণী—আর তিনি এখন সংসারের বোঝাস্বরূপ, কৃপাপ্রার্থিনী, ভিখারিণী। কাত্যায়নীর চোখে আবার অশ্রুর বান ডাকিল। অন্য ঘরে যখন দুই জনে সেই পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে আনন্দে সুখসাগরে ভাসিতেছিল, তখন কাত্যায়নী শুধু নীরবে অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিতেছিলেন।

সকালবেলায় নিজের আঁচল হইতে ভাঁড়ারঘরের চাবি ঝিকে দিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, নূতন বৌকে চাবি দে গা—ওর কাছ থেকেই ভাঁড়ার বুঝে নিস মা।—ঝি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; হ্যাঁরে, চাবি দিয়েছিস? কিছু বলল নাকি নূতন বৌ।

ঝি বলিল, না। উনি চাবি আঁচলে বাঁধলেন।—সে বেলা কাত্যায়নী আর কিছু খাইলেন না। বেলা বাড়িতে লাগিল—সকলের একে একে খাওয়া হইয়া গেল। কাত্যায়নী নিজের ঘরে শুইয়া, জানালার বাহিরে তাকাইয়াছিলেন। এক সময় মিনতি একবাটি গরম দুধ লইয়া আসিয়া ডাকিল—দিদি।—কোন সাড়া না দিয়া, নিস্পৃহভাবে, মিনতির দিকে তাকাইয়া শুধু বলিলেন, খাব না কিছু।

—খাবে না? সারাদিন উপোস করে থেকে যে অসুখ করবে।

ম্লান হাসিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, অসুখ? আমার আর ভালমন্দ। নিয়ে যাও দুধ, খাব না। মিনতি চলিয়া গেল। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা করিয়া বেলা চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া যায়, তবুও স্বামীকে একবারও খোঁজ লইতে না দেখিয়া কাত্যায়নী একখানি চাদরে আপাদমস্তক ঢাকিয়া সেই অবেলায় শুইয়া পড়িলেন। একটা দুরন্ত অভিমান যেন রক্তের মাঝে ঝিম্ ঝিম করিয়া বাজিতে লাগিল। দুই শুষ্ক চক্ষু দিয়া উষ্ণজল শুধু গড়াইয়া আসিতে লাগিল।…

এমনি ভাবে মাসখানেক কাটিয়া যাইবার পর একদিন বিকাল-বেলায় কাত্যায়নী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া নিজের বাক্স খুলিলেন। একটি বাক্সে নিজের প্রয়োজনীয় জামা কাপড় খুঁটিনাটি জিনিষপত্র গুছাইয়া বাক্স বন্ধ করিয়া মিনতিকে ডাকিলেন। মিনতি আসিলে তাহাকে আলতা সিঁদুর পরাইয়া দিলেন। তারপর নিজের যাবতীয় গহনা একে একে মিনতির সর্ব্ব অঙ্গে সাজাইয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ দেখিয়া একটা সস্নেহ চুম্বন করিয়া বলিলেন—জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে সন্তানবতী হও। সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামী পুত্র নিয়ে ঘরসংসার কর, এই আশীর্ব্বাদ করি বোন।

মিনতি হেঁট হইয়া কাত্যায়নীকে প্রণাম করিয়া, চতুর্দ্দিকে রূপের ও অলঙ্কারের তরঙ্গ তুলিয়া ঝকমক করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সেইদিন রাত্রে, বহুদিন পরে, কাত্যায়নী নিজহাতে রান্না করিলেন। স্বামীকে খাইতে দিয়া, ঠিক পূর্ব্বের মতই পাতের কাছে বসিয়া খাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া যত্নে খাওয়াইতে লাগিলেন। খাওয়া শেষ হইলে হাতে জল ঢালিয়া

পান দিলেন। সদানন্দবাবু যেমন বিস্মিত হইলেন—তেমনি আনন্দিতও হইলেন। যেটুকু মনের মেঘ এতদিন জমিয়াছিল আজ যেন কোথা হইতে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাসে সবকিছুকে উড়াইয়া দিল। আনন্দে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দবাবু বলিলেন, তুমিই ত সব—তুমিই বাড়ীর গিন্নী। আর আজ অনেকদিন পর আমার ভারি আনন্দ হ'ল। কাত্যায়নী কোন কথা বলিলেন না—শুধু মৃদু হাসিলেন মাত্র।

তখনও ভোর হয় নাই, গাছপালায় রাত্রির অন্ধকার লাগিয়া রহিয়াছে। সদানন্দবাবু অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সচকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন—কাত্যায়নী দাঁড়াইয়া।

দুই চোখ মুছিয়া সদানন্দবাবু বলিলেন, কি হ'ল? অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?

—না। এই বলিয়া কাত্যায়নী হেঁট হইয়া স্বামীর পায়ের ধুলা লইয়া বলিলেন, আমি যাচ্ছি—কাশী যাচ্ছি।

—কাশী যাচ্ছ মানে? বাঃ, সে কি? বলা কওয়া নেই, কিছু জানলাম না—সে কি? আর কার সঙ্গে যাচ্ছ?

কাত্যায়নী ধীর স্বরে বলিলেন, আর সময় নেই। বাইরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ঘোষালকাকা যাচ্ছেন—খুড়ীমা নন্দ ধীরেন এদের সঙ্গে। দেরি করলে ট্রেন ফেল হবে। আগে বলি নি পাছে বাধা দাও। এই নাও ঘরের চাবি।

সদানন্দবাবু বলিলেন, তুমি আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছ বড়-বৌ। অন্যায় যদি করে থাকি মাপ কর। কাত্যায়নী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ছিঃ ছিঃ, কি যে বল তুমি! ও শুনলে যে পাপ হয়। তা নয়—ঠাকুর আমায় ডেকেছেন, শেষ ক'টা দিন তাঁরই চরণ-তলে পড়ে থাকব। আর ছোটবৌ—বোন আমার, সাবধানে থেক। আশীর্ব্বাদ করি জন্মএয়োস্ত্রী হয়ে পাকা মাথায় সিঁদুর পরো। খোকা হলে আশীর্ব্বাদ করে যাব।—পুনরায় সদানন্দবাবুকে প্রণাম করিয়া, একদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, আজ বিদায়ের প্রাক্কালে সেই কথা বলিলেন।

—আর দেখ, চ্যবনপ্রাশ খেতে ভুলবে না। রোজ সূর্য্য-প্রণাম করে, মাদুলি ধুয়ে জল খাবে, সাবধানে থাকবে। তবে আসি।

মিনতি ডাকিল, দিদি।

যাইতে যাইতে কাত্যায়নী বলিলেন, আসি বোন। নারায়ণ নারায়ণ! কাত্যায়নী ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। সদানন্দ বাবু স্থাণুর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাত্যায়নীর যাত্রা-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্ফুলিঙ্গ আছে তাই

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

স্ফুলিঙ্গ আছে তাই আগুন লাগে—
যে মন নিভেছে সেও জীবন মাগে।
সহসা ঝলিয়া উঠে স্তিমিত শিখা,
জীবন দহিয়া জ্বলে কি দীপালিকা!
স্ফুলিঙ্গ উড়ে,
হায় জীবন পুড়ে,
বিকল হৃদয় নাচে বহ্নিরাগে,
স্ফুলিঙ্গ আছে তাই আগুন লাগে।

স্ফুলিঙ্গ আছে কোন্ গোপন মনে—
দাবাগ্নি জ্বলে তাই শ্যামল বনে!
আগুন-আলেয়া দিল স্বপনে দোলা,
হৃদয় আহুতি দেয় আপনাভোলা,
হিয়ার তলে
জ্বলে আহুতি জ্বলে,
মুমূর্ষু মনে ক্ষণে ফাগুন জাগে,
স্ফুলিঙ্গ আছে তাই আগুন লাগে।

স্ফুলিঙ্গ আছে কোন্ খনির তলে
বুকের আঁধারে মণি আজিও জ্বলে।
রঙীন আভায় কাঁপে আলোক-ছটা
ক্ষণিক মরণ যবে দোলায় জটা।
আঁধার খনি—
সেথা জ্বলিছে মণি,
হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে কি অনুরাগে।
স্ফুলিঙ্গ আছে তাই আগুন লাগে।

শান্তির আন্তঃরাষ্ট্রীয় বার্তাবহ

দাদা ধর্মাধিকারী

অনুবাদিকা—শ্রীকমলা ঘোষ

"ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব" একটি পদ। ঐ পদে আজ জবাহরলাল অধিষ্ঠিত। কাল অন্য কেউ হতে পারেন। কিন্তু জবাহরলাল নেহরু এক ব্যক্তি, এক প্রতীক, নিজেতেই এক সংস্থা। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ আছে। রাগ তারা করে। তাঁর ভালমন্দ সমালোচনা তারা করে। তবুও জবাহরলালের প্রতি তাদের মনে প্রীতি রয়েছে। বিরাট জবাহরলালের ব্যক্তিত্ব, আর তা মনোরমও বটে। এ বয়সেও কেউ তাঁকে বৃদ্ধ বা স্থবির মনে করে না। তাঁর বুদ্ধি নূতন জিনিষ শেখার জন্য সদা প্রস্তুত, হৃদয় তাঁর সদা নূতন অনুভূতিতে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য তৎপর। প্রধানমন্ত্রী হওয়াতে প্রধানমন্ত্রীর আসনের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বেড়েছে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব একটা গণ্ডীতে এসে আবদ্ধ হয়ে গেছে। জবাহরলাল জননেতা, জবাহরলাল সভ্য ও সুসংস্কৃত নাগরিক। তিনি জিজ্ঞাসু, জ্ঞানপিপাসু, বুদ্ধিযোগী; কিন্তু প্রশাসন, ক্ষমতা-পরিচালন, বিধি-ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি তাঁর ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপকরণ নয়। এ কারণে প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল আর ভারতের নেতা জবাহরলালে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তাঁর সমৃদ্ধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও রমণীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ প্রশাসনে কোথাও দেখা যায় না। তাঁর বিভূতিতে ও রাষ্ট্রের প্রশাসনে তথা বিধিব্যবস্থায় একটা বিচ্ছেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জননেতা জবাহরলালের ব্যক্তিত্বে বার্ধক্যের লেশমাত্রও নাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনে বার্ধক্যের নানা নিদর্শন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত। জবাহরলালের ব্যক্তিত্ব একই টানা-পোড়েনে বোনা। কিন্তু ভারত সরকারের আর্থিক ব্যবস্থা যেন জীর্ণ কন্থার উপর ভ্রান্তি-সৃষ্টিকারী মখমলের তালি আর রেশমী সুতার রিপুকর্ম।

তাই আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব নিজ অন্তর্নিহিত গুণ অপেক্ষা সমধিক বিকশিত হয়ে ওঠে। জবাহরলাল সাহসিক পৌরুষসম্পন্ন ব্যক্তি বটেন, কিন্তু সেনাপতি তিনি নন। নিখিল জগতের বিশিষ্ট নাগরিক তিনি, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শান্তির তিনি প্রধান দূত। আন্তঃরাষ্ট্রীয় নাগরিকের অর্থে তিনি বিশ্বনাগরিক। তাঁর বৃত্তি সাম্প্রদায়িক নয়। জাতি, বর্ণ অথবা ভাষা-ভেদের ভৌগোলিক ব্যবধান তা জানে না। এ কারণে পাশ্চাত্যবাসীরা তাঁকে 'এশীয়'ই বলে, আর ভারতীয়েরা বলে "বিলাতী ভারতীয়"। হিন্দুরা তাঁকে "একমাত্র রাষ্ট্রীয় মুসলমান" ও মুসলমানেরা "পণ্ডিত নেহরু" বলে থাকে। তাই তিনি আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তির মুখ্য প্রবক্তারূপে ও মন্ত্রদাতারূপে সাফল্যলাভ করেন। কিন্তু তাঁর আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবহার সব সময়ে সফল ব৷ কার্যকরী হয় না। নেহরু এশিয়ার একমাত্র যথার্থ নেতা, কিন্তু তিনি এশিয়ার রাজপুরুষ নন।

এশিয়ার নেতা

১৪ই জবাহরলালের জন্মতিথি। আর সম্প্রতি তিনি চীনদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। এ দু' কারণে তাঁর সম্বন্ধে সহসা এ বিচার মনে উঠছে। তাঁর চীনগমনে ভাবী ঘটনার উপর কতটা প্রভাব পড়বে, তা আজ বলা যায় না। তিনি যে আমেরিকার দলভুক্ত হন নি, তা রাশিয়া ও চীনের দৃষ্টিতে যথেষ্ট। চীনের তিনি পরম সুহৃদ, এটা আমেরিকার কাছে বড়ই বেদনাদায়ক। পাকিস্থান মনে করে—আমরা আমেরিকার সঙ্গে যোগ দিয়েছি বলে জবাহরলাল চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ মনে করে যে, চীন এবং ভারতের লোকসংখ্যা একত্র করলে দুনিয়ার প্রায় অর্ধেক লোকের সমান হবে। এ দুয়ের মিলনের প্রভাব সারা দুনিয়ার উপর পড়বেই। এরা শুধু গণিতের অঙ্ক নয়। এদের নিজের ইতিহাস আছে, সভ্যতা আছে, সংস্কৃতি আছে, আর তা ছাড়া আছে অপূর্ব্ব জাগৃতি ও আত্ম মর্যাদার ভাব। যদি এই দুই মানব-মহাসাগর শান্তির আকাঙ্ক্ষা ও পুরুষার্থের প্রেরণা থেকে নিজেদের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে ত তারা সংসারকে প্রলয় থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে।

ভারত-চীন সম্বন্ধ

এ ধারণা বাস্তবিকই সত্য। ইউরোপের প্রধান-প্রধান দেশসমূহ একে অন্যের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। ফ্রান্স-জার্মানীর শত্রুতা আজও "অহি-নকুলবৎ"। রাশিয়াকে তারা আধা প্রাচ্য আধা পাশ্চাত্য মনে করে। ইউরোপের সমস্ত দেশ গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অনুসারী। তারা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু তাদের মধ্যে সদা বৈমাত্র ভাইয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান। যীশু ছিলেন শান্তির দূত। তাঁর জন্মভূমি ইউরোপীয় জাতিসমূহের তীর্থক্ষেত্র। তা দখল করবার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধ করেছে। সে রক্তরঞ্জিত ইতিহাস কারও অবিদিত নয়। ইহুদীদের উপর যে আসুরিক উৎপীড়ন চলেছিল তা তারই এক অধ্যায়। নিজেদের পুণ্যভূমিতে শাসন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম্মাভিমানী

ইউরোপীয় দেশসমূহ কোন অত্যাচার করতে বাকী রেখেছে? চীন-ভারতের ঘনিষ্ঠতা স্মরণাতীত কাল হতে আজ অবধি অক্ষুণ্ণ। চীনের অধিকাংশ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তাদের পুণ্যক্ষেত্র ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি এই ভারতেই। ভগবান বুদ্ধের বোধিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রও এই ভারতেই অবস্থিত। তা হলেও ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, চীনবাসীরা কখনও ভারত আক্রমণ করে নি আর ভারতীয়েরাও কখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী চীনের উপর হামলা করে নি। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান উভয়ের মধ্যে চলে আসছে—কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়ের ফলস্বরূপ হয় নি। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দৃশ্যতঃ লোপ পেয়েছে। কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য চীনবাসীরা ভারতের উপর তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করেন নি। খ্রীষ্টধর্ম্মানুগামী দেশের রাজকীয় পতাকার সঙ্গে সঙ্গে তার পৃষ্ঠপোষক ও অগ্রদূত রূপে এসেছে ক্রস—কখনও-বা এসেছে আগে, কখনও-বা পিছে। সেখানে ক্রস ও রাজদণ্ড ঐহিক বা পারলৌকিক দিগ্বিজয়ে একে অন্যের সহচারী। কিন্তু ভারত-চীনের পারস্পরিক সম্বন্ধে ধর্ম্ম-ধ্বজা আর রাজ-ধ্বজা একে অন্যের সহচারী হয় নি। বৌদ্ধ-চীন যদি সাম্রাজ্য-লালসা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরে থাকে, তবে কি এ আশা করা ভুল হবে যে, কম্যুনিজমপন্থী চীনও রাজনৈতিক সম্প্রসারণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

চীনযাত্রার কারণ

এই ঐতিহাসিকপরম্পরা আর মূল প্রকৃতি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য জবাহরলাল চীন গমন করেছিলেন। গমনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, চীনবাসীরা নিজেদের রঙ ও পোশাক-পরিচ্ছদ ত ঠিক রাখবেনই, কিন্তু পোশাকের নীচে ঢাকা প্রকৃত রূপ ও নিজস্ব সত্তা যেন তারা ভুলে না যান। রাজ-নীতিক আকাঙ্ক্ষার অভাব আর সর্ব্বপ্রকার আক্রমণ-বিমুখতা—এই হচ্ছে চীনের আত্মার মুখ্য তত্ত্ব। ভারতের আত্মার সত্তাও তা-ই। এ ভাবে এই দুই প্রকৃতিতে পারিবারিক সাধর্ম্ম্য বর্ত্তমান। এই সাধর্ম্ম্যই আন্তঃরাষ্ট্রীয় নাগরিক নেহরুকে চীনে নিয়ে গিয়েছিল আর এ সাধর্ম্ম্যই ভারত ও চীনের মৈত্রীকে সমস্ত ভৌগোলিক ও রাজকীয় বিভেদের উপরে নিয়ে যাবে।

জবাহরলালের ব্যক্তিত্ব

জবাহরলাল কংগ্রেসেরও অধ্যক্ষ। এক সময়ে কংগ্রেস তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল; আজ কিন্তু কংগ্রেস তাঁকে আশ্রয় করেই দণ্ডায়মান। এরূপ একটি মণ্ডপের কথা ধরুন, যার একটি মাত্র স্তম্ভ সোজা শক্ত, ভারবহনক্ষম আর অপর সকলগুলি শিথিল, নড়বড়ে। তাই তাঁকে প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের অধ্যক্ষও হতে হয়েছে। ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবার উপরে একই সময়ে তাঁকে সওয়ার হতে হয়েছে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, না আছে কংগ্রেসে প্রাণ আর না আসছে সরকারী কাজে দক্ষতা। উল্টে জবাহরলালের নিজ ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দোটানায় পড়ছে। তিনি এখন পদনিবৃত্তি ও ক্ষমতানিবৃত্তির কথা বলছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের সত্তা আন্তঃরাষ্ট্রীয়। ঈশ্বরের বিধিই এইরূপ যে, যিনি নিখিল-ভারতীয় হবেন, আন্তঃরাষ্ট্রীয়ও তিনি হবেন। এ দেশে এত বেশী ও আর এত প্রকারের ভেদাভেদ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এখানকার সকল প্রদেশের, সকল ভাষাভাষীর, সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল মানুষের নেতা হবেন, তিনি দুনিয়ারও নাগরিক হবেন। তাঁর আন্তঃ-প্রাদেশিকতা অতি সহজেই আন্তঃরাষ্ট্রীয়তায় পরিণত হয়ে যায়।

জবাহরলাল নেহরু হৃদয় থেকে ভাষাগত রাজ্য চান না, কিন্তু তাঁকে ভাষাগত প্রান্ত স্বীকার করে নিতে হয়েছে। অস্ত্রসম্ভার তিনি বাড়াতে চান না তবুও তাঁকে নিজের স্থল সৈনিক, অন্তরীক্ষ সৈনিক ও নৌ-সৈনিক বাড়াতে হয়েছে এবং তাদের নিরন্তর কর্ম্মক্ষম রাখতে হচ্ছে। আধুনিকতার দিকে তাঁর ঝোঁক, কিন্তু সমর্থন করতে হচ্ছে গ্রামোদ্যোগ ও খদ্দরকে। তিনি দেশের প্রধান রাষ্ট্র-পরিচালক যদিও প্রশাসনের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ আনুকূল্য নাই। এই সব অন্তর্বিরোধ হেতু জনগণের মনে ধারণা জন্মেছে যে, তাঁর নিজস্ব কোনও স্থির লক্ষ্য, নিষ্ঠা, নীতি বা দিশা নাই। আর এ ধারণা একেবারে অমূলকও নয়। আমি ব্যবহারজ্ঞ নই, আমি জ্যোতিষীও নই, তথাপি এ কথা আমার অবশ্য মনে হয় যে, পদত্যাগ করিলে খুব সম্ভব জবাহরলালের ব্যক্তিত্ব, আত্ম-গুণ ঝলমলে হয়ে উঠবে।
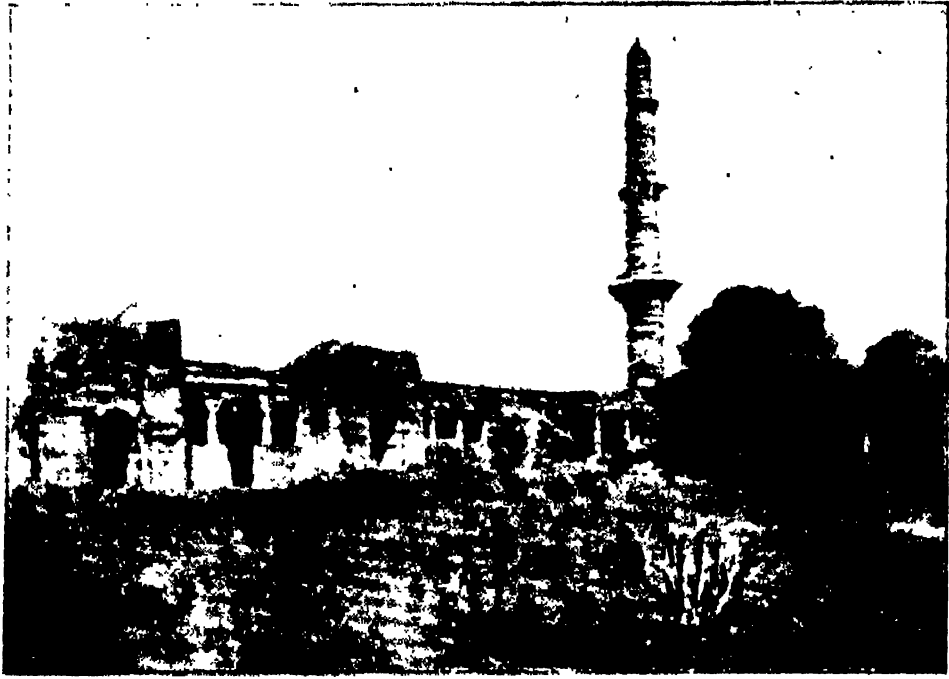
দৌলতাবাদ দুর্গ—টানা শাহ এখানেই অন্তরিত হন

গোলকুণ্ডার গিরিদুর্গে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

গোলকুণ্ডা গিরিদুর্গের বুরুজের উপর আরোহণ করে নীচের দিকে তাকালাম। চারিদিকে যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে মুক্ত প্রান্তরের অনন্ত প্রসার। এই মহাপ্রান্তরের বুকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু' হাজার ফুট উঁচুতে, একটি পাহাড়ের সানুদেশে অতীতের অসংখ্য স্মৃতি-বিজড়িত এই ভগ্ন জীর্ণ দুর্গটি অবস্থিত—এর পাষাণগাত্রে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা রয়েছে দক্ষিণ ভারতের কুতবশাহী বংশের উত্থান-পতনের বিচিত্র চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর কুতবশাহী বংশের নৃপতিদের রাজধানীরূপেই ইতিহাসে গোলকুণ্ডার প্রসিদ্ধি, কিন্তু এর অতি-প্রাচীনত্বের নিদর্শন রয়ে গেছে দুর্গবেষ্টনীর অভ্যন্তরে হিন্দু স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষসমূহে—এর মৌলিক তেলুগু নাম হচ্ছে গোল্লা কুণ্ডা বা মেষপালকের পাহাড়। বিশাল অন্ধ্রের কাকতীয়া রাজাদের আমলে গোলকুণ্ডা ছিল আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র। কুতবশাহী বংশের চরম গৌরবের দিনে প্রতিষ্ঠিত এই গিরিদুর্গের ভগ্ন প্রাচীরসমূহ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের বহু বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মূক সাক্ষী। অতীতে হীরকভূমি গোলকুণ্ডার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে সুদূর পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল, হীরামাণিক্যের সন্ধানে সপ্তদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক টাভার্নিয়ে এখানে এসে কিছুকাল অবস্থান করে-ছিলেন প্রকাণ্ড এক সরাইয়ে;* মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল এখানকার ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের উপর। বিরাট শাহী সৈন্যদল নিয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন গোলকুণ্ডার উপর, কিন্তু এখানকার গিরিদুর্গ দখল করা সহজসাধ্য হয় নি বাদশাহের পক্ষে। দশ বৎসর কাল ব্যর্থ চেষ্টার পরে অবশেষে কূটকৌশল অবলম্বন করে সাফল্যলাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব।

গোলকুণ্ডার পূর্ব্বসমৃদ্ধি আজ স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত। কুতবশাহী বংশের রাজধানীর আকাশস্পর্শী সৌধমালা আজ নিশ্চিহ্ন, শুধুমাত্র কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে অনমনীয় দৃঢ়তায় দাঁড়িয়ে আছে কামান ও বন্দুকের গুলীতে বিক্ষতগাত্র গোলকুণ্ডা গিরিদুর্গ। এর প্রাচীর

---

* ১৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী টাভার্নিয়ে সুরাট থেকে রওনা হন এবং দৌলতাবাদ ও আওরঙ্গাবাদ হয়ে ২৭ দিনে ৩২৪ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে গোলকুণ্ডা রাজ্যে এসে পৌঁছেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে টাভার্নিয়ে দৌলতাবাদ গিরিদুর্গ এবং পাহাড়ের পাদদেশস্থ দৌলতাবাদ শহরের ও সেখানকার ঐতিহাসিক কাহিনীর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। *Taverniers Travels in India*, pp. 115-118.

এবং গম্বুজসমূহ প্রকাণ্ড পাথরের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি—এক একটির ওজন কয়েক টন। দুর্গের তোরণসমূহে ধারালো চোখা বড় বড় লোহার পেরেক বসানো। আগে তোরণের সংখ্যা ছিল আটটি—এর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে ফতে দরওয়াজা বা বিজয়-তোরণ। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী মোগল সৈন্যদল এই তোরণ দিয়েই দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। দুর্গমধ্যে প্রাচীন আমলের কুতবশাহী প্রাসাদসমূহের ভগ্নাবশেষের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে নৌমহল নামে প্রাসাদমালা। সেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক—পরবর্ত্তী আমলের নিজামদের তৈরি। এই সমস্ত প্রাসাদের পরিকল্পনায় সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পরিস্ফুট, চতুষ্পার্শ্বস্থ মনোরম পুষ্পোদ্যানসমূহ জায়গাটিকে পরম রমণীয় করে রেখেছে।

গোলকুণ্ডা দুর্গ

দুর্গ থেকে বাজারার ভেতর দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত কুতবশাহী নৃপতিদের সমাধিক্ষেত্র দেখতে গেলাম। ১৫১৮ সন থেকে ১৬৮৭ সন—এই প্রায় পৌনে দুই শত বৎসরকাল শাহী বংশের যে সকল নৃপতি অখণ্ড প্রতাপে গোলকুণ্ডায় রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র এক জন ছাড়া আর সকলেরই সমাধি এখানে বিদ্যমান। স্বীয় বংশের কীর্ত্তিমান নৃপতিদের সমাধিপার্শ্বে সমাহিত হওয়ার সৌভাগ্য যাঁর হয় নি—তিনি হচ্ছেন শাহী বংশের শেষ স্বাধীন রাজা আবুল হাসান টানা শাহ। গোলকুণ্ডার পতন হয় তাঁরই আমলে। কিন্তু সে কাহিনী পরে বলছি।

সমাধিগুলি যে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে নির্ম্মিত তা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায়। প্রত্যেকটি সমাধিই চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর এক একটি গম্বুজযুক্ত এবং সুক্ষ্মাগ্র মিনারবিশিষ্ট মঞ্চদ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্ষুদ্র সমাধির মঞ্চগুলি একতলা—বৃহত্তরগুলির দোতলা। এগুলি শাহী আমলের স্থাপত্যকলার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—যেমন সুষমামণ্ডিত তেমনি সৌসামঞ্জস্যপূর্ণ। শাহী বংশের পঞ্চম নৃপতি, অশেষ কীর্ত্তিমান মহম্মদ কুলী কুতবশাহ এবং সপ্তম নৃপতি আবদুল্লা কুলী কুতবশাহের সমাধিই স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট্যে মনকে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করে। চতুষ্পার্শ্বস্থ রমণীয় উদ্যানসমূহে প্রস্ফুটিত বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাজি চোখে যেন রঙের নেশা ধরিয়ে দেয়। মনে হয়, শাহীবংশের লোকান্তরিত মহানুভব নৃপতিদের এই সমাধিভূমিতে তাঁদের সুকৃতিসমূহ যেন ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

শাহী বংশের সপ্তম নৃপতি আবদুল্লা কুতবশাহের জননী হায়াৎ বক্সী বেগমের সমাধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে একটি সুন্দর মসজিদ। কুতবশাহী আমলে গোলকুণ্ডায় স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে যে হিন্দু এবং মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণ হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায় এই মসজিদটির গঠনকৌশল ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করলে। এর স্থাপত্যকলায় আছে হিন্দু মণ্ডনশিল্পের প্রভাব।

সুলতান আবদুল্লা কুতবশাহের সমাধি-পার্শ্বে বসে মানসপটে ভেসে উঠল গোলকুণ্ডার অতীত সমৃদ্ধির চিত্র। এই প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতির রাজত্বকালে গোলকুণ্ডা আরূঢ় হয়েছিল গৌরবের উচ্চতম শিখরে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তিনি এক বিপুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন।

এই আবদুল্লা কুতবশাহের রাজত্বকালেই হীরক-সন্ধানী টাভার্নিয়ে আসেন গোলকুণ্ডায়।* তাঁর বর্ণনায় পাই গোলকুণ্ডার বিগত দিনের চিত্র। তিনি বলেন—"সাধারণ ভাবে বলতে গেলে গোটা গোলকুণ্ডা রাজ্য একটি উৎকৃষ্ট দেশ—এখানে শস্যাদি খাদ্য, গরু বাছুর ভেড়া মুরগী ইত্যাদি এবং মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। এখানে হ্রদের সংখ্যা প্রচুর এবং মাছও অজস্র পাওয়া যায়। এই সমস্ত হ্রদের সৃষ্টিতে প্রকৃতির শিল্প-কৌশলের অতিরিক্ত আরও কিছুর পরিচয় মেলে—সাধারণতঃ এগুলি

* "The whole kingdom of Golconda, take it in general, is a good country, abounding in corn, rice, cattle, sheep, poultry, and other necessaries for human life. . . . there are great stores of lakes in it, there is also a great store of fish. Nature has contributed more than art, toward making these lakes, whereof the country is full, which are generally in places somewhat raised, so that you need do no more than make a little dam upon the plainside to keep in the water. The dams or banks are sometimes half a league long, and after the rainy seasons are over, they open the sluces from time to time to let out the water into the adjacent fields, where it is received by diverse little channels to water particular grounds."—*Taverniers Travels in India*, pp. 121-22.

কতকটা উচ্চ স্থানে এমনভাবে অবস্থিত যে, জল আটকে রাখবার জন্যে সমতল অংশে একটি বাঁধ দেওয়া ব্যতিরেকে আর কিছুই করতে হয় না। এই সকল বাঁধের মধ্যে কোন কোনটি অর্দ্ধ লীগ দীর্ঘ। বর্ষাঋতুর অবসানে সন্নিহিত ক্ষেত্রসমূহে জল সরবরাহ করবার জন্যে সময় সময় স্লুইসগুলিকে খুলে দেওয়া হয়, অনেকগুলি ছোট ছোট খালের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই জলধারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রকে সিক্ত করে।

পারস্যের শাহ কর্তৃক উপহৃত পরিচ্ছদে তুর্কি জে. বি টাভার্নিয়ে

টাভার্নিয়েরের সময় রাজধানীর নাম ছিল ভাগনগর, কিন্তু ইতর-জন তাকেও বলত গোলকুণ্ডা। দুর্গের নাম থেকেই গোটা অঞ্চলের নাম হয়েছিল গোলকুণ্ডা, রাজধানী থেকে দু' লীগ—প্রায় ছয় মাইল দূরবর্তী ঐ দুর্গেই ছিল রাজদরবার।

টাভার্নিয়েরের বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে, তখন নগরীতে, নগরোপান্তে এবং দুর্গে রূপোপজীবিনীর সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজারেরও অধিক। এদের মধ্যে যারা ছিল নৃত্যগীতে নিপুণা তারা মাঝে মাঝে শুক্রবারে রাজপ্রাসাদে এসে রাজার সমুখে নৃত্যগীত করত। রাজা যখন মসলিপত্তন পরিদর্শন করতে যান তখন নাকি স্থির করেন যে, এই শ্রেণীর নয়টি রমণী তাঁকে বয়ে নিয়ে যাবে। তারা অভিনব ভঙ্গীতে অবস্থান করে 'নব নারীকুঞ্জরে'র সৃষ্টি করে। চারিটি মেয়ে হয় হাতীর চারিটি পা, আর চারিটি হয় হাতীর দেহ আর একটি মেয়ে হয়েছিল তার শুঁড়। রাজা এই অভিনব গজাসনের উপর বসে নগর-প্রবেশ করেন। বাদশাহী খেয়ালের এক অপূর্ব্ব নমুনা বটে!

আবদুল্লা কুতবশাহের কোন পুত্রসন্তান ছিল না, কিন্তু তাঁর কন্যা ছিল তিনটি। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ে হয় মক্কার এক শেখের সঙ্গে। শেখ গোলকুণ্ডায় এসে উপস্থিত হন ফকিরের বেশে এবং রাজপ্রাসাদের তোরণের বাইরে অবস্থান করতে থাকেন। রাজসভাসদদের মধ্যে কেউ কেউ এসে জিজ্ঞেস করেন—তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কি, কিন্তু তিনি কোন জবাব দেন না, চুপ করে থাকেন। অবশেষে রাজার কানে যখন এ খবর গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি তাঁর রাজ্যের আরবী-জানা প্রধান হেকিমকে পাঠালেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কি তা জানবার জন্যে। হেকিম এবং আরও কয়েকজন ওমরাহ বুঝতে পারলেন যে, এই শেখ হচ্ছেন একজন মস্ত বড় 'আলিম' এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাঁরা তাঁকে নিয়ে চলে এলেন রাজসকাশে। রাজা তাকে দেখে খুব খুশী হয়ে উঠলেন। কিন্তু শেষে শেখ যখন বললেন যে, তিনি জ্যেষ্ঠা রাজ-কন্যার পাণিপ্রার্থী তখন বাদশাহের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রইল না। এ অসঙ্গত প্রস্তাব শুনে সভাসদগণের মধ্যে অধিকাংশই মনে করলেন যে, লোকটার মাথা খারাপ। রাজা ত প্রথমে হেসেই তার প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু দেখলেন যে, লোকটা একেবারে নাছোড়বান্দা, কিছুতেই দাবি ছাড়বে না। শেষে শেখ এই বলে শাসালেন যে, রাজা যদি তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হন তা হলে রাজ্যে কোন অপ্রত্যাশিত দৈবদুর্বিপাক দেখা দেবে। তখন রাজা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন, সেখানে কাটল তাঁর দীর্ঘকাল। শেষে রাজা কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে মসলিপত্তন থেকে জাহাজে করে তাঁর স্বদেশ মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। দু'বছর পরেই কিন্তু লোকটি আবার গোলকুণ্ডায় এসে হাজির, এবার তাঁর আদবকায়দা ও চালচলন দেখে এবং অফুরন্ত ধৈর্য্যের পরিচয় পেয়ে রাজার মনের বিরূপ ভাব দূর হয়ে গেল। রাজা খুশী হয়ে মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হবার পর শেখ শাসনকার্য্যে রাজার সহায়তা করতে লাগলেন। রাজ্যে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল। আওরঙ্গজেব এবং তাঁর পুত্র যখন ভাগনগর দখল করলেন, রাজা তখন গোলকুণ্ডা দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বেগতিক দেখে রাজা স্থির করলেন, আওরঙ্গজেবের হাতে গোল-কুণ্ডা তিনি সঁপে দেবেন, কিন্তু এই সঙ্কল্প থেকে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেন তাঁর এই জামাতা। তিনি রাজাকে এই বলে শাসান যে, যদি শত্রুর হাতে দুর্গের চাবি সঁপে দেন তা হলে তাঁকে হত্যা করতে পর্য্যন্ত তিনি কুণ্ঠিত হবেন না। এই মহানুভব এবং মহাবীর শেখের দরুন সেযাত্রা গোলকুণ্ডা শত্রু কবলিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। দুর্গ অধিকারের আশা সেবারকার মত পরিত্যাগ করেই প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেব।

১৬৭২ সনে আবদুল্লা কুলী কুতবশাহের মৃত্যুর পর গোলকুণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁর ভাগিনেয় আবুল হাসান টানা শাহ। টানা শাহ ছিলেন বিলাসী ও ভোগাসক্ত। তাঁর আমলে বিলাসিতা ও দুর্নীতির স্রোত প্রবেশ করল গোলকুণ্ডার সমাজ-জীবনের সকল স্তরে। রাজ্যের আমীর-ওমরাহরাও গা ভাসিয়ে দিলেন বিলাসিতার স্রোতে। ঝকঝকে শিবিকায় আরোহণ করে তাঁরা যখন বেরুতেন গোলকুণ্ডার রাজপথে তখন তাঁদের শিবিকার সম্মুখে ও পশ্চাদভাগে চলত সুসজ্জিত হাতী ও উটের সারি, এই শোভাযাত্রা পরিবেষ্টন করে অগ্রসর হ'ত সশস্ত্র অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যদল। সঙ্গে সঙ্গে গীতবাদ্যের আরাবে মুখরিত হয়ে

টাভার্নিয়ে কর্তৃক গোলকুণ্ডায় জনৈক রত্নবণিকের নিকট দৃষ্ট বৃহত্তম রত্ন। ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল পাঁচ লক্ষ টাকা, টাভার্নিয়ে চার লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াও ইহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই

উঠত চারিদিক। নর্ত্তকীদের সুঠাম দেহভঙ্গী গোলকুণ্ডার রাজপথের উপর লীলাবিভ্রমের সৃষ্টি করত। এই শোভাযাত্রার মাঝখানে শিবিকায় রেশমের গদীতে শোভন ভঙ্গীতে হেলান দিয়ে বসতেন ওমরাহ। তাঁর মাথার উপর শোভা পেত একজন পরিচারকের করধৃত স্বর্ণখচিত ঝলমলে আড়ানি, চামরধারীরা ব্যজন করত চামর, তাঁর শ্রবণের পরিতৃপ্তিসাধন করত নর্ত্তকীদের নূপুরনিক্বণ আর পথে প্রতীক্ষমাণ অগণিত নরনারী নিজেদের ধন্য মনে করত তাঁর ক্ষণিক দর্শনলাভ করে।

আমীর ওমরাহদের এই বিলাসলীলা বিলাসী এবং আয়েসী আবুল হাসানের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করল। রাজধর্ম্ম, রাজ্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব সবকিছু ভুলে গিয়ে তিনি মেতে উঠলেন ভোগ-স্পৃহা চরিতার্থ করবার নব নব উপায় উদ্ভাবনে, রাজকার্য্যের সকল ভার তিনি ন্যস্ত করলেন মদন এবং টিক্কানা নামে দু'জন হিন্দু মন্ত্রীর হস্তে। স্বধর্ম্মীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণের দ্বারা এঁরা হলেন মুসলমানদের বিরাগভাজন, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধির সূচনা হ'ল—গোলকুণ্ডা রাজ্যে উপ্ত হ'ল বিষবৃক্ষের বীজ।

দক্ষিণ ভারতকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র মোগলসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব তখন বিপুল বাদশাহী সৈন্যদল নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন দাক্ষিণাত্যের ঢোলপুরে—তাঁর প্রথম লক্ষ্যস্থল বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনার তোড়জোড় করছেন। আবুল হাসান জানতেন, বিজাপুরের পরেই গোলকুণ্ডার পালা।

অত্যন্ত ভীত হয়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে, আবুল হাসান তাঁকে গোলকুণ্ডা আক্রমণ না করবার জন্যে কাকুতি-মিনতি জানিয়ে পত্র লিখলেন। কিন্তু তাতে ফায়দা হ'ল না, আওরঙ্গজেবের নিকট থেকে এল চরমপত্র—গোলকুণ্ডা আক্রমণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর, বিপুল বাদশাহী সৈন্যদল নিয়ে তিনি এগিয়ে আসছেন রাজধানীর অভিমুখে।
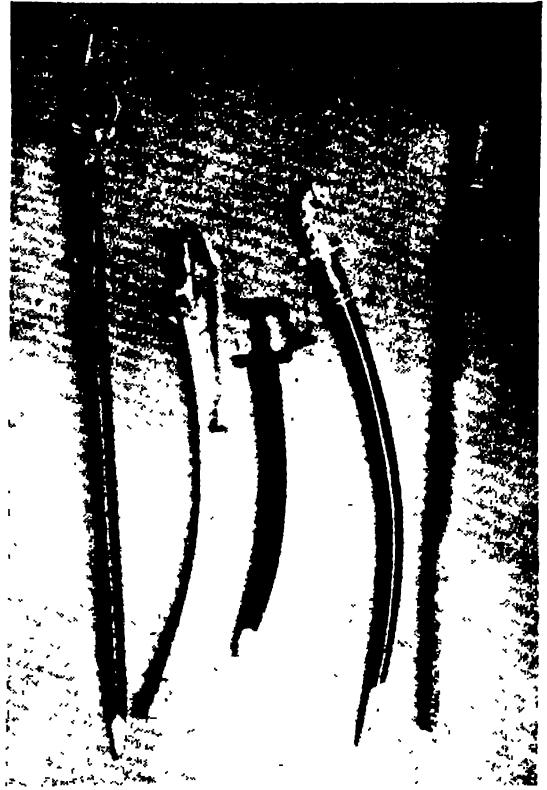
হায়দরাবাদের সালার জং মিউজিয়ামে রক্ষিত টানা শাহের তরবারি (বাঁদিকে প্রথম), চতুর্থ তরবারিটি আওরঙ্গজেবের

যখন এসে পৌঁছল আওরঙ্গজেবের এই চরম পত্র তখন আবুল হাসান ছিলেন হায়দরাবাদ নগরীর উপকণ্ঠস্থ গোসামহল বারাদারী নামক প্রাসাদে। আবুল হাসানের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে নির্ম্মিত এই প্রমোদগৃহ ছিল মনোরম উদ্যান-পরিবেষ্টিত। এই প্রাসাদ থেকে ভূগর্ভের ভেতর দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ-পথ প্রসারিত ছিল 'বালা হাসার' বা দুর্গ পর্য্যন্ত।

সেদিন রমণীয় সায়ংকালে বিলাসমণ্ডপে মগ্ন আবুল হাসান টানা শাহের মনে লেগেছিল গোলাপী নেশার আমেজ, মুখে ফুটে উঠেছিল সান্ধ্যাকাশে অস্তরাগের মত আনন্দের আভা, নর্ত্তকীদের চরণের মঞ্জীর বেজে উঠেছিল তালে তালে, আর তাদের কণ্ঠনিঃসৃত, আমীর খসরু-রচিত প্রণয়সঙ্গীতে প্রমোদকক্ষে সৃষ্ট হচ্ছিল সুরের ইন্দ্রজাল। তাকিয়া হেলান দিয়ে উপবিষ্ট আবুল হাসান আকণ্ঠ

পুরে পান করছিলেন সুরের সুধা। সুর ও সুরার সমুদ্রে ধীরে ধীরে যেন ডুবে যাচ্ছিলেন সৌন্দর্য্যপিয়াসী, বিলাসী নৃপতি। মন তাঁর বিচরণ করছিল কল্পলোকে, এমন সময় তাঁর হাতে দেওয়া হ'ল আওরঙ্গজেবের পত্র—পত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের নির্ম্মম আঘাতে নৃপতির স্বপ্ন ভেঙে গেল, গণ্ডের গোলাপী আভা অন্তর্হিত হয়ে মুখখানা তাঁর হয়ে গেল ছাইয়ের মত সাদা। কেন যেন তাঁর মনে এই পূর্ব্বজ্ঞানের উদয় হ'ল যে, তাঁর এবং সঙ্গে সঙ্গে গোলকুণ্ডারও পতন আসন্ন।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই এই আকস্মিক আঘাতের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠলেন টানা শাহ। সহসা তাঁর অন্তরে জাগল এক প্রবল প্রেরণা, তাঁর মোহভঙ্গ হ'ল, সুর ও সুরার নেশা গেল কেটে। নর্ত্তকীদের বিদায় করে দিয়ে তিনি আহ্বান করলেন সৈন্যাধ্যক্ষদের। তিনি তাঁদের সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করে আওরঙ্গজেবকে বন্দী করবার নির্দ্দেশ দিলেন।

টানা শাহের আদেশ কার্য্যে পরিণত হওয়া হয়ত একেবারে অসম্ভব ছিল না; কেননা গোলকুণ্ডার সৈন্যবাহিনী সাহস এবং বীরত্বের দিক দিয়ে সমগ্র ভারতে ছিল অদ্বিতীয়। কিন্তু হায়, হতভাগ্য খাঞ্জা জানতেন না যে, ইতিমধ্যে ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে, কেবলমাত্র একজন ছাড়া যে আর সকল সৈন্যাধ্যক্ষই তলে তলে তাঁর বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন, তা তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পান নি। যিনি এই জঘন্য 'নিমকহারামী' থেকে বিরত ছিলেন, সেই দেশভক্ত মহাযোদ্ধার নাম আবদুল রজ্জাক লরি।

টানা শাহ সৈন্যাধ্যক্ষদের যথাবিহিত উপদেশ প্রদানান্তে বিদায় দিয়ে সবেমাত্র বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করেছেন এমন সময় দূরের থেকে ভেসে এল প্রলয়গর্জ্জনের মত প্রচণ্ড কোলাহল। বাদশাহী সৈন্যদল বাঁধ-ভাঙা বন্যাস্রোতের মত এগিয়ে আসছে হায়দরাবাদের দিকে আর আতঙ্কগ্রস্ত নর-নারী আশ্রয়লাভের জন্যে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছে গোলকুণ্ডা গিরিদুর্গের পানে। কালবিলম্ব না করে আবুলহাসান সুড়ঙ্গ-পথে নেমে পড়লেন এবং নিরাপদে এসে পৌঁছলেন গোলকুণ্ডা দুর্গে।

১৬৮৭ সনের ১৪ই জানুয়ারী স্বয়ং আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা থেকে দু' মাইল দূরবর্ত্তী আশকনগর পাহাড়ে সসৈন্যে এসে শিবির-সংস্থাপন করলেন। এবার টানা শাহী সৈন্যদল বাদশাহী সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগল প্রচণ্ড বিক্রমে। বাদশাহের একথা বুঝতে বাকী রইল না যে, গোলকুণ্ডা-বিজয় তিনি যতটা কল্পনা করেছিলেন তার চেয়ে ঢের বেশী আয়াসসাধ্য এবং গোলকুণ্ডার আসল প্রতিরোধ-শক্তি যে এর দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরে ততটা নয়, যতটা একটি লোকের অতুলনীয় প্রভুভক্তি, অদম্য সাহস এবং অপরিসীম রণনৈপুণ্যে, সেকথাও তাঁর বোধগম্য হ'ল। গোলকুণ্ডার সেই মুকুটমণি হচ্ছেন বীরকুল-চূড়ামণি আবদুর রজ্জাক লরি। বাদশাহ তখন লরিকে স্ব-পক্ষে টানবার জন্যে কূট কৌশলজাল বিস্তার করলেন, কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল—আবদুর রজ্জাক যে কোন্ ধাতুতে গড়া তা বুঝতে পারেন নি বাদশাহ আওরঙ্গজেব। প্রলোভন দেখিয়ে বাদশাহ একে একে আবুল হাসানের সকল ওমরাহকে এবং সৈন্যাধ্যক্ষকেই দলে টানতে সক্ষম হলেন, বাকী রইলেন শুধু—আবদুর রজ্জাক লরি। আসাদুল্লা খান পনি নামে আর একজন ওমরাহ প্রকাশ্যে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগ দিলেন না, বরং টানা শাহকে এই আশ্বাস প্রদান করলেন যে, নিজের প্রাণ দিয়েও তিনি তাঁর মানরক্ষা করবেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি তাঁর চরম সর্ব্বনাশের ফন্দী আঁটতে লাগলেন। আবদুর রজ্জাকের অতুলনীয় বীরত্ব সত্ত্বেও যে গোলকুণ্ডার পতন হ'ল তা শুধু ঐ নিমকহারাম পনির বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে।

বাদশাহী সৈন্যদল দুর্গ অবরোধ করলে বটে, কিন্তু গোলকুণ্ডা-দুর্গের অফুরন্ত আগ্নেয়াস্ত্র-ভাণ্ডার থেকে দিন-রাত অবিশ্রান্ত গোলা-বর্ষণের দরুন দুর্গ দখল করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। বন্দুক-কামান-নিঃসৃত ধোঁয়ায় চব্বিশ ঘণ্টা দশ দিক হয়ে রইল আচ্ছন্ন, দিন ও রাতের পার্থক্য গেল ঘুচে। এমনি ভাবে কাটল সুদীর্ঘ তিনটি মাস, কিন্তু আওরঙ্গজেবের পক্ষে দুর্গ জয়ের আশা তখনও রইল সুদূরপরাহত। ওদিকে মোগল সৈন্যদের মনোবল প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম—আবদুর রজ্জাক লরির সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে তারা তার নামকরণ করলে—'জিন-কা-বাচ্চা।'...

কেটে যায় মাসের পর মাস, বাদশাহ আওরঙ্গজেব দেখেন—তাঁর শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে স্তূপীকৃত হয়ে উঠে মৃত সৈন্যদের কঙ্কাল, তা দেখায় ঠিক যেন তুষারশুভ্র পাহাড়ের মত। মন হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠলেও হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন্ সম্রাট আওরঙ্গজেব। লরিকে হাত করবার জন্যে আবার তিনি ছয় হাজার অশ্বসহ ছয় হাজার মনসবের প্রলোভন দেখিয়ে নিজের হাতে পত্র লেখেন। চিঠি পড়ে লরি পত্রবাহককে বলেন, "তোমার মনিবকে গিয়ে বল, নিমকহারাম নয় আবদুর রজ্জাক লরি আর তার অনুগামীরা। যাঁর নিমক খাচ্ছি, আমাদের সেই মনিবের সঙ্গে বেইমানি করব না আমরা।"

দূতের জবানিতে লরির এই জবাব শুনে একেবারে তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেব। এদিকে দুর্গাবরোধের পর আট মাস কেটে গেছে, কিন্তু দুর্গ এখনও অনধিকৃত। বাদশাহী সৈন্যব্যূহের পৃষ্ঠদেশ প্রায় ভেঙে পড়বার উপক্রম।

এই সময় বিশ্বাসঘাতক পনির সঙ্গে স্থাপিত হ'ল আওরঙ্গজেবের যোগাযোগ, আবুল হাসানের পক্ষে এটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আবুল হাসান পনিকে মনে করতেন অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর বলে। ফতে দরওয়াজার রন্ধ্রপথ রক্ষার ভার ছিল তাঁর উপরে। এক অন্ধকার নিশীথে সেই রন্ধ্রপথেই গোলকুণ্ডা দুর্গে প্রবেশ করল শনি। দ্বাররক্ষীকে সরিয়ে পনি নিজেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, রজনীর শেষ যামে তিনি অনতিদূরে প্রতীক্ষমাণ মোগল সৈন্যদের নিকট সঙ্কেত প্রেরণ করলেন। রাত্রির অন্ধকারে পিপীলিকার সারির মত বাদশাহী সৈন্যদল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রন্ধ্রপথে দুর্গমধ্যে

প্রবেশ করে অস্ত্রাগার অর্গলমুক্ত করলে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল রাত্রির আকাশ। এই অতর্কিত আক্রমণে হতবুদ্ধি গোলকুণ্ডা দুর্গের সৈন্যগণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে লাগল।

তুমুল আর্ত্তনাদে টানা শাহের নিদ্রা টুটে গেল—তিনি বুঝতে পারলেন, গোলকুণ্ডার আর আশা নেই। রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে তিনি মসনদে গিয়ে উপবিষ্ট হলেন এবং উৎকণ্ঠিত ভাবে অবাঞ্ছিত অভ্যাগতদের আগমন-প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ওদিকে আবদুর রজ্জাক লরি কিন্তু প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করবার সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্কোষিত অসি-হস্তে অশ্বে আরোহণ করলেন, তাঁর অনুগামী হ'ল ডজনখানেক দুঃসাহসিক সৈন্য। মৃত্যুপথযাত্রী আবদুর রজ্জাক এবং তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ধাবমান অশ্বসমূহ এগিয়ে চলল দুর্গ-তোরণের অভিমুখে।

মরণের নেশায় পাগল হয়ে শত্রুসৈন্যদের কচুকাটা করে এগোতে লাগলেন আবদুর রজ্জাক—দুর্গ-তোরণের নিকট যখন তিনি গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাঁর অনুচরদের মধ্যে একজনও জীবিত নেই, কিন্তু এক অদৃশ্য দৈবশক্তি যেন তাঁকে রক্ষা করছে, তাঁর বাহুতে সঞ্চারিত করেছে অতি-মানবীয় শক্তি। দুর্গ-তোরণের নিকটবর্ত্তী হবামাত্র কয়েকজন মোগল সৈন্য তাঁকে চিনতে পেরে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠল, 'জিন-কা-বাচ্চা' বলে, সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে তাঁর উপর অনবরত নিক্ষিপ্ত হতে লাগল তীক্ষ্ণধার তীরসমূহ। আপাদমস্তক অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত, একচক্ষুহীন এবং অজস্র শোণিতক্ষরণে দুর্ব্বল আবদুর রজ্জাক মূর্চ্ছিত হয়ে ভূপতিত হলেন।

সংজ্ঞাহীন আবদুর রজ্জাক লরিকে মোগল সৈন্যেরা ধরাধরি করে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শিবিরে নিয়ে গেল। বাদশাহ তাঁর যথোচিত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন, আর হতভাগ্য নৃপতি টানা শাহ বন্দীকৃত হয়ে অন্তরিত হলেন দৌলতাবাদ দুর্গে। এমনি ভাবে দীর্ঘ আট মাস কাল প্রবল প্রতিরোধের পর দেশদ্রোহী পনির বিশ্বাসঘাতকতায় গোলকুণ্ডার তথা শাহীবংশের পতন হ'ল। দৌলতাবাদ দুর্গে বন্দীদশায় থাকাকালে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে আবুল হাসান টানা শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কালের স্থূল হস্তাবলেপে শাহীবংশের রাজৈশ্বর্য্যচ্ছটা, গোলকুণ্ডা রাজ্যের 'হীরামুক্তামাণিক্যের ছটা' সবকিছুই আজ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু বহুজনাকীর্ণ হায়দরাবাদ নগরীর কোলাহল থেকে দূরে, নিভৃত নির্জ্জনতায় কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোলকুণ্ডা গিরিদুর্গ—আক্রমণকারী বাদশাহী সৈন্যদলের গোলাগুলির আঘাতে একদা এর পাষাণগাত্রে যে ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয়েছিল আজ প্রায় পৌনে তিন শত বৎসর পরেও তা বিলীন হয়ে যায় নি। পাহাড়ের উপরকার দুর্গের নির্ম্মাণ-কৌশল, পরিখা, দুর্গপ্রাকার, ঘাটি ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করলে গোলকুণ্ডা গিরিদুর্গের পূর্ব্বগৌরবের চিত্র যেমন মনশ্চক্ষে ভেসে উঠে, তেমনি স্মৃতিপটে সমুদিত হয় দেশদ্রোহী আসাদুল্লা খান পনির বিশ্বাসঘাতকতার দরুন এর নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা। সেই শোচনীয় কাহিনী স্মরণ করে মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। গোলকুণ্ডার পরিত্যক্ত জনমানবহীন গিরিদুর্গে বিচরণ করতে করতে মনে পড়ে বিগত দিনের ইতিহাস, যখন শাহী বংশের নৃপতিদের অতুল বৈভবের কথা, রূপকথার মতই লোকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করত। এখানকার খনির তিমিরগর্ভ থেকে উত্তোলিত হীরক-সম্পদে প্রলুব্ধ হয়ে একদা দেশ-বিদেশের রত্নবণিক সম্প্রদায় এসে সমবেত হ'ত ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের এই অমরাবতীতে। কিন্তু এ সকল এখন অতীতের কাহিনী মাত্র।* গোলকুণ্ডার হীরকভাণ্ডার আজ নিঃশেষিত—গিরিদুর্গে এবং পাহাড়ের পাদমূলচুম্বী বিরাট প্রান্তরে মহাশ্মশানের নিস্তব্ধতা। এই নির্জ্জন পরিবেশে মহাকালের করাল দংষ্ট্রারেখার মত দৃশ্যমান গোলকুণ্ডা দুর্গের ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডসমূহ যেন বিকট হাসি হেসে দর্শককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ঐহিক ঐশ্বর্য্যের নশ্বরতার কথা—এর পাষাণগাত্রে সর্ব্বত্র যেন অদৃশ্য অক্ষরে লিখিত আছে :

"ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে
সে গৌরবশশী।"

* ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে হায়দরাবাদে অবস্থানকালে সেখানকার ষ্টেট কংগ্রেসের সেক্রেটারী বাকের আলি মির্জা সাহেবের অনুরোধে হায়দরাবাদের ইনফরমেশন এণ্ড পাবলিক রিলেশন্‌সের ডিরেক্টর মহোদয় কিছু পত্রপত্রিকা এবং হায়দরাবাদ সম্পর্কিত পুস্তকাদি প্রদান করে আমার প্রতি বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করেন। বর্তমান প্রবন্ধ-রচনায় সেগুলো থেকে সাহায্য পেয়েছি—লেখক।

কিরণদা

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কিরণদা নামে পরিচিত, অগ্নিযুগের আরম্ভ কাল হইতে দীপ্তিমান সাগ্নিক কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের পরিচয় প্রদানের সুযোগ ঘটিয়াছে। তিনি প্রচারবিমুখ আত্মবিলোপকারী কর্ম্মী ছিলেন এবং তাঁহার কীর্ত্তিকথায় বিন্দুমাত্র আলোচনা কোথাও প্রকাশ হইতে দেখিলে তিনি এতই বিরক্ত হইতেন যে, তাঁহার জীবিতকালে সে আলোচনা সম্ভব ছিল না। তাঁহার অনুগত শিষ্য শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত (বিপ্লবীমহলে যিনি ছোট ভূপেন দত্ত নামে পরিচিত) একবার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একটি বিশেষ অধ্যায়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রসঙ্গতঃ কিরণচন্দ্রের কাজের কিছু পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতে কিরণচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হন এবং ভূপেন্দ্রকে সেজন্য তিরস্কার করেন। আমি "বিপ্লবী যুগের কথা" নামে আরম্ভকালের যে ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক চিত্র রচনা করি তাহাতে মাণিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশ ধৃত হওয়ার পর বিপ্লবীদলের যে অবস্থা হয় তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া আমি লিখিয়াছিলাম :

'বাহিরে যে সমস্ত বিপ্লবী রহিল তাহারা ক্ষণিকের জন্য ছন্নছাড়া হইলেও অতি অল্পদিনের ভিতরে আপনাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিল এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত থাকিয়া কাজ করা সুবিধা মনে করিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইল। এরূপে আত্মোন্নতি ও অনুশীলন দল ব্যতীত বহু ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হইল। কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত ও মোক্ষদা সামাধ্যায়ী একটি দল তৈয়ারী করেন ও নিখিলেশ্বর রায়মৌলিক প্রভৃতিও একটি দল গড়েন। প্রভাসচন্দ্র দেব, ময়মনসিং সুহৃদসমিতির কেদার চক্রবর্ত্তী, প্রিয়শঙ্কর সেন ও যোগেশ চৌধুরী কলিকাতায় 'পন্থা' নামক বিদ্রোহাত্মক পুস্তক প্রকাশের জন্য দণ্ডিত বিপ্লবী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতা হওয়া অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত যোগসাধন ও গোপনে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের কাজে রত হয়। চোরবাগানে যোগেন্দ্রনন্দন ঠাকুরের ছাপাখানা ও হ্যারিসন রোড এবং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের 'বণিক প্রেস' হইতে গোপনে 'যুগান্তর' মুদ্রিত হইয়া বাহির হইতে লাগিল। ছাত্রভাণ্ডারের দল শ্রমজীবিসমবায়ের অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মজুমদারের সহিত একযোগে কাজ করিতে লাগিলেন। ছাত্রভাণ্ডারের দলস্থ অধ্যাপক বিমলচন্দ্র দেব, লাডলিমোহন মিত্র (পরে বঙ্গবাসী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক), যতীন্দ্রলোচন মিত্র প্রভৃতি বিদ্যাসাগর কলেজের কতিপয় ছাত্রের সহযোগিতায় 'যুগান্তর' নাম দিয়া স্বতন্ত্র পত্রিকা মুদ্রিত করিয়া গোপনে প্রচার করিতে থাকেন। হরিশচন্দ্র শিকদার ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছন্নছাড়া দলগুলিকে একত্রিত করিতে প্রয়াসী হইলেন।"

আমার এই বর্ণনায় কিরণচন্দ্রের যে কার্য্যধারা আমার জানা ছিল তাহাও প্রকাশ করি নাই ; ইতিহাসের পারম্পর্য্য রক্ষার্থে প্রসঙ্গতঃ তাঁহার সে সময়ের ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত না হইলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় বলিয়াই, নাম প্রকাশেও কিরণচন্দ্রের আপত্তি জানিয়াও, আমি তাঁহার নামোল্লেখে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইহাতে বিব্রত হইয়া কিরণচন্দ্র আমার নিকট উপস্থিত হন ও তিরস্কার করেন। তিনি আরও বলেন যে, বিপ্লবীযুগের পরবর্ত্তী কাহিনী যদি আমি কোনও দিন লিখি তাহাতে যেন আমি তাঁহার কোনও উল্লেখ না করি।

কিরণচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। বোমার কারখানা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ও পরে কয়েক বৎসর তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং সেজন্য তাঁহার সে সময়কার বৈপ্লবিক জীবনের পরিচয় আমার যথেষ্ট জানা ছিল। বিপ্লবীদলের মধ্যে যেখানে অনেকেই নিজ কীর্ত্তিধারা প্রচারে উন্মুখ, সেক্ষেত্রে যে অতি অল্পসংখ্যক লোক সম্পূর্ণ প্রচারবিমুখ, কিরণচন্দ্রের স্থান তাঁহাদের মধ্যেও বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে। তিনি বলিতেন যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য পণবদ্ধ যোদ্ধারা যুগে যুগে দেশে দেশে যে অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও বিপদ বরণ করিয়াছেন এবং যেরূপ অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, আমরা তাহার তুলনায় এমনকি-বা করিয়াছি এবং দেশকে স্বাধীন করিবার যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহাতে সিদ্ধিলাভের পথে কতটুকুই বা অগ্রসর হইতে পারিয়াছি যে তাহা লইয়া বড়াই করিব ? আমাদের জাহির করিলে মুক্তি-যুদ্ধকে বড় ছোট করা হয়।

এইরূপ ধারণা হইতেই কিরণচন্দ্র নিজের কীর্ত্তিকে অবলুপ্ত রাখিতে চাহিতেন। তাঁহার তিরোভাবের পর মহাযুদ্ধের কীর্ত্তিগাথা গোপন রাখিবার কোনও হেতু নাই। কিন্তু এই কাজ এক জন বা দুই জনের সাধ্যাতীত ; কেননা বৈপ্লবিক পন্থায় মন্ত্রগুপ্তি ও অতি সঙ্গোপনে কার্য্য করাই যখন সিদ্ধিলাভের সোপান তখন প্রত্যেক নায়কই আপন কাজকে যথাসম্ভব অল্পলোকের গোচরে সাধন করিয়া লইয়াছেন এবং নিজের কাহিনী নিজে না লিখিলে কোনও একজন সহকর্ম্মীর পক্ষে সকল কথা জানা ও লেখা সম্ভবপর নহে।

স্বাধীন হওয়ার পর বহু নেতা ও উপনেতা তাঁহাদের স্মৃতিকথা প্রকাশ করিয়া বিপ্লবের ইতিহাসকে পূর্ণতর রূপ দিবার সুবিধা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কিরণচন্দ্র অনুগত সহকর্ম্মীদের বহু অনুনয় সত্ত্বেও আপন বৈপ্লবিক জীবনের কাহিনী না বলাতে অনেকটাই অজানা থাকিয়া যাইবে।

এই অজানার যবনিকার অন্তরাল হইতে সহকর্ম্মীরা নিজেদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানগত কাহিনীগুলি লিখিলে তবুও এই আত্মভোলা লোকটির কিছু পরিচয় ভবিষ্যতের জন্য থাকিয়া যাইবে ভাবিয়া আমার জানা কিরণচন্দ্র সম্পর্কে কিছু লিখিতেছি।

যুগান্তরদলের স্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম নায়ক দেবব্রত বসুর (পরে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ নামে খ্যাত) সংস্পর্শে আসিয়া কিরণচন্দ্রের বৈপ্লবিক জীবন আরম্ভ হয়। লিখিবার ক্ষমতা ছিল কিরণচন্দ্রের

স্বভাবজাত এবং মনে স্বাধীনতা লাভের যে অনির্ব্বাণ আগুন যৌবনেই তাঁহার প্রাণে জলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্তাপে তাঁহার লেখনী অগ্নিবর্ষী হইয়া উঠিয়াছিল। 'কঃ পন্থাঃ' নামক পুস্তিকার তেজোগর্ভ লেখনীর যে পরিচয় তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে তাহাই দেবব্রতকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং দেবব্রত কিরণচন্দ্রকে শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। এই পরিচয়ের ফলে কিরণচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" "যুগান্তর" ও "নবশক্তি"র নিয়মিত লেখক হইলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়া পড়ায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। এই 'সন্ধ্যা' পত্রিকার শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ আপিসেই অর্দ্ধোদয় যোগের সময় প্রভাসচন্দ্র দেব ও কার্ত্তিকচন্দ্র দত্তের মাধ্যমে আমার সহিত কিরণচন্দ্রের পরিচয় ঘটে এবং তাহার পর নিখিলেশ্বর রায়মৌলিক (বর্ত্তমানে ভোলানন্দ গিরি আশ্রমের স্বামী ভবানন্দ) মহাশয়ের রামধন মিত্র লেনস্থ সুমতি প্রিন্টিং ওয়ার্কসে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। নিখিলেশ্বরের সহিত কিরণচন্দ্রের যে হৃদ্যতা জন্মে, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা অটুট ছিল। অল্পদিন পূর্ব্বেও ভবানন্দের সুখচরস্থ আশ্রমে কিরণচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য গিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে যে, অগ্নিযুগের আরম্ভকালীন কিরণচন্দ্রের একান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের মধ্যে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অতীন্দ্রনাথ বসুই কেবল জীবিত আছেন, সে সংবাদ ঠিক নহে। সে যুগের প্রখ্যাত কর্ম্মীদের অন্যতম নিখিলেশ্বর রায়মৌলিক ও সতীশচন্দ্র সরকার (বর্ত্তমানে হাওড়া বালটিকরি আশ্রমের নির্ব্বাণ স্বামী) প্রভৃতি কিরণচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণ আজিও জীবিত এবং তন্মধ্যে নিখিলেশ্বর বয়সে প্রবীণতম। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৮৫ বৎসর। নিখিলেশ্বরের ছাপাখানা হইতেই 'মুক্তি কোন্ পথে ?", "বর্ত্তমান রণনীতি" প্রভৃতি পুস্তক মুদ্রিত হয় এবং বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রথম বিপ্লবী ইস্তাহার "Now or Never" গোপনে মুদ্রিত হইয়া যেদিন বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন সেই দিন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ হাওড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত বিপুল জনগণের মধ্যে বিতরিত হয়। এই মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থায় নিখিলেশ্বরের সহযোগিতা করেন মেছুয়াবাজারের প্রভাসচন্দ্র দেব, (সে সময়ে চন্দননগরের উক্ত নামীয় আর একজন আত্মোন্নতি সমিতিভুক্ত বিপ্লবী ছিলেন) ও কিরণদা। মুদ্রণ ও বিতরণ ব্যাপারে যাহারা যুক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম, সেজন্য এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই কিরণচন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতার সাক্ষ্য দিতে পারি। "যুগান্তর" প্রকাশ বোমা আবিষ্কারের পর নিখিলেশ্বরের দায়িত্বে মানিকতলা ষ্ট্রীটে হেদুয়ার নিকট একটি বাটী হইতে চলিতে থাকে এবং লেখা, লেখা যোগাড় করা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রভাসচন্দ্র ও কিরণচন্দ্র সহায় হন। তাহার পর সরকারী আদেশে যুগান্তরের প্রকাশ্যে প্রকাশ যখন বন্ধ হয় তখন সুমতি প্রেসের প্রতি পুলিসের খর দৃষ্টি থাকাতে প্রভাসচন্দ্র ও কিরণদা বণিক প্রেস ও যোগেন্দ্রনন্দন ঠাকুরের ছাপাখানা হইতে গোপনে উহা মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যবস্থার ভার লন। প্রিয়শঙ্কর সেন ও সতীশ সরকার ইঁহাদের সহকারী হইলেন। এই গোপন প্রকাশের

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সঙ্গে আমার কতকটা সংস্রব ছিল বলিয়া ইহা প্রকাশে যে দুস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে হইত এবং অর্থসংগ্রহের জন্য কিরণচন্দ্র প্রভৃতিকে যে বেগ পাইতে হইত তাহা কতকটা আমার জানা আছে।

বোমার কারখানা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যে বোমা প্রস্তুত-প্রণালী লুপ্ত হয় নাই এবং বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্ম্মক্ষমতা যে কর্ম্মচঞ্চল আছে তাহা জনসাধারণকে জানাইবার জন্য কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে সে সময়ে যে মধ্যে মধ্যে বোমা বর্ষিত হইত, তাহার সহিতও কিরণচন্দ্রের সক্রিয় যোগ ছিল। আলিপুর জেলে আগ্নেয়াস্ত্র প্রেরণ ব্যাপার লইয়া নানাবিধ গুজব আছে; কিন্তু এ ব্যাপারের প্রকৃত ঘটনা জানিতেন কিরণচন্দ্র ও সতীশ সরকার ওরফে নির্ব্বাণ স্বামী। নির্ব্বাণ স্বামী এখনও জীবিত আছেন; চেষ্টা করিলে এই সময়কার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অনেক সত্য কাহিনী তাঁহার ও স্বামী ভবানন্দের কাছ হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে শ্রুত আছি যে, জেলে রিভলবার প্রেরণ সম্ভব হইয়াছিল সেই সময়ে জেলের ডাক্তার আনন্দ রায়ের সহযোগিতায়; তবে এ সম্পর্কে আমার কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই।

১৯০৮ সনের শেষদিকে কিরণদা ও সতীশচন্দ্র বিপ্লবীনায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে থাকেন। ১৯০৯ সনে ১০ই ফেব্রুয়ারি আলিপুর আদালত-প্রাঙ্গণে বোমার মামলার সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাসকে চারুচন্দ্র বসু নামক দক্ষিণ হস্তে পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক বালক হাতে রিভলবার বাঁধিয়া লইয়া কোনও ক্রমে গুলি চালাইয়া হত্যা করে। চারুচন্দ্র যশোহরের উকীল কেশবচন্দ্র বসুর সন্তান। পঙ্গু জীবনকে দেশের মুক্তিযজ্ঞে আহুতি দিয়া জীবন সার্থক করিবার মানসেই সে হত্যার ভার লয়। যতীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশেই আশুতোষ-হত্যার সঙ্কল্প স্থির হয়। বালকটিকে সংগ্রহ করা ও উদ্দীপ্ত করার ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন কিরণচন্দ্র।

তাঁহার সহচর সতীশচন্দ্র সরকার শামসুল হকের হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে সংগ্রহ করিয়া যতীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে সঙ্গে করিয়া হাইকোর্টে লইয়া গিয়া শামসুল হককে চিনাইয়া দেন। বীরেন্দ্রের স্বীকারোক্তিতে সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় ফেরার হন।

কিরণচন্দ্র ভারত-জার্ম্মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন সন্দেহে ১৯১৫ সনে ১৮১৮ সনের তিন নম্বর রেগুলেশন বলে ধৃত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে প্রেসিডেন্সী জেল, মেদিনীপুর জেল ও হাজারিবাগ জেলে আটক থাকেন। ১৯২০ সনে মুক্তিলাভ করিয়া কিরণচন্দ্র নিজ অঞ্চল যশোহর-খুলনাকে আপন কার্য্যের প্রধান কেন্দ্র করিতে ইচ্ছুক হইয়া ৺কুন্তল চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, চারু ঘোষ ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় দৌলতপুরে "সত্যাশ্রম" স্থাপন করেন। ইহা ছিল প্রধানতঃ সমাজসেবামূলক ও চরিত্রগঠন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান। অবশ্য, মুক্তিপূজারী এই দল তাঁহাদের ব্রতকে ভুলেন নাই ; বিপ্লবীমন্ত্রে নূতন সদস্যদের দীক্ষা দেওয়াও ইহার কার্য্যের অঙ্গ ছিল।

১৯২৪ সনে গোপীনাথ সাহা মিষ্টার টেগার্ট ভ্রমে আর্নেষ্ট ডেকে হত্যা করিলে সেই প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত বলিয়া সন্দেহবশে কিরণচন্দ্র অরুণ গুহ, সতীশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির সহিত ধৃত হন ও পুনরায় কারারুদ্ধ হন। তাহার পর তাঁহাকে বাংলা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বিশাখাপত্তনে রাখা হয়।

১৯২৮ সনে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি পুনরায় সত্যাশ্রমের সহিত যুক্ত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বাংলা দেশব্যাপী যে ধরপাকড় হয় তাহাতেও তিনি গ্রেপ্তার হন ও দেউলী বন্দী-নিবাসে আটক থাকেন। ১৯৩৮ সনে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি সরস্বতী লাইব্রেরী নামক জাতীয় ভাবধারা-প্রচারক পুস্তকালয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি যুবকদিগের মধ্যে নৈতিক বল সঞ্চার ও তাহাদের চরিত্রগঠনে বিশেষভাবে মনোযোগী হন।

'৪২ সনে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া দমদম জেলে আটক রাখা হয়।

১৯৪৫ সনে মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে "প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার" নামে একটি পাঠাগার স্থাপন করিয়া যুবসমাজে সদ্গ্রন্থ পাঠ ও তাহার মাধ্যমে চরিত্রগঠনকার্য্যে ব্রতী হন। তরুণদের মধ্যে নাগরিক কর্ত্তব্যবোধ জাগাইবার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরীর তরুণ সদস্যদের লইয়া তিনি পাড়ার ফুটপাথ ঝাঁট দেওয়া, কলা, আম, কমলালেবুর খোসা রাস্তায় ছড়াইয়া থাকিলে তাহা পথচারীদের পতন ও তজ্জনিত আঘাতের হেতু হয় বলিয়া সেগুলি অপসারণ প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োজিত হন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

বন্দী অবস্থায় পুলিস তাঁহার প্রতি যে অকথ্য অত্যাচার করে, তাহার ফলে তাঁহার দৈহিক স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায় ও গুহ্যদ্বার অবসাদগ্রস্ত হওয়ায় বহু বৎসর যাবৎ তিনি মলত্যাগের সময় অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়াছেন। শেষকালে তিনি দুরন্ত কর্কট রোগে (ক্যান্সার) আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ইহা আংশিক চিত্রমাত্র। বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার সহিত তাঁহার বৈপ্লবিক জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। সে সমস্ত কাহিনী অতি অন্তরঙ্গদের নিকটও তিনি কোনও দিন প্রকাশ করিতেন না।

তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্র নিষ্ঠায় জীবন ভিন্ন বৈপ্লবিক কার্য্যধারা সফল হইতে পারে না ; সেইজন্য তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাবে নিজের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। আমাদের মনে অনেক সময় উহা অনাবশ্যক কঠোরতা বলিয়া মনে হইয়াছে ; কিন্তু তিনি তাঁহার ধারণায় শেষ পর্য্যন্ত অচল নিষ্ঠা রাখিয়া চলিয়াছেন। বাহিরের এই কঠোরতা সত্ত্বেও তাঁহার হৃদয়ে স্নেহ-প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল। তাঁহার বন্ধু ও শিষ্যবর্গের প্রতি তাঁহার মমতা ছিল অসীম এবং তাহাদের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য তাঁহার প্রাণে বিরাট আকুতি ছিল।

তিনি ধূমপানের অভ্যাস বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। শরীরের পক্ষে কোনও উপকারে আসে না অথচ অনর্থক ব্যয়বহুল এই অভ্যাস তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। আমার নিকট ইহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হইত বলিয়া অনেক সময় তাঁহাকে রাগাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার সম্মুখে ধূমপান করিতাম এবং তিনি বারণ করিলে তর্ক তুলিতাম যে, তোমার সম্মুখে যদি না ধূম সেবন করি তাহা হইলেই ত অভ্যাস ছাড়া হইবে না এবং ইহা যখন আমি গর্হিত আচরণ বলিয়া বিবেচনা করি না, তখন উহা তোমার সম্মুখেই বা খাইব না কেন? এক দিন কি জানি কি মনে করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তর্ক রাখ, তোকে আমি ধূমপানের অনুমতি দিলাম।"

আমি সেই দিনই স্থির করিলাম যে, আমার প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার পক্ষে যাহা স্বীকার করা মর্ম্মান্তিক তাহাও করিতে যখন তিনি অনুমতি দিলেন, তখন তাঁহার মর্য্যাদা রাখিয়া তাঁহার সম্মুখে আর ধূমপান করিব না। এ কথা তখনই তাঁহাকে জানাইলাম।

আমার সৌভাগ্য যে, আমি আমার এই সঙ্কল্প বজায় রাখিতে পারিয়াছি।

প্রথম পরিচয়ের অল্প পরেই তিনি আমাকে তুমি বলিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তাঁহাকে তুমি বলাতে ভক্তবৃন্দের নিকট আমাকে একবার বেশ নাজেহাল হইতে হইয়াছিল। মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য বাংলার ডেলিগেট রূপে গিয়া ডেলিগেটদিগের আবাসে বাংলা হইতে বহিষ্কৃত কিরণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে আমি তাঁহাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহার কতিপয় অনুগত শিষ্য আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও কিরণচন্দ্র সেই স্থান হইতে অন্যত্র গমন করার পরই তাঁহারা আমাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই কিরণচন্দ্র সেই স্থানে পুনরাগমন করিলে আমি তাঁহাকে "কিরণবাবু আপনি" প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি বলিলেন, "এ সব কি হচ্ছে গাধা।" আমি উত্তরে বলিলাম, "কি করি, আপনাকে তুমি বলাতে আপনার চেলারা যে চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল তাতে 'আপনি বলাই শ্রেয় মনে হইতেছে।" এই কথা শুনিয়া তিনি উক্ত শিষ্যবর্গকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় গঞ্জনা প্রদান করেন। ইহার পর হইতে এই সব ভক্তের দল আমাকে কিছু বলিতে সাহসী হয় নাই।

শেষে যে দুইটি কাহিনী বলিলাম তাহা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলেও এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অন্ততঃ কতকটা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় এই আশাতেই বলিলাম।

আমার কবিতা

শ্রীরণেশ মুখোপাধ্যায়

রাঙা মাটির দেশে,
আকাশ যেথা লুটিয়ে প'ড়ে
মাঠের বুকে মেশে;
উপচে-পড়া তরল অন্ধকারে,
একা একা ভাবছি বসে আমার কবিতারে।
মনের পাড়ার বাঁধানো পথপাশে,
ভাবকন্যা দাঁড়িয়ে আছে হাতছানিটির আশে।
মনে পড়ে আদম-ঈভের অনুরাগের ভাষা,
স্বপন-ঘোরে ছিটিয়ে-দেওয়া একটু ভালবাসা:
বুকের মাঝে ছন্দ ওঠে দুলে,
পিঠের ওপর এলিয়ে দেওয়া চুলে;
আকাশ বীণার তন্ত্রীগুলি সুর-বালিকার সুরে
কোথায় যেন ডাকছে কত দূরে!

শাল-তমালের ছায়,
সন্ধ্যা যেথায় হঠাৎ নামে আঁধার-কালো পায়:
শালের শাখা থরথরিয়ে ওঠে,
একটি দিনের প্রার্থনাতে জীর্ণ-পাতা লোটে;
হংস-সারির পিছিয়ে-পড়া পাখী,
অন্ধকারের আকাশ চিরে উঠল কারে ডাকি!
কে যেন তার চলে গেল দূরের ঠিকানায়!
ঐখানে ঐ শাল-তমালের ছায়,
আমার সে কি দাঁড়িয়ে আছে সলাজ প্রতীক্ষায়?

সন্ধ্যাকাশে তারার ফুল ফোটে,
সুরত-প্রিয়া কোন্ রমণীর কণ্ঠচ্যুত রত্নহার লোটে;
উতল মন আজি যে অভিসার,
ছিন্ন হয়ে পড়ল মণিহার,
ছড়িয়ে গেল পথের 'পরে পৃথিবীরে সাক্ষ্য জানাবারে।
ঐখানে ঐ নীল-আকাশের পারে,
পাবো কি আজ আমার কবিতারে?

স্বপ্ন আমার ফিরে এলো লাল অসমের মাঝে,
পাশে যেন কিসের সাড়া বাজে!
তাকিয়ে দেখি পাহাড়-ঘেরা সাঁওতালী এক মেয়ে
অবাক চোখে দেখছে চেয়ে চেয়ে,
উঠতে দেখে সরে গেল, ডাকতে গেলেম তাকে:
শুনল না সে, চলে গেল—
কে জানে কোন দূরের গাঁয়ে থাকে!
ফিরে এসে ভাবছি একা একা—
এতক্ষণে পেলেম বুঝি মোর কবিতার দেখা।

সাঁওতাল ভূমি　　　　শিল্পী—শ্রীগোপাল ঘোষ

প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

চিত্রগুপ্ত

বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে চিত্রপ্রদর্শনীর বহুলতা ও বিপুলতা যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে আশান্বিত হইবার কারণ আছে কিনা, এই সকল শিল্পীর কোন কোনও সাধনার ধন দেশলক্ষ্মীর ভাণ্ডারে চিরসম্পদ হইয়া স্থান পাইবে কিনা, ভবিষ্যৎ কাল তাহার বিচার করিবে।

আপাতত খোস খবরের ঝুটাও ভাল, অন্তত এই কথা মনে করিয়া খুশি হওয়া যাক।

একটা উন্নতি অন্তত এই হইয়াছে যে, ছবি ফটোগ্রাফের মত না হইলে এ যুগে আর কেহ নিন্দা করে না। বরং হইলেই পংক্তিভোজনে তাহার আসনটা দূরে পাতা হয়। "রাজ্ঞী পক্ষী নিরীক্ষণ করিতেছেন", এ ব্যঙ্গচিত্র কাগজে আর প্রকাশিত হয় না; "নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরগণ"-এর জাত গিয়াছে বটে, কিন্তু লতানে আঙুল এখন আর কোন পরিহাস-রসিকের ব্যঙ্গের বিষয় নয়। এমনকি আঙুল না থাকিলেও চলে; চতুষ্কোণ বা বহুকোণ 'হেড অব এ ওম্যান' যদি কোন মানবজাতীয়ার মুণ্ড বলিয়া চেনা নাও যায়, তবু শিল্পীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কেহ করেন না, বুঝিতে চেষ্টা করেন, বা বুঝিবার ভান করেন। হাওয়া ফিরিয়াছে। প্রত্যেক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের নিজস্ব কলাসমালোচক নিযুক্ত হইয়াছেন, ছবি ও তাহার আলোচনা কাগজের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া থাকে। সাধারণ মানুষের ছবির প্রতি আগ্রহ বহু গুণ বাড়িয়াছে ইহাতেও সন্দেহ নাই। এই মানুষ আপাতত 'তর্কের ঝড়, বাক্যের ধূলি'তে উদ্‌ভ্রান্ত হইলেও, এই যে আগ্রহ ইহা সত্যকার আগ্রহ এবং ইহাই আশার কারণ।

শিল্পবিদ্যালয়ের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়িতেছে; প্রতি বৎসর বহু ছাত্র শিক্ষাসমাপ্তির পর এই সকল বিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন; ইঁহাদের অনেকে কেবল জীবিকার

একটা উপায় রূপে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ; অনেকের মনে শিল্প-সাধনার অগ্নি যেটুকু আছে তাহা জীবনসংগ্রামে ভস্মান্তরাল হইবে ; এক দল শিল্পমতবাদের আবর্তে আত্ম-বিসর্জন দিবেন ; তবু আশা করা যায় যে, ইঁহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন শিল্পীর সৃষ্টি হইবে যাঁহাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ, তুলি স্বচ্ছন্দ। অবনীন্দ্রনাথের মত কবি ও মনীষী শিল্পী হয়ত আর শীঘ্র জন্মিবেন না, গগনেন্দ্রনাথ যে অলৌকিক রূপকথার জগৎ, কালো-শাদায় যে কল্পলোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা আবার কাহার হাতে চিত্ররূপে ধরা দিবে কে জানে ; নন্দলালের মত শিল্পীর আবির্ভাব—যাঁহার শিল্পদৃষ্টিতে উমার বিরহ-বেদনা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সাঁওতাল রমণীর প্রণয়মুগ্ধ দৃষ্টি সকলই বিপুল পরিমায় বিধৃত হইয়াছে—কোনকালেই সুলভ হইবে না—কিন্তু আমাদের দেশে একাল হয়ত কয়েকজন যুগন্ধর শিল্পীর মহান্ সৃষ্টির দ্বারা চিহ্নিত হইবে না, বহুজনের সবল শিল্পকর্মের প্রভাবেই হয়ত দেশময় শিল্প-সচেতনতা একটা সুস্থ মূর্তিলাভ করিবে। শিল্প-বিচারের একটা মানদণ্ড গড়িয়া উঠিবে। তাহা কম লাভ নহে।

২

এই যে দেশময় শিল্পকর্মের প্রসার ও প্রচারের জন্য এত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে ইহা দ্বারা দেশের যতখানি স্থায়ী উপকার হইতে পারে তাহা কার্যত হইবে কিনা, তাহা অবশ্য নির্ভর করিবে এগুলির নায়ক ও পরিচালকবর্গের শিল্পবোধ ও কর্মপদ্ধতির উপর।

কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পীর একক প্রদর্শনীর কথা বাদ দিলে, অধিকাংশ যৌথ প্রদর্শনীতেই যাহা সবচেয়ে চোখে পড়ে তাহা হইতেছে উদ্যোক্তাদের বহ্বায়তনপ্রীতি ও সংখ্যাগৌরবলুব্ধতা।

এই সকল প্রদর্শনীর বিচারকমণ্ডলী বলিয়া যাঁহাদের নাম ছাপা হয় তাঁহাদের শিল্পবোধ সম্বন্ধে সংশয় করিবার কারণ নাই এবং নিজেদের কর্তব্য তাঁহারা মন দিয়াই করেন, আশা করা যাইতে পারে। এই সকল প্রদর্শনীতে কেবল "masterpiece"-এর ভিড় হইবে এমন আশা করা যায় না, কিন্তু competence-এর ও শিল্পরুচির পরিচয় আছে অন্তত এরূপ ছবি থাকিবে ইহা ধরিয়া লওয়া যায়—কিন্তু বহু ছবি সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায় না। এ রকম বেমানান কি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

ভাবে প্রবেশ করে, তাহার কারণ চিন্তা করিলে দুটি সিদ্ধান্ত করা ছাড়া উপায় দেখা যায় না :

(১) প্রদর্শনীগুলি কতকটা সার্বজনীন পূজার ও তদানুষঙ্গিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রের রূপ লইয়াছে। এ ক্ষেত্রে আয়তন ছোট হইয়া গেলে লজ্জা পাইতে হয়। প্রদর্শনীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিব তাহাতে তাহার আয়তন ছোট হোক ক্ষতি নাই—এই মনোভাব যতদিন না প্রদর্শনী-গুলির কর্তৃপক্ষ সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীকার করেন ততদিন প্রদর্শনীগুলির এই মেলার চেহারা পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

(২) দ্বিতীয় কারণ সম্ভবত এই—যৌথ প্রদর্শনীগুলি সাধারণত সর্বভারতীয়, জাতীয় এইরূপ আখ্যায় ভূষিত—এ ক্ষেত্রে সম্ভবত একপক্ষে প্রাদেশিকতা-অপবাদের আশঙ্কায়, অপরপক্ষে তাঁহাদের নাম যে পরিচয় বহন করিতেছে তাহার সার্থকতা সম্পাদনের জন্য, বিভিন্ন প্রদেশের এমন ছবি কিছু কিছু বিচারকমণ্ডলী স্বীকার করিতে বাধ্য হন, সাধারণত যাহা তাঁহারা অঙ্গীকার করিতেন না।

সাঁঝের আলো শিল্পী—শ্রীচন্দ্রনাথ দে

ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে শিল্পকলার কিরূপ বিকাশ ঘটিতেছে তাহা জানিবার আগ্রহ আমাদের স্বাভাবিক, প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষের সে পরিচয় ঘটাইবার দায়িত্বও আছে। অপরপক্ষে, এরূপ প্রাদেশিক ভিত্তিতে শিল্পীর সৃষ্টি হয় না এবং স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেশন ও ওয়েইটেজ দিয়া সার্থক প্রদর্শনীর সমাবেশও সম্ভব নহে। এরূপভাবে তথাকথিত সর্বভারতীয় চিত্রনির্বাচন করিতে গেলে কিরূপ শোকাবহ পরিণাম হইতে পারে তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা সরকারী একটি চিত্রসংগ্রহ-গ্রন্থে দেখিয়াছি। সরকারী পোষকতায় হয়ত গ্রন্থখানির দেশ-বিদেশে বহুল প্রচারও ঘটিয়াছে, প্রকাশক আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু 'যুগে যুগে ভারত-শিল্পের পরিচয়' এই গ্রন্থ বহন করে না; আধুনিককালে ভারত-শিল্পের কীর্তি যতই ক্ষীণ হোক তাহার আভাসও ইহাতে পাই না। চিত্রীর শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন বিচারে ত্রুটি এবং ভাল মন্দ মাঝারি শিল্পীর শোভাযাত্রা রচনা, এই দুয়ে মিলিয়া—মুদ্রণের অসৌষ্ঠবের কথা তুলিলাম না—এই প্রশংসনীয় উদ্‌যোগের এইরূপ বিবর্ণ সমাপ্তি ঘটাইয়াছে।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের পক্ষে তাহা হইলে এই সকল পথ আছে—শিল্পী আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এমন সকলের নিকটই তাঁহারা লোকপ্রিয় থাকিবেন এরূপ প্রলোভন যদি তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারেন তবে হয় তাঁহারা নির্বিচারে চিত্র আহ্বান করিলেও তাহা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্মম হইতে পারেন; কিংবা তাঁহারা যাঁহাদের প্রকৃত শিল্পীপদবাচ্য মনে করেন তাঁহাদেরই আহ্বান করিতে পারেন। বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে যদি উদার দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই আসন হয় তাহা হইলে ইহার ফলে গোষ্ঠীবাৎসল্য দেখা দিবার কোন কারণ নাই। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করিয়া সন্ধান রাখিতে হইবে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে নবীন শিল্পীর অভ্যুদয়ের কথা; প্রতিষ্ঠানকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্যই তাহা প্রয়োজন।

সংখ্যা, গোষ্ঠী বা প্রদেশ এই সকল বিবেচনা ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র শিল্পোৎকর্ষ বিচারই একমাত্র মানদণ্ড হইলে ছবির সংখ্যা এখনকার তুলনায় ক্ষীণ হইয়া যাইবে, এমন সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যদি সকল সমাদরযোগ্য শিল্পীর রচনা সংগ্রহ করিবার পরও প্রদর্শনীর আয়তন সংক্ষিপ্ত হয় তাহাতে উহার গৌরব বাড়িবে বৈ কমিবে বোধ হয় না। পরিমাণের বিনিময়ে তাঁহারা মর্যাদা অর্জন করিতে পারিবেন। নিজ লক্ষ্যে কিছুকাল স্থির থাকিতে পারিলে, গোষ্ঠীবাৎসল্য ও প্রাদেশিকতা উভয় অপবাদেই তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়া স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।

৩

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গে এই কথাটা মনে হয় যে, আধুনিক যুগে আমাদের শিল্প-কৃতির পরিচয় আধুনিক কালের ভারতীয়দের কাছেও স্পষ্ট নহে, বিদেশীদের কাছে তো নহেই। হইবার কোন সুযোগও নাই। আধুনিক যুগ অর্থে এই শতাব্দীর সূচনা হইতে অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কথা বলিতেছি। দেশের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রগুলিতে এমন মিউজিয়ম নাই যেখানে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতির বিভিন্ন কালের মূল চিত্র দেখিবার সুযোগ আছে; এমন প্রতিলিপির ব্যবস্থা নাই যাহার দ্বারা সর্বসাধারণের সহিত ইঁহাদের চিত্রকলার পরিচয় ঘটিতে পারে; এমন ব্যাখ্যাতা কম যাঁহারা ইঁহাদের শিল্পী-জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে সক্ষম

আলোচনা করিতে পারেন। অপরপক্ষে, এক দিকে অক্ষম অনুকারীর দল—প্রদর্শনীগুলিতে 'ইণ্ডিয়ান আর্ট' বিভাগে ইঁহাদেরই ভিড়—অপর দিকে অক্লান্ত অপব্যাখ্যাকারীদের দল, উভয়ে মিলিয়া 'নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা' সম্বন্ধে অপবাদ দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে শিল্পকলার প্রসারোদ্যোগের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে; এবং তাঁহাদের কোন কোন উদ্যোগে উৎসাহিত বোধ করিবারও কারণ আছে।

কালীমাতা ভাস্কর—শ্রীরামকিঙ্কর

রাষ্ট্রানুকূল্যেই কিছুকাল পূর্বে কলিকাতায় আচার্য নন্দলাল বসুর প্রদর্শনী ও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, কলিকাতায় ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বড় শহরগুলিতেও অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতির অনুরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন হইতে পারিলে, ইঁহাদের সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার ও অজ্ঞতার ক্রমশ অবসান ঘটিতে পারে, এবং তরুণ চিত্রশিল্পীদের সম্মুখেও নিজস্ব একটি স্থির লক্ষ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে।

আর একটি সুসংবাদ সকলের নিকট সুবিদিত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত নিখিল-ভারত সমিতি অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের বহু চিত্র রবীন্দ্র-স্মৃতিভবনের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এগুলি স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত হইবার আয়োজন এখনও হইতে পারে নাই, আশা করি শীঘ্রই সে-ব্যবস্থা সম্ভব হইবে।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের অর্থানুকূল্য লাভ করিলে ভারতবর্ষের সর্বত্র এগুলি প্রদর্শিত হইতে কোন বাধা নাই মনে হয়।

'ততঃ কিম্' শিল্পী—শ্রীরথীন মৈত্র

আচার্য নন্দলাল বসুর বহুসংখ্যক চিত্র এখনও স্বাধিকারে রক্ষিত আছে। শুধু দু-একখানি নিদর্শনমাত্র সংগ্রহ না করিয়া, এরূপ নিদর্শনে তাঁহার শিল্পকীর্তির বৈচিত্র্য ও মহিমার উপলব্ধি সম্ভব নয়—ভারত বা বাংলা সরকার অবশিষ্ট এই ছবি সংগ্রহ করিলে, আধুনিক ভারত-শিল্পের একটি প্রধান অধ্যায় লোকদৃষ্টিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহে নন্দলালের অনেক শ্রেষ্ঠ চিত্র আত্মগোপন করিয়া আছে, রাষ্ট্র উদ্‌যোগী হইয়া প্রার্থী হইলে

নিখিল-ভারত কলাকেন্দ্রের জন্ত এগুলি দানরূপে সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য না হইতে পারে।

৪

এদেশ হইতে বিদেশে আধুনিক ভারত-শিল্পের প্রদর্শনী পাঠানো এখন রেওয়াজ হইয়াছে। সেগুলির জন্ত অর্থব্যয়ও হয়, ধুমধামও হয়, বিদেশী দর্শকের প্রশংসাপত্রও পাওয়া যায়। আধুনিক বলিতে যদি হাল ১৯৫৪ সন না বুঝি, তবে অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-নন্দলালের শ্রেষ্ঠ চিত্র ব্যতীত এই সকল প্রদর্শনীতে ভারত-শিল্পের কি পরিচয় পাওয়া যায়? অনেক সময় এই সকল প্রদর্শনীতে ঐ শিল্পী-ত্রয়ীর এক-আধখানি ছবি থাকে, তাহাতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নয়, তাহাকে মন্দের ভাল বলা যায় না।

ভবিষ্যতে প্রদর্শনী বিদেশে পাঠাইবার সময় যদি সরকারী উদ্যোক্তারা রবীন্দ্র-ভারতীর ও অন্যান্য সংগ্রহকর্তার সহায়তা গ্রহণ করেন তবে বিদেশে ভারত-শিল্পের পরিচয় ভাস্বর হইয়া উঠিতে পারে। এজন্ত অন্যতম প্রয়োজন এরূপ চিত্র ও চিত্রাধিকারীদের তালিকা সঙ্কলন।

৫

এই প্রদর্শনীগুলি ঘুরিয়া দেখিলে আর একটি বিষয় মনে হয়; তুলির টানে বর্ণবিন্যাসে দক্ষতাও যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের সকলের সমুখে কোন লক্ষ্য বা বক্তব্য স্থির আছে কিনা সন্দেহ। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কথা বাদ দিলে প্রাচীন ও আধুনিক নানা পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইঁহাদের শিল্পীজীবনের গভীরতম সত্যের প্রকাশ হইতে পারে—অধিকাংশ তথাকথিত "আধুনিকপন্থী"দের কাছে দুর্বোধ্য বিদেশী পদ্ধতি গ্রহণ অন্তরের কোন ব্যাকুলতার প্রকাশ নহে; বিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হইবার, আধুনিক বলিয়া পরিগণিত হইবার একটা উৎকণ্ঠার পরিচয় মাত্র। বিদেশে এই সকল পদ্ধতির প্রবর্তকদিগের পক্ষে এ সকল দীর্ঘকালের ভাবনা-কল্পনার প্রকাশ; আমাদের দেশের অনেকের পক্ষেই তাহা নিশ্চিন্ত অনুস্মৃতি মাত্র, এমনকি অনেকস্থলে নিছক অনুকৃতি—প্রভাবমাত্র নহে।

ভবিষ্যতে কি আমরা এসপেরেন্টো ভাষায়[১] কবিতা লিখিয়া জগৎসভায় আসন লাভ করিব?

---

১ শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—"বাংলার চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা", প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪৫

একটি সন্ধ্যা

শ্রীকরুণাময় বসু

চাঁপা রঙের মেঘ ছবির মতো আঁকা,
অস্তবেলার শেষে রামধনুটি বাঁকা;
ফুলের চোখে ঘুম, ভ্রমর গেছে ফিরে,
একটুখানি ছায়া পাহাড়গুলি ঘিরে।

পারুল বনে বনে পাতাঝরার গান,
চৈত্র বুঝি শেষ, মুকুল অবসান।
দোলে নতুন চাঁদ, দোলে মেঘের সিঁড়ি,
মাঠে নদীর ঘাটে বাতাস ঝিরি ঝিরি।

ঝরণা-জলে কাঁপে ছন্নছাড়া হাওয়া,
কাজল-আঁকা রাত বুলিয়ে দিলো মায়া;
তোমার চোখে চেয়ে ফুরিয়ে গেল কথা,
শিউরে ওঠে বনে লজ্জাবতী লতা।

দুয়ার ধরে ছিলে মেঘের পানে চেয়ে,
শুধাই মনে মনে, ভাটির স্রোত বেয়ে
মরা গাঙের ধারে হঠাৎ এলে আজ;
কতকালের পরে ফুরিয়ে গেল কাজ।

পলাশবনে দোলে সোনাঝুরির লতা,
তোমার চোখে চেয়ে ফুরিয়ে আসে কথা;
শূন্য মনে গাঁথি মিনি সুতোর মালা,
সন্ধ্যা আসে নেমে, ছুটি নেবার পালা।

সরস্বতী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল

সৃষ্টিরহস্যে সরস্বতী

বিশ্বজগৎ শব্দ, জ্ঞান, বাক্‌শক্তি এই ত্রিগুণ সত্তায় নিরন্তর পরিস্পন্দিত, আবর্তিত এবং আলোড়িত হইতেছে। আকাশের নাদ-অনুনাদের স্পন্দনের মধ্য হইতে বিচিত্র ভাবে জ্ঞান বাক্‌ সাহায্যে প্রকাশ পাইয়া জগতের নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেছে। নিখিলের জ্ঞান-বিজ্ঞান নাদতরঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া নব নব জ্ঞানপ্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে। জগৎ এক দিকে যেমন শব্দের প্রভাবে, অন্য দিকে তেমনি বাক্যের প্রভাবে পরিচালিত হইতেছে। এই চলমান গতির ছন্দ, ভারতীয় যজ্ঞনিষ্ঠ ঋষিগণের লোকোত্তর প্রতিভায় জগতের পরিণাম ও অভিব্যক্তি রূপে ধরা পড়িয়াছিল। তাঁহারা এক জ্ঞানকে বিভিন্ন বস্তুজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন—এক বহু রূপে ছড়াইয়া পড়িল।

ঋষিগণ বলিলেন, 'প্রজাপতির্বা ইদমাসীৎ'। জগৎ যখন অস্তিত্বহীন ছিল, তখন একমাত্র পুরুষ ব্রহ্ম ছিলেন…তস্য বাক্‌ দ্বিতীয়া আসীৎ। এই ব্রহ্মের সহিত ছিলেন একমাত্র বাক্‌, এই বাকের মধ্যে তিনি সংলগ্ন থাকিয়া তাঁহারই শক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া দ্বিতীয়া হইলেন। ব্রহ্ম বা পুরুষ ইচ্ছা করিলেন যে 'একোঽহং বহুস্যাম' এই কামনা বা ইচ্ছাশক্তিই জগৎসৃষ্টির প্রধান কারণ হইল। অথর্ববেদ এই কামনা বা কামকে দেবতার মধ্যে অগ্রজ বলিয়া অভিহিত করিলেন, তার পরে তাঁহার কন্যা ধেনুরূপা কল্পিত হইল।

এই ধেনুকে জগৎরূপিণী বাক্‌ বা বাগ্‌ বিরাট বলা হয়।* এইরূপে বাক্‌ সৃষ্টি হইয়া ব্রহ্মের মনের সঙ্গিনী হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গলাভে লোকসৃষ্টি হইল।

'সা এতস্মাদ্‌ অপক্রামৎ সা ইমাঃ প্রজাঃ অসৃজত'† বৃহদারণ্যক উপনিষদ‡ এই বিষয় আরও পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—ঐ বাক্‌ এবং আত্মা হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্বেদ, যজ্ঞ ছন্দঃ লোক, পশু সমস্ত তাহা হইতে সৃষ্ট হইল, 'স তয়া বাচা তেন আত্মনা ইদং সর্বম্‌ অসৃজত যদিদং কিঞ্চর্চো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্‌ প্রজাঃ পশূন্‌।' —আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তি বাক্‌রূপা সরস্বতী এই দুই শক্তির পরিস্পন্দনে বিশ্বজগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়া পড়িল। ব্রহ্মের শক্তি বাক্‌রূপা সরস্বতী তাঁহার মুখে অধিষ্ঠান করিলেন। তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী হইলেন। এই সরস্বতীই জগৎসৃষ্টির মূল কারণ…বাক্‌। শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বাগ্‌ব্রহ্ম হইলেন, পুরাণকার পুনরায় এই সৃষ্টিরহস্যকে নূতন জ্ঞানের আলোকে নানা রূপে ব্যাখ্যা করিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিলেন যে, লক্ষ্মী, মহাকালী, সরস্বতী এই দেবীত্রয়ের শক্তিতে বিশ্বজগৎ আলোড়িত হইতেছে। ধনৈশ্বর্যদাত্রী লক্ষ্মী, রাজসিক গুণযুক্ত, বর্ণ রক্তগৌর। অজ্ঞান অন্ধকারের তামস শক্তি মহাকালী, বর্ণ কৃষ্ণ। আর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে, পূর্ণ সত্যের শুভ্র সাত্ত্বিক জ্যোতিঃ সরস্বতী। বর্ণ শুভ্রশুভ্রা সাত্ত্বিক মূর্তি—অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা, পুস্তক হস্তে চতুঃষষ্টিকলার দেবী, মহাবিদ্যা মহাকালী, ভারতী বাক্‌ সরস্বতী, আর্যা, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা, ধী, ঈশ্বরী ইত্যাদি নামে পরিচিতা। এই শক্তিই বিশ্বমাতা—এই শক্তির স্পন্দনে, আলোড়নে, বিচিত্র ভাবে, সুরে জীবনের গতির ছন্দ ও বিশ্বজগৎ পরিচালিত হইয়া সৃষ্টির নিয়ম রক্ষা করিয়া মহাকাল-প্রবাহে জগৎ চলিতেছে। জগতের পরিণাম এবং অভিব্যক্ত বেদ, ব্রহ্মা নারী রূপে মহালক্ষ্মী হইলেন, মহালক্ষ্মীর ভিতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণ সত্তা প্রকাশ পাইল। তিনি যখন তমঃ দ্বারা সৃষ্টি করিলেন, তখন তিনি মহামায়া, মহাকালী রূপে প্রকাশ পাইলেন, সত্ত্বের শুভ্র জ্যোতিতে মিলিয়া তিনি সরস্বতী রূপে প্রকাশমানা হইলেন, জগৎসৃষ্টির নিয়মে প্রজ্ঞা-লোকে, বাক্‌রূপা সরস্বতী হইলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী।

সরস্বতীর প্রাণ, বাগীশ্বরী যন্ত্রের ব্যাখ্যা

বাক্‌সরস্বতীর প্রাণ যে যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রকাশ করে, সেই যন্ত্র-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, বাগীশ্বরী তাঁহার শক্তি। জ্ঞান শব্দে পরিণত হইয়া বাক্‌ সাহায্যে প্রকাশ পায়, অতএব বাগীশ্বরী যন্ত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী সরস্বতীর প্রাণকেন্দ্র। যন্ত্রের আকৃতি পদ্মের ন্যায়; কেন্দ্রস্থলে পীঠ, অর্থাৎ বসিবার আসন, চতুর্দিকে কর্ণিকা, বহির্দেশে অষ্টদল আছে। হ স, ঔঃ, এই বর্ণ, প্রথমে কর্ণিকা-মধ্যে অঙ্কন করিবে পদ্ম, পরে কর্ণিকার বাহিরে একটি বৃত্ত অঙ্কন করিয়া, বৃত্তের চতুর্দিকে আটটি পদ্মপত্র আঁকিয়া দুই দুইটি স্বর দ্বারা পদ্মের কেশর এবং পত্রমধ্যে আটবর্গ অঙ্কন করিবে এবং ঐ সকলের বাহিরে চারি কোণ এবং চতুর্দ্বার অঙ্কিত হইবে, চতুর্দ্বারে 'ব' এবং চতুষ্কোণে 'ঠঃ' লিখিতে হইবে। এই যন্ত্রমধ্যস্থ বর্ণসকল বাগীশ্বরীর পূর্ণ বিকাশ-কেন্দ্র, এই বর্ণে চৈতন্যের পূর্ণ শক্তি নিহিত আছে। এই বর্ণই সরস্বতীর প্রতীক। বর্ণসম্বৃত পুরুষ ও প্রকৃতির সংকেত, হ, স, ঔঃ =হসৌঃ। এই বীজমন্ত্র হ=আকাশ, পুরুষ, স=সুধা প্রকৃতি, ঔ—রসনা, 'সৃষ্টির প্রতীক।' প্রকৃতি ত্রিগুণ সত্তা বলিয়া স, শ, ষ, স, ভেদে তিন প্রকার। অন্য অর্থে শ, ষ, স, তমঃ, রজঃ সত্ত্বের

---

* সাতে কামস্য দুহিতা ধেনুরুচ্যতে যামাহুর্বাচং কবয়ো বিরাজম্‌। ৯-২-৫ অথর্ববেদ

† তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ২০।১৪।২

‡ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ ১।২।৫

রূপ। এই বর্ণের সহিত সুরতরঙ্গিণীর অমৃতের চিরসম্পর্ক আছে। এই অপার অমৃত-সমুদ্রে, বাসনার তরঙ্গ উঠিলে প্রলয়-সমুদ্রে লীন পদার্থের উৎপত্তি হয়। অতঃপর এই যন্ত্রমধ্যে সুধা, কাম, বিশ্ব-বীজ সংস্থিত আছে। সৃষ্টিরহস্য ব্যাপারে পদার্থের ধর্ম্ম সম্পর্কে আলোচনায় বুঝা যায় যে, কোন একটা শক্তি বা প্রাণপদার্থ সকলের মধ্যে নিহিত আছে। ঐ শক্তি স্রষ্টার ইচ্ছায় বা প্রেরণায় পদার্থ-সকলকে নূতনভাবে সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। এই শক্তি বা প্রেরণাই প্রাণ কিংবা স্বর, এই স্বরই ত্রিগুণধর্ম্মী। যে-কোন পদার্থ প্রথমে একটা রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহার গুণপ্রকাশান্তে লীন হয়। এই লীন পদার্থ পুনরায় নবরূপে সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করে। এই কারণে বাগীশ্বরী যন্ত্রের মধ্যস্থ এবং পদ্মের কর্ণিকা-মধ্যে প্রাণের যাবতীয় প্রতীক স্বরসমূহ অঙ্কন করা হইয়া থাকে। চলমান প্রাণের স্বরূপ সকল স্বরমধ্যস্থ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল যখন ব্যঞ্জনের সহিত একত্রিত হয় বা বর্ণের ব্যঞ্জনের মধ্যে অবস্থান করে তখন শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয়।

এই জন্য সম্ভবতঃ ব্যাকরণশাস্ত্রকে শব্দশাস্ত্র বলা হয়। প্রাণের ভাবসকল নিরাকার। এই ভাবসকল যখন কোন পদার্থের উপরে তাঁহার গুণের ক্রিয়াসূচক কর্ম্ম প্রকাশ করে, তখন সাকারে পরিণত হয়, শক্তির গুণ এবং ধর্ম্মকে বুঝিতে পারা যায়। মানবদেহযন্ত্রে শব্দোচ্চারণের স্থান কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা (মস্তক), দন্ত, ওষ্ঠ—ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ; যথা—স্পর্শবর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ, উষ্ম বর্ণ। স্পর্শবর্ণকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই পাঁচ ভাগকে বর্গ বলে। যথা, ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ। এই সকল বর্গের ধ্বনি দেহযন্ত্রের কণ্ঠ, তালু, মস্তক, দন্ত, ওষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বর্ণসকল মানবের হৃদ্‌যন্ত্রে ধ্বনিত হইয়া ঐ সকল স্থানকে স্পর্শ করিয়া বাহিরে প্রকাশিত হয় বলিয়া উহাদিগকে স্পর্শবর্ণ বলা হয়। যে সকল পদার্থের বাস্তব অনুভূতি হয়, তাহাদিগকে বাস্তব জগতের অধীন বলে। সেই পদার্থসকলকে তত্ত্বান্বেষীরা পঞ্চমহাভূত বলেন, ধ্বনি বা শব্দতত্ত্বের স্পর্শবর্ণ সকলই বাস্তব জগতের ভূতপঞ্চকের রূপ। অতএব পাঁচ বর্গ যথা-ক্রমে পঞ্চমহাভূতের স্বরূপ। ক বর্গ ব্যোমীয়, চ বর্গ মারুৎ, ট বর্গ তেজঃ, ত বর্গ রস, প বর্গ ক্ষিতির স্বরূপ। চিত্তে কোন ভাবের স্পন্দন হইলে, একটা তরঙ্গের আলোড়ন হয়, সেই আলোড়নে আকাশীয় শক্তির সৃষ্টি হয়। চিদাকাশে স্পন্দন যখন তীব্র ভাবে আলোড়িত হয় তখন শব্দের জনক বায়ুর উৎপত্তি হয়। আরও তীব্রতর হইলে তেজ সৃষ্টি হয়। চিদাকাশে যে পরিস্পন্দনে স্বরের তারা-গ্রামের নি—নিষাদ সুরের সৃষ্টি হয় তাহা হইতে আরও অধিক তীব্র স্পন্দনে নীলাভ রঙের বিকাশ হয়। এই হইল তেজের স্বরূপ। এই তেজ হইতে রস, রস ঘনীভূত হইয়া পৃথ্বীর সৃষ্টি করে। এই নিয়মে ক্রমাভিব্যক্তিতে একে অন্যকে সৃষ্টি করিয়া আপেক্ষিক চলমান গতিতে বিশ্বজগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিণতি লাভ হইয়া থাকে। বাগীশ্বরী যন্ত্রমধ্যে এই বিশ্বজ্ঞান-বীজ নিহিত আছে। এই জ্ঞানবীজের ঈশান কোণের অষ্টম দলে ল, ক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে। এই বর্ণ দুইটি অমা-চন্দ্রের ন্যায় লীন এবং ক্ষীণ প্রাণের প্রতীক। এই যন্ত্রে যে চতুষ্কোণ ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে, উহার চতুর্দ্দিকে বরুণ বীজ বং আছে। রঙের সন্নিকটস্থ রেখাকে জলপ্লাবন-নিয়ন্ত্রণ বুঝানো হইয়াছে। ধরিত্রীর জলমগ্নক্ষেত্র যাহা রচিত হইয়াছে ; তাঁহার শক্তির ধারক চতুষ্টয় চন্দ্র বীজ ঠং রক্ষা করা হইতেছে। এই বর্ণ সকলই সুধা। অসীম পারাবার-ক্ষেত্রকে সীমার ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তাহার ভিতরে অমৃত-সমুদ্র কল্পিত হইয়াছে। এই অমৃত-সমুদ্রে বাগীশ্বরী সরস্বতীর বিশ্বসৃষ্টিযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই যন্ত্রমধ্যে প্রেম, প্রীতি, বিষাদ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাগ, অনুরাগ ইত্যাদি পরিদৃশ্যমান পার্থিব ভাব সকলের প্রতিরূপ বিদ্যমান।

বাক-রূপা সরস্বতী

বাগ্‌ব্রহ্ম বাক্ সরস্বতী—সে বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সরস্বতীকে সৃষ্টিজ্ঞানে বাক্ বলা হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে সরস্বতী নদীরূপা। ঋষিগণ সরস্বতীকে, অম্বিতমে, নদীতমে, দেবীতমে সরস্বতী বলিয়াছেন ; অর্থাৎ তাঁহাকে মাতৃগণের, নদীগণের এবং দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সরস্বতীকে বাক্‌রূপা বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে বাগম্ভৃণী ঋষিকে অম্ভৃণ ঋষির বাক্ নাম্নী কন্যার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে* আছে—আদিত্য অশ্বিনীকে শুক্লযজুর্ব্বেদ শিক্ষাদান করেন, আর বাক্ অম্ভৃণীর নিকট ব্রহ্ম-জ্ঞান শিক্ষা করেন। এই অর্থে বাক্‌মাত্রের শক্তি আধারভূত দেবী সরস্বতীকেও বাক্ বলা হইয়াছে। বাক্ ও সরস্বতী মধ্যে সম্বন্ধ হইল এই যে, বাক্ এবং তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত গুণ ও ধর্ম্ম এক, অভিন্ন। সেই কারণে বাগ্‌দেবীর নামান্তর বাণী, ভারতী, সরস্বতী। বৈদিক ঋষিগণ আবার এই বাক্‌কে ধেনুরূপে অর্চনা করিতেন। 'বাচং ধেনুমুপাসিত'। ধেনু যে রকম ইচ্ছানুসারে দুগ্ধ দান করে, সেই রকম বাক্‌কে ধেনুরূপে উপাসনা করিলে ফলদান করেন ; ধেনুর ন্যায় বাক্যের চারিটি স্তন আছে। স্বাহা, স্বধা, বষট্, হন্ত। এই স্তনচতুষ্টয়ের মধ্যে যেভাবে যাহাকে উপাসনা করা যাইবে, সেই অনুযায়ী ফললাভ হইবে। বেদে বাগ্‌দেবীর উপা-সনার নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে বাক্, ভারতী, সরস্বতীকে এক শক্তির আধার রূপেই পাওয়া যায়।

নবশক্তিরূপা ভারতী এবং ষোড়শ মহাবিদ্যা

বাক্-রূপা ভারতী নবশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিতা। এই শক্তিসমূহ নিরাকার এবং বাক্যসাহায্যে প্রকাশ পায়। মেধা, প্রজ্ঞা, প্রভা, বিদ্যা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি, বিদ্যেশ্বরী।† প্রপঞ্চসার গ্রন্থমতে

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—৫ম ব্রাহ্মণ।

† মেধাপ্রজ্ঞাপ্রভাবিদ্যাধীধৃতিস্মৃতিবুদ্ধয়ঃ। বিদ্যেশ্বরীতি সম্প্রোক্তা ভারত্যা নব শক্তয়ঃ। প্রপঞ্চসার ৭।৯।

এই নবশক্তিরূপা ভারতীর অর্চনার বিধান আছে। তন্ত্রে শক্তি নিরাকার, বর্ণমধ্যে শক্তি নিহিত আছে। প্রত্যেক অক্ষরের মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। স্বরবর্ণের কেশব, নারায়ণ ইত্যাদি ষোড়শ বৈষ্ণবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। এই বর্ণ, বা আক্ষরিক মূর্ত্তিই ষোড়শ শক্তিরূপা। এই শক্তির ভিতরে সরস্বতী হইলেন—সম্যকভাবে আকর্ষণের শক্তি। নারদপঞ্চরাত্রাগমের ৩য় রাত্রির ১ম অধ্যায় দ্বাদশসংখ্যকে বৈষ্ণবমূর্ত্তিকে সঙ্কর্ষণের শক্তি সরস্বতী বলা হইয়াছে। আবার অক্ষরের ব্যঞ্জনের মধ্যে, অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে রুদ্রমাতৃকা, মহাকালী সরস্বতী, সর্ব্বসিদ্ধি। গৌরী ভদ্রকালী ইত্যাদি পঞ্চত্রিংশ মূর্ত্তি আছে। প্রপঞ্চসার মতে—বিশ্বকে জলে নিমজ্জন হইতে রক্ষার জন্ম ভগবান বরাহরূপে দংষ্ট্রায় পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হুঙ্কারে সরস্বতী ছিলেন বাক্-রূপে. এই মাতৃকামূর্ত্তি সকলই মহাবিদ্যা। মাতৃকাদেবীর পূজা নানামতে হইয়া থাকে। তাঁহার বয়স কল্পনা করিয়া বয়ঃক্রম অনুসারে বিভিন্ন নামে অর্চনা হয়। দেবীর এক বৎসরে সন্ধ্যা, দুই বৎসর হইলে সরস্বতী, সাত বৎসর হইলে চণ্ডিকা, আট বৎসরে সাম্ভবী নামে আরাধ্যা হইয়া থাকেন। প্রাচীন জৈন সম্প্রদায় সরস্বতীকে 'গীর্ব্বাণী বাগ্‌দেবী' রূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন। শ্বেতাম্বর জৈনগণের শাসন দেবী-পূজার মধ্যে. ষোড়শ মহাবিদ্যার অর্চনার ব্যবস্থা আছে। তাহার মধ্যে বিদ্যার অধিদেবতা হিসাবে সরস্বতী হইলেন শ্রেষ্ঠতমা।

শ্বেতাম্বর জৈনগণের মতে ষোড়শ মহাবিদ্যা। ১ রোহিণী ২ প্রজ্ঞপ্তী ৩ বজ্র শৃঙ্খলা ৪ কুলিশাঙ্কুশা ৫ চক্রেশ্বরী ৬ নরদত্তা ৭ কালী ৮ মহাকালী ৯ গৌরী ১০ গান্ধারী ১১ জ্বালা ১২ মানবী ১৩ বৈরোট্যা ১৪ অচ্ছুপ্তা ১৫ মানসী ১৬ মহামানসী। ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই সরস্বতী জ্ঞান ও কলা-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। সরস্বতীর চৈতন্য-শক্তির ক্রিয়াসূচক জ্ঞানের কর্ম্ম বিভিন্ন দেশের সাধকগণ দেশাচারানুসারে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অর্চনা করিয়া থাকেন।

বৈদিক ঋষিগণ পরমা প্রকৃতির উপাসনা করিতেন। তাঁহারা প্রকৃতির নিসর্গ-প্রভাবের মধ্যে সম্বৎসরব্যাপী যজ্ঞ করিতেন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের চিত্তে দেবদেবীর মূর্ত্তি রূপ-পরিগ্রহ করে নাই। সম্ভবতঃ যাস্কের সময় দেবদেবীর প্রতিমা রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল। যাস্কের নিরুক্তে দেব-দেবীর মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্‌ভাষ্যে ইড়া, ভারতী, সরস্বতী এই দেবীত্রয় অগ্নিরূপা—এই পরিচয় পাওয়া যায়। পার্থিব জগতের ইড়া, সূর্য্য সম্পর্কে ভারতী এবং দ্যুলোক সম্পর্কে বাগ্‌দেবী সরস্বতী। বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সরস্বতীপূজা চলিয়া আসিতেছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে পূজা ভারতীয় আর্য্য-জাতির মধ্যে চলিয়া আসিতেছে—সেই পূজার মধ্যে দেবীর নানা-রকম মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি

পদ্মাসনা সরস্বতী

ব্রাহ্মণ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সহিত পদ্মের সম্পর্ক রাখিয়াছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।৩।৫) আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎ সৃজনের ইচ্ছা করিলে তিনি দেখিলেন যে, সলিল ভাবে একটি 'পুষ্কর পর্ণ' জলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। বিষ্ণুর নাভি হইতেও আবার পদ্মের উৎপত্তির কথা পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহিত পদ্মের সম্পর্ক আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখে সরস্বতীর অধিষ্ঠান, সুতরাং সৃষ্টির প্রথম পদ্মই সরস্বতীর আসন হইল। পদ্মের উপরে সরস্বতী দণ্ডায়মান অবস্থায় কল্পিত হইয়াছে। তিব্বতে সরস্বতীর বসিবার আসন পদ্ম। দক্ষিণ-ভারতে গঙ্গৈকোণ্ডচোড়পুরমে* বাগড়ি ও গদগে দ্বিভুজা পদ্মাসনা সরস্বতীর প্রস্তরমূর্ত্তি আছে।

হংসবাহনা সরস্বতী

পুরাণে দেবী সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি। ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতী জ্ঞানের দেবী, জ্ঞানের উৎপত্তি হলস বা আত্মা হইতে হয়। আত্মাকে হংস বলে। অতএব জ্ঞানের দেবী হংসবাহনা। ব্রহ্মা হংসবাহন, অর্থাৎ আত্মাই ব্রহ্ম; তাঁহার শক্তি বাক্যে প্রকাশ পায়, অতএব বাক-রূপা সরস্বতীর বাহন হংস। মানসসরোবরে হংস খেলা করে। মানস সরোবর ব্রহ্মার প্রিয় স্থান, ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতীরও প্রিয় স্থান। অর্থাৎ মনের স্বচ্ছ সরোবরে জ্ঞান-রূপে আত্মা খেলা করেন, সেই আত্মার শক্তি সরস্বতী, কাজেই সরস্বতী হংসবাহনা। পুরাণে সরস্বতী মানসসরোবর হইতে উৎপন্না। বাস্তব অর্থে—সরস্বতী হংসবাহনা, আধ্যাত্মিক অর্থে—মনের সরোবরে আত্মারূপী হংসের শক্তি বাক-রূপা সরস্বতী।

ময়ূরবাহনা সরস্বতী

পুরাতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম বলেন,† প্রায় সমস্ত প্রাচীন হিন্দু-মন্দিরে গঙ্গা, যমুনার প্রস্তরক্ষোদিত মূর্ত্তি দেখা যায়। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর ভিন্ন ভিন্ন বাহন থাকে। মকরবাহিনী গঙ্গা, গঙ্গায় প্রচুর মকর পাওয়া যায়। কচ্ছপবাহিনী যমুনা, যমুনায় অনেক কচ্ছপ দৃষ্ট হয়। ময়ূরবাহনা সরস্বতী—সরস্বতী নদীর তীরে অনেক ময়ূর বাস করে, অতএব ময়ূরবাহনা সরস্বতী। রাজপুতানায় ময়ূর-বাহিনী সরস্বতী আছে। দক্ষিণ-ভারতে বোম্বাইয়ে চতুর্ভুজা ময়ূর বাহনা সরস্বতী আছে।‡

মেষবাহনা সরস্বতী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চিত্রশালায় মেষবাহনা সরস্বতীমূর্ত্তি আছে। দেবী মহাচূড়া আসনে সুখাসন মুদ্রায় বসিয়া আছেন। পদতলে একটি মেষ আছে। দেবী সরস্বতী মেষের পুচ্ছদেশে দক্ষিণ পদ রাখিয়াছেন। দেবী চতুর্ভুজা, উপরের দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা, উপরের বাম হস্তে পুস্তক। নিম্নের হস্তদ্বয়ে বীণা ধৃত।

---

* গোপীনাথ রাও *Elements of Hindu Iconography*; Pls. CXIII, CXIV, CXV

† *Archeological Survey Report* Vol IV p. 70

‡ Moore—*Hindu Pantheon.*

সিংহবাহনা সরস্বতী

বৌদ্ধগণ সিংহবাহিনী সরস্বতীর অর্চনা করেন। মহাযান বৌদ্ধগণের মঞ্জুশ্রীর শক্তিই সরস্বতী। মঞ্জুশ্রীর বাহন সিংহ, অতএব তাঁহার শক্তি সরস্বতীর বাহন সিংহ। বুদ্ধগয়ার উত্তরে 'সোভনাথ' পাহাড়ের সন্নিকটে একটি বালক (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে) এক স্তূপের কাছে এই সরস্বতীর মূর্ত্তি পাইয়াছিল। এই মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজা, দুই হস্তে বীণা, অপর দুই হস্তে অক্ষমালা ও পুস্তক। সরস্বতী দ্বিদলযুক্ত পদ্মাসনে উপবিষ্টা আছেন। পাদপীঠের নিম্নে মধ্যভাগে একটি সিংহ: সিংহের উপরে এক পদ্মোপরি দেবীর দক্ষিণ পদ স্থাপিত আছে। সিংহের বামে একজন সেবক করজোড়ে বসিয়া আছেন। দক্ষিণ দিকে দুই সারি ক্ষোদিত অক্ষর, কলিকাতা যাদুঘরের পুরাতত্ত্ব-বিভাগে সিংহবাহনা চতুর্ভুজা বাগীশ্বরীর মূর্ত্তি (৩৯৪৭ সংখ্যক) আছে। দেবীর দুই হস্তে পরশু এবং গদা, অন্য দুই হস্তে তিনি দৈত্যের জিহ্বা উৎপাটন করিতেছেন।

তিব্বত, যবদ্বীপ, জাপানে সরস্বতী

ভারতবর্ষে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সরস্বতীর পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়। তিব্বত, যবদ্বীপ, এবং জাপানেও সরস্বতীপূজা হইয়া থাকে।*

জৈনগণ যে সরস্বতীকে 'গীর্বাণী' বাগ্‌দেবীরূপে পূজা করেন একথা আগেই বলা হইয়াছে। মথুরায় জৈন পুরাকৃতি ভবনে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর লৌহনির্ম্মিত মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মূর্ত্তিটি মস্তকহীন, পাদপীঠে উপবিষ্ট, জানু উচ্ছ্রিত, বাম হস্তে পুস্তক, দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন এবং বস্ত্রপরিহিত। দুই ধারে দুই জন উপাসকের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে। ১০৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্তূপের মধ্য হইতে এই মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। জৈনগণের নিয়ন্ত্রী দেবীর মধ্যে ষোড়শ মহাবিদ্যার অর্চনা হইয়া থাকে। হীনযান বৌদ্ধগণের মধ্যে সরস্বতীপূজার ব্যবস্থা নাই। মহাযান বৌদ্ধগণের মধ্যে সরস্বতীর কল্পনা স্থান পাইয়াছে। তাহাদের সরস্বতী একবক্ত্র, দ্বিভুজা, তিন মুখবিশিষ্টা এবং ষড়্‌ভুজা রূপেও পূজিতা হইয়া থাকেন। বৌদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর। এই অবলোকিতেশ্বরের পরেই মঞ্জুশ্রীর স্থান। মঞ্জুশ্রীর অন্য নাম মঞ্জুঘোষ ও মঞ্জুনাথ। ইনি বিদ্যাদেবীরূপে পূজিতা হন। ত্রিপিটক, ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান প্রভৃতি সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে মঞ্জুশ্রীর উল্লেখ নাই। 'সুখাবতীব্যূহে' মঞ্জুশ্রীর নাম পাওয়া যায়। চীনদেশে ২৭০ খ্রীষ্টাব্দে চীনা ভাষায় 'রত্নকারণ্ডব্যূহ' গ্রন্থের অনুবাদ হয়। এই গ্রন্থে মঞ্জুশ্রীকে প্রচুর সম্মান দেখানো হইয়াছে। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে তিনি প্রধান বোধিসত্ত্ব এবং চিরযৌবনা। চীনে ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে, মঞ্জুশ্রী বিক্রীড়িত গ্রন্থের যে অনুবাদ হইয়াছে, তাহাতে মঞ্জুশ্রী-চরিতে তাঁহার কোন শক্তি নাই। লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁহার শক্তি। সরস্বতীই মঞ্জুশ্রী বাগীশ্বর। বৌদ্ধগণের একবক্ত্রা দ্বিভুজা সরস্বতী চারি প্রকার, যথা—মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা, বজ্রসারদা, আর্য্যসরস্বতী। রাশিয়ার লেনিনগ্রাড চিত্রশালায় উখতোমস্কির (Ukhotomsky) সংগ্রহে একটি বীণাবাদনরতা সরস্বতীমূর্ত্তি আছে। সরস্বতী বীণাবাদনরতা মূর্ত্তিটি নেপালী পদ্ধতিতে বজ্রালঙ্কারভূষিতা। তিব্বতের সরস্বতী দ্বিভুজা, হস্তে বীণা—শুভ্রবর্ণা, পদ্মাসীনা। তিব্বতী ভাষায় সরস্বতীকে যঙ-চন-ম (Dbyangs-can-ma) বলে। যবদ্বীপে সপ্তহস্তা বীণাবাদিনী সরস্বতীর পূজা হয়। দেবী যজ্ঞোপবীতধারিণী, দ্বিদল পদ্মে আসীনা: তাঁহার মস্তক কারুশিল্পভূষিত। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারসূত্রে হিন্দুর তিনটি দেবতা জাপানে পূজিতা হইতেছেন। জাপানে সাতটি সৌভাগ্য-দেবতা আছেন ইঁহাদের মধ্যে তিন জন ভারতবর্ষের দেবতা। প্রথম দেবতা দইকোকুতেন বা মহাকাল। দ্বিতীয় বেন-জইতেন—সরস্বতী, তৃতীয় বিষমনতেন—কুবের। টোকিওর সন্নিকটস্থ উয়েনো নামক স্থানে এনোশিমা চিকুবুশিমা, মিয়াজিমা এই সকল দ্বীপে বেন-তেন বা সরস্বতী পূজা হয়। এই বেন-তেন মূর্ত্তির হস্তে বীণা, সম্মুখে নৃত্যশীল উপাসক। দেবী ড্রাগনের উপরে দণ্ডায়মানা, ড্রাগনের মুখ নরাকৃতি, পুচ্ছ আছে, চক্ষু রত্নখচিত, মুখশ্রী অনবদ্য: বেন-তেনের পুরা নাম দই-বেন জাইতেন, অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধির মহাদেবী।

জাপানে ভারতীয় বৌদ্ধগণের যে দেবতা আছেন তাঁহার নাম 'আযাকাওলি'। এই মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ ও রত্নকায় খচিত, দেবী চতুর্ভুজা, দুই হস্তে বীণা, দেবীর সহিত একটি শ্বেত সর্প আছে। জাপানীরা শ্বেত সর্পকে সরস্বতীর প্রকাশমূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন। বেন-তেন সম্পর্কে অনেক গল্প আছে।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে ভারতীয় আর্য্যগণের চিত্তে যে জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহাই ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধধর্ম্মে এবং বিশাল এশিয়া ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়া এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'সরস্বতী' গ্রন্থ পাঠ করিলে এই বিষয়ের বিপুলতা কতক উপলব্ধি করা যাইবে। মানবসভ্যতার জ্ঞানোদয়ের সময় হইতে বর্ত্তমানের বিজ্ঞানের গৌরবময় যুগেও সরস্বতীর প্রভাব সমগ্র ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। সত্যের আলোকে, জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতিতে, মানবহৃদয়ের জ্ঞান-মুকুলিত পদ্মে, শুভ্র সাত্ত্বিক প্রভায় সরস্বতী বিরাজিতা রহিয়াছেন। চিত্তের মলিনতা মুছিয়া সরস্বতীর আরাধনা করিলে প্রজ্ঞা-লোকের সত্য রূপ দর্শন হয়। জ্ঞানই পৃথিবীর চরম পরিণতি, সাধনা জীবনের নাভিকেন্দ্র। ব্রহ্মের শক্তি সরস্বতীই বাক্যের শ্রেষ্ঠ স্থান, অতএব আমাদের জ্ঞান ও বাক্যের বলিষ্ঠ সাধনাই সরস্বতীর প্রকৃত সাধনা হইবে।

---

* অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সরস্বতী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† Young East *What Japan owes to India* ১৯২৫ খ্রীঃ খণ্ড ১, নং ৫ ১০৪-১৪৫ পৃষ্ঠা।

আমাদের শিষ্টাচার

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই নানা প্রকার শিষ্টাচার প্রচলিত আছে। সুসভ্য উন্নত সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকথিত অসভ্য অনুন্নত সমাজও একেবারে শিষ্টাচারবর্জ্জিত নহে। বলা বাহুল্য, সকল সমাজের শিষ্টাচার একই প্রকার নহে। অনেক স্থলে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সমাজের লোক যাহাকে শিষ্টাচার বলিয়া মনে করে, অপর সমাজের লোক তাহাকেই চরম অশিষ্ট আচরণ বলিয়া গণ্য করে। আমাদের এই বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজে গুরুজনের সহিত কথা কহিবার সময় অবনতমস্তকে বা নত নয়নে কথা বলা শিষ্টাচার বলিয়া গণনীয়। কিন্তু ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংরেজ বা ফরাসী সমাজে কোন গুরুজনের সহিত কথা কহিবার সময় তাঁহার চোখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা কহিতে হয়। ইহার অন্যথা হইলে তাহা অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের সমাজে গুরুজনের পার্শ্বে থাকিয়া পথ অতিবাহন করা অশিষ্টতা। গুরুজনের সহিত পথে চলিবার সময় তাঁহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে থাকাই আমরা শিষ্টতা বলিয়া মনে করি। তাহাতে গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। কিন্তু ইংরেজ সমাজে এইরূপ পশ্চাতে থাকা শিষ্টাচার বলিয়া গণ্য নহে।

ফরাসী সমাজে যুবক পুত্র পিতামাতার সহিত এরূপ বিষয় লইয়া আলোচনা করে যাহা আমরা অশ্লীলতার নিদর্শন বলিয়া মনে করি। এমনকি অনেক সময় মনে হয় যে উহা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। ইউরোপীয় সমাজে পিতাপুত্রে কথোপকথন কালে পিতাপুত্র পরস্পরকে সিগার, সিগারেট ও দিয়াশলাই প্রদান করা শিষ্টাচার-বহির্ভূত নহে। কিন্তু আমাদের সমাজে গুরুজনের সম্মুখে ধূমপান করা যৎপরোনাস্তি অশিষ্টতা বলিয়া গণনীয়। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ধূমপায়ী যুবক বা প্রৌঢ় গুরুজনের হাত হইতে হুঁকা লইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরালে গিয়া ধূমপান করে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। এই অন্তরালে ধূমপান এমন এক হাস্যকর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমি দেখিয়াছি, অনেকে বয়োবৃদ্ধ প্রতিবেশীর হাত হইতে হুঁকা লইয়া নিজের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উত্তোলনপূর্ব্বক ধূমপান করেন। ওরূপ তর্জ্জনী উত্তোলনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলেন যে, উহা অন্তরালের নিদর্শন। ধূমপান কালে এইরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু নস্যগ্রহণ-কালে এইরূপ শিষ্টতা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। যেন ধূমপানটাই নেশা, আর নস্য ব্যবহার নেশা নহে।

আমাদের পারিবারিক ব্যাপারেও এককালে যে সকল শিষ্টাচার প্রচলিত ছিল, এখন তাহার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেকালে পুত্রবধূ শ্বশুরের সহিত এবং পরিবারস্থ অন্যান্য পুরুষ গুরুজনের সহিত কখনও কথা কহিত না। তাঁহাদের সম্মুখে অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া থাকিত। শ্বশুর বা ভাসুর কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাহার উত্তর দিত। ভাসুর বা মামাশ্বশুর যদি দৈবাৎ ভ্রাতৃবধূ বা ভাগিনেয় বধূকে স্পর্শ করিয়া ফেলিতেন, এমন কি বধূর অঞ্চলের সহিত স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের সংস্পর্শ ঘটিত, তাহা হইলে তাঁহারা স্নান করিতেন। ইহা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বহু কাল পূর্ব্বে আমি একদিন শীতকালে অপরাহ্নে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেখানে পাঁচ-সাত মিনিট থাকিবার পর দেখিলাম, আমার বড় শ্যালক পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপস্থিত। অসময়ে স্নানের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "আপিস হইতে আসিয়া ধূমপান করিতেছি, এমন সময় ছোট বৌমা (অর্থাৎ, তাঁহার ভ্রাতৃবধূ—তের বৎসরের বালিকা) নিকট দিয়া যাইবার সময় আঁচল দ্বারা আমাকে স্পর্শ করিয়াছেন, তাই এই সন্ধ্যাবেলা আবার পুকুরে ডুব দিয়া আসিলাম।" অবশ্য, কলিকাতা অঞ্চলে বা মফস্বলের শহরে এইরূপ শিষ্টাচার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেকালে স্বামীর বন্ধুদের সহিত কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। আমার পিতা আমাদের পরিবার-মধ্যে শ্বশুরের সহিত ও ভাসুরের সহিত নব বধূদিগকে কথা বলিতে আদেশ করেন। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, শ্বশুরকে 'বাবা' বলিয়া এবং ভাসুরকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিও এবং তাঁহারই আদেশে বধূরা নিকট-বন্ধুদের সহিতও কথা কহিতে আরম্ভ করে। আমাদের বাটীর এই 'অদ্ভুত' প্রথা দেখিয়া পাড়ার বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা আমার পিতাকে 'বেহ্ম', 'ক্রিশ্চান' বলিয়া মনে করিতেন। আজকাল বোধ হয় সুদূর মফস্বলে অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিক সমাজে বধূর ঐরূপ স্বাধীনতা এখনও হয় নাই। তবে শিক্ষিত এবং ভদ্রসমাজে বধূদের এই স্বাধীনতা হইয়াছে।

কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে হাজার হাজার মাড়োয়ারী ও অবাঙালী ব্যবসায়ীর বাস। যাঁহারা কর্ম্মোপলক্ষে ওই মাড়োয়ারী মহলে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন তাঁহারা জানেন যে, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী মহিলারা সর্ব্বদাই আবক্ষলম্বিত অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া রাজপথে পুরুষ-জনতার মধ্যে বেশ স্বচ্ছন্দে, অসঙ্কোচে যাতায়াত করেন এবং ঐ মহিলারা বেশ উচ্চ কণ্ঠে পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের শিষ্টাচার ব্যাহত হয় না। কিন্তু অবগুণ্ঠনটা আবক্ষলম্বিত হওয়া চাই। আমি দেখিয়াছি, বিবাহ প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে রাজপথে অবগুণ্ঠিতা মাড়োয়ারী মহিলারা বেশ উচ্চ কণ্ঠে গান গাহিতে

সাহিত্যে যাতায়াত করেন। উঁহাদের সমাজের এই শিষ্টাচার আমাদের বাঙালী সম্ভ্রান্ত সমাজে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বলিয়া মনে হয় না কি?

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, পৃথিবীর সকল দেশে সকল সমাজেই অল্পাধিক শিষ্টাচার প্রচলিত আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে, মুসলমান সমাজে শিষ্টাচারের যেরূপ প্রবলতা, সেরূপ অন্য কোন সমাজে নাই। তুরস্ক দেশবাসী মুসলমানগণ ইউরোপের অন্যান্য দেশে "Gentlemen of Europe" অর্থাৎ ইউরোপের ভদ্রলোক বলিয়া অভিহিত হইতেন। মুসলমানগণ শিষ্টাচার প্রদর্শনে কাহারও নিকট ন্যূনতা-স্বীকারে সম্মত নহেন। কোটি-পতি মুসলমান তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মুসলমানকে আহ্বান করিবার সময় বলেন, "আইয়ে মেরি গরীব-খানামে," অর্থাৎ গরীবের কুটীরে আসুন। আবার অন্য লোকের আবাসের উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহারা বলেন, 'আপকা দৌলত-খানা," অর্থাৎ আপনার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। পথ চলিবার সময় যদি দুই জন শিক্ষিত মুসলমান এক সঙ্গে অগ্রসর হন তাহা হইলে প্রত্যেকেই অপরকে অগ্রবর্তী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। এই ভদ্রতার একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের গল্প আমরা কৈশোরে ও যৌবনে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে এবং কলেজে পড়িবার সময় অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। যাঁহারা হুগলী কলেজ ভবন দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, কলেজের দ্বিতলে উঠিবার জন্য গাড়ীবারান্দা হইতে একটি দক্ষিণে অপরটি উত্তরে —এই দুইটি প্রশস্ত সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দুইটি দ্বিতলে একই স্থানে মিলিত হইয়াছে। কলেজভবনে দুইটি পৃথক বিভাগ আছে। একটি ইংরেজী বিভাগ অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত, অপরটি মাদ্রাসা। মাদ্রাসায় উর্দু, ফারসী ও আরবী পড়ানো হয়। এই উভয় বিভাগই কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষের অধীন। আরবী ও ফারসী বিভাগের মৌলভী দুই জন সমবেতনভোগী ও সমপদমর্য্যাদাসম্পন্ন এবং প্রায় সমবয়স্ক। এক দিন আরবী মৌলভী ও ফারসী মৌলভী উভয়ে ঠিক একই সময়ে কলেজের কক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং গল্প করিতে করিতে গাড়ীবারান্দা পার হইয়া সিঁড়ির নিকটে উপস্থিত হইলেন। এইখানে গোল বাধিল, কে অগ্রে সিঁড়িতে পদার্পণ করিবেন। আরবী মৌলভী ফারসী মৌলভীকে বলেন, "জনাব, আপ উঠিয়ে।" ফারসী মৌলভী সাহেবও বলেন, "নেহি, নেহি জনাব, আপ উঠিয়ে।" পাছে শিষ্টাচার ক্ষুণ্ণ হয়, সেইজন্য কেহই প্রথমে সিঁড়িতে পদার্পণ করিতে সম্মত নহেন। কলেজ বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকেরা এবং ছাত্রগণ নিজ নিজ ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। পাঠ আরম্ভের ঘণ্টা বাজিল। কলেজ বিভাগ নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু মাদ্রাসাবিভাগে আরবী ও ফারসী শ্রেণীর মৌলভীরা অনুপস্থিত থাকাতে ছেলেরা পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা ও গোলমাল করিতে লাগিল। সেই গোলমাল কলেজের প্রিন্সিপাল থোয়েট সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি বেয়ারাকে বলিলেন, "মাদ্রাসায় গোলমাল হইতেছে কেন জানিয়া আইস।" ক্ষণকাল পরে বেয়ারা গিয়া খবর দিল, আরবী ও ফারসী মৌলভী সাহেবেরা সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কেহই ক্লাসে প্রবেশ করেন নাই। ব্যাপার কি জানিবার জন্য মিঃ থোয়েটস স্বয়ং সিঁড়ির নীচে গিয়া দেখিলেন, মৌলভী সাহেবেরা তখনও "আপ উঠিয়ে, আপ উঠিয়ে" বলিয়া পরস্পরকে আপ্যায়িত করিতেছেন। তখন মিঃ থোয়েটস একজন মৌলভীকে উত্তর দিকের সিঁড়ি দিয়া এবং অন্য জনকে দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে বলিলেন। মৌলভীদের শিষ্টাচার অক্ষুণ্ণ রহিল, তাঁহারা উপরে উঠিয়া গেলেন।

উল্লিখিত বিবরণের মধ্যে হয়ত কিছু অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মুসলমান সমাজে এই শিষ্টাচারপ্রদর্শনের একটু আতিশয্য আছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। শিষ্টাচারটা হইল সভ্যতার বাহ্যরূপ ও বহিঃপ্রকাশ। যে সমাজ যত সভ্য ও উন্নত, তাহার শিষ্টাচার প্রকাশও তত বেশী। আমি লক্ষ্ণৌ নগরের রাজপথে দেখিয়াছি, দরিদ্র শ্রমজীবী এমনকি কুলীমজুর পর্য্যন্ত সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পথে বেড়াইতে বাহির হয়। তাহার নিকট দিয়া চলিয়া গেলে আতর ও তেলের গন্ধ পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখিয়াছি, তাহাদের বাম হস্ত চাপকানের বামদিকের পকেটের মধ্যে প্রবিষ্ট। আর দক্ষিণ হস্তে কয়েকটা পেস্তা বা বাদাম। গলায় একখানি রেশমী রুমাল বাঁধা। তাহারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলে পরস্পরকে "আলেকম্ সেলাম" বলিয়া অভিবাদন করে এবং নিজ নিজ দক্ষিণহস্ত পরস্পরের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন উভয়েই পরস্পরের হাত হইতে একটিমাত্র পেস্তা বা বাদাম তুলিয়া লইয়া অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় এবং একাকী পথে চলিবার সময় বাম পকেট হইতে ছোলা বাহির করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে যায়। অথচ তাহারা সকলেই জানে যে, তাহাদের বাম পকেটে ছোলা ও দক্ষিণ পকেটে পেস্তা বা বাদাম আছে। কিছুদিন তাহাদিগকে দেখিবার পর তাহাদের একজনের মুখ আমার নিকট পরিচিত বলিয়া মনে হইল। সে সময় আমাদের বাসার নিকটে একটা ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইতেছিল। আমি এক দিন মধ্যাহ্নে দেখিলাম, আমার সেই পরিচিত মুখ মুসলমান 'ভদ্রলোক'টি চুন-সুরকি মাখা বালতি মাথায় করিয়া অনাবৃত শরীরে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে রাজমিস্ত্রীদের নিকট যাইতেছে, অর্থাৎ, সে রাজমিস্ত্রীদের নিকট যোগান দিতেছে।

শিষ্টাচারের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য পরস্পরকে অভিবাদন। এই অভিবাদন বিভিন্ন সমাজে কোন-না-কোন ভাবে প্রচলিত আছে। তিব্বতের লোকেরা কোন পরিচিত লোককে পথে দেখিলে জিহ্বা বাহির করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রকাশের নিদর্শন। শুনিয়াছি, আসামে কোন কোন পার্ব্বত্য জাতি অভ্যাগতের সহিত দেখা হইলে তাহার মস্তক বা গাল হইতে নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস টানিয়া লয়। ফরাসী দেশে প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত পরস্পরের মুখচুম্বন করে। দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গুম্ফ-

যুক্ত লোককে পরস্পরের মুখচুম্বন করিতে দেখিলে আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। অবশ্য, এই চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের করমর্দ্দনও চলিতে থাকে। আমাদের বাংলার হিন্দুসমাজে নানা-প্রকার অভিবাদন-প্রণালী প্রচলিত আছে। কোন গুরুজনের সহিত দেখা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকি। এই প্রণাম করিবার প্রথারও বিভিন্নতা আছে। আমরা "দণ্ডবৎ" প্রণাম করি অথবা নতজানু হইয়া প্রণাম করি। ইহাতে গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা হয়। দণ্ডবৎ প্রণামের রীতি—ভক্তিভাজন ব্যক্তির সম্মুখে একগাছা লাঠির মত অধোমুখ হইয়া একবার শয়ন করা। ইহাই ভক্তিপ্রকাশের চরম নিদর্শন। ইহার নিম্নতর পর্য্যায় হইতেছে দুই পদের অঙ্গুলি, জানু বা হাঁটু, দুই করতল, নাসিকা এবং কপাল এই ষষ্ঠ অঙ্গ দ্বারা প্রণাম করা ইহারই নাম অষ্টাঙ্গ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। সন্ধ্যার সময় বা সন্ধ্যার পর শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে "প্রাতঃপ্রণাম" বলিয়া প্রণাম করে। ব্রাহ্মণেরাও প্রত্যুত্তরে বলেন, "প্রাতঃজয়স্তু"। এই সন্ধ্যার সময় "প্রাতঃ" শব্দ উচ্চারণ করা হয় কেন তাহা আমি বলিতে পারি না। প্রণত ব্যক্তির শির চুম্বন করিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করা হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্রদ্ধাভাজন মহিলাদিগকে প্রণাম করিলে তাঁহারা প্রণত ব্যক্তির চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের করাঙ্গুলি চুম্বন করেন। ইহা শিরশ্চুম্বনের নিদর্শন। মুসলমানেরা ভক্তিভাজন ব্যক্তির চরণচুম্বন করিয়া থাকেন। ইহাকে বলে, "কদমবুসি"। কদম অর্থে চরণ, আর 'বুসি' অর্থে 'চুম্বন'। উহা ফারসী শব্দ। বিহারী এবং উত্তর প্রদেশের লোকেরা ব্রাহ্মণকে দেখিলে "পাঁও লাগে" বলিয়া ঈষৎ নত হইয়া করজোড়ে নমস্কার করে। উড়িষ্যাবাসীরা প্রণাম করিবার সময় মুখে বলেন, "দণ্ডবত"। এইরূপ সকল সমাজেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ অভিবাদন-প্রথা প্রচলিত আছে।

আমি এই প্রসঙ্গে একটা প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার পূর্ব্বক্ষণে কোন্ কথা বলিতে হয় তাহার কোন স্থিরতা নাই। আমার মনে হয়, এস্থলে "নমস্কার" শব্দের প্রচলন হওয়া উচিত। কোন শূদ্র ভদ্রলোক ব্রাহ্মণকে "নমস্কার" বলিতে পারেন; আবার ব্রাহ্মণও যদি শূদ্রকে "নমস্কার" বলেন, তাহাতেই বা আপত্তি কি? মানুষ ত দেবতাকেও "নমস্কার" বলিয়া অভিবাদন করে। তাহার প্রমাণ, "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্" অর্থাৎ, নরোত্তম নারায়ণ এবং নরকে নমস্কার করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। আমাদের সমাজে কোন ব্রাহ্মণের সভায় আগন্তুক কোন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিয়া থাকেন,—"ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ"। প্রত্যভিবাদনে সভাস্থ ব্রাহ্মণেরা বলেন,—"নমস্তুভ্যাম নমো নমঃ"। আমার মনে হয় এই "নমস্কার" শব্দ মুখে বলিয়া কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র সকলেরই পরস্পরকে অভিবাদন করা চলিতে পারে। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।

ইউরোপীয় সমাজে, বিশেষতঃ ইংরেজ সমাজে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সময়ের উল্লেখ করিবার রীতি আছে। ইউরোপে রাত্রি ১২টা হইতে নূতন দিবস গণনা করা হয়, অর্থাৎ মধ্যরাত্রি শেষ হইলেই নূতন দিনের প্রভাত আরম্ভ হয়। সেইজন্য মধ্য রাত্রি হইতে বেলা নয়টা-দশটা পর্য্যন্ত ইংরেজেরা পরস্পরকে "good morning" বা "সুপ্রভাত" বলিয়া অভিবাদন করেন। তাহার পরই ইংরেজদের মতে বেলা তিনটা-চারিটা পর্য্যন্ত "noon" বা 'মধ্যাহ্ন'। সে সময়ে অভিবাদনে "good noon" বা 'সু-মধ্যাহ্ন' এবং তৎপরে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত ইহাদের মতে "Evening" বা 'অপরাহ্ণ'। অপরাহ্নের পর ইহাদের মতে রাত্রি। সে সময়ের অভিবাদন বাক্য, "good night"। আর একটা অভিবাদন-বাক্য উঁহারা যে-কোন সময়ে বিদায়গ্রহণ-কালে ব্যবহার করেন, "good bye"। ইহা "God be with you"—এই বাক্যের সংক্ষিপ্তরূপ। ইহার অর্থ ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন। ইহা ব্যতীত কোন সমুদ্র-গামী ব্যক্তিকে বিদায় দিবার সময় আত্মীয়বন্ধুরা বলেন, "I wish you a good voyage"। ফরাসীরাও এই বাক্যটি নিজেদের ভাষায় ব্যবহার করেন। বিদায়-অভিনন্দনে ফরাসীরা আর একটি শব্দ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করেন। তাহা হইল—"ও রে ভুয়া"। ইহার অর্থ হইল—"আবার যতক্ষণ না দেখা হয়"। আমাদের সমাজে, প্রথম সাক্ষাতে বা বিদায়কালে এতগুলি পৃথক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পরস্পরকে একই রূপ কথা বলিয়া অভিবাদন করিতে পারেন, এরূপ কথার প্রচলন নাই। ব্রাহ্মণ-সন্তান শূদ্রকে "নমস্কার" বলিলে অনেকে তাহাতে আপত্তি করেন। তাহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে "নমস্কার" বলিবেন কেন? তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া যান যে, নারায়ণ সর্ব্বভূতেই অবস্থিত। হিন্দু যখন প্রস্তর, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রতিমাকে দেবতা কল্পনা করিয়া প্রণাম করিতে পারে, তখন সেই কল্পিত দেবতা কি রক্ত মাংসের শরীরেও বিরাজ করেন না? না, সে দেবতা ব্রাহ্মণের প্রণম্য নহেন? তবে পরস্পরকে নমস্কার বলিতে দোষ কি?

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে পরস্পরকে "বন্দে মাতরম" বলিয়া নমস্কার করিতে অনেককেই দেখিয়াছি। অনেকে পত্র লিখিবার সময় যেখানে দেবতার নাম লিখিতে হয়, সেই স্থানেও "বন্দে মাতরম" লিখিয়া পত্র আরম্ভ করিতেন। আজকাল দেখিতে পাই অনেকে "জয় হিন্দ" শব্দ "বন্দে মাতরমে"র পরিবর্ত্তে ব্যবহার করেন।

আমি প্রত্যহ প্রভাতে এবং সন্ধ্যার সময় আমার বাসার সন্নিহিত একটা পার্কে বেড়াইতে যাই। সেখানে দশ-পনের জন ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, এমনকি প্রগাঢ় বন্ধুত্বও হইয়াছে। সেই পার্কে প্রথম দর্শনে আমরা পরস্পরকে "নমস্কার" করি। কিন্তু বিদায়গ্রহণ-কালে দেখিতে পাই, সকলেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের খুশী বা সময়মত স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অর্থাৎ, তাঁহারা অভিবাদনের প্রথমটা পালন

করিয়া শেষ অংশটাকে অবহেলা করেন। ইহাতে কি শিষ্টাচার ক্ষুণ্ণ হয় না?

উপসংহারে আর একটি কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের সমাজে দরিদ্র ভিক্ষুকের প্রতিও শিষ্টাচার প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। কোন ভিক্ষুক গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী বা গৃহিণী কখনও বলেন না—"ভিক্ষা দিব না" বা "ভিক্ষা পাবে না"। তাঁহারা ভিক্ষুককে বলেন, "মাপ করো", অথবা বলেন, "ফিরে দেখতে হবে"। বাটীতে যদি ভিক্ষা দিবার মত চাল না থাকে তাহা হইলে বলেন, "চাল বাড়ন্ত"। আমরা কখনও ভিক্ষুককে হেয় বা হীন বলিয়া মনে করিতাম না। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়া 'গৃহস্থ কৃতার্থ হন, ভিখারী ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া দাতাকে ধন্য করেন'—এই ধারণা অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের সমাজে বদ্ধমূল আছে। এমন কি, গ্রহীতার চরণ ধারণ করিয়া দাতা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, ইহার নিদর্শন এখনও বাংলার হিন্দুসমাজে বিদ্যমান আছে। আমাদের বিবাহ ব্যাপারে ভাবী জামাতার উরু স্পর্শ করিয়া কন্যাদাতা বলেন, "আমি এই সালঙ্কারা সবস্ত্রা কন্যাকে দান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।" পাত্রও উত্তরে বলেন "অহং গৃহ্ণামি", অর্থাৎ, আমি গ্রহণ করিলাম। উপনয়নের পর উপনীত ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দেওয়া সকলেই পুণ্যকার্য বলিয়া মনে করে। এমন কি মহিলারা ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিবার জন্য উপবাসী থাকেন: ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিয়া তাঁহারা জলগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম হইতে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্মেও ভিক্ষুগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সন্ন্যাসী, ভিক্ষোপজীবী—জনসাধারণই তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করে এবং উহা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে জাতিভেদ না থাকায় তাঁহারা গৃহস্থের বাটী হইতে ভাত, তরকারি, ভিক্ষা পাইয়া থাকেন। আজকাল ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে ভিক্ষুক-সমস্যা একটি অতি জটিল এবং গুরুতর সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। ইংরেজ-সমাজে ভিক্ষাপ্রার্থনা বা ভিক্ষাগ্রহণ একটি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া রাজবিধানে গণ্য। কিন্তু আমাদের সমাজে মুষ্টিভিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকায় এই সমস্যা অতি সহজে সুমীমাংসিত হইয়াছে। এ-দেশের বিধানকর্তারাও ইংরেজদিগের অনুকরণে ভিক্ষা করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা প্রায়ই দৈনিক সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, পুলিস কত জন ভিক্ষুককে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছে, সেই খবর। কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে তাহাদের প্রতিপালনের সুব্যবস্থা হয় কি? এই ভিক্ষুক 'ধরিবার' ব্যবস্থা কলিকাতা এবং হাওড়া প্রভৃতি বড় বড় শহরেই প্রচলিত আছে। কিন্তু মফস্বলে ইহা দেখিতে পাই না। আমরা মধ্যে মধ্যে অবাঙালী ভিক্ষুকদের জোরজবরদস্তির কথা শুনিতে পাই। অবাঙালী অর্থাৎ হিন্দুস্থানী ভিখারীরা বলে, 'যো দেতাই নেই, ও তো দেতাই নেই লেকিন্ যো … দেতা, ও … কাহে নেহি দেগা।" অর্থাৎ, যে ভিক্ষা দেয়, তাহার সহিত একটা মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে।

গান্ধী-কথামৃত

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে স্বাধীনতা তার মন্দিরে প্রবেশের প্রধান কুঞ্চিকাটি হ'ল অর্থ নৈতিক সাম্য। অর্থ নৈতিক সাম্যের জন্যে কাজ করার মানে হচ্ছে পুঁজিপতি আর শ্রমিকের চিরন্তন দ্বন্দ্বের বিলোপসাধন। এর তাৎপর্য হচ্ছে, এক দিকে যারা জাতির সম্পদের সাড়ে পনের আনা দখল ক'রে ঐশ্বর্যের চূড়ায় বসে আছে তাদের নীচুতে নামিয়ে আনা এবং আর এক দিকে নগ্ন ও বুভুক্ষু লাখো লাখো নরনারীকে দারিদ্র্যের গহ্বর থেকে উপরের আলোয় ওঠানো। ধনী এবং ক্ষুধার্ত জনসাধারণের মাঝখানে ব্যবধান যত দিন দুস্তর থাকবে তত দিন অহিংস শাসনপদ্ধতিকে চালু রাখা নিশ্চয়ই একটা অসম্ভব ব্যাপার। নয়াদিল্লীর সৌধরাজি এবং তাদের পাশেই নিঃস্ব শ্রমিকদের কদর্য আস্তানাগুলি—এ দুয়ের পার্থক্য স্বাধীন ভারতে এক দিনের জন্যেও বরদাস্ত করা যেতে পারে না। সেখানে দেশের যারা সবচেয়ে ধনী তারা যে ক্ষমতা ভোগ করবে, দরিদ্রতম যারা তারাও সেই ক্ষমতা ভোগ করবে। ঐশ্বর্য এবং ঐশ্বর্যের জোরে যে ক্ষমতা লাভ করা যায়—এই উভয়কে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ এবং সর্বসাধারণের হিতার্থে ব্যবহার না করলে এক দিন রক্তসাগরে তরঙ্গ তুলে সশস্ত্র বিপ্লব আসবেই আসবে।

[রচনাত্মক কর্মধারা—এম. কে. গান্ধী

সারাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি: সত্যই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর। সার্বজনীন এবং সর্বব্যাপী সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হলে সকলের অধম যে তাকেও আত্মবৎ ভালবাসতে হবে। আর যে মানুষ সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চায়, জীবনের কোন ক্ষেত্রকেই সে উপেক্ষা করতে পারে না। এইজন্যই সত্যানুরাগের বশবর্তী হয়ে আমি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি। আর একটুও দ্বিধা না করে অথচ সমস্ত নম্রতার সঙ্গে আমি বলতে পারি, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, এমন কথা যাঁরা বলেন তাঁরা ধর্মের তত্ত্ব আদৌ জানেন না।

[আত্মজীবনী—এম. কে. গান্ধী

খুব স্পষ্টভাবে না হলেও আমি অনুভব করি যে, আমার চারিদিকে যখন সবকিছুই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং মৃত্যুর গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তখনও এই সমস্ত পরিবর্তনের পিছনে এমন একটি জীবন্ত শক্তি বিরাজ করছে যার কোন পরিবর্তন নেই, যার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে জগতের সবকিছুই—যা গড়ছে, ভাঙছে, ভেঙে পুনরায় গড়ছে। সেই চিন্ময় শক্তি অথবা আত্মাই ভগবান। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত কিছুই অনিত্য। নিত্য একমাত্র তিনিই। এই শক্তি শুভ না অশুভ? আমি দেখছি, এই শক্তি সর্ব্বতোভাবে শুভ। কারণ আমার চক্ষে মৃত্যুর মাঝেও জীবনের ধারা রয়েছে অব্যাহত; মিথ্যার মধ্যে সত্য আছে অক্ষয় হয়ে; অন্ধকারের মধ্যে আলো রয়েছে অনির্ব্বাণ। এইজন্যে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, জ্যোতিস্বরূপ। তিনি প্রেমময়। তিনি পরম কল্যাণ।

[বেতার ভাষণ—এম. কে. গান্ধী

গান্ধীবাদের দোহাই দিয়ে যদি একটা বিশেষ সম্প্রদায় গড়ে ওঠে তবে গান্ধীবাদের ধ্বংস হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মৃত্যুর পরে আমি যদি জানতে পারি, যা ছিল আমার জীবনের ব্রত তার পরিণতি ঘটেছে একটা দলবিশেষের সঙ্কীর্ণ মতবাদে, তবে আমার অন্তরে নেমে আসবে বেদনার ছায়া। নিঃশব্দে আমাদিগকে কাজ করে যেতে হবে। আমি গান্ধীর অনুগামী—এমন কথা কেউ যেন না বলে। আমি জানি, নিজেকে নিজের অনুসরণ করার ব্যাপারে আমার অক্ষমতা কি বিপুল! যে সকল আদর্শে আমার গভীর বিশ্বাস সেগুলিকে আমি কি আচরণে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারি? তোমরা আমার অনুচর নও; তোমরা আমার সতীর্থ, সহযাত্রী, সত্য-সত্যান্বেষী এবং সহকর্মী।

সত্য এবং অহিংসা কেবল ব্যক্তিবিশেষের সাধনার বিষয় হয়ে থাকুক—এ আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই সত্যের এবং অহিংসার সাধনা হবে সমস্ত দলের, সমস্ত সম্প্রদায়ের এবং সমস্ত জাতির সাধনা। অন্ততঃ আমার স্বপ্ন তো তাই। এই স্বপ্নকে ফলবান করবার জন্যেই আমি বাঁচব। এর জন্যে আমি মরতেও প্রস্তুত। প্রতিদিন নব নব সত্যকে আমি যে আবিষ্কার করতে পারছি, সেও এই বিশ্বাসেরই বলে। আর এইজন্যেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই অহিংসার সাধনা করতে হবে। সর্ব্বক্ষেত্রে এই সাধনা যদি সম্ভব না হয় তবে বুঝতে হবে অহিংসার কার্য্যতঃ কোন মূল্য নেই।

[মালিকান্দায় গান্ধীসেবাসঙ্ঘে গান্ধীজীর ভাষণ

ভেবে দেখ, ত্রিশ কোটি মানুষ আমাদের মধ্যে রয়েছে যারা বেকার, ভেবে দেখ, কাজের অভাবে লাখো লাখো নর-নারী হারিয়ে ফেলছে মনুষ্যত্ব, হারিয়ে ফেলছে আত্মমর্য্যাদাবোধ, হারিয়ে ফেলছে ঈশ্বরে বিশ্বাস। ঐ যে ক্ষুধার্ত্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী যাদের চোখে নেই জ্যোতি এবং অন্নই যাদের কাছে একমাত্র ভগবান—ওদের কাছে ঈশ্বরের বাণী বলা যা—ঐ কুকুরটির কাছেও ঈশ্বরের বাণী বলাও তাই। ওদের কাছে শুধু পবিত্র কাজের বাণী পৌঁছে দেওয়ার ভিতর দিয়েই ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। সুন্দর প্রাতরাশ খাওয়া শেষ হয়েছে; আরও সুন্দর মধ্যাহ্নভোজন অপেক্ষা করছে সম্মুখে—এমনি একটা পরিবেশের মধ্যে ঈশ্বরীয় কথা বলতে ভালোই লাগে। কিন্তু দিনে দু'বেলা যাদের ভাগ্যে আহার্য্য জোটে না সেই লাখো লাখো মানুষের কাছে আমি কেমন করে ঈশ্বরীয় কথার অবতারণা করতে পারি? তাদের কাছে শুধু ডালভাতের মূর্ত্তিতেই ভগবানের আবির্ভাব সম্ভব।

[হরিজন—এম. কে. গান্ধী

লোকে বলে, পথ আসলে পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি কিন্তু বলি, পথই সবকিছু। নোংরা পথ নোংরা জায়গায় নিয়ে যাবে, নির্ম্মল পথ নির্ম্মল লক্ষ্যে। পথের আর লক্ষ্যের মাঝখানে ব্যবধানের কোন প্রাচীর নেই। সত্যি কথা বলতে কি—ভগবান আমাদিগকে পথ চলবার ক্ষমতা দিয়েছেন (তাও কত অল্প); ফলে আমাদের অধিকার কোথায়? পথ যেমন হবে, লক্ষ্যও হবে তারঅনুরূপ। এ হচ্ছে এমন একটি উপপাদ্য যার কোন ব্যতিক্রম নেই।

পথকে তুলনা করা যেতে পারে বীজের সঙ্গে, লক্ষ্যকে বৃক্ষের সঙ্গে। বীজের এবং বৃক্ষের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, পথের এবং লক্ষ্যের মধ্যেও ঠিক সেই সম্পর্ক।

[হরিজন—এম. কে. গান্ধী

হরিজনদের সম্পর্কে প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য তাদের হাতের সঙ্গে হাত মেলানো, তাদের নিদারুণ নিঃসঙ্গতায় বন্ধু হিসাবে তাদের পাশে দাঁড়ানো। ভারতে হরিজনদের নিঃসঙ্গতার মধ্যে যে একটা বিপুল হৃদয়হীনতা আছে, দুনিয়ার অন্যত্র তার জুড়ি মেলা ভার। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি কি কঠিন এই কাজ! কিন্তু এ কাজ তো স্বরাজের সৌধরচনার কাজেরই অঙ্গ। আর স্বরাজের পথ দুর্গম এবং ক্ষুরধার। এ পথে কত যে পিচ্ছিল চড়াই এবং কত যে অতলস্পর্শী গহ্বর! এদের সকলকে অতিক্রম করতে হবে অকম্পিত পদক্ষেপে। তবেই এক দিন আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে স্বাধীনতার পর্ব্বতচূড়ায় উপনীত হয়ে সেখানকার সঞ্জীবনী বায়ু সেবন করা।

[হরিজন—এম. কে. গান্ধী

সেবাব্রতে নারী হবে পুরুষের সত্যিকারের সহকর্মী। সমাজের বিধি-নিষেধের চাপে নারীর আত্মপ্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। এর জন্যে পুরুষই তো দায়ী। এই সব বিধিনিষেধ রচনায় নারীর কোন হাত ছিল না। অহিংসার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে পুরুষের যে অধিকার—নারীরও সেই অধিকার আছে।

[রচনাত্মক কর্ম্মধারা—এম. কে. গান্ধী

পৃথিবীকে দিবার মতো ভারতের কোন বার্ত্তা আছে—একথা আপনারা—খ্রীষ্টান মিশনরীরা যদি অন্তরে অনুভব করেন, যদি অনুভব করেন ভারতের ধর্মগুলিও সত্য যদিও তারা মানুষের অসম্পূর্ণতার জন্যেই আর সব ধর্মের মতোই অপূর্ণ এবং সর্ব্বোপরি যদি আপনারা ভারতে আগমন করেন সত্যের সন্ধানে—ভারতবাসীদের সহযাত্রী এবং সাহায্যকারী হিসাবে, তবেই এখানে আপনাদের জন্যে স্থান আছে। কিন্তু আপনারা যদি ভারতবাসীদিগকে অন্ধকারে ভ্রাম্যমাণ জাতি মনে করে তাদের কাছে সত্যধর্ম্মের প্রচারক হিসাবে আসেন তবে আমার দিক থেকে বলতে পারি, এখানে আপনাদের কোন স্থান নেই।

[খ্রীষ্টান মিশনরী সভায় গান্ধীজীর ভাষণ থেকে

প্রাণধর্ম্মী অহিংসা হচ্ছে স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করা। দুষ্কৃতকারীর ইচ্ছার নিকট বিনম্র আত্মসমর্পণকে কখনও অহিংসা বলা যেতে পারে না। অত্যাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মার সমস্ত শক্তি-প্রয়োগই যথার্থ অহিংসা। ["ইয়ং ইণ্ডিয়া"—গান্ধীজী অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

পুনশ্চ

শ্রীমহেন্দ্রলাল সেন

বড্ড বেকুব বনে গেছি, নতুবা ব্রজমোহন ও অনুরাধাকে নিয়ে গল্প ফাঁদা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, হাস্যকরও বটে। এদের দেখা পাবেন, হাটে-বাজারে, অলিতে-গলিতে, পল্লীতে-জনপদে। এদের কাউকে নায়ক-নায়িকা করে গল্প লিখতে হলে পৃথিবীর যে-কোন নারী-পুরুষকেই নায়ক-নায়িকা করা চলে। তবু মনের ক্ষোভে ওদের কাহিনী বলে চলেছি। শুধু মনের ক্ষোভে মানুষ রেগে যাই হয়, তারপর কিছু গর্জন বা বর্ষণের পর ধীরে ধীরে সব ভুলে যায়। আমার ক্ষোভের সঙ্গে কিছুটা, আর কিছুটা কেন, পুরোপুরিই সত্যিকারের গভীর আনন্দানুভূতি জড়িত রয়েছে; তাই এ কাহিনীর অবতারণা। বলতে হলে গোড়া থেকেই বলতে হয়।

ব্রজমোহন আমার বাল্যবন্ধু। বাল্যবন্ধু বলতে অবশ্য ছেলেবেলার খেলাধুলো, মাছধরা, পেয়ারা চুরি প্রভৃতি বহুবিধ ছেলেখেলার সাথী বুঝায়। ব্রজমোহন আমার সে রকম বাল্যবন্ধু নয়। স্কুলেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সে গম্ভীর প্রকৃতির ও পড়াশুনায় তার অখণ্ড মনোযোগ। আমি সর্ব্বদাই চঞ্চল-স্বভাব। লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলো, আড্ডা-আশ্রম, সভা-সমিতিতেই আমার ঝোঁক বেশী। তবু এ দুই ভিন্নমুখী প্রকৃতির মনের মিলন ঘটেছিল এবং এক বিষয়ে গভীর মতের মিলও। দেশোদ্ধারে দু'জনই বহু চিন্তা চেষ্টা ও বহু ব্যর্থশ্রম করেছি। এ বিশ্বে নাকি কিছুই ব্যর্থ নয়, সে অর্থে 'ব্যর্থশ্রম' না বলে 'বহু-শ্রম' বলাই বোধ করি সঙ্গত। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পিচ্ছিল ধাপগুলো অবধি দু'জনে একই সঙ্গে ডিঙিয়ে চলেছি, কোথাও ছাড়াছাড়ি হয় নি। তারপর জীবিকার ঘূর্ণাবর্ত্তে দু'জন ছিটকে পড়েছি—দু'দিকে। মধ্যবিত্তের আশানুরূপ ভাল চাকরি অবশ্য আমাদের জুটেছে। আমি বিয়ে করে পুত্রকন্যা নিয়ে দস্তুরমত সংসারী জীব হয়ে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি। ব্রজমোহন তখনও অনূঢ়।

এক দিন ট্রেনের কামরায় ওর সঙ্গে দেখা। নানা আলাপাদির পর বললাম, দেখ ব্রজমোহন, চাকরি-বাকরি নিয়ে বেশ ত জাঁকিয়ে বসেছিস, এবার বিয়ে-থা কর। চিরকাল আইবুড়ো থাকবি নাকি?

ব্রজমোহন স্মিতমুখে আমার দিকে চেয়ে রইল। এ চাউনির অর্থ আমার জানা। যা সে কানে তোলে না এবং তার জবাব দিতেও চায় না—এ সে অবস্থা। আপনারা বলতে পারেন, ওটা মনের কথা নয়, চিরন্তন পুরুষ চিরন্তনী নারীতে আসক্ত থাকবেই থাকবে, কিংবা ও কোনও কোমল হাতের কঠোর ধাক্কা পেয়েছে, তাই এ শ্মশানবৈরাগ্য। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি এ কথা সত্যি নয়। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম, 'তোর বিয়ে করার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে, কিন্তু তোর বুড়ো মা-বাপ, ছোট ছোট ভাইবোনদের ত সাধ-আহ্লাদ সেবা-যত্নের প্রয়োজন আছে। তোর বিয়ের অমতের জন্য মাসীমা সেবার কত না দুঃখ করলেন!" ব্রজমোহনের মাকে আমি মাসীমা বলে ডাকি। কৈশোরে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় ওখানে আমার বাৎসল্য-রস আস্বাদনের একটি উৎস ছিল। ব্যথিত চোখে তাকিয়ে ব্রজমোহন এবার মুখর হয়ে উঠল; "দেখ ভাই, জানিস ত বাবা অজস্র ঋণ করে আমাকে মানুষ করেছেন। সে ঋণের জেরই এখনও মেটে নি। সংসারে অল্প আয় নেই, ভয়ানক টানাটানি চলেছে। ভাই-বোনদের পড়াশোনাই রীতিমত চলছে না। তা ছাড়া ভেবে দেখ, দেশোদ্ধারে ত একবার মেতেছিলি, দেশ এখন স্বাধীন বটে, কিন্তু ক'টি লোকের মুখে হাসি ফুটেছে? দেশ বলতে কি বুঝিস? যদি ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ বুঝায়, তবে তাদের মুখে হাসি ফুটানো খুব বড় ব্যক্তিত্বশালী লোক ও সর্ব্বত্যাগী প্রেমিক কর্ম্মী ভিন্ন আর কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমি আমার দেশকে খুব ছোট করে নিয়েছি। আমার মা-বোন আত্মীয়-পরিজনের মুখে যদি হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারি তবেই নিজেকে ধন্য মনে করব। দেশের

প্রত্যেকটি কর্ম্মঠ পুরুষ যদি এইরকম কর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তবে আমার মনে হয়, দেশের অনেক সমস্যারই আশু সমাধান হতে পারে। তারপর বৃহত্তর সমস্যাগুলোর সমাধান অতি অল্প আয়াসেই হয়ে যাবে। ভেবে দেখ অমরেশ, জাপানের কথা। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে জাপানের আজ দুরবস্থা। কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্ব জাপান কি দ্রুত উন্নতি লাভ করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। জাপানীরা নিজের কাজ ও দেশের কাজকে এক করে নিয়েছিল পরম নিষ্ঠায়, তাই তার এত দ্রুত উন্নতি হয়েছিল। জাপানের তুলনায় ভারতবর্ষ পরম ঐশ্বর্য্যশালী দেশ। এর উন্নতি নির্ভর করছে শুধু কাজ ও নিষ্ঠার ওপর। নিজের ক্ষুদ্র সুখ ত্যাগ করে কাজ করে যেতে হবে,—শুধু কাজ।" আবেগে ব্রজমোহনের ওষ্ঠাধর কাঁপতে লাগল। একটু রূঢ়ভাবেই বলে ফেললাম, "সে না হয় হ'ল। কিন্তু কাজের জন্যও প্রেরণার প্রয়োজন আছে; হ্লাদিনী-শক্তির সাহায্য ছাড়া কোন মহৎ কাজই হতে পারে না।" ব্রজমোহন কৌতুকে ব্যঙ্গ করে উঠল, "নিকুচি করেছে তোর হ্লাদিনী-শক্তির! বাজে বকাসনে অমরেশ, কাজের স্পৃহা যখন মানুষের আসে কেউ তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না, আর অলসকে তোর মহাহ্লাদিনী-শক্তিও এগিয়ে দিতে পারে না। মহৎ কাজের জন্য চাই মনন—দুটো একান্ত নিজস্ব।"

"যুক্তির খাতিরে না হয় ওটা মেনেই নিলাম। তোর ত্যাগ বা নিষ্কাম কর্ম্মের মহিমায় নরনারীর চিরন্তন কিংবা আদিম কামনা না হয় জয়ই করে নিতে পারলি কিন্তু গার্হস্থ্য-ধর্ম্মেই যখন আছিস, তখন তোর অবসন্ন মুহূর্ত্তে, তোর রোগে শোকে, তোর উৎসবে বাস ন তোর পাশে দাঁড়াবার একজন সঙ্গিনী ত চাই। বৃদ্ধত্বের ছায়ায় যে বাৎসল্যরস অন্তরে উদ্গত হয়, তাও একান্তই মানবীয়। তার জন্য কি চাই না কচি কচি শিশুরা তোকে ঘিরে আনন্দের হাট খুলে বসে? তুই ত আর পরমপুরুষ হয়ে যাস নি।

ব্রজমোহন স্বপ্নাতুর হয়ে এল; "পরমপুরুষ নয় ভাই, আমি ঐ পল্লী-প্রান্তরেরই সাধারণ একটি মানুষ মাত্র। সাধারণ মানুষের মত আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তিই জাগ্রত আছে। মানুষের কামনা-বাসনার কিছুই আমি ছোট করে দেখি না।" একটু থেমে বলে, "কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ স্বস্তির বিনিময়ে একটি অপাপবিদ্ধা কুমারী ও তার অবশ্যম্ভাবী সন্তানসন্ততিকে ভবিষ্যৎ দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা করা ঢের বেশী কাম্য।"

ভর্ৎসনার স্বরেই বললাম, "বড্ড বেশী ভাবালু হয়ে উঠেছিস ব্রজমোহন, নিজেকে আজকাল বড্ড বেশী ছোট করে ভাবতে শিখেছিস—ওটা কি তোর নতুন বৈষ্ণবীয় তিতিক্ষা?" ব্রজমোহন হেসে ফেললে, সে তুই যা বলিস, কিন্তু আমার শক্তির পরিধি ত আমার জানা আছে। নিজের শক্তিকে অযথা বড় করে দেখা শুধু হাস্যকর নয়, মহাপাপ।"

ব্রজমোহনের অবিবাহিত তিনটি ছোট বোন ও চারটি ছোট ভাই। ওদের কারও পড়াশোনা এখনও শেষ হয় নি। বাবা বৃদ্ধ-বয়সে অতি সামান্য আয়ের চাকরি থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন। পারিবারিক অবস্থা-বিবেচনায় ব্রজমোহনের যুক্তি খণ্ডন করতে মনে জোর পেলাম না। আমার গন্তব্য ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামল, আলোচনা আর এগোল না। তার পর বহুদিন ব্রজমোহনের সঙ্গে দেখা নেই।

সেই দিন আপিস ফেরত একটু ত্রস্তপদেই বাড়ী ফিরছি—গৃহিণীর কি যেন জরুরি সাংসারিক আদেশ ছিল। মধ্যবিত্তের টানা-টানির সংসার; বাইরের হুকুম তামিল করে যথাশক্তি ঘরের আদেশ পালন করতে পারলে কদাচিৎ কিঞ্চিৎ স্বস্তির সম্ভাবনা থাকে। আমি তাই সব নামেলা এড়িয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে খুঁজে পাবার চেষ্টা দেখি। থাক সে কথা। পৃষ্ঠদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম, "কি রে অমরেশ, এত হন্ হন্ করে চলেছিস কোথা? বৌদি বুঝি তোর বকে যাবার ভয়ে একটুখানিও বাইরে থাকতে দেয় না?" রাস্তার মাঝে আমাকে চাপড় মেরে কথা বলার লোক থাকা ত দূরের কথা, শুধু নাম ধরে ডাকারই লোক ছিল না, বিস্ময়ে চোখ ফিরিয়ে ভাল করে চেয়ে বিস্ময়ে চেয়ে দেখি—স্বয়ং ব্রজমোহন। তার আগেকার গাম্ভীর্য্যে অনেকটা ভাঁটা পড়েছে, নতুবা সে চাপড় মেরে কথা বলার ছেলেই নয়। দেহে বেশ লাবণ্য, মনও খুশিতে উচ্ছল। আমার বিস্ময় কাটিয়ে দিয়ে বললে, "তোর ঠিকানা না জানায় খবর দিতে পারি নি, আজ দুদিন বদলী হয়ে এসেছি এখানে।" ঠিকানা দিয়ে বললে, "কাল একবার বৌদিকে নিয়ে যাস যেন ভাই, মা তোদের খুঁজছিলেন।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হঠাৎ বদলী কেন রে?"

"ঠিক হঠাৎ নয়। ওখানে ত অনেক দিন চাকরি হ'ল। বদলী করবে কথাই ছিল। বিয়েতে ছুটি নেওয়াতে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল আর কি।"

"কার বিয়ে রে? মালতীর বিয়ে দিয়েছিস শুনেছিলাম, এবার মল্লিকার বিয়ে হ'ল?"

"না ভাই, গেলবার মল্লিকারও বিয়ে হয়েছে," একটু হেসে লজ্জানম্রস্বরে বলল, "এবার আমার……" আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম, "সে কি রে? তোর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কে ভাঙালে? সে কোন্ উমারাণী—মহাদেবকে পাশে আনতে যাকে ভয়ানক কোপে পড়তে হয়েছিল, আর যার ফলে বেচারা মদনকে পুড়ে ভস্ম হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে হ'ল?" ব্রজমোহন কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "যা, সবজান্তেই তোর ফাজলামো। আমাদের মত সাধারণের জন্য কারো কোনও বেগ পেতে হয় না; যা হবার হঠাৎই হয়ে যায়।"

আমি নিকটস্থ কফি-হাউসে ব্রজমোহনকে টেনে নিয়ে দুই পেয়ালা কফির অর্ডার দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললাম, "বেশ, এবার তোর 'হঠাৎ'-এর আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর আমি উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণ করি। উমারাণীর রূপ-গুণ-কীর্ত্তনে যেন কার্পণ্য করিস নে।" ব্রজমোহন আনন্দের প্রাচুর্য্যে একটু হেসে সুরু করলে, "সেদিন পাড়ার ছেলেরা আমাকে ধরে বসলে ওদের ডিবেটিং ক্লাবে

আমাকে সভাপতিত্ব করতে হবে। কিছুতেই ওরা ছাড়লে না। বিষয় আবার অদ্ভুত—'বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজে পুরুষের সঙ্গে নারীর সম-অধিকার সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্ম একান্ত অপরিহার্য্য।' উপায়ান্তর না দেখে রাজী হতে হ'ল। আমার বিদ্যা ও বক্তৃতার দৌড় ত জানিস। কোনও কালে নারীর সম-অধিকার হবে না, কি হবে ভেবেও দেখি নি। কি যে করি, নিরুপায় হয়ে পড়লাম। শেষে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির নারীবিষয়ক প্রবন্ধাদি পড়ে মনে মনে বক্তৃতার একটি খসড়া তৈরি করে ত সভাপতির চেয়ার চেপে বসলাম। ছেলেমেয়েরা একটির পর একটি পক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতা দিয়ে চলল। ওরা ভাল বক্তৃতা দিলে, বেশ তৃপ্তি পেলাম। আমি কিন্তু তখন আমার বক্তৃতার খেই হারিয়ে ফেলেছি। সর্বশেষ বক্তৃতা দিতে দাঁড়াল অনুরাধা। এমন রূপলাবণ্যময়ী যৌবনোচ্ছল নারী যে আমাদের সেই ছোট শহরে লুকানো ছিল সে আমার ধারণার অতীত। সাপের মত কুচকুচে কালো সুদীর্ঘ তির্যক বেণী দুলিয়ে, পাতার কুঁড়ির রঙের ঠোঁটে ঢাকা মুক্তোর মত দাঁতের সারির ঝিকি-মিকিতে কথার ফুলঝুরি কেটে মেয়েটি অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে চলল। মনে কেমন যেন ধাক্কা পেলাম।..." ব্রজমোহনের আবেগ থামিয়ে দিয়ে স্ফূর্তিতে চীৎকার করে উঠলাম, "সাবাস, এ-ই ত চাই—বলে যা ব্রজমোহন, তোর অপূর্ব্ব-কাহিনী।" ব্রজমোহন 'বাঃ' বলে আবার বলে চলল, 'কিন্তু মেয়েটি তাহার উদাহরণ দেখিয়ে পুরুষের নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ও কূটনীতিই মেয়েদের দাসী করে সমাজে তাদের দাবিয়ে রাখার জন্ম দায়ী বলে অজস্র গালাগালি দিয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করলে। এ যেন কুসুমে কীট। আমি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, এবার কেমন যেন রোখ চেপে বসল। ঝাড়া পৌনে এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে তার যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, জীবন-সংগ্রামে পুরুষ ক্ষত-বিক্ষত, বাস্তবিক ওরা স্বাধীন মনে হলেও ঘরে-বাইরে ওরা সম্পূর্ণ পরাধীন। ওরা নিজেদের ও সন্তান-সন্ততিদের সমস্ত দায়িত্বভার নারীদের উপর অর্পণ করে ওদের কল্যাণী করে রেখেছে। ঘরে ওরা স্বাধীন। ঘরের ছোট রাজত্বে ওরাই একমাত্র রাজেন্দ্রাণী। তা ছাড়া স্বাধীনতা হাতে তুলে দেবার সামগ্রী নয়। তা অক্লান্ত চেষ্টায় প্রত্যেককেই অর্জ্জন করতে হয়। বাপ-ভাই বা স্বামীর অর্থে যা খুশি করা শুধু খিজিপনা নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা। একে স্বাধীনতা বলা চলে না। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের স্বাধীন হওয়ার সংসাহস খুব কম নারীরই আছে এবং প্রকৃতিদত্ত নারীদেহেও তার অস্তিত্ব খুবই কম।...কে যে আমাকে বলিয়ে-ছিল জানিনে ভাই, কিন্তু বক্তৃতা নাকি খুবই চমৎকার হয়েছিল।" ব্রজমোহন নিঃশ্বাস নিলে, "আমার বক্তৃতায় মেয়েটি যেন কেমন আবিষ্ট হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে তাকে আর তার আসনে দেখতে পেলাম না।" আমি 'হায় হায়' করে উঠলাম। ব্রজমোহন আমাকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'একটি মেয়েকে আঘাত করে মনে কেমন যেন খচখচ করতে লাগল। ও ত আমার সমান নয় যে, দরকার হলে আঘাতের বদলে আঘাত করতে হবে। কিন্তু সভা-শেষে 'হল' থেকে বাইরে গিয়ে দেখি পথের এক কিনারায় ছোট ভাইটির হাত ধরে অনুরাধা দাঁড়িয়ে। কাছে যেতেই মিনতির স্বরে বললে, 'দেখুন আপনি যা বলেছেন; সেটাই আমার সত্যিকারের মত ও আদর্শ। শুধু বক্তৃতার জন্মই আমি এ রকম বলেছি, আমাকে ক্ষমা করবেন।' সস্নেহে বললাম, 'সে কি, তোমার বক্তৃতা ত খুব সুন্দর হয়েছে, তোমার একথা শুনে আমার আরও ভাল লেগেছে।'

তার পর অনুরাধার সঙ্গে কারণে-অকারণে দেখা হতে লাগল। তার দিনকয়েক পরে দেখি আমাকে কিছু না বলেই মা-বাবা পাকাদেখা করে অনুরাধাকে আশীর্ব্বাদ করে এসেছেন। শুভ লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল।"

আমি কৌতুকে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম, "প্রথম ধাক্কায়ই কেল্লা ফতে! মাসীমা মেসোমশায় সেকেলে হলেও তোর স্বীকার করতেই হবে, ওঁরা তোর চেয়ে অনেক বেশী আধুনিক এবং তাঁদের চোখকান ও বোধশক্তি তোর চেয়ে ঢের বেশী সজাগ।" ব্রজমোহন জবাব না দিয়ে একটু হাসল। একটু থেমে বললাম, "তোর সেই ছোট দেশ-সেবার কি হ'ল রে, ওটা কি উপস্থিত বাতিল করে দিয়েছিস?"

ব্রজমোহন একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "যাকে আদর্শ বলে মনে প্রাণে জেনেছি, তাকে কখনও বাতিল করি নি, অমরেশ, কিন্তু ওর একটু পরিধি বেড়েছে এইমাত্র।" মনে মনে খুশী হয়েই বললাম, "বৌদিকে সেকথা বলেছিস ত? ধর্ম্মপত্নীকে স্বধর্ম্মে পতিতা করতে নেই যদি সে তোর ধর্ম্ম মাথা পেতে নিতে রাজী থাকে।" ব্রজ-মোহন আবার উচ্ছল হয়ে উঠল, "ওকে কিছু বলতে হয় না, অমরেশও আমার মনের কথা অন্তরে বুঝে নেয়। ও চিরন্তন নারীত্বে লীলাচঞ্চলা, ঘরে কল্যাণী। মা-বাবা, ভাইবোন—কারো কোনও কষ্ট হতে দেয় না, আর আমাকে ত পক্ষপুটে ঘিরেই রেখেছে। জীবনের এক নূতন স্বাদ পাচ্ছি—এক অখণ্ড-আনন্দানুভূতি। আমার প্রগলভতায় কিছু মনে করিস নে ভাই।"

আমি আবার নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠি, "কিছুই মনে করি নি রে মূর্খ, এ স্বাদ-বিস্বাদ আনন্দ-নিরানন্দের কথাই তোকে বহু বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, তখন ত বুঝিস নি। যাক্, 'বেটার লেট দ্যান নেভার'।" ব্রজমোহন আবার সস্ত্রীক নেমন্তন্ন ঝালিয়ে চলে গেল।

সত্যের অপলাপ না করলে বলতে হবে, বন্ধুর স্ত্রী-ভাগ্যে কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিতই হয়ে পড়লাম। আপনারা হয়ত বলে বসবেন—এমন না হলে আর কি বন্ধুত্ব! আমি কিন্তু নাচার। জৈবিক প্রাণধর্ম্মে মানুষ একমাত্র নিজেকেই ভালবাসে। বিশ্বের সমস্ত সুখতৃপ্তি নিজের মাঝেই মূর্ত্ত দেখতে চায়। বহু সাধনায় উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতিশীল আদর্শ মানবধর্ম্মী মন পলকে সে আত্মস্বভাব জয় করে মানুষের কল্যাণ-কামনা করে এবং মানুষের কল্যাণে প্রফুল্ল হয়, আত্মীয়-পরিজন বান্ধুবান্ধবের কল্যাণে ত বটেই।

পরদিন যথারীতি সস্ত্রীক ব্রজমোহনের বাড়ী গিয়েছি। অনু-

রাধা সম্পর্কে ব্রজমোহনের অতিশয়োক্তি কিছুই ছিল না। সে সত্যিই নারীরত্ন বলে মনে হ'ল। ব্রজমোহনের বাড়ীতে আনন্দের বান ডেকেছে এবং মাসীমার বৌয়ের দুঃখ ঘুচেছে দেখে পরম স্বস্তিতে প্রফুল্লমনে বাড়ী ফিরলাম। তারপর হরদম আমার বাড়ীতে ও ব্রজমোহনের বাড়ীতে যাওয়া-আসা চলেছে। তারপর তারও ভাঁটা পড়েছে। আমরা দু'জনই জীবিকার ঘূর্ণাবর্তে নিজ নিজ কক্ষে ঘুরে চলেছি। কিছুদিন দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। এক দিন আমার স্ত্রী বললেন, "ওগো শুনছো ?" আমি শুনতেইছিলাম। তিনি বললেন, "তোমার বন্ধু-পত্নীর ভাবগতিক কিন্তু আমার যেন কেমন কেমন লাগছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন কেমন, কি রকম ?" উনি বললেন, "কেমন যেন ধিঙ্গিপনা—স্বাধীনতা, দাসীপনা, এ রকম কত কি যে বলে, সবকিছুর মাথামুণ্ডও আমি বুঝতে পারি নে।" মনে মনে বললাম, "ও নারীত্বের লীলাচাঞ্চল্যে পুরুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আবার কল্যাণীরূপে তাকে স্বধর্মে ও কর্তব্যে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। তোমার সনাতনী কল্যাণী ভাবের কাছে ওর প্রথম ও আদিম রূপ খাপছাড়া বলেই ঠেকবে।" আমাকে নীরব দেখে গিন্নী কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করলেন, "কি গো, কথা বলছ না যে ? বন্ধুপত্নীর রূপধ্যান করছ না কি ?" উত্তরে বললাম, "হাঁ...না, হয়ত করছি, কিংবা করছি না। কিন্তু কি বলব, বল, ওকে ত ভাল বলেই মনে হয়েছিল।" কথাটি এখানেই শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আমার স্ত্রী-কথিত কেমন-কেমন ভাব যে কি মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে সম্পূর্ণ অন্য অধ্যায়।

কিছুদিন পর সহসা আমার গিরিডি বদলীর আদেশ এল। বাক্স পেটরা সাজিয়ে একেবারে তৈরি হয়েই ব্রজমোহনের বাড়ী গেলাম তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। তখন বিকাল। রাত্রি দশটায় আমার ট্রেন ছাড়বে। কিন্তু এ কি! বাড়ীখানি যেন একেবারে নিঝুম। মাসীমা মেসোমশায়কে প্রণাম করে বিদায় চাইলাম। বিড়বিড় করে তাঁরা কি যেন আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু তাঁদের সে সৌম্যভাব ত দেখছি নে। তার বদলে বিশ্বের বেদনা যেন তাদের আননে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিমর্ষ মুখে ভাইবোনেরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, "ব্রজমোহন কোথা ?" ওঁরা জবাবে বললেন, "ঘরে শুয়ে রয়েছে বোধ করি।" "অবেলায় শুয়ে কেন ?" বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ব্রজমোহনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। ব্রজমোহন বেদনাতুর চোখে তাকালে। ক'দিনেই যেন সে অনেক বছর বুড়িয়ে গেছে। ওর এমন অসহায় ভাব আমি কখনও দেখি নি। কাছে বসে ধীরে ধীরে পিঠে হাত বুলোতে লাগলাম, তোর এমন হ'ল কি করে, ব্রজমোহন, খুলে বল দিকি ভাই।"

"বলার বিশেষ কিছু নেই, ব্যাপার সংক্ষিপ্তই। আমারই ভুল, অনুরাধা...।" একটু থেমে ঢোক গিলে বললে, "অনুরাধা শুধু চিরন্তনী নারীই, ওর কল্যাণীরূপ সাময়িক ধার-করা ছদ্মবেশ মাত্র। ও চায় প্রাচুর্য্য, বিলাস, খুশি করার অবধি স্বাধীনতা ও উপকরণ। আমাকে উপলক্ষ্য করে সে চালাতে চায় তার আত্মকেন্দ্রিক জীবন। যেটাতে চায় তার নিত্য নূতন খেয়াল। অনুরাধার অসংযত ও অবাধ গতি কিছুদিন ধরেই মা-বাবাকে খুব পীড়া দিচ্ছে। ঘরের কাজ, মা-বাবার সেবা, ভাইবোনের যত্ন—এ সব দাসীপনা আর একগোষ্ঠী মানুষকে প্রতিপালন করার ঝুঁকি সে একটু মুহূর্ত আর নিতে রাজী নয় বলে চরম কথা জানিয়ে দিয়ে চিরকালের মত তার মা-বাবার কাছে চলে যেতে তৈরি হয়ে বসে আছে..." একটু থেমে কিঞ্চিৎ দৃপ্ত কণ্ঠেই ব্রজমোহন বললে, "আমার ভুলের মাশুল আমিই দেব অমরেশ, আর স্বধর্মচ্যুতও হব না। আমার অন্তরে যে স্নেহ শ্রদ্ধা ও আমার যে আর্থিক সামর্থ্য আছে, আমার ছোট দেশের সবাইকে আমি তা ভাগ করে দিচ্ছি ও দেব। ওতে ত অনুরাধার তৃপ্তি নেই। আমি সেকথা অবশ্য ভাবছি নে, দিন-রাতই ভাবছি, এ আঘাতে, লোকলজ্জায় ও আমার কথা ভেবে ভেবে মা-বাবা একেবারে ভেঙে পড়বেন। সে যে কি বেদনা...।" ব্রজমোহন ভেঙে পড়ল। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "অনিবার্য্যকে মাথা পেতে নিতে হয় ব্রজমোহন, দুঃসময়ে এত উতলা হতে নেই। বৌদি কোথায় ? একবার দেখি কি হয়।" অদ্ভুতভাবে ব্রজমোহন বললে, "ও ঘরেই আছে। গাড়ীর অপেক্ষা করছে। কিছুতেই কোনও ফল হবে না, অমরেশ, আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি, অনেক মানবতার দোহাই দিয়েছি।"

অনুরাধা সত্যিই একেবারে তৈরি হয়ে বসে রয়েছিল। বললাম, "এ কি বৌদি, একেবারে যে রণসাজে! কোথায় আমি এলাম তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে, না তুমিই যে দেখছি, তার আগেই বিদায় নেবে!"

"তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ, ঠাকুরপো।"

"আমাকে গিরিডি বদলী করেছে যে, আজ রাত্রিরেই যেতে হচ্ছে।"

"বেশ ভালই হ'ল। আমিও গিরিডি যাচ্ছি—একই ট্রেনে। দাদা ওখানে চাকরি করে কি না, আর বাবাও রিটায়ার করে সকলকে নিয়ে ওখানে আছেন।"

"তোমার এ যাওয়া কি শোভন হচ্ছে বৌদি ?"

"অশোভনই বা কোথায় ? এ দাসীপনা, এ উঞ্ছবৃত্তি আমার সয় না, ঠাকুরপো।"

"তুমি কাকে দাসীপনা বলছ বৌদি ?"

"এই তোমরা যাকে সতীসাধ্বীর ব্রত বল।"

"কিন্তু প্রেমপ্রীতিও ত সংসার থেকে মুছে যায় নি।"

"তা যায় নি, কিন্তু শুষ্ক কণ্ঠে একগোষ্ঠী লোকের তাঁবেদারির দাসীপনার ফাঁকের এক বিন্দু করুণাবারিকে আমি প্রেম বলি নে।"

"নারী পুরুষের আসক্তি স্বভাবধর্ম। কিন্তু নর্ম্ম ও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে তিলে তিলে পুরুষকে জয় করায় গৌরব পরম কাম্য, সেকথা স্বীকার কর ত ?"

"তা কবি···কিন্তু···"

"কিন্তু স্নেহ প্রেম ও সেবার ভিতর দিয়ে তিলে তিলে একগোষ্ঠী লোককে জয় করার গৌরব যে আরও বড়, আরও মহীয়ান্, সে কথা মানছ না কেন? সে পাওয়াকেই পরম পাওয়া বলা চলে।"

"ঐ পরম পাওয়ায় আমার লোভ নেই ঠাকুরপো, চিরবঞ্চিতদের একমাত্র সান্ত্বনা, বৃহত্তর আদর্শের হাহাকার। ওটা আমার ধাতে সয় না।"

"কিন্তু তোমার এ যাওয়াতে কি তোমার গৌরব বাড়বে?"

"দাসীপনা, উঞ্ছবৃত্তির পরিবর্ত্তে বাবা ভাইয়ের কাছে থাকাতে অগৌরবের ত কিছু দেখি নে।"

"তোমার বাবা ভাই কি এতে খুশী হবেন, মনে কর?"

"তুমি ত বাবা আর বড়দাকে জান না, তাই বলছ। জান, আমি বি-এ পাস করে চাকরি পেয়েছিলাম। আমার কষ্ট হবে বলে চাকরি নিতে কিছুতেই ওঁরা দিলেন না। কিন্তু আমার স্বাধীনতায় কেউ হাত দেয় না।"

"বাইরেটাকে দূর থেকে ভালই দেখায়, কিন্তু তার স্তূপীকৃত আবর্জ্জনার খবর তো রাখ না। সে চরম দুর্গতি থেকে তোমাকে বাঁচাতে ওঁরা তোমাকে চাকরিতে না দিয়ে, বিয়ে দিয়েছেন। তোমার এ যাওয়া ওঁদের কাছে খুব প্রীতিকর হবে বলে মনে হয় না।"

"তোমার মনের 'পর ত সব নির্ভর করে না, ঠাকুরপো, আমি ওঁদের জানি। আর এ অবাঞ্ছিত পুরী আমি ছাড়বই ছাড়ব।" বুঝলাম তর্ক নিষ্ফল।

বলা বাহুল্য, অনুরাধা সে রাত্রেই গিরিডি চলে এসেছে। কর্ত্তব্যের খাতিরে ওকে ওর মা-বাবার কাছে পৌঁছেও দিয়েছি। ওঁদের নিমন্ত্রণে দু'চারদিন ওঁদের বাড়ীতে বেড়াতেও গিয়েছি, কিন্তু ব্রজমোহন ও তার প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবারের নিষ্ফলা কুৎসা শুনতে শুনতে ওদিক মাড়ানো বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে। জীবিকার আবর্ত্তে দিন কেটে চলছে।

বহুদিন অনুরাধার খবর নিই নি। তবে লোকমুখে শুনেছি, তার মা-বাবার ও বড়দার ভুল ভেঙে গেছে। ওঁরা ভেবেছিলেন, স্বামীস্ত্রীর সামান্য কলহ, অচিরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ ত সে নয়। ব্রজমোহন নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছে, কিন্তু কোন দিক থেকেই মিলনের কোন তাড়া নেই। এমনকি পিতৃবিয়োগেও ব্রজমোহন তার স্ত্রীকে এসে নিয়ে যায় নি কিংবা যেতে লেখে নি। ক্রমে অনুরাধার স্বচ্ছন্দ আচরণ ওঁদের চোখেও বিসদৃশ ঠেকেছে, আত্মবেদনার অবাধ প্রশ্রয় দেওয়াতে নিজেদেরই এখন ধিক্কৃত করছেন। অনুরাধাকে আর আগেকার মত তেমন প্রীতির চোখে দেখতেও পারছেন না। কিন্তু তার নিরুপায় জীবনের জটিলতা তাঁদের জীবনকেও ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

সেদিন একখানা চিরকুট লিখে অনুরাধা নিজেই আমাকে জরুরি তলব করে বসল। সাতপাঁচ ভেবে দেখা করতে গেলাম।

"কি বৌদি, কেমন আছ? খবর সব ভাল ত? একেবারে কড়া তাগিদ যে ব্যাপার কি বল ত?"

"খবর আর কি? এমনিতেই ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি ত ভুলেও এ পথ মাড়াও না।"

"অন্নচিন্তা চমৎকারা। অন্নের জন্য কলুর বলদের মত ঘুরে মরছি—আমাদের ত স্বাধীন হবার জো-টি নেই।" আমার শ্লেষে অনুরাধা একটু রক্তিম হয়ে উঠল। লক্ষ্য করে দেখলাম, ওর সে দৃপ্ত ভঙ্গিমা নেই; কেমন যেন ক্লান্ত ও বিষণ্ণ। একটু ব্যথিত হয়ে তরল পরিহাস করলাম, "কিছু বলছ না যে, নিশ্চয়ই কোন সুখবর আছে, না হলে কি লোকে শুধু ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠিয়েছ।"

"খবর কিছু নয়। সবাই নিজের পথে ও কাজে ব্যস্ত। একা একা যেন হাঁফিয়ে উঠেছি, তাই একটু গল্প-গুজব করতে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তোমার কাজের ক্ষতি করি নি ত?"

"না সে কিছু নয়।"

"তবে একটি খবর আছে, শিগগীরই আমি চাকরি পাচ্ছি যে—প্রায় কথা পেয়েছি।"

"তাতে কি তোমার মন ভরবে? তার চেয়ে আমি বলি কি নিজের ঘরে ফিরে যাও। ব্রজমোহন সোনার মানুষ, তোমাকে ক্ষমা করে আগের মতই দেখবে।"

"কে কার ক্ষমা চায়? আমি আমার নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আমার স্বাধীনতা বাঁচিয়ে চলব। আপাততঃ তোমাকে অবশ্য সে জন্য ডাকি নি।"

একটু থেমে আব্দারের সুরে বললে, "চল না ঠাকুরপো, একটু সিনেমা ঘুরে আসি। বহু দিন যাই নি। একা একা যেতেও ভাল লাগে না।"

ফিক করে হেসে বললে, "ভয় নেই, দিদিকে তোমার বাড়ী হয়ে নিয়ে যাব।"

হেসে বললাম, "তার প্রয়োজন হবে না। অনেক কাল পরে ওরা কিছু দিনের জন্য ওদের মা-বাবার কাছে গেছে। রামশরণই এখন আমার একমাত্র অভিভাবক।" অনুরাধার মুখের অসহায় ক্লান্ত ভাব দেখে ওর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

তার পর ঘন ঘন এবং পরে রোজই অনুরাধাকে নিয়ে হয়ত সিনেমায় নয়ত-বা পথেপ্রান্তরে বেড়াতে গেছি। কেমন যেন নেশায় পেয়ে বসেছিল। আপনারা হয়ত ব্যঙ্গ করে বলবেন, অনুরাধার প্রতি প্রীতি—পরকীয়াতে তোমার অনুরাগ, তাতে আর বিচিত্র কি! সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে সবিনয়ে নমস্কার করে আমি জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'-এর কথার প্রতিধ্বনি করে বলব,"ব্রজমোহন যেমন আমার অনুরাধাও তেমনি আমার ইন্দ্রিয়ের কামনাহীন স্ত্রী, যাকে শ' বলেছেন, সত্যিকারের বন্ধু। অনুরাধার সাহচর্য্য আমার ভাল লাগে, কিন্তু ওর সাহচর্য্য আমার ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে না।"

জীবিকার দুর্নিবার আবর্ত্তে আবার কিছুদিন অনুরাধার খোঁজ-

খবর নিতে পারি নি। এক দিন খবর পেলাম, এবার সত্যিকারের ঘর পাতবে বলে অনুরাধা স্বেচ্ছায় রতনগড়ে চলে গেছে। ব্রজমোহনের সংসার আবার জোড়া লাগবে ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু মনে খুঁত রয়েই গেল, কল্যাণীর পদে প্রতিষ্ঠিত হতে যে অমোঘ শক্তির প্রয়োজন তার অধিকারিণী সে হতে পেরেছে কিনা।...

অনেক দিন কেটে গেছে, ওদের কথা আর ভাববারও সময় পাই নি। ঘরে স্ত্রী-পুত্র পরিবার—ওদের উৎসবে-ব্যসনে এবং বাইরে কাজে ও অকাজে ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম। সেদিন খবর পেলাম, অনুরাধা নাকি ব্রজমোহন ও তার ভাই বোন সবাইকে নিয়ে গিরিডি বেড়াতে এসেছে। কৌতূহল জাগল। ওদের ডাকার অপেক্ষা না করেই দেখতে গেলাম।

গিয়ে দেখি ওদের বাড়ী প্রায় শূন্য। ব্রজমোহন তার ভাই-বোন শ্যালক-শ্যালিকাদের নিয়ে বন-ভোজনে গেছে। তার শ্বশুর-শাশুড়ী অবশ্য বাড়ীতেই। কিন্তু নিজেদের ঘরে কি যেন কাজে ব্যস্ত। অনুরাধা অনেক ওজরআপত্তি করে ওদের সঙ্গে বনভোজনে যায় নি। সকলের নানা অসুবিধে হবে বলে বাড়ীময় কাজকর্ম দেখে ফিরছে।

সহাস্যে অভিবাদন করলাম: "কি বৌদি, একটু খবর না দিয়েই রতনগড়ে চলে গেলে, আবার এসেও খোঁজখবর নেবার যে কোন গরজই দেখছি নে। ব্রজমোহনটিও যেন কেমনধারা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।"

"এস, ভাই, ঠাকুরপো, একেবারে হঠাৎ চলে গেলাম কিনা, তাই আর খবর দিতে পারি নি। ওঁদেরও এসে দেখা না-করা ত্রুটি ত বটেই, কিন্তু সকালেই তোমার ওখানে যাওয়ার জন্য ছটফট করছিলেন। তোমার আপিস তাই পিন্টু জোর করে ওঁকে পিকনিকে নিয়ে গেল। তা ভাই বস, ওঁরা এসে পড়বেন কিছু-ক্ষণের মধ্যেই। বাড়ীর সব খবর ভাল ত?"

"তা ভাল। কিন্তু বৌদি আমি যে তোমাকে নিয়ে সিনেমায় যেতে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছি, আশা করি, নিরাশ করবে না।"

বলা বাহুল্য, ওর গৃহিণীরূপের নমুনা পরখ করতেই আমার এ ছলনা।

"তা ত হয় না ঠাকুরপো, সংসার অগোছাল, তাই ওদের সকলের অসুবিধে হবে বলে আমি পিকনিকেই যাই নি। আজ আমাকে ক্ষমা কর।"

"কিন্তু বৌদি ওসব ত চাকরেরাই দেখতে পারে। তুমি নব-যুগের নারীত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতীক, তোমার মুখে আজ একথা শোভা পায় না। তুমি তোমার পথ ভুল করতে বসেছ বৌদি।"

"না ভাই", একটু সলজ্জভাবেই বললে অনুরাধা, "আগে যা ভেবেছিলাম ও করতে চেয়েছিলাম, সেটাই ছিল ভুল।"

"একথা তোমার মনের কথা, আদর্শের কথা নয় বৌদি, ধোঁকা দিয়ে শিখিয়ে-দেওয়া বুলিমাত্র। সাধারণের জন্য তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পার না। তোমার মনের অবাধ মুক্তির জন্য তোমাকে আজ সিনেমায় নিয়ে যাবই বৌদি, কিংবা মুক্ত দিগন্তের কোথাও বেড়াতে।"

বলে আগেকার মত ওর হাত ধরতে যাচ্ছি অমনি ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত অনুরাধা গর্জে উঠল, "এই কি আপনার ভদ্রতা! অমরেশ-বাবু, এই কি আপনার বন্ধুপ্রীতি। বন্ধুপত্নীর গায়ে হাত দিতে আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল! ওদের স্বভাব ধরা পড়তে খুব বেশী বিলম্ব হয় না। আপনি বেরিয়ে যেতে পারেন এখন..."

মাথা নীচু করে ওখান থেকে চলে এলাম। আমার ঔৎসুক্যের সুদূরপ্রসারী জবাব পেয়েছি, মনে আনন্দের ঢেউ খেলছে, আদর্শবাদী ব্রজমোহন এবার ওর উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করতে পারবে; কিন্তু মনে প্রচণ্ড ক্ষোভও জন্মেছে। রক্তমাংসের মানুষের এক্ষেত্রে ক্ষোভ না হয়েই পারে না। অনুরাধা মিছিমিছিই তার পূর্বেকার আচরণের সব দোষের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমাকে কিনা একেবারে অপমানিত করে ছাড়লে। একেই বলে বোধ করি 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্'। যাক সে কথা, আমার কাহিনীর সূচনাতেই যে ক্ষোভের কথা আপনাদের বলেছিলাম, এ সেই ক্ষোভ।...

তার পরের কথা খুবই সংক্ষিপ্ত। আমি ব্রজমোহনকে অকপটে সব কথাই বলেছি। ও আমাকে চিরদিনই কল্যাণকামী বলে বিশ্বাস করে। অনুরাধাও নিজের ভুল বুঝে বহু মিনতি করে ক্ষমা চেয়েছে। ওদের সঙ্গের সেই প্রীতিমধুর সম্পর্কটিও অটুট আছে। ব্রজমোহন আমাকে গোপনে বলেছে, অনুরাধা এবার সত্যিকারেরই কল্যাণীর পদ অধিকার করেছে। ওর সংসারে এখন দুঃখকষ্টের ছায়া নেই। অনুরাধার নারী ও কল্যাণী রূপের অপূর্ব সমন্বয়ে ব্রজমোহনের মত সুখী আর কেউ আছে বলে সে মনে করে না। তবে মাঝে মাঝে তার অন্তরে একটু ব্যথা জাগে: "ভাই, অমরেশ, আমার কথা ভেবে ভেবে বড়ই আশাভঙ্গের গোপন অশান্তিতে বাবার মৃত্যু হয়। বাবা জীবিত থাকতে অনুরাধা যদি এমনটি হ'ত।"

জাতির আকাঙ্ক্ষা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আমরা ছিলাম শক্তির মহাসন্তান,
মর্ত্তে প্রথম পেলাম মোরাই সত্যের শিবসন্ধান।
সংসার ছিল কুঞ্জভবন
গগন পবনে নন্দিত মধুগন্ধ,
চিত্ত সবার ঐক্যেতে গাঁথা
ভ্রাতায় ভ্রাতায় মৈত্রীতে নির্দ্বন্দ্ব।
কল্লোলিত এ জীবন মোদের
ছন্দমুখর যাত্রার ছিল পথটি,
জাতির জীবন চলিত মোদের
দুর্জ্জয় যেন জগন্নাথের রথটি।
আমাদের যারা পূর্বপুরুষ
তাহারা ছিল যে দেব্তার মহাবংশ,
প্রত্যেকে তারা মৃত্যুবিজয়ী
সবাই যেন ঈশ্বর-ঝরা অংশ।
বিশ্বপিতার সর্ব আশিস্
ঝর্‌ত তাদের মস্তকে নিঃস্পন্দি',
খামখেয়ালীর এই প্রকৃতি
তাদের ছিল যে হাতের মুঠোয় বন্দী।
পাঁচ ছ' হাজার বর্ষের পরে
জন্মিয়া মোরা তাদেরি মহান্ বংশে,
চলছি ভেসে' যে কোন্‌খানে আজ
নিঃসহায়ের মতন মহাধ্বংসে।
জগন্নাথের পুত্রগণের গোত্রের ফুল
আমরা যে আজি নিঃস্ব,
বিস্ময়েরি এ নয় কি বারতা ?
আমাদের দেখে হাস্‌ছে যে সারা বিশ্ব।
নির্বাপিত এ অগ্নিশিখার ভস্মরাশির বক্ষে
আবার তোরা তোল্‌রে জেলে অগ্নি,
ভস্মে চাপা স্ফুলিঙ্গ তুই আবার জলে ওঠরে
অগ্নিসমান প্রদীপ্ত ভাইভগ্নী।
পক্ষাঘাতের লজ্জাকে আজ বজ্র হেনে দগ্ধ কর্
ইচ্ছাবলের ঘর্ষণে আল্ বিদ্যুৎ,
মৃত্যুর মোরা কঙ্কাল নই সৃষ্টির মোরা ঝঙ্কার
প্রত্যেক জন মৃত্যুঞ্জয় শিবদূত।
স্বর্গের পথ পিছলে যে মোরা পড়লাম কেন নিম্নে
কারণটি তার আজ হবে বের করতে,
শক্তির ছেলে কোন্ পথে আজ ডুবলাম মোরা দৈন্যে
তাহারি সঙ্গে আজকে যে হবে লড়তে।

সর্বসমাজ উপড়িয়ে ফেলে
দেখতে হবে যে কোন্‌খানে সেই পাপটা,
জীবন্মৃত কে করলো মোদের
কোথায় আছে লুকিয়ে সে খল সাপটা।
মৃত্যুর দূত সেই সব কালসর্প,
দারিদ্র্য দূর করতে গেলেই চূর্ণত হবে
প্রথম তাদেরি দর্প।
দুর্নীত সেই খল্‌রা যদিই তক্ষকেরি মতন গিয়ে
শরণ মাগে ইন্দ্রদেবের কক্ষে,
কিম্বা যদি লুকায় গিয়ে সঙ্গে নিয়ে লুটের পুঁজি
সমুদ্রেরি অতল মহাবক্ষে,
তবুও তাদের থাক্‌বে নাকো মোদের হাতে নিস্তার,
অপরাধীদের রক্ষকেরে করব মোরা তচ্‌নচ্
স্বর্গ এবং সমুদ্রকে করব মোরা তোলপাড়।
এই আমাদের প্রতিজ্ঞা আজ এই আমাদের আজকেরি সংকল্প,
হয় আমাদের মৃত্যু হবে কিংবা হবে নতুন জীবন
হাল্কা কথার নয়তো ইহা গল্প।
জাতির জন্যে আত্মদান আজ শ্রীভগবান সহায় মোদের নিশ্চয়,
আমরা আবার উচ্চ শিরে মৃত্যুনাশের করব সকল বিশ্ব জয়।
তারির সাথে আমরা সবাই পবিত্রতায় ধৌত হব
নইলে বৃথাই দুঃখেরি এই মুক্তি,
শ্রেষ্ঠ হবার গৌরবেতে ধরার বুকে বাঁচতে গেলে
পাপের সাথে চলবে নাকো চুক্তি।
দুর্নীতি আর দুর্নীতদের ধ্বংস করার
আজকে মোদের শেষ পণ,
সর্বরকম দুঃখবাদের মুক্তিলাভের
আজকে মোদের শেষ রণ।
ধান্যধন আর দুগ্ধ ঘিয়ের
দেশকে মোরা করবো আবার ভাণ্ডার
কন্যাকুমারিকায় থেকে হিমাদ্রির ঐ শীর্ষ ছেপে
আকাশ ব্যেপে ছুটবে আবার গান তার।
সূর্য্যেরি ঐ ভর্গ দিয়ে আমরা আবার ব্রহ্মতেজে জলবো,
মৃত্যুকে ভাই ভৃত্য করি আমরা আবার সর্বজয়ী চলবো।
সর্বনর আর সর্বনারীর জীবনমহাসিন্ধুটিকে
এবার মোরা এমনি করেই করব রে ভাই মন্থন,
উঠবে না আর গরল তাতে ঝরবে শুধুই অমৃতরস
এই পৃথিবীর বুকের 'পরে ঝরবে শুধুই চন্দন।
দুঃখনাশের মৃত্যুপণ আজ শীর্ষে মোদের চালবে দয়াল বর গো
বাঁচবো মোরা একশো বছর দেশকে আবার করব মোরা স্বর্গ।

মাইচিশান গুহার শিল্পকলা-সম্পদ

উত্তর পশ্চিম চীনের তিয়েনশুই কাঙ্‌শু প্রদেশের আটাশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটি অদ্ভুত আকারের খাড়া পাহাড় রহিয়াছে। ইহার আকৃতি হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে—মাইচিশান অর্থাৎ "গাদা-করা গমের পাহাড়।" চীনের মুক্তির পর প্রাচীন চীনা শিল্পকলার যে সকল মণিকোঠা আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা তাহাদের অন্যতম।

একমাত্র ১৬৫ ফুট উঁচু এবং প্রায় সাত শ' ফুট প্রসারিত খাড়া পাহাড়ের পার্শ্বদেশেই বৌদ্ধ তীর্থস্থান এবং বৌদ্ধ গুহার সংখ্যা ১৮০টিরও অধিক। তন্মধ্যে কতকগুলির গড়ন সাদাসিধা, কতকগুলি আবার জমকালো—শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ এবং কার্নিশযুক্ত। মধ্যেকার অংশে খনিত গুহাগুলি প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থিত এবং তন্মধ্যে কতকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম অংশের গুহাগুলি কিন্তু অটুট অবস্থায় আছে। বিভিন্ন আমলের অমূল্য ভাস্কর্য্যে এবং প্রাচীরচিত্রে সেগুলি পরিপূর্ণ—তন্মধ্যে কতকগুলি দেড় হাজার বৎসর আগেকার।

ওয়েই রাজবংশের (৩৮৬-৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমলের কতকগুলি চমৎকার প্রতিমূর্ত্তি ধূসরাভ লাল রঙের বেলে পাথরে তৈরি এবং তাহাদের প্রত্যেকটির ওজন দুই কিংবা তিন টন। মাটি হইতে ১৬৫ ফুট উপরে—এইরূপ উচ্চ স্থানে অবস্থিত গুহাসমূহে এগুলি যে কেমন করিয়া তোলা হইয়াছিল তাহা কল্পনা করা কঠিন। খোদিত মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই কিন্তু কাদামাটির। ইহার হেতু ঐ যে, এই পাহাড়ের পাথরের পিণ্ডগুলি এত নরম যে তাহা খোদাই কার্য্যের পক্ষে অনুপযোগী।

বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বগণ, লোকপাল এবং উপাসকদের মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তির সংখ্যা কয়েক হাজার। অনেকগুলি রঙীন, বহু মূর্ত্তিতে আবার রঙের প্রলেপ নাই। বিভিন্ন ভঙ্গীর এবং ভাবের দ্যোতক এই সকল প্রতিমূর্ত্তি, ছোট-বড়-মাঝারি নানা

গুহাতীর্থ
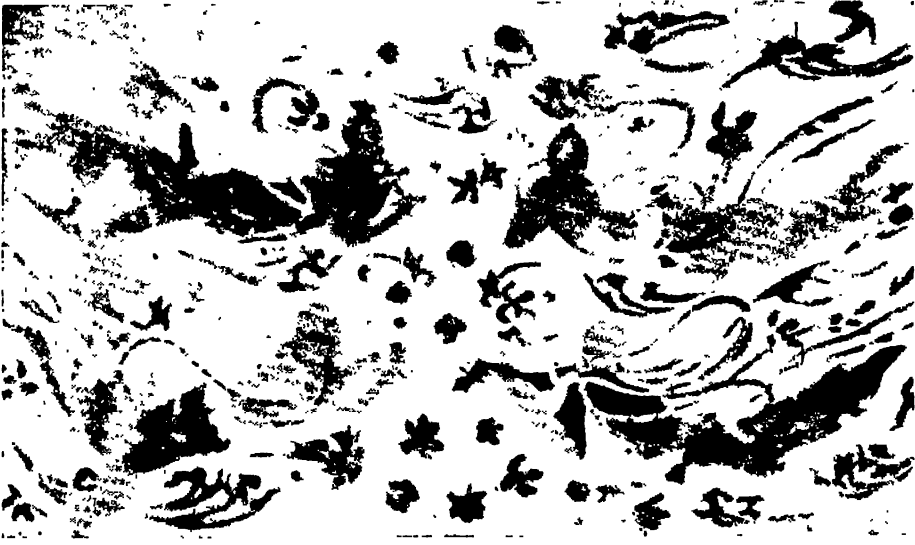
গন্ধর্ববৃন্দ—মাইচিশান গুহার একটি প্রাচীরচিত্র

আকারের—উচ্চতা আট ইঞ্চির কম হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ ফুটের উপর পর্য্যন্ত। এ ছাড়া কাদার তৈরি অনেকগুলি 'রিলিফ'ও আছে। গোড়াকার অধ্যাত্ম আদর্শবাদ হইতে সুরু করিয়া টাং (৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং সুং (৯৬০-১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) রাজবংশের আমলের বাস্তববাদ পর্য্যন্ত চীনা প্লাষ্টিক শিল্পের ক্রমাভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষ ভাবে উপাসকদের প্রতিমূর্ত্তিগুলির মুখের অভিব্যক্তি হইতে।

মাইচিশান গুহাবলী

গোড়াকার দিকের শিল্পকর্ম্মগুলি দেখিয়া প্রতীয়মান হয়, উপাসকেরা যেন অতিপ্রাকৃতের ভাবসত্তার ধ্যানে মগ্ন। টাং এবং সুং ভাস্কর্য্যে, বিশেষভাবে শেষোক্তটিতে, কিন্তু ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তির আননে পরিলক্ষিত হয় মানবীয় ভাবের অভিব্যক্তি।

ধর্ম্মীয় কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া আঁকা প্রাচীর-চিত্রগুলির (murals) মধ্যে কিন্তু বেশীর ভাগেরই রং চটিয়া গিয়াছে, অনেকগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত। কিন্তু যেগুলি উৎকৃষ্টতর রূপে সংরক্ষিত সেগুলিতে অতীতকালের চীনদেশের মানুষের জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। শিল্পীরা যে সকল পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, পরব-উৎসব, শিকার এবং যুদ্ধের দৃশ্য আঁকিয়াছে তাহাতে তাহাদের অঙ্কনকালের সমসাময়িক চীনের নর-নারীর জীবনের বিভিন্ন দিক রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বলিষ্ঠ এবং সজীব বহিঃরেখার বিন্যাসে আঁকা কতকগুলি প্রাচীর-চিত্র হান (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০৬-২২০ অব্দ) এবং চিন (২৬৫-৪১৯ খ্রীষ্টাব্দ) রাজবংশের আমলের অঙ্কনশৈলীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যদিও এগুলিতে বিষয়বস্তুর অভিব্যক্তি ভিন্ন ধরণের। এই পদ্ধতির একটি শ্রেষ্ঠ

নিদর্শন—গুহাছাদের ভিতরের দিকের আবরণের উপরে আঁকা স্বর্গের গায়ক গন্ধর্ব্বদের একটি চিত্র। কতিপয় গন্ধর্ব্ব আকাশপথে গীতবাদ্যে তন্ময়—দেহ তাদের সুঠাম ভঙ্গীতে লীলায়িত—তাদের গায়ের পোশাকের চওড়া হাতা এবং উত্তরীয় বায়ুভরে সঞ্চরমাণ।

মাইচিশানে আবিষ্কৃত কতকগুলি খোদিত প্রস্তরস্তবক শিল্পকলার অনবদ্য নিদর্শন। তন্মধ্যে একটি স্তবকে, প্রস্তরে রূপায়িত হইয়াছে বুদ্ধের জীবন-কথা। গুহাসমূহের খোদাই করা কার্নিশ, স্তম্ভ, পীঠস্থান, কুলুঙ্গি প্রভৃতিতে বিভিন্ন রাজবংশের আমলের ভাস্কর্য্য-শৈলীর ছাপ এমন সুপরিস্ফুট যে, সেগুলি হইতে শুধু কান্তবিদ্যার (aesthetics) গবেষণার নহে, ঐতিহাসিক গবেষণারও উপকরণ মিলিবে।

মাইচিশানের কলা-সম্পদ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে, যখন কয়েক জন চীনা ঐতিহাসিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেখানে যান। তাঁহারা কিন্তু গুহামুখে পৌঁছিয়া দেখেন—সোপানপথসমূহ এমন ভাবে ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে যে গুহাগুলি একেবারে দুষ্প্রবেশ্য। বর্ত্তমানে চীনের প্রজাতন্ত্রী সরকার সোপানপথ পুনর্নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হইতে জাতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সরকারী ভাবে গুহাগুলির একটি প্রাথমিক অনুসন্ধানকার্য্য পরিচালিত হয়, অবশেষে সরকার আরও চৌদ্দ জন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং শিল্পীর উপর ব্যাপকতরভাবে গবেষণাকার্য্যের ভার অর্পণ করেন।

বিনষ্ট সোপানপথ পুনর্নির্ম্মিত হইবার পর আরও ছত্রিশটি গুহা এবং তীর্থস্থানের কথা জানিতে পারা গিয়াছে। এ সকলের বিশদ বিবরণী তৈরি করা হইয়াছে, সহস্রাধিক ফোটো তোলা হইয়াছে, শিল্পকলা-জগতের অমূল্য সম্পদস্বরূপ প্রাচীর-চিত্র এবং প্রতিমূর্ত্তিসমূহের অনুকৃতি এবং প্লাস্টারের ছাঁচ পিকিঙে প্রদর্শিত হইয়াছে।* ন. ভ.

* রোম হইতে প্রকাশিত *East and West* নামক ত্রৈমাসিক অবলম্বনে।

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনে বিশ্বভারতী

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

৪ঠা আশ্বিন। ১৩৩৯ সাল।

'রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত' করতে উদ্যত যখন আমাদের শাসকসম্প্রদায় তখন হিন্দুজাতিকে সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য আত্মবিসর্জনে কৃতসংকল্প মহাত্মাজী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেছেন। 'সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করেছে।'

আশ্রমবাসিগণ দুঃখে, উদ্বেগে মুহ্যমান। গুরুদেব বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আমাদের দীর্ঘ আশ্রমজীবনে তাঁকে এরূপ বিচলিত হতে কখনও দেখি নি। আশ্রমের পুরনো কর্ম্মীদের এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের তিনি বারংবার ডেকে পাঠাচ্ছেন। আমাদের কি কর্ত্তব্য সে বিষয়ে আলোচনা করছেন। পুণা থেকে তারযোগে সর্ব্বদা সংবাদের আদান-প্রদান চলেছে।

শান্তিনিকেতনে অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব ছিল না। সর্ব্বজাতি সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী একত্রে এক স্থানেই তখন আহার করতেন। তথাপি সমস্ত দেশের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আমাদেরও কিছু করা প্রয়োজন—একথা সকলেই অন্তরে অনুভব করছিলেন।

বিশ্বভারতীর প্রবীণ অধ্যাপকগণ বললেন, "আশপাশের গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ করা হোক। গ্রামবাসীদের এই সমবেত সভায় আমরা সামাজিকভাবে হরিজনদের জলগ্রহণ করব।" কর্ম্মিগণ সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। গুরুদেবও এতে সম্মতি দিলেন।

৫ই আশ্বিন, প্রায়োপবেশনের দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে গ্রামবাসীদের আহ্বান করা হ'ল। গুরুদেব তাঁদের উদ্দেশ্যে সেদিন যা বলেছিলেন দেবী সরস্বতীর কণ্ঠের ন্যায় তাঁর সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠ হতেও এমন অমৃতনির্ঝর সুলভ ছিল না। সেদিন সেবাণী যে শুনেছে সে-ই তার সমস্ত সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়ে হাড়ি ডোম মুচি মেথরের হাতে জলগ্রহণ করেছে। আচারনিষ্ঠ বিধবাগণ পর্য্যন্ত সেদিন চোখের জলের সঙ্গে তাঁদের আজন্মসংস্কার বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। গুরুদেবের সেই অভিভাষণের কিছু পূর্ব্বেও কেউ যা কল্পনা করে নি তাই ঘটতে দেখেছিলাম।

৪ঠা আশ্বিন শান্তিনিকেতনের প্রবীণ অধ্যাপকগণ যখন সামাজিকভাবে হরিজন-হস্তে ঐরূপ জলগ্রহণের প্রস্তাব করেন তখন আশ্রমবাসী তরুণ ছাত্রছাত্রীগণ সে প্রস্তাবে খুশী হয় নি। তারা এর চেয়ে ঢের বেশী কিছু করতে চায়। সুতরাং ঐ প্রস্তাব

শুনবামাত্র বর্তমান লেখককে তাদের মুখপাত্র করে গুরুদেবের কাছে পাঠাল। গুরুদেবকে বললাম, "ছাত্রছাত্রীরা কেবল 'জল-চলে' সন্তুষ্ট নয়।" তিনি তখন আমাদের ইচ্ছা কি তা জানতে চাইলেন। তাঁকে বললাম, "সাধারণ পাকশালায় যেখানে পাচক ব্রাহ্মণগণ পাক করেন, সেখানে আগামী কাল রাত্রে মেথররা পাক করবে। তাদের সেই পাক করা অন্ন তারাই পরিবেশন করবে এবং সমস্ত আশ্রমবাসী তা গ্রহণ করবে।" গুরুদেব প্রফুল্লচিত্তে সম্মতি দিলেন।

৫ই আশ্বিন অপরাহ্নে যেদিন সিংহসদনে হরিজন-হস্তে জলগ্রহণ করা হয়, সেইদিনই রাত্রে পাকশালায় মেথরের হাতে অন্নগ্রহণ করা হ'ল। শান্তিনিকেতনেও এ খুব সহজে হয় নি। যাঁরা সর্বজাতির অন্নগ্রহণে অভ্যস্ত, তাঁরাও মেথরের অন্নগ্রহণে রীতিমত সঙ্কোচবোধ করেছিলেন।

যাই হোক, সেদিন রাত্রে আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রীগণ এবং কর্মীমণ্ডলী সপরিবারে ঐ সর্বজনীন ভোজে যোগ দিলেন। মেথরগণ তাদের স্বহস্তে পক্ক অন্ন পরিবেশন করলে। উদ্যোক্তা তরুণ-সম্প্রদায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করল।

কিন্তু পরদিন এক নূতন বিপদ উপস্থিত হ'ল। পাকশালার দাসদাসীরা কাজ করবে না। ব্রাহ্মণ-পাচকগণ কাজে যোগ দিল, কিন্তু হরিজন ঝি-চাকরের দল এল না। নিকটবর্তী ভুবনডাঙ্গা গ্রামে তাদের বাস। সেখানে গিয়ে আমরা বহু সাধাসাধনা করলাম —কিন্তু তারা অটল। মেথর যে বাসন ছুঁয়েছে সে বাসন কেবল সেদিন নয়, কোনদিনই তারা মাজবে না। শুধু তাই নয়, ঐ পাকশালাতেই তারা আর ঢুকবে না।

কর্তৃপক্ষ অধ্যাপকগণ মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তরুণদের নেতারা বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। তারা বললে, "আমরাই বাসন মাজব। শুধু এক দিন নয়, দিনের পর দিন।" তাদের সেই অটল প্রতিজ্ঞায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এক আশ্চর্য অনুপ্রেরণা দেখা দিল।

হাসিমুখে দিনের পর দিন তারা ঐ বিরাট পাকশালার বাসন-মাজার কাজ করে চলল। কিন্তু খুব বেশী দিন তা করতে হ'ল না। ঝি-চাকরেরা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। ঐ পাকশালা তাদের জীবিকার উৎস। সমস্ত পরিবার পোষণ করা হয় ওখানকার খাদ্যে। কয়দিন তারা তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবে! তা ছাড়া তাদের আশঙ্কা হ'ল অন্য জায়গা থেকে লোক আসবে। ধীরে ধীরে সকলেই এসে তাদের কাজে যোগ দিল।

এই প্রায়োপবেশন-কালের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন হতে শান্তিনিকেতনে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটকের রিহার্সেল চলছিল। নাটকটির বিষয়বস্তু হচ্ছে: জগন্নাথের রথযাত্রা। রথটানা হচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রথ চলছে না। ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে টানছেন। ক্ষত্রিয়বীরেরা যোগ দিয়েছেন। বণিকগণ তাঁদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছেন। তথাপি রথ চলছে না। শেষে যখন সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের অবজ্ঞাত নিপীড়িতের দল এসে রথের রশি ধরল, তখন রথ চলল।

মহাত্মাজীর উপবাসের সময় তরুণ অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, "এই সময় নাটক করা বা নাটকের রিহার্সেল দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?"

৮ই আশ্বিন দুপুরবেলা মধ্যাহ্নভোজনের জন্য পাকশালার দিকে রওনা হয়েছি, এমন সময় গুরুদেবের কাছ থেকে জরুরি আহ্বান এল। উত্তরায়ণে গিয়ে দেখি, কোনার্কের বাইরের বারান্দায় গুরুদেবের টেবিলের উপর একখানি সাদা ফুলস্কাপ কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"এতকাল হিন্দুসমাজে যাহারা অন্ত্যজ জাতি বলিয়া গণ্য; অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা স্বীকার করিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

আমি অতি মনোযোগের সহিত লেখাটি পড়ছি—এমন সময় গুরুদেব বেরিয়ে এলেন। তাঁর তখনকার সেই মূর্তি কোনদিন ভুলব না। পূর্বেই বলেছি মহাত্মাজীর উপবাসের সময় তিনি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিন যা দেখলাম, তা সারাজীবনে আর কখনও দেখি নি। সুগৌর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। চক্ষু ভ্রূকুটিপূর্ণ। শরীর কম্পমান। সেই ভীষণমধুর অপরূপ রূপের দিকে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছি—সহসা বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল, "মহাত্মাজীর উপবাসে—আমি অভিনয় করছি—তাঁর বেদনা আমায় স্পর্শ করে নি। করেছে তোমাদের—কলেজের—ওই তরুণ অধ্যাপকদের! এ নাটকটা কী। তারা কি তা বোঝে না। এই নাটকের রিহার্সেলে যারা দোষ দেখতে পায়, রতন কুটীরে সন্ধ্যাবেলায় তাদের প্রতিদিনের—ব্রিজখেলা কি বন্ধ হয়েছে?"

আমি ভয়ে বিস্ময়ে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি ওই লিখিত কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যাও, নিয়ে যাও! তোমাদের ওই অধ্যাপকদের কাছে। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করার সাহস তাঁদের আছে কি?"

অত্যন্ত ভীত স্বরে প্রশ্ন করলাম—"আমি সই করব।"

তিনি বললেন, "তোকে করতে হবে না। তোর উপর আমার সে বিশ্বাস আছে। যাদের কথা বলছি তাদের সই নিয়ে আয়।"

হায় ভগবান! সেকালের পুরনো সরল অকপট মানুষ! মনে তাঁর এ সন্দেহ কখনও জাগে নি যে, একালে আমরা অম্লান বদনে অকম্পিত হস্তে বহু প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করি, অথচ জীবনে তা পালন করি না।

সেদিন অপরাহ্নেই গুরুদেব পুণা রওনা হলেন। আমি সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে সই সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

দিনেন্দ্রনাথই তখন আমাদের 'কালের যাত্রা'র রিহার্সেল

চালাচ্ছিলেন। পরদিন অপরাহ্ণে বিহার্সেলের সময় সমস্ত শুনে তিনি বললেন, "দেখ বাপু, উনি পুনা থেকে এলে তুমি যেন আবার ওই প্রতিজ্ঞাপত্রখানি ওঁকে ফিরে দিতে যেও না।"

প্রতিজ্ঞাপত্রের স্বাক্ষর

তাঁরই পরামর্শে ওই সই-করা প্রতিজ্ঞাপত্রটি আমি আর গুরুদেবকে দিই নাই। তিনিও আর সেটার খোঁজ করেন নি।

পুনা হতে ফিরে এসে গুরুদেব পুনরায় আশ্রমের কর্ম্মীদের এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন—গ্রামে গ্রামে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন এবং হরিজন-উন্নয়নের জন্য আমরা কি করতে পারি। বহু আলাপ-আলোচনার পর স্থির হ'ল—একটি সমিতি গঠন করা হোক যার সভ্যেরা গ্রামে গ্রামে কি ভাবে ঐ কাজ করা যায় তার পদ্ধতি স্থির করবেন, এবং নির্দ্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী কর্ম্মপরিচালনা করবেন। ঐ সভাতেই সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন অধ্যাপক জগদানন্দ রায়। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হল তদানীন্তন বিদ্যাভবনের ছাত্র এই লেখক।১

সমিতির নাম কি হবে তাই নিয়ে বহুক্ষণ বাদপ্রতিবাদ চলতে লাগল। তরুণদের মুখপাত্রগণ বললেন—"সংস্কার সমিতি নামে আমাদের একটি সমিতি পূর্ব্ব হতেই ঐ ধরণের কাজ করে আসছে; ঐ নাম যদি আপনারা গ্রহণ করেন, তা হলে আমরা সেই সমিতি উঠিয়ে দিয়ে একত্রে কাজ করি। সভায় অনেকের এতে আপত্তি ছিল।২ তথাপি গুরুদেব তরুণদের প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন। তরুণদের আগ্রহে তিনিই এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক হলেন।

বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীগণ বহুদিন এই সমিতির কাজ অতি উৎসাহের সহিত করেছিল। পরে শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠন-বিভাগ অধিকতর ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারাদি নানাবিধ গ্রামোন্নয়নের কাজ করতে থাকায় ধীরে ধীরে এই সমিতির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়।

১। এই সময় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হরিজন-উন্নয়নের জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চলেছিল। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে হরিজনদের মধ্যে কাজ করবার জন্য বিশ্বভারতীর নিকট কর্ম্মী চেয়ে পাঠান বঙ্গীয় আর্য্যসমাজ। গুরুদেব 'সংস্কার-সমিতি'র সম্পাদককে ঐ কাজে পাঠান। তখন কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র করকে সহ-সম্পাদক নির্ব্বাচন করা হয়। কালীমোহনবাবু এবং অন্য আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী সুধীরবাবুর পরিচালনায় ঐ সমিতির কার্য্য কেমন সুচারু ভাবে চলেছিল তখনকার আশ্রমবাসী মাত্রেই তা জানেন। এঁদের উদ্যোগে সংস্কার সমিতির "সংস্কার ভবনে" দরিদ্র হরিজন ছাত্রদের আশ্রয় দিয়ে বিনা খরচে বিশ্বভারতীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

২। সত্যের খাতিরে বলতে হয় এই 'সংস্কার সমিতি' ছিল কয়েকটি 'কালাপাহাড়ে'র সমিতি। এই 'কালাপাহাড়'গণ স্পৃশ্যাস্পৃশ্য খাদ্যাখাদ্য-বিষয়ক সংস্কারসমূহ এমনভাবে ভাঙতেন যে, প্রাচীনদের কথা দূরে থাক বহু তরুণও তাদের ভয় করত! সেইজন্যই 'সংস্কার সমিতি' এই নাম গ্রহণে অনেকের আপত্তি ছিল।

ভ্রম সংশোধন

গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "হালিসহর" শীর্ষক ১ম আলোচনাটির লেখকের নাম শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে "শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" হইবে।

রবীন্দ্রকাব্যলোক

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

রবীন্দ্রকাব্য-পাঠের পূর্ব্বে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা এক শাশ্বত সৌন্দর্য্যলোকে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। সৌন্দর্য্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারী—কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার জীবনে ও কাব্যে কোথাও কুৎসিতের স্থান নাই। প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্য্যের অধিদেবতাকে এরূপ কায়মনোবাক্যে—কায়েন মনসা বাচা—এ পৃথিবীতে আর কে আরাধনা করিয়াছে জানি না। কাব্যে অনেকেই সুন্দরের বন্দনাগীতি গাহিয়া থাকে, কিন্তু কাব্যের উচ্ছ্বসিত আবেগ বাস্তব জীবনের রূঢ় কুশ্রী পরিবেশের মধ্যে এক মুহূর্ত্তেই খপুষ্পের ন্যায় মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যায়। জীবন আর যাহাই হউক—কাব্য নয়—নিতান্ত শুষ্ক নীরস গদ্য! তাহার অপরিহার্য্য কুশ্রীতার মধ্যে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে কয়জন! বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র-জীবন সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্যহীন পার্থিব অস্তিত্বমাত্র নয়—"finite and finished cold untroubled by a spark" ইহা আদৌ নয়। মনে হয়, এ যেন কাব্যেরই রক্তমাংসময় একটা শরীরী সংস্করণ মানুষের নিগূঢ় চিন্ময় সত্তার একটা সঙ্গীত ও ছন্দোময় অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি! রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে জীবন ও কাব্য একটি অপরটির নামান্তর কিংবা ভাষ্যমাত্র। কবিতা জীবনের একটা 'running commentary' অথবা সচল ভাষ্য—এ কথা রবীন্দ্রনাথের মত আর কোন কবির ক্ষেত্রে বোধ হয় এত বেশী সত্য নয়। বস্তুতঃ তিনি একাধারে কালিদাস ও মল্লীনাথ। তাঁহার কাব্যসৃষ্টিকে সমগ্রভাবে দেখিলে ও উপলব্ধি করিলে ইহাকে একটা বিশাল, অনন্যসাধারণ ও চিরবিবর্ত্তনশীল কবিচিত্তের স্বচ্ছ, নির্ম্মল দর্পণ বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রকাব্যলোকে যে সৌন্দর্য্যের সমারোহ দেখিতে পাই তাহা শুধু ইন্দ্রিয়ের উপচার নয়। কবি কীট্‌সের মত তিনি একমাত্র sensuous beauty-র আরাধনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে সৌন্দর্য্যের উপাসক তাহা শুধু ধ্যান ও অনুভূতিগম্য, স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না।

> … … …গ্রহতারাময়ী নিশি,
> বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূর দিশি,
> সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতিদূর গিরিমালা,
> তারি পরপারে রবির উদয় কনককিরণ-জ্বালা,
> চকিততড়িৎ সঘন বরষা, পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
> শরৎ-আকাশে অসীমবিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু।

সৌন্দর্য্যের এই বহিরঙ্গ কবিকে মুগ্ধ, অভিভূত করিয়াছে সন্দেহ নাই; প্রকৃতির রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের আবেদন তাঁহার মুগ্ধ, পিপাসু, সংবেদনশীল চিত্তের নিকট ব্যর্থ হয় নাই ইহাও সত্য; কিন্তু এহ বাহ্য—তাঁহার দৃষ্টি বস্তুর বহির্ভাগ অতিক্রম করিয়া শরবৎ অব্যর্থগতিতে তাঁহার অন্তর্গূঢ় সত্তায় উপনীত হইয়াছে। এই অদৃশ্য অন্তর্লীন সত্তাকেই সম্ভবতঃ ইংরেজ ঋষি কবি "Life of things" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বাস্তব জগৎ ও কাব্যজগৎ সম্পূর্ণ এক প্রকার নয় এবং হইতেও পারে না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কাব্যজগৎ বাস্তবজগতের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। আমাদের অতিপরিচিত উপেক্ষিত বস্তুগুলিও কবিতার রাজ্যে "Nurslings of immortality" হইয়া দেখা দেয়। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—রবীন্দ্রসৃষ্ট রমণীয় কাব্যভুবন। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনুচ্ছটায় রঞ্জিত এই মায়াময় মনোহর জগৎ। এ সৌন্দর্য্যে স্থূলতা বা crudeness নাই—ইহা নিতান্ত পেলব ও ছায়াশরীরী। মোটের উপর ইহাকে নিরবলম্ব এক প্রকার "ethereal beauty" বলিতে বোধ হয় আপত্তির কারণ নাই। এই চারুকল্পলোকচারিণী কুহকিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর নৃত্যের তালে সিন্ধুবক্ষে ছন্দে ছন্দে তরঙ্গদল নাচিয়া উঠে; তাহার পীবরস্তনহার হইতে নভস্তলে তারাদল স্খলিত হইয়া পড়ে; জগতের অশ্রুধারে ধৌত তাহার তনুর তনিমা; ত্রিলোকের হৃদয়রক্তে আঁকা তাহার চরণ শোণিমা; তাহার বিলোল কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন হইয়া উঠে যৌবনচঞ্চল এবং মধুমত্ত ভৃঙ্গের মত মুগ্ধ কবির লুব্ধ চিত্ত সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। এই শাশ্বত-যৌবনা নগ্নকান্তি মায়াবিনী কাহারও মাতা, কন্যা, বধূ নয়; বৃন্তহীন পুষ্পের ন্যায় সে আপনাতে আপনি বিকশিত! জনৈক প্রখ্যাত রসজ্ঞ সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন:

> "রবীন্দ্রনাথের অন্তরপুরুষটি আসিয়াছে যেন এক গন্ধর্ব্বলোক হইতে। এই গন্ধর্ব্ব পৃথিবীতে অবতীর্ণ পার্থিব জীবনে প্রকৃত সুন্দরের কিছু প্রকাশ, কিছু প্রসার করিয়া দিতে। সৌন্দর্য্যকে সকল রকমে ব্যক্ত করাই তাঁহার ব্রত ও ধর্ম্ম। সুন্দর কাব্য অনেকে রচনা করিয়াছে—সুন্দরের উপরেও অনেকে কাব্য রচিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিশ্রেণীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।"

রবীন্দ্রকাব্যজগৎ শুধু অনুপম সৌন্দর্য্যেই উদ্ভাসিত নয়—বিচিত্র, সূক্ষ্ম সঙ্গীত ঝঙ্কারে অবিশ্রাম স্পন্দিত, মুখরিত।

সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য এখানে হরিহরের মত গলাগলি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইজন্ত রবীন্দ্রকাব্যকলার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বদা চক্ষু ও কর্ণকে সতর্ক সজাগ রাখিতে হয়, এবং সম্ভবতঃ চক্ষু অপেক্ষা কর্ণের প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে বেশী—কারণ রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ গীতিকবি।

আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে
ছিল মনে

কবির সেই সাধ পূর্ণ হয় নাই,—গীতিকবিতাই তাঁহার প্রতিভার আশ্রয় ও উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, শৈশবে বিশ্বের সঙ্গীতময় রূপের মধ্য দিয়াই তাহার সহিত কবির পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। সাধারণ মানুষের সাদা চোখে 'জলপড়া', 'পাতা নড়া'র কোন বিশেষত্ব নাই, কিন্তু কবির—বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের মত রোমান্টিক কবির চোখ ত সাধারণ মানুষের সাদা চোখ নয়! তাহাতে আঁকা ছিল এক অপূর্ব্ব মায়া-কাজল যাহার ফলে তাঁহার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া উঠিয়াছিল জলবেণীরম্যা বর্ষার এক অভিনব সঙ্গীতময় মূর্ত্তি। অতএব রবীন্দ্রকাব্য যে সঙ্গীতলক্ষণাক্রান্ত হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

আমাদের ভাষা কত দুর্ব্বল, কত সীমাবদ্ধ। "মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে!" অনির্ব্বচনীয়কে ব্যক্ত করিবার জন্ত বৃথাই আমরা মাথা কুটিয়া মরি; তাহাকে বাঙ্ময় মূর্ত্তি দিয়া অমর, অক্ষয় করিয়া রাখিবার জন্ত আমাদের কত প্রয়াস, কত নিঃসীম আকুতি! সঙ্গীত সেই অব্যক্তকে সুরের সোনার কাঠির স্পর্শে, আভাসে ইঙ্গিতে প্রমূর্ত্ত করিয়া তুলিবার একটা উচ্ছ্বসিত, অশ্রান্ত প্রয়াসের অভিব্যক্তি। তাই সঙ্গীতে অর্থের অপেক্ষা ব্যঞ্জনার প্রাধান্ত দেখিতে পাই,—"Where more is meant than meets the ear"। এই সাঙ্গীতিক আভাসধর্ম্মিতা—ইঙ্গিতপ্রাধান্ত রবীন্দ্রকাব্যসৃষ্টির প্রাণ। তাঁহার কবিতা মুখ্যতঃ গীতিকবিতা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত,—সঙ্গীতের সহিত তাহার নিবিড় একাত্মতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্ত তাঁহার কবিতায় গোধূলির একটা মনোহর অস্পষ্টতা, একটা আধো-আলো, আধো-ছায়ার ললিত লীলা! যাহারা কবির নিকট সুস্পষ্ট অর্থপ্রতীতির প্রত্যাশা করে তাহাদের নিকট এই স্বপ্নকুহেলিকাময় অস্পষ্টতা ও ম্লানিমা একটা মারাত্মক অপরাধ—"গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।"

সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে যেটুকু ব্যবধান বর্ত্তমান তাহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে এত সূক্ষ্ম যে, অনেক সময় তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাই বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি' অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

এ যেন সঙ্গীত ও কাব্যের, কথা ও সুরের এক অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। এই গীতি-ধর্ম্ম রবীন্দ্রকাব্যের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য,—তাহার অন্তর্নিহিত আভাসধর্ম্মিতা ও ব্যঞ্জনা-প্রাধান্ত এই সঙ্গীতস্রোতে নিঃশেষে আত্মসমর্পণের (Lyrical abandon) ফলস্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, গতি ও গীতি বাক্য এবং অর্থের ন্যায় পরস্পর সম্বদ্ধ—বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ। যেখানে গীতি, সেইখানেই গতি। প্রবাহ যেরূপ নদীকে স্থির, অচপল, স্তব্ধ হইয়া থাকিতে দেয় না, সুরও সেইরূপ সঙ্গীতকে অস্থির, আকুল, গতিচঞ্চল করিয়া তুলে। রবীন্দ্রকাব্যজগৎ শুধু সৌন্দর্য্য ও ভঙ্গীতে পূর্ণ নয়—যাহা কিছু এখানে দেখিতে পাই তাহাই পলাতক, চপল, চঞ্চল। অবাধ, উদ্দাম গতিশীলতাই এই জগতের বৈশিষ্ট্য। এখানে লক্ষ কোটি হংসবলাকা যৌবনমদরসে মত্ত পাখার ভরে রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাস্যে বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিত করিয়া অবিশ্রাম আকাশপথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।

তাই পর্ব্বতের অন্তরে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হইবার স্বপ্ন; পাখা মেলিয়া তরুশ্রেণী আকাশের কিনারা খুঁজিবার জন্ত ব্যাকুল! রবীন্দ্রকাব্যে যে সৌন্দর্য্য ছন্দে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহা নিশ্চল, নিথর চিত্রার্পিত রূপমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য নয়,—তাহা অস্থির, চঞ্চল, কম্পমান। কবির অজস্র কাব্যসৃষ্টির মধ্যে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের সহিষ্ণুতা, স্থৈর্য্য ও গভীরতা ততটা দেখা যায় না—যতটা দেখা যায় বৈচিত্র্য, গতি ও বিস্তৃতি।

রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক রূপশিল্পী। তাঁহার কাব্যলোকে রুক্ষ, রূঢ়, কুশ্রী বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। কবিচিত্তের কোমল রশ্মিপাতে বস্তুর স্থূলতা ও কার্কশ্যতা এক অভিনব সৌষম্যে স্নাত, পরিসিক্ত হইয়া

রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। এখানে আমাদের কুটীরের অনতিদূরে সবুজ দূর্ব্বাদলের উপর ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুটি নূতন চোখে, নূতন ভঙ্গীতে দেখিতে পাই। বস্তুতঃ প্রাত্যহিক জীবনের অতিপরিচিত তুচ্ছতম পদার্থটিকেও রবীন্দ্রকাব্যের মাধ্যমে দেখিলে অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়—যেন এইমাত্র তাহাকে আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই সামান্য বস্তুর এত রূপ, এত চারুতা, এত ঐশ্বর্য্য কোথায় ছিল! "A violet by a mossy stone half hidden from the eye"—ওয়ার্ডসওয়ার্থের রোমাণ্টিক কল্পনায় মণ্ডিত, অভিষিক্ত হইয়া গোধূলির ললাটে তারার মত পাঠকের চিত্তগগনে ভাস্বর হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগৎ এই রোমাণ্টিক কল্পনার বিচ্ছুরিত বিদ্যুচ্ছটায় প্রোজ্জ্বল, উদ্ভাসিত। তাই এখানে যাহা দেখি তাহা চিরপুরাতন হইয়াও চিরনূতন, এবং তাই গগন-পবন, দ্যুলোক-ভূলোক "প্রাণে আমার বাজায় বাঁশী।" মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রকাব্য জগৎ ও জীবনের অবিকল আলোকচিত্র নয়,—ধ্যানমুগ্ধ মহাশিল্পীর স্বপ্নরঞ্জিত রম্য আলেখ্য। বস্তুর সহিত কবির "আপন মনের মাধুরী"র সংযোগ হইয়াছে বলিয়াই তাহা পাঠকের নিকট নব রূপে, নব লাবণ্যে দেখা দেয়। তাঁহার দৃষ্টিতে নারী অর্দ্ধেক মানবী ও অর্দ্ধেক কল্পনা এবং তাই সে নিখিল-চিত্তহারিণী।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কাব্যজগতে যদৃচ্ছ বিচরণ করিতে গেলে ছাড়পত্রের আবশ্যক, এবং এই ছাড়পত্র মঞ্জুর করিবার অধিকার যদি কাহারও থাকে তবে সে আর কেহ নয়—রসাধিষ্ঠাত্রী দেবতাই এই ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। রবীন্দ্রকাব্যলোকে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার কাব্যরস গব্যরসের মত সকল ক্ষেত্রে আদৌ সহজসেব্য নয় এবং অনেকের পক্ষে ইহা রীতিমত দুষ্পাচ্য! কিন্তু কোনোমতে এই অনাস্বাদিত মধুর আস্বাদলাভ ভাগ্যে ঘটিলে অন্তরে যে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠে তাহা বোধ হয় একমাত্র ব্রহ্মাস্বাদ ব্যতীত আর কোন কিছুর সহিত তুলনীয় নয়! কবির অনুপম কাব্যলোকে প্রবেশ করিলে জগৎ ও জীবন আমাদের নিকট মধুরায়িত হইয়া উঠে এবং তাঁহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে!"

শিশুকল্যাণ-প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা

দেশের সর্ব্বত্র অনেক সংসারে পারিবারিক জীবনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার অন্যতম কারণ মানসিক জড়তাগ্রস্ত, সুতরাং অনগ্রসর শিশুরা। তাহাদের জীবন দুঃখময়, তাহারা তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অজানা অপরাধের জন্য ইহা এক অদ্ভুত নির্যাতন। এই সমস্ত হতভাগ্য শিশুর পিতামাতারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া লজ্জায় মুখ ঢাকেন।

এ সম্পর্কে সর্ব্বাগ্রে যে জিনিষটি প্রয়োজন তাহা হইতেছে সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি। দৈহিক অক্ষমতাবশতঃ যে সকল শিশুকে দুর্গতি ভোগ করিতে হয়, এই সকল জড়বুদ্ধি শিশুর অবস্থাও তাহাদের সঙ্গে তুলনীয়। নিশ্চয়ই ইহারা সমাজের দায়স্বরূপ এবং ভারতে শ্রীমতী জয় ভকীলই প্রথম ইহাদের শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার নিজের বাসভবনে একটি ছোট কিণ্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন—নয় বৎসর বয়স্কা দুটি দুর্গত বালিকা ছিল এই স্কুলের প্রথম ছাত্রী। ইহা ছিল এদেশে সমাজ-কল্যাণকর্ম্মের একটি নূতন ক্ষেত্র, যদিও বিদেশে ইহার সূচনা হইয়াছিল শতবর্ষ পূর্ব্বে। স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ইহার কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল। তাহারা মূল্যবান উপদেশ ও নির্দ্দেশাদি প্রদান করিল এবং সেগুলির আনুকূল্যে বিদ্যালয়টি প্রায় পনরটি শিশুকে সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হইল।

এই সাহায্যপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা অবশ্য স্বল্প এবং এদেশে এমন আরও অনেক শিশু আছে যাহাদের পক্ষে এরূপ সহায়তা একান্ত আবশ্যক। সেইজন্য ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কার্য্যক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং ইহার স্থায়িত্ব বিধানকল্পে, বিশেষ যত্ন যাহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক সেই সকল শিশুর তত্ত্বাবধান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যে "দি সোসাইটি ফর দি কেয়ার, ট্রিটমেণ্ট এণ্ড ট্রেনিং অব চিলড্রেন ইন নিড অব স্পেশাল কেয়ার" নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হইল।

শীঘ্রই শিশুদের সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়াইল ত্রিশটিতে এবং বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। কালক্রমে বোম্বাই পৌর প্রতিষ্ঠান (Municipal Corporation) ; কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারসমূহ এবং অবশেষে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ এই বিষয়ে পথিকৃৎ শ্রীমতী ভকীলের প্রচেষ্টার সাহায্যার্থ আগাইয়া আসিলেন।

ভর্ত্তি হইবার জন্য যে সকল আবেদনপত্র আসিতে লাগিল সেগুলির সংখ্যাধিক্য দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল যে, দেশে এই ধরণের আরও অনেকগুলি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। কাজেই ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি ভারতের সকল স্থান হইতে আগত সেই সকল শিক্ষকদের একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইল, যাহাদের উদ্দেশ্য ছিল জড়বুদ্ধি শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশসাধন কোন্ পদ্ধতিতে করিতে হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষালাভ। এই সকল শিক্ষককে উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত করিয়া সবগুলি রাজ্যে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও গৃহীত হইল।

এমনই ভাবে শ্রীমতী জয় ভকীল যে দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন তাহা ভারতের সমস্ত অঞ্চলে জড়বুদ্ধি (mentally retarded) শিশুদের জীবনের উপর স্বীয় রশ্মি বিকীর্ণ করিল। জড়বুদ্ধি শিশুরা চিকিৎসার অতীত—এই প্রচলিত ধারণা যে ভ্রান্ত শ্রীমতী জয় ভকীলের কল্যাণ-কর্ম্ম প্রচেষ্টায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার ফলে অনেকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, যদি সমাজ এই সকল শিশুকে সাহায্য করে তাহা হইলে তাহারা প্রয়োজনীয় এবং আত্মনির্ভরশীল নাগরিকে পরিণত হইতে পারে।

তবে এখনও স্কুলের অবস্থাকে সন্তোষজনক কোনমতেই বলা যাইতে পারে না। ইহা অধিকতর উৎকর্ষলাভের আশা পোষণ করিতেছে, বাসস্থানের ও অবসরবিনোদনের উন্নততর ব্যবস্থা, বৃত্তি ও পেশা সম্পর্কিত আরও উপযুক্ত সুযোগসুবিধা করিয়া দেওয়া ইহার লক্ষ্য। স্কুল হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের জন্য বেতন দিতে যাহারা অপারগ বিশেষ ভাবে সেই সকল নিঃসহায় শিশুদের জন্য অধিকতর কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ যাহাতে কার্য্যকরী হয় সে বিষয়ে বিদ্যালয়টি বিশেষ ভাবেই অবহিত।

সোসাইটি ফর দি কেয়ার, 'ট্রিটমেণ্ট এণ্ড ট্রেনিং অব চিল্‌ড্রেন ইন নিড অব স্পেশাল কেয়ার' নামক সংস্থাটির ঠিকানা :

রাস্তি লজ, ওয়ার্ডেন রোড, বোম্বাই।

রাজ্য সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদসমূহের চেয়ারম্যানদের সম্মেলনের উদ্বোধন

পার্লামেণ্টের কেন্দ্রীয় ভবনে (Central Hall) রাজ্য সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া সভাপতি বলেন, "আমাদিগকে নিজেদের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া আত্মজিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, শাসনতন্ত্রের ৩৮ এবং ৪১ ধারার সাফল্যের জন্য যাহা কিছু করণীয় ছিল আমরা তৎসমুদয় করিয়াছি কি না ?"

এ ধরণের সম্মেলন ইহাই প্রথম। ইহাতে চেয়ারম্যানদের এবং রাজ্য-পর্ষদের প্রতিনিধিদের পক্ষে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের সভ্যদের সহিত আলাপ-আলোচনার এবং ভবিষ্যতের জন্য নির্দ্দেশলাভের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন প্রেসিডেণ্ট তাহা স্মরণ করেন। গোখলে তখন নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, প্রকৃত সমাজ-সেবায় যদিও কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই তথাপি দেশ ইহাই প্রত্যাশা করে যে, যে সকল যুবকের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিহিত তাহারা যেন সমাজ-কল্যাণকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করে এবং সর্ব্বশেষে তিনি এই কথাই বলেন, 'তোমার দেশবাসীর নিকট নিশ্চয়ই তোমার কাজের কদর হবে।'

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাগঠিত সমাজসেবা সংস্থাসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট বলেন, "এই ক্ষেত্রে যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টা এত কাল ছিল বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্কশূন্য, তাহা এই প্রথম সর্ব্বসাধারণের স্বীকৃতিলাভ করিল। ইহা সমাজ-কল্যাণের একটি ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনায় পরিণতিলাভ করিয়াছে এবং সুদৃঢ় স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। কাজেই দেশের বর্ত্তমান সমাজ-কল্যাণ সংস্থাগুলির প্রতি অর্থানুকূল্যের ব্যবস্থা করিয়া কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ যে সদ্বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দিত করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমগ্র কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে মোটামুটি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অর্থনৈতিক এবং সামাজিক। সমাজসেবা যদিও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তথাপি এই উদ্দেশ্যে আশানুরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে না। অর্থনৈতিক কর্ম্মতালিকাকে কার্য্যকর করিতে গেলে সুগঠিত সংস্থার সাহায্য পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে সমাজ-কল্যাণমূলক কর্ম্মতালিকার কার্য্যকরীকরণের উপকরণ কিন্তু কেবল তখনই তৈরি হইতে পারে যখন প্রকৃত কাজের উন্নতি সাধিত হয়।

কিন্তু এই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, এক দিক দিয়া অর্থনৈতিক প্রগতি সমাজ-কল্যাণ-প্রগতির অনুপূরক পন্থা মাত্র—সমাজ-কল্যাণকে বলা যাইতে পারে প্লানিং বা পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য।"

একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করাও ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। প্রেসিডেণ্ট বলেন, "কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের আদর্শটি উত্তম এবং নিঃসন্দেহে ভারত-সরকার কর্ত্তৃক তাহা অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু যেমন অর্থনীতির ক্ষেত্রে, উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তেমনি বা ততোধিক মিশ্র উন্নয়ন-নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। উন্নয়ন-কর্ম্মের বহুধাবিচিত্র প্রশস্ত ক্ষেত্রের সমগ্রটাই—ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্যাও তাহার অন্তর্গত—দখল করিয়া রাষ্ট্র একাধিপত্য স্থাপন করিবে, এমন আশঙ্কাও দেখা গিয়াছিল। সরকারী সংগঠন—এমন কি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রও—নিয়মতন্ত্রের বলে হইয়া থাকে নৈর্ব্যক্তিক, পক্ষান্তরে কল্যাণকর্ম্মের ক্ষেত্রে মানবীয় স্পর্শের প্রয়োজন, যাহা কেবলমাত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কল্যাণকর্ম্মীদের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের ন্যায় একটি স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত এবং রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই উভয়বিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পৃথক্ পৃথক্ সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে।

প্রেসিডেণ্টের ভাষণের পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখ প্রেসিডেণ্ট এবং প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত করিয়া গত চৌদ্দ মাসের মধ্যে পর্ষদ কর্ত্তৃক যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, ইহা কল্যাণসংস্থা, এবং পরিকল্পনাসমূহের প্রতি সহায়তামূলক যে কর্ম্মতালিকা ইহা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে খরচ হইবে ৬৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২৭·৫ লক্ষ টাকা ৯০০টি প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাহায্যদান রূপে অনুমোদিত হইয়াছে এবং আরও ৩৪·২ লক্ষ টাকা কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনাসমূহের (The Welfare Extension Project)—যাহাদের কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে,

ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শিশু, নারী, বিকলাঙ্গ এবং সমাজজীবনে যাহারা নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে অক্ষম—পরিকল্পনায় তাহাদেরই অগ্রাধিকারের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—সাহায্য দিতে গিয়া পর্যন্ত এই নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করেন নাই।

শ্রীমতী দেশমুখ আরও বলেন,"সামনে আরও অনেকখানি পথ আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, তবেই আমরা সামাজিক সমস্যাসমূহের চূড়ান্ত রকমের সমাধান এবং একটা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সামাজিক কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হব।"

মনে রাখবার মত চারিটি মুখ

ফ্রেডা এম্. বেদি

প্রায় পিতৃসুলভ গর্ব্বের সঙ্গে নয় মাসের একটি হাসিখুশী মেয়েকে দেখিয়ে স্বামীজী বললেন—"এটি হচ্ছে সারদা দেবী।" তার পর যেন আরও একটু গর্ব্ব সহকারে বললেন, "এইটিই আমার প্রথম কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে।"

শ্রীমতী ঠাঙ্কাম্মা এবং আমি ত্রিভান্দ্রমের রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল পরিদর্শন করা স্থির করেছিলাম। এখানেই কৃশকায় তরুণ স্বামীজী আমাদিগকে তাঁর আশ্রিত শিশুটিকে দেখান। তিনি বলেন, "আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে-ছিলাম যে, এখানে অনাথ শিশুদের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন আমাদের গুরুতর। কিন্তু একাধিক শিশুকে এখানে নেবার মত যথেষ্ট অর্থ আমার নেই। সারদার দিনের জন্যে একটি ও রাত্রির জন্য একটি পরিচারিকা এবং একটি রমণীয় খেলাঘর (nursery) আছে। তার দুধ, ফলের রস, খাদ্য এবং ভিটামিনের জন্য আমি প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা খরচ করে থাকি।"

আমরা সারদার গোল গোল পা, গোলগাল মুখ এবং তার কালো চোখ দুটির শান্ত অভিব্যক্তির পানে তাকালাম। স্বামীজী যেন একটু বেপরোয়া ভাবেই বললেন, "সারদার আহারের মান নামানোর ইচ্ছা আমার নেই।" তাঁর কথায় আমরা সায় দিলাম। এই তো প্রকৃত জাতিগঠনের কাজ। ইতিমধ্যেই সারদার বাপ মা এবং ঠিকমত একটি বাড়ীও মিলে গেছে, তার বয়স যখন আঠার মাস হবে, তখন সে সেখানে চলে যাবে। তার পর আমি আরো দুটি কিংবা তিনটিকে নেব ভাবছি এবং জীবনের পথে যাতে তারা চলতে পারে, সে ব্যবস্থা করে দেব।"

আমরা বুঝতে পারলাম যে, স্বামীজীর কাম্য হচ্ছে আদর্শের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা। সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করে এবং যে যে রাজ্যেই আমরা গিয়েছিলাম সেগুলির প্রত্যেকটির ছোট এবং বড় অনাথ শিশু-নিকেতন-সমষ্টি দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে, স্বামীজী প্রতিষ্ঠানগত ভিত্তিতে শিশুদের উপযুক্ত খাদ্য যোগানোর ব্যবস্থা করে আমাদের সমাজের একটি অমীমাংসিত বড় সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করেছেন, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানসমূহেও পর্য্যন্ত কতকগুলো শিশুর যে ধরণের অস্থিচর্ম্মসার চেহারা দেখতে পাওয়া যায়, তা বাস্তবিকই হৃদয়বিদারক। সচরাচর রুগ্ন চেহারাই তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—এটাই সাধারণ নিয়ম—নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একথা অনস্বীকার্য্য যে, প্রায়শঃই তারা আসে কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে এবং অতি কষ্টে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়। যে সকল প্রতিষ্ঠান আমি পরিদর্শন করি তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট দুটিতে মৃত্যুহার শতকরা ৫০ বলে জানতে পারি, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলিতে এ প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করি নি।

অনাথ, অনাশ্রিত এবং কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের সমস্যা অবশ্য সুস্থ এবং স্বাভাবিক শিশুর সমস্যা নয়। তাদের শতকরা হারের একটি বৃহৎ অংশ জন্মাবধি বিদ্যমান ব্যাধিতে ভুগতে পারে, অন্যেরা জন্মায় বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা, উৎপীড়িতা মায়েদের গর্ভে। নির্ম্মম পরিস্থিতির জন্যে সেই সকল মায়েরা নবজাত শিশুকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কুড়িয়ে নেওয়ার আগে পর্য্যন্ত শিশু হয়ত থাকে আধপেটা খেয়ে। এই সমস্ত কারণ অবশ্য এক্ষেত্রে বিদ্যমান, কিন্তু এ সকল ছাপিয়ে যে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হ'ল তা হচ্ছে এই যে, ভারতীয় পরিবেশ অনুযায়ী সস্তা এবং তৎপরতার সহিত লভ্য স্থানীয় খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যে শিশুদের খাওয়ানোর সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আমাদের যে ভাবে চিন্তা করা উচিত ছিল, আমরা তা করি নি। আমরা আমাদের পুষ্টি-বিশারদ এবং চিকিৎসকদের জ্ঞানকে কাজে লাগাই নি। হয়তো আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, সমাজ-কর্ম্মীরূপে আমাদের যে সকল বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমরা সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছি।

কাজেই সারদার অদৃষ্ট ভালই বলতে হবে। উত্তম দুধ

এবং ফলের রস তাকে খেতে দেওয়া হ'ত; তাকে রাখা হ'ত ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে—স্বামীজী এখানে মানুষের জীবন-গঠনের একটি পরীক্ষণকার্য্য পরিচালনা করেছিলেন। তিনি তাঁর কাজ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করছিলেন কেবল বইয়ের থেকে নয়, কেননা তাঁরই মত কল্যাণকর্ম্মে প্রবৃত্ত আরও অনেকের মত তিনিও—ভাগ্যচক্রে যে সকল মানব-সন্তান তাঁর জিম্মায় এসে পড়েছিল তাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনন্ত-জীবনের এক একটি স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছিলেন।

মাদ্রাজ রাজ্যে নারীদের সামাজিক অধিকার-সংগ্রামের নেতৃস্থানীয়া ডাক্তার মুথুলক্ষ্মী রেড্ডির সহিত আমি সাক্ষাৎ করি তাঁর স্বগৃহে।

তিনি একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মাথার চুল হয়ে গিয়েছিল সাদা এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তিও খুব ভাল ছিল না। কিন্তু যখন তিনি মৃদুভাবে হাসলেন এবং কথা বলতে সুরু করলেন তখন, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যে সাধারণ ব্যক্তি নন সে বিষয়ে আমরা সচেতন হয়ে উঠলাম।

"নিঃস্ব স্ত্রীলোক এবং যে-সকল স্ত্রীলোক আভ্‌ভাই হোমে ভর্ত্তি হবার জন্যে আসত তাদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা দেখে আমি দুর্ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম।" তিনি বললেন, "আর একটি সমস্যা দাঁড়াল—'হোম' কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা। বৃহৎ নগরীর জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হওয়ার পর তাদের পক্ষে গ্রামে ফিরে যাওয়া কঠিন।

"আপনি কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করবেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আমি জানতাম যে ইতিপূর্ব্বে তিনি অধিকতর কঠিন এবং জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমার কথার জবাবে তিনি বললেন, "আমার লক্ষ্য হচ্ছে মাদ্রাজের প্রতিটি জেলায় নিঃস্ব স্ত্রীলোক এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি করে 'হোম' প্রতিষ্ঠা। এগুলো হবে গ্রামে স্থাপিত প্রকৃত গ্রামীণ নিকেতন বা 'হোম'।"

তা হলে প্রত্যেক জেলায় একটি করে 'হোম' প্রতিষ্ঠা তাঁর কাম্য। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ অতীত হবার আগে কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনাসমূহ (Welfare Extension Projects) গোটা রাজ্যের সর্ব্বত্র জাল বিস্তার করবে এবং প্রত্যেকটি পরিকল্পনা রূপায়নী সমিতি (Project Implementing Committee) কর্ত্তৃক অন্ততঃ পক্ষে এমন কেন্দ্রের বীজ উপ্ত হবে যা পরিশেষে বাঞ্ছিত 'হোমে' পরিণতি-লাভ করতে পারে। মাদ্রাজে সাতটি কেন্দ্রকে একটি ইউনিট ধরে প্রত্যেকটি প্রোজেক্ট পরিকল্পিত হয়েছে। তন্মধ্যে সবগুলি যে একই ধরণের তা নয়, তবে স্থানীয় বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা এগুলির অন্তর্ভুক্ত। স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীলোকদের (কখনো কখনো বিবাহসূত্রে যে যৌতুক লব্ধ হয় তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে; কখনও তারা চায় অধিকতর শিক্ষিতা স্ত্রী; কখনও বা দ্বিতীয়বার যৌতুকের লোভে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে) প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন স্থানীয় লোকের অভাব নেই এবং এই সকল হোম প্রতিষ্ঠায় আমাদের কোন বেগ পেতে হবে না।"

আপনারা বলছেন—আমরা কেমন করে জানি যে, এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবে? আমরা জানি তা হবেই, কারণ ডাক্তার রে ড্ড হচ্ছেন ডাক্তার রেড্ডি এবং দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ তাঁর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছে। যৌবনে মুথুলক্ষ্মী চেয়েছিলেন মন্দিরে বালিকাদের দেবদাসীরূপে উৎসর্গ করবার মারাত্মক প্রথার বিলোপসাধন করতে। তাঁর বিরুদ্ধে ছিল রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মতবাদের চাপ। কিন্তু তিনি সে কাজ সম্পন্ন করেছিলেন—তার স্বামীর সহযোগিতায়। কুরি-দম্পতি রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্যে যে ভাবে কাজে লেগে থেকে-ছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে মুথুলক্ষ্মী এবং তাঁর স্বামী দেব-দাসী প্রথা উচ্ছেদের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন একাগ্র নিষ্ঠায়। নিছক কাজের দ্বারা, স্রেফ বিশ্বাসের জোরে, তিনি পর্ব্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধ অপসারিত করতে সমর্থ হয়ে-ছিলেন—শেষ পর্য্যন্ত বিল পাস হ'ল, তরুণ সম্প্রদায় তাঁকে সমর্থন করলেন।

দক্ষিণে তাঁর নাম ও কৃতি উপকথায় পরিণত হয়েছে, সমগ্র ভারতে তাঁর পরিচিতি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তিনি এখনও এমন স্তরে পৌঁছেন নি যে, তাঁর কাহিনী বলতে হবে আমাদের নাতিপুতিদের নিকট। যদিও ইদানীং তাঁর বয়স বাহাত্তরের কাছাকাছি, তথাপি এখনও একনিষ্ঠ ভাবে কর্ম্মে নিরত থেকে তিনি যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারেন, 'ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটে'র ভবনসমূহই তার প্রমাণ।

আমরা সুন্দরভাবে সাজানো অপারেশন থিয়েটারের ভিতর দিয়ে গেলাম, এক্সরে প্লাণ্ট দেখলাম, এটির গঠনকার্য্য এখনও চলছে। আমরা সেই সকল খ্যাতিমান চিকিৎসকের তালিকা দেখলাম, যাঁরা ক্যান্সার রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করে-ছেন। আর এক মাসের ভিতরে মাদ্রাজে সেখানকার অধি-বাসীদের একটি উপেক্ষিত অংশের জন্য সম্প্রসারণযোগ্য চিকিৎসা বিভাগের কেন্দ্র খোলা হবে। এ কথা অনুধাবন করলে কি আপনার হৃৎকম্প উপস্থিত হবে না যে, সাত অথবা আট জন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ এবং ছয় জন

নারীর মধ্যে একজন নারী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। এ-কথাও জানা উচিত যে, কেবলমাত্র প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা সুরু করলেই এই ব্যাধি আরোগ্য হতে পারে।

ডাক্তার রেড্ডির বাসভবন তাঁর বিখ্যাত আভ্‌ভাই হোমের এত নিকটে যে, এটিকে তার অংশবিশেষ বললেই চলে। যে সকল স্ত্রীলোককে তিনি বাঁচিয়েছেন, যে সকল শিশুকে তিনি প্রতিপালন করেছেন তারা সকলেই মোটের উপর তাঁর পরিবারভুক্ত···যে সকল ছেলে, পুত্রবধূ এবং নাতি নাতনীরা তাঁর সঙ্গে বাস করে তাদের মত আশ্রিতেরাও তাঁর সত্যিকারের আত্মীয়।

আর একজন ডাক্তারকে পেয়েছিলাম আমি অন্ধ্রদেশে। ইনি মধ্যবয়স্কা, এঁরও মাথার চুল সাদা এবং আপাতদৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়েছিল যে. ইনিও আর একজন প্রকৃত সমাজ-কর্মী। নেল্লোরের নিকটবর্ত্তী এবড়োখেবড়ো অঞ্চলের উপর দিয়ে আমাদের গাড়ী যখন ঝাঁকি দিতে দিতে চলছিল তখন আমি তাঁর অন্যান্য গুণাবলী আবিষ্কার করি।

তখন যথারীতি অন্ধকার হয়ে গেছে, আমাদের গাড়ী সেই রাত্রে দেরিতে ছাড়বার কথা। আমরা এক জঙ্গুলে পোড়ো জমিতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। সত্য বটে রাত্রিটি ছিল চন্দ্রকরোজ্জ্বল এবং সেই চন্দ্রালোকের দরুনই শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্কটত্রাণ হয়েছিল। নেল্লোর ওয়েলফেয়ার এক্সটেনশন প্রোজেক্টের চতুর্থ গ্রামীণ কেন্দ্র থেকে ফিরে আসবার সময় যে বুনো এবং অনুন্নত অঞ্চলে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম সেখানে এমন একটি পর্য্যন্ত ধুলো-কাদাময় রাস্তা ছিল না যা দেখে জীপ ড্রাইভার পথের হদিস পেতে পারে। আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে কাঁটা ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। যে সকল কাঁটাগাছ দেখতে অধিকতর ভয়ঙ্কর, জীপ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সে গুলোর কিনারা ধরে ছোট ছোট কাঁটা ঝোঁপগুলোর উপর দিয়ে যেতে লাগল। আমরা ভেবেছিলাম যে, আমরা রাস্তা চিনি, কিন্তু এখন এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না যে, রাস্তা আমাদের জানা নাই।

এই দুর্গম অঞ্চলে পথ হারিয়ে আমরা ডাক্তার লক্ষ্মীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেলাম। প্রোজেক্টের আহ্বায়ক-রূপে (convener) তিনি এই পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন এবং যে সকল গ্রামে তাঁর মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেগুলো খুঁজে বের করেছেন। গ্রাম-সমূহ নির্ব্বাচনের সময় তিনি—এগুলো পরিদর্শন আরাম-দায়ক নহে, অথবা এতে সময় লাগে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হয় এ সকল বিষয় গ্রাহ্য করেন নি। তিনি প্রফুল্লভাবেই বললেন—“আমরা পূর্ব্বেই আমাদের পথ হারিয়েছি।” তাঁর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাকে আমি বলব—“আন্ধ্র মনোভাব।” এই অন্ধ্র মহিলার মধ্যে আমি দেখলাম সংক্রামক উৎসাহ, অকপটতা, সাহসিকতার সহিত এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা···আমি একে বলতে পারি প্রায় বেপরোয়া ভাব। এটা হচ্ছে সেই মনোভাবের অভিব্যক্তি যার পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম, গ্রামের এতগুলি সভাসমিতিতে। এই মনোভাবের মধ্যে নিহিত ছিল সেই অনুচ্চারিত কথা—“আমরা একটা নূতন রাজ্য গড়ে তুলছি এবং সমগ্র ভারতকে দেখাতে যাচ্ছি যে, আমরা কি করতে পারি।” ডাক্তার লক্ষ্মীর হয়ত ইচ্ছা হ'ল যে, তিনি একটি কল্যাণ-কেন্দ্র স্থাপন করবেন ? সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল কোনো বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে কোন ব্যক্তি দিলেন একটি ঘর ; অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পল্লীতে গ্রামবাসীরা একত্র হয়ে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের গৃহ এবং গ্রামীণ কর্ম্মীদের জন্যে একটি ঘর তৈরি করে দিলে। ডাক্তার লক্ষ্মী চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জমি মেলে, সাহায্যকারীর সংখ্যাও প্রচুর। আমার মনে হয় না যে, অন্ততঃপক্ষে অন্ধ্রে গ্রামে কাজ করতে ইচ্ছুক নারী-কর্ম্মীর অভাবে আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত হবে।

এটা ইতিহাসের একটা আকস্মিক ঘটনা নয় যে, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ভারতের এই অঞ্চলেরই অধিবাসিনী। অন্ধ্র মহিলাসভায় বহু বৎসর তাঁর সহকর্ম্মিণী এবং সম্প্রতি অন্ধ্র রাজ্য পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমতী এ. সি. কৃষ্ণা রাও হচ্ছেন সেই মহিলা-সম্প্রদায়ের অন্যতম যাঁরা মাদ্রাজে গড়ে তুলেছেন অন্ধ্র মহিলাসভা। শ্রীমতী কৃষ্ণা রাও প্রথম এর পরিকল্পনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এখন চারিটি অংশে বিভক্ত :—স্কুল, শিক্ষণকেন্দ্র, কলেজ এবং নার্সিং হোম। অন্ধ্রে সামাজিক অবস্থা পরিদর্শনের কাজ এরূপ নিখুঁত ভাবে করা হয়েছে যে, খুব কম রাজ্যেরই তার সঙ্গে তুলনা হতে পারে। এই রাজ্যে প্রায় সমস্ত প্রোজেক্টেই তিনটি অথবা চারিটি করে সক্রিয় কেন্দ্র আছে।

'শীগ্‌গিরই আমরা রাস্তা পেয়ে যাব,' প্রফুল্লভাবে বললেন ডাক্তার লক্ষ্মী। 'জীপে ঘুমোনো বেশ আরামদায়কই হবে।' সমান খোশ মেজাজে জবাব দিলেন চেয়ারম্যান। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু খাবার বের করলেন যমুনা বাঈজী—ঠেকার সময় যাতে কাজে লাগতে পারে সেজন্যেই যেন তিনি এগুলো তৈরি রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামীণ পথপ্রদর্শক এবং যে উৎকৃষ্ট ছাত্র ড্রাইভারটি এতক্ষণ কাঁটা ঝোঁপের চারপাশে জীপ নিয়ে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছিল—তারা দু'জনে ঠিক রাস্তার হদিস পেয়ে গেল।

অবশেষে পথের নিশানা আমরা পেলাম। গাড়ী চালিয়ে আমরা আধ ঘণ্টা পরে সদর রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলাম এবং আমাদের গাড়ী ধরলাম।

আমার "মনে রাখবার মত চতুর্থ মুখখানি"র প্রসঙ্গে এই কথাই বলতে হয় যে, তার মধ্যে এমন একটি গুণ ছিল যার বর্ণনা করা আমার পক্ষে দুষ্কর।

বয়স তাঁর কুড়ির কোঠায়, মাথায় মসৃণ কালো চুল গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগে চমৎকার ভাবে রচিত জোড়া বিনুনির আকারে স্তূপীকৃত। তাঁর পোশাকপরিচ্ছদ ছিল সাধারণ, কিন্তু ফিটফাট। তাঁর চোখ দুটি ছিল তৃপ্তিমাখানো এবং শান্ত।

ওখানকার অবসাদপূর্ণ পরিবেশে তাঁর গলায় পরিহিত হারটি অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছিল। অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে এটা অসঙ্গত বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু শেষে আমি এই জিনিষটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। মধ্য-প্রদেশের দত্তপুরের কুষ্ঠ উপনিবেশের (Leprosy Colony) শিশুবিভাগে আমরা তাঁকে নার্সরূপে কর্ম্মরত অবস্থায় দেখলাম। তাঁর বাহু দুটি দিয়ে তিনি জড়িয়ে রেখেছিলেন একটি সুস্থ ছোট বাচ্চাকে। কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে বারান্দার চতুষ্পার্শ্বে ছুটোছুটি করছিল, দোলার উপরে ছিল একটি রোগা ছোট শিশু যাকে নিয়ে সমস্যাসৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আর একটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দুর্ব্বল শিশু দড়ির দোলায় রোদে শুয়ে শ্রান্ত এবং বিষাদমাখা চোখ দুটি দিয়ে এমন একটা কাজ দেখছিল, যা বোঝা তার পক্ষে কঠিন। "ও আমাকে সাহায্য করছে এই সমস্ত শিশুদের কুষ্ঠ রোগসংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার কাজে।" বললেন, বাপুসদৃশ আকৃতি-বিশিষ্ট সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের চারিদিকের সবকিছু দেখাচ্ছিলেন। শ্রীদেওয়ান—তিনি এখনও সেবাগ্রাম আশ্রমের সভ্য আছেন, মধ্যপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে বিপুল-সংখ্যক কুষ্ঠরোগাক্রান্তের মধ্যে মহাত্মাজীর সেবাকার্য্যকে সম্প্রসারিত করেছেন।

তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—কোন শিশুই কুষ্ঠরোগ নিয়ে জন্মায় না। এই রোগ বংশগত নয়, এর সৃষ্টি হতে পারে কেবলমাত্র নিরন্তর সংস্পর্শের দরুন। কাজেই জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আমরা শিশুদের তাদের মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিই, তা'হলে যে-কোন সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর ন্যায় তাদের শরীরের বাড় হতে পারে।

"আর সেই তরুণী স্ত্রীলোকটি," অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে, সঙ্কোচের সঙ্গে আমরা প্রশ্ন করলাম।

"ওর স্বামী হাসপাতালের একটি রোগী। মেয়েটি তার কাছে থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন তাকে আমি বললাম যে, সে আমার প্রতিষ্ঠানের জন্যে এই কাজ করতে পারে..."

সেই শান্ত, পরিতৃপ্তিমাখানো চোখ দুটির কথা আমার মনে পড়ল, মনে পড়ল সেই কণ্ঠহারের কথাও, আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার গলার ভেতরে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠতে লাগল।

যে তরুণী বধূ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত স্বামীর পরিচর্য্যার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে, চিরাচরিত প্রথা-অনুযায়ী সোনার চুড়ি এবং বিবাহের কণ্ঠহার পরবার যোগ্যতা তার চেয়ে বেশী আর কার আছে?

শ্রীদেওয়ান আরো বললেন, "আমরা যখন রোগীদের ওয়ার্ডের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন ওর স্বামীকে আপনাদের দেখাই নি। সে হয়ত এটা পছন্দ নাও করতে পারত।" অপরের মনোভাব বুঝে তদনুযায়ী আচরণ করবেন, এটা বুঝতে পেরে ঠিক এ ধরণের উক্তিই আমি তাঁর কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম।

পরে এ কথাটা আমার মনে জাগল যে, 'আমার দেখা চারিটি মুখ' এমন সব আদর্শের প্রতীক যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে বড়। আমি যে চারটি রাজ্য পরিদর্শন করেছিলাম, এদের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে সেগুলির মূলগত চারিটি সমস্যা। নয়নমনমুগ্ধকর বালুকাপ্রান্তর ও তালীবন এবং শুভ্র সমুদ্র-ফেনরেখাঙ্কিত উপকূলভাগ সমন্বিত, বিশুদ্ধ সমুদ্র বায়ু পরিশোধিত ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ঘন লোকবসতিপূর্ণ ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যের অনেক শিশুকে চলে যেতে হয় মাদ্রাজ কিংবা বোম্বাইয়ে। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, এই সকল নগরীর অপরাধপ্রবণ শিশুদের শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগই মালাবার থেকে আগত। শিশু-কল্যাণই ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের মুখ্য সমস্যা, কুড়িয়ে পাওয়া অনাথ এবং অনাশ্রিত শিশুদের সমস্যা এর আর এক দিক। যেখানে জমির উপর চাপ এবং বেকার-সমস্যার দরুন পারিবারিক আয় কমে গেছে, সেখানে কাজে কাজেই কি ভাবে সস্তায় পরিবারের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান করা যায় সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া অত্যাবশ্যক। মাদ্রাজ তার শোভা এবং সৌন্দর্য্য, তার সামাজিক ভেদবৈষম্য এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা ভালমন্দ সবকিছু নিয়ে আমার সামনে উপস্থাপিত করেছিল বিগত যুগের ভারতের সমস্যা। কিন্তু বর্ত্তমান জগতের সংঘাতে দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে তার সনাতন সংস্কারসমূহে। ডাক্তার রেড্ডির মধ্যে পাচ্ছি আমরা যুগসন্ধির মানবীয় প্রতিরূপ। মানুষের কৃতিসমূহের আরও একটি স্রোতো-ধারার গভীর তলদেশ থেকে যে সকল উপকরণ ভেসে এসে

তটভূমিতে বিকীর্ণ হয়ে আছে, তিনি হচ্ছেন সেগুলোর রক্ষয়িত্রী। যদিও তাঁর মাথার চুলে পাক ধরেছে তথাপি ডাক্তার লক্ষ্মীর মধ্যে আছে নবীন অনন্তের জীবন্ত আদর্শ। দুরদুরান্তের গ্রামাঞ্চলে মাতৃমঙ্গলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কিত গুরুতর সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। আর দত্তপুরের সেই 'অজানা বধূ'? তিনি এখনও পর্য্যন্ত অমীমাংসিত কুষ্ঠ-ব্যাধি-সমস্যাকে এমন মর্ম্মান্তিক ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে, তাতে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। এর চিকিৎসার দিকটা যদিই বা আমরা ডাক্তারদের হাতে ছেড়ে দিই, তা হলেও মানুষ হিসেবে কুষ্ঠরোগীর পক্ষে যে সকল জিনিষ একান্ত আবশ্যক সেগুলো পূর্ণ করতে এগিয়ে যাচ্ছে কে? তারা চায় সেবা এবং যত্ন, তাদের সকলের সম্বন্ধে সুবিবেচনা—তাদেরও আছে বন্ধুলাভের আগ্রহ। কিন্তু কে মেটাবে তাদের এ সকল দাবি? কুষ্ঠ রোগের আক্রমণ থেকে কে বাঁচাবে তাদের ছেলেমেয়েদের, তাদের চিকিৎসাকালে কে প্রতিপালন করবে তাদের পরিবার? চিকিৎসার ফলে শেষে চূড়ান্তভাবে আরোগ্য হলেও যদি তারা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, তা হলে কে তাদের ফিরিয়ে নেবে সমাজে? যাতে তারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করে সেজন্য আমরা কি ভাবে তাদের স্বাবলম্বী হবার শিক্ষাদান করব? তাদের সামাজিক দুর্ভাগ্য লাঘব করবার নিমিত্ত, এমনকি যখন পরীক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, তাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে ব্যাধিবীজাণুশূন্য তখনও যাতে তারা তথাকথিত 'পারিয়া'দের মত অস্পৃশ্য বলে গণ্য না হয় সেজন্যে চিরাচরিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবেন কে?

দত্তপুরের অজানা বধূর দৃষ্টান্ত দেখে আমার মনে পড়েছিল ভারতের আরও কোনো কোনো মহীয়সী নারীর কথা। ইতিহাসের যে কুহেলিকাচ্ছন্ন আদিম প্রভাতে ভারতের আবির্ভাব, সেই সুদূর অতীতকাল পর্য্যন্ত এই সকল মহীয়সী নারীর ধারা প্রবাহিত। দত্তপুরের 'অজানা বধূ' ভারতের সেই চিরন্তনী বধূদেরই ধারাবাহিকা—যারা নির্ব্বাসনে, কারাগারে, পাণ্ডববর্জিত দেশে সর্ব্বত্র হয়েছে স্বামীর অনুগামিনী।

দত্তপুরের বধূর কাহিনী ভারতের সেই অতিপ্রাচীন কাহিনীরই আধুনিক রূপায়ণ।

শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

সম্প্রতি শ্রীদেশমুখ যখন আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের (International Monetary Fund and World Bank) গবর্ণরদের সভা এবং কলম্বো পরিকল্পনা আলোচনা সমিতির (Colombo Plan Consultative Committee) সভায় যোগদান করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান তখন তাঁহার পত্নী শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখও তাঁহার অনুগামিনী হন। এই সময় শ্রীমতী দেশমুখ বে-সরকারী ভাবে ছয় সপ্তাহকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমতী দুর্গাবাঈ প্রায় পাঁচ শত জন উচ্চ স্তরের সমাজকর্ম্মীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নারী শিশু ও বিকলাঙ্গদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। যদিও যেখানেই তিনি গিয়াছিলেন সেখানেই—স্বাধীনতার পর ভারতে যে প্রগতি হইয়াছে সেজন্য সকলের প্রশংসামূলক মনোভাবের পরিচয় পান তথাপি সমাজ-উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে কত যে অভাব ও ত্রুটি রহিয়াছে এই ভ্রমণ্য উপলক্ষে তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্প্রতি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি শিশু-রক্ষণাগারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, ভারতে স্ত্রীলোকদের কার্য্যকালে শিশু-রক্ষণাগার (Creche) আছে বটে, তবে এগুলি কেবলমাত্র কারখানাসমূহে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা কর্ম্মে নিযুক্ত সেগুলিতে এ ধরণের সুবিধা নাই। আজিকার দিনে যখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম্মী অথবা বেতনভোগী হিসাবে হাজার হাজার স্ত্রীলোককে কর্ম্মে নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে তখন এই সকল রক্ষণাগারের আবশ্যকতা বিশেষ জরুরি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লণ্ডনে শিশু-রক্ষণাগার: শ্রীমতী দেশমুখ বলেন যে, লণ্ডনে কর্ম্মরত নারীদের শিশুদের জন্য প্রায় ৭৫টি 'হোম' বা শিশুনিকেতন আছে। লণ্ডনে তিনি একটি 'হোম' পরিদর্শন করেন যেখানে ছিল প্রায় ১৪০টি শিশু,

২৫টি শিশুর এক একটি দলের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তিন জন কর্ম্মীর উপর। লণ্ডনে এই একটি অতিপরিচিত সাধারণ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মে নিযুক্ত মাতা তাহার ছয় মাস হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের শিশুকে সকাল সাড়ে সাতটার সময় এই সকল 'হোমে'র মধ্যে কোন

শ্রীদুর্গাবাঈ দেশমুখ

একটিতে লইয়া আসে এবং অপরাহ্নকালে আপিসের কাজের শেষে তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যায়। আগে শিশুকে ভর্ত্তি করানোর জন্য মাতাকে সে যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহার সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইত, কিন্তু এখন যারা অসুস্থ এবং সেজন্য যথোচিত ভাবে শিশুর তত্ত্বাবধান করিতে অক্ষম তাহারাও এই সুবিধা পাইতেছে। ইহার ব্যয় নামমাত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিটি চেষ্ট: যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীমতী দেশমুখ 'কম্যুনিটি চেষ্ট' সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ পান এবং কম্যুনিটি চেষ্টের আদর্শ তাঁর মনে বিশেষ রেখাপাত করে।

যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি সংস্থা—যা তার খুব ভাল লাগিয়াছিল, সেটি হইতেছে গুডউইল ইণ্ডাষ্ট্রিজ। ইহা বিকলাঙ্গ বা অন্য কারণে যাহাদের দেহ অপটু তাহাদের জন্য কর্ম্মের সংস্থান করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমবায় সংস্থাগুলির প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন। এগুলি বাড়ীতে স্ত্রীলোকদের হাতের তৈরি শিল্পজাত বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

মিশরে এক মিশরীয় সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান তাঁহার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মিশরের স্ত্রীলোকেরা, যাহাদের পিতা-মাতা যক্ষ্মায় ভুগিতেছে এমন চারি শত শিশুর জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ভারতে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদকে যে আত্মকর্তৃত্বের অধিকার দেওয়া হইয়াছে সেকথা শ্রীমতী দেশমুখ বিদেশে যে সকল সমাজকর্ম্মীর নিকট উল্লেখ করেন তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহার প্রশংসা করেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহাদের দেশে এ ধরণের ক্ষমতা ন্যস্ত না হওয়ার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রীমণ্ডলী খরচের টাকা মঞ্জুরে অযথা বিলম্ব করিয়া থাকেন।

সে অনামী, কিন্তু আপনি তাকে সকল স্থানেই পাবেন।

আমাদের অধিকাংশেরই এমন সব নিঃস্বার্থ সমাজ-কর্ম্মীর কথা জানা আছে, যারা কোনও সুদূর গ্রামাঞ্চলে বাস্তুহারাদের মধ্যে অথবা জনাকীর্ণ শহরে বিস্ময়কর কল্যাণ-কর্ম্ম করেছে অথবা করছে এবং যেখানেই তারা যায় সেখানেই লোকে তাদের ভালবাসে।

তারা বড় বড় সংস্থা পরিচালনা করে না। এমন সব পরিস্থিতির মধ্যে তারা কাজ করছে যা কেবলমাত্র চূড়ান্ত রকমের সাহসী ছাড়া আর সবাইকে ভগ্নোদ্যম করে দিতে পারে। বস্তুতঃ তারা জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্র, আধুনিক কুরুক্ষেত্রের সৈনিক।

নামের প্রয়োজন আমরা অপরিহার্য্য বলে মনে করি না, কিন্তু যদি সম্ভবপর হয় তা হলে একটি ছবিসহ আপনার কাহিনীসমূহ পাঠাবেন এবং যেসব কাহিনী পরম চিত্তাকর্ষক বলে গণ্য হবে, তন্মধ্যে এক-একটি প্রত্যেক সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করব।

তড়িৎ-লতা

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৭

এদিন এত কায়দা করে পুলিসের হাত এড়িয়ে এসে শেষে কিনা এখানে এমনি ভাবে ধরা পড়তে হবে! মনে মনে আমার একটু ভাবনা হ'ল বৈকি! গাঁয়ের লোক নূতন মুখ দেখেছে, নিশ্চয়ই তারা কৌতূহলী! তাদেরই কাছে খোঁজখবর পেয়ে তবে বাবাজীরা এসেছে এখানে। কথাটা বিনুদার কাছে প্রকাশ না করে পারলাম না!

বিনুদার মনে তেমন কোন ভয় হয় নি। তিনি বললেন, "নারে ভাই আমাদের খবর পেয়ে এলে দলে ওরা আর একটু ভারি হয়ে আসত বৈকি! তবে রিভলবারটা ঠিক করে রাখ, যাতে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করতে পারি তেমন অবস্থায় পড়লে। শম্পা ফিরে না আসা পর্যন্ত একেবারেই মুখ বন্ধ রাখতে হবে।"

হঠাৎ সব চুপচাপ। নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ আর উঠোন থেকে ভেসে আসা কথার অস্পষ্ট শব্দ ছাড়া কিছুই কানে আসছিল না। কয়েক মিনিট পরেই সিঁড়ি বেয়ে উঠার শব্দ পেয়ে মনে মনে একটু যেন শঙ্কিত বোধ করলাম। কিন্তু অচিরেই শম্পা দেবীকে হাসিমুখে ঘরে ঢুকেই মেঝের বসতে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

আমাদের দু'জোড়া উৎসুক চোখ তার উপর। যা ঘটেছিল—

দারোগাবাবু জোড় হাতে নমস্কার করে বলেছিল, "অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম, কিছু মনে করবেন না। দেশের শান্তিরক্ষার জন্যই আপনাদের এ সহায়তা প্রয়োজন!"

"তা বেশ ত, নিশ্চয়ই করব আপনাদের সহায়তা। কিন্তু আর কথা বলবার আগে একেবারে ঘরের ভেতর এসে বসুন, তার পর যা হয় কথাবার্তা হবে'খন।"

"অশেষ ধন্যবাদ। দয়া করে মাপ করবেন। আমাদের সময় খুব কম, কিন্তু কাজের পরিমাণ তার তুলনায় অনেক বেশী। তা নইলে আপনাদের এখানে বসব সে ত সম্মানের কথা। যাক, এখন কথাটা হচ্ছে কি, এই তালদহে এক বড় পুলিস অফিসারের উপর বোমা মেরেছে!"

"এ্যাঃ, বলেন কি! তিনি বেঁচে আছেন ত! অন্য কোন ক্ষতি হয়নি ত?"

"না, ভগবানের কৃপায় তিনি অক্ষত দেহে আছেন, অন্য কোন ক্ষতিও বিশেষ হয় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আসামীরা ধরা পড়ে নি!"

"তাদের সন্ধান কিছু পেয়েছেন?"

"মনে হয় ওরা এখনও এ অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে নি, গোয়েন্দা বিভাগেরও এই ধারণা—ওরা এখনও এদিকেই আছে। তাই আপনাদের একটু হুঁসিয়ারী করতে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটু খোঁজও করে নিলাম।"

"কিছু ভাববেন না, এ অঞ্চলে থাকলে ত ধরা পড়বেই, বেরুতে গেলেও ধরা পড়বে, চারদিকে তার বন্দোবস্ত আছে।"

"ওদের সব খবরই আপনারা রাখেন দেখছি। ওরা কিছুতেই আপনাদের নজর এড়াতে পারে না, তাই পুলিশ হ'ল সহস্রলোচন। চারিদিকে তার চোখ।"

"আজ্ঞে সেটা আমাদের নয়, আমাদের কারবার হ'ল চোর-ডাকাত নিয়ে। বিপ্লবীদের জন্য আছে গোয়েন্দা পুলিশের একটা বিশেষ বিভাগ, তারাই ওদের সব খবর রাখে।"

"গোয়েন্দাদের বাহাদুরি আছে। বিপ্লবীদের সব খবর রাখা ত সহজ কথা নয়। সাধারণ পুলিশ দিয়ে বোধ হয় তা হয় না।"

দারোগাবাবু ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কেন হবে না? ভার দিয়ে দেখুক না আমরা পারি কিনা। ওরা কি মন্ত্র জানে? না জ্যোতিষী বিদ্যা জানে? আসল কথা কি জানেন? বিপ্লবীদের মধ্যেই এমন লোক আছে যারা সব কথা বলে দেয়। বাহাদুরি নেয় গোয়েন্দা পুলিশ। গোয়েন্দা বিভাগ আমাদের সব কথা বলে না। তবে সময় সময় আমাদের সাহায্য নিতে হয় কিনা তাই আমরা কিছু আভাস পাই। আন্দাজ করছি শীগ্‌গিরই একটা বড় রকমের জাল ফেলবে। বিপ্লবীদের ভেতরের খবর রাখে এমন ভাল সোর্স ওদের জুটে গেছে।"

"সোর্স! সোর্স কি?"

দারোগা হেসে বললেন, "যারা গোপনে দলের লোকের সংবাদ দেয় তাদেরই আমরা বলি সোর্স—সংবাদ সংগ্রহের উপায়। গোয়েন্দা কর্মচারীর মধ্যে যার যত সোর্স আছে গবর্ণমেন্টের কাছে তার তত সুনাম। এজন্য টাকাও খুব খরচ হয়। দিক আমাদের টাকা খরচ করবার সুবিধে, আমাদেরও অনেক সোর্স জুটে যাবে।"

"ও! এই ওদের কেরামতি! সোর্স পেলে—টাকা খরচ করবার সুবিধে পেলে সবাই খবর সংগ্রহ করতে পারে। আপনি ঠিক বলেছেন।"

"আচ্ছা এখন আসি। নমস্কার, দেশগাঁয়ে আপনার মত একজন ইনটেলিজেন্ট লেডির দেখা পাব ভাবি নি! নূতন লোকের সংবাদ পেলে বা দেখলে তখুনি আমাদের খবর পাঠাবেন, এই অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছি।"

"কিন্তু, ওরা যদি বোমা-পিস্তলের ভয় দেখায়?"

"না, না, সে ভয় করবেন না। ওরা ওধার দিয়েই যাবে না।

এমনিতে এ সব লোক বিনয়ী, ভদ্র—হু'মিনিটেই লোকের সহানুভূতি কেড়ে নেয়। সত্যি ওরা আশ্চর্য্য মানুষ। মনে হবে মানুষের প্রতি দরদে ওদের হৃদয় একেবারে ভরপুর এবং সত্যিই হয়ত তাই। অথচ মানুষ খুন করতে একটুও দ্বিধা করে না। কাজেই বলছিলাম···"

"সে আপনি কিছু ভাববেন না। মানুষ চিনতে আর বাকী নেই দারোগাবাবু···"

"তা ত নিশ্চয়ই, আপনারা হলেন গিয়ে যাকে বলে এডুকেটেড লেডি তা ছাড়া বংশমর্য্যাদাও ত আছে।"

"সেইটুকুর জোরেই এখনও টিকে আছি দারোগাবাবু। এইটুকু ত ভুললে চলবে না যে, ইংরেজদের সহায়তার বলেই আমরা আজও মাথা খাড়া করে আছি, কাজেই এ ত আমাদেরই স্বার্থ—ওদের বাঁচিয়ে রাখা।"

"আচ্ছা, তা হলে আজ আসি। আপনারা সজাগ থাকলে আমাদের অনেক সুবিধে, নইলে কর্ত্তব্য সম্পাদন করা ত সহজ কথা নয়!"

"একটু চা, কিংবা সরবত খেয়ে যান, বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছে।"

"আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না বলে মাফ করবেন। খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার। পাকিস্তিতি ধরা পড়লে মুশকিল হতে পারে।"

"বিনুদা যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, তার মুখে চিন্তার রেখা। জিজ্ঞাসা করলেন, "গোয়েন্দাদের সংবাদ সংগ্রহের উপায় সম্বন্ধে আর কোন কথা হ'ল?"

শম্পা দেবী বললেন, "না, এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হয় নি। দারোগা চলে গেলেন।"

এ পর্য্যন্ত বলেই শম্পা দেবী হাসিতে ঘর মাতিয়ে তুললেন। যেন এমন মজার ব্যাপার কোনদিন ঘটে নি তার জীবনে। হাসি থামলে ঠাট্টার সুরে বললেন, "বুঝলে ত মশাইরা, উপকার করার একচেটে অধিকার তোমাদেরই নয়—অপর লোকেও তার কিছু কিছু ধার ধারে।"

"ঠিক এই কথাটিই তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি শম্পা যে তুমি তোমার সন্তান আর শ্বশুর পরিবৃত হইয়েই আমাদের সমিতির সবচেয়ে বড় সহায়ক হবে আমাদের লক্ষ্য, সমস্ত ভারতবাসীর কামাকে নিকটতর করে তুলতে পার"—বিনুদা হাসতে লাগলেন।

শম্পা দেবীর মুখ নূতন ঊষার রক্তিম আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠল। এ আলোচনা বন্ধ করার জন্যই বোধ হয় বিনুদাই পুনরায় বললেন, "আজ আর আমরা বেরুতে পারব বলে মনে হয় না। বেলা যত গড়িয়ে আসছে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের ঘনঘোরও যেন আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে।

"পুলিশ যখন একবার খোঁজ-খবর করে গেছে তখন ঝড়জলের ভেতর আঁধার আর নদীর মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার তাড়াহুড়ো নেই। এখানে আজ আর কোন আশঙ্কা নেই। পুলিশ আজ আর ফিরে আসবে বলে মনে হয় না।"

"আজ আর রাত্রের বেলা রান্নার কোন বিশেষ হাঙ্গামা করো না। যা হোক কিছু সামান্য বন্দোবস্ত করে নিও। তাড়াতাড়ি খেয়ে বরং ঘুমিয়ে বাঁচি।"

"বাত্তিরে যেমন বৃষ্টি তোড়জোড় করে আসছে তাতে তোমাদের ঘুম হবে বলে মনে হয় না।"

"কেন?"

"পুরানো ছাদের অসংখ্য ফাটল বেয়ে নামবে অজস্র ধারায় পুরানো স্মৃতির অশ্রুবারি।"

"সেজন্য তুমি ভেব না শম্পা। বিছানা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঠিক জায়গাটি বার করে নেব'খন।"

"রাতভর ওকাজ করলে ঘুম যা হবে তা ত বুঝতেই পারছি। যাক, এ কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই।"

উত্তরের অপেক্ষা না করে শম্পা দেবী নিজের কাজে ভিতরে চলে গেলেন। রাত্রে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে শোবার ব্যবস্থা করলাম। ততক্ষণে জলঝড় পুরোদমে মাতামাতি সুরু করে দিয়েছে। ঘরের একটা কোণ দিয়ে ছাদ থেকে জল পড়ছিল। ওর জন্য বিশেষ অসুবিধে হয় নি, কিন্তু একটু মুশকিল হ'ল একটা ভাঙা জানালার মধ্য দিয়ে আসছিল মাঝে মাঝে জলের ছাট।

শুয়ে শুয়ে বিনুদা বলছিলেন, "জানিস আজ রাত হচ্ছে গল্প করে কাটিয়ে দেওয়ার মত। গভীর রাত, নইলে শম্পাকে ডেকে এনে গল্প করা যেত। কিন্তু একে ত কাল আমাদের পক্ষে একান্ত অনিশ্চিত, শম্ভুও বিশেষ করে সতর্ক করে গেল, কাজেই আজ যদি বিশ্রামের সুযোগ মিলে থাকে তবে তার সদ্ব্যবহার করাই উচিত। তা ছাড়া সারাদিন ধরে নানা টানাহ্যাঁচড়ায় শম্পারও মনের ভিতরটা খান খান হয়ে গেছে। আজ বাইরে ঝড়, ওর মনেও ঝড়।"

আমি ভাবছি নিজেদের বিপদের কথা। চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "শম্ভুর সঙ্গে আড়ালে তোমার কি কথা হ'ল জানি নে। আসন্ন বিপদের কথা কি বলে গেল, তাও জানি নে। আমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখা ভাল কিনা তুমিই জান।"

মৃদু হেসে বিনুদা বললেন, "অন্ততঃ কিছু জানা থাকা ভালই। সমিতির একটা বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আমাদের ভিতর থেকে একজন লোক গোয়েন্দা পুলিশকে সব কথা বলে দিচ্ছে, শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ তাদেরই লোক হয়ে গেছে। লোকটা অনেককে চেনে এবং অনেক খবর রাখে। যাই হটুক, তোকে বিপদে পড়তে দেব না। সময়মত সবই জানতে পারবি। এখন আর এসব কথা নয়।"

তারপর বিনুদাকে এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলাম না। তবে মনের ভিতরটা খচখচ করছিল, ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললাম, "বিনুদা, আমি কি কেবল নিজের বিপদের কথাই ভাবছি!"

"নারে না, কেন মিছিমিছি দুঃখিত হচ্ছিস। নিজের বিপদের কথাটা ভাবলে দোষ হয় না, বিপদকে ভয় করলেই হয় দোষ!" তারপর আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলিলেন, "এসব কথা থাক, এখন ঘুমিয়ে পড় দেখি।"

কিন্তু মনটা আমার আশঙ্কায় ভরে রইল।

বাইরে উদ্দাম প্রকৃতির উল্লাসে আঁধার যেন সচকিত হয়ে উঠেছে! এ কি আমাদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি নয়! এই জীবনের কি সুষ্ঠু পরিণতি নেই! শম্পা দেবীর ভবিষ্যৎ কি বিমুদার সঙ্গে জড়িত হ'ল! "আচ্ছা বিমুদা, ছেলে আর শ্বশুর নিয়েই কি শম্পা দেবীর ভবিষ্যৎ কাটবে! ও কি পারবে সুখী হতে এই পথে! আমার খুব বিশ্বাস একমাত্র তুমিই ওকে সুখী করতে পারতে।"

বিমুদা গম্ভীর হয়ে বললেন, "নীতীশ, ও আমার একটা প্রধান ভাবনা। কিন্তু ওকে সুখী করতে গিয়ে আর সব ত ছাড়তে পারি নে! সবাইকে নিয়েই সুখী সমাজ গড়ে তুলব। তাইতেই শম্পাও সুখী হবে, আমিও সুখী হব।

"কারুর ব্যক্তিগত সুখদুঃখ যদিও তুচ্ছ করবার মত নয়, তবু তার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি করা কিম্বা তার চিন্তা করাও অন্যায়। যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ঘুণে ওর জীবন শতছিদ্র তাকে উৎখাত করে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের কাম্য। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ এর কাঠগড়ায় বলি দিতেই হবে!"

আমি বললাম, "কিন্তু ইংরেজ ত আর এ দেশে চিরকাল থাকবে না! একদিন ত আমাদের ঘর বাঁধতেই হবে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-দেরও ত ব্রতে সফলতার পর ঘরে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

বিমুদা হেসে বললেন, "যুদ্ধশেষে তারা যখন কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে বলে মনে করলেন তখনও কিন্তু জীবানন্দ ও শান্তি গৃহে ফিরে যান নি, তারা গৃহী হন নি। তারা সন্ন্যাসী থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছিলেন, দেশের যাতে মঙ্গল হয় দেবতার কাছে আরাধনা করে সেই বরই মেগেছিলেন।

"ঘর ভাঙলেই যেমন আবার নতুন ঘর আপনা থেকে গজিয়ে উঠে না, তার জন্য চাই কাঠ, খড়, নতুন মালমসলা আর নিষ্ঠা, তেমনি ইংরেজ গেলেই সুরু হবে আমাদের সত্যিকারের উদ্যোগ-পর্ব্ব। এই সাধনায়ই আমাদের জীবন কেটে যাবে।"

এক ঝলক বেগুনি আলো ঘরকে মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত করে গভীর আঁধারে ডুব দিল। মড় মড় করে একটা গাছের ডাল ভেঙে যাওয়ার শব্দ এল। বিমুদা বললেন, "শুনতে পেলি চার-দিকে কেবল ধসে পড়ার আওয়াজ···কিন্তু আর কাব্য নয়, আর আমরাও ডুব দেই ঘুমের অতলে। কাল কপালে কি আছে কে জানে!"

সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন ঝড়বাদল থেমে গেছে—আকাশ তকতকে নীল প্রথম আলোর রেশমী আভায় দীপ্ত। গাছপালা নীরব নিথর—পাতা থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে জল, যেন বনানীর শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য।

শরীর মন বেশ ঝরঝরে। বিছানার বসে আছি বালিশ আঁকড়ে ধরে—হাতমুখ ধোয়ারও আর তাড়া নেই। এক বৃদ্ধের গলার আওয়াজ নয় কি! হাঁ ভাই ত! ক্রমেই আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে আসছে; এবার যেন একেবারে বাড়ীর উঠানে—"মা, মা, কৈ গো তুমি মা আমার!" সঙ্গে সঙ্গে শিশুর গলার একটু আওয়াজও যেন কানে এল। চমকে উঠলাম। এই ভোরে কারা এল রে বাবা!

বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে যাব, দেখি শম্পা দেবী আলুথালু বেশে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন! ব্যাপার কি! আমরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেলাম বারান্দায়। এমনি কিছু দেখতে হবে এ আশাও করতে পারি নি—একটি শিশু শম্পা দেবীর গলা জড়িয়ে ধরে বলছে, "মা, মা, মাগো!"

শম্পা দেবীর বুকজোড়া তার সন্তান আর তিনি নিজে বৃদ্ধ শ্বশুরকে জড়িয়ে ধরে। কারুর মুখে কথা নেই—নিরুদ্ধ অভিমান কথার দুয়ার বন্ধ করে রয়েছে মনে হয়। চোখ ফেটে বেরিয়ে এল মনের আবেগ।

শম্পা দেবীর হাত ছেড়ে বৃদ্ধ মাটিতে বসে পড়লেন। শম্পা দেবী নিশ্চল! বিমুদা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে বৃদ্ধকে পাঁজাকোলা করে আমাদের বিছানায় এনে শুইয়ে দিয়ে আমায় জল আনতে বললেন।

কিছু সময় অনবরত জলের ছাট দিতে লাগলেন। একটু বাদে বৃদ্ধ চোখ মেলে তাকালেন—ততক্ষণে শম্পা দেবীও ঘরের মধ্যে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন ছেলেকে সবলে বুকে চেপে ধরে। বৃদ্ধ চোখ চেয়ে শম্পা দেবীকে দেখতে পেয়ে—"ও, হাঁ, না, আমি ঠিক অজ্ঞান হই নি! কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। অমনি আমার মাঝে মাঝে হয়!"

বিমুদা বললেন—"আপনি এখন কথা না বলে চুপ করে একটু বিশ্রাম করুন।"

"বিশ্রামের ডাকের জন্যই পথ চেয়ে আছি রে বাপ···"

"আপনি ওসব কথা বলছেন কেন?"

"তা জিজ্ঞেস কর ঐ আমার পাগলী মাকে কেন ও ফেলে এল ওর দু'ছেলেকে এমনি অসহায় অবস্থায়। কি অপরাধ করেছিলাম আমরা! কেন ও চলে এল কোন কথাই না বলে। তাই এসেছি জবাব চাইতে। নইলে কি বালাই পড়েছিল এই ঝড়বাদল মাথায় করে এমনি এমনি ভাবে ছুটে আসবার! আমি না হয় ওর পেটের ছেলে নই, চেয়ে দেখুক ওর পেটে ধরা ছেলের মুখপানে। দাদুভাই আমার না খেয়ে খেয়ে শুধু কেঁদেছে। গাঁয়ের যাকেই দেখেছে তাকেই জিজ্ঞেস করেছে মায়ের কথা! ওরই মত আর একটি মেয়েকে দেখে মা মনে করে দৌড়ে তাকে ধরতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে···"

বৃদ্ধ থেমে গেলেন। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে, মনে হ'ল

আরও যেন কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু আবেগ রুদ্ধ করেছে তার কণ্ঠস্বর !

শম্পা দেবীর ঠোঁট দুটি কাঁপছে—বুঝি ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। তিনি হাসবার চেষ্টা করে ছেলের লুকানো মুখ সামনে ধরে তুলতে চাইছেন। অনেক চেষ্টায় তার মুখ তুলে ধরতেই সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল "মা" "মা" বলে—"কেন আমায় ফেলে এলে মা···"

খুব তাড়াতাড়ি শম্পা দেবী ছেলের মুখ তার বুকে সবলে চেপে ধরলেন—মনে হ'ল ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

মনে হ'ল বিনুদা এ অবস্থা আর বেশী দূর এগোতে দিতে চাইবেন না। তিনি শম্পাকে উদ্দেশ করে বললেন, "আর একটুও দেরি করো না শম্পা, চট করে ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেল ত। আজ ক'দিনের টানা-হ্যাঁচড়ায় ওরা একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন !"

শম্পা দেবীর যেন সংবিৎ ফিরে এল।

তিনি অনেক কষ্টে ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে বললেন,"লক্ষ্মী-মণিটি, তুমি তোমার দাদুর কাছে বস দেখি, আমি এই চট করে তোমাদের সবার খাবার তৈরি করে ফেলি।"

"আয় দাদুমণি আমার কাছে আয়"—হাত বাড়ালেন বৃদ্ধ।

"না, না, আমি কিছুতেই মায়ের কাছ থেকে যাব না। মা আবার আমায় ফেলে পালিয়ে যাবে"—আপত্তি জানায় ছেলে।

শম্পা দেবী ছেলের গাল টিপে দিয়ে বলেন, "নারে না···।" কিন্তু পারলেন না তাকে রেখে যেতে। হাত ধরে মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ওর ঘরে চলে গেলেন।

বিনুদা বিছানাপত্র আর হাতের কাছে জামা-কাপড় যা ছিল সব জড় করে বৃদ্ধকে তাকিয়ার মত করে দিয়ে তার ওপর হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলেন। বৃদ্ধের আপত্তি টিকল না, দেখে মনে হ'ল তিনি চোখ বুজে চিন্তাসাগরে ডুব দিলেন। হঠাৎ দিদিমার গলার আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠলাম। পাশের ঘর থেকেই কথা ভেসে আসছিল—

"হ্যালো শমি, আজ সকাল থেকেই এত চেঁচামেচি কিসের। ঐ ছোঁড়ারা কোন হাঙ্গামা বাধাল নাকি! যত বিপদ কি বাপু আমাদের জন্যই জমা হয়েছিল নাকি?"

"এ্যা, দাদুভাই না, হ্যাঁ দাদুভাই ত আয় আয় মাণিক আমার। কার সঙ্গে এলি? বুড়ো তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? আঃ হা হা মাণিকের আমার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। যাবে না, যে মিনসের হাতে পড়েছে। এই সোনার চাঁদকে কি ফেলে আসতে হয়, ঐ পাজি হতচ্ছাড়ার কাছে? আমি তখনই কত বলেছি, নিয়ে চল, খোকাকে নিয়ে চল। খোকাকে বুকে করে বুকের জ্বালা কিছু নেবাতে পারবি।"

"চুপ চুপ দিদিমা, ওর দাদু সঙ্গে এসেছে।"

"কি বললি ও বুড়ো মিনসে এখানেও ধাওয়া করেছে, দূর দূর, একেবারে দূর করে দে। ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।"

"তোমার পায়ে পড়ছি দিদিমা, হাজার হলেও সে তোমার কুটুম্ব।"

"কুটুম্ব না হাতী। তোর কপাল গেল, বাপের সংসারটা ছারে খারে দিল, দেশান্তরী হয়ে ওরা আজ কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে কে জানে, তার সঙ্গে আবার কুটুম্বিতে—মুখে আগুন !"

খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার সুরু হয়, "আমার মুখ চেপে আর কত বন্ধ করবি। এ রাজ্যের কে না জানে।"

"দিদিমা, তোমার পায়ে পড়ি। কুটুম্বকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে বদনাম হবে যে।"

"একথা ঠিক। আর যে গুণ থাক আর না থাক, বদনাম রটাতে একটুও পিছ-পা হবে না। যা তবে যা ভাল করেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দে গিয়ে। আমি ওর মুখ কিছুতেই দেখব না। কিছুতে না।"

ক্রমশঃ
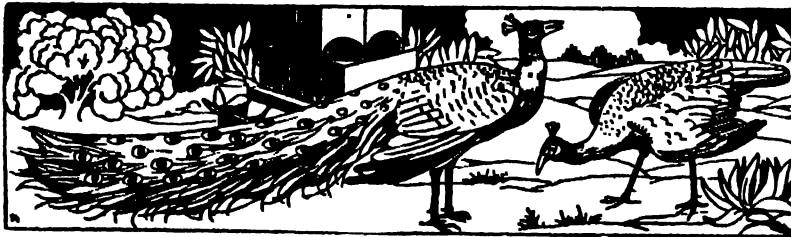
হিজলীর উপভাষা

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

হিজলীর উপভাষা সম্পর্কে ছুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর* ঐ অঞ্চল হইতে কয়েকটি চিঠি পাইয়াছি। জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন—"হিজলীর উপভাষা যেমন সংরক্ষণশীল, তেমনি প্রগতিশীলও বটে। এখানে যত সহজে শব্দের বিবর্তন ঘটে, বঙ্গের সর্বত্র তেমন সুলভ নয়। যথা—অভিমান<আইমান; গভীর<গইরা ইত্যাদি।" আর এক বন্ধু জানাইয়াছেন—"আপনি 'ঠিয়া'কে উড়িয়া শব্দ বলিয়াছেন। হিজলী বা মেদিনীপুরের ঠিয়া শব্দ উড়িয়াপ্রভাব-জাত হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন বাংলায় 'দাঁড়ানো' অর্থে 'থিয়া' শব্দ পাওয়া যায়। যেমন, 'পুনি বকুলের তলে হইলেক থিয়া'।—গোরক্ষ বিজয়, সেখ ফয়জুল্লা।" একথা সত্য যে, একজন ভ্রাম্যমাণের পক্ষে নূতন অঞ্চলের ভাষার নিখুঁত আলোচনা সম্ভবপর নয়; অসতর্ক মুহূর্তে তাঁহার হাতে দু'একটি কথা বাদও পড়িয়া যাইতে পারে। স্থানীয় বা দীর্ঘদিন উপনিবিষ্ট কোন ভাষাতাত্ত্বিকই প্রাদেশিক ভাষার সার্থক আলোচনা করিতে পারেন।

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা প্রমীলা দেবীর আহ্বানে মেদিনীপুরের মেয়েলি ছড়া ও প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি তৃতীয় বার হিজলীতে যাই। মেয়েলি ছড়া সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে, এক্ষণে হিজলীর উপভাষা সম্পর্কে যে দু'একটি কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে অথবা নূতন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই বলিতেছি। হিজলীর দেশজ শব্দাবলীর তালিকা আমার পক্ষ হইতে শেষ করিতেছি।

পারিপার্শ্বিক ধ্বনির প্রভাবে হিজলী প্রদেশে কোন কোন তৎসম বা বিদেশী শব্দের রূপান্তর ঘটে। যেমন নর্ক<নরক। এখানে 'স্বর্গ' শব্দের ধ্বনি প্রবাহ বর্তমান। লৌকিক হিন্দীতে 'নর্ক' শব্দ পাওয়া যায়। ঐরূপ 'সর্ম'<ফারসী 'শ-রম' ইত্যাদি।

হিজলীর উপভাষায় দু'একটি শ্রুতিধ্বনি (Glide) মিলে অর্থাৎ দ্রুত উচ্চারণের ফলে পদ মধ্যে এক নূতন ধ্বনির সৃষ্টি করে। যথা—বিবর<বিষর। তুলনীয়—বৈদিক 'সুনর'<সং 'সুন্দর'; সং 'বানর'<প্রাচীন বাং 'বান্দর' ইত্যাদি। (ডক্টর সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' দ্রষ্টব্য।)

গতবারে আমি 'বট' শব্দের আলোচনা করিয়াছি। ঐ প্রসঙ্গে একটি কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ধলভূম-মানভূমের ভাষার ন্যায় হিজলীর উপভাষায়ও প্রশ্নবাচক 'কিব কিব' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কেদারনাথ মণ্ডল-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও ইহার ব্যবহার দেখিয়াছি। যথা—'কিব কিব করিয়া আপন ভাষা কহে।' কেহ কেহ মনে করেন, 'বট' শব্দের 'ট' লোপ পাইয়া 'ব' অক্ষরটি 'কি' পদের সহিত যুক্ত হইয়াছে। আমি ইহা মনে করি না। আমার ধারণা *কিয়<কিব্ব<কিব: তুলনীয় পুয়<পুব্ব<পিব্ব<হিন্দী 'পিব'। বর্গের প্রথম বর্ণের পরিবর্তে তৃতীয় বর্ণের দৃষ্টান্ত কিছু কিছু মিলে, যথা, উকি—উগি; কাক—কাগ ইত্যাদি।

হিজলীর উপভাষায় যেমন 'উ'কারের প্রবণতা আছে, তেমনই কোথাও কোথাও 'ও'কারের দিকেও বেশ ঝোঁক দেখা যায়। যথা, কুকুর—কোকর, মুগুর—মোগর ইত্যাদি।

হিজলীর প্রাদেশিক শব্দাবলীর (খেজুরী থানার বলাই উচিত) তালিকা দিতে আশঙ্কা হয়। বিভিন্ন জাতির (caste) মধ্যে শব্দের পার্থক্য আছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ত বটেই। প্রবীণেরা যাহা বলেন, নবীনেরা তাহা স্বীকার করিতে চান না। ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছেন, "বাংলা ভাষায় শত শত তদ্ভব ও দেশী শব্দ অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অনার্য (মোন-খের কোল বা দ্রাবিড়) শব্দ গ্রাম্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেই সকল শব্দ এখন অনাদৃত, কৃষক ও অজ্ঞ নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ। বহু স্থানে শহরের ভাষার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারসীর চাপে পড়িয়া এই শব্দ লোপ পাইতেছে।…কিন্তু এই সকল তদ্ভব ও দেশী বা অজ্ঞাতকুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার ও জাতির ইতিহাস লুকাইয়া আছে।" (সা. প. প., ১৩৩৫)

আমি এখানে যে শব্দের তালিকা দিলাম উহা হিজলীর কোন-না-কোন অংশে আজিও প্রচলিত, একথা দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি। কোন কোন বন্ধু অনুযোগ জানিয়াছেন বলিয়াই এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

এবারকার শব্দ সংগ্রহে বন্ধুকন্যা শ্রীমতী বুলবুলের ও শ্রীতড়িৎকুমার বসুর বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি এবং শব্দগুলির আলোচনায় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ আমার সহায়ক হইয়াছে।

শব্দসূচী:

আইল পাইল দেওয়া—ঘন ঘন যাতায়াত করা।

আকচাক—হঠাৎ; যথা—সে আকচাকে সংবাদ দিল।

আগা—খলে, বস্তা; যথা—কাপড়টা যেন আগাচট।

আখোদ (আরবী)—বিধবার বিবাহ।

আড়া—পাখীর দাঁড় তুল: স্বর্ণময় ঘর দেখিতে সুন্দর পক্ষী বসিবার আড়—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

আড়ানী—বৃহৎ পাখাজাতীয় আতপ নিবারক বস্তু। যথা—তপনের আতপে আড়ানী ধরে মাথে।—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।

আনক [<ফার্সী আয়নাক]—আয়না

আনাট্টা—আনাড়ী

---

* হিজলীর উপভাষা, প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ ও পৌষ ১৩৬০

আন্দারে [<অন্দর]—ছাওনের নীচের খড়।

আবঁট গোরু—কৃষিকাজে অপটু অল্পবয়স্ক গোরু। বীরভূমে 'আবোর গোরু।'

আমলানো [<অম্ল]—বাসি। ২৪ পরগণায় 'এলানো'।

আমসরা—আম্রপল্লব। আমশকা—বর্ধমান।

আলতাবোল—জলকচু।

আলাতানি (আকুলথা আনি)—অগোছালো; যথা—মেয়েটা বড় আলাতানি।

ইলচি বা চিক্‌বালি—উপহাস করা। যথা—গরীব দেখি ইলচি করেছে।

উথড়া—মুড়কী।

উগাল—বাঁধ; তুল: 'আরম্ভে উগালা গেল এক শত কুড়া'। শিবায়ণ, রামেশ্বর।

উজ্‌গারা—জাগরণ। সমজাতীয় 'উজাগর' শব্দ প্রাচীন বাংলায় প্রচুর পাওয়া যায়।

উঝাল—একপ্রস্থ, যথা—এক উঝাল বেগুন হই গেলা।

উড়ুস—চিটা ধান, আগড়া

উলি—ছাঁচ, যেখান দিয়ে জল পড়ে।

কছম (ফার্সী কিসম্‌)—ধরণ; যথা—আচ্ছা কছমের লোক।

কঁকল—ডগা।

কাইজ্জা [<কাজিয়া]—ঝগড়া।

কাকতল—বগল। তুল: হাতে গলে বান্ধি তাকে নিব কাঁকতালি—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

কাটাভোকা—কাঁটা ফোটা। ফুটা অর্থে 'ভুকা' শব্দ কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে।

কাড়া [<কাণ্ড]—মাকুজাতীয় দ্রব্য।

কান্দল বা কাঁদাড়—গৃহের পশ্চাৎভাগ।

কাম্‌ড়া—ঘরের চালে লম্বিত সরু বাখারি।

কাঁয়া—পিচুটি। প্রাচীন বাঙলায় শব্দটি পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে।

কায়কা—ঘটের মুখ।

কিরমিটি—কৃপণ; যথা—বাপরে, কি কিরমিটি! ২৪ পরগণায় 'কিপ্টে', 'কিট্টে'।

কুণ্ড— (১) গুচ্ছ; যথা—'সব কুণ্ডঘাটে রাধা মোর যাতাদান' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। (২) অনুমান।

কুমরী—

কুসনি—ধাই

কেজুকা—কেন্নু

কোটরানো—কার্পণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করা

কোপতুল [<কবুতর]—ঘুঘু

ক্যাট্‌লা—হুকার নলিচায় ভিতরকার ময়লা। তুল: 'কাট'—২৪ পরগণা। যেমন তেলের কাট পড়া।

ক্ষীরা (ফার্সী)—শশা

খুঁকি—বিষম লাগা; যথা—আস্তে জল খা, খুঁকি লাগবে। তুল: খুক্ খুক্।

খতুয়া—উর্বর। ২৪ পরগণায় 'খত' অর্থে সার।

খাইট—(১) খাজ; (২) কোন দ্রব্য রাখায় নির্দিষ্ট স্থান।

খাটাল—গোশালার নিকটে যেখানে প্রতিদিন গোরু বাহির করা হয়। ফরিদপুরে খাটাল অর্থে 'মেঝে'।

খুঁটি—ক্ষুদ্র পাত্র

খেড়িয়া [<খড়্গধারী ?]—মুসলমান। গাজির গানের মূল গায়েনকে 'খেড়ো' বলে। ('যশোহর খুলনার ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।)

খোত্তানো [<*খন্ত<খণ্ড]—ভেংচি কাটা

গজড়—বাঁশের পাশ হইতে উৎপন্ন নূতন বাঁশ। 'গজল'—২৪ পরগণা।

গণ্ড [<গজ্জ]—গণ্ড

গাভাড়া—সিঁড়ি। তুল: গাভয়াট<গর্ভাগার কাষ্ঠ।

ঘম্‌—ঘোমটা। তুল: অড়ঘোমা টানি ঈষৎ ভ্রুকুটি করিয়া ইত্যাদি—ভক্তমাল, লালদাস নামান্তরে কৃষ্ণদাস।

চখা—পরিষ্কার। ২৪ পরগণায় 'চকোশা'।

চড়কা—বজ্র; যথা—'চড়কা চড় চড় করিয়া পড় পড় বড় বড় পাষাণ পড়ে'—শিবায়ণ, রামেশ্বর

চপট—ব্যস্ততা, যথা—চঞ্চল চপট…ভরে যেন তারা খসে কিবা সম মলয় পবন—রূপরামের ধর্মমঙ্গল।

চপা—আবর্জনা। তুল: এঁটো চোপা খাইলে নষ্ট কুলের খাপার—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

চহট [<চৌহট্ট]—অত্যন্ত; যথা—লোকটা চহট কালো।

চাঙ্গারি—মাচান। ঢাকায় 'চাঙ্গ'।

চাটা—আসন; তুল: চাটাই—২৪ পরগণা

চাড়—ভড়ং; যথা—'চাড়ে মৈলা রাজার ঝি…সেঁকতে গেল আড়াই টাকার ঘি'।

চাড়ুয়া—মাছধরা যন্ত্রবিশেষ।

চাপট—কবাট। তুল: চাপ—কলিকাতা।

চুনী—কাতনা, বড়শীর রজ্জুতে ভাসমান শরখণ্ড।

চেরাগদান (ফার্সী)—দীপবৃক্ষ, পিলসুজ।

ছাট—দুটি বাখারি দড়ি দিয়ে বেঁধে জড়ো করা।

ছাঁদ—গাভীর পাজান।

ছিয়া [<ছেদ<ক্ষেপ]—খণ্ড। ২৪ পরগণায় 'ছে'। যেমন, এক ছে বাঁশ।

ছিলকা— (১) টুক্‌রা। তুল: ছিলা—কলিকাতা। যেমন, কাপড়ের ছিলা। (২) গাছের ছাল। তুল: ছিল্‌তা—বর্ধমান।

ছুটিয়া—উচ্চিংড়া, পতঙ্গবিশেষ।

ছুছুক—(১) গবাদি পশুর কর্তিত লেজ,
(২) ছোঁয়াচে

ছেঁউড় কাপড়—শ্রাদ্ধের কাপড়।

ঝুঁট—হোঁচট: যথা—ঝুঁট খাই পড়ি গেলি?

টাউক—তাল আঁঠির হাতা।

টাঁকা—পরখ করা; যথা—'নিশ্বাস টাঁকিয়া থাই সেখাতো ন গেল।'—বত্তিলালের পালা, কিন্নর

টাট—[<টেটঠ<ফার্সী Tasht]—গোরুর জাবনা খাবার পাত্র। বর্ধমানে তাম্রনির্মিত পূজার পাত্রবিশেষকে 'টাট' বলে। মেদিনীপুরে ইহাকে বলে 'তাট'।

টুই—চালের মটকা। প্রায় সমার্থক 'টুঙ্গি' শব্দ প্রাচীন বাংলায় প্রচুর মিলে।

ঠস—ভঙ্গুর। ঠসক—২৪ পরগণা।

ঠোসা—ফোস্কা। ঠোলা—২৪ পরগণা।

ডঁক—গাছের বা পাতার ডগা

ডগর—পাইক। তুলঃ অসমীয়া 'ডাঙ্গরিয়া', অর্থ ভদ্রব্যক্তি, মহাশয়।

ডরা—নৌকার একধার। ফরিদপুরে নৌকার খোলকে 'ডরা' বলে। তুল: দধির চুপড়ী বাধা থুইল ডরাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ডাক্চা—পত্রদণ্ড (যেমন কলার)

ডাক্‌রা—(ডাক+রব?)—উচ্চস্বর। তুল: সীতা পরীক্ষা লইব সর্বত্রে ডাকরি।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত)

ডাঙ্গানো—প্রহার করা; নাম ধাতু ডাং হইতে। বীরভূমে 'ডাংরানো'

ডাবানো [<দর্বী?] জারিত করা

ডুম্‌নী—কপাটের সরঞ্জামবিশেষ

ডাম্‌রা—চোখ (ব্যঙ্গার্থে); যথা—ডাম্‌রাকে হাঁ করি রাখছু কেনি? পশ্চিমবঙ্গে মেয়েলি গালি 'ড্যামরা চোখী' অর্থে ডাগর চোখবিশিষ্ট

ঢাম—দেমাক

তর—কাপড়ের পাড়

তল্‌কিয়া—ছলে', চলকে'। যথা—তোর হাঁটার সাপটে মাটি গুলা তলকে উঠবে।

তাকড়া, তাকড়ি [<হিন্দী তগড়া]—বাচলতা। তুল: ফার্সী 'তগ'

তাটী—মুখ; যথা—'ছাগলের তাটী মুকাইয়া দিল বুড়ি':—সারদামঙ্গল, আত্মারাম

তুথা—বিবিধ দ্রব্য

তেড়—কলাগাছের চারা। বীরভূমে 'তেউড়ি'

তেলমারা—আরসোলা। তুল: তৈলাচোরা—ঢাকা; সং তৈলচর্চিকা

থোট [<ত্রোটি]—নিরোষ্ঠ। দ্বাদশ শতকে সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টীকা সর্বস্বে' শব্দটি দেখিতে পাওয়া যায়। কেদারনাথ মণ্ডল-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও মিলে।

দুনী [<দ্রোণ]—গোদোহনের জন্য ছোট মাটির হাঁড়ি

নাওনি—লাউ

নাকড়ি—বৃক্ষবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শব্দটি পাওয়া যায়

নেঙ্গুয়া—হাত; যথা—আমার শাপে তোর নেঙ্গুয়া খসি পড়বে। ২৪ পরগণায় বাঁ হাতকে 'নেঙ্গা হাত' বলে।

নেড়ো—তামাক খাবার জন্য খড়ের যে গুটিতে (Ball) অগ্নি সংযোগ করা হয়, সেই গুটি।

পয়না—জলনিকাশী নালা। সুন্দরবন অঞ্চলেও কথাটির প্রচলন আছে। তুল: পয়নালা।

পাকুটি—পাটকাঠি

পাখড়া—শুকিয়ে খড়ি মারা; যথা—তোর গায়ে পাখড়া ফুটবে। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গলে' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়।

পাগা—গোরুর দড়ি (শিঙে ব্যবহৃত)

পাগাড়ি— „ „ (গলায় ব্যবহৃত)

পানিটোন—চালের নিম্ন প্রান্ত, যেখান দিয়ে জল পড়ে।

পালো [<পল্লব]—হরিদ্রাজাতীয় বন্য উদ্ভিদ্‌জাত শুভ্র মণ্ড

পিছা [<পিচ্ছ]—চোখের পাতার লোম

পিছা মারা—পলক পড়া

পুরচাক—বেষ্টিত

ক্যাচকল—জটিলতা। ২৪ পরগণায় 'ক্যাচাং'।

ক্যারাটি—বাখারি

বলি, বল্লী—বোলতা। বল্লা—ফরিদপুর। হিন্দী 'বর্‌রা'।

বাউর—আমকসির উপরকার শক্ত আবরণ

বাড়োই [<বর্ধকী?]—যে গো মুষ্ক ছেদন করে।

বাতানো [<বার্তা]—ব্যবস্থাপন করা; যথা—'যে দেশে আছয়ে কন্যা দিব বাতাইয়া'।—বাঘাম্বরের পালা, 'দ্বিজ কবি।'

বাম্পড়ি—বাটপাড়। তুল: ভর্ডি চড়ি নাচঅ ডোম্বা বাপুড়ী—চর্যাগীতি।

বালা—(অষ্ট্রিক শব্দ)—পাতা (যেমন কলার বালা)

বিঞ্জিনী—ব্যজনী। তুল: খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বিটবা—বাউণ্ডুলে

বিড়া—প্রমাণ করিয়া দেখা; যথা—'সজিনীর কথা তবে বিড়িব এক্ষণে'—মদনমঞ্জরীর পালা, দয়ারাম।

বিবশে যাওয়া—এক হাঁড়ি ভাতের অর্ধেক সিদ্ধ হওয়া, অর্ধেক অসিদ্ধ থাকা।

বিবর—গর্ত

বিরকালি—ব্যাকুলতা; যথা—তুই অত বিরকালি দেখাউটু কেনি?

বিলাক (অসমীয়া)—সমূহ। তুল: বিলকুল।

বীচে বীচে—ভিতরে ভিতরে

বেন—ধানের চারা

বেলা বাটী—বড় বাটী

বোলবালা [<হিন্দী বোলবোলা]—প্রসার; যথা—বোলবালা হতে হয় বিপত্তি খণ্ডায়—মনোহর কাসরায় পালা, অজ্ঞাত

ভাটে—দিকে; যথা—'জান চলি গেলা উপর ভাটে।'

ভাত্‌ড়ি—খুদের জাউ

মাদা—বীজরোপণের স্থান। ফার্সী 'মাদা' অর্থে স্ত্রীজাতীয়।

মিনাই, মিনাচি—বিনামূল্যে। প্রাচীন বাঙ্গালায় বিনা অর্থে মিনি শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়।

মিয়লা, মিল্‌মিলি—হামজাতীয় রোগ। তুল: মিল্‌মিলা—মাণিক গাঙ্গুলির শীতলা-মঙ্গল।

মুজা [<মুহ<মুখ]—মুখোস

মুন্না [<মণ্ডল]—বৃত্ত

মুন্নীমাছ—সামুদ্রিক মৎস্যবিশেষ। তুল: মৈলীমচ্ছ—প্রাকৃত পৈঙ্গল।

মেচনা—মৃত্তিকানির্মিত প্রশস্তমুখ পাত্র যাহাতে গবাদি পশুর জাব দেওয়া হয়: ২৪ পরগণায় 'মেচলা'।

মেড়িয়া—ঐ, যাহাতে ধান ভিজাইয়া রাখা হয়।

মেঠে—রূপার বালা; যথা—'হাতে মেঠে মাথে জটা যোগিনীর বেশ;—শিবায়ণ, রামেশ্বর

মোহর—ঘণ্ট (ব্যঞ্জন)

রাকা—ব্যয়কুণ্ঠ

লেই করা [<লেপ ?]—ভক্ষ করা

লেথুড় দেওয়া—সাম্নিবদ্ধভাবে যাওয়া

লোকদি [<পুঃ বাং নগদী]—দারোয়ান

শকপকিয়ে ওঠা—অগ্রে বাধিয়ে ওঠা

শামা [<শাম]—[ঢেঁকির] মুষলের তলা। তুল: সুবর্ণের শামী চিয়ার বান্ধিল কাম।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

শুবে [ক্রময়তে<সুয়াদি<সুয়াই<সুবই<শুবে]—শোনায় যথা—এত ডাকেটে, তোকে শুবেটে নি?

শেঁয়াবল্লী—শেঁয়াপোকা

সড়া—পচা; যথা—'সড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে'।—চৈতন্যচরিতামৃত।

সঁতর—সতর্ক। তুল: বুলী চৌর পৈসে ঘরে পিট্রীক সন্তর করে তেন হুঠ বড়ায়ির বাণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সয়াল—বাঁধ, জাঙ্গাল। খুলনায় বনাঞ্চলে সরু মেঠো রাস্তাকে 'সয়লা' বলে।

সাউকুড়ি [<সাধুকরী]—সাধুতার ভান। হিন্দী 'সাহুকার'।

সাঁজা বা সাঁজাল—খড়ের বিড়া বা অন্য কোন পাত্রে আগুন রাখা। তুল: জয় জয় দেয় সখী যশোমতী চন্দ্রমুখী বলে কর আগুনি সাজাল।—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

সুখচুকলি—সরুচাকলি, পিষ্টকবিশেষ

সুঙ্গা—ছুঁচালো। তুল: শোঁয়া (যেমন ধানের)।

সুড়ঙ্গী—জাল বুনিবার জন্য যাহাতে সুতা জড়ানো হয়

হটর হটর—ঘন ঘন। ২৪ পরগণায় 'হট হট'।

হদ—দীর্ঘদিনের জমীভূত দাম

হলসা [<হিন্দী 'হুলাস'<উল্লাস]—হাসিখুসি; যথা—মনটা বেশ হলসা হচ্ছে।

হাঙ্গা—বস্ত্রাদি রাখিবার জন্য টাঙানো বাঁশ

হারাবাদি করা—বাজী রাখা

হ্যাংলা—মোটাবুদ্ধি।

"বাংলার লোক-সাহিত্য"

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের পলিমাটির ন্যায় এখানকার মানুষের সরস এবং উর্ব্বর চিত্তভূমিতেও ভাবের ফসল অনায়াসেই ফলিয়া থাকে। বাংলার লোক-সাহিত্য বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির সেই বৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক। বাঙালীজাতির প্রাণসত্তার প্রকৃত পরিচয় নিহিত তার লোকসাহিত্যে। নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতার মধ্যে, বিজাতীয় আদর্শে বিভ্রান্ত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের রচিত সাহিত্যে জাতির প্রাণ-ধর্ম্মকে কচিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, তাহার সন্ধান করিতে হইবে মুখ্যতঃ পল্লীর নর-নারীর দৈনন্দিন জীবনধারা এবং সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র জাতির দ্বারা লোকের মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত সাহিত্যে। আবহমান কাল ধরিয়া যে লোকসাহিত্যের ধারা সমগ্র দেশের চিত্তভূমিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার উৎস-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তবেই জাতীয় জীবনের বহুধাবিচিত্র বিকাশের নিগূঢ় রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হইবে পরিপূর্ণ মহিমায়।

বস্তুতঃ বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালীজাতির এক অপূর্ব্ব সম্পদ। এই লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গ—ব্রতকথা, উপকথা, রূপকথা, গীতিকা, ছড়া, পশ্চিমবঙ্গের পড়ুয়া, ভাদু, ঝুমুর; উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া; পূর্ব্ববঙ্গের জারি, ঘাটু প্রভৃতি লোকগীতি স্মরণাতীত কাল হইতে বাংলার অগণিত নর-নারীকে আনন্দদান করিয়া আসিতেছে—এই সকলের মাধ্যমে পরিবেশিত যে আনন্দসুধা বাংলার লোকসমাজ যুগ যুগ ধরিয়া পান করিতেছে, বাঙালীর জাতীয় জীবনের একেবারে মর্ম্মমূল হইতে তাহা উৎসারিত।

পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং সংস্কৃতির তীব্র রশ্মিচ্ছটায় বিভ্রান্ত শিক্ষিত বাঙালী একদা তাহার এই একান্ত নিজস্ব জাতীয় সম্পদের অফুরন্ত রস-মাধুর্য্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। চিরন্তন মানবীয় বৃত্তিসমূহকে ভিত্তি করিয়া রচিত, লোকগীতি ছড়া প্রভৃতি তখন তাহার রসচেতনায় সাড়া জাগাইতে সক্ষম হইত না। আজ হইতে প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বাংলা লোক-সাহিত্যের মণিকোষে সঞ্চিত মধুর সহিত শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয়সাধনের প্রয়াস পান তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করেন। তাঁহার 'লোকসাহিত্য' নামক পুস্তকখানি শিক্ষিত বাঙালীকে এক নিরুপম রসলোকের সন্ধান দেয়। তার পর যাঁহারা বাংলার এই বিলুপ্ত লোকসংস্কৃতির উদ্ধারসাধনে আত্ম-নিয়োগ করেন তাঁহাদের মধ্যে গুরুসদয় দত্ত, মৌলবী মনসুর উদ্দীন, পালাগান-সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রয়াসে বহু অমূল্য রত্ন আবিষ্কৃত হইয়া বঙ্গবাণীর পাদপীঠকে অপূর্ব্ব দ্যুতিতে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। লোকসাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর উপেক্ষামূলক মনোভাব তিরোহিত হইয়াছে, উত্তরোত্তর ইহার প্রতি তাঁহাদের উৎসাহ, ঔৎসুক্য এবং অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এতদিন ঠিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এ বিষয়ে গবেষণা ও অনুশীলন বাংলা-সাহিত্যে হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এই অভাব মোচন করিতে অগ্রসর হইয়া বাংলা সাহিত্যের একটি মহদুপকার সাধন করিলেন। বস্তুতঃ 'আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সমালোচনা' পদ্ধতি অনুযায়ী নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বাংলা লোকসাহিত্যের আলোচনায় পথিকৃৎ হইবার গৌরব তিনিই অর্জ্জন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে বাংলা লোকসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা কেহ কেহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে। সামগ্রিকভাবে বাংলার লোক-সাহিত্যকে বিচার করিবার প্রয়াসের পরিচয় বর্ত্তমান পুস্তকেই* সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গেল। বিশেষতঃ, বাংলার লোকসাহিত্যে ওরাওঁ, সাঁওতাল, কোচ, রাজবংশী, হাজং প্রভৃতি উপজাতি এবং আদিবাসীদের দান যে কত বেশী এবং তাহাদের ভাবধারা যে বাংলা লোকসাহিত্যের সহিত কিরূপ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া লেখক আমাদের উপেক্ষিত 'জ্ঞাতিদাদা'দের সহিত আমাদের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিয়াছেন এবং বাংলার লোকসাহিত্যকে তার নিজস্ব মহিমায় ও বৈশিষ্ট্যে স্বকীয় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

লেখক সংজ্ঞা ও প্রকৃতি অধ্যায়ে বলিয়াছেন—"বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদান ও ভাবের বিনিময়ের ভিতর দিয়াই লোকসাহিত্যের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। প্রাচীন কাল হইতেই বাংলাদেশ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সংস্পর্শে আসিবার ফলে ইহার মধ্যে এক সমৃদ্ধ লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।" পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো বা লড়কা-কোল প্রভৃতি অষ্ট্রিক বা কোল-ভাষী এবং ছোটনাগপুরের ওরাওঁ প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষী উপজাতি শুধু আমাদের প্রতিবেশীই নয়, জ্ঞাতিও বটে। (পাহাড়িয়া কাহিনী—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ও বলিয়াছেন, "আমাদের ব্যবহারিক ও মানসিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদিবাসীদের মধ্যে।" কাজেই বাংলার লোকসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাইতে হইলে এই সকল প্রতিবেশী আদিম জাতির লোকগীতি ইত্যাদির আলোচনা অপরিহার্য্য। বাংলার লোকগীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিকাশ ভাদুগানের সহিত দ্রাবিড় ও 'মুণ্ডা' (অষ্ট্রিক)-ভাষী উপজাতিসমূহের করম উৎসব উপলক্ষে গীত গানগুলির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া এই দুটি উৎসব যে মূলতঃ একই প্রেরণা হইতে জাত—বর্ত্তমান পুস্তকের লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কীর্ত্তনগান বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। লেখক কীর্ত্তনের জন্মকথা সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, কীর্ত্তনগান ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওরাওঁদের এক শ্রেণীর সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। সঙ্গীত অর্থে ওরাওঁ ভাষায় কীর্ত্তন কথাটির প্রচলন আছে। "ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওরাওঁদিগের নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীতের একটি অংশের নাম কীর্ত্তন।" দক্ষিণ-ভারতে কীর্ত্তন কথাটি প্রচলিত থাকায় লেখক মনে করেন যে, শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে।

এমনি ভাবে বাংলার পশ্চিম প্রান্তের অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠী, পূর্ব্বদিকের হাজং গারো খাসিয়া প্রভৃতি আর উত্তরদিকের কোচ রাজবংশী ইত্যাদি নানা উপজাতির সংস্কৃতি হইতে উপকরণ আহরণ করিয়া বাংলার যে লোকসাহিত্য রূপে রসে ভাবৈশ্বর্য্যে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ হইয়া, আপাতদৃষ্টিতে বহুধাবিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান সমগ্র বাঙালী জাতিকে নিবিড় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এক বিরাট পাদপীঠ রচনা

---

* বাংলার লোক-সাহিত্য—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য। ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য দশ টাকা।

করিয়াছিল তাহারই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিবেশটি বিধৃত রহিয়াছে—বত যত্নে রচিত, তথ্যসম্ভারসমৃদ্ধ এই বিরাট গ্রন্থের মধ্যে। বইখানি—সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, ছড়া, গীতি, গীতিকা, কথা, ধাঁধা প্রবাদ, পুরাকাহিনী এই কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। পরিশিষ্টে "বাংলা লোক-গীতির সুরবিচার" নামক অধ্যায়টি বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ ডক্টর শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক লিখিত। গ্রন্থে একটি শব্দসূচী দেওয়াতে ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুস্তকখানি একদিকে যেমন লেখকের বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি মাঝে মাঝে তাঁহার রস-বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াও মুগ্ধ হইতে হয়। লোকসাহিত্যের তিনি শুধু গবেষকই নহেন, এক জন সংগ্রাহক এবং রসবেত্তাও বটেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "...ইহার (লোকসাহিত্যের) সঙ্গে আমার যে যোগ তাহা হৃদয়ের পথে স্থাপিত হয় নাই, মস্তিষ্কের পথেই স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং আমার এই গ্রন্থে আমি বুদ্ধিজাত যুক্তিতর্ক দ্বারা লোক-সাহিত্যের রস-বিচার করিয়াছি, হৃদয়াবেগের বশীভূত হইয়া রসোদ্গার করি নাই।"

হৃদয়াবেগে আত্মবিস্মৃত হইয়া মাত্রাতিরিক্ত ভাবে রসোদ্গার লেখক করেন নাই বটে, কিন্তু এই রচনার সহিত হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নাই একথা মনে করিলে ভুল হইবে। এমন সহৃদয়তার সহিত স্থানে স্থানে তিনি লোক-সাহিত্যের রস-বিচার করিয়াছেন যে, সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহার ভাষা রসার্দ্র এবং রসনাংশ স্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। ছড়ার ব্যাখ্যায়, পল্লী-গীতিকাগুলির মর্ম্মোদ্ঘাটনে এবং পাত্রপাত্রীর চরিত্র-বিশ্লেষণে তিনি সুপরিণত রসবোধ এবং সহৃদয়-হৃদয়-বেদ্য রসপরিবেশন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত যে ঘাটুগান বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা লেখক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা পরম উপভোগ্য হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে অন্য কেহ 'লোক-নৃত্যের পরম বিস্ময়কর সৃষ্টি' ঘাটু-নৃত্য এবং ঘাটু-গানের প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি এমনভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের ত জানা নাই। মৈমনসিংহ-গীতিকার স্ত্রী-চরিত্রগুলির প্রাধান্যলাভের এবং বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠার মূল কারণ যে মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) আদিবাসী সমাজের প্রভাব, 'গীতিকা' অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া লেখক মৈমনসিংহ-গীতিকাসমূহের বিষয়বস্তুর উপর অভিনব আলোক-সম্পাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু লেখকের লোকসাহিত্যের আলোচনা শুধু মস্তিষ্কের চুলচেরা বিচারের মধ্যেই পর্য্যবসিত নহে; পল্লী-গীতি লোককথা ও কাহিনীর অন্তর্গূঢ় বেদনা এবং করুণা মাঝে মাঝে তাঁহার ভাবাবেগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে অত্যন্ত সংযত অথচ রসমধুর ভাষায়।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস লিখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'অসামান্য পারদর্শিতার' জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 'বাংলার লোকসাহিত্য' তাঁহার খ্যাতিকে সুদূরপ্রসারিত এবং বাংলা সাহিত্যবিষয়ক গবেষণাক্ষেত্রে তাঁহার আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। শুধু বাংলার লোকসাহিত্যের গবেষকদিগের নিকটে নহে; বাঙালী জাতিকে যাহারা ভাল করিয়া জানিতে চাহেন, বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া যাহাদের কাম্য, তাঁহাদের নিকটও গ্রন্থখানি অপরিহার্য্য এবং পরম আদরণীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 250-X52 B

গীতা প্রবচন—বিনোবা। অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। সুপ্রকাশন। অক্টোবর, ১৯৫৪। পৃ ২৬৮। মূল্য এক টাকা।
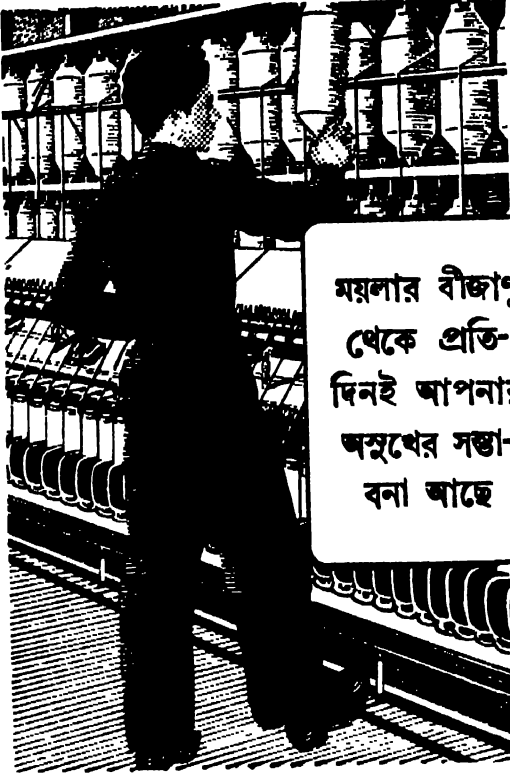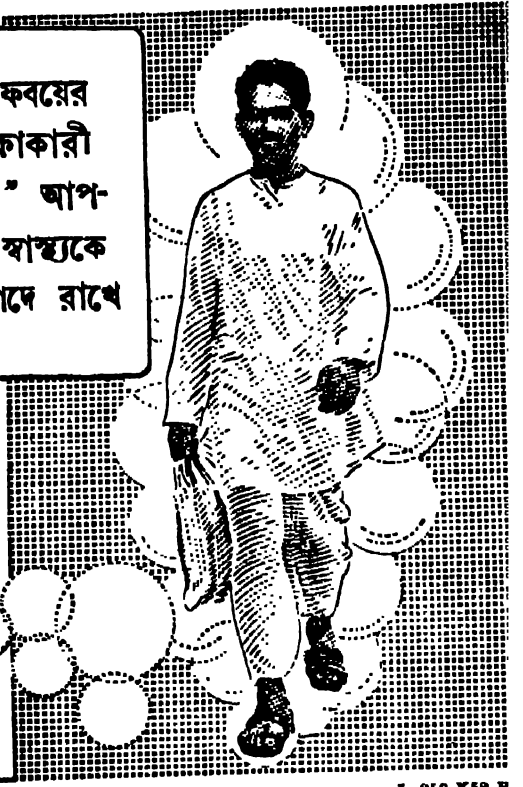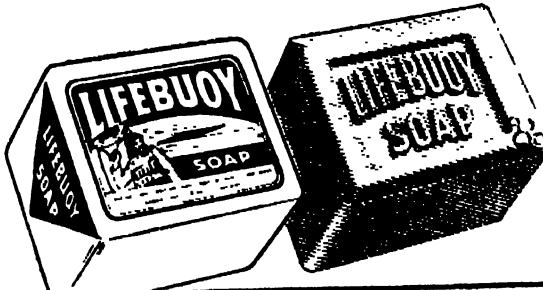
বিনোবাজীর ভূদান-যজ্ঞের পবিত্র ধূম আজ সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, সকলেই আজ বিনোবাজীর নাম ও ভূদান-যজ্ঞের সহিত পরিচিত। গীতা-প্রবচন পাঠে সেই পরিচিতি নূতন আকার ধারণ করিবে—যাঁহার সহিত যাঁহাদের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে তাঁহারা বিনোবাজীকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানিবেন। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, বিনোবাজী যেন কাছে বসিয়াই উপদেশ দিতেছেন। এমনি সুন্দর তাঁহার বলার ভঙ্গী! সার্থক তাঁহার কারাগৃহে বাস, ধন্য কারাবাসের সেই সকল সঙ্গী যাঁহারা তাঁহার মুখ হইতে এই অমৃতময়ী বাণী সেই সময়ে শুনিতে পাইয়াছিলেন। জীবনের বহু বিবিধ কথা, বেদ-পুরাণের মর্ম ও কাহিনী, সাহিত্য ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কত স্তরের উল্লেখ ইহাতে আছে, কিন্তু পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর কোথাও নাই—সহজ, সরল, "সহজপ্রবাহে"র লেখা, অনাড়ম্বর অথচ ঐশ্বর্যময় ভাবের এক বাঙ্ময় নিত্য পঠনীয়।

বিনোবাজী লিখিয়াছেন, "আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া 'গীতা-প্রবচন পরিপাক' করা চাই।" অতি সত্য কথা: এবং সামগ্রিক ভাব যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তাহার জন্য তিনি গ্রন্থমধ্যে কতবার পৌর্বাপর্যের রেশ টানিয়াছেন, 'বিভিন্ন অধ্যায়ের পরস্পর যোগসাধন করিয়াছেন। আদ্যোপান্ত না পড়িলে এই গ্রন্থপাঠের সফল পাওয়া যাইবে না। সুতরাং একাগ্রতা চাই, বার বার পড়াও চাই। খণ্ড ভাবে এখান-ওখান হইতে পড়িলে চলিবে না। তথাপি দুই-টি উক্তি এখানে দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না:

"আমি নিজকে ঊর্ধ্বে লইয়া যাইব এই সাহস রাখ। আমি ক্ষুদ্র সাংসারিক জীব, একথা ভাবিয়া মনের শক্তি খোয়াইও না। কল্পনার ডানা ছিঁড়িয়া ফেলিও না। কল্পনা বিশাল কর।...আমরা যতটা উঁচুতে উড়িতে পারিতাম ততদূর না উড়িয়া, নিজেদের কল্পনা ও ভাবনাকে বন্ধনে আড়ষ্ট করিয়া আমরা নিজেদের আরও নীচে ফেলিয়া দিই। হাতে পাওয়া শক্তি হীন ভাবনা হেতু নষ্ট করিয়া ফেলি। যেখানে কল্পনার পা-ই খোঁড়া করা হইয়াছে সেখানে নীচে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে কি? অতএব কল্পনার গতি ঊর্ধ্বমুখী হওয়া চাই। মানুষ কল্পনার সহায়তায় অগ্রসর হয়। তাই কল্পনাকে সঙ্কুচিত করিবে না।" (পৃঃ ৬২)

"আমাদের দৈনন্দিন জীবন, প্রতিক্ষণের জীবন দেখিতে সাধারণ হইলেও বস্তুতঃ সাধারণ নহে। তাহার মহান অর্থ রহিয়াছে। সমস্ত জীবনটাই এক মহান যজ্ঞকর্ম। তোমার নিদ্রা, তাহাও এক সমাধি। সর্বপ্রকারের ভোগ ঈশ্বরার্পণ করিয়া নিদ্রা গ্রহণ করিলে তাহা সমাধি নয় তো কি? স্নান করার সময় পুরুষসূক্ত আবৃত্তি করার রীতি আছে। স্নান-ক্রিয়ার সহিত এই পুরুষসূক্তের সম্বন্ধ কি তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন, খুঁজিলেই সম্বন্ধ দেখিতে পাইবেন। সহস্র যাহার বাহু, সহস্র যাহার চক্ষু সেই বিরাট পুরুষের সহিত আমার স্নানের কি সম্বন্ধ? সম্বন্ধ এই, ঘটি ভরিয়া যে জল তুমি মাথায় ঢালিতেছ তাহাতে হাজারো বিন্দু রহিয়াছে, সেই বিন্দু তোমার মাথা ধুইতেছে, তোমায় নিষ্পাপ করিতেছে, তোমার মস্তকে উহা আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছে।

"পরমেশ্বরের সহস্র হাত হইতে যেন সহস্র ধারা তোমার উপর বর্ষিত হইতেছে, বিন্দুরূপে স্বয়ং পরমেশ্বর যেন তোমার মস্তকাভ্যন্তরের ময়লা দূর করিতেছেন। এরূপ দিব্য ভাবনা ঐ স্নানে যদি আরোপ কর তবে সে স্নান অন্য কিছু হইয়া যাইবে, তাহাতে অনন্ত শক্তি আসিবে।" (পৃঃ ১১০)

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় এই পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করিয়া ও নামমাত্র মূল্যে তাহা প্রকাশ করিয়া বড় কাজ করিয়াছেন। পুস্তকের স্বকীয় বিশুদ্ধির কথা ছাড়াও বলি, মহারাষ্ট্র ও বাংলার মধ্যে যোগও ইহাতে প্রকারান্তরে দৃঢ় করা হইয়াছে। বাঙালীর পক্ষে ইহা অবশ্যপাঠ্য, বাঙালীরই অগ্রগতির জন্য।

অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব—বীরেনবাবু পরবর্তী সংস্করণে একটু ভাবিয়া দেখিবেন। 'সেই প্যার চাখ' (১৩ পৃঃ), 'পাড়ুরঙ্গ মতো খোট' (২০ পৃঃ), 'সোয়াদের চর্চা' (৬৬ পৃঃ)।

এই গ্রন্থপাঠে তীর্থস্থানের মত মানুষের চিত্ত শান্ত ও পবিত্র হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বাংলার সঙ্গীত (প্রাচীনযুগ)—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র। প্রকাশক—শ্রীতমস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

বাংলার সঙ্গীত বাংলাদেশেরই বিচিত্র সঙ্গীতবিকাশের ইতিহাস। গ্রন্থকার সঙ্গীতশাস্ত্রে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। তিনি বাংলার প্রাচীন যুগের সঙ্গীত-বিকাশের আলোচনায় সঙ্গীতের আকৃতি বা form নিয়েই প্রধানতঃ আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর সুচিন্তিত নিবেদনে বলেছেন: "রাগরাগিণীর বিচার আজকাল প্রায় গ্রন্থেই পাওয়া যায়: সুতরাং সে চেষ্টাও আমি করি নি, সঙ্গীতের আকৃতি বা form নিয়েই প্রধানতঃ আলোচনা করেছি।" তিনি সমালোচ্য গ্রন্থে অভিনব পদ্ধতিতে সত্যই প্রাচীন বাংলার সঙ্গীতের গঠন বা আকৃতি ও পরিবেশন কি রকম ছিল তা নিয়েই বেশী করে আলোচনা করেছেন এবং সেদিক থেকে তাঁর আলোচনার সার্থকতাও আছে। বাংলার সঙ্গীত-বিকাশের বেলায়, রাগ-রাগিণীর আলোচনা নিয়েই বেশীর ভাগ গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন, কিন্তু কি ভাবে ও কি রূপ নিয়ে সেই সকল রাগ-রাগিণী তদানীন্তন সমাজে পরিচিত ও প্রকাশিত ছিল তার কাহিনী ও ইতিহাস নিয়ে আধুনিক লেখকেরা বেশী মাথা ঘামান না। অথচ আমাদের মনে হয় সেটাই সঙ্গীত-জিজ্ঞাসুদের কাছে বেশী দরকারী। রাগ-রাগিণীসমূহ অচলায়তন নয়, যুগে যুগে সমাজের রুচিভেদে তাদের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে এবং এ পরিবর্তন যে অতীতেই কেবল হয়েছে তা নয়, ভবিষ্যতেও কত নূতন নূতন ভাবে ও রূপে হবে। সুতরাং সেই বিবর্তনের ইতিকথাই আমাদের জানা উচিত, কেননা তার উপরই নির্ভর করে সঙ্গীতের সত্যিকারের রূপ ও বিকাশ-পরিচিতি। সূক্ষ্মদর্শী গ্রন্থকার সে মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং বাংলার সঙ্গীতের পরিচয় দিতে গিয়ে তার রাগ-রাগিণীসমূহের রূপ-পরিগ্রহ ও রূপ-বিবর্তনের কথা তাই সুনিপুণভাবেই বলেছেন, যদিও তাঁর বলার বা রাগ-রাগিণীর পরিচয় দেবার ভঙ্গী ও ধারা অনুসরণ করেছে প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থগুলিকে এবং বিশেষভাবে শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরকে। অবশ্য, রত্নাকরোত্তর সঙ্গীতগ্রন্থে এসবের আরও বিস্তৃত আলোচনা আছে।

সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে বাংলা দেশের একটি ইতিহাসের অবতারণা করেছেন সমগ্র আলোচনার ভূমিকারূপে। তিনি প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের একরূপ আদিক্ষেত্র, পুণ্ড্রবর্ধন বরেন্দ্র ও রাঢ়ভূমির প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতনের মধ্যে সঙ্গীতের পরিচয় দিয়েছেন। মৌর্যযুগ থেকে গুপ্তযুগের মধ্যে যথাসম্ভব প্রাপ্ত সঙ্গীতধারার কাহিনী এবং পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলা-সঙ্গীতের বিকাশভঙ্গীরও কিছু পরিচয় দিয়েছেন। চর্যাপদের গায়নরীতি—পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থের নজিরে তুলনামূলকভাবে আলোচনাও তিনি করেছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে রাগ-রাগিণী, তাল ও বাদ্যযন্ত্রবিশেষেরও পরিচয় দিয়েছেন। পরিশেষে "প্রাচীন বাংলার বাদ্যযন্ত্র" আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুপরিবেশিত হয়েছে। কতকগুলি ভাস্কর্যচিত্র গ্রন্থটির সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেছে।

মোট কথা সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ রাজ্যেশ্বর মিত্রের "বাংলার সঙ্গীত" গ্রন্থ প্রাচীন যুগের বাংলার সঙ্গীত পরিবেশনে অভিনব ভঙ্গী ও মৌলিক ধারারই পরিচয় দিয়েছে। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী নূতন, ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রিক। তাঁর ধারার অনুসরণ করার জন্য আমরা বর্তমান সঙ্গীতগ্রন্থ-রচয়িতাদের অনুরোধ করি, কেননা মামুলি পুরাতন ব্যাখ্যানের যুগ এখন প্রায় অস্তমিত। দেশের সঙ্গীতরুচির ও দৃষ্টির এখন যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সত্যসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারও অভাব নাই। বিজ্ঞানসম্মত ধারা ও ঐতিহাসিক নজিরের মাপকাঠিতেই এখন সকলে সঙ্গীত অনুশীলন করার পক্ষপাতী। বাংলাদেশে যারা সঙ্গীত-আলোচনায় রত ও ইচ্ছুক তাঁরা রাজ্যেশ্বর মিত্রের পথ অনুসরণ করলে ভাল হয়।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

আমার বন্ধু—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ, রসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য দুই টাকা।

বইখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৩৩ সনে। সম্প্রতি নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে। বালক-বয়সে প্রতিভাবান্ রামতনুর সংসর্গে ভবভূতির মনে সাহিত্যিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে, আর বলিতে গেলে—সেই আকাঙ্ক্ষারই যূপকাষ্ঠে সে আত্মবলি দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কোনদিন বুঝিতে পারে নাই যে, সাহিত্যিক হওয়ার ক্ষমতা লইয়া সে পৃথিবীতে আসে নাই। আপন শক্তি সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা না থাকিলে ব্যর্থতা অনিবার্য, অথচ

ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এ পর্য্যায় মর্মান্তিক। করুণ কাহিনীটি রচনাগুণে মর্মস্পর্শী হইয়াছে। মনে হয়, লেখকের বাল্যজীবনের স্মৃতি কিছু কিছু এ কাহিনীতে মিলিয়াছে।

ঋষি রবীন্দ্রনাথ—শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

'রবীন্দ্রনাথ কি ঋষি? তিনি কি সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ? বিভিন্ন উক্তি, পত্র ও রচনা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া লেখক এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন, বলিয়াছেন—হাঁ, তিনি ঋষি, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ।

কুড়িটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানি বিভক্ত। আলোচনা সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, বিশেষ অভিনিবেশ ও যত্নের পরিচায়ক।

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র, পাতঞ্জল দর্শন, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল উক্তি রহিয়াছে, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি মিলাইয়া তিনি যুক্তিপথে আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সত্যদর্শন কেবল বিচার-সাধ্য নহে, উহা অন্তর্দৃষ্টি-সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মদৃষ্টির নিদর্শন তিনি তাঁহার লেখা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। বিস্তৃত অধ্যয়নের সহিত এরূপ বিন্যাস-নৈপুণ্য সচরাচর দেখা যায় না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাসংস্কার—শ্রীজনার্দন সাহ। যোগদা মঠ, ৭৮, অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড, বরাহনগর। পৃঃ ৬১। মূল্য আট আনা।

লেখক প্রবীণ শিক্ষাব্রতী। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তিনি দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং কি ভাবে উহার উন্নতি-বিধান হইতে পারে তাহা বলিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়গুলি তিনি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা: বর্ত্তমান শিক্ষার কুফল, শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, নারী-শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা, পরিদর্শক-মণ্ডলীর কর্ত্তব্য, ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রগঠন, শিক্ষার বিবিধ ধারা ইত্যাদি।

লেখক বুনিয়াদী শিক্ষার সমর্থক এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে শিক্ষার্থী স্বাবলম্বী হন এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। তাঁহার বক্তব্য—পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির কুফল ও ভ্রান্ত পথ পরিহার করিয়া যাহাতে সুফল পাওয়া যায় সেজন্য বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারসাধন করিতে হইবে। শ্রমের প্রতি মর্য্যাদাবোধ যাহাতে বৃদ্ধি পায় এজন্য সকল শিক্ষার্থীকে কায়িক শ্রম ও সমাজ-সেবায় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সরকারী নিয়মকানুনের সহিত সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের হিসাব-পত্রাদির সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তথাকথিত শিক্ষাব্রতীদের দ্বারা যে দুর্নীতিমূলক আচরণ অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে লেখক তাহার জন্য গভীর দুঃখপ্রকাশ এবং তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় সংস্কারসাধন না হইলে উন্নতির কোনই আশা করা যায় না। শিক্ষাকে ব্যয়বাহুল্য হইতে মুক্তি দিতে হইবে। প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদের মনে জাগাইতে হইবে। লেখক আদর্শবাদী হইলেও বাস্তবজ্ঞানবর্জ্জিত নহেন।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাসংস্কার-কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী তাঁহারা এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন। দেশের শিক্ষাসংস্কারে আগ্রহশীল ব্যক্তি এবং শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জীবনবেদ—কেশবচন্দ্র সেন। নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, ৯৫ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা।

"জীবনবেদ" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিজমুখ-বিবৃত স্বীয় জীবনতত্ত্ব। গ্রন্থখানির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন: "সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সকল বস্তু অপেক্ষা আদরণীয় আমার জীবন। যদি ব্রহ্মাণ্ডপতি মনুষ্য-জীবনকে বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকেন, তবে বিশ্বাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য জীবনের কথা ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিবৃত করা। সেই জন্য পরমপিতার আদেশে এই বক্তার জীবনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" আচার্য্য কেশবচন্দ্র ২১শে নবেম্বর ১৮৮০ সনে "জীবন গ্রন্থ" সম্বন্ধে একটি উপদেশ প্রদান করেন। "জীবনবেদ" শীর্ষক উপদেশটি প্রদত্ত হয় ১৮৮১ সনের ২২শে জুন, যখন তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন দার্জ্জিলিঙে অবস্থান করিতেছিলেন। দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ১৮৮২, ২৩শে জুলাই হইতে ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৮২ সন পর্য্যন্ত রবিবারে রবিবারে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে পনরটি উপদেশ দেন। ইহা ছাড়া 'অমৃত-খণ্ড' শীর্ষক আরও একটি উপদেশ বিবৃত হয়। গ্রন্থখানির বর্ত্তমান অষ্টম সংস্করণে এই উপদেশসমূহ একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। ভাষার লালিত্য এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যের এরূপ সমাবেশ অতি অল্প গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। গ্রন্থখানির এতগুলি সংস্করণে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ইহা বাঙালী পাঠক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাসমূহে এবং ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায়ও ইহার অনুবাদ আছে। বাংলার ধর্ম্ম-ভক্তিমূলক সাহিত্যে এখানি যে একটি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান শোভন সংস্করণটি বড়ই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য—শ্রীসতী ঘোষ, এম-এ, ডি, ফিল। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

বাংলার পদাবলী সাহিত্য রত্নাকরসদৃশ—তন্মধ্যে মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ক পদসমূহ সুরধুনীর মত বাঙালীর চিত্ত পবিত্র করিয়া আসিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে মাত্র নয় জন কবির পদ উদ্ধৃত এবং বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বহু পাঠকের চিত্তাকর্ষী হইবে নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ ইহার মূলাংশের "খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়বস্তু' একজন সুবিখ্যাত অধ্যাপক অত্যন্ত যত্নসহকারে দেখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এজাতীয় থিসিস্ বা গবেষণাগ্রন্থ

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও
লাবণ্যময়
ত্বক্
ক্যাডিলযুক্ত
রেক্সোনাকে
আপনার
প্রকৃত সৌন্দর্য্য
ফুটিয়ে তুলতে
দিন
রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
★ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona

অন্যান্তরূপে প্রকাশিত হয়, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়—বিশেষ করিয়া সুযোগ্যা গ্রন্থকর্ত্রীর পক্ষে। গ্রন্থটির যে সকল ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি তাহার দুই-একটি প্রদর্শিত হইল—গ্রন্থের গুণসন্নিপাতে ও মনোজ্ঞ মুদ্রণে তাহা নিমগ্ন হইয়াই আছে, বিশেষ হানি করিতে পারে নাই। গ্রন্থে উদ্ধৃত সব কয়টি মূল সংস্কৃত শ্লোক অশুদ্ধ মুদ্রিত হইয়াছে—বিশেষ করিয়া উৎসর্গে গুরুস্তুতির শ্লোক দুইটি অশুদ্ধির বিজয়-বৈজয়ন্তী। বাসুঘোষের পদাবলী (পৃ. ৯৫-১১৬) "পুঁথি হইতে সংগৃহীত"—পূর্ব্বমুদ্রিত পাঠের সহিত তাহাদের পার্থক্য থিসিসে প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল। নরহরি সরকার চৈতন্যের ৭।৮ বৎসরের বড়—তাঁহার কোন পদ চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে রচিত কিনা (পৃঃ ৬) প্রশ্নই হইতে পারে না। গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষা প্রাঞ্জল কিন্তু 'অসমোর্দ্ধ' (পৃঃ ১) প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগ প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী। পদকর্ত্তাদের অতিরিক্ত প্রশস্তি করিতে যাইয়া তিনি চরিতকারদের উপর কতকটা অবিচার করিয়াছেন, মনে হয়। থিসিস্ গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত রীতিই অবলম্বনীয়, উচ্ছ্বাস বর্জ্জনীয়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ক্ষেপার ঝুলি—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) প্রতি খণ্ডের মূল্য দেড় টাকা।

বাণীমালা—মূল্য দশ আনা।

পত্রাবলী—(প্রথম খণ্ড) মূল্য বারো আনা। শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ প্রণীত এবং হুগলী, ডুমুরদহ—রামময় আশ্রম হইতে প্রকাশিত।

ক্ষেপার ঝুলির প্রথম খণ্ডে 'কামিনীকাঞ্চন' হইতে 'তত্ত্ববিভ্রাট' পর্য্যন্ত বাহান্নটি বিষয় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'পেঁচার খাঁচা' হইতে 'সাগর তীরে অন্ধ বালক' পর্য্যন্ত একান্নটি বিষয় প্রশ্নোত্তর ছলে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত গ্রন্থকার ক্ষেপা ছদ্মনামে আলোচনা করিয়াছেন। ঝুলি হইতে বহু জটিল তত্ত্ব সাধক-জীবনের অনুভূত সত্য রূপে স্নিগ্ধ কৌতুকরসধারায় প্রবাহিত হইয়াছে।

'বাণীমালা'তে একশত আটটি উপদেশবাণী পরিবেশিত। ক্ষেপার ঝুলির অনেক রসধারাও ইহতঃ প্রবাহিত।

'পত্রাবলী'তে ষোল জন ভক্ত নর-নারীকে লিখিত উপদেশপূর্ণ সাতাশটি পত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভক্তিপথের যাত্রীরা এই সব গ্রন্থ পাঠে অনেককিছু হিতকর পাথেয় পাইবেন নিঃসন্দেহ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আলোচনা

'আমাদের জাতিভেদ' ও 'আমাদের দেশের আচার-বিচার'

(উত্তর)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমার লিখিত 'আমাদের জাতিভেদ' সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পড়িয়া শ্রীমঞ্জুলা সানা আমার একটি বিষয়ের অভিমত সম্পর্কে ভ্রম-প্রদর্শনে অগ্রসর হইয়াছেন এবং গত আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে আমার লিখিত, 'আমাদের দেশের আচার-বিচার' প্রবন্ধ পড়িয়া শ্রীঅতুলেন্দু গুপ্ত আমার একটি ভ্রম-প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহারা যে আমার প্রবন্ধগুলি অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছেন, সেজন্য আমি ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই দুইটি ব্যাপার সম্বন্ধে আমার অভিমত আমি নিম্নে প্রকাশ করিলাম :

শ্রীমঞ্জুলা সানা লিখিয়াছেন, বৌদ্ধ গ্রন্থ, 'সংযুত্ত নিকায়ে' আছে যে, 'জনসমাজে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন, তিনি দেব ও মনুষ্য-সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।' বৌদ্ধগ্রন্থের এই অভিমত আমিও সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কিন্তু আমাদের হিন্দুসমাজে কে শ্রেষ্ঠ, আর কে নিকৃষ্ট, তাহা মীমাংসার জন্য বৌদ্ধ গ্রন্থের সাহায্য লইব কেন? আমাদের সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রেও ত আছে, 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরু।' সুতরাং কে বড়, কে ছোট, তাহার মীমাংসার জন্য আমি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র, খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বা মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র খুঁজিতে যাইব কেন? আমি আমার ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশই শিরোধার্য্য করিয়া লইব।

শ্রীঅতুলেন্দু গুপ্ত মহাশয় আমার ভ্রম-প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৯০৭ সালে ইংলণ্ডে 'Deceased Wife's Sister's Marrige Act' এই আইন পাস হওয়াতে আজকাল আর মৃতা পত্নীর সহোদরাকে বিবাহ করা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ নহে। এই আইনের কথা আমি জানিতাম না। তবে বিবাহ সম্বন্ধে কোন রাজবিধান প্রচারিত হইলেই সকলে যে সেই আইন শিরোধার্য্য করিয়া লইতে বাধ্য, তাহা নহে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় 'হিন্দু বিধবা বিবাহ' আইন তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই আইন অনুযায়ী আজ পর্য্যন্ত কয়জন বিধবার বিবাহ হইয়াছে?

দেশ-বিদেশের কথা

বর্দ্ধমানে মেয়েদের কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে মহারাজা শ্রীউদয়চাঁদ মহতাবের দান

বর্দ্ধমান শহরে মেয়েদের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীউদয়চাঁদ মহতাব সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের একটি ভবন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বর্তমানে এই শহরে মেয়েদের কোন কলেজ নাই।

জানা গিয়াছে যে, বর্দ্ধমানের মহারাজা শহরস্থ রাজপ্রাসাদের দুইটি ভবনের মধ্যে একটি সরকারকে দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান শহরে একটি প্রথম শ্রেণীর মেয়েদের কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য-সরকার প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ড. শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত

১৮৮৬ সনের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় শৌরীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভূপেন্দ্রকুমার গুপ্ত। 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন'-প্রণেতা দুর্গাচরণ রায় ছিলেন শৌরীন্দ্রকুমারের খুল্লমাতামহ।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি-এ পাস করিয়া শৌরীন্দ্রকুমার যখন কলিকাতায় এম-এ ও বি-এল পড়িতে-ছিলেন—সেই সময়ে কমলাদেবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়।

শৌরীন্দ্রকুমার ১৯১০ সনে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে গিয়া তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ভারতের লোকসাহিত্য সম্বন্ধে থিসিস লিখিয়া বি-লিট ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তাহা ছাড়া বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি পিএইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১২ সনে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া তিনি ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। এই ভাবে বিদেশী শিক্ষা সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তিনি ১৯১৩ সনে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং রিপন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ।

রিপন কলেজের অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিয়া শৌরীন্দ্রকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল-কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলেন। ল-কলেজের সহিত সম্পর্কসূত্রেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন-বিভাগে সদস্যরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বহুবর্ষ ধরিয়া সেনেটের সভ্য, বি-এল ও বি-কম পরীক্ষার পরীক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ ফ্যাকাল্টির সদস্য ছিলেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয়ে তিনি প্রশ্নপত্র রচনা করিতেন এবং থিসিস পরীক্ষা করিতেন। ভারতের ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও সিংহলের সিবিল সার্ভিস কমিশনের ও কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি পরীক্ষারও তিনি পরীক্ষক ছিলেন।

১৯১৬ সন হইতে ২৫ বৎসর ধরিয়া ল-কলেজের অধ্যাপকরূপে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করেন। ল-কলেজ হইতে অবসর গ্রহণকালে তিনি ল-কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন।

শৌরীন্দ্রকুমার সর্বপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকের অনুরাগী, উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তিনি নিবিড়-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৮ হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত তিনি আই-এফ-এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

হাইকোর্টে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল অসামান্য। বিচারপতিরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। আইন সংক্রান্ত মুসাবিদায় তাঁহার সমকক্ষ ছিল দুর্লভ—তাঁহার আইন সংক্রান্ত অভিমত চরম কথা বলিয়া বিবেচিত হইত।

ভারত-প্রেমিকা কুমারী হেলেন রুবেল

কয়েক মাস হইল সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে কুমারী হেলেন রুবেল পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ভারতের এবং ভারতের আদর্শের একান্ত অনুরাগিণী ছিলেন। ভারতের কল্যাণ এবং ভারতের আদর্শ প্রচার তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল।

হেলেন রুবেল ১৯২৮ সনে বোষ্টনে স্বামী অখিলানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রোড দ্বীপে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র স্থাপনে স্বামীজী তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকল্পে কুমারী রুবেল সেখানে প্রায় দশ বৎসর অবস্থান করেন।

তাঁহার অর্থসাহায্যেই বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মন্দির এবং কলিকাতায় একটি শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তিনি ভারতে পনর বৎসর কাল অবস্থান করেন।

গণপতি সরকার

সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক গণপতি সরকার সম্প্রতি ৬৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম গগনচন্দ্র সরকার।

গণপতি সরকার শুধু যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা নয়, তাঁহার বক্তৃতাশক্তিও ছিল প্রশংসনীয়। মাতৃভাষা ছাড়া সংস্কৃত,

ইংরেজী এবং হিন্দী ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। কালিদাস (নাটক), মধ্যম ষড়ন্ত (নাটক), কামন্দকীয় নীতিসার, জ্যোতিষ যোগতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি কিছুকাল কায়স্থ পত্রিকা সম্পাদন করেন।

গণপতিবাবু দেশের বহু সমাজহিতকর ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অন্যতম সহঃ সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইহার কোষাধ্যক্ষও হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ইহার সহকারী-সভাপতি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী ও বেলিয়াঘাটা লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল।

সুরেন্দ্রমোহন দত্ত

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্ম্মী সুরেন্দ্রমোহন দত্ত গত ৮ই জানুয়ারী ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট জেলার লাখাই গ্রামের বিখ্যাত দত্ত বংশে সুরেন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোলকমোহন দত্ত শ্রীহট্ট শহরে একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রজীবনে সুরেন্দ্রমোহনের আশ্চর্য্য মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া সকলেই বিস্মিত হন। যৌবনে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া সুরেন্দ্রমোহন স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বেঙ্গল ন্যাশনেল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে লাঠিখেলা ইত্যাদিতেও সুরেন্দ্রমোহন বিশেষ নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি একবার সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া কিছুকাল নানা স্থানে পর্য্যটন করেন।

সংসার-জীবন অবলম্বন করিবার পর সুরেন্দ্রমোহনকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইতে হয়। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চা অব্যাহত ছিল। ইংরেজী ও বাংলা ছাড়া তিনি সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে ইংরেজী বাংলা অভিধান প্রণয়নে চারুচন্দ্র গুহ সুরেন্দ্রমোহনের নিকট বিশেষ সাহায্যলাভ করেন।

আজ হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রমোহন ভারতে হিন্দীভাষা প্রসারের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া "হিন্দুস্থানী টিচার", "হিন্দী স্বয়ংশিক্ষা" প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এগুলি হিন্দী শিক্ষার আদর্শ পুস্তক বলিয়া গণ্য। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তিনি সাংবাদিক-বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। বাংলা-ইংরেজী-হিন্দী অভিধান তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতি। দীর্ঘ পনর বৎসরকাল অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া শেষ রোগশয্যায় তিনি গ্রন্থখানি লেখা সমাপ্ত করেন। ইহা এখনো ছাপা হয় নাই। এই বিরাট এবং অভিনব অভিধান প্রকাশিত হইলে সুরেন্দ্রমোহন মৃত্যুর পরেও যশোলাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠান

গত ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যায় ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা-দিবসে উপলক্ষে সভা ও সঙ্গীতের বৈঠক হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, বিখ্যাত কলা-সমালোচক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে শ্রী ভি, এন, পট্টবর্দ্ধন রাগ ও রাগিণীর শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতা রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমানে সঙ্গীত-সম্মেলনগুলির মাধ্যমে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা দেখা যাইতেছে, তাহা অতি আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গীতকে দোষক্রটিসমূহ হইতেও মুক্ত রাখিতে হইবে। শ্রুতি-মধুর করিবার উদ্দেশ্যে রাগ-রাগিণী স্বরগ্রামের অদল-বদল করা, নূতন নূতন নামকরণ করা, রাগ-রাগিণীর গাহিবার যে বিশেষ বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখা এবং রাগ ও রাগিণীর রূপরঙ্গের পরিবর্ত্তন সত্য সত্যই নিন্দনীয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা এমন সব রাগ গাহিয়া থাকেন যাহা স্ত্রীলোকের গলায় গাহিবার নয়, যেমন দরবারী কানাড়া; অপর পক্ষে পুরুষ সঙ্গীত-শিল্পীরা এমন সব রাগ গান করেন যাহা স্ত্রীলোকের গাহিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ইহা ছাড়া গানে মাইক্রোফোন ব্যবহার, বৈদেশিক গানের চাল-প্রবর্ত্তন এবং উৎকট ভাবভঙ্গী ও মুদ্রাদোষ ইত্যাদিও শিল্পীর পক্ষে নিন্দনীয়। শিল্পীর প্রয়োজন রাগ-রাগিণীর প্রতি নিষ্ঠা, শ্রোতার মনোরঞ্জন করাই যেন তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়।

পট্টবর্দ্ধনজী আরও বলেন যে, ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ইহা ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত পুণার পরলোকগত বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকার প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয় অপেক্ষা পুরাতন।
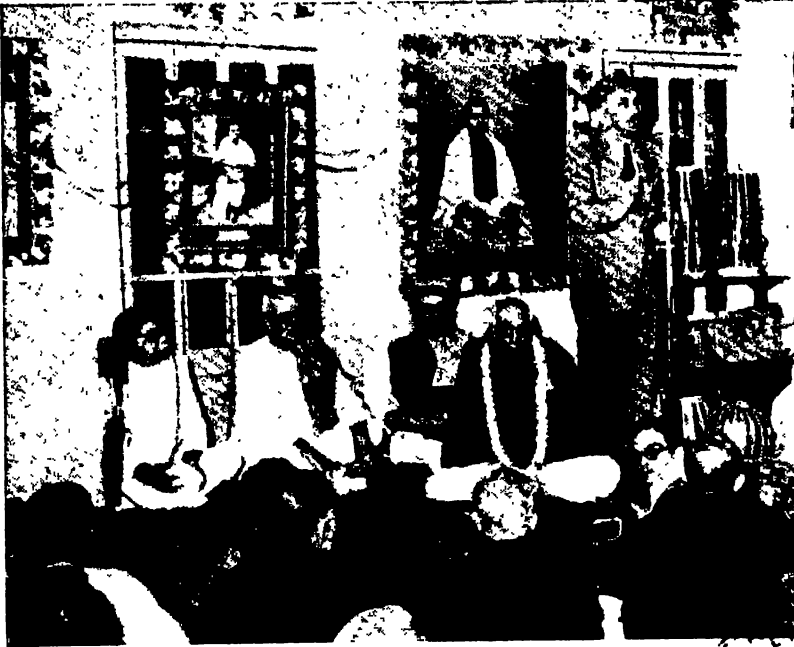
ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানে ভাষণদানরত সভাপতি শ্রী ভি এন, পট্টবর্দ্ধন। উপবিষ্ট বাম হইতে : শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রাণজীবন জৈঠা এবং শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহার পর প্রধান অতিথি শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণ দান করেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা যাহাতে ক্রমবিকাশের পথে চলিতে পারে তাহার উপর তিনি জোর দেন। তিনি বলেন, ভারতীয় ও বৈদেশিক সঙ্গীত সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার এই ধারণাই হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঠাট ও রূপের রাগরঙ্গ প্রকাশের ভিতর দিয়া সেই সেই দেশের ও সেই সকল ঠাট বা ধরণের গানের ধারা অপরিবর্ত্তিত ভাবে রাখার প্রয়াসের মধ্যে যথেষ্ট গোঁড়ামির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে শিল্পীদের প্রয়োজন বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়াও সংস্কারপন্থী হওয়া। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি ও দান উল্লেখযোগ্য। রসসৃষ্টি ও রস-পরিবেশনেই কলাবিদ্যার সার্থকতা এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মত ব্যাপক বিষয়কে পরিমিত ও সীমায়িত রাখা উচিত নয়। প্রকৃত রসজ্ঞেরা সব বিষয়েরই ভাল দিকটা গ্রহণ করেন, প্রকৃতিগত রাগরঙ্গ বজায় রাখিয়া সঙ্গীতরস বিস্তারে সহায়তা করেন। আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, সেটি হইল সঙ্গীতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ। উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান অনেকেরই দেখা যায় না।

ভাষণাদি শেষ হইবার পর নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী সঙ্গীতের আসর আরম্ভ হয়। দুই দিবসব্যাপী এই অনুষ্ঠানে যে সকল শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁ, পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্র ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীবিষ্ণু মিশ্র, মৈহারের ওস্তাদ হাবিবুদ্দীন খাঁ, শ্রীমন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী উমা দে, শ্রীশিশির গুহ, শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র, শ্রীসজিৎ ঘোষ এবং শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রদর্শনী গৃহ

গবেষণা-মন্দির (এফ্. আর. ই)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
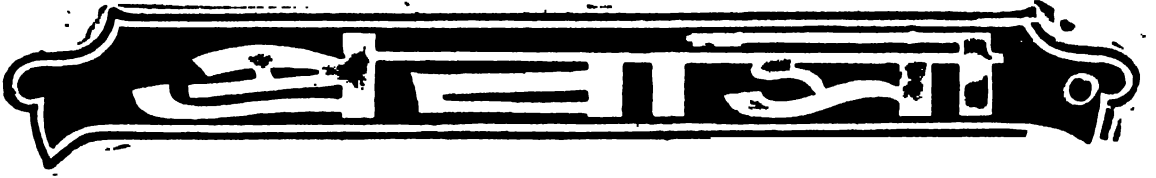
৫৪শ ভাগ ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৬২ | ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেস, রাষ্ট্র ও রাজ্য

বিগত মাঘ মাসে দেশে ও বিদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহার কিছু জের আরও অনেক দিন চলিবে।

বহির্জগতে জাতীয়তাবাদী চীন (ফরমোসা) ও গণতন্ত্রবাদী চীনের (পিপিং) মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজনে বিশ্বশান্তি বিনাশের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই পরিস্থিতির শেষ কোথায় তাহা বলা অতি বড় দৈবজ্ঞেরও আয়ত্তের বাহিরে। ইন্দোনেশিয়ায় ও লণ্ডনে উহারই আলোচনা চলিয়াছিল ও চলিতেছে এবং মস্কো ও ওয়াশিংটন অতি সজাগ তীব্র দৃষ্টিতে ঐ পরিস্থিতির গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে। সারা পৃথিবী উহারই দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন।

আমাদের দেশেও নানাপ্রকার সভা-সমিতি ও কার্য্যকলাপ ঐ মাসে চলে। কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তীর অধিবেশন এবার মাদ্রাজে সত্যমূর্ত্তিনগরে হয়। এই বার্ষিক উৎসবে এইবারেও অজস্র অর্থ-ব্যয়ে এবং আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জার যোগে সাধারণ ও বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়। প্রত্যহ তিন লক্ষাধিক দর্শক তাঁহাদের ভাগ্যনিয়ন্তাদিগের দর্শন লাভে আনন্দিত হইয়াছেন।

বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি দুই দিন ব্যাপী গবেষণার ফলে ১৩টি সরকারী প্রস্তাব গঠন ও গ্রহণ করেন। ঐ ১৩টির মধ্যে আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূরীকরণের প্রস্তাবটি বোধ হয় বাক্যসাত্মক ও অন্যগুলি পুরাতন বিষয়ের চর্ব্বিতচর্ব্বণ।

এবারের কংগ্রেসে নূতন শুধু সভাপতি। তিনি এতদিন কংগ্রেসের দলাদলি হইতে দূরে থাকিয়া গঠনমূলক কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি আছে যে, তিনি নিরপেক্ষ বিচারে সমর্থ ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। বহুদিন পরে তাঁহার মত লোক কংগ্রেসের বরমাল্য গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই এবারের কংগ্রেসের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। অধিবেশনের সমাপ্তির পর তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত এক বিবৃতি আমরা অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়াছি এবং শ্রীনেহরুর এক অনুরূপ বিবৃতিও দেওয়া হইল।

শ্রীধেবরের বিবৃতিতে আমরা একজন সত্যকাম কিন্তু সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকের পরিচয় পাই। তিনি অধিবেশনে গৃহীত সকল প্রস্তাবই পূর্ণ মূল্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে কথায় ও কাজে প্রভেদ যে সচরাচর হইয়া থাকে তাহা তিনি জানেন বলিয়াছেন। প্রভেদ যে আকাশ ও পাতাল তাহা তিনি পরে বুঝিবেন। আমরা তাঁহাকে শুভেচ্ছা জানাই এই বলিয়া যে, যেন কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারীবর্গের অধঃপতনের পূর্ণ পরিচয় পাইলেও তাঁহার দৃঢ় চিত্তে দৌর্ব্বল্য না আসে।

পণ্ডিত নেহরু আরও একবার স্তোকবাক্যবাজীর উদগার করিয়াছেন। যে ব্যক্তি চাটুকার ভিন্ন কাহারও কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য মহত্তর কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি কল্পনার রাজ্যে বিহার করিয়াছেন বেতারযোগে। তাঁহার ভাষণ সংযত ও সদিচ্ছাপূর্ণ। কিন্তু দেশের ও দশের মানসিক এবং নৈতিক অবস্থার বিষয় তিনি নির্ব্বাক। হয়ত বা সে বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

সবশেষে বলি ঘরের কথা। বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ও বিধান পরিষদের আরম্ভ উপলক্ষে রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি যে ভাষণ দিয়াছেন তাহা আমাদের মনঃপূত হয় নাই। উহা তাঁহার মন্ত্রীসভার প্রদত্ত "বাণিয়ার খতিয়ান" মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের সন্তান যাহারা তাহাদের দৈহিক মানসিক ও নৈতিক অবস্থা যে কিরূপ শঙ্কাজনক তাহা তাঁহার অজানা নহে। সে বিষয়ে কি কিছুই বলিবার অধিকার তাঁহার নাই? মন্ত্রীসভা তো দল-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছে।

শ্রীনেহরুর সমাপ্তি ভাষণ

কংগ্রেসের ষষ্টিতম অধিবেশনের উপসংহারে পণ্ডিত নেহরু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সত্যমূর্ত্তিনগর, ২৩শে জানুয়ারী —শ্রীনেহরু অদ্য এখানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্টিতম অধিবেশনের উপসংহারে বলেন, "আজ দেশের যুবকদিগকে উৎসাহ ও ঐকান্তিকতার সহিত কংগ্রেসের পতাকাকে সমুচ্চ রাখিতে হইবে। কেবলমাত্র অতীত কংগ্রেসের নহে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্য্যায়েরও প্রতিনিধিত্ব তাহাদিগকে করিতে হইবে।"

তিনি প্রকাশ্য অধিবেশনে সমবেত দেড় লক্ষাধিক শ্রোতাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "সকলের মঙ্গল হউক। আমরা এখানে যে সকল সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি, আমরা যেন তাহা পরিপূরণ করিতে পারি। ভবিষ্যতে আমাদিগকে বড় বড় কাজ করিতে হইবে। কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি আমরা সকলের

আকারে গ্রহণ করিয়াছি। জগতের চক্ষে নানাদিক হইতেই আমরা বিশিষ্ট হইয়া উঠায় শুধু ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র পৃথিবী আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। আমরা যেভাবে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি, অন্ত লোকের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত না হইয়া আমরা যেভাবে নিজস্ব পথে চলিয়াছি, সেই সমস্তই আমাদিগকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। আমি আশা করি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং অপরাপর সমস্ত ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিব। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদিগকে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। এখন কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা যে মহৎ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি, তাহার জন্ত নিরলসভাবে কাজ করিতে হইবে।"

শ্রীনেহরু নূতন কংগ্রেস-সভাপতি শ্রী ইউ. এন. ধেবরের ব্যক্তিত্বের ও কার্য্য পরিচালনার প্রশংসা করিয়া বলেন, "তাঁহার মধ্যে 'বিনয় ও নিয়মনিষ্ঠা'র সমন্বয় ঘটিয়াছে এবং আজ এই দুইটি গুণেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। তিনি যে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, তাঁহার হাতে কংগ্রেস শুধু নিরাপদ নহে, পরন্তু কংগ্রেসের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইবে।"

কংগ্রেস-সভাপতির বিবৃতি

বিগত ২৪শে জানুয়ারী সাংবাদিকদিগের নিকট শ্রীযুত ধেবর নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করেন :

"আবাদী অধিবেশন বহু দিক দিয়া স্মরণীয়। অনুন্নত শ্রেণীদের সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত কংগ্রেস দেশের সম্মুখে সামাজিক আদর্শের একটি পূর্ণ চিত্র এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যসূচী পেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনুন্নত শ্রেণী সম্পর্কিত কমিশনের রিপোর্ট পেশ না হওয়ায় তাহাদের সম্পর্কে কোনরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। এই অধিবেশনে কেবল সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শই গৃহীত হয় নাই, পরন্তু দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক নীতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া দেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হইবে।"

কংগ্রেস-সভাপতি বলেন, "প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা ও সুদৃঢ় করা সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তি যাহাতে রোধ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে নেতৃবর্গ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শ্রীধেবর বলেন, "আবাদী অধিবেশনে গৃহীত নীতি ও কার্য্যসূচী রূপায়িত করাই হইল এখন সমস্যা। আমরা বড় বড় কথা বলিতে অভ্যস্ত, কিন্তু সেই ভাবে কাজ করি না বলিয়া যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়, তাহা আমার অজানা নাই। বড় বড় কাজ করার ব্যাপারে মানুষের শক্তিও সীমাবদ্ধ। এইসব বিষয় চিন্তা করিয়া আবাদী অধিবেশন সম্পর্কে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, তথায় গৃহীত নীতি ও কার্য্যসূচীর প্রতি দেশের সম্পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।"

তিনি বলেন, "এইসব নীতি ও কর্ম্মসূচীর সমর্থনে জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা যাহাতে কাজে লাগান যায় সে বিষয়ে বর্ত্তমান নেতৃবর্গকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

তিনি আরও বলেন, "জাতির জীবনে সুযোগ-সুবিধা অতি অল্পই আসে। কিন্তু আবাদী অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ এই সুযোগ-সুবিধা যে দেশের স্বার্থে প্রয়োগ করিবেন সে বিষয়ে জনগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে।"

ভৌগোলিক সীমানা ও বাংলার ইতিহাস

কলিকাতায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের তৃতীয় ও শেষ দিনের অধিবেশনে শনিবার রাজ্যসরকারের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। রাজ্যসরকার কমিশনের নিকট বর্ত্তমানে বিহার ও আসামের অন্তর্ভুক্ত প্রায় এগার হাজার বর্গমাইল এলাকা দাবি করেন। এই এলাকায় লোকসংখ্যা ৫৭ লক্ষ।

কলিকাতায় সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করিয়া কমিশনের সদস্যদ্বয় পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও সর্দ্দার কে. এম. পানিক্কর কর্ম্মচারিগণসহ শনিবার রাত্রে কটক অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। কমিশন পুনরায় আগামী এপ্রিল অথবা মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া কতকগুলি জেলায় সফর করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

এইদিন রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে যে প্রতিনিধিদল কমিশনের সহিত সাক্ষাৎ করেন উহাতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছাড়া আরও দুই জন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারা হইলেন রাজস্বমন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসু ও কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আর. আহমেদ। তাঁহারা ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, শাসনগত ও অর্থনৈতিক দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের দাবির যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় পৃথক ভাবে কমিশনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাস্তুহারা পুনর্বাসনের সমস্যার উল্লেখ করেন। বিশেষ করিয়া জমির অভাবে পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারা পুনর্বাসনে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু আসিয়াছেন ও আরও উদ্বাস্তু আসিবার সম্ভাবনা আছে। এই সকল উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া দিবার সঙ্গতি পশ্চিমবঙ্গের নাই।

১০ই ফেব্রুয়ারী 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এক প্রবন্ধে শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ বঙ্গের ঐতিহাসিক বিবর্তনে ভৌগোলিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন, বাংলার উপর ভৌগোলিক প্রভাব বিশেষ ভাবে পড়িয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলই বাংলা নামে খ্যাত। কয়েকটি অংশ ব্যতীত সমগ্র অঞ্চলটি বদ্বীপ দ্বারা গঠিত। কিন্তু এই বদ্বীপ চারিদিক হইতে সুনির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতমালা ও উচ্চভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহার উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী, পূর্ব্বে গারো, খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া আরাকান য়োমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ পর্ব্বতমালা। যেখানে মধ্যভারতীয় পর্ব্বতশ্রেণী আসিয়া পরেশনাথ এবং রাজমহল পাহাড়ের নিকট মিলিত হইয়াছে সেখানে এই বদ্বীপের পশ্চিম সীমানা। বস্তুতঃ বাংলার চারিদিকে যে উচ্চভূমি উহাকে

বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে উহারা চারিদিক হইতে ধীরে ধীরে ঢালু হইয়া বাংলার সমতলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

বাংলার এই প্রাচীরবেষ্টনীতে তিনটি ফাঁক রহিয়াছে : উত্তর-পূর্ব্বে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সহিত উত্তরবঙ্গ গিয়া মিশিয়াছে এবং অপর দিকে কোশী নদীর পরপারে মিথিলাতে বাংলার সমতল গিয়া মিশিয়াছে উত্তর ভারতের উপত্যকার সহিত ; দক্ষিণ পশ্চিমে বঙ্গের সমতল সুবর্ণরেখা পার হইয়া উড়িষ্যার সহিত মিশিয়াছে। ইতিহাস হইতে দেখা যায় বাংলার সহিত বাহিরের সকল সংস্পর্শই ঘটিয়াছে এই তিন দিক দিয়া। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস হইতে নানারূপ নজীর দেখাইয়া শ্রীযুত সিংহ তাঁহার বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন।

ভাষাগত, জাতিগত এবং অন্যান্য বিচারে মানভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়ার অধিকাংশ, গোয়ালপাড়া, শিলচর, কাছাড় প্রভৃতি নিশ্চিতভাবেই বাংলার মধ্যে পড়ে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বাংলার প্রকৃত ভৌগোলিক সীমা ঐ সকল অঞ্চল ছাড়াইয়া গিয়াছে। কয়েকটি বিষয় হইতে তাহা স্পষ্ট হয়। প্রথমতঃ বঙ্গীয় উপত্যকার জনসাধারণ কখনও উচ্চ ভূমিতে বসতি স্থাপন করে নাই। তাহারা সর্ব্বদাই সমতলভূমিতে বাস করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ রাঁচী-লোহারদগা অঞ্চলের দ্রাবিড়ভাষী লোকেরা এবং অ-বঙ্গীয় উপজাতিরা পাহাড়ের উপর বাস করে। কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশে আসিলে দেখা যায় যে, রাঁচী জেলার কয়েকটি অংশে সাধাকরা বসবাস করিতেছে। রাঁচী গেজেটিয়ারে উহাদিগকে স্পষ্ট ভাবেই বঙ্গভাষী বলা হইয়াছে। তাহাদের আচার-বিচারও বাঙ্গালীদের মত। ড. গ্রীয়ারসন ঐ ভাষাকে বাংলার অন্তর্গত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এইভাবে রাঁচীর পঞ্চ পরগণার নিকট বাংলার সীমা শেষ হইয়াছে।

সাংস্কৃতিক দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, বাংলার ভৌগোলিক সীমা বাঙালী সংস্কৃতিরও সীমা। ব্যক্তিগত ও আনুষ্ঠানিক আইন এবং বিভিন্ন প্রথার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উপত্যকা অঞ্চলেই দায়ভাগ প্রথার প্রবর্ত্তন রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভৌগোলিক সীমানার নিকট দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা প্রথা দুইটিরই মিলন ঘটিয়াছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উপরোক্ত ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই স্ত্রীলোকদিগের মাথায় সিঁদুর দেওয়া, উলু দেওয়া, লোহার বালা পরা প্রভৃতির প্রচলন রহিয়াছে। উক্ত সীমানার পরপারে বিহারী প্রথার প্রচলন। ঐ ভৌগোলিক অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐক্যের অপর একটি পরিচয় দুর্গাপূজার প্রচলন। ঠিক ভৌগোলিক সীমানা ছাড়াইয়া গেলেই তৎপরিবর্ত্তে 'ছাট' পূজার প্রচলন দেখা যায়।

স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যের ব্যাপারেও ঐ সীমানা নির্দ্ধারণ বিশেষ ভাবে প্রকাশমান। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, রেওয়া রাজ্যের বনভূমির নিকট এবং উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলির নিকটে বরাকর পদ্ধতিতে মন্দির নির্ম্মাণের ধারা শেষ হইয়াছে।

এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, এই বদ্বীপের জনসাধারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চতুর্দিকবেষ্টিত উপত্যকার মানুষ হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। ইহারা উপত্যকার মানুষ, পাহাড়-পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া তাহারা থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ ইতিপূর্ব্বে বর্ত্তমান রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট একটি বিচারপূর্ণ স্মারকলিপি দিয়াছেন। তাহাতে এই সকল তথ্যের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা আছে। কিন্তু কমিশন যে ভাবে চলিতেছে ও তাহাতে সাক্ষ্যদানের জন্য যে ভাবে যাঁহাদের আহ্বান করা হইতেছে তাহাতে ঐ সকল তথ্যের পূর্ণ বিচার ও গবেষণামূলক আলোচনা হইবে কিনা সন্দেহ।

আমাদের দাবি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সমীচীন। কিন্তু বিপক্ষের দল "ভারে" কাটার আয়োজন করিয়াছে। তাহারও প্রত্যুত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা এখন হইতে চিন্তা করা প্রয়োজন।

গ্রাম্য পঞ্চায়েত

প্ল্যানিং কমিশনের তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, ১৯৫৪ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ৯৮,২৫৬টি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ১৯৫১ সনের মার্চ্চ মাসে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতে পঞ্চায়েতের মোট সংখ্যা ছিল ৮৩,০৯৩টি। পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ১৫,১৬৩টি পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে মোট ৫,৮১,৮১৪টি গ্রামের মধ্যে ২,৯৪,৪৬০টি গ্রামে পঞ্চায়েত আছে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত সকল "ক" শ্রেণীর প্রদেশে, সকল "খ" শ্রেণীর প্রদেশে এবং ছয়টি "গ" শ্রেণীর প্রদেশে যথা : আজমীর, ভূপাল, কুর্গ, হিমাচলপ্রদেশ, কচ্ছ এবং বিন্ধ্যপ্রদেশে পঞ্চায়েত সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চায়েত গঠনের জন্য একটি বিল প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে কার্য্যকরী ক্ষমতাবলে কয়েকটি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দিল্লী প্রাদেশিক সরকারও পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিল তৈয়ার করিয়াছেন।

প্রায় সাতটি প্রদেশে গ্রাম পঞ্চায়েত নামে একটি করিয়া বিভাগ খোলা হইয়াছে। সরকারী স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের সহিত এই বিভাগটিকে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উত্তর-প্রদেশে ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনার পদাধিকার বলে পঞ্চায়েতসমূহের ডিরেক্টর। মাদ্রাজ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে মিউনিসিপাল কাউন্সিলের ইন্‌সপেক্টর পঞ্চায়েতদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করেন। মহীশূরে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের কমিশনার পঞ্চায়েতের কর্ত্তা এবং মধ্যপ্রদেশে সামাজিক কল্যাণ বিভাগের ডিরেক্টর পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশে সমবায় ও পঞ্চায়েত বিভাগ একত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আসামে গ্রাম্য উন্নয়ন বিভাগ পঞ্চায়েতের দেখাশোনার জন্য দায়ী।

প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব প্রাদেশিক পঞ্চায়েত আইনকে কার্য্যকরী করা, পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা করা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। বোম্বাই সরকার ভূমি রাজস্বের আয় হইতে শতকরা

১৫ ভাগ পঞ্চায়েতদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মাদ্রাজে ভূমিরাজস্বের শতকরা ৩১/২ ভাগ, হায়দরাবাদে শতকরা ১৫ ভাগ, মধ্যভারতে শতকরা ৩১/২ ভাগ, মহীশূরে শতকরা ১২১/২ ভাগ, পেপস্যুতে শতকরা ১০ ভাগ, সৌরাষ্ট্রে শতকরা ২০ হইতে ৩৩ ভাগ এবং কচ্ছে ভূমিরাজস্বের শতকরা ১৫ ভাগ পঞ্চায়েতদের দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, কর্মচারীর বেতন বাবদ, আসবাবপত্রের খরচ এবং গ্রাম্য পথঘাট তৈয়ারীর জন্ত প্রাদেশিক সরকার পঞ্চায়েতদের অর্থ সাহায্য করেন। আসামে প্রায় ১৪,০০০ গ্রাম্য অধিবাসীর জন্ত একটি করিয়া পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছে এবং একটি পঞ্চায়েতের অধীনে পাঁচটি করিয়া প্রাথমিক পঞ্চায়েত আছে। আসাম সরকার প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে ৫৫,০০০ টাকা দিয়া সাহায্য করিতেছেন।

স্বল্প-আয়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান বোর্ড

ভারত সরকার একটি স্বল্প-আয়তন শিল্পবোর্ড সংগঠন করিয়াছেন। এই বোর্ডের কাজ হইবে স্বল্প-আয়তন শিল্পের উন্নতির জন্ত কার্য্যতালিকা প্রণয়ন করা। শ্রীজসবীর সিং স্বল্প-আয়তন শিল্পের ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনার পদাধিকার বলে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োজিত হন।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আন্তর্জাতিক কমিটির প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার চারিটি আঞ্চলিক শিল্প-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কলিকাতা, বোম্বাই, ফরিদাবাদ এবং মাদুরাই এই চারিটি স্থানে একটি করিয়া আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এই শিল্প-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি স্বল্প-আয়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন-প্রথা ও পরিচালন-ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্ত সাহায্য করিবে। অধিকন্তু ঋণ গ্রহণ এবং মূলধন সংস্থান, উন্নততর কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়করণ প্রভৃতি ব্যাপারেও সাহায্য করিবে। বৃহদায়তন এবং স্বল্প-আয়তন শিল্পসংস্থার মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্ত পন্থা নির্দ্ধারণ করিবে এই আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি।

কলিকাতার আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানটির অধীনে থাকিবে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, মণিপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্য। ফরিদাবাদ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানটির সহিত যুক্ত থাকিবে পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান, পেপস্যু, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লী এবং আজমীর। দক্ষিণ ভারতের প্রদেশগুলি—যথা, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মহীশূর, হায়দরাবাদ এবং কুর্গ মাদুরাই প্রতিষ্ঠানটির সহিত যুক্ত থাকিবে। বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠানটির অধীনে থাকিবে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, সৌরাষ্ট্র, মধ্যভারত, কচ্ছ, বিন্ধ্যপ্রদেশ এবং ভূপাল।

কেন্দ্রীয় স্বল্পায়তন শিল্প বোর্ডের মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি সংযোগসূত্রে গ্রথিত থাকিবে। পরে একটি মার্কেটিং সার্ভিস কর্পোরেশন এবং স্বল্পায়তন শিল্প-সংস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সকল প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় বোর্ডের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। গত বৎসরের মাঝামাঝি বোম্বাইতে প্রাদেশিক সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিবর্গের একটি বৈঠক বসে। সেখানে স্বল্পায়তন শিল্প-সংস্থাগুলিকে বর্দ্ধিত হারে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বৈঠকের পর ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারদের অর্থ দিতেছেন শিল্পগুলিকে ঋণ দেওয়ার জন্ত এবং এই বাবদ প্রদেশগুলি ২৮ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পাট ব্যবসা

জুট এনকোয়ারী কমিশনের রিপোর্টের উপর ভারত সরকার সম্প্রতি কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কাঁচা পাট ও শিল্পোৎপাদন উভয়ই এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত। কাঁচা পাট সম্বন্ধে জুট কমিশন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহা আরও উন্নত শ্রেণীর হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ তাহার মিলগুলির চাহিদা মিটাইতে পারে। এই প্রস্তাবের সহিত ভারত সরকার একমত। উচ্চশ্রেণীর পাট উৎপাদনে ভারতকে স্বাবলম্বী করিতে হইলে প্রচার, গবেষণা, প্রদর্শন ইত্যাদি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। সার এবং উন্নত ধরণের বীজ, উন্নত ধরণের বেচাকেনার বন্দোবস্ত, যানবাহনের ব্যবস্থারও প্রয়োজন। কমিশনের আর একটি প্রস্তাবের সহিত ভারত সরকার একমত—অর্থাৎ, কাঁচা পাট রপ্তানী কোনও ক্রমেই করিতে দেওয়া হইবে না। নূতন পাটকল স্থাপন করিতেও আর অনুমতি দেওয়া হইবে না।

জুট কমিশন অভিমত দিয়াছেন যে, ভারতের পক্ষে পাট সরবরাহে সর্বাঙ্গীণ স্বাবলম্বী হওয়ার চেয়ে আপেক্ষিক স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয়। ব্যাপক ক্ষেত্রে পাট চাষ না করিয়া নির্দ্ধারিত ক্ষেত্রে উন্নত শ্রেণীর পাট চাষ করা উচিত। ভবিষ্যতে পাটের পরিমাণের চেয়ে গুণাগুণ সম্বন্ধে বেশী নজর দেওয়া হইবে। ঘাটতি জমিতে (uneconomic lands) পাট চাষ করিয়া পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে সমস্যার সমাধানের চেয়ে সমস্যা আরও সঙ্কটময় হইয়া উঠিবে। নূতন পাটকল স্থাপন না করিয়া বর্ত্তমান পাটকলগুলির উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। কয়েক বৎসর ধরিয়া পাটশিল্প তাহাদের শতকরা সাড়ে বার ভাগ তাঁত বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং সাপ্তাহিক কার্য্যকরী ঘণ্টাও হ্রাস করিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি পাটকলের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল অবশ্য কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে কার্য্যকাল সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি করিয়া দিলে উৎপাদন এবং রপ্তানী দুই-ই বৃদ্ধি পাইবে।

কাঁচা পাট বাজারের, এবং প্রধানতঃ পাটজাত শিল্পদ্রব্যের, প্রধান অসুবিধা এই যে, ফাটকা বাজারের জুয়াখেলায় ইহারা পর্য্যুদস্ত। এই ব্যাপারে ভারত সরকার জুট কমিশনের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ, বোম্বাইয়ের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশনের ন্যায় একটি সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান পাটের বাজারের জন্ত গঠন করা হইবে। সরকারী ফরওয়ার্ড মার্কেটস কমিশন ফাটকা বাজারের দোষগুলি দূরীভূত করিবার জন্ত সচেষ্ট হইবেন বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়াছেন।

পাট ব্যবসায়ের আর একটি প্রধান সমস্যা—কাঁচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের উচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করা। জুট কমিশনের

মতে আইনসিদ্ধ মূল্য নির্দ্ধারণ অবাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে যখন একজন জুট কমিশনার নিয়োজিত হইবেন তখন তিনি এই ব্যাপারে সাহায্য করিবেন। মিল-মালিকদের লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হইবে এবং সেই বোর্ড পাট ব্যবসায়ে লিপ্ত অন্যান্য সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক এবং মহাজন, চাষীর প্রতিনিধি এবং প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি সকলের সহিত আলোচনা করিয়া জুট কমিশনার কাঁচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন। জুট কমিশনের এই সকল অভিমতের সহিত কেন্দ্রীয় সরকার অনেকখানি একমত। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, পাটজাত শিল্পদ্রব্যের অধিকাংশই যখন বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায় তখন আইনের দ্বারা মূল্য নির্দ্ধারণ কার্য্যকরী হইবে না, কারণ বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতার দ্বারা মূল্য নির্দ্ধারণ হয়। তবে সরকার মনে করেন যে, মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য জুট কমিশনারের কোন অংশ গ্রহণের প্রয়োজন নাই, কারণ কাঁচা পাট এবং পাটজাত শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কোন স্থিরীকৃত মূল্য-সম্পর্ক নাই; এবং যদিও কাঁচা পাটের মূল্যের উপর পাটজাত শিল্পদ্রব্যের মূল্য নির্ভর করে, তথাপি মূল্য নির্দ্ধারণ দ্বারা চাষী কিংবা মিল-মালিক কেহই যথার্থভাবে উপকৃত হইবে না। আর নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত কেবলমাত্র মূল্য ঘোষণার দ্বারা সাধারণ বাজারে নির্দ্ধারিত মূল্যে কেনাবেচা সম্ভবপর হইবে না।

বিশ্বশান্তি ও ফরমোসা

বর্ত্তমানে সমস্ত পৃথিবীর উপর একটা যুদ্ধের ছায়া আসিয়াছে। ফলে প্রতি দেশেই আসন্ন যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশের জনসাধারণ বহির্জগত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং একান্তই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। কিন্তু এখানেও পাট, সোনা ইত্যাদিতে বড় রকম জুয়া খেলা আরম্ভ হইয়াছে। তবে যাঁহারা খেলিতেছেন তাঁহারাও জানেন না যে কিসের আশায় তাঁহারা আছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ এবং মানবজাতির শতকরা ৮০ ভাগ জড়িত হইয়া পড়ে। ইউরোপ ও এসিয়া মহাদেশের মানচিত্রেও অসংখ্য পরিবর্ত্তন ঘটে। সমস্ত মানবজাতিরই দৈনন্দিন জীবনে বিষম ক্রান্তি দেখা দেয়। আজও কোনও জাতি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইতে পারে নাই। অতি সমৃদ্ধশালী জাতিও নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে অনেকস্থলে এবং পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ শক্তি ভূপতিত হইয়াছে।

তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি সত্যই আরম্ভ হয় তবে মানবজাতি সমষ্টির মধ্যে কোনটি বাঁচিবে কোনটি লোপ পাইবে ইহাই কেহ জানে না। বর্ত্তমান সভ্যজগৎ যে সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্রের অবকাশ নাই। সেইজন্য এতো শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। এ বিষয়ে শেষ খবর আমরা লণ্ডন হইতে পাইতেছি :

"লণ্ডন, ১২ই ফেব্রুয়ারী—মস্কো বেতার হইতে আজ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ফরমোসা সমস্যা সমাধানকল্পে রাশিয়া এই মাসে সাংহাই অথবা নয়াদিল্লীতে ব্রিটেন, রাশিয়া, ভারত, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থান ও সিংহল এই দশটি রাষ্ট্রের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়াছে। আট দিন আগে সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটভ মস্কোস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত সার্ উইলিয়ম হেটারের নিকট এই প্রস্তাব অর্পণ করেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেন রাশিয়া, ও ভারত এই সম্মেলন আহ্বান করিবেন। লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন চলিবার কালে রাশিয়া এই প্রস্তাব করে—এত দিন ইহা গোপন রাখা হইয়াছিল, আজ মস্কো বেতার হইতে ইহা প্রচার করা হইয়াছে। সার্ উইলিয়ম হেটার গত বুধবার আবার মঃ মলোটভের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মনে হয় তিনি তখন রুশ প্রস্তাবের উত্তরে ব্রিটেনের মতামত মঃ মলোটভকে জানাইয়াছেন।

মস্কো বেতার হইতে আরও বলা হইয়াছে যে, ২রা ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব ফরমোসা সম্পর্কে ব্রিটিশ ঘোষণা সম্বলিত এক নোট লণ্ডনস্থ ভারপ্রাপ্ত রুশদূতের হস্তে অর্পণ করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মঃ মলোটভ মস্কোস্থিত ব্রিটিশ দূত সার্ উইলিয়ম হেটারকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার হাতে সোভিয়েট প্রস্তাব-সম্বলিত নোট অর্পণ করেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নোটে বলিয়াছেন যে, স্বস্তি-পরিষদে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ

বিগত ২৫শে জানুয়ারী রাত্রে ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বেতারযোগে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার বেতার ভাষণে বলেন, 'আগামীকল্য আমরা আমাদের প্রজাতন্ত্রের পঞ্চম বার্ষিকী দিবস পালন করিতে যাইতেছি। এই উপলক্ষে আমি আমার সকল দেশবাসীকেই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। এইদিনে আমরা আমাদের অতীত সাফল্য ও কীর্ত্তির কথা সবিনয়ে আলোচনা করিব। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও সচিন্তুতার সহিত আলোচনা করিব এবং ঐগুলি দূরীকরণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইব। এই বৎসরের প্রজাতন্ত্র দিবস বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনেই স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে জাতির সঙ্কল্প প্রকাশ করিবার জন্য দেশের সর্ব্বত্র—নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। তাহার পর এই কয় বৎসর আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, আমাদের সংবিধান রচনাও চালু করিয়াছি এবং একটি সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। কাজেই এই উপলক্ষে আমরা আনন্দ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু আত্মসমীক্ষণ করি এবং নিরপেক্ষভাবে নিজদিগকে বিচার করিয়া দেখি।

'যেদিন আমরা আমাদের দেশকে একটি সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম সেই দিন হইতেই আরম্ভ করি। আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণে আমরা অনেকখানি সাফল্য লাভ করিয়াছি এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সকল ভাই-বোনকে কি দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও দুর্দ্দশার

কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি? প্রকৃতির শক্তি নিয়ন্ত্রণে এবং ঐ শক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজনে আমরা অনেকটা সফল হইয়াছি। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বেই বিধ্বংসী বন্যায় ভারতের কোন কোনও অঞ্চলের যে ক্ষতি হইয়াছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া নানাভাবে জনসাধারণের যে দুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহাও আমরা ভুলিতে পারিতেছি না। গণশিক্ষা প্রসার এবং রোগ দূরীকরণের পরিকল্পনা লইয়া আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। তবে এখনও দেশের অনেক অঞ্চলে এবং অনেক শ্রেণীর মধ্যেই অজ্ঞতা ও স্বাস্থ্যহীনতা ব্যাপকভাবেই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের জনগণের কল্যাণের জন্য আমাদের প্রণীত পরিকল্পনাগুলি লইয়া যে আমরা অগ্রসর হইয়া যাইব এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জাতি ঐ সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যেভাবে চেষ্টা করিতেছে তাহাতে আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই। আমাদের সাফল্য যদি খুব দ্রুত না হইয়া থাকে তাহার কারণ এখনও রোগের চিকিৎসা হইতেছে মাত্র। একটি জাতি গড়িয়া তুলিতে সময়ের প্রয়োজন। আমরা আমাদের সাধারণতন্ত্রের পঞ্চম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করিতেছি মাত্র। আমাদের মত প্রাচীন জাতির ইতিহাসে পাঁচটি বৎসর অতি অল্প সময়।

'আজ যে বৎসরটি শেষ হইয়া গেল এখন আমি সেই এক বৎসরের ঘটনাবলী আলোচনা করিব। তাহা হইলেই আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে আমরা কতদূর সফল হইয়াছি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

'আমাকে যদি একটি বাক্যের মধ্যে গত বৎসরের ঘটনাবলীর কথা বলিতে বলা হয় তবে আমি বলিব, আমাদের সংবিধানের নির্দ্দেশমূলক নীতি অনুযায়ী আমরা আমাদের দেশের সম্পদ কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছি, একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ভিত্তি যে স্থাপিত হইতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। গত কয়েক বৎসর আমরা যে সকল সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছি এবং যাহা যাহা করিব বলিয়া দাবি করিয়াছি সেইগুলি এখন রূপ লইতে আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই জাতি কোন দিকে চলিয়াছে এবং দশ-পনর বৎসর পরে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা উপলব্ধি করা এখন কঠিন নহে।

'বৃহৎ বৃহৎ নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে ইতিমধ্যেই পঞ্জাব, পেপসু ও রাজস্থানের কোন কোনও অঞ্চলে জল ও বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ সুরু হইয়া গিয়াছে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা অনুযায়ীও কিছুকাল আগেই বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ কাজ আরম্ভ হইয়াছে। হীরাকুণ্ড, চম্বল ও অন্যান্য পরিকল্পনাও নানাদিক দিয়াই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায় শেষ হইয়া যাওয়ার ফলে—এইগুলির সম্পূর্ণ রূপায়ণের ফলে কি বিরাট ও সুদূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হইবে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন।

'দুঃখের নদী কোশী এই বৎসরও তাহার নামের তাৎপর্য্য বজায় রাখিয়া লোকের দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে। এই নদীটিকেও শীঘ্রই আয়ত্তে আনা হইবে।

'আলোচ্য বৎসরের কয়েকটি কল্যাণকর বিষয় হইতেছে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দ্রুতগতি উৎপাদনবৃদ্ধি এবং দেশবাসীর মাথাপিছু আয়ের পরিমাণবৃদ্ধি। শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে কুটিরশিল্প ও ছোটখাট শিল্পের দিকেও যথোচিত উৎসাহ দেওয়া হইতেছে এবং উৎপাদন ও কর্ম্মসংস্থানের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। যদি ভারতীয় জনসাধারণের মন হইতে নৈরাশ্যের ভাব দূরীভূত করিতে হয় তাহা হইলে বেকার সমস্যার বৃদ্ধি রোধ করিতে হইবে।' "

অতঃপর রাষ্ট্রপতি পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে, বিশেষে পাকিস্থান, গোয়া ও বর্ত্তমান সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে, কিছু বলেন। তাহার পর তিনি বলেন:

"পরিশেষে আমি আমাদের অনুন্নত, প্রপীড়িত ও পঙ্গু দেশবাসী-দিগকে আশার কথা শুনাইব। আমরা ভারতের শাশ্বত আদর্শ অনুযায়ী প্রকৃত জনহিতকর রাষ্ট্র গঠন করিব। মহাত্মা গান্ধীও এই বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রস্তাবিত ভারত রাজ্যে প্রত্যেক নাগরিক সকল বিষয়ে সমান সুখ-সুবিধা ভোগ করিবেন। আশা করি, মাতৃভূমি ও দেশবাসীর ঐরূপ সুপরিধান কার্য্যে প্রত্যেক ভারতীয় প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। ধ্রুব নক্ষত্রের মত এই আদর্শই আমাদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে অনুপ্রাণিত করুক।

আবার আমি আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। আশা করি, আগামী বৎসর মাতৃভূমির সুখ ও সমৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি পাইবে।"

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি গত ৮ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে রাজ্যবিধান সভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত অধি-বেশনে আনুষ্ঠানিক ভাষণের মধ্য দিয়া রাজ্য বিধানমণ্ডলীর বজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের সম্মুখে এক্ষণে বিরাট ও জটিল সমস্যাসমূহ রহিয়াছে। তন্মধ্যে বেকার সমস্যা হ্রাসের প্রশ্ন অন্যতম। এতদ্ব্যতীত পল্লী উন্নয়ন এবং উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের সমস্যাও উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিষয়ে বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণ যখন সাধারণ প্রশ্নে ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিবেন, তখন যেন তাঁহারা মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত না হন, সদস্যগণের নিকট ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। আপনাদের সকলের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার দ্বারাই আমরা অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিব।"

রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে খাদ্য পরিস্থিতি, কৃষি সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, গৃহনির্ম্মাণ, শ্রমকল্যাণ, হাসপাতাল সম্প্রসারণ, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন

ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের অবলম্বিত বিবিধ ব্যবস্থার অগ্রগতির উল্লেখ করেন। বর্ত্তমান অধিবেশনে রাজ্যসরকারের ১৯৫৫-৫৬ সনের বাজেট বিবেচনা ছাড়াও যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপিত হইবে, তন্মধ্যে রাজ্যপাল ভূমিসংস্কার বিল, গ্রাম পঞ্চায়েত বিল এবং চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিলের নামোল্লেখ করেন।

রাজ্যপাল তাঁহার বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার গবর্ণমেণ্ট আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ঐ সমস্যার তীব্রতা হ্রাসের জন্য যথাসম্ভব বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদগ্রীব। তাঁহার গবর্ণমেণ্ট এই সমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টায় নানাবিধ কুটীরশিল্প ও ছোটখাটো শিল্প প্রতিষ্ঠার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ড. মুখার্জি পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৯৫৩-৫৪ সনে প্রচুর ফলন হওয়ায় রাজ্যের খাদ্যপরিস্থিতির বহুল উন্নতি হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সনে ৩৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন আমন ফসল ফলিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। কয়েকটি অঞ্চলে বন্যা এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে এ বৎসর ফসল ১৯৫৩-৫৪ সনের তুলনায় কম হইলেও উদ্বেগের কোন কারণ নাই। গত বৎসরের ফসল হইতে নয় লক্ষ টন চাউল উদ্বৃত্ত আছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে, তন্মধ্যে দুই লক্ষ টন সরকারের হাতে মজুত আছে। সুতরাং ১৯৫৫ সনের প্রথমে ৪২ লক্ষ ৪০ হাজার টন চাউল পাওয়া যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত চার লক্ষ টন আউসও পাওয়া যাইবে। বীজ এবং ক্ষয়ক্ষতি বাবদ শতকরা দশ ভাগ বাদ দিলেও ১৯৫৫ সনে ৪১ লক্ষ ৮০ হাজার টন চাউল পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে চাউলের বাৎসরিক প্রয়োজনের পরিমাণ ৪০ লক্ষ টন।

গত বৎসরে রাজ্যে রেশন ব্যবস্থা বিলোপের উল্লেখ করিয়া রাজ্যপাল বলেন, বিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ঝুঁকি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। তাঁহারা চাউলের অযথা মূল্য বৃদ্ধি নিরোধের জন্য পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

ড. মুখার্জি বলেন, গত বৎসর উত্তরবঙ্গে যে অভূতপূর্ব্ব বন্যা হয় তাহার ফলে ৪ লক্ষ ৮২ হাজার একর জমির ক্ষতি হয় এবং প্রায় সাত কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট জরুরী রিলিফ ব্যবস্থা হিসাবে ৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা কৃষি ঋণ, ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা গৃহ নির্ম্মাণ ঋণ, ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা খয়রাতী সাহায্য এবং টেষ্ট রিলিফ বাবদ ২২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। বর্দ্ধমান বিভাগ এবং ২৪ পরগণা জেলার কতকগুলি অঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলেও ফসলের ক্ষতি হয়। এই সকল অঞ্চলে ৫০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা কৃষিঋণ, ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা গৃহ-নির্ম্মাণ সাহায্য এবং ৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। ১৯৫৪-৫৫ সনে বিবিধ রিলিফ ও সাহায্য বাবদ প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় হয়।

রাজ্যপাল বলেন, উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য উত্তরবঙ্গ বন্যা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সম্প্রতি একটি পর্য্যবেক্ষক দল সিকিমের অববাহিকা অঞ্চলে তদন্ত করিয়াছেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা সময়-সাপেক্ষ। রাজ্যসরকার মনে করেন যে, ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুর দুয়ার, মাথাভাঙ্গা এবং শিলিগুড়ি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি বন্যার আক্রমণ হইতে অবিলম্বে রক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতদনুযায়ী ঐ শহরগুলি রক্ষার জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকার কতকগুলি পরিকল্পনা সম্পর্কে রাজ্যসরকার ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে কাজ ইতো-মধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল পরিকল্পনার ফলে কতকগুলি গ্রামাঞ্চলও উপকৃত হইবে।

ড. মুখার্জি রাজ্যে পাঁচসালা পরিকল্পনার অগ্রগতির উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই বৎসরের ৩১শে মার্চের মধ্যে ৪৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে এগারটি সমাজ-উন্নয়ন ব্লকে কাজ চলিতেছে। এজন্য ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্বেচ্ছায় নগদ অথবা অন্য প্রকারে ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা সাহায্য করা হইয়াছে। ১৯৫৪ সনের জুলাই মাস হইতে ১৫টি জাতীয় সম্প্রসারণ সার্ভিস ব্লকেরও কাজ চলিতেছে।

রাজ্যপাল বিবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, ইতিমধ্যেই ১৫৪৪ মাইল পাকা সড়ক যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সনের শেষে ৫ হাজার মাইল সড়ক নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। রাজ্য-পাল এতৎপ্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ গ্রাম্য বৈদ্যুতীকরণ পরিকল্পনা, কল্যাণী উপনগর নির্ম্মাণ এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার পরিকল্পনার অগ্র-গতির উল্লেখ করেন।

উদ্বাস্তু সমস্যার উল্লেখ করিয়া রাজ্যপাল বলেন, গত বৎসরের জুন মাস হইতে উদ্বাস্তু সমাগম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ডিসেম্বর মাসে ঐ সংখ্যা ২২,৮৫৭ হয়। ঐ বৎসরের মার্চ মাস হইতে গবর্ণমেণ্ট বিহার এবং উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগত উদ্বাস্তু সমস্যারও সম্মুখীন হন। ঐ সকল উদ্বাস্তু পরিবারকে এক্ষণে উল্লিখিত রাজ্যগুলিতে সাময়িক ভাবে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনীতে বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের নিমিত্ত সমবায়ের মাধ্যমে কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। কয়েকটি বড় বড় কলোনীতে ছোট ও মাঝারী শিল্প স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৫৪,১২২ একর পরিমাণ জমি দখল করা হইয়াছে এবং তথায় কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উদ্বাস্তু পুনর্বসতি দপ্তরের পক্ষ হইতে ১,৩৫,৮২৩ জন উদ্বাস্তুর কর্ম্মসংস্থান করা হয়। সরকারী প্রচেষ্টায় এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের যে সকল ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ ২২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা।

রাজ্যপাল রাজ্যের শ্রমিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন যে, গত

বৎসর এই ক্ষেত্রে উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। ১৯৫৩ সনে বিবিধ ধর্ম্মঘট এবং লকআউটের সহিত ২,৭০,২৩০জন শ্রমিক জড়িত ছিল। ১৯৫৪ সনে ঐ সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৮২,৬২৬ হয়। রাজ্যপাল মালিক এবং শ্রমিকদের উদ্দেশে সালিশী ও আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করার জন্য আবেদন জানান।

তিনি জানান যে, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনার কাজও অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তিনি বলেন, তপশীলী জাতিসমূহের উন্নতির জন্যও গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট আছেন। ১৯৫৪-৫৫ সনে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং রাজ্যসরকার আরও ১১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। এই অর্থ বিবিধ ক্ষেত্রে তপশীলী জাতিসমূহের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হইতেছে।

রাজ্যপাল আরও বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে রাজ্যে একর প্রতি চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে ১৪,০০০ প্রদর্শনী কৃষিক্ষেত্র এবং ৪,৭০০ প্রদর্শনী প্লট আছে। জাপানী পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য আড়াই লক্ষ একর জমি চাষের আওতায় আনা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ১৯৫৪-৫৫ সনে কৃষিঋণ বাবদ ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। রাজ্যপাল হরিণঘাটা পশুপালন ও ডেয়ারী ফার্ম্ম, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অগ্রগতিরও উল্লেখ করেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিয়া মেডিক্যাল রিলিফের ক্ষেত্রে সরকারী কর্ম্মপ্রচেষ্টাও বিবৃত করেন।

ড. মুখার্জ্জি বলেন, শিক্ষার বিভিন্ন পর্য্যায়ে গবর্ণমেণ্ট বিবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন: ১৯৪৮-৪৯ সনে শিক্ষা খাতে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এক্ষণে ঐ ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটি টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জুনিয়র বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৬,৬৮৯ এবং ৩৮৪ হইয়াছে। এক্ষণে এক হাজার গ্রামের ৩,৮৩৫ বর্গমাইল এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের অতিরিক্ত বেতন ও ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষকদেরও বর্দ্ধিত হারে বেতন ও ভাতা মঞ্জুর হইয়াছে। এই জন্য বৎসরে ৫২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা সম্প্রতি মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলিকে ক্রমে ক্রমে বিবিধ উদ্দেশ্যসাধক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইবে। তিনি এতৎপ্রসঙ্গে কলেজের শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা এবং প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা বিবৃত করেন।

রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, খাদ্যবিনিয়ন্ত্রণের ফলে ১০,৩৮৪ জন কর্ম্মচারী বাড়তি হইয়া পড়িয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। খাদ্যবিভাগের বাড়তি কর্ম্মচারীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬,৯৩০ জনকে অন্যান্য বিভাগে কাজ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষিত বেকারদের সাহায্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩,৫০০ জনকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। রাজ্য পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষও তিন হাজারের অধিক লোককে কাজ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহা স্বীকার করেন যে, বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান করিতে হইলে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট এজন্য কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এক্ষণে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ১৪টি পরিকল্পনা, ছোটখাট শিল্পের ১৫টি পরিকল্পনা এবং কারুশিল্পের ১০টি পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। রাজ্যপাল দুর্গাপুরে প্রস্তাবিত কোকচুল্লি স্থাপনের পরিকল্পনার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ভারত সরকারের নিকট ঐ পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য পেশ করা হইয়াছে।

রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, এতৎসংক্রান্ত পরিস্থিতি মোটামুটি শান্তিপূর্ণ থাকিলেও ডক শ্রমিক ধর্ম্মঘট, ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা, গোহত্যা নিরোধ অভিযান প্রভৃতি কতকগুলি ঘটনা ঘটে। ১৯৫৪ সনের শেষের দিকে পুলিস বাহিনীর কতকগুলি কনষ্টেবলের ধর্ম্মঘট হয়, কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। পুলিস বাহিনীর পক্ষ হইতে যে সকল অভাব-অভিযোগের উল্লেখ করা হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া বর্দ্ধিত হারে বেতন ও ভাতা দেওয়ার বিষয় ঘোষণা করিয়াছেন। এজন্য ৬৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। অতঃপর রাজ্যপাল বর্ত্তমান অধিবেশনে সরকারের পক্ষ হইতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন করা হইবে তাহার উল্লেখ করেন।

শনিবার ১২ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণ সম্পর্কে আলোচনার দ্বিতীয় দিবসে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, কর্ত্তব্যে অবহেলা প্রভৃতি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং বলেন, উক্ত ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু তদনুযায়ী আয় বাড়ে নাই। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের নিমিত্ত কিছুই করিতে পারেন নাই। মুদ্রাস্ফীতিও অব্যাহত আছে।

এইদিন মোট ১৫ জন সদস্য বিতর্কে যোগদান করেন। তন্মধ্যে ৪ জন কংগ্রেস সদস্য। তাঁহারা বলেন যে, রাজ্যপালের ভাষণে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার নিমিত্ত সরকারী কর্ম্মপ্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল চিত্র প্রতিভাত হইয়াছে। কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন, বেকার সমস্যার প্রতিকার, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার নিরলসভাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন।

বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যদানে বিলম্ব

বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যদানে অস্বাভাবিক বিলম্ব উপলক্ষে একটি বিশেষ অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন, "আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে অভিযোগটি ভিত্তিহীন নহে। সাহায্য যখন দেওয়াই হইতেছে তখন তাহা দিতে অযথা বিলম্ব করিয়া বিদ্যালয়গুলির অসুবিধা ও জটিলতা সৃষ্টি করিবার পিছনে কি কারণ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।" সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তৃপক্ষের দীর্ঘসূত্রিতাকেই সেজন্য দায়ী করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, প্রাক্-স্বাধীন যুগে যে আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে হৃদয়হীনতা প্রত্যক্ষ হইত দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও তাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। পরিশেষে অভিযোগটি উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া প্রতিকারের জন্য "ভারতী" অনুরোধ করিয়াছেন।

বিদ্যালয় বিভাগ সম্পর্কে আমরা কিছুদিন যাবৎ নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। ইহার মূলে যাহাই থাকুক, আমাদের মনে হয় উচ্চতম অধিকারিবৃন্দের এবিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয় জাতিগঠনের প্রথম সোপান।

শিক্ষা বিভাগ দীর্ঘদিন দুয়োরাণীর অবস্থায় থাকায় বাংলায় শিক্ষার যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার নিদর্শন আমরা প্রত্যহ ছাত্র-দিগের উদ্ধত ব্যবহারে ও বাঙালী ছেলের প্রতিযোগিতায় পরাজয়ে দেখিতেছি। অথচ এই বিভাগটি এখনও সজাগ ও সচল হইল না।

সরকারী দুর্নীতি

১৮ই জানুয়ারী "জি. টি. রোড" পত্রিকার সরকারী দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গমের চোরাকারবার সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকার প্রাক্তন আলোচনার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "জি. টি. রোডে"র এই লেখা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই; তাঁহারা এই বিষয়ে সাবেকী ব্যবস্থার পরিবর্তন চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীযুত ঘোষ লিখিতেছেন যে, মহকুমা হাকিমের নিকট গমের পারমিট চাহিয়া ব্যর্থকাম হইয়া জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসাদার নাকি মহকুমা হাকিমকে বলেন যে, তিনি যদি উপর হইতে গমের পারমিট লইয়া আসেন তাহাতে হাকিম ক্রুদ্ধ হইবেন কিনা। ঠিক ঐ একই পথে কলিকাতার জনৈক নেপাল দত্ত নাকি প্রায় দুই হাজার মণ গমের পারমিট লইয়া বার্ণপুরে গম বিক্রয় করিয়া আসিয়াছেন যাহার উপর স্থানীয় গম বণ্টনকারী কর্মচারীদের হাত ছিল না।

ঐ ঘটনার উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে শ্রীযুত ঘোষ লিখিতেছেন, নিয়স্তর কর্মচারীদের মধ্যে যে প্রবল দুর্নীতির অভিযোগ চতুর্দিক হইতে করা হয়, তাহার সত্যাসত্য বিচারের ভার যাঁহাদের উপর তাঁহারাও যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তবে কে ঐ দুর্নীতি দমন করিবে? এই সকল নিম্নপদস্থ আমলা যদি জানে তাহাদের উপরের স্তরের ব্যক্তিরাও দুর্নীতিপরায়ণ তবে তাহারা দুর্নীতিকে ভয় করিবে কেন? অথবা তাহারাই বা কেন সুযোগ গ্রহণ করিবে না?

"নীচের স্তরের কর্মচারীরা যখন দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে তখন বুঝিতে হইবে উপরের স্তরে দুর্নীতির মূল রহিয়াছে এবং ঐ রন্ধ্র পথেই দুর্নীতি শনির মত সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতেছে। অতএব নিম্নপদস্থ কর্মচারী ("petty officor") যখন দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে তখন বুঝিতে হইবে সরকারের মাথার উপর যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহারাই ইহার প্রবর্ত্তক।"

এইরূপ মন্তব্যের মূলে কিছু আছে কিনা তাহার তদন্ত প্রয়োজন। কণ্ট্রোলের পাপ সম্পূর্ণরূপে দূর হইতে দেরী লাগিবে আমরা জানি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নিজে যে কাজ হাতে লইয়াছেন তাহাতেও এরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে জনসাধারণ যায় কোথায়?

মফস্বলে চুরির হিড়িক

মুর্শিদাবাদ জেলায় চুরির হিড়িক বৃদ্ধি সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে "ভারতী" লিখিতেছেন, "পল্লী অঞ্চলেই শুধু নয়, জঙ্গীপুর ও রঘুনাথ-গঞ্জ শহরে সম্প্রতি চুরির হিড়িক বাড়িয়াছে। এমনকি কয়েকদিন পূর্ব্বে মহকুমা পুলিস অফিসারের বাড়ীর নিকটেও দুইটি চুরি হইয়া গিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত একটিরও কোন কুল-কিনারা হইল না। ইহার ফলে পুলিসের উপর জনসাধারণের আস্থা দিন দিন কমিতেছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ধারক ও বাহকদের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই গৌরবের নহে।" জনসাধারণের সহিত পুলিসের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইলে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া পত্রিকাটি পুলিস কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সচেতন হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

পুলিস ও শান্তিরক্ষা বিভাগ এমন এক জন মন্ত্রীর হাতে যাওয়া উচিত যিনি অনন্যমনা হইয়া সমস্ত বিভাগটির পুনর্গঠন ও উন্নয়ন করিতে পারেন। এ কথা আমরা আগেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি; নহিলে ইহার আরও অবনতি ঘটিবে। কলিকাতায় তো চুরি বাড়িয়াই চলিয়াছে। খবরের কাগজে চুরি রাহাজানির খবর দেওয়া বন্ধ। বোধ হয়, সকল খবর দিতে হইলে নিত্যই "স্পেশ্যাল" ছাপিতে হয় এই কারণে।

পল্লী-অঞ্চলে ডাকবিলিতে বিলম্ব

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে চিঠিপত্রাদি পৌঁছানোর ব্যাপারে ডাক-বিভাগের ঔদাসীন্যের কথা আলোচনা করিয়া "ভারতী" লিখিতে-ছেন:

"পল্লী-অঞ্চলে ডাকবিলির ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য ভারত সরকার বহু টাকা ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে পোষ্টাপিস স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থান হইতে আমরা সংবাদ পাইতেছি যে, নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে পরের দিন কিংবা অন্ততঃ এক দিন পরে যেখানে ডাক পাওয়া উচিত তাহা তিন-চারি দিনেও পৌঁছায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই পোষ্টাপিসগুলি স্থাপিত হওয়ার ফলে গ্রামের

ডাকবিলির কোন উন্নতি ত হয় নাই, বরং অবনতিই ঘটিয়াছে। কি কারণে ডাকবিলির এইরূপ অবস্থা ঘটিতেছে তাহা অবিলম্বে অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। ব্যাপকভাবে নূতন পোষ্টাপিস স্থাপনের ফলে গ্রামবাসিগণের যদি কোন সুযোগ-সুবিধা না হয় তবে ইহার পিছনে অর্থব্যয় করিয়া লাভ কি? কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সজাগ হইলে অবস্থার উন্নতি সম্ভব হইতে পারে।"

ডাকবিভাগ আগে সরকারী সকল বিভাগ অপেক্ষা সুশৃঙ্খল ও কর্ম্মতৎপর ছিল: এখন লোকসংখ্যা যতই বাড়িতেছে কাজে ফাঁকি ততই বেশী চলিতেছে। ইহা পরিতাপের বিষয়।

বর্ত্তমানে ডাক বিভাগে লোক প্রায় চতুর্গুণ, খরচ প্রায় দশগুণ, কিন্তু সাধারণে উহা হইতে কাজ পাইতেছে অর্দ্ধেক। এমন অপরূপ ব্যবস্থা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনও সভ্য দেশে নাই।

মুর্শিদাবাদ সীমান্তে পাকিস্থানী হানা

মুর্শিদাবাদ জেলা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন ও দয়ারামপুর ইউনিয়নভুক্ত তিনটি মৌজা—পিরোজপুর, বাজিতপুর ও বাগবাগি—সম্প্রতি পাকিস্থানী পুলিস জবরদখল করিয়া লয়। ২৮শে পৌষ "ভারতী" পত্রিকায় ঐ সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

পাক-পুলিস কর্ত্তৃক ভারতীয় এলাকা জবরদখল করার ব্যাপারে দয়ারামপুরের কতিপয় মুসলমানের সহযোগিতা করার উল্লেখ করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, "ঘটনাটি সামান্য হইলেও তুচ্ছ নহে।" পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "মুর্শিদাবাদ সীমান্তে যদিও পাকিস্থানী হামলার সংবাদ পূর্ব্বেও প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু জেলা কর্ত্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট বহু বার আবেদন জানান সত্ত্বেও কোন ফল হওয়া ত দূরের কথা কর্ত্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পত্রের উত্তর দিবার সৌজন্য পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। ঐরূপ সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে এক দিকে যেমন ভারতীয় প্রজা-সাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে অপর দিকে তেমনি পাকিস্থানীদের লোভও দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছে। তাহারা একের পর এক মৌজা নির্বিবাদে দখল করিয়াই চলিয়াছে এবং আমাদের সরকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সত্যই বিস্ময়কর। সীমান্ত সম্প্রসারণের এই অভিনব কৌশল অপ্রতিহত-ভাবে চলিতে থাকিলে অবস্থা শেষ পর্য্যন্ত যে কি দাঁড়াইবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি।"

পাক-ভারত সৌহার্দ্দ্যের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও পাকিস্থানের ঐরূপ অন্যায় আচরণ সহ্য করার যুক্তি পত্রিকাটি স্বীকার করেন না। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনার ফলে নদীয়া সীমান্ত চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও যে কেন মুর্শিদাবাদ সীমান্ত চিহ্নিত হইতে পারিল না তাহার কারণ অজ্ঞাত রহিয়াছে।

তবে, "ভারতী" লিখিতেছেন, "যত দিন না এই সীমান্ত চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হয় তত দিন পূর্ব্বাবস্থা বজায় রাখাই সাধারণ নীতি ও নিয়ম। এ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের দ্বারা অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। উপরোক্ত মৌজাগুলি আজও রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন এবং স্থানীয় আদালতের এলাকাধীন। সুতরাং এ সম্পর্কে সরকারী পর্য্যায়ে অনুরূপ ঘোষণা না হওয়া পর্য্যন্ত এই অঞ্চলগুলি পাকিস্থান সরকার এভাবে কুক্ষিগত করিয়া লইতে পারেন না ইহাই আমাদের ধারণা।"

পত্রিকাটি দাবি করিয়াছেন, হয় সরকার প্রকাশ্যভাবে বলিবেন যে ঐ অঞ্চলগুলি পাকিস্থানের এলাকাধীন, আর না-হয় ঐ অঞ্চলে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁহারা সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিবেন।

আমাদের প্রশ্ন এই যে, দায়ী কে হইবে? কর্ত্তৃপক্ষ কিছু না করেন ত প্রাদেশিক বিধান পরিষদ ও লোকসভায় যাঁহারা ঐ অঞ্চলের প্রতিনিধিরূপে গিয়াছেন তাঁহারা কি করিতেছেন? "ভারতী"র উচিত, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ চাওয়া।

বিনোবার পশ্চিমবঙ্গ সফর

বাঁকুড়া জেলার পাবড়া গ্রামে প্রার্থনান্তিক ভাষণে বিনোবা বলেন:

"বাংলাদেশে দুইখানি সমগ্র গ্রাম আমরা পাইয়াছি। এই ঘটনা এত গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে ছাপা উচিত। কিন্তু সংবাদপত্র বেচারাদের গুরুত্ববোধের জ্ঞান নাই। কোন মন্ত্রী আসিল, দালদার কারখানা খুলিল ত তাহা বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইল। কোন রাইফেল ক্লাব খোলা হইল এবং গান্ধীজীর নাম লইয়া বলা হইল ভারতের পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক, এই সব কাজের বিজ্ঞাপন কাগজে বাহির হয়। সংবাদ-পত্রে বড় বড় হরফে ইহা ছাপা হয়। আপনারা যে কোন খবর কাগজ দেখুন তাহাতে দেখিবেন, বিদেশের খবরই বড় বড় অক্ষরে দেওয়া থাকে। নিজের দেশের খবর ছোট ছোট অক্ষরে দেওয়া হয়। যে-কোন পত্রিকার প্রথম পাতা খুলিয়া দেখুন দুনিয়ার খবর তাহাতে। নিজেদের সংবাদ ভিতরের পৃষ্ঠায়। ইহার কারণ তাঁহারা মনে করেন, ভারতে কোন বড় কিছু হইতেছে না। যাহা কিছু হইতেছে দুনিয়ার অন্যান্য দেশেই হইতেছে। ইহাতে সংবাদ-পত্রের কোন দোষ নাই। ইহা আধিকার এক প্রবাহ। কিন্তু এই যে দুইখানি গ্রাম পাওয়া গিয়াছে তাহা কোন একজন লোকের কাছ হইতে পাওয়া যায় নাই। গ্রামের সমস্ত লোক দান দিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, ঐ দুই গ্রামে ভূমির গ্রামীকরণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, যে বিচারধারাকে জগতের সব চেয়ে অগ্রসর অর্থনৈতিক বিচার বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা ঐ দুই গ্রামে নিষ্পন্ন হইতে চলিয়াছে। জমি কাহারও ব্যক্তিগত থাকিবে না। জমি থাকিবে সমাজের। ইহা হইল অর্থশাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত ঐ দুই গ্রামের গ্রামবাসীরা গ্রহণ করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, ঐ দুই গ্রামে কি দেবদূতেরা বাস করে আর অন্যান্য গ্রামে সাধারণ মানুষ?"

দামোদরের পরপারে পশ্চিম বাংলার কিছু আছে সেকথা আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলই জানেন না। সুতরাং দৈনিক সংবাদপত্রের মালিক বা কর্মচারীদের জ্ঞান ততোধিক হইবে একথা ভাবাই বিনোবাজীর ভুল। সংবাদপত্রের মূলনীতি এখন অর্থনৈতিক। অন্য সব কথা অবান্তর ও অগ্রাহ্য।

বাঁকুড়ায় দারিদ্র্য

বিনোবাজী তাঁহার সাম্প্রতিক পরিভ্রমণকালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলাতে যান। সেখানে পাবরা গ্রামে এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি জনসাধারণের অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রামের দারিদ্র্যের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

"গরীবদের যে দুর্দশা দেখিলাম তাহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। যে সব হরিজন এই গ্রামে আছেন তাঁহাদের ঘর তাঁহাদের নিজেদের জমির উপর নয়।" অন্য লোকে ঘর তৈয়রীর জন্য জমি দিয়া রাখিয়াছে। সে জমি দানরূপে দেওয়া হয় নাই, সে জমিতে মালিকানা তাঁহারা দাবি করেন। হরিজনেরা নিজেদের পরিশ্রমে ঘর বানাইয়া লইয়াছে, কিন্তু সেই জমির মালিককে প্রতি বৎসর বার দিন বিনা মূল্যে খাটিয়া দিতে হয়। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়— যদি দৈনিক এক টাকা মজুরী হয় তবে বার দিনে বার টাকা কেবল জমির জন্য মালিককে দিতে হয়। আর সেই জমিই বা কতটুকু? পনর ফুট লম্বা ও এই রকম দশ বার ফুট চওড়া। এইভাবে গরীবদের শোষণ করিয়া রোজ আমরা তাহাদের অভিশাপ কুড়াইতেছি। মালিকদের দৃষ্টিতে ইহা ধরা পড়ে না।"

বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা হইতেছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। বাঁকুড়াতে মেডিক্যাল স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ সনে। মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে তুলিয়া সেই স্থানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভোর কমিটি যে সুপারিশ করেন তদনুযায়ী বাঁকুড়ার মেডিক্যাল স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করিবার জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী সরকারের নিকট আবেদন জানাইলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আশ্বাস দেন যে, জনসাধারণ ছয় লক্ষ টাকা তুলিয়া দিতে পারিলে বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি দেওয়া হইবে। তাহার পর যাহা ঘটে তাহা এইরূপ:

"টাকা তোলার আয়োজন শুরু হইল, আর এদিকে ১৯৫০ সনে ফার্স্ট এম-বি কোর্সের অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয় একটি বোর্ড অব ইনসপেক্টরস গঠন করিয়া অনুসন্ধান করিতে আসিলেন। ১৯৫১ সনের মে মাসে এই বোর্ড সমস্ত দেখিয়া আর যাহা প্রয়োজন তাহার এক দীর্ঘ তালিকা দিলেন, বলিলেন ঐগুলি জোগাড় করিলে এফিলিয়েশনের কথা বিবেচনা করা হইবে। একে একে জিনিষগুলি জোগাড় হইল। বোর্ডকে জানানো হইলে তাঁহারা সেপ্টেম্বরে পুনরায় ইনসপেক্সন করিলেন। বোর্ড প্রথম দুই বৎসরের এফিলিয়েশন সর্তাধীনে অনুমোদন করিলেন। বলা হইল, তৃতীয় বর্ষের জন্য পৃথক এফিলিয়েশন লইতে হইবে। যদি মঞ্জুর না হয় তবে ঐ ছেলেদের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় লইবে না, সম্মিলনীকে লইতে হইবে।

"অতঃপর সিণ্ডিকেট রিপোর্ট দেখিয়া সর্বসম্মতিক্রমে দুই বৎসরের এফিলিয়েশন দিলেন। সিনেটও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দিলেন। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য চ্যান্সেলার ড. হরেন্দ্র কুমার মুখার্জির নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। চ্যান্সেলারের কাজ আনুষ্ঠানিক, কাজেই সম্মিলনী কর্তৃপক্ষ কলেজে ছাত্র ভর্তির জন্য প্রস্তুতি শুরু করিলেন।

"পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় আইনে এই ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। কাজেই ফাইল ১৯৫৪ সনের জানুয়ারীতেই সরকারের নিকট যায়। এস এম এক স্বাস্থ্য-উপমন্ত্রীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, ফাইল হাতে পাইয়া চাপিয়া রাখিলেন। সম্মিলনী অস্থির হইয়া তাগাদা দিতে লাগিলেন; চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলারের নিকট ধর্ণা দিলেন। চ্যান্সেলার প্রতিশ্রুতি দিলেন, ফাইল তাঁহার কাছে আসিবামাত্র তিনি স্বাক্ষর দিয়া দিবেন। ভাইস চ্যান্সেলারও তাহাই বলিলেন। বাঁকুড়া সম্মিলনীকে চ্যান্সেলারের অনুমোদন সাপেক্ষ ছাত্রভর্তির আয়োজন করিতে বলা হইল।

'এইবার 'ল্যাক্ষ' উপমন্ত্রীর লম্ফমান শুরু হইল। যে মাসে হঠাৎ সরকারী কর্তারা জানাইলেন, তাঁহারা কলেজ ইনসপেক্সন করিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন চালু হইয়াছে। এই আইন অনুযায়ী কোন সরকারী সম্মতি বা অসম্মতির দরকার নাই। সম্মিলনী সে কথা জানাইলে স্বাস্থ্যবিভাগ কিল খাইয়া কিল চুরি করিলেন। কিন্তু 'ল্যাক্ষ'র অমূল্য বুদ্ধির খেলা শেষ হইল না। ...দৈনিকের চীফ রিপোর্টারকে চা বিস্কুট খাওয়াইয়া সংবাদাকারে সরকারী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করানো হইল। ইতিমধ্যে ছাত্রদের বহু দরখাস্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আসিয়াছে। ইণ্টারভিউ হইয়া গিয়াছে। 'ল্যাক্ষ' শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারীকে দিয়া কলকাঠি টিপাইতে লাগিলেন। চ্যান্সেলারের প্রতিশ্রুতি ভাগীরথীর জলে ভাসিয়া গেল। চ্যান্সেলার জানাইয়া দিলেন, পাঁচ বৎসরের উপযোগী খরচ চালাইবার টাকা সম্মিলনী দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া এফিলিয়েশন দেওয়া হইবে না।

"প্রথম দুই বৎসরের জন্য প্রয়োজন ৮৩ হাজার টাকা। সম্মিলনী এই টাকা জমা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু চ্যান্সেলার বলিলেন, পাঁচ বৎসরের পুরা টাকা জমা দিতে হইবে। কলিকাতার বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলির উপরেও এরূপ

অত্যাচারমূলক সর্ত আরোপ করা হয় নাই। সম্মিলনী অন্ততঃ তাহাদিগকে প্রদত্ত সুযোগটুকু চাহিলেন। কারণ কলেজ সুরু হইলে দান আপনা হইতে আসিবে। মেডিক্যাল স্কুল সেই ভাবেই তৈরি হইয়াছিল।"

হিন্দুবাণীর বিবরণে বাদ পড়িয়াছে স্থানীয় লোকের ও তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা। তাঁহারা সংঘবদ্ধ রূপে মত প্রকাশ করিলে এরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। মূক-বধিরের উপর অত্যাচার তো হইয়াই থাকে, সে যতই অন্যায় হউক না কেন। ক্লীবের পরিত্রাণ অসম্ভব।

বর্দ্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী

বর্দ্ধমান জেলাবোর্ড সম্প্রতি এক সর্ব্বসম্মত প্রস্তাবে কল্যাণীর পরিবর্ত্তে বর্দ্ধমানে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানাইয়াছেন। বর্দ্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যুক্তি হিসাবে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বর্দ্ধমান শহরের সহিত অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ রক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। দামোদর এবং অজয় নদের উপর সেতু ও রাজপথ নির্ম্মাণের কার্য্য সম্পন্ন হইলে বাঁকুড়া ও বীরভূমের সহিত বর্দ্ধমানের যোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর হইবে এবং যাতায়াত অধিকতর সহজ ও সুগম হইবে। দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে লৌহ ও কয়লা কেন্দ্রিক ঐ শিল্পাঞ্চলের সমৃদ্ধি ঘটিবে। রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনও মানভূমকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার হয়ত পরামর্শ দিবেন। "বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী বর্দ্ধমান মহারাজের সুবৃহৎ মনোরম অসংখ্য কক্ষ ও হল বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদটি প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থানকাল নির্ব্বাচিত হইতে পারে। এই সঙ্গে গোলাপবাগের যাদুঘর ও উদ্যানগুলি পুনঃসংগঠিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিলে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষানিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবে।"

পশ্চিমবঙ্গে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি সমর্থন করিয়া "মেদিনীপুর পত্রিকা" লিখিতেছেন, উত্তর প্রদেশে যদি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় সুচারুরূপে চলিতে পারে তবে পশ্চিম বাংলায়ই বা চলিবে না কেন?

"শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অভাব নাই, আর যুগের হাওয়া যদি গ্রহণ করিতে হয় তবে যত অধিকসংখ্যক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।"

এই প্রসঙ্গে একটি মেডিক্যাল কলেজসহ মেদিনীপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতার প্রতিও পত্রিকাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

হয়ত এমন দিন আসিবে যখন ঐ সকল আশাই পূর্ণ হইবে। অন্ততঃপক্ষে আশা করায় অন্যায় কিছুই নাই। কিন্তু বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল কলেজ গঠন ব্যাপারে সরকারী মনোবৃত্তির যে ঘৃণ্য পরিচয় আমরা পাইতেছি তাহাতে আশা পূর্ণ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আমরা দেখি না। জনমত যে দেশে স্লোগানে পরিচালিত সেখানে ঐরূপ প্রগতিমূলক চিন্তাই বৃথা।

যদি বর্দ্ধমানের জনসাধারণ এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর ও সচেষ্ট হয়, যদি দলীয় ছাপের মহিমায় না ভুলিয়া নিজ অধিকার রক্ষায় সক্রিয় হয় তবে সবই সম্ভব। যদি ওখানেও জড়ত্ব থাকে তবে বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের দাবি আকাশকুসুমে পরিণত হইবে।

বর্দ্ধমানে বিজলী সরবরাহ

বর্দ্ধমান শহরে বিজলী সরবরাহ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাইয়া ২২শে পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "দামোদর" লিখিতেছেন, "এত দিন পর্য্যন্ত যে কোম্পানী বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া আসিতেছিল, নাগরিকদের প্রতি তাহারা তাহাদের সাধারণ কর্ত্তব্য পালন করা দূরে থাকুক, শহরবাসীকে তাহারা পদে পদে ঠকাইয়াছে, বেআইনীভাবে বহু প্রকারে অর্থ আদায় করিয়া, অত্যধিক রেটে অল্প শক্তির আলো দিয়া শহরবাসীর চক্ষু নষ্ট করিয়াছে। ইলেকট্রিক কোম্পানীর অনাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া বর্দ্ধমানের নাগরিকবৃন্দ একটি এক্শন কমিটি গঠন করেন। সরকার এক্শন কমিটির কথা সসম্মানে শুনিলেন, কিন্তু দাম্ভিক কোম্পানী সৌজন্যের খাতিরেও এক্শন কমিটির পত্রের উত্তর দেওয়া পর্য্যন্ত প্রয়োজন বিবেচনা করিল না।

"এক্শন কমিটি কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া সরকার যখন কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিলের নোটীশ জারী করিলেন তখনও খুঁটির জোরে কোম্পানী তাহা তাচ্ছিল্যের সহিত দেখিল। সরকার স্বহস্তে বর্দ্ধমানের বিজলী সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত জানাইবার পরও কোম্পানী বর্দ্ধমানের ২০ জন বিশিষ্ট নাগরিকের মারফত সরকারের সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তনের জন্য চাপ দেয়। "এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগীয় আই. সি. এস. সেক্রেটারী পর্য্যন্ত কোম্পানীকে বহাল তবিয়তে রাখিবার জন্য যথেষ্ট ওকালতি করিয়াছেন।"

সরকার এইরূপ চাপে নতি স্বীকার না করায় 'দামোদর' মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও জেলাশাসক শ্রীঅশোক মিত্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছি।

বর্দ্ধমানে তাঁতশিল্পী সম্মেলন

বর্দ্ধমান জেলায় তাঁতশিল্পী সম্মেলনের আয়োজনের সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া "বর্দ্ধমানের কথা" ৬ই মাঘ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "যদিও ভারত সরকার অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড মারফত বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন, "পশ্চিম বাংলার এই টাকা যে যথাযথভাবে ব্যয়িত হইতেছে না ইহা আমরা স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছি। এ পর্য্যন্ত যেখানে যতটা টাকা ব্যয়িত হইয়াছে তাহারও খুব কমই তাঁতিদের কল্যাণে লাগিয়াছে। এখানেও একদল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গঠিত হইয়া তাহার উপস্বত্ব

ভোগে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহার ফলে তাঁতশিল্পীদের বিড়ম্বনা লাঘবের সম্ভাবনা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে।"

এইরূপ অবস্থা সকলেরই অবাঞ্ছিত। বহুক্ষেত্রেই সাহায্যদানের সংবাদ সংশ্লিষ্ট তাঁতিদের নিকট পৌঁছায় না। একমাত্র সম্মেলনের মাধ্যমেই তাঁতশিল্পীদের মধ্যে সরকারী সাহায্য সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার সম্ভব। অবশ্য একটি সম্মেলনেই যে সকল সমস্যার সমাধান হইবে তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু সম্মেলনে তাঁতশিল্পীদের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ ও তাহা প্রতিকারের উপায় আলোচনা হইলে তাহার ফলে তাঁতিসম্প্রদায় যে লাভবান হইবেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

"বর্ত্তমানের কথা" লিখিতেছেন: "তাঁতশিল্পী সম্মেলনকে শুধুমাত্র তাঁতশিল্পিগণের দায়িত্বের উপর ছাড়িয়া রাখিলে চলিবে না।" সম্মেলনের সার্থকতার জন্য সকল শ্রেণীর লোকদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ "দেশবাসীর বিশেষ একশ্রেণীকে উপেক্ষা করিয়া অপর সকলে নিরঙ্কুশ বাঁচিয়া থাকিবে ইতিহাসের পাতা হইতে সে যুগের প্রভাব লোপ পাইতে বসিয়াছে।"

ঐ সম্মেলন যাহাতে রাজনৈতিক দলের মারপ্যাঁচের মধ্যে না পড়ে তাহাও দেখা দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে দলাদলির অনুযোগ-অভিযোগে প্রকৃত কথা চাপা পড়িয়া যায়।

ভিক্ষুক সমস্যা

মাদ্রাজ নগরীতে ভিক্ষুকসমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ৬ই ফেব্রুয়ারী "হিন্দু" পত্রিকাতে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর এক সমাজসেবী কর্ম্মীদল কর্ত্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, মাদ্রাজে ভিক্ষুকদের সংখ্যা প্রায় ৭৪০০ জন। উহাদের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক—তাহাদের অধিকাংশই পিতামাতা কর্ত্তৃক ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বালক-বালিকাকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া লইবার পরামর্শ দিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে পিতামাতাকে ধমকাইয়া দিবার জন্য বলা হইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কদিগের মধ্যে ১১৫৩ জন নাকি রোগগ্রস্ত, ১৪৩৫ জন বিকলাঙ্গ এবং ৪৫২ জন উন্মাদ। এই সকল হতভাগ্যের ব্যবস্থা জনসাধারণকে করিতে হইবে। উহাদের রক্ষণাবেক্ষণে মাদ্রাজ-কর্পোরেশন দান সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হইতে পারেন বলিয়া পত্রিকাটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ৪,৩১৬ জন সবল এবং সুস্থ বলিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে। উহাদিগের জন্য কর্ম্মসংস্থান করিতে হইবে। উক্ত 'সামাজিক সার্ভে'র রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শেষোক্ত শ্রেণীর অধিকাংশই লাভজনক ব্যবসায় হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে; জনসাধারণও এবিষয়ে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই।

ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করিতে হইলে পুলিসকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং এই সকল সুস্থ, সবল ভিক্ষুককে স্বগ্রামে প্রেরণ করিতে হইবে; যাহারা প্রকৃতপক্ষে গৃহহীন তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক ভিক্ষুক এককালে দক্ষ কারিগর ছিল; কিন্তু অধিকাংশই কর্ম্মবিমুখ ভবঘুরে। উহাদের মধ্যে অ-দক্ষদিগকেও কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কর্ম্মে অনিচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ড দেওয়া হইবে। যে সকল দেশে এক সময় ভিক্ষাবৃত্তি বিশেষরূপে প্রকট ছিল সেইরূপ বহু দেশেই বর্ত্তমানে ভিক্ষাবৃত্তির অবসান ঘটান হইয়াছে। অনুরূপ করা আমাদের সাধ্যাতীত নহে। অসুস্থ এবং বিকলাঙ্গদের জন্য ব্যবস্থা করিবার পর সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি মারফত জানাইয়া দিতে হইবে যেন তাঁহারা নির্বিচারে দানধ্যান না করিয়া কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মারফত তাঁহাদের সাহায্য পাঠান।

মাদ্রাজের পুলিস কমিশনার শ্রী এস. পার্থসারথি আয়েঙ্গার সম্প্রতি মাদ্রাজ নগরীর ভিক্ষুক সমস্যা আলোচনা করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, "৪০০ জন ভিক্ষুক মেলপক্কম ক্যাম্পে এবং আরও ২৪০ জন দয়াসাগরে রহিয়াছে। উহা ব্যতীত কর্পোরেশনের রয়াপুরম এবং কৃষ্ণমপেট কারখানাতেও কিছুসংখ্যক ভিক্ষুক রহিয়াছে। নগরীতে গৃহহীন যে-সকল বালকবালিকা রহিয়াছে তাহাদিগকে কয়েকটি "হোমে" রাখিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কারণ অন্যথায় উহারা অপরাধপ্রবণ হইয়া উঠিতে পারে। উহাদের অনেকেই বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া নগরীতে আসিয়াছে। পিতামাতাকে অনুরোধ করিয়া উহাদের কয়েকজনকে গৃহে পাঠান যায়। তবে অবশ্য অনাথ এবং অন্ধ বালকদিগের রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।"

আশ্রয়হীন বালকবালিকাদের সেবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের উল্লেখ করিয়া "হিন্দু" লিখিতেছেন, "হরিজনদের উন্নতির জন্য সংগৃহীত অর্থের যে অংশ ব্যয় হয় নাই তাহা কেন ঐ সকল অনাথ বালকবালিকার সেবার জন্য নিয়োগ করা হইতেছে না? উহারা অধিকাংশই ত অনুন্নত শ্রেণী হইতে আগত? অর্থ সাহায্য পাইলে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকতর সংখ্যায় বালকবালিকা আশ্রয় পাইতে পারিত এবং তাহাদের জন্য নূতন নূতন আশ্রয় শিবিরও খোলা সম্ভব হইত।"

কলিকাতায় বহিরাগত ভিক্ষুক ও কাঙ্গালীর সংখ্যা বোধ হয় সকল ভিক্ষুকের শতকরা ৯০ অংশ। এখানে যে সকল পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা এতাবৎ সেরূপ ফলপ্রদ হয় নাই। মাদ্রাজের ব্যবস্থা কি হয় তাহা দেখা প্রয়োজন।

সরস্বতী পূজায় উচ্ছৃঙ্খলতা

সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা সাম্প্রতিককালে বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে সেই সম্পর্কে ২৫শে মাঘ তারিখের "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় 'দীপশিখা' লিখিত একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

বারোয়ারী পূজায় বহরমপুরের ঘটনা বর্ণনা করিয়া লেখক লিখিতেছেন: "একস্থানে দেখিলাম পূজার দক্ষিণা দেওয়া লইয়া

পূজারীর সহিত উদ্যোক্তাদের বচসা আরম্ভ হইয়াছে। পূজারী যুক্তি দিয়া বলিতেছেন যে অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে অর্থাভাব হয় না, পূজার দক্ষিণা ক্ষেত্রেই শুধু কেন অর্থাভাব। অনেক বিতণ্ডার পর পূজারী আট আনা দক্ষিণা লাভ করিলেন। অনুসন্ধানে জানিলাম ঐ পূজায় মোট ব্যয় হইবে ছয় শত টাকা।"

চাঁদা আদায়ে বর্তমানে যে সকল গর্হিত আচরণ করা হয় তাহার বর্ণনা করিয়া লেখক বলিতেছেন, "আজকাল চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন থাকে। ধরুন আপনি বেশী চাঁদা দিতে চাহিলেন না, বা দিলেন না, এবং আপনার বাড়ীতে মরশুমি ফুলের গাছ আছে, বা আপনার বন্দোবস্ত করা আছে। চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারের পরে এক দিন সকালে উঠিয়া দেখিবেন আপনার সাধের ফুল গাছগুলি কে বা কাহারা উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে এবং মেয়ের নিকট শুনিবেন যে পাড়ার ছেলেরা তাহার প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করিয়াছে; ইহা যেন জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ! আপনাকে মান ও প্রাণ বাঁচাইতে হইবে—সুতরাং আপনি সামর্থ্য অপেক্ষা বেশী চাঁদা দিতে বাধ্য হইবেন।..."

এই ভাবে উদ্যোক্তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, কিন্তু বর্ষান্তে সাধারণের নিকট একটি হিসাব দেওয়া পর্যন্ত তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন না।

প্রতিমা-নিরঞ্জন উপলক্ষে আজকাল যাহা ঘটিয়া থাকে তাহার কদর্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে "দীপশিখা" লিখিতেছেন যে, প্রতিমা নিরঞ্জনে জাকজমক লইয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। "মিছিলে থাকেন সবই ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়। কিন্তু মিছিলে থাকাকালীন তাঁহারা সকলেই আচরণে অত্যন্ত নিম্নমনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। আপনার আমার সন্তানদেরই দেখিবেন মদের বোতল হস্তে মাতালের অভিনয় করিতে, অথবা বাইনাচের ভঙ্গীতে ও পোশাকে রাস্তা দিয়া নাচিতে নাচিতে যাইতে, অথবা পার্শ্ববর্তিনী কোন ভদ্রমহিলাকে দেখিয়া অভদ্র অঙ্গভঙ্গী করিতে।"

কিন্তু ঐরূপ আচরণের প্রতিবাদ করা কেহ প্রয়োজন মনে করেন না। লেখক জনসাধারণকে, বিশেষতঃ ছাত্রসাধারণকে, অগ্রণী হইয়া এই অবনতি প্রতিরোধ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

বস্তুতঃ এইরূপ আচরণ যে শুধু ধর্মের নামে অধর্মাচরণ তাহাই নহে, ইহা জাতীয় চরিত্রের শোচনীয় অবনতির লক্ষণ। পূজার চাঁদা যদি ব্ল্যাকমেলে দাঁড়ায় তবে তাহার প্রতিকার আশু হওয়া প্রয়োজন। দেশের আশা-ভরসা যাহাদের উপর তাহারা যদি এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় পায় তবে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কলিকাতাই এইরূপ অধোগতির মূল।

আমরা বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, সরস্বতী পূজার চাঁদার অন্ততঃ আট আনা অংশ দুঃস্থ ছাত্র ও শিক্ষকের সাহায্যের জন্য যাওয়া উচিত এবং যে সমিতির বা বিদ্যালয়ের পূজায় ঐরূপ দানের ব্যবস্থা নাই তাহাতে জনসাধারণের এক পয়সাও চাঁদা দেওয়া উচিত নহে।

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন

গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার মহম্মদ আলী পার্কে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে। এই বৎসরেও ১১ই ফেব্রুয়ারী ঐ স্থানেই সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া প্রকাশ।

দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় সম্মেলনের সাফল্যের জন্য জনসাধারণের নিকট সহযোগিতার আবেদন জানাইয়াছেন। বিগত সম্মেলনের জনপ্রিয়তা এবং সাফল্যের উল্লেখ করিয়া বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, সম্মেলনের আদর্শ যে জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার অন্যতম প্রমাণ, সম্মেলন সমাপ্ত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় ও বাংলার কতিপয় মফস্বল শহরে অনুরূপ আদর্শে উদ্বুদ্ধ একাধিক লোকসংস্কৃতি অনুশীলন প্রতিষ্ঠানের আকস্মিক সৃষ্টি।

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্দেশ্য "বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির প্রতি দেশবাসীকে সচেতন করে তোলা এবং সেইসঙ্গে যে সব লোকশিল্প ও শিল্পী উৎসাহের অভাবে আজ ধ্বংসোন্মুখ, তাহাদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করা।" কেবলমাত্র দর্শকের আনন্দদানই সম্মেলনের উদ্দেশ্য নহে "আনন্দের মধ্য দিয়ে তাঁদের আত্মসচেতন করে তোলাই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।" লোকসংস্কৃতির প্রকৃত রূপের সহিত জনসাধারণের সাক্ষাৎ পরিচয় না ঘটাইতে পারিলে এই চেতনার উন্মেষ সম্ভবপর নহে। "তাই পল্লীর গ্রামীণ গুণী শিল্পীদের একত্রিত করে বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত যাত্রা ও পুতুলনাচ, ছড়াগান, কথকতা, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী ও আউলবাউলের গান, তরজা, জারিসারি, ঝুমুর, মনসামঙ্গল, গাজন, গম্ভীরা, কবিগান ও কবির লড়াই ইত্যাদি শোনাবার দায়িত্ব বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন গ্রহণ করেছেন।"

বিগত দেড় শতাধিক বৎসর যাবৎ শিল্পসংস্কৃতি ক্ষেত্রে নাগরিকতার উপর মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক দিবার ফলে লোকসংস্কৃতির আত্মবিকাশের পথে যে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া সম্মেলনের ঘোষিত উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত অবস্থায় কোনক্রমেই আর ঐরূপ চলিতে দেওয়া সমীচীন নহে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, সম্মেলন কর্তৃপক্ষ লোকসংস্কৃতির পোষকতা করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা সনাতন গ্রামীণ ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহেন মনে করিলে ভুল হইবে।

আসামের শিক্ষাবিভাগে বৈষম্যনীতি

সম্প্রতি আসামের সংবাদপত্রজগতে হাইলাকান্দি বিদ্যালয় লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। গত বৎসর হইতে উক্ত স্থানের

অধিবাসীদের উপর জোর করিয়া অসমীয়া ভাষা চাপাইয়া দিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হইতেই হাইলাকান্দিতে ছাত্রধর্মঘট প্রভৃতি অশান্তি দেখা দেয়। সম্প্রতি হাইলাকান্দি সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অপর একজন শিক্ষককে স্থানান্তরিত করিবার ব্যাপার লইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

২১শে জানুয়ারী 'ক্রনিকল' পত্রিকা এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উক্ত শিক্ষকদ্বয়ের স্থানান্তর করণের নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, শিক্ষকদিগকে স্থানান্তর করিবার পিছনে কারণ একমাত্র এই যে, উক্ত শিক্ষকদ্বয় কাছাড়ের জনসাধারণের উপর বলপূর্বক অসমীয়া ভাষা চাপাইবার কার্যে সরকারের ক্রীড়নক হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। পত্রিকাটি সরকারী কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদি শিক্ষকদের কোন দোষ থাকিয়া থাকে তবে তাহার প্রকাশ্য বিচার হওয়া প্রয়োজন, এভাবে তাঁহাদের স্থানান্তরিত করায় কাছাড়ের জনসাধারণ বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

আসামে বাংলা সংবাদপত্রে দলন

আসাম সরকার পক্ষপাতিত্ব সহকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশ ব্যাপারে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া "যুগের আলো" পত্রিকার ৮ই মাঘ সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "গোয়ালপাড়া জেলা হইতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে যদিও 'যুগের আলো' প্রাচীনতম তথাপি উক্ত পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপনদানের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় নাই। রাজ্যসরকার কিন্তু যুগের আলোর পরবর্তীকালীন অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত 'সেবক' পত্রিকাখানিকে প্রথম প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিজ্ঞাপনদানের জন্য অনুমোদিত পত্রিকা বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু অনুমোদন পাওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরেই উক্ত 'সেবক' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়াছে।

"যুগের আলো" পত্রিকা ভারত বিভাগের পূর্বে শিলেট হইতে প্রকাশিত হইত। বর্তমানে গোয়ালপাড়া হইতে পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। "গোয়ালপাড়ায় প্রকাশিত হওয়ার পর যুগের আলো পত্রিকায় স্থানীয় পি. ডব্লিউ. ডি. বিভাগ, বন-বিভাগ, পৌরসভা বিভাগ ও লোকাল বোর্ডের বিজ্ঞাপন নিয়মিত মুদ্রিত হইত। কিন্তু রাজ্যসরকার গোপন করিয়া যাহাতে যুগের আলোয় বিজ্ঞাপন মুদ্রণ না হয় তজ্জন্য সরকারী দপ্তরে ফতোয়া জারী করেন।" ধুবড়ী লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসন্তোষকুমার বড়ুয়া (কংগ্রেস) কর্তৃক 'যুগের আলো' পত্রিকায় লোকাল বোর্ডের বিজ্ঞাপন দানের বিরোধিতা করিয়া আসাম সরকার শ্রীবড়ুয়াকে চিঠি দেন। তদুত্তরে শ্রীবড়ুয়া জানান যে, স্থানীয় পত্রিকাগুলির মধ্যে একমাত্র 'যুগের আলো'ই নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাজ্যসরকার হইতে পুনরায় তাঁহাকে উক্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপনদানে বিরত থাকিতে বলা হয় (ঐ সকল পত্রের প্রতিলিপি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হুবহু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে)।

কাশ্মীরের ঐতিহাসিক নথিপত্র

সাপ্তাহিক "কাশ্মীর পোষ্ট" পত্রিকা ২৮শে জানুয়ারী সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "কাশ্মীর রাজ্যের ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ রক্ষণাবেক্ষণের কার্যে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। যদিও সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস লিখিত ছিল, তথাপি সম্প্রতি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে বিশেষ ত্রুটির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, রাজ্যের শাসকদিগের দূরদর্শিতার অভাব উহার একটি কারণ। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে কাশ্মীর সরকার ঐতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণ ব্যাপারে সজাগ হন এবং যে সকল দলিলপত্র রেকর্ড বিভাগে মজুত ছিল সেগুলি সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করেন। তাহার পর হইতে কয়েকজন অফিসার ও কেরানী লইয়া একটি রেকর্ডস বিভাগ সৃষ্টি করা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কিছুই করা হয় নাই। প্রতি বৎসর নানা বিভাগ হইতে দলিলদস্তাবেজ উক্ত রেকর্ডস বিভাগে পাঠাইলে সেগুলিকে মলিন অবস্থায় ইঁদুর আরশুলার আস্তানায় ফেলিয়া রাখা হয়। মজার ব্যাপার এই যে, রেকর্ডস বিভাগ আবার সরকারের আসবাবপত্র সরবরাহের কার্যও করিয়া থাকে।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "এখনও যদি সরকার তৎপর হইয়া উপযুক্ত গুণবান লোকের উপর নথিপত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার ভার অর্পণ করেন তবে বহু তথ্যাদি রক্ষিত হইতে পারে।"

ম্যালেনকভের পদত্যাগ

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যালেনকভের পদত্যাগ শুধু আকস্মিক নয়, অপ্রত্যাশিতও বটে। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তিনি প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন, এবং সেই পদে ২ বৎসর দশ মাস আসীন ছিলেন। নূতন প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন। ষ্ট্যালিনের পর রাষ্ট্রনৈতিক পদাধিকারী যে ম্যালেনকভ ইহা সকলেরই জানা। সেইজন্য তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয় আশ্চর্যজনক। ম্যালেনকভ, বেরিয়া এবং মলোটোভ ছিলেন ষ্ট্যালিনের অন্তরঙ্গ সহচর এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এই তিনজনই একত্রে সর্বাধিনায়কত্ব শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিত্ব এবং সর্বজনগ্রাহ্য প্রভাব তাঁহাদের মধ্যে ছিল না, ফলে আর একটি শক্তিশালী দল নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে সচেষ্ট হয়—এই দল হইতেছে রাশিয়ার সেনা ও সেনাধিনায়কগণ। সেনাপতি জুকোভ এই বিপক্ষ দলের প্রধান নেতা। ষ্ট্যালিন তাঁহার জীবিতকালে জুকোভ ও বুলগানিনকে রাজনীতিতে আসিতে দেন নাই।

১৯৫৩ সনের জুন মাসে পূর্ব বার্লিনে শ্রমিকেরা যে বিদ্রোহ করে, শোনা যায় যে তাহার ফলে বেরিয়ার পতন হয়। বেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দলকেও প্রায় নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেরিয়ার ভাগ্যবিপর্যয়ে ম্যালেনকভ সেই দিন ছিলেন মূক দ্রষ্টা, ভাবিয়াছিলেন বেরিয়াকে সিংহের মুখে দিয়া নিজেকে বাঁচাইতে পারিবেন। কিন্তু তাহা আজ দুরাশায় পর্যবসিত হইয়াছে। ম্যালেনকভ তাঁহার পদত্যাগের কারণ দেখাইয়াছেন—তাঁহার রাজনৈতিক অক্ষমতা এবং রাশিয়ার কৃষিনীতির ব্যর্থতা। দুইটি কারণই যেন অবিশ্বাস্য। রাশিয়ার কৃষিকার্যের ভার ছিল ক্রুশেভের উপর এবং তিনি এখন রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান সেক্রেটারী। সেইজন্য ক্রুশেভের কার্যের নিমিত্ত ম্যালেনকভ কিছুতেই দায়ী হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, ম্যালেনকভের নিজের অযোগ্যতার স্বীকৃতি হাস্যকর। ম্যালেনকভ ছিলেন ২০ বৎসর ধরিয়া ষ্টালিনের বিশিষ্ট অনুচর ও সহকর্মী এবং গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার তিনি এক জন প্রধান নায়ক ছিলেন। তাই রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যাপারে তাঁহার যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তাহা হইলে কাহার থাকিবে বলা মুশকিল।

পশ্চিম জার্মানীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার যে প্রচেষ্টা আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স করিতেছে তাহাতে রাশিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছে। ম্যালেনকভ বোধ হয় ছিলেন উদারনৈতিক পন্থী—অর্থাৎ তিনি রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় উদারনীতি প্রয়োগ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং বৈদেশিক নীতিও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পরিচালনায় চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু উদারনীতি রাশিয়ার গোঁড়া দলের মনঃপূত নয়। ম্যালেনকভের স্বীকৃতি দেখিয়া মনে হয় তিনি বেরিয়ার ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি এড়াইতে চাহেন, গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হওয়ার চেয়ে পদত্যাগ করা শ্রেয় মনে করিয়াছেন। নিজেকে এবং নিজের দলকে বাঁচাইয়া রাখার উপায় এইভাবেই তিনি ঠিক করিয়াছেন। ক্রুশেভ বুলগানিনের দল বর্তমানে রাশিয়ার শক্তিশালী রাজনৈতিক দল এবং ইহার সপক্ষে আছে রাশিয়ার সামরিক শক্তি। তাই এই দলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া আজ আর ম্যালেনকভের গত্যন্তর নাই। বেরিয়ার মৃত্যুর পর ম্যালেনকভ কোণঠাসা হইয়া গিয়াছেন এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার উদারনীতি সফলকাম হয় নাই।

ফরমোসার উপর আন্তর্জাতিক যুদ্ধের মেঘ যে ভাবে ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহাতে রাশিয়ার ভাগ্যাধিনায়কগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। নিজেদের আভ্যন্তরিক ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার এই সুযোগ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। বুলগানিনের ক্ষমতা পাওয়ার অর্থ রাশিয়ার সামরিক শক্তির রাজনীতিতে প্রবেশ। আভ্যন্তরিক শাসনব্যবস্থা কঠোরতর হওয়া সম্ভব এবং এই অবস্থায় ম্যালেনকভ ও তাঁহার দল কত দিন নির্বিঘ্নে বাঁচিতে পারিবেন তাহা দেখিবার বিষয়। রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিও কঠোরতর হইবে। বুলগানিন এখনই সাবধানবাণী ছাড়িতেছেন। ক্ষমতা পাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটে বলিয়াছেন যে, ফরমোসা ব্যাপারে আমেরিকার নীতি বিপজ্জনক। ফরমোসাতে আমেরিকা যে তাহার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে ইহাতে রাশিয়ার শঙ্কার কারণ আছে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় আটাত্তর বৎসর বয়সে গত ২২শে মাঘ শান্তিপুরে পরলোকগমন করিয়াছেন। রবীন্দ্র-যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ কবির তিরোধানে বাংলা-সাহিত্য এবং বাঙালী সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

করুণানিধান ১২৮৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ (১৮৭৭, ১৯শে নবেম্বর) শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্য-রসিক ছিলেন। অল্প বয়সে পিতামহ ও পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় করুণানিধানের কালেজী-শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। তথাপি স্বাভাবিক সাহিত্য-প্রীতিবশতঃ জেনারল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) অধ্যয়নকালে সহপাঠীদের লইয়া তিনি একটি সাহিত্যগোষ্ঠী গঠন করেন। শিক্ষাব্রতী রূপে তাঁহার কর্ম-জীবনের আরম্ভ। হাওড়া জেলা স্কুলে তিনি কিছুদিনের জন্য শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কর্মীরূপে গৃহীত হন। ১৯১৫ সন হইতে তিনি এই কর্মে লিপ্ত থাকিয়া ১৯৩৮ সনে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতে দীর্ঘ সতর বৎসর তিনি একরূপ লোকচক্ষুর অন্তরালেই কাটাইয়া গিয়াছেন।

কবি হিসাবে করুণানিধান রবীন্দ্রপন্থী এবং রবীন্দ্রবিরোধী উভয় দলেরই সমান প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া এক দিকে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্য দিকে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন। 'ঝরাফুল' কাব্যের ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ করুণানিধান-রচিত কবিতাসমূহের মর্মকথা অনবদ্য ভাষায় এইরূপ লিখিয়াছেন: "তিনি প্রকৃতির দুলাল। প্রকৃতির রহস্য-ভাণ্ডারের চাবি চুরি করিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত লুকানো ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিয়াছেন ও বালকের ন্যায় সরল প্রাণে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গীতে ছন্দে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সামান্য উপকরণে, ঘরোয়া কথায় উপমা সজ্জিত করিয়া এরূপ সৌন্দর্যসৃষ্টি আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে অতি বিরল। কবির সমস্ত কবিতাগুলিতে দেশী ভাবের একটা মিঠে গন্ধ আছে, গ্রাম্য বধূর একটি সরল সলজ্জ ভাব আছে—কবিতাগুলি যেন ছবির পর ছবি।"

কবির রচিত গ্রন্থগুলি এই: বর্ষামঙ্গল (১৩০৮), প্রসাদী (১৩১১), ঝরাফুল (১৩১৮), শান্তিজল (১৩২০), ধানদূর্ব্বা (১৩২৮), শতনরী (১৩৩৭, হেমচন্দ্র বাগচি সংস্করণ), রবীন্দ্র-আরতি (১৩৪৪), শতনরী, (১৩৫৪, কালিদাস রায় সংস্করণ), গীতায়ন (১৩৫৬), ত্রয়ী, (বর্ষামঙ্গল, প্রসাদী ও ঝরাফুল—১৩৬০)।

করুণানিধান ছিলেন মানবপ্রেমিক। মানুষ মাত্রেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। প্রবীণ-নবীন সাহিত্যিক মাত্রেই ছিলেন তাঁহার আপনার। তিনি শেষজীবনে বিভিন্ন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যিকমণ্ডলীর নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ করেন।

নামসংকীর্ত্তন

শ্রীকালিদাস দত্ত

খোলকরতালের ধ্বনির সহিত উচ্চৈস্বরে পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবানের নামগানই নামসংকীর্ত্তন। বহু ব্যক্তির একত্রে ভগবৎ-প্রণিধানের উহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও উৎকৃষ্ট উপায়। অন্ত কোনরূপ সাধনপদ্ধতির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র উহার দ্বারা একাগ্রতা, ভক্তি ও প্রেমলাভ সুলভ বলিয়া উহা ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে এবং সর্ব্বশ্রেণীর অসংখ্য হিন্দু নরনারীর ধর্ম্মসাধনের প্রধান অবলম্বন হইয়া আছে।

বিগত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে শ্রীচৈতন্যদেব, মানবগণের কল্যাণের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম উহার প্রবর্ত্তন ও প্রচার করেন। সে কারণ বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভেই তাঁহাকে সংকীর্ত্তনের জনক বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের কিরূপ দুর্দ্দিনে উহা তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হয় এবং তাহার ফলে জাতি ও শ্রেণীগত বিভেদ-বিদ্বেষ হ্রাস পাইয়া কি প্রকারে তৎকালীন হিন্দু সমাজের মানবতার পথে অগ্রগতি ঘটে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছি।১

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোনরূপ সংকীর্ত্তন প্রচলিত থাকিলেও তাহা ঐ ধরণের ছিল না এবং আপামর সাধারণও তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে বোধ হয় তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল গমনের পর সেখানে উহা প্রথমে শুনিয়া উড়িষ্যার মহারাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব বিস্মিত হন এবং তিনি কোথাও ঐ রকম কীর্ত্তন শুনেন নাই বা দেখেন নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাঁহার সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার কথা সত্য, উহা নামসংকীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সৃষ্টি। যথা:

> "কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন।
> ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
> কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি।
> ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সত্য বচন।
> চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম সংকীর্ত্তন।"

প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শ্রীপ্রেমদাসের রচনায়ও উহার এই ভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়:

> "সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পথে যায়।
> দূর হইতে গজপতি তা শুনিতে পায়।
> ভট্টাচার্য্যে বলে অহো কি আশ্চর্য্য ধ্বনি।
> কর্ণমন জুড়াইল ঐ কৃষ্ণ নাম শুনি।
> হেন কৃষ্ণ নামগান কেবা সৃষ্টি কৈল।
> শুনিয়া সবার প্রাণে আনন্দ উদিল॥
> সার্ব্বভৌম বলেন উহা কীর্ত্তন বিধান।
> সৃষ্টি করিলেন শ্রীচৈতন্য ভগবান।
> পৃথিবীতে হেন হরিকীর্ত্তন না ছিল।
> বৃন্দাবন রস প্রভু প্রকাশ করিল।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব যে সময় নবদ্বীপে আপামর সাধারণের মধ্যে উহা প্রবর্ত্তন করেন তখন খোলকরতাল ছিল না। সে কারণ প্রথমে তিনি সকলকে হাতে তালি দিয়া উহার অনুষ্ঠান করিবার জন্য এইরূপ নির্দ্দেশ দেন:

> "দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
> কীর্ত্তন করিবে সবে হাতে তালি দিয়া।" (১)

তাঁহার এই নির্দ্দেশমত জনসাধারণ নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে তৎকালে গৃহস্থদের বাটীতে দুর্গোৎসবে বাজাইবার নিমিত্ত যে সকল মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও শঙ্খ থাকিত সেইগুলি উহাতে বাজান হইত। যথা:

> "পরম আনন্দে সব নাগরিয়াগণ।
> হাতে তালি দিয়া বলে রামনারায়ণ।
> মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
> দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে।
> সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন সময়।
> বাজান গায়েন সবে আনন্দ হৃদয়ে।" (২)

এই প্রকারে নামসংকীর্ত্তন প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ সময়ই উহাতে বাজাইবার নিমিত্ত কাষ্ঠে নির্ম্মিত উক্তরূপ মৃদঙ্গের৩ পরিবর্ত্তে মৃত্তিকার খোল ও কাংস্যের ক্ষুদ্রাকার মন্দিরার স্থলে উহা অপেক্ষা বৃহৎ ও সমতল করতালের সৃষ্টি হয়। ঐ ভাবে সংকীর্ত্তনে হাতে (করে) তাল দিবার কার্য্য উহার দ্বারা সম্পন্ন হইত বলিয়া উহা করতাল আখ্যা লাভ করে। প্রবাদ, শ্রীচৈতন্যদেবই ঐ বাদ্যযন্ত্র দুইটিকে

---

(১) প্রবাসী—শ্রীচৈতন্যদেবের পতিতোদ্ধরণ, মাঘ, ১৩৬০ ও উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্যদেব, বৈশাখ ১৩৬১।

(১) শ্রীচৈতন্যভাগবত (২) শ্রীচৈতন্যভাগবত

(৩) বর্ত্তমান সময় মৃদঙ্গকে পাখোয়াজ বলে এবং উহার দেহ কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়। খুব প্রাচীনকালে বোধ হয় উহারও দেহের উপাদান মৃত্তিকা ছিল। কারণ পুরাণে উল্লিখিত আছে যে ত্রিপুরাসুর শিবকর্ত্তৃক নিহত হইলে তাহার শোণিতাক্ত মৃত্তিকাতেই মৃদঙ্গের দেহ এবং তাহার চর্ম্মে ও অস্থিতে উহার আবরণ ও দল প্রস্তুত হইয়াছিল। মৃত্তিকার ভঙ্গপ্রবণতার জন্যই সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালের কোন সময় হইতে উহার দেহ নির্ম্মাণে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ঐ আকারে গঠন করিবার নির্দেশ দেন। নামসংকীর্ত্তনের উপযোগী করাই যে উহার উদ্দেশ্য ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। উক্ত কারণে আজিও সর্ব্বত্র নামসংকীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পত্তি রূপে খোল করতালে চন্দন পুষ্পমালা অর্পণের ব্যবস্থা আছে। ঐ ব্যবস্থাটিও বহুদিনের। ভক্তিরত্নাকরে উহার উল্লেখ এইরূপ:

"শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন পুষ্পমাল।" (১)

ঐ রকমে খোলকরতালের সৃষ্টি হওয়া অবধি ঐ বাদ্যযন্ত্র দুইটি সর্ব্বত্র নামসংকীর্ত্তনের প্রধান অঙ্গ হইয়া আছে। উহাদের ধ্বনি শ্রীভগবানের নামগানের সংযোগে যে স্পন্দনের সৃষ্টি করে তদ্দ্বারা সংকীর্ত্তনকারীদের চিত্তে সহজেই একাগ্রতা ও ভক্তিভাব প্রকাশ পায় এবং তাঁহারা ক্রমশঃ ভগবৎমুখী হইতে সক্ষম হন। ভক্তগণের বিশ্বাস সংকীর্ত্তনকারীরা ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত নরনারী উহা নিকট বা দূর হইতে শ্রবণ করেন তাঁহাদেরও ঐ প্রকারে মঙ্গল হয়। তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন:

"জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে।" (২)

উপরোক্ত কারণেই শ্রীচৈতন্যপ্রভু সর্ব্বত্র বহু ব্যক্তির একত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ নামসংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন। প্রাচীন সাহিত্য হইতে জানা যায় তাঁহার আবির্ভাবকালে ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে কি ভাবে বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় অসংখ্য ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ভেদাভেদ ভুলিয়া সমভাবে একত্রে ঐরূপ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাহার ফলে তৎকালে উচ্চনীচ সর্ব্বশ্রেণীর কত নরনারীর চরিত্র নূতন আকারে গঠিত হয় ও তন্মধ্যে অনেকে কিরূপ উচ্চ জীবন যাপন করিতে সক্ষম হন।

নিয়মিতভাবে নিরপরাধে শ্রদ্ধা ও আর্ত্তির সহিত ঐ প্রকার সাধনের অনুষ্ঠানে ভক্তি ও একাগ্রতার উন্মেষের ফলে মানুষ ভগবৎ-মুখী হইলে সত্বরই শ্রীভগবানে তাঁহার অনুরাগ জন্মে। অনুরাগ সর্ব্বদা প্রবর্দ্ধনশীল তজ্জন্য উহাও উক্তরূপ সাধনে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া নিরন্তর তাঁহাকে ভগবৎ-অনুধ্যানে নিমগ্ন করে।

ভক্তিশাস্ত্রে ঐ অবস্থাকেই সাধনাবস্থা বলে। ঐ অবস্থাতে একান্তভাবে ঐ প্রকারে ভগবৎ-প্রণিধানের পরিণতিতে তাঁহার চিত্তাকাশের যাবতীয় দুর্ব্বলতা ও কলুষ তিরোহিত হইয়া যায় এবং তিনি মায়ার প্রহেলিকা মুক্ত হন। ঐ সময়ই তাঁহার যাবতীয় অনর্থবিহীন শুদ্ধচিত্তে ভাবের আবির্ভাব ঘটে। শ্রীচৈতন্যপ্রভুর ভাষায় তখন:

"প্রাকৃত ক্ষোভেতে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয়।
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়।
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি জানে।
কৃষ্ণকৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে।" (৩)

উহাই প্রেমের প্রকটাবস্থা। উহারই পরিপাকে মহাভাব বা প্রেমের উৎপত্তি হয় ও ভগবৎ-সত্তার পরমানন্দময় মাধুর্য্য তাঁহার অন্তরে প্রকাশ পায়। তখন তিনি বহির্জগতের সর্ব্ববস্তুতেও উহা উপলব্ধি করেন এবং ঐ প্রকার প্রেমাবেশেই শ্রীভগবানকে সর্ব্বত্র নিখিল রসামৃত মূর্ত্তিতে বিরাজমান দেখিতে পান ও একান্ত নিবিড়ভাবে তাঁহার প্রীতিলাভ ও লীলামাধুরী সম্ভোগ করেন।

বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নামসংকীর্ত্তনের পরিণতিতে ভক্তের ঐ উপায়ে ভগবৎ-দর্শন ও ভগবৎ-প্রীতিলাভ প্রসঙ্গে বলেন:

"Nama-Samkirtana helps the devotee to completely loose himself in the consciousness of the Lord, which in the first stages is a subjective experience only, but gradually it possesses even the outer senses, thereby filling not only the inner consciousness of the devotee with the Presence of the Deity but also covering his outer sense contacts with the Divine Presence and thus it gradually possessing both the inner consciousness and the outer sense contacts of the devotee with the Presence of the Divine result in that state of trance wherein he sees even with his outer eyes his Lord. The Bhakta or devotee who has reached this goal, lives in perpetual consciousness of the Divine Presence. All his senses realise Him in all their objects and activities. The eyes see His *rupam* in all visible objects, the ears hear His *shabda* in every sound and so on and so forth. The mind is possessed absolutely by the thought of Him." (*Bengal Vaishnavism*).

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ অবস্থারই সংক্ষেপে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন:

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাহা নেত্র পড়ে তাহা ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।" (৪)

শ্রীচৈতন্যপ্রভু নামসংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তনদ্বারা নানারূপ জটিল ও প্রক্রিয়াবহুল সাধনপদ্ধতির পরিবর্ত্তে ভগবৎ-প্রণিধানের ঐ প্রকার সহজ ও উৎকৃষ্ট উপায় প্রদর্শন ব্যতীত উহার পূর্ণতম পরিণতিতে কীদৃশ পরমোৎকর্ষের সহিত ভগবৎ-দর্শন ও ভগবৎলাভ সিদ্ধ হয় তাহাও ভক্তগণের শিক্ষার জন্য নিজ জীবনলীলায় অনুপম ভাবে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। সে কারণ ঐরূপ সাধনের সকল অবস্থার সর্ব্বোত্তম পরিচয় তাঁহার জীবনলীলাতেই পাওয়া যায়।

(১) ভক্তিরত্নাকর (২) শ্রীচৈতন্যভাগবত (৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

উহাতে প্রেম স্ফূর্ত্তির যে আলেখ্য আছে তাহা জগতে অতুলনীয়।

উহার আবেশে কি আকুল অনুরাগে তিনি উন্মত্তের ন্যায় স্খলিত পদে মন্থরালস গতিতে চারিদিকে কেবল কামনার ধন অন্বেষণ করিতেন। তখন তাঁহার দেহে কি অদ্ভুত সাত্ত্বিকভাবের শুক্ল শিহরণ হইত ও নয়নযুগল প্লাবিত করিয়া মুক্তাদামের মত অজস্র অশ্রুধারা ঝরিত। ঐ সময় আকাশে উড্ডীয়মান মেঘরাশি, গিরিশৃঙ্গ, নীলাম্বু, বৃক্ষলতা ও শিখী অঙ্গ প্রভৃতি সকল পদার্থ ই তাঁহার সম্মুখে, শ্রীভগবানের পরমানন্দময় মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিত এবং তিনি তদ্দর্শনে ঘন ঘন আত্মহারা হইতেন।

তৎকালীন পরিব্রাজক প্রবোধানন্দ সরস্বতীর রচনায় তাঁহার ঐ অবস্থার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম বঙ্গভাষায় এইরূপ :

"হেরিলে আকাশে নবজলধর।
প্রেমে দিশাহারা হন নিরন্তর॥
কভু শিখিপুচ্ছে চন্দ্রিকা নেহারি।
ব্যাকুলিত হন আপনা পাশরি॥
ভাবাবেশে কভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
হেরি গুঞ্জাবলী কাঁপে থর থর॥
প্রেমেতে বিভোর উন্মত্তের প্রায়।
স্থাবর জঙ্গম হেরে কৃষ্ণময়॥" (১)

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও তাঁহার ঐ অবস্থার নানারূপ চিত্র আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে উহার উল্লেখ করা সম্ভব নহে। তজ্জন্য শেষোক্ত গ্রন্থে বৃন্দাবনের অরণ্য মধ্যে তাঁহার ভ্রমণের যে বিবরণ আছে তাহার কিয়দংশমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া॥
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভীরা প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥
প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করে কৃষ্ণে সমর্পণ॥
মৃগের গলাধরি প্রভু করেন ক্রন্দন।
মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রুনয়ন॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ স্মৃতি হইল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমেতে পড়িল॥"

ঐ প্রকার আনন্দময় অপ্রাকৃত পরিবেশ হইতে প্রাকৃত পরিবেশের মধ্যে আসিলে তিনি কত কাতর হইতেন তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় ঐ রকম সময় তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই উক্তিটি হইতে :

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥"

(১) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অর্থাৎ, গোবিন্দের বিরহে আমার প্রতিটি মুহূর্ত্ত যুগবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। বর্ষার ধারার মত চক্ষু হইতে জল পড়িতেছে ও সমগ্র জগৎ শূন্যময় বোধ হইতেছে।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাশয়ও একদা তাঁহাকে ঐরূপ সময় যে অবস্থায় দর্শন করেন তাহা তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

"বাম করতলে কপোল রাখিয়া
বিষণ্ণ গৌরাঙ্গ রায়।
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে নয়ন
গণ্ড ভাসিছে তায়॥
ঘন হা হুতাশ ঘন দীর্ঘশ্বাস
ঘন ঘন হাহাকার।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে গৌরাঙ্গ সুন্দর
ভাবে মগ্ন শ্রীরাধার॥"

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নানাস্থানে তাঁহার সমকালীন অনেক কবির রচনায়ও তাঁহার ঐরূপ ভগবৎ-বিরহের মর্ম্মস্পর্শী আলেখ্য আছে। তাঁহার জনৈক পার্ষদ নরহরি সরকারের এই পদটি উহার একটি নিদর্শন :

"গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত ক্ষণে ক্ষণে কাঁপ॥
ক্ষণে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কেহ যদি নাহি রয় পাশে॥
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
বলি কোথা মোর প্রাণনাথ॥"

শ্রীভগবানের নামসংকীর্ত্তনের ফলে প্রেমের ঐ প্রকার বিকাশে নানা রকম অপ্রাকৃত মানসিক অবস্থারও সৃষ্টি হয়। উহার কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ :

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

অর্থাৎ, এইরূপ আচরণকারী ব্যক্তি নিজের প্রিয় শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনের দ্বারা (ধ্যেয় বস্তুতে) অনুরাগ প্রাপ্ত হওয়ায় শিথিল চিত্তে উন্মাদের ন্যায় কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও চিৎকার, কখনও গান, কখনও-বা নৃত্য করেন।

ঐ অবস্থা ভক্তিশাস্ত্রে প্রেমোন্মাদ বা দিব্যোন্মাদ নামে প্রসিদ্ধ। প্রাকৃত ব্যক্তিগণের নিকট উহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট উহাই প্রকৃত সত্য। কারণ ঐ অবস্থায় ভক্ত চিরসত্য অপ্রাকৃত রাজ্যে অবস্থান করেন। তজ্জন্য উহাতে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ ভগবৎপ্রীতি লাভ ও উহার অভাবজনিত অবস্থাই চিত্তের বিষয়ীভূত হইয়া ঐ প্রকারে প্রকাশ পায়।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুর জীবনলীলাতে প্রকাশিত উহার আলেখ্য দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি উল্লিখিতরূপ সাধনের পরিণতিতে উহাও কত গভীর ও বিচিত্র হইতে পারে। তাঁহার জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর ঐ অবস্থাতেই অতিবাহিত হয়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী উহারও যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই :

"ক্বচিৎ হসতি রোদিতি ক্বচিদথক্বচিৎ মূর্চ্ছতি
ক্বচিৎ লুঠতি ধাবতি ক্বচিদথক্বচিৎ নৃত্যতি।
ক্বচিৎ শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্বচিদমুদার হাহারুতিং
মহাপ্রণয়সীধুনা বিহরতীহ গৌরোহরিঃ।" (১)

অর্থাৎ, কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও আবার মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখনও মাটিতে পড়িয়া আছেন, কখনও ধাবিত হইতেছেন, কখনও আবার নৃত্য করিতেছেন। কখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, কখনও স্বেদ মোচন করিতেছেন, কখনও আবার হাহা শব্দ করিতেছেন, মহাপ্রেমামৃতে গৌরহরি এইভাবে এখানে বিহার করিতেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজও উহা এইরূপে বলিয়াছেন :

"শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর।
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পড়েন বিষাদে।
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ।
রোমকূপে রক্তোদগম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে।
তিনদ্বারে কবাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধু নীরে।
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে।
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাহা যাই নাচে গান ক্ষণে মূর্চ্ছা যান।
কাঁহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই সব ভাব হয় শরীরে প্রচার।" (২)

কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উহার আরও নানারূপ বিবরণ দিয়া অবশেষে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :

"দ্বাদশ বৎসরের যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে
অতি বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থে না কৈল লিখনে
প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেইজন।
চাঁদ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন।"

ভক্তিসাধকের বিভিন্ন ভাবানুযায়ী ঐ প্রকার বিকারের অনেক লক্ষণ রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় ভক্তিগ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। ঐ সকল লক্ষণ সাধারণতঃ অশ্রুপাত, পুলক, কম্প, স্বেদ, স্বরভঙ্গ, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য ও প্রলয় এই আট রকমে প্রকাশ পায়। সে কারণ ঐগুলি অষ্ট সাত্ত্বিক নামে অভিহিত এবং প্রধানতঃ পাঁচটি দশায় উদ্ভূত হয়। রসশাস্ত্রকারেরা ঐ দশা কয়টিকে ধূমায়িতা, জলিতা, দীপ্তা, উদ্দীপ্তা ও সুদ্দীপ্তা আখ্যা দিয়াছেন।

নামসাধনের প্রথম অবস্থায় যখন শ্রীভগবানের স্মৃতিতে বা তাঁহার নাম শ্রবণে ভক্তের দেহে অশ্রুপাতাদি দুই একটি বিকার দেখা যায় তখন তাহাকে ধূমায়িতা বলে। সাধনের উচ্চস্তরে উত্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাব প্রবল হইতে থাকিলে যখন ভক্তের দেহে উহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিকারের উৎপত্তি হয় তখন উহাকে জলিতা বলে এবং ক্রমশঃ বিকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে উহা দীপ্তা ও উদ্দীপ্তা নামে কথিত হয়। ঐ সমস্ত বিকার যখন ভক্তদেহে যুগপৎ প্রকটিত হয় তখনই উহাকে সুদ্দীপ্তা বলে। শ্রীচৈতন্যপ্রভুর দেহে প্রায় সর্ব্বসময়ই ঐ বিকারগুলি একত্রে প্রকাশ পাইত। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :

"স্বরূপ গোসাই যবে এপদ গাহিল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিল।
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি ব্যভিচার সব উথলিল।"

অষ্ট সাত্ত্বিকের ঐ প্রকার যুগপৎ প্রকাশের ফলেই সুদ্দীপ্তা অবস্থায় ভক্তের বাহ্য চৈতন্য তিরোহিত হয়। উহাকেই প্রলয় বলে।

ভক্তিশাস্ত্রে উক্ত উদ্দীপ্তা ও সুদ্দীপ্তা অবস্থায় এইরূপ পরিচয় আছে।

"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষা সর্ব্বএব বা। আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ। উদ্দীপ্তানাং ভিদাএব সুদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ। সাত্ত্বিকাঃ পরমোৎকর্ষ-কোটী-মাত্রৈব বিভ্রতি।"

অর্থাৎ, পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তিকে উদ্দীপ্তা বলে। সুদ্দীপ্তা উদ্দীপ্তারই ভেদমাত্র এবং কদাচিৎ ঘটে। ঐ অবস্থাতেই সাত্ত্বিক ভাবের পরমোৎকর্ষ হয়।

ঐ দশা দুইটি মহাভাব নামেও পরিকীর্ত্তিত। উহার আবার দুইটি প্রকারভেদ আছে। একটি রূঢ় ও অন্যটিকে অধিরূঢ় বলে। উক্ত অধিরূঢ় দশা চিত্তস্থৈর্য্যের সর্ব্বোত্তম অবস্থায় ঘটে। উহাতে ভক্ত প্রাকৃত জগৎ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ আনন্দময় অপ্রাকৃত রাজ্যে নিবিড় ভাবে ভগবৎ-প্রীতি লাভ করেন।

নীলাচলে প্রথম প্রবেশের পর জগন্নাথদেবের মন্দির মধ্যে শ্রীচৈতন্যপ্রভু যখন উক্ত প্রকার অধিরূঢ় মহাভাবে মগ্ন হন সেই সময় তাঁহার বাহ্যচেতনারহিত দেহ উৎকল-

(১) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

রাজের সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে লোকদ্বারা বহিয়া আনা হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহা দর্শনে বিস্মিত হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উহার যে উল্লেখ আছে তাহা এই :

"বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার।
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদ্দীপ্ত ভাব হয়।
অধিরূঢ় মহাভাব যার তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার।"

শ্রীচৈতন্যপ্রভুর নীলাচললীলার শেষভাগে এই সুদ্দীপ্তা অবস্থা ঘন ঘন ঘটিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ উহারও অনেক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি এই :

"একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে।
গোবর্দ্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
... ...
ফুকার পড়িল মহাকোলাহল হৈল।
যে যাহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল।
... ...
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভ হইল পথে চলিতে নাহি শক্তি।
প্রতিরোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তদুপরি রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার।
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার।
দুই নেত্র বহিয়া অশ্রু পড়য়ে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গাযমুনা ধার।
বৈবর্ণ্য শঙ্খের প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তাহে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ।
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
তবে তো গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা।
... ...
স্বরূপাদিগণ তাহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কাঁদিতে লাগিলা।"

রঘুনাথদাস গোস্বামী ঐ সময় নীলাচলে থাকিতেন। তাঁহার লিখিত বিবরণেও অন্ত একরাত্রে সংঘটিত ঐরূপ আর একটি ঘটনার যে উল্লেখ আছে তাহা এই :

"শয়ন মন্দিরে গোরা রায়।
কৃষ্ণের বিরহভরে ভিতরে রহিতে নারে
বাহিরে যাইতে মন ধায়।
যথা কৃষ্ণের বিরহে রাধা হয়ে উৎকণ্ঠিত সদা
কৃষ্ণবেণু শুনি বনে যান।
সেইমত আচম্বিতে বংশীধ্বনি শুনি চিতে
বাহিরে চলিয়া যেতে চান।
তিনদ্বার ছিল রুদ্ধ তিন ভিত্ত অতি উচ্চ
তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে।
তেলেঙ্গা গাভীর মাঝে দেখি গিয়া রসরাজে
পড়ে আছে শ্বাস নাহি চলে।
ভাব নাহি বুঝা যায় দেহ যেন কূর্ম্ম প্রায়
হস্তপদ সঙ্কুচিত অঙ্গে।
অন্বেষিয়া ভক্তগণ দীপ জ্বালি দরশন
করে সেইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গে।"

উহার পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ :

"অচেতনে পড়ে আছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা ভিতরে আনন্দে বিহ্বল।
গাভীসব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গসঙ্গ।
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া আনিল ভক্তগণ।
উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ত্তন।
বহুক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন।"

ঐরূপ প্রলয় অবস্থা সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন :

"This is really not an unconscious state, but what may be called a super-conscious condition. Death here is also not physical death but the complete cutting off of the channel of the outer consciousness, the channel that establishes and helps to continue the communication between the self, through the mind and the senses, and the objective world about us. It is called *samadhi* in our spiritual literature. The *samadhi* may be either only partial or absolutely complete. When it is partial the devotee loses only the outer consciousness. When it is complete, there is cessation of the functioning even of the inner organs, the lungs do not breathe, the heart does not beat . . . In this state of complete *samadhi*, so closely corresponding to what we familiarly know as death, the devotee lives in the consciousness of the Divine Presence."[1]

উক্তরূপ পূর্ণ সমাধিকালে ভগবৎ-দর্শন লাভের পরিচয় শ্রীচৈতন্যপ্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশার বহু উক্তিতে পাওয়া যায়। তিনি সাধারণতঃ অন্তর্দ্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা এই তিন অবস্থায় কালাতিপাত করিতেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি রহে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে।
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধবাহ্য স্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্য স্ফূর্ত্তি এই তিনে প্রভুর স্থিতি।
... ...
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচন।
আকাশে কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণ।"

1. *Bengal Vaishnavism.*

প্রথমোক্ত দশায় যখন তাঁহার কোনরূপ বাহ্যজ্ঞান থাকিত না তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবৎলীলামৃত সাগরে ডুবিয়া থাকিতেন। কিন্তু বহুক্ষণ পরে ঐ অবস্থা হইতে বাহ্যদশায় আসিবার পূর্ব্বে, অর্দ্ধজাগরণের মত উক্ত অর্দ্ধবাহ্য দশার প্রারম্ভেই ভগবৎ-দর্শনের অভাবজনিত কাতরতার লক্ষণ তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইত এবং তিনি প্রলাপের ন্যায় অনেক সময় "কাঁহা গেল কৃষ্ণ এই পাইনু দর্শন ?" এইরূপ উক্তি করিয়া চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেন। আবার কখনও অতিশয় কাতর হইয়া বলিয়া উঠিতেন :

"পাইনু বৃন্দাবন নাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা আমি আইনু॥"

ঐ সময় তাঁহার মুখমণ্ডল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইত।

তাঁহার জনৈক পার্ষদ বাসুদেব ঘোষের এই পদটিতেও তাঁহার ঐ অবস্থার উল্লেখ আছে :

"চেতন পাইয়া গোরা রায়।
ভূমে পড়ি ইতি ইতি চায়॥
সমুখে স্বরূপ রাম রায়।
দেখি প্রভু করে হায় হায়॥
কাঁহা মোর মুরলী বদন।
এখনি পাইনু দরশন॥"

শ্রীচৈতন্যপ্রভু মানবগণের হিতার্থে আপামর সাধারণের মধ্যে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন প্রচার করতঃ উহার মহিমা এই ভাবেই তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনলীলার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন :

"আপনি করি আস্বাদনে শিখাইলা ভক্তগণে
প্রেম চিন্তামণির প্রভু ধনি
নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি॥"

নীলাচলে দিব্যোন্মাদ সময়েও তিনি নামসংকীর্ত্তনের মহিমা তাঁহার ভাষায় এই ভাবে ঘোষণাপূর্ব্বক উহার বিজয় কামনা করেন।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥"

অর্থাৎ, যাহার দ্বারা মানবগণের চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, শ্রেয়রূপ শুভ্রোৎপলের চন্দ্রিকা বিতরিত হয়, যাহা বিদ্যারূপ বধূর জীবন স্বরূপ, যাহা বিমলানন্দ সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ প্রদান করে এবং মনপ্রাণ আত্মাকে পরমানন্দে অবগাহন করাইয়া পরিতৃপ্ত করে সেই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

জয়পুর শিল্পী—এফ. জস্

ভারতের জীবনযাত্রা-চিত্রাবলী

বোম্বাইয়ের ধোপা

এফ. জস্ নামক একজন শিল্পী-সাংবাদিক কিছুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের দৈনন্দিন জীবনের অনেকগুলি চিত্র আঁকিয়া লইয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীদের অতিথিপরায়ণতা-মুগ্ধ এই শিল্পীর কয়েকখানি ছবি প্রকাশিত হইল।

মল্লযুদ্ধ

বোম্বাইয়ের পথে

শিশুর দল

দিল্লী মসজিদের রক্ষণকারী

মন্বন্তর

নানাসাহেব

শ্রীসুভাষ সমাজদার

(ভূমিকা—সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক নানাসাহেব আত্মগোপন করে আছেন। ভারতের তদানীন্তন সরকার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের জরুরী হুকুম এসেছে যেমন করে হোক সারাদেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে নানাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা উত্তর-ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় শহরে পরিভ্রমণ করছেন এবং নানাকে গ্রেপ্তারের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজে সরকারের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন—জনসাধারণের সহযোগিতা আকুলভাবে প্রার্থনা করছেন। দেশ জুড়ে নানাকে গ্রেপ্তারের জন্য তুমুল তোড়জোড় চলছে।)

১ম দৃশ্য

[কানপুর পুলিস-ষ্টেশনের ভেতরে একটি বড় হলঘরে জরুরী সভা বসেছে। ডিভিসনাল কমিশনার সভাপতির আসনে আসীন। তাঁর সামনে চেয়ারে বসে আছেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি আরও দু'এক জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তারপরেই সারি সারি বেঞ্চে বসে আছে কানপুরের বিখ্যাত 'দিলরুবা' হোটেলের মালিক সুলতান মামুদ, তার দুই জন সঙ্গী এবং তার হোটেলের বেয়ারা ইসাক (একটু তফাতে)। তা ছাড়া আরও জন-দশেক গণ্যমান্য হোমরা-চোমরা সরকারের পয়েরখা শ্রেণীর লোকও উপস্থিত আছে সভায়। রাজকর্মচারীদের চোখেমুখে নিদারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে।]

কমিশনার। (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে) Gentlemen! হামরা সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। ইংল্যাণ্ড হইটে হুকুম হাসিয়াছে টিন মাহিনা মে ঐ নানা scoundrelকে ফাটকে পুরিটে না পারিলে হামাডের service book will be blackmarked. ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট হামাডের worthless বলিটেছে। মাড্রাজ, আসামে, উট্টর-ভারটবর্ষের সর্ব্বট্র সেই villain নানাকে খোজ করা হইটেছে। গবর্ণমেণ্ট লাখো লাখো টাকা খরচ করিটেছে। (ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে) হামি শুনিটে চাই হাপনারা এখানে কটডুর proceed করিয়াছেন? শুড়ু নানাসাহেব নয়, নানার Assistant আজিমুল্লা খাঁ, টার চাকরাণী সেই জুবেডি বিবি যাহারা বিবিঘরে horrible হট্যাকাণ্ড করিয়াছিল; ঐ টিনঠো রক্টখেকো জানোয়ারকে যেমন করিয়া হোক ঢরিটে হোবে। যডি হাপনারা কোম্পানীকা নোকরী করিটে চান টবে, Be alert and try with your best efforts to arrest those scoundrels! (মামুদের দিকে তাকিয়ে) হাপনারা please, হামাডের এই গুরুটর কাজে help করুন—

ম্যাজিষ্ট্রেট। স্যার, হামার বিশোয়াস নানা বাঁচিয়া নাই। আউর সেই কুট্টা বাঁচিয়া ঠাকিলেই-বা কি? টার ডেশবাসীর ওপরে টার কোনরূপ influence নাই। Sir! এটো খরচপট্ট করিয়া নানার মটো একঠো লোফারকে ঢরিবার কি ডরকার আছে?

এস. পি.। Well, Sir, quite agree with D.M. নানাকে ঢরিটে যাইয়া হামার force বহুট হয়রানি হোইটেছে। যখন টখন rumour শোনা যাইটেছে, অমুক মণ্ডিরে কি মসজিডে, কি হাটে নানা ঢরা পড়িয়াছে। কানপুর Police station মে টাহাকে ঢরিয়া আনার পর ডেখা যাইটেছে সে একঠো নেংটো ফকির কি ফুটাট ভিক্ষারী। টাহারা খাওয়ার লোভে নিজেডের নানা বলিয়া ঢরা ডিয়াছে। ডেশে এখন terrible famine—ভয়ানক ডুর্ভিক্ষ, টাই ফুটাট লোক ডলে ডলে জেলে আসিটেছে। Sir, number of prisoners in Kanpur jail are swelling day after day with false Nanas. হামার বিশোয়াস, নানা বাঁচিয়া নাই (মামুদের দিকে নির্দেশ করে) Sir, কানপুর দিলরুবা হোটেলের যেখানে ঐ নানা শেষ কয়ডিন লুকাইয়া ছিল, সেই হোটেলকা owner সুলটান মামুড উপস্টিট আছে। His statement may be reliable regarding Nana's whereabouts.

কমিশনার। টাহাকে টাহার বক্টব্য বলিটে বলুন—

এস. পি.। (অদূরে মামুদকে ইঙ্গিত করে) মামুড! টোমার কি বিশোয়াস নানা still বাঁচিয়া আছে? সেই রক্টখেকো beastটা সম্বন্ধে যাহা জানো টুমি বলো—

মামুদ। (উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে) হুজুর ধর্ম্মাবতার! নানাসাহেব বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের পরই এখান থেকে পালিয়ে যায় নেপালের দিকে। সে তরাই অঞ্চলেই পটল তুলেছে হুজুর—

কমিশনার। What?

মামুদ। হুজুর তরাই অঞ্চলেই সেই শয়তানটা মারা গেছে। তার সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তারা কানপুরে ফিরে এসে বলেছে, নেপাল যাওয়ার পথে তরাইয়ের জঙ্গলে নানার শরীর খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। খং খং করে কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ঐখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তার সঙ্গীরা স্বচক্ষে দেখে এসে এসব বলেছে হুজুর—

কমিশনার। Well! মামুড! টুমি কোন eyewitness কোন প্রট্যক্ষডর্শীর নাম বলিটে পারো?

মামুদ। হ্যাঁ হুজুর, নিশ্চয়ই (তার পাশে একটি মধ্যবয়সী লোকের দিকে ইঙ্গিত করলে। লোকটা কালো বেঁটে। চুলগুলো খাড়া খাড়া। ছোট ছোট ধূর্ত্ত চোখ) হুজুর, এই যে দেখছেন একে—এর নাম কেষ্ট, ও নানার নাপিত। নানার সঙ্গে তরাই

পর্যন্ত গিয়েছিল। হুজুররা কেষ্টর মুখ থেকেই শোনেন না শুনতে চান (সে বেঞ্চে বসল। কেষ্টর গায়ে একটা ঠোকা মেরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল)।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (কেষ্টকে) Well! তুমি নানাকে কামাইটে?

(দু' গালে হাত বুলিয়ে কামানোর ভঙ্গী করে)

কেষ্ট। (কানে হাত দিয়ে কর্কশ রুক্ষ গলায়) কি বললেন হুজুর? কি বললেন? একটু জোরে বলুন, আমি আবার কানে একটু খাটো। কাকে কামাতাম?

ম্যাজিষ্ট্রেট। নানাকে তুমি কামাইটে?

কেষ্ট। ওঃ নানাকে! সেই বাটপাড়টাকে? হ্যাঁ হুজুর, সেই বাটপাড়টাকে কামাতাম বটে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। সপ্টাহে কয়বার করিয়া টাহাকে কামাইটে?

কেষ্ট। সপ্তাহে দু'বার হুজুর। বাটপাড় কোথাকার।

(চাপা স্বরে স্বগতোক্তি করল)

ম্যাজিষ্ট্রেট। এখন আউর টাকে কামাইবার ডরকার নাই কি বলো? As definitely he has gone away. Is not it?

কেষ্ট। হ্যাঁ হুজুর। মরেছে বলে মরেছে, নিশ্চয়ই মরেছে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরেছে। ঐ নানা বাটপাড়টার লাশে দড়ি বেঁধে জমাইরের গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছি—

ম্যাজিষ্ট্রেট। Thank you Keshta! (কমিশনারের দিকে তাকিয়ে), কেষ্টর বক্টব্য বিলকুল সট্য বলিয়া মনে হইটেছে স্তার। That villain has already gone to hell.

মামুদ। (ম্যাজিষ্ট্রেটকে নির্দেশ করে) হুজুর! শুনেছি বিলেত থেকে অনেক গুণী লোক এদেশে এসেছেন নানাকে ধরতে। শুনেছি তাঁরা কেউ হাতের অক্ষরে, কেউ নাকের আকৃতিতে, কেউ চোখের দৃষ্টিতে আবার কেউ-বা বুড়োআঙুলে কি পায়ের চিহ্নে খুব বিশেষজ্ঞ। তাঁদের না কি খুব মোটা মাইনেও দেওয়া হচ্ছে (কমিশনারের দিকে তাকিয়ে) হুজুর! একটা কথা বলি, মনে কিছু করবেন না—আপনারা শুধু শুধু ভস্মে ঘি ঢালছেন, মাঝখান থেকে সরকারের টাকা গচ্চা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের বিদেয় করে দিন হুজুর। নানা মরেছে—

কমিশনার। No No, it can't be, it can't be. British Parliament has sent these specialists. উহাডেরকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পাঠাইয়াছে। India Government has no authority to send them back to England. মামুড! টুমি জানো না উহাডের ফিরাইয়া ডিলে পার্লামেণ্ট হামাডের গভর্ণমেণ্টকে inefficient বলিবে। টাই হামরা উহাডের ফিরাইয়া ডিটে পারি না। হামার ডিলও বলিটেছে যে নানা বাঁচিয়া নাই। টবুও টাকে চরিবার কাজে হামাডের সাথ হাপনারাও হাট মিলাইয়া ডিন। যেমন সাহায্য করিটেছেন টেমন করিয়া যান।

কেষ্ট। (চাপা গলায়) সগ্গে গিয়ে নানাকে ধরে আনতে বলছে না কি সাহেব?

কমিশনার। What? কি বলিটেছো টুমি?

কেষ্ট। না হুজুর কিছু না। এই বলছি যে ব্যাটা এখন নরকে।

কমিশনার। (এস, পি.-কে) well S.P.! টোমার Force জেলার প্রট্যেকটি suspected place-এ হানা দিক। আউর প্রট্যেক তিন জেলে identification parade করাইয়া যাহারা নানা বলিয়া ঢরা ডিয়াছে টাহাডের release করিয়া ডিবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। স্তার, we are releasing some of them everyday. কিণ্ট স্তার! ডেশে এখন ডুর্ভিক্ষ বলিয়াই ডলে ডলে চাষী গৃহষ্টরা জেলে আসিটেছে। উহারা উট্টমরূপে জানে, জেলে আসিলেই খাড্য পাওয়া যাইবে।

এস. পি.। (কমিশনারকে) স্তার, just remember the very difficult sum of tank of our school-days. চৌবাচ্চার বটো পানি বাহির হোইয়া যায়, টাহার ঠিক double আসিয়া প্রবেশ করে। ফজিরমে যডি নানার ডাবিডার ডুইশো ঝাংটো ফকির, সাডু, চাষী-মজডুর গৃহষ্টকে release করা হোইটেছে টো বিকেলবেলাই ফিন চারশো আসিয়া জেল হাজটের সোম্মুখে হৈ হৈ সুরু করিয়া ডিটেছে। গ্রামের চৌকিডার, ডাকাডার কনষ্টেবল, ডারোগার পা চরিয়া কাঁডাকাটি করিয়া টাহারা arrest হইয়া জেলে আসিটেছে! Situation is very grave, স্তার!

মামুদ। আমি একটা কথা বলি হুজুর। আপনারা আদা-জল খেয়ে নানার মত একটা লোফারকে ধরার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন বলেই তো দেশের লোক মজা পেয়ে গেছে। তারা দলে দলে থানায় এসে নিজেকে নানা বলে পরিচয় দিয়ে ধরা দিচ্ছে। তাদেরও বাইরে থাকবার কোন উপায় নেই হুজুর! গৃহস্থের খাদ্য নেই, সাধুফকিরের ভিক্ষে নেই; তাই তারা দলে দলে থানায় আসছে। আমি বলি কি, নানাকে ধরার এই বাতিক ছেড়ে দিন হুজুরেরা। তা না হলে মাথায় ঘায়ে পাগলা কুকুরের মত হয়ে যাবেন আপনারা।

কমিশনার। No, No. It's impossible. Absurd! We can't disobey the order of our Parliament. নানাকে চরিবার চেষ্টা হামাডের করিটেই হোবে। মামুড, টুমি হামাডের identification-এর কাজে কোন help করিটে পারো কিনা বলো? শটো শটো নানাকে জেলে খাড্য যোগাইটে হোইটেছে; unnecessary খরচ হোইটেছে গভর্ণমেণ্টের। হামি identification করাইয়া জেল vacate করিয়া ডিটে চাই।

মামুদ। হ্যাঁ হুজুর! নানাকে চেনার কাজে আমি কিছু সাহায্য করিতে পারি। (তার পাশের একটি লোককে ইঙ্গিত করে) হুজুর, এ আমার হোটেলের বাবুর্চি ইসাক। ওর সঙ্গে নানার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। শেষ কয়দিন ও নানার সঙ্গে ছিল। কানপুর শহরে নানাকে ইসাকের চেয়ে ভালো করে কেউ চেনে না। ঠিক

আছে হুজুর, মহামান্য সরকার বাহাদুরের সাহায্যের জন্য আমি ইসাককে ছেড়ে দেবো। সে জেলে গিয়ে নানাকে সনাক্ত করার কাজে সাহায্য করবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। Well! ইসাক! (ইসাক উঠে দাঁড়াল, তার পরনে বাবুর্চির পোশাক। সে মাথা নীচু করে মুখখানাকে প্রায় আধুলি পরিমাণ ফাঁক করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল) Strange! What makes you laugh man? টুমি হাসিটেছো কেন?

মামুদ। হুজুর কিছু মনে করবেন না। হাসিটা ওর মুদ্রাদোষ। ওকে দেখে মনে হয় বোকা, কিন্তু ও খুব বুদ্ধিমান হুজুর। ও ছাড়া আমার হোটেল একেবারে অচল হয়ে যাবে একদিনে। কোন্ খরিদ্দারকে কতটুকু সম্মান করতে হবে, কার কি মেজাজ, সব, সব ওর নখদর্পণে। আরও মজা এই যে, সব সময়ই ওর মুখে হাসির আভা ঝিক্‌মিক্ করছে। খরিদ্দারদের প্রত্যেকের মানমর্য্যাদা অনুযায়ী ইসাক টাকা, আধুলি, সিকি কি দুয়ানি পরিমাণ মুখটা ফাঁক করে হাসে। কিন্তু বাদ পড়ে না কেউ হুজুর; কেউ ওর হাসি থেকে বঞ্চিত হয় না। আমার 'দিলরুবা'র যে এত নাম তার একমাত্র কারণ ইসাক। হুজুর! বিদ্রোহের পরে বিঠুরের ইঁদারায় যেসব সোনার তৈজসপত্র পাওয়া গেছে, তার বদলেও যদি কেউ ইসাককে চায়, তবুও ওকে আমি ছাড়বো না।

কমিশনার। Well! ইসাক টুমি নানাকে সনাক্ট করিটে পারিবে টো?

ইসাক। (মাথা নীচু করে হাসতে হাসতে বলল) যদি নানা সত্যিই জেলে থেকে থাকে তা হলে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না হুজুর। নানার দেহের কোথায় ক'টা তিল আছে। বাঁ গালের কয় ইঞ্চি ওপরে একটা ছোট্ট জড়ুল আছে সব আমার মুখস্থ।

কমিশনার। Bravo! Bravo! ইসাক! টুমি কাল কজিয়মে ঠিক সাড়ে সাটটায় সময় কানপুর জেলগেটে উপস্থিট ঠাকিবে। (মামুদকে) মামুড! টোমার ডোকানের কাজের কোন ক্ষটি হইবে না টো?

মামুদ। না হুজুর, কিছুমাত্র না। সকালে তো তেমন ভিড় থাকে না আমার হোটেলে।

কমিশনার। Well. Thank you. এই সহযোগিটার নিমিট্ট হামাডের গবর্ণমেণ্ট টোমাদের কাছে খুব কৃটজ্ঞ ঠাকিবে। Gentlemen! meeting may now be dissolved.

২য় দৃশ্য

[কানপুর 'জেলগেট'। জেলের লোহার গারদের ওপরে খুব কম করে ত্রিশ-চল্লিশ জন সাধু, ফকির, মজদুর, গৃহস্থ, চাষী কয়েদী চুপচাপ বসে আছে। এরা প্রত্যেকে নানাসাহেব বলে ধরা দিয়েছে। জেলের সম্মুখে ছোট্ট উঠানে দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র নিরন্ন *একদল লোকের প্রবেশ। তাদের মধ্যে একজন চীৎকার করে বলল—*]।

১ম। কৈ গো? কে কোথায় আছ? কোথায় গো দারোগা সাহেব, আমাদের গ্রেপ্তার কর। আমরা সবাই নানাসাহেব—

(দেশীয় দারোগার প্রবেশ)

দারোগা। তোমরা এতগুলো লোক সবাই নানাসাহেব? একসঙ্গে এত জন ত নানা হতে পারে না—

২য়। এত লোক বলেই ত নানা বলছি রে মুখ্যু! একজন হলে কি আর নানা বলতুম?

দারোগা। তুমি কে হে? ভদ্রলোকের মত কথা বলতে পার না? তুমি কি কর?

২য়। সে খোঁজে তোমার দরকার কি হে বাপু? তোমাকে গ্রেপ্তার করতে বলছি তুমি গ্রেপ্তার কর। তা না সাত-সতের ধানাই-পানাই—

দারোগা। আশ্চর্য্য! লোকটার মাথা খারাপ না কি?

৩য়। (২য় ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে) ওর মাথা খারাপ নয় হুজুর। ও পাঠশালার পণ্ডিত—

দারোগা। হুঁ বুঝেছি তা না হলে এমন হয়—

পণ্ডিত। কেন তুমি শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছ বাপু? আমি খিদের জ্বালা আর সইতে পাচ্ছি না। তুমি গ্রেপ্তার করে চালান দিয়ে দাও না, সরকারের দেওয়া দুমুঠো ভাত খেয়ে বাঁচি—

দারোগা। (বিরক্ত হয়ে) কেন বক বক করছ? গ্রেপ্তার করতে আমার নিষেধ আছে—

পণ্ডিত। হুঁ বুঝেছি। কেউ বুঝি দু' পয়সা খাইয়েছে—

দারোগা। দেখ ওসব কথা বল না। আইনে পড়ে যাবে কিন্তু—

পণ্ডিত। আরে, সেই ভরসাতেই ত বলছি। যে-কোন একটা ধারায় গ্রেপ্তার কর বাবা! বেঁচে যাই। ঘরে খাবার নেই। বৌ গলায় দড়ি দিয়েছে। ছেলেদের একজন পালিয়েছে, আরেকজনও আত্মহত্যা করেছে হুজুর।

(ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল)

(দারোগা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। এমন সময় দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এক সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। (চীৎকার করে) অহম, অহম ভো! আমিই নানাসাহেব। আমাকে গ্রেপ্তার কর্ শীগগির কে কোথায় আছিস—

দারোগা। তুমি ত সন্ন্যাসী হে?

সন্ন্যাসী। বটে? সন্ন্যাসীর কি এমন হাতের গুলি হয়?

(ডান হাতের পেশী বাঁ হাত দিয়ে টিপতে সুরু করল দারোগার একেবারে নাকের কাছে দাঁড়িয়ে) দেখ, দেখ হে দারোগা—দেখ টিপে দেখ, এ হাতের গুলি, না লোহার গুলি!

দারোগা। (অসহায় ভাবে) আমি কি করব ঠাকুর? তোমাকে দেখে ত মনে হচ্ছে নানাসাহেব হওয়ার যোগ্যতা তোমার

আছে। দু'চারটা খুনজখম তুমি করতে পার—কিন্তু—(জনতার দিকে নির্দ্দেশ করে) এরা সবাই যে উমেদার ঠাকুর—

সন্ন্যাসী। (উত্তেজিত হয়ে) কি? এই হাড় জিরজিরে ভাংটা ফকিরের দল নানাসাহেব হতে চায়! তবে রে ব্যাটা সব বুজরুকের দল। (উন্মত্ত ক্রোধে লাঠি হাতে তাড়া করল। জনতা ভীত হয়ে চোখের নিমেষে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। নেপথ্য থেকে তাদের আর্ত্ত চীৎকার ভেসে এল—ওরে বাবারে—মরে গেলাম···)

(ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস-সুপার, আরও দু'একজন কর্ম্মচারী এবং ইসাকের প্রবেশ। তাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সন্ন্যাসী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দারোগা শশব্যস্ত হয়ে তাদের সেলাম জানাল)

ম্যাজিষ্ট্রেট। (জেলের গারদের ওপারে বন্দীদের দিকে ইঙ্গিত করে দারোগাকে) ইহারা কি নিজেদেরকে নানা বলিয়া surrender করিয়াছে?

দারোগা। হাঁ হুজুর! এরা সবাই নানাসাহেব বলে থানায় এসে surrender করেছিল। থানার হাজতে জায়গা নেই তাই আমি ওদের জেলের lockupএ পুরেছি। Prop r identification না হলে ওদেরকে releaseও করা যাচ্ছে না স্যার—

পুলিস সুপার। (অদূরে দণ্ডায়মান হাবিলদারকে) হাবিলডার! জেলার সাহেব কাঁহা গিয়া?

হাবিলদার। জেলকে অন্দর মে হ্যায় হুজুর—(প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জেলার গারদের ওপার থেকে সামনে এসে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল তাদের প্রত্যেককে)

ম্যাজিষ্ট্রেট। (জেলারকে) নানার সংখ্যা ডিনের পর ডিন বাড়িয়া যাইটেছে ক্যান?

জেলার। জেলে খাবার বন্ধ করে দিন হুজুর। দেখবেন দুদিনে সব পালাবে। জেলে বসে বসে দু'বেলা পেট পুরে ভাত খেতে পাচ্ছে এই মাগগি গণ্ডার বাজারে—তাই ওরা আসছে। বাইরে এমন স্বর্গসুখ কি সহজে মিলবে?

ম্যাজিষ্ট্রেট। Jailor! Open the jail gate. সমোষ্ট prisonerকে এইখানে হামাদের সম্মুখে Fall in করিয়া ডাঁড় করাইয়া ডাও। Identification parade হোবে—

(হাবিলদার এবং একজন সেপাই জেলের দরজা খুলল। নিশ্চিন্ত আরামে উপবিষ্ট নানাসাহেবের দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাবিলদার তার বেটনটা শূন্যে একবার ঘুরিয়ে চীৎকার করে বলল)

হাবিলদার। এইও—তোমলোক খাড়া হো যাও (বন্দীর দল সবাই দাঁড়াল) সামনে ময়দানমে চলো—হাঁট হাঁট (বন্দীরা সবাই জেল গেটের বাইরে এল) এইও সব লাইন বাঁধিয়ে 'কলাইন' হোকর খাড়া হো যাও—

(বন্দীরা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস. পি. প্রভৃতি অফিসারদের সম্মুখে লাইন বেঁধে দাঁড়াল। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই গেরুয়া পরা হাড়জির-জিরে হিন্দু সন্ন্যাসী এবং আলখাল্লাপরা মুসলমান ফকির। কয়েক-জন কঙ্কালসার গৃহস্থও আছে। এদের মধ্যে বাইশ থেকে বিরাশি পর্য্যন্ত বয়সের লোক যেমন আছে, তেমনি বিহারী, বাঙালী, মরাঠী প্রভৃতি ভারতের প্রায় সমস্ত জাতি আছে।)

জেলার। (ম্যাজিষ্ট্রেটকে) স্যার! ওয়ান, টু, থ্রি, করে ওদের নিজেদের মুখ দিয়ে বলিয়ে প্রত্যেকের এক একটা নাম্বার ঠিক করলে ভাল হয়—

পুলিস সুপার। Well! উহারা one, two, three, count করিটে পারিবে টো?

(জেলার হাবিলদারকে ইঙ্গিত করতেই সে হেঁকে নানার দলকে বলল)

হাবিলদার। এইও পয়লা আদমী, তোম বলো—ওয়ান, টু (সঙ্গে সঙ্গে বন্দীরা প্রত্যেকে নিজের নিজের সংখ্যাটা একেবারে ত্রিশ পর্য্যন্ত স্পষ্ট গলায় বলে গেল)

পুলিস-সুপার। (ইসাকের দিকে তাকিয়ে) ইসাক! You just begin your work! হাবিলডারকা সাথ যাও। প্রত্যেকটি prisonerকে উট্টম রূপে লক্ষ করিয়া বলো এডের মধ্যে কেউ নানাসাহিব কি টার Assistant আজিমুল্লা খাঁ কি that witch woman জুবেডি বিবি আছে কি না—

(ইসাক তার অভ্যাসমত অকারণ পুলিস-সুপারের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে হাবিলদারের সঙ্গে দীর্ঘ লাইনের একেবারে মাথার দিকে অগ্রসর হ'ল। বন্দীদের প্রথম জনের দিক থেকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ইসাক চীৎকার করে বলছে—আর একজনের পর আর একজনের দিকে সরে আসছে···)

ইসাক। এক নম্বর—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—সাত বাতিল হ্যায়—

(৮ নম্বরের দিকে ইসাক স্থির চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ৮ নম্বরের মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দে তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। সে বলল)

৮ নম্বর। হাঁ, হাঁ বাবা ইসাক চিনতে পারছ না? আমি—আমিই নানাসাহেব—

ইসাক। তুমি কি বিবিদের হত্যা করেছিলে?

৮ নম্বর। নিশ্চয়ই। এখনও আমাকে ধরে চালান না দিলে বাবাদেরও সাবাড় করে দেব—

হাবিলদার। এইও উল্লু—চুপ রহো—

ইসাক। আট নম্বর বাতিল হ্যায়—না, না, তুমি যাও, তুমি নানা নও—

(সঙ্গে সঙ্গে আট নম্বর একেবারে দু'হাতে বুক চেপে ধরে শিশুর মত হাউ হাউ করে কেঁদে মাটিতে বসে পড়ল)

৮ নম্বর। (কান্নাভরা গলায়) ভিক্টোরিয়া মহারাণীর দোহাই লাগে। শুনুন হুজুররা আমি সেই বাংলা মুলুক থেকে আসছি। মামলা আর বন্যায় আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছি হুজুর। রেলগাড়ীতে টিকিট কিনবার পয়সা অবধি ছিল না। চেকার এসে টিকিট চাইল।

তাকে বললাম—তোমাকেই বলছি বাপু, আর কাউকে বল না—আমি সিপাহী বিদ্রোহের নানাসাহেব। সঙ্গে সঙ্গে চেকার আমাকে ছেড়ে দিল (অদূরে দণ্ডায়মান ম্যাজিস্ট্রেট পুলিস-সুপার প্রভৃতি অফিসারদের দিকে তাকিয়ে) বড় ভরসা করে এসেছি সাহেব। তোমরা ঠেললে দাঁড়াই কোথায় বল ত?

(ধুঁপিয়ে কেঁদে উঠল)

(ইসাক আবার হেঁকে বলে উঠল)

ইসাক। নয়, দশ, এগার, বার নম্বর বাতিল হায়—

(এমন সময় ইসাকের বরখাস্ত বন্দীদের মধ্যে জনকয়েক বাঙালী বন্দী আট নম্বরকে বলল)

১ম। আট নম্বর! কান্নাকাটির যুগ এটা নয় ভাই! ভুলে যেও না আমরা বাঙালী। আমরা গণবিক্ষোভ বাধিয়ে দিতে 'এক্সপার্ট', চল, আমরা গভর্ণর-জেনারেল সাহেবের বাড়ীর সামনে ধর্মঘট সুরু করি—

২য়। আহা, এ সময়ে একটা যদি খবরের কাগজ থাকত আর আমাদের এই ধর্মঘটের খবর ছাপা হ'ত, তা হলে দেশময় ছড়িয়ে পড়ত আমাদের আন্দোলনের কথা—

৩য়। সারা দেশের সমর্থন পেতাম আমরা। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি উঠত—আমাদের দাবি মানতে হবে—কিন্তু খবরের কাগজই নেই একখানাও—ভুত্তোর—

(সারিবদ্ধ বন্দীদের একেবারে শেষের দিকে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ও আর একজন মুসলমান ফকির চীৎকার করে পরস্পর ঝগড়া সুরু করেছে)

সন্ন্যাসী। নানাসাহেব মুসলমান ছিল তোকে এ কথা কে বলেছে রে হারামজাদা?

ফকির। আলবৎ মুসলমান। নানার সাত পুরুষ ছিল মুসলমান। খুব ভোরে মসজিদের দিক থেকে আজানের যে মিষ্টি সুর ভেসে আসত তা শুনেছিস কখনও? ঐ আজান যে করত সেই ব্যক্তিই আমি—নানাসাহেব—

সন্ন্যাসী। গুলগপ্পো মারবার আর জায়গা পেলি না? তোর মত প্যাঁকাটি চেহারা নানার? কানপুরের বাঙালীপাড়ায় দুর্গাপূজা দেখেছিস কখনও? পূজার সময় মণ্ডপে বসে গরদের কাপড় পরে কপালে তিলক কেটে যিনি চণ্ডী পাঠ করতেন—তিনিই আমি—নানাসাহেব—

ফকীর। চুপ কর ব্যাটা। বক বক করিস না। উল্লু কাঁহাকো—ইবলিশের বাচ্চা। একেবারে মেরে ঠাণ্ডা বানিয়ে দেব। বলছি, নানা মুসলমান—

সন্ন্যাসী। (হুঙ্কার দিয়ে বুক চাপড়ে) তবে রে ব্যাটা! আয় এ দিকে আয় তোকে—

(ফকির সরোষে এগিয়ে গেল। দু'জনে পরস্পরকে কিল চড় ঘুসি মারতে লাগল। ছুটে এল ইসাক, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস-সুপার)

পুলিস-সুপার (উদ্বিগ্ন হয়ে চীৎকার করে) strange! communal riot বাড়িয়া গেল যে! এইও হাবিলদার—ব্যাটন চালাইয়ে—

(হাবিলদার বেটনটা ঘুরিয়ে তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তারা ক্লান্ত পশুর মত দাঁড়িয়ে বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগল। ইসাক তাদের দু'জনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল)

ইসাক। বাপু! তোমাদের মধ্যে কেউই ত নানাসাহেব নও—

সন্ন্যাসী। তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ? ভাল করে তাকিয়ে দেখ ত আমার মুখের দিকে। আমি নানাসাহেব নই ত কি তোমার বাপ নানাসাহেব?

ইসাক। চুপ রও। যা তা বল না। (খুব বিরক্ত হয়ে) হ্যাঁ, আমার বাপই নানাসাহেব, আমিই নানাসাহেব হ'ল ত? যাও এখন ভাগো—

ফকির। (মুখটা বিকৃত করে) আহা চাঁদ আমার! নানাসাহেব তুমিই হবে যদি তবে নানাকে সনাক্ত করতে এসেছ কেন?

ইসাক। নানাসাহেবকে সনাক্ত করতে নানাসাহেবই ত সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি—

পুলিস-সুপার। Bravo! Bravo! ইসাক, His conversation is fully logical!

(সন্ন্যাসী ও ফকির ভয়ানক ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ইসাকের দিকে অগ্রসর হ'ল)

সন্ন্যাসী। এই ব্যাটা, বল, বল শীগগির বল—আমিই নানাসাহেব। দেশে ভাত ভিক্ষে মেলে না। লোকের ধর্মে মতি নেই ···বাইরে থাকলে না খেয়ে মরে যাব আর তুই মজাসে বলছিস কি না আমি নানা নই। হারামজাদা কাঁহাকো—

(চার-পাঁচটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল ইসাকের গালে)

ফকির। ব্যাটা, আমি পই পই করে বলছি—আমি একেবারে নিখাদ নানাসাহেব। আমার চৌদ্দপুরুষ নানাসাহেব—আর তুই ব্যাটা কোন লাট রে বলিস—আমি নানা নই—ইবলিশ কাঁহাকা (কয়েক ঘা বসিয়ে দিল ইসাকের পিঠে। অন্যান্য নানাসাহেব বলে বাতিল বন্দীরা সবাই এসে একসঙ্গে তাকে আক্রমণ করল। সিপাই, হাবিলদার তাদের উপর লাঠি চালিয়েও তাদের থামাতে পারল না।)

ইসাক। (আর্তস্বরে) ওরে বাবারে, মরে গেলাম—মরে গেলাম। চোখে অন্ধকার দেখছি রে, হা আল্লা—হা খোদা আমাকে বাঁচাও। আমি বলছি ওরে তোরা সবাই নানাসাহেব, সবাই—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, তোদের পায়ে পড়ি—

(বন্দীদের ব্যূহ থেকে বেরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ম্যাজিস্ট্রেটের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কেঁদে বলল)

হুজুর আমাকে ছুটি দিন। এমন করে রোজ রোজ আমি মার খেতে পারব না—

পুলিস-সুপার। How strange! টুমি কি বলিটেছো ইসাক?

ম্যাজিস্ট্রেট। Without your help, how it is possible for us to identify that scourdrel? No, no, Isac, টুমি হামাডের সাঠে সহযোগিটা কর। আগামী কল্য হইটে টোমার সাঠে ডুজন করিয়া পাঠান বডিগার্ড ডিয়া ডিব—

ইসাক। বাই দিন, আমি পারব না হুজুর (জামাটা তুলে পিঠ দেখিয়ে) এই দেখুন, পিঠে কালশিরে পড়ে গেছে, দেখুন নাক ফেটে রক্ত ঝরছে। এই কাজ আর একদিন করতে হলে মরে যাব হুজুর—মরে যাব—

তৃতীয় দৃশ্য

[মামুদের 'দিলরুবা' হোটেলের 'ডাইনিং হল'। হলের শেষ দিকে কাউণ্টারে বসে মামুদ ঝিমোচ্ছে। দেয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িতে রাত্রি নয়টা বেজেছে। চার দেয়ালে চারটি দেয়াল-বাতির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে হল ঘরটা। কাউণ্টারের অদূরে বেঞ্চে বসে আছে বাবুর্চি ইসাক। এমন সময় মসিয়ে লুবলিন এবং মিষ্টার জর্জ এই দুই ফরাসী ও ইংরেজ 'টুরিষ্ট' এসে প্রবেশ করল 'দিলরুবা'য়। তারা দুটো ফাঁকা চেয়ারে এসে বসল। খাটি ইউরোপীয় অভিজাত দু'জন খরিদ্দার দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে এসে মামুদ নিজে তাদের অভ্যর্থনা করল]

মামুদ। আসুন, আসুন, স্যার—বসুন (ইসাক তাদের সামনে এসে দু'জনের দিকে তার অভ্যাসমত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল) কি দেব স্যার বলুন? ড্রিঙ্ক সব রকম আছে স্যার—'বীয়ার', 'রাম' ব্র্যাণ্ডি, জীন, হুইস্কি সবই আছে—আর আছে 'বীফের কারি,' শিক কাবাব, মটন কাটলেট—

লুবলিন। Please don't be so hasty! খাওয়ার কঠা পরে হোবে। টোমার সাঠে হামাডের কয়েকটা private কঠা আছে—

মামুদ। (বিস্মিত হয়ে) সে কি সাহেব? আমার সঙ্গে প্রাইভেট কথা? (খুব খুশী হয়ে লুবলিনের কাছে সরে এল)

লুবলিন। হামরা ডুইজনেই Tourist. India ডেশটা ডেখিটে এবং Sepoy Mutiny কা cause and effect উট্টর রূপে জানিটে আসিয়াছে। হামাডের একঠো contemplation আছে—Ring leader of the Mutiny that Mr. Nana সম্বন্ধে একঠো কেটাব লিখবে। হামাডের ডেশের বহুট publishers হামাকে বলিয়াছে, European people is very eager to know the details of Mr. Nana। মামুড! টুমি টো নানাকে intimately জানিটে শুনিয়াছে। If you don't mind, টা হইলে হামি টোমাকে নানা সম্বন্ধে কটগুলো question করিবে, টুমি টাহার ঠিক ঠিক উট্টর করিবে—

মামুদ। বেশ বলুন সাহেব, আমি যা জানি বলব—

লুবলিন। Well! নানা কি Hotelকা খানা খাইট?

মামুদ। (চমকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে) বিশমিল্লা! হোটেলের খানা খাবে নানা? সর্বনাশ ও কথা মুখেও আনবেন না সাহেব। কে কোথায় শুনতে পাবে—

জর্জ। (উত্তেজিত হয়ে) টবে কি খাইট সেই Scoundrel? English women or childকা blood?

মামুদ। সাহেব দেখছি নানার উপর বেজায় ক্রুদ্ধ হয়েছেন—

জর্জ। হামি ইংল্যাণ্ডে কিন্টু ঐরকম শুনিয়াছে—

মামুদ। না, না, ভুল শুনেছেন সাহেব! নানা মানুষের রক্ত খেতে যাবে কি দুঃখে? সে ছিল খাটি নিরামিষাশী অর্থাৎ vegetarian—আচ্ছা আমি বলছি সে কি খেত। (হলঘরটার দিকে নির্দেশ করে) এই যে দেখছেন না হলঘরটা? এই ঘরেই নানা কয়দিন লুকিয়ে ছিল। সে সময় তার জন্যই একটা চুল্লী ছিল ঘরের ঐ কোণে। আর ঐ চুল্লীর ওপরে হাঁড়িতে অর্থাৎ earthen potএ clarified butter অর্থাৎ ঘি প্রস্তুত করা হ'ত—

লুবলিন। Only clarified butterটার favourite food ছিল?

মামুদ। হ্যাঁ সাহেব, নানা সবচাইতে ভালবাসতেন ঘি—

জর্জ। নানা কি এই Roomকা Floorমে শয়ন করিট? আউর কোন furniture ছিল না?

মামুদ। আসবাব? আজ্ঞে হ্যাঁ ছিল—একটামাত্র তক্তাপোষ ছিল। আর একটা বাছুর ঘরময় অবাধে ঘুরে বেড়াত। আর একটা চাকর সোনার বাটিতে করে তার চোনা অর্থাৎ urine নিয়ে নানাকে খাওয়াত।

লুবলিন ও জর্জ। (এক সঙ্গে) urine! How horrible. He used to take urine of the cow?

জর্জ। Lublin, I suspect, ঐ scoundrelটা যখন cowকা urine খাইট then definitely he also took beef.

লুবলিন। George! (জর্জের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল) I think, secretly। উই বস্টুটা ঔর্টি that urine test করিয়া ডেখিলে কেমন হয়? Nana is not a poor fellow. But do you think, he drinks urine without any cause?

জর্জ। হামি ইংল্যাণ্ডে একঠো কেটাবে পড়িয়াছিলাম, হিণ্ডুরা cowকা urine ডিয়া Godকে worship করে। টারা বিশওয়াস করে, ঐ urineকা মড্যেই কোন divine power আছে। হয়টো নানাকা অটো শক্টি, অটো courage ঐ urine regularly সেবন কবার নিমিট্টই—

লুবলিন। Right you are! Right you are Mr. George! (পকেট থেকে নোটবুক বের করে, তার পাতায় কি যেন লিখতে সুরু করল। একটু পরে মুখ তুলে বলল মামুদকে)

Listen, Mamood! হামি Mystery of Nana নামে যে কেটাবটা লিখিবো, টাটে Nana's Foodকা Chapterএ urine সম্বন্ধে একঠো para লিখিটে হোবো। হামার বিশওয়াস, Nana's Food সম্বন্ধে এই peculiar research সারি ডুনিয়ামে sensation জাগাইয়া ডিবে—

জর্জ। Well মামুদ! নানা ডেখিটে কেমন ছিল?

মামুদ। সে বিষয়ে হুজুর, আমার চেয়ে ভাল জানে আমার হোটেলের বাবুর্চি ঐ ইসাক। (অদূরে কাউণ্টারের কাছে দণ্ডায়মান ইসাককে নির্দেশ করল) আপনারা ওকেই প্রশ্ন করুন। ও আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবে। শুধু নানাই নয়, ইসাক নানার right hand আজিমুল্লা খাঁ এবং জুবেদি বিবিকেও খুব ঘনিষ্ঠভাবে চেনে।

লুবলিন। Well! উহাকে এইডিকে আসিটে বলো টো মামুড! (মামুদ হাতছানি দিয়ে ডাকতেই ইসাক তার পাশে এসে দাঁড়াল। লুবলিন আর জর্জের দিকে তাকিয়ে তার অভ্যাসমত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল)

মামুদ। ইসাক! এই সাহেবরা যা যা জিজ্ঞাসা করছেন উত্তর দে। ওঁরা দেশে গিয়ে নানা সম্বন্ধে একখানা কেতাব লিখবেন—

(মামুদ কাউণ্টারে গিয়ে বসল)

লুবলিন। Listen,—শোন ইসাক, নানার কঠা চিন্টা করিলেই হামার চোখে এই picture ভাসিয়া ওঠে—কাশ্মীরী loose পায়জামা নানার পরনে, টার আঁখমে একঠো coloured spectacle! নক্সাকাটা slipper পরিয়াই নানা টক্টাপোষের ওপর গড়াইটেছে, টার পাশে ডাঁড়াইয়া ডুঠো বহুট খাপসুরোট girl peacockকা পাখা ডুলাইয়া টাকে বাটাস করিটেছে। আউর নানা মাঝে মাঝে টার পায়ের কাছে অর্ধশায়িট এবং Half naked ইরানী girl ডুঠোকে amuse করিয়া tease অর্থাট চিমটি কাটিতেছে। In the meantime, একঠো ডেশী সেপাই একঠো আংরেজ babyকে সঙীনের মাথায় বিঢাইয়া টার কাছে হাজির করিল। নানা শিশুটাকে ডেকিবার নিমিট্ট hurriedly উঠিয়া ডাঁড়াইটেই টার কোল হইটে একঠো কালো বিড়াল I mean একঠো cat suddenly লাফ দিয়া পড়িল। Dead আংরেজ babyটাকে ডেখিয়া পৈশাচিক আনণ্ডে নানা just like a monster—ডৈট্যের মটো হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। Just tell me Isac? নানার character এবং কথাবার্টা কটকটা এইরূপ ছিল না?

ইসাক। (বিনীত হেসে মাথা নুইয়ে) তা হ্যাঁ হুজুর যা বলেছেন তা প্রায়ই ঠিক—

জর্জ। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) That scoundrel! that insect of Hell, Nana সম্বন্ধে হামার ঢারণা কিণ্ট বিলকুল different মসিয়ে লুবলিন—

লুবলিন। What's your impression Mr. George?

জর্জ। (ইসাককে) টুমি ডেখো টো, হামার impressionটা মেলে কি না! নানার figure ছিল ডৈট্যের মটো। টার bodyটে বড় বড় কালো লোম। টার চোখডুটো আউর টার গায়ের colour, just like coal tar—আলকাটরা মাফিক। টার মাঠাটা প্রকাণ্ড একঠো earthen potএর মটো। বিলকুল illiterate—signature পর্যণ্ট করিটে পারিটো না। ক্রুদ্ধ হইলে টার servantডের পেটে লাঠি ডিয়া মারিয়া ফেলিটো। টার ডুপুরের lunch ছিল human childকা 'লিভারের কারী' আউর nightকা dinner—কুমারী অর্ঠাট virgin girlকা হৃডপিণ্ডের চাটনী। Oh! What a veritable monster! কি বলো ইসাক, নানা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম টা একডম ঠিক না?

ইসাক। তা হ্যাঁ, কিছুটা কাছাকাছি গিয়েছে হুজুর।

জর্জ। (খুব উল্লসিত হয়ে) লে-আও ডু' পেগ ব্র্যাণ্ডি—

(ইসাক ছুটে দু'পেগ ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এল। জর্জ ও লুবলিন দু'জনে এক চুমুকে ব্র্যাণ্ডি খেয়ে ফেলল। হাতের চেটো দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে লুবলিন বলল)

লুবলিন। Well Isac. Why are you silent? টুমি টো কুছ বলিটেছো না? টুমি নানাকে intimately জানিটে, বলো না, সে ডেখিটে কেমন ছিল?

ইসাক। (বিনীতভাবে হেসে বলল) হুজুর! বাস্তব আপনাদের কল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে কেন? নানার যে রকম চেহারা আর যেসব গুণের কথা বললেন, সেই হতভাগার কিন্তু এসব কিছুই ছিল না। হুজুর! নানাটা ছিল নেহাতই সাদামাটা লোক। বেঁচে থাকলে এই—তার বয়স এত দিনে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হ'ত। গায়ের রঙ ছিল কালো। কারণ যেসব লোক ইউরোপের বাইরে জন্মেছে, আপনাদের চোখে তারা সবাই কালো। মোটাসোটা চেহারা ছিল নানার। খেত চাপাটি আর ডাল, তাও আবার অনেক সময় স্বহস্তে তৈরি করে নিতে হ'ত তাকে। তার হারেমে অবশ্য অনেক স্ত্রীলোক ছিল হুজুর, কিন্তু সেটা অন্য কারণে। কেননা ঐ স্ত্রীলোকগুলোর অন্যত্র যাওয়ার কোন জায়গা ছিল না। ফরাসী ভাষা তো দূরে থাক, ইংরেজী ভাষাটাও সে জানতো না বললেই হয়। আর নাক-টেপা চশমা-টশমা বলেছিলেন না হুজুর? ওসব নানার কিছু ছিল না। টাইল-ফাইল যা একটু-আধটু ছিল ঐ নানার Assistant আজিমুল্লা খাঁর। তার এক জোড়া চক্চকে কানপয়ালো চশমা ছিল।

(কথা শেষ করে ইসাক দু'জনের দিকে তাকিয়েই মৃদু হাসল। হাসিটার অর্থ যেন—একটু আগে লুবলিন ও জর্জ যা বলেছে তাই ঠিক)

লুবলিন। (টেবিলে থাপ্পড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল) Wonderful! Wonderful! ইসাক—Wonderful. টোমার des-

cription শুনিয়া হামায় ভিল বলিটেছে যে নানা ছিল ঠিক তোমায়ই মট ডেখিটে।

জর্জ। No, no, Lublin! Don't you know, all orientals are liars to the backbone! This Isac "Truth" গোপন করিটেছে। টুমি Indian characterকা কুছ নেই জানে। Just leave this place. উসকা সাথ বাত করিলে আউর বহুট মিঠ্যা কঠা শুনিটে হোবে—

(লুবলিন ও জর্জের প্রস্থান)

(মামুদ কাউণ্টারে বসে ঝিমোচ্ছিল। সে হঠাৎ মুখটা তুলে বলে উঠল)

মামুদ। কি রে সাহেবরা চলে গেল ?

ইসাক। হ্যাঁ, হুজুর।

মামুদ। যাক বাঁচা গেল বাবা! নানা, নানা করে সাহেব-গুলো একেবারে অস্থির। সারাদিন শুধু ওদের জেরার উত্তর দাও। নানা দেখতে কেমন, কি খেত, কোথায় শুতো সে—হারামজাদা নানা নিজে মরেছে, সেই সঙ্গে আমাদের মেরেছে। আমি চললাম বুঝলি ইসাক। রাত দশটা বেজে গেছে। (ক্যাশবাক্সের চাবিটা লাগিয়ে সে উঠে পড়ল) তুই হোটেল বন্ধ করে খেয়ে নিস। আমি যাই, কেমন ? (প্রস্থান)

(ইসাক হলঘরের দুটো জোরালো বাতি নিভিয়ে দিল। ম্লান আলোর ছায়া নেমে এল মঞ্চে। ইসাক হোটেলের বড় দরজাটা বন্ধ করতে যেতেই একজোড়া সাহেব মেম এসে প্রবেশ করল। তাদের দু'জনের পরনেই নিখুঁত ইউরোপীয় পরিচ্ছদ। কিন্তু আগন্তুকদ্বয় ভারতীয়)

সাহেব। কি হে খাবার-টাবার কিছু আছে, না শেষ ?

ইসাক। শেষ হবে কেন হুজুর ? আপনারা মামুদের দিলরুবা হোটেলে এসে ফিরে যাবেন—এই কি কখনও হয়, না হয়েছে ?

(সাহেব ও মেম দু'জন দুটো চেয়ারে বসলেন)

(ইসাক সন্দিগ্ধ চোখে আগন্তুকদের দিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ সাহেবটির চোখে ইসাকের চোখ পড়তেই সে মুখখানা নামিয়ে নিল)

সাহেব। কি, হাবার মত দাঁড়িয়ে রইলে যে ? যাও কি আছে নিয়ে এস।

ইসাক। (বিনীত হেসে) আজ্ঞে, হুজুর আপনি ত কোন অর্ডার দেন নি! অর্ডার পেলেই যাব—বলুন কি আনব।

সাহেব। শিক কাবাব আছে ?

ইসাক। না হুজুর ফুরিয়ে গেছে। চিংড়ির ফ্রাই আর ফাউল কাটলেট আছে। নিয়ে আসব ?

সাহেব। আচ্ছা যাও, দুটো চিংড়ির ফ্রাই নিয়ে এস।

(ইসাকের প্রস্থান)

(সাহেব ভীত-চোখে হলঘরের চারিদিকে তাকিয়ে খুব উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত চাপাগলায় মেমকে বলল)

সাহেব। দেখ, শুনছ ? ও কিন্তু চিনতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে। ও বারে বারে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। তোমারই পরামর্শে শেষে 'দিলরুবা'য় এসে ধরা না পড়ি।

মেম। (চাপাগলায়) চুপ কর ত এখন। পাগল নাকি তুমি ? আমি বলছি ধরতে পারবে না।

(দুটো প্লেটে খাবার নিয়ে ইসাকের প্রবেশ। দু'জনে খেতে আরম্ভ করতেই ইসাক আবার নেপথ্যে চলে গেল)

মেম। দেখলে ত, তোমার সন্দেহ অমূলক। ও আমাদের কাউকেই চিনতে পারে নি।

সাহেব। তাই ত মনে হচ্ছে।

(দু'জনেই খাবারের সদ্ব্যবহার করার পর মেম হেঁকে ডাক দিল)

মেম। এই বেয়ারা, পানি লে-আও।

(দুই হাতে দুটো জলে ভরা গ্লাস নিয়ে ইসাকের প্রবেশ)

সাহেব। এই, তোমার বিল হয়েছে কত ?

ইসাক। দেড় টাকা হুজুর।

সাহেব। (পকেট থেকে মানিব্যাগ খুলে) এই নাও তোমার দেড় টাকা, আর এই আট আনা তোমার বকশিশ।

ইসাক। সেলাম, আজিমুল্লা খাঁ।

(সাহেব মেম দু'জনেই চমকে উঠল। ভয়ের ছায়া পড়ল সাহেবের চোখেমুখে। মেমসাহেব কিন্তু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নির্ভীক ভাবে ইসাককে বলল)

মেম। এই বেয়ারা আউর দু' পেগ ব্র্যাণ্ডি লে-আও।

(ইসাকের প্রস্থান)

(সাহেবের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায়)

আঃ, ওরকম কেন করছ তুমি ? চুপ করে বসে থাক তুমি। খবরদার নার্ভাস হয়ো না। ভয় পেয়েছ কি বিপদে পড়ে যাবে।

(সাহেব কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়ল)

সাহেব। (ভয়ব্যাকুল চাপা গলায়) তোমাকে তখুনি বলে-ছিলাম ও ঠিক চিনে ফেলবে। চল, চল, সরে পড়ি।

মেম। আরে দূর! তুমি কি! ঐ লোকটাকে দিয়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষের সমস্ত জেলে হাজার হাজার বন্দী, ভুয়ো নানা-সাহেবকে সনাক্তকরণের কাজ করাচ্ছে। ও সারাদিন নানাসাহেব আজিমুল্লা খাঁ, তাঁতিয়াটোপী ঐসব নাম ভাবছে। তাই হঠাৎ কি বলতে কি বলে ফেলেছে—দেখ, এর পর হয়ত তোমাকেই নানা-সাহেব বলে সেলাম দিয়ে বসবে। আর এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা যে বলছ—পালিয়ে যাবে কোথায় শুনি ? সারা ভারতেই যে ইংরেজের রাজত্ব।

(ইসাকের প্রবেশ। তার দুই হাতে দুটো গ্লাসে রঙীন ব্র্যাণ্ডি। সাহেব ও মেম মুখ নীচু করে এক চুমুকেই ব্র্যাণ্ডিটুকু নিঃশেষ করে ফেলল। এবার মেমসাহেব তার হাত-ব্যাগ খুলে ব্র্যাণ্ডির দাম চুকিয়ে উপরন্তু ইসাককে আরও কিছু বকশিশ দিয়ে বলল)

মেয়। তোমার কাজে আমি খুব খুশী হয়েছি। তার দরুন এই তোমার বক্‌শিশ।

(মুদ্রাগুলো হাত পেতে নিয়ে ইসাক খুশী-উচ্ছল গলায় বলে উঠল)

ইসাক। সেলাম জুবেদি বিবি।

(ছদ্মবেশী আজিমুল্লা খাঁ এবং জুবেদি বিবির মুখ ভয়ে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তারা থর থর করে কাঁপতে লাগল। ইসাক চারিদিকে তাকিয়ে তাদের কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলল)

ইসাক। আজিমুল্লা খাঁ, জুবেদি বিবি, আপনারা ভয় পাবেন না। সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে এসেছেন আপনারা। এখানে নির্ভয়ে থেকে যান। কেউ আপনাদের চিনতে পারবে না।

জুবেদি। কিন্তু তুমি—তুমি আমাদের চিনলে কি করে?

ইসাক। (তার সেই সর্ব্বজয়ী হাসি হেসে) আমার চোখে ধুলো দেওয়া কি আপনাদের কর্ম্ম বিবিসাহেব? আমি যে নানা-সাহেবের দলের প্রত্যেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

(জুবেদি বিবি ও আজিমুল্লা খাঁ একসঙ্গে ইসাকের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে তীব্র সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করল। তারপর উগ্র কৌতূহলভরা গলায় বলল)

জুবেদি ও আজিমুল্লা (একসঙ্গে) কিন্তু—তুমি—তুমি কে? কে তুমি?

(ইসাক চারিদিকে শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে খুব চাপা বিস্মিত গলায় বলল)

ইসাক। আশ্চর্য্য? আমাকে তোমরা চিনতে পারলে না?

জুবেদি। আরে! নানা—

ইসাক। (তার মুখে আঙুল চাপা দিয়ে) চুপ! হাঁ—আমিই নানাসাহেব।

যবনিকা

(প্রমথনাথ বিশীর একটি গল্প অবলম্বনে।)

বাসন্তিকা

শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাসন্তিকা, বাসন্তিকা! ডাকিছে কবি: বাসন্তিকা!
বসন্তেরি রচেছি গান, শোনো গো রাণী, দীপ্তিশিখা!
তোমারি তরে এনেছি ভরে আমার প্রিয় গানের ডালা,
স্বপ্ন-সখি, দিতে যে চাহি তোমার গলে বরণ-মালা!

সাগরফেনশয্যা'পরে নিদ্রালীনা স্বপ্নময়ী,
তোমারে সখি, ডাকিয়া ফিরি, জাগিয়া ওঠো প্রেয়সী অয়ি!
স্বপনলোকে রহিবে শুধু তন্দ্রা-মায়া নয়নে মাখি'?
তোমারে ডাকি, বাসন্তিকা! আজিকে হেথা আসিবে নাকি?

আমারে তুমি বাসো যে ভালো, স্বপনে তুমি দানিলে চুম,
আমারি চোখে চাহিয়া তব সুনীল-চোখে নামিল ঘুম!
আমারে জানি, ভালো গো বাসো, তোমারে তাই লাগে যে ভালো,
চাহিয়া দেখ, তোমারি রূপে নয়নে জ্বলে প্রেমের আলো!

তোমারে দেখি' পাখীর গানে বাজিয়া উঠে সুরের রেশ,
বসন্ত সে আবেগভরে ধরাতে করে স্বপ্নদেশ!—
কাজল-কালো রাত্রি-অমা রচিয়া দিল নিবিড় কেশ,
প্রকৃতি-রাণী সাজাল তোমা' রচিল তব মোহন বেশ।

সাগর-ঢেউ উচ্ছ সিত নাচিছে তারা তোমারে ঘিরি;—
আবেগ ভরে আগারে গিয়ে তোমারি তরে আসিছে ফিরি'!
আলোর আলো-তুফান আসে, আকাশে নীল-কাঁপন আসে,
তোমারি মৃদু-চলার তালে বাতাসে মধু-সুবাস ভাসে!

তোমারে ঘিরি' বাঁশরী বাজে, সাগর-ঢেউ নাচিয়া উঠে,
তোমারি দেহ কমল হ'তে মুগ্ধ-মধু-সুরভি লুটে!
হাসিয়া তুমি উঠিলে যবে গগনে চাঁদ উঠিল হাসি',
সাগর-জলে লহর এল প্লাবনে তট গেল যে ভাসি'!

কানন-গিরি মুখর করি' মধুর বাঁশি উঠিল বাজি'!—
শুভ্র জরি অঙ্গে পরি' বনের পরী আসিল সাজি'।
হাসিতে তার ফুটিল ফুল, মাণিক-হীরা হাসিতে ঝরে,
কণ্ঠকলকাকলিধ্বনি ঝর্ণাধারে ঝাঁপায়ে পড়ে!

আকাশ-নীল স্বপন-মায়া তোমারি ওই কাজল-চোখে,
নয়নে মোর নামিল ঢুল ভাসিনু বুঝি তন্দ্রালোকে!
মমতাভরা শান্তিভরা প্রেমের সুধা আবেশে মাখি'
সাগর-সম গভীর তব ডাগর দুটি নিবিড় আঁখি!

জড়ায়ে নিলে প্রেমের জালে, পরায়ে দিলে ফুলের মালে,
ছড়ায়ে দিলে স্বপ্নমায়া, ঝরালে রূপ নাচের তালে!
পাগলপারা গাহিয়া উঠি' আবেগভরে কাননে লুটি'
সহসা আসি' সমুখ পানে পুষ্পসম উঠিলে ফুটি'!

আলোয় কাঁপে সবুজ শিখা, তারকাদলে জ্যোতির লিখা!—
অধীর হয়ে চাহিয়া দেখি: মদির-চোখে বাসন্তিকা!
মোহন হেসে পরায়ে দিলে ললাটে মোর প্রেমের টিকা!—
কম্প্রস্বরে উঠিনু ডাকি: বাসন্তী গো, বাসন্তিকা!

বিশ্ব বন-কংগ্রেস

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে দেরাদুন ষ্টেশনে গিয়েছিলাম একটু কাজে। দেখি সব ওলট-পালট। প্রধান ফটক আর তার ওপরের চালা ভেঙে তচনচ। নতুন ঢঙে তৈরি করার পূর্ব্বাভাস! অনেক লোক কাজ করছে। সকলের চোখে মুখে কর্মচাঞ্চল্য পরিস্ফুট। আশপাশে নূতন রঙের ঝলমল দেওয়ালকে করেছে রঞ্জিত।

প্রদর্শনীগৃহের প্রবেশদ্বার

ব্যাপার কি! এ যেন নিত্যপরিচিত রূপসী ভুলে-যাওয়া রূপকে ঘষে মেজে প্রস্তুত হচ্ছে আবার কোন এক নূতনের অভিসারিকা হতে! জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন সদুত্তর পেলাম না। কেননা কাজ করছে ঠিকাদারের লোক। তাদের হাতে পড়েছে কড়ি, তাই তারা মাপছে তেল। 'কেন'র ধার তারা ধারে না।

সন্ধ্যার পর কিন্তু দিল্লীর আকাশবাণী রহস্য উদ্ঘাটন করলেন। পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশটি দেশের অন্যূন চার শত বনবিশেষজ্ঞ মিলিত হবেন দেরাদুনের সুবৃহৎ বন-গবেষণা-মন্দিরে।

বিশাল দুন উপত্যকার চারিদিকে ঘিরে আছে হিমালয়ের চির-উন্নত ত্রিশূল। স্নিগ্ধ-সবুজ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই বিরাট মন্দির—গবেষণার স্থান বটে! রীতিমত অভ্যাস না করে তেমন তেমন দৌড়নেওয়ালাও এ মাথা থেকে ও মাথা এক দৌড়ে পৌঁছতে পারবে না।

প্রশ্ন জাগে—বনে যারা থাকে তারা অভিহিত হয় বন্য বলে। সেই অবস্থা থেকে দূরে সরে থাকাই হচ্ছে সভ্য জগতের প্রাণপণ চেষ্টা। তার জন্য আবার বিশ্বব্যাপী সুধীবৃন্দের একত্র হওয়ার প্রয়োজন কোথায়! বন-জঙ্গল কেটে সাফ করে দিলেই কাজ ফতে হয়ে যায়।

উত্তর খুঁজতে গিয়ে কবির ভাষায় মনে পড়ে 'আয়রে সবুজ আয়রে আমার কাঁচা।' সবুজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আমরা নবীন প্রাণের উৎস। আর গাছপালা লতা-ঘাস-গুল্ম এরাই হ'ল সবুজের জন্মদাতা। এক কথায় মানব-সভ্যতার ধারক ও বাহক বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ঐ যে সারি সারি গাছ দাঁড়িয়ে আছে নদীর ধার ঘেঁষে, ওরা যে শুধু ফল আর ফুল যুগিয়ে মানুষের রসনা আর চোখের তৃপ্তিসাধন করছে তা নয়—নদীর ধারের জমি আঁকড়ে ধরে আপনার ঘরবাড়ী নিরাপদ করে রাখছে বহুলাংশে।

বিরাট এলাকা জুড়ে কেটে ফেলুন গাছপালা, আষাঢ় শ্রাবণ চলে যাবে দু-চার ফোঁটার বেশী জল হ'ল না। শস্য শুকিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে হ'ল অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব। যে সবুজ বনানীর স্নিগ্ধ স্পর্শে মেঘের বুক গলে যায়, মেঘ ঢেলে দেয় নিজেকে উজাড় করে ধরাকে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা করে তুলবার জন্যে—সেই সজল মেঘ যেন সবুজ-বিহনে শুষ্ক হৃদয়ে ফিরে চলে যায় চিরবিরহিণী প্রিয়ার অন্বেষণে।

বনসম্পদের যত শত্রু আছে, মানুষ তাদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান। শুনে অবাক হওয়ার কথা! কিন্তু ভেবে দেখুন, আজও পৃথিবীর অধিকাংশ লোক আগুন জ্বালাতে ব্যবহার করে কাঠ। আপনারা কি ভাবছেন এ কাঠ আসছে কোন্ সুপরিকল্পিত সংস্থার মাধ্যমে! মোটেই নয়। আপনি পয়সা দিয়েই কিনুন কিংবা নিজেই গাছ কেটে কাজ চালান, মোট

কথা যে যার খুশীমত ঠকাঠক কুড়ুল মারছে গাছের উপর আর তা মড়্‌মড়্‌ শব্দে ভেঙে পড়ছে পৃথিবীর বুকে! কতক যাচ্ছে বৈশ্বানরের রেশন হিসাবে, কিছু-বা করাতের মুখে পড়ে আপনার ঘরদোর সুদৃশ্য করবার জন্ত দোকানে অপেক্ষা করছে।

প্রদর্শনীগৃহের প্রাচীরচিত্র

একখানি সবুজ ঘাসের মাঠ—মখমলের মত তকতক্ করছে। রাখাল তার গরু মোষ-ছাগল-ভেড়া ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বসে আশপাশের আবহাওয়া মুখরিত করে তুলছে প্রাণের বাঁশীর সুমধুর সুরে। কিন্তু বেশী দিন নয়। কয়েক বছর পর আর কিন্তু সেখানে তেমন ঘাস হয় না—রাখাল বাজায় না বেণু—বন্ধ্যাভূমি বলে ঘৃণাভরে ত্যাগ করে চলে যায় আবার কোন নতুনের সন্ধানে।

সরকারী পাঁচসালা পরিকল্পনায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচে বাঁধ তৈরি হচ্ছে আপনাকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাবার জন্তে। প্রয়োজনমত সেচের জল সরবরাহ করে আবাদী জমিতে সোনার ফসল ফলানো হবে। কিন্তু তারও শত্রুর অভাব নেই! ঐ সব বাঁধের উচ্চতর ভূমিতে যেখানে বন-গাছে সেগুলি কেটে সাফ হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে—ব্যক্তি লাভ করছে কাঠ আর আবাদী জমি! কিন্তু বৃষ্টির জলে ধুয়ে মাটি নেমে আসছে বাঁধের মুখে। লক্ষ লক্ষ টাকা আর হাজার হাজার লোকের পরিশ্রম এবং জন-স্বার্থ বানচাল হয়ে যায়।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে—আপনি ঘরে বসে উপভোগ করছেন আর আপনার হৃদয় ময়ূরের মত নেচে উঠছে মেঘের

প্রদর্শনীগৃহের আর একটি প্রাচীরচিত্র

আড়ম্বরে; সন্ সন্ করে বাতাস বইছে আর আপনার কবিতার ছন্দ মনে আসছে। এরা কিন্তু আপনার অজান্তে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে জমির উপরের স্তরের মাটিকণা। কিছুদিন পর আপনি অদৃষ্টকে দোষী করছেন আপনার জমিতে ভাল ফসল ফলে না বলে! হবে কি করে! এরা চোরের মত নিয়ে গেছে ফসল জন্মাবার ক্ষমতাযুক্ত মাটির উপরের ভাগ!

ঐ যে শুষ্ক মরুভূমি যার কাহিনী ভয়ঙ্কর—সবপ্রকার নীরসতা যার উপজীব্য—কে জানে এক দিন সে সব স্থান সবুজময় নয়নমনোহর ছিল না—মানুষের নির্বুদ্ধিতায় এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে আগুনঢালা মরুসাগর!

যে মাটির কোলে আমাদের জন্ম, যে মাটিতে মিশে যাবে আমাদের কায়া, তাকে সরস সজীব করে রাখতে সাহায্য করছে গাছপালা-লতাগুল্ম!

কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে, এক দিকে যেমন রয়েছে মানুষের নিত্যকার প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ, অন্য দিকে তেমনি রয়েছে আত্মরক্ষার দাবি, তথা মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রশ্ন। এমনিতে দেখতে গেলে এ দুয়ের গতিপথ
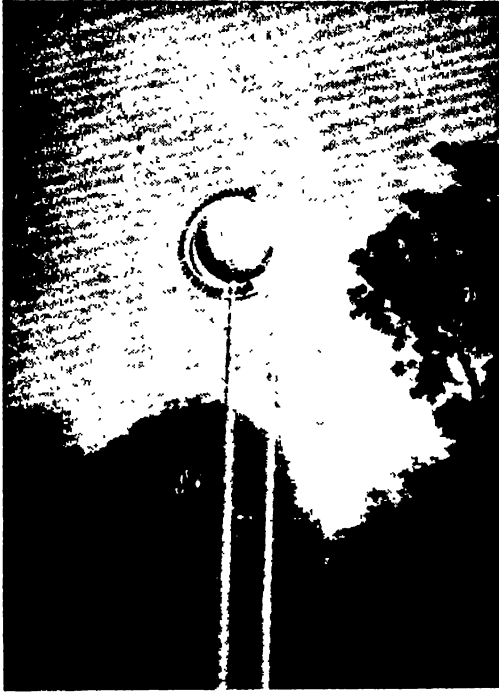
প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণ—মহাশূন্যে অখণ্ড পৃথিবী

বিপরীতমুখো। সমন্বয়সাধন দুরূহ, তবু অত্যন্ত জরুরী। মেটাতে হবে প্রয়োজন—রোধ করতে হবে ভূমিক্ষয়—সম্প্রসারণ করতে হবে সবুজের আস্তরণ।

এ সমস্যা একক ভারতবর্ষের নয়—সমগ্র জগতের। সারা দুনিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষণা-মন্দিরে যেসব তথ্য প্রতি দিন সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, তাদের একক সংস্থার মাধ্যমে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে চাই এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা আর সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা—সর্বোপরি সভ্যসমাজের সহযোগিতা।

প্রতি বৎসর আমরা পালন করে থাকি বনমহোৎসব। এই মহা উৎসবকে নিত্যকার জীবনে অবশ্যকর্তব্য বলে স্বীকার করে নেবার নির্দেশ শুনতে পাই সমগ্র বিশ্বের সুধী-বৃন্দের সম্মেলনের প্রতিদিনকার অধিবেশনে, তাঁদের প্রতিটি লিখিত বাক্যে ও কথিত ভাষণে।

বিশ্ব বন-কংগ্রেস উপলক্ষে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে-ছিলেন কর্তৃপক্ষ, তা এক দিকে যেমন পরিপূর্ণ ছিল বনজ সম্পদের সুচারু কলাশিল্পে, তেমনই যে দুটি সুদৃশ্য গৃহের মধ্যে এগুলি ঠাঁই পেয়েছিল তারও একটা বৃহৎ অংশ নির্মিত হয়েছে এই বনজ সম্পদে। নিয়ন্ত্রিত প্রয়োজনেই মানুষ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—বিজ্ঞানীর এই নির্দেশই ফুটে উঠেছে প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

বন-কংগ্রেসের প্রচেষ্টা সফল হবে বলেই মনে হয়।

নৃত্যশিল্পী

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

মেলায় নাচিতে নামে সাঁওতালী ছেলে আর মেয়ে।

গানের সুরেরা বুঝি প্রাণের আবেগে পথ পেয়ে
রূপের লীলায় নামে?···তন্দ্রাহারা কোনো অন্ধরাতে
নভের সাধনা হতে স্বপ্নশান্ত হাওয়ার দোলাতে
নামে বুঝি তারকারা ঝুরি-ঝুরি উড়ি-উড়ি রূপে?
পূজোৎসবে কোনো প্রান্তে মন্দিরের বহ্নিমুখী ধূপে
তির্যক ধূম্রের নৃত্যে নামে বুঝি গন্ধের আকাশ?

ওরা আছে, ওরা নাচে। পৃথিবীতে আজও মধুমাস
তাই আসে। স্বপ্নে হাসে সপ্তকের মায়া। গানে গানে
চঞ্চলের জয় বাজে চলমান মৃত্যুর সন্ধানে।

যৌবন-অরণ্যে, কবি, গান-গাওয়া হীরামন পাখী
সুরের সোহাগে স্নেহে চেতনার তারে যায় রাখি'
স্বর্গের রাগিণী রমণীয়া, পাছে তারে যাই ভুলে—
রাত্রির মেলায় নামে সুর্যের সোনারা ঢেউ তুলে'!

ইতুপূজা ও তুষুপূজা

শ্রীসুখময় সরকার

হিন্দুর জীবন উৎসবময় ছিল। নানাবিধ পূজা-পার্বণ তাহার সাক্ষী। দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব ছাড়িয়া দিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূজা-পার্বণ হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন স্তরে কত যে ছড়াইয়া আছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। 'বার মাসে তের পার্বণ' একটা কথার কথা। তেরোর পৃষ্ঠে স্বচ্ছন্দে শূন্য বসাইতে পারা যায়। কতকগুলি পার্বণ একান্ত ভাবে আঞ্চলিক; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও আনন্দরসের অভাব নাই। এখানে বাঁকুড়ায় প্রচলিত ইতুপূজা ও তুষু-পূজা আলোচনা করিয়া পাঠকগণের নিকট আনন্দরস পরিবেশনের চেষ্টা করিতেছি।

১

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে বাঁকুড়া জেলার নারীগণ ইতুপূজা করে। অন্যত্রও নিশ্চয় ইতুপূজা আছে; কিন্তু কি আকারে আছে, আমার জানা নাই। কেবল বাঁকুড়া জেলার ইতুপূজা ধরিয়া একটা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমি পণ্ডিত নহি; যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহাদের সমীপে একটা চিন্তাকণা উপস্থিত করিতেছি মাত্র। এই সূত্র অবলম্বনে তাঁহারা হয়ত গভীরতর গবেষণা করিতে পারিবেন।

সৌর অগ্রহায়ণের প্রথম দিবসে অতি প্রত্যুষে বালিকারা দল বাঁধিয়া 'ইতুর সাজ' সংগ্রহ করিতে বাহির হয়। আর্দ্র ভূমিতে নানাবিধ উদ্ভিদ জন্মে, সে সবই ইতুর সাজ। ইহাদের আকৃতি অনুসারে নামকরণ হয়; যথা—কাজল-লতা, লবঙ্গলতা, বেলকলি, শিবজটা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া মানকচু, হরিদ্রা, ধান্য, গুগ্গা, সরিষা ইত্যাদির গাছ একটি মাটির শরাবে পাঁক রাখিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়। এই উদ্ভিদ-সমন্বিত শরাবেই ইতুর অধিষ্ঠান। সকল গৃহে ইতুপূজা হয় না। পাড়ার মধ্যে দুই-একটি গৃহে ইতু 'পাতা' হয়, সেখানে অনেকে আসিয়া পূজা করে। প্রতি রবিবারে পুরোহিত আসিয়া পূজা করেন। স্মৃতির বিধানানুসারে তিনি মিত্রদেবের পূজা করেন। নারীরা তাহা জানে না; মনে করে ইতু লক্ষ্মী। পুরোহিতের পূজা শেষ হইলে তাহারা একটা ছড়া বলিয়া ইতুর শরাবে জল ঢালে। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিদিনে প্রত্যুষে নদীতে কিংবা অপর জলাশয়ে ইতু বিসর্জন করা হয়।

এ অঞ্চলে 'ইতুর কথা' প্রচলিত আছে। কথাটি সংক্ষেপে এইরূপ:

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের রুকনা ও ঝুকনা নামে দুই কন্যা ছিল। একটা অতি তুচ্ছ অপরাধে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে বনবাস দিয়াছিল। বন্যজন্তুর ভয়ে তাহারা এক বটবৃক্ষের কোটরে আশ্রয় লইল। কিছুক্ষণ পরে সেই বটবৃক্ষের তলায় কয়েকটি অপ্সরা আসিয়া ইতুপূজা করিতে লাগিল। রুকনা-ঝুকনা তাহাদিগকে অনুনয় করিয়া ইতুপূজার ফল জিজ্ঞাসা করিলে অপ্সরারা বলিল, "ইতুপূজা করিলে ধনলাভ হয়, দেহ নীরোগ হয়।" কন্যা দুইটি তাহাদের নিকট ইতুপূজা শিক্ষা করিয়া বনমধ্যে যথাবিধি ইতুর পূজা করিল। তাহাদের দরিদ্র পিতা ধনবান হইল এবং পুত্রলাভ করিল। ঘটনা-ক্রমে কন্যারা পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। রুকনা বিবাহের পর অহঙ্কারবশতঃ ইতুপূজা পরিত্যাগ করায় সে সমস্ত ধন-সম্পদ হারাইল। কিন্তু ঝুকনা বিবাহের পরেও ইতুপূজা ছাড়ে নাই। সে ধনজন লইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। অবশেষে নিঃস্বা ভগিনীকে আশ্রয় দিয়া তাহাকে পুনরায় ইতুপূজার উপদেশ করিল। রুকনা পুনরায় ইতু-পূজা করিয়া ধনজন ফিরিয়া পাইল। ব্রাহ্মণও ধনী হইয়া মদগর্বে ইতুপূজা পরিত্যাগ করিয়া সর্বস্ব হারাইল। পরে কন্যার উপদেশে পুনরায় ইতুপূজা করিয়া সর্বস্ব ফিরিয়া পাইল। ঝুকনা ইতুর কৃপায় ইহকালের সকল সুখ ভোগ করিয়া পরিণত বয়সে স্বামীপুত্র রাখিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল।

ইতু ধনের দেবতা; এই হেতু নারীরা মনে করে, ইতু লক্ষ্মী। লক্ষ্মী ব্যতীত কে ধন দিতে পারেন? বীরভূমের পশ্চিমাংশে নারীরা 'ইতুপূজা' না বলিয়া 'ইউতি-ব্রত' বলে এবং মনে করে, আয়ুর নিমিত্ত 'ইউতি-মাতা'র পূজা করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইতু শব্দই অপিনিহিত হইয়া সেখানে ইউত ইউতি রূপ ধারণ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইতু সূর্য। ইতুপূজা সূর্যপূজা। বিহার প্রদেশে কোন কোন অঞ্চলে কার্তিক মাসে ষষ্ঠপঞ্চমীর দিন মহাসমারোহে 'ছটপূজা' হয়। ইহাও সূর্যপূজা। কিন্তু সে সব অঞ্চলের নারীরাও ভ্রমবশতঃ 'ছটমাতা' বলে।

পঞ্জিকায় ইতুপূজার পরিবর্তে 'মিত্রপূজা' লিখিত আছে। পঞ্জিকাকার মনে করিয়াছেন, মিত্র শব্দের অপভ্রংশ 'মিতু', তাহা হইতে 'ইতু' শব্দ আসিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই। মিত্র শব্দ হইতে ইতু শব্দ সহজে আসিতে পারে না; ইহা কষ্টকল্পনা। আদিত্য শব্দ হইতে ইতু শব্দ সহজে আসিতে পারে: আদিত্য>

আইত্ত>ইত্ত>ইতু। এখানে আদ্য স্বরধ্বনি গ্রস্ত হইয়াছে। বাংলায় এমন শব্দ আরও আছে। যথা: অলাবু>লাউ; উডুম্বর>ডুমুর।] হিন্দী এতোআর (ইতওআর)=আদিত্য বার=রবিবার। বাংলা রামায়ণে:

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

এখানেও রবিবারের পরিবর্তে আদিত্যবার লিখিত হইয়াছে। আদিত্য সূর্য। বাস্তবিক ইতুপূজা সূর্যপূজা। রবিবারে পূজা হয়, ইহাও তাহার এক প্রমাণ।

মিত্রও সূর্য। কিন্তু ইতুপূজা মিত্রপূজা নহে। আদিত্য সূর্য হইলেও আদিত্য শব্দের একটা বিশেষ অর্থ আছে। সূর্য অয়ন-পরিবর্তন দ্বারা শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু বিধান করিতেছেন। সূর্যের যে শক্তি ঋতু বিধান করেন, তিনিই আদিত্য। পুরাণে দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ আদিত্য প্রসিদ্ধ হইলেও বৈদিক যুগে ঋতুভেদে আদিত্য কল্পনা হইয়াছিল। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ঋগ্‌বেদ হইতে সপ্রমাণ করিয়াছেন, মিত্র বরুণ ভগ পুষা সবিতা ও অর্যমা, এই ছয় আদিত্য যথাক্রমে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত ঋতুর অধিপতি কল্পিত হইয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে গ্রীষ্ম ঋতু হইতে পারে না; হইলেও তাহা বহু পূর্বকালে হইয়াছিল। সেকালে আর্য-সভ্যতার উদ্ভব হয় নাই, অতএব সেকালের কোনও স্মৃতি নাই। সুতরাং পঞ্জিকাকারের প্রদত্ত 'মিত্র-পূজা' এই নাম অসঙ্গত। পঞ্জিকায় স্মৃতি অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু স্মৃতি ও শ্রুতির বিরোধে শ্রুতিকেই গরীয়সী ধরিতে হয়। সুতরাং মিত্রপূজা না লিখিয়া বরং আদিত্য-পূজা লেখাই সঙ্গত মনে হয়। পঞ্জিকাকারগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

অবশ্য, ঋতু চিরকাল একস্থানে থাকে না। অয়ন-চলন হেতু প্রতি দুই সহস্র বৎসরে ঋতু এক মাস পশ্চাদ্‌গত হয়। এক্ষণে অগ্রহায়ণ মাস হেমন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাস। কিন্তু বহু শত বৎসর পূর্বে এমন ছিল না; আবার বহু শত বৎসর পরে এমন থাকিবে না। যেকালে ইতুপূজার প্রবর্তন হইয়াছিল, সেকালে অগ্রহায়ণ মাসে নিশ্চয় অন্য ঋতু ছিল। সে কোন্ ঋতু, এখানে তাহার একটা সম্ভাব্য উত্তর মিলিবে।

নারীগণ যে ছড়া বলিয়া ইতুর শরাবে জল ঢালে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি:

ইতু ইতু ব্রাহ্মণ।
তুমি ইতু নারায়ণ।
তোমার শিরে ঢালি জল।
অন্তিম কালে দিও স্থল।
সুষণী-কলমী ঢল ঢল করে।
রাজার বেটা বক্ষি গাড়ে।
গাড়ুক বক্ষি উড়ুক চিল।
সোনার কৌঠা রূপার খিল।

ছড়া হইতে পাইতেছি, ইতু ব্রাহ্মণ এবং নারায়ণ। ব্রাহ্মণ শব্দ শ্রেষ্ঠত্ব ও পূজার্হত্ব জ্ঞাপক। নারায়ণ বিষ্ণু। ঋগ্‌বেদে সূর্যই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, অথবা সূর্যই বিষ্ণু। যে শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুর পূজা হয়, তাহা সূর্যেরই প্রতীক। ব্রতিনীগণ তাঁহার শিরে বারি সেচন করিয়া অন্তিমে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে।

ছড়ায় কোন্ ঋতুর বর্ণনা? বর্ষা অতিক্রান্ত হইয়াছে, শরৎ ঋতুতে স্বচ্ছ জলাশয়ে সুষণী, কলমী প্রভৃতি জলজ শাক ঢলঢল করিতেছে। আদিত্যদেবের পূজা করিয়া রাজপুত্র শরৎকালে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন; তিনি শত্রুর বক্ষে বর্শা বিদ্ধ করিয়াছেন। নিহত শত্রুর মাংস ভক্ষণের জন্য চিল-শকুনি উড়িতেছে। রাজপুত্র অবশ্যই যুদ্ধে জয়ী হইবেন; রৌপ্যের অর্গল ও স্বর্ণের প্রকোষ্ঠযুক্ত অট্টালিকা অধিকার করিবেন।

ছড়ায় যে শরৎ ঋতুর বর্ণনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ তর্ক তুলিতে পারেন হেমন্তকালেও ত 'সুষণী কলমী ঢলঢল' করিতে পারে এবং 'রাজার বেটা বক্ষি গাড়িতে' পারে। কিন্তু আর একটা ব্যাপার হইতে মনে হইতেছে, ইতুপূজা শরৎ ঋতুরই উৎসব। অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে ইতুপূজা সমাপ্ত হয়, সেদিন 'আশকে' পিঠার ভোগ নিবেদন করিতে হয়। 'আশুকিয়া' শব্দ হইতে 'আশকে' শব্দ আসিয়াছে। আশকে পিঠা, আশু ধান্যের পিঠা। আশুধান্য শরতের শস্য, হেমন্তের নহে। অতএব অগ্রহায়ণ মাসে যে আদিত্যের পূজা হইত, তিনি শরৎ ঋতুর আদিত্য। তাঁহার বৈদিক নাম "ভগ"। ভগ শব্দের অর্থ 'ধন', 'ঐশ্বর্য'। বস্তুতঃ শরৎকালে প্রচুর শস্যরূপ ধন উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়; অতএব আদিত্যের 'ভগ' নাম সঙ্গত বটে।

ইতুর কথা কন্দশ্রুতি, ইতুপূজা করিলে ধনলাভ হয়। সূর্যপূজা করিলেও ধনলাভ হয়, ইহা বহুকালের বিশ্বাস। বেদে সূর্যের এক নাম হিরণ্যপাণি। আদৌ শব্দটার অর্থ ছিল 'স্বর্ণরশ্মি'। পরে অর্থ হইল, যাঁহার পাণিতে (হস্তে) হিরণ্য (স্বর্ণ) আছে। অতএব সূর্যদেব তাঁহার উপাসককে ধন দান করেন। ইতুপূজা করিলে দেহ নীরোগ হয়। সূর্যপূজা করিলেও দেহ নীরোগ হয়; বিশেষতঃ তিনি কুষ্ঠ রোগ নিরাময় করেন, এই বিশ্বাস অতি পুরাতন। বিহারে যাহারা ছটপূজা করে, তাহারাও বলে, রোগমুক্তির জন্য ছট পূজা করা হয়।

কতকাল হইতে ইতুপূজা প্রচলিত আছে? উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব করিতে পারা যায়। হায়ণ শব্দের অর্থ বৎসর। অগ্রহায়ণ= হায়ণের (বৎসরের) অগ্র (প্রথম) মাস। প্রাচীনকালে অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের প্রথম মাস গণ্য হইত। বৎসরের প্রথম মাস; অতএব শরৎ ঋতুরও প্রথম মাস হওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমান কালে ভাদ্র মাসে শরৎ ঋতু আরম্ভ হয়। যেকালে অগ্রহায়ণ মাসে শরৎ ঋতু আরম্ভ হইত, সেকাল হইতে ঋতু তিন মাস পশ্চাদ্‌গত হইয়াছে। ঋতু এক মাস পিছাইয়া আসিতে দুই সহস্র বৎসর লাগে। অতএব অদ্যাবধি প্রায় ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসে আদিত্যপূজার প্রবর্তন হইয়াছিল। ইতুপূজায় অন্ততঃ ছয় সহস্র বৎসরের পুরাতন স্মৃতি রক্ষিত আছে।

পণ্ডিতদের মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা ভারতে সূর্যপূজার প্রবর্তক। সে ব্রাহ্মণেরা অল্পকাল পূর্বে ভারতে আসেন নাই। ভগবান বুদ্ধ শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; নিশ্চয় তাঁহার পূর্বপুরুষগণ শাকদ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন। সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণও নিশ্চয় সূর্যোপাসক ছিলেন। সে কত কালের কথা কে বলিবে? হিন্দুর পূজা-পার্বণের অন্তরালে যে কত কালের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

২

পৌষ মাস পড়িতে না পড়িতে বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় বালা-কণ্ঠে তুষুর গান শুনিতে পাওয়া যায়। গানের একটা বিশেষ রকমের একটানা সুর আছে, অনেকটা রামপ্রসাদী সুরের মত। শুনিতে বেশ লাগে। পূর্বে ইতর-ভদ্র সকল বাটীতেই কন্যারা তুষুপূজা করিত; এক্ষণে ক্রমশঃ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে ভদ্রকন্যারা তুষুপূজা ভুলিয়া যাইবে। অবশ্য এখনও দেখিতে পাই, অনেক গ্রামে বর্ষীয়সী নারীরাও তুষুপূজা করে।

তুষুপূজা কিরূপে হয়, বাঁকুড়াবাসীর নিকট তাহা অজ্ঞাত নহে। কিন্তু বাংলাদেশে অন্যান্য জেলার অধিবাসিগণ বোধ হয় এ সম্বন্ধে অল্পই জানেন। গত বৎসর (১৩৬০) মানভূমে 'তুষু সত্যাগ্রহ' হইবার পর অনেকেই তুষু সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়াছিলেন। মানভূমের লোকে আবার 'টুসু' বলে, কিন্তু সেটা উচ্চারণের দোষ। সংবাদ-পত্রেও ভ্রমবশতঃ 'টুসু' ছাপা হইয়া গিয়াছে।

দগ্ধ মৃত্তিকার শরাবের উপর চতুর্দিকে মৃৎপ্রদীপ সজ্জিত থাকে। শরাবের গর্ভে ধান্যের তুষ দেওয়া হয়; তদুপরি নানাবিধ পুষ্পের মাল্য, কড়ি ও গুঞ্জার হার দিয়া শরাব সজ্জিত হয়। পূজার সময় প্রদীপগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হয়। শরাবের গর্ভে তুষ দেওয়া হয় বলিয়াই বোধ হয় তুষু নাম হইয়াছে। তুষলা (তুষযুক্তা) এবং তাহা হইতে তোষলা নামও প্রচলিত আছে। তুষু নামের উৎপত্তির অন্য কারণও থাকিতে পারে। তুষুপূজা হয় পৌষ মাসে। বৈদিক গ্রন্থে পৌষ মাসের নাম তৈষ।

তৈষ শব্দের সহিত তুষু শব্দের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে কিনা, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। তুষু-পূজার মন্ত্র নাই, গানের দ্বারাই পূজা হয়। ইদানীং তুষুর গানে ভাদুর গান* ঢুকিয়া গিয়াছে, কিন্তু অল্পদিন পূর্বেও এমন ছিল না। কেহ কেহ শরাবের পরিবর্তে প্রতিমায় পূজা করিতেছে, ইহাও নূতন। তুষু যেন এক আদরিণী কন্যা, কিছুকাল পিত্রালয়ে বাস করিতে আসিয়াছে। পূজারিণীদের গানে বাৎসল্য-রস সম্পৃক্ত একটি সুন্দর ভাব ব্যক্ত হয়। ভাবটি বাংলার নিজস্ব।

অবশ্য, মানভূমেই তুষুপূজার প্রচলন অধিক এবং কেহ কেহ বলেন, মানভূম হইতেই ইহা বাঁকুড়ার এদিকে আসিয়াছে। কিন্তু মানভূম সকল দিক হইতেই বাংলার অংশ। ভাব-ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সকল বিষয়েই মানভূমের সহিত পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলার সাদৃশ্য আছে। কেহ যদি জোর করিয়া মানভূমকে বঙ্গবাহ্য বলে, সে কথা স্বতন্ত্র। গত বৎসর পুরুলিয়ার রাজপথে কয়েক জন তুষুর গান গাহিয়া যাইতেছিল, বিহার-সরকার রুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু রোষের কারণটা কি? বোধ হয় তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, মানভূমবাসী তুষুর গান গাহিলে তাহারা যে ভাষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙালী তাহা প্রমাণিত হইয়া যাইবে। যাক সে কথা। আমরা কিন্তু মানভূমকে তুষুপূজার উৎপত্তিস্থান মনে করি না। বাঁকুড়াতেই ইহার উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। এখানে একটা প্রমাণ দিতেছি।

পৌষ-সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে তুষুর জাগরণ হয়। পূজারিণীগণ সন্ধ্যায় তুষুর নিকটে পুলি-পিঠের ভোগ নিবেদন করে।

---

* কিংবদন্তী, পঞ্চকোটের এক রাজা তাঁহার একমাত্র কন্যা ভদ্রার মৃত্যুতে শোকার্ত হইয়া তাহার মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করেন এবং প্রজাদিগকে অনুরূপ মূর্তি নির্মাণ করিয়া ভাদ্র মাসে তাহার পূজা করিতে আদেশ করেন। তদবধি মানভূমে ও বাঁকুড়ায় ভাদুপূজা চলিয়া আসিতেছে। ভাদুপূজাও গানের সাহায্যেই হইয়া থাকে। পূর্বে ভাদু-প্রতিমায় সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব থাকিত; এক অপরূপ লাবণ্যময়ী নারীমূর্তি, করে লীলাকমল। এক্ষণে উগ্র বিলাতী মেম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভদ্রঘরে এখন আর ভাদুপূজা বড় একটা দেখা যায় না।

বাঁকুড়ায় এই পিঠার নাম ছ'বড়ি পিঠা কিংবা গড়গড়ে পিঠা। সারারাত্রি জাগরণ ও গান চলিতে থাকে। সংক্রান্তির দিন প্রত্যুষে তুষু-বিসর্জন হয়। পূজারিণীগণ তুষু সাজাইয়া, শোভা-যাত্রা করিয়া শোকের গান গাহিতে গাহিতে নিকটবর্তী জলাশয়ে (সাধারণতঃ নদীতে) গমন করে। রাণীবাঁধ থানার পড়কুস গ্রামে কাঁসাই নদীতে তুষু-বিসর্জন একটা দর্শনীয় ব্যাপার। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে অগণিত তুষু বিসর্জনার্থে আনীত হয়। বহু সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। একটা ছোট কাঠের ভেলায় কিংবা তে-কাঠায় তুষুকে বসাইয়া প্রদীপগুলি জ্বালিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। বিসর্জনের প্রাক্কালে যে ছড়া বলে, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

> তোষলা, তোষ-তোষলা, তোষলা গো রাই।
> তোমার দৌলতে আমরা ছ'বড়ি পিঠা খাই।
> ছ'বড়ী ন'বড়ী গাং সিনানে যাই,
> গাঙের জলে রাঁধি বাড়ি মগরায় জল খাই।
> চার মাস বর্ষা পোখন্না যাই।
> পোখন্নায় দেখে এলাম দুয়ারে মরাই। ইত্যাদি।

তুষু কে? এই ছড়ায় তাঁহার পরিচয় আছে। পূজারিণীদের নিকটে তিনি রাই (রাধিকা)। রাধিকা লক্ষ্মী। তুষুও লক্ষ্মী অথবা লক্ষ্মীস্বরূপা। যাঁহার দৌলতে ছ'বড়ি পিঠা খাইতে পাওয়া যায়, তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীরূপা। ছ'বড়ি—ছয় বুড়ি=১২০টা। বোধ হয় বহুসংখ্যক বুঝাইতে 'ছয় বুড়ি' বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলি পিঠা বা গড়গড়ে পিঠা লোকে একসঙ্গে বহুসংখ্যক খাইয়া থাকে। ছয় বুড়ী (বৃদ্ধা) কিংবা নয় বুড়ী (ন'বড়ী) মিলিত হইয়া গাঙে স্নান করিতে যাইতেছে। পুণ্যার্থিনী বৃদ্ধারা দল বাঁধিয়া পুণ্য জলস্রোতে মকর-সংক্রান্তিতে স্নান করিতে যাইত, সেই কথাই এখানে বলা হইতেছে। গাং শব্দ গঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ হইলেও বাংলায় ইহা সামান্য নদীবাচক। বোধ হয় এই গাং দামোদর। পুণ্য-স্নানার্থিনীগণ যাত্রাপথে দামোদরের জলে রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইত, পরে মগরায় যাইত। মকর শব্দের অপভ্রংশে মগরা। হুগলী জেলায় ত্রিবেণীর নাম মগরা। এখানে লোকে মকর-সংক্রান্তিতে পুণ্যস্নান করিত, এখনও করে।

ছড়ায় চারি মাসব্যাপী বর্ষাকালে পোখন্না যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ষা চারি মাস, ইহা প্রসিদ্ধ ছিল। রামায়ণে বর্ষা চারি মাস। চারি মাসব্যাপী বর্ষায় চাতুর্মাস্য ব্রতের প্রচলন ছিল। বাঁকুড়াতেও বোধ হয় এককালে চারি মাস বর্ষা হইত, জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি হইতে ভাদ্র পর্যন্ত। পোখন্না গ্রাম অদ্যাপি আছে, সোনামুখী থানায় দামোদর নদের কূলে। পোখন্নায় কেহ বর্ষাকালটা আরামে কাটাইতে যাইত; সেখানকার লোকের দুয়ারে বড় বড় মরাই (ধানের গোলা) দেখিয়া আসিত। ছড়ায় পোখন্নার সমৃদ্ধি সূচিত হইতেছে। এখনও সেখানে কিংবদন্তী আছে, এককালে পোখন্নায় রাজধানী ছিল। এ পর্যন্ত সেখানে যে অল্প-স্বল্প পুরাকৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, সত্যই পোখন্নায় রাজধানী ছিল। কোন্ রাজার রাজধানী?

বাঁকুড়া নগর হইতে বায়ুকোণে ছয়-সাত ক্রোশ দূরে শয়ান শিশুনাগের (হস্তি-শাবকের) আকৃতিবিশিষ্ট নীলবর্ণ শুশুনিয়া পাহাড় দেখা যাইতেছে। উহার ঈশান কোণে পাষাণগাত্রে একটি অপরূপ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। সমীকৃত শিলার উপর খোদিত একটি চক্র, চক্রের নাভিতে একটি অগ্নিশিখা। চক্রের ব্যাস প্রায় এক হাত। কয়টি অর, গণিতে পারি নাই। নেমি চিত্রিত। নিকটবর্তী গ্রামের সাঁওতালেরা ইহাকে চাঁদো-বঙ্গা (চন্দ্রদেব) বলে। চক্রের নিম্নে অতি প্রাচীন অক্ষরে লিখিত আছে :

> চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতি সৃষ্টঃ
> পুষ্করণাধিপতের্মহারাজ শ্রীসিংহবর্মণঃ পুত্রস্য
> মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ।

লিপিবিৎ পণ্ডিতগণ এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া অনুমান করেন, ইহা চতুর্থ খ্রীষ্ট-শতাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে পুষ্করাধিপতি মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার নাম পাইতেছি। 'পুষ্করনগর' শব্দ হইতে 'পুষ্করণা' হইতে পারে। নগর শব্দের সংক্ষেপে 'না', বাঁকুড়া-বর্ধমানে বহু প্রচলিত। যথা : ছত্রিনগর—ছাতনা, কালীনগর—কালনা, বিক্রম-নগর—বিকনা, রায়নগর—রায়না ইত্যাদি। পুষ্করণা হইতে 'পুখরনা'—পোখরনা এবং তাহা হইতে প্রাকৃতজনের মুখে 'পোখন্না' হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পোখন্নায় মহারাজ সিংহ-বর্মার এবং তৎপুত্র চন্দ্রবর্মার রাজধানী থাকা অসম্ভব নহে।

ভারত-ইতিহাসে এক চন্দ্রবর্মার নাম আছে; সমুদ্র-গুপ্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। তিনিও পুষ্করের অধিপতি ছিলেন। সে পুষ্কর রাজপুতানায় না বাঁকুড়ায়, আমাদের এই চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা, সে সব তর্কের মীমাংসা ঐতিহাসিকগণ করিবেন। কিন্তু শিলালিপিতে এবং তুষুর ছড়ায় পোখন্নার উল্লেখ হেতু অনুমান হয়, বাঁকুড়াতেই তুষুপূজার উৎপত্তি এবং যে সময় সিংহবর্মা-চন্দ্র-বর্মা পোখন্নায় রাজধানী করিয়াছিলেন সেই সময় হইতে তুষু-পূজা চলিয়া আসিতেছে। সে ষোল শত বৎসর পূর্বের কথা। উৎসবটি বাঁকুড়া হইতে মানভূমে গিয়া প্রসারলাভ করিতে করিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; অপরপক্ষে বাঁকুড়া কলিকাতার সংস্কৃতি গ্রহণ ও স্ব-সংস্কৃতি বর্জন করিতে করিতে উহা ভুলিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব ও আচারের মধ্যে কত কালের কত কথা লুকাইয়া আছে, ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

তাস

শ্রীতারাপদ রাহা

তাস, দাবা, পাশা,
এ তিন সর্ব্বনাশা।

ছেলেবেলায় বুড়ো এবং বড়দের মুখে এ কথা যে কতবার শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই, অথচ তাঁদের আবার দেখেছি গ্রীষ্মের দিনে আমগাছ বা বটগাছের নীচে, চণ্ডীমণ্ডপে, গোলোক ঘোষের দোকানঘরে ঐ নিয়েই মেতে উঠতে। দিবানিদ্রাহীন দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা ত হ'তই, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর দুপুর রাত্রি পর্যান্ত খেলা চলত।

বুড়োদের দেখে দেখে যথাসময়ে আমরাও শিখে নিলাম এ খেলা, বিশেষ করে তাস, বিন্তী, টোয়েন্টি নাইন আর ব্রিজ।

বয়স তখন আমাদের পনর ষোল সতের। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা সাধারণতঃ একটু বেশী বয়সেই ম্যাট্রিক দেয়। গ্রামের সন্তোষ অধিকারী বিদেশেই থাকতেন, তাঁর বৈঠকখানা ঘরটিতেই ছিল আমাদের তাসের আড্ডা। ছুটির দিনে ত কথাই নাই, মর্নিং স্কুলের সময় দুপুরেও আমরা এখানে এসে ভিড় জমাতাম। সন্ধ্যায়ও অনেক দিন অন্ত বাড়ী পড়তে যাচ্ছি বলে এখানে এসে খেলায় মেতে উঠতাম।

সুকুমার ছিল আমাদের মধ্যে বিশেষ ভাল ছেলে। ক্লাসে সে বরাবর ফার্ষ্ট হ'ত, সেও শেষে আমাদের তাসের আড্ডায় এসে জমে গেল।

বেশ লাগত। মনে হ'ত বাপ-মা যদি চিরকাল বেঁচে থেকে অন্নবস্ত্র যোগান, জীবনটা তা হলে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়—এই তাস খেলে। বস্তুতঃ গুরুজনের দুর্ব্বাক্য, পরীক্ষায় ফেল, প্রিয়জনের বিয়োগ—সবকিছুই ভুলে থাকতাম আমরা এই খেলায়।

কিন্তু যত গোল বাধায় ঐ সুকুমার। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় সুকুমার সেবার হঠাৎ কম নম্বর পেয়ে সেকেণ্ড হয়ে গেল। তার বাবা আবাইপুরের হাটে গিয়ে হেডমাষ্টারের মুখে খবরটা শুনে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে বাড়ী ফিরলেন। রবিবারের সন্ধ্যায় সুকুমার আমাদের আড্ডাঘরে সর্ব্বশোকাপহারী তাসক্রীড়ায় তার পরাজয়ের দুঃখ ভুলে ছিল, এমন সময় সেই ঘরে ঢুকলেন সুকুমারের বাবা শ্রীযুত সোমনাথ রায়। সুকুমারের বাপের সেই রক্তচক্ষু উগ্র মূর্ত্তি যেন আজও স্পষ্ট দেখতে পাই। তাঁকে ঐ ভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে আমরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। একটি বাক্যব্যয়ও না করে বাঁ হাতে সুকুমারের চুলের মুঠি ধরে, ডান হাতে তার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করতে করতে সেখান থেকে নিয়ে গেলেন। সুকুমারের বয়স তখন ষোল-সতের বৎসর। সে একটিও উচ্চবাচ্য করলে না।

সোমনাথ রায় আমাদের অভিভাবকের কানে তুলে আমাদের খেলাও অবশ্য কিছুদিনের জন্ম বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু সে কিছুদিনই, পরে অভিভাবকের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে আমরা তাস পাশা দুই-ই খেলেছি, কিন্তু নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে সন্তোষ অধিকারীর বৈঠকখানা ঘরে আর নয়।

বাপের শাসনের জন্তই হউক, বা নিজের স্বভাবগুণেই হউক, এর পর থেকে সুকুমারের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সর্ব্বনাশা তাস দাবা পাশার কাছে সে আর ঘেঁষে নি। বেশ মনোযোগ দিয়েই সে এর পর পড়াশুনা করেছে। ফলে সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে দশ টাকার ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেলে।

ভাল ছেলে বলে তার কিন্তু বিন্দুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। আমাদের সঙ্গে অন্তান্ত ব্যাপারে সে আগেকার মতই মিশেছে। হৃদয় তার আমাদের প্রতি আকৃষ্ট, সে আমাদের সুহৃদ। তা ছাড়া চিরকালই সে নিরীহ, কোমলস্বভাব, নির্ব্বিবাদী; এর উপর, সে আবার ধর্মভীরু।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর আমরা বিভিন্ন স্থানে পড়তে গিয়েছি, দেখাশুনা কম হয়েছে। কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করে ত দেখাশুনা এক রকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। কচিৎ কোন সময়ে যখন দেশে যেতাম, সুকুমারের খবর নিতাম। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় পাস করে শিক্ষকব্রত বেছে নিয়েছে। সুকুমারের বাপ-মা দু'জনই মারা গিয়েছেন, সুতরাং দেশে সে আর বড় আসত না, ঘটনাচক্রেও সুকুমারের সঙ্গে দেখা আমার হ'ত না; আমিও দেশ থেকে বেরুলেই আর দশ জন বন্ধুর মত তার কথাও ভুলে যেতাম।

সুকুমারের মত অত লেখাপড়া আমি শিখি নি, তবে শ্বশুরের কৃপায় সরকারী চাকরি একটা জুটেছিল, তেমন উঁচুদরের নয়, তবে সরকারী। এই চাকরি নিয়ে পঁচিশ বছর পশ্চিমে কাটাবার পর হঠাৎ কলকাতায় বদলি হলাম। সাতটি পুত্রকন্তাসহ স্ত্রীকে পশ্চিমে শ্বশুরের বাসায় রেখে আমি দক্ষিণ কলকাতায় একটি মেসে সাময়িক আস্তানা গাড়লাম। সুবিধামত বাসা পেলেই ওদের নিয়ে আসব।

কলকাতা দেশের মাটি হলেও আমি যেন এখানে প্রবাসী। স্ত্রীপুত্রকন্তা কাছে নেই, পরিচিত বন্ধুবান্ধব ত নেই-ই, দেশের ছেলেবেলায় বন্ধুদের কেউ কেউ যদিও কলকাতায় আছে, তাদের ঠিকানা আবার আমার জানা নেই, সুতরাং আপিস থেকে ফিরে এসে সময় আর আমার কাটতে চাইত না। কাছেই বড় রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান ছিল, সকাল সন্ধ্যায় অধিকাংশ সময় আমি সেখানে গিয়ে পড়ে থাকতাম। কিছুক্ষণ পর পর এক এক পেয়ালা চা খাওয়া, আর ঐ দোকানেরই খবরের কাগজ পড়া, এই ছিল আমার কাজ।

দোকানে অনেক রকমের লোক আসত, নানা ধরণের কথা

হ'ত, তার সবকিছুই যে আমার চোখে কানে আসত, তা নয়, কারণ দোকানে একখানা ইংরেজী এবং দুইখানা বাংলা খবরের কাগজ আসত, আর দৃষ্টি ও মন আমার অনেক সময় তাতেই নিবদ্ধ থাকত। হঠাৎ একদিন রাত্রি আটটার কাছাকাছি খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলতেই সামনে দৃষ্টি পড়ল। দেখি আমারই বয়সী একটি লোক চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। মুখখানা যেন চেনা চেনা।

কে, সুকুমার না? হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

মৃদু ম্লান হাসি হেসে সে উত্তর দিলে, তবু ভাল, যে চিনতে পেরেছ! অনেক দিন পর যারা আমায় দেখে তাদের অনেকে আমায় চিনতেই পারে না।

হাঁ, বড্ড বেশী বুড়িয়ে গেছ তুমি।

আর পশ্চিমের জলহাওয়ায় বড্ড বেশী মুটিয়ে গেছ তুমি, আবার সেই ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিলে সুকুমার, তারপর পাশের খালি চেয়ার দেখিয়ে বললে, এস, কাছে এস।

বাল্যবন্ধুর আহ্বানে কাছে গিয়ে বসলাম। তারপর আছ কেমন বল?

আবার সেই ম্লান হাসি। পঁচিশ বছরের কেমন থাকা না-থাকা সমান, এক কথায় বলা যায় না, বন্ধু।

আমিও একটু হেসে বললাম, এক কথায় না হয় দশ কথায়ই বল, হাতে সময় আছে আমার, অফুরন্ত সময়।

কেন, ফ্যামিলি আন নি বুঝি?

না, বাসা পাই নি, দাও না একটা ভাল বাসা।

ভালবাসা দিতে পারি, কিন্তু ভাল বাসা পাওয়া মুশকিল।

হেসে বললাম, বুঝতে পারছি, তবু একটু খোঁজে থেকো, তোমার বাসার কাছাকাছি।...হাঁ, ভাই, ক'খানা ঘরের কত ভাড়া দাও তুমি বল ত?

সুকুমার অভ্যস্ত ম্লান হাসি হেসে বললে, এই একটি ঝামেলা থেকে জীবনে মুক্তি পেয়েছি ভাই, আমি একটুখানি বাড়ী করেছি।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম তার মুখের দিকে। মাষ্টারি করে এই কলকাতায়?...তুমি ত মাষ্টারি কর শুনেছি।

আবার সেই হাসির মাঝ দিয়ে সুকুমার উত্তর দিলে। হাঁ, ভাই। বলে সে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালে। আমায় ভাই, নিষ্ঠুর অভদ্রের মত উঠতে হবে এবার। সওয়া আটটায় টিউশনী আছে আরেকটা।...তুমি ত কাছেই থাক?

হাঁ।

প্রায়ই এ চায়ের দোকানে আস ত?

হাঁ।

আবার বুধবার আটটার সময় এইখানে থেকো, দেখা হবে।...তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে দশটা কথা বলতেই ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য তোমার হাতে অফুরন্ত সময় থাকলেও, 'উইক্ ডেজে' আমার হাতে দু'মিনিটও সময় থাকে না।

সুকুমার তখনই উঠে আমার পিঠ চাপড়ে ম্লান হাসি হেসে বলে গেল, এবার আসি, ভাই, আবার দেখা হবে, বুধবার আটটা, থেকো তুমি এখানে।

বুধবার আটটার অনেক আগে থেকেই অবশ্য আমি চায়ের দোকানে এসে বসে ছিলাম। কাঁটায় কাঁটায় আটটায় সুকুমার এসে দুই পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিয়ে আমার টেবিলের সামনের চেয়ারে বসল। ক্লান্ত চোখমুখ।

বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়!

ও কিছু নয়, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত মেশিন ঠিক চলবে, পরীক্ষার সময় রাত্রি এগারো সাড়ে এগারো পর্য্যন্ত চালাতে হয়—বলে তার সেই বিষণ্ণ হাসি হাসলে সুকুমার।

আগের দিনই বুঝেছি সুকুমার সুখী নয়, কি এক মনঃকষ্ট ও সর্ব্বদাই লুকিয়ে রাখে। কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে জানতে ইচ্ছা করছিল আমার, কিন্তু তারই-বা কি উপায় আছে, হাতে ত মাত্র দু'চার মিনিট সময়, তার পরেই ত সুকুমার বলবে, উঠি ভাই। তবু যে দু'চার মিনিট সময় আছে তারই সদ্ব্যবহার করা যাক ভেবে বললাম, এত খাটুনিই বা কি জন্যে আর, বাড়ী ত করেছ, পয়সা-কড়িও সামান্য কিছু জমিয়েছ নিশ্চয়। তা ছাড়া ছেলেপিলেও এত দিন বড় হয়ে গেছে হয়ত, তারাও সম্ভবতঃ কিছু রোজগার-পত্র করে, সুতরাং—

সুকুমার বললে, ছেলে মাত্র একটি, সে বড় হয়েছে, রোজগারও করে, তার বিয়ে দিয়েছি।

তবে ত তোমার সুখের সংসার হে, তোমার অবস্থা শুনে আমার হিংসে হচ্ছে।

সুকুমার হেসে উঠলে, এবার বেশ জোর হাসি, তার পর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, এবার উঠি ভাই, আবার শুক্রবার। সুকুমার চলে গেল।

আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম, বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সুকুমারের ত কোন দুঃখের কারণ থাকা উচিত নয়। নিজের বাড়ী, দু'জন উপার্জ্জনশীল লোক, এতেও যদি।

পরের দিন দেখা হলে এই কথাই তাকে জিজ্ঞাসা করব ভেবে রাখলাম, কিন্তু শুক্রবার কথাটা পাড়তেই সে বললে, বাইরে থেকে বিচার করতে গেলে এসব বুঝা যায় না ভাই, ভিতরে প্রবেশ করতে হয়।

ভিতরে প্রবেশ করাচ্ছ কৈ?

সে কি এখানে বসে হয়!

তবে তোমার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে চল। বাড়ীটাও তোমার দেখা হবে, তা ছাড়া বন্ধুনী, পুত্র, পুত্রবধূর সঙ্গেও পরিচয় হবে।

কিন্তু মনের ভিতর প্রবেশ করানো চলবে না!

তবে?

সুকুমার একটু গম্ভীরমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে, বাড়ীতে

তোমায় পরে নিয়ে যাব।···রবিবার সন্ধ্যায় তোমার সময় হবে?

হবে।

তবে সাতটার সময় এখানে এস।

কিন্তু তুমি যে বললে, সে এখানে বসে হবার নয়।

সুকুমার হাসলে, তুমি এস ত, তার পর সে ব্যবস্থা হবে।

রবিবার সাতটার আগেই আমি চায়ের দোকানে এসে বসে ছিলাম। সুকুমার কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় এসে দু' কাপ চায়ের অর্ডার দিলে। চা এলে বললে, নাও চটপট খেয়ে নাও, একটু বেড়ানো যাবে।

চা খাওয়ার পর সুকুমার আমাকে নিয়ে লেকের পথ ধরলে: ঠিক দশটা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকব আমি।

জীবনটা যে একেবারে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছ?

তা বলতে পার।

কিন্তু এখনও কি এত কড়াকড়ির প্রয়োজন আছে? পরীক্ষা পাস ত করে চুকে গিয়েছে, বাড়ীও করেছ, ছেলেও বড় হয়েছে, রোজগার করে, এখন আর এত কেন? একটু জিরোও।

সুকুমার হাসলে: জিরোব একদিন। তার পর রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার দু' লাইন আবৃত্তি করে সে বললে,—

আমার ছুটি আসছে কাছে সকল ছুটির শেষ,
ছবি একটি জাগছে মনে,—ছুটির মহাদেশ।

মানে?

মানে অতি প্রাঞ্জল, মানে মৃত্যুর আগে ওরা আমায় কেউ ছুটি দেবে না।

সবাই এখনও খাটিয়ে নিতে চায় বুঝি?

প্রকারান্তরে। গিন্নী ত সরাসরিই বলেন।

কি বলেন তিনি?

বলেন, আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে যেও না। তোমার সংসারের জন্য সব খোয়ালাম আমি, আমার একটা ব্যবস্থা করে যাও তুমি, তবে তোমার ছুটি।

বুঝলাম না ঠিক। বাড়ী করে রেখেছ, ছেলে বড় হয়ে উপার্জন করে, আর কি ব্যবস্থা করবে তুমি?

সুকুমার আবার হাসলে, হাসি যেন তার ব্যাধি। বললে, ঐখানেই ত গোল ভায়া। গিন্নীর বদ্ধমূল ধারণা আমি মারা গেলে ছেলে-বউ তাকে খেতে দেবে না, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।

দুঃখের কথা।···কিন্তু এমন ধারণাই বা তাঁর কেন হয়, একটি মাত্র ছেলে!···এমন ধারণার কি কোন কারণ আছে?

তা আছে।

বাড়ীটা কার নামে?

আমার নিজের নামে।

তা হলে বাড়ীটা গিন্নীর নামে উইল করে দাও।

তাও বলেছিলাম, কিন্তু তাতেও তার মন শান্ত হয় না, বলেন বাড়ী তাঁর নামে দিলে আমি মারা গেলে ওরা তাকে বিষ খাইয়ে মেরে বাড়ী নেবে।

সুকুমারের কথা শুনে তার জন্য দুঃখ বোধ হচ্ছিল মনে, বুঝলাম বেচারা সত্যিই বড় অসুখী। জনবিরল রাস্তা থেকে ক্রমে আমরা জনবহুল রাস্তায় এসে পড়লাম। আমাদের কথাবার্তা সাময়িক বন্ধ করতে হ'ল—নানা লোকের যাতায়াত। ঘুরতে ঘুরতে লেকের দক্ষিণে জলের ধারে বটগাছের নীচে একটা খালি বেঞ্চ পেলাম। তাতেই বসলাম দু'জনে।

দুঃখের কথা মন খুলে বলতে পারলে মন অনেকটা হালকা হয়ে যায়, আর এই জন্যেই সুকুমার আজ আমায় আমন্ত্রণ করে এনেছে বুঝে আমি আর বিলম্ব না করে সুরু করলাম, এই সব গোলযোগের জন্যেই তুমি আমায় তোমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাও নি,—নয়?

হাঁ ভাই। বাড়ীতে শান্তি থাকলেই বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে নিয়ে শান্তি। গিয়ে দেখবে সবাই মুখ গোমরা করে বসে আছে, কেউ কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলছে না। বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে এ সব দেখে কি তোমারই ভাল লাগবে, না আমারই ভাল লাগে? তার পর ধর তোমার চা জলখাবার নিয়েই ওদের মাঝে আবার নূতন করে গোলযোগ সুরু হয়ে যাবে···।

সে আবার কি রকম?

কি রকম? বলছি। ওরা ঠিক করে রেখেছে ছেলের শ্বশুর-বাড়ী থেকে কোন আত্মীয়-স্বজন এলে অথবা ছেলে-বউয়ের কোন বন্ধু এলে তাদের চা-জলখাবারের আয়োজন করবে আমার পুত্রবধূ, এবং আমার আত্মীয়-স্বজন এলে ও-সবের আয়োজন করবে আমার স্ত্রী।

বললাম, আশ্চর্য ত!

তুমি বলছ আশ্চর্য, আর আমার কাছে এটা 'পেনফুল', নিদারুণ 'পেনফুল'। বুঝে দেখ, নিরঞ্জন, আমাদের মেয়ে নেই, মেয়ের সাধ মেটাব আমরা বেটার বউ দিয়ে, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বউটি দেখাব সেটি হবার উপায় নেই। তা ছাড়া আত্মীয়-বন্ধুর সামনে বউমার অনুপস্থিতি নিতান্ত অপমানকর মনে হয় আমার।

চিত্রটি কল্পনা করে সুকুমারের কথার গুরুত্ব অনুভব করলাম আমি। সুকুমারের কথায় মনটা ক্রমেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল আমার। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অতি সহজ: আমি তাদের সঙ্গে খেলা করি। বললাম, ছেলে-বউয়ের সঙ্গে তোমরা দু'জন কি খুব মুরুব্বিয়ানা দেখাও?

মোটেই না, মানে মোটেই দেখাতাম না, বরং তার উল্টো।

তা হলে এটা হ'ল কি করে?

কি জানি, হয়ত বেশী আস্কারা পেয়ে। ছেলেকে জীবনে আমি কোনদিন শাসন করি নি, একটি কটু কথা বলি নি। কলেজ পালিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরেছে—কানে এসেছে, পরীক্ষা না দিয়ে 'কলকাতায় পচে মলাম' বলে টাকা নিয়ে বাইরে ভ্রমণে গিয়েছে, কোন বাধা দি' নি আমি। অথচ তুমি নিজের চক্ষে

দেখেছ তাস খেলতে গিয়েছিলাম বলে বাবা চুল ধরে থাপ্পড় মারতে মারতে নিয়ে গিয়েছিলেন।···ভালই করেছিলেন, নইলে জীবনে যেটুকু করেছি, সামান্য যা লেখাপড়া শিখেছি তাও হয়ত হয়ে উঠত না।

এইটুকু বলে সুকুমার একটু থামল, কি যেন ভাবতে লাগল সে। প্রায় আধ মিনিট পরে সে নৈরাশ্যের সুরে বললে, শাস্ত্রকাদ্র সব মিছে কথা হে, ও এদেশের ওদেশের দুই দেশেরই।

কি রকম?

আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ', ওদের দেশের 'সাইকোলজি'-তেও ঐ একই কথা। অথচ তাই করতে গিয়েই ত আমার এ দশা। অথচ বাবা আমায় ওর চেয়েও বেশী বয়সে শাসন করেছেন, তাতে কোন কুফল হয় নি, বরং সেজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অন্ধকারে আমার মুখের হাসির রেখা আর দেখতে পেল না সুকুমার, কিন্তু শব্দ তার নিশ্চয়ই কানে গেল, বললাম, তবে মানুষের প্রকৃতি এক ধাতু দিয়ে গড়া নয়, ভায়া। ঐ বয়সে তোমার ছেলেকে অমনি শাসন করতে গেলে হয়ত সে ঘাড় বাঁকিয়ে রুখে দাঁড়াত, অথবা লেখাপড়া একেবারে ছেড়ে দিত।

সুকুমার আমার কথা স্বীকার করে বললে, সে কথা ঠিকই, কিন্তু শাসন না করে চিরকাল মিষ্টি কথা বলেছি, তাতেও ত তেমন লেখাপড়া করলে না।

করলে না, তার কারণ লেখাপড়ায় তার চাড় নেই, লেখাপড়া করা সে তেমন প্রয়োজন বোধ করে না, সে ওতে আনন্দ পায় না।

সুকুমার ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, একটু পরে আবার সুরু করলে, ও সব পাট ত চুকেই গেছে, ছেলেকে দিগগজ দেখার আকাঙ্ক্ষা আর করি নে। চাকরিও যা হোক একটা পেয়েছে, ওতেই যদি ওর আশা মিটে যায়, যাক। ও সব কোন কিছু নিয়েই—আর কথা বলতে চাইনে আমি, আমি চাই এখন শুধু একটু শান্তি। সারাজীবন দারুণ খাটুনি খেটে এলাম, এখনও খাটি, কিন্তু বাড়ীতে এসে একটু জুড়োতে চাই, কিন্তু কি বলব, ভাই, বাড়ী হয়েছে যেন আমার 'হট বেড', সেখান থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচি।

সুকুমারের কথা শুনে একটুখানি চুপ করে থেকে বললাম, তোমার এই অশান্তি কবে থেকে সুরু হ'ল, মূল কারণ কে, ছেলে, না ছেলের বউ, বিয়ের আগে বাড়ীতে অশান্তি ছিল না নিশ্চয়?

একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করে ফেলে সুকুমারকে হয় ত একটু অসুবিধায় ফেললাম—ভাবছিলাম, কিন্তু দেখলাম সুকুমার অনেক দিন মাষ্টারি করে করে অনেকগুলি প্রশ্নের একসঙ্গে জবাব দেওয়ার কৌশলটা রীতিমত আয়ত্ত করেছে। সে বললে, প্রথম এবং প্রধান দোষ, ভাই, আমার ছেলের। বউটি প্রথমে বেশ ভাল ব্যবহারই করত। আমি স্কুল থেকে হয়রান হয়ে এলে ছুটে এসে বাতাস করত, সব কথা শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করে নিত। আমাদের মেয়ে নেই, বউটি এসে আমাদের মেয়ের স্থান অধিকার করেই বসেছিল। বউমার বাপের বাড়ী যাওয়ার সময় আমার স্ত্রী কেঁদে ফেললে দেখে বউমা তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, মা, আপনার যদি এত কষ্ট হয়, তা হলে আমি না হয় ওখানে আর যাব না।

বুঝতেই পারছ বউমার এমন মন দেখে আমরা ভাবলাম যেমনটি আমরা চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনটি পেয়েছি। আনন্দের আর সীমা রইল না আমাদের।

বউমা বাপের বাড়ী যাওয়ার পর থেকেই ছেলের আচরণ হয়ে উঠল যেন দুঃসহ। মায়ের সঙ্গে তার ঝগড়া লেগেই আছে। বুঝতে পারছিলাম কারণ সব, কিন্তু আমার হয়ে উঠল অসহ্য। শুধু এই নয়, আপিসের ছুটির পর রোজ শ্বশুরবাড়ী তার যাওয়া চাই, ফিরত রাত্রি বারোটার কাছাকাছি, না খেয়ে। কে বুঝবে বল—অত রাত্রে শ্বশুরবাড়ী থেকে আসবে না খেয়ে। এসেই আবার মেজাজ? শ্বশুরের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ। রাগের কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট বুঝতেই পারছ। সে বেচারার কিছুই দোষ নেই, বেহানের ভীষণ অসুখ, মেয়েকে কিছুদিন তাই তাঁরা কাছে রাখতে চান।

এদিকে ছেলের কাণ্ড দেখে আমি লজ্জায় মরে যাই। বেহাই ভদ্রলোক কি মনে করছেন। বুঝতেই পারছিলাম ছেলে সেখানেও রীতিমত মেজাজ দেখিয়ে না খেয়ে আসে।

একদিন আমিও মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারলাম না। সারা দিন ভীষণ খাটুনি গিয়েছিল, অথচ বাড়ী এসে খেয়ে শুয়ে পড়বার উপায় নেই। ক্ষিদের নাড়ী জ্বলে যাচ্ছিল, ঘুমে দুই চোখ জড়িয়ে আসছিল, অথচ ছেলে খেয়ে আসবে কি না, না জেনে আমরাই-বা খেয়ে নিই কি করে। রাত্রি বারটার সময় পুত্র বাড়ী এলেন, এসে ঘরে ঢুকলেন না, বাইরের সিঁড়ির উপর পড়লেন বসে, যেন কি সর্বনাশ হয়ে গেছে। নির্লজ্জতা দেখে মেজাজ আরও তিরিক্ষে হয়ে উঠল, বললাম, কি হয়েছে?

কিছু না।

ওর মা জিজ্ঞাসা করলেন, খেয়ে এসেছিস?

না।

বললাম, ও বাড়ীতে খাবি না ত যাওয়া কিসের জন্যে? সাধ্যসাধনা করে লোকে জামাই বাড়ী আনতে পারে না, ভাগ্যচক্রে এলে—বাড়ীতে সাড়া পড়ে যায়: কোত্থেকে মাছ আসবে, কোত্থেকে দুধ, কোত্থেকে দই মিষ্টি। তা নয়, রোজ রোজ তাঁর বাড়ী যাব খেয়ে আসব না। ভদ্রলোক কি মনে করে, ভাবতে মাথা কাটা যায় আমার—ছি, ছি, ছি···।

ও আবার ভদ্রলোক!

নিশ্চয়ই ভদ্রলোক, রীতিমত ভদ্র, আমার যদি জামাই থাকত, আর সে অমন করত, আমি তা হলে তাকে মেরে তাড়াতাম।···বউ আর বাপের বাড়ী যেয়ে থাকে না কারও—নির্লজ্জ কোথাকার।

ছেলে উত্তর দিলে, বিয়ে দিয়েছিলেন কেন?

বললাম, জানিস না তুই, তুই যে অরক্ষণীয় হয়ে উঠেছিলি।

দুঃখের জালায় উত্তেজিত সুকুমারের কথা শুনতে শুনতে সহানুভূতিতে মন ভরে উঠছিল তবুও শেষের কথাটা শুনে একটু না হেসে আর পারলাম না : অরক্ষণীয় !···সে আবার কি ?

সুকুমার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, আরে ভাই, কি বলব, বিয়ের আগে সে কি কাণ্ড। আমাদের জানাশোনা একটি মেয়ে প্লুরিসির পর টি-বিতে ভুগে ভুগে কোন রকমে সে বেঁচে গেছে। একদিন ছেলে এসে তার মাকে বলে, ঐ মেয়েকে আমি আমার জীবনসঙ্গিনী করতে চাই।

সুকুমারের কথা শুনে অতি দুঃখের মাঝেও আমার কেমন হাসি পাচ্ছিল, বললাম, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে বুঝি তখন ?

হাঁ সে ত দিয়েছেই—পরীক্ষা এবার দেব না, আসছে বার ভাল করে দেব, সেবার এলে বলে তার পরের বার, অথচ পড়া-শুনা করে না, কেবল ঘুরে বেড়ায়।

বললাম, আইডল ব্রেণ ইজ ডেভিলস ওয়ার্কশপ।

তা ত বুঝতেই পারছি—বললে সুকুমার, তার পরে চুপ করে কি ভাবতে লাগল। আমি তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললাম, জীবনে সব আশা মানুষের পূর্ণ হয় না, ভাই, মনের সঙ্গে সবকিছু মানিয়ে নিতে হয় :

হাঁ জানি—এডজাষ্টমেণ্ট।···এখন আর আশা করি না তার কাছ থেকে কিছু, জীবনের বাকী দিনগুলি শুধু একটু শান্তিতে কাটাতে চাই।

সারাজীবন বিলাস আমোদ-প্রমোদ সবকিছু ত্যাগ করে কেবল সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে সুকুমার, এখন পুত্রের মতিগতির সঙ্গে নিজের জীবনকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না—তার কথা শুনে আমি এই বুঝলাম।

পুত্র-পুত্রবধূর সঙ্গে নিজেদের গোলমালের আরও নানা কথা বলতে বলতে হঠাৎ একবার দেশলাইয়ের কাঠি জেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুকুমার বলে উঠল, এইবার উঠতে হবে আমার, ভাই, নইলে আবার কথা শুনতে হবে।

তোমার বাড়ীতে তোমায় আবার কে কথা শোনাবে ?

হাঁ, ছেলে গজগজ করবে, রাত্রিতে খেয়ে তার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।···কত বলি তোমরা আগে খেয়ে আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখবে, তাও কেউ শোনে না।

এর পর থেকে প্রতি রবিবার সন্ধ্যাতেই সুকুমারের আমন্ত্রণে আমি তার সঙ্গে গিয়ে লেকের সেই গাছতলাতে বসতাম, শুনতাম তার সাত দিনের যত দুঃখের কাহিনী। ছেলের সঙ্গে সুকুমারের প্রায় বছর দেড়েক কথা বন্ধ, এখন মায়ের সঙ্গে কথা বলাও ছেলে একরকম ছেড়ে দিয়েছে, মা বলে ডাকা ত দূরের কথা। পুত্রবধূ শাশুড়ীকে মা বলে ডাকলে ছেলে তাকে ধমকায়।

সুকুমারের স্ত্রী বাতের ব্যথায় মাঝে মাঝে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে, পুত্রবধূ রাঁধতে গেলে ছেলে তাকে ধমকায়, এবার তোমায় হাসপাতালে যেতে হবে, কখনও বলে, বিনি মাইনের রাঁধুনী হয়েছ ! সুকুমার বলে, বউটা প্রথমে ভালই ছিল, অসুস্থ শাশুড়ী ব্যথায় নীচে নামতে পারতেন না শুনে বউ বললে, আপনি উপরে থাকুন, আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি। ছেলে অমনি ধমকে উঠলে, তোমার মত এমন অপদার্থ ত আমি দেখি নি। স্ত্রী মনের দুঃখে ভাতের থালা সামনে নিয়ে অমনি কাঁদতে বসল ; সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল।

একদিনকার কথা বলতে গিয়ে দেখলাম—সুকুমারের একেবারে গলা ধরে এল, বললে, ভাই, ছুটিতে দিন পনেরর জন্য একবার বাইরে গিয়েছিলাম, এসে শুনি কি নিয়ে কথা কাটাকাটির পর ছেলে এসে তার মাকে অপমান করেছে—পুত্রবধূ বলেছে, মাঝে মাঝে এইরকম হওয়া দরকার ! কাঁদবার উপায় নেই, প্রতিবেশীরা কি মনে করবে। বাড়ী এলে গিন্নী যখন গোপনে চোখের জলে ভেসে সব কথা জানালে তখন আমার মনের অবস্থা কেমন হ'ল একবার ধারণা করবার চেষ্টা কর। এদের নিয়ে আমার সংসার !

তুমি বললে না কিছু ছেলেকে ?

জানই ত আমি তার সঙ্গে কথা বলি না, আর যদি বলতামও তা হলে এমন একটা কথা শুনে মনের এরূপ অবস্থা হয় যে কথা বলবার আর প্রয়োজন থাকে না।

সুকুমারের সেদিনকার কথায় আমি নিজেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, বলেছিলাম, আমি হলে এমন ছেলেকে বাড়ী থেকে বের করে দিতাম। শুনে সুকুমার হাসলে, আমিও এক দিন উত্তেজনার মুহূর্তে বলেছিলাম, বের করে দেব বাড়ী থেকে, তার উত্তরে আমায় শুনিয়ে তার বউকে বললে, ওঁকে আস্ফালন করতে মানা করে দাও, উনি পারেন না আমায় তাড়াতে, বড়ছেলেকে কেউ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

বললাম, বাংলা দেশে দায়ভাগ আইনে সম্পত্তিতে পিতার সম্পূর্ণ অধিকার, তা ছাড়া এ ত তোমার স্বোপার্জিত সম্পত্তি, বাংলার বাইরের মিতাক্ষরাতেও এ বাধে না।

সুকুমার দুঃখের হাসি হেসে বললে, ইডিয়ট বোঝে না, সম্পত্তি থেকে যদি না বঞ্চিত করাও যেত, তা হলে বাড়ী বিক্রী করলে আমায় আটকায় কে ? জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্য বাড়ী বিক্রী আইনত বন্ধ রাখতে হলে দেশে বাড়ী কারো বিক্রীই হ'ত না, কারণ অন্য পুত্র না থাকলেও—যার পুত্র আছে জ্যেষ্ঠপুত্র তার আছেই !

কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে রুদ্ধ হয়ে উঠত সুকুমারের কণ্ঠস্বর, সমবেদনা দেখানো ছাড়া আর যে কি করতে পারি আমি কিছুই বুঝে উঠতাম না।

পূজার ছুটির সঙ্গে আরও কিছুদিন ছুটি নিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমি পশ্চিমে। ফিরে এলাম নবেম্বর মাসের প্রথমে। এসেই সুকুমারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য মনটা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। নিজের পুত্রকন্যার সঙ্গে গোলোকধাঁধা, কেরাম থেকে সুরু করে লুকোচুরি পর্য্যন্ত খেলে এসেছি—সেখানে, মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীও যোগদান করত সে সব খেলায়। তাদের সবার

সঙ্গে সম্বন্ধ আমার সহজ সরল, অনেকটা বন্ধুর মত। তাদের সাহচর্যের আনন্দ উপভোগ করতে করতে মন আমার ব্যাথাতুর হয়ে উঠত সুকুমারের জন্ত। তাই এসেই আমি সন্ধ্যাকালে সেই চায়ের দোকানে ঢুকলাম। সেদিন শুক্রবার, সুকুমারের আসবার দিন।

যথাসময়ে সুকুমার সেখানে এল। প্রথমে দেখে আমি তাকে চিনতেই পারি নি, চেহারার এত পরিবর্তন হয়েছে তার। চোখ-মুখের দুশ্চিন্তা আর দুঃখের রেখা নিঃশেষে মুছে গেছে, শীর্ণ মুখ যেন অনেকটা গোলগাল হয়ে উঠেছে, বয়স যেন তার পনর বছর পিছিয়ে গেছে। আমার দিকে চেয়ে সে-ও হাসতে লাগল, আমিও হাসতে লাগলাম।

কি ব্যাপার, চেঞ্জে গিয়েছিলে না কি?

না, ভাই, কোথায় আর যাব, এইখানেই ছিলাম।

বাড়ীর খবর কি,—সেই রকম?

না ভাই, বাড়ীতে একেবারে যুগান্তর!

কি রকম?

সুকুমার ঘড়ির দিকে চেয়ে খুশির হাসি হেসে বললে, আজ নয়, রবিবারে···আসবে কিন্তু অতি অবশ্য···সেইখানে।

রবিবারে যথাসময়ে লেকের ধারে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসলাম। সুকুমার এল প্রায় বিশ মিনিট দেরি করে।

বড্ড দেরি করে ফেলেছ তুমি, তোমার বাড়ীর কথা শুনবার জন্ত এদিকে আমি ছটফট করছি।

সুকুমার হেসে বললে, জানি···এদিকে আবার ছুটির দিন কি না তাই বাড়ী থেকে সহজে ছুটি পাই না।

কি আবার হেঁয়ালি করে তুলছ, খোলসা করে বল।

সুকুমার হাসতে হাসতে বললে, তুমি হয়ত শুনে আশ্চর্য্য হবে, ভাই, আমি তাস খেলছিলাম।

বটে!···এতকাল পরে আবার তাস হাতে পড়ল তা হলে,—তাতেই এত ফুর্ত্তি?

হাঁ, তাই বটে, তবে তার সঙ্গে আরও অনেককিছু আছে।

আবার যে হেঁয়ালি করে তুলছ?

না, এবার আর হেঁয়ালি নয়, খোলসা করেই বলছি। প্রথম থেকেই বলছি—

ছুটিতে দু' দুটি অতিথি এল ভাই বাড়ীতে। একটি আমার বিবাহিতা ভ্রাতুষ্পুত্রী, আর একটি পুত্রের শ্যালিকা। ছেলে তার শ্যালিকার অনুরোধেই হয়ত নূতন এক জোড়া তাস কিনে নিয়ে এল। পাশের ঘরেই দিনরাত চলতে লাগল হৈ চৈ, আনন্দের রোল। খানিকটা বাঁচলাম যেন আমরা; আমাদের নিয়ে আর ওরা মাথা ঘামায় না, আমাদের মেজাজ গরম করবার মত তিক্ত অশোভন কথা বলার আর ওদের ফুরসত নেই, নেশা গিয়েছে খেলায়। দিনদশেক পরে ভাইঝি চলে গেল, ডাক পড়ল গিন্নীর। বউমার বোন রমা অবশ্য ডাকলে তাকে, শুধু ডাকলে না, একেবারে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল; মাউই মা, আসুন, খেলবেন আমাদের সঙ্গে।

গিন্নী অবশ্য প্রথমে আপত্তি করেছিলেন; বুড়ো মানুষ, আমি আবার কি খেলব? রমা শোনে নি সে কথা, সে বললে, বুড়ো না হাতী, আপনার চেয়ে কত বেশী বয়সের মেয়েরা তাস খেলে!

আমি নিজের ঘর থেকে শুনতাম—ওদের আনন্দের রোল। গিন্নীও দেখি মেতে উঠেছেন ওদের সঙ্গে। ঝগড়াঝাটি আর হয় না। বউমা দেখি দুপুরে তার শাশুড়ীকে তাড়া দেয়, তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে নিন, আজ ছুটির দিন আছে।

আরও দিনপাঁচেক পরে রমাও চলে গেল। পাশের বাড়ীর একটি মেয়েকে ডাকছিল ওরা খেলতে, তার স্বামী এসেছে, সে এল না। এ অবস্থায় ক্রীড়ার্থীদের যে কি কষ্ট হয় তার অভিজ্ঞতা আছে আমার—ছেলেবেলার। চুপি চুপি কি যেন সব বলাবলি করলে ওরা, পরক্ষণেই দেখি ওদের ঘর থেকে ডাকছেন গিন্নী, ওগো শুনছ, তুমি এসো না, খেলবে একটু!···তুমিও ত শুনেছি তাস খেলতে ছেলেবেলায়!

বাড়ীতে খেলা সুরু হবার পর থেকেই লক্ষণ একটু ভাল দেখছি, তা ছাড়া বাড়ীতে এই হৈ চৈ আনন্দের রোল দেখে ছুটির দিনে আমারও যে একটু খেলবার ইচ্ছা জাগে নি এ কথা বললে মিথ্যা বলা হয়, সুতরাং গিন্নীর আহ্বানে সলজ্জ মুখে এগিয়ে গেলাম।

সুকুমার এইটুকু বলে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে একটু হাসির শব্দ তুলে বললে, সেই থেকে আমাদের বাড়ীতে সন্ধি।

আমারও হাসি পেল, বললাম, 'তাস দাবা পাশা এ তিন সর্ব্বনাশা',—এ কথা আর বলা চলে না তা হলে কি বল?

সুকুমার হেসে বললে, না, বরং বলা যেতে পারে, এরাই শান্ত ভালবাসা? ঝগড়া-বিবাদ দুঃখ-কষ্ট দারিদ্র্য সবকিছু ভুলিয়ে রাখতে পারে এরা, আর মানুষের জীবনে সে বড় কম কথা নয়!

দাক্ষিণাত্যে বৈদেশিক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

নিজাম-উল-মুলকের অন্যতম পুত্র গুণ্টুর এবং আদোনির জায়গীরদার বসালৎজঙ্গেরও একটি পরাক্রান্ত ইউরোপীয় বাহিনী ছিল। উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ অনেক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক কোন-না-কোন সময়ে উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। জেনারেল রেমঁ কর্ত্তৃক পাশ্চাত্ত্য যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত সৈন্যদল সংগঠনের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিজাম আলির অপেক্ষা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুণ্টুর-আদোনির জায়গীরদার বসালৎজঙ্গের বাহিনী ইউরোপীয় সৈনিক-বলে প্রবলতর ছিল। বসালৎজঙ্গ বরাবরই ইউরোপীয় সাধারণ সৈনিক লইয়া দল গঠন করিতেন। ইউরোপীয় অফিসার-পরিচালিত পাশ্চাত্ত্য সমরপদ্ধতিতে শিক্ষিত দেশীয় সিপাহীপল্টন গঠনে তাঁহার তেমন লক্ষ্য ছিল না। হায়দর আলি এবং টিপু সুলতানও এই নীতিরই পরিপোষক ছিলেন।

বসালৎজঙ্গের প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষের নাম ছিল চার্লস ব্যাবেল ওরফে জেফির (Charles dit Zephyr)। তাঁহার মৃত্যুর পর গার্দে ও বঁফে বঁ আঁফাঁ অর্থাৎ কিনা "ভাল ছেলে" (Garde dit Bon Enfant) উক্ত পদে নিযুক্ত হন (১৭৭০ খ্রীঃ)। অল্পকাল পরে তিনি পদত্যাগ করিলে সুপ্রসিদ্ধ জেনারাল লালী (The younger Lally) ঐ দলের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। তাঁহার কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলা হইবে, এখানে অপর দুই জনের বিষয়ই দেওয়া হইতেছে।

জেফিরের প্রথম জীবন সম্বন্ধে সব কথাই অজানা। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। প্রথম জীবনে ফরাসী সৈনিকের বেশে তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন এবং পণ্ডিচেরীর পতনের সম-সময়ে আরও অনেকের মত দেশীয় দরবারে ভাগ্যান্বেষণে গিয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে। কোন্ সময়ে তিনি বসালৎজঙ্গের কর্ম্মে প্রবেশ করেন তাহা সঠিক জানা নাই, তবে তাহা যে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার কথা তাহা জানা যায়। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর জাঁল দি লরিষ্টঁ তাঁহার পূর্ব্বকথিত গ্রন্থে* বসালৎজঙ্গের বিদেশী সৈনিকগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :

"বসালৎজঙ্গের নিকট "সুইস পার্টি" নামে অভিহিত একটি দল আছে। লালী ইহাদের অধ্যক্ষ। তিনি পূর্ব্বে বুসীর দলে সার্জ্জেণ্ট মেজর ছিলেন। বহু বিভিন্ন জাতের লোক লইয়া সংগঠিত এই দলটিতে অধুনা তিন চারি শত লোক আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই ফরাসী। অশ্বারোহী সৈনিকের সংখ্যা প্রায় দুই শত হইবে। এই দলটি ফরাসী রাজসরকারের নিকট হইতে অনুমোদন-প্রাপ্ত নহে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আমার এদেশে আগমনকালে ব্যাবেল ওরফে জেফির দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি বসালৎজঙ্গের একজন পুরাতন ভাল সৈনিক এবং বহু বিভিন্ন ব্যাপারে অনেকবার নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শনও করিয়াছেন। তিনি ইংরেজগণের ঈর্ষ্যার কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। উহারা আমাকে জানাইয়াছিল যে, সাধারণভাবে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং উভয় নৃপতির মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার জন্য আমার পক্ষে জেফির এবং তাঁহার ইউরোপীয় অনুচরবৃন্দকে পণ্ডিচেরী প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম, 'ঐ দলটি বিভিন্ন জাতীয় প্রজাসমাবেশে গঠিত এবং আমার ভারতবর্ষে আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং উহারা আমার আজ্ঞাধীন নহে। জেফির এবং তাঁহার দলভুক্ত ফরাসীদিগকে আমি আমাদের পতাকাতলে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিতে পারি বটে; কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা একটা চাকুরিতে রহিয়াছেন এবং আমার পক্ষে উহাদিগকে যাহা দিতে পারা সম্ভব তদপেক্ষা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট ব্যবহার উহারা সেখানে পাইতেছেন, এ অবস্থায় উহারা যে আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন এমন আশা আমি ত করিতে পারি না। তদ্ভিন্ন উহাদিগকে বাধ্য করিবার মত সামর্থ্যও আমার নাই।"

২৯শে নবেম্বর ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে গুণ্টুরনগরে জেফিরের মৃত্যু হইয়াছিল। তথায় তাঁহার কবর আছে এবং সেই সমাধিগাত্রে ফরাসীভাষায় লিখিত আছে :

"D. O. M. Charles Babel, dit Zephyr, general des armees de Basalat Zingue. mort a Gontour le 29 Novembre 1770, age de 39 ans. Requiescat in pace.

Cheri de la Fortune at favori de Mars,
La Victoire suivit partout ses etendards,
D'Hercule il egale les travaux et le glorie,
Mais une mort trop cruelle a trompe notre espoir."*

শেষ চারি ছত্রের অর্থ দেওয়া যাইতেছে—"(তিনি) ভাগ্যদেবীর প্রিয় এবং রণদেবতার প্রীতিভাজন ছিলেন। বিজয়া দেবী তাঁহার পতাকার সর্ব্বত্র অনুগমন করিতেন। তিনি তাঁহার কৃত কার্য্যে এবং যশে হারকিউলিসের সহিত তুলনীয় ছিলেন, কিন্তু ঘোর নিষ্ঠুর মরণ আমাদের সকল আশা ধ্বংস করিয়াছে।" বলা বাহুল্য, এসকল বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা নিতান্ত অত্যুক্তিদোষদুষ্ট। জেফিরের এ ধরণের কৃতিত্বের কোন নিদর্শনই আমরা দেখিতে পাই না, বরঞ্চ তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে মসলিপত্তনের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ ম্যাসির মাজ্যা কর্ত্তৃক লিখিত একখানি পত্রে তাঁহার "যশগৌরবপূর্ণ জীবনের" অপর দিকটাও দেখিতে পাওয়া যায়। সওনপল্লী তালুকের অধিবাসী জনৈক দেশীয় খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের অধিকারে উক্ত চিঠিখানি

* *L'Etat Politique de l'Inde en 1777*, p. 144.

* *Lists of Inscriptions on Tombs and Monuments in the Madras Presidency*, No. 1242.

ছিল। জি. টি. ম্যাকেঞ্জি-রচিত "Krisna District Manual" গ্রন্থে উহা প্রদত্ত হইয়াছে।

জেকিয়ের মৃত্যুর পর কোণ্ডবিদ দুর্গের অধ্যক্ষ পার্দে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কয়েকটি কারণে, বিশেষতঃ শরীরের অস্বাভাবিক স্থূলত্বের জন্য তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল কর্ম্মনিরত থাকা সম্ভবপর হয় নাই। সেজন্য বসালৎজঙ্গের ইচ্ছানুসারে তিনি লালীর হস্তে সৈন্যদলের অধ্যক্ষতা প্রদান করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। "পার্দে এক্ষণে পণ্ডিচেরীতে আছেন এবং সেনাদল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান করিতে সমর্থ।"* চন্দননগরের গবর্ণর ম্যাসিয় শ্যেভালিয়ে, ফরাসী সরকার, মিত্র-রাজন্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন দরবারে ভাগ্যান্বেষণনিরত ফরাসী সৈনিকবৃন্দের সহযোগিতায় ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিবার এক অদ্ভুত পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনায় হিন্দুস্থানে সমরু ও মাদেক এবং দাক্ষিণাত্যে পার্দে ও হুগেলের দলের উপরই শ্যেভালিয়ে প্রধানতঃ ভরসা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য লরিস্তঁর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অনুমান ১৭৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্দের পদত্যাগের পর লালী ঐ দলের অধ্যক্ষতা লাভ করেন এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদিগের প্ররোচনায় বসালৎজঙ্গ তাঁহার ইউরোপীয় বাহিনী ভাঙিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথা অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

লরিস্তঁর গ্রন্থ হইতে রুভো (Rouveau) নামক বসালৎজঙ্গের আর একজন ফরাসী সৈনিকের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার লেখেন:—আমি দিল্লীতে যে ক্ষুদ্র দলটি পরিচালনা করিতাম রুভো তাহাতে এক জন ভলাণ্টিয়ার ছিল। পরে কিছুকাল জেকির, পার্দে, লালীর অধীনে সে কাজ করিয়াছিল, কিন্তু অধ্যক্ষের সহিত মনান্তর হওয়ায় ফলে ঐ ব্যক্তি দলত্যাগ করিয়া কাল্পীর নিকটে জনৈক পাঠান সর্দ্দারের কাছে চলিয়া যায়। উহার নিকট এখনও সে কাজ করিতেছে, কিন্তু তাহার দলে অপর কোন ইউরোপীয় সৈনিক আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই রুভো একজন সাহসী এবং বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। অনেক দিন হইল আমি আর তাঁহার নিকট হইতে কোন সংবাদ পাই নাই। হয়ত সে আর বাঁচিয়া নাই।"*

কয়েকজন বিদেশী ভাগ্যান্বেষীর কথা এখানে পর পর বিশদ ভাবে বলা হইতেছে।

জর্জ্জ হেসিঙ্গ

হল্যাণ্ড দেশের অন্তঃপাতী উট্রেক্ট নগরে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট* তারিখে প্রথম যুগের অন্যতম খ্যাতনামা ওলন্দাজ জাতীয় ভাগ্যান্বেষী সেনানী কর্ণেল জন উইলিয়ম হেসিঙ্গের জন্ম হইয়াছিল। এখানে তাঁহার পুত্র কর্ণেল জর্জ্জ উইলিয়ম হেসিঙ্গ এবং জামাতা কর্ণেল রবার্ট সাদরলণ্ডের বিষয়ও তাঁহার প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইবে। হেসিঙ্গের প্রথম জীবন সম্বন্ধে কোন কথা আমরা জানি না। ওলন্দাজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিকরূপে তিনি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে আসিয়াছিলেন এবং ঐ দেশীয় নৃপতির রাজধানী কাণ্ডীনগর অধিকার-সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সৈনিক-জীবন সম্বন্ধেও আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু পর বৎসরই আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন এবং দাক্ষিণাত্যে নিজামের অধীনে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। দি বইন যখন মহাদজী সিন্ধিয়ার জন্য পাশ্চাত্ত্য সমর-পদ্ধতিতে শিক্ষিত বাহিনী গঠনে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি তাঁহার প্রথম ব্যাটালিয়নদ্বয়ের মধ্যে অন্যতরের অধ্যক্ষতা হেসিঙ্গকে দিয়াছিলেন (১৭৮৪)। মধ্যবর্ত্তীকালের কোন কথাই জানিতে পারা যায় না, এই সুদীর্ঘকাল তিনি হয়ত নিজাম দরবারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন অথবা ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে একাধিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মাদমোয়াজেল এন দেরিদঁ নাম্নী একটি ফরাসী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; উহার অপর এক ভগিনী মাদেলিনকে বিবাহ করিয়াছিলেন উত্তরকালে জেনারেল পেরঁ নামে সুপ্রসিদ্ধ অপর একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক।

দি বইনের বাহিনীর প্রথম দিকের সকল যুদ্ধাভিযানেই হেসিঙ্গ অংশগ্রহণ করেন। টোঙ্গা বা লালসোট, চাকসানা, ভোঁদাগাঁও, আগ্রা, পাটন যুদ্ধ—ইহাদের প্রত্যেকটিতেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কয়েকবার আহতও হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভোঁদাগাঁও রণক্ষেত্রে লব্ধ অস্ত্রক্ষতগুলি সাংঘাতিক হইয়াছিল। অতঃপর তিনি ক্যাপ্টেনপদে উন্নীত হন। পাটন যুদ্ধের পর দি বইনের সহিত কোন কারণে তাঁহার দারুণ মনোমালিন্য ঘটে, এবং তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে পদত্যাগ করেন। মহাদজীর কিন্তু হেসিঙ্গকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা ছিল না। তিনি উঁহাকে স্বীয় "খাসরিশালা" অর্থাৎ দেহরক্ষীদলের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য, দি বইনের সহিত ঐ দলের কোন সম্বন্ধ ছিল না। অতঃপর হেসিঙ্গ সিন্ধিয়ার আদেশে স্বীয় ক্ষুদ্র দলটিকে স্বতন্ত্র এক ব্রিগেডে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পেশবাদরবারে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মহাদজী যখন পুণায় গমন করেন (১৭৯২ খ্রীঃ) তখন তিনি শুধু হেসিঙ্গ এবং ফিলোজের

* Etat Politique de l'Inde en 1777, p. 144.

* হেসিঙ্গের সমাধিলিপিতে লিখিত হইয়াছে যে, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তারিখে ৬৩ বৎসর ১১ মাস ৫ দিন বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সে হিসাবে ইহাই তাঁহার জন্মদিন।

গৃহহারা

ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

জেলে নৌকা

ফোটো—শ্রী বিনয়ভূষণ দাস
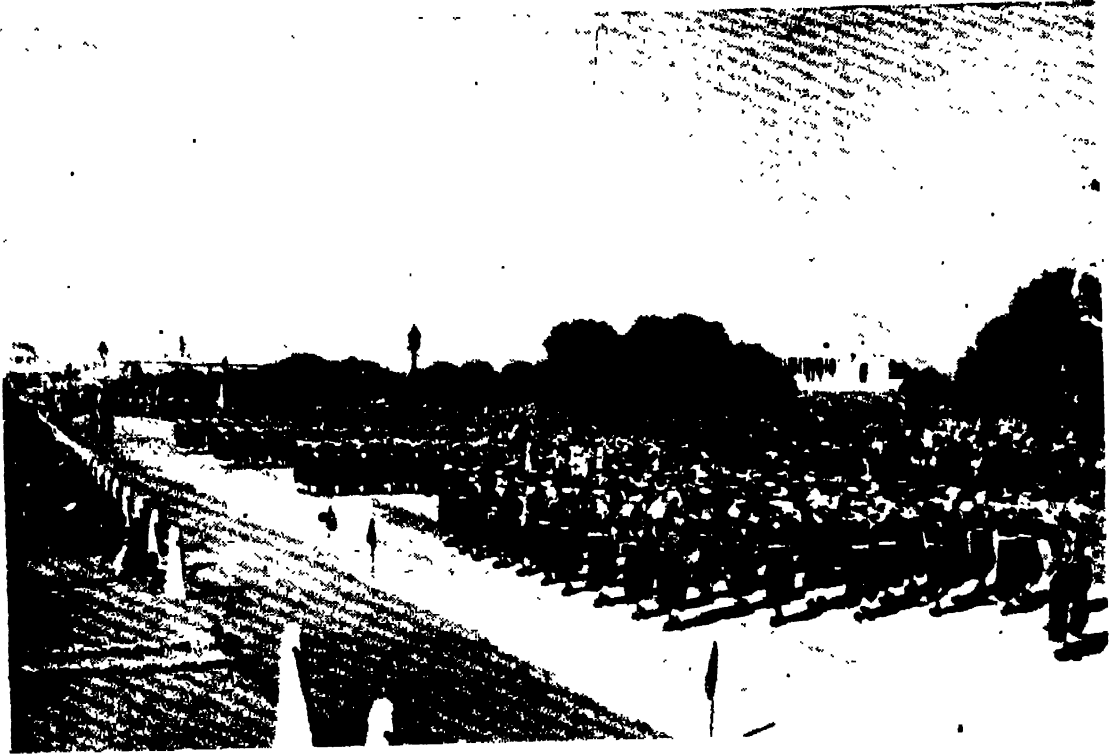
প্রজাতন্ত্র দিবসে নিউ দিল্লীতে বাদ্যভাণ্ডসহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর শোভাযাত্রা

প্রজাতন্ত্র দিবসে নিউদিল্লী, রাষ্ট্রপতি-ভবনে সংবর্দ্ধনা অনুষ্ঠান। বাম দিক হইতে বেগম ইস্কান্দার মির্জ্জা, পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু, ডাঃ খাঁন সাহেব এবং মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ্জা

ব্যাটালিয়ন দুইটি সঙ্গে লইয়াছিলেন। মহাদজীর দেহত্যাগকালে হেসিঙ্গ তাঁহার নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে মরাঠা রাজধানীতে পেরঁ, হেসিঙ্গ এবং ফিলোজের সৈন্যগণের উপস্থিতি দৌলৎরাওয়ের মসনদে উপবেশনের পথ যথেষ্ট সুগম করিয়াছিল সন্দেহ নাই। অতঃপর কয়েক বৎসর হেসিঙ্গ পুণানগরে অধিষ্ঠিত করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে হেসিঙ্গ পুত্র জর্জের হস্তে স্বীয় ব্রিগেডের ভারার্পণপূর্ব্বক সামরিক জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সিন্ধিয়া তাঁহাকে আগ্রা দুর্গের কিল্লাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতঃপর আগ্রা দুর্গেই অতিবাহিত হইয়াছিল। "অপক্ষপাত ন্যায়পরায়ণতার সহিত দয়াধর্ম্ম মিশাইয়া তিনি এরূপ সুচারুভাবে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন"* যে, তাহার ফলে তিনি সকলকার শ্রদ্ধাপ্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্য এবং ভদ্র ব্যবহারের জন্য যে কেহ একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সে-ই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া পারিত না। হেসিঙ্গ সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কিছুই শুনা যায় না। বরং সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের প্রথম ইতিবৃত্ত-লেখক মেজর লুই ফার্ডিনাণ্ড স্মিথ হেসিঙ্গের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইঁহাকে "সৎ এবং উদারচেতা ব্যক্তি এবং একজন সাহসী সৈনিক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আতিথেয়তার জন্য হেসিঙ্গ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তখনকার দিনে আগ্রা দর্শনে সমাগত ইউরোপীয় ভ্রমণকারীমাত্রেই তাঁহার আতিথ্যসুখ উপভোগে উপযুক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্পও নয়। ইঁহাদের অনেকের লেখার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে হেসিঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেটকাফ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়া-দরবারস্থ ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সহকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হেসিঙ্গের সহিত সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "আগ্রা দুর্গের গুলন্দাজ অধ্যক্ষ কর্ণেল জন হেসিঙ্গের আমন্ত্রণে আমি তাঁহার সহিত প্রাতর্ভোজন করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট আমি তাঁহার পুত্রকে দেখিয়াছিলাম,—যিনি উজ্জয়িনী-যুদ্ধে সেনা পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং যেখানে তাঁহার ব্যাটালিয়নসমূহ পরাভূত হইয়াছিল। মার্শাল নামক একজন ইংরেজ এবং আরও দুই ব্যক্তিকে আমি তাঁহার নিকট দেখি। উঁহাদের নাম আমি শুনি নাই। আহার্য্য-দ্রব্যের মধ্যে ছিল পোলাও (চাউল এবং ডিমসংযোগে প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য), মৎস্য, মাংস, পক্ষী-মাংস, কারি, ভাত, ষ্ট, কমলালেবু, পেয়ারা, বেদানা, ডিম, রুটি, মাখন, বিভিন্ন প্রকারের কেক, প্যানকেক এবং আরও কয়েক প্রকার ডিস—যাহাদের কথা আমার ঠিক মনে নাই। পনিরের উল্লেখ করিতে আমার ভুল হইয়াছে। ওলন্দাজরা যেমন হইয়া থাকে, এই ওলন্দাজটি তেমনই অতি ভদ্র ছিলেন এবং তাঁর চিত্ত যে খুব সচ্ছন্দপূর্ণ, সেকথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। পরদিন সকালে এবং রাত্রেও আমি তাঁহার সহিত ভোজন করিয়াছিলাম।"

"দীর্ঘকালস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক রোগযন্ত্রণা খ্রীষ্টানোচিত ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিয়া" হেসিঙ্গ আগ্রা দুর্গমধ্যে ২১শে জুলাই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। আগ্রা শহরের পুরাতন ক্যাথলিক সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার কবর আছে। তাজমহলের অনুকরণে রক্তবর্ণ বালুপ্রস্তরে লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে নির্ম্মিত সৌধটি সত্যই মনোহর। মহম্মদ লতিফ নামক জনৈক স্থপতি উহার নির্ম্মাতা। ভিক্টর জাকম নামক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পর্যটক উহাকে তাজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন; একথাটা অবশ্য নিতান্ত অসার। শুনিলেই বক্তার মস্তিষ্কের প্রকৃতিস্থতার প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়। সমাধি-সৌধটি বেশ সুন্দর, বড়জোর এই কথা উহার সম্বন্ধে বলা চলে। সুদীর্ঘ সমাধিলিপিতে হেসিঙ্গ সম্বন্ধে বক্তব্য সকল কথাই প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা প্রকৃত কথা বলিতে হইলে বলা উচিত যে, ঐ স্মারকলিপি হইতেই হেসিঙ্গ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়।

মরাঠাদিগের ইতিবৃত্ত-লেখক গ্রাণ্ট ডাফ হেসিঙ্গকে "একজন সম্মানার্হ ইংরেজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেসিঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার আরও একটি অসঙ্গত ভ্রম দেখা যায়। জর্জকে তিনি তাঁহার দেশীয়া রমণীর গর্ভজাত পুত্র বলিয়াছেন। দেবিদ্-বংশে কতকটা রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকিলেও উঁহারা সম্পূর্ণ দেশীয় ছিল না এবং জর্জ যে হেসিঙ্গের বিবাহিতা পত্নী মাদাম এনের পুত্র ছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহের কারণ দেখা যায় না।

হেসিঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র টমাস উইলিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। মরাঠা-সমরের অবসানের পর হিন্দুস্থানের সমরক্ষেত্রে ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের লীলাখেলা ফুরাইলে টমাস তাহার জননীর সহিত পাটনার অদূরবর্ত্তী দীঘা নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ৩০শে জুন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে টমাস দানাপুরে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদলের অধ্যক্ষ জেনারেল ব্রাউনের তৃতীয়া কন্যা জেনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার স্বল্পকাল পরেই টমাসের দেহান্ত হয় (২১।১০।১৮২০)। হেসিঙ্গ-নন্দিনী মাদেলিন দা মার্গারালেনের বিবাহ হইয়াছিল সিন্ধিয়ার অন্যতম খ্যাতনামা সেনানী কর্ণেল রবার্ট সাদারল্যাণ্ডের সহিত। ইঁহার কথা পরে বলিব।

অতঃপর হেসিঙ্গের জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণেল জর্জ উইলিয়ম হেসিঙ্গের কথা বলা যাইতেছে। অনুমান ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। নিতান্ত অল্প বয়সেই জর্জের সামরিক জীবন আরম্ভ হয়; দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার দুর্বিনীত শ্বশুর এবং তাঁহার সকল অনর্থের মূল সর্জ্জারাও ঘাটগেকে ফাইডেল ফিলোজের সহযোগিতায় বন্দীকরণ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট কৌশল এবং সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

* হেসিঙ্গের সমাধিলিপি।

তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের অনধিক। পিতার অবসর-গ্রহণের পর তিনি তাঁহার ব্রিগেডের অধ্যক্ষতা লাভ করেন এবং সিন্ধিয়ার আদেশে ব্যাটালিয়নগুলির সংখ্যা চারিটি হইতে আটটিতে পরিবর্দ্ধিত করেন। যশোবন্তরাওয়ের সহিত সমরে তিনি নিতান্ত ভীরুতা ও অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে (২।৭।১৮০১) তাঁহার সেনাদল শত্রুহস্তে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত* ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ব্রিগেডের একাদশ জন ইউরোপীয় অফিসরের মধ্যে আট জন রণক্ষেত্রে নিহত এবং অবশিষ্ট তিন জন আহত অবস্থায় শত্রুকরে বন্দী হইয়াছিল। কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জর্জ নিজে যুদ্ধের প্রারম্ভেই প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলেন। পথি-মধ্যে কোথাও তিষ্ঠিতে তাঁহার সাহস হয় নাই, একেবারে পিতৃ-সকাশে নিরাপদ আগ্রা-দুর্গের আশ্রয়ে পৌঁছিয়া তিনি বিরত হন।

ইহার পর হান্সির রাজা জর্জ টমাসের সহিত সমরে জর্জ হেসিঙ্গের আবার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ যুদ্ধেও তিনি কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। জর্জ গড়ের যুদ্ধে কর্ণেল লুই বুর্কুইয়ার পরাজয়ের পর পেরঁ জর্জকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। জর্জ পতনোন্মুখ অবরুদ্ধ গড় পরিত্যাগপূর্ব্বক মুষ্টিমেয় অনুচরসহ নৈশান্ধকারে আত্মগোপন করিয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া হান্সিতে পলায়নকালে টমাস হেসিঙ্গের দলের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে জর্জ হেসিঙ্গের ব্যাটালিয়ন-চতুষ্টয় লইয়া পেরঁর পঞ্চম ব্রিগেড গঠিত হয় এবং মেজর জন ব্রাউনরিগ নামক জনৈক আইরিশ জাতীয় সেনানায়কের প্রতি তাহাদের অধ্যক্ষতা প্রদত্ত হয়। পরিবর্ত্তে হেসিঙ্গ সাদরল্যাণ্ড পরিত্যক্ত দ্বিতীয় ব্রিগেডের নেতৃত্বলাভ করেন। কিন্তু এ পদে তাঁহাকে বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি আগ্রা দুর্গের কিল্লাদার নিযুক্ত হন। ইহার মাত্র কয়েক দিন পরেই ইংরেজদিগের সহিত সিন্ধিয়ার সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং সংবাদকালে অন্যান্য বহু ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় সৈনিকের মত জর্জেরও সামরিক জীবনের অবসান ঘটে।

ইংরেজদিগের সহিত সংগ্রাম আসন্ন হইলে পেরঁ নিরাপত্তার জন্য চল্লিশ লক্ষ টাকা, নিজ পত্নী এবং দুইটি সন্তানকে আগ্রা-দুর্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন আরও নানা স্থানে তাঁহার প্রভূত অর্থ রক্ষিত ছিল। কলিকাতার ব্যাঙ্কসমূহে তাঁহার প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা জমা ছিল। ইংরেজদিগের সহিত মরাঠাদের সমর প্রত্যাসন্ন দেখিয়া বিপুল ধনরাশির জন্য পেরঁর উৎকণ্ঠিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাঁহার সহিত বৈবাহিক কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ তিন জন সিনিয়র অফিসারের* এই সময় আগ্রা দুর্গে সমাবেশ শুধু আকস্মিক ব্যাপার না-ও হইতে পারে। আলিগড়ের নিকটে প্রতি-পক্ষকে একটা লোকদেখানো আক্রমণ করিবার ভান করিয়া পেরঁ আগ্রায় আসিয়া দেখা দিলেন (৪।৯।১৮০৩)। শত্রুহস্ত হইতে দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য নহে, তাঁহার আগমনের কারণ অন্যবিধ ছিল। নিজ পরিবারবর্গ এবং অর্থ লইয়া যাইবার জন্যই তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। হেসিঙ্গকে তিনি এ বিষয়ে আদেশ দিলে হেসিঙ্গ মাতৃষসা এবং তাঁর সন্তানদ্বয়কে পেরঁর নিকট পাঠাইয়া দিয়া অর্থপ্রেরণে স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা আসলে তদীয় প্রভু সিন্ধিয়া মহারাজের; একমাত্র তিনিই ঐ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারেন। হেসিঙ্গ পেরঁকে আরও জানাইলেন যে, ইচ্ছা করিলে তিনি দুর্গমধ্যে আসিয়া স্বহস্তে নেতৃত্বগ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু যতক্ষণ তিনি অর্থাৎ হেসিঙ্গ স্বয়ং দুর্গাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন, ততক্ষণ তিনি প্রাণপণে প্রভু সিন্ধিয়ার সকল শত্রুর বিরুদ্ধে আগ্রা রক্ষাকার্য্যে যত্নবান রহিবেন। পেরঁর দুর্গে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। সুতরাং এতদতিরিক্ত আর কিছু তিনি আগ্রা হইতে পাইলেন না।

পরদিবস ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল লেকের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া পেরঁ রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংরক্ষিত অর্থ পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করে। এই সময় দুর্গমধ্যে প্রায় চারি হাজার সিপাহী বর্ত্তমান। চারিদিকে ফিরিঙ্গি সেনানায়কগণের বিশ্বাসঘাতকতা দর্শনে উহারা পূর্ব্ব হইতেই নিজেদের অফিসরদের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়াছিল, [illegible] সেনাপতির আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে সন্দেহের মাত্রা বর্দ্ধিত হইল। সহসা একদিন অভ্যুত্থান করিয়া উহারা হেসিঙ্গ, সাদরল্যাণ্ড এবং [illegible] বন্দী করিল। এই সময় দাক্ষিণাত্য হইতে পঞ্চম ব্রিগেড [illegible] উপস্থিত হয়। ইঙ্গ-মরাঠা সমর [illegible] দেখিয়া পেরঁ উহাদের আগ্রা [illegible] প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলেন। এই দলে মেজর জন ব্রাউনরিগ, ক্যাপ্টেন জেমস [illegible], ক্যাপ্টেন [illegible], এবং ক্যাপ্টেন এটকিন্স এই চারি জন ইউরোপীয় ছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর যুদ্ধে লর্ড লেকের হস্তে বিধ্বস্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্রিগেডের কয়েকটি ব্যাটালিয়ান সিপাহী কোনমতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া আগ্রায় আসিয়া পৌঁছে। ইহাদের মধ্যে কোন ইউরোপীয় অফিসার ছিল না, কারণ উহারা ইতিপূর্ব্বেই শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। নবাগত কাহাকেও দুর্গরক্ষিগণ ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না। সমস্ত টাকা নিজেরাই গ্রাস করিবে

* যুদ্ধের পূর্ব্বে যে চারিটি ব্যাটালিয়ন তিনি আগ্রায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন শুধু সেই কয়টি রক্ষা পাইয়াছিল, বাকী চারিটি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

* ভাগিনেয়পুত্র কর্ণেল জর্জ হেসিঙ্গ, শ্যালিকা-জামাতার কনিষ্ঠ সহোদর কর্ণেল হিউ সাদরল্যাণ্ড এবং শ্যালক মেজর লুই দেরিদ। এই সময়ে আলিগড়ের কিল্লাদার ছিলেন পেরঁর জামাতা কর্ণেল এডওয়ার্ড পেড্রন।

তাহাদের এইরূপই অভিপ্রায় ছিল। সেই হেতু হাতের অংশীদার বঞ্চিত করিতে তাহাদের স্পৃহা ছিল না। তাহাদের হাতে যত বেশী ফিরিঙ্গি অফিসার প্রতিভূ থাকে ততই মঙ্গল, এই ভাবিয়া অবশেষে মাত্র পঞ্চম ব্রিগেডের অফিসার-চতুষ্টয়কে এই সর্তে দুর্গমধ্যে তাহা প্রবেশ করিতে দিয়াছিল যে তাঁহারাও সহকর্মিগণের মত বন্দীভাবে অবস্থান করিবেন, যুদ্ধ-পরিচালনা ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করিবেন না। সিপাহীরা এত যাবৎ ঐ অর্থরাশিতে হস্তার্পণ করে নাই কেন তাহা বুঝা যায় না। বোধ হয় বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে একমত হইতে না পারাই ইহার কারণ। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নবাগত সিপাহীগণ নগরমধ্যে অথবা দুর্গপ্রাকারের ঢালু পাড়ের নিম্নদেশে অবস্থান করিতে লাগিল।

এদিকে দিল্লী অধিকার করিয়া জেনারেল লেক আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। ৩রা অক্টোবর তারিখে তিনি আগ্রার অদূরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ইংরেজদিগের সৌভাগ্যক্রমেই যেন বিপক্ষবাহিনী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইল। লেক প্রথমে বাহিরের দলের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর নেতৃবিহীন সিন্ধিয়ার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল (১০।১০।১৮০৩)। এই যুদ্ধে তাহারা এই প্রকার দৃঢ়তা এবং সাহস দেখাইয়াছিল যে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া লেক নিজ ডেস্পাচে তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত পরিচালক কর্তৃক যদি এই দুর্ধর্ষ বাহিনী পরিচালিত হইত তবে যুদ্ধের ফলাফল কি হইত বলা যায় না। তিন দিন পরে হতাবশিষ্ট প্রায় তিন হাজার সৈনিক তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহাদের গ্রহণপূর্ব্বক কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পর বৎসর হোলকারের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধে উহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

অতঃপর লেক আগ্রা দুর্গ অবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। ডুড্রেনেক প্রমুখ চতুর্থ ব্রিগেডের ইউরোপীয় অফিসারগণ মথুরায় শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিলে সাবওয়ার খাঁ নামক এক ব্যক্তি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। উহারা এক্ষণে আগ্রা হইতে পনর ক্রোশ দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই দলে ৯০০০ পদাতিক এবং ১৫০০ সাদিসেনা (অশ্বারোহী) ছিল। অবরুদ্ধ দুর্গ উদ্ধারের কোন চেষ্টা ইহারা কেন যে করিল না, সে সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বিস্ময়প্রকাশ করিয়াছেন। সমরনীতিজ্ঞানসম্পন্ন উপযুক্ত সেনানায়কের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। শত্রুভয়ে উহারা ভীত হয় নাই বা তাহাদের সমরপিপাসা মিটিয়া যায় নাই—পরবর্তী লাসওয়ারীর যুদ্ধ (১।১১।১৮০৩) তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ যুদ্ধে তাহারা যে প্রকার শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল এবং ইংরেজ সেনাকে যে বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহার তুলনা অল্পই দেখা যায়। ইংরেজ সেনা মূর্চ্চা বাঁধিয়া দারুণ গোলাবর্ষণে দুর্গপ্রাকার চূর্ণ করিবার উপক্রম করিলে মরাঠাসেনা আত্মসমর্পণে সম্মত হয়। ইংরেজদিগের সহিত মধ্যস্থতা করিবার জন্য তাহারা বন্দী ইউরোপীয় অফিসারগণকে অনুরোধ করে। জেসিজের এবং তাঁহার নিজের স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি লইয়া কর্ণেল হিউ সাদারল্যাণ্ড* লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন:

"দুর্গাভ্যন্তরস্থ সৈন্যগণের পক্ষে অতঃপর আর বাধা প্রদানের চেষ্টা করা নিষ্ফল। আপনি এবং আপনার সৈনিকগণ আক্রমণ করিলে এমন এক দারুণ হত্যাকাণ্ডের উদ্ভব হইবে যাহার ফলে সকলে সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারে, একথা আমরা সকলকে তাহাদের বিশেষ উগ্র এবং দুর্দান্ত আচরণসত্ত্বেও বারংবার বুঝাইয়া বলাতে এক্ষণে উহারা কতকটা যুক্তি এবং বিচারের বশীভূত হইয়াছে।

"সে কারণ অন্য প্রাতে উহাদের নেতৃবৃন্দ একযোগে আমাদের নিকট আসিয়াছিল এবং এই পত্রের সহিত প্রেরিত দুর্গ পরিত্যাগের নিম্নলিখিত সর্তসমূহ—যাহাতে তাহাদের সকলকার নাম পর্য্যায়ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে, আপনার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য আমাদের অনুরোধ করিয়াছে। যদি দৈবক্রমে এই লেখার দরুণ অভাবিত কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে, তজ্জন্য আমাদের দায়ী করিবেন না। কারণ আমরা এখনও বন্দীশালায় রহিয়াছি।

"তাহাদের প্রস্তাবিত সর্ত এই প্রকার—এই পত্রপ্রাপ্তির পর আপনি যখন উচিত বিবেচনা করিবেন তখনই কামান বন্দুক এবং রসদাদিসহ দুর্গের অধিকার আপনার করে সমর্পিত হইবে। সরকারী অস্ত্রশস্ত্র এবং দ্রব্যাদি সমর্পণের পর সকলকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং দৈহিক অস্ত্র প্রদান করিতে হইবে এবং নগরমধ্যে অথবা অন্যত্র যেখানে তাহাদের পরিজনবর্গ আছে সৈনিকগণকে সে স্থানে যাইতে দিতে হইবে।"

দুর্গের বাহিরে অর্থ লইয়া গমনের অনুমতি প্রদান ভিন্ন অপর সকল সর্ত লেক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন আবার যুদ্ধ বাধিল। পরদিবস ইংরেজসেনা তাহাদের সমস্ত তোপমঞ্চ হইতে একযোগে অগ্নিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে দুর্গরক্ষী সেনাদল আত্মসমর্পণে সম্মত হইল (১৮।১০।১৮০৩)।

লক্ষ্ণৌ নগরে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইতে আগ্রার পতনের সংবাদ পাইয়া পেরঁ লেকের নিকট উক্ত চব্বিশ লক্ষ টাকা তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইংরেজ সেনাপতি সে কথায় কর্ণপাত করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। লুঠের মাল বা Prize Money বলিয়া তাহা সৈনিকগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। সেনাপতির নিজের ভাগে যে একটা বড় রকম অংশ পড়িয়াছিল ইহা সহজেই অনুমেয়। পেরঁ জীবনে এই অর্থের শোক ভুলিতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের

* হিউ এবং তাহার ভ্রাতা রবার্টকে সকলে অভিন্ন মনে করিয়া দারুণ ভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। রবার্ট সাদারল্যাণ্ড এ সময় আদৌ আগ্রা দুর্গে ছিলেন না।

পরও তিনি মধ্যে মধ্যে ইহার জন্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্ফল দাবি তুলিতেন।

সমরাবসানের পর ইংরেজ সরকার বন্দী ইউরোপীয় সৈনিকবৃন্দকে ইউরোপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা প্রধানতঃ ফরাসীদিগের বিরুদ্ধেই অবলম্বিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ জাতীয় ভাগ্যান্বেষিগণের মধ্যে অনেকেই কোম্পানীর কার্য্যগ্রহণ করিল। ইউরোপের সহিত হেসিঙ্গের কোন যোগসূত্র ছিল না। ভারতবর্ষই তাঁহার স্বদেশ হইয়া গিয়াছে, তিনি এখানেই রহিয়া গেলেন, এবং অতঃপর চুঁচুড়ায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন। ওলন্দাজদিগকে স্বজাত মনে করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কথিত আছে, কোম্পানীর কাগজ ছাড়া পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ইহারই প্রতি কটাক্ষ করিয়া উত্তরকালে কর্ণেল জেমস স্কিনার বলিয়াছিলেন, 'জর্জ হেসিঙ্গ যে প্রকার ধনী ব্যক্তি তাহাতে তাঁহার পক্ষে আগ্রা দুর্গ ভালমত রক্ষা করা সম্ভব ছিল না!' এ কথার সরল অর্থ এই যে, সঞ্চিত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবার ভয়ে হেসিঙ্গ কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। অবশ্য হেসিঙ্গের সপক্ষে বলিবার কথা এই আছে যে, উত্তেজিত সিপাহীরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, ইচ্ছামত কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার তখন ছিল না। তদ্ভিন্ন সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনার আক্রমণ হইতে দুর্গরক্ষা করার মত সামরিক যোগ্যতাই বা তাঁহার কতটুকু ছিল সেকথাও মনে রাখা প্রয়োজন।

চুঁচুড়ায় বাসকালে হেসিঙ্গের একটি শিশুপুত্রের মৃত্যু হয় (২৭।৭।১৮০৬)। সমাধিলিপিতে প্রকাশ, মৃত্যুকালে বালক আর, জবলিউ, হেসিঙ্গের বয়স ৩ বৎসর ৮ মাস ২৮ দিন হইয়াছিল। সে হিসাবে ২৯শে অক্টোবর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ উহার জন্মদিন। একাদশ মাস-বয়স্ক এই শিশু লেক কর্ত্তৃক আগ্রা অবরোধকালে দুর্গমধ্যে ছিল।

কিছুকাল পরে জর্জ কলিকাতায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার এই সময়ের জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। তাঁহার পত্নী এনের পিতৃপরিচয় বা অপর কোন বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কলিকাতা নগরীস্থ সাউথ পার্ক স্ট্রীট কবরস্থানে স্বামী-স্ত্রীর সমাধি বর্ত্তমান। স্মারকলিপিতে মৃত্যুকালে (৬।১।১৮২৬) জর্জের বয়স ৪৪ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং আনুমানিক ১৭৮১ খ্রীঃ তাঁহার জন্মকাল। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে ব্যারাকপুরে এন পরলোকগমন করেন (৩১।৮।১৮৩১)। তাঁহাকেও ঐ সমাধিক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ স্বামীর পার্শ্বেই সমাহিত করা হয়। এনের কবরের উপর কোন স্মারকলিপি নাই। বেঙ্গল ওবীচুয়ারীতে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৮ বৎসর ছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। সে কথা সত্য হইলে এন চুঁচুড়ায় সমাহিত হেসিঙ্গ-নন্দনের জননী ছিলেন না।

জর্জ এবং এনের তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র জন অগাষ্টাস ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে ব্রাইটম্যান নামক জনৈক ইংরেজ বণিকের কন্যা জেনকে বিবাহ করিয়াছিল। দ্বিতীয় পুত্রটির নাম ছিল উইলিয়ম জর্জ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার বিধবা পত্নী এমেলিয়ার কলিকাতায় দেহান্ত ঘটে। সুতরাং তাহার পূর্ব্বে কোন সময় ঐ ব্যক্তি পরলোকগমন করিয়াছিল। কনিষ্ঠ উইলিয়ম জর্জ পিতার ন্যায় সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করে। কন্যাটির নাম ছিল মাদেলিন বা ম্যাগডালেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কর্ণেল জন গেডিস নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক পুরুষের সহিত তাহার বিবাহ হয়। জর্জের পুত্রেরা কিন্তু সকলেই এ দেশের অধিবাসী হইয়া গিয়াছে। ইহাদের বংশধরগণকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস হ্যারিয়েট জেন হেসিঙ্গের মৃত্যু হয়। গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ বিভাগে উচ্চপদে একজন হেসিঙ্গকে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। বি-বি-সি-আই রেলের আজমীরের কারখানায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর. এ. হেসিঙ্গ নামক এক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। দার্জিলিং ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার ই. এ. এইচ. বি. হেসিঙ্গকেও ইহাদের অন্যতম বলিয়া জানা যায়।

মেজর লুই দেরিদ, ব্রাউনরিগ ও মার্শাল

মেজর লুই দেরিদ জন হেসিঙ্গের শ্যালক এবং জর্জের মাতুল ছিলেন। দেরিদ বংশ অনেক দিন হইতে ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। গ্রাণ্ট ডফ "বর্ণসঙ্কর অর্দ্ধ-ফরাসী" বলিয়া উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগের লেখকগণের মধ্যে অনেকেই সেকথা নির্বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দেরিদদিগের মধ্যে এ সময় দেশীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না। যদিও দীর্ঘকাল এ দেশে বাস করার ফলে উহারা অনেক বিষয়ে দেশীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে দেরিদরা এককালে পণ্ডিচেরীতে বাস করিত। সে কথা সত্য হইলে উহাদের হিন্দুস্থানে আগমনের সময় এবং কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। লুই দেরিদর যখন প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তখন তিনি হেসিঙ্গের ব্রিগেডের এক ব্যাটালিয়ন সৈনিকের অধিনায়ক। ইহার দুই ভগিনী—এন এবং মাদেলিনের যথাক্রমে জন হেসিঙ্গ এবং পেরঁর সহিত বিবাহ হইয়াছিল, সেকথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভ্রাতা-ভগিনীদিগের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে লুই আহত হইয়া শত্রুকরে বন্দী হইলে তাঁহার ভগিনীপতি হেসিঙ্গ চল্লিশ সহস্র টাকা মুক্তিপণ-বিনিময়ে যশোবন্ত রাও হোলকরের হস্ত হইতে তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন। দৌলত-রাও পরে তাঁহাকে ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ভাগিনের জর্জের সহিত লুইও আগ্রার পতনের পর ইংরেজদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন এবং সমরাবসানে তাঁহার মতই তিনিও এদেশে বাস করিতে থাকেন। ইউরোপের সহিত দেরিদ-বংশের যোগ বহু পূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ফ্রান্স তাঁহার নিকট বিদেশ ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না।

লুই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন এবং আলিগড়ে জেনারেল পেরঁর বাড়ীতে বাস করিতেন তাহা লেডী ফ্যানী পার্কসের এক প্রসঙ্গোক্তি হইতে জানা যায়।* গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত এণ্টি নামক স্থানে ২৩শে মার্চ্চ, ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লুইয়ের পত্নী এলেনের জন্ম হইয়াছিল এবং সুদীর্ঘ ৮৮ বৎসর বয়সে আগ্রা নগরে তাঁহার দেহান্ত হয় (২৫।৯।১৮৬৫)।† মাদাম খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিনী ভারতীয় রমণী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের দপ্তরখানায় সংরক্ষিত কতকগুলি দলিলপত্রে মাদামকে সর্ব্বত্র স্বীয় নামস্বাক্ষরের পরিবর্ত্তে "ঢেরাসই" করিতে দেখা যায়। সুতরাং তাঁহার অক্ষর-পরিচয় ছিল না মনে করাই স্বাভাবিক।

লুইয়ের বহুসংখ্যক সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের বিশেষ পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। এখানে শুধু উহাদের নামগুলি দেওয়া যাইতেছে—

এন, মাদেলিন, টমাস, আনা, রোজালিন, জেমস, জর্জ্জ, উইলিয়ম, আলেকজাণ্ডার, ফ্রান্সিস, মেরী, জন। আগ্রানগরে লুই দেদিঁর বংশধরদের আজও দেখা যায়। গত শতাব্দীর শেষ সপ্তকের মধ্যে মিঃ কীন যখন আগ্রার জেলা-জজ ছিলেন তখন মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে উহারা প্রায়ই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তাহাদের মধ্যে সাজপোশাক ভিন্ন ইউরোপীয়ত্বের অপর কোন নিদর্শন ছিল না; গাত্রবর্ণে এবং ভাষায় তাহারা হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছিল।‡

অতঃপর ব্রাউনরিগ এবং মার্শাল সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। মেজর জন ব্রাউনরিগ জাতিতে আইরিশ ছিলেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল প্রথম লর্ড মিণ্টোর (১৮০৭-১৩ খ্রীঃ) সহিত তাঁহার আত্মীয় সম্পর্ক ছিল বলিয়া কথিত আছে। সেকথা কতদূর সত্য বলিতে পারি না। সাহসী এবং সুদক্ষ সৈনিক বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। সে কারণ প্রভু সিন্ধিয়া মহারাজ এবং অধীনস্থ সিপাহীগণ সকলের নিকট হইতেই তিনি সম্মান শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৈনিকগণের মুখে তাঁহার নাম বিকৃত হইয়া "বুরাঙ্গি সাহেব" (অর্থাৎ ব্রাণ্ডি) এই আকারে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম জীবন বা দেশীয় দরবারে কর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কোলাপুর অবরোধে তাঁহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে কর্ণেল ফিলোজ প্রসঙ্গে সে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পর বৎসর দাক্ষিণাত্যে পেশবার সেনানায়ক পরশুরামরাওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে তাঁহাকে লিপ্ত দেখা যায়। অনন্তর সিন্ধিয়ার মালব অভিযানে তিনি সহগামী হইয়াছিলেন। নর্ম্মদাতটে যশোবন্ত-রাও হোলকরের সহিত সংঘটিত যুদ্ধ (জুন ১৮০১) তাঁহার সেনাপতিত্বের এবং সামরিক কৃতিত্বের বিশিষ্ট পরিচায়ক। ইতি-পূর্ব্বে শেভালিয়ে ডুদ্রেনেক প্রসঙ্গে সে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। ইন্দোর-যুদ্ধে বিজয়লাভে তিনি সাদারল্যাণ্ডকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল কৃতিত্ব হেতু তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ব্রাউনরিগ দৌলতরাওয়ের বিশেষ সম্মান ও প্রীতি অর্জ্জনে সমর্থ হন।

ইহার ফলে পেরঁর মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইয়াছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পেরঁ যখন সিন্ধিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হিন্দুস্থান হইতে উজ্জয়িনী আগমন করেন তখন তিনি ব্রাউন-রিগের নামে প্রভুর নিকট নানাবিধ মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহার পতন ঘটাইয়াছিলেন। স্কিনার বলেন, পেরঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু স্বল্প-কাল মধ্যে সসম্মানে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি নিজ পদে পুনর্নিযুক্ত হন। কয়েক মাস পরে তাঁহাকে পেরঁর হেডকোয়ার্টার্স কোয়েলে উপস্থিত দেখা যায়। পর বৎসর নবগঠিত পঞ্চম ব্রিগেডের নেতৃত্ব লইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজদিগের সহিত সমর আসন্নপ্রায় হইলে বলবৃদ্ধির জন্য সিন্ধিয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি ব্রাউনরিগ আগ্রার নিকট আসিয়া উপনীত হন। সিপাহীদের হস্তে তাঁহার এবং অপরাপর ইউরোপীয় সৈনিকগণের বন্দীদশা এবং ইংরেজ-করে আত্মসমর্পণের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমরাবসানের পর ব্রাউনরিগ কোম্পানীর কার্য্যে প্রবেশ করেন এবং পর বৎসর হোলকারের সহিত যুদ্ধে সিন্ধিয়া-বাহিনীর ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত এক দল সৈনিকের নেতৃত্বে তিনি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর বেশী দিন যুদ্ধ করিতে হয় নাই। হিসার জেলার অন্তর্গত সারসা নামক স্থানে প্রবল শত্রুসেনার সহিত সংঘটিত এক সংগ্রামে তিনি প্রাণ হারাইয়াছিলেন (১৯।২।১৮০৪) এবং তাঁহার সেনাদল সম্পূর্ণরূপেই বিধ্বস্ত

---

* *Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque*, Vol. II.

"সাহেব বাগ" নামক এই বাড়ীটিতে দি বইন এবং পেরঁ উভয়েই বাস করিয়াছিলেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানমধ্যে অতীতের মৌন সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান জরাজীর্ণ অট্টালিকাটি আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। প্রকাণ্ড ফটকের উভয় পার্শ্বে প্রহরীদের বাসকক্ষের এবং প্রতি কোণে অট্টালক (tower) থাকার নিদর্শন আছে। বাড়ীটি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দেও লুইয়ের পৌত্রগণের অধিকারে ছিল। পরে ইহা সেটেলমেণ্ট আপিসরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। উদ্যানমধ্যস্থ বৃহৎ একটি কূপগাত্র-সংলগ্ন ফারসী লিপি হইতে জানা যায় যে, পেরঁ কর্ত্তৃক উহার জীর্ণসংস্কার সাধিত হইয়াছিল। গাড়ীবারান্দার ঊর্দ্ধ-দেশে "perron, 1802" এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ আছে। অপর একটি ফারসী লেখাতে তাঁহার দীর্ঘ উপাধিসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে।

† Blunt: *List of Inscriptions on Tombs and Monuments in the United Provinces*, No. 169.

‡ H. G. Keane: *Hindusthan under Free Lances*, p. 191.

হইয়া যায়। দ্বাদশবর্ষব্যাপী বিরামবিহীন কঠিন সামরিক জীবনে ইহাই তাঁহার প্রথম এবং একমাত্র পরাজয়।

ক্যাপ্টেন জেমস মার্শাল স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং সদ্বংশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কোম্পানীর নৌবহরে মিডশিপম্যান বা শিক্ষানবীশ অংস্তন অফিসারদের পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যে "কষ্টপূর্ণ বৈচিত্র্যময় জীবনের সন্ধানে" তিনি সে কার্য্যে ইস্তফা দিয়া দেশীয় দরবারে ভাগ্যান্বেষণে গমন করেন। সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীতে তাঁহার প্রবেশের সময় অথবা তাঁহার সামরিক জীবন সম্বন্ধে কোন কথাই জানা নাই। ফেলিজের দলের একটি ব্যাটালিয়নের অধ্যক্ষতা হইতে মনে করা যাইতে পারে, উহাদের কোন কোন যুদ্ধাভিযানে তিনি সমুপস্থিত ছিলেন। আগ্রার ইংরেজ-করে তাঁহার আত্মসমর্পণের কথা বলা হইয়াছে। সমরাবসানে সিন্ধিয়ার ভূতপূর্ব্ব সৈনিকগণকে লইয়া ইংরেজরা কতকগুলি "ইরেগুলার ব্যাটালিয়ন" গঠন করেন। এইরূপ একটি দলের অধ্যক্ষতা মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনসহ তাঁহারা মার্শালকে দিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাউনদিগের মত মার্শালকেও আর বেশীদিন নূতন কর্ম্মজীবনযাপন করিতে হয় নাই। পর বৎসর হরিয়ানা প্রদেশে একটি যুদ্ধে তিনি নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে মেজর লুই স্মিথ স্বীয় গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন, "মার্শালের মত চরিত্রের লোক সচরাচর দেখা যায় না। আমি অনেক দিন হইতে তাঁহাকে জানিতাম। উহার বহুবিধ সৎ এবং মনোহর গুণরাজির সহিত যাঁহাদের পরিচয় ছিল তাহারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করিত। জীবনের এক শ্রেষ্ঠ সময়ে তিনি প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বন্দুকের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হইবা মাত্র তিনি তাঁহার বন্ধু ক্যাপ্টেন হেরিয়োটের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, এক বার তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষীণ হাস্য করিলেন; পর মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণহীন দেহ ভূমে নিপতিত হইল।"

ক্রমশঃ

মাদ্রাজী বিয়ে

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

রাজপথে এক দল সুসজ্জিত নারীপুরুষ, বালক-বালিকাসহ পদব্রজে এগিয়ে আসছে, তাদের বেশভূষায় বৈচিত্র্য। মহিলাদের পরিধানে সবুজ, লাল, নীল ময়ূরকণ্ঠী ইত্যাদি গাঢ় রঙ-বেরঙের রেশমী শাড়ী, পরবার ধরণটা একটু অন্য রকমের, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শাড়ীখানা পরেছে। নাকে পাথর-বসানো বড় নাকফুল, এবং অধিকাংশ মহিলার কানেই মুক্তা বা পাথরবসানো কানফুল। গলায় সোনার বড় বড় ফুল-ওয়ালা হার এবং হাতেও ঐ ধরণের মোটা চুড়। পায়ে রূপার আংটি। কপালে সিন্দুরের বড় ফোঁটা, মস্তক অবগুণ্ঠনশূন্য।

পিছনে পুরুষের দল। তাদের মাথায় জরির পাড় দেওয়া মেজেণ্টা রঙের পাগড়ী। গায়ে রেশমী কোটের উপর জরির কিনারা দেওয়া রেশমী চাদর পাট করে রাখা, পায়ে শুঁড়তোলা লাল মাদ্রাজী চপ্পল। তাদের পিছনে তুমুল বাদ্যভাণ্ডের ভিতর দিয়ে ফুলের মালায় সুসজ্জিত মোটর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মোটরে ফুলের মুকুট মাথায় বর বসে আছে, এক পাশে বরের পিতা, অন্য পাশে পুরোহিত। বরের পিতার মুখে বেশ একটু ভারিক্কী ভাব। বরের পিছনে আরও কয়েকটি মোটর বরযাত্রীসহ ধীরে ধীরে চলেছে। এই শোভাযাত্রা হ'ল একটি মাদ্রাজী বিয়ের।

আমরা নিমন্ত্রিতা মহিলারা উৎসুক হয়ে 'বরাত' দেখতে লাগলাম। মোটর এসে দরজায় থামল, কনের পিতা নারকেল হাতে নিয়ে বরকে বিশেষ সংবর্দ্ধনা করে নামালেন। সংক্ষিপ্ত মাদ্রাজী বিয়ে দেখে, পান সুপারি হাতে নিয়ে ফিরে এলাম, কৌতূহল মিটল না। প্রতিবেশিনী মাদ্রাজী তরুণী মহিলাকে বললাম, "তোমাদের দেশের বিয়ের পদ্ধতি কি রকম সব খুলে বল।"

তরুণীটি হেসে অস্থির, বললে, "মাদ্রাজী বিয়ের পদ্ধতি দিয়ে তুমি কি করবে?"

বললাম, "সে যাই করি না কেন, তুমি ত তোমার বিয়ের কাহিনী বল।"

তরুণীটির মুখে লজ্জার আভা ফুটে উঠল, বললে, "ভুলে গেছি।"

"তা হলে আজকের বিয়ের পদ্ধতিটাই বল।"

একটু উত্তেজিত হয়ে তরুণী বললে, "শহরে বিয়েতে আজকাল আনন্দ-উৎসব এক রকম নেই-ই। আমি পুরোহিত-বংশের মেয়ে, আমার বিয়ে হয়েছিল তাঞ্জোরে, তা কত অনুষ্ঠান, কত নিয়ম। আমরা তাঞ্জোরে তামিল ভাষা ব্যবহার করি। আমাদের ভাষায় সধবাকে সুমঙ্গলী, বরকে মহাপিল্লই, কনেকে কল্যাণপন্ন ও বিয়েকে কল্যাণম্ বলা হয়।

বিয়ের প্রথম অনুষ্ঠান হ'ল "লগ্নপত্রিকা"। সেদিন বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা হয়। পুরোহিত শুভদিন দেখে বিয়ের মুহূর্ত্ত ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের দিন ঠিক করেন এবং ঐ লগ্নপত্রিকা অনুযায়ী বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপানো হয়। মাদ্রাজে বরপণ যথেষ্ট আছে, লগ্নপত্রিকার দিনই বিয়েতে দেনাপাওনা সব বিষয় স্থির হয়, এবং প্রায়ই পণের অর্দ্ধেক টাকা ঐ দিন অগ্রিম দিতে হয়।

বিয়ের এক দিন আগে হয় "নিশ্চিত তাম্বুলম্," মানে পাকা পান সুপারি। বরকে শোভাযাত্রা করে ধুমধাম সহকারে সেদিন কনের বাড়ীতে নিয়ে আসে। বরের পিতা এক পাশে বর ও অন্য পাশে কনেকে বসিয়ে নিজে মধ্যখানে বসে। সামান্য পূজা ও মন্ত্রাদি পাঠ হয়। বরের পিতা ভাবী পুত্র-বধূর হাতে একটি রেশমী শাড়ী, কাঁচুলি ও একটি নারকেল দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন।"

আমাদের ব্রাহ্মণ-মেয়েদের মধ্যে পর্দ্দাপ্রথা নেই, কাজেই অবগুণ্ঠনশূন্যা কনে বরকে ও বর কনেকে সেদিনই দেখে নেয়, বিয়ের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাদের সংশয়ের দোলায় দুলতে হয় না।

জিজ্ঞেস করলাম, "তা হলে তুমিও ত বিয়ের আগেই তোমার বরকে দেখে নিয়েছ ? পছন্দ হয়েছিল কি ?"

তরুণীর চোখমুখের লজ্জাভরা মিষ্টি হাসিটুকু বুঝিয়ে দিল যে বর পছন্দ হয়েছে। তরুণীটি নবাববাহিতা। ইনি পুরোহিত-বংশের কন্যা ও একজন সরকারী কর্ম্মচারীর স্ত্রী।

তরুণীটি উৎসাহের সঙ্গে বলে চললেন—"সেদিন রাতে কনের বাড়ীতে বিরাট ভোজ হয়, তার নাম "মহাপিল্লই বিরুন্দ' অর্থাৎ বরের জন্য ভোজ। বর কনের বাড়ীতে খেতে আসে না, বরের জন্য থালা ভরে ভরে ভোজের খাবার পাঠাতে হয়।

আমাদের মাদ্রাজে বিয়ে রাত্রে না হয়ে দিনে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের দিন সকালে বরের বাড়ীতে "জানোয়াসম" অর্থাৎ পৈতাধারণের উৎসব ও কনের বাড়ীতে "কন্দনধারণম্" উৎসব হয়। সেদিন বরের পৈতা বদল করে বরকে নূতন পৈতা গলায় ও কনের হাতে হলদি-রসানো সুতা বেঁধে দেওয়া হয়। এর পর বর বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা করে কনের বাড়ীতে আসে। বর গাড়ীতে বসে থাকে ও পুরোহিত বরের হয়ে মন্ত্র বলতে থাকে।

বর বলছে, "আমি কাশী চললাম, বিয়ে করব না...." ইত্যাদি, তখন বরের পিতা এসে বরকে যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করে হাতে নারকেল দিয়ে গাড়ী থেকে নামায়। বরের এই মানভঞ্জনের পালাকে বলা হয় "কাশিযাত্রা"।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সবারই বিবাহ-পদ্ধতি এক। শুধু সামান্য দু'চারটি স্ত্রী-আচার একটু পৃথক হয়।

ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিয়ের পূর্ব্বে তিন দিন ধরে বর ও কনেকে তেল-হলুদ মাখানো উৎসব হয়, সব সধবা মিলে আনন্দের সহিত এই উৎসব করে। বিয়ের দিন প্রভাত থেকে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বিয়ের সব অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়।

কাশীযাত্রা অনুষ্ঠানের পর বিশেষ সমাদরে বরকে বিয়ের মণ্ডপে নিয়ে নূতন পিঁড়ির উপর দাঁড় করানো হয়। বাড়ীর ভিতর থেকে কনেকে বরের সামনে নিয়ে আসে ও একখানা নূতন পিঁড়িতে দাঁড় করায়। কনে বরের গলায় মালা পরিয়ে দেয়, বরও কনের গলায় মালা পরায়,—এভাবে বর-কনের মালা বদলের পর বরকনেকে ঝোলাতে বসানো হয়।

দক্ষিণাঞ্চলে "ঝোলা" মানে দোলনার প্রচলন খুব বেশী। অধিকাংশ বাড়ীতেই ঝোলা থাকে। একটা প্রমাণ সাইজ তক্তপোষ, মোটা মোটা লোহার শিকল দিয়ে ঘরের মধ্যভাগে ঝুলিয়ে রাখা হয়, আর বাড়ীর ছেলেমেয়ে, কর্ত্তা-গিন্নী মাঝে মাঝে ঝোলায় বসে অবসরবিনোদন করে। অতিথি-অভ্যাগত এলে তাদেরও কখনও কখনও ঝোলাতে আদর করে বসানো হয়।

বরকনেকে ঝোলাতে বসিয়ে তিন জন সৌভাগ্যবতী একটা ঘটির উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, আর এক ঘটি জল ও চাল হাতে নিয়ে ঝোলায় উপবিষ্ট বরকনেকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে, তার পর বরকনেকে ঝোলা থেকে নামিয়ে অন্দরে নিয়ে আসে। তখন পুরস্ত্রীরা ঝোলার গান গাইতে থাকে :

> বজ্র বৈডূর্য্যিস্তাল, কালাহল নাটি,
> মগতঙ্ক তাজিলৈত, কোড়ুঙ্গৈ পুট্টি।
> উচ্ছিতরত্ন পতিত্ত, পঙ্গৈ শের্ত্তু,
> উহন্দ সারঙ্গনাথর, আডিক্কুঁজল।

'ভগবান সারঙ্গনাথ দোলনায় দুলছেন। দোলনার থাম ও শিকল হীরা ও সোনায় জড়িত, দোলনাটি সোনার আর তাতে রত্ন ঝকঝক করছে—দেখে মনে হয় ভগবান সারঙ্গনাথ ইন্দ্রপুরীতে দোলনায় দুলছেন।'

ঘরের ভিতর হোম হতে থাকে, পুরোহিত বসে পূজা পাঠ করে। এই সময় কনের বাড়ী থেকে বরের জন্য জরিপাড় পট্টবস্ত্র ও চাদর এবং বরের বাড়ী থেকে কনের জন্য শাড়ী ও কাঁচুলি উপহার আসে। সেই সব নববস্ত্র বরকনেকে পরানো হয়। পিতার কোলে কনেকে বসায় এবং সধবা ও সৌভাগ্যের চিহ্ন "মঙ্গলসূত্র" কনের গলায় বর পরিয়ে দেয়। কনে যাবৎ সধবা থাকে, তাবৎ গলা থেকে এই মঙ্গলসূত্র কখনও খোলে না।

মঙ্গলসূত্র পুরোহিতের মন্ত্রপূত হলুদে ছোপানো সুতোয় গাঁথা থাকে, বিয়ের পর মেয়েরা সেটাকে সোনার হারে লকেটের মত পরে। যারা শিবভক্ত তাদের মঙ্গলসূত্রে সোনার একটি পাতে আড়াআড়ি ভাবে তিনটি রেখা থাকবে, অথবা প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা সোনার পাতে হরপার্ব্বতীর মূর্তি বা ফুল খোদাই করা থাকবে। যারা বিষ্ণুভক্ত তাদের মঙ্গলসূত্রের সোনার পাতে শুধু সোজা একটা রেখা অঙ্কিত থাকবে।

কনের গলায় মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দেবার পর বর ডান হাতে কনের ডান হাত নিয়ে তিন বার হোমের অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে। এই অনুষ্ঠানের পর বিবাহ সমাপ্ত হয়। তারপর নানা রকম স্ত্রী-আচার আছে, তা অনুষ্ঠিত হয়।

বরকনেকে মুখোমুখি করে দুখানা পিঁড়িতে বসানো হয়, মধ্যে মশলা পিষবার শিল-পাথর রাখে। কনে ঐ শিল-পাথরের উপর পা দেয় এবং বর একটা রূপার আংটি কনের পায়ের আঙুলে পরিয়ে দেয়। সেই আংটির নাম হ'ল "সিথু"। সখী ও ভ্রাতৃবধূরা এই আংটি পরানো ব্যাপার নিয়ে বরকে খুব জব্দ করে। আগেকার দিনে বিয়ের কনেরা ছিল ছোট ছোট। পুতুলখেলার মত বিয়ের সব অনুষ্ঠান করে যেত। আমার ত বেশ বয়স হয়েই বিয়ে হয়েছে, বৌদি আর সইয়েরা মিলে আমাকে নিয়ে যা কাণ্ড করেছে তা আর বলবার নয়।

এই আংটি পরানো পর্ব্ব শেষ হলে বর নববিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে নিজ আবাসস্থানে চলে যায়। সেখানে শাশুড়ী হাতে নারকেল দিয়ে বরবধূকে বরণ করে নেয়। পাঁচ বা তিন জন সুমঙ্গলী দুধকলা চটকে সেই দুধকলা প্রথমে বরকে খাওয়ায় ও পরে সেই উচ্ছিষ্ট দুধকলা কনেকে খাওয়ায়। অবশ্য, ক্ষত্রিয়েরা উচ্ছিষ্ট খায়, আমি ব্রাহ্মণকন্যা, কাজেই আমাকে উচ্ছিষ্ট খেতে নাই। এই দুধকলা খাওয়ার নাম হ'ল "পালম"।

বিয়ের দিন বরকনে ফল দুধ মিষ্টি খেয়ে থাকে, রাত্রে ভোজের ভাত তরকারি খায়। বরের বাড়ীতে সত্যনারায়ণ-পূজা ও সামান্য স্ত্রী-আচারাদির পর বরকনে আবার কনের বাড়ীতে ফিরে আসে।

অপরাহ্ণে নালঙ্গু উৎসব সুরু হয়। রাত্রে বিয়ের বড় ভোজ হবার পর বরকনেকে বসিয়ে সবাই যে যার উপহার দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে। বিয়েতে কন্যাপক্ষকে নির্দ্ধারিত পণ ত দিতেই হয়, তা ছাড়া কনের হাত, গলা ও কানে সোনার গয়না, শাড়ী কাপড়, খাট, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, রান্নার বাসন-কোসন এবং বরের খাবার জন্য রূপার থালা, গ্লাস ও ছোট চামচ দিতেই হয়।

অপরাহ্ণের নালঙ্গু উৎসবে অল্পবয়সী বউদিরা খুব আমোদ-আহ্লাদ করে। তরুণীরা মিলে একটা থালাতে হলুদ আর চূণ গুলে লাল রং তৈরি করে রাখে, ভ্রাতৃবধূ ও সখীরা বরের হাত দিয়ে কনের পায়ে ও কনের হাত দিয়ে বরের পায়ে সেই রং লাগিয়ে দেয়। এই পা ধরাধরির ব্যাপারে মেয়েরা খুব হৈ চৈ করে নেয়। আমাদের দেশে বিয়ের সময় বরের সঙ্গে বরের বাড়ীর মেয়েরাও আসে। কনের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে তারা বিয়ের উৎসব দেখে ও আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেয়। এই নালঙ্গু উৎসবের সময় দু'পক্ষেরই মেয়েরা একত্রিত হয়ে বেলি, কুন্দ, জুঁই এসব সুগন্ধি ফুল দিয়ে তোড়া বাঁধে ও সেই ফুল দিয়ে ফুলখেলা হয়।

কনের দলের মেয়েরা কনের হাত ধরে বরের গায়ে ফুল ছুঁড়ে মারে, বরের দলের মেয়েরাও বরকে দিয়ে কনের গায়ে ফুল ছুঁড়ে মেরে তার পাল্টা জবাব দেয়। এ ভাবে নানা প্রকার হাস্যপরিহাসের ভিতর দিয়ে স্ত্রী-আচার সমাপ্ত হয়। আমি বয়স্থা মেয়ে ছিলাম, আমার ননদরা ফুল ছুঁড়ে খেলবার সময় আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে," বলতে বলতে তরুণীটির মুখে লাজরক্তিম আভা ফুটে উঠল, বোধ হয় নিজের বিয়ের মধুর স্মৃতিতে।

এখানে একটি নালঙ্গুর গান (গোপী কৃষ্ণকে আহ্বান করছে) দেওয়া হ'ল :

> নলংগিড়ওয়ারই নন্দকুমারা. ওয়েধমে ওয়ারায়,
> ওয়েধমে ওয়ারায়. বেণু গোপালা, বিজয় গোপালা।
> পটু পায়গলু পোটিরিরুত্ত, পাদতৈতারুম,
> মেলকারণ বংলু, কাতুহরকিরাণ, ভেড়িনইয়াত্তল ওয়ারুণ।

গোপী কৃষ্ণকে বলছে, "প্রভু নালং তৈরি হয়েছে। আমার বেণু গোপাল, বিজয় গোপাল, শীঘ্র এস। তোমার জন্যে রেশমের চাদর বিছানো হয়েছে, এখন পর্য্যন্ত তুমি এলে না, শীঘ্র এস। আমার গোপাল তুমি দেরি করছ কেন? তোমার আসতে দেরী হচ্ছে বলে শানাইয়ের মধুর রাগিণী বাজছে না। রাসলীলার প্রভু, আমার মনচোর, প্রিয় গোপাল শীঘ্র এস।

শ্রেষ্ঠ দান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

এক

দেরাদুন,
৭ই জুন, ১৯৫০।

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার চিঠি পেলাম। স্পষ্টই বুঝতে পারছি এখনও তোমার ক্ষত শুকোয় নি। কবিতা চলে গেছে। স্বামীর কর্তব্য তুমি শেষ পর্যন্ত করেছ, সেদিক দিয়ে তোমার অনুশোচনার অবকাশ নেই। বাকি রইল তোমার হৃদয়ের শূন্যতা। কিন্তু আসলে সে ত শূন্যতা নয়, ভগ্ন হৃদয়ের ব্যাকুলতারই বিকার সেটা।

স্থির হয়ে চিন্তা করলেই, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলেই বুঝতে পারবে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত হলেই ত আর হারায় না কিছু। স্থূল দৃষ্টিতে যে আড়াল হয়েছে, অণু-পরমাণুতে তারই সূক্ষ্ম ব্যাপ্তি আজও তোমাকে ঘিরে।

কবিতা আর নেই,—তোমার মনে হচ্ছে চোখের সব জ্যোতি বুঝি হারিয়ে গেছে, সব বাতাস বুঝি-বা থেমে গেছে। কিন্তু ভেবে দেখো, তার আহ্বান আজও দিকে দিকে তোমায় ডাকছে। আত্মকেন্দ্রিক সংসারভার নেমে গেছে মহত্তের বিশ্বকেন্দ্রে। একটা উদ্দেশ্যও পেলে জীবনে—তার সন্তানদের চোখের সামনে রেখে মানুষ করে তোলা।

আমি তোমার চিরদিনের বন্ধু। আবাল্য তোমায় শ্রদ্ধা করেছি। ভালবেসেছি বলতেও আজ আমার কোন কুণ্ঠা নেই। তাই তোমার কাছে সকরুণ মিনতি জানাই। কবিতার স্মৃতি বহন করে তার প্রিয়কর্ম করে যাও। এর চেয়ে বড় সাধনা বা সান্ত্বনা আমি ত খুঁজে পাই নি।

তোমার চিঠি পড়ে কেবলি আমার মনে হয়েছে, তুমি আমার কাছে অনেক কিছু আশা কর। তোমার মনের সে ইচ্ছা সঠিক অনুমান করতে পারলাম না। তবে তোমার সে আকাঙ্ক্ষা যদি সমস্ত পার্থিব কামনার ঊর্ধ্বে হয়, স্পষ্টই জানাচ্ছি, আমি তোমার চিরদিনের বন্ধু হয়ে রইলাম। আমার সামান্য ক্ষমতায় যা-কিছু সম্ভব—অবশ্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার বেশী আশা করলে, এক দিন যা সম্ভব হয় নি, আজ তা দিতে পারব না।

বেশ বুঝতে পারছি তোমায় সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেরও কিছু অকারণ অভিমান বেরিয়ে আসছে। কিন্তু সেটুকুও তোমারই ভালোর জন্যে, পাছে বেশী চাইতে গিয়ে নিরাশ হও।

আমি নারী। সমবয়সী হলেও তোমার চেয়ে আমার স্বাভাবিক অনুভূতির জ্ঞান অনেক বেশী। যদি সুদূর অতীতে চলে যাও—সেদিনের সব কথা তোমার মনে আছে কি না জানি না, কি দেখতে পাও? হয়ত দেখবে সমবয়সী একটি রুগ্ন মেয়ের সঙ্গে নিতান্ত শৈশবের খেলাধূলায় দিন কাটিয়েছ, আর সদাসর্বদা তার সঙ্গে খুনসুটি করেছ, তাই না? তোমার উদ্দাম স্বভাবের সমস্ত অত্যাচার সে নীরবে সহ্য করেছে বলেই হয়ত সে তোমার মনে কোন রেখাপাত করে যেতে পারে নি।

শৈশবে মাতৃহারা বলে আমার বাবা-মায়ের যে কুণ্ঠাহীন স্নেহ-মমতা পেয়েছিলে, তাও ভুলেছ কি না বলা শক্ত?

তারপর 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'র দিনটা মনে আছে নিশ্চয়। নারদ-প্রতিম বাঁড়ুজ্যে মশায়ের অকালে তালবর্ষণ ও কানমলার ভিতর দিয়েই ত আমাদের বিদ্যারম্ভ হয়েছিল একসঙ্গে। ঠিক দুটো বছর,—তার পরই এল এক দীর্ঘ ছেদ, মাঝে দশ বছরের ব্যবধান। অর্থাৎ, আট বছর বয়সে দিল্লী চলে গেলে, ফিরে এলে আঠার বছরের এক তরুণ কিশোর।

প্রথম যেদিন আবার আমাদের দেখা হয়েছিল, কে বেশী লজ্জা পেয়েছিল, আন্দাজ কর ত? মনে পড়ে কি, সেদিন তুমি আমার চোখেমুখে কিসের আভাস পেয়েছিলে? হয়ত বলবে, তুমি কারও মুখের দিয়ে চাও না। এ-ও বলতে পার, লজ্জা মেয়েদের সহজাত বলে লক্ষণীয় কিছু নেই তাতে। সব মানলাম। কিন্তু আজ একবার সহজ করে বল ত, সেদিন কি তোমার মনে কিছুই উদয় হয় নি, কিছুই আশা কর নি আমার কাছে? সেদিন তুমি সাবালক হও নি বললে সত্যের অপলাপ করবে। বরং এ কথাই বলব তুমি আমায় উপেক্ষা করেছিলে।

তাই আজ এতদিন পর আবার তোমার ডাক পেয়ে সহসা সেই সুপ্ত চেতনা অভিমান হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তাই বলে মনে করো না, সুযোগ বুঝে আজ আমি তার প্রতিশোধ নিতে এসেছি। তত নিষ্ঠুর আমি নই। আমি কেবল মাঝের দিনগুলো গুছিয়ে সাজাবার চেষ্টা করছি, নিজের দিকটা হাল্‌কা করবার জন্যে।

তারপর একই শহরে আরও ছ'টা বছর ত কেটে গেল, কিন্তু তোমার উদাসীনতা কাটল কৈ? স্বীকার করছি, বাবা পুরানো কালের গোঁড়া মানুষ ছিলেন। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা পছন্দ করতেন না। কিন্তু সে নিয়ম ত

তোমার জন্তে ছিল না। তবু কেন এড়িয়ে চলতে ? আমি কেন যেতাম না ?—সেখানে আমার নারীত্বের অভিমান ছিল।

প্রথম কথা, ডাক্তারের একমাত্র সন্তান তুমি। এম-এস্‌সি পড়ছ, বড় ডাক্তার হবে বলে। আমি সামান্ত শিক্ষকের মেয়ে, বিদ্যাতেও সমকক্ষ হতে পারি নি যে সমান তালে মিলতে পারি। তা ছাড়া আর একটি প্রতিবন্ধ ছিল। পাড়ার মেয়েদের মধ্যে কথা উঠেছিল আমিই হয়ত শেষ পর্যন্ত তোমার গলার ফাঁসি হব। সমবয়সী বলে, তখনকার দিনে একটা কলঙ্কের ভয়ও করত সবাই। তবু সেটাকে বড় করে দেখি নি। আমার অভিমান ছিল অন্ত কারণে, তুমি গোপনই রয়ে গেলে চিরদিন। তবু অন্তরে অন্তরে সেদিনও তোমার কত শুভকামনা করেছি, তাই-বা তুমি জানবে কেমন করে।

যেদিন শুনলাম বিজ্ঞান ছেড়ে সহসা তুমি দর্শনে এম-এ নিয়ে বসলে, সেদিন যে কি নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলাম তা বোঝাবার নয়। তবু মনে মনে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি—বেশ, তবে তাই হোক, তুমি খুব বড় দার্শনিক হও। ভবিষ্যতের তোমার জ্ঞানদীপ্ত প্রশান্ত সে মুখখানির কত ছবিই না এঁকেছিলাম মনের পটে। তখন আমাদের বয়স বাইশ। কেন জানি নি, যেদিন থেকে তুমি দার্শনিক হবার সঙ্কল্প করলে, তোমার কঠোর ভবিষ্যতের জন্তে দুঃখিত হ'লেও তোমার আকর্ষণ যেন শতগুণ বেড়ে গেল।

নিজে দর্শন পড়েছি। দার্শনিকদের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম অথচ গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সময় সময় মনে হয়েছে, আত্মপ্রবঞ্চনার মুখোশ খুলে ফেলে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু তখনই আর একটা নূতন দুর্বলতা এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াত। যদি তাও অবহেলা কর ?

কিন্তু হায়! যেদিন আত্মপ্রকাশ করতেই হ'ল, সেদিন দুর্লঙ্ঘ্য এক প্রাচীরের মত প্রমীলা এসে দাঁড়িয়েছে দু'জনের মাঝে। দুঃখ হ'ল এই ভেবে, প্রমীলাকে কি তুমি চিনতে না ? তবে সে এত সহজে তোমায় ভোলালে কেমন করে ?

তুমি প্রোফেসর হলে, আরও ক'বছর পর। হাসি পেল এই ভেবে, দর্শনের ডাক্তার না হয়ে 'সাইকো-প্যাথোলজিষ্ট' হলে অন্ততঃ প্রমীলার প্রজাপতিপনার চিকিৎসা করতে পারতে। উভয়েরই মঙ্গল ছিল তাতে। তবু সাতাশ বছরের সেই তরুণ অধ্যাপককে দেখে আমার বুকখানা উঁচু হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল কাকে নিয়ে আমার এ গর্ব—সে আমার কে ? তুমি অধ্যাপক হলে সত্য, কিন্তু সত্যিকার দার্শনিক হলে কৈ ? তুমি হয়ত প্রশ্ন করবে, আমি কি তোমায় প্লেটোনিক হতে চেয়েছিলাম। কথাটা সত্যি, আবার নয়ও। কারণ সেখানেই আমার প্রথম হার। জিৎ হ'ল প্রমীলার। কিন্তু সেই প্রমীলা অতর্কিতে দেখা দিয়ে আবার সহসা এক দিন যখন তোমায় ত্যাগ করে গেল, জানি নে, সেদিনও তুমি আমায় আবিষ্কার করতে পেরেছিলে কি না। হয়ত পার নি। নইলে আমি দূরে সরে যাব কেন ? তুমি একবার বলেছিলে প্লেটোনিক হওয়া মেয়েদেরই সাজে ভাল, পুরুষের দিন কাটে না তাতে। শরৎবাবুর রাজলক্ষ্মী কিন্তু ঠিক উল্টো কথাটাই বলেছিল। গঙ্গাজল আর কৌটা-তিলকে মেয়েদের দিন কাটে না। অল্প বয়সে সেটাই একমাত্র সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। তাই এত স্থূল কথা অন্ততঃ তোমার কাছে আশা করি নি। ত্যাগ পুরুষে যতটা করে দেখিয়েছে, ক'টা মেয়ে পেরেছে সে রকম ? তোমার কাছে আমি সেই আদর্শই আশা করেছিলাম, এমনকি নিজেকে অস্বীকার করেও।

তুমি ত জান, অসীম, বিবাহ করতে চাইলে অনেক আগেই আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল। রূপ, যৌবন কিংবা অর্থের ত সেদিন আমার কোন অভাব ছিল না। তবু কেন আমি সুদীর্ঘ দিন ধরে এ কৃচ্ছ্রসাধন করলাম ? এমন কি, বাবার মৃত্যু-সময়েও তার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে আজও আমি আঘাতের পর আঘাতের তরঙ্গ ঠেলে চলেছি, আশা করি, এতদিনে তা তুমি বুঝতে পারবে।

কিন্তু সেজন্ত তোমার কোন ক্ষতি হয় নি। কবিতাকে নিয়ে আট বছর তুমি সুখেই সংসার করেছ। সে তোমায় সুখী করতে পেরেছে জেনে, তার বিরুদ্ধে কোন দিনই আমার কোন ক্ষোভ হয় নি। কোন ঐহিক সম্পদই চিরন্তন নয়,—নশ্বর দেহ এক দিন নিপাত হ'তেই। কিন্তু ঐ অল্প সময়ে সে তোমায় যতখানি দিয়ে গেছে, তাই তোমার অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল—আমি ত সারাজীবনেও তা পারলাম না।

তাই এখন তোমার কর্তব্য, কবিতার আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করা। প্রিয়জনের প্রিয়কর্ম করার বাড়া সুখ আর নেই। সকল পার্থিব সুখের অতীত সেই অনাবিল সুখই যেন তোমার হয়।

আমার শেষ অনুরোধ, তুমি চিরদিন যেমন আমায় দূরে রেখেছ তার চেয়ে কাছে আজ আমায় টেনো না। আমার প্রীতি আর শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। মা-হারাদের আমার আন্তরিক স্নেহ দিও। ইতি

মন্দিরা।

দুই

গোপালপুর অন্-সি।
২৫।৮।৫০

মন্দিরা,

তোমার সুদীর্ঘ লেখাটি নাগপুর হয়ে এক মাসেরও উপর এখানে এসেছে। আজ দেড় মাস আমি এখানে। জনাকীর্ণ শহরের কোলাহল থেকে বহু দূরে জায়গাটা বড় ভাল লেগেছে। ছোট হোটেলের অপরিসর একটি ঘরে, ঠিক যেন সমুদ্রের কোল ঘেঁষে বসে আছি। সময় সময় মনে হয় যেন একটি ছোট ভেলায় চড়ে অসীম চলেছে অনন্তের পথে। কিছু আর চাইবার নেই, পাওয়াও সব শেষ হয়ে গেছে, শুধুই এখন ভেসে চলা। নিঃসঙ্গ জীবনের এ একাকিত্ব সত্যি অপূর্ব। অমৃত ও হলাহলের এ এক অনির্বচনীয় সংমিশ্রণ।

হ্যাঁ ভাবছি তোমায় কি উত্তর দেব? তুমি জানিয়েছ, নারী বলেই সমবয়সী হয়েও তোমার নাকি সহজাত অনুভূতিবৃত্তি (অর্থাৎ, তোমার সমীক্ষণপটুতা) আমার চেয়ে বেশী। জন্মাধিকার নিয়ে কোন ঝগড়া নেই, তুমি যে নারী, তার পরিচয় ত তুমি প্রায় প্রতি ছত্রেই প্রকাশ করেছ। সেই আবেগ, সেই অভিমান, উচ্ছ্বাসভরা মমত্বও তোমার সেই নারীরই মত। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের সচেতন মনের উপর অত্যধিক আস্থা রাখতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে আমার উপর সামান্য অবিচার করেছ মনে হয়। তারই উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

বাল্যাবধি কেবল তুমিই আমার অনুসরণ করে ফিরছ, আর আমি উদাসীনের মত চিরদিন তোমায় এড়িয়ে চলেছি, এ অপবাদের হেতু কি? তুমি কি কোনদিন তোমায় প্রত্যাখ্যানের সুযোগ দিয়েছিলে আমায়? অল্পদিনের জন্য চলতি পথে প্রমীলা এসে দেখা দিয়েছিল আমার জীবনে, আমার অতর্কিতে একদিন সে কেন খসে পড়ল, সে কৌতূহল কি কোনদিন তোমার মনে স্থান পেল না?

দার্শনিকদের সম্বন্ধে তোমার অভিমত জানা আছে। তুমি নিজে উৎকট আদর্শবাদী শিক্ষকের মেয়ে। দর্শনের সাহায্যে নিজেকেও তুমি জাপানী মেয়েদের পায়ের মতই গড়েছ কেবল, বাড়তে দাও নি। আর সেজন্যই বোধ হয় আমাকেও তুমি সমস্ত জৈব-পরিধির ঊর্দ্ধে তুলে 'আদর্শবাদী' বলে দেখতে চেয়েছিলে।

প্রমীলার আগমন একদিকে যেমন আমার নৈতিক অবনতির লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছিলে, অন্যদিকে নিজেই আবার স্বীকার করেছ—তার কাছেই তুমি প্রথম হার মেনেছ। যদি বলি কল্পনা থেকে সেই তোমায় প্রথম বাস্তব রাজ্যে নামিয়েছিল, বোধ হয় আতিশয্য হবে না। নিজেই ভেবে দেখ, তোমার ইচ্ছা ও কামনার মধ্যে তুমি কোনদিন আপোষ করতে পার নি। এ যেন কেবল লবণ-জলে বসে লবণের পুতুল খেলা। তুমি যাকে অত উচ্চ মূল্যে আদর্শের হাতে দান করেছিলে, দান করেই কি তার সম্বন্ধে দাতার কর্তব্য শেষ করা উচিত ছিল না? তা পার নি বলেই তোমার এ পরাজয়।

লিখেছ, কবিতার উপর তোমার কোন ক্ষোভ নেই, এটাও কেমন অদ্ভুত শোনায় না কি? মানলাম, তুমি আমায় বড় করে দেখেছিলে বলেই প্রত্যহের ক্ষুদ্র স্পর্শে আমায় কলুষিত করতে চাও নি। সে জন্যই হয়ত তোমার দূরে থাকা, হয়ত সে কারণেই আজও তুমি অনূঢ়া। কিন্তু সেটাই কি সম্পূর্ণ সত্য। একান্ত অপরিচিতাকে ঈর্ষা না করায় আমি ত কেবল একটি অর্থই খুঁজে পাই। হয়ত তুমি ধরে নিয়েছ, বিবাহ হয়ে গেলে মানুষের সকল প্রেমের উৎস নিঃশেষ হয়ে যায়। কিংবা ভেবেছিলে, বিবাহে প্রেমের কোন অবকাশই থাকে না, স্থূল আসঙ্গলিপ্সাতেই তার পরিণতি। কিন্তু তুমি যদি একটি সত্য বুঝে নিতে পারতে, হয়ত তোমার জীবনে এ 'ট্র্যাজেডি' আসত না। ফুলের পরিণাম যে ফল, তাও কি তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে?

আদর্শের মুখোশ পরে অন্যকে হয়ত ঠকানো চলে, কিন্তু নিজেকে বঞ্চনা করা যায় না।

তোমার চরিত্রের এই দুর্বলতাটুকু আমার জানা ছিল, আর ছিল বলেই ভয় করতাম, পাছে চাইতে গিয়ে হারিয়ে বসি। একটি পুরুষ তোমার জীবন অধিকার করে রেখেছিলেন, তিনি তোমার বাবা। অন্য পুরুষ সে আমি। অথচ আমরা দু'জনে একই জিনিষের স্থূল আর সূক্ষ্ম বিভাগ। তাই দীর্ঘদিন ধরে তোমাকেই প্রস্তুতির সুযোগ দিয়ে এসেছি। কিন্তু তুমি তা পার নি বলে আজও তোমার জীবন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বিধা-কণ্টকে জর্জরিত।

আমার বেশী চাওয়ার মধ্যে কোন গলদ নেই। তুমিই তাকে নিজের মনে অকারণ প্রাধান্য দিয়ে বিকৃত ও গুরুতর করে নিয়েছ। শুধু এটুকুই তোমায় জানাতে চেয়েছি, আজ আমি কত একা, কি অসহায়।

দেখেছি একাকিত্বেরও কেমন যেন একটা রোমন্থনবৃত্তি থাকে। সেটুকুই সে জানাতে চায় আর একজনের কাছে, বিশেষ যে অন্তরঙ্গ, তার কাছে। আজ চারিদিকে চেয়ে মনে হয়, আপনজন আমার কেউ নেই—সত্যি আমি একা। তবু তা যেন আর কারও সান্নিধ্যের অপেক্ষা রাখে। সে কে তা বলতে পারব না, কেন এমন হয়, তাও আমার জানা নেই। হয়ত আমার অন্তর জানে, তোমার মত আমার জীবন-মরণের এমন সাথী আর কেউ নেই। তাই, এতদিন যা মনের গোপনে ছিল, তাই-বা

মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে তোমার ছে।

বলতেও আশ্চর্য লাগে, কবিতার ক্ষতির চেয়ে তোমার ক্ষতিই যেন আজ বেশী করে বুকে বাজছে। আমার ক্ষীণ ধারণা (হয়ত স্বার্থপরের মত), আমার যে প্রিয়, প্রিয় সে তোমারও হবে। ভেবেছিলাম, দু'জনে যাকে ভালবাসতে পারি, তার বিরহই বা একসঙ্গে উপভোগ করতে পারব না কেন? তুমি হয়ত বিস্মিত হয়ে বলবে এ কি উপভোগের বস্তু? উপভোগই যদি না হবে, মরণকে মানুষ তবে এমন মনোরম সাজে সাজায় কেন? শাজাহানের 'তাজ' নিশ্চয় তার বিরহের চেয়ে বড় ছিল না। তবু আমরা সেটিকেই বড় করে দেখি কেন? তুমিও তো আমার প্রত্যক্ষ ক্ষতির চেয়ে পরোক্ষ প্রাপ্তিকে বড় করে দেখিয়েছ। তেমনি আমার মনের নিভৃতে যে চিন্ময় সৌধখানি দর্শক খুঁজে বেড়াচ্ছে, তুমিই তার প্রথম দর্শনার্থী হবে না? বন্ধু বন্ধুর কাছে এর বেশী আর কি আশা করে? তাই আমার আমন্ত্রণে ভুল বুঝ না।

কবিতার সন্তান, সে ভার আমার। কর্তব্য করতে চেষ্টা করব, তার বেশী ভরসা দেওয়া কঠিন। প্রীতি গ্রহণ করো। ইতি

অসীম

তিন

বরাহনগর,
৭ই জানুয়ারী, ১৯৫১।

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, নিরাশ হয়ে ফিরছি। শুনলাম, তুমি দেশের জোত-জমা বিক্রী করে রওনা হয়েছ পণ্ডিচেরির দিকে। ছেলেদের ভার দিয়ে গেছ তোমার মামাতো ভাইদের উপর। অনেককিছু বলার ছিল। বোঝাবার অবকাশও দিলে না। যে পথে চলেছ, বাধা দিতে গেলে অনেক কঠিন কথা এসে পড়বে, তাই বিরত হলাম। কেবল একটি কথাই আমায় লিখে জানিও, যা স্থির করেছ, তা কি সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্তে, না অভিমানের বশে? আমাকে জ্ঞানের তত্ত্ব-দীক্ষা দিয়ে নিজে আত্মপ্রবঞ্চনা করছ না তো? আমার কত প্রতিবন্ধক, সবই তুমি জান। ছুটির মঞ্জুরিও স্কুল কমিটির মর্জির উপর। সব বুঝেও আমায় কোন সাহায্যের সুযোগ দিলে না, এইটুকুই খেদ রয়ে গেল।

যদি কখনও ফিরে এস, জানতে দিও, এই আমার শেষ মিনতি। ইতি

একান্ত অনুগতা
মন্দিরা

চার

যোশীমঠ,
১৭ই মে, ১৯৫২।

কল্যাণীয়াসু,

মন্দিরা, ভেবেছিলাম কাউকেই আর লিখব না। অনেক বেড়ালাম, খোঁজাও কম হয় নি, তবু যেন শান্তি পাই নি কোথাও।

শেষ পর্য্যন্ত এখানে এসেছি আজ তিন মাস। আমার সব খোঁজার শেষ এখানেই। নতুন দেশে, এখন আমি নতুন মানুষ—দেখলে চিনতেও পারবে না। সেজন্য অতীতকে আর টানতে চাই নে। দেড় বছরে প্রথম চিঠি দিলাম তোমাকেই। কেননা তোমার প্রতি আমার সামান্য কর্তব্য বাকী ছিল। জীবনে তুমি আমার জন্যে যা ত্যাগ করেছ, তার তুলনা পাই নে। কেবল আমিই পারি নি তার মূল্য শোধ দিতে।

তোমায় কোন সুযোগ দিই নি বলে যে খেদ করেছ, তারই প্রায়শ্চিত্ত করে নিজেকে মুক্ত করতে চাই এ পত্রে।

আমার শুভাশুভ সমস্ত চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করো —তাই আমার কাম্য। যদি কখনও আমায় ভালবেসে থাক, কখনও গ্রহণ করে থাক গুরুজন বলে তো আমার শেষ আদেশ পালন করবে। যদি পার, নিজে বিবাহ করো। তার পরেও যদি আমায় মনে রাখতে চাও, আমার ছেড়ে-আসা ছেলেদের মানুষ করে দিও। সেই তোমার শ্রেষ্ঠ দান হবে।

আমায় আর খোঁজার চেষ্টা করো না। করলে পাবে না। আমি এখন নিরুদ্দেশের যাত্রী। তোমার কল্যাণ হোক।

ইতি
অসীম

নালন্দা

শ্রীসুধীরচন্দ্র ব্রহ্ম

'ফাহিয়ান' খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের প্রধান প্রধান নগরীতে পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর 'হিউ-এন সাঙ' ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন। তিনি ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ষোল

নালন্দায় অবস্থিত প্রধান স্তূপ
(ভগ্ন অবস্থায়ও ৩।৪ তলা বাড়ীর সমান উঁচু)

বৎসর ভারতে ছিলেন। তিনি 'প্রাচ্যদেশের ইতিবৃত্ত' নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ লেখেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"এই সময়ে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র 'সঙ্ঘারাম' ছিল, কিন্তু নালন্দার গৃহরাজি উচ্চতায় ও সৌন্দর্য্যে অপর সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল। পালি ভাষায় এই বিহার 'নালন্দা' নামে উক্ত হইত। কেহ কেহ বলেন বিহারের দক্ষিণে আম্রোদ্যানের মধ্যবর্ত্তী সরোবরে এক নাগ বাস করিত। উক্ত নাগের নাম হইতে বিহারের নাম 'নালন্দা' হইয়াছে। কোন্ সময়ে ইহা ধ্বংস হয় তাহা নিঃসংশয়ে জানিতে পারা যায় নাই।"

আধুনিক পাটনা জেলার বরগাঁও গ্রামে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বক্তিয়ারপুর—বিহার ছোট রেলওয়ের বরগাঁও রোড ষ্টেশন হইতে নালন্দা এক মাইল দূরে অবস্থিত। তক্ষশিলা ও নালন্দার মত বৃহৎ মহাপীঠ ভারতবর্ষে অতি অল্পই ছিল, কিন্তু দেশের সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র বৃহৎ সাধুনিবাসে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

তখন এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এমন সুবৃহৎ হইয়া উঠিয়াছিল যে, সেখানে দশ সহস্র ভিক্ষু ও ছাত্র বাস করিতেন। ইহার কক্ষগুলি দৈর্ঘ্যে ১২ হস্ত এবং প্রস্থে ৮ হস্ত ছিল।

নালন্দার ধ্বংসস্তূপ

নালন্দা বিহার প্রদেশে অবস্থিত হইলেও বাঙালীরা ইহাকে আপনার মনে করিতেন। বুকানন হ্যামিল্টন ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলি পর্য্যবেক্ষণকালে প্রথম নালন্দার সন্ধান পান। ১৯১৫ সালে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে খননকার্য্য সুরু করেন। নালন্দার ধ্বংসস্তূপ এদেশের উচ্চশিক্ষার প্রাচীন কীর্ত্তি ও তার ইতিহাস বিশ্ববাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করে।

একদা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বহুবিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙ ভারতে আগমন করেন, তখন নালন্দার খ্যাতি ও গৌরব ছিল সর্ব্বত্র প্রচারিত। তিনি লিখিয়াছেন, "উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত এই বিহার চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে পরম রমণীয়। এখানে আটটি সমচতুষ্কোণ কক্ষ আছে ; এখানকার বিহার-সমূহের অভ্রভেদী উচ্চচূড়া প্রভাত-শিশিরে অদৃশ্য হইয়া থাকে। এখান হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়।"

তিনি নালন্দায় মানমন্দির ও জলঘড়ি দেখিয়াছিলেন। তখনকার জলঘড়ি সঠিক সময় প্রকাশ করিত। এখানকার ভিক্ষু-নিবাসসমূহের চতুর্দ্দিকে ১৩০০ ফুট দীর্ঘ, ৪০০ ফুট প্রস্থ এক প্রাচীর ছিল। ঐ প্রাচীর অংশতঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীরের বহির্দ্দেশেও অনেক স্তূপ এবং মন্দির রহিয়াছে।

এবং মঠ ও উপাসনার মন্দির। যদিও মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেব শেষ জীবনে কুশীনগরে যাইবার পথে নালন্দায় আসিয়াছিলেন, তবু নালন্দা কখনও সারনাথ বা বৌদ্ধগয়ার তুল্য বৌদ্ধগণের তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হয় নাই। তথাপি, এখানে যে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাহা বৌদ্ধ-

নালন্দার বৌদ্ধ বিহারগুলির ধ্বংসাবশেষ

একটি মঞ্চ

যুগের অতুল গৌরব। এখানকার বিহারশ্রেণী বৌদ্ধ শ্রমণদের বাসগৃহ ও উপাসনা-স্থল রূপে ব্যবহৃত হইত।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই সব উপাসনা-মন্দির বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। অসংখ্য স্তূপ বা মন্দির মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে। এইগুলি কারুকার্য্যখচিত। এগুলিতে দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। স্থাপত্যকলা ইহাদের অতুলনীয়।
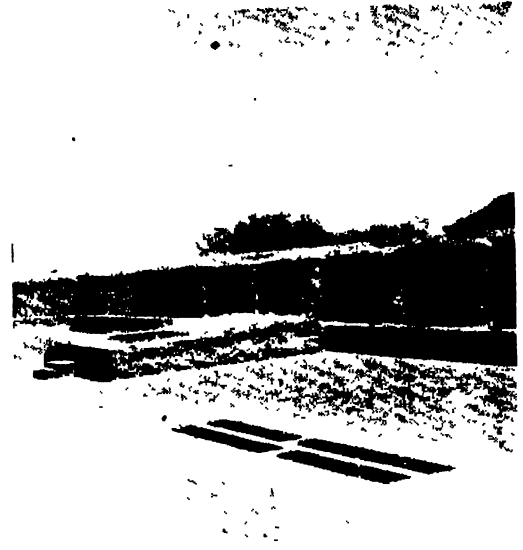
এখানে খনন করিয়া এক বৃহৎ ভবন উদ্ধার করা হইয়াছে। উহাই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তম ভবন বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বিতলে ছাদ বা প্রাকার নাই। নিম্নে মধ্যস্থলে সুবৃহৎ অঙ্গন। এখানকার 'রত্নোদধি' নামক গ্রন্থালয়ে 'হীনযান ও মহাযান' এই দুই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যাবতীয় গ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থালয় অতি বৃহৎ। এখানকার যাদুঘরে প্রাচীনকালের অভগ্ন মৃৎপাত্র ও তণ্ডুল রাখা হইয়াছে। তণ্ডুলগুলির কতক কৃষ্ণবর্ণ, কতক নূতন তণ্ডুলের মত শুভ্র। প্রস্তর ও ধাতুর উপর উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের বুদ্ধ-মূর্ত্তি এখানে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কানিংহামের জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে নালন্দায় প্রত্নসম্পদ কথঞ্চিৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।

নালন্দার যেটুকু মাটির নীচ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার নক্সা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার একদিকে ছিল যত সব চৈত্য বিহার ও সাধারণ গৃহ এবং ঠিক তাহার অপর দিকে ছিল পর পর শয়ন-ভবন ও বিদ্যালয়-গৃহগুলি,

নালন্দায় আবিষ্কৃত প্রধান স্তূপটি ভগ্ন অবস্থাতেও তিন-চার তলা বাড়ীর চেয়ে উঁচু।

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যকলায় খিলানের উপর এমন বৃহৎ ছাদ এইখানেই প্রথম দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল ছাদ কিন্তু পেটা ছাদ নয়—অর্দ্ধ গোলাকৃতি খিলানের ছাদ। এই মঠের প্রশস্ত সোপানশ্রেণী এবং চারিদিকের প্রাচীর সুদৃঢ় আস্তরণে তৈয়ারী হইয়াছিল। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় পাশের প্রাচীরে আলো আসিবার জন্য ঘুলঘুলি করা আছে। ভক্তেরা যে সকল স্তূপ ও মূর্ত্তি এখানে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলিতে দাতার নাম ও তাঁর ইচ্ছা উৎকীর্ণ করা আছে।

আজ হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশেরই জ্ঞানপিপাসু লোক এখানে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আসিতেন। এই বিদ্যালয়ে দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। নানা দেশের দশ সহস্র

উপাসনা-মন্দির (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত)

ছাত্রের শিক্ষার জন্য প্রায় তিন সহস্র শ্রমণ-অধ্যাপক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। এখানে বহু বাঙালী ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙ শীলভদ্র নামক এক বাঙালী অধ্যাপকের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। যিনি এই অধ্যাপকমণ্ডলীর উপর অধ্যক্ষতা করিতেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হইতে হইত। দশ হাজার ছাত্র সারি সারি আসনে বসিয়া এক সঙ্গে এই স্থানে অধ্যয়ন করিতেন।

নালন্দায় একটি মঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে—গুরু বা আচার্য্যদেব এইখান হইতে ছাত্রদের উপদেশ দিতেন। ইট-বিছানো প্রাঙ্গণে বসিয়া ছাত্রেরা গুরুমুখে উপদেশ শুনিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতেন। নালন্দার শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার রীতিনীতি এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

বঙ্গের পালরাজাদিগের রাজত্বকালে বিহার প্রদেশ তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল। রাজা দেবপাল দেবের রাজত্বকালে আচার্য্য বীরদেব এবং নয়নপাল দেবের রাজত্বকালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দার সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হন। বৌদ্ধ-বিদ্বেষীদের নিষ্ঠুর ধ্বংসাভিযান ও আক্রমণের ফলে নালন্দা একাধিকবার বিধ্বস্ত হয়। নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পর পর তিনটি স্তরের তিন রকম গাঁথুনি দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটির গাঁথুনি কাদার ও কয়েকটিতে চুণ-বালির গাঁথুনি ছিল।

স্তূপ—খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মহীন্দ্র পালের রাজত্বকালে নির্ম্মিত যে স্তূপটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার চারি কোণে চারিটি সুদৃশ্য চূড় ছিল এবং চমৎকার কারুকার্য্যকরা বেষ্টনী ছিল। তৎসন্নিহিত অসংখ্য ছোট বড় স্তূপ দেখা যায়। শিলাপট্টে বিভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়—অগ্নিদেবতা, কুবের, গজলক্ষ্মী, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি মূর্ত্তি সুপরিচিত। জাতকের কাহিনীও কিছু কিছু উৎকীর্ণ আছে।

নালন্দার চতুর্দ্দিকে আরও অনেক দেখিবার, শিখিবার ও জানিবার বস্তু আছে। এগুলি হইতে বুঝা যায় ভারতবর্ষ একদিন সভ্যতার কত উচ্চস্তরেই না উঠিয়াছিল! মৃত্তিকা, প্রস্তর, চুণ, বালি ও ইটের গাঁথুনি এখানে পর পর রহিয়াছে—স্থাপত্যশিল্পের ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তরই এই স্থানে বিদ্যমান।*

* প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফোটোগুলি শ্রীদেবেন ব্রহ্ম কর্ত্তৃক গৃহীত

শতবর্ষে ভারতের ডাকঘর

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

(১৮৫৪—১৯৫৪)

১৮৩৭ সনের বিধি অনুযায়ী ডাকের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া ডাকের নূতন ব্যবস্থা হইয়াছিল ১৮৫৪ সনে। এই ব্যবস্থাই কতকটা পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান সময়েও চলিতেছে।

পূর্বের ন্যায় এইবারও চিঠি বহন ও বিলি গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া কাজ বলিয়া গণ্য হইল।

১৮৫৪ সনে সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন হইয়াছিল। তখন হইতে শুধু ওজনের উপর চিঠির মাশুল ধার্য হইল। সিকি তোলার অনধিক ওজনের চিঠির জন্য দুই পয়সা দিতে হইত। সিকি তোলার অধিক, কিন্তু আধ তোলার অনধিক ওজনের চিঠির জন্য লাগিত এক আনা।

সেই সময়ে শতকরা একজনের বেশী লোক লিখিতে ও পড়িতে পারিত না। যে অতি অল্পসংখ্যক লোক লিখিতে ও পড়িতে পারিত তাহাদিগের সুবিধার জন্য এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার দিকে নজর রাখিয়া চিঠির মাশুল তখন সস্তা রাখিবার ব্যবস্থা হয়। কম দামের ডাকটিকিটের প্রচলন হয়।

১৮৬৬ সনে চিঠির মাশুল নূতন করিয়া ধার্য হইল। অর্ধ তোলা পর্যন্ত ওজনের চিঠির জন্য পূর্ব হারেই মাশুল রহিল। উহার অতিরিক্ত প্রতি অর্ধ তোলার জন্য এক আনা হারে ধার্য হইল। পূর্বে এরূপ সংক্ষেপ ব্যবস্থা ছিল না।

১৮৬৯ সনে চিঠির মাশুল আরও কমাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৯৮, ১৯০৫ এবং ১৯০৭ সনে মাশুল ক্রমশঃ হ্রাস পায়। ১৯১৮ সনে যুদ্ধের জন্য চিঠির মাশুল বৃদ্ধি পায়।

সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি ডাকে দিবার সময়েই ডাকটিকিট লাগাইবার কড়া আদেশ হইল। উহা না করিলে জরিমানা হইত। চিঠির মাশুলস্বরূপ চিঠির উপর ডাকটিকিট লাগানো না থাকিলে ডবল মাশুল আদায় হইত। ন্যায্য মাশুলের চেয়ে কম টিকিট লাগাইলে যে পরিমাণ কম থাকিত উহার দ্বিগুণ আদায় হইত। ঐ নীতিই এখন পর্যন্ত বেয়ারিং চিঠির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতেছে। সংবাদপত্র বা মুদ্রিত কাগজ, পুস্তিকা প্রভৃতির প্রতি এই আদেশ প্রযোজ্য হইত না।

এই সময়ে সংবাদপত্র ও বুকপোষ্টের মাশুল কম ধার্য হইল; কিন্তু ভারতে মুদ্রিত ও বিদেশ হইতে প্রাপ্ত সংবাদপত্র ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াই গেল। ভারতীয় সংবাদপত্রের চেয়ে বিদেশী সংবাদপত্র সস্তা মাশুলে আনা যাইত। ইহাতে ইংলণ্ডের সংবাদপত্র ভারতে আনিবার সুবিধা হইল। কিন্তু অতিরিক্ত মাশুলের জন্যই ভারতীয় সংবাদপত্রের ভারতের অভ্যন্তরেই প্রচার ব্যাহত হইতে লাগিল। এই জন্য তখনকার ভারতীয় সংবাদপত্রে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের খবরের কাগজে তীব্র অসন্তোষের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৬৬ সনে সংবাদপত্রের ও বুকপোষ্টের মাশুল আরও কমাইয়া দেওয়া হইল। ১৮৫৪ সনে ভারতীয় সংবাদপত্রের মাশুল ছিল প্রতি ছয় তোলায় বা উহার অংশের জন্য দুই আনা। ১৮৬৬ সনে হইল ১০ তোলার অনধিক ওজনে এক আনা; এবং অতিরিক্ত প্রতি ১০ তোলায় এক আনা।

বিদেশী ও ভারতে মুদ্রিত সংবাদপত্রের মাশুলের মধ্যে যে বিভেদ ছিল উহা ১৮৬৬ সনে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৯৮ সনে সংবাদপত্র রেজেষ্ট্রি করিবার আইন প্রণয়ন হইয়াছিল। সেই হইতে এখন পর্যন্ত একমাত্র রেজেষ্ট্রি করা সংবাদপত্রই সুলভ মাশুলে পাঠানো চলে।

১৮৩৭ সনে দূরত্ব হিসাবে মাশুল ধার্য হওয়াতে এখন আমরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাই; কিন্তু তখনকার পথের অবস্থা চিন্তা করিলে এইরূপ আশ্চর্য হইবার কারণ থাকে না। ১৮৩৩ সনেও কলিকাতা হইতে বারাণসী পর্যন্ত সড়ক অনুন্নত ছিল গরুর গাড়ীর পথের মত। একমাত্র কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর পর্যন্ত সড়কের প্রশংসাই সেই যুগে শুনিতে পাই। ১৮৫৪ সনে মিলিটারী বোর্ড উঠিয়া যাইয়া পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সৃষ্টি হইল। সেই সময় হইতেই পথের উন্নতিসাধন সুরু হইয়াছে। ১৮৫২ সনে রেলগাড়ী চলে। ইহার পর হইতেই হরকরা ছাড়াও রেলে এবং সড়কে হালকা গাড়ীতে ডাকবহা চলিত। কাজেই ডাকের ওজন তখন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছিল।

এই সময়ে বিলাতের ডাক মাসে এক দিন আসিত। বোম্বাই হইতে কলিকাতায় দৈনিক দুই মণ কুড়ি সেরের বেশী ডাক পাঠানো সম্ভবপর হইত না।

এক শত বৎসর ডাকটিকিটের প্রচলন হইয়াছে, তবুও বেয়ারিং চিঠির সংখ্যা কমে নাই। এখনও বৎসরে গড়ে প্রায় ২,৪৫,৪৬,৩৬৮ খানি বেয়ারিং চিঠি বিলির জন্য পাওয়া যায়।

নিরক্ষর লোকেরা ডাকটিকিটের ধার ধারে না। তাহারা পাঠায় বেয়ারিং চিঠি। ইহাতে খরচ ডবল হইলেও তাহারা মনে করে এই প্রণালীই নিরাপদ। কথাটা মিথ্যা নহে। বেয়ারিং চিঠি অর্থ-তহবিলের অংশ বলিয়া গণ্য হয়।

পোষ্টকার্ড বেয়ারিং হয় না, কারণ তাহা হইলে প্রাপক উহা পড়িয়া ফেরত দিতে পারে। ডাকঘরের লোকসান হইবে। সেইজন্ত বেয়ারিং পোষ্টকার্ড বিলি করিবার ব্যবস্থা ছিল না। বর্ত্তমানে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

তখন চিঠির প্রাপক অন্যত্র গেলে চিঠির ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া তথায় পাঠাইতে হইলে নূতন মাশুল দিতে হইত। ১৮৬৯ সনে এই মাশুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বর্ত্তমান সময়ে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের জন্ত নূতন মাশুল দিতে হয় না।

তখনকার দিনে চিঠি রেজেষ্ট্রী করিতে হইলে রেজেষ্ট্রী খরচ ডাকটিকিটে লাগাইতে হইত না। নগদ পয়সায় দিতে হইত। এই বাবদ ডাকটিকিট লাগাইবার আদেশ হইল ১৮৬৬ সনে।

১৮৩৭ সনের আইনে ব্যবস্থা হইয়াছিল, জাহাজের কাপ্তেনকে বন্দরের ডাকঘর হইতে চিঠি সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং সংগৃহীত চিঠি অপর বন্দরের ডাকঘরে দিতে হইবে। জাহাজের কাপ্তেন প্রতি চিঠির জন্ত এক আনা হিসাবে কমিশন পাইতেন। ১৮৫৪ সনের আইনেও এই ব্যবস্থা বলবৎ রহিল।

১৮৩৭ সনে সরকারী কাজে বিনামাশুলে চিঠি বা প্যাকেট পাঠাইবার অধিকার কোনও কোনও সরকারী কর্মচারীকে দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৫৪ সনে বিনামাশুলে সরকারী চিঠি পাঠাইবার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে প্রতি সরকারী বিভাগের নিকট হইতেও চিঠিপত্রের জন্ত অর্থ আদায় করা হইত। নানা কারণে এই ব্যবস্থাও অসুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় ১৮৬৬ সনে 'সার্ভিস ষ্ট্যাম্পে'র প্রচলন হইল। সরকারী চিঠিপত্রে উহা লাগাইতে হইত। এখনও ঐ ব্যবস্থা চলিতেছে।

তখন গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ডাক-বিভাগের আয় জনগণের সুবিধার জন্তই ব্যয় হইবে। মুনাফা রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের তহবিলে অর্থসঞ্চয় করা উদ্দেশ্য নহে। গবর্ণমেণ্টের সু ও দুর্দিনে এই নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে।

১৮৫৪ সন হইতেই ভারতীয় ডাকঘর সুগঠিত হইয়া উঠে। উহার পূর্বে প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টারই ছিলেন পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল এবং প্রতি প্রদেশের ডাকবিভাগের কর্ত্তা। মফস্বলের ডাকঘরগুলি ছিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে। ১৮৫৪ সনে প্রথম ভারতের ডাকবিভাগ একজন ডিরেক্টর জেনারেলের অধীনে আসে। পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পৃথক পদও সৃষ্টি হয়। তিনি হন প্রতি প্রদেশের ডাক-ঘরের কর্ত্তা। ছোট ছোট প্রদেশ বা এলাকার প্রধান হন এক একজন চীফ ইন্সপেক্টর। পরে এই পদের নামকরণ হয় ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল। এখন হইয়াছে ডিরেক্টর।

প্রতি ডাকঘরকে উহার হিসাব একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অধীন 'অডিট আপিসে' পাঠাইতে হইত। ১৮৬১ সনে ডাকঘরের হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্ত একটি পৃথক পদের সৃষ্টি হয়। উহার নাম 'কম্পাইলার অব পোষ্ট অফিস একাউণ্টস্'। ১৮৬৬-৬৭ সনে দৈনিক হিসাব পরীক্ষার জন্ত ডাকঘরকে প্রধান ও শাখা হিসাবে ভাগ করা হয়। নূতন ব্যবস্থায় ডাকঘরগুলি হেড, সাব ও ব্রাঞ্চ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইল।

হেড আপিসগুলি সাধারণতঃ জেলা শহরেই থাকিত। ডাকের সকল প্রকার কাজ যে স্থলে বেশী তথায় সাব-আপিস খোলা হইত। ব্রাঞ্চ আপিসগুলি সাধারণতঃ পল্লী অঞ্চলের জন্তই। হেড আপিস কেন্দ্রীয় ডাকঘর। অন্যান্য ডাকঘরের দৈনিক আয়ব্যয় ইহাকে প্রত্যহ বুঝিয়া লইতে হয়। সাব-আপিস ব্রাঞ্চ আপিসের হিসাবনিকাশ ও কাজ-কর্মের উপর নজর রাখে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে বড় ডাকঘর ছিল মাত্র ২০১টি, এবং ছোট ডাকঘর ছিল ৪৫১টি। ১৯৫২ সনে হইয়াছে ২৯,৬৩৩টি ডাকঘর। ইহার মধ্যে পল্লী অঞ্চলেই ২৪,৬৩৮টি। ২৯,৬৩৩টি ডাকঘরের মধ্যে হেড পোষ্টাপিস ২২৩, সাব-আপিস ৬,১৩৮, এবং ব্রাঞ্চ আপিসের সংখ্যা ২৩,২৭২।

এই বৎসর ভারতে প্রতি ২৮ বর্গমাইলে এবং ৮,৪৭৫ জনের জন্ত একটি ডাকঘর হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১১ বর্গমাইলে, এবং ৮,৮৩২ জন নরনারীর মাথাপিছু একটি ডাকঘর আছে।

ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতেই ডাকঘরের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু এক বৎসরেই (১৯৫১-৫২) প্রায় ছয় হাজার ডাকঘর খোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫,৩২৮টিই পল্লী অঞ্চলে। আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট শুধু জনকল্যাণের জন্তই বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহার পূর্বে অগ্রগতির ধারা এইরূপ ছিল না।

স্বাধীন ভারতে শুধু কি ডাকঘরের সংখ্যাই বাড়িয়াছে? তাহা নহে, নূতন ধরণের ডাকঘরও হইয়াছে। নাগপুর,

দিল্লী, মাদ্রাজ এবং কানপুরে চলন্ত ডাকঘরও চলিতেছে। এইরূপ ডাকঘর বড় মোটরকারে অবস্থিত। শহরের নির্দিষ্ট পথে চলন্ত ডাকঘর চলে। সাধারণতঃ বেলাশেষেই, স্থানীয় ডাকঘরগুলি বন্ধ হইলে ইহাদের কাজ সুরু হয়। এইসব ডাকঘরের কাজ রবিবার এবং ডাকঘরের ছুটির দিনেও হয়। ইহাতে চিঠি দেওয়া চলে, ডাকটিকিট বিক্রয় হয়, চিঠি ও এয়ার-পার্শেল রেজেষ্ট্রি করা হয়। রাত্রের এয়ার-মেলে সব পাঠান হইয়া যায়। কাজেই ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ সকলেরই সুবিধা হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, জমিদারদিগের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ডাকঘর পল্লীডাকঘরের অগ্রদূত। এখন পল্লী অঞ্চলের ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টারের প্রধান রোজগার অন্যত্র। তিনি হয় শিক্ষক, নয় ত দোকানী, অথবা জমিজমার উপর নির্ভর করিয়া সংসার চালাইয়া থাকেন। ডাকবিভাগের এজেন্ট হিসাবে তিনি অবসরসময়ে ডাকঘরের কাজ চালাইয়া জনসেবা করেন। তজ্জন্য তিনি মাসে সামান্য ভাতা পান। বাংলার পল্লী অঞ্চলে, শুধু বাংলা কেন, ভারতের পল্লীর সর্বত্র এই শ্রেণীর ডাকঘরই প্রায় সব

পল্লীর ডাকঘরের সাহায্যে শুধু যে পল্লীর সহিত বাহিরের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহা নহে, সঞ্চয়ের অভ্যাসে, শিক্ষাপ্রচারে, ছোট ছোট ব্যবসা-বাণিজ্যেও সাহায্য হইয়াছে যথেষ্ট। ইহার মূলে রহিয়াছে শত শত পল্লীবাসী ডাক এজেন্টের নীরব দেশসেবা। তাঁহাদের সংখ্যা কম নহে ১৯৫২ সনে ভারতরাষ্ট্রে ২৫,৫৫৮টি ডাকঘরের ভার ছিল এই এজেন্টগণের উপর

পল্লীর ডাকঘরগুলি অবস্থিত কোথাও দোকানে, কোথাও বিদ্যালয়ের কুঠরিতে, অথবা কাছারি বাড়ীর কোণে এজন পল্লী-ডাকঘরের দাওয়ায় বা চত্বরে হয় ডাকের অপেক্ষায় সমবেত গ্রামবাসীদিগের রাজনীতিচর্চা, পল্লীসমাজের কত কু- ও সু-এর আলোচনা। ডাকঘরের ক্ষুদ্র বারান্দা হইতেই সুরু হয় সংবাদপত্র পাঠ ও সংবাদ প্রচার। পল্লীর ডাকঘর একাধারে সবই।

১৮৫৪ সনে চিঠি সর্ট বা বণ্টন করিবার ব্যবস্থা ছিল না। এক লাইনে অবস্থিত এক ডাকঘরকে উহার অগ্রেস্থিত প্রতি ডাকঘরের জন্য একটি করিয়া পুলিন্দা তৈরি করিয়া পাঠাইতে হইত। তখনও ডাকের থলি বা ব্যাগের চলন হয় নাই। কাগজের বা কাপড়ের পুলিন্দা ব্যবহৃত হইত। ১৮৬০ সনে এই অসুবিধাজনক ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে ডাক লাইনে কোনও কোনও চিঠি সর্ট করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

মাশুল দেওয়া চিঠিতে লাল কালিতে এবং বেয়ারিং চিঠিতে কাল কালিতে তারিখ মোহরের ছাপ দেওয়া হইত।

১৮৫৪ সনের ব্যবস্থায় ডাকঘরের এক কর্মচারী অপর কর্মচারীর ত্রুটিবিচ্যুতি ধরিতে পারিলে যিনি ভুল করিয়াছেন তাঁহার জরিমানা হইত। এই জরিমানার টাকার শতকরা দশ টাকা পাঠাইতে হইত পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের আপিসে বাকি অংশ যিনি ভুল ধরিয়াছেন তিনি পাইতেন একটি ডাকব্যাগ ভুলে অন্যত্র পাঠাইলে তিন টাকা, এবং একটি পার্শেল বা প্যাকেটের বেলা ভুল হইলে আট আনা জরিমানা হইত ইহার ফলে বিভিন্ন ডাকঘরের মধ্যে রেষারেষি ও ঝগড়া প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। তজ্জন্য ১৮৮০ সনে এই প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

এইরূপেই ভারতের ডাকঘর গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

গত মাঘ সংখ্যা, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, প্রথম স্তম্ভে চিত্রের নাম 'কালীমাতা' স্থলে "কুলি-মা" পড়িতে হইবে।

মাঘ ১৩৬১ পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	হইবে না	হইবে
৪৫০		১৩	শামসুল হক	শামসুল আলম
		১৪	বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত	বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত

নারিকেল

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

নারিকেল ভারতবর্ষের একটি অন্যতম প্রধান কৃষিজ ফসল। প্রধানতঃ নারিকেলের মধ্যস্থিত শাঁসের ব্যবহারের জন্য ইহার চাষ হইয়া থাকে, কচি নারিকেলের জল উপাদেয় পানীয় হিসাবে সুপেয় এবং অপেক্ষাকৃত পাকা নারিকেলের শাঁস রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শুক্‌না শাঁস পিষিলে তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল রন্ধনকার্য্যে এবং শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি, সাবান, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি নারিকেল তৈল হইতেও প্রস্তুত হয়। নারিকেলের খইল একটি উচ্চশ্রেণীর পশুখাদ্য। ইহার ছিবড়া হইতে দড়ি কার্পেট এবং অন্য বহু প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে নারিকেল হইতে ব্যাপক

আদর্শ নারিকেলের বাগান

ভাবে দেশীয় মদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার তাহা হইতে এক প্রকার গুড় বা চিনি পাওয়া যায়। প্রাচীন নারিকেল গাছের গুঁড়ি গৃহনির্ম্মাণে সহজেই ব্যবহৃত হয় এবং শুক্‌না পাতা ছাত ছাইবার জন্য প্রয়োজন হয়, শুক্‌না পাতা এবং শাঁসের উপরকার শক্ত আবরণ ইত্যাদি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং উহাদের ছাই জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। নারিকেলের এই বহুমুখী উপকারের কথা আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, যে অঞ্চলে ইহার চাষ হয় ইহা তথাকার জনসাধারণের দৈনন্দিন উপজীবিক এবং অর্থনৈতিক পক্ষে ইহা একটি প্রয়োজনীয় সম্পদ।

নারিকেলের চাষের উপযুক্ত জমি হইতেছে পলি মাটি। দো-আঁশ মাটিতেও উহা জন্মে তবে এই মাটিতে গ্রীষ্মকালীন আর্দ্রতা এবং বর্ষাকালে জলনিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কঙ্করময় মাটি, কর্দ্দমাক্ত জমি এবং তটভূমির বালুময় জমিতে শিকড় যেখানে সহজেই ভূমিতল হইতে জল পাইতে পারে তথায়ও নারিকেলের চাষ হয়।

চারা নির্ব্বাচন কালে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ হইতে অঙ্কুরিত চারা নির্ব্বাচন করিতে হইবে; ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর চারার মধ্যে দীর্ঘকায় জাতীয় চারাই সবচেয়ে ভাল। ইহা হইতে প্রাপ্ত শাঁস এবং তৈল খুব উৎকৃষ্ট ধরণের, ইহা হইতে প্রাপ্ত ছিবড়া দিয়া ভাল দড়ি তৈয়ারী করা যায়। "খর্ব্বকায় জাতীয়" গাছ যদিও শীঘ্র ফল দান করে তবুও গুণাগুণের তুলনায় সেই নারিকেল নিকৃষ্ট।

বীজ পছন্দ করিবার জন্য আদর্শ মাঝামাঝি আকারের গোলাকার নারিকেল

নূতন চারা রোপণ করিবার জন্য খোলা উৎকৃষ্ট জমি নির্ব্বাচন করা দরকার, ২৫-৩০ ফুট অন্তর সোজা লাইনে চারা রোপণ করিতে হয়, সাধারণতঃ ৩ ফুট গভীর গর্ত্ত করিয়া এক ফুট গর্ত্ত ভাল মাটি এবং বালিসহ পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার উপর পাঁচ সের ভাল ছাইয়ের সহিত দু'মুঠা সাধারণ লবণ মিশ্রিত করা দরকার, নীচু জমিতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে বা মাটি উঁচু করিয়া গাছ পোতা হয়, সাধারণ ক্ষেত্রে ৯-১৫ মাস বয়স্ক চারা রোপণ করিতে হয়, নীচু জমিতে অবশ্য ২ বৎসর বয়স্ক চারা রোপণ করা বিধেয়।

ছাড়া গরুবাছুরের জন্য রোপিত চারার চারিপাশে ভাল ভাবে বেড়া দিতে হয়, দুইটি চারাগাছের মধ্যস্থিত খালি জমিতে ডাল বা ছোলা জাতীয় শস্য এবং সবুজ সারের পর্য্যায়-ক্রমে চাষ করা যাইতে পারে। চারাগুলি ভাল ভাবে

বসিয়া যাইবার পর তাহার চারিপাশের জমির উপর অল্প খইল এবং ছাই প্রয়োগ করিলে উহা চারার দ্রুত বৃদ্ধির সহায়ক হইবে, নারিকেল গাছে ফুল ফুটিতে সুরু করিলে নিয়মিত সার প্রয়োগের প্রয়োজন, প্রত্যেক গাছে ১ মং ১০ সের গোবর সার, ৵১॥ সের এমোনিয়া, ১ সের হাড়ের গুঁড়া এবং ১ সের সালফেট অব পটাস দেওয়া দরকার।

নারিকেল গাছ নানা প্রকারের রোগ এবং পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, রাইনেসেরস পোকা নারিকেলের ভীষণ শত্রু, নরম অংশ এবং ফুল ইহারা খাইয়া থাকে। ০.২০/. বি. এইচ. সি. ছিটাইলে ইহার আক্রমণ হইতে গাছকে রক্ষা করা যায়। পাতার পোকা ডি-ডি-টির দ্বারা নির্মূল করিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত ইঁদুর নারিকেলের অন্ত আর একটি শত্রু।

নারিকেলের রোগের মধ্যে কুড়ি পচা (Bud-rot) এবং শিকড়ের রক্তপাত (Stem-bleeding) প্রধান। ফুল পচা রোগের সূত্রপাতে বোরডোক্স ছিটাইলে সুফল পাওয়া যায়। শিকড়ের রোগ দেখা গেলে উপক্রান্ত অংশটিকে কাটিয়া ফেলিয়া আলকাতরা লাগাইয়া দেওয়া দরকার।

উৎপাদন এবং চাষের জমির পরিমাণের দিক হইতে বিচার করিলে নারিকেলচাষে ভারতবর্ষ বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতবর্ষে ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মাদ্রাজ, মহীশূর এবং অন্ধ্রে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মে। উড়িষ্যা, বোম্বাই ও বাংলায় কিছু পরিমাণে নারিকেল জন্মায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণ নারিকেল বিদেশে চালান করিত ; কিন্তু কতকগুলি আন্ত-র্দেশীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক কারণে পরে ভারতবর্ষের নারিকেল-শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনকল্পে ভারত সরকার ১৯৩৫ সনে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রি-কালচারের পরিচালনায় একটি অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন : এই অনুসন্ধানের ফলে কাউন্সিলের পরিচালনায় ত্রিবাঙ্কুরে শিকড় ও পাতার রোগ এবং মাদ্রাজে নারিকেলের চাষ সম্পর্কে গবেষণা সুরু হয়।

ভারতবর্ষের অর্থনীতি ক্ষেত্রে নারিকেল-শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনুধাবন করিয়া ১৯৪৫ সনে প্রধানতঃ উৎপাদন, বিক্রয়-ব্যবস্থা, নারিকেলের বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার এবং নারিকেল-শিল্পের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক কেন্দ্রীয় নারিকেল কমিটি নিযুক্ত হয়। মাদ্রাজের অন্তর্গত দক্ষিণ কানাড়ায় এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে এই কমিটির পরিচালনায় দুইটি সর্ব্বভারতীয় নারিকেল গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে : আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক নারিকেল গবেষণা-কেন্দ্রও স্থাপিত হইতেছে।*

* ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার রিসার্চের 'সিলভার জুবিলী সুভেনীর' সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে

শীত

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

তবু তার সেই চোখে হিমে-নীল আকাশের তারা
আজো তো দিল না এনে এতটুকু প্রাণের ইশারা।
সেই ভীরু মেয়ে একা ম্লান চোখে দেখে শুধু চেয়ে
পাহাড়ের বুক ছুঁয়ে হাওয়া এসে মাঠ দিল ছেয়ে।

সে হাওয়ায় ঝরে পড়ে হিমবতী শিশিরের মণি
ঘরে তার উঁকি দিয়ে ভোরে উঠে দেখে সে যখনি :
একা একা কেঁপে কেঁপে সে ভোরের শীতের সানাই
শুধু তারে বলে গেছে পৃথিবীতে কিছু তার নাই :

সব স্বপ্ন মুছে গেছে : সব রাত ভুলে গেছে বাণী,
আদিগন্ত কামনায় মুছে গেছে প্রেমের বনানী।
শুধু একা পড়ে আছে এই সব কলাবতী ঘর
হু হু করে কেঁপে-ওঠা আর ওই অসীম প্রান্তর।

সারা রাত খড়ো-ঘরে তবু সেই শীতের বাতাসে
নতুন পৃথিবী এসে চুপে চুপে বসে থাকে পাশে।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক সাহায্য

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম এ

যাঁরা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন তাঁদের হয়ত মনে আছে, গত বৎসর আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কের (International Bank of Reconstruction and Development) কাছে ভারতের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশন আশি লক্ষ ডলার ঋণ চেয়েছিলেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই ঋণের প্রয়োজন হয়েছিল। ভারতীয় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশনের তরফ থেকে বলা হয়েছে, কর্পোরেশন নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন, কারণ তা না হলে ভারতীয় শিল্পে কর্পোরেশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় দাদন দেওয়া সম্ভবপর নাও হতে পারে। আজ দেশের প্রায় সকল অর্থনীতিবিদ্‌ই হয়ত স্বীকার করবেন, প্রধানতঃ তিনটি কারণে আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়েছে। প্রথম কারণটি হ'ল প্রয়োজনীয় মূলধনের স্বল্পতা। দ্বিতীয় কারণ, শিল্পের প্রসার করতে হলে যে ধরণের যন্ত্রপাতি দরকার আমাদের দেশে সে ধরণের যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। তৃতীয়তঃ, শিল্প-প্রসারের পক্ষে যে সব কারিগরি বিশেষজ্ঞ আবশ্যক, আমাদের দেশে এখনও পর্যান্ত তার সংখ্যা অল্প। ফলে শিল্পের তত্তটা প্রসার সম্ভবপর হচ্ছে না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, শিল্প-প্রসারের পথে যে সব অন্তরায় রয়েছে সে সব দূর করবার জন্য দেশের সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে সে চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত কতটা সফল হবে তা নিশ্চিতরূপে বলা যাচ্ছে না।

দাদন সরবরাহের দিক থেকে দুটো প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম প্রতিষ্ঠানটি হ'ল—ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশন, আগে এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির নাম হ'ল রিহ্যাবিলিটেশন ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রধানতঃ দুটো প্রতিষ্ঠানেরই পিছনে রয়েছে ভারত সরকারের প্রেরণা এবং অর্থানুকূল্য। এ ছাড়া আমরা দেখেছি, কতকগুলো রাজ্যে ফাইনান্স কর্পোরেশন স্থাপন করা হয়েছে, এবং যে সব রাজ্যে এখনও পর্য্যন্ত ফাইনান্স কর্পোরেশন স্থাপিত হয় নি সেগুলোতে ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে। এখানে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। সে প্রশ্নটি হ'ল—আমাদের দেশে মূলধন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অভাব এতটা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে কেন। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই স্বীকার করবেন, ভারত হ'ল অর্থনীতির দিক দিয়ে অনগ্রসর দেশ। বহুদিন ধরে শিল্প-প্রসারের প্রয়োজনীয়তার দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় নি, ফলে দেশে মূলধন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যে চাহিদা রয়েছে সে চাহিদা পূরণ করবার জন্য ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করা হয় নি। শিল্প-উন্নয়ন সংস্থা সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই হয়ত কিছু কিছু ধারণা আছে। সম্প্রতি এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া শিল্পলগ্নী এবং দাদনী তহবিল স্থাপন করবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, দেশে মূলধন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যে অভাব রয়েছে, এই দুটো প্রতিষ্ঠান সে অভাব অনেকখানি দূর করতে পারবে।

এখানে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-উন্নয়ন সংস্থা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা দরকার। কয়েকদিন আগে সংস্থাটি রেজিষ্ট্রীকৃত হয়েছে, তবে এর মূলভিত্তি হচ্ছে সরকারী মালিকানা। অন্য দিকে যে প্রস্তাবিত শিল্পলগ্নী ও দাদনী তহবিলের কথা বলেছি—সে তহবিলের প্রধান অবলম্বন হ'ল দুটো। প্রথম অবলম্বন হচ্ছে ভারত, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিত্তশালী লোকদের সহযোগিতা। দ্বিতীয়তঃ, প্রস্তাবিত তহবিলটির পিছনে রয়েছে ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রেরণা এবং অর্থানুকূল্য। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কারণ তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে ভারতে বেসরকারী সহযোগিতায় একটি দাদন-প্রতিষ্ঠান গঠন করবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে দুই জন বিশিষ্ট মার্কিন ব্যাঙ্কার এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি ভারতে এসেছিলেন। এঁরা ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে প্রস্তাবিত দাদনী প্রতিষ্ঠানের কাঠামোটি প্রস্তুত করেন, এর পর আলোচনা সুরু হ'ল ভারতীয় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। আলোচনার পর একটা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হ'ল। প্রকাশ—নবগঠিত প্রস্তুতি কমিটির সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে এক দিকে ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক, অন্য দিকে ব্রিটিশ ও মার্কিন বেসরকারী লগ্নীকারীদের সঙ্গে বিশদভাবে আলাপ-আলোচনা করে প্রস্তাবিত দাদনী প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেছেন।

প্রস্তুতি কমিটি আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা দাদন এবং মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছেন। অবশ্য, কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয় নি। অন্যান্য দেশ থেকেও মোটা টাকা দাদন এবং মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে প্রস্তুতি কমিটি সমর্থ হয়েছেন। প্রস্তুতি কমিটির এই সাফল্য ভারতীয় শিল্প-প্রসারের পথ অনেকখানি প্রশস্ত করে দেবে। জানা গিয়েছে, প্রথমে সওয়া সতের কোটি টাকার সংস্থান নিয়ে ব্যবসা সুরু করা হবে। এই সওয়া সতের কোটি টাকার মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা হ'ল মূলধন। এ ছাড়া সাড়ে সাত কোটি টাকা হচ্ছে আমানত। আমানতটি হবে দীর্ঘমেয়াদী এবং এর ক্ষেত্রে সুদ দেবার কোন প্রশ্ন উঠবে না। বাকী রইল পৌনে পাঁচ কোটি টাকা। এই টাকাকে আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণ হিসাবে বিবেচনা করা হবে

হয় নাই। তবে শত বাধাতেও যে তিনি বিচলিত হইতেন না, তাহার মূলে ছিল তাঁহার কর্ম্মসাধনার অন্তর্নিহিত বুদ্ধিযোগ। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহারই হইল সেই বুদ্ধিযোগ। এই বুদ্ধিযোগের বলেই তিনি 'কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ' হইয়াছিলেন। গোড়াকার শিক্ষক-জীবন হইতেই তাঁহার প্রাণের কথা ছিল—ছেলেদের সেবা করিতে পাইয়াছি, আমার জীবন ধন্য। সেবাই জীবনের চরম সার্থকতা—ইহার পুরস্কারস্বরূপ কাম্য আর কিছু নাই, এই বুদ্ধিযোগে আরূঢ় হইয়াই তিনি ছিলেন সার্থক সেবক, সার্থক কর্ম্মী, সার্থক সাধক, সার্থক ভক্ত। এই বলেই অহিংসার ভাববেগে তিনি ছিলেন মালিন্যমুক্ত। গঙ্গাজলঘাটি বিদ্যালয়কে যখন তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে চাহেন, অবহেলিতদের বুকে তুলিয়া লইতে থাকেন, তখন বিরুদ্ধভাবাপন্ন বহু বিরোধী স্বজাতি (ক্ষত্রিয়) চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে স্থানচ্যুত করে। কিন্তু তিনি ছিলেন সেবাধর্ম্মে অটল; অহিংসা যে তাঁহার কতখানি সহজাত ছিল এই সময় হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তদানীন্তন গ্রাম্য নেতারা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে তিনি এতটুকু দ্বেষকেও কোনদিন মনের কোণে স্থান দেন নাই—একেবারে নির্ব্বিকার ছিলেন।

গঙ্গাজলঘাটি হইতে স্থানচ্যুত হইয়া, দুই মাইল দক্ষিণে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে গোবিন্দপ্রসাদ স্বহস্তে গৃহনির্ম্মাণ শুরু করেন. চাঁদা উঠাইতে থাকেন পরমস্নেহভাজন সহকর্ম্মী অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অকালবিয়োগের ব্যথা বুকে লইয়া নূতন প্রতিষ্ঠানের নাম দেন 'অমর-কানন'. জাতীয় বিদ্যালয়ের উপর সংকারী নীতি-লঙ্ঘনের অভিযোগ আরোপ করিয়া ব্রিটিশ সরকার উৎপীড়ন শুরু করেন। বলা বাহুল্য, দেশমুক্তির আন্দোলনে বারংবার দীর্ঘকাল কারাবরণ করিয়া গোবিন্দপ্রসাদ দেশসেবার নিকষ-পাষাণে পরীক্ষিত হইয়াছেন।

শেষ পর্য্যন্ত অন্যতর কর্ম্মগুরু দেশবন্ধুর নামে পৃথক একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 'অমর-কানন'-সংশ্লিষ্ট রাজরোষের কবল হইতে উহাকে তিনি রক্ষা করেন। তাঁহারই প্রযত্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের স্থলে বিদ্যালয়ের সুরম্য হর্ম্ম্য আজ শোভা পাইতেছে তাঁহারই ঐকান্তিকতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির নির্ম্মিত হয়। তাঁহার প্রচেষ্টায় নব-নির্ম্মিত অতিথি-ভবন আশ্রমের মর্য্যাদা এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

কি কারাজীবনে, কি কারাপ্রাচীরের বাহিরে অহিংস, অক্রোধ আচরণে—তথা অকৃত্রিম প্রীতিবিতরণে তিনি সকলের হৃদয় সম্যক্ জয় করিয়াছিলেন। বলিতে কি, সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে অহিংসা, অহিংসার সঙ্গে অক্রোধ, ত্যাগের সঙ্গে শান্তি, পরছিদ্রান্বেষণবিমুখতার সঙ্গে দয়া, নির্লোভতার সঙ্গে মৃদুতা এবং অচাপল্য এই সব দৈবী সম্পদের অধিকারী হইয়াই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ ত্রিংশবর্ষকাল তাঁহার অবিচ্ছেদে কংগ্রেসের অধিনায়কত্বে বিরুদ্ধ সমালোচনা যে হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন সমালোচকের বিরুদ্ধে রোষ বা দ্বেষ এক দিনের জন্যও তাঁহার মনের কোণে বাসা বাঁধিতে পারে নাই। আদর্শে অটল ছিলেন বলিয়াই তিনি ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের, এমনকি স্বকীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিপরীতমুখী স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত ব্যক্তিদের সমালোচনা বা উত্তেজনার মুখে অবিচলিত থাকিতে পারিতেন।

প্রকৃতপক্ষে, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতায় ব্যথিত হইয়া কিছুকাল যাবৎ তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ পরিহারেরই বাসনা করিতেছিলেন। পদত্যাগপত্র পেশও করিয়াছিলেন। এদিকে আর এক সর্ব্বত্যাগীর আহ্বান তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। চিরপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার চরম ত্যাগের ধর্ম্মে বিনোবাজীর কর্ম্মে আত্মদান করিলেন।

তিনি ছিলেন বহু জনের আশ্রয়। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের গুরু কর্ম্মভার সত্ত্বেও পৃথক ভাবে তিনি কত জনের অভাব মোচন করিতে সময় ও সামর্থ্য নিয়োগ করিতেন, কত প্রতিবেশীতে-প্রতিবেশীতে কলহের মীমাংসা করিয়া দিতেন, কত দীন-দরিদ্রের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতেন, কত দুঃস্থ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যত্ন করিতেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

গুপ্তের রাজ্যে এক মহামহীরুহের উদ্ভব ঘটিয়াছিল অকস্মাৎ সে মহীরুহের পতন হইল নির্ভরের নীড় সহসা ভাঙিয়া গেল বহু জনের ভরসা শূন্যে মিলাইয়া গেল।

আজ মনে পড়ে তাঁহার আযৌবন জগন্মাতার চরণে আশ্রয়-গ্রহণের কথা। যৌবনের প্রারম্ভে দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য সাধনার দুস্তর স্তরে পদার্পণ করিয়া তিনি কাতর প্রাণে জগন্মাতার শরণাপন্ন হইতেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি এই আশ্রয়কে চরম আশ্রয় জ্ঞান করেন। ইহাই তাঁহাকে শ্রীশ্রী-সারদাদেবীর নিকট দীক্ষাগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

সেই চিরকুমার কর্ম্মযোগী জীবনের পঁয়ষট্টি বৎসরকাল সেবাধর্ম্মে উৎসর্গ করিয়া অবশেষে ভূদান যজ্ঞের মহাব্রতে ব্রতী হইয়া উহার হোমশিখায় স্বকীয় জীবনকে পূর্ণাহুতি দান করিলেন। অন্তিমের দণ্ডকালপূর্ব্বে কর্ম্মভূমির পথে পা বাড়াইতে গিয়া ভূপতিত হইলেন, আর উঠিলেন না।

দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁহার ত্যাগের কথা, সেবার কথা মহতী কীর্ত্তিরূপে উজ্জ্বল থাকিবে সন্দেহ নাই। অমর-কাননের অণু-পরমাণুতে তাঁহার কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান হইয়া রহিল—একথাও সত্য। অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ দেশবাসী কিন্তু নিতান্ত ব্যথাতুর হৃদয়েই তাঁহাকে স্মরণ করিয়া উচ্চারণ করিতেছে—"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" প্রকৃতপক্ষে স্বকীয় কীর্ত্তি অপেক্ষা মহত্তর চরিত্রের শোভাতেই তিনি স্বদেশবাসীর অন্তরে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন।

তড়িৎ-লতা

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৮

চা-জল খাবারের আয়োজন আমাদের ঘরেই হ'ল। খেতে খেতে বিমুদার মাথায় হাত দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, "এমনি একটা ছেলে যদি আমার থাকত!"

"কেন, আমি কি আপনার সন্তান নই?"

"না না, ও কথা বল না বাবা। যাকে আমার সন্তান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পাই, তার সঙ্গে তোমার তুলনা, ছিঃ ছিঃ।"

"কি যে বলেন···"

"হ্যাঁ বাবা, ঠিকই বলেছি।" শম্পা দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "জান মা, এমনি মায়ার শরীর আমার চোখে কোন দিন পড়ে নি। ব্যাটা ছেলে, অমন শক্ত জোয়ান চেহারা—কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার পর ও আমায় তুলে নিয়ে এল মনে হ'ল যেন তুমিই আমায় নিয়ে এলে, এমন নরম ওর শরীর। যেমন ওর নরম মন তেমনি ওর শরীর।" পরে বিমুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের সাংসারিক পরিচয় জানি নে, কিন্তু তবু অকুণ্ঠ চিত্তে আশীর্বাদ করছি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক—তোমরা সুখী হও বাবা।"

বিমুদা বললেন, "আমাদের সত্যি পরিচয় শম্পা দেবীই আপনাকে বলবেন।"

খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। বৃদ্ধ যতই প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করুক না কেন, আমাদের সামাজিক পরিচয় তখনও তার কাছে অজ্ঞাত। তার দিকে তাকিয়ে, শম্পা দেবী মনে হ'ল তার মনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন—"বাবা, জানেন? এদের জন্যই আমরা বেঁচে আছি।"

বৃদ্ধ চকিত হয়ে উঠল। "কেন, কি হয়েছিল?"

"আমাদের নৌকো ডাকাতের হাতে পড়ে। মনে হ'ল বুঝি এরা আকাশ থেকে আমাদের নৌকোর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। ডাকাতরা পালাল কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গেল নৌকোটা। যে নৌকোয় ওরা আসছিল, তাই বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছিল আমাদের সঙ্গেই।"

"পরম সৌভাগ্য আমার, মা, পরম সৌভাগ্য।" আকাশের দিকে হাত তুলে ভগবানের করুণা প্রার্থনা করলেন যেন। "তোমরা আমার জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়। শুধু আত্মীয় বললে তোমাদের ছোট করা হয়, তোমরা আমার সন্তান—না-না ত্রাণ-কর্তা। ওদের রক্ষা করে কি শুধু ওদেরই বাঁচিয়েছ—রক্ষা করেছ এই বৃদ্ধ আর শিশুর প্রাণ।"

বিমুদা একটু হেসে বললেন, "কিন্তু আমাদের সত্যিকারের পরিচয় পেলে ভয় পাবেন না ত!"

"আমি লোক ভাল এমন অপবাদ আমাকে বড় কেউ একটা দেবে না, কিন্তু ভীরু বলতে শত্রুরও জিভে আটকাবে। এই মাথার পাকা চুলগুলি অনেক কিছুর সাক্ষী; তোমাদের মত মানুষকে ভয় করতে আমায় কেউ শেখায় নি বাবা।"

শম্পা দেবীর মুখে দুষ্টুমির হাসি, "আচ্ছা বাবা, এদের কি আপনি আর কোন দিনই দেখেন নি।"

বৃদ্ধের কপাল কুচকে গেল। "কি জানি মা, মুখ ত চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু আসল কথা জান মা, এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এরা আমায় এমনি করে আপন করে ফেলেছে যে মনে হয়, এরা আমার যুগ যুগ ধরে পরিচিত, আজকেই এদের প্রথম দেখলাম না।"

"সেই ডাকাতির রাতের কথা মনে পড়ে আপনার···"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! কেন, কি হয়েছে তার।"

"মনে পড়ে সেই ছেলেটিকে যে গুলির আঘাতে আহত হয়েছিল!"

"ও! সেই! সেই ছেলে যে আহত হয়ে বললে, 'আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাও।' আর যে আমাদের ইজ্জত বাঁচিয়ে নিজের কাজ করলে। তুমি বাবা সেই! সেই যে গুলির আঘাতের পর কিছুক্ষণের জন্য তোমার মুখোসটা সরিয়ে নিয়েছিলে, তাই ত তোমায় একটু দেখেছিলাম। সে রকম ছেলে না হলে কি আর এত সাহস যে ডাকাতের হাত থেকে এমন করে আমার মাকে বাঁচালে।"

শম্পা দেবী একটু গম্ভীর ভাবেই বললেন, "এখন ত চিনলে বাবা? এখন তবে পুলিসে খবর পাঠাই. এদের ধরে নিয়ে যাক।"

বৃদ্ধ বললেন, "এ তোমার একান্তই ছলনা মা। তা কি কখনও হয়! আমি আর যাই হই না কেন, এত বড় অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি নই মা! তখনই পুলিসের কাছে কিছু বলতে পারলাম না, আর এখন···"

আমাদের দিকে তাকিয়ে শম্পা দেবী বললেন, "সে জানেন না বুঝি, বড় মজার ব্যাপার। পুলিস আমাদের জবানবন্দী চাইল—বাবা বললেন, 'কি জানি দারোগাবাবু, বাড়ীতে হঠাৎ লোকজনের চেঁচামেচি, বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ, আর ডাকাত ডাকাত শব্দ শুনতে পেয়েই আমরা দু'জনে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কতক্ষণ অমনি ভাবে ছিলাম জানি নে, যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের লোক। কাজেই কি যে হয়েছিল কিছুই জানি নে। আপনার গুলিতে আহত হওয়ার সংবাদ পুলিস টের পায় নি।"

বৃদ্ধের মুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির আভা। আমাদের দু'জনের কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, "ভগবানের অসীম

করুণা, তা ভিন্ন তেমনি সুবুদ্ধি কোথায় পাব মা বল ত। সেদিনকার সামান্য ভুল হয়ত আজ এনে দিত আমার জীবনে চরম বিপর্য্যয়।" একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—"আমার বাড়ী যেতে আজ থেকে আর বন্দুক বা লাঠি সোটার দরকার হবে না। আমার ঘর, বাড়ী, সবকিছুর দুয়ার খোলা থাকবে তোমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে।"

"কিন্তু তাতে আপনার বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে!"

"অনেক বিপদ ঘরে ঢুকেছে নানান্ পথে। তোমাদের আসার খোলা পথে যদি বিপদ আসে, সে বয়ে নিয়ে আসবে আনন্দ, তার বোঝা বইতে এতটুকু শ্রান্তি, এতটুকু ক্লান্তি, এতটুকু দ্বিধা যদি করি, তখন তোমরা আমায় বলো!

"ধন্য তোমাদের পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন। আজ থেকে তোমরাও আমার সন্তান, আমাদের পরিবারের অঙ্গ!"

বিনুদা হেসে বললেন, "বুঝলে শম্পা দেবী, ভাগীদার বেড়ে গেল, রাগ কর আর যাই কর না কেন!..."

বিনুদা আরও যেন কি বলতে চাইছিলেন। হঠাৎ থেমে গেলেন। বাইরে কাদের এগিয়ে আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। শম্পা দেবী বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এসে বিনুদাকে বললেন, তার জন্য এই গাঁয়েরই ক'জন লোক এসেছে।

বিনুদার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে দেখি নাইতে গিয়ে সেদিন পুকুরের ধারে যে বুড়োর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সে এবং আরও জনকয়েক চাষী। আমাদের দেখতে পেয়েই হাতজোড় করে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাল। আমরাও প্রত্যুত্তর জানালাম।

সবাই উপরে উঠে এসে বসে পড়ল, আমরাও বসলাম। বিনুদা জিজ্ঞেস করলেন, "কি খবর মাতব্বর।"

"আজ্ঞে, সেদিন ত আপনি আমাদের সব কথাই শুনলেন, পথও বাত্‌লালেন জোট বেঁধে কাজ করতে। কিন্তু জোটটা বাঁধি কি করে, সেটা ঠিক মাথায় ঢোকে না কর্ত্তা। আপনি নিজে থেকে ও কাজটি করে না গেলে আমাদের আর গতি নেই।"

চাষীদের মধ্যে একজন মন্তব্য করল, "কিন্তু মনে করবেন না কর্ত্তা। আসল কথা কি আপনারা আসবেন বলেই যান, কিন্তু আর আপনাদের দেখা পাওয়া যায় না। আমাদেরই অদৃষ্ট—আপনাদের আর দোষ কি! চোখের উপর আমাদের কষ্ট দেখে আপনাদের মনে কষ্ট হয়—আপনাদের খেয়াল জাগে আমাদের জন্য কিছু করবার। কিন্তু চোখের আড়াল হলেই আপনাদের দয়ার জোয়ার থেমে গিয়ে ভাটার টান লাগে। এই ত দেখে আসছি।"

বিনুদা—"তা কেন ভাই, এত আমাদের কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম।"

চাষী জবাবে বললে, "কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম এ সব কথায় বেশী দিন চলে না। আপনাদের এসব হ'ল খেয়ালখুশীর কথা। প্রয়োজনের তাগিদ ত নেই যে ঘাড় ধরে করাবে। ও বেলা কি খাব, ছেলেপুলেকে কি খেতে দেব আপনাদের ত সে রকম সমস্যা কিছু নেই! পথে দেখা হ'ল, রাস্তায় চলতে চলতে দু'কথা বলে গেলেন। এই পর্য্যন্ত।"

কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। গরীব দুঃখীর প্রতি দয়ায় আমরা চোখের জল ফেলি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হ'ল বলে মনে করি। সত্যিই বুঝি দরদ আমাদের নেই!

বিনুদা হাসিমুখেই বললেন, "তা যা বল ভাই, প্রথম অবস্থায় বাইরের লোকের সাহায্য ছাড়া যদি তোমরা নিজেরাই সমিতি গড়ে ফেল তাতে পুলিসের সন্দেহ অযথা জাগবে না। আমাদের কথা এখন প্রকাশ না করলেই ভাল। তোমরা শক্ত জোটবন্দী হলে আর তখন প্রকাশ পেলেও ক্ষতি করতে পারবে না। বড় মাতব্বর কথাটা এদের একটু বুঝিয়ে বল।"

মনে হ'ল মাতব্বর কথাটা বুঝতে পেরেছে। সে হাতজোড় করে বললে, "মাপ করবেন বেয়াদবী কর্ত্তা। আমি ওদের সব বুঝিয়ে বলব'খন।" তার পর আর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "চল ভাই, চল, এখানে আর বেশীক্ষণ জটলা করা ঠিক নয়।"

সবাই চলে গেলে বিনুদা মাতব্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে মীরগঞ্জ হেঁটে যেতে কতক্ষণ লাগবে মাতব্বর?"

"প্রায় ঘণ্টা তিনেকের পথ কর্ত্তা। হাঁ ক্রোশ চার হবে। ভাঙাচোরা পথ, তাতে সাঁকো, পুল সব জায়গায় ঠিক নেই।"

"মীরগঞ্জের পথ আমাদের জানা নেই। রাত্তির করে যাব, কাজেই কাউকে সঙ্গে দিতে পার মাতব্বর। তার পারিশ্রমিক যাই হোক দেব, কিন্তু বিশ্বাসী হওয়া চাই।"

"পয়সার কথা বলছেন কেন কর্ত্তা..." একটু ভেবে বলল, "পয়সার কথা বলছেন কেন কর্ত্তা, আমার ছেলেকেই দেব আপনাদের সঙ্গে। ওর জান যাবে তবু মুখ দিয়ে একটা কথা কেউ বার করতে পারবে না। কিন্তু একটা কথা বলি কর্ত্তা, একে পথ খারাপ, তার ওপর আঁধার রাত্তির, অত কষ্ট করে আপনাদের গিয়ে কাজ নেই, তার থেকে বরং তোমরা নৌকোয় যাও।"

বিনুদা হেসে বললেন, "তোমার ছেলে পারবে আর আমরা পারব না, নিশ্চয়ই পারব।"

বিনুদার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মাতব্বর বললে, "সাহস দেন ত একটা কথা বলি কর্ত্তা।"

"বল না কি কথা।"

"এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি—তোমরা বোধ হয় তারা। তোমাদের ভাবে স্বভাবে কথাবার্ত্তায় তারই যেন নমুনা পাই। তোমরাই স্বদেশীবাবু, যারা বোমা বন্দুক নিয়ে..."

বিনুদা বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরল। আস্তে আস্তে বন্ধন মুক্ত করে মাতব্বর আর কোন কথা না বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইবারে ছাড়াছাড়ির পালা। ঠিক হ'ল আমরা আজ রাতে বেরিয়ে পড়ব, আর শম্পা দেবীরা বাড়ী ফিরে যাবেন কাল। এক সময় আমাদের দু'জনকে একলা পেয়ে শম্পা দেবী বললেন, "তোমার

ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য করে নিলাম। ফিরে পেয়েছি আমার সন্তানকে, দেখতে পেলাম আমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে এক নূতন মূর্ত্তিতে। এর পর ভবিষ্যতের আর যা কিছু তা সব ছেড়ে দিয়েছি তোমার ওপর। আর কিছু ভাবতে পারি নে।"

মনে হ'ল বিমুদা ঠাট্টা করে বললেন, "অতটা নির্ভরশীল হওয়া ভাল নয়। আমি যদি বিগড়াই!"

"তবে ফুটো হাঁড়ীর মতই এক বিন্দু মায়া না করে ছুঁড়ে ফেলে দেব ছাইয়ের গাদায়!" একটু থেমে বললেন, "ঠাট্টার কথা নয়, এ সত্য প্রমাণ করতেই হবে যে, বাড়ীঘর আর আমরা সব তোমাদেরই!"

"কিছু ভেবো না শম্পা, দু'দিন যেতে না যেতেই দেখবে লোকজন আসা-যাওয়া, খাওয়া-থাকা আরও কত কি ঝামেলা পোহাতে হয়। আমাদের নীলা বলে একটি বোন আছে, তাকে হয়ত খুব শীগগির তোমাদের ওখানে রেখে আসতে হতে পারে।"

"এ্যাঁ, সত্যি বলছ? ওকে পেলে হয়ত চম্পার অভাব ভুলতে পারব।"

বৃদ্ধের ডাক শুনে আমরা সবাই গিয়ে তার কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি শম্পা দেবীকে উদ্দেশ করে বললেন, "মা ওদের তুমি আজ একটু ভালমন্দ খাইয়ে দাও। আজ সারা রাতে ত জুটবেই না, কালও কোথায় কি জুটবে কে জানে! পয়সাকড়ির দরকার থাকলে আমার ব্যাগটা থেকে ওদের দরকারমত টাকা দিয়ে দাও।"

সামান্য হলেও আবার সব গোছানোর পালা। তার মধ্যেই নানা হাসিতামাশার সঙ্গে সঙ্গে বেলা গড়িয়ে গেল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। পশ্চিমের আকাশে যদিও তখনও রক্তিমাভা বিদ্যমান কিন্তু গাছপালার প্রাচুর্য্যে এ বাড়ীতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে অনেক আগেই।

চাষীর ছেলে লাঠি হাতে উপস্থিত হ'ল। আমাদের আর চাষীর ছেলের খাওয়া একসঙ্গেই শেষ হ'ল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করেই আমরা যাওয়ার জন্ম তৈরি হয়ে গেলাম!

আমাদের কারুরই মনের অবস্থা ভাল নয়। আজ মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধান, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন বহু দিনের মেলা-মেশার বিচ্ছেদ ঘটছে। শম্পা দেবীর চোখে জল টল টল করছে।

"চোখের জল ফেলে আমাদের যাত্রাপথ পিছল করো না শম্পা, হাসিমুখেই বিদায় দাও।"

"আমার অদৃষ্ট মন্দ কিনা, তাই চোখে জল আসে। নইলে আজ আমার জীবনের পাত্র তুমি কানায় কানায় ভরে দিয়েছ। সার্থক হয়ে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে আমার সমস্ত জীবনের দুঃখবেদনা। তবু কিসের ভয়, তবু কিসের ভাবনা মনকে ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায় দোলা! চোখে জল ভরে আসে। যাওয়ার আগে এই আশীর্ব্বাদ শুধু করে যাও যেন পেয়ে হারাবার বেদনা সহ্য করতে না হয়।"

আমরা পা বাড়ালাম। বিমুদা পিছু তাকিয়ে বললেন, "চললাম শম্পা, ভুলে তুমি যাবে না জানি—তোমার স্মৃতিতে থাকব এই আমার বড় পাওয়া।"

"আমি ভুলব তোমায়! হায় রে অদৃষ্ট আমার! তুমি যেখানে যখন যে ভাবেই থাকো না কেন, শম্পার মনপ্রাণ তোমাকেই অনু-সরণ করে ফিরবে। তোমার পথ আর তুমি—এতে আমার কোনই তফাৎ যে নেই! একটু দাঁড়াও, খোকা তোমায় প্রণাম করবে, তাকে তুমি আশীর্ব্বাদ করে যাও সে যেন তোমার মত হয়। প্রণাম কর খোকা।"

"আশীর্ব্বাদ করছি শম্পা, ওর জীবনে যেন সংগ্রামের ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে না হয়—ওগুলি যেন আমাদের উপর দিয়েই শেষ হয়। ওরা যেন শান্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে বিকশিত হয়, ওরা যেন মুক্ত ভারতের স্বাস্থ্যকর সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।"

খোকাও মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "মাগো, তুমি কাকুর জন্ম কাঁদছ, তুমি কাকুকে খুব ভালবাস, না মা? কেঁদো না, কাকু আবার আসবে।"

এবারে বিমুদার হাত ধরে বললে, "এস কিন্তু কাকু, না এলে মা কাঁদবেন, আমি কাঁদব। বলছ না কেন কাকু, তুমি আবার আসবে? দেখছ না মা যে কাঁদে।"

খোকা আবার মাকে বললে, "মা কেঁদ না, কাকু ফিরে আসবে। তুমি কাঁদলে আমিও কাঁদব মা।"

শম্পা দেবী ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের মনেই বললেন, "তুমি মানুষ হয়ে ওঠ বাবা, তোমার মধ্যেই আমি সবাইকে ফিরে পাব।"

আমরা এগিয়ে পড়লাম। লক্ষ্য করলাম বিমুদা বারকয়েক পিছন ফিরে তাকালেন। এত বড় একটা প্রশান্ত অচঞ্চল হৃদয়ে লেগেছে দোলা। সেই মহান্ হৃদয়ের ঢেউ এসে যেন আমার হৃদয়কেও ছুঁয়ে গেল। মনে হ'ল, এরাই ধন্য। মহৎ হৃদয় মহতের সঙ্গে মিলেছে। সোনার বুকে মাণিকই মানিয়েছে ঠিক।

আমার হৃদয়ের অন্তস্তল খুঁজে দেখলাম সেখানে আঁধার ছাড়া কিছুই নেই! সেই আঁধার সমুদ্রে তলও নেই, সীমাও নেই!

১২

একে অন্ধকার তায় জঙ্গল। পথ যা ছিল গ্রীষ্মের সময় তা বর্ষার চাপে ভেঙেচুরে একাকার! সর্ব্বোপরি বাধা-বিপত্তি পদে পদে! তাড়াতাড়ি চলা ত দূরের কথা, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল বুঝি আমরা ঘুরে ফিরে একই পথের বাঁকে এসে দাঁড়িয়ে গেছি!

যতটা সম্ভব আস্তে আস্তে ঝোপঝাড় সরিয়ে চললেও রাতের নিস্তব্ধতায় তার আওয়াজ অনেক দূরের লোকেরও কানের পর্দায় আঘাত করে! 'কে যায়' হাঁক শুনে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। হয়ত আমাদের উদ্দেশ করে নয়, অন্য কাউকে ডাকছে মনে করে

যেই দু'পা এগিয়েছি, অমনি আবার—"কে যায়, যেই হও থাম।" অন্ধকারে আমরা কেউ কারুর মুখ দেখতে না পেলেও এটা অনুমান করা শক্ত নয়, সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। চাষী যুবক ছেলেটি আস্তে আস্তে বলল, "আপনারা এগোন—আমি ওদের কাছে যাই—গাঁয়ের চৌকিদারের গলায় আওয়াজ পেলাম। আমি ওদের ডাকের সাড়া দিচ্ছি।"

কথা শেষ করেই যুবকটি চেঁচিয়ে বলল, "কে তোমরা, দাঁড়াও আসছি।"

বিমুদা বললেন, "কিন্তু ওরা ত একা মনে হচ্ছে না!"

"আমারও তাই মনে হয় বাবু। আপনারা এখানে দাঁড়াবেন না। এগুতে থাকুন। একটু গেলেই একটা সাঁকো পাবেন। সেটা পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই একটা পায়ে-হাঁটা পথ—এখন অবশ্য জঙ্গলে ঢাকা। খানিক বাদেই ডাইনে বাঁক নিলে পাবেন একটা মস্ত গাছ, অনেক ডালপালা। তার নীচে একটু ঝোপঝাড় আছে, তার মধ্যে চুপচাপ আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি এই এলাম বলে।"

"তুমি তাদের কি বলবে জিজ্ঞেস করলে।"

"যা হোক একটা কিছু বলব এখন। জান থাকতে আপনাদের অনিষ্ট হতে দেব না বাবু।" কথা শেষ করেই যুবকটি এগিয়ে গেল।

এতক্ষণ সে ছিল আমাদের অন্ধের নড়ি। এবার আমরা একরকম অন্ধকারে হাতড়েই চলতে লাগলাম। কিছুদূর এগিয়ে তার কথামত সাঁকো পেয়ে মনে ভরসা হ'ল ঠিক পথেই এগুচ্ছি। কিন্তু এটির ওপরে উঠেই বুঝতে পারলাম যে, পুলিসের হাতে রেহাই পেলেও এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় নেই। দুই প্রস্থ সাড়াশীর মত বাঁশের ওপরে তিনখানা বাঁশ। দুখানা খালের দু'পাশ থেকে আর একখানা মাঝখানে বেশী উঁচুতে, নীচ দিয়ে নৌকো যাতায়াতের সুবিধের জন্যে। ডানদিকে ধরবার একখানা বাঁশ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু না থাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। ধরতে গিয়েই বুঝলাম এর উপর ভর দিলেই ওটাকে নিয়েই নীচে পড়ে যেতে হবে। আমরা পা ফেলা মাত্রই নড়বড়ে সাঁকোটি দুলতে লাগল।

সশরীরে ওপারে পৌঁছতে পারব এমন ভরসা নেই, অথচ ফেরবার উপায় নেই। তেমন তেমন সার্কাসের ওস্তাদ, যারা তারের ওপর দিয়ে সাইকেল চালায় তারাও এমনি সাঁকোর ওপর কি করবে সে বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগছিল। অবশ্য বেশীক্ষণ আর এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটাতে হয় নি! কেননা যেই শেষের দিকের বাঁশে পা দিয়েছি অমনি মড় মড় মড়াং করে ভেঙে একেবারে জলে পড়ে গেলাম। জল অল্প ছিল, মাটিতে ঠেকলাম। যাই হোক, কোন রকমে ওপারে গিয়ে উঠলাম।

বিমুদা ছিলেন ঠিক আমার পেছনেই! আমার পড়ে যাওয়ার ফলে তাঁরও আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় নি। তিনিও বেপরোয়া হয়ে সামনের দিকে লাফ মারলেন। ঠিক জলে না পড়লেও কাদার ওপর পড়লেন।

বোমার পুটলীটা ছিল বিমুদার বাঁ হাতে—দুটো টিনের কৌটায় বোমা আর ক্যাপ, সবসুদ্ধ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে একটা পুটলী। ওটাকে বাঁচাতে গিয়ে তার আপাদমস্তক কাদায় মাখা হ'ল, তখন অবশ্য অন্ধকারে কিছুই মালুম হয় নি ঠিক কেমনটি দেখতে হ'ল। কোমরে ছিল রিভলবার আর কার্টিজ আমাদের দু'জনের কাছেই—কাজেই সেগুলোও ভিজে গেল—

কি আর করব। এগুতে লাগলাম। খানিক এগিয়ে আসবার পর অনুমান করলাম পায়ে চলার পথ। দিনের আলোতেও তার অস্তিত্ব বার করা বোধ হয় মুশকিল হ'ত। কিন্তু যে অবস্থায় চলেছি তাতে দৃষ্টিশক্তি বোধ হয় একশ' গুণ বেশী বেড়ে গিয়েছিল, তাই অনুমানে ঠিক করলাম এই সেই চলার পথ। দু'হাতে জঙ্গল সরিয়ে এগোতে লাগলাম। ডালপালা ছড়ান একটা বড় গাছ দেখে স্থির করলাম এইখানেই চাষী যুবক বলেছিল আমাদের দাঁড়াতে। অনুমান ভিন্ন আর দ্বিতীয় চিহ্ন নাই। যাই হোক, একটা ঝোপ আড়াল করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। খস খস পাতার আওয়াজ পেয়ে সচকিত হলাম। ফিস ফিস আওয়াজ, "আপনারা কি আছেন এখানে?" নিশ্চিন্ত হয়ে জবাব দিলাম। ওর কাছে শুনতে পেলাম চৌকিদার আর পুলিসের লোক মিলে সবসুদ্ধ চার পাঁচ জন লোক হবে। ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই রাতে ও চলেছে কোথায়? জবাব দিয়েছে যে ও চলেছে ওর পিসীর বাড়ী, ভারী ব্যামো। এদিকে বাড়ীতেও কাজের অন্ত নেই। তাই রাতারাতি দেখে ফিরে আসবে বাড়ী।

যুবকটি কম ওস্তাদ নয়। কৌশলে জেনে নিয়েছে ওদের মতলব। ওরা বলেছে যে, "আর কও কেন, এদ্দিন ঘুরেছি চোর ছ্যাঁচড়ের জন্য। এখন দিনকাল গিয়েছে পালটে, তাই ভদ্রলোকের খোঁজখবর নিতে হয়। চলেছি চৌধুরী বাবুদের বাড়ী। ওখানে কারা নাকি নতুন লোক এসেছে। খোঁজখবর নিতে হয় ওরা কারা। আসল কথা কি—থাকলে ধরেই আনব।"

তারপর একটু থেমে যুবকটি বলল, "আচ্ছা বাবু, সাঁকোটা দেখলাম ভাঙা। আপনারা পড়ে গিয়েছিলেন নাকি? আওয়াজ যেন একটা পেয়েছিলাম।"

আমাদের জবাব শুনে বলল, "তাই বটে আমরাও শব্দ শুনতে পেয়েছি। ব্যাটাদের কান এড়ায় নি। ওরা চেঁচিয়ে উঠল কে যায়। তারপর আর কোন সাড়া না পাওয়ায় আমি বললাম রাত-বিরেতে জন্তুজানোয়ার বেরোয়। ওদেরই কেউ বুঝি খাল পার হচ্ছে। তারাই কেউ হবে।"

যাই হোক, আপাততঃ বিপদ কেটে যাওয়ায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। আর মনে মনে যুবকটির উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না।

আর কালবিলম্ব না করে এগিয়ে চলতে হবে। উত্তেজনা-বশে এতক্ষণ যা লক্ষ্য করতে পারি নি তার প্রথম হচ্ছে বাঁ পা আমার বেশ জখম হয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে কার্টিজগুলি আপাততঃ একটা শুকনো নেকড়ায় জড়ান দরকার। বিনুদার হাতের পুটলীটা থেকে শুকনো নেকড়ার এক টুকরো দিয়ে দ্বিতীয় কাজটি সমাধা হ'ল। প্রথম কাজটির জন্ম কোন কিছু বলতে লজ্জা বোধ করছিলাম।

মীরগঞ্জ যখন এলাম তখন রাত বোধ হয় দুটো আন্দাজ হবে। জায়গামত পৌঁছে দেখি শম্ভু দাঁড়িয়ে আছে। আমরা খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম!

"কি ব্যাপার শম্ভু।"

দশটা থেকে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে কোন কিছুই বলব না, চলুন আড্ডায়!"

"কিন্তু এখখুনিই যে রওনা হতে হবে। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে!"

"আজ রওনা হওয়া মোটেই নিরাপদ নয়, কেননা রাত থাকতে কিছুতেই পৌঁছান যাবে না। এখন নদীতে জোয়ার শেষ হয়ে ভাটা সুরু হয়েছে। ভাটার টান খুব জোর, জল ঠেলে উজিয়ে যেতে অনেক সময় লাগবে। পৌঁছতে দিন হয়ে যাবে। আমাদের কাল সন্ধ্যায় পৌঁছতে পারলেই চলবে। তাতেই ভাল হবে, নদীর ধারে বাঁধের রাস্তার উপরটাও তখনই একবার দেখে নিতে পারব। বারে বারে সেখানে ঘোরাফেরা ঠিক হবে না। ঐ শহরে খুব জোর খোঁজখবর চলছে। ওখানে যেন ওদের ঘাঁটিই বসিয়েছে। তা ছাড়া অনেক জরুরী ব্যাপার আলোচনা করবার আছে।"

"অবাক করলি শম্ভু, আবার কি হ'ল!"

"যা হবার তাই হয়েছে। যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্ম আমাদের এই অজ্ঞাতবাস সেই পুলিসের লোকের কাছে আমাদের অবস্থান—প্রায় সকলেরই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। শম্পা দেবীদের বাড়ীতে তোমরা ছিলে তার খবরও তাদের জানতে বোধ হয় বাকী নেই।"

"এদিক দিয়ে যদি যাবার উপায় না থাকে তবে বরং অন্ম দিক দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতাম আগে জানতে পারলে।"

"তার উপায় নেই, নির্দেশ এসেছে এই পথেই যেতে হবে। যাই হউক, এখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নয়। চলুন আড্ডায়।"

আর কালবিলম্ব না করে আমরা এগোতে লাগলাম কোন শব্দ না করে। আশঙ্কাময় একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যেন প্রতি পদ-ক্ষেপকে আঁকড়ে ধরছে। যার ভরসায় এত পথ পার হয়ে এলাম, সে যেন রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ল!

এসে দাঁড়ালাম আমরা একটা কুড়েঘরের সামনে। দরজায় টোকা দিতেই একটি ছেলে দরজা খুলে দিয়ে আমাদের জন্ম পথ ছেড়ে দাঁড়াল, আমরা ঘরে ঢুকলে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, "আলো জ্বালব শম্ভুদা?"

"না, জ্বালবার দরকার নেই। তুমি বাইরে থেকে চারদিকে চৌকি দাও। কাউকে এগোতে দেখলে দু'বার কাশবে। আর যদি তেমন কোন বিপদ বুঝতে পার তবে ছুটে এসে আমাদের খবর দিও। চোখ কান দুই-ই খুব সজাগ রেখ ভাই।"

শম্ভু কথা শেষ করতেই ছেলেটি বেরিয়ে গেল—দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে। অনাগতের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। মনে হ'ল শম্ভু যেন ইতস্ততঃ করছে; কারণ আমার কাছে অস্পষ্ট হলেও বিনুদার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না।

বিনুদা বললেন, "নীতীশ! ও আর কোথায় যাবে। এ জায়গায়ও নতুন মানুষ, বাইরে গিয়ে দাঁড়ান ঠিক হবে না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে ঠিক উত্তর দিতে পারবে না। ও থাকলে কোন অসুবিধাই হবে না।"

বিনুদার কথায় বুঝতে পারলাম সমস্যাটা দাঁড়িয়েছিল আমাকে নিয়ে, কেননা শম্ভুর কাছে আমার পরিচয় সেই পর্য্যায়ে পৌঁছয় নি যেখানে অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না। তা ছাড়া একই সমিতির সভ্য হলেও ব্যক্তিগত পরিচয় সকলের সমভাবে হয়ে উঠতে পারে না। কাজেই বিশেষ কোন গোপন ব্যাপার আলোচনার বেলায় একটু সতর্কতার প্রয়োজন হয়।

আলোচনা সুরু হ'ল অন্ধকারের মধ্যে, কাজেই শুধু কেবল কথার ওজনেই সবকিছুর গুরুত্ব মাপতে হচ্ছিল—কথার সঙ্গে মানুষের চোখ-মুখের ভাব যে কথাকে সম্পূর্ণ করে তার প্রকাশ এমন আমাদের কারুরই পাওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু গলার আওয়াজ তার সহায়তা করল অনেক। তাই যখন শম্ভু বলল, "আমাদের বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত বিনুদা"—তখন তার গুরুত্ব বুঝতে খুব বেশী দেরী হ'ল না।

বিনুদা রসিকতা করে বললেন, "আমাদের সুদিন কবে ছিল বলতে পারিস শম্ভু!"

কথাটা খাটি সত্য—কাজেই মনে হ'ল শম্ভু একটু অপ্রতিভ হয়েছে। যাই হোক বিনুদাই ওকে লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্ম বললে, "পরিস্থিতি ভাল নয় নিশ্চয়ই—যাই হোক, কি হয়েছে তাই বল!"

"আজ মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধানে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তোমরা পাণ্ডববর্জ্জিত জায়গায় থেকে এর কোন খবরই পাও নি!"

"আন্দাজ করেছি!"

"কি করে!"

"পরে বলব'খন।"

"এদিকে বাছাই বাছাই সব ধরা পড়েছে। এমন ভাবে সব ঘটে যাচ্ছে যে দেখলে মনে হয় আমাদের প্রতিটি লোকের অবস্থান পুলিসের লোকের একেবারে নখদর্পণে।"

"হয়ত তাই, কিন্তু তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার কথা চিন্তা করে দেখেছিস কি ?"

"তোমাকেই তা করতে হবে বিনুদা ! এই নির্দ্দেশই এসেছে ওপর থেকে ! আর তোমাকে এগোতেও হবে এই পথেই। তোমার সঙ্গে যদি যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র না থেকে থাকে সেজন্য আমার কাছে আর একটা বোমা পাঠিয়ে দিয়েছে তোমাকে দেওয়ার জন্য।"

"আমাদের মধ্যেই কোন লোক পুলিসকে আমাদের অবস্থান জানাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কে সেই লোক অনুমান করতে পেরেছিস কি শম্ভু !"

"শুধু অনুমান নয় বিনুদা, একেবারে পাকা খবর। সেই ব্যক্তিটি আর কেউ নয়—আমাদের অনেকেরই প্রিয় কৃষ্ণদাস !"

"এঁ্যা, কৃষ্ণদাস ! বলিস কি !"

ঘরটি মুহূর্ত্তের জন্য নীরবতায় ডুব দিল। কৃষ্ণদাসকে নামে জানলেও তার সম্পর্কে বিশেষ কোন খবরই আমার জানা ছিল না। সে যখন শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে তখন তার খবর বলতে কোন বাধা নেই মনে করে জিজ্ঞেস করলাম, "কে এই কৃষ্ণদাস বিনুদা ?"

মনে হ'ল মুহূর্ত্তের জন্য হলেও বিনুদা আনমনা হয়ে পড়েছিলেন—টের পেলাম তাঁর গলার আওয়াজে, "এঁ্যা, কৃষ্ণদাস, হাঁা, শুনে রাখ ওর ইতিহাস। তোর জানা থাকা দরকার। আমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে—হয় ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলব নয়ত সাগরপারের দ্বীপে বসে জীবনের বাকী দিন কয়টা কাটাব। কিন্তু তোকে পেছনে রেখে যাব—আবার যারা আসবে তাদের অন্ততঃ গৃহী সভ্যরূপে সাহায্য করতে। মানুষ চিনে রাখলে, নির্ব্বাচনের গলদ বুঝতে পারলে তুই তোর অভিজ্ঞতা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবি অনেক—

"কৃষ্ণদাস ছিল গোড়াতে ময়মনসিংহের এক জমিদারের খাস চাকর। শুধু যে ও কেবল তার হাত-পা টেপা ও ব্যক্তিগত কাজ করত তা নয় কর্ত্তা ওকে বিশেষভাবে বিশ্বাস করতেন বলে তাঁর অস্ত্রাগারের মধ্যে ঢুকতে দিতেন।

"ভদ্রলোকের শিকারের প্রচুর সখ ছিল। ভাল শিকারী বলে তাঁর সুনামও যথেষ্ট ছিল। আর তার সঙ্গে আর একটা সখ ছিল তা হচ্ছে নূতন ধরণের কোন বন্দুক, রিভলবার বা পিস্তল বেরুলেই তিনি তা কিনে ফেলতেন। কাজেই তাঁর অস্ত্রাগার নানা ধরণের বন্দুক, পিস্তল আর রিভলবারে ভর্ত্তি ছিল।

"এইগুলির প্রয়োজন আমাদের সমিতির জন্য কতখানি তা ত বুঝতেই পারছিস। এইগুলি আমাদের আয়ত্তে আনবার সহজতম উপায় ছিল কৃষ্ণদাসকে হাত করা। সমিতিরই এক সুচতুর সভ্যের দু'চার দিন কথাবার্ত্তায় সে দেশোদ্ধারের মোহে আচ্ছন্ন হ'ল। জমিদার যখন দেখতে পেলেন যে অতি সহজে তার শেষ হাতিয়ারটি পর্য্যন্ত উধাও হয়েছে তখন কৃষ্ণদাসকে সন্দেহ করা ভিন্ন আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

"কৃষ্ণদাস ধরা পড়ুক এটা সমিতির দিক থেকেও মঙ্গলজনক নয়, কেননা পুলিসের সামান্যতম পীড়নে হয়ত সব ফাঁস করে দেবে। তাই ওকে বাধ্য হয়েই আমাদের আশ্রয় দিতে হ'ল। ও ঘুরতে লাগল আশ্রয় থেকে আশ্রয়ে। চিনতে লাগল সবাইকে।

"অশিক্ষিত বলে ওকে কোন নির্দ্দিষ্ট গঠনমূলক কাজেই—যেমন ধর না কেন মাষ্টারী বা ঐ জাতীয় কাজ দিয়ে নিযুক্ত করতে পারা গেল না, মাঝে মাঝে দুই-একটা একগুনে বা জোর করে অর্থসংগ্রহের কাজে তাকে লাগানো গিয়েছিল—তাতে ফল দাঁড়াল উল্টো। ওর চালচলতি দেখে খুব অল্পদিনের মধ্যেই এটা সবারই বুঝতে বাকী রইল না যে ওকে এখন সর্ব্বপ্রকারে সমিতির কাজ থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে। কিন্তু আলাদা করব বললেই ত আর আলাদা করা যায় না। কারণ একে ওর পুলিসের হাতে ধরা পড়ার ভয় তার চাইতে বড় ভয় আমাদের খবরাখবর পুলিসের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বার।

"এই জন্যই সভ্য করে পড়ে তুলতে প্রথম চাই গোড়াপত্তনের শিক্ষা। সেই শিক্ষা কৃষ্ণদাসকে দেওয়া সম্ভব হয় নি, আর তা ছাড়া তার অশিক্ষিত দাসমনোবৃত্তি তাকে কখনই কোন উচ্চ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে নি। আর এ ব্যাপারে সে যে একা ছিল তা নয়, আমাদের সমিতির মধ্যেই কেউ কেউ যে নিজের স্বার্থের খাতিরেই সভ্য হয় নি, তাও নয়। কাজে কাজেই কৃষ্ণদাসকে তারা অনায়াসেই নাগালের মধ্যে পেল।

"ক্রমে ওরা একটা ডাকাতি করল। খবরের কাগজে বেরুল স্বদেশী ডাকাতি ব'লে। প্রথমে আমরাও ওদের নাম অনুমান করতে পারি নি। কিন্তু যেখানে ওরা ডাকাতি করল সেখানকার পোষ্ট মাষ্টার আর ষ্টীমার ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের সমিতির সভ্য থাকার দরুন তাদের মারফত ওদের চিঠিপত্র সব আমাদের হাতে পড়ে ও গতিবিধি আমরা জেনে ফেলি।

"প্রথমে ঠিক হ'ল কৃষ্ণদাস এবং আর ও রকম সবাইকে চরম শাস্তি দিতে হবে, ওদের অনিষ্ট করার ক্ষমতা একেবারে নষ্ট করে দিতে হবে, কিন্তু তার পেছনে যে বিরাট ঝুঁকি রয়েছে তাকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না। বরং এই মনে হ'ল যে এমনি করে যদি ওরা আপনাআপনি দল করে সরে পড়ে তা মন্দ হবে না। এক দিন হয়ত ওরা ধরা পড়বে। কিন্তু সেদিন ওতে স্বদেশীর গন্ধও থাকবে না। কাজেই মাকড়সার মত নিজের জালে যদি নিজেরাই জড়িয়ে মরে তাতে আর বাধা দিয়ে লাভ নেই।

"কার্য্যত সমিতি থেকে আলাদা হয়ে পড়ায় ওদের আর টিকে থাকা সম্ভব মনে হ'ল না। ডাকাতির দরুন পুলিসের সন্দেহভাজন হয়ে ওরা ভয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে একেবারে নাকে খৎ দিয়ে পুলিসের সাহায্যে লেগে গেছে এই আশায় যে এতে সমিতির দণ্ড থেকে আত্মরক্ষাও হবে এবং পুলিসকে সাহায্যের বদলে অর্থলাভও হবে।"

হয়ত বিনুদা আরও কিছু বলতেন, কিন্তু মনে হ'ল শম্ভু এতক্ষণ অধীর আগ্রহে সব শুনছিল, সে বলে উঠল, "ঠিক তাই। ওরা

যে শুধু শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েছে তা নয় ওরা টাকা-পয়সাও পেয়েছে প্রচুর, পাচ্ছেও দিনের পর দিন। সবার আড্ডায় ওর যাতায়াত আছে বলে, পুলিস ওকেই বেশীর ভাগ সঙ্গে নিয়ে ঘোরে, আমাদের মধ্যে ওর পরিচিতদের ধরিয়ে দেবার জন্ত ও থাকে ওদের সবার আগে। সকলেই অবশ্য একান্ত গোবেচারী ভদ্রসাজে বেড়িয়ে বেড়ায়।

"অনেকের ধরপাকড় শেষ করে ওরা বেরিয়েছে আমাদের খোঁজে। একটিকে ওরা মোতায়েন করেছে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে, একটি শিয়ালদহে আর কৃষ্ণদাস স্বয়ং এসেছে এদিকে—চাটার্জ্জি, মজুমদার প্রভৃতি বড় বড় গোয়েন্দা কর্ত্তারা ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে আরও অফিসার ও অনেক দেহরক্ষী আছে। তার ফল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সভাদের গতিবিধি একেবারে বন্ধ। কিন্তু ওরা চুপ করে নেই —ওরা দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করতে আমাদের বিরুদ্ধে। রাজসাক্ষী তৈরি, এখন আসল লোক ধরতে পারলেই হ'ল।

"তাই কেন্দ্র থেকে নির্দ্দেশ দিয়েছে যে কৃষ্ণদাসকে চরম দণ্ড দিতেই হবে—এর পরিবর্ত্তে যদি আমাদের কারুর জীবন যায়, তাও আচ্ছা—তবু ওকে সরাতে হবেই।"

"কৃষ্ণদাস এখন ঠিক কোথায় তা জানা আছে কি", জিজ্ঞেস করলেন বিনুদা।

"ও এসেছে এখন গোবিন্দপুর। ওকে গোবিন্দপুরেই ভূতলশায়ী করবার জন্ত নির্দ্দেশ এসেছে।"

"কিন্তু কি ভাবে কি করতে হবে তার কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা পাঠিয়েছে কি কেন্দ্র থেকে?"

"না, তারা সমস্ত ভার তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিশেষ করে বলে দিয়েছেন কৃষ্ণদাসকে গোবিন্দপুরেই শেষ করতে হবে, তার সঙ্গী বড় বড় পুলিস অফিসারদের উপর লক্ষ্য না রেখে শুধু তার উপরই সমস্ত নজর দিতে হবে। তাকে যেমন করেই হউক চাই। এই জন্ত কাছাকাছি যা-কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে সবই তোমার ব্যবহারে লাগাতে পার। আর সঙ্গে আমি ত থাকবই। আর যদি কাউকে সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন থাকে তাও ব্যবস্থা করতে পারব।"

"না, আর কারুর দরকার নেই, আপাততঃ তুই আর আমি।"

ঠিক হ'ল এরা পরদিন নিশ্চয়ই গোবিন্দপুর যাবে। কৃষ্ণদাসকে মরণের কালো পর্দ্দার অন্তরালে পাঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা ছকে ফেলল। আমার নাম এল না একবারের জন্তও। আমি যে সাহায্য করতে পারি এ কথা হয়ত বিনুদা ভুলে গেছেন—"দরকার হলে আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নাও না কেন বিনুদা।"

"অভিমান করিস নে ভাই", আমার হাত ধরে ফেললেন বিনুদা! তাঁর কণ্ঠে দরদভরা মিনতির সুর—"প্রত্যক্ষ ভাবে তোকে কিছুই করতে হবে না। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এর নিশ্চিত ফলাফল। এ ঘটনা অন্তান্ত এক্শনের মত নয়, যাতে পালিয়ে আসবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার কিংবা শম্ভুর, কারুরই বেঁচে থাকবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই চাই না তোকে টানতে এর মধ্যে।

"তোর সাহায্যের যে একেবারেই দরকার হবে না তা নয়। গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত তোকে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয় যেতে হবে। তার পর প্রত্যক্ষ অবস্থা বুঝে, হয়ত এমনও হতে পারে তোর সাহায্যই হবে আমাদের প্রধান ভরসা।"

কথাগুলি শেষ করেই কেন জানি নে কোন্ খেয়ালে বিনুদা শম্ভুর আর আমার হাত ধরে বাইরে চলে এলেন। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। সামনের বড় গাছটায় পাখীগুলি হঠাৎ কিচিরমিচির করে উঠল। বোধ হয় কোন নিশাচর মাংসভুক পাখী গাছের নিদ্রিত পাখীগুলির বাসায় এসে উৎপাত সুরু করেছে। অন্ধকার রাত্রি। তারাগুলি যেন আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, যেন লক্ষ লক্ষ নানা রঙের হীরার ফুল ফুটে আছে আকাশে।

বিনুদার কণ্ঠে আবেগ—"আজ কি সুন্দর রাত। এত সুন্দর যেন আর কখনও দেখি নি। কে জানে, এই হয়ত আমাদের শেষ রাত, তাই এত সুন্দর মধুময় লাগছে, ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। আকাশের তারা, পৃথিবীর মাটি, এরাও মানুষের মত আকর্ষণ করতে পারে তা আগে আর কোন দিন যেন অনুভব করতে পারে নি। ক্রমে যেন মনে হচ্ছে জ্বল্ জ্বল্ তারাগুলি নেমে আসছে নিরন্ধ্র অন্ধকারের পথ বেয়ে পৃথিবীর বুকের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে এক হয়ে।

"আমাদের সব অন্ধকার হয়ে আসছে, কিন্তু আমাদের অকুণ্ঠ আত্মদানের জ্যোতি এই গভীর অন্ধকারে রাতভোর আলো দেখাবে অরুণোদয় পর্য্যন্ত।"

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ত সব চুপচাপ। বিনুদা শম্ভুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, তাকে গভীর স্নেহে আলিঙ্গনবদ্ধ করে বললেন, "একটা শম্ভু, একটা বিনুর শেষ হলে কিছুই আসে যায় না। আমরা মরে গেলেও ঐ তারাগুলির মত আলোর ধারায় পৃথিবীর বুক স্পর্শ করে থাকব—সকলের প্রাণের শুক্তিতে বেজে উঠব। সেই আলোতে অন্ধকারের বুক চিরে পথ দেখে এগিয়ে গিয়ে সকলে নবজীবনের গান গাইবে।"

"যে আলোর বর্ত্তিকা বিধাতা আমাদের বইতে দিয়েছেন তা চিরকাল নিপীড়িত মানুষের পৃথিবীকে আলোকিত করবে তাদের পথ দেখাতে বাধা করবে আমাদের শূন্যস্থান পূর্ণ—তাদের সকলের প্রাণে, সকলের সকল কথায় কাজে নূতন নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। বসন্তের ফুল ঝরে যায় কিন্তু ফুল আবার ফোটে। ফুলের সাময়িক মরণ আছে কিন্তু ধ্বংস নেই—আমাদের দেহটা গুলির আঘাতে মিলিয়ে যাবে কিন্তু বেঁচে থাকব আমরা, জেগে থাকবে আলো—তাই যদি না হবে তবে কিসের জোরে আমরা পেয়েছি শক্তি এগিয়ে যেতে রাত্রি প্রভাতের আশায়।"

একটু চুপ করে থেকে বিনুদা সস্নেহে শম্ভুর মাথা স্পর্শ করে

বললেন, "শম্ভু, একটা কথা তুই আজ আমাকে দে ভাই। মিছি-মিছি প্রাণ দিয়ে লাভ নেই। মরণে তোর ভয় নেই সে আমি জানি, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়িস নে ভাই। আমি একাই পারব এ কাজ সমাধা করতে। যদি প্রয়োজন হয় তবেই কেবল সাহায্য করতে এগিয়ে আসবি, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারলে করবি, একটুকুও দ্বিধা করবি নে। শুধু এই ভরসা-টুকু আমায় দে ভাই।"

শম্ভু বললে, "এত রাত্রে এমনি একটা বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি যে প্রাণভরে হাসবার উপায় নাই। কোন রকমে নিজেকে সংযত রাখছি। তুমি সত্যি হাসালে বিনুদা, এই শম্ভুর প্রাণের এত বড় মূল্য! তোমার প্রাণের চেয়েও বেশী! তুমি বাস্তবিক হাসালে, আর বোলো না কিন্তু, নইলে জোরে হেসে ফেলব।"

"যাক, জেনে রাখ মরতে আমি চাই নে। হাঁ, তবে যদি দরকার হয় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বৈ কি। যুদ্ধে যে যায় সে-ই কি মরে? হাজার হাজার গুলিবৃষ্টির মধ্যেও কেউ কেউ বেঁচে যায়। কার অদৃষ্টে বাঁচা আর কার বা মরা কে বলতে পারে। খামকা আমি মরতে যাব কেন? কি দুঃখে যাব বল।"

যে ছেলেটি বাইরে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল, সে এসে খবর জানাল যে, অদূরে কাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিনুদা আমাদের দু'জনার হাত ধরে ছোট ঘরটার মধ্যে ঢুকে আমাদের শুইয়ে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়লেন, "নে, ঘুমিয়ে নে, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে যতটুকু পারি আরাম করে নিতে হবে রে, আদায় করে নিতে হবে!"

পরদিন ভিজা কার্টিজগুলি গরম বালিতে হ'ল শুকানো। রিভলবার, বোমা আর ক্যাপ সবগুলি আবার ভাল করে পরীক্ষা করা গেল।

দুপুর নাগাদ বেড়িয়ে পড়লাম। বিনুদা আর আমি চলতে লাগলাম পাশাপাশি, শম্ভু খানিকটা পিছনে পিছনে। ওকে এখানে কেউ কেউ চেনে, কাজেই ও-যে আমাদের সঙ্গী এ পরিচয় না থাকাই ভাল।

আমরা ক্রমে বাজার ছাড়িয়ে নদীর ধারের বন্দরে এসে পড়লাম। বন্দরও পড়ে রইল আমাদের পিছনে। আমরা এগোতে লাগলাম পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে গাঁয়ের দিকে।

ভর-দুপুর বেলা, চারদিক নিস্তব্ধ। রাস্তায় লোকচলাচল নেই বললেই চলে। এক সময় শম্ভু একটু কাছে এগিয়ে এসে বলল, "মনে হচ্ছে একটা লোক আমাদের অনুসরণ করছে। তোমরা এগিয়ে যাও, ঠিক বুঝতে পারছি না ও আমাকে অনুসরণ করছে না আমাদের সবাইকে। আমি চলব এখন উল্টোমুখো যদি আমার জন্য ওর যাত্রা হয় তা হলে ও আবার পিছনে ধাওয়া করবে। তবে ত মন্দের ভাল, কোনরকমে ওকে এড়িয়ে আসতে পারবই। কিন্তু যদি বুঝি ও তোমাদের পিছু নিয়েছে তবে ওর সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে এমনি মার দেব যেন বাছাধনকে রাস্তায় পড়ে থাকতে হয় অজ্ঞান হয়ে। তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করো না। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছতে হবে গোবিন্দপুর।"

মুহূর্তের জন্য সব চুপচাপ, শম্ভুর কণ্ঠে আবেগ, মুখে রক্তের ঝলক, চোখ চক্ চক্ করছে, "বিনুদা, আজও তুমি আমায় ফাঁকি দিলে, নিলে না হাত ধরে, একলাই চললে চিরকালের মত। এই ছন্নছাড়া হতচ্ছাড়া শম্ভুকে দরদ দিয়ে ডাকতে, বুঝতে, স্নেহ করতে বুঝি আর কেউ রইল না! না, আর দেরী করব না, আমারও দিন আসবে, আমিও এক দিন সকলের উপর তুড়ি মেরে হাসতে হাসতে আগুনের রথে চলে যাব। আর চলে যাব সেই পথে, সেই আলোকের দেশে, যেখানে আজ তুমি চললে: দু'দিন আগে তুমি গেলে মন্ত্রে।"

"বিদায় ভাই শম্ভু, এক কাজ কর, তোর সঙ্গের বোমাটা আমাদের কাছে রেখে যাওয়া ভাল। কেননা ওর সঙ্গে যদি তোর হাতাহাতি হয় তবে বড় বিপদের সম্ভাবনা, ওতে তোরও বিপদ হতে পারে। তা ছাড়া হৈ চৈ বেধে যাবে, সব নষ্ট হবে। তুই একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার পিছন ফিরে আয়। আমাদের পার হওয়ার সময় আড়াল করে বোমাটা আমার হাতে দিয়ে দিতে পারবি।"

বোমাটা হস্তগত করে আমরা দ্রুতপদে এগিয়ে চললাম আর শম্ভু চলল পিছনের দিকে—"বিদায় বিনুদা, বিদায় নীতীশ ভাই।"

একটু পরে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি শম্ভুর সঙ্গে লোকটির হাতাহাতি বেধে গিয়েছে। লোকটা মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু আবার উঠে দাঁড়িয়েই শম্ভুর পিছন পিছন ছুটতে লাগল।

আমরাও তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলাম। এসে পড়লাম গাঁয়ের পথে। দু'ধারে ধানের ক্ষেত। আর বেশী দূর সোজা পথে যাওয়া নিরাপদ মনে না করে ঢুকে পড়লাম ক্ষেতের মধ্য দিয়ে নদীর কিনারার দিকে। অদূরেই আমাদের নৌকো বাঁধা। বন্দরে নৌকো রাখলে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে বলেই এই সাবধানতা!

নদীতে তখন ভরা জোয়ার। নদীর বুক ফুলে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার আঘাতে নৌকা চঞ্চল। স্রোতের আবেগে ছল ছল ঢেউ নদী-তীরকে যেন আদর করে বুকে টেনে নিতে চাইছে। উঁচু ঘাসগুলি জলের স্রোতে আত্মসমর্পণ করে যেন জলের আদরে আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

দুই-একখানা নৌকা নদীর বুকে চলেছে শাদা পাল তুলে—পাখীর মত পাখা ছড়িয়ে! জোয়ারের বেগে বাতাসের চাপ লেগে মাঝ-নদীতে উঠেছে ঢেউ। উঠছে পড়ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। শব্দে বেজে উঠছিল রুদ্রতালের আওয়াজ—মনে হ'ল যেন বলতে চাইছে, "আমিই ধরতে পারি ধ্বংসমূর্তি—তোদের সবাইকে ডুবিয়ে দিতে পারি অতল তলে।"

নৌকায় বসেছিল একটি ছেলে; ও নেমে এল। বিনুদার মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "শম্ভু আসবে না—ওর সঙ্গে

হাতাহাতি হচ্ছে এক গুপ্তচরের। তুমি এই সোজা পথে ফিরে যেও না! অন্যদিক দিয়ে ঘুরে যাও।"

বাঁধন ছেড়ে দিতেই নৌকা ছুটল স্রোতের টানে ঢেউয়ের তালে তালে দুলতে দুলতে। আমরা যখন গোবিন্দপুর পৌঁছলাম তার খানিক আগেই সূর্য্য গেছে অস্তাচলে। ধরণীকে ঘিরে ঘিরে নেমে আসছে অন্ধকার।

নৌকা বেঁধে বিনুদা বাঁধের গায়ে নেমে পড়লেন। ওপরের দিকে উঠতে উঠতে বোমা আর রিভলবারের অবস্থান সম্পর্কে যেন নিশ্চিন্ত হবার জন্য শরীরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলেন।

আমি তখন সবে নৌকা থেকে উঠেছি—বিনুদা উঠে গিয়েছেন একেবারে বাঁধের ওপর নদীর ধারের রাস্তায়। দূরের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে ইশারা করে উপরে উঠতে নিষেধ করে নিজেই কয়েক পা নীচে নেমে এলেন।

"নীতীশ, আজ বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন। বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হ'ল না। ঐ ওরা আসছে দেখতে পেলাম। আমাকেও ওরা দেখতে পেয়েছে বলেই বিশ্বাস। তুই আর একটুও দেরী করিস নে। বাঁধের ঢালু দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় উঠে পালিয়ে যা। নইলে তোকে বাঁচাবার আর কোনই পথ দেখতে পাচ্ছি নে। যা, যা, এখখুনি যা, আর একটুও দেরী করিস নে! ওকে যখন পেয়েছি আর আমি ছাড়ছি নে।"

তিনি তাড়াতাড়ি বোমার শেলটায় ক্যাপ পরিয়ে নিলেন, বললেন, "পালা শীগগির আমাকে দেখে ফেলেছে।"

কথা শেষ করেই বিনুদা রাস্তায় উঠে গেলেন। আমি দুরু দুরু বুকে ঢালু পার দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় উঠে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে আশ্রয়ের জন্য দাঁড়ালাম একটা পাঁউরুটি-বিস্কিটওয়ালার সামনে। কেনার ছল করে দরদস্তুর করতে লাগলাম —চোখ আমার বিনুদার ওপর।

মনে হচ্ছিল তার যাওয়ার নমুনা দেখে যে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে চেয়ে এমন ভাবে যে ওদের আগমনবার্ত্তা যেন বিনুদার কিছুমাত্র জানা নেই। আর প্রহরিসহ কৃষ্ণদাসরা একই ভাবে এগিয়ে আসছে, যদি ওদের আগমনবার্ত্তা জানতে পেরে শিকার পালিয়ে যায়! ওরা যদি জানতে পারত কি ভীষণ পরিণামের দিকে ওরা এগিয়ে আসছে।

এমনি অবস্থায় কখনও পড়ি নি।···এতগুলি লোককে বিনুদা একা সামলাতে যাচ্ছেন, আর আমি নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়েছি। আজ জীবনের শেষ ধাপে এসে স্বীকার করতে একটুও লজ্জা পাচ্ছি নে যে আমার মন ছিল ভীরু। কিন্তু তখনকার অবস্থায় নিজেকে ভীরু বলে স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করছিলাম। একেবারে চলে যেতে মন চাইল না। এখনই চলে যাওয়াটা অত্যন্ত ভীরুতা মনে হ'ল। সবাই ভীরু বলবে, বিশেষ করে নীলা! লজ্জার আর সীমা থাকবে না! এক বার মনে হ'ল যাই বিনুদার পাশে রিভলবার হাতে দাঁড়াই গিয়ে। কিন্তু এই নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে যেতে সাহস হ'ল না, আর বিনুদারও নিষেধ আছে। ওরা অন্ততঃ জনাসাতেক লোক, সকলেরই হাতে রিভলবার আছে নিশ্চয়ই। নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে সব লক্ষ্য করতে লাগলাম। ভাবলাম এমন যদি হয়, এ অবস্থায়ও বিনুদার যদি কোন কাজে লাগতে পারি!

এদিকে কৃষ্ণদাস সপ্তরথী-পরিবৃত হয়ে আসছে। দু'পক্ষের পরস্পর দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছিল। ওদের হয়ত আশা ছিল যদি বিনুদাকে জীবিতাবস্থায় ধরে ফেলতে পারে—তা হলে হয়ত অনেক খবরাখবর জানবার সুবিধা হবে। অবশ্য জীবিত কিংবা মৃত যে ভাবেই হউক ধরতেই হবে।

বিনুদাই ওদের প্রথম আক্রমণ করবেন এটা হয়ত ওরা একেবারেই অনুমান করতে পারে নি। তাই, যাই বিনুদা ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বোমা ছুড়লেন ওদের লক্ষ্য করে, ওরা প্রায় সকলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, অনেকেই আহত হ'ল। গোয়েন্দা অফিসার চাটার্জির মত কেউ কেউ বাঁধের নীচে ঝাপিয়ে পড়ল নদীর জলে। কালবিলম্ব না করে বিনুদা লাফিয়ে পড়লেন কৃষ্ণদাসের উপর। ধূলায় লুণ্ঠিত কৃষ্ণদাসের বুকের উপর বসে বিনুদা দু'বার গুলি করলেন, বোধ হয় একেবারে নিশ্চিতরূপে শেষ করবার জন্য।

বিনুদা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলেন। তখনই দেখা গেল যারা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে দু'তিন জন উঠে দৌড়তে লাগল বিনুদার পিছু পিছু, বিনুদার দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে। কেউ কেউ বোধ হয় ভয়ে এতক্ষণ মরার মত পড়েছিল।

আমার পক্ষে আর ওখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'ল না! ওদের পিছন পিছন ছুটতে লাগলাম। ক্রমেই ভিড় বাড়তে লাগল। কোথা থেকে একে একে পুলিস এসে জড় হ'ল।

রাস্তায় তেমন বাতি ছিল না। যাও ছিল তা গুলির আঘাতে নিবিয়ে দিয়ে, মাঝে মাঝে পেছনের দিকেও গুলি ছুড়তে ছুড়তে বিনুদা এগিয়ে যাচ্ছেন।

বেশ খানিকক্ষণ ছুটাছুটির পরও যখন কেউ আর পিছু ধাওয়া ছাড়ল না, তখন বোধ হয় একান্ত বেপরোয়া হয়ে হঠাৎ তিনি রাস্তায় দাঁড়ানো একটা ঘোড়ার গাড়ী আড়াল করে আর একটা বোমা ছুড়ে মারলেন। কয়েক জন ভূতলশায়ী হ'ল। লোকগুলি চারদিকে ছিটকে পড়ল, অনুসরণকারীদের মধ্যে একটা ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ল। অল্পক্ষণের জন্য যেন অনুসরণ বন্ধ হ'ল।

এর পুরো সুযোগ নিলেন বিনুদা। তিনি সরে পড়লেন। আমিও মুহূর্ত্তের জন্য একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমিও পা চাকা দিয়ে তার পিছু পিছু ছুটতে লাগলাম। কিছুদূর এগিয়েই একটা বাঁকে এসে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম দৃষ্টির মধ্যে কোন লোক নেই। আমিও আর দ্বিধা না করে ঢুকে পড়লাম ঐ ঝোপের মধ্যে। খানিকটা এগিয়েই খাল, খালের জলে তখন প্রবল স্রোত। কোন লোকজনের অবস্থান বোঝবার উপায় নেই অন্ধকারে। কিন্তু

প্রায় জল ঘেঁসে কিসের মৃদু গোঙানি ? নেমে গিয়ে প্রায় জলের ধার থেকে তুলে ধরলাম বিনুদাকে !

"কে ! ও, তুই নীতীশ ! এখনও তুই আছিস ? পালাস নি কেন ভাই ! আমি বড্ড অবসন্ন হয়ে পড়েছি । বোধ হয় কয়েকটা গুলি লেগেছে আমার শরীরে । নিজের বোমার টুকরোও বোধ হয় লেগেছে । আমায় ভাই নিয়ে চল ঐ সামনের ঝোপটার মধ্যে । যদি পারি একটু বিশ্রাম করে নিতে । এখুনিই হয়ত ওরা এসে পড়বে এখানে । আমায় একটু জল দিবি । বড্ড তৃষ্ণা পেয়েছে !"

ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বিনুদাকে শুইয়ে দিলাম ঝোপের মধ্যে । অঞ্জলি পূরে জল দিলাম । মনে হ'ল অসীম পরিতৃপ্তি পেলেন । "আঃ, বাঁচালি আমায় !" মনে মনে ভাবলাম যদি সত্যিই বাঁচাতে পারতাম !

আমি কাপড় ছিঁড়ে বিনুদার পায়ের ক্ষতের উপর বাঁধলাম । মনে হ'ল তিনি একটু সামলে উঠছেন ।

বেশীক্ষণ এমনি অবস্থায় কাটল না । কিছুক্ষণের মধ্যেই দূরে মানুষের কোলাহল শুনতে পাওয়া গেল । এরা যে বিনুদারই অনুসন্ধানে বেরিয়েছে তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না । বিনুদা তড়াক্ করে বসে বললেন, "ঐ শুনতে পাচ্ছিস, তুই শীগগির পালা । যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, যতক্ষণ শরীরে অস্ত্র ধরবার শক্তি থাকবে, ততক্ষণ ওদের কাছে বিনা যুদ্ধে বিনা বাধায় ধরা দেব না ।

"তুই যা, আর একটুও দেরী করিস নে । শুধু চলে যাওয়া নয় এখান থেকে, তোকে ফিরে যেতে হবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ থেকে । তুই সংসারধর্ম যাকে বলে তাই পালন কর আর পরোক্ষ ভাবে সমিতির কর সেবা । তোর দ্বারা যে কত উপকার হবে সমিতির তা আর কি বলব !

"আর একটা কথা, শম্পাকে বলিস আমার কথা ! ও হয়ত মনে ব্যথা পাবে । কিন্তু কি করব । শম্পাকে বলিস, তাকে মৃত্যুকালেও আমি ভুলি নি ; তাকে কোন দিনই ভোলা আমার সম্ভব নয় । বলিস আমি সমস্ত মন-প্রাণের সঙ্গে তাকে ভালবাসি ।"

বুঝলাম বিনুদা শেষ মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত, নইলে একথা এভাবে আমায় বলতেন না । মনে মনে ভাবলাম যাকে বোঝাবার কথা বললেন তাকে বোঝাবার শক্তি আমার নেই । আমি মুখ ফুটে ধীরে ধীরে বললাম, "বিনুদা, আমি অক্ষম, আমি দুর্ব্বল, কিন্তু তাই বলে কি একবার শেষ চেষ্টাও করে দেখব না । একবার চেষ্টা করে দেখিই না তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে পারি কিনা, আমার সঙ্গেও ত রিভলবার আছে ।"

বিনুদা সস্নেহে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, "পারবি নে ভাই পারবি নে । শুধু নিজে বিপদে পড়বি । যদি রক্ষা পাবার একটুও সম্ভাবনা থাকত তবে আমিই তোকে বলতাম সাহায্য করতে । আমি ত মরবার জন্যই মরিয়া হই নি ! মরিয়া হয়েছিলাম দুষ্কৃতের, বিশ্বাসঘাতকের বিনাশের জন্য । সে কার্য্য যখন সফল হয়েছে, তখন আত্মরক্ষা করতে পারলে করতাম । আর এখন আমার মনে জাগছে শুধু :

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্,

যাদের যাদের দরকার বিধাতা আগেই নিহত করে রেখেছেন । এখন তোমার আমার কিছু করবার নেই,শুধু নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন ।"

একটু থেমে, এমন সময়েও রসিকতা করে হেসে বললেন, "জানিস ত—'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্ ।' আমারও লোভ হচ্ছে । দেখিই না একবার স্বর্গে গিয়ে, সেখানেও অত্যাচার, অবিচার, শোষণ আছে কিনা । তা হলে সেখানে গিয়েও ত লড়াই করতে হবে ।"

আমি বিনুদার হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না, ধীরে ধীরে বললাম, "আর তুমি বুঝি ঠিক করেছ আমার জন্য 'জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।' ভোগের জন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে ! এমনি অপদার্থই আমি ।"

বিনুদা বললেন, "রাগ করিস নে ভাই, এখন অভিমান করবার সময় নয় ।"

তখন কোলাহল একেবারে নিকটে এসেছে । তাদের কথাবার্ত্তা ও পদ-শব্দ শোনা যাচ্ছে । বিনুদা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তোর রিভলবারটা ও কার্টিজগুলো শীগগির আমায় দিয়ে যা । আমার গুলি ফুরিয়ে এসেছে । আমার রিভলবারটায় বোধ হয় কোথাও কোন গলদ ঘটেছে, মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে, ঘুরছে না ঠিক মত । তোর রিভলবারটার এখনই দরকার হবে ।"

রিভলবার আর কার্টিজগুলি নিয়ে তিনি আবার ব্যাকুল হয়ে বললেন, "যা, শীগগির যা, ওরা এসে পড়েছে । দেরী করিস নে । যা ভাই, যা ।"

কথা শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন । কিন্তু সে রকম শক্ত হয়ে দাঁড়াতে না পেরে আমায় বললেন, "নীতীশ ভাই, আমাকে একটু ধরে ঐ গাছটার আড়ালে দাঁড় করিয়ে দে ত ভাই, যেন এক হাতে গাছ ধরে অপর হাতে গুলি ছুড়তে পারি ।"

মর্ম্মবিদারী এই অনুরোধ, কিন্তু উপেক্ষা করতে পারলাম না । আমি তাকে তুলে ধরলাম । "বিদায় বন্ধু" বলে আমাকে আলিঙ্গন করে পরে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে কোনমতে দাঁড়ালেন, পায়ে যেন আর দাঁড়াবার শক্তি পাচ্ছেন না ।

বিনুদা গুলি ছুড়তে লাগলেন । পুলিসও গুলি করতে লাগল । বিনুদা আমাকে যথাশক্তি একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, "যা ভাই যা, হঠাৎ একটা গুলি তোর গায়ে লেগে যেতে পারে ।" একটু থেমে ফের বললেন, "শম্পাকে আমার কথা বলিস ।"

আমি যেতে যেতেই চকিতে একবার পিছন ফিরে দেখলাম, বিনুদা ঘুরে পড়ে গেলেন এবং খালের ঢালু পাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলেন জলের দিকে । ওদিকে অনুসরণকারী পুলিস সমানে গুলি চালাচ্ছে । এই আমার বিনুদাকে শেষ দেখা ।

পরের দিন খবরের কাগজে দেখতে পেলাম—লড়াইয়ের সংবাদ, কৃষ্ণদাসের হত্যা ও আরও লোকের হতাহত হওয়ার খবর । কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম হত্যাকারী ধরা পড়ে নাই, তার কোন সংবাদই নাই ।

সমাপ্ত

কালিদাস-সাহিত্যে রাজা ও রাজ্যশাসন

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাসের কাব্য-নাটকগুলি পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে সময় তিনি ভারত-জননীর ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—তা সে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেই হউক, কিংবা দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে গুপ্তসম্রাটগণের অভ্যুদয়ের সময়েই হউক, ভারত ছিল ছোটবড় বহু রাজ্যে বিভক্ত। তাঁহার 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে সূর্য্যবংশের গৌরব রঘু যখন মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মত পৃথিবী জয় করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, সে সময় তিনি তাঁহার অজেয় সৈন্য লইয়া কোন্ কোন্ দেশে প্রবেশ করিয়া কি ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, মহাকবি তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার সে বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, রঘুর অভিযান আরম্ভ হয় পূর্ব্বদিকে—রাজধানী অযোধ্যা হইতে পূর্ব্বমুখ হইয়া বাহির হইয়া তিনি গিয়াছিলেন ভারতের পূর্ব্ব-সীমানায় শেষপ্রান্তে সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন সুহ্মদেশে (আসাম, আরাকান ইত্যাদি)। সুহ্মদেশ হইতে তিনি বঙ্গে গিয়া বঙ্গ আক্রমণ করেন ও বাঙালী সৈন্যদের পরাজিত করিয়া 'গজসেতু'র সাহায্যে কপিশা নদী পার হইয়া যান উৎকলে এবং সেখান হইতে আরও দক্ষিণে কলিঙ্গে। কলিঙ্গরাজকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তিনি চন্দনবনের ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন পাণ্ড্যদেশে, এবং সেখানকার পরাজিত রাজাদের নিকট হইতে দক্ষিণ-সমুদ্র হইতে সংগৃহীত মহামূল্য মুক্তারাজি উপহার লইয়া পশ্চিম-মুখ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করেন। পথে কেরলদেশ জয়ের গৌরব অর্জ্জন করিয়া রঘু এবার ভারতের বাহিরে গিয়া পারসীকা আক্রমণ করেন। পারস্যের পরাক্রান্ত যবনরাজকে পরাজিত করিয়া ও তাঁহার সৈন্যদের 'মধুমক্ষিকা পরিব্যাপ্ত মৌচাকের মত' দাড়িওয়ালা কাটা মুণ্ডগুলি দিয়া রণক্ষেত্র ভরাইয়া তাঁহার রণক্লান্ত সৈন্যদল পারস্যের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বহুমূল্য চর্ম্মনির্ম্মিত আস্তরণ বিছাইয়া বসিয়া দ্রাক্ষারস পান করিয়া জয়-উৎসব সম্পন্ন করেন, এবং তার পর নবীন উদ্যমে কাশ্মীরের কুঙ্কুমক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গিয়া হূনদেশ আক্রমণ করেন। সেখানকার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী রঘু আরও উত্তরে আখরোট বন অতিক্রম করিয়া ভারতের বাহিরে গিয়া কাম্বোজদেশ জয় করেন। তার পর হয়ত তখনকার দিনে উত্তরে যাইবার মত দেশ আর জানা ছিল না বলিয়া তিনি হিমালয় পর্ব্বতের উপর দিয়া ফিরিবার পথে দুর্ব্বল কৈলাস-রাজের বীর্য্যকে যেন উপহাস করিয়া (অর্থাৎ, দুর্ব্বল চীন-রাজকে আক্রমণ না করিয়া) কামরূপ হইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসেন। মহাকবি রঘুর দিগ্বিজয়ের সময়কার যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ যেভাবে দিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে এই সব দেশের রাজারা ছিলেন স্বাধীন, উত্তর কোশলেশ্বরদিগের অধীনতা ইঁহারা পূর্ব্বে কখনও স্বীকার করেন নাই।

তার পর, বিদর্ভরাজের ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভার যে চিত্র মহাকবি আঁকিয়াছেন, তাহাতেও বুঝা যায়, যে সব রাজা ও রাজপুত্র নিমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ংবর-সভার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে স্বাধীন রাজা ছিলেন, কেহ যে কাহারও অধীন বা সামন্তরাজ ছিলেন তাহা নহে। তবে অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রঘুর দিগ্বিজয়ের সময় যুদ্ধে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন—এই পর্য্যন্ত। ক্রথকৈশিকনাথের রাজধানীতে সে সময় যে-যে নৃপতি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মগধরাজ পরন্তপ, অঙ্গদেশের অধিপতি, অবন্তীর রাজা (যাহার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী) অনূপরাজ, শূরসেন দেশের রাজা সুষেণ, কলিঙ্গরাজ হেমাঙ্গদ, পাণ্ড্যরাজ (রাজধানী নাগপুর) এবং কোশলেশ্বর রঘুর পুত্র অজ প্রভৃতি প্রধান। এই সব রাজা ও রাজ্যের বর্ণনা কালিদাস এমন ভাবে করিয়াছেন যে, সেগুলি পড়িলে মনে হওয়া স্বাভাবিক—তাঁহার সমসাময়িক কালে, সে সব স্বাধীন রাজ্য বা দেশ নাম করার মত ছিল, তিনি যেন তাঁহার কাব্যে প্রধানতঃ সেইগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন, রাজাদের নামগুলি কাল্পনিক হইতে পারে, দেশ বা রাজ্যগুলি কাল্পনিক নয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার কাব্য-নাটকে বিদিশা, মিথিলা, তক্ষশীলা, তাম্রপর্ণী (সিংহল), সিন্ধুদেশ, প্রতিষ্ঠানপুর, স্বর্ণপত্তির, অলকা প্রভৃতির নামও পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বতন ব্রিটিশ আমলের অথবা বর্ত্তমান কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন ভারতের মত, কালিদাসের সময়ের ভারত বা ভারতের অধিকাংশ এক শাসকের অধীনে ছিল না। উপরন্তু মহাকবির সময় যবনেরাও যে ভারতের পশ্চিম সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন তাহাও তাঁহার 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক হইতে জানা যায়। বিদিশারাজ 'সেনাপতি' পুষ্পমিত্র পুত্র অগ্নিমিত্রের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া রাজধানীর বাহিরে গিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে যখন বিচরণ করিতেছিল, সে সময় একদল অশ্বারোহী যবন সৈন্য তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, এবং এই যবন সৈন্যদলকে পরাজিত করিতে পুষ্পমিত্রের পৌত্র বসুমিত্রকে রীতিমত বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, সিন্ধুনদের দক্ষিণ ভাগের যেন কিয়দংশ যবনদের আধিপত্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। এখানে 'যবন' বলিতে যেন পারসীকদিগকে বুঝায়।

যাহাই হউক, ভারতের সেই সময়কার এই সব ছোটবড় রাজা স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করিতেন। পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহও করিতেন, কোন কোন রাজা 'রাজ-যজ্ঞ' অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া প্রতিবেশী রাজাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান জানাইতেন। তাঁহারা কি ভাবে জীবনযাপন করিতেন তাহারও অনেক বিবরণ

মহাকবির কাব্য-নাটক হইতে পাওয়া যায়। রাজারা সাধারণতঃ একের অধিক বিবাহ করিতেন, তবে একটি মাত্র নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এমন রাজারও অভাব ছিল না। বর্তমানে অনেকের ধারণা যে, তখনকার দিনে 'রাজা' বলিলে বুঝায় এমন একটি প্রাণী, যিনি অত্যাচারের দ্বারা প্রজা শোষণ করিয়া বিলাসব্যসনে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে জীবনযাপন করিতেন। কিন্তু মহাকবির কাব্য-নাটকগুলি পড়িলে এ ধারণা প্রমাণ করা কঠিন হইবে। তাঁহার সময়ে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে স্বাধীন রাজার সংখ্যা ছিল অনেক এবং একের অধিক রাজার দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী স্বচক্ষে দেখার ও তাঁহাদের ঘর-সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার বিবরণ শোনার সুযোগ-সুবিধা যে মহাকবির ছিল, তাহাও বেশ বুঝা যায়। তাহা ছাড়া তিনি ভারতের বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার দেশ-পর্য্যটনের ও বাস্তব অভিজ্ঞতার চিহ্ন তাঁহার কাব্য-নাটকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। রাজাদের কথা তিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে চরিত্রবান্ নরপতির সংখ্যা যে বড় অল্প ছিল না, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। রাজা দুষ্মন্ত যদিও বিবাহিতা পত্নী থাকা সত্ত্বেও শকুন্তলাকে দেখিয়া ও তাঁহাকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, তবু পরস্ত্রী সম্বন্ধে বয়স্যকে বলিয়াছিলেন, 'অবর্ণনীয়ং খলু পরকলত্রং' (পরস্ত্রীর রূপবর্ণনা করা ভাল নয়)। মহারাজ কুশও অর্দ্ধেক রাত্রে তাঁহার নির্জ্জন শয়নকক্ষে সহসা এক জন পরনারীকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'আচক্ষ মত্বা বশিনাং রঘূনাং মনঃ পরস্ত্রী বিমুখ প্রবৃত্তিঃ' ('যা বলিবার থাকে বল, কিন্তু মনে রেখো রঘুবংশীয় রাজারা জিতেন্দ্রিয়, পরনারীর প্রতি তাঁহাদের মন আসক্ত হয় না')।

মহাকবি 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর প্রায় সাতাশ-আটাশ জন রাজার জীবনী—কোনওটি সবিস্তারে কোনওটি-বা সংক্ষিপ্তভাবে, বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনের ছাড়া আর কাহারও চরিত্র যে হীন ছিল না, ইহাই তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রজাদের উপর অত্যাচার করা বা তাহাদিগকে শোষণ করা দূরে থাকুক, প্রায় সকল রাজা যে প্রজাদিগের মঙ্গলসাধনের জন্য সচেষ্ট থাকিতেন, ইহাই তাঁহার সাহিত্যে দেখিতে পাই। মাত্র একটি চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবের রাজার বর্ণনা তাঁহার সাহিত্যে পাওয়া যায়—তিনি হইলেন রঘুবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ, যাঁহার সংযমহীন ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করিবার শোচনীয় পরিণাম মহাকবি অতি নিপুণ ভাবে দেখাইয়াছেন 'রঘুবংশে'র ঊনবিংশ সর্গে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজা মন্ত্রীদের উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়া দিনরাত কেবল প্রাসাদের মধ্যে থাকিয়া নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং সুরা ও নারী লইয়া আমোদ-প্রমোদে মাতিয়া থাকিতেন। মহাকবি বলেন, 'মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বীণা ও মধুরভাষিণী নারী, এ দুয়ের একটি সকল সময় তাঁহার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়া থাকিত।' এই ভাবে কালযাপনের ফলে অগ্নিবর্ণ রাজ-যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া একটা অত্যুন্নত বংশকে অবনতির চরমসীমায় আনিয়া দিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। রঘুবংশ আরম্ভ করার সময় মহাকবি যেমন কি কি গুণে সূর্য্যবংশীয় রাজারা উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিলেন, তাহা বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি আবার কি কি দোষে যে এমন বিখ্যাত বংশ নষ্ট হইয়া গেল, তাহাও তিনি অগ্নিবর্ণের জীবনীতে সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাজারা সে সময়, অনেকেই একের অধিক বিবাহ করিতেন বটে, কিন্তু মহাকবির সাহিত্যে 'সুয়োরাণী' থাকিলেও 'দুয়োরাণী'র কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র অগ্নিমিত্র ছিলেন দুইটি নারীর স্বামী, কিন্তু তার পরেও তিনি মালবিকার চিত্র দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়া পরে তাঁহার প্রিয়বন্ধু বিদূষকের সাহায্যে ও চক্রান্তে, তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে প্রেম নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার পত্নী ইরাবতী সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে অভিমানভরে দু'কথা শুনাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন, রাজা তখনি রাণীর মান ভাঙাইবার জন্য সকলের সম্মুখে তাঁহার পায়ের উপর পড়িলেন। ইরাবতী অবশ্য 'ছাড়, ছাড়, এ ত আর মালবিকার পা নয়' বলিয়া নিজের পা ছাড়াইয়া লইলেন, কেবল যে পা ছাড়াইয়া লইলেন তাহা নহে, নিজের কটি হইতে স্খলিত রশনা বা কাঞ্চী দ্বারা রাজাকে প্রহার করিতেও উদ্যত হইলেন, রাজা ইহাতে রাগ করা দূরে থাকুক, বরং যে খুশীই হইলেন, তাঁহার কথা হইতে বুঝা যায়।

'বিক্রমোর্ব্বশী'র দ্বিতীয় অঙ্কে যেন ইহারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। অপ্সরা উর্ব্বশী একখানি পত্রে নিজের হৃদয়ের প্রেম নিবেদন করিয়া প্রেমপত্রখানি গোপনে পুরূরবার কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। দৈবের বিড়ম্বনায় প্রেমপত্র আসিয়া পড়িল পুরূরবার পত্নী রাণী ঔশীনরীর হাতে। রাণী যখন সেখানি লইয়া স্বামীর সহিত বুঝাপড়া করিতে গেলেন, তখন নিরুপায় স্বামী স্ত্রীর পায়ে পড়িয়া দোষ ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সেযুগে অল্প বয়সে অর্থাৎ যৌবন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের বিবাহ হইত বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের পিতা বা অন্যান্য অভিভাবকেরা বিবাহের 'সম্বন্ধ' অর্থাৎ কন্যা পছন্দ করিয়া দিতেন। পিতা বা অভিভাবকের অভাবে বৃদ্ধ মন্ত্রীদের উপর এ কাজের ভার পড়িত এবং অনেক ক্ষেত্রে একসঙ্গে দুই-তিনটি কিশোরীর সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেওয়া হইত। তখনকার দিনে 'স্বয়ম্বর' বিবাহ এবং 'গান্ধর্ব্ব' বিবাহেরও বিবরণ পাওয়া যায়। 'অসবর্ণ' বিবাহ রাজাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল (মালবিকাগ্নিমিত্র)।

রাজারা মৃগয়া করিতে ভালবাসিতেন, কেহ কেহ দ্যূতক্রীড়া বা পাশা খেলিয়া আমোদ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীত এবং চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, এমনকি সে সময় কাহারও কাহারও 'সঙ্গীত বিভাগ'ও ছিল, সেখানে বেতনভোগী আচার্য্যেরা শিষ্যদিগকে নৃত্য, সঙ্গীত এবং অভিনয় শিক্ষা দিতেন। রাজারা নিজেরাই গানবাজনা শিখিতেন, চিত্রবিদ্যায় চর্চ্চাও কেহ কেহ

করিতেন। 'শকুন্তলা'র রাজা দুষ্যন্ত যে একজন নিপুণ চিত্রকর ছিলেন, তাহা নাটকের ষষ্ঠ অঙ্ক পড়িলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। প্রাসাদে সঙ্গীতশালা থাকিত, রাণীরাও কেহ কেহ সেখানে একাকিনী, নয় ত স্বামীর সহিত একসঙ্গে গান গাহিতেন। রাজপুত্রদিগকেও সে সময় বাল্যকালে গুরুগৃহে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত, বেতন দিয়া 'গৃহশিক্ষক' রাখার রেওয়াজ তখন হয় নাই। বিদ্যাশিক্ষার পর তাঁহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হইত। রাজাদের সৈন্য পরিচালনা করিবার জন্য সেনাপতি থাকিত, তাঁহাদের আবার কেহ কেহ নিজেরাই সৈন্যদের অগ্রভাগে থাকিয়া শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতেন। রঘু যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে যাত্রা আরম্ভ করেন, মহাকবি তাহার বর্ণনায় বলেন, 'প্রথমে রঘু, তাঁহার পশ্চাতে বিপুল বাহিনী, দেখাইতেছিল যেন ভগীরথের পশ্চাতে হরজটা-ভ্রষ্ট গঙ্গার উত্তালতরঙ্গভঙ্গ বুঝি পূর্ব্বসাগরে মিলিত হইতে চলিয়াছে।' রাজা দশরথ যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হন, তখন তিনি যাইতেন সৈন্যদের পুরোভাগে এবং একাকী এমন বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতেন যে, মনে হইত যেন সঙ্গের সৈন্যদল কেবল তাঁহার জয়ঘোষণার কাজটি করিয়া দিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' দেখা যায়, রাজা দুষ্যন্তের সেনাপতি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তপোবন হইতে রাক্ষসদের অত্যাচার দূর করিবার জন্য তিনি নিজেই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন। বিজয়ী রাজারা বিজিত দেশে কখনও কখনও 'জয়স্তম্ভ' নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের উপর নিজেদের জয় বর্ণনা করিয়া রাখিতেন (রঘু—৪।৩৬), এমন কি পর্ব্বতগাত্রেও 'শিলালিপি' উৎকীর্ণ করিয়া রাখার প্রথা ছিল (রঘু—৪।৫৯)। রাজাদের কেহ কেহ তাঁহাদের ব্যবহৃত শরের উপর নিজেদের নাম খোদাই করাইয়া রাখিতেন, অনেকের রথের পতাকা নিজস্ব চিহ্নে চিহ্নিত থাকিত, দূর হইতে দেখিলে কাহার রথ জানিবার সুবিধা হইত। প্রাসাদগুলিরও বিভিন্ন নাম দেওয়ার রীতি ছিল, 'মেঘচ্ছন্দ', 'দেবচ্ছন্দ', 'বৈজয়ন্ত' প্রভৃতি প্রাসাদের নাম পাওয়া যায়।

তখনকার দিনে বিচার করা যেন রাজাদের নিজস্ব কাজ ছিল, মহাকবির কোনও কাব্য বা নাটকে 'বিচারক' কিংবা 'বিচারপতি'র কোনও উল্লেখ নাই। অজের জীবনী-বর্ণনায় মহাকবি বলিতেছেন, 'প্রজাদের অভিযোগ শুনিয়া বিচার করিবার জন্য যুবক অজ বসিতেন 'ব্যবহারাসনে' (রঘু—৮।১৮)। সংস্কৃত ভাষায় 'ব্যবহার' শব্দটির এক অর্থ মামলা, সুতরাং 'ব্যবহারাসনে' বলিলে বুঝিতে হইবে বিচারপতির আসনে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র পঞ্চমাঙ্কেও দেখা যায়, রাজা দুষ্যন্ত 'ধর্ম্মাসনে' অর্থাৎ বিচার করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া বিচারকার্য্য সমাপন করিবার পর বিশ্রাম করিতেছেন। ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত তাঁহার এক প্রতিহারিণীকে বলিতেছেন, 'বেত্রবতি অমাত্য পিশুনকে গিয়া বল যে, রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই বলিয়া আজ আমি আর 'ধর্ম্মাসনে' বসিতে পারিব না, তিনি যেন 'পৌরকার্য্য' পরিচালনা করিয়া যাহা হয় লিখিয়া জানান।" এখানে 'পৌরকার্য্য' শব্দটির অর্থ যে বিচারকার্য্য তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা ও দুষ্যন্তের কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা যায়, কারণ অমাত্য পিশুন কার্য্য-শেষে রাজাকে তাঁহার নির্দ্দেশমত জানাইতেছেন যে, 'রাজকার্য্য' সেদিন অত্যন্ত বেশী থাকাতে, তিনি কেবল 'পৌরকার্য্যে'র আলোচনা মাত্র করিয়াছেন, অর্থাৎ শাসনকার্য্যের চাপে তিনি 'পৌরকার্য্য' অর্থাৎ মামলা সংক্রান্ত কাজগুলি করিবার ফুরসত পান নাই, কেবলমাত্র আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার বিবরণ লিখিয়া জানাইতেছেন, মহারাজ যাহা নির্দ্দেশ দিবেন, সেই অনুযায়ী রায় দেওয়া হইবে।

রাজারা সভার মধ্যে সাধারণতঃ স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিতেন, কাহারও কাহারও হস্তিদন্তের সিংহাসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। শাসনকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য রাজাদের একের অধিক মন্ত্রী থাকিতেন, প্রধান মন্ত্রীকে বলা হইত 'আর্য্যসচিব'। মন্ত্রী ছাড়া 'উপমন্ত্রী'ও থাকিতেন। 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা'র দেখা যায়, 'বিক্রমাদিত্য যখন রাজা হইলেন তখন ভ হইলেন তাঁহার মন্ত্রী এবং গোবিন্দ হইলেন 'উপমন্ত্রী'। তখনকার দিনে এখনকার মত 'লোকসভা' বা 'রাজ্যসভা' থাকিত কিনা জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র পঞ্চম অঙ্কে পাওয়া যায়, কঞ্চুকী মহারাজকে বলিতেছেন, 'মন্ত্রিপরিষদোপ্যেতদেব দর্শনং' অর্থাৎ 'মন্ত্রীপরিষদের'ও ইহাই মত। এখানে 'মন্ত্রী-পরিষদ্' বলিতে কি বুঝাইতেছে? 'মন্ত্রী' এবং 'পরিষদ্' (পরিষদের সভ্যেরা)? না, মন্ত্রীদিগের পরিষদ্, ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'Cabinet'? মালবিকাগ্নিমিত্রের পঞ্চমাঙ্কের অপর এক জায়গায় পাওয়া যায় কঞ্চুকী মহারাজকে বলিতেছেন, 'দেব, এবমমাত্যপরিষদে বিজ্ঞাপয়ামি', অর্থাৎ—'রাজন্, আমি একথা 'অমাত্যপরিষদে' জানাইয়া আসি'। মহাকবির টীকাকার 'মন্ত্রি-পরিষদ্' শব্দে 'মন্ত্রী' এবং 'পরিষদের সভ্যদিগকে' বুঝাইতে চাহিয়াছেন, সুতরাং পরিষদের সভ্যবৃন্দ ছিলেন রাজার রাজসভার সেইসব সভ্য যাঁহারা রাজার বা মন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীদের ইচ্ছানুসারে মনোনীত হইয়া সভায় বসিতে পাইতেন ও রাজকার্য্যে নিজেদের মত প্রকাশের অধিকার লাভ করিতেন। তাঁহারা যে এখনকার মত প্রজাদের ভোটে নির্ব্বাচিত হইতেন না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা হইতেন মনোনীত সভ্য এবং তাঁহাদের মতামত কেবল সুপারিশ (recommendatory) বলিয়া ধরা হইত, অবশ্যপালনীয়ের (binding) কথা ভাবা যাইত না। রাজ্যশাসন ব্যাপারে কোনও গুরুতর কিছু ঘটিলে দেশের বা রাজধানীর প্রধান প্রধান লোকদিগকে সম্মিলনীতে আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার বিবরণও 'রঘুবংশে' পাওয়া যায়। ঊনবিংশ সর্গের ৫৫তম শ্লোকে মহাকবি বলিতেছেন, অগ্নিবর্ণ যখন যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া অপুত্রক অবস্থায় মারা পড়িলেন, তখন মন্ত্রীরা প্রধান প্রধান প্রজাদিগকে ('নাগরিকদিগকে'—মল্লিনাথ) একত্র করিয়া অতঃপর কি করা যায় স্থির করিতে বসিলেন; সে সময় জানিতে পারা গেল যে, তাঁহার এক মহিষীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, সুতরাং 'সকলের মত অনুসারে রাণীকেই রাজলক্ষ্মী প্রদান করা হইল' এবং 'তিনি যাহা বলিতেন,

কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিত না।' রামের বনগমনের পরও পুত্রবিচ্ছেদের শোকে যখন রাজা দশরথ মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন, তখন মহাকবি বলিতেছেন, 'রাজাহীন রাজ্য ছিদ্রান্বেষণে পারদর্শী শত্রুদের ভোগাবস্ত হইয়া পড়িল', তাই 'প্রজারা নিজেদের অনাথ ভাবিয়া সচিবদিগের দ্বারা ভরতকে তাঁহার মাতুলালয় হইতে আনাইয়া লইলেন (রঘু ১২-১২), এখানে প্রজাদের দায়িত্ব ও মতের গুরুত্ব বড় কম বলিয়া মনে হয় না।

রাজারা সে সময় ছোট ছোট রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও, তাঁহাদেরও আবার অনেকের 'সামন্তরাজ' থাকিত, যুদ্ধের সময় বা বিপত্তিকালে এই সমস্ত সামন্তরাজা তাঁহাদের প্রধান রাজাকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন এবং তাঁহাদের নির্দেশ অনুসারে সুবিধা পাইলে বিপক্ষীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগকে বন্দী করিয়া আনিতেন। সামন্তরাজ ছাড়া রাজ্যের সীমা রক্ষার জন্য 'অন্তপাল' থাকিত এবং সীমার প্রান্তে 'অন্তপাল দুর্গ' নির্মাণ করিয়া এই সব অন্তপাল কর্মচারী রাজ্যের সীমানা পাহারা দিত। শহরের শান্তিরক্ষার জন্য থাকিত নগররক্ষী দল এবং তাহাদের উচ্চতম কর্মচারীকে বলা হইত 'নগরপাল', 'রাষ্ট্রীয়' শব্দটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। রাজাদের শ্যালকেরা সে সময় রাজ্যের অনেক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের শ্যালক বীরসেন ছিলেন তাঁহার এক অন্তপাল দুর্গের সীমারক্ষক। বিদর্ভ-রাজের শ্যালক ছিলেন তাঁহার 'আর্য্যসচিব', শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ তাঁহার ভাবীপত্নী কুমুদ্বতীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'শ্লাঘ্যবন্ধন' অর্থাৎ 'বড়কুটুম' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

রাজকার্য্য সে সময় চালানো হইত সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, রাজারা রাজকার্য্য সারিয়া ভোজনের পর বিশ্রাম করিতেন, তাঁহাদের অবসরবিনোদনের জন্য 'বিদূষক' বা 'ভাঁড়' থাকিত। বিদূষকেরা রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নানা রসপূর্ণ কথা কহিয়া তাঁহাদের রাজকার্য্যজনিত পরিশ্রম লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। বিদূষকেরা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ হইতেন, তবে বিদ্যার সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক থাকিত না, লোকে তাঁহাদিগকে খাতির করিত না, অথচ সে সময়ের হিন্দুরাজাদের এক একটা ভাঁড় না হইলে চলিত না। এই ভাঁড়গুলিই হইত রাজাদের পরম বিশ্বস্ত বন্ধু, যাঁহাদিগকে প্রাণের গোপন কথা বলিতে বা যাঁহাদের পরামর্শ লইতে তাঁহারা দ্বিধা বোধ করিতেন না।

সে সময় 'বসন্তোৎসব' খুব ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হইত, কেবল রাজাদের মধ্যে নয়, সাধারণ নরনারীরাও কয়েকদিন 'বসন্তোৎসবে' মাতিয়া থাকিতেন। 'বসন্তোৎসবের' দিনগুলিতে দোলনায় বসিয়া দোল খাওয়া রাজরাণীদের খুব আনন্দের ব্যাপার ছিল। রাজরাণীরা দোলনায় উঠিয়া পাশাপাশি বসিতেন, আর অপরেরা, কখনও কখনও রাজার বিদূষকও দোলনা ধরিয়া দোল দিতেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' দেখা যায়, অগ্নিমিত্রের প্রধান রাণী ধারিণী বিদূষকের চপলতায় দোলনা হইতে পড়িয়া গিয়া পায়ে আঘাত পাইয়াছিলেন। 'বসন্তোৎসবে'র আর একটা অঙ্গ ছিল, অশোক-তরুর দোহদ সঞ্চার করানো। যে অশোকবৃক্ষে সময়মত ফুল ফুটিত না, প্রাসাদের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে পুষ্পের সাজে সজ্জিত করিয়া বৃক্ষের তলায় লইয়া গিয়া তাহার বামচরণ বৃক্ষের মূলে স্পর্শ করানোর রীতি ছিল, সাধারণতঃ রাণীদের উপর 'দোহদ' সঞ্চার করানোর ভার পড়িত। রাণীরা ছাড়া সাধারণ ঘরের মেয়েরাও এ উৎসব প্রতিপালন করিতেন (মেঘদূত : উ-মে)। রাজাদের রাজসভায় 'কাইকরমাজ' খাটিবার জন্য নারী-কর্মচারীও থাকিত। কটি ও প্রতিহারীরা রাজার নির্দেশ মন্ত্রী বা অন্যান্য সভাসদকে জানাইতেছে, এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যবনীরাও যে সময় সময় রাজাদের খাস কর্মচারী হইতে পাইত এবং প্রকাশ্য সভার মাঝে পুরুষের মত হুকুম তামিল করিত তাহাও 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে দেখা যায়।

রাজাদিগকে শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলিতে হইত, শাস্ত্রে রাজাদের যে সময়ে যে কাজ করা বিধি বলিয়া বর্ণিত আছে, তাঁহারা সে সময় সেই কাজ করিবার চেষ্টা করিতেন। মহাকবি বলেন, মহারাজ দিলীপের প্রজারা 'রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদোমনো র্ধর্মনঃ পরম্', অর্থাৎ—মনু যে বিধি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, প্রজারা তাহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। রাজারা সাধারণতঃ প্রজাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেন এবং যাহাতে তাহাদের মনে কোনও কষ্ট না থাকে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতেন। অনেক রাজার 'অগ্নিগৃহ' থাকিত, সেখানে অগ্নিদেবের নিত্যপূজার ব্যবস্থা ছিল। গো-ব্রাহ্মণদের প্রতি রাজাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির অন্ত ছিল না। দিলীপের মত পরাক্রান্ত সম্রাটের গুরুদেব বশিষ্ঠের সহিত পরামর্শ করার আবশ্যক হওয়ায় তিনি গুরুদেবকে প্রাসাদে আসিবার আদেশ না পাঠাইয়া স্বয়ং সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রমে গিয়া গুরু ও গুরুপত্নীর চরণ বন্দনা করিয়া বশিষ্ঠদেবকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্দেশ অনুসারে একাকী রাখালের মত তাঁহার গাভীটিকে মাঠে মাঠে চরাইতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। কেবল রাজা দিলীপ নয়, মহাকবির সকল কাব্য-নাটকেই ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঋষিদের এবং তাঁহাদের শিষ্য-শিষ্যাদের প্রতি রাজাদের ভক্তির বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময় সমাজে ব্রাহ্মণদের যে কি বিপুল প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহা এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়।

রাজাদের শেষজীবন কিভাবে যাপিত হইত, তাহাও আমরা কালিদাসের সাহিত্য হইতে জানিতে পারি। প্রবলপরাক্রান্ত রাজারাও, যাঁহারা নিজেদের ভুজবলে বহুদেশ জয় করিতেন, অশ্বমেধ প্রভৃতি বীরত্বের পরিচায়ক যজ্ঞ করিতেন, নানারূপ ভোগবিলাসে জীবনযাপন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শেষবয়সে উপযুক্ত পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, সংসার ছাড়িয়া তপোবনের তরুচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া যোগাভ্যাসে বা ভগবচ্চিন্তায় দেহত্যাগ করিতেন। তাঁহারা শেষজীবন তপোবনে কি ভাবে

কাটাইতেন, এখানে তাহার দুইটি উদাহরণ দেওয়া গেল। 'রঘুবংশের' এক রাজা সুদর্শন যখন শেষবয়সে উপযুক্ত পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া, নৈমিষারণ্যের অধিবাসী হইলেন, মহাকবি বলেন, "তখন সেখানকার তীর্থসলিলে স্নান করিয়া তিনি প্রমোদ দীর্ঘিকার কথা ভুলিয়া গেলেন, ভূমির উপর কুশের শয্যায় শয়ন করিতে করিতে সুকোমল শয্যার কথা তাঁহার মনে রহিল না, এমনকি পর্ণকুটীরে কিছুকাল বাস করিবার পর রাজপ্রাসাদের স্মৃতিও আর তাঁহার মনে পড়িত না। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া তিনি একাগ্র চিত্তে নিজেকে তপস্যায় নিযুক্ত করিয়া ফেলিলেন।" আর একজন রাজা, নাম পুষ্য, তাঁহার শেষজীবনের কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহাকবি বলেন, "আবার সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, সেই ভয়ে 'মহোক্ষ' পুষ্য (মহাশয় পুষ্য) পুত্রের উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়া সংসার পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞ মুনি জৈমিনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিতে লাগিলেন" (রঘু ১৮।৩৩)।

মহাকবির সাহিত্যে প্রজাদের উপর রাজার অত্যাচার, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের অভ্যুত্থান, অব্রাহ্মণদের, বিশেষতঃ শূদ্রদের ব্রাহ্মণদের শাসন না-মানার হুমকি ইত্যাদির কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, বরং সে সময় প্রজারা সাধারণতঃ রাজাদিগকে যে দেবতার মত ভক্তি করিত, তাহারই উল্লেখ বহু স্থানে পাওয়া যায় এবং তখন হয়ত অধিকাংশ ব্রাহ্মণের মধ্যে এমন একটা সাধনা, সংযম ও নিষ্কাম কর্মের প্রতি লক্ষ্য দেখা যাইত, যাহার ফলে তাঁহাদের নিয়মকানুন কঠোর হইলেও লোকেরা সেগুলি না মানিয়া থাকিতে পারিত না।

কাশীরাম দাসের জন্মস্থান

শ্রীঅভয়াদাস মুখোপাধ্যায়

মহাভারতের রচয়িতা কাশীরাম দাসের জন্মস্থান কোথায় তাহা সঠিক জানা যায় না, কিন্তু অনেকে কাটোয়া মহকুমার দাঁইহাটের নিকটবর্তী 'সিঙ্গী' গ্রামকেই কাশীরাম দাসের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত মহাভারতে যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় আছে, তাহাতে তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই নাই। তথাপি আমরা "মহাভারত" ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে তাঁহার জন্মস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। মহাভারতে গ্রন্থকার পরিচয়ে লিখিত আছে:

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।
বারঘাট, তেরহাট, তিনচণ্ডী তিনেশ্বর।
ইহাই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।"

তৎকালে কাটোয়ার নিকটবর্তী "ইন্দ্রাণী" নামক দেশ ছিল (বর্ত্তমানে ইন্দ্রাণী দেশ লুপ্ত), এই ইন্দ্রাণীতেই দ্বাদশটি তীর্থঘাট, তেরটি হাট শব্দবাচক গ্রাম, তিনটি শিবলিঙ্গ ও তিনটি "চণ্ডী"র মূর্ত্তি ছিল। বর্ত্তমানে সেগুলি কাটোয়া হইতে দাঁইহাট পর্য্যন্ত দেখা যায়। দ্বাদশ তীর্থঘাটের মধ্যে গণেশ মাহাতার ঘাট, বারদুয়ারী ঘাট, পীরের ঘাট অদ্যাপি অভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। এই ইন্দ্রাণী দেশের মধ্যেই মণ্ডল হাট, ঘোষ হাট, আতু হাট ইত্যাদি তেরটি 'হাট' শব্দবাচক গ্রাম; ঘোষেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর ও চন্দ্রেশ্বর এই তিনটি শিবলিঙ্গ এবং একাইচণ্ডী, পাতাইচণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডী এই তিনটি চণ্ডীমূর্ত্তি ছিল। ঐ তেরটি হাট শব্দবাচক গ্রামের মধ্যে নয়টি অদ্যাবধি বর্ত্তমান, বাকি চারিটি লুপ্ত। ঐ ইন্দ্রাণী দেশের মধ্যবর্ত্তী "সিদ্ধি" গ্রাম ছিল এবং ঐ গ্রামেই কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন।

তৎকালে "ইন্দ্রাণী" একটি বৃহৎ শহর ছিল, তাহা বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সেটেলমেণ্টে দেখা যায়—কাটোয়া ইন্দ্রাণী পরগনার অন্তর্গত, অথচ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৫৫ শকে) রচিত চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে দেখা যায়:

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।"

যদি তৎকালে ইন্দ্রাণী দেশ না থাকিত তাহা হইলে কাটোয়া গ্রাম ইন্দ্রাণী দেশের নিকট অবস্থিত একথা চৈতন্যভাগবতের গ্রন্থকার লিখিতে পারিতেন না, কারণ কাটোয়া ইন্দ্রাণী-পরগনার অন্তর্গত। পরগনা ফারসী শব্দ, উহার অর্থ জেলার অংশ। পরগনা কখনই দেশ নামে অভিহিত হইতে পারে না। দেশ শব্দের অর্থ পৃথিবীর অংশ, ভাগ, স্থান, রাষ্ট্র ও স্বদেশ। সুতরাং পরগনা কেবলমাত্র মুসলমান-অধিকারে সৃষ্ট হইয়াছে। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিকঙ্কণচণ্ডী কাব্যে ইন্দ্রাণী, মণ্ডলঘাট, ললিতপুর ইত্যাদির উল্লেখ আছে। ঐ কাব্যেই ইন্দ্রেশ্বর শিবেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গাতীরবর্ত্তী "সিদ্ধি" গ্রামই কাশীরাম দাসের জন্মস্থান বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

"সিঙ্গী" গঙ্গাতীরবর্ত্তী নহে, তথায় দ্বাদশ তীর্থঘাট নাই। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হয় যে, কাশীরাম দাসের জন্মস্থান সিঙ্গি,

তাহা হইলে কাশীরাম দাস স্বয়ং "ইন্দ্রাণী"র কথা লিখিতেন না। কারণ মহাভারতে লেখা আছে—যথায় দ্বাদশঘাট, তেরহাট, তিন চণ্ডী ও তিন ঈশ্বর আছে, যথায় ভাগীরথী নিত্য বাস করেন সেই দেশের নাম ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীতে যে বারো ঘাট ছিল তাহার অধিকাংশই আজ লুপ্ত ও ভগ্ন, কিন্তু পীরের ঘাট, বারদুয়ারীর ঘাট, গণেশ মাহাতার ঘাট, রাজার ঘাট অদ্যাপি দেখা যায়। ঐ তিন-চারটি ঘাটও বারো ঘাটের অন্যতম। ইন্দ্রাণী শহর এত বৃহৎ ছিল যে, ঐ শহরে প্রত্যহ তেরটি হাট বা গঞ্জ বসিত এবং এইরূপেই হাট শব্দবাচক গ্রামের উৎপত্তি হয়। তেরটি হাটের মধ্যে নয়টি এখনও বর্ত্তমান এবং বাকী কয়টি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের তেরটি হাটের নাম যথাক্রমে :— (১) আতুহাট, (২) ঘোষহাট, (৩) একাইহাট, (৪) মণ্ডলহাট, (৫) পাতাইহাট, (৬) বিকেহাট, (৭) দাঁইহাট, (৮) পাল্লহাট, (৯) বীরহাট, (১০) বামুনহাট, (১১) কুমোরহাট, (১২) তাঁতিহাট, (১৩) দেহাট। এই তেরটির মধ্যে দস্যু ও মুসলমানদের অত্যাচারে 'বামুনহাট, দেহাট, কুমোরহাট ও তাঁতিহাট' নষ্ট হওয়ায় গঞ্জ মুর্শিদপুর আদি দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছে। ইন্দ্রাণী শহর কাটোয়ার দক্ষিণ অংশ হইতে দাঁইহাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কারণ কাটোয়ার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত আতুহাট তের হাটের মধ্যে একটি। তিন চণ্ডী মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় অদ্যাপি বর্ত্তমান, তাঁহাদের নাম "পাতাই-চণ্ডী, একাই-চণ্ডী ও মঙ্গল-চণ্ডী" এবং তিন ঈশ্বরের মধ্যে ইন্দ্রেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর লুপ্ত। একমাত্র ঘোষহাটের ঘোষেশ্বর এখনও বিদ্যমান। এই ইন্দ্রাণী শহরে ইন্দ্রদ্যুম্ন বা ইন্দ্রেশ্বর নামক রাজা বাস করিতেন। কাশীরাম দাস ঐ রাজ-বাড়ীর দেওয়ান ছিলেন। ঐ রাজবাটী রাজারডাঙ্গা নামে অদ্যাবধি পতিত অবস্থায় আছে। সুতরাং কাশীরাম ইন্দ্রাণী দেশের নাম করিয়া গিয়াছেন, ইন্দ্রাণী পরগনার নাম করেন নাই।

১। ইন্দ্রাণী শহরের মধ্যবর্ত্তী সিদ্ধি গ্রাম ছিল, ঐ গ্রামই মহাভারতকার কাশীরাম দাসের জন্মস্থান। সিদ্ধি গ্রামে "কাশী-গড়ে" নামক কাশীরাম দাসের স্মৃতিজ্ঞাপক একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে।

২। অতি প্রাচীনকালের লিপিতে "দ্ধ" এবং "দ্ব" দেখিতে প্রায় একরূপই ছিল, সেই কারণ সিদ্ধি গ্রাম লুপ্ত হওয়ায়, কাশীরাম দাসের ভিটা পতিত থাকিয়া শৃগাল-কুকুরের বাসস্থান হওয়ায় প্রাচীন পুঁথির সিদ্ধি গ্রামের পরিবর্ত্তে সিঙ্গী গ্রাম ছাপা হয়।

৩। কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস রচিত মহা-ভারত এবং জগৎ-মঙ্গলে দেখা যায় :

"কায়স্থ কুলেতে জন্ম, বাস সিদ্ধি গ্রাম।"

এই "মহাভারত"খানি গদাধর দাসের স্বহস্ত-লিখিত এবং রাইপুর রাজবাড়ীতে আছে। উপরের শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয় যে, কাশীরাম দাসের বাড়ী ছিল সিদ্ধি গ্রামে।

৪। সিদ্ধি গ্রাম ভাগীরথীর তীরে ও ইন্দ্রাণী দেশের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ঐ গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালী, বরশাগাজীর সমাধি, সাধক রামানন্দের পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রভৃতি দেখা যায়। ঐ গ্রাম দাঁইহাটের সন্নিকটবর্ত্তী।

সিদ্ধি গ্রাম যে কাশীরাম দাসের জন্মস্থান তাহা উপরোক্ত প্রমাণাদি হইতেই বেশ বুঝা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সিদ্ধি গ্রামে মহাকবির কোন স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। কাশীরাম দাসের বাটী প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল, কালের প্রভাবে যখন বাটী ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় তখন অনেকেই ঐ প্রস্তরাদি লইয়া গিয়াছিল। এখনও বহু বাটীতে ঐ সমস্ত দেখা যায়। কাশীরাম দাসের গুরুবংশের বাস ছিল ইন্দ্রাণীর বীরহাট পল্লীতে। ঐ বীরহাট পল্লীর শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, তিনি কাশীরাম দাসের গুরুবংশের লোকান্তরিতা কল্যাণী দেবীকে অল্প বয়সেই দেখিয়াছিলেন। কল্যাণী দেবীর নিকট কাশীরাম দাসের পুত্র নন্দলাল দাসের দান-পত্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ত্তমানে কাশীরাম দাসের গুরুবংশের কেহই জীবিত নাই। কাশীরাম দাসের দেশে তদ্বংশের কেহ জীবিত আছে কিনা, অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে সুধীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারতে পরিবার-উন্নয়ন-কার্য্য

ডাক্তার মিসেস্ জি. আর. ব্যানার্জি

পরিবারই হইতেছে সুস্থ সমাজের ভিত্তি এবং উৎকৃষ্ট মানবীয় সম্পর্কের পক্ষে প্রাথমিক অত্যাবশ্যক উপকরণ। কাজেই সম্প্রতি পারিবারিক সমস্যাসমূহের গুরুত্ব এবং ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলার সহিত তাহাদের সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন ধরণের পারিবারিক সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকগুলি সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায়শঃই এগুলিকে পরিবার-উন্নয়ন সংস্থা বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, কেননা ব্যাপকতম অর্থে এ ধরণের সংস্থার উদ্দেশ্য পরিবারের কল্যাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগানো। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রকে পরিবার-উন্নয়ন-সংস্থা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কেননা এইরূপ সংস্থার কাজ হইতেছে—মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি যোগানো ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করা। এই প্রচেষ্টা পরোক্ষভাবে পরিবারের উন্নয়নের পক্ষে কতকটা সহায়ক হইয়া থাকে। যে সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠান দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য বিতরণ করিয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। আর্থিক দিক দিয়া অনগ্রসর পরিবারসমূহকে অর্থসাহায্য প্রদান করা তাহাদের উদ্দেশ্য।

এতৎসত্ত্বেও আজিকার দিনে 'পরিবার-উন্নয়ন-কার্য্য' এই কথাটি সুনির্দিষ্ট অর্থে এমন কিছু বুঝায় যাহা কতকটা ভিন্ন ধরণের। পূর্ব্বোল্লিখিত সংস্থাগুলির মনোযোগ এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয় সমস্যার অংশবিশেষের উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক্ একটি পরিবারের কথা, যেখানে—(১) স্বামী বেকার, (২) স্ত্রী পীড়িত, (৩) শিশুটি অপরাধপ্রবণ। এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোর কাজ হইতেছে কেবলমাত্র স্বামীর জন্য একটি কর্ম্মসংস্থান করিয়া দেওয়া আর হাসপাতালের কর্ত্তব্য হইল স্ত্রীর রোগের চিকিৎসা করা। এই সমস্ত সংস্থার কোনটিই পারিবারিক সমস্যার সামগ্রিকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখে না। আধুনিক পরিবার-উন্নয়ন-সংস্থা কিন্তু একটি সামাজিক 'ইউনিট' হিসাবে পরিবারের উপর কর্ম্মপ্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে এবং পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদিগকে তাহাদের সামগ্রিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সহায়তা করে। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, কেমন করিয়া ইহা যুগপৎ বহুসংখ্যক সমস্যা সমাধানের ঝুঁকি লইতে সক্ষম হয়। ইহা কি একটি সংস্থার মধ্যেই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার সমবায় ঘটাইতে সমর্থ? অন্য কথায়, ইহা কি একটি হাসপাতাল, এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো এবং একটি শিশুমঙ্গল কেন্দ্র পরিচালনা করিবে? সমাজে সেবামূলক যে সকল সংস্থা বিদ্যমান সে-গুলির দ্বিতীয় সংস্করণ চালু করাই কি ইহার উদ্দেশ্য? হাঁ, কিন্তু ইহা অন্যান্য সংস্থা—যথা হাসপাতাল, কোর্ট, বিশেষ দলের প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সহিত সহযোগিতার দ্বারা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া থাকে। অন্যান্য সংস্থা দ্বারা যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় সেগুলির স্থান দখল করা ইহার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সাহায্যপ্রার্থী দুর্গত ব্যক্তির প্রয়োজনসমূহ মিটাইবার জন্য সমাজের যাবতীয় সম্বল এক জায়গায় জড়ো করা ইহার লক্ষ্য।

পরিবার-উন্নয়ন-সংস্থার কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে আছেন সমাজ-সম্পর্কিত ব্যষ্টিগত ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজ-কর্ম্মিগণ এবং লোকেরা যখন নিজে নিজে তাহাদের কোন ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করিতে অপারগ হয় তখন তাহাদিগকে সাহায্য করাই তাঁহাদের প্রধান কাজ। পরামর্শদাতা ইউনিট হিসাবে ইহা পারিবারিক সম্পর্ক, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ, মনিব কর্ম্মচারীর সম্পর্ক ইত্যাদি এবং অনুরূপ অন্যান্য সমস্যা বিষয়ে নির্দ্দেশ দিতে পারে। উক্ত সংস্থার সমাজকর্ম্মী এমন একজন বিশেষজ্ঞ, যাঁহার নিকট সমাজের যে-কেহ সাহায্য এবং নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিতে পারে।

যদিও পরিবার-উন্নয়ন-সংস্থা কর্তৃক বহুক্ষেত্রে একটিমাত্র বিষয়ের অভিযোগ সম্বন্ধে নির্দ্দেশাদি প্রদান করা হইয়া থাকে, তথাপি সংস্থা সামগ্রিক পারিবারিক সমস্যার অংশ রূপে ইহাকে (ব্যক্তিগত বিষয়) বিচার করিবার দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখে। যেমন, চিকিৎসা ব্যাপারে অব্যবস্থাসমূহের বেলায়, তেমনি বিবাহগত অসঙ্গতি, বেকার-সমস্যা, বিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষালাভ প্রভৃতি বিষয়েও সংস্থা ওয়াকিবহাল হইয়া থাকে এবং পরিবারের প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা, গণ্ডী অনুযায়ী সাহায্য প্রদত্ত হয়।

ব্যষ্টিসম্পর্কিত সমাজ-কর্ম্ম আমাদের দেশে এখনও প্রাথমিক অবস্থায় আছে, বর্ত্তমানে খুব অল্পসংখ্যক 'কেস-ওয়ার্ক' সংস্থাই কাজ করিতেছে। বস্তুতঃ এমন কোন সংস্থার অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ যাহা কাহাকেও ব্যষ্টিগত সাহায্য প্রদানের বেলায় পরিবারের সমস্যার সামগ্রিকতার

পারিবারিক ব্যাপারে উপদেশ প্রদান, পারিবারিক জীবনের শিক্ষা এবং ভগ্ন পরিবারগুলির পুনর্বসতি ইত্যাদির জন্য ভারতে পরিবার-উন্নয়ন-সংস্থাসমূহের গুরুতর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। পারিবারিক সমস্যার একটি ভগ্নাংশ অপেক্ষা, এই সকল সংস্থার সামগ্রিক ভাবে পরিবারের কল্যাণের উপর জোর দেওয়া উচিত। উপরন্তু, পারিবারিক সমস্যাসমূহ লাঘব করা, সমস্যার পরিমাণ কমাইয়া আনা এবং পরিবারগুলিকে ভাঙ্গনের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রয়োজন—কাজের নিবারণ এবং প্রতিকার উভয় দিকের সমন্বয়সাধন।

শিশুর বৃদ্ধি এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে গৃহের দান

ডি. পালচৌধুরী

“শিশু মানবের পিতা” এই সুপরিচিত উক্তিটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছে। শিশুদের স্বার্থকে যাহা ক্ষুণ্ণ করে তাহা দ্বারা সমষ্টির স্বার্থও ব্যাহত হয়, কেননা শিশু এই সমষ্টিরই একজন। ভারতবর্ষে আমরা সময় সময় এ কথাটা ভুলিয়া যাই যে, শিশুই জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার উন্নতির উপর কেবল যে জাতির স্বাস্থ্য এবং উন্নয়ন নির্ভর করে তাহা নহে, শিশু-কল্যাণমূলক কার্য্যের দ্বারাই জাতি নিজেকে সভ্য বলিয়া দাবি করিতে পারে। অধিকাংশ অগ্রসর দেশে শিশু-কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

শিশু মনস্তত্ত্ব আলোচকদের অভিমত এই যে, গৃহই হইতেছে শিশুর শারীরিক, মানসিক, পারিপার্শ্বিক এবং আবেগসঞ্জাত যাবতীয় চাহিদা মিটাইবার একমাত্র স্থান। আমরা আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ গৃহে কাটাই এবং জীবনভোর আমরা আমাদের গৃহের ছাপ বহন করিয়া থাকি।

তৃতীয় হোয়াইট হাউস কনফারেন্সে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি শিশু সনদের অন্তর্নিবিষ্ট হয়ঃ

“প্রত্যেক শিশুর জন্য প্রয়োজন একটি গৃহ এবং গৃহে লব্ধ ভালবাসা ও নিরাপত্তা। ইহার অভাবে পোষ্য হিসাবে প্রতিপালক জনক-জননীর স্নেহযত্ন পাওয়া শিশুর পক্ষে অত্যাবশ্যক, পালক পিতামাতার গৃহ হইতেছে তাহার নিজ গৃহের নিকটতম অনুকল্প (substitute)।

শিশুর বৃদ্ধি এবং কল্যাণের পক্ষে গৃহের গুরুত্ব এত বেশী যে, এ বিষয়ে যতই বলা হোক না কেন তাহা কখনও অতিশয়োক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কাজেই “পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয়ের পক্ষে গৃহই শ্রেষ্ঠ” এই নীতিবাক্যটি শিশুদের বেলায় সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং আমাদিগকে শিশুর মূলগত (basic) প্রয়োজনসমূহ সম্বন্ধে এক একটি করিয়া আলোচনা করিতে হইবে এবং এই সকল চাহিদা মিটানোর ব্যাপারে গৃহ কি ভাবে প্রকৃষ্টরূপে শিশুকে সাহায্য করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে।

প্রথমে আসে শিশুর আবেগজনিত প্রয়োজনীয়তার কথা। এম. পি. সেলস্ তাঁহার “দি প্রবলেম চাইল্ড এট হোম” নামক রচনায় উক্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই মর্ম্মে বলিয়াছেন: “শৈশবে সঞ্চিত আবেগসঞ্জাত বৃত্তিসমূহের অসামঞ্জস্য হইতে যাবতীয় মানসিক বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় বলিয়া শিশুর আবেগময় জীবন এতরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে, ইহার উপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা।”

শিশুর শরীরের পক্ষে শারীরিক খবরদারির প্রয়োজন যতটুকু, তাহার ব্যক্তিসত্তার পক্ষে ভালবাসার আবশ্যকতা ততটুকু। কাজে কাজেই নিরাপত্তার প্রধান শর্ত হইতেছে—শিশুর প্রতি পিতামাতা উভয়ের ভালবাসা। মনোমালিন্য অথবা মৃত্যুর দরুন যেসব ভাঙ্গিয়া যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী পিতামাতার গৃহে যে সকল শিশুর জন্ম হয় অথবা উভয়ের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহারা আত্মীয়পরিজনের আশ্রিত হইতে বাধ্য হয়, সেই সকল শিশুই যে অপরাধপ্রবণ এবং পারিবারিক জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিবার মূল কারণ হইয়া উঠে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার ক্ষেত্রে “ভালবাসা”র স্থান সর্ব্বাগ্রে। শিশু ভালবাসা পাইতে পারে কেবলমাত্র তাহার নিজের বাড়ীতে এবং শুধু তাহার নিজের পরিবারের নিকট হইতে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা-নিরপেক্ষ ভাবে শিশুর পক্ষে ব্যক্তিগত যত্ন-আত্তি এবং ভালবাসার প্রয়োজন, অন্যথায় সে সেই শ্রেষ্ঠতম একক বস্তুটি হইতে বঞ্চিত হয় যাহা আবেগের দিক দিয়া সুসমঞ্জস, আনন্দময় এবং সহযোগিতাকারী, ব্যষ্টির বিকাশের সহায়তা করিয়া থাকে। এমনকি ব্যক্তিত্বের গড়নের

জন্যও সুস্থ গৃহজীবন অত্যাবশ্যক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, যে শিশুর মাতা তাহার পিতাকর্ত্তৃক সর্ব্বদা ভর্ৎসিতা হয় সেই শিশুর মনে নারীবিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া থাকে এবং সেইজন্য উপযুক্ত সময়ে তাহার পক্ষে নিজের স্ত্রীর সহিত মানাইয়া চলা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আবেগের দিক দিয়া শিশুরা যাহাতে নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য। শারীরিক প্রয়োজনীয়তার বেলায় আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম বিবেচনা করিতে হইবে, কোন্ ধরণের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গৃহ অবস্থিত সেকথা। কেননা ইহা দেখা যায় যে, খোলা এলাকা এবং গ্রামাঞ্চল হইতে আগত লোকেরা সাধারণতঃ হইয়া থাকে সহজ সরল এবং উদারমনা, কিন্তু নোংরা বস্তির ভিতর প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা, কুটিল মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় এবং সাধারণতঃ তাহারা সমাজের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না। এই সকল ঘনসন্নিবিষ্ট অঞ্চলে তাহারা আমোদ-প্রমোদের যথোচিত সুযোগ-সুবিধা পায় না, কাজেই কোন-না-কোন অবাঞ্ছিত কার্য্যকলাপের দিকে স্বতঃই তাহাদের মন ধাবিত হইয়া থাকে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থানের মত গৃহের আভ্যন্তরিক পরিবেশও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গৃহের সাধারণ পরিচ্ছন্নতা, ইহার ব্যবস্থাদি, খাবার টেবিলে প্রাত্যপাল্য নিয়মাবলী, স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন প্রভৃতি হইতেছে এমন কতকগুলি জিনিষ যাহা যেমন শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী। গৃহ-জীবন শিশুর শিক্ষাকে কি ভাবে প্রভাবিত করে এখন আমরা তাহা বিচার করিয়া দেখিব। শিশুর শিক্ষার জন্য পরিবেশই সবচেয়ে বেশী দায়ী, কেননা শিশুর প্রথম শিক্ষা নির্ভর করে চারি পাশের লোকেদের উপর। কোন কোন বিষয়ের প্রতি শিশু এমন কতকগুলি মনোভাব পোষণ করে এবং আঁকড়াইয়া ধরে যাহা তাহার সারা জীবন ধরিয়া সমভাবে বিদ্যমান থাকে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বসংস্কারসমূহ কেবলমাত্র গৃহেই আয়ত্ত এবং অর্জ্জিত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে শিশু যে পুঁথিগত শিক্ষা পাইয়া থাকে তাহা যথাযথ গৃহ-শিক্ষার অভাবে পুরাপুরি ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

ব্যক্তির ধর্ম্মজীবনের উপরেও পরিবার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আমাদের পিতামাতা যে ধর্ম্মবিশ্বাস পোষণ করেন সাধারণতঃ আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকি। ধর্ম্ম-বিশ্বাসমূলক কতকগুলি মনোবৃত্তি শিশুর মধ্যে অনিবার্য্যরূপে আসিয়া থাকে তাহার পরিবার কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত মনোভাবের মাধ্যমে এবং গীর্জ্জা ও মন্দিরের সহিত সম্পর্কহীন হওয়া সত্ত্বেও এগুলি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ হইতে পারে।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, যে-কোন কেতাদুরস্ত প্রাতিষ্ঠানিক জীবন (Institutional life) —যাহা ব্যক্তিগত সংস্পর্শ অথবা পারিবারিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ বর্জ্জিত তাহা নিশ্চিতরূপে শিশুর দেহমনের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী।

প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিশুর অধিকারবোধ জন্মিতে পারে না। সেখানে শরীরের দিক দিয়া সে নিরাপদ হইতে পারে, কিন্তু ভাবাবেগের দিক দিয়া সে নিরাপত্তাবিহীন—কোনও প্রতিষ্ঠানে সে পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা পাইতে পারে না। যে তরুণ কোনও প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার পক্ষে জীবনের পথে নূতনভাবে যাত্রা করা বড়ই দুরূহ হইয়া থাকে কেননা জীবন-গঠনের সময়ে পরিবার এবং বহির্জগতের সহিত তাহার সংস্পর্শ থাকে না। কাজেকাজেই প্রতিষ্ঠান পরিবারের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না।

শিশুজীবনের অপচয় যে-কোন দেশের সম্পদের মারাত্মক অপচয়। ইহার পরিণাম—সমাজসেবা-কর্ম্ম এবং প্রতিকার্য্য চিকিৎসার জন্য বিপুল ব্যয়, ইহার পরিণাম—বহু মূল্যবান, সম্ভাবনাপূর্ণ মানব-শক্তির অপচয়, সুতরাং কোন প্রতিষ্ঠানে শিশুকে রাখার মনোবৃত্তিকে উৎসাহদানে বিরত থাকিতে হইবে। এমনকি, সাময়িক ভাবেও পারিবারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্নতা গুরুতর ব্যাপার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

অতএব গৃহই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। গৃহের অভিভাবিকারূপে মায়েদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ঘরেই শিশুর যাবতীয় চাহিদা মেটে। এমনকি মাতা যদি কর্ম্মে নিযুক্তা থাকেন তাহা হইলেও গৃহ হইতে তাঁহার অনুপস্থিতি শিশুর উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সে বিষয় তাঁহাকে অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে এবং কুফল এড়াইবার জন্য তাঁহাকে গৃহ-জীবনে যথোপযুক্ত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া লইতে হইবে। শিশু যাহাতে সন্তোষজনক ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, অখণ্ড পরিপূর্ণত্ব লাভ করিয়া জাতীয় সম্পদের অপচয়ের হেতু স্বরূপ হওয়ার পরিবর্ত্তে জাতির সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে শিশুর জন্য যেভাবে আকর্ষণীয় গৃহ-জীবনের ব্যবস্থা হয় সেদিকে মায়েদের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের শিশুরা জাতির আশা এবং স্তম্ভস্বরূপ—অনুকূল গার্হস্থ্য পরিবেশের মধ্যে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষণ ও যত্নের সহিত তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।

শিশুর খাদ্য

ভারতে শিশু-খাদ্যে নবপদ্ধতি-প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশিত তালিকা

ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শিশুর উপর খাদ্যের ফলাফল অনুযায়ী সময়ের পরিবর্ত্তন এবং যাবতীয় সংযোজন করিতে হইবে। কোন নূতন খাদ্য স্বল্প পরিমাণে প্রবর্ত্তন করা, সপ্তাহের মধ্যে সেই খাদ্যের পুনরানুবর্ত্তন করা—সতর্কতামূলক সমীচীন ব্যবস্থা।

খাদ্যতালিকা	প্রথম প্রবর্ত্তনের সময়	পরিমাণ
ফলের রস	তৃতীয় সপ্তাহ	তরল করিয়া এক চামচে। অর্দ্ধ চামচ করিয়া এমন হারে পরিমাণ বৃদ্ধি করুন যেন ৬ মাসের সময় শিশু দৈনিক ১—১½ আউন্স খাইতে পারে।
ফল : কলা, আম, আপেল তাজা, চূর্ণকরা, রান্না করা অবস্থায়	৪-৬ সপ্তাহ	¼ আউন্স। প্রত্যেক পর্য্যায়ক্রমিক সপ্তাহে ¼ আউন্স করিয়া পরিমাণ বৃদ্ধি করুন।
কডলিভার অয়েল অথবা অনুরূপ কিছু	৬-৮ সপ্তাহ	কমলার রসের সঙ্গে এক ফোঁটা। ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া এক চামচ অথবা প্রত্যহ ৪০০ আই. ইউ'র সমান করুন।
ডিম	৩-৪ মাস	স্বল্প পরিমাণ, সিদ্ধ করা ডিমের কুসুম—ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়াইয়া ছয় সপ্তাহের মধ্যে গোটা কুসুম দিতে হইবে। আস্তে আস্তে সাদা অংশ যোগ করিবেন এবং ৫-৬ মাসের মধ্যে গোটা ডিম খাওয়াইবেন।
ধান যব ইত্যাদি শস্য	৪-৬ মাস	১-১½ আউন্স।
তরিতরকারি : গাজর, গোল-আলু, মিষ্ট-আলু, শাকসব্জী, বীটের মূল, বীন, মিষ্ট গোল-আলু	৪-৬ মাস	রান্না করা অবস্থায় দিবেন। ১ চামচ—৬-৮ মাসের সময় ১½—২ আউন্স পর্য্যন্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করুন।
ডাল	৪-৬ মাস	উত্তমরূপে রান্না করা এবং ১ চামচ ভাতের সহিত খাইতে দিবেন, ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বৃদ্ধি করুন।
মাংসের জুস	৬ মাস	অর্দ্ধ আউন্স। ৬-১০ মাসেই পরিমাণ বাড়াইয়া ২ আউন্স করিতে হইবে।
চাপাটি	৬-৭ মাস	ছোট টুকরা—আস্তে আস্তে বাড়াইতে হইবে।
ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটা মাংস	৯ মাস	এক চামচ—সতর্কতার সহিত পরিমাণ বাড়ানো দরকার।

(এই চার্টটি ওয়েড্‌লাইন এইচ মেথুজ এবং ডক্টর পি, এম, টানেজ কৃত)

আপনার শিশুর খাদ্যের প্রতিক্রিয়া

১৫—২১ মাস—এটা শিশুর "ইহা আমার" অবস্থা। শিশুখাদ্য লইয়া ওজর-আপত্তি করে। তার ক্ষুধার কমিবেশী হইয়া থাকে। বাহ্যিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাহার ক্ষুধার পরিবর্ত্তনসাধন করিবে। স্বাদের বিভিন্নতার বোধ তার তীব্র। দুই বৎসর বয়সের সময় সে খাবার প্রত্যাখ্যান করিবে। খাইতে বসিয়া সে মিছামিছি সময় নষ্ট করে এবং রং ও মিষ্টতা উভয়ের জন্য গাজর এবং বীটের মূলের মত বর্ণাঢ্য খাবার পছন্দ করে।

২—২॥ বৎসর—উত্তম রূপে চিবানোর অভ্যাস আয়ত্ত হইয়াছে। এটা হইতেছে খাদ্য সময়।

৩ বৎসর—এই সময় মিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা অধিকতর। শিশু নূতন তরিতরকারি পছন্দ করে।

৪ বৎসর—সময় সময় অনশনে থাকে। এই সমস্ত সাময়িক খেয়ালকে উপেক্ষা করিবেন।

৫ বৎসর—সাধারণতঃ যাহা দেওয়া যায় তাহাই খায়। শিশু অমিশ্রিত এবং সাদাসিধা খাবার পছন্দ করে।

৬ বৎসর—এই বয়সে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে পছন্দ অপছন্দ সুনির্দ্দিষ্ট। বেশীর ভাগ সময়েই খাবার টেবিলে সে দুষ্টামি করে।

৭ বৎসর—শিশু প্রায়শঃই তাড়াতাড়ি খাবার গিলিয়া খেলাধুলার জন্য ছুটিয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য লইয়া এবং খাইবার সময়ে সে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অধীর হইয়া উঠে।

শিশুও একটি ব্যক্তিসত্তা এবং তদনুযায়ী তাহার সহিত যথোচিত ব্যবহার করা উচিত। আধুনিককালের প্রবণতা হইতেছে শিশু এবং তাহার দাবিগুলির কথা বিবেচনা করা, সদভ্যাস শিক্ষাদানের এবং বিভিন্ন প্রকারের ও নানা পদ্ধতিতে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের প্রতি আসক্তি সৃষ্টির ইহাই প্রশস্ত কাল।

বিকল্প বিসি—দক্ষিণ ভারতের গ্রামাঞ্চলে অনেক কমলা লেবু এবং টম্যাটো নাই, কিন্তু সেখানে সবুজপত্র-সমন্বিত তরকারি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলি সিদ্ধ করিয়া জলটুকু খাইতে দিলে তাহা দ্বারা ভাইটামিন সি সরবরাহ হইয়া থাকে। এমনি ভাবে আমরা গম ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে কঞ্জির ব্যবস্থা দিয়াছি—এই কঞ্জি বিভিন্ন গ্রামে পাওয়া যায়।

গ্রামগুলিতে যখন দুধ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে তখন শিশুদিগকে কফি খাইতে দেওয়া হয়। শিশুর পক্ষে কফির চেয়ে কঞ্জিই ভাল, বিশেষতঃ কফির মধ্যে যখন দুগ্ধজাতীয় পদার্থ কিছুই নাই। এমনকি যে কলা অধিকাংশ স্থানেই পাওয়া যায়—তাহা যদি চটকাইয়া স্বল্প পরিমাণে প্রাপ্ত দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহা উৎকৃষ্টতর খাদ্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং কফি অপেক্ষা উহা পান করিয়া শিশু বেশী সুস্থ থাকিবে। উপলব্ধ বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্তব্য এবং ব্যবহার্য্য বিভিন্ন শ্রেণীর যাবতীয় শস্যাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যখন আমরা গ্রামে কাজ করি তখন আমরা এটা প্রত্যাশা করি না যে, কোন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণাঙ্গ খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে। তাহারা যেখানে আছে, আমরা ঠিক সেখান হইতেই তাহাদের সঙ্গ ধরি এবং এক একবারে তাহাদিগকে এক এক পা আগাইয়া লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শিশুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জল পান করে, গ্রামের লোকেরা ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে জল দেয় না বলিয়া আমরা যখন বাহিরে যাই তখন সঙ্গে করিয়া কিছু জল লই। এখন আমরা সাধারণতঃ তাহাদিগকে যে জলে তরিতরকারি পাঁচ মিনিট সিদ্ধ করা হইয়াছে সেই জল দিই এই উদ্দেশ্যে যেন তাহারা ইহার সঙ্গে কিছু পরিমাণ ভিটামিন 'সি' পাইতে পারে। তাহাদিগকে আরও ভাল করিয়া জানিলে পরে আমরা অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করি, কিন্তু একবারে তাহাদিগকে সমগ্র ফিরিস্তি দেবার চেষ্টা করি না।

আজরা আপা

সামনে একটি থালা ভরতি তরিতরকারি নিয়ে তিনি বসে ছিলেন বারান্দার এক কোণে একটি খাটের উপরে। সে-ই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পরস্পরের একান্ত পরিচিত হয়ে উঠলাম। তিনি আমাদের প্রতিবেশী মৌলবী সাহেবের পত্নী আজরা আপা— এই নামেই পরে আমি তাঁকে সম্বোধন করতাম। মৌলবী সাহেবই আমাকে তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠান এবং আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি বিদ্যাবত্তায় তাঁর স্বামীর চেয়ে খাটো নন। আজরা

আপা খুব প্রগতিশীল পরিবারের মেয়ে নন এবং তাঁর বিয়ে হয় একটি অত্যন্ত গোঁড়া পরিবারে। এই পরিবারে পর্দ্দা-প্রথা খুব কড়াকড়ি ভাবে মেনে চলা হ'ত এবং তাঁকে কচিৎ দেখা যেত তাঁর ঘরের বাইরে। তাঁর কথাবার্তা ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এমন একটি আলোকপ্রাপ্তা নারী মৌলবী সাহেবের বাড়ীর একঘেয়ে পরিবেশের মধ্যে কি ভাবে যে দিন কাটাচ্ছিলেন তা ভাবলে অবাক লাগত। আগেই বলেছি যে, তিনি কদাচিৎ তাঁর ঘরের বাইরে বের হতেন, তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু ছিলেন উদার চিন্তা এবং সুন্দর আচরণবিশিষ্টা একজন সংস্কারমুক্তা নারী। পরে অবশ্য আমি দেখলাম যে, কেবলমাত্র আমিই যে তাঁর ওখানে গিয়ে থাকি তা নয়, ঐ মহল্লার সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই উপদেশ, পরামর্শ এবং নির্দ্দেশলাভের জন্য তাঁর আস্তানায় গিয়ে ভিড় জমাত এবং তাঁকে রন্ধনশালার সমস্যা থেকে আরম্ভ করে শেলির এবং গালিবের কবিতা পর্য্যন্ত যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখে বিস্মিত হতে হ'ত। আমার মত তরুণবয়স্ক থেকে সুরু করে উক্ত অঞ্চলের বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত সকলেই ছিল তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত।

তিনি ছিলেন একজন দয়াবতী মহিলা। শিক্ষাদান থেকে সুরু করে গরীবদের সযত্নপ্রযত্নে সাহায্য করা ছিল তাঁর সমাজসেবামূলক কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। ওখানে ছিল একটি ঝাড়ুদারের মেয়ে, যে তার উর্দ্দু প্রাথমিক পাঠ নিয়ে নিয়মিত ভাবে তাঁর কাছে আসত, একটি তরুণী নববিবাহিতা বধূ এসে শিখত রন্ধনশালার কাজ, বদমেজাজী শাশুড়ীর প্রতি প্রযোজ্য পারিবারিক কূটনীতি শেখবার জন্য আগমন হ'ত বৃদ্ধ-পত্নীর। আজরা আপার এমন সব বন্ধু ছিলেন যাঁদের সঙ্গে তিনি দার্শনিক তত্ত্ব বা শহরের চলতি রাজনীতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতেন। তাঁর বারান্দাটিকে বলা চলে একটি প্রতিষ্ঠানবিশেষ, যা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্ম্মপ্রচেষ্টার গুঞ্জনধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত।

মৌলবী সাহেব তাঁদেরই মত এক গোঁড়া পরিবারে তাঁর এক বোনের বিয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। আপার কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ছিল অন্য রকম। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ননদকে পর্দ্দার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর থেকে মুক্তি দিতে। এই মাতৃহারা বালিকাটি শৈশবকাল থেকে আপার নিকট প্রতিপালিত হয়। এই মেয়েটিকে বিয়ে দেবার জন্যে একবার তার চাচারা গ্রামে নিয়ে যায়। তখন তার সমগ্র ভবিষ্যৎটাই নষ্ট হতে চলেছে দেখে আপা আর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। সাহস অবলম্বন করে সরাসরি তিনি চলে গেলেন গ্রামে। ওদিকে বর্ষীয়সী চাচীরাও কিন্তু মাতৃহারা বালিকার অদৃষ্টকে নিজেদের ছাঁচে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। আপার অনুনয়বিনয়ে কোন ফল হ'ল না, তা সত্ত্বেও কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না আপা। বাড়ীর ঝাড়ুদারনীর সঙ্গে গোপনে সলাপরামর্শ হ'ল। অবশেষে একদিন রাত্রি প্রভাত হওয়ার আগে দেখা গেল বোরখাপরা দুটি স্ত্রীলোক ত্বরিতপদে চলেছে নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে।

বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল। আমার শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছিল অনেক আগে। হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আত্মপ্রকাশ করল—এই বিপর্য্যয়ে অমুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা পশ্চিম পঞ্জাব ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হ'ল। আপার গৃহ তখন হয়ে দাঁড়াল উভয় সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল। আপা তখন তাঁর হিন্দু এবং শিখ বন্ধুদের নিরাপদ অপসারণ ব্যবস্থার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কয়েক বৎসর পরে আমি নিজের শহরে যাবার একটা সুযোগ পেলাম। সেখানে পৌঁছে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আগেকার ধরণের জীবনধারা বজায় রাখবার জন্যে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাঁর কর্ম্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছিল তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন। উপরন্তু তিনি অত্যন্ত ঋণ-গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। উদ্বাস্তু বন্ধুদের অর্থসাহায্য করে করে তিনি একেবারে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরি-বারের লোকেদের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের পর অবশেষে তিনি নিজের ইচ্ছামত ননদের বিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। চিরাগত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে এভাবে বর-নির্ব্বাচনের জন্য এই বিবাহের সকল দায়িত্বভারও তাঁরই উপর পড়েছিল।...

তাঁকে তাঁর সেই পুরনো খাটের উপরেই অসুস্থ এবং অসহায় অবস্থায় শায়িত দেখলাম। চিকিৎসার জন্য তাঁর অর্থ ছিল না, ভবিষ্যতেরও আশা তাঁর ছিল না। এমনকি মৃত্যুশয্যায় পর্য্যন্ত উত্তমর্ণদের কথা তাঁর মনের ভিতর আনা-গোনা করছিল।

সম্প্রতি আমি জানতে পারলাম যে, আজরা আপার মৃত্যু হয়েছে। মাঝে মাঝে আমার কল্পনা যখন অতীতে উড়ে চলে যায়, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হতে থাকে। তাঁর মাতৃবৎ স্নেহ এবং ভালোবাসার স্মৃতি আমাকে পরম তৃপ্তি দান করে। একাধারে যিনি ছিলেন আমার বন্ধু, শিক্ষিকা এবং ভগিনী, তাঁর বিয়োগে নিজেকে আমার অনাথ বলে মনে হয়।

সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবং এজেন্সীগুলির সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে সেণ্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সিদ্ধান্ত

১৯৫৪ সালের ১২ই নবেম্বর শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের সপ্তম অধিবেশনের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ :

১। গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে দান—

স্বেচ্ছামূলক উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা হইতে পারে :

(ক) সাধারণতঃ কল্যাণ সংস্থাসমূহের গৃহের মেরামতি অদলবদল এবং নবাংশ সংযোজনের জন্ম সাহায্য দেওয়া হইবে, অবশ্য যদি ইহার প্রয়োজনীয়তা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

(খ) কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের সাহায্যপ্রাপ্ত অথবা সাহায্যনিরপেক্ষ কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের যদি গৃহের এই বাড়তি নির্মাণকার্য্য আবশ্যক হয় তাহা হইলেও সাহায্য প্রদত্ত হইবে—অবশ্য যদি দেখা যায় যে, ভাড়া দিয়া কার্য্যোপযোগী গৃহ পাওয়া সম্ভব নয়।

(গ) কোন প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য অনুমোদিত কার্য্যের জন্ম যে সমস্ত সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে, গৃহনির্মাণ সাহায্য হইবে তাহা হইতে পৃথক। গৃহনির্মাণ খাতে সর্ব্বোচ্চ সাহায্য মঞ্জুর করা হইবে ১৫,০০০৲ টাকা। ৩০,০০০৲ টাকা পরিমাণ ব্যয় পড়ে এমন গৃহনির্মাণ কার্য্যে যাহাতে হাত দেওয়া যায় সেজন্ম প্রতিষ্ঠানের দেয় সমপরিমাণ সাহায্যের ভিত্তিতে এই সাহায্য প্রদত্ত হইবে।

২। মোটরভ্যানের জন্ম সাহায্য—

উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে মোটরভ্যানের জন্ম নিম্নলিখিত সর্ত্তাবলীর অধীনে ১৫,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে :

(ক) চিকিৎসা শিক্ষামূলক সবাক চলচ্চিত্র অথবা শিশুদের লাইব্রেরী এবং অনুরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যে এই গাড়ীর প্রয়োজন হইবে এবং ব্যবহার করা চলিবে। শুধুমাত্র যাতায়াতের জন্ম ইহা ব্যবহৃত হইবে না।

(খ) সাজসরঞ্জাম সমপরিমাণ দান বলিয়া গৃহীত হইবে, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গাড়ী রক্ষণের ব্যয়ভারও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বহন করিতে হইবে।

৩। একই সমিতি সঙ্ঘ অথবা সংস্থাকে একাধিক সাহায্যদানের বিষয় :

যদি একটি স্বেচ্ছাগঠিত সংস্থা কর্ত্তৃক কতিপয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় তাহা হইলে পর্ষদ প্রত্যেকটিতে তাহাদের নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী পৃথক সাহায্যদানের কথা বিবেচনা করিবেন। প্রত্যেক দানের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ১৫,০০০৲ টাকা বরাদ্দ আছে। একই ভবনে একই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত স্বতন্ত্র কল্যাণপ্রচেষ্টার বেলায় এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

৪। নূতন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে সাহায্য দান :

নূতন কর্ম্মপদ্ধতিসমূহ অনুমোদনের সিদ্ধান্তের পরিপূরক রূপে ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, যে ক্ষেত্রে চালু সংস্থাসমূহ নব অনুমোদিত কর্ম্মপদ্ধতিসমূহের কার্য্যকরীকরণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন, সেই ক্ষেত্রে নূতন স্বয়ংগঠিত গ্রুপসমূহের সাহায্যের আবেদন গৃহীত হইবে যদি সেগুলি তদুদ্দেশ্যে নিজেরা একটি রেজেষ্টারীকৃত সমিতিতে পরিণত হয়।

৫। কল্যাণ-সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবের (Welfare Project Budget) পরিবর্দ্ধন :

কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনার বর্ত্তমান বাজেটের অর্দ্ধেক ১২,৫০০৲ টাকা কেন্দ্রীয় পর্ষদ সাহায্য করে, কিন্তু সম্প্রতি সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদসমূহের চেয়ারম্যানদের সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে পর্ষদ কল্যাণ-সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার কাজে আরও টাকা দিবেন।

৬। কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা (Welfare Services)—

স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহ শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মী নিয়োগ করিতে চাহিলে কেন্দ্রীয় পর্ষদ সাহায্য করিবে।

সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সাহায্যপ্রাপ্ত অথবা পৃষ্ঠপোষকতা-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কিংবা পরিকল্পনাসমূহ যাহাতে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক (technical) নির্দ্দেশাদি পাইতে পারে সেজন্ম রাজ্য সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদসমূহ কর্ত্তৃক অভিজ্ঞ অথবা যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্ম্মীদের নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সমাধান

শ্রীমিহিরকুমার বসু

"নাঃ, এ বিয়েতে তোমার যে সত্যি এমন কি আপত্তি থাকতে পারে, সে ত আমি ভেবেই পাই না,"—অবশেষে এই ক'টি কথা বলে বিভূতিবাবু চেয়ারের পিঠে একেবারে গা এলিয়ে দিলেন। যেন এতদিন ধরে অরিন্দমকে তার মূঢ়তা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার প্রচণ্ড প্রয়াসে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

অরিন্দম কিন্তু যেমন ছিল তেমনি মাথা নীচু করেই বসে রইল। ঠিক সামনেই একখানা চেয়ার দখল করে বিভূতিবাবু বসে আছেন, তাঁর চোখের সেই অতি পরিচিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কল্পনা করে অরিন্দমের সারা শরীর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। মুখ তুলে যে একবার তাকাবে, সেই সাহসটুকুও হ'ল না। তবু বিভূতিবাবুর চেহারাখানা সে যেন খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছিল। সেই কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে কণ্টকিত সারা মুখ, অনবরত পান খাবার ফলে রক্তরাঙা দুই পাটি দাঁত, আর ঘন ভুরুর নীচে বুদ্ধিতে ধারালো দুটি ক্ষুদে চোখ। তাঁর সামনে নিজেকে অরিন্দমের কেমন যেন অত্যন্ত তুচ্ছ বলে বোধ হয়, মনে হয় যে, বিভূতিবাবুর কাজই যেন তাকে উপদেশ দেওয়া, আর তার একমাত্র কর্তব্য সেই উপদেশ নির্বিবাদে শিরোধার্য করা।

অরিন্দমকে চুপ করে থাকতে দেখে বিভূতিবাবু আবার বললেন, "তুমি কেন যে আবার বিয়ে করবে না, তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ কি সত্যি দেখাতে পার?"

না, দেখাবার মত কোন কারণই অরিন্দমের নেই। অনুভা মরেছে, পৃথিবীর অন্য সকলের কাছে সে একেবারেই মরেছে, অরিন্দমের কাছেও সে কেন মরবে না তার কি এমন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে? অরিন্দম তাই নিরুপায় ভাবে তার কোঁচার খুঁটটাকে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে মাটির সঙ্গে ঘষতে লাগল।

এবারেও অরিন্দমের কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে বিভূতিবাবু অবশেষে বললেন, "দেখ বাপু, শাস্ত্রবাক্য মেনে নিয়ে আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমার এই চুপ করে থাকার অর্থ হচ্ছে, এ বিয়েতে তোমার বিশেষ কোন আপত্তি নেই। তবু—উদারতায় বিভূতিবাবুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ অত্যন্ত দরাজ হয়ে উঠল, তোমাকে না হয় আরও এক দিন সময় দেওয়া গেল। দেখ, তার মধ্যে যদি তোমার এই অদ্ভুত জেদের সপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে বার করতে পার। কিন্তু তা যদি না পার, তা হলে আমি কিন্তু দাদাকে বলে সঙ্গে সঙ্গে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলব। তখন কিন্তু ভায়া, আর কোন ওজর আপত্তি শুনব না"—বলেই তিনি কি মনে করে হো হো করে হেসে উঠলেন। তার পর আরও কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে অরিন্দমের কাঁধে বারদুয়েক সস্নেহে ঝাঁকুনি দিয়ে সংসারধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গুটিকয়েক মূল্যবান উপদেশ দিলেন এবং পরদিন সন্ধ্যাবেলা আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অতঃপর বিদায় নিলেন।

বিভূতিবাবু চলে যাবার পরেও অরিন্দম অনেকক্ষণ তেমনি একই ভাবে বসে রইল। তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে ফিরছিল বিভূতিবাবুর কথাগুলি, আর সেই সঙ্গে অনুভার কথাও। অনুভার স্মৃতি আজ অনেকখানি ঝাপসা হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু এক বছর আগে তার মৃত্যুর পর অরিন্দমের মনে হয়েছিল যে সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। সমস্ত জীবন জুড়ে সে এমন একটা ধূসর, আদিগন্ত শূন্যতা, যার কোন প্রতিকার নেই অথচ যা প্রতি মুহূর্তে নিঃশ্বাস বন্ধ করে আনে। সেই অবর্ণনীয়, অসহনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধারের আশায় সে যে তখন আত্মহত্যা করে নি এইটাই আশ্চর্য্য, যদিও সে কথা তখন অনেকবারই তার মনে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই সে সেই দুর্ব্বহ দুঃখকেও কাটিয়ে উঠেছিল। প্রাত্যহিক জীবনের নানা নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আজ থেকে কাল, কাল থেকে পরশুর নিয়মিত আবর্ত্তনে। এমনি করে একদিন সে আবার আপিসেও গিয়েছিল, এমনকি লোকের সঙ্গে কথা বলতে, হাসি-ঠাট্টা করতেও তার আটকায় নি। তার পরে কি ভাবে যে অনুভা তার মন থেকে আস্তে আস্তে বহুদূরে সরে গেছে তা সে বুঝি নিজেও ভাল করে জানতে পারে নি।

প্রায় চার বছর আগে অরিন্দম যখন একমাত্র অনুভাকেই সঙ্গী করে এই বাড়ীতে সংসার পেতেছিল তখন থেকেই বিভূতিবাবুর সঙ্গে তার পরিচয়। তিনি বরাবরই তার নিকট-প্রতিবেশী ছিলেন। যাতায়াতের পথে প্রায়ই তাদের দেখাসাক্ষাৎ হ'ত। কিন্তু অনুভা যত দিন বেঁচে ছিল ততদিন সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে পারে নি। তার কারণ অরিন্দম তখন অনুভাকে নিয়েই পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। অন্য কোন লোকের দিকে ভাল করে তাকাবার ফুরসতই ছিল না তার। তাই এত কাছাকাছি থেকেও প্রথম কয়েক বছর বিভূতিবাবুকে সে ঠিকমত চিনতেই পারে নি। সেই চেনাশোনা হয়েছিল অনুভা মারা যাবার পর।

সংসারে অরিন্দম ও অনুভা ছিল একেবারে নিঃসঙ্গ। সংসারে খুঁজে দেখলে হয় ত তাদের আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না, কিন্তু সামাজিক বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে বিয়ে করবার ফলে আত্মীয়কুল তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি। এতে অবশ্য অরিন্দম বা অনুভার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি। তখন তাদের মনে অদম্য উৎসাহ, দুর্জ্জয় সাহস ও অসীম আকাঙ্ক্ষা। বাইরে আর কোন অবলম্বন ছিল না বলেই পরস্পরের মধ্যে তারা খুঁজে পেয়েছিল বিপুল নির্ভরতা। জীবনের এই ক'টা বছর কত সহজ,

কত স্বচ্ছন্দেই না কেটে গেল। সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত অরিন্দম এক মস্ত সওদাগরী আপিসে মাঝারি বেতনের একটা চাকরি করত। আপিস ছুটির পর কোনদিন সে এক মুহূর্ত্তও দেরি করত না, একেবারে সোজা চলে আসত বাড়ীতে।

সারা রাস্তা তার মাথার মধ্যে ঝাঁক বেঁধে বেড়াত শুধু অনুভা সম্বন্ধে নানা রঙীন কল্পনা। হয় ত বা এতক্ষণে অনুভার গা ধোয়া শেষ হয়েছে, হয় ত বহু যত্নে বাঁধা বেণীটি এঁকে-বেঁকে পড়ে রয়েছে তার পিঠের উপর, সুগৌর ললাটে বুঝি জ্বলজ্বল্ করছে লাল সিঁদুরের টিপ। বাইরের কড়া নাড়তেই সে ছুটে আসবে দরজা খুলতে। কিন্তু দরজাটা খুলবে হয় ত নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে, যেন অরিন্দমের আসা না আসাতে তার কিছুই যায় আসে না। কিন্তু সেই মিথ্যার ভান সে বজায় রাখতে পারবে কতক্ষণ? বাড়ীর ভিতর পা দিয়ে অরিন্দম যেই তাকে—কিংবা সবচেয়ে ভাল হয় যদি সে ও ঠিক অনুভার মতই অন্যমনস্কভাবে সটান গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। সেই মুহূর্ত্তেই কোথায় খসে যাবে তার কপট উদাসীনতার খোলস? নানা প্রশ্নে ও সেবায় অরিন্দমকে সে রীতিমত উদ্ব্যস্ত করে তুলবে। শেষে সব চালাকি যখন ধরা পড়ে যাবে তখন তার সে কি হাসি! সেই স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হাসি ভুলবার নয়; মাঝে মাঝে এখনও সেই হাসি মৃত্যুর বাধা অতিক্রম করে অরিন্দমের হৃদয়ে বিচিত্র সুরের তরঙ্গ তোলে।

বিরাট কলকাতা শহরের এই অখ্যাত গলিটির ততোধিক অখ্যাত এই বাড়ীতেই তাদের বিবাহিত জীবনের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সবসুদ্ধ মোটে তিনটি বছর, সে আর কতটুকুই বা! ভাল করে শুরু হতে না হতেই সুখ-স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গেল! অনুভা মারা যাবার পর অরিন্দমের তাই কেবলি মনে হয়েছিল যে, সে বুঝি তাকে ভাল করে কাছেই পায় নি, সে যে সত্যি কতটুকু পেল আর কতখানি পেল না তার চূড়ান্ত হিসাব সে কোন দিন জানতে পারবে না।

অনুভার কথা মনে হলেই অরিন্দমের মনে পড়ে আর একটি মেয়ের কথা—সে সবিতা। তাদের বিবাহিত জীবনের নিবিড় নিভৃতে ঐ একটিমাত্র মানুষই কি করে যেন নিজের পথ করে নিয়েছিল। ঠিক পাশের বাড়ীতেই সে থাকত। দেখতে শুনতে নিতান্ত চলনসই, তবু সে যে কোন গুণে অনুভার এতটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল সে রহস্য আজও অরিন্দমের অজ্ঞাত। সকালে বিকালে প্রায়ই অরিন্দম তাকে লক্ষ্য করত, তা ছাড়া অনুভার মুখেই শুনেছিল যে প্রায় প্রতিদিনই নাকি সারা দুপুর সে কাটিয়ে যেত এ বাড়ীতে। তাদের সেই বন্ধুত্বের বহর দেখে অরিন্দম এক দিন হেসে অনুভাকে বলেছিল, "তোমার বন্ধুটির ভাগ্য দেখে হিংসা হয়। দেখ, শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে আবার ভাগিয়ে নিয়ে না যায়।"

অনুভাও হেসে উত্তর দিয়েছিল, "ভাগলে পরে তোমাকে সুদ্ধই ভাগব। কিন্তু জান, সবিতার সঙ্গে প্রায়ই আমার তর্ক হয়। ও কেবল বলে যে, পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করা আর সাপকে চুমু খাওয়া নাকি একই কথা। তোমার উপর কিন্তু ভীষণ নজর রাখতে বলেছে আমাকে।"

অরিন্দম বলেছিল, "নজর দিলেই কি বেঁধে রাখা যায়? তুমি কি শেষে সেই মতলবই আঁটছ নাকি?"

অনুভা তেমনি হেসেই বলেছিল, "না বাপু, তেমন কোন মতলব নেই আমার। বলেইছি ত, সবিতার সঙ্গে এ জায়গায় আমার মতে মেলে না।"

অনুভার সঙ্গে এত মেলামেশা সত্ত্বেও সবিতা কিন্তু কোনদিন অরিন্দমের সঙ্গে আলাপ করবার কোন চেষ্টাই করে নি। সে যেন তাকে একটু এড়িয়েই চলত। অনুভার মুখ থেকে তার যেটুকু খবর পাওয়া যেত তাই ছিল সবিতার সম্বন্ধে অরিন্দমের জ্ঞানের পুঁজি। তার পরিচয় আরও একটু ভাল করে পাবার ইচ্ছা যে মাঝে মাঝে অরিন্দমের না হ'ত এমন নয়, কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতিরে কখনও সে এ সম্বন্ধে অনুভাকে কোন প্রশ্ন করতে পারে নি।

অনুভার শেষ অসুখের সময় সবিতা সবাইকে আশ্চর্য্য করেছিল তার অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষার গুণে। অনুভার রোগশয্যার পাশে সে প্রায় সারাক্ষণ ঠায় বসে থাকত, সেই ক'দিন নিজের বাড়ীর সঙ্গেও সে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখে নি। অনুভারও যে তখন কি হয়েছিল, সবিতাকে সে সহজে তার কাছছাড়া হতে দিত না। শেষ দিনটি পর্য্যন্ত অনুভাকে সবিতা ওভাবে আড়াল করে ছিল বলেই তার অসুখের গুরুত্ব অরিন্দম ঠিকমত উপলব্ধি করবার সুযোগ পায় নি। এতে এক হিসাবে সে যেমন অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল তেমনি আবার মাঝে মাঝে এ কথা ভেবে তার দুঃখও হ'ত যে, অনুভার কাছে সবিতার প্রয়োজন যেন ক্রমশঃ তাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। বাড়ীতে অরিন্দম যতক্ষণ থাকত তার মধ্যে সে কতবার অনুভার ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখেছে যে, হয় সবিতা অনুভার খাটের এক ধারে চুপ করে বসে আছে, নয় ফিস ফিস করে কি সব যেন বলছে। সে সব কথা শুনবার, বুঝবার, অদম্য কৌতূহল হ'ত তার, কিন্তু অনুভার এই অবস্থায় তাকে একা পেলেও ও বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় নাকি? বিশেষ করে সে যখন নিজের থেকে কিছুই বলতে চায় না। দুই বান্ধবীর সেই সব গোপন কথা তাই অরিন্দমের আর জানবার সুযোগ হয় নি। অনুভা মারা গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সবিতাও এ বাড়ী থেকে চিরবিদায় নিল। তার প্রায় মাস ছয়েক পরে সবিতার বিয়েও হয়ে যায়। শ্যামবাজারের দিকে কোথায় যেন তার শ্বশুরবাড়ী, সেখানে সে চলে গেল। তার পর মাঝে মাঝে সে তার বাবার কাছে এখানে বেড়াতে এসেছে বটে, কিন্তু ভুলেও কখনও অরিন্দমের খোঁজখবর নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি।

অনুভা মারা যাবার পর অরিন্দম নূতন আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল বিভূতিবাবুর মধ্যে। অনুভা যত দিন বেঁচে ছিল তত দিন বিভূতিবাবু ছিলেন পাড়ার দশ জনের এক জন মাত্র, কিন্তু এখন তিনি একেবারে অরিন্দমের জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। অনুভা যে সেই অসুখে মারা যাবে এটা অরিন্দম ভাবতেই পারে নি। তাই

শোকের প্রথম ধাক্কাটায় সে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সংসারে সে পড়ে রইল একা, তা ছাড়া অনুভা যেন তার আধখানা ভেঙে দিয়ে চলে গেল। তখন তার যা মনের অবস্থা তাতে হঠাৎ একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলা তার পক্ষে মোটেই আশ্চর্য্য ছিল না, কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতেই বিভূতিবাবু দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিলেন। অনাত্মীয়, অপরিচিত এই লোকটির অপরিসীম স্নেহ ও সহানুভূতি অরিন্দম কি কোনদিন ভুলতে পারবে? সেই সময় তাকে ঠিকমত খাওয়ানো, স্নান করানো, আপিস পাঠানো এমনকি সেখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা ও রাত্রে শাইয়ে শোওয়ানো পর্য্যন্ত—এ সমস্তই যেন বিভূতিবাবুর নিত্যকর্ম্ম হয়ে উঠেছিল। এই ভাবেই কেটেছিল প্রায় প্রথম চার মাস। বিভূতিবাবু ইতিমধ্যে অরিন্দমকে তাঁর নিজের বাড়ীতেও নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনুভার সহস্র স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ী ছেড়ে যেতে তার একান্ত অনিচ্ছা দেখে আর বেশী পীড়াপীড়ি করেন নি।

অনুভার মৃত্যুর মাসচারেক পরে অরিন্দম যখন একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল তখন বিভূতিবাবুও তাঁর সতর্ক দৃষ্টির পাহারা ক্রমশঃ শিথিল করে দিলেন। তবু রোজ সকালে বিকালে এবং ছুটির দিনগুলিতে যখন তখন তিনি আসতেন; পানের বটুয়াটি খুলে নিজে পান খেতেন, অরিন্দমকেও দিতেন; নানা রসিকতা ও খোশগল্প করে অট্টহাস্যে ঘর কাঁপাতেন। অনুভার বিচ্ছেদ অরিন্দমের জীবনে যে অপরিমেয় শূন্যতা এনেছিল এমনি করেই দিনে দিনে তা ভরাট হয়ে উঠতে লাগল।

তার পর হঠাৎ এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বিভূতিবাবু অরিন্দমের কাছে দ্বিতীয় বার বিয়ের প্রস্তাব তুললেন। এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে অরিন্দম হাসবে কি কাঁদবে ঠিক বুঝতেই পারে নি, শেষে ওটাকে নিছক পরিহাস মনে করে আলগোছে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অরিন্দমের সাধ্য কি যে সে বিভূতিবাবুকে টলায়? কথাটা একবার তুলে তিনি আর সেটাকে ছাড়লেন না, একেবারে জোঁকের মত আঁকড়ে ধরে রইলেন। একটু একটু করে মাত্রা চড়িয়ে সেই অনুরোধকে ক্রমশঃ তিনি এমন প্রবল ও প্রচণ্ড করে তুললেন যে, অরিন্দমের পক্ষে শুধু একটু মুচকি হেসে চুপ করে থাকবার কোন উপায় রাখলেন না। কেবল তখনই তার জীবনের এই নূতন সম্ভাবনার দিকে নিতান্ত বাধ্য হয়েই অরিন্দমকে দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। কিন্তু দৃষ্টি দিয়েই বা হবে কি? তার পক্ষে আবার বিয়ে করা কি সত্যি সম্ভব? অন্য কোন নারীকে অরিন্দম কি কখনও অনুভার জায়গা ছেড়ে দিতে পারবে? বিভূতিবাবুর ঋণ এ জীবনে শোধ হবার নয়। কিন্তু তাই বলেই কি তাঁর এই নিষ্ঠুর নির্দ্দেশও মাথা পেতে মেনে নিতে হবে?

অথচ বিভূতিবাবুও নাছোড়বান্দা। তাঁর তীক্ষ্ণ সাংসারিক বুদ্ধির শলাকা দিয়ে তিনি অরিন্দমের জ্ঞানচক্ষু ফোটাবার জন্য একেবারে কোমর বেঁধে লাগলেন। তার মত তরুণ যুবকের পক্ষে বিয়ে না করে থাকা যে কতদূর গর্হিত কাজ সে কথা এমন সব অকাট্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে লাগলেন যে, প্রতিবাদ করবারও কোন পথ আর অরিন্দমের রইল না। আর বলবার তার ছিলই বা কি? অনুভার সঙ্গে ত তার কোন যুক্তির বন্ধন ছিল না যে, নিছক তর্কের জোরেই তাকে যে-কোন লোকের কাছে মস্ত একটা কিছু বলে দেখানো যায়। অনুভা যে তার কি ও কতখানি ছিল তা জানত অনুভা—সে মরেছে; সবিতা হয়ত তার কিছু জেনেছিল—সে বিদায় নিয়েছে; আর জানে অরিন্দম নিজে—অন্য কাউকে বড় গলায় সে কথা শোনাবার বিড়ম্বনা থেকে ভগবান যেন তাকে রক্ষা করেন।

বিভূতিবাবু কিছুতেই হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। দিনের পর দিন তিনি অক্লান্তভাবে উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন। অরিন্দমের মনকে সমস্ত মিথ্যাসংস্কারমুক্ত করে ধুয়ে মুছে সাফ তিনি করবেনই। বিরহকে বিলাসে পরিণত করবার নির্বুদ্ধিতাকে সংসার যে এক কানাকড়িরও মূল্য দেয় না, নানা জলন্ত উদাহরণ দিয়ে তিনি তা অরিন্দমকে বোঝাতে লাগলেন। অবশেষে এক দিন তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে প্রকাশ করলেন যে, বিয়ে করতে অসুবিধাও কিছু নেই; পাত্রী আর কেউ নয়, বিভূতিবাবুরই ভাইঝি। অরিন্দমকে কোন ঝামেলাই পোয়াতে হবে না। সে শুধু একবার মত করলেই কন্যাপক্ষ বিয়ের সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পারে।

এদিকে অনুভার স্মৃতিও আগের তুলনায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। আর যেটুকুও বা অবশিষ্ট ছিল তাও বুঝি বিভূতিবাবু শেষ না করে ছাড়বেন না। অরিন্দমই বা তাঁকে আর কত ঠেকিয়ে রাখবে? অনুভার একখানা ছবি বা তার হাতের লেখা একটা চিরকুটও যদি থাকত! কিন্তু তাও ত কিছু নেই। সেরকম কিছু জমিয়ে রাখবার কথা অরিন্দমের কখনো খেয়ালই হয় নি। একমাত্র এই বাড়ীর হাওয়ার মধ্যে অনুভার নিশ্বাস জড়িয়ে ছিল। সেই হাওয়াকেও ত বিভূতিবাবু হাসির হুল্লোড়ে বহুদিন ঘরছাড়া করে ছেড়েছেন। সমস্ত বাড়ীর কলি ফিরিয়ে অনুভার ছোটখাটো চিহ্নগুলিও তিনি বিলুপ্ত করেছেন। অনুভার জামাকাপড় বোঝাই একটা মস্ত ট্রাঙ্কও সেই যে মাসতিনেক আগে ধোপাবাড়ী পাঠাবার নাম করে তিনি নিয়ে গেলেন, আজও তা ফেরত পাওয়া গেল না। অরিন্দমও লজ্জায় আর সেগুলি চাইতে পারে নি। মোট কথা, তার জীবনে আজ যে অনুভার চেয়ে বিভূতিবাবু অনেক বেশী সত্য, অনেক বেশী প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন সে কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

•

পরদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর স্বাভাবিক হাসিমুখ নিয়ে বিভূতিবাবু এলেন। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "কৈ হে অরিন্দম, কি ঠিক করলে বাপু? আমি ত এদিকে দাদাকে একরকম পাকা কথাই দিয়ে ফেলেছি।"

"কিন্তু···" শশব্যস্তে তাঁর বসবার ব্যবস্থা করতে করতে অরিন্দম কুণ্ঠিতভাবে একটু আপত্তি জানাল।

বাধা দিয়ে বিভূতিবাবু বললেন, "আর কিন্তু কিন্তু করো না ভায়া। ঐ কিন্তুর কাঁটাটি পুষে রেখেছ বলেই এই ভোগান্তি। ওটাকে উপড়ে ফেল, দেখবে সব সহজ হয়ে যাবে।" এই বলে পকেট থেকে অতি সন্তর্পণে পানের বটুয়াটি বার করে তার থেকে একটি পান নিজের মুখে পুরলেন এবং আর একটি অরিন্দমকে দিলেন। কোঁচা গুটিয়ে নিয়ে বাইরে থেকে এক ফাঁকে পিক্ ফেলে এসে আবার বললেন, "তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে পাকা দেখা আর আশীর্ব্বাদটা পরশুই সেরে ফেলা যাক্, কি বল? এই মাঘ মাসেরই শেষের দিকে একটা ভাল দিন আছে, ঐদিন শুভকাজটাও হয়ে যেতে পারে। ঐ দিনটা হাতছাড়া হয়ে গেলে আবার দিন আছে সেই ফাল্গুনের মাঝামাঝি। সে অনেক দেরি হয়ে যায়।"—চেয়ার ছেড়ে উঠে বিভূতিবাবু আর একবার বাইরে পিক্ ফেলতে গেলেন।

এর জবাবে অরিন্দম যে কি বলবে তা সে ভেবেই পেল না। তার শুধু মনে হচ্ছিল যে, যদি আরও কিছুদিন সময় পাওয়া যেত তা হলে হয়ত এই সমস্যার একটা সহজ সমাধান জুটে যেতেও পারত। এ কথা কিন্তু তার একবারও খেয়াল হ'ল না যে, সময় সে এমনিতেই নেহাত কম পায় নি, কারণ বিভূতিবাবু এই প্রস্তাব প্রথম তুলেছিলেন প্রায় চার মাস আগে। এই চার মাস ধরে সে অসংখ্যবার এ নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে কিন্তু কোন কূল-কিনারাই খুঁজে পায় নি। বিভূতিবাবুকে সোজাসুজি 'না' বলে দিতে যেমন তার সাহস হয় নি, তেমনি আবার 'হাঁ' বলতেও সে ভিতর থেকে ক্রমাগত বাধা পেয়েছে।

বিভূতিবাবু ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "তুমি হয়ত ভাবছ যে বিয়ের আগে মেয়েটিকে একবার ভাল করে দেখতেও পেলে না। মেয়ে বাপু চলনসই—খুব সুন্দরী নয়, তবে কুৎসিতও তাকে কেউ বলবে না। ঘরের কাজকর্ম্ম ভালই জানে, লেখাপড়াও শিখেছে একটু-আধটু। মোট কথা, সংসারকে সুখের করে তুলবার সমস্ত গুণই যে তার আছে এ তোমাকে আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি।"

"কিন্তু এত তাড়াতাড়ি··" অরিন্দমের মনের কথাটা এতক্ষণে ভাষায় একটু প্রকাশ পেল।

মুখের কথা লুফে নিয়ে বিভূতিবাবু বললেন, "আমি ত আগেই বলেছি যে, তা নিয়ে তোমাকে কিছু মাথা ঘামাতে হবে না। সে সব ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব আমাদের। তুমি শুধু তোমার মস্তটুকু দিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও গে যাও।"

"আমি ভাবছিলাম, এই বাড়ীতে···"

"সেটা অবশ্য একটা কথা বটে। তবে দেখ বাবা, এখন আবার বাড়ী বদলাবার হাঙ্গামা করতে গেলে হয়ত সামনের শুভ দিনটা ফসকে যাবে। তার চেয়ে আমি বলি কি, বিয়েটা এ বাড়ীতে থেকেই হয়ে যাক্, বিয়ের পর সয়ে সয়ে নূতন বাড়ী খুঁজে নিলেই চলবে। আরে ভায়া, আমি ত শেষ পর্য্যন্ত আছিই তোমার সঙ্গে।"—বলেই বিভূতিবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

এর পর অরিন্দমের আর কোন কথা বলবার মুখ রইল না। এর আগেও এই প্রসঙ্গ যখনই উঠেছে তখনই সে একটা ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছে। আজও গোড়া থেকেই সে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিল আর ভাবছিল যে এই একই প্রশ্নের জের ত চলছে মাসের পর মাস। এ আর ভাল লাগে না। এখন এর যা হোক একটা কিছু শেষ মীমাংসা হয়ে গেলেই যেন বাঁচা যায়। চেয়ারে বসে তাই সে প্রাণপণে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি কামনা করতে লাগল।

"তা হলে তোমার মত পাওয়া গেল," বিভূতিবাবু এমনভাবে কথা ক'টি বললেন যেন অরিন্দমের মত না পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অরিন্দম এতক্ষণ মাথা নীচু করেই ছিল। আবার কি ভেবে একবার মুখ তুলতেই বিভূতিবাবুর সঙ্গে তার একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ একটু হেসেও ফেলল। পরে অবশ্য অরিন্দম বহু বার নিজেকে বুঝিয়েছে যে তার সে হাসির পিছনে সত্যি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না। তবু যে সে হেসেছিল তার কারণ, ঐ অবস্থায় ওভাবে হাসা ছাড়া করবার আর ছিলই বা কি?

বিভূতিবাবু কিন্তু তার ঐ হাসিটুকু লক্ষ্য করেই মহা উল্লাসে চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। তারপর চীৎকার করে বললেন, "এই ত পুরুষের মত কথা। (যদিও অরিন্দম মুখে একটি কথাও বলে নি)। আমি জানতাম যে এ দুর্ব্বলতা তুমি এক দিন না এক দিন কাটিয়ে উঠবেই। একটা কথা নিশ্চয় জেনো ভায়া—যে মোহ তোমাকে পেয়ে বসেছিল সে তোমার মনগড়া জিনিষ ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ হয়ত ঠিক বুঝবে না, কিন্তু এক দিন তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তোমার সত্যিকার উপকার যদি কেউ করে থাকে তবে সে এই বিভূতি চাটুজ্জে।"—এই বলে আঙুল দিয়ে সগর্ব্বে নিজেকে নির্দ্দেশ করলেন। তারপর আরও খানিকক্ষণ অরিন্দমের পৌরুষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, নিজের বহুবিধ কাজ এবং আগামী পরশুদিনের পাকাদেখার কথাটা তাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাস্তার অন্ধকারে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এর পর ঘটনাস্রোত একেবারে হু হু করে এগিয়ে যেতে লাগল। সেই তোড়ের মুখে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া অরিন্দমের আর কিছুই করবার রইল না। যথারীতি পাকা দেখা ও আশীর্ব্বাদের পালা শেষ হয়ে গেল। বিয়ের দিন ঠিক হ'ল তার দু'সপ্তাহ পরে। ঐ তারিখের পরে এ মাসে নাকি আর দিন নেই। বিভূতিবাবু

আহারনিদ্রা বর্জন করে উদ্ধাবেগে চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। তবু প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনি অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও অরিন্দমের কাছে এসে গল্পগুজব করে যেতেন। এ কাজটা তাঁর একটা কর্তব্যের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিয়ের দিন ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে লাগল।

পাকা দেখার দিনও অনুভাকে অনেকবার মনে পড়েছে অরিন্দমের। বিশেষ করে মনে পড়ছিল একটি রাত্রির স্মৃতি। এই বাড়ীতে এসে সংসার পাতবার কিছুকাল পরেই সেদিন ছাদে দাঁড়িয়ে অনুভা বলেছিল, "শেষ পর্যন্ত এই হ'ল! শুধু জাতে বনল না বলেই কেউ আমাদের সঙ্গে রইল না। আচ্ছা, মানুষের জন্য সমাজ না সমাজের জন্য মানুষ, বল ত?"

অনুভার সেই প্রশ্নের কোন উত্তর অরিন্দম দিতে পারে নি। সেদিন আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠেছিল। কুয়াসায় ঘেরা ধুসর জ্যোৎস্নায় পরিচিত শহর অপরূপ হয়ে উঠেছিল তাদের চোখে। অনুভার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে অরিন্দম অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রশ্নটাকে নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করেছিল, যদিও তার কোন মীমাংসাই সে খুঁজে পায় নি। শুধু দূরে কতকগুলি তাল আর নারকেল গাছের ঝিরিঝিরি পাতার দিকে চেয়ে নিজেকেই পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, "কেন এমন হয়? কোন একটা জিনিস বহু যুগ ধরে চলে আসছে বলেই কি তাতে কোন ফাঁকি থাকতে পারে না? অধিকাংশ লোক যা মেনে নেয় তাই কি নির্ভুল?"

অনেকক্ষণ পর অনুভা একটু হেসে আবার বলেছিল, "তোমার হয়ত একটা দুঃখ রয়ে গেল। মানুষের বিয়ে হয় কত আনন্দের মধ্যে—কত তার আয়োজন, কত তার আড়ম্বর। তোমার ভাগ্যে তার কিছুই জুটল না।" এর উত্তরে অরিন্দম তাড়াতাড়ি বলেছিল, "অন্যায়কে মুখ বুজে মেনে নিয়ে যে আনন্দ তাতে আমার কাজ নেই।"

পাকা দেখার দিন অরিন্দমের কেবলি মনে হচ্ছিল যে সেদিন যে সমারোহকে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, আজ সে কি নিজেই যেচে তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে না? অবশেষে কোন ভাবেই যখন সে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারে নি তখন 'জ্বরের' বলে চলে গিয়েছিল বিভূতিবাবুর বাড়ী। সেখানে তার জন্য উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা, সুললিত সম্ভাষণ ও গুটিকয়েক পানের কোন অভাবই অবশ্য হয় নি।

অনুভাকে কিন্তু সেদিন সে অত সহজেই মন থেকে তাড়াতে পারে নি। সন্ধ্যার পর বিভূতিবাবুর বাড়ী থেকে ভাবী জামাতার উপযুক্ত ভূরিভোজন শেষ করে এসে অরিন্দম অনেক রাত্রি অবধি বিছানায় শুয়ে জেগেছিল। ঘর অন্ধকার, শুধু রাস্তার গ্যাসবাতির একটা রশ্মি বন্ধ জানালার ছিদ্র দিয়ে দেয়ালের গায়ে একটা উজ্জ্বল বিন্দু রচনা করেছে। সেই বিন্দুটির উপর ভর করে তার সমস্ত ভাবনা কখন এক সময় অতীতের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। এই বাড়ীতেই অনুভা ও সে কাটিয়েছে তাদের বিবাহিত জীবনের সব ক'টি বছর। এমনি অন্ধকারে কান পেতে থাকলে এখনও হয়ত অনুভার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। অনুভার এই ঘরে সে বিভূতিবাবুর ভাইঝিকে কেমন করে নিয়ে আসবে? কিন্তু কেনই বা আনবে না—অরিন্দম এবার নিজেকেই ধমকে উঠল। এই মৃতের বোঝা সে আর কতকাল বয়ে বেড়াবে? তারই বা কি এত দায়? অনুভার সঙ্গে এমন ত কোন কথা হয় নি যে, সে মরে গেলেও অরিন্দম শুধু তারই সম্পত্তি থাকবে? কিন্তু কথাটা মনে পড়তেই অরিন্দম ভয়ানক চমকে উঠল—এই ধরণেরই কি সব কথা অনুভা মাঝে মাঝে তাকে কি বলত না? সে সব কথাকে নেহাত ছেলেমানুষি মনে করে তখন তাতে কান দেয় নি, কিন্তু আজ এই অন্ধকারে তারাই যেন ঘরময় ঘুরে ঘুরে তাকে ভেংচি কাটতে লাগল।

তবে কি অনুভা বেঁচে থাকতেই কোনভাবে টের পেয়েছিল যে সে মরে গেলে অরিন্দম এমনি করে আবার বিয়ে করতে যাবে? কিন্তু তাই কি কখনও সম্ভব নাকি? ব্যাপারটার অভাবনীয়তা কল্পনা করে অরিন্দমের এবার হাসি পেল। না, অনুভা সত্যি মরেছে, আজ আর কোথাও তার কোন চিহ্ন নেই। পাশের ঐ ঘরটাতে সে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে গেছে, অরিন্দম ত নিজের চোখেই দেখেছে সব। চিকিৎসার কোন বিরাট আয়োজন অবশ্য সে করতে পারে নি, তার বিশেষ কোন প্রয়োজনও বোধ করে নি সে। অনুভাও নিজের অসুখের বিষয়ে বরাবরই অত্যন্ত চাপা ছিল। শেষের দিকে মাঝে মাঝে শুধু এই বলে দুঃখ করত যে, সে আর আগেকার মত সবকিছু দেখাশোনা করতে পারে না বলে হয়ত অরিন্দমের কত অসুবিধাই হচ্ছে।

কিন্তু এখনও সে এই সব পুরনো কথাই বা ভাবছে কেন? অতীতকে সে কি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না? অনুভা ত মরেই গেছে, এখন তাকে ভোলাই ভাল। কিন্তু ভুলতেই-বা সে পারছে কৈ? রাত্রির অন্ধকার আরও নিথর হয়ে উঠেছে, দূরে কোথায় ঢং ঢং শব্দে দুটো বাজল। এবার সে সত্যি বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে পড়ল বিভূতিবাবুকে। এই ত সেদিন তাঁকে সে কথায় কথায় অনুভা সম্বন্ধে তার আগেকার নানা দুর্বলতার একটু আভাস দেবার চেষ্টা করেছিল। বিভূতিবাবুকে সে আজকাল এমন অনেক কথাই বলে বা বলতে পারে—যা হয়ত এক মাস আগেও তার মুখে আটকে যেত। সেদিন তার সেই কথা শুনে বিভূতিবাবু তাঁর পানে-ছোপানো সব ক'টি দাঁত বার করে বলেছিলেন, "কুছ পরোয়া নেহি। অমন একটু-আধটু হওয়াই স্বাভাবিক। বিয়েটা হয়ে গেলেই দেখবে ভেল্কিবাজীর মত এ সব কোথায় উবে গেছে। এইজন্যেই ত তোমাকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে বলছি। গরজটা তোমারি, জেনে রেখ।" পানের রঙে রাঙা তাঁর সেই দাঁত ক'টি এই অন্ধকারেও অরিন্দম যেন খুব কাছে, খুব স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেল। তীক্ষ্ণ, উদ্ধত ঐ দাঁত, যেন হৃদয়ের সমস্ত দুর্বলতাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে

পারে। নাঃ, বিভূতিবাবুর সাংসারিক বুদ্ধির সত্যি তুলনা নেই। তিনি ঠিকই বলেছেন, বিয়ে না করে অরিন্দমের উপায় নেই, এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। আশ্চর্য্য, বিভূতিবাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই তার মনের উদ্বেগ অনেকটা শান্ত হয়ে এল। তারপর কখন যে সে পাশ ফিরে শুয়েছে, আর কখনই বা ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে কিছুই জানতে পারে নি।

এদিকে বিয়ের দিন ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল। বিভূতিবাবুর যেন আর নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ নেই। সারাদিন তিনি নানা কাজে ছুটাছুটি করে বেড়ান, অরিন্দমকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে রকমারি জিনিষ কেনেন, তার ঘরটিকে বিভিন্ন ছাদে সাজিয়েগুছিয়ে ভদ্রস্থ করবার চেষ্টা করেন। ওরই মধ্যে পানের বটুয়া খুলে একবার নিজের মুখে পান গুঁজে দেন এবং সেই সঙ্গে অরিন্দমকেও একটি করে পান না খাইয়ে ছাড়েন না। হেসে হেসে কেবলি বলেন, "আমি ত বলতে গেলে তোমারই দলে। কন্যাপক্ষের কাজ-কারবার ওরা করুক গে, আমি বাপু তোমাকেই চিনি। তোমাকে বিয়ে দিয়ে ঠিকমত সংসারী করে তবে গিয়ে আমার ছুটি।"

বিভূতিবাবুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অরিন্দমও আজকাল রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন তার কাছে বেশ একটু রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর বলে মনে হচ্ছে। একটা আশ্চর্য্য আনন্দময় অনুভূতি—এতকাল যা ছিল অস্পৃষ্ট, ধরাছোঁয়ার বাইরে—এখন তাকে আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। কোন অচেনা আগন্তুকের আসন্ন আবির্ভাবের সম্ভাবনায় তার আকাশ-বাতাস যেন আজ কি গভীর ইঙ্গিতময়!

অরিন্দম নিজেও এখন গোপনে গোপনে দু'চারটে জিনিষ কিনতে সুরু করেছে। সামান্যই হয়ত সে সব জিনিস—এক শিশি এসেন্স, এক কৌটা পাউডার, একটি সখের ফুলদানী—কিন্তু অরিন্দমের কাছে তাদের মর্য্যাদা মোটেই সামান্য নয়। বিভূতিবাবুকে অবশ্য এসব কিছুই সে জানায় নি, জানাতে কেমন যেন লজ্জা করত তার। তবে এ ব্যাপারে তার এটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, এ সব কিছুই ত বিভূতিবাবুর জন্য নয়। যার হাতে দেবে বলে এদের সে লুকিয়ে ঘরে তুলেছে, তাকে এখনও সে চোখে দেখে নি বটে, কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে কি ইতিমধ্যেই অনুভব করে নি? তাই এতকাল যার জন্য ছিল কৌতূহল আর কিছু কৌতুক আজ তারই জন্য সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে সুরু করেছে।

শেষের কয়েকটা দিন যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। সেদিন সকালবেলা দাড়ি কামাতে কামাতেই সে মনে মনে হিসাব করছিল যে, আর ঠিক কতক্ষণ তাকে এমনি একলা কাটাতে হবে। এমন কিছু শক্ত হিসাব নয়, একষট্টি ঘণ্টা কয়েক মিনিট মাত্র হবে। কিন্তু মিনিটের হিসাবটা আর কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছে না। অরিন্দমের কেমন জিদ চেপে গেল, যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম হিসাব তার জানা চাই-ই। তাড়াতাড়ি দাড়ি কামানো শেষ করে খবরের কাগজের কোণ থেকে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে সে পেন্সিল হাতে বসল। হিসাবটা প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় হঠাৎ কানে এল বাইরের দরজাটা কে যেন সশব্দে খুলে ফেলল। এ নিশ্চয়ই বিভূতিবাবু, অত্যন্ত বিব্রত হয়ে সে তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরোটার উপর হাত চাপা দিল। ইতিমধ্যে আগন্তুকের পদশব্দ তার ঘরের বাইরে এসে থেমেছে। কিন্তু বিভূতিবাবু ত বিনা হাঁকডাকে এমন নিঃশব্দে কখনও আসেন না! একটু আশ্চর্য্য হয়েই অরিন্দম দরজার দিকে চোখ ফেরাল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ আতঙ্কে উঠে এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দরজার উপর স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে সবিতা। পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল, নিস্পন্দ, শুধু তার চোখ দুটি থেকে কি একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি যেন ঠিকরে পড়ছে। তাকে অরিন্দম যখন শেষ দেখেছিল এখনও সে প্রায় তেমনি আছে, তফাতের মধ্যে কেবল তার সিঁথির উপর সিঁদুরের চওড়া রেখাটি রক্তাক্ত খড়্গের মত ঝক্ ঝক্ করছে।

অরিন্দম হতভম্বের মত তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। না বলল তাকে বসতে, না জিজ্ঞাসা করল তার এখানে আসবার কারণ। অথচ কারণ নিশ্চয়ই কিছু ছিল, যেহেতু অনুভা মারা যাবার পর সে আর একবারও এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ায় নি।

প্রথমে সবিতাই কথা বলল, "আপনি নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছেন?"—সমস্ত মুখে চোখে তার অপরিসীম ঘৃণা যেন ফেটে বেরুচ্ছে। অরিন্দমকে নিরুত্তর দেখে সে আবার বলল, "কথাটা তা হলে সত্যি?" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার, "কিছুদিন আগেই খবর পেয়েছিলাম, বিশ্বাস করি নি। কাল রাত্রে এখানে এসে পাকা খবর শুনলাম। তাই আজ নিজেই যাচাই করতে এসেছি। সত্যি তা হলে? আর হবেই বা না কেন? বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা দিলে তার আর এর চেয়ে কি ভাল গতি হবে?"

"আপনি আমাকে অপমান করতে এসেছেন?" এতক্ষণে অরিন্দম তবু কয়েকটা কথা উচ্চারণ করতে পারল।

"অপমান?"—ঘৃণিত হাসিতে সবিতার সারা মুখ বিকৃত হয়ে উঠল—"না, অভিনন্দন জানাতে এসেছি। অনুভার সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম যে, তার মরবার এক বছরের মধ্যে আপনি বিয়ে করবেন। সেই বাজি আমাকে জেতালেন।"

"বাজী?" কিছুই বুঝতে না পেরে অরিন্দম নির্ব্বোধের মত চেয়ে রইল।

"আপনি যে সত্যি এত ছোট তা আমি নিজেও তখন ভাবি নি। এই ঘরে আপনি ঐ বিভূতি চাটুজ্জ্যের ভাইঝিকে আনবার স্পর্দ্ধা রাখেন? এত সাহস আপনার?"—ক্রোধে, ক্ষোভে সবিতার নীচের ঠোঁটটি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

"বাড়ী বদলাবার কথা ত ভাবি নি।"—অসহায় শিশুর মত চেয়ারে বসে পড়ে অরিন্দম বলল।

সাড়ীর আড়াল থেকে ছোট্ট একখানা নীল খাতা এক ঝটকায় বের করে সবিতা বিকৃত স্বরে বলল, "মরবার আগের দিন অনুভা এই খাতাখানা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল যে, তার স্বামী যদি কোন দিন তাকে ভুলে যায় তা হলে আমি যেন এখানা তাকে ফিরিয়ে দিই। সেই তার শেষ অনুরোধটুকু রাখবার জন্যই আজ এলাম, নইলে আপনার মুখ দেখবার ইচ্ছা ছিল না। যেখানে অনুভার শরীরটাকে পুড়িয়ে ছাই করেছেন সেখানে এটাকেও পুড়িয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হোন।"—চক্ষের পলকে অরিন্দমের দিকে খাতাখানা সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

খাতাখানা একটা জলন্ত আগুনের পিণ্ডের মতই অরিন্দমের মুখের উপর এসে পড়ল। মুহূর্তের জন্য তার দৃষ্টি পড়েছিল সেখানার উপর, পরক্ষণেই দরজার দিকে চোখ তুলে সে দেখল যে সবিতা অদৃশ্য হয়েছে। ঠিক সামনেই মেঝের উপর ছোট্ট নীল খাতাখানা যদি পড়ে না থাকত তা হলে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে কোন কষ্ট হ'ত না।

মেঝে থেকে খাতাখানাকে সে যে তুলে নেবে সেটুকু সাহসও অরিন্দমের হ'ল না। বহুক্ষণ পর্যান্ত সে শুধু সে দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। শেষে অনেক দ্বিধা, অনেক সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে সে যখন দুরু দুরু বুকে খাতাটিকে কোলের উপর এনে রাখল তখন অতীতের অনেক কথাই একে একে তার মনে ভিড় জমাতে সুরু করেছে। এই খাতাখানা সে নিজেই অনুভাকে কিনে দিয়েছিল। কোন দোকান থেকে, কত দামে, তা-ও বোধ হয় একটু চেষ্টা করলে সে এখনও বলে দিতে পারে। এখানা কিনে দেবার কিছুদিন আগে থেকেই অনুভা তাকে বলেছিল একখানা খাতা এনে দেবার কথা, কিন্তু তখন তার অসুখ একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল বলে খাতা পেন্সিলের কথায় অরিন্দম বেশী কান দেয় নি। কিন্তু অবশেষে অনুভার অনুরোধ যখন অনুযোগে পরিণত হ'ল তখন এক দিন আপিস থেকে ফিরবার পথে হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে সে এই খাতাখানা কিনে এনেছিল।...আজ এত দিন পরে অনুভা সেই খাতা তাকে ফেরত পাঠিয়েছে। খাতাখানাকে কোলের উপর রেখে অরিন্দম অভিভূতের মত তার মলাটের উপর আস্তে আস্তে আঙুল বোলাতে লাগল।

মলাট ওল্টাতেই অনুভা যেন একেবারে শত মুখে কথা কয়ে উঠল। সেই তার স্বচ্ছ, সুন্দর, অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর! রোগ-শয্যায় শুয়ে কত যত্নেই না সে এই লাইনগুলি লিখেছে। পাতার পর পাতায় জুড়ে তার মনের কথা ছড়ানো। কম্পিত হাতকে যথাসম্ভব সংযত করে অরিন্দম রুদ্ধনিশ্বাসে গোড়া থেকে পড়তে লাগল। প্রথম পাতাতেই অনুভা লিখেছে—

"আমি জানি আমার এ রোগ আর সারবে না। তবু সে কথা আমি তোমাকে জানাতে পারব না কিছুতেই। এখন তুমি আপিসে বসে কত কাজ করছ, হয় ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু'একবার আমার কথাও মনে পড়ছে। হয় ত ভাবছ যে, আমার সেরে উঠতে আর ক'দিন লাগবে? কিন্তু আমার শরীরে যে দিনরাত কি হচ্ছে সে তোমাকে বোঝাব কেমন করে? বোঝাতেও চাই না, শুধু ভগবানকে ডাকছি যে, আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত যেন তোমার সামনে হাসিমুখেই কাটিয়ে যেতে পারি। আজও কিন্তু সবিতা আমায় অনেক কথা শোনাল। সে বলে, তুমি নাকি আমায় ভুলে যাবে, পুরুষ জাতটাই নাকি ঐ রকম। আমি কিন্তু চুপ করে সব শুনি আর হাসি। ভুলে যাওয়া, সে কি কখনও সম্ভব? আমি মরে গিয়েও কি কোনদিন তোমাকে সত্যি ছেড়ে যেতে পারব?"

পাতার পর পাতা অরিন্দম পড়ে যেতে লাগল। ঐ দারুণ শীতেও তার কপালের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, নিশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে মাঝে মাঝে। শুধু সেই খাতা ছেড়ে উঠবার সাধ্য অরিন্দমের নেই। মৃত্যুর ওপার থেকে অনুভা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছে।

আর এক জায়গায় অনুভা লিখেছে:

"সবিতা কিছুতেই তার গোঁ ছাড়বে না। ও নাকি যে-কোন টাকা বাজি ধরতেও রাজী। ও বলে, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই ভুলে যাবে। আমি কোন তর্ক করি না, কিন্তু ওর কথা শুনে এত দুঃখেও বেজায় হাসি পায়। ও কি করে বুঝবে আমাদের সব কথা? বোঝে না বলেই তো এমন অবুঝের মত কথা বলে। কিন্তু আমি আর বেশীদিন বাঁচব না। যতই আমার দিন ফুরিয়ে আসছে ততই যেন এগিয়ে যাচ্ছি তোমার আরও কাছে। তাই তুমি আজকাল কাছে থাক বা না থাক, কোন সময়েই তোমাকে ছাড়া থাকি না। তার পর যেদিন সত্যি আমি আর থাকব না সেদিন থেকেই হয় ত তোমাকে সবচেয়ে বেশী করে পাব।..."

বাইরের দরজায় আবার কিসের একটা শব্দ! পড়া বন্ধ করে অরিন্দম কান খাড়া করে বসল। শব্দ কিসের? বিভূতিবাবু নয় তো? বিভূতিবাবুর কথা মনে হতেই কি এক অজানা আতঙ্কে অরিন্দমের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। বিভূতিবাবুর সঙ্গে আজ সে কিছুতেই দেখা করতে পারবে না, মরে গেলেও না। কিন্তু তিনি তো যে-কোন মুহূর্ত্তেই এসে হাজির হতে পারেন। বাইরে জোর বাতাস বইছে, খুব সম্ভব তারই ঝাপটায় কড়াটা নড়ে উঠেছিল, কারণ শব্দ হওয়া সত্ত্বেও কেউ ঘরে ঢুকল না। কিন্তু এই ঘরের মধ্যেও যে সে আর টিকতে পারছে না। সমস্ত ঘরটাই যেন তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভেংচি কাটছে। সাদা দেয়ালগুলি, কোণের ঐ আলনাটি, ওধারে দুখানা চেয়ার, সামনে টেবিল, তার উপরে দাড়ি কামিয়ে রাখা খোলা ক্ষুরখানা, এমনকি কিছুক্ষণ আগে মিনিটের হিসাব কষবার ঐ কাগজের টুকরাটি পর্য্যন্ত। নাঃ, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়। এখান থেকে তাকে এখনি পালাতে হবে। তাড়াতাড়ি কোনরকমে গায়ে একটা পাঞ্জাবী চড়িয়ে, ঘর তালাবন্ধ করে অরিন্দম প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

দুপুরবেলা শহরের পথে লোকচলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু মাঝে মাঝে কনকনে হাওয়ার এক একটা ঝলক স্তব্ধ প্রহরের

ঘুরে শিহরণ তুলে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। অরিন্দমের অবশ্য সে সব দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে কেবল হনহন্ করে এগিয়েই চলেছে। অনুভার টুকরো লেখাগুলি আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত মস্তিষ্কের মধ্যে দপ দপ করছে, মনে হচ্ছে তাদের উত্তাপে বুঝি সব কিছু এখনি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। সজোরে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে অরিন্দম সোজা হাঁটতে লাগল। এমনি ভাবে সে যে কতক্ষণ হেঁটেছিল তার কোন ঠিক ছিল না, তবে হঠাৎ এক সময় তার খেয়াল হ'ল যে পা দুখানা তার যেন পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপায় নেই, পা যদি ভেঙেও যায় তা হলেও তার থামবার উপায় নেই, চিরদিন যেন তাকে এমনি করেই ঘুরে মরতে হবে। কোন এক বিরুদ্ধ ভাগ্যের কবলে সে আজ শিশুর মতই অসহায়। তার সেই অবস্থাটা কল্পনা করে নিজেরই প্রতি উচ্ছ্বসিত সহানুভূতিতে হঠাৎ অরিন্দমের সমস্ত হৃদয় ছল ছল করে উঠল। তারই ঢেউ এসে লাগল তার দু'চোখে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখের জলকে সে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলতে চলতে নিজের ভাগ্যকেই সে বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, এর হাত থেকে কি কোন ভাবেই নিষ্কৃতি নেই? এই দুঃসহ দুঃখের অবসান কি কখনও হবে না? সারাজীবন কি এভাবেই কাটবে? হে ঈশ্বর, এর সমাধান কোথায়?

কিন্তু নিষ্কৃতি পাবার সত্যি কি কোন প্রয়োজন আছে? কথাটা বিদ্যুতের মতই অরিন্দমের মনের মধ্যে ঝলসে গেল। অনুভা তো ভুলেও কোনদিন তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি চায় নি। তবে সেই তুচ্ছ নিষ্কৃতির জন্য তারই-বা কেন এই প্রাণপণ চেষ্টা? কি আশ্চর্য্য, কথাটা মনে হতেই তার মনের অস্বাভাবিক আলোড়ন অনেকটা শান্ত হয়ে এল। ঝড়ের পরে শান্তির মত সে একরকম শ্রান্ত প্রসন্নতা। বাড়ী থেকে বেরোবার পর এই প্রথম সে নিজের চারদিকে এক বার ভাল করে চেয়ে দেখবার অবকাশ পেল। সামনেই একটা পার্ক, কোন চিন্তা না করে সে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে। তার পর কোণের দিকে একটা খালি বেঞ্চ দেখে সেখানা দখল করে বসল।

তখনও ঠিক বিকেল হয় নি, কিন্তু এরই মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে জুটে বিচিত্র চীৎকারে খেলা জুড়ে দিয়েছে। তাদের সেই কলরবে কি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা। মুহূর্তের জন্য অরিন্দমের মনে পড়ল তার নিজের ছেলেবেলার কথা, সে নিজেও যখন ঠিক এমনি ভাবেই মাঠে মাঠে ছুটোছুটি করে বেড়াত। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে পড়ে গেল অনুভার কথা। সেদিন ঠিক এমনি সময়েই তার মৃত্যু হয়েছিল। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত সে মৃত্যু, বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই। তার ঠিক পরের ঘটনাগুলি অনেকটা ছায়াছবির মত তার মনে পড়ে। পাড়ার কত লোক এল, অরিন্দমের অসহায় অবস্থা দেখে তাদের মধ্যে জনকয়েক বেছে শ্মশান-সঙ্গী হবার প্রস্তাব করল —বিভূতিবাবু ছিলেন তাদের সকলের অগ্রণী। অবশ্য অরিন্দমকেও সঙ্গে যেতে হয়েছিল। সারা পথ যখনই সে চোখ তুলে চেয়েছে, দেখেছে অনুভার আলতা-পরা পা দুখানি—নিশ্চল অথচ কত দূরের যাত্রী। শ্মশানে পৌঁছে চিতাশয্যা রচিত হবার পর কত সাবধানে তারা অনুভাকে তার উপর আলগোছে শুইয়ে দিয়েছে—কখন যে তাকে ঘিরে ধীরে ধীরে বহ্নিবলয়ের সৃষ্টি হয়েছে তা অরিন্দম ঠিক বুঝতেই পারে নি। একটুকুও বিচলিত হয় নি সে, সেজন্য বিভূতিবাবু পরে তাকে রীতিমত তারিফ করেছিলেন। একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে দেখছিল—কেমন করে তিলে তিলে অনুভার দেহ আগুনের আড়ালে চলে যাচ্ছে। সেই আগুনের ছোঁয়া বুঝি লেগেছিল তার অন্তরে, তাই সে এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলতে পারে নি। অনুভার আলতা-মাখা রাঙা পা দুখানি আগুনের আভায় আরও রঙীন হয়ে উঠেছে। কত লঘু, কত স্বচ্ছন্দভাবেই না ঐ দুখানি পা তাকে এতকাল বহন করেছে। প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল অরিন্দমের এক বার ঐ দুটি পা তুলে ধরবার, পরীক্ষা করে দেখবার যে সত্যই কি তারা চিরদিনের জন্য ধোঁয়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবে? এগিয়েও গিয়েছিল বোধ হয় সে চিতার খুব কাছে, তা না হলে হঠাৎ সেই নাম-না-জানা ছেলেটি তাকে টানতে টানতে একেবারে নদীর ধারে নিয়ে আসবে কেন? কিন্তু যেখানে তারা তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল সেখান থেকে তার পর সে আর একচুও নড়ে নি। শুধু অসীম শূন্যে তাকিয়ে দেখেছিল, ঘন মেঘের অন্তরালে কেমন ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত গেল, তরল অন্ধকার ক্রমে ঘন হয়ে এল নিকষ কালো রাত্রিতে। তার পর কখন যে ওরা চিতা নিবিয়ে দিয়েছে, কখন যে সে গঙ্গাজলে অবগাহন করেছে, ঠিকমত তার কিছুই মনে নেই। শুধু মনে পড়ে অনেক রাত্রে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনিতে নিস্তব্ধ রাস্তাঘাট সচকিত করে তাদের গলির মুখে এসে ছেলের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

কিন্তু এ কি? পার্কের বেঞ্চিতে একা বসে সে কি স্বপ্ন দেখছে নাকি? কিন্তু স্বপ্নও তো নয়। সেই যে দিনটি এসেছিল সে কি অন্য কোন দিনের চেয়ে কিছু কম সত্য? বরং তার মত সত্য অরিন্দমের জীবনে আর কি আছে? অনুভাকে তো সে নিষ্কৃতি দেয় নি, তবে সে নিজেই-বা কেন তার থেকে নিষ্কৃতি চাইবে? তার জীবনের এই একটা বছর যেন একটা মস্ত ভুল, যেন তার কায়াহীন ছায়ার একটা অনর্থক সম্প্রসারণ। তার প্রকৃত সত্তা সেই রাত্রে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত এসেই থমকে রয়েছে। তার পর যা'কিছু ঘটেছে সে শুধু স্বপ্নে জাগরণ।

অনুভার মৃত্যুর অব্যবহিত পরের দিনগুলিই বা কেমন! সে শুধু কতকগুলি আশ্চর্য্য, সৃষ্টিছাড়া অনুভূতির সমষ্টিমাত্র। সমস্ত দিন ধরে অরিন্দমের কেন যেন মনে হ'ত যে আশেপাশে যা'কিছু ঘটছে সবই বুঝি একটা বিরাট ভোজবাজি, সে নিজেও তারই একটা অলীক অংশমাত্র। কতবার সে দেয়ালে মাথা ঠুকে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করেছে যে সে মরে নি, মরেছে অনুভা। তবুও এ সংশয় তার বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল যে, হয়তো অনুভাই সত্যিকার বেঁচেছে, মৃত্যু হয়েছে তার নিজেরই। যে সীমারেখা জীবন ও মৃত্যুকে

বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তার কোন দিকে প্রকৃত জাগরণ তা কে বলবে ? রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কত দিন তার মনে হয়েছে, ঐ যে রিক্সাওয়ালা রিক্সা টানছে, ঐ যে ফলওয়ালা ফলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ছুটছে, ঐ যে আপিসের বাবুরা হন্তদন্ত হয়ে আপিসের দিকে চলেছে, এ সবই বুঝি কোন গল্পে পড়া অবাস্তব ঘটনা। প্রকৃত-পক্ষে এদের কোন অস্তিত্বই নেই। অস্তিত্ব যাদের সত্যি আছে তারা তো কেউ এখানে নেই। তাদের সে শেষ দেখেছে সেই গঙ্গাতীরে, যেখানে তিলে তিলে তাদের দেহ ভস্মীভূত হয়েছে। এই ছায়ার মিছিলের মধ্যে তাদের স্থান হবে কি করে ?

মনের সেই নিদারুণ সংশয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে তখন আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভেবেছে। কি বিরাট সমস্যা, অথচ কত সহজ তার সমাধান। সে যখন কলেজের ছাত্র তখন এক দিন ঘটনাক্রমে একখানা ডাক্তারী বই তার হাতে পড়েছিল। তার মধ্যে এক জায়গায় সে দেখেছিল যে, মানুষের কণ্ঠনালীর কাছাকাছি কি একটা শিরা আছে, যা কোনভাবে একটুমাত্র ছিঁড়ে গেলেই মৃত্যু অনিবার্য। ডাক্তারী বইয়ে সেই শিরাটার নিশ্চয়ই একটা দাঁতভাঙা নাম ছিল, যদিও বহুদিন হ'ল অরিন্দম সেটা বেমালুম ভুলে গেছে। তখন কতবার সে চেষ্টা করেছে সেই শিরাটাকে খুঁজে বার করতে, নিশ্চিত হতে চেয়েছে তার সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে, বহু কষ্টে দমন করেছে শরীর থেকে সেটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার প্রবল ইচ্ছা। সেসব কথা মনে পড়তেই এই পার্কে বসেও সে যন্ত্রচালিতের মত আর একবার তার কণ্ঠনালীর চারপাশে আঙুল বুলিয়ে দেখল। কোথায় সে মারাত্মক শিরাটি লুকিয়ে আছে কে জানে ? নিশ্চয়ই এই কয়েক ইঞ্চির মধ্যেই কোথাও হবে ! কিন্তু সে যেখানেই থাক্, তাতে এখন আর তার কি ? তাড়াতাড়ি গলা থেকে হাত নামিয়ে এনে অরিন্দম আবার তার চিন্তার হারানো সূত্র খুঁজতে লাগল।

কিন্তু সেই সূত্র আর খুঁজে পাওয়া গেল না। আশপাশের ক্রমবর্দ্ধমান কোলাহল অরিন্দমকে অন্যমনস্ক করে তুলল। ইতিমধ্যে পার্কে আরও বহু ছেলের ভিড় হয়েছে, প্রবীণদের সংখ্যাও কিছু কম নয়। এতক্ষণে সে লক্ষ্য করল যে, তার বেঞ্চির বাকী অংশটুকু দুই জন অপরিচিত ভদ্রলোক কখন এসে অধিকার করে বসেছেন। তাদের দিকে নজর পড়তেই অরিন্দম হঠাৎ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল এবং ক্রমেই সেটা পরিণত হ'ল নিদারুণ বিরক্তিতে। সে আর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা পার্ক ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়ল। বহুদিন পরে সে যেন আবার ফিরে গেছে সেই দিন-গুলিতে যখন জীবনকে তার মৃত্যুর মুখোস ছাড়া অন্য কিছুই মনে হ'ত না। তার চারপাশে যা-কিছু ঘটছে সবই আবার তার কাছে নিতান্ত অর্থহীন বলে ঠেকছে। পৃথিবীর শক্ত মাটি ছাড়িয়ে সে যেন বহুদূরে কোথায় চলে এসেছে। সেই দূরত্ব থেকে এখানকার এই কোলাহল, এই ব্যস্ততা, অসহ্য মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নয়। সব জেনে শুনেও সে কি সাধ করে আবার এই জগৎজোড়া পাগলামির ফাঁদে পা দেবে ? মাটির দিকে চেয়ে হন্‌হন্ করে সে প্রায় ছুটেই পথ চলতে লাগল।

বাড়ীতে যখন সে পৌঁছল তখন সন্ধ্যার আর অল্পই বাকী। তালা খুলে ঘরে ঢুকেই তার প্রথমে মনে পড়ল বিভূতিবাবুকে। আজ সারাদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি, কে জানে হয়ত ইতিমধ্যেই তিনি অরিন্দমের খোঁজ করে গেছেন। হয়ত যে-কোন মুহূর্ত্তে আবার তাঁর আবির্ভাব হতে পারে। কথাটা মনে হতেই অরিন্দমের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। আজ সে কিছুতেই বিভূতিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দরজাটায় ভাল করে খিল এঁটে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সে আবার ফিরে গেল।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই সকলের আগে তার চোখে পড়ল সেই নীল খাতাটি—যেভাবে সে ফেলে গিয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবেই টেবিলের উপর পড়ে আছে। ওর পাতায় পাতায় অনুভার হাতছানি, কোন অজ্ঞাত অর্থের ইঙ্গিত। খাতাখানা তুলে নিয়ে অরিন্দম আবার গোড়া থেকে পড়তে সুরু করল। কিন্তু কি জানি কেন, কিছুদূর পড়েই এবার আর এ সব তেমন ভাল লাগল না। ক্লান্তভাবে খাতাখানা রেখে দিয়ে সে একবার ভাল করে ঘরের চারদিকে তাকাল। সব ঠিক তেমনি আছে। সেই চেয়ার, টেবিল, আলনা, খোলা ক্ষুরখানা, মিনিটের হিসাব করবার সেই কাগজের টুকরাটি পর্য্যন্ত। কিন্তু কিছুই আর তাকে এখন স্পর্শ করতে পারছে না। ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে সে শুধু দেয়ালের গায়ে হাত বুলোতে লাগল। এই দেয়ালে কতবার অনুভার হাতের স্পর্শ লেগেছে। এই জায়গাটাতে কতদিন সে অনুভাকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছে। ঐ জায়গায় অনুভার চুলের ফিতে ঝোলানো থাকত, একটা তৈলাক্ত দাগ পড়েছিল দেয়ালের গায়ে। সে দাগ এখন আর নেই। এখানে-ওখানে অনুভার সিঁদুরের লাল দাগ লেগেছিল কত, তাদের কোন চিহ্ন আজ কোথাও নেই। ঘরের কলি ফিরিয়ে বিভূতিবাবু অনুভার সমস্ত স্মৃতিকে নিঃশেষে লুপ্ত করেছেন। সেই মহাপাপে অরিন্দম নিজেও তাঁকে কম সাহায্য করে নি।

অরিন্দম এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। এই ঘরে, এইখানে বসে অনুভা কত রান্না রেঁধেছে তার জন্য। সামান্যই হয়ত সে সব আয়োজন, তবু কি গভীর স্নেহসুধায় সিঞ্চিত। একটু চেষ্টা করলেই যেন এখনো স্পষ্ট দেখা যায়, পিঠের উপর ঘন এলোচুল ছড়িয়ে অনুভা একমনে রান্না করছে। কলি ফিরিয়ে ঘরের রং না হয় নষ্ট হয়েছে, কিন্তু অনুভাকে কি সত্যি ঘরছাড়া করতে পেরেছে তারা ? তার আত্মা যে এখনো এর দেয়ালে, মেঝেয়, সর্ব্বত্র হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। বিভূতিবাবুর বধির কানে সে শব্দ কি এ জন্মেও কোনদিন পৌঁছবে ?

সবই যেন কি রকম বিশৃঙ্খল, এলোমেলো হয়ে আসছে। স্বপ্ন-পাওয়া মানুষের মত অরিন্দম দেয়াল ধরে ধরে কিসের খোঁজে

হাতড়ে বেড়াতে লাগল। সবই আছে—নাগালের মধ্যেই আছে—কিন্তু কোথায় যে কি একটা দুরতিক্রম্য বাধা রয়ে গেছে যেজন্য কিছুই ধরা-ছোঁয়া যাচ্ছে না। সেই যে ধোঁয়ার আড়ালে অনুভা অদৃশ্য হয়ে গেল, সেই আড়ালটাই বা কোথায়? সেটাকে যদি কোনরকমে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলা যেত তা হলেই বুঝি আর কোন বাধা থাকত না। অনুভা নিশ্চয়ই তার পিঠময় কালো চুল এলিয়ে আবার এসে বসত ঠিক এইখানেই। সেই আড়ালটাতেই ত অরিন্দম তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ও আবার কি? ও কিসের শব্দ? সেই নাম-না-জানা ছেলেটি নয়ত? আবার হয়ত অরিন্দমকে জোর করে এখান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবে। এবারেও যদি অরিন্দম মুখ বুজে নিজেকে তার হাতে সঁপে দেয় তবে সে কি আর কখনো অনুভাকে খুঁজে পাবে? হাঁ, ঐ যে শব্দ! অরিন্দম থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল। কি সর্বনাশ! এ যে বিভূতিবাবু! ঐ ত তিনি বেদম জোরে কড়া নাড়ছেন আর উচ্চৈঃস্বরে তারই নাম ধরে ডাকছেন। হায় হায়, আবার কি তাকে ঐ বিভূতিবাবুর পাল্লায় পড়তে হবে নাকি? না, সে কিছুতেই হবে না, হতে পারে না। ঐ যে আবার কড়ানাড়ার শব্দ। এবার দ্বিগুণ জোরে। আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। কিন্তু কি করবে সে? সেই যে আড়ালটা, সেটাই ত যত বাধা হয়ে রয়েছে। সেটাকে ত কিছুতেই পার হওয়া যাচ্ছে না।

বাইরে বিভূতিবাবুর চীৎকার শোনা যাচ্ছে, "তোমার এ কি হ'ল অরিন্দম? দরজা খোল শীগগির।" কিন্তু দরজা সে কিছুতেই খুলবে না, তার আগে নিজেই সে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সেই গুপ্ত দরজাটা কোথায়? সেই যে বাধাটা—সে কি কিছুতেই হদিস পাবে না? নিষ্ফল আক্রোশে অরিন্দম এবার দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

আবার বিভূতিবাবুর চীৎকার, "আমরা আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব। ভাল চাও ত এখনো দরজা খোল অরিন্দম, নইলে দরজা ভেঙেই ঢুকব।"···আমরা? তা হলে হয়ত আরও কেউ এসে তাঁর সঙ্গে জুটেছে। দরজার বাইরে খুব একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছে বটে। ওদিকে ওরা সবাই, আর এদিকে একা অনুভা। কিন্তু অনুভা যে একাই একশ'।

হঠাৎ একটা দারুণ ঠাণ্ডায় অরিন্দমের সারা শরীর সিরসির করে উঠল। আবার বুঝি হাওয়া দিয়েছে গঙ্গার ওপার থেকে, ঐ ত সেই আড়ালটা যেন একটু একটু করে কাঁপছে, ঐ ত সে আবার দেখতে পাচ্ছে অনুভাকে। কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে তাকে! পরনে তার রাঙা চেলী, কপালে সিঁদুরের উজ্জ্বল টিপ, দু'পা আলতায় রাঙানো। সে তার এত কাছে তবু অরিন্দম তাকে বুকে টেনে নিতে পারছে না কেন? কিন্তু তাকে যে পারতেই হবে, এ সুযোগ আর কিছুতেই হারানো চলবে না। পাগলের মত এবার সামনের দিকে এগোতে গিয়েই অরিন্দম যেন কিসের সঙ্গে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, প্রায় অনুভার পায়ের উপর। তাকে সে একটু ছুঁয়েও ফেলেছিল বুঝি, কারণ কি এক অনির্বচনীয় স্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে তার মনের সমস্ত ঘোর কেটে গেল। এই ত মনে পড়েছে···এই ত সে খুঁজে পেয়েছে—বাধা এইখানে, এই গলার কাছে। তার নামটা—কিন্তু কি হবে তার নাম দিয়ে—তাকে যে সে খুঁজে পেয়েছে এ-ই যথেষ্ট। কি আশ্চর্য, এত কাছের এই বাধাটার কথা এতক্ষণ তার খেয়াল হয় নি?

বাইরের দরজায় দমাদম শব্দ। ওরা তা হলে সত্যি দরজা ভাঙতে সুরু করেছে। কিন্তু অরিন্দমের আর কিসের ভয়? কাঁপতে কাঁপতে সে এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। চোখে পড়ল, সকাল-বেলা দাড়ি কামিয়ে রাখা খোলা ক্ষুরখানা। তার চকচকে ফলাটা থেকে ঘরের আলো যেন শতমুখে ঠিকরে পড়ছে। চোরের মত চুপি চুপি অরিন্দম সেখানা তুলে নিল। তারপরেই প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরল তার বাঁটটা···।

সেদিন সন্ধ্যায় কি দুরন্ত শীত! কণ্ঠনালীর উপর তীক্ষ্ণ ইস্পাতের স্পর্শ যেন বরফের মত ঠাণ্ডা···।

ইটালীতে ছাত্র ও শিশু-কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা
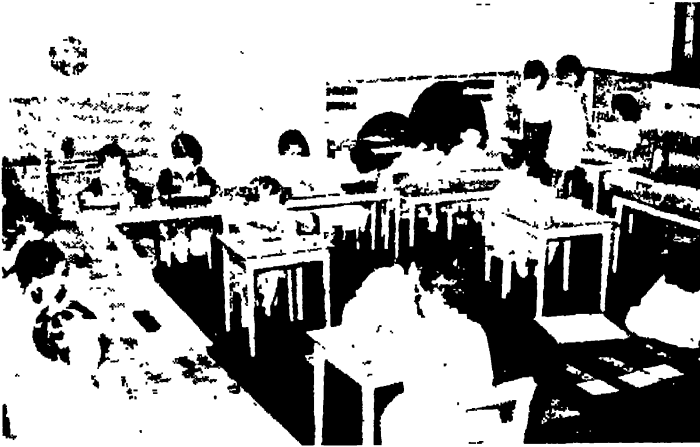
মণ্টেসরি পদ্ধতি অনুযায়ী শিশুদের ক্রীড়া
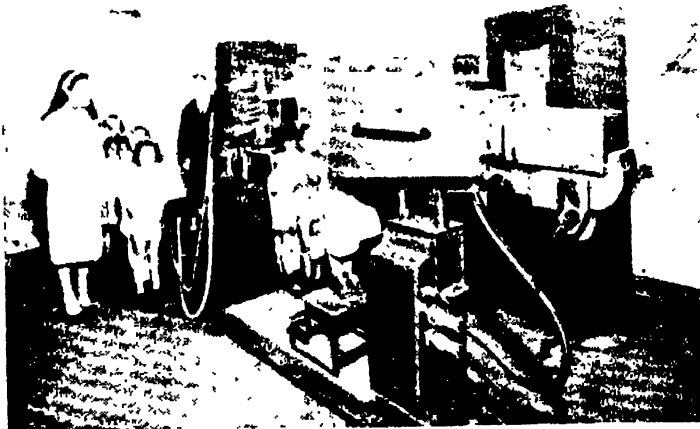
রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে শিশুদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইটালীতে নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে, কিন্তু সেগুলি এই দেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। সুষ্ঠু ভাবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিয়া বর্ত্তমান ইটালী ধীরে ধীরে প্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

বিদ্যালয়-গৃহের সংখ্যাল্পতা যুদ্ধোত্তর ইটালীর গুরুতম সমস্যাসমূহের মধ্যে একটি। ইহার সমাধানকল্পে ১৯৪৬-৫৩ সনের মধ্যে ৬০,০০০-এর উপর ক্লাস-রুম মেরামত অথবা পুনর্নির্ম্মিত করা হইয়াছে এবং আরও ১০,০০০টি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। একটি দশ-বার্ষিকী বিদ্যালয় গৃহনির্ম্মাণ-পরিকল্পনাকে অর্থসাহায্য প্রদানমূলক আইন এখন আলোচনাধীন আছে। আশা করা যায় যে, এই পরিকল্পনা গৃহীত হইলে চূড়ান্তরূপে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হইবে। ইহার কর্ম্মপদ্ধতি অনুসৃত হইলে অবশেষে ক্লাসরুমসমূহে ছাত্রছাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় কমিবে।

ইটালীর যোগ্য কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত আইন সম্বন্ধে আলোচনাদিতে ব্যাপৃত আছেন। দশ বৎসরের অধিককালের জন্য স্কুলগৃহ নির্ম্মাণের সপক্ষে অবলম্বনীয় বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ এই আইনের অন্তর্ভুক্ত।

শিশুরাই যে জাতির ভবিষ্যৎ একথা বর্ত্তমান ইটালী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে এবং সেখানে শিশুকল্যাণমূলক বিবিধ কর্ম্মপ্রচেষ্টা সাফল্যের সহিত অনুসৃত হইয়া

চলিয়াছে। শিশুরা যাহাতে নীরোগ দেহে সুস্থ মন লইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে সেজন্য সেখানে শিশুদের শরীরচর্চার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছে।

মানুষের জীবনের প্রাথমিক অত্যাবশ্যক বস্তুসমূহের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছিল, সেগুলি আজ সামাজিক নিরাপত্তার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শিশু এবং তরুণদের সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত—দরিদ্র শিশুদের গ্রীষ্মকালীন শিবিরসমূহ—যেগুলিতে ১৯৪৭-৫৩ সনের মধ্যে প্রায় ৫০,০০,০০০ শিশু স্থান পাইয়াছে। নিয়মিত ভাবে শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিশু-মঙ্গল কার্য্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই পরীক্ষার ফলে শিশুর স্বাস্থ্যে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়।

ইটালীর মিলান প্রদেশের একটি প্রতিষ্ঠানে শিশুদের প্রাভাতিক ব্যায়াম

ইটালীতে শিশুদের জন্য উদ্ভাবিত নব নব পদ্ধতির খেলাধুলার উপরেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল শিশুরা বিচিত্র ক্রীড়া-কৌতুকের ভিতর দিয়া জীবনানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের প্রাণচাঞ্চল্য জাতির মনে নবীন আশার সঞ্চার করে।

ইটালীতে জীবন্ত শতরঞ্চ খেলা

ভারতের মোগল যুগের রাজা-বাদশাহদের বিচিত্র খেয়ালের কথা সর্ব্বজনবিদিত। তখন দিল্লী ও আগ্রায় বাদশাহ এবং প্রধান বেগম অন্যান্য বেগম ও বাঁদীদিগকে সাজপোশাক পরাইয়া—জীবন্ত মানুষকে দাবার ঘুঁটি করিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে শতরঞ্চ খেলিতেন। দিল্লী ও আগ্রা দুর্গে তাহাদের সেই জীবন্ত শতরঞ্চ ক্রীড়ার ছক আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

পালের্মো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রছাত্রী
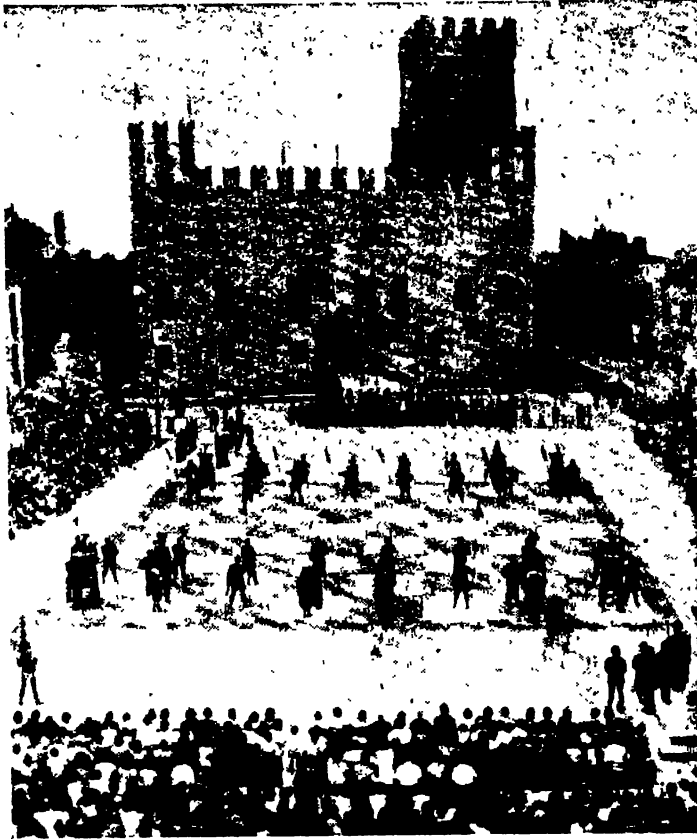
ইটালীতে আজও পর্য্যন্ত এই জীবন্ত শতরঞ্চ খেলার প্রচলন আছে। প্রতি বৎসর ভিসেন্‌জা প্রদেশের মারোস্তিকাতে যে খেলা হইয়া থাকে তাহাতে দাবার ঘুঁটির স্থান অধিকার করে মানুষেরা। পর্যটকদের নিকট এই অভিনব ক্রীড়া একটি মস্ত বড় আকর্ষণ।

মারোস্তিকা ছিল মধ্যযুগের ইটালীর একটি ছোট কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নগর এবং সেখানে এই অ-সাধারণ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। যত দূর জানা যায়, ভেনিসিয়ান রিপাব্লিকের চূড়ান্ত ক্ষমতার সময়ে পুনরায় আর একবার ইহার রেওয়াজ হয় এবং ঐ বৎসরে যে সকল ব্যক্তি দাবার ঘুঁটি রূপে ক্রীড়ায় যোগ দেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন: কামিয়ো পিলোত্তো আন্তে নিক্কি এবং প্রায় ২০০ জন অতিরিক্ত (Extras) খেলোয়াড় —সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত।

ভিসেন্‌জা প্রদেশের মারোস্তিকাতে জীবন্ত শতরঞ্চ খেলা

খেলায় অংশগ্রহণকারীদের দুর্গত্যাগ

আমাদের আয়, ব্যয় ও অপব্যয়

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমরা আজকাল যে দারুণ অর্থসঙ্কটে পতিত হইয়াছি, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ ভদ্রলোকেরা কিরূপে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। যাঁহার মাসিক আয় এক শত টাকা, অন্ততঃ দুই শত টাকা না হইলে তাঁহার পক্ষে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। এই যে আর্থিক সঙ্কট, এ সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন যাঁহারা চাকরিজীবী, অর্থাৎ যাহারা ইচ্ছা করিলেই নিজের আয় বাড়াইতে পারেন না। দশ টাকা আয় বাড়াইতে হইলে যাহাদিগকে প্রভুর, অর্থাৎ বেতনদাতার করুণার উপর নির্ভর করিতে হয়। শ্রমিক, কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা এই অর্থাভাবে কাতর হন নাই। তাঁহারা দেশের অবস্থা দেখিয়া অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরাই নিজেদের আয় বাড়াইয়া লইয়াছেন।

আমরা এই অর্থসঙ্কট সম্বন্ধে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমার নিজের বাড়ীতে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ এবং পুরাতন জীর্ণ গৃহের সংস্কারের জন্য কয়েক মাস ধরিয়া রাজমিস্ত্রী ও ছুতার মিস্ত্রী লাগাইতে হইয়াছিল। তখন তাহাদিগকে যে পারিশ্রমিক দিয়াছিলাম, তাহা এইরূপ :—রাজমিস্ত্রীর দৈনিক পারিশ্রমিক ।০, রাজ ।৵০ এবং মজুরি পুরুষের ।০ আনা এবং স্ত্রীলোকের ৶০ আনা। ছুতার মিস্ত্রী ।০, সহকারী ।০ ; সম্প্রতি অর্থাৎ গত পৌষ মাসে বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, কয়েকটা কাঠের দ্রব্য মেরামত করিবার জন্য একজন ছুতার মিস্ত্রী লাগাইলে ভাল হয়। আমার এক প্রতিবেশীর গৃহে রাজমিস্ত্রীর ও ছুতার মিস্ত্রীর কাজ হইতেছিল। আমি এক দিন তাহাদের পারিশ্রমিকের কথা জিজ্ঞাসা করায় ছুতার মিস্ত্রী বলিল, তাহার রোজ ৩।০, রাজমিস্ত্রীও বলিল, তাহার রোজ ৩।০। আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রোজ এত বাড়াইয়াছ কেন, বাপু ?" তাহারা উত্তর করিল, "বাজারদরটা কি রকম একবার ভেবে দেখুন। আমার বাবা যখন আপনার বাড়ীতে কাজ করিয়াছিল, তখন চাউলের দর ছিল তিন টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা। সরিষার তেল /১ সের ।০, আর এখনকার দর দেখুন দেখি। এক সের চাউল ।৵০ বা ৸০, সরষের তেল ১৷০ থেকে ২৲। সুতরাং আমাদের রোজ ।০ থেকে ৩।০ না করিলে আমরা পাইব কি ?" মিস্ত্রী সত্য কথাই বলিয়াছিল। আমাদের ব্যবহার্য্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রের মূল্য যখন আট-দশ গুণ বাড়িয়াছে, তখন তাহাদের পারিশ্রমিক অন্ততঃ সাত গুণ না বাড়াইলে তাহাদেরই বা চলিবে কি করিয়া ? মিস্ত্রীরা ত অন্যায় কথা বলে নাই !

আমার প্রথম যৌবনে আমি কলিকাতা আসিয়া যে কাপড়-চোপড় কিনিতাম, অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে যখন অবাধে মানচেষ্টারের কাপড়, জার্ম্মানীর র‍্যাপার ও জাপানের মোজা কিনিতাম, তখন এক জোড়া লাটু মার্কা বিলাতী কাপড়ের দর ছিল ১৷৶০, জার্ম্মানীর র‍্যাপার একখানা ৩।০ হইতে ৫৲, আর জাপানী উল্‌টপ মোজা ।৵০ জোড়া। আর সে দিন—মাসতিনেক পূর্ব্বে একখানা গামছা কিনিলাম ১৶০ দামে। অর্থাৎ, যে মূল্যে পূর্ব্বে এক জোড়া লাটু মার্কা ধুতি কিনিয়াছি, এখন সেই মূল্যে একখানা গামছা কিনিতে হইতেছে, সুতরাং যাহাদের হাতে আয় বাড়াইবার ক্ষমতা আছে, তাহারা তাহাদের পারিশ্রমিক বাড়াইবে না কেন ? আমাদের বাড়ীতে বাগান এবং গোয়ালের কাজ করিবার জন্য যে ভৃত্য ছিল, তাহার মাসিক বেতন ৩।০ এবং দুই বেলা আহার্য্য পাইত। ইহার উপর ছিল বৎসরে দুইখানা ধুতি, আর দুইখানা গামছা। আর এখন ! চাকরকে যদি অন্ন দিতে না হয়, তাহা হইলে মাসিক ৩০৲ টাকার কমে কোন লোকই আমার কাছে চাকরি স্বীকার করিবে না। এখানে আর একটা কথা বলি। দুগ্ধ প্রত্যেক বাঙালীর সংসারে অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। যাহাদের বাড়ীতে শিশু, বালক-বালিকা, রোগী বা বৃদ্ধ আছে, তাহাদের দুধ না হইলে চলে না। কলিকাতায় আজকাল দুধের দাম এক সের ১৲ ; এবার বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, এক টাকায় /১। পোয়া দরে দুগ্ধ কেনা হইতেছে। আমাদের বাড়ীতে কখনও দুধ কেনা হইত না। আমার যত দূর মনে পড়ে, আমরা আশৈশব বাড়ীর গরুর দুধ খাইয়াই মানুষ হইয়াছি। আমার পিতা কর্ম্মোপলক্ষে যখন বিদেশে থাকিতেন, তখনও আমাদের বাসাতে গরু থাকিত। আমার মনে পড়ে, বাল্যকালে আমাদের বাসস্থান চন্দননগরে এক টাকায় এগার সের দুগ্ধ বিক্রয় হইত। তখন দুধের ক্রেতা কোথায় ? সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই গরু, দুধ কিনিবে কে ? যাহাদের গরু ছিল না, তাহারাই দুগ্ধ কিনিত। সে সময়ে আর একটা প্রথা ছিল ; তাহার নাম "দুগ্ধ গচ্ছিত রাখা"। আমাদের বাড়ীতে সাধারণতঃ দুই-তিনটা করিয়া গরু থাকিত। গড়ে প্রত্যেক গাভীর দৈনিক তিন সের, সাড়ে তিন সের দুগ্ধ হইত। যদি একসঙ্গে দুই-তিনটা গাভী প্রসব হইত, তাহা হইলে প্রত্যহ ৮।১০ সের দুগ্ধ হইত। কিন্তু আমাদের তত দুগ্ধের প্রয়োজন ছিল না। আমাদের যে প্রতিবেশীর বাড়ীতে দুগ্ধ কম হইত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুগ্ধটা তাহারা লইয়া যাইত। ইহার কোন মূল্য ছিল না। আমরা আবার যখন দুগ্ধাভাবে প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হইতাম, তখন তাহারা সেই গচ্ছিত দুগ্ধ ঋণ-পরিশোধ হিসাবে আমাদিগকে দিত। এইজন্য প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে কখনও দুগ্ধের অভাব হইত না। আমার জননী বাড়ীতে দুধের সর তুলিয়া তাহা হইতে মাখন ও ঘৃত প্রস্তুত করিতেন। আমরা কখনও গব্য

ঘৃত কিনিয়া খাই নাই। আজকাল আমাদের বাড়ীতে আর গরু নাই। সুতরাং ভাতের সঙ্গে খাইবার জন্য সাত টাকা বা আট টাকা সের দরে ভেজাল গব্য ঘৃত কিনিতে হইতেছে। আজকাল আমাদের প্রতিবেশীদের বাড়ীতে আমাদের ন্যায় অনেকেরই গোয়াল শূন্য। প্রায় সকলকেই দুগ্ধ কিনিয়া খাইতে হয়। সে দুগ্ধ পান করিবার সময় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে উহা জলমিশ্রিত দুগ্ধ নহে, উহা "দুগ্ধ মিশ্রিত জল"। আমরা বাল্যকাল হইতে বাড়ীর খাঁটি দুগ্ধ খাইয়া আসিয়াছি বলিয়া এখন এই অষ্টাশি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চলাফেরা করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমাদের পৌত্র-প্রপৌত্রেরা কত বৎসর পরমায়ু পাইবে? অথবা পঞ্চাশ বৎসর বয়সেই কি সংসারের ভারস্বরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে না?

আমাদের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "আয়ুর্বৈ হবিঃ"। হবি অর্থাৎ গব্য ঘৃতই পরমায়ু। আজকাল অনেককেই বাধ্য হইয়া হবিষ্য করিতে হয়, কিন্তু আমার মনে হয়, কথাটাকে হবিষ্যান্ন না বলিয়া "দালদান্ন" বলিলেই শোভা পায়। দেশে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ত দূরের কথা, ধর্ম্মরক্ষার জন্যও দালদা দিয়া হোম করিতে হয়। সুতরাং আমাদের বংশধরগণের, অর্থাৎ পৌত্র, প্রপৌত্রাদির পরমায়ু যে সুদীর্ঘ হইবে না তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

কৃষক শ্রমিক ও ভৃত্য প্রভৃতি যখন অভাবপূরণের জন্য আয় বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে, তখন উকিল, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার আয় না বাড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন কেন? আমরা দেখিয়াছি, চন্দননগরে পাস করা ডাক্তারদের ভিজিট ছিল দুই টাকা, আর 'নেটিভ' ডাক্তারের ভিজিট ছিল এক টাকা। তাঁহারা হয়ত উদারতা-বশতঃই যথাক্রমে ষোল টাকা ও আট টাকা ভিজিট করেন নাই। মাত্র দ্বিগুণ বাড়াইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কবিরাজেরাও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন কেন? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরে একটি আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে কলিকাতা হইতে একজন খ্যাতনামা কবিরাজ সভাপতি রূপে গমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কলিকাতার কবিরাজেরা ডাক্তারদের দেখাদেখি ভিজিটের মাত্রা চার গুণ এমন কি ষোল গুণ পর্য্যন্ত বাড়াইয়াছেন। কবিরাজদের পক্ষে এই অর্থলোভ সংবরণ করা কি উচিত নহে? তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, ডাক্তারদের মত কবিরাজেরাও ব্যবসায়ী। কেহ তাঁহাদিগকে যাচিয়া টাকা দিলে তাঁহারা লইবেন না কেন? তিনি বলিলেন যে, যখন তাঁহার ভিজিট চারি টাকা ছিল তখন দৈনিক মাত্র চার-পাঁচটা বাড়ী হইতে তাঁহার "ডাক" হইত। যেই তিনি ভিজিট আট টাকা করিলেন, অমনি তাঁহার দৈনিক "ডাক" আট-দশটা হইতে লাগিল। এখন তিনি ষোল টাকা করিয়া ভিজিট লন। আজকাল তাঁহার "ডাক" এত বাড়িয়াছে যে, তিনি বাড়ীতে আহার করিবার সময় পান না। তাঁহার স্বজাতীয় কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রোগী দেখিতে গিয়া মধ্যাহ্নভোজনটা সেই রোগীর গৃহেই শেষ করিতে বাধ্য হন।

কলিকাতার ধনগর্ব্বিত লোকেদের ধারণা, যে ডাক্তার বা কবিরাজের ভিজিট যত বেশী, তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যও তত অধিক বাড়িয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার কোন বন্ধুর একটি ছয় মাস বয়স্কা পৌত্রীর প্রবল জ্বর হওয়ায় আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, একজন ভাল হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ডাকিলে হয় না? তিনি তাহাতে সম্মত হইলে আমি আমার সুপরিচিত একজন চিকিৎসকের নাম করিয়া বলিলাম, "ঐ ডাক্তারবাবুর একটি ছেলে আজ পাঁচ-ছয় বৎসর হইল এম-বি পাস করিয়া এলোপ্যাথির পরিবর্ত্তে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেছে। আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি সেই যুবক হোমিওপ্যাথকে আনিতে পারি।" আমি সেই ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া হোমিওপ্যাথের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অমুকবাবুর পৌত্রীর প্রবল জ্বর হইয়াছে দেখিলাম। আপনার পুত্রকে একবার পাঠাইলে ভাল হয়।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমার ছেলের ভিজিট আট টাকা। অমুকবাবু তাহা দিতে পারিবেন কি?" শুনিয়া আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। কয়েক ঘণ্টা পরে আমি আমার প্রথমোক্ত বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া শুনিলাম যে, সেই শিশুর সুশিক্ষিতা জননী নিজেই কন্যাকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়াছেন এবং তাহাতেই শিশুটির জ্বর কিছু কমিয়াছে। তাঁহাদের বাড়ীতেও একখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পুস্তক এবং এক বাক্স হোমিওপ্যাথি ঔষধ আছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি বলিলে বুঝিতে হইবে যে, টাকার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। টাকার এই মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি বেশ বুঝিতে পারা যায়, বিদেশীয় স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের সহিত তুলনা করিলে। আমরা বাল্যকালে যখন স্কুলে পড়িতাম তখন জানিতাম, ইংলণ্ডের এক ষ্টার্লিং বা পাউণ্ডের মূল্য দশ টাকা, আর শিলিঙের মূল্য আট আনা মাত্র। ইহার অনেক দিন পরে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া হইল পনর টাকা এবং শিলিঙের মূল্য হইল বার আনা। আর আজকাল পাউণ্ডের মূল্য হইয়াছে ৬০৲ টাকা। আমাদের ভারতে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা বা মোহরের মূল্য ছিল ষোল টাকা হইতে সতর টাকা। আমরা শুনিতাম হাইকোর্টের উকিল ব্যারিষ্টারেরা তাঁহাদের পারিশ্রমিক মোহর হিসাবে লইতেন, অর্থাৎ সেকালের উকিল ব্যারিষ্টারেরা তাঁহাদের মক্কেলের নিকট হইতে তিন মোহর বা চারি মোহর হিসাবে দৈনিক পারিশ্রমিক লইতেন। এখন আর সেরূপ মোহরের কথা শুনিতে পাই না। দেশীয় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ টাকার ক্রয়শক্তির হ্রাস। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে যে কৃষক এক মণ চাউল লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত, সে সেই এক মণ চাউলের পরিবর্ত্তে তিন টাকা হইতে চারি টাকা পর্য্যন্ত মূল্য পাইত। এখন সে সেই এক মণ চাউল বাজারে লইয়া গিয়া তাঁহার মূল্য-স্বরূপ কুড়ি-বাইশ টাকা পাইয়া থাকে। চাউলের যে অভাব হইয়াছে, তাহা নহে, টাকার ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাঁহারা বাজারের অবস্থা দেখিয়া নিজ

নিজ আয় বাড়াইয়া লইয়াছেন ; অর্থাৎ যাঁহারা স্বাধীন বা ব্যবসায়ী, তাঁহারা নিজেদের আয় বাড়াইয়াছেন, কিন্তু যাঁহাদের সে স্বাধীনতা নাই, তাঁহারাই অর্থাৎ ছোট-বড় কেরাণী এবং শিক্ষকের দল বিপদে পড়িয়াছেন। দ্রব্যাদির মূল্য ছয়-সাত গুণ বৃদ্ধি পাইলেও তাঁহাদের আয় ছয়-সাত গুণ বাড়ে নাই। কোন কোন বিভাগে কর্ম্মচারীদিগকে মাগগিভাতা হিসাবে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা বেতনের তুলনায় অতি নগণ্য।

গবর্ণমেণ্ট আপিসে যাঁহাদিগের মাসিক বেতন হাজার টাকার উপর, তাঁহারা মাগগিভাতা পাইবেন না। হাজার টাকা বেতনওয়ালারা মাগগিভাতা হিসাবে মাসিক ১৭৫৲ টাকা পাইতেন, কিন্তু তাঁহার বেতন যদি বৃদ্ধি পাইয়া ১১০০৲ টাকা হয় তাহা হইলে তাঁহার মাগগিভাতা বন্ধ হইয়া যায়। আমার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পুত্র কোন সরকারী বিভাগে হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বেতন ও মাগগি ভাতা হিসাবে মোটের উপর ১১৭৫৲ টাকা করিয়া পাইতেন। গত জানুয়ারী মাসে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি পাইয়া ১১০০৲ টাকা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাগগি ভাতাও বন্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ মোটের উপর তাঁহার মাসিক ৭৫৲ টাকা হিসাবে লোকসান হইল। তবে এ কথা ঠিক যে যাঁহারা সাত-আটশ' বা হাজার টাকা মাসিক বেতন পান, তাঁহাদের মাসিক ১০,১৫৲ টাকা আয় কমিয়া গেলেও অর্থসঙ্কটে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয় না। বিপদ হইয়াছে অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের। পূর্ব্বে সস্তাগণ্ডার বাজারে তাঁহাদের সাংসারিক ব্যয় যেরূপ ছিল তাহাতে তাঁহারা কোনরূপে আপনাদের পদমর্য্যাদা বজায় রাখিতে পারিতেন। কিন্তু টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় তাঁহারাই বিপদে পড়িয়াছেন।

এইবার আমাদের অপব্যয় সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "many farthings make a pound" এই ভাবব্যঞ্জক বাংলাতেও একটা প্রবচন আছে, "তিল কুড়িয়ে তাল হয়।" আমি সেই "তিল" হইতে আরম্ভ করিয়া "তালের" দিকে অগ্রসর হইব। আমাদের কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে, অর্থাৎ এখনকার পঁচাত্তর বা আশি বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন ছয় পয়সা হইতে দশ পয়সা পর্য্যন্ত এক দিস্তা ফুলস্কাপ কাগজের দাম ছিল। আর এখন সেই কাগজের দাম হইয়াছে, এক দিস্তা ছয় আনা, অর্থাৎ কাগজের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা সেই সস্তার বাজারে কাগজ কিনিয়াও তাহার ভগ্নাংশ মাত্রও কখনও অপব্যয় করিতাম না। হস্তাক্ষরের উন্নতির জন্য আমরা কাগজে মক্‌শ্ করিতাম। কিন্তু এখনকার ছাত্রেরা অর্থাৎ কিশোর ও যুবকেরা বোধ হয় "মক্‌শ" কথার অর্থই জানে না। মক্‌শ কথার মানে লেখার উপরে আবার লেখা। সেকালে সকল স্কুলেই ছাত্রদের হস্তাক্ষরের প্রতি শিক্ষকদের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাঁহারা প্রত্যেক ছাত্রকে হস্তাক্ষরের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রত্যেক ছাত্রেরই হস্তাক্ষরের জন্য একখানি করিয়া বাংলা বা ইংরেজী খাতা থাকিত। শিক্ষকেরা পাঠ্য পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র বাড়ীতে লিখিবার জন্য নির্দ্দেশ দিতেন। ছাত্রেরা নির্দ্দিষ্ট অংশ খাতায় লিখিয়া পরদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে শিক্ষক মহাশয় লেখার তারতম্য বিচার করিয়া প্রত্যেক লেখার জন্য নম্বর দিতেন। আর সে হস্তাক্ষর ছোট ছোট অক্ষর নহে; এক একটা অক্ষর প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ও তদনুরূপ প্রস্থ হইত। অর্থাৎ এখনকার ছাপাখানার ভাষায় যাহাকে "ডবল গ্রেট" বলে, সে অক্ষরগুলা তাহা অপেক্ষাও বৃহৎ হইত। ছাত্রদের হস্তাক্ষরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের লিখিত অক্ষরও ক্রমে ছোট হইত। আমরা যখন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে পড়িতাম তখন সেখানের থার্ড ক্লাস (এখনকার Class VIII) পর্য্যন্ত আমাদিগকে এইরূপ হস্তাক্ষর লিখিতে হইত। ইহা ত ছিল স্কুলের লেখা। কিন্তু বাড়ীতে আমাদের অভিভাবকেরা সেই লেখার উপরে খাতাখানা উল্টাইয়া ধরিয়া আবার লিখিতে বলিতেন। ইহারই নাম 'মক্‌শ করা' বা লেখার উপর লেখা। এইরূপে এক পৃষ্ঠাতে চার পাঁচ বার লেখা হইত। ফলে এই দাঁড়াইত যে মক্‌শ-করা পৃষ্ঠা আগাগোড়া মসীলিপ্ত হইয়া যাইত। এইরূপে মক্‌শ-করা পৃষ্ঠায় যখন আর তিলধারণের স্থান থাকিত না, তখন আমরা দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় হস্তক্ষেপ করিতাম। বারংবার এইরূপ লেখায় আমরা অতি দ্রুতগতিতে লিখিতে পারিতাম।

"আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি যে, সেকালের গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রথমে তালপত্রে, তাহার পর কদলীপত্রে এবং শেষে কাগজে লিখিবার প্রথা ছিল। বাংলা লেখা লিখিবার জন্য প্রধানতঃ কঞ্চি, শর, এবং খাগড়ার লেখনী বা কলম ব্যবহৃত হইত। সেজন্য ষ্টীল পেন্ নিব বা পেন্সিল কিনিতে হইত না। আমরাই আমাদের লেখনী বাঁশঝাড় বা শরবন হইতে সংগ্রহ করিতাম। ইংরেজী লিখিবার জন্য হংসপুচ্ছ ও ময়ূরপুচ্ছের লেখনী ব্যবহার করিতাম। তখন আর একটা নিয়ম ছিল, স্কুলে থার্ড ক্লাস, এমনকি সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত আমরা অঙ্ক কষিবার জন্য এবং শ্রুতিলিখনের জন্য স্কুলে শ্লেট ও পেন্সিল লইয়া যাইতাম। এজন্য আমাদের অভিভাবকদিগকে কাগজ ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে হইত না। প্রত্যেক ছাত্রই স্কুলে যাইবার সময় শ্লেট ও পেন্সিল পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে লইয়া যাইত। কলিকাতায় আমার বাসার নিকটে অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। প্রত্যহ শত শত ছাত্রকে আমার বাসার সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখি। কিন্তু কোন ছাত্রকেই শ্লেট লইয়া যাইতে দেখি না।

অভিভাবকদিগের উপেক্ষার জন্য কত কাগজ যে অপব্যয়িত হয়, তাহার শেষ নাই। আমারই পৌত্র বা পৌত্রীরা বিদ্যালয়ে যে খাতায় অঙ্ক কষে, তাহার প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই দেখিতে পাই, এক পৃষ্ঠায় হয়ত একটা অঙ্ক কষিয়া সে পৃষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়াছে, অথচ সেই পৃষ্ঠাতে আরও ৪।৫টি অঙ্ক কষিবার স্থান যথেষ্ট আছে।
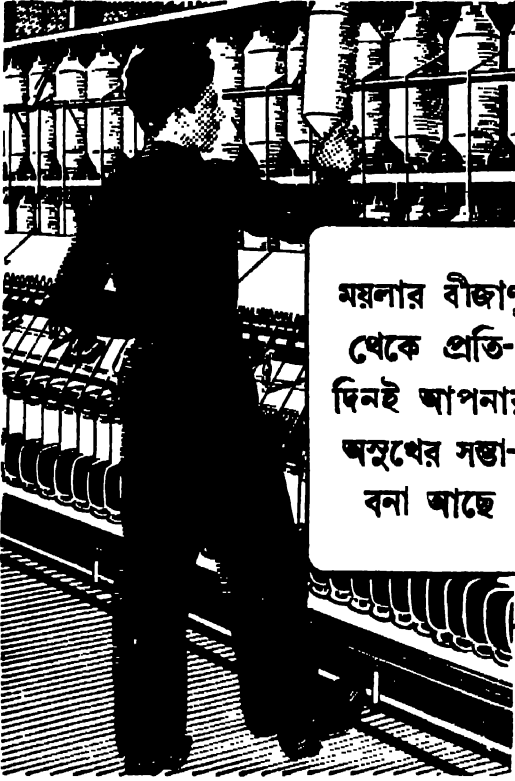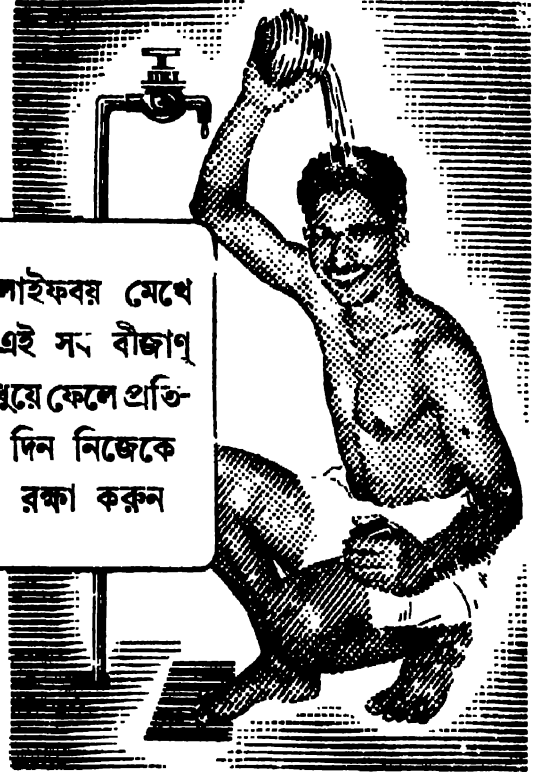
লাইফবয়ের
"রক্ষাকারী
ফেনা" আপ-
নার স্বাস্থ্যকে
নিরাপদে রাখে

লা ই ফ ব য়
সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 250-X52 BG
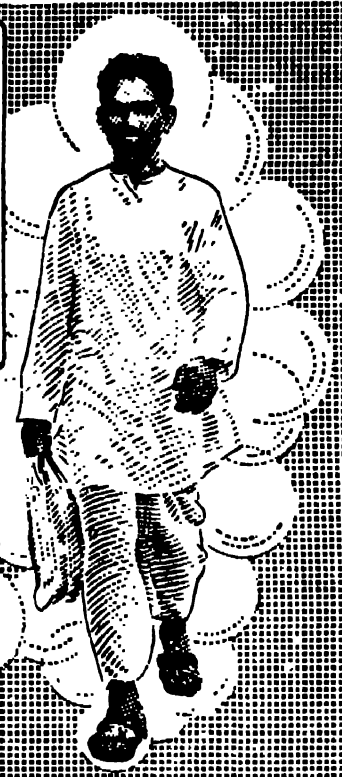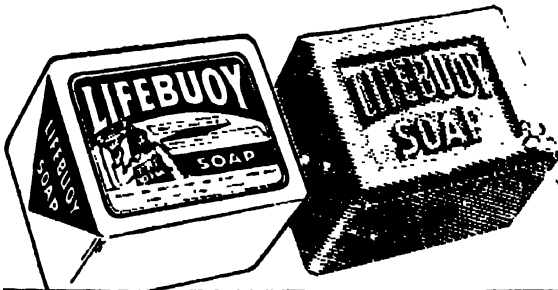
এ বিষয়ে অভিভাবকেরা যদি একটু মনোযোগ দেন, তাহা হইলে আমার মনে হয় প্রত্যেক ছাত্রের কাগজ কিনিবার জন্ম বার্ষিক ৮।১০৲ টাকা অপব্যয় করিতে হয় না। ইহারই নাম "তিল কুড়াইয়া তাল"।

এ ত গেল তিল কুড়াইবার কথা। এইবার "তালে"র কথা বলি। আমি পূর্বে এক প্রবন্ধে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি কথার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, বাঙালীর সংসারে যতরূপ পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে ভোজন-বিলাসিতাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা আমরা অর্থাৎ বৃদ্ধেরা চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি। আমাদের বাল্যাবস্থায় আমরা কখনও ভোজের বাড়ী ব্যতীত লুচির আস্বাদন পাইতাম না। আজকাল ত অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রত্যহ জলযোগের জন্ম লুচি, পরটা ও মোহনভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যত বৃদ্ধি পাইতেছে, আমাদের ভোজনবিলাসিতাও সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ বাড়িয়া যাইতেছে। ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী হইতে মুড়ি, মুড়কি নির্ব্বাসিত হইয়া ইতর লোকের ব্যবহারের মধ্যে পরিগণিত। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, ভোজের নিমন্ত্রণে অন্নের ব্যবস্থা হইলে ভাত ডাল, দুই-তিনটা আমিষ ও নিরামিষ ব্যঞ্জন, একটা অম্বল এবং শেষে দধি ও সন্দেশ হইলে লোকে ধন্ম ধন্ম করিত। আর আজকালকার ভোজের বাড়ীতে ব্যঞ্জনের সংখ্যা দেখিলে মনে হয়, যেন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের বাড়ীর ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছে। পোলাও, ঘি-ভাত, তুনি খিচুড়ি প্রধান খাদ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। আর তাহার উপকরণ অসংখ্যপ্রকার দেশী, বিলাতি, মোগলাই ব্যঞ্জন সেই পোলাও বা ঘি-ভাতকে বেষ্টন করিয়া আছে। আজকাল কলিকাতায় ভোজ উপলক্ষে মধ্যবিত্তশালী ও দরিদ্র গৃহস্থেরাও অর্থের কিরূপ শ্রাদ্ধ বা অপব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় "পাকাদেখা"র ভোজে। পূর্ব্বে কলিকাতায় যাহা আশীর্ব্বাদরূপে পরিচিত ছিল, এখন তাহারই নাম হইয়াছে, "পাকাদেখা"। আমাদের বিবাহের কথা ছাড়িয়া দিন, সে ত সত্তর বাহাত্তর বৎসর পূর্ব্বেকার কথা; পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার পুত্রকন্যাদির বিবাহ উপলক্ষেও "পাকা-দেখা"র ভোজের আড়ম্বর ছিল না। কন্যাকর্তা নিজ পরিবারস্থ দুই-তিন জন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতেন এবং আশীর্ব্বাদের পর কন্যাপক্ষ আশীর্ব্বাদকদিগকে যৎসামান্য "মিষ্টমুখ" করাইয়া, অর্থাৎ চারি আনা কি আট আনার মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া আগন্তুকদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। আর এখন! পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদের পর কন্যাপক্ষকে লুচি পোলাও আর তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপ ২০।২৫ প্রকার দেশী ও বিলাতী খাদ্য এবং কলিকাতায় যত প্রকার মিষ্টান্ন কিনিতে পারা যায়, তাহা থরে থরে সাজাইয়া কন্যাকর্তার সহিত সমাগত দশ-পনর জন অভ্যাগত এবং নিজের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী ভদ্রলোকদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন।

কন্যাকর্তাই বা ঠকিবেন কেন? তিনি বলেন, বরপক্ষ পঁচিশ প্রকার তরকারি খাওয়াইয়াছেন, আমরাও তাঁহাদিগকে ৩০।৩২ প্রকার তরকারি ও তদনুরূপ মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া দেখাইব, যে আমরাও পয়সার অপব্যয় করিতে জানি। অর্থাৎ, বরকর্তা ও কন্যা-কর্তা এই দু'জনের মধ্যে অর্থের অপব্যয় করিয়া কে কত নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিতে পারেন, তাহার প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই পাকাদেখার ভোজে অনেক সময় শতাধিক ব্যক্তিরও নিমন্ত্রণ হয়। এইরূপ ভোজে যে সকল দ্রব্য পরিবেশন করা হয় তাহা যে-কোন এক ব্যক্তি, তা তিনি যত বড় ভোক্তাই হউন না কেন, নিঃশেষে খাইতে পারেন না। সুতরাং ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যাদি দরিদ্র কাঙ্গালী-দিগকে বিতরণ করা হয়। তাহাতে দরিদ্রগণেরই কি কোন উপকার হয়? মাত্র একদিনের জন্ম দেবভোগ্য খাদ্যের অংশ পাইয়া তাহাদের কি দারিদ্র্য হ্রাস পায়?

আমরা শুধু পাকাদেখারই উল্লেখ করিলাম। বিবাহ উপলক্ষে গাত্রহরিদ্রা, এবং ফুলশয্যায় যে সকল দ্রব্যাদি নূতন কুটুম্বের বাড়ীতে প্রেরিত হয়, বাহুল্যভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিব না! আমাদের প্রাত্যহিক সংসারযাত্রায় যে সকল ছোট-খাটো অপব্যয় করি, তাহার দুই-একটার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

আজকাল শহর অঞ্চলে, এমনকি দূর মফস্বলেও এমন গৃহস্থ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় যাহার বাড়ীতে প্রত্যহ দুই বেলা "চা" পানের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু এই "চা" পানটা কি অপরি-হার্য্য? "চা" শীতপ্রধান দেশের পানীয়। পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং শীতপ্রধান ইউরোপে চা' হয়ত অপরিহার্য্য। শীতপ্রধান দেশের লোকে উত্তাপটাই ভালবাসে। তাই ঐ সকল স্থানে আগন্তুককে অভ্যর্থনার জন্ম উষ্ণ চা পান করিতে দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে অভ্যর্থনার আন্তরিকতা প্রকাশ করিবার জন্ম বলা হয়—warm reception, আর আমাদের দেশে ডাবের জল, সরবৎ প্রভৃতি শীতল পানীয় এবং চরণ ধৌত করিবার জন্ম শীতল জল দিলে লোকে বলিয়া থাকে—অমুকের অভ্যর্থনায় প্রাণ 'জুড়াইয়া' গেল। আমি পাঠকগণকে জিব-পোড়ানো উষ্ণ চা এবং প্রাণ-জুড়ানো ডাবের জল সরবৎ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। তাঁহারা একবার মনে মনে তুলনা করিয়া দেখুন, কিরূপ অভ্যর্থনা তাঁহাদের প্রিয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—বরোদা অধিবেশন

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

সম্প্রতি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪২তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে ১৯৪২ সনেও বরোদা রাজ্যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৯তম অধিবেশন হয়েছিল এবং বরোদার অধিবাসীদের বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রতি যে আন্তরিক অনুরাগ দেখা যায় তাকেই এখানকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাফল্যের কারণ বলা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু অপরিসীম কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বিজ্ঞানীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে এখানে এসে এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। সভাস্থলে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্তা হংস মেহতা, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মহারাজ ফতেসিং গাইকোয়াড়, ডাঃ জীবরাজ মেহতা প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রায় বার শত প্রতিনিধি, চীন, জাপান, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও ইউ. এস. এস. আর.-সমূহের প্রায় পঞ্চাশ জনের অধিক বিদেশী বৈজ্ঞানিক এবং প্রায় দুই হাজার আমন্ত্রিত বিজ্ঞানানুরাগী এই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পণ্ডিত জবাহরলাল তাঁর ভাষণে জাতীয় পরিকল্পনাসমূহকে কার্যে পরিণত করবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি পরলোকগত ডঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভারতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির মূলে এই মনীষীর কর্মপ্রচেষ্টার কথার উল্লেখ করেন। আজ ভারতবর্ষে যে বহুসংখ্যক জাতীয় গবেষণা-মন্দির গড়ে উঠেছে তার মূলে ডঃ ভাটনগরের কৃতিত্ব অনেকখানি।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছিলেন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়ান্স এণ্ড টেকনলজির ডঃ এস. কে. মিত্র। তিনি তাঁর অভিভাষণে বিবিধ শিল্পসম্প্রসারণ সম্বন্ধীয় কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশে অবলম্বিত নীতি অনুযায়ী শিল্পজাত হইতে লব্ধ অর্থের একাংশ শিল্পপ্রসার এবং গবেষণার জন্য ব্যয় করবার উপদেশ দেন। তাঁর মতে এই নীতি অবলম্বন করলে শিল্পসমূহের দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা দ্বারা শ্রমসংক্ষেপের যে সকল উপায় উদ্ভাবন করেছে ভারতবর্ষ তার সম্যক সদ্ব্যবহার করে নাই। এ কারণে এদেশে শিল্পোৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই এবং জনসাধারণের চাহিদা মেটে নাই। ভারতবর্ষকে প্রকৃতই যদি সমৃদ্ধ জাতির পর্যায়ে উন্নীত হতে হয় ত তাকে তার প্রকৃতিজাত শক্তিসমূহের সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শ্রমসংক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হবে। অনেকের ধারণা, এতে উৎপাদন প্রয়োজন অপেক্ষা বৃদ্ধি পাবে এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি হবে। কিন্তু কেবলমাত্র পণ্য-উৎপাদন শিল্পের (consumer goods) উপর গুরুত্ব না দিয়ে শিল্পের অন্যান্য বিভাগের প্রতিও নজর রাখলে এরূপ সমস্যা সৃষ্টি হবে না। নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা দেশ কিরূপ সমৃদ্ধ হচ্ছে ডঃ মিত্র সে বিষয়ও উল্লেখ করেন। তিনি রেডিও বিজ্ঞান এবং তড়িৎ অণুবিজ্ঞানের উন্নতির কথা বলেন। ইহার ফলেই আজ বাড়ার যন্ত্র এবং টেলিভিশন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। ডঃ মিত্র প্রসঙ্গক্রমে বলেন, অদূর ভবিষ্যতে 'জারমানিয়ামে'র যুগ আসবে, অর্থাৎ জারমানিয়াম ধাতু দ্বারা নির্মিত বাল্‌বের সাহায্যে অসম্ভব ক্ষুদ্র আকারের রেডিও বিসিভার আবিষ্কৃত হবে যার সাহায্যে কেবলমাত্র মানুষের হস্তপৃষ্ঠের উপরেই একটি রেডিও রিসিভার বহন করা যাবে। তিনি বাঙ্গালোরে স্থাপিত রেডিও বাল্‌ব নির্মাণের কারখানার কথা উল্লেখ করেন। এর ফলে দেশের চাহিদা অনুযায়ী রেডিও এবং ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জামসমূহ ক্রমশঃ এদেশেই নির্মিত হবে ডঃ মিত্র এই আশা পোষণ করেন। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেডিও ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পে বহু কোটি ডলার মূলধন নিয়োজিত হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে এই শিল্প এখনও পর্যন্ত ঠিকমত প্রতিষ্ঠালাভই করে নাই।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে তেরটি শাখার সভাপতিগণ নিজ নিজ অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর প্রত্যেক শাখার কাজ আরম্ভ হয়।

রসায়ন শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এ সি. চাটার্জি। তিনি প্রকৃতিজাত নানা বর্ণবিশিষ্ট এগেট, চ্যালসিডনি, ওনিক্স, কর্নেলিয়ান প্রভৃতি কয়েকটি খনিজ পদার্থের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে মৌলিক গবেষণামূলক একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন। ঐ সব ধাতবজাতীয় বস্তুর উপর যে সমস্ত বর্ণযুক্ত লিসিগ্যাং বলয় (বৈজ্ঞানিক লিসিগ্যাঙের নামানুযায়ী) দৃষ্ট হয় তিনি তাহাদের উৎপত্তির রাসায়নিক কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন।

শারীর বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ এন. এন. দাস। তিনি জীবদেহের মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াসমূহের স্থান সম্বন্ধে একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্নায়ু এবং পেশী একত্র সক্রিয় হয়ে উঠে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। আধুনিক বিদ্যুৎ-পরিমাপক সূক্ষ্ম-যন্ত্রাদির আবিষ্কারের পর এই জৈব বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াসকল নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। ইহাতে শারীর বিজ্ঞানের গবেষণাকার্য্যও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে।

পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আর. কে. অসুন্দী। তিনি 'মলিকুলার স্পেকট্রোসকপি' সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

তিনি বলেন, অধিক পরিমাণযুক্ত অণুর অভ্যন্তরস্থ পরমাণুসকলের সঠিক সন্নিবেশ আজও রহস্যময় এবং আণবিক বর্ণালী নিরূপণ করে এ বিষয়ে প্রচুর আলোকসম্পাত করা যেতে পারবে।

চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ এস. কে. বসু। তিনি তাঁর ভাষণে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাদান-পদ্ধতির আমূল সংস্কার করে পুনর্গঠন করবার সপক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। তাঁর মতে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার ন্যূনতম বয়স উনিশ-কুড়ি হওয়া উচিত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকগণকে গ্রাজুয়েট ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী বিজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাকালকে কয়েকটি বিশেষ-ভাগে ভাগ করে শিক্ষাদানের মানকে আরও উন্নত করবার অনুকূলে যুক্তি উপস্থাপিত করেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ জে. সি. সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ফসলও বাড়ানো দরকার। তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত ঔষধের সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যে গাছের ফুল ফোটানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে তার উল্লেখ করেন।

ডঃ আর. কে. কালসকর কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি মৃত্তিকা-সংরক্ষণ ও ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ দেন।

প্রাণী-বিজ্ঞান ও পতঙ্গ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ডঃ পূর্ণেন্দু সেন বাংলাদেশের এনোফিলিস মশা, তাহাদের উৎপত্তি, বাসস্থান ও বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুসংশোধন বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক বি. বি ভৌমিক। তিনি তাঁর ভাষণে উচ্চ-শক্তিবিশিষ্ট বিদ্যুৎ ও এক্স রে যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন।

গণিত-বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ বি. আর. শেঠ। তিনি তাঁর ভাষণে গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় দু'একটি মৌলিক আবিষ্কারের বিষয় আলোচনা করেন।

মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রাজনারায়ণ। তিনি বলেন, যুদ্ধ ব্যাপারে মানুষের মনোবলই জয় পরাজয়ের জন্য দায়ী। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক ফ্রণ্ট সুরক্ষিত রাখতে হবে। মনস্তাত্ত্বিকগণ স্বজাতির মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার এবং শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং ইহার উপর জয়-পরাজয় অনেকটা নির্ভর করে।

পরিসংখ্যান বিভাগের সভাপতি ডঃ ভি. জি. পান্‌সী এবং ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি শ্রী ডি. পি. সোন্ধী বৈদগ্ধ্যপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন।

প্রতিটি বিজ্ঞান-শাখায় মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পঠিত ও সমালোচিত হয়েছিল। পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা-শাখার যৌথ অধিবেশনে আণবিক শক্তি কমিশনের সভাপতি ডঃ এইচ. জে. ভাবা বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আণবিক-শক্তির গবেষণা দেশের উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য। কোন দেশ যদি দ্রুত উন্নতি করতে চায় তবে তাকে স্বীয় সত্তা বজায় রেখেই আণবিক-শক্তির গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র বর্তমানে যে হারে শক্তির ব্যবহার করছে তাতে সমগ্র বিশ্বের শক্তির ভাণ্ডার মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে।

নিমন্ত্রিতেরা সকলে বিদায় নেবার পর…

…আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। কি তাড়াহুড়ো ক'রেই না দিনটা কেটেছে। কিন্তু সকলের উচ্ছসিত প্রশংসা পাওয়ায় তা সত্যিই সার্থক হ'য়েছে।

আমার মেয়ের বিয়ের ভোজেতে দু'শ লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কাজেই আমার ভাবনা ছিল যাতে কথা যাতে কোনও ত্রুটি না হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খাওয়া আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি কেবল বাহবাই পেয়েছি। সকলেই খাচ্ছেন আর বলছেন 'বাঃ! কি চমৎকার হ'য়েছে।' সুখ্যাতির এ প্রশংসা ডাল্ডা বনস্পতিরই প্রাপ্য। বড় গোছের ভোজের ব্যাপারে ডাল্ডার তুলনা নেই কারণ সব রকম খাবার তৈরী ক'রতে একই ডাল্ডা বার বার ব্যবহার করা চলে। ডাল্ডা যে খাবারের চমৎকার স্বাভাবিক স্বাদ-গন্ধ ফুটিয়ে তুলতে পারে তা নিমন্ত্রিতদের সকলের খুব তৃপ্তি ক'রে খাওয়াতেই বোঝা গেল। আর ডাল্ডা বায়ুরোধক শীল-করা টিনে থাকে ব'লে নিশ্চিন্ত থাকা যায় যে ধুলো-ময়লা, মশামাছি প'ড়ে বা ভেজালে তা দূষিত হবার কোনও ভয় নাই। ডাল্ডা সব সময়েই **তাজা, বিশুদ্ধ** আর **স্বাস্থ্যকর** পাবেন।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় নেবার সময় খাবার-দাবার খুব সুন্দর হ'য়েছে

বলে প্রত্যেকেই আমার কাছে সুখ্যাতি ক'রে গেলেন। আর আমার স্বামীর মুখের ভাব যদি তখন দেখতেন! আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে ডাল্ডাই আজ মান বাঁচালো!

যাঁরা বিয়ের ভোজ বা বেশী লোকের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেন তাঁদের সকলকেই আমি ডাল্ডা বনস্পতি দিয়ে সব খাবার-দাবার রান্না করতে বলি! ব্যবহার ক'রে দেখে আশ্চর্য্য হবেন এক টিনে কত রান্না করা যায়! আমার মেয়েকেও আমি তাই বলছিলাম "দেখে শেখ, তার সংসার ক'রতে তুমিও রান্নার ব্যাপারে সর্বদা ডাল্ডা বনস্পতির ব্যবহার কোরো।"

ডাল্ডায় এখন ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' দেওয়া হয়।

ভোজের জন্য কম খরচে কি ক'রে সুস্বাদু খাবার করা যায়

বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখে দিন:-

দি ডাল্ডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস,
পোঃ, আঃ, বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই - ১

১০পাঃ, ৫পোঃ, ২পাঃ, ১পাঃ ও ১/২ পাউণ্ড টিনে পাওয়া যায়

ডাল্ডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো - খরচ কম

গাছ মার্কা টিন দেখে নেবেন

HVM. 222-X52 BG

আণবিক-শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে অধিকাংশ রাষ্ট্রই যাবতীয় তথ্য গোপন রাখে, সুতরাং কারও কাছে সাহায্যের আশা না করাই ভাল। ভারতবর্ষে ইউরেনিয়াম প্রচুর পাওয়া যায়। তার থেকে নিজ চেষ্টার বলেই আণবিক-শক্তি উৎপাদন করতে হবে। তিনি বিদ্যুৎ সম্পর্কে বলেন যে, ভাকরা-নাঙ্গল পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ এক আনার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হিসাবে পাওয়া যাবে।

বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের অধ্যাপক নোবেল লরিয়েট পল কারার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক নোবেল লরিয়েট এল. পাউলিং নিজ নিজ গবেষণা সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। চীনদেশীয় বিখ্যাত শিল্পবিদ্ ও রাসায়নিক অধ্যাপক টি. পি. হাউ সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুতের জন্য যে সস্তা এবং সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছেন তার বিষয় বর্ণনা করেন।

চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ চিয়েন তুয়ান সেং বলেন, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত ও চীনের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা অধিকতর প্রসারিত হওয়া দরকার। তিনি আরও বলেন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চীনদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহু কাজ করছেন। বর্তমানে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগগুলি চীনদেশ হতে প্রায় নির্মূল হয়েছে এবং কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপও অনেক হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, চীনদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তিনি একথাও বলেন যে, প্রয়োজনের তুলনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনও যথেষ্ট হয় নাই।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি. ওয়াটানাবি বলেন যে, ১৯৪৫ সনের আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে হিরোশিমা ও নাগাসাকির প্রস্তর ও মৃত্তিকা-পদার্থের বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

এবার বিজ্ঞান-কংগ্রেস উপলক্ষে বরোদা শহরে বিরাট কর্মচাঞ্চল্য দেখা গেল। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই বরোদা কার্যমন্দির হলে ভারতীয় ভেষজ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল; বোম্বাইয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীশান্তিলাল শাহ এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন এবং মেজর-জেনারেল এস. এল. ভাটিয়া উহার সভাপতিত্ব করেন। এখানেও দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসেও যোগদান করে একে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন।

এবারে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাফল্যের সহিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যোগাযোগ রয়েছে। ঐ জাতীয় পরিকল্পনাগুলি যত দিন না সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় তত দিন পর্যন্ত যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ যেন একথা স্মরণ রাখেন।

—

দুই শার্টের গল্প
বিক্রী — শার্ট
৫ টাকা
রাম ও শ্যাম দুজনে একই রকম শার্ট কিনলেন
এইটা
এইটা
এই নিন, মশায়— একটি ক'রে!
তিন মাস পরে — ময়দানে
ঘুড়ির সুতা জড়িয়ে গেছে— বাবাকে ডাকি।
রাম ও শ্যামের আবার দেখা হ'লো
আপনার শার্ট এখনও নতুন আছে। আমারটাত প্রায় ছিঁড়ে এসেছে।
দুই গৃহিণী
এর রহস্য কি?
খুব সোজা। সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা না আছড়াতেই সব ময়লা বের ক'রে দেয়। আছড়ালে কাপড়ের সুতা ছিঁড়ে যায় — আর তা বেশীদিন টেঁকে না।
এ পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ!
এ কথা সত্যি! সানলাইটের অপর্য্যাপ্ত ফেনা না আছড়ালেও কাপড়কে সাদা ও ঝকঝকে করে দে'য়। সবই বেশীদিন টেঁকে, আর তাতে পয়সাও বাঁচে!!
SUNLIGHT SOAP
Rs 10000 Reward
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়-চোপড়কে আরও টেঁকসই করে

আর্ট ও আহিতাগ্নি—যামিনীকান্ত সেন। শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য বার টাকা।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সাহিত্যিক ও শিল্পী মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু বাংলায় শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত অপ্রচুর। চিত্রকলা সম্পর্কে কিছু কিছু লেখা হইয়াছে, মন্দিরাদি সম্পর্কেও কিছু গবেষণা হইয়াছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে শিল্পতত্ত্বের বিচার "আর্ট ও আহিতাগ্নি" ছাড়া আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদক বলিতেছেন, "সুপ্রাচীন যুগ থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতার সঙ্গে শিল্পকলার ক্রমবিবর্তন-তত্ত্ব ও আদর্শগত বিচারের যে প্রয়াস এই গ্রন্থে দেখা যায় তেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাব-বিশ্লেষণ অন্য কোন ভাষায়ও খুব সহজলভ্য নয়।" বিধাতার সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা দ্রষ্টা, আর্টে আমরা স্রষ্টা। আর্ট মানুষের সৃষ্টি। "বিশ্বমানব ছুটে চলেছে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে।" আর্টের তত্ত্ব এবং সৌন্দর্য্যতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুন্দরের অন্বেষণে মানুষের সাধনা শিল্পরূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহারই উপর নির্ভর করিয়া কল্পনা প্রসার-লাভ করে। কিন্তু বস্তুর সত্য স্বরূপ কি? এই রূপ নির্ণয় করিতে গিয়াই সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নিজেদের রুচি অনুযায়ী বিচিত্র সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের তথ্য সংগ্রহে বিস্মিত হইতে হয়। সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের আর্ট লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। আদিম মানবের গুহাচিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই সেদিনের অদ্ভুত ডাডা-সাহিত্য পর্য্যন্ত কোন কিছুই তাঁহার শিল্প-বিচার হইতে বাদ পড়ে নাই। কোন বিশেষ কলার মধ্যে গ্রন্থকার নিজের আলোচনাকে বদ্ধ রাখেন নাই। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত, কাব্য—এ সমস্তের মধ্য দিয়া তিনি আর্টের বিবর্তন দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর সকল শিল্পীদের তুলনামূলক বিচারে গ্রন্থকার অদ্বিতীয়।

পুরাকালে আর্ট ধর্ম্মেরই অঙ্গ ছিল, তারপর জীবনের সকল ক্ষেত্রে আর্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আধুনিককালে পরিবর্তনের প্রতি, নূতনত্বের প্রতি শিল্পীদের একটা উদগ্র আগ্রহ দেখা যায়। যেখানে নূতনের সঙ্গে প্রাচীনের কোন সম্বন্ধ নাই, যেখানে 'নূতন' সাময়িক খেয়ালমাত্র, সেখানে সৃষ্টি উৎকট হইয়া উঠিয়াছে, সার্থক হয় নাই। মানুষ আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। প্রকাশের মধ্য দিয়াই আর্টের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আর্টকে দেখা যায় না। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই একমাত্র সত্য নয়। আর্টের ভিতর দিয়া মানুষ বার বার ইন্দ্রিয়াতীত রূপরসের স্পর্শলাভ করিয়াছে। মানুষ সীমার দ্বারা বেষ্টিত, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা অসীম। রূপ ও অরূপের, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের সীমারেখা কোথায়? মানুষ রূপের ভিতর দিয়াই রূপাতীতকে লাভ করে। গ্রন্থকার মিশরীয়, চৈনিক, গ্রীক, আসিরীয়, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় আর্টের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে আর্টের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। পরিবর্তন পৃথিবীর নিয়ম। কিন্তু সমস্ত পরিবর্তনকে ছাপাইয়া অচপল একটা-কিছু আছে। আহিতাগ্নিক সারা জীবন এবং বংশপরম্পরাক্রমে অগ্নিকে অনির্ব্বাণ রাখে। আর্টের মধ্যেও এই আহিতাগ্নি দেখি। যেখানে আর্ট চিরন্তন সেইখানে এই ধারাবাহিকতার সাক্ষাৎ পাই।

'সুন্দর ও সৌন্দর্য্য', 'ভাবের পাথেয়', 'রূপরাজ্যে আদর্শের পারম্পর্য্য', 'শিল্পকলার পরিবেশ', 'রসের সামাজিক মধ্যবিন্দু ও গ্রন্থি', 'রূপলোকের স্বাধীনতা', 'অরূপের অপরূপ রূপ', 'রূপ ও রূপকের রাগমালা', 'মানবের বিশ্বরূপ ও বিরাট রূপ', 'আরোপিত ও অতিপ্রাকৃত রূপ', 'অসীমের স্পর্শ',—এই এগারটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানি বিভক্ত। গ্রন্থে চারখানি বিখ্যাত বিবর্ণ চিত্র এবং উনিশখানি একবর্ণ চিত্র আছে। ইহা ছাড়া ভূমিকা, বিষয়সূচী ও নামসূচী লইয়া বইখানি সম্পূর্ণ। ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির কথা বলিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। "দেহসীমার মধ্যে দেহাতীতের অপরূপ রূপ ফুটিয়ে তোলার এ রকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন শিল্পে নাই।...ভারতবর্ষ যে সামঞ্জস্যের ধ্যান করে এসেছে তারই ছায়া এ মূর্ত্তিতে রূপগ্রাহী হয়েছে।...এ মূর্ত্তিতে রূপ ও অরূপের অপূর্ব্ব মিলনকেন্দ্র নিহিত হয়েছে বলে আর পরিবর্তন চলে না।...এই মূর্ত্তি বহু কালের ও বহু ভাবুকের আহিতাগ্নি ও ধারাবাহী সাধনা ও মননের ফল।" চিন্তা ও জ্ঞানের রত্ন-ভাণ্ডার রূপে "আর্ট ও আহিতাগ্নি" চিরদিন পাঠকের সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা— শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪॥০ টাকা।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া রচিত প্রাচীন বাংলা কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব চরিতকাব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদতিরিক্ত ঐতিহাসিক কাব্য বা তজ্জাতীয় গ্রন্থও কিছু কিছু পাওয়া যায় সত্য। তবে সেগুলি তেমন পরিচিত নয়—তাহারা কোন দিন বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, সমসাময়িক ব্যক্তি বা ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোটবড় যে সমস্ত ছড়া রচিত হইয়াছে সেগুলি সাধারণ লোকের মধ্যে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। এ জাতীয় রচনার ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই। এগুলি সকল সময় পুস্তকাকারে লিখিত ও রক্ষিত হইয়াছে এমন নহে। কিছু কিছু লোকের মুখে রক্ষিত হইয়াছে, কিছু কিছু পুথির আকারে কোন কোন পুথিশালায় পাওয়া যায়, কিন্তু বেশীর ভাগই কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা-সাহিত্যের এই সমস্ত উপেক্ষিত অপাংক্তেয় উপাদানগুলিকে সুসংবদ্ধ ভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৭৫১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর বাংলা ভাষায় যে সমস্ত ঐতিহাসিক কাব্য ও ছড়া রচিত হইয়াছিল, আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাহাদের মোটামুটি পরিচয় দিয়াছেন। ঐতিহাসিক পুথিপত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি মুখ্যতঃ ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিয়াছেন। ইহাদের বিষয়বস্তুকে তিনি চার ভাগে ভাগ করিয়াছেন—যথা, রাষ্ট্রকথা, রাজকাহিনী, দুর্যোগবার্তা ও সংঘাতচিত্র। অবশ্য এ জাতীয় সমস্ত রচনার সন্ধানই যে তিনি দিতে পারিয়াছেন এমন নহে। তাহা সম্ভবও নহে। এই গ্রন্থে অনুল্লিখিত অথচ অন্যত্র প্রকাশিত ছড়ার মধ্যে মহানন্দ চক্রবর্তীর রেল-ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র-বিষয়ক ব্যঙ্গাত্মক ছড়াটি উল্লেখযোগ্য। ইহার ও মহানন্দের অন্য কয়েকখানি ঐতিহাসিক কাব্যের পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় আছে। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে যে সকল ছড়ার আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের আকর সকল স্থলে যথাযথ ভাবে উল্লিখিত হয় নাই। গ্রন্থের ভাষা বহু স্থলে দোষ-দুষ্ট। নির্ঘণ্টের অভাব অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অসুবিধা সৃষ্টি করে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কর্ণ—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৷৷৴০।

পঞ্চাঙ্ক শোক-নাট্য। মহাভারতে কর্ণচরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে উজ্জ্বলতর করিয়া আঁকিয়াছেন 'কর্ণকুন্তীসংবাদে'। এ গ্রন্থেও তাঁহার মহিমময় করুণ জীবনকথা মর্মস্পর্শীরূপে ফুটিয়াছে। গিরিশচন্দ্র প্রমুখ বাঙালী নাট্যকারগণ যে ধরণে পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়া আসিয়াছেন, ইহা সেই ধরণেই রচিত।

অশোকের সময়ের গ্রাম—শ্রীদুর্গাদাস সরকার। একক প্রকাশনী। ৪৪৩।১, কালীঘাট রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ।৵০

ষোলটি কবিতা, প্রথমটির নামে বইয়ের নাম। অবশ্য অশোকের যুগের 'পরিবেশ' কোনও কবিতায় নাই। ভাষা ও ছন্দ আড়ষ্টতাহীন।

মিতার জন্য—রোমাণ্টিক কবিতা—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ১৷৷০

নূতনত্ব মানেই অবোধ্যতা নয়, কবিতাগুলি পড়িয়া সে কথা নূতন করিয়া মনে হইল। আর কবি যে রোমাণ্টিক কবিতার অনুরাগী, সে কথা তো তিনি নামেই বলিয়া দিয়াছেন। কতকগুলি প্রাকৃতিক চিত্র—বিশেষ করিয়া পাহাড়-দেশের—সুন্দর ফুটিয়াছে। 'রাত্রির রূপকথা' মধুর ব্যঞ্জনাময়। 'বিদেশী বন্দরে' মনে হইল, দুই জায়গায় ছন্দ চড়ায় ঠেকিয়াছে:

"সাঁকোর ওধারে পারে ছুটির জনতা
যেয়েছে মেলায়—পোরায় রঙিন ছাতা"
আর "সুঠাম সুডোল বাহু তুলে দিলে আকাশে
ঝাঁকে ঝাঁকে সাগরিকা পাখী উড়ে আসে।"

অন্যত্র রচনা সরস ও সাবলীল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কোন্ পথে ?—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

শিক্ষা সমস্যার কয়েকটি দিক—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য বার আনা।

প্রথম পুস্তকখানি কিছু দিন পূর্ব্বে এবং দ্বিতীয়খানি সম্প্রতি প্রকাশিত। দুইখানিই—বারোমাসী ও সাময়িকীতে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ-সমষ্টি। কিন্তু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও উহাদের গুরুত্ব এতটুকুও কমে নাই। আমরা ইদানী নানা সমস্যার সম্মুখীন। তন্মধ্যে শিক্ষা ও সমাজ-সমস্যা যেমন মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে এমনটি আর কোন সমস্যাই নয়। আমরা সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করি; আবার বর্ত্তমান সমাজেরই আমরা অঙ্গীভূত। এহেতু পুস্তকদ্বয়ে আলোচিত সমস্যাগুলি প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার অন্তরেই দোলা দিবে। বর্ত্তমানে 'শিক্ষা' একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; প্রত্যেক পিতামাতাই চিন্তায় আকুল—কিরূপ শিক্ষা দিলে সন্তান জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবে: পুত্র জ্ঞানআহরণ এবং জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইবে; কন্যা সু-কন্যা, সু-গৃহিণী এবং সু-মাতা হইয়া বসুন্ধরা স্বস্থ ও সুন্দর করিবে। আলোচ্য পুস্তক দুইখানি পাঠ করিলে আমাদের অনেক চিন্তার খোরাক মিলিবে। ভাবনাগ্রস্ত পিতা-মাতা-অভিভাবক নিজ নিজ সন্তানকে সুপথে চালনায় নির্দ্দেশ পাইবেন।

প্রথম পুস্তকখানিতে আটটি নিবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অষ্টমটি "কন্যার বিবাহ হবে না?" আবার তিনটির সমষ্টি। পঞ্চম, ষষ্ট এবং সপ্তম প্রবন্ধ বাদে সবগুলিই 'প্রবাসী' বারোমাসীতে স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে ১৩২৭ হইতে ১৩৫৭ এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে লিখিত। এই দীর্ঘকালে সমাজে বহু সমস্যা দেখা দিয়াছে, বহু সমস্যার সমাধান হইয়াছে, যথাকালে তাহা অন্তরিত হইয়াছে, আবার অনেকগুলি এখনও সমাধানের অপেক্ষায়। নূতন নূতন সমস্যাও যে দেখা না দিতেছে তাহা নয়। সমাজের চিন্তা-নেতারা এই সকল সমস্যার যুগোপযোগী এবং শাশ্বত সমাধানের নির্দ্দেশ দেন। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র আলোচ্য পুস্তকখানিতে বাঙালী-জীবনের সমস্যাগুলির যথাযথ আলোচনার দ্বারা সমাধানেরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সমাজে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ চিরকাল ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। সমাজের স্বাভাবিকী শক্তি বলে ছোট বড় হয়, উচ্চ নীচ হয়; আবার বড় ছোট হয়, নীচ উচ্চ হয়। এই শক্তির উদ্বোধন চাই। বাহিরের চাপে তাহা আসিবে না, অন্তরের তাগিদেই তাহা সম্ভব। গ্রামের 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়' 'অস্পৃশ্য'কে কোলে তুলিয়া লইলেই অস্পৃশ্যতা-পাপ দূরীভূত হইবে, শত সভা-সমিতি, বক্তৃতা বা বিতর্কের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। যে শিক্ষায়, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়ে'র এই মনোবৃত্তির উন্মেষ হইবে, সেই শিক্ষাই চাই, এবং তাহাই সৎশিক্ষা। লেখক কোন কোন প্রবন্ধে শিক্ষা-সমস্যার সমাধানেরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বুনিয়াদি শিক্ষা-আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে গ্রামের কারুশিল্প শিক্ষার কথা লেখক পাড়িয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারকের নিকট নারীর অধীনতা এবং বৈষম্য বড়ই ক্লেশকর। কিন্তু লেখকের মতে নর-নারীর বৈষম্য সৃষ্টিগত, প্রকৃতিগত। সমাজের স্থিতির পক্ষে এই ভেদ বা বৈষম্য দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিলে চলিবে না। নারী-স্বাধীনতা, এবং নর-নারীর সাম্য-প্রতিষ্ঠা পাশ্চাত্ত্য দেশে হইয়াছে, আমাদের দেশেও তাহা আইনতঃ এবং কার্য্যতঃ

স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সমাজের স্থিতির পক্ষে তাহা কতখানি অনুকূল তাহা ভাবিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্যের অভিজ্ঞতা কিন্তু ইহার বিপরীত কথাই বলে। এই সকল 'ভাববার' কথা পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত ঠাসা। বাঙালীর এখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ, উত্থাপিত ও আলোচিত বিষয়াদি অনুধ্যান এবং তদনুযায়ী স্বীয় কর্তব্য নির্দ্ধারণ অবশ্যকর্তব্য। সাধারণ 'মালী'ও যে কত উচ্চস্তরের মানুষ—একটি নিবন্ধে অতি সুন্দর করিয়া তাহা দেখানো হইয়াছে। হিন্দুর 'আচার' কত যুগ যুগান্তের স্মৃতিই না বহন করিতেছে। আমাদের সংস্কৃতি-সভ্যতার ইতিহাস তাহার মধ্যে ধৃত। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র একটি প্রবন্ধে তাহার আভাস দিয়াছেন। নানা স্থলে বিকীর্ণ রচনাগুলি পুস্তকখানিতে একত্র সমাবেশ করিয়া প্রকাশকগণও আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি—'শিক্ষা সমস্যার কয়েকটি দিক'—মাত্র চল্লিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় লেখকের মননশীলতার পরিচয় মিলে। জাতিগঠনের দিক হইতে শিক্ষাসমস্যা আজিকার দিনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। অথচ এই শিক্ষা লইয়াই বর্তমানে ছিনিমিনি খেলা হইতেছে যেন। শিক্ষার অধিকর্তারা কিংবা শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা-অভিভাবকেরা শিক্ষা সম্পর্কে সত্যসত্যই চিন্তা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। অথচ স্বাধীন দেশে প্রত্যেক নর-নারীর কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নেলসনের কথা—"England expects everyone to do his duty" (ইংলণ্ড আশা করেন দেশের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিবে)—পুরানো হইলেও ইহার মর্ম্ম আমাদিগকেও ষোল আনা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক নর-নারী নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিলেই তবে ভারত-মাতা শক্তিসম্পৎশালিনী হইবেন। এই কর্তব্য সম্পাদনের প্রথম ও প্রধান উপায় সুশিক্ষালাভ। প্রশ্ন এই—সুশিক্ষা কাহাকে বলিব? ভারতীয় সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামের তথা সমাজের পরিবেশে শিক্ষা-নিরূপণই সুশিক্ষা এবং সৎশিক্ষাও। দেশের যাঁহারা কর্ণধার তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে—বড়ই শুভ লক্ষণ। রাধাকৃষ্ণন কমিশন এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন। গ্রন্থকার প্রথম নিবন্ধে ইহাই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। দ্বিতীয় নিবন্ধে তিনি বিলাতের 'স্কুল ফাইনাল' পরীক্ষার শিক্ষার মান দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনায় আমাদের উক্ত পরীক্ষায় শিক্ষার মান যে কত নিম্ন, শিক্ষাবিদ্ মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। অথচ উহা আরও নিম্নতর (না, 'সহজতর?') করিতে এখানে আন্দোলনের অন্ত নাই। সংসারক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছুদের ঢের কঠিনতর ও কঠিনতম পরীক্ষা সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইবার প্রথম ধাপকে এত নীচু করার প্রয়াস অদৃষ্টের পরিহাস বৈ আর কি? তৃতীয় প্রবন্ধে এবং এইটিই দীর্ঘতম—গ্রন্থকার শিক্ষা-সমস্যার কয়েকটি কথা-প্রসঙ্গে আমাদের শিক্ষার গলদের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই গলদের নিরসনকল্পে তিনি ছয়টি মুখ্য বিষয় আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, যথা—প্রথম: শিক্ষার উদ্দেশ্য বিনিশ্চয়, দ্বিতীয়: পাঠ্য তালিকার কার্যক্রম, তৃতীয়: বিদ্যালয়ের রূপ, চতুর্থ: শিক্ষা বিভাগের সংস্কার, পঞ্চম: অর্থব্যবস্থা এবং ষষ্ঠ: শিক্ষা ও রাজনীতি। বিমলবাবু এই ছয়টি বিষয়ই সংক্ষেপে অথচ তথ্য-প্রমাণ প্রয়োগে অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত বিষয়ে তাঁহার উক্তি ক'টি প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষার্থীর অনুধাবনযোগ্য: যেমন—"ভবিষ্যতে ভাল করে রাজনীতি করব বলেই গোড়ায় চলতি রাজনীতির আবর্ত হতে দূরে মানুষ গড়ার কাজটা নিশ্চিন্তে ভালভাবে হওয়ার নিদারুণ প্রয়োজন ঘটেছে। যেমন গার্হস্থ্যের আগে বা গার্হস্থ্যের জন্যই ব্রহ্মচর্য্য": "মানুষ গড়ার কারখানা মানুষ লড়ার কারখানা হলে দুই-ই নষ্ট হয়।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষানুরাগীকে এই ছোট্ট পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটিও প্রণিধানযোগ্য।

শঙ্কর আবির্ভাব—ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার। প্রকাশক—শ্রীরমেশচন্দ্র দে। ৫, রাজেন্দ্র দত্ত লেন, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

পুস্তকখানি বড়ই আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু দেখি, ইতিহাস-সম্মত ভাবে ইহা রচিত হয় নাই। ভূমিকায় লেখকের উক্তি:

"আচার্য্য জীবনী মধ্যে দৈব বা অলৌকিক এবং যৌগিক শক্তি প্রকাশক ঘটনার প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। আমি তাহার অধিকাংশই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছি। অবিশ্বাসের কোন অবকাশ রাখি নাই।"

সাধারণ পাঠক-পাঠিকা ইহার মধ্যে শঙ্কর-জীবনী প্রসঙ্গে বিস্তর অলৌকিক ঘটনাদির কথা জানিতে পারিবেন। অবশ্য প্রাকৃত জনোপযোগী জ্ঞাতব্য তথ্যাদিও ইহাতে কিছু কিছু পাওয়া যাইবে। কিন্তু ইতিহাস-সম্মত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত একখানি শঙ্কর-জীবনীর বিশেষ অভাব রহিয়াছে। এই অভাব পূরণে কেহ অগ্রসর হইলে বাঙালীর ধন্যবাদার্হ হইবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীগোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়, ২৭।৩বি হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃঃ ২৯১। মূল্য ২৲

ইহার এক পৃষ্ঠায় সংস্কৃত মূল শ্লোক, অন্বয় ও ব্যাখ্যা, এবং অপর পৃষ্ঠায় বাংলায় পদ্যানুবাদ ও মার্জিনে শ্লোকগুলির সারমর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে। অন্বয়, ব্যাখ্যা, পদ্যানুবাদ ও সারমর্ম্ম যতদূর সম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল। সর্বজনপাঠ্য গীতার এরূপ একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার ও প্রকাশক সাধারণ পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ধর্ম্মপিপাসু নরনারী মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। সরল স্বচ্ছন্দ পদ্যানুবাদ মূল শ্লোকের অর্থোপলব্ধির পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়ক হইবে।

(১) নতুন দিনের গান, (২) নতুন পৃথিবীর গান—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য। মানসবাণী, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। প্রত্যেকটির মূল্য ১৲

কবিতাগুলি ভাবাবেগে ও ব্যঞ্জনায় চিত্তাকর্ষক এবং ভাবোদ্দীপক। নূতন দিনের ও নূতন পৃথিবীর স্বপ্নে নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কবি বই দুখানি লিখিয়াছেন। রচনায় বিশেষ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বই দুখানি পাঠককে আনন্দিত করিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ১১ই জানুয়ারী হইতে ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত অন্ধ্র দেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলার কব্বুর নামক স্থানে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক উৎসব বিপুল সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার অন্তর্গত নিখিল-ভারত সংস্কৃতি সংযোগ পরিষদের সভ্যগণ কব্বুরে সমবেত হন। মড়গোলা প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে অনেক আদিবাসীও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

১১ই তারিখে বীরমন্দিরে ভারতের জাতীয় পতাকা এবং শ্রমিক পতাকা উত্তোলনের পর বেজওয়াদা এস. আর. আর এণ্ড সি. ভি. আর. কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীএম. রাঘবাচারিয়ুলু সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার প্রতিষ্ঠাতা এবং বীরমন্দিরের ট্রাষ্টি শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা তাঁহার ভাষণে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার আদর্শ ও বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

১২ই হইতে ১৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বীরমন্দির, স্থানীয় সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলি সভাসমিতি এবং সূত্রযজ্ঞ (সূতাকাটার প্রতিযোগিতা) ইত্যাদির অনুষ্ঠান হয়।

শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ১৬ই তারিখে কব্বুরে পৌঁছেন। ১৭ই তারিখ অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় বীরমন্দিরে এই অনুষ্ঠানের সর্ব্বশেষ অধিবেশন হয়। ঐদিনকার সভায় সভাপতিত্ব করেন গুন্টুরের এডভোকেট শ্রী ভি. ভি. রমন। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভা ভারতের চিরন্তন আদর্শেরই ধারাবাহী। স্বামী বিবেকানন্দের সেবামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াই মহাত্মা গান্ধীর অন্তরঙ্গ শিষ্য, অন্ধ্র দেশের বিখ্যাত বিদ্বান্ শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার প্রতিষ্ঠা করেন।

কব্বুরের উৎসব শেষ হইলে পর শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের নেতৃত্বে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার একটি সাংস্কৃতিক মিশন বেজওয়াদাতে পৌঁছেন। ২০শে জানুয়ারী বেজওয়াদা মেডিক্যাল এসোসিয়েশন হলে স্থানীয় বিশিষ্ট আইনব্যবসায়ী শ্রী কে. নাগভূষণ রাওয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। শ্রীরাঘবাচারিয়ুলুর উদ্বোধনী বক্তৃতার পর

শ্রীনলিনীকুমার গুপ্ত "বাংলা ও অন্ধ্রের সাংস্কৃতিক মিলন" সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় লিখিত একটি দীর্ঘ ভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন, বাংলা ও অন্ধ্রের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্কের সূচনা হয় ষোড়শ শতাব্দীতে যখন শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে তীর্থযাত্রাকালে কব্বুরের নিকট গোদাবরীতটে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তর্পণাদি করেন। এই ঘটনারই স্মারক হিসাবে সূর্য্যসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে একজন বাঙালী ভক্ত কর্ত্তৃক যে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কব্বুরের উপকণ্ঠে গোদাবরীতটে একটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় একথা অনেকেই অবগত নহেন।

নলিনীবাবু তাঁহার ভাষণে অন্ধ্রের অতীত গৌরব এবং বাংলা ও অন্ধ্রের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিকের কথা উল্লেখ করেন।

নলিনীবাবুর ভাষণের পর বেজওয়াদা এস. আর. আর এণ্ড সি. ভি. আর কলেজের ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক শ্রীসত্যনারায়ণমূর্ত্তি নলিনীবাবুকে তাঁহার সাংস্কৃতিক মিশনের জন্য অভিনন্দিত করিয়া বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তাঁর জন্ম গোদাবরীতীরে, কিন্তু তিনি প্রতিপালিত হন হুগলী নদীর তীরে। বাংলাদেশের অন্নজলেই তাঁহার দেহ পুষ্ট এবং বাংলার ভাবধারায়ই তাঁহার মনের বিকাশসাধন হয়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রভাতকুমার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিকদের রচনা মূল হইতে তেলুগুতে অনুবাদ করিয়া তিনি বাংলাদেশের প্রতি তাঁহার যে মানস-ঋণ ছিল তাহা কথঞ্চিৎ শোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সভাপতির একটি মনোজ্ঞ ভাষণের পর সভার কার্য্য শেষ হয়। ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষ পি. সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা, বিখ্যাত শিল্পপতি সি. ভি. রেড্ডি, পি. আপ্পারাও, পি. সুন্দররাও প্রমুখ শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বেজওয়াদা হইতে নলিনীবাবু কয়েকজন সহকর্মীসহ শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভার কাজে বোম্বাইয়ে যান এবং সেখানে শ্রী কে. এম. মুন্সী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিদ্যাভবন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন।

আগামী ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে শ্রমিক ধর্মরাজ্য সভার বার্ষিক অধিবেশনের প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করিবার জন্য নলিনীবাবু ২৮শে জানুয়ারী বোম্বাই হইতে নাগপুরে পৌঁছেন এবং স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিয়া কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করেন।

হাওড়া জেলা মণিমেলামণ্ডলী

গত ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী হাওড়া টাউন হলে হাওড়া জেলা মণিমেলামণ্ডলীর প্রথম বার্ষিক মিলনী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে হাওড়ার আটটি মণিমেলার প্রায় ৪৫০ জন যোগদান করে। মিলনীর এই দুই দিন ব্যাপী উৎসবে প্রদর্শনী, শিশু-পাঠাগার, খেলাধূলা ও আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ৩১শে ডিসেম্বর সকাল আটটায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় পতাকা উত্তোলন করিয়া মিলনীর উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে মণিভাই-বোনদের দলাদলি হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দেন। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সকাল সাড়ে নয়টায় বিতর্কসভা আরম্ভ হয়। সভাপতিত্ব করেন শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযামিনীকান্ত সোম। বিকাল সাড়ে তিনটায় শারীরিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন সুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন হাওড়া পৌর প্রতিষ্ঠানের এডমিনিষ্ট্রেটার শ্রী আর. এস. ত্রিবেদী এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়। শিশুদের নৃত্য, গীত ও শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত "বীরশিকারী"র অভিনয় দর্শকদের আনন্দবিধান করে। পরদিন, ১লা জানুয়ারী সকাল সাড়ে আটটায় আরম্ভ হয় "আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা"। বিকালের "ব্রতচারী" অনুষ্ঠান বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়াছিল। প্রায় ৪৫০ জন ভাইবোন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। সন্ধ্যা ছয়টায় আরম্ভ হয় আনন্দানুষ্ঠানের পালা। নৃত্য, গীত, হাস্যকৌতুক, আবৃত্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করে। শ্রীশৈলেন ঘোষের মুখোশ-নাট্য 'দস্যিদানার ছানা'-অভিনয় দর্শকদের আনন্দদান করে। ঐ দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীসুনির্ম্মল বসু ও "প্রবাসী"-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ইহার বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে একাধিক বার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২২ সনে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর যে ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহা বিশেষ আশাপ্রদ। ১৯২৩ সনে ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'বালক পাঠাগার' নামক গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। পরে এই গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক পরলোকগত সচ্চিদানন্দ দত্তের নামে ইহার নামকরণ করা হয় সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাগার। ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ এবং একটি স্বতন্ত্র শিশুবিভাগ আছে। ১৯৫৩ সনে বর্ষশেষে এই গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ছিল ৩৮১৫খানি। এখানে নিয়মিতভাবে দৈনিক সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রিকাদি রাখা হয়। কর্ত্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থাগারটিকে গড়িয়া তুলিতে হইলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। পুস্তকাদি এবং অর্থসাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে :

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার
৬৫বি বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমেরিকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না শ্রীযুক্তা হেলেন কেলার
(বামদিকে) এবং তাঁহার সেক্রেটারী পলি টমসন

দৃষ্টিহীনের মেশিন চালানো

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

৫৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৬১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মধ্যবিত্তের জীবন-সমস্যা

কেন্দ্রীয় বাজেটে এইবার যে ভাবে আয়কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং জীবনযাত্রার পথে অত্যাবশ্যক কয়েকটি দ্রব্য, যথা কাগজ, যে ভাবে অধিকতর শুল্ক ভারগ্রস্ত করা হইয়াছে তাহাতে সকল মধ্য-বিত্তের এবং বিশেষতঃ বাঙালী মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মান বিগত এক শতাব্দীতে অনেকটা উচ্চে উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক এবং চারিত্রিক উন্নতি, ইহার জন্ম তাহার ব্যয় আয়ের অনুপাতে অন্য সকল শ্রেণী অপেক্ষা অধিক ছিল। তাহার এই উন্নতির প্রয়াসের ফলে জাতি ও দেশ অগ্রসর এবং লাভবান হইয়াছে। সেই প্রগতির ফলে সারা দেশের মঙ্গল হইয়াছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, জগতের মনুষ্য-সমাজের ও সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ প্রগতির মূলে এই মধ্যবিত্ত সমাজ। কেবলমাত্র বিদেশীর সম্মোহিত ও অনুগত কয়েকটি দল সমস্ত মধ্যবিত্ত সমাজকেই বুর্জোয়া আখ্যা দিয়া ঘৃণার ও বিদ্বেষের পাত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বলা বাহুল্য ঐরূপ প্রচার শুধু দাস-মনোবৃত্তির পরিচায়কমাত্র। উহার পিছনে যুক্তি-তর্ক যাহা কিছু ছিল তাহা বহু পূর্ব্বেই খণ্ডিত ও সর্ব্বদেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে—এমনকি রুশ দেশেও।

বর্ত্তমান অবস্থায় মধ্যবিত্তের আয় বৃদ্ধি অতি সামান্যই হইয়াছে, ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে চতুর্গুণের উপর। ফলে তাহার স্বাস্থ্য, কৃষ্টি, শিক্ষা সবকিছুই অন্নবিস্তর ব্যাহত হইতে চলিয়াছে। ইহার উপর আবার প্রত্যক্ষ ভাবে আয়কর বৃদ্ধি এবং পরোক্ষভাবে অন্য কর শুল্ক বৃদ্ধি হইল। যদি আয়ও কিছু বৃদ্ধি পাইত তবে উহার কোনও অর্থ থাকিত, আয় ত এখন কমিবারই মুখে। অথচ সরকারী শোষণ বৃদ্ধি পাইল।

আজিকার বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা আয় পূর্ব্বেকার ৩,০০০ টাকা আয়ের অপেক্ষা কম, যদি মূল্য বৃদ্ধি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করা যায়। অথচ ঐ শ্রেণীর উপর আয়কর শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইল। সারা জাতির আয় বাড়িয়াছে—তাহাও "পরিসংখ্যানে"র মাপে, প্রকৃত তথ্য জানেন শুধু চিত্রগুপ্ত—মাত্র শতকরা সাড়ে এগার, অথচ শুল্কাদিতে বাড়িল শতকরা প্রায় ২৫-৩০। কি অপরূপ ব্যবস্থা।

বুঝিলাম যে, দেশের প্রগতির জন্য সকলেরই স্বার্থত্যাগ ও অন্নবিস্তর কৃচ্ছ্রসাধন করা প্রয়োজন—অবশ্য মন্ত্রীকুল তাঁহাদের অনুচর ও আশ্রিতবর্গ বাদে। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনেরও তো সীমা আছে। যদি জাতির দেহ ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া যায় তবে দেশের উন্নতির ফলভোগ করিবে কি বিদেশী বিজেতা? কেন্দ্রীয় বিদগ্ধচূড়ামণিবর্গ এই প্রশ্নের উত্তর দিন।

কাগজের উপর শুল্কবৃদ্ধির অর্থ শিক্ষার ও সংস্কৃতির পথে কণ্টক রোপণ। জগতের সকল সভ্য দেশেই কাগজের মূল্য কমিয়াছে, কমে নাই শুধু 'অসভ্য' ভারতে ও তাহাপেক্ষাও হীন অবস্থার কয়েকটি দেশে। অথচ এখানে কাগজের আরও মূল্য বৃদ্ধি করা হইল। কি-বা সভ্যতার পরাকাষ্ঠা!

পুস্তক বিনা শিক্ষা সম্ভব নয় এবং কাগজ বিনা পুস্তক হয় না, একথা কি শ্রীমান্ দেশমুখ ভুলিয়া গিয়াছেন? এবং তিনি যদিই-বা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝেন নাই তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর কি ঘুমাইয়া আছে?

এবারের যে বাজেট হইয়াছে তাহাতে সততার পথে অস্তিত্ব রক্ষা মধ্যবিত্তের পক্ষে—বিশেষতঃ বাঙালী মধ্যবিত্তের পক্ষে—অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। মধ্যবিত্ত সমাজ নিষ্ক্রিয়ভাবে এত দিন বসিয়া ছিল। এখন বাকি রহিল তাহার অন্তিমপথে যাত্রা।

এখন উপায় একমাত্র ইহার প্রতিকারকল্পে কয়েকটি সংশোধনের দাবি। আয়কর যখন বাড়িল তখন সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ের একটা অংশ আয়করের বহির্ভূত করা প্রয়োজন, যেমন জীবন-বীমার ক্ষেত্রে হইয়া থাকে, এবং জীবনযাত্রার জন্য অত্যাবশ্যক যাহা কিছু সে সকলেরই মূল্য হ্রাস করাইবার জন্য সম্মিলিত ভাবে আন্দোলন আরম্ভ করাও প্রয়োজন। খাদ্যশস্যের মূল্য ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের (protective diet) মূল্য কমিয়াও এখনও তিন হইতে পাঁচ গুণ অধিক রহিয়াছে।

বিধানসভায় বেকার সমস্যা

বাঙালী সমাজ উন্নয়নের কথা উঠিলেই মনে হয় যে এ যেন ঘটা করিয়া বাঙালী সমাজের গঙ্গাযাত্রা করা হইতেছে। উচিতবক্তা স্বার্থসর্বস্ব মন্ত্রী ও উচ্চ অধিকারী এবং তাঁহাদের ধামাধরার দল এই একই সুরে গান অনেক দিন গাহিতেছেন। তবে এবারের বিধানসভায় শ্রীকালী মুখার্জি (ছোট কালী) মনের কথা প্রকাশে নিবেদন করিয়া অনেকের শত্রুবাদাই হইয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য আমরা নীচে দিলাম :

"পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেটের সাধারণ আলোচনায় তৃতীয় দিন (বুধবার) শিল্পোন্নয়ন ও বেকার সমস্যার উপর বিতর্কের প্রধান ঝোঁক আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ তিন জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, কম্যুনিষ্ট ডাঃ রণেন সেন এবং কংগ্রেসের ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু ও শ্রীকালী মুখার্জি তিন দিক হইতে এই সমস্যার উপর জোর দেন।

প্রকৃতপক্ষে শুধু এই দিনের বিতর্কে নয়, গত তিন দিনের মধ্যেই সবচেয়ে প্রভাবজনক এবং সুক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক একটি বক্তৃতা দেন শ্রীকালী মুখার্জি। তিনি প্রচুর তথ্যের সাহায্যে বাংলা দেশের সমস্যাকে তিনটি সিদ্ধান্তে আনিয়া দাঁড় করান : প্রথমতঃ, বাংলাদেশে নূতন কারখানা গড়িয়া উঠিলেও ক্রমশঃ মোট শ্রমিকের সংখ্যা কমিতেছে। যদিও বোম্বাই প্রদেশে এই সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গে মালিকেরা বোম্বাইয়ের তুলনায় ক্রমাগতই অন্ততঃ শতকরা তিন ভাগ বেশী মুনাফা উপার্জ্জন করিতেছেন এবং তৃতীয়তঃ, পশ্চিম বাংলার শিল্প-সংস্থার কেরানী শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশঃ বাঙালী ছাঁটাই করিয়া অন্য প্রদেশের লোক আনিয়া ভর্ত্তি করা হইতেছে, যে সম্পর্কে গত এক বৎসরের একটি দীর্ঘ সালতামামী তিনি পেশ করেন।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জি বলেন যে, এই তিনটি দুর্লক্ষণের প্রতিবিধান যদি না হয় এবং এই সমস্যাকে দাবানোর জন্য কৌজী প্রতিজ্ঞা লইয়া যদি অগ্রসর হওয়া না যায়, তবে বাংলাদেশেও বাঙালী দুই তিন বৎসরের মধ্যেই এক মহাসঙ্কটের মধ্যে পড়িবে। তিনি বেকার সমস্যার জন্যই একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রীদপ্তর সৃষ্টি করার সুপারিশ জানান।

শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জি বলেন যে, ডাঃ রায় বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ১৪০০ কোটি টাকা লগ্নী প্রয়োজন বলিয়াছেন, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে মাসে চার শত টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জক শ্রেণীর মধ্যে শতকরা ৩৬'৮ হইতে বাঙালীর সংখ্যা। বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধানের জন্য আরও বেশী অর্থ প্রয়োজন এবং উহা প্রায় ৩০ শত কোটি দাঁড়াইবে। ডাঃ রায় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে পরিমাণে শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে সেই পরিমাণে জীবিকার সংস্থান বাড়িতেছে না। এই প্যারাডক্সটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, আসলে ইহা শিল্পপতিদের অতিরিক্ত মুনাফার 'প্যারাডক্স'। শিল্প-প্রসার সত্ত্বেও চার শত টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জক কারখানার চাকুরীয়ার সংখ্যা ১৯৪৮ সনে যাহা ছিল তাহা '৫৪ সনে মোট ৯০ হাজার কমিয়াছে, অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ লোকের চাকরী গিয়াছে। অথচ বোম্বাই প্রদেশে ১৯৩৯ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে শ্রমিক নিযুক্তির পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ বাড়িয়াছে। আবার শ্রমিকদের আয়ের দিক হইতে দেখিলে লক্ষণীয় যে, ২০০্ টাকার নিম্ন আয়ের শ্রমিকেরা ১৯৫১ সনে মোট যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, ১৯৫৪ সনে জুন মাসে তাহা ৭ কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছে। উপার্জ্জনের পরিমাণের এই অবনতি অর্থাৎ কর্ম্মচারী ও শ্রমিকের বেতনের হারের অবনতি ক্রমশঃ ঘটিতেছে। কিন্তু এই সময় বোম্বাই রাজ্যের শ্রমিকদের উপার্জ্জনের চিত্র ভিন্ন রূপ, ১৯৫১ সনের তুলনায় বৎসরে তাঁহাদের উপার্জ্জনের পরিমাণ প্রায় ১০০ শত কোটি টাকা বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এই শ্রেণীর গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ৯৬৭।/০ এবং বোম্বাই-এ ১৩৪৬।০ আনা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে শতকরা ৪৩ ভাগ বেশী।

আবার মালিকদের উপার্জ্জনের হিসাব তুলনা করিয়া তিনি দেখান যে, বোম্বাইয়ের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপতিরা শতকরা প্রায় তিন ভাগ অতিরিক্ত মুনাফা অর্জ্জন করিয়াছেন। সুতরাং সমস্যাটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের প্রসার ঘটিলেও জীবিকার সংস্থান বৃদ্ধি পায় না এবং শ্রমিকদের আয় না বাড়িয়া কমিয়া যাইতে থাকে। অন্য দিকে শিল্পপতিদের মুনাফার পরিমাণ —রুশ ও চীনের তুলনা দরকার নাই—এই ভারতেরই অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশী হয়। বেকার সমস্যা সমাধান করিতে হইলে ইহার প্রতিবিধান দরকার। মাঝারি ও ছোট শিল্পের দুরবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি কেবল হোসিয়ারী শিল্পের উদাহরণ দিয়া দেখান যে, ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত বাঙালী শ্রমিক অধ্যুষিত এই শিল্পের প্রসার ঘটিতেছিল। কিন্তু ১৯৫৪ সনে মোট ১৩৩৪টি কল বন্ধ হইয়াছে এবং '৫০ সনে যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা ৯ হাজার ছিল তাহা '৫৪ সনে আসিয়ামাত্র ২৩০০ দাঁড়াইয়াছে। তিনি বলেন যে, শুধু শ্রমিকদেরই যে এই দুরবস্থা ঘটিতেছে তাহা নয় ; কেরানীরাও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রের এই বিপজ্জনক লক্ষণগুলি হইতে মুক্ত নন। এক এক করিয়া তিনি আটটি বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের (বিদেশী এবং অবাঙালী) ছাঁটাই ও নূতন নিয়োগের হিসাব দিয়া দেখান যে, ঐগুলিতে মোট ৭৪৪ জন কেরানী শ্রেণীর চাকুরিয়া ছাঁটাই হইয়াছেন এবং ২৪৭ জন অবাঙালী নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। বাংলাদেশের শিল্পে ও ব্যবসায়ে বাঙালীর নিয়োগের ক্ষেত্রে এই যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তিনি তাহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, কৌজী কর্ম্মশক্তি লইয়া ইহার বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে বাংলাদেশে ও বাঙালীর জীবনে দু-তিন বৎসরের মধ্যেই এক সঙ্কট দেখা দিবে। কৃষির ব্যাপারে তিনি বলেন যে, যদিও ভূমি বিপ্লব কেবল বিনোবাজীর দ্বারাই সম্ভব, তবু দুঃখের বিষয় কংগ্রেসের মধ্যেই কেউ কেউ সন্ত বিনোবার নীতির বিরোধী। তিনি আবেদন

জানান যে, সরকার ভূমি বণ্টনের সময় যেন একেবারে ভূমিহীনদের উপরেই নজর দেন।

পশ্চিমবঙ্গে সমাজ-উন্নয়ন

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি পেশ করিতে গিয়া মুখ্যমন্ত্রী বিগত ২৮শে ফাল্গুন বিধানসভায় বলেন যে, পাঁচসালা পরিকল্পনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলায় ৫১ লক্ষ লোক সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আসিবে। এই রাজ্যের ইতিহাস ও বিশিষ্ট প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই পরিকল্পনা কাজে লাগানো হইতেছে, যাহাতে গ্রামগুলি পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু বিধানসভায় শনিবার সকালের এই বৈঠকে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট—এই দুইটি বিভাগেই মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত জোরালো সমালোচনার সম্মুখীন হন। বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা দেখান যে, এই পরিকল্পনা একটা ভ্রান্ত অর্থনৈতিক মতবাদের উপর স্থাপিত এবং ইহাতে টাকা ঢালিয়া কয়েকটি বাছা-বাছা এলাকার গ্রামকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠনের কাজ সম্প্রতি এই দপ্তরের হাতে আসার ফলে যে আশঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কবিগুরুর গ্রামসংগঠনের যে মহান্ আদর্শ লইয়া পরীক্ষা চলিতেছিল এখন তাহার পরিবর্তে একজন আই-সি-এস ডেভেলপমেণ্ট কমিশনারের আদর্শ বিশ্বভারতীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এবং ডাঃ রায় আশ্বাস দেন যে, নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী শ্রীনিকেতনের আত্মকর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে না।

কিন্তু অধ্যাপক সেন স্বীকার করেন যে, সরকারী দপ্তরের সাহায্যে শ্রীনিকেতনকে লইয়া এখন যে বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লক গঠিত হইতেছে বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য তাহার সভাপতি থাকিবেন না। ডেভেলপমেণ্ট কমিশনারই উহার পরিচালক সভার সভাপতি হইবেন এবং বিশ্বভারতীর কর্মী ছাড়া অন্য লোকও উহাতে থাকিবেন।

ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট দপ্তরে সাধারণ নীতিগত আলোচনার চেয়ে নির্দ্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগের উপরই বেশী ঝোঁক আসিয়া পড়ে। শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী গত বারের মত এবারও অসংখ্য তথ্য উপস্থিত করেন যাহা দ্বারা তিনি প্রভাবজনক ভঙ্গীতে দেখান যে, এই বিভাগে বিরাট লোকসানের আসল কারণ অসাধু অফিসার এবং তাঁহাদের ব্যাপক দুর্নীতি।

আমরা মনে করি যে, শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতীর উপাচার্য্যের আয়ত্তাধীন না থাকিলেই মঙ্গল। শ্রীনিকেতনের পূর্ব্বের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ে একমত হইবেন। তবে নূতন ব্যবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে লুকান রহিল।

সমাজ-উন্নয়নমূলক সকল কাজেই দলগত স্বার্থ ও শাসন-তন্ত্রের অধিকারীবর্গের হুকুম যত দিন প্রবল থাকিবে তত দিন উহার পরিচালনা সুষ্ঠু বা খরচের অনুপাতে উহা ফলপ্রদ হওয়া কখনই সম্ভব নয়। নিরপেক্ষ পরামর্শদাতার সর্ব্বত্রই প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা

বিগত ২৫শে ফাল্গুন কলিকাতা ময়দানে নিখিল-ভারত বয়নশিল্প সম্মেলনের যে দ্বাদশ অধিবেশন সুরু হয়, তাহাতে সভাপতি কেন্দ্রীয় উৎপাদন-সচিব শ্রী কে. সি. রেড্ডি আভাস দেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ দেশে দুইটি নূতন ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রেড্ডি আরও জানান যে, ভারত সরকার সম্ভব হইলে, প্রত্যেকটির বাৎসরিক ১০ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতাসহ আরও দুইটি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন। এই কারখানার একটি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠার বিষয় সরকার অনুকূল মনোভাব লইয়া বিবেচনা করিবেন।

শ্রীযুক্ত রেড্ডি পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী লইয়া তাঁহার বক্তৃতা সুরু করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন "পশ্চিমবঙ্গের নিদারুণ বেকার সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার অবহিত আছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের এই ভীষণ সঙ্কটের অবসান প্রচেষ্টায় তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ যাহাতে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, সেই বিষয়ে সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টার কোন ত্রুটি করিবেন না। পশ্চিমবঙ্গে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও এই রাজ্যে মধ্যাকৃতির শিল্প ও কুটীরশিল্পের প্রভূত প্রসার সাধনের ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাখা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা একটি কেন দুইটি লোহা-ইস্পাত কারখানাতেও সমাধান হইবার নয়। ঐ সকল কারখানায় শ্রমিক হিসাবে বিহারী পঞ্জাবী, অন্ধ্রদেশীয়, উৎকলবাসী ইত্যাদি হাজারে হাজারে যাইবে, বাঙালী যাইবে শতের হিসাবে। তবে মধ্যাকৃতির শিল্প ও কুটীরশিল্প ইত্যাদির প্রতিষ্ঠায় যদি প্রাদেশিক সরকার অবহিত হইতে পারেন তাহা হইলে অবস্থা কতকটা অনুকূল হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে লোকশিক্ষা

বিগত ২৭শে ফাল্গুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শিক্ষাখাতে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টায় বিতর্কে বিরোধী পক্ষ অসংখ্য অভিযোগ আনয়ন করেন। কিন্তু এই সব স্তূপীকৃত অভিযোগের পিছনে উচ্চ স্তরের বক্তৃতার কোন প্রভাব ছিল না। "যুগান্তরে"র ষ্টাফ রিপোর্টারের বিবৃতি এইরূপ:

"শুধু শেষের দিকে শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় শিক্ষা দপ্তরের দুর্নীতির ব্যাপারে বিভাগীয় মন্ত্রীকে কঠিনভাবে আঘাত করেন। তিনি বলেন যে, পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের ব্যাপার হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে, এই বিভাগের কর্ম্মচারীরা সরকারী কাজ ও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে আলাদা রাখিতে পারেন নাই। অধিকাংশ সদস্যই পাঠ্য পুস্তকের ভুল, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন পাওয়ার ব্যাপারে হয়রানি এবং স্পেশাল কেডারের শিক্ষক নিয়োগে দলীয় স্বার্থের প্রভাব সম্পর্কে সমালোচনা করেন।

বিতর্কের জবাব দিতে উঠিয়া মন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু অনেকটা সাধারণভাবে শিক্ষানীতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 'সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন করা—একটিও শিশু যাহাতে শিক্ষার সুযোগ হইতে বাদ না পড়ে।' যদি ইহা কার্য্যকরী করা যায়, তবে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট একটা সার্থকতা লাভ করিবেন। বয়স্ক শিক্ষার মত এই সার্থকতা অস্পষ্ট হইবে না।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বিতরণের বিলম্ব সম্পর্কে অভিযোগ তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি সদস্যদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, ৬০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে ডাকযোগে বেতন পাঠানো সহজ ব্যাপার নয়, গ্রামাঞ্চলে ডাকঘরগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ থাকে না বলিয়া বেতন প্রাপ্তিতে আরও বিলম্ব ঘটে।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতার পূর্ব্বে উপমন্ত্রী শ্রীপূরবী মুখার্জ্জি বিরোধী সদস্যদের সমালোচনার প্রধান বিষয়গুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁহার আত্মপ্রত্যয়শীল বলার ভঙ্গী এবং বাছিয়া বাছিয়া বিরোধী পক্ষের দুর্ব্বল যুক্তিগুলিতে কঠিন প্রত্যুত্তর দেওয়ার কায়দা কংগ্রেস পক্ষের বক্তব্যকে অনেকখানি জোরালো করিয়াছিল।"

আমাদের দেশে, অর্থাৎ সকল প্রদেশে ও কেন্দ্রীয় লোকসভায় বিরোধী পক্ষের মুখপাত্র যাঁহারা তাঁহাদের অধিকাংশই শুধু ছিদ্র অনুসন্ধানকারী তার্কিক মাত্র। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে বিরোধী পক্ষের মধ্যে কেহ না কেহ নিশ্চয়ই বর্ত্তমানে বাংলায় শিক্ষার মানের অবনতি এবং শিক্ষক ও বিদ্যার্থী উভয় পক্ষেরই অধোগতি সম্পর্কে সুচিন্তিত সমালোচনা ও গঠনমূলক বিশদ যুক্তির অবতারণা করিবেন। সেরূপ কিছুই আমরা কোথায়ও খুঁজিয়া পাইলাম না।

শিক্ষার মানের উন্নতি ভিন্ন বাঙালীর পরিত্রাণের অন্য পন্থা কিছুই নাই। শ্রমকাতর বাঙালী অন্য সকল ক্ষেত্রেই পরাজিত-প্রায়। অথচ দেশের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থার সম্যক পর্য্যালোচনায় প্রয়োজন এবং তাহার জন্য নিরপেক্ষ কমিটি স্থাপনার প্রস্তাব কেহই করিলেন না।

স্বেচ্ছাসেবকগণের সামরিক শিক্ষা

"পুণা, ১০ই মার্চ্চ—আগামী পাঁচ বৎসরে সমগ্র ভারতে পাঁচ লক্ষ ব্যক্তির সামরিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং আগামী মাসের প্রথম হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে।

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নামে পরিকল্পনাটি অভিহিত হইবে এবং প্রতি বৎসর এক লক্ষ ব্যক্তির সামরিক শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে ও এই উদ্দেশ্যে দুই শত শিক্ষা-শিবির স্থাপন করা হইবে। শিক্ষার কার্য্যকাল মাত্র এক বৎসর হইবে এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যরাই এই শিক্ষা দিবেন।"

পশ্চিমবঙ্গে ঐরূপ সামরিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি অনেক চেষ্টার ফলে এক স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে তাহার কি অবস্থা তাহা কেহ জানে না, সে খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহাই বা যথাযথ হইতেছে কিনা তাহারও কোনও সংবাদ কেহই পায় না। অথচ এক জন মন্ত্রী এই কার্য্যে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের শাসনতন্ত্রের এই অভিনব ব্যবস্থা সর্ব্বঘটেই একরূপ।

ভারতের বন্দর সংস্কার

নিয়োক্ত সংবাদটি সম্প্রতি দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে :

"নয়াদিল্লী, ১০ই মার্চ্চ—ভারতের বৃহৎ বন্দরগুলিকে আধুনিকীকরণ এবং তাহাদের সম্প্রসারণ ও সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী ভারত সরকার কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষসমূহের পরিকল্পনা কার্য্যকরী থাকাকালীন ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষকে দিবার জন্য ১৯৫৩-৫৪ সনে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দরসমূহের জন্য ১৯৫৪-৫৫ সনের সংশোধিত বাজেটে ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সনের বাজেটে ভারতের চারটি বৃহৎ বন্দরের উন্নয়নের জন্য বন্দর কর্ত্তৃপক্ষকে দিতে আগামী বৎসরে ঋণ মঞ্জুরের উদ্দেশ্যে ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।"

কলিকাতা বন্দরের রক্ষা, সংস্কার ও সম্প্রসারণ, সবকিছুই নির্ভর করে গঙ্গার বাঁধের উপর। নদীতে জলের স্রোত না থাকিলে বন্দর ত দূরের কথা কলিকাতা জনপদেরও অস্তিত্ব থাকিবে না। লোকসভায় আমাদের প্রতিনিধিবর্গ এ বিষয়ে—এবং প্রায় অন্য সকল বিষয়েও—মূকবধির বা জড়ভরত তুল্য।

রহস্যজনক সংবাদ ?

মঙ্গলবার ২৪শে ফাল্গুন 'যুগান্তর' এই সংবাদটি প্রকাশ করেন :

"সোমবার মধ্য কলিকাতায় বোমা বিস্ফোরণে জনৈক ফেরিওয়ালা ও একজন পথচারীর মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং আর একজন পথচারী আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, এই দিন এক ঝাড়ুদারনী ও ফেরীওয়ালার মধ্যে কোনও ব্যাপার লইয়া বিরোধ বাধিলে, ফেরিওয়ালাটি নিজের বাক্স হইতে একটি বোমা লইয়া মদন চ্যাটার্জ্জি লেন দিয়া ঐ ঝাড়ুদারনীকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে থাকে। পলায়মানা ঝাড়ুদারনীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া জনৈক পথচারী বিপরীত দিক হইতে

ছুটিয়া আসিয়া ঐ ফেরিওয়ালাকে জড়াইয়া ধরে। এই সময় ফেরিওয়ালার হস্তধৃত বোমাটি বিস্ফোরিত হয় এবং তাহাতে ফেরিওয়ালা ও ঐ পথচারীর মৃত্যু ঘটে। আর একজন পথচারী তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল, সে ঐ বিস্ফোরণে আহত হয়। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠান হয়। সংবাদ দিবার সময় পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।"

পত্রান্তরে উক্ত "ফেরিওয়ালা"র যে নাম প্রকাশিত হয় তাহাতে বুঝা যায় যে সে পশ্চিমা কাহার জাতীয় লোক ছিল। ঝাড়ুদারনী সম্ভবতঃ ধাঙ্গড়জাতীয়া স্ত্রীলোক। আমরা পশ্চিমা 'কাহার' কি কারণে বোমা লইয়া ঝাড়ুদারনীকে খুন করিবার চেষ্টা করে তাহা বুঝিতে অসমর্থ এবং "ফেরিওয়ালা" ঐরূপ মারাত্মক বোমা রাখিয়াছিল কেন তাহাও বুঝি না। যে ষ্টাফ রিপোর্টার উক্ত সংবাদ দিয়াছেন তাঁহার মাথায় সে প্রশ্নের উদয় হয় নাই।

আমরা এই ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত চাহিতেছি, কেননা আমরা শুনিয়াছি যে ঐ হত কাহার প্রকৃতপক্ষে ভয়ানক প্রকৃতির লোক ছিল এবং এই ব্যাপারের পিছনে আরও অনেক ঘুষ ও অন্য গূঢ় ব্যাপার ছিল।

কেন্দ্রীয় বাজেট

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ ১৯৫৫-৫৬ সনের জন্য তাঁহার পঞ্চম বাজেট পেশ করিয়া বলেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তির সময়ে সরকারী ব্যয়ের বর্দ্ধিত গতি বাজেটে প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীদেশমুখ তাঁহার বাজেটে আনুমানিক ৪২০·৪৬ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হইবে বলিয়াছেন। আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪৮৩·৮৩ কোটি টাকা। ফলে রাজস্বখাতে ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন যে, ১৯৫৪ সনকে একদিক হইতে যুদ্ধোত্তর পরিবর্ত্তনকালের শেষ বৎসর বলিয়া ধরিতে পারা যায়। খাদ্যোৎপাদনের সমূহ বৃদ্ধি, সরবরাহ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য দিকে উন্নতি ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থার অবসানের ফলে যুদ্ধকালীন অভাব-অভিযোগের অবসান ঘটিয়াছে। ১৯৫২ সনে বিনিয়ন্ত্রণের যে কার্য্য সুরু হয় ১৯৫৪ সনে মোটামুটি ভাবে তাহার সমাপ্তি ঘটে এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রে পুনরায় সরবরাহ ও চাহিদার শক্তিসমূহের অবাধ ক্রীড়া আরম্ভ হয়।

বাজেটে নিম্নলিখিত নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে :

কাগজ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি, পেষ্ট বোর্ড, কার্ডবোর্ড প্রভৃতি এবং লেবেল, বিজ্ঞাপনের সার্কুলার, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতির উপর প্রায় শতকরা ৬৭ ভাগ মূল্যানুসারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য হইবে। ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি, ড্রইং এবং কপিবুক, উপহারের কার্ড প্রভৃতির উপর প্রায় শতকরা ৪০ভাগ মূল্যানুসারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য হইবে।

শ্লেটের আমদানী শুল্ক মূল্যানুসারে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ স্থির করা হইয়াছে। ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক প্রভৃতির আমদানীর উপর প্রায় শতকরা ৬৭ ভাগ মূল্যানুসার শুল্ক দিতে হইবে। শুষ্ক ব্যাটারী এবং একিউমিউলেটর (accumulator) আমদানীর উপর প্রায় শতকরা ৩২ ভাগ এবং গগলস, সানগ্লাস প্রভৃতির উপর শতকরা ৫১ ভাগ মূল্যানুসারে শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে।

চিনির উৎপাদন শুল্ক হন্দর প্রতি ৩৮০ হইতে বর্দ্ধিত করিয়া ৫৮০ করা হইয়াছে।

সূতী কাপড়কে "অতিসূক্ষ্ম" (Super-fine) এবং "অন্যান্য" এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। অতিসূক্ষ্ম বস্ত্রের উপর প্রতি বর্গগজে দশ পয়সা এবং অন্যান্য প্রকার কাপড়ের উপর প্রতি বর্গগজে এক আনা করিয়া উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হইবে। তাঁতশিল্পের উন্নতিকল্পে গজ প্রতি তিন পয়সা করিয়া যে বিশেষ শুল্ক এত দিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল তাহাও পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে।

যে প্রকার সিগারেটের মূল্য প্রতি হাজার চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ টাকা তাহার উপর উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি পাইবে। কর তদন্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সিগারেটের উপর ধার্য্য কয়েকটি শুল্কের অদলবদল করা হইবে। অবশ্য তাহাতে রাজস্বের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

পশমের কাপড়, সেলাইকল, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক আলোর বাল্‌ব, ইলেকট্রিক ব্যাটারী, কাগজ (নিউজপ্রিন্ট বাদে অন্যান্য), কাগজের বোর্ড রং এবং বার্ণিশের উৎপাদনের উপর শতকরা ১০ ভাগ মূল্যানুসারে শুল্ক ধার্য্য হইবে।

আয়করের কাঠামোর অনেক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বার্ষিক ৭,৫০০৲ হইতে ১০,০০০৲ টাকা আয়ের পর্য্যায়ের উপর টাকাপ্রতি দুই পয়সা কর বৃদ্ধি। এতদিন পর্য্যন্ত ঐ আয়ের পর্য্যায়ের লোকেরা সাত পয়সা কর দিতেন, এখন হইতে তাঁহাদিগকে টাকাপ্রতি নয় পয়সা কর দিতে হইবে। যাঁহাদের আয় ১০,০০০৲ হইতে ১৫,০০০৲ টাকার মধ্যে তাঁহাদিগকে টাকাপ্রতি তিন আনা কর দিতে হইবে।

এতদিন পর্য্যন্ত যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদ শতকরা ২০৲ টাকা রিবেট দেওয়া হইত। নূতন বাজেটে তাহার পরিবর্ত্তে নূতন কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য মোট ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ রিবেট দেওয়া হইবে।

ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে ব্যবসায়িগণ এখন অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত তাহার জের টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এতদিন পর্য্যন্ত তাহা কেবল ছয় বৎসর পর্য্যন্ত টানা যাইত।

আমোদ-প্রমোদ এবং অন্যান্য ভাতার উপরও আয়কর দিতে হইবে।

রং এবং চামড়া ট্যান করিবার সরঞ্জাম, গঁদ, রঞ্জন, সীসা প্রভৃতির উপর আমদানী শুল্ক রহিত করা হইয়াছে।

তুলার কাপড়ের উপর রপ্তানী শুল্ক কমাইয়া শতকরা সওয়া ছয় ভাগ করা হইয়াছে।

চায়ের রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য্যের কাঠামোর পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

এতদিন পর্য্যন্ত ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম বা প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টাকা জমা দেওয়ার দরুন মোট আয়ের এক-ষষ্ঠমাংশ রিবেট দেওয়া হইত। এখন তাহা বৃদ্ধি করিয়া শতকরা এক-পঞ্চমাংশ করা হইয়াছে এবং সর্ব্বোচ্চ রিবেটের পরিমাণ ৬,০০০৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮,০০০৲ টাকা করা হইয়াছে। অবিভক্ত হিন্দু পরিবারগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

নূতন আয়করের পরিবর্ত্তনের বিবরণ "যুগান্তর" এইরূপ দিয়াছেন :

আয়করের নূতন হার

অর্থসচিব আয়করের হারে যে পরিবর্ত্তনসাধন করিয়াছেন তাহার ফলে এখন হইতে নিম্নোক্ত হারে কর আদায় হইবে :

(ক) প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তি ও প্রত্যেক একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের পক্ষে :

(১) মোট আয়ের প্রথম দুই হাজারে ০।

(২) মোট আয়ের পরবর্ত্তী তিন হাজারে টাকায় তিন পয়সা।

(৩) মোট আয়ের পরবর্ত্তী আড়াই হাজারে টাকায় সাত পয়সা।

(৪) মোট আয়ের পরবর্ত্তী পাঁচ হাজারে টাকায় তের পয়সা।

(৫) মোট আয়ের অবশিষ্ট টাকার উপর টাকায় চার আনা।

(খ) অবিবাহিত লোকদের পক্ষে :

(১) মোট আয়ের প্রথম এক হাজারে ০।

(২) মোট আয়ের পরবর্ত্তী চার হাজারে টাকায় তিন পয়সা।

(৩) মোট আয়ের পরবর্ত্তী আড়াই হাজারে টাকায় সাত পয়সা।

(৪) মোট আয়ের পরবর্ত্তী আড়াই হাজারে টাকায় নয় পয়সা।

(৫) মোট আয়ের পরবর্ত্তী পাঁচ হাজারে টাকায় ১৩ পয়সা।

(৬) মোট আয়ের অবশিষ্ট টাকার উপরে টাকায় চার আনা।

ইহা ছাড়া প্রতি ক্ষেত্রে কর-হারের বিশ ভাগের এক ভাগ সারচার্জ্জ রূপে ধার্য্য হইবে।

সুপার ট্যাক্সের হার এইরূপ :

প্রত্যেক ব্যক্তি একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবার, রেজিষ্ট্রি করা নয় এরূপ ফার্ম্ম ও অন্যান্য ব্যবসায়ী সঙ্ঘের ক্ষেত্রে মোট আয়ের প্রথম কুড়ি হাজারে—০,

মোট আয়ের পরবর্ত্তী পাঁচ হাজারে—টাকায় এক আনা,
মোট আয়ের পরবর্ত্তী পনের হাজারে— টাকায় তিন আনা,
মোট আয়ের পরবর্ত্তী দশ হাজারে—টাকায় পাঁচ আনা,
মোট আয়ের পরবর্ত্তী দশ হাজারে—টাকায় ছয় আনা,
মোট আয়ের পরবর্ত্তী কুড়ি হাজারে—টাকায় সাত আনা,
মোট আয়ের পরবর্ত্তী কুড়ি হাজারে—টাকায় আট আনা,
মোট আয়ের পরবর্ত্তী পঞ্চাশ হাজারে—টাকায় নয় আনা,
মোট আয়ের অবশিষ্ট টাকায় উপরে—টাকায় সাড়ে নয় আনা,

ইহা ছাড়া, কর-হারের কুড়ি ভাগের এক ভাগ সারচার্জ্জ হিসাবে আদায় করা হইবে।

কর অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট

সম্প্রতি কর-অনুসন্ধান কমিশন তাঁহাদের রিপোর্ট দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব কয়েক বৎসর যাবৎ ভবিষ্যৎ কর-প্রথাকে প্রভাবান্বিত করিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রায় ৩০ বৎসর আগে আর একটি কর-অনুসন্ধান কমিশন তাঁহাদের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এযাবৎ ভারতীয় কর-ব্যবস্থার কাঠামো এই প্রস্তাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরিবর্ত্তিত পরিপ্রেক্ষিতে নূতন কাঠামোর অভাব অনুভূত হওয়ায় ১৯৫৩ সনে একটি নূতন কমিশন নিয়োজিত হয় এবং ইঁহাদের সুপারিশ অনুসারেই এবারকার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের নূতন বাজেট তৈয়ার করা হইয়াছে। কমিশনের প্রধান সুপারিশ এই যে, কর বেড়াজাল সর্ব্বতোভাবে অতি অবশ্য বিস্তার করা প্রয়োজন, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সকল প্রকার কর জনসাধারণ সকলের উপর বসাইতে হইবে। ১৪০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী কমিশনের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার এত অল্প সময়ের মধ্যে যথাযথ বিচার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই পরে সুবিধামত তাঁহারা নূতন বিল উত্থাপন দ্বারা কমিশনের সুপারিশকে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করিবেন।

কমিশন ঘাটতি খরচে আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কর-কাঠামোর বিস্তৃতি এবং জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ— এই দুইটি সবচেয়ে প্রশস্ত উপায়। ভোগ্য জিনিষ ক্রয় সীমাবদ্ধ করা সর্ব্বশ্রেণীর পক্ষে অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। আয়কর দ্বারা জাতীয় জমা বৃদ্ধি ও মূলধন সৃষ্টি করার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। উচ্চ আয়ের প্রতি উচ্চ হারে কর আরোপণ করা প্রয়োজন এবং কমিটি মনে করেন না যে ইহাতে কোন মূলধন সৃষ্টির ব্যাঘাত হইতে পারে। শিল্পোন্নয়ন উৎসাহিত করার জন্য কমিশন শতকরা ২৫ ভাগ "উন্নয়ন হ্রাস" বাবদ বাদ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। নূতন মূলধন নিয়োগের উপর প্রথম বৎসরে এই "হ্রাস" পাওয়া যাইবে। লবণের উপর কর বসান কমিশন পছন্দ করেন না।

সম্পদাশুল্ক সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত এই যে, ইহা আরও নিম্ন আয়ের সম্পত্তির উপর বসান উচিত। সম্পদাশুল্কের হারও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কমিশন যে অভিমত দিয়াছেন যে ভোগ্যবস্তু ক্রয় সীমাবদ্ধ করা উচিত সে সম্বন্ধে দ্বিমত অবশ্যই হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনে করা হইত যে কম খরচ করিলেই জাতীয় জমা তথা মূলধন বৃদ্ধি পাইবে। বর্ত্তমানে অর্থনীতিবিদ্‌রা কিন্তু অন্য কথা বলেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, যতই মানুষ ভোগ্যবস্তু ক্রয় করিবে দেশের শিল্পবাণিজ্য ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে বেকার সমস্যা সমাধানের সুরাহা হইবে।

কর-অনুসন্ধান কমিশন মনে করেন যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর উপরও কর ধার্য্য অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগত ভোগের চেয়ে সামাজিক তথা জাতীয় মূলধন সৃষ্টি আগে প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলার বাজেট

পশ্চিম বাংলার বাজেটে ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হইয়াছে, অর্থাৎ ঘাটতি। চলতি বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩.২৯ কোটি টাকায়, আগামী বৎসরে ১৭.১২ কোটি টাকার ঘাটতি হইবে—ঘাটতির পরিমাণ ক্রমবর্দ্ধমান। নূতন বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হইয়াছে ৪৫.৭৫ কোটি টাকায় এবং রাজস্বখাতে খরচ হইবে ৬২.৮৮ কোটি টাকা। বাজেট ঘাটতি ব্যতীত পশ্চিম বাংলার সরকারী ঋণের পরিমাণ হইতেছে ৭.৩৫ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১১.৩৫ কোটি টাকায়। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ঋণ লইয়াছেন তাহার পরিমাণ বর্ত্তমানে ১০৪.৬০ টাকা এবং আগামী বৎসরে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৪০.৯০ কোটি টাকায়। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, পুনর্বসতি খাতে যে খরচ হইতেছে তাহার সবটাই আসিতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমির পরিমাণ অল্প হওয়ার দরুন ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নাই বলিলেই চলে। এখানে ৭ লক্ষ ভূমিহীন কৃষিকর্ম্মী-পরিবার হিসাবে গণ্য হয় এবং কৃষিজীবীদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ২১ ভাগ। পশ্চিম বাংলার ৩০ হাজার বর্গ মাইল ভূমির মধ্যে ২০ হাজার বর্গ মাইল (শতকরা ৬৬.৬ ভাগ) কর্ষণীয় ভূমি। ২০ হাজার বর্গ মাইল প্রায় ১২৮ লক্ষ একরের সমান এবং ইহার মধ্যে ১১৭ লক্ষ একর বর্ত্তমানে কৃষির অধীনে ও ১১ লক্ষ একর পতিত জমি হিসাবে আছে যাহা উন্নয়ন দ্বারা ভবিষ্যতে কর্ষণীয় জমিতে পরিণত হইতে পারে। এই প্রদেশে পতিত জমির পরিমাণ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় খুবই অল্প এবং ইহার ফলে বনজ ভূমির হ্রাস হইয়া বর্ত্তমানে মাত্র মোট ভূমির শতকরা ১৪ ভাগ আছে। বনজ ভূমির স্বাভাবিক পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হওয়া উচিত। বনজভূমির আনুপাতিক পরিমাণ হ্রাস পাওয়াতে বাংলাদেশের ভূমি বর্ত্তমানে ক্ষয়িষ্ণু এবং প্লাবনের আধিক্য বৃদ্ধি পাইতেছে। বন্যারোধের জন্য রাষ্ট্রকে টাকা খরচ করিয়া বৃক্ষরোপণ দ্বারা বনজ ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫৭.২ ভাগ অর্থাৎ ৩২ লক্ষ পরিবার কৃষিজীবী। ২৫ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবার ভূমির অধিকারী। ১১৭ লক্ষ একর জমি যদি ৩২ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে গড়পড়তায় প্রতি পরিবারে ৩.৭ একর জমি পড়ে। জীবিকা সংস্থানের জন্য প্রতি পরিবারের প্রয়োজন অন্ততঃ ৫ একর করিয়া। বাংলাদেশে ২০ হাজার ভূম্যধিকারী কৃষিপরিবারের গড়পড়তায় প্রতি পরিবারের জমির পরিমাণ ৩৩ একর বা ততোধিক। অর্থাৎ, ভূম্যধিকারী কৃষিপরিবারের মধ্যে শতকরা মাত্র .৯ ভাগ ১০.৫ লক্ষ একর জমির মালিক।

নূতন বাজেটে কোন নূতন করধার্য্য করার প্রস্তাব করা হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলায় মাথাপিছু গড়পড়তায় ৮.৩ টাকা করিয়া করভার পড়ে। উত্তরপ্রদেশে মাথাপিছু গড়পড়তায় করের পরিমাণ ৬.১ টাকা, মাদ্রাজে ৬.৬ টাকা এবং বিহারে ৩.৮ টাকা। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় খরচ অত্যধিক। অবিভক্ত বাংলার এক-তৃতীয়াংশের শাসনের জন্য বিভাগ পিছু প্রায় তিন-চার গুণ করিয়া অধিক লোক নিয়োজিত হইয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিই হইয়াছে।

বাংলাদেশের বিক্রয়কর-ব্যবস্থা অনাচারে পূর্ণ। বোম্বাইয়ে প্রায় ২০ হইতে ২৫ কোটি টাকার মত বিক্রয়কর আদায় হয়, কিন্তু সেই তুলনায় বাংলাদেশে অনধিক মাত্র ৫ কোটি টাকার মত বিক্রয় কর আদায় হয়। অথচ বোম্বাইয়ের তুলনায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ের পরিমাণ বেশী বই কম নয়। মূল হইতে বিক্রয় কর আদায়ের ব্যবস্থা করিলে আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতীয় জাতীয় আয় বৃদ্ধি

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ভারতীয় জাতীয় আয় সম্বন্ধে প্রথম বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে।' ইহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৫১-৫২ সনে ভারতীয় জাতীয় আয় প্রায় ৪৬০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সনে ভারতীয় জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯,৯৯০ কোটি টাকা। চলতি মূল্য ধারায় মাথাপিছু গড়পড়তা বাৎসরিক আয় প্রায় ২৭৪.৫ টাকা, এবং ১৯৫০-৫১ সনের তুলনায় শতকরা ৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনযাত্রার খরচের পর্য্যায়ে সত্যিকার ভাবে মাথাপিছু গড়পড়তা আয় শতকরা ২.২ হারে বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সনের তুলনায় কৃষি হইতে আয় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু শিল্প হইতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। ব্যবসা এবং যানবাহন হইতে আয়ও বাড়িয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে ২১ বৎসরে অর্থাৎ, ১৯৭৭ সনে মাথাপিছু গড়পড়তা আয় দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। ১৯৫৫-৫৬ সনে ভারতীয় জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমান করিয়াছে অর্থাৎ, পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয়ের পরিমাণ শতকরা ১১ ভাগ হিসাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। প্রথম পাঁচ বৎসরের হিসাব অনুসারে জাতীয় আয় যথাযথ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে বৃদ্ধির হার নির্ভর করিবে যদি অতিরিক্ত হারে মূলধন সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে মূলধন সৃষ্টির হার জাতীয় আয়ের শতকরা চার-পাঁচ ভাগ মাত্র। ১৯৫৫-৫৬ সন হইতে জাতীয় মূলধন সৃষ্টির হার শতকরা প্রায় ৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে মনে হয়।

ভবিষ্যতের মাথাপিছু গড়পড়তা বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি নির্ভর করিবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তথা মূলধন সৃষ্টির আনুপাতিক হিসাবে যদি যথাযথভাবে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মূলধন সৃষ্টি ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির আনুপাতিক হার বর্ত্তমানে ধরা হইয়াছে ৩:১ অর্থাৎ, তিন ভাগ মূলধন বৃদ্ধিতে এক ভাগ জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

বলা বাহুল্য, এই আয় বৃদ্ধির যে অঙ্কপাত দেখানো হইয়াছে তাহা যুদ্ধ-পূর্ব্বকালের আয় ও জীবনযাত্রার মানের সহিত তুলনা করিলে তবেই প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়।

ধান্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে চাউলের যথেষ্ট অভাব ছিল। লর্ড বয়েড্ অর্ প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মাথা নাড়িয়া অভিমত দিলেন যে,পৃথিবীতে লোকসংখ্যা অগণিত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেই অনুপাতে খাদ্যশস্যের হার বৃদ্ধি না পাওয়ায় পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব অবশ্যই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমেরিকায় গত বৎসরে এত অধিক পরিমাণে গম উৎপন্ন হইয়াছিল যে সেখানে গম চাষ হ্রাস করিতে হইয়াছে। কারণ পৃথিবীর চাহিদা কমিয়া আসিতেছে। আর চাউলের উৎপাদনও গত দুই বৎসরে অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে পৃথিবীর চাউলের অভাবও পূরণ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে বিজ্ঞগণ অভিমত দিতেছেন যে আগামী দুই-তিন শত বৎসরের মধ্যে খাদ্যশস্যের অভাব পৃথিবীতে হইবে না। এমনকি ঘাটতি ভারতবর্ষেও চাউল উৎপাদন বর্ত্তমানে অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার জন্য ভারত সরকার এই বৎসর ২।৩ লক্ষ টন চাউল রপ্তানীর জন্য অনুমতি দিয়াছেন। ভারতবর্ষে ১৯৫৪ সনের জুলাই মাস হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে রাশিয়া ও চীন ব্যতীত পৃথিবীর ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি টন; ১৯৫২ সনে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১১ কোটি টনে এবং ১৯৫৩ সনে প্রায় ১২ কোটি টনের মত ধান্য উৎপাদন হয়। ধান্যচাষ জমির পরিমাণও অভূতপূর্ব্ব হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব্ব যুগে এই জমির পরিমাণ ছিল ৬·৫৮ কোটি হেক্টার; ১৯৫২ সনে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭·৬০ কোটি হেক্টারে এবং ১৯৫৩ সনে ৭·৮৭ কোটি হেক্টার জমিতে ধান চাষ হয়। ১৯৫৪ সনে নিশ্চয়ই ধান্য উৎপাদন এবং কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫৩ সনে পৃথিবীতে ৪২ লক্ষ টন চাউল উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, এবং ১৯৫৪ সনে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৭ লক্ষ টনে। ব্রহ্ম এবং শ্যাম দেশের উদ্বৃত্তের পরিমাণই সবচেয়ে বেশী। ব্রহ্মে ১৪ লক্ষ টন এবং শ্যামদেশে ১৯ লক্ষ টন চাউল উদ্বৃত্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে বর্ত্তমানে ব্রহ্ম, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, ভীয়েটনাম, ব্রেজিল, আমেরিকা, মিশর, ইটালী এবং ভারতবর্ষ চাউল রপ্তানী করিতেছে; আর জাপান, সিংহল ও মধ্যপ্রাচ্য চাউল আমদানী করিতেছে। ভারতবর্ষ অবশ্য গত বৎসর ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী করিয়াছে।

আইন ও সমানাধিকার

ভারতের এটর্নী-জেনারেল শ্রীএম. সি. শিতলবাদ 'উইকলি ওয়েষ্ট বেঙ্গল' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে আইন ও সমানাধিকারের প্রশ্ন আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল ভারতীয় নাগরিকের নিমিত্ত সমান মর্য্যাদা এবং সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য ভারতীয় জনগণের দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষিত হইয়াছে। ঐ পবিত্র সঙ্কল্প রক্ষার্থে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় এলাকায় কোন ব্যক্তিকেই রাষ্ট্র আইনের সম্মুখে সমানাধিকার এবং আইনের নিরপেক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সংবিধানের নির্দ্দেশমূলক নীতির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঘোষিত হইয়াছে—এবং দেশের শাসনকার্য্য চালাইবার পক্ষে উহা অপরিহার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, জীবনধারণের উপযুক্ত উপায়গুলি স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের নিকট সমভাবে উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। সমাজের সম্পদ এমন ভাবে বণ্টন করিতে হইবে যাহাতে তাহা মুষ্টিমেয়ের হস্তগত না হইয়া সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে। একই প্রকার কার্য্যের জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে একই বেতন দিতে হইবে। সকল নাগরিকের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য একটি দেওয়ানী দণ্ডবিধি রচনার চেষ্টা করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রকর্ত্তৃক আইন প্রণয়নের সময় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের এই সকল দিকের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ভারতে বসবাসকারী এবং ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে কতকগুলি বাধ্যতামূলক নিয়ম মানিয়া চলিবারও নির্দ্দেশ রহিয়াছে। উহাদের মৌলিক ধারাটি হইতেছে এই যে, কাহাকেও রাষ্ট্র আইনের নিরপেক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা (equal protection) এবং আইনানুগ সমানাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। এই অস্পষ্ট নিয়মের সঠিক অর্থ গ্রহণ এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাহার নৈতিক প্রয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে পর্য্যন্ত সহজ হয় নাই। শ্রীশিতলবাদ উহার অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সংবিধানের ১৪ ধারায় বলা হইয়াছে, রাষ্ট্র কাহাকেও আইনের নিরপেক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং আইনের সম্মুখে সমানাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। রাষ্ট্র কে? সংবিধানে রাষ্ট্র বলিতে বুঝা যায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলি, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য আইনসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে। ইঁহাদের প্রত্যেকেই সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতে বাধ্য। কোন্ কোন্ ব্যাপারে ইঁহারা সমানাধিকারের নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য? আইনসভাগুলি আইন প্রণয়ন করেন, স্থানীয় ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষ অপরাপর বিধি ও উপবিধি প্রণয়ন করেন, সরকার সময় সময় কার্য্যকরী নির্দ্দেশ জারি করেন। এই সকল আইন, বিধি-উপবিধি ও সরকারী নির্দ্দেশগুলি সাধারণভাবে সকলের প্রতিই প্রযোজ্য হইতে পারে অথবা নাগরিকদের এক বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিও প্রযোজ্য হইতে পারে। অন্যান্য অঞ্চল বা রাজ্যের অধিবাসীদের যে সকল সুবিধা নাই এরূপ কোন বিশেষ সুবিধা সরকার কোন রাজ্য বা অঞ্চলের অধিবাসী-

দিগকে দিতে পারেন না। অনুরূপ ভাবে সরকার কোন রাজ্য বা অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর এমন কোন নিষেধ আরোপ করিতে পারেন না যাহা অন্য প্রদেশে নাই। একই কাজের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার বিভিন্ন মান দাবী করিতে পারিবে না। সম-পর্যায়ের কোন ব্যক্তি বিশেষ সুবিধা পাইলে ভারতের যে কোন নাগরিক অথবা ভারতে অবস্থিত যে কোন বিদেশী ব্যক্তি যে আইনের বলে ব্যক্তি বিশেষকে ঐরূপ বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকলের সমান মর্যাদার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে সকলেই সমান মর্যাদা পায় সেজন্য আইনের নিকট সকলেরই সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং সকলের প্রতি আইন যাহাতে সমভাবে প্রযুক্ত হয় সেইরূপ বিধান করা হইয়াছে। যাহাতে সকলের প্রতি সমান বিচার এবং সমান ব্যবহার করা হয় সেজন্যই সংবিধানে উপরোক্ত ধারা দুইটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আইনের সম্মুখে সকলের সমানাধিকারের অর্থ এই যে, আইন কাহাকেও বিশেষ সুবিধা দিবে না। আইনের নিরপেক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার অর্থ হইল এই যে, আইন সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। মনে রাখিতে হইবে এই ক্ষেত্রে আইন বলিতে সকল আইন, বিধি, উপবিধি এবং সরকারী নির্দেশকে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এই সম্পর্কে ভুল বুঝিলে চলিবে না। উক্ত দুইটি ধারা হইতে ইহা মনে হইতে পারে যে, অবস্থা এবং গুণাগুণ নির্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার এবং সুবিধা দাবি করিতে পারে। সেরূপ যদি হইত তাহা হইলে একজন অশিক্ষিত লোক এবং পণ্ডিতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না এবং একজন অদক্ষ শ্রমিক সর্বাপেক্ষা কুশলী কারিগরের সমান বেতন দাবি করিতে পারিত। সে ক্ষেত্রে সাম্যের বদলে অসাম্যই প্রাধান্য লাভ করিবে। সংবিধানে এরূপ কোন অবাস্তব সাম্যের কথা বলা হয় নাই। সেখানে বলা হইয়াছে যে, সমপর্যায়ের সকল লোক সমান ব্যবহার পাইবে। অবস্থার তারতম্যে আইনের প্রয়োগেরও তারতম্য ঘটিতে পারে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট তাহাদের রায়ে বলিয়াছেন যে, আইনের সমান পৃষ্ঠপোষকতা হইতে যাহাতে কেহ বঞ্চিত না হয় সেজন্য সংবিধানে যে ধারা রহিয়াছে তাহার অর্থ এই নহে যে, অবস্থা-নির্বিশেষে ভারতের সকল অধিবাসীর প্রতি একই আইন বা এক ধরণের নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে। পরন্তু তাহার অর্থ হইল এই যে, কোন আইন প্রণয়নের ফলে যেন সমপর্যায়ের লোকেদের মধ্যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা হয়। অর্থাৎ, আইনের সমান প্রয়োগ দাবি করিতে হইলে দুই ব্যক্তির সম-পর্যায়ের হওয়া অবশ্য প্রয়োজন ও তাহাদের অবস্থার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য থাকিলে চলিবে না। বিভিন্ন অবস্থার লোকদের প্রতি যদি এক ধরণের আইন প্রয়োগ করা হয় তাহার ফলে সাম্যের বদলে অসাম্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাস্তবক্ষেত্রে হয়ত কোন রাজ্যের কোন বিশেষ জেলায় বহু-সংখ্যক উপজাতীয় অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর জাতির বাস থাকিতে পারে। হয়ত ঐ রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী অগ্রসর। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যবিধান সভায় ঐ বিশেষ জেলার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করা যাইতে পারে। ঐ জেলার শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকার হইতে অধিকতর পরিমাণে অর্থসাহায্য করা যাইতে পারে বা রাজ্যের চাকুরীতে লোক নিয়োগের জন্য ঐ জেলার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার মান নিম্ন করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জেলার লোকেরা ঐরূপ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। হয়ত অনুরূপভাবে তাহারা অপর কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও ভোগ করিবে। ফলে সকল জেলার লোকেরা আইনের সমান সুবিধা পাইবে না। আইনের প্রয়োগের এই তারতম্যের কারণ বিভিন্ন জেলার অধিবাসীদের পৃথক বাস্তব পরিবেশ এবং অবস্থা। মাদক নিবারণের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর বিশেষ অবস্থা আইনের চক্ষে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং ডাক্তার, আইনজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি এইরূপ কোন আইন প্রণীত হয় যাহাতে কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের এক অংশ জুরীর বিচারের সুযোগ পায় অথচ অনুরূপ অবস্থায়ই অন্যান্যেরা সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়—তবে ঐ আইন সংবিধানবিরোধী বলিয়া গণ্য হইবে।

কোন অবস্থায় অসমান আইনের প্রয়োগ করা উচিত হইয়াছে কি না তাহা কে ঠিক করিবে? স্বভাবতঃই বিচারালয়েই উহার চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে। আইনের বিভিন্ন ধারা এবং বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বিচারক রায় দেন যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অসম আইনের প্রয়োগ ঠিক হইয়াছে কি না।

কোন আইন সাম্যনীতি বিরোধী কি না কোন্ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বিচারক তাহা স্থির করিবেন? বিভিন্ন বিচারালয়ে যে নীতি গৃহীত হইয়াছে তাহা হইতেছে সার্থক শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োগের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় বিচারক দেখিবেন বিশেষ আইনটি প্রণীত হইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ এবং বাস্তব অবস্থার যুক্তিসঙ্গত বিচার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে কিনা। কিন্তু ইহাই একমাত্র পরীক্ষা নহে। বিষয়টিকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ হইতেও বিচার করা যায়। বিচারক দেখিবেন—যে আইনকে অসম বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, সাধারণ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হইতেও তাহাকে অসম বলা যায় কিনা। এই সকল পরীক্ষা স্বভাবতঃই অস্পষ্ট এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর উহাদের প্রয়োগ নির্ভর করিবে। কিন্তু উহা অবশ্যম্ভাবী, কারণ কোন আইন মৌলিক অধিকারবিরোধী কিনা একমাত্র বিচারালয়েই তাহার সিদ্ধান্ত হইতে পারে এবং এই সকল প্রশ্নের সমাধানে বিচারকদের ব্যক্তিগত মতামত আংশিক প্রভাব বিস্তার করিবেই।

টেকনিক্যাল যোগ্যতা রহিয়াছে—যদিও উঁহাদের অধিকাংশেরই কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা নাই।

সর্ব্বক্ষণের জন্য কর্ম্মপ্রার্থীদের মধ্যে ২২১'০ (০০০) জন শারীরিক পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক ও উঁহাদের ২০২'৩ (০০০) জনের বিদ্যা ম্যাট্রিকুলেশনের নিম্নমানের।

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এরূপ সর্ব্বক্ষণের জন্য কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা ২৭৮'২ (০০০)। উঁহাদের ১৪২'২ (০০০) জন কলিকাতার বাহিরে অন্যান্য জেলাতেও কাজ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু ১২১'৩ (০০০) জন কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে চায় না।

কলিকাতায় ৮৫৭'৮ (০০০) জন সর্ব্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। উঁহাদের মধ্যে ৫০৫'১ (০০০) জন শিল্প এবং (অধস্তন) সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত, ১৬২'৪ (০০০) বাণিজ্যে, ১৪৯.৮ (০০০) জন (উচ্চতর) সরকারী কার্য্যে এবং ৩৭'২ (০০০) জন বিশেষ ক্ষেত্রে (in profession) এবং ৩'৩ (০০০) জন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। সর্ব্বক্ষণের মত কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৬৩ জন পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী, শতকরা ৩৪ ভাগ ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে আগত এবং শতকরা ৩ ভাগ ভারতের বাহির হইতে আগত বিদেশী। (রিপোর্টে যাহাদিগকে সর্ব্বক্ষণের জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহারা সকলে অবশ্য সর্ব্বক্ষণের জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত নহে।) সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ৪২'২ (০০০) জন অন্য কাজের প্রার্থী—অবশিষ্ট ৮১৫'৬ (০০০) জন কোনরূপ পরিবর্ত্তন কামনা করে না।

সর্ব্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মীদের মধ্যে শতকরা ৭৩'৪ ভাগের মাসিক আয় ১-১০০ টাকা, শতকরা ১৭'২ ভাগের ১০১-২০০ টাকা, শতকরা ৪'৮ ভাগের ২০১-৩৫০ টাকা এবং মাত্র শতকরা ৩'৫ ভাগের ৩৫০ টাকার উপর। শতকরা ১'১ ভাগের আয়ের হিসাব পাওয়া যায় নাই।

'কোন কাজ নাই অথচ যাহারা কোনরূপ কর্ম্মপ্রার্থী নহে তাহাদের মোট সংখ্যা ' ১৬৮'০ (০০০)। উঁহাদের অধিকাংশেরই বয়স হয় খুব বেশী না হয় খুবই কম।

তরুণ সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা

করিমগঞ্জের ছাত্র এবং তরুণদলের একাংশের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া ২১শে মাঘ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা "যুগশক্তি" লিখিতেছেন যে, যদিও যুবকদের বৃহদংশকে বিভিন্ন জনকল্যাণকর এবং সমাজসেবামূলক কার্য্যে সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, তথাপি স্বাধীন দেশের যুবকসমাজ যাহাদের হস্তে ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের ভার তাহাদের একাংশের মধ্যেও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসার দেখিলে দেশপ্রেমিকমাত্রই বেদনাবোধ না করিয়া পারিবেন না।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "প্রকাশ, এবার সরস্বতী পূজার পূর্ব্ব রাত্রে একদল যুবক বা ছাত্র স্থানীয় বালিকা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ছাত্রীদের রোপিত কদলীবৃক্ষ কাটিয়া দিয়াছে ও পূজাপ্রাঙ্গণ জঘন্যভাবে অপবিত্র করিয়াছে; পূজার ফুল তুলিতে গিয়া শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সব্জীবাগান নষ্ট করিয়া সব্জী সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে, বাঁশ চাটাই ইত্যাদি চুরি হইয়াছে।" এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতায় শহরের কোন কোন দায়িত্বশীল পদাধিকারী যুবকও নাকি যোগদান করিয়াছিল।

অনতিবিলম্বে এইরূপ কার্য্যকলাপ বন্ধের আবেদন জানাইয়া পত্রিকাটি ঐ বিষয়ের প্রতি স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক সংস্থা, ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠান এবং অভিভাবক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির ত্রুটি

কলিকাতায় এক সাম্প্রতিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া বলেন যে, কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট এবং প্রজাসমাজতন্ত্রী প্রভৃতি সকল ভারতীয় দলেরই তিনটি বিশেষ ত্রুটি রহিয়াছে, যথা—প্রথমতঃ, 'ভাড়াকরা সভ্য' (hired membership), দ্বিতীয়তঃ, সকল পার্টিরই কেবলমাত্র উচ্চতম কমিটিগুলি কাজ করে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্থানীয় এবং জেলা কমিটিগুলি নিষ্ক্রিয় থাকে এবং সকল কাজে নির্দ্দেশ ও প্রেরণার জন্য উচ্চতর কমিটিগুলির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, তৃতীয়তঃ, সকল পার্টিই ধনীদের নিকট হইতে টাকা লয় এবং দরিদ্রদিগের নিকট হইতে ভোট পায়।

বর্দ্ধমানের গ্রামাঞ্চলে অরাজকতা

বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অধীন এলাকাতে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের সংঘটন এবং সেই সম্পর্কে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করিয়া "দামোদর" ২০শে ফাল্গুন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে রায়না ইউনিয়নের হাজপুর গ্রামে দুই ভগিনীকে কে বা কাহারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঐ ব্যাপারে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার বিশেষ উল্লেখ করিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন, "আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, থানা হইতে উক্ত স্থান বেশী দূরে না হওয়া সত্ত্বেও এবং ঘটনার পরদিন প্রাতে থানায় সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও পুলিস এত বড় ব্যাপারেও সন্ধ্যায় উপস্থিত হয় এবং তাহার পর চলিয়া গিয়া এক দিন পর বিভিন্ন স্থানে খানা তল্লাস করে।" পুলিস ঐ হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা করিতে পারে নাই। ১৯৫৪ সন হইতে ঐ অঞ্চলে যতগুলি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল পুলিস তাহার কোনটিরই কিনারা করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলেই জমিদারের লাঠিয়ালের আক্রমণে কয়েকজন কৃষক গুরুতররূপে আহত হন। রায়না পুলিস সে সংবাদ পাইয়াও ঘটনাস্থলে আসিল কয়েকদিন পর। "আশ্চর্য্যের কথা বর্দ্ধমানের সহকারী পুলিস অধ্যক্ষ যেদিন ঘটনাস্থলে আসিলেন, তখন থানার দারোগাকে তাঁহার সহিত দেখা গেল। তাহার পূর্ব্বে তিনি নাকি অবসর পান নাই।"

বর্দ্ধমানে পুলিসের অধ্যক্ষ মহাশয়কে পুলিসের ঐরূপ বহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি সমাপ্ত করা হইয়াছে।

ডাকাতির প্রতিরোধ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে রক্ষীবাহিনীর কার্য্যকলাপের এক বিবরণী দিয়া "উইকলি ওয়েষ্ট বেঙ্গল" পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, ১৯৫৫ সনের জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন অঞ্চলের রক্ষীবাহিনীগুলি পুলিসের সহযোগিতায় কতিপয় ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন।

২৪ পরগণার গৈঘাটা থানা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রক্ষীবাহিনীর সহায়তায় এক বাড়ীর ভৃত্য এক পলায়মান দস্যুকে গ্রেপ্তার করে। সেই ডাকাতের আইন-বহির্ভূত (extra-judicial) স্বীকৃতির ভিত্তিতে দলের অপর একটি দুর্বৃত্তকে মালসহ গ্রেপ্তার করা হয়। পূর্ব্বেই খবর পাইয়া পুলিস শেওরা-ফুলীতে আনন্দপ্রসাদ দোকানে ডাকাতির উদ্দেশ্যে সমবেত ছয় জন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের নিকট হইতে দেশী বন্দুকের কয়েকটি অংশ, কার্তুজ এবং অন্যান্য আপত্তিকর দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

পশ্চিম দিনাজপুরের হেমতাবাদ থানায় পুলিস এবং রক্ষী-বাহিনীর সময়মত হস্তক্ষেপের ফলে একটি পরিকল্পিত ডাকাতির প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তথায় দস্যু দলের সহিত পুলিসের সংঘর্ষে পুলিস ও রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন আহত হন। বাধ্য হইয়া পুলিসকে গুলী চালনা করিতে হয় ফলে বর্শা, তীর, ধনুক প্রভৃতি সহ দুই জন আহত ডাকাত গ্রেপ্তার হয়। অপর এক স্থলে ডাকাতির সংবাদ পাইয়া মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত সলিম-পুরের রক্ষীবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসে এবং পলায়মান ডাকাত-দের একজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে দেখা যায় যে ধৃত দুর্বৃত্ত একজন পাকিস্থানী। গত ১০শে জানুয়ারী এক দল দুর্বৃত্ত যখন ডাকাতি করিতে যাইতেছিল তখন কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থানার মোরাগঞ্জ পুলে পুলিস তাহাদের সাত জনকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের নিকট হইতে অনেক বড় বড় কাটারী এবং ছুরি প্রভৃতি উদ্ধার করা হয়।

উক্ত রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, গ্রাম রক্ষীবাহিনীর তৎপরতার ফলে গত ডিসেম্বর মাসে বর্দ্ধমানে রায়না থানায় ডাকাতির এক প্রয়াস ব্যর্থ হয়। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল হইতেও রক্ষী-বাহিনীর অনুরূপ তৎপরতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের অসৌজন্য

সরকারী কর্ম্মচারিগণের অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের সমালোচনা করিয়া ২৫শে ফাল্গুন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন যে, যদিও প্রতি বৎসর বিভিন্ন সরকারী আপিসে "সৌজন্য সপ্তাহ" আড়ম্বরে সরকারে পালন করা হয় তথাপি সরকারী কর্ম্মচারীদের সৌজন্যবোধের যে উন্নতি ঘটিয়াছে সে কথা বলা চলে না। "যে কোন সরকারী আপিসে গেলেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। জনসাধারণ কিছু জানিতে গেলে কিংবা কোন কার্য্য উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের কোন সাহায্য লইতে গেলে সেখানকার কর্ম্মচারীরা যেরূপ বিরক্তির সহিত ব্যবহার করে বা প্রশ্নের জবাব দেয় তাহাকে সৌজন্যপূর্ণ বলা চলে না।"

সরকারী আপিসে পত্র লিখিয়া সহজে উত্তর মিলে না; বঙ্গবাণী লিখিতেছেন, "জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসে, এস. ডি. ও'র আপিসে চিঠি লিখিয়া কবে যে তাহার উত্তর পাওয়া যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা থাকে না; এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের হইয়াছে। জনসাধারণের কোন কাজে পূর্ব্ব হইতে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াও অফিসারগণের দেখা পাই নাই। তাঁহারা কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। Engagement বাতিল হইল এ কথা জানাইয়া দিবারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই কিংবা এইরূপ ব্যবহার করিতে তাঁহাদের সৌজন্যবোধ কিংবা কর্ত্তব্যজ্ঞান বাধা দেয় নাই। সাংবাদিক হিসাবে প্রাক্ স্বাধীনতা কালের বহু সাহেব আই-সি-এস অফিসারদিগের সহিত আমাদিগকে যোগাযোগ রাখিতে হইত এবং জনসাধারণের কাজে প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদিগের সহিত দেখাসাক্ষাৎও করিতে হইত, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও এইরূপ নির্ব্বিকারচিত্তে 'engagement' ভঙ্গ করিতে দেখি নাই। যদি কখনও অনিবার্য্য কারণে উহা করিতে হইত তাহা হইলে তাঁহারা পূর্ব্বেই তাহা সাক্ষাৎপ্রার্থীকে জানাইয়া দিতেন।"

জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব

১২ই ফাল্গুন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ভারতী" হরিপুর মহকুমার দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন যে, পুনঃ পুনঃ আলোচনা সত্ত্বেও মহকুমার অবস্থার প্রায় কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই। সরকার পক্ষ হইতে দুরবস্থার প্রতিকারকল্পে কোন চেষ্টার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মহকুমার দুর্ভাগ্যে স্থানীয় জনসাধারণের "অলৌকিক নিষ্ক্রিয়তা ও সকলপ্রকার আন্দোলন বিমুখ মনোভাবে"র উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "সমস্যাকণ্টকিত অনগ্রসর এই মহকুমার প্রতিনিধিত্ব করিতে হইলে বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যগণের যে পরিমাণ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত দুঃখের বিষয় কার্য্যক্ষেত্রে তাহার অভাবই পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের জনপ্রতিনিধিদের অপেক্ষাকৃত অধিক কর্ম্মোদ্যমের উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি স্থানীয় প্রতিনিধিদিগকে সক্রিয় হইবার অনুরোধ জানাইয়া লিখিতেছেন, 'বঞ্চিত অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্যের মনোভাব স্বাভাবিক কিন্তু যাঁহারা ইঁহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন তাঁহারা যদি আশাবাদী ও সক্রিয় না হন তবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এই মহকুমার ভাগ্য পরিবর্তন করা সুদূর পরাহত।"

রাজ্যবিধান সভার বাজেট অধিবেশনে উক্ত মহকুমার দুরবস্থার

প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যে সুযোগ জনপ্রতিনিধিবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহারের পরামর্শ দিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন, সীমান্তের গোলযোগ, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রভৃতি প্রশ্ন যদি জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ঠিকমত পেশ করিতে পারেন ও ইহার প্রতিবিধানকল্পে সচেষ্ট থাকেন তবে তাহাতে যে কোন ফলোদয় হইবে না ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।"

বালুরঘাটে কয়লার অভাব

১৬ই ফাল্গুন "আত্রেয়ী" পত্রিকায় এক সংবাদে বালুরঘাট মহকুমায় কয়লার বিশেষ অভাবের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাটির বিশেষ প্রতিনিধি এই প্রসঙ্গে গত বৎসর ফাল্গুন মাসে অনুরূপ কয়লাসঙ্কটের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কয়লার অভাব হেতু স্বাভাবিক সময়েও অপ্রতুল জ্বালানী কাঠের মূল্যও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, চোরা-কারবার বন্ধের ঘোষিত উদ্দেশ্যে সরকার সীমান্ত অঞ্চলে কয়লার উপর যে নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতেই ঐরূপ সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে প্রকাশ, স্থানীয় বিক্রেতাদিগকে নাকি উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করা হয় না। উক্ত বিশেষ প্রতিনিধির সংবাদ অনুযায়ী বালুরঘাটে যে ৭।৮ জন কয়লা বিক্রেতা রহিয়াছেন তাহাদের অনেকেই নাকি কয়লা পানেন না বা আনিতে পারেন না।"

"আত্রেয়ী"তে প্রকাশিত অপর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, কয়েক মাস যাবৎ হিলিতেও নাকি কয়লা পাওয়া যাইতেছে না। "কচিৎ কখনও চোরাবাজারে কয়লার সাক্ষাৎ মিলিলেও তাহার মূল্য পাঁচ-ছয় টাকা মণ।" ফলে জনসাধারণকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

বসিরহাট মহকুমার মেছোঘেরী সমস্যা

বসিরহাট মহকুমার মেছোঘেরীগুলির উচ্ছেদ করিয়া এবং সেই সকল স্থান হইতে লবণাক্ত জল অপসারণ করিয়া জমিগুলিকে চাষযোগ্য অবস্থায় আনিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া ১লা ফাল্গুন "সংগঠনী" পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে: মেছোঘেরীগুলি অপসারণের জন্য কৃষক সাধারণের ব্যাপক দাবির উল্লেখ করিয়া "সংগঠনী" লিখিতেছেন, "হাড়োয়া থানা-গোবোড়িয়া জলকর ১০,১১,১২ ও মালঞ্চ ইউনিয়নের ৮২ নম্বর লাটের মেছো-ঘেরীতে লোনা জল প্রবেশ করাইয়া কয়েক হাজার চাষী এবং চাষের যে কি ব্যাপক সর্ব্বনাশ এই সকল অর্থলিপ্সু জমিদার ডাকিয়া আনিতেছে প্রতি বৎসরই সে বিষয়ে সরকারকে ওয়াকিবহাল করান হইয়া থাকে।" কিন্তু সরকার বিশেষ কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

পত্রিকাটির অভিমতে, "সরকারের কর্ত্তব্য এই জমিগুলি জমিদার ও লাটদারদের লুব্ধ ও অত্যাচারী হাত হইতে উদ্ধার করিয়া জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে লোনা জল সরাইবার ব্যবস্থা করিয়া চাষীর নামে জমি রেকর্ড করিবার সহায়তা করা।"

বসিরহাট মহকুমার ঐ জমিগুলিতে চাষ হইলে প্রায় ১০।১২ হাজার বেকার কৃষক অথবা ক্ষেতমজুর কাজ পাইবে এবং অতিরিক্ত আট-দশ লক্ষ মণ ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়া পত্রিকাটি অনুমান করেন।

বারাসতের বাসপথের অসুবিধা

২৩শে ফেব্রুয়ারী বারাসতের দক্ষিণ পাড়ায় ডাকবাংলার সম্মুখে যশোহর রোডের উপর বিপরীত দিক হইতে আগত ৭৯বি এবং ৭৯ নম্বর যাত্রী বোঝাই দুইটি বাসের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয় বলিয়া ১৬ই ফাল্গুন "বারাসত বার্তা" সংবাদ দিতেছেন। উক্ত দুর্ঘটনায় অবশ্য কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বারাসতের বাস চলাচলের রাস্তার অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে:

"যশোহর রোডের এই স্থানটি অর্দ্ধগোলাকাররূপে বাঁকিয়া গিয়াছে এবং এখানেই দার্জ্জিলিং রোড (কল্যাণী কংগ্রেসের পথ) নামে পরিচিত নূতন সড়ক সংযুক্ত হইয়াছে। উক্ত সড়কে কৃষ্ণনগর রোডের যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া যেরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে, তদ্রূপ চালকের যথেষ্ট নিপুণতা না থাকিলে ঐরূপ বাঁকে গাড়ীর গতি ও পথ রক্ষা আদৌ সম্ভব নহে। ফলে স্থানটি একটি দুর্ঘটনার স্থল নতুবা হইয়াছে। পথচারীর পক্ষে এটি বিপৎসঙ্কুল—গত কয়েক মাস পূর্ব্বে জনৈক পথচারী উক্ত স্থানে শোচনীয় দুর্ঘটনার মুখে প্রাণ দিয়াছে।"

মুর্শিদাবাদের খনিজসম্পদ

"মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় ১০ই ফাল্গুন সংখ্যায় উক্ত জেলার খনিজসম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, মুর্শিদাবাদের কালেক্টর নাকি কান্দী মহকুমার বিভিন্ন অফিসে এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, কান্দী মহকুমার কান্দী, ভরতপুর ও বড়োয়া থানার সম্পূর্ণাংশ এবং খড়গ্রাম থানার ঝিল্লী, মিরহাটি, বিশ্বনাথপুর, শালদহ, পুনরাপাড়া, গোপীনাথপুর, পারুলিয়া প্রভৃতি মৌজা ভূতাত্ত্বিক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সরকারের প্রয়োজন হইতে পারে। ভারত সরকারের সহিত মার্কিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম তেল কোম্পানীর যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার সর্ত্ত অনুযায়ী জিওফিজিক্যাল সার্ভিস ইণ্টারন্যাশনাল নামক প্রতিষ্ঠান ঐ সকল স্থানে খনিজ তৈলের অনুসন্ধান করিবেন। আইনঘটিত বাধা-নিষেধের ফলে যাহাতে ঐরূপ অনুসন্ধানকার্য্য ব্যাহত না হয় সেজন্য ১৮৯৪ সনের ভূমি গ্রহণ আইনের চতুর্থ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল আদেশ জারি করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়া মুর্শিদাবাদ সমাচার লিখিতেছেন যে,

মুর্শিদাবাদ জেলার কোন্ কোন্ স্থানে খনিজসম্পদ রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান শেষ হইতে সময় লাগিবে। "অনুসন্ধান সাফল্যমণ্ডিত হইলে জেলার উপকার হইবে। যুগযুগান্তর হইতে মুর্শিদাবাদের অধিবাসী কৃষিকার্য্য ও হস্তচালিত বয়নশিল্প লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে। জেলার ভূগর্ভ হইতে খনিজের সন্ধান পাওয়া গেলে কৃষিপ্রধান মুর্শিদাবাদের পক্ষে শিল্পপ্রধান হওয়ার উপায় হইবে। কাজেই জেলাবাসীর পক্ষে ইহা সুখবর ছাড়া কিছুই নয়।"

শিক্ষক-সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকগণের সন্তান-সন্ততিবর্গ যাহাতে অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী ছাত্রের পিতা যে স্কুলে শিক্ষকতা করেন সেই উচ্চ-বিদ্যালয়ে এখন হইতে ঐ ছাত্র বিনা বেতনে পড়াশুনা করিবার সুযোগ পাইবে। যাহাতে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়, সেজন্য সরকার হইতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য দেওয়া সর্ত্তাবলীর সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঐ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সরকারী সাহায্যলাভের অন্যতম সর্ত্তরূপে গণ্য হইবে।

এই ব্যবস্থা অতি সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি।

গ্রাম্য তৈলশিল্প

ভারত পৃথিবীর অন্যতম তৈলবীজ-উৎপাদক। প্রতি বৎসর পৃথিবীতে আনুমানিক তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ভারতের অংশ পঞ্চাশ লক্ষ টন। তৈলবীজের অল্প অংশ চাষের বীজ, রপ্তানী এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারে লাগে। বাকী অংশ মিল এবং ঘানিতে তৈলে পরিণত করা হয়। ১৯৫২-৫৩ সনে ভারতে আনুমানিক এগার লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন হয়। উহা ব্যতীত ঐ বৎসর এক লক্ষ টন নারিকেল তৈল উৎপাদিত হয়।

ভারতে তৈলের ব্যবহার অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্তই অল্প। আনুমানিক দশ হইতে এগার লক্ষ টন বার্ষিক উৎপাদনের ভিত্তিতে হিসাব করিলে ভারতে মাথাপিছু তৈল ব্যবহারের পরিমাণ দৈনিক ·৩৫ আউন্সে দাঁড়ায়। পুষ্টিবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি দৈনিক তৈল ব্যবহারের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ দুই আউন্স হওয়া উচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় পরিকল্পনা কমিশন স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৫০-৫১ সন অপেক্ষা ১৯৫৫ সনে তৈলবীজের উৎপাদন চার লক্ষ টন বৃদ্ধি করা হইবে।

ভারতে প্রায় চার লক্ষ ঘানি আছে, ইহাতে বার্ষিক কুড়ি লক্ষ টন তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করা যাইতে পারে। কিন্তু ঘানিগুলিতে বৎসরে মাত্র দশ লক্ষ টন তৈলবীজ পিষ্ট হয়, অর্থাৎ উহার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অকেজো থাকে। কেবলমাত্র দুইটি রাজ্য —মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশেই শতকরা নব্বইটি ঘানি রহিয়াছে। সাম্প্রতিককালে তৈলমিলের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তৈলশিল্প ক্রমশঃ শহরমুখী হইয়াছে। ভারতে বর্ত্তমানে প্রায় এক হাজার রেজিষ্টার্ড তৈলমিল রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও বহু মিল রহিয়াছে, যেগুলি রেজিষ্ট্রি করা হয় নাই। ঐ সকল মিলে বৎসরে ছয়-সাত মাস কাজ হয় এবং তাহাতে ত্রিশ হইতে চল্লিশ লক্ষ টন তৈলবীজের পেষণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৯৪৯-৫০ সনে মিলগুলিতে ২২·১২ লক্ষ টন এবং ঘানিগুলিতে ১১·৫৬ লক্ষ টন তৈলবীজ পিষ্ট হয়।

গ্রামের ঘানিগুলির সম্মুখে প্রধান সমস্যা হইল উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচামালের অভাব। ঘানির তুলনায় বহুগুণে বিত্তবান মিলগুলি কাঁচামাল কিনিয়া প্রচুর পরিমাণে গুদামজাত করিয়া রাখিতে পারে ফলে ঘানির তুলনায় মিলগুলি বেশী কাঁচামালের সরবরাহ পায়।

ঘানি এবং মিলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতায় উভয় পক্ষ হইতেই সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া হয়। মিলের পক্ষ হইতে তৈল-নিষ্কাশনে অধিকতর দক্ষতার উল্লেখ করা হয়; অপর দিকে ঘানির সমর্থনে ঘানি তৈলের উচ্চমান এবং অধিকতর সংখ্যায় কর্ম্মী নিয়োগের সুবিধার উল্লেখ করা হয়।

দেখা গিয়াছে যে, মিলের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তৈলশিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। সর্ব্বশেষ সেন্সাসের হিসাবে, ভারতের ঘানিগুলিতে প্রায় দুই লক্ষ ব্যক্তির কর্ম্ম-সংস্থান হইতেছে কিন্তু এই সংখ্যা কম করিয়া ধরা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভারতে চার লক্ষ ঘানি রহিয়াছে অথচ কর্ম্মীর সংখ্যা মাত্র দুই লক্ষ হইতে বুঝা যায় যে অনেক ঘানিই এখন আর চলে না। ১৯২১ সন হইতে ১৯৫১ সন এই ত্রিশ বৎসরে তৈলশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা তিন লক্ষ হ্রাস পাইয়াছে, ঐ একই সময়ে মিলগুলিতে মাত্র ৪০,০০০ অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছে।

যান্ত্রিক দিক হইতে মিলগুলির তুলনায় ঘানি কম কর্ম্মদক্ষ নহে। ঘানিতে তৈলবীজ হইতে শতকরা ৩৭।৩৮ ভাগ তৈল নিষ্কাশিত হয়, মিলে হয় প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ। কিন্তু কতকগুলি কারণে মিলগুলির উৎপাদন-দক্ষতার পরিপূর্ণ সুযোগ পাওয়া যায় না। যেমন, মিল-উৎপাদনে গ্রামাঞ্চল হইতে দূরে অবস্থিত মিল এলাকায় তৈলবীজ বহন করিয়া আনিতে হয়; ফলে পথে কিছু বীজ নষ্ট হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ঘানিসমূহের বেলায় এই অসুবিধা নাই। দ্বিতীয়তঃ, মিল-উৎপাদনের জন্য বীজ বহুদিন যাবৎ গুদামজাত করিয়া রাখিতে হয়, ফলে বীজের গুণাবলী নষ্ট হয় কিন্তু ঘানির ক্ষেত্রে তাহা হয় না। উপরন্তু ঘানির খইলে অধিকতর পরিমাণে তৈল থাকায় গরু, মহিষের খাদ্য হিসাবে সেগুলির উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। তদুপরি মিলের তৈল প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হওয়ার দরুন এবং অধিকতর দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া যাইতে হয় বলিয়া ঐ তৈলে ভেজাল মিশাইবার সুযোগ বেশী থাকে, কিন্তু অল্প পরিমাণে উৎপন্ন এবং স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত ঘানির তৈলের ক্ষেত্রে সেরূপ করা সহজ নহে।

এই অবস্থায় গ্রাম্য তৈলশিল্পের উন্নতিবিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করিয়া পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন, (১) তৈলমিলশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতে দেওয়া হইবে না, (২) ঘানিগুলি আহার্য্য তৈল উৎপাদন করিবে এবং মিলগুলি

ন্ত্রাংশ তৈল উৎপাদনের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, এবং (৩) মিলে প্রস্তুত আহার্য্য তৈলের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হইবে।

নিখিল-ভারত খাদি ও পল্লীশিল্প বোর্ড মিলে উৎপন্ন আহার্য্য তৈলের উপর মণপ্রতি ১।০ আনা শুল্ক ধার্য্যের পরামর্শ দিয়াছেন। এই উপায়ে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা ঘানিশিল্পের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে। তৈলবীজ সংগ্রহে এবং তাহা সংরক্ষণের জন্য গুদাম ভাড়া দেওয়া, ঘানিতৈলকে অর্থসাহায্যের জন্য এবং ঘানি-প্রথার দক্ষতার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত গবেষণাকার্য্যের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করিবার বোর্ড পরামর্শ দিয়াছেন। ঘানিতে তৈল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তৈলবীজ যাহাতে অল্প ব্যয়ে সংরক্ষিত করা যায় তজ্জন্য বোর্ড রাজ্য সরকারগুলিকে গ্রামাঞ্চলে গুদাম তৈয়ার করিয়া নামমাত্র অর্থ লইয়া ভাড়া দিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তৈলবীজের ফাটকাবাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য বোর্ড সরকারকে তৈল-বীজের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিবার জন্যও পরামর্শ দিয়াছেন।

বোর্ডের সুপারিশ কার্য্যে পরিণত করিলে ঘানিগুলিতে প্রতি বৎসর অতিরিক্ত কুড়ি লক্ষ টন তৈলবীজ পেষণ করা যাইবে। ফলে কর্ম্মীর সংখ্যা শতকরা দুই শত ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং ষোল কোটি টাকা মজুরী বৃদ্ধি পাইবে। এই অতিরিক্ত আয় সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে বিতরিত হওয়ার ফলে তৈলশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

এ. আই. সি. সি. ইকনমিক রিভিউ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে উক্ত তথ্যাবলী পরিবেশন করিয়া বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রণালয়ের শীঘ্রই তৈল-নিষ্কাশন শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিবেন। তবে ঐ কমিটি বিশেষভাবে তথ্যানুসন্ধানের কার্য্যই করিবেন। অধিকাংশ সভ্যেরই সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে—উহার ফলে কমিটির উপযোগিতা বিশেষ হ্রাস পাইবে।

তৈলবীজ পরিসংখ্যান

তৈলবীজ ভারতের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ভারতে বর্ত্তমানে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হয়। তাহাতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ৪০ লক্ষ টন মিল ও ঘানিগুলিতে পিষ্ট হইয়া তৈলে পরিণত হয়।

ভারতের প্রধান পাঁচটি তৈলের উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ সাড়ে বার লক্ষ টন। জনসাধারণের চর্ব্বিজাতীয় খাদ্যের একটি প্রধান উৎস এই সকল উদ্ভিজ্জ তৈল। বহু শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল হিসাবেও এই সকল তৈলের ব্যবহার হয়। তদুপরি এই সকল তৈল ভারতের রপ্তানী দ্রব্যগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান সামগ্রী। ১৯৫২-৫৩ সনে ঐরূপ তৈল রপ্তানী করিয়া ভারত ২৮ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রা উপার্জ্জন করে।

উপরি-উক্ত তথ্যগুলি "ভারতীয় তৈলবীজ পরিসংখ্যান" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকটির বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে, "ভারতের তৈলবীজ—১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫২-৫৩।" উহাতে তৈলবীজ সংক্রান্ত আরও বহুবিধ তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, একটি ভূমিকাতে বিশ্বের বাজারে তৈলবীজ সরবরাহ এবং চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তৈলবীজ অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের আলোচনা করা হইয়াছে।

রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন ও বিহার

রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের বিহার সফরকালে বিহারে যে উচ্ছৃঙ্খলতার অনুষ্ঠান ঘটিয়াছিল সেই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "নবজাগরণ" লিখিতেছেন, "বিহার সরকার কমিশন নিয়োগ ও তাহার তথ্যানুসন্ধান আদৌ পছন্দ করেন নাই এবং কেন যে পছন্দ করেন নাই তাহা বিজ্ঞজনের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কিন্তু সরকার যে তাঁহাদের স্বার্থ হাসিল করিতে এতদূর যাইতে পারেন তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস বলিয়া মনে হইত না। যাহারা তাঁহাদের সপক্ষে নয় তাহাদের ভীত, (সন্ত্রস্ত ?) ও উৎপীড়িত করাইতে সরকার যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয় প্রদেশে সত্য ও ন্যায়ের কোন স্থান আছে কি না ?"

কাশ্মীরে বিরোধীদলের আবির্ভাব

কাশ্মীর বিধানসভায় নবগঠিত বিরোধীদলের আবির্ভাব সম্পর্কে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "কাশ্মীর পোষ্ট" লিখিতেছেন যে, বিধানসভায় বিরোধীদলের আবির্ভাব একটি অভিনন্দন-যোগ্য ঘটনা, কিন্তু তথাপি উহার মধ্যে একটি অস্বাস্থ্যকর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। বিরোধী সকল সদস্যই জাতীয় কনফারেন্সের প্রাক্তন সভ্য ; বর্ত্তমানে দলত্যাগ করিয়া নূতন দল গঠন করিয়াছেন। যদি ঐ সকল সভ্য বিধানসভা হইতে পদত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নূতন নীতির ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত হইতেন তবে তাঁহাদের সম্পর্কে জনসাধারণের কোন সন্দেহ থাকিত না। কিন্তু তাহা না করাতে নূতন দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বহু সন্দেহ থাকিয়া গিয়াছে। কারণ নবগঠিত বিরোধীদলের নেতা যিনি সেই হামদানি স্বয়ং এক বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান সরকারের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। বিরোধী-দলের অপর একজন প্রধান সদস্য মিঃ আবদুল গণি ১৯৫৩ সনের আগষ্ট মাসে শেখ আবদুল্লার অপসারণের সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, সকলেই জানেন যে মিঃ হামাদানি এবং মিঃ গণি দুই জনেই উপমন্ত্রীত্বের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বাভাবিকরূপেই জনসাধারণ আত্মস্বার্থে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিবৃন্দ লইয়া গঠিত বিরোধীদলের আবির্ভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। ভূতপূর্ব্ব রাজস্বমন্ত্রী মির্জা আফজল বেগ কর্ত্তৃক বিরোধীদলে যোগদানের সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়া "কাশ্মীর পোষ্ট" আশা প্রকাশ করিয়াছেন

যা, মিঃ বেগ নিশ্চয় রাজ্যের ক্ষতিকর, বিশেষতঃ ভারত ও কাশ্মীরের বন্ধুত্বের হানিকর, কোনরূপ আচরণ করিবেন না।

উক্ত পত্রিকার ৬ই মার্চ্চ সংখ্যায় আর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে রাজ্যবিধান সভার বিরোধীদলের কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। বিরোধীদলের পক্ষ হইতে হাকিম হাবিব উল্লা কাশ্মীর সরকারের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, সস্তায় খাদ্যের প্রলোভন দেখাইয়া কাশ্মীরীদিগকে ভারতের ক্রীতদাসে পরিণত করা হইয়াছে। এই উক্তির কঠোর সমালোচনা করিয়া "কাশ্মীর পোষ্ট" লিখিতেছেন যে, যাহার নীতি কাশ্মীরকে দুর্ভিক্ষের কবলে লইয়া আসিয়াছিল সেই আকজল বেগ এবং তাহার সহচরদিগের নিকট হইতে এই আচরণ অবশ্য বিশেষ অপ্রত্যাশিত নহে। কিন্তু আকজল বেগ এবং তাঁহার দলীদের স্মরণ রাখা উচিত যে ভারত কাশ্মীরকে ক্রীতদাস করিবার জন্য খাদ্য সরবরাহ করে নাই। যে মুহূর্ত্তে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির অনুষ্ঠানপত্র স্বাক্ষরিত হয় তখন হইতেই ভারত আইন এবং শাসন উভয় সম্মত ভাবেই নিজের কর্তৃত্ব জারী করিতে পারিত। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী তবুও কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ দিলেন। তথাপি ভারতের উদারতার জন্যই কাশ্মীর রাজ্য ভারতশাসনতন্ত্রে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ একটি বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদি মিঃ বেগ এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ এই স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়া থাকেন তাহার জন্য নিশ্চয়ই ভারতকে দায়ী করা যায় না। কারণ ঠিক ঐ একই ব্যবস্থায় থাকিয়া বর্ত্তমান কাশ্মীর সরকার রাজ্যের পুনর্গঠন এবং জনগণের দুরবস্থার নিরসনকল্পে ব্রতী রহিয়াছেন।

উপসংহারে "কাশ্মীর পোষ্ট" লিখিতেছেন, মিঃ বেগ প্রভৃতির বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে কাশ্মীর, জম্মু এবং লাদাকের জনগণ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কতকগুলি অপরিণামদর্শী রাজনীতিককে তাহারা পুনরায় তাহাদের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে দিবে না।

আসামের সরকারী ভাষা

সম্প্রতি আসামের জোরহাট মহকুমা শিক্ষক সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ দান প্রসঙ্গে আসামের শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, আসামের ন্যায় বহু ভাষাভাষী রাজ্যে অসমীয়া ভাষাকে সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করা কেবলমাত্র অসম্ভব নহে, অসঙ্গতও বটে। ৬ই ফাল্গুন "যুগশক্তি"তে প্রকাশিত উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় নাকি আরও বলেন যদি অসমীয়া ভাষাকে সরকারী ভাষা করা হয় তবে আসামে অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে।

আসাম সরকারের ভাষাবৈষম্যনীতি এবং উদ্দেশ্যগামী অসমীয়া ভাষাকে জনসাধারণের উপর বলপূর্ব্বক আরোপিত করিবার অপচেষ্টা সম্পর্কে বহু সংবাদ "প্রবাসী"র পাঠকগণ অবগত আছেন। বর্ত্তমানে রাজ্যসরকারের অন্যতম মন্ত্রীমহোদয়ের উক্ত বিবৃতি হইতে বুঝা যায়—আসাম সরকারের অনুসৃত নীতি কিরূপ ভ্রান্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল। তবে ইহাতে যে আসাম সরকারের চৈতন্যোদয় ঘটিবে অভিজ্ঞতা হইতে তাহা মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বলপূর্ব্বক অসমীয়া ভাষা চাপাইবার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলেও তাঁহারই প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন রাজ্যের শিক্ষাবিভাগেই অসমীয়া ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আসাম রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের বাঙালীবিরোধী নীতির ফলেই আসামে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা গত কয়েক বৎসরে প্রভূত হ্রাস পাইয়া বর্ত্তমানে মুষ্টিমেয় সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। ইহা কি প্রধানমন্ত্রী বর্ণিত "ত্রমুখো নীতির"ই বাস্তব রূপ?

পাকিস্থানের সমস্যাবলীর সমাধান

লাহোর হইতে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ষ্টার' পত্রিকার ২৬শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীআজিজ বেগ এক প্রবন্ধে পাকিস্থানের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য বিভিন্ন সমস্যার অগ্রাধিকারের আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, একটি সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার নীতি না গ্রহণ করিলে পাকিস্থানের অসংখ্য ক্ষুদ্রবৃহৎ সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভব হইবে না। শ্রীবেগের মতে পাকিস্থানের ভূতপূর্ব্ব শাসকবৃন্দ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু করিতে পারেন নাই। অন্যান্য কারণের মধ্যে সেজন্য দায়ী একটি সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার নীতির অভাব।

দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং মাত্রাজ্ঞানের অভাবের ফলে সকল নীতিই ভ্রান্ততায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রতিরক্ষাখাতে গত কয়েক বৎসর প্রচুর ব্যয় হইয়াছে। শ্রীবেগ লিখিতেছেন যে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শক্তিসাধনে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু স্বাস্থ্যবান, সুখী, শিক্ষিত, সন্তুষ্ট, দেশপ্রেমিক জনসাধারণ অপেক্ষা শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকতর শ্রেষ্ঠ কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকিতে পারে কি? পাকিস্থানের বহু অর্থ সরকারী নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন কিছুই সম্পন্ন হয় নাই। পাকিস্থানের শিল্পোন্নয়নের জন্য অনেক ঢাকঢোল হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের প্রধান শিল্প কৃষির উন্নতির জন্য কিছুই করা হয় নাই।

কোন্ কার্য্য অগ্রাধিকার লাভের উপযোগী কয়েকটি মৌলিক নীতির ভিত্তিতে তাহা স্থির করিতে হইবে বলিয়া শ্রীবেগ পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার অভিমতে অগ্রাধিকার দানের পূর্ব্বে দেখিতে হইবে ঐ কার্য্যদ্বারা (১) কতজন লোক উপকৃত হইবে; (২) জাতীয় জীবনের উপর উহার নৈতিক প্রভাব কিরূপ হইবে; (৩) প্রত্যাশিত সুবিধাগুলি কতদিন স্থায়ী হইবে; এবং (৪) ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ঐ কাজকে কি দৃষ্টিতে দেখিবে।

লেখকের অভিমতে উপরি-উক্ত নীতির ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিয়া কর্মনীতি গৃহীত হইলে পাকিস্থানের উন্নতি অবধারিত।

পশ্চিমবঙ্গের উপর উড়িষ্যার দাবি

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সম্মুখে উড়িষ্যা ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অংশ দাবি করিয়াছে—মেদিনীপুর জেলার ৩,৩৪৮ বর্গমাইল ও ২১,২১,০০০ লোক দাবি করিয়াছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল—প্রায় শতকরা ১০.৯ ভাগের উপর ইহার দাবি। উড়িষ্যার এই দাবি কিরূপ অযৌক্তিক তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উড়িয়া-ভাষাভাষীরা তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল—বঙ্গদেশে (১৯০৫ সনের পূর্ব্বে বিশাল বঙ্গে), মাদ্রাজে ও মধ্যপ্রদেশে। ১৯০৩ সনে মধুসূদন দাস মহাশয় এ বিষয়ে লর্ড কার্জ্জনের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন এবং যাহাতে উড়িয়া-ভাষাভাষীরা বেশী করিয়া সরকারী গেজেটেড অফিসার নিযুক্ত হন তাহার দাবি জানান। লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করিবার সময় মধ্যপ্রদেশ হইতে সম্বলপুর জেলা (বর্ত্তমানে সম্বলপুর ও বরগড়) মধ্যপ্রদেশ হইতে আনিয়া বঙ্গদেশের উড়িষ্যা বিভাগের সহিত যুক্ত করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনারের শাসনমুক্ত করিয়া বঙ্গদেশের ছোটলাটের অধীন করিয়া দেন। তথাপি মধ্যপ্রদেশের মধ্যে কিছু উড়িয়া-ভাষী থাকিয়া যায়। ১৯১২ সনে যখন লর্ড হার্ডিঞ্জ খণ্ডিত বঙ্গ জোড়া দেন তখন বিহার ও উড়িষ্যাকে একত্র করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টি করেন। মধুসূদন দাস এই নূতন প্রদেশের প্রথম মন্ত্রী নিযুক্ত হন। নানা কারণে মধুসূদন দাস মহাশয়কে (তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন বলিয়া বিহারীরা তাঁহাকে প্রায় অপাংক্তেয় করায়) এই মন্ত্রিত্ব পদে ইস্তফা দিতে হয়। তৎপরে ১৯২২ হইতে ১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আর কোনও উড়িয়া-ভাষী বা উড়িষ্যার অধিবাসী বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হন নাই। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ সৃষ্টির সময় উড়িষ্যার কতিপয় নেতা অভিযোগ করেন যে, আগে আমরা (উড়িয়া-ভাষীরা) তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিলাম ; এখন চারটি প্রদেশে বিভক্ত হইলাম। বঙ্গদেশে কিছু পরিমাণ উড়িয়া ভাষাভাষী রহিয়া গেল। মণ্টেগু সাহেব এদেশে আসিলে উৎকল ইউনিয়ন কনফারেন্সের পক্ষ হইতে মেদিনীপুরের কিয়দংশ সম্বন্ধে দাবি করা হয়। এই দাবি ভাসা ভাসা ; ফলও কিছু হয় নাই। তৎপরে যখন সাইমন কমিশন এদেশে আসেন (১৯২৭) তখন সকল উড়িয়া-ভাষীর এক-শাসনের অধীনে আসিবার ও উড়িষ্যাকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার কথা উঠে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে সিন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করিবার দাবি জিন্না ও মুসলিম লীগ পেশ করেন। এই দাবি কংগ্রেসী নেতারা মানিয়া লন। সঙ্গে সঙ্গে বিহার হইতে উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে সৃষ্ট হইবার দাবি স্বীকৃত হয়। গোলটেবিল বৈঠক এই দাবি মানিয়া লন। তবে কোন্ কোন্ স্থান লইয়া এই নবগঠিত উড়িষ্যা সৃষ্ট হইবে তাহার জন্য একটি আলাদা কমিটি বসে। ইহার পূর্ব্বে মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলা ও অন্যান্য উড়িয়া-ভাষী অঞ্চল মাদ্রাজ হইতে আলাদা করা যায় কিনা ও করিলে কি কি সুবিধা বা অসুবিধা হইতে পারে তৎসম্বন্ধে ফিলিপস কমিটি নামক একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

সাইমন কমিশনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৩১ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর কোন্ কোন্ জায়গা লইয়া নূতন উড়িষ্যা প্রদেশ সৃষ্ট হইবে তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম-সেক্রেটারী এস্. পি. ওডোনেল সাহেবের সভাপতিত্বে ও আসামের জননেতা তরুণরাম ফুকন ও বোম্বাইয়ের এইচ. এম মেহতাকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। তাঁহারা আরও নির্দ্দেশ দেন যে, কমিটির সহিত সহকারী হিসাবে উড়িষ্যার পারলাকামিডির রাজা, বিহারের সচ্চিদানন্দ সিংহ ও মাদ্রাজের রাও বাহাদুর সি. ভি. এস. নরসিংহ রাজু গারু এই তিন জন কাজ করিবেন।

এই কমিটি কার্য্যারম্ভ করিলে উড়িষ্যা বা উড়িয়া-ভাষীদের তরফ হইতে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও ঝাড়গ্রাম সাব-ডিভিসন ও সদর সাব-ডিভিসনের খড়্গপুর, নারায়ণগড়, দাঁতন, মোহনপুর ও কেশিয়ারী থানা এবং বাঁকুড়া জেলার রায়পুর, খাতড়া ও সিমলাপাল থানা দাবি করা হয়। মেদিনীপুরের তরফ হইতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই দাবীর প্রতিবাদ করেন। বাংলা পুনর্গঠন সমিতির পক্ষ হইতে—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহার সভাপতি ও ব্যারিষ্টার জে. চৌধুরী যাহার সম্পাদক—বাংলার দাবি সম্বন্ধে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। (রবীন্দ্রনাথের জীবনের কর্ম্মপঞ্জীতে এই বিষয়ের অনুল্লেখ দেখা যায় ; লেখক জে. চৌধুরীর সহকারী ছিলেন বলিয়া এই বিষয়টি জানেন। নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, বেলেঘাটায় কয়লা-ব্যবসায়ী সুশীল ঘোষ ও শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী

এই সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। কাগজপত্র ভারত-সভা ভবনে পাওয়া যাইতে পারে।)

ওডোনেল কমিটি এই দাবি সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করেন। আর এই মন্তব্য সর্ব্ববাদিসম্মত :

"The Oriya claim thus fails on all counts. By the test of race (as we have defined it) they are in a minority in all areas and except in a few thanas a minority of less than 30 per cent. By the test of language they are still more heavily outnumbered except perhaps in the Mohanpur Thana where, however, the utmost that can be claimed is that the majority of the people speak a language which can be regarded as Oriya or Bengali. And in all areas there is an overwhelming majority opposed to the transfer to Orissa of any part of the district."

অর্থাৎ, উড়িয়াদের দাবি সর্ব্বপ্রকমে গ্রহণীয় নয় সাব্যস্ত করেন। (রিপোর্টের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ১৮শ প্যারা দেখুন)

ইহা মেদিনীপুরের অংশ সম্বন্ধে কমিশনের মন্তব্য। বাঁকুড়া জেলার অংশ সম্বন্ধে কমিশন কি মন্তব্য করিয়াছিলেন দেখুন :

"The inclusion of any part of Bankura in a separate province of Orissa is clearly impossible, if no part of Midnapore is to be so included. Moreover, the claim to the thanas of Khatra, Raipur, Simlaipal, cannot be justified on linguistic or racial grounds. There were in 1931 only 170 persons speaking Oriya in the whole district."

অর্থাৎ, বাঁকুড়া সম্বন্ধে দাবি অবাস্তব ও অসম্ভব।

উড়িষ্যা-ভাষীদের দাবি কিরূপ অসঙ্গত তাহা তাঁহাদের উপরোক্ত দাবি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ওডোনেল কমিটির কাছে যাহা তাঁহারা দাবি করিয়াছিলেন তাহা হইতে বর্ত্তমান দাবিতে বাঁকুড়া জেলার তিনটি থানা ও মেদিনীপুরের নারায়ণগড় থানা বাদ দিয়াছেন। আর গতবারে যাহা তাঁহারা দাবি করেন নাই এইবারে তাঁহারা মেদিনীপুর জেলার আরও পাঁচটি থানা, যথা:—দেবরা, পিঙ্গলা, সাবং, পাঁশকুড়া ও নন্দীগ্রাম দাবি করিয়াছেন। ফলে নারায়ণগড় থানা (পরিমাণ ৩০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ১,৬০,০০০) দ্বীপের মত চতুর্দ্দিকে দাবিকৃত এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে। মেদিনীপুরের যে এলাকা তাঁহারা দাবি করিয়াছেন তাহার লোকসংখ্যা ২১,২১,০৯৩ জন; তন্মধ্যে উড়িয়া-ভাষীর সংখ্যা ২৮,১৯৭ জন; অর্থাৎ শতকরা ১৩ জন। ইহাই যদি তাঁহাদের দাবির ভিত্তি হয় তাহা হইলে আমরা—বাঙ্গালীরা সমগ্র বালেশ্বর জেলা ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্য দাবি করিতে পারি—কারণ বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জে বাংলা-ভাষীদের অনুপাত যথাক্রমে শতকরা ১৬ জন ও ১.৯ জন।

এই দাবির মূলে রহিয়াছে উড়িয়া-ভাষীদের সর্ব্বগ্রাসী মনোবৃত্তি ও কতিপয় নেতার ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি লাভের অসঙ্গত আশা। কটক হইতে শাসিত অঞ্চলের পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে দিলাম :

	বর্গমাইল
১৮৭২	৭,৭১৭
১৮৮১	৯,০৫৩
১৮৯১	৯,৮৫৩
১৯০১	৯,৮৪১
১৯১১	১৩,৭৪৩
১৯২১	১৩,৭৩৬
১৯৩১	১৩,৭০৬
১৯৪১	৩২,১৯৮
১৯৫১	৬০,১৩৬

তাঁহারা নিজেদের প্রদেশ স্বতন্ত্র করিয়া লন ১৯৩৬ সনে মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের সমস্ত উড়িয়া-ভাষী অঞ্চল পান। শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাবের মহৎ কীর্ত্তি উড়িষ্যার করদ রাজ্য-সমূহের বিলোপসাধন করিয়া উড়িষ্যার অঙ্গীভূত করা। এই বিষয়ে তিনি পথপ্রদর্শক এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত সমান সম্মানের অধিকারী। সর্দ্দার প্যাটেল সর্ব্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন, মহতাব উড়িষ্যার ক্ষেত্রে তাহাই করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম নীলগিরি রাজ্যকে অনাচার ও অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পুলিস পাঠাইয়া স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্য থাকা যে সমগ্র দেশের কল্যাণকর নহে তাহা বুঝাইয়া দেন। দেশীয় রাজ্য-সমূহের বিলোপসাধনের ফলে উড়িষ্যার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

বর্ত্তমান উড়িষ্যার লোকসংখ্যা ১,৪৬,৪৫,৯৪৬ জন; তন্মধ্যে উড়িয়া-ভাষীর সংখ্যা ১,২০,৬৫,২৭৬ জন; অর্থাৎ, শতকরা ৮২.৪ জন। কিন্তু তাঁহারা আরও চান। তাঁহারা সমগ্র সিংভূম জেলা চান, মেদিনীপুর জেলা চান। মানভূমেরও কিছু অংশ চান। এগুলি পাইলে ফল এইরূপ হইবে :

	লোকসংখ্যা হাজারে	উড়িয়া-ভাষী	শতকরা উড়িয়া ভাষী
উড়িষ্যা	১,৪৬,৪৬	১,২০,৬৫	৮২.৪
মেদিনীপুর	২১,২১	২৮	১.৩
মোট	১,৬৭,৬৭	১,২০,৯৩	৭২.১
সিংভূম	১৪,৮১	২,৯৮	২০.১
সর্ব্বমোট	১,৮২,৪৮	১,২৩,৯১	৬৭.৮

উড়িষ্যা প্রদেশ সৃষ্ট হইবার পর গঞ্জাম অঞ্চলের শ্রীবিশ্বনাথ দাস প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি প্রায় দশ বৎসর যাবৎ প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের সহিত অনেক প্রশাসনিক যুদ্ধ করেন ও মন্ত্রিসভার শক্তি বৃদ্ধি করেন। যখন কথা উঠে তাঁহারই অধীনস্থ কমিশনার আনসরজী সাহেব উড়িষ্যার লাট হইবেন তখন তিনি আপত্তি উত্থাপন করেন। ইংরেজ সরকার সিবিলিয়ান হিসাবে আনসরজী সাহেবকে উড়িষ্যার লাট বলিয়া গেজেট করিলে বিশ্বনাথ দাস পদত্যাগের ভয় দেখান। বাধ্য হইয়া আনসরজী সাহেব ছুটি লন ; তৎস্থলে অন্য ব্যক্তি লাট হন। ১৯৪৬ সনের নির্ব্বাচনের পর কটক ও গঞ্জাম জেলার নেতাদের মধ্যে রেষারেষির ফলে শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি দিল্লী চলিয়া গেলে শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি অতি ধীর প্রকৃতির লোক ; জাতিবিদ্বেষ বা প্রাদেশিকতাবোধ তাঁহার মধ্যে নাই বলিলেই হয়। কতকগুলি উড়িয়া যুবক যখন পুরীর সমুদ্র-সৈকতে বাঙালী নারীদের অপমান করিতে উদ্যত হয়, তখন তিনিই পুলিস দিয়া তাহাদের সংযত করেন। উড়িষ্যায় যখন জমিদারী প্রথা লোপ হয় তখন আইনে থাকে তিন বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত জমিদারী খাস করিয়া লওয়া হইবে। কোন কোন উড়িয়া মন্ত্রী চেষ্টা করেন যে, আগে বাঙালীদের জমিদারীগুলি খাস করিয়া লওয়া হউক, পরে উড়িয়া জমিদারদের জমিদারী খাস করা হইবে। নবকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় এইরূপ হইতে দেন নাই। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যাহা দরকার তাহাই তিনি জাতি, সম্প্রদায় ও প্রদেশনির্ব্বিশেষে করিয়াছিলেন।

কটকের 'সমাজ' পত্রিকা বহুদিনের প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্র। ইহা উড়িষ্যার অর্থমন্ত্রী শ্রীরাধানাথ রথ মহাশয়ের দ্বারা পরিচালিত। রথ মহাশয় জাতিতে ব্রাহ্মণ ; উড়িষ্যার মন্ত্রীদের ও উপ-মন্ত্রীদের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। ইঁহারা জাতিতে করণ নবকৃষ্ণ চৌধুরীর প্রতিপত্তি ভাল চক্ষে দেখেন না। অথচ নবকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার পান না। উড়িষ্যার সংগঠন কার্য্যে চৌধুরী মহাশয়ের দান অসীম। 'সমাজ' পড়িলে এই উক্তির সত্যতা বুঝা যাইবে।

উড়িষ্যার শ্রীবৃদ্ধি হউক. উড়িষ্যার আয়তন-বৃদ্ধি হউক ইহা সকলেই চাহেন। কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ দাস, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব ও শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী—ইহারা কেহই অসঙ্গত দাবি বা ভারতরাষ্ট্রের সংহতির ব্যাঘাতজনক দাবি করিতে প্রস্তুত নহেন। রথ মহাশয় দেখিলেন ইহাই তাঁহার সুযোগ—উড়িষ্যার হইয়া দাবি করিলে তাহা সঙ্গতই হউক বা অসঙ্গতই হউক, ইঁহারা কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিবেন না। করিলে লোকপ্রিয়তা হারাইবেন ; না করিলে রথ মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে আসিতে হইবে। তিনি বিরোধী দলের নেতা পাটনার মহারাজার সহিত 'হাত মিলাইলেন'। দাবি যত অসঙ্গত হইবে রথ মহাশয়ের সুবিধা তত। দাবি অগ্রাহ্য হইলে বলিবেন কি করিব—একা আর কত পারি ? দাবি গ্রাহ্য হইলে বলিবেন—আমি একাই করিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে অসঙ্গত দাবি পেশ হইল। ইহার সপক্ষে ফরমাসী যুক্তি তৈয়ারী হইতে লাগিল, যাহাকে ইংরেজীতে বলে "reasons made to order"। রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের সম্মুখে রাধানাথ রথ হইলেন মুখপাত্র।

রাধানাথ রথ নিজস্ব প্রাদেশিক মনোভাব লইয়া দক্ষিণ উড়িষ্যার তেলুগু-ভাষীদের কয়েকটি বহুকালের স্বীকৃত অধিকার মৌখিক হুকুমজারি করিয়া হরণ করিয়া লইলেন। ফলে অত্যাচরিত, প্রপীড়িত এই সব অন্ধ্রদের সাহায্যের জন্য অন্ধ্রদেশ হইতে অন্ধ্ররা আসিয়া মারপিট গৃহদাহ প্রভৃতি করিল। উড়িয়ারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ব্যাপারটা ধামাচাপা দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। রথ মহাশয় যে যে অধিকার লোপ করিয়াছিলেন তাহা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইলেন।

পশ্চিম বাংলার বিরুদ্ধে এই মনোভাব লইয়া উড়িষ্যার দাবি পেশ করা হইয়াছে। ইহা মনে রাখিলে যুক্তির অভাবের জন্য আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

এক্ষণে তাঁহারা, অর্থাৎ উড়িয়া-ভাষীরা বাংলার বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তাহার আলোচনা ও বিচার করা যাক। একটি অভিযোগ—উড়িষ্যা বিভাগ যখন বঙ্গদেশের অন্তর্ভূত ছিল তখন তাঁহারা তাদৃশ চাকুরী ইত্যাদি পাইতেন না। তখন চাকুরী দিবার ক্ষমতা বাঙালীর হাতে ছিল না—ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাতে। আরও একটি কারণে তাঁহারা চাকুরী ইত্যাদি পাইতেন না। তাঁহারা ছিলেন শিক্ষায় অনগ্রসর, বিশেষ করিয়া ইংরেজী শিক্ষায়। নিম্নে আমরা অখণ্ড বঙ্গের ও কেবলমাত্র উড়িষ্যা বিভাগের প্রতি দশ হাজারে পুরুষ লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির ও ইংরেজীতে তদ্রূপ ব্যক্তির অনুপাত দিলাম। যথা :

	লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তি				ইংরেজীতে লিখন-পঠনক্ষম	
	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯০১	১৯১১
অখণ্ড বঙ্গ	১১৭০	১৩৪০	১২৭০	১৪০০	১৭৫	২৪৩
উড়িষ্যা	১০৩০	১৩৪০	১৫১০	১২৭০	৩৮	৫২

কেবলমাত্র লিখন পঠনক্ষমদের অনুপাত ধরিলে, তাঁহারা বাংলার খুব পশ্চাতে ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু

যদি আমরা কেবলমাত্র হিন্দুদের ধরি তাহা হইলে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়। বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে ১৯১১ সনে লিখন-পঠন-ক্ষম ব্যক্তির অনুপাত ছিল ২১০০; আর উড়িষ্যায় ছিল ১২৭০। আর তাঁহারা সকলেই উড়িয়া-ভাষী ছিলেন না—বহু বাঙালী এই অনুপাত বাড়াইয়াছে। কটক, পুরী ও বালেশ্বরবাসী বাঙালীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত বেশী। উড়িয়া-ভাষীরা যে তখন শিক্ষায় অনগ্রসর ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ও প্রচার-সংখ্যা দিলাম:

বাংলায়

	১৯১১		১৯০১		১৮৯১	
সংবাদপত্র	সংখ্যা	প্রচার	সংখ্যা	প্রচার	সংখ্যা	প্রচার
বাংলা	৬৬	১,৩৭,৯০০	৫৮	১,২১,৪০০	৪২	৬১,০০০
ইংরেজী	৫১	৫৬,৪৫০	১৯	১৩,৮৭০	পাওয়া যায় না	
উড়িয়া	—	—	—	—	—	—
মাসিকপত্রাদি						
বাংলা	৯১	৯৩,৫৫০	৭৫	৬২,৬৭৬	৩৪	৩৮,৩০০
ইংরেজী	৫৮	৬১,৯৫০	৩১	২৫,০৩৫	৮	৪,৪০০
উড়িয়া	১	১,০০০	—	—	—	—

বিহার ও উড়িষ্যায়

সংবাদপত্র						
বাংলা	৩	১,৩০০	১	৮০০	—	—
ইংরেজী	৯	৩,৫২৭	৪	৪,০০০	পাওয়া যায় না	
উড়িয়া	৬	৩,৬০০	৪	১,৬০০	৪	১,০৫০
মাসিকপত্রাদি						
বাংলা	১	২০০	—	—	—	—
ইংরেজী	৪	২,৩৫০	১	৩৫০	—	—
উড়িয়া	৩	১,৬০০	—	—	—	—

১৯০১ হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বঙ্গদেশে এবং বিহার ও উড়িষ্যায় প্রকাশিত বাংলা ও উড়িয়া পুস্তকের সংখ্যা এইরূপ:

	বাংলা	বিহার ও উড়িষ্যা	মোট
বাংলা	১০,৫৩৫	৬৩	১০,৫৯৮
উড়িয়া	২১২	২,৩৭৯	২,৫৯১

বাঙালী কখনও উড়িয়াকে উড়িয়া বলিয়া তাচ্ছিল্য করেন নাই। স্বনামধন্য সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন উড়িয়া মধুসূদন দাস। ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া দিলে কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্লাম্বারদের মধ্যে বারো আনার অধিক উড়িয়া; আর তাঁহাদের দ্বারা কাজ করান বাঙালী গৃহস্থগণ। এখনও করান।

দ্বিতীয় ও প্রধান অভিযোগ যে, মেদিনীপুর জেলায় উড়িয়া-ভাষীদের ভাষা ও সংস্কৃতি বাঙালীরা নষ্ট করিতেছেন। অভিযোগ প্রমাণের জন্য মেদিনীপুর জেলার উড়িয়া-ভাষীদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাওয়ার উল্লেখ করেন। প্রথমেই দেখা যাক মেদিনীপুরের উড়িষ্যা-সংলগ্ন অঞ্চলের ভাষা কি? বাংলা ও উড়িয়া উভয়ই একই ভাষা হইতে সৃষ্ট। তৎপরে যুগ যুগ ধরিয়া স্বাভাবিক নিয়মে বাংলার মধ্যে বহু উড়িয়া শব্দ বা ভাব আছে। আবার উড়িয়ার মধ্যে বহু বাংলা শব্দ ও ভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। বাঙালী বৈষ্ণব যখন মহাপ্রভুর উল্লেখ করেন তখন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকেই বুঝেন, পুরীবাসী উড়িয়া যখন মহাপ্রভুর উল্লেখ করেন তখন তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকেই বুঝান। আর সাধারণ বাঙালী মহাপ্রভু বলিতে স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে উভয়কেই বুঝেন। বাঙালী যদি মহাপ্রভু বলিয়া জগন্নাথদেবকে বুঝাইতে চাহেন তবে তিনি উড়িয়া শব্দ ব্যবহার করিতেছেন না—উড়িয়া ভাব ব্যবহার করিতেছেন মাত্র। অনেকে "র" স্থলে "ড়" উচ্চারণ করেন। শহর অঞ্চলে ইহা গ্রাম্যতার পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয়। তদ্রূপ এই সব স্থানের ভাষার মধ্যে বহু বাংলা ও উড়িয়া ভাব, শব্দ ও উচ্চারণ ভঙ্গীর মিশ্রণ আছে। বাংলা গদ্যের যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে; তেমনই এই অঞ্চলের ভাষারও দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে গত শতাব্দীর শেষ পাদে ও এই শতাব্দীর প্রথম পাদে। ড. গ্রিয়ারসন গত শতাব্দী শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে এই অঞ্চলের ভাষার যে নমুনা সংগ্রহ করেন তাহা হইতে বলেন:

"The Oriya of North Balasore shows signs of being Bengalised, and as we approach the boundary between that district and Midnapore, we find at length a new dialect. It is not, however, a true dialect. It is a mechanical mixture of corrupt Bengali and of corrupt Oriya. A man will begin a sentence in Oriya, drop into Bengali in its middle, and go back to Oriya at its end. The vocabulary freely borrows from Bengali."

অর্থাৎ, এই অঞ্চলের ভাষা ভাঙা উড়িয়া ও ভাঙা বাংলার খিচুড়ি-মিশ্রণ।

এই অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধে ১৯০১ সনের সেন্সাসের সময় সর্ এডওয়ার্ড গেট্ একটি অনুসন্ধান করেন। মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট লেখেন:

"In parts of the Contai Sub-division and Dantau

Thana a mixture of Bengali and Oriya is spoken. In some places the Oriya element predominates, in some places the Bengali."

অর্থাৎ এই খিচুড়ি ভাষার স্থানবিশেষে উড়িয়া বা বাংলার ভাগ বেশী

সর্ এডওয়ার্ড গেট এই অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেন :

"The classification made for the Linguistic Survey must necessarily depend on the particular specimens submitted for Dr. Grierson's examination, and what is now classed under one linguistic head might well have been classed under another if the specimens had been selected from a different locality."

সুতরাং ড. গ্রিয়ারসন যে ভাষা সম্বন্ধে 'curious mixture of corrupt Bengali and Oriya" অর্থাৎ, 'বিকৃত বাংলা ও উড়িয়া ভাষার উদ্ভট সংমিশ্রণ' বলিয়াছেন তাহার মূল্য নমুনা সংগ্রহের দোষে অনেকটা কমিয়া যায়।

বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার ও জানিবার বিষয় এই যে, এ অঞ্চলের ভাষা বরাবরই বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে।

পাঠশালার শিক্ষা হইত কলাপাতে—লেখা হইত শরের কলমে। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বলেন, এই অঞ্চলের ভাষা মূল উড়িয়া ভাষা হইতে কেবলমাত্র উচ্চারণেই আলাদা নহে ব্যাকরণেও আলাদা। এই অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধে ১৯২১ সনের সেন্সাস সুপারিনটেনডেন্ট টমসন সাহেবের মত এইরূপ :

"There a hybrid language, Bengali with something of Oriya in it, is commonly spoken, and it is often a matter of opinion whether what any particular individual speaks should be called Bengaii or Oriya."

অর্থাৎ, এই ভাষাকে উড়িয়া বা বাংলা ইচ্ছানুযায়ী যাহা কিছু বলা যায়।

১৯৩১ সনের সেন্সাস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই সম্বন্ধে লিখিতেছেন :

"What passes for Oriya in the district (Midnapore) is a rather indeterminate speech. It is described in the *District Gazetteer* as Oriya infected by the Bengali spoken across the river Haldi. Grierson, in the *Addenda Minora* to Volume I of the Linguistic Survey of India, endorses the statement that in Contai it is in its skeleton Oriya so modified by the adjoining Bengali as to be called Bengalised dialect of Oriya, and that even in Danton and Narayangarh where the speech approaches more closely to the dialect of Balasore and is not so much Bengalised it is unintelligible to the speaker of true Oriya. It is described both as being—

'a curious mixture of fairly pure Bengali and fairly pure Oriya';

and as—

'not a dialect so much as a mechanical mixture of corrupt Bengali and corrupt Oriya.'

"It is very probable therefore that the language returned as Oriya would often be unintelligible to speakers of Oriya hailing from Cuttack."

এই অঞ্চলের ভাষা কটকের উড়িয়ারা বুঝিতে পারে না।

এই অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধে ওডোনেল কমিটির মত নিয়ে দিলাম :

"His (Census Superintendent of Bengal, 1931) own view, however, is that the language is assimilating itself to Bengali, and the statistics therefore reflect, though perhaps in an exaggerated form, *a real change* in the speech of the people. *This is also the conclusion to which we ourselves incline.* Bengali is now not only the dominant language of the district as a whole; in all areas the language of the majority is either Bengali or a dialect which is or is rapidly becoming more Bengali than Oriya."

এই অঞ্চলের ভাষা প্রথমতঃ খাঁটি উড়িয়া নহে, ইহা উড়িয়া ও বাংলার সংমিশ্রণ। উচ্চারণ উড়িয়া হইতে আলাদা। ব্যাকরণ উড়িয়া হইতে বিভিন্ন। লেখা হয় বাংলা হরফে। তাহার মধ্যে যেটুকু উড়িয়ার প্রভাব ছিল কালক্রমে স্বাভাবিক কারণে তাহা কমিয়া যাইতেছে ও বাংলার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে—আর এই পরিবর্ত্তন দ্রুত হইতেছে ও হইয়াছে। ইহাকে বাংলা না বলিয়া উড়িয়া বলা চলে না। তথাপি এই অঞ্চলের ভাষাকে উড়িয়া ভাষা ধরিয়া উড়িয়া-ভাষীরা এই অঞ্চলকে উড়িষ্যাভুক্ত করিবার দাবি করিতেছেন। যদি এই অঞ্চল উড়িষ্যাভুক্ত হয় তবে তথাকার এই ভাষাভাষীদের কি সুবিধা হইবে? তাঁহাদের কটকের উড়িয়া ভাষা শিখিতে হইবে। অবস্থাটা কতক মিথিলার অধিবাসীদের ন্যায় হইবে। স্কুলে ও সরকারী কার্য্যে যে হিন্দীভাষার প্রচলন তাহা মীরাট-দিল্লী অঞ্চলের হিন্দী; মিথিলার লোকের কাছে সম্পূর্ণ নূতন ভাষা। তাহাই শিখিতে হইতেছে। বিহারের ভোজপুরীর অবস্থাও অনুরূপ। ভোজপুরী ও মৈথিলী ভাষাভাষীরা মাতৃভাষায় শিক্ষা পাইবার দাবি করিতেছেন এবং আংশিক ভাবে তাঁহাদের এই দাবি স্বীকৃত হইয়াছে।

এইবার সংখ্যার দিক দিয়া উড়িয়া ভাষা ও উড়িয়া সংস্কৃতি মেদিনীপুরে কতটা নষ্ট হইয়াছে বা হইতেছে তাহার বিচার করা যাক। নিম্নে আমরা মেদিনীপুর জেলার মোট লোকসংখ্যা ও উড়িয়া-ভাষী বলিয়া যাহাদের সেন্সাসের সময় ধরা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ও শতকরা হিসাব দিলাম :

	মোট লোকসংখ্যা	উড়িয়াভাষী	শতকরা
১৮৮১	২৫,১৫,৫৬৫	৪,৫৪,৬৭০	১৮·১
১৮৯১	২৬,৩১,৪৬৬	৫,৭২,৭১৮	২১·৮
১৯০১	২৭,৮৯,১১৪	২,৭০,৪৯৫	৯·৭
১৯১১	২৮,২১,২০১	১,৮১,৯০১	৬·৪
১৯২১	২৬,৬৬,৬৬০	১,৪২,১০৭	৫·৩
১৯৩১	২৭,৯৯,০৯৩	৪৫,১০১	১·৬
১৯৪১	৩১,৯০,৬৪৭	তথ্য নাই	—
১৯৫১	৩৩,৫৯,০২২	২৮,১৯৭	·০৮

এই প্রসঙ্গে আমরা ১৮৯১ সনের সেন্সাস রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডের ২১৪ পৃ হইতে এই জেলার লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তিদের শতকরা হিসাব ভাষা হিসাবে দিব। যথা:

সব ভাষায়	বাংলায়	উড়িয়ায়
১৭·৫	১৬·৭	·০৩

অর্থাৎ, ১০০ জন লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে ১·৭ জন উড়িয়ায় লিখন-পঠনক্ষম। এই বৎসরে শতকরা ২১·৮ জন উড়িয়াভাষী বলিয়া সেন্সাসে ধরা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, উড়িয়া অক্ষরের চলন এই সব উড়িয়া-ভাষীদের মধ্যেও কিরূপ কমিয়া গিয়াছে। আমরা যদি ধরিয়া লই যে, এই উড়িয়া-ভাষীদের ও বাংলা-ভাষীদের মধ্যে সমান অনুপাতে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে (যাহা ধরিয়া লইবার পক্ষে সঙ্গত কারণ আছে) তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ২১৮ জনের মধ্যে মাত্র ১·৭ জন উড়িয়া-অক্ষরের পক্ষপাতী। শতকরা হিসাবে ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ৭·৮ জন। ইহা হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি খাঁটি উড়িয়ার পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে মাত্র শতকরা আট জন।

১৮৮১ সন হইতে ১৮৯১ সনের মধ্যে উড়িয়া-ভাষীদের বৃদ্ধিও যেমন অস্বাভাবিক, তাঁহাদের দ্রুত কমিয়া যাওয়াও তেমনই অস্বাভাবিক। ইহার কারণ কি?

গেট্ সাহেব ১৯০১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:

"In 1881 and 1891, the column in which information for language was recorded was headed 'parent tongue' and the enumerators were told to enter the language returned by each person as spoken in his *parent's home*. This may have led to mistakes. . . . At the present census the title for the column was changed to 'Language ordinarily used."

অর্থাৎ, ভাষা সম্বন্ধে প্রশ্নের আকার বদলাইয়া গিয়াছিল। বাপমায়ের দেশে কি ভাষায় কথা বলা হয় এই প্রশ্নের বদলে সাধারণতঃ কি ভাষায় কথা বল এই প্রশ্ন করা হয়। সুতরাং মহান্তি মহাশয়ের দেশের ভাষার পরিবর্ত্তে মহান্তি মহাশয় বর্ত্তমানে কি ভাষায় কথা বলেন জিজ্ঞাসা করা হইল। ইহাতে স্বাভাবিক ভাবেই উড়িয়া-ভাষীদের সংখ্যা খুব কমিয়া গেল। কিন্তু সাধারণতঃ কি ভাষায় কথা বল জিজ্ঞাসা করাতে রাঁচির জার্ম্মান পাদ্রী উত্তর দিলেন যে, ওরাওঁ ভাষা। এইরূপ জবাব এড়াইবার জন্য ১৯১১ সনের আদমসুমারির সময় পুনরায় প্রশ্নের রকম পাল্টাইয়া দেওয়া হইল। বলা হয়:

"Enter the language which each person ordinarily uses in his home."

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি বাড়ীতে সাধারণতঃ কি ভাষায় কথা বলে। এই প্রশ্ন পরিবর্ত্তনের ফলে উড়িয়া-ভাষীদের সংখ্যা আরও কমিয়া গেল। ইহার পরেও ভাষাসম্বন্ধীয় প্রশ্নের অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১৯১১ সন হইতে ১৯২১ সনে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার লোকসংখ্যা ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর জন্য কমিয়া গিয়াছিল। উড়িয়া-ভাষী অঞ্চলে এই মহামারীর প্রকোপ বেশী হইয়াছিল। সুতরাং ১৯২১ সনে উড়িয়া-ভাষীদের সংখ্যা কমিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নহে। সমগ্র জেলায় লোকসংখ্যা কমিয়াছিল শতকরা ৫·৫ জন করিয়া; আর উড়িয়া-ভাষী অধ্যুষিত নিম্নলিখিত থানায় কমিয়াছিল শতকরা থানার নামের পাশে লিখিত হিসাবে। যথা:

থানা	শতকরা
নারায়ণগড়, কেশিয়ারি	১৮·৪
দাঁতন, মোহনপুর	১০·০
গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম	৬·৯
এগ্রা	৬·৬
পটাসপুর	৭·৬

১৯৩১ সনে উড়িয়া-ভাষী সংখ্যা কমিয়া যাওয়া সম্বন্ধে ঐ সনের সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, যে সময়ে সেন্সাস লওয়া হয় সে সময়ে উড়িষ্যা সম্বন্ধে একটি কমিশন শীঘ্রই বসিবে বলিয়া লোকে জানিত এবং উড়িষ্যা-ভুক্ত হইবার আশঙ্কায় ভাষা উড়িয়ার স্থলে বাংলা লিখাইয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যা কমিবার আরও একটি কারণ:

"That in general, there is a genuine assimilation of the mixed Oriya-Bengali of this district to Bengali."

সুতরাং উড়িয়া ভাষার নষ্ট হইয়া যাইবার কথা সঙ্গত

নহে। উড়িয়া-ভাষীরা অনেকেই বহিরাগত (immigrant), তাঁহারা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নহে। ইহার একটি প্রমাণ পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যানুপাত। নিয়ে আমরা উড়িয়া-ভাষীদের মধ্যে প্রতি এক হাজার পুরুষে কয় জন করিয়া স্ত্রীলোক, সমগ্র জেলার লোকের মধ্যে ঐরূপ অনুপাত দিলাম :

	উড়িয়া-ভাষীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অনুপাত	সমগ্র জেলার লোকের মধ্যে ঐরূপ অনুপাত	উভয়ের পার্থক্য
১৯০১	৮৯০	১০০৬	—১১৬
১৯১১	৯৩৪	১০০০	— ৬৬
১৯২১	৯১৫	৯৯১	— ৭৬
১৯৩১	৯০৪	৯৭৫	— ৭১
১৯৪১	—	—	—
১৯৫১	৬৭৬	৯৫৫	—২৭৯

মেদিনীপুর জেলায় যেমন বাহির হইতে লোকের আমদানী হয়, তেমনই জেলার বহু লোক জেলার বাহিরে চলিয়া যায়। সাধারণতঃ যাহারা চলিয়া যায় তাহাদের সংখ্যা যাহারা আসে তাহাদের অপেক্ষা বেশী। নিয়ে আমরা তথ্যগুলি দিলাম :

	যাহারা আসিয়াছে তাহাদের সংখ্যা		যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১৮৯১	২০,৪০৫	২১,৯৫০	৫৫,৯৩৮	৫৫,৪১৪
১৯০১	২৭,৭৫৪	২২,১০৭	৭২,১২৯	৬২,১১৬
১৯১১	৪১,০৮৯	৩৪,৫৩৬	৯২,১৮৮	৭৯,৫৮৪
১৯২১	৩৭,৩১০	৩২,৮৭১	৯৬,১৩৫	৮০,৯৬৯
১৯৫১	২,২৯,৮৬৩		২,৬৪,০৬৪	

১৯৫১ সনে যাহারা মেদিনীপুরে আসিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ২,২৯,৮৬৩। ইহার মধ্যে পাকিস্থান হইতে দেশচ্যুত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৩,৫৭৯ জন। বরাবরই যাহারা জেলা হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা যাহারা বাহির হইতে জেলায় আসিয়াছে তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী। ১৯৩১ সনের ও ১৯৪১ সনের সেন্সাসের সময় এই সব তথ্য সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয় নাই। দেখা যায়, গত ৬০ বৎসর ধরিয়া এই ব্যাপার চলিতেছে।

এক্ষণে যাহারা চলিয়া যায় তাহারা যদি উড়িয়া-ভাষী অঞ্চল হইতে বেশী করিয়া যায় ত উড়িয়া-ভাষীদের সংখ্যা ক্রমাগতই কমিয়া যাইবে। মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত আছে যে, জেলার পশ্চিম অর্দ্ধেকে (অর্থাৎ যেখানে উড়িয়া-ভাষীরা সংখ্যায় খুব বেশী) চাষের উপযোগী জমি কম। লোকবসতি কমিতে কমিতে সর্ব্বশেষ পশ্চিম ভাগে সিংহভূম ও ময়ুরভঞ্জের সীমানায় তমলুকের জনবসতি অপেক্ষা সিকিরও কম। তমলুকের পশ্চিমে কাঁথি পাথুরে জমির উপর অবস্থিত, সে কারণ বেশী কৃষিজীবী লোক ধারণ করিতে পারে না—বিশেষ করিয়া বহু স্থানে যখন শালবন আছে।

জেলা হইতে যদি লোক বাহিরে যায় তাহা হইলে এই অঞ্চল হইতেই যাওয়া সম্ভব। ঘটিতেছেও তাহাই। ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত আছে :

"There is considerable *permanent* migration from the west of the district to Mayurbhanj and to the Assam tea gardens."

সুতরাং উড়িয়া-ভাষীদের সংখ্যা কমিয়া যাইবার ইহাও একটি কারণ ; ভাষা বা সংস্কৃতি ধ্বংস নহে। যাহারা বহিরাগত তাহাদেরই পুনরায় বাহিরে চলিয়া যাওয়া সম্ভব। উড়িয়া-ভাষীদের মধ্যে অনেকেই বহিরাগত ; তাঁহাদের অনেকেরই নিজ জেলায় চলিয়া যাওয়া সম্ভব—এ কারণেও তাঁহাদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাওয়ায় আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

এইবার সংস্কৃতি ধ্বংস সম্বন্ধে সামান্য দু'একটি কথা বলিব। বাঙালীরা দায়ভাগ দ্বারা শাসিত। উড়িয়ারা মিতাক্ষরা মতে শাসিত। কোন উড়িয়া বাংলায় কাজ করিলেও মিতাক্ষরা দ্বারা শাসিত হইবেন ; কিন্তু তিনি বাঙালী আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিলে দায়ভাগ দ্বারা শাসিত হইতে পারেন। জানা পদবীটি উড়িয়া পদবী—এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে ওডোনেল কমিটির রিপোর্ট দেখুন। 'জানা'রা বহুকাল বঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় বাস করিতেছেন ও দায়ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাপারটি এমনই সর্ব্বজনগ্রাহ্য যে, ১৯৩০ সনে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন সিবিলিয়ান সাহেব জজ ও একজন বাঙালী জজ গোপাল জানা বনাম ব্রজমোহন স্বামীর মামলায় বলেন যে, তাঁহারা দায়ভাগ দ্বারা শাসিত হইবেন। (৩৪ কলিকাতা উইকলি নোটস ৯৪৪ পৃ. দেখুন)। অনুরূপ আরও মামলা আছে।

গোবর্দ্ধন বিশ্বাস ছঁদে জমিদারের ধুরন্ধর প্রতিনিধি ও হাই-কোর্টের মামলার তদ্বিরকারক, কিন্তু টেলিগ্রামের মর্ম্মোদ্ধার করিতে সেও হিমসিম খাইয়া গিয়াছিল। বাংলায় তর্জ্জমা করিলে তারবার্ত্তাটি এইরূপ দাঁড়ায়:—"বাহাদুর শা'র বংশধরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কর—শাদা দাড়ির জন্ম। নিকুঞ্জ রওনা হইতেছে।—হরনারায়ণ"।

শেষোক্ত নামটি পড়িয়া গোবর্দ্ধনের অবশ্য সংশয় থাকে নাই যে, এটি খোদ তার মনিব বিলাসগঞ্জের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার হরনারায়ণ চৌধুরীর একটি জরুরি আদেশ, কিন্তু কেই-বা বাহাদুর শা আর তার বংশধর এবং শেষোক্ত ব্যক্তির শাদা দাড়ির ব্যবসা আছে কিনা এবং থাকিলেও তার দোকান কোথায়, কিছুই তার বোধগম্য হয় নাই। প্রভুর টেলিগ্রামের পাল্টা জবাবে সে এদিকে তার কর্ম্মতৎপরতার কথা জানাইয়া নিকুঞ্জের পৌঁছানোর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

'ব্যাপার কি হে, নিকুঞ্জ। বাহাদুর শা'টাই বা কে, আর তার বংশধরের শাদা দাড়ির দোকানটাই-বা কোথায়? আর দাড়ি দিয়ে করবেই-বা কি, থিয়েটার?'

'ঠিকই ধরেছ, দাদা। তবে যে-সে থিয়েটার নয়। খোদ কর্ত্তা নিজে এবার সাজাহানের পার্ট করছেন।' গোমস্তা নিকুঞ্জ রিকশাওয়ালার ভাড়া মিটাইবার পর কহিল, 'হুজুরের জন্ম মানানসই দাড়ি চাই।'

'বলো কি হে!' গোবর্দ্ধন সবিস্ময়ে কহিল, 'গত পঁচিশ বছরে হুজুরের হুকুমে অন্তত পাঁচ শ' বার থিয়েটার হয়েছে, কিন্তু কৈ, একবারও তো তাঁর নিজের প্লে করবার শখ হয় নি! আর আজ একেবারে বুড়ো বয়সে…'

'তা হলে আর কি হবে।' নিকুঞ্জ কহিল, 'তাঁর শখ হলে আর কে আটকাচ্ছে। তিনি বলছেন, "ওরে, এই তো সাজাহান সাজবার বয়েস। আমারও তো অথর্ব্ব হয়ে পড়তে আর দেরি নেই। দেখিস্, কেমন মানানসই অভিনয় হয়।"—এখন তারই উদ্যোগ চলছে।

'কিন্তু আমাদের শাদা দাড়ির অভাব কি?' গোবর্দ্ধন কহিল, 'সাজঘরের তাকে খোঁজ করলে এখনও দু'দশ গণ্ডা আনকোরা শাদা দাড়ি পাওয়া যাবে।'

'আর ওতে হবে না, দাদা। তবে আর আমি হন্তদন্ত হয়ে কলকাতায় ছুটে আসি। হুজুর বলেন, 'আমি নিজে প্লে করছি—যা তা প্লে ত করতে পারি নে। জেলা থেকে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-কমিশনার, কত সাহেব-সুবো আসবে, তার ঠিক নেই। আমাকে এমন প্লে দেখাতে হবে যেন তাঁরাও বলে যান—হাঁ, একখানা এক্টিং দেখে গেলাম বটে। তা ছাড়া, আমার প্রজা বা সেরেস্তার কর্ম্মচারীরা যারা এই ভূমিকায় আগে নেমেছে, তাদের কাছেও ত নিজের সম্মান রাখতে হবে। যেন তারাও দেখে বলে—হুজুর যা করলেন, তার কাছাকাছিও আমাদেরটা পৌঁছয় নি।…কিন্তু তার জন্ম যথাযোগ্য আয়োজন চাই। এই ধর, সাজাহানের দাড়ি। যখনই মনে করব আমার গালের সঙ্গে যেগুলি সেঁটে রয়েছে, সেগুলি পাট বা শণ বা ভটচাজ মশায়ের দাড়ি, একেবারে শ্মশান থেকে কেটে নেওয়া, তখন কি আর প্লে করবার মত ফিলিং থাকবে। থিয়েটারে আনুষঙ্গিকটা কম কথা নয়। উচ্চাঙ্গের অভিনয় করতে হলে উচ্চশ্রেণীর সাজসজ্জা চাই। শুনেছি, কলকাতায় এখনও শেষ মোগলরাজা বাহাদুর শা'র বংশধরেরা বেঁচে আছেন; এঁদের কেউ কেউ টাকার টানা টানিতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। এঁদের কারুর কাছ থেকে

যদি তাঁদের নিজস্ব দাড়ি কিছুটা ছাঁটিয়ে আনতে পার, তবে তা দিয়ে দিব্যি আলগা দাড়ি বানিয়ে নেওয়া যাবে; একেবারে খাঁটি মোগলাই দাড়ি। সেই দাড়ি গালে পরে কত সহজে নিজেকে সাজাহান বলে মনে করতে পারব, ভেবে দেখ। আমি নিজে যখন নামছি, তখন উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম যোগাড় করতেই হবে।'—তবেই বুঝছ দাদা, ব্যাপারটা কত জরুরি।'

'তা ঠিক আছে।' গোবর্দ্ধন সহাস্যে কহিল, 'দরকার হলে আমি বাঘের দুধ সংগ্রহ করে আনতে পারি, আর মোগলাই দাড়ি সংগ্রহ করতে পারব না, এ একটা কথা হ'ল। চট করে তৈরি হয়ে নাও, এখখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।'

বিলাসগঞ্জের বিরাট জমিদারবাড়ীর প্রকাণ্ড শয়ন-কক্ষে জমিদার হরনারায়ণ বারবার পায়চারি করিতেছেন। শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে কোনও জমিদারী কূটনীতি প্রয়োগের সময় সর্ব্বদাই তিনি এমন করিয়া পিছনে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এমনই অস্থির ভাবে হাঁটাহাঁটি করিয়া থাকেন। আজ কোনও জমিদারী চাল চালিবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু বিপদ আরও গুরুতর! বার বার পার্ট ভুল হইয়া যাইতেছে, বার বার তাহা আওড়াইয়া তিনি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গ ও মুখভঙ্গির মহড়া দিতে গিয়া কথা ভুল হইয়া যায়। কথা নির্ভুল বলিতে চেষ্টা করিলে মোশন বন্ধ হয়। শুধু কি তাই, আজ যাহা মুখস্থ করেন, কাল তাহা ভুলিয়া বসেন। এই বুড়ো বয়সে পড়া মুখস্থ করা কি পোষায়—মনে মনে হাসিয়া হরনারায়ণ নিজের কাছেই মন্তব্য করেন। তাঁর অনুচরেরা অবশ্য বলে—মুখস্থ করবার এমন কি দরকার, হুজুর। প্রম্‌টিং শুনে বললেই গোল চুকে যায়! উহারা ত বলিয়াই খালাস, কিন্তু একবার স্টেজে দাঁড়াইলে প্রম্‌টিং মোটেই কি কানে পৌঁছাইবে? ইতিপূর্ব্বে কবে আর তিনি স্টেজে দাঁড়াইয়াছেন!

'জাহানারা, জাহানারা।' আবেগপূর্ণ কণ্ঠে নিজ কন্যাকে আহ্বান করিতে করিতে সাজাহান ঘরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পার্ট আবৃত্তি করিয়া চলিলেন।

'হুজুর, ম্যানেজারবাবু দেখা করতে এসেছেন।'

'চুপ রও। আমি আর দিল্লীর বাদশা নই।' আবৃত্তিতে বাধা পাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবিষ্ট খাস্-বেয়ারা শিবুকে হরনারায়ণ ধমক দিয়া উঠিলেন, 'এখন কুলাঙ্গার ঔরংজীব তাদের প্রভু। আমার কাছে কেন, তার কাছে যাক। আমাকে এখন বিরক্ত করা চলবে না।'

ইতিপূর্ব্বে জমিদার-গৃহিণী পঙ্কজিনীও একবার জরুরি কাজে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সাজাহান আমল দেন

'আ মরণ!' বলিয়া ছদ্ম মন ওজনের মমতাজ বিরক্ত মুখে অন্তঃপুরে প্রস্থান করেন

নাই। কহিয়াছিলেন, 'কে, মমতাজ? পরলোক থেকে সাজাহানকে দেখতে এসেছ? কিন্তু আমি আর এখন স্বাধীন নই, প্রিয়া। তোমার কবরের ওপর স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণে অত টাকা ব্যয় করেছি বলে ব্যাটা ঔরংজীব প্রকাশ্যে আমাকে ব্যঙ্গ করে বেড়ায়। তুমি আর এখানে থেকো না মহিষী, শুধু শুধু অপমানিত হবে।"

'আ মরণ!' বলিয়া দু'মণ ওজনের মমতাজ বিরক্ত মুখে অন্তঃপুরে প্রস্থান করেন।

ইহার পর যে-ই হরনারায়ণকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছে, সে-ই বকুনি খাইয়া ফিরিয়াছে। দায়িত্ব কম নয়! তিনি স্বয়ং সাজাহানের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন; কত গণ্যমান্য লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছেন। তা ছাড়া নিজের প্রজা ও অধীন কর্ম্মচারীদের কাছে নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রশ্ন আছে। অন্ততঃ পার্ট ভুল করিলে তাঁর কিছুতেই চলিবে না।

ম্যানেজারবাবুকে নিষেধ করিয়া অবিলম্বে ফিরিয়া

আসিয়া শিবু জলন্ত কলিকাটি প্রভুর গড়গড়ার মাথায় পরাইয়া দিল ও উহার নলটি প্রভুর জন্ত উন্মত করিয়া রাখিল।

'—"কথা কস্‌নে জাহানারা। পুত্র আমার পা জড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি—আমি কি…"—দূর ছাই, কি জানি এই জায়গাটায়, একবারও যদি এখানটা মনে থাকে।"

' "আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি। হা রে বাপের মন!"—' শিবু মাথা চুলকাইয়া কহিল।

'ঠিক বলেছিস! "হা রে বাপের মন!"—' হরনারায়ণ যেন অকূলে কূল পাইয়া কহিলেন। 'কিন্তু তুই জানলি কি করে রে, ব্যাটা!'

'দরজার আড়াল থেকে শুনে শুনে আমার এ সব মুখস্থ হয়ে গেছে, হুজুর।'

'মুখস্থ হয়ে গেছে! কতটা? বল দেখি এর পরের টুকু কি?'

'—"না, আমি আর সম্রাট হতে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর ঔরংজীব"…সবটা পার্টই মুখস্থ হয়ে গেছে, হুজুর।'

'বলিস কি রে! তোরই মুখস্থ হতে পারে, আর আমার হবে না? আলবৎ হবে। আজ আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ না করে আমি আর এ ঘর থেকে বের হচ্ছি না।—প্রম্‌টিঙের ওপর আমার থোড়াই ভরসা।—নিকুঞ্জ কলকাতা থেকে সকালের গাড়ীতে ফিরেছে কিনা খোঁজ নিস। উপযুক্ত দাড়ি না হলে কিছুতেই আমার প্লে জমবে না। কাল সন্ধ্যায় ড্রেস রিহার্সেল।'

'হুজুর, পাল মশায় ত সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরছেন।' শিবু এই লইয়া ত্রয়োদশ বার কথাটা প্রভুকে স্মরণ করাইয়া দিল।

'বড্ড দেরি করে ফেলছে।' হরনারায়ণ কতকটা বিরক্ত ভাবেই কহিলেন। 'আগে থাকতে দু'চার বার না পরে' নিলে পরের দাড়িকে কখনও নিজের বলে মনে করা যায়? ড্রেস-রিহার্সেল দেখতে গুচ্ছের লোক জড়ো হবে—তাদের কাছে আমাকেও পরীক্ষা দিতে হবে।' বলিয়া তিনি রগড়ের সুরেই হাসিয়া উঠিলেন।

উত্তরাধিকারসূত্রে সম্রাট সাজাহানের কাছ হইতে পাওয়া অকৃত্রিম বাদশাহী দাড়ি গালে সাঁটিয়াই হরনারায়ণ ড্রেস-রিহার্সেল সমাপ্ত করিলেন। যে পার্ট গড়গড় করিয়া মুখস্থ বলিতে শিখিয়াছিলেন, স্টেজে তাহাও বারবার ভুল হইয়া গিয়াছে। এক দৃশ্যের জায়গায় অন্ত দৃশ্যের পার্ট বলিতে সুরু করিয়া বারবার মহড়া সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। যেখানে প্রস্থান করিবার কথা সেখানে তাহা স্রেফ ভুলিয়া বসিয়া অন্তদের পার্টে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে দৃশ্যে তিনি কোনও রকমেই প্রবেশ করিতে পারেন না, সেখানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছেন (এবং অন্তেরা বাধা দিতে আসিলে প্রভু-সুলভ জোর ধমক দিয়াছেন)।

"আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি। হা রে বাপের মন!"…
শিবু মাথা চুলকাইয়া কহিল

রাত বারটায় শুইতে আসিয়া এই সকল অসঙ্গতির কথা তাঁহার মনে পড়িল। কিন্তু ইহার চাইতেও যাহা ভয়ের কথা তাহা এই যে, স্টেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা অত্যন্ত বেশী অভদ্র ভাবে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়াছে এবং স্টেজে একাধিক বার তিনি দু'চোখেই অন্ধকার দেখিয়াছেন। ইহার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে! হরনারায়ণ চৌধুরী দুর্দ্দান্ত জমিদার। মহড়ার দর্শকেরা হয় তাঁহার নিজের কর্ম্মচারী নতুবা অনুগৃহীত ব্যক্তি। ইহাদের সামনে দাঁড়াইতেই যদি বুক কাঁপে, পার্ট ভুল হয়, প্রবেশ-প্রস্থানের জ্ঞান এলোমেলো হইয়া যায়, তবে কাল কি করিবেন? কাল সকালেই বিভাগীয় কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হাজির হইবেন। তার পর ক্রমে বহু সম্রান্ত নিমন্ত্রিত উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে বিদেশী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সংখ্যা কম নয়। হরনারায়ণ নিজে অভিনয় করিতেছেন বলিয়াই ইঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ এদিকে হরনারায়ণ নিজেই যদি ভয় পাইয়া ঘাবড়াইয়া যান, তবে কি ইঁহাদের কাছে সম্মান থাকিবে?

'ও কিছু নয়, প্রথম স্টেজে দাঁড়ালাম কিনা, তাই এমন হয়েছে।'—হরনারায়ণ নিজ মনে কহিলেন। 'আমি দুর্দ্দান্ত জমিদার। কাউকে কখনও ডরাই নি। দরকার হলে শত্রুর গর্দ্দান নিয়েছি। প্রতিবেশী জমিদারের সঙ্গে লাঠিয়ালের লড়াই আমি নিজে দাঁড়িয়ে পরিচালনা করেছি। বাবা জমিদার বলে বিশ গাঁয়ের লোক আমাকে ডরায়। আর ক'জন লোকের সামনে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করা ক'টা লাইন আউড়ে যেতে আমি ঘাবড়ে যাব? এ অসম্ভব। নিশ্চয়ই কোনও কারণে বায়ুর চাপবৃদ্ধি হয়ে থাকবে, তাই বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করেছে। কাল খুব বিবেচনা করে খেতে হবে।'

সকাল হইতেই বিলাসগঞ্জে বহু সম্ভ্রান্ত অতিথির সমাগম সুরু হইল। আদর-অভ্যর্থনার আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া-দাওয়ার বিরাট সমারোহ—পোলাও, মাংস দই-রাবড়ির ছড়াছড়ি। খাদ্যের এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে শুধু জমিদার স্বয়ং অর্দ্ধ-উপবাস করিয়া রহিলেন। আহারে সংযম করিবেন, আগে হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, খাওয়ার স্পৃহাও তাঁহার অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। তাঁহার একমাত্র ভাবনা, সন্ধ্যাবেলার অভিনয়। এটিকে উপলক্ষ্য করিয়াই সকলকে ডাকা হইয়াছে; যেমন করিয়াই হোক, এটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতেই হইবে। আরও মুশকিল হইয়াছে এই যে, সাজাহানের দাড়ির সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। সকল নিমন্ত্রিতই সাজাহানের দাড়ি দেখিতে উদ্‌গ্রীব। ইহাতে সাজাহান আরও বিব্রত বোধ করিতেছেন।

আদর-আপ্যায়নের ফাঁকে সময় পাইলেই তিনি অন্তঃপুরে নিজের শয়নকক্ষে ছুটিয়া আসেন এবং খাতা খুলিয়া নিজের পার্ট ঝালাইয়া লন। পার্ট ভুলিয়া গেলে তাঁহার কিছুতেই চলিবে না। নিমন্ত্রিতদের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে পারিবেন না। কি কুক্ষণেই তাঁহার নিজের থিয়েটার করিবার সখ হইয়াছিল! এবার যদি সম্মান বাঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারেন, তবে জীবনে আর এমন অবিমৃষ্যকারিতা করিবেন না।

জমিদার-বাড়ীর যে থিয়েটার হলে পাঁচ-ছয় শত লোকের বসিবার মত ব্যবস্থা আছে, সেখানে প্রায় হাজার লোক ঢুকিয়া বসিয়াছে। এমন বিশেষ অভিনয় ইতিপূর্ব্বে জমিদার-বাড়ীতেও হয় নাই। বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতেরা সব আসনগ্রহণ করিয়াছেন; আতর-দান হইতে আতর বর্ষিত হইতেছে। কনসার্ট সুরু হইয়াছে প্রায় দশ-বার মিনিট হইল। ঘোষিত সময় পার হইয়াও পাঁচ-সাত মিনিট বেশী হইয়াছে। যে-কোনও সময়েই যবনিকা উঠিতে পারে।

'শিবু!'

'হুজুর?'

'বাবা, আরেক গেলাস জল খাওয়া।'

'এই নিন্ হুজুর। কিন্তু দেখবেন দাড়িটা যেন আবার ভিজিয়ে ফেলবেন না। আবার ভিজলে বড়ই চুপ্‌সে যাবে।'

'তা গেলে যাবে। তুই বরঞ্চ মাথার পরচুলা খুলে মাথার চাঁদিতেও একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে দে, বাবা। আর দেখ্, ডাক্তারবাবুকেও না হয় আরেক বার কাছে ডাক্। বুকটা আবার ধড়াস্ ধড়াস্ করছে, হট করে না একেবারে থেমে যায়!'

'ও কিছু নয় হুজুর। আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনছি।' হরনারায়ণের খাস-ভৃত্য শিবু প্রভুর চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে গ্রীনরুমে হাজির ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে ছুটিল। মাত্র দু'মিনিট আগেই তিনি উইংসের এক প্রান্তে আরাম-চেয়ারে নিৰ্জ্জীব ভাবে শয়ান সাজাহানকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিয়া আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'আপনার ভয় কি। সিরিঞ্জে ওষুধ আমি রেডি করেই রেখেছি। এ সাময়িক দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। একবার স্টেজে ঢুকলেই দেখবেন, এ সমস্ত লক্ষণ দূর হয়ে গেছে।'

'তুমি ত বলছ, ডাক্তার। এদিকে আমার যে কি হচ্ছে তা ভগবানই জানেন।' বলিয়া হরনারায়ণ আবার চোখ বুজিয়া ইজিচেয়ারে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন।

'হুজুর!'

'এসেছ ডাক্তার?'

'আজ্ঞে না, আমি বিভূতি। এবার আপনার প্রবেশ।'

'কোথায়?' চোখ বুজিয়াই হরনারায়ণ যেন জীবনের পরপার হইতে প্রশ্ন করিলেন।

'এইবার সাজাহানকে স্টেজে ঢুকতে হবে হুজুর। আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই--'

'তা আমি পারব না বিভূতি। তা আমি পারব না। আমাকে তোমরা মাফ কর। আমার শ্বাস উঠেছে। আমি এখুনি মারা যাব।—এই যে ডাক্তার। যদি কিছু শেষ ওষুধ থাকে, তবে দাও। আমার আর দেরি নেই।... শিবু—'

'হুজুর?'

'তোর ত সমস্ত পার্ট মুখস্থ আছে। কাল ত গড়গড়িয়ে সব বলছিলি। মনিবকে বাঁচাতে পারবি? যদি পারিস্,
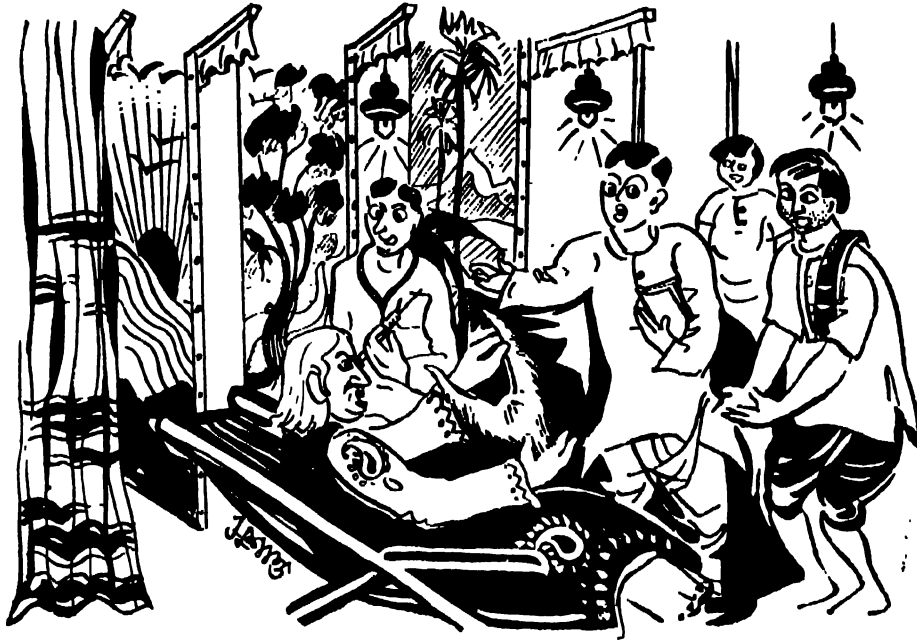
'...এই নে। ছ'শো টাকা দামের সাজাহানের দাড়িটা তোকে উপহার দিলাম।'

সাজাহানের পার্টটা করে দিয়ে আয় বাবা। এতগুলি হোমরা-চোমরা লোক ডেকে এনেছি, তাদের কাছে জমিদার-বাড়ীর সম্মান রক্ষা হোক।—বল, পারবি শিবু? এ তোর মনিবের শেষ অনুরোধ।'

'তা আর পারব না কেন হুজুর। চটপট সেজে নিলেই পারব। পার্ট ত মুখস্থই আছে।' শিবু মনিবকে আশ্বাস দিয়া কহিল।

'তবে যাও, একেই নিয়ে যাও বিভূতি।' হরনারায়ণ মুমূর্ষুর কণ্ঠে কহিলেন। 'আমার ভালমন্দ কিছু হলেও তোমরা থেমো না—জমিদার-বাড়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা চাই। —যা শিবু, চটপট সেজে নে বাবা। আর এই নে। ছ'শো টাকা দামের সাজাহানের দাড়িটা তোকে উপহার দিলাম।'

সাজাহানের সেই খানদানী দাড়ি পরিয়া শিবু চাকর যা অভিনয় করিয়া আসিল, তাহা তাজ্জবের। সে যেন প্রকৃতই দিল্লীর অধীশ্বর; ষড়যন্ত্র করিয়া কুলাঙ্গার পুত্র তাঁহাকে নিজের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। যে-ই দেখিল, সে-ই বলিল অপূর্ব্ব অভিনয়।

পরদিন হাইব্রেডিস জুট মিলসের বড়সাহেব জোন্স জমিদার হরনারায়ণ চৌধুরীকে যে অভিনন্দন-পত্র পাঠাইলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল:

"গত সন্ধ্যাটা সত্যই উপভোগ করিয়াছি। আপনার অভিনয় অনবদ্য হইয়াছিল। প্রকৃত অভিজাত-ঘরের ছেলে না হইলে সম্রাট সাজাহানের আভিজাত্য এমন সুষ্ঠুভাবে আর কেহই ফুটাইয়া তুলিতে পারিত না। আপনার মেক্-আপটিও একেবারে নিখুঁত হইয়াছিল।"

উৎসবের সাজে নৃত্যরতা সাঁওতাল স্ত্রীলোকগণ

পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী উন্নয়ন

ব্রহ্মচারী রমেশ

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রগঠনই নূতন শাসনযন্ত্রের লক্ষ্য। এইজন্য স্বাধীন ভারতের বুকে যে সমস্ত অনগ্রসর সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ-সাধন বিষয়ে উহাতে বিবিধ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অনগ্রসর সম্প্রদায় বলিতে সাধারণতঃ তপশীলী হিন্দু এবং আদিবাসী সম্প্রদায়কেই গণ্য করা হয়। আদমশুমারির সর্ব্বশেষ রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতে প্রতি সহস্র মানুষের মধ্যে ১৪৪ জন তপশীলী হিন্দু এবং ৫৪ জন আদিবাসী। সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি ৬৭ লক্ষ, তন্মধ্যে ৫ কোটি ১৩ লক্ষ তপশীলী সম্প্রদায়ের এবং ১ কোটি ৯১ লক্ষ আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত। সংবিধানের ২৭৫ (১) ধারার নির্দ্দেশ অনুসারে ভারত সরকার এই সাত কোটি অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। এই তপশীলীভুক্ত ও আদিবাসী সম্প্রদায়কে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর মানুষের সমপর্য্যায়ে আনয়ন করা হইবে বলিয়া শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে প্রতি রাজ্যসরকারের পরিচালনাধীনে এক একটি নূতন মন্ত্রণালয় সৃষ্ট হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঐ বিভাগগুলিকে আর্থিক সহায়তা দান করিতেছেন।

১৯৫৩ সনের নবেম্বর মাসে লোহার ডাগায় (রাঁচি) অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত অনুন্নতশ্রেণী কল্যাণ সমিতির অধিবেশনের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই আশা পোষণ করিয়াছেন যে, আগামী দশ বৎসর পরে ভারতে অনুন্নত-সম্প্রদায় বলিয়া কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকিবে না। যাহা সকল জাতি ও সমাজের পক্ষে সত্য, আদিবাসী এবং অনুন্নত সমাজের পক্ষে তাহার অন্যথা হইবার কোন কারণ নাই। এই সমস্ত আলোচনা হইতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, আদিবাসী-সমাজ আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসিগণের কথা অতি বিচিত্র। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী-কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করিব।

২

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসিগণকে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, ভুটিয়া, লেপচা, ম্রু, মেচ এই প্রধান সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সমস্ত আদিবাসীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার। তন্মধ্যে সাঁওতালগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালের সংখ্যা ৮ লক্ষ

৪৫ হাজার, ওরাওঁ ২ লক্ষ, মুণ্ডা ১ লক্ষ, ব্র সাড়ে চার হাজার, মেচ ১০ হাজার, লেপচা ১৩ হাজার, ভুটিয়া ৫ হাজার। বাঁকুড়া, পশ্চিম-দিনাজপুর, মেদিনীপুর, মালদহ, বীরভূম ও বর্দ্ধমানে অধিকসংখ্যক সাঁওতাল বসবাস করে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসী-কল্যাণ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমানে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, চব্বিশ পরগণা এবং হাওড়ার কোন কোন স্থানে কিছু সাঁওতাল শ্রেণীর নর-নারী জীবিকার জন্য বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করিতেছে।

উৎসবের সাজে বাদ্যরত সাঁওতাল যুবক

আদিবাসিগণ সাধারণতঃ শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর। সেইজন্য কেন্দ্রীয় তথা রাজ্যসরকার ইহাদের শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক আয়োজন করিতেছেন। উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যালয়-স্থাপন, ছাত্রাবাস-প্রতিষ্ঠা, ছাত্রদের বৃত্তিদান, পাঠ্যপুস্তক ক্রয় ও পরীক্ষা-দিতে আর্থিক সাহায্য দান করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী-কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় এক বেতার ভাষণে বলিয়াছেন যে, রাজ্যসরকার প্রতি বৎসর অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। সরকারী চাকুরি ক্ষেত্রে ৫ ভাগ স্থান ইহাদের জন্য সংরক্ষিত করা হইয়াছে। এখন পুলিস-বাহিনীতে সাঁওতাল গৃহীত হইতেছে। বর্ত্তমান বিধান-সভায় বার জন সদস্য উপজাতি সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে আট জন সাঁওতাল এবং বাকি চার জন ওরাওঁ, মুণ্ডা, মেচ ও ভুটিয়া সম্প্রদায় হইতে—এক একজন করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভায় উপমন্ত্রী শ্রীতেনজিং ওয়াংদি ভুটিয়া সম্প্রদায় হইতে গৃহীত হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে আদি-বাসী-কল্যাণের জন্য নিম্নরূপ কার্যসূচী প্রচার করিয়াছেন :

(১) আদিবাসীদের পঞ্চায়েত প্রথার পুনরুজ্জীবন।
(২) আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন।
(৩) শস্যগোলা স্থাপন।
(৪) বেসরকারী সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাহায্যদান।

কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ মঞ্জুর করিতেছেন তাহাতে নিম্নরূপ কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে :

(১) উৎপাদনমূলক পরিকল্পনা।
(২) শিক্ষামূলক পরিকল্পনা।
(৩) জনস্বাস্থ্য ও জলসরবরাহ ব্যবস্থা।
(৪) রাস্তা-নির্ম্মাণ।
(৫) কুটীর-শিল্পের উন্নয়ন।
(৬) বেসরকারী সেবা-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কার্য্যের প্রসার।

উপরোক্ত পরিকল্পনাসমূহকে বাস্তব রূপ দান করিবার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সরকার হইতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইতেছে তাহার সামান্য ইঙ্গিত এখানে দেওয়া প্রয়োজন। লোহারডাগায় অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত উপজাতি কল্যাণ-সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আদিবাসীদের জন্য ভারত সরকার বৎসরে দুই কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারসমূহ তিন কোটি টাকা ব্যয় করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মিশনরীগণ ভারতে প্রচারের জন্য কিরূপ বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত করেন তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি লোকসভার এক প্রশ্নোত্তরে অর্থদপ্তরের সহকারী সচিব শ্রীযুক্ত এম. সি. শাহ বলিয়াছেন যে, গত ১৯৫০ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৫৪ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত সাড়ে চার বৎসরে বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচারকগণ সেবামূলক কার্য্যের অজুহাতে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্মান্তরিতকরণের জন্য বিদেশ হইতে ২৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে একমাত্র ঠক্কর বাপা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় আদিম জাতি সেবকসঙ্ঘের কথা বাদ দিলে ভারতের সমাজসেবাব্রতী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান অনুন্নত সম্প্রদায় তথা আদিবাসিগণকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক বলিষ্ঠ জাতি গঠনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন বা মুক্তহস্তে অর্থাদি সাহায্য করিয়া সমাজ ও জাতি গঠনের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছেন—এরূপ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা এক প্রকার হয় নাই বলিলেই চলে।

বহু প্রতিষ্ঠান আদিবাসী উন্নয়নকল্পে কাজ করিতেছেন ; কিন্তু ঐ কার্য্যের দ্বারা আদিবাসিগণকে বিশেষ প্রভাবিত হইতে দেখা যাইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫) বিধান সভায় বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন-ভাষণে বলিয়াছেন, "উন্নয়ন-পরিকল্পনার সাফল্যের পরিমাণ কেবলমাত্র রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, নলকূপ খনন এবং অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থার দ্বারা করিলে চলিবে না। আমাদের জনসাধারণেও মধ্যে মনস্তাত্বিক বিপ্লব ঘটানো ও স্বাবলম্বনের মনোভাব গড়িয়া তোলাও ইহার উদ্দেশ্য।" আজ আদিবাসী উন্নয়নের দিকেও আমাদের এমন ভাবে কল্যাণকার্য্যে অগ্রণী হইতে হইবে যাহাতে অবহেলিত ও অবজ্ঞাত আদিবাসিগণের মধ্যে মানসিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভিতর এমন প্রেরণা জাগ্রত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা দীর্ঘকালের অবজ্ঞাত জীবনকে অন্যান্য উচ্চ স্তরের মানুষের সমপর্য্যায়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করে। তাহা হইলে আমরা অনুন্নত-উন্নয়নের জন্য যে কর্ম্মধারা গ্রহণ করিতেছি তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

বাঁকুড়ার রাণীবাঁধে সাঁওতাল সংগঠন কেন্দ্রে সাঁওতাল বালকদের তীর নিক্ষেপ শিক্ষা

৩

পশ্চিমবঙ্গে আর এক শ্রেণীর উপজাতীয় মানুষ বাস করে। তাহাদের কাহিনী অতি বিচিত্র। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পার্ব্বত্য বন্য অঞ্চলে ইহাদের বাস। ইহারা শবরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগকে খড়িয়া লোধা নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের স্থায়ী বাসগৃহ নাই। বনেজঙ্গলে বা পাহাড়ের পাদদেশে পর্ণকুটীরে ইহারা থাকে। বনজ ফলমূল, ও পশুপক্ষীর অর্দ্ধদগ্ধ মাংসই ইহাদের খাদ্য। ব্রিটিশ শাসনকালে ইহাদিগকে স্বভাবদুর্বৃত্ত (criminal tribe) নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছিল। ইহারা অত্যন্ত দৈন্যের মধ্যে ও হীন দশায় কালাতিপাত করিয়া আসিতেছে। জীবিকার জন্য ইহারা প্রকাশ্য দিবালোকে নরহত্যাদিও করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। সেইজন্য এখনও ইহাদের জন্য পুলিস-প্রহরার ব্যবস্থা আছে। স্বাধীন ভারতের বুকে মানুষ যে এরূপ শাসন-বহির্ভূত জীবন যাপন করে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ হইতে উক্ত খড়িয়া লোধা অধ্যুষিত অঞ্চলে গঠনমূলক কার্য্যাবলী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা কর্ম্মব্যপদেশে সুদূর পল্লী অঞ্চলে গিয়া লোধা খড়িয়া সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। জনৈক সংবাদদাতা পত্রযোগে এই বিষয়ে অনেক তথ্য আমাদের গোচরীভূত করিয়াছেন। সংবাদদাতার পত্রাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"...অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতের নব-সংবিধানে সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থায় এই খড়িয়া লোধা জাতি উপেক্ষিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার প্রকৃত বন্যজাতি লোধা সম্প্রদায়কে স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতি (Criminal Tribe) আইনে আবদ্ধ রাখা সত্ত্বেও তপশিলীশ্রেণী তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। আবার, সংবিধানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার খড়িয়া সম্প্রদায়ের নাম পার্ব্বত্যজাতির তালিকায় বা অপর কোন তালিকায় মধ্যে স্থান পায় নাই। আজও তাহারা ভারতীয় সংবিধানের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশে এই খড়িয়া জাতির নাম বন্য পার্ব্বত্যজাতির তালিকাভুক্ত আছে।"

রাণীবাঁধে আদিবাসী সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শান্তি-যজ্ঞ

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে এই খড়িয়া জাতির সংখ্যা দশ সহস্রাধিক। তন্মধ্যে ঝাড়গ্রাম ও

কাষ্ঠনির্ম্মিত লাঙ্গল স্কন্ধে পশ্চিম বঙ্গের সাঁওতাল যুবক

অর্জ্জনের জন্য কৃষিকার্য্যাদিতে নিয়োজিত থাকে, রাত্রিকালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। বর্ত্তমানে ষাট জন সাঁওতাল বালক-বালিকা উক্ত বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিতেছে। পশ্চিম-দিনাজপুরের তিওড় নামক স্থানে সাঁওতালদের ভিতর একটি ছাত্রাবাসও স্থাপিত হইয়াছে।

আদিবাসিগণের ভিতর শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে শরীরচর্চ্চার শিক্ষাও দেওয়া হয়। আদিবাসিগণের জাতীয় ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ ও উৎসব-পার্ব্বণাদিতে তাহাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়। ছায়াচিত্রযোগে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, পৌরাণিক বীরগণের কীর্ত্তিকাহিনী ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার উৎসাহ দান করা হয়। তাহাদের চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে ঔষধপথ্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা আছে।

বাঁকুড়ার বন্য অঞ্চলে সহস্রাধিক লোধা খড়িয়া বসবাস করে। আদিম শবর হিন্দু জাতীয় সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবলরাম দাস খড়িয়া লোধা জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়ন-ব্যবস্থার প্রার্থনা জানাইয়া যে পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন তদনুযায়ী সরকার সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের নিকট আইলি গাড়িয়া গ্রামে পঁচিশটি পরিবারের একটি পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার হরিজন সেবক সঙ্ঘ এই লোধা খড়িয়া জাতির কল্যাণের জন্য সরকারী সাহায্য পাইতেছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ জাতিকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাই ঐ অবহেলিত সম্প্রদায়কে উচ্চ-বর্ণের মানুষের সমপর্য্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

৪

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতেও ঝাড়গ্রামের পুকুরিয়া নামক স্থানে একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্র হইতে আদিম জাতির মধ্যে বিবিধ গঠনমূলক কার্য্যাবলী পরিচালিত হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। লোধা, মহালী, মহাতো প্রভৃতি আদিবাসী ছাত্রগণ এখানে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে কাপড়, জামা প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছে। ছাত্রদের শ্লেট, বই কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। জলকষ্ট দূরীকরণের জন্য একটি গভীর কূপ খনন করা হয়। দুঃস্থদের আর্থিক সহায়তা করা হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত সঙ্ঘ হইতে বাঁকুড়ার রাণীবাঁধ নামক স্থানে সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চলেও অনুরূপ একটি কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। একটি আবাসিক নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। সাঁওতালগণ দিবাভাগে জীবিকা

ঝাড়গ্রাম অনগ্রসর কল্যাণকেন্দ্রে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র

স্বামীজী মহারাজ বলিতেন, "অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রকৃত ক্ষাত্রশক্তি নিহিত রহিয়াছে। জ্ঞান-শক্তি ও ক্ষাত্রশক্তির সমন্বয়ে জাতি প্রকৃত শক্তিমান হয়। কাজেই অনুন্নত সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষায় উচ্চবর্ণের হিন্দুর সহিত সমমর্য্যাদা দান করিলে, শৌর্য্যবীর্য্য সাহসিকতায় ও জ্ঞানের অনুশীলনে হিন্দুজাতি দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে।" তাই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ আজ অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন এবং স্বামিজী পরিকল্পিত কর্ম্ম-ধারাকে বাস্তব রূপ দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতের মূল আদর্শ আধ্যাত্মিকতা। ঐ আধ্যাত্মিক ভাবধারা আদিবাসিগণের ভিতর আজ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া দরকার। আমরা আদিবাসিগণের মধ্যে কার্য্যকালে লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাহাদের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব পার্ব্বণ, বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ড বহুল পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। যদি হিন্দুধর্ম্মের মহান্ আদর্শ আদিবাসিগণের ভিতর ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রতিষ্ঠার সুবন্দোবস্ত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আর্থিক অবস্থা-উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম পরিকল্পনাকে যথার্থ সফলতার পথে আনয়ন করা যায়। তবে আদিবাসিগণ বৈদেশিক মিশনরীগণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সেবামূলক কার্য্যাবলীর আওতায় পড়িয়া ভারতীয় জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার পথে সাহায্য করিবে না। লক্ষ্য করিয়াছি যে, মিশনরীগণ সমাজসেবামূলক কার্য্যাবলীর অছিলায় ভারতীয়-গণকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়া থাকেন এবং খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মিশনরীগণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত আদিবাসী, খণ্ড পার্ব্বত্য জাতি ও উপজাতীয় তপশীলী হিন্দুগণের মধ্যে তাঁহাদের কর্ম্মজাল বিস্তার করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ভারতে বৈদেশিক ধর্ম্ম-প্রচারকগণের কার্য্যাবলীর তথ্যানুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সাত জন সদস্য লইয়া মধ্যভারতে এই কমিশন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত কমিশনের সভাপতি মধ্যভারত হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী এস. বি. রোজ তাঁহার তদন্তের তথ্য সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দান করিয়াছেন।

শ্রীযুত রোজ বলিয়াছেন, "মধ্যভারতে এখনও ৪৪৬ জন বৈদেশিক মিশনরী আছেন। তাঁহারা বিশেষ উৎসাহ উদ্যোগ সহকারে কাজ করিয়া গত ছয় বৎসরে ১২০০ ভারতবাসীকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়াছেন। ঐ ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তিগণ মধ্যভারতের অধিবাসী, অজ্ঞ ও দরিদ্র উপজাতীয় নর-নারী।" শ্রীযুত রোজ আরও প্রকাশ করিয়াছেন, "মধ্যভারতের খ্রীষ্টান মিশনরীগণ প্রচার ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। ঐ অর্থের দ্বারা মিশনরীগণ প্রথমতঃ অজ্ঞ ও দরিদ্র নর-নারীদিগকে খাদ্য ও বস্ত্রাদির দ্বারা অনুগৃহীত করেন এবং পরে সেই প্রভাব-প্রতিপত্তির সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করেন।

ঝাড়গ্রামের পুকুরিয়া গ্রামে নৈশবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত লোধা, মহাতো প্রভৃতি বালকগণ

"বৈদেশিক মিশনরীগণ শুধু যে মধ্যভারতে তাঁহাদের কার্য্য সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাদের সুবিস্তৃত কর্ম্মকৌশল ভারতের সর্ব্বত্র প্রসারলাভ করিয়াছে।"

তাই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুধর্ম্মের বিশোদার আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচারের আয়োজন হইয়াছে। আদিবাসী-পল্লীতে বৈদিক যজ্ঞ করা হইতেছে। উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে আদিবাসিগণকে যোগদানের সুযোগ দান করা হয়। তাহাদের মধ্যে নিয়মিত প্রার্থনাসভায় সমবেত ভাবে স্তব-স্তুতি পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইতেছে। আদিবাসিগণ যে হিন্দুসমাজের একটি অংশ, তাহারা অবজ্ঞাত অস্পৃশ্য নহে, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকেও আদিবাসীদের প্রতি উদারভাবাপন্ন হইয়া তাহাদিগকে সকলের সহিত সমমর্য্যাদাসম্পন্ন করিবার জন্য বলা হইয়া থাকে। মদ্য ও হাড়িয়া পচাই প্রভৃতি পানের অপকারিতার বিষয় তাহা-দিগকে ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। সঙ্ঘের কার্য্যাবলী-প্রসারের ফলে আদিবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। সঙ্ঘের গঠনমূলক কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঙ্ঘকে আর্থিক সহায়তা দান করিয়া উৎসাহিত করিতে-ছেন।

সমাধির শঙ্কা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কাল কালো তুলি বুলাইছে অবিরাম,
মুছিয়া যেতেছে বড় বড় সব নাম।
ঝুটা মুকুতারা গলিয়া হতেছে দ্রব,
ম্লান, বিশুষ্ক, বিমলিন নিষ্প্রভ।
দাঁড়কাকদের খসিছে ময়ূর-পাখা,
কঠিন হতেছে স্বরূপ তাদের ঢাকা।
ভেবেছিল নিজে জ্যোতিষ্ক সম যারা,
হাউই-এর খোল রহিছে দীপ্তিহারা।
দগ্ধ পাপের স্তূপ—
বাহির হতেছে, ভস্ম হইয়া
দামী মণিমঞ্জুষা।

২

ভীম বর্ব্বর মতন যাহারা উঠি'
নির্ম্মম, দিল লক্ষ জীবন টুটি';
যাহারা দৃপ্ত পশুবলে বলীয়ান,
হরিল দেশের ধন জন মান প্রাণ,
ধ্বংস করেছে দগ্ধ করেছে নিতি,
বৈশিষ্ট্য ও মহতী সংস্কৃতি,
করেছে জাতিরে অপমান-জর্জ্জর
শান্তি কি পাবে তাহাদের পঞ্জর?
কি সে রবে নিরাপদ?
অতীত পাপের বিচার যখন
করিবে ভবিষ্যৎ।

৩

দুষ্কৃতিদের জীর্ণ অস্থি অতি
লাঞ্ছনা হতে পাবে কি অব্যাহতি?
প্রোথিত তাদের পাপদেহ, আমি ভাবি
পঞ্চভূতেরা হয়ত করিবে দাবি।
বিষাক্ত যারা করেছে ধরিত্রী,
নৃশংসতাই যাহাদের কীর্ত্তি,
ন্যায় সত্য ও যুক্তিকে উপহাসি'
নিরপরাধকে যাহারা দিয়েছে ফাঁসি,
হউক যতই স্ফীত—
বর্ব্বরতার শিকার হইবে
বর্ব্বর গর্হিত।

৪

প্রবল প্রতাপ 'ফেরওয়া'গণের 'মমি',
আছে যাদুঘরে এক কোণে আজ জমি'
সমাধি হইতে তোলা নরকঙ্কাল,
ফাঁসির মঞ্চে সহিয়াছে নাজেহাল,
কত সমাধির মর্য্যাদা অপহৃত,
কত লুণ্ঠিত, বিকৃত, বিক্রীত।
দম্ভী দলের সমাধি এখন ভাবে
এই সমারোহ রক্ষা কেমনে পাবে?
মৃত 'জার' হয়ে ধূলি—
সাইবিরিয়ার দীন কুটীরের
রোধিতেছে ঘুলঘুলি।

৫

এমন সমাধি রয়েছে আছে ও রবে,
যেথা নতজানু নতশির হয় সবে।
বিলাইয়া গেছে তাহারা অমৃত,
যুগ জাতি দেশ করেছে সমৃদ্ধ,
তাহাদের জয় যশ অবিনশ্বর,
বৃহৎ হইতে হতেছে বৃহত্তর।
প্রেমে মৈত্রীতে তাহারা দিগ্বিজয়ী
অক্ষয় হ'ল তাহাদের দেহ ক্ষয়ী।
প্রণমে দণ্ডবৎ
সে সব সমাধি গোটা ধরণীর
অমূল্য সম্পদ।

৬

শুধু অনাগত জনগণ শ্রদ্ধায়
সমাধি তাদের নিরাপত্তা যে চায়।
ক্ষতি অপমান ভুলিতে পারে না জাতি,
রাখিবে সে ব্যথা রক্তধারায় গাঁথি।
না গণি, প্রতিজ্ঞা কীর্ত্তি এবং বয়ঃ
দর্পী দিতেছে দণ্ড দুর্বিষহ।
বৈজ্ঞানিক যে সভ্যতা এলো দেশে
বর্ব্বরতাই এসেছে ছদ্মবেশে—
মৃতও পাবে না ক্ষমা—
ফুটিবে, তাদের সমাধি উপরে
'ভায়লেট' নয়—বোমা।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এবং মুখ্যতঃ সুরুচিপূর্ণ শিক্ষাপ্রদ ও সরল বাংলায় লিখিত পুস্তকাদি প্রচারোদ্দেশ্যে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে এই সমাজের কার্য্যকলাপ ও প্রয়োজনীয়তা সমসাময়িক সংবাদপত্রে এবং মনীষীদের দ্বারা আলোচিত হইয়াছিল। আমরা এসমুদয় আলোচনা ও সংবাদাদি হইতে এই হিতকারক প্রতিষ্ঠানটির বিষয় অবগত হইয়াছি। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ হইতে বিভিন্ন সময়ে যে-সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও সমাজের কথা কিছু কিছু লিপিবদ্ধ আছে। ইহার বিষয় আলোচনাকালে এগুলিও আমাদের বিশেষ কাজে আসে। নামেই প্রকাশ, এই প্রতিষ্ঠানটি ইংরেজ ও বাঙালী যোগ্য লেখকদের দ্বারা প্রথমে ইংরেজী এবং পরে সংস্কৃত ভাষা হইতে গ্রন্থাদি অনুবাদ ও সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। কোন কোন লেখকের মৌলিক রচনাও সমাজ পরে প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা ক্রমে জানিতে পারিব।

আমি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের জন্মবৃত্তান্ত এবং প্রথম দিককার কার্য্যকলাপের কথা ইতিপূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে* লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল—ডিসেম্বর ১৮৫০।† ইহার ১৮৫৩ সনের কার্য্যকলাপের বিবরণ ১৮৫৪ ২২শে মে দিবসীয় 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' সাপ্তাহিকে বাহির হয়। বিবরণটির তারিখ ইহার শেষে প্রদত্ত হইয়াছে ১লা এপ্রিল ১৮৫৪। সমাজের প্রথম কার্য্যবিবরণী হইতেই জানা গিয়াছিল যে, 'রবিন্সন ক্রুশো', 'ল্যাম্বস টেলস ফ্রম শেক্সপীয়র' এবং মেকলের 'এসে অন ক্লাইভ'—পুস্তক তিনখানি অনুবাদিত হইয়া যন্ত্রস্থ হয়। এই পুস্তকত্রয় অনুবাদ করেন যথাক্রমে—জে. রবিন্সন, ডক্টর রোয়ার এবং হরচন্দ্র দত্ত। তিনখানিই ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল, নাম দেওয়া হইয়াছিল—'রবিন্সন ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত', 'শেক্সপীয়ার কৃত গল্প' এবং 'লার্ড ক্লাইব চরিত্র'। প্রথম ও তৃতীয় পুস্তক চিত্রিত। বহু অর্থব্যয়ে ইংলণ্ড হইতে ইহার ব্লক সমাজ-কর্তৃপক্ষ আনাইলেন।

২

শেষোক্ত পুস্তক—'লার্ড ক্লাইব চরিত্রে'র ইংরেজী "Preface" বা পূর্ব্বাভাষে সমাজের উদ্দেশ্য, বাংলা ভাষা এবং অনুবাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান কথা আছে। অনুবাদ 'আক্ষরিক' না হইয়া যে 'ভাবমূলক' হইবে এ সম্বন্ধে লেখক হরচন্দ্র দত্ত বিশেষ জোরের সঙ্গে এইরূপ বলেন:

"The object of the Association is distinctly stated to be not only to *translate* but *adapt* English authors in Bengali."

এ বিষয়ে সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হজসন প্র্যাট সমাজ-প্রতিষ্ঠার পরে একখানি পত্রে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন:

"Mere translation would not meet the great object which this society intended to keep in view. . . . With this view, therefore, all works, issued by the Committee will be carefully *adapted* with reference to the actual condition of the native mind."*

'সমাজে'র অনুপ্রাণনায় যেসব পুস্তক লিখিত বা অনূদিত হয় তাহা এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই প্রায়শঃ করা হইত। বাংলা ভাষার মাধ্যমেই যে জনশিক্ষা দিতে হইবে, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে দিতে গেলে সাধারণের নিকটে তাহা পৌঁছাইবে না একথাও প্র্যাট সাহেব উক্ত পত্রে অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ব্যাপকতা ও মাধুর্য্য এবং বাংলা পুস্তক পঠন-পাঠনে জনগণের আগ্রহ সম্পর্কে হরচন্দ্র দত্ত উক্ত পূর্ব্বাভাষে বলিতেছেন:

"Again the resources of the Bengali language are unbounded. It possesses great powers and sweetness, and the activity of the native press testifies to the fact, that it is the favourite tongue of the great mass of readers in the country. But much of the literature thus provided for the people is professedly pernicious in its character. These, and like considerations have induced the translator to take into hand the translation of Macaulay's celebrated paper on Clive." (Translator's *Preface*, p. iv).

* প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৫১

† পাদ্রী লঙ *Returns Relating to Publications in the Bengali Language in 1857, etc.,* পুস্তকের ৫৪ (LIV) পৃষ্ঠায় তারিখটি ভ্রমক্রমে '১৮৫১' দিয়াছেন।

* 'পাল ও বর্জিনিয়া' (১৮৫৬) পুস্তকের ভূমিকায় প্র্যাট কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

সমাজের উদ্দেশ্য - ট্রাক্ট সোসাইটি প্রকাশিত বাংলায় খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-পুস্তক এবং কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির বাংলা পাঠ্য পুস্তকসমূহের অতিরিক্ত বঙ্গ পাঠকপাঠিকার উপযোগী সহজ ভাষায় জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পরিবেশন—এ বিষয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। সমাজ-প্রকাশিত 'লার্ড ক্লাইব চরিত্র' এবং অন্যান্য পুস্তকের আখ্যাপত্রের "পার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ" কথাগুলি উক্ত উদ্দেশ্যেরই দ্যোতক।

৩

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের বৈষয়িক কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত প্রতি মাসে অধ্যক্ষ-সভার একটি করিয়া অধিবেশন হইত। অধিবেশনের সিদ্ধান্তগুলির গুরুত্ব বিবেচনায় সেক্রেটারী বা কর্ম্মসচিব মাঝে মাঝে ইহার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রেরণ করিতেন। এইরূপ একটি অধিবেশনের বিবরণ* হইতে জানা যায়, ১২ই আগষ্ট ১৮৫৩ তারিখে অধ্যক্ষ-সভার অন্যতম সদস্য মিঃ এম্ ওয়াইলির গৃহে সভা হয় এবং তাহাতে উপস্থিত ছিলেন—ডবলিউ. সিটনকার, এম্. ওয়াইলি, এইচ. উড্রো, হজসন প্রাট, জে. লঙ, রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সভায় সর্ব্বসাকুল্যে পাঁচটি প্রস্তাব গৃহীত হয়:

১ম। সমাজের পুস্তকাদি বিক্রয়ের ভার লালবাজারের ডি' রোজারিও কোম্পানী এবং শোভাবাজারের তত্ত্ববোধিনী সভা প্রেসের উপর অর্পিত হইল। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এই প্রেসের পরিচালক।

২য়। দশখানা বা ততোধিক পুস্তক ক্রয় করিলে ক্রেতা উহার মূল্যের উপরে শতকরা পনর টাকা কমিশন পাইবেন।

৩য়। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রেসের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হইবে যাহাতে মফস্বলে এবং বিভিন্ন স্থলের মেলায় ও বাজারে তাঁহাদের এজেন্সির সঙ্গে বিক্রেতা পাঠাইয়া পুস্তক বিক্রয় করা যায়।

৪র্থ। পত্রিকা প্রস্তুতকরণের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে গতানুগতিক বিষয়াদির সঙ্গে সাধারণ বিজ্ঞান, ইতিবৃত্ত, পরিসংখ্যান, আইন-কানুন প্রভৃতি বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৫ম। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হউক—অনুবাদের যোগ্য কিনা তাহা বিচার করিবার জন্য:

1. *The Arctic Region.*
2. *Insect Architecture.*
3. *Bird Architecture.*

এতদ্‌ব্যতীত এই সভায় নির্দেশ দেওয়া হয়—যাহাতে মেকলের 'ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্' রচনাটি অনুবাদের ব্যবস্থা শীঘ্র করানো যায়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির অনুবাদ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া সদস্যদের বলা হয়:

1. *Life of Columbus.*
2. *Quavis' Chines?*
3. *Life of Peter the Great.*
4. *Selections from Chambers's Tracts.*
5. *The Percy Anecdotes.*

৪

সমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণীতে* ১৮৫৩ সনের অধ্যক্ষ-সভা এবং ইহার কার্য্যকলাপ সমগ্র ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সময়েও সমাজের 'পেট্রন' বা পৃষ্ঠপোষক রূপে লর্ড ডালহৌসীকে দেখি। সভাপতি—অনারেবল জে. আর. কল্‌ভিন। সদস্যদের মধ্যে এগার জন ইউরোপীয় ও ছয় জন বাঙ্গালী। তাঁহারা যথাক্রমে—এইচ্. ডি. বেলী, এইচ্. টি. বাক্‌ল্যাণ্ড, জে. এ. ক্রফোর্ড, এ. গ্রোট, ডবলিউ. সিটনকার, ডবলিউ. কে, পাদ্রী জেমস লঙ, ই. এ. স্যামুয়েলস্, ডক্টর স্প্রেঙ্গার, মেরিডিথ টাউনশেণ্ড, রসময় দত্ত, রাধাকান্ত দেব, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কোষাধ্যক্ষ—এইচ. উড্রো এবং সম্পাদক বা কর্ম্মসচিব—হজসন প্র্যাট।

সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" সম্পর্কে বিবরণীতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকাশের পর হইতেই পত্রিকাখানি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুযোগ্য সম্পাদনার ফলে খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ১৭৭৪ শকের (১৮৫২), কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা বাহির হয় নাই। দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হয় পৌষ ১৭৭৪ শকাব্দ হইতে। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ষোল পৃষ্ঠা হইতে চব্বিশ পৃষ্ঠায় বর্দ্ধিত হয়। প্রকাশ বাবদ ব্যয়ও প্রতি মাসে পঁচাত্তর টাকা হইতে সোয়া শত টাকায় বাড়িয়া যায়। পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা স্থলে ধার্য্য হয় দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা দুই আনা স্থলে হয় তিন আনা। পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তিনখানি করিয়া ব্লক থাকিত। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলির মত ইহার চিত্রের ব্লকও ইংলণ্ড হইতেই করাইয়া আনা হইত। "বিবিধার্থ সংগ্রহ" (এবং পরে "রহস্য-সন্দর্ভ") কতখানি জ্ঞানগর্ভ ছিল এবং ঐ সময়ে কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠে, সমসাময়িক উক্তি হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। বালক রবীন্দ্রনাথ ইহার রচনাপাঠে বিশেষ মুগ্ধ হইতেন। 'জীবন-

* *The Hindu Intelligencer*, September 5, 1853, p. 285.

* *The Hindu Intelligencer*, Fay 22, 1854, pp. 163-4.

স্মৃতি'তে তিনি তাহার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলীর পক্ষপাতী না হইলেও এই পত্রিকাখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন:

"It is, however, due to that body (the Vernacular Literature Society) that the Bengali periodical published under their auspices offers a remarkable exception to this criticism, and that it is the most useful publication of the kind in all Bengali periodical literature."*

"বিবিধার্থ সংগ্রহ" শুধু সে যুগে কেন, বর্ত্তমানকালের পাঠক-পাঠিকাকেও ইহার রচনাবলীর সরসতা এবং জ্ঞানগর্ভতা হেতু মুগ্ধ করিয়া রাখে।

এখন আবার পত্রিকা প্রকাশের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। মূল্যবৃদ্ধি হেতু "বিবিধার্থ সংগ্রহে"র বিক্রী ১৮৫৪ সন নাগাদ এক হাজার হইতে কমিয়া সাড়ে আট শতে দাঁড়ায়। কিন্তু কমিটি উক্ত বিবরণীতে এই আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে, মফস্বলের বিভিন্ন স্থলে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই সংখ্যা চতুর্গুণ বাড়িয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা সিদ্ধ না হইয়া পারিবে না। এই সময়ের মধ্যেই ১৮৫৩ সনে সমাজ-কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশিত করিয়াছেন পূর্ব্বোল্লিখিত তিনখানি পুস্তক—'রবিন্সন ক্রুশোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'সেক্স্পীয়র কৃত গল্প' এবং 'লার্ড ক্লাইব চরিত্রে'সহ জেম্স লঙ-সম্পাদিত সংবাদ-সার (Selections from Native Periodical Press) এবং হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। 'লার্ড ক্লাইব চরিত্রে'রও দ্বিতীয় সংস্করণ এই ১৮৫৩ সনেই বাহির হয়।

আরও প্রকাশ, "The Arab", "Life of Columbus" এবং "The Life of Peter the Great"—এই পুস্তক তিনখানির অনুবাদকার্য্য শেষ হইয়াছে, শীঘ্রই মুদ্রণার্থ প্রেরিত হইবে। জে. রবিন্সন প্রণীত 'রবিন্সন ক্রুশোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় বার মুদ্রণেরও ব্যবস্থা হয়। এ সময়ে সমাজ-কর্ত্তৃক সামাজিক তথ্যবহুল একখানি অভিনব ধরণের 'পঞ্জিকা' বা বার্ষিকী পুস্তক প্রকাশের আয়োজন চলিতে থাকে। বিবরণীতে প্রকাশ, এখানি হইবে ১২৬১ বঙ্গাব্দের জন্য এবং ছাপা হইবে আড়াই হাজার খণ্ড। মূল্য স্থির হয় প্রতি খণ্ড চারি আনা। পঞ্জিকার তথ্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত সমাজের অধ্যক্ষ-সভা একটি সুন্দর পন্থা অবলম্বন করেন। সভার পক্ষে কর্ম্মসচিব বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন জেলার বেসামরিক কর্ম্মপ্রধানদের নিকট তথ্য ও সংবাদাদি চাহিয়া একখানি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেন। ইহাতে বেশ ফলোদয় হইয়াছিল। তবে ১২৬১ বঙ্গাব্দের পঞ্জিকা বাহির হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ লঙ ১৮৫১-৫৭ সনের অনুবাদক সমাজ-প্রকাশিত পুস্তকসমূহের যে তালিকা
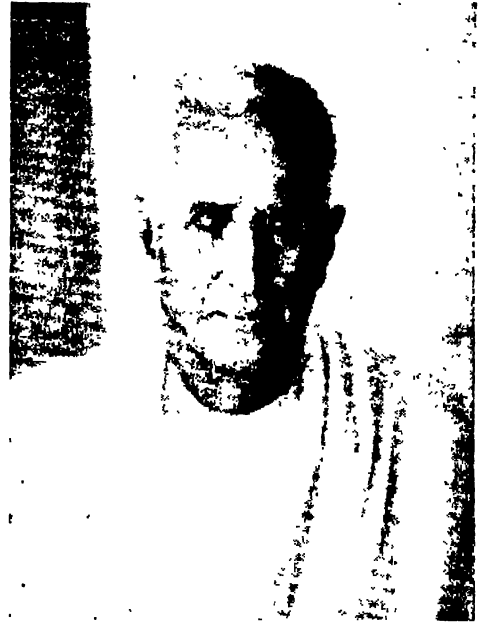
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

দিয়াছেন তাহার মধ্যে ১২৬১ সনের কোন পঞ্জিকা-পুস্তক স্থান পায় নাই। কর্ম্মসচিব সমাজের বৎসরাধিক কালের কার্য্যাবলীর ফিরিস্তি দিয়া সর্ব্বশেষে এই আশার বাণী ঘোষণা করেন:

"The Committee with these facts before them feel they have every reason to be thankful for the great success which has attended their efforts, and that they have every encouragement to extend the sphere of their operations, they trust that the Native and European public will give them the support necessary to enable them to pursue this object."

সমাজের কার্য্য ইতিমধ্যেই সুষ্ঠুভাবে আরব্ধ হইয়াছিল। ইহার কার্য্য যে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিবে ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে এবং ইহাতে যে দেশীয় ও ইউরোপীয়দের সমর্থন পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভার কোনরূপ সন্দেহ ছিল না।

৫

কিন্তু ১৮৫৪ সনের মধ্যভাগ হইতে 'সমাজে'র অবস্থা

---

* বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভায় প্রদত্ত "A Popular Literature for Bengal" শীর্ষক বক্তৃতা। *Essays and Letters*, (বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ), পৃ. ১৮।

গোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। পাজী লঙ সমাজের ১৮৫১-৫৬ অব্দের যে আয়ব্যয়ের হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হয় —১৮৫৪ সনে সমাজের আয় হইয়াছিল ছয় শত ছিয়াশী টাকা, ১৮৫৫ সনে তাহা কমিয়া দাঁড়ায় মাত্র তিন শত তেত্রিশ টাকায়। প্রায় দুই বৎসরকাল সমাজের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হওয়ায়, ইহার কার্য্য আশানুরূপ পরিচালিত হইতে পারে নাই। ঐ সময়কার সংবাদপত্রেও ইহার কথা সামান্যই বাহির হইত। 'বেঙ্গল হরকরা' হইতে এই রকম আভাস পাওয়া যায় যে, এই সময়ের মধ্যে অনেক প্রতিপত্তিশালী সদস্য সমাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ইহার কথা একটু পরে বিশেষ করিয়া বলিব।

১২৬২ সালে (১৮৫৫-৫৬) যে "নূতন পত্রিকা" বঙ্গভাষানুবাদক সমাজকর্ত্তৃক বাহির হইয়াছিল, তাহার মলাটে সমাজ-প্রকাশিত পুস্তকের একটি তালিকা মুদ্রিত হয়। ইহাতে দেখা যায়, 'গজার খাদের সংক্ষেপ বিবরণ' ও 'মনোরম্য পাঠ' ব্যতীত আর কোন পুস্তকই এ সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পর পর তিন বৎসর (১৮৫১-৫২, ১৮৫২-৫৩ ও ১৮৫৩-৫৪) প্রকাশান্তর বন্ধ হইয়া যায়। নূতন পত্রিকায় (১২৬২) প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে সমাজের সম্পাদকরূপে হজসন প্র্যাটের নাম পাইতেছি। 'পোল ও বর্জিনিয়া'র ভূমিকাতেও ১লা জানুয়ারী ১৮৫৬ তারিখে তিনি নিজেকে সমাজের সেক্রেটারী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার অল্প পরেই তাঁহাকে সরকারী কর্ম্মে অন্যত্র যাইতে হয়। সমাজের পুস্তক এই সময়েও বিক্রয়ার্থ লালবাজারের ডি' রোজারিও কোম্পানী এবং তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নিকট মজুত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই কিন্তু বাংলা সাহিত্য প্রচারে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক বৎসর যাবৎ যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, ইহা হইতে তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

সমাজের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহার গ্রন্থাগারে অনেকগুলি বই দান করেন। আগে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত অর্থে আরও কিছু বই কেনা হয়। ১৮৫৫ সনে লঙ এই সকল বইয়ের একটি তালিকা মুদ্রিত করান। তাহাতে দেখা যায় এই পুস্তকসংখ্যা ৯৪৪; এবং ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায়ই লেখা।

১৮৫৬ সনের এপ্রিল মাস হইতে সমাজের অধ্যক্ষ-সভার মাসিক অধিবেশনের সংবাদ আবার পত্রিকায় যথারীতি বাহির হইতে লাগিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭শে মার্চ্চের একটি অধিবেশনে প্যারীচাঁদ মিত্র সাময়িকভাবে সমাজের সম্পাদক হইলেন।* পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাব হইল—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে ইহাকে সংযুক্ত করা হউক। প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থলে এ অধিবেশনে আর. বি. চ্যাপম্যান সমাজের অনারারি সেক্রেটারি বা কর্ম্মসচিব পদে বৃত হন। এই সভায় "বৃহৎ কথা" প্রকাশ করাও স্থির হইল।†

ইহার পর সমাজ একক ভাবে পূর্ব্বানুরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন। উক্ত অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশের এক মাস মধ্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ২৪শে মে, ১৮৫৬ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিলেন:

"The Vernacular Literature Society which was for some time in a flourishing condition and was kept up with considerable energy and spirit has latterly suffered severely from the removal of some of its most influential members. Its operations have been practically suspended. Mr. R. B. Chapman is the present Honorary Secretary, and he announces the design of placing the Society on a more secure basis by adding considerably to the number of the working members of its Committee and calling upon the public for more general support."

'হরকরা' বলেন, কর্ম্মসচিব নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী 'সমাজ' পুনর্গঠনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি ইহার কর্ম্মী-সভ্য বাড়াইয়া ইহাকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হন। 'হরকরা'-সম্পাদক সমাজ-কর্ত্তৃপক্ষকে বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশ করিতেও পরামর্শ দিলেন। প্রায় দেড় মাস পরে, ১০ই জুলাই ১৮৫৬ তারিখে 'হরকরা' সমাজের পুস্তকসমূহের একটি বিস্তৃত ফিরিস্তি দেন। ১৮৫৭ সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকার একটি তালিকা পাদ্রী লঙ দিয়াছেন। একটু পরে এই উভয় তালিকার সমাহার প্রদত্ত হইবে।

ইতিমধ্যে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি। সমাজের একটি মাসিক অধিবেশন হয় মেটকাফ হলে ২৮শে আগষ্ট ১৮৫৬ সনে। এই সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে কয়েকজনকে নূতন দেখিতেছি। এখানে উপস্থিত ছিলেন—ম্যাকলিওড ওয়াইলি (সভাপতি), মেরিডিথ টাউনসেণ্ড, ডবলিউ. জি. ইয়ং, এফ. ককবার্ণ, আর. বি. চ্যাপম্যান (সম্পাদক), জেম্‌স লঙ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং প্যারীচাঁদ মিত্র। জয়কৃষ্ণ

---

* *The Bengal Hurkaru*, April 1, 1856.
† *Ibid*, April 25, 1856.

[বন্দ্যো]পাধ্যায়ের প্রস্তাবে রমানাথ ঠাকুর অধ্যক্ষ-সভার অন্যতম [সভ্য] রূপে গৃহীত হন। সভায় সম্পাদক জানান যে, পূর্ব্ব অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি বাংলা সরকারের নিকট দুই শত টাকা সাহায্য চাহিয়া একখানি আবেদন পাঠাইয়াছেন। এই পরিমাণ সাহায্য পাইলে তাঁহারা পুনরায় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশ করিতে পারিবেন।*

৬

১৮৫৬, সেপ্টেম্বর মাসে সমাজের পক্ষে সেক্রেটারী চ্যাপমান পুস্তক প্রকাশের একটি পরিকল্পনা সাধারণ্যে পেশ করিলেন।† এই পরিকল্পনা দৃষ্টে জানা যায়, সমাজ-কর্ত্তৃক পুস্তকাদি প্রকাশে একটি মৌলিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এ যাবৎ সমাজ-কর্ত্তৃপক্ষ শুধু অনুবাদ-পুস্তকই প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতঃপর মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশেও উদ্যোগী হইলেন। উক্ত পরিকল্পনায় কতকগুলি নিয়ম সাপেক্ষে প্রত্যেক মৌলিক পুস্তকের গ্রন্থকারকে দুই শত টাকা পারিতোষিক দিবার প্রস্তাব হয়। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে পুস্তক রচনার কথা হইল :

"(১) প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র; (২) দেশ-প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোলের বৃত্তান্ত, (৩) বাণিজ্য এবং লোকবার্ত্তা বিধান, (৪)লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞানশাস্ত্র, (৫) শিল্প-বিদ্যা, (৬) শিক্ষা-বিধান, (৭)জীবন চরিত এবং (৮) নীতিগর্ভ গল্প।"

রচনা সরল ও সহজবোধ্য হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেকখানি পুস্তক এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন হইবে না। গ্রন্থের স্বত্বাধিকার বঙ্গভাষানুবাদক সমাজে ন্যস্ত থাকিবে, এক-একখানি বই দুই হাজার খণ্ড বিক্রয় হইলে গ্রন্থকার অন্যূন পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত পারিতোষিক পাইবেন—এই মর্ম্মেও কতকগুলি নিয়ম প্রচারিত হয়। এই সকল নিয়ম পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর যাবৎ বহাল ছিল এবং গ্রন্থকারগণ মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়া পুরস্কারও পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে ইহা জানা যাইবে।

সমাজ-কর্ত্তৃপক্ষ শুধু সরকারের নিকটই সাহায্যের আবেদন করেন নাই, মহানুভব হিতৈষীদিগের নিকটও আবেদন জানাইলেন। লঙ্ বলেন, বারাণসী হইতে সমাজের সাহায্যার্থ মোটা টাকা পাওয়া গিয়াছিল।‡ বাংলা সরকার "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রকাশের জন্য মাসিক দেড় শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন, সম্ভবতঃ ১৮৫৭ সনের প্রথম হইতে। কারণ উক্ত মাসিক পত্র ১৭৭৯ শকের বৈশাখ মাসে (১৮৫৭, এপ্রিল-মে) হইতে পুনরায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

সমাজের পত্রিকা ও পুস্তকগুলির কোন কোনটি সচিত্র করার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার পত্রিকা দুইখানির কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১২৬২ এবং ১২৬৩ এই দুই বঙ্গাব্দে 'নূতন পঞ্জিকা' নামে সমাজ দুইখানি পঞ্জিকা পর পর বাহির করিলেন। ১২৬২ বঙ্গাব্দের পঞ্জিকা-

প্যারীচাঁদ মিত্র

খানি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। ইহা হইতে জ্যোতিষ বচন একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। তিথিপঞ্জী বাদে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হয়। কলিকাতা সমেত বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মেলার বিবরণ, কোম্পানী ও সিক্কা টাকার বিনিময় হার, ডাকবিভাগ, রেলযাত্রীদের কর্ত্তব্য, ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান রোগের বিবরণ ও তাহার প্রতিকার, বঙ্গপ্রদেশের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টরদের বিবরণ, মুন্সেফ ও উকীল পদপ্রার্থীদের জন্য বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত প্রস্পেক্টাস প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য ও কতকটা কৌতুককর বিষয় ইহা হইতে জানা যায়।* পঞ্জিকা সমাজ-কর্ত্তৃক ১২৬৩ সালের পরে আর প্রকাশিত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহার বিক্রয়-সংখ্যা হইতে বুঝা যায় ইহার চাহিদা হইয়াছিল আশাতীত।

৭

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক, পত্রিকা,

* *The Bengal Hurkaru*, September 1, 1856.
† *Ibid*, September 15, 1856.
‡ *Long's Returns* . . . (1859), p. LV.

* শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 'দেশ'—১৩ বৈশাখ, ১৩৫২ সংখ্যায় বাংলা 'পঞ্জিকা' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের 'নূতন পঞ্জিকা' (১২৬২) সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এবং পত্রিকার উল্লেখ আমরা এখানে মাঝে মাঝে পাইয়াছি। সমাজের অন্যতম উদ্যোগী সদস্য পাদরী লঙ্ এই সকল পুস্তকের (১৮৫৭, ৩১শে মে'র পূর্ব্বে প্রকাশিত) একটি তালিকা দিয়াছেন। সমসাময়িক সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি দৃষ্টে এই পুস্তকসমূহের ১ম সংস্করণের একটি কালানুক্রমিক তালিকা এখানে দেওয়া গেল :

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	প্রকাশের বৎসর	মূল্য	মুদ্রণ-সংখ্যা
রবিন্সন ক্রুশোর চরিত্র (১২খানা চিত্র)	জে. রবিন্সন	১৮৫৩	।০	১,০০০
লার্ড ক্লাইব চরিত্র (৭খানা চিত্র)	হরচন্দ্র দত্ত	ঐ	।০	১,০০০
সেক্স্পীয়র কৃত গল্প	ড মোরার	ঐ	।৶০	১,৫০০
সংবাদ সার (৪খানা চিত্র)	জে. লঙ	ঐ	।০	৭৫০
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	হরিশ্চন্দ্র তর্কলঙ্কার	ঐ	৶০	৭৫০
গঙ্গার খালের বিবরণ (২খানা চিত্র)	জে. রবিন্সন	১৮৫৫	৶০	১,০০০
মনোরমা পাঠ	রামচন্দ্র মিত্র	১৮৫৫	।০	১,০০০
পাল ও বর্জ্জিনিয়া (২খানা চিত্র)	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন	১৮৫৬	।০	১,০০০
বৃহৎ কথা, ১ম খণ্ড	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	১৮৫৭	।০	১,০০০
পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা এবং নায়ক-শোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা (১খানা চিত্র)	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	ঐ	৲১৫	২,০০০
হংসরূপি রাজপুত্রদিগের বিবরণ (১খানা চিত্র)	ঐ	ঐ	/১৫	২,০০০
নূতন পত্রিকা, ১২৬২ ও ১২৬৩			।০ (প্রত্যেক খানি)	৩,৫০০
বিবিধার্থ সংগ্রহ (১-৩৬ খণ্ড)	সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র			৩১,৬০০

৮

১৮৫৭ সনের মধ্যভাগ হইতে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ তৃতীয় পর্ব্বে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যকলাপ কত দূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী বৎসরে সমাজ কি করিবেন, ১৮৫৬-৫৭ সনের বার্ষিক বিবরণে তাহার একটি ফিরিস্তি দিয়াছিলেন। 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' (২৪ জুলাই, ১৮৫৭) উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিজ মন্তব্যসমেত এইরূপ প্রদান করেন :

"আমরা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সদ্যঃ প্রকাশিত রিপোর্ট পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎপাঠে অবগতি হইল গত বৎসর প্রারম্ভে উক্ত সমাজ অতীব ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছিল, যেহেতু তাহার কার্য্য প্রণালী অতিশয় বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হইবাতে অর্থাদায় পক্ষে ব্যাঘাত সম্ভূত হয়, বিশেষতঃ সমাজের সমুৎসুক চিতৈষিগণের মধ্যে অনেকে স্থানান্তরিত ছিলেন। কিন্তু এইক্ষণে তাহার অবস্থা সম্ভাবিত মতে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর [এই সময়ে লর্ড ক্যানিং] তাহার প্রতিপোষক ও সিসিল বীডন সভাপতি পদ ধারণ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত বিদ্যাধ্যাপনের ডাইরেক্টর প্রভৃতি কতিপয় বিদ্যানুরাগী সাহেব সম্প্রতি তৎসমাজে সংযুক্ত হইয়াছেন। গত বৎসর ৫৩৮৮৶৬ টাকা আয় এবং ৪১৭২ /১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কার্য্যবাহুল্য প্রযুক্ত ২০০ টাকা বার্ষিক বেতনে একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

"নিম্নলিখিত নূতন গ্রন্থ সকল সম্প্রতি প্রস্তুত হইতেছে।

সাইবিরিয়া দেশে দূরীকৃতদিগের বৃত্তান্ত।

রাজপুত্র ইতিহাস।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের বৈচিত্র্য।

সংবাদপত্র হইতে দ্বিতীয় সংগ্রহ।

বৃহৎ কথা, দ্বিতীয় খণ্ড।

বাঙ্গলা কবিতা সার।

"এতদ্ভিন্ন কলিকাতার ইতিহাস নিমিত্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"আমরা শুনিলাম কোন মহাশয় শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় প্রস্তুত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদেক গ্রন্থ সমাজের আগামী বৈঠকে অর্পিত হইবেক।

"ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তত্তাবৎ সাধারণের প্রিয় হয় নাই, সমাজ এক্ষণে তন্নিদান অবগত হইয়া জনরঞ্জনীয় গ্রন্থ প্রকাশে বিহিত উপায়াবধারণ করিয়াছেন। আমরা এই সভার ক্রমশঃ উন্নতি প্রার্থনা করি

উপরে যে সহকারী সম্পাদকের উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহার নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তিনি সমাজের প্রকাশার্থ বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা আমরা পরেও জানিতে পারিব। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আদি কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রধান ছিলেন, আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। সমাজের প্রতিষ্ঠাকালে তিনি এবং বেথুন সাহেব প্রত্যেকে এককালীন হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণ সমাজকে বরাবর নানাভাবে সাহায্য করিতেন। আলোচ্য বর্ষেও তাঁহার প্রশংসনীয় অভিপ্রায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাজ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকসমূহ সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলেও একান্ত সাধারণ বিষয়াদি লইয়া রচিত বলিয়া পরবর্ত্তীকালে উহার বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষাকে একটি সহজ রূপ দানের পক্ষে এসকল পুস্তকের কৃতিত্ব কম নহে।

মঙ্গলা

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামসুন্দরের বাঁধানো চত্বরে ভাগবত পাঠ হচ্ছে।

রঘুনাথ পণ্ডিতের উদাত্ত কণ্ঠের ব্যাখ্যা, ত্রিশ-চল্লিশটি নানা বয়সের মেয়ে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে ছোট কাঠের পিঁড়ির উপর হলদে রঙের পুঁথিটির দিকে। পাড়ার বড় গিন্নী সুখদারও চোখ দুটি সৌম্যদর্শন পাঠকের দিকেই, কিন্তু দুপুরটা যেমন ক্রমশঃ অপরাহ্ণের দিকে গড়িয়ে পড়ছে, তাঁর মনটিও কখন এক পা এক পা করে এগিয়ে চলে এসেছে পথটার পানে! গোধূলি, মেঠো পথে ধূলি উড়িয়ে আসছে এবার গরুর পাল ঘরের দিকে। সুখদা মানসচক্ষে দেখতে পান, গাঢ় কালো রঙের হৃষ্টপুষ্ট একটি গরু দলের মধ্যে রাণীর মত হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। পাশের রাস্তাটায় বালির উপর খসখস একটা শব্দ হয়, মনের সঙ্গে সুখদার একটি চোখও হঠাৎ চলে আসে এদিকে। কিন্তু না, ও মঙ্গলা নয়। হৃদয়গ্রাহী পাঠ ও ব্যাখ্যা, অমৃতবর্ষী স্বর—মন ও চোখ, দুইই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে আবার।

—হাম্—মা!

চমকে উঠেন সুখদা। এসেছিস!

দামাল ছেলের মত দুষ্টু মি বেড়েছে আজকাল মঙ্গলার, বাড়ী না এলে উৎকণ্ঠা কাটে না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, গরুটা চাটতে লাগল হাতটা।

মঙ্গলাকে নিকটে পাবার জন্যই চত্বরের এধারে বসেন সুখদা। তবু এটুকু অমনোযোগে লজ্জিত হন, তাড়াতাড়ি পাঠের দিকে চোখ ফেরান। পতিতের উদ্ধারের জন্যে মরজগতে ভগবানের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে যাচ্ছেন পাঠক রঘুনাথ, মঙ্গলা ঠিক তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে এসেছে সুখদার কোলের কাছে, সুখদারও সমান তালে একটির পর আর একটি হাত বিচরণ করছে মঙ্গলার সর্ব্বশরীরে।

ভাগবত বলেন, পাপের উদ্ধার আছে, জীবে দয়া, নামে রুচি, নাম সঙ্কীর্ত্তন—

ডান হাতটা গিয়ে পড়েছে পিঠের উপর একটা দগদগে ক্ষতে, মুহূর্ত্তে দেশ-কাল-পাত্রের বিস্মৃতি ঘটল সুখদার। শিউরে উঠে ফিরে তাকালেন। কে এমন মারল লো? আ-হা! হাড়ের উপর কেটে কেটে বসেছে গা! একে তোর শরীর খারাপ, দুটো দিন শুয়ে ছাড়ি নি।

এবার শুধু চোখ কান নয়, সমস্ত চিত্ত মঙ্গলার উপর সমর্পণ করে দিয়ে উঠলেন সুখদা।

বালির গলি পথটা দু'ধারে উঁচু, মাঝখানে খাল হয়ে গেছে বর্ষার ঢল নেমে; এঁটো পাতা এবং আবর্জ্জনা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতে লাগলেন একটি ষাট বছরের বৃদ্ধা, তিন বছরের দামাল মঙ্গলা লেজ এবং মাথা নাড়তে নাড়তে নির্ব্বিকার চিত্তে পিছনে পিছনে চলল।

বাড়ীতে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার এটাই সোজা পথ।

এক জায়গায় আবার একটা চোরপালতার ডাল ভেঙে পড়েছে, নীচের পথটাও যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। পায়ের কাপড়টা একটু তুলে ধরে মাথাটা নীচু করে পার হলেন সাবধানে। হারামজাদীর জন্যে কি কোথাও শান্তি নাই গা! কার পাকা ধানে মই দিতে গিয়েছিলি? আখবাড়ীতে ঢুকেছিলি বোধ হয়। মারবে না? বেশ করেছে; কিন্তু মানুষের আক্কেল বলিহারি যাই বাবা! মুখ্যু একটা গরু, ভগবতী তো! দেখে মার বাপু দু'এক ঘা। গোটা গাটা রক্তারক্তি করে দিয়েছে গা!

কল্যাণী সন্ধ্যার প্রদীপ সাজাতে বসেছিল, সবৎসা সুখদা চৌকাঠ হতে ডেকে উঠলেন। বড় বৌমা, শীগগির নারকেল তেলের শিশিটা আর এক ঘটি জল নিয়ে এস।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু ওয়াকিবহাল হবার জন্যে কল্যাণী উৎসুক দৃষ্টি তুলতেই সুখদা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। দেখতে পাচ্ছ না? পাঁচটা নয়, দশটা নয়, মাত্র একটাতে ঠেকেছে, তাও তোমরা দেখতে পার না বাছা।

সাজানো গমগমে সংসার! হীরা, মাণিক, চুনি—তিন ছেলের মধ্যে মাত্র কনিষ্ঠই সস্ত্রীক বাস করে পশ্চিমে; মাণিকলালের সংসার এখানেই, চুণিলাল ত বাড়ী ছেড়ে যেতেই পারে না। ছেলে-বউ, নাতি-নাতনী, দাস-দাসী, লোকজনের অভাব নেই। তবু মঙ্গলার সম্বন্ধে সুখদার কিন্তু বিশ্বাস নেই কাউকেও। আর বিশ্বাস করবেই বা কি করে? মরা-হাজা ছেলের মত টিকে আছে মাত্র ঐ একটি গরু, অনেক বিপত্তি চলে গেছে এই তিন বছরের মঙ্গলার উপর দিয়ে। হারিয়ে গিয়েছিল ও যখন মাত্র এক বছরের, নারায়ণ গোপীনাথ দয়া করে খুঁজে না দিলে আজ কোথায় মরে পড়ে থাকত কে জানে? সেই দুর্ঘটনার কথাটা মাঝে মাঝে মনে হলে সুখদার দু'ধারের রগ দুটো চনচন করে উঠে এখনও।

ঠিক এক বছরেরও বোধ হয় নয়। চিকণ কালো রঙ ফুটে উঠেছে গায়ে, শুধু কপালের উপর একটি সাদা বৃত্ত। ছুটে বেড়াচ্ছে শিশু মঙ্গলা বেআক্কেলের মত, খানা-কুয়ো দেখা নেই, পুকুর পর্য্যন্ত গ্রাহ্য নেই। তার পর একদিন বিকালবেলা এমনি খেলায় ফাঁকে উধাও। ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনী, পাড়ার লোকজন পর্য্যন্ত খাঁতি পাঁতি করে প্রায় সমস্ত গ্রামটা খুঁজল, কিন্তু পাওয়া গেল না কোথাও। যদি কুয়োতে পড়ে থাকে!

সন্দেহটা মনে উদয় হওয়া মাত্র হীরালালকে বললেন, ডুবুরি একটা ডাক বাবা, আশেপাশের কুয়োগুলোর যদি—

—তুমি কি পাগল হলে মা ? ডুবলে ত ভেসে উঠবে।

—পাগল আমি হই নি, বাবা ; ভিতরে আটকে যেতেও ত পারে। ডুবুরিকে পয়সা দেব—দেখতে একবার দোষ কি ?

গোটাপাঁচেক কুয়োতে নামানো হয়েছিল ডুবুরি, কিন্তু পাওয়া যায় নি সে বাচ্চা চতুষ্পদটিকে :

শেষে প্রায় ডজনখানেক দেবদেবীর কাছে শক্তি অনুসারে মানসিক করে গোপীনাথের দরজায় ধর্না দিয়ে পড়লেন। যদি আমার মঙ্গলাকে এনে না দাও ঠাকুর, আমি হত্যে হব তোমার কাছে।

ছেলে-বৌয়েরা হাত ধরে নিয়ে এল বাড়ীতে, কিন্তু বৃদ্ধা দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটলেন না, শোকাতুরা জননীর মত শয্যা আশ্রয় করে পড়ে রইলেন। গভীর রাত, সুখদা স্বপ্ন দেখছেন, পাশের রাখাল ছেলেটা দরজার কাছে ডাকছে, ওমা, এই নাও তোমার মঙ্গলা।

—পেয়েছিস ? বাট্ রে, দাঁড়া।

উঠি-পড়ি করে সুখদা এসে দরজা খুলে দিলেন, দেখলেন সামনেই মঙ্গলা দাঁড়িয়ে আরামে রোমন্থন করছে। দূরে দাঁড়িয়ে রাখালবালক বৃন্দাবন।

সুখদা আনন্দে প্রশ্ন করলেন, কোথায় পেলি বাবা ?

—ঐ হাজার মাঠে।

—আহা, বেঁচে থাক বাছা আমার। বড় কষ্ট হ'ল তোর রে ! কাল এসে গুড়মুড়ি নিয়ে যাস।

বৃন্দাবন হাসতে হাসতে চলে গেল।

পরদিন সকালবেলায় বাড়ীটা আবার আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে, ছোট্ট শিশুটির মত হাসিখুশী যাট বছরের বৃদ্ধার আনন্দধারা যেন বাধাবন্ধহারা ! বড়বৌ লজ্জা পেয়ে বলল, তুমি অত রাত্রে কষ্ট করে উঠতে গেলে কেন মা ? আমায় ডাকলেই পারতে। কে দিয়ে গেল ?

সুখদা বৃন্দাবনের কথা বর্ণনা করছিলেন, এমনি সময়ে পুরোহিত হন্তদন্ত হয়ে সংবাদ দিলেন, গোপীনাথের বসনে অজস্র চোরকাঁটা লেগে রয়েছে, এবং এক পায়ের নূপুর পাওয়া যাচ্ছে না।

সুখদার অন্তরের গভীরতম স্থানে একটা আবছা আতঙ্ক সিং-সিং করে উঠল। সহজ, সরল মনের আকুল মিনতি শেষে এমনি ভাবে নিজেকে হেনস্ত করে রাখলেন ঠাকুর। বৃন্দাবন রাখালকে ডাকা হ'ল, সে ত আকাশ থেকে পড়ল : আমি ত কাল ঘরেই ছিনু না মা ; আত্তিরে সেই হোথা মাসীর বাড়ী চলে গেছনু। এই তো আসছি।

সুখদার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা অস্পষ্ট কথা :

কোথায় পেলি বাবা ?

—ঐ হাজার মাঠে।

সন্দেহের নির্দেশ অনুসরণ করে পাওয়া গিয়েছিল নূপুর ঐ মাঠেই। ঠাকুরের কাপড়ের চোরকাঁটায় রহস্য জড়িত ছিল ঐ মাঠেরই সঙ্গে। গ্রামের সবাই বুঝতে পারল, স্বয়ং গোপীনাথ ভক্তের ডাকে গরুটি খুঁজে দিয়ে গেছেন। ঐ মঙ্গলার জন্যেই ত বৃন্দাবনের বেশে ভগবানকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল সুখদার !···

দিনচারেক পরে নারিকেল তৈল-লিপ্ত শরীরে মঙ্গলা ছায়ায় বসে রোমন্থন করছে, মঙ্গলার মাতৃস্থানীয়া সুখদা হাতে তুলসীর মালা নিয়ে আনন্দদীপ্ত নয়নে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছেন। কিন্তু পরিপূর্ণ তৃপ্তি যেন আর আসে না। একটু চিন্তিত মুখে বললেন, ঘাগুলো ত বেশ সারছে না, হীরু।

বড় ছেলে দাওয়ায় বসে ভাইপোর সঙ্গে খেলা করছিল, না তাকিয়ে বলল, ঘাগুলো আর কোথায় মা, মোটে ত একটা। খাওয়াটা একটু কমিয়ে দাও, শরীরের রস মরলে এমনিই শুকিয়ে যাবে।

—কি আর খেতে দিচ্ছি বাবা ? ঐ ত ঠায় বাঁধা পড়ে আছে আজ চার দিন।

বড়বৌ কল্যাণী ভেতর থেকে ফোড়ন দিয়ে বলল, আর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ভাগের ভাগ লুচিমণ্ডা লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ানো—

—তোমার এক কথা বড়বৌমা, বাসি লুচি ক'টা খামকা নষ্ট যাবে বৈ ত নয় !

হীরালাল হাসল মুখ টিপে বলল—তবে বোধ হয় নূপুর-হারানো মাঠে গিয়েছিল। ও ঘা নিয়ে আবার কি অনর্থ হয় দেখ।

—বলিস না হীরু তুই অমন কথা। তা হলে আমি বাঁচব না কিন্তু।

—ও, তা হলে তুমি তোমার মঙ্গলার জন্যেই বেঁচে আছ, বল ?

—তা কেন। তবু—

কল্যাণী চেপে চেপে থেমে থেমে বলে. মায়ের আদরে মেয়ে ! দেখছ না, ভাবর কাটছে আর কলাই পাহারা দিচ্ছে। এবার উঠেই মুঠো-মুঠো চেপে দেখবে।

সত্যিই সুখদা কলাই-মশলা রোদে দেন, আর মঙ্গলাকে পাহারায় বসিয়ে রেখে রাখেন পাশে। কাক-পক্ষী নামবার উপায় থাকে না, শিঙ নেড়ে তাড়ায় সে। বধূর কথায় মাতৃসুলভ গাম্ভীর্যে উত্তর করেন শাশুড়ী, ছি বৌমা, ছোট ছেলেমেয়ে হলে এক-আধটু ছড়াত না ?

—ছড়ায়, কিন্তু খায় না। কল্যাণী হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

সুখদা তবুও মঙ্গলার হয়ে ওকালতী করেন, ও হচ্ছে অবলা গরু, মানুষ ত আর নয়।

আশ্চর্য যুক্তি সুখদার। প্রয়োজন হলে বলেন, ও—ও ত একটা ছেলেমেয়ের মত ; আবার সুর পাল্টাবার প্রয়োজনে বলে বসেন, মানুষ ত আর নয়, অবলা গরু। অথচ এই গরুটির পেছনে আজ-কাল সব স্নেহ উজাড় করে দিয়েছেন যেন ! ছেলে-বউ, নাতি-নাতনী ক্রমশঃ পেছনে ফেলে এক ইতরপ্রাণীর মায়ায় বদ্ধ হয়ে

পড়েছেন! নমনীয় শিরদাঁড়াবিশিষ্ট একটি নিরীহ প্রশান্ত জীব, প্রাণচ্ছন্দে সর্ব্বদেহ লীলায়িত, রূপে রঙে ভাবে সুষ্ঠু শিল্পের রমণীয়তা লাভ করেছে সুখদার মঙ্গলা। মালাজপা ভুল হয়, ভাগবত শোনা মাথায় উঠেছে। কেবল মঙ্গলা—মঙ্গলা। সংসার থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছেন তিনি, এক কঠিন বন্ধনে আটকা পড়ে গেছেন।

হয়ত পাঁচ বছরের নাতি ছোট একটা কাঠি দিয়ে নিদ্রামগ্ন মঙ্গলাকে প্রহারের অভিনয় করছে: হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন সুখদা, মেরো না ভাই, ওর বাচ্চা হবে, দুধ খাবে—সরু কাঠিটা ইতিমধ্যে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছেন ঠাকুমা।

ঠিক সাতটি দিনের দিন ছাড়া পেল মঙ্গলা। অবোধ পশুকে অনেক বোঝালেন তিনি, চলাফেরার অনেক নির্দ্দেশ দিলেন, তারপর গোপীনাথের নাম করে মুক্তি দিলেন দড়ি থেকে। সন্তান সম্ভাবনা মঙ্গলার, বড় চিন্তিত হয়ে থাকেন সুখদা। ধুলো উড়াতে উড়াতে ঝিকিঝিকি-চালে আনমিত দেহ নিয়ে কালো রঙের গরুটা মিলিয়ে যায় মেঠো পথে, তাঁর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি কিন্তু উড়ে যেতে চায় মঙ্গলার পেছনে পেছনে। কি জানি, আবার নূপুর-হারানোর মাঠে গিয়ে নামবে কিনা!

চৈত্রের আকাশের নীচে ঝলক ঝলক আগুনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, এমনি রোদের তেজ। দুরন্ত দুপুর।

মেজ বৌ পদ্মা রামায়ণ নিয়ে ঘরের ভেতর যাচ্ছিল, সুখদা বললেন, এই বারান্দাটিতেই বস, বৌমা, বেশ ফাঁকা।

—আগুনের হল্কা উড়ছে যে মা।

—তা হোক বাছা। ভেতরটা বড় গুমোট, যেন দমটা বন্ধ হয়ে যায়।

মুখ লুকিয়ে একটু হাসল পদ্মা, ভেতরে বসলে মঙ্গলার ডাক শুনতে পাবেন না; আর এ বেশ হবে, বাইরে বসে রামায়ণ শোনাও হবে, উঁকি মেরে দেখাও হবে, সাধের মঙ্গলা আসছে কিনা।

রামের "হরধনু ভঙ্গ" পর্ব্বটা আরম্ভ করেছে, পদ্মা। গলাটি যেন মধু-ঢালা, কানে একটা পায়রার পালকের সুড়সুড়ি দিতে দিতে মুগ্ধ হয়ে শোনেন সুখদা। কিন্তু পাতাকয়েক পড়া না হতেই হঠাৎ উন্মত্তপ্রায় হয়ে ছুটে এল মঙ্গলা, তার পরেই জনছয়েক বাউরি চাষা, তাদের হাতে বাঁশের লাঠি এবং মোটা দড়ি।

পাগলিনীর মত উঠানে গিয়ে দাঁড়ালেন সুখদা, জনক রাজার বিরাট ধনুটা রক্ষা পেয়ে গেল এ যাত্রা।

মঙ্গলা আস্তে আস্তে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সুখদার, যেন শান্ত-শিষ্ট মাতৃভক্ত একটি দুলালী মেয়ে। লোকগুলো হাঁফাচ্ছে তখনও। একজন দম ছেড়ে বলল, মাঠানের গাই! তাই ত বলি, ই তাজ্জ কুথা থেকে এ্যালো।

আর একজন বলল, আমরা ছ'সাতটা জোয়ান মনিষ্যি লাঠি দড়ি নিয়ে হিমসিম খেয়ে গেলম মা!

—ই সব দড়ি লাফ মেরে, পাঁচ-পাঁচটা মাঠের শুকনো ফসল তছনছ করে ছুটল, বাপ্-বা! কেউ কায়দা করতে লারলম আমরা।

তারা যে মঙ্গলাকে মারে নি বা ধরে অন্ত গাঁয়ের খোঁয়াড়ে দেয় নি, এরই জন্তে সুখদা তাদের আশীর্ব্বাদ করলেন প্রাণভরে, এবং যাবার সময় নগদ একটি টাকা বকশিশ ও প্রত্যেককে প্রচুর মুড়িগুড় দিয়ে বিদায় করলেন।

—'কিন্তুক মাঠান', মুড়ি আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে তাদের একজন বলে, 'গরুটা আপনকার ই সাঁপাই মরবেক এক দিন।'

সাপে খেয়ে মরবে! যেন নিজেরই উপর বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে, এমনি ভয়ে নীল হয়ে গেল সুখদার মুখ।

কথাটা পরিষ্কার করে লোকটি বলল, নূপুর-হারানোর দখিনের মাঠ বরাবর আঁকেড়ের জঙ্গলের মধ্যে কেয়াঝোপ; মানুষভোর কেলে কেউটে থাকে গো ওখানটায়। আপনকার গরুর যাবার-আসবার ঐ রাস্তা, মাঠান।

অন্ত ধারে সব কাঁটার বেড়া দেওয়া, সুতরাং দক্ষিণদিকের ঐ নিরতিশয় দুর্ব্বল স্থানটাই মঙ্গলার গমনাগমনের প্রশস্ত পথ। ঐ পথেই থাকে মানুষের সমান কেলে কেউটে!

সুখদা অনুনয় করলেন, ওদিকে গরুটা গেলে তারা যেন একটু দেখে শুনে তাড়িয়ে এনে বাড়ি পৌঁছে দেয়। জলখাবার পাবে।

তারা চলে গেল। সুখদা কিন্তু ভাবেন, মানুষের সমান গোখরো কেউটে কেয়াগাছের নরম গন্ধে আঁকোড় জঙ্গলের ঘুপসি অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে—মনে পড়তেই বুকটা দুরু দুরু কেঁপে ওঠে।

পাড়া বাঁধা রইল মঙ্গলা আবার ক'দিন।

চৈত্র মাসের চড়কসংক্রান্তি। দুই নাতনী "গোকুল-ব্রত" করে মঙ্গলার কপালে হলুদ, সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটা দিল, মাথায়, শিঙে, চার পায়ে তেল মাখিয়ে হলুদ জল দিয়ে ধুয়ে দিল। একটি আস্ত কলা আর এক আঁটি দূর্ব্বাঘাস মুখে তুলে দিয়ে বলল—

রোগ শোক দূর হোক,
কীট-পতঙ্গ দূর হোক,
বিঘ্নি বিপদ দূর হোক,
দূর হোক, দূর হোক,
মশা-মাছি দূর হোক।

এই গোকুল-ব্রতের প্রার্থনা। ছোট মেয়েদের সঙ্গে সুখদাও গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন, বললেন—তাই বল বাছারা। বেঁচে থাকো সবাই, সুখে থাকো সবাই।

আসন্নপ্রসবা মঙ্গলার মসৃণ, উজ্জ্বল দেহবল্লরীর দিকে তাকিয়ে সুখদা যেন আর চোখ ফেরাতে পারেন না। অমিলিত চলচলে দুটি কাজল নয়ন মেলে তাকিয়ে থাকে গাভীটি, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীশ্রী একটি শ্যামা মেয়ে মা হয়ে এবার আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা, প্রকাশ-না-পাওয়া সুখদার অনেক আশা ভগবান্ পূর্ণ করলেন বোধ হয় এতদিনে।

মঙ্গলা নয়, মেয়ে। সুখদার অনাগত মেয়ের প্রতীক। ধীরে ধীরে হাত বোলান জননী, নরম দেহের পেলব স্পর্শ একটা অপূর্ব্ব আবেশ আনে। অশ্রুঝরা ঝাপসা চোখে তিনি দেখেন, একটি ছোট মেয়ে মায়ের কোলের কাছে দাঁড়িয়ে আদর খাচ্ছে।

সত্যিই সুখদার ছোট মেয়ে।

কষ্ট হয় তাঁর এমনি ভাবে দিনের পর দিন দড়ি দিয়ে গোঁজের মুখে বেঁধে রাখতে। ছেড়ে দিলেন পরদিন। শিঙে ক্ষুরে তেল হলুদ মেখে, নাদুস-নুদুস দেহ হেলিয়ে দুলিয়ে মঙ্গলা চলল সব গরুর পুরোভাগে, যেতে যেতে ফিরে তাকাল বারকয়েক সুখদার দিকে।

মেয়েটার মায়া পড়ে গেছে। হাসতে হাসতে ভাবলেন সুখদা।

কিন্তু মানুষের দিকে পেছন ফিরে আকাশে এক দেবতা থাকেন, তিনি মাঝে মাঝে ক্রুর হাসেন।

ঠিক সময়ে ফিরে এল না মঙ্গলা। রাখালবালক বৃন্দাবন খুব সঙ্কোচে বলল, কোথাও পেলুম না, মাঠান। ও ত থাকে না পালে, হি কোথায় ছুটে পালায়।

আকাশ ভেঙে পড়ল সুখদার মাথায়। বাড়ীসুদ্ধ লোকের খাওয়া শোয়া নেই, উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটাছুটির পর গোপীনাথের কাছে গিয়ে পড়লেন সুখদা: বাবা, আর একটি বার এনে দাও, আর ছাড়ব না আমি।

থমথমে অন্ধকার মন্দিরে। একটা বেড়াল কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অমঙ্গলে ডাকটায় শিউরে উঠলেন সুখদা। উঠে তাড়াতে যাবেন, সিঁড়ি ভুল করে পড়ে গেলেন আচমকা।

শয্যা নিলেন বৃদ্ধা। রাত দুপুরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল।

ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন সুখদা: মঙ্গলার গলায় আঁচল বেঁধে ধরতে যাবেন, হঠাৎ মিলিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে আছে মঙ্গলার জায়গায় সেই রাখাল বৃন্দাবন, বলছে, কোথাও পেলুম না মাঠান!

সকালবেলায় হীরালাল আবার বেরিয়েছে লোকজন নিয়ে। কেমন যেন সন্দেহ হ'ল, সেই আঁকোড় আর কেয়াঝোপের ভেতরটা ত দেখা হয়নি?

পাওয়া গেছে মঙ্গলাকে। মৃত, পড়েছিল ঐ ঝোপের মধ্যেই। কালো রঙ অন্ধকারে মিশে ছিল। জাত কেউটেতে খেয়েছে, নড়তে পারে নি এক পা।

পাওয়া গেছে? কোলাহল কানে আসতেই সুখদা জ্বরের ঘোরে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এলেন। আর ছাড়বেন না তিনি—ঠাকুরের কাছে শপথ করেছেন।

চোখের সামনে পড়ল, উঠানে একটা ফুলে-ওঠা, বিকৃতদর্শন কালো রঙের মাংসস্তূপ।

তারপর তেমনি কাঁপতে কাঁপতে দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সম্বিৎ ফেরে যখন, কেবল একটা চীৎকার করেন—ওরে আমি কি দেখলুম রে! ওরে আমি কি দেখলুম রে!

জগতের সঙ্গে মানুষের অন্তর কোন বন্ধনে বাঁধা আছে কে জানে, সুখদা যেন হাত পা ভেঙে বিছানায় পড়লেন। ডাক্তাররা কেউ বললেন, সর্দিগর্মি, কেউ বললেন ম্যানেনজাইটিস। মুখ শুকিয়ে গেল সকলেরই।

দিনদুয়েকের মধ্যেই হীরা, মাণিক, চুনি এসে গেছে সুখদার বিছানার পাশে। ফুলে ফলে সাজানো সংসার।

সন্তান-সন্ততি-পরিবৃত সুখদা কিন্তু চিনলেন না কিছুই। ক্রমাগত ভুল বকছেন। মাঝে মাঝে রাঙা জবার মত চোখ মেলে এধার ওধার তাকিয়ে দেখছেন, আবার নির্জ্জীব হয়ে নেতিয়ে পড়ছেন।

হীরালালের আট বছরের ছেলে ঝুঁকে পড়ে বলল, ঠাকুরমা, আমি কে বল ত?

একবার চোখ খুললেন সুখদা: কে?

—মঙ্গলা, না নাতি?

—মঙ্গলা।

আর একটি দিন বেঁচে ছিলেন সুখদা, কিন্তু কথা আর বলতে পারেন নি।

ভারতে বৈদেশিক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক

অমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ণেল রবার্ট সাদারলণ্ড

কর্ণেল রবার্ট সাদারলণ্ড স্কচজাতীয় ছিলেন। অনুমান ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতা কর্ণেল হিউ সাদারলণ্ডের সহিত তাঁহাকে অভিন্ন মনে করিয়া পূর্ব্বতন লেখকবৃন্দ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারও এক বিষম ভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সাদারলণ্ড ভ্রাতৃযুগল সম্ভ্রান্তবংশজাত ছিলেন। ব্ল্যাক-ওয়াচ বা ৭৩শ-গণিত পদাতিক রেজিমেণ্টে এনসাইন পদে রবার্ট সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই নিদারুণ অবমাননার সহিত তিনি কোম্পানীর সেনাবিভাগ হইতে বিতাড়িত হন। ইহার প্রকৃত কারণ সঠিক জানা যায় নাই। এক মতে তিনি সরকারী তহবিল তছরূপ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহাই সত্য। অতঃপর তিনি দি বইনের নিকট কর্ম্মগ্রহণ করেন (১৭৯০ খ্রীঃ)। তাঁহাকে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রথম ব্রিগেডে লেফটেনাণ্ট পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। পর বৎসর দ্বিতীয় ব্রিগেডের অধ্যক্ষ কর্ণেল ফ্রেমন্তের মৃত্যু হইলে তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হন। এই বৎসরের শেষ-ভাগে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ দি বইন অবসর গ্রহণ করিলে হিন্দুস্থানে প্রবীণতম অফিসররূপে রবার্ট কিছুদিনের জন্ত প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিলেও স্থায়ীভাবে উক্ত পদ লাভ করিতে পারেন নাই। দি বইনের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং দি বইনের ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তনের পরও দীর্ঘকাল উভয়ের মধ্যে পত্র-ব্যবহার চলিত। কীন বলেন যে, তাঁহার শূন্য পদে সাদারলণ্ডের নিয়োগে দি বইনের বিশেষ আগ্রহ ছিল, পের্ঁর প্রতি তাঁহার তেমন আস্থা ছিল না। কীনের এ অনুমান কতদূর সত্য তাহা অবশ্য বলিতে পারা যায় না। কিন্তু পের্ঁই শেষ পর্য্যন্ত সৈন্য-বিভাগের নেতৃত্বপদ লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি রবার্ট অপেক্ষা অনেক সিনিয়র কর্ম্মচারী, তদ্ভিন্ন পুণানগরে সিন্ধিয়া মহারাজের সান্নিধ্যে অবস্থান হেতু তাঁহার মর্য্যাদা বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রবার্ট পের্ঁর শ্যালিকার জামাতা হইলেও এই প্রতি-যোগিতা হইতে উভয়ের মধ্যে যে তীব্র বিরোধের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা আর জীবনে কোনদিন দমিত হয় নাই।

১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সাদারলণ্ডকে বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে বিদ্রোহ-প্রশমন কার্য্যে নিরত থাকিতে দেখা যায়। এই সময়ে সংঘটিত যুদ্ধাভিযানের মধ্যে নারবর এবং তোড়ি-ফতেপুর এই দুইটি দুর্গা-ধিকার উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন তিনি দুইটি খণ্ডযুদ্ধে বিজয়ী হইয়া-ছিলেন এবং আরও চারিটি গিরিদুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পর মেবার রাজ্যে বিখ্যাত জর্জ্জ টমাসের সহযোগী রূপে তিনি বিদ্রোহী মরাঠা-সর্দ্দার লকবাদাদার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। টমাস-প্রসঙ্গে সে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; পুনরুক্তি অনাবশ্যক। সাদারলণ্ডের এই সময়ের কীর্ত্তিকলাপ বিশেষ প্রশংসার্হ নহে। এক বার সেনানায়কগণের মন্ত্রণাপরিষদে স্থির হইয়াছিল যে, পর দিবস প্রাতঃকালে শত্রুপক্ষকে অতর্কিতে আক্রমণ করা হইবে। কিন্তু সেই রাত্রেই সাদারলণ্ড টমাসের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া নিজ সেনাদলসহ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। কারণ বুঝা যায় না, সম্ভবতঃ গোপনে শত্রুপক্ষের সহিত চক্রান্তে লিপ্ত হইয়া থাকিবেন। উত্তরকালে টমাস স্বীয় জীবন-স্মৃতি বিবৃতিকালেও সাদারলণ্ডের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কর্ণেল জেমস স্কিনারও সাদারলণ্ডের পক্ষে নিতান্ত গ্লানিকর আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন সকালে স্কিনার পূর্ণ যোদ্ধবেশে তাঁর বাহনটিকে ব্যায়াম করাইবার জন্ত অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার নিকট-আত্মীয় হরিজী সিন্ধিয়া নামক এক মরাঠা-সর্দ্দারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। প্রবীণ সেনাপতি অম্বাজী ইঙ্গলিয়ার আদেশমত তিনি নদী পার হইবার উপযোগী একটি সুবিধামত স্থানের সন্ধানে যাইতেছিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্কিনার তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। হরিজীকে বিনাশ করিবার জন্ত যে শত্রুর সহিত তিনি বাস্তবতঃ সমরনিরত ছিলেন সেই লকবাদাদার সহিত চক্রান্ত করিয়া অম্বাজী এই জাল পাতিয়াছিলেন। উঁহারা দুই জনেই তাঁহার প্রতি সমান বৈরসম্পন্ন। কিয়দ্দূর যাইবার পর স্কিনারের মনে সহসা সন্দেহের উদ্রেক হইল এবং তিনি হরিজীকে সতর্ক করিয়া দিলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে প্রায় সহস্রাধিক শত্রুসৈন্ত আসিয়া তাঁহাদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিল। হরিজীর দলে প্রায় পাঁচ শত সৈনিক ছিল। স্কিনার তরবারির দুই-তিনটি আঘাত-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার লৌহবর্ম্মে প্রতিহত হইয়া সে আঘাত-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। তবে তাঁহার অশ্বটি এই ব্যাপারে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হরিজীও আহত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে চরম ফল ফলিবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সেস্থলে স্কিনার আসিয়া আততায়ীকে বিনাশপূর্ব্বক সুহৃদের প্রাণরক্ষা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আক্রমণকারিগণ ব্যর্থমনোরথ হইয়া পলায়ন করিল। সেইদিন প্রকাশ্য দরবারে হরিজী মুক্তকণ্ঠে স্কিনারের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাহারা আমাকে রক্ষা করিবার জন্ত আজ যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা সকলে আমার বেতনভোগী ভৃত্য; তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। পক্ষান্তরে তুমি আমার প্রিয় বন্ধু এবং যথার্থ বন্ধুর মতই কার্য্য করিয়াছ।" অতঃপর হরিজী হীরক-খচিত এক জোড়া স্বর্ণকঙ্কণ স্কিনারের হস্তে পরাইয়া দিয়াছিলেন এবং একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব, অসি ও চর্ম্ম তাঁহাকে উপহার দেন।

এ সকল কথা কর্ণগোচর হইতেই সাদারলণ্ড তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে হরিজীর সঙ্গে যাওয়ার জন্ত স্কিনারকে অত্যন্ত তিরস্কার

করিলেন, এবং প্রধান সেনাপতির নিকট তাঁহার নামে রিপোর্ট করিবেন—বলিলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই তিনি উঁহাকে গোপনে জানাইয়াছিলেন যে, হরিজী-প্রদত্ত ঘোড়াটি পাইলে তিনি আর ঐ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিবেন না। স্কিনার তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন যে, অসি চর্ম্ম বা ঘোটক ইহার কোনটি তিনি হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত নহেন; ইচ্ছা হইলে সাদারলণ্ড বালাজোড়াটি লইতে পারেন! বলা বাহুল্য, ইহাতে সাদারলণ্ড বিষম ক্রুদ্ধ ও নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। ইহার পর যখন তিনি শুনিলেন, স্বয়ং হরিজী স্কিনারের উচ্চ প্রশংসা করিয়া পের‍ঁর নিকট পত্র লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার ক্রোধের আর অবধি রহিল না। "তাহার অল্পকাল পরেই মরাঠা-সর্দ্দারগণের সহিত সাদারলণ্ডের গুপ্ত চক্রান্তে লিপ্ত থাকার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং পের তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া কর্ণেল পলম্যানকে ব্রিগেডের অধ্যক্ষপদ প্রদান করিলেন।"

কিন্তু সাদারলণ্ডের শ্বশুর কর্ণেল জন হেসিঙ্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সিন্ধিয়া মহারাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম ব্রিগেডের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে যান। ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল আর্থার ওয়েলেসলি বা উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ ডিউক অফ ওয়েলিংটন এই সময় ধারবার অঞ্চলে ঢুণ্ডিয়া-বাঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে নিরত ছিলেন। টিপু সুলতানের পতনের পর ঢুণ্ডিয়া নামক তাঁহার অনুচর জনৈক মরাঠা-সর্দ্দার ছত্রভঙ্গ সৈনিক দলের কতক অংশ সমাবেশ করিয়া ইংরেজগণের যথেষ্ট বিরোধিতা করিতেছিলেন। ওয়েলেসলি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও প্রথমতায় তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঢুণ্ডিয়াকে পর্য্যুদস্ত করিতে হইলে সিন্ধিয়ার বাহিনীর সহযোগিতালাভ একান্তরূপেই আবশ্যক বুঝিয়া ওয়েলেসলি সাদারলণ্ডের সহিত পত্রব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের পত্রসমূহ বাহুল্যবোধে এখানে প্রদত্ত হইল না। কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করিলে তজ্জন্য কীনের গ্রন্থ দেখিতে পারেন।* এখানে শুধু সংক্ষেপে এই বলা যাইতেছে যে, ওয়েলেসলির সহযোগিতার প্রস্তাবের উত্তরে সাদারলণ্ড তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার পত্রের মর্ম্ম স্বীয় অধস্তন কর্ম্মচারী কাপ্তেন ব্রাউনরিগকে জানাইয়াছেন এবং নিজ সৈন্যদল মহারাজের সীমার বাহিরে লইয়া যাওয়া ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে ওয়েলেসলির আজ্ঞাবহ হইয়া চলিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিয়াছেন। তিনি আরও জানাইলেন যে, "ভাগ্যচক্র তাঁহাকে ভারতীয় নৃপতির পরিচর্য্যারত করিলেও তিনি মর্য্যাদাজ্ঞানের সুনির্দ্দিষ্ট প্রত্যেকটি বিধি অনুসারে স্বজাতির উপকারসাধন করিবার সকল সুবিধার সন্ধানে থাকিতে ন্যায়তঃ বাধ্য বলিয়াই নিজেকে বিবেচনা করেন। এই কথা কয়টির মধ্যে সিন্ধিয়ার বাহিনীর আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার কারণ স্পষ্টই নিহিত আছে। জনৈক মরাঠা-সর্দ্দারের সহিত যুদ্ধে ইংরেজদিগের উপকারসাধনে সর্ব্বপ্রযত্নে ন্যায়তঃ বাধ্য বলিয়া নিজেকে বিবেচনা করা, ইহাই যদি সিন্ধিয়ার অন্যতম ব্রিগেড-কম্যাণ্ডারের মনোভাব হয়, তবে ভবিষ্যতে সেই স্বজাতীয়গণের সহিত সিন্ধিয়ার যুদ্ধ বাধিলে তাঁহারা কি করিবেন, তাহার আভাস তো ইহা হইতেই সুস্পষ্ট প্রকটিত হইতেছে! মহাদ্‌জী দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত অফিসার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইংরেজদিগের সহিত সমরে উপযুক্ত নেতৃবৃন্দের অভাবই দি বইনের বাহিনীর পরাজয়ের অন্যতম এবং প্রধানতম কারণ।

যশোবন্তরাও হোলকারের বিরুদ্ধে সিন্ধিয়ার মালব অভিযানে সাদারলণ্ড তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। ইন্দোর-যুদ্ধে (১৪।১০।১৮০১) তাঁহার বিজয়লাভ তখনকার দিনে অন্যতম প্রধান ঘটনা এবং তাঁহার সামরিক কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই যুদ্ধে হোলকারের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। উঁহাদের ৯৮টি কামান, ১৬০টি গাড়ী গোলাবারুদ এবং শিবিরস্থ যাবতীয় দ্রব্যাদি বিপক্ষের হস্তগত হয়। যুদ্ধের পর বিজয়ী সৈন্যদল ইন্দোর নগরী নির্ম্মম ভাবে লুণ্ঠন করে। উঁহাদের নিজেদের লোকক্ষয় এই যুদ্ধে মাত্র চারি শতের অনধিক। তদ্রনেক প্রসঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে হোলকরের অন্যতম সেনানায়ক পাণ্ডুরঙ্গ হরিজীর আত্মকাহিনী হইতে তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। ইহা অপর পক্ষের কথা বলিয়া ইহার একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে :

"আমি সবেমাত্র নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি এমন সময়ে রাজধানী ইন্দোর অভিমুখে অগ্রসর হইবার আদেশ পাইলাম। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে মরাঠা সেনাদলে সন্নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের অধিবাসী প্রত্যেক জাতি, ধর্ম্মীয় নানাবিধ পরিচ্ছদধারী সৈনিকের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন বর্ণের একত্র সমাবেশে রঙীন ক্রীড়াবস্তু জাতের মতই মরাঠা-বাহিনী সবিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। উহা বর্দ্দ্য ও শৃঙ্খলার লেশমাত্রবিহীন। সৈনিকগণের নির্দ্দিষ্ট কোনপ্রকার পরিচিকার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এমন দেখা যায় যে, অশ্বারোহী পদাতিক সবার একই শ্রেণীতে সকলকার অস্ত্রশস্ত্রও এক প্রকারের নহে। কেহ অসিচর্ম্মধারী, কাহারও আছে বন্দুক, কেহ-বা বর্শা হাতে লইয়া চলিত, আবার কাহারও বা ধনুর্ব্বাণ মাত্র সম্বল। অনেকে 'পরশু' ব্যবহারেও সুদক্ষ। তবে একমাত্র তরবারি কিন্তু সকলকার পক্ষেই অপরিহার্য্য। যাহারা বর্ম্মাবৃত তাহারা আকৃতিতে সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক, বৈচিত্র্য সৃষ্টির পক্ষে উঁহাদের সংখ্যাও সুপ্রচুর। শিরস্ত্রাণে যে শুধু মস্তক এবং কর্ণদ্বয় মাত্র ঢাকা পড়ে তাহা নহে, উহা স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত রক্ষা করে। লৌহ-নির্ম্মিত জাল অথবা পুরু তুলা ভরা পরিচ্ছদে অবশিষ্ট শরীর উঁহাদের আচ্ছাদিত থাকে।

ক্লান্তিকর অভিযানের পর আমরা উজ্জয়িনী পৌঁছিলাম। আমাদের আয়োজন এবার সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং আমরা সাফল্য সম্বন্ধেও

* *Hindusthan Under Free Lances*, p. 204.

বিশেষ রূপেই আশ্বাবিত ছিলাম। আমাদের অশ্বারোহী পল্টন-দলকে বেশ একটি জনতা বলিলেই চলে এবং তাদের ঘোড়াগুলি আকারে বড় ছোট এবং বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন জাতিরও। পেটির অভাবে জিনগুলি তাদের অঙ্গ হইতে সর্ব্বদা খসিয়া পড়িত। যে-কোন প্রকারের দড়ি পুরানো লোহার টুকরায় বাঁধিয়া লাগামের কাজ চালানো হইত। পুরাতন ছেঁড়া পাগড়ী পেশবন্ধের এবং তাঁবুর দড়ি চুমচির অভাব পূরণ করিত। পদাতিকদের সাজসজ্জাও এই ধরণেরই। সবকিছুরই অভাব, নিয়মমত কিছুই ছিল না। কোথাও গুলির জন্য, কোথাও বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রের জন্য তাদের মধ্য হইতে অসন্তোষের চীৎকার শোনা যাইত। কোনরূপ আয়ুধ সংগ্রহের সৌভাগ্য যাহার হয় নাই সে একটি বংশদণ্ড দ্বারা নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া এবং উহাকে গৌরবান্বিত করণার্থে বর্শা আখ্যা প্রদান করিয়া উভয়েরই মান রক্ষা করিয়াছিল।

অবশেষে বিশেষ রূপেই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি প্রভাত হইল। প্রত্যূষে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই শিবিরের বাহিরে আসিয়া আমি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, তখনও চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় এবং কুয়াশাচ্ছন্ন। শীঘ্রই অন্যান্য সকলে জাগিয়া উঠিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, গোলমাল, অসন্তোষপ্রকাশ এবং যুদ্ধের আয়োজন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চারিদিকে জয়ঢাকের বাদ্য সকলকে প্রস্তুত হইবার আদেশ প্রদান করিতেছিল। সুসজ্জিত রণহস্তীসমূহ অধীর চাঞ্চল্যে বৃংহিতধ্বনি করিতে লাগিল। যাবতীয় বস্তুজাতকে ছাপাইয়া তাহাদের প্রকাণ্ড মূর্ত্তিগুলি দৃশ্যমান হইতেছিল। অশ্বের হ্রেষারব, অস্ত্রের ঝনঝনা, অসহিষ্ণু কণ্ঠের সমবেত গুঞ্জরণ, উচ্চকণ্ঠের প্রদত্ত আদেশসমূহ, নিয়ম বা শৃঙ্খলা-বিরহিত সৈনিকগণের যদৃচ্ছা গমনজনিত অসম পদধ্বনি সমস্ত মিলাইয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য ও শব্দজালের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রথমে মন্থর এবং অনিয়মিত, পরে অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও সুস্পষ্ট কামানের বজ্রনাদ অনতিপরেই আমাকে নিঃসন্দেহে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, ক্ষেত্রবিশেষে মরণের মহোৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং তাহা দ্রুত আমার সৈন্যদলের অভিমুখে—আমি যেখানে অশ্বারোহণে গভীর উৎকণ্ঠার সহিত অবস্থিত ছিলাম—সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। এইবার যুদ্ধের স্রোত আমাদের পার্শ্ব দিয়া বহিতে লাগিল। তখন কাজ করিবার এত বিষয় ছিল যে, অন্য কিছুই ভাবিবার অবকাশ মাত্র রহিল না। আমাদের সেনাগণ শীর্ণকায় 'অফলা' গাভীর মতই—আহার্য্যাভাবে উহারা এক একটি নর-কঙ্কাল অপেক্ষা বেশী কিছুই ছিল না। ঘোড়াগুলির অবস্থাও ইহাদের অপেক্ষা কিছু উন্নততর নয়। সিন্ধিয়ার অশ্বারোহী বাহিনী যখন সবেগে আমাদের আক্রমণ করিল তখন প্রত্যাঘাত না করিয়াই রণভূমি হইতে আমরা সহজেই বিতাড়িত হইতে বাধ্য হইলাম। আমি সৈনিকগণকে পুনঃসম্বদ্ধ করিবার যথোচিত প্রয়াস পাইয়াছিলাম, কিন্তু মাত্র কয়েক জনকেই একত্রিত করিতে পারিয়াছিলাম, অপর সকলেই পশ্চাতে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া যাহাকে বলে, 'লেজ গুটাইয়া' পলায়ন করিল। আমি যে দলের সহিত সংশ্লিষ্ট, এই ভাবেই তাহার কর্ত্তব্যের নিষ্পত্তি ঘটিয়াছিল।

সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক পশ্চাতে বিতাড়িত আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত আমাদের পদাতিক সৈন্যও মিলিয়া গিয়াছিল এবং ভ্রমক্রমে শত্রুপক্ষের সেনা বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। পক্ব শস্যক্ষেত্রের মতই উহাদের নির্ম্মমভাবে ছেদনকার্য্যও আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়। এই নিদারুণ ভ্রান্তিনিরসনের এবং নিজেদের লোকক্ষয় নিবারণের জন্য আমার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনায় এবং মরণোন্মুখ আহতের কাতর আর্ত্তনাদে আমার কণ্ঠস্বর বিলীন হইয়া গেল। এ হত্যাকাণ্ড কতক্ষণ পর্য্যন্ত চলিত বলিতে পারি না। সহসা অশ্বারোহীদের দৃষ্টি এমন একটি বিষয়ে নিবদ্ধ হইয়াছিল যুদ্ধের সর্ব্ববিধ নৃশংসতা ও বিপুল উত্তেজনার মধ্যেও যাহা সত্যই ভীষণদর্শন। উহাই সেই উন্মত্ত অবস্থাতেও উহাদের মনে মুহূর্ত্তে আত্মরক্ষার চিন্তার উদ্রেক করিয়া ঐ ধ্বংসলীলা বন্ধ করিয়া দিল। কামানের গোলার আঘাত-যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায় একটি রণহস্তী সচল পর্ব্বতের মতই তাহাদের দিকে তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল এবং ভীত অশ্বারোহী ও তাদের তরবারির অবধা আঘাতে খণ্ডবিখণ্ডিত-দেহ স্বপক্ষীয় সেই পদাতিকদলের মধ্য দিয়া সে সবেগে প্রধাবিত হইল। তাহার বিশাল বপুর আঘাতে ও পদমর্দ্দনে বাহন এবং আরোহী উভয়েই ভূপতিত ও বিমথিত হইয়া গেল, তার যাত্রাপথ-মধ্যে যাহা কিছু পড়িল, সমস্তই উহার আক্রোশের পাত্র হইল। 'সাদি' গণের আরব্ধ ধ্বংসকার্য্য এবার স্বতঃই বন্ধ হইয়া গেল, কারণ ভীত ঘোটকসমূহ আরোহিগণকে লইয়াই দ্রুত করিবর কর্ত্তৃক হতভাগ্য ঐ পদাতিকগণকে বিমর্দ্দিত হইবার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া রণস্থল হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সিন্ধিয়ার অশ্বারোহী সৈন্যদল আমাদের তোপখানা অভিমুখে ধাওয়া করিল এবং যাবতীয় সমরসম্ভার ও রসদসহ উহা বেদখল করিয়া লইল। এইখানেই যুদ্ধের মীমাংসা হইয়া গেল। যশোবন্তরাও তাঁহার 'ভুবনবিজয়ী' বীরগণকে ছত্রভঙ্গ হইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিতে দেখিলেন। যুদ্ধের অবসানকালে সিন্ধিয়ার দৃষ্টিপথে তাহার একটিমাত্র শত্রুও আর অবশিষ্ট রহিল না, কারণ পলাতকগণ অনুসরণকারীদিগকে পবন-বেগে বহু পশ্চাতে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। আমাদের শারীরিক শীর্ণতা যুদ্ধের সময় আমাদের অসুবিধার কারণ হইলেও এক্ষণে পলায়নকালে সবিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য্য।"

হরিজীর লেখাটি বেশ কৌতূহলপ্রদ বলিয়া তাহা হইতে এখানে একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল। সিন্ধিয়া নিজে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না—হরিজীর এই কথাটি কিন্তু প্রকৃত নহে। সাদারলণ্ড বা তাঁহার সৈনিকগণের কোন প্রসঙ্গই ইহাতে নাই, ইহাও অবশ্য লক্ষণীয়। এই বিজয়লাভের ফলে সাদারলণ্ডের সামরিক খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি আবার সিন্ধিয়া মহারাজের সুদৃষ্টিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মধ্যে এমন কথাও শুনা গেল

যে, পেরঁ'র স্থলে দৌলৎরাও তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে পেরঁ'র মনে তাঁহার বিরুদ্ধে দারুণ ক্রোধ ও ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছিল। সাদারলণ্ড তাঁহার শ্যালিকা-জামাতা হইলেও উভয়ের মধ্যে কোন কালেই কিছুমাত্রও সদ্ভাব ছিল না। পেরঁ আবার সাদারলণ্ডের বিরুদ্ধে সিন্ধিয়ার বিরাগসৃষ্টির চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পর বৎসর মার্চ মাসে যখন তিনি সিন্ধিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উজ্জয়িনী নগরে আসেন, তখন তাঁহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছিল। দৌলৎরাওকে তিনি নিজ মতে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাদারলণ্ডকে আবার হতমান হইতে হইল। পেরঁ তাহাকে নিজ দেহরক্ষী সেনাদলের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে সাদারলণ্ড বিষম ক্রোধে এবং ক্ষোভে অধীর হইয়া সিন্ধিয়ার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

ইহার পর সাদারলণ্ড সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। লর্ড লেক কর্ত্তৃক আগ্রা অবরোধকালে দুর্গমধ্যে যে কর্ণেল সাদারলণ্ডকে দেখা যায়, তিনি যে রবার্টের ভ্রাতা হিউ তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সমসাময়িক পত্রে পুস্তকে Col. H. Sutherland বলিয়া তাঁহার সুস্পষ্ট উল্লেখ সত্ত্বেও কেন যে সকলে তাঁহাকে রবার্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। পদত্যাগের পর রবার্ট অতি অল্প দিনই জীবিত ছিলেন। মথুরানগরে সদরবাজারের অদূরে শেঠের বাগানের হাতার মধ্যে মস্তাভ ধূসরবর্ণের বালুপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ একটি মনোরম সমাধি-সৌধ আছে। উৎকীর্ণ লিপি হইতে প্রকাশ যে, উহা সাদারলণ্ডের সমাধি এবং ২০শে জুলাই ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩৮ বৎসর বয়সে মথুরায় তাঁহার দেহান্ত হয়।* বাগানের মধ্যে এক কালে একটি বাটী থাকার নিদর্শন আজও দেখা যায়। মনে হয় পদত্যাগ করিবার পর মথুরানগরে আসিয়া ঐ বাড়ীটিতে তিনি বাস করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর এই উদ্যান-মধ্যেই তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছিল। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট-প্রদত্ত বৃত্তিভোগীবৃন্দের নামের তালিকামধ্যে রবার্টের নাম পাওয়া যায় না। তাহার কারণ সুস্পষ্ট। এদিকে হিউ সাদারলণ্ড মাসিক ৮০০৲ টাকায় পেন্সনসহ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

হেসিঙ-নন্দিনী মাদেলিন বা ম্যাগডালেনকে সাদারলণ্ড কোন্ সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। ইহাদের দুই পুত্রের মধ্যে একটির (স্মারক লিপিতে নাম C. P. Sutherland প্রদত্ত হইয়াছে) তিন বৎসর বয়সে চিত্তিরা নামক স্থানে মৃত্যু হইয়াছিল (১৪।১০।১৮০১)। জন উইলিয়ম নামক অপর শিশুটিকে তাহার খুল্লতাত স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনকালে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। উত্তরকালে ইহার পুত্র ষ্টুয়ার্ট সাদারলণ্ড, সি. আই. ই. সরকারী চাকরি উপলক্ষে দীর্ঘকাল এদেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কীর্ন তাঁহার গ্রন্থরচনাকালে ইহার নিকট সংরক্ষিত ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃন্দের স্মারক বহুসংখ্যক পত্র এবং চিত্র হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হন।

সাদারলণ্ড একজন বিশিষ্ট সৈনিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সমরনৈপুণ্য সাধারণ ভাগ্যান্বেষী সৈনিক অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের। ইন্দোর-যুদ্ধে তাঁহার বিজয়লাভ সমসাময়িক ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম একটি প্রধান ঘটনা এবং তাঁহার রণচাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। কিন্তু হইলে কি হয়, সাদারলণ্ডের চারিত্রিক গুণাবলী তাঁহার সামরিক কৃতিত্বের অনুরূপ ছিল না। তিনি অতিশয় লোভী এবং নীতিজ্ঞানবিবর্জ্জিত ছিলেন। ইংরেজ সেনাদল এবং সিন্ধিয়ার বাহিনী এই দুই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে ঐ কারণে পর্য্যায়ক্রমে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল।

জাঁ ল দি লরিস্তোঁ

"ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে সৈনিকদিগের মধ্যে প্রথম স্থান দিতে হয় ম্যাসিয়ল বা মুসলমান ঐতিহাসিকগণের 'মুসিয়ল্যাস'কে। কারণ ইনিই প্রথম ইউরোপীয় সৈনিক যাঁহাকে উক্ত পর্য্যায়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

কীর্নে'র একথা কিন্তু সত্য নহে। কর্ণেল ভ্যেভালিয়ে জাঁ ল দি লরিস্তোঁকে কোনমতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক বলা চলে না। তাঁহাকে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক বলিলে দুপ্লে, বুসী, লালী, সাফ্রাঁ এদের সকলকেই উক্ত আখ্যা প্রদান করিতে হয়। সপ্তবর্ষব্যাপী সময়-মধ্যে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল অবস্থাচক্রে পড়িয়া হিন্দুস্থানের অভ্যন্তর-প্রদেশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ এবং বিভিন্ন দেশীয় নৃপতি ও সর্দ্দারগণের সাহচর্য্যে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইলেও জাঁ ল বরাবরই ফরাসী রাজসরকারের কর্ম্মচারী ছিলেন, চন্দননগরের পতনের পর উত্তর-ভারতের ফরাসী গবর্ণমেন্টের তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। এই সময়-মধ্যে তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন। সুতরাং দেশীয়-গণের সহযোগীরূপে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে জাঁ লকে অস্ত্রধারণ করিতে দেখিয়া যাঁহারা তাঁহাকে স্বদেশীয় গবর্ণমেন্টের সহিত সম্পর্কপরিশূন্য, অর্থবিনিময়ে অসিবিক্রয়েচ্ছু ভবঘুরে মনে করিয়াছেন তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জাঁ ল বঙ্গদেশে কাশিমবাজারের ফরাসীকুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। ক্লাইভ এবং ওয়াটসন চন্দননগর অধিকার করিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে জাঁ ল প্রমুখ ফরাসীগণকে তাঁহাদের করে সমর্পণ করিবার জন্য বলিলে তিনি প্রথমে ইহাতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু পরে ফরাসীদের জন্য নিজ রাজ্যমধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে অনিচ্ছুক ও শান্তিকামী সিরাজ জাঁ লকে সদলে অন্যত্র গমন করিতে আদেশ দেন। পলাশীযুদ্ধের পর বঙ্গদেশে ইংরেজাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বীয় মুষ্টিমেয় অনুচরবৃন্দ সহ জাঁ ল আশ্রয়ান্তরাভাবে তখনকার দিনে সর্ব্বপ্রকার ইংরেজ প্রভাববিহীন হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরভাগে

* Blunt: *List of Christian Tombs in the U.P.*, No. 367; Turner: *List of Christian Tombs and Monuments in the N.W.P. and Oudh.* No. 67.

এপার ওপার [শ্রীকনক দত্ত

গ্রামের দোকান [শ্রীবিনয়ভূষণ দাস
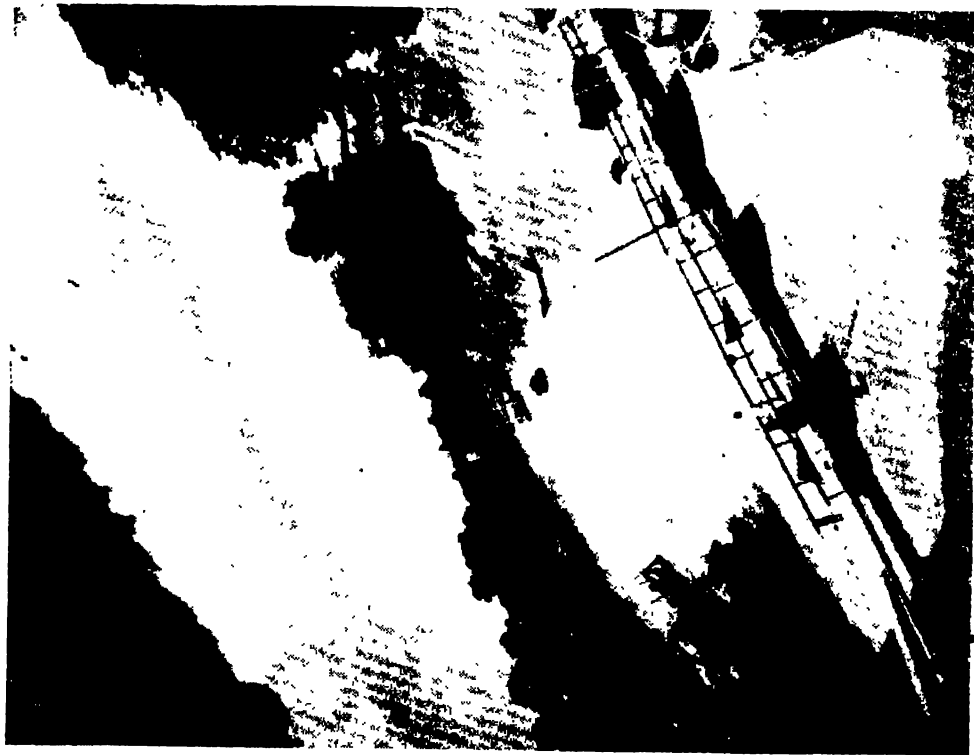
সাঁতারু—লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার মুখে শেষ চেষ্টা। (ব্রোঞ্জমূর্তি) ভাস্কর : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

মস্কোর ট্রেড ইউনিয়ন হাউস পার্টিতে রং-তামাশা উপভোগে রত শিশুবৃন্দ

গমন করিয়াছিলেন। সপ্তবর্ষব্যাপী সমরের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণে এবং আবশ্যক হইলে তজ্জন্য দেশীয় নৃপতিগণের সহিত মৈত্রী সংস্থাপনে কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠামাত্র ছিল না। ইহাই জা ল-এর হিন্দুস্থান পরিভ্রমণের এবং দেশীয় দরবারের সহিত সংসর্গের প্রকৃত কারণ।

শাহজাদা অবস্থায় ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার এবং পুনরায় পর বৎসর শাহ আলম রূপে বঙ্গদেশে অভিযানকালে শিক্ষিত ইংরেজ ও নবাবী সেনার বিরুদ্ধে জা ল-এর ফরাসী সেনাদলের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। জা লও তখন আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থা-ভাবে বিব্রত হইতেছিলেন। ফ্রান্স অথবা দাক্ষিণাত্যে লালী বা বুসীর নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনামাত্র ছিল না, সুতরাং শাহ আলম তাঁহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইলে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে জা ল-এর পক্ষে কোনই বাধা হইল না। হিলসাবা সোয়ানের যুদ্ধে (১৫।১।১৭৬১) বাদশাহী ফৌজের ইংরেজহস্তে পরাজয়ের পর জা ল শত্রুকরে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরেজরা তাঁহাকে বন্দীদশায় কলিকাতায় প্রেরণ করেন, পরে তথা হইতে তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সমরাবসানের পর ফরাসী কর্তৃপক্ষ শত্রু-কর্তৃক প্রত্যর্পিত জা লকে তাঁদের এতদ্দেশস্থ স্থানগুলির গবর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরাধিককাল (১৭৬৫-৭৭ খ্রীঃ) উক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদের যথাযথ ভাবে পরিচালনাপূর্ব্বক অবশেষে জা ল অবসর লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এ সকল কথা জানা না থাকায় কীন ভ্রমক্রমে সোয়ানের যুদ্ধের পর আর জা ল-এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

জা ল দি লারিস্তো সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ অপর যে বিষম ভুলটি করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর জ্যাক্ ফ্রাঁসোয়া ল্‌-এর সহিত তাঁহাকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া। ভ্রাতৃদ্বয় প্রায় সমসময়েই ফরাসী কোম্পানীর কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জাঁ দেওয়ানী এবং জ্যাক সামরিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন। কর্ণাটক সমরকালে (৩রা জুন ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে) ত্রিচিনোপল্লীতে চাঁদ সাহেবের সহিত যে ফরাসী সেনাপতি ক্লাইভ ও মেজর লরেন্সের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনিই এই জ্যাক ফ্রাঁসোয়া ল। তখনকার দিনে সরকারী কাগজপত্রাদিতে অনেক সময় অধস্তন অফিসারবর্গের পূর্ণ নাম প্রদত্ত হইত না এবং ফরাসী দপ্তরের কাগজপত্রাদিও দীর্ঘকাল অজ্ঞাত অবস্থায় উহ্য থাকাতে ত্রিচিনোপল্লীতে আত্মসমর্পণকারী সেনাপতি ল সম্বন্ধে বিশদ কিছুই জানা ছিল না। কয়েক বর্ষ পরে বঙ্গদেশে কাশীমবাজারে কুঠিয়াল পদে একজন ল'কে সমাসীন দেখিয়া, উভয় ব্যক্তিকে অভিন্ন বলিয়া সকলে মনে করিতেন এবং ইংরেজ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আর উন্নতি লাভের আশা নাই দেখিয়া ল ভাগ্যপরীক্ষার্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। ম্যালিসনের মত প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিকও এ বিষম ভ্রম হইতে অব্যাহতি পান নাই।

তাঁর পাঁচ বৎসরব্যাপী ভ্রাম্যমাণ জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহ নিজেই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত হস্তলিখিত গ্রন্থের চারিটি বিভিন্ন প্রতিলিপি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এবং প্যারিসনগরীর জাতীয় গ্রন্থাগার ও কলোনিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত থাকিলেও সুদীর্ঘকাল উহা মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের দপ্তরখানার তৎকালীন অধ্যক্ষ S. C. Hill ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে স্বীয় "Three Frenchmen in Balgne or the Commercial Ruin of the French settlements in 1756." নামক পুস্তক-মধ্যে জাঁ লরিস্তোর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম জ্যাক ও জাঁ ল-এর ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার পর হিল পুনরায় "Bengal in 1756-57" নামক নিজ গ্রন্থের (১৯০৬-১৩) তৃতীয় খণ্ডে ল-এর আত্মচরিতের প্রথম পঞ্চম অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করেন। তাহার পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর সুপণ্ডিত মাসিয়ঁ আলফ্রেড মার্তিনো কর্তৃক উহা সমর্থিত হয়। ঐ গ্রন্থ হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

"পরদিবস ১৫ই জানুয়ারী উষারম্ভে আমরা সংবাদ পাইলাম, শত্রুসেনা যাত্রা সুরু করিয়াছে এবং অনতিবিলম্বেই তাহারা আসিয়া পড়িবে। তখন পর্য্যন্ত কামগার খাঁ সেনাসন্নিবেশের কোন কিছুই বন্দোবস্ত করেন নাই; মূলতঃ এ সব লইয়া তিনি নিজে বেশী মাথা ঘামাইতেন না! শিবির পুনঃপ্রবেশ করাই প্রথমটায় স্থির হইয়াছিল; সেইজন্য আমি একটা বাঁধের আড়ালে আমার লোক-দিগকে যতখানি সম্ভব কতকটা নিরাপদ আশ্রয়ের অন্তরালে রক্ষা করিলাম এবং উক্ত বাঁধের পার্শ্বে আমার তোপগুলি সাজাইলাম। উহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্থান বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ছয়-সাত ঘটিকার সময় শত্রুপক্ষ কর্দ্দম ও জলপূর্ণ একটি খাল* উত্তীর্ণ হইয়া শৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হইতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিলে আমরা সহজেই তাহাদিগকে অপর পারেই বাধা দিতে পারিতাম; কিন্তু সবই বেবন্দোবস্ত! কিছুকালের জন্য আমাদের মনে হইয়াছিল যে, শত্রুপক্ষ বুঝি-বা ঐ খালের ধারেই শিবির স্থাপন করিবে, কিন্তু তাহারা আরও অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমাদের সৈন্যগণের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইবার আদেশ প্রদত্ত হইল। তৎক্ষণাৎ সমগ্র বাহিনী কয়েকদল অশ্বারোহী সেনায় বিভক্ত হইয়া শিবির হইতে বাহির হইল; প্রত্যেক দলের পুরোভাগে হস্তীপৃষ্ঠে বাদশাহ, সৈন্যাধ্যক্ষ কামগার খাঁ এবং অপরাপর প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমারূঢ় ছিলেন। শিবির হইতে বাহির হইবার অল্প পরেই শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিবার জন্য আমাদের

* বনৌয়া নদী।

থামিতে বলা হইল। চারিদিকে বিষম গণ্ডগোল। সেনাদলের মধ্যে দক্ষিণ বা বাম পার্শ্ব অথবা কেন্দ্রদেশ বলিয়া কোন কিছুই ছিল না, শত্রুকে আক্রমণে সমুদ্যত অথবা আত্মরক্ষায় তৎপর বলিয়া ঐ সৈন্যদলকে মনে করা যাইতে পারে, এমন কোন নিদর্শনই উঁহাদের মধ্যে দেখা যাইতেছিল না।

সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে একজন এডিকং আসিয়া আমাকে তাঁহার নির্দ্দেশ প্রদান করিল যে, আমাকে আমার সমস্ত সৈন্য লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা যে স্থানে ছিলাম সে স্থান হইতে তোপের গোলার পাল্লা যতদূর যায়, তত দূরবর্ত্তী স্থানে আমাদের অবস্থান করিতে হইবে। এই বলিয়া ঐ ব্যক্তি নির্দ্দেশ দান করিল। আমি দেখিলাম, ঐ স্থানে গমন করিলে পরিত্যক্ত অবস্থায় আমাদিগকে ইংরেজদের সমগ্র তোপখানার লক্ষ্যীভূত হইতে হইবে এবং মূল সৈন্যদলের সহিত সম্পূর্ণরূপেই সম্পর্কচ্যুত অবস্থায় প্রথম আক্রমণেই শত্রু সৈন্যকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও বন্দীকৃত হইতে হইবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে আমরা কয়েক পদ অগ্রসর হইলাম, কিন্তু আমাদের সাহায্যকল্পে আর কেহই এক পদও নড়িল না দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল যে, আমাদের শত্রুহস্তে বিসর্জ্জন দেওয়াই উঁহাদের অভিপ্রায়। আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিয়া আমি পুনরায় যথাস্থানে অর্থাৎ প্রায় ২০০ পদ ব্যবধানে আমার লোকজনদিগকে ফিরাইয়া আনিলাম। বিপক্ষ সেনা তখনও দৃঢ়পদে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল। সর্ব্বাগ্রে অবস্থিত ইংরেজ সেনা ও তাহাদের তোপখানা ইতিমধ্যেই আমাদের কামানের পাল্লার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উহারা ক্ষিপ্রহস্তে কামানগুলিকে দক্ষিণে ও বামে দুই ব্যাটারীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। প্রায় পনর মিনিটের মধ্যেই তাহারা বহুসংখ্যক সৈনিক, কয়েকটি হস্তী, অশ্ব—তাহাদের মধ্যে একটি হস্তী আমার, বিনাশ করিয়া কামগার খাঁর ফৌজকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে বাধ্য করাইল। আমাদের সাহায্যের জন্য একটি প্রাণীও না রাখিয়া তিনি সদলবলে মহাবেগে পলায়ন করিলেন। শত্রুপক্ষের অগ্নিবৃষ্টি (যার তুলনায় আমাদেরটি বাস্তবই নগণ্য) ক্রমেই বর্দ্ধিততর হইতে লাগিল। পশ্চাৎপদ হওয়া ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর ছিল না, তবে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিতই আমরা কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমাদের দলের কয়েকজন সৈন্য ও সিপাহী নিহত হইয়াছিল এবং একটি কামান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। উহা আমরা যুদ্ধক্ষেত্রেই ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। আমরা গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম, কিছুক্ষণের জন্য সেখানে আশ্রয় মিলিল। শত্রুসেনা আমাদের অনুসরণ করিতেছিল. আমরা গ্রাম হইতে শীঘ্রই বাহির হইলাম, কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কর্দ্দমপরিপূর্ণ খালগুলির জন্য আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তনে যথেষ্ট বিলম্ব হইতে লাগিল। কামানগুলি দৃঢ়ভাবে কর্দ্দমে বসিয়া গেল। উহাদের উদ্ধারসাধনে আমি ব্যাপৃত ছিলাম, এমন সময়ে ইংরেজ সৈন্যদল আমাদের একেবারে নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া পলায়নের সমস্ত পথই রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। তখন আমি নিরুপায় হইয়াই আমার নিকট যাহারা ছিল, সেই তিন-চার জন অফিসার ও ৩০।৪০ জন সৈন্যসহ শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলাম। ১৫ই জানুয়ারী ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের তখন অপরাহ্ণকাল, আন্দাজ প্রায় চার ঘটিকা হইবে—সেই মুহূর্ত্তের একান্ত অমঙ্গলকর প্রভাব অতিক্রম করা যেন কোনমতেই সম্ভবপর হইল না। কারণ আমাদের নিকট হইতে তিন শত লীগ মাত্র দূরে অবস্থিত পণ্ডিচেরীর উহাই ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত পতনকাল। (১৫ই জানুয়ারী ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে এক বৎসরব্যাপী ভীষণ অবরোধের পর লালী M. Duze নামক তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীকে সার্ আয়ার কুটের নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়া সন্ধিসর্ত্ত নিরূপণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।) এই যুদ্ধে আমি আমার সমস্ত জিনিসপত্র এবং বহু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি হারাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে যখন ইংরেজ সেনাদল সম্রাট শাহ আলমের অনুসরণে পুনরায় প্রবৃত্ত হইল, তখন মেজর কার্ণাক আমাকে পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে যতদূর সম্ভব ভদ্র ব্যবহার আশা করা যায় আমি তাহা পাইয়াছিলাম, সেকথা এখানে স্বীকার করা সঙ্গত মনে করি। পাটনায় ইংরেজ অধ্যক্ষ ম্যাগুয়ার আমার একজন পুরাতন বন্ধু, তিনিও আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং দুই শত স্বর্ণমুদ্রা আমাকে প্রদান করিলেন। তখন বাস্তবিকই আমার দারুণ অর্থাভাব হইয়াছিল।"

ল-এর স্বলিখিত বিবরণের সহিত তাঁহার শত্রুপক্ষীয়গণ এই যুদ্ধের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে দেওয়া প্রয়োজনীয়। যুদ্ধজয়ের পর মেজর কার্ণাক (১৭।১।৬১ তারিখে) সিলেক্ট কমিটিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত আছে; তাহা এইরূপ:—"গত পরশ্বদিন শাহজাদার বিরুদ্ধে আমাদের সাফল্যের সংবাদ আপনাদের জ্ঞাপন করিয়াছি। এক্ষণে আমার হস্তে ধৃত ইউরোপীয় বন্দীগণের তালিকা পাওয়া যায় নাই এবং মসিয় ল ও অপরাপর ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্রের নকল পাঠাইতেছি। দুই কোম্পানী সিপাহীসেনার প্রহরায় আজ প্রাতঃকালে বন্দীদিগকে পাটনায় মিঃ ম্যাগুয়ারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি—কেবল দশ জন লোক ভিন্ন। উহাদের মধ্যে নয় জন আমাদের সেনাদল হইতে পলাতক; শুধু মিঃ ল-র সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমি উহাদিগকে মার্জ্জনা করিয়াছি এবং একজন আমাদের পক্ষে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক। উহাকে লওয়া হইবে কিনা তাহা নিরূপণের ভার আমি ম্যাগুয়ারকেই দিয়াছি। মসিয় ল-এর সমগ্র তোপখানা অর্থাৎ আটটি ছোট ছোট কামান আমাদের হস্তগত হইয়াছে কিন্তু ঐগুলি একটা জলায় আটকাইয়া যায়, আমাদের সেনাদলের সে সময়ের অগ্রগতি ব্যাহত করা সমীচীন নহে বুঝিয়া ঐগুলির উদ্ধারসাধন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি কোনমতেই সঙ্গত বোধ করিতে পারি

নাই। সেইজন্ত আমি কামানবাহী শকটগুলি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিবার এবং তোপগুলিকে ঐস্থানেই ফেলিয়া রাখিবার আদেশ দিয়াছি। পরে সুবিধামত উহাদের তুলিয়া লইলেই চলিবে। সৈন্তগণের মধ্যে কয়েকজন—যাহারা একটি ফরাসী গোলাবারুদের গাড়ীর সন্নিকটে গিয়া পড়িয়াছিল, তদ্ভিন্ন এই যুদ্ধে আমাদের কোন লোকক্ষয় হয় নাই। আমাদের ইউরোপীয়গণ যখন ব্যাটারী আক্রমণে নিরত ছিল তখন তাহাদের বিনাশসাধনের উদ্দেশ্যে শত্রুরা উহাতে অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা করিয়া রাখে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমরা শত্রুর অনুসরণে দুই-তিন শত পদ অগ্রসর হইয়া যাইবার পর উহা জ্বলিয়া উঠে এবং নবাবের সৈন্তগণের সর্বাগ্রবর্তী দলই বিস্ফোরণের পূর্ণ ফল ভোগ করে। উহাদের মধ্যে সংখ্যায় প্রায় চারি শত জন সৈনিক উড়িয়া যায়, তন্মধ্যে ১০।৮০ জন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।····এই পত্র লিখিবার কালে যুদ্ধে আহত একজন ফরাসী সৈনিক আনীত হইয়াছে এবং শত্রুসেনার এত সন্নিকটে থাকিয়া তাদের আমরা অনুসরণ করিতেছি যে, আরও অনেকেই আমাদের হস্তে ধৃত হইবে বলিয়া আশা করি।" ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা হইতে কার্ণাককে লিখিত এক পত্র হইতে জানা যায় যে, ৬ই তারিখে লেফটেনান্ট পেরী তেতাল্লিশ জন বন্দী ফরাসী সৈনিক ও পাঁচ জন অফিসারসহ তথায় পৌঁছিয়াছিলেন।

৪ঠা এপ্রিল তারিখে কার্ণাক কর্ণেল কুটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এইরূপ:—"কামানসমূহের আশ্রয়ে ইংরেজ সেনা তৎক্ষণাৎ শত্রুর সমক্ষেই তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ভিন্নই নালা পার হইল। দূরবর্তী কয়েকটি বাঁধ ও নালায় আশ্রয় লইবার অভিপ্রায়ে বিপক্ষ সেনা পরিষ্কার পথ খোলা রাখিয়া পশ্চাৎপদ হইল এবং এইরূপে যখন জলরাশির দ্বারা আমাদের সৈন্তগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, তখন ঘোর অসুবিধার মধ্যে তাহাদের আক্রমণ করিবার সকল সুবিধা হারাইল। পার হইবার পর ইংরেজ সেনা শত্রুকে তাহাদের সন্নিবেশস্থল হইতে বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু উহারা সেজন্ত প্রতীক্ষায় না থাকিয়া নিজেরাই ঐ লাইন ছাড়িয়া পরবর্তী লাইনে আশ্রয় লইল। অনায়াসেই প্রথম লাইনের সহিত সংযোগ রক্ষা করা চলিত যদি উহারা এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইত। তৃতীয় লাইনে বিতাড়িত হইলে, অবশেষে আমাদের শত্রুপক্ষ যুদ্ধের একটা প্ল্যান করিয়া লইয়া বাধাদানে প্রবৃত্ত হইল। ইংরেজগণ অগ্রসর হইতে থাকিল, কামানসমূহ গোলাবৃষ্টি করিতে নিবৃত্ত হইল না এবং প্রত্যেক মুহূর্তেই বিপক্ষের সওয়ারগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা হইতে থাকিল। একটা কামানের গোলার আঘাতে দৈবক্রমে শাহ আলমের হস্তীর মাহুতটি নিহত হইলে, হস্তীটি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল, তাহাকে আর কোন মতেই শান্ত করা গেল না; সে পশ্চাতে ফিরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল। ইংরেজসৈন্ত দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল, শত্রুসেনা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে পলায়নপর হইল। প্রায় চারি মাইল পর্যন্ত সেদিন উহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করা হইয়াছিল, ইহার ফলে তাহাদের দ্রব্যাদির অনেক অংশই আমাদের হস্তগত হয়। পরিশেষে অনেকটা নিকটে আসিয়া আমি দেখিতে পাইলাম ফরাসী সৈন্তগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আনীত হইয়াছে এবং তাহাদের পশ্চাদ্ভাগরক্ষার্থ চেষ্টাও তাহারা করিতেছিল। আমি তখনই সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম, যাহাই হউক না কেন, উহাদের বিরুদ্ধে একবার চেষ্টা আমার করিতেই হইবে; মূল সৈন্তদলের সহিত উহাদের একত্রে পলায়ন অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। সেজন্ত একদল সিপাহীর রক্ষণাবেক্ষণে তোপগুলি পিছনে ফেলিয়া আমি শুধু ইংরেজ সৈনিকগণ ও অবশিষ্ট সিপাহীদগকে লইয়া মঃ ল-এর প্রতি সবেগে ধাবমান হইলাম। আমাদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া ফরাসীরা ছয়টি তোপ হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল, কিন্তু কামানগুলির মুখ অনেকটা ফিরানো ছিল বলিয়া গোলাসমূহ আমাদের মাথার উপর দিয়া দূরে গিয়া পড়িতে লাগিল। আমাদের ইউরোপীয় সৈনিকগণ বন্দুক স্কন্ধে লইয়াই মার্চ করিয়া এই কামানগুলির সীমানা পার হইয়া গেল, এজন্ত তাহাদের প্রশংসা করিতে হয়। ফরাসী ব্যাটেলিয়নসমূহ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল এবং আমাদের বন্দুকের গুলি তাহাদের মধ্যে পৌঁছিবার পূর্বেই দলটি ভাঙ্গিয়া উহারা পলায়ন আরম্ভ করিল। আমাদের একটিও গুলি ছুঁড়িতে হয় নাই অথবা আমরা একটি প্রাণীকেও হারাই নাই। ল তাঁহার কয়েকজন অফিসর এবং প্রায় পঞ্চাশ জন সৈনিকসহ আমাদের হাতে ধৃত হইলেন এবং অবশিষ্ট সেনাগণও কিছু পরে আত্মসমর্পণ করিল।"*

---

* India Office, *Orme Mss.*, *VIII*, pp. 2007-2008; *Asiatic Annual Register*, 1800 or Lew's *Memoirs*, pp. 477-479.

শিবের গাজন

শ্রীসুখময় সরকার

বাল্যকালে আমাকে দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে ধরিয়াছিল। তখন মাসীমার কাছে থাকিতাম। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের তুলনা ছিল না। তিনি গ্রাম-দেবতা গঙ্গাধর-শিবের নিকট মানত করিলেন, "বাবা! ছেলেকে আমার ভাল করে দাও, ভাল হয়ে গেলে ও তোমার 'সন্নিসি' হবে।" মাসীমার মনের জোরেই হউক, আর বাবা গঙ্গাধরের কৃপাতেই হউক, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। বৎসর দুই পরে গঙ্গাধর-শিবের গাজনে আমাকে 'সন্ন্যাসী' হইতে হইয়াছিল।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার একটি গ্রাম। এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের গাজন হইত, এখনও হয়। কিন্তু বাঁকুড়ায় একতেশ্বরের গাজন হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে; অন্য বহুস্থানে এই রীতি। আবার বাঁকুড়ার কোন কোন গ্রামে বৈশাখের ১৫ই, ২০শে, ২৫শে গাজন হয়। সাহসপুরে বৈশাখ-সংক্রান্তিতে বন শিবের গাজন হয়। ১০ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত গাজন হইতে দেখিয়াছি। ইহার পরে আর নাই। আমি যে গাজনে সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, সে গাজন জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই গাজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

শিবের গাজন ব্যাপারটি স্পষ্টতঃ হর-গৌরীর বিবাহ। শিবমন্দিরের সম্মুখে দক্ষিণ দিকে একটি বেদী, নাম অম্বিকার বেদী। বেদীর পার্শ্বে একটি উদ্দুখান নির্মাণ করিয়া পুরোহিত গাজনের নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে কয়েক দিন প্রত্যহ বৈকালে তাহাতে পায়সান্ন রন্ধন করেন এবং সন্ধ্যায় শিবের ও অম্বিকার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করেন। ইহা অন্নারম্ভ। প্রসাদ পাইবার জন্য গ্রামের ছেলেমেয়ের দল আসিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে জুটে। তাহাদের কলরবে গাজনের আনন্দ পূর্ব হইতেই ঘোষিত হয়। গ্রামে অনেক পর্ব আছে, কিন্তু গাজনের মত আমোদ কোনটায় নাই। দুর্গোৎসব বৃহত্তম পর্ব বটে, কিন্তু ইহাতে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে সমান আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায় না।

গাজন প্রকৃত পক্ষে পাঁচ দিন। প্রথম দিনে নিরামিষ্যকরণ, দ্বিতীয় দিনে হবিষ্যান্ন গ্রহণ, তৃতীয় দিনে ফলাহার, চতুর্থ দিনে রাত্রি-গাজন, পঞ্চম দিনে দিন-গাজন। ষষ্ঠ দিনে 'আমিষ-পারণ', এই দিনে ব্রত উদ্‌যাপন। গ্রাম-সোল আনার শিবের গাজন। এক এক বংশের বা শরিকের এক-একটি সন্ন্যাসী অবশ্য চাই। অক্ষম হইলে সন্ন্যাসী 'কিনিয়া দিতে' হয়। সন্ন্যাসী হওয়ার ব্যাপারে জাতি-বিচার নাই। ব্রাহ্মণ হইতে বাগদী-বাউরী পর্যন্ত সকলেই সন্ন্যাসী হইতে পারেন। সন্ন্যাসী হইলেই শিব-গোত্র; তখন জাতাশৌচ নাই, মৃতাশৌচ নাই। বিশ্বাস, এই সময়ে মৃত্যু হইলে শিবলোক-প্রাপ্তি ঘটে। হর-গৌরীর বিবাহে সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। সন্ন্যাসীর হস্তে বেত্রদণ্ড, কণ্ঠে উত্তরীয়, বস্ত্র পীত অথবা রক্তবর্ণ। সন্ন্যাসীরা সর্বদা সংযত ও শুদ্ধ চিত্তে এবং শুদ্ধাচারে থাকেন। দেউল-প্রাঙ্গণে গাজনের কয়েক দিন সারি সারি বসিয়া পুরোহিতের অনুসরণে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শিবের পূজা করেন আর মাঝে মাঝে "গঙ্গাধরের চরণে 'সেবা' লাগে শিব মহাদেব" বলিয়া গর্জন করেন [সেবা শব্দ প্রণাম অর্থে প্রযুক্ত হয়। পূর্ববঙ্গের অনেক জেলায় অদ্যাপি সেবা শব্দ এই অর্থে প্রচলিত আছে।] বাঁকুড়ায় একতেশ্বরের গাজনে ভক্তাদিগকে (ভক্ত+ইয়া=ভক্তা, সন্ন্যাসীকে 'ভক্তা'ও বলে) "একতেশ্বর নাথ মুনি মহাদেব" বলিয়া গর্জন করিতে শুনি। এই গর্জন হইতেই গাজন শব্দ আসিয়াছে মনে হয়।

গাজন শব্দের উৎপত্তি যাহাই হউক, শব্দটি শুনিলেই একটা বৃহৎ ব্যাপার আমাদের মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বাস্তবিকই গাজন ব্যাপারটি অতি বৃহৎ। নিরামিষ্যকরণের দিন হইতে যখন ঢাকীরা দেউল-প্রাঙ্গণে বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদিত ঢাকে পালকের গুচ্ছ গুঞ্জাকারে 'গজকা' আঁটিয়া নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতে থাকে এবং গ্রীষ্ম ঋতু শুষ্ক-চর্মঢাকের কড়া কড়াং শব্দ দিগ্‌বিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখন গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় উল্লসিত ও উন্মত্ত হইয়া উঠে। অন্য সকল কাজের কথা লোকে প্রায় ভুলিয়া যায়, গাজনের কথাটাই অন্তরে সর্বদা জাগিয়া থাকে। এ গ্রাম সে গ্রাম হইতে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া গাজন দেখিতে আসে। গাজন উপলক্ষ করিয়া যে প্রীতি-সম্মেলন হয়, তাহারও সামাজিক মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। গাজন উপলক্ষে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে মেলা বসিয়া যায়। ছোট বড় মনিহারী ও চুড়ি মালার দোকান, কাঠের ও মাটির পুতুলের দোকান, মিঠাইয়ের দোকান, আরও কত জিনিসের দোকান বসে। আবালবৃদ্ধবনিতা সেই সকল দোকানে ইচ্ছামত জিনিসপত্র বাছিয়া বাছিয়া কিনিতে থাকে। বালকেরা কেহ ফিরকিরি কিনিয়া সহাস্যমুখে ঘুরাইতেছে; কেহ-বা ঝুমঝুমি ও বাঁশী কিনিয়া বাজাইতেছে। বালিকারা কাঠের ও মাটির পুতুল কিনিয়াছে।

বর্ষীয়সীরাও নানা দ্রব্য কিনিয়া আঁচলে বাঁধিতেছেন, বাড়ীতে নাতি-নাতিনী আছে। মাঠের ওদিকে নাগরদোলা বসিয়াছে। চারিটি পয়সা দিয়া বালক-বালিকারা এবং যুবকেরা খানিকক্ষণ তাহাতে ঘুরিয়া আমোদ করিতেছে। আর এক দিকে কুলপী বরফের দোকানে ভিড় জমিয়াছে, দোকানী সরবৎ সরবরাহ করিয়া সামলাইতে পারিতেছে না।

কিন্তু এ সব গাজনের বাহ্য বিষয়। গাজনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। পূর্বেই বলিয়াছি, শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হর-গৌরীর বিবাহ। আমাদের বিবাহের অনেক অনুষ্ঠানই ইহাতে লক্ষিত হয়। বাদ্যভাণ্ডসহকারে 'গাজন তুলিবার' পর অম্বিকার ঘট তুলিয়া বেদীতে স্থাপন করা হয়। অতঃপর শিবলিঙ্গে বিবাহের মৌড় (মৌলি) এবং অম্বিকার ঘটে সিঁথি পরাইয়া দেওয়া হয়। অম্বিকা শিবানী, পুরাণে ইহাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু যজুর্বেদে ইনি রুদ্রের ভগিনী। ভগিনী হউন আর পত্নী হউন, তিনি রুদ্রের শক্তি। রুদ্র ভয়ঙ্কর, অম্বিকাও ভয়ঙ্করী, সৌম্যা নহেন। অম্বিকানগরে (বাঁকুড়া জেলা) অম্বিকার যে সুপ্রাচীন প্রস্তরপ্রতিমা আছে, তাহাও ভয়ঙ্করা! বেদে অম্বিকা 'হিংসিকা'। যাহা হউক, রুদ্রের সহিত রুদ্রাণীর, শিবের সহিত শিবাণীর মিলনই গাজনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। এই মিলন কে ঘটাইতে পারে? তন্ত্র বলিতেছেন, শিরোমধ্যস্থ সহস্রারে মহাশিব ধ্যানস্থ আছেন, মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীও নিদ্রিতা আছেন। তপোবলে সেই নিদ্রিতার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া, চক্রের পর চক্র ভেদ করিয়া মহাশিবের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইতে পারিলেই সাধক মুক্তির অধিকারী হইবেন। গাজনের সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছসাধন সেই তপস্যা, হরপার্বতী-মিলনের জন্য তপস্যা। গাজনের সন্ন্যাসী অবশ্য এত কথা ভাবেন না, তবু তপস্যা করেন। কিরূপে সেই তপস্যা হয়, বলিতেছি।

রাত্রি-গাজনের দিন সন্ধ্যাকালে শিবের দেউল হইতে দূরবর্তী এক জলাশয়ে 'গাজন তোলা' হয়। পাট ভক্ত্যা (প্রধান সন্ন্যাসী) মাথায় ঘট লইয়া নাচিতে নাচিতে আসিতে থাকেন, পশ্চাতে অন্য সন্ন্যাসীদের গর্জন ও ঢাকের বাদ্য চলিতে থাকে। অধিকাংশ সন্ন্যাসীর 'মানসিক' থাকে, তাঁহারা 'শালে ভর' দেন। প্রায় চারি হস্ত দীর্ঘ, এক হস্ত বিস্তৃত এক খণ্ড দারুপট্টের উপর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ-কণ্টক প্রোথিত থাকে, ইহাই শাল। এই শালের উপর উত্তান হইয়া শয়ন করিতে হয়। শালের উপর শয়ান সন্ন্যাসীকে চারি-পাচ জন মিলিয়া স্কন্ধে করিয়া জলাশয় হইতে দেউল পর্যন্ত লইয়া যায়। অনেক সময় সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত হয়, শরীর এত অবসন্ন হয় যে মৃতবৎ বোধ হয়। তখন কেহ তৈল ও সিন্দুর দিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ মর্দিত করিয়া দেয়। অধিকাংশ সন্ন্যাসী জলাশয়ের ঘাট হইতে দেউল পর্যন্ত 'প্রণাম খাটেন'। একবার উচ্চ কণ্ঠে শিব-নাম উচ্চারণ করিয়া বন্ধুর ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন; মস্তক যেখানে থাকে, কেহ বেত্রদ্বারা সেখানে একটা চিহ্ন আঁকিয়া দেয়। পুনরায় সন্ন্যাসী সেই চিহ্নিত স্থানে পা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন। এইরূপে 'প্রণাম খাটিতে খাটিতে' অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, উপবাস-ক্লিষ্ট দেহে এই তপঃক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না। তখন অপরে তাঁহার মুখে-চোখে জলসিঞ্চন করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ব্যজন করিতে থাকে আর সন্ন্যাসীর কর্ণে শিব-নাম শুনাইতে থাকে। এইরূপে সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে পুনরায় 'প্রণাম খাটা' চলিতে থাকে। দিন-গাজনের দিনও 'শালে ভর' এবং 'প্রণাম-খাটা' হয়। সেদিনকার তপশ্চর্যা আরও ক্লেশকর। প্রচণ্ড রবিকরে চারিদিকে দিগ্‌দাহ; মাথায় অসহ্য সূর্যতাপ; পদতলে কঠিন বন্ধুর মৃত্তিকাও উত্তপ্ত। পার্বতীর পঞ্চাগ্নি-তপস্যার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অনেক সময় নারীদেরও পতি-পুত্রাদির কল্যাণার্থে নানা-বিধ মানত থাকে। তাঁহারাও গাজনে অর্ধ-সন্ন্যাসিনী হন। নিরামিষাকরণের দিন হইতে তাঁহারাও উপবাস এবং শুদ্ধাচারে থাকিয়া, রাত্রি-গাজনের দিন সন্ধ্যাকালে গাজন-ঘাটে স্নান করিয়া মস্তকে একটা অগ্নিপাত্রে ধুনা পোড়াইতে পোড়াইতে দেউল পর্যন্ত গমন করেন। কেহ-বা পুরুষ-সন্ন্যাসীর ন্যায় 'প্রণাম খাটেন'; কদাচিৎ কেহ 'শালে ভর' দেন। সাত বার দেউল প্রদক্ষিণ করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিতে হয়।

সত্তর-আঠার বৎসর পূর্বে আমাদের গ্রামে গাজনে চড়ক দেখিয়াছিলাম। তাহার অস্পষ্ট স্মৃতি এখনও চিত্তে জাগরূক আছে। একটি অত্যুচ্চ শালগাছ পুঁতিয়া উপরে চরকি-সমেত আড়াআড়ি ভাবে আর একটি কাঠের একপ্রান্তে ভক্ত্যাকে বাঁধিয়া দেওয়া হইত এবং অপর প্রান্তে দড়ি বাঁধিয়া অন্য লোকে সবেগে ঘুরাইত। সঙ্গে সঙ্গে 'কুলকুলি' ও ঢাকের বাদ্যে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিত। চড়কতলায় লোকারণ্য হইত; চড়কের সময় কেহ ঘরে বসিয়া থাকিত না। এখন চড়ক প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

দিন-গাজনের দিন অন্যান্য অনুষ্ঠানের সহিত তপশ্চর্যার আরও দুইটি অঙ্গ লক্ষিত হয়। একটি 'হিন্দোল-সেবা', অপরটি 'ঝাঁপ-লওয়া'। (১) দেউল-প্রাঙ্গণে একটা বৃক্ষের শাখায় সন্ন্যাসীর পায়ে দড়ি বাঁধিয়া ঊর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে ঝুলাইয়া বারকয়েক দোল দেওয়া হয়। নীচে অগ্নি জ্বলিতে থাকে। সন্ন্যাসী দুলিতে দুলিতে শিবের নাম লইয়া এক অঞ্জলি ধূপচূর্ণ ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি তখন দাউ

দাউ করিয়া জলিয়া উঠে, সন্ন্যাসীর দেহ পীড়িত করে। (২) নিরামিষ্যকরণের দিন 'গামার গাছ কাটা' গাজনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। গ্রামের আশেপাশে যেখানে গামার গাছ (গাম্ভারি বৃক্ষ) থাকে, বৈকালে পুরোহিত, কর্মকার, সন্ন্যাসিগণ, গ্রামের 'রাজা' ও অন্যান্য অনেকে সেখানে সমবেত হন। গামার গাছের মূলে শিবপূজা করিয়া পুরোহিত উপস্থিত মান্য ব্যক্তিগণকে মাল্য প্রদানান্তর সকলের মণিবন্ধে হরিদ্রা-রঞ্জিত সূত্র বাঁধিয়া দেন। পরে পুরোহিতের আদেশক্রমে কর্মকার গামার গাছের একটা ডাল কাটিয়া বাড়ীতে লইয়া যায় এবং যত জন সন্ন্যাসী তত জোড়া 'ঝাঁপকাঠি' প্রস্তুত করিয়া দেয়। প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমিত দুইটি কাষ্ঠখণ্ডের একটিতে তিনটি, অপরটিতে দুইটি, মোট পাঁচটি লৌহ-শলাকা পুঁতিয়া দেয়। ইহারই নাম 'ঝাঁপকাঠি'। একটা উচ্চ মঞ্চের পাদদেশে ঝাঁপকাঠি দুইটি রক্ষিত হয়। মঞ্চের উপর হইতে সন্ন্যাসীকে এমন ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয় যেন ঝাঁপকাঠির শলাকায় তাঁহার বক্ষ বিদ্ধ অথবা বিক্ষত হয়।

'ঝাঁপ লওয়া'র পর মূল সন্ন্যাসী আঁচল ভরিয়া কাঁচা আম, খেজুর ইত্যাদি ফল লইয়া মঞ্চের উপর আরোহণ করেন এবং ফলগুলি চতুর্দিকে নিক্ষেপ করেন। ফল লুফিয়া ধরিবার জন্য নারীগণ সেখানে সমবেত হন। সন্ন্যাসী ফল নিক্ষেপ করিবামাত্র কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। বিশ্বাস, ঐ ফল ভক্ষণ করিলে পুত্রবতীর কল্যাণ হয়। এই অনুষ্ঠানের পর গ্রামের কোন কোন কৌতুকপ্রিয় যুবক সং সাজিয়া বাহির হয়। হাস্যজনক বেশভূষা করিয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে গাজনতলায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ শিব সাজে, কেহ দুর্গা, কেহ নন্দী, কেহ ভৃঙ্গী, কেহ-বা ভূত-প্রেত। ইহাতে সকলেই বেশ আমোদ পায়; সন্ন্যাসীদের তপঃক্লেশও কিয়ৎপরিমাণে অপনোদিত হয়।

পরদিন আমিষ-পারণা। কয়েকদিন ব্রতচর্যার পর বেত্র ও উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিগণ এই দিনে ব্রত উদ্‌যাপন করেন এবং আমিষাহার করেন। বৈকালে পুরোহিত ও সন্ন্যাসিগণ গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে গমন করিলে গৃহকর্ত্রী অথবা কোন দুহিতা হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত জলে তাঁহাদের পা ধোয়াইয়া দেয়। সন্ন্যাসিগণ বাড়ীর কর্তার ও অন্যান্য সকলের নাম উচ্চারণ করিয়া জয় কামনা করেন। সন্ধ্যাবেলায় দেউল-প্রাঙ্গণে চাঁদোয়া খাটাইয়া আলো জালিয়া যাত্রাগান শুরু হয়। কোন বারে দুই দিন, কোন বারে তিন দিন যাত্রা হয়। যাত্রা না হইলে 'নেড়া গাজন'। গ্রামবাসীরা নেড়া গাজন করিয়া নিন্দার্হ হইতে চাহে না। এই রূপে গাজন সমাপ্ত হয়।

বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ গ্রামেই শিবের গাজন হয়, কিন্তু সকল গ্রামে অবিকল একই আকারে গাজন হয় না। আচারের ইতর-বিশেষ কিছু-না-কিছু থাকিলেও প্রধানতঃ উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলি গাজনে অবশ্য থাকে। শিবমঙ্গল-গানে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ মন্তব্য করিয়াছেন যে বাংলার শিব কৃষক শিব; ইনি ত্রিশূল ভাঙিয়া সেই লৌহে লাঙ্গলের ফলা নির্মাণ করিয়াছেন; ইনি পুরাণের যোগীশ্বর শিব নহেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু 'শিবমঙ্গলে' যাহাই থাকুক, বাঁকুড়ায় শিবের গাজনে কিংবা শিবপূজায় এমন ভাব কখনও ব্যক্ত হইতে দেখি নাই। বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে সাড়ম্বরে একতেশ্বর শিবের গাজন হয়। একতেশ্বর=একতা+ঈশ্বর, এইরূপ অর্থ করিয়া কোনও গ্রাম্য কবি এইস্থানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার একতার কাহিনী রচিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত জনে তাহাই বিশ্বাস করে। কিন্তু একতেশ্বর প্রকৃত পক্ষে একপাদেশ্বর। বেদে অজ-একপাদ নামে এক দেবতা আছেন। পুরাণে ইনি একাদশ রুদ্রের এক রুদ্র। রুদ্র ঝড়ের দেবতা। চৈত্রের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝড়ের কাল। এই জন্যই বোধ হয় বাঁকুড়ায় চৈত্র সংক্রান্তি হইতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত রুদ্রের উপাসনা হয়। রুদ্র সন্তুষ্ট হইলে ঝড় প্রবল হইবে না, ঘরের চাল উড়িয়া যাইবে না, বনস্পতির শাখা ভগ্ন হইবে না। এইরূপ প্রার্থনা আজিকার নহে, বেদের কাল হইতে আছে। কিন্তু গাজনের নির্দিষ্ট তারিখগুলির অন্য হেতুও থাকিতে পারে, পরে আলোচনা করিতেছি।

একতেশ্বর 'শিবলিঙ্গ' নহেন, পদতলের আকৃতিবিশিষ্ট একখণ্ড শিলা। সহসা দেখিলে তাহাও বুঝিবার উপায় নাই, কালে কালে শিলা ক্ষয় পাইয়া প্রায় আকৃতিহীন হইয়া আসিয়াছে। যাঁহার জন্ম নাই, তিনি অজ। দেবাদিদেব শিবও অজ। 'ঈশ্বর' শব্দ শিবের নামেই যুক্ত হয়, অন্য দেবতার নামে হয় না। ধ্যানী শিবের মূর্তি-কল্পনায় এবং শিবের গাজনের কতকগুলি অনুষ্ঠানে বৌদ্ধপ্রভাব থাকিতে পারে, কিন্তু শিবের গাজন আদিতে বৌদ্ধ উৎসব ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মূর্তি বহু স্থানে শিবরূপে পূজিত হইয়াছে। বাঁকুড়া ও মানভূম জেলার প্রত্যন্তদেশে বুধপুর (বুদ্ধপুর ?) গ্রামে বুদ্ধেশ্বর নামে এক শিব আছেন। তাঁহার গাজনও বিখ্যাত। বুদ্ধেশ্বর নাম কোথা হইতে আসিল, চিন্তার বিষয়। বুধপুরের নিকটে 'পাইকবিড়রা' গ্রামে বহুসংখ্যক সুদৃশ্য বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাঁকুড়ায় শিবপূজায় নাথ-পন্থের অবশেষ আছে, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত হইবে না। কেবল বাঁকুড়ায় নহে, রাঢ়ের প্রায়

সর্বত্র পূজার সময় শিবের নামের সহিত 'নাথ' শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা: বীরভূমে "বক্রেশ্বরনাথায় শিবায় নমঃ"। ইহা জৈন প্রভাবও হইতে পারে। তবে ইহা নিশ্চিত যে বাঁকুড়ার শিব 'মুনি' অর্থাৎ যোগী। গাজনের সন্ন্যাসীদের সেই গর্জন স্মরণ করুন—"শিবমুনি নাথমুনি মহাদেব—"

কতকাল হইতে শিবের গাজন চলিয়া আসিতেছে? এখানে সেই কাল অনুমান করিতেছি। আমাদের পঞ্জিকায় চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের গাজন নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ (গুপ্তাব্দ মুখ) হইতে এই পঞ্জিকার গণনা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ ঐ সময় হইতেই বঙ্গদেশে ১লা বৈশাখ নববর্ষ ধরা হইতেছে। এক্ষণে শিবের গাজন আমাদের দেশে নববর্ষের পূর্ব দিনের উৎসবে (New Year's Eve) পরিণত হইয়াছে। ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে সৌর ৩০শে চৈত্র রবির মহাবিষুব-সংক্রান্তি হইয়াছিল, ইহা জ্যোতিষিক সত্য ঘটনা। অতএব সে বৎসর উক্ত দিবসের পরদিন হইতে নববর্ষ গণনা আকস্মিক নহে, ইহার মূলে জ্যোতিষিক যোগ ছিল। এখন ৭।৮ই চৈত্র মহাবিষুব দিন হয়, কিন্তু আমরা ৩০শে চৈত্র শিবের গাজন করিয়া এবং ১লা বৈশাখ নববর্ষ ধরিয়া খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের পুরাতন স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে অদ্যাপি প্রায় ১৬০০ বৎসর ধরিয়া শিবের গাজন আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। মহাকবি কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' পার্বতীর তপস্যার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান হয়, তিনি অনুরূপ তপশ্চর্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কবি নিজে শৈব ছিলেন এমন মনে করিবারও হেতু আছে। আর এ অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নহে। কারণ কবি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে জীবিত ছিলেন। শিবের গাজন তৎপূর্বেই প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু স্থানবিশেষে ১৫ই, ২০শে ও ২৫শে বৈশাখ, বৈশাখ-সংক্রান্তি এবং ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শিবের গাজন বিহিত হইল কেন? পূর্বে বলিয়াছি, চৈত্রের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝড়ের কাল বলিয়া সম্ভবতঃ ঐ সময়ের মধ্যে ঝড়ের দেবতা রুদ্রের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বলিতে হয়, লোকে ইচ্ছামত গাজনের এই সব তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অন্যরূপ বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ দিনটির বৈশিষ্ট্য আছে। বাঁকুড়ায় এই দিনে 'রোহিণী-উদয়' নামে একটি ধর্মানুষ্ঠান হয়। যেকালে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রোহিণী নক্ষত্রে রবির মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত, এই অনুষ্ঠানটি সেই কালের স্মৃতি বহন করিতেছে। ইহা আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের কথা। এই সূত্র ধরিয়া বলিতে পারা যায়, যে-যে কালে ১৫ই, ২০শে ও ২৫শে বৈশাখ, বৈশাখ-সংক্রান্তি এবং ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মহাবিষুব দিন হইয়াছিল, উক্ত দিবসসমূহে অনুষ্ঠিত শিবের গাজনে সেই সেই কালের স্মৃতি রক্ষিত আছে। সামান্য জ্যোতির্গণিতের সাহায্যে গণিয়া দেখিতেছি, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে ১৫ই বৈশাখ, খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দে ২০শে বৈশাখ, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দে ২৫শে বৈশাখ, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দে বৈশাখ-সংক্রান্তি এবং আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের নিকটবর্তী কালে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মহাবিষুব-দিন হইত। আর খুব সম্ভব, ভারতভূমির ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ঐ ঐ দিন নববর্ষ ধরা হইত। এখনও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নববর্ষ ধরা হয়। পূর্বভারতে ১লা বৈশাখ, উত্তর ভারতে দোলপূর্ণিমা, পশ্চিম ভারতে ও মহারাষ্ট্রে দীপালীর দিন নববর্ষ আরম্ভ হয়। পূর্বকালেও হয়ত এইরূপ ছিল। যে দেশের ভূমিভাগ সুবিস্তৃত এবং যে দেশের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালে ব্যাপ্ত, সে দেশে এইরূপ ঘটনা অস্বাভাবিক নহে, বরং খুবই স্বাভাবিক।

শিবের গাজন ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর বর্তমান রূপ লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বহু বহু পূর্বে এই উৎসবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। হঠাৎ কোনও উৎসব প্রবর্তিত হয় না, হইলেও তাহার আদিরূপ অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত হয়; কালে কালে ইহার ক্রম-পরিণতি (evolution) হইতে হইতে পূর্ণতর রূপ প্রাপ্ত হয়। শিবের গাজনের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মহীরুহে পরিণত হইতে এবং শাখা-পল্লবে পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইতে বহু শত বৎসর অতীত হইয়াছিল। ভারতে আর্য-সভ্যতার বয়স কি তবে সার্ধ ত্রিসহস্র বৎসর মাত্র? ভারতে আর্য-উপনিবেশ কি তবে খ্রীষ্টজন্মের মাত্র দুই সহস্র বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়? মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে, সে সব কতকালের এবং কাহারা নির্মাণ করিয়াছিল? মক্কায় যে শিবলিঙ্গ আছেন, কে এবং কতকাল পূর্বে তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল? এ সকল প্রশ্নের উত্তর সহজে দিবার নহে। সুধীবৃন্দ বিচার করুন।

কারুকার্য্যকরা মন্দিরের কপাট

'অমূল্য' প্রত্নশালা, রাজবলহাট

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে যুগে যুগে ইতিহাসই মানুষকে উত্থান ও পতনের সন্ধান দিয়াছে। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি সবকিছুই ইতিহাসের ভিতর দিয়া জগতে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগেও

'অমূল্য' প্রত্নশালা

প্রাচীন ইতিহাসের কদর এবং মূল্য এত বেশী। জগতের বড় বড় শহর, সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার পথে আজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। শহরের বুকে তাই আজ নিত্য নূতন বিভিন্ন প্রকারের ছোট-বড় বহু সংস্কৃতিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পল্লীগ্রামের কথাও আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। আমরা এই অভাব পূরণের নিমিত্ত কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। পল্লীবাসীর ভিতরে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিতরণের জন্য ১৯৪১ সনে বাংলার খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামে পরলোকগত স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের পৌরোহিত্যে 'অমূল্য' প্রত্নশালার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের পর মাত্র দুই বৎসর স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, পরে স্থানীয় দানবীর শ্রীজহরলাল ভড় মহাশয় ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। জহরবাবুর দানেই কিছুদিন হইল প্রত্নশালার নিজস্ব বৃহৎ ভবনটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীজহরলাল ভড়

এই ভবনটির সঙ্গে বাংলার চিরস্মরণীয় জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের স্মারক "হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার"টিও সংযুক্ত রহিয়াছে। ভবনটির দক্ষিণ দিকে এই পাঠাগারের মধ্যে প্রত্নশালা এবং উত্তর দিকের শেষপ্রান্তে স্থানীয় দাতব্য ঔষধালয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভবন-নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও জহরবাবু উক্ত পাঠাগারে এবং প্রত্ন-শালায় বহু নগদ অর্থ, আলমারী, শো-কেস ইত্যাদি দান করিয়া পল্লীবাসীর প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই দান রাজবলহাটবাসীর তথা সমগ্র হুগলী জেলার গৌরবের বস্তু।

আজ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এই প্রত্নশালার তরফে রাঢ়ে

বিভিন্ন স্থানের, বিশেষ করিয়া এই ভুরীশ্রেষ্ঠপুর বা 'ভুরসুট' পরগনার প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানগুলির গবেষণা-কর্মে কেহ কেহ লিপ্ত রহিয়াছেন। ভুরসুটের ব্রাহ্মণ রাজগণের রায়বাঘিনীর পাড়ার, ছাউনাপুর গড়ের (বা দুর্গের) গড় ভবানীপুর রাজবংশের ভারামল্লপুর গড়ের রাজা রণজিৎ রায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলির বিশদ বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। উক্ত গড়সকলের ও নিকট হইতে একটি ছোট পিতলের বিষ্ণুমূর্ত্তি, একটি প্রাচীন তরবারি, একটি তীরের ফলক, একটি পিতলের প্রদীপ, একটি পিতলের চেনের অংশ, কতকগুলি ইট ও মাটির বল বা গুলি প্রত্নশালায় রাখিবার জন্য দান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নশালায় উক্ত প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি সযত্নে সংরক্ষিত হইতেছে।

প্রত্নশালায় যে সব পুরাদ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কতকগুলির বিবরণ এখানে সংক্ষেপে দেওয়া গেল। বিবরণ পাঠে সংগ্রহগুলির গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

ভবানী-মূর্ত্তি

একটি মূর্ত্তি, সাটিথান গ্রামে প্রাপ্ত

[শ্রীহরিহর শেঠ কর্ত্তৃক প্রদত্ত

ব্রাহ্মণ রাজবংশের বহু প্রাচীন ইতিহাসের দ্রব্যাদি ও তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। সংগৃহীত দ্রব্যাদির মধ্যে রহিয়াছে—রাঢ়ের নানা স্থানের বহু প্রাচীন শিল্পের বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন, যথাঃ প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য্যময় পোড়ামাটির ইট, প্রাচীন ছবি, প্রাচীন পুথি, দলিল, মূর্ত্তি, যুদ্ধের অস্ত্রাদি, মহাপুরুষগণের হস্তলিপি ও তাঁহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি।

প্রথমে প্রত্নশালার সংগ্রহের মধ্যে গুপ্ত, পাল, সেন যুগের প্রত্নদ্রব্যের কথা বলি। রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানের ভগ্ন মন্দির-গাত্র হইতে সংগৃহীত প্রায় দুই শতাধিক কারুকার্য্যময় পোড়া

* উক্ত ছাউনাপুর গড় ১৯৩০-৩৫ সন পর্য্যন্ত হাওয়াখানা নিবাসী স্বর্গীয় হীরালাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রত্নশালা-কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে ব্যক্তিগত ভাবে খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, ছাউনাপুর গড়ের নিম্নে বহু প্রাচীন ছোট ছোট ইটের গাঁথুনি ছিল। ঐরূপ দু'চারখানি পুরাতন ইটও প্রত্নশালায় তিনি দিয়াছেন। হীরালালবাবু কর্ত্তৃক গড়টি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে খনিত না হওয়াতে গড়ের নিম্নের ঘর ও দেয়ালগুলির অবস্থান ভাল ভাবে বুঝা যায় না। তবে ঘর ও দেয়াল যে আলাদা আলাদা ছিল তাহা বুঝিতে আদৌ কষ্ট হয় না। হীরালালবাবুর

ছাউনাপুর গড়ের চিত্র

ইট প্রত্নশালায় আছে। ঐগুলিতে লতাপাতা, ফুল, দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ ইটগুলির কারুকার্য্য ও খোদাই বড়ই সুন্দর।

নিদর্শন—গণেশমূর্তি হুগলীর জেলাশাসক মাননীয় শ্রীঅবনী-ভূষণ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে প্রত্নশালাকে দান করিয়া-ছেন। এই মূর্তিটি অন্যান্য কারুকার্য্যখচিত ইট অপেক্ষা

কারুকার্য্যকরা ইট
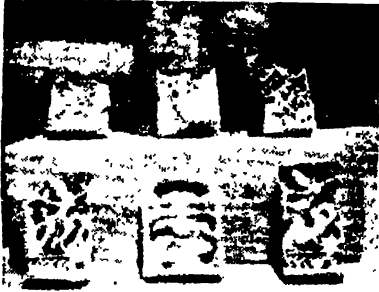
কারুকার্য্যকরা ইট

এই ইষ্টক-শিল্পের সুনিপুণ পদ্ধতিতে তখনকার রাঢ়ীয় শিল্পীর মনের ভাব ভাল রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ইষ্টক-শিল্পের ভাবধারা বাংলা তথা রাঢ়ের নিজস্ব সম্পদ। কারণ বাংলার রাঢ়ভূমি ছাড়া অন্য কোথাও ঐরূপ ইষ্টক-শিল্পের নিদর্শন দেখা যায় না। রাঢ়ভূমি হইতে এখন উক্ত শিল্প ও শিল্পী উভয়েই বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু তাহাদের হাতে তৈরী শিল্প-নিদর্শনসমূহ আজও বাংলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ঐরূপ কারুকার্য্যময় কিছু কিছু মন্দির এখনও বাংলার নানা স্থানে ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থায় পূর্ব্ব-

ব্রহ্মদেশীয় কাষ্ঠ-শিল্পের নিদর্শন

স্মৃতি বহন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যাহা আছে, উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে হয়ত তাহা অচিরে নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজেই উক্ত শিল্প-নিদর্শনগুলি কত মূল্যবান তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ঐরূপ ইষ্টক-শিল্পের একটি

কিছু ভিন্ন ধরণের। ঐ যুগে শিল্পী যে কেবল মাটির উপরই তাঁহার তুলির রং ফলাইয়াছিলেন তাহা নহে, পাথর ও কাঠের উপরও তিনি তাঁর নিপুণতা দেখাইতে কসুর করেন নাই। ঐরূপ ইষ্টক-শিল্পের অনুকরণে শিল্পী নানা দেবদেবীর মূর্তি মন্দিরের দরজায়, কপাটে ও থামে লতাপাতা ফুলসহ খোদাই করিয়াছিলেন। প্রত্নশালা ঐরূপ একটি কারু-কার্য্যময় কাঠের কপাটের নিদর্শন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কপাটটির কারুকার্য্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহার উপরে নানা দেবদেবীর মূর্তি নিখুঁতভাবে খোদিত
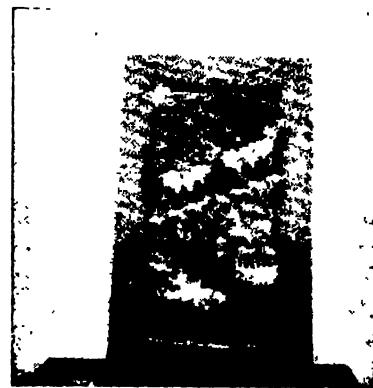
ব্রহ্মদেশীয় কাষ্ঠ-শিল্পের আর একটি নিদর্শন

রহিয়াছে। এই কপাটটি পালযুগের বলিয়া মনে হয়। এইটি হুগলী জেলার ভালিয়া গ্রামের 'সরকার বাটী' হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার জোড়াটির একখানি এখনও সেখানে রহিয়াছে। সংগ্রহকালে শুনিয়াছিলাম যে,

উক্ত সরকার-বাড়ীর মন্দিরের এবং চণ্ডীমণ্ডপের কপাটে ও থামের গায়ে ঐরূপ বহু খোদাই-কাজ ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই, সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রত্নশালায় ঐ জাতীয় কাঠ খোদাই শিল্পের আরও একটি নিদর্শন রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। ইহা ভবানীমূর্ত্তি বলিয়া কথিত। এইটি হুগলী জেলার বাসুড়ী গ্রাম হইতে উক্ত গ্রামবাসীদের সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে। মূর্ত্তিটি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে উহা একখানি নিমকাঠ হইতে তৈয়ারী।

বরাহ ও মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির ভগ্নাংশ
[শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত

ঐ সকল ঐতিহাসিক সম্পদ ছাড়াও প্রত্নশালায় পাল-যুগ, সেনযুগ ও গুপ্তযুগের এবং মোগল ও পাঠান আমলের বহু পাথরের বিষ্ণু, বরাহ, সরস্বতী ও মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি প্রভৃতি রহিয়াছে। অক্ষত বিষ্ণুমূর্ত্তিটি পালযুগের। এইটি চন্দননগরের শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় প্রত্নশালায় দান করিয়াছেন। তিনি ইহা হুগলী জেলার সাটিথান গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও তিনি প্রত্নশালায় বহু প্রাচীন চিত্র, বহু মুদ্রা, ডুপ্লের হস্তলিপির প্রতিলিপি, চন্দননগরের বহু প্রাচীন চিত্র ইত্যাদি প্রত্নশালায় দান করিয়া প্রত্নশালার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশী।

এইবারে প্রত্নশালার "পাল-সংগ্রহে"র কথা বলি। এই সংগ্রহে গুপ্ত, পাল, সেন, মোগল ও পাঠান যুগের প্রায় সহস্রাধিক পুরাবস্তু রহিয়াছে, যথা: রঙীন মৃৎপাত্রের খণ্ড, মাটির বাসন, কড়াই, হাঁড়ি, নক্সাদার হাঁড়ির ঢাকনি, মাটির 'বল' ইত্যাদি। হুগলী জেলার মহানাদ গ্রামনিবাসী বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় সপ্তগ্রাম, মহানাদ ও বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার বৌদ্ধবিহার খননকালে বহু পুরাদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই সংগ্রহটি তাঁহারই দানে পুষ্ট।
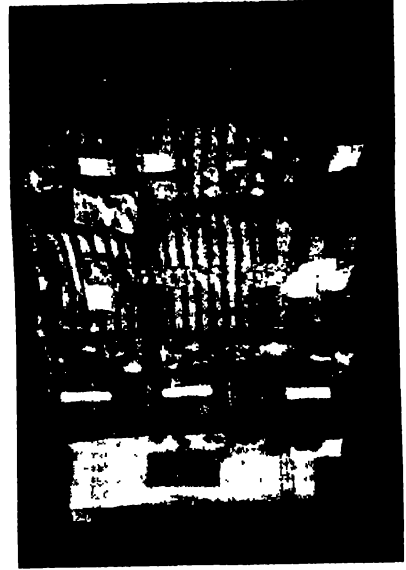
"পাল-সংগ্রহ"
[শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত

মৃৎশিল্পের এই নিদর্শনগুলি দেখিলে সহজেই তৎকালের সহিত বর্ত্তমান যুগের মৃৎশিল্পের পার্থক্য ভাল ভাবে বুঝিতে পারা যায়। এই 'পাল-সংগ্রহ'টি বাস্তবিকই প্রত্নশালার অমূল্য সম্পদ।

এইবারে প্রাচীন পুথিসংগ্রহের কথা কিছু বলিব। প্রত্নশালায় হস্তলিখিত, তিন শত বৎসরের পুরাতন রামায়ণ, পুরাণ, চণ্ডী, পূজাপার্ব্বণ, কথকতা ইত্যাদি প্রায় দেড় শতাধিক পুথি রহিয়াছে। রাঢ়ের বিভিন্ন স্থান হইতে এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। উর্দ্দু পুথিও একখানি রহিয়াছে। এই পুথিগুলির মধ্যে কয়েকখানি জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রীকালিদাস দত্ত মহাশয় ও কলিকাতার শ্রীবিজয়সিং নাহার মহাশয় মুদ্রা, চিত্র ইত্যাদি সহ দান করিয়াছেন। প্রত্নশালায় ইহা ছাড়া বহু প্রাচীন দলিল, মানচিত্রাদিও রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা প্রায় শতাধিক। গ্রন্থাগারের নিজস্ব একটি ছোট প্রাচীন পুস্তক বিভাগ আছে। তাহাতে প্রায় চারি শতাধিক প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুস্তিকা রহিয়াছে।

রাঢ় অঞ্চলের পল্লীগ্রামে এরূপ একটি পুরাতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠান আর আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইতে হয়। কারণ ইহার কোন স্থায়ী তহবিল নাই। এত দিন সমুদয় ব্যয়ভার

স্থানীয় শ্রীজহরলাল ভড় মহাশয় বহন করিতেছিলেন এবং এখনও করিতেছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার সাহায্য ছাড়াও বহু অর্থের প্রয়োজন। বিস্তর গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্ম অর্থাভাবে সম্পাদন করিতে পারা যাইতেছে না। বাংলার দুই জন খ্যাতনামা ব্যক্তির স্মরণার্থে স্থাপিত পল্লীগ্রামের এই প্রতিষ্ঠান দুইটি যদি অর্থাভাবে নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সহৃদয় স্বদেশবাসী এবং সরকার এরূপ একটি যোগ্য পল্লী-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থ নিশ্চয়ই অগ্রসর হইবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

পানফল

শ্রীউমা দেবী

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানফল খেতে সাধ যায়—
মেঘের বিছানা পেতে নিয়ে—আকাশের ঠাণ্ডা নিরালায়।
এ দেহ পেয়েছে তাপ মিহিন জ্যোৎস্নায়
ফাল্গুনের উত্তপ্ত হাওয়ায়
আগুন শিখায় যেন অঙ্গ পুড়ে যায়—
ছাই হয়ে মন উড়ে যায়—
মেঘের বিছানা পেতে তাই
ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানফল খেতে সাধ যায়।

সে কোন দীঘিতে আছে পানফল পানের মতন
অথচ ফলের স্বাদে রেখেছে রসাল করে মন,
একান্তই নিজস্ব আপন।
স্বপ্নের অগাধে ডুবে হয়ে আছে স্তব্ধ অচেতন—
সমস্ত রঙের স্বাদ— সমস্ত রসের গন্ধ ঘিরে তাকে আছে অনুক্ষণ,
অগাধ জলের মধ্যে ডুবে আছে পানফল—
রঙ তার সবুজ চিকণ—
ও জলে ডুবিয়ে হাত তুলে নিতে সাধ যায়—
দুই—চার—দশ—বারো—বিশ—অগণন,
মুঠো মুঠো পানফল ঘোর ঘোর পান্নার মতন—
পৌষালি হাওয়ায় ধোয়া অতি হিম পাতার মতন—
বোবা এক কুমারীর ব্যথা-পাওয়া কান্নার মতন—
—পৌষালির হিমেল হাওয়ায়—
পানফল খেতে সাধ যায়।

আজ ফাল্গুনের এই মিহিন জ্যোৎস্নায়
জলন্ত আঙরার মত কুচি কুচি জরি ঝরে যায়—
অসহায়—ভারি অসহায়—
ঘাসেদের হিমে ভেজা পাতার আগায়—
এখন—এখন—শুয়ে মেঘেদের গায়
ডুবে গিয়ে মেঘেদের ঠাণ্ডা নিরালায়
আকাশের নিরালা ছায়ায়—
পানফল খেতে সাধ যায়।
ঠাণ্ডা হিম পানফল জলে ডোবা স্বপ্নের মতন—
আঙুলে লাগলে ব্যথা ছুঁচ-বেঁধা ব্যথার মতন—
ডুবিয়ে শ্যাওলা-জলে ভেঙে ভেঙে ঘোলা ঘোলা সময়ের ঘায়—
পানফল খেতে সাধ যায়।

এ নয় প্রেমের সাধ—নোনা স্বাদ—কাঁচা নোনা জলের মতন,
ভাবিনি কারুর কথা কিছুই এমন।
মনে মনে ইচ্ছাদের একটি প্রবাল দ্বীপ আছে
বুদ্ধির এমন কোনো ইশারা নাই যে সেও ভেসে ভেসে যাবে তার কাছে,
সেখানে মধ্যরাতে উঠে পড়ে যদি কোনো ফাল্গুন বাতাস—
কাঁপায় পাখাকে যদি জলে ডোবা কোনো বুনো হাঁস—
শিশিরে সজল হওয়া ঘাসে ঘাসে সতেজ সহাস,
তরুণী নারীর মত চাঁদ যদি খেয়াল ছড়ায়
অমনি পাইনবনে ওঠে হায় হায়—
অমনি আগুন হয়ে জ্যোছনার মিহিন গুঁড়ায়—
বাঁকা চাঁদ কাঁপা-কাঁপা ভ্রূকুটি বাঁকায়।
এলোমেলো মেঘের অলকে
দু-একটি রাঙা তারা জলে ওঠে চুনির ঝলকে—
তখন যে মনে মনে কি যে হয়ে যায়—
পানফল খেতে সাধ যায়—
ডুবিয়ে আঙুলগুলি শ্যাওলার সবুজ দীঘিতে—
জলে ডোবা পানফল তুলে নিতে নিতে—
পুড়ে-যাওয়া আঙুলের ব্যথাটি জুড়োনো—
ভুলে-যাওয়া গান গেয়ে কোনো—
মেঘেদের ঠাণ্ডা বিছানায়—
আকাশের পৌষালি হাওয়ায়—
পানফল খেতে সাধ যায়—
ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানফল খেতে সাধ যায়!

ব্যক্তি করুণানিধান

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কবি করুণানিধান আমার স্ব-গ্রামবাসী, অথচ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়। একদা কবির গ্রামবাসী গুণমুগ্ধের দল তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্ত শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের বিভার্স টমসন হলে এক সভার আয়োজন করলেন। অভিনন্দন-পর্ব্ব মিটলে কবি এসে বসলেন—হলের পৈঠার উপর। তখন তাঁর বয়স ষাট ছাড়িয়েছে। দেখলাম, গৌরবর্ণের ক্ষরা গোছের মানুষটি, মুখখানি পাকা দাড়ি-গোঁফে ভরা, কিন্তু আয়ত দুটি চোখে স্বপ্ন-উজ্জ্বল দৃষ্টি—যে দৃষ্টির মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনকে উনি অপরূপ মহিমায় প্রত্যক্ষ করে চলেছেন।

শুনলাম, কিছুকাল আগে কবির পত্নী বিয়োগ হয়েছে এবং জীবনের উপর দিয়ে ঝঞ্ঝাবাদলও বয়ে গিয়েছে কম নয়। কিন্তু ওঁর মেদুর মুখে একটিও রেখা ত চোখে পড়ল না যার মধ্যে ক্লেশ বহনের স্বাক্ষর রয়েছে। মনে হ'ল দুঃখকে অঙ্গীকার করেও তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেন নি। কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম পা ছুঁয়ে। সস্নেহে বললেন, এস ভাই।

সেই প্রথম দর্শনেই কনিষ্ঠের অধিকার কায়েম হয়ে গেল। প্রমাণ পেলাম আরও কয়েকটি বছর পরে। অবশ্য পরের সপ্তাহে দেশে গিয়ে কবির দর্শন পেলাম না। উনি ধানবাদে চলে গেছেন। কবির আত্মীয়স্বজন অন্তরঙ্গজন জানেন—ভারি খেয়ালী মানুষ উনি, কখনও এক জায়গায় বেশী দিন থাকেন না। যখন সংসারে বন্ধন ছিল, অর্থাৎ স্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন তখন বাধ্য হয়ে বেশ কিছুকাল এক জায়গায় থাকলেও মাঝে মাঝে ছিটকে পড়তেন আরাম-আয়েশের পরিমণ্ডল থেকে। তখন মধুপুর-গিরিডিতে নির্দ্ধারিত ছিল তাঁর সফর-সীমানা। এ ছাড়া কচিৎ বন্ধুবর সতীশচন্দ্র বাগচীর সঙ্গে দূর দূরান্তে পাড়ি দিতেন, কিন্তু বেশী দিন কলকাতা ছেড়ে থাকতেন না। স্ত্রী-বিয়োগের পর ওঁর মনের অস্থিরতা বেড়েই চলেছে—এক জায়গায় বেশী দিন থাকতে পারেন না কোনমতেই। আজ রয়েছেন ধানবাদে বন্ধুর আশ্রয়ে, সপ্তাহ পরে হয়ত টাটানগরের কোন হোটেলে গিয়ে উঠেছেন। পুরী ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতীর ওঁকে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি টানে তুষারমৌলি হিমালয়ের কোল। দার্জ্জিলিং, হৃষীকেশ, প্রয়াগ, চিত্রকূট, দ্বারকা, রামেশ্বর, জ্বালামুখী, ভুবনেশ্বর, নাসিক, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী···সারাভারত পরিক্রমা করেছেন এককালে; 'শতনরী'তে এ সবের পরিচয় কিছু কিছু আছে। যাই হোক, খেয়ালী কবি কবে যে শান্তিপুরে ফিরবেন—সেই দিনটি গুনতে লাগলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে—কবি ফিরে এলেন শান্তিপুরে। শনিবারে বাড়ী এসে শুনলাম সে খবর। এক

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইল দূরত্ব কিছুই নয়, রবিবার দুপুরে কবি-সন্দর্শনে যাত্রা করলাম। মনে সঙ্কোচ রয়েছে যথেষ্ট, সেই কবে দেখা—কয়েকটি

মিনিটের আলাপ মাত্র। শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলাম, সকলকে যেমন স্নেহ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছিলেন—তেমনই নৈর্ব্যক্তিক স্নেহে হয়ত বলেছিলেন, এস ভাই, আর কোন সূত্রে পরিচয় ত ঘনিষ্ঠ হয় নি। যদি না চিনতে পারেন, কিংবা ভদ্রতা-রক্ষাগোছের সাধারণ আলাপ করেন? পরক্ষণেই এ কথাও মনে হ'ল, নাই যদি চিনতে পারেন তাতেই বা ক্ষতি কি! ওঁকে দর্শন করতে চলেছি, ভাল করে দেখব, কিছু কথা শুনব—এই কি যথেষ্ট নয়? স্মৃতির পাতায় বরণীয় ব্যক্তির একটি মাত্র স্বাক্ষর পড়লেই ত সে পাতা অমূল্য হয়ে উঠবে।

সেই পরম লাভের লোভে এসে উঠলাম ওঁর বাড়ীতে। পথের ধারে চওড়া রোয়াকে আরও পাঁচ-সাত জন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে বসে গল্প করছেন কবি। একখানা খবরের কাগজ ও একটি খেলো হুঁকো ফিরছে হাতে হাতে, আলোচনাটা চলছে যুদ্ধ নিয়ে, এবং সেটা বেশ জমেছে।

প্রণাম করতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন। বললেন, তোমায় যেন দেখেছি কোথায়?

নাম বলতেই লাফিয়ে উঠলেন, আরে,এস এস ভাই, ঘরে এস।

জমাট আসর ছেড়ে আমাকে নিয়ে চলে এলেন ঘরের মধ্যে।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বললাম, ওঁরা হয়ত—

হেসে বললেন, না, না, ওঁদের কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। জার্ম্মানী যা এগোচ্ছে তাতে ইংরেজ ছাড়া কারও অসুবিধা হবার কথা নয়। ইংরেজের প্রজা আমরা—আমাদের তো নয়ই। বলে উচ্চ হাসি হাসলেন।

অতঃপর গলা নামিয়ে বললেন, মনের মানুষের সঙ্গে মনের কথা কইব—তার চেয়ে তৃপ্তি আর কিসে বল। ওসব বাইরের কথায় মন ভরে না।

বুঝলাম, ইতিমধ্যে আমার যৎসামান্য সাহিত্য-সেবার কথা উনি জেনে নিয়েছেন।

নিজের কথা কত শোনালেন, শোনালেন রবীন্দ্রনাথের কথা—রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বঙ্গসাহিত্যগগন পরিক্রমা করেছেন তাঁদের কথা। বললেন, দেখ, সাহিত্য-সাধনা করতে হলে একটি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখবে খুব বেশী। শব্দচয়ন-নৈপুণ্যের উপর ভাষার গতিবেগ নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন, মেয়েদের গায়ের গহনা প্রতিদিন ব্যবহার করে করে যেমন সোনার জলুস নষ্ট হয়—তেমনি শব্দ। যে শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হচ্ছে—সেটির বদলে অন্য একটি শব্দ বেছে নিতে হয়। তাতে করে প্রকাশভঙ্গী হয় জোরালো।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল, নিজের হাতে আলো জাললেন। এবং ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একটি বুড়ী ঝি ছাড়া ওঁর ঘরে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিল না। সে-ই থালা বাসন মেজে ঘরদুয়োর পরিষ্কার করে—কুটনো কুটে বাটনা বেটে উনুন ধরিয়ে রান্নার উদ্যোগ করে দেয়—ওঁর একটি ছেলে পাক করে। দুটি মাত্র প্রাণী—এমনি করেই চলে যায়। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে উনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আহারের আয়োজন কতটা এগিয়েছে বলে নয়—আমাকে কিছু জলযোগ করাবেন এই ইচ্ছাতেই।

ব্যস্ত হয়ে বললাম, দাদা, আজ উঠি—এসব আবার কেন?

হেসে বললেন, লক্ষ্মীছাড়া মানুষ আমি, তোমার বউদি যদি থাকতেন তো আমাকে এতটা ব্যস্ত হতে হ'ত না। একটু মিষ্টিমুখ যদি না কর—আমার মন বুঝবে কেন!

ভদ্রতা-রক্ষা-গোছ জলখাবার খাওয়ানো নয়—তার সঙ্গে এমন স্নেহের স্বাদ মিশিয়ে দিলেন—যাতে করে আজও স্বাদু হয়ে রয়েছে সমস্ত অন্তর।

নিজে রেকাবীতে করে সন্দেশ সাজিয়ে দিলেন, গেলাসে জল ভরলেন, পান সাজলেন নিজের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে নানান গল্প। জন্মসূত্রে পাওয়া পরমাত্মীয়কে ছাড়া বাইরে থেকেও যে পরমাত্মীয় লাভ হয়—এটি প্রথম বুঝলাম।

একবার যদি এসে দাঁড়ালাম হৃদয়-সান্নিধ্যে—সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করলেন হৃদয় দ্বার, কোথাও বাধাবন্ধ রইল না।

সেবার ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস-জন্মোৎসবে সভাপতি হয়ে আসছেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী ও সুধী সাহিত্যিক উৎসবে যোগদান করবেন বলে জানিয়েছেন। কবিও স্বরচিত অর্ঘ্য নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। আমায় ডাকিয়ে বললেন, দেখতো ভায়া, একটা কবিতা লিখেছি—মনটা তবু খুঁত খুঁত করছে। কতকগুলো লাইন ঠিক মনোমত হচ্ছে না, এক একটি শব্দ বহুবার এসে গেছে। শোন তো। বলে আবৃত্তি করলেন তন্ময় হয়ে।

কবিতার ছন্দ বিচার বা শব্দযোজনা-নৈপুণ্য-রহস্য আমার জানা নাই, অথচ আমাকেই কবি শোনাতে লাগলেন স্বরচিত কবিতা! দুর্ব্বল লাইনগুলো বললেন বাদ দিতে, অনুরোধ করলেন কোন শ্রুতিমধুর শব্দ দিয়ে পাদ পূরণ করতে এবং কবিতা সম্বন্ধে আমার মতামত জানাতে চাইলেন। আমার সাধ্যমত দু'একটি লাইন সম্বন্ধে মতামত দিলাম, দু'একটি শব্দও যোজনা করলাম অত্যন্ত কুণ্ঠাভরে। কবি ছোট ছেলের মত উল্লাসধ্বনি করে উঠলেন, বাঃ—বেশ হয়েছে! রবীন্দ্রমণ্ডলের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের এই নিরভিমান উচ্ছ্বাস আমাকে অভিভূত করল, ছোট্ট দেহের মধ্যে বিস্তৃত এক প্রাণের সন্ধান পেলাম।

তখন যুদ্ধের হিড়িকে কলকাতার বহু আপিস স্থানান্তরিত হচ্ছে, আমাদের আপিসও লক্ষ্ণৌ যাবে স্থির হ'ল। বাংলা ছেড়ে চলেছি—কত দিনে ফিরব জানি না, বিদায় নিতে গেলাম কবির কাছে। বুকের মধ্যে চেপে ধরে বললেন, সাবধানে থেকো বিদেশে, পত্র দিয়ো। আর যদি সুবিধা মনে কর লিখবে—তোমাদের কাছে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসব। লক্ষ্ণৌটা দেখতে আমার ভারি ইচ্ছে।

তের মাস ছিলাম লক্ষ্ণৌতে—প্রতি সপ্তাহে ওঁর পত্র পেয়েছি। বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে কত দরদ, অভিমত—কত প্রশংসার কথা থাকত পত্রগুলিতে। একবার একখানি চিঠিতে কেমন যেন করুণ সুর বাজল। তখন যুদ্ধের বিভীষিকা বাংলা ছেয়ে ফেলেছে—নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রমশঃ অগ্নিমূল্য হয়ে উঠছে, এবং সবচেয়ে অসুবিধার কথা কবিকে একই জায়গায় আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—মৃত্যুর পদধ্বনি বাজছে ওঁর কানে। চিঠিতে ছোট্ট একটি কবিতার মধ্য দিয়ে ওঁর মনোভাব জানিয়েছেন :

ভাল নাহি লাগে আর
আসা যাওয়া বার বার—
বহুদূর দুরাশার প্রবাসে,
করুণ রাগিণী বাজে বাতাসে।

এই সময়ে আমার নব-প্রকাশিত গল্প-সংগ্রহ 'আলেখ্য' ওঁর নামে উৎসর্গ করলাম। লক্ষ্ণৌ থেকে বই পাঠিয়ে ওঁর অভিমত চেয়ে পাঠালাম। কবি কয়েকটি গল্পের প্রশংসা করে লিখলেন : হাতের সব আঙুলগুলি সমান নয়, তেমনি একই লেখকের প্রত্যেকটি লেখা তুল্যমূল্য হয় না। নাই হোক, সাহিত্যের সাধনায় যার কল্যাণবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে—সে কখনও পথভ্রষ্ট হয় না। সাহিত্য সাধনার জিনিস—সেখানে ফাঁকি চলে না। ফাঁকি দিলে বাইরের কেউ না বুঝুক, নিজের মনই খুঁত খুঁত করে।

তারপর লিখলেন, অনেক দিন এক জায়গায় থেকে ভাল লাগছে না। লক্ষ্ণৌতে যদি ভাল বাড়ী পাওয়া যায়—জানিও, দিন কতক ওখানে গিয়ে থাকব।

এই সময়ে হঠাৎ বদলি হয়ে কলকাতায় চলে এলাম। সেই বছরই হ'ল পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশ ছেড়ে কবির আর কোথাও যাওয়া হ'ল না।

মন্বন্তর কাটলে কবি একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন কবি? শুনলাম—কৃষ্ণনগরে একটা সভা সেরে কবি রওনা হয়েছেন বহরমপুরের দিকে। সেখানে খবর নিয়ে জানা গেল—টাটানগরে চলে গেছেন। তারপর টাটানগর থেকেও কোন খবর নেই। বহুদিন পরে ধানবাদ থেকে চিঠি লিখলেন কোন আত্মীয়কে। নাগপুর, পাঁচমারি, জব্বলপুর, চিত্রকূট ঘুরে এসেছেন ধানবাদে। এর পর একদিন হয় ত বাংলায় আসবেন। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা।

কিন্তু বাংলায় এসেও ত কবি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকেন না। হাওড়া, বালিগঞ্জ, সেণ্ট্রাল এভিন্যু, কামালপুর, ভদ্রকালী, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর এই চক্রের মধ্যে পাক খেতে থাকবেন। হ'লও তাই। এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিক ও কোবিদকুল মিলে কবিকে অভিনন্দন দিলেন; একদিন মহাবোধি সোসাইটি হলে—আর একদিন সাহিত্য-পরিষদ-ভবনে। এ ছাড়া কোন সুধী অথবা কোন সঙ্ঘ ঘরোয়া ভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। এ সবের হিসাব করলে বক্তব্য দীর্ঘ হয়ে যাবে, সুতরাং শেষ দু'বছরের হিসাবটাই দিয়ে রাখি।

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা সেরে কবি তাঁর কন্যার বাড়ী ভদ্রকালীতে এসেছেন। শরীরে জরার আধিপত্য হয়েছে প্রবল। ক্ষীণ দেহ নুয়ে পড়েছে, পা'দুখানির শক্তিও হ্রাস হয়েছে, শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত মুখমণ্ডলে ক্লান্তির ছায়া হয়েছে ঘন, কিন্তু অনুভূতি-প্রখর দুটি বিস্তৃত নয়নে—ভুবনের রূপৈশ্বর্যের মহিমা ও মানুষের প্রীতি-স্নেহের রঙটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখন মানুষটিকে দেখলে কবিতার কথাই মনে পড়বে—কোমলকান্ত পদাবলীর কথা।

দেখা করতে গেলে সহজে ছাড়েন না। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন, সেকালের সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্যিক বন্ধুদের প্রসঙ্গ তোলেন, যা-কিছু সুন্দর ও মনোহর তার প্রতি প্রীতি-জ্ঞাপন করেন।

একদিন ছেলেমানুষের মত বললেন, শুনেছ ভাই, বুড়ো বয়সে একটা মেডেল পেয়েছি? অজিত, অজিত, আমার সেই মেডেলখানা তোমার দাদুকে এনে দেখাও ত। সেই যে জগত্তারিণী পদক—দেখ ভাই, আমার সারাজীবনের সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতি।

তারপর বললেন, আজ আর তোমায় শীগগির ছাড়ছি না। অনেকগুলো কবিতা লিখেছি, শুনতে হবে। বড্ড গরম পড়েছে, নয়? তা হোক, যে সময়ের যা—তা না হলেই খারাপ।

ঘণ্টাখানেক পরে কালবৈশাখীর মেঘ ঘনিয়ে এল—সুরু হ'ল বর্ষণ। কবির আনন্দ দেখে কে! অপটু শরীর টেনে টেনে উঠানে গিয়ে দাঁড়ালেন, এক রকম নাচতে নাচতে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন, আজ আমি ভিজব—আমি ভিজব।

প্রকৃতির সঙ্গে কবিচিত্তের নিগূঢ় সম্বন্ধ—সেই কালবৈশাখীর সজল-স্নিগ্ধ পরিবেশে অকস্মাৎ উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল।

আর একদিন প্রসঙ্গতঃ বললেন, আমার অক্ষর সঙ্গীত প্রবন্ধটি পড়েছ। শনিবারের চিঠিতে বার হয়েছে। ব'লে পত্রিকাখানি আমার হাতে দিয়ে বললেন, মনোযোগ দিয়ে পড়। প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্যে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত মাত্রা আছে। এরা কোনটা ক্ষীণ—কোনটা বা মহাপ্রাণ বর্ণ। ধ্বনি ও সুরমাধুর্যে এগুলি সম্পূর্ণ। এই মাত্রা, ধ্বনি আর বর্ণাশ্রিত সুর যদি কানকে সজাগ করতে পারে তা হলে বাক্য মনোহারী হবেই। এই সাধনায় সিদ্ধ না হলে বড় শিল্পী হওয়া যায় না।

বলে ডাকলেন, অজিত, সেই বইখানা নিয়ে এস ত—কাল যেখানা পড়ে শোনাচ্ছিলে। যার মধ্যে অক্ষর সঙ্গীতের অপূর্ব ব্যঞ্জনা—ওই যে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'। জান, ওই রচনাটি এবার রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছে।

আমার হাতে বইখানা দিয়ে বললেন, পড়। আমি পড়তে

লাগলাম—উনি প্রীতি মুগ্ধদৃষ্টিতে মাথা নাড়তে নাড়তে কাব্যরস উপভোগ করতে লাগলেন।

অন্য এক দিন মোহিতলাল মজুমদার রচিত সাহিত্য-বিতানে ওঁর সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ চোখে পড়ল। বললাম, দাদা, মোহিতবাবু আপনার সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তাই নাকি? কোথায়—কোথায়? ছেলেমানুষের মত উৎসুক হয়ে উঠলেন। আমার পড়িও ত প্রবন্ধটা। আজ আনতে পার বইখানা?

এবার যেদিন আসব—নিশ্চয় আনব।

মনে থাকবে ত? না হয় চিঠিতে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব, কেমন?

পর দিন প্রবন্ধ পড়া শেষ হলে বললাম, আপনার কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যের সুর আছে—উনি বলেছেন। এটি কি মাটির গুণ?

হবে। শ্রীচৈতন্যের পদপূত মাটি ত! বলে হাসলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবৎ-সত্তায় বিশ্বাস করেন আপনি? কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে কখনও কি উপলব্ধি করেছেন তাঁকে?

কবির মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, গলার স্বর নামিয়ে গভীর কণ্ঠে বললেন, উপলব্ধি করেছি কিনা জানি না। দুটি ঘটনা ঘটেছে জীবনে যাতে করে বুঝেছি আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ছোঁয়া যায় না—এমন একটি শক্তি আছে পৃথিবীতে।

বলবেন আপনার সেই অভিজ্ঞতার কথা?

অভিজ্ঞতা কিম্বা অনুভূতি যাই বল—সেই ঘটনা দুটি জীবনের সঙ্গে গাঁথা আছে। একটি ঘটেছিল হরিদ্বারে আর একটি চিত্রকূটে। দুটিই পুণ্যভূমি, স্থান-মাহাত্ম্য আছে বৈ কি।

প্রথমে হরিদ্বারের কথাটাই বলি। একবার হৃষীকেশ থেকে বেড়াতে গেলাম পাহাড়ের দিকে। দু'ধারে গভীর বন, মাথার উপর আকাশ আর চারদিকে উঁচু নীচু পাহাড়ী-পথ, বেশ লাগছিল। বেশ খানিকক্ষণ চলার পর হুঁস হ'ল এবার ফিরতে হবে। এতক্ষণ আপন মনে বিভোর হয়েই চলেছি, ফেরার হিসাব রাখি নি। চেয়ে দেখি পড়ন্ত বেলার রোদ গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করছে—চারিদিকে ঘন বন—উঁচু পাহাড়; বনের মধ্যে আলো কমে গেছে আর পিছনের পায়ে-চলা পথ কোথায় হারিয়ে গেছে। কে জানে, এখান থেকে হৃষীকেশ কতদূর? যেমন বুঝতে পারলাম ওইটুকু দিনের আলো নিয়ে এই বনের সীমা পার হতে পারব না, অমনি কোথা থেকে জমল অবসাদ। একটা পাথরের উপর বসে আকুল মনে ভাবতে লাগলাম কেমন করে পার হব এই দুস্তর পথ? ভাবতে ভাবতে দেখি আমার চোখের সামনে—ঠিক দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। গেঁয়ো মানুষের যেমন বেশবাস হয়, তেমনি। কাপড় মালকোঁচা করে পরা, গায়ে ময়লা একটা জামা, মাথায় মস্ত বড় একটা পাগড়ী আর কাঁধে লম্বা এক বাঁশের লাঠি—লাঠিতে বাঁধা একটা পুঁটলি। দেখেই মনটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ডাকলাম, ও ভাই শুনছ? হৃষীকেশ যাবার পথটা আমাকে বলে দাও না? লোকটা কোন উত্তর না দিয়ে সামনে চলতে লাগল। আমিও তাকে ধরবার জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম আর ডাকতে লাগলাম, ও ভাই—শুনছ? ও ভাই—

ও কোন কথা না বলে চলতেই লাগল। সবচেয়ে আশ্চর্য্য পায়ের গতি বাড়িয়েও আমি ওর নাগাল ধরতে পারলাম না—সেই দশ হাত তফাতেই রয়ে গেলাম। এমনি করে ওকে অনুসরণ করে রেল লাইনের ধারে পৌঁছলাম। লোকটা গুমটি ঘরের পাশ দিয়ে লাইন পার হয়ে ওদিকে চলে গেল, আর তাকে দেখতে পেলাম না। গুমটির ভিতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল, টেবিলের উপর ঝুঁকে একটা লোক কি কাজ করছিল। আমায় দেখে লোকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? এ দিকে এলে কোত্থেকে?

বললাম, একটা লোকের পিছু পিছু এসেছি। লোকটি তোমার ঘরের পাশ দিয়ে ওদিকে গেল, দেখ নি?

ও অবাক হয়ে বলল, লোক! কোন লোকই ওদিকে যায় নি। ওদিকে মানুষের আস্তানা নেই, খালি বন। তুমি থাক কোথায়?

বললাম সব কথা। এখানে এখন কোন ট্রেন থামবে কিনা জানতে চাইলাম।

ও বলল, একখানা গাড়ী এখনই আসবে, সেটা এক্সপ্রেস গাড়ী—এখানে থামবে না। ওই দেখ—

দেখলাম, নুয়ে-পড়া সিগ্‌ন্যালের সবুজ আলো।

মনের মধ্যে বলবতী ইচ্ছা জাগল, আচ্ছা, ওই আলোটা কি লাল হতে পারে না? পাখাটা কি উঠে যায় না? তা হলে আমার যে একটা গতি হয়। হোক না আলোটা লাল।

একাগ্র চিন্তায় তন্ময় হয়ে ভাবছি, গুম্ গুম্ শব্দ করতে করতে গাড়ীখানা আমার সামনে এসে হঠাৎ থেমে গেল। সামনেই প্রথম শ্রেণীর কামরা পড়ল, সম্মোহিতের মত লাফিয়ে উঠলাম সেইটিতে। দু' তিন সেকেণ্ড মাত্র, ফের চলতে লাগল গাড়ী। চেকার লক্ষ্য করেছিল অন্য কামরা থেকে। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামলে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া আর পেনাল্টি দাবি করল। দিতে অস্বীকার করায় আমাকে হরিদ্বার ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় দিয়ে গেল। ষ্টেশন-মাষ্টার ছিল ইউরোপীয়ান। সমস্ত শুনে বলল, এ নিশ্চয় ভগবানের দয়া, না হলে ডাকগাড়ী বা হঠাৎ থামবে কেন। যাও, তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম—ধন্যবাদ দাও প্রভুকে।

গল্প শেষ করে বললেন, এমন অদ্ভুত যোগাযোগ কেমন করে হয় বলতে পার ভায়া?

তারপর আরম্ভ করলেন দ্বিতীয় গল্প:

চিত্রকূটে এসেছি বেড়াতে। বন গমনের সময় এই পাহাড়ে শ্রীরামচন্দ্র কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। এইখানেই দশরথের মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে ভরত এসেছিলেন ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ভাবি

পুণ্যস্থান এটা। স্থির করলাম, রাম-সীতার মন্দিরে পূজা দিয়ে তারপর অন্য পথ ধরব।

পাণ্ডা পূজার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরের দিন মন্দিরের মধ্যে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে পূজায় বসলাম। বেশী যাত্রী ছিল না—পূজায় বেশ মন বসল। তখন বেলা ন'টা হবে, রাম-সীতার কাহিনী ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে চোখ বুজলাম, তারপর কিছু মনে নেই। চোখ চেয়ে দেখি, পূজারী আর পাণ্ডা ছাড়া মন্দিরে আর কেউ নেই। আমায় চোখ চাইতে দেখে পাণ্ডা বললেন, আজ আপনার পূজা সফল হয়েছে বাবু।

ওঁদের অভ্যস্ত বুলি মনে করে দক্ষিণা দিয়ে বাইরে এলাম। ও-হরি, বাইরে এসে দেখি বেলা দুটো! তা হলে ন'টা থেকে দুটো—এই পাঁচ ঘণ্টা আমার পূজায় কেটেছে! অথচ মনে হচ্ছে এই ত দশ-পনের মিনিট মাত্র জপ করেছি। খুব আনন্দে কেটেছে বলেই কি দীর্ঘ সময় এমন অল্প বোধ হচ্ছে? সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, বুকের মধ্যে ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগল। এরই নাম কি ভাব-তন্ময়তা—বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধি? সেই থেকে সীতারামের মহিমা স্বীকার করি ভাই। সীতারাম আমায় নূতন দৃষ্টি দিয়েছেন।

এই উপলব্ধির পর গীতা পাঠে আসক্তি জন্মাল কবির। অতঃপর গীতার সারমর্মটিকে কবিতায় গেঁথে রচনা করলেন, 'গীতায়ন'—পরে 'গীতারঞ্জন'।

ভদ্রকালীতে শেষ সাক্ষাতের দিন আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

চৈত্রমাস—অপরাহ্ণ বেলায় কবি-সন্দর্শনে গিয়ে দেখি কবি বাড়ীতে নেই। ওঁর দৌহিত্র অজিত বললে, দাদু গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছেন। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই।

বাড়ীর পাশেই গঙ্গা। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হয়ে ঢালু জমি —দু'ধারে পাতলা ঝোপ, একটেরে একটা ইটের পাঁজা। সেই জমির মাঝ বরাবর একটি পায়ে-চলা সরু পথ—এ কেবেঁকে গঙ্গার তীর-ভূমিতে নেমে গেছে। পথের পাশে একটি নালা, সেটি পার হয়ে পৌঁছলাম ছোটমত একটি ঝোপের সামনে। একটু তাকিয়ে দেখি—ঝোপের ওপাশে একখানি মাদুরের উপর আধ-শোয়া অবস্থায় কবি একখানি বই পড়ছেন। পাশে ছোটমত একটি জলের কুঁজা, একটা গ্লাস আর একখানি হাত পাখা।

আমায় দেখে লাফিয়ে উঠলেন, আরে—এস—এস। 'রাম-পদ পঙ্কজ ভজরে মন।'

এই দেখ একখানা বই পড়ছিলাম—সৈয়দ মুজতবা আলীর। বৈঠকী আলোচনায় মন্দ বেশ লাগছে।

তার পর নানা প্রসঙ্গ উঠল।

এক সময় বললেন, শনিবারের চিঠিতে আজ কাল আমার কবিতা বার হচ্ছে। সজনী ভায়া কখনও একা—কখনও বা সস্ত্রীক —এখানে এসে যেটুকু লেখা হয়েছে, নিয়ে যান। ওঁদের প্রেস থেকেই আবার গ্রন্থ বার করবেন। একটা প্রুফ আছে, তোমার হাতে দেব—কলকাতায় ডাকবাক্সে ফেলে দিও, শীগগির যাবে। এটি অবশ্য আগেকার লেখা—বঙ্গমঙ্গল, প্রসাদী ও বর্যাফুল—এই তিনখানি বই ওতে আছে। এখন ত বইগুলো ছাপা নেই। নতুন করে বার না হলে কোথায় তলিয়ে যেত, কে জানে। যাক বেরিয়ে, তবু ত কিছুদিন লোকের সামনে ধরা থাকবে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ওপারে মিলের কোয়ার্টারে বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলে উঠল, এপার অন্ধকারে হ'ল অস্পষ্ট। গঙ্গার জলে তার ছায়া পড়ল। জল আর জমি এখনই অন্ধকারে একাকার হয়ে যাবে, কিন্তু স্রোতে স্রোতে ধাক্কা লেগে যে সুরের সৃষ্টি হচ্ছে—তা অবিশ্রান্ত বেজেই চলবে।

কবি গাত্রোত্থান করতে করতে বললেন, সীতারাম—সীতা রাম। আর কতকাল এই অপটু দেহের ভার বইব? আর কত কাল! বলে আবৃত্তি করলেন:

> ছুটি দাও তবে হে বসুন্ধরা,
> প্রণমে মন।
> পেয়েছি তোমায় বিদ্যুতে মধু-
> নির্ঝরণ।
> মৃত্যু হাসিয়া প্রসাদ বিতরে,
> কাঁপে থর থর বুকের ভিতরে,
> যাই গো তরণী—কোন কূলে শেষ
> উত্তরণ?

এক বছরও কাটে নি—কবি তাঁর সীতারামের কাছে পৌঁছেছেন। আমাদের শোক-বিধুর চিত্ত কবির ভাষাতেই বলতে চাইছে:

> তোমার সাথে কহি কথা, তুমি কি ওই তোমার দেহ?
> পথের বুকে রাতের দেখা, আসা একা, যাওয়া একা,
> পথ ফুরালে রয় কি মনে পথের সাথীর প্রীতি-স্নেহ?

কবি করুণানিধান

(১৮৭৭—১৯৫৫)

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি করুণানিধান শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বিগত শনিবার ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

করুণানিধানের রচনার মধ্যে অপূর্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়:

চাঁদের রঙে ডুবিয়ে আঁচল ফাগের গুঁড়া মেখে,
ঝুলনাতে ফুল ঝরিয়ে দিয়ে খেলনি তোরা কে কে?
এমন মায়া-পূর্ণিমাতে,
শুনবি সারঙ্ রঙ্ খেলাতে,—
রাঙা আঁচল ভাসিয়ে দিবি নীল দরিয়া ঢেকে। (দোল-স্বপ্ন)

পঞ্চকোটে অবস্থান কালে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ ঘটে। "ঝরাফুল", "শান্তিজল", "ধানদূর্বা", "রবীন্দ্র-আরতি", "গীতারঞ্জন" (গীতায়ন—১ম সং) ইত্যাদি ইহার শ্রেষ্ঠ রচনা। ইনি ছিলেন বর্তমান যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি। এ যাবৎ রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়ঃপ্রবীণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীক্ষাগুরু একথা তিনি তাঁহার "রবীন্দ্র-আরতি" কবিতায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন:

মনে পড়ে একদিন পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার
শুনেছি তন্ময় হয়ে তব দৈবী বীণার ঝঙ্কার
সুন্দরের মন্ত্র দিলে তরুণের স্মৃতি-রন্ধ্র-পথে,
ধ্বনিল উদাত্ত গ্রামে মরমের পরতে-পরতে;
দিয়াছিলে পরসাদ, পেয়েছিনু চরণের ধূলি,
আজও সেই গর্ব জাগে, ভুলি নাই স্নেহস্পর্শগুলি।
প্রসীদ হে দীক্ষা-গুরু, তব তপো-নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
হোম-বৈশ্বানর সম অপ্রকাশে করিল প্রকাশ;
অচিহ্নিত অনুদ্দেশে চিনিয়াছ আলোর বাসর,
সার্বভৌম প্রতিষ্ঠায় বিদ্যোতিত উষ্ণীষ ভাস্বর।
সীমা হতে যাত্রা তব অসীমের অদৃশ্য উরসে,
ভাবের প্রশান্ত মহা-সমুদ্রের অতল-পরশে।

করুণানিধানের ভাষা ভাবব্যঞ্জক। কবি শব্দচয়নে অসামান্য দক্ষতা দেখাইয়াছেন:

তোমার আলো সব ভুলালো লো অমরী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি চুলের তারার মালা;
পাখীর গানে কাঁকণ তোমার বাজে কানন ছেয়ে,
শিউরে ফোটে শিউলি-কলি তোমার সোহাগ পেয়ে।
(সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি)

সত্যই ইহার মধ্যে কবির নিপুণ শিল্পীমনের পরিচয় রহিয়াছে। কবির উপমাগুলি স্বাভাবিক ও সাবলীল:

অলক-ঢাকা কোমল পলক, নয়ন গরবী—
কাঙাল বায়ু যাচে তোমার চুলের সুরভি।
কোহিনুরের টিপটি ভালে, কাণে রতন দুল,
বরষ-কালের তরুণ বধূ রে দুলালী ফুল! (সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি)

প্রত্যেক ছত্রেই দেখি সুনির্বাচিত শব্দপ্রয়োগে কবিতার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কবির বর্ণনা-শক্তির বিশেষ পরিচয় আমরা তাঁহার 'শতনরী' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছে পাই:

ঊষার সোনার-কলস-জলে,
সন্ধ্যারাণীর চেলাঞ্চলে—
কোহিনুরের কিরণ-ঝারি মোদের জননীর। (গান)

তাঁহার কুণাল-কাঞ্চন এবং জীবন-ভিক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুণাল-কাঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত হইল:

প্রাসাদ-কক্ষে নিদ্রোত্থিত রাজার পরাণ-মাঝে
সেই পুরাতন শিশুর কণ্ঠ আরতির সুরে বাজে।
অতীতের স্মৃতি-পারা ছাপিয়া
স্নেহের ফোয়ারা উঠিছে কাঁপিয়া,
বাতায়ন-পথে নেহারে দুলালে দাঁড়ায়ে ভিখারী-সাজে।

পালিভাষায় লিখিত থেরীগাথায় বুদ্ধদেব কিসা গোতমীকে যে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তাহাই কবির 'জীবনভিক্ষা' কবিতার প্রাণবস্তু হইয়াছে। কিসা গোতমী করুণভাবে বুদ্ধের চরণে আবেদন জানাইয়া পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিতেছে:

যে দিকে তাকাই, বাছা মোর নাই! প্রাণ দিলে যদি প্রাণ ফিরে পাই—,
উড়িয়া উড়িয়া শ্মশানের ছাই ভরিল বিকল হস্ত।

শুদ্ধ, সৌম্য, শান্ত বুদ্ধের উত্তরটি সুন্দর:

কহেন বুদ্ধ, "কুমার তোমার নীরব-সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চিরসুন্দর মরণের মহালগ্ন।

শেষে কিসা গোতমী বুদ্ধদেবের নিকট হইতে অমূল্য শিক্ষা লাভ করিলেন। তিনি বলিলেন:

"জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার
হর' জগতের বিরহ-আঁধার দাও গো অমৃত-দীক্ষা।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অবলম্বনে "গীতারঞ্জন" কাব্যগ্রন্থে জটিল হিন্দুদর্শন ও ধর্মের পরিচয় সুচারু রূপে প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই পুস্তকের 'উত্তরণ' কবিতায় জীবন-মরণ সংগ্রামের একটি জলন্ত চিত্র কাব্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার গীতারঞ্জন কাব্যখানি অতি অপূর্ব ও মনোহর হইয়া উঠিয়াছে:

পিতা যেমন পুত্রে ক্ষমে, সখা যেমন সখায় তার,
প্রিয় ক্ষমে প্রিয়তমায়, তেমনি ক্ষমা কর আমায়,
প্রদর্শিলে ঐশ্বর রূপ করি তোমায় নমস্কার।

শিরোধার্য্য আদেশ তব, হও প্রসন্ন নারায়ণ,
তুমিই বেদ্য, তুমিই বেত্তা, হে সর্বসংশয়চ্ছেত্তা,
এ ব্রহ্মাণ্ড ধরে রাখ সূত্রে যেমন মণিগণ।

অতীত বর্তমান আমি অনাগত ভবিষ্যৎ,
আমায় যখন যায় গো জানা, কিছুই নাহি রয় অজানা,
আমিই বোধী, আমিই বোধ্য, আমিই স্বপ্ন ও জাগ্রৎ।

কবির 'হৃষীকেশে' কবিতায় একটি ভক্তিব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে :

চিরপুরাতন, নিত্য-নূতন, তুমি বর্ধন-ক্ষয়,
চিরসুন্দর, ক্ষণসুন্দর, নমি তোমা লীলাময়।
জীবলোকে তব অংশ প্রকাশ, তুমি আদি নারায়ণ,
দাও ছিড়ে দাও মায়া-মৃত্যুর মহাপাশ-বন্ধন।

করুণানিধানের কবিতায় ভাষার মাধুর্য্য, শব্দচয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণ ও রূপ, শব্দের সাহায্যে চিত্রিত করিবার শক্তি—এই তিনটি গুণ বিশেষ-ভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনে 'ঝরাফুলে'র কবি সকলকে হারাইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কতক-গুলি গাথা প্রদত্ত হইল :

গাংচিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়বে ভাঙ্গা পাড়ের বাঁকে,
ডাকবে চাতক 'ফটিকজল' মেঘের ছায়ে ছায়ে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে মোতির সাত-নরী ;
কদম-কেশর শিউরে উঠে পড়বে ঝরি' ঝরি'।
শিল কুড়ায়ে বাঁধন মোরা লাঙল দেব ভূঁয়ে,
কড়্ কড়্ কড়্ ডাকবে দেয়া, আসব আমন রুয়ে।

কাঠবিড়ালী বেড়ায় ছুটে রান্নাঘরের চালে ;
জিহ্বা মেলে ধুঁকছে 'ভুলো' সামনে ঢেঁকিশালে। (বাসনা)

ভাবের দিক দিয়া তিনি যেমন নিছক সৌন্দর্য্যের কবি, তেমনই ছন্দের অনুসারী ভাষা ও ভাবের অনুযায়ী শব্দপ্রয়োগে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়।

বন-পথে আজ ফুল-দোল-লীলা, কুঙ্কুম ভাঙে রঙ্গণ ;
'জল-তরঙ্গ' ঝঙ্কার তুলি বাজাও শঙ্খে কঙ্কণ।
ছুটাও উধাও মনোরথ অয়ি নন্দন-বন-বল্লি,
প্রেম-সৌরভে গৌরবময়ি কুন্দ চন্দ্রমল্লি,
চাহ, খঞ্জন-চঞ্চল চারু নয়ন-ভঙ্গি সঙ্গে,
লুটাও লীলায় রেশমী-ওড়না ফাল্গুন মধু-রঙ্গে। (বন-পথে)

তাঁহার ভাষায় মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য এই দুইয়ের সমন্বয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় :

তব আরতির পূজা উপচার
সাজায়ে আজি,
অঞ্জলি ভরি' এনেছি জননী
কুসুমরাজি ;
জ্যোৎস্না-রেণুর ঝিকি-মিকি রাচ
আঁচল-ভাঁজে
দাঁড়াও আসিয়া আমার মানস
সরসী মাঝে।

শব্দপ্রয়োগে তাঁহার দক্ষতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, যথা :

ওই অলকে, ওই কপোলে, অপাঙ্গে কি ভঙ্গিমা!
অভিসারের ললিতবেশে বিলাস-লীলার নেই সীমা।
নূর-জাহানের রূপ জিনিয়ে
নিলে যে মোর মন ছিনিয়ে!—
চুণির মত দাও রাঙিয়ে অনুরাগের রক্তিমা। (জুম্‌কারাণী)

করুণানিধানের প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয় তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। তাঁহার গীতিকাব্যে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের নিদর্শনও আছে। কবির সমস্ত কবিতায় একটা দেশী ভাবের প্লাবন বহিয়াছে—কোথাও ভাবের পাষাণ গুরুভার নাই—মানব-জীবনের সুখদুঃখ, প্রীতি-প্রেম, ব্যথা-বেদনা সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :

আলুলিত চুল মাটিতে লুটায়ে দিয়া
কেঁদে-রাঙা আঁখি ফুলায়েছে মোর প্রিয়া ;
আষাঢ়-আকাশে আঁধার ঘনিয়ে আসে,—
জহরী-চাঁপার সুরভি হাওয়ায় ভাসে,
আজি, আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে। (আষাঢ়ে)

কবিতার অনেক স্থলে কবির সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় :

সীমাহীন তুমি মূরতি ধরিয়া ছিলে ভুবনের নয়ন-আলো,
মানুষ না হ'লে কেমন করিয়া মানুষে তোমায় বাসিবে ভালো? (পুরীতে)

উদ্ধৃত অংশে কতখানি দরদী মনের পরিচয় পাই।

করুণানিধানের 'হরিদ্বারে' কবিতায় একটি ভাবব্যঞ্জক সুর আছে :

এই আমিত্ব-অহঙ্কারের কল-কোলাহল ক্লান্ত,
হৃদয় আজিকে নিঃশ্বাস ফেলে কারাগার-নিক্রান্ত!
মূক কীট সম কত যুগ আর হাসিব কাঁদিব হেথা বার বার?
কবে যে ফুরাবে বিরহ-বিকার, টুটিবে গহন-ধ্বান্ত!

কবির 'শেষ বাসরে' ও 'পদ্মাতটে' মেঘ ও রৌদ্রের খেলা দেখিয়া মনে হয় এ যেন এক অপরূপ চিত্রের লীলারাজ্য :

লুটিয়ে বালুকা-কুহেলি-আঁচল
ছুটল পদ্মা ক্ষিপ্ত-উতল—
ফুৎকারে করি চূর্ণ দু' পাড়,
অম্বর ভরি' ওকি তোলপাড়,
ওঠে চরাচর কাঁপায়ে। (পদ্মা-তটে)

বক্ষঃ কারায় রুদ্ধ উতলা,
প্রেম নর্ম্মদা, পূত নির্ম্মলা,
ভাঙি সরমের মর্ম্মর-গিরি তূর্ণ ধায়—
মোতিয়া-বেলার গন্ধ বিলাসী মন্দ বায়। (শেষ বাসরে)

ইহাতে বর্ণনা কত নিখুঁত ও অনবদ্য, অথচ সর্ব্বত্র একটি

সংযত সুর বিদ্যমান রহিয়াছে। করুণানিধান কেবল যে প্রেম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতির কবি তাহা নহে, তাঁহার কবিতায় মানব-হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। কবির 'পাগলিনী' কবিতায় কারুণ্যব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে :

অঙ্গুলি-নির্দেশে যেথায় মাঠের শেষে
ধূম্ররাশি পানে চেয়ে—
সমুখে জাগিল ধরা, পাগলী পাগলে ভরা,—
কাঁদিল অবুঝ মেয়ে।
বুকটি দু'হাতে চাপি' ভীত পাখী সম কাঁপি'
বসিল ধূলার পরে ;
কি বলে সুধাই তায় কথা না জুয়াল হায়—
ভাসিনু নয়ন-লোরে।

কবি কত গীতে, ছন্দে, সুরে প্রকৃতির সৌন্দর্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আনন্দের কবি, স্বপ্নের কবি করুণানিধানকে দেশবাসী কখনও ভুলিতে পারে না—ভুলিবেও না। কবি শুধু বর্তমান জগতের সুখ-সৌন্দর্য বিতরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি নিজ কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। কবির কবিতায় স্বপ্নময় আনন্দ ও রসানুভূতি, সুন্দর, সংযত, স্থায়ী ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাব বিদ্যমান আছে।

জনম-মরণ-বাসনার তীরে উত্তরিব নির্ধন,—
নিরঞ্জনের চরণে যাচিব মুক্তির চিরানন্দ।
এস গো পরম-ভাগ্যবন্ত, ভক্তির রথে এস তুরন্ত
এস হেথা এই তীর্থ-রেণুতে মিশে যাও নিস্পন্দ।

উচ্চ ভাবের কবি, সুরের কবি, সৌন্দর্য্যের কবি, প্রকৃতির কবি করুণানিধান দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ ভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে "জগত্তারিণী পদক" দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। কবি আজ ইহজগতে আর নাই, কিন্তু দেশবাসী তাঁহার নিকট চিরঋণী। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার অমূল্য দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার "শতনরী" শীর্ষক মহামূল্য কাব্যগুচ্ছ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কাব্য-গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

বসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অপূর্ব্ব অদ্ভুত তুমি, তুমি যাদুকর!
হে বসন্ত, তুমি এলে—প্রাণের নির্ঝর
ছুটে চলে দিকে দিকে। গায় বিহঙ্গম ;
রিক্ত যত তরুশাখে নব পত্রোদ্গম
শুষ্ক বনে গর্ব্বোদ্ধত মৃত্যুর চূড়ায়
অজেয় প্রাণের জয়-পতাকা উড়ায়!
হে বসন্ত, বনে বনে আনিলে জীবন!
আমারে দিবে না ফিরে হারানো যৌবন?
আমারই তারুণ্য শুধু জরার কারায়
বন্দী হয়ে রবে আজি? অজস্র ধারায়
প্রাণবন্যা ধেয়ে চলে অরণ্যে প্রান্তরে!
সে বন্যা পাবে না পথ আমারই অন্তরে?
আনন্দে উদ্বেল কণ্ঠে ডাকিছে কোকিল ;
নিষ্প্রাণ রহিবে শুধু আমারই নিখিল?

চির-বিরহের পারে

শ্রীমহাদেব রায়

হেরি হেমন্তের 'তাজ' দিবা দ্বিপ্রহরে—
বিরহের হাহাকার মিলনের করে
সমর্পিত শুভ্রতায় অমরার লোকে
উঠিয়াছে ঊর্দ্ধ-শিখা উদ্গাতার শোকে
মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্যময় এ তাজমহল—
রিক্ততা পূর্ণতা-ভারে রূপে ঝলমল
নর্ম্মলীলা সহচরী যমুনার তীরে,
প্রেমিকের হাহাকার তারে ঘুরে' ফিরে—
আকাশ চুম্বন করে অতৃপ্ত হিয়ায়
জ্বালামুখী, অনন্ত প্রেমের মহিমায়।
প্রেমিক বিচ্ছিন্ন প্রেমে মিলনে আকুল
মর্ম্মর-শিলায় কাঁদে—যমুনার কূল
কহে বার্ত্তা বিরহের—তোমার-আমার
সঙ্গ চির-বিরহের পারে সে কোথায়?

দখিন হাওয়া

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

"হোলী হায়", "হোলী হায়", চেঁচাতে চেঁচাতে এক দল কিশোর একখানা ছোট্ট কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়াল। কিশোর কানাইয়া ধীরে ধীরে পা টিপে গিয়ে হঠাৎ কমলীর চোখে মুখে একরাশ আবীর মাখিয়ে দিলে। কাহারদের চৌদ্দ বছরের মেয়ে কমলী নিবিষ্ট মনে অঙ্গনের এক কোণে বসে দোলপূর্ণিমার উৎসবের জন্ত রং গুলছিল। আচমকা আক্রান্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে, ছাড় ছাড়, ভাল হবে না বলছি", বলে জোর করে হাত ছাড়িয়ে চোখের আবীর মুছে দেখতে পেল পড়শী কানাইয়া মুচকি মুচকি হাসছে। কৃত্রিম ক্রোধে কমলী বললে, লজ্জা করে না কানাইয়া, মেয়েদের সঙ্গে রং খেলতে এসেছিস ?"

কোঁকড়া কোঁকড়া অবিন্যস্ত চুলের মাঝে আবীরমাখা গৌর মুখখানার দিকে চেয়ে কানাইয়া বললে, "জানিস না দোলপূর্ণিমায় রং খেলতে হয় ?" বলে চলে যেতে যেই পা বাড়িয়েছে অমনি একগাল হেসে হঠাৎ রঙের ঘটি তুলে কমলী কানাইয়ার মাথায় ঢেলে দিল। ছেলের দল "হোলী হায়" বলে চেঁচিয়ে উঠল। কানাইয়ার মাথা গাল বেয়ে গাঢ় সবুজ রং গড়িয়ে পড়তে লাগল টপটপ করে, বিচিত্র মুখের শোভা নিয়ে কানাইয়া পালিয়ে গেল ছেলের দলের সঙ্গে।

চল্লিশ বছর পূর্ব্বের কাহিনী, দোলপূর্ণিমায় অজন্তী গ্রামখানি উৎসবের আনন্দে ভরপুর, আবালবৃদ্ধবনিতা হোলীর উৎসবে মত্ত, রঙের ছোপ সবার মনেই লেগেছে, দলে দলে ছেলেবুড়ো ঢোল করতাল বাজিয়ে বাড়ী বাড়ী ফিরেছে গান গেয়ে, হুল্লোড় করে একে অন্তকে রং ঢালছে, আবীর মাখাচ্ছে। চেহারা এক এক জনের হয়ে উঠেছে অদ্ভুত।

সমৃদ্ধ সম্পন্ন অজন্তী গাঁ শ্যামলশ্রীমণ্ডিত। পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে। বিশেষতঃ উৎসব উপলক্ষ্যে যে যার ঘরদোর অঙ্গন গেরিমাটি দিয়ে লেপে মুছে সুন্দর করে তুলেছে।

সাত দিন ধরে গ্রামের কিশোর ও বালকের দল বাড়ী বাড়ী "হোলী হায়" চেঁচিয়ে হাত পেতেছে। সবাই দু'চার আনা পয়সা, গণ্ডাছয়েক ঘুঁটে দিয়েছে। দেয় নি শুধু শেঠ লছমন দাস। ছেলের দল প্রতিশোধ তুলতে রাতে চুপি চুপি তার বাগিচার একদিককার সুদৃশ্য কাঠের গেটখানা খুলে নিয়ে লুকিয়েছে। নিরুপায় শেঠ মনের দুঃখে 'হা হতোস্মি' করলেও কিছু বলতে পারে নি। হোলীর উৎসবে সাতখুন মাপ। লাকড়ির গাড়ী শহরে বিক্রী করতে যাচ্ছে। তা থেকে চুপি চুপি কাঠ টেনে বের করে নিয়েছে ছেলের দল। সে সব সংগৃহীত ঘুঁটে ও চুরি-করা কাঠ এনে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে রেখেছে, পূর্ণিমারাতে শুভ মুহূর্ত্তে কৃষ্ণঠাকুরের পূজো করে তাতে লাগিয়ে দিয়েছে আগুন। আর সমস্বরে ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠেছে "হোলী হায়"। বিরাট কাঠ আর ঘুঁটের স্তূপে জলে উঠেছে আগুন দাউ দাউ করে। ছেলেরা তাতে ছুড়ে ফেলছে নারকেল উৎসর্গ করে। তার পর সেই প্রসাদী নারকেল বাতাসা পোড়া সবার হাতে বেঁটে দিয়েছে। এই মধ্যরাতে হোলীজালানো উৎসব দেখতে বউ-ঝি-বুড়ীরাও যোগ দিয়েছে। আগুনের তাতে কমলীর সুন্দর টকটকে মুখখানার দিকে চেয়ে, "কাল রং খেলবি ত ?" বলে কমলীর দু' হাত ভরে কানাইয়া তুলে দিয়েছে নারকেল আর বাতাসা।

পূর্ণিমারাতে হোলী-জালানোর পরদিনই পাড়ায় পাড়ায় রং খেলা সুরু হয়ে গেল। কমলী আজ সাধ মিটিয়ে রং খেলছে সখীদের সঙ্গে। বউঝিরা তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে লোটাভর্ত্তি রং হাতে নিয়ে দল বেঁধে চলল গান গাইতে গাইতে এ পাড়া থেকে ও পাড়ায়। ঘরে ঢুকে একজন আর একজনকে টেনে মুখে মাথায় আবীর মাখিয়ে গায়ে রং ঢেলে ভিজিয়ে দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-তামাসাতে এ ওর গায়ে পড়ল ভেঙ্গে। রং-খেলা শেষ হলে বিচিত্র ভূষণে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়ে ফিরে চলল ঘরে। পরিষ্কার হয়ে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে হবে, বিকেলে মেয়েদের জলসা আছে। বয়স্কা নারীদেরও আজ অনেক কাজ, সিদ্ধির সরবত বানাতে হবে খুব ভাল করে। কানাইয়ার মা সিদ্ধির সরবত বানাতে ওস্তাদ, তার হাতেই এপাড়ার সিদ্ধি বানাবার ভার পড়ে প্রতি বৎসর। বিকেল হতে না হতেই কানাইয়ার মা সিদ্ধি ঘুঁটতে বসে গেল। রামভরসার মা, ভগবানদীনের মা, শিউ-রতনের বউ হাতে হাতে সব জিনিস যোগাতে লাগল। কানাইয়া দাওয়ার এক পাশে বসে মার সিদ্ধি বানানো দেখছিল, পরিধানের বসনখানা তার বিচিত্র রঙে রাঙানো, মাকে আবদার করে বলে, "মা, আমাকে আজ বেশী করে সিদ্ধি দিস কিন্তু, তোর হাতের সিদ্ধির মত কেউ সিদ্ধি করতে পারে না।"

মা বললে, "কমলীকে আমি শিখিয়ে দেব কি করে সিদ্ধি তৈরি করতে হয়।" রামভরসার মা ছেলের কথাগুলো শুনছিল, সে বলে উঠল, "কানাইয়ার মা, ছেলের বিয়ে কবে দিচ্ছিস ?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শিউরতনের বউ বললে, "তোমার কানাইয়ার সঙ্গে কমলীকে খুব মানাবে দিদি, তা কমলীকেই ত বউ করে আনছ ?"

কানাইয়ার মা গম্ভীর ভাবে বললে, "এ ইচ্ছাই ত মনে আছে বোন। ভগবান যদি মঙ্গল করেন তবে আসছে দোলপূর্ণিমায় কমলীকেই আমার বউ করে ঘরে আনব।" বলে মা আড়চোখে একবার ছেলের দিকে চাইলে। কানাইয়ার মা পাঁচ বছরের পিতৃহারা কানাইয়াকে কত কষ্টে মানুষ করেছে, আজ কানাইয়া উনিশ বছরের বলিষ্ঠ যুবক। শ্যামবর্ণ, দেহের গড়ন মজবুত,

মুখখানাতে বেশ একটু শ্রী আছে। কমলীর বাপ কানাইয়ার বাপের বন্ধু, অনেক সাহায্য করেছে সে কানাইয়ার মাকে সংসার চালাতে। কানাইয়ার মা ছেলের দিকে সগর্ব্বে চেয়ে বললে, যা বলেছিস বউ ঠিকই, আমার কানাইয়ার সঙ্গে কমলীকে মানাবে ভাল, কমলীর বাপমায়েরও সেই ইচ্ছে। তার পর দেনাপাওনাও বেশী নেই, পাঁচ রকমের গয়না দিলেই চলে যাবে।"

কানাইয়া বারান্দায় বসে বসে মা আর প্রতিবেশিনীদের কথা মন দিয়ে শুনছিল। আর নিজের বিয়ের একটা রঙীন চিত্র মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিল। এই কমলীর সঙ্গে শৈশবে সে কত খেলেছে। মারধোর করেছে, আজ সেই কমলী তারই বউ হয়ে আসবে ভাবতেও তার কি রকম মজা লাগছিল। কৈশোরে পা দিয়ে কমলীর একটু সঙ্কোচ এসে গিয়েছিল। এত অবাধে চলাফেরা মেলামেশা করত না, আর সেই ব্যবধানটুকুই কানাইয়ার মনে একটা আকর্ষণ এনে দিয়েছে কমলীর প্রতি।

টাক্ ডুমা ডুম্ করে বাজনা বেজে উঠল পাড়ায়, বউঝিরা সাজ-গোজ করে ছুটল নাচের আসরে। কমলী তার সইদের নিয়ে নাচবে। নাচের মেয়েরা নানা সাজগোজ করে এসেছে। গ্রামের 'মুখিয়া' মানে সর্দ্দারের বাড়ীতে জলসা বসেছে। গ্রাম্য নারীরা বৃত্তাকারে বসেছে, আর একজন বর্ষীয়সী মহিলা ক্ষিপ্রহস্তে ঢোল বাজাচ্ছে তাল রাখতে। সই সেজেছে কৃষ্ণকানাইয়া, মাথায় ময়ূরের পালকের মুকুট। পরনে পীত বসন। পায়ে নূপুর, গলায় ফুলের মালা, হাতে বাঁশী, কমলী সেজেছে রাধা, নকল জরির বর্ডার দেওয়া লালটুকটুকে ঘাঘরা পরেছে, গায়ে ফুলতোলা চোলী। মাথায় বাসন্তী রঙের পাতলা ফিনফিনে ওড়না, খোঁপায় এক থোকা রক্ত-করবী ফুল। কোমরে রূপার চন্দ্রহার, পায়ে পায়েল, লচ্ছে, গলায় ফুলের মালা, হাত দুটি মেহেদী পাতার রঙে রাঙানো, চোখে কাজল, কপালে বিন্দি।

মেয়েদের আসরে পুরুষদের যাওয়া নিষেধ। তবু কানাইয়া আজ থাকতে পারল না। চার পাঁচ জন সমবয়সীকে নিয়ে ছুটে গিয়ে এক কোণে কৃষ্ণচূড়ার আবডালে লুকিয়ে বসে রইল। রাধা-বেশে কমলী বড় সুন্দর নাচ নাচলে। বহুক্ষণ রকমারি নাচগানের পর মেয়েদের আসর ভাঙল। যে যার ঘরে ফিরে চলল।

রাধা-সাজে কমলী খানিকটা আবীর নিয়ে চলল, কানাইয়ার মাকে প্রণাম করতে। কানাইয়ার মা প্রতিবেশিনীদের নিয়ে বসে-ছিল। কমলীকে ডেকে আদর করে আবীর কপালে মাখিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে। শিউরতনের বউ বললে, "ও কমলী, আসছে বছর ত তুই এই বাড়ীতেই রং খেলবি।" কমলী লজ্জায় মাথা নোয়ালে। ততক্ষণে কানাইয়া এসে গেছে, কমলী বাড়ী ফিরে চলল। শিউরতনের বউ বললে, "আয় কানাইয়া, কমলীকে আবীর দিয়ে যা।" কানাইয়া একটু এগিয়ে গিয়ে কমলীর কপালে আবীর দিয়ে চুপি চুপি বলল, "তুই নাচলি, আমাদের দেখালি না কেন?" কমলী [illegible] হেসে বলল, "গাছে চড়ে বানরের মত বসে নাচ দেখছিলি সেটা কি?" বলে হঠাৎ কোঁচড় থেকে আবীর নিয়ে কানাইয়ার চোখে মুখে ছুঁড়ে ছুটে পালাল। কানাইয়াও পিছু ছুটবে ভেবেছিল, কিন্তু পেছন ফিরে শিউরতনের বউয়ের মুচকি হাসি দেখে থমকে দাঁড়াল। রাধা-সাজে কমলীর রূপটা কানাইয়ার মনে গেঁথে রইল। ভাবতে লাগল, আসছে বছর এমনি সাজে কমলি তার বধূ হয়ে আসবে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে না নামতেই গ্রামের পুরুষেরা জায়গায় জায়গায় একত্র হয়ে সিদ্ধির সরবত পান করতে লাগল। ক্ষণে ক্ষণে হৈ হৈ চীৎকার অট্টহাসি। ঢোল মৃদঙ্গের আওয়াজ গ্রামটাকে তোলপাড় করে তুলল। তার পর কখন সবাই একে একে বেহুস অচেতন হয়ে পড়ল কেউ বুঝতেও পারলে না। উৎসবোন্মত্ত গ্রাম সিদ্ধির নেশায় নীরব নিঝুম হয়ে পড়ল।

আবার ধারাবাহিক গ্রাম্য জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেল। বসন্তের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে খরতর গ্রীষ্মের আবির্ভাবে গ্রামবাসী ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। একটানা কঠোর পরিশ্রমের পর কাজে শৈথিল্য আসে। কৃষকেরা আরাম বিশ্রাম করে নেয় এই গ্রীষ্মকালে। গত বৎসর কতক অনাবৃষ্টি ছিল, ফসল খুব ভাল হয় নি। কিষাণরা আশায় আশায় ছিল এবার বর্ষাকালে গাঁয়ে সোনা ফলবে।

বর্ষাকাল এল, কিন্তু আবহাওয়া দেখে কৃষকদের মস্তকে বজ্রাঘাত হ'ল। বিদ্যুৎ চমকায়, গগনে ঘনঘটা করে মেঘ আসে, কিন্তু কোথায় ভেসে চলে যায় ঐ মেঘ, ঝর্ ঝর্ বারিধারায় কঠিন ঊষর জমিকে সিক্ত উর্ব্বর করে তোলে না। কিষাণরা কুয়ার জল সেচে সেচে বীজ বুনল, কিন্তু রোদের তাতে, অনাবৃষ্টিতে সঞ্জীবিত, জোয়ার-গম-ক্ষেতের নবকিশলয়গুলি ঝলসে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে শ্যামল প্রান্তরগুলি ধূসর রুক্ষ প্রান্তরে পরিণত হ'ল। কৃষকেরা চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল। শস্যশ্যামলা অন্তর্বী গাঁ, যার শ্যামলশ্রী দর্শকের নয়ন জুড়াত, সেই গ্রামখানি আজ রিক্তবসনা বিধবা সেজেছে। কোথাও এতটুকু সবুজ আভরণ নেই। গ্রাম আজ মরুভূমি, চারিদিকে হাহাকার উঠল। জল যে ভাবেই হোক্ মিলাতে হবে। জোয়ান ছোকরারা গাঁইতি নিয়ে কোদাল নিয়ে প্রাণপণে মাটি খুঁড়ছে। টপ টপ করে তাদের মাথা থেকে ঘাম ঝরছে। হাতের মাংসপেশীগুলো হয়ে উঠেছে শক্ত, চওড়া বুক পিঠ ভিজে গেছে ঘামে, শ্যামবরণের রূপ হয়ে উঠেছে আরক্ত কঠিন। কিন্তু জলের দেখা পাওয়া যায় না।

পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট বালিকারা হাতে একখানা পিতলের থালায় নারকেল বাতাসা রেখে বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে মাগনী মাগতে লাগল। "হে ভগবান, জল দাও।" গৃহস্থবধূরা এক এক ঘটি জল নিয়ে তাদের উপর ছিটিয়ে, ভিজিয়ে দিয়ে বলে, "তোদের যে-রকম ভিজিয়ে দিলাম, বর্ষা যেন তেমনি করে আমাদের ধরিত্রী-মাতাকে ভিজিয়ে দেয়।" মন্দিরে মন্দিরে গ্রামবাসীরা মিলিত হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল, "হে ভগবান জল দাও, জল দাও।" জায়গায় জায়গায় সারাদিন কীর্ত্তন ভজন চলল, কিন্তু বরুণ দেবতার কৃপা

হ'ল না। কার পাপে আজ বিধাতার এই নিষ্ঠুর দণ্ড নেমে এসেছে কেউ বুঝতে পারে না।

সব কুয়ো শুকিয়ে গেছে, বিশ-পঁচিশ হাত রশি ফেলে টেনে তুলে দেখা যায় বালতি ভরে উঠেছে শুধু কাদাগোলা জল। গ্রামের বউঝিরা মাথায় 'ঘাঘরে'র পর 'ঘাঘর' বসিয়ে চলে দূরে বহু দূরে একটা জঙ্গলের ভিতর, একটা বড় কুয়ো থেকে জল আনতে। কমলী কাজের মেয়ে, সেও মাথায় দুটি ঘাঘর চড়িয়ে চলে বউদের সঙ্গে জল আনতে। চলার তালে চুনটকরা ঘাঘরা দোলে তাঁজে তাঁজে, পায়ের পায়েল বেজে ওঠে ঝম্ ঝমাঝম্।

কানাইয়া জঙ্গলে যায় তার বলদজোড়াকে চরাতে। একদিন তার নজরে পড়ল, কুয়োতে রশি ফেলে কমলী আর টেনে তুলতে পারছে না, তার ছোট হাতদুটি হয়ে উঠেছে আরক্ত, পরিশ্রমে মুখখানা হয়েছে স্বেদসিক্ত রাঙা। কানাইয়া এগিয়ে গেল সাহায্য করতে। কমলী কৃত্রিম রাগের ভান করে বলে, "কে বলেছে তোকে জল টেনে দিতে, আমার হাত নেই নাকি?"

সুকুমার ঘর্মাক্ত মুখখানার দিকে চেয়ে তার কথা অগ্রাহ্য করে মোটা রশি হাতে নিয়ে কানাইয়া বালতির পর বালতি জল তুলে ঘাঘর ভরে দিল কমলীর। একটি বউ বসে ঘাঘর ঘষছিল, তাদের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল।

কমলীর পরিশ্রমকাতর মুখের দিকে চেয়ে কানাইয়ার মনটা ভরে উঠে ব্যথায়। পরদিন থেকে সে তার বলদজোড়াকে জল খাওয়াবার অছিলায় বসে থাকে কুয়োর পারে। কমলী এলে জল ভরে দেয় তার ঘাঘরে। কৈশোর তাদের মধ্যে যে ব্যবধান এনে দিয়েছিল, অনাবৃষ্টি তা মুছে দিলে।

আকাল দেখা দিল ভলাভাবে। ধীরে ধীরে গ্রামের লোকের রসদ ফুরিয়ে এল। এ'ক দিন ছিল অর্দ্ধাহারে, এবার অনাহারে থাকতে হ'ল। সম্পন্ন গৃহস্থরাও আজ অন্নহীন। গ্রামের জোয়ানরা বসে আছে মাঠে—কাজ নেই, জমিতে কোদাল বসে না। হাল চলে না। একটুকরো মাটি উঠে না। বৃষ্টির অভাবে ধরা পাষাণ হয়ে গেছে। কিষাণরা হাটবারে হাটবারে তাদের সযত্নে পোষিত গরু মোষ বইল শহরে নিয়ে জলের দরে বিক্রী করে আনতে লাগল। কোমরের বটুয়াতে টাকাগুলো গুনে ভর্তি করে কাঁধের লাল গামছাখানি দিয়ে মুছে ফেলে দু'ফোঁটা অশ্রু, একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ে ভিতর থেকে।

একদিন কানাইয়াও তার সাধের বইলজোড়াকে বাজারে বিক্রী করে এল। সেদিন কমলীকে কুয়ো থেকে জল তুলে দিতে দিতে বললে, "জানিস কমলী, আমার বইলজোড়া ত বাজারে বিকিয়ে এলাম। এবার নিজের পাটও উঠাতে হবে এ গাঁ থেকে।" চকিতে কমলীর মুখ ম্লান হয়ে উঠে। উদ্গ্রীব হয়ে বলে, "কেন, কোথায় যাবি?"

কানাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "বাপদাদার ভিটে, আমাদের সোনার অজন্তী গাঁ ছেড়ে কি কেউ বাইরে যেতে চায় রে কমলী? কিন্তু উপায় নেই, পেট ভরাব কি দিয়ে? দেখতে পাচ্ছিস না আমার কত সাধের বইলজোড়াকে কেমন জমের মত পরের হাতে তুলে দিয়ে এলাম।"

অনেক লোক হতাশ হয়ে চলে গেল গ্রামের বাইরে কাজের খোঁজে পেট ভরতে। যখন গ্রামের এমনি দুর্দ্দশা, তখন রামচরণ একদিন উৎফুল্ল মুখে খবর আনলে, একটা লোক শহর থেকে এসেছে, তার হাতে নাকি অনেক কাজ আছে, খেতে-পরতে দেবে ভাল, মাইনে দেবে ভাল, তবে গ্রাম ছেড়ে বহু দূর যেতে হবে। গ্রামের মুখিয়ার কাছে নিয়ে এল তাকে। সকল গ্রামবাসী সমবেত হ'ল সেখানে, লোকটা কি আশার বাণী এনেছে শুনতে। লোকটির নাম পিয়ারীলাল। গায়ে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী, ভিতর থেকে হাত-কাটা গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। পরনে ফিনফিনে ধুতি, মুখে সিগারেট, বাঁ হাতের আঙুলে একটা একটা আংটি চক্‌চক্ করছে। শরীরখানা নাদুসনুদুস। লোকটা বেশ ভারিক্কী চালে এসে বসল। অনাহারে দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের মধ্যে এই খোপদুরস্ত ভদ্রলোকটিকে নিতান্ত বেমানান দেখাতে লাগল। পিয়ারীলাল সালঙ্কারে বলতে লাগল, এমন একটা দেশের সন্ধান সে জানে যেখানে সোনা ফলে। সেখানে কোন কিছুর অভাব নেই। ভাল খাওয়া পাবে, পরতে কাপড় পাবে, থাকতে ঘর পাবে, কি মজার জীবন, কাজ কিছু কঠিন নয়। শুধু চায়ের বাগানে ঘুরে ঘুরে পাতা সংগ্রহ করা। তার বক্তব্য শেষ হলে সে পকেট থেকে একরাশ লজেন্স ছেলেমেয়েদের হাতে বেঁটে দিল।

রাতে কানাইয়া কমলীর বাপের কাছে দাওয়াতে বসে বললে, "মামা, কি করা যায় বলত, দিন ত আর চলে না, বল ত আমি চলে যাই ওই সোনার দেশে।" এক পাশে কমলী আর তার মা বসেছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কমলীর বাপ বললে, "কানাইয়া তুই আমাদের ছেড়ে কোন্ দূরদেশে চলে যাবি। তোর উপরই ত আমাদের ভরসা ছিল।" কানাইয়া ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল, "মামা, তবে তুমিও সবাইকে নিয়ে চল না, আমি পিয়ারীলালের কাছে খোঁজ নিয়ে এসেছি, যারা কাজের লায়েক এমনি সবাইকে ও কাজ দিতে রাজী আছে। ছাড়াছাড়ি করে লাভ কি মামা, এমন আকালের সময় সবাই একত্রে থাকা কি ভাল নয়?"

ছিলিমের পর ছিলিম তামাক পোড়াতে পোড়াতে কমলীর বাপ অনেক ভাবলে, তারপর বললে, "চল কানাইয়া তাই করি। মেয়েটার কথাও ত ভাবতে হবে। আগামী দোলে তোদের দু'জনের বিয়ে দেব বলে কত আশাই না করেছিলাম। আজ যে বাপদাদার ভিটের বাতি জ্বলবে না। তালা বন্ধ করে ঘরদোর ফেলে চলে যেতে হবে কে ভেবেছিল? চল কানাইয়া শুকিয়ে মরার চেয়ে ওই দেশেই চলে যাই।"

ওদিকে শিউরতনের ঘরেও বৈঠক বসেছে। পিয়ারীলালের কথা ঠিক কিনা। ভাল মাইনে, খেতে-পরতে দেবে কিনা কে জানে। বুড়ীরা তাদের জোয়ান ছেলেদের ছেড়ে দেবে কিনা সুদূরে, তাই বলাবলি করতে লাগল। ইতিমধ্যেই পিয়ারীলাল আশ-

পাশের গাঁয়ে ঘুরে আরও বহু লোক সংগ্রহ করল। কমলীর মা বাপ আর কানাইয়া তার মাকে নিয়ে তাদের দলে ভিড়ল। এই প্রলোভনে পড়ে দেখাদেখি আরও কয়েক ঘর গৃহস্থও গ্রাম ছেড়ে যেতে রাজী হ'ল। এক দিন সবাইকে নিয়ে পিয়ারীলাল নিকটবর্তী এক শহরে যাত্রা করল। সেখানে তাদের একটা বিরাট পড়ো বাড়ীর গৃহে জমা করল। তারপর সিগারেট টানতে টানতে একটা কাগজে স্ত্রী-পুরুষ সবাইয়ের নাম লিখে বুড়ো আঙলে কালি দিয়ে টিপসই নিতে লাগল। তাদের সবাইকে অনেক মিষ্টি কিনে খাওয়ালে পিয়ারীলাল। তার মিষ্টি কথায় আর আদর-আপ্যায়নে গ্রামবাসী মুগ্ধ হ'ল, তাদের মনে হ'ল তাদের দুঃখ দূর করতে দেবতাই বুঝি-বা পিয়ারীলালের বেশে দেখা দিয়েছেন। পিয়ারীলাল ঘুরে ফিরে কমলীকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগল, কিন্তু কানাইয়ার চোখে তা বিশেষ ভাল লাগল না। পিয়ারীলাল সকলের জন্ত রেলের টিকিট কিনল। যাত্রীদের অনেকেই দূর থেকে শুধু রেলের বিপুল গতি দেখেছে, তীব্র বংশীধ্বনি শুনেছে, তাতে চড়ে বসবার সৌভাগ্য হয় নি, ভয়ে ভয়ে সবাই চড়ে বসল রেলগাড়ীতে। বিপুল বিস্ময় নিয়ে কমলী আর কানাইয়া রেলের কামরার প্রত্যেকটি জিনিষ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর রেল যখন হুইসেল দিয়ে গতিশীল হ'ল, তখন কমলী ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলে।

হুস হুস করে রেলগাড়ী চলতে লাগল। কমলী জানালার গরাদে মাথা রেখে দেখতে লাগল। গাড়ীর দোলনে ঘুম এসে যায়। কমলী নিজেকে জোর করে সজাগ রাখে দু'ধারের দৃশ্য দেখতে। পুরোপুরি দু'দিন রেল-ভ্রমণের পর মধ্যপ্রদেশ পেরিয়ে দু'একটা জংসনে গাড়ী বদল করে যখন বাংলাদেশে পৌঁছল, তখন চারদিকের শ্যামলশ্রী দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে গেল। তারপর ষ্টীমারঘাটে এসে দেখে রূপালী নদী বিছানো রয়েছে শ্যামল ক্ষেতের পা ঘেঁষে। প্রভাত-রবির সোনালী আলোয় ঝিকমিক্ করছে নদীর জল। ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে ওরা পিয়ারীলালের সাহায্যে উঠে বসল ষ্টীমারে। ক্ষিপ্র গতিতে দু'ধারে জল কেটে চলেছে জলযান। এধারে ওধারে ভাসছে ছোট ছোট পালতোলা নৌকা, নদীর জল তোলপাড় করে থেকে থেকে মাছগুলি ডিগবাজী খেয়ে যাচ্ছে জলে, তাদের রূপালি আঁশগুলো ঝকমক করে ওঠে সূর্যকিরণে। বহুদিনের তৃষিত চাতকের মত অজন্তী গাঁয়ের লোকেরা পূর্ণকায়া স্বচ্ছসলিলা নদীর বিচিত্র রূপ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল। বিশাল নদী পার হয়ে আবার তারা ট্রেনে উঠে বসল। এবার তারা বাংলার সীমা ছাড়িয়ে আসামের বুকে এসে যাচ্ছে। রেল কখনও সর্পিল গতিতে চলেছে এঁকেবেঁকে, কখনও পাহাড়ী নদীর লৌহ-সেতুর উপর গুর গুর আওয়াজ করে। কানাইয়া কমলী বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে বসে দু'ধারের দৃশ্য দেখে। কোথাও টিলা থেকে ঝরণা ঝম্ ঝম্ করে ঝরে আসছে জঙ্গলের ভিতর পথ কেটে, মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড় ছায়াকীর্ণ করে রেখেছে স্থানটিকে। এবার তারা এসে গেছে সোনার দেশে। ঐ যে পাহাড়ের টিলায় টিলায় চা-বাগিচায় শ্যামলশ্রী দেখা যাচ্ছে। সিগারেট টানতে টানতে পিয়ারীলাল মাতব্বরী চালে বলতে লাগল, "বলেছিলাম কিনা তোমাদের সোনার দেশে নিয়ে আসব, চোখ জুড়াবে।" গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যে যার পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে নেমে পড়ল রেল থেকে। পিয়ারীলাল সবাইকে নিয়ে চলল চা-বাগিচায়।

পাহাড়ের নীচে সারি সারি কুটীর, মজুরেরা তাদের সংসার পেতে বসেছে। দুখানা পাশাপাশি কুটীরে কানাইয়া আর কমলীর মাও সংসার সাজিয়ে বসল পোঁটলাপুঁটলি গুছিয়ে।

পরদিন পিয়ারীলাল তাদের সবাইকে নিয়ে চুক্তিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়ে নিলে, অন্ততঃ পাঁচ বছর এরা চাকুরি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। তারপর তাদের চায়ের পাতা তোলার কাজে লাগিয়ে দিলে। কমলী ওরা দেখলে কত দেশের নর-নারী বালক-বালিকাতে চা-বাগিচা পূর্ণ। পিয়ারীলাল কমলীর কাজ একটু কমিয়ে দিলে; কানাইয়ার মনটা যেন কেমন বিষিয়ে গেল এই নতুন আবেষ্টনে। কমলীর প্রতি পিয়ারীলালের অতিরিক্ত আদর-যত্ন কানাইয়াকে বিমর্ষ করে তুললে। সারাদিন কানাইয়া কমলীকে এক রকম দেখতেই পায় না। পিয়ারীলাল তাকে অন্ত বিভাগে কাজ দিয়েছে।

ধীরে ধীরে অজন্তী গাঁয়ের লোকগুলোর নূতনের আকর্ষণ কমে এল, প্রলোভন দূর হ'ল। এরা দেখতে পেল চা-বাগিচা খেতে দেয় ডাল ভাত, পরতে দেয় মোটা কাপড়, আর ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করে যেতে হয়। এক চুল এদিক-ওদিক হলে তিরস্কার-গঞ্জনা শুনতে হয়, বেত পড়ে পিঠে সপাং সপাং। ভয়ে কমলীর বুকের ভিতরটা শুকিয়ে ওঠে।

এই নিষ্ঠুর নতুন আবেষ্টনে ওরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না। কমলী কানাইয়া প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠেছে। তারা হাঁপিয়ে উঠল চা-বাগিচার এই ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনে। কমলী বিষণ্ণ মুখে বলে,"আমাদের অজন্তী গাঁখানা কি সুন্দর ছিল রে কানাইয়া। সেই বনে বনে ঘুরে বুনোকুল কুড়ানো, তুঁতে করমচা পেড়ে খাওয়া, কি মজাই না লাগত! আজও জানি লছমী, কুলী, ক্ষেমী, বনে বনে ঘুরে ফল-ফুল কুড়োয়" বলতে বলতে কমলীর দু'চোখ ভরে উঠল জলে।

"কাঁদিস নে কমলী, পাঁচ বছর কাটিয়ে দেব কোন রকমে, তারপর আমরা চলে যাব আমাদের সোনার গাঁয়ে। আবার আমরা সুখের সংসার পেতে বসব ভগবানের দয়ায়", কানাইয়া বলে।

কিন্তু এই নতুন আবেষ্টনের ধাক্কাটা কাটাতে পারলে না কানাইয়ার মা। অত্যধিক পরিশ্রমে আর নির্যাতনে শয্যাশায়িনী হ'ল। কানাইয়া সারাদিন ছটফট করে কাজ করত। মন পড়ে থাকত তার দুঃখিনী মায়ের কাছে। সন্ধ্যে হলেই ঘরে ছুটে এসে মার রোগক্লিষ্ট মস্তক কোলে তুলে নিত। ছোট শিশুর মত মাকে যত্ন করে দুধ চা পথ্য দিত।

কমলীর মাও ছুটি পেলেই এসে বসত কানাইয়ার মার কাছে। এক সন্ধ্যায় কানাইয়ার মা কমলীর মার হাত ধরে বললে, "বোন, বড় সাধ ছিল কমলী-কানাইয়ার বিয়ে দিয়ে সুখের সংসার পাতব, তা আর হ'ল না। বুঝতে পারছি আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।" কমলীর মা বললে, "এমনি অলক্ষুণে কথা বলিস নে বোন। অসুখ হয়েছে, ভাল হয়ে যাবি। কমলী-কানাইয়ার বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসার করবি। তোর কি এখন চলে যাবার বয়েস? আসছে দোলপূর্ণিমায় কমলী-কানাইয়ার বিয়ে দিয়ে দে।"

কানাইয়ার মা উত্তেজিত হয়ে বলে, "এখানে কি বিয়ে হয় দিদি? যমপুরীতে কি বিয়ের বাঁশী বাজে? এরা মানুষ নয়, রাক্ষস দিদি। কি সুখেই আমরা অজন্তী গাঁয়ে ছিলাম",—বলতে বলতে কানাইয়ার মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, ভুলে গেছিস দিদি, সেই ভোরে উঠে অঙ্গনে গোবরছিটা দিয়ে তুলসীতলা নিকানো। ঘরদোর ঝাটপাট দিয়ে চলে যেতাম আমরা কুয়োতে জল আনতে। কি সুন্দর মজলিস বসত আমাদের কথাবার্তা আর গল্পের। রামভরসার মা, শিউরতনের বউ, সোহাগী, ভজন এরা কত গল্প বলেছে, কত হাসিয়েছে। পূর্ণিমায় সাঙ্গোজ করে দল বেঁধে যেতাম আমরা বটগাছের নীচে বটপূজা দিতে। বর্ষায় জল পেয়ে আমাদের ক্ষেতগুলি হয়ে উঠত কত সুন্দর সবুজ। ক্ষেতের দেবতার পূজা দিতাম কত মিষ্টি তৈরি করে। তারপর দিদি, মনে পড়ে সেই শ্রাবণ মাসে ঝুলনপূর্ণিমায় কাজরী গান গেয়ে দোলনায় দোলা? সে সুখের দিন চলে গেছে, আছে শুধু যন্ত্রের মত কাজ করে যাও। হাতের কাজ একটু ঢিলে হলে দেবে অকথ্য গালি। কুলীর সর্দারের বেত যখন-তখন লিক্‌লিক্ করে উঠে পিঠে পড়বে। এখানে মন খুলে হাসিগল্প করবার অবসর নেই। মানুষ এখানে পাষাণ হয়ে গেছে, আমি আর এই জীবন বইতে পারি না।" বলতে বলতে উত্তেজিত কানাইয়ার মা মলিন উপাধানে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কমলীর মায়ের অশ্রুজল টপটপ করে ঝরে পড়ে কানাইয়ার মার শীর্ণ হাতে। কানাইয়ার মা ফুঁপিয়ে বলে, "কোথায় আমার কানাইয়াকে বিয়ে দেব এই পাষাণপুরীতে। কোথায় আমাদের গৃহদেবতা, কোথায় আমাদের গ্রামের দেব-মন্দির। কোথায় তাঁকে অর্ঘ্য দিব? পাঁচ সোহাগিন কোথায় যাবে সোহাগ মাগতে? আমার সব সাধ-আহ্লাদ ভগবান কেড়ে নিয়েছেন।"

তিন দিন পর কানাইয়ার মা কমলী কানাইয়ার হাত ধরে চোখ বুজল। কানাইয়া 'মা, মা' করে চেঁচিয়ে উঠল আর্ত স্বরে। কিন্তু মা আর ফিরে এল না। কানাইয়ার মার অকালমৃত্যুতে অজন্তী গ্রাম থেকে আগত সবাই মুষড়ে পড়ল। তাদের মন হাহাকার করে উঠল—মুক্তি চাই এ রাক্ষসপুরী থেকে, মুক্তি চাই। কিন্তু মুক্তি নেই, এক পাও নড়তে পারবে না চা-বাগিচার গণ্ডী থেকে। পাঁচ বছরের কড়ারে তারা আবদ্ধ। মার মৃত্যুতে কানাইয়া ভেঙে পড়ল, যেন মনে হয় দেহমনের শক্তি অনেক কমে গেছে। সে বলিষ্ঠ যুবক, পিয়ারীলালের আদেশে কুলীসর্দার তাকে দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে নেয়। একদিন তার ক্লান্তি এল, হাতের কাজ ফেলে সে খানিকক্ষণ বসে রইল। মন ডুবে গেল তার অতীতের মধুর স্মৃতিতে। হঠাৎ পেছন থেকে কুলীসর্দারের বেতখানা আচমকা কানাইয়ার পিঠে পড়ল সপাং করে। "কিরে বড় কাজে ফাকি দিতে শিখেছিস।" বলে সর্দারের সে কি অট্টহাসি। পলকের মধ্যে কানাইয়া লাফ দিয়ে উঠল। শ্যাম মুখখানা হয়ে উঠল আরক্ত, নাসারন্ধ্র ফুলে উঠল, সে রুদ্ধ আক্রোশে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্দারের উপরে। কিন্তু সে নিরস্ত্র, পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র, তার কি চাবুকধারী ধূর্ত সর্দারের সঙ্গে এঁটে উঠবার শক্তি আছে। চাবুকের পর চাবুক পড়তে লাগল কানাইয়ার পিঠে। একটা আর্তনাদ করে কানাইয়া লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ওদিককার ক্ষেতে কমলী চায়ের পাতা তুলছিল, গোলমাল আর আর্তনাদ শুনে ছুটে এসে ভূলুণ্ঠিত কানাইয়াকে দেখে তীব্র চীৎকার করে সে চোখ বুজলে। কুলীসর্দার হিংস্রমুখে বলে উঠল, "ওঠ কাজ কর্, আজ তোর মাইনে কাটা গেল, বেশী শয়তানী করিস ত আরও চাবুক পিঠে পড়বে।" পিয়ারীলাল এসে কমলীর হাত ধরে টেনে বললে, "তুই এখানে এসেছিস কেন, চল ওখানে।"

বেত্রাঘাতে জর্জরিত দেহখানা নিয়ে উঠে বসে কানাইয়া নির্জীবের মত কাজ করতে লাগল। দুপুরে কিছু খেল না। সন্ধ্যায় শরীর এলিয়ে দিল মলিন শয্যায়। কমলী সারাদিন কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। ছুটি হতেই সে ছুটে গেছে কানাইয়ার কাছে। কানাইয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, "চল্ কানাইয়া আমরা এ রাক্ষস-পুরী ছেড়ে পালাই।" কানাইয়া হতাশ ভাবে বলে, "কোথায় যাব কমলী, হাত-পা যে বাঁধা কড়ারে, পালালেও ওরা ধরে নিয়ে আসবে, এক যমপুরী ছাড়া নিস্তার নেই।"

কমলী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, মনে মনে বলে, "হে ভগবান, এখান থেকে আমাদের মুক্তি দাও।" রাত্রে কানাইয়ার প্রবল জ্বর হ'ল, সে বেহুস হয়ে পড়ল। চা-বাগিচার মজুরদের চিকিৎসাই বা কি? খানিকটা কুইনিন মিকশ্চার গিলিয়ে রাখে। অবসর সময়ে কমলী আর তার বাপ-মা প্রাণপণে যত্ন করে। কিন্তু রোগের উপশম হয় না, কানাইয়াকে হাসপাতালে নেওয়া হ'ল।

কিছুদিন পর হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পেল, ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ। সে ঘরে ফিরে এল, পিলেভরা বড় পেট। কাঠির মত হাত-পা। সে কাজের বার হয়ে গেছে, চা-বাগিচায় তার ঠাঁই নেই। কমলী এ কয় দিন কানাইয়াকে না দেখে হাঁপিয়ে পড়েছিল, খাওয়া-দাওয়া একরকম সে ছেড়েই দিয়েছে। তার সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে এই নিষ্ঠুর পরিবেশে। সে কানাইয়ার এই মূর্তি দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দু'চোখে নামল জলের ধারা। কানাইয়াকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বাগিচার কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, আর তাকে চা-বাগিচার এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হ'ল। নিজের টুকিটাকি জিনিস পুটুলি বেঁধে কানাইয়া পথে ভাসল।

যাবার আগে কমলীর হাত দুখানা ধরে বলল, "কাঁদিস না কমলী, দু'বছর কেটে গেছে, আর তিন বছর আমি তোর অপেক্ষায় থাকব। দেখিস আমাকে ভুলে যাস নে যেন।"

কানাইয়া চলে গেল। কমলী ছিন্ন লতার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কানাইয়া চা-বাগিচা ছেড়ে চলে গিয়েছে, কিন্তু কমলীকে ছেড়ে টিকতে পারে নি। সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে সে কমলীকে দেখতে আসে। একদিন পিয়ারীলাল দেখতে পেয়ে বলল, "তোর বেত খেয়ে সাধ মেটে নি। আরও বেত খেতে চাস বুঝি। এখখুনি চলে যা। আর যদি কখনও তোকে এখানে দেখা যায় তবে পুলিসে দেব।"

কানাইয়া ক্লান্ত শরীর দুর্ব্বল পা দুটো টেনে টেনে চলল। একটা গাছতলায় আজ চার-পাঁচদিন হ'ল ঠাঁই নিয়েছে। সে আজ গৃহহীন, আশ্রয়চ্যুত, কোথায় যাবে জানে না। পরদিন সে গাছ-তলা ছেড়ে পোঁটলাপুটলি নিয়ে বটগাছ-ছাওয়া রাজপথ ধরে চলতে চলতে রেল-ষ্টেশনে চলে এল। এতদূর হেঁটে সে হাঁপিয়ে উঠল, প্লাটফর্ম্মে রেলের অপেক্ষায় বসে রইল। সে অজন্তী গাঁয়েই চলে যাবে, সেখানেই ধৈর্য্য ধরে তিন বছর কমলীর জন্যে অপেক্ষা করবে। রেল এলেই সে একটা কামরার এককোণে উঠে বসল। তার পর বেঞ্চিতে সটান লম্বা হয়ে গাড়ীর দোলনে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হ'ল।

রেল তাকে কমলীর সান্নিধ্য থেকে কোথায় কোন্ সুদূরে বিপুল গতিতে নিয়ে চলেছে জানতেও পারল না। হঠাৎ হাতে একটা ঝাকুনি খেয়ে চোখ খুলে দেখতে পেল টিকিট চেকার কর্কশ স্বরে টিকিট চাইছে। সে উঠে অসহায় ভাবে বলে—টিকিট, টিকিট কোথায় পাব ? আমি গরীব মানুষ।' টিকেট চেকার তার হাত ধরে টেনে তাকে গাড়ী থেকে এক ষ্টেশনে নামিয়ে দিলে। রেল নিমেষে চোখের আড়াল হয়ে গেল, সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আসাম তার সম্পূর্ণ অজানা, সে চা-বাগিচা ছেড়ে কোথায় কোন্ দিকে এসে গেছে কিছুই বুঝতে পারল না। নিরুপায় হয়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে রাজপথ দিয়ে চলতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল এক দল অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু বুড়ো বুড়ী হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে চলেছে। সে তাদের অনুসরণ করে একটা বড় বাড়ীতে এসে দাঁড়াল, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে অনাহারক্লিষ্ট দেহ নিয়ে সে আচ্ছন্নের মত বারান্দায় শুয়ে পড়ল। গৃহকর্ত্তা বসে ছিলেন ইজিচেয়ারে, তার নজর পড়ল এই দুঃস্থ লোকটির উপর। তিনি কানাইয়াকে খাইয়ে সতেজ করে তুললেন। তার পর সংক্ষেপে তার কাহিনী শুনে তাকে আশ্রয় দিলেন।

গৃহকর্ত্তা ধনী বৃদ্ধ, মাসেকের মধ্যে কানাইয়া তাঁর আশ্রয়ে থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। তাঁর সেবাতে কৃতজ্ঞতায় সে মন ঢেলে দিল। সারাটা দিন কানাইয়া কাজ করত, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই চুপ করে এককোণে বসত, চোখে ভেসে উঠত তার জীবনচিত্র, কমলীর সুন্দর মূর্ত্তি তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াত। দু'ফোটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ত। সে কাজে একনিষ্ঠ ছিল, বৃদ্ধ কর্ত্তা তাকে খুবই স্নেহ করতেন। কিন্তু তার মুখে হাসি কেউ দেখে নি। অন্যান্য ভৃত্যেরা কত আমোদ-আহ্লাদ হাসি-তামাশা করত অবকাশ সময়ে, কিন্তু কানাইয়া সে আসরে যোগ না দিয়ে গম্ভীর ভাবে বসে থাকে এককোণে। কারও কাছে সে মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করে না। সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলে ছিল সে। ভাগ্যদোষে আজ সে বিড়ম্বিত। ঝড়ের ঝাপটাতে সে জীবন-নদীতে দুলছে। আঘাত খেয়ে এধার থেকে ওধারে যাচ্ছে। শেষ পরিণতি কি, কে জানে।

দিন দিন কানাইয়া বেশী গম্ভীর হয়ে উঠছে। আগে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় দুঃখিনী মা আর কমলীর কথা ভেবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেছে। এখন অশ্রু শুকিয়ে গেছে। শুধু একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। চা-বাগিচা শুধু তাকে আশ্রয়চ্যুত, কর্ম্মচ্যুত করে নি। কিশোরী কমলীকে নিয়ে যে নীড় বাঁধবার রঙীন স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল, সে রঙীন স্বপ্ন, উজ্জ্বল সুখের ভবিষ্যৎ নিষ্ঠুর ভাবে চা-বাগিচা চূর্ণ করে দিয়ে তাকে ভাগ্যহীন করে তুলেছে। তাই আজ সে গৃহহীন হয়ে ব্যর্থ জীবন বহন করছে।

আবার বসন্ত ফিরে এসেছে। গাছে গাছে ঝরাপাতা খসে গিয়ে নতুন পাতা গজাচ্ছে। দখিন হাওয়া সবার মনে দিয়ে যাচ্ছে দোলা। এসেছে দোলপূর্ণিমা। সবার মনে রং লেগেছে।

দোলপূর্ণিমায় রং-খেলা সুরু হ'ল। সখীরা বলল, "আয় কানাইয়া রং খেলবি," কানাইয়া পাথরের মত নিশ্চল নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল। মণিপুরী যুবকের দল সাদা ধবধবে ধুতি শার্ট পরে মাথায় রং-বেরঙের পাগড়ী বেঁধে জয়ঢাক নিয়ে নাচতে নাচতে এল রং খেলতে। মণিপুরী বুড়ী মনোরমা একদল বালিকা নিয়ে এল। তারা নাচবে গাইবে রং খেলবে, মুঠি ভরে বকশিশ নিয়ে যাবে। বালিকাদের গায়ে রঙীন কোর্ত্তা, বুকে পিঠ দিয়ে রঙীন কাপড় বেঁধে পা অবধি ঝুলিয়ে দিয়েছে—মাথায় কানে গুঁজেছে ফুল, গলায় গলায় মালা। মনোরমা গান ধরেছে, "এই দেশেতে এল নিতাই, আর ভাবনা নাই," আর গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বালিকারা দু'হাতে তালি দিয়ে সমান তালে নাচছে। এককোণে বসে কানাইয়া দেখছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটা তীব্র শিহরণ খেলে গেল, অজন্তী গাঁয়ের হোলীদৃশ্য চোখে ভেসে উঠল। কানাইয়া দেখতে পেল রাধার সাজে কমলী নাচতে নাচতে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। গলায় দুলছে ফুলের হার। কানাইয়া এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, "কমলী দাঁড়া, আবীর নিয়ে আসছি।" এক পলকের জন্য চারদিক আঁধার হয়ে এল, কানাইয়া বেহুঁস হয়ে পড়ল। জল, পাখা, হৈ চৈ। কিছুক্ষণ পরে কানাইয়ার হুঁস হ'ল।...

বসন্ত-উৎসব, দোলপূর্ণিমা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কানাইয়ার মনে এদিনের ঘটনাটা দিয়ে গেছে প্রবল ধাক্কা। কানাইয়া ভুলে গেছে কমলীকে। ভুলে গেছে অজন্তী গাঁ। শুধু দখিন হাওয়া বইলেই তার মন উদাস হয়ে যায়। সে ছুটে যেতে চায় দক্ষিণ-দিকে। দেখতে পায় এক সুন্দরী মেয়ে দখিন হাওয়ার সঙ্গে এসে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে ধরতে যায়, ধরতে পারে না, দখিন হাওয়ায় সুন্দরী মেয়ে মিলিয়ে যায়।

যাদের চোখে নেইকো আলো

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পথ চলতে চলতে হঠাৎ পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে আপনি বেসামাল হয়ে পড়লেন। মনে মনে চটলেও হয়ত বুঝলেন লোকটা অন্ধ। পরে তার ছুঁটো ড্যাব-ড্যাবে চোখে ক্ষমা চাইবার ছায়া দেখে নিজেকে অনেকটা সামলে নিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গায়ের ঝাল একটু না মিটিয়েও পারলেন না—"মশায়, অন্ধ নাকি।" অভিশাপের সুর বেজে উঠে—আপনার ধমকের ব্যঞ্জনায় লোকটি কাঁচুমাচু হয়ে চলে যায়।

"অন্ধ" বলে ভর্ৎসনা করে আমরা চরম শাস্তি দেওয়ার তৃপ্তি পাই। অর্থাৎ, যত রকমের শারীরিক অপটুতা মানুষকে অসহায় করে রাখে তার ভেতরে অন্ধত্বের মত আর কিছুই নয়। অন্ধব্যক্তিরা আমাদের দয়া আকর্ষণ করে থাকে সবচেয়ে বেশী। অন্ধ কোন বিষয়ে প্রার্থী হলে 'না' বলার কিংবা উপদেশ দেওয়ার কথা যেন আমরা ভুলেই যাই। তাদের দাবি যে সকলের আগে!

অনেকেই জানেন, মহাকবি হোমার ছিলেন জন্মান্ধ, মিশরের ডাঃ তাহা হোসেন—যিনি সেখানে সক্ষম হয়েছিলেন সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে, তিনিও জন্মান্ধ। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র নাম বাংলা দেশে কে না শুনেছেন। হয়ত আপত্তি উঠবে যে, এঁরা একান্তই নিয়মের ব্যাতিক্রম। এটা মানলে নিয়ম ত নিশ্চয়ই মানতে হবে। অর্থাৎ, এঁরা যদি সাধারণের অনেক উচ্চ স্তরে উঠে থাকেন, তবে অন্ধদের মধ্যে যারা সাধারণ তারা আমাদের—অর্থাৎ যারা দেখতে পাই, তাদের সাধারণের সঙ্গে তুলনীয়।

তাসখেলা

কিন্তু যারা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই দেখতে পেল না এই সুন্দর বিশ্বের অপরূপ রূপ, তাদের অনুভূতি আসবে কোন পথে তা যেন আমাদের কল্পনার বাইরে। কেননা, আমরা এমন কোন কিছুই ভাবতে পারি না যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোন দৃশ্য বস্তুর তুলনা করতে পারা যায় না। যার দেহ নেই, যার রূপ নেই, তেমন অপার্থিব বস্তুকেও আমরা আকারের মধ্যে ফেলে চিনতে চেষ্টা করি।

তবে কি অন্ধকে চক্ষুষ্মানের মত করে তোলার কোনই উপায় নেই! আছে নিশ্চয়ই, খুঁজে বার করার অপেক্ষা মাত্র—তাই ত চোখে যাদের আলো প্রবেশ করল না তাদের স্পর্শানুভূতির মাধ্যমে তারা বুঝে নিলে জীবনের মাধুর্য্য। দৃশ্য জগতের অবলুপ্তি পুষিয়ে নিলে এঁরা শ্রবণ আর স্পর্শেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। হোমারের কথা আগেই বলেছি, মিল্টন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেছিলেন অন্ধ হবার পরে। তাঁরা জগৎকে অমূল্য সম্পদ দান করে গিয়েছেন; কিন্তু তাই বলে অন্ধের জীবন কারুর জন্যই বাঞ্ছনীয় নয়। যা বলতে যাচ্ছিলাম—চোখে দেখতে না পেলেও অন্ধেরা হাত আর কানের সাহায্যে দশ জন চক্ষুষ্মানের মত শিক্ষালাভ করতে পারেন বা কায়িক পরিশ্রমের কাজেও সমর্থ হয়ে উঠতে পারেন।

যারা চোখের দৃষ্টি নিয়ে জন্মায়, কিন্তু হারিয়ে ফেলে চোখের জ্যোতি, তাদের মানসিক যন্ত্রণা হয়ত জন্মান্ধের চাইতে বেশী, হয়ত সহ্যের অতীত। আলোর স্বাদ পেয়ে আঁধারের রূপ ভয়ঙ্কর। সব মেনে নিলেও প্রশ্ন জাগে এরা কি শুধু আমাদের দয়ার পাত্র হয়ে জীবনাতিপাত করবে। আত্মীয়-পরিজনের দীর্ঘশ্বাস থাকবে তাদের জীবন ঘিরে, তারা থাকবে বাইরের লোকের করুণামিশ্রিত কৌতূহলের পাত্র হয়ে।

শেখালে যারা শিখতে পারে, কাজে লাগালে যারা কাজ করতে পারে, তাদের দূরে ফেলে রাখবার কোন অধিকার আমাদের আছে কি! কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলতে পারবেন যে, এদের শিক্ষা বিশেষ ধরণের, সুতরাং ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু চক্ষুষ্মানদের শিক্ষার

টাইপ করা

দোকান চালানো

বোনার কাজ
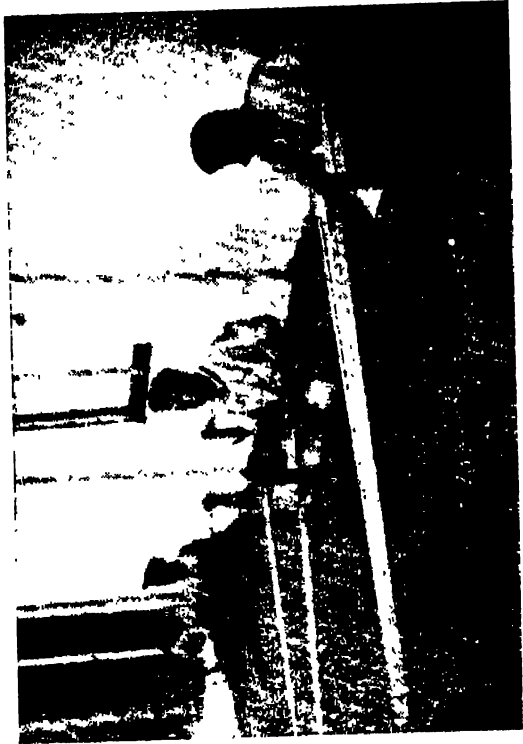
জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় পিতা-মাতা কিংবা আত্মীয়-পরিজন করে থাকেন তা ত নেহাত কম নয়।

স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে যে শিক্ষা আর আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার দাবি করা হয় তা ত কেবল দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্নের জন্যই নির্দিষ্ট নয়। শুধু ব্যয়বাহুল্যের অজুহাতে দৃষ্টিহীনকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে কি করে বলা যায়! যত শীঘ্র এদের তুলে আনা যায় কৃপার ক্ষেত্র থেকে ততই আমাদের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল।

স্বাধীনতালাভের পূর্ব্ব পর্যন্ত দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা আর কর্ম্ম-সংস্থানের যাবতীয় প্রশংসনীয় ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে এসেছিল বেসরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে, কিন্তু ইংরেজ চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই 'জন'-সরকারের দৃষ্টি বেশী করে আকৃষ্ট হয়েছে এ সমস্যার প্রতি। কমিশন নিযুক্ত হ'ল, যথাসময়ে এদের বক্তব্য এরা দাখিল করলেন। কাজও শুরু হয়ে গেল ১৯৫০ সনের মধ্যে। সরকারের প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্বাধীনে দেরাদুনে প্রতিষ্ঠিত হয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পনানুযায়ী এটি হ'ল জাতীয় কেন্দ্রেরই একটি শাখা মাত্র। ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়বে সারা ভারতবর্ষে এমনি আরও শাখা-প্রশাখা।

শিক্ষার্থী হয়ে যাঁরা ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ পান তাঁদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করেন সরকার, তা ছাড়া এঁরা পকেট খরচ হিসাবে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু বৃত্তি পেয়ে থাকেন। যাতে তাড়াতাড়ি কাজ শিখতে এঁরা উৎসাহ পান তার জন্য শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই নির্দিষ্ট হারে ভাতা দেওয়া হয়। অবশ্য সাপ্তাহিক বৃত্তি এ কারণে বন্ধ হয় না।

শারীরিক, মানসিক, সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা যথাসম্ভব আছে। ইচ্ছা করলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব এঁদের সঙ্গে দেখা করে যেতে পারেন। নিয়মিত খেলা-ধূলার ব্যবস্থাও এখানে আছে।

কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা প্রাথমিক শিক্ষাও পেয়ে থাকেন। চরিত্রগঠন, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রাথমিক নিয়মাবলী সবই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা সমাপনান্তে নিয়মিত কর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে যাতে তাঁরা স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারেন তার জন্যও কেন্দ্র যথেষ্ট সচেতন থাকে। উদ্দেশ্য হ'ল—তাদের অতল অন্ধকার থেকে স্বাধীন ভারতের আত্মসম্মান-বোধসম্পন্ন কর্ম্মক্ষম সভ্য নাগরিকের পর্যায়ে তুলে নিয়ে আসা।

বহুকাল পরে ভারতবর্ষের প্রতিটি নর-নারীকে এক সুখী পরিবারের অন্তর্গত করবার সুযোগ আমরা ফিরে পেয়েছি। আজ সেই আনন্দ-উচ্ছল পরিবেশ গড়ে তুলতে যেমন প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন তেমন চাই কোটি কোটি টাকা।
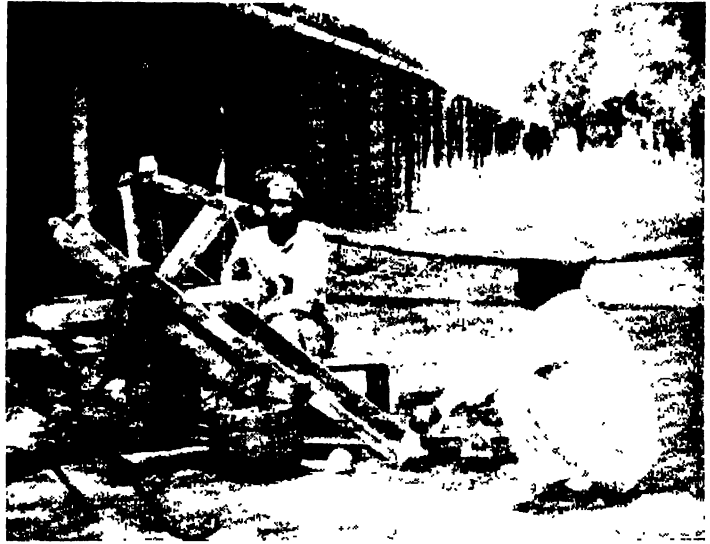
চরকায় কাটা সুতা গোটানো

কিন্তু আমাদের সেই পরিমাণ অর্থ কি মজুত আছে? তাই এগোতে হবে ধাপে ধাপে। সরকারী আওতায় যতদিন এমনই একটি সুপরিকল্পিত গণ্ডীর মধ্যে প্রতিটি অন্ধ নরনারীকে না আনতে পারা যায় ততদিন বেসরকারী প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আগের মতই পুরোদমে।

এমনিতর প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সম্মুখে ধরে তুলতে হবে অন্ধত্বের ভয়াবহ পরিণাম, কেন মানুষ অন্ধ হয় তার জ্ঞাত কিংবা সম্ভাব্য কারণ। এর নিবারক এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যার ফলে এ অভিশাপ পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে মুছে না গেলেও অভিশপ্তদের সংখ্যা অতি দ্রুত কমে আসবে।

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

আমরা ইতিপূর্ব্বে রাগের গঠনমূলক বিবর্ত্তন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি।* সাহিত্যসৃষ্টির প্রারম্ভে যেমন বর্ণ হইতে স্বর-ব্যঞ্জন সংযোগে শব্দাংশ, শব্দাংশগুলির সংযোগে শব্দ অথবা পদ, কতকগুলি পদসমাবেশে বাক্য এইরূপ ক্রমবিকাশ দেখা যায়; সঙ্গীত সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ নিয়ম অসঙ্গত নহে। যে-কোন সঙ্গীত বুঝিতে হইলে প্রারম্ভেই তাহার স্বরগুলির অবস্থান, পরস্পরের ব্যবধান ইত্যাদি বুঝিবার চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিভিন্ন প্রদেশজাত দেশী সঙ্গীতেরই রাগরূপ—ইহাই বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের মত এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে এই দেশী সঙ্গীতেরই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থকার মার্গসঙ্গীত অথবা 'মন্দ্রগীতি'র 'স্বরশ্রুতি মূর্চ্ছনা গ্রাম জাতি' ইত্যাদির নিয়মগুলি ভক্তিসহকারে তাঁহাদের গ্রন্থগত করিয়া প্রাচীন সঙ্গীতের রূপ আরও দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমরা স্বরগুলি ও শ্রুতি-সাহায্যে তাহাদের অবস্থান বুঝাইবার চেষ্টা বিষয়ে এবং পরবর্ত্তীকালে শ্রুতির সাহায্যে স্বরস্থান প্রদর্শনের চেষ্টার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ শাস্ত্রকারগণ কি উপায়ে স্বরগুলির অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতম গুণিগণের গ্রন্থাদি পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহাদের মত উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। যে গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নারদীয় 'শিক্ষা' একখানি প্রাচীনতম গ্রন্থ। কারণ নাট্যশাস্ত্রেও 'শিক্ষা'র নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত দেখা যায়:

'আচার্য্যাঃ সমমিচ্ছন্তি পদচ্ছেদং তু পণ্ডিতাঃ।
স্ত্রিয়ো মধুরমিচ্ছন্তি বিক্রুষ্টমিতরে জনাঃ॥ না. শিঃ

স্বরগুলির অবস্থান বিষয়ে বিশেষ কোন নির্দ্দেশ 'শিক্ষা' হইতে পাওয়া যায় না। যদিও 'শিক্ষা'কার লিখিয়াছেন:

য সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমস্বরঃ।
যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয়স্ত্বৃষভঃ স্মৃতঃ॥

বেণুর ছিদ্রগুলির অবস্থান না বুঝাইয়া দিলে মাত্র ইহাদ্বারা স্বরস্থান বুঝা সম্ভব নহে। 'দারবী গাত্রবীণা চ...' ইত্যাদি বলিয়াও বীণার কোন বর্ণনা না করিয়া 'সামগান' গাহিবার সময়ে কি ভাবে হাতের উপরে বীণা রাখিতে হইবে, তাহারই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত 'ষড়জং বদতি ময়ূরো' বাক্য হইতে মাত্র ইহাই বুঝা যাইবে যে, বেদগান তার ষড়জ হইতে আরম্ভ হইত; 'কণ্ঠাদুত্তিষ্ঠতে ষড়জঃ', 'নাসা কণ্ঠ মুরস্তালু-জিহ্বাদন্তাংশ্চ সংস্থিতঃ' 'ষড়্ভিঃ সঞ্জায়তে যস্মাত্তস্মাৎ ষড়জ ইতি স্মৃতঃ' ইত্যাদি বাক্য স্বরস্থান বুঝাইবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তবে শেষোক্ত বাক্যটি অত্যন্ত সারগর্ভ, কারণ যে-কোন একটি মাত্র স্বর পাইলেই তাহাকে ষড়জরূপে গ্রহণ করিয়া ষড়জ পঞ্চম ভাবে সপ্তকস্থ অন্যান্য স্বরগুলি বাহির করা যাইতে পারে। এ বিষয় পরে আলোচ্য। শ্রুতি সম্বন্ধে নারদ লিখিয়াছেন:

"যথাপ্সু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে।
আকাশে বা বিহঙ্গানাং তদ্বৎ স্বরগতা শ্রুতিঃ॥

অর্থাৎ,

জলে মৎস্য ও আকাশে পক্ষী সঞ্চরণের পথ যেরূপ লক্ষিত হয় না স্বরান্তর্গত শ্রুতিগুলিও তদ্রূপ। অতঃপর স্বরগুলির ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি জাতি, রক্ত, পীত ইত্যাদি বর্ণ, দেবতা ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে—যাহা শ্রুতি ও স্বরস্থান বুঝিবার কার্য্যে প্রয়োগ করা সম্ভব নহে।

পরবর্ত্তী গ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্র। নাট্যশাস্ত্রের শ্রুতি ও স্বরস্থান সম্বন্ধে আমরা আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে আলোচনা করিয়াছি। 'নাট্যশাস্ত্র'...অর্থাৎ নাট্যের শাস্ত্র (Science of theatrics) গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বস্তু নাট্য এবং পণ্ডিতগণের মতে ইহা সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতও হইয়াছে। ইহাতে সঙ্গীত বিষয়ে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের মত বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। তৎকালে ষড়জ ও মধ্যম দুইটি গ্রাম-সঙ্গীতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। শ্রুতি স্বর জাতি ইত্যাদির বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভরত শরীরবীণা ও দারুবীণার উল্লেখ করিয়াছেন—কারণ 'কণ্ঠ' (শরীরবীণা) সাহায্যে শ্রুতি এবং মূর্চ্ছনাগুলির প্রয়োগ কষ্টসাধ্য। বীণাবাদকের পক্ষেই ভিন্ন ভিন্ন স্বর হইতে স্বরসপ্তক পরিবর্ত্তন করিয়া নানাবিধ জাতি (বর্ত্তমান ঠাট) উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছিল। রত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল স্বীকার করিয়াছেন যে, "তদুক্তং সঙ্গীত সময়সারে কে তু দ্বাবিংশতির্নাদা ন কণ্ঠেন পরিস্ফুটাঃ। শক্যা দর্শয়িতুং তস্মাদ্বীণায়াং তন্নিদর্শনম্॥" 'সঙ্গীত সময়সারে' উক্ত হইয়াছে যে, বাইশটি সূক্ষ্ম নাদ কণ্ঠে পরিস্ফুট হয় না—বীণার সাহায্যেই সেগুলি প্রদর্শন সম্ভব। শ্রুতির সাহায্যে ভরত স্বরগুলির অবস্থান বর্ণনা করিয়াছেন:

"ষড়্জশ্চতুঃ শ্রুতির্জ্ঞেয় ঋষভস্ত্রিশ্রুতিস্তথা।
দ্বিশ্রুতিশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুঃশ্রুতি॥
চতুঃশ্রুতি পঞ্চম স্যাত্ত্রৈবতস্ত্রিশ্রুতি তথা।
নিষাদো দ্বিশ্রুতিশ্চৈব ষড়জগ্রামে ভবন্তিহি॥

এই নিয়মে স্বরান্তরগুলি এইরূপ হইবে ৪ ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ২। ভরতের পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ এই মতই তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকের মতেই স্বরগুলি তাঁহাদের অন্তিম শ্রুতিতে তদ্রূপ প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে ৪র্থ শ্রুতিতে সা,

* প্রবাসী, মাঘ ১৩৬১

৭ম রে, ৯ম গা, ১৩শ মা, ১৭শ পা, ২০শ ধা, ২২শ নি স্থাপিত হইল। ইহা দ্বারা দেখা যায়—গা ও নি অর্দ্ধস্বরান্তর হওয়াতে আধুনিক কাফি ঠাটের মতই হয়। এই স্বরগুলি ব্যতীত 'স্বর-সাধারণ' নামে দুইটি স্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়।*

"স্বরসাধারণং কাকল্যন্তরৌ স্বরৌ, তত্র দ্বিশ্রুতি প্রকর্ষণান্নিষাদবান কাকলী সংজ্ঞো নিষাদঃ, ন ষড়জঃ। এবং গান্ধারোঽপ্যন্তর স্বর-সংজ্ঞো গান্ধারো ন মধ্যমঃ।" নিষাদ ষড়জের দুইটি শ্রুতি গ্রহণ করিলে কাকলী, নিষাদ ও গান্ধার মধ্যমের দুইটি শ্রুতি গ্রহণ করিলে অন্তর গান্ধার নামে অভিহিত হইবে। এখন দেখি শ্রুতি এবং তাহার মাপ সম্বন্ধে ভরত কি লিখিয়াছেন। এক শ্রুতির মাপ—"মধ্যম গ্রামে তু শ্রুত্যপকৃষ্টঃ পঞ্চমঃ কার্য্যঃ। পঞ্চম শ্রুত্যুৎকর্ষাপকর্ষাদ্বা যদন্তরং মার্দ্দবাদায়তত্বাদ্বা তৎপ্রমাণ শ্রুতিঃ।" অর্থাৎ, মধ্যম গ্রামের পঞ্চম ১ শ্রুতি নিম্নে অবস্থিত থাকিবে। ষড়জ গ্রামের পঞ্চমকে মধ্যম গ্রামে ও মধ্যম গ্রামের পঞ্চমকে ষড়জ গ্রামে পরিণত করিলে একটি শ্রুতির ('মান') 'মাপ' পাওয়া যাইবে। আমরা আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি যে, ভরতের মতানুসারে সপ্তকস্থ বাইশটি শ্রুতিই সমান হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ তারের দৈর্ঘ্যের হিসাবে দেখিলে 'সা' হইতে তার সা পর্য্যন্ত (বাইশটি শ্রুতি) স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে 'মা', এই 'মা' মধ্য সা হইতে নয়টি শ্রুতি ব্যবধানে ও তার 'সা' হইতে তের শ্রুতি ব্যবধানে অবস্থিত। কাজেই শ্রুতিগুলি সমান হওয়া সম্ভব নহে। শ্রুতি যদি তারের দৈর্ঘ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন সূক্ষ্ম নাদ হয় তাহা হইলে এই শ্রুতি কি প্রকারে বাহির করা সম্ভব? ষড়জের ঠিক পরবর্ত্তী শ্রুতি কত দূরে হইবে?

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—পর পর শ্রুতিগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার উপরে স্বর স্থাপনা করা সম্ভব, অথবা সঙ্গীতে ব্যবহৃত নাদ বা স্বরগুলির মধ্যবর্ত্তী অন্তর শ্রুতির সাহায্যে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা সম্ভব: প্রথম পদ্ধতিটি অযৌক্তিক, কারণ এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট মাপ হয় না যাহা দ্বারা শ্রুতিগুলি পর পর প্রদর্শন সম্ভব। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, শ্রুতি গ্রাম সম্বন্ধে ভরত কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। যেমন প্রশ্ন করা হইল—"কোথায় যাবে? উত্তর হইল যেদিকে দু'চোখ যায়।" আবার প্রশ্ন হইল—"কোন্ দিকে দু'চোখ যায়?" উত্তর হইল, "যেদিকে যাব"। শ্রুতি কাহাকে বলে? উত্তর হইল, "ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের পঞ্চম দুইটির অন্তর"; আবার প্রশ্ন হইল—"ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম কি উপায়ে চেনা যাইবে?" উত্তর হইল—"দুই গ্রামের পঞ্চমের অন্তর দ্বারা।" গুরুপরম্পরাগত শিক্ষায় স্বরগুলির অবস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং শ্রুতির সাহায্যে তাহাদের অবস্থান বুঝাইবার প্রয়াস নিষ্ফল দেখিয়া পরবর্ত্তীকালে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তবুও প্রত্যেক গ্রন্থে 'নাট্যশাস্ত্র' তথা শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' হইতে স্বরাধ্যায় উদ্ধৃত করা শাস্ত্রকারগণের স্বাভাবিক নিয়মে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে বহুদিন পর্য্যন্ত শার্ঙ্গদেবের "সঙ্গীতরত্নাকর" গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। তাঁহার প্রাচীন-রাগ নিয়মাদির সঙ্কলন (অন্ত গ্রন্থাভাবে) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শার্ঙ্গদেবও ভরতেরই অনুকরণে স্বরাধ্যায়ে শ্রুতির সাহায্যে স্বরস্থান প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি (শার্ঙ্গদেব) বাইশটি তার-সমন্বিত একটি শ্রুতিবীণা কল্পনা করিয়া তাহাতে "কার্য্যামন্দ্রত-মাধ্বানা দ্বিতীয়োচ্চ ধ্বনির্যনাক্" নিয়মে শ্রুতিগুলি বাহির করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ এইরূপ: একটি বীণায় বাইশটি তার সংযোজনা করিয়া শ্রবণযোগ্য একটি নাদে প্রথম তারটি বাঁধা হইল। তৎপরে দ্বিতীয় তারে, কিঞ্চিৎ উচ্চে, যাহার মধ্যবর্ত্তী অন্ত কোন সূক্ষ্ম নাদ শ্রুত হইবে না, দ্বিতীয় শ্রুতি, তাহা হইতে তৃতীয় তারে ক্রমোচ্চ সূক্ষ্ম নাদ তৃতীয় শ্রুতি—এই নিয়মে বাইশটি তারে বাইশটি শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া স্বরস্থাপনা করা হইল। কিন্তু তারে এই শ্রুতিনির্দ্দেশ শ্রবণশক্তির সাহায্যে কৃত হইবে। শার্ঙ্গদেব হয়তো মনে করিয়া থাকিবেন, এই নিয়মে গায়ক বাদক শ্রুতির সাহায্যে স্বরগুলির নিয়মিত ব্যবধান বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে, একটি বিশেষ শ্রুতিতে পাঁচটি শ্রুতিবীণার প্রথম তারটি বাঁধিয়া পাঁচ জন গুণীকে স্বতন্ত্র স্থানে বসাইয়া দিলে পাঁচটি যন্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের শ্রুতি উৎপন্ন হইবে। কোন কোন পণ্ডিত ইহাও বলেন যে, প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞগণ এই প্রকার শ্রুতির ঝঞ্ঝাট মানিতেন না। মূর্চ্ছনা ও জাতির প্রচলনের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরসপ্তক পরিবর্ত্তনের সময়ে কিছু কিছু শ্রুতির ব্যবহার আপনা হইতেই হইত বটে, তাঁহারা কিন্তু এক সপ্তকে মূণা বার অথবা চৌদ্দটি স্বরের উপরেই সঙ্গীত স্থাপিত করিয়াছিলেন। অবশ্য বাদ্যাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব লিখিলেন:

"ততঃ বীণা দ্বিধা সা চ শ্রুতিস্বর বিবেচনাৎ।
তত্র শ্রীশার্ঙ্গদেবেন শ্রুতিবীণোদিতা পুরা॥
বক্ষ্যতে স্বরবীণাঽত্র তস্তামপি বিচক্ষণাঃ।
অঙ্কিত্বা স্বরদেশানাং ভাগানুত্তিষ্ঠন্তে শ্রুতিঃ॥

দুই প্রকার বীণা—শ্রুতি ও স্বরবীণা। পূর্ব্বে শ্রুতিবীণার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এই স্থানে স্বরবীণার প্রসঙ্গে তিনি দেখাইতেছেন যে, বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজে দেখিয়া স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থান অঙ্কন দ্বারা ভাগ করিয়া শ্রুতিবিভাগ করিয়া লইবেন। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কারণ স্বরস্থানগুলি তো পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট ছিল; শ্রুতির সাহায্যে তাহাদের অবস্থান প্রদর্শনের চেষ্টা বিফল মনে করা যাইতে পারে। শার্ঙ্গদেবও ৪ ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ২ শ্রুতির উপরে তাঁহার শুদ্ধ স্বরগুলি স্থাপনা করিয়াছেন—যাহা ভরতের মতেই আধুনিক 'কাফি' ঠাটের মতই হয়। শার্ঙ্গদেব বিকৃত স্বরের বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন:

চ্যুতোঽচ্যুতো দ্বিধা ষড়্জো দ্বিশ্রুতির্বিকৃতো ভবেৎ।
সাধারণে কাকলীত্বে নিষাদস্য চ দৃশ্যতে॥

---

* আগেকার প্রবন্ধে "নাট্যশাস্ত্রে কোন বিকৃত স্বরের উল্লেখ নাই" বাক্যের স্থলে বিকৃত স্বর 'দশটির' হইবে)।

সাধারণে শ্রুতিঃ ষড় জীমূক্তঃ সংশ্রিতো যদা।
চতুঃ শ্রুতিত্বমাপ্নোতি তদৈকো বিকৃতো ভবেৎ ॥
সাধারণে ত্রিশ্রুতিঃ স্যাদন্তরত্বে চতুঃ শ্রুতিঃ।
গান্ধার ইতি তদ্ভেদৌ দ্বৌ নিঃশঙ্কেন কীর্তিতৌ ॥
মধ্যমঃ ষড় জ বদ্দ্বেধাহন্তর সাধারণাশ্রয়াৎ।
পঞ্চমো মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ কৈশিকে পুনঃ ॥
মধ্যমস্য শ্রুতিঃ প্রাপ্য চতুঃ শ্রুতিরিতি দ্বিধা।
ধৈবতো মধ্যমগ্রামে বিকৃতঃ স্যাচ্চতুঃ শ্রুতিঃ ॥
কৈশিকে কাকলীত্বে চ নিষাদস্ত্রি চতুঃশ্রুতিঃ ॥
প্রাপ্নোতি বিকৃতৌ ভেদো দ্বাবিতি দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥
তৈঃ শুদ্ধৈঃ সপ্তভিঃ সার্ধং ভবন্ত্যেকোনবিংশতিঃ ॥ সঃ রঃ

যায়—তিনিও 'চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড় জ মধ্যম পঞ্চমাঃ।' নিয়মে শুদ্ধ স্বরগুলি ৪ ৩ ২ ৪ ৪ ৩ ২ শ্রুতির উপরে স্থাপিত করিয়াছেন—যাহা আধুনিক 'কাফি' ঠাটেরই অনুরূপ হয়। তাঁহার বিকৃত স্বরের বর্ণনায় দেখা যায়:

"স্ব স্ব শেষ শ্রুতিং ত্যক্ত্বা যদা ঋষভ ধৈবতৌ।
গীয়েতে শুণিভিঃ সর্বৈস্তদা তৌ বিকৃতৌ মতৌ ॥
গৃহ্নাতি মধ্যমস্যাপি গান্ধারঃ প্রথমাং শ্রুতিম্।
যদা তদা জনৈরেষ তীব্র ইত্যভিধীয়তে ॥
দ্বিতীয়ামপি চেদেবং তদা তীব্রতরঃ স্মৃতঃ।
তৃতীয়ামপি চেদেব তদা তীব্রতমঃ স্মৃতঃ।
চতুর্থীমপি চেদেবমতি তীব্রতমঃ স্মৃতঃ ॥"

আ			শ্রুতি		ভরত		শার্ঙ্গদেব		তরঙ্গিনী	হৃদয়		অহোবল
ধু		১	তীব্রা				কৈশিক নি		তীব্র নি	লোচনের		
নি		২	কুমুদ্বতী		কাকলী নি		কাকলী নি		তীব্রতর নি	স্বর		
ক		৩	মন্দা				চ্যুত সা		তীব্রতম নি			
সা	১	৪	ছন্দোবতী	সা		সা	অচ্যুত সা	সা			সা	
	২	৫	দয়াবতী									পূর্ব রে
	৩	৬	রঞ্জনী						কোমল রে			কোমল রে
	৪	৭	রক্তিকা	রে		রে	বিকৃত রে	রে			রে	পূর্ব গ
রে	৫	৮	রৌদ্রী									কোমল গ
	৬	৯	ক্রোধা	গা		গা		গা			গা	
	৭	১০	বজ্রিকা				সাধারণ গা		তীব্র গ			
গা	৮	১১	প্রসারিণী		অন্তর গ		অন্তর গ		তীব্রতর গ			
	৯	১২	প্রীতি				চ্যুত ম		তীব্রতম গ			
মা	১০	১৩	মার্জনী	মা		ম	অচ্যুত ম	মা	অতি তীব্রতম গ		ম	
	১১	১৪	ক্ষিতি									
	১২	১৫	রক্তা						তীব্রতর ম			
	১৩	১৬	সন্দীপনী				কৈশিক প					
পা	১৪	১৭	আলাপনী	পা		প		প			পা	
	১৫	১৮	মদন্তী									পূর্ব ধ
	১৬	১৯	রোহিণী						কোমল ধ			কোমল ধ
	১৭	২০	রম্যা	ধা		ধ	বিকৃত ধ	ধ			ধা	পূর্ব নি
ধা	১৮	২১	উগ্রা									কোমল নি
	১৯	২২	ক্ষোভিণী	নি		নি		নি			নি	
	২০											
নি	২১											
	২২								লোচন			

উপরে ভরত শার্ঙ্গদেবাদি পণ্ডিতগণের শ্রুতিদৃষ্টিতে স্বরস্থানের প্রস্তুত নক্সা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল বলিয়া পংক্তিগুলির পৃথক ব্যাখ্যা করা হইল না। প্রাচীন কাল হইতেই শাস্ত্রকারগণ শ্রুতির সংখ্যা বাইশটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শার্ঙ্গদেবের পরবর্তী গ্রন্থাদিতে সঙ্গীত রত্নাকরের স্বরাধ্যায় কিঞ্চিৎ ভাষা পরিবর্তন করিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে দেখা যায়। এই জন্য গ্রন্থপ্রণয়নকালের সঙ্গীতের ব্যবহারিক রূপ অস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থে বর্ণিত লোচন কবির শ্রুতিস্বর দৃষ্টে বুঝা যায় অর্থাৎ, ঋষভ এবং ধৈবত যখন তাহাদের স্ব স্ব শেষ শ্রুতি ত্যাগ করিবে তখন তাহাদিগকে 'বিকৃত' রে ও ধা বলা হইবে। গান্ধার মধ্যমের একটি শ্রুতি গ্রহণ করিয়া উচ্চারিত হইলে তীব্র, দুইটি শ্রুতি গ্রহণ করিলে তীব্রতর এবং তিনটি শ্রুতি গ্রহণ করিলে তীব্রতম, চতুর্থ শ্রুতি গ্রহণ করিলে অতিতীব্রতম গান্ধার (শুদ্ধ ম) হইবে। লোচন কবির গ্রন্থেই আমরা প্রথম দেখিতে পাইলাম, মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী'তে উদ্ধৃত বিশ্বাবসুর মতানুসারে।

"শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ।
সা চৈকাপি দ্বিধা জ্ঞেয়া 'স্বরান্তর বিভাগতঃ ॥"

লোচন স্বরগুলির শুদ্ধ রূপ বিকৃত করিবার কারণেই শ্রুতিগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন, 'স্বরান্তর বিভাগতঃ' অর্থাৎ দুইটি স্বরের মধ্যবর্তী স্থান ভাগ করিয়া। এইরূপ ষড়জের দুইটি শ্রুতি গ্রহণ করিলে 'নিষাদ' কাকলী অথবা তীব্রতর নিষাদ বলা হয়। এই গ্রন্থে ষড়জ গ্রামেই স্বরগুলি বর্ণিত এবং ষড়জ ও পঞ্চম কখনও স্থানচ্যুত হয় না দেখা যায়।

ইহার পর হৃদয়নারায়ণ দেবের 'হৃদয় কৌতুক' ও 'হৃদয় প্রকাশ' গ্রন্থ দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৌতুক গ্রন্থে রাগতরঙ্গিণীর স্বরাধ্যায় উদ্ধৃত দেখা যায়, কেবলমাত্র ত্রিশ্রুতি 'ম' ও ত্রিশ্রুতি 'নি' এই দুটি নূতন স্বরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় তাঁহার স্বরচিত রাগিণী 'হৃদয় রমায়'। কিন্তু 'প্রকাশ' গ্রন্থে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বরস্থাপন প্রণালী রহিয়াছে যাহার জন্য সঙ্গীতজগৎ চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি এই গ্রন্থে তারের দৈর্ঘ্যের উপরে কোথায় কোন্ স্বর বাজিবে তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া তৎপরে ঠাট রচনা করিয়া দেন। শুদ্ধ স্বরগুলি এক একটি শ্রুতি যোগে তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম ইত্যাদি এবং শুদ্ধরূপের এক শ্রুতি নিম্নে কোমল আখ্যা পাইবে।

> "শ্রুতিমাদ্যাদি ভুক্তাস্তাঃ স্বরা যে চোর্দ্ধবর্তিনঃ।
> তীব্রতীব্রতর-তীব্রতমা ভবন্তি ক্রমাৎ॥
> কোপান্ত্যশ্রুতিবর্তী তু কোমলঃ পরিকীর্তিতঃ॥" হৃঃ প্রঃ

ইহা ব্যতীত দুইটি বিকৃত স্বরের প্রাচীন নামের উল্লেখও আছে:

> "ম পঞ্চমোর্দ্দি শ্রুতীস্তৌ মৃদু স্বরাবিমৌ।
> মৃদু সো মৃদু পশ্চেতি তদাখ্যে সপয়োর্দ্ধবে॥

'ম' পঞ্চমের তিনটি এবং নি ষড়জের তিনটি শ্রুতি গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে মৃদু 'পা' ও মৃদু 'সা' বলা হয়। আমাদের মনে হয় বস্তগুলি পূর্ব্বলিখিত গ্রহণ করিয়া বসিলে এই বিপদ সৃষ্টি হয়—কোনটি রাখিবেন এবং কোনটি বাদ দিবেন। শার্ঙ্গদেবের পরবর্তী কালে (ত্রয়োদশ শতক), যদিও ঐ নাদস্থান দুইটি সঙ্গীতে নিশ্চয়ই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তথাপি মৃদু 'সা' ও মৃদু 'পা' নাম দুইটি কোন রাগের বর্ণনায় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অতঃপর তারের দৈর্ঘ্যের উপরে স্বর স্থাপনা করিয়া দেখানো হইয়াছে। শুদ্ধ স্বরগুলির স্থান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে, এ স্থানে মাত্র বিকৃত স্বরগুলি দেওয়া হইল। শুদ্ধ স্বরের বিবরণ এইরূপ। কোন বীণার যে তারটিতে 'সা' বাজিবে তাহার দৈর্ঘ্য ৩৬ ইঞ্চি ধরিয়া লইলে ঠিক মধ্যস্থলে তার সা (১৮ ইঞ্চি) ও তাহার মধ্যস্থলে অতি তার সা (৯ ইঞ্চি) বাজিবে। বীণার 'কান' যেদিকে থাকে সেদিক পূর্ব্ব মেরু ও অপরদিক উত্তর মেরু। খোলা তারের ধ্বনি ও ঠিক মধ্যস্থলের ধ্বনির মধ্যবর্তী স্থান ৩৬-১৮-১৮ ইঞ্চি মাত্র। এই স্থানে দ্বিভাগাত্মক ও ত্রিভাগাত্মক পদ্ধতিতে স্বরগুলির অবস্থান দেখানো হইয়াছে। এই ১৮ ইঞ্চির ঠিক মধ্যস্থলে মা ২৭ইঞ্চি ও ১৮ ইঞ্চিকে তিন ভাগ করিয়া পূর্ব্বের দুই ভাগের অগ্রে পা ২৪ ইঞ্চি। এইরূপে ৩৬ ইঞ্চি সা, ৩২ ইঞ্চি রে, ৩০ গা, ২৭ মা, ২৪ পা ২১$\frac{1}{3}$ ইঞ্চি ধা, ২০ ইঞ্চি নি, ১৮ ইঞ্চিতে তার সা বাজিবে। বিকৃত স্বর:

> "ভাগ ত্রয়োদিতে মধ্যে মেরো ঋষভসংজ্ঞিনঃ।
> ভাগদ্বয়োত্তরং মেরোঃ কুর্য্যাৎ কোমল রিস্বরম্॥

মেরু ও ঋষভের স্থানকে তিন ভাগ করিয়া মেরুর দুই ভাগ উত্তরে কোমল ঋষভ হইবে যেমন মেরু=৩৬ রে=৩২ ; ৩৬-৩২ =৪ ইঞ্চি মেরু ও ঋষভের মধ্যবর্তী স্থান ৪ ইঞ্চি—ইহাকে তিন ভাগ করিলে $\frac{4}{3}$ হইল—ইহার দুই ভাগ—$\frac{4}{3}\times২=\frac{8}{3}$ ইঞ্চি মেরু হইতে বিয়োগ করিলে ৩৬—$\frac{8}{3}$=($\frac{108-8}{3}$) $\frac{100}{3}$=৩৩$\frac{1}{3}$ ইঞ্চি কোমল রে।

> "মেরু ধৈবতয়ো র্মধ্যে তীব্র গান্ধারমাচরেৎ"

মেরু ও ধৈবতের মধ্যে তীব্র গান্ধার হইবে। মেরু ৩৬—ধা $\frac{64}{3}$=$\frac{108-64}{3}$=$\frac{44}{3}\times\frac{1}{2}$=$\frac{22}{3}$।৩৬—$\frac{22}{3}$=$\frac{86}{3}$ =২৮$\frac{2}{3}$ ইঞ্চি তীব্র গ

> "ভাগত্রয় বিভিক্তেঽস্মিন্ তীব্রগান্ধার মধ্যমঃ।
> পূর্ব্বভাগোদ্বয়ং মধ্যে মং তীব্রতর মাচরেৎ॥

তীব্র গ $\frac{86}{3}$"—তার সা ১৮"=$\frac{32}{3}$"; $\frac{32}{3}$÷৩=$\frac{32}{9}$, পূর্ব্ব ভাগের উত্তরে $\frac{86}{3}$—$\frac{32}{9}$=২৪$\frac{1}{9}$" মা।

> "ভাগত্রয়ান্বিতে মধ্যে পঞ্চমোত্তর ষড়জয়োঃ।
> কোমলো ধৈবতঃ স্থাপ্যঃ পূর্ব্বভাগে মনীষিভিঃ॥
> তথৈব ধসয়োর্মধ্যে ভাগত্রয়সমন্বিতে
> পূর্ব্ব ভাগদ্বয়াদূর্দ্ধে নিষাদং তীব্রমাচরেৎ॥

পঞ্চম এবং উত্তর ষড়জের মধ্যবর্তী স্থান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্ব ভাগের অগ্রে কোমল ধৈবত স্থাপন করিবে। সেইরূপ ধা ও তার সা এর মধ্যবর্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া পূর্ব্বের দুই ভাগের অগ্রে তীব্র নিষাদ হইবে।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পণ্ডিত অহোবলের "সঙ্গীত পারিজাত"। পারিজাত গ্রন্থের স্বরাধ্যায় সম্বন্ধে পণ্ডিত রতনজনকরের উক্তি উল্লেখ করিলাম:

"Ahobala dutifully accepts the Shrutis and Moorchhana's of the ancients and describes them in elaborate details in the Swaradhyaya. When however he comes to the Ragadhyaya he quietly selects from the Swaradhyaya whatever had a practical bearing on the music current in his time and throws the rest of the bundle overboard."

স্বরাধ্যায়ে অহোবল প্রাচীন শ্রুতি মূর্চ্ছনাদির বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া, রাগাধ্যায়ে তারের দৈর্ঘ্যের উপরে শুদ্ধ ও বিকৃত বারটি স্বর স্থাপনা করিবার প্রণালী দেখাইয়াছেন। 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে তিনি সহজেই দেখিতে পাইবেন যে, অহোবল তাৎকালিক সঙ্গীতের সুষ্ঠু পরিচয় দিতে শার্ঙ্গদেবের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই। এইরূপ শোনা যায় যে, তিনি একজন বিখ্যাত বীণাবাদক ছিলেন। ব্যবহারিক সঙ্গীতে অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তাহার গ্রন্থ সঙ্গীতের বিশেষ কয়েকটি সূত্র আমাদিগকে প্রদান করিয়াছে। যেমন:

"শ্রুতয়ঃ স্যু স্বরাভিন্নাঃ শ্রাবণত্বেন হেতুনা।
সর্বাশ্চ শ্রুতয় স্তদ্রাগেষু স্বরতাংগতা।
রাগহেতুত্ব এতাসাং শ্রুতি সংজ্ঞৈব সম্মতা ॥" সঃ পাঃ

বিভিন্ন রাগে সকল শ্রুতিগুলিই স্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ এই যে, যে শ্রুতিগুলি কোন রাগে ব্যবহৃত হয় সেগুলি স্বর হয় এবং বাকি শ্রুতিগুলি শ্রুতিই রহিয়া যায়। অহোবলের শ্রুতি বাহির করিবার প্রণালীও বিজ্ঞানসম্মত। তিনি লিখিয়াছেন।

"মধ্যে পূর্বোত্তরাবদ্ধ বীণায়াং মাত্রএব বা।
ষড়্‌জ পঞ্চম ভাবেন শ্রুতির্দ্বাবিংশতির্ভবেৎ।

বীণায় আবদ্ধ তারে ষড়্‌জ পঞ্চম ভাবে (সা-পা) অর্থাৎ যে ভাবে স্বরগুলি বাহির করিয়া দেখানো হইয়াছে, সেই ভাবে বাইশটি শ্রুতি প্রদর্শিত হইতে পারে।

"এবমেবন্ যথা সিদ্ধিঃ সর্বত্র শ্রুতিষু স্থিতাঃ।
স্বরাশ্চেদ্যদি জায়েরন্ নৈকশ্রুত্যা কথং ভবেৎ ॥"

স্বরগুলি সর্ব্বত্রই এই শ্রুতিতে বিদ্যমান। স্বরগুলি উৎপন্ন হইতে পারিলে এক শ্রুতি হইতে অন্য শ্রুতিগুলি কেন উৎপন্ন হইতে পারিবে না?

পারিজাত গ্রন্থের স্বরাধ্যায়ে নারদ, শার্ঙ্গদেব, হৃদয়নারায়ণ (রাগবিবোধ) প্রত্যেক শাস্ত্রকারের প্রতিই অহোবল উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এই নিয়মগুলি লইয়া আমরা আর কালক্ষেপ করিতে চাহি না, কারণ রাগাধ্যায়ে তিনি বারটি স্বরের সাহায্যেই (হৃদয়ের তীব্র তীব্রতর স্বরও ব্যবহৃত হইয়াছে) রাগ বর্ণনা করিয়াছেন।" হৃদয় প্রকাশ গ্রন্থের অনুরূপ অহোবলও রাগাধ্যায়ের পূর্ব্বে—বীণার তারের দৈর্ঘ্যের উপরে স্বরগুলির অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ধ্রুবচিহ্ন বীণায়াং মধ্যে তারক সঃ স্থিতঃ।
উভয়োঃ ষড়্‌জয়োর্মধ্যে মধ্যমং স্বরনাচরেৎ।
ত্রিভাগাত্মকবীণায়াং পঞ্চমঃ স্যাত্তদগ্রিমে।
ষড়্‌জ পঃ ময়োর্মধ্যে গান্ধারস্ত স্থিতির্ভবেৎ ॥
স পয়োঃ পূর্বভাগে চ স্থাপনীয়োঽথ রি-স্বরঃ।
স পয়োর্মধ্যদেশে তু ধৈবতঃ স্বরমাচরেৎ ॥ সাঃ পাঃ ইত্যাদি

'প্রকাশ' গ্রন্থের প্রসঙ্গে ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অহোবল দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত—সেইজন্য একটি স্বরের দুইটি নামও পারিজাতে দেখা যায়।

"ঋষভ শুদ্ধ এবাসৌ পূর্বগান্ধার ঈর্য্যতে।
গান্ধারঃ শুদ্ধ এবাসৌ তীব্রতর ঈর্য্যতে ॥
অতিতীব্রতমো গঃ স্যাদথ মঃ শুদ্ধ এবহি
ধৈবতঃ শুদ্ধ এবাসৌ নিষাদঃ পূর্বসংজ্ঞকঃ ॥
নিষাদ শুদ্ধ এবাসৌ ষট্‌তীব্রতর ঈর্য্যতে ॥

অর্থাৎ, শুদ্ধ ঋষভকে পূর্ব্বগান্ধার, শুদ্ধ গান্ধারকে তীব্রতর রে, শুদ্ধ মধ্যমকে অতি তীব্রতম গ, শুদ্ধ ধৈবতকে পূর্ব্বনিষাদ, শুদ্ধ নিষাদকে তীব্রতর ধ-ও বলা হইয়া থাকে। কর্ণাটী সঙ্গীতেই একই নাদের দুই নাম দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে, সঙ্গীতে শ্রুতির দ্বারা কি কার্য্য হয়, শ্রুতির জন্য রাগ অথবা রাগের জন্য শ্রুতি? রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান বুঝাইবার জন্যই শ্রুতির প্রয়োগ প্রয়োজন হয়। ব্যবহারিক সঙ্গীতে স্বরের 'নাম'গুলিই ব্যবহৃত হয়, শ্রুতির নাম হয় না—কারণ স্বরের রূপান্তরের জন্যই শ্রুতির প্রয়োগ। হৃদয়নারায়ণ অথবা অহোবলের তারের দৈর্ঘ্যের মাপে স্বরস্থান নির্দ্দেশ বর্ত্তমান রাগসঙ্গীতের ভিত্তিস্থাপনা করিয়াছে। স্বরস্থান স্পষ্ট হওয়াতে তৎকালে প্রচলিত রাগ-স্বরূপও জানা সম্ভব হইয়াছে। চতুর্থ শ্রুতির উপরে ষড়্‌জ স্থাপনা করলে আধুনিক কাফি ঠাটেরই অনুরূপ হয়। শুদ্ধস্বর সপ্তকের মধ্যমেই অন্যান্য সপ্তক অথবা ঠাট বর্ণনা করা হয় বলিয়া শুদ্ধস্বর সপ্তক জানা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রুতির সাহায্যে স্বরস্থান প্রদর্শনের পদ্ধতি লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীতের প্রভাবমুক্ত হইল। দক্ষিণী পণ্ডিত ভেঙ্কটমখী স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি বিভাগ দ্বারা শ্রুতি-নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যেমন:

মেরূপকণ্ঠগং শুদ্ধর্ষভ ক্ষেত্রান্তরং ত্রিধা
বিভজ্য র্ষভপর্বং তদ্ দৃশ্যমানং বিনান্তরে।
পর্বত্রয়নিবেশে স্যুস্তিস্রোঽপি শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ।

মেরুর উপকণ্ঠ হইতে শুদ্ধ ঋষভের ক্ষেত্র তিন ভাগ করিলে তিনটি শ্রুতি পরিস্ফুট হইবে। যন্ত্রসঙ্গীতের জন্যই এই বিধান। কণ্ঠসঙ্গীতে 'পর্দ্দা' কোথায়? কণ্ঠসঙ্গীতে শ্রুতি সূক্ষ্ম স্বরান্তর মাত্র, ইহার কোন নিয়মিত মাপ অথবা ভাগ হয় না।

হৃদয়নারায়ণের 'প্রকাশ' ও অহোবলের 'পারিজাত' গ্রন্থদ্বয় লিখিত হইবার পর স্বরগুলির অবস্থানের অস্পষ্টতা দূর হইয়াছে। কাহার গ্রন্থ পূর্ব্বে লিখিত তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। যদি কেহ প্রশ্ন করেন 'সা' হইতে 'রে' কত দূরে অবস্থিত, তৎক্ষণাৎ তারের দৈর্ঘ্যের মাপে ঋষভের অবস্থান বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। সঙ্গীত স্বতঃপ্রচলিত কলা; স্বরগুলি কেহ সৃষ্টি করিয়া সঙ্গীতে ব্যবহারের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ইহা সম্ভব নহে। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—তাহাদের অবস্থানের নির্দ্দেশ দান এবং নাদের দৃষ্টিতে সেগুলির রচনা বিজ্ঞানসম্মত কিনা তাহা প্রদর্শন। আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'চতুর্থ' শ্রুতির উপরে ষড়্‌জ স্বর স্থাপনা। সঙ্গীত পরিবর্ত্তনশীল ও অগ্রগামী সন্দেহ নাই—কিন্তু গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, 'কাফি' শুদ্ধঠাট অথচ প্রচলিত সঙ্গীতে 'বিলাবল' শুদ্ধঠাট রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন সঙ্গীতে হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এ বিষয়ে গীতসূত্রসার-প্রণেতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সহিত আমরা একমত। তিনি লিখিয়াছেন: "অনেক সময়ে মনে হয় যে শ্রুতি-সংখ্যানুসারে ষড়্‌জ গ্রামে সাত সুরের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে গ্রন্থকারদিগের ভ্রম হইয়া থাকিবে; কারণ ভরত, হনুমান প্রভৃতি আদি শাস্ত্রকারদিগের লিখিত গ্রন্থ বহুকাল লোপ পাইয়াছে। মধ্যকালের গ্রন্থকারগণ কেবল আবহমানকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছেন যে, সা, মা ও পা চতুঃশ্রুতিক, রে ও ধা ত্রিশ্রুতিক এবং গা ও নি দ্বিশ্রুতিক। কিন্তু আদি শাস্ত্রালোকাভাবে কোন এক গ্রন্থকার হয়ত নিজে কল্পনা করিয়া, উহার উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা

করিয়াছেন এবং পরবর্তী গ্রন্থকারগণও সেই মত অবলম্বন করাতে ঐ ভুল হইয়া থাকিবে।" গী. সূ. সাঃ, পৃ. ১১৩।

স্বর উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বে কি প্রকারে শ্রুতি থাকিতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। মধ্যকালে 'কাফি' শুদ্ধঠাট হইয়াছে কেবলমাত্র চতুর্থ শ্রুতির উপর ষড়জ স্থাপনা করা হইয়াছে বলিয়া। 'কাফি' ঠাটের মন্দ্র নি (কোমল) স্বরে, অর্থাৎ প্রথম শ্রুতিতে ষড়জ স্থাপনা করিলে 'বিলাবল' ঠাটের স্বর দেখা যায়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে শুদ্ধঠাটের মধ্যমে অন্যান্য ঠাট বর্ণনা করা হয়। 'কাফি' ঠাটের মধ্যমে ভৈরো (রে, ধা কোমল) আজিকার ভৈরবী (রে গা ধা নি কোমল) হইয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় রাগগুলিতে পূর্ব্বেরই স্বরস্বরূপ আছে, শুদ্ধ স্বরগুচ্ছের পরিবর্ত্তনে মাত্র 'নামে'রই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তানসেন যে রাগ যে 'স্বরবর্ণে' গাহিতেন আজিও শিল্পী সেই সব রাগ ও গান সেই সুরেই তো গাহিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারের পরিবর্ত্তন সঙ্গীতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? রাগের স্বরূপে অথবা 'নামে'ই পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

দুহিতা

এরস্কিন কল্ডওয়েল

অনুবাদক—শ্রীজ্যোতিকুমার ঘোষ

ভোরবেলা এক কাফ্রি অশ্বতরদের খাওয়াবার জন্য বড় বাড়ীতে যাওয়ার পথে কর্ণেল হেনরী ম্যাক্সওয়েলকে কথাটা বলে দিল আর কর্ণেল হেনরী শেরিফকে ফোন করলেন। শেরিফ জিমকে তাড়াতাড়ি শহরে নিয়ে গেলেন এবং তাকে জেলে আটক করে রেখে তিনি প্রাতরাশ শেষ করলেন।

জিম শার্টের বোতাম আটতে আটতে ফাকা কুঠরিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল আর কিছুক্ষণ পরে বাক্সের উপর বসে জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগল। সেদিন সকালে সবকিছু এত দ্রুততালে ঘটেছে যে, সে এক চুমুক জলও পান করবার পর্য্যন্ত সময় পায় নি। সে উঠে দরজার কাছে রাখা জলের বালতির কাছে গেল, কিন্তু শেরিফ ওতে জল রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে জেলের উঠানে কতকগুলি লোক এসে দাঁড়িয়েছিল। জিম জানালার কাছে গেল এবং বাইরের দিকে তাকাল। সে তাদের কথা বলতে শুনলে। ঠিক এই সময় আর একখানি মোটর এল আর তা থেকে ছ'জন কি সাত জন লোক নেমে এল। আরও লোক রাস্তার ছ'দিক থেকে জেলের দিকে আসতে লাগল।

"আজ সকালে তোমার বাড়ীতে কি গোলমাল হয়েছে, জিম?" একজন শুধাল।

জিম অর্গলের মধ্যে তার থুতনি ঠেকিয়ে জনতার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। সে প্রত্যেককে চিনত।

যখন সে বোঝবার চেষ্টা করছিল—কেমন করে শহরের প্রত্যেকেই তার এখানে আটক হওয়ার কথা শুনলে, তখন আর একজন তাকে বললে, "এটা নিশ্চয় একটা দুর্ঘটনা, তাই না জিম?"

একটা কালো ছেলে কপিকলে তুলার একটা গাঁট নিয়ে রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালিয়ে আসছিল। যখন গাড়ীটা জেলের সামনে এল তখন ছেলেটি লাগামের প্রান্ত দিয়ে অশ্বতরদের মারতে লাগল আর তাদের দ্রুত চালাল।

"জিম তোমার বিরুদ্ধে যে সরকারের ঈর্ষা দেখতে পাচ্ছি তার জন্য আমি ঘৃণা বোধ করি," একজন বললে।

শেরিফ হাতে একটা টিনের খাবারের কেঁড়ে দোলাতে দোলাতে রাস্তা দিয়ে এলেন। তিনি ভিড় ঠেলে এগোলেন, দরজার চাবি খুললেন এবং কেঁড়েটি ভেতরে রাখলেন।

কতকগুলি লোক শেরিফের পিছনে পিছনে এল এবং তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে জেলের ভেতরটা দেখতে লাগল।

"জিম, এই নাও তোমার প্রাতরাশ, আমার স্ত্রী তোমার জন্য পাঠিয়েছেন। তুমি বরং কিছু খাও, লক্ষ্মীটি জিম।"

জিম কেঁড়ের দিকে, শেরিফের দিকে আর খোলা জেলের দরজার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

"আমার খিদে নেই", সে বললে। "আমার মেয়ের খিদে পেয়েছিল, হাঁ ভীষণ খিদে।"

শেরিফ দরজার দিকে পিছু হটতে লাগলেন, পিস্তলের হাতলের দিকে হাত বাড়িয়ে। তিনি এত তাড়াতাড়ি পিছু হটলেন যে, তাঁর পিছনের লোকের বড়া আঙ্গুলটা পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেললেন।

"এখন অন্যমনস্ক হয়ো না, জিম", তিনি বললেন। "চুপচাপ বসে থাক এবং শান্ত হও।"

তিনি দরজা বন্ধ করে চাবি দিলেন। রাস্তার দিকে কয়েক পা এগোবার পর তিনি থামলেন এবং তাঁর পিস্তলের খোপগুলি পরীক্ষা করলেন—তাতে গুলিভরা আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য।

জানালার বাইরের জনতা আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। কতকগুলি লোক অর্গলের উপর আঘাত করতে লাগল, অবশেষে জিম এসে বাইরের দিকে চাইল। যখন সে তাদের দিকে তাকাল, তখন সে অর্গলের মধ্যে থুতনি লাগিয়ে হাত দুটো দিয়ে ওটাকে জড়িয়ে ধরল।

"কেমন করে ব্যাপারটা ঘটল জিম ?" একজন প্রশ্ন করলে। "এটা নিশ্চয় একটা দুর্ঘটনা, তাই নয় কি ?"

জিমের লম্বা শীর্ণ মুখ মনে হচ্ছিল যেন অর্গলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবে। শেরিফ জানালার কাছে এলেন দেখবার জন্ত যে সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

"এখন এ ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নাও, লক্ষীটি জিম," তিনি বললেন।

যে লোকটি জিমকে অনুরোধ করেছিল কি হয়েছে তা বলবার জন্ত সে শেরিফকে পথ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল। অন্ত লোকেরা আরও কাছে এসে ভিড় করতে লাগল।

"কেমন করে ঘটল, জিম ?" লোকটি প্রশ্ন করল। "এটা কি হঠাৎ ঘটে গেল।"

"না," আঙুলগুলি অর্গলে চেপে ধরে জিম বললে, "আমার বন্দুকটা তুলে নিয়ে এই রকম করলাম।"

শেরিফ জানালার দিকে আবার ঠেলে এগোতে লাগলেন।

"থামলে কেন জিম, বলে যাও ব্যাপারটা যা হয়েছে।"

জিমের মুখ অর্গলের মধ্যে এমন চেপে বসেছিল যে মনে হচ্ছিল যেন তার কান দুটিই তার মাথাটাকে বেরিয়ে আসতে বাধা দিচ্ছিল।

"মেয়ে বলল তার ক্ষিদে পেয়েছে এবং আমি আর তা সহ্য করতে পারলাম না। তার এ কথা শুনতে আর আমি পারলাম না।"

"এখন অতটা উত্তেজিত হয়ো না, লক্ষীটি জিম," শেরিফ বললেন পিছনের লোককে ধাক্কা দিয়ে এক মুহূর্ত এগিয়ে গিয়ে।

"সে মাঝরাতে আবার জেগে উঠল এবং বলল সে ক্ষুধার্ত। আমি তার ও কথা শুনতে আর পারলাম না।"

কে একজন ভিড় ঠেলে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"কেন, জিম, তুমি আমার কাছে এসে তার খাওয়ার জন্ত কিছু চাইতে পারতে, আর তুমি জান এ পৃথিবীতে আমার বলতে যা কিছু আছে সব তোমায় দিয়ে দিতে পারতাম।"

শেরিফ আর একবার ভিড় ঠেলে এগোলেন।

"সেটা ঠিক হ'ত না," জিম বললে, "আমি সারা বছর ধরে কাজ করেছি আর আমাদের সকলের খোরাকের পক্ষে যথেষ্ট রোজগার করেছি।—"

থেমে অর্গলের উপরের দিকের মুখগুলির দিকে সে চেয়ে রইল।

"আমি ভাগে যথেষ্ট কাজ করেছিলাম, কিন্তু তারা এসে আমার কাছ থেকে জোর করে সব নিয়ে গেল। আমাদের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট রোজগার করার পর আমি ভিক্ষে করে বেড়াতে পারি না। তারা শুধু এল আর সব নিয়ে গেল। তারপর আমার মেয়ে আবার আজ সকালে জেগে উঠল, ক্ষিদে পেয়েছে' বলতে বলতে —আমি আর তা সহ্য করতে পারলাম না।"

শেরিফ বললেন, "লক্ষীটি জিম, তুমি বরং এখন বাক্সের উপর উঠে বস।"

কে একজন বললে, "ছোট্ট মেয়েটিকে ওভাবে গুলি করা ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না।"

"মেয়ে বললে, ক্ষিদে পেয়েছে।" জিম উত্তর দিল—"গত মাসভোর সে ও কথা বলেছে। মাঝরাতে মেয়েটা জেগে উঠত আর ও কথা বলত। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।"

"তাকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল জিম। আমি আর আমার স্ত্রী তাকে কোনরকমে কিছু খাওয়াতে পারতাম। তার মতন ছোট্ট একটি মেয়েকে হত্যা করা আমি ন্যায্য বলে মনে করতে পারি না।"

"আমি আমাদের সকলের জন্ত প্রচুর উপার্জ্জন করেছি" জিম বললে। "কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। গত সারাটা মাস ধরে আমার মেয়ে ক্ষুধায় আর্ত্তনাদ করেছে।"

ভিড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করে শেরিফ বললেন, "এ ব্যাপারটাকে সহজভাবে গ্রহণ কর, লক্ষীটি জিম।"

জনতা এক দিক থেকে আর এক দিকে দুলতে লাগল।

"এবং সেইজন্ত তুমি আজ সকালে বন্দুকটি তুলে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়লে ?" কে একজন জিজ্ঞেস করলে।

"যখন আজও সকালে সে 'ক্ষিদে পেয়েছে' 'ক্ষিদে পেয়েছে' বলতে বলতে জেগে উঠল তখন আমি আর তা সহ্য করতে পারলাম না।"

জনতা তারও কাছে এগোতে লাগল। চারিদিক থেকে জেলের দিকে লোক আসতে লাগল এবং যারা তখন উপস্থিত হচ্ছিল তারা জিমের কি বলবার আছে শুনবার জন্ত ধাক্কা মেরে এগোতে লাগল।

"তোমার উপর সরকারের এমন একটা আক্রোশ হয়েছে জিম", একজন বললে, "কিন্তু যাই হোক তোমার কাজটা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয় না।"

"আমি অসহায়," জিম বললে। "আমার মেয়ে আজ সকালে একই ভাবে, একই কথা বলে আবার জেগে উঠেছিল।"

জেলপ্রাঙ্গণ, রাস্তা আর অপরদিকে খালি জায়গাটা পুরুষে আর ছোট ছেলেতে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল। সকলেই জিমের কথা শুনবার জন্ত ঠেলে এগোচ্ছিল। ইতিমধ্যে শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে জিম কারলাইল তার আট বছরের মেয়ে ক্লারাকে গুলি করে মেরেছে।

"জিম কার শস্যের ভাগীদার ?" একজন প্রশ্ন করল।

"কর্ণেল হেনরি ম্যাক্সওয়েল" জনতার মধ্য থেকে একটি মেয়ে বললে।

"কর্ণেল হেনরি ভাগে জমি দিয়েছে প্রায় ন'দশ বছর হ'ল।"

"হেনরি ম্যাক্সওয়েলের কোন অধিকার নেই সমস্ত ভাগ নেবার। তার নিজের যথেষ্ট আছে। হেনরি ম্যাক্সওয়েলের উচিত হয় নি জিমের অংশটাও নেওয়া।"

শেরিফ আর একবার ঠেলে এগোবার চেষ্টা করলেন।

"সরকারের এখন জিমের উপরে আক্রোশ হয়েছে" একজন বললে, "যাই হোক এটা বাস্তবিক উচিত বলে মনে হয় না।"

শেরিফ জনতাকে কাঁধ দিয়ে ঠেলতে লাগলেন এবং আর একটু কাছে পথ করে নিতে সমর্থ হলেন।

একটি লোক শেরিফকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

"কেন হেনরি ম্যাক্সওয়েল এসে তোমার ভাগের শস্য নিয়ে গেল জিম ?"

"তিনি বললেন, আমি ওটা তাঁর কাছে ধারি, কারণ প্রায় এক মাস আগে নাকি তাঁর একটি অশ্বতর মরে গেছল।"

শেরিফ অর্গলবদ্ধ জানালার সামনে এলেন।

"তোমার উচিত এখন বাঙ্কে গিয়ে খানিকটা বিশ্রাম নেওয়া, লক্ষীটি জিম" তিনি বললেন। "লক্ষীটি জিম, জুতো খুলে শুয়ে পড়।"

তাঁকে ঠেলে বাইরে বার করে দেওয়া হ'ল।

"তুমি অশ্বতরটিকে হত্যা কর নি, তাই নয় জিম ?"

"অশ্বতরটি গোলাবাড়ীতে মরে গেল", জিম বললে, "আমি এর চতুঃসীমার মধ্যে ছিলাম না। ওটা এমনিই মরে গেল।"

জনতা আরও জোরে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। সামনের লোকেরা জেলের দেয়ালে ঠাসাঠাসি করতে লাগল আর পিছনের লোকেরা শ্রবণ-দূরত্বের মধ্যে আসবার চেষ্টা করছিল। মাঝের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে এটে গেছে যে তারা কোন দিকেই নড়তে পারছিল না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অপেক্ষা চেঁচিয়ে কথা বলছিল।

জিমের মুখ অর্গলের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল আর তার অঙ্গুলি লোহাকে এত জোরে চেপে ধরেছিল যে আঙ্গুলের গাঁটগুলি সাদা হয়ে গিয়েছিল।

ক্রমবর্দ্ধমান জনতা রাস্তা ছাড়িয়ে খালি জমিটার দিকে এগোচ্ছিল। কে একজন চেঁচাচ্ছে। সে একটা মোটরের উপর উঠে উচ্চস্বরে শাপান্ত করতে আরম্ভ করলে।

জনতার মাঝবরাবর থেকে একটি লোক ঠেলে বাইরে এল এবং তার গাড়ির দিকে গেল। সে গাড়িতে চেপে একাই চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

জিম অর্গল ধরে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে জনতার দিকে চেয়ে রইল। শেরিফের পিঠ ছিল জনতার দিকে এবং তিনি জিমকে কিছু বলছিলেন। তিনি কি বললেন জিম তা শুনতে পেল না।

একটি লোক তুলার গাঁট নিয়ে সুতাকলের দিকে যাবার পথে থামল কি গণ্ডগোলটা হচ্ছে দেখবার জন্য। সে মুহূর্তের জন্য খোলা জায়গাটিতে জনতার দিকে তাকাল এবং তার পর ঘুরে অর্গলের পিছনে জিমকে দেখল। রাস্তায় চীৎকার বাড়তে লাগল।

"কি ব্যাপার, জিম ?"

রাস্তার বিপরীত দিকের একজন লোক মালবাহী গাড়ীর কাছে এল। সে মালবাহী গাড়ীর চাকার স্পোকে তার পা রাখল এবং তুলার উপর বসে যে লোকটা কথা বলছে তার দিকে চেয়ে রইল।

"খিদে পেয়েছে—বলতে বলতে আজ সকালে আমার মেয়ে আবার জেগে উঠল", জিম বললে।

শেরিফ একমাত্র লোক যিনি তাঁর কথা শুনতে পেলেন। তুলার গাঁটের উপর যে লোকটা বসেছিল সে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল, মালবাহী গাড়ীর চাকায় লাগাম বাঁধল এবং সেটা ভিড়ের মধ্য দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে মোটরের দিকে নিয়ে চলল—যেখানে সবাই চীৎকার আর শাপান্ত করছে। খানিকটা শোনার পর সে রাস্তায় ফিরে এসে একটি কাফ্রিকে ডাকল, সে কোণের দিকে আরও কতকগুলি কাফ্রির সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল, লোকটা তাকে লাগামটা দিয়ে দিল। কাফ্রিটি সুতাকলের দিকে গাড়ী চালিয়ে দিলে সে ভিড়ের মধ্যে ফিরে গেল।

ঠিক সেই সময় যে লোকটি একা মোটর চালিয়ে চলে গিয়েছিল সে ফিরে এল। সে ষ্টিয়ারিং হুইলের পিছনে এক মুহূর্তের জন্য বসে রইল এবং তারপর মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। সে পিছনের দরজা খুলে একটা শাবল বার করল, সেটা তারই মত লম্বা।

"ওটা দিয়ে জেলের দরজা খুলে ফেল এবং জিমকে বাইরে আসতে দেওয়া হোক", কে একজন বললে।

"ওর পক্ষে ওখানে থাকা ন্যায়সঙ্গত নয়।"

ফাঁকা জায়গাটার জনতা আবার এগোতে সুরু করল। যে লোকটা মোটরের ছাদে দাঁড়িয়েছিল সে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল এবং জেলের দিকের রাস্তা ধরে জনতা এগোতে লাগল।

যে লোকটা ওখানে প্রথম পৌঁছল সে ছ'ফুট লম্বা শাবলটিকে নরম মাটি থেকে টেনে তুলল—সেখানে ওটা চেপে বসেছিল।

শেরিফ পিছন ফিরলেন।

"এখন এটা শান্তভাবে গ্রহণ কর, লক্ষীটি জিম" তিনি বললেন।

তিনি পিছন ফিরলেন এবং তাঁর বাড়ীর দিকের রাস্তা ধরে দ্রুত হাঁটতে সুরু করলেন।

সংস্কৃত কাব্যসঞ্চয়ন

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ

সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব্ব রত্ন এর কবিতা-সঞ্চয়ন। কবি চান তাঁর সৃষ্টির মাঝে অমর হয়ে থাকতে, কালের নির্ম্মম বাঁধন ছিনিয়ে কবি হন অমরাপথের যাত্রী। প্রত্যেক কবির হৃদয়ে আসন পেতে আছে এই ব্যাকুলতা, আত্মপ্রকাশের এই প্রাণময় অভিব্যক্তি। মহাকবি রেখে গেছেন তাঁর অমরকীর্ত্তি মহাকাব্য। ভাবের গম্ভীরতায় ও কাব্য-বৈচিত্র্য-বিলাসে মহাকাব্য পাঠকের মানসপটে রেখে যায় তার অক্ষয় চিহ্ন, মহাকবি বুঝি-বা চান আপন সৃষ্টির বিশালতার মাধ্যমে রসিকজনের মন হরণ করতে, কিন্তু এই কাব্যমহীরুহের স্নিগ্ধচ্ছায়া-তলে যুগ যুগ ধরে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত হয়ে আসছে কত জানা-অজানা কবির চিত্তচমৎকারী কবিতাবলী। কালিদাস, অশ্বঘোষ প্রভৃতি ধুরন্ধর কবিগণের পাশে কত নামহীন গোত্রহীন, বুঝি-বা অপাংক্তেয়, কবিকুল একটু আসন ভিক্ষা করেছে, উত্তরকালের সহৃদয় সমাজের মনের কোটরে বাসা বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই উভয়বিধ কবির কবিতাচয়ন আমরা পাই খৃষ্টীয় দশম শতক থেকে। নানান্ কবিতাসঞ্চয়নের মাঝে প্রায় সহস্রাধিক কবির সন্ধান মেলে। এরূপ একটি কবিতা-সঞ্চয়ন "কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়"। এ সব কবিতা-চয়নিকার মাঝে কবির ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ কোন পরিচয় আমরা পাই না সত্য, কবির কালের হয়ত কোন সন্ধান মেলে না, কিন্তু কবির অন্তর্জীবনের সঙ্গে আমাদের নিগূঢ় পরিচয় ঘটে, কয়েকটি ছত্রের মাঝে কবির অন্তরের গূঢ় কামনা সার্থকরূপে অভিব্যক্ত হয়। এ সঞ্চয়নগুলি যেন সে যুগের ভাবধারার প্রতীক।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম কবিতা-সঞ্চয়ন—"কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়"। পরের যুগে বল্লভদেব (১৫শ খ্রীষ্টাব্দ), শ্রীধরদাস (১৩শ খ্রীষ্টাব্দ), কহ্লন (ঐ), "ভক্তপ্রবীণ" রূপ-গোস্বামী, বেণী দত্ত প্রভৃতি বহু কবি সংস্কৃতসঙ্কলন-সাহিত্যকে বিচিত্র উপায়ে সমৃদ্ধ করেছেন, কিন্তু "কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়কারে"র স্থান সবাকার ঊর্দ্ধে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সঞ্চয়নের প্রকৃত নামটি আজও অজ্ঞাত, আর এর সংকলয়িতা আমাদের কাছে আপন পরিচয়টি রেখে যান নি। স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়েই নামগোত্রের মোহপাশ কাটিয়ে এক নৈর্ব্যক্তিক জগতের যাত্রী। "কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়" অসমাপ্ত। গত শতকের শেষভাগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালী অক্ষরে লিখিত এই পুঁথির সন্ধান পান। বিদগ্ধজনের মতে ইহা খ্রীষ্টীয় দশম শতকে রচিত। শাস্ত্রীমশাই এই সঞ্চয়নের নাম দিয়েছিলেন "কবি-বচন-সমুচ্চয়" (Report on the search of Sanskrit Mss, 1895—1900)। কিন্তু প্রথম শ্লোকটি থেকেই "কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়" যে এই সঞ্চয়নের নাম তা কতকটা অনুমান করা যায়। সংকলয়িতা বলছেন:

"নানাকবীন্দ্রবচনানি মনোহরাণি—
সংখ্যাবতাং পরমকণ্ঠবিভূষণানি।
আকল্পকানি শিরসশ্চ মহাকবীনাং
তেষাং সমুচ্চয়মনঘমহং বিধাস্যে।"

গ্রন্থকার প্রথমেই তথাগত বুদ্ধদেবকে অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে এই সঞ্চয়ন রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—"নমো বুদ্ধায়"। এক একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন "ব্রজ্যা"। প্রথম সমুচ্চয় 'সুগতব্রজ্যা'। দ্বিতীয়টি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের নামানুসারে 'লোকেশ্বর ব্রজ্যা'। প্রথম কবিতাটিও বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষের। এ থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ের অজ্ঞাত-কুলশীল কবি বোধ হয় বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু চয়নিকার প্রথমে সুগতব্রজ্যার ষোলটি ও লোকেশ্বর ব্রজ্যার তিনটি—এই আঠার-উনিশটি কবিতা ছাড়া সমগ্র রচনার মধ্যে অন্য কোথাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি এতটুকু ঝোঁক চোখে পড়ে না। মোট ৫২৫টি কবিতার ব্যাপক পরিধির মাঝে বৌদ্ধপ্রভাবের এই ক্ষীণ রেখা নিতান্তই কৃত্রিম। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে এই সঞ্চয়নের নাড়ীর যোগসূত্র নেই বলেই মনে হয়। প্রথম দুটি ব্রজ্যা ছাড়া অন্যান্য অংশের বিভাগ, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক-আভরণ অপরাপর কবিতা সঞ্চয়নের মতই।

প্রথম সুগত ব্রজ্যার ষোলটি শ্লোকে উল্লিখিত কবির নাম: অশ্বঘোষ, বসুক, সংঘশ্রী, অপরাজিত-রক্ষিত, বসুকল্প, শ্রীধর নন্দী, বরুণ, শ্রীপাশবর্ম্মা, জিতারি নন্দী ও ত্রিলোচন। এই ব্রজ্যায় আছে মারবিজয়ী সুগতদেবের বন্দনাগীতি। সংঘশ্রী তাঁর কবিতায় বলছেন, কাম ও ক্রোধ, দুই-ই মানবের পরম শত্রু। পার্ব্বতীর জীবন-দেবতা দেবাদিদেব মহাদেব কামরূপী মদনকে ভস্মে পরিণত করলেন, কিন্তু ক্রোধ ত তাঁর হৃদয়টিকে অধিকার করেছে। এক শত্রুকে বিনাশ করতে গিয়ে অপর শত্রুর কবলে পড়লেন। এতে মহাদেবের আর এমন কৃতিত্ব কি? কিন্তু তথাগত বুদ্ধদেব ক্রোধ-শূন্য শান্তচিত্তে কন্দর্পরূপী মারকে চিরতরে ধ্বংস করেছেন, তাই তিনি অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ শান্ত। ভগবান বুদ্ধই সংসারার্ণব-পারের দিশারী। সপ্তম শ্লোকের অজ্ঞাতনামা কবি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে রাজ্যাভিষেকের তুলনা করেছেন। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য্যে ভরে উঠেছে। বৌদ্ধ-দর্শনের রূপরেখাও বহু কবিতায় ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত। শীল, ধ্যান, দান, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও ক্ষান্তি—এই ছয় পারমিতা নিয়েই কল্পবৃক্ষ। সংবোধিরূপ বীজের উদ্গমে মানবের হৃদয় হয় নির্ব্বাণমুখী।

দ্বিতীয় লোকেশ্বর ব্রজ্যায় বুদ্ধাকরগুপ্ত ও অপোহসিদ্ধিকার রত্নকীর্ত্তিরচিত বুদ্ধাবতার অবলোকিতেশ্বরের স্তুতি। আরাধ্য

দেবতার প্রতি-ছত্রে ছত্রে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। কোন্ মরমী সাধকের পাগল-করা সুর যেন আমাদের কানে ভেসে আসে।

কিন্তু পরবর্তী ব্রজ্যায় একেবারে পট-পরিবর্তন। বৌদ্ধ-দর্শনের সীমারেখা পেরিয়ে একেবারে বৈষ্ণবকবিকীর্তিত শ্রীহরির ভাবঘন মূর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। কবি বাক্পতিরাজের একটি কবিতা :

'দেবি ত্বং কুপিতা ত্বমেব কুপিতা কোঽন্যঃ পৃথিব্যা গুরু—
র্মাতা ত্বং জগতাং ত্বমেব জগতাং মাতা ন বিজ্ঞোঽপরঃ,
দেবি ত্বং পরিহাসকেলিকলহেঽনন্তাত্বমেবেত্যথ
জ্ঞাতানন্তপদো নমন্নবতু বঃ শৌরিশ্চিরং পাতু বঃ।'

বিষ্ণু মানিনী লক্ষ্মীকে বলছেন, দেবি তুমি কেন কুপিতা ? লক্ষ্মী বললেন, কই, আমি ত নই, তুমিই ত কুপিতা, কু অর্থাৎ পৃথিবীর পিতা। এ বিশ্বের তুমি ছাড়া আর গুরু কে ? বিষ্ণু বললেন, তুমি ত জগতের মাতা। উত্তরে লক্ষ্মী বললেন, কে বলে আমি মাতা, তুমিই ত জগতের মাতা অর্থাৎ প্রমাতা। বিষ্ণু বললেন, দেবি, তুমি ত বড় পরিহাসকুশলিনী। এ বিষয়ে তোমার শক্তি অনন্তা।

দেবী বললেন—কে বলে আমি অনন্তা, তুমিই ত অনন্তা, অর্থাৎ কারও কাছে নত হও না। ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতম এই বৈচিত্র্যকে বলেছেন "বাক্ছল"। এই শিল্পচাতুরীর নিদর্শন সংস্কৃত সংগ্রহ-সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়। এই ব্রজ্যায় শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মাতা যশোদার আলাপন, হিরণ্যকশিপুবধ, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি অংশ বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই ব্রজ্যায় নিম্নোক্ত কবিগণের উল্লেখ পাওয়া যায় :— বাক্পতিরাজ, রাজশেখর, মুরারি, পুরুষোত্তমদেব, শ্রীভগীরথ, সোল্লোক, মালাবুধ, বৈদ্যোক।

তৃতীয় সূর্য্য ব্রজ্যা মাত্র চারিটি শ্লোকে গ্রথিত। রাজশেখর, বরাহমিহির ও ময়ূর কবি-রচিত সূর্য্য স্তোত্র মার্জ্জিত শব্দবৈভবের অপরূপ নিদর্শন। ময়ূরকৃত শ্লোকটি তাঁর সূর্য্যশতক থেকে সংগৃহীত।

এরপর সংগ্রহকার সুরলোক ছেড়ে চলে এসেছেন একেবারে প্রকৃতির দুয়ারে, সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্যে ঘেরা দৈনন্দিন জীবনের মাঝে। বসন্ত ব্রজ্যা, গ্রীষ্মব্রজ্যা ও প্রাবৃট ব্রজ্যায় বসন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষার রম্যরূপ শব্দচিত্রে নিপুণ তুলিকায় অভিব্যক্ত করেছেন। তেত্রিশটি শ্লোকে কবি বসন্তের একটি রমণীয় মূর্তি অঙ্কিত করেছেন। সে চিত্র মুখ্যতঃ কামোদ্দীপক। শৃঙ্গাররসের উদ্দীপনায় সহকারী বসন্ত প্রকৃতি। সেই সহকার তরু, সেই বাচাল কোকিল, কমলিনী, দক্ষিণ পবন, নির্ম্মল গগনে চন্দ্রিমার শোভাবিধৌতা ধরিত্রী— বিরহাতুরার বড় পীড়াদায়ক, বসন্তবায়ু মলয়পর্ব্বত থেকে যাত্রোচিত সজ্জায় শোভিত হয়ে বহির্গত হয়েছেন। কামিনীগণ স্বাগত জানাচ্ছে তাঁকে। তিনি মদনসখা। এই ব্রজ্যায় আমরা শ্রীকণ্ঠ, ভবভূতি ছাড়া বিনয়দেব, বাক্কূট, নীল, রাজশেখর, শুভাঙ্গ, অভিনন্দ, যৌতারণি, সাবর্ণি, বাণের, শ্রীধর্ম্মকর, যোগেশ্বর প্রভৃতি বহু অখ্যাতনামা কবির রচনার সঙ্গে পরিচিত হই।

গ্রীষ্ম ব্রজ্যায় কবি অধিকতর বাস্তবমুখী, এ যেন বাংলা দেশে গ্রীষ্মের অবিকল চিত্ররূপ। অপটুতাকে গোপন করবার কোন প্রচ্ছন্ন প্রয়াস নেই, কোন উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার বিলাসিতা নেই। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পক্ষীকুল অতি ক্লিষ্ট, পবনদেব অতি নির্দ্দয় অতি নিঠুর। মাথা নত করে আপন পক্ষ দিয়ে ব্যজন করছে। পরে কালবৈশাখীর মাতন সুরু হ'ল। গ্রীষ্মলক্ষ্মী এক বিশেষ রূপ-লাবণ্যে কামিনী-অঙ্গ ভরিয়ে তুলল।

প্রাবৃট ব্রজ্যায় কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ের সঙ্কলক যে রম্য রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন, নৃত্যচপলা বর্ষা সৌন্দর্য্যের পুষ্প চয়ন করে যে মালা তিনি গেঁথেছেন তার সৌরভ উত্তরকালের কবিকুলের সৌন্দর্য্যবোধের দিশারী। সেই যূথিকা, কুটজকুসুম, সেই ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য। পর্ব্বতনিতম্বে উন্মত্ত মেঘের আনাগোনা। কবি নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ, শ্যামলায়িতা বসুন্ধরা ও মৃগশাবকের ত্রস্তগতির রম্যরূপ-কুসুম চয়ন করেছেন ভবভূতির মালতী-মাধব নাটকোপবন থেকে। অবিশ্রান্ত ধারায় বারি বর্ষণে শুষ্ক প্রান্তর ভরে উঠেছে, মেঘ-মেদুর অম্বরে ঘন ঘন গুরুগম্ভীর গর্জন। রাতের গভীর আঁধার ক্ষণিকের জন্য দূরে চলে যায় সৌদামিনীর চকিত আত্মপ্রকাশে। আকাশ যেন নিজ কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, তার দুটি চক্ষু, চন্দ্র সূর্য্য মুদিত। গম্ভীর নাদ যেন ঘুমন্ত আকাশের নাসিকাধ্বনি মৃদঙ্গধ্বনির তালে তালে মহাকাল ও গৌরীর নৃত্য সুরু হয়েছে। নতুন মেঘের আনাগোনায় বিরহিণীর হৃদয় আনচান করছে। মদনার্ত্তা এসে দাঁড়িয়েছে সেই ঘোর বর্ষণের মাঝে, তার চূর্ণকুন্তল সিক্ত, কপোলে শীকরবিন্দু। ঋতুবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে এই রুচিবোধের দ্যোতনা, বর্ষার এমন ভাবঘন রূপ মহাকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহারে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি কবিতায় বর্ষাকে নরাস্থিবাহী কাপালিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেতকীর শুভ্র পরাগ যেন ভস্ম, বলাকা-মেখলা কৃষ্ণমেঘ যেন শুভ্র অস্থি-বেষ্টিত কাপালিকের অলকরাজী, রামধনু যেন তার ধাতুময় বলয়। কাপালিকের এই রূপ দেখে প্রোষিতভর্তৃকা ভীতা, সন্ত্রস্তা। এই ব্রজ্যায় আঠারটি শ্লোকে কবি বর্ষার যে অখণ্ড চিত্র এঁকেছেন তা সত্যই রসিকজনের চিত্তহারী। এখানে আমরা যোগেশ্বর, অভিনন্দ, শতানন্দ, অভিষেক প্রভৃতি কবিগণের সঙ্গে পরিচিত হই।

এরপর বয়ঃসন্ধি ব্রজ্যা, তরুণী ব্রজ্যা, অনুরাগ ব্রজ্যা, দূতীবচন-সম্ভোগ, সমাপ্তনিধুবন, মানিনী, বিরহিণী, বিরহী অসতী, প্রভৃতি ব্রজ্যা প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসার রূপরেখায় ভরা। দৈহিক তৃষার উপরে যে অনুভূতি আছে, দেহের মাঝে যে প্রাণ আছে, হৃদয়বৃত্তি আছে তার সার্থক রূপায়ণ এই কবিতাগুলি। প্রেমিক হৃদয়ের অনুভূতির এমন গভীরতার বুঝি বা তুলনা নেই। স্থানে স্থানে মনে হয় যে, কবি রুচিবোধের অপকর্ষ ঘটিয়েছেন, কিন্তু সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডে তা নিতান্তই হেয়।

আঙুলের সাহায্যে একটি তরুণীর সঙ্গে আলাপন-রত হেলেন কেলার

হেলেন কেলার

শ্রীমোহনসিং সেঙ্গার

চুয়াত্তর বৎসরবয়স্কা অন্ধ ও বধির গ্রন্থকর্ত্রী এবং সমাজসেবিকা শ্রীযুক্তা হেলেন কেলার সম্প্রতি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। দৃষ্টিহীন এবং মূক-বধির হইয়াও তিনি কিরূপে জীবনে এতখানি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শারীরিক বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং অধ্যবসায় তাঁহাকে জীবনযুদ্ধে জয়মাল্য পরাইয়াছে। অন্ধ মূক-বধিরদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সর্ব্বপ্রথম উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহা যেন অতি সহজ ভাবেই ঘটিয়াছে। অন্যের চেয়ে তিনি যে অদ্ভুত কিছু করিয়াছেন এরূপ মনোভাব তাঁহার আদৌ নাই। বরং তিনি বিশ্বাস করেন, অপর দশ জনের নিকট যাহা অতি সহজসাধ্য, তিনিও সেইরূপ সাধারণ বিষয়ই সহজ ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। তবে হেলেন মহোদয়া জীবনে যে আশ্চর্য্য সাফল্যলাভ করিয়াছেন, অন্ধ মূক-বধিরদের মধ্যে তাহা সত্যসত্যই অভিনব। মানবসেবায় তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। তিনি বলেন, 'আমরা কি তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, আমরা সমাজসেবায় কতটুকু যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহাই বিবেচ্য।' মার্ক টোয়েন যথার্থই বলিয়াছেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক মানুষ হইতেছেন—নেপোলিয়ন এবং হেলেন কেলার।'

হেলেন কেলার জন্মাবধি অন্ধ ও মূক-বধির নহেন। দেড় বৎসর বয়সে তিনি কঠিন জ্বর রোগে আক্রান্ত হন; সেই সময়ই তিনি প্রথম দৃষ্টিশক্তি হারান এবং মূক ও বধির হন। হেলেন কেলারের জন্ম হয় ১৮৮০ সনের ২৭শে জুন তারিখে। তাঁহার পিতামাতা আলাবামা—টাস্কাম্বিয়ার সন্নিকটে বাস করিতেন। জন্মাবধি হেলেন ছিলেন খুবই স্বাস্থ্যবতী। ছয় মাস বয়সে তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করেন, হাঁটিতে শিখেন মাত্র এক বৎসরের সময়। কিন্তু উক্ত ব্যাধিতে অন্ধ ও মূক-বধির হইয়া তাঁহাকে অপরের উপরই সকল বিষয়ে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। তিনি আবদেরে হইয়া উঠিলেন, সময় সময় তাঁহার ক্রোধও বাড়িয়া যাইত, যদি পিতামাতা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিতেন। জীবনের

প্রথম পাঁচ-ছয় বৎসরে প্রধান সঙ্গী ছিলেন তাঁহার পিতা। তিনি আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬৫-৬১) সরকারপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে তিনি একখানি সংবাদপত্র সম্পাদনা করিতেন। দুই ভ্রাতা ও এক ভগ্নীও হেলেনের সঙ্গী ছিল। কিন্তু তাহাদের দ্বারা তাঁহার বিশেষ কোন সাহায্য হইত না। হেলেনের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থাও হয় নাই।

কিন্তু অল্পকাল পরেই এরূপ একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। বোষ্টন শহরে 'পার্ক ইনষ্টিটিউশন ফর দি ব্লাইণ্ড' নামে একটি অন্ধ বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন বিংশতিবর্ষীয়া কুমারী এ্যান ম্যানস্‌ফীল্ড সালিভান। হেলেনকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেওয়া হইল। ভর্ত্তি হইবার দিন হেলেনের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। পরবর্ত্তীকালে তিনি বলিয়াছিলেন যে, মা তাঁহাকে এমন এক জনের নিকট সমর্পণ করিলেন যাঁহার মঙ্গল হস্ত স্পর্শেই যেন তাঁহার জীবন আলোতে উদ্‌ভাসিত হইল!

শিক্ষয়িত্রী সালিভানও শিশুটির ভার পাইলেন; হেলেন মোটেই নিরীহ গোবেচারী-গোছের নন, তিনি সাহসী, স্বাস্থ্যবতী, দুরন্ত এবং সদা-চঞ্চল। তবে শিশুটির আশ্চর্য্য বোধশক্তি দেখিয়া সালিভান মুগ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে লেখেন, 'এরূপ একটি মেয়েকে শিক্ষাদান জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য।' সালিভান হেলেনকে একটি "Doll" বা পুতুল উপহার দিলেন। হেলেন যখন এটি লইয়া খেলা করিতেছিলেন তখন সালিভান তাঁহার হাতের চেটোয় এই শব্দটি বর্ণবিন্যাস করিয়া দিলেন। হেলেনও অঙ্গুলি দিয়া হাতের চেটোতে অনুরূপ ভাবে লিখিতে লাগিলেন। দুর্ভেদ্য তমসা ও নীরবতার মধ্যে হেলেন আজ পথের সন্ধান পাইলেন। শব্দশিক্ষার্থ হাতের চেটোয় অনবরত অঙ্গুলি চালনায় নিজের আঙুলগুলিতে মাঝে মাঝে ব্যথা হইত। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য! এইরূপে কয়েক মাসের মধ্যে হেলেন আট শত শব্দ এবং বহু বাক্যাংশ শিখিয়া লইলেন; ব্রেল পদ্ধতিতে লিখিতে এবং গণনা করিতেও তিনি সমর্থ হন। যাহা এত দিন তাঁহার পক্ষে বিস্ময়কর বস্তু ছিল উহা এইরূপে উঁহার সম্পূর্ণ অধিগত হয়। ভাবজগৎ এবং বস্তুজগৎ উভয়ের সঙ্গেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ক্রমে স্থাপিত হইতে লাগিল।

হেলেনের অনুভূতি-শক্তি এবং জ্ঞানস্পৃহা অসাধারণ ছিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছিলেন তাহাও তাঁহার বিশেষ অনুকূল ছিল। সালিভান হেলেনকে সময়ে সময়ে নানা স্থানে শিক্ষাদানের নিমিত্ত লইয়া যাইতেন। এ সব স্থান, মানুষ এবং দ্রব্যাদির সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ঘটে। বিদ্যালয়ে বয়স্ক, শিশু, অভ্যাগত এবং চাকরবাকর-

ব্রেল পদ্ধতিতে রচিত পুস্তকসমূহের নিজস্ব সংগ্রহশালায় হেলেন কেলার

দের মধ্যেই হেলেনের দৈনন্দিন জীবন কাটিত না, সালিভান তাঁহাকে পল্লী অঞ্চলে প্রকৃতির ক্রোড়ে লইয়া যাইতেন। সেখানে রকমারি জীবজন্তু, ফুল, শস্যক্ষেত্র, ছোট ছোট নদী, অরণ্য এই সকল হইতে অনেক কিছু মনের খোরাক আহরণ করিতেন। হেলেন গৃহে থাকিতেই গন্ধ লইয়া ফুল ফলের পরিচয় পাইয়াছিলেন, আর স্পর্শ দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতিজাতের হ্রাসবৃদ্ধির বিষয়ও জানিয়া লইতেন। নূতন নূতন পরিবেশে নব নব মূক জীবজন্তুর সান্নিধ্যে

তিনি বিশেষ আনন্দ পাইতেন। আত্মীয়স্বজনদের নিকট পত্র লিখিয়া তিনি তাঁহার আনন্দের কথা ব্যক্ত করিতেন। পাখী, কুকুর, গাধা, টাট্টুর দিকে ছিল তাহার অধিকতর আকর্ষণ। পশুপক্ষীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ এখনও অব্যাহত আছে।

ব্রেল-পদ্ধতির সাহায্যে পাঠরত হেলেন কেলার

দশ বৎসর পর্য্যন্ত হস্তের মাধ্যমেই তিনি প্রায় সব বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। যেমন, একটি প্রজাপতির গঠন এবং সৌন্দর্য্য ইহার ডানার উপরে হাত বুলাইয়া তিনি জানিয়া লন। একটি হাতীর বিশাল অদ্ভুত আকৃতি অবগত হন ঘণ্টাখানেক ইহার চারদিকে ঘুরিয়া। দর্শকদের আকার-প্রকার সম্বন্ধেও তিনি স্পর্শ দ্বারা ধারণা করিয়া থাকেন। বক্তার মুখের উপরে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে তিনি কথা বুঝিয়া লন। স্পর্শের পরেই ঘ্রাণ। পত্র ও তৃণের গন্ধ লইয়া তিনি পারিপার্শ্বিকের কথা বলিতে সমর্থ। গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইবার কালে দরজার ঘ্রাণ লইয়া জানা কি অজানা বুঝিতে পারেন।

এ যাবৎ হেলেন হস্ত সাহায্যে লিখন-পঠন অভ্যাস করিলেন। কিন্তু হেলেন যে মূক। তিনি শুনিলেন, নরওয়ের একটি মূক বালিকা কথা কহিতে সমর্থ হইয়াছে; শুনিয়া তাঁহারও মনে হইল তিনিই-বা কেন কথা কহিতে পারিবেন না। বোষ্টনের কুমারী সারা ফুলাশের 'হোরেস ম্যান্ স্কুলে' হেলেনকে অতঃপর ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া এক একটি কথা উচ্চারণ করিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাদিক্রমে চেষ্টা করিয়া অবশেষে হেলেন কথা বলিতে সক্ষম হইলেন। স্কুল হইতে ফিরিবার সময় হেলেন সালিভানকে বলিলেন, 'আমি এখন আর মূক নই।' সালিভান তো অবাক! হেলেন সত্যসত্যই কথা বলিয়াছেন! সালিভান উত্তর করিলেন, 'হাঁ, তুমি কথা বলিতে শিখিয়াছ বটে, কিন্তু এখনও জড়তা রহিয়া গিয়াছে।' ইহার পর গত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ এই জড়তা ভাঙিবার জন্যই তিনি সচেষ্ট আছেন। তিনি বলেন, আত্যন্তিক প্রয়াস সত্ত্বেও হয়ত তাঁহার কথার জড়তা এখনও যায় নাই, কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার যে মনোবল বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার হেতু সম্বন্ধে যে ভূয়োদর্শন ঘটিয়াছে তাহার তুলনা নাই। হেলেন ১৯১৩ সনে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যে কথা বলিতে আরম্ভ করেন।

পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিভিন্ন অন্ধ ও মূকবধির প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিকট হেলেন শিক্ষালাভ করিয়াছেন। নায়াগ্রা জলপ্রপাত, শিকাগোর বিশ্বমেলা এবং নিউ ইংলণ্ডের সমুদ্র-তীরে গিয়া নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনেও তিনি সমর্থ হইলেন। কিন্তু ষোড়শ বর্ষে হেলেনের জীবনের মোড় ঘুরিয়া গেল। অন্ধ ও মূক-বধিরের পক্ষে এমনটি হওয়া ছিল এত দিন প্রায় অসম্ভব। কেমব্রিজে (ম্যাসাচুসেটস) একটি মেয়েদের স্কুলে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল—উদ্দেশ্য হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ের নারী-বিভাগে র‍্যাডক্লিফ কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন। ইহার মানে—আট বৎসর হাড়ভাঙা খাটুনি—তাঁহার এবং তাঁহার শিক্ষয়িত্রী সালিভানেরও। কারণ সালিভানকে তাঁহার সঙ্গে প্রতি ক্লাসে হাজির থাকিতে হইত। তিনি অধ্যাপকের বক্তৃতা হেলেনের হাতে লিখিয়া দিতেন, তাঁহার হইয়া পাঠ লইতেন এবং তাঁহাকে যথানির্দিষ্ট উপায়ে উহা হৃদ্গত করাইতেন। হেলেন ১৯০৪ সনে র‍্যাডক্লিফ কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার 'বিশেষ অনার্স' ছিল।

এই আট বৎসরে হেলেন বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই অধিগত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন আঠারো তখনই তিনি জ্যামিতি, বীজগণিত, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব এবং দর্শনশাস্ত্র অনেকটা আয়ত্ত করিয়া লন। ফরাসী, জার্ম্মান ও লাটিন ভাষাও তাঁহার আয়ত্ত হয়। সাহিত্যের প্রতিই হেলেনের বিশেষ অনুরাগ; তিনি ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে লিখিত সাহিত্য-গ্রন্থরাজি যাহা পাইলেন, একে একে পাঠ করিলেন। কবিতা ও ললিতকলায় এবং এমনকি নাট্যাভিনয় ও ছায়াচিত্র 'দর্শনে'ও তাঁহার বিশেষ রুচি জন্মে। অঙ্গুলিস্পর্শে মার্ক টোয়েনের হাস্যপরিহাস এবং এনরিকো কেরুসোর সুমধুর স্বর উপভোগ করিতেন। আঙুলের সাহায্যে পিয়ানোর তাল লয় কম্পন বুঝিয়া লইতেন। সাধারণ অন্ধ ও মূক-বধিরের একটা সুবিধা সংসারের 'সু' ও 'কু' কোন কিছুই তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। হেলেনের শৈশবেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুভূতিশক্তি যেমন প্রবল হয় তেমনি সংসারের সুখ-দুঃখও তাঁহাকে সমভাবে উদ্বেলিত করিতে থাকে। সালিভান (এই সময় মিসেস মেসি) লিখিয়াছেন, 'হেলেন

জানিত না এমন কোন বিষয়ই নাই। আমি তাঁহার নিকট হইতে কিছুই লুকাইয়া রাখিতাম না। তাঁহার বোধশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, কোন কিছু লুকাইয়া রাখা সম্ভবও ছিল না।' হেলেন নিজেও বলেন, 'সংসারের দুঃখকষ্ট কিছুই আমার অজানা ছিল না।' শৈশবে যখন প্রথম জানিতে পারিলাম যে, প্রত্যেকটি মানুষই প্রত্যেকটি মানুষকে ভালবাসে না, তখন তাঁহার মনে কতই না দুঃখ হইয়াছিল। তবে দৃষ্টিহীন ও মূক-বধির হওয়ায় একটি বিষয়ে তাঁহার পরম লাভ হইয়াছে। তাহা হইতেছে—তাঁহার গভীর আত্মদর্শন। আধিভৌতিক বিষয়াদি তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তাঁহার আত্মচরিত পাঠে আমাদের মনে এই ধারণাই জন্মে যে, সাধারণ লোক ও অন্ধ-মূক-বধিরদের মধ্যে তিনি কোন রকম পার্থক্যই করেন না। অন্যের দোষ-ত্রুটি তিনি বরাবরই ক্ষমার চোখেই দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মন আনন্দে ভরপুর। তাঁহার সঙ্গলাভে অতি বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তিও প্রাণে আনন্দ লাভ করে। হেলেনের মনে যে কখনও বিষাদের ছায়া পড়ে নাই এমন নয়, তবে তিনি তাহা বরাবর অতিক্রম করিয়া আনন্দের দিকেই নিজেকে চালিত করিয়াছেন। হেলেনের জীবনাদর্শ—'এগিয়ে চল, বাধা-বিঘ্ন অপসারণ কর, একটি বারও দাঁড়িয়ে থেকো না।'

হেলেন কেলারের জীবন দীন-দুঃখীদের সেবায় উৎসর্গীকৃত। অল্পবয়সে কখনও কখনও স্বীয় একাকিত্ব অনুভব করিয়া তিনি বেদনাবোধ করিতেন। কিন্তু তাহা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। তিনি ইহা কাটাইয়া নিজেকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার চিত্ত শুধু প্রসারলাভ করে নাই, তাঁহার সংস্পর্শে সহস্র সহস্র অন্ধ-মূক-বধিরও প্রাণে নূতন বল পাইয়াছে, তাহাদের প্রাণেও আশার সঞ্চার হইয়াছে। সেবা তাঁহার জীবনের মুখ্য আদর্শ; শুধু চিন্তায় বা কথায় নয়, কর্মের মাধ্যমে তিনি এই ভাবাদর্শ অন্ধদের মধ্যেও উদ্দীপিত করিয়াছেন। দুর্গতদের দুঃখ দূরীকরণে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া এবং তাহাদের জন্য সমাজের নিকট হইতে ন্যায়বিচার আদায় করিয়া হেলেন জগদ্বাসীর প্রীতি-শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। মার্কিন দার্শনিক উইলিয়ম জেম্স্ শুধু একটি শব্দে হেলেন কেলারের জীবনকথা ব্যক্ত করিয়াছেন—মানবজাতির নিকট তিনি একটি 'বর' বা 'আশীর্বাদ'।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, হেলেনের চিত্ত প্রথম হইতেই অন্ধ ও মূক-বধিরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি যেরূপ জীবনে সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছেন, অন্যেরাও যাহাতে সেইরূপ সুযোগ পায় তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত। তাঁহার ঐকান্তিকতায় ইহাদের প্রাণেও নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। যখন হেলেনের মাত্র বার বৎসর বয়স সেই সময়েই তিনি চা-পার্টির আয়োজন করিয়া অন্ধদের একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের জন্য দুই হাজার ডলার বা প্রায় ছয় হাজার টাকা তুলিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবেও প্রতিটি অন্ধ-মূক-বধিরকে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন। তিনি যখন কলেজে পড়িতেন সেই সময় অন্ধদের কারুশিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য ম্যাসাচুসেটস আইন-সভায় একটি বিল উত্থাপিত হয়; হেলেন ইহার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে নিউ ইয়র্কে চোখ ও কানের হাসপাতালের নিমিত্ত একটি নূতন ভবন

হেলেন কেলার চিঠির জবাব টাইপ করিতেছেন

দান উপলক্ষে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অন্ধদের জন্য গঠিত প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সহিতই তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। 'নিউ ইংলণ্ড হোম ফর দি ব্লাইণ্ড' নামক বিখ্যাত অন্ধ-প্রতিষ্ঠানটির তিনি একজন ট্রাষ্টী।

ব্রেল-পদ্ধতিতে লিখিত পুস্তকগুলির প্রচারেও তিনি সবিশেষ লিপ্ত রহিয়াছেন। ব্রেল-পদ্ধতির সর্বজনগ্রাহ্য একটি মান নির্ণয়ে তিনি ইউনেস্কোরও সহায়তা লাভ করিয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যেই পাঁচ বার বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলেও তিনি বহু বার যাতায়াত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য একই—কি করিয়া অন্ধদের সমস্যাগুলি নিরাকরণ করা যায়। তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন 'আমেরিকান ফাউণ্ডেশন ফর্ দি ব্লাইণ্ড'এর জন্য বিশ লক্ষ ডলার বা প্রায় ষাট লক্ষ টাকা তুলিবার নিমিত্ত। অনন্যপরতন্ত্র হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তিনি যে কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহার জন্য দেশ-বিদেশে তিনি প্রভূত সম্মানেরও অধিকারী হইয়াছেন। হেলেন কেলার জগতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মানবকে বন্ধুরূপে পাইয়াছেন—বার্ণাড শ, এলবার্ট আইনষ্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জবাহরলাল নেহরু, অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস, ডাক্তার জো ডেভিডসন

প্রভৃতি। গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড (১৮৯৩-৯৭) হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু প্রেসিডেন্টও হেলেনের বান্ধবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও হেলেন অন্ধদের সেবায় সময় ও শক্তি পুরাপুরি নিয়োজিত করিয়া আসিতেছেন। বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ দৃষ্টিহীন তাঁহার সেবার কথা স্মরণ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করেন; তাঁহাদের নিকট তিনি যেন মূর্ত্তিমতী আশা। হেলেন এখনও প্রত্যহ গড়ে আট-দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। প্রতিদিন সকাল ন'টার সময় তিনি কাজ করিতে বসেন—পুস্তক লেখেন, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ রচনা করেন, বক্তৃতা তৈরি করেন, আবার দেশ-বিদেশ হইতে যেসব চিঠিপত্র আসে তাহার জবাব দেন। হেলেন এ পর্য্যন্ত দশখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, প্রবন্ধ লিখিয়াছেন দুই শতেরও অধিক। প্রতি মাসে তিনি ছয়খানি মাসিকপত্র ব্রেল-পদ্ধতিতে বাহির করেন। ইংলণ্ড হইতে ইংরেজী ভাষায় একখানি এবং প্যারিস হইতে ফরাসী ভাষায় আর একখানি 'ওয়ার্ল্ড ডাইজেষ্ট'ও তাঁহার আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। ব্রেল-টাইপরাইটারে তিনি নিজেই টাইপ করেন। জগতে যে-কোন জায়গায় ব্রেল-পদ্ধতিতে পুস্তক রচিত হউক, বা খুচরা লেখা বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হউক না কেন, সব খবরই হেলেনের নখদর্পণে।

হেলেন দয়ালু, বুদ্ধিমতী, জ্ঞানবৃদ্ধা, আশ্চর্য্য ব্যক্তিত্বসম্পন্না, একান্ত আশাশীলা, অথচ অত্যন্ত বিনয়ী।

হেলেন সর্ব্বদাই সুখী। তাঁহার বিস্তর বন্ধু—যাঁরা অসম্ভব বিস্ময় উৎপাদন করে, কাজও তাঁহার প্রচুর। নিজের দৃষ্টিহীনতার কথা কচিৎ তাঁহার মনে হয়—এজন্য তাঁহার কোন দুঃখ বোধ হয় না। মনে যে কখনও আকাঙ্ক্ষা না জাগে এমন নয়, কিন্তু পুষ্প-রাজির মধ্যে একটা হাল্কা হাওয়ার মত উহা চলিয়া যায়। ফুলগুলির মত তিনিও আবার ধীরস্থির হন।*

* "The Story of Helen Keller" শীর্ষক প্রবন্ধের শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-কৃত সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

ফাল্গুনের গান

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

তোমারে শোনাব ব'লে গাই আমি ফাল্গুনের গান,
সে গানে কি পাও টের দক্ষিণের ব্যাকুল বেদনা,
সচকিত অরণ্যের রোমাঞ্চিত চঞ্চল চেতনা;
ঘূর্ণাবেগে ঝরাপাতা ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুত ধাবমান।
শান্ত তটিনীর বুকে অকস্মাৎ উঠে কলতান,
রিক্তশাখ তরু—কার স্পর্শ লভি' একান্ত উন্মনা,
অন্তরের তন্ত্রে তন্ত্রে সঞ্চারিত তারি উন্মাদনা,
অনন্ত আবেগে শুধু উচ্ছ্বসিয়া ছন্দে উঠে প্রাণ।

তুমি জান, আমি জানি, আর কেউ জানে না তা জানি,
সে গান কিসের গান, কোন্ অর্থ সে-সব কথার!
মর্ম্মরিত বনভূমি, বেদনায় নিঃস্বনিত বাণী,
বসন্তে সে বাজে সুর আনন্দ না নিবিড় ব্যথার?
তাইতো তোমার তরে ফাল্গুনের সেই গান আনি,
হৃদয়ের বর্ণময় বিকশিত পুষ্পের সম্ভার।

ভ্রম-সংশোধন

ফাল্গুন ১৩৬১,	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	হইবে না	হইবে
	৫৯৫	২	১৯	ঋণপতির	ধনপতি
	৫৯৮	২	১৭-৮	'রেখামাত্রমপি ক্ষুন্নাদোমনোবর্ত্মনঃপরম্'	'রেখামাত্রমপি ক্ষুন্নাদামনো

ফিনল্যাণ্ডের নীরব বিজ্ঞান-সাধক এ. আই. ভির্তানেন

এমন অনেক বিজ্ঞান-সাধক আছেন যাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র 'কাজ'। লোকচক্ষুর অন্তরালে একাগ্র নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানের সাধনায় রত থাকিতেই তাঁহারা ভালবাসেন। ভাগ্য অনুকূল হইলে এক দিন তাঁহাদের প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা গবেষণাগারের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে, তাঁহাদের যশোগানে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করা সত্ত্বেও তাঁহারা সাধনায় বিরত হন না। তাঁহাদের নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার দানে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়া থাকে, তাঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

গবেষণাগারে অধ্যাপক ভির্তানেন এবং তাঁহার জাপানী ছাত্র ডক্টর তোশিরো ইয়ামাদা

গোলাবাড়ীতে গো-সেবারত অধ্যাপক ভির্তানেন

ফিনল্যাণ্ডের অধ্যাপক আর্ত্তুরি আই ভির্তানেন হইতেছেন এমনি একজন নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক এবং নিরলস কর্ম্মী, ১৯৪৫ সনে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই ফিনদেশীয় বৈজ্ঞানিক সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত তাঁহার আবিষ্কৃত এ. আই. ভি পদ্ধতির জন্য। এই পদ্ধতি দ্বারা পশুখাদ্য তাজা রাখা যায় এবং দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় মাখন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই আবিষ্ক্রিয়া সম্পন্ন হয় দীর্ঘকাল পূর্ব্বে এবং তাহার পর হইতে তিনি মানবজাতির হিতকল্পে আরও অনেক কিছু দিয়াছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি তিনি হেলসিঙ্কির বায়ো-কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রধানরূপে কর্ম্মরত আছেন। পৃথিবীর সকল স্থান হইতে জ্ঞানের সন্ধানে যে সকল তরুণ বৈজ্ঞানিক এখানে আসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে যথোচিত নির্দ্দেশ-প্রদান এবং সহায়তা করাও তাঁহার এখানকার কৃত্যসমূহের অঙ্গীভূত।

ঊনষাট বৎসর বয়সেও অধ্যাপক আর্ত্তুরি আই ভির্তানেন সুস্থ

এবং সবল আছেন। তাঁহার নিয়মিত জীবনযাত্রা-প্রণালী ইহার মূল কারণ। তিনি পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইয়া থাকেন, গাড়ীতে চড়িয়া বেড়ানো পছন্দ করেন না—একবার তিনি বলিয়াছিলেন যে, এটা রীতিমত বিরক্তিকর।

শিশু, কিন্তু পেকা এখন বড় হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে স্কী-ক্রীড়ায় বেশ পটু হইয়া উঠিতেছে। গোলাবাড়ীটি দুই শত বৎসরের পুরনো। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার মালিকানা হয় ভির্তানেনের। দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ওলাভি ভির্তানেন পারিবারিক জোতজমার কাজ চালায়। অধ্যাপক মহাশয় সেখানে প্রায়ই ব্যবহারিক পরীক্ষাদি পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, "আমি গরুগুলির ধরণধারণ লক্ষ্য করিতে ভালবাসি। তাহাদের সকলেরই স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন রকমের এবং তাহাদের উপর বিভিন্ন জিনিষের প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন প্রকার—গরুগুলিকে বোকা বলা হাস্যকর।"*

পৌত্রের স্কী-ক্রীড়া অবলোকনরত অধ্যাপক ভির্তানেন

যে তিন জন বৈদেশিক গবেষক ইদানীং উক্ত রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে গবেষণা-কার্য্য এবং অধ্যয়ন করিতেছেন, জাপানের নাগোইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. তোশিরো ইয়ামাদা তাঁহাদের অন্যতম। চৌদ্দটি দেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক— তন্মধ্যে তিন জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের— অধ্যাপক ভির্তানেনের নিকট বৈজ্ঞানিক বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন। তদুপরি তিনি পনেরটি দেশের উনচল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বায়োকেমিক্যাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের অধিকর্ত্তারূপে অধ্যাপক ভির্তানেন সপ্তাহে এক দিন কফির আসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্ম্মীদের সঙ্গে গালগল্পে যোগ দেন। আপাতদৃষ্টিতে মিতবাক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তিনি আলাপ করিতে ভালবাসেন, এই বৈজ্ঞানিকটির রসবোধ আছে এবং তাঁহার রসিকতাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া সহকর্ম্মীদের আনন স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

ভির্তানেনের ফার্ম্মে এ. আই. ভি. পদ্ধতিতে পশুখাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ১৯২৫ সনে এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় এবং এখন সমগ্র পৃথিবীতে ইহা অনুসৃত হইয়া থাকে। ঐ সময় হইতে এই 'ফিনিশ' বৈজ্ঞানিক অন্য দেশে গিয়া কাজ করিবার অনেকগুলি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—স্বদেশকে তিনি তাঁর সারাজীবনের কর্ম্মভূমি বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন।

অধ্যাপক ভির্তানেন সবচেয়ে বেশী খুশী হন ফার্ম্মে গিয়া অবস্থান করিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিলে। সেখানে তিনি তাঁর পরিবারের লোকেদের সাহচর্য্য লাভ করিতে পারেন। তাঁহার নাতী-নাতনীর সংখ্যা পাঁচটি। তন্মধ্যে দুইটি এখনও নিতান্তই কোলের

বর্ত্তমান জার্ম্মানীর নানা প্রসঙ্গ

জার্ম্মানীর পুনর্ম্মিলন

সম্প্রতি পশ্চিম জগতে জার্ম্মানীর পুনর্ম্মিলন সম্বন্ধে প্রকাশিত মন্তব্যের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। তন্মধ্যে কতকগুলি পশ্চিম জার্ম্মানীতে প্রভূত বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। একদল লোক ঘোষণা করেন যে, পুনর্ম্মিলনের জন্য জার্ম্মানীর আকাঙ্ক্ষা বাস্তব নহে, আর এক মহল হইতে এই পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছে যে, পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিত্রপক্ষসমূহের কথা বিবেচনা করিয়া ফেডারাল রিপাব্লিকের পুনর্ম্মিলনের সকল চিন্তা বাদ দেওয়া উচিত। তৃতীয় আর একটি দল আবার জার্ম্মানীর বিভাগ বজায় রাখিয়া চলার সুযোগ-সুবিধা প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

ফেডারাল রিপাব্লিক সরকার এবং বিরুদ্ধপক্ষের সাময়িক মত-সংঘাতের অপব্যাখ্যাকে উপরোক্ত প্রতিক্রিয়ামূলক মন্তব্যসমূহের মধ্যে কোন কোনটির কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি ভিতরকার কথা জানেন না তাঁহার পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা কঠিন হইবে যে, এতাদৃশ মতভেদ সত্ত্বেও দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মধ্যে মূলগত বিষয়ে যথেষ্ট ঐক্য বিদ্যমান। আজিকার দিনের দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ঐকমত্য আছে—উভয়েই পুনর্ম্মিলন চায় এবং উভয়েই ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের পক্ষপাতী।

যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিকারী তাঁহারা মনে করেন যে, পশ্চিমের সহিত ঘনিষ্ঠ মৈত্রীই কেবলমাত্র পুনর্ম্মিলন সংঘটনের উপযোগী অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারে, অন্যদিকে বিরুদ্ধ পক্ষের ধারণা এই যে, এই ধরণের মৈত্রীর ফলে পুনর্ম্মিলন ব্যাহত হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র ইউরোপ এবং জার্ম্মানী এতদুভয়ের ঐক্যবিধানের পদ্ধতি লইয়াই মত-সংঘর্ষ বিদ্যমান।

---

* "Finlandia Pictorial" অবলম্বনে

একটি বিষয় কিন্তু নিশ্চিত। যদি জার্মানীর পশ্চিমা মিত্রবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে, প্রকাশ্যভাবে এমনকি সরকারীভাবে পর্য্যন্ত দাবি করিতে আরম্ভ করিতেন যে, পুনর্মিলনের কল্পনা পরিহার করা হোক্, তাহা হইলে তাহার দরুন চ্যান্সেলারের নীতির মূল ভিত্তিই নষ্ট হইয়া যাইত। আজিকার দিনে জার্মান জনগণ উক্ত নীতির উপর আস্থাবান এই কারণে যে, তাহারা পশ্চিমের সহিত মৈত্রী এবং জার্মানীর পুনর্মিলন সমভাবে কামনা করে এবং এই আশা পোষণ করে যে প্রথমোক্তটি দ্বারা শেষোক্তটির পথ সুগম হইবে।

বার্লিনে আন্তর্জাতিক শতরঞ্চক্রীড়া-প্রতিবোগিতা

চ্যান্সেলারের নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পরবর্ত্তীকালীন ঘটনাসমূহের ক্রমপরিণতি দ্বারা যদি প্রমাণিত হইত যে, উক্ত নীতি যে পশ্চিমা জগতের মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা এখন আর জার্মানীর পুনর্মিলনের সমর্থন করে না এবং সাম্প্রতিক চুক্তির সময় যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল সেগুলি মানিয়া চলিতে অনিচ্ছুক, তাহা হইলে তাহার দরুন জার্মানীর রাজনীতিক্ষেত্রে একটা পুরাপুরি ওলটপালট হইয়া যাইত এবং যুদ্ধোত্তরকালে এই দেশে যে সকল প্রগতিমূলক কার্য্য হইয়াছে তাহার ভিত্তিই বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

সৌভাগ্যক্রমে জার্মানীর এই পুনর্মিলনের ব্যপারে কোন কোন সংবাদপত্র এবং ভাষাকার অপেক্ষা সরকার অধিকতর সুবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমেরিকা এবং ইংলণ্ড উভয়েরই সরকারী মহল সম্প্রতি নূতন করিয়া জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, জার্মানীর পুনর্মিলন ছাড়া পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কাজেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য তাঁহাদের দেশসমূহ সাধ্যমত চেষ্টা করিবে।

জার্মানীতে শতরঞ্চখেলার ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা

একদা জার্মানী শতরঞ্চ বা দাবাখেলায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। শতবর্ষ পূর্ব্বে জার্মানীতে শতরঞ্চখেলার গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা। তখন অধ্যাপক এডল্ফ আণ্ডেরসেন দাবাখেলায় প্রথম 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন' হন। ইহার পর প্রায় দুই দশক ধরিয়া শতরঞ্চখেলায় অসাধারণ প্রতিভাশালী ড. ইমানুয়েল ছিলেন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর শতরঞ্চখেলার এই গৌরবময় যুগের অবসান হয়।

পরবর্ত্তী কুড়ি বৎসর জার্মানীতে দাবাখেলার ক্রমাবনতির সময়। ক্রমে শ্রেষ্ঠ জার্মান দাবা খেলোয়াড়দের নাম ও কৃতি পুরনো কাহিনীমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। বিখ্যাত খেলোয়াড়গণ জাতিগত কারণে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন। এমন কি ডাঃ লাসকের এবং ডাঃ টারাশের মত শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দ্বয় পর্য্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গিয়া বসবাস করিতে বাধ্য হইলেন।

"হাণ্ডবল" খেলা

আজ আবার জার্মানীতে দাবাখেলার পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। এই দেশে আবার ইহা ক্রমোন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। অতি আধুনিকতম আন্তর্জাতিক শতরঞ্চক্রীড়া-প্রতিযোগিতায়—বিশেষ ভাবে আমষ্টারডামে যেটি অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কয়েকজন অসাধারণ গুণী তরুণ জার্মান খেলোয়াড় যোগদান করেন। লোকেরা যাহাতে দেশের অশান্ত সমস্যা সম্বন্ধে অকারণে অতিরিক্ত চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন না হয় সেজন্য সাম্প্রতিককালে জার্মানীতে দাবাখেলার উন্নয়নের জন্য প্রভূত চেষ্টা চলিতেছে। সোভিয়েট-অধিকৃত অঞ্চলে দাবাখেলাকে সাধারণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার অন্যতম অঙ্গ হিসাবেও গণ্য করা হয়।

পশ্চিম জার্মানীতেও ইহার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭৭ সনে প্রতিষ্ঠিত জার্মান শতরঞ্চক্রীড়া সমিতির অধীনে বর্ত্তমানে ২০০০টি শতরঞ্চ ক্লাব আছে এবং এগুলির বর্ত্তমান সদস্য-সংখ্যা এক লক্ষ। এই সকল ক্লাব ফেডারাল রিপাব্লিকের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে।

জার্ম্মানীর বর্ত্তমান বর্ষের ক্রীড়াকৌতুক

জার্ম্মানীতে বর্ত্তমান বৎসরের আসন্ন ক্রীড়া-কৌতুকের তোড়জোড় যথারীতি সুরু হইয়া গিয়াছে। অলিম্পিক ক্রীড়া-বর্ষের ধারার অনুবর্ত্তন করিয়া এবার জার্ম্মানীতে ছয়টি বিশ্ব-ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। বার্লিন এবং গ্যাস্মশ-পার্টেন কারচেনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার সময় অপেক্ষা অধিকসংখ্যক ক্রীড়া-তারকা সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে আসিয়া সমবেত হইবেন। তদুপরি এই অনুষ্ঠানে এমেচার বক্সিং (বার্লিন) এবং জিমনাষ্টিক্স (ফ্রাঙ্কফোর্ট) প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ নির্দ্ধারিত হইবে।

বার্লিনে "গ্রীন উইক" উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দুরূহতম উল্লম্ফন-প্রতিযোগিতা। দুই জন অশ্বারোহী এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়

'তুষার-হকি' প্রতিযোগিতা ডাসেলডর্ফ, ক্রেফিল্ড এবং কলোনে এই মাসেই অনুষ্ঠিত হইবে। চার সপ্তাহ পূর্ব্বেই ইহার প্রায় সমস্ত প্রবেশ-টিকিট বিক্রী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার এই শাখার অনুরাগীরা বর্ত্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইউ.এস.এস.আর. টিম এবং কানাডীয় টিমের প্রতিযোগিতার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছে। কে জিতে, কে হারে ইহা লইয়া এখন হইতেই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা সুরু হইয়া গিয়াছে। সে যাই হোক, বর্ত্তমান বর্ষের 'আইস হকি' প্রতিযোগিতা যে ক্রীড়া-কৌতুকের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এপ্রিল মাসে কার্লস্রুহেতে গ্রীক এবং রোমান পদ্ধতিতে তিন শত পঞ্চাশটি ব্যক্তিগত কুস্তি-প্রতিযোগিতা হইবে। বহু দেশ ইহাতে প্রতিনিধিত্ব করিবে—রাশিয়ানরাই প্রথমে এই অনুষ্ঠানে তাহাদের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে।

বিখ্যাত অক্টোবর উৎসবকালে মিউনিক হইবে আন্তর্জ্জাতিক ভার-উত্তোলন-প্রতিযোগিতার রঙ্গভূমি। পৃথিবীর বলিষ্ঠতম ব্যক্তি হইতেছেন আমেরিকার নবার্ট শেমান্স্কি যিনি ৪৮৭.৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করিতে পারেন! জীবিতদের মধ্যে কেহই আজও পর্য্যন্ত তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই এবং সকলেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, মিউনিকে তিনি তাঁহার 'বিশ্ব বিজয়ী' পদবী বজায় রাখিতে পারিবেন। যাহাই হউক, এই প্রতিযোগিতায় পঁচিশটি দেশ তাহাদের শ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলনকারীদের পাঠাইবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউ.এস.এস.আর. টিমগুলির মধ্যে কিছু প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

জুলাই মাসে ডর্টমাণ্ডে উনিশটি বিভিন্ন দেশের 'হ্যাণ্ডবল টিম' পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইবে। জার্ম্মানী হইতে এই ক্রীড়ার উদ্ভব বলিয়া, এই দেশের টিম স্বীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। বিশেষজ্ঞেরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, এই প্রতিযোগিতায় জিতিবে হয় জার্ম্মানী, নয় সুইডেন।

প্রাচীন নগরী আচেনের অধিবাসীরা ব্যাকুল আগ্রহে জুলাই মাসের প্রতীক্ষা করিতেছে, যখন দুনিয়ার সেরা 'শো-জাম্পিং' অশ্বারোহীরা সেখানে মিলিত হইবেন। সোয়েরষ্টালের ঘোড়দৌড়ের মাঠে পঁচিশটি দেশের ঘোড়সওয়ারগণ পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইবেন। সকলেই আশা করিতেছে যে, আচেনে জার্ম্মান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন এইচ. জি. উইঙ্কলার মুখ্যতঃ স্প্যানিশ এবং ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় 'বিশ্ববিজয়ী' পদবী বজায় রাখিতে সমর্থ হইবেন। জার্ম্মান 'বোলার'গণ সেপ্টেম্বর মাসে এসেনে তাঁহাদের আন্তর্জ্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে স্বাগত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। কেবলমাত্র নারী-বোলাররাই এবার হতাশ হইবেন, কেননা ১৯৫৫ সনে তাঁহাদের জন্য কোনো বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা হয় নাই।

ন. ভ.

নারী এবং শিশুদের জন্য কল্যাণকার্য্যে রত সমাজ-কল্যাণ সংস্থাসমূহের প্রতি অর্থসাহায্য প্রদান সম্পর্কিত নিয়মাবলী

১। ১১-এ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটস্থ পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের (West Bengal Social Welfare Advisory Board) আপিসে প্রাপ্তব্য রেগুলেশন ফরমে, রবিবার ভিন্ন সপ্তাহের অন্য যে-কোনও দিন বেলা ১১-৩০ মিনিট হইতে বেলা ২টার মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।

২। অর্থসাহায্যের নিমিত্ত আবেদন এক বৎসরের জন্য—১লা এপ্রিল '৫৫ হইতে ৩১শে মার্চ্চ ১৯৫৬ পর্য্যন্ত, করা যাইতে পারে।

৩। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অর্থসাহায্য অনুমোদন করা হইয়া থাকে।

(১) নার্শারি স্কুল, বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য জলখাবার।

(২) গ্রন্থাগার।

(৩) ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা (sports) এবং ক্রীড়া-কৌতুক (games) প্রভৃতির সাজ-সরঞ্জাম।

(৪) খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম।

(৫) স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহ।

(৬) মাতৃমঙ্গলকেন্দ্রসমূহ এবং সন্তানজন্মের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অবস্থা।

(৭) নারী এবং বালিকাদের জন্য শিল্প-বিদ্যালয় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ।

(৮) হাসপাতাল, মাতৃমঙ্গলকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত নারীদের শিক্ষা।

(৯) শারীরিক অথবা মানসিক অপটুতাগ্রস্ত নারী এবং শিশুদের জন্য হোম বা নিকেতন।

(১০) শ্রমোপজীবিনী মায়েদের কার্য্যকালে শিশুদের রক্ষণের সাধারণ স্থান (creches)।

(১১) বয়স্কা স্ত্রীলোকদের জন্য হোম বা প্রতিষ্ঠান।

(১২) রোগ সারিবার অব্যবহিত পরেকার সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদির নিকেতন।

(১৩) অপরাধপ্রবণ শিশু এবং শিক্ষানবীশদের জন্য হোষ্টেল ও কারখানা।

(১৪) শিশু এবং নারী-কয়েদীদের স্বল্পকাল অবস্থানের গৃহ।

(১৫) অনাথ বালকদের জন্য ক্রীড়াকেন্দ্র এবং খেয়াল-খুশীর (hobby) ক্লাস।

(১৬) পুনঃপ্রেরণের (Remand) নিকেতন।

(১৭) অনাথ আশ্রম এবং কুড়াইয়া-পাওয়া ছেলে-মেয়েদের প্রতিষ্ঠান।

(১৮) যে সকল নারী এবং শিশুকে উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠান।

(১৯) নিঃস্ব স্ত্রীলোকদের প্রতিষ্ঠান।

(২০) শিশুদের ক্রীড়াক্ষেত্রের সাজ-সরঞ্জাম।

৪। যে প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী এবং যাহার পৃথক পৃথক পরীক্ষিত হিসাবপত্র আছে, সেই প্রতিষ্ঠান অর্থসাহায্যের জন্য আলাদা আলাদা ফরমে আবেদন করিতে পারে।

৫। সম-পরিমাণ দান

(ক) নূতন সংস্থাসমূহকে স্বেচ্ছামূলক সেবা, হাতের কাজ অথবা অন্য প্রকার সমপরিমাণ সাহায্যদানের দ্বারা পর্ষদের অর্থসাহায্যের জুড়ি হইতে হইবে।

(খ) অন্ততঃ তিন বৎসর ধরিয়া পরিচালিত সংস্থা-সমূহ কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের নিকট যে পরিমাণ অর্থ-সাহায্য চায়, তাহাকে তাহার সম-পরিমাণ সংস্থান দেখাইতে হইলে তিন বৎসরের পরীক্ষিত হিসাব এবং প্রতিষ্ঠানের তিন বৎসরের সাকুল্য ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে হইবে।

৬। গৃহনির্ম্মাণখাতে সাহায্য—

কোন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত চালু ভবনের মেরামতি অথবা সম্প্রসারণকল্পে গৃহনির্ম্মাণ সাহায্য-খাতে ১৫০০০৲ টাকার জন্য আবেদন করা যাইতে পারে, কিন্তু উক্ত সংস্থাকে জমি অথবা নগদ টাকায় সমপরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখিতে হইবে।

৭। চিকিৎসা-সংক্রান্ত অথবা শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যের আনুকুল্যের জন্য গাড়ীর নিমিত্ত ১৫,০০০৲ টাকা পরিমাণ সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে। গাড়ীর রক্ষণ এবং সাজ-সরঞ্জামের ব্যয়নির্ব্বাহ সমপরিমাণ সাহায্যদান বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। অর্থসাহায্যের যাবতীয় আবেদনপত্র অবশ্যই ১৯৫৫ সালের ৩০শে এপ্রিলের পূর্ব্বে সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের আপিসে পৌঁছানো চাই।

৯। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে তিন বৎসরের পরীক্ষিত হিসাবের (Audited accounts) তিনটি নকলসহ দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

স্বাধীনতার পূর্ব্বে ও পরে ভারতের নারীদের মধ্যে সমাজ-কল্যাণ কর্ম্ম

শ্রীপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-লাভের পর সাত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত করে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার একটি সন্তোষজনক স্তরে পৌঁছিতে হইলে আমাদের দেশের স্বল্প-উন্নত (কোন কোন ক্ষেত্রে অনুন্নত) আর্থিক সংস্থান-সমূহের প্রচুর উন্নয়ন আবশ্যক। এটা আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের কথা যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নের গতিবেগের এরূপ দ্রুততা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন যাহা বাস্তবিকই ঈর্ষ্যার বস্তু, যদিও বৈদেশিক সচিবরূপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের একটি গৌরবজনক স্থানলাভের চেষ্টায়ই তিনি পরিপূর্ণভাবে ব্যাপৃত আছেন—অবশ্য এই কার্য্যে তিনি অপরিমেয় সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীতি হয়। উপরন্ত স্বাধীনতা আমাদের সেই প্রাচীন সাংস্কৃতিক আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে যাহা আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছিল যে, কেবলমাত্র কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগ, প্রেম এবং শান্তির ভিতর দিয়াই জীবন সফল এবং সার্থক হইতে পারে। এই ভাব আমাদের দেশ এবং জাতির সীমা অতিক্রম করিয়া দুরদুরান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং জগতের অনেক দেশ ও জনসমাজ আজ আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের জন্ত ভারতের দিকে তাকাইয়া আছে। পৃথিবীর মানুষেরা আজ ভগবদ্গীতা, বেদ এবং উপনিষদের এই উপদেশ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছে যে, সুখ কেবলমাত্র জড় উপকরণ আহরণ দ্বারা লভ্য নহে; তাহা অর্জন করিতে হইবে অধ্যাত্ম-উন্নয়ন, নিঃস্বার্থপরতা এবং নিষ্ঠা দ্বারা।

স্বাধীনতার পর ভারতবাসীদের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বসমূহ স্বভাবতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে, বর্ত্তমান জগতের দুইটি সমপর্য্যায়ভুক্ত মহতী শক্তিজোটের মধ্যে নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রাখিয়া ভারতবর্ষ যে অতুলনীয় মর্য্যাদা অর্জন করিয়াছে তাহার দরুন তাহার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য উভয়েরই গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সর্ব্বতোভাবে আদর্শস্থানীয় করিবার জন্ত আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাধীনতার পর আমাদের উপর এক দিকে যেমন গুরুতর দায়িত্ব বর্ত্তাইয়াছে, অন্ত দিকে তেমনি আমাদিগকে কাজও ঢের বেশী করিতে হইবে। নারী এবং পুরুষের যুগ্ম সহযোগিতা দ্বারা আমরা অধিকতর এবং উচ্চস্তরের কাজ সম্পন্ন করিতে পারি, কেননা নারী হইতেছে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতীয় সমাজ সকল সময়েই নারীদিগকে খুব উচ্চ ও গৌরবের স্থান দিয়া আসিয়াছে এবং নারীরা শুধু গার্হস্থ্য ব্যাপারে—সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে নয়, জাতীয় কৃত্যে অর্থাৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামেও অপরিহার্য্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

তিন দশক পূর্ব্বে ভারতীয় নারীর পক্ষে গৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পুরুষদের সহিত একাত্ম হওয়া এবং জাতিগঠনের দায়িত্বের অংশভাগিনী হওয়া প্রায় সম্ভবপর ছিল না। সমাজকর্ম্মীদের চেষ্টার ফলে খুব ধীরে ধীরে নারীরা পর্দ্দা পরিহার সুরু করে। বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর রেওয়াজ হয়—অবশ্য তা সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র একটা নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত। তখন যে-কোন স্তরেই সহশিক্ষা অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। আমার নিজের 'রাজ্য' (state) উত্তর প্রদেশে এই ধরণের পরিস্থিতি বর্ত্তমান ছিল। তিনটি প্রেসিডেন্সীতে কিন্তু অধিকতর উদার মনোভাববশতঃ পরিস্থিতি ছিল উন্নততর। কতিপয় উদার-চরিত ইংরেজ সমাজকর্ম্মী এবং আমাদের নেতৃবৃন্দ যথা—এনি বেসান্ট, মিসেস মার্গারেট কাজিন্স, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোখলে এবং অন্তান্ত ভারতীয়েরা ঐ সকল অঞ্চলে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের নারীসমাজ পূর্ব্বেই শিক্ষানুরাগিণী হইয়াছিলেন এবং ইহার প্রভাবে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হয় তাহার দরুন পর্দ্দা-প্রথার কুফলসমূহ বিলুপ্ত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে—যেমন মহারাষ্ট্রে নারীদের কখনও পর্দ্দাপ্রথা মানিয়া চলিবার রেওয়াজ ছিল না এবং এই সকল নারী যে উত্তম স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতাপূর্ণ মনোভাবের অধিকারিণী—ইহাই হইল তাহার মুখ্য কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা উল্লেখ করা উচিত যে, গত বৎসর পুণায় অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত নারী সম্মেলনের জয়ন্তী অধিবেশনে, ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরবয়স্কা নারীদের মধ্যে দু'হাজার জন শারীরচর্চ্চা-কৌশল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন। আমার

ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, আগামী বহু বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে আর কোনও অঞ্চলেই নারীদের দ্বারা এ ধরণের দেহানুশীলন প্রদর্শন সম্ভব হইবে না।

ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন ভারতে পর্দ্দাপ্রথা ছিল অজ্ঞাত। ইহা বিধাতার এমন একটি অভিশাপ যাহা আমাদের সমাজের বুকে স্থান করিয়া লয় মধ্যযুগে এবং ব্রিটিশ-রাজও এই পর্দ্দানশীনাদের কোনও লক্ষণীয় উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হন নাই। পর্দ্দার প্রভাবে নারীরা বহির্জগতের সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হন, এইরূপে তাঁহারা নিন্দনীয় রূপে সঙ্কীর্ণমনা হইয়া যান, এই কুফল উদ্ভবের মূলে এই বিষয়টিও নিহিত যে, পর্দ্দা তাঁহাদিগকে—মূলগত মানবীয় প্রয়োজন—শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করিবার জন্য অহিংস জন-প্রতিরোধকে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন তখন ভারতের অধি-কাংশ অঞ্চলে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্রতর আকারে পূর্ব্বোল্লিখিত ধরণের পরিস্থিতিই বিদ্যমান ছিল। জাতির প্রতি গান্ধীজীর আহ্বান কেবল পুরুষের প্রতি গণসংগ্রামে যোগদানের আহ্বান ছিল না, তাহা (কোন কোন দিক দিয়া বিশেষ ভাবে) ভারতীয় জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ নারীসমাজের উদ্দেশেও তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। গান্ধীজী বহুবার ভারতের নারীদের নিকট তাঁহার আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহার আবেদন ব্যর্থ হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ব্বদাই নারীত্বের পবিত্রতা এবং মহত্ত্বের উপর জোর দেওয়া সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামকালে নারীসমাজ পর্দ্দা-প্রথার কুফল উত্তরোত্তর বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন এবং স্বাধীনতালাভের পর এই কুফল তীব্রতর রূপে অনুভূত হইল। স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক নারীর পক্ষে পূর্ণ নাগরিকরূপে সমাজে তার বিধিসম্মত ভূমিকা গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই এই বোধ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে যে, যেহেতু পিতা মূলতঃ রুটির সংস্থানকারী এবং বাহিরে কর্ম্মব্যস্ত থাকেন, সেই হেতু পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের প্রধানা যিনি সেই মাতা যাহাতে তাঁর শ্রেষ্ঠতম দান পরিবারকে দিতে পারেন তন্নিমিত্ত তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের হাত-ধরাধরি করিয়া সংগ্রামের পথে যাত্রা করিয়াছিল—এক সঙ্গে তাহারা দুর্গতিভোগ করে এবং সমভাবে তাহাদের দায়িত্ব ভাগ করিয়া লয়। আমাদের দেশে কেন যে "সাফ্রেজিষ্ট" বা নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের প্রয়োজন হয় নাই, ইহাই হইতেছে তাহার মুখ্য কারণ, যদিও অন্যান্য অধিকাংশ দেশেই কেবলমাত্র দীর্ঘ সংগ্রাম তথা আন্দোলনের পরেই নারীরা রাজনৈতিক স্বীকৃতি এবং অধিকার অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশে কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়ের নিকট সমান সুযোগ-সুবিধা স্বাভাবিকভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং দুঃখভোগের মাধ্যমে।

স্বাধীনতার পূর্ব্বে সক্রিয় সমাজকর্ম্ম করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না, কেননা তৎকালে কর্ম্মীকে সহানুভূতিহীন পরিবেশের মধ্যে বহু বিভিন্ন দিকে সংগ্রাম করিতে হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে যাহা কিছু সম্ভবপর ছিল, তৎসমুদয়ই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়া-ছিল। সেই সময়ে নারীদের মধ্যে সমাজ-সচেতনতার সৃষ্টি করাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং হয়ত এখনও তাহাই সবচেয়ে বড় কাজ। তখন কোনও নূতন ভাব ও আদর্শ উপস্থাপিত করিলে লোকসমাজের অধিকাংশ এবং বিশেষ ভাবে কোন-না-কোন নারী তাহাতে প্রতিবন্ধের সৃষ্টি করিত। সমস্যাটি এই কারণে জটিলতাপূর্ণ ছিল যে, সামাজিক কলুষ (evil)-সমূহের সংখ্যা এবং প্রকারভেদের অন্ত ছিল না। সমাজ-উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর একটি জিনিষ যাহা আমাদের প্রয়াসকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়া আসি-য়াছে এবং কিয়ৎপরিমাণে এখনও করিতেছে, সেটি হইতেছে সেই মনোভাবের অস্তিত্ব যাহার নিকট সমাজ-কল্যাণ শুধু-মাত্র ব্যষ্টির প্রতি করুণাপ্রকাশ এবং ব্যষ্টিকে সাহায্যদান বলিয়া প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য আদর্শে সমাজ-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে খুব কমই স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতে কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা দেখিয়াছি যে, সামাজিক আইন কেবলমাত্র শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করে।

একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে, সামাজিক আইন প্রণয়ন অনাবশ্যক, কেননা কেবলমাত্র এবংবিধ পন্থাসমূহের মাধ্যমেই স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পক্ষে সমরূপ (uniform) বিধি সহ সামাজিক ন্যায়-বিচারের পরিবেশ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। কিন্তু যাবতীয় সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত প্রকৃত কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে কেবল-মাত্র রাজ্যের এজেন্ট বা প্রতিনিধিস্থানীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক কর্ম্মের দ্বারা এবং স্বেচ্ছামূলক সংস্থা-সমূহের প্রচেষ্টায়, আর সহ-অবস্থানকারী লোকেদের মধ্যে যাহারা ঐকান্তিক অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সমর্থ সেই সকল সমাজকর্ম্মীর কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের পল্লী-

গ্রামসমূহে সামাজিক আইনের সীমাবদ্ধ কার্য্যকারিতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—গ্রামীণ ভারতের উপর শারদা আইনের অকিঞ্চিৎকর প্রভাব, যদিও এই আইন পাস হইবার পর বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে একথা বোধগম্য হইবে যে, যখন কল্যাণকর্ম্ম ছিল বদান্য লোকেদের ব্যক্তিগত করুণার ব্যাপার তখন কেবলমাত্র উত্তম নৈতিক আদর্শসম্পন্ন হওয়া এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রবল অনুমোদন লাভই সমাজ-কর্ম্মীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইত। স্বাধীনতার পরে কিন্তু সমাজ-কর্ম্মীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কাজেই স্বতন্ত্র ধরণের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা উপলব্ধ হইতেছে যে, আমাদের বিশাল দেশের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকেরই। কথা বলা এবং বক্তৃতার পালা শেষ হইয়াছে এবং অবশ্যই তাহা হওয়া উচিত যদিও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে জোরালো ও প্রাসঙ্গিক (to the point) কথা কাজের সহায়ক হইয়া থাকে। আমাদিগকে সর্ব্বদা ঐকান্তিকতার সহিত কাজ করিতে হইবে এবং ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, যদি সুস্থ (sound) কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গড়িতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারসমূহ সংঘবদ্ধ সমাজ-কল্যাণকর্ম্মের প্রচুর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন—এই ধরণের সুযোগ-সুবিধা পূর্ব্বে ছিল না। ভারতে পরিকল্পিত কল্যাণ-কর্ম্মের সূচনা হইয়াছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে এবং কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ হইতেছে ইহার মূল কীলক (pivot) স্বরূপ। বিরাট আকারে অনুষ্ঠিত এই কল্যাণ-কর্ম্মের পরিকল্পনা ও সংগঠনের কৃতিত্ব অনেকখানি কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং সক্রিয় সঞ্চালিকা শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের। তিনি ব্যক্তিত্বশালিনী এবং কল্যাণ-কর্ম্মের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। ভারতের সমাজ-কল্যাণের অগ্রগতির পক্ষে এটা বাস্তবিকই সৌভাগ্যের বিষয় যে, তিনি সকল কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী বেসরকারী সমাজ-কল্যাণ সংস্থাসমূহের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য এখন লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে, আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে—স্বেচ্ছামূলক চেষ্টা দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে দিবার জন্য চার কোটি টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সম্পর্কে অর্থবণ্টন বিধিসঙ্গত (regularize) করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অংশে যাইবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৩ সনে দিবার জন্য যে পঁচিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাবে তন্মধ্যে মাত্র ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইয়াছিল।

এখন আমার ভগিনীদিগকে এই প্রশ্ন করিবার মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত যে, তাঁহাদের স্বদেশকে সামাজিক দিক দিয়া উন্নীত করিবার এই যে সুবর্ণসুযোগ স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাঁহারা কি তাহাকে কাজে লাগাইতে প্রস্তুত আছেন। খণ্ডশঃ অনুষ্ঠিত সামান্য সমাজসেবা বস্তুতঃ আমাদের পক্ষে সহায়ক হইবে না। শিক্ষিত নারীদিগকে অবশ্যই নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে এবং ভারতের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এমন হইতে পারে যে, দীর্ঘ সংগ্রামের পর আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এমন সব শত সহস্র তরুণী আছেন, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজগুলিতে শিক্ষালাভ করিতেছেন অথবা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আর স্কুলে যাঁহারা শিক্ষা অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ত ঢের বেশী। এখানে একটু থামিয়া আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা কেবলমাত্র পার্থিব উন্নতির জন্যই এই শিক্ষালাভের চেষ্টা করিতেছেন কিনা। যদি তাহাই হয় তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, ভারতবর্ষ তাহার জনগণের নিঃস্বার্থপরতার দ্বারা আজ যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা বজায় রাখিতে পারিবে না, তাহা হইলে অবশ্য যে-কোন দিকে এই দেশ একাকী পদক্ষেপ করিতে পারে।

যদি পশ্চাদ্‌গতি আমাদের কাম্য না হয় তাহা হইলে আমাদের পক্ষে বিপুল চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। আমাদিগকে ইহা উপলব্ধি করিতেই হইবে যে, প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্যেই ভবিষ্যতের কতকগুলি সম্ভাবনা এবং শক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং আমরা যদি আমাদের দেশ হইতে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে ঐকান্তিকতার সহিত অগ্রসর হই তাহা হইলে আমাদের মধ্যে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ তাঁহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, তরুণদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কৃত্য এবং দৃষ্টান্তের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। এক সময় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের যুবশক্তিকে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, যদি আমরা আত্মমর্য্যাদাশালী দেশের অধিবাসীরূপে টিকিয়া থাকিতে চাই তাহা হইলে আমাদের পক্ষে আর তিলমাত্র সময় নষ্ট করাও সমীচীন নয়। আমাদিগকে অবিলম্বে ভারতের যুবশক্তিকে সংগ্রামের জন্য তৈরি করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাদের মাধ্যমেই সমাজ-কল্যাণকর্ম্মরূপ বিরাট

কর্ত্তব্যতার গ্রহণ করা সম্ভব হইবে। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহাদিগকে স্বাধীনতার পূর্ব্বে সামান্ত অর্থ-প্রাপ্তির জন্ত অথবা কোন কাজ সম্পন্ন করাইয়া লইবার জন্ত বৎসরের পর বৎসর সংগ্রাম করিতে হইত, কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এখন আর সুযোগ-সুবিধার অভাব নাই এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ অথবা দুরূহ কর্ম্ম হাতে লইলে অর্থের সংস্থান হওয়াও কঠিন নয়। সুতরাং এই কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক তরুণবয়স্কা মেয়ের যে দায়িত্ব রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে সচেতন করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা গঠিত হইতে পারে না, ইহা যৌথ দায়িত্বের সৃষ্টি। নিকট-অতীতে আমরা যে নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছি তৎসত্ত্বেও আমার মনে হয় যে, ভারতবাসী আমরা স্বভাবতঃই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্ব-মতের প্রতি আমাদের আসক্তি অত্যধিক এবং আমরা সহজে কোন যৌথ-কার্য্যের ভার লইতে পারি না। অতএব আমাদের পক্ষে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কেননা বড় কিছু পাইতে হইলে আমাদিগকে সমবেত ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ব্যক্তিগত ভাব এবং আদর্শকে বৃহত্তর আদর্শের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে হইবে এবং এমন সব পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে যাহা সকলের জন্ত কার্য্যকরী করা প্রয়োজন। ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, অনেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের মৌলিক পরিকল্পনাগুলিকে কর্ম্মে রূপায়িত করিবার জন্ত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসা সত্ত্বেও সুযোগের অভাবে সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবাবেগ ও মনোভাবকে চাপিয়া রাখিয়া, আমরা সকলে আগাইয়া আসিতে পারি এবং ব্যক্তিগত ভাবাদর্শকে বৃহত্তর স্বার্থে বিলীন করিয়া দিয়া তৎসমুদয়কে বাস্তব পরিকল্পনায় রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারি। এই ব্যাপারে আমাদের সবাইকে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমরা এমন এক দল সৈনিক যাহাদিগকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রগঠনের জন্ত কঠোর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

সাধারণভাবে দেশের উন্নয়নের জন্ত আমাদিগকে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আমাদের কর্ম্মক্ষমতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সম্মুখে যে-সকল স্কীম উপস্থাপিত করা হইবে সেগুলিকে কার্য্যকর করিবার জন্ত আমাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগাইয়া আসিবে। কৃতকার্য্যতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে গঠন-মূলক কল্যাণ-কর্ম্মের সময় যাবতীয় দলগত রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত মতবৈষম্য ভুলিয়া যাওয়ার উপরে। সকল সমাজ-কর্মীর চরম লক্ষ্য হইবে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ এবং গৃহ্যতামুক্ত জাতিগঠন।

পশ্চিম এবং উত্তর ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার কতকগুলি দেশে ভ্রমণের সুযোগ আমার হইয়াছিল। তথাকার সামাজিক পরিস্থিতিসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে যে, ঐ সকল দেশের অধিকাংশেরই অনেক পিছনে পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারা পরিকল্পনা এবং স্কীমগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্ত এখনও পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকই মনে করে যে, ঘর-গৃহস্থালির তত্ত্বাবধান এবং রান্নাবান্নার কাজ—এইটুকু হইলেই দৈনন্দিন কাজ যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক করা হইল। যিনি এ ধরণের চিন্তা করেন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার ঘর-সংসারের কাজ যথোচিত নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় না, কিন্তু যদি তাহা হইত তাহা হইলে এ ধরণের চিন্তা তাঁহার মনে উঠিত না। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমরা বিজ্ঞানসম্মত এবং অর্থনীতিসম্মত ভাবে আমাদের কাজ করিতে সমর্থ হই না। প্রত্যহ আমরা যে খাদ্য পরিবেশন করি, আমাদের মধ্যে কয়জন তাহার খাদ্যগুণ (Food value) সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন। এই সম্পর্কে উপযুক্ত পদ্ধতিতে অধিকতর শিক্ষা-দান আবশ্যক।

আমাদিগকে শুধু যে যথোচিতভাবে আমাদের গৃহ এবং পরিবারের তত্ত্বাবধানের শিক্ষাই গ্রহণ করিতে হইবে তেমন নয়, সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময়ও আমাদিগকে করিয়া লইতে হইবে এবং সেইজন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি বিনিয়োগ করিতে হইবে। রাজনৈতিক বিরোধ এবং মতের পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া যাবতীয় বৃহত্তর কল্যাণসাধনের জন্ত আমাদিগকে একযোগে কাজ করিতে হইবে। বর্ত্তমান ভারতে আচার্য্য বিনোবা ভাবের "ভূদান" এবং সম্পত্তিদান একটি নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিতেছে। পণ্ডিত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক "বিদ্যা-দান"ও ক্রমবর্দ্ধমান রূপে আচরিত হইতেছে। আমাদের নারীসমাজকে চরিতার্থতা খুঁজিয়া পাইতে হইবে সেবাদানের শক্তির মধ্যে। লোকান্তরিতা সরোজিনী নাইডুর মতে, সময়ের সঙ্গে ফ্যাশন বা রীতির পরিবর্ত্তন হয়। কি পরিমাণ সেবাদান আপনি করিতে পারেন—ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান

কালের আধুনিকতম ফ্যাশন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এলাহাবাদে নারীদের এক বিরাট সভায় শ্রদ্ধেয়া সরোজিনী নাইডু কর্ত্তৃক এই উপদেশ প্রদত্ত হয়। আমরা যেন এই শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকা, নেত্রী এবং আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির অনুরাগিণী ও ব্যাখ্যাকারিণীর যোগ্য উত্তরসাধিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারি।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ

শ্রী এম. রঙ্গনায়কী

প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদনের উপর ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের উদ্ভব হইয়াছে এবং এক বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল যাবৎ উহা কাজ চালাইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশে যে সকল স্বেচ্ছামূলক সংস্থা নারী, শিশু এবং সাধারণ কল্যাণকর্ম্মের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য কাজ করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করাই এই পর্ষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ পর্য্যন্ত এই সকল স্বেচ্ছামূলক সংস্থার প্রতি কোন প্রকৃত সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য্য যে, কোন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনে এই সকল সংস্থা অপরিহার্য্য, কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার খুব ন্যায্যভাবেই এতৎ-সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছেন এবং জনগণের এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ হইতেছে একটি স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা (body)। স্বেচ্ছামূলক সমাজ-কল্যাণ সংস্থা এবং পার্লামেন্টের দুইটি সভার প্রতিনিধিবৃন্দ ইহার সদস্য—শ্রীমতী দুর্গবাঈ দেশমুখ ইহার চেয়ারম্যান এবং নেতৃস্থানীয়া। পর্ষদকর্তৃক সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে চার কোটি টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে পর্ষদ এই কার্য্যে প্রভূত সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার মুখ্য কারণ এই যে, পর্ষদ একটি স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে।

ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক সমস্যাসঙ্কুল একটি বিশাল দেশ। যে সকল স্বেচ্ছামূলক সংস্থা সমাজ-কল্যাণ কার্য্যে গভীরভাবে ব্যাপৃত আছে, সমপরিমাণ সাহায্যের ভিত্তিতে অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ তাহাদের আনুকূল্য করিতেছে। এ পর্য্যন্ত যে ১৫২৯টি প্রতিষ্ঠান সাহায্যের জন্য আবেদন করে তন্মধ্যে ১০০৮টি পর্ষদ কর্ত্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছে। পর্ষদের সাহায্যের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়াছে ১৫ হাজার টাকা। সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের নিমিত্ত। অর্থসাহায্য বিতরণ এবং উক্ত অর্থ কি ভাবে ব্যয়িত হয় তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য পর্ষদকর্ত্তৃক সাধারণ নীতিসমূহ নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং এগুলি কড়াকড়িভাবে অনুসৃত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং তদুপরি ভিন্ন ভিন্ন স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় পর্ষদ দলে দলে সমাজকর্ম্মী এবং বিশেষজ্ঞদের দেশের সর্ব্বত্র পাঠান —তাঁহাদিগকে পর্ষদের নিকট তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের রিপোর্ট হইতে স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য সবগুলি রাজ্যে কল্যাণ-উপদেষ্টা পর্ষদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। পর্ষদের কল্যাণ-সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার সিদ্ধান্তের সহিত সমাজ কর্ম্মীদের এই অভিমতের মিল হইয়াছে। ইহার অর্থ কেন্দ্রীয় পর্ষদের বিকেন্দ্রীকরণ। তদনুসারে ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে রাজ্য সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনকল্পে কর্ম্মপন্থা অবলম্বিত হয়। ইদানীং ২৭টি রাজ্যের সবগুলিতেই তাহাদের নিজ নিজ রাজ্য-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ আছে, প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সহিত পরামর্শক্রমে এই সকল রাজ্যপর্ষদ গঠিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও আবার সদস্যগণ অংশতঃ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় পর্ষদ কর্ত্তৃক মনোনীত। সুতরাং ইহা প্রশংসার কথা যে, সরকারী এবং বেসরকারী উভয়বিধ সংস্থাসমূহকেই একটি একক (unit) হিসাবে কাজ করিবার জন্য একত্রে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে,

সরকারী এবং স্বেচ্ছামূলক উভয়বিধ সংস্থার উপরেই যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং দুটি সম্বন্ধেই সমভাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত রাজ্যপর্ষদ আর্থিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিক দিয়া কেন্দ্রীয় পর্ষদ কর্তৃক সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাজের বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারাই কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের কর্তব্য শেষ হইয়া যায় নাই, আর একটি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার—অর্থাৎ, গ্রামাঞ্চলে কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রবর্তন—কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত পল্লী কল্যাণ-পরিকল্পনা প্রবর্তনে রাজ্যপর্ষদসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

কল্যাণ-সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—কালবিলম্ব না করিয়া গ্রামাঞ্চলের লোকসমাজের যে অংশ জাতির মর্মস্থল-স্বরূপ এবং যাহাতে সহজে প্রবেশ করা যায় তাহার সেবা করা। কম্যুনিটি প্রোজেক্টগুলির সম্প্রসারণ-পরিকল্পনা এবং এন.ই.এস. ব্লকসমূহের কার্য্যাবলীর পুনরাবৃত্তি পরিহার করিবার জন্য ইহা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা—নারী, শিশু এবং শারীরিক দিক দিয়া যাহারা অপটু (Physically handicapped) তাহাদের সম্পর্কিত একটি সর্বার্থসাধক (multi-purpose) উন্নয়ন প্রোগ্রাম দ্বারা সেবিত, মোটামুটি ২০,০০০ লোক সমন্বিত পনের হইতে কুড়িটি পরস্পরসংলগ্ন গ্রামের একটি একক (unit) বলিয়া গণ্য হয়। সর্বক্ষণের (whole time) গ্রামীণ 'একক' (village unit) কর্তৃক এই সকল পরিকল্পনা কর্মে রূপায়িত হইবে—নারীকর্মীরা বহুসংখ্যক আংশিক সময়ের (part time) স্বেচ্ছাকর্মীদের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে। এই সমুদয় কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইবে প্রত্যেক জেলায় ক্রিয়াশীল পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির (Project Implementing Committee) পরিচালনাধীনে।

হিসাবক্রমে স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক পরিকল্পনার ব্যয় পড়িবে ৫০,০০০ টাকা। ইহার প্ল্যানিং-এর সময়ে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ দিবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং বাকী পঞ্চাশ ভাগ রাজ্য সরকার ও স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহ সমভাবে বহন করিবে। কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ বিনামূল্যে যানবাহনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবেন। বিভিন্ন রাজ্যে নিম্নলিখিত হারে প্রোজেক্টসমূহে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমগ্র অঞ্চলের 'ক' রাজ্যগুলিতে দেওয়া হইয়াছে ১৭টি প্রোজেক্ট, 'খ' রাজ্যগুলিতে ১০টি এবং 'গ' রাজ্যগুলিতে ৫টি—এখানে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বিস্ময়কররূপে স্বল্প কালের মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যপর্ষদ কর্তৃকই কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইয়াছে। এই সাফল্যটুকু অর্জন করিবার জন্য রাজ্যপর্ষদসমূহ, পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতি ও রাজ্যসরকারসমূহকে কর্মীদের জন্য প্রচুর ভ্রমণ, অধ্যয়ন এবং চিন্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত রাজ্যপর্ষদ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন অঞ্চলে পরিদর্শনকার্য্যকে সহজসাধ্য ও দ্রুততর করিবার উদ্দেশ্যে সময়মত জীপসমূহ পাঠানো হইয়াছিল বলিয়া কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছে। প্রোজেক্টগুলির নির্দ্ধারিত লক্ষ্যবস্তু ৩৫টি এবং তন্মধ্যে স্বাধীনতা দিবস এবং গান্ধী-জয়ন্তী দিবস—এই দুইটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৩৬টি প্রোজেক্টের যথারীতি উদ্বোধন হইয়াছে। এই দেশে সবসুদ্ধ ৩২৯টি জেলা আছে—প্রোজেক্টগুলি মোটামুটি জেলাওয়ারি এরূপ ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে ২৩টি বাকী রহিয়া গেল সেগুলি পরবর্তীকালে ভাগ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে 'প্রাইজ পকেট' রূপে সংরক্ষিত হইবে।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ দিল্লী নগরীতে একটি 'পাইলট' প্রোজেক্টে হাত দিয়াছে। শহর অঞ্চলের স্বল্প আয়বিশিষ্টা স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নয়ন ইহার লক্ষ্য। মতিনগরে কারখানা-গৃহ নির্ম্মাণকার্য্যও সমাপ্তপ্রায় এবং দেশলাইয়ের কারখানার কাজও এই বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুরু হইবে। এই সমস্তের মাধ্যমে, ঘরগৃহস্থালির কাজে বাধা না জন্মাইয়া স্বল্প আয়বিশিষ্টা স্ত্রীলোকদের জন্য কর্মের সংস্থান করা হইবে।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ এবং বিভিন্ন রাজ্য পর্ষদের কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রচারকার্য্য এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিতরে খোলাখুলি ভাবে মতের আদান-প্রদানও সমান তালে চালাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পর্ষদের সম্পাদকীয় বিভাগ কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের এবং আঞ্চলিক ভাষায় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই সমস্ত উপকরণের ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের নির্দেশানুসারে সমাজ-কল্যাণ এবং সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাপন বিষয়ে আদর্শ তথ্যাদি সম্বলিত দু'খানি উল্লেখ্য (reference) পুস্তক সঙ্কলিত হইতেছে। শ্রীমতী দেশমুখ উক্ত দুখানি পুস্তকের যুক্ত-সম্পাদকীয় কমিটির চেয়ারম্যানও বটেন।

নিখিল-ভারত সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক আহূত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৫৪ সনের ১১ই নবেম্বর তারিখে। উক্ত সম্মেলনে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্য দান এবং পরিকল্পনাগুলির কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সকল গৃহীত হয়। সবগুলি রাজ্য যে কর্ত্তব্যতার ভার গ্রহণ করিয়াছে তৎপ্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করে।

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ্

পশ্চিমবঙ্গ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের অন্যতম কর্ম্মপ্রচেষ্টা—বিভিন্ন জেলায় একটি করে ব্লকে শিশু ও নারীদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ। প্রতিটি জেলায় একটি এবং কলকাতার উপকণ্ঠে তিনটি মোট সতেরটি ব্লক পশ্চিম বাংলায় গঠন করা হচ্ছে। প্রতিটি ব্লক পনের থেকে আঠার হাজার অধিবাসী নিয়ে। প্রত্যেক ব্লককে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতি ভাগে একটি করে কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। প্রতিটি কেন্দ্রে দুই জন (বিশেষ ক্ষেত্রে তিন জন) মহিলা কর্ম্মী কাজ করবেন।

এ সব কেন্দ্রে শিশুদের জন্য চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, ব্রতচারী, ড্রিল, নানা রকমের খেলাধুলা, গার্লস গাইড বা বয়েজ স্কাউট ইত্যাদির মধ্যে দু তিনটি বেছে নিয়ে কাজের ব্যবস্থা আছে। নারীদের জন্য সন্তানপ্রসবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালীন চিকিৎসার ব্যবস্থা, বয়স্কা শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, মহিলা সমিতি সংগঠন, শিল্প শিক্ষা-কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে স্থানবিশেষে কাজ বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনমত বিভিন্ন কেন্দ্রে ডাক্তারের সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। এই সব কাজ পরিচালনা করবার জন্য প্রতিটি ব্লকে একটি কার্য্যকরী কমিটি আছে—এই কমিটির সভ্যসংখ্যা নয় জন। আট জন বিভিন্ন সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং একজন জেলা শাসকের প্রতিনিধি। বর্ত্তমানে পনেরটি জায়গায় এই পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়েছে—আরও দুইটি জায়গায় আগামী মাসের প্রথমেই কাজ আরম্ভ হবে।

বিভিন্ন কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল। অন্যান্য কর্ম্মসূচীর সঙ্গে প্রত্যেক কেন্দ্রে বয়স্ক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে। সম্প্রতি যে কাজ নিয়ে কর্ম্মকেন্দ্রগুলি কাজ আরম্ভ করেছে—এখানে শুধু তারই উল্লেখ করা হচ্ছে—ভবিষ্যতে আরও কর্ম্মতালিকা নূতনভাবে প্রত্যেক কেন্দ্র গ্রহণ করবেন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে তিনটি—

১। স্থান কালিকাপুর—প্রতাপনগর (সোনারপুর থানার অন্তর্গত)

লোক সংখ্যা—১৪,৩৮৯

বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্ম্মতালিকা:—প্রসূতির পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালীন চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্র, প্রসূতি সদন, শিশু চিকিৎসা।

২। স্থান:—জোকা—বিষ্ণুপুর (বেহালা ও বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত)

লোকসংখ্যা—১৬,৮২৩

কর্ম্মতালিকা—প্রসূতিদের স্বাস্থ্যরক্ষণ ব্যবস্থা ও শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র।

৩। মধ্যমগ্রাম—(বারাসত সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত)

লোকসংখ্যা—১৬,৬৮৫

কর্ম্মতালিকা—প্রসূতি মেয়েদের জন্য প্রসবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও শিল্প শিক্ষা-কেন্দ্র।

৪। হুগলী—

স্থান—আরামবাগ সাব-ডিভিশন

লোকসংখ্যা—১৫,০০০

কর্ম্মতালিকা—প্রসূতিদের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালীন চিকিৎসা ব্যবস্থা।

৫। নদীয়া—

স্থান—কোতোয়ালী, ছাপড়া ও কৃষ্ণগঞ্জ থানা

লোকসংখ্যা—১৮,২০৫

কর্ম্মতালিকা—শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র ও প্রসূতিদের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালীন স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা

ক্রমশঃ

নব প্রাণ

শ্রীবিজন দাশ

বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় গোবিন্দর ঘুম ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল বাইরের ঠাণ্ডা যেন তার হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। সারা শরীরটা একবার কাঁপুনি দিয়ে উঠল। বৃষ্টি বাঁচিয়ে গাছটার গোড়ার দিকে সরে এল ও। সেখানে একটা নেড়ি কুকুর কিসের একটা পুঁটুলি নিয়ে যেন টানাটানি করছিল, আচমকা পুঁটুলিটা ফেলে দিয়ে কয়েক পা হটে গেল। তার পরে গোবিন্দকে বারকয়েক দেখে নিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার আহার্যটার দিকে। গোবিন্দ ঠাহর করতে পারল না রাত কতটা হয়েছে। সারাদিন প্রচণ্ড ঘোরাঘুরি গেছে। শেষবেলায় নির্জ্জন দেখে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল এই পুরানো কবরখানাটার মধ্যে। সারাক্ষণ একটা অনির্দ্দেশ্য দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল—যেন সে মারা গেছে, শীতের ভারী রাত্রি আর বৃষ্টি ঠেলে গ্যাসের আবছা আলো এসে পড়েছে এদিকটায়। তা ছাড়া চারিদিক নিদারুণ ভাবে নিঝুম।

গোবিন্দ ঐ ভাবেই বসে রইল কিছুক্ষণ। এর পরে কোথায় যাবে বসে বসে তাই ভাবছিল। হঠাৎই তার ঐ পুঁটুলিটার দিকে নজর পড়ল। দৃষ্টি পড়তেই ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শরীরে। হৃৎপিণ্ডটা যেন কে থাবা দিয়ে চেপে ধরল। ঐ পুটুলিটা থেকে একটা কচি হাত বেরিয়ে আছে। ওটা যেন একবার একটু নড়ে চড়ে উঠল। গোবিন্দর বুকের রক্ত হিম হয়ে যেতে লাগল ভয়ে। কুকুরটা আবার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তার শিকারের দিকে। থমকে একবার গোবিন্দর মুখের দিকে চাইলে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল গোবিন্দর। ও তাড়াতাড়ি হাত উঁচিয়ে কুকুরটাকে তাড়া করলে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না।

পুঁটুলির মধ্যে একটা জ্যান্ত কচি বাচ্চা।...

আজ শনিবার। হিডলি গ্রেসাম কারখানায় আজ নাচের দিন। কারখানার মধ্যে বল-নাচের ব্যবস্থা আছে। এই কারখানার সাহেব অফিসাররা, তা ছাড়াও নানা জায়গা থেকে জোড়ায় জোড়ায় সাহেব-মেম এসে আজ এখানে সারা রাত স্ফূর্ত্তি করে যাবে। কাল ছুটি, বিশ্রাম। গৃহিণীদের গলা সপ্তমে উঠছে—ওদের হৈ-হুল্লোড় ছাড়া পাড়ার আর কোথাও সাড়া-শব্দ নেই, সব নিঃসাড়। তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। গোবিন্দ বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না।

কারখানার গেটের দিকে এগিয়ে আসে—বাচ্চাটার কিছু একটা গতি হয় কিনা। প্রভুভক্ত সতর্ক প্রহরী নেপালী দারোয়ান। এই শীত-বৃষ্টির মধ্যেও গেটে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকে ঠুকে প্রভুদের ভিতরে যাবার জন্যে গেট ফাঁক করে দাঁড়াচ্ছে। ভিতরে বাজনা সুরু হয়ে গেছে। এক দল নামল গাড়ী থেকে সঙ্গিনীদের বর্ষাতির নীচে চেপে ধরে ধরে। "ও গড্", মেয়েরা কল কল করে উঠল। কুয়াশার মধ্যে কারখানার চড়া আলো হলদে রহস্যঘন হয়ে উঠেছে। দূর থেকে শুধু ওদের পাগুলো আলাদা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাটকায় দানব চারটে পা দিয়ে হেঁটে চলেছে। ঘেঁষাঘেঁষিতে যতটা গরম হওয়া যায়।

"এ আদমী লোগ ক্যায়া মাংটা ইধর ?" নেপালী দারোয়ানটা থপ থপ করে হেঁকে উঠল, "গেট সাফা রাখখো।"

হঠাৎ আবার কোন্ প্রভু কখন এসে পড়ে।

বৃষ্টিতে গোবরা রোডের ধুলো চপচপে কাদায় পরিণত হয়ে গেছে। গোবিন্দ অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে থাকে। ওর শ্রান্ত পা দুটি ওকে টেনে নিয়ে চলে এণ্টালি বাজারের সামনে, ঢাকা দেওয়া ফুটপাথের উদ্দেশ্যে। সেখানে রাত্রে তার মত অনেক হতভাগ্যের ভিড় জমে। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো বেআব্রু পড়ে থাকে যে যার টুকরো-টাকরা কাপড়ে কোন-মতে কান ঢেকে। শীতে একের ঠকঠকানি অপরে টের পায় সারারাত ধরে। গোবিন্দ মসজিদটার পাশ দিয়ে চক-মেলানো নূতন রাস্তায় এসে পড়ল।

পার্ক সার্কাস থেকে নূতন জোড়া রাস্তাটা হবার পর এই দিকটার কদর বেড়ে গেছে। আগে নগরের যে সব সম্ভ্রান্ত পরিবার গোবরার পাশে এ সব নোংরা অঞ্চলে আসতে নাক সিটকাতেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে আজকাল এখানে এসে বাড়ী তুলেছেন, নয়ত তোলার অপেক্ষায় জায়গা কেনা হয়ে গেছে। গোবিন্দ পথ চলতে চলতে একবার ভাবে যেখানকারটা সেখানেই রেখে আসে। ঠোঁট কামড়ে দাঁড়ায়। দু'হাতের মধ্যে নরম তুলতুলে ঠেকে বাচ্চাটা। মানুষের সন্তান শেষে কুকুরের পেটে যাবে! আবার শ্রমিকের মতই বেপরোয়া মাথা ঝাঁকি দিয়ে ওঠে, 'এনেছি যখ...ন', যে বালিশের খোলের মধ্যে বাচ্চাটা ভরা ছিল তা ভাল করে আবার তার মুখের উপর টেনে দেয়। একেবারে উপর থেকে বৃষ্টিটা পড়ছে।

অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলতে চলতে হঠাৎ বুকের মধ্যে

ধড়াস করে উঠল। দেখে প্রায় তার সামনেই একটা গাড়ি বড় বাড়ীটার সুমুখে ব্রেক কষে দাঁড়াল। একটুর জন্তে গায়ের ওপর পড়ে আর কি! গাড়ির শব্দ পেয়ে হয়ত বাড়ীর চাকর-বাকর কেউ বাইরের বাতিটা জালিয়ে দিলে। ঝলমল করে উঠল মস্ত গাড়িটা। গাড়ি থেকে দু'জন মহিলা নেমে এলেন। সাজগোজ দেখে বড়-ছোট বোঝা মুশকিল। একজনের পেছনের দিকটা দেখে গোবিন্দ মনে মনে বলল, "এই বড়"। গলা শুনেও বোঝা গেল। তরুণীটি মাথার উপর একটা হাত উঁচিয়ে কল্পনায় বৃষ্টি ঠেকিয়ে কি এক কথার রেশ টেনে খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ল। ওর আঁটসাট জামার ওপর দোলানো মোটা হারের লকেটটা ঝকমক করতে লাগল।

গোবিন্দ জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট দুটো চেটে নিলে। মুখে দুর্গন্ধ। ঐ হারটা থাবা দিয়ে নিয়ে যদি সে সোজা দৌড় দেয় তবে অনেক দিনের জন্তে নিশ্চিন্ত। কোথাও সাড়াশব্দ নেই। এই ত দুর্যোগের রাত্রি। কম্পিত পা দুটোকে ও শক্ত করে দাঁড় করাতে চেষ্টা করল। 'দু'দিন হ'ল আমার কিছু খাওয়া হয়নি'—কথাটা মনে হতেই গোবিন্দর গলার কাছে কি যেন দলা পাকিয়ে উঠল। একবার মনে এল আজকের মত দু'এক আনা যদি ভিক্ষে দেয় কেউ। ওদের সামনে হাত পাতার কথা মনে হতেই শরীরটা অবশ হয়ে এল ওর। বুকের মধ্যে হাঁফ ধরে গেছে যেন। গাড়ির মধ্যে থেকে কে একজন পুরুষ-কণ্ঠে বিদায় জানালে। গাড়িটা বেরিয়ে গেল। এইবার গোবিন্দকে নজরে পড়ল বুঝি। গোবিন্দ শুধু দেখলে শঙ্কাতুর ত্রস্ত গতিতে তারা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

তখন বাড়ীর মধ্যে চাকর-বাকরদের ওপর তম্বি সুরু হয়ে গেছে, "বাড়ির সামনে যে কে সেই দাঁড়িয়ে থাকবে—চোর কি ডাকাত! আজকাল এরকম ত চারদিকে হামেশাই ঘটছে। উঃ বাপস্!"

ও বাড়ীটা ছাড়িয়ে হাতের বাঁ-দিকে একটা নূতন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কয়েক পা এগোতেই সেই দিক থেকে নারীকণ্ঠের অর্থপূর্ণ কৌতুকভরা আওয়াজ এল, "অত রাতে ভদ্দরলোকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছিল গো? এস! এই যে, তোমাকেই বলছি। এসো না গো শুনি।"

রাস্তার আলোয় গোবিন্দ লক্ষ্য করে দেখলে অর্দ্ধসমাপ্ত বাড়ীটার সামনে বাঁশের মাচার নীচে একটা মেয়ে হাঁটু উঁচু করে বসে আছে। তার শরীরের উপরের অংশের ছায়া পড়েছে মাচায়। সেই আঁধারে মেয়েটি ঘাড়টা একটু নাড়াতেই কপালের টিপটা চিকমিক করে উঠল। গোবিন্দ বোঝে সবই।

"মাপ কর।"

"কি গো গোপাল, আমি কি তোমায় গুলে খাব নাকি গো?"

"আমার নাম গোপাল নয়।"

"বাবাঃ খুব তেজ যে। আমি বেকার চিনি। গোবরা রোডে আমি তোমায় সাতপাক খেতে দেখি নি? অ্যাঁ? জানি গো জানি, তোমাকে বেঁধে মারলেও কানাকড়িটি বেরুবে না। বাবুর আবার নাগ হয়েছে। কৈ এস।"

"মালকড়ির ব্যাপার আগেই আবিষ্কার। বল ত বলি—" গোবিন্দ এগিয়ে আসে, "আরে ভাই গোবরা কবরখানার মধ্যে একটা বাচ্চা কুড়িয়ে পেলাম।"

মেয়েটা হাসতে হাসতে চলে পড়ে, "এঁ্যা?"

"হাঁ, জ্যান্ত বাচ্চা।"

"দেখি, দেখি।"

গোবিন্দর হাত থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে বালিশের খোল ছাড়িয়ে আলোর মধ্যে ধরল সেটাকে, "হুঁ, আজকেই হয়েছে।"

গোবিন্দও আলোর মধ্যে ভাল করে লক্ষ্য করল বাচ্চাটাকে, বেশ বড়সড়। মুখের গড়নটি নিখুঁত একটা চিনামাটির পুতুলের মত দেখাচ্ছে।

"বল ত কোন্ আবাগীর বাচ্চা! এখন কি করি।"

তার কথাই বলে যায় মেয়েটা, "বাচ্চারা আড়াই দিন পর্য্যন্ত মনে করে তারা পেটের মধ্যেই আছে। দেখছ না কোন ট্যাঁ-ফো নেই। তারপরেই সুরু করবে ট্যাটানি। উঃ, আমি দু'চোখে দেখতে পারিনে। তুমি বুঝি ঐ ভদ্দরনোকদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে বাচ্চাটাকে। রাম কহ! দাঁড়িয়ে রইলে কেন গো, বস।"

"বসি গো—পথ কিছু বাতলাবে না বসে বসে শুধু খুনসুটি করবে।"

"বাঃ খুব মজা!" বাচ্চাটাকে দুই হাঁটুর ফাঁকে কোঁচড়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলে, "এখন বল যে আমি এটাকে নিয়ে যাই। পাঁচ মাসের ভাড়া দিতে পারি নি বলে বাড়িওলী আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে জান? বের করবার আগে ওর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে খুব ঠেঙালে আর সেই ফাঁকে আমি অন্ধকারে বাঁ-হাতে বুড়ীর শিককাবাবের ঠোঙাটা গ্যাঁড়া দিয়ে আনলাম বলে আজকের রাতটা চলল। আর ত যা পেলাম, তা তুমি—ছিবড়া। আচ্ছা, তুমি চুরি করতে পার?"

"তেমন কিছু করি নি। ছোটবেলায় ফল-টল এটা-ওটা করেছিলাম।"

"ব্যস্‌ চুরিও জান না। তাতেই-বা হবে কি করে। তোমাদের যা চরিত্তির, চুরি করে এক সঙ্গে হাতে টাকা পড়লেই ফুঁকে দেবে।"

মেয়েটা ঠোঙা থেকে একটা শিককাবাব বের করে কুকুরের মত ঘাড় কাত করে কামড় দিয়ে ঝট্‌কা দিয়ে ছিঁড়ে নিলে। তার পর কচকচ শব্দে চিবোতে লাগল। গোবিন্দর হাতেও একটা শিককাবাব তুলে দিয়ে বললে, "খাও। খিদের কথা যদি বল তবে প্রথম তিন দিনই মারাত্মক। তোমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবে। তার পর থেকে সারা দিনে চার পয়সার চা আর দু'পয়সার ছোলা হলেই দিব্যি চলে যাবে। তার পরে তারও বেশী প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাচ্চাটা!"

"সেই ত কথা।" হাতে শিককাবাবটা নিয়ে গোবিন্দর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এল। এই খাবারের জন্তেই সে মাসের পর মাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার যৌবনের সমস্ত শক্তি দিয়েই সে চেষ্টা করেছে। গত ছয় দিন ধরে কলকাতার এক মাথা থেকে আর এক মাথা ঘুরে বেড়িয়েছে সে, কোথাও কাজ মেলে নি, যে-কোনও কাজ, যত পরিশ্রমের কাজই হোক—মুখের উপর সকল দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে।

"ও কি তুমি কাঁদছ নাকি গো! কি বোকা মরদ। নাও খাও। মানুষের দুদ্দিন কি চিরকাল থাকে? বোকা—" কচকচ করে চিবোতে চিবোতে বলল, "এই দুদ্দিন ঠিক কেটে যাবে। যদি বল,—আমারও একটি মেয়ে ছিল। থাকলে এখন খেলে বেড়াত। আঃ—! ঐ বুড়োটাই চুরি করেছে। ভগবান জানে, কোথায়!—খুব শীত করছে? আচ্ছা আর একটু সরে বস। আমি ঘরের মধ্যে ইঁটকাঠ সরিয়ে শোবার জায়গা ঠিক করে রেখেছি। ও তুমি বুঝি এই প্রথম? কেঁদো না। গ্রাম থেকে এসেছ বুঝি? সেই ভাল তুমি একটা চাকরির খোঁজ কর। আমিও ভাবছি বজবজ চলে যাব। সেখানে আমার এক মাসী থাকে। বিস্তর শ্রমিক। চোয়াড়গুলো সেখানে চুষে খায়। তবু একটা পেট কোনমতে চলে যাবে। মাসী ত তাই বলে।—ও সোনা, কেঁদো না। খাও।—সেখানে তোমারও একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে।"

সারারাত ধরে শীতের ঠকঠকানির মধ্যে এক নবজাতককে আকড়ে ধরে দুই বেকার বঞ্চাবিক্ষুব্ধ ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল।

ভোর হবার আগেই ওরা উঠে পড়ল। রওনা দিল শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে। বজবজ যাবে। আবার কাজ জুটবে। নূতন আশায় শরীর হাল্‌কা মনে হচ্ছে। এখনই যেন একটা কিছু হয়ে যাবে গোবিন্দর। সে বজবজ সম্বন্ধে আবার নূতন করে নানা প্রশ্ন করে মেয়েটাকে। হাঁ না করে জবাব দেয় মেয়েটা। "সত্যি বলছ কাজ পাওয়া যাবে?" —উদ্দীপনায় গোবিন্দর গতিবেগ বেড়ে যায়। মেয়েটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে পড়ে বার বার।

ভিজে রাস্তা আর কনকনে হাওয়া। গোবিন্দ ভাবে—টাকা পেয়ে এক সঙ্গে বেশী টাকা পাঠাবে না দেশে। বৌদির যা খরচের হাত। মা ত উপযুক্ত ছেলের বিয়ের জন্তে কানের কাছে দিনরাত ঘ্যানর-ঘ্যানর করছেন। তারই-বা দোষ কি, আমার বয়স ত আর কম হ'ল না। নিশ্চয় কুড়ি পেরিয়ে গেছে। সবদিক গুছিয়ে নিতে হলে কিছু কিছু করে নিজের কাছে জমাব যাতে আগামী চাষের আগে দাদাকে একটা গরু কিনে দেওয়া যায়। আর একটা মোড়লদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে চালালেই হবে। তা না হলে এই বছরই ভাগচাষের কর্ম শেষ। গুষ্টিসুদ্ধ ক্ষেত-মজুর। গ্রামের ক্ষেত-মজুরদের কথা মনে হতেই শিউরে ওঠে গোবিন্দ। সে ত এত দিন গ্রামে ক্ষেত-মজুরিরই চেষ্টা করে এসে ছিল। সেখানকার অবস্থা এর চেয়েও খারাপ। চারদিকে বেকার।...

ভোরবেলাকার নীলচে শাদা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুক্ষ্ম কাঁটার মত বেঁধে বাচ্চাটার কথা। মনে মনে ভাবে, 'আমি সময়মত ঠিক সট্‌কে পড়ব।' নানা কথা ভাবতে ভাবতে একবার চোখ ফেরায়। বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে উপোসী মেয়েটার আবার নূতন করে জেগে ওঠে মাতৃত্বের ক্ষুধা—পেটের ক্ষুধা তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে। সে তখন বাচ্চাটার মুখে তার শুষ্ক স্তন গুঁজে দেবার চেষ্টা করছিল, ঝট্‌ করে বাচ্চাটার মুখে আঁচল ঢাকা দিয়ে মুখ তুলে ঘাড় বাঁকি দিয়ে মুচকি হেসে বললে, "দেখছ কি?"

গোবিন্দ হকচকিয়ে ওঠে। কৃষকের ঘরগুছানোর চিন্তা ঠেলে একটা অনির্দ্দেশ্য অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে ওর মুখ দিয়ে, "আ-মা-র..."

"কে?"

গোবিন্দ হাত দুটোকে গরম করবার জন্তে একবার ঘষে নিয়ে আত্মস্থ হয়ে ওর কৌতুকভরা মুখের দিকে চেয়ে স্মিত হাসিতে বলল, "দুই-ই।"

মানবের ইতিহাসে লিখন আবিষ্কারের প্রভাব

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সভ্যতার ভিত্তি স্তম্ভ

চীন, মিশর ও বেবিলনের পুরাতন কিংবদন্তী অনুসারে অক্ষর ও লেখার আবিষ্কার দৈবশক্তির প্রভাবে হইয়াছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই। কারণ সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষরের আবিষ্কার বাস্তবিকই এক অতুলনীয় পরম বিস্ময়কর বস্তু। কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রসার অক্ষর ও লেখার উদ্ভব হইতেই সম্ভব হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক জগতের উন্নতি, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ইহা দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। এই বিরাট আবিষ্কারের ফলে মানুষ বর্ব্বরতা হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

মন্দিরের মৃৎফলক লেখ

লেখার আবিষ্কার হইতে কিরূপে মানবের উন্নতি হইয়াছে তাহার ইতিহাস জানিতে হইলে প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় যাইতে হয়—এইখানেই শুষ্ক মাটির ফলকে দাগ কাটিয়া (cuneiform) লেখার প্রথম আবির্ভাব। এই লেখার সঙ্গে মন্দিরের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। গবেষকগণের নিকট সুমেরীয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত এই সকল মৃৎফলক খুবই মূল্যবান। সেই সুদূর অতীতে মানুষের উপর ধর্ম্মের প্রভাব খুবই প্রবল থাকায় ধর্ম্মযাজকগণের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। মন্দিরের পূজারীদের ভগবানের নামে বিপুল সম্পত্তির মালিকানা ছিল। পুরোহিতেরা সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করিতেন, প্রজাবিলি করিতেন, মজুর খাটাইতেন এবং আবশ্যকমত চাষও করিতেন। অনেক সময় শিল্পের উৎপাদন-কার্য্য মন্দির হইতে পরিচালিত হইত। লাগাস নামে একটি ক্ষুদ্র সুমেরীয় শহরে বায়উ দেবতার এক মন্দিরের মৃৎফলকের নথিপত্র হইতে জানা যায় যে, সেখানে সাতাশ জন দাসসহ আটচল্লিশ জন রুটি তৈরির কারিগর, একত্রিশ জন সুরা তৈরির মজুর ছিল। ইহা ছাড়া সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়নের এবং ধাতুদ্রব্য ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যের জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হইত। আর বেবিলনের পুরাবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, মন্দিরের বাড়তি অর্থ সুদে খাটানো হইত।

মৃৎফলকে প্রাচীন হিসাব

এই বিভিন্ন রকমের কার্য্যের হিসাব রাখিবার জন্য লিখন অত্যাবশ্যক ছিল। এজন্যই দেখা যায় যে, প্রাচীনতম সুমেরীয় লেখার নিদর্শন—হিসাবসংক্রান্ত। হিসাব না থাকিলে মন্দিরের মোট আয় যেমন জানিবার উপায় ছিল না তেমনি পুরোহিতরা দেবতার অর্থ আত্মসাৎ করিলেও ধরা যাইত না। উরুকের একটি ফলকে (খ্রীঃপূঃ ৩৫০০) চিত্রের অক্ষরে কতকগুলি দ্রব্যের তালিকা ও সংখ্যাজ্ঞাপক দাগ ও গোল চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছিল মন্দিরের ও রাজপরিবারের সম্পত্তির হিসাব। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত লিখন এই ভাবে চলিয়াছিল।

মৃৎফলকে লিখিতে হইলে মাটি শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই আকার কার্য্য শেষ হওয়া দরকার। এজন্য লিখিয়েরা দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক হিসাব সাময়িক ভাবে পৃথক পৃথক লিখিয়া রাখিত এবং পরে উহা স্থায়ী ভাবে নরম মৃৎফলকে (যেমন বর্ত্তমানে 'লেজার' লেখা হয়) আঁকিত। এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে লিখিত মৃৎফলকের সংখ্যা যে প্রতি বৎসর বহু সহস্র হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মন্দির-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

সেই অতি প্রাচীন যুগে নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা লেখা হইত। এই সঙ্কেতগুলি যাহাতে ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত না হয় এজন্য ইহা রীতিমত শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। আজকাল যেমন 'কপি-বুক' নকল করিয়া ছেলেরা লিখিতে শিখে, পুরাতন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তেমনি নানা প্রকার নমুনার মৃৎফলক পাওয়া গিয়াছে। তা ছাড়া এই সকল প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মগ্রন্থ, মন্ত্র, পূজা-পদ্ধতির বর্ণনা ও তৎকালীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (তুক্তাক্ ও জ্যোতির্বিদ্যা) সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি নকল করা হইত। পুরোহিত-শাসিত সমাজে লিখন-পদ্ধতির ব্যবহার এইরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমাজ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই অক্ষরজ্ঞান আর কেবল মন্দিরের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। ইহা বাহিরেও প্রসারলাভ করিল। এজন্য ক্রমে ক্রমে পার্থিব বা রাজকীয় ক্ষমতা পুরোহিতের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। আসিরীয়া ও বেবিলনে যখন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেখানে সকল বিষয়েই বর্ত্তমান কালের মতই লিখন প্রচলিত হইয়াছিল।

বাণিজ্যে লিখন-ব্যবহার

বাণিজ্যে লিখন-ব্যবহার মেসোপোটেমিয়ার সেমিটিক জাতির বৈশিষ্ট্য। এইখানেই প্রাচীন গ্রীক, মিশর ও চীনা সভ্যতার সঙ্গে সেমিটিক সভ্যতার পার্থক্য। বাণিজ্যসংক্রান্ত মৃৎফলক বহু পাওয়া গিয়াছে, দৈনন্দিন ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয় এই সকল স্থায়ী ফলকে লেখা হইয়াছে। অবশ্য যাহারা এই সকল লিখিয়াছিল তাহারা হয়ত স্বল্পকালের ব্যবহারের জন্য এগুলি প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু এগুলি বহু সহস্র বৎসর টিকিয়া গিয়াছে। অন্যান্য সভ্যদেশে এই শ্রেণীর লেখার কাজ অল্পকালস্থায়ী দ্রব্যাদির উপর হওয়ায় বহুপূর্ব্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তখনকার দিনে, এমনকি চুক্তিপত্র পর্য্যন্তও মৃৎফলকে লেখা হইত। তৎকালীন আইন অনুযায়ী চুক্তিপত্র লিখিত ভাবে সম্পন্ন করিবার নিয়ম ছিল, চুক্তিপত্রে উভয় পক্ষের সহির এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তখন লিখনের বহুল প্রচলন থাকিলেও

লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। সুতরাং যাহাতে লেখার কাজ সংক্ষিপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা ছিল। সাক্ষীগণের আঙুলের ছাপ দিয়া বা কোন সীলমোহর দ্বারা সহি করা হইত। কোন কোন সীলে দৈনন্দিন জীবনের ছবি বা কোন গল্প উৎকীর্ণ করা হইত। এইরূপ সীল দ্বারা মালিকের সহি বুঝাইত। ব্যক্তিগত নথিপত্রে বা বিবাহসম্পর্কিত চুক্তিতে এরূপ সীলের ব্যবহার দেখা যায়।

এই সকল শুষ্ক মাটির ফলক আবার জলের দ্বারা পুনরায় নরম করিয়া উহাতে নূতন কিছু অঙ্কিত করা যাইতে পারিত। এই ভাবে এই সকল দলিল জাল হইবার সম্ভাবনা থাকিত এবং মনে হয় এরূপ জালিয়াতিও তৎকালে কিছু কিছু হইত। এরূপ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ নকল দলিলখানি জালিয়াতের কপালে দাগিয়া দেওয়া হইত। জালিয়াতির প্রতিকারার্থে মূল দলিলখানিকে একটি বড় মৃত্তিকানির্মিত লেফাফায় বা খামে একেবারে বন্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা ছিল, তদুপরি মূল দলিলের একখানি নকল করিয়া রাখা হইত। কলহ-বিবাদ উপস্থিত হইলে খামখানি ভাঙ্গিয়া মূল দলিল বাহির করা হইত: অবশ্য মৃৎফলকখানি অগ্নিদগ্ধ করিয়া প্রস্তুত হইলে এই সকল হুসিয়ারীর কোন প্রয়োজনই হইত না, কারণ সে ক্ষেত্রে লিখিত বিষয় পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না।

১৯২৫ সনে এশিয়া মাইনরের কুলটিপি নামক স্থানে প্রাচীন কেনেচ কেপেডোসিয়ান নামে পরিচিত যে মৃৎফলক পাওয়া গিয়াছে তাহা আসিরীয় বাণিজ্যিক প্রচেষ্টার নিদর্শন। এই ফলক আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের। স্থলপথে ধাতুচালানি ব্যবসায়ে আসিরীয় মহাজনগণ এবং গোমস্তাগণ যে পত্রালাপ করিয়াছিল তাহা উহাতে আছে। সেই অতি প্রাচীনকালেও স্বদেশের সহিত দূরদেশের প্রতিনিধিগণের রীতিমত যোগাযোগ থাকিত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সময়ের সাহিত্যসংক্রান্ত কোন মৃৎফলক পাওয়া যায় নাই। এই সকল আসিরীয় ব্যবসায়ী বিদেশে গিয়া স্থানীয় লোকসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস করিত। কিন্তু সেই সকল দেশবাসী মৃৎফলকের লেখায় অভিজ্ঞ ছিল কিনা জানা যায় নাই। এই মৃৎফলকের লেখায় সাহিত্য, ইতিহাস, শাসন ও আইন এবং বিজ্ঞান ইত্যাদির নিদর্শন দেখিয়া মেসোপোটেমিয়ার বহুমুখী সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যবিষয়ক-মৃৎফলক

স্তোত্র, মন্ত্র, গাথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সভ্য মানুষ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতা, হোমারের ইলিয়াড এবং আরও সাম্প্রতিক কালে স্কটল্যাণ্ডের 'বর্ডার ব্যালাড' এই ভাবে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিয়াছে। লেখার জন্ম হয় বহুকাল পরে। বেবিলনের রাজা হাম্মুরবির সময়ের লেখা মৃৎফলক পাওয়া গিয়াছে। যখন লেখার আবিষ্কার হয় নাই তখন সাহিত্যিক সম্পদ লোকের মুখে মুখে প্রচারিত ও রক্ষিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে লেখার প্রচলন হইল কোন্ তাগিদে এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে! খ্রীঃ পূঃ প্রায় ২০০০ অব্দে বেবিলনে সেমিটিকগণের উপর সুমেরীয়গণের প্রভুত্ব লোপ পাইতে থাকে এবং অ-সেমিটিক সুমেরীয় ভাষা ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া অবশেষে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। বহু শতাব্দী ধরিয়া তখনও সুমেরীয় ভাষায় ধর্ম্মের গাথা ইত্যাদি লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এই সকল যে কোন কালে লোপ পাইবে তাহা কেহ ধারণা করিতে পারিত না। কিন্তু কালক্রমে যখন কথিত সুমেরীয় ভাষায় প্রচলিত এই সকল লোপ পাইতে বসিল তখন হইতে লিখন-পদ্ধতির মাধ্যমেই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। এই ভাবে ধর্ম্মের মধ্যে এবং ধর্ম্মের জন্যই সুমেরীয় ভাষা লিপিগত আকারে বাঁচিয়া রহিল। তা ছাড়া পুরাতন কিংবদন্তী প্রভৃতিকে ধরিয়া রাখিবার জন্যও লিখন-পদ্ধতি খুবই সহায়ক হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত লিখিত বিষয়ের মধ্যে একটা মন্ত্রশক্তি নিহিত আছে—প্রাচীন ও আধুনিক বহু অনুন্নত জাতির মধ্যে এই ধারণা বিদ্যমান। লিপিয়েরা ছিল সমাজের এক বিশিষ্ট অংশ এবং বিশেষ সম্মানিত। আর প্রাচীন বিষয়বস্তুও ছিল বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য। খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেও যে আসিরীয় রাজারা খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ এবং আরও প্রাচীনকালের গ্রন্থগুলি নকল করাইয়া তাঁহাদের গ্রন্থাগারে রাখিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক নথীপত্র

প্রাচীন বেবিলন ও আসিরীয়ার কোন ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে কিছু কিছু ঐতিহাসিক মালমশলা মেলে। প্রথমতঃ মৃৎফলকে রাজাদের রাজত্বের অথবা মন্দির-নির্ম্মাণের হদিস পাওয়া যায়। এই সকলের মূলে ছিল রাজাদের নিজেদের স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা। ইহা ছাড়াও ভাটগণ নথীপত্র রক্ষা করিত। সুমেরীয় যুগ হইতেই বড় বড় ঘটনা ধরিয়া কাল গণনা করা হইত। বেবিলনীয় মৃৎফলকে বড় বড় ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি এইরূপ: "যে বৎসরে হাম্মুরবি এটুরকালাম্মা (Eturkalamma) শহরে আনু (Anu), ইসতার (Ishtar) এবং নান্নাই (Nannai) দেবতার মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।" রাজা এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা যে সকল চিঠিপত্র লিখিতেন তাহা হইতেও বহু ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। মিশরের টেল-এল-আমার্না এবং এশিয়া মাইনরের বাঘাজ-কোই নামক স্থানে এই ধরণের বহু মৃৎফলক উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে রাজনৈতিক ইতিহাসের এবং সেকালের লোকেদের সন্ধি ও চুক্তির বহু উপকরণ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের ভাষা এবং লিখন-প্রণালী সাধারণতঃ বেবিলনীয় মৃৎলেখ অনুসারেই হইত, কারণ ইহা ছিল দেশের বাহিরে তৎকালীন আন্তর্জাতিক ভাষা (lingua franca)।

আইনের অনুশাসন

লিপিবদ্ধ আইনের কিছু কিছু ফলক পাওয়া গিয়াছে। যদিও

খুব বেশী পুরাতন নহে তথাপি 'হাম্মুরবির বেবিলনীয় সংহিতা' ইহার অপূর্ব্ব নিদর্শন। বেবিলনের এক মন্দিরগাত্রে একটি পাথরে খোদিত এই সংহিতা সর্ব্বসাধারণের পাঠের জন্য উন্মুক্ত থাকিত।

বৈজ্ঞানিক ব্যবহার

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সংখ্যার ব্যবহার হরফের অগ্রগতির আর এক ধাপ। ইহা খুবই কার্য্যকরী হইয়াছিল। ক্রমে পাটীগণিত ও জ্যামিতির জন্ম হইল। এই দুই বিজ্ঞানের সাহায্যে কতটা জমিতে কি পরিমাণ বীজ রোপিত হইবে এবং গৃহপ্রস্তুতে কি পরিমাণ কাঠ লাগিবে তাহা নিরূপিত হইত। বিজ্ঞানের লিখন-পদ্ধতি তৎকালীন পুরোহিতগণের খুবই কাজে লাগিয়াছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞান দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ক গণনায় সুবিধা হইল, পঞ্জিকার সাহায্যে সমাজের অর্থনৈতিক জীবন, বিশেষতঃ চাষবাস ইত্যাদির সময় নিরূপিত হইত। রোগের বর্ণনা ও ঔষধ-ব্যবস্থার যে তথ্য জানা গিয়াছে তাহা হইতে ঐ বিষয়ে তৎকালীন লোকেদের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ ছিল সে পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল ফলকে লিখিত চিকিৎসাগ্রন্থ দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের খুব উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ প্রচলিত বিধিব্যবস্থা ছিল অপরিবর্ত্তনীয় এবং লিখিত ফলকগুলি সাহিত্যের স্তরে স্থান পাইয়াছিল মাত্র। এত উন্নতি সত্ত্বেও কিন্তু সেকালে এই মৃৎফলকের লেখা খুব জনপ্রিয় ছিল না বা ইহা সাধারণের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল না। এই লেখ-শিল্প-জ্ঞান বেবিলন ও আসিরীয়ায় কেবল পুরোহিত, লেখক, মন্দির ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মণিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সরকার আইনজীবী এবং চিকিৎসকগণ আবশ্যক হইলে মৃৎফলক-লেখকগণকে ঐ কার্য্যে অর্থব্যয়ে নিযুক্ত করিতেন।

সাধারণ লোকের মধ্যে কাহারও এইরূপ দলিল (মৃৎফলক) প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইলে সে অর্থ ব্যয় করিয়া ইহা প্রস্তুত করাইত অথচ সে নিজে হয়ত ইহা পড়িতে জানিত না। আসিরীয়ার রাজা অসুরবানি পালের (খ্রীঃ পূঃ ৬৬৮-৬২৮) বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। অসুরবানি পাল নিজে ছিলেন খুব বিজ্ঞ এবং পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক। তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র লিপিকার পাঠাইয়া পুরাতন গ্রন্থের নকল সংগ্রহ করাইয়াছিলেন এবং নিজ রাজধানী নিনেভে একটি বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। মেসোপোটেমিয়ায় ইহাই বোধ হয় প্রথম ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী সকল গ্রন্থাগারই ছিল মন্দিরের অন্তর্গত। এই গ্রন্থাগারে সুমেরীয় গ্রন্থও ছিল, বহুক্ষেত্রে সুমেরীয় ভাষার পার্শ্বেই আসিরীয় ভাষায় অনুবাদ দেখা যায়। নিনেভ নগরের নেবো দেবতার (জ্ঞানের দেবতা) মন্দিরের গ্রন্থাগারও অসুরবানি পালের দান। রাজা মৃৎফলকে নিজের জীবনের কথা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"আমি অসুরবানি পাল, রাজপ্রাসাদের মধ্যে একমাত্র আমিই নেবো দেবতার সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। লেখকগণের সকল রকম লেখা বুঝিতে পারি কারণ সকল রকম বিদ্যাই আমার আয়ত্ত।" ইহা হইতেই বুঝা যায়—তিনি 'লেখা' ও 'পড়া' উভয়ই জানিতেন, মৃৎফলক তৈয়ারি করিতে, উহাতে এবং প্রস্তরফলকে লেখা উৎকীর্ণ করিতেও জানিতেন। সেকালে তিনি যে একজন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার নিজের গ্রন্থাগারের উৎকীর্ণ ফলকে লেখা আছে, "আমার পূর্ব্বে যে সকল রাজা ছিলেন কেহই আমার মত এত বিদ্যা অর্জ্জন করেন নাই—আমি সুমারের ফলক পাঠ করিতে পারি, অজ্ঞাত আক্কেডিয়ান ভাষা—যাহা ব্যবহার করা অতিশয় কষ্টকর, তাহাও জানি। মাটির ফলকের লেখা যে সমাজের সকলের বোধগম্য হইত তাহা নহে। পুরোহিত, রাজা, অভিজাত, শাসক, ব্যবসায়ী আর লেখকেরা ইহা জানিতেন, অপর সকলেই ছিল এই বিষয়ে অজ্ঞ। ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের যেটুকু উন্নতি সেকালে হইয়াছিল তাহা অল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত। ইহার ফলেই সমাজ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল—শ্রমিক ও যাহারা শ্রমিক নহে অর্থাৎ উচ্চ-শ্রেণী। আর্থিক বিষয়ে পরিবারগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। সাহিত্য ও কাব্য যে এই লিখননিরপেক্ষভাবে কণ্ঠে কণ্ঠে মানুষের স্মৃতিশক্তি আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া ছিল এবং প্রসারলাভ করিত সেকথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেকালে শিক্ষিত ব্যক্তি বা পণ্ডিত এবং শ্রমিকের মধ্যে এজন্য একটি পারস্পরিক অবিশ্বাসের ভাব কায়েম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন মিশরের লিখন-প্রণালী

সুমারগণ হিসাবপত্র রাখিবার জন্য লিখনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, কিন্তু মিশরদেশে অন্য কারণে লিখন প্রবর্ত্তিত হয়। নীল নদের দেশ মিশর প্রতি বৎসর বন্যায় ভাসিয়া যাইত। খ্রীষ্ট-জন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সে দেশের লোকেরা লক্ষ্য করিয়াছিল যে প্রায় ৩৬৫ দিন পর পর এই বন্যা আসে এবং এই অভিজ্ঞতা হইতেই তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম ক্যালেণ্ডার বা পঞ্জিকা প্রণয়ন করে। বর্ত্তমানকালের সৌর পঞ্জিকার উৎপত্তিও ইহা হইতে। তাহারা নীল নদের এই পরিবর্ত্তন হইতে মাসগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করে—বন্যার, ফসল বুনিবার এবং ফসল কাটিবার মাস—বাস্তব জীবনে এই আবিষ্কারের তুলনা নাই, কারণ ইহা হইতে কৃষক তাহার চাষের সময় জানিতে পারিত। বন্যার জলের বৃদ্ধির পরিমাণ হইতে খাজনা নির্দ্ধারিত হইত, কারণ বন্যার জলের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত শস্য উৎপাদনের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। আর বন্যার জলই জমির সীমানাগুলি বদলাইয়া দিত বলিয়া ইহার হিসাব রাখার প্রয়োজন ছিল। এই সকল কারণে হয়ত হরফ ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছিল। মিশরদেশে লিখন-প্রণালীর জন্মকথা সম্বন্ধে অধ্যাপক হক বলেন, মৃতের শরীররক্ষায় ব্যবস্থাই মিশরীয়গণের মনকে খুব আলোড়িত করিয়াছিল। মমী তৈয়ারি করিবার সময় তাহারা সমাধির গায়ে মন্ত্রতন্ত্র লিখিয়া রাখিত। মৃত রাজার কীর্ত্তিকাহিনী কেবল চিত্রে রূপায়িত করিয়া তাহারা খুশী হইত না, কিছু কিছু লিখিয়াও রাখিতে লাগিল। এই লেখাগুলির মন্ত্রশক্তিতেও বোধ হয় প্রাচীন মিশরীয়গণ বিশ্বাস করিত।

অল্প লোকই এই লিখনবিদ্যা অধিগত করিত ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই বিদ্যা আয়ত্ত হইলে জীবন আরামে কাটানো যাইত। একজন মিশরীয় উচ্চ রাজকর্মচারী তাঁহার পুত্রকে বলিতেছেন, "অক্ষরকে নিজ মাতার মত ভালবাসিবে, কারণ—জ্ঞান থাকিলে তোমাকে আর কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে না, এজন্য ইহার দৌলতে নিজে সম্মানজনক বিচারকের পদ পাইবে।" উচ্চ-বংশীয়েরা এই বিদ্যা জানিত এবং নিজের এক খণ্ড 'পুস্তক' থাকিলেই মন্ত্রতন্ত্র ও পরকালের সংবাদ অপরকে জানাইতে পারিত। তবে কিছু পরিমাণ অপসাহিত্য যে ছিল না তাহা নহে— 'জড়বিজ্ঞান', 'কাহিনী' এবং 'ভ্রমণবৃত্তান্ত'ও পাওয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই সাধারণের মধ্যে এমন এক দল ছিল যাহাদের এই বিষয়গুলি উপভোগ এবং কাজে লাগাইবার মত জ্ঞান ও অবসর ছিল।

প্যালেস্টাইনের লিখন-ব্যবস্থা

প্যালেস্টাইনে হিব্রুগণের ধর্মগ্রন্থ (যাহা হইতে ওল্ড টেষ্টামেন্ট বা পুরাতন ইহুদীপুরাণ হইয়াছে) বিভিন্ন সময়ে লিখনের সাহায্যে রক্ষা করা হইয়াছে—খুব সম্ভব খ্রীষ্টজন্মের নয় শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার সূচনা। ফিনিসীয়গণ তাহাদের ভূমধ্যসাগরের বিপুল বাণিজ্যের সম্পর্কে লেখা ব্যবহার করিত। ফিনিসীয়গণের নিকট হইতে গ্রীকেরা এই লিখনবিদ্যা আয়ত্ত করে এবং গ্রীসের দ্বারাই মানব-সভ্যতার লিখন-প্রণালী স্থায়ী মর্য্যাদা পায়। কাজেই ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে রহিয়াছে প্যালেস্টাইন ও গ্রীসের দান। যাহা এক সময় স্মৃতির মধ্যে বাঁচিয়া থাকিত এবং কালক্রমে লোপ পাইত বা পরিবর্ত্তিত হইত তাহা অক্ষরের বাঁধনে পড়িয়া স্থায়িত্ব লাভ করিল। চিত্রলিপি, গ্রন্থিলিপি ও অন্যান্য সাংকেতিক চিত্র-লেখনের স্থানে এরূপ একটা জিনিষ আবিষ্কৃত হইল যাহা কালজয়ী হইয়া আছে। প্রাচীন কালের 'গ্রীক' বা 'সংস্কৃত' লেখা আজও অনেকের অবোধ্য নহে। এই নূতন আবিষ্কারের ফলে মানুষের জ্ঞানের পরিধিও বাড়িয়া গেল যদিও এই বিদ্যা 'লেখক'গণের মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। ওল্ড টেষ্টামেন্টে উল্লিখিত আছে যে খ্রীষ্টজন্মের হাজার বৎসর পূর্ব্বেও প্যালেস্টাইনে 'পুস্তক' ছিল। লিপিয়েরা তখনকার দিনে বাজারের নিকট বসিয়া থাকিত এবং কাহারও প্রয়োজন হইলে লিখিয়া দিত, দু'পয়সা এইরূপে তাহারা রোজগার করিত। অবশ্য ইস্রাইলের গৃহস্থগণের এরূপ নিয়ম ছিল যে, ঘরের দরজায় বা দরজার মাথায় 'ধর্ম্মের নির্দ্দেশ' লিখিয়া রাখিতে হইবে। ভাড়া-করা লেখকগণের দ্বারা এরূপ লিখাইয়া লওয়া চলিত ইহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রীকদের সাহিত্যিক দান

হোমারের কাব্য খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম ও অষ্টম শতাব্দীতেই লিখিত আকারে ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ফিনিসীয়গণের নিকট হইতে গ্রীকেরা সরাসরি অক্ষরজ্ঞান লাভ করিয়াছিল, এই বিষয়ে অন্যান্য জাতির মত তাহা-দিগকে দীর্ঘ সময় নষ্ট করিতে হয় নাই। কেননা তাহাদিগকে 'লেখা'র জন্য 'অক্ষর' আবিষ্কার করিতে হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে গ্রীসদেশে আইন ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে, সাধারণ ঘোষণা বিষয়ে, পূজার মন্ত্রে ও উৎসর্গে, ঐতিহাসিক নথীপত্রে—এমনকি ব্যক্তিগত কলহে ও অন্যান্য সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়ে গ্রীক ভাষার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সকল বেতন-ভুক গ্রীক সৈন্য রাজা দ্বিতীয় সামেটিকাসের (Psammetichus II) পক্ষে মিশর দেশে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা উত্তর মিশরে আবুসিম্বেল নামক স্থানে এক মন্দিরের মূর্ত্তির গায়ে নিজেদের নাম-সহি করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, তখনকার দিনে গ্রীসের সাধারণ লোকেরও অক্ষরজ্ঞান ছিল।

পঠন-পাঠন ও গ্রন্থাগার

খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পঠন-পাঠন ও পুস্তক রাখার প্রথা এথেন্সের সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়। ইহার পরবর্ত্তী শতাব্দীর মনীষী দার্শনিক এরিষ্টটলের একটি গ্রন্থাগার ছিল। জ্ঞানের সাধনায় এই গ্রন্থাগার হইতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়া শহরে খ্রীঃপূঃ ২৮০ অব্দে প্রথম টলেমি যে সংগ্রহশালা স্থাপন করেন তাহাই প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার। অবশ্য ইহারও পূর্ব্বে নিনেভে রাজকীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু টলেমির গ্রন্থাগারের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। আলেকজেন্দ্রিয়ার এই গ্রন্থাগারে সাত লক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে লিখন ও পঠন বর্ত্তমান কালের মতই প্রসার ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তখন মানব-সভ্যতার বুকে অক্ষরজ্ঞানের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল।

রোমে খ্রীঃপূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত ফলক দৃষ্ট হয় এবং আরও পরে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকলই গ্রীসের প্রভাবে সম্ভব হয়। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে রোমে লেখাপড়া সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে নাই। বিত্তশালী, সাহিত্যানুরাগী লুকুলাস এই সময় সর্ব্বপ্রথম একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে পুস্তক ও গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুবই বাড়িয়া যায়। ধনী রোমীয়গণ বিলাসের অঙ্গস্বরূপ পুস্তকসংগ্রহ ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া দার্শনিক সেনেকা অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি ধনীগৃহের গ্রন্থাগারকে তাঁহাদের সৌখিন স্নানাগারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। লেখা-পড়া যে সাধারণ লোকের জানা ছিল তাহা পোম্পীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীরগাত্রের নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয়। এরূপ লেখা অনেক সময় পথচারীর খেয়ালবশে লিখিত—কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন।

ইউরোপে অন্ধকার-যুগে গীর্জ্জা ও গ্রন্থ

রোমের পতনের পরে ইউরোপে অন্ধকার-যুগ আসিল, ফলে

বিদ্যা ও জ্ঞান গীর্জ্জার আশ্রয় লইল। মৃৎফলক বিদ্যা (cuneiform) যেমন প্রাচীন যুগে সুমার ও বেবিলনের মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল তেমনই এই যুগে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল। ধর্ম্ম ও পার্থিব সকল বিদ্যার রক্ষক হইয়া উঠিল গীর্জ্জা ও খ্রীষ্টীয় মঠগুলি। এই সময় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রবল চেষ্টা হয় এবং সেই সঙ্গে অক্ষরজ্ঞান ইউরোপে উৎকর্ষলাভ করে। কিন্তু ইহাতে সাধারণ লোকের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান বাড়ে নাই। সাধারণে পুরোহিতগণের মুখের বাণী শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। এই বিষয়েও অতি প্রাচীন কালের সহিত ইউরোপীয় অন্ধকার-যুগের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

বাণিজ্যিক যুগে নবজাগরণ

পাশ্চাত্য (ইউরোপীয়) সভ্যতা ভাঙিয়া পড়িলে শিল্প ও বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে ক্রমে আবার নগরের সঙ্গে নগরের বাণিজ্য-দ্রব্যের আদান-প্রদান আরম্ভ হয়। যে বাণিজ্যিক কারণে প্রাচীন আসীরিয়া ও বেবিলনে লিখনের ব্যবহার আরম্ভ হয় ও তাহা প্রসারলাভ করে, ঠিক অনুরূপ কারণেই মধ্যযুগীয় ইউরোপে ইহার সূচনা ও প্রসারসাধন হইয়াছিল। ইটালীতে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইহার সূচনা হয় এবং ক্রমে ক্রমে জার্ম্মানী, ডেনমার্ক এবং হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে, ইহারই ফলে চতুর্দ্দশ শতকে গীর্জ্জানিরপেক্ষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। তখন ঐ সব দেশে ব্যবসায়ীর হিসাবপত্র লিখন ও রক্ষণের উদ্দেশ্যে লেখক (Scribes) নিযুক্ত করা হইত। কিন্তু উদ্দেশ্য গোড়ায় সঙ্কীর্ণ হইলেও ইহার ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পরই পুস্তক বহুল পরিমাণে মুদ্রিত হইতে থাকে এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার সম্ভব হয়। ছাপাখানার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব যে অপরিসীম তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহার পরবর্ত্তী চারি শতাব্দী ধরিয়া জ্ঞানের ধারা বহু বিচিত্র খাতে প্রবাহিত হইয়া চলিল।

খ্রীষ্টীয় 'রিফর্মেশনে'র পরে

এই যুগের (ষোড়শ শতাব্দী) অন্যতম প্রধান কার্য্য বাইবেল প্রচার। যাহাতে বিশ্বাসী নিজে বাইবেল পড়িতে পারে এজন্য পৃথিবীর বহু ভাষায় (প্রায় চারি শতাধিক) ইহা অনূদিত হইয়া দেশে বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই কার্য্যে প্রোটেষ্টাণ্টগণের উৎসাহই ছিল বেশী, কারণ তাহারা চাহিত যে প্রত্যেকে নিজেই বাইবেল পাঠ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করুক, পুরোহিতের মাধ্যমে নহে। পৃথিবীর নানা ভাষায় এই সময় বাইবেল প্রচারিত হয় বলিয়া ইউরোপীয়গণ বিভিন্ন ভাষায় অক্ষর প্রস্তুত ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যে সকল আদিবাসীর নিজেদের 'হরফ' বা লিখিত ভাষা ছিল না ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাহাদের জন্য রোমান হরফের প্রচলন বা নূতন হরফ তৈরি করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই যুগেই ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন কলকব্জার আবিষ্কার হয় এবং উৎপাদন-পদ্ধতি ও বাণিজ্যের বিপুল পরিবর্ত্তন হয়। ফলে ক্ষুদ্র কুটীর-শিল্প ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে জটিল এবং বৃহদাকার উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে আরও ব্যাপকভাবে সাধারণের অক্ষরজ্ঞান-লাভ ও শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

রাজনৈতিক কারণেও অক্ষরজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার দরকার হইয়া পড়ে। গণতন্ত্রের ক্রমবিস্তার অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নহে। সমাজে অল্প লোক শিক্ষিত হইলে রাজনৈতিক ক্ষমতা তাহাদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়, সুতরাং শিক্ষার বিপুল প্রসার গণতন্ত্রের তাগিদেই হইয়া থাকে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে। ইহা অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের প্রগতি ইহারই ফল।
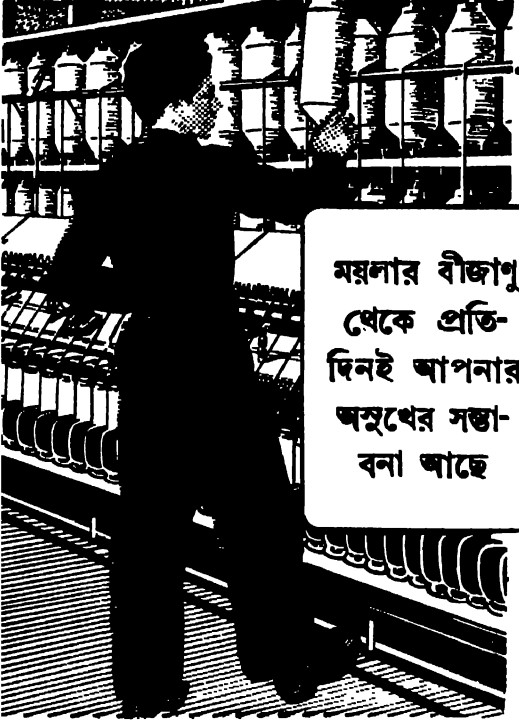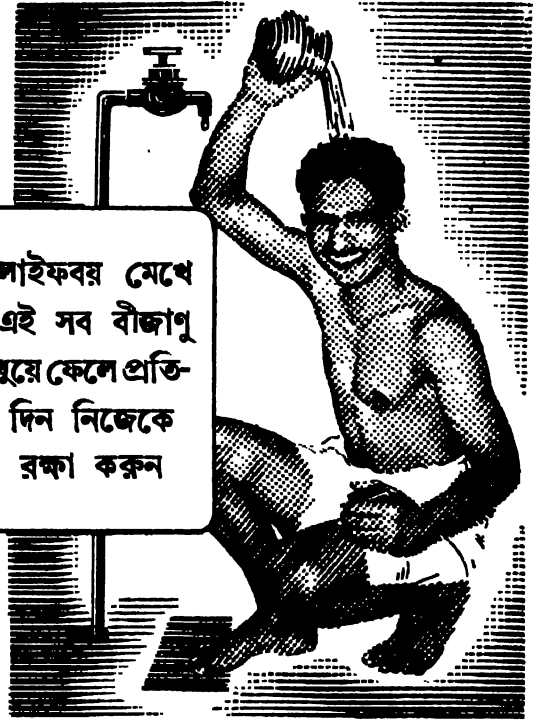
লাইফবয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে

লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 250-X52 BG
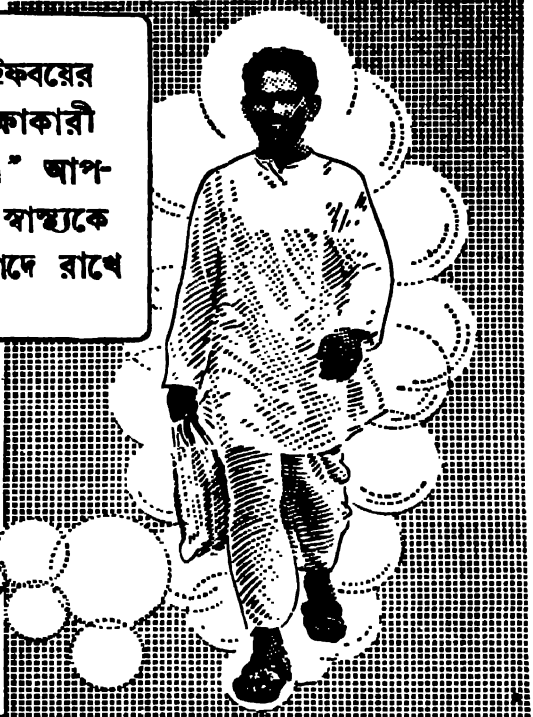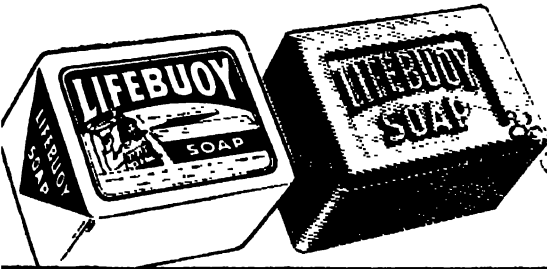
হারানো অতীত—শ্রীসরলাবালা সরকার। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ১৩৪। মূল্য তিন টাকা।

ইদানীং বাংলা সাহিত্যে স্মৃতিকথার প্লাবন। গত সাত-আট বৎসরের মধ্যে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং অন্যান্য সাময়িকীতে বহু খ্যাতনামা এবং কচিৎ অখ্যাতনামা লেখক আত্মস্মৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন, পুস্তকাদিতেও তাহা প্রায় সবটাই গ্রথিত হইয়াছে। জীবনী-সাহিত্য, তথা মনন-সাহিত্যের পাঠক ঢের কমিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রায়ই শুনা যায়, কিন্তু স্মৃতি-পুস্তকসমূহ প্রকাশের বহর দেখিয়া তেমনটি তো মনে হয় না। বাঙালী আজিকার দিনে যেন জীবনাদর্শ খুঁজিয়া পাইতেছে না। এইজন্য যাহারা নামজাদা সাহিত্যিক বা সাহিত্যসেবী এবং চিন্তাশীল বলিয়া সাধারণের নিকট জ্ঞাত তাঁহাদের জীবনকাহিনীর মধ্যে এই অত্যাবশ্যক বস্তুটি পাওয়া যায় কিনা তাহা পরখ করিতেই যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই স্মৃতিকথাগুলির পাঠকও বিস্তর পাওয়া যায়, এ সকল প্রকাশেও বেশী বিলম্ব হয় না। অথচ লেখক খুব বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন না হইলে, পাকা হাতের লেখাও পাঠককে বিভ্রান্ত করিতে পারে। অতিরঞ্জন, অসত্য বা অর্দ্ধসত্য-কথন, কাল ও পরিবেশের বিকৃতি প্রভৃতি নানা দোষে পাঠকের প্রকৃত জ্ঞানলাভে বাধা উৎপাদনে হেতুও হইয়া থাকে। জীবনীকারের আত্মম্ভরিতা এবং আত্ম-প্রচার-কৌশল বোদ্ধা পাঠকের নিকট ধরা পড়ে বটে, কিন্তু সাধারণে প্রায়শঃ তাহা তেমন বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই স্মৃতিকথার লেখক এবং পাঠককে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। কিছু না বলা বরং ভাল, কিন্তু বলিতে গিয়া অতিরঞ্জন করা বা অসত্যের আশ্রয় লওয়া একান্তই দোষাবহ। স্মৃতিকথাগুলির অধিকাংশই এ সকল দোষ ছাপাইয়া উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া বড়ই দুঃখ বোধ হয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি 'স্মৃতিকথা' পর্য্যায়ে পড়ে বটে, কিন্তু বড়ই আনন্দের বিষয় এখানি উপরোক্ত তথাকথিত প্রচারমূলক 'আত্ম-স্মৃতি'র অনেক ঊর্দ্ধে। গ্রন্থকর্ত্রী প্রবীণা লেখিকা—কাব্য এবং মনন-সাহিত্য উভয়েই তাঁহার সমান দখল। দীর্ঘকাল সাহিত্যসাধনা করিয়া গৌড়জনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সহজ সাবলীল রচনা বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব অবদান। তাঁহার লেখনীপ্রসূত স্মৃতি-কথাগুলি অকৃত্রিমতা ও সারল্যের পূত স্পর্শে সাহিত্য-স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ঠিক ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া একখানা সুসম্বদ্ধ আত্মজীবনী রূপে এখানি লিপিবদ্ধ নহে। লেখিকার জীবনের প্রারম্ভ হইতে এমন কতকগুলি ঘটনা বা কাহিনী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা তাঁহার মনের উপরে একটা চিরন্তন ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। এই সকল বিষয়ের যথাযথ সন্নিবেশে লেখিকার চিত্তবিকাশের ধারাবাহিকতা স্পষ্টই উপলব্ধ হইয়া থাকে। পুস্তকখানিতে এই অধ্যায়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে: সাহিত্যচর্চ্চার হাতে খড়ি, সেকালের কথা, কাঁঠালপোতার বাড়ী, আমার ঠাকুরমা, জব্বলপুরের স্মৃতি, দাতব্য চিকিৎসালয়, পুরানো দিনের দানাপুর, সেকালে পরলোকের চর্চ্চা, ঢেঁকানল রাজ্য ও কপিলাস পাহাড়, ব্যাস সরোবর, পুরীর সমুদ্রতীর, মালপাড়ার কীর্ত্তন, ধুলটে কীর্ত্তন। অধ্যায়-সমূহের নাম হইতেই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতকটা আঁচ করা যাইবে।

লেখিকার পিতৃনিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বড়রামদিয়া গ্রামে, তাঁহার ঠাকুরমা অষ্টাশী বৎসর বয়সে ১৩০৩ সালে মারা যান। ঠাকুরমার 'আমার জীবন' গ্রন্থখানি সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি নিভৃত পল্লীর সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরানা কথায় পূর্ণ। লেখিকার পিতা কিশোরীলাল সরকার হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল, তাঁহার মাতুল অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ। শ্বশুরকুলেরও বিশেষ প্রসিদ্ধি। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুলের আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত সংসারের অভিজ্ঞতা, যাহা তিনি প্রথম জীবনে অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাই সুনিপুণভাবে অতি নিষ্ঠার সহিত পুস্তকখানিতে বিবৃত। বাগবাজারের মাতুলগৃহের বর্ণনা, ঠাকুরমার কথা, ব্যাস সরোবর, মালপাড়ার কীর্ত্তন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি অধ্যায়গুলি লেখিকার লেখনীমুখে অতীব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এগুলিতে তিনি যেন দরদ ঢালিয়া দিয়াছেন। লেখিকা ছিলেন শিশিরকুমারের অন্যতম কলমচি। কিন্তু মুরারীপুকুর বোমার মামলার রায় বাহির হইলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং কয়েক দিন মাতুলালয়ে যান নাই। শিশিরকুমার তাঁহার না আসিবার কারণ শুনিলেন এবং তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "গৌরীমণি, তুমি কি দেশকে সত্যই ভালবাস? ভালবাসার অনেক মূল্য দিতে হয়, মনে রেখো দেশের স্বাধীনতা যদি তোমার কামনা হয়, তবে কেবলমাত্র ত্রিশটি নয়, তিন লক্ষ বা তিন কোটি সন্তানকেও তার মূল্যস্বরূপ বলিদান দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, একথা ভুললে চলবে না।" পুরীধামে যাইবার পথে, ব্যাস-সরোবর দর্শন-মানসে লেখিকা পিতা ও অন্যান্যের সঙ্গে রওনা হইয়াছেন। আঁকা-বাঁকা শ্বাপদসঙ্কুল, বন পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে পথ চলা দুরূহ, গাইড ছোকরাও পালাইয়াছে; এমন সময় লণ্ঠন হস্তে এক সাধুর আবির্ভাব এবং তাঁহাদিগকে যথাস্থানে নির্বিঘ্নে লইয়া যাওয়া—ঘটনাটি বর্ণনাগুণে শুধু রোমাঞ্চকর নহে, বিশেষভাবে রসাপ্লুতও হইয়া উঠিয়াছে। মালপাড়া যাইবার পথে 'গোঁসাইমা'র আচরণ ও কার্য্যকলাপ বড়ই উপভোগ্য। স্মৃতিকথার প্লাবনের অথই জলের মধ্যে সত্যই আমরা পুস্তক-খানি পাঠে যেন ঠাঁই পাইয়াছি।

পরিশেষে দুইটি ত্রুটির কথা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। পুস্তকের প্রারম্ভে সাধারণতঃ অধ্যায়-সূচী থাকে। ইহা না থাকায় পাঠকের এবং পাঠেচ্ছুর পক্ষে অসুবিধা ঘটিতে পারে। এত সুন্দর বইখানিতে কতকগুলি ছাপার ভুল বড়ই পীড়াদায়ক।

শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ১২+৪২০। মূল্য পাঁচ টাকা।

"যেমন সাদা—তেমন বিশুদ্ধ—
লাক্স টয়লেট সাবান—
কি সরের মতো, সুগন্ধি ফেনা এর।"

নীলিমা দাস

বলেন।

দেখুন, লাক্স টয়লেট সাবানের প্রচুর সরের মতো ফেনা আপনার মুখের স্বাভাবিক রূপ-লাবণ্যকে কেমন ফুটিয়ে তোলে। "এই সাদা ও বিশুদ্ধ সাবান নিয়মিত ব্যবহার ক'রে আপনার গায়ের চামড়ার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করুন" নীলিমা দাস বলেন। "এর পরিষ্কারক ফেনা লোমকূপের ভেতর পর্য্যন্ত গিয়ে গায়ের চামড়াকে ফুলের পাপড়ির মতো মসৃণ আর সুন্দর ক'রে রাখে।"

সুখবর!

নতুন
বড় সাইজ
সারা শরীরের সৌন্দর্য্যের জন্য
এখন পাওয়া যাচ্ছে
আজই কিনে দেখুন।

"...তাই আমি সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক লাক্স টয়লেট সাবান মেখে আমার মুখের প্রসাধন সারি।"

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান ★

চিঠিপত্র সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথার মত ইহাও সাহিত্যিকে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যের যে এত সমৃদ্ধি, তাহার মূলে এই চিঠিপত্র কম রসদ যোগায় নাই। বাংলা সাহিত্যেও চিঠিপত্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী ও কেশবচন্দ্র সেনের পত্রাবলী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য মনীষী-সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠদের পত্রাবলীও তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে, কিছু কিছু সাময়িক পত্রাদিতেও প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র—যাহা এযাবৎ পুস্তকে এবং সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় সমসাময়িক বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রও পুস্তকে গ্রথিত করিয়াছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র সংখ্যায় বিস্তর এবং খ্যাত, অখ্যাত, অল্পখ্যাত বহু ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে তিনি এত চিঠি লিখিয়াছিলেন যে, স্বল্প সময়ে সংগ্রহ করিয়া সব না হউক, অন্ততঃ একটি বিশিষ্ট অংশ প্রকাশ করাও তখন সম্ভবপর ছিল না। এই অসম্ভবকে অনেকটা সম্ভব করিয়াছেন আলোচ্য পুস্তকের সঙ্কলক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়। গোপালবাবুর নব-সংগৃহীত পত্রাবলীর কিছু কিছু মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন তিনি নূতন-পুরাতন চিঠিপত্র একত্র করিয়া বর্তমান পুস্তকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। প্রকাশ, শরৎচন্দ্রের এখনও বহু পত্র অপ্রকাশিত আছে, বা পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

সে যাহা হউক, আলোচ্য পুস্তকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে লিখিত দুই শতাধিক চিঠিপত্র সংগৃহীত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ, পরিচিত, অপরিচিত এবং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে পর্য্যন্ত তাঁহার যথেষ্ট পত্রালাপ হইয়াছিল। এই সকল পত্র ১৯১২ সন হইতে ১৯৩৭ সনের মধ্যে লিখিত। এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের নানা সমস্যা, চিন্তা, ঘরানা কথা, সাহিত্য বিষয়ক মতামত ও আলোচনা, রাজনীতি, তরুণ সাহিত্যিকদের সাহিত্য সম্পর্কে উপদেশ, নিজেকে ও অন্যকে লইয়া হাস্য-পরিহাস—কত বিভিন্ন বিষয়ই না এই পত্র সকলে বিধৃত! আবার শরৎচন্দ্রের দরদী মন মনুষ্য-সমাজ ছাপাইয়া পশু এবং পক্ষীজগতেও কিরূপ প্রগাঢ়ভাবে উপচাইয়া পড়িয়াছে, মৃত্যুশয্যায় 'ভেলু' কুকুর এবং ঢাকা হইতে আসিবার পথে দেখা মৃত গরু ও মোরগের বর্ণনায় তাহা সুপরিস্ফুট।

শরৎচন্দ্রের আত্মনির্ভর এবং আত্মপ্রত্যয় অপরিসীম। দীর্ঘকালের অনন্যচিত্ত সাহিত্য-সাধনাই তাঁহাকে এই গভীর আত্মপ্রত্যয় দান করিয়াছিল। গল্প-উপন্যাস রচনায়, এমন কি সাহিত্যিক রসবোধে, সাহিত্য আলোচনা-সমালোচনায় 'রবিবাবুর পরেই তাঁহার স্থান'—এরূপ কথাও অতি জোরের সঙ্গে শরৎচন্দ্র একাধিক পত্রে লিখিয়াছেন। কিরূপে এই আত্মপ্রত্যয় জন্মিল? প্রতিনিয়ত অধ্যয়ন, অনুধ্যান এবং অনুশীলন—এই তিনটিই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূল। শরৎচন্দ্রের ভাষায়—১. "পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর [১৯০২-১৯১২] Physiology, Biology and Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।" (পৃ, ৫)। ২. "আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশি কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি—এ রীতি আমার নিজের আমি কিছুতে করিব না।" (পৃ, ১৭৬)। ৩. "বড় দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্য একজামিন দিতে পাই নি।... তার পরে পড়তে শুরু করি। ১৪ বছর ১৪ ঘণ্টা ধরে পড়ি। সেই যে একজামিন দিতে পারিনি কেবল সেই রাগে।" (পৃ, ২১০)। তাই শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর খ্যাতিও তাঁহার লেখনীকে দ্রুত অনুসরণ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের এই প্রবৃত্তি আরম্ভ হয় কৈশোরে—সতের-আঠার বৎসর বয়স হইতে। তিনি তখনই কিশোর সাহিত্যসেবীদের গুরুর আসনে আসীন ছিলেন। তাঁহাদের রচনা সংশোধন করিয়া দেওয়া, লেখার ধরণধারণ দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার কাজ ছিল। এই সকল চিঠিপত্রের বহু স্থলে এই প্রসঙ্গে 'বুড়ী' (নিরুপমা দেবী), উপীন (মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) প্রভৃতি শিষ্য-শিষ্যাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁহার আর একটি কঠোর নির্দ্দেশ—লেখায় সংযম। তিনি বহু স্থলে এই সংযমের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কথাই হইল—"বলা বা আঁকার চেয়ে না-বলা না-আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবে সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।" (পৃ, ১২৫). "শুধু লিখে চললেই তো নয়, থামতে পারার কথাটাও মনে রাখা চাই যে।" (পৃ, ২৪৫)। আবার, "পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া যত বড়ই হোক, তাহার দমন করিবার পুণ্যও সংসারে কম নয়।" (পৃ, ২১১) সাহিত্য-সমালোচনায় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিমত প্রণিধানযোগ্য: "সমালোচনায় যেন তাহার [লেখকের] চৈতন্য হয়, জ্ঞান হয়, শিক্ষা হয়। সমালোচনার উদ্দেশ্য সাধু হওয়া উচিত—গালাগালি দিয়া অপ্রতিভ করিব, দাবাইয়া ধরিব, এ মতলব ভাল নয়।" (পৃ, ৪১)

শরৎচন্দ্র ছিলেন সত্যই নারী-দরদী। নারীর দুঃখ তাঁহাকে কৈশোর হইতেই বিচলিত করিয়াছিল। তিনি একবার বহু পরিশ্রমে ৬।৭ শত বেশ্যার 'ঠিকুজী-কুষ্ঠি' সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি দেখিতে পান—

খুকীর নতুন ফ্রক
ও, মা, এ যে নতুন ফ্রক !
হাঁ, দেখ খুকী যেন খারাপ না হ'য়ে যায়।
না, আমার নতুন ফ্রক খারাপ হ'য়ে যাবে যে।
তিন মাস পরে
তোমার ফ্রক যে সব ছেঁড়ে গেছে, খুকী।
আমি ত সাবধান ছিলাম মা।
আমিই কাচি।
মাপ করবেন,...
...কিন্তু এ আছড়ে কাচার জন্যেই হ'য়েছে, তাতে কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে যায়, কলার ও আস্তিনের কোণা বেরিয়ে যায়।
সানলাইট সাবানে কাপড় না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে হয়ে যায়।
উনি ঠিকই বলেছেন। এখন আমি সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনায় কাচি, আমার কাপড় আরও বেশদিন টেকে, তাতে পয়সাও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে

ছাদের মধ্যে শতকরা আশী জনই সধবা। ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির তাড়নায় তাহারা এ পথ ধরে না—গৃহের নানা উৎপীড়ন অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের মধ্যে তাহারা ঝাঁপ দেয়। শরৎচন্দ্রের এই উক্তিটি নারী-পুরুষ সকলের স্মরণীয়: "নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।" (পৃ, ১৮৯)। শরৎচন্দ্র পল্লীগ্রামে দীর্ঘ দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন: "গ্রামকে আমি বড় ভালবাসি।…[গ্রামের সমস্যাগুলির] প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান-বিস্তারে। আর যাহারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কার্য্য করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভাল-মন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া—তবে।" (পৃ, ১৫১-২)

সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র হইলেন সব্যসাচী। এক কবিতা ছাড়া প্রায় সকল বিষয়ে তিনি লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন এবং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা গল্প-উপন্যাস-আলোচনা সবকিছুতেই সক্ষম করিয়াছিল। তাঁহার 'চরিত্রহীন' সম্পর্কে বলিতে গিয়া বহুবার টলস্টয়ের 'রেসারেকশন' উপন্যাসখানির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এখানি টলস্টয়ের 'বেষ্ট বুক' বা শ্রেষ্ঠ পুস্তক। Art for Art's sake—কথাটিতে শরৎচন্দ্রের মোটেই সায় নাই। কেননা তাঁহার মতে যাহা 'সুন্দর' তাহা 'শিব' না হইয়াই যায় না। সঙ্গীতচর্চা, চারুশিল্প প্রভৃতির অনুশীলনও তিনি করিতেন। এই সব চিঠিপত্রের অনেক স্থলে 'প্রবাসী'র উল্লেখ আছে। প্রবাসীর প্রতিষ্ঠা, আদর্শ প্রভৃতির দিকে নূতন সাহিত্যিক এবং পত্রিকা-সম্পাদকদের দৃষ্টি তিনি বহুবার আকর্ষণ করিয়াছেন। হাস্য-পরিহাসেও বুঝি তাঁহার জুড়ি নাই। শরৎচন্দ্রের মধ্যে বাস করিতেন এক 'বৈরাগী' মানুষ। সম্মান-অসম্মান, সুখ-দুঃখকে তিনি সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন। কুমিল্লা রাজনৈতিক সম্মেলনে যাইবার পথে তাঁহার কামরায় কয়লার গুঁড়া নিক্ষেপ ও খাস শহরে শোভাযাত্রা করিয়া আট ঘোড়ার রথে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া—দুই-ই শরৎচন্দ্রের নিকট একই কথা। তিনি বলিয়াছেন, মৃত্যুই স্বাভাবিক। মৃত্যু পর্য্যন্তই লোকের জন্য তাঁহার ভাবনা, মৃত্যুর পরে আর শোক করিবার প্রয়োজন কি? দীর্ঘদিনের অসুস্থতায়ও তাঁহার মোটে ক্ষোভ নাই, বরং ইহা লইয়া পরিহাসের অন্ত রাখেন না। কত সুন্দর শাশ্বত কথা চিঠির মধ্যে প্রকাশ! আবার, 'ষোড়শী' ও 'পথের দাবী' প্রসঙ্গে 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পত্রালাপের মধ্যে সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব মতামত লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের পত্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর আজিকার পাঠকের নিকট যুগপৎ উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র শরৎ-জীবনের উপরই শুধু আলোকপাত করে না, তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল হওয়ার পক্ষেও এগুলি অপরিহার্য্য।

পরিশেষে বর্ত্তমান পুস্তকখানির সঙ্কলন ও সম্পাদনা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। চিঠিপত্র সংগ্রহে যে কতখানি শ্রমস্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা পুস্তক দৃষ্টে সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু পত্রেও বিভিন্ন বিষয়, ব্যক্তি, কাল প্রভৃতি নির্ণয় করিতে গোপালবাবু বিশেষ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের জীবন এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারা এই পুস্তকখানির মধ্যে এমন বিষয়ের নির্দ্দেশ ও বিবৃতি পাইবেন যাহা অন্যত্র পাওয়া সুকঠিন। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত চিঠিপত্র, অভিনন্দন ও অন্যান্য রচনা একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় এখানি আকর-গ্রন্থের পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। মলাটে শরৎচন্দ্রের চিত্র এবং শরৎচন্দ্রের বাংলা ইংরেজী পত্রাংশের প্রতিলিপি ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। এরূপ একখানি গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল, রঘু ডাকাত

(নাটকত্রয় পুস্তকাকারে একত্রে সম্বদ্ধ)—মন্মথ রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিমের জীবন যেমনি সংঘাতময়—তেমনি বিষাদান্ত। পলাশীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন কাশেম আলী—বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। তাঁর স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেম, অতুলনীয় বীরত্ব নাট্যকার এমন জোরালো নাটকীয় আবেগ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন যে, মীরকাশিম চরিত্রের সঙ্গে আমরা যেন একাত্ম হয়ে যাই—তাঁর উত্তেজনায় আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠি—তাঁর বেদনায় ব্যথিত হই। এক কথায় তৎকালীন রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি অধ্যায় আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেই বিগত দিনের জাতীয় জীবনের হৃৎস্পন্দনধ্বনি আমরা যেন শুনতে পাই। নাট্যকার এক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তা ছাড়া তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে নজরে পড়ে। দর্শকের সস্তা হাততালির লোভে তিনি কোথাও ইতিহাসকে বিকৃত করেন নি—স্টান্ট বা চমকের সাহায্যে মেলোড্রামা সৃষ্টির প্রয়াস পান নি। ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে যে অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু প্রতিভাশালী প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের পক্ষেই সম্ভব।

কেওহেবজ্জের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
চুল উঠা বন্ধ করে
মাথা ঠাণ্ডা রাখে
এই মার্কা দেখে কিনুন • নকল থেকে সাবধান

একদা যুগে 'মীরকাশিম' বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আজও এর আবেদন পুরনো হয়ে যায় নি। নাটকের চরম সার্থকতা নির্ভর করে অভিনয়-সাফল্যের উপর। মীরকাশিম যে একখানি মঞ্চসফল নাটক তা বলা বাহুল্য। এ নাটকের অভিনয় সকল সময়েই দর্শকদের আনন্দবিধান করতে সমর্থ হবে।

"মমতাময়ী হাসপাতাল" একখানি কৌতুক-নাট্য। শ্লেষ নেই, ভাঁড়ামি নেই, ব্যঙ্গের কশাঘাত নেই—শুধু অনাবিল হাসির ঝরণাধারা বয়ে গেছে এই নাটকের ছত্রে ছত্রে। বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ হাসির নাটকের খুবই অভাব। 'মমতাময়ী হাসপাতাল'—বাংলার কৌতুক-নাট্য-সাহিত্যের সে অভাব পূরণ করবে সন্দেহ নেই।

রঘু ডাকাতের কাহিনী সুবিদিত। দুর্ধর্ষ রঘু ডাকাত কি করে কৃষ্ণভক্তে রূপান্তরিত হ'ল—সেই চিত্তাকর্ষক কাহিনীকে কেন্দ্র করেই 'রঘু ডাকাত' রচিত হয়েছে। এ ধরণের নাটক রচনায় মন্মথবাবুর জুড়ি নেই। নাট্যকারের ভাষার মাধুর্য এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য নাটকখানিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। এখানি যে দর্শক-সাধারণের মনোরঞ্জন করবে তাতে সন্দেহ নেই।

মহাভারতী (নাটক)—মন্মথ রায়। মূল্য ২।০।

বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন ও সর্বশেষ পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর—আমাদের এই পঞ্চাশ বৎসরের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাস আলোচ্য নাটকে রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার। এই ধরণের বিরাট পটভূমিকায় ইতিপূর্বে আর কোন সামাজিক নাটক-রচনার চেষ্টা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই এবং একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, নাট্যকারের প্রয়াস সার্থক হয়েছে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

মালাচন্দন—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ২৸৹ আনা।

চাষী বা শ্রমিকের সমস্যা লইয়া বাংলা সাহিত্যে বহু গল্প রচিত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে রসোত্তীর্ণ গল্পের সংখ্যা অতি অল্প। পক্ষান্তরে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের যে ছবি বাংলা কথা-সাহিত্যের আসর জুড়িয়া আছে তাহার অধিকাংশই পাঠকমনেও আসর জমাইয়া লইয়াছে। উহার একমাত্র কারণ—লেখক এবং পাঠক উভয় পক্ষেরই এই সমাজ ও মানুষের সঙ্গে পরিচয়টা অত্যন্ত নিবিড়। নিজ অভিজ্ঞতার পরিধিতে গল্প বলা এবং সে গল্প শুনিয়া (কিংবা পড়িয়া) রস গ্রহণ করা সহজ। গল্প এত সব পরিধি বিস্তৃত না হইলেও যায় আসে না; জীবনের সীমায়িত দিকটি স্পষ্ট হইলেই মধ্যবিত্ত মনের সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-ভালবাসা প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাহা বাহিরের ঘটনাকে প্রভাবিত করে, লেখকমনের সঙ্গে পাঠকমনের যোগসাধনাও অনায়াসে ঘটিয়া যায়। শ্রীযুত গজেন্দ্রকুমার মিত্রের আলোচ্য গল্প-সংগ্রহটিতে এমনই কয়েকটি গল্প আছে—যেগুলির প্রসার হয়ত ব্যাপক নয়, কিন্তু নিজ সীমায় সেগুলি সুসম্পূর্ণ। নিপুণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয়ে কয়েকটি গল্প তো বেশ উজ্জ্বল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'গৃহিণী' ও 'বিনয়' গল্প দুটির নাম করা যায়। মধ্যবিত্ত ঘরের ও মানুষের মনোজগতের বহু খুঁটিনাটি তথ্য এই দুটি গল্পে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। 'যোদ্ধা' গল্পে এক আদর্শবাদী দৃঢ়মনা শিক্ষকের চিত্র যেমন ফুটিয়াছে তেমনি চমৎকার ছবি পাওয়া যায় আশৈশব সমুদ্রের কোলে লালিত এক দরিদ্র পরিবারের—'তরঙ্গিত মহাসিন্ধু' গল্পে। 'বিবাহের ইতিবৃত্ত', 'মিছে কথা' গল্প দুটির সুর অপেক্ষাকৃত হাল্কা, গল্পের বুননও শিথিল, তবু গল্প বলার সরস ধরণটির জন্য গল্প শোনার দায়টুকু এড়ানো যায় না। 'ভক্তের' গল্পে হৃদয়-বেদনার সাথটি অত্যন্ত সুকৌশলে পরিবেশিত হইয়াছে। মোট কথা—গল্প-বলার সাবলীল ভঙ্গিই লেখকের প্রত্যেকটি গল্পকে পাঠকমনে পৌছাইয়া দিবে।

মোহনলাল—শ্রীশীতাংশু মিত্র। প্রদীপ পাবলিশার্স, ৩।২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য উল্লেখ নাই।

পলাশী-প্রান্তরে দেশের ভাগ্যপরীক্ষাকালে আমরা দেশপ্রেমিক বীর মোহনলালের সাক্ষাৎ পাই। ইতিহাসের ভাষণ সংক্ষিপ্ত হইলেও, কাব্য ও নাটকে তাঁহার প্রশস্তির অভাব হয় নাই, অথচ যুদ্ধের আগেকার মোহনলাল কেমন স্পষ্ট নহেন। মনে হয়, রণক্ষেত্রের মত সমাজেও মোহনলালকে পাওয়া গেলে চরিত্রটি সম্পূর্ণ হইত। কিন্তু এই চরিত্রটিকে সম্পূর্ণতা দান করিবার দায়িত্ব নাট্যকার যদি না লন তাহাতেও ক্ষতি নাই। যুগসন্ধিক্ষণে জন্ম-বেদনা, মোহান্ধতা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কে বাংলার আকাশ বাতাস একদিন গ্লানিযুক্ত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে পরিত্রাণলাভে ক্ষীণ প্রচেষ্টাও চলিয়াছিল; সেই মহৎ প্রচেষ্টার রূপটি মোহনলাল মীরমদনের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। নাট্যকার আলোচ্য নাটকে সেই দিকটিকে পরিচ্ছন্ন সংলাপ ও ঘটনার মাধ্যমে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

নাটকখানি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই, সুতরাং নাট্য-সৃষ্টি সার্থক কি অসার্থক সে বিচারে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে। তথাপি সৌখিন সম্প্রদায় এটি মঞ্চস্থ করিলে অতীত দিনের এক গরীয়ান্ চরিত্র ও কলঙ্কময় পরিবেশকে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্য পরিক্রমা—শ্রীকল্যাণনাথ [illegible] নারায়ণ লিঃ, ১৭০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কিছু রচনার সংক্ষি[illegible] সমালোচনা করিয়াছেন লেখক, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' সম্বন্ধেও কি[illegible] বলিয়াছেন এবং প্রগতি কাব্যের ধারা ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গ[illegible] ও প্রগতি নামে দুটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া বি[illegible] আলোচনার ক্ষেত্রটি অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্ব[illegible] তবু খানিকটা সুসংবদ্ধ চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক সাহিত[illegible] গহন বনে লেখক পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সম্মুখে যাহা পড়িয়[illegible] তাহাই নিশানা স্বরূপ ধরিয়া পথ চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে[illegible] হইয়াছে অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসাবে কয়েকটি [illegible] মন্দ লাগে না, কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা বলিতে যে বি[illegible] বিষয়বস্তুর ধারণা মনে জাগে, আলোচ্য পুস্তকখানির ক্ষুদ্র পরিসরে তাহ[illegible] ধরিয়া রাখাই মুশকিল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যা[illegible]

গীতপ্রবেশিকা—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

লেখকের পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন। সঙ্গীতকলায় তাঁহার নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমানে বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গায়ক। তাঁর চেয়ে বড় ওস্তাদ কেউ আছেন কিনা সে কথা বলা কঠিন।" বস্তুতঃ উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে তিনি বাংলার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং সমগ্র ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু গোপেশ্বরবাবু শুধু সঙ্গীতে ক্রিয়াসিদ্ধই নহেন, সঙ্গীতের উপপত্তিক (Theoretical) বিষয়েও যে তাঁহার ব্যুৎপত্তি গভীর সে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচিত সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থসমূহে। সঙ্গীত-শিক্ষাদাতা হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীদিগকে একেবারে গোড়া হইতে স্তরে স্তরে শাস্ত্রসম্মতভাবে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি বর্ত্তমান পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। ইহার স্বরলিপিগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে এবং শত বর্ষ পূর্ব্বে বাংলাদেশে উদ্ভাবিত, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম স্বরলিপি-পদ্ধতি—দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি-সঙ্কেতের পরিচয়ও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রচলিত স্বরলিপি-পুস্তকের সহিত সমালোচ্য পুস্তকের প্রধান পার্থক্য এই যে, ইহাতে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য—গায়কী ঢং রক্ষিত হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারে বাংলার তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকেন্দ্র বিষ্ণুপুরের যে ঘরানা সঙ্গীতধারা পুরুষানুক্রমে কণ্ঠ হইতে কণ্ঠান্তরে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে, এই পুস্তকের স্বরলিপিসমূহের মাধ্যমে তাহার বিশেষত্ব—গায়কী ঢং আয়ত্ত করিবার সুযোগ লাভ করিয়া সঙ্গীতশিক্ষার্থিগণ মনে মনে গ্রন্থকারকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।

পুস্তকখানি সঙ্গীতশিক্ষার্থীর পক্ষে রত্নখনিস্বরূপ। ইহাতে প্রদত্ত মাত্রাযোগে স্বরসাধন প্রণালী, কম্পন-সাধন, কড়ি ও কোমল সাধন, গিট-অলঙ্কার-সাধন ইত্যাদির প্রণালী এবং খেয়াল, ধ্রুপদ, ভজন ও ঠুংরী অঙ্গের বিখ্যাত সঙ্গীতাবলীর নির্ভুল স্বরলিপি এক দিকে যেমন শিক্ষার্থীর সঙ্গীতে ক্রিয়াসিদ্ধ হইবার পক্ষে সহায়ক হইবে, অন্য দিকে তেমনি ইহার 'শাস্ত্রবোধ' নামক অধ্যায়গুলিতে বিবৃত ভারতীয় সঙ্গীতকলার বিভিন্ন অঙ্গ এবং আঙ্গিকের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা উপপত্তিক দিক সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞানলাভের সহায়তা করিবে। রবীন্দ্রনাথের মিশ্র রাগরাগিণীর গানগুলির সহিতই সাধারণের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। কিন্তু অনেকেই অবগত নহেন যে, তাঁহার অনেকগুলি ধর্ম্মসঙ্গীতের সুরের কাঠামো পুরাতন হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরীর অনুকরণে রচিত। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ অঙ্গের "প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল"···(ভূপালী—সুরফাক্তা), "আছ অন্তরে চিরদিন" (কাফী—চৌতাল), "মহারাজ এ কি সাজে" (বেহাগ—ঝাঁপতাল) "আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা" (পূরবী—তেওরা) প্রভৃতি ধ্রুপদ অঙ্গের গানের স্বরলিপি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার মূল্য এবং মর্য্যাদা উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিতাল, একতাল, চৌতাল, ঝাঁপতাল, তেওড়া, সুরফাক্তা প্রভৃতি চলন্ত এবং প্রধান প্রধান তালে আলাহিয়া, বৃন্দাবনী সারঙ্গ, খাম্বাজ, ইমন, কাফি, বেহাগ, দেশ, ভৈরব, ভৈরবী, কেদারা, বাগেশ্রী, পূরবী, জৌনপুরী, ভূপালী এবং মালকোষ প্রভৃতি বিভিন্ন রাগরাগিণীর বিখ্যাত গানসমূহের স্বরলিপি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিক্ষার্থী শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবেন। মূলতঃ বাংলা ও হিন্দী উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের স্বরলিপি পুস্তক হইলেও, কয়েকটি বাউল ও ভাটিয়ালী প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতের স্বরলিপি সন্নিবেশিত করিয়া লেখক পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সর্ব্বশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে-মাতরম্'এর রবীন্দ্রনাথ-কৃত সুরের এবং 'জনগণমন-অধিনায়কে'র স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে বাংলার দান কতটুকু, পুরাতন সঙ্গীত-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে এবং সমগ্র ভারতে তাহা প্রচারের মূলে বাংলার ব্রাহ্মসমাজের কৃতিত্ব এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কতখানি, ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্বরলিপি আবিষ্কারের কৃতিত্ব কোন্ বাঙালীর, বাংলার সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যই বা কি—গ্রন্থের 'শাস্ত্রবোধ' এবং 'অনুশীলনী' নামক অধ্যায়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিলে এ সকল তথ্য অবগত হইয়া বাঙালীমাত্রেই গৌরববোধ করিবেন।

সঙ্গীত শ্রেষ্ঠতম কলাবিদ্যা—এই বিদ্যা গুরুমুখী এবং ইহাতে সিদ্ধিলাভ কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। উপযুক্ত গুরু বা ওস্তাদের অভাবে স্বরলিপি-পুস্তকই সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর একমাত্র অবলম্বন। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিক্ষার পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্গীতনায়ক মহাশয় কর্ত্তৃক বহু আয়াসে রচিত "গীত-প্রবেশিকা" স্বরলিপির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিস্মিত দৃষ্টির সমক্ষে এক নিরুপম 'সুর'-লোকের রহস্যকক্ষ উদ্ঘাটিত করিবে—এই পুস্তকে প্রদত্ত তানসেন, সদারঙ্গ প্রমুখ প্রাচীন কালের এবং যদু ভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রন্থকারের পিতা) ও আধুনিক কালের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গায়ক ও সুরশিল্পীদের রচিত গানের স্বরলিপি আয়ত্ত করিলে রসপরিবেশনের এক অনুপম অমৃত-ভাণ্ড তাঁহাদের করায়ত্ত হইবে। পুস্তকখানির সংস্করণবাহুল্য (৩য় সং) ইহার ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।
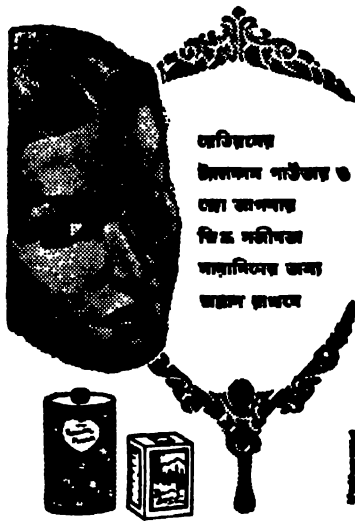
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

গল্প পঞ্চক—শ্রীহরিদাস ঘোষ। এ, মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৷০

ভুল, কণ্ট লাল, অনুতাপ, অভিমান ও অবিচার এই পাঁচটি গল্প আলোচ্য পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গল্পই শিক্ষামূলক—কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করিয়া লেখা। গল্পগুলি সুলিখিত ও চিত্তাকর্ষক।

মৌনমুখ—শ্রীকুমুদকান্ত চক্রবর্ত্তী। ডি. এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২৲

উপন্যাস। কয়েকটি, অনুন্নত পরিবারের সামাজিক জীবনের সুখ, দুঃখ, উত্থান ও পতনের কাহিনী। কানাইয়া, মোহিনী, রাধাচরণ, বড়বাবু, কঙ্কা, শশী ও তার মা, শশীর অবৈধ সন্তানের পিতা তারাচরণ ও তার স্বামী সখিনাথকে লেখক অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পরিবেশসৃষ্টির ত্রুটির জন্য সে চেষ্টা পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। কঙ্কা, মোহিনী এবং শশীর সুস্থ চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ পুস্তকখানিকে বহু স্থানে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইলেও এই কথাটাই বারে বারে মনে হইয়াছে—যে সমাজে যে পরিবেশে উহারা মানুষ কোন প্রকারের শিক্ষাই যাহারা পায় নাই তাহাদের পক্ষে এই ধরণের চিন্তা করা এবং তাহা প্রকাশ করা কি স্বাভাবিক না সম্ভব?

লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হইলেও গল্প বলিবার শক্তি তাঁর আছে। এই ধরণের ত্রুটি হইতে মুক্ত হইতে পারিলে ভবিষ্যতে তাঁর নিকট ভাল কিছু আশা করা যাইতে পারে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বটের বাঁশী—স্বামী সত্যানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ২ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬। পৃঃ ২০০। মূল্য ৩৲

ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় রচিত ভক্ত ও সাধক-কবির এই গানগুলি বিদ্যাপতি ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে রচিত। গানগুলি এরূপ সুমিষ্ট, মর্ম্মস্পর্শী ও ভাবব্যঞ্জক যে, পড়িলে হৃদয় অপূর্ব্ব ভাবরসে সিঞ্চিত হয় ও হৃদয়তন্ত্রী সুরে অনুরণিত হইয়া উঠে। দিবসের প্রখর রৌদ্রতাপে কঠোর পরিশ্রমের পর স্নিগ্ধ সুশীতল বটচ্ছায়ায় বসিয়া ব্রজের রাখাল যেমন মনমাতানো সুরে আকাশ বাতাস প্লাবিত করিয়া বাঁশীতে তান ধরিয়া ব্রজবাসীকে মুগ্ধ করিত, গ্রন্থকারও তেমনই ভাবের আবেগে বটের বাঁশীতে প্রাণ-মাতানো সঙ্গীতগুলি গাহিয়াছেন। কবিতাগুলি বেগুনী কালিতে ছাপা, প্রত্যেক পৃষ্ঠাই চিত্রিত, উপহারোপযোগী সিল্কের কাপড়ে বাঁধাই।

(১) যদুলাল মল্লিকের জীবন-কথা, (২) মন্মথনাথ স্মৃতি-কথা—শ্রীরাসবিহারী মল্লিক। সাহিত্য-তীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের বিখ্যাত দানবীর নিমাইচরণ মল্লিকের পৌত্র যদুলাল মল্লিক এক দিকে যেমন বদান্য ধনী হিসাবে রাজ-পুরুষগণ কর্তৃক সম্মানিত হইতেন, অন্য দিকে তেমনই স্বাধীনচেতা বাগ্মী ও পরদুঃখ-কাতর জনসেবক এবং দাতা হিসাবে দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র মন্মথনাথ মল্লিকও পিতার ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন। যদুলাল মল্লিকের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল, তাঁহার স্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, রামকৃষ্ণদেবও যদুলালের পুত্রগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। লেখক তাঁহার পিতা ও পিতামহের জীবন-কথা সুষ্ঠুভাবে এই পুস্তিকা দুটিতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

সাংবাদিক এন. কে. দত্ত

আসামের বিখ্যাত সাংবাদিক এন. কে দত্ত গত ২৮শে জানুয়ারি ৭৩ বৎসর বয়সে সেরিব্র্যাল থ্রম্বসিস রোগে তাঁহার শিলঙস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আসামের সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান্ সাংবাদিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আসামের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার দত্তগ্রামে ১৮৮২ সনে এন. কে. দত্তের জন্ম হয়। করিমগঞ্জ মিশন হাই স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং উক্ত কলেজ হইতে বি-এ পাস করেন। সমগ্র বরিশালে তখন যে সাত জন প্রথম গ্রাজুয়েট হন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম: অতঃপর তিনি শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হন এবং অবিভক্ত বাংলা ও আসামের বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। প্রধান শিক্ষকরূপে তাঁহার শেষ কর্ম্মস্থল হবিগঞ্জ মহকুমার বানিয়াচঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়। তাঁহার পরিচালনাধীনে উক্ত বিদ্যালয়টি কয়েক বৎসরের জন্য সমগ্র প্রদেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়।

গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ সাংবাদিকতার সহিত দত্ত মহাশয়ের যোগাযোগ ছিল। তিনি "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ" এবং কলিকাতার "ইংলিশম্যান" ও "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ তিনি শেষোক্ত পত্রিকাটির শিলঙস্থ প্রতিনিধি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই এবং দিল্লীর "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস", কলিকাতার "আসাম রিভিয়্" এবং কাছাড় জেলার শিলচর হইতে শ্রীপ্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামীর সম্পাদকতায় প্রকাশিত "দি ক্রনিকল" প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তিনি আসামের সাংবাদিক জগতের দিকপাল বলিয়া গণ্য হইতেন। শিলং জার্ণালিষ্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তাঁহার শোক-সভায় "আসাম ট্রিবিউনে"র এন. সি রাজখোয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে গিয়া বলেন—"আসাম রাজ্যে

সাংবাদিকতা বর্তমানে যে স্তরে উন্নীত হইয়াছে, তাহার কৃতিত্ব এন. কে দত্তের।"

আসামের রাজ্যপাল শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া যে বাণী প্রেরণ করেন তাহাতে বলেন, গত চার বৎসর যাবৎ তিনি তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার কৃতির কথা তিনি জানিতেন। দত্ত মহাশয়ের ব্যাপক অভিজ্ঞতার জন্য সহকর্মীরা যে তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তিনি যে বাস্তবিকই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, প্রদেশপাল তাহারও উল্লেখ করেন।

চরিত্র-মাধুর্য্যের জন্য উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যেই দত্ত মহাশয়ের অনুরাগীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। সততা, সত্যানুরাগ এবং স্পষ্টবক্তৃত্ব ছিল তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শিল্পী শ্রীবিমল সিংহ

তরুণবয়স্ক মণিপুরী চিত্রশিল্পী শ্রীবিমল সিংহ শিল্পকলা শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিঃসম্বল অবস্থায় মণিপুর হইতে কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিবার পর অর্থাভাবে তাঁহাকে নানা বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। আশ্রয়ের অভাবে তাঁহাকে পথে এবং পার্কে অবস্থান করিয়া অনশনে-অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হয়। কিন্তু এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও না দমিয়া গিয়া তিনি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কিছু কিছু রোজগার করিতে থাকেন এবং আর্ট কলেজে ভর্ত্তি হন। কায়ক্লেশে সেখানকার খরচ চালাইয়া তিনি শিল্পকলা শিক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ায় অকালে তাঁহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি রচনা হইতে চলিয়াছে। আর্ট কলেজের ছাত্রগণ তাঁহার চিকিৎসা ও সাহায্যের জন্য "চ্যারিটি" অভিনয় করিয়া কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কিছুই নহে। নিদারুণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ফলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত এই শিল্পীর প্রতি যেমন সমাজের তেমনি সরকারেরও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সরকারী হাসপাতালে শিল্পী বিমল সিংহ যাহাতে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ পান তাহার আশু ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আঁটপুর পল্লী উন্নয়ন প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে এবং আঁটপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রবৃন্দ ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার অন্তর্গত আঁটপুর গ্রামে, আঁটপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। সরকারী কৃষি বিভাগ, পশু-চিকিৎসা বিভাগ এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগ এই প্রদর্শনীতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীশরৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। কৃষিজ দ্রব্য এবং কুটীর-শিল্প প্রদর্শনীর বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল। প্রদর্শনীর সঙ্গে একটি মনোরম মাতৃকল্যাণ ও শিশু-মঙ্গল অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রদর্শনী ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল; উক্ত দিন একই সঙ্গে প্রদর্শনী এবং আঁটপুর বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষ যুক্ত-অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ, সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় এবং প্রদর্শনীর পুরস্কারের সংখ্যা এবং অভিনবত্ব সকলকেই চমৎকৃত করে। উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—রায় বাহাদুর দীননাথ দে ("অরুণোদয়", মধুপুর) কর্ত্তৃক প্রদত্ত দুইটি বৃহৎ রৌপ্যপদক। শ্রীমান্ গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় নামক নবম শ্রেণীর একটি ছাত্র দুর্বৃত্তের হাত হইতে একটি বিবাহিতা তরুণীকে আপনার বুদ্ধিবলে রক্ষা করায় তাহাকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের জন্য—যথা: সমাজসেবা, সৎসাহস, কৃষিকার্য্যে দক্ষতা প্রভৃতি রৌপ্যপদক, কাপ ইত্যাদি দেওয়া হয়।

আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান; ইহা আকারে, সাজসজ্জায় এবং আড়ম্বরে ক্ষুদ্র হইলেও গ্রামাঞ্চলে ইহার উপকারিতা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রদর্শনী উপলক্ষে আঁটপুরে গমন করেন। ১৯৫২ সনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয় প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন; আমেরিকার "কেয়ার" মিশন কর্ত্তৃক প্রদত্ত নানাবিধ কৃষিযন্ত্রাদি পুরস্কার হিসাবে প্রদত্ত হয় এবং ইহার সংখ্যা ও অভিনবত্ব সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করে।

গ্রামাঞ্চলে এইরূপ ছোট ছোট প্রদর্শনী জনশিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। এই দিকে রাষ্ট্রের সহযোগিতা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বার্ষিক আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাতা।

শ্রীএষা হালদার

জব্বলপুর প্রবাসী ডাঃ এন. হালদারের চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী এষা হালদার বিশিষ্ট নৃত্যগুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া ভারতীয় নৃত্যকলায় বিশেষ নৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। মধ্য-প্রদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভরত নাট্যম্ প্রভৃতির মত দুরূহ এবং উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলায় পারদর্শিতার জন্য তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

গত ২৮শে জানুয়ারী জব্বলপুরের নেপিয়ার টাউনে বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসুর ভবনে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান 'বিচিত্রা বাসর' কর্ত্তৃক এক বিচিত্রানু-

ভরতনাট্যম নৃত্যভঙ্গীতে শ্রীএষা হালদার

শ্রীপাঁচকড়ি দে 'শিক্ষা ও মানুষের সেবা' সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, "সেবা কথাটির ব্যাপক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে গেলেই শিক্ষার প্রয়োজন এবং তা বুঝতে হলে আমাদিগকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে যুগোপযোগী নূতন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হতে হবে।" সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়। তিনি তাঁর ভাষণে গত কয়েক দিন নিজের আশ্রমবাসের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া ছাত্রদের দৈনন্দিন কর্মধারার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শিক্ষায় চিরাচরিত সঙ্কীর্ণ রীতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন।

সেবায়তনের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দসহ আচার্য্য

ষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী এষার ভরত নাটাম্ তিল্লানা সকলকে মুগ্ধ করে।

শ্রীমতী এষার মাতা শ্রীচেনা হালদার একজন কবি ও বিশিষ্ট লেখিকা।

সেবায়তনের একাদশ প্রতিষ্ঠা-দিবস

• ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের একাদশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে গত ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪ তারিখে ব্রহ্মসূত্রজ্ঞ স্বামী প্রেমানন্দ গিরিজীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে কর্মচাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়।

আশ্রমবাসিগণ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া যোগমন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইলে পর স্বামীজী আশ্রমের গৈরিক পতাকা উত্তোলন করেন। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে আগত অতিথি ভক্তবৃন্দের ভিড় হইতে থাকে। বেলা পৌনে তিনটায় স্থানীয় খ্যাতনামা জনসেবক শ্রীগোপীনাথ পতি বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তার পর যোগমন্দির-প্রাঙ্গণে মূল অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর আশ্রম-বালকগণ সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করে। অতঃপর আশ্রম-সচিব শ্রীশৈলেশমোহন মজুমদার আশ্রমের বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। আশ্রম-বিত্তালয়ের অধ্যক্ষ

সান্ধ্য প্রার্থনার পর কলিকাতা হইতে আগত শিল্পীবৃন্দের কণ্ঠ-সঙ্গীত, বাঁশী, ভজন ও কীর্তনগান সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে ২৫শে ডিসেম্বর সকালে আশ্রমের ক্রিয়াবান সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানে আশ্রমাচার্য্য স্বামীজী পৌরোহিত্য করেন। সাধকগণ নিজেদের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। সন্ধ্যায় প্রার্থনাসভায় যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ করিয়া স্বামীজী বলেন, "যে

আশ্রম-সচিব শ্রীশৈলেশমোহন মজুমদার কর্তৃক রিপোর্ট পাঠ

ক্রিয়াবান সম্মেলনে বক্তৃতারত আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি

মহা অবতার এক দিন আত্মত্যাগের দ্বারা পৃথিবীতে প্রেম ও শান্তির পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেরই অবনত মস্তকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে সকল দেশেই কোটি কোটি নরনারী আজ তাঁর জন্মোৎসব প্রতিপালন করছেন। আমাদের এই উৎসবের লক্ষ্যও আনন্দ এবং শান্তি, তাই এই শুভ দিনে এই উৎসবের মধ্যে পরিত্রাতা যীশুর শান্তির বাণী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়।" প্রার্থনার পর স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅবনী-ভূষণ কুণ্ডু "নৌকাবিলাস" কীর্ত্তনের মাধ্যমে বৈষ্ণবতত্ত্ব পরিবেশন করিয়া সকলের আনন্দবিধান করেন। রাত্রি দশটায় সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন, ভজন, রাগ-প্রধান সঙ্গীত ইত্যাদি শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হন। অবশেষে গভীর রাত্রিতে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন এই জেলার মাকড়দহ-গ্রামে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সঙ্ঘটি প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে পাঠাগারের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই জেলার ১৭২টি পাঠাগার এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাওড়ার পাঠাগার-সমূহের প্রকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত দ্বিতীয় বর্ষে আড়াই হাজার টাকা সাহায্য দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্যের বরাদ্দ হইয়াছে। তবে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় পাঠাগার গঠনকল্পে এই টাকার একটি মোটা অংশ ব্যয় হইবে। বিভিন্ন পাঠাগারের সাহায্যের খাতেও যথেষ্ট টাকা রহিয়াছে। এই অর্থে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সক্রিয় সহায়তায় হাওড়া জেলার পাঠাগারসমূহ সত্যিকার উন্নতি লাভ করিবে আশা করা যায়। পাঠাগার সঙ্ঘের গত অধিবেশনে পাঠাগার-কর্ম্মীদের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে তাহাতে এই আকাঙ্ক্ষা অচিরে ফলপ্রসূ হইবে বলিয়াই মনে হয়।

এই দিনে মাকড়দহে দুইটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সকালে অনুষ্ঠিত হয় পাঠাগারকর্ম্মী সম্মেলন। এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সহ-সম্পাদক সুসাহিত্যিক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল। তিনি স্বীয় ভাষণে পাঠাগার সম্পর্কে তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি বর্ণনা দিয়া বলেন যে, প্রত্যেক পাঠাগার-কর্ম্মীকে স্বদেশবাসীদের মধ্যে সত্যকার শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারে সহায়ক হইতে হইবে। শুধু পাঠকে

হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন

উপবিষ্ট (বামদিক হইতে): শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (১ম), শ্রীবি. এস. কেশবন (২য়), শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় (৫ম), ড. শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত (৬ষ্ঠ), শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (৭ম), অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (৮ম), ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল (৯ম)

পুস্তক সরবরাহ করিলেই পাঠাগারকর্মীর কর্তব্য সম্পাদিত হয় না, জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ পাঠে যাহাতে পাঠকের রুচি জন্মে তাহারও আয়োজন করিতে হইবে। পাঠাগারগুলির সঙ্গে আঞ্চলিক জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয়ের এক একটি মিউজিয়ম থাকা আবশ্যক। শিক্ষাকে বস্তুগত করিয়া তোলার পক্ষে ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সভায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মী এবং পাঠাগারদের সভাপতি শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় পাঠাগার সংক্রান্ত নানা সমস্যার আলোচনা করেন। হাওড়া জেলার সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীযুত মন্মথনাথ রায়ও এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

ঐ দিন অপরাহ্ণে সম্মেলনের মূল অধিবেশন হয়। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. এস. কেশবন। সভাপতি পদে বৃত হন সুপণ্ডিত অধ্যাপক ড. শ্রীযুত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ভাষণ বিশেষ মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। মাকড়দহনিবাসী শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উপস্থিত মাননীয় অতিথিবৃন্দ এবং বিভিন্ন পাঠাগারের প্রতিনিধিগণকে অভিনন্দন জানান। অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, সঙ্ঘপতি শ্রীযুত রতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট প্রতিনিধি ও সুধীবৃন্দ সংক্ষেপে পাঠাগার আন্দোলন সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি ড. দাশগুপ্ত সমাজ-জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব এবং পাঠাগারের কর্তব্যাদি বিষয়ে যে ভাষণ দেন তাহা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সভার আরম্ভে ও শেষে সুমধুর সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতৃবর্গ আপ্যায়িত হন। সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন। এবারে স্বল্পকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ-কেন্দ্রে যেসব কর্মী উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। পাঠাগার-সঙ্ঘ হাওড়া জেলায় পাঠাগারগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে জনশিক্ষার প্রকৃষ্ট কেন্দ্র করিয়া তুলিতে অগ্রণী হইয়াছেন। আমরা সর্বান্তঃকরণে সঙ্ঘের সাফল্য কামনা করি।

কুসুমমালা দেবী

শ্রীঅবন্তী দেবী

ছোট পিসীমাতা কুসুমমালা দেবী সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আমার জেষ্ঠা ননদিনী লোকান্তরিতা হেমলতা দেবী অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিলেন।

আমার দাদাশ্বশুর পূজনীয় হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রণী ছিলেন। ১৮৫৯ সনে মজিলপুরে যখন প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ইনিই গ্রামের জমিদার ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদিগের বিরাগ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কন্যাদের ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কন্যাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সেইজন্য পিসীমাতা ঠাকুরাণী অনেক সময় বলিতেন, "কন্যা-বৎসল বংশ।"

তখন বালিকা-বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হইত পিসীমাতারও হইয়াছিল। হরিনাভির নিকটবর্ত্তী রাজপুর গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ যুবক ভবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমি ইঁহাকে দেখি নাই কিন্তু আমার ছোট শাশুড়ীঠাকুরাণী ও হেমদিদি প্রভৃতির নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি গৌরবর্ণ, সুশ্রী, সৎ ও উন্নতমনা ব্যক্তি ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সম্পাদিত সঞ্জীবনী পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন। ইনি বৃদ্ধামাতা, বাইশ বৎসরবয়স্কা পত্নী, দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া অকালে পরলোকে গমন করেন। তিনি মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। শুনিয়াছি মৃত্যুশয্যায় ইঁহার মাতা পুত্রশোকে যখন অধীরা হইয়া "ভব, তুই চলে গেলি আমাকে কে দেখবে" বলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন তখন আমার শ্বশুর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া "মাঐমা আমি আছি, আপনার ভার আমি নিলাম, আপনি কাঁদবেন না" বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। যত দিন এই পুত্রহারা বিধবা জীবিতা ছিলেন, শ্বশুরমহাশয় তত দিন তাঁহার ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতামাতা পুত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হওয়াতে দারুণ মনঃকষ্টে মজিলপুরের গৃহ ত্যাগ করিয়া কাশীবাস করিবার সঙ্কল্প লইয়া কাশীতে চলিয়া যান।

কনিষ্ঠা কন্যা বিধবা হওয়াতে ও ইঁহার শ্বশুরগৃহে অভিভাবকস্থানীয় কেহ না থাকায় তাঁহারা কাশীবাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় মজিলপুরে আসিয়া এই কন্যা ও তাঁহার সন্তানগণের ভার গ্রহণ করেন। শ্বশুর মহাশয়ও ইঁহাদের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইঁহাদিগকে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করিতে থাকেন।

১৯০১ সনে আমার বিবাহ হয়, তখন পিসীমাতার বয়স তেত্রিশ বৎসর ছিল। তখন হইতে এই দীর্ঘ তিপ্পান্ন বৎসরের মধ্যে আমি তাঁহাকে কত ভাবে পাইয়াছি। কত সময় তিনি আমাদের নিকট বাস করিতেন।

ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন, এবং পণ্ডিত পিতার নিকট সর্ব্বদা থাকার দরুন বিবিধ শাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। ইঁহাদের বাক্যালাপ এরূপ শুদ্ধ ভাষায় হইত ও এত বিষয় পিসীমাতার জানা ছিল যে, কিছুক্ষণ তাঁহার কাছে বসিলে, আমরা প্রচুর শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিতাম। আমার বড় ননদ স্বর্গীয়া হেমলতা দেবী অনেক সময় বলিতেন, "আমার পিসীকে যদি সভায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত, মাৎ করে দিতে পারতেন। কি শুদ্ধ ভাষা, কি বর্ণনা-ভঙ্গী—যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে ঘটনাগুলি।" পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যাসাগরের কন্যা আজন্ম যে উদার, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ পিতার সাহচর্য্য পাইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব তাঁহার আচরণে সর্ব্বতোভাবে পরিলক্ষিত হইত। ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

ইঁহার প্রতি শ্বশুর মহাশয়ের গভীর স্নেহ ছিল। মজিলপুরের ঘর-সংসারের সমুদয় কার্য্যে ও বৃদ্ধ পিতামাতার সেবায় পিসীমা যেন নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার কত গল্প তিনি আমাদিগের নিকট করিতেন। পিতার সামান্য কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইত, আবার এমনি শিশুসুলভ সরলতা ছিল যে একটুকুতেই ভুলিয়া গিয়া বালকের মত উচ্চহাস্য করিতেন। পিসীমাতার বর্ণনাগুণে সেই সকল গল্প আমাদিগের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠিত। তাঁহার দাদার কথা বলিতে আনন্দে ভক্তিতে তাঁহার আনন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। পিসীমাতা যেন তাঁহার ক্রোড়ের সন্তান হইয়া ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁহারা কত সময় শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ইঁহারা দুই ভাইবোনে তখন কি ভাবে পিতামাতাকে প্রসন্ন রাখা যায় সে বিষয় আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন।

কত দৃশ্যই চোখের উপর ভাসিতেছে। এই তিপ্পান্ন বৎসর ধরিয়া পিসীমার কত স্নেহাশীর্ব্বাদ, কল্যাণকামনা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—সুখ-দুঃখ, বিপদ-সম্পদ, রোগ-শোক, সব সময়েই পিসীমাতা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার সাহচর্য্য দিয়া আমাদিগকে অভয় দিয়াছেন—আনন্দে সম্পদে গৃহকে উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছেন।

তিনি হেমদিদি অপেক্ষা কয়েক মাসের ছোট ছিলেন। প্রায় সমবয়সী এই পিসী-ভাইঝির মধ্যে গভীর ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল। হেমদিদির স্বামীর দেহত্যাগের পর সান্ত্বনা দিবার জন্য, "চল্ জন্মভূমি, পিতৃপুরুষের দেশ দেখবি চল্" বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ জীবনের পুণ্যতীর্থে লইয়া যান। ধর্ম্মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি, সকলের সহিত প্রীতির যোগ, শেষ বয়স পর্য্যন্ত সকলের সুখে-দুঃখে প্রাণ দিয়া সাহায্য করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। বহু রোগের টোটকা ঔষধ তাঁহার জানা ছিল, তাহা দ্বারা কত লোককে সুস্থ করিয়াছেন। অতি বৃদ্ধ বয়সেও গরীব ছেলেমেয়েদের সকালে সন্ধ্যায় পড়াইতেন। তিনি তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহের সকল প্রকার উন্নত ভাবের অধিকারিণী ছিলেন।

তাঁহার জীবনে কত শোক, কত সংগ্রাম আসিয়াছে। একমাত্র কন্যার বিয়োগবেদনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। পিতা, মাতা, স্বামী, একে একে কত আত্মীয়-স্বজন তাঁহার চক্ষের সমক্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন। এমন ভ্রাতা—যাঁহার কথা বলিতে গিয়া তিনি শ্রদ্ধাভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন তিনি পর্য্যন্ত তাঁহাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি ভাঙিয়া পড়েন নাই। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। তার পর সুদীর্ঘ পঁয়ষট্টি বৎসরকাল স্বামীর স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে ধারণ-পূর্ব্বক সকল গুরুজনের আশীর্ব্বাদ নিয়ত স্মরণ করিয়া, অবিচলিতভাবে কঠিন কর্ত্তব্যপালনে নিজ জীবনটিকে সার্থক করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যে ভ্রাতাকে আদর্শ করিয়া নিজের জীবন গঠন করেন তাঁহারই ন্যায় ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া কর্ত্তব্যপালনকেই জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বংশের রসবোধও তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন—তাই দায়িত্বপূর্ণ অজস্র কাজের মধ্যেও হাস্যরসের মাধুর্য্য তাঁহার জীবনে তিক্ততা আনিতে পারে নাই।

পৃথিবী হইতে চিরবিদায়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ও দাদা আমাকে ডাকছেন—বলছেন, তুমি সিদ্ধকাম হয়েছ এবার চলে এস।" পিতামাতার পুণ্যস্মৃতিপূত ঘরখানিতে, তাঁহাদের ব্যবহৃত খাটে শুইয়া শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার যে বাসনা সে সাধটিও পূর্ণ হইয়াছে। তিনি অন্তরে যাহা পোষণ করিতেন তাহাও পূর্ণ হইয়াছিল।

শ্বশুর মহাশয় অনেক সময় বলিতেন, "আমি ছেলে হয়ে মা-বাবার কাজে এলাম না, কুসী আমার সেই কাজ করছে।" তিনি কত কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ যে প্রকাশ করিতেন ও প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন তাহা আজও মনে জাগিতেছে।*

---

* শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯